

CUK - H04 882-41-P30118

প্রবাসী

756.3
018

সচিত্র মাসিক পত্র

২৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড

১৩৩৪

(41)

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য: ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ হইতে—আশ্বিন

২৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৩৪

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
অশুভ রক্তার শিল্প-পরিচয়—শ্রী নীহাররঞ্জন রায়...	৩৬১	উমাপদ রায় (সচিত্র)
অল্পমত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়ক সভা	৭৭২	উর্ধ্বশী ও পুরুষা—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত
অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে কমাল পাশার মত	৬২৪	উড়িষ্যার আত্মপনা (সচিত্র) শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু
অবলা বহুর পত্রাবলী	১৩	একটিলে দুই পাখী (সচিত্র)
অবলা-আশ্রম	৭৭২	এডিনবরাহ বর্ণ বিবেচ
অভিনব উপায়ে রাস্তা পরিষ্কার	৪৩৩	ওমব-সুহৃৎ আবু আলি সিনা
অরুণ রতন (অরলিপি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও		ওলাউঠার টাকা
শ্রী সাহানা দেবী	২৩২	কনোজরাণী রাজ্যশ্রী (কষ্টি)—শ্রী প্রবোধচন্দ্র
অষ্টগ্রায় নির্মাসিত রাজপুত্র (সচিত্র)	৬০০	
আকবর নামায় চাঁদ রায় কেনার রায় (কষ্টি)—		কবিতা-চুরির অভিযোগ
শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন	৭০৫	কথোক্তো দ্বীপের অদ্ভুত জ্ঞানোয়ার (সচিত্র)
আত্মশক্তি—শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৭৭৬	কলিকাতা অনাথ-আশ্রম
আধুনিক কাঠ খোদাই চিত্র (সচিত্র)		কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী সজ্জনীকান্ত দাস	৮২১	কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চাকরী ভাগ
আম্বার রহিমের বক্তৃতা, স্মার	২২১	কলিকাতায় বক্রীদ
আমরা কাদি কেন (সচিত্র)	৪৩৩	কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য প্রকল্প
আমেরিকার দুই মনীষী (সচিত্র)	২৪২	কলিকাতার ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর আক্রমণ
আয়ল্যান্ড ও ভারতবর্ষ (কষ্টি)	৫২৮	কষ্টিপাথর ৫১, ২০৩, ৩৪৪, ৫২
আর-এক ভারত-হিতৈষিণী পাশ্চাত্য জ্ঞানলোক	২২৪	করেদীদেব কথ
আলাপ-আলোচনা—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩১, ৭৭৪	কংগ্রেস পার জাতীয় নাই
আলোক-সঙ্গীত (সচিত্র)	৬০১	কাকেরী ষড়ষজের মামলার রায়
আলোচনা ১২৪, ২৩৬, ৩২৩, ২০৩		কাব্য-আলোচনা—শ্রী স্বশীলকুমার দে
আষাঢ়-শেষে (কবিতা)—শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী	৫৪৫	কাকশিল্পের পুনরুদ্ধার—শ্রী শান্তা দেবী
আহ্বান (কবিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২২	কাল-বৈশাখী (কবিতা)—শ্রী প্রিয়দর্শন
অ্যাথিনিয়াম ইন্সটিটিউশন	১৪৩	ক্যাথারিন মেয়োর এরকন পূর্বগ
ইমাম আবুলকতেহ ওমর-বিন ইব্রাহীম-অল-খৈয়ামী		ক্যাথারিন মেয়োর বহির উদ্দেশ
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—শ্রী অমৃতলাল শীল	১৬০	ক্যাথারিন মেয়োর প্রথম মিথ্যা কথা
উইলিয়ম সিম্পসনের সাক্ষ্য, স্মার	১৫২	ক্যাথারিন মেয়োর “ভারত-মাতা”
উগ্রচণ্ডা (গল্প)—শ্রী সীতা দেবী	৮৪২	কুকুর ও চীনদেশের মাছ
উচ্চ বর্ণের হল-চালন	৬১৬	কুমিল্লার দাঙ্গা
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২২১	কৃত্রিম আলোকে বৃক্ষপালন (সচিত্র)
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার	৭৬৮	কোইরা-সানের যাত্রী (সচিত্র) শ্রী প্র
উত্তাপহীন আলো (সচিত্র)	৬০৩	কীরোর প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩৩	টলষ্টয়ের একখানি চিঠি—শ্রী কালিদাস নাগ	৪৮২
২২৮	ডাকমাশুল কেন কমিল না ?	১৩৮
৬২২	ঢাকা অনাথ আশ্রম	১৪৮
৫৪৫, ৭১৪	তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি দয়া	৪৫৫
২	ত্রিপুরার মহারাজার গঙ্গাপ্রাপ্তি	২৪৬
৮২৩	ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব	১৫২
৬, ২২২	দান (কবিতা, কষ্টি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১
৩২	দাক্ষিণ্য (সচিত্র)—শ্রী কেশবচন্দ্র বসু	৪১৮
৫০৪	দুইবার বাজা (গল্প)—শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৬৮
৪২৬	দুর্গা (সচিত্র)	৪৩১
৪৬৫	দেশবিশেষের কথা (সচিত্র) শ্রী প্রভাত সান্যাল	১১৭,
৫৪	২৬২, ৪০২, ৫৬৪, ৭৪১, ৯১২	
৩৩৪	ধর্মের গান কতকালের ?—শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়	৬৩২
৫২৮	ধর্মবিষয়ক নিন্দা কুংসা	৬২৮
৬২৬	ধর্মবোধ—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫৭
৭৭১	ধর্মিতা নাবীর আত্মীয়দের পাতিত্যা	২৮৩
৭৩৫	ধাতুত্বপ-মহার্ণব	১৫২
৬.৩	নববর্ষ—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৭
৪৩২	নারীবক্ষা	৬২৩
২৫৪	নাড়ী-পরীক্ষার যন্ত্র (সচিত্র)	৬০২
৫২৭	নিউইয়র্কের অলংলিহ প্রাসাদ ও অগ্নিকাণ্ড সমস্ত	
৪৩০	(সচিত্র)	৫২৬
১৪২	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সচিত্র)	২২৫
২৮৪	নিপীড়িত জাতিসমূহের কংগ্রেস (সচিত্র)	১২৭
৭১	নিরাশ্রয় বালিকা. যুবতী ও অন্ধ নারীদের আশ্রম	১৩৬
২৩১	নির্বাকচন্দ্র সঙ্কল্প কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন	৪৩৬
৭৩৮	নির্বাকচন্দ্র (কবিতা)—শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু	৩২১
৮২৪	নৃত্য (কষ্টি)—শ্রী অমল্যচরণ বিদ্যাকৃষ্ণ	৫২২
৪৩২	নেপাল ও আফগানিস্থান	৪৫৬
২৬৮	নেপালে রেলওয়ে	১৫২
২৪৮	পঞ্চশস্ত্র (সচিত্র)—শ্রী সঞ্জয়কান্ত দাস	১১২,
	২৫৩, ৪৩০, ৫২৬, ৭০৪, ৯০৫	
৫২৬	পাঞ্জাবের সহিত বাঙালী বিধবার বিবাহ	৭৫২
১৩৭	পরভূতিকা (উপন্যাস)—শ্রী সীতা দেবী	২৬,
১৪৭	১৬৬, ৩১৭, ৪৭৩, ৬৬০, ৭৮২	
৪৫২	পল্লী-সংস্কার-কার্যে অর্থের কথা—শ্রী নগেন্দ্রনাথ	
৮৭, ২২৭, ৩৮১, ৫৩৭, ৭০৬, ৮৮৪	ভট্টাচার্য	৪৮৩
২৫৩	পাগল হরনাথ (সচিত্র)	৪৫৩
৭৫২	পারস্ত-সাহিত্য (কষ্টি)	৫৩
৭৩৮	পাঙ্কি (সচিত্র)	৭৩৩
	পীতাম্বর সাওতাল (সচিত্র গল্প)—শ্রী ভাবকুমার	
	বার্জিলাল	৫৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পুৰাতনী (কবিতা)—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ...	৪৮৪	বঙ্গীয় জনসংঘ	...
পুস্তক-পরিচয় ১২৫, ২৬৯, ৪১৫, ৭৪৪, ৯১৬	...	বার্গার্ড শ ও ভারতীয় সত্যতা, জর্জ	...
পূজার ছুটি	২৪২	বাঁকুড়ার কয়েকটি প্রতিানে বক্তৃতা—	...
পূর্ববঙ্গে বেল-বিস্তার	৪৫৫	শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...
পৃথিবীর জন্মকথা (কষ্টি)—শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়	৫২৪	বার্কেনহেডের বিরক্তিকর পুনরুজ্জী	...
পৃথিবীর নানাজাতির লোকসংখ্যার অল্পপাত	৪৩২	বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল	...
পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় ইংরেজ ও ফরাসী (সচিত্র)	২৫৭	বাংলাদেশে নারীনিগ্র	...
প্যারাসুট ক্যামেবা (সচিত্র)	১১৪	বাংলাদেশে বিরল। পরিবারের দান	...
প্রকাশকের বিড়ম্বনা (গল্প)—শ্রী সরসীবালা বসু	১৯২	বাংলার জেলা ও পৃথিবীর স্বাধীন দেশ	...
প্রবর্তক সজ্জ কৰ্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধনা	৪৩৬	বাংলার রাজস্ব বাণ্যার অংশ	...
প্রবাসের চিঠি (কষ্টি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১	বিখ্যাত ডাক্তার ফ্রেডরিক হিবার্ড (সচিত্র)	...
প্রস্তাবিত প্রদেশগুলির ভাষা ও আয়	৪৪৮	বিজ্ঞাপনের নতুন পদ্ধতি (সচিত্র)	...
প্রাচীন ভারতীয় রাজকোষের আয়-ব্যয়—	...	বিবিধ প্রশঙ্গ (সচিত্র) ১২৭, ২৭৪, ৪৩৬, ৬১৩, ৭৫	...
শ্রী বাধাগোবিন্দ বসাক	৪৬০	বিহাং (কবিতা)—শ্রী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়	...
প্রাচীন ভারতে রাজকোষ বিষয়ক বিধিব্যবস্থা—	...	বিধবা-বিবাহ মস্তা (কষ্টি)—শ্রী রামানন্দ	...
শ্রী বাধাগোবিন্দ বসাক	৩৫০	চট্টোপাধ্যায়	...
প্রাচীন ভারতের কয়েকটি বঙ্গক পদার্থ (কষ্টি)	৫২৭	বিধবা-বিবাহ সংক্ষেপে প্রাচীনকাল মত	...
প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা (কষ্টি)—শ্রী হীবেন্দ্রনাথ	...	বিশ্ববিদ্যালয়ে ক পদাধিকারী	...
দস্ত	৫২৯	বিশ্ববিদ্যালয় ও মঙ্গলমান পরীক্ষার্থী	...
প্রাচ্যের বিরুদ্ধে মিন্দা-অভিযান	৯২৯	বিশ্ববিদ্যালয়ে ন পাকান	...
প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব	২৮৮	বিশ্ববিদ্যালয়ে শিষ্কদের দ্বারা নির্বাচন	...
প্রাধান্যে মন্দিরে রামায়ণের প্রস্তাব-চিত্র	৯৩৯	বিশ্বভারতীয়ে নিজামের দান	...
ফরোখজের রাজপ্রদোহের মামলা	৬১৪	বিশ্বভারতীয়ে মিশরের দান	...
বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—শ্রী বিধুশেখর	...	বিশ্বস্তিষ্টির উপ (সচিত্র)—শ্রী নিখিলরঞ্জন সেন	...
ভট্টাচার্য্য	৪৭০	বিহার প্রাচীন সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির	...
বঙ্গীয় হিন্দু সংমেলন	১৪৯	অভিযাণ (কষ্টি)—শ্রী অমৃতলাল বসু	...
বঙ্গে ও পাঞ্জাবে কাগজের কারখানা	১৪৮	বীরভূমে শর্করা-শিল্প—শ্রী গৌরীহর মিত্র	...
বঙ্গে নারীনিগ্রহ	১৫০	বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব (কবিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ	...
বঙ্গে নারীনিগ্রহাতন	২৭৪, ৪৫২, ৭৬৯	বুদ্ধবন্দনা (কবিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
বঙ্গের নদীতে ধীমার মাত্রার দুর্দশা	৭৭১	বৃহত্তর ভারত—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
বঙ্গের প্রতি অবিচার	৭৬০	বেঙ্গল প্রাশস্তাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া	...
বঙ্গের প্রতি গবর্ণমেন্টের অবিচার—শ্রী রামানন্দ	...	বেঙ্গল প্রাশস্তাল ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল স্ট্রী কটন মিল	...
চট্টোপাধ্যায়	৬১৯	বেতালের বৈঠক ১৭৩, ৬৯, ২৫৯, ৩৯২, ৭	...
বর্তমান ক্রাষণ (সচিত্র)	৭৩৬	বেদ-কথা (কষ্টি)—শ্রী রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	...
বর্ষের বিবাহ ও আধুনিক বিবাহ	২৮৩	বোশখ শেষের মাঠ (কবিতা)—শ্রী সীমউদ্দীন	...
বর্ষা অয়েল কোম্পানীর দান	৪৫৬, ৬১৩	ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় নারী (সচিত্র)	...
বর্ষ-শেষ (কবিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৩	ভাষ্যের চিঠি (সচিত্র)—শ্রী তারকনাথ দাস	৬৪
বৃহত্তর ভারতে রামায়ণ (সচিত্র)	৯৩৮	ভাষ্যচক্র (গল্প)—শ্রী সীতা দেবী	...
বর্ষ-শেষ (কবিতা)—শ্রী চন্দ্রবিনোদ দাস	১১৬	ভারতবর্ষ ও লীগ অব নেশন্স	...
বাঙালী বিধবার পঞ্জাবে বিবাহ	১৪৭	ভারতবর্ষে জলপ্রাচীন	...
বাঙালী বীর (কষ্টি)	৫৩		
বঙ্গের নদীতে ধীমার কোম্পানী	৯৩৭		

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরাদীনতার স্বরূপ—শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন	২১২
ও পাশ্চাত্য সভ্যতা—শ্রী রামানন্দ	৬০৩
পাধ্যায়	৬২১
মন সংস্কার বিষয়ক রাজকীয় কমিশন	১৪৩
সেনাদলের ভারতীয়তা-পাদন	৬২৭
ধর্ম সম্প্রদায়ে বিবাহ	২২৮
গরণ, ষৈরাজ্য বিনাশ নহে	৬১৭
ছুইচারি কথা	৭৫৩
হ (সচিত্র)	৮৬৪
হ যুবক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন—	৮০৪
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৮০৪
হাসন—শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু	৮০২
বন্দনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী	২৮৫
সংঘের চাকরী	৭২২, ৮৮১
বার (সচিত্র)—শ্রী প্রভাত সান্তাল	২৪৪
সম্মিলন	৫২৭
ই)	৫২৭
ত কি চরম সীমায় পৌছিয়াছে (সচিত্র)	৫২২
ই (সচিত্র)	১১৫
বিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৭৩
কম্বুসের জালা যাত্রা	২৩২
বিতা (সচিত্র)	৫২৬
ও অন্ত্যস্ত হিন্দী কবি—শ্রী সুর্য্যপ্রসন্ন	৮০০
পরী চৌধুরী	৫২৫
বিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২৭
যতন পুস্তক—শ্রী অধোদ্যুত চট্টোপাধ্যায়	৪৪৭
ঐতিহ্য প্রদেশের সংখ্যা-বৃদ্ধি	৪৩৪
(সচিত্র)	৫৬৬
চিত্র)—শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও	৩৪৬
কনৌজাস্ত্র দাস	২২
সাহিত্য-সভা—শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৬০২
নি (সচিত্র)—শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৭২
রেলের সংঘর্ষ নিবারণ (সচিত্র)	৩৭২
কবিতা) শ্রী কালিদাস নাগ	৮১২
রাত্তর উপনিবেশ—শ্রী বিজয়রাজ চট্টো-	৬৭১, ৮৩৩
র ও শ্রী নীহাররঞ্জন রায়	৪৪৩
পথে (সচিত্র) শ্রী সুনীতিকুমার চট্টো-	৭৫১
র	৭৪০
রাজ্য কাজ ও প্রাথমিক শিক্ষা	৫৬৩
ব বসু (সচিত্র)	১৪০
(কবিতা)—শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	২৩৫
(কবিতা)—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ও	৫৬৩
রীমোহন সেনগুপ্ত	৫৬৩
বিষয়	৫১৩
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেন্ড টমসনের বহি—শ্রী বাণী-	৩২৪
বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৩
রবীন্দ্রনাথের চিঠি	১৫৬
রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান	৫৫১
রবীন্দ্রনাথের পত্র	৬২১
রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দীপপুঞ্জ যাত্রা	৬২০
রবীন্দ্রনাথের যবদীপ যাত্রা	৫২৮
রবীন্দ্রনাথের সর্জন	৭২৮
রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন—শ্রী নিবারণচন্দ্র	৭২৮
দাশগুপ্ত	৭২৮
রস ও ক্রটি—শ্রী ব্রজদুর্জয় হাজারী	২৮৮
রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য	৬৮২
রাজবোম—(গল্প)—শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৪৮
রামায়ণে সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ	২৪৭
(কষ্টি)	২৮৫
রাষ্ট্রীয় পরিষদের কীর্তি	৩৪৭
রূপ ও আলাপ—শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৭
রেজিষ্টারী-করা গ্রাজুয়েট	২৮৫
রেভারেন্ড টমসনের পণ্ডিতমত্ততা—শ্রী রামানন্দ	৫১৮
চট্টোপাধ্যায়	২৩১
রেলওয়ে যাত্রীদের দিবস	১৩৭
লবণ গুপ্ত	১৫২
লর্ড লিটনের পরামর্শ	৩৩২
লাটের স্পেশাল (গল্প)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	১১৩
লার্কিন-মিনার (সচিত্র)	৬২৫
লালা স্ত্রীর গল্পারাম	৭২৫
লালা স্ত্রীর গল্পারামের দানশীলতা (সচিত্র)	২৪১
লীগ্‌কে কে কত টাকা দেয়	২১৮
লেগ্‌ ও তাহার আবিষ্কার (সচিত্র)	৮৭৪
লেপাচক্রাক্ষণ (সচিত্র)—শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৮৬
হিন্দু বিচারার্থী (সচিত্র)	১৩৬
শশীমোহন ও বাঁশরীভূষণ	৪১২
শশীমোহন দেব অব্যাহতি	২৭৪
শান্তিপুত্রের শিক্ষকসমিতির অধিবেশন	২০৮
শাসন (গল্প)—শ্রী ইন্দুভূষণ দেব	১৪২
শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবসাদারী	২৭২
শিবাজীর জিহাদ বাহিক জন্মোৎসব	৭৩৪
শিশু-শিক্ষায় মেরিওটা জন্মসন্ (সচিত্র)	৩৪৬
শেষ মধু (কষ্টি-কবিতা)	১১৮
শ্রীনিবেশ—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩৫
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	৫৬৩
ষ্টাটুটরী কমিশন	৫৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
সঙ্গীতে পরিবর্তন—শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ...	৩৫, ১৮৭, ৩২৮	স্বাধীনতালোপ ও জাতীয় দোষ
সন্তোষচন্দ্র মিত্রের মূর্তি ...	৭৭১	স্বামী সাবদানন্দ (সচিত্র)
সন্তর বৎসর (সচিত্র)—শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ...	১৬, ২১৩, ৩৩৭, ৫২২, ৬৫১, ৮৪৮	সাহিত্য-ধর্ম (কষ্টি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনেটগুচ্ছ (কবিতা)—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ...	৮৪৭	সিদ্ধুব্রজ স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা
সত্যাত্ম বর্করতার বীজ (কষ্টি) ...	৩৪২	সিংহল দেশের উপকথা (পাত্তাডি)—শ্রীনির্মলা
সমগ্র ভারতীয় প্রচেষ্টাসমূহে বাঙালীর স্থান ...	১৩৬	সিংহলে প্রবাসী বাঙালী (সচিত্র) শ্রী মণীন্দ্রকৃষ্ণ ও
সম্পাদকের চিঠি ...	৭৮, ২৪১, ৩২২, ৫৮৭	সিংহলের প্রাচীন চিত্রকলা (সচিত্র) শ্রী—মণীন্দ্র
সম্মিলিত নির্বাচন ...	১৫০	গুপ্ত
সত্যাত্ম বর্করতার বীজ (কষ্টি) ...	৫২	সুবিখ্যাত জাপানী গায়িকা (সচিত্র)
সংবাদপত্রের প্রকাশের আগে পরীক্ষণ ...	৬১৩	সুভাষচন্দ্র ও উইন্টারটন (সচিত্র)
স্বাইকেলে পৃথিবীভ্রমণ ...	১৫২	সুভাষচন্দ্র বসু বস্তু
সাদ দ্বল্ল পাশা (সচিত্র) ...	২৪২	সুমেত্র অভিশানে বাঙালী (সচিত্র)
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন ...	৪৩৮	সৃষ্টি-রহস্য (কবিতা)—শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ...	২২০	স্বভাব-সেতু (সচিত্র)
সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে লর্ড আক্কাইনের বক্তৃতা ...	২২২	হৃদয়ত মুহম্মদের প্রতিভা (কষ্টি)—সামসুল হুদা
		হিন্দুজাতি (কষ্টি)—শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
		হিন্দু-নারীর দায়াদিকার

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
অজ্ঞাত মায়াদেবতার মূর্তি ...	১১৫	অবলিহ প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড
অজ্ঞাটা, আদিম যুগ, গহনা ...	৫৫৭	অমরাবতী, গহনা
অজ্ঞাটা, গহনা ...	৫৫১	অমরাবতী, স্থল গহনা
অজ্ঞাটা, গহনা ...	৫৫৩	অমিতাভ বুদ্ধ
অজ্ঞাটা, গহনার সুরুচি ...	৫৬০	অলমেলু মাক্কাথা অমল, শ্রীমতী
অজ্ঞাটা, যোদ্ধে বেশে নৃপতি ...	৫৫৬	অশ্বিনীকুমার বর্ষদেব রায়, ভাস্কর
অজরনাথ ঘোষ ...	১৮১	অশ্রুকা দেবী, শ্রীমতী
অজুর্গী ও শির-অলঙ্কার, বোম্বাই ...	৭১৭	আদি মাহুয (দুইখানি ছবি)
অত্যাধুনিক জার্মান গহনা ...	৭২১	আধুনিক ও অত্যাধুনিক “প্যারিফ্যাশন”
অন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের নব-নির্মিত গৃহ, জেনীভা ...	২৪৭	গহনা (রঙিন)
অশ্রুনাশকব রায় ...	৪১৩	আধুনিক জার্মানীর আসবাব পরিকল্পনা
অপর্ণা দাশগুপ্তা ...	৪১৩	আধুনিক বিলাতী, গহনা
অবলোকিতেশ্বর ...	৮৪৫	আধুনিক শিরদণ্ডা
অব্যবহার্য কাঠখণ্ডের ব্যবহার ...	২০২	আনারকলি (রঙিন)
অভিনব বিজ্ঞাপন ...	৬০০	শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
		আবলুস কাঠে হাতীর দাঁতের বসান কাজ

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২৩	করোনা বা মুকুট মেঘ	৫০২
১৩০	কান্তির দল্ল-বিহার	৩১০
৬০১	কানাড়ার চন্দনকাঠে খোদাই	৪২৫
৬৪২	কায়ার ছবি	৪৩৪
৪২২	কালিম্পাং-এর ভূটয়া ভিখারী (রঙীন)—শ্রী চৈতন্যদেব	
৬৭৭	চট্টোপাধ্যায়	৬২২
৪৩১	কাম্পাজদের বৌদ্ধমন্দির	২০৫
৭২০	কাসেল, মিস	১১২
৮৮২	কিশোর (রঙীন)—সাজো বতিচেল্লী	৩৭২
২০৫	কিশোরীর প্রতিকৃতি (রঙীন)—ডোমেনিকো	
৮৭৫	স্বরলাগাইয়ো	১২৪
২৩৬	কুমদা মেহেতা, কুমারী	৮৮২
৮৪২, ৮৫৩, ৮৫৪	কুম্ভমেলায় জনতাব পেখেণে মৃত ব্যক্তি	৬২১
৫৬২	কুম্ভমহাল, চিতোব	১১১
৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬	কুম্ভ জয়ন্তী, উদয়পুর	১০৬
৫৫৬	কুম্ভোমিন্টাং সৈন্তদল	২৫৬
৫৫৪	কৃত্রিম আলোকে কুক পালন	২৫৮
৪১২	কোইয়াসান বিদ্যালয়/মন্দিরের প্রধান দ্বার	৮৪৬
৪৪৬	কোইয়াসানের পথে	৮৪৫
১০০	কোইয়াসানে কো-বো-দাইশির প্রথম আগমন	৮৪৬
৫৪৭	কোদো-বু-জি মন্দির	৮৪৫
১০৩	কোদালে কুড়লে মেঘ	৫১১
২২৫	ক্যাথারিন স্ক্রায়ফ, শ্রীমতী	৮৮২
১৩০	কাণ্টনে জাতীয় সম্মিলনী গৃহ	২৫৬
১২১	ক্যাম্বোজ মেঘ	৫০৫
৭৩৮	ক্যাম্বোজ ও ষ্ট্রাটাস মেঘ	৫১২
১০৫	খেলা (রঙীন)—শ্রী সারদাচরণ উকিল	২৬৮
২৫২	খেলাচ্লে ভূগোল শিক্ষা	৭৩৫
৭২২	গঙ্গারাম, লাল	৭৫৬
৬৮	গঙ্গার, শ্রীমতী	৭৩০
১২৭	গঙ্গবহ প্রজাপতি	২০৭
২৪৬	গঙ্গবহ রাজ প্রজাপতি	২০৭
১২২	গাছের ভিতরে গাছ	২৫৮
১২২	গোচারণেব মাঠ (রঙীন)—শ্রী বর্জেন্দ্র শাসন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৭
১১৭	গোলা-ঘর	৮২৫
৭৩৭	গৌরীশঙ্করের পথে	২০৫
৮৪২	গৌরীশঙ্করে সন্ধ্যা	২০৫
১১৪	চিতোরগড়ের মানচিত্র	১০৮
৫৪৭	চিপেনডেল	৪২৮
১১৫	চিয়াং কাইশেক	৪৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চীনদেশে লেপ-চিত্রাঙ্কণ (রঙিন)	৮৭৬	দেওগড়, গহনা	৫৪৮
চীনা অদৃষ্ট	৫২৭	দেবকিস্বর মুখোপাধ্যায়	১৮৩
চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদল	২০৮	দেয়ালের কুলুঙ্গী	৪২৮
জগদ্বাহরলাল নেহরু	১২২	দৌড়বাজ প্যাডক	৬০৭
জগদীশ মন্দির, উদয়পুর	২৭	দ্বাদশ শতাব্দীর, খৃঃ উড়িষ্যার শির ও কর্ণের গহনা	৫৪৮
জগন্নিবাস প্রাসাদ, উদয়পুর	২২	(একরঙা)	৫৪৮
জগন্নির প্রাসাদ, উদয়পুর	২৪	দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার	৪১৩
জগন্নাথ পাশা	২৪৩	দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহের সমাধি, উদয়পুর	২৭
জন্ম দি ব্যাপটিষ্ট—ফণীন্দ্র বসু নির্মিত মূর্তি	২৬৬	জ্যোতম মোটির গাড়ী ও তাহার চালক	৪৩৩
জয়মল ও পুস্তকের বাড়ী, চিতোর	১০৭	নক্ষত্র-জগতের আকৃতি	৬৭
জর্জ ল্যান্সবেরী ও হালিয়েন লিয়র্ড	১৩১	নক্ষত্রের ক্রমবিকাশ প্রণালী	৬৬
জলপুস্তক মেঘ	৫১০	ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৮১
জাতিসংঘের সম্মিলন-গৃহ, জেনীভা	২৪৪	নবকৃষ্ণ দস্তিদার	৩৪০
জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ	৮৭৫	নাগদেবতার মুখ, মায়াসভা	১১৬
জাৰ্মানিতে ব্যায়াম-শিক্ষার নমুনা	৬৪৭	নাড়ীপরীক্ষার যন্ত্র	৬০২
জাহাজে করাসী যাত্রী—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কব অঙ্কিত	৬৭২	নায়াগারা জলপ্রপাত	২৫৪
জাহাজীরের শোভাযাত্রা	৭২৪	নিউইয়র্কে চীনা শোভাযাত্রা	৪৩৪
জিমু ভেমো	৮৪৬	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৫
জি, লেভেবোর (জাৰ্মানী)	১২৮	নোবেল শান্তি পুরস্কার, দুইখানি ব্যক্তিচিত্র	২৫৭
জুলিয়েট ভিলিয়ার	৭২২	পঞ্চ-পরিষ্কারক যন্ত্র	৪৩৩
জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪৮	পদ্মিনী মহল, চিতোর	১০৭
জেলিয়াছের শোভা	৬০৩	পঞ্চাধ্যানী বৃক্ষ	৮৪২
জোসেফ পেয়েল	২৫৩	পঞ্চাবী চৌকী	৪২
জ্যানভান আইকের পত্নী	৭৩৬	পঞ্চাবের পিঞ্জরা কাজের কুলুঙ্গী	৪২
জ্যোতিষ্মণ সেন	৭৫৩	পাঁচমাইলব্যাপী সুরঙ্গ	২০
জাপানের অংশ	৪২৭	পাগল হরনাথ	৪৫৭
টিকী মিস ই	১১২	পানামা খাল	২৫৪
ডাক্তার ও মিসেস তারকনাথ দাস	৬৪৬	পার্কভী অমল, শ্রীমতী	৭৩১
ডাঙ্গুলবিহারের ছাদের চিত্রাবলী	৩১৬	পালক, জাপানী পরিকল্পনা	৪২৬
ডি, কে, মুখোপাধ্যায়	৪১৪	পাহাড়ি	৭২০
ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো	৩১০, ৩১২, ৩১৩	পিঞ্জরা কাজের ব্রাকেট	৪২৩
তক্ষশীলা, তুল	৫৫২	পিকি	৭৩৪
তারাবাই মাণেকলাল প্রেমচাঁদ, শ্রীমতী	৮৮২	পীতাম্বর সাংগলের ছবি—মৃত্যুঞ্জয় গুড় চিত্রিত	৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৮২
ত্রিবাঙ্কড়ী চন্দন-কাঠের বাক্সের ডালা	৪১৮	পোলাণ্ডীয় কৃষিজীবী	৫৮২
তীর্থযাত্রী, কেলানী বিহার	৩১৪	প্রতীক্ষমানা (রঙিন)—শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়	৫৮২
তৈলচালিত রেলগাড়ী	২০৮	চৌধুরী	৫৮২
দর্পণে (একরঙা)—জাপানী চিত্র	৬৫৬	প্রভাতচন্দ্র সর্বাধিকারী	৫৮২
দাক্ষিণাত্যের স্বর্ণময় রত্নাক্ষমালা	৭১৬	প্রাগঐতিহাসিক যুগে গৃহীণীর মনোরঞ্জন	৫৮২
দিল্লীর জড়োয়া তুল	৭২৩	প্রাচীন সরকারী ইঙ্কল গৃহের পশ্চাভাগ,	৫৮২
দুইটি স্পাইরেল নেবিউলা	৬৮	শ্রীমতী	৫৮২
দুর্গা, দাক্ষিণাত্য	৪৩২	প্রাচীন ও আধুনিক গহনা	৫৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাচীন বৌদ্ধযুগের হার	... ৭১৪	মণিকাবেবের কারুকর্ম, মোহোজ্জোদডো	... ৫৪৬
প্রাচীন বৌদ্ধযুগের গহনা	... ৭২৪	মণিময় কটিবন্ধ ও চন্দ্রহার	... ৭২৪
প্যারাহাট ক্যামেরা	... ১১৪	মনীষা সেন, কুমারী	... ৮৮২
প্যারিক্যাসন, অত্যাধুনিক গহনা	... ৭৭২	ময়মসিংহ যুবক সম্মিলন	... ৭৫৪
প্যারিক্যাসন, এলারম্যান	... ৭৩৮	মল ও কর্ণফুল, মোহোজ্জোদডো	... ৫৪৫
প্যারিবার্ট, বাথিলিয়াবের ময়মেন্ট	... ২৫৩	মস্কোর বৃহত্তম গীর্জা	... ৭৩৮
পুষ্ক ওং, মিস	... ৫২৮	মস্কো	... ৭৩৭
পুষ্ক ওয়ারা যুগ, জাপানী	... ৮৭৬	মস্কোর বাজার দৃশ্য	... ৭৩৭
কেং যুশিয়াং	... ৪৩০	মহম্মদ হাট্টা (ইন্দোচীন)	... ১২৭
ফাইজ মিন	... ১১৩	মহারাণা সম্বল সিংহ, উদয়পুর	... ১০৪
বজ্রমেঘ	... ৫৮	মহাসতী, উদয়পুর	... ১০২
বজ্র ও মেঘ (বড্ডিন)—শ্রী সারদাচরণ উকিল	... ১	মহাসতীর পথে ভগ্নমন্দির-গাত্রে মূর্তি, উদয়পুর	... ২২
বর্তমান মহারাণা ফতেসিংহজি, উদয়পুর	... ১০৪	মহিলামূর্তি	... ৭৩৬
বলিমন্দির, মায়ামভাতা	... ১১৬	মহিষ-মর্দিনী, জাভা	... ৪৩২
বাইজাক্টর হুল, দশম শতাব্দী	... ৫৫৪	মাইকেল বোরোভিন বামে, চিয়াং কাইশেক	... ২৫৬
বাইজাক্টর হুল, ৭ম শতাব্দী	... ৫৫৩	দক্ষিণে,	... ২৫৬
বাদামী, গহনা	... ৫৪২	মাদক দ্রব্য প্রচার	... ২০৬
বিদ্যাবল্লভের আলোক-চিত্র	... ২৫৮	মাদগাস্কার, শ্রীমতী	... ৭৩০
বিদ্যো	... ৫২৮	মাদ্রাসা, নৃপতি তিরুমল্লের জোর সম্মুখে পরিহিত	... ৭১২
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ১২২	চন্দ্রহার	... ৭১২
বুকের গহনা, প্যারিক্যাসন	... ৭১৮	মাদ্রাসা, নটরাজমূর্তি	... ৭১২
বুনো শূবর খাওয়ান, উদয়পুর	... ২৮	মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরের গহনা	... ৭২৫
বিশ্ব-সঙ্ঘ (রডিন)—শ্রী প্রমোদকুমার চট্টো-	...	মাদ্রাজের লেপ-চিত্রাঙ্কণ	... ৮৭২
পাধ্যায়	... ৮০৮	মাদ্রাসা দেবী, শ্রীমতী	... ৮৮২
ব্রহ্মদেশের টীক কাঠে খোদিত যুদ্ধ-অভিযান	... ৪২৮	মাদ্রাসা লেন ফটোর খোদিত চিত্র	... ৮২১
ব্রহ্মদেশের চন্দ্রহার	... ৭২৫	মি ল্যাং ফ্যাং	... ৪৩২
ব্রহ্মলিন ব্রীজ	... ৮২২	মিসিসিপি বস্ত্রের উন্নত জলস্রোত	... ৫২৬
ব্রহ্মলিন কংগ্রেস সভাপতিমঞ্চ	... ১৩৩	মিসিসিপি বস্ত্রের জলমগ্ন সহর	... ৫২৬
ব্রহ্মলিন কংগ্রেস, সাধারণ দৃশ্য	... ১৩২	মীরাবাইয়ের মন্দির, চিতোর	... ১০২
ভবিষ্যতের সূর্য্যগ্রহণ	... ২০৬	মুসাফির (রডিন)—শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	... ৩২৪
ভল্লুর হাতি	... ৫২২	মুসোলিনী-জায়া	... ৪৩৪
ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ, শিল্প প্রদর্শন	... ৮৭৪, ৮৭৬, ৮৭৮	মুসোলিনীর বংশধরদ্বয়	... ৪৩৫
ভারত, গহনা বাহুল্য	... ৫৫১	মুহাম্মদ (বড্ডিন)—শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	... ১৫৩
ভারত, গ্রন্থিত গহনা	... ৫৫১	মেবিয়টা জনসন	... ৭৩৪
ভারত, গহনা	... ৫৪৮	মোটর ও বেলেব সংঘর্ষ নিবারণী যন্ত্র	... ৬০২
ভারতীয় জাপানী গায়িকা	... ৬০১	মোটর সাইকেল নৌকা	... ১১৫
ভারতীয় ভারতসাম্রাজ্য আলেকজান্ডার বিবাহ	...	ম্যাডোনা	... ৭৩৫
ভারতীয় ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত উপহার—ভারতীয় অলম্বাব	...	যবদীপের প্রাধান্য মন্দিরে রামায়ণের প্রস্তর চিত্র	...
ভারতীয় রডিন)	... ৫৫৬	১০ খানি একরঙা ছবি	... ২২৮
ভূপেন্দ্রনাথ বসু	... ১৮২	১। অনন্ত শয়নে বিষ্ণু	...
ভূপেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত	... ১৮৩	২। মহিষী সহ রাজাদেশবধ, রাজকন্যা ও রাজপুত্রগণ	...
মনারায়ের টিলা—শ্রীহট্ট	... ২১৪	৩। মহিষী বিশ্বামিত্রের আগমন	...

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪। রামের তাড়কাবধ		শীলা রায়, কুমারী	৭৩০
৫। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞশালা		শো-তোকু তাইশি	৮৪০
৬। রামের হরধনুভঙ্গ		শ্রবণ-শক্তি-বর্ধক যন্ত্র	২০৮
৭। রাম ও লক্ষ্মণের অযোধ্যাবৃত্তা, পরশুরামের আক্রোশ		শ্রীঃট্রেব দৃশ্য	...
৮। পরশুরামের ধনুতে রামের জ্যা-রোপণ		শ্রীমকুমারী নেহেরু, কুমারী	...
৯। রাম নিকাসন		সঙ্কনগড়, উদয়পুর	...
১০। ভরতাবিষেক		সতীচিহ্নযুক্ত স্মারক ফলক, উদয়পুর	২২
যাদুপুত্র, গহনা	৫৪২	সমাধিতে স্মারক ফলক, উদয়পুর	২২
যীশুব্রতদেহ	৭১৫	সান ইয়াং-সেনের স্বযোগ্য পত্নী ও তাঁহার পুত্র	...
যোগীন্দ্রনাথ বহু	৭৫১	মেঘর সান-কুর পত্নী	২৫৫
রজনীকান্ত দাস, ডাক্তার	২৪৫	সাম্রাজ্য-বিস্তার	৮২০
রজম্ নায়াহব একটি চিত্র (একরঙা) তারা ও		সারনা দেওয়ান, শ্রীমতী	৭৩২
তুলসী কর্তৃক অঙ্কিত	৭২৪	সারদানন্দ স্বামী	২৪২
রাজকুমার খুবরমের বিবাহ	৭২৫	সারনাথ, গহনা	৫৫০
রাজপথে নৃত্যগীত, উদয়পুর	২৫	সারনাথ, বোধিসত্ত্ব	৫৫৫
রাজপুত্র অটো	৬০০	সাবনাথ, মঞ্জুশ্রী	৫৫২
রাজ সামান্য হ্রদ, উদয়পুর	১০১	সাহজালালের মসজিদ, শ্রীহট্ট	৩৪১
রাজ্যের প্রসাধন (রঙিন)—অজ্ঞাটা গুহাচিত্রাবলী	৫০০	সাংঘাই বন্দর	২৫৫
রাণা অমরসিংহের সমাধি গাজে কারুকার্য, উদয়-		সাংঘাইয়ে ভাবতীর সৈন্তদল	২৫৭
পুর	২৩	সাঁওতাল ছেলে (একরঙা)—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ	...
রায়পুরে লর্ড সিংহ	১১২	বন্দোপাধ্যায়	৮৪
রিফর্মেশন স্মৃতিমূর্তি, জেনীভা	২৪৩	সিগিরিয়া ফ্রেঙ্কোর ফটো—৩০৮, ৩০৯, ৩১১, ৩১৪, ৩১৫	...
রুক্ষণীমোহন কর	২০	সিগিরিয়া শৈলে উত্তিবার সিঁড়ি	...
রুম্যানদার সম্রাট প্রথম মাইকেল	২০৭	সিগিরিয়া শৈলের দৃশ্য	৩০৭
রুসোর প্রস্তর প্রতিমূর্তি, জেনীভা	২২	সিদ্ধার ছাউরি, চিতোর	১১০
রৌপ্যপাড মেঘ	৫১১	সিব্বস মেঘ	৫৬৬
লক্ষ্মী একাম্বরম্, শ্রীমতী	৭৩০	স্বভাষচন্দ্র বহু	৪৫৪
ললিতা বালসুন্দরম্, শ্রীমতী	৮৮৩	স্ববেন্দ্রনাথ বহু	১২৩
লাক্ষ্যালেপিত পালঙ্কের পায়	৪২৪	সুলতান মহম্মদ তুগলকের সভার নৃত্যগীত	৭২৫
লামিন সেংঘর (সেনিগ্যাল)	১০১	সুলভা পানানুভিকার, শ্রীমতী	৭৩৩
লার্কিন মিনার	১১৩	সূর্য ও সূর্যাকৃত	৭৩২
লুৎসুরলিন্ (ক্যান্টন)	১২৮	সূর্যাকৃত	৭৩২
লেপ-চিত্রাঙ্কিত আবরণী	৮৭৭	সেন্টজর্জ স্মৃতি গীর্জার একটি অংশ,—ফণীন্দ্র বহু নির্মিত	২৬৬
শরৎকুমার রায়	২৪১	সেন্টজর্জ স্মৃতি-গীর্জা,—ফণীন্দ্র বহু অঙ্কিত	২৬৬
শশীমোহন দে	৫৬৮	সেন্টপল ও সেন্টপিটার গির্জা, লেনিনগ্রাদ	...
শাক্যপুত্র প্রাপ্ত গহনা	৭২৫	স্বর্গচ্যুতির পর	...
শান্ত জল-মহিষ	৫২৮	স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতি ও পুষ্প—জাপানী	...
শাহজহান্নের মহল, উদয়পুর	১০৫	স্বর্ণময় হার, ব্রহ্মদেশ	...
শাহপুরের স্বদাবস্ত্র নির্মিত ঢাল ও বিকানীরের		স্বভাব-সেতু	৬১
টেবিল (রঙিন)	৮৮০	স্বাতমাম্বরের গায়ে খোদাই কাজ, উদয়পুর	২১
শিকারী ও কুকুর—ফণীন্দ্র বহু নির্মিত	২৬৭	হরপার্কতী (রঙিন)—শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০৭
শ্রীতগীর কাঠে খোদাই	৪২৬	হরিণ	৮২৭

দোলক, দিল্লী	... ৭২৬	হিবার্ডের ভাস্কর্য্য নিদর্শন	... ৫২২
না-পরিহিত আধুনিক বঙ্গ মহিলা—		হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৪১৬
শ্রীমদ্রামানন্দ সেনের পরিকল্পনা	... ৭২৪	হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	... ১৮৪
বথার্থী (একরঙা)	... ৭৮৬	মুহুর, পারশুর (বামে)	... ১৩১

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

নারনাথ চট্টোপাধ্যায়—		শ্রী দ্বিজরাজ শর্মা—	
ত পুস্তক	৩২৭	যবে ও বাহিরে (গল্প)	৪২৬
সত্যকুমার সেনগুপ্ত—		শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—	
যার রাজ্য (গল্প)	৩৬৮	রাজরোষ (গল্প)	৬৮২
মল্লিক জীল—		আদ্যা শাস্ত্র	৭৭৪
ম অবল ফতেহ ওমর বিন ইব্রাহীম-অল্		শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—	
খৈয়ামী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	১৪০	পল্লীসংস্কার কার্যে অর্থের কথা	৪৮৩
জিজ্ঞাসা মুখোপাধ্যায়—		শ্রী নগিনীকান্ত গুপ্ত—	
হ্যাং (কবিতা)	৪১৭	উরুশী ও পুরুষবা	৪৮৫
কৃষ্ণ দেব—		শ্রী নিখিলরঞ্জন সেন—	
শাসন (গল্প)	২০৮	বিশ্ব-সৃষ্টির রূপ (সচিত্র)	৫৮
শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু—		শ্রী নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত—	
ময়ূর-সিংহাসন	৮০৪	রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন	৬৫৮
শ্রী কালিদাস নাগ—		শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী—	
যক্ষ কবি (কবিতা)	৩৭২	আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র (সচিত্র)	৮২১
শ্রী কল্যাণী একথানি চিঠি	৪৮২	শ্রী নীহাররঞ্জন রায়—	
কেন্দারনাথ চট্টোপাধ্যায়—		অগুপ্ত রদ্যাব শিল্প-পরিচয়	৫৬১
মেবার দর্শন (সচিত্র)	২২	যবদীপে ভারতীয় উপনিবেশ	৮১২
দাক্ষিণ্য (সচিত্র)	৪১৮	শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—	
মেঘ (সচিত্র)	৫০৬	জয় স্বাধীনতা জয় (কবিতা)	২৬৮
গহনা (সচিত্র)	৫৪৫, ৭১৪	রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	৫৬৩
লেপ-চিত্রাঙ্কণ (সচিত্র)	৮৭৪	রং-সজীত (কবিতা)	৭৪০
শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু—		কষ্টিপাথর, ইত্যাদি	
নির্বাক্ষর (কবিতা)	৩২১	শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী—	
শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—		কোইয়া-সানের যাত্রী (সচিত্র)	৮৪০
রূপ ও আলাপ	৬৫৭	শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন—	
শ্রী গৌরীহর মিত্র—		ভারতবর্ষের পরাধীনতার স্বরূপ	২১২
শ্রী হেমেন্দ্রনাথ শর্করা-শিল্প	১৭৬	শ্রী প্রভাত সান্তাল—	
বিনোদ দাস—		মহিলা-সংবাদ (সচিত্র)	৭২২, ৮৮১
শেষ (কবিতা)	১১৬	দেশবিদেশের কথা, ইত্যাদি	
গদ্যীশচন্দ্র গুপ্ত—		শ্রী প্রিয়দর্শনা দেবী—	
নন্দী (গল্প)	৮২৪	✓ বাল-বৈশাখী (কবিতা)	১১১
ম উদ্দীন—		শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু—	
বোশেধ শেষের মাঠ (কবিতা)	২৩৮	চন্দ্রায় হিন্দু-উপনিবেশ	৩৩৪
শ্রী তারকনাথ দাস—		উড়িষ্যার আল্পনা (সচিত্র)	৭৮৪
ভবঘুরের চিঠি (সচিত্র)	৬৪৫, ৮২২		

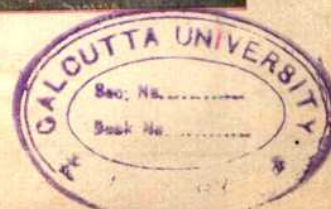
শ্রী বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়— রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টমসনের বহি	৫১০	প্রাচীন ভারতীয় রাজকোষের আয়-ব্যয়	
শ্রী বিজ্ঞানরাজ চট্টোপাধ্যায়— যবদীপে ভারতীয় উপনিবেশ	৮১২	শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়— মেদিনীপুৰ সাহিত্য-সভা	
শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য— বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ	৪৭০	রেভারেণ্ড টমসনের পণ্ডিতমুগ্ধতা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	
শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল— সত্তর বৎসর (সচিত্র) ১৬, ২১৩, ৩৩৭, ৫২২, ৬৫১, ৮৬৮		বঙ্গের প্রাতি গবর্ণমেন্টের অবিচার	
শ্রী ভাবকুমার কাক্সিলাল— পীতাম্বর সাওল (সচিত্র গল্প)	৫৭০	মহম্মদসিংহ যুবক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ	
শ্রী মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত— সিংহলে প্রবাসী বাঙালী (সচিত্র)	১৮০	বাকুড়ার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা	
শ্রী ব্রজহরভ হাজরা— রস ও কচি	৭২৮	শ্রী শান্তা দেবী— কাকশিল্পের পুনরুদ্ধার	
শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু— চণ্ডাঙ্গাস-গণ	৪৬৫	জীবনদোলা (উপন্যাস) ৮৭, ২২৭, ৩৮১, ৫১৭, ৫	
শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ— গোতমের ধর্মে আশ্রয় স্থান	৬, ২২২	শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা— সৃষ্টি-রহস্য (কবিতা)	
শ্রী মোহিতলাল মজুমদার— পুরাতন (কবিতা)	৪৮৪	শ্রী সঙ্কীর্ষদাস দাস— মেঘ (সচিত্র)	
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	৫৬৩	আধুনিক কাঠবোদাই চিত্র (সচিত্র)	
সনেট-গুচ্ছ (কবিতা)	৮৪৭	পঞ্চশস্ত্র, ইত্যাদি	
শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়— ধর্মের গান কত কালের	৬০২	শ্রী সরসীবালা বসু— প্রকাশকের বিড়ম্বনা (গল্প)	১২২
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব (কবিতা)	১	শ্রী সাহানা দেবী— স্বরলিপি	২৩২
গাহপালায় প্রতি ভাগবাদ	২	শ্রী সাতা দেবী— পরভৃতিকা (উপন্যাস) ২৬, ১৬৬, ৩১৭, ৪৭৩, ৬৬০,	
বৃক্ষবন্দনা (কবিতা)	৪	ভাগ্যচক্র (গল্প)	৬৮৯
বর্ষ শেষ (কবিতা)	১৫৩	উগ্রচণ্ডা (সচিত্র গল্প)	৮৪৯
শ্রী নিকেতন	১৫৮	শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— যবদীপের পথে (সচিত্র)	৬৭১, ৮৩৩
গান	২৩২	শ্রী সুনীলকুমার দে— কাব্য-আলোচনা	৩৮৮
নববর্ষ	২২৭	শ্রী সূর্য্যকুমার বাজপেয়ী চৌধুরী— মৌরবাদি ও অগ্রদূত হিন্দী কবি	৮০০
ধর্মবোধ	৪৫৭	শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়— সঙ্গীতে পরিবর্তন	৩৫, ১৮৭, ৩২৮
মুক্ত (কবিতা)	৪২১	শ্রী হিরণ্ময় মুন্সী— গ্রাম্য গীতি-কবিতায় বারাম্বে	
ব্রহ্মর ভারত	৫৮৩	শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী— আষাঢ়-শেষে (কবিতা)	
আত্মান (কবিতা)	৬২২	শ্রী হেমমালা বসু— গ্রামের মেয়ে (চিত্র)	
আলাপ-আলোচনা	৬৩১, ৭৭৪		
মিলন (কবিতা)	৭৭৩		
শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র— চণ্ডামণ্ডপ (গল্প)	৫৪		
লাটের স্পেশাল (গল্প)	৩৩২		
দিবালীর জীবন-পঞ্জী (গল্প)	৮২২		
শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক— প্রাচীন ভারতে রাজকোষ বিষয়ক রিষি-ব্যবস্থা	৩৫০		

হার ও
 হিন্দুগণ
 যত
 হিন্দু
 কি
 শ্রী অ
 শ্রী মু
 শ্রী অচি
 শ্রী অম
 শ্রী অরী
 শ্রী বি
 শ্রী ইম



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

বজ্র ও মেঘ
 শিল্পী শ্রী সারদাচরণ উকিল



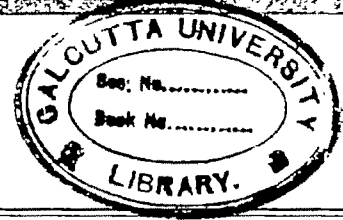
1953 47

P30116



“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”



২৭শ ভাগ

১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৪

১ম সংখ্যা

বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব •

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিংসায় উদ্ভক্ত পৃথি,
নিত্য নিষ্ঠুর হৃদয়,
ঘোর কুটিল পন্থ তার
লোভ-জটিল বন্ধ ।
নূতন তব জন্ম লাগি' কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ, মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম
চির মধুনিষ্যন্দ ॥

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ।

এস, দানবীর, দাও
ত্যাগ-কঠিন দীক্ষা ।

মহাভিক্ষু, লও সবার
অহঙ্কার ভিক্ষা ।

লোক-লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জল কর' জ্ঞানসূর্য্য-উদয়-সমারোহ ।

প্রাণ লভুক সকল ভুবন,
নয়ন লভুক অন্ধ ॥

শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়

তাপ-দহনদীপ্ত ।

বিষয়-বিষ-বিকারজীর্ণ

খিন্ন অপরিভূপ্ত

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষপ্রাণি ;

তব মঙ্গলসম্ভব আন', তব দক্ষিণ পানি,

তব শুভ সঙ্গীতরাগ,

তব সুন্দর ছন্দ ॥

শাস্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

“গাছপালার প্রতি ভালোবাসা”

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হোটেল ইম্পোরিয়ল ক'রে দিলে । তোমার গাছপালার প্রতি ভালোবাসা
ভিয়েনা আমার মনের সুরের সঙ্গে ভারি মেলে, সেইজন্তে আজ

কল্যাণীয়েষু

তেজেশ, তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দ হ'ল ।

তোমার লেখাগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলি
মর্ম্মরঞ্জন ক'রে উঠেছে । তাতেই আমার মনকে পুলকিত

এত খুসি হয়েছি । আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব
আমার বোবাবন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের
দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে
পৌঁছল । তাদের ভাষা হচ্ছে (জীবজগতের আদিভাষা)

তার ইসারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাদা ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুণ্ণনিহিত ওঠে। ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতারা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ’য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহ’লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্ত সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সূর্যের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শ্যাম শিবম্ অধৈতম্। সেই সূর্যের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্মোলন। “এতশ্রীবানন্দম্ মাত্ৰাম্” দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, (বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি)। বষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়? তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিস্তৃত সুর; সেই সুরটি যদি কান পেতে নিতে পারি তাহ’লে আমাদের মিলন সন্দ্বীতে বদসুর লাগেনা। বুদ্ধদেব যে-বোধিজ্ঞানের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিজ্ঞানের বাণীও শুনি যেন,—চুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনে পেরেছিলেন গাছের বাণী,—“বৃক্ষ ইব স্তম্ভো দ্বিবি তিষ্ঠত্যেকঃ”। শুনেছিলেন “যদিদং বিঞ্চু সর্বং প্রাণ এজ্যতি নিঃসৃতং”। তাঁরা গাছে গাছে চির-যুগের এই প্রসঙ্গটি পেয়েছিলেন, “কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ”—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এটি বিবেচনা? সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের বরুণা অহরহ কর্তে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! (সেই প্রথম প্রাণ-

প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃতভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?)। এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানলার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি শাস্তি-নিকেতনের প্রাস্তরে আমার ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধ-বিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্তে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হ’য়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছে সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যান-মন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অকণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওড়ারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাজি প্রায় তিনটির সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চকলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্ধারবেগে পালিয়ে যাবার জন্তে। পালাব কোথায়? কোলাহল থেকে সন্দ্বীতে। এই আমার অন্তর্গুচ বেদনার দিনে তোমার চিঠি যখন পেলুম তখন মনে প’ড়ে গেল সেই সন্দ্বীত তার সরল বিস্তৃত সুরে বাজচে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,—তাদের কাছে চূপ ক’রে বসতে পাবলেই সেই সুরের নির্মল বরুণা আমার অন্তরাত্মকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পাববে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হ’য়ে স্বিক্ত হ’য়ে তবেই আনন্দ-লোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরম সূর্যের মুক্তরূপ প্রকাশের মধ্যেই আমার পরিজ্ঞান,—আনন্দময় সৃগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সূর্যের চরম দান। বুঝতে পাবুচ তোমার চিঠিখানি আমার কাছে লেগেচে—সেইজন্তে তোমাকে এতখানি লিখলুম। ইতি ২৩শে অক্টোবর, ১৯২৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বক্ষবন্দনা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্ধ ভূমিগর্ভ হ'তে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ; আদিপ্রাণ,
উর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সেদিন অস্থির মাঝে
শ্রামে নীলে মিশ্রমস্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ষ্যের মাহাত্ম্য-গান করিলে ঘোষণা। যে-জীবন
মরণ-তোরণদ্বার বারম্বার করি' উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পাশ্চশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশব্দ গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি' উল্লসি'
নিজেরে পড়েছে তার মনে,—দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল স্বর্গ ছাড়ি' সম্মাসিনীবেশে
পাণ্ডুল্লান গৈরিকবসনা,—খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদার্য করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মুক্তিকার হে বীর সম্ভান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মুক্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হ'তে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সমুদ্রি' সমুদ্রউর্গি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্রামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান-লিপি লিখি' দিলে পল্লব অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া-মুক্ত, চিরহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পঙ্খ।

বাণীশূন্য ছিল একদিন

জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন,—
 শাখায় রচিলে তব সঙ্গীতের আদিম আশ্রয়,
 যে-গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
 সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তম্বু
 রঞ্জিত করিয়া নিল, অঞ্চল গানের ইন্দ্রধনু
 উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে । সুন্দরের প্রাণমূর্ত্তিখানি
 মুক্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি'
 টানিয়া আপন প্রাণে রূপগন্ধি সূর্যালোক হ'তে,
 আলোকের গুণধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে ।
 ইন্দ্রের অঙ্গরী আসি' মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
 বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি' লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
 যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি' ভরি'
 আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি'
 সাজাইলে বসুন্ধরা ।

হে নিস্তরু, হে মহাগম্ভীর,

বীর্ঘ্যেরে বাঁধিয়া বৈর্ঘ্যে শাস্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
 তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শাস্তিদীক্ষা লভিবারে,
 শুনিতে মোনের মহাবাণী ;—হৃচ্ছিত্তার গুরুভারে
 নত শীর্ষ বিলুপ্তিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,—
 প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
 বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরনীর বাণীরূপ তার
 লভিতে আপন প্রাণে । ধ্যানবলে তোমার মাঝার
 গেছি আমি, জেনেছি, সূর্য্যের বক্ষে জ্বলে বহিরূপে
 সৃষ্টিযজ্ঞে যেই-হোম, তোমার সত্ত্ব চুপে চুপে
 ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ ; ওগো সূর্য্যরশ্মিপায়ী,
 শত শত শতাব্দীর দিনধেনু হুহিয়া সদাই
 যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি' দান-
 করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম-সম্মান ;
 হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্শী,—সে-অগ্নিচ্ছটায়
 প্রদীপ্ত তাহার শক্তি, বিশ্বতলে বিশ্বয় ঘটায়

ভেদিয়া ছঃসাধ্য বিদ্বাবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
 তব স্নেহছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীমান,
 সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হ'য়ে,
 ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
 শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
 অর্পিতাম তোমায় প্রণামী।

৯ই চৈত্র, ১৩৩০

গোতমের ধর্ম আত্মার স্থান

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বুদ্ধের ধর্ম আত্মার স্থান কি? এবিষয়ে নানাপ্রকার
 বাক্যবিভাগ চলিয়া আসিতেছে। এক শ্রেণীর লোক
 বলিতেছেন, তিনি আত্মা স্বীকার করিতেন না। আর-এক
 শ্রেণীর লোক বলিতেছেন—ঐহিক ধর্মের আদিত
 কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তঃকল্যাণ, যিনি ধর্ম-সাধনার
 ক্ষমতা এত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, আত্মসংঘম ও তৃষ্ণা-
 ক্ষয় ঐহিক ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ—তিনি আত্মা
 মানেন না ইহাও কি কখন হয়?

সুতরাং এ বিষয় আলোচ্য। আলোচনায় প্রবৃত্ত
 হইবার পূর্বে ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যিক।

‘আত্মা নাই’—বলিলে এক শ্রেণীর লোক এইপ্রকার
 বুঝে :—দেহই মানব; দেহ ছাড়া মানব কিছু নয়। সুখ-
 দুঃখাদি দেহ হইতে উৎপন্ন। লোকে যে বলে ধর্মার্থ
 কর্তব্যাকর্তব্য—এ সমুদায়ই সুখদুঃখমূলক। দেহ-
 বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। পরকাল
 বলিয়া কিছু নাই। ‘আত্মা নাই’ ইহার উচ্চতর ব্যাখ্যা
 প্রাচীন কালে দেওয়া হইয়াছে কি না সম্ভেদ।

‘আত্মা আছে’ বলিলে অনেকে এই প্রকার বুঝে :—
 মানব কেবল দেহপিণ্ড নহে; দেহ ছাড়াও এমন কিছু
 আছে যাহার দ্বারা মানবের মানবত্ব। দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু

সব বিনষ্ট হয় না। দেহ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের
 যাহা বিনষ্ট হয় না, দেহ বিনষ্ট হইবার পরও পুরুষের যাহা
 বর্তমান থাকে তাহাই আত্মা। এই মতে পুরুষের এক
 দেহাতীত সত্তা আছে, এই সত্তাই সুখ-দুঃখ ভোগ করে,
 এই সত্তারই ধর্মার্থ। মৃত্যুর পরে ধর্মার্থ লইয়া
 পুরুষ পরলোকে গমন করে। আত্মবাদের ইহাই প্রচলিত
 ব্যাখ্যা। ঐহিক আত্মাব বিষয়ে এইপ্রকার ব্যাখ্যা
 দেন তাঁহারাও আত্মবাদী।

এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে, গোতম
 আত্মা মানিতেন কি না। ‘আত্মবাদ’ ও অনাত্মবাদেতে
 যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি একটি প্রকৃত বা
 প্রচলিত ব্যাখ্যা হয়, আমরা দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিব, গোতম
 আত্মবাদী ছিলেন।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যিক। গোতমের
 সমসাময়িক ধর্মচার্যগণ যে যে বস্তুকে আত্মা বলিয়া
 নির্দেশ করিতেন, গোতম সে-সমুদায়কে আত্মা বলিয়া মনে
 করিতেন না। এইজন্য সেই সময়ের লোকে গোতমকে
 ‘আত্মবাদী’ বলিত না এবং গোতমও আপনাকে
 ‘আত্মবাদী’ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই; প্রত্যুত তিনি
 প্রচলিত আত্মবাদের যথেষ্ট সমালোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা আত্মবাদের যে-অর্থ দিচ্ছি সেই অর্থে গোতম আত্মবাদী। আমরা দেখাইব যে, গোতম স্বীকার করিতেন যে, একজন পুরুষ আছে; এই পুরুষই কর্ম করে এবং দেহত্যাগের পরে এই পুরুষই কর্ম লইয়া পরলোকে গমন করে এবং সেই স্থলে কর্মফল ভোগ করে।

১

ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, যাহারা দেহাতিরিক্ত কোন সম্ভার অস্তিত্ব স্বীকার করিত না, যাহারা ধর্মার্থ ইহলোক পরলোক মানিত না, গোতম তাহারিগণের মতকে তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

দাঁচনিকায় গ্রন্থে (১৫৫, ইংরেজী সংস্করণ) লিখিত আছে যে, অজিত কেশ-কণ্ঠা নামক একজন আচার্য এই প্রকার বলিতেন :—

“দান নাই, ইষ্ট নাই, আহুতি নাই; স্বকৃত দ্রুত কর্মের ফল নাই; ইহলোক নাই, পরলোক নাই; পিতা নাই মাতা নাই স্বর্গীয় জন্ম নাই, জন্ম-ব্রাহ্মণ নাই—যাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, যাহারা প্রকৃত পথে বিচরণ করেন, যাহারা ইহলোক পরলোক স্বয়ং সম্যকরূপে অবগত হইয়া অপরকে উপদেশ দেন।” (ক)। “এই দেহ চারি মহাত্ম হইয়া গঠিত। যত্ন হইলে দেহের পার্শ্ব অংশ পৃথিবীতে গমন করিয়া পৃথিবীর সহিত সম্মিলিত হয়; দেহের জলীয় ভাগ জলে গমন করিয়া জলের সহিত সম্মিলিত হয়; দেহের তেজ তেজে গমন করিয়া তেজের সহিত সম্মিলিত হয়; দেহের বায়বীয় অংশ বায়ুতে গমন করিয়া বায়ুর সহিত সম্মিলিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে গমন করে। চারিজন লোক তাহাকে আশানে লইয়া যায়, তাহার অস্থি কপোতের ডায় শেতাব হইয়া যায় এবং আহুতি ভস্মে পরিণত হয়। এই যে দান ইহা মূর্খদিগের কথা; যাহারা বলে ইহার মূল্য আছে, তাহাদের কথা তুচ্ছ, মিথ্যা এবং বৃথা। যত্নের পরে কিছু থাকে না।” (খ)। (সমগ্র অংশ মজ্জিম গ্রন্থে ১৫১৫; কেবল (ক) অংশসংযুক্ত ৩.২০৬; ৪।৩৪৮; মজ্জ ১১২৮, ৪০১ এ)।

গোতম বলেন, এই মত মিথ্যা দৃষ্টি (মিচ্ছাদিচ্ছা) এবং বিপরীত দর্শন (বিপরীত দসন); তিনি আরও

বলিয়াছেন যে, ইহা অধর্মচর্যা ও বিধর্মচর্যা (অধর্মচরিয়্যা—বিসমচরিয়্যা)। ইহার পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ধর্মার্থ ও ইহলোক পরলোক আছে (মজ্জ, ১১২৮)।

“তুই ভাবে আমরা মতামত প্রকাশ করিতে পারি—(১) সাধারণ ভাবে বলিতে পারি যে, আমরা এই প্রকার বিশ্বাস করি; (২) দ্বিতীয়ত, বিকল্প মতের সমালোচনা করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে পারি। এই দ্বিতীয় প্রণালীই অধিকতর সম্ভাব্যদায়ক। পূর্বোক্ত অংশে গোতম এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত হইতে আমরা তাহার মত বিষয়ে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারি :—ধর্মার্থ ও ইহলোক পরলোক আছে এবং দেহ-বিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। ইহা আত্ম-বাদের কথা।

২

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, তিনি সাক্ষ্যভাবেও কর্ম ও কর্মফলের ভোগ স্বীকার করিয়াছেন।

কায়, মন ও বাক্য-সংক্রান্ত শুভাশুভ কর্ম কি এবং এই সীমাবদ্ধের ফল কি—তাহা তিনি নানাস্থলে নানাতাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মজ্জিম-নিকায়ের অন্তর্গত চুল-কম্ব বিভঙ্গ-বৃত্তে লিখিত আছে যে, মজ্জাগণের মধ্যে উচ্চ-নীচ, অজ্ঞান-দীর্ঘায়ু, স্বস্থ অস্থস্থ, স্বন্দর কুৎসিৎ, অজ্ঞাতোপী মহাতোপী, উচ্চ-বংশোদ্ভব নীচ-বংশোদ্ভব, প্রজ্ঞাবান-প্রজ্ঞাবিহীন, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার কেন হয়? ইহার উত্তরে গোতম সংক্ষেপে বলিয়াছেন :—

“সত্তাসমূহ ‘কম্মসূক’ ‘কম্ম-দায়াদ,’ ‘কম্ম-ধোনি’ ‘কম্ম-বজ্জ’ এবং ‘কম্ম-পটিসরণ’ (মজ্জ ৩২০৩, ২০৬)।

‘কম্ম-সূ-সক’ দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, কর্মই স্বকীয় (সক), কর্মই আপনার।

‘কম্ম-দায়াদ’—মাছুষ স্বকৃত কর্মের উত্তরাধিকারী হয়। ইহার ব্যাখ্যায় বুদ্ধবোধ বলিয়াছেন—যং কম্মং করিস্সসি, তত্ত্ব দায়াদো ভবিস্সসি (বিসুদ্ধি-মগ্ন পৃ ৩০১ ইং সং) অর্থাৎ তুমি যে কর্ম করিবে তাহারই দায়াদ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হইবে।

‘কন্ম-যোনি’—স্বকৃত কন্ম অনুসারে মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করে।

‘কন্ম-বন্ধু’—কন্মই মানবের বন্ধু।

‘কন্ম-পটিসরণ’—কন্মই মানবের সরণ বা আশ্রয়।

ইহার পরে গৌতম/বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে দৈহিক, মানসিক, এবং অপরাপর পার্থিব যাহা কিছু শুভ, তাহা পূর্বজন্মের স্বকৃতির ফল এবং যাহা কিছু অশুভ তাহা পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল। এই স্থলে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বকৃতি-স্বকৃতির জন্ত মানুষ স্বর্গ-নরকও ভোগ করিয়া থাকে। (মজ্জ ৩২.০২-২০৬)।

তিনি বলেন, কন্মামুসারে মানুষের ৫ প্রকার গতি হইয়া থাকে। সে পাঁচটি গতি এই :—

(১) নিরয়, (২) তির্যক্-যোনি, (৩) প্রেত-যোনি, (৪) মনুষ্য-জন্ম এবং (৫) দেবজন্ম (মজ্জ ১.৭৩; দীঘ ৩২.৩৪; অঙ্গুত্তর ৪।৪৫২ ইত্যাদি)। কোন কোন স্থলে ছয় গতির কথাও বলা হইয়াছে। এ স্থলে ‘অমর জন্ম’ অতিরিক্ত (দীঘ ৩২.৬৪)।

অনেক স্থলে গৌতম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অমুক ব্যক্তির গতি স্বর্গে, অমুক ব্যক্তির গতি নরকে ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

(ক)

দেবদত্ত পৃথিবীতে ভীষণ দুঃস্বপ্ন করিয়াছিল। একজন তাহাকে এক কল্প ‘অবীচি’ নামক নরকে বাস করিতে হইবে (বিনয় পিঃ চুক্ত ৭।৪।৭, ৮; ইতিবৃত্তক ৮২; অঙ্গুত্তর, পু ৩।৪.৩৩ ইত্যাদি)

(খ)

কোকালিক নামক ভিক্ষু এই পৃথিবীতে দুঃস্বপ্ন করিয়াছিল, সেইজন্য সে ইহকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং মৃত্যুর পরে পচুম (—পদ্ম) নামক নরকে প্রবেশ করিয়াছিল (সংযুক্ত ১।১৫০—১৫১; অঙ্গু ৫।১৭০—১৭৩)।

(গ)

সংযুক্তনিকায়ের এক স্থলে (২।২৫৪—২৬২) লিখিত আছে যে, দিব্যচক্ষু দ্বারা মহা মোগ্গলান এবং গৌতম—

উভয়ই ২১ জন পরলোকগত নরনারীর অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। ইহারা পার্থিব দশায় কে কোথায় বাস করিত এবং কে কি কার্য্য করিত—গৌতম তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সমুদায় অংশ হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, গৌতমের মতে ইহলোকে পুরুষ কন্ম করে; পরলোকে সেই পুরুষই কন্মকল ভোগ করে।

কিন্তু এ বিষয়ে দুই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইয়া আসিতেছে। (১) এক শ্রেণীর লোক বলেন, পুরুষ ইহলোকে কন্ম করে ইহা সত্য। যখন যখন দেহ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল কন্মই থাকে, আর কিছুই থাকে না। পরকালে এই কন্মই ফল প্রসব করে; এই কন্ম হইতেই এক নূতন পুরুষের উদ্ভব হয়। সেই পুরুষই কন্মকল ভোগ করিয়া থাকে। (২) বুদ্ধঘোষ এবিষয়ে আরও অগ্রদর। তিনি পুরুষেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কর্তা ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই; আছে কেবল কন্ম। তিনি ‘বিসুদ্ধি মগ্গ’ নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৫১৩, ইং সং) এই প্রকার লিখিয়াছেন :—

“দুঃখ আছে কিন্তু দুঃখী নাই; কার্য্য আছে কিন্তু কর্তা নাই; নির্বাণ আছে কিন্তু এমন পুরুষ নাই যে নির্বাণপ্রাপ্ত; পথ আছে কিন্তু পথিক নাই”—অনেক লোক মনে করেন ইহাই বৌদ্ধধর্ম। ইহা এক শ্রেণীর বৌদ্ধ মত হইতে পারে, কিন্তু ইহা বুদ্ধের মত নহে। তিনি অসংখ্য স্থলে অন্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

(১)

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই—গৌতম মনে করিতেন, পুরুষ আছেন যিনি কন্ম করেন, কন্ম ত্যাগ করেন এবং মোক্ষলাভ করেন।

সংযুক্ত-নিকায় গ্রন্থে ‘ভার’ শীর্ষক একটি উপদেশ আছে। এইস্থলে গৌতম এইরূপ বলিয়াছেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে ভার, ‘ভার-হার’ (অর্থাৎ ভারবাহী), ভারগ্রহণ এবং ভার নিক্ষেপ—এই কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। হে ভিক্ষুগণ! ভার কাহাকে বলে? দেহ, বেদনা (—Sensation,

ইন্দ্রিয়ের উপবাগ), সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই (পঞ্চ) স্বকমূলক উপাদানকে ভার বলা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ভারবাহী কে? ইহার উত্তরে বক্তব্য—পুরুষ (পুংগল)—যাহাকে বলি এই আয়ুস্মান, এই যাগাব নাম, এই যাহার গোত্র। হে ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় “ভারবাহী”।

হে ভিক্ষুগণ! ভার গ্রহণ কি?—এই যে তৃষ্ণা, যাহা পুনর্জন্ম আনয়ন করে, যাগা আনন্দ ও আসক্তি সহিত বিচরণ করে, যাহা যেখানে-সেখানে স্থল অমুভব করে, (অর্থাৎ) এই যে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা (জীবনে আসক্তি), ও বিভবতৃষ্ণা (জীবনের বিনাশে আসক্তি—ইহাকেই বলে “ভার গ্রহণ”।

হে ভিক্ষুগণ! “ভার নিক্ষেপ” কাহাকে বলে? তৃষ্ণার এই যে সম্যক নিবৃত্তি, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি, অবস্থান—ইহাকেই বলা হয় “ভাবনিক্ষেপ”।

গোতম ইহার পরে আরও বলিয়াছেন:—“পুরুষই ভার, পুরুষই ভারবাহী, লোকে—ভারগ্রহণই দুঃখ এবং ভাবনিক্ষেপই মুক্তি। গুরুভার নিক্ষেপ করিয়া, অন্তর্ভার গ্রহণ না করিয়া, তৃষ্ণাকে সমূলে বিনাশ করিয়া, নিস্পৃহ হইয়া (পুরুষ) পরিনির্কোপ লাভ করে।” (সংস্কৃত ৩২৫ ইং সং)।

এস্থলে বুদ্ধ বলিতেছেন, পুরুষই “ভার-হার”; পুরুষই ভার নিক্ষেপ করে এবং যখন পুনরায় ভার গ্রহণ না করে, তখনই সে নির্কোপ লাভ করে।

সুতরাং কর্মও আছে কর্তাও আছে। যে কর্ম করে, সেই কর্ম ক্ষয় করে, সেই তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া নির্কোপ লাভ করে।

(২)

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, পুরুষই পরলোকে গমন করে। এ বিষয়ে গোতমের ভাষা সুস্পষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই:—

(ক) হুসীলো কায়স্ ভেরা.....নিরয়ং উল্লঙ্ঘতি (দীঘ ২৮৫) অর্থাৎ হুঃশীল ব্যক্তি দেহত্যাগের পর নরকে গমন করে।

(খ) সীলবা কায়স্ ভেরা সগংগং লোকং উল্লঙ্ঘতি

(দীঘ ২৮৬) অর্থাৎ সীলবান ব্যক্তি দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে গমন করে।

(গ) ‘এই পুরুষ’ (পুংগল) নরক প্রাপ্ত হয় (অবুত্তর ৪১২২৫)

(ঘ) এই পুরুষ (পুংগল) তির্ঘাঙ্ক-যোনি প্রাপ্ত হয় (অবু ৪১২২৬)।

(ঙ) এই পুরুষ (পুংগল) প্রেতলোক প্রাপ্ত হয় (অবু ৪১২২৬)

বহুস্থলে এই প্রকার ভাষা। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, দেহত্যাগের পর পুরুষই পরলোকে গমন করে।

(৩)

তৃতীয় বক্তব্য এই যে, গোতম স্পষ্ট ভাষাতে বলিয়াছেন যে, পুরুষ যখন পরলোকে গমন করে, তখন কর্ম তাহার অঙ্গগমন করে। একস্থলে তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন—

“অন্তক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন জীবন পরিত্যাগ করে, তখন কি তাহার আপনার হয় (সকং হোতি)? সে কি লইয়া গমন করে? পশ্চাৎধাবিনী (অনপায়িনী) ছায়ার স্রায় কি তাহার অঙ্গগমন করে?”

মর্ত্য এই পৃথিবীতে পাপ এবং পুণ্য বাহা কিছু করে, উভয়ই তাহার নিজের হয় (সকং হোতি)। তাহাই লইয়া সে গমন করে। অনপায়িনী ছায়ার স্রায় তাহাই তাহার অঙ্গগমন করে”। (সংস্কৃত নিঃ ১১৭২; ১১৭৩, ইং)

এস্থলে অনপায়িনী ছায়ার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ‘অনপায়িনী’ শব্দের অর্থ ‘বাহা দূরে চলিয়া যায় না’ অর্থাৎ নিত্যসাজনী। ছায়া যেমন মানুষের অঙ্গগমন করে, যত্নের পরে পাপ-পুণ্যও তেমনি মানুষের অঙ্গগমন করে।

(৪)

চতুর্থ বক্তব্য এই—পৃথিবীতে যে-ব্যক্তি কর্ম করে; পরলোকে সেই ব্যক্তিই স্বকর্তৃক কর্মের ফলভোগ করে। প্রমাণ এই:—

(ক)

নিম্নলিখিত ঘটনা গোতম বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া ছিলেন। আমরা ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

দুষ্কৃতিবশতঃ একজন লোক নরকে নীত হইয়াছিল। বিচারের সময় নিরয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে যমের নিকট আনয়ন করিয়া বলিল, “হে দেবতা! এই পুরুষ (পুরিস) মাতাকে সম্মান করে নাই, পিতাকে সম্মান করে নাই, শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করে নাই, কুলের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান করে নাই। হে দেবতা! ইহার দণ্ড বিধান করুন।”

তখন যমরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“হে পুরুষ! মহুগ্গণের মধ্যে যে প্রথম দেবদূত প্রকাশিত, তাহাকে কি তুমি দেখ নাই?”

সে বলিল—“হে ভদ্র! আমি দেখি নাই।”

তখন যম তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জরাই প্রথম দেবদূত। এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি জরার লক্ষণও বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া সেই পুরুষ বলিল “হা, আমি দেখিয়াছি।” তখন যম তাহাকে বলিলেন তোমার কি এ প্রকার মনে হয় নাই যে “আমিও জরাগ্রস্ত হইব; স্তব্রাং কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কল্যাণ সাধন করি”।

সে, বলিল, প্রমাদ বশতঃই এ প্রকার চিন্তা আসে নাই।

তখন যমরাজ বলিলেন :—

“হে পুরুষ! প্রমাদবশতঃ তুমি কায়মনোবাক্যে কল্যাণ সাধন কর নাই। তুমি যেমন প্রমত্ত, তেমনি শাস্তি বিধান করিব। তুমিই এই পাপ কর্ম করিয়াছ, তোমার মাতা করে নাই, পিতা করে নাই, ভ্রাতা করে নাই, ভগিনী করে নাই, বন্ধুবান্ধব করে নাই, রক্ত-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিও করে নাই, দেবতা করে নাই, শ্রমণ ব্রাহ্মণ করে নাই—তুমি নিজেই এই পাপ কর্ম করিয়াছ এবং ইহার ফল তুমিই ভোগ করিবে।”

(ক)

ইহার পরে ব্যাধিরূপী দ্বিতীয় দূত এবং মৃত্যুরূপী তৃতীয় দূতের কথা উল্লেখ করিয়া ঐক প্রকৃতির ভাষা ব্যবহার করিয়াই তাহাকে বলিলেন যে, এ পাপ কর্ম আর কেহ করে নাই, তুমিই নিজেই ইহা করিয়াছ এবং তুমি নিজেই ইহার ফল ভোগ করিবে। (অকৃতর-নিকায়, তিক নিপাত, ৫৩, দেবদূত বগ্গ)।

মজ্জিম-নিকায় গ্রন্থেব দেবদূত স্তোত্র (৩। ১৭৮ ইং সং) এই আখ্যানিকাটি পাওয়া যায়। তবে ইহাতে দেবদূতের সংখ্যা পাঁচ জন। নতুবা উভয় উপাখ্যানের ভাষায় এবং ভাবে বিশেষ ভেদ পার্থক্য নাই। (ক) চিহ্নিত অংশ অকৃতর-নিকয়ে তিন বার এবং মজ্জিম-নিকয়ে পাঁচ বার উক্ত হইয়াছে।

এই আখ্যানিকা হইতে আমরা এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি :—

(১) পার্শ্বিক কর্ত্তা এবং নরকের ভোক্তা একই পুরুষ।

(২) পুরুষ স্বকৃত কর্মেরই ফল ভোগ করে।

(৩) পরলোকে গমন করিলেও পুরুষের পার্শ্বিক স্থিতি থাকে।

(৪)

রট্ট পাল স্তোত্র ইহাই অতি সংক্ষেপে এই ভাবে বলা হইয়াছে :—

“চোর যদি সন্ধিমুখে (অর্থাৎ সিন্ধের মুখে) দ্রুত হয় সেই পাপধর্ম্ম স্বকর্মের জন্ত (সকম্মনা) যেমন শাস্তি প্রাপ্ত হয়, মানবগণও তেমনি। যাহারা পাপধর্ম্ম, তাহারা মৃত্যুর পরে স্বকর্মের জন্ত (সকম্মনা) শাস্তি ভোগ করে”। মজ্জিম ২। ৭৪

এস্থলে ‘সকম্মনা’ শব্দটার প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যিক। স্বকৃত স্বকৃত কর্মেরই ফল ভোগ করে।

(৫)

পঞ্চম বক্তব্য এই যে, গোতম অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন একই লোকের অসংখ্য জন্ম।

(ক)

অনন্তগুণ সংযুক্ত গোতম নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সংসারের আরম্ভ কল্পনা করা যায় না। এই প্রকরণে তিনি মানবের জন্ম বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন—

“এক কল্পে একই পুরুষের (এক-পুংগলস্) জন্ম-জন্মান্তরে যত অস্থি হইয়াছে তাহা যদি ধ্বংস না হইত এবং তাহা যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা হইলে

সেই মহা অস্থিপুঞ্জ বেণুজ নামক পর্বতের ত্রায় বৃহৎ
হইত।” (সংযুক্ত নিকায় ২।১৮৫)

এস্থলে ‘এক পুণ্ড্রলঙ্গ’ শব্দটির প্রতি প্রাধান্য করা
আবশ্যক। একই পুরুষের অসংখ্য জন্ম।

(খ)

ছয়টি অংশে পৃথক পৃথক ভাবে যাহা বলা হইয়াছে
তাহা নিয়ে একসঙ্গে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। গোতম
বলিতেছেন :—

এপ্রকার সত্তা পাওয়া সহজ নহে, যে দীর্ঘকাল কখন
(১) মাতা বা (২) পিতা বা (৩) ভ্রাতা বা (৪) ভগিনী
বা (৫) পুত্র বা (৬) কঙ্কারূপে কখন জন্মগ্রহণ করে নাই।
(সংযুক্ত ২।১৮২—১২০)

সংসারের আদি জানা যায় না—ইহা ব্যাখ্যা করিতে
যাইয়া গোতম এই ‘অনমত্তগণ’ সংযুক্ত পুরোক্ত কয়েকটি
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

সংসার অনাদি; এইজন্ত উদ্ধৃত অংশে ‘দীর্ঘকাল’ শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে। একই মানবের অসংখ্য জন্ম। কোন
না কোন জন্মে তাহাকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র
বা কঙ্কা হইতে হইয়াছিল।

এস্থলে একই মানবের বিভিন্ন জন্মের কথা বলা হইল।

(গ)।

গোতম বলিতেছেন :—

“হে ভিক্ষুগণ দীর্ঘকাল তোমরা গো, মহিষ, মেঘ, অজ্ঞা,
মৃগ, কুক্ষুটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে; এবং তোমাদিগের
মস্তক ছেদন করা হইয়াছিল; তোমাদিগকে চোর, গ্রাম-
লুণ্ঠক, পরিপন্থী দণ্ড্য বা পরদারিক রূপে ধৃত করিয়া
তোমাদিগের শিরচ্ছেদন করা হইয়াছিল। ইহাতে যে
রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও
অধিক।” (সংযুক্ত ২।১৮৮)

(ঘ)

“হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল নানাভয়ে মাতৃস্তনের যত
দুগ্ধ পান করিয়াছ, তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও
অধিক।” (সংযুক্ত ২।১৮১)

(ঙ)

“তোমরা দীর্ঘকাল মাতৃমরণ, পুত্রমরণ, ছহিতৃমরণ,
জাতিগণের বিপদ, অর্থহানি, রোগ—এই সমুদয়ের জন্ম
যত . অশ্রু বিসর্জন করিয়াছ তাহা চারি সমুদ্রের জল
অপেক্ষাও অধিক।” (সংযুক্ত ২।১৮০)

(চ)

“হে ভিক্ষুগণ! যখন তোমরা দুঃখ দেখিবে তখন এই-
প্রকার চিন্তা করিবে—‘আমরাও দীর্ঘকাল এইপ্রকার
অনুভব করিয়াছি’। (সংযুক্ত ২।১৮৬)

(ছ)

“হে ভিক্ষুগণ! যখন তোমরা দুঃখ দেখিবে, তখন
তোমরা এইপ্রকার চিন্তা করিবে—‘আমরাও দীর্ঘকাল
এইপ্রকার অনুভব করিয়াছি’। (সংযুক্ত ২।১৮৬, ১৮৭)

পুরোক্ত সাতটি অংশে আমরা অনমত্তগণ সংযুক্তের
১২টি স্থল বিচার করিয়াছি। প্রত্যেক স্থলেই বলা
হইয়াছে, একই পুরুষ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে
একজন্মে কষ্টা, সেই অপর জন্মে ভোক্তা; আবার যে
ভোক্তা সেই কষ্টা। এই সমুদায় অংশে গোতম কষ্টা ও
ভোক্তার একত্ব স্বাকার করিয়াছেন।

(জ)

ষষ্ঠ বক্তব্য এই যে, স্বর্গে বা নরকে গমন করিলেও
সে-স্থলে পার্থক্য স্থিতি বর্তমান থাকে।

(ক)

দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান স্তম্ভে গোতম স্বয়ং বর্ণনা
করিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ-লোকে
গমন করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ তাহার নিকট
উপস্থিত হইয়া নিজেদের পার্থক্য জীবনের বিষয় বর্ণনা
করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিল—

“আমরা ভগবান্ বিপত্তীর নিকটে ব্রহ্মচর্য্য উদ্যাপন
করিয়া সমুদয় আসক্ত ছিন্ন করিয়াছিলাম।” (দীঘ
১৪।৩২২)

ইহার পরে অপরাপর অনেক দেবতা আপনাদিগের
মানবজীবনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল। যাহারা গোতম

দ্বৈর সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সর্বশেষে
তাহারা বলিয়াছিলেন :—

“ভগবানের নিকট আমরা ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করিয়া
আসক্তিশূন্য হইয়াছিলাম। এখন আমরা এই লোক
প্রাপ্ত হইয়াছি।” দীর্ঘ ১৪১৩৩০

গোতম দেব-লোকে গমন করিয়াছিলেন কিনা,
তাহা বিচার্য্য নহে; বিচারের বিষয় তিনি মানব ও
পরলোক বিষয়ে কি-প্রকার মত পোষণ করিতেন।
পূর্বোক্ত অংশ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, গোতম
বিশ্বাস করিতেন পুণ্য কৰ্ম করিলে মানব স্বর্গে গমন
করে এবং স্বর্গে গমন করিলেও তাহার পার্থিব স্মৃতি
বিলুপ্ত যেন না।

ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-মানব ইহলোকে
কৰ্ম করে, সেই মানবই স্বর্গলোকে স্বকৃত কৰ্মের ফল
ভোগ করে।

(খ) অজিতের ঘটনা

গোতম বলিতেছেন—

অধুনা অজিত নামক লিচ্ছবী সেনাপতির মৃত্যু
হইয়াছে; তাহার পর সে জয়জিংশ দেবগণের রাজ্যে
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া
এইরূপ বলিয়াছে :—

“নগ্ন সন্ন্যাসী পাটিক-পুস্ত নিলজ্জ; নগ্ন সন্ন্যাসী পাটিক-
পুস্ত মিথ্যাবাদী। সে ‘বজ্জিগণেব’ গ্রামে এই কথা
বলিয়াছে যে, লিচ্ছবী সেনাপতি অজিত মহা-নিরয়ে
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি মহা নরকে জন্মগ্রহণ করি
নাই—আমি জয়জিংশ দেবগণের রাজ্যে জন্মগ্রহণ
করিয়াছি। (দীর্ঘ, ৩।১৫ ইং)

অজিতের দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে, ইহলোকের
বর্ত্তা ও পরলোকের ভেদ একই পুরুষ।

(গ) ঘটিকারের কথা

ঘটিকার নামক এক জন পুরুষ মৃত্যুর পরে ‘অবিহ’
নামক স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এক সময়ে
সে অবিহ লোক-হইতে গোতম-সমীপে উপস্থিত
হইয়াছিল।

কথা-প্রসঙ্গে ঘটিকার গোতমকে এইপ্রকার
বলিয়াছিল :—

“আমি পূর্বে বেহলিঙ্ক নামক স্থানে কুস্তকার
ছিলাম; আমার নাম ছিল ঘটিকার। আমি কস্ত্রপের
গৃহস্থ শিষ্য (উপাসক) ছিলাম ইত্যাদি”। (সংযুক্ত
১।৩৫, ৬০)

(ঘ) সেরির কথা

এক সময়ে ‘সেরি’ নামক এক দেব-পুত্র বুদ্ধ সমীপে
উপস্থিত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছিল :—

“পূর্বে আমি এক রাজা ছিলাম; আমার নাম ছিল
সেরি; আমি ছিলাম দাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি”। (সংযুক্ত
১।৫৮)

(ঙ) অনাথপিণ্ডকের ঘটনা

মৃত্যুর পরে অনাথপিণ্ডক স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে তিনি দেবলোক হইতে
জ্যেত বনে উপস্থিত হইয়া গোতম-সমীপে ধর্ম সাধন ও
সাবিপুত্র বিষয়ে এক গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।
প্রাতঃকালে গোতম ভিক্ষুগণকে বলিলেন, এক দেবপুত্র
রাত্রিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এক গাথা
উচ্চারণ করিয়াছিল। গোতম সেই গাথাও ভিক্ষুগণকে
শুনাইলেন। তখন আনন্দ বলিলেন :—ইনি নিশ্চয়ই
অনাথপিণ্ডক। তখন গোতম বলিলেন—

“সাবু, সাধু, আনন্দ! তর্ক দ্বারা যত দূর সত্য নির্ণয়
করা যায়, তাহা তুমি করিয়াছ। আনন্দ! এই দেবপুত্র
অনাথপিণ্ডকই”। (সংযুক্ত ২।৫৫, ৫৬)

এই কয়েকটি ঘটনাতে দেখা যাইতেছে যে, স্বর্গে
গমন করিলেও পার্থিব স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। ইহা দ্বারা
প্রমাণিত হয় যে, ইহলোকের কৰ্ত্তা ও পরলোকের ভোক্তা
একই মানব।

(চ)

চতুর্থ বক্তব্যের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এইঃ—পরলোকে গমন
করিলেও পুরুষের পার্থিব স্মৃতি থাকে। এস্থলেও দেখা
যাইতেছে যে, ইহলোকের কৰ্ত্তা ও পরলোকের ভোক্তা
একই পুরুষ।

(৭)

সপ্তম বক্তব্য এই যে, গোতমের মতে এ জন্মেও পূর্ব পূর্ব জন্মেও স্মৃতি জাগ্রৎ করা সম্ভব। গোতম নিজের এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। সংযুক্ত-নিকায় নামক গ্রন্থে এইরূপ আছে :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি ইচ্ছা করিলেই আমার সর্ববিধ পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারি। এক জন্ম, কি দুই জন্ম, কি তিন জন্ম, কি চারি জন্ম, কি পাঁচ জন্ম, কি দশ জন্ম কি বিংশ জন্ম, কি ত্রিংশ জন্ম, কি চল্লিশ জন্ম, কি পঞ্চাশ জন্ম, কি শত জন্ম, কি সংশ্র জন্ম, কি শত-সহস্র জন্ম সংবর্ত্ত-কল্পে (প্রলয়-কল্পে,) বিবর্ত্ত-কল্পে (সৃষ্টি-কল্পে), সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত-কল্পে আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র ছিল, এই বর্ণ ছিল, এই প্রকার আহার ছিল, এই প্রকার স্থূহুঃ অন্নভব করিয়াছিলাম, এতদিন আমার আয়ু ছিল, সেই অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; বিস্মৃত ঘটনা ও বিবরণ সহ আমার সর্ববিধ পূর্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারি।

হে ভিক্ষুগণ! কল্পণও এই প্রকার স্মরণ করিতে পারে।” (সংযুক্ত, ১২১৩ ইং)।

গোতম নিজের এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, অপরেও সাধনবলে এই ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। (মজ্জিম ১২২, ৩৫, ৭০, ২৭৮, ৪২৫, ২২০, ২১৩১; ৩।১২, ৯৮ ইত্যাদি)।

এই স্মৃতি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, একই পুরুষ জন্ম-জন্মান্তরে জীবন ধারণ করে।

নানাদিক হইতে আলোচনা করিয়া গোতমের মত বিষয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

১। একজন পুরুষ আছে।

২। এই পুরুষই কর্ম করে।

৩। দেহত্যাগের পরে পুরুষ পরলোকে গমন করে এবং কর্ম তাহার অনুগমন করে।

৪। পরলোকে ঐ পুরুষই স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে।

এ মতকে যে নামই দেওয়া যাউক না কেন আত্মবাদও যাহা, ইহাও তাহাট।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে অন্তর্দিক হইতে গোতমের আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীযুক্তা অবলা বসুর পত্রাবলী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত

1 Lavenders Gardens,
Clapham Common. S. W.
20th March, 1908.

কবিবরেষু,

অনেক দিন হইল আপনাকে পত্র লিখিব ভাবিয়াছি, কিন্তু নানা কারণে হইয়া উঠে নাই। চিঠিপত্র না লিখিলেও জানিবেন, আমাদের হৃদয় আপনার সমুদয় শোভাঃখে আন্দোলিত ও ব্যথিত। আপনার বিপদে

আমরা ধেকপ কষ্ট পাই, আপনার ঈর্ষ্যা ও দ্বন্দ্বপ্রীতি দেখিয়া আমরা সেইরূপ আশঙ্কিত হই। আপনি যে-স্ব গুরুতর আঘাত পাইতেছেন, তাহা সামান্যই প্রকৃত দ্বন্দ্বপ্রেমকে মত আরও গভীরতমভাবে শাধু কার্যে ও চিন্তাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত স্বাভাব বলি যায়। আপনার ও সামান্য সংকট দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সেবার বড়দিনের ছুটির সময় অশান্তিপূর্ণ চঞ্চল হৃদয়

লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটি কথা বলিয়াই নবজীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। সে-কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

যাহাকে এত যত্নে ও স্নেহে বহিত করিয়াছিলেন, সে-সব আশা চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া মায়ের কোলে গেল। আপনি মনকে শাস্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা দেশের কাজে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কি বলিতে পারি—আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্ব পরিণত হউক। আমরা ধন্ত হই, জন্মভূমি ধন্ত হোক। প্রাদেশিক অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সঙ্কটের সময় দেশবাসী সকলকে একমুখে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন। কারণ, শুনিতে পাই, যে, অল্পদেশীয় দেশভক্তরা নাকি বাকালীর আবার একতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছে এবং বলিতেছে, তবে ইহারা কেন স্মরণ কন্ডেম্যানে সহি করিলেন। যাহা হউক, আশা করি বঙ্গদেশে একতার ফল ফলিবে। আপনি কিন্তু বতাবর পৃথক হইয়া থাকিবেন এবং এখন যেমন কাষ করিতেছেন তেমনি করিবেন। আপনার হইতেই আপনার সংসর্গে থাকিয়া সেইসব লোক গঠিত হইবে, যাহারা আপনার আদর্শমত গ্রামে গ্রামে ঘাইয়া কাষ করিবে। আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু এদেশে যে সব ছেলে আসে তাহাদের হইতে কথা ছাড়া কোন কাষ আশা করা যায় না। এক্ষণেই আমার মনে হয়, আপনার জ্বলের ছেলেদের কত বেশী আবশ্যক। তাহারা বিদেশে আসিয়া আরও বড় হইয়া যাইবে।

আপনি সভাভঙ্গে কি বলিয়াছিলেন, তাহা কোন কাগজেই দেখিলাম না। শুনিতে পাই তাহা খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। (অধ্যাপক-মহাশয়ের শরীর মাঝে খুব অসুস্থ ছিল; এখন অনেকটা সুস্থ বটে, কিন্তু হৃদয়ের অবসন্নতা গভীর। এখন বসন্তের

পূর্বাভাস, গাছপালা সবই নিষ্কীব, তাহারা কিছুতেই সাড়া দেয় না। তাহারা না জাগিলে ওঁর অবসন্নতাও দূর হইবে না।

রথী শরৎবাবুর কাছে অধ্যাপক-মহাশয়ের বিষয় একটা চিঠি লিখিয়াছেন। তাহাতে জানা গেল, যে, ইলিনয় হইতে ওঁকে লেকচারার করিয়া লইবার খুব সম্ভাবনা আছে। হয়ত রথী আপনার কাছেও লিখিয়াছেন। এটা সুসংবাদ বটে।

আমরা লগুনে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে চাই। আপাততঃ বাড়ীতে বাড়ীতে করিলেই ভাল। এখানে উপযুক্ত লোক নাই। সেজন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, যাহার বাড়ীতে উপাসনা হইবে তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিবেন। আপনার ইহাতে কি বক্তা আছে কি? এবং আদিসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি একথানা পাঠাইতে পারেন কি? তাহা এই সমাজের সম্পত্তি হইবে। আরও অনেক লিখবার ছিল, কিন্তু আজ এখানেই আসি। আবার যখন সকলে একত্রিত হইব তখন কত গল্প করা যাইবে। আশা করি, বেলা ও মীরা ভাল আছে। পিসিমা এখন কোথায় আছেন?

আপনাদের

শ্রীঅবলা বসু

C/o Mrs Ole Bull,
Studio House,
168, Brattle Street,
Cambridge, Mass., U.S.A.
20th Nov, 1908.

প্রিয়বরেণ্য—

লগুন ছাড়িয়া আপনাকে পত্র লিখি নাই বটে, কিন্তু সর্বদাই আপনার কথা ভাবিতেছি এবং আমরা কত সময় আপনাকে নিকটে পাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। এ সময় আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের কাষ থাকিতে পারিলে কত সুখী হইতাম। রথীদের ত যাইবার সময় হইয়াছে; আপনি কি আসিতে পারেন না? এত কথা জামতেছে, যে, আপনি এখানে থাকিলে খুব সুখে থাকা যাইত। চিঠিতে

কিছু লেখা যায় না। পানের বহিতে আপনার ছবি দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। এত ধারাপ দেখাইতে চেষ্টা করা কি আপনার উচিত? আমি দেশে থাকিলে কখনই আপনাকে এই ছবি ছাপাইতে দিতাম না। আপনাকে জোর করিবার কেহ নিকটে নাই বলিয়া আপনি এই ছবি ছাপাইতে দিয়াছেন। এবার দেশে গিয়া আপনাকে প্রতিজ্ঞা করাইব, যে, আপনি আমাকে না দেখাইয়া কোন ছবি ত্রাহাকেও দিবেন না। আমি জানি আপনি বৃদ্ধ বয়সের ভাণ করিবেন, কিন্তু আমার কাছে তাহা করা সম্ভব হইবে না। কারণ, আমার স্বামী আপনা হইতে বড়। আমেরিকা আসিলে আপনি নিজকে বৃদ্ধ বলিতে লজ্জা বোধ করিবেন। কারণ, এখানে ৬০।৭০ বৎসরের পুরুষ ও মেয়েকে কিছুতেই ৫০এর বেশী মনে হয় না। এই ছবি দেখিয়া আপনাকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের প্রতিমূর্ত্তি মনে হয়। কিন্তু আমাদের কবিকে এই অল্প বয়সে অবসর দেখিতে পারিব না। আপনাকে আরও কাজ করিতে হইবে, তাহা জানেন? আপনি ছেলেদের জুগ করিয়াছেন, এখন মেয়েদের জুগ কিছু না করিয়া আপনাকে অবসর হইতে দিব না। আপনি এবারে আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন; আমি এই কার্যে আমার শক্তি নিয়োগ করিতে চাই। মেয়েদের জাতীয় ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত আমাদের হাতে কাজ করিবার অনেক আছে। আপনি ছেলেদের জুগটাকে যে-রকম করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আশা করি এই সময় লোকে তাহার মূল্য বুঝিয়া ছেলে পাঠাইতেছে। জুলে প্রবর্ত্তিত ঋতু-উৎসবগুলি খুব চমৎকার। এখানে একদিন জুলের ছেলেমেয়েরা গাছ পৌতে, আমাদের ১৯১১ বৈশাখ বা কোনদিন অমন একটা উৎসব করিলে বেশ স্মরণ হয়। বিশেষ যদি কার্পাস পোতা যায়।

রথীদের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নাই, জাহ্নয়ারীতে হইবে। রথী ওঁব লেকচার দেওয়া সম্বন্ধে খুব খাটিয়াছে। কলে এত নিমন্ত্রণ আসিয়াছে যে, উনি সব রাখিতে পারিলেন না; কেবল ৫৬টা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন। এখানে বোষ্টন সহরে যে দুইটা বক্তৃতা

দিয়াছেন, তাহাতে সকলেই খুব প্রশংসা করিয়াছে। এখানে ওঁর বই অনেক লোকে পড়িয়াছে ও ওঁর চিন্তার ধারার অনুবর্ত্তক এক মস্ত শ্রেণী আছে। তাঁহারা ওঁকে খুব অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমেরিকাতে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখিতেছি। এখানকার ইতিহাস পড়িলে ও ছোট ছোট ঘটনা শুনিলে মনে নূতন উৎসাহ ও উত্তম আসে। অরবিন্দ ছুটিতে আপনার কাছে গিয়াছিল শুনিয়া খুসী হইয়াছি। সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে। আশা করি, আপনার মেয়েরা ভাল আছে। শরৎকালে আপনার বোটে নিশ্চয় খুব স্মরণ দৃশ্য দেখিয়াছেন। এখানকার শরৎকালের নানাবর্ণের পাতাতে অতিশয় মনোরম শোভা হয়। আমরা একমাস নদীর পারে মিসেস বুলের একটা বাড়ীতে ছিলাম। জোয়ার তাঁটা দেখিয়া গঙ্গার কথা স্মরণ হইত, যদিও এদেশে নদীর পাড় অতিশয় স্নান ও পরিষ্কার। এখানে কত কথা লিখিবার আছে, কিন্তু রথীরা অনেক লিখিয়াছে। সেজন্য আমার লেখার আবশ্যক নাই বোধ হয়। কিন্তু আপনার বিষয় অত্যন্ত চিন্তিত আছি জানিবেন। আপনি একলা একলা মনকে আরও ভারাক্রান্ত করিতেছেন এই ভয় হয়। একলা একলা শোক সহ করা অত্যন্ত কঠিন। কাহাকেও বলিতে পারিলে ও সহ্যভূতি করিবার লোক পাইলে অনেক লাঘব হয়। আমার চিরকাল স্মৃতিতে থাকিবে, শীতকালে আপনার বোটে আপনার কাছ থেকে কি রকম সাহায্য পাইয়াছিলাম। আপনাকে বুঝাইবার আমার কোন শক্তি নাই। কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হয়, যে, সুখহীন একই জিনিষের রূপান্তর মাত্র। এবং বঙ্গদেশের সব সম্ভান আপনার। তাহারা সকলেই আপনার মুখ চাহিয়া আছে; ঈশ্বর আপনার একটিকে নিজ কোলে লইয়া গিয়াছেন, তাহার বদলে শত সহস্র শিশুসম্ভান আপনার অপেক্ষায় আছে, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া অবসাদ দূর করুন। দূর, বহুদূর হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও স্নেহ আপনার কাছে গিয়া আপনাকে কতকটা সুখ দেন করিতে পারে।

আপনার বোঠাকুরাণী

অবলা বহু

93, Upper Circular Road,
Calcutta.
11th April.

কবিগরেজ,

অনেক দিন পর আপনি অধ্যাপক-মহাশয়কে পত্র
দিয়াছেন। তাঁর চিঠির উত্তর তিনি নিজেই দিবেন।

আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই, আশা করি
ভাল আছেন। আপনি যে আমাদের বোলপুঁবে চান না,
সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাবণ, আমাদের যাইতে
লেখেন নাই। যাক, আপনি অবসর মত আমাদের স্কুলের
মেয়েদের জন্ত যদি কোনরূপ খেলা লিখিয়া দেন, তাহা
হইলে উপকার হয়। আপনাকে ইংবেঞ্জী কয়েকখানা বই

পাঠাই। তাহা হইতে বুঝিবেন কিরূপ আমি চাই। আপনার
'লক্ষ্মীর পবিত্রতা'র মতন কোন লেখা হইলেই হইবে। আব
আপনি যখন কলিকাতা আসেন, তখন কি একবার ব্রাহ্ম
মেয়েদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের সহিত দেখা করিয়া শিক্ষা
সম্বন্ধে কিছু বলিবেন? বোলপুঁবে যে-সব বই পড়ান, তাহা
কোথায় পাওয়া যায়? আমাকে একটা সিলেবাস পাঠাইয়া
দিতে পারেন কি? সম্ভাব্যকে যদি বলেন, তবে সে
পাঠাইয়া দিবে। আমি মেয়েদের স্কুলে আপনাদের
পড়াইবার প্রণালী অল্পস্বল্পে শিখাইতে চাই। আজ তবে
আসি।

আপনাদের
শ্রী অবলা বসু

সত্তর বৎসর

বাল্য-স্মৃতি

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

ফেঁচুগঞ্জ—শ্রীহট্ট

পঞ্চমটি বৎসর পূর্বে বর্শালের অন্তর্গত কোটের
হাট মঃকুমার আমার বাবা মুল্লফি করিতেন। কয়েক
বৎসর পবে কোটের হাটের মঃকুমা উঠিয়া গেলে সঙ্গে
সঙ্গে বাবার কর্ম্ম যায়। এই অবসরেই বাড়ী আসিয়া
বাবা আমার চূড়াকরণ করেন। এই সময়ে শ্রীহট্ট সহরের
নিকটে ফেঁচুগঞ্জের মহকুমার মুল্লফের পদ খালি হয়।
আমার চূড়াকরণের পবেই বাবা এই পদ লইয়া ফেঁচুগঞ্জে
যান। মা তাঁহার সঙ্গে যান নাই। গ্রামের বাড়ীতে
থাকিলে আমার লেখাপড়া হইবে না, আব গ্রাম্যজীবনের
খেলাধুলার মাঝে পড়িয়া কি জানি আমি যদি গ্রাম্যচরিত্র
লাভ করি, এই ভয়ে বাবা আমাকে ফেঁচুগঞ্জে লইয়া

গেলেন। প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশেও
গ্রাম অপেক্ষা সহবেই শিক্ষা ও শিষ্টাচারের প্রভাব অনেক
বেশী ছিল। বৈষ্ণব সাধনে বারংবার গ্রাম্য ভাব ও
গ্রাম্য ভাষা বর্জন কবিত্তে উপদেশ দিয়াছেন।

ফেঁচুগঞ্জ ঠিক সহর ছিল না। কিন্তু একেবারে
গ্রামও ছিল না। এখানে একটা মুল্লফি আদালত
ছিল বলিয়া কতকগুলি আমলা নানা স্থান হইতে
জুটিয়াছিলেন। কেহ বা ঢাকা কেহবা ত্রিপুরা বা
ময়মনসিংহ হইতে আসিয়াছিলেন। এইভাবেই নানা
দিক্দেশের লোকসমাগমে সর্বত্রই সহরের সভ্যতার ও
শিষ্টাচারের একটা উদ্যবতা জন্মিয়া যায়। এইরূপেই
সর্বত্র সহরগুলি সমসাময়িক সভ্যতা এবং শিষ্টাচারের
কেন্দ্র হইয়া উঠে। গ্রাম্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা ও বর্ষভরতা
সহরে শুদ্ধাইয়া যায়। এই সঙ্কীর্ণতা ও বর্ষভরতার ভয়েই

বাবা আমাকে মায়ের কাছে গ্রামের বাড়ীতে রাখিয়া আসেন নাই। মাও রাখিতে চাহেন নাই।

(২)

একবার ঘটনা-বশে মায়ের সঙ্গে আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। বোধ হয় তখন আমার বয়স আট বৎসর কি নয় বৎসর হইবে। গ্রামে থাকিয়া আমি সহজেই গ্রাম্য বালকদিগের সহিত মিশিয়া গেলাম। তাহাদের সঙ্গে সারাদিন হয় ফাঁদ পাতিয়া দোয়েল পাখী ধরিবার চেষ্টায়, কিম্বা মাঠে গিয়া ডাঙা-গুলি খেলায়, অথবা ছোট খেলার ঘর তৈয়ারী করিয়া, কলাগাছ কাটিয়া চারিটা বাঁশের উপর বিধিয়া মহিষ কল্পনা করিয়া তার বলি দিয়া দুর্গোৎসবের অভিনয়ে দিন কাটাইতে লাগিলাম। সেদিনের কথা এখনও উজ্জ্বল রূপে মনে আছে। ষাট বাষট্টি বৎসর পরেও গ্রামের সেই খেলার সাথীদের চেহারা এখনও তুলি নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজনও আছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সে খেলাধুলার কথা মনে করিয়া বার্ত্তক্যেও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিতেছে। সে গ্রাম্যপথ, সে গ্রামের মার্গ, সে হুড়োহুড়ি-মারামারি, খেলা করিতে করিতে হঠাৎ বিরোধের উৎপত্তি ও বহু যত্নে নিষ্পত্তি, বহু আদরে সাজান, খেলার ঘর রাগের মুখে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলা,—সকলই মনে পড়িতেছে। মনে পড়িয়া সে রস আর ইহজীবনে আশ্বাদ করিতে পারিষ না ভাবিয়া আক্ষেপ হইতেছে। তখন এসকল খেলাধুলা ছাড়িয়া সহরে যাইয়া পাঠশালার শাসনের ভিতর বাঁধা পড়িতে মন কিছুতেই চাহিত না।

কিন্তু মা'ও কিছুতেই আমাকে গ্রাম্যজীবনের উচ্ছলতার ভিতরে রাখিতে চাহিতেন না। তিনি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সন্তান মূর্খ হইয়া থাকিবে এ ভাবনা তাঁহার অসহ্য ছিল। আমার পড়াশুনায় মন নাই দেখিলেই সর্বদা কহিতেন, মূর্খ হইয়া থাকা অপেক্ষা মরিয়া যাওয়াও ভাল। এবারও আমার নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও মা আমাকে জোর করিয়া বাবার কাছে সহরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কত

কান্নাকাটি করিলাম, বাড়ী হইতে বাহির হইব না বলিয়া কখন বা ঘরের খুঁটি ধরিয়া, কখন বা মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়িলেন না। বাঁহার সঙ্গে সহরে যাইব, আমাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে তাহাকে হুকুম দিলেন। সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। আমি কান্নাড়াইয়া আঁচড়াইয়াও তাহার সে বাহুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। চৌংকার করিতে করিতে, হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে, তাহার বন্দী হইয়া সহরের পথে চলিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া না গিয়াছি, আর সহরে না গিয়া অব্যাহতি নাই বুঝিয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কান্না ও হাত পা ছুঁড়াও থামিল না, সেও আমাকে কোল হইতে নামাইল না। মাহুষ, শিশুই হোক, আর বৃদ্ধই হোক, যতক্ষণ অপ্রিয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা আছে বোঝে, ততক্ষণই প্রাণপণে তাহার সঙ্গে জুঝিয়া চলে। কিন্তু যখন অব্যাহতি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখে, তখন নিরুপায় হইয়া অনিবার্যকে আপনা হইতেই বরণ করিয়া লয়। যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না, তখন আমিও শাস্ত-শিষ্ট হইয়া সহরের মুখে চলিতে লাগিলাম।

(৩)

ফেঁচুগঞ্জ মা বাবার সঙ্গে যান নাই, আমি গিয়াছিলাম। এই বোধ হয় জীবনে প্রথম আমি মাকে ছাড়িয়াছিলাম। ফেঁচুগঞ্জ কুশিয়ারা নদীর তীরে। এখনও কলিকাতা হইতে কাছাড়ের ষ্ট্রামারের পথে ফেঁচুগঞ্জ একটা বড় ষ্টেশন হইয়া আছে। ফেঁচুগঞ্জ-বার্ট আসাম-বেঙ্গল রেলেরও একটা ষ্টেশন। কিন্তু এখনকার ফেঁচুগঞ্জ দেখিয়া আমার বাল্যকালের ফেঁচুগঞ্জের স্মৃতি মনে জাগে না। সকলই যেন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। নদীর উপরেই আমাদের বাসা ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে “টীলা” কহে। ফেঁচুগঞ্জেও কতগুলি “টীলা” ছিল। একটা “টীলার” উপরে আমাদের বাসা ছিল। তাহারি সম্মুখে আর-একটা “টীলায়” মুন্সেফের কাছারী

ছিল। আমাদের বাসার টালার আধখানা না কি এখনও আছে, বাকি আধখানা ও কাছারীর টালা কুশিয়ারা-পর্তে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের আপনাতর লোক বেশী কেহ যান নাই। আমার সমবয়স্ক কেহই ছিল না। আমি তখনও কোন পাঠশালায় যাই নাই। ফেঁচুগঞ্জে তেমন পাঠশালা ছিল কি না জানি না। বাবার কাছেই বাংলা লেখাপড়া করিতাম, এটুকু মনে আছে। হস্তলিপির উপর সেকালের লোকের খুব দৃষ্টি ছিল। বাবাও প্রতিদিন আদালতে যাইবার সময়ে আমাকে বাংলা লেখা মক্শ করিবার জন্য কাগজের মাথায় একটা লাইন লিখিয়া দিয়া যাইতেন। সেকালের পড়ুয়ারা প্রথম প্রথম কলাপাতায় মক্শ করিতেন। কতকটা লেখা অভ্যাস হইবার পরে তালপাতায় লিখিবার অহুমতি পাইতেন। তারপর, হাতের লেখা পাকিয়া উঠিলে, কাগজে লিখিতেন। এখনকার মত কাগজ এত সস্তা ছিল না, এবং পয়সাও এত সচ্ছল ছিল না। সুতরাং অবতলক কলাপাতাতেই লোকে নিজের হাতের লেখা মক্শ করিয়া পাকাইতেন। আমার বাল্যকালেও গ্রাম্যজীবনে এই পদ্ধতিই ছিল। তবে আমি নিজে আমার গ্রামের পাঠশালায় কখনও পড়ি নাই বলিলেই হয়। এইজন্য শৈশব হইতেই কলাপাতা ও তালপাতার পরিবর্তে কাগজেই লেখা অভ্যাস করিয়াছিলাম।

(৪)

কহিয়াছি যে, শিক্ষানীতিতে বাবা চাণক্যের অনুসরণ করিতেন।

“লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাদ্রয়েৎ।

প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিব্রব্রাচরেৎ।”

আমার শৈশবে ও বাল্যে বাবা প্রায়ই এই শ্লোক আওড়াইতেন। কার্যেও এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোটেরহাটে ছিলাম। সুতরাং সেখানে বাবার নিকট হইতে আদরই পাইয়াছিলাম, কোন প্রকারের তাদ্রনা পাই নাই।

কেবল একদিনের কথা মনে আছে। তখন আমি পাঁচ ছাড়িয়া ছয়ে পা দিয়াছি। ফাস্তন মাস, দোল-

পূর্ণিমার পূর্বদিন। আদালতের ছুটির পরে বাবার পেয়াদারা আসিয়া আমাদের বাহিরের উঠানের নিকট হইতে মাটি কাটিয়া দোলমঞ্চ তৈয়ার করিতেছিল। পর দিনের উৎসবের আনন্দের পূর্ব-আনন্দনে বাড়ীর সকলেই স্বল্প-বিস্তর মাতিয়াছিলেন। দোলমঞ্চ প্রস্তুত হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। আমার কিন্তু চোখে ঘুম নাই। উৎসবের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। তার পর যখন আর আগিয়া থাকা সম্ভব হইল না, তখন বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথে একটা ঢালু জায়গায় উপরের দিকে মুখ করিয়া মূর্ত্ত্যাগ করিতে বসিলাম। সেই মূর্ত্ত আমায় পায়ের নীচ দিয়া গড়াইয়া পথে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমার এই মূর্ত্ততা দেখিয়া বাবার ধৈর্য্য নষ্ট হইল। ভদ্রলোকের ছেলের ভদ্রবুদ্ধি হইবে না কেন? শীলতা এবং আচারের ক্রটি হইবে কেন? ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। বাবার হাতে বাল্যকালে যত মার খাইয়াছি তাহা লেখাপড়ায় অমনোবোগের জন্য নহে, কিন্তু এই শীলতা ও সদাচারের ক্রটির জন্য। এই দিনও এই কারণেই মার খাইয়াছিলাম। ইহার পূর্বে বাবা আমার গায়ে হাত তুলেন নাই বলিয়া, এই প্রথম দিনের কথা আজিও তুলিতে পারি নাই।

(৫)

ফেঁচুগঞ্জে যখন যাই তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর হইবে। এইখানেই আমার বাল্য-শিক্ষায় চাণক্য-নীতির দ্বিতীয় পর্বের পূর্ব প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বাবা যে লেখা মক্শ করিতে দিয়া যাইতেন তাহা না করিয়া রাখিলে মার খাইতে লাগিলাম। তবে প্রতিদিনই যে এই দণ্ড ভোগ করিতাম তাহা নহে। প্রতিদিন বাবাও আমার লেখা হইয়াছে কি না ইহা তদারক করিতেন না। যেদিন করিতেন এবং লেখা হয় নাই দেখিতেন, সেদিন কিন্তু রেহাই ছিল না।

(৬)

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের বাসার নীচেই নদী এবং পিছন দিকে একটা খাল ছিল। বাবার ছিপে মাছ ধরার সখ ছিল। অতি বাল্যকাল হইতে আমিও মাছ ধরিতে আরম্ভ করি। ফেঁচুগঞ্জে যাইবার আগে কখনও মাছ

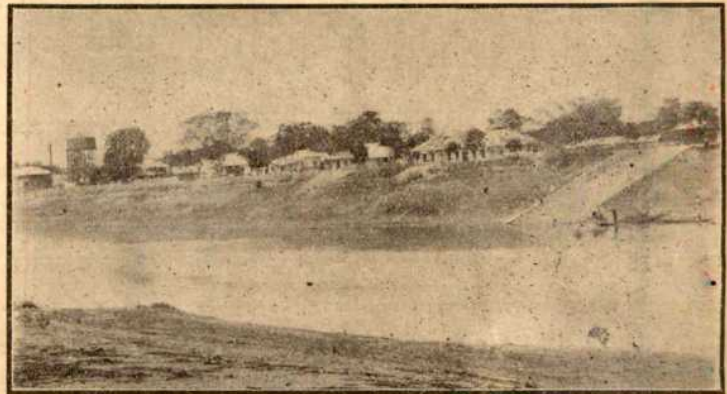
ধরিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না। ফেঁচুগঞ্জের কথা খুব মনে আছে। আর বিশেষ মনে আছে এইজন্য যে, এই মাছ-ধরার বাতিকেই তখন আমার লেখাপড়ার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটত। প্রাতঃকালে বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার ভয়ে হয় নান্দা মুখস্থ না হয় লেখা মক্ণ করিতে হইত। তবে মনটা পড়িয়া থাকিত সেই খালের ঘাটে। বাবা কাছারী চলিয়া গেলেই আমিও ছিপ লইয়া খালের ধারে যাইয়া বসিতাম। বাবা বাড়ী ফিরিবার সময় হইলেই আমিও বাড়ী আসিয়া শাস্ত-শিষ্ট হইয়া লেখা মক্ণ করিতে চেষ্টা করিতাম। বাবা ভাবিতেন যে, সারাদিনই আমি লেখাপড়া করিয়াছি। সুতরাং মুখ-হাত ধুইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজে মাছ ধরিতে যাইতেন। অথচ কি মাছ ধরিতাম মনে নাই, তবে প্রায়ই যে এইরূপে নদী বা খাল হইতে খলুই ভরিয়া পাব্দা মাছ লইয়া আসিতাম ইহা মনে পড়ে। ফেঁচুগঞ্জের স্মৃতির মধ্যে পিতা পুত্রে মিলিয়া এই মাছ ধরবার স্মৃতিটা সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর বলিয়া এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন উজ্জল হইয়া আছে।

ফেঁচুগঞ্জে বোধহয় বাবা পাঁচছয় মাস মাত্র ছিলেন। ফেঁচুগঞ্জের কাজ স্থায়ী ছিল না। সেখানকার স্থায়ী মুন্সেফ-ছুটা হইতে ফিরিয়া আসিলে, বাবা অবসর লইয়া চিরদিনের মত মুন্সেফীর লোভ ছাড়িয়া শ্রীহট্টে যাইয়া জেলার আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি বা শেষভাগে বাবার সঙ্গে ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। এই-খানেই আমার সমগ্র বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সে স্মৃতি-জড়িত হইয়া শ্রীহট্ট আমার জন্মভূমি না হইলেও এখনও পবিত্র তীর্থভূমি হইয়া আছে।

শ্রীহট্ট সহরে

(১)

বাবার এক মাতুল, রাজমোহন মুন্সী, সে-সময়ে শ্রীহট্টের জজ আদালতে ওকালতী করিতেন। আমরা প্রথমে শ্রীহট্টে যাইয়া তাঁহার বাসাতেই উঠি। তারপর বাবা নূতন বাসা করিয়া সেখানে উঠিয়া যান। আমরা শ্রীহট্টে যাইবার কিছুদিন পরেই রাজমোহন মুন্সী মহাশয়ের পরলোক হয়। সে-কথা এখনও আমরা বিশেষ ভাবে মনে আছে। জ্যেষ্ঠদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরে ফিরাসের পাশে যে-মকল বাংলা নজীর জড় করা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহারি ভিতরে কয়েকখানা হাজার টাকার নোট পাওয়া যায়। সেকালে লোকের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা যে কত কঠিন ছিল, চোর-ডাকাতের উপদ্রব কত বেশী ছিল, এই ঘটনাতেই তাহার প্রমাণ হয়। টাকাকড়ি লোকে সচরাচর সিন্দুকেই রাখিত। চোর-ডাকাতেরা সেইখানেই গৃহস্থের টাকাকড়ির খোঁজ করিত। সুচতুর মুন্সী মহাশয় এমন জায়গায় তাঁহার সঞ্চিত নগদ সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, যেখানে চোর-ডাকাতের চক্ষু পড়িবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। [তিনি একথা পরিবারের কাহাকেও বলিয়া যান নাই। সুতরাং দৈব কৃপাতেই কেবল তাঁহার আপনার লোকের হাতে এই নোটগুলি পড়ে।



শ্রীহট্টের দৃশ্য

(২)

এখন যেখানে শ্রীহট্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে সেখানে একটা পুরানো পাকা বাড়ী ছিল। বহুদিন বোধহয় সে বাড়ীতে কোন লোকজন বাস করে নাই। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল আর পিছনে একটা বিস্তৃত জলাভূমি ছিল। বাবা সেই বাড়ীটাকেই মাসিক আট টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। আমরা যখন প্রথমে সেই পুরানো পোড়ো বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম তখন সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতাম। তারপরে অল্পদিনের মধ্যেই সে-বাড়ীর হাতায় আমাদের দুই তিন জন আত্মীয় আসিয়া বাসা প্রস্তুত করেন। সেই পাকা বাড়ীরও আধখানা শ্রীহট্টের তদানীন্তন স্কুল ডেপুটী ইন্সপেক্টার নবকিশোর সেন মহাশয় আসিয়া দখল করেন। বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার শ্রীহট্টের বাসা নবকিশোর-বাবুর সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া এই পাকা বাড়ীতেই ছিল। এখন সে-বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। যারা আমার বাল্যজীবনের সাক্ষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন বাঁচিয়া আছেন। ইনি শ্রীহট্টের মুন্সেফী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এখন ওকালতী করেন না। ইহার নাম শ্রীযুক্ত রুক্মিণীমোহন কর, মাতৃদম্পর্কে আমার আত্মীয়, মাতুল-পর্যায়ভুক্ত। এই অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীহট্টে আজিও শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী মারোয়াড়ী, ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের অকুত্রিম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। প্রাচীন অর্থেও প্রাচীন আদর্শে শ্রীহট্টে যদি এমন কোনও লোক-নায়েক বা সমাজপতি থাকেন, তাঁহার সেদিকে কোনও লোভের লেশ মাত্র নাই বলিয়া, সর্ববাদীসম্মতিক্রমে রুক্মিণীবাবুই সেই পদ ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। তিনি বড় জমিদার নহেন। তাঁহার কোনও ভৈজ্যরতিও নাই। সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র। কিন্তু শ্রীহট্ট সহরে বা জেলায় এমন কোনও জমিদার বা ধনী নাই, লোক-সমাজে যাহার কথার দাম রুক্মিণী-বাবুর কথা অপেক্ষা বেশি।

এইটা লেখা হইবার পরে, ২৮এ ফাল্গুন (১৩৩৩)



রুক্মিণীমোহন কর

তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ রজনীমোহনের পত্রে জানিলাম যে, ঐ মাসের ২৩এ তারিখ রুক্মিনীমোহন কর মহাশয় তাঁহার কস্মৌচিত লোক লাভ করিয়াছেন।

৩

আমরা যখন প্রথম এই পোড়ো বাড়ীতে যাইয়া উঠি তখন শ্রীহট্টে বাঘের ভয় ছিল। শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখন সেগুলিতে লোকের বসতি হইতেছে। আমার বাল্যকালে এই পাহাড়গুলি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গল হইতে শীতকালে মাঝে মাঝে সহরে পর্য্যন্ত বাঘ আসিত। প্রায়ই সহরের নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা বড় বড় বাঘ মারিয়া কালেক্টরের কাছারীর সামনে আনিয়া ফেলিত।

আমাদের এই পোড়ো বাড়ী পর্যন্ত কখনও বাঘ আসে নাই। কিন্তু মনে পড়ে ছ-একবার খুব বড় বুনো বিড়াল দেখিয়া বাঘেব ছানা ভ্রমে আমরা বাসকেরা ভয়ে ছুটিয়া পালাইয়াছিলাম। কেবল বুনো বিড়াল নহে, খট্টাসেরও উৎপাত অনেক ছিল। সর্কাপেকা বেশী উৎপাত ছিল সাপের। প্রথম প্রথম সাপের জন্ম হইতে ডাঁড়াশ সাপ আসিয়া প্রায়ই ঘরের ছুখ খাইয়া যাইত। কখনও কখনও আমাদের মালী বর্ষার প্রথমে যখন শাক-গব্জির বাগান করিত তখন ভীষণ গোকুর সাপ ফণা তুলিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইত। আর সে “জয় মা বিষহরি! জয় মা বিষহরি!” বলিতে বলিতে ছুটিয়া পালাইত। মনসাকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় বিষহরি বলিত। এত সাপের ভয় সে-অঞ্চলে ছিল বলিয়াই শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ঘরে ঘরে মনসা পূজা হইত। পদ্মপুরাণেই এই মনসা পূজা প্রচার হয়। আর পূর্ব-মৈমনসিংহেই এই পদ্মপুরাণের সৃষ্টি হয়।

(৪)

বিষহরি বা মনসা পূজা সেকালে আমাদের অঞ্চলে একটা অতি প্রধান পর্বাহ ছিল। দুর্গোৎসব সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাধারণ লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে এই চারিদিন ব্যাপী পূজার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু বিষহরি বা মনসা পূজা প্রায় ঘরে ঘরেই হইত। শ্রীহট্ট সহরে তেমন বেশী দেখি নাই। বোধ হয় সহর অঞ্চলে সাপের ভয় তেমন ছিল না বলিয়াই সেখানে সাপ-কুলের দেবতার পূজার তেমন আয়োজন ছিল না। কিন্তু যে-সকল স্থান বর্ষার সময় জলে ভাসিয়া যাইত বলিয়া মাটজন্মের সাপেরা গ্রামের ভিতরে যাইয়া উঠিত, যেসকল অঞ্চলে এই সাপের দেবতাকে সম্বোধন করা আবশ্যক ছিল। এইসকল নীচু জায়গায় বর্ষাকালে গোচারণের মাঠ একেবারে ডুবিয়া যাইত। এইজন্য বর্ষার জল নামিতে আরম্ভ করিলেই গ্রামেব গোধান সকল গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়া বান্ধিয়া রাখিতে হইত। বর্ষার চার মাস গৃহস্থকে প্রতিদিন নৌকা করিয়া গিয়া জল-প্রাণিত মাঠ হইতে গরুর জন্ত ঘাস কাটিয়া আনিতে হইত। এই ঘাস কাটা

সর্বদা নিরাপদ ছিল না। প্রায়ই শুনা যাইত যে, ঘাস কাটিতে যাইয়া মাঝে মাঝে লোক সর্পাঘাতে মরিয়াছে। এই সকল কারণেই আমাদের অঞ্চলে সেকালে বিষহরি বা মনসা পূজার এত প্রাচুর্য ছিল। আর প্রায় সকলেই মনসার মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত। মনসার রং সাদা, প্রায়ই বাহন বিস্তৃত-ফণা কালনাগ ছিল। মনসার আভরণ ছিল সাপ, শিরে মুকুট ছিল সাপ, কাণে কুণ্ডল ছিল সাপ, হাতে বালা ছিল সাপ, বাহুতে বাজু, গলায় হার, কটিতে মেখলা সকলই ছিল সাপ। মনসা-পূজার মন্ত্র কি ছিল মনে নাই। তবে পূজায় ছাগাদি বলির বিধান ছিল। আবেণের সংক্রান্তিতে মনসা-পূজা হইত। ভাসানের দিন দেশময় নৌকার বাচ-খেলা হইত। আমাদের প্রান্তিক ভাষায় বাচ-খেলা শব্দ প্রচলিত ছিল না। আমরা ইহাকে নাও-দোড়ান বা নৌকা দোড় কহিতাম। জলাকীর্ণ পল্লীগ্রামে সকল গৃহস্থেরই ঘাসের নৌকা ছিল। এসকল নৌকা লম্বা ও হালকা। অনেকটা ছিপ্ নৌকাব মতন। স্ততরাং এসকল ঘাসের নৌকাতে যখন আট দশ জন, বা কখন কখন লম্বা নৌকা হইলে, বোল কুড়ি জন পাশাপাশি বসিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিয়া বাহিয়া চলিত তখন এসকল নৌকা তীব্রের মতন ছুটিত। নৌকা-দোড়ের সময় সারি গান হইত। প্রত্যেক নৌকাতেই একজন গলুইএ ঠাড়াইয়া সারি গানের মূল গায়ক হইত। প্রত্যেক সারি গানেই একটা মূল দোহা ছিল। সকলে সেটাই গাহিত। আর মূল-গায়ক অনেক সময় নিজে কবিতা রচনা করিয়া সেই দোহার সঙ্গে লাগাইয়া দিত। এসকল কবিতা অনেক সময় স্থানীয় সমাজের স্বকীর্তি-কুকীর্তির কথাও প্রচার করিত। সারি গানের একটা দোহা মাত্র মনে আছে। বাড়ী ফিরিবার সময় সকলেই এই সারিটা গাহিয়া ফিরিত। সে দোহাটা এই :—

“ঘাটে লাগাওরে নাও ওবে ভাই মাঝি।

যে ঘাটে লাগাইবায় নাও দেখবায় ফুলের পানি।”

ইহা হইতেই বুঝা যায় এই মনসা পূজা, মনসার ভাসান ও নৌকা-দোড়ান এসকলের ভিতর দিয়া সেকালের আমাদের গ্রাম্যজীবনের কতটা আনন্দ উল্লাস উছলিয়া

22/11/11

উঠিত। মেয়েরা বা'ঘের নৌকার সঙ্গে যাইতেন না। কিন্তু এসকল নৌকা যখন সারি গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিত তখন ঘাটে ঘাটে পুরজীরা আসিয়া দাঁড়াইতেন। এবং যেই একথানা নৌকা তাঁহাদের ঘাটের পাশ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে যাইত তখনই ইহারা উলু দিয়া আত্মপর নিরীক্শেবে সকল খেলোয়াড়কেই উল্লাসে অভিনন্দিত করিতেন। মাঝে মাঝে এই নৌকা-দৌড় উপলক্ষে মারামারি এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। কিন্তু তাহাতে সচরাচর গ্রাম্য জীবনের মৌহাদ্দ ও শান্তি নষ্ট হইত না। মনসাপুজা হিন্দুরই পূজা। কিন্তু মনসার প্রতিমা বিসর্জনের দিনে হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া এই নৌকা-দৌড়ের আনন্দ-উৎসবে মতিয়া যাইতেন। এই বাচ-খেলায় কোন সম্প্রদায়িক ভাব বা ভেদ ছিল না। হিন্দুর নৌকাতে মুসলমান এবং মুসলমানের নৌকাতে হিন্দু উঠিয়া বৈঠা ধরিতেন। তখনকার দিনে ধর্মের পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিকতার অভাব ছিল না। একে অঙ্কে নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের মতন দেখিতেন।

(৫)

শ্রীহট্টে যাইয়াই আমার রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হয়। আমি কখনই বাংলা পাঠশালায় যাই নাই। একেবারেই ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হই। তবে শ্রীহট্টে যাইয়া বাবা প্রথমে আমাকে কার্শি শিখিবার জন্য এক মৌলবীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই মৌলবীর নিকটে যাইয়া ফার্সি বর্ণমালা শিখিয়া ছিলাম। হিন্দু যেমন সরস্বতীর নাম লইয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিতেন, মুসলমানেরা সেইরূপ আল্লাহ ও রসুলের নাম লইয়া—লা এলাহি এল আল্লাহ মহম্মদ রসুল আল্লা—বলিয়া প্রতিদিনের পড়া শুরু করিতেন। মৌলবীর নিকটে যাইয়া আমাকেও অন্তান্ত পড়বার মতন এই মুসলমানী মন্ত্র পাঠ করিয়াই আলেক বে, তে, সে, পড়িতে হইত। বর্ণমালা শিখিয়া আমি “বন্দেনামা” পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু এইখানেই আমার কার্শি পড়া শেষ হয়। বন্দেনামার প্রথম দু-চার লাইন মুখস্থ হইতে না হইতেই

বাবা আমাকে মৌলবীর নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়া দেন।

(৬)

আমি যখন ইংরেজী স্কুলে যাই তখন শ্রীহট্টে কোন সরকারী স্কুল ছিল না। শুনিয়াছি পূর্বে নাকি একটা সরকারী স্কুল ছিল কিন্তু খৃষ্টীয়ান পাদ্রীরা শ্রীহট্টে গিয়া বসিলে ক্রমে তাঁহাদের হাতেই লোক শিক্ষার ভার আসিয়া পড়ে। পাদ্রীদের স্কুল খোলা হইলে পরে পূর্বকার সরকারী স্কুল উঠিয়া যায়। ১৮৬৬ ইং অব্দে আমি শ্রীহট্টে যাই। তখন সহরে দুইটা ইংরেজী এন্ট্রেন্স স্কুল ছিল। দুইটাই পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত। একটা সহরের পূর্বদিকে আর-একটা ইহার প্রায় কম বেশী এক মাইল দূরে সহরের পশ্চিম প্রান্তে ছিল। পূর্ব প্রান্তের নাম ছিল নয়াশড়ক। স্কুলেরও নাম ছিল নয়াশড়ক স্কুল। পশ্চিম প্রান্তের নাম ছিল সেখ-ঘাট। স্কুলেরও ঐ নাম ছিল। যতদূর মনে আছে বোধ হয় সেখ-ঘাটের স্কুলই বড় ছিল। নয়াশড়ক স্কুলে এন্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়ান হইত কি না ঠিক মনে নাই সেখ-ঘাট স্কুলে পড়ান হইত জানি। নয়াশড়ক আমাদের বাসার নিকটে বলিয়া আমি প্রথমে নয়াশড়ক স্কুলে ভর্তি হই। তাহার অল্পদিন পরেই সেখ-ঘাট স্কুলে যাইয়া প্রবেশ করি।

শ্রীহট্টের আগেকার সরকারী স্কুলের কথা বেশী কিছু শুনি নাই; তবে শ্রীহট্টে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক ইংরেজ সরকার নহেন, কিন্তু পাদ্রীরাই, ইহা জানি। শ্রীহট্টের তখনকার ইংরেজীনবিশেরা রেভারেন্ড ডব্লিউ প্রাইজ মহাশ্বাকে শ্রীহট্টে আধুনিক শিক্ষা-শুরু বলিয়া আজিও সম্মান করেন। শ্রীহট্টে প্রথমে বাহারী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন প্রাইজ সাহেব তাঁহাদের সকলেরই গুরু ছিলেন। আমি প্রাইজ সাহেবকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার নিকটে পড়ি নাই। বোধ হয় তখন তিনি শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়াছিলেন। আবছায়ার মতন তাঁহার খেতখাশখোভিত প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখ এখনও স্মৃতিতে জাগে। শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকেরা সহরের সাধারণ পুস্তকাগারে প্রাইজ সাহেবের নাম ও স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। প্রাইজ সাহেব বাস্তবিক পুণ্যলোক ব্যক্তি

ছিলেন। কলিকাতার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের ঘে-স্থান শ্রীহট্টের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে প্রাইজ সাহেবেরও সেই স্থান। শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব স্কুল-ডেপুটী ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় নবকিশোর সেন, উকিল সরকার স্বর্গীয় দুলালচন্দ্র দেব, ইহারাই শ্রীহট্টের ইংবেজী শিক্ষিতদের প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন। নবকিশোর সেন সিনিয়ার স্কলার্শিপ পরীক্ষা পাস করিয়া ডেপুটী ইন্সপেক্টর হন। দুলালচন্দ্র দেব মহাশয় ইহার কিছুদিন পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বি-এ, ও পরে বি-ল, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহট্টে যাইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহারাই দুই জনেই শ্রীহট্টের প্রথম ইংরেজী-নবীশদিগের সর্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন। আর ইহারাই দুজনেই নিজেদের জীবনের ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা প্রাইজ সাহেবের শিক্ষা ও সংস্পর্শে সহবাস হইতে লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত, বাংলার খৃষ্টিয়ান সমাজের অন্ততম অধিনায়ক, হাইকোর্টের উকীল এবং ইণ্ডিয়ান খৃষ্টিয়ান হেরল্ড কাগজের সম্পাদক, পরোলকগত জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন। ইনিও প্রাইজ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ কলেজ হইতে একই বৎসরে বি-এ ও এম-এ পাশ করেন। বোধ হয় ডাক্ সাহেবের নিকটে ইনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেরণা ইনি প্রাইজ সাহেবের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন

(৭)

আমি যখন সেখাট স্কুলে যাইয়া ভর্তি হই, প্রাইজ সাহেব তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্কুলে আর রীতিমত পড়াইতেন না। তবে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার নিকটে ইংরেজী সাহিত্যাদি পড়িতেন ইহা মনে পড়ে। জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় একই বৎসরে বি-এ, ও এম-এ পাশ করিয়া, বি-এল, পরীক্ষা দিবার পূর্বে, শ্রীহট্টে যাইয়া সেখাট স্কুলে প্রধান শিক্ষক হইলেন। তবে নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। জয়গোবিন্দ-বাবু বেশীদিন শ্রীহট্টে শিক্ষকতা করেন নাই। বি-এল পরীক্ষা

দিবার অল্প অল্পদিন পরেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার স্থানে স্বর্গীয় দুর্গাকুমার বসু মহাশয় সেখাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সেখাট স্কুলে আমি কতদিন পড়িয়াছিলাম, মনে নাই। তবে বছর-খানেকের বেশী বোধ হয় নহে। এই সময়ে, কি উপলক্ষে ঠিক মনে নাই, সহরের খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের প্রতীক্ষিণের একটা বিরোধ বাধিয়া উঠে। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা হিন্দু ধর্মের অপমান করিতেছেন বলিয়া হিন্দু অভিভাবকেরা তাঁহাদের বালকদিগকে পাদ্রী স্কুল হইতে তুলিয়া লয়েন এবং নিজেদের একটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। আমিও তখন সেখাটের স্কুল ছাড়িয়া এই হিন্দু স্কুলে যাইয়া ভর্তি হই।

(৮)

সেখাটের স্কুলের প্রাঙ্গণে একটা ‘সূর্যঘড়ি’ ছিল। সূর্যের গতি দিয়া এই ঘড়িতে সময় নিরূপণ হইত, কিন্তু মেঘলা দিনে ইহা সম্ভব হইত না। এইজন্য স্কুল-বাড়ীর ভিতরে একটা ‘জল-ঘড়ি’ও ছিল। তখনও দেশে কলের ঘড়ি বেশী আমদানি হয় নাই। দামও এত বেশী ছিল যে, লোকে সচরাচর কিনিতে পারিত না। এই জল-ঘড়িতে একটা হাঁড়ি ও একটা পিতলের বাঁকাসার বাটি ছিল। এই বাটিতে একটা ছোট ছিদ্র ছিল। হাঁড়িতে জল পূরিয়া তাহাতে বাটিটা ভাসাইয়া রাখা হইত। বাটির ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া বাটিটা ভরিতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় লাগিত। আর বাটি ডুবিয়া গেলেই ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছে বুঝা যাইত। এই হাঁড়ি ও বাটি স্কুলের লাইব্রেরী ঘরের এক কোণায় থাকিত। বৈকালে ৪টার সময় স্কুল ছুটি হইত। তখন ছোট ছোট ছেলেরা ছুটি পাইবার অল্প অধীর হইয়া উঠিত এবং মুহূর্তে মুহূর্তে নানা ছল করিয়া ঘড়ির জল ভরিতে কত দেবী আছে দেখিতে যাইত; আর এদিক ওদিক দৃষ্টির সাক্ষী কেহ নাই দেখিলে পেন্সিলের খোঁচা দিয়া ঘড়ির গতি বাড়াইয়া দিত। আঙ্গুল দিয়া দিত না, কেননা ভিজা আঙ্গুলই দৃষ্টির সাক্ষী থাকিত। আর ছুটির সময় আসিলে স্কুলের চৌকীদারকে ডাকিয়া ঘড়ির কাছে দাঁড় করাইত, যেন ঘড়ি ডুবিরামাত্র ছুটির খণ্টা বাজাইতে পারে।

(২)

পাক্ষীদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সহরের হিন্দু অভিভাবকেরা একটা স্থল স্থলেন এবং আমি সেখানটুকু ছাড়িয়া এই স্থলে যাইয়া ভর্তি হই, একথা কহিয়াছি। এই স্থল সহরের উত্তর প্রান্তে একটা ছোট টালার উপরে একটা বাংলাতে বসে। কিছুদিন পূর্বেও সেই বাংলাটা ছিল। এখন বোধ হয় সেই টালার ঐ বাংলার ভিত্তিতেই ভাস্কর সাহেব বা সিভিল সার্জন বাস করেন। এই স্থলটা বোধ হয় কম বেশী বছরখানেক ছিল। এই স্থলের সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের একটা বিশেষ ঘটনার স্মৃতি জড়িত আছে। এই সময়ে শ্রীহট্টে সোডা-লেমেনডের একটা কল যায়। ছোট সহর, গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস, এখানে সোডা-লেমেনডের কাঁচিতি হইবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না। তবে ইহার কিছুদিন পূর্বে হইতেই শ্রীহট্টে চা-বাগান খোলা হয়। চীনেরা বহু দিন হইতেই চা পান করিয়া আসিতেছিল। চীন হইতে ইউরোপীয়েরা চা পান শিখিয়া নিজেদের দেশে চায়ের পাতা আমদানী করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ গল্প আছে যে, প্রথম যখন বিলাতে চা আমদানি হয় তখন কোন কোন ইংরেজ-গৃহিণী চায়ের পাতা সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া পাতাগুলিই রোষ্টি মাংসের উপরে ছড়াইয়া দিতেন। ক্রমে কি করিয়া চা পান করিতে হয় ইহার বহুল প্রচার হইলে চায়ের ব্যবসার বৃদ্ধিপাত হয়। এই সময়েই প্রথমে আসামের জঙ্গলে চায়ের গাছ আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই চা বাগানেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। আমার শৈশবে কাছারে এবং শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে অনেকগুলি চা বাগান হয়। এসকল বাগানের মালিক ও মেনেজার সাহেব ছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীহট্টের উপকণ্ঠে কতগুলি সাহেব যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের প্রয়োজনেই শ্রীহট্টের কোন ব্যবসায়ী আমাদের ক্ষুদ্র সহরেও একটা সোডা-লেমেনডের কল লইয়া যান। কল মাত্রই লোকের মনে কৌতূহলের উদ্বেক করে। আমরা, বালকের দল, কি করিয়া কলে সোডা-লেমেনড প্রস্তুত হয় ইহা দেখিবার জন্য অনেক সময় এই দোকানের দরজায় যাইয়া ভীড়

করিয়া। ক্রমে দু একজন এক-একটা সোডা-লেমেনড কিনিতেও আরম্ভ করেন। বোধ হয় ইহাতেই কলওয়ালার চোখ খুলিয়া যায়। সহরের ও সহরতলীর দশ পনের জন ইংরেজ ছাড়াও যে সোডা-লেমেনডের খরিদার জুটিতে পারে ইহা বুঝিয়া সে আমাদের স্থলে প্রতিদিন বুড়ী ভরিয়া সোডা ও লেমেনড পাঠাইতে আরম্ভ করিল। বন্ধুদের মত শব্দ করিয়া ছিপিশিপ উড়িয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জল উথলিয়া উঠে, ইহা দেখিবার জন্য ছেলেরা চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত। আর অনেকেই লেমেনড কিনিয়া খাইতেও আরম্ভ করে। মুসলমানের ছোঁয়া জল খাওয়াতে জ্বাত যায় একথা কাহারই মনে উঠে নাই। কাহারও কাহারও মনে উঠিলেও জ্বাত রক্ষার জন্য তাহারা লেমেনডের লোভ ছাড়িতে রাজী ছিল না। স্বতরাং প্রতিদিন এই নূতন হিন্দু স্থলের বালকদিগের মধ্যে বিস্তর সোডা-লেমেনড বিক্রী হইতে আরম্ভ হইল। অভিভাবকেরা ইহার খোঁজও পাইলেন না, সন্ধানও করিলেন না। অজ্ঞাতসারে হিন্দুর জ্বাতের মূল নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। অভিভাবকেরা খবর পাইলে কি করিতেন তাহা বলা যায় না।

(১০)

এই সময়ে, অথবা ইহার অল্পদিন পূর্বে, বিস্কুট খাওয়া লইয়া নিকটবর্তী কাছারের হিন্দু সমাজে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। শ্রীহট্ট হইতে কাছার বোধ হয় সত্তর পঁচাত্তর মাইল দূরে। কিন্তু চলাচলের তেমন সুবিধা না থাকিলেও সর্বদাই লোক দুই সহরের মধ্যে যাতায়াত করিত। কাছারের প্রায় সকল চাকুরিয়ারাই শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। চায়ের ব্যবসা আরম্ভ হইলে শ্রীহট্টের লোকেরাই কাছারে যাইয়া চা-বাগানের কেরাগী হন। এইজন্য দেশের ব্যবধান থাকিলেও শ্রীহট্টের ও কাছারের সমাজের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাছারের নূতন ইংরেজীবিদ্যেশ্বরী যখন নিজেদের সখের বৈঠকে চায়ের সঙ্গে প্রথমে বিলাতী বিস্কুট খাইলেন, তখন সে-কথা কাছাবেও চাপা রহিল না, শ্রীহট্টেও রাষ্ট্র হইতে দেরী হইল না। উভয় সমাজই এই অভাবনীয় অনাচারের উপরে খড়গহস্ত হইয়া উঠিল। অনাচারী বিদ্রোহীরা

তখন যথারীতি মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজ-চ্যুতির নিদারুণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সমাজ-পতিগণের মনেব পতি যখন একরূপ ছিল, তখন খ্রীষ্টের হিন্দু বালকেরা দলে দলে মুসলমানের তৈয়ারী সোডা-লেমনেড পান করিতেছে—একথাটা রাষ্ট্র হইলে খ্রীষ্টেও একটা স্বল্পবিস্তর হলুদুল বাধিয়া যাইত।

(১১)

সহরে রাষ্ট্র হয় নাই বটে, কিন্তু দুর্দৈব-বশে আমার এই দুষ্কর্মেয় কথা বাবার কানে উঠিতে বেশীদিন লাগিল না। আমার ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত এক কপর্দিকও বাবা আমার হাতে দেন নাই। তখন যাহা প্রয়োজন হইত লোক দিয়া বাজার হইতে তাহা আনাইয়া দিতেন। মা'ও এবিষয়ে অত্যন্ত কড়া শাসন করিতেন। হাতে পয়সা পড়িলে ছেলে নষ্ট হইয়া যায়, তখনকার সমাজের সুশিক্ষিত অভিভাবকদিগের মধ্যে এই আশঙ্কাটা অতিশয় প্রবল ছিল। এইজন্য ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি কোন দিন হাতে পয়সা পাই নাই। অথচ লোভে পড়িয়া অস্বাস্থ্য বালকদিগের সঙ্গে জুলে লেমনেড খাইয়াছিলাম। সে লেমনেডেব পয়সা দেওয়া হয় নাই। একদিন বাবার কাছারী যাইবার সময়, তিনি কাছারীর পোষাক পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় এক অপরিচিত মুসলমান আসিয়া আমার খোঁজ করিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে বলিল, জুলে লেমনেড খাইয়াছিলাম তার নাম বাকী আছে। বোধ হয় দু' আনা কি তিন আনা তার পাওনা ছিল। বাবা আমাকে ডাকিয়া তাহার মোকাবেলা করাইয়া তখনই তাহার প্রাপ্য পয়সা তাহাকে দিয়া দিলেন। আর সে চলিয়া যাইবা মাত্র আমাকে বেদম্ প্রহার করিলেন। সেদিন হইতে আমার জুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্য নষ্ট হইবে বলিয়া পাত্রী জুল হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত নূতন হিন্দু জুল ভক্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এখানেও যদি জাত-ধর্ম্য না থাকে, তাহা হইলে, ইংরেজী পড়াই বন্ধ করিতে হইবে। আমার জুল বন্ধ হইল।

(১২)

সেবারে, কি কারণে মনে নাই, পূজার পরে মা বাবার সঙ্গে সহরে আসেন নাই। তাহার অল্পপস্থিতিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। মা যতদিন না সহরে আসিয়াছেন ততদিন আমার জুল যাওয়া বন্ধ ছিল। বোধ হয় মা চার পাঁচ মাস গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন। ইহার পবে যখন সহরে আসিয়া আমার লেমনেড খাওয়ার কাহিনী শুনিলেন ও এই অপরাধে আমাব যে দণ্ড হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি বাবাকে বুঝাইয়া আমার এই দণ্ড খণ্ডন করিলেন। ছেলেটাকে মুর্থ করিয়া রাখিয়া ফল কি? আর কালের গতিকে সমাজে কতই অনাচার ত চলিয়া যাইতেছে, লেমনেড খাওয়া ত সামান্য কথা। এইজন্য ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কিছুতেই কর্তব্য নয়। সমাজের বীধন কতটা যে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল মা যতটা জানিতেন তখনও বাবার ততটা জানিবার অবসর হয় নাই। আমার মাতুলেরা এবং জ্যেষ্ঠতুত ও খুড়তুত ভায়েরা যে-সকল কথা মায়ের কাছে কহিতেন বাবার কাছে তাহা মুখে আনিবার সাহস হইত না।

(১৩)

এসম্বন্ধে একটা ঘটনা মনে আছে। একবার নবদ্বীপের একজন গৌসাই খ্রীষ্টে গিয়াছিলেন। ইনি পদাবলী কৌর্দন করিতে পারিতেন। বোধ হয় ভাগবতেও কিছু কিছু দখল ছিল। বাহিরে বৈষ্ণবের আচরণীয় তিলক বস্তু প্রভৃতি ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া উপবীতও ছিল। কিন্তু জাতটাত মানিতেন না। বৈষ্ণব গৌসাইবা নিরামিষাশী। কিন্তু এই গৌসাই ঠাকুর দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন ভিতরেও তেমন সৌখীন ছিলেন এবং রূপের অসুন্দর নাগরিক প্রবৃত্তি এবং ভোগ-লিপ্সাও তেমনি ছিল। মদ্যপান করিতেন কি না জানি না। আমাদের জানিবারও অবসর ছিল না। কারণ বাবা সাংঘিক বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের বংশে বোধ হয় কেহ কখন মদ্যপান করেন নাই। গৌসাই ঠাকুর কিন্তু সুবিধা মত পাইলে মাছ মাংস ছাড়িতেন না। খ্রীষ্টের ভ্রম সমাজে বস্ত্র-বরাহের মাংস একেবারে বর্জনীয় ছিল না।

পাহাড়তলীতে, আর শ্রীহট্টের সর্বত্রই বিস্তর বন জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড় আছে, সে-সকল জায়গায়, এখানকার কথা বলিতে পারি না, আমার বাল্যকালে বঙ্গ বরাহের খুবই উপভব ছিল। কৃষকেরা বরাহের উৎপাতে আপনাদিগের শস্যাদি রক্ষা করিতে বিস্তর বেগ পাইত। মাঝে মাঝে দাঁতাল বরাহ গ্রামে ঢুকিয়া সুবিধা পাইলে মাছকে পর্যন্ত আহত এবং হত করিত। সুতরাং শিকারীরা প্রায়ই পার্কৃত্য অকলে বরাহ শীকার করিতেন। অন্ত্যজ জতিরা বঙ্গ এবং গৃহপালিত উভয় জাতীয় শূকরের মাংসই স্বচ্ছন্দে ভোজন কবে। কিন্তু বঙ্গ বরাহ শীকার হইলে শক্তিমত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতিও সুযোগ পাইলে ইহার উপরে ভাগ বসাইতে ছাড়িতেন না। শ্রীহট্ট সহরে মাঝে মাঝে শাক্ত ভক্তলোকদিগের বাড়ীতে বরাহ-মাংস আমদানী হইত। বরাহের মাংস অত্যন্ত স্বস্বাদু, কোমল ও স্নেহযুক্ত। এই গোসাই ঠাকুরের শ্রীহট্টে অবস্থিতি কালে একবার আমার জ্যেষ্ঠতুত ভাই কতকটা বরাহ-মাংস সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমার পিতৃকুল বৈষ্ণব হইলেও মাতৃকুল ঘোর শাক্ত। আমার মাতামহীর পিত্রালয়ে এককালে রীতিমত

মদ চোয়ান হইত। ইংরেজের আবগারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও একেবারে সেখানে এ কাজ বন্ধ হয় নাই। সে সমাজে বঙ্গ বরাহের মাংস হিন্দুর অখাদ্য ছিল না। সুতরাং মা এই মাংস রীতিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। তবে বাবাকে লুকাইয়া এ কাজটা করিতে হইল। গোসাই ঠাকুর বঙ্গ বরাহের ব্যঞ্জনের সম্বাদন পাইয়া তাহা আশ্বাদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার জ্যেষ্ঠতুত ভাই মাকে আসিয়া সে-কথা বলেন। মা প্রথমে ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নিজের রান্না থাইতে দিতে রাজী হন নাই। বোধহয় শেষে দিয়াছিলেন। এইসকল ঘটনাতেই দেশে জাতটা যে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে মা ইহা বেশ টের পাইয়াছিলেন। আর এই কারণেই জাত রাখিবার জন্ত ছেলের লেখাপড়া বন্ধ করা তাহার চক্ষে কিছুতেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বাবাকে বুঝাইয়া আমাকে আবার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। মা যদি এটি না করিতেম, তবে আমি আমরণ হয়ত গ্রাম্য জীবনের সঙ্গীর্ণতা এবং দলাদলির মধ্যেই পড়িয়া থাকিতাম। অথচ আমার মা বর্ণ-জ্ঞান লাভ করেন নাই।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

“ভবানী, ও ভবানী!”

“কি পো? কেন ডাকছ?” বলিতে বলিতে ভবানী আহ্বানকারিণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বেশা দশটা হইবে। শীতকালের রোদ খোলা জানালার পথে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। এই মধুর উত্তাপটুকু উপভোগ করিবার জন্তই যেন একটি যুবতী জানালার পাশে ইঁজি-চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়াছে। তাহার উজ্জল গৌরবর্ণ মুখে রক্তের লেশমাত্র

নাই, সম্প্রতি কোন পীড়া হইতে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মুখও শুদ্ধ, বেশভূষারও তেমন পারিপাট্য নাই, অথচ ঘরখানির সজ্জা ও ঘে-প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার মধ্যে তাহার স্থান, সেটিকে দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই গৃহের অধিবাসীদের আর বাহারই অভাব থাকুক, অর্থের অভাব নাই।

ঘরখানি যুবতীর শয়নকক্ষ। তাহার এক দিকে মেহগনির প্রকাণ্ড জোড়াখাট, অন্য দিকে আয়না-

লাগানো একটি বড় আলমারী। দুখানি ইঞ্জিচেন্নার ছুটি জ্ঞানলার পাশে, ঘরের মাঝখানে কারুকার্যে ভরা একটি জয়পুর্বা পিতলের টেবল ও গুটিদুই ছোট চেয়ার। তাহার উপর কোন এক ব্যক্তির প্রাতরাশের অধিকাংশই এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

ভবানী যুবতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কি ভাঙ্গ, কেন ডাকছ?”

যুবতী বিবস্ত্রিপুরে বসিল, “কেন ডাকছ, তা কি এক লাখ বার বলতে হবে? কোনও তার কি চিঠিপত্র এল?”

ভবানী জ্রীলোক বটে, কিন্তু তাহার লম্বা-চওড়া চেহারা, বলিষ্ঠ গঠন ও রুক্ষ মুখ দেখিলে মনে হয় পুরুষকেই কেহ জ্রীলোকের পোষাক পরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ভাঙ্গমতীর কথায় তাহার মুখেও একটুখানি বিষাদের ছায়া পড়িয়া ক্ষণকালেব মত মুখখানাকে একটু কোমল করিয়া তুলিল। সে বলিল, “কই, এসেছে ব’লে ত শুনি। আচ্ছা, তুমি ওঠ, মুখ হাত ধুয়ে, কাপড়-চোপড়গুলো ছাড়। কিছু ত খাওনি দেখছি, যেমন যা রেখে গিয়েছি, তেমনই প’ড়ে আছে। ওমা, দুখটা শুদ্ধ খাওনি? গরম ক’রে এ’নে দেব? নিজের শরীর বোঝ না বাছা, যা খুসি তাই কর! এমন করলে চলে কখনও? নাও, ওঠ, মুখ ধোও, আমি কাপড় নিয়ে আসি। কাতিকে ডেকে দিচ্ছি, দুখটা গরম ক’রে আনুক।”

ভাঙ্গমতী একেবারে রাগের আতিশয্যে কাঁদিয়াই ফেলিল। অশ্রুধ্বকর্মে বলিল, “তুই বেরো ঘর থেকে, পোড়ারমুখি! আমি মরছি নিজের জালায় জ’লে, উনি এসেছেন এখন আমার মুখ ধোয়াতে, দুখ খাওয়াতে! যা তুই।”

ভবানীও একটু রাগিয়া বলিল, “তা ত বটেই, দাসী-বাঁদী মানুষ আমরা, ভাল কথা বললেও মন্দ হয়। শান্তি কী বড় নন্দ থাকলে কেমন কথা শুনতে না তাই দেখতাম। এই শরীর, এখন অবস্থ করা চলে কখনও? আর এমন ক’রে দিনরাত না খেয়ে, না দেয়ে যে কান্নাকাটি করছ, এতে আমার অকল্যাণ হয় না? ওঠ, লক্ষ্মী দিদি আমার, মুখ-

হাত ধোও, আমি বাইরে দরওয়ানের কাছে গিয়ে আবার খোঁজ নিয়ে আসছি।”

ভাঙ্গমতী উঠিবার ক্রোনও লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল, “তুই যা আগে খোঁজ নিয়ে আস, তারপর আমি উঠব।” তাহার দুই গাল বাহিয়া টপ, টপ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

ভবানী অগত্যা বাহির হইয়া চলিল। বাইতে বাইতে বলিল, “বলিহারী বাই জামাইয়ের আকলকে! এ দিকে ত এত আদরের ঘটা, বউ যেন মাথার মণি। আর এই যে আট দিন বাড়ী ছাড়া হ’য়েছি, মেয়েটাকে একটা খবর দিতে নেই গা? ছি, ছি, ছি। একেবারে শবীর পাত করতে বসেছে সে। বুড়ো বাপ প’ড়ে অস্থখে ধুকছে, তার কথাও কি একবার ভাবতে নেই?”

“কি ভবানী, জ্ঞানদার কোনও খবর-টবর এলো?” বলিতে বলিতে ইংরেজী পোষাকপরা এক প্রৌঢ় ভ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

“কই আর এল, ডাক্তার-বাবু? আবার চলেছি দেউড়ীতে, দরওয়ানের কাছে খবর নিতে।”

ডাক্তার নিজের মাথার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, “তাইত, মহা মুন্সিল দেখছি। ছেলেটা বড় নিরীক্সের কাজ করছে। প্রমদা-বাবুর এই অবস্থা, তার উপর এমন ক’রে ভাবাচ্ছে। এর পর বুড়োতে টিকিয়ে রাখা শক্ত হবে।”

ভবানী মুখ নাড়িয়া বলিল, “আর ভাঙ্গর কথাও একবার ভেবে দেখুন দিখি। তাকে না পারছি নাওঘাতে, না পারছি খাওয়াতে, খালি ব’সে চোখের জল ফেলছে। এমন করলে মানুষের শরীর টেকে?”

“আচ্ছা, বিপদেই পড়া গেল দেখছি,” বলিতে বলিতে ডাক্তার কর্তা প্রমদারঞ্জন শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রমদারঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের একজন ধনবান জমিদার। তাঁহাদের বংশমর্যাদা ও ধনের খ্যাতি আজ পর্যন্ত কালের প্রভাব এড়াইয়া অনেকটাই টিকিয়া আছে। এক কালে ধার্মিক পরিবার বলিয়াও তাঁহাদের নাম-ডাক ছিল। কিন্তু প্রমদারঞ্জন যৌবনে লুকাইয়া মদমাংস খাইয়া, ও

আত্মবিক্ষিপ্ত নানা অনাচার করিয়া সে-খ্যাতি অনেকটাই দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুত্র জ্ঞানদারঞ্জন ও সকল উপসর্গ না থাকিলেও, তাহার উগ্র সাহেবীয়ানাকে সকলেই হিন্দু বলিয়া পক্ষে ঘোরতর অনাচার বলিয়া গণ্য করে। সে মদ না খাইলেও মাংস ও চুরটের প্রতি ভক্তি তাহার অসাধারণ। পারতপক্ষে ধূতি সে পরে না, এবং জী ভাঙ্গুমতীর পায়ে চটি জুতার অভাব দেখিলে, তাহার সঙ্গে মহা ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। ভাঙ্গুমতী হিন্দু ঘরের মেয়ে হইলেও, স্বামীর পালায় পড়িয়া নব্য ধরণে কাপড় পরিতে ও চুল বাঁধিতে, জুতা মোজা পরিতে, এবং চলনসই রকম ইংবেঞ্জী বলিতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাতে বাড়ীতে ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছিল, এমন-কি প্রমদারঞ্জনও বিধবা ভগিনী ত বজ্রায় ঘৃণায় আকুল হইয়া কাশীই চলিয়া যাইতে চাহিলেন। কোনো রকমে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাঁহাকে দেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে রাধা-গোবিন্দজীর পুত্রের তদারক করিয়া আশ্রিতা আত্মীয়া ও অনাত্মীয়াদের উপর প্রভুত্ব করিয়া এবং পরচর্চা করিয়া তাঁহার দিন একরকম ভালই কাটিতেছে। এ দিকে পিসিমার সমস্তদীনব্যাপী আর্ন্তনাদ ও তিরস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জ্ঞানদারঞ্জন এবং ভাঙ্গুমতীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রমদারঞ্জনও বিশেষ কিছু লাভ বা লোকসান হইল না। বার্কফোর সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা আসিয়া পড়াতে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অধিকাংশ অনাচার ছাড়িতে হইয়াছিল, কাজেই ভগিনী কাছে থাকিলেও তাঁহার কোনো আপত্তি ছিল না। তবে একদিকে পুত্রের অবিশ্রান্ত নালিশ ও অন্যদিকে ভগিনীর অবিশ্রান্ত বিলাপের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তাঁহারও একটু আরাম বোধ হইল না হইল তাহা নহে।

জ্ঞানদারঞ্জন কয়েক দিন হইল এক বন্ধুব বিবাহ উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে। আমোদ-প্রমোদে চির-কালই তাঁর অত্যন্ত রুচি, তাহার শ্রোতে ডুবিয়াই বোধ হয় সে-বাড়ীতে একটা খবরও দেয় নাই। এ দিকে বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী পত্নী ত ভাবনায় চিন্তায় পাগল হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ফিরিবার সময় জ্ঞানদারঞ্জন সকলে জল-

পথে ফিরিতেও পারে এমন একটা কথা ছিল, তাহারই জন্ত ভাঙ্গুমতীর ভাবনা হইয়াছে অধিক।

ভাঙ্গুমতী সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে হইলেও ধনে মানে তাহার স্বস্তর ও পিতৃকুলে অনেকটাই তফাৎ ছিল। রূপের জোরেই সে প্রমদারঞ্জনও একমাত্র সন্তানের ঘর আলো করিতে আসিয়াছিল। প্রমদারঞ্জনও পত্নী-বশুণের অভাব না থাকিলেও রূপের অভাব যথেষ্টই ছিল, এবং তাহার জন্ত তাঁহার নিজের মনে খেদের সীমা ছিল না। পুত্রের বাহাতে এই ভোগ ভুগিতে না হয়, তাহার জন্ত তিনি অনেক দেখিয়া-শুনিয়া বো আনিয়াছিলেন। বাংলাদেশ খুঁজিয়া মনের মত পাত্রী মিলিল না বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানেও চর পাঠাইয়াছিলেন। ভাঙ্গুমতীর পিতা রাজপুতানায় জী-পুত্র লইয়া বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। মেয়ের বিবাহ কি প্রকারে হইবে, এ ভাবনা তাঁহাদের নিত্যস্ত কম ছিল না। ধনে, মানে, কুলে, শীলে এমন অপ্রত্যাশিত রকম পাত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা ত আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিবাহ স্থির হইতে, এবং হইয়া যাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

ভাঙ্গুমতী একরকম চিরকালের মতই পিতৃগৃহ ছাড়িয়া আসিল। সঙ্গে আসিল তাহার রাজপুত দাসী ভবানী।

ভবানী জাতিতে রাজপুত হইলেও বাঙ্গালীর সংসারে বহুকাল কাজ করা বদ্বন, বাঙ্গালীরই মত বাংলা কথা বলিতে পারিত। তবে তাহার ধরণধারণ একটু কাঠ-খোঁট গোছের থাকিয়া গিয়াছিল। তাই বাড়ীতে সকলে তাহাকে “রগচণ্ডী, মন্দা ভগবতী” বলিয়া ক্ষেপাইত। ভাঙ্গুমতী নিজেও ঠিক বাঙ্গালী মেয়ের মত নম্র বা লাজুক ছিল না, কিন্তু এই কারণেই জ্ঞানদারঞ্জনও তাহাকে বিশেষ রকম ভাল লাগিয়া গেল। বাবা তাহার জন্ত একটি ছিঁচ কাঁছনে গোমূর্থ খুঁকী ধরিয়া আনিবেন এই ভয়টা তাহার অত্যন্তই ছিল, এখন ভাঙ্গুমতীকে পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। জীব ভিতর আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার যা অভাব ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে তাহা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাড়ী হইতে যেটুকু বাধা পাইল, তাহার বিরুদ্ধেও

প্রবলভাবে বিদ্রোহ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারই জয় হইল।

এইসকল কারণে ভাষ্করমতী খুব শীঘ্রই স্বামীর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিল। বাড়ীর অন্তর সকলে সামনে পিছনে তাহাব নিম্না করিত বলিয়া আর কাহারও কাছে সে বড় একটা ঘেঁষিত না। স্বামীই ছিল তাহার একমাত্র সখল। যতক্ষণ বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বামী হইতে দূরে থাকিতে হইত, তাহার একটা মিনিটও ঘেন কাটিতে চাহিত না। বই পড়িয়া, শেলাই লইয়া বসিয়া, গোছানো ঘর দশবার করিয়া গোছাইয়াও সে অস্থির হইয়া উঠিত। আর কিছু না পাইলে ভবানীর সঙ্গে অকারণ ঝগড়া করিত, এবং জ্ঞানদার ভিতর বাড়ীতে আসিবার সময় পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হইয়া যাইতে না বাইতে বালিশে মুখ ঝুঁকিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিত। ভবানী এই ছেলে-মামুষের ছেলে-মামুষী দেখিয়া মনে মনে হাসিত, ভাবিত, “হুঁদিন যাক্, ছেলে-পিলের মা হ’লে, এসব পাগলামী নিজের থেকেই যাবে।”

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ভাষ্করমতীর বিবাহ হইয়াছিল প্রায় পনেরো বৎসর বয়সে, এখন তাহার বয়স কুড়ি। রূপ-যৌবনে তাহার সাবা দেহ কুলে কুলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু কোল শূন্যই থাকিয়া গেল।

কর্ত্তা প্রমদাবরঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর চাকর দাসী পর্যন্ত সকলেবই ইহা লইয়া ক্ষোভের সীমা ছিল না। বংশের একমাত্র ছুলাল জ্ঞানদা, তাহার ঘর যদি শিশু-মুখের হাসিতে আলো না হইয়া উঠে, তাহা হইলে এই বিশাল পুরীর আধার ঘুঁচবে কেমন করিয়া? শেষে কি কর্ত্তার ভাইপো লক্ষ্মীছাড়া মাতাল উদয়টাই আসিয়া সব জুড়িয়া বসিবে নাকি?

ডাক্তার রমেন্দ্রবাবু কর্ত্তার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কেমন বোধ করছেন?”

প্রমদাবরঞ্জন তখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠেন নাই। একখানি খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন, “ভাল আর আছি কই? ছেলেটা বড় ভাবিয়ে তুলল। এইমাত্র প্রিপেড-টেলিগ্রাম করলাম বোসদের বাড়ী।”

রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আজ্জিকালকাব ছেলে-ছোকরাদের রকমই হ’য়েছে ঐ। আমোন হ’লেই হ’ল। কোথায় বুড়ো বাপ খুড়ো খবরের জুড় ইপিয়ে মরুছে, সে-কথা তাদের মনে থাকলে ত।”

প্রমদাবাবু বলিলেন, “শুধু বুড়ো বাপ ত বাড়ী জুড়ে নেই, তার জ্ঞাও ত রয়েছে? তাকেও ত একটা খবর দিতে পারত। সে বেটা ত শুনুছি একেবারে মরুতে বসেছে ভাবনায়।”

ডাক্তার বলিলেন, “হুঁ, বৌমার শরীর কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না শুনুছিলাম। ছেলে-পিলে হবে নাকি?”

কর্ত্তা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, “কি জানি, সে-রকম ত কিছু শুনিনি। অদৃষ্টে সে স্থখ কি আছে ঘে নাতীর মুখ দেখে মরুবে? এত বড় বংশ জ্ঞানদার সঙ্গেই শেষ হ’বে নাকি কে জানে? উদয় হতভাগা এসে এ বাড়ীতে তার বারো ভূত নিয়ে রাজত্ব করছে জানলে আমার আত্মা ত শাস্তি পাবে না।”

ডাক্তার বলিলেন, “এরি-মধ্যে হাল ছাড়ছেন? কি বা আপনার ছেলে বৌয়ের বয়েস? কপাল জোর থাকে ত এখনও ঘর-ভরা নাতী-নাতনী দেখে যেতে পারবেন।”

প্রমদাবরঞ্জন বলিলেন, “ঘর ভরার আশা করি না হে ভায়া, এখন একটি দেখে যেতে পারলেই আমার ঢের হয়।”

রমেন্দ্রবাবু উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “তা দেখবেন বই কি, নিশ্চয় দেখবেন। আচ্ছা, আসি আজ; মিক্‌শারটা ঠিকমত থাকেন ত? এখনো গুটি পাঁচ রুগীর বাড়ী চু মেয়ে যেতে হবে।” ডাক্তার চলিয়া গেলেন এবং কর্ত্তা আবার খবরের কাগজ পাঠে মন দিলেন। একজন হিন্দুস্থানী চাকর ঘরের সব দরজা জানলাগুলি খুলিয়া ঘর বাঁট দিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

ভবানী বাহির হইয়া যাইতেই ভাষ্করমতী উঠিয়া অস্থির ভাবে ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। জ্ঞানদার অন্ত্রায় ব্যবহারের কথা যত তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই রাগে তাহার বকের ভিতরটা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, অশ্রু যেন তাহার কর্ণরোধ করিয়া ধরিতে লাগিল। কি করিয়াছে সে, যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার? কায়মনোবাক্যে স্বামীকে

তুষ্ট করিবার কোনো চেষ্টার সে ক্রটি করে নাই। তিনি যখন যেভাবে চলিতে বলিয়াছেন সে তাহাই চলিয়াছে, আত্মীয় বন্ধু সকলের ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তি সব অগ্রাহ্য করিয়া। পিতামাতা সাগ্রহে বারবার আহ্বান করা সত্ত্বেও, সে একদিনের জন্তও বাপের বাড়ী যাইতে চাহে নাই। এত করিয়াও যে কি স্বামীর কাছে এমনি অবহেলার জিনিষ থাকিয়া গেল যে, দু'দিন চোখের আড়াল হইতেই তিনি তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? না, এ ব্যবহার একেবারে অসম্ভব। এর শোধ সে তুলিবেই, যেমন করিয়া হোক।

কিন্তু তাহার যদি কোনো বিপদ হইয়া থাকে? এই চিন্তা মনে আসিবামাত্র ভাহুমতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। হায়রে, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে তাহার মত হতভাগিনী আর থাকিবে কে? এমন স্বামী কি কাহারও কখনও হয়? এমন করিয়া স্ত্রীকে আর কে ভালবাসে? জমিদার বংশের শত অনাচার-কল্যাচারের শ্রোত তাহাকে ত একবিন্দুও স্পর্শ করে নাই, তাহার চরিত্র হীরকের মতই উজ্জ্বল নির্মল থাকিয়া গেছে। আজ কি শুধু ধনের মানের জন্ত ভাহুমতী সকল আত্মীয়-আত্মীয়ের হিংসার পাণ্ডী? তাহার অসাধারণ স্বামীসৌভাগ্যই যে তাহাকে নারীকুলের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। তাহার সম্মান হইল না বলিয়া পরের কাছে সে কত না কথা শুনিয়াছে, কিন্তু স্বামী ত তাহার এ ক্রটি কোনোদিন ধর্মব্যয়ের মধ্যেই আনেন নাই, হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন।

ভবানী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “না বাছা, কোনো খবর এখনও আসেনি। তবে কর্তা তার করেছেন জবাবের টাকা দিয়ে, আজ বেলা বারোটা একটার মধ্যে ঠিক খবর আসবে। নাও, এখন হ'ল ত? মুখ হাতগুলো ধোও এরপর। চাবিটা দাও, কাপড় জামা বার ক'রে দি।”

চাবির রিংটা ভবানীর পায়ে ছুড়িয়া দিয়া ভাহুমতী বলিল, “ছাই হ'ল। কি খবর যে আসবে তা মা দুর্গাই জানেন। নে, কি বার করবি কর।”

ভবানী আলমারী খুলিয়া একটি লেশ-বসানো সেমিজ একটি নীল ভায়েলা ক্লানেলের অ্যাকসেট এবং একখানি লাল পাড়ের ঢাকাই শাড়ী বাহির করিল। ক্রমাগত

কাপড়াকাটি করিয়া এবং ভবানীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভাহুমতী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে আর কাপড় ছাড়িতে বেশী আপত্তি করিল না। ফিরিয়া আসিয়া ইজি চেয়ারে বসিতেই ভবানী চিকণী লইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল। আর একজন বৃদ্ধা কি আসিয়া সকালের পরিত্যক্ত খাবারগুলি উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং খানিক পরে গরম লুচি, তরকারী, সন্দেশ, এবং একবাটা গরম দুধ রাখিয়া গেল। চুল বাঁধা শেষ হইতেই, ভবানী পিতলের টেবলটি ভাহুমতীর সামনে টানিয়া আনিল, এবং যতক্ষণ সে কিছু না খাইল তাহাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিল না।

খাওয়া শেষ করিয়া, ভবানীকে বিদায় দিয়া ভাহুমতী আবার ঘরের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এমন এক ইঞ্চি স্থান নাই, যেখানে তাহার স্বামীর কোনো না কোনো চিহ্ন বর্তমান। ঘরের ভিতর জানদার ছবিই বুলিতেছে কম করিয়া বারো চৌদ্দখানা। তাহার পর তাহার বই, তাহার কাপড়, তাহার জামা, জুতা, ছড়ি, তামাকের পাইপ, ঘরময়। সবাই যেন যুক দৃষ্টিতে ভাহুমতীর দিকে চাহিয়া আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে এ গৃহের অধীশ্বর কোথায়? সে সজল চোখে জিনিষগুলি একে একে স্পর্শ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটা ছবির উপর তাহার চোখ পড়িল। ইহা তাহাদের বিবাহের বৎসরে তোলা। তখনও ভাহুমতী ভাল করিয়া নব্য প্রথায় চুল বাঁধিতে, কাপড় পরিতে শিখে নাই। ছবি তুলিবার আগে জানদা তাহাকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছিল, মনে করিয়া ভাহুমতীর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মধুর সলাজ হাসি বিদ্যুতের মত ঝলিক হানিয়া গেল।

বাহির হইতে কে একজন গলা ঝাঁকরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঘরেই নাকি, বোঠাকুরুণ?”

ভাহুমতী পরদার কাঁকে উকি মারিয়া দেখিল উদয় দাঁড়াইয়া আছে। অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলিয়া এ বাড়ীর কেহই উদয়কে দেখিতে পারিত না। জানদা বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে বারণ করিয়া দিয়াছিল সে যেন উদয়কে কোনো প্রকার আত্মীয়তা করিতে প্ররোচন না দেয়, এমন

কি সম্ভব হইলে তাহার সহিত কথা পর্যাঙ্ক যেন না বলে। কিন্তু যতই উপেক্ষা-অনাদর লাভ করুক, উদয় সহজে দমিবার ছেলে নয়। ভাষ্কর্যমতীর সহিত আত্মীয়তা করিবার প্রবল চেষ্টা সে একদিনও ত্যাগ করে নাই। তবে ভাষ্কর্যমতী অসুস্থ থাকায় তাহার চেষ্টায় যে কিছু লাভ হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

বিরক্তিতে ভাষ্কর্যমতীর সর্বদা জ্বালা করিতে লাগিল। এ হতভাগার কি একদিনও বাদ যাইতে নাই? উত্তর দিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় কাতি ক্রি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “ছোট দাদাবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, বোঁরাগীমা; আপনার খোঁজ কচ্ছেন।”

ভাষ্কর্যমতী ভ্রূহুটি করিয়া বলিল, “বল্গে যা যে তাঁর শরীর বড় ধারাপ, শুয়ে আছেন।”

এই দাসীটি কোন অজ্ঞাত কারণে উদয়ের কিঞ্চিৎ বশীভূত ছিল। সে তখনই বিদায় না হইয়া বলিল, “কি দরকারী কথা আছে বললেন।”

ভাষ্কর্যমতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “তাঁর দরকারী কথা শুনার আমার দরকার নেই। আমি এখন উঠতে পারব না।”

কাতিকে আর কষ্ট করিয়া এ খবরটা উদয়কে দিতে হইল না। সে দরজার খুব কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, ভাষ্কর্যমতীর কথা বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইল। পক্ষীর কাছে আসিয়া বলিল, “বৌঠাকরুণ, কথাটা আপনার জানা দরকার, তাই আপনাকে বলতে এলাম। শুধু শুধু আপনাকে রাগাবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।”

ভাষ্কর্যমতী এবার আর না উঠিয়া পারিল না। মাথাঘর কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, “কি কথা বলুন।”

উদয় মুখখানাকে যথাসাধ্য কাঁতর করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, “দাদার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ীর অমরও বোসদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিল, আপনার মনে আছে বোধ হয়?”

ভাষ্কর্যমতী ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, তাহার মনেই আছে।

উদয় বলিল, “আজ সকালে ঘুবে ঘুবে এমনি

একটু তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। শুন্লাম অমরের চিঠি এসেছে। দাদার কোনো খবর আছে কি না জিজ্ঞেস করতে তারা-বল্লে, বড় ভাল খবর নয়।”

ভাষ্কর্যমতীর পা ধবু ধবু করিয়া কাঁপতে লাগিল। দরজার কপাট ধরিয়া কোনমতে নিজে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি লিখেছে সে?”

“বিয়ের ছ’ তিন দিন পরে ওরা সবাই মিলে শিকারে যায়। সেখানে কেমন করে জানি না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। দাদার অবস্থা বোধ হয় বিশেষ সুবিধার নয়। এখনি এবাড়ীর থেকে কারো ওখানে যাওয়া উচিত। আমার হাতে একটা পয়সাও নেই, তা না হ’লে সকালের ছেনেই আমি চ’লে যেতাম।”

ভাষ্কর্যমতী টলিতে টলিতে ঘরের ভিতর গিয়া খাটের উপর অর্ধ অচেতন অবস্থায় লুটাইয়া পড়িল। সে যেন ভাল করিয়া উদয়ের কথা বুঝিতেই পারে নাই। কাতির মুখে খবর পাইয়া ভবানী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিল। উদয় তখনও পক্ষীর ওপাশে দাঁড়াইয়া। তাহাকে উদ্বেষ্ট করিয়া তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে বলিল, “কর্ত্তা মশায়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে খবর দিন। এখানে দাঁড়িয়ে কি হ’বে?”

কর্ত্তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইবার ইচ্ছা যে উদয়ের খুব ছিল তাহা নহে। তবে ভাষ্কর্যমতীর অবস্থা দেখিয়া সে বুঝিল যে, এখানে দাঁড়াইয়াও খুব বেশী কিছু লাভ নাই। অগত্যা আস্তে আস্তে সে সরিয়া গেল। প্রমদারঞ্জনর কাছে নিজে না গিয়া একজন কর্মচারীকে ডাকাইয়া, তাহার মায়ুফতে আপনার বক্তব্য বলিয়া পাঠাইল। কিছুক্ষণ পরে গোটা তিন চার দশটাকার নোট পকেটে ভরিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরেই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব আসিয়া পড়িল। বজ্রাহতের মত সারাবাড়ী যেন নীরব নিঃশব্দ হইয়া গেল। জানদা মারা গিয়াছে।

প্রমদারঞ্জনর ঘরের দিকে ভয়ে ভয়ে আর কেহ পা বাড়াইল না। কেবল ভাস্কর্যমতীর রমেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া

তাঁহার ঘবেব দবদ্বায় করাঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। দরজা বন্ধই রহিল, ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত গাঢ় কণ্ঠে প্রমদারঞ্জন বলিলেন, “ডাক্তার, মৃত্যু যাদের স্বভাবিক, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা জ্ঞান কোবো না। আমবা মরণকে তার জ্ঞান পাওনার থেকে বঞ্চিত করি ব’লে সে এমনি ক’বেই আমাদের ওপর শোধ তোলে। আমার ছাব্বিশ বছরের ছেলে আমাবই পাপে গেল।”

ভানুমতীর সেদিন জ্ঞানই হইল না। ভবানী হস্তশাবক ব্যাঙ্গীর মত তাহাকে আগ্লাইয়া বসিয়া রহিল, কাহাৎও আর তাহার কাছে আসিতে দিল না। নিজেও সাবাদিন সে জলস্পর্শ করিল না।

সন্ধ্যার সময় উদয় আসিয়া একবার করুণাবিগলিত-কণ্ঠে ভানুমতীর খবর জিজ্ঞাসা করিল। কাতি তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। ভবানী দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বিড় বিড় কবিয়া বলিল, “বড় ক্ষুধিই হ’য়েছে মনে। কিন্তু হতভাগা তোর সব আশাতেই ছাই পড়বে, এই আমি ব’লে রাখলাম।”

উদয় বাহিব হইয়া যাইতে-যাইতে আপন মনেই বলিল, “যাক্, টাকা চল্লিশটা আর বুড়ো এখন কিরে’ চাইবে না।”

(২)

দশ বায়োট্টা দিন কোনো রকমে কাটিয়া গেল। জমিদার-বাড়ীর উপর শোকের ক্রম ছায়া গাঢ় হইয়া রহিল তবু মাহুষেব স্বাভাবিক ধর্মবশে সকলেই এক এক করিয়া জীবনকে আবার এই নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বাধিয়া চালাইবাব চেষ্টা করিতে লাগিল। চাকর-বিশ্বলি এতদিন মনিবদের শোকেব আওতায় একেবারে মুসড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহাবাও অল্পে অল্পে কোলাহল শুরু করিল। বাকি রহিল কেবল ভবানী। তাহাকে আর হাসি গল্পে যোগ দিতে ডাকিবাব সাহস কাহাবও হইল না। কাতি মূগ ঘুবাইয়া অল্প দাসীদের কাছে বলিল, “জ্বাকাপানা দেখ, সোয়ামী মরেছে যেন ওই। এমন যে যার-পর-

নেই বাপ, সেও সাম্লে উঠেচে, আব ঐ বুড়ী মাগীর রকম দেখ, ঘোবাণাকে যেন ভুতের মত পেয়ে বসেছে। না দেয় বেরতে, না দেয় কারো সঙ্গে কথা বইতে। বিধবা কি আর কেউ হয় না? এই ত আমরা রয়েছি। যে গিয়েছে তাব জন্তে নিজে ম’রে আর কি হ’বে? খাও, দাও, আপনার জ্ঞান বাঁচাও, এই ত বুঝি বাপু।”

প্রমদারঞ্জন ভিতরে ভিতবে কতটা সাম্লাইয়া ছিলেন বলা যায় না, তবে বাহিবের চালচলন তাঁহার আবার প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কথা-বার্তা আব আগের মত ততটা বলিতেন না। ভানুমতীর অর্ধ-অচেতন ভাবটা এখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। ভবানী তাহাকে শিশুর মত করিয়া আগ্লাইয়া রাখিত। নাওয়ানো, খাওয়ানো সবই আপন হাতে করিত। সে স্বভাবতই স্বল্পভাষণী ছিল, এখন আর একেবারেই কথা বলিত না। কেবল উদয়কে দেখিলে তাহার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত, আপন মনে চাপা গলায় সে অভিশাপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিত।

বেলা দশটা বাজে। ভানুমতীকে জ্ঞান কবাইয়া, তাহার জলযোগের সব আয়োজন করিতে ভবানী ঘরের বাহির হইতেছে, এমন সময় কর্তাব খাস চাকর কুবেব আসিয়া খবর দিল যে, কর্তাবাবু একবার তাহাকে ডাকিতেছেন।

কর্তাব ঘবে বিশেষ কখনও তাহার ডাক পড়ে না। কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া ভবানী বলিল, “সেখানে আর কে কে আছেন?”

কুবেব বলিল, “ডাক্তার-বাবু, নায়েব-বাবু, আর ছোট দাদা-বাবু।”

মাথার কাপড় টানিতে টানিতে ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ডেকেছেন জ্ঞান কিছু?”

কুবেব বলিল, সে খবর তাহার জ্ঞান নাই। দুখ, ফল, মিষ্টি গোছাইবাব ভাব আর-একজনের উপব দিয়া ভবানী আস্তে-আস্তে কর্তাব ঘরের দিকে চলিল। কি প্রয়োজনে যে তাহার ডাক পড়িতে পাবে, তাহার মনের মধ্যে কেবল তাহারই জল্পনা চলিতে লাগিল।

প্রমদারঞ্জন খাট ছাড়িয়া একথানা বড় ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিলেন। ডাক্তার ও নায়েব তাঁহার দুই পাশে বসিয়াছিলেন, এবং উদয় ছিল কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া। জ্যাঠা মহাশয়ের সামনে বসিবার সাহস তাহার কোনো কালেই হইত না, প্রয়োজন দেখিলেই ঘেন দৌড় মারা চলিত, এমন ভদ্র করিয়া সে সর্বদা দাঁড়াইয়া থাকিত।

ভবানী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। হাতের ইসারায় তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে বলিয়া উদয় আরো একটু সরিয়া গেল। প্রমদারঞ্জন একথানা থোলা চিঠি হাতে করিয়া ছিলেন, সেই বিষয়েই বোধ হয় ডাক্তার এবং নায়েবের সঙ্গে তাঁহার কোনো পরামর্শ হইতেছিল। ভবানীকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, “এই যে ভবানী! বৌমার শরীর আজ কেমন?”

ভবানী মুহূর্ণ্যে গলায় বলিল, “অল্পে অল্পে সামলে উঠছে, বাবু। কাল রাতে বেশ ঘুমিয়েছে। এ ক’দিন ত চোখে-পাতায় এক করেনি।”

প্রমদারঞ্জন চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, “বৌমার বাবা কলকাতায় এসেছেন। তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে চান। বৌমার কি মত জানা দরকার। এখানে থাকতে চান, যেমন আমরা চিরদিন ছিলেন তাই থাকবেন, বাপের কাছে থাকতে চান আমি কোনো আপত্তি করব না। তাঁর শরীর যদি বেশী খারাপ না থাকে, তাঁকে একবার জিগগেস ক’রে এসো। আমার চিঠির জবাব পেলেই বেয়াই মশায় ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন।”

ডাক্তার-বাবু বলিলেন, “কিন্তু একেবারে পাঠিয়ে দেওয়া আমি ঠিক মনে করি না। ছেলের অবর্তমানে এখন তাঁরই ছেলের সব কাজ করতে হবে। কর্তব্য বলে ত একটা জিনিষ আছে। আপনাকে দেখা-গোনাই তাঁর জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত এখন।”

জমিদারবাবু বলিলেন, “ওকথা আর বোলোনা, ভায়া। আমি কবে আছি কবে নেই। আমার ভাবনা ভাবতে স্তগবান আছেন। ওর অল্প বয়স, এমন ভয়ানক আঘাতটা পেল, এখন যা নিয়ে মনকে ভোলাতে পারে, তাকে তাই দেওয়া উচিত। বাপের বাড়ী থাকা আর এখানে থাকা

এখন ওর একই কথা। ওখানে থাকলেও টাকাকড়ির কোনো অভাব তাঁর হবে না, জ্ঞানদার সন্তে যে মাসহারা বরাদ্দ ছিল, তা বোমাই পাবেন আজীবন।”

নায়েব মশায় এই জমিদারীতে কাজ করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মাঝে মাঝে একটু মন খুলিয়া কথা বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বিধবা ভাঙ্গুমতীকে মাসিক দেড় হাজার টাকা দিবার প্রস্তাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “অত টাকা, ছেলেমানুষ তিনি, তাঁর হাতে দেওয়া কি ঠিক হবে? বারোভূতে লুটে থাকে শেষে। আমাদের দেশে মেয়েছেলের আর খরচ কি বলুন? বিশেষ ক’রে বিধবা মাছুষের? দেড়শ দু’শ টাকা হ’লেই ভেসে যাবে। দান-ধ্যান করা বই আর তাদের খরচ কি?”

ভবানীর কাণ ছিল প্রমদারঞ্জনের ও তাঁহার সঙ্গীদের কথার দিকে, কিন্তু চোখ ছিল উদয়ের মুখের উপর। অতগুলি টাকা মাস মাস হাতছাড়া হইবে এই প্রস্তাব শুনিয়াই ঘেন উদয়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। যদিও প্রমদারঞ্জন এখনও মরেন নাই এবং উদয়ের স্ত্রের কাঁটা ভাঙ্গুমতীও এখনও বাঁচিয়া, তবু সে নিশ্চেকে জমিদার বলিয়া একরকম ধরিয়াই লইয়াছিল। সুতরাং তাহার টাকা এমন ভাবে অপব্যয় করার প্রস্তাবে তাহার মুখ যে বিকৃত হইয়া উঠিবে সে আর বিচিত্র কি?

ভবানী অশিক্ষিতা জীলোক হইলেও মানব-চরিত্রে জ্ঞান তাহার অল্প ছিল না। বিশেষ করিয়া উদয় সন্তকে তাহার কখনও ভুল হইত না। উদয়ের মনের কথা সে একরকম আঁচ করিয়াই লইল এবং ত্রুট দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া প্রমদারঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “দিদিমণি ত যেতেই চাইবেন, কিন্তু এখন তাঁকে এত নাড়ানাড়ি করা কি ঠিক হ’বে? এই গাড়ী থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে ষ্টীমার, এত সব কি সইবে?”

প্রমদারঞ্জন উত্তর দিবার আগেই ডাক্তার বলিলেন, “তাতে বেশী কিছু অনিষ্ট হবে না। শরীর দুর্বল, তা ফাষ্ট ক্লাশে যাবেন এখন, লোকের ভীড় পোহাতে হবে না।”

ভবানী গলা নীচু করিয়া বলিল, “তাঁর শরীরের কথা বলছি না ডাক্তারবাবু, কিন্তু বংশের ছালা রয়েছেন তাঁর

পেটে, তাঁব কথা ভারতে হবে। এখনও এত টানাটানি কবুবার মত হয়নি।”

ডাক্তার ও নায়েব আনন্দের আতিশয্যে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াই পড়িলেন। প্রমদারঞ্জন অতটা আনন্দ কিছু প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু তাঁহারন হাত হঠতে বেহাইয়ের চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া পেল। উদয়ের মুখ প্রায় অমাবস্তার আকাশের মত হইয়া উঠিল, তবুও সে ঘর ছাড়িল না, দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

প্রমদারঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠিক এ খবর ত আগে শুনিনি?”

ভবানী লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, “এত দিন ঠিক ক’রে ধরুতে পরিনি বাবু, তাই বলতে সাহস করিনি; এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।”

ডাক্তার বলিলেন, “তাহ’লে এখন তাকে পাঠানোর কোনো কল্পনাই করা চলে না, অন্ততঃ আর দুটো মাস যার আগে। যাক, ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এত পতীর শোকের মধ্যেও এইটুকু সাস্থনা তিনি আপনার জন্তে রেখেছিলেন। ছেলে যদি হয় তা হ’লে সেই আপনার ছেলের অন্তর্ব পূরণ করবে।”

কর্তা কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। নায়েব মশায় কয়েকখানা কাগজ-পত্র গুছাইয়া কর্তাকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন, ডাক্তার আবার চেয়ার টানিয়া লইয়া জাঁকাইয়া বসিলেন। উদয়ের সম্মানে চোখ ফিরাইয়া ভবানী দেখিল সে কখন নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। মনে মনে হান্তিয়া বলিল, “তোরা বাড়ি ভাতে যে, ছাই দিতে পাবুলাম হতভাগা, এর জন্তে হরির লুট দেব চার আনার।”

ভাষ্করমতীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া ভবানী দেখিল, সে তখনও খায় নাই। দাসী তাহার জন্ত দুধ মিষ্টি প্রভৃতি লইয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে। ভবানীর মনটা অনেককাল পরে একটু ভাল ছিল, সে সময় কণ্ঠেই বলিল, “ওমা, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্ মুখী? যা, যা, আমি খাওয়াছি দিদিমশিকে।”

মোকদ্দা হাঁক ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ভাষ্করমতীর

ঘরে আজকাল ভবানী ছাড়া আর কেহ বড় আসিতে সাহস করিত না। তাহার পাথরের মত মুখ আর নিশ্চিন্ত চোখেব দিকে তাকাইলেই যেন তাহাদের বৃকের রক্ত জল হইয়া আসিত। কাঁদ, কাট, মাথা কোট, এ সব তাহাদের অভ্যাস ছিল; সে-রকম কিছু দেখিলে পাশে বসিয়া নিজেবাও খানিক হাঁউ মাউ করিয়া চীৎকার করা চলে, কিন্তু এমন ধারা কাণ্ড তাহারা দেখে নাই। এমন ইন্দ্রতুঙ্গা স্বামী যে মরিগ, তাহার জন্ত দণ্ডটা দিন কাঁদিতেও পারিল না গা? এ কেমন মেয়েমানুষ? ঐ বড়ী মাগীই কিছু পরামর্শ দিয়া থাকিবে বোধ হয়, একদণ্ড তবোরাণাব ঘর ছাড়িয়া নড়ে না। তাগকে কোন প্রশ্ন করিবার সাহস কাহারও ছিল না। যা স্বভাব, কি জানি যদি ছ’ বা লাগাইয়াই দেয়? তাহার সঙ্গে জোরে পারিবারও কাহাবও সম্ভাবনা ছিল না।

ভবানীর অহুরোধে ভাষ্করমতী আস্তে আস্তে খাইতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিনের মধ্যেই সে আরো অনেক খানি রোগা হইয়া গিয়াছে। শোকের আগুন তাহাকে ভিতরে ভিতরে পোড়াইতেছিল বলিয়াই যেন তাহার মুখের রং অনেকটা ছাইয়ের মত হইয়া আসিয়াছে, চোক অর্ধশূন্য জ্যোতিহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তাহার পরিধানে সেমিজের উপর একখানা সৰু কালোট পাড়ের ধুতি, হাতে দু’গাছি বালা। একেবারে বিধবার বেশ পরাইতে ভবানী প্রাণ ধরিয়া পারে নাই। অবশ্য এ লইয়াও সমালোচনার অন্ত ছিল না। বিধবা মাহুবেক আবার এত গহনা পরা, খাটে শোওয়া কেন? কপাল যখন পুড়িলই, সেইমত থাকিলেই হয়?

ভবানী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “কলকাতার থেকে আমাদেব বাবু চিঠি দিয়েছেন, কর্তা আমায় ডেকে বললেন: ভোমায় নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমি বলি, এখন তোমার এত নাড়ানাড়ি না করাই ভাল। মাস দুই পরে গিয়ে একবার বিন কতকের মত থেকে এসো।”

ভাষ্করমতী হঠাৎ খাওয়া ছাড়িয়া সরিয়া বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “না ভবানী, আমি এখন

যাব, আমার নিয়ে চল। এখানে আর দু'দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার কিছু হবে না, তুই কর্তা মশায়কে বলে আর, আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে।”

ভবানী বলিল, “ছি, দিদি, এমন অবস্থার মত কাজ করে না। সন্তান রয়েছে পেটে, সেই তোমার আশা ভরসা সব। তার ভাল-মন্দ তুমি যা হয়ে দেখবে না।”

ভানুমতী ফুলিয়া ফুলিয়া কানিতে লাগিল। খানিক পবে অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিল, “আমার অদৃষ্টে কি কিছু ভাল টকবে, ভবানী? তা না হ'লে এই দশা হ'ল আমার কুড়ি বছর যেতে না যেতে? আমার মা, ঠাকুমা সবাই বুড়ো হয়ে পাকা চুলে সিঁদুর পরে গেছে রে।”

ভবানী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। “সকলের অদৃষ্ট সমান হয় না দিদি, যা কপালে ছিল ঘটল, কি করবে বল? মাহুষের হাত ত নেই? এখন যেটুকু আশা ভগবান দিচ্ছেন, তাইতেই বুক বেঁধে থাক। দেখ, কর্তা-মশায় শুদ্ধ আজ খবর শুনে কত বল পেয়েছেন। তাঁরও ত কম ঘায়নি। এখন শশুরের বংশ যাতে বজায় থাকে, তাই

কেবল ভাব। নিজের কোন অসুস্থ কোরো না।” ভানুমতী আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। সে আর থাইবে না দেখিয়া ভবানী পবিত্রাঙ্ক খাবারের পাত্র উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার পর কিবিয়া আসিয়া ঘরের সব আসবাব পালকের ঝাড়ন দিয়া মুছিয়া, ঘর ঝাঁট দিবার জোগাড় করিতে লাগিল।

ভানুমতী হঠাৎ চিন্তাসা করিল, “হ্যাঁরে, ঠাকুরপো ছিল সেখানে, এখন তুই কর্তামশায়কে খবর দিলি?”

ভবানী মুখ ঘুবাইয়া বলিল, “ছিল না আবার? ক'দিন থেকে হতভাগা কি বাড়ীছাড়া হয়েছে, ঠিক যেন যন্ত্রির ধন আগলে বেড়াচ্ছে। তেমন হয়েছে মুখের মতন জুতো! ক'ন্ যে জুট ক'রে পালাল দেখতেও পেলাম না।”

ভানুমতীর পাক্ত মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, “আমার স্বামীকে ঐ খেল, সাধারণ চোখ দিয়ে দিয়ে। তা না হ'লে এমন মাহুষ বেঘোরে মারা যায়? এখন ছেলে খাবার চেষ্টায় লাগছে। কিন্তু আমার না খেয়ে পারছে না, তা বলে রাখলাম দেখিস।”

উদ্বেজনায় তাহার সারা শরীর কাঁপিতেছে দেখিয়া ভবানী আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া খাটে শোয়াইয়া দিল। (ক্রমঃ)

সঙ্গীতে পরিবর্তন

শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(১)

ইংরেজী ১৮৭৪ কি ৭৫ শালে, তখন আমি কাশীর বাল্মীকীটোলা জুলে পড়ি, বর্ষক্রম ১৩১৪ বৎসর হইবে, হঠাৎ শুনা গেল, একজন ভাল বাঁশী-বাদ্যি কাসীতে আসিয়াছেন, আমার লেখাপড়ার তত বিশেষ মনোযোগ ছিল না; বাঁশীর বখা শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। আমি তাঁহার সন্ধান করিলাম এবং বাঁশী শিখা করিব

বলিয়া তাঁহাকে জানাইলাম। তাঁহার আরও ৩৪ জন শিষ্য ছিল। এই বাঁশী-বাদ্যিদের নাম শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ মিত্র (বর্তমানে লঙ্কোতে আছেন); দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ; হাতে বাঁশী লইলেই কৃষ্ণাঙ্কুরের মত দেখাইত বলিয়া আমবা তাঁহাকে “কালমাণিক” বলিয়া ডাকিতাম। বাঁশীতে আমার হাতেখড়ি হইল। “নি সা খা নি প” বেহাগের গং আরম্ভ হইল। ইহার অন্তরা এখন

শিখিলাম তাহাতে কোমল নিষাদ পাইলাম। তখন উহাই শুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম (অর্থাৎ বেহাগের কোমল নিষাদই ব্যবহার হয়)। বেহাগের গং শেষ হইলে বিভাগের গং “সা রে গং প পপ্ রে গ ধ...” আরম্ভ হইল, ইহাতেও নিষাদ ছিল এবং তখন উহাই শুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম। এইরূপে চারি পাঁচ খানি গং শিখিলাম এবং আমাদের ছোট একটি কনসার্ট পার্টি হইল। সে-সময়ে এখানে আউথ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে নূতন খোলা হয়। সিকরোল স্টেশনে একজন বাদ্যালী (সিঙ্গেলবাবু) স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার একটি থিয়েটারের দল ছিল। সেই দলে আমরা কনসার্ট বাজাইতাম। ফুই এক বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে একজন মুসলমান ওস্তাদ (খেয়ালী) কাশীতে আসেন। মিত্র মহাশয়-তাঁহার নিকট খেয়াল শিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা অর্থাভাবে শিক্ষা করিতে পারি নাই। ওস্তাদজি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাঁশী বাজান শুনিতেন। আমরা একদিন উক্ত বেহাগের গং বাজাইতেছিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিলেন। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি অস্থায়ী অন্তরাতে স্বরের প্রভেদ বলিলেন। কোমল নিষাদ সব বেহাগে লাগে না; বেহাগ শুদ্ধ রাগ; বেহাগড়া, বেহাগ ষাষাজ, অরুণ বেহাগ প্রভৃতি মিশ্র বেহাগ; তিনি আরও কত কি বলিলেন। তখন আমরা সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না। তাঁহার কথাগুলি শুনিলাম, কিন্তু কোন কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। আর একদিন আমরা বিভাগের গং বাজাইতেছিলাম এবং কেহ কেহ গানের বোল মুখেও পড়িতেছিল। তিনি শুনিয়া তোবা তোবা বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, চারটি বোল, অর্থাৎ সারে, মরে, গধা, ধসা,” বাদ দিয়া তবে সর গ ম তৈয়ারী করা কর্তব্য; কারণ এই কথাগুলি চলিত হিন্দীভাষায় অত্যন্ত শ্রুতিকটু। ক্রমশঃ স্বরের একটু ব্যবহার, বিচার এবং বোধ করিতে লাগিলাম। শানাই, বাঁশী কিছুদিন বাজাইয়াছিলাম। ক্রমে গান শিখিতে ইচ্ছা হইল, বাঁশী ছাড়িয়া দিলাম।

ঐ সময়ে কাশীধামের দীঘাপতিয়ার রাজবাটীতে

গায়ক বাদকদিগের সমাবেশ হইয়াছিল। তখন “মহাসম্মেলন” বলিয়া কেহ কিছু জানিত না। দীঘাপতিয়ার রাজা বোধ হয় গুণীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (হুলো গোপাল), তাঁহার ওস্তাদ স্বর্গীয় গোপাল-প্রসাদ মিশ্র; পশ্চিম প্রদেশ হইতে বন্দে আলি খাঁ বীণকার; কাশীধামের মহেশচন্দ্র সরকার, চিত্তামণি বাপুসী, রামদাস গোস্বামী প্রভৃতি গুণীগণ উপস্থিত ছিলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত মুদঙ্গী, গণেশ সিংহ মুদঙ্গী এবং আরও অনেক গুণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বন্দে আলি খাঁ বীণা বাজাইয়াছিলেন এবং গণেশ সিংহ মুদঙ্গী বাজাইয়াছিলেন। তখন বিশেষ করিয়া কিছুই বুঝিবার শক্তি ছিল না। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহার কি করিয়া গিয়াছেন। বীণাযন্ত্রের স্বর মিলাইবার প্রথা যাহা দেখিয়াছি তাহা এক্ষণে দেখা যায় না। কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর মিলন করেন না। তিনি এক-একটি তার মিলাইয়া সেই তার ধরিয়া বীণাযন্ত্রটি তুলিয়া ধরিতেন। যদি তারটি নরম (বেহুয়া) না হইত তবে সে তার রাখিতেন, নচেৎ অল্প তার চড়াইতেন। এই প্রথম প্রকরণ। সমস্ত তার এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চড়াইতেন; পরে একটি বন্ধার দিতেন। সব তারের স্বর মিলিত হইয়া একটি স্বর (ধনি) যতক্ষণ পর্যন্ত বাহির না হইত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বর মিলাইতেন। ইহা দ্বিতীয় প্রকরণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইহা দেখিয়াছি এবং পঞ্চাশ বৎসর পরে অতি অল্পদিন হইল কাশাতে গৌরীপুর রাজার বাড়ীতে যখন ঋগ ও ঐরূপ স্বর মিলাইবার পদ্ধতি দেখিয়াছি। বন্দে আলি খাঁ সরস্বতীর স্তব ও প্রণামান্তে বীণা ঘাড়ে করিলেন এবং চারি প্রকার রীতি অল্পসারে আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পরণ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং গণেশ সিংহ মুদঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। ইহার পরে গায়কদিগের ঋপদ গান হইয়াছিল। গোপাল-বাবু প্রথমে গান করেন এবং গণেশ সিংহ মুদঙ্গী বাজান। পরে রামদাসবাবু গান করেন এবং কাশীনাথ পণ্ডিত মুদঙ্গী বাজান। ঋপদ গান তখন বুঝি না, কেবল নানারূপ ভঙ্গী এবং

কম্পনযুক্ত স্বর শুনিলাম। মনে মনে কিন্তু আনন্দ পাইলাম। ছেলেছোকরাদের মধ্যে আমাদের দল ছাড়া অন্য সকলে কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল, কেহ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। গোপাল-বাবু “চরণ মেরে মাথে” কল্যাণেব ঞ্চপদ গান করিয়াছিলেন। রামদাস-বাবু “গোরা গণেশ” কল্যাণের ঞ্চপদ গান করিয়াছিলেন। গোপাল-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কি কেদামতী (প্রাচীন কালের) চিত্র?” মহেশ-বাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “কল্যাণের সনদী ঞ্চপদ দুই চারিটিই আছে।” বন্দে আলী খাঁ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কল্যাণ কা মো চার হী ঞ্চপদ সনদী, অওর সব রামানন্দী।” খাঁ সাহেব একটু কারণ করিতেন; তিনি হাসিতে হাসিতে “হাদিয়ে আঞ্জা” গান করিতে লাগিলেন এবং বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আমি এই প্রথম বীণার সঙ্গে গান শুনিলাম; এবং পরেও একবার কাসিম আলী খাঁর গান বীণার সহিত শুনিয়াছি; আর তৃতীয় বার শুনি নাই। ৫০বৎসরে কি ভীষণ পরিবর্তন? এখনকার বীণাতে গং বাজান হইয়া থাকে এবং তার পরণ স্থানে ঠুংরী বাজান হইয়া থাকে।

গান শিখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল; কিন্তু বলিবার সাহস নাই, কারণ স্থলে পড়ি।

কিছুদিন পরে পুনরায় কাশীধামের মদনপুরায় স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী রায় বাহাদুর মহাশয়ের বাড়ীতে তত্ত্বকারদিগের সম্মেলন হইয়াছিল। বন্দে আলী খাঁ, সাদিক আলি খাঁ (উভয়েই বীণাকার); বাজু পাই সেতারী, অহম্মদ খাঁ সেতারী; স্থানীয় তত্ত্বকারদিগের মধ্যে মহেশবাবু (বীণাকার), নকুড়-বাবু, মাণিক-বাবু (উভয়েই সেতারী); ইহার সকলে নিজ নিজ যন্ত্র লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায়ীরাই আপন আপন বাদ্যযন্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই ৪৫ বৎসর পূর্বে গুণিগণ কাশীতে আসিলেই ধনী এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিবা গুণিগণের বিচার পরিচয় লইবার নিমিত্ত ঐরূপে সকলকে আহ্বান ও সন্মান করিতেন। কেবল যে গুণের পরিচয় হইত

তাহা নহে, গুণগাতা গুরুদিগেরও পরিচয় এবং গুণের বিচার হইত। সাধনার দ্বারা গুরুদত্ত জব্য কতদূর কাহার লক্ষ হইয়াছে তাহারও পরিচয় প্রকাশ হইত। সকলে সভাস্থ হইলে কে অগ্রে যন্ত্র হাতে করিবেন ইহার নিমিত্ত পরস্পরের মধ্যে অমুরোধের আদান-প্রদান হইতে আরম্ভ হইল। আজকাল দেখা যায় যে, গৃহস্থায়ী তাঁহার মনোমত লোককেই আগে বাজাইতে বা গান করিতে বলেন। তখন লঘু গুরুজ্ঞান এবং বিচার করা কর্তব্যবোধে কেহই আগ্রে যন্ত্র হাতে লইতে সাহস করেন নাই। অবশেষে বন্দে আলী খাঁ কাশীর বৃদ্ধ বাজুপেয়ী মহাশয়কে আগে বাজাইতে অমুরোধ করিলেন। তিনি সেতার হাতে করিলেন এবং গণেশ সিং জী যুদ্ধে বাজাইলেন। বাজুপেয়ী জী ধর্ম্মভক্তি লোক ছিলেন এবং তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার সেতার বড় দেখাইত। যখন বাম হস্তের সাহায্যে আলাপ করিতে লাগিলেন তখন বড়ই মধুর শুনাইয়াছিল। মীড়গুলি মর্ম্মভেদী এবং চিন্তাকর্ষক ছিল বলিয়া বন্দে আলী খাঁ বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রীতিমত আলাপ অর্থাৎ স্থায়ী আরোহী অবরোহী এবং সঞ্চারী এই চারি-বর্ণের আলাপ করিয়া তিনি পরণ বাজাইতে লাগিলেন; সেই সময়ে গণেশ সিং জীও যুদ্ধে ঐ পরণ বাজাইলেন। আজকালকার মত যেমন যুদ্ধ বাজান হইয়া থাকে তেমন নহে। আধুনিক যুদ্ধরীরা কথায় কথায় তেহাই দিয়া থাকে, গায়কের মধ্যেও কেহ কেহ তেহাই দিয়া গান শেষ করিয়া থাকেন দেখা যায়। সে সময়ে নিয়ম ভিন্ন ছিল। যে বোল পরণ বীণাতে বাজান হয় সেই বোল পরণ যুদ্ধেও বাজান হয়; তাহা ছাড়া পরণেরও হিসাব আছে, অর্থাৎ সম্ কি তিন, সম্ কি ছয়, নও সম্ কি, সম্ কি বারহ। উপরন্তু আর একটি তেহাই আছে, তাহার নাম “বেমনকা”; ইহার উদ্দেশ্য যে শুনিলেই গায়ক গান অথবা তাল ভুলিয়া যাইবেন। তখন এইসমস্ত গুণ ও বিচার পরিচয় দেওয়া ও লওয়া হইত। বাজুপেয়ী জী সেতারে বাজাইলেন কিন্তু বীণার সমস্ত কাজই সেতারে দেখাইলেন; এই নিমিত্তই বন্দে আলি খাঁ অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন এবং বাজনা শেষ হইলে বাজুপেয়ীজীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা এইরূপে

কাটিয়া বাধায় সেদিন আর কাহারও কিছু হইল না। পব দিন বন্ধে আলী খাঁর বীণা এবং অন্যান্য গুণীদিগের সেতার বাজনা হইয়াছিল, খাঁ সাহেবের বাজনার কথা আর কি বলিব? সে স্বাক্ষর। যিনি স্তম্ভিত হইলেন, তিনি ধন্য; এক্ষণে আর সেরূপ বীণাবাদন শুনা যায় না। তিনি বীণার আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং গণেশ সিং জী মুদঙ্গ-বাজাইলেন। পূর্বেদিবস অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক সঙ্গীত হইল; নানারূপ ছন্দ ও বাদ্যকৌশল উভয়েই দেখাইলেন। পূর্বে দিবস চৌতালের তারপর রাঙ্গান হইয়াছিল; এদিন রূপাল, স্বরফাঁকতাল চৌতালের মধ্যে সমাবিষ্ট করিয়া তারপর বাজান হইয়াছিল। গণেশ সিং জী অবলীলাক্রমে সংগত করিয়া খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। খাঁ সাহেবও তাঁহার খুব প্রশংসা করিলেন। দুই ঘণ্টার পর সাদিক আলী খাঁর বীণা ও সেতার এবং অন্যান্য গুণীদিগের গান হইয়াছিল।

(২)

কাশীধামে মহেশচন্দ্র সরকার নামে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় বীণকার ছিলেন, ইনি বীণাশিক্ষা-ব্যাপারে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, একজন কারিকর বীণাযন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য মাসিক ৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিল। সে আদ্য ৪০ বৎসরের কথা। বহুদূর দেশান্তর (চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান) হইতে বংশ ও কাঠ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন এবং মনোমত বীণা প্রস্তুত না হইলে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। তিনি ছয়টি বীণা ছয় রকমের প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমটি লাউ, দ্বিতীয় বেতচন্দন, তৃতীয় গাঙ্গার, চতুর্থ পিত্তল, পঞ্চম তাম্র, এবং ষষ্ঠ মিশ্র অর্থাৎ ফল কাঠ এবং ধাতু মিশ্রিত। কেবল ইহাই নহে; প্রত্যেক বীণার শয্যা এবং তৎপার্শ্বে রংগের ধ্যান লিখিত পালঙ্ক। প্রাতর্মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যাহ্ন এবং প্রথম রাত্রি, মধ্যরাত্রি ও শেষ রাত্রি—এই ছয়কালে তিনি ঐ ছয়টি বীণার পূজা করিতেন এবং ধ্যানস্তুতি করিয়া বীণা বাজাইতেন। কোন শ্রোতা সমদ্ব্যাসারে তাঁহার নিবট আসনে তিনি সেই সময়ের

বীণাই বাজাইতেন এবং অঙ্গুলি দর্শন করাইতেন ও শাস্ত্রীয় প্রথায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী বুঝাইয়া দিতেন।

সরকার মহাশয়ের নিকট ব্যবসায়ী তত্ত্বকারেরা প্রায় আসিতেন। তন্মধ্যে আমরা বাঁহাদিগকে দেখিয়াছি তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ করিতেছি। বড় প্যার খাঁ, সাদিক আলী খাঁ, ছোট প্যার খাঁ, নিসার আলি খাঁ, এই কয়েকজনই তত্ত্বকার। নিসার আলি খাঁ স্বর শৃঙ্খার (রবাব) বাজাইতেন; ইনি কাশিম আলি খাঁর সহোদর ভাই ছিলেন। পঞ্চকোট অন্তর্গত কাশীপুর্ব রাজবাটীতে কাশিম আলী থাকিতেন, পরে আগরতলা রাজবাটীতে ছিলেন। বিখ্যাত রবাবী বাসদ খাঁর বংশধর ইহার ছিলেন এবং ইহার সাক্ষাৎ এখন লোকান্তরপ্রাপ্ত। নিসার আলী খাঁ সরকার মহাশয়ের বাটীতে ঘন ঘন আসিতে পারিতেন না, কারণ তিনি সহরের একপ্রান্তে থাকিতেন। প্যার খাঁ, সাদিক আলী খাঁ প্রত্যহই আসিতেন এবং সরকার মহাশয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে তালিম পাইতেন। সরকার মহাশয় প্রথমে বাজপেয়াজীর নিকট বীণা শিক্ষা করেন, পরে সাদিক আলি খাঁর নিকট হইতে বীণার হস্ত এবং অঙ্গুলির ব্যবহার শিক্ষা করেন। এই তত্ত্বকারদিগের প্রদত্ত কতকগুলি সরগম বাহা সরকার মহাশয় আমাদেরকে শিখাইয়াছিলেন তাহা অন্তত পুস্তকে দিয়াছি। পান্নালাল নামে একজন জৈন ব্রাহ্মণ উক্ত নিসার আলী খাঁর নিকট স্বরশৃঙ্খার শিক্ষা করিয়াছিলেন। পান্নালাল বড়ই উৎকৃষ্ট বাজাইতেন ও প্রদগদগদ করিতে পারিতেন। সেই সময়ে কাশীতে অর্জুনজী বৈষ্ণব ছিলেন; ইনিও সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার রবাব শিখিবার ইচ্ছা হইলে নিসার আলি খাঁর নিকট প্রার্থনা করায় খাঁ সাহেব প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। বৈষ্ণবজী তীক্ষ্ণ-মস্তকবিশিষ্ট ছিলেন। যেখানে খাঁ সাহেবের বাজনা হইত বৈষ্ণবজী লুকাইয়া তাহা শুনিতেন এবং বাড়ী আসিয়া সেইগুলি নকল করিয়া বাহির করিতেন।

কোন সময়ে এক মজলসে খাঁ সাহেব সেতার বাজাইয়াছিলেন। তাঁহার বাজনা শেষ হইলে অন্যান্য গুণীদিগেরও সেতার বাজনা হইয়াছিল; পরে বৈষ্ণবজীকে কেহ কেহ সেতার বাজাইতে অনুরোধ করায় তিনি যে

সকল গং লুকাইয়া শয়্যাগাইলেন সেইগুলি বাসাইলেন ।
 খাঁ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যাব্বিত ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন “এ গং কোথায় পাইলে ?” বৈদ্যাজী
 উত্তবে বলিলেন, “আপনারই নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি ।”
 খাঁ সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে শিখাইবেন
 বলিয়া তাঁহাব বাটীতে বাইতে বলিলেন । গুরুশিষ্য
 এইরূপ কিছু কাল সাধনা করিতে লাগিলেন । অজ্ঞানজী
 কবিরাজী করিতেন এবং অবসর মত রাজিতে সুরশৃঙ্গার
 বাজাইতেন । পান্নালাস ব্যবসায়ী বলিয়া দিব্যরাত্র
 পরিভ্রম করিতে পারিয়াছিলেন এবং ভাল বাজাইতেন ।
 অনেকের ধারণা যে, মুসলমান ওস্তাদগণ সহজে কাহাবেও
 শিখাইতে চাহে না, কিন্তু আমরা বৈদ্যাজীর মুখে উক্তবিষয়
 শুনিয়াছি । অগ্রান্ত লোকের মুখেও ঐরূপ শিক্ষার কথা
 শুনিয়াছি । আমার ধারণা, শিষ্য উপযুক্ত হইলে গুরু
 শিক্ষা না দিয়া থাকিতেই পারেন না । সময়ে সময়ে ইহার
 ব্যতিক্রমও দেখা যায়, অর্থাৎ শিষ্য মনে করিয়া থাকেন যে,
 “আমি শীঘ্র শীঘ্র গুরুর নিকট সমস্তই শিখিয়া লইব,”
 কিন্তু সাধনার কথা উপস্থিত হইলেই গুরুশিষ্যে মনান্তর
 উপস্থিত হয় । অপর পক্ষে কোথাও কোথাও দেখা যায়
 যে, গুরু শিষ্যকে হাতে রাখিয়া শিক্ষা দেন এবং পাছে শিষ্য
 তাঁহার সমস্ত বিদ্যা শিখিয়া লন এই নিমিত্ত শিষ্যকে
 অগ্রসর হইতে দেন না । শিষ্য শিক্ষা শীঘ্র সম্পূর্ণ করিতে
 ইচ্ছা করিলেও তিনি জানেন না যে, গুরু কিরূপে ও কত
 কালে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছেন । কাজেই গুরু শিষ্যকে

উপযুক্ত পরিভ্রম করাইয়া পাকা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা
 করেন । সময়ের গুণে শিষ্য অধীর হইয়া পড়েন বলিয়া
 গুরুর মত হইতে পারেন না, আমার এইরূপ ধারণা ।

এই সময়ে কাশীতে বিশেষরূপ মুখোপাধ্যায় নামে
 একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি কাশীবাসের নিমিত্ত পশ্চিম প্রদেশ
 হইতে আসেন । ইনি ছোট মিঞার (হাঙ্গ খাঁ) শিষ্য ।
 হঙ্গু খাঁ, হাঙ্গু খাঁ বিখ্যাত খেয়ালী ছিলেন । বাঙ্গালী-
 টোলার সে-সময়ে আনন্দচন্দ্র সেন নামে একজন মুদকী
 থাকিতেন ; তাঁহার বাড়ীতে প্রতি বুধবারে গানবাজনা
 হইত । তখন আমি গান শিক্ষা করি নাই বটে, কিন্তু
 শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা খুবই প্রবল ছিল । মুখোপাধ্যায়
 মহাশয়ের খেয়াল শুনিয়া মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, কিন্তু
 শিখিবার বাসনা পূর্ণ হইল না ; সপ্তাহকাল মধ্যেই বৃদ্ধ-
 ইহধাম ত্যাগ করিলেন । আজকাল অনেকেই, খেয়াল
 গান করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহা পদ্ধতি-সম্মত তান তাহা
 দেন না, অথবা সেরূপ তানের সঙ্গে সংশ্রব রাখেন না ।
 খেয়ালে কেবল তান,—রকম রকম তান ও রকম রকম
 ছন্দ হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন লয়ে ভিন্ন ভিন্ন তান
 অর্থাৎ দুই তালের এক রকম তান, তিন তালের একরকম
 তান, সম হইতে গম পর্য্যন্ত একরকম তান ; এইরূপ
 ভিন্ন ভিন্ন রকমের তান । রাগ বজায় রাখিয়া তাঁহাটাই
 গান করিয়া গিয়াছেন । এখন আর সেরূপ শুনা যায় না,
 হয়ত ঘাইবেও না ।

(ক্রমশঃ)

গ্রামের মেয়ে

(চিত্র)

শ্রী হেমমালা বসু

এবারের ছুটিতে কোথায় যাওয়া হইবে, এই
 আলোচনার আরম্ভ হইতেই আমি ছেলের বলিলাম,
 ‘চল, আমার জন্মভূমি দেখে আসবে ; কত বৎসর অতীত
 হ’য়ে গেছে, বাবা মা’র মৃত্যুর পরে আমি আর সেখানে

বাইনি । ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আমাদের জীবনের কত
 পরিবর্তন হয়েছে ।’

খুড়তুত ভাই ময়ূকে ডাকিয়া মনের ইচ্ছা জানাইলাম ;
 আমি দেশে বাইব শুনিয়া সে খুসী হইল ও তাহার জীকে

পিঞ্জালয় হইতে আনিয়া আমাদের সঙ্গে সেই গ্রামে পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে চাহিল। শুনিলাম, দেশের বাড়ীতে কাকীমারা ছেলেদের লইয়া রহিয়াছেন, আমি সেখানে গেলে পরে পিসীমাও দেখা করিতে আসিবেন; শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইল, কত কাল পরে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! তাহাকে বলিলাম, ‘শুভস্র শীঘ্রম্—আজকের ট্রেনেই যাই চল; তা’ হ’লে কালই সেখানে গিয়ে পৌঁছিতে পারব।’

ট্রেন হইতে পাকী, পাকী হইতে ঈমার, ঈমার হইতে নৌকা এমনি করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে দেশের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেলা অবসান হইয়া আসিল; এমন স্থলর সন্ধ্যা যেন আর কোথাও দেখি নাই, সন্ধ্যার স্নান্দ সৌন্দর্য্য আমার মনকে এমন করিয়া আর কখনও অভিভূত করে নাই! এই সময়ে নৌকাখানি খাল ছাড়িয়া ইছামতী নদীতে আসিয়া পড়িল।

নৌকাখানা নদী ছাড়িয়া আবার খালে পড়িতেই মন্থ বলিয়া উঠিল, ‘আর বেশী দেবী নেই দিদি, এইবারে এসে পড়েছি! আমাদের গায়েব গাছগুলি ওই যে দেখা যাচ্ছে, চেয়ে দেখুন!’

‘আর বেশী দেবী নেই’—একথা তো আমি বিকাল হইতেই শুনিতেছি, তবে এবারে গ্রামের গাছগুলি দেখা যাইতেছে, এই একটু ভরসা! ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া চাহিলাম, কিছুই তো দেখিতে পাইলাম না। আকাশ আধার করিয়া মেঘেরা জমাট বাধিয়া রহিয়াছে, এ যে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি আসিতেছে! মাঝীরা তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিতে লাগিল, যদি আমাদের ইহার পূর্বে বাড়ী পৌঁছিয়া দিতে পারে। ঝড়ের আগে বাতাস ‘শুম’ হইয়া রহিয়াছে! দুই ধারে বন, তার মাঝখানে এই সরু খাল আর কি ভীষণ অন্ধকার! আমাদের নৌকাতে যা একটি আলো জ্বলিতেছে, দূরে কচিং কোথাও গৃহস্থ-বাড়ীর আলো দেখিলেই সেই দিকে চাহিয়া থাকি, আর ভাবি এইটি যদি আমাদের বাড়ী হইত!

একটু পরেই ঝড় আরম্ভ হইল, খালের একধারে কয়েকখানা বাড়ীও এসময়ে দেখা গেল; মন্থ বলিল, ‘দিদি, এইসব আমাদের প্রজাদের বাড়ী, দেখুন!’ কি

দেখিব, ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া শুধু একটুখানি আলো দেখা যায়, আর কিছুই নয়। বনের ভিতর তখন ঝড়ের হাওয়া সোঁ সোঁ করিয়া বাহিতেছিল, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টপ-টপ করিয়া নৌকার ছাদের উপরে পড়িতে লাগিল। মন্থ নৌকা ভিড়াইতে মাঝিকে আদেশ করিয়া আমাকে বলিল, ‘দিদি, এইবারে এসেছি!’

তাহার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, এইবারে এসেছি! কে জানে কত যুগ আগে পৃথিবীর এইখানেই প্রথমে আমি আসিয়াছিলাম। হলুধানি শস্যধানির সহিত আমার রোদন-ধ্বনি মিশিয়া এই স্থানেরই আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়াছিল। আমাকে দেখবার আগ্রহে, সেদিন প্রাতিবোধিনীরা রাজি-শেষের নিদ্রাস্থ অগ্রাহ্য করিয়া জন্তু পদে পল্লী-পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল; আজও তো সেই আমি কত কাল পরে আসিয়াছি, এই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আজ কি কেহই আমাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিলে না!

নৌকা বাঁধা হইলে মন্থ ভৃত্য ও মাঝিদিগের মাধ্যম বাস্তব বিছানা চাপাইয়া, হারিকেন্টি তাহাদের হাতে দিয়া বলিল, ‘বড় বাড়ী, পাড়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া যাইও। জিনিসগুলি রাখিয়া দুইটি আলো লইয়া শীঘ্র আসিও, তোমরা আসিলে পরে আমরা যাইব।’ তাহারা বনের ভিতরে অদৃশ হইলে, দ্বিতীয় মাঝি একটি কেরোসিনের ‘ডিবা’ বাহির করিয়া তাহাই জ্বালাইয়া সেই ভীষণ আধার দূর করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এই অগ্নিশিখাটি আলো যতটা দিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া আমাদের মুখে চোখে ধোঁয়া দিল তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী।

খানিক পরেই প্রবল বৃষ্টি ও ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল; মেঘের গর্জন, বাতাসের তর্জন, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতন, এ সব তো হইলই, ঘূর্ণী-ঝড়ে খালের ধারের পাছে পাছে যেন লড়াই বাধিয়া গেল। কেরোসিনের আলোটির ক্ষুদ্র প্রাণ ঝড়ো হাওয়ার একটি ‘ঝাপটা’তেই নির্ঝগপ্রাপ্ত হইল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়-বৃষ্টি কমিলে ভৃত্যদের দর্শন পাওয়া গেল; কাকীমা রান্না চাপাইয়া দিয়াছেন শুনিয়া ক্ষুধার্তগণ আশ্বস্ত হইয়া নৌকা ছাড়িয়া উঠিল; আমরা

এইবারে বাড়ী চলিলাম। সেই বনের পরেই একটি শুষ্ক খাল, তার ভিতরে আবার একটুখানি জলও দেখা যাইতেছে; পাহাড়ের মত ওঠা-নামা করিয়া অতি সাবধানে সেটি পার হইয়া মাঠে গিয়া পড়িলাম। উচু নীচু বন-পথ, মাঝে মাঝে জলপথ পার হইতে হইতে কত পথই যে চলিলাম একটি বড় পুকুরের পার দিয়া যাইতে যাইতে পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলাম, গায়ে কিছু একটুও লাগিল না। এমনি করিয়া ক্রমে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম।

কলিকাতা হইতে কতকগুলি সৰু স্তার 'ফ্রেটবল' ও কুর্সীর কাঁটা আনিয়াছিলাম; এখানে তো লেখাপড়া হইবে না, আমার ঠাকুর-ঘরের দরজার অন্ত একটা লেসের পরমা প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে ছিল। সকাল-বেলা পুকুর-পাড়ে বসিয়া লেশ বুন আর পাপিয়ার পিউ পিউ, বউ কথা কও, কোকিলের কুহুধ্বনি কান পাতিয়া শুনি। আমার সেই লেশ পল্লীবালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; স্ত্রী ও কুর্সীর কাঁটা হাতে করিয়া কয়েকটি মেয়ে আসিয়া উহা শিখিতে চাহিল। তাহাদিগকে শিল্প শিক্ষা দিতে দিতে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে দেখিবার মত কি কি জিনিষ আছে, বল তো?' শুধু এই পল্লীটির শাস্ত সৌন্দর্য আর লতা, পাতা, ফুল, পাখী দেখেই কি আমি চ'লে যাব?'

একটি বালিকা বলিল, "নিষ্কেশ্বরী কালী বাড়ী দেখবেন চলুন।" "সেখানে পিসীমা এলে পরে যাব। আর দেখবার কি কিছুই নেই?" "ভিন্ গায়ে আরও অনেক ঠাকুর-বাড়ী আছে।"

একটি চতুরা মেয়ে বলিল, "জন্মভূমি দেখতে এসেছেন, চোখ ভ'রে তাই দেখে যান; এর চেয়ে দেখবার জিনিস আর কি আছে বলুন।"

হাসিয়া বলিলাম, "তা ঠিক। দেখ, এখানে ব'সে ব'সে আমি ওপাড়ার বউদের রোজই দেখি, পুকুর থেকে জল তুলে কি বাসন মেজে নিয়ে যায়, একেবারে কলাবউটির মত সাত হাত ঘোমটা টেনে! আমায় দেখে অমন করে না তো?"

"না, ঘোমটার 'বহর' কম হ'লে মুখ দেখা যাবে যে;

তা হ'লে এখানে নিশ্চয় হয়। এ গায়ে আবার এমন বউও আছে যে নিশ্চয় ভয় করে না; তার সঙ্গে ঝগড়া কি মারামারিতে এখানকার পুরুষেরাও পারে না! তা'কে আপনি দেখবেন?"

"নিশ্চয় দেখব! আমি সব দেখতে-শুনতেই ভো এসেছি; কে সে?"

"সে বাতাসীর মা; সিংপাড়ার গোরাচাঁদের বউ। আপনি এসেছেন শুনে পেলে সেই আপনাকে দেখতে আসবে। ঘাসের মত রায়-বাবুর দাড়ী উপড়ে দিয়েছে সে, এত সাহস তার! তার পর থেকে এ গায়ে সবাই তাকে ভয় ক'রে চলে।"

অবাক হইয়া শুনিলাম, এমন বীরদমনা বাঘালীর ঘরেও আছে! এ দেশে এমন নারীর সংখ্যা যত বাড়তে ততই ভাল; নর-হন্তে নারী-নির্যাতনের কথা তাহা হইলে আর শুনিতে হইবে না, ইহার বিপরীত ঘটনাই না হয় ঘটবে। একরূপ সাহসী ও শক্তিশালিনী নারী নিশ্চয়ই নারী সমাজের স্বপ্ন, বঙ্গমাতার কণ্ঠহারের রত্ন!

"বাতাসীর মাকে আজই আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলো, বুরুলে?" আগ্রহ-ভরে এই কথা বলিয়া বাড়ী চলিলাম।

বিকাল-বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়া আছি, পাশের ঘরে তখন খুব ভাস খেলা চলিতেছে; পিসীমা কখন উঠিয়া গিয়াছেন, জানি না। তিনি হয় ত তখন কান্ধনদী প্রস্তুত করিতেছেন, কিংবা মল্ল আঙ্গ কলিকাতা রওনা হইবে বলিয়া তাহার পথের খাবার গুছাইয়া দিতেছেন। আলস্য কাহাকে বলে ইহারা তাহা জানেন না। আমার খুড়তুতো খোন সৰু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাতাসীর মা এসেছে, দিদি।"

ফিরিয়া নবাগতের দিকে চাহিলাম, এই বুঝি সেই বাতাসীর মা! যেমন শুনিয়াছি, ইহাকে দেখিয়া ত 'তেমনই' বলিয়া বোধ হইতেছে না। এই হস্তময়ী নারীর মুখে তেজ কি গর্কের ছায়া ত আমি দেখিতে পাইলাম না। উহার কোমল হাত দুইখানা যে শক্তিতে

পুরুষদিগকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল না।

সকল মাদুর বিছাইয়া দিলে সে বসিয়া বলিল, “আপনি এত কাল পরে দেশে এসেছেন দিদিঠাকুরন, আপনাকে এখানকার কেউ এখন আর চিন্তেও পারবে না। আমারই মনে পড়ে না—দেই যখন ঠাকুরঝির সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে ওবাড়ীতে যেতেন, তখন আপনাকে দেখিছি, আর এই দেখলুম। অন্নপূর্ণাকে আপনার কি এখন মনে পড়ে, ছেলে-বেলায় কত খেলা কবেছেন তার সঙ্গে। আমি তার বড় ভাজ।”

তখন অন্নপূর্ণা ও তাহার ছেলেমেয়ের কথা, কত কথা হইল। ‘বীরভৈরব’ কথা উঠিতেই সে হাসিয়া বলিল, “আপনি এরি মধ্যে সবই শুনেছেন দেখছি। বেলা গেছে, আজ বাড়ী যাই; আর একদিন এসে আপনাকে এদেশের কথা বুঝিয়ে হুজিয়ে বলব।”

বাতাসী তখন আমার মেয়ে টুহুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল, সে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ী চলিল। আমি জানালার ধারে বসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ক্রমে মা ও মেয়ে বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রোগে পড়িয়া শরীর বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; সারাদিন চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া পানীয় গান শুনি, আর কত কথা ভাবি। দেশের কবিরাজের গুণেই আমার ছুরারোগ্য রোগ সারিয়া আসিতেছে। দুর্বলতার ভিতরেও এই রোগমুক্তির আনন্দ সর্বক্ষণ আমার সারা দেহ-মন ঘিরিয়া থাকে; আমার দেশ! কত বড় দান তুমি আমাকে দিলে, আর আমি কি তোমাকে কিছুই দিতে পারিব না? ভাবিতে ভাবিতে মনের আবেগে কবিতা লিখিতে লাগিলাম।

“ওকি, অল্প করেছে, তবু শুয়ে-শুয়েই যে লিখছেন, বড় দরকারী বুঝি?” এই প্রশ্নে সচকিতা হইয়া দেখিলাম, মেয়েরা লেশ ও সূতা হাতে করিয়া আসিয়াছে। হাসিয়া খাতা বন্ধ করিয়া বিছানার পাশে রাখিলাম। মেয়েটির কেতুহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না, সে জিজ্ঞাসা করিল, “ও’তে কি লিখছিলেন আপনি?”

“ও কিছু নয়।”

“দেখব” বলিয়া সে খাতা খানার পাতা উন্টাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “ও মা, আপনি কবিতা লিখছিলেন! দেখুন, এখানেও একটি কবি আছে; সে লিখতে পারে না, কিন্তু এমন কথায় কথায় ‘ছড়া’ কাটে যে, শুনুলে অবাক হ’য়ে যাবেন। আমার তাকে ‘কবি চণ্ডীদাস’ ব’লে ডাকি। অল্পথ সেবে গেলে আপনাকে একদিন তার বাড়ীতে নিয়ে যাব।”

আব-একটি মেয়ে বলিল, “খাম! সে হ’ল ছোট লোক, যুগী, তার বাড়ী উনি কক্ষনো যাবেন না।”

প্রথমা বলিয়া উঠিল, “মহাত্মা গান্ধী ‘বুঝি যুগী’ জ্বোলানের ঘোড়া করতে তোকে ব’লে গেছেন? তিনি কি বলেননি যে, যাদের আমরা ছোট লোক ভাবি, তারা কেউ ছোট লোক নয়, তাদের হাতের জলও খেতে পারা যায়? তুই চুপ কর ত, তোকে কেউ কথা বলতে ডাকেনি।”

দ্বিতীয়া নীরব রহিল দেখিয়া আমি বলিলাম, “তোমাদের কবিতার কি নাম? আজ তার কবিত্বের পরিচয়টাই কেন দাও না, কবিতা শুনতে আমি খুব ভালোবাসি। কোথা থাকে সে?”

উৎসাহের সহিত উত্তর হইল, “আপনাদের বাড়ীর পেছনের পুকুরের ওপাড়ে যুগীপাড়া; চণ্ডী এখানেই থাকে, সে ম’হেশ যুগীর বউ। ‘ছোট’ জাত হ’লেও ওরা লোক খুব ভালো; আমাদের সেমিজের জুড়ে রঙীন কাপড়, ব্লাউজপিস বললে পরেই বুনে দেয়। আর এমন চমৎকার নীলাস্বরী, দাঁতপাড় তাঁতের সাড়ী সব বোনে যে, দেখলেই বিনুতে ইচ্ছে করে। স্বদেশী হ’য়ে ওদেব খুব ভাল হয়েছে।”

গবীরের উন্নতির কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল; মেয়েটির হাতখানা ধরিয়া বলিলাম, “আমার যদি অল্পথ না থাকত, তবে আজই সেখানে যেতাম; তিন চার দিন পরেই বোধ হচ্ছে যেতে পারব, এখন শুধু কানে শুনেই স্বপ্নী হই। তোমাদের চণ্ডী কবির ছ’একটা ছড়া-টড়া ব’ল না, শুনি; মনে আছে ত?”

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, “আছে বই কি, শুনুন!

একদিন আমি রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকুচ্ছিলুম, চণ্ডী ঐ দিক দিয়ে কোথা যাচ্ছিল, আমার বললে, “এই ‘খর’ রোদে দাঁড়িয়ে কি করছ গো মেয়ে ?” আমি বললুম, ‘যা করছি, তা ত দেখতেই পাচ্ছিস। হ্যারে চণ্ডী, তাকে কখনো এ কাজ করতে হ’লি, না ? মাথায় যে ক’গাছি ‘কেশ’ ভগবান দিয়েছেন, সে ত আপনিই শুকিয়ে যাব—’ সে অমনি হাত মুখ নেড়ে বললে কি জানেন—

‘আমার ছিল কেশের রাশি—উকুনে খেয়েছে,

দেখেছে সব পাড়া-পড়নী, যারা মাথা চেয়েছে ;

চাঁদ চাইলে কাঁধ পেয়েছে, শু’লে পেয়েছে পাটা,

ঝেড়ে ঝুড়ে বেঁধেছি বেই—এইটুকুই ঝুটি।’

আমাকে শুধু নয়, সবার সঙ্গেই সে এমনি ক’রে কথা বলে ; আর একদিন আমার মা চণ্ডীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘অমন হন হন ক’রে কোথা যাচ্ছিস চণ্ডী, দাঁড়া না একটু। তোর বউমার শুনলুম সেদিন ব্যাথা উঠেছিল, কি ছেলে হ’ল ? গাইটা ছাগীটিও না কি তোর বিইয়েছে, সত্যি নাকি ?’

চণ্ডী হেসে বললে, ‘সব সত্যি, বউঠাকুরা—

ছাগীটির পাটা, বউমার বেটা,

আর ‘লালীর’ হয়েছে ‘বকন’,

আমি স্থখের কথা কইব কখন।’

“বেশ মজাব মাহুয ত।” আমি হাসিয়া বলিলাম, “কাল আর যাব না, পরশু তুমি আমায় ওদের বাড়ীতে নিয়ে যেও, কেমন ?”

মেয়েটি বলিল, “ওদের বাড়ী বসাই মজার ; ওর বড় ছেলে মধু কলকাতায় কাজ শেখে। অনেক দিন মধুর খবর না পেয়ে তার বউয়ের বড্ড ভাবনা হ’ল। আমাদের সঙ্গে দেখা হ’লেই বলতো, ‘কলকাতা গিয়ে আর চিঠি দেয়নি, কেমন আছে কে জানে।’ একদিন দেখলুম ওর দেওর সিধু একখানা চিঠি নিয়ে চলেছে ডাক-বাক্সে ফেলে দিতে। মধুর বউ এই চিঠি লিখেছে শুনে আমি তার হাত থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে দেখলুম, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে খামের ওপরে লেখা রয়েছে—মধু ঘোণী, জেলা কলিকাতা।

আমি সেই অদ্ভুত ঠিকানা প’ড়ে চিঠিখানা পড়বার লোভ সামলাতে পারলুম না। একটু জল দিয়ে খামখানা তখনি খুলে ফেললুম। তার ভেতরে সিধুর বইয়ের একখানা ছেঁড়া পাতায় এই ক’টি কথা লেখা ছিল—

চিঠা করিতেছি অতিসাবে আসিও।

এই বউটি তবু াঁড়িলো লিখতে শিখে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করেছিল।

আমি চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে বউটিকে বললুম, “একি তুই লিখেছিস, বউ ? মধু যেখানে থাকে সে বাড়ীর নম্বও তো দিসনি ; এ চিঠি তোর যাবে না।”

বউ কিছুতেই তা বোঝে না, বলে, “ডাকে দিনেই যাবে দিদি, তুমি চিঠিখানা ডাক-বাক্সে গে ফেলে দাও।’ আমায় হাসতে দেখে মিনতি ক’রে বললে, ‘দেখো দিদি, চিঠিখানা যেন ডাকে ফেলে দিও ; লিখতে কি জানি ছাই ; বড় ভাবনা হয়েছে মনে তার খবরটা পাবার জন্যে, তাই ওটুকু লেখা। তুমি যদি চিঠিখানা ডাকে না দিয়ে আর কোথাও ফেলবে, তবে আমার মাথা খাবে।’ আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, ‘সে চিঠি কি তুমি ডাকে দিয়েছিলে ?’

‘হ্যা ; মধু বাড়ী এসে চিঠির কথা শুনে বললে, ‘সে চিঠি-ফিট কিছু পায়নি।’ বউয়ের কি তা বিশ্বাস হয়, সে রাগ ক’রে বললে, ‘লিখলে পরে সবাই ত চিঠি পায়, আর তুমিই শুধু পেলে না ? পেয়েছ নিশ্চয় ; অবাব দাওনি কি না তাই মিছে কথা বলছ।’

একদিন বিকালে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। সদিনী আমার ছাত্রী। পাড়ার শেষ প্রান্তে ফুল-লতা-পাতা-ঘেরা একটি টিনের বাড়ী দেখাইয়া মেয়েটি বলিল, ‘এই দেখুন, চণ্ডীর বাড়ী।’ কবির উপযুক্ত বাসস্থানই বটে। এইটুকু পথ গেলেই আর কি, চণ্ডীদাসের দর্শন লাভ করিতে পারিব। গতির বেগ যথা সম্ভব বৃদ্ধি করিলাম ; কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কবিত্বের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে বোধ হয় এমনি বেগেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু একি ! ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইলাম, বাড়ীতে কে কাঁদিতেছে।

আমাব স্তব্ধ ভাব দেখিয়া মেয়েটি মুহূর্ত্তবে বুঝাইয়া

বলিল যে, মহেশ দুগী লোকটা নিতান্ত নীরস প্রকৃতির, সে কবির মর্যাদা সব সময়ে রাখিতে পারে না। তাহার সহিত বচসা হইলে চণ্ডীর ভাণ্ডে যাহা ঘটে, আজও সেইরূপ কিছু হইয়া থাকিবে। আমি নীরবে সেই বাড়ীটির পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, কবি কাদিতে কাদিতে বলিতেছে—

‘আমি যাব বাপের বাড়ী

বাপের বাড়ী গেলে পরেই পায় ধরাতে পারি;’

ওবে, ও—

আমীকে সে ইহার পরে যে-সব সন্ধান করিতে লাগিল, কবিতা হইলেও আমি তাহা শ্রবণ করা অল্পচিত মনে করিয়া, চক্ষুর তৃষা অক্ষুর রাখিয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

পথেব এপাশেই পড়িল সিংহপাড়া; আমাকে বাতাসীর মার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেয়েটি অবাক হইয়া দাঁড়াইল।

আমি তাহাকে বলিলাম, ‘তুমি বাড়ী যাও, আমি এখানে একটু বসব।’ তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরের দাণ্ডায় শীতল পাট বিছাইয়া আমাকে বসিতে বলিয়া বাতাসীর মা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিতে গেল। মেয়েটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আর কেহ তখন ছিল না, শুধু মা ও মেয়ে। বাতাসী রান্না-ঘরে কি করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিল; তাহার মা ফিরিয়া আসিলে সে তেমনি নীরবে চলিয়া গেল। বাতাসীর মা দাণ্ডার উপরে দীপ রাখিতে চাহিলে আমি নিষেধ করিলাম।

আমি বলিলাম, ‘আজ খুব বেড়িয়েছি, বাতাসীর মা। তবু তোমার বাড়ীর সামনে দিগে অগ্নি চ’লে যেতে পারলুম না, এখানেও একবার বেড়াতে এলুম।’

সে স্নান হাসিয়া বলিল, ‘আমি কখনও ভাবিনি যে, আপনি এ বাড়ীতে আসবেন। দেশে এসেই আমার নামে যে-সব নিন্দে শুনেছেন, তা’তে ক’রে—

‘তোমার নিন্দে।’ আমি ভাবিয়া বলিলাম, ‘শুনেছি বটে তুমি পুরুষদের একটু—আমি কিন্তু তা’তে নিন্দার কিছু দেখতে পাই না। ছুটকে যে দমন করে, বিশেষ

মেয়ে হ’য়ে যে একাজ করতে পারে, আমি তার প্রশংসা করি।’

বাতাসীর মা উৎসাহের সহিত বলিল, এইজন্তই ত আমার এত নিন্দে হয়, দিদি। আমি বুঝতে পারি না, এই ছুটো জাতে এত তফাত হয় কেন? যদি একটা মেয়ে না বুঝতে পেরে কোনো দোষ ক’রে ফেলে, পাড়া শুদ্ধ সবাই ছুটে আসে তা’কে শাসন করতে; পুরুষরা যে কত অজ্ঞায় করে, তা’তে কেউ কিছু বলে না, তাদের সব দোষ বেমালুম চাপা প’ড়ে যায়। বিনা দোষেও কত মেয়েকে ভুগতে দেখলুম; মহা অপরাধ ক’রেও ওরা কেমন বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। এইজন্তে ওজাতটার সঙ্গে আমার বিরোধ লেগেই রয়েছে। আমার সামনে কেউ কিছু করলে, তা তিনি গায়েব জমিদারই হোন না কেন, আমি তা’কে এমনি শাস্তি দিই, যেন কিছুদিন সে-কথা তার মনে থাকে। ছুটদের দমন করলে ভগবান ত ভুট হবেন। মানুষের মুখের কথায় আমার কি ক্ষতি হবে, দিদি?’

‘সে তো সত্যি; কিন্তু তুমি এইসব ‘ছুটদের দমন’ যে কি ক’রে কর, আমি তা বুঝতে পারলুম না, বাতাসীর মা। সাহস থাকলেই তো হ’বে না, ওদের সঙ্গে লড়তে হ’লে গায়ের জোরও খুবই দরকার। তোমার অবিশ্বি এত জোর নেই যে, একটা জোয়ান পুরুষকে হারাতে পারো।’

‘কি যে বল, দিদিঠাকরুণ! মা কালী শুভ, নিগুস্ত, আরও অনেক ভীষণ বলবান দৈত্যদের বিনাশ করেছিলেন সে কি শুধু গায়ের জোরে? এসব কাজে সাহস আর বুদ্ধিরই বেশী দরকার, গায়ের জোব একটু অবিশ্বি চাই; ওদের গায়েই বা এমন কি জোর? দেখতেই সব এক-একটা হোমরা চোমরা বুনো চেহারা, গায়ে এত কিছু জোর নেই যে, হারাতে পারা যাবে না। আরও একটা মজা দিদি, আমি লড়তে গিয়ে টের পেয়েছি, ওদের সহবার শক্তি একটুও নেই; যে-ব্যথা আমি অনায়াসে সহিতে পারি, ওরা তাতে একেবারে অস্থির হ’য়ে পড়ে! মেয়েরা সাহস নেই ব’লেই ত মরে, নইলে বুঝে যা দিতে পারলে ওরা সহজেই কাবু

হ'য়ে পড়ে। আমাদের ভ কই, বেউ এখনো হারাতে পারলে না।

আমি অথাক হইয়া শুনিতেছি দেখিগা সে আবার বলিল, একটা ঘটনা শোনেন তো বলি। রাত হ'য়ে যাবে দিদিঠাকরুণ, তা আমি আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসব। আপনি রায় পাড়া বেড়াতে গেছিলেন কি? যদি ওদিকে যান, তবে—বাবুর বাড়ীতেও যাবেন। বউটি বেশ ভালো, কিন্তু বাবু ভাবী খারাপ; তার ক্ষমতা আছে, জমিদার-বাবুর কুটুম কি না, যা ইচ্ছে তাই করতে যান। আমি দাড়ী ছিড়ে দিয়ে শর স্বভাব অনেকটা শুধরে দিয়েছি।

‘একদিন দিদি, ভোরের বেলা পুকুর-ঘাটে মুখ ধুতে গিয়েছি; রায় বাবু তখন পুকুরের ওপারে পাইচারী করতে করতে এদিক পানে তাবিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিলেন; হঠাৎ আমার নজব প'ড়ে গেল; মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, শশী তাঁতির বউও তখন বাসন মাছতে বসেছে। বেড়াল যেমন তার বড় চোখ আরও বড় ক'রে শিকাবের দিকে চেয়ে থাকে, উনিও তেমনি জলন্ত দৃষ্টিতে সেই স্বন্দরী বউটির আধ-ঘোমটা-ঢাকা মুখের পানে বিলী ভাবে চেয়েছিলেন। তার পর থেকে রোজ সকাল-বেলা রায় বাবুকে পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতে লাগল। মেয়েদের কাছ করুবার ঘাট—তা এখানকার পুরুষগুলো যা, কেউ তাঁকে কিছুই বলতে সাহস করল না।

রায় বাবু ক্রমে ক্রমে পুকুরের এপারে এসে, একে বারে শশীদের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে, এই গাছগুলোর ভেতরে—কোনটা কোনটা তাঁর—ওব কোন্ ভাল কে কবে কেটে নিয়েছে, এই সবের তদারক করতে লাগলেন। বেগতিক দেখে বউটি আর বাড়ীর বার হ'ত না, তার শাশুড়ী তখন ঘাটের কাছ সাবুতে লাগল। রায় বাবুও ঘাট মাঠ ছেড়ে, শশীর বাড়ীর সামনের রাস্তায় এসে অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রোজ রোজ তাঁর এইরকম ভাব দেখে দিদি, আমার তো একেবারে অসহ হ'ল; তবু গারে প'ড়ে আর ঝগড়া করলুম না, চুপ চাপ থেকে সব দেখে যেতে লাগলুম।

শশীর মা আর বউতে একদিন কি কথা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল, শশী তখন বাড়ী ছিল না। গোল বেড়ে চলেছে দেখে আমি আর পাচুর মা ওবাড়ীতে গেলুম দেখি যদি ধামিয়ে দিতে পারি। ওমা, দেখি কি, রায় বাবু ওদের বাড়ীর ভেতরে হন্ হন্ ক'রে র'মা-ঘরে গিয়ে শশীর মাকে ধমকে বলছেন, ‘ওকি করু'ছিস বুড়ী? একলা পেয়ে বউটিকে তুই মেয়ে ফেল'বি নাকি। শশীর মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে যেমন তিনি বউয়ের সামনে যাবেন অমনি দেখলেন আমি শশীর বউকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে, কথো উঠে তাকে বললুম, ‘একি করুছেন আপনি, বাবু। মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া হচ্ছে, আপনি কেন তার ভেতরে এসেছেন? বাইরে যান শীগগির। তিনি প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে আমাব পানে চাইলেন, তাব পরেই বাঘের মত গর্জ্জ উঠলেন, কি, আমাদের তুই হুকুম করু'চিস? হারামজাদী, এত আশ্পর্ধা তোর!’ এই ব'লে যেই ঘুসী তুলেছেন, আনিও অমনি ঝট ক'রে তাঁর দাড়ীর গোছা ধ'রে, ঘাসের মত সেগুলো পটাপট ছিড়ে ফেলতে লাগলুম। তখন আমার আর জ্ঞান ছিল না। পাচুর মা বললে, বাবুও আমার পিঠে দু চারটে ‘চড়-চাপড়’ বসিয়ে দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু কিছু টের পাইনি। দাড়ীগুলোর অর্ধেকটা উড়ে ফেলতেই রায় বাবু ব্যাথায় অস্থির হ'য়ে ব'সে পড়লেন; রক্ত-মাখা তাঁর মুখখানা তখন যে কি ভীষণ দেখাচ্ছিল, দিদি। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তখন পেছন ফিরে দেখলুম, শশীর বউ লজ্জায় বেড়ার সঙ্গে যেন মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আব সবাই অবাক হ'য়ে এই কাণ্ড দেখছে। উল্লুনে কি চাপানো ছিল, আমি তাই থেকে একপান পোড়া কাঠ নিয়ে বাবুর পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে বললুম, পালিয়ে যাচ্ছ? ওগো বাবু, যাও। এমন পিরবিস্তি নিয়ে আর কখনো এ পাড়ায় পা বাড়িও না—আজকের এ ঘটনা এ বেদনা যেন তোমাব মনে থাকে।”

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতে শুনিতে আগি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, “তোমায় যে ওরা অমনি ছেড়ে দিয়েছে বাতাসীর মা, আমি আশ্চর্য হচ্ছি। ঘরে আগুন ধরিয়ে

দেয়নি বা আর কোনো রকমে এর শোধ নিতে চেষ্টা করেনি ? ষষ্ঠ সাহস তোমার, বাঘের সঙ্গে লড়াইতে চাও ।” বাতাসীর মা হাসিয়া বলিল, “একথা সবাই বলে, দিদি । সাহস না থাকলে এসব দেশে বাস করা চলেও না ; তবে আমি একটু বেশী দূর এগিয়ে যাই । সবাই ঘর সামলায়, আমি পর সামলিয়েও মরি । ভেবে দেখুন তখন যদি আমি ওকে তাড়িয়ে না দিতুম, ওই বউটিকে কি অপমানই করত সে ।”

‘কি ভয়ানক ! বল বাতাসীর মা, তার পরে কি হ’ল ?’

‘এ কথা তো একেবারে চারদিকেই ছড়িয়ে পড়ল । বাড়ী গিয়ে রায় বাবু বাকি সমস্ত দাড়ী টাড়ী ছেঁটে ফেলে ঘায়ে মলম লাগিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়লেন । শত্রুরা মজা দেখতে ভালো মানুষ সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যেতে লাগল আর তাঁর মিত্রেরা মেয়ে-মানুষের স্পর্শ দেখে চটে মটে আমাদের জমিদার সেজ বাবুর কাছে আমার নামে নালিশ ক’রে এল ।

‘ছ’তিন দিন পরে বাইরের ঘরটায় ব’সে, কে এ বাড়ীর কর্তাকে খুব কড়া কড়া কথা বলছে শুনতে পেয়ে আমি দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলুম, সেজ বাবু এসেছেন । তিনি তখন বলছিলেন, ‘তোমার জীবন অত্যাচারে দেখছি এ গাঁয়ে ভ্রলোক আর বাস করতে পারবে না ! রায় বাবুর কি করেছে সে শুনেছো ? ওকে তোমার আচ্ছা ক’রে শাসন করা দরকার ; যদি না পার, তবে বল, আমাকেই তা হ’লে এর বিচার করতে হ’বে ।’

আমি ঘরে গিয়ে বললুম, “ওকে আপনি মিছে আদেশ করছেন বাবু, ও কিছু করতে পারবে না ; আমার হাতের কাঁকণের দাগ ওর পিঠেই যে, কত রয়েছে ! আপনি বিচার করতে চাইছেন, তাই করুন । কিন্তু দেখবেন, বিচারের নামে যেন অবিচার না হয়—রায় বাবু শশীর বউকে যে অপমান করতে গিয়েছিলেন, আগে তাঁর বিচার করুন ত, তার পরে আমার যে শাস্তি দেবেন, আমি তা মাথা পেতে নেবো ।”

‘সেজ বাবু চমকে একবার চেয়ে দেখলেন, তার পরে আর কিছু না ব’লে সোজা বাড়ী চ’লে গেলেন । এ গোল এইখানেই মিটে গেল ।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা বাতাসীর মা, তুমি যে বললে, গোরাকান্দার পিঠে তোমার হাতের কাঁকণের দাগ কত রয়েছে, এ কথাও কি ঠিক ? তুমি স্বামীকে ও এই রকম শাসন-টাসন কর না কি ?”

সলজ্জ হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া সে বলিল, “একথাও মিছে নয়, দিদি ! লুকোব আর কেন ? বড় ভাল মানুষ, একেবারে পোবেচারি । কখনো কার সাতেও থাকে না, পাঁচোও থাকে না । তবু যে কেন তার ওপরেও একদিন একদিন আমার রাগ হ’য়ে পড়ে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না ! আমার মনে হয় দিদি, এবারে আমি এই কর্ত্তেই জগতে এসেছিলুম । আমার স্বভাবই ওইরকম হ’য়ে গেছে ।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “বেশ, ভালো ! তোমার বীরত্বের কথা শুনতে আমার বড় ভালো লাগছে, বাতাসীর মা, আরও কিছু থাকে ত বলো । তবে স্বামী বেচারীকে একটু রেহাই দিও ।”

আমার কথা শেষ না হইতেই পিসীমার পুত্র মুকুন্দ হারিকেন হাতে লইয়া সেখানে আসিল, কাকীমা তাহাকে পাঠাইয়াছেন ; আর এসব আশ্চর্য কাহিনী শোনা হইল না ; উঠিয়া পড়িলাম । বাতাসীর মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া একটা গাছতলায় দাঁড়াইল, আর খানিক দূর গেলেই আমাদের বাড়ী । নিশ্চয় জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ; নিৰ্জন পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া মুকুন্দ একটা স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে চলিল, তাহা শুনিতে-শুনিতে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমি ফিরিয়া দেখিলাম, একটা ছায়ার মত বাতাসীর মা, তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । কে বলিবে ওই নম্র মুষ্টিটি এমন মহিমমন্দিনীর !

বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, ছোট বাড়ীর ঠাকুরমা আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন ; তিনি আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “এত রাত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারো, আর আমাদের বাড়ী একটি বার যেতে পারলে না ? আমি দেখ তোমার অজ্ঞে কখন এসে ব’সে আছি । কলকাতার ‘সত্য’ মানুষেরা

বুঝি শুধু ছোট লোকদের সঙ্গে মিলে-মিশেই মজা পায় ?”

এই মুহূর্তে তিরস্কারে আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম, ‘আপনাদের বাড়ী যাব বই কি ঠাকুরমা, এখানে ত বেড়াতেই আমি এসেছি। বাতাসীর মার সাহস আমার অবাধ করেছে কি না, তাই তার কাছে গিয়েছিলুম। আচ্ছা, পুরানো বাড়ীর সেজ বাবুও তাকে ভয় করলেন ?’

‘ওকে ভয় করে এখানকার সন্ধ্যাই, এতে আর অবাধ হ’বার কি আছে, ভাই। এখন ত এই রকমই হয়েছে, জমিদাররা সব প্রজার ভয়ে শশব্যস্ত। কর্তাদের আমলে প্রজারা বাবুদের সঙ্গে কথাটি কইতে সাহস পেত না; একটা কিছু অত্যাচার করলে হয় ত তার ‘জানই’ নিয়ে বসতেন; ভিটে মাটি উচ্ছন্ন, সে ত কথায় কথায় করতেনই। এখনও আমি পুরুষের পাড় খুঁড়লে পরে কত মড়ার মাথা নর-কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে। সেজ বাবুর বাবার সময় থেকেই সে-সব দিন গিয়েছে। তিনি ছিলেন ভারী ভয়কাতুরে। তারই ছেলে ত সেজ বাবু, তার কত সাহস হ’বে বল, বাতাসীর মা ওকে আর তুচ্ছ করবে না।’

আমি বলিলাম, ‘কাউকে ভয় পেতে দেখলে ওরাই আবার ঠাট্টা ক’রে বলেন, ওতো মেয়েমানুষ; বাতাসীর মা এদেশের মেয়েদের এ অপবাদ ঘুচিয়েছে। রায় বাবু শুনেছি একটি ভয়ঙ্কর লোক, সে তাকেও কেমন জব্ব ক’রে দিয়েছে—শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। তখন যদি আমি এখানে থাকতুম, এসব কাণ্ড দেখলে পরে বডড খুসী হতুম, ঠাকুরমা !’

‘বাতাসীর মা যে সেজ বাবুর জামাই তাড়িয়েছে, তা বুঝি তুমি এখনো শোননি ? সে তার নন্দাইকেও এমনি শাস্তি দিয়েছে যা সে কখনো কুলতে পারবে না। পুরুষদের ‘দোষ ঘাট’ সে কক্ষনো সহ্য ক’রে যায় না। শুধু সেজ বাবু কেন, সব বাবুই সেজন্ত ওকে মনে মনে ভয় করে।’

‘বলুন ঠাকুরমা, কেন সে ওসব করেছিল, আমার শুনে বডড ইচ্ছে করছে, বলিয়া আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ‘ইচ্ছে করছে তো শোনো !

আচ্ছা, ওদের বাড়ীর কথাটাই আগে বলি। বাতাসীর বড় পিসী অন্নপূর্ণাকে কি তোমার মনে পড়ে ? ছেলে-বেলায় তার সঙ্গে কত খেলা করুছ; সে পড়েছে একটা হতভাগীর হাতে। নিবারণ কিছু করে না, কাজেই ঘরে নিত্য অভাব। অন্নপূর্ণা ধান ভেনে, পরের বাড়িতে রান্না ক’বে কোনো রকমে সংসার চালায়। নিবারণ বাবু সেজে ব’সে থাকে, নয়তো ছেলে কোলে ক’বে একটু বেড়ায়। কাজ করিতে বললে একেবারে মারমুখো হ’য়ে ওঠে। মেয়েটাকে তো মেরে মেরে হাড় কখানা সার করেছে—’

ঠাকুরমা বলিয়া যাইতেছিলেন, ‘মা বাপ ম’রে গেলে সে আর এখানে বড় আস্ত না; যত কষ্টই হোক, সব স’য়ে স্বামীর কাছেই থাকত; একদিন বড় অসহ্য হ’তে ছেলে মেয়ে নিয়ে সেই অতদূর থেকে হেঁটেই এখানে এসে পড়ল। বাতাসীর মা ওদের দৈখে তো খুব খুসী ! “ওলো ছোটবউ বেরিয়ে এসে দেখ কে এসেছে; এত দিন পরে আমাদের কথা মনে পড়ল কি, ঠাকুরম্মি ! এসো ভাই, এসো”—বলে সে আদর ক’রে অন্নপূর্ণাকে ঘরে নিয়ে বসালে, ছেলেদের মুখ মুছিয়ে জল খেতে দিলে। ভাই-ভাইয়ের কাছে যত পেয়ে অন্নপূর্ণা সেখানে স্থস্থির হ’য়ে রইল, তার শরীর ও আশ্বে আশ্বে বেশ স্বস্থ হ’য়ে উঠল।

‘মাস দুই পরে একদিন বিকেলে নিবারণ এসে উপস্থিত; বাইরের ঘরে গিয়ে সে গোরাচাঁদকে বললে, ‘এদের নিয়ে যেতে এসেছি।’ বাতাসীর মা তাকেও অস্বস্ত করলে না, আপনি পাঁচ রকম রান্না-বান্না ক’রে নন্দাইকে বেশ ক’রে খাইয়ে, ওপাশের ঘরটায় ওদের শোবার ব্যবস্থা ক’রে দিয়ে তবে সে ঘুমুতে গেল।

অনেক রাতে অন্নপূর্ণার কান্না শুনে তার খুম ভেঙ্গে গেল। এপ্রি মধ্যে ওদের খুব ঝগড়া হ’য়ে গেছে; এখানে এসেও নিবারণ ‘নিজ মুক্তি’ ধরেছে। বাতাসীর মা তখনি এক গাছা বেত হাতে ক’রে ওঘরের দোর ঠেলে ডাকলে, বুড়ী, ওবুড়ী দোরটা একবার খোলতো !’ বুড়ী মেয়েটা বাপের কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঁপছিল, মামীর সাড়া পেয়ে উঠে এসে দোর খুলে দিলে।

নিবারণ তখন নাকি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্নপূর্ণা বিছানার কোণে বসে, বাতাসীর মা ঘবে ঢুকেই আগে সেই ছিপ-ছিপে বেত গাছটা সপাসপ্ নিবারণের পিঠে বসিয়ে দিলে যা কতক! তার পর বললে, ‘তোমার আত্মপীড়া তো কম নয়!’ নিজের বাড়ীতে ঠাকুরঝিকে কত কষ্ট দাও, কত অপমান কর; এখানে এসেও ওর গায়ে হাত তুলতে তোমার সাহস হ’ল? বার বাড়ীতে, এসেছ, তাকেই অপমান! যত বলছে, বেতগাছটি তত জ্বোবে নিবারণের পিঠে, বুকে, মুখে কেটে কেটে পড়ছে। ব্যথায় অস্থির হ’য়ে সে তক্ষুনি লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে প’ড়ে সোজা ছুট দিলে। বাতাসীর মার মনেও কি ভয়-ভব কিছু নেই! সে সেই নিশ্চিন্তি রাতে তার পেছন পেছন তাড়া ক’রে বটগাছটার ওধার পর্যন্ত গেল। নিবারণকে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ী আনতেই গোবাটাণ্ড ওকে বন্ধুতে লাগল। বাতাসীর মা আর কথাটিও না ব’লে বাকী বাতটুকু অন্নপূর্ণার পাশে শুয়ে প’ড়ে বইল।”

“তাব পরে নিবারণ কি আর ওখানে এসেছিল, ঠাকুবমা?”

“আসবে না তো কি করবে? যারা অকারণ মানুষকে অপমান করে বোন, ওসব সহিতেও তো তাবাই পাবে! চাব পাঁচ মাস হ’য়ে গেল, অন্নপূর্ণা আর বায় না দেখে নিবারণ আবার এল। কুঁড়ে তো, কাছ ক’বে খেতে পাবে না, ছেলেদের ছেড়ে থাকতেও চায় না! কত ব’লে ক’য়ে মাপটাণ্ড চেয়ে তবে এবাব তা’কে নিয়ে গেছে। এখন হয় তো অভাগীকে সে একটু ‘যত্ন-আত্তি’ করে, তার পর থেকে আব কিছু গোলমাল শুন্তে টুন্তে পাইনি। যাই ভাই, রাত হ’য়ে গেল; কাল পবন্ত তুমি একবাব ‘ছোট বাড়ীতে’ যেও।”

‘এখনি যাবেন কি, ঠাকুবমা! সেজ বাবুর জামাই তাড়ানোর কথাটাও ব’লে যান, আমাব শুন্তে বড় ইচ্ছে করছে।’

‘সে আর কি ক’রে বলি দিদি, সে হ’ল আমাদেব ঘরের কথা; বিশেষ ওবাড়ীর কথা যে আমি তোমাকে বলেছি দেখো দিদি, তা যেন ওরা জানতে না পারে।

তা হ’লে আমায় বড় মুন্সিলে পড়তে হ’বে। তুমি শুন্তে চাইছ—নইলে ওদের কথা আমি কখনো আর ‘দু’কাণ’ করিনি।”

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমি হাসিধা বলিলাম, ‘না না, আপনি যা বলবেন, আমি তা কখনও মুখেও আনবোনা এখন নির্ভয়ে বলুন’ ঠাকুর-মা সম্বন্ধে হইয়া বলিলেন, ‘তা ‘মুখে’ আনলেই বা এমন কি ক্ষতি! তুমি দেশে গায়ে থাক না ভাই, নইলে এসব কথা আর এখান-কাব কে না জানে? দেশের ‘ভালো মন্দ’ লোকের কাছে গল্প করবে বই কি, আমি যে তোমায় বলেছি, এইটুকুন শুধু চেপে গেলেই হবে।’

এইরূপে ভূমিকা শেষ করিয়া ঠাকুবমা বলিতে লাগিলেন, ‘ঐ যে বোশেখে ভয়স্বব ঝড় হয়েছিল, গবীবদের কারু ঘরে আব ‘চালা’ ছিল না; কত লোক ঘর চাপা প’ড়ে ম’রেও গিয়েছিল সেই ঝড়-বৃষ্টিব ভেতরে সেজ বাবু ঘটা ক’বে তাঁর মেয়ে মিল্লর বিয়ে দিলেন। স্বধীন ছেলেটি কুলীন, দেখতে মন্দ নয়, পয়সা আছে। আমরা দেখলুম এই! কিন্তু সেজ বাবু ‘জাঁক’ ক’বে ব’লে বেড়াতে লাগলেন, অমন তিনটে পাশ করা জামাই এ গায়ে আর আসেনি। তা হ’বে? আমরা সব চুপ ক’রে শুন্তলুম, বড় লোকেব কথায় আর কি জবাব দেব ভাই? তার পর থেকে জামাই তো এখানে বেশ যাওয়া আসা করে, পাড়াব পাঁচ জনার সঙ্গে কথা-বার্তা বলে, সবাই তাকে ভালোও বাসে। আমি কিন্তু তখুনি টের পেয়েছিলুম, মিল্লর বর বড় ‘মেয়ে-ঘোঁশা।’ মেয়েদেব সঙ্গে মিশতে পেলে সে আর কিছু চায় না। ছোট লোকেব মেয়েদের সঙ্গেও সেধে সেধে আলাপ করুতে যায়। একদিন ঐ বাতাসীকে কি ঠাট্টাটাই করুলে। সে তো মুখ ফিরিয়ে চ’লে গেল, ওর সঙ্গে কথাও করুইলে না। আমার এসব দেখে শুনে কি রকম লাগত। তা কেউ যখন কিছু বলে না, তখন আমিই বা বলতে যাই কেন? একেই ত সেজগিন্নীর বিঘ-নজরে প’ড়ে রয়েছি—কিছু বলতে গেলে তখনি তুমুল ঝগড়া করবে। কাছ কি? চুপ ক’রে থাকাই ভালো মনে ক’রে আমি ত মুপটি বুজে রইলুম। আগেকার

গিন্নীরা পাড়ার কারু কিছু অন্তায় দেখলে মুখের ওপরে ব'লে বসত, এখন আর সেদিন নেই, ভাই। ওই সেজ-গিন্নী—দেখেছ ত, মুখখানা ঘেন হাড়ীপানা। তার ভেতর থেকে যা কথা বেরোয়, গায়ে একেবারে বিষ ছড়িয়ে দেয়। আমার ত ভাসুরপো বউ, খুড়-শাস্ত্রী ব'লে আমার একটু মাস্ত ক'রে না; তার ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই—কাউকে আমাদের কিছু বলবার জোটি নেই—তেমনি বাতাসীর মা দিয়েছে ওকে আকেশ দিয়ে। সেবাবে স্বধীন যখন মিছকে নিতে এল তখন সেজ বাবু কি তার ছেলেরা কেউ বাড়ীতে ছিল না; পাঁচ সাত দিন পরে জামাই যখন যেতে চাইলে, তখন গিন্নী তা'কে যেতে দিলে না, বললে, দিন কত এখানে থাক, তোমার তো এখন ছুটি; কর্তা বাড়ী এলে মিছকে নিয়ে যেও। স্বধীনের ত একেবারে পোয়াবারো হ'ল। সে তখন কি আর করে! দুপুর বেলা ভাত খেয়ে পানের ডিবে আর খবরের কাগজ নিয়ে একসাটি বাহিরেব ঘরে গিয়ে ব'সে-শুয়ে থাকে। পাড়ার মেয়ে কি বউরা তখন এবাড়ী দে-বাড়ী যায় কি না, তাই জানলা দিয়ে দেখে আর তাদের ডেকে ডেকে হাসি-ঠাট্টা করে।

একদিন হয়েছে কি, বাতাসীর মার বাপের বাড়ী থেকে কি দবকারী চিঠি এসেছে। সে কদমের হাতে এক-খানা খাম দিয়ে বললে, 'বা, ছোট বউমার কাছে থেকে এর জবাব লিখিয়ে নিয়ে আয়।'

বাতাসীর বোন কদমকে তুমি দেখনি। গেল বছরে তার বিয়ে হয়েছে, এই সেদিন সে খশুব বাড়ীতে গেল। বেশ দেখতে মেয়েটা, নোষের ভেতোর বড্ড বেশী বোকা।

কি কি লেখাতে হ'বে কদম যখন তাই ভাবতে ভাবতে বাইরের ঘরের সামনে দিয়ে আসছিল, তখন কেউ কোথাও ছিল না, নিঝুম রাস্তা। স্বধীন তাকে ডেকে বললে, 'কদম, একটা কথা শুনে যাও।'

মেয়েটা ত মহা মুন্সিলে পড়ল। ছেলে-বেলা থেকে ও বাড়ীর সকলের কথাই সে শুনে এসেছে; মেয়েদেব ফরমাস খাটা, বউদেব ছেলে বাধা, সেজগিন্নী ব'লু 'ভামিল' ক'বা এতো তার নিত্যকার ব্যাপার আছে। আবার জমিদারদের জামাই তাকে ডাকছে—এদিকে

মা মানা ক'রে দিয়েছে, 'পুরুষদের সামনে কখনো বেও না।' কি করবে বুঝতে না পেরে কদম যখন সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাবছে, স্বধীন আবার বললে, 'কদম, বাড়ীর ভেতবে তো যাচ্ছ; এই ডিবেটা হাতে ক'বে নিয়ে যাও না। ফেব্রুয়ার সময় গোটা কত এখানে আমায় দিয়ে যেও।'

বোকা মেয়েটা স্বধীনের চালাকী বুঝতে পারলে না! বারাণ্ডায় উঠে ডিবে নেবার জন্তে যাই সে হাতটি বাড়িয়েছে, স্বধীন অমনি সেই হাতখানি ধ'রে টেনে তা'কে ঘরের ডিতরে নিয়ে দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে! এক-একটা খারাপ ঘটনা এমনি অতর্কিতে হ'য়ে পড়ে, ভাই! কিন্তু ভগবান কেমন ক'রে যে তথনি তার বিহিত করেন, এই বার শোন।

মেয়ে তো এদিকে মস্ত বিপদে পড়েছে; মাম মনে তখন হয়েছে কি, 'চিঠিখানা বড্ড দরকারী, কদম সব কথা হয়ত শুছিয়ে বলতে পারবে না; বাই, আপনি গিয়ে চিঠি লিখিয়ে একেবারে ডাক-বাস্তে ফেলে দিও আসি।' এই ভেবে আস্তে-আস্তে বাতাসীর ম দূর থেকেই সব দেখতে পেল; তাড়াতাড়ি সেজবাবু বৈঠকখানার জানালার ধারে এসেই সে বললে, 'বাব, দোর খুলে কদমকে বাইরে আসতে দাও।'

কদমের তখন একেবারে 'ভিন্নমী' যাবার অবস্থা, মার কথা শুনে তবে তার 'ধড়ে' প্রাণটা এল! এদিকে আবার জামাইবাবুরও ঠিক তেমনি দশাই হ'ল। সে দোরটা খুলে দিয়েই লজ্জায় ভয়ে পেছন ফিবে দাঁড়াল। কদমকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে বাতাসীর মা তা'কে বললে, 'বাব, তুমি ভজলোকের ছেলে, আমাদের জমিদারের জামাই; কত পয়সা খরচ ক'রে কলেজে গিয়ে লেখা-পড়া শিখেছ; শুনেছি, ও সব শিখলে নাকি জ্ঞান হয়। বাবু, তোমার এই জ্ঞান হয়েছে? অত শিখে তার এই ফল পেয়েছ? কি বল, তুমি আমাদের গায়ের অতিথি, নইলে আমি তোমায় যা শিখিয়ে দিতাম আজ—সে তোমার কলেজের শিক্ষার চেয়ে ঢের বেশী ভাল হ'ত। তোমাব এই 'পরিবর্তি'কে নই ক'রে দিয়ে তোমায় সে মানুষ করতে পারত। তোমার বড়-

মাছন মা বাপ তা শেষাতে পারেনি ব'লেই ত তুমি এমন পশু হ'য়ে পড়েছ।" বাতাসীর মা সেই দিকে খানিকটা থুতু ফেলে বেরিয়ে এল।

সেদিন সেঙ্গগিমীর অনেক রকম রান্না হয়েছিল, জামাই আসবার পর থেকে রোজই ত তাই হ'চ্ছে। খাওয়া শেষ হ'তে বেলা প'ড়ে এল দেখে গিম্মী বউ ছুটোকে একটু জিরোতেও দিলে না; তক্ষুনি তাদের ডেকে নিয়ে বিকেলের খাবার করুতে বসল। আমি বেড়াতে গিয়ে দেখলুম, গিম্মী উল্লন ধরিয়ে একটি কড়া দুধ জ্বালে চড়িয়ে বউদের আর অদৃষ্টেব নিম্নে করুতে করুতে ক্ষীর তৈরী করুছে। একটি বউ ময়দা ঠাসুছে, আর-একটি নারিকেল কুড়িয়ে রেখে বাদাম পেস্তা ছাড়াতে বসেছে। এমন সময়ে বাতাসীর মা কদমের হাতখানা ধ'রে ভীষণ মূর্তিতে সেখানে এসে দাঁড়াল। কদম তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে দেখে সেঙ্গগিম্মী জিজ্ঞেস করলে, "ওর কি হয়েছে গা, বাতাসীর মা! কেন তুমি ওকে এমন ক'রে টেনে নিয়ে আসছ?"

বাতাসীর মা চৈচিয়ে চৈচিয়ে তখন সব কথাগুলো বললে; সব শুনে সেঙ্গগিম্মীর মুখখানা লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠল; তার কড়ার ক্ষীরটুকুও অতক্ষণ নাড়া না পেয়ে তলা ধ'রে পুড়ে কালো হ'য়ে গেল; সে 'ছন' ক'রে কড়াখানা নাবিয়ে রেখেই বাইরের ঘর খেতে স্বধীনকে ডেকে আনবার জন্তে চাকর পাঠিয়ে দিলে। সে কি আর সেখানে থাকে? নদীর ধারে গিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া ক'রে তখন যে বাড়ীর দিকে 'গাড়ী' দিয়েছে! সেই থেকে স্বধীন এ গাঁয়ে আর আসেনি।"

ঠাকুরমা চলিয়া গেলেও অনেক রাত্রি অবধি আমি সেখানে বসিয়া রহিলাম, যুগায় আমার মন তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবকও এত নীচ হয়! ভ্রম বংশের মর্যাদা, ভাল-মন্দ জ্ঞান, কিছুই

উহাকে এই কুকার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না?

বাতাসীর মার সাহস ও শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি শয়ন করিলাম। এই নারী বাস্তবিকই সিংহিনী! এই নারী আমার স্বয়ংগী হইয়া থাকিবে। যদি এইরূপ তেজস্বিনী নারীদিগকে লইয়া দেশে দেশে একটি করিয়া নারী সমিতি গঠিত করা হয়, তাহা হইলে 'নারী-নির্ঘাতন' দেশ হইতে দূর হইয়া যাইবে, পুরু-ধোরা নারীর সহিত সম্বাবহার করিতে শিখিবে।

ক্রমে আমার বিদায় লইবার দিন আসিল।

সকলেরই মুখ বিষাদে গম্ভীর। আহা-শেষে শুনিলাম, খালের ধারে আমাদের নৌকা বাধা রহিয়াছে; সকলের নিকটে বিদায় লইয়া, ঠাকুর প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। কাকীমা, পিসিমা, ভাই-ভগিনীরা, বাড়ীর প্রায় সকলেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খালের ধারে চলিলেন; আর চলিল আমার 'শিল্পশালা' সেই চতুরা ছাত্রীটি; সবুজ-বসনা পল্লীরাণীর হরিৎশিরোভূষণের মতই এই স্ত্রী মেয়েটিকে আমি ভালবাসিয়া ছিলাম, ইহার মন মুখখানি দেখিয়া বুঝিলাম এও আমাকে একেবারে ভুলিতে পারিবে না!

বাতাসীর মা একটি সুন্দর ফুলের গুচ্ছ আমার হাতে দিয়া বলিল, "এইটি আপনি সেখানে নিয়ে গিয়ে যত্ন ক'রে রেখে দেবেন, দিদি, তা হ'লে কখনো আমাকে আপনার মনে পড়বে।" আমি সেটি হাতে লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "আমার মেয়ের বিয়ের সময়ে এঁদের সঙ্গে তুমিও কলকাতা যেও, বাতাসীর মা, তা হ'লে আবার তোমাকে দেখতে পাব!"

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছি। আমার দেশের কৃষকদিগের কুটীরগুলি ক্রমে ক্রমে দূরে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাদের নিকট হইতে আজ আমিও কত দূরে চলিয়া যাইতেছি! কে জানে আর কখনও এখানে আসিব কিনা!

কণ্ঠ পাথর



দান

পুরাণে জানিয়া চেয়ো না আমারে
আধেক আঁখির কোণে
অলস অস্ত্র মনে ।
আপনারে আমি দিতে আসি যেই
জেনো, জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই
কেলে দেই পুরাতনে ॥
আপনারে দেখে স্বরনা, আপন
দানহুধে উচ্ছলি ।
লহরে লহরে হয় যে নুতন
অর্থের অঞ্জলি ।
সাধবীকুল বারবার করি
বনলক্ষ্মীর ডাঙা দেয় ভরি,
বাব বার তার দানমঞ্জরী
নবীন শ্রুতি ক্ষণে ॥
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমার
চির নুতনের হর ।
সব কাজে মোব সব ভাবনার
জাগে চির হৃদয় ।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি নাহি পাবে শেব,
আমার দিনের সকল নিমেষ
ভরা অশেষেব ধনে ॥

(মানসী ও মর্মবাণী, ফাস্তন ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসের চিঠি

(অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত)

ও

508, W. High Street,
Urbana,
Illinois, U. S. A.

কল্যাণিয়ারে,

আজ ৭ই পৌষ । কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো আলিবে বসলুম আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হ'তে লাগল সে আমি বলতে পারিনে, সে বেদনা শরীরের কি মনের তা জানিনে, কিন্তু আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুললে । তখন আমার

মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোয়ের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে । কেননা এখনকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারো ঘণ্টা তফাৎ । তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে বোধ হয় আকর্ষণ করছিল । কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ করছিলাম । স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকালকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি, কিন্তু কেউ জানে না । তুমি তখন গান গাচ্চ, “জাগো সকল অমৃতের অধিকারী ।” আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ায় মত খাচ্ছি তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব—তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে উঠেছ । এমনতর হৃদয় আমি অনেকদিন দেখিনি, হেসে উঠে ঐ গানটা আমার মনে পড়ে লাগল । হায়রে, এদেশে কি তেমন সকাল হয় না ? সেই অমৃতের অধিকারের মধ্যে জেগে ওঠবার গান এখানকার আকাশে কি ঠিক হয়ে বেজে উঠতে চায় না ? এদেশে কেবলি কি election আর Balkan Wars, আর Suffrage movement ? কলের ধোঁয়ায় আকাশের সমস্ত জ্যোতির্লোককে একেবারে ঢেকে ফেলে বে । কেবল গায়েব জোব, কেবল গায়ের জোর,—কেবল আদব কায়দা আইনকানুন । সরল আনন্দে হবি কোথায় দেখব—একেবারে সম্পূর্ণ পরীষ হ'য়ে মনের অ্যুন্মে মাটিতে বসবার স্বপ্ন এখানে পাওয়া যায় কোন্‌খানে ? এখানে যে টাকাকড়ি না হ'লে এক মুহূর্ত চলবার জো নেই—তাই কত বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় তাব ঠিকানা নেই—কেবলি ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে চলবার তাড়া । সেই স্বপ্নে যখন ভোয়ের রাগিণীতে শুনলুম—“জাগো সকল অমৃতের অধিকারী”, তখন আমার মনে হ'ল আমি যেন একেবারে সময়ের তলায় তলিয়ে গেছি, ডাঙা থেকে আমার ডাক আসচে—সেই ডাঙা যেখানে সূর্যের আলো আকাশ ভরা, যেখানে মাঠ মিশিয়ে গেছে নীলের কোমরে যেখানে পুঞ্জোব ফুল ফুটে স্ব'রে পড়চে, যেখানে উদাস হাওয়া ফ্যাপার মত বনে বনে একতারা বাজিয়ে চলেচে, যেখানে মাটি কোলে টানে, জল বুক ক'বে নেয়, বাতাস গায়ে হাত বুলায়, আকাশ কপালে চুনো খাব—সমস্ত যেখানে বুকের কাছাকাছি, জগৎ যেখানে বহুর মত গলাগলি করে ।

তখনো অন্ধকার যখন বিহানা থেকে উঠে এসে বসলুম । তারা-লোকিত আকাশকে একটুখানি যে অভ্যর্থনা করলুম সে কেবল একটু জানুলা খুলে । সাড়ে পাঁচটা বাজল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হ'ল । আমার শোবার ঘরের একপ্রান্তে একখানা কঞ্চল পেতে আমরা পাঁচ জনে বসলুম । তোমাদের ওখানে তখন হয়ত সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে । আমার এই বন্ধ ঘরের অন্ধকার কোণের মধ্যে তোমাদের প্রাস্তরলক্ষ্মী তাঁর দেই অক্ষণাগরজিত সাদিখানি প'রে প্রানমুখে ক্ষণকালের জন্তে দেখা দিয়েছিলেন—তাঁর দেই শুভ দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ আমাদের লঙ্গটিকে একবার স্পর্শ করেছে । ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে কেলে যেতে পারবে ? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতি হ'য়ে গিয়েছে । এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মত আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি—আমার যা কিছু আছে সমস্তকে একে একে সোনা ক'রে না নিয়ে কি

ছাড়ব? লোহার সিন্ধুক বন্ধ হ'বে আছে, সবচে-ধরা তাল। খুল'চ না ব'লে সব জায়গায় তার স্পর্শ পৌঁছচ্ছে না, নইলে বিছু কি থাক'ত? আমার ভাবনের পবন সৌণ্ডা যে, একটা কেল্লেকে সে আশ্রয় বস্তু পেয়েছে; এখানে অনেকের মঙ্গলের সঙ্গে তার মঙ্গল; অনেকের আশ্রয়ের সঙ্গে তার আশ্রয় ভাঙিত করে গেছে, এখানে সমুদ্রের নিক থেকে অমৃতের দিকে সে যুগ তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এখানে অহোবাত্র বরণা স্ব'রে পড়বে, কালো পাখবন্তলো যত কঠিন হোক যত প্রকাণ্ড হোক স্ববে স্ববে সমস্ত শেখ হ'য়ে যাবে, বোঝা কিছুই বাকী থাকবে না। আজ আমি এই দরবারেই জানিয়ে বেগেছি, কিছু যেন চাপা না থাকে, সমস্ত যেন একেবারে ফুঁকে দিয় হানিমুখে হাফা হ'য়ে চলে যেতে পারি। আমার ইচ্ছটাকে দিনযাত্রী কাঁধে ক'রে নিয়ে আর যেন পেডাতে না হয়, পেটাকে তাঁর কাছে কেলে দিয়ে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসতে পারি। 'মা গৃধঃ' তিনি যা দেবার একেবারে পূর্ণ ক'বে দিয়ে বেগেছেন—আকাশ-স্তর্য দান, জীবন-স্তর্য যজ্ঞ—যা পেয়েছি তাও নিতে পাবিনে ব'লেই লোভীর মতন এমন অঙ্গের ভয়ে লালাবিত হ'য়ে বেড়াই—তিনি আমাকে নেবার শক্তি দিন, আকাশে যা'র'রে পড়বে তা যেন আমি অঙ্গলি পেতে পান ক'বতে পারি। তৃষ্ণা মিটে যাক, রাহ জুড়িবে যাক—মলিনতা কোথাও বিছু লুকিয়ে না থাকে—সত্য সমুজ্জল হ'য়ে উঠুক—অমৃত-স্রোতের পথ অব্যাহত হোক এই ভীষনের বৃষ্টির উপরে চিরজীবনের শতরঙ্গ বিকশিত হ'য়ে উঠুক—অস্ত্রের বাহিরে প্রকাশমান হোক শাস্ত্রমুখিবর্মণৈতম্।

তোমাদের শুধানে রাত্রের উৎসব এতক্ষণ শেষ হ'য়ে গেছে। লোকের কোলাহল শেষ হ'য়ে এসেছে—সুভ্রাত্তরাদিশীর জ্যোৎস্নার তোমাদের প্রস্তুত প্রাপ্তি হ'য়ে গেছে—সুভ্র-শান্তি-জলে তোমাদের আশ্রয়ের অর্ধেক হ'বে পেল—এক বছরের মত তোমাদের মঙ্গলঘট পূর্ণ হ'ল, তোমাদের নবজীবনের পথের সঞ্চিত ক'রে নিলে—আজ তোমাদের রাত্রের নিজা শুভ হোক, পবিত্র হোক।

আমার শরীর এবার ঝগা। তাই শিকাগো যাওয়া হ'ল না। রথী এবং বৌমা এইমাত্র দিন কয়েকের জন্ত বেড়াতে গেলেন। তাঁদের এখন কলেজের ছুটি। বোধ হয় ছুটি কাটিয়ে আসবেন। শিকাগোতে এবার ছুটিতে এখানকার ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের একটা সম্মিলনী হ'বে, তাতে তারা আমাকে প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু আমার ত হুকুম হ'ল না। আজ এই পৌষ কোথাও যাত্রায় আমার চু'ব না—আজ সমস্তদিন আমার মনের মধ্যে নহবৎ বাজাবার বাধন পেরেছি—যাঁকি দিয়ে কোথাও যাব এমন সাধ্য নেই। গত সপ্তাহ ধ'বে আমার রোগের আযোজন এই আমার উৎসবের আযোজন; যাঁটি দিয়ে সমস্ত আযোজন পরিষ্কার ক'রে ফেললে; সমস্ত শুকুনো পাঁতা বেনদায় পুড়িয়ে গাই ক'বে দিলে।

আজ সকালে এই জানুয়ার আছে ব'লে লিখছি, আমার কিছুতেই মনে হচ্ছে না তোমাদের উৎসবের মধ্যে আমি ছিলুম না। আমি তোমাদের মুখরিত মাঠের কলরব শুনে পাজি, তোমাদের ছেলের আনন্দধ্বনি এখানকার বাতাসকেও নিবিড় ক'বে তুলেছে আমার সমস্ত মন উৎসবে ভরে উঠেছে। ইতি ৭ই পৌষ, ১৩৩৩।

তোমাদের

(দীপিকা, পৌষ—মাঘ, ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যতাগ বর্ধিততার বীজ

বর্তমান সভ্য মানবের মধ্যে বর্ধিততার বীজ যে নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার পূর্বে, গৃহপালিত পশুপাও যে তাদের বস্ত

জীবনের ব্যবহার একেবারে ত্যাগ ক'বতে পারেনি, আগে এইটে আমরা দেখাব।

আমাদের যত রকমের গৃহপালিত পশু আছে, তাদের সকলকেই জঙ্গল থেকে ধ'বে এনে পোষ মানান হয়েছে।

কতকগুলো পোষা জানোয়ার আছে, যাঁদের আমরা টপ ক'রে ধরতে পাবি—কোন বস্ত্র পশু থেকে তারা গ্রামে এসে বাস করছে। কিন্তু কতকগুলোর আদিম স্বভাব কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না।

অনেকে বলে থাকেন, বুনো অশ্বাটী অস্বাভাবিক। কিন্তু তা ঠিক নয়। মানুষ ও গৃহপালিত জীবের জীবন-প্রণালী হচ্ছে কৃত্রিম।

মানুষ তাদের কাজের বেশী উপযোগী ব্যবহার জন্ত অশ্বশীলনের দ্বারা কতকগুলো গাছ ও জানোয়ারের দেহ ও মনের এত উন্নতি সাধন ক'বছে যে তাদের পূর্বপুরুষদের আব চেনবাই য়ো নেই। আর এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে আরও কত হবে।

এই পরিবর্তন সাধিত হয় কি ক'রে? যোগাত্মকের নির্বাসনের দ্বারা অর্থাৎ ভালগুলোকে বেছে নিয়ে চাষ করা। চাষারা ব'লের জন্ত সব-চাইতে পুষ্ট ধান ও আলুগুলো বেছে নেয়। সেই রকম যারা পশুর চাষ করে তারা যে-শেড়ালুগোব লোমগুলো লম্বা ও নরম সেইগুলোকে বেছে নেয় এবং যারা পালক ও ডিমের ব্যবসায় করে তারা সেই পানীগুলো বেছে নেয় যাদের পালক খুব হালকা, ডিম বড় এবং যাঁরা ডিম পাড়ে বেশী।

প্রকৃতির একটা হস্ত আমরা দেখতে পাই যে, যদি আমরা বেছে বা মনের কোনও একটা বিশেষ দিকে জোর দেই তাহ'লে সেটাকে অনন্ত কাল ধ'রে বাড়ান যেতে পারে। ঠিক এই প্রণালী ধ'রে সবুজ গোলাপ তৈরী করা হয়েছে; আবার আঙ্গুর, আপেল, কমলা, কলা এবং আনারসের বীচগুলো একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে।

গৃহপালিত পশুদের মধ্যে বোধ হয় কুকুরই মানুষের সব-চাইতে প্রাচীন সঙ্গী। কুকুরের গৃহ-প্রবেশের ইতিহাসের তারিখ এত প্রাচীন যে তখনও মানুষের কোনও ইতিহাস লেখা হয়নি, ডার্বিন বলেন যে, নানা জাতীর নেকড়ে থেকে পৃথিবীর নানা অংশে নানা কালে নানা জাতীয় কুকুরের সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বসম্মত ১৭৫ রকমের বিশেষ জাতীয় গৃহপালিত কুকুর আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন জাতীয় মানুষদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে কুকুরের মধ্যেও ঠিক তাই। সাংবাদী পশুদের মধ্যে কলি আর সেন্ট বার্নার্ড সব-চাইতে বেশী বুদ্ধিমান, পক্ষান্তরে এস্কিমো কুকুর আকারে একেবারে নেকড়ে।

স্টলগেভ লোকেরা কলি কুকুর পোষে মেস চরাবার জন্তে। সেন্ট বার্নার্ড কুকুরের মুখ-চোখের চেহারা অতি হৃদয়।

বুল ডগ্ প্রকাণ্ড চোখালের জন্ত বিখ্যাত। একবার যদি তারা কিছু ধরে তাহ'লে গলা বেটে ফেললেও তারা কামড় ছাড়ো না। গোচরণের জন্তে এদের ব্যবহার হ'ত, বিশেষতঃ বজ্রাত বাঁড়গুলোকে টিট করাবার জন্তে। যখন মানুষ বেড়াব আবিষ্কার করেনি এবং গরুরাও এত বণ হ'বনি তখন তাদের সামলে রাখা বড় ব্যঠিন ছিল। সেইজন্তই মানুষ এইরকম বলবান কুকুর পুষতে আরম্ভ করে। এরা দুবস্ত গরুগুলোকে ভারি রজাব উপায়ে সামলে রাখে। এরা লাফিয়ে গরুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ভয়ানক চীৎকার ক'বে লাফিয়ে কান ধরবার চেষ্টা করে, কখন কখনও কান ধরে টেনে মাথা মাটিতে নামিয়ে দেয়।

বুল টেরিয়ার, বুল ডগ্গব অপভ্রংশ। এর বিশেষ কোনও গুণ নেই। বরং ফল টেরিয়ার বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য এবং তৎপরতার অনেক বড়। টার্প স্পিট কুকুরের দেহ ও পা ছোট।

বিগত দেড়শো দুশো বছরের মধ্যে পরেটাস এবং সেন্টাস কুকুরের সৃষ্টি হয়েছে।

কুকুব—নেকড়ে প্রভৃতি কোনও একটা জাত থেকে এসেছে এবং পোষমানাব সঙ্গে সঙ্গে তাদের আধুনিক অবস্থার দোষগুলো অল্প-বিস্তর অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে কুকুরের মত শুভ্রকর্ণ, স্নেহশীল এবং বিদ্যাদী আনোয়ার আর নেই; কুকুরের দেহবস্ত্র মানুষের দেহের চাইতে চের নিকৃষ্ট। কিন্তু এই নিকৃষ্ট দেহবস্ত্র নিয়ে তুলনায় সে মানুষের চাইতে চের সভ্য হয়েছে—মানুষের চাইতে সে তাব বস্ত্র স্বভাব চের বেশী তাই কবুতে গেয়েছে।

পোষা-বিড়াল—বন-বিড়াল থেকে এসেছে।

বোধ হয় কুকুরের চের পরে বিড়াল পোষা হয়েছে এবং কুকুরের মত একে কখনও কোনও বুদ্ধির কাজেও লাগান হয়নি, মানুষ বরাবরই একে কেবল ইঁদ্রব মাংসবাসর জন্তু এবং সৌন্দর্যের জন্তু ব্যবহার করেছে।

মাংসাদী জন্তুর মধ্যে কেবল কুকুব ও বিড়াল পোষা মেনেছে।

বর্ধরতা থেকে সমস্তা পর্যন্ত যে দীর্ঘ জীবনয পথ, একে অতিক্রম করতে মানুষকে বোড়ার যত সাহায্য নিতে হয়েছে এমন আব কিছুর নয়। যুদ্ধে, শাস্তিতে সব সময় বোড়া মানুষের বন্ধু।

মানুষ বোড়াকে প্রথম পোষ মানার, বোধ হয় মধ্য বা দক্ষিণ এশিয়ায়। মধ্য এশিয়ায় নানা দুর্গম স্থানে এখনও বস্ত্র বোড়ার দল দেখা যায়। তারা দল বেঁধে থাকে, খাস খায় এবং ভয় পেলেই চকিতে ছুটে পালায়।

বোধ হয় সেই আধুনিক যুগে বোড়া একটা ছাগলের চাইতে বড় ছিল না।

(উদ্ধোধন, চৈত্র ১৩৩৩)

বান্দালী বীর

সম্প্রতি বান্দালী পালোয়ান গোবর গত ছয় বৎসরকাল যুক্তরাজ্য ও কানাডা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া বান্দাম, কৃষ্টি প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়াতে জগৎবিখ্যাত বহু পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়া দেশ-বিদেশে বান্দালীর সখলতার প্রমাণ দিয়া আসিয়াছেন।

গোবর পালোয়ানের নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ, ডাক নাম গোবাব। যতীন্দ্রচরণ ১৮৯২ সনে কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবু বামচরণ গুহ, হোব দিলার কোম্পানীর মুংহুদি তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অধিকাচরণ গুহ অম্বুবাবু নামে পরিচিত। অম্বুবাবু সেকালে এশিয়ার পালোয়ান ছিলেন এবং তাঁহার অন্ততম পুত্র, গোবরের জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। স্নেহবাবুই গোবরের শিক্ষা-গুরু। গোবরের বয়স এখন মাত্র ৩৫ বৎসর। এই বয়সেই তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হয়েছেন। আজ সমগ্র জগৎ এই বান্দালী বুকের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

গোবরের শরীরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, বুক—৪৮ ইঞ্চি ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, গলা ১৮ ইঞ্চি, জাম্বু ৩০ ইঞ্চি, ওজন তিন মণ। তাঁহার হুই ছোড়া মূল্যব আছে; এক ছোড়ার প্রত্যেকটার ওজন ২৫ সেয়; আর-এক ছোড়ার প্রত্যেকটার ওজন একমণ দশ সেয়। তিনি যখন খোলা শরীরে এই দ্বিতীয় ছোড়া মূল্যব লইয়া ব্যায়াম করিতে থাকেন তখন তাঁহার প্রকাণ্ডকার চেহারা দেখিয়া সেকালের দৈত্যদের কথা মনে উদয় হয়। তাঁহার খাওয়ার পরিমাণ নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। বান্দালীর সাধারণ দৈনিক খাদ্য ছাড়া গোবর বিশেষ ভাবে বাইবার পূর্বে কলিকাতার নিম্নলিখিতরূপ

আহাব করিতেন।—“তিন পোষা ঘি মিশ্রিত মাংসের আকনি; ৪০০ বাদাম ও এক ছোট ছোট এলাচ, দেড় সেব বেদনাব রস; এক টাকার সোনার পাত ও দুই আনার রূপার পাত, বাদাম ও মদলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই ও এক সেয়-দুধ এবং শ্রুতাহ এক টাকার স্বলা।” খাওয়ার পরিমাণ শুনিয়া নুহ, খাওয়ার মূল্যের কথা ভাবি। যে-সকল ঐশ্বর্যশীল মস্তিষ্ক বৃথা আলোড়িত হইবে তাহাদের অবগতির জন্তু আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, গোবরের পিতামহ গোবরের উদর পালনের পক্ষে প্রচুর অপেক্ষাও অনেক বেশী সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গোবর সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভান।

মিঃ গুহ তাঁহার উপাধিকৃত শিক্ষা বান্দালী জাতিতে সংক্রামিত করিবার সহ্য উদ্দেশ্যে কলিকাতাতে একটি ব্যায়ামাগার ও শারীরিক শিক্ষা-প্রদর্শনী স্থাপন করিতেছেন।

আমরা আশা করি বান্দালী বুকের দলে দলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া এইটিকে জয়যুক্ত করিবেন।

(সৌরভ, মাঘ ১৩৩৩)

পারশু-সাহিত্য

পারশু-সাহিত্য অতি বিস্তৃত, অসংখ্য সাহিত্য সাগর মন করিয়া বহু আদ্যে যে-রস লাভ করিতে পারা যায়, পারশু-সাহিত্য-ভাণ্ডারের যত্র তত্র বহুল পরিমাণে তাহা হইতেও উদ্ধৃত রত্নরাশি বিবাক্ষিত আছে।

বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান যুগে এহেন পারশু-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বহু রত্নস্বরূপ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শোভাবর্ধন করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক লেখকমণ্ডলী এবিষয়ের সম্যক চর্চায় আশ্রিত উদ্যোগীন।

আমরা আশা করি পারশু কবি মহাত্মা ‘নেত্রানী’র পবিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লইয়া উপনীত হইতেছি।

কবির প্রকৃত নাম আবু মহম্মদ বেনে ইউসুফ বেনে মুহীদ। তিনি মুহীদগুণী নিকট নেত্রানন্দী (ধর্মের নিয়ামক) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার রচিত কবিতাসমূহের ভগ্নিতায় তিনি আপনাকে ‘নেত্রানী’ নামে অভিহিত করিয়াছেন। পারশুর ‘কুন’ প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ১১১৬খৃঃ কবি জন্মগ্রহণ করেন।

পারস্য কবিদের মধ্যে কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব বিষয়ের বর্ণনায় লেখনী পরিচালনা করিতে ইনিই প্রথম পথ প্রদর্শক; এছাড়া অনেকে তাঁহাকে কল্পনা-রাজ্যের প্রথম সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিবিগ্রহাদির বর্ণনায় অমর কবি ফেরদৌসী, বিষয়-বৈচিত্র্য ও সজীব ভাব প্রকাশে ‘মৌলানা রুমী’ এবং সহজ ও সরল ভাষায় কবিতা লিখিতে মহাকবি সাদীর সমতুল্য ছিলেন।

কবি চিরদিন আড়ম্বরশূন্য, দারিদ্র্যপ্রিয় ছিলেন। মতল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি সর্বদাই বলিতেন, মস্তাবই সকল মন্ত্রের মূল।

কবি সর্বদা নির্জনবাসে ভগ্নবদারধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তৎসাম-য়িক পাবসারাজ সোলতান নোসরাতুদ্দীন কবিকে যারপরনাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

দ্বিধ্বজ-মানসে মহামুগ্ধব য্যালেকজানারের (সেকেন্দার) নানাদেশে বুদ্ধাভিযান ও রাজ্যবিস্তার সত্বে ‘সেকেন্দার নামা’ নাম দিয়া কবি একখানি বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি পারস্যরাজ সোলতান নোসরাতুদ্দীনের নামে উৎসর্গিত হইয়াছে।

কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—“মান্ অী বোলবোলায়্ কাজ এবাম তাধ্‌তাম্ চ বাগে তু আরাগ্‌গাহ্—সাধ্‌তাম্ নাওয়ারে সাবাইগাম্ জে আহিমমেতু কে মানাদ্ বগে সালাহা নামে তু মারাপীল্ বার আছ, তু মাক্‌হদ নিস্ত কে পীলে তু চ পীল্ মাহ্‌মুদ নিস্ত মাহাদাদ্ তাওকিক গোক্তান্ খোদায় তোয়া বার পায়েন্না ফাবহাজ ও রায় অর্থাৎ—আমি স্বর্গোচ্চানেব হক্‌ঠ বুলবুল, এক্ষণে উড়িয়া আসিয়া তোমার রাজ্যোচ্চানে আশ্রয় লইয়াছি, দেখিবে অচিরে আমার কঠিনিস্ত পানের পীযুষ-ধারাব সাহিত্য-জগৎ প্রাবিত হইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে তোমার নামও যাবচ্ছন্দ্যদিবাকর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমি (ফেরদৌসীর আয়) তোমার নিকট হস্তী-পুষ্ঠে বোঝাই দেওয়া হবর্ণ মুলার প্রার্থী

নহি, পক্ষান্তরে তোমার হস্তীও সোলাতান মহম্মদের হস্তীর জায় (কবিকে গদ্যলিত করিবার আজ্ঞা-প্রাপ্ত) নহে! আমাকে সর্বগজ্জমান অনাধারণ কবিত্ব-সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমি অস্ত্র কোন সম্পদের ভিত্তি নহি। হে রাজন, তুমি এই প্রকার হবুজি ও সম্মিবেচনার সহিত চিরজীবী হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনে রত থাক।

উহার রচিত “নাখ্‌জাহুল্ আদাব্” ‘খোদরোস্তে’ ‘সিঁরী’ ‘হাক্ক-পায়-কার’ এবং বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘সেকেন্দারনামা’ সাহিত্য-জগতে যারপরনাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

(মজলিশী, মাঘ ১৩৩৩)

কাজী নওয়াজ খোদা

চণ্ডীমণ্ডপ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রকাণ্ড একটি বেলগাছ। তাহার ছায়ায় মোহন-ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ। সম্মুখে আঙ্গিনা, প্রথম বাজির পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ধব-ধব কবিতাছে।

কোন্‌জাগরের পরের দিনের রাত্রি। চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন মোহনপুত্রের সমাজপতিদের বার্ষিক বৈঠক। সামাজিক হুঙ্কারকারীদের বিচার ও দণ্ডদানের সভা।

দেবী আসনের চৌকীতে তখনও সিন্দূর জল জল করিতেছে। সেই আসনকে বেজ্র করিয়া কুশাসন এবং পাটি বিছাইয়া সমাজপতির বসিয়াছেন। আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড নিমের গুঁড়ি জলস্ত, তাহার পাশে চিমুটা হাতে দীর্ঘ-দেহ বংশী গোপ তামাক জোগাইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে ডাবা খেলো ও বাঁধা ছঁকা অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্ত হইতে হস্তান্তরে ঘুরিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় মহিষ-শৃঙ্গের কোঁটা খুলিয়া ঘন ঘন নস্ত লইতেছেন। কাশি এবং হাঁচির শব্দে চণ্ডীমণ্ডপ মুখর।

“না হে, চক্ৰোত্তি, আব সওয়া যায় না। দিন কাল-ক্রমেই খারাপ হ’য়ে আসছে। তোমরা গায়ে থাক, বাঘবও রয়েছে—তোমাদেরই দেখা-শোনা উচিত, এখন হাল ছেড়ে দিলে শেষে সাম্লাতে পারবে না।”

“দেওয়ানজী যা বল্লেন ঠিক। কিন্তু রাখব করবে কি? মোহন-ঠাকুরের ছেলে হ’লেই তো হয় না, বয়সটা কি তাব? আপনি থাকুন একটা মাস, দেখুন কি করি।”

সাহেবপুরের রেশমকুঠীর দেওয়ান হরি মুখ্যে ব্রেক্‌ফাস্টের বোতাম খুলিয়া স্কীতোদর বাহির করিয়া কহিলেন, “বুঝি তো সব দাদা, কিন্তু চাকর আর কুকুর। এই পনেরোটি দিন ছাড়া সাহেব ছুটি মঞ্জুর করে না তার কি? গায়ে থাকতে গেলে চাকুরী ছাড়তে হয়, একবার ভাবি—”

জায়রত মহাশয় কহিলেন, “সর্বনাশ! তুমি আছ তবু মোহনপুরের গাজন-তলায় ঢাক বাজে হে, মুখ্যে। চাকুরী তো তোমার একার নয়, দশ জনের। দশ জন খাচ্ছে। পালা-পার্কিণে অতিথি-বোষ্টম সেবা হচ্ছে। গোয়াল মালীরা টিকে আছে। দীর্ঘজীবী হ’য়ে থাক, বাবা।”

হরি মুখ্যে জায়রত মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া কহিলেন, “এটা কি একটা কথা, পণ্ডিত মহাশয়? আপনাদের আশীর্বাদেই সব, দশ জনের বরাতেই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্ত।”

দেওয়ানজী ব্রেক্‌ফাস্টের বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল এক বৃদ্ধ।

“কে, সাধুচরণ?”

নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে জানিত। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “আজ্ঞে, বাবা ঠাকুর।”

“ওরে বেটা! হারামজাদা!”—শব্দক ঘোষাল হাঁকিলেন।

“খড়ম পেটা ক’রে তাড়াও ব্যাটাকে গাঁ থেকে! ধর্ম নষ্ট করুলি!”—আয়রত্ব মহাশয় নস্ত্র লইলেন। সাধুচরণ কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ডাকিলেন, “রাঘব কোথায় হে? কি করা যাবে এর এস দেখি শুনি।”

স্বর্গীয় মোহন-ঠাকুরের সন্তান রাঘব ঠাকুর। বছর ত্রিশেক বয়স। মাথায় বাবরী, বলিষ্ঠ স্বপুষ্ঠ দেহ। কপালে সিন্দূরের ত্রিগুণ্ড; হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা! বয়সে সকলের ছোট বলিয়া সকলের পশ্চাতে এক কোণে বসিয়া কলিকায় তামাক খাইতেছিলেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, “বিচার আপনারা করুন, খুড়ো মশাই। আপনাদের যা মত হবে আমারও—”

“তা কি হয়? দেওয়ানজী কহিলেন, মোহন-ঠাকুরের ছেলে তুমি বাবাজী! বয়সে যাই হও মোহনপুরে তোমার কথাই আগে।”

রাঘব ঠাকুরের গম্ভীর তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “সাধুচরণ!”

রাঘব ঠাকুরের দিকে ভয়ে সাধুচরণ চাহিতে পারিল না। চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় মাথা রাখিয়া আর্জনাৎ করিয়া কহিয়া উঠিল, “আর করব না, বাবাঠাকুর! এবারকার মত—”

“বেটা হারামজাদা! এবারকার মত! মোহন-পুরের জেলে তুই বেটা! তোর পান্ধীতে মুগী রেঁধে খেল সাহেব! মোহনপুরের মুখে কালী দিলি বুড়োকালে, হারামজাদা!”

সাধুচরণ রাঘব ঠাকুরের সম্মুখে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল মাত্র।

আয়রত্ব মহাশয় নস্ত্রদানী রাখিয়া খড়ম তুলিয়া লইলেন। সাধুচরণ আর্জনাৎ করিয়া উঠিল, “প্রাচিন্তির করব, বাবাঠাকুর!”

“প্রাচিন্তির! পয়সা পাবি কোথা রে? কে কে ছিল সে-পান্ধীতে?”

কাঁপিতে কাঁপিতে আরও পাঁচজন নত মস্তকে কম্পমান গলায় সাধুচরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জগু, মানকে, বৈকুণ্ঠ, বিপিন আর শ্যামাদান।

“মুগী আর পেঁয়াজের গন্ধ বড় ভালো রে হতভাগারা! আবার তুলসীর মালা রেখেছিস!”

জগু, মানিক, বিপিন প্রভৃতি সমস্তের কহিল, “আর হবে না, বাবাঠাকুর!”

“আর যদি কখনও হয় তো, দেখেছিস লাঠি, পাঁজর ভেঙ্গে দেব। গত বছর সনাতনের কথা মনে আছে তো? যা সব। এবার কালীপূজোর দিন পাঁচ মণ মাছ জোগাতে হবে তোদের ছ’ জনকে, দাম পাবিনি।”

ছয়টি প্রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

“তোদের পাড়াশুদ্ধ ছেলে-মেয়েকে এখানে পাঠাবি সেদিন, দুবেলা প্রসাদ পাবে। যা বেটারা! আজ রাত-ভোর কীর্তন ক’রে কাল সকালে স্নান ক’রে আসুবি, একটু শাস্তি দিবে দেব।” রাঘব ঠাকুর লাঠি কোলের উপর রাখিয়া আসন লইলেন।

বৃন্দাবন বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইল। অপরাধ গুরুতর। কায়স্থ পরিচয়ে পানীয় জল দিয়া সে এক সদ্ব্রাহ্মণের ধর্ম নষ্ট করিয়াছে, অভিযোগ। এইরূপ “পেবু নাম হই”—বৃন্দাবন যুক্তকরে প্রণাম করিল।

“কি রে, বেন্দা? বামুন-কায়েতকে জল খাওয়াতে সাধ হয় তো কণ্ঠি নিলেই পারিস। এসব দুর্ন্যতি কেন রে বেল্লিক!” রাঘব ঠাকুরের কথা শুনিয়া নত শিরে বৃন্দাবন দাঁড়াইয়া রহিল, জবাব দিল না।

“বেটা! অধার্মিক চণ্ডাল!” আয়রত্ব মহাশয় চীৎকার করিয়া খড়ম ছুঁড়িলেন। বাঁ হাতে লনাটের রক্ত ধারা চাপিয়া বৃন্দাবন বসিয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই উঠিয়া খড়মখানিতে মাথা ঠেকাইয়া সসজমে সেখানিকে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে তুলিয়া দিল।

“আর কে আহিস্ ?” রাঘবঠাকুর হাঁকিলেন। প্রাঙ্গণের অন্ধকার কোণ হইতে জন কয়েক লোক উঠিয়া আসিল। তাহাদের অঙ্গ কম্পমান, মুখ পাংশু।

“বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!!” উন্মাদের মত একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল।

“বাবাঠাকুর!”

“আরে ছুঁস্নি, ছুঁস্নি, বাগ্‌দী-বৌ! হোখা থেকেই বল।”

বাগ্‌দী-বৌ ছাড়িল না, রাঘব ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। সমস্ত অঙ্গ অশুচি হইয়া গেল, রাঘব ঠাকুর ক্রুদ্ধিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। “দিলি ছুঁয়ে সন্ধ্যা-বেলায়!”

বাগ্‌দী-বৌ তথাপি পা ছাড়িল না—“বাঁচান, বাবাঠাকুর।”

“আরে উৎপাত, হ'ল কি বল দেখি-তোরা?”

“মান-সরমুস্তম সব গেল, বাবাঠাকুর! শেষ বেলায় ঘাটে গিয়েছিল নারায়ী। নেয়ে আস্‌বার পথে ও গাঁয়ের রহিম সদ্দারের বেটা বলে কি না—। মেয়ে তো আমার কলনী ফেলে পালিয়ে এসেছে। নজ্জায় মাথা কাটা গেল, বাবাঠাকুর!”

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ সমাজপতিরা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আত্মীয় বংশী গোপের হাতের চিমটা বন্ বন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সাধু মাঝি হুজ্জ দেহ সহস্ৰ ঝুঁ হইয়া গেল। ক্ষতস্থানে খানিকটা ছাই লেপিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। বাম হস্তের বংশঘটি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া রক্তচক্ষু রাঘব ঠাকুর তিন লম্ফে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেন, অপরাধীর দল বিনা বাক্যে তাহার অঙ্গসরণ করিল, চণ্ডীমণ্ডপের অঙ্গন শূন্য হইয়া গেল।

দ্বায়বত্ত্ব মহাশয় শ্রামা বাগ্‌দীনীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন—

“ভয় করিস্নে, বাগ্‌দী-বৌ। আমরা আছি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখে নেব। আজ রাতে দেওয়ানজীর বাড়ীতে নারায়ীকে নিয়ে এসে শুয়ে থাকবি। রামু,

জগাই, বৈকুণ্ঠ যা বাগ্‌দী-বৌয়ের সঙ্গে—মা বেটাকে সাথে ক'রে দেওয়ান-বাড়ীতে পৌছে দে।”

ইহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহন-ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ দেনার দারে কয়েক হাত ঘুরিয়া শেষে দি মোহনপুঁব ড্রামাটিক ক্লাবে পরিণত হইয়াছে।

কোজাগরের পরের দিনের সন্ধ্যা। আগামী দীপাষিতার দিন বারোয়ারী কালীতলায় প্রতাপসিংহের অভিনয় হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছিল।

ক্লাব-ঘরে জন বিশেক লোক বালক এবং যুবক। কয়েক জোড়া তবলা, ডুগি, গুটি ছুই হার্মোনিয়াম, একখানা বেহালা ইত্যদ্যতঃ বিক্ষিপ্ত; বেড়ার গায়ে খানকয়েক স্বদেশী ও বিদেশী অভিনেতার বিচিত্র মুখ-ভঙ্গীর ছবি, গুটি কয়েক বার্বরী চুল, জরিদার চাপকান ও একখানি বড় আয়না।

হার্মোনিয়ামে সুর দিয়া চপল কহিল, “আচ্ছা ‘সি সার্পে’ ধ'রে দাওতো দেখি।” জন কয়েক বালক মুখের জগন্ত বিড়ি মাটিতে নামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, যুঝেছিল বেথা প্রতাপ বীর।’”

“ও কি হচ্ছে আনন্দ! চিতোর বল্চ অমন ক'রে যে! তোমার ‘ফিলিং’ হচ্ছে না মোটে। চোখটা একটু বোজ—মিঠে, রকমের ঘাড়টা একটু কাৎ ক'র, বাঁ পাটা একটু সাম্নে। বাস্। অনেকটা হ'য়েছে। মনে ভাবতে থাক তুমি সত্যিকার রাণা প্রতাপ, তাহ'লে ঠিক ‘পস্‌চার’ আস্বে। ওরে একটা সিগারেট দে।”

“মাষ্টার মশাইকে একটা সিগারেট দিয়ে যা কমল। আচ্ছা নাচগুলোতে আমাদের খুব সাক্ষেস্ হবে, না? কি বলেন, মাষ্টার মশাই? অনঙ্গ উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ভাবে মাষ্টারের নিকে চাহিল।”

মাষ্টার আশ্বাস দিয়া একবার গা মোড়া দিতে দিতে বলিলেন, “খুব সম্ভব। আমরা কল্‌কাত্তায় হোক্‌রা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান, আর তোমাদের জেলে ছুঁতোয় পাড়া থেকেই তিনটে প্লের নাচের ছেলে জুটে যায়, তাও

বিনি পয়সায়। কি? ভাব, না, খাব না গলা ভেরে যাবে।
তার চেয়ে চা আনো।”

“ওরে চায়ের জল চাপিয়ে দে।” তিন চার জন
সমস্বরে আদেশ দিল।

একটি যুবক হাঁকাইতে হাঁকাইতে আসিয়া উপস্থিত।

অনঙ্গ কহিল, “কি প্রেম-কোরক, হাঁপাতে-হাঁপাতে
আস্‌ছিস্‌ যে?”

“আর শুনো না, অনঙ্গ-দা! বুড়োরা সব বৈঠক
বসিয়েছে, বলছে জাত গেল, ধর্ম গেল। যত জ্বলে মালী
ছোট জাতের ছেলে নিয়ে নাকি আমাদের কারবার,
তাদের হাতের জল খেয়ে চা খেয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছি। হাঃ!
হাঃ!”

প্রেম-কোবক হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল।

“ফুলস্‌! ছোটজাত! আর ওঁরা সব বড় জাত!
ওঁরাই তো সর্বনাশ করলেন জাতটার! ও সব
গোড়ামি—”

অনঙ্গ কথিয়া উঠিল।

চপল হার্মোনিয়ামে সুর দিয়া কহিল, “ছোট জাতই
আমরা চাই, তারা থাকলেই জাত থাকবে।”

“ধা দিগাড় ধা, দিগাড় ধা ধা” বোল আওড়াইয়া
স্বধাংসু তবলায় টাটি দিয়া কহিল, “একবার তেরে কেটে
তাক্‌ ক’রে দিতে পার না, অনঙ্গ-দা?”

“আর ছ’টি বছর সবুর ক’র স্বধাংসু, মোহনপুরের
চেহারা একদম বদলে দেব, দেখে নিও।” অনঙ্গ
সিগাবেট ধরাইল।

অনঙ্গ আসিয়া দাঁড়াইল বিপিন মালী। তাহার দৃষ্টি
শক্তি।

“কি রে, বিপিন, অত শুকনো যে?”

“জ্বাঞ্জে বাবু কি বলব, আপনাদের চরণে আছি।”

“ব্যাপার—কি বলতো দেখি। আবার বুঝি সমাজে
‘ঠেকা’ করেছে, না?”

“না, বাবু। বাড়ীর মেয়েদের তো ঘাটে যাওয়া বন্ধ
হ’ল, বাবু। কাল আমার বোনকে ঘাটের পথে ইসারায়
ও পাড়ার কবির দেখে ডাকছিল, আজ আমার মেয়ের
হাত ধরে টেনেছে। আর ভয় দেখিয়েছে যদি বোনকে
তাদের বাড়ী না পাঠাই তবে বাড়ীতে চড়াও করবে।”

“তুই কি করেছিস্‌?”

“গরীব মানুষ, আমি কি করব, বাবু? আপনারা একটা
বিহিত করুন।”

“চৌকীদারকে বলিস্‌ নি?”

“বলেছি। সে ‘গা’ করলে না। থানায় যেতে
বলে। সে তো আবার দশ ক্রোশ পথ, ঘর ফেলে যাই
কি ক’রে? আপনারা আছেন বাপের মত—” হাউ হাউ
করিয়া বিপিন মালী কাদিয়া উঠিল।

“এই তোমাদের গাঁয়ের একটা মন্ত ‘ডুবাক’—কাছে
থানা নেই।” বলিয়া মাষ্টার মহাশয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক
দিলেন।

“সেটা ঠিক! ঘে-রকম অবস্থা, থানা কাছে না
থাকলে চলবার আর উপায় নেই। কাগজে এসব নিয়ে
লেখালেখি করবারও দরকার হ’য়ে পড়েছে দেখছি।
শেষে কোন্‌দিন গুণাগুণো আমাদেরই মাথা ফাটিয়ে
দিয়ে যাবে।

আচ্ছা তুমি যাও বিপিন, বাড়ীতেই থেকো কোথাও
যেয়ো না। মেয়েদের আর ঘাটে জল আনতে পাঠিস্‌ না।
কাল সকালে একবার এসো। ডেবে-চিন্তে যা হয় করা
যাবে। হঠাৎ তো কিছু করা যায় না।”

বিপিন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে সমবেত কণ্ঠস্বরে
সমস্ত পল্লী মুখর হইয়া উঠিল—

“অলিল যেখানে সেই দাবাঘি

—সে রূপ-বর্হি পদ্মিনীর।

বাঁপিয়া পড়িল সে মগ্ন আহবে

যবন-সৈন্ত অজবীর।”

বিশ্ব-সৃষ্টির রূপ*

শ্রী নিখিলরঞ্জন সেন

অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে তাহার গায়ে অসংখ্য জ্যোতিঃকণার সমষ্টি দেখিয়া মনে হয় ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! পৃথিবীর উপর কয়েক হাত জমি আমাদের বাসের পক্ষে যথেষ্ট। দুই তিন ক্রোশ পথকে দূর বলিয়াই মনে হয় এবং তাহার বেশী হইলে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী না হইলে স্থান পরিবর্তন দুঃসম্ভব হইয়া উঠে। এখনও একদেশ হইতে অন্যদেশ আমাদের নিকট বহুদূর বলিয়াই বোধ হয়, এবং যাতায়াতে মাসাধিক কালও লাগিয়া থাকে! ক্ষুদ্র কয়েক হাতই দূরত্বের পরিমাণকালে আমাদের মাপকাঠি। ইহার সাহায্যে পৃথিবীর গা মাপিয়া বলি তাহার পরিধি বা বেড় ২৫০০০ মাইল। তখন ভারি চার পয়সার পোষ্ট-কার্ড যে এক মাসের মধ্যে ইহার অর্ধেক পথ চলিয়া মাছুষের পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরকে জানাইয়া দেয় তাহা মানুষের অসীম বুদ্ধিশক্তি ও কার্যতৎপরতার পরিচায়ক। আজকাল রেডিওর প্রসাদে একদেশের বার্তা মুহূর্তে অন্যদেশে চলিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা দ্রুতগামী বাহন আর কিছু আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাই জ্যোতির্বিদ যখন বলেন যে, এই দ্রুত-বাহন ও নিকটবর্তী কোন তারার খবর আমাদের নিকট পৌছাইয়া দিতে অনেক বৎসর লাগাইয়া দেয় তখন ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকাণ্ড তাহাতে সন্দেহের কারণ আর কি আছে?

কিন্তু মাছুষ বড়কে বড় এবং ছোটকে ছোট বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না। বড় হইলেও কত বড়, এবং দুইটি বড় বস্তুর তুলনা করিয়া একটি অপরাটির কত গুণ বড়, তাহা না বলিলে উহাদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমরা

করিতে পারি না। অনেক বড় বস্তুর ক্ষেত্রেও উহাদের মধ্যে তুলনায় কোনটি সর্বাপেক্ষা ছোট, কোনটি ইহার চেয়ে বড়, এইরূপ শ্রেণী-বিভাগেব সাহায্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে স্পষ্ট করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। আকাশের দিকে তাহাইয়া যে-সকল জ্যোতিষ্ক আমরা দেখিতে পাই তাহাদেরও, তারতম্য অনুসারে, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অধিকতর স্পষ্টভাবে জানিবার প্রয়াস আমাদের মধ্যে প্রবল। যদিও চক্ষে দেখিতে সবগুলি একই জিনিষ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, ইহাদের মধ্যেও তারতম্য যথেষ্ট আছে। ইহারা সকলে একই জাতীয় নহে। ইহাদের কতকগুলি একই আদিম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছে; আবার কতকগুলি ক্রমবিকাশের শেষ অবস্থায় আসিয়া শক্তির অপচয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অসীম শূন্যে ইহারা নানাতাবে অবস্থিত। আকাশে তাহাদের বেশ একটা জিওগ্রাফিও আছে। এইসব বিষয়ে গত বিশ বৎসরের আলোচনার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ যে-সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আপনাদের নিকট তাহার কিছু আভাস দেওয়াই আজ আমার উদ্দেশ্য।

মানব-সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, পূর্ব ও পশ্চিমে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং সৌরজগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেন। আমাদের পক্ষে সূর্য্যই সর্বাপেক্ষা প্রতাপাধ্বিত জ্যোতিষ্ক। চতুর্দিকে আকাশে ইহা আলো ও তাপ বিকিরণ করে। এই আলো ও তাপশক্তি সূর্য্যের ভিতর কি প্রকারে উৎপন্ন হইতেছে, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের এখনও নাই।

বিজ্ঞানের আলোচনা ও নানা অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা শক্তি

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ছাত্র-সভে, বাঘবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পঠিত।

(Energy) বলি তাহার সৃষ্টি ও লয় অসম্ভব। শক্তি কেবল এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয় মাত্র। কল্পনা পোড়াইয়া আমরা তাপশক্তি পাই। এই তাপশক্তি জলকে তরল অবস্থা হইতে গরম বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করে। এই বাষ্প-নিহিত শক্তিকে নানাপ্রকার ব্যবহার সাহায্যে গতিশক্তিতে পরিণত করিয়া রেলগাড়ী চালান হয়। কয়লার তাপশক্তি সমস্তই এই-রূপ গতিশক্তিতে পরিণত হইয়া যায় না। তাহার পূর্বেই কিয়দংশ অন্তর্প্রকারে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু ঘোড়ের উপর এইসব রূপান্তরিত শক্তি ও গতিশক্তি একত্র করিলে সম্পূর্ণ তাপশক্তির সমান হইবে। এই শক্তির অবিনশ্বরতা বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটি মূল কথা। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। সূর্যের তাপশক্তি তাহার অন্তর্নিহিত কোন্ শক্তির রূপান্তর এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কিছু নাই। এক শ্রেণীর পদার্থ আছে বাহা স্বতঃই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহারা ইংরেজীতে (Radioactive) তেজ-বিকিরক বলিয়া পরিচিত। বিখ্যাত রেডিয়াম এই শ্রেণীর একটি বস্তু। এইরূপ পদার্থ সম্ভবতঃ সূর্য্যেও আছে। এবং তাহাদের বিনাশও আপনা হইতেই চলিতেছে। কিংবা হয় ত সূর্য্যদেহের প্রচণ্ড তাপে তথাকার পদার্থ-সকল ক্রমাগত তাহাদের আদি অণু-পরমাণু অবস্থা অতিক্রম করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে। পদার্থের সত্তা (mass) এবং শক্তি মূলতঃ অভিন্ন, ইহা বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। সুতরাং একের রূপান্তরে অন্যের উৎপত্তি স্বাভাবিক। এই রূপান্তরের অবশ্যজাবিত্ব হেতু পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে, সৌরদেহের বিনষ্ট পদার্থ হইতে উৎপাদিত শক্তির সহিত তাহার তাপশক্তির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

যেমন পৃথিবী একটি গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে বৎসরে একবার ঘুরিতেছে, এইরূপ আরও সাতটি গ্রহ সৌরমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া প্রত্যেকেই কম বা বেশী সময়ে সূর্যের চারিদিকে এক একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। ইহাদের মধ্যে শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে খালি চোখেই দেখা যায়। বৃহস্পতি (Mercury) সূর্যের খুব নিকটে বলিয়া প্রথমে আলোতে

অদৃশ্য হইয়া থাকে। শনিগ্রহ অপেক্ষাও দূরে, সৌরমণ্ডলের প্রায় সীমানার দিকে, ইউরেনাস (Uranus) ও নেপচুন (Neptune) নামে আরও দুটি গ্রহ আছে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তাহাদিগকে কখনও দেখা যায় না। সেইজন্য প্রাচীনেরা এই গ্রহ দুইটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জাভুয়ারীর রাতে ইতালীয় জ্যোতিষী গ্যালিলিও যখন তাঁহার দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া বৃহস্পতি দেখিতে পাইলেন তখন হইতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। ইউরোপের সর্বদেশীয় ধর্মযাজকের চোখরাজানি সবেও শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া গেল যে, সূর্য্য সৌরমণ্ডলে স্থির হইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রভৃতি অসংখ্য গ্রহগণ তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু তাহাই নয়। সূর্য্য ও তাহার চতুর্দিকে আবর্তমান গ্রহ যেমন একটি সমষ্টি, সেইরূপ পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলি, প্রত্যেকেই নিজে নিজে কতকগুলি ক্ষুদ্রতর উপগ্রহ লইয়া, এক-একটি সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহা পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। এইপ্রকার বৃহস্পতি ও শনি প্রত্যেকের ৯টি করিয়া উপগ্রহ আছে—৯টি চন্দ্র বৃহস্পতি ও শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইউরেনাস ও নেপচুনেরও নিজ নিজ উপগ্রহ বর্তমান। বৃহস্পতির সৌরজগতের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতের সমষ্টি একটি বিরাট বিষয়। ইহা ছাড়া আরও একটি আশ্চর্য্য রকমের শৃঙ্খলা সৌরজগতে বিদ্যমান। দূরবীক্ষণ ও গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে ক্রমশঃই তাহা আমাদের নিকট স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কোন একটি বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া অন্য একটি বস্তু তাহার চারিদিকে ছই প্রকারে ঘুরিতে পারে—যথা ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেইদিকে, অথবা তাহার উল্টাদিকে। সূর্যের চারিদিকে যে-সকল গ্রহ ঘুরিতেছে, উহারা আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে ছইদিকের যে-কোন দিকে ঘুরিতে পারিত; কিন্তু সকলেই যে দল বাঁধিয়া একদিকে ঘুরিতেছে ইহা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেকটি গ্রহের উপগ্রহগুলিও ঠিক সেইদিকে নিজ নিজ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রত্যেক গ্রহ কিংবা তাহার উপগ্রহের কক্ষ প্রায় একই সমতলে (plane)

অবস্থিত। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের ৯০০টি সমতল যে যেমন ভাবে থাকিতে পারিত, কিন্তু এই সমতলগুলির মধ্যে পরস্পর কোণ (angle) বেশ ছোট। খুব মোটামুটি ভাবে বলা যায়, কক্ষগুলি প্রায় এক সমতলেই অবস্থিত। সৌরজগতে এই বিরাট শৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল, ইহা গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি বিবয়ম সমস্যা। এই সমস্যা নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে।

সৌরজগতের বাহিরে প্রকাণ্ড নক্ষত্র জগৎ। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকাইলেই অসংখ্য তারা আমাদের চোখে পড়ে। কোনটি বা বড় ও উজ্জ্বল, আবার কোনটি বা ছোট ও ক্ষীণজ্যোতিঃ। পৃথিবীর বহুপূর্বেই গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহার প্রত্যেকটি আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে। সূর্যের মত ইহারও আলোক ও তাপ বিকিরণ করে। সেইজন্য ইহাদের প্রত্যেকটিকেই এক-একটি সূর্য মনে করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সূর্যের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কতদূর ঘনিষ্ঠ, তাহা এই আলোচনা-প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে। অনেকে মনে করেন, এইসব তারার অধিকাংশই সৌরজগতের মত গ্রহ-উপগ্রহ-বেষ্টিত। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ কবিরার কিছু কারণ আছে। চোখে দেখিয়া আমরা প্রত্যেকটি তারাকেই একটি স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক বলিয়া মনে করি। কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় তাহাদের অনেকগুলিই দুইটি তাবার সমষ্টি। এইপ্রকার তারাকে আমরা যুগল-তারা* বলি। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় যে, দুইটি তাবাই পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতেছে, অথবা দুই-ই তাহাদের ভারকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই প্রদক্ষিণের সময় দেখিয়া গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহাদের একটি অপরটি অপেক্ষা কতদূর ভারী তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। কোন তারার নিকট একটি মানুষকে যদি আমরা কল্পনা করি, তবে সে সে স্থান হইতে আমাদের সূর্যকেও একটি তারার মত দেখিবে। গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতিই সর্বাপেক্ষা বড়, অল্পগুলি তাহার তুলনায় খুব ছোট। সেইজন্য তারার নিকট

হইতে সূর্য ও বৃহস্পতিকে একত্রে একটি দূরবর্তী যুগল-তারার স্থায় দেখাইবে। কিন্তু তাহাদের একটির ওজন আরেকটির প্রায় হাজার গুণ। অথচ আমরা পৃথিবী হইতে যত যুগল-তারা দেখিতে পাই তাহারা সকলেই ওজনে একটি আর একটির প্রায় সমান কিংবা কয়েকগুণ মাত্র বড়। সূর্য ও বৃহস্পতির মত এত বড় বৈষম্য আর কোথাও লক্ষিত হয় না। অতএব সৌরজগতের মত জগতের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া এইপ্রকার জগৎ নক্ষত্র জগতে একেবারে নাই, একথা এখনই বলিলে কিছু বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই হইবে।

সৌরজগৎ ও নক্ষত্রজগতের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড শূন্য। ইহার মধ্যে আমাদের আর কোন পাড়াপ্রতিবেশী নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণতঃ দূরের জিনিষ বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখা যায়। গ্রহগুলি চোখে দেখিতে তারার মত, কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বেশ বর্ষুলাকার মনে হয়। কিন্তু তারগুলি সৌরজগৎ হইতে এত দূরে যে, দূরবীক্ষণে তাহাদের একটিও বড় দেখায় না। সৌরজগৎ হইতে অল্প কয়েকটি তারার দূরত্ব ছাড়া, তারা সম্বন্ধীয় বিশেষতঃ তারাদেরের প্রায় সমস্ত রহস্যই গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রহস্য আমরা এখন ভেদ করিতে পারিয়াছি। এই আলোক-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্রের মেরুদণ্ড। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা এই স্থলে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

গত অর্ধশতাব্দী হইতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আলোক একটি বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ। জলের উপর তরঙ্গ আমরা চোখে দেখিতে পাই। স্থির জলের কোথাও একটু নাড়া পড়িলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই তরঙ্গের একটি বেগ * আছে। এক সেকেন্ডে

* Double Star.

* ইং Velocity.

তরঙ্গ যতদূর বিস্তৃত হয় তাহাকেই উহার বেগ মনে করা যাইতে পারে। তরঙ্গের একটি দৈর্ঘ্যও আছে। বায়ুপ্রবাহেও জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, আবার প্রকাণ্ড আলোড়নেও হইয়া থাকে। কিন্তু দুইয়ের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। প্রত্যেক তরঙ্গে একটি চড়াই ও একটি উৎবাহি থাকে। এক চড়াই হইতে পরবর্তী চড়াই যত দূর তাহাকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা তরঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। কোন্টো কোন্ শ্রেণীর তরঙ্গ, তাহা তাহার দৈর্ঘ্য বলিলেই বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। তরঙ্গ-সৃষ্টির দ্বারা তাহার একটি বাহন দরকার, যাহার ভিতর তরঙ্গ বিস্তার লাভ করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে ঈথর নামে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহারই ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহন করিবার ক্ষমতা ঈথরের আছে। কোন স্থানে আলো থাকিলে সেই স্থানের ঈথর-সাগরে একটা বৈদ্যুতিক কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পন আসিয়া যখন আমাদের চোখে পড়ে তখন তাহা আমাদের মস্তকে আলোকের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। উত্তাপও সেইপ্রকার ঈথরেরই তরঙ্গ। বিভিন্নতা কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্য *। উত্তাপতরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু বড়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, দুইই খুব ছোট। আলোর রং তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এমন কি রং ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে যদি একই জিনিষ মনে করি, তাহাতে আমাদের হিসাব ও গণনা সম্পূর্ণ নিভুল থাকিবে। সূর্যের শাদা আলো ত্রিশির কাচের † সাহায্যে নানা রঙের আলোতে বিভক্ত করা যায়। তাহার এক দিকে বেগুনি, অন্য দিকে লাল। ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। তরঙ্গগুলি বেগুনি হইতে আরম্ভ করিয়া লালের দিকে ক্রমশঃ বড় হইয়া যাঠিতেছে—আরও বড় তরঙ্গগুলি চোখে দেখা যায় না।

* ইং Wave length.

† ইং Prism

তাহারা উত্তাপ সৃষ্টি কবে। সূর্যের শাদা আলো নানা রঙের আলোর সমষ্টি মাত্র। রেডিও যে বিনা তারে বার্তা বহন করে তাহাও এইপ্রকার ঈথরের তরঙ্গ। তবে তাহাদের দৈর্ঘ্য প্রকাণ্ড বড়। কিন্তু এই প্রকার-বিভিন্ন শ্রেণীর তরঙ্গের বেগ একই। এই বেগই আলোর বেগ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির নির্ণয় করা হইয়াছে যে, আলোক সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল গমন করে অর্থাৎ আলোক-রশ্মি এক সেকেন্ডে প্রায় আট বার পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া ঘুরিতে পারে। বিভিন্ন প্রকার আলোর সংমিশ্রণে যে ঘৌপিক আলোব সৃষ্টি হয় তাহাকে পৃথক করিবার নানা প্রকার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকদের জানা আছে। আলোককে ত্রিশির কাচের ভিতর প্রবেশ করাইয়া তাহাকে বিভক্ত করিবার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এক খণ্ড কাচের উপর যদি কঠিন পদার্থ দিয়া পাশাপাশি বহু রেখা টানা যায় তাহার উপর আলো পড়িলে তাহা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুসারে নানাবর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়। এই-প্রকার যে-কোন আলোককে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যস্থিত বিভিন্ন রঙ বা আলোক-কম্পনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এই আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের বর্তমানে এত উন্নতি হইয়াছে যে, এক ইঞ্চির এক কোটি ভাগের এক ভাগকে মাপকাঠি করিয়া এখন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য স্থির করা হইয়া থাকে। সূর্য কিংবা নক্ষত্রের আলোককে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অনেক রহস্য আজকাল উদ্ঘাটন করা হইতেছে।

সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি যে, সকল আলোই সমান। সূর্যের কিংবা তারার আলোতে কোনই প্রভেদ নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে পদার্থ জ্বলিয়া আলো বাহির হয়, তাহারই ধর্ম সেই আলোকে বর্তমান থাকে। রাসায়নিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আমরা যে-সব পদার্থের সঙ্গে পরিচিত তাহাদের প্রায় সবগুলিই কতকগুলি মৌলিক পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। অল্পজ্ঞান ও জলজ্ঞানের যোগে জলের উৎপত্তি। অল্পজ্ঞান ও জলজ্ঞান এই দুইটি মৌলিক পদার্থ। অনেক ধাতুও মৌলিক পদার্থ, যথা স্বর্ণ, বোপা, লৌহ, তাম্র, ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নামে

পরিচিত আরও দুইটি মৌলিক ধাতু আছে, ইহারা অনেক পদার্থে বর্তমান। এইসকল মৌলিক পদার্থ জলিয়া যে আলোক বিকিরণ করে, সেই আলোককে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এই আলোক সাধারণতঃ কয়েকটি বিভিন্ন রংয়ের আলোকের সমষ্টি। বিশ্লেষণান্তে তাহা কয়েকটি বিশিষ্ট আলোক-দৈর্ঘ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং বিশ্লেষণ-যন্ত্রের যে স্কেলের উপর দৈর্ঘ্য মাপা হয়, তাহার উপর যথাস্থানে ব্যবস্থা অল্পসারে কয়েকটি উজ্জ্বল কিংবা কালো রেখা রূপে প্রতীয়মান হয়। রেখার স্থান দেখিয়াই ইহা কোন দৈর্ঘ্যের আলোক তাহা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইসব রেখাকে আমরা বিশ্লেষণ-রেখা * বলিব। এক একটি মৌলিক পদার্থ এক এক প্রকার বিশ্লেষণ-রেখার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রায় সকল মৌলিক পদার্থেরই বিশ্লেষণ-রেখা নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং কোন নূতন পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোককে বিশ্লেষণ করিয়াই পূর্বোক্ত রেখার তুলনা করিলে তাহাতে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে বলা যাইতে পারে। এই বিশ্লেষণ যন্ত্র জ্যোতিষের হস্তে এখন এক মহা অস্ত্র। স্বদূর শূন্যে যে তারা মিট মিট করিয়া জলিতেছে, তাহার অনেক গোপন-কাহিনী এই ক্ষুদ্র যন্ত্রে আলিয়া ধর্য পড়ে। কোন্ তারায় কি কি মৌলিক পদার্থ জলিতেছে, এমন কি অনেক স্থলে তাহাদের তাপমান ও পর্যন্ত এখন আর জ্যোতিষের নিকট লুক্কায়িত নাই। এই বিশ্লেষণ-যন্ত্রের ব্যবহার অতি আশ্চর্যজনক। ইহা দ্বারা তারার গতিও নির্ণয় করা যায়। কোন-একটি তারা সৌরজগতের দিকে কত বেগে আসিতেছে, বা কত বেগে বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও এই বিশ্লেষণ দ্বারা বলিয়া দেওয়া সহজ। যে-বস্তু হইতে তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে তাহার সমুখ কিংবা পশ্চাৎ দিকে গতি অল্পসারে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেইজন্য যে-তারা সৌরজগতের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমাদের

নিকট ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাহার বিশ্লেষণ রেখাগুলি সেই তারার উপাদান-পদার্থের বিশিষ্ট বিশ্লেষণ-রেখা হইতে একটু বেগুনি রং এর দিকে সরিয়া যাইবে। বেগুনি রং এর দিকে সরার অর্থ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হইয়াছে। এই সঙ্কেচন কিংবা প্রসারণের মাপ হইতে গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অল্পসারে আলোক-উৎপাদক পদার্থের বেগ নির্ণয় করা যায়। অনেক তাবা এবং তারাপুঞ্জের বেগ এই প্রকারে নির্ণয় করা হইয়াছে। আমাদের নিকটবর্তী তারার কথা বলিতে গেলে (Cassiopeiae) ক্যাসোপিয়া নামক তারাটি সেকেন্ডে ছয়মাইল বেগে সৌরজগতের দিকে আসিতেছে; লুক্ক * নামে আকাশের সর্কীপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটি সেকেন্ডে প্রায় পাঁচ মাইল বেগে আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। এইপ্রকার সর্কীপেক্ষা ক্ষতগামী তারার গতি গড়ে সেকেন্ডে ১০১২ মাইল। কিন্তু এক-প্রকার তারাপুঞ্জ আছে তাহাদের বেগ বড় প্রবল। গড়ে সেকেন্ডে প্রায় ১৫০ মাইল। এই বিষয়ে আলোচনা আমরা একটু পরে করিব।

আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা সূর্যের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় যে, তাহাতে বেশীর ভাগ অয়রান, জলজান, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) ও লোহা ধাতু বর্তমান। ইহা ছাড়াও আরো অনেক ধাতুর বিশ্লেষণ-রেখা দেখা গিয়াছে। যবক্ষারজান, আবুসেনিক, গন্ধক ও স্বর্ণ এই কয়টি সাধারণ পরিচিত পদার্থের অস্তিত্ব সূর্যে এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য সৌরদেহে তাহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সময়ের সঙ্গে এ বিষয়ের জ্ঞান আমাদের আরও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। সূর্যের আলোকের প্রখরতা পরীক্ষা করিয়া যে-স্থানে পূর্বোক্ত পদার্থ জলিয়া আলোক-তরঙ্গ সৃষ্টি হইতেছে তাহার তাপের পরিমাণ গণনা করা হইয়াছে। ইহা প্রায় ৬০০০ হাজার ডিগ্রি। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, সূর্য একটি প্রকাণ্ড বর্তুলাকার জলন্ত পদার্থ। এই

* ইং Spectral lines.

† ইং Temperature.

* ইং Sirius

বর্তমানের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা প্রায় ১০০ গুণ বড় এবং তাহার আকৃতি পৃথিবীর এক লক্ষ গুণ। এই ভীমাকার সৌরদেহের অভ্যন্তরে কি হইতেছে সে-বিষয়ে আমাদের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত কোন জ্ঞান নাই। সূর্যের মূল অবয়বের বাহিরে প্রকাণ্ড একটা জলন্ত বায়ু-মণ্ডল আছে, সেই বায়ু-মণ্ডলেই উপরোক্ত পদার্থগুলি বিদ্যমান এবং তাহারই খবর আমরা আলোক-বিস্তেৰণ-যন্ত্রে জানিতে পারি।

আমাদের সূর্য যে আকাশের তারাগুলিরই জ্ঞাতি তাহা আমরা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। তারা হইতে যে-আলোক আসে তাহা বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে কতকগুলি বিশ্লেষণ-রেখা পাওয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে সূর্যালোকের বিশ্লেষণ-রেখার নিকট-সম্বন্ধ আছে। নানা প্রকার পরীক্ষার ফল বিশদরূপে আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, আকাশের তারাগুলিকে মোটামুটি ৬ শ্রেণীতে ভাগ করা বাইতে পারে, এবং এই শ্রেণীভাগের মূলে ক্রমবিকাশের ধারা বিদ্যমান। এই ছয়টি শ্রেণী জ্যোতিষী-গণের নিকট যথাক্রমে বি (B), এ (A), এফ (F), জি (G), কে (K), এম (M) * এই ছয়টি অক্ষর দ্বারা পরিচিত। বি শ্রেণীর তারা প্রায়ই বেশ একটু উজ্জ্বল; রং শাদা বরং একটু নীলাভ। আলোক-বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে, ইহাদের মধ্যে হিলিয়াম নামক পদার্থ বেশী আছে; অতি অল্প পরিমাণে জলজানের বিশ্লেষণ-রেখাও দেখা যায়। কোন ধাতু আছে বলিয়া মনে হয় না। তারাগুলি অতি উষ্ণ; তাপমানও খুব বেশী, প্রায় ১৬০০০ ডিগ্রি। ওরায়ান (B Orion) নামক তারা এই শ্রেণীর। এ শ্রেণীর তারায় হিলিয়াম প্রায় পাওয়া যায় না। দেখিতে শাদা; প্রচুর পরিমাণে জলজান বর্তমান; সামান্য ধাতুর লেশও কখনও পাওয়া যায়—তাপমান প্রায় দশ হাজার ডিগ্রি। এফ শ্রেণীর তারায় জলজান ও কেলসিয়াম বিদ্যমান; জলজানের রেখাগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া

আসিতেছে; কেলসিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর রেখা স্পষ্টতর; তাপমান প্রায় ৭০০০ ডিগ্রি। এই উপরোক্ত তিন শ্রেণীর তারা শাদা। জি শ্রেণীর তারা দেখিতে একটু হলদে; জলজানের রেখা অতিব ক্ষীণ। ক্যালসিয়ামের রেখা খুব প্রবল; লৌহ, মেনগেনেসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর রেখাও বিদ্যমান, এবং ইহাদের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বন্ধিষ্ণু। আমাদের সূর্য এই শ্রেণীর তারা। কে শ্রেণীর তারা গাঢ় হলদে; জলজান একেবারে অন্তর্হিত; বহু পরিমাণে ধাতুর রেখা বিদ্যমান; তাপমান প্রায় ৪৫০০ ডিগ্রি। দুইটি বিখ্যাত তারা আর্কটুরাস (Arcturus) এবং অ্যালডিবেরন (Aldebaran) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এম শ্রেণীর তারা দেখিতে লাল; সূর্যে যে-সব ধাতু আছে তাহার অনেকগুলি বিদ্যমান। ধৌগিক পদার্থ * জলিয়া যে আলো নির্গত হয় তাহার বিশ্লেষণ-রেখা-গুলি একটু বিশেষ প্রকারের। তাহাতে অল্প কয়েকটি বিশ্লেষণ-রেখার পরিবর্তে রেখা-সমষ্টির সৃষ্টি হয়। ইহার। এত কাছাকাছি যে, দেখিলে একটি মাত্র প্রশস্ত রেখা বলিয়া মনে হয়। এই রেখা-সমষ্টির আবির্ভাবে বোঝা যায় যে, ধৌগিক পদার্থ হইতে আলো বাহির হইতেছে। এম শ্রেণীর তারার আলোতে এইপ্রকার রেখা-সমষ্টি পাওয়া যায়। এই তারাগুলি নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত শীতল। প্রথমোক্ত শ্রেণীগুলির তারা অতি উষ্ণ বলিয়া সমস্ত ধৌগিক পদার্থ ভাদিয়া মৌলিক পদার্থে পরিণত হইয়াছে। এম শ্রেণীর তারার তাপমান প্রায় ৩৫০০ ডিগ্রি।

এই ছয় শ্রেণীর তারা পরীক্ষা করিয়াই মোটামুটি একটা ক্রমবিকাশের কথা মনে হয়। তারাগুলি অত্যন্ত উষ্ণ। বি শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আলোকের ও রঙের পরিবর্তন হয়। ক্রমে বেশী শীতল হইলে তারাকান্তিত মৌলিক পদার্থগুলি একত্রিত হইয়া ধৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। পরে বোধ হয় সম্পূর্ণ শীতল হইয়া অদ্ভুতকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই মতবাদ অনেক দিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি দশ বৎসর যাবৎ রাসেল

* শ্রেণী বোধক এই ছয়টি অক্ষর B, A, F, G, K, M—ইহাদের কোন বিশিষ্ট বাংলা নামের প্রয়োজন নাই। কারণ, সকল বিভিন্ন দেশেই বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিকগণ এই অক্ষর কয়টিকেই পরিবর্তন না করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নামক এক জ্যোতির্বিদ অন্ত্র একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং তাহাই আজকাল বৈজ্ঞানিক-সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

সকল তারা যে সমান উজ্জ্বল নয় তাহা* চোখে দেখিয়াই বোঝা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তারার জ্যোতি * অহুসারে তাহাদের কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। আমরা এই জ্যোতির মাপকে তাহার মান μ বলিব। প্রথম মানের তারা খুব উজ্জ্বল, এবং আকাশে ২১০টির বেশী নাই। দ্বিতীয় মানের তারা তাহা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল। ষষ্ঠমানের তারা পর্যন্ত খালি চোখে দেখা যায়। তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ তারা দূরবীক্ষণ-যন্ত্রেব সাহায্যে দেখিতে হয়। বর্তমানে আমেরিকার মাউন্ট উইলসন্ মানমন্দিরের ভীমকায় দূরবীক্ষণ দ্বারা উনবিংশমানের তারার আলোক চিত্র লওয়া হইয়াছে। তারার এই মান-পরিমাপ অতি সূক্ষ্ম। যে-কোন শ্রেণীর তারা অপেক্ষা তাহার ঠিক উর্দ্ধতন শ্রেণীর তারা হইতে আমরা প্রায় আড়াই গুণ বৈশী আলো পাইয়া থাকি। যথা প্রথম মানের তারা দ্বিতীয় মানের তারা অপেক্ষা প্রায় আড়াইগুণ বৈশী আলো দেয়; তৃত্য তাহার জ্যোতি ২০ গুণ বৈশী। ফটোমিটার নামক যন্ত্রেব সাহায্যে যে-কোন আলোর জ্যোতি অতি সূক্ষ্ম ভাবে মাপা যায়। তাহা দ্বারা তাহার জ্যোতি বা মান বিস্তৃতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। উল্লিখিত বি.এ.এফ. প্রভৃতি শ্রেণীতে কোন্ মানের কত তারা আছে তাহা রাসেল (Russel) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। তাহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, অনেক শ্রেণীর মধ্যেই খুব অল্প ও উর্দ্ধ মানের তারকা দুই-ই বিত্তমান; অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীতেই খুব উজ্জ্বল ও ক্ষীণ তারা বর্তমান। বি ও এ শ্রেণীতে উর্দ্ধমানের তারা প্রায় নাই। অতএব এই শ্রেণীর তারার জ্যোতি খুব প্রধর। এম্ শ্রেণীর গাঢ় লাল তাবগুলির মান অতি উচ্চ। ইহাদের জ্যোতি খুব অল্প। কে ও এম্ শ্রেণীর হলুদ ও দীপ্য লাল তাবগুলির মধ্যে প্রায় সবই হয়

অতি প্রধর-জ্যোতি, কিংবা অতি ক্ষীণ-জ্যোতি। মধ্যম-জ্যোতির তারা অতি অল্প। অন্তান্ত শ্রেণীব মধ্যে মধ্যম-জ্যোতির তারার বাহুল্য আছে। রাসেল কে ও এম্ শ্রেণীর প্রধর-জ্যোতির তারাগুলিকে দুইটি নাম দিয়াছেন—জায়েন্ট এবং ডোয়ার্ফ; * আমরা তাহাদিগকে ‘দানবতারা’ ও ‘বামনতারা’ বলিব। ১৯১৩ খৃঃ পর্যন্ত বহু পরিমাণে বামনতারা আমাদের জ্ঞাত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিস্তৃত ভাবে তারার মান নির্ণয় করার পর হইতে দানবতারার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

তারার মান তুলনা করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক জ্যোতি মাপা যাইতে পারে। কিন্তু দূরত্ব হেতু তারার স্বজ্যোতির μ ধারণা আমবা করিতে পারি না। যদি তারাটিকে ধরিয়া সূর্যের নিকট রাখা হইত তবে তাহার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতির যতগুণ হইবে তাহাকে তারার স্বজ্যোতি বলিব। যে জ্যোতি আমরা পরীক্ষা দ্বারা মাপি তাহা তারার ঠিক স্বজ্যোতি নহে। দূরত্ব হেতু স্বজ্যোতি অনেক স্নান হইয়া যায়। বস্তুতঃ আমাদের চোখে আসিয়া যে-আলো পড়ে তাহারই জ্যোতি আমরা মাপিয়া থাকি। কিন্তু তারার দূরত্ব জানা থাকিলে এই জ্যোতি হইতেই তারার স্বজ্যোতি অতি সহজে গণনা করা যাইতে পারে। অ্যাডাম্‌স্ (Adams) নামক এক জ্যোতির্বিদ তারার দূরত্ব নির্ণয় করিবার এক অভূত উপায় সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার উদ্ভাবিত প্রণালী অহুসারে এখন তারার মান হইতে তাহার স্বজ্যোতি নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। এই আবিষ্কারের পর হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইল যে, একই শ্রেণীর তারার মধ্যে স্বজ্যোতির বিশেষ তারতম্য আছে। কোনটি অতি

* ইং Brightness

+ ইং Magnitude

* ইংরেজ জ্যোতির্বিদগণ Giants ও Dwarfs নামকরণ করেন। ফরাসী ও জার্মান জ্যোতির্বিদগণ ইহা নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া যথাক্রমে Geantes ও Naines এবং Giganteu ও Zwerge ব্যবহার করিতেছেন। আমি ‘দানব’ ও ‘বামন’ নামে ইহাদের পরিচয় দিয়া, আশা করি, হাস্যাস্পদ হইব না।

+ ইং Absolute brightness

স্বল্প-জ্যোতি, কোনটি তীক্ষ্ণজ্যোতি। সুতরাং একই শ্রেণীতে দানব ও বামন উভয়ই বর্তমান। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাসেল তাঁহার নতুন মত প্রচার করিলেন।

তারার বিভিন্ন প্রকার জ্যোতির কারণ কি? বি শ্রেণীর সাদা তারা যে অতি উজ্জ্বল তাহার এক কারণ নিশ্চয়ই যে, তাহারা অতি উষ্ণ। কিন্তু কে ও এম শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা নিশ্চয়ই ভিন্ন। দানব ও বামনের জ্যোতির বিভিন্নতা থাকিলেও তাপমান ও উষ্ণতা প্রায় সমান। বিভিন্নতার কারণ এক এই হইতে পারে যে, দানবদের সত্তা বা ওজন বেশী, অর্থাৎ তাহাতে বহুপরিমাণে পদার্থ আছে, অথবা ইহাদের ওজন বামনেরই মতন কিন্তু ইহাদের আয়তন অতি বৃহৎ। যে-বস্তু হইতে আলো বাহির হইতেছে তাহার উপরিভাগের বিস্তৃতির * উপর সেই আলোর উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। দানবদের শরীর যদি অতি বৃহৎ হয় তবে তাহাদের উপরিভাগও অতি বিস্তৃত। সেইজন্য সমান উষ্ণতা সত্ত্বেও বামনদের অপেক্ষা তাহাদের জ্যোতি অনেক বেশী হইবে। কিন্তু অন্য প্রকারে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দানব ও বামন তারার ওজন প্রায় এক প্রকার, তাহাতে বেশী তারতম্য নাই। দানব ও বামন তারার জ্যোতির বিভিন্নতা খুব বেশী। এক অস্ত্রের প্রায় সহস্রগুণ। ওজনের বিভিন্নতার জন্তই যে এতবড় তারতম্য হইতে পারে না ইহা বিশ্বাস করিবার অন্য কারণ আছে। অতএব দানবতারাগুলির বৃহৎ অবয়বের জন্তই নিশ্চয়ই এই জ্যোতির পার্থক্য লক্ষিত হয়। দানব তাহার নামের সম্পূর্ণই অধিকারী।

মাইকেলসন (Michaelson) নামে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক আলোক-তরঙ্গের ধর্ম আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত যন্ত্রে তিনি তারার ব্যাস পর্য্যন্ত মাপিয়াছেন। একটি তারার বিভিন্ন স্থান হইতে দুইটি আলোক-রশ্মিকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের লেন্সের দুইটি বিভিন্ন স্থান দিয়া প্রবেশ করাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। ইহাদের যোগে যে

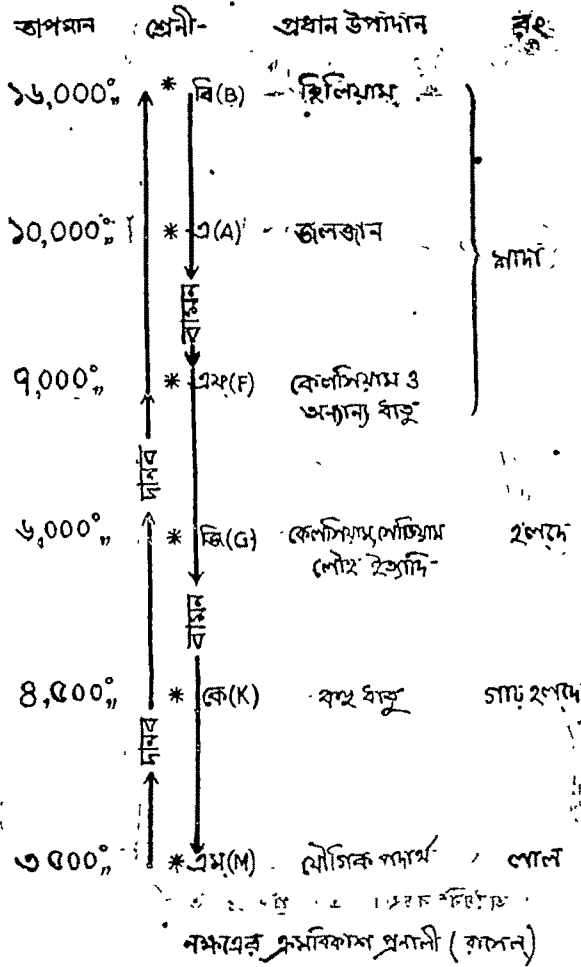
উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখার সৃষ্টি হয় * তাহা হইতে তিনি তারার ব্যাস নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রণালীতে এম শ্রেণীর অনেক দানবতারার ব্যাস নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, এই ব্যাস অতি বৃহৎ, সূর্যের ব্যাসের অনেক গুণ; বামনদের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় সমান। দুইয়েরই ওজন প্রায় একপ্রকার, কিন্তু দানবদের ঘনত্ব অতি সামান্য। জলের ঘনত্বের সহস্র, এমন-কি কোন কোন স্থলে লক্ষ ভাগেরও কম। বামনতারার ঘনত্ব মোটের উপর প্রায় জলের সমান। ইহা হইতে মনে হয় যে, দানবতারাগুলি বৃহদাকার, কিন্তু প্রায় বাষ্পীয় পদার্থে পূর্ণ। বামনগুলি ক্ষুদ্র এবং অনেকটা জমাট বাঁধা; মোটের উপর ওজন দুইয়েরই প্রায় সমান। কাল-পুরুষ তারাপুঞ্জ বেটেলগিউস (Betelgeuse) নামে যে লাল দানবতারাটি আছে, তাহার ব্যাস ২১১ কোটি মাইল; অর্থাৎ সূর্যের ব্যাসের প্রায় ২৫০ গুণ। অ্যান্টারিস নামক দানবতারার ব্যাস ৪০ কোটি মাইল।

এইসকল তথ্য হইতে রাসেল সিদ্ধান্ত করেন যে, তারা মাত্রই এম শ্রেণীর দানবতারা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখন তাহার রং লাল। অপেক্ষাকৃত শীতল এবং অবয়ব বৃহৎ। এই প্রকাণ্ড তারা ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে ও সেই হেতু তাপের ঊৎপত্তি হয়। তাপের সঙ্গে সঙ্গে তারাও উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে থাকে, রংএর পরিবর্তন হয়। এদিকে সঙ্কোচনের ফলে আয়তনও কমিতে থাকে। এই ক্রমশঃ পরিবর্তনে তারাটি কে, জি, এফ, এ, এইসকল শ্রেণী অতিক্রম করিয়া বি শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তারকা উষ্ণতম, রংও শাদা হয়। তাহার পর এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, অধিকতর সঙ্কোচনে উৎপন্ন তাপ অপেক্ষা বেশী তাপ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে তারাদেহ উষ্ণতর না হইয়া শীতল হইতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ তাপ

* ইং Surface

* ইং Interference

† ইং Density



বিকিরণ সম্বন্ধে তারাটি প্রথম উচ্চ হইয়া পরে যে শীতল হইতে পারে তাহা লেন (Lane) নামক একজন বৈজ্ঞানিক গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, তারার আদিম অবস্থায় ইহা যত তাপ বিকিরণ করে তত উষ্ণ হয়। ইহা পরে লেনের বিরোধভাঙ্গ (Lane's paradox) নামে খ্যাতি লাভ করে। বি শ্রেণীতে পৌঁছবার পর সমস্ত তারা শীতল হইতে আরম্ভ করে। এম হইতে বি শ্রেণী পর্যন্ত উষ্ণতা বর্ধনের কালই তারার দানবাবস্থা। তাহার পর শীতল হইতে হইতে তারাটি আবার যথাক্রমে এ, এফ, জি, কে, ইত্যাদি শ্রেণীর ভিতর দিয়া বিপরীত দিকে চলিতে থাকে এবং ক্ষীণজ্যোতি ও মৃতপ্রায় হইয়া

পুনর্বার এম অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই বিপরীত দিকে ভ্রমণ-কালই তারার বামনাবস্থা। সকল তারা বি শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায় না, তাহার পূর্বেই বিপরীত ভ্রমণ আরম্ভ করে। এইজন্য বি শ্রেণীতে কেবল অতি বৃহৎ দানব তারাই পাওয়া যায়। এম ও কে শ্রেণী দুইটি প্রথম এবং শেষ অবস্থা বলিয়া ইহাদের মধ্যে দানব ও বামন বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মধ্যম মানের তারার সম্পূর্ণ অভাব। জি ও এফ শ্রেণীতে মধ্যম মানের তারা বেশী। আমাদের সূর্য জি শ্রেণীর বামন। ক্রমশঃ কে ও এম শ্রেণী অতিক্রম করিয়া জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। রাসেল-এর এই মতবাদ এখন বৈজ্ঞানিক-সমাজে গৃহীত হইয়াছে। গত কয়েকবৎসরে এই মতবাদের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এইসকল নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও অনেক বাড়িয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নয়।

তারার দূরত্ব কি করিয়া স্থির করা যাইতে পারে? পূর্বে এসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশী ছিল না। খুব নিকটবর্তী তারার দূরত্ব স্থির করার এক প্রথা ছিল। জানালায় ভিতর দিয়া বাহিরের কোন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া একটু মাথা এপাশ ওপাশ নাড়িলেই মনে হইবে দেওয়ালের গায়ে জানালায় শিকন্তুলি নড়িতেছে। কিন্তু অনেকদূরে দেওয়ালের পাশে যদি কোন জিনিষ থাকে, তবে মাথা নড়িলে দেওয়ালের গায়ে কোন জ্ঞান-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বেশী দূর এদিক ওদিক নড়িলে সামান্য পরিবর্তন বোঝা যায়। কোন একটি তারার দূরত্ব মাপিতে হইলে তাহার নিকট একটি অতি ক্ষীণ তারা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাহাকে আমরা উপরোক্ত উদাহরণের দূরস্থিত দেওয়াল মনে করিতে পারি। এই ক্ষীণ তারা হইতে অন্ত তারাটির দূরত্ব ছ মাস অন্তর দুই দিন মাপা হয়। এই ছ মাসে

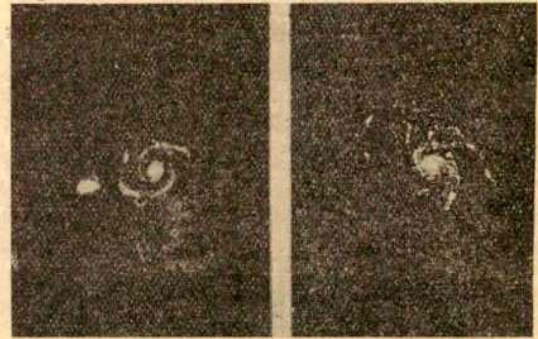


এণ্ড্রোমেডা নামক স্পাইরেল নেবিউলা

nebula) নামক একপ্রকার নীহারিকা পুঞ্জ দূরবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে তাহার প্রায় দশ লক্ষটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহারা দেখিতে নীহারিকা জাতীয় পদার্থ; অবয়ব সুন্দর; একটি স্পাইরেল বা প্যাচের মত। প্রত্যেকের দুইটি ডানা আছে। ইহারা আকাশের সকল স্থলেই দৃষ্ট হয়। ছায়াপথের পার্শ্বে সেই সমতলে কম, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বহুদূরে ছায়াপথের সমতলের বাহিরে অনেক বেশী। আলোক-বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের গতি নির্ণয় করিলে দেখা যায় ইহাদের বেগ অত্যন্ত বেশী, গড়ে সেকেন্ডে প্রায় ১২৫ মাইল। সাধারণ নক্ষত্রের গতির বেগ গড়ে সেকেন্ডে দশ বার মাইল মাত্র। ইহা হইতে মনে হয় ইহারা ছায়াপথের নক্ষত্র হইতে ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ। ছায়াপথের সমতল হইতে অনেক দূরে অবস্থান ও তাহার পরিচায়ক। এইরূপ নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া অনেক জ্যোতির্বিদ বলেন যে, স্পাইরেল নেবিউলাগুলি ছায়াপথের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র জগৎ। এই

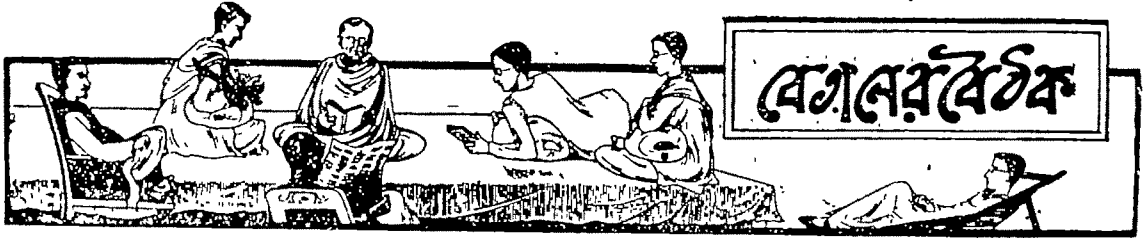
দ্বীপব্রহ্মাণ্ডগুলি শূন্য অসীম বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ছায়াপথও এইরূপ একটি দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। ইহাতে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে, স্পাইরেল নেবিউলাতে যেমন একটি মাথা আছে, যেখানে তারাপুঞ্জ অতিশয় ঘনীভূত হইয়া আছে, ছায়াপথে সেরূপ কোন স্থান নাই। কোন জ্যোতির্বিদ আবার সেই স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি এই প্রশ্নের আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম।

এখন আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন ব্রহ্মাণ্ড সত্যই কি প্রকাণ্ড!



দুইটি স্পাইরেল নেবিউলা

অসীম শূন্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-জগৎ আপন আপন ভীমকায় দেহ বিস্তার করিয়া প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে। কোটি-তারা-খচিত ছায়াপথ নামক আমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল তাহাদেরই ক্ষুদ্র একটি মাত্র। এই ছায়াপথের অতি নগণ্য বামন শ্রেণীর একটি বৃদ্ধ তারকা আমাদের সূর্য্য এবং তাহারই একটি ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের বাস!



বেঙ্গলবৈঠক

জিজ্ঞাসা

(১)

লাইব্রেরী পরিচালনা

বঙ্গ বা ইংরেজী ভাষার লিখিত সাধারণ পাঠ্যগার পরিচালনা বিষয়ক কোন পুস্তক আছে কি না? থাকিলে দাম কত, কাহার কৃত এবং কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

(২)

বাংলা স্টাফাণ্ড-শিক্ষা

আমাদের দেশে "স্টাফাণ্ড" ছাড়া আরও কতগুলি আমদানি হয়েছে কি না? যদি হ'য়ে থাকে, তবে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অসুসন্ধিতব্য? যদি এ দেশে গুরুত্ব কিছু না থাকে, তবে বাংলা "রেভ্যুসক্রেডেট"র অঙ্ক কোনরূপে প্রকাশ-সাধন সম্ভব সম্ভব কি না?

জনৈক সভ্য

পল্লী সাধন-মন্দির

খড়দহ।

(৩)

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর কোনও সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা আছে কি না? থাকিলে তাহা কাহার কৃত, কত মূল্য ও কোথায় পাওয়া যায় এবং একাধিক থাকিলে কোন্‌খানা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আদৃত হয় জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রী বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

(৪)

সাহিত্যিক উপাধি

পূর্বে আমাদের দেশে বাঁহারা আবুকের অধ্যয়ন করিতেন অথবা টোলে সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠ করিতেন তাঁহারা কবিরাজ, কবিত্বরণ ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেন। আজকাল দেখিতে পাই, বাংলা সাহিত্যসেবীগণের মধ্যেও অনেকে টোল ইত্যাদিতে না পড়িয়া ও সাহিত্যবিশারদ, কবিত্বরণ, সরস্বতী ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেছেন। এইসকল শেখোক্ত উপাধি সকল কোন্‌ কোন্‌ সভা, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হইতে দেওয়া হয় এবং এইসকল সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপাধি-বিতরণের অধিকার বা যোগ্যতাই বা কোথা হইতে লাভ হইল?

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(৫)

বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি (origin and gradual development) সম্বন্ধে কোন বই আছে কি? যদি থাকে নান কি ও লেখক কে? দীনেশ-বাবুর History of Bengali Literature and Language'এ পাই নাই।

শ্রী কিতিনাথ হর

(৬)

প্রবাদ-বাক্য

নিম্ন-লিখিত প্রবাদ বাক্যগুলির উদ্ভব কেমন করিয়া হইল;—

- (১) উত্তম মধ্যম দেওয়া। (২) অস্থির পকানন। (৩) খয়ের খাঁ। (৪) ধামাধরা। (৫) আক্কেল শুড়ুম। (৬) আক্কেল দেলানী। (৭) আদা জল ধেরে লাগা। (৮) আবাচে গল্প। (৯) গায়ে হুঁ দিয়ে বেড়ান। (১০) গদাই লক্ষ্মী চালা। (১১) লাগে টাকা দেবে গোবী সেন। (১২) কোতো বাবু (Fop?)। (১৩) কোঁসোল দালালি। (১৪) ভবি ভুলবার নয়। (১৫) যত দোষ নন্দ দোষ। (১৬) প্যাঁজ-পরজার ছই হওয়া। (১৭) নিরেনবইয়ের ধাক্কা। (১৮) চম্পট দেওয়া। (১৯) হরি মটর। (২০) পটল তোলা। (২১) পোবর গণেশ। (২২) ভায়া গন্ধারাম।

শ্রী জ্যোৎস্না ঘোষ

মীমাংসা

১৩৩০ সালের

(৬১)

বিধবা-বিবাহ

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পূর্বে রাজা রাজবল্লভ এবিষয়ে একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ শকাব্দে ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন পলাশডাঙ্গা-নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা বঙ্গা কালীমতি দেবীর পানিগ্রহণ করেন। ইহাই এদেশে প্রথম বিধবা বিবাহ।

শ্রী প্রশংকু মিত্র

(৭২)

বাউল সম্প্রদায়

বাউলগণ মহাপ্রভু চৈতন্যকে তাহাদের সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রকাশ করে। এমন-কি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্যের মধ্যে কয়েকজন ছিল বাউল। সেই সময় হইতেই বাউল-ধর্ম বিস্তার লাভ করে। মহাপ্রভু চৈতন্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সহজিয়া বাংলার একটি ভিন্ন সম্প্রদায়। ইহাদের সহিত বাউলগণের সামান্য থাকিলেও ইহারা বাউলগণ হইতে পৃথক।

বাউলগণ তাহাদের সাধনপ্রণালী কাহারও নিকট প্রকাশ করে না অ-বাউলের নিকট সর্বদাই গুপ্ত রাখে। নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয়ে উহাদের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।—

ভাবতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়—৮ অক্ষরকুমার দত্ত প্রণীত।

বাউল সম্প্রদায়—শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত।

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

(৭৪)

শেখুর-গুড়

যে মেটে হাঁড়ী বা কলসীতে গুড় রাখা হয়—গুড় ভরিবার পূর্বে ঐ কলসীগুলি ধোত করতঃ রোজে শুকাইয়া লউন—পরে হাঁড়ী বা কলসীর অভ্যন্তর ভাগে টাটকা কলিচূর্ণ উত্তমরূপে মাখাইতে হইবে, চূর্ণ বেশ শুকাইয়া, হাঁড়ীর গায়ে লাগিয়া গেলে গুড় ভরিয়া রাখুন। অথবা আরও একটু সাবধান হইয়া, হাঁড়ী বা কলসীর ঢাকনার ঐমত চূর্ণ মাখাইয়া, একদম, পাত্রগুলি বন্ধ করিয়াও রাখিতে পারেন। সাধারণ অবস্থায় রাখা গুড় হইতে, এই গুড় ত অধিক দিন ভাল থাকিবেই, গাঁজিয়াও উঠিবে না।

শ্রী শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেখুর গুড় দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় রাখিবার সহজ উপায় (ইহাতে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নাই) এই—শেখুর গুড়ের কলসীর তলদেশ গৌশলাকার ধারায় হ্রিৎ করিয়া দিবা, সমস্ত তরলাংশ বাহির করাইয়া দিবে। পরে সেই কলসী কোন শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দিলে এক বা দেড় বৎসর কাল বেশ ভাল অবস্থায় থাকে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

শ্রী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭৫)

“কুশীলব”

কুশীলব :—পুং (কুৎসিতং শীলং যন্ত ইতি কুশীলঃ । কুৎসিত্যসমাসঃ অস্ত্রত্বাঙ্গি দৃশ্যতে ইতি বঃ । যদা কুশীলং বাতি গচ্ছতি প্রাপ্তাতীতি যাবৎ । বা+তঃ ।) চারণঃ ইত্যমরঃ নটবিশেষঃ কথকাদিঃ । ইত্যস্তে । দেশান্তরে কীর্ত্তিঃ প্রচারয়তি যো নটঃ । ইত্যস্তে ইতি ভরতঃ । ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ

“সর্বপ্রথমে রামের পুত্র কুশ ও লব বাম্পীকি-প্রণীত রামায়ণ গান

করেন; বোধ হয় সেইজন্য সজীত-ব্যবসায়ীগণের নাম কুশীলব হইয়াছে।”—প্রকৃতিবাদ অভিধান।

শ্রী কাজীদাস ভট্টাচার্য

অযোধ্যাবিধি মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্রকুমার কুশীলব প্রথম রামায়ণ গান করেন বলিয়া সজীতব্যবসায়ী, নাটক-অভিনয়কারী, চারণ, নট এবং নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনিও “কুশীলব” এই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এইজন্য নাটকের পাত্র-পাত্রীও “কুশীলব”।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ বায়

(৭৬)

কবিকল্প চণ্ডী

চন্দ্রকোণা নামের সহিত বিষ্ণুপুরাণ চন্দ্রমন্ডলের কোন সম্পর্ক নাই। ১৮৮০ সালের “কলিকাতা রিভিউ” নামক বিখ্যাত পত্রিকার “ক্রিনিক্স অফ চন্দ্রকোণা” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বে চন্দ্রকোণার মন্ডলরাজ্য ছিল; সে ১৭২ শক বা ৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। ষরের মল্ল নামে মাত্র একজন রাজার (শেষ) নাম পাওয়া যায়। চোহানবংশীয় চন্দ্রকেতু নামে একজন নরপতি ৮ পুরীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্তমান চন্দ্রকোণার সন্নিকটে দেবগিরি নামক ভূমলে কিছুকাল ছাউনি করিয়া থাকেন এবং পরে ষরের মল্লকে পরাজিত করিয়া নিজের নামে চন্দ্রকোণা স্থাপন করেন। চন্দ্রকেতু হইতেই চন্দ্রকোণার নামকরণ হইয়াছিল—তাহা জনশ্রুতিতেও এখনও জানিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। মন্ডেরা চন্দ্রকোণা হইতে ২৮২৯ মাইল উত্তরে গিয়া নূতন এবং প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর মন্ডরাজ্যবংশে প্রতিষ্ঠা করে। চন্দ্রকোণার পূর্ব নাম মানা বলিয়া জানা যায় এবং মল্লের সময়ে ঐ নামেই বিখ্যাত ছিল বলিয়া ক্রনিকেল লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রকোণাব মন্ডেশ্বর নামক মহাদেব ও মল্লেশ্বরপুর, (মল্লারপুর্ব নহে) নামক পল্লী সেই প্রাচীন মল্লদিগের স্মৃতি জাগ্রত বজায় রাখিতেছে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদিগের চন্দ্রকোণা আক্রমণ বা আয়ত্ত করিবার ইতিহাস পাওয়া যায় না, এবং (চন্দ্রকেতু) কেতুবংশের পরবর্তী ভানবংশীয় হরিনারায়ণ নামক নৃপতির সহিত শ্রীনাথার মল্লরাজ-ভগিনীর পরিণয় হইয়াছিল তাহার নিদর্শন (শিলালিপি) পাওয়া যায়। এই হরিনারায়ণ হবিভানরাজ্য বলিয়া প্রকাশ।

শ্রী সুগন্ধনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

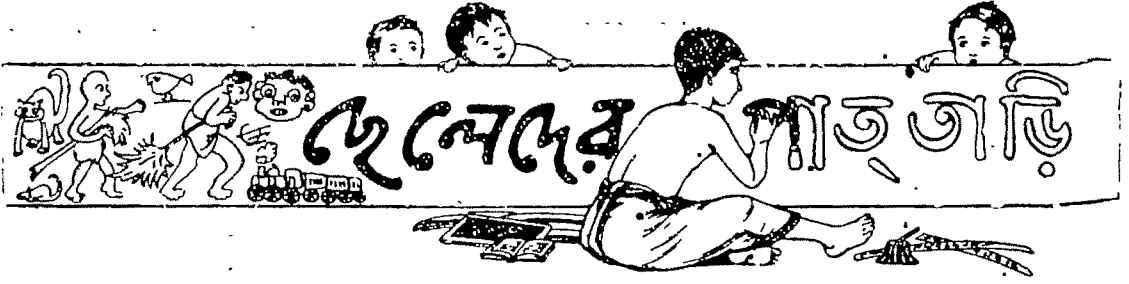
রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্র” বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে। কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা বহুসংখ্যক পত্র একত্র চয়ন করিলে সাহিত্যের দিক হইতে তাহা যে বিশেষ উপাদেয় হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মনে করিয়া সকলের কাছে আজ আমাদের অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠির সংগ্রহ যাহার আছে তিনি যেন তাহা যথায় নকল করিয়া তারিখশুদ্ধ আমাদের পাঠাইয়া দেন বা কোন মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন।

মূল পত্রগুলি কেহ পাঠাইলে তাহা ফেরৎ দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব; এবং আপত্তি না থাকিলে পত্রগুলি যাহাদের নিকট প্রাপ্ত যথাস্থানে তাহাদের নামোল্লেখ থাকিবে।

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন



সিংহল-দেশের উপকথা।

শ্রী নির্মলা রায়

সিংহল দেশের রাজার একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাটি তাঁর নয়নের মণি, জীবনের আনন্দ স্বরূপ। সেই কন্যাই আবার তাঁর পরম নিরানন্দের কারণও হ'ল। আনন্দ স্বরূপ ছিল—তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। নিত্য শৈশবেই সে মাতৃহারা, মায়ের স্নেহ কি বস্তু তা জানতে পারনি। পিতার স্নেহে, আদরে সে অভাব বোধ করবার অবসরও তার হয়নি। তিনিই তাকে বুকে করে' এত বড়টি করে' তুলেছেন। রাজকন্যার বয়স হ'লে রাজা যখন বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন কন্যা তখন একেবারে বঁকে বসল; বিয়ে করতে সে কোন মতেই রাজী নয়—ইহাই তাঁর নিরানন্দের কারণ।

রাজকন্যার যখন বয়স অল্প তখন থেকেই সে লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালবাসত। একটু বড় হ'লে মেয়ের ইচ্ছা অল্পস্বারে রাজা তাকে অতি উচ্চ একটি পাঠ-মন্দির প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। নানা দেশ থেকে রাশি রাশি বই আনিয়ে সে সেই মন্দির প্রায় পূর্ণ করে' তুলেছিল। বইগুলি তার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই মন্দিরে পুস্তকরাশির মধ্যেই দিনের অধিকাংশ সময় তার কাটিত। সারাদিন ধরে' নানা রকম প্রশ্নের মীমাংসা করা—এই ছিল তার প্রধান আনন্দ। মন্দিরের গায়ে একটি দড়ির সিঁড়ি লাগান থাকত, রাজকন্যা মন্দিরে উঠে সেটা তুলে নিত যাতে আর কোন লোক গিয়ে তাকে বিরক্ত করতে না পারে।

রাজার একজন দূর সম্পর্কীয় ভাই ছিল, তার দৃষ্টি বরাবরই সিংহাসনের দিকে। সে লোকটি বড় ভাল ছিল না। এখন রাজার মনে, মনে ভয় ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর সেই ভাই রাজকন্যাকে বঞ্চিত করে' নিজেই সিংহাসন দখল করে'

বসবে। রাজকন্যার বিয়ে হ'লে তার স্বামী তাকে রক্ষা করে' চলতে পারবে এই ভেবে তিনি তার বিয়ে দেবার জন্য আরও ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। তাছাড়া সিংহল দেশে মেয়েদের চিরদিন অবিবাহিত থাকবার রীতিও ছিল না। সেটা বড় নিন্দার বিষয় ব'লে সবাই মনে করত। রাজার সভাসদগণ সকলেই উপযুক্ত কোনও রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবার জন্তে রাজাকে অতুরোধ করতে লাগলেন। রাজ-ঘটকও তাঁকে ব্যস্ত করে' তুলল, কারণ রাজকুমারীর বিয়ে হ'লে তার প্রাপ্য টাকা সে পেতে পারে। কিন্তু রাজা কি করবেন, রাজকন্যা বিয়ে করতে মত না দিলে তিনি তো আর জোর করে' বিয়ে দিতে পারেন না। তিনি যখনই মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে যান তখনই সে সে-কথা হেসে উড়িয়ে দেয় ও নানা কথা তুলে সে-বিষয় চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত রাজকন্যাই পরাস্ত হ'ল। রাজা একদিন কোনও কথায় না ভুলে, তাকে ভাল করে' বুঝিয়ে দিলেন যে বিয়ে করাটা তার কর্তব্য কাজের মধ্যে একটা। তা' না করলে তার দেশের এবং পিতার প্রতি কর্তব্যের জ্ঞাতি করা হয়।

তখন রাজকন্যা বিয়ে করতে রাজি হ'ল। কিন্তু এই সন্তে রাজি হ'ল যে—যদি কোনও রাজপুত্র এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে যার মীমাংসা রাজকন্যা করতে পারে না তবেই তাকে সে বিয়ে করবে। তা ছাড়া যাকে তাকে বিয়ে করবে না। 'যে-সকল রাজপুত্র তার কাছে পরাস্ত হ'বে তারা কেউ আর ফিরে যেতে পারবে না, সকলকেই প্রাণ দিয়ে যেতে হ'বে।

তখন রাজা চিত্রকর ডেকে রাজকন্যার একখানি ছবি তৈরী করালেন ও যে-পণে সে বিয়ে করতে মত দিয়েছে সেই পণের কথা ভূজ্ঞপত্রে লিখে হাতের দাঁতের ক্রেমে

বাঁধিয়ে নিলেন। তার পর তাঁর এক বিশ্বস্ত সভাসদের হাতে রাজকন্ডার সেই ছবি ও হাতির দাঁতের বাঁধান লিখনখানি দিয়ে তাকে দেশ-দেশান্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই নানা দেশ থেকে দলে দলে রাজপুত্র সিংহলে এসে উপস্থিত হ'তে লাগল। রাজকুমারী পরমা হৃন্দরী ছিল। তার ছবি দেখা অবধি রাজপুত্রদের মনে আর শাস্তি ছিল না। রাজকন্ডা-লাভের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে তারা আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্তে সিংহলের রাজসভায় উপস্থিত হ'তে লাগল এবং যত্নে শাস্তিলাভ করিতে লাগল। কারণ, রাজকুমারীকে প্রাণে পরাস্ত করা সহজ কাজ ছিল না।

রাজপুত্রনার রাজপুত্রও সে ছবি ও লিপি দেখেছিল। সে যখন তার বাপের কাছে গিয়ে অহুমতি প্রার্থনা করল, যে সেও একবার সিংহলে গিয়ে চেষ্টা করে' দেখতে চায় রাজকুমারীকে লাভ করিতে পারে কি না—তখন রাজা তাকে নিষেধ করে' বললেন—“তুমি কি পাগল হ'য়েছ, কুমার! বাক্য লাভ করিতে গিয়ে কত দেশের কত পুত্র প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে সেই রাজকুমারীর গলায় মালা দিতে গিয়ে কি তুমি যত্নকে বরণ করিতে চাও? আর বিশ্বাসনা দেশ নিয়ে আমরা এই যে রাজ্য যার উপর অতীতের কোন যুগ থেকে আমাদের এই বংশ একাধিপত্য করে' আসছে—আমার যত্নের পর তা অগ্নি কোন এক বংশের অধীনে চলে' যাক—এই কি তুমি ইচ্ছা করছ?”

রাজার এই কথা শুনে রাজকুমার কিছুদিন চূপ করে' রইল, রাজকুমারীর কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করিতে লাগল। কিন্তু যতই সে রাজকন্ডাকে ভুলতে চেষ্টা করে ততই যেন তার মূখ মনের ভিতরে আরও ফুটে ওঠে। ঘুমের মধ্যে সে রাজকন্ডাকে স্বপ্ন দেখে। তার চোখের মধ্যে যেন সে কি এক রহস্য দেখতে পায়, যে-রহস্য কেউ ভেদ করিতে পারেনি। তার চোঁট ছুখানি যেন তার সঙ্গে কথা বলে। কি তারা বলে? তারা যেন বলে—ঐ গভীর কালো আঁখি দুটির রহস্যের অর্থ তারা করে' দিতে পারে, রাজপুত্রের হৃৎকের পথের সন্ধান তারা বলে' দিতে পারে।

না, রাজপুত্র আর চূপ করে' থাকতে পারছে না, তাব দিন আর কাটে না। তাকে একবার ধেতেই হ'বে সিংহল দেশে। অবশেষে এই প্রতিজ্ঞা করে' সে তার বাপ, রাজার কাছে থেকে সিংহলে যাবার অহুমতি পেল যে, সে রাজকুমারীর সভায় গিয়ে তাকে প্রাণ জিজ্ঞাসা করে' পরাস্ত করিতে চেষ্টা করবে না।

যাবার সময় রাজা ছেলের সঙ্গে তিনটি অতি উজ্জল মুক্তা দিয়া দিলেন; এই মুক্তা তিনটি এমন দীপ্তিশালী ছিল যে, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে এইগুলি দিয়ে তিনি রাজগৃহ আলোকিত করতেন। রাজকুমার সঘরে মুক্তা তিনটিকে তার পাগড়ীর ভাঁজের মধ্যে সেলাই করে' নিয়ে সামান্য ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে সিংহলেরই উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানকার বন্দরে পৌঁছে দেখে, কত দেশ-বিদেশের জাহাজ যে সেখানে ভিড়েছে তার ঠিকানা নেই। দেশী ও বিদেশী লোকে রাজপথ পরিপূর্ণ,—কত রকমের অভূত পোষাক যে তারা পরেছে সে-সব রাজপুত্র কখন দেখেনি। কত ভাবায় যে তারা কথা বলছে সে তার কিছুই বোঝে না। সব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে রাজপুত্র রাজবাড়ির দিকে চলতে লাগল। ফটকের সামনেও অত্যন্ত ভীড়। অনেক কষ্টে পথ করে' ভিতরে ঢুকে সে রাজকন্ডার মন্দিরের নীচে অপেক্ষা করিতে লাগল। সামান্য পথিক মনে করে' কেউ তাকে গ্রাহ্য করল না।

সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন ও পথিককে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি চায়; পথিক উত্তর করলে—আমি বিদেশী পথিক, ক্ষুধার্ত হয়েছি, কিছু খাবার চাই।

রাজকুমারী তাঁর দাসীদের ডেকে পথিককে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার এনে দিতে বললেন। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন, একে দেখেতো তেমন ক্ষুধার্ত বলে' বোধ হ'চ্ছে না। দেখতে হ'বে খাবার দিলে খায় কি না। আমার মনে হচ্ছে, এ ছদ্মবেশে কোন খৃষ্ট লোক হবে।

এই মনে কবে' রাজকুমারী সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে গেল ও একটা ছোট জানালার আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগল পথিক কি করে। এদিকে দাসীরা খাবার নিয়ে এলে রাজপুত্র তার পাগড়ীর ডিতর থেকে একটা মুক্তা বের করল ও সেটাকে একটা পাথরের উপর রেখে মনের আনন্দে সেই-সব ভাল ভাল খাবার খেতে লেগে গেল এবং নিজের মনে বলতে লাগল—আ, রাজকুমারী, তোমাকে আমি দেখলাম, তোমার ছবির চেয়ে তুমি আরও শতগুণ সুন্দরী। তোমাকে আমি জয় করে' নেবই, অর তা যদি না পারি তবে সেই চেষ্টাতেই এ জীবন আনন্দের সঙ্গে বিসর্জন দেব।

রাজপুত্রের খাওয়া শেষ হ'লে রাজকুমারী উপর থেকে নেমে এসে তার কাছ থেকে সেই মুক্তাটি বিনে নিতে চাইলে।

রাজপুত্র বললে—“রাজকুমারী, আমার এ মুক্তা আমি বিক্রী করব না, তবে তুমি যখন চাইলে, তোমায় আমি দিতে পারি যদি তোমার পা ছ'খানি আমার চুষন করতে দাও।”

তারপর সেই মুক্তা নিয়ে রাজকুমারী তার বাগকে দেখাতে চলে' গেল।

পবদিন রাজপুত্র আবার মন্দিরের নীচে অপেক্ষা করতে লাগল ও রাজকুমারী নেমে এলে খাবার চাইলে। সেদিন আরও উজ্জল ও বড় আর একটা মুক্তা বার করে' সে খেতে আরম্ভ করলে। রাজকুমারী সে মুক্তাটাও কিনতে চাইলে। আবার রাজপুত্র বললে—মুক্তা সে বিক্রী করতে আনেনি, তবে দিতে পারে যদি রাজকুমারী তাকে তাব সুন্দর কপালটিতে একটা চুষন দিতে দেয়।

রাজকুমারী উত্তর করলে—“তুমি বড় বেশী দাম চাইছ পথিক, অথচ বলছ মুক্তা বিক্রী করতে নয়। যাহোক এ জিনিষ পাবার জন্যে আমি তোমায় দাম দিতে রাজী আছি।” সে তখন চারিদিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে কেউ তাদের দেখছে কি না ও পথিককে

তার কপাল চুষন করতে দিয়ে মুক্তা নিয়ে চলে' গেল।

তার পর দিন যখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসে রাজকুমারী আশা করিতে লাগল মন্দিরের নীচে পথিককে দেখতে পাবে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তবু পথিক আসেনি দেখে তার মন পথিকের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কেন সে আজ এখনও এল না? ঐ যে, মন্দিরের নীচে পথিককে দেখা যাচ্ছে, তার হাতে উজ্জল সাদা আলো, ওটা কিপের আলো? ও যে দেখছি আর-একটা মুক্তা। তাড়াতাড়ি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নাচে নেমে এসে রাজকুমারী পথিকের হাত ধরে' তার বাগের কাছে নিয়ে গেল।

এবার রাজকুমারী তার অর্ধেক রাজ্য দিয়ে সেই মুক্তাটি কিনতে চাইলে, এ বারেও রাজপুত্র বললে—তার মুক্তা সে বিক্রী করবার জন্যে আনেনি তবে রাজকুমারীকে দিতে পারে যদি সে তার বক্ষস্থলে তাকে একটি চুষন দিতে দেয়।

রাজকুমারী বক্ষদেশে চুষন করে' শেষে মুক্তাটি তাকে দান করে' রাজপুত্র সিংহল ছেড়ে চলে' গেল।

রাজকুমারী প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় তার প্রতীক্ষায় মন্দিরের জানালায় বসে' থাকে। কিন্তু হয়, বুধাই প্রতীক্ষা। দিনের পর দিন চলে' যায় পথিক আর আসে না। রাজকুমারী বসে' বসে' ভাবে কে এই পথিক? সে যে সামান্য একজন পথিক নয়, ছদ্মবেশে কোন বড় লোক হ'বে এ কথা নিজের মনে সে নিশ্চয় বুঝতে পারত। কিন্তু কে সে? এই একটা প্রশ্ন যার উত্তর সে দিতে পারছে না। তা সে যেই হোক না কেন তার জন্যে রাজকুমারীর এত চিন্তা কেন? কেন সে প্রতিদিন তার আগমন-প্রতীক্ষায় বসে' থাকে? এই একটা রহস্য যাব মীমাংসা সে করতে পারছে না হয়, একি হ'ল? রাজকুমারীর মনের স্থখশান্তি কে হরণ কবে' নিল? তার মনে হ'তে লাগল সেও যদি একজন সামান্য পথিক বালিকা হ'য়ে ঐ পথিকের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারত তা হ'লে তার কত না আনন্দ হ'ত!

অনেক দিন পরে রাজকন্যা একদিন তার মন্দিরের জানালা থেকে দেখতে পেল, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। শীঘ্রই রাজপ্রাসাদে সংবাদ এল রাজকন্যার নিকটে একজন রাজপুত্র আসছেন। তিনি রাজকন্যাকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যার উত্তর রাজকন্যা দিতে পারবেন না।

রাজকন্যা বিষন্ন মনে রাজপুত্রের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল। তার জন্ত যে কত রাজপুত্রের প্রাণ নষ্ট হ'ল সে কথা চিন্তা করে তার মন বড়ই বিমর্ষ হ'য়ে গেল। নিরুদ্দেশ পথিকের জন্তে চিন্তা কবে' করে' তার মন অশ্রুর ছুঃখ বুঝতে শিখেছিল।

অবশেষে রাজপুত্র তার পিতা রাজপুতনার রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যার মন্দিরে এসে পৌঁছলেন এবং তাকে বললেন—“রাজকুমারী! আমার একটি প্রশ্ন আছে, তুমি যদি পার তবে তার মীমাংসা করে' দাও। আমার প্রশ্নটি এই :—

আমি একবার বিদেশে শিকার করতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি চমৎকার হরিণী আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। আমি তার পদব্ধ লক্ষ্য করে' তীর নিক্ষেপ করলাম। সে আহত হ'য়ে পলায়ন করলে। পরদিন সেইস্থানেই আবার

তাকে দেখতে পেলাম, এবার তার কপাল লক্ষ্য করে' তীর নিক্ষেপ করলাম, সে আহত হ'য়ে পড়ে' গেল, কিন্তু আমাকে অগ্রসর হ'তে দেখে উঠে পালিয়ে গেল। তৃতীয় দিন ঠিক সেই স্থানেই আবার সেই হরিণীকে দেখলাম। এবার আমি তার হৃদয় লক্ষ্য করে' তীর নিক্ষেপ করলাম। আমার তীর তার হৃদয় ভেদ করে' গিয়েছে বলে' আমার ধারণা ছিল। কিন্তু যেখানে তাকে পড়তে দেখেছিলাম বলে' মনে হ'ল, সেদিকে যখন অগ্রসর হ'লাম তখন আর তাকে কোথাও দেখা গেল না।

তুমি কি এই রহস্যের মীমাংসা করে' দিতে পার ?”

রাজপুত্রের কথাগুলি যখন রাজকন্যা মন দিয়ে শুনছিল তখনই সে বুঝতে পারল এ রাজপুত্র তার সেই পথিক ভিন্ন আর কেউ হ'তেই পারে না। সে তার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্তে কোনও চেষ্টাই না করে' পবাক্ষয় স্বীকার করে' নিল।

তখন মহাসমাবোধেই রাজপুতনার রাজপুত্রের সঙ্গে সিংহলের রাজকন্যার বিয়ে হ'য়ে গেল। দুই রাজাই পরম আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করলেন। কিন্তু রাজপুত্র ও রাজকন্যা পরস্পরের মিলনে যেমন সুখী হ'য়েছিল এমন আর কেউ হয়নি—সে-সব কথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য।

কারুশিল্পের পুনরুদ্ধার

শ্রী শাস্তা দেবী

শিল্প বলিতে সচরাচর আমরা কখনও বা চাকুশিল্প কখনও বা কারুশিল্পমাত্রকে বুঝি। আমাদের নানা শিল্প-ভবনগুলির সহিত চাকুশিল্পের কোনো সংশ্লিষ্ট নাই, তবু আমরা সর্বদাই তাহাদের শিল্পভবন বলি এবং ভুলিয়া যাই যে, শিল্পের নামটা চাকুশিল্প হইতেই উৎপন্ন। চাকুশিল্প সৃষ্টি যে করে সেই শিল্পী, কারুশিল্প রচনা করে কারিগর। সভ্যজগতে সকল দেশেই চাকু ও কারু শিল্প পরস্পরের

সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; স্বতরাং সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে শিল্প বলিতে এই দুইটিকেই বোঝা উচিত।

এক শিল্প শব্দের দ্বারা এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি ও রচনাকে বোঝায় বলিয়াই যে, কেবল ইহাদের পরস্পরের সহিত যোগ তাহা নয়, ইহারা মানুষের সভ্য জীবনে পরস্পরের সহিত সকল দিক দিয়াই অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। মানুষের জীবনে আনন্দ ও প্রয়োজন দুইয়েরই সমান স্থান

এবং সমান মূল্য। যে-মানুষ প্রয়োজন বুঝে না কেবল আনন্দ চাহে তাহাকে আমরা বলি পাগল, যে জীবনে আনন্দ ও হাসিকে বাদ দিয়া কেবল প্রয়োজন লইয়াই থাকিতে চায় তাহাকেও আমরা বলি পাগল। এক কথায় উভয় শ্রেণীর মানুষই মানসিকরোগগ্রস্ত। সমাজ এবং জাতিও অনেকাংশে মানুষেরই প্রতিরূপ। মানুষ আনন্দ ও প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া কাজ করিয়া সৃষ্টি করিয়া জীবনের পরিচয় দেয়, জীবনকে সার্থক করে; সমাজ এবং জাতিও আনন্দ এবং প্রয়োজনের খাতিরে তাহার শক্তিকে নানাভাবে খেলাইয়া জীবনের পরিচয় দেয়। যে জাতি কিম্বা যে-সমাজ আনন্দের মূল্য না বুঝিয়া কেবল প্রয়োজন-সাধনেই ডুবিয়া থাকে অথবা যে জাতি চার্বাকপন্থীর মত স্তব্ধই সর্বস্ব করে সে যে বোগগ্রস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। চিকিৎসা না করিলে এ জাতির রোগবৃদ্ধি ও মৃত্যু অনিবার্য।

মানুষের জীবনে প্রয়োজন এবং আনন্দের দুইটি বিভাগ আছে বটে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কড়া মাপকাঠিতে মাপিতে গেলে তাহাদের দুইটির মাঝখানেই ভেদ-রেখাটি খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। বহির্জগতে যেমন ফুলকে আমরা বলি সৃষ্টির আনন্দের বিকাশ এবং ফলকে বলি প্রয়োজনের রূপ, অথচ জানি যে ফলের সৃষ্টির জন্ত ফুলের বিশেষ প্রয়োজনই আছে, এবং ফলের প্রয়োজনের মধ্যেও ফুলের সৌন্দর্য্য একেবারে মরিয়া যায় নাই; তেমনি মানুষের অন্তর্জগতেও প্রয়োজন এবং আনন্দ, গদ্য এবং কাব্য, উপকথা ও নীতিকথা পরস্পরকে অনেকখানি জড়াইয়া আছে। গদ্যকে আমরা কাব্যালঙ্কারে শোভিত করি, কাব্যে আমরা মোহমুগের রচনা করি, সুরোরাণী দুয়োরাণীর উপকথায় আমরা নীতি প্রচার করিয়া হেটো-কাটা উপবে কঁটা দিয়া অপরাধীর শাস্তি বিধান করি, আবার হিতোপদেশে জরদুগ ও লঘুপতনকের গল্প বলি। বিধাতা স্বয়ং আমাদের লইয়া এমন খেলা খেলিতেছেন, স্তত্রাং আমাদের পক্ষে তাহার অনুকরণ করা কিছুই বিচিত্র নয়। খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে যে জিনিষ তাহাতে পাওয়া যায়, বিধাতা বিজ্ঞচিকিৎসকের মত সেগুলি শিশিতে ভরিয়া

আমাদের জন্ত ত ডিম্পেন্ডারি সাজাইয়া রাখেন নাই; তিনি সেই খাদ্যকে রূপে রসে গন্ধে অল্পম করিয়া মানুষকে আনন্দ দিয়াছেন। কেননা আনন্দ আপাত দৃষ্টিতে প্রয়োজনাতীত বোধ হইলেও বাস্তবিক এক পক্ষে তাহাই অধিকতর প্রয়োজনীয়; কারণ, যাহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, কিম্বা আনন্দ ক্ষুব্ধিত হয় না, এমন জিনিষ তাহার নীরসতার দোষে মানুষের বিতৃষ্ণা আনিয়া প্রয়োজন-সিদ্ধির পথেও ব্যাঘাত জন্মায়।

মানুষের আনন্দবোধ ও আনন্দপ্রকাশের প্রেরণা হইতেই চারু শিল্পের জন্ম। আনন্দের উৎস যে-জাতির শুকাইয়া গিয়াছে শিল্প তাহাদের মধ্যে মৃত অনদৃত। জাতীয় অবনতির সঙ্গে-সঙ্গেই তাই শিল্পেরও অনাদর এবং সঙ্গে সঙ্গে অধোগতি হয়। কেবল খাইয়া আর পরিয়াই মানুষ বাঁচে না; আনন্দই মানুষের প্রাণ, জাতির প্রাণ। স্তত্রাং কেহ যদি মনে করেন এই দরিদ্রদেশে শিল্পসৃষ্টি কোনো মূল্য নাই, কেবল চালের কল ও কটন মিল প্রতিষ্ঠা করিলেই দেশ উদ্ধার হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার মত ভ্রান্ত আর কেহ নাই। প্রাণের লক্ষণই বহু রূপে বহুস্তিতে আপনাকে প্রকাশিত করা; যে-জাতিব প্রাণ তাহার শিরায় শিবায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত সেই শিল্প-সাহিত্যাদি নানা আনন্দের খেলার ভিতর আপনার ক্ষুধাকে ছড়াইয়া দিয়া আপনার আয়ুষ্কাল বর্ধিত করে। যে জাতির প্রাণ বুকের কাছে বুকধুক করিতেছে, সেই নাড়ী টিপিয়া পাঁচনের হাঁড়িটুকুমাত্র আঁকড়াইয়া জড়ের মত পড়িয়া থাকে, অল্প দিকে দৃষ্টিপাত করাকেও দৃষ্টিশক্তির অপচয় মনে করে। স্তত্রাং শিল্পের আদর করিতে গিয়া আমরা যদি কারুশিল্পকে বাঁচাইয়া চারুশিল্পকে আবর্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাই, তাহা হইলে গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া হইবে।

কারুশিল্পের জন্মই হইয়াছে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের সহিত তাহার আনন্দজাত চারু-শিল্পের একটা সামঞ্জস্য করিবার জন্ত। মানুষ তাই পটের উপর তুলি চালাইয়াই আপনার রসাতত্ত্বটিকে শেষ করে নাই। কার্পাসের ও পশমের স্তত্রাং বোনা যে কোনো কাপড়ে মানুষের লজ্জা ও শীত নিবারণ হইত; শিল্পী তাহাতে

সঙ্কট হইতে পারিল না ; সে ঢাকাই মসলিন, মচলিপটম-ছিট, জামিয়ার শাল, কিংখাব, কত কি সৃষ্টি করিল ; কাবিগবেরা শিল্পী গুরুর অমুদ্রণে বংশের পর বংশ ধরিয়া বংশশিল্পের ব্যবসায় চাপাইতে লাগিল। ইহাতে মাসুকের মনও খুণী হইল প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল। শিল্পী যে আনন্দজাত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন তাহাকে সহজলভ্য করিয়া ঘরে ঘরে বিকাইবার জন্ত এবং পণ্যজীবী যে কাজ-চালানো পণ্যে বাজার ছাইয়া দেন তাহাকে সৌন্দর্যে ভূষিত করিবার জন্ত কারিগরের কারুশিল্প। এইখানেই সৌন্দর্যের সহিত প্রয়োজনের যোগ, শিল্পের সহিত পণ্যের মিলন।

ভারতের কারুশিল্প প্রধানত কৃষিজ প্রব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ; তাহার দেহের খাদ্য ও মনোব আনন্দ সমস্তই এই ভূমিসম্মার জোড় হইতে প্রাপ্ত। তাই তাহার অন্তরের কাব্যবস গ্রাম্য বাউলকবি ও কথকের মুখে মুখে আনন্দ বিলাস এবং শিল্পকলা কুটীরে কুটীরে গড়িয়া উঠে। গৃহের আবেষ্টনে বর্ধিত এই কৃষিজ কুটীর শিল্প ভারতবাসীর জীবন যাত্রার সহিত জড়িত। এই কারুশিল্পের উন্নতি-অবনতির সহিত সখের কারিগরের মাত্র সম্পর্ক নয়, ইহার সহিত ভাবতের শতকরা পঁচানব্বই জন কৃষজীবীর ভাগ্য জড়িত। গ্রামে কার্পাসজাত সূতা কাটা হইত বস্ত্রের জন্ত। মাসুস নৈপুণ্য দেখাইবার জন্ত ও সৌন্দর্য বর্ধন করিবার জন্ত তাহাকে মসলিনের মত সূত্র করিয়া কাটিল ; এ সূতা গ্রামেবই মেয়েদের চরকায় কাটা। তারপর গ্রামের তাঁতী কাপড় বুনিল, কেহবা তাহাতে জামদানি পাড় তুলিল কেহ নানা নক্সার বুটি তুলিল। সাদা কাপড় মাসুকের চোখে একেবেয়ে হইয়া যায় বলিয়া দেশজ রঙে গ্রামের রঞ্জকই তাহাকে কত রঙে রঙাইত। আজও আমরা দেশী রঙীন ঢাকাই শাড়ী পরিতেছি বটে, কিন্তু সে শাড়ীর সূতাও বিদেশী, রংও বিদেশী। শুধু তাই নয়, সে-সকল শাড়ীর পাড়ের ও আঁচলের নক্সা পর্যন্ত বিলাতী ও ফ্রেঞ্চ সস্তা পর্দা প্রভৃতির অমুদ্রণে বোনা ; কারণ, কারিগর যদি বা দেশে আছে, শিল্পী এমন নাই, যে উচ্চদের দেশী নক্সা তাহাদের কাজের জন্ত আঁকিয়া দেয়।

ঘরের বারান্দার খুঁটি, দরজার কপাট হইতে আরম্ভ কবিয়া খাটপালঙ্ক, বাজ, খেলনা সমস্তই গ্রামের ছুতার তৈয়ারি করিত, এবং নানা কারুকার্যে সাজাইত। এখন দবিশ্রের ঘরের আমকাঠ শিমুলকাঠের দরজায় সৌন্দর্যের ত চিহ্নই নাই, বড়লোকে চীনা মিস্ত্রীর কাজের জন্তই বেশী লালস্বিত। কাঠের খেঁচনাব পাট ত প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে ; তাহার বদলে সেলুলয়েড টিন এবং রবারের জর্জান ও জাপানী খেলনাই ঘরে ঘরে বিরাজিত।

রেশম-শিল্পও মরিতে বসিয়াছে। আমরা যে বেপারী পরি তাহাব রেশম ও জরী সবই প্রায় বিদেশ হইতে আনা। দেশী কাবিগর বুনিয়া দেয় এই পর্যন্ত। অনেক সময় বোনাও বিদেশী, কেবল জরিব কাজটা দেশী। তাছাড়া বাংলার নানা গ্রামে গ্রামে তসব গবদ চেলি প্রভৃতির যে ছোট ছোট শিল্প-কেন্দ্র ছিল, তাহা আমাদের চোখের সামনেই দিন দিন এক এক কবিয়া অনেকগুলি মরিয়া গিয়াছে ; কারণ এসকল বেশমের চেয়ে অনেক সস্তা ফ্রেঞ্চ সিদ্ধ এবং তাব চেয়েও সস্তা আলপাকা নামে চলিত নকল সিদ্ধ আজ বাজারের সমস্ত দোকান ছাইয়া দিগাছে।

ধাতব শিল্পের ভিতর বাসন ও গহনা প্রভৃতির দুর্দশাও সমান। গহনা অবশ্য আজকার মাসুস কিছু কম পরিতেছে না ; কিন্তু সে গহনার কারিগরের সহিত শিল্পীর কোনো যোগ নাই বলিয়া তাহাও বিদেশী গহনার সস্তা নকলে অথবা দেশী বিলাতী সংমিশ্রণে খিচুড়ি নক্সায় মাসুকের অঙ্গসৌষ্ঠব লাঘব করিতেছে।

কিন্তু নানা-প্রকার কুটীর-শিল্পের একটা তালিকা দেওয়া এবং তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করা ত আমাব মত একজন মাসুকের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু বলিতে চাই যে, ভারতবর্ষব্যাপী অসংখ্য গ্রামে যে অগণ্য শিল্প একদিন ঘরে ঘরে গড়িয়া উঠিয়া গ্রামবাসীর জীবিকার সংস্থান ও দেশের লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি এবং আনন্দবিধান করিতেছিল তাহাদের যে আজ কি অবস্থা তাহার কি কেহ খোঁজ রাখে ? এই বিষয়ে খাঁটি বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্ত দেশজোড়া অমুদ্রণ হওয়া উচিত। কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে কি কি শিল্প ছিল, তাহার কতগুলি আছে, কতগুলি মরিয়া গিয়াছে, কতগুলি উন্নত হইতেছে,

কতগুলির অধোগতি হইতেছে, এবং কোন্ জাতের কত মানুষ সেই সেই কাজে ব্যাপৃত ছিল এবং আছে, তাহাদের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষের স্থান কি ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ-খবর লওয়া এবং পরে যথাবিহিত পথে কার্য্য করা দরকার। তাহা হইলে বোঝা যাইবে, কেন আমাদের শিল্পকলায় এমন অনাদর ও অধোগতি।

এই কার্য্যের ক্ষমতা আমবা যদি গবর্ণমেন্টের উপর ভার দিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে কাজটি সুসম্পন্ন হওয়া শক্ত হইবে। আমাদের নিজেরের একাজে নামিতে হইবে। স্ব স্ব জেলা ও গ্রামের খবর আমরা ইচ্ছা করিলে যেমন ভাল ভাবে সংগ্রহ করিতে পাবি, সবকারী বেতনভোগী লোকে সর্বদা তেমন পাবে না। তা ছাড়া একাজে যথেষ্ট অর্থও প্রয়োজন আছে, আমাদের এবং সরকারের তরফে হই দলেব লোকেরই এই অর্থ সববরাহ করা উচিত।

বেহারে ১৯২৫ সালে লেডি হুইলার কুটীৰ-শিল্পেব একটি প্রতিষ্ঠান ও ক্রয়বিক্রয়েব কেন্দ্র স্থাপন কবিতো চেষ্টা করিযাছিলেন। বাংলা দেশে এরূপ কোনো সবকারী কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। খুব ছোটখাট ধরণেব দুই-একটি যা আছে তাহাদের না খবিলেও চলে।

যথেষ্ট ধনবল ও লোকবল থাকিলে আমরা দেশের জীবিত শিল্পগুলির সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। তাহাদের দোষগুণ ক্রটিবিকার প্রভৃতির কারণাদিও নির্ণয় করিতে পারি।

তারপর তাগদের বিদেশী কলের মালেব প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অর্থ-সাহায্য ও বিক্রয়েব সুবিধা দান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব, এবং দেশবাসীদের মনে স্বদেশী শিল্পেব প্রতি অহুভাগ বৃদ্ধি করাইয়া দেশের ঘবে ঘবে তাহাদের প্রতিষ্ঠা করাও দরকার।

দেশে কারুশিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শিল্পীদের ও শিল্পের উন্নতির জন্ত আব একটা ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। এই যে সব কারুশিল্পগুরু গ্রামের অজ্ঞাত কোণে অনাহারে অর্দ্ধাহারে পড়িয়া নিজেরাও মরিতেছে এবং

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যাগুরুসকলও লুপ্ত কবিয়া দিতেছে, ইহাদের আমরা বলি, 'ছোটলোক'। এই তথাকথিত ছোটলোকদের তাহাদের অজ্ঞাত-বাস হইতে আবিষ্কার করিয়া আনিয়া অল্প বেতনেই আমরা আমাদের তথাকথিত ভদ্রলোকদের উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয়ে কারুশিল্প শিক্ষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে দেশেব লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলি বাঁচিয়া যায় এবং ছাত্রছাত্রীদের এক-একটা অর্থকরী বিদ্যাও লাভ হয়। যাহার যা আজন্মের ব্যবসায় সে তাহাব দোষগুণ যেমন করিয়া বুঝিয়া শিষ্যদের গড়িতে পারে, শিক্ষিত অর্থাৎ বর্ণজ্ঞানবান যে কোনো মাষ্টাব-মহাশয় তাহা পাবিবেন না। সুতরাং এই তথাকথিত ছোটলোকদেরই ভদ্রলোকদের গুরু বলিয়া মানিতে হইবে; তাগাতে সজ্জা বা অপমান বোধ করাব মূর্থতা কবিলে চলিবে না। তারপর স্থল-সমূহে এইসকল শিল্পবিদ্যাকে রীতিমত পাঠ্যতালিকাত্তুক্ত করিয়া অবশু-শিক্ষণীয় করিতে হইবে। এবং হাতের কাজকে কেবল হাতে শিখিলেই হইবে না, মস্তিষ্কেব সাহায্যে তাহার সকল আইন-কানুন ও মূল সূত্রগুলিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যেন শিষ্য কেবল গুরুর শিক্ষিত কোনো একটি শিল্পসৃষ্টিব মাছিমারা নকল মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত না হয়। শিষ্যের মনে যাহাতে উদ্ভাবনী শক্তি জাগে, শিল্পের দোষসংশোধন ও বর্দ্ধনের ক্ষমতা বাড়ে এবং মানুষেব প্রয়োজন, অবস্থা ক্রটি ও অর্থবল বৃদ্ধিয়া জিনিষ সববরাহ করিবার যোগ্যতা জন্মে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রেতাদের সৌন্দর্য্য-বোধের বিকাবকে অল্পে অল্পে সংশোধন কবিয়া মার্জিত সৌন্দর্য্যজ্ঞান তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াসও এই নবীন শিল্পীদের থাকা উচিত। নতুবা শিল্পের উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতিই হইবে।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেক স্থলে অন্তত একটি করিয়া কারুশিল্প অবশু-শিক্ষণীয় করা দরকার। পাঠ্যবিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মত শিল্পবিদ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরও প্রাইজ ইত্যাদি পাইবে এবং অসুত্তীর্ণ ছাত্রদের বেলাতেও পাঠ্য বিষয়ে অসুত্তীর্ণদের মতই ব্যবস্থা হইবে। বিদ্যালয়ের কর্তৃস্থানীয়েরা বলেন যে, অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের একটি

বিদ্যা পবিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করা অপেক্ষা নানা বিদ্যা চাখিয়া দেখার প্রবৃত্তিই বেশী। এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া এবং একের ভিতরই বৈচিত্র্য আনিয়া শিল্প-বিদ্যাটিকে তাহাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই "দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে আসিয়া থাকে। ইহাদের শিল্পবিভাগের হাতের কাজগুলি বিক্রয় করিবার জন্য প্রত্যেক স্কুলে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি তাহা বিক্রয় করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের পাঠ ও ভরণ-পোষণের ব্যয় সহজেই চলিয়া যায় এবং ছাত্রাবস্থা হইতেই উপার্জনক্ষম হইতে পারায় একটা আত্ম-সম্মানবোধ ও কার্যে উৎসাহ জাগে। প্রত্যেক বদ্যালয় এবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগী হইবেনই, তাহা ছাড়া শিক্ষা-বিভাগ হইতে সমুদায় বিদ্যালয়জাত শিল্পদ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটা কেন্দ্র যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিক্রয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আর একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ছাত্রদের ইহাতে অর্থলাভ হইবে, উপরন্তু মানুষ যে তাহাদের হাতের জিনিষের আদর করিতেছে, এই আনন্দের খোবাকটুকুও জোটে।

সর্বসাধারণের চোখের সম্মুখে গ্রামের আজন্মশিল্পী ও সহরের ছাত্রশিল্পী প্রভৃতির হাতের কাজগুলি ধরিবার জন্য ও মানুষের চোখের ভিতর দিয়া সকলের মনে

তাহাদের স্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জেলায় জেলায়, সহরে ও গ্রামে মাঝে মাঝে শিল্প-প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি খোলা যে উচিত তাহা বলাই বাহুল্য। সামান্য একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকিলেই সেখানে লোকের ভিড়ের কন্মতি হইবে না। খরচ যা হইবে তাহা সমস্তই উঠিয়া গিয়া বরং লাভ থাকিবে।

ইহা ছাড়া গ্রামশ্রমাল চেষ্টার অফ কমার্শের সহিত গ্রামজ কুটীর-শিল্পের যদি একটা যোগ স্থাপন করা যায়, দালালেরা যেমন প্রতি গ্রাম হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে তেমনি করিয়া যদি ইহাদের নিযুক্ত লোক প্রতি গৃহ হইতে সামান্য সামান্য শিল্পরচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া সর্ব-সাধারণের কাছে আনিয়া কেলিতে পারে এবং চাহিদা বুঝিয়া শিল্পীদের অর্থ ও কাঁচামাল দিয়া এই কাজে উৎসাহী করিয়া তুলিতে পারে তবে আমাদের দেশজ শিল্পগুলি ক্রমে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

আজ জাতীয় জাগরণের দিনে আমরা দেশের আনন্দ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ, অন্ন, দেশাত্মবোধ সকল বিষয়েই ভাবিতে বসিয়াছি; এমন দিনে দেশের কলালক্ষ্মীকে যেন আমরা তুলিয়া না যাই তাহা বলিয়া দিতে হইবে না, কারণ এই লক্ষ্মীর হস্তেই অন্ন, অর্থ, আনন্দ বিলাইবার ভার এবং অন্ন, অর্থ ও আনন্দ যাহার আছে, সেই স্বাস্থ্য শিক্ষায় জন্মের হইতে ও দেশাত্মবোধে উদ্ভূত হইতে পারে।

সম্পাদকের চিঠি

(৭)

আনি মোটা মুটি যে বারদিন ইংলণ্ডে ছিলাম, তার প্রত্যেক দিনের চ'ব্বশ ঘণ্টা ঘূরিয়া বেড়াইলেও দেশটির বেশী কিছু দেখা হইত না। সুতরাং এটা দেখা হয় নাই, ওটা দেখা হয় নাই, বলিয়া দুঃখ করা বুধা। কিন্তু আমি যে একটা আকস্মিক বাধা প্রযুক্ত ব্রিটল গিয়া রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির ও তথাকার

টাউনহলে রক্ষিত তাহার তৈলচিত্র দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তাহার জন্য আমি দুঃখিত। ইংলণ্ডের অন্ন যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ শ্রীমান্ অরবিন্দমোহন বসুর দেখাইবার উৎসাহে ঘটিয়াছিল। সেই উৎসাহ আমার জড়তাকে পরাভূত করিয়াছিল।

জেনীভায় লীগ অব নেশন্সের গ্যাসেস্চার অধিবেশন ৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার আরম্ভ হইবে স্থির ছিল। এই

রবিবার, লীগের সব অফিস বন্ধ থাকিবে। লগুনে ম্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সুপারামর্শ দিয়াছিলেন, যে, ২১ দিন আগে গিয়া আবশ্যক মত লীগের কোন কোন কর্মচারীর সহিত পরিচয় করিয়া লওয়া ভাল। সেইজন্য আমি ১লা সেপ্টেম্বর লগুন হইতে রওনা হইব ভাবিয়াছিলাম। সেই দিনের জন্য টিকিটও কেনা হইয়াছিল। যিনি টিকিট কিনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমার বসিবার জায়গা রিজার্ভ করিতেও বলিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কারণে তাহা না হওয়ায়, বসিবার জায়গা না পাইতেও পারি ভাবিয়া, দোসরার জন্য জায়গা রিজার্ভ করিয়া তবে রওনা হই। বিদেশে অল্পদূর যাইতে হইলে আমি অধিকাংশ স্থলে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতাম, দু'এক স্থলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও গিয়াছি; কিন্তু বহুদূর যাইতে হইলে প্রথম শ্রেণীতে যাইতাম। যাহাদের বয়স বেশী এবং স্বাস্থ্যও খুব ভাল নয়, বিদেশে তাহাদের যথাসাধ্য সাবধান হওয়া ভাল। এইজন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াও, আমি জায়গা রিজার্ভ না করিয়া রওনা হই নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীমান শশধর সিংহ এবং আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত (বর্তমানে রেজুন-প্রবাসী) শ্রীমান ডাক্তার সুবোধকুমার নাগ, এম-ডি, আমার জিনিষপত্র ওজন করাইয়া আমাকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। লগুনের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত একটি অফিসের অন্ততম কর্মচারী শ্রীমান নলিনীকান্ত রায় গাড়ী ছাড়িবার আগেই আসিয়া ছুটিয়াছিলেন। ইহার ও অন্ত ২১ জন বাড়ালী যুবক লগুনে আমার অন্ত সাহায্যও করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় আমেরিকা রওনা হইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহার নিকট হইতে আগেই বাসায় বিদায় লইয়াছিলাম।

যে ট্রেনটিতে উঠিলাম, তাহা ডোভার পর্যন্ত যাইবে। তাহার পর জাহাজে ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া ক্যালেন্ডে আর-একটা ট্রেনে উঠিয়া প্যারিস যাইতে হইবে। প্যারিস হইতে আবার আর-একটা ট্রেনে জেনীভা। ডোভার-গামী ট্রেনটি দেখিলাম বেশ আরামদায়ক। যাত্রীদের

প্রত্যেকের জন্য খুব পরিষ্কার গদী আঁট; এক-একটি চেয়ার ও ঘামনে টেবিল। টেবিলে লেখাপড়া চলিতে পারে, আবার খাইবার সময় খাওয়াও চলে; অন্য ট্রেনের মত খাইবার জন্য ভোজনের পাড়িতে যাইতে হয় না। আমার যাহাতে বেশ কুটি হয়, একরূপ খাদ্য ট্রেনে কমই পাওয়া যাইত বলিয়া আমাকে যখন হুপুর বেলা একজন রেলের লোক খাইব কি না জিজ্ঞাসা করিল, তখন বলিলাম, না।

ডোভারে নামিয়া দেখিলাম, জাহাজে যাইবার পথে একটা ফার্টকের কাছে সব যাত্রীরা একটা ছোট ফার্মে নাম ধাম জাতি গন্তব্যস্থান প্রভৃতি পূরণ করিতেছে। আমিও পূরণ করিয়া ফার্টকের সমীপস্থ কর্মচারীকে দিলাম। সে ব্যক্তি উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, ব্রিটিশ জাহাজাল-দিগকে ঐ কার্ডটা পূরণ করিতে হয় না। আয়ি ইহাতে গৌরব অহুতব করিলাম না। বড়মাহুঘদের বাড়ীর আশ্রিত অল্পগত ব্যক্তি ও ভৃত্যবর্গ যদি আপনাদিগকে বড় ঘরানা মনে করে, তাহা হইলে ব্যাপারখানা ঘেঁরপ দাঁড়ায়; আমরা আপনাদিগকে ব্রিটিশ জাহাজাল বা ব্রিটিশ সিটিজেন মনে করিলেও প্রায় সেইরূপ অবস্থা ঘটে।

জাহাজে ইংলিশ প্রণালী পার হইবার সময় আমার সামুদ্রিক পীড়া অর্থাৎ বমনেচ্ছা প্রভৃতি কিছু হয় নাই। জাহাজের ডেকে বসিয়া থাকিবার সময় আমার একটা ছোট ব্যাগ বেকির তলায় গড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমি সেটা তুলিয়া আমার অন্ত্রাজ জিনিষপত্রের উপর রাখিলাম। আমাকে উহা তুলিতে যাইতে দেখিয়া একটি ইউরোপীয় মহিলা ও একটি ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাহা তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম। তাঁহারা কোন্ দেশের জানি না। ক্যালেন্ডে হইতে প্যারিস যাইবার ট্রেনেও এইরূপ শিষ্টাচার দেখিলাম। ট্রেনের যে কামরায় আমি ছিলান, তাহাতে একটি প্রৌঢ়া বা বর্ষীয়সী ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন ও একটি ইউরোপীয় যুবকও ছিলেন। যুবকটি বোধ হয় তাঁহার পুত্র। গাড়ীতে যতবার আমার গারে ও মুখে রৌধ পড়িতেছিল, ততবার মহিলাটি যুবকটিকে পর্দা টানিয়া আড়াল করিয়া দিতে বলিতেছিলেন। প্যারিস

ষ্টেশনে গাড়া হহতে যখন নামিলাম, তখন মহিলাটি বিদায়সূচক নমস্কার করিলেন। ইহারা বোধ হয় ফরাসী-জাতীয়, কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না। এইসব সামান্য বিষয় উল্লেখ করিবার কারণ এই, যে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, সব জাতির মধ্যেই বিদেশী বুদ্ধের প্রতি সৌজন্য দেখাইবার লোক আছে, এবং যেতাদের যদিও এদেশে ভারতীয়দের প্রতি এরূপ সৌজন্য সচরাচর দেখায় না, তথাপি ইউরোপে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ সৌজন্য দুলভ নহে। বিদেশী অ-শ্বেত জাতিদের প্রতি ইউরোপীয় শ্বেত জাতিদের জাতিগত ব্যবহারের আলোচনা অবশ্য এখানে করিতেছি না।

প্যারিসে ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, তথাকার সুপরিচিত ভারতীয় বণিক শ্রীযুক্ত সদ্ধারসিংহজী রাণা, এবং শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ বাসু ও শ্রীমান্ বিমলকুমার সিদ্ধান্ত নামক দুটি ভারতীয় ছাত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আগের বারে যখন প্যারিসে আসি, তখনও রাণা মহাশয় আমার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বাসু ও সিদ্ধান্ত আমাকে সহবাসে দেখাইয়াছিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব হোটেল যাইবার জন্য আমি রসীদ দেখাইয়া জিনিষপত্র আনিবার নির্মিত পকেট হহতে রসীদটা বাহির করিতে গেলাম; কিন্তু কোন পকেটেই তাহা পাইলাম না। এ অবস্থায় কি করা উচিত, জানিবার জন্য রাণা মহাশয় রেলের কয়েকটা আফিসে ঘূর্ণিলেন। শেষে জানিতে পাইলেন, আমাকে ষ্টাম্পযুক্ত কাগজে ফরাসী ভাষায় একটা দরখাস্ত লিখিতে হইবে ও তাহাতে দস্তখত করিতে হইবে, তখন ফ্রান্সদেশীয় সাক্ষীকে দস্তখত করাইতে হইবে, এবং তারপর থানায় গিয়া পুলিশ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত ছকুম আনিতে হইবে; তবে আমি জিনিষ পাইব। দরখাস্ত যাহা লিখিতে হইবে তাহার মুদ্রিত একখণ্ড বেলের আফিস হইতেই পাইলাম। কিন্তু ইহাও জানিতে পারিলুম, যে, বেলা পাঁচটার মধ্যে থানায় যাওয়া দরকার। তখন কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেদিন জিনিষ পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমি শ্রীমান্ বিমলকুমার ও বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে হোটলে গেলাম। এই হোটেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায়

অবস্থিত। এই পাড়ার হোটেলগুলি অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত বর্ণিয়া আমাদের মত পর্যটকদের পক্ষে সুবিধাজনক।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্যারিসে মোটেই শীত ছিল না, অথচ আমি লগুন হহতে বাহির হইয়াছিলাম গরম পোষাক পারয়া। হাফা ও ঠাণ্ডা ঘুমাইবার পোষাক যাহা ছিল, তাহা ষ্টেশনে আমার বাক্স প্যাটারার মধ্যে ছিল। বিমলদের কাছে আমার যে চামড়ার বাক্সটা রাখিয়া লগুন গিয়াছিলাম, তাহাতেও ছিল। কিন্তু তাহা চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। গরম কোট ও প্যাটালুন প্রভৃতি খুলিয়া ফেলাও শুষ্ক রাখে ঘুম সামান্যও হইয়াছিল কিনা, এখন মনে পড়িতেছে না। বলা বাহুল্য, হোটেলের কোন কামরাতেই ঐচ্ছাসিক বা অন্য কোন রকম পাখা ছিল না, ইউরোপের যে-সব গৃহস্থ বাড়ী ও হোটলে গিয়াছি, কোথাও পাখার বন্দোবস্ত দেখি নাই। কিন্তু গ্রীষ্ম অল্পতব অনেক জাতিগায় করিয়াছে।

রাত্রিটা কোনপ্রকারে কাটাইয়া সকালে উঠিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করিতে কারতেই বিজয়কৃষ্ণ বাসু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ছেলেটির নাম বাঙালীর মত, কিন্তু বাড়ী মালাবারে এবং বংশতঃ মালাবারী, বাল্যকাল হইতে প্রথমে শান্তিনিকেতনে ও পরে কলিকাতায় শিক্ষিত হওয়ায় বাঙালীর মত বাংলা বলিতে, লিখিতে পারে। শান্তিনাট, ইটালিতে ও ফ্রান্সে তামাকের দোকানে ষ্টাম্প বিক্রী হয়। বাসু ষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহাতে মুদ্রিত দরখাস্তটি নকল করিয়া আমার সাহ লইল, এবং পরে হোটেলের ছুঁজন কর্মচারীর দস্তখত লইল। তারপর আমরা নিকটবর্তী থানায় গেলাম। তখন বেলা নটা। থানার এক পুলিশ কর্মচারী বলিল, এখনত কিছু হইবে না, বারটার পর হইবে। বাসু ফরাসী ভাষায় কিছুক্ষণ আমার পক্ষে ওকালতী করায় তাহাব মনটা নরম হইল ও সে দরখাস্তখানা উপরওয়ালার নিকট লইয়া গিয়া তাহার ছকুম লিখাইয়া আনিল। তাহার পর আমরা গেলাম আবার ষ্টেশনে, এবং সেখানে কিছু ফাঁ দিয়া জিনিষগুলি আনিলাম। বলা বাহুল্য, পণ্যস্বত্ব

বিভাগের সেক্রেটারী ছ' একটা প্যাটার্ন খুলাইয়া দেখিয়া-
ছিল। এই সামান্য বাপারের এত বড় বর্ণনা লেখা
সম্ভব নয়; কিন্তু আমার চিঠিগুলো প্রবন্ধ নয়, এবং
আমার তুচ্ছ অভিজ্ঞতা হইতে অল্প সাবধান হইতে
পারিবেন, ইহাই আমার কৈফিয়ত।

এবার আমি প্যারিসে দু'রাত্রি ও একদিন ছিলাম।
ঈহার মধ্যে ছুটি মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র খবরের কাগজের পক্ষ
হইতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।
গণিতের ছাত্র টেণ্ডুলকর আসিয়াছিলেন, বোম্বাইয়ের
ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলের পক্ষ হইতে লীগ অব নেশ্যন্স
সম্বন্ধে আমার মতামত জানিবাব জন্ত। কিন্তু আমি
তখনও জেনীভা যাই নাই; সুতরাং সে-বিষয়ে বিশেষ
কোন কথা হয় নাই। সাধারণ রকমের কিছু কথাবার্তা
হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুবকটির নাম ধাবাল্। ইনি
প্যারিসে আয়র্সের সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইনি
বলিলেন, তথাকার বিখ্যাত দৈনিক কাগজ ল্য মাতিন
(Le Matin) তাঁহাকে ভারতবর্ষের তাত্‌কালিক
রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে
পাঠাইয়াছেন। আমি তখন একমাসের উপর
দেশছাড়া, দেশী কাগজ হইতে টাটকা খবর জানিয়া কোন
একটা মত গঠন ও প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই
নাই; সুতরাং এই ছোকরাটির সঙ্গেও সাধারণ কথাবার্তা
ছাড়া আর কিছু হইল না।

কয়েক বৎসর পূর্বে জাঁদ্রে কার্পেলস্ নাম্নী একটা
ফরাসী মহিলা কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তখন
তাঁহার বিবাহ হয় নাই। পরে হগম্যান নামক এক
সুইড ভদ্রলোককে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি চিত্রশিল্পী।
তাঁহার আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র বিশ্ব-
ভারতীয় গ্রন্থাগারে আছে। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-
পরিচয় না থাকিলেও সাহিত্যিক প্রয়োজনে তিনি
কখন কখন আমাকে চিঠি লিখিতেন। শান্তিনিকেতনে
থাকিবার সময় আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার
পরিচয় হয়। আমি যখন প্রথম বার প্যারিস যাই, তখন
তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল; শুনিয়াছিলাম
তাঁহারও আমার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু সেবার দেখা হয় নাই। এবার প্যারিসেব উপকণ্ঠে
বোলোনে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর বাড়ী গিয়াছিলাম।
আমি বিদেশী বলিয়া তাঁহারা আমার হোটেলে আসিয়া
আমাকে লইয়া যান। অনেক মাইল পথ অতিক্রম
করিয়া তবে তাঁহাদের বাড়ী পৌঁছিতে হয়। প্যারিসের
সীমায় পৌঁছিয়া একটা চুপী ঘরের কাছে আমাদের ট্যাক্সি
থামিল। আঁদ্রে হাসিয়া আমাকে বলিলেন, “আমরা
ফরাসীরা অনেক বিষয়ে খুব অগ্রসর, কিন্তু কোন কোন
বিষয়ে মধ্যযুগে আছি। ট্যাক্সি-চালক যে নিজের
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেট্রল লইয়া যাইতেছে না, তাহা
চুপী রক্ষণারীকে বুঝাইবার জন্য গাড়ী থামাইয়াছে।”
বোলোনে যাইবার পথ বেশ সুন্দর। রাস্তায় ধূলা নাই।
ধূধারে গাছের সারি। কতকটা রাস্তা অরণ্যেণ পাশ
দিয়া গিয়াছে। আঁদ্রে বলিলেন, “অতীত যুগে এখানে
নেকড়ে বাঘ ও ভালুক থাকিত। এখন কোন হিংস্র
জন্তু সেখানে থাকে না, কিন্তু বড় বড় গাছ গা ঘেঁসারবেঁসি
করিয়া থাকায় বনভূমি সুন্দর দেখাইতেছে।”

আঁদ্রে ও তাঁহার স্বামী উভয়েই ভারতপ্রেমিক ও
রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। তাঁহাদের বাড়ীটির নাম
রাখিয়াছেন “চিত্রা”। বাড়ীটি ছোট, সুন্দর, ও কতকটা
প্রাচ্যধরণের আসবাবে সজ্জিত। শান্তিনিকেতনের নিকটস্থ
সাঁওতাল পল্লী হইতে ক্রীত একটি দড়ি-ছাওয়া কাঠের
মোড়া সম্বন্ধে রক্ষিত দেখিলাম। আঁদ্রে চিত্রাঙ্কনক্ষে
তাঁহার নিজের আঁকা অনেকগুলি ছবি রহিয়াছে।
সদ্যোতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিটি বেশ
হইয়াছে মনে হইল। রবীন্দ্রনাথের ছোট একখানি ছবিও
মন্দ নহে। পেছন দিকে হাতছ'টি রাখিয়া ও সামনে
ঝুঁকিয়া তিনি যেমন চলেন, সেই ভঙ্গিতে আঁকা
হইয়াছে। তিনি সচরাচর যেমন হাঁটেন, তদ্বাে কিন্তু
তাঁহার অপেক্ষা কিছু দ্রুত মনে হয়। আঁদ্রে ও তাঁহার
স্বামী বলিলেন, “আমরা মডার্ন রিভিউ কাগজখানির
প্রত্যেক সংখ্যার নিয়মিত পাঠক।” তাঁহার স্বামী
বলিলেন, “উহা আমাদের দৈনিক সম্বল। আঁদ্রে ত
আর কোন কাগজই প্রায় পড়েন না; উহার বিজ্ঞাপন
পর্যন্ত পড়েন। প্রবাসী পড়িতে পারেন না বলিয়া তাঁহা

বড় দুঃখ; কেননা শ্রীমতী প্রাতমা দেবীর নিকট তিনি শুনিয়াছেন, যে, তাহাতে অনেক ভাল জিনিষ থাকে। আমি আপনার কানঠা কস্তুর সোনার খাঁচার ইংরেজী অলুবাড় পুড়িতেছি।” দোখলাম, তাহার অধ্যয়নকালের টোবলেব উপর উহা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। স্বকলে শ্রীমতেনে রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্ম দুটি গাছের ডালের উপর একটি কাঠের ঘর নির্মাণ কবাইয়াছেন। শ্রীমতী আত্রে গল্প করিলেন, যে, তিনি, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও আমার জ্যেষ্ঠা কস্তা এক বাত্রি সেই কাঠের ঘরে ছিলেন। “চিত্রায়” রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী নন্দিনীকে দেখিয়া আত্মলাদত হইলাম। সে বছর পাঁচ ছয়েব হইবে বোধ হয়। কয়েক মাস প্যারিসে থাকিয়াই অনায়াসে ফ্রেঞ্চ বলিতেছে, মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চ শব্দ না জুটায় দু’একটা বাংলা কথাও চালাইতেছে। শিশুবা যে এত সহজে ভাষা শিখে, তাহার কারণ তাহারা স্বাভাবিক প্রণালী অনুসারে অল্পকৈ কথা বলিতে শুনিয়া শিখে। কোন একটা কাগজের বা খামের টুকরার উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া একটা টুকরীতে বা বাস্কে ফেলিয়া দিলেই তাহা তাহার দাদা মশায়ের কাছে পৌছিয়া যায়। সুতরাং দিনের মধ্যে অনেকবার জামেনীতে ভ্রাম্যমাণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার নাতনীর চিঠি নিশ্চয়ই পাইতেন। “চিত্রায়” আমার চা কক্ষের পরিবর্তে প্রাচ্য রীতি অনুসারে কলের শব্দ পান করিলাম।

৪ঠা সেপ্টেম্বর আমার জেনীভা রওনা হইবাব কথা। রেলের টিকিট আগের দিন সহজেই কিনিয়াছিলাম। কিন্তু বসিবাব জায়গা রিজার্ভ করা তত সোজা নয় দেখিলাম। তাহা ভিন্ন আফিসে করিতে হয়। সেখানে গিয়া দেখি, একজনর পেছনে আর একজন, তার পেছনে আর একজন, এইরূপে সারি বাঁধিয়া বিস্তর নারী ও পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। মুখে সন্তোষের চিহ্ন কাহারও বড় দেখিলাম না; কিন্তু সকলেই ধৈর্য ধরিয়া আছে, ঠেলাঠেলি করিতেছে না। ধৈর্যের সহিত এই রকমের সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবাব অভ্যাস আমাদের দেশেও প্রচলিত হওয়া উচিত। ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি অন্তায়, অশোভন, এবং তাহাতে অধিকাংশের অহবিধাও হয়।

শ্রীমান্ বিমল ও বিজয় আমাকে সকলে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলেন। আমার কামরায় কেবল একটি প্রৌঢ় মহিলা ছিলেন। পরে জানিলাম, তিনি আমেরিকার এক সাংবাদিকের স্ত্রী, জেনীভা যাইতেছেন—বোধ হয় লীগ সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কোন আমেরিকান্ কাগজের সংবাদপ্রেরক রূপে। তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং বোধ হইল না। শীর্ণ চেহারা। কিন্তু অস্বচিন্তা চমৎকার। গাড়ী ছাড়িতেই দোখ, তিনি হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া দাঁতদেছেন। বাড়িতে ছেলেপিলে রাখিয়া আসিয়াছেন—কাঁদা আর বিচর কি? তিনি ফরাসী হোটেলের লোকদমকে ও ফরাসী জাতকে অর্থগুরুতার অপবাদ দিতে লাগিলেন। আমি ভারতীয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন ও কি করিতেছেন। ইউরোপের নানা স্থানে, প্রধানতঃ রেল-গাড়িতে, যে ২৪ জন আমেরিকানের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাহারা সকলেই মহাত্মা গান্ধীকে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার খবর জানিতে চাহিয়াছেন। ট্রেনে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। কেবল একটা ছোট কথা বলিব। দুপুর-বেলা যাইতে বসিলাম, তিন জন ইউরোপীয়ের সহিত এক টেবিলে। ইউরোপের সব জায়গার জল পানযোগ্য নহে শুনিয়াছিলাম, মদও পাই না; সুতরাং এক বোতল বনিজ জল (মিনার্যাল ওয়াটার) চাহিলাম। টেবিলের ইউরোপীয় খানাসামা আনিয়া দিল। তাহাকে উহার ছিপি খুলিয়া দিতে বলিলাম; দিল না। কিন্তু তাহা এক আধ মিনিট পরেই ঐ খানাসামা আমার পাশের যাত্রীর একটা বোতল আপনা হইতেই খুলিয়া দিল।

আগেকার একটা চিঠিতে আমি লিখিয়াছি, জেনীভার ট্রেন হইতে নামিয়াই আমি আমার জিনিষপত্র কেন পাই নাই। তাহা আগেকার বেলগার্ড ষ্টেশনে পড়িয়াছিল। সে সব কথা আগে বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস মহাশয় ও তাহার পত্নীক সৌজন্যে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। তাহারা আমার জন্য যে হোটেল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, টাকাও বেশী দিতে হয় না।

অধিকন্তু সেখানে সব রান্না হয় মাথনে; অল্পত্র সচরাচর চাকিতে হয়, শুনিলাম।

এই হোটেলে একজন ভারতীয় মুসলমান সাংবাদিক আমাব সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি সাধারণতঃ সুইজারল্যান্ডেই থাকেন। তাঁর কাগজেব ছু এক সংখ্যা জেনীভায় থাকিতে পাইয়াছিলাম। ভাবতশাসক ইংরেজদেব প্রতি তিনি খুব ভক্ত ভাবা প্রয়োগ করিলেন না। যাহারা হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্বভা বাধাইয়া দিয়া নিজেদেব কাজ উদ্ধার করে, তাহাদিগকে ত তিনি খুবই গালি দিলেন। যে-সব ভারতীয় পরম্পরের মধ্যে ঝগড়া করিয়া বিদেশীদের পক্ষে ভারতশাসন ও ভারতশোষণ সহজ কবে, তাহাদের প্রতি তিনি সাতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

লীগের দ্ব্যাসেম্বরী বঙ্গম বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম বৈঠক হয় ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে। সভা আরম্ভ হইবার সময় ছিল বেলা এগাবটা। কিন্তু এগাবটা অপেক্ষা বাবোটাব কাছাকাছি সময়েই কাজ আরম্ভ হইল। ভার আগে কিছুক্ষণ শৃঙ্খলার অভাব ও গোলমাল লক্ষিত হইয়াছিল। যে হলে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধি, দর্শক, সংবাদপত্রের রিপোর্টার প্রভৃতি কয়েক হাজার লোক ছিল। স্রীপুরুষ প্রায় সকলেরই পোষাক ইউরোপীয়, যদিও দস্তুরমত কাল এবং কতকটা কাল রঙের মাহুয় তাদের মধ্যে কিছু ছিল। সম্পূর্ণ প্রাচ্য বা কতকটা প্রাচ্য পরিচ্ছদ কেবল জন কতক মাহুয়ের দেখিলাম। যেমন, পারস্তের প্রতিনিধি প্রিন্স্ আফা, মাদ্রাজের আবু সি পি রামস্বামী আইয়ার (কেবল পাগড়ীটা ভারতীয়), সিন্ধুদেশের একজন দর্শক (কেবল পাগড়ীটা ভারতীয়), লিখিত মোতিলাল নেহরু এক বহু, আবও ২১টি ভারতীয় মহিলা, এবং আমি। হলে ইউরোপীয় ও প্রাচ্য পোষাক পবা লোকদের অহুপাত দেখণ, লীগে ইউরোপীয় ও অনিউরোপীয় লোকদের প্রভাবের অহুপাতও প্রায় লেইরূপ। যে কোন জাতির মাতৃভাষা কোন ইউরোপীয় ভাষা, তাহাদিগকে আমি ইউরোপীয় বলিতেছি। ফলে প্রাচ্য চেহারা বেশী না থাকায় কোন কোন

রিপোর্টার এটা কোতুদ্ধনক ভ্রম করিয়াছিল। যেমন, জেনীভার ল্য ত্রিবিউনের ৭ই সেপ্টেম্বরের কাগজে দেখিলাম :—

“A la tribune d'honneur on remarque un venerable personnage a longue barbe grise qui n'est autre que le poete philosophe Rabindranath Tagore.”

‘সম্মানার্থের উপবেশনের মকে একজন দীর্ঘসেতুশ্রুজবিশিষ্ট ভক্তিজ্ঞান ব্যক্তিকে দেখা গেল যিনি কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন আর কেহ নহেন।’

রবীন্দ্রনাথ তখন জেনীভায় ছিলেন না, সুইজারল্যান্ডের কোথাও ছিলেন না। যাহারা রবীন্দ্রনাথকে কখনও একবারও দেখিয়াছে, তাহাদের এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব। এইরূপ ভ্রমবশতঃ বপুতলার মহারাজাও দীর্ঘসেতুশ্রু মাহুটিকে নমস্কার করিয়াছিলেন; যদিও সে ব্যক্তি সেলামটি আত্মসাৎ করে নাই। জায়েনীতেও এইরূপ ভুল কোন কোন জার্মান পুরুষ ও স্রীলোকের হইয়াছিল। সেই কারণে জায়েনীতে একদিন রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া বলিলেন, “মশায় রামানন্দ-বাবু, লেকচার দিয়ে দিয়ে ক্লাস্ত হ'য়ে পড়ে'ছ। আপনি আমাব কয়েকটা লিখিত বক্তৃতা নিয়ে কোন কোন সহরে পড়ে দিন; তার পর পণ্ডিতজী মুখে মুখে তার জার্মান অহুবাদ ক'রে দেবেন। বেশ চলে' যাবে; আমিও বেঁচে যাব।” বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক পণ্ডিত ভারী-চন্দ রায় নামক একজন পাঞ্জাবী ভক্তলোক রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার জার্মান অহুবাদ সভাস্থলে মুখে মুখে কবিতেন। তাঁর গলাব আওয়াজ বেশ উচ্চ ও গম্ভীর, এবং তিনি বেশ দ্রুত হৃদয় জার্মান বলিতে পারেন। তিনিই পণ্ডিতজী।

লীগের তথ্যজ্ঞাপন বিভাগের (Information Sectionএর) কর্তা কামিংস্ সাহেব আমাকে টিকিট দেওয়ায় আমি দ্ব্যাসেম্বরী বঙ্গম বৈঠকে যাইতে পাবিতাম; কয়েকটাতে গিয়াছিলামও। কামিংস্ সাহেব প্রথম দিন নিজে হইতেই আমাকে একটা বিশেষ টিকিট দিবেন বলিয়াছিলেন, যাহা দেখাইলে লীগ-কাউন্সিল,

কমিটি প্রভৃতির বৈঠকেও যাওয়া যায়। কয়েক দিন পরেও সেটা না পাওয়ায় আমার কোন বন্ধু তিন দিন তাহা আনিতে যান; কিন্তু কোন-না-কোন কারণে একদিনও মিস্টার কামিংসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই। তার পর ঐ বিশেষ টিকিট যে ক্ষুদ্র ঘটনার পর আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

জেনীভা হ্রদের ধারে অষ্টাশ্রু দিনের মত একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে ভারতীয় অষ্টমতম প্রতিনিধি থানু বাহাদুর শেখ আব্দুল কাদির এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাধারণ সেক্রেটারী মিস্টার প্যাট্রিকের সহিত দেখা হয়। নমস্কার কুশলজিজ্ঞাসাদির পর মিস্টার প্যাট্রিক বলিলেন, “কাল দ্বিতীয় কমিটিতে থানু বাহাদুর বক্তৃতা করিবেন; আপনি শুনিতে যাইবেন না?” আমি বলিলাম, “আমি কি যাইতে পারি?” তিনি বলিলেন, “অবশ্যই পারেন।” স্ততরাং আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম। পর দিন যথাসময়ে লীগ সেক্রেটারীয়েটে ভবনে উপস্থিত হইলাম। সব-কমিটির অধিবেশন সেখানেই হইত। প্রথমে দ্বিতীয় কমিটির যামবা ঠিক করিতে না পারিয়া অস্ত্র কামরায় গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে যে কার্ড ছিল, তাহা দেখাইলাম—চুকিতে দিল না; বোধ হয় সেটা স্যাসেমন্ট্রীর কার্ড বলিয়া। তার পর ঠিক কামরার দরজায় গেলাম। সেখানেও চুকিতে দিল না। প্যাট্রিক সাহেব বলিয়াছিলেন আমি চুকিতে পাইব, এইজন্তই গিয়াছিলাম। বুঝিলাম, তিনি ঠিক অবস্থাটা জানিতেন না। যাহা হউক, এখন অগত্যা কামিংস সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্ত তাঁহাকে আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি সাক্ষাৎকার-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, “থানু বাহাদুরের বক্তৃতা আমি শুনিতে পাইব, প্যাট্রিক সাহেব আমাকে এইরূপ বলায় আমি আসিয়াছি; কিন্তু আমি চুকিতে পাইলাম না। আপনি আমাকে যে বিশেষ কার্ড দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা না থাকাতোই বোধ হয় এইরূপ ঘটিয়াছে।” তখন কামিংস বলিলেন, “আমি বড়

ব্যস্ত ছিলাম,” ইত্যাদি। একখানা মূল্যবান টিকিট পাঠাইতে এত কি বেশী সময় লাগে, যে, খুব ব্যস্ত লোকেও একজন সুদৃগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তাহা পাঠাইতে সময় পান না, বুঝিতে পারিলাম না। আমি যথাসম্ভব ঠাণ্ডা ভাবে বলিলাম, “আমার নিজের দেশে আমাকেও লোকে কতকটা অবসরশূন্য ব্যস্ত মাহুফ মনে করে। নিমন্ত্রণপত্রে আমাকে সব সুবিধা দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা যদি দেওয়া নাই-ই হইবে, তাহা হইলে, এত সময় ও এত অর্থ অপব্যয় করিয়া এত হাজার মাইল পথ বাহিয়া আসার পরিবর্তে, বাড়ীতে বসিয়া লীগের পুস্তক রিপোর্টাদি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া কিনিলেই ত হইত।” তখন ইংরেজ ডব্ললোকটি কিছু থতমত খাইয়া আমাকে দ্বিতীয় কমিটিক গৃহে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। সেখানে দেখিলাম, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় অনেক লোক ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা এবং তাহার ফরাসী ও ইংরেজী অম্বুবাদ শুনিতেছেন। প্রোভান্সের মধ্যে জী ও পুরুষজাতীয় এমন বয়সের কতকগুলি মাহুফ দেখিলাম, যাহারা, জ্বলের না হউক, কলেজের ছাত্র হইবাবই সম্ভাবনা। স্ততরাং কমিটির মীটিঙে প্রবেশাধিকার দেওয়াও বলিয়া মনে হইল না। যাহা হউক, কয়েকটি বক্তৃতা ও অম্বুবাদ শুনিবার পর থানু বাহাদুরের বক্তৃতাও শুনিলাম। তাহা অস্ত্র বক্তৃতাগুলি অপেক্ষা নিকট মনে হইল না। সে দিন আলোচ্য বিষয় ছিল, ইণ্টেলেকচুয়েল কো-অপারেশন অর্থাৎ জ্ঞানাহরণ শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সব জাতির মধ্যে অভিজ্ঞতার আদান প্রদান, ইত্যাদি। তিনি পাঠাবী মুসলমান, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীনতম সভ্যতা সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছিল, এবং আলোচ্য বিষয়ে ভারতীয় যে-সব লোক কাজ করিয়াছেন, বলিয়া তিনি নাম করিলেন, সবাই অমুসলমান।

সেই দিন হোটেলে সন্ধ্যার আগে কামিংস সাহেবের প্রেরিত বিশেষ টিকিটটি পাইলাম।

৬ই সেপ্টেম্বর লীগ স্যাসেমন্ট্রীর অধিবেশনের প্রথম দিনে সভাস্থলে যাইবার আগে আমি ঐ ইংরেজটির সহিত দেখা করিয়া ভারতবর্ষ ও লীগ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য



সাঁওতাল ছেলে

শিল্পী শ্রীমতোদ্ভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শাস্তিনিকেতন

[প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

জানিতে চাহিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা তিনি টুকিয়াও লইয়াছিলেন। কিন্তু সে-বিষয়ে তিনি পরে আমাকে কিছু লেখেন নাই। আমার জ্ঞাতব্য তথ্য পুস্তিকা ও রিপোর্টাদিতে থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাও আমি পাই নাই।

হোমরা-চোমবাদের সঙ্গে দেখা করিবার অভ্যাস আমার নাই। অভ্যাসটা বদলাইতে উৎসাহ জন্মে, এরূপ কিছুও জেনীভায় ঘটে নাই। এই কারণে আমি উপযাচক হইয়া লীগের কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি নাই। আমার দোষ বা গুণ বর্ণনাচ্ছলে ইহা লিখিতেছি না; কেবল তথ্য হিসাবে লিখিতেছি। ১৪ই সেপ্টেম্বর কামিংস্ সাহেব আমাকে লিখিয়াছিলেন, “যখন ঘ্যাসেমুরীর সব বৈঠক শেষ হইয়া যাইবে, এবং সেক্রেটারিয়েটের লোকেবা অতিব্যস্ত থাকিবেন না, তখন আমি, আপনি লীগের যে-সব বিভাগের কাজ সম্বন্ধে বিশেষ বৌতুলী, তাহাৎ কর্মীদের সঙ্গে আপনার পবিচয় করাইয়া দিব।” এই চিঠি পাওয়ার পরও আমি তাঁহাকে দেখা-সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অমুখোষ করি নাই। ঘ্যাসেমুরীর শেষ বৈঠক হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর। ২৮শে কামিংস্ আমাকে প্রাতে লিখিলেন, যে, যদি সে দিন অপরাক্ত পাঁচটার সময় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তা ডাক্তার রাইক্-ম্যানের সহিত দেখা করিবার আমার সুবিধা হয়, তাহা হইলে তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে; এবং এই সাক্ষাৎকারের পরও যদি আমার সময় থাকে, তাহা হইলে লীগের সেক্রেটারী-জেনার্যাল আর্ এলিক ড্রাগণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকারেরও বন্দোবস্ত হইতে পারে। আমি উভয় বন্দোবস্তই সম্মতি জানাইলাম, এবং যথাসময়ে তথ্যজ্ঞাপন বিভাগের আফিসে হাজির হইলাম। কামিংস্ ডাক্তার রাইক্-ম্যানকে খবর দিতে গেলেন। আমি আফিসে অপেক্ষা কবিত্তে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আফিসের এক কর্মচারী টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিয়া আমাকে বলিলেন, “ডাক্তার রাইক্-ম্যান ভয়ানক (“frightfully”) দুঃখিত যে আপনার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। তিনি একটা কমিটিব কাজে ব্যস্ত আছেন।” কামিংস্ও ফিবিয়া আসিয়া এই

কথা বলিলেন। এই ব্যাপারের জন্ত কাহারও নিন্দা করিতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু একথাটা বলা দরকার মনে কবি, যে, কমিটির অধিবেশনটা ত হঠাৎ হয় নাই; আগে হইতেই ইহার বন্দোবস্ত ছিল। ইহা অল্পমান করাও অসাধ্য ছিল না, যে, উহা ব কাজ পাঁচটার মধ্যে শেষ না হইতেও পারে। সুতরাং আমার সহিত দেখা করিবার সময়নির্দেশ তখন না করিলেই সুবিবেচনা-ও শিষ্টাচার-সঙ্গত কাজ হইত। অবশ্য যদি কেহ দেখা করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি কাকুতি মিনতি করে, তাহা হইলে অমুগ্রাহক বা মুক্কা কখন কখন বলিয়া থাকেন বটে, “আচ্ছা, অমুক সময়ে এসো; সে সময় ফুরসৎ হলে দেখা যাবে।” কিন্তু আমি উমেদার ছিলাম না, কোন অমুগ্রহপ্রার্থনা করিতে জেনীভা যাই নাই; সুতরাং আমাকে আমার ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ দিবার নিমিত্ত কোন বন্দোবস্ত কবিবার প্রয়োজন ছিল না। যে-মাহুষ দেখা করিবার কোন দরখাস্ত করে নাই, তাহার সহিত দেখা করিবার জন্ত সময় নির্দেশ করিয়া তাহার পর তাহাকে বলা, “আমার এখন অবসর নাই,”—এরূপ ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে হয় নাই।

ডাক্তার রাইক্-ম্যান আমাব সহিত দেখা করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণে দুঃখিত, ইহা আমাকে জানাইবার পর কামিংস্ লীগের বড় বর্জা সেক্রেটারী-জেনার্যালের সহিত দেখা হইতে পারে কিনা, জানিতে গেলেন। কিন্তু জানা গেল, তিনিও বড় ব্যস্ত, দর্শন মিলিবে না। তিনি ওজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বা কিংকর্তব্যাত্মক দুঃখিত কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। অতঃপর কামিংস্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরদিন ঐ দুই ব্যক্তির সহিত দেখা করিবার সময় ঠিক কবিবেন কিনা। আমি বলিলাম, আমি চিঠি লিখিলে করিবেন। পরে আমি তাঁহাকে এবিষয়ে কোন চিঠিই লিখি নাই। তাহার নিকট বিদায় লইবার পর তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে কামরায় বাহিরে আসিলেন ও বলিলেন, “আপনার জেনীভা যাতায়াতের ও জেনীভায় থাকিবার ব্যয় নির্বাহ করিবার ইচ্ছা লীগের বরাবরই ছিল। আপনি যদি রাজী হন, ত, টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত অবিলম্বে হইতে পারে।” আমি

বলিলাম, ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে, নিজেই নিজের ব্যয় নির্বাহ করিব। তাহার পর বলিলাম, লীগ যদি নিজেব নানাবিধ কার্যাদেশদ্বারা আমার দরকারী পুস্তকবিপোচাদি আমাকে দেন, তাহাই যথেষ্ট সৌজন্য মনে করিব। তিনি আমাকে কলিকাতায় আমার দরকারী পুস্তকাদি পাঠাইয়া দিতে রাজী হওয়ায় আমি লীগের পুস্তকাদির মূল্যতালিকায় দরকারী জিনিষগুলি দাগ দিয়া হোটেল হইতে লীগ আফিসে পাঠাইয়া দিয়া আসি। তন্মধ্যে কিছু আমি পাইয়াছি; পবে আরও কিছু কিছু পাইতে পারি। কিন্তু কতকগুলি যে পাইব না, তাহা নিশ্চিত। বারগ, কামিংস্ লিখিয়াছেন, “ম্যাগেট্‌স্ সঙ্ঘদ্বায় মন্তব্যাদিগুলির পূর্বা সেট পাইলাম না”, ইত্যাদি। ইহার ঠিক মানে বুঝিতে পারি নাই। মানে তিন রকম হইতে পারে। (১) ঐ জিনিষগুলির পূর্বা সেট আমাকে দিবার ক্ষমতা কামিংস্ লীগের কর্তাদের নিকট হইতে পান নাই। তাহা হইলে ওগুলি আমাকে দেওয়া অব্যাহতীয় বিবেচিত হইয়াছে। (২) মন্তব্যাদির সবগুলিই ফুরাইয়া গিয়াছে; আর ছাপা নাই। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে না। আমি লীগ আফিস হইতেই প্রাপ্ত তালিকায় ঐ জিনিষগুলির উল্লেখ দেখিয়া দাগ দিয়াছিলাম। (৩) মন্তব্যগুলির কোন কোনটি ফুরাইয়া যাওয়ায় ও ছাপা না থাকায় এখন পূর্বা সেট পাওয়া যায় না। কিন্তু জিনিষগুলি এমন নয়, যে, কতকগুলির অভাবে অগ্রগুলি অকেজো বা অবোধ্য হইবে। সুতরাং পূর্বা সেট পাওয়া না গেলেও, যাহা পাওয়া যায়, তাহা কেন আমাকে দেওয়া হইল না?

ম্যাগেট্‌ কথাতার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কি হইবে জানি না। জিনিষটা এই। গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানী তুৎ প্রভৃতির অধিকৃত নানা ভূখণ্ড জয়ী জাতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। আগে আগে এই রকম দেশ-গুলিকে বিজিত ও তৎপর অধিকৃত বলা হইত। এখন সভ্যতাব ভাষায় বলা হইতেছে, যে, এইগুলি সূশাসন কবিবার অস্থায়ী অমুক অমুক জাতি পাইলেন, ও তৎক্ষণাৎ জবাবদিহি রহিলেন; ইত্যাদি। ইহারই নাম ম্যাগেট্‌। এই সর্বমুখ বন্দোবস্ত একটা মন্তব্য ভণ্ডামি বলিয়া পৃথিবীব

বিস্তর নিরপেক্ষ বৃদ্ধমান লোকের ধারণা। সুতরাং তৎক্ষণিক কাগজপত্র আমাকে দিতে যদি লীগের অনিচ্ছা থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইতে পারি না। তবে, আমাকে তাহা না দিবার উহাই কারণ কিনা, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, আমার এই ধারণা জন্মাচ্ছে, যে, লীগ নিমন্ত্রণপত্রে আমাকে সব সুবিধা দিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। লীগের বড় বড় কর্মচারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সম্বন্ধে কামিংস্ আমাকে ২২ শে নবেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন, “ম্যাসেমুরীর পরে বড় বড় কর্মচারীরা যখন অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ফুরসৎ পাইয়াছিলেন, আপনি সেই সময়েই জেনীভা ছাড়িয়া যাওয়ায় দুঃখিত হইলাম; কারণ আপনার সহিত তাঁহাদের মূল্যকাৎ ঘটাইতে আমি উৎসুক ছিলাম।” আমি তাঁহার উৎসুক্যের আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু আমি নিজেও ত খুব বেশী ফুরসতী লোক নই। একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশী জেনীভায় থাকা আমার সাধ্যাত্ত ছিল না। কবে কাহার অগ্রহ হইবে ও দর্শন পাইব, সে আশায় জেনীভায় বসিয়া থাকিতে পারি নাই; ইউরোপ অল্প স্বল্প দেখিবার ইচ্ছা ছিল। যদি কেবল বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করিবার ক্ষমতা ম্যাসেমুরীর অধিবেশনের পর যাইতাম, তাহা হইলে লীগ সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞান কিছুই হইত না। অথচ সেইটাই বেশী দরকারী মনে করিয়াছিলাম। আর ম্যাসেমুরীর বৈঠক ত ২৫শে সেপ্টেম্বর শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ২৮শেও তুজন কর্তা পূর্ব প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে দর্শন দেন নাই।

যাহা হউক, অপর যদি লীগ ভারতীয় কোন দেশী সম্পাদককে নিজ কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে আহ্বান করা আবশ্যিক মনে করেন, তাহা হইলে যেন ভারত-গবন্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া লোক মনোনীত করেন (যাহা আমাকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় করা হয় নাই), এবং এমন কাহাকেও মনোনীত করেন যিনি লীগের নিকট হইতে টাকা লইবেন (একাধিক বার জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যাহা আমি লই নাই)। জেনীভায় আমা অপেক্ষা একরূপ ব্যক্তির ভাগ্যবান হইবার সম্ভাবনা বেশী।

জীবনদোলা

শ্রী শাস্তা দেবী

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

বাংলা পাড়া। বড় রাস্তার পর দুই তিনটা বড় ও ছোট গলির মোড় ফিরিয়া তবে সেখানে পৌছাইতে হয়। শেষ গলিটা এত সরু যে পাশাপাশি তিন চার জন মানুষের হাঁটা কষ্টকর। দুই পাশে বেশীর ভাগ ছুতলা ও তিনতলা বাড়ী গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করিয়া সার বাধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের রাস্তার ধারের দরজা জানালা প্রায় সমস্তই বন্ধ। সুতরাং গলির ভিতর আলো বাতাসের ছড়াছড়ি বিশেষ নাই। তাহার উপর গৃহস্থদের গৃহের সমস্ত আবক্ষনা দরজায় দরজায় স্তূপ হইয়া উঠিয়া দুর্গন্ধে মানুষের দম আটকাইয়া দিব্যার যোগাড় কবে। বাড়ী ব কিরা আলস্য করিয়া ময়লার টিনে আবক্ষনা ফেলতে কখনও যায় না; মনে করে নিজেদের দরজাটি বাঁচাইয়া ফেললেই শুচিতা রক্ষা হইবে। এমন করিয়া পরস্পরে পরস্পরের দরজায় উচ্ছষ্ট অন্নব্যঞ্জন, এঁটোপাতা, ভাঙ ইঁড়া, ছাই, মাছের ঝাঁশ গুড়াত বত হৃদয় ও স্বগন্ধ জ্বিনঘের বাজার বসাইয়া গলিটিকে অপক্লপ করিয়া তুলিয়াছে।

ইহারই মধ্যে বাড়ী ব পাশে বাঁধানো রোয়াকে ছাঁকা হাতে খাল গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা ধূত পরা বাড়ীর বাবুণ, টেরিকাটা পানদোকানারঙিত মুখ, পাড়ার বয়্যাটে ছেলেরা, ও ঘর্মান্তকলেবর ঝা চাকরের কোলে ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ শিশুরা মাঝে মাঝে বসিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছে। দুই একটা বাড়ী হইতে রান্নাঘরের ধোঁয়া তখনও পাক খাইতে খাইতে বুলকালিমাখা জানালার গরাদে ও জলনিষ্কাশনেব নর্দমার ফাঁক দিয়া গলির ভিতর আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদেশের লোক অকস্মাৎ এ গলিতে আসিয়া পড়িলে মনে করিত জীবনযাত্রা-পথের

সকল প্রকার কুশ্রীতা, কদর্যতা ও স্থূলতাকে সর্বসাধারণের চোখের সামনে খুলিয়া ধরাই বুঝ বাঙালী জীবনের বিশেষত্ব। কোথাও যেন স্বকৃতির আবরণ দিয়া কদর্যতাকে ঢাকিবার প্রয়াস নাই। জীবনযাত্রার অতি স্থূল সকল নিদর্শন উৎকট রূপে পথের ধারে আসিয়া পড়িয়া মানুষের চক্ষু কর্ণ নাসায় জ্বালা ধরাইয়া দিতেছে।

গলির শেষপ্রান্তে একটুখানি ফাঁকা জায়গা অল্পে আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। শেষ বাড়ী-খানার গা ঘেসিয়া সেই জামটুকুর কোলেই এতটা কৃষ্ণচূড়া ও দুইটা দেবদারু গাছ মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছে। গাছ-গুলার বয়স বেশী নয়, এখনও বাড়ীর মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। বসন্তের বাতাস দেবদারু গাছের কৃষ্ণিত পাতায় পাতায় কাঁচা সোনার রং লাগাইয়া আর কৃষ্ণচূড়ার সর্করাধে আবীর ছড়াইয়া এই অতি কুৎসিত গলিটার অস্তিত্ব মানুষকে একটুখানি ভুলিতে সাহায্য করিতেছে। গোখুলব আলো বর্ণোজ্জ্বল-গাছগুলার মাথা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িয়া গলির মুখ ও শেষ বাড়ীখানার ঘেরা ছাদটুকু কেমন একটা স্নগ্ধ স্বর্ণাভ রঙে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। গলির ভিতর দিকটা অন্ধের আলোর অবসানে এবং গ্যাসের আলোর অনাবির্ভাবে তখনই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অন্ধকার পথটা মাড়াইয়া আসিয়া এখানে দাঁড়াইলে এমন স্নগ্ধ আলোও চোখে হঠাৎ তাঁত্র লাগে।

অদৃশী মোটা কাপড় ও চাদরে সজ্জিত অল্পবয়স্ক তিনটি স্তন্যদর্শন যুবক বাড়ীটার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই জন গাছতলাব দিকে একটু সরিয়া গেল; সকলের বয়োভ্যেষ্ঠ যুবক দরজার কড়া দুটা খুব জোরে নাড়িয়া দিল। দুই একটা বাড়ীর উপরের জানালা হইতে দুই একটি মেয়ের মুখ একবার উকি মারিয়া বাহিরের দিকে

দেখিল, তাহার পবই জানালাটা টানিয়া দিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। একটি ছেলে বলিল, “এদেয় ত সাড়া-শব্দ নেই; আজ দেখছি কিবতে রাত হ’য়ে যাবে। আমার কাজ সব প’ড়ে রয়েছে।”

আব একজন হাসিয়া বলিল, “তোমার ত সর্বদাই কাজ প’ড়ে থাকে। তোমার কাজ নেই এমন একটা দিন যেদিন আবিষ্কার করিতে পারব, সেদিন আমি নগদ চার আনা পয়সাব হরিবলুট দেব। সত্যি বলছি সঞ্জয় দা’, তোমার কাজ করার জ্বালাতেই আমার কাজ করার মোহ একেবারে কে’টে গেছে। বাপ’রে, ভোর ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ ছাড়া কথা বলবে না। ভোর বেলা যখন ঘুমটা বেশ নেশার মত চোখ দুটো জড়িয়ে রয়েছে, ইচ্ছে করছে খোলা জানালাটার পাশে ঘণ্টাখানেক আরো চোখ বুজে প’ড়ে থাকি; ঠিক তখুনি প্রতিদিন সঞ্জয়দা’ মহা উৎসাহে তক্তপোষ থেকে একলাফ দিয়ে উঠে হুঁম্ ক’বে দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়বে। একটা মানুষ যে ঘুমুচ্ছে তা জ্ঞাপকও নেই। গায়ে যত জোর আছে সেটা তক্তপোষ আর দরজাব হড়কোর উপর ফলিয়ে এমন সব বিকট আওয়াজ তুলবে যে আমার ঘুম বেচারী লজ্জায়ই দেশ ছেড়ে পালায়। কিছু বললে বলে, ‘আজ বড় কাজের তাড়া; মনে ছিল না, কিছু মনে কোরো না। যেন আর কোনো দিন ঠর কাজের তাড়া থাকে না। একটা কথা পাঁচ শ’ বার বলতে লজ্জাও করে না।”

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, “আমার মত বেরসিককে ক্রম মেট ঠিক করেছিলে কেন?”

ছেলেটি বলিল, “কি করি বল? মা বাবা বল্লেন সঞ্জয়ের মত ভাল ছেলে জুড়ারত খুঁজলেও নাকি মেলে না; একমাত্র সেই সঞ্জয় ছাড়া আর কারুর হাতে তাঁরা তাঁদের এমন অমূল্য রত্নটিকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এদিকে অভিভাবকটি যে আমাব ভোরের ঘুম ভাঙানো ছাড়া আর কোনো খবরই রাখেন না তা ত আর তাঁরা জ্ঞানেন না আমি যদি তোমার ক্রম-মেট না হ’য়ে ডিপ্রেসড ক্লাশের ভিখু কাওয়া হতাম, তাহ’লে হয়ত তোমার সনে আমার দেখা শুনাটা আর একটু বেশী হ’তে পারত। বিয়ের চামার মুচি মেথর খাঙড় এ’সে সারাক্ষণ

আমার দরজায় ব’সে সঞ্জীবাবুর খোজ ক’রে ক’রে ঘরটা শুদ্ধ অশুচি ক’রে দিলে। এপিডেমিকের ভ’য়ে মাসে আমার চার বোতল ফেনাইলই খরচ হ’য়ে যায়।”

সঞ্জয় বলিল, “সেত একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। নাহলে তোমাদের মেসের ঝি বছরে একদিনও ঘবে বাঁটি দিত কি না সম্ভেহ। দুটো টাকার বদলে শুটা কি কম লাভ?”

ছেলেটি রাগ দেখাইয়া বলিল, “শুধু কি দুটো টাকা? তাহ’লে ত ভাগ্যকে ধন্য বলতাম। তোমার ভদ্র বন্ধুদের চানার খাতা নেই? সঞ্জয় দা’ করবে বিশ্বপ্রেম, আর মাঝা পড়ব বেচারী আমি! জগতের সমস্ত হিত ত করিতে হবে, কাজেই যে খাতা ধ’রে তাকেই নই ক’রে দিয়ে মনিবাগটিটাকে শুঁছে সঞ্জয় দা’ বেবিয়ে পড়ে। আব আমি বেচারী ঘরে ব’সে নিজের কাজ করব কি দিবারাত্রি সব চানার পেয়াদাদের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত। তারাতা শুনবেই বা কেন? বলে, ‘মশায় শুধু হাতে কিবে যাব? আপনাই না হয় দুটো টাকা দিয়ে দিন।’”

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, “কি করি বল ভাই? দাতা হবার সখ আছে অথচ পয়সা নেই; তাই তোমার দিকে সবাইকে লেলিয়ে দি। শব্দর, কি বল হে, কাজটা কিছু মন্দ? সোসিয়ালিজ্‌মের দিনে পরের টাকায় দাতা হওয়াই ত আদর্শ।”

শব্দর বলিল, “টাকাটা যখন আমার নধ, অপূর্বর, তখন তোমার কথায় সায়’দিতে আমার কিছু আপত্তি নেই। তোমার নাইট জুগ, ফ্রিলাইব্রেরী, দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি যত রকম পাগলামী আছে, সব যদি অপূর্বর ঘাড় ভেঙে করিতে পার তাহ’লেও আমি ‘না’ বলব না। তবে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে আর বেশীক্ষণ তোমাদের বক্তৃতা শুনতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।”

শব্দর আর একবার সজোবে কড়া দুইটা নাড়া দিল। ভিজা হাত আঁচলে মুছিতে মুছিতে একটি ঝি হাসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া লজ্জিত ভাবে বলিল, “কলতলায় বাসন মাজতে বসেছিলুম, জলের হড়হড়ানিতে কিছু শুনতে পাইনি, বাবু, মাপ করবেন। মাকে এত বলি আর একটা লোক রাখ, তোমার বাড়ী অষ্টপহর লোক আস

লেগে রয়েছে, কেঁটা ছোঁড়া একবার বেরুলে দেউড়ী আগ্নাতে আগ্নাতে আমার প্রাণ যায়, তা মা কিছুতে গুনবে না।”

দাসীর বক্তৃতায় আর উৎসাহ না দেখাইয়া সঞ্জয়, শব্দর ও অপূর্ণ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সদর দরজার পরেই উঠান, ডান পাশে বসিবার ঘর, বাঁপাশে রান্না, ভাঁড়ার ইত্যাদি, দরজার মুখোমুখি উঠানের উন্টা দিকে দোতলা অন্দর মহল। সদর দরজার দুই পাশের ঘরগুলি একতলা বলিয়া অন্দরের দুতলা হইতে দুইটি ছোট ছাদে আসা যায় এবং অনেকখানি আলো-বাতাসও পাওয়া যায়।

ছেলেরা বসিবার ঘরেই বসিল। ঘরখানি বসিবার জুগাই ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু বসিবার ঘর বলিতে আজ-কাল যে গৃহস্থামীর ঐশ্বর্য দেখাইবার ঘরগুলি দেখা যায়, ইহা সে-রকম কিছু নয়। ঘরের দুই পাশে দুইটি সরু তক্তপোষের উপর দুখানা সতরঞ্চি লম্বো-ছিটের চাদর দিয়া ঢাকা, বাঁশের উপর বেত জড়ানো দুই তিনখানা হাঙ্কা চেয়ার, একটি সেইরকম ছোট টেবিল ঘিরিয়া মাঝখানে সাজানো এবং দেয়াল ঘেঁসা একটি ছোট কাঠের টেবিলের উপর একটি কেবোসিনের আলো, একটি ঘড়ি ও একটি ক্যালেন্ডার বসানো। ঘরের সাজসজ্জার ভিতর দেয়ালে একখানা বিলাতী চিত্রকরের আঁকা ‘প্রার্থনা’ ছবি ছাড়া আর কিছু নাই, কিন্তু ঘরের দেয়াল, মেজ, দরজা, জান্না এবং সামান্য আসবাবগুলি প্রত্যহ সমস্তে ঝাড়া মোছা এবং ঘসামাজ্য এমন উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে ঘরখানা ধনার ড্রয়িংরুম বলিয়াই ভ্রম হয়। মনে হয় যেন একেবারে নূতন ঘরে নূতন পালিশ করা জিনিষপত্র দিয়া এইমাত্র কে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সঞ্জয়রা তিনজনেই একখানা তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। ঝি তাহাদের বসাইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ভিতর বাড়ীতে খবর দিতে গেল।

সঞ্জয় শব্বরের সহপাঠী। তাহারই সহিত আজ বৎসর দুই মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। সকল নূতন ডাক্তারের মতই তাহারও পশার বেটুকু জমিয়াছে, তাহা বিনা পয়সার, স্ততরাং অবসর

প্রচুর। কিন্তু কথায় বলিতে অবসর প্রচুর বলিয়াই কার্যত তাহার কিছুই অবসর নাই। দেশ-হিতৈষণার একটা খেয়াল তাহার মাথায় ছেলে-বেলা হইতেই ছিল। পড়াশুনা সাজ করিয়াই তাই সে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। যে মানুষ একটা কাজে মন দিয়া লাগে, এবং কিছু করিতে পারে, আমাদের দেশের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে দেশের সমস্ত কাজের মধ্যেই সেই মানুষটাকে ধরিয়া টানটানি করা। সঞ্জয় অনেক যোগাড়যন্ত্র করিয়া একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খাড়া করিবার চেষ্টায় ছিল। যাহাদের ঔষধ ও চিকিৎসার প্রয়োজন আছে অথচ শিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে, এমন অনেক ভদ্র পরিবার খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের সাহায্য করাও তাহার খেয়াল ছিল। এই সূত্রে নানা মানুষ তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে শারীরিক ও মানসিক সকল রকম হিত-সাধন-প্রচেষ্টার সহিতই জড়াইয়া তুলিতেছিল। অবশ্য তাহার নিজের যে ইহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল তাহা বলা যায় না। সেই রকমই একটা উপলক্ষে তাহারা এখানে আসিয়াছে।

শুভ্রবেশিনী, উজ্জল গৌরবর্ণা একটি মহিলা কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। তাহার শরীর দীর্ঘ, উন্নত, চোখ দুটি আয়ত, কপাল বিস্তৃত, মুখের কাটে কোথাও দুর্বলতার চিহ্ন নাই। বয়স তাহার পঞ্চাশের কাছাকাছি, চলাকোরা ও কথাবার্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু মুখে এখনও নববধূ মত একটি সলজ্জ নম্র হাসি লাগিয়া আছে।

তিনি ঘরে ঢুকিতেই ছেলেরা তিনজন উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা ব্যস্ত হ’চ্ছ কেন? এই যে আমিও বসছি।”

সঞ্জয় সকলের আগে বলিল, “মাসিমা, সে মেয়েটির কি হ’ল?”

মাসিমা বলিলেন, “কি আর হবে, বাছা? বিধবা মেয়ে, তাকে রাখতেও পারে না, ফেলতেও পারে না। এমন ক’রে আর কেলে রাখলে মরেই যাবে মেয়েটা। বাপ মা হ’য়ে সেটাও সহ করতে পারছে না, অথচ ডাক্তার ডাকবার সাহসও নেই। আমি তোমাদের কথা বললাম,

তাতেও ভয়ে মরে। বলে ‘জানাজানি হ’য়ে যাবে।’ কি যেক’রূপ বুঝতে পারছি না। আমার এখানে লুকিয়ে নিয়ে এলে ছায়। বলেছে, ‘কাদের মেয়ে কি বৃত্তান্ত না বলে আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান?’ কিন্তু আমি যদি আনি, তাহ’লে আমার মেয়েদেব অভিভাবকেরা গোলমাল করবে।”

সঞ্জয় বলিল, “আচ্ছা, আমরা আপনাকে একটা ঘর ভাড়া ক’রে দেব। আপনি দিন কতক তাকে নিয়ে সেইখানে থাকবেন চলুন।”

মাসিমা বলিলেন, “আমার মেয়েগুলোকে কার কাছে ফেলে যাব?”

অপূর্ণ হঠাৎ বলিল, “আচ্ছা, দিনের বেলা আপনি থাকবেন। রাত্রে জন্তো আমি ভাড়া করা নাসের বন্দোবস্ত ক’রে দেব। আপনার বাড়ীর খুব কাছেই ঘর দেখে দিচ্ছি—যাতে আপনার যাওয়া-আসার কোনো অসুবিধা না হয়।”

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, “সঞ্জয় ত একটা নার্সিং ব্রাদার-ছড্ডও খাড়া করবার চেষ্টায় আছে; একটা সিষ্টারহুড করিতে পারলে আর পয়সা খরচ হয় না।”

মাসিমা বলিলেন, “আমার মেয়েদের মধ্যে অনেকের কিন্তু সত্যি সত্যি এসব দিকে ঝোঁক আছে। কিন্তু এসব জায়গায় তাদের আমিও যেতে দিতে পারি না, বাপ মাও দেবে না।”

সঞ্জয় বলিল, “আপনার বাড়ীতেও ত একটা রুগী আছে। সে রুগীর খবর কি?”

মাসিমা বলিলেন, “সে বোচারী ত যতদিন সুস্থ ছিল, খেটেখুটে থাকিল, আমারও অনেক কাজে লাগছিল। এখন রোগে পড়েছে, কি ক’রে যে খরচ চলবে জানি না। স্বামীর খোঁজ ত অনেক ক’রেও পেলাম না। আর পেলেই বা কি? যে ইচ্ছা ক’রে ফেলে পালিয়েছে তাকে ধ’রে আনলেই কি আর সে মাথায় তুলে নেবে? তোমরা আছ—তাই ওর ঔষধ-পথ্যটা জুটছে।”

সঞ্জয় বলিল, “মাসিমা, আপনার অনেক গুণ আছে, কিন্তু একটা মস্ত দোষ যে, নিজেকে আপনি

কোথাও দেখতে পান না। আপনি যদি ওকে টাই না দিতেন তা হ’লে ঔষধ-পথ্য আমরা ত শুল্লে চালতে পারতুম না। যা দেখছি ওত চিরকুই হবে; এবং আপনারই পোষ্য থাকবে। কিন্তু আপনি চিরকাল কি ক’রে ওকে বইবেন?”

মাসিমা বলিলেন, “চিরকাল যদি বাঁচতাম, বাবা, তা হ’লে না হয় চেষ্টা করা যেত, কিন্তু ম’রে গেলে কার ঘাড়ে ফেলে যাব তাই ভাবছি। বোচারীর পৃথিবীতে কোনো আশ্রয় নেই। ওকে নিয়ে কি করব ভাবতে ভাবতে রাজে ঘুম শুদ্ধ ভেঙে যায়। পঞ্চাশ বছর বয়স হ’ল, বাড়ালীর মেয়ে আর ক’দিনই বা বাঁচবে? এখন থেকে সব ব্যবস্থা ত ক’রে যাওয়া উচিত। তার উপর চপলা আর চঞ্চলা আছে; লেখাপড়া কাজকর্ম অবশ্য সাধামত শিখিয়েছি, ক’রে খেতে পারবে। কিন্তু বয়স অল্প, মেয়ে হ’য়ে জন্মেছে, একটা যদি নিজের সংসার না গ’ড়ে দিতে পারি, বড় একলা পড়বে বোচারীর।”

অপূর্ণ বলিল, “একলা থাকাই ত ভাল। পৃথিবীতে বন্ধন যত কম হয়, দুঃখও তত কম হবে। ছেলেবেলায় দুঃখ পেয়েছে ঢের, বড় হ’য়ে একটু সুখভোগ ক’রে নেবে।”

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, “তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই ওকথা বলতে পারছ, অপূর্ণ। এখনও তোমার বন্ধনের বয়স আসেনি। আর একটু বড় হ’লেই দেখবে স্বেচ্ছায় যাদের জন্ত দুঃখ-বহন করতে চাও, তারাই তোমার প্রাণের স্বপ্নের কেন্দ্র এবং এই দুঃখও সুখ দেবার মাছুষ জগতে যদি না থাকে তবে জীবনটা একেবারে শূন্য বোধ হবে।”

শঙ্কর বলিল, “তাই বুঝি, মাসিমা, বহু কল্পনাময়ের দুঃখ পাবার জন্ত এতগুলি বোঝা সংগ্রহ করেছেন। আপনি নিজের আদর্শে সবাইকে বিচার করেন-ব’লেই অমন কথা বলছেন। না হ’লে আপনার মত এই ‘পরের বোঝার’ ভিতর থেকেও অল্প লোকে সুখ সংগ্রহ করতে পারত না।”

মাসিমা বলিলেন, “ওটা একেবারে ভুল কথা। যে

কেউ আপনার হ'য়ে উঠতে পারে সেই মানুষকে স্থখ দিতে পারে। সে কি আর তখন পর থাকে? তোমরা আমাকে অত বড় ত্যাগী ভেবো না। এই সমস্ত সংসার, এই সমস্ত সেবার খেলা, এ সবই আসলে আমার স্বার্থের জন্ত। যাক, আর বেশী কথা ব'লে সময় নষ্ট করব না। সন্ধ্যা ত নিশ্চয়ই সকাল থেকে না খেয়ে ঘুবে, একটু সামান্য জল-টল খেয়ে যাও।”

শঙ্কর ও অপূর্ণ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “আমরা সকালে খেয়েছি ব'লে বিকালে বুঝি খেতে জানি না, মাসিমা।”

মাসিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “বড়র নাম ক'রে আনলে সে কি আর একলাই খায়? ছোটরাও ভাগ পায় কিছু কিছু।”

শঙ্কর বলিল, “বাপরে, আমাকেও শেষকালে তোর প্রসাদ খেতে হবে, সন্ধ্যা! তুই দেখছি একেবারে মহাপুরুষ হ'য়ে উঠেছিস।”

মাসিমা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গে একটি মসীকৃষ্ণ ভৃত্যকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার হাতে ট্রে উপর লুচি, পটলভাজা, আলুর চচ্চড়ি ও নারকেল-নাড়ু তিনখানা রেকাবীতে সাজানো। ট্রে নামাইয়া ভৃত্য উর্দ্ধ্বাশ্রমে চা আনিতে দৌড় দিল।

গৃহকর্ত্তী শঙ্করের হাতে একখানা রেকাবী তুলিয়া দিয়া বলিলেন, “তোমরা সর্বদা মা মাসীর হাতের জিনিষ খাচ্ছ, তোমাদের হাতে এসব দিতেই লজ্জা করে। আমি ত নিজে কিছু করতে সময় পাই না; মেয়েদের জলখাবার করার পালা আছে; তারা কিছু করে, কিছু চাকরটাই করে।”

শঙ্কর বলিল, “আপনার মেয়েরা রান্নার পরীক্ষায় গ্রাইজ পাচ্ছে, তারা মন্দ রাঁধবে কি ক'রে?”

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পাড়ার দুই-একটা বাড়ী হইতে শাঁখের আওয়াজ সন্ধ্যা ঘোষণা করিয়া ধামিয়া গেল। পাশের একটা বাড়ীতে সন্ধ্যায় সংকীৰ্ত্তন হয়; সেখানে গায়কেরা গানের পূর্বে সজ্ঞারে খোল ও কবতাল বজার দিয়া ভাবটা জমাট করিবার প্রচণ্ড

চেঁটা জুড়িয়া দিল। লাল-কুর্তা-পরা কৃষ্ণ-ভৃত্য ঘরের আলোটা জালিতে আসিতেই সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি; আজ বৌধ হয় আর জালাতন আপনার সহ্য হবে না।”

গৃহকর্ত্তী বলিলেন, “তোমার কাজ প'ড়ে রয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। আমার ঘাড়ে আর কেন অপবাদ দিয়ে যাচ্ছ?” তারপর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “শঙ্কর, কি গৌরীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে?”

শঙ্কর বলিল, “এসেছি যখন তখন একবার দেখে না যাওয়া কি আর উচিত? গৌরীই কি আর তা হ'লে আমাকে আস্ত রাখবে?”

গৃহকর্ত্তী সন্ধ্যা ও অপূর্ণের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “তুমি যদি একলা দেখা করতে চাও ত আমার সঙ্গে এস, শঙ্কর।”

শঙ্কর বলিল “একলা কেন? গৌরীর আর অত পর্দায় কাজ নেই। সে এখানে এলেই ত পারে।”

দাসা রাখালীর মা'র ডাক পড়িল। সে গৌরী দিকিকে খবর দিতে ছুটিল। একবার পিছন ফিরিয়া লুকুদৃষ্টিতে বাবুদের খালার দিকে তাকাইয়া গেল। খানকয়েক লুচি পড়িয়া আছে। সে ফিরিতে না ফিরিতে কেঁটা যদি আগে আসিয়া খালা সরায় তাহা হইলে ওগুলো আজ আর তাহার ভাগ্যে জুটিবে না। চাহিয়া লইলে অবশ্য অর্ধেক পাইতে পারে, কিন্তু সে ছেলেপিলের মা, উচু জাত, চাহিয়া উচ্ছিষ্ট খাইতে কি পারে?

রাখালীর মার তাড়ায় গৌরীর আসিতে বিলম্ব হইল না। এই পাঁচ বৎসরে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গৌরী আর সে বাপ মায়ের স্নেহের দুলালী আদরিণী গৌরী নাই। তাহার মধুর কৈশোরসৌন্দর্য্য, বয়স ও জীবন-সংগ্রামের ছাপ লাগিয়া শাপিত অন্তরের মত আরো জলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেশভূষা দে-সৌন্দর্য্যকে অনেকখানি চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। ব্লাউস পেটিকোট ইত্যাদির উপর পুরুষদের মত একখানা সরু পাড় ধুতি তাহার

পরণে। হাতে দুইগাছা খুব সরু সোনার চুড়ি তাহার স্বর্ণাভ রঙের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। আর কোনো অলঙ্কার তাহার গায়ে নাই। বুদ্ধির শ্রী সমস্ত মুখখানা আলো করিয়া রাখিয়াছে।

শঙ্কর বলিল, “কি রে গৌরী, কেমন আছিস? এই সঞ্জয় আর অপূর্ণ। এদের পরিচয় ত আর নূতন ক’রে দিতে হবে না!”

অল্প কথাবার্তার পর সকলে উঠিয়া পড়িল। সঞ্জয়, “মাসিমা, এই ওষুধের শিশি ছোটো আর গোটো-দশেক টাকা রইল”, বলিয়া টেবিলের উপর তাড়াতাড়ি সেগুলো রাখিয়া দিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

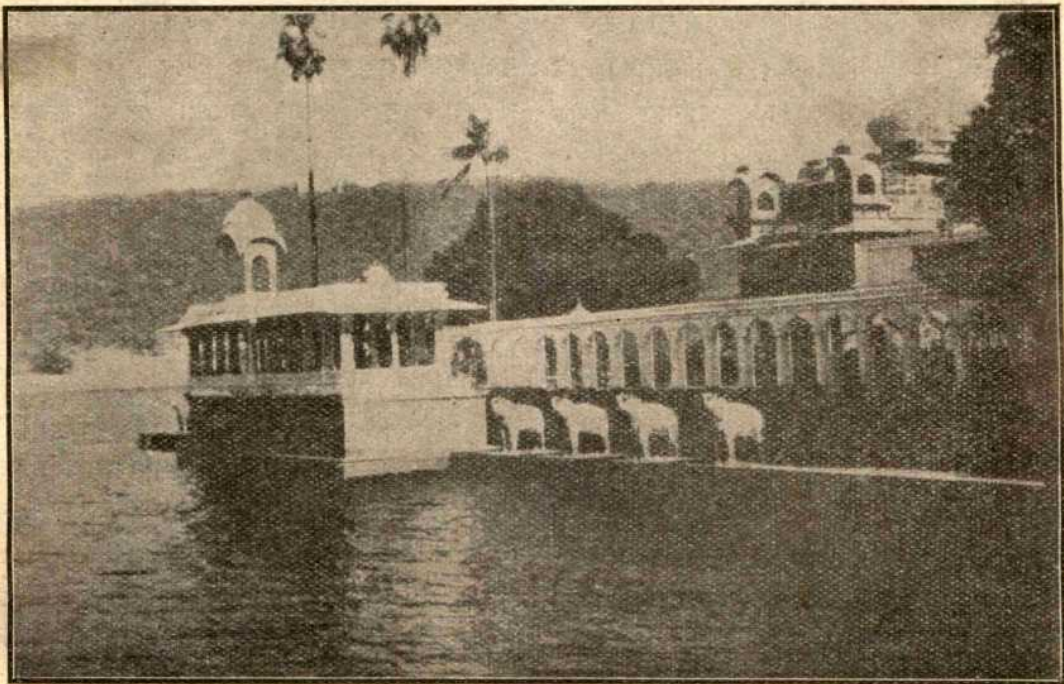
(ক্রমশঃ)

মেবার দর্শন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল, যে, রাণা প্রতাপের দেশ একবার দেখে আসি। সে ইচ্ছা মনেই ছিল, কাজে পরিণত হ’বার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নি। হঠাৎ গেল শীতকালে সে সুষোণ পাওয়া গেল। বন্ধুরা ত নানা

কথাই বললেন। কেহবা আমি সেখানে সতিাই যাব, একথা অবিশ্বাস করুলেন; আবার অস্ত্রেরা রেলের কষ্ট, থাকার কষ্ট, শীতের কষ্ট ইত্যাদি অনেক কিছুই ভয় দেখালেন। যাই হোক, কয়েক দিন তোড়-জোড় করিতে আর



জগদ্বাস প্রাসাদ, পিছোলা হ্রদ, উদয়পুর



রাণা অমরসিংহের সমাধিগাত্রে প্রস্তরকারকাৰ্য্য, মহাসতী, উদয়পুর

[লেখক কর্তৃক গৃহীত কটো হইতে]

কয়েক দিন যাই যাই ক'রে কাটিয়ে একদিন হঠাৎ “ব্যর্থ-রিজার্ভ” ক'রে ফেলা গেল। নানা মূনির নানা মত শুনে (এর মধ্যে মূনিশ্রেষ্ঠ হলেন হাওড়া ষ্টেশনের এনকোয়ারি অফিসের সবজান্তা সাহেব) ঠিক সব-চেয়ে খারাপ রেলযাত্রা যাতে হয়, তাই করা হ'ল। অর্থাৎ পাঞ্জাব মেলে “বুক্” ক'রে ফেললাম। তার পর সেই দিনই রাত্রি আটটা আন্দাজ গিয়ে “ব্যর্থ” খুঁজে বার ক'রে ট্রেনে সোয়ারি হওয়া গেল।

স্বনামধন্য পাঞ্জাব মেল এতই প্রসিদ্ধ, যে, অনেকে বৃদ্ধ বয়সেও মাসে পাঁচবার তাঁকে শুধু দর্শন করিতে হাওড়া যান। স্ততরাং ওসময়ে বিশেষ না বললেও চলে।

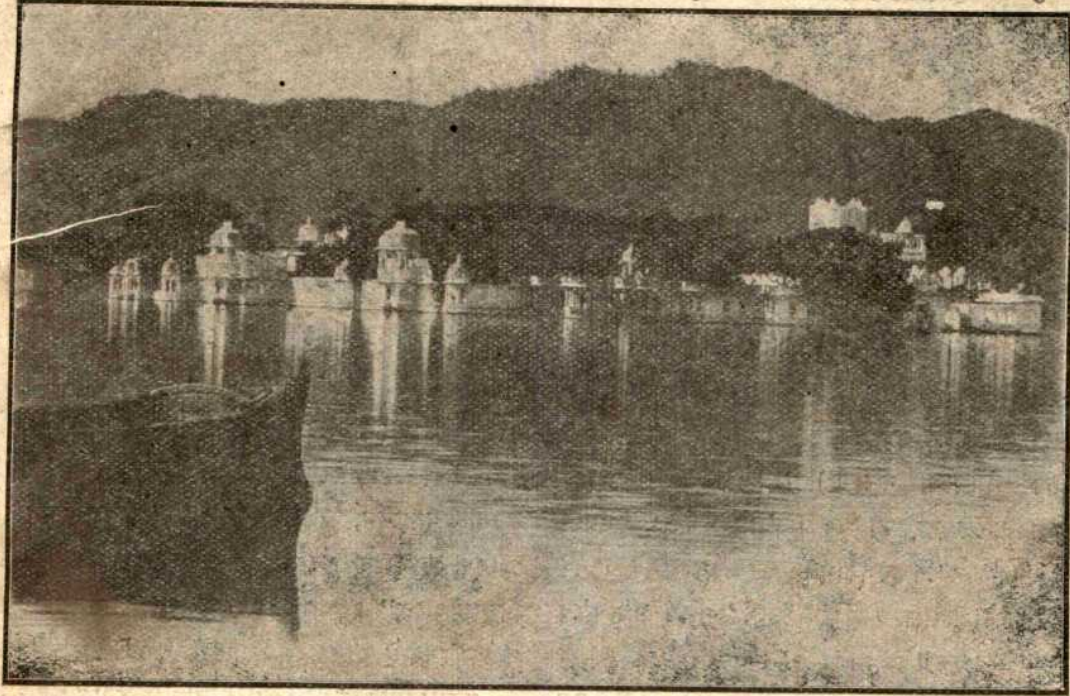
ট্রেনে ভিড় ছিল না। বেশ বিছানা পেতে কন্ডলের আশ্রয় নিয়ে ঘুম দেওয়া গেল। সকালে পাটনায় উঠে মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের জোগাড় দেখছি, এমন সময়ে খদ্দর-ভূষিত এক বেহারী ভদ্রলোক একটি ফ্রেমে বাঁধান বিজ্ঞাপন হাতে আমার গাড়িতে এলেন। আমি বিদেশী “রাত্রি-পোষাক” (নাইট সুট) প'রে কেলুনারের চা খাচ্ছি দেখে তিনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন—বোধ হয় আমি খাটি দেশী কি না ঠাণ্ড করিতে পারছিলেন না, খাটি বিদেশী যে নই সে-বিষয়ে আমার “বদনসাঁবি” গায়ের রং যথেষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিল—তারপর নীরবে বিজ্ঞাপনখানি দেখালেন। বিজ্ঞাপনটি শ্রীযুক্ত রাওল্ড-প্রসাদের থগোল গান্ধি আশ্রমের জন্ম সাহায্যের প্রার্থনা। তাতে আশ্রমের উদ্দেশ্য এবং যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর নাম ধাম এবং তাহার টাকা আদায়ের অধিকার লেখা ছিল। কথাবার্তায় জানলাম, যে, রেল ও ষ্টীমারের যাত্রীদের কাছ থেকে ইহার প্রায় মাসিক পাঁচশ টাকা

সাহায্য পান। কিছু টাকা দেওয়ায় তিনি ছাপান রসিদ দিয়ে পরের ষ্টেশনে নেমে গেলেন।

তারপর ছপুয়ে এলাহাবাদ পৌঁছলাম। দেখলাম, ষ্টেশনটি বিয়ের কনের মত মেজে রয়েছে। শুন্লাম বড়লার্ট আসছেন, তাই এত। “উলু” দেবার জন্ম স্থানীয় হোমরা-চোম্বার দল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবে “পেয়াদা ফিরছে ঘারে,” একথা পাছে কেউ ভুলে যায়, তাই একদল পাঠান সেপাই আর বেশ কিছু পুলিশও উপস্থিত আছে।

সন্ধ্যাবেলায় টুঙলা পৌঁছলাম। নেমে গাড়ি বদল ক'রে আগরা ফোর্টের ট্রেনে উঠলাম। একজন রেল-কর্মচারী টিকিট দেখে জানতে চাইলেন, যে, আমি আগ্রা ফোর্ট থেকে রাত্রের গাড়িতে যাব কি না। যাব বলায় তিনি বললেন, যে, তাহ'লে তিনি আগ্রা ফোর্টের সেই গাড়িতে জায়গা রাখার জন্তে তার করবেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তারের খরচা দিতে হবে কি না। তিনি দরকার নাই বলায় একবার ভাবলাম তাঁকে কিছু বকসীস করি, কিন্তু তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বেশ বড় কর্মচারী মনে হওয়ায় সেটা আর করলাম না। আগ্রা ফোর্টে পৌঁছে বুঝলাম যে, সেটা মস্ত ভুল করা হয়েছিল, কেননা তাঁকে “স্মৃতি-উত্তেজক” না দেওয়ায় তিনি আর কষ্ট ক'রে তার করার কথা মনে রাখেন নি। যাই হোক, কোন রকমে একটি গাড়িতে চুকে উপরের “ব্যর্থ” দখল ক'রে বসা গেল। বসা গেল এই কারণে, যে, সমস্ত জিনিসপত্রও উপরের “ব্যর্থ” এ নিতে হয়েছিল; স্ততরাং শোবার জায়গা ছিল না। নীচে রাখবার জায়গা ছিল না।

যদি কেউ বি-বি-সি-আই রেলওয়ের এ ট্রেনে



জগন্মল্লির প্রাসাদ, পিছোলা হ্রদ, উদয়পুর

সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে চান, তাহ'লে বিছানা যা দরকার
গায়ে জড়িয়ে নেবেন, আর অল্প লটবহর তিন চারটি খামে
পুরে পকেটে রাখাই শ্রেয়ঃ। এর বেশী জিনিষ হ'লে
সারারাত ব'সে কাটাতে হবে।

যে-গাড়িতে আমি উঠেছিলাম, সেটি রেলগাড়ি-
আবিকারক মহাত্মা জর্জ ষ্টিফেন্সনের আমলে তৈরী।
আমার ঠাকুরমার বাসন রাখার জন্ত একটি সেকলে
ধরণের শালকাঠের সিন্ধুক ছিল। সেটির থেকে এরকম
ছ'খানি গাড়ি তৈরী করা চলত। কাঠও বোধ হয় কিছু
বাঁচত। সিন্ধুকটি এমন কিছু অত্যশ্চর্য্য গোছের বড়
ছিল না। সাধারণ সেকলে ধরণের শালকাঠের বড়
সিন্ধুক।

সারারাত জায়গার অভাবে ও শীতে আড়ষ্ট হ'য়ে
ভোরে আজমীরে পৌঁছালাম। শরীরের ঘানি দূর করার
জন্ত ওয়েটিংরুমে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলাম। গায়ে জল
ঢেলে মনে হ'ল বুঝিবা আমি “আজ মরু গয়া”। স্নানের

পর প্রচুর গরম চা, কুটী, মাখন, ডিম ইত্যাদি খাওয়াতে
রক্ত-চলাচল ফের আরম্ভ হ'ল।

আবার অল্প এক ট্রেনে উঠে ঘণ্টা পাঁচ ছয় শুকনো
পাহাড় আর শরের বন দেখতে দেখতে যাবার পর
চিতোর গড়ে পৌঁছলাম।

স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে চিতোর দুর্গ। চারিধারে
সমতল জমি ঘেরা চিতোরের পাহাড়, তার মাথায়
মন্দিরের চূড়া, রাজপ্রাসাদ, রাণাকুন্ডের জয়ন্তস্তম্ভ, গলদেশে
ছয় সার দুর্গপ্রাকার, রোদের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে,—
সে এক অপূর্ণ দৃশ্য! কিব্বার পথে দেখা যাবে ঠিক
ক'রে ট্রেনে উঠবার জোগাড় করলাম।

উদয়পুর-চিতোরগড় রেলওয়েটি আমাদের বারাসত-
বসিরহাট বা হাওড়া-আমৃতার মত ছোট মাপের।

ট্রেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন বোম্বাইয়ের এক
মাড়ওয়ারি জৈন পরিবার। ভদ্রলোকটি আমার বয়স্ক।
সঙ্গে ছিলেন তাঁর পৃথিবী, ছুটি ছোট ছেলে এবং একটি



রাজপথে নৃত্যগীত—ঝুলনযাত্রা, উদয়পুর

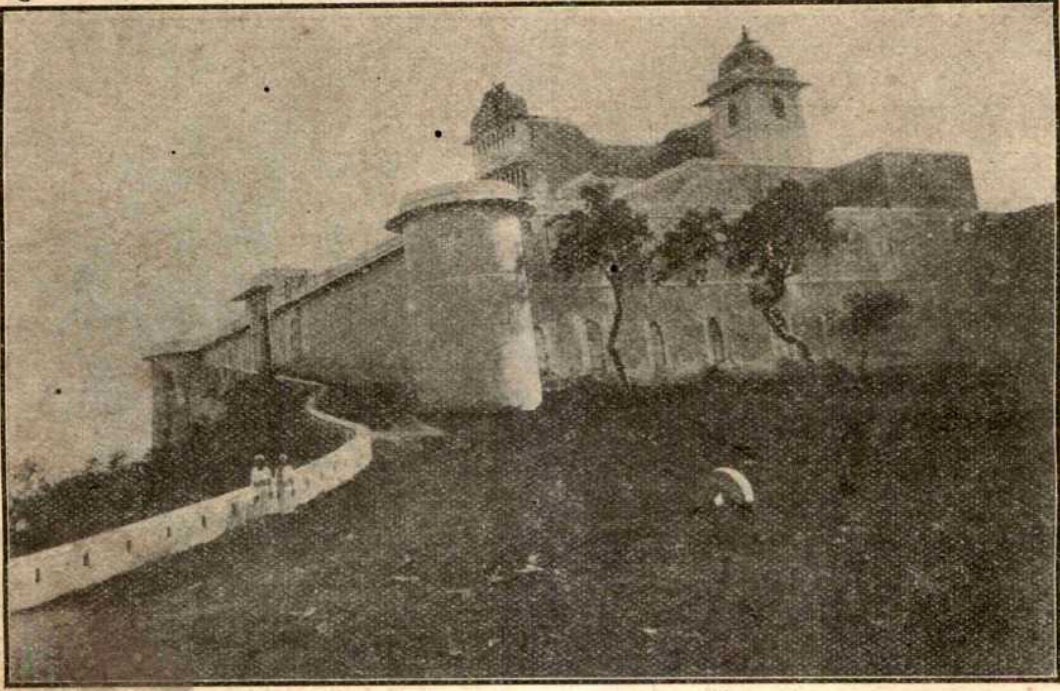
ছয় সাত বছরের মেয়ে। প্রথমে আমাকে ফিরিঙ্গী স্থির ক'রে এঁরা একটু জড়সড় হ'য়ে পড়েন। পরে বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়ায় এবং বোম্বাইয়ের ক্রীকেটের কথা জিজ্ঞাসা করায় বেশ আলাপ পরিচয় হ'ল। ভদ্রলোকটি স্মীণকায় ও নিস্তেজ; ভদ্রমহিলা বেশ সুস্থ ও সপ্রতিভ। বোম্বাইয়ে বাস করার দরুন মাড়ওয়ারি মেয়ের পর্দা ঘুচে গেছে দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম। “সাহেব, তোমার বিয়ে হয়েছে?” “সাহেব, তোমার স্ত্রী কি রকম গয়না পসন্দ করেন?” “তোমাদের দেশের মেয়েরা কি রকম গয়না পরেন?” এইসব মেয়েলি কথা থেকে আরম্ভ ক'রে, “সাহেব, আমার তৈরী খাবার খাও,” “আমার ছেলেটাকে ব'কে দাও ত, ও ওর বাপকে ভয় করে না,” এইরকম সব কথা চলল। ভদ্রলোকটি ক্রমাগত বিদেশের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের কারবারের কথা বলছিলেন। যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে কেন বিদেশে যান না জিজ্ঞাসা করায় বললেন, যে, “স্ত্রী অহুমতি দেয় না”। তাঁর সংসারে শামুন-দণ্ড কার হাতে সেটা বোঝা গেল।

রেলপথের দু'ধারে প্রথমে বালি শর ও বাবুলার ঝোপে ভরা “ভাঙ্গা” জমি (অর্থাৎ মক্কাভূমি), পরে পাহাড়ের শ্রেণী আরম্ভ হ'ল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড হ্রদের মত “তালাও”। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

সন্ধ্যা সাতটার সময়, দু'দিন দু'রাত্রি ট্রেনে বাস ক'রে উদয়পুরে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে দুটি বন্ধু এসেছিলেন। তাঁদের সাহায্যে জিনিষপত্র উদ্ধার ক'রে ও নিজে পুলিশ এবং চুঙ্গীওয়ালার হাত থেকে উদ্ধার হ'য়ে টাকা চ'ড়ে সহরের দিকে যাত্রা করা গেল।

ষ্টেশন সহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। স্তবরাং আধঘণ্টা ধ'রে অন্ধকারে জ্বল ঝোপ, পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা মন্দির এসব ছাড়িয়ে একটি ছোট নদী পার হ'য়ে সহরে পৌঁছান গেল। সহরে ঢুকেই রাস্তায় বিছাতের আলো দেখে তাক লেগে গেল। পরে জানলাম, যে, সহর সম্পর্কে বিশ শতাব্দীর পরিচায়ক একমাত্র ঐ বিছাতের আলো।

ক্রমে গিয়ে ফুলচাঁদবাড়ি নামে এক পাছনিবানে পৌঁছান গেল। ফুলচাঁদ নামে সহরের এক উকিল এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন; মন্দিরের আয়ের জন্ত তার



সজ্জনগড়, উদয়পুর

চারিধারে ঘরবাড়ি করেছেন। সে-সকল দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসাবে ভাড়া পাওয়া যায়।

উদয়পুরে থাকবার জায়গা উদয়পুর হোটেল (বিলাতি ধরনের) আর এই ফুলটাদবাড়ি। বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।

শীত বেশ পড়েছে বোঝা গেল। বিলাত থেকে আসার পর এতটা শীত অনেক দিন পাইনি। পার্শ্বমিটারে দেখলাম ৩৮°। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করা গেল। তার পর এক ঘুমে রাত কাবার।

সকালে উঠে বাড়ির ছাদ থেকে দেখি, যে, চারিধারে পাহাড়। কিন্তু মরুভূমির কোনও চিহ্ন নাই। সমস্তই বেশ সবুজ গাছ লতা পাতায় ভরা।

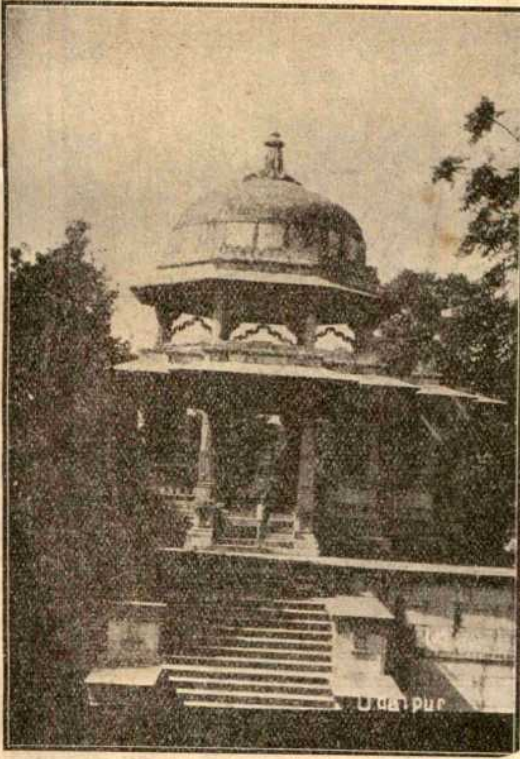
এর পর রোজনাঞ্চা হিসাবে দিনের হিসাব দিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে। স্তবরাং সোজাহজি বর্ণনা দেওয়াই ভাল।

উদয়পুর সহরটি তিন দিকে উচু দেওয়াল ঘেরা। দেওয়ালের পরে একটি পরিখা আছে। দেওয়াল এখন

শত্রুসজ্জাবিহীন। পরিখাটি সহর শুদ্ধ লোকে খিড়কির গুহুর হিসাবে ব্যবহার করে। সহরে ঢুকবার জয় কয়েকটি দ্বার আছে; যথা, হাতি পোল, চাদ পোল (পোল অর্থে দ্বার, না পরিখার উপর পুল তা জানি না) ইত্যাদি। অবশ্য একটি দিল্লী দরওয়াজাও আছে।

সহরটি প্রায় ৫০ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি উপত্যকায় বসান। তবে উপত্যকা হওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় চড়াই উতরাই যথেষ্টই আছে। সহরের ভিতরটি পশ্চিমের যে-কোনো পুরানো সহরের মত। জাঁকা-বাঁকা রাস্তা, কোথাও চওড়া, কোথাও সরু, কোথাও পাথর-বাঁধান, কোথাও মেটে। বাড়ি ঘরও প্রায় সেই রকম, তবে জানলা দরজায় জাফরি-কাটা পাথরের কাজ আছে, আর বাইরের দেওয়ালে হাতি, উট, বা ঘোড়ার সোয়ার রাজপুত বা রাজপুতনীর ছবি আছে।

সহরে মহারাণার আক্ষীয় রাজা হিম্মত সিংজির প্রাসাদ ছাড়া খুব বড় বাড়ি আর নাই। তবে আছে মহারাণার প্রাসাদ। পৃথিবীর যেমন তিন ভাগ জল ও

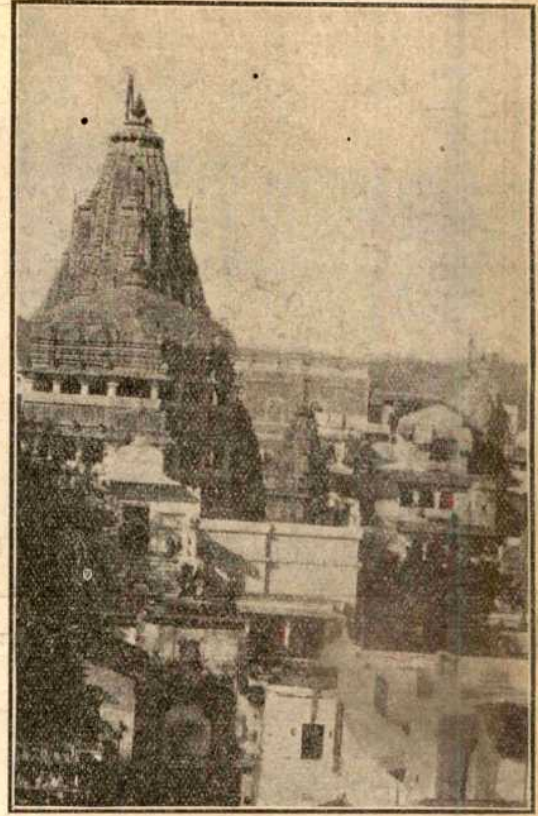


দ্বিতীয় শ্রিংগ্রাম সিংহের সমাধি, মহাসতী, উদয়পুর

এক ভাগ স্থল, উদয়পুরেরও তেমনই তিন ভাগ রাজ-প্রাসাদ, আর-এক ভাগ বাকী সব।

পাহাড়ের কোলে হৃদের মালা, আর হৃদের গায়ে প্রকাণ্ড গগনভেদী মন্দিরপ্রাসাদ-শ্রেণী,—এ দৃশ্য ভূভারতে অশ্রু কোথায়ও আছে কি না জানি না। ধূসর পাহাড়, নীল হ্রদ ও শ্বেত মন্দিরপ্রাসাদ; প্রাসাদে অসংখ্য তোরণ, গম্বুজ ও ছত্রী, আর সে-সকলই নিখুঁত জাকরী আর উৎকৃষ্ট (Bas-relief) কাজে ভরা—এ এক অপূর্ণ দৃশ্য। রাজপ্রাসাদ এত বড় যে, সহজে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু সে সমস্তটাকেই এমন সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, যে, দেখলে মনে হয়, যে, হিন্দুর গৌরবের মধ্যে স্থপতি-বিদ্যা অগ্ন্যতম।

উদয়পুর প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অনেক রাণায় করেছেন। তার মধ্যে প্রথম অবশ্য উদয়সিংহ। রাণা অমর সিংহ, করণ সিংহ, জগৎ সিংহ, রাজসিংহ, দ্বিতীয় শ্রিংগ্রাম সিংহ, ইঁহারা সকলেই একটি দুটি মহল জুড়ে দিয়ে



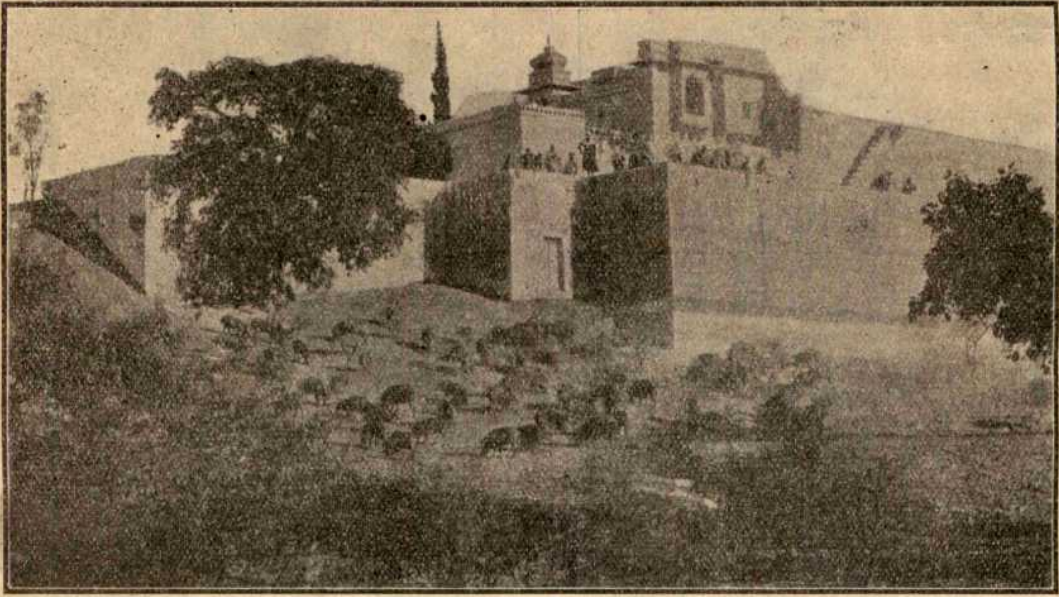
জগদীশ মন্দির, উদয়পুর

যান। মহারাণা শত্ৰুসিংহ শত্ৰু নিবাস ও মহারাণা সজ্জন সিংহ শিব নিবাস পৃথক করে নির্মাণ করেন। বর্তমান মহারাণাও একটি মহল ও দরবার-গৃহ তৈরী করছেন।

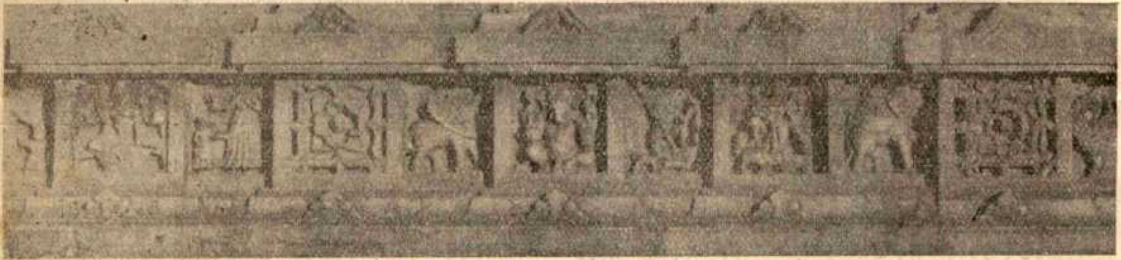
পুরানো প্রাসাদ সঙ্কীর্ণ অলি-গলি, সিঁড়ি ও খোপে ভরা। শিবনিবাস ও শত্ৰুনিবাস তার তুলনায় অনেকটা প্রশস্ত মোগল ছাঁচে তৈরী।

এই প্রাসাদগুলির ভিতরের অংশও দ্রষ্টব্য জিনিসে ভরা। সাদা মন্দির পাথরের ঘরের মধ্যে অতি সুন্দর খোদাই করা কাল শেল (shale) জাতীয় পাথরের কাজ, দেয়ালের গায়ে শিকার, যুদ্ধ, উৎসব ইত্যাদির উৎকৃষ্ট (Bas-relief) ছবি, পঙ্কের কাজে গড়া আশ্চর্য্য নিখুঁত পদ্মের ফুল মৃণাল ইত্যাদির নক্সা, আরও কত কিছু।

আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল, রাণা করণ সিংহের দিল খুসাল মহলে ও মহারাণা দ্বিতীয় শ্রিংগ্রামসিংহের



বুনো শূরর ঝাওয়ান, ঝাঙ্গুদি, উদয়পুর



স্বতি-মন্দিরের গায়ে পাথর খোদাই কাজ, মহাসতী, উদয়পুর

[লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে]

“বড়ী চিত্রশালী” মহলের দেওয়ালে এবং গবাক্ষে (জানালা বলা চলে না, কেননা এজিনিষটি বিলাতি Recessed Balcony” র মত) পুরানো রাণা-মহারাণাদের এবং তাঁদের আমলের শিকার নৃত্য যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির ছবি। প্রত্যেকটি ছবিতে চিত্রকরের নাম, ছবির বিষয় ইত্যাদি নাগরী অক্ষরে লেখা আছে।

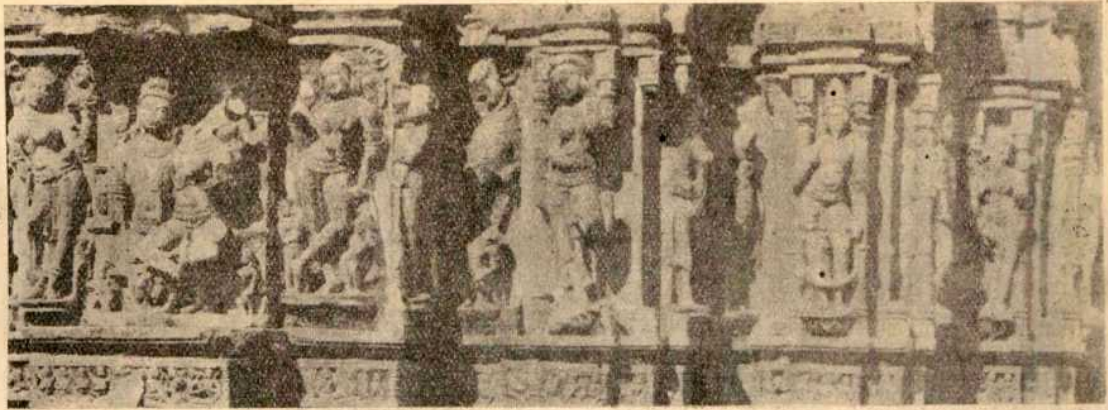
এ ছাড়া শস্ত্রাগারে পুরানো রাণাদের আমলের অনেক জিনিষ, যথা রাণাপ্রতাপের অসি, রাখা আছে।

প্রাসাদের ভিতর দেখতে হ’লে পায়ের জুতা ও মোজা ছই-ই খুলতে হয়। অবশ্য এ নিয়মটা হুর্ভাগ্য ভারতবাসীদের জ্ঞানই। কাজেই যখন প্রাসাদ দেখতে-দেখতে হঠাৎ

ক্যামেরা জুতা ও ছাতা শোভিত এক পাল খেতকায় ভূপর্ধ্যটকের সঙ্গে দেখা হয়, তখন কি রকম বিস্মী লাগে।

রাজপুতানায় পদ্ম মুসলমানী পদ্মার চেয়ে বেশী বই ত কম নয়। কাজেই প্রাসাদের অনেক অংশ দেখার উপায় নাই।

রাজ-প্রাসাদের কাছে একটু উঁচু জমিতে জগন্নাথ রায়জি বা জগদীশের মন্দির। মহারাণা জগৎ সিংহ এটি স্থাপন করেন। মন্দিরের দ্বারের সামনে একটি ছোট ছত্রির ভিতর কঁাসার গরুড় মূর্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের চার পাশে সূর্য্য, দেবী, শিব, ও গণেশের চারটি ছোট মন্দির আছে। মন্দির সুন্দর খোদাই কাজ এবং



মহাসতার পথে ভগ্নমান্দর গাজে মূর্তি রচনা, উদয়পুর



সমাধিতে স্মারক-কলক, মহাসতী, উদয়পুর
(লেখক কর্তৃক গৃহীত কটো হইতে)

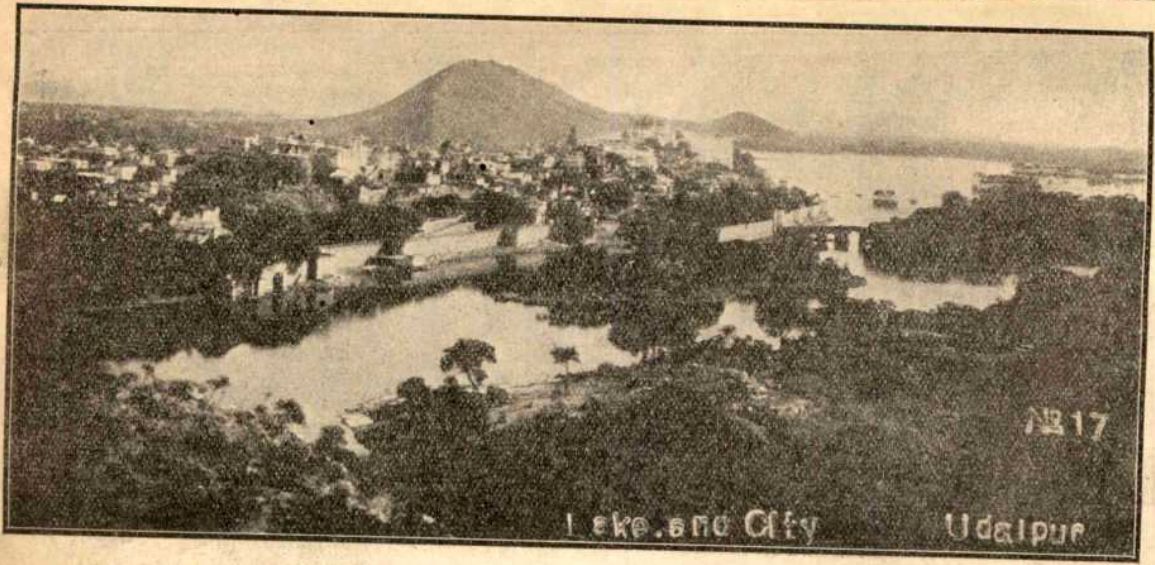
পাথরের মূর্তি দ্বারা শোভিত। তবে তার ধানিক অংশ
আগরদ্বজ্জের শনির দৃষ্টির দরুন নষ্ট হ'য়ে গেছে।

প্রাসাদের নীচেই পিছোলা হ্রদ। এইসকল হ্রদ



সত্যচিহ্নযুক্ত স্মারক-কলক, মহাসতী, উদয়পুর
(লেখক কর্তৃক গৃহীত কটো হইতে)

পার্কৃত্য নদীতে বাধ দিয়ে তৈরী করা। নদীর জল জ'মে
ক্রমে যত নাবাল জমি ছাপিয়ে প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত



উদয়পুর

হয়েছে। গল্প আছে যে, প্রথমে রাণা লখা (১৪শ শতাব্দী) এক বজ্রা জাতের শস্ত্রব্যবসায়ী এই বাঁধ তৈরী করে। বর্ষাকালে তার শস্ত্রবাহী বলদ নদী পার হ'তে পারত না ব'লে সে এই কাজ করে। যাহোক রাণা উদয়সিংহ প্রথমে পাকা বাঁধ তৈরী করেন। পিছোলা হ্রদটি অল্প কয়টি হ্রদের সঙ্গে যুক্ত। উদয়পুরের উপত্যকার সমস্ত নাবাল জমী এই হ্রদের মালায় পরিণত হয়েছে। হ্রদের দরুন উদয়পুরের জমি রাজপুতানার মধ্যে সবচেয়ে সরস এবং এখানের আবহাওয়াও কিছু মৃদু।

পিছোলা হ্রদে তিনটি দ্বীপের উপর সাদা মন্দির পাথরের প্রাসাদ আছে। তার মধ্যে জগনিবাস ও জগ-মন্দির বড় এবং অরাস বিলাস ছোট। জগমন্দির রাণা করণসিংহ এবং জগৎ সিংহের তৈরী, জগনিবাস জগৎ-সিংহের এবং অরসি-বিলাস রাণা দ্বিতীয় অরিসিংহের। রাণাদের এই জলবিলাস-নিকেতনগুলি কি স্থাপত্য-কৌশলে, কি প্রস্তর কারুকার্যে, সকল হিসাবেই ঠিক গল্পের মায়াপুরীর মত সুন্দর।

সত্য সত্যই উদয়পুরের এই পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ ও রাজপ্রাসাদ, এসবই পরস্পরের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি করেছে, যে, এসকলের সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

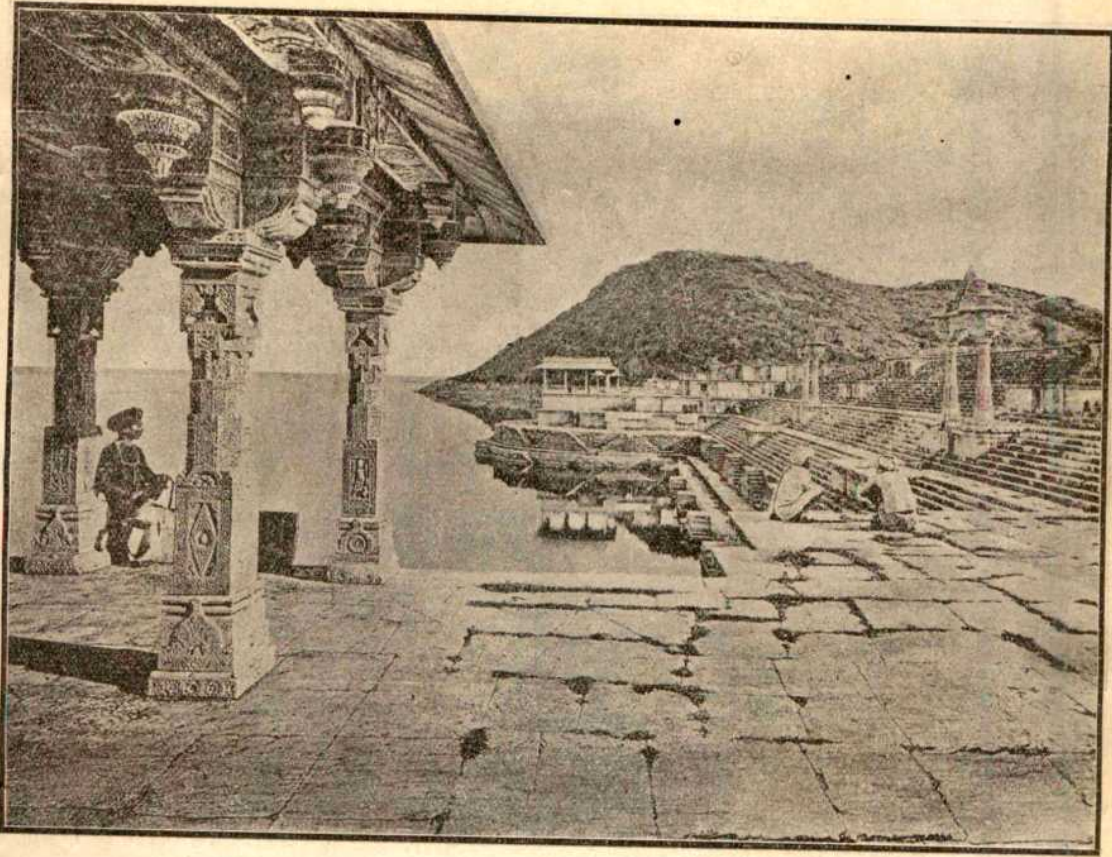
আমার পেশা হিসাবে আমি ঘোর বস্তুতান্ত্রিক। কবি,

লেখক বা শিল্পী ইত্যাদি কল্পনা-রাজ্যের সামন্তদের মধ্যে কল্পে পাওয়ার অধিকার আমার একেবারেই নেই। সুতরাং আমার বর্ণনা এই দৃশ্যের মোটেই উপযুক্ত হচ্ছে না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, উদয়পুরের এই সৌন্দর্য্যসমষ্টি, বর্ণনার কেন, কল্পনারও অতীত। উদয়পুরে থাকার কষ্ট যথেষ্ট ছিল, খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল এক বেগার-সারা মুসলমান বাবুর্জির হাতে, সুতরাং সেটাও খুব সুখের ছিল না; আর চলা-ফেরা এই পাহাড় বনজঙ্গলের দেশে ট্রাম-বাস টাক্সী পূর্ণ কলিকাতার সমতলভূমিবাসী নিরীহ বাঙালীর ছেলের পক্ষে ঠিক যে বেশ আরামের ছিল তাও নয়। কিন্তু ধূসর পাহাড়ে ঘেরা শ্রামল উপত্যকার কোলে স্বচ্ছ নীল হ্রদের মালা, তার কূলে তোরণ গম্বুজ খিলান ছত্রি শোভিত বিরাট খেতমন্দির প্রাসাদ, এবং বৃকে রত্নের স্তায় উজ্জল জলবিলাস-মন্দিররাজী, প্রতি মুহূর্তে আলো ও ছায়ার পরিবর্তনে এ সকলের নূতন রূপ—এই দৃশ্য যেদিন যখনই দেখতাম তখনই মনে হ'ত, যে, সব কষ্টই সার্থক হয়েছে। সত্য সত্যই দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাসের মত উদয়পুর সম্বন্ধেও বলা যায়।

অগবু ফিরদৌস ববু রুহে জমীনস্ত

হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত।

অর্থাৎ “ভূতলে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সে এই স্থান



রাজসামান্দ হ্রদ

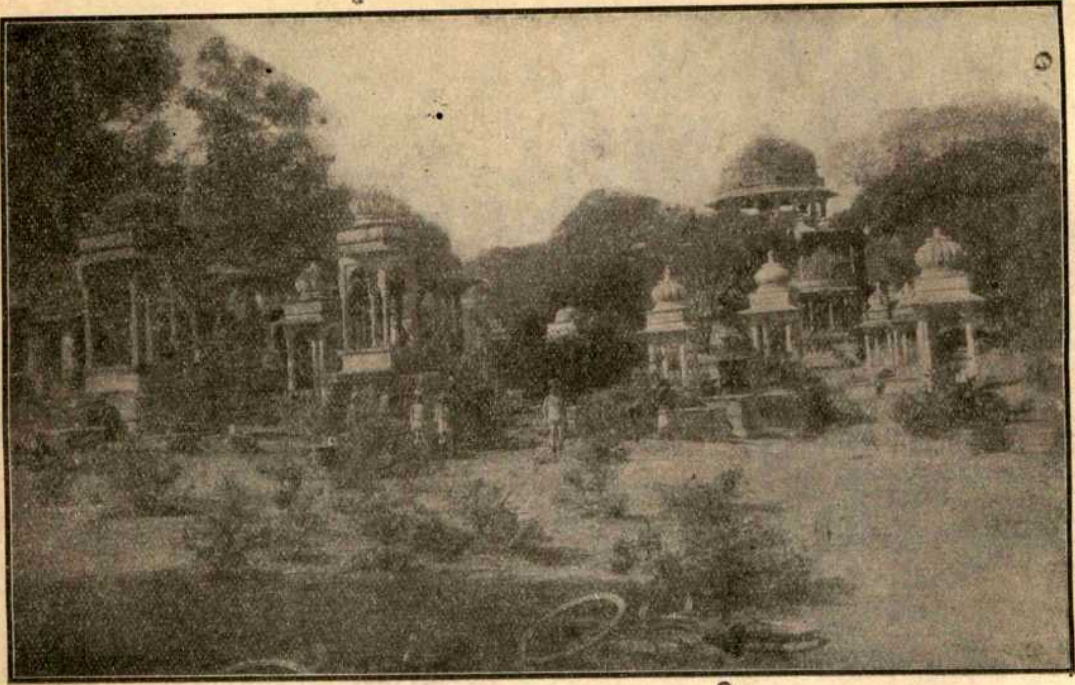
এই স্থান এই স্থান”। (আমি পার্শী একেবারেই জানিনা স্ততরাং বয়েড ও তর্জমা দুই হয়ত ভুল। তবে পারস্ত-দেশজাত কবিতার অনুবাদের খুব চলতি, এই জন্ত লিখলাম। বিশেষ ভরসা এই, যে, অধিকাংশ অনুবাদকই ঐ ভাষায় আমারই মত পণ্ডিত।)

তবে এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে, বেশীদিন থাকতে হ'লে উদয়পুর বাস ঠিক স্বর্গবাস ব'লে মনে হ'তেও পারে। কেননা, বিংশশতাব্দীর লোকের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে থাকাকাটা উপভ্রাস হিসাবে খুবই ভাল হ'তে পারে। বাস্তব জীবনে সেটা নির্বাসন দণ্ড ব'লে মনে হওয়াই সম্ভব। উদয়পুর এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রয়েছে। কেবল মাত্র সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

পিছোলা হ্রদের জগমন্দির প্রাসাদে রাজকুমার খুরম

(পরে বাদশাহ শাহজহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর পলাতক অবস্থায় আশ্রয় পান। তিনি যে মহালে ছিলেন, তা এখনও প্রায় নূতনের মত ঝক্ ঝক্ করছে। তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা রাণা করণ সিংহের সহিত যে পাগড়ী বদল করেছিলেন, সেটা স্থানীয় জাদুঘরের একটি বিশেষ জটব্য জিনিষ।

পিছোলা হ্রদের দক্ষিণ কূলে পাহাড়ের উপর “খাস ওদি” নামে মহারাণার শিকারের বাড়ি আছে। এখানে চারিধার ঘেরা একটি উঠান আছে, সেখানে বাঘে ও বুনোশুওরে লড়াই হয়। দর্শকেরা উঁচু ছাতের উপর থেকে দেখে। শোনা গেল, যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে বাঘের জিত একবারও হয়নি। ছুটি লড়ায়ে-শুওর ধরে রাখা হয়েছে দেখলাম। তাদের চেহারা ও চলাফেরা দেখে এবং গন্ধ পেয়ে মনে হ'ল, যে,



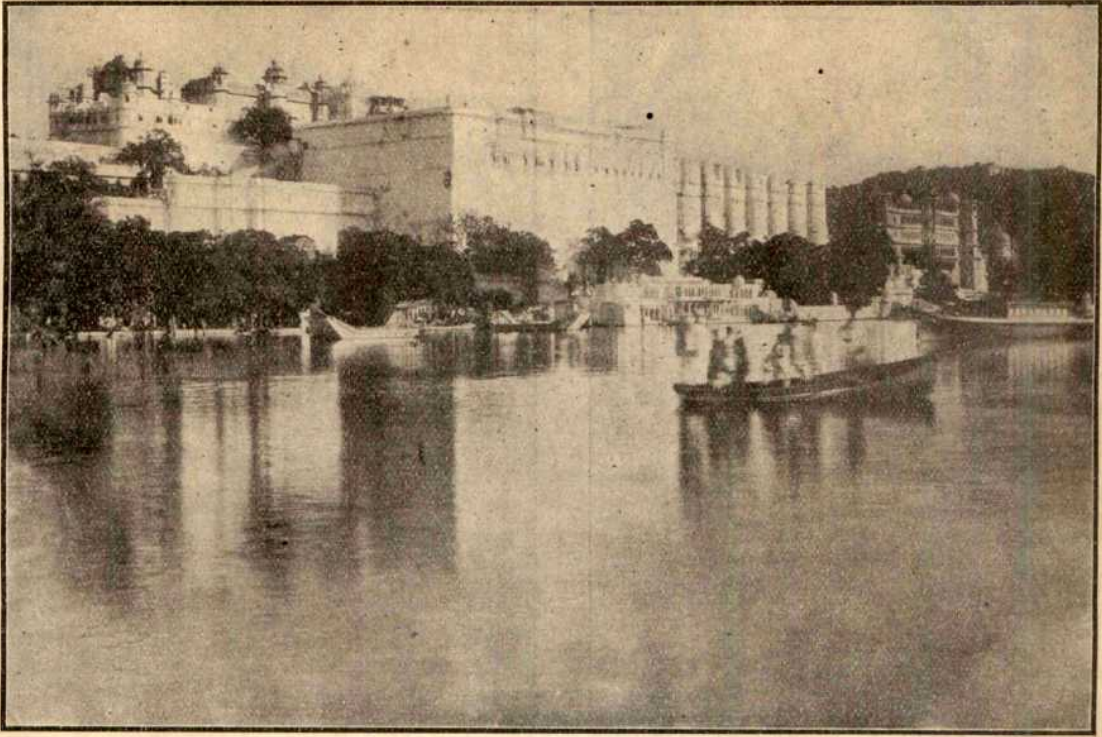
মহানদী, উদয়পুর

বাঘের হার হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এই জায়গাটির চারি ধারে জঙ্গল। প্রায়ই এখানে মহারাণার তরফ থেকে বুনো শূওরকে ভুট্টা বা বাজরি খাওয়ান হয়। বিকালের দিকে এই বাড়ির নীচে খোলা জায়গায় ভুট্টা ছড়ান হয়, তার পর শিকার খানার একজন ভীমকায় শিকারী এক রকম অদ্ভুত ডাক দেয়। শুনে এক দুই ক'রে চারি দিকের জঙ্গল থেকে শূওরের দল এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। প্রথমে যখন তাদের আসা এবং তাদের কাছে শিকারী খানার লোকদের যাতায়াত দেখলাম, তখন মনে হ'ল, যে, সেগুলো ঘরের পোষা, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন খাবার নিয়ে দাঁতালে দাঁতালে ঝগড়া বাধতে লাগল, তখন তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ দেখে বুঝলাম তাঁরা পোষা শূওর নহেন, তাঁরা বজ্র বরাহ।

উদয়পুরের কাছে প্রত্যেক পাহাড়ের গায়ে এই রকম ছোট বড় শিকার ঘর আছে। তবে রাণা বা তাঁর প্রিয়পাত্র ভিন্ন আর কেউ শিকার কর্তে

পায় না। উদয়পুর সহরের ভিতর শিকার ত দূরের কথা, জঙ্গল জানোয়ারের উপর অত্যাচারও বারণ। সেখানে পথে গরুর গাড়ির ছড়াছড়ি, কিন্তু কোথাও কলকাতার গরুর গাড়ির চালকের মত বলদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আর রাস্তায় ঘাটে ময়ূর, পায়রা, বাঁদর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন সহরটা তাদেরই। একদিন আমরা ছাতে বসে গল্প করছি, এমন সময় এক কাঠবিড়ালি ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে ছাতের পাশের গাছে উঠবার চেষ্টা করল। গাছের একটা ডাল ছাতের উপর একটু উচুতে ছিল। কাঠবিড়ালিটা সেটা খানিক লক্ষ্য ক'রে আমার বন্ধুটির গা বেয়ে মাথায় চ'ড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে গাছে চড়ল।

উদয়পুরের হ্রদগুলির ওপারে যে-সব পাহাড় আছে তার সর্বোচ্চটির চূড়ায় সজ্জনগড় নামে গ্রীষ্মাবাস (রাণা সজ্জনসিংহের তৈরী) আছে। হ্রদের পাড়ে আঁকাবাঁকা পথে মাইল চার টান্ধায় ক'রে গিয়ে তার পর তিন মাইল



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ ও পিছলো হ্রদ

খাড়া চড়াই হেঁটে পাল্লা দিয়ে ঘোর শীতের মধ্যে গলদর্শ্য অবস্থায় সেখানে পৌঁছান গিয়েছিল। এর ভিতরটি অতি সুন্দর। খিলান, থাম, এসব দেখলে মনে হয় হাতির দাঁতের কাছ—এত সুন্দর কিন্তু সরল রেখার কাছ। পাথরে খোদাই ও পঙ্কে গড়া নক্সাও চারিধারে।

সঙ্কনগড় থেকে উদয়পুরের পাহাড়ের প্রাকার ঠিক দুর্গের প্রাকারের মত দেখায়। প্রথমে একসার পাহাড় তার পর খানিকটা উপত্যকা, আবার এক সার পাহাড়, এইরূপে যতদূর দেখা যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পাহাড় ও উপত্যকা। সঙ্কনগড়ে জলের একান্ত অভাব বলে এখানে রাণা কখনও থাকেন না।

উদয়পুর থেকে কিছু দূরে ফতে সাগর নামে বর্তমান মহারাণার বাঁধান হ্রদ আছে। এই হ্রদের দক্ষিণ কূলে নীচু পাহাড়ের উপর রাণা উদয়সিংহ প্রথমে যে প্রাসাদ দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন, তার ভগ্নাবশেষ আছে।

ফতে সাগরের অন্ত পারে সহেলিয়া-কি-বাড়ি

(সখিদের বাড়ি) নামে সুন্দর প্রমোদ কানন ও বিলাস-ভবন আছে। এখানে দেখবার প্রধান জিনিষ ফোয়ারা, পদ্মে ভরা বাঁধান প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা এবং একটি ছোট ঘর যার দেওয়াল ছাদ প্রভৃতিতে সুন্দর পদ্ম, মৃণাল পদ্মপাতা ইত্যাদি আঁকা।

উদয়পুর সহরের বাইরে, স্টেশনের পথে, প্রায় তিন মাইল তফাতে, মহাসতী নামে রাজাদের শ্মশান ও স্মৃতি-মঠ স্থাপনের জায়গা আছে। এটি মেবারের শিশোদিয়া রাজপুতদের প্রথম বাসস্থান আঢ় গ্রামের সীমানার উপর রয়েছে। চিতোর ছাড়বার পর এ বংশের রাণাদের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন ও স্মৃতিমঞ্জিরা সবই এখানে হয়েছে। তবে রাণা উদয়সিংহ আরাবল্লী পাহাড়ের মধ্যে গোপোঙাহ নামক স্থানে এবং রাণা প্রতাপ যুদ্ধ করতে করতে দেশভাগী অবস্থায় ভীলদের জঙ্গলী দেশে ছাওয়ান্দে মারা যান।

সমাধিমন্দিরে রাণাদের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নেই।



বর্তমান মহারাণা কতেসিংহজি



মহারাণা সঙ্করসিংহ

চিতাভস্ম দশদিনের জ্ঞাত সমাধিমন্দিরের কাছে রাখা হয়, পরে তা গঙ্গায় ফেলা হয়। তবে অধিকাংশে পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হয় ও সেগুলির পূজা আরতির জ্ঞাত পূজারী রাখা আছে। অনেকগুলিতে ষাঁর নামে ছত্রি (মন্দির) তাঁর প্রতিমূর্তি প্রস্তরফলকে খোদাই করা আছে এবং যদি চিতায় সতীদাহ হ'য়ে থাকে তাহ'লে যে কয়জন স্ত্রী সহমৃত্যু হয়েছিলেন তাঁদের (কল্পিত?) মূর্তি ও সতী-চিহ্নও সেই ফলকে খোদাই করা হয়। সতী-চিহ্ন চন্দ্র সূর্য্য এবং সতীর ঘোড়হস্ত। এই রকম একটি ফলকে ১৭টি সতীর মূর্তি খোদাই করা আছে।

এই সমাধি বা স্মৃতি মন্দিরগুলি প্রায় সবই এক ধরণের। তবে মন্দিরের গায়ে খোদাইয়ের বা ভাস্কর্য্য কাজের অনেক তফাৎ আছে। এ হিসাবে একটি ভাস্ক

ছত্রির (বোধ হয় রাণা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহের) গায়ে যা কাজ আছে, সেটি অতি সুন্দর। পদ্মের নক্সা, দেবদেবীর খোদাই করা প্রতিমূর্তি, রূপক ছবি এ সব যা কিছু তাতে আছে, সবই অতি উৎকৃষ্ট কলাকৌশল-পরিচায়ক।

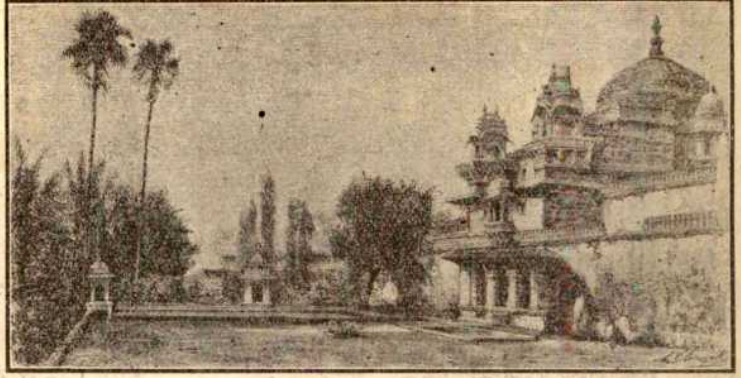
দুঃখের বিষয় এই, যে, মেবারের রীতি অনুসারে এসব স্মৃতিমন্দিরের মেরামত করা নিষিদ্ধ। কাজেই সব কটিই ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে, ছ-একটি প্রায় হ'য়ে গেছে।

মহাসতীর পথে দুটি বড় আধুনিক জৈন মন্দির আছে। সেগুলির বাইরের প্রাচীরের গায়ে এবং আশে-পাশের কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালে সুন্দর খোদাই করা পাথরের ফলক ওলট পালট ক'রে বসান আছে। দেখে মনে হয়, যে, সেগুলি কোনও অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে নেওয়া। একটি প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের

ভগ্নাবশেষও কাছেই আছে। মন্দিরে কয়টি সাধু থাকেন। তাঁরা বললেন সেটি মীরা বাইয়ের মন্দির। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই মুসলমান বিধ্বংসকারী বিশেষ যত্ন ক'রে নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

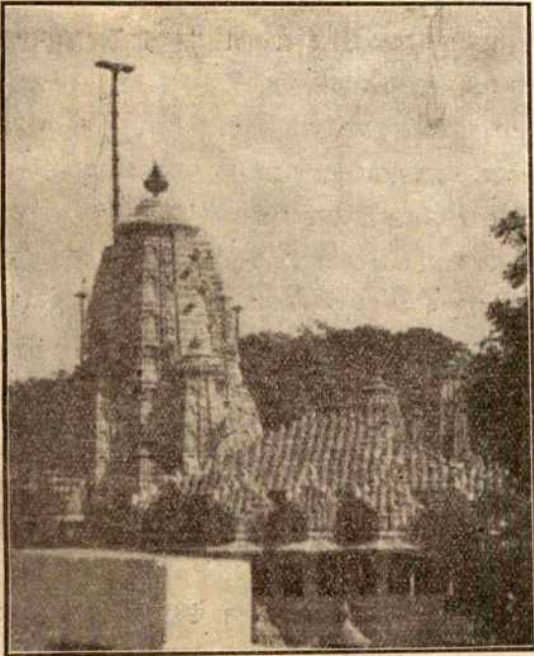
উদয়পুরে সাধারণের জ্ঞাত একটি জাদুঘর আছে। ইমারত হিসাবে সেটি ইঙ্গ-ভারতীয় চক্ৰশূল। তবে তার ভিতরে পুরানো অস্ত্র-শস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ (যথা শাহজহানের পাগড়ি) ইত্যাদি অনেক দ্রষ্টব্য জিনিস আছে।

মেবার হ্রদ ও পাহাড়ের দেশ। হ্রদের মধ্যে যেগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তা ছাড়া রাণা রাজসিংহ প্রতিষ্ঠিত রাজসামান (রাজসমুদ্র) এবং দ্বিতীয় জয়সিংহের জয়সামান, এ দুটি প্রসিদ্ধ। আমাদের সেগুলি দেখার সুযোগ হয়নি; কেবলমাত্র রাজসামান দূর থেকে দেখেছিলাম।



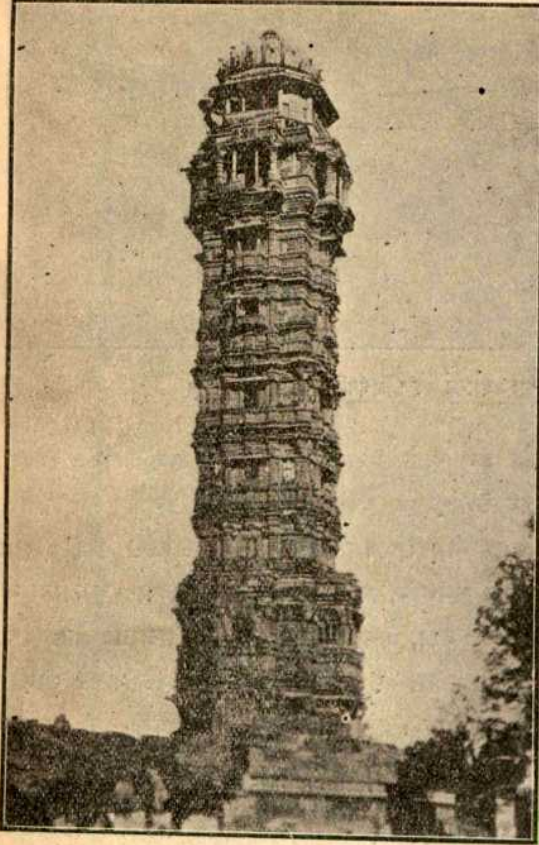
শাহজহানের মহল, জগন্মন্দির প্রাসাদ উদয়পুর

হলুদিঘাট দেখারও খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেখলাম, যে, উদয়পুরের অধিকাংশ লোকই হলুদিঘাট কোথায় তা জানে না! শেষে দেওয়ানজি প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুন্লাম, যে, কুড়ি মাইল টেনে, পরে আঠারো মাইল মোটর লরী, তার পর সাত মাইল ঘোড়ায় এবং শেষের পাঁচ মাইল দুর্গম জঙ্গল ভেঙ্গে হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। অতএব উদ্দেশ্যে নমস্কার করা ছাড়া আর কিছু হ'লনা। উদয়পুর থেকে সোজা পথ কিছুই নাই!



একলিংজির মন্দির (লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটো)

উদয়পুরে দু'সপ্তাহ আন্দাজ থাকার পর একদিন ভোরে টাঙ্গায় চ'ড়ে বাগ্না রাওয়ালের স্মৃতি ও কীর্তি চিহ্ন একলিংজির মন্দির দেখতে রওনা হলাম। উদয়পুরের প্রাচীররূপ পাহাড়জ্রেণী পার হয়ে একলিংজির পথ চলেছে। পথে এমন ভীষণ চড়াই, যে, টাঙ্গার ভাড়া দিয়ে মাইল দেড়েক পাহাড় বেয়ে উঠতে হ'ল। পথের দুধারের দৃশ্য চমৎকার। ক্রমে পাহাড় দেখতে দেখতে একটি ফাটক দেওয়া গিরিসঙ্কট পার হ'য়ে উত্তরাইয়ে এসে পড়া গেল। তারপর দুধারে পুরানো মন্দির ঘর বাড়ি কেল্লা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ ছাড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড দীঘির ধারে পৌঁছলাম। দীঘির আশে পাশে অনেকগুলি অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। দীঘির পর আবার পাহাড়ের গায়ে ফাটক এবং দুর্গপ্রাকার দেখা গেল। সেটি পার হ'য়ে, প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর পাহাড়ের কোলে লুকানো একলিংজির মন্দির দেখা দিল।



কুন্তলগুপ্ত, চিতোর

এইখানেই হিন্দু জাতির মধ্যে সর্কাপেক্ষা দুর্দ্ধ যোদ্ধকুলের জন্মদাতার সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্যোদয় হয়। সম্রাট-প্রদত্ত এই একলিঙ্গ বিগ্রহ এইখানে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর দেওয়ান হিসাবে বাপ্পা রাওয়াল অসিহস্তে রাজ্য গঠন ও বিজয় আরম্ভ করেন। সেই ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি কে ছিলেন, কোথা হ'তে এসেছিলেন, কেহই বোধ হয় সঠিক জানেন না। অতীতের ধুলি-ধুসারিত, সহস্রাধিক বৎসরের জরাবিকৃত ছ'চারটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা মাত্র আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজও তাঁহার যুদ্ধবিজয় ও হৃদমনীয় প্রতাপের খ্যাতি হিন্দুজগতে লোপ পায়নি।

হুর্গম, নীরস, প্রস্তরময় পাহাড়ে ঘেরা একলিঙ্গের মন্দিরের একটা সুন্দর সৌম্য ও গম্ভীর ভাব আছে। যেন সৈন্তবাহিনীর মধ্যে রণনেতা বীর পুরুষ। মন্দিরের

আকৃতি এদেশের যে-কোন অল্প মান্দরের মত। কিন্তু বিরাট আয়তনে, মন্দিরের প্রস্তরের ধূসর বর্ণে, মন্দিরের গঠনের ঋজু রেখাপাতে (এবং বোধ হয় বাপ্পা রাওয়ালের স্মৃতির রুদ্র-জ্যোতির প্রভাবে) কি রকম যেন ইহার মধ্যে একটা দৃঢ় অটল পৌরুষের ভাব এসেছে।

মন্দিরের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার, নৃত্য-গীত, রাজসভা ইত্যাদি খোদিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে পিতলের নন্দী ষণ্ডমূর্তি—গায়ে ধনরত্নাঘেবী স্বলতান বাবরের ছেনীকাটার দাগ—প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আশে-পাশে অনেকগুলি লিপিখোদিত পাথরের ফলকও রয়েছে। একলিঙ্গি কালো কষ্টি-পাথরের পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ।

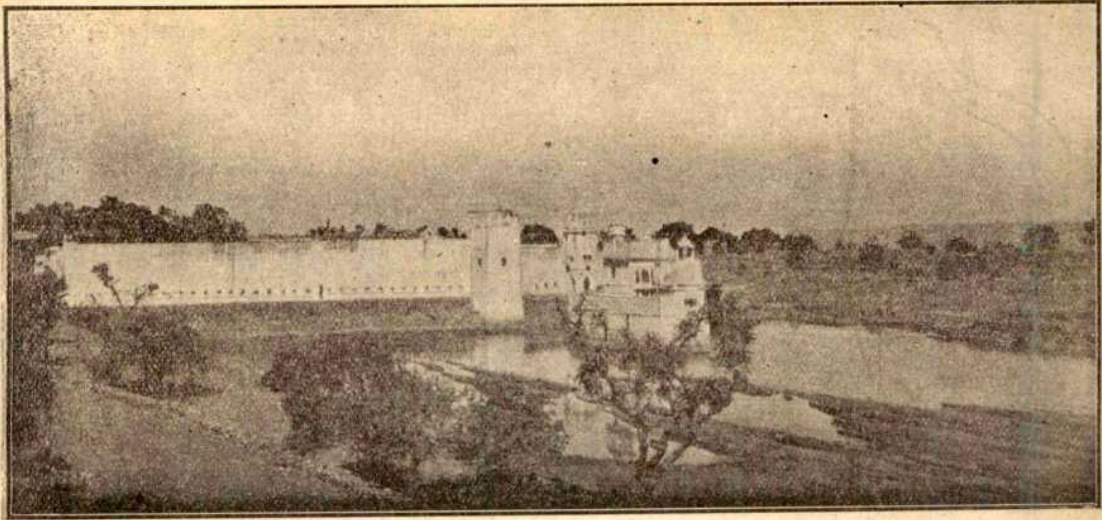
একলিঙ্গির মন্দিরের পাশেই এবং একই প্রাচীরের ঘেরার মধ্যে মৌরাবাই প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর বিষ্ণু-মন্দির এবং ছোট বড় আরও অনেকগুলি মন্দির আছে।

মেবারের মন্দিরগুলিতে একটু আশ্চর্য্য জিনিষ আছে। বিধর্মী, শ্রেষ্ঠ, বা “অস্পৃশ্য”দের মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। উদয়পুর পুরাতন প্রাসাদে সূর্য্যমন্দির দেখতে যে দিন গিয়েছিলাম, সেদিন আমাদের সঙ্গে একজন বাংলা দেশের মুসলমান ছিলেন। তিনি মন্দিরের কাছে যেতে ইতস্ততঃ ক'রে মন্দিরের প্রদর্শককে নিজের পরিচয় দেওয়াতে সে গম্ভীর ভাবে বলল, “তাতে কি? তুমি বিগ্রহ না ছুঁলেই হ'ল, আমাদের তোমাদের দেশের মত মুসলমান ভয় নাই”। একলিঙ্গিতেও মন্দিরের এক দ্বারে এক স্থান নির্দিষ্ট আছে যেখান থেকে ভিন্নধর্মীরা দেব দর্শন করতে পারেন। সে জায়গাটি লিঙ্গ থেকে দশ বার হাত মাত্র তফাতে।

একলিঙ্গি দর্শনের পরই চিতোর দেখার এবং ফিরে আসার আয়োজন আরম্ভ হল।

সেইমতে একদিন বিকালে উদয়পুর ছেড়ে চিতোর গড়ের দিকে রওয়ানা হ'লাম।

ট্রেনে মাইল বারো চৌদ্দ ঘাবার পর দেবারী গিরিসঙ্কট



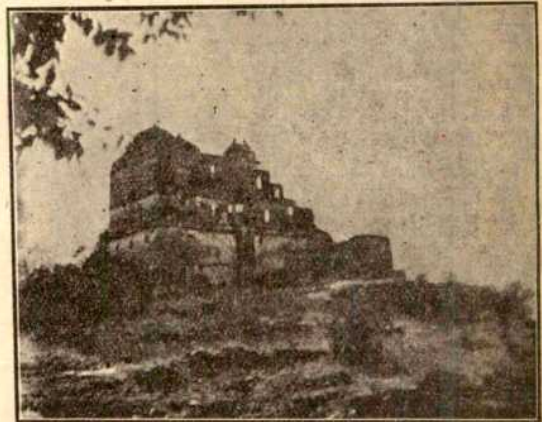
পদ্মিনী মহল, চিতোর

(লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটো)

দেখা দিল। উদয়পুর আসবার সময় রাত্রিবেলায় কিছুই দেখা যায়নি। এবার বেশ দিনের বেলায় পৌছান গেল। দেবারীর যুদ্ধক্ষেত্র স্টেশন থেকেই দেখা যায়। চারিদিকে প্রস্তরসঙ্কুল পাহাড়ে ঘেরা শুকনো মরু জমী। এই স্থানেই রাণা রাজসিংহের হাতে আওরংজেবের বিপুল সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়।

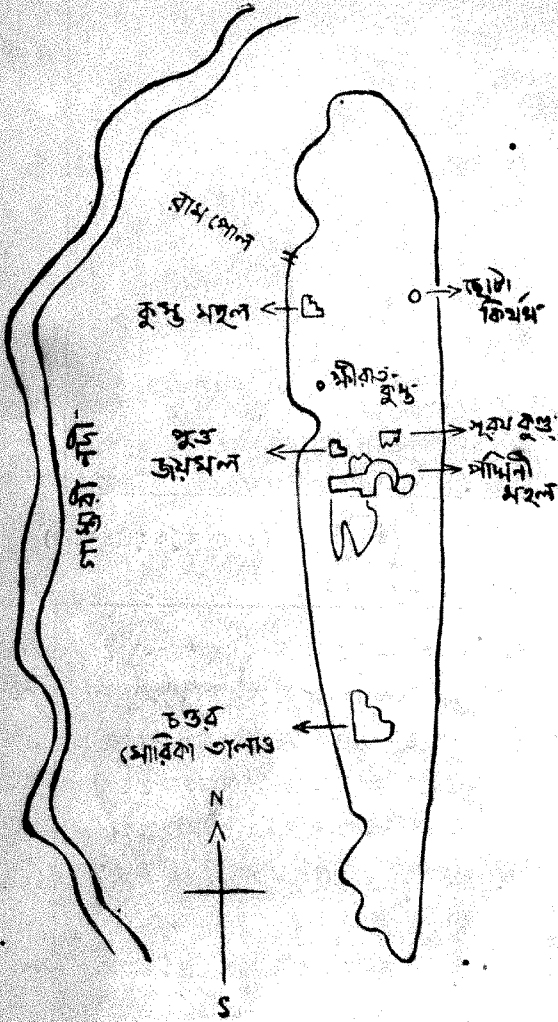
চিতোর গড় পৌছাতে রাত হ'য়ে গেল। স্টেশন থেকে কুলীর মাথায় জিনিষ-পত্র চাপিয়ে মাইল খানেক দূরে ডাক-বাংলায় গেলাম। গিয়ে শুন্লাম, যে, এক সপ্তাহের মত সেখানে জায়গা পাবার উপায় নাই; তোর পর ফিরে মাইল দেড়েক হেঁটে রাজসরকারের সরাইয়ে এসে শুন্লাম সেখানেও জায়গা নাই। এদিকে অন্ধকার রাত এবং বিষম শীত। শেষে সরাইয়ের অধ্যক্ষ অবস্থা বুঝে অনুগ্রহ ক'রে জেনানা মহলের এক অংশ সাক্ষ্য করিয়ে দিলে পরে মনের অবস্থা কিছু ভাল হ'ল। সরাইয়ের ঘর দেয়াল ছাত মেজে সবই পাথরের তৈরী। সেই ঠাণ্ডা পাথরের মেজের উপর বিছানা পেতে রাত কাটানো গেল।

রাত্রেই কুলীদের মাথায় টাঙ্গার বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছিল। ভোর হ'তে না হ'তেই এক টাঙ্গাওয়ালা এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে ভাড়া ঠিক ক'রে, তাকে



জয়মঙ্গ ও পুন্ডের বাড়ি, চিতোর (লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটো)

দিয়ে জল আনিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে ঘরে জিনিষ পত্র রেখে তালা লাগিয়ে টাঙ্গাত্রজে চিতোরের দিকে রওয়ানা হ'লাম। তখনো বেশ শীত। কাজেই ফিদেও পেয়েছিল বেশ। টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, চাও কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। সে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় শ্রেষ্ঠ হালুঘাইয়ের দোকানে নিয়ে গেল। পাশে এক চায়ের দোকান। হালুঘাইকে “পুরী”র অর্ডার এবং চাওয়ালাকে চায়ের ফরমাস ক'রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। আমরা তিন জন বাড়লী ছিলাম। এই তিনটি ক্ষীণজীবী প্রাণীতে মিলে আমরা দেড় সের (২০ সিকা সের) পুরী, তিন



চিত্তোর গড়ের মানচিত্র

পোয়া অতি উৎকৃষ্ট রাবড়ি, আধসের পেড়া, এক পোয়া “গোলাপ জামুন,” উপযুক্ত পরিমাণ তরকারি চাটনি ও চায়ের সঙ্গে পার ক’রে দিয়ে ফের টাঙ্কায় বসলাম। দাম সবশুদ্ধ দিতে হয়েছিল নগদ এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। এদেশ থেকে খাবারের জিনিষ রপ্তানী বারণ; কাজেই যা পাওয়া যায়, সবই সস্তা।

মাইল খানিক পথ পার হ’বার পর চিত্তোরগড় পরিষ্কার দেখা গেল। হিন্দীতে ছড়া আছে,

গড় তো চিত্তোর গড়, অণ্ডর সব গড়ইয়া !
রাণী তো কমলাবতী, অণ্ডর সব গড়ইয়া ॥

রাণী কমলাবতী কে ছিলেন তা জানিনা; স্ত্রতরাং তাঁর তুলনায় জগতের অস্ত্র সব রাণী গর্দভতুল্যা কিনা, বলতে পারি না। তবে চিত্তোর গড়ের তুলনায় সব গড় যে এক কালে নগণ্য মনে হ’ত ভারতের ইতিহাসে সে কথা জুস্পষ্টভাবেই লেখা আছে।

এখন সে চিত্তোরের কঙ্কালও নাই, কয়েকটি অস্থি মাত্র প’ড়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দূরের থেকে চিত্তোরের দৃশ্য অত্যন্ত মহিমাভাষক। চিত্তোর গড় একটি সাড়ে তিন মাইল লম্বা এবং আধ হ’তে তিনপোয়া চওড়া পাহাড়ের অধিত্যকার উপর স্থাপিত। এই পাহাড়ের চারিপাশে নীচু সমতল জমি। মাঝে দ্বীপের মত চিত্তোর গড় দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্তোর উঠবার পথ তৌলায়তি নামে একটি ছোট সহরের ভিতর দিয়ে। চিত্তোর গড় স্টেশন হ’তে পথে গান্তেরী নামে একটি ছোট নদী পার হ’য়ে তৌলায়তির দ্বারে পৌঁছান যায়। এই সহরের কাছারি থেকে চিত্তোর দেখার ছাড়-পত্র নিয়ে আমরা চিত্তোরে প্রবেশ করলাম।

চিত্তোর গড়ে পাঁচ ছয় সারি দেওয়াল আছে। তার মধ্যে তিন সারি বেশ ভাল মেরামত করা। সাতটি প্রকাণ্ড দুর্গদ্বার পার হ’য়ে চিত্তোরের অধিত্যকার পৌঁছাতে হয়। প্রত্যেকটি দুর্গদ্বার স্মারকলিপি ও স্মৃতিচিহ্নযুক্ত। তৃতীয় দ্বার (ফটা দরওয়াজা) এবং চতুর্থ দ্বারের (হুম্মান পোল) মাঝে জয়মল ও পুস্তের নামে উৎসর্গ করা মর্ম্মরনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এইখানে আকবরের চিত্তোর অবরোধের সময় ঐ দুই বীর যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত জীবন লাভ করেন। এই রকম অনেক স্মৃতিচিহ্ন পার হ’য়ে শেষ দ্বারের (রামপোল) ভিতর দিয়ে আমরা চিত্তোরে পৌঁছলাম।

রামপোল অতি বিরাট ও সুন্দর দ্বার। রামপোলের প্রায় গায়ে লাগা প্রকাণ্ড সান্দ্রী ঘর আছে এবং তার পরই পুরানো দরীখানা অর্থাৎ দরবার গৃহ। প্রবাদ আছে, এইখানেই চিত্তোরের ভয়ঙ্কর অধিষ্ঠাত্রী দেবী “কাংড়া-রাণী” (দুর্গ প্রাকারকে কাংড়া বলে) “ময় ভূখা হু” ব’লে অরিসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হন।

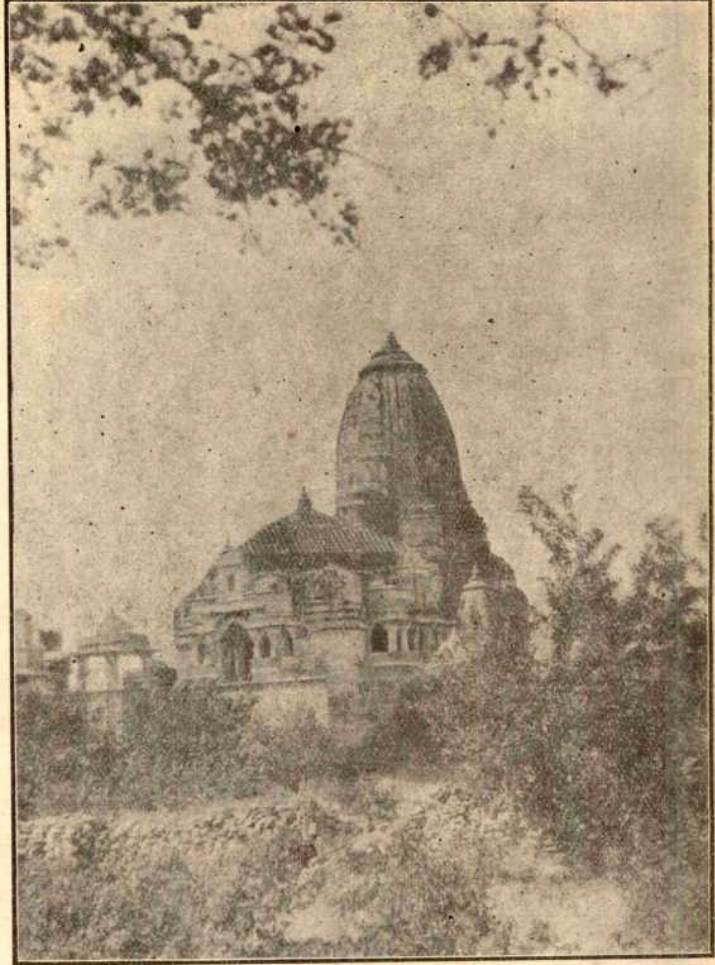
দরবার ঘর ছাড়িয়ে তুলসী ভবানীর সুন্দর মন্দির। তারপরেই তোপখানা ও সেনানায়কদের মহল। তোপখানায় অনেকগুলি পুবাণে কামান আছে। আমাদের প্রদর্শক (একটি ১৬১৭ বৎসর বয়সের ব্রাহ্মণ ছেলে) তার মধ্যে একটি রাণা প্রতাপের কামান ব'লে দেখাল। সেটি অষ্টধাতুর ব'লে শুনলাম। দেখে মনে হ'ল গন্ মেট্যাল। আরো অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাণার কামান ব'লে প্রদর্শিত। এগুলির গায়ে সিন্দূর দেখে পূজা হয় ব'লে মনে হ'ল। তোপখানার প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে রাণা প্রতাপের মন্ত্রী ভীম শাহের বাড়ীতে গেলাম। সেটি এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র এবং যা আছে তাও দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে।

তোপখানার কাছেই নোলাখাবিন্দার (নওলাখা ভাণ্ডার?) বা পুরাতন রাজকোষ। তারপর চিতোরের রাণাদের বিবাহমণ্ডপ সিদ্ধার ছাউড়ি। এটির গায়ে অঙ্কিত খোদাইয়ের কাজ করা আছে। ভিতরেও অতিসুন্দর কাজ করা বিবাহের বেদী, হোমকুণ্ড ইত্যাদি। তোপখানা ছাড়া এ সবই ধ্বংস হ'য়ে চলেছে।

তার পরই রাণাকুন্ডের প্রকাণ্ড প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

যেটুকু ঠিক আছে, তা গোয়াল ও আস্তাবল করা হয়েছে। অল্প একটু মেরামত হয়েছে দেখা গেল। শুনলাম সেটুকু মহারাণা সজ্জন সিংহ ক'রে গিয়েছেন।

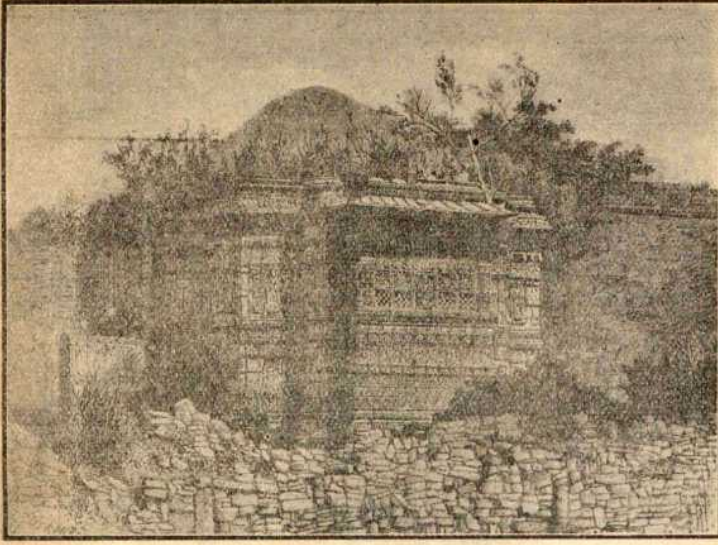
কুস্ত মহালের ধ্বংসাবশেষ যা আছে, তার থেকেই মুসলমান প্রভাবের পূর্বে এদেশের রাজপ্রাসাদ কি আশ্চর্য্য স্থপতিকৌশলের নিদর্শন ছিল, তা বোঝা যায়। সম্পূর্ণ অবস্থায় এ যে কি ছিল, তা কল্পনাও করা যায়



মোরাবাইয়ের মন্দির, চিতোর (লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটো)

না। কুস্তমহালের এক অংশে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। শোনা যায়, যে, পদ্মিনী অল্প রাজ-অস্ত্রপুত্রের মহিলাদের সঙ্গে এইখানেই “জহরব্রত” পালন (অগ্নিপ্রবেশ) করেন।

কুস্তমহালের কিছু দূরে দুটি মন্দির আছে। একটি বোধ হয় ভবানী মন্দির, অল্পটি প্রসিদ্ধ মোরাবাইয়ের বিষ্ণু-মন্দির। মোরাবাইয়ের মন্দিরের ভিতর বাহির সমস্ত কারু-কার্য্যে ভরা। মুসলমান বিজ্ঞতার অত্যাচারের পরেও তার যা আছে, তাহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এই মন্দিরের কাছে একটি ছোট জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেই মন্দিরটি আশ্রতনে ছোট, কিন্তু স্থাপত্য-



সিঙ্গার ছাউরি, চিতোর

কৌশলে, কারুকার্যে এবং স্থায়ী গঠনে একটি রত্ন বিশেষ। আগ্রা বা দিল্লীর কেল্লা ইত্যাদিতে এর কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কিছু নাই।

মন্দিরগুলির কাছেই চিতোরের সূর্যাকুণ্ড। গোরক্কে কলুষিত হবার আগে এই কুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বের আবির্ভাব হ'ত বলে কিম্বদন্তী আছে।

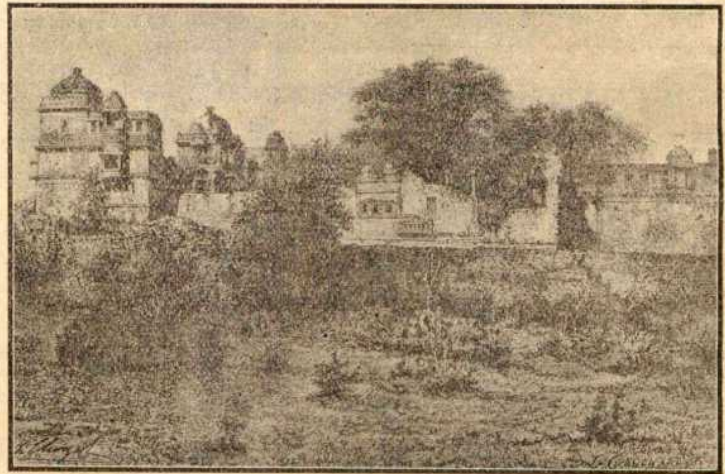
সূর্যাকুণ্ডের কাছেই কুস্তুর জয়ন্তস্ত। ইহা হিন্দু স্থপতিবিদ্যার, ললিত কলার ও প্রস্তর কারুকার্যের জয়ন্তস্ত স্বরূপ। গঠন রেখা, অলিন্দ 'গবাক্ষ' খিলানের রচনাকৌশল, ভিতর ও বাহিরের প্রস্তর-খোদন কার্য, অশ্রু মূর্তি খোদন ও বিজ্ঞাস এবং স্থাপত্য-কৌশল প্রদর্শন হিসাবে ইহার তুলনা জগতে নাই বোধ হয়। চিতোরে আর একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সেটিও অতীত স্মরণ। কিন্তু তাহাতে কুস্ত জয়ন্তস্তের (খীরাকুস্তুর) বিরাট গাভীরা নাই।

কুস্তুর জয়ন্তস্তের নীচে ঢাল

পাহাড়ের পথে কিছুদূর যাবার পর গোমুখী ধারা এবং পাথর বাধান প্রকাণ্ড জলাধার কুণ্ডে পৌঁছালাম। এই গোমুখীর পাশে পাহাড়ের গায়ে রাণী বিন্দার নামে গহ্বরের মুখ দেখা যায়। গহ্বরটি পাথরের দেওয়ালে বন্ধ করা। এইখানে চিতোরের বারো হাজার কুলললনা অগ্নি প্রবেশ ক'রে জোহরব্রত পালন করেন।

কিছু দূরে জয়মল ও পুস্তের বাড়ী। এই দুই রাজপুত বীরের বাড়ীও ধ্বংসের পথে চলেছে। তার পর পদ্মিনী মহল। পদ্মিনী মহলের কিছু অংশ মেরামত করা হয়েছে।

অধিকাংশই এখানে সেখানে ধ্বংস হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে। মেরামত অতি "হাতুড়ে" ভাবে করা হয়েছে দেখলে মনে হয়; না কবুলেই ছিল ভাল। মহলের সামনে প্রকাণ্ড পুকুর। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, যে, চিতোরের পাহাড় কোনখানেই নীচের সমতল জমীর থেকে চারশ ফুটের কম উঁচু নয়; অথচ এই সকল জলাশয়ে বারো মাস জল থাকে।



কুস্ত মহাল, চিতোর

পদ্মিনী মহল ছাড়িয়ে বাদল মহলের ধ্বংসস্থপ।
তারপর জঙ্গলের আরম্ভ। স্থানীয় লোকের কাছে
শুনলাম, বাঘের উৎপাত যথেষ্ট আছে।

চিতোরের ভিতরে বর্তমান মহারাণা অনেক লক্ষ
টাকা ব্যয়ে প্রকাণ্ড প্রাসাদ তৈরী করছেন। প্রাসাদের
কাজ এখনো শেষ হ'তে চের দেবী, কিন্তু এর মধ্যে
প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।

প্রাসাদের চারিপাশে শত শত মন্দির, ঘরবাড়ী,
মহাল, ঘরে ঘরে ধ্বংসস্থপে পরিণত হচ্ছে। বাপ্পা
রাওয়াল, অরিসিংহ, ভীমসিংহ, পদ্মিনী, হাফীর সিংহ
কুন্তরাণা, মীরাবাই, পৃথীরাজ, জয়মল, পুত, বীরজন
রাঠোরণী ও তাঁর পুত্রবধূ, রণনেত্র সালুধু। পত্নী, রাণা
সংগ্রাম, রাণা প্রতাপ ও শত সহস্র রাজপুত বীরের অক্ষয়
কীর্তিহল চিতোর এখন এক বিরাট শ্মশানে পরিণত।

ইহার ধ্বংসস্থপের প্রত্যেক অণুপরমাণু যত্নাঙ্কুরী,
স্থিরকর্তব্য মহাতেজা রাজপুত বীর পুরুষ ও ললনার
গৌরবকীর্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে এলে যে
অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে গৌরব অপেক্ষা বিষাদেরই
উপলব্ধি অধিক হয়।

শত্রু-অত্যাচার-প্রদীড়িত, বর্ষার কর্তৃক লুপ্তিত ও
বিধ্বস্ত চিতোর দেখলে মনে হয়, যেন কোন এক
দৌম্যকান্তি বৃদ্ধ যোদ্ধাপুরুষ শত্রু কর্তৃক মারাত্মক
ভাবে আহত হ'য়ে নির্জিন শ্মশানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা
করছেন।

পাশ্চাত্য জগতে একটি প্রবাদ আছে, যে, প্রাচীন
গ্রীসের গৌরবের অস্তিত্ব হয় জার্মানীতে। সেই
রকম চিতোর ও মেবারের গৌরবের সম্যক অস্তিত্ব
বোধ হয় বাংলা দেশেই হয়।

কাল-বৈশাখী

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

এমনি বাদল গেল, বৃষ্টি আর ঝড়ের দাপটে
ধ্রুব সমুদ্রাশি ছবি মুছে গেল নভ-চিত্রপটে,
বিদ্যুৎশলাকা বিদ্রু ক্রুদ্ধ অন্ধ অযুততারকা
স্বচ্ছসহ বেদনায় অশ্রুজল জমাট করকা,
কাদে নীড়-ভাঙা পাখী; ছিন্নপত্র ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
নিরুদ্দেশ পথহারা, অরণ্যানী পরিভ্রাহি ডাকে
অবিগম নিরুপায় আর্তনাদে, পল্লব-পদ্মারে
বক্ষে বাঁধি, ভগ্নাশা লুটাইয়া পড়ে একেবারে।
অন্ধকার নেমে আসে ঘনকৃষ্ণ আর্দ্র যবনিকা,
নির্বাপিত নিখিলের আলোকের প্রত্যেক কণিকা;

প্রলয়ের ক্ষণ স্মরি' সৃষ্টি কেঁপে ওঠে বারে বারে,
কাটে নিজ্রাহীন রাতী দীপহীন আঁধার আগারে,
প্রভঞ্জন এসেছিল পূর্বের দূর্বপথ বাহি',
দক্ষিণে চলিয়া গেছে হেথা বাতায়ন-পথে চাহি'
দেখি' পড়ে দেবদাক্ষ ভগ্নরথ যোদ্ধার সন্ধান,
পল্লবে প্রচ্ছন্ন পথ, তোরণের আচ্ছন্ন সোপান,
মরিয়াছে বুলবুল কামিনী-কুসুম-সমাহিত,
বিঁধে আছে বাতায়নে প্রজাপতি ঝটিকা-বাহিত,
কুসুমের লাজাঞ্জলি চারিদিকে অলিন্দে হুড়ামে,
ভেঙেছে মঙ্গল ঘট রচনার মালিকা জড়ামে।



ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় নারী—

মেয়েরা যে শুধু গৃহ-বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া স্বামী-পুত্র-ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সেবা ও পরিচর্যা এবং সমস্তান প্রতি-পালন করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, পুরুষ শাস্ত্রকার ও সমাজ পরিচালক-গণের দ্বারা প্রচারিত এই ধারণা পৃথিবীর সর্বত্র বর্তমান ছিল। মুছ ও কোমলাঙ্গী নারী, অন্তঃপুরের কোণেই তাহার বসার্থ স্থান, গৃহের বাহিরে উদ্গুস্ত আকাশের নীচে রোজান্তপ, ঝড়-বৃষ্টির সহিত

যুঝিবার মত মনোভাব ও দেহ তাহার নহে, এইসকল কথা শুনিয়া শুনিয়া নারীরাও এত দিন আত্ম-বিশ্রুত ছিল। বহু শতাব্দীর এই অন্ধসংস্কার তাহাদের দেহমনে এমনই মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল যে ভগবানের অপূর্ণ দান আলো-হাওয়াও তাহারা অবাধে, নিঃসঙ্কেচে উপভোগ করিতে দ্বিধা করিত। মেয়েদের দৈহিক শক্তি থাকার দোষের বলিয়া গণ্য হইত। যে-মেয়ে যত দুর্বল, কোমল ও অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত, সেই তত স্পন্দর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিত। কিন্তু এই ভাব চিরদিন থাকিবার নহে। পাশ্চাত্য দেশে এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটয়াছে;



মিস ই-টুকী



মিস কাসেল

আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসিতেছে। জ্ঞানের আলোকে নারীরা এখন আপনাদের স্বরূপ বুঝিতেছে। শুধু সংসারের রাঁধা-বাড়া, সন্তানপালন ও একান্ত দাস বৃত্তিই নারীর চরম ধর্ম নহে। পুরুষের মত সমগ্র বিধেও তাহার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার আজ তাহারা দাবী করিতে বসিয়াছে। ভগবান মেয়ের শরীর দিয়াছেন শুধু পেলবতা ও সৌন্দর্য্য-সুধমামণ্ডিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পুতুল সাজিয়া থাকিবার জন্ত নহে, এই অনুভূতি মেয়েদের মনে জাগরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতেছি, বাহিরের সকল কাজই নারীরা যোগ দিতেছে। আকাশে, সমুদ্রে, আহাৰবিহারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শীকারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বত্রই নারী পুরুষের যথার্থ সহচরী, কেবল মাত্র ভোগের উপচার নহে। দৈহিক শক্তি পরীক্ষায়, ব্যায়াম-ক্ষেত্রে নারীদের উন্নতি বিস্ময়কর। সম্ভরণ, দৌড় বাঁপ, বন্দুক ব্যবহার, টেনিস, ফুটবল এবং সাইকেল, মোটরকার, জাহাজ, এরোপ্লেন ব্যবহারেও আজকালকার শিক্ষিতা নারীরা পিছ পানহেন। এই সকল ব্যায়াম দ্বারা মেয়েরা শরীর ও মনে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিতেছেন ও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারী কেবল মাত্র পুরুষের সম্পত্তি নহে, তাহার স্বতন্ত্র

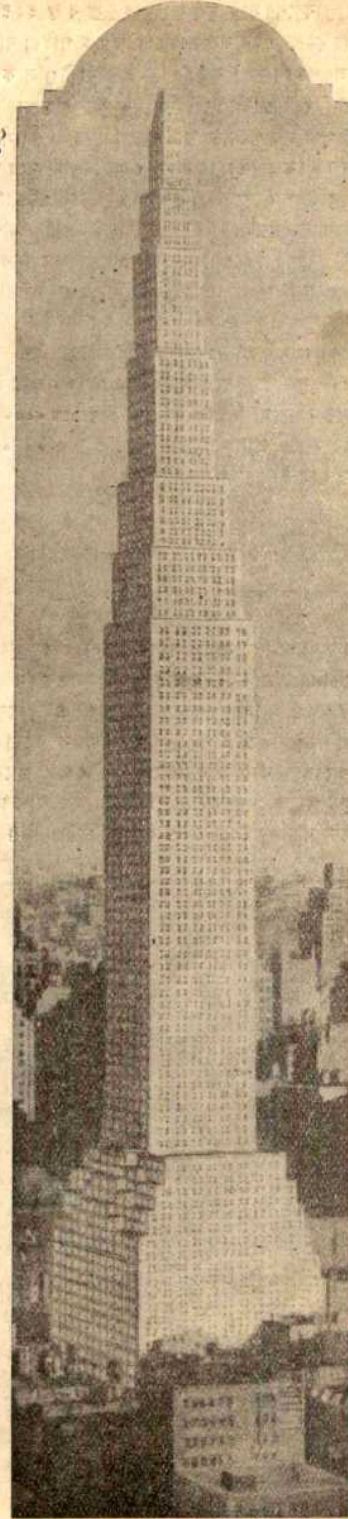


মিস ফ্রাইজ

অস্তিত্ব আছে। এই পঞ্চশত বিভাগে আমরা ইতিপূর্বে শরীর ও মনের দিক দিয়া নারী-সমাজের অনেক কীর্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শারীরিক ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায়ও যে, নারী নিতান্ত পিছনে নহেন তাহা দেখাইবার জন্ত এখানে তিনটি ব্যায়ামপটু মহিলার ছবি দিলাম, ইহাদের দুই জনে মিস ই টুকী ও জাঙ্কার কাসেল লখা দেড়ে যথাক্রমে হাজার মিটার ও ১০০ মিটারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। মিস টুকী জাতিতে ইংরেজ, ইলুফোর্ডের আধ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন। মিস কাসেল জার্মান জাতীয়, ইনি ১২'৪ বেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়াইয়াছেন। তৃতীয় ছবিটি জর্জ-ওয়ারশটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইকেল দলের একজন নামজাদা সভ্য। ইহার নাম মিস এলিজাবেথ ফ্রাইজ। রাইকেল ব্যবহারে ইনি একজন অস্বতীয় ওস্তাদ।

লার্কিন্ মিনার—

আকাশ-পোত হইতে মার্কিন দেশের বড় বড় সহরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলিতে আকাশের শরশয্যা পাখিয়া রাখা হইয়াছে। দর্শনীয় অজংলিহ (Sky-Scraper) প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া আমেরিকার

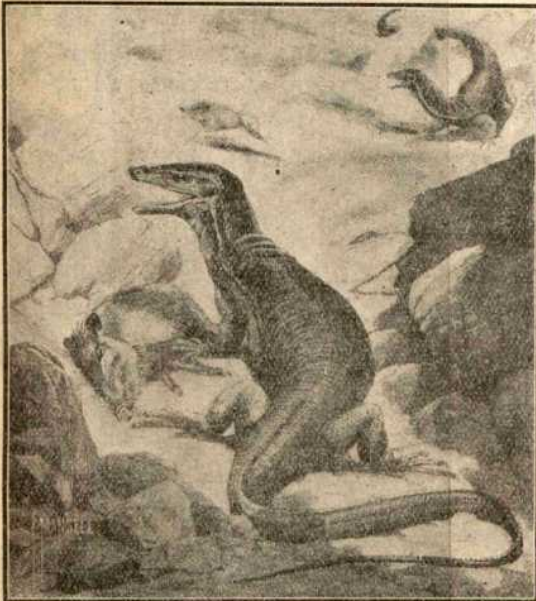


লার্কিন মিনার

অধিবাসীরা যেন আকাশের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। এই আকাশ ধরার নেশা এমন ভাবে আমেরিকাকে পাইয়া বসিয়াছে যে, লোকে চল্লিশ তলা পঞ্চাশ তলা বাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ীগুলিকে বাড়ীই মনে করে না। আমেরিকার স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধ এডিসন্ এই ভয়ঙ্কর নেশাকে ধ্বংসের পূর্ব-লক্ষণ জানে বার বার তাঁহার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শোনা দূরে থাকুক এই মোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে যে ছবিটি দেওয়া হইল সেটি একটি কল্পিত প্রাসাদের নক্সা। নিউইয়র্ক সহরে এটি নির্মিত হইবে। ১১০ তলায় এটি সম্পূর্ণ হইবে। ইহার পাশে আমেরিকার অন্ত্যস্ত অঙ্গলিহ প্রাসাদগুলি নিতান্তই নগণ্য হইয়া উঠিবে। বর্তমানে ষাটতলা উলওয়ার্থ প্রাসাদই পৃথিবীর উচ্চতম প্রাসাদ; তাহার উচ্চতা ৭২২ ফুট। এটি উলওয়ার্থ প্রাসাদ অপেক্ষা ৪১৬ ফুট অধিক উচ্চ হইবে অর্থাৎ ইহার উচ্চতা হইবে ১১৩৮ ফুট। ইহার নির্মাণে প্রায় ৮০ লাখ ইট ব্যবহৃত হইবে এবং ইহার কাঠামো নির্মাণ করিতে প্রায় ১১২০০০০ মণ লোহা লাগিবে। জমির দামও প্রাসাদ নির্মাণ খরচ প্রায় ৫০০০০০০০ টাকা পড়িবে। ইহার নাম হইবে লার্কিন-মিনার।

কমোডো দ্বীপের অদ্ভুত জানোয়ার—

স্তার এলান কব্‌হাম বিমানপথে সমস্ত পৃথিবী প্রায় দুইবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৬০০০ মাইল পথ অভিযান করিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ইস্টইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কমোডো দ্বীপে এক অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলিয়াছেন। এই জানোয়ার লম্বায় ১০ হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের নখ আশ্চর্য্য রকম বড়, এই নখের সাহায্যে বড় বড় বোড়াকেও ইহারা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করি-



কমোডো দ্বীপের অদ্ভুত জানোয়ার

দ্রাবনী দর্শক

পারে। ইহাদের প্রকাণ্ড লেজের জোরও অসামান্য। এই লেজের এক বাড়িতেই গরু মহিষ শূকর মানুষ ইত্যাদির প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। এইগুলি গিরগটি জাতীয় জীব। বৈজ্ঞানিকেরা সন্দেহ করিতেছেন যে, অতি-আদিমযুগের যে কয়েকটি জানোয়ার আজিও জীবিত আছে ইহার তাহাদের অন্তর্গত। ইহার অতি দ্রুত দৌড়াইতে পারে। এই জানোয়ারের দুইটি মাত্র সম্প্রতি ধৃত হইয়া আমেরিকায় নীত হইয়াছিল। একটি মারা গিয়াছে। এখানে সেই অদ্ভুত জানোয়ারের ছবি দেওয়া হইল।

প্যারাহাট ক্যামেরা—

জিমি ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তি এক ধরণের ক্যামেরা নির্মাণ করিয়াছেন। আকাশপথে হইতে প্যারাহাট যোগে অবতরণকালে ইহার সাহায্যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র লওয়া যায়, ক্যামেরাটি বৃকের উপর

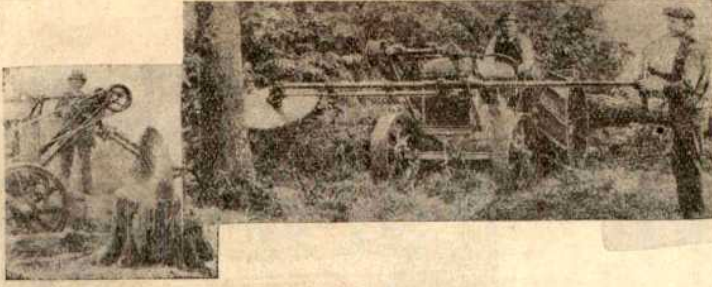


প্যারাহাট-ক্যামেরা

আঁটির বাঁধা হয় ও এক হাতের সাহায্যে ছবি লওয়া যায়, ২৫০০ ফুট উপর হইতেও ইহাতে ছবি তোলা যায়।

এক টিলে দুই পাখী—

যন্ত্র লান্ডল (Tractor) দিয়া অতিনহঞ্জেই জমি চাষ করা যায়। বইই অনুর্বর জমি হউক না কেন, যন্ত্রে মুখে কোনো বাধাই টিকে না। কিন্তু এতাবৎ কাল এই ট্রাক্টরের সাহায্যে কেবল মাটিই ভাঙ্গা হইত। সম্প্রতি ইহার সহিত একটি গোল করাত যন্ত্রসাহায্যে যুক্ত করিয়া দিয়া মাটি চাষ ও পাছকাটা একসঙ্গে চলিতেছে। এই করাতটি



করাতযুক্ত টাউটার বা যন্ত্র লাঙল

সোজা, বাঁকা লম্বালম্বি যে-ভাবে ইচ্ছা চালানো যায়। এখানে করাত-যুক্ত লাঙলের একটি ছবি দেওয়া হইল, পাশে করাতের সাহায্যে কণ্ডিত গাছকে লম্বালম্বি ভাবে কি ভাবে কাটা হইতেছে তাহাও দেখান হইয়াছে।

মোটর-সাইকেল-নৌকায় পৃথিবী ভ্রমণ—

লণ্ডনের একজন যন্ত্রবিদ একটি মোটর-সাইকেল-নৌকা নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ইহার সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন। এই সাইকেলটি এমন মজবুত হইয়াছে যে, তিনি জলপথে বিশেষ



মোটরসাইকেল নৌকা

বিপদের আশঙ্কা করেন না। নৌকার ভিতরে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি রাখিবারও ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজন হইলে হাঙ্গর কুমীর হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নৌকাটিকে আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলা যায়।

মায়া-সভ্যতা—

আমরা ইতিপূর্বে এই বিভাগে মায়াসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি ও মেজিকার যুগটান প্রদেশে আবিষ্কৃত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করিয়াছি। এই মায়াসভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা আজিও ঠিক মত নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে মায়াসভ্যতার ধ্বংস-শেষের মধ্যে প্রাপ্ত বস্তুবিড়ি এবং প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত জরাজীর্ণ দেখিয়া

মনে হয় যে, তখন লোকে সভ্যতার ও জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হইতে এগুলি কোনো অংশেই হীন নহে। সম্ভ্রান্তি মায়া নগরীর পুরাতন ধ্বংসাবশেষ সংস্কার করিয়া এক নূতন নগরী পত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই নগরীর আধুনিক নাম চিচেন-ইটুজ। অতীত যুগের জ্ঞান-গরিমা ও শিল্পকলার সাক্ষ্যরূপে আবিষ্কৃত মূর্তি ও মূর্তি ইত্যাদির সংস্কার শুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে ধ্বংসের মধ্যে প্রাপ্ত দুইটি মূর্তি



অজ্ঞাত দেবতার মূর্তি

ও পিরামিডের উপরে বলি-মন্দিরের ছবি দিলাম। প্রথমটি নাগদেবতার মূর্তি। ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, এই মূর্তির খুব বেশী প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ প্রায় প্রত্যেক গৃহেই একটি করিয়া এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত। দ্বিতীয় প্রস্তর-মূর্তিটি কোন্ দেবতার ছবি তাহা বুঝা যায় নাই। তবে এই মূর্তির নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সন্দেহ করিতেছেন যে, এই ধরনের ভাস্কর্য্য সম্ভবতঃ সমুদ্র-পার হইতে আমদানি। কেহ কেহ বলেন, ইহা মিসর হইতে নীত হইয়াছিল। কাহারও মতে ভারতবর্ষের সহিত ইহার যোগ আছে।



নাগদেবতার মুখ



বলিমন্দির

বলি-মন্দিরটি কালের কোপ হইতে কোনো রকমে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মারা রাজ্যে হুন্দরী কুমারীদিগকে জলদেবতার কাছে বলি দেওয়া হইত। নগরের লোক

এই মন্দিরের উপর সমবেত হইয়া দেবতার পূজা অর্চনা করিয়া সমাবাহ সহকারে উপর হইতে নীচের কূড়ে বলিকে ফেলিয়া দিত।

বর্ষশেষ

শ্রী চন্দ্রবিনোদ দাস

(১)

যেথা লক্ষ বর্ষমালা বিশ্ব ছাপি' চির শ্রোত রূপে
চলিয়াছে কেবল চলিতে,—স্মরণের গন্ধধূপে
স্পর্শমাত্র করি' 'বর্তমান'-ক্ষণবিন্দু, দূরে দূরে
শুধু দূরে,—হে অজস্র পল-দল! শেষদলে পুরে
সেথা তব আভিমান। ফুটে উঠা হ'ল সম্পূর্ণ,
—বেলাতটে ঝরি' পড়। উ'ষ্ম দেয় প্রথম চূষন।

(২)

জীবন অমর-পুরে মোরে ঘেরি' গেল নৃত্য করি'
তোমার পলের কক্ষে লক্ষ লক্ষ স্বপ্নের অঙ্গুরী ;
তাদের সার্থক গুণে আশা-তৃপ্ত প্রেমের লালিমা
প্রতিবিম্ব রচি' গেল, তব দলে রক্তিম গরিমা
ভাসে তাই ; তাদের নিরাশা-হত অতৃপ্তি নিশ্বাসি'
সস্তাপে জালায়ে দিল, খেত পাণ্ডুলে তা প্রকাশি'।

(৩)

আনন্দের গন্ধস্নান, বিষাদের ধূস্রদাহ লয়ে,
হে পূর্ণ বরষ-পুষ্প, বাসনার প্রেতমূর্তি বয়ে
চলিয়াছ তুমি ; প্রাপ্তির কাকলি-ধ্বনি কর্ণে আসে

এখনও এই পার্শ্ব-কক্ষ হতে ; ছবি চোখে ভাসে
ব্যথামোহন অপ্রাপ্তির মুহূর্তের আগে শুধু দেখা ;
সমাপ্ত তথাপি, তব, জীবনের শেষ গণ্ডী-রেখা।

(৪)

চলিয়াছ তুমি,—কোথা ? সেথা কি গো শাস্ত কল্যাণ
সর্বদৈন্ত কণ্ঠে শুবি' নীলকণ্ঠ,—করিছে ধোয়ান।
অপূর্ণ ! স্নানিমাহীন তারি স্পর্শে পূর্ণ হ'য়ে ফুটি'
আনন্দের চিবগন্ধে পাদপদ্ম-প্রান্তে যাবে লুটি,
ধান-স্বাগ্ন-শ্রীচরণ-স্পর্শ-স্থখে ধরি' বক্ষ-ডালা
লক্ষ লক্ষ বর্ষসনে সৃষ্টি করি' অমৃতের মালা।

(৫)

চলিয়াছ প্রেতলোকে ? সেথা শুধু সংহার-উল্লাস,
ধ্বংসের অনন্ত ধূলি মসৌপূর্ণ করিছে আকাশ,
ভৈরবের রক্তনৃত্যে দিকে দিকে বহি' উঠে জ্বলে,
আনন্দ-নৈরাশ্য-রাশি ভস্ম-কণা তব পদতলে।
সংহারের নৃত্য-ভন্দে তুমি কিগো নটরাজ রূপে
মৃত্যু মাঝে দেখাইবে ভূতিবেশে অনন্ত-স্বরূপে ?



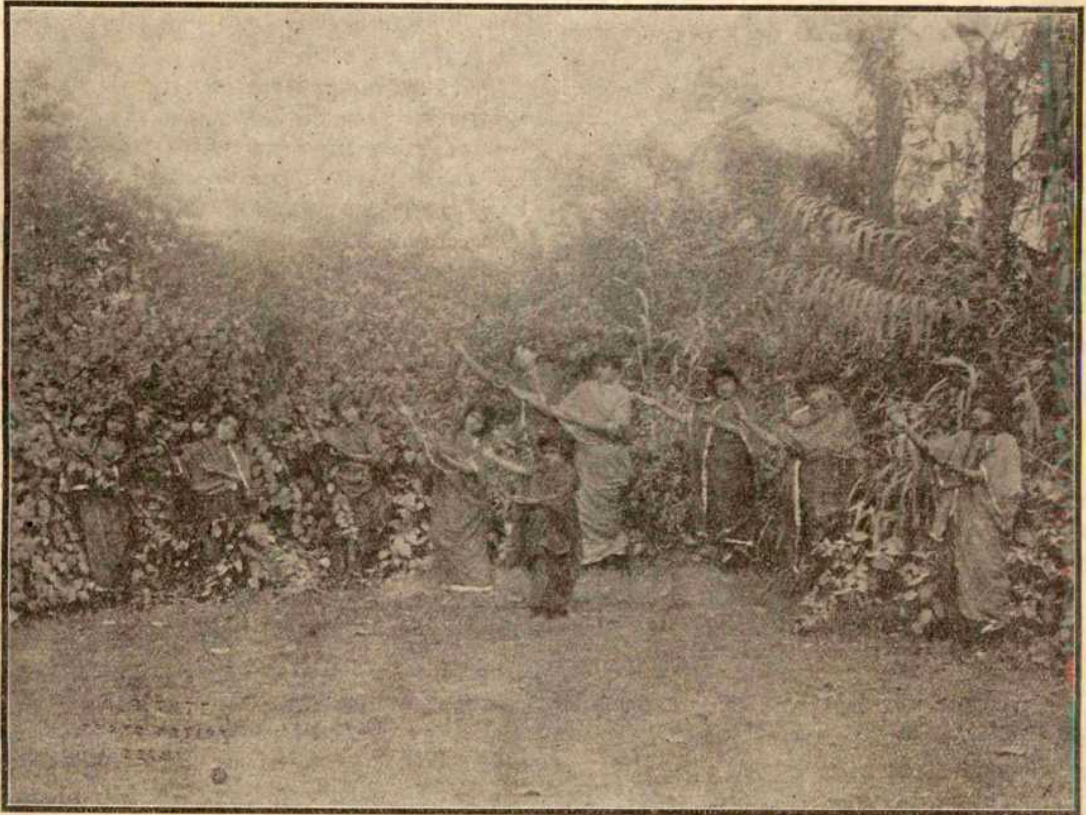
ভারতবর্ষ

দিল্লীতে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও ফাল্গুনীর অভিনয়—

দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন গত অধিবেশন উপলক্ষে যে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও ফাল্গুনীর অভিনয় হইয়াছিল। আমরা গত বৎসর মাঘ মাসের প্রবাসীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যে-নব বালকবালিকা অভিনয় করিয়াছিল, তাহাদের কতকগুলি ভাল ফোটোগ্রাফ আমরা পাইয়াছি। আগে একটি ছাপিয়াছিলাম; এ মাসেও একটি মুদ্রিত করিলাম। এগুলি দেখিয়া অনুমান হয়, যে, অভিনয় ভালই হইয়াছিল। ফোটোগ্রাফারের দক্ষতাও প্রশংসনীয়।

সেনা-বিভাগে ভারতীয়ের নিয়োগ—

সেনা-বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ ও ভারতে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত বিলাতের জেনারেল স্কোনের সভাপতিত্বে এক তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। কমিটিতে মিঃ জিমা, স্তার ফিরোজ সেখনা, মেজর জারোয়ার সিংহ, মিঃ রামচন্দ্র রাও, মেজর ডাফলে এই কয়জন ভারতীয় ছিলেন। কমিটি তাহাদের রিপোর্টে ভারতীয় সেনা-বিভাগে ভারতীয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির পরিবর্তনের সুপারিস করিয়াছেন। কমিটির মতে রাজকীয় কমিশনের (King's Commission) জন্ত ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করার বর্তমান ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে। সেনা-



“ওগো দখিন হাওয়া, পখিক হাওয়া

দেছিল দোলায় দাও চলিয়ে।”—দিল্লীতে ফাল্গুনী

বিভাগে ভারতবাদীদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজ এ পর্যন্ত মোটেই অগ্রগতিতে অগ্রসর হয় নাই। ইহার নানা কারণ উহার নির্দেশ করিয়াছেন। কমিটি বলেন—৮টি সেনাদলকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করিয়া সেনাবিভাগে ভারতবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাবনা হইয়াছে উহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। এরূপ প্রস্তাবনা লইয়া কার্য করিতে গেলে শুধু যে তাহা শাসনের নানা বিভাগে ইংরেজ এবং ভারতবাসীদের সহযোগিতা-নীতির বিরোধী হইবে ইহাই নহে, সেনানী পদে যেসব ভারতবাসী নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে উহাদের প্রতি উহাতে অবিচার করা হইবে। এখনই তাহাদিগকে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে কাজ করিতে হয়। ঐ প্রস্তাব বাতিল করিয়া সেনা বিভাগের উচ্চ পদে ভারতবাসীদের নিয়োগের সুবিধা বিশেষরূপে প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। সেনাবিভাগে ভারতবাসীদের প্রাধান্য-দানের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এরূপ বিষমভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

কমিটি-একটি প্রস্তাবনা উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার। বলেন, সেনাবিভাগে যে-সব উচ্চপদ খালি থাকে, তন্মধ্যে ১০টি পদ বর্তমানে যেন ভারতবাসীকে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে ঐ সংখ্যা দ্বিগুণ করা হউক এবং ১৯৩০ সালে ভারতে ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর ৪টি করিয়া নিয়োগ বৃদ্ধি করা হউক। কমিটি এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, সেনাবিভাগের সকল পদই ভারতবাসীদের জন্য উন্মুক্ত করা হউক। তাহার। যে-প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে কার্য হইলে ১৯৪২ সালে ভারতীয় সেনাবিভাগের মোট পদের অর্ধেক ভারতবাসী নিযুক্ত হইবে।

এই বিষয়ে কমিটির সমস্তবর্ণের মধ্যে মতের মিল হয় নাই। মিঃ জিন্না, মিঃ রামচন্দ্র রাও এবং মেজর জারায়ার সিং বলেন, ১৫ বৎসরের মধ্যে সেনাবিভাগের শতকরা ৬০টি পদে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। স্তর ফিরোজ মেথনা এবং মেজর ডাফলে ২০ বৎসরে ঐ সংখ্যায় পৌঁছিতে চাহেন। শতকরা ৫০টি পদ ভারতবাসীর নিযুক্ত হইলে সেনানীপদে ভারতবাসী এবং ইংরেজ নিয়োগের অনুপাত কিরূপ হইবে কমিটি তৎপক্ষে কোন সুপারিশ করেন নাই। সামরিক যোগাভা বজায় রাখিবার জন্য ভারতীয় সেনাদলে ইংরেজ সেনা রাখার আবশ্যকতা কমিটি স্বীকার করিয়াছে।

জামায়াত সংবাদপত্রসেবী—

নেদিলকো নেকোভিচ নামক একজন সংবাদপত্রসেবী এবং ছাত্র মাত্রাজে আগমন করিয়াছেন। ইনি সাক্ষিয়ার অধিবাসী। দুই বৎসরকাল পদত্রেজ্ঞ অমণ করিয়া তিনি প্রায় ২৭০০০ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি ২০টি দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। মাত্রাজ হইতে তিনি কলম্বো যাইবেন এবং তথা হইতে চীন ও জাপান অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

বাণী হিন্দু মহিলাশ্রম—

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত বিনোদিনী দেবী নাম্নী একজন বঙ্গ-বিধবা দুইজন মাত্র সহকর্মিণী লইয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা প্রতিরূপা দেবী (৮ভূদেবী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী) এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করেন ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য ‘বাহাতে সহায়সম্মলবিহীন নারী বাইরের সর্বপ্রকার বিপদ হইতে সশস্ত্রে রক্ষিতা হইয়া সনাতন নীতি ও দেবা-ধর্ম শিক্ষিতা হইয়া ও বাহাতে নানা প্রকার শিল্প-কার্য শিক্ষা করিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন।’ আশ্রমের কর্মিণি এ উদ্দেশ্য

সাধন জন্য আশ্রম যত্ন করিতেছেন। আমরা আশ্রমের চতুর্থ বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া আশ্রমের কার্যের প্রশংসা করিতেছি।

বাংলা

বাংলার জেলা-বোর্ড—

বাংলার জেলাবোর্ড-সমূহের ১৯২৫-২৬ সনের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ—

আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নূতন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের উহাদের সংখ্যা ছিল ১৫০০ শত; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উহাদের সংখ্যা হইয়াছে ২২১৭। বিশেষভাবে ময়মনসিংহ, নদীয়া এবং চট্টগ্রাম জেলাতেই ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহ দলাদলির জন্য উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কর্তৃপক্ষ অসুস্থমান করেন, এই প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মনির্ভরতার ভাব বেশ সজীব আছে।

জেলা বোর্ডসমূহের ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল এবং খরচ হইয়াছে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

সমগ্র প্রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক লোক পিছু ২ আনা ৯ পাই কর ধাৰ্য্য ছিল। কোনও কোনও জেলায় ১ আনা ৭ পাই হইতে ৮ আনা ১১ পাই পর্যন্ত করের ভারতম্য হইয়াছিল।

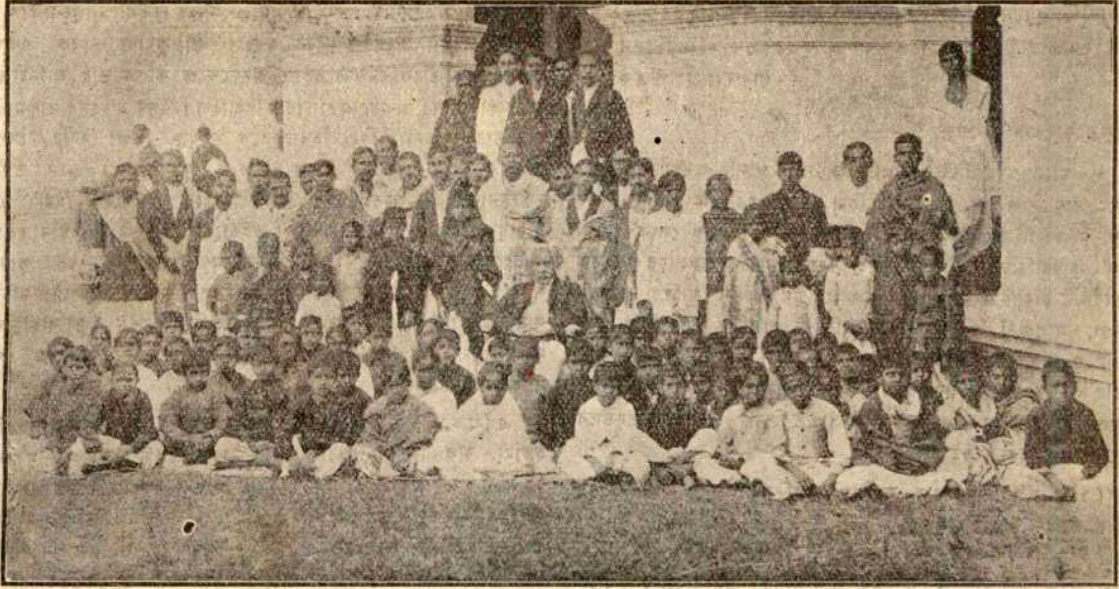
শিক্ষা ব্যাপারে খরচ ৫৭ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী ১৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সাহায্যে পরিচালিত উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা ৪১৪২০ হইতে ৪১৯৯৮ দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে বালক-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪৪২৩ ও বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৫৬৫। এইসমস্ত স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা ১৭৪৫৭টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে সাঁওতালদিগকে শিক্ষাদানের জন্য একটি নূতন বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসক ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য-বিভাগে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই বৎসরে ২২টি নূতন ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে। জেলাবোর্ডের অধীন ডিসপেন্সারীর সংখ্যা ৪৮৫ এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ডিসপেন্সারীর সংখ্যা ৩১৯।

জনসাধারণের হিতকর কার্যে—যেমন জল সরবরাহ, পথ-প্রণালী, ঘানবাসাদি ইত্যাদিতে খরচ ৪৩০০০ হাজার হইতে বাড়িয়া ৬৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত প্রদেশ হইতেই এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, মোটার ও বাস চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাসমূহ নীচ নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং জেলাবোর্ড সমূহ উহাদের রক্ষার জন্য টাকার সংস্থান করিতে পারিতেছেন না।

জল সরবরাহের খরচ ৯ লক্ষ ৯০ হাজার হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ ১০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। মেদিনীপুর, জগলী এবং হাওড়ার জেলাবোর্ড-গুলি জল সরবরাহের জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়াছেন। মফঃস্বলে জল সরবরাহ বিষয়ে নলকূপ সমূহ যথোপযুক্ত হইলেও বর্তমানে এইগুলি সম্পর্কে কয়লাকটি অসুবিধা দেখা দিয়াছে। এই বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের মতে বর্তমান বন্দোবস্ত অনুযায়ী জল সরবরাহের সমস্তা পূর্ণ হইতে পারে না।

আলোচ্যবর্ষে খরচাদি দিয়া বোর্ড সমূহের হাতে ২১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আছে পূর্ববঙ্গের ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল।



রায়পুরে লর্ড সিংহ এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ

রায়পুরে লর্ড সিংহের কার্য—

বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে লর্ড সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত ত্রিনিদেত্তনের সহযোগে তিনি তাঁহার গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষাদানের অঙ্গস্বরূপ কৃষি এবং কুটিরশিল্প শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন। যেখানে বাঁধাকপির চাষ হইতেছিল, সেই ক্ষেতটি তিনি দেখিয়া বালকদের কাজের সফলতার সম্ভাব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রদত্ত পুস্তকাবলীর সাহায্যে রায়পুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীদের ব্যবহারার্থ একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। তাহা হইতে গ্রামবাসীরা পড়িবার জন্ত বহি বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহার ব্যয়ে একটি দ্ব্যতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলের দরিদ্র রোগীরা এই চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইয়া থাকেন। তিনি অজ্ঞান প্রকারেও নিজ গ্রামের উন্নতির জন্ত অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিলে তিনি নিশ্চয়ই আরও অর্থ ব্যয় করিতেন।

গত জানুয়ারী মাসে তিনি রায়পুর গিয়াছিলেন। স্থানীয় যে-সকল বুদ্ধ কৃষক বাল্যকালে তাঁহার খেলার সাথী ছিলেন, তাঁহাদের ও অজ্ঞান কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথনে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ—

গত মাসে বিপুল আড়ম্বরের সহিত যাবনপুরস্থিত কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে।

সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সাহায্যে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রসার করাই বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে এপর্য্যন্ত এই ইনস্টিটিউটে তিনটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। যথাঃ—মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এতদ্বিত্ত একটি কৃষি-বিভাগ

খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এইজন্ত একশত বিঘা জমি চাই। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের নিকট এইজন্ত আবেদন করা হইয়াছে।

আচার্য্য রায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—“স্থায়ী আয়ের জন্ত তোমরা বড় ব্যস্ত। একটি চাকুরী পাইলেই তোমরা বাঁচিয়া যাও। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, নিজে নিজে ব্যবসায় করিতে শিখ। সেইজন্তই তো এখানে তোমাদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকুরী খুঁজিতে গিয়া তোমরা এই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য বার্থ করিয়া থাক। তোমরা বলিবে মূলধন কোথায়? আমার মনে হয়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও একগ্রতা থাকিলে মূলধনের অভাব হয় না। মনে রাখিবে—এই দুইটি গুণই জীবনে সাফল্যলাভের সোপান।”

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সাবডিভিশনে বিরামপুর গ্রামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রায় সাহেব সরোজিনী বর্দন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিটা কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল্.এম্.এস্. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সরকারী চাকুরী লইয়া দিল্লীপুরে গমন করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গমন করিয়া D. P. H. এবং D. T. M পরীক্ষা দিয়া মালস্কার ডেপুটি প্যাথলজিস্টের পদে নিযুক্ত হন। তিনি দিল্লীপুরে “আর্য্যসঙ্ঘ” সভায় প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। মহাসমরের সময় উত্তর ভারত রেডক্রস্ ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘রায়সাহেব’ উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রবাদে তিনি সকলের উপদেষ্টা ও অভিভাবকের মত ছিলেন, তিনি সত্যতা, অমায়িকতা, দানশীলতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি সদালাপী, ষিষ্টভাবী ও পরোপকারী ছিলেন। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী কার্কফল রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভূতন ইউরোপীয় কর্মচারীর তাঁহার জন্ত আনুষ্ঠানিক দৃশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। চীন, জাপান, ও অজ্ঞান দেশীয় বহুলোক

তাহার শব্দসুগমন করিয়াছিল। প্রকাশ, একট ইংরেজ যুবক দাহকাণ্ড শেষ হইয়া পথান্ত্র স্থানে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

অমূল্য হিন্দু সম্মিলনী—

গত মাসে ময়মনসিংহ জেলার আটপাড়া থানার অধীন খিলাপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অনাচরণীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় দুই সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের চৈনিক প্রচারক ‘চ্যারিট্র’র সাহায্যে ধর্মোন্মুখ হিন্দু জাতির বর্তমান অবস্থা, অসুস্থতা ও বাল-বিধবার পরিণাম প্রভৃতির বিষয় অতি মর্ম্ম-স্পর্শী ও অলস ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সকলকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। সভার অনুষ্ঠিত ও জল অনাচরণীয় নমঃশূর সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে।

(১) জল অনাচরণীয় নমঃশূর প্রভৃতিকে অতি সদর জলচল করিয়া লওয়া বাবস্থা।

(২) হিন্দু সমাজ মধ্যে বাল-বিধবার বিবাহ প্রচলন না থাকায় হিন্দু সমাজ কলঙ্কের ও ধর্মের পক্ষে চলার অনতিবিলম্বে বাল-বিধবার বিবাহের প্রচলন করা।

(৩) গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বাকুড়ার অভয় আশ্রম :—

বাকুড়া জেলার আশ্রমের মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ—এই জেলার শিভিরস্থানে চ্যারিট্র সংযোগে সজ্ঞারে প্রচার কার্য চলিতেছে। বাকুড়া জেলার আশ্রম পল্লীতে ভারতের অতীত সম্পদ, পরাধীনতার সহিত আনুযায়িক নৈতিক অবনতি, বিলাসপ্রিয়তা ও আনুযায়িক দারিদ্র্য, অসুস্থতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা, দেশ সেবার বাণী পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি চৈনিক কর্ম্মী কামারপাড়া ও শিবরিপাড়া এই দুইটি স্থানে যথাক্রমে চ্যারিট্র সংযোগে বক্তৃতা দেন। এবং অপর একজন কর্ম্মী বেলবনী গ্রামে খন্দর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি বিশদ বক্তৃতা করেন। দৈনিক ব্রহ্মসংক্রান্ত প্রকাণ্ড ধর্মোন্মুখ হয় তিনি তাহা বিবৃত করেন ও শ্রদ্ধার বহুল প্রচার ও উৎপাদন কি প্রকারে দেশের বহুমুখী উন্নতি হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। এই গ্রামে অভয় আশ্রমের একটি উৎপাদন কেন্দ্র আছে। কর্ম্মীগণ স্থানে স্থানে ব্যায়ামগার, গ্রন্থাগার ও পাঠদ্বন স্থাপন করিয়াছেন। রোগ শুষ্কতা, অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে সাহায্য ইত্যাদি সেবা-কার্য্য করিয়াছেন।

বঙ্গনারীর বীরত্ব—

হুগলীতে একটি বৃদ্ধা জলে ডুবিয়া মরিবার উপকন্ম হইয়াছিল। তখন প্রমোদহুন্দরী দাসী নামে একটি স্ত্রীলোক নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার উদ্ধার করে। এই বীরত্বের জন্ত হুগলীর মহিলা সমিতি প্রমোদাকে একখানি পদ্ম উপহার দিয়াছেন।

খড়গ বাহাদুর ও শশীমোহন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র খড়গ বাহাদুর নামক একজন নেপালী যুবক মারোয়ারী বাবসায়ী হিরালাল আগর-ওয়ালাকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের

বিচারে আট বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে উক্ত মারোয়ারী খড়গ বাহাদুরের আত্মীয় রাজকুমারী নামক একজন নেপালী যুবতীকে নেপাল হইতে অন্তর্দেশে কলিকাতায় আনিয়াছিল ও তাহার উপর অকথা অত্যাচার করিয়াছিল। খড়গ বাহাদুর রাজকুমারীর অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া হিরালালকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উদ্দেশে তাহাকে আঘাত করে, ফলে তাহার মৃত্যু হয়। নিজ ভগ্নীর সত্যজননকারী অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করিতে গিয়া এই বীর যুবক আইনের চক্ষে অপরাধী হইয়াছে। দেশের নানাস্থান হইতে—ইংরেজ, ভারতবাসী, হিন্দু, মুসলমান নিম্নলিখিত—এই কঠোর শাস্তির তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। কতিপয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মহিলা বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সদস্য মিঃ মোবারকের নিকট খড়গ বাহাদুরের দণ্ড মকুবের প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এবিষয় এখন সরকারের বিচারধীন।

এ নিকে শ্রীহট্টের জনশক্তিতে প্রকাশ—করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ইছামতি বাকু নিবাসী ফেরাজ আলী নামক একটি লোকের মৃত্যুদেহ এই কানুন তারিখে এক মাঠের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, এই লোকটি নাকি অতিশয় বদমায়েস ছিল। পুলিশ তদন্তক্রমে উক্ত গ্রামের নিকটবর্তী রঘুচক গ্রামের শশীভূষণ দে ও তিন জন পাটনী জাতীয় লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত শশী ভক্তলোকের ছেলে, তাহার বয়স ১৭ বৎসর হইবে। পুলিশের নিকট সে অন্তরান বদনে স্বীকার করিয়াছে—“আমি এই অকলের মাতৃজাতির সত্য নাপ-কারী শত্রুকে সহজে হত্যা করিয়াছি। এই লোকটি অধিক বলশালী ছিল, এটা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই ভাবিয়া ঐ তিন জন পাটনীকে সাহায্যের জন্ত সঙ্গে রাখিয়াছিলাম মাত্র। তাহাদের কোন অপরাধ নাই।”

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

রাজবাড়ী আধামঙ্গল সমিতির চেয়ারম্যান গত ২৬শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পাবনা জেলার অন্তর্গত সাংআনি নিবাসী শ্রীমতী পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদীপেন্দ্র পালের সহিত কবিরপুর জেলার অন্তর্গত কবিরপুর গ্রাম নিবাসী মৃত রাইচরণ পালের বিধবা কন্যা শ্রীমতী নীরদাবালা দাসীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান হইয়াছে। বিবাহ-সভায় প্রায় ৭৬ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।—স্বরাজ (পাবনা)

মাটিকান্টা কৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীমাদিক মালর পুত্র শ্রীমান হুমন্ত মালর সহিত ভাওগাবাড়ী (সিরাজগঞ্জ) নিবাসী শ্রীচন্দ্রনাথ মালর বিধবা কন্যা শ্রীমতী বরদাহুন্দরী দাসীর বিবাহ উক্ত মাটিকান্টা গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জগৎকুড়া নিবাসী শ্রীমোহন মালর পুত্রের সহিত সোনামই নিবাসী শ্রীকান্ত মালর বিধবা কন্যার বিবাহ সোনামই গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৩শে ফাল্গুন তারিখে গুয়া-দাইর সাকিনের মৃত শিবনাথ মালর বিধবা কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী মালর বিবাহ কৃষ্ণপুর সাকিনের মাণিকচন্দ্র মালর পুত্র শ্রীমান মহেন্দ্র মালর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ৩০ বৎসর ও বিধবা কন্যার বয়স ১৬ বৎসর।

খানুবাড়ী নিবাসী ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত স্বয়ংনাথ সরকার সম্ভ্রান্ত কার্য বংশজাত এবং তিনি কার্যোপলক্ষে পিন্ধাতেই অবস্থান করেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিধবা-বিবাহের জন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে টাকা কর্জ লইলে তিনি ঐ টাকার কোন হুম নিবেন না এবং তিনি এই ভাবে করে জনকে টাকা ধার দিয়া বিধবা-বিবাহের সাহায্য

করিয়াছেন। এইরূপে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী মালদার মধ্যে বিধবা-বিবাহে সাহায্য ও সহায়ত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজের ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

—টান্কাইল হিতৈষী

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ সঙ্ঘ—

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উন্নতি সাধন ও তাহার দুঃখ-দুর্দশা নিবারণ উদ্দেশ্যে বঙ্গের বিভিন্ন জাতি-সমূহের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। এক্ষণে সঙ্ঘ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। (১) বিবাহের পণপ্রথা উচ্ছেদ। (২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। (৩) দারিদ্র্য-সমন্বয় সমাধান। (৪) সর্ববিধ শিক্ষার বিস্তার। (৫) স্বাস্থ্যের উন্নতি। (৬) ধর্মভাব প্রসার। (৭) আর্তিসেবা ও বিপন্নের উদ্ধার। (৮) মামলা-মর্দমার হ্রাস।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রী পার্শ্বচরণ তর্কতীর্থ, শ্রী গণনাথ সেন, শ্রী চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রী আশুতোষ শাস্ত্রী, মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দা, রাজা জয়কেশ লাহা, শ্রী বীণেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কার্য পরিচালনার ভার লইয়াছেন।

কলিকাতায় মহিলা শিল্প প্রদর্শনী—

গত মাসে নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় এক মহিলা শিল্প প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনী তিন দিন খোলা ছিল। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, হাওড়া, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক অনেক শিল্পদ্রব্য আসিয়াছিল। তিন দিনে প্রায় দুই হাজার দর্শক এই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় বিশেষ প্রীতি হইয়াছেন। প্রদর্শনীতে জন-সমাগম এত বেশী হইয়াছিল যে, দুই দিন সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা রাখিতে হইয়াছিল।

বহুবিধ পণ্যসম্ভারে প্রদর্শনী-ক্ষেত্র রীতিমত একটি মেলায় পরিণত হইয়াছিল।

কলিকাতায় উদ্ধারার্থম্ প্রতিষ্ঠা—

গত মাসে কলিকাতায় মেয়রের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার অসংখ্য স্থান হইতে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালিকাদিগকে উদ্ধার করিয়া আশ্রয় দান করিবার জন্ত একটি তহবিল খুলিবার ও উক্ত তহবিলের টাকা ব্যয় করিবার জন্ত একটি কমিটি গঠন করার বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়। বহু সম্ভাষিত মতামতের পরে মহোদয় ও মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মেয়র ও গবর্ণরের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল তাহা মেয়র সভায় পাঠ করেন। কলিকাতার বিশপের লিখিত চিঠিও পঠিত হয়। কিছুকাল আলোচনার পর সাব্যস্ত হয় যে, ঐ তহবিল উঠাইবার ও ব্যয় করিবার জন্ত ১৫ জন লোককে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। মেয়র নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঐ কমিটি নিযুক্ত করিবেন, ঐ কমিটির আবার সদস্য নির্বাচনের অধিকার থাকিবে। ফণ্ডের পক্ষ হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষকে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ করা হইবে এবং সাংবাদিকগণকে ফণ্ডের আবেদন ও দাতা-গণের নাম ছাপাইতে অনুরোধ করিতে হইবে। বর্তমানে কর্পোরেশনের সেক্রেটারী কমিটির সেক্রেটারী থাকিবেন। বঙ্গের গবর্ণর এই তহবিলে এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

দান—

চকলের রাজা কলিকাতা মুক-বধির বিজ্ঞালয়ের সাধারণ ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা এবং গৃহ নির্মাণ ভাণ্ডারে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

টান্কাইল মহাকুমার অন্তর্গত নাগপুর থানার এলাকাহু স্বদামপাড়া নিবাসী ডাঃ সামছউদ্দিন সাহেব তাঁহার পিতা হুবিখাত গোলেন্দ্রী ও বৃত্ত। প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক মৌলবী আবদুল কাদের সাহেবের নামে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন উদ্দেশ্যে উক্ত স্বদামপাড়া গ্রামস্থ তাঁহার আনুমানিক ১০০০০ দশ হাজার টাকার সম্পত্তি ও একটি বাগান বাটী দান করিয়াছেন। স্থানীয় মুসলমানগণ, উক্ত দানে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু টাকা চাঁদা দিয়া এই শিক্ষা-অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। ডাক্তার সাহেব ইহা ভিন্ন পূর্বে অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী ভাস্কর—

শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার বর্ধন রায় মৈমনসিংহের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভাস্কর্য্য শিল্পের শিক্ষা ইংলণ্ডে গিয়াছেন; এখনও সেই সংগ্রাম চলিতেছে। তিনি ব্র্যাডফোর্ডে আট বৎসর কাজ করিতেছেন। কোন কোন বিলাতী কাগজে তাঁহার নির্মিত মূর্তির কোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। আমরাও তাঁহার একটি মূর্তির ছবি দিলাম। তিনি কৃতী হইলে স্মৃতি হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্য বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিতে পারেন।



একটি শিশুর মূর্তি
[ভাস্কর বর্ধন রায়ের নির্মিত]



ডাক্তর অশিনীকুমার বর্মণ রায়

ইষ্টার্ল বেঙ্গল রেলপ্রদর্শনী ট্রেন—

ইষ্টার্ল বেঙ্গল রেলওয়ের প্রদর্শনী ট্রেন এক মাস সফরের পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ট্রেনখানি ব্রডগেজের ত্রিশটি স্টেশনে গিয়াছিল। প্রত্যেক স্টেশনেই বহু দর্শক সমবেত হইয়া বক্তৃতা শুনিয়াছে এবং ছায়াচিত্র দেখিয়াছে। ক্রমকদের কল্পনাশক্তি জাগ্রত করা এবং স্বীয় অবস্থার উন্নতির প্রতি অবহিত করাই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরকে সাহায্য করার বাসনা জাগ্রত করাও অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। দুইটি উদ্দেশ্যই বিশেষ সফল হইয়াছে। এই প্রদর্শনী দর্শনে যে উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে তাহার ফলে অনেকেই গোচারণ ও পশু-চিকিৎসায় স্থাপনকল্পে জমী এবং অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কৃষি, পশু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ব্যবহারিক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের কো-অপারেটিভ বিভাগ যে সমস্ত হিতকর কার্য করিয়া থাকে তাহা প্রচার করা হইয়াছে। রেল কোম্পানী মনোরম স্থান-সমূহের যে চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে ঐ সমস্ত স্থান দর্শনের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই দেশের স্থাপত্য বিদ্যা এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অতিও লোকের একটা শ্রদ্ধা আসিয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রদর্শনী এই প্রথম। ইহার চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে এবং পল্লী-সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

দুই জন কৃতী বাঙালী—

ডাক্তার হরেশচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিয়া লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যা-



ডাক্তার এন্স দি রায়

লয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ডি-এসসি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রায় পালিত বিজ্ঞানমন্দির হইতে এন্স-এসসি পান করেন এবং তথায় প্রায় দুই বৎসর যৌব-গবেষণা ছাত্ররূপে কাজ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইনি লণ্ডনে হুইটন লেবরেটরীতে (Wheastone Laboratory) কোমল রঞ্জনরশ্মি (Soft X-rays) ও আলোক বিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ (Photo-electricity) সম্বন্ধে মৌলিক পরীক্ষা স্বরূপ করেন। ইনি রয়েল সোসাইটিতে তাপবিক্ষিপ্ত তড়িৎপ্রবাহ (Thermionies), আলোকবিক্ষিপ্ত তড়িৎপ্রবাহ (Photo-electricity) এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার (Chemical Re-activity) নিয়ম ও গুরুত্ব (Law and Mechanism) সম্বন্ধে অতি মূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ের বিদ্যাৎপ্রবাহের গিওরি আমেরিকা ও জার্মেনীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কাগজে আলোচিত হইয়াছে। আলোকজাত রাসায়নিক ক্রিয়ার (Photo-Chemical Re-actions) রহস্য উদ্ঘাটন করার অভিলাষে গত বৎসর ফারাদে সোসাইটি (Faraday Society) অক্সফোর্ডে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ ও রাসায়নিকদের এক সভা আহ্বান করেন। ডাক্তার রায় ও এই সভাতে যোগদান করিবার জন্ম আহুত হন। ডাক্তার রায়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রয়েল সোসাইটির যারো গবেষণাধাপক প্রফেসর রিচার্ডসন ভারতের হাইকমিশনারের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুবাদ এই,—“গত দুই বৎসর যাবৎ ডাক্তার রায় আমার লেবরেটরীতে কাজ করছেন। কিন্তু এর পূর্বেও আমি ডাক্তার

রায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত সুপরিকল্পিত ছিল। এই তরুণ যুবকের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। পদার্থবিজ্ঞানে এর দৃষ্টি বৈকল্পিক, জ্ঞানও তেমনি বহুব্যাপ্ত। একাধারে একগুণ উচ্চতরের গণিতবিষয়ক ক্ষমতা, ব্যাপ্তিক নৈপুণ্য (experimental ability) এবং মৌলিকতার শুভ-সমাবেশ অতি বিরল। ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার পথে ইনি নিশ্চয়ই একজন মূল্যবান পথপ্রদর্শক হ'বেন।" ডাক্তার রায়ের বয়স এখন ২৭ বৎসর। সম্প্রতি ইনি ভারত সরকারের মেট্রিকলজিষ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জমশেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর সহকারী চাক ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ের ডিস্টোরিয়া জুবিলি টেরিক্যাল ইল টিউটর ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় লাইসেন্সিয়েট উপাধি লইয়া ১৯১০ সালে আমেরিকা যান, এবং সেখানে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তথা হইতে ১৯১৭ সালে তিনি মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। দেশে থাকিতে জামালপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কারখানায় তিনি হাতে-হাতে যে কোর্সে শিক্ষা আরম্ভ করেন, কর্ণলে শিবিবার সময়ও আমেরিকার নানা কারখানায় সেইরূপ শিক্ষা করিতে থাকেন; যথা ক্যাজেনোভিয়া ইলেক্ট্রিক কোম্পানী, পেলিসভেনিয়া রেলওয়ে কোম্পানী, নিউইয়র্কের শেনেকাডার জেনার্যাল ইলেক্ট্রিক কোম্পানী প্রভৃতির কারখানায়। ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত পেরিন মার্শাল এণ্ড কোম্পানী এবং জে জি হোয়াইট এণ্ড কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ারের কাজ করেন। ১৯২৬ সালের শেষ অংশে তিনি জমশেদপুর আসিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু

ছাত্র বলিয়া এবং কার্যক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় বহু মহাশয় আমেরিকার ও ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ারিং পরিষদ ও সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আমেরিকায় তিনি শুধু কার্য-দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না; তাহার উচ্চ চরিত্রও তাঁহাকে প্রশংসাজনক করিয়াছিল। তিনি যেখানে যেখানে কাজ করিয়াছেন, সর্বত্রই তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ব-বোধ তাঁহাকে আদরণীয় করিয়াছিল। নিউইয়র্কের প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট এবং অনেক আমেরিকানদের নিকটেও তিনি কর্ণিষ্ঠতা, সদাশয়তা এবং নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার জন্য সুবিদিত ছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত চৈত্রের প্রবাসীর 'ছাতনায় চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে কতকগুলি ছাপার ভুল হইয়াছে। 'স্তপ' স্থানে 'স্তপ', 'বড়' স্থানে 'বড়', 'নান্নর' স্থানে 'নান্নর' হইয়াছে। আর হইবে,

৭৭০ পৃষ্ঠা	২ পাটি	১১ গুণ্টি
৭৭২	২	২০
		২৮
৭৭৪	১	টিপ
		১৩
		১১
	২	১১
৭৭৫	১	৬
		টিপ
	২	৪
৭৭৬	১	৫
৭৮৫		ইন্টার ছাপ
৭৮৬		"
৭৮৭		"
৭৯১	২	টিপ
		২
৭৯২	১	২

নান্নরের	নান্নরের
নান্নর	নান্নর
নান্নর	নান্নর
১ সনেত্র	১, নেত্র
কমাগতি	বামাগতি
এক বা কম	এক-কম
কাল	কোল
শুকর	শুকর
বাঁকুড়া (য়)	(বাঁকুড়া)
আদীম	আদীম
ছত্রী + ছাতনা	ছত্রী + না = ছাতনা
গৃহে	গৃহের
পাশে	নিকটে এক অস্বাভাবিকমূলে
২য়	১ম
১ম	২য়
১ম	২য়
নান্নর হাট	নান্নর হাট
হুথোচর্ম	হুথোচর্ম
চণ্ডীদাস, ভক্তেরা	চণ্ডীদাস-ভক্তেরা



[কোন মাসের “প্রবাসী”র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদের পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ “প্রবাসী”র আশ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

“অগ্রদানী” ও “আচার্য” ব্রাহ্মণ

শ্রীযুক্ত বিপিন-বাবু তাঁহার “বংশ ও গ্রাম পরিচয়” অংশে লিখিয়াছেন—

“আমাদের একজন ‘দ্বারস্থ’ আচার্য বা গণক ছিলেন। খোপা নাপিত ধারণ তখনকার হিন্দুসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, গণকেরাও সেইরূপ প্রত্যেক গ্রামের গ্রাম্য জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতেন। আমাদের অঞ্চলে ইঁহারা জ্যোতিষগণনা করিতেন, শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রদান লইতেন।”

তাঁহার এই উক্তির মূলে দেখা যায়, আচার্য বা গণকই শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্রদানগ্রাহী অগ্রদানী বা মহাপুরোহিত। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্তিক্যক।

“অগ্রদানী” ব্রাহ্মণ ও আচার্য ব্রাহ্মণ কখনও এক হইতে পারে না।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রাহ্মণদি বর্ণচতুষ্টয়ের শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রদান-গ্রহণকারী ব্রাহ্মণকে অগ্রদানী বা মহাপুরোহিত বলিয়া থাকে।

এই অগ্রদানী পুরোহিত, আচার্য বা গণক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদি বর্ণ চতুষ্টয়ের গৃহে শ্রাদ্ধাদিতে গোবেহিত্য করা অগ্রদানীর ব্যবসা এবং সূত্রধর বা ‘সূতার’ সম্প্রদায়ের পুরোহিত্য করাও আচার্য বা গণকের ব্যবসা। গ্রহগণনা ও শাস্তি করেন বলিয়া গণকের অস্ত্র নাম গ্রহাচার্য। উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণই শ্রীহট্টে বহু প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের কাহারো কাহারো উচ্ছৃঙ্খল চতুর্দশ পুরুষেরও খবর পাওয়া যায়, কিন্তু ততদূর না গেলেও ৪৫ পুরুষ বাবৎ এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিভিন্ন শ্রেণীর ‘যজ্ঞমানের’ পুরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত বিপিন-বাবুর জীবনের সত্তর বৎসর পূর্বেও যে শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্রদানী পুরোহিত এবং আচার্য বা গণক দুইটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, ইঁহার প্রমাণ দেওয়া শক্ত নয়। বর্তমানেও অপরাপর জিলার স্থায় শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্রদানী পুরোহিত এবং আচার্য বা গণক বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত।

বিপিন-বাবু অত্যন্ত লিখিয়াছেন—

“এইরূপে গ্রহপূজা, জন্ম-পত্রিকা ও কোষ্ঠী গণনা এবং প্রতিমাদি নির্মাণ আমাদের আচার্য বা গণকদিগের জাতি ব্যবসায় হইয়া উঠে। ক্রমে শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করিয়া ইঁহারা পতিত হইলেন।”

সুতরাং বিপিন-বাবুর মতে ‘অগ্রদান’ গ্রহণ করিয়াই আচার্য বা গণকেরা (অর্থাৎ অগ্রদানীরা) পতিত হইয়াছেন।

আচার্য বা গণকেরা তাঁহাদের যজ্ঞমান সূত্রধর-গৃহে শ্রাদ্ধাদিতেই অগ্রদান গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্বিত্তি কোন ব্রাহ্মণ কার্যই ইত্যাদির বাড়ীতে কোন সময়ই আচার্য বা গণককে শ্রাদ্ধের ‘অগ্রদান’ বা কোনও দান দেওয়া হয় না। অন্যাপি বিপিন-বাবুর বংশ-পরম্পরা-গত অগ্রদানী পুরোহিতগণ শ্রীহট্টের তরুণ পরগণার অধীন ‘দত্তপাড়া’ গ্রামে বাস করিতেছেন। বিপিন-বাবুর জীবনে ইঁহাদের সন্মুখে দেখা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পিতামহ-প্রপিতামহের শ্রাদ্ধাদিতে ‘অগ্রদান’ উক্ত দত্তপাড়া নিবাসী অগ্রদানীদিগকেই দেওয়া হইয়াছে। এখনও তদ্বংশীয়েরা বা বিপিনবাবুর পিতৃনিবাস পৈলগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ কার্যস্থেরা কথিত অগ্রদানীদিগকেই দিয়া থাকেন।

শ্রীশশিভূষণ পাল, উকীল,

জজকোর্ট, শ্রীহট্ট।

“বঙ্গ-ভাষায় বৌদ্ধ স্মৃতি”

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ)

গত কালক্রমের প্রবাসীতে উক্ত প্রবন্ধের আমি যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতিবাদ-কল্পে গত চৈত্রের প্রবাসীতে রমেশ-বাবু প্রতিবাদ করিয়া বাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত স্থান প্রবাসীর আলোচনাস্তম্ভে নাই। যেহেতু, আলোচনা-স্তম্ভের স্থান অতি সংকীর্ণ, বিশদ আলোচনা তাঁহাতে সম্ভবপর নয়। অথচ যে-বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাঁহার সূক্ষ্মমাংসা করিতে হইলে বিস্তৃত প্রবন্ধের অবতারণা অবশ্যজ্ঞাবী। তাই, রমেশ-বাবুর নিকট এবং অজ্ঞাত সূত্রীস্বদের নিকট সাহসন প্রার্থনা, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কিছুদিন সময় দিয়া বাধিত করিবেন। আমার বক্তব্য বাহা, তাহা যে আমার ধৃষ্টতামূলক নয় তাহা সীতিমত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে।”

শ্রী তারকেশচন্দ্র চৌধুরী

* এ বিষয়ে প্রবাসীতে আর আলোচনা হইবে না।—প্রঃ সঃ



কিশোরীর প্রতিকৃতি

শিল্পী ডোমেনিকো গিরলাওইয়ো

১৪৪২—১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দ



['পুস্তক-পরিচয়'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

ছোটদের গল্প—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১/০।

গ্রন্থকার বহুকাল হইতেই ছোটদের জন্য গল্প ও কবিতা প্রভৃতি লিখিয়া আসিতেছেন। অতি শিশুকালে তাঁহার লেখা "মাসিমা" উপন্যাস ও অন্যান্য গল্প কবিতা "স্কুলে" আগ্রহেব সহিত পড়িতাম, আনন্দ মনে পড়ে। তাঁহার লেখা :—

"কল্যাণবরষু

কবেছ হকুমজারি, যেমন করিয়া পারি, পড়ে পত্র লিখিতেই হবে,
কান্নেই কলম লয়ে কবির মতন হয়ে বসিয়াছি নির্জনে নীরবে।"

কোন শৈশবের পড়িয়াছি, কিন্তু এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, আজও কণ্ঠস্থ আছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত "ডেপুটি মীনেশ-বাবু বাড়ী তাঁর চাকা," কবিতাটিও আমাদের অতি প্রিয় ছিল। শিশুনাহিত্যে সুপরিচিত লেখকের নতুন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই পুস্তকে ইংরেজি হইল ফেমিলি রবিন্সন অবলম্বনে একটি গল্প ও মৌলিক কয়েকটি ছোট গল্প, কবিতা ও নাটক আছে। সকলগুলি সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া লেখা। নরেন, বিনোদিনী, জগদম্বা পিসি, ভূতা হলধর প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে; অতঃপর ইহা যে আদর হইয়াছে তাহা বোঝাই যাইতেছে। ছবিগুলি গল্পের মত হৃদয় হইলে আরও ভাল হইত। তৃতীয় সংস্করণে 'মালবিকা'র ছবিখানি বাদ দিলেই বইটির দোষার্থ বাড়িবে।

শ

কুরঙ্গ (কবিতাপুস্তক)—মহম্মদ আলীজ উন্ সোভান্।
প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম। ১৯২২।
৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

বীরভূমের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কবির অন্তর্ভুক্ত বন্ধু হিসাবে 'কবি-কথা' লিখিয়াছেন। কবির অল্পত জীবনের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বন্ধু কর্তৃক সম্বন্ধ-রক্ষিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া কবির অকালমৃত্যুতে বেদনা অনুভব করিলাম। অপূর্ণ-প্রতিভা-সম্পন্ন এই অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য কবি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত আপনার প্রতিভা রাখিয়া বাইতে পারিতেন। এই খাম্বেরালী কবির জীবনই একটি সত্য কাব্য। ছন্দ, যতি, অলঙ্কারের বেড়া ভাঙিয়া কবি সহজ ভাষায় আপনার মনের কথা পাইয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্যে সংযত শিল্পী কুশলতা বা চাতুর্য না থাকিলেও কবিমনের একটি অপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, কবির শাস্ত্র অমুভূতি মনকে নাড়া দেয়, অলঙ্কারদর্পণ বা কাব্যপদ্ধতির দিক্ দিয়া এ কবির সমালোচনা চল না। কবির খণ্ডিত জীবনের আংশিক আভাস দিবার জন্য আমবা কেবল তাঁহার লেখার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমাদের মনে হয়, এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কবির অকাল মৃত্যুতে প্রত্যেকেই বেদনা বোধ করিবেন। কবিতার নমুনা—

প্রান্তরে প্রান্তরে বনে

কে আশুন জেলে দিলি

চকিত কুরঙ্গ সম জদি,

আশুন লাগারে বনে

কেম গো বেড়িলি পথ

কে বধিলি অনলে দগধি। (মর্ষকথা)

অমুরোধ প্রিয়জনে

আমাব মরণ-দিনে

হৃদয় সলিলে স্নান দিরা,

মুক্তিকা-শয়নে রাপি

খুলে দেয় হৃদয় আঁখি

সে যে সেই লুকায়েছে,

মরে থাকি আকাশ চাহিয়া। (আন্তমে)

সে যে সেই লুকায়েছে,

আসি, শুধু বলে গেছে

হ'ল বহু দিন,

গেছে কি জন্মের মত

কি দোষ আমার এত

আসিবে না? দূরে দূরে রয়ে চিরদিন?

তা' কি হয়? এত কি কঠিন?

(এত কি কঠিন)

দম্পতি (দ্বোন তথ)—শ্রীশশিকুমার সেন, বি-এ, এল-এম-এস প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ৭৫১ বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙলা ভাষার যৌবনতঃ বিষয়ক বস্তুগুলি পুস্তক আমাদের চোখে পড়িয়াছে, কোনোটিই সঙ্গম-সুচিন্তা ও সংযম লইয়া লিখিত নহে। পুস্তকের কাটতি বাড়াইবার জন্য রচিবগণিত ভাষা ও ভাবে লিখিত বলিয়া এই ধরনের বহিষ্ঠলি দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয় এবং এইসকল গ্রন্থের প্রচারও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। গ্রন্থকার এমন সংযত হইয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, এই পুস্তক পাঠে অপকারের কোনো সম্ভাবনা নাই। যৌবনতঃ সম্বন্ধে সাধারণের এমন বিকৃত ধারণা আছে যে, একপ একটি পুস্তকের অভাব ছিল। একজন চিকিৎসক এই কাজে হস্তক্ষেপ করাতো পুস্তকখানি এই অভাব পূরণ করিয়াছে। গ্রন্থকার সমস্ত বিষয় হৃদয় ভাবে বুঝিয়া বলিয়াছেন। তবে পুস্তকের ভাষা আরো একটু সরল হইলে ভাল হইত। গ্রন্থকার বাৎসর্য্যানের কামহৃদয়ের সাহায্যে এই পুস্তক লিখিয়াছেন। আধুনিক মতামতও তৎসঙ্গে দিয়া তিনি বইখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রী গীতা—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ সম্পাদিত ও চাকা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে শ্রীঅনাথবন্ধু আদিত্য কর্তৃক প্রকাশিত শকেট সাইজ। ১০২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০।

বাঙলা অক্ষরে শ্রীমন্তগবদগীতার মূলের সহিত, অঘর-অনুবাদ, টীকা-টীপনি, ভাষ্য-রহস্য ও নানা টীকাকারগণের বিভিন্ন মতের বিস্তৃত আলোচনা ও 'গীতার্থ-দীপিকা' ব্যাখ্যা সম্বলিত এই গীতখানি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশক সাধাবণের কৃতজ্ঞতাস্বাক্ষর করিয়াছেন। ভূমিকাটি হালিখিত। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

উজ্জ্বল-চাম্পকা—প্রাচীন কবি শচীনন্দন বিনোদিনী কৃত 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থের পর্যা্যহবায়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদ্বাপ্রসাদ

মল্লিক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। শ্রীশিবরতন মিত্র কর্তৃক টাকা সহ সঞ্চলিত। সিউড়ি বীরভূম হইতে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল কর্তৃক প্রকাশিত। ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১ টাকা।

বৈষ্ণব সাধনার রহস্য বৃত্তিতে গেলে শ্রীরাগ গোবামৌকৃত 'শ্রীশ্রীউচ্ছল-নীলমণি' আরম্ভ করিতেই হইবে। কিন্তু দুকহ সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া তাহা আয়ত্ত করা কঠিন। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বাঙ্গালা-ভাষার আরো দুই-একটি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে; যেমন, ভাস্কর্য্য প্রণীত রসমঞ্জরী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ইত্যাদি, কিন্তু 'উচ্ছল-নীলমণি' সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় শচীনন্দনকৃত উচ্ছল-নীলমণির এই অনুবাদ উচ্ছল-চন্দ্রিকা প্রকাশ করিয়া বাঙালার সাহিত্য-ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। পদাবলী-সাহিত্যও যথাযথ বৃত্তিবার জন্ত এই রস-গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। পঞ্চকল্পতরু প্রভৃতি সকল পদাবলী সংগ্রহই রসের বিভাগ অনুযায়ী সম্বদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে উচ্ছল-চন্দ্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণের খুব সুবিধা হইল। বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক সকলেই উচ্ছলচন্দ্রিকা একখণ্ড সংগ্রহ করিবেন, সন্দেহ নাই।

নিরাশ্রয় উমেদার (কবিতা-পুস্তক) — স্বর্গীয় গোবিন্দ-

প্রসাদ সরকার, প্রণীত ও শ্রীরাধাবিহার্য্য সবকার কর্তৃক আড়ড়া—বিহার কুটীর, মানবাঁধা পোঃ, বাকুড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ পয়সা।

নিরাশ্রয় উমেদারের বর্ণনা সম্বন্ধিত কয়েকটি ব্যঙ্গরসায়ক কবিতা। অনেক স্থলে পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে।

নারী (কাব্যগ্রন্থ) — শ্রীমদ্রাচরণ রায়গুপ্ত প্রণীত ও নীরঞ্জননাথ দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

বহিধানির সর্বত্রই গ্রন্থকারের স্বপ্নের উচ্ছ্বাস ফুটয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার কাব্যধানি গড়ে লিখিলে ভাল হইত। নারীর-মহিমা কীর্জন যে, কবিতাতেই করিতে হইবে এমন কিছু বাঁধা-ধরা নিষেধ নাই। ছন্দ ও মিলকে কবি যে-ভাবে জবাই করিয়াছেন তাহাতে নারীর অর্থ্যও লাঞ্ছিত হইয়াছে। একটু নমুনা বিতেহি—

দ্বিতীয় কবিতার—এসেছে, এসেছে আমার যৌবন,

নিখিল চিন্তা-মোহন।

এ কোন্‌ ঋষি ভগন্তার আলো

চমকে ছদয়ে গহন।

লহবে লহবে আকুলি, উছলি

মুগ্ধবে মুগ্ধ মরম।

ওগো এসেছে আমার যৌবন।

এসেছে, এসেছে আমার যৌবন,

এবে—অপূর্ব্ব, অলোক কাহিনী।

আমি এ-বারতা এ জগৎপূরে

কারেও এখনো বলিনি—

এমন মারাত্মক যৌবনের আগমনের বার্তা কাহাকেও না বলিলেই ভাল হইত।

দম্পতি-সুহৃদ—শ্রীরামচন্দ্র মিত্র প্রণীত ও কলিকাতা। ১৮নং রায় বাগান স্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পুবাণ-কাহিনী-হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্রন্থকার নবদম্পতীকে উপদেশ দিয়াছেন। এতদসঙ্গে কয়েকটি সুপ্রিয়োগ ও অবদর-কুহুম নামক একটি কবিতাও পাইবেন।

বুকের বালাই—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ প্রণীত প্রকাশক শ্রীনলিনচন্দ্র পাল, ১০৭ মেছুরাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।

কবিতা-পুস্তক। অনেকগুলি কবিতা ইতিপূর্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; কাজেই লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। কবি বলিতেছেন, “হৃদয় লবে কাববার মোর নিশিদিন বার মাস”। আমাদেরও মনে হয়, এই সুবিজ্ঞ কারবারীর ব্যবসা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। নির্ধ্যাতিতা নারীদের উদ্দেশে কবিতাগুলি বেশ হইয়াছে এবং অধ-দুঃখের কবিতাগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

মণি মুক্তা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৭নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ০। ১৩৩৩।

কৌতুক হাসি-ভাসায়া ভিতর দিয়া ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে জ্ঞাতব্য তথ্য শিক্ষা দিতে হইবে, একথা এখন সর্ববাদীসম্মত। লেখক শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দখল করিয়া শিশুদের জন্য এই হাসি-ভাসায়া বই লিখিয়া তাহাদের আশেব কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই সুরচিত রচনাগুলি শিশুরা আত্মার সহিত পড়িয়া যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে।

প্র

(১) বুকের জীবন ও বাণী; (২) পঞ্চকন্ধ্যা;

এবং (৩) বঙ্গগৌরব স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—তিনখানিরই প্রণেতা শ্রীস্বরংকুনার রায়। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিবিন্দু নাথ রায়, বি-এ। প্রান্তিহান ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ও চক্রবর্তী চার্টার্ড—এও কো লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা, বারো আনা ও দশ আনা।

‘বুকের জীবন ও বাণী’ তৃতীয় সংস্করণ লাভ করিয়াছে। ইহাই পুস্তকটির যথেষ্ট প্রশংসাপত্র। ভগবান বুকের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাঁহার ধর্মের পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণ সুবিস্তৃত, সরল, বাহ্যল্যবর্জিত এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বহু বহু প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের উপর ভিত্তি রাখিয়া গ্রন্থকার এই চরিত্র-কথা রচনা করিয়াছেন। মহাপুরুষের প্রতি-ভক্তির প্রাচুর্য্যে বিবরণ অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয় নাই, বরং মর্মস্পর্শী হইয়াছে। সর্বসাধারণের পক্ষে বইটি প্রয়োজনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে, কারণ, পাণ্ডিত্যেব আড়ম্বর ইহাতে মোটেই নাই।

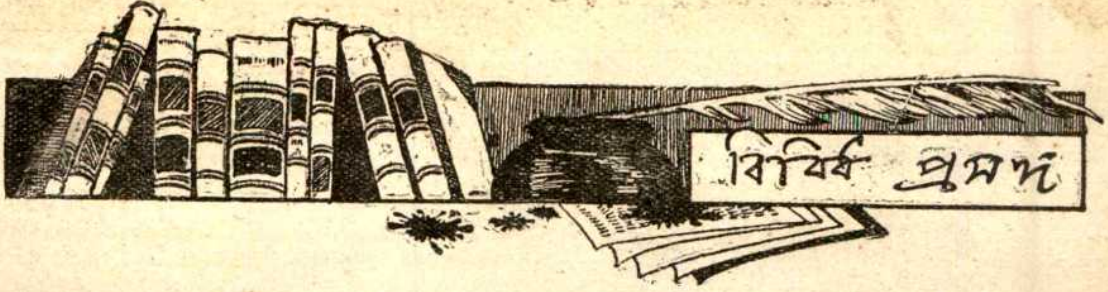
‘পঞ্চকন্ধ্যা’ পুস্তকে সীতা, ভগবতী দেবী, রাবণ, দ্রোণ, নাইটঙ্গেল ও ভগিনী ডোরা—এই পাঁচটি ভারতীয় ও বিদেশীয় পুণ্যপ্রোক্তা মহিমনী নারীর জীবন-কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের চিত্তের উদারতা ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মেয়েদের ইহা অবশ্য পঠনীয় পুস্তক হইয়াছে।

আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অমৃতম হইতেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার সরল, নিরহঙ্কার, তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ জীবন বাঙালীর অমুকরণীয়। এই মহৎ জীবনের স্মরণ আলোচ্য এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হৃদয় সল ভাষায় সুলিখিত চরিত্রাখ্যান।

তিনখানি পুস্তকই পঠন-সোপাণে, স্মরণে ও চিত্র-সংযোগে অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। পুস্তকগুলি কেবল উপহার বিবারই যোগ্য হয় নাই, বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।

শুভ

স



“নিপীড়িত জাতিসমূহের কংগ্রেস”

গত ২ই হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী অবধি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ নগরীতে জগতের সকল “নিপীড়িত” জাতির প্রতিনিধিদিগের একটি মহাসভার অধিষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। জগতের প্রায় শত কোটি অধিবাসী নানান প্রকারে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছেন। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এসকল “নিপীড়িত” ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া নিজেদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিলেন। প্রায় দুই শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; এবং কংগ্রেসের ফলে অন্তর্জাতিক নিপীড়ন-নীতির

উচ্ছেদ সাধনের জন্ত একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত বাহাদুরের সহায়ত্ব আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে বারুট্রাও রাসেল, অধ্যাপক আইনষ্টাইন, আরি বারবুস, রম্যা রল, স্নু-ইয়াং-সেনের পত্নী, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভ্যদিগকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,

“প্রিয় বন্ধুগণ,

উপনিবেশবাদ ও নিপীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে যে



নীরিয়ার এন্ বক্ত



ইন্দো-চীনের মহম্মদ হাট্টা



ক্যাণ্টন সৈন্যদলের অন্তিম সেনাপতি লু ৭ংহং লিন্

কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে আপনারা আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার দুঃখ এই, যে, ভারতে নিজের যা কাজ আছে, তাহা ফেলিয়া আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না। আমি সর্বাস্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যে, আপনাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।”

বহু লোক, ইচ্ছা সত্ত্বেও, মহা সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কারণ অর্থের কিংবা পাসপোর্টের অভাব। কিন্তু তাহা হইলেও আফ্রিকা, মেক্সিকো, ইন্দো চীন, সুমাত্রা, জাভা, মিশর, ভারতবর্ষ, কোরিয়া, ফিলিপাইন্স, চীন, পারস্য, আলজিরিয়া, টিউনিস, মরোক্কো, আরব প্রভৃতি নানা দেশের প্রতিনিধিগণ মহাসভায় উপস্থিত হন। ইহা ব্যতীত ইয়োরোপের, আমেরিকার ও জাপানের শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ডের নানান শ্রমিক সংঘের প্রায় কুড়ি জন ও চীনের কুও-মিং-টাং (জাতীয়

দল), ক্যাণ্টন সৈন্যদল প্রভৃতির ত্রিশ জন প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীযুক্ত জগদ্বাহরলাল নেহরু ও তাহা ছাড়া আর অনেকগুলি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। সিংহলের প্রতিনিধিকে সরকারী তরফ হইতে পাসপোর্ট না দেওয়াতে, তিনি যাইতে পারেন নাই।

কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিভাষণগুলির মধ্যে ভালো কথা ও ভাবিবার কথা অনেক ছিল। ফরাসী মনস্বী শ্রীযুক্ত আঁরি বারবুস্ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, যে, বর্তমান কালে জগতের অধিকাংশ লোক সন্ধীনের ভয়ে অপরের দাসত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের মুক্তির জন্ত সর্বপ্রথমে প্রয়োজন এই বোধ হয়, যে, তাঁহারা মিলিত হইয়া কার্য্য কবিলেই জয়ী হইবেন। শক্তির মূল মন্ত্র মিলন। মুক্তির ফল আর্থিক, অধ্যাত্মিক, সকল দিক্ দিয়া উন্নতি।

আমরা ভারতবাসীরা একথার সত্যতা সংজ্ঞেই



জার্মান শ্রমিক নেতা জি লেডেবোর—বয়স ৭৬



শ্রী জগদীশচন্দ্র হরলাল নেহরু

বুঝিতে পারিব। আমেরিকা হইতে চীন অবধি জাতীয় দাসত্বের রূপ সেই একই ভাবে বর্তমান আছে। সকলের দেশেই ১৮৫৭ ঈশাখ ও জালিয়ানওয়ালা বাগ দেখা যায়, সর্কট্রই মুখ বন্ধ ও লেখনী আড়ষ্ট, বে-আইনী আইন ও আইনের বে-আইনী ব্যবহার, ধনিকের শতকরা ৩০০ লাভ ও মজুরের দিনে ১৬ ঘণ্টা খাটুনো, শিশুমৃত্যু, অনাহার ও অত্যাচার অসংখ্য দুর্গতি। এই মহাসভায় নানা স্থান হইতে উৎপীড়নের বার্তা বহন করিয়া লোক আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অভিযোগ প্রায় একই ধরনের ছিল। ইয়োরোপের ধনিকদের সংবাদপত্র-মহলে প্রথমে কংগ্রেসের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ক্রমে সর্কট্রই বক্তৃতার সারাংশ ও কংগ্রেস-সংক্রান্ত অপরাপর খবর বাহির হইতে আরম্ভ হয়। শেষ অবধি ব্যাপারটাকে সকলেই ক্ষুণ্ণ মনে মানিয়া লয়। পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইয়া দেন, যে, জগতের মুক্তির

জয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। কারণ, ভারতের শাসন-নীতি জগতের সকল সাম্রাজ্যশাসকের আদর্শ, ও ভারতের অর্থ ও লোকবলের সাহায্যেই ইংরেজ আজ আরও বহু স্থলে উপনিবেশ স্থাপন ও বলপূর্বক ব্যবসা বিস্তার করিতেছে।



এশিয়া ও আফ্রিকার অধীনতার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। মানচিত্র



শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



এইচ. লিগাউ ও চেন চুয়েন

ইংলণ্ডের স্বাধীন শ্রমিক দলের প্রতিনিধি ফেনার একোয়ে ভারতকে আশ্বাস দান করেন, যে, যদিও বিগত বিলাতী শ্রমিক গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া ভারতের সহিত ধনিকের হায়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও অর্ডিনান্স প্রভৃতি দমনাত্মকের সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি যেন ভারত না ভাবেন, যে, ভবিষ্যতে শ্রমিক দল আবার গবর্ণমেন্ট হাতে পাইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপে আদর্শবিচ্যুত হইবেন। চীনকে তিনি বলেন, যে, যদি ইংরেজ চীনের সহিত লড়াই করে তাহা হইলে শ্রমিক দল চীনের দিকেই সহায়ত্ব দিবে। অতঃপর এই শ্রমিক প্রতিনিধির সহিত চীনের কুয়ো-মিং-টাং এর প্রতিনিধি কর মর্দন করেন। আমরা অবশ্য ইংরেজজাতীয় কোন লোকের কথার উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মনে

করি না। কার্য্য দেখিলে তবে আমরা ইংরেজের কথার মূল্য স্বীকার করিব।

মেক্সিকোর প্রতিনিধি বলেন, যে, যদিও নিপীড়ন-নীতির কথা উঠিলেই লোকে এশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তথাপি এশিয়া এই নীতি অহুসরণের পক্ষে বর্তমানে আর শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র নাই। বর্তমানে এশিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এমন দাঁড়াইয়াছে, যে, লোভী লোকের আর সে দিকে ততটা নজর নাই। বর্তমানে উপনিবেশ-ও পরস্বাপহরণ-বাদের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি দক্ষিণ আমেরিকা।

বিলাতী পার্লামেন্টের শ্রমিক সভ্য শ্রীযুক্ত জর্জ ল্যান্স্বেবরী সকলকে আশার বাণী শুনান। তিনি বলেন, যে, “কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, কি জাপান, কাহারও এক্ষমতা নাই, যে, এই অত্যাচারকে চিরস্থায়ী করে। আমাদের জয় ও মুক্তি অবশ্যস্বাবী। দুই দিন সময় যাইতে পারে, দুই জন কি দুই হাজার



ক্রালের স্মারি বারবুস



সেনিগ্যালের লামিন্ সেন্গোর

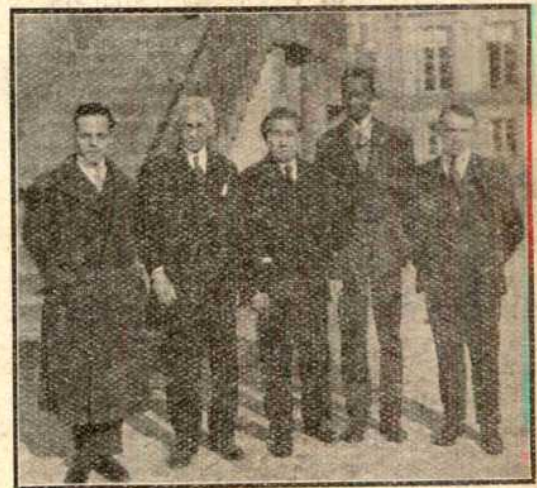
লোকের প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু শেষ অবধি আমাদেরই জয় হইবে। বর্তমানের সাম্রাজ্যগুলির চেয়ে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যও অতীতে অত্যাচার ও অত্যাচার করিয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। অধর্মের উপর স্থায়ী কিছু গড়া যায় না। আমরা সকল দেশের শ্রমিকদিগকে ক্রমশঃ শিখাইয়া আনিতেছি। শীঘ্রই তাহারা আর কোথাও সেনাদল-ভুক্ত হইবে না, বা যুদ্ধের মাল-মশলা প্রস্তুত করিবে না। তার পর আমাদের আর কেহ দাসত্বে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।”

এই কংগ্রেসের আভাস মাত্র এখানে দেওয়া হইল। বিস্তারিত বিবরণ মডার্ন রিভিউ মাসিকে বাহির হইবে।

যে অন্তর্জাতিক কংগ্রেসের কথা এখানে লিপিবদ্ধ হইল, তাহার উদ্দেশ্যের সহিত অবশ্য আমরা একমত; কিন্তু কংগ্রেস কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীন হইতে বলেন এবং কি কি প্রকারেই বা এই কংগ্রেস অধীন জাতিদের সাহায্য করিতে পারেন,

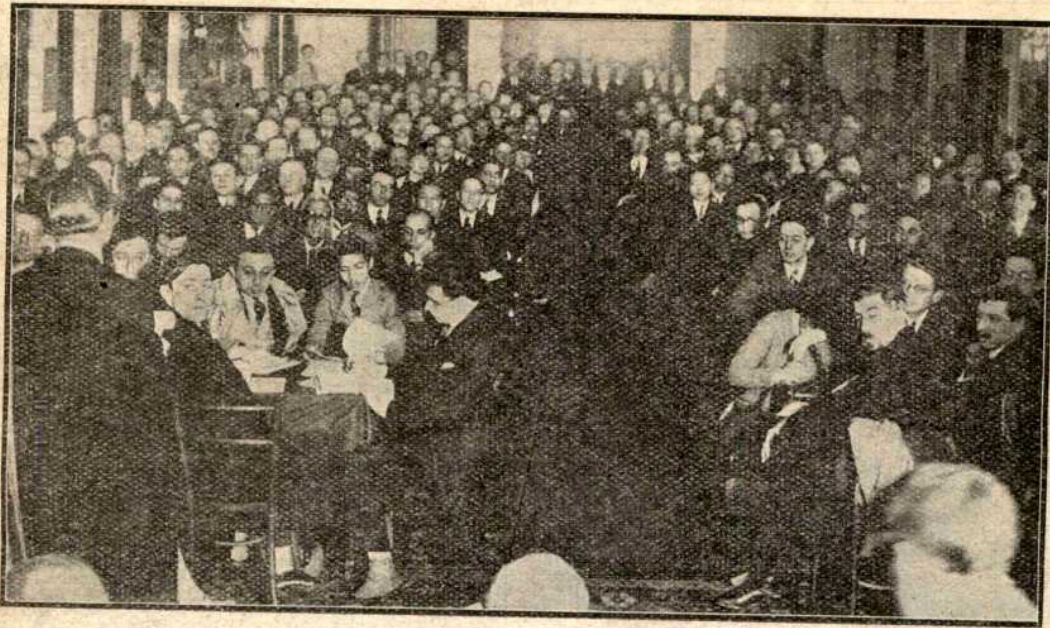


বিলাতের লর্ড ল্যাণ্‌বেরী ও চীনের জাতীয় দলের হালিয়েন লিয়াউ



বামে পারস্তের মুহম্মদ

তাহা ভাল করিয়া না জানিয়া ইহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা মত প্রকাশ করিতে পারি না। পৃথিবীর যে সব জাতি এখন রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা, তাহাদের মুক্তি হওয়া উচিত, এই মত যদি কংগ্রেস



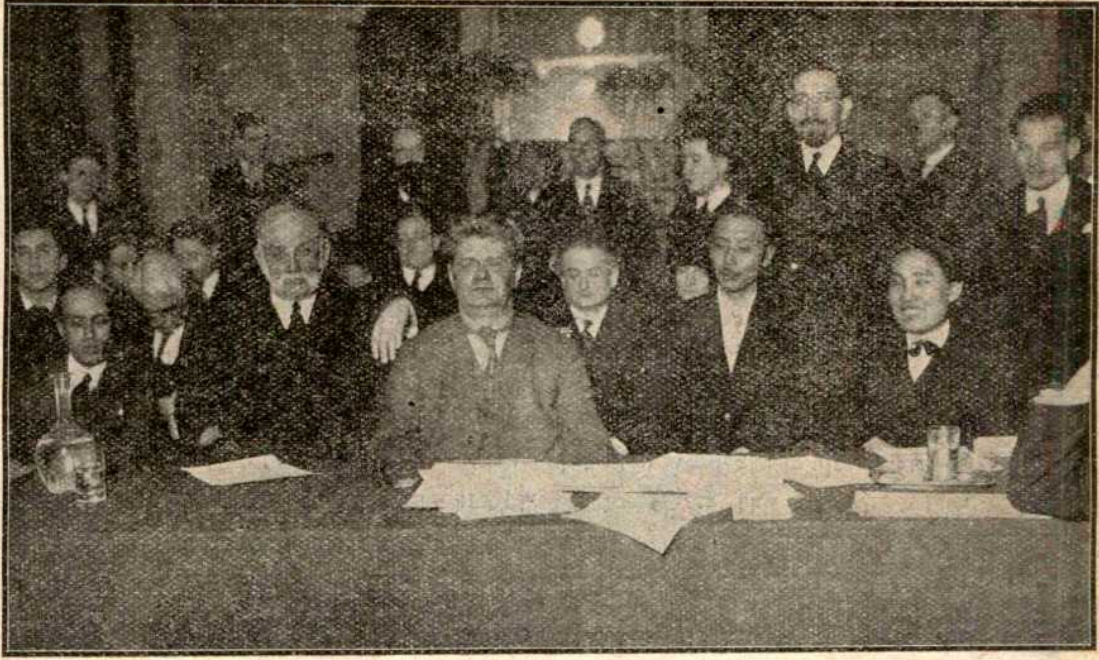
কংগ্রেসের সাধারণ দৃশ্য

সমুদয় সাম্রাজ্যশাসক, পণ্যশিল্পী ও বণিক জাতিদিগকে এবং অগ্রাগ্র জাতিদিগকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করাইতে পারেন, তাহাও কম লাভ হইবে না। কিন্তু আমাদের যেন সর্বদাই মনে থাকে, যে, রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক ও আর্থিক মুক্তি লাভ করিতে হইলে তাহার জন্ত প্রধান চেষ্টা ও দুঃখ-ভোগ—বলিতে গেলে প্রায় সমুদয় চেষ্টা ও দুঃখ-ভোগ—আমাদিগকেই করিতে হইবে। অতরাং আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারে না;—যাহার নিজের স্বাধীন হইবার ক্ষমতা নাই, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। অগ্র জাতিরা অবশ্য আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু কেবল মাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকা অলস, ভীক, ও মূর্খের কাজ।

এই কংগ্রেস সম্বন্ধে আর-একটি বিষয়েও আমাদের মত প্রকাশ করা দরকার। কংগ্রেসটি প্রধানতঃ শ্রমিক-দলের প্রভাবের বশবর্তী। পাশ্চাত্য সমুদয় দেশে শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে খুব সংগ্রাম চলিতেছে। একপাশে একটা সংগ্রামের স্তব্ধপাত আমাদের দেশেও হইয়াছে। কিন্তু তাহা যাহাতে না বাড়ে, ধনিকেরা নিজেই যাহাতে শ্রমিকদের সহিত আত্ম বন্দোবস্ত করেন, তাহার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। পাশ্চাত্য শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ

দিয়া ভারতবর্ষেও একটা স্থায়ী শ্রমিক-ধনিক যুদ্ধ খাড়া করা অস্বাভাবিক হইবে। একপাশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অগ্র য়ে-সব যুক্তি আছে, তাহার কথা না তুলিয়া এই একটা যুক্তির কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্ত সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের একযোগে কাজ করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি জমীদার ও রায়ৎ, ধনিক ও শ্রমিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকদেরও একযোগে কাজ করা দরকার। ভারতবর্ষে ধর্মগত, জাতিগত, শ্রেণীগত বিবাদ এমনই বিস্তার আছে; তাহার উপর আর-একটা কায়েমী ঝগড়া যাহাতে বন্ধমূল না হয়, সেই চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য।

পাশ্চাত্য শ্রমিকদের সম্বন্ধেও একটা কথা মনে রাখা উচিত। বিলাতের শাসকশ্রেণী প্রধানতঃ ধনিক-শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। এই ধনিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে, আবার বিলাতী শ্রমিক শ্রেণীরও অভিযোগ আছে। সুতরাং এখন এই পাশ্চাত্য শ্রমিকরা আমাদের প্রতি দরদ দেখাইতেছে। কিন্তু যখন পাশ্চাত্য ধনিক ও শ্রমিকদের ঝগড়া আপোনে মিটিয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের কাহারও নিকট হইতে আত্ম ব্যবহার নিশ্চয়ই পাইব মনে করা ভুল। শ্রমিকদের



ক্রসেল্‌স্‌ কংগ্রেসের সভাপতির মঞ্চ

জীবিকা নির্ভর করে কারখানাগুলির লাভ ও হানিদের উপর। তাহা নির্ভর করে উৎপন্ন মালের কাটুতির উপর। ভারতবর্ষ বিলাতী ও অন্তর্দেশীয় শিল্পজাত মালের অন্ততম প্রধান ক্রেতা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে আমাদের নিজেদেরই পণ্যশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় আমরা আর পাশ্চাত্য দেশসকলের বর্তমান সবরকম জিনিষের এত বড় ক্রেতা থাকিব না। সুতরাং তখন পাশ্চাত্য কোন কোন রকম মালের কারখানার অবনতি এবং তাহাদের বণিক ও শ্রমিক উভয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অতএব ঐহিক সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষা নীতির অহুসরণ করিলে বিলাতী শ্রমিকদল যে ভারতবর্ষকে নিশ্চয়ই স্বাধীন হইতে দিবে, এমন মনে হয় না। অবশ্য, যেমন এক এক জন মানুষের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে গ্রায্য কাজ করা সম্ভব, তেমনি মানবসমষ্টিরও পক্ষে উহা, তত সহজে না হইলেও, অসম্ভব নহে। তথাপি কাজ না দেখিয়া কাহারও কথায় বিশ্বাস না করাই ভাল। অবিশ্বাস প্রকাশ করিবারও আবশ্যক নাই।

খড়্গবাহাদুর সিংহ

হীরালাল আগরওয়াল নামক কলিকাতার একজন ধনী পশ্চিমা ব্যবসাদার নেপালী বালিকা রাজকুমারীকে ক্রয় করে। সে ও তাহার দুবৃত্ত সঙ্গীরা বালিকাটির উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। রাজকুমারী হীরালালের বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া পুলিশের সাহায্য চায় এবং প্রতিকারপ্রার্থী হয়। কিন্তু হীরালালের কোন শাস্তি হয় নাই। হীরালাল প্রভৃতির অত্যাচারে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া রাজকুমারীকে হাসপাতালে যাইতে হয়। খড়্গবাহাদুর সিংহ নামক একজন গুপ্তা যুবক এইসকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং হাসপাতালে রাজকুমারীর রোগযত্ন প্রত্যক্ষ করিয়া হীরালালকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। একদিন হীরালালের আফিসে গিয়া খড়্গবাহাদুর তাহাকে কুকরী-দ্বারা আঘাত করেন। পরে হীরালালের মৃত্যু হয় এবং হাইকোর্টে খড়্গবাহাদুরের বিচার হয়। জজ তাঁহাকে আট বৎসর গশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। আইন যেরূপ আছে, তাহাতে জজের রায় আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু, ইহাও নিশ্চিত, যে, যেরূপ অবস্থায় ও যে

উদ্দেশ্যে খড়্গাবাহাদুর হীরালালকে আঘাত করেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া কর্তব্য। এরূপ মুক্তি দিবার অধিকার রাজার আছে, এবং সেই ক্ষমতা ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনার্যাল ও প্রাদেশিক গবর্ণরদের আছে। বঙ্গের গবর্ণরকে খড়্গাবাহাদুরের মুক্তির জন্ত অনেক সভাসমিতি অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহার মুক্তি হইলে ভাল হয়। অন্ততঃ পক্ষে তাঁহাকে সাধারণ ছুৰ্ত্ত কয়েদীদিগের সঙ্গে না রাখাই উচিত, কারণ, সেরূপভাবে রাখিলে তাঁহার উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবার সম্ভাবনা।

খড়্গাবাহাদুরের উদ্দেশ্য যে খুব ভাল ছিল এবং তিনি যে সাহসের সহিত আদালতে বিচারের সময় নিজের কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই মেধাবী যুবক সকলের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী। আমাদের দেশের যুবকেরা ও প্রৌঢ় ব্যক্তির এইরূপ সাহসী ও সজ্জদেহশালী হইলে, দেশে যে শত শত নারীর অপমান ও নির্ধ্যাতন অহরহ হইতেছে, তাহাদের জন্ত খড়্গাবাহাদুরের মত এইসকল পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগিলে, কত যে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কোন নরপশু কোন নারীর উপর অত্যাচার করিতে যাইতেছে বা করিতেছে দেখিয়া যদি কেহ অত্যাচারীর প্রাণবধ করিয়াও অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করে, তাহা হইলে কর্তব্যই করা হয়। এইরূপ চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়, একটুও নিন্দনীয় নহে। বরং এরূপ চেষ্টা না করাই অপরাধ। সর্ববিধ অত্যাচার নিবারণ ও দমনের ভার অবশ্য প্রত্যেক দেশের শাসনযন্ত্রের উপর আছে। কিন্তু সর্বসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে শাসকদের এই কর্তব্য পালিত হইতে পারে না। কাহারও বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতির উপক্রম বা চেষ্টা হইলে তখন পুলিশ ডাকিবার সময় নয়; তখন চোর ডাকাতদের নিরস্ত করিবার ও তাড়াইবার সময়। তেমনই অচিরে নারীর উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা বা চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিলে তখন পুলিশ ডাকিবার বা আদালতে নালিস করিবার সময়

নয়, তখন, প্রয়োজন হইলে অত্যাচারীর প্রাণবধ করিয়াও, অত্যাচার নিবারণ করা কর্তব্য।

খড়্গাবাহাদুর সিংহের কাজ ঠিক এই জাতীয় কর্তব্য-পালন নহে। কারণ, অত্যাচারের অনেক পরে, অত্যাচার নিবারণের জন্ত নহে, পরন্তু অত্যাচারীকে শাস্তি দিবার জন্ত হীরালালকে তিনি আঘাত করেন। অতএব কাজটির বিচার অকৃতভাবে করিতে হইবে।

সকল দেশ ও জাতির এক সময় এরূপ অবস্থা ছিল, যখন আইন-আদালত প্রভৃতি ছিল না; কেহ কাহারও কোন অনিষ্ট করিলে ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত ব্যক্তি স্বয়ং বা পরিবার ও জাতিবর্গের সাহায্যে অনিষ্টকারীকে শাস্তি দিত। কেহ হত হইলে তাহার জাতিরা হত্যা-শাস্তি দিত। পরে সভ্যতার বিকাশ এবং আইনের প্রবর্তন ও আদালতের প্রতিষ্ঠা হইলে, যাহার বিরুদ্ধে কেহ অপরাধ করে, সে বা তাহার জাতিবর্গ স্বয়ং অপরাধীকে সাজা না দিয়া, বিচার করিবার ও সাজা দিবার ভার শাসনযন্ত্রের অঙ্গ স্বরূপ আদালতকে দিয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে আদালত দ্বারা স্থবিচার হয় ও অপরাধীর শাস্তি হয়, অনেক স্থলে হয় না। আইনের দোষে, পুলিশের দোষে, বিচার-প্রণালীর দোষে বা আদালতের দোষে যে-সব স্থলে অপরাধীর সাজা হয় না, সে-সকল স্থলে যাহাদের অনিষ্ট হইয়াছে তাহাদের, তাহাদের জাতিবর্গের এবং সর্বসাধারণের কর্তব্য কি? সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, এইসকল স্থলে নিজেরাই দণ্ডদাতা না হইয়া আইনের সংস্কার, পুলিশের সংস্কার, বিচারপ্রণালীর সংস্কার ও আদালতের সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত; প্রয়োজন মত রাষ্ট্রীয় সংস্কার, সমাজ-সংস্কার এবং জাতীয় চরিত্রের সংশোধনও দরকার। এইরূপ কর্তব্য নির্দেশ অনেকেরই মনঃপূত হইবে না, কিন্তু স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রতিকার, সম্যক প্রতিকার, উক্ত সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন ব্যতিরেকে হইবে না।

খড়্গাবাহাদুর যে প্রকৃত বীরত্বের কাজ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। খড়্গাবাহাদুর যদি গোড়াতেই, হীরালালকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে অত্যাচারোন্মুখ দেখিয়া বা জানিয়া

তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত করিতেন এবং অত্যাচার নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার কাজ নীতিবিরুদ্ধ বা আইনবিরুদ্ধ কিছুই হইত না। অত্যাচার হইবার পর তাহার কাহিনী শুনিয়া তিনি হীরালালকে যে-শাস্তি দিয়াছেন, তাহা বে-আইনী হইয়াছে, কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ হয় নাই। কেহ অত্যাচার কাজ করিলে, তাহার শাস্তি হউক, এইরূপ একটা ইচ্ছা মানবপ্রকৃতিতে নিহিত আছে। শাসনযন্ত্র দ্বারা যদি হীরালালের শাস্তি হইত, তাহা হইলে এই স্বাভাবিক প্রতিশোধ-ইচ্ছা তৃপ্ত হইত। কিন্তু শাসনযন্ত্র তাহাকে স্পর্শ করে নাই। এইরূপ অবস্থায় খড়্গ বাহাহুরের কাজের দ্বারা হীরালালের শাস্তি হওয়ায়, “যেমন কর্ম তেমন ফল”, ব্যক্ত বা অব্যক্ত এইরূপ মনোভাব বিস্তৃত লোকের হইয়াছে। অপরাধীর শাস্তির উদ্দেশ্য ও ফল সম্বন্ধে দণ্ডবিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক আলোচনা করিবাব মত বিদ্যা আমাদের নাই; এ ক্ষেত্রে তাহা করাও সম্ভব হইবে না। তবে, শাস্তিদানের অস্ত্র যে যে উদ্দেশ্য আছে, তাহার কোন কোনটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপরাধীকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা এবং তাহার চরিত্রের সংশোধন করা দণ্ডদানের অগ্রতম উদ্দেশ্য। আলোচ্য স্থলে, হীরালালের মৃত্যু হওয়ায় এই উদ্দেশ্য সাধনের কথা উঠিতে পারে না। তাহার শাস্তি বশতঃ তাহার দুর্বৃত্ত সঙ্গীরা অতঃপর সচরিত্র হইবে এবং দুর্ভাগ্য হইতে বিরত থাকিবে কিনা, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। ইহার কোন উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ। যদি তাহার অতঃপর নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করে, তাহা হইলে খড়্গবাহাহুরের আত্মোৎসর্গ অনেকটা সফল হইবে।

কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তির বশবর্তী হইয়া মানুষটাকে মারিয়া ফেলিলে দণ্ডদানের প্রধান উদ্দেশ্য যে দুর্বৃত্তের চরিত্রসংশোধন, তাহা সাধিত হয় না। এইজন্য অপরাধীকে প্রাণে না মারিয়া, পুনর্ব্বার সে যাহাতে অপরাধ করিতে না পারে, তাহার উপায় থাকিলে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত,

এবং তাহার চরিত্র সংশোধনের বন্দোবস্ত করা উচিত। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেরূপ কোন কার্যপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

দুর্বৃত্ত লোকদিগকে শাস্তি দিবার ভার রাষ্ট্রীয় শাসন-যন্ত্রের উপর না রাখিয়া কেহ স্বয়ং সে ভার লইলে সভ্য সমাজের ভিত্তিতে এবং সভ্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের ভিত্তিতে আঘাত করা হয়। তন্নিম্ন কেহ স্বয়ং দণ্ড দিবার ভার লইলে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া ঘটিয়া উঠে না; সচরাচর অভিযোক্তাব কথার উপর নির্ভর করিয়াই দণ্ড দেওয়া হয়। ইহাতে ভ্রমবশতঃ নিরপরাধের দণ্ড বা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

আমরা “বিজ্ঞ” সাক্ষিয়া এইসব কথা বলিতেছি না। আমরা এবং আমাদের মত আরও অনেকে, যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা অমঙ্গলের অস্তিত্ব জানিয়াও সেই সব অমঙ্গলের কারণীভূত লোকদের স্বয়ং শাস্তি দিই না, তাহা সভ্য-সমাজের ভিত্তি বা সভ্য-শাসনযন্ত্রের ভিত্তিকে আঘাত না-করিবার জ্ঞান নহে; আমরা যে নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহার কারণ অনেক স্থলেই অজ্ঞ প্রকার, ইহা আমরা স্বীকার করি। অনেক সময় ঔদাসীন্য বশতঃ আমরা কিছু করি না, কখন কখন ভীকৃত্য বশতঃ কিছু করি না, এবং সাধারণতঃ কিছু করি না এইজন্য, যে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অমঙ্গলে গুরুত্ব আমরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করি না, এবং ঐ সব অমঙ্গল-হইতে যাহারা দুঃখ পায় তাহাদের জ্ঞান আমাদের প্রাণ কাঁদে না। তথাপি, আমাদের দোষ দুর্বলতা ত্রুটি স্বীকার করিয়াও, অমঙ্গলের মূল উচ্ছেদ কেমন করিয়া করা যায় এবং অমঙ্গলকারীর দণ্ডবিধান কাহার দ্বারা ও কি প্রকারে হইতে পাবে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক মনে করিয়াছি। আলোচনা উপলক্ষে আমরা বাহা বলিতেছি, আমাদের মত “বিজ্ঞ” লোকদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা তাহাব উদ্দেশ্য নহে; কারণ আমরা জানি, “বিজ্ঞ” উদাসীন অলস ও ভীকৃত লোকদের “বিবেচকতা” অপেক্ষা খড়্গবাহাহুরের মত যুবকের জ্ঞানবস্তা, সাহস ও “হঠকারিতা” দ্বারা সমাজের ও রাষ্ট্রের অধিকতর উপকার হয়। যদি খড়্গ

বাহাদুরের মত হৃদয়বান সাহসী ও কর্মতৎপর লোক অধিকতর ধীর এবং বিবেচকও হন, তাহা হইলেই আদর্শমূরূপ কার্য হয়, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

খড়গ বাহাদুরের কাজের দ্বারা এই একটি মহা উপকার হইয়াছে, যে, একটা ঘোর সামাজিক অমঙ্গলের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

খড়গবাহাদুর যাহা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কেবল একটা মাত্র দুর্বৃত্তের শাস্তি হইয়াছে। রাজকুমারীর সম্পর্কে পিতামহী বা মাতামহী-যে বৃদ্ধা তাহাকে পদমুদ্রাসাদ নামক যে লোকটার হাতে দিয়াছিল, তাহার শাস্তি হয় নাই। পদমুদ্রাসাদ রাজকুমারীকে হীরালালের নিকট বিক্রী করিয়াছিল, কিন্তু তাহারও শাস্তি হয় নাই। হীরালালের দুর্বৃত্ত সহচরদেরও শাস্তি হয় নাই। বস্তুতঃ, কোন বাড়ীর সব দেওয়াল, আসবাব ও বিছানা হইতে এক-একটি করিয়া ছারপোকা বাহির করিয়া মারা যেমন দুঃসাধ্য ও ব্যর্থ চেষ্টা, ত-একটা বদমাইসের প্রাণবধ করিয়া সামাজিক দুর্নীতির জড় মারিবার চেষ্টাও তেমনই ব্যর্থ। তাহা করিতে হইলে সামাজিক নানা কুপ্রথার মূল উচ্ছেদ করিতে হইবে, নারীজাতি সম্বন্ধে পুরুষদের হীন ও জঘন্য ধারণা বিনষ্ট করিতে হইবে, নারীদিগকে শৈশব হইতে সুশিক্ষিত, সাহসী, আত্মনির্ভর-পরায়ণ এবং আত্মরক্ষার সমর্থ করিতে হইবে, দুশ্চরিত্র পুরুষ খুব উচ্চপদস্থ ও ধনী হইলেও সমাজে তাহাদিগকে অবজ্ঞার পাত্র করিতে হইবে, এবং শৈশব হইতে পুরুষজাতীয় লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তদ্বিন্ন, শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বয়সের নারীজাতীয়দিগের বিরুদ্ধে যে-কোন দৈহিক অপরাধ বা অপরাধ-চেষ্টা হয়, তাহার শাস্তি বর্তমান সব শাস্তি অপেক্ষা কঠোরতর হওয়া দরকার। নারীদের সম্মতির বয়সও স্বামী ভিন্ন অন্য সকল পুরুষের পক্ষে একশ বৎসর করা উচিত।

নিরাশ্রয় বালিকা, যুবতী ও অন্ত্র নারীদের আশ্রয়

কলিকাতার ও অন্যান্য সহরের বেআইনি গৃহে অনেক অন্নবয়স্ক বালিকা আছে, যাহাদিগকে পালিকারা পাপ-

ব্যবসায়ের জন্ত রাখিয়াছে। কুস্থান হইতে এইসব বালিকাদের উদ্ধারসাধন করিবার ক্ষমতা পুলিশের আছে। কিন্তু উদ্ধার-করিয়া রাখিবার জায়গা যথেষ্ট নাই। এইরূপ বালিকাদের বিবাহ মুসলমান সমাজে ও খৃষ্টীয় সমাজে হইতে পারে; কিন্তু হিন্দু সমাজে সচরাচর হয় না,—হইতে পারে না বলিতে পারি না। যাহা হউক, ইহাদের যাহাতে সুশিক্ষা ও সত্বপায়ে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের উচিত। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের কর্তব্যই সকলের চেয়ে কঠিন, কারণ, ভদ্র হিন্দুসমাজে এইরূপ বালিকাদের স্থান পাওয়া কঠিনতম।

এইরূপ বালিকা ছাড়া, যে-সব হিন্দু কুমারী, সধবা বা বিধবা ধর্মিতা হন, তাঁহাদের আত্মীয়, স্বজন যদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করেন, কিম্বা যদি এইরূপ কুমারী ও বিধবাদের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের জন্তও সুপরিচালিত আশ্রমের প্রয়োজন আছে। তাহার জন্ত হিন্দুসমাজকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তদভাবে অগত্যা যদি ধর্মিতা নারীরা মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের লোকদের চীৎকার করিবার কোন অধিকার থাকিবে না। তাঁহাদের কেহ কেহ যে বেস্তাশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন, তাহাতে হৈ চৈ পড়ে না।

এইরূপ একটি আশ্রমের জন্ত কলিকাতার মেয়র যে একটি ফণ্ড খুলিয়াছেন, দলাদলি ভুলিয়া এবং তিনি আগে কেন এরূপ কিছু করেন নাই, এবিধ আপত্তি না তুলিয়া, তাহাতে সকলের যথাসাধ্য দান করা কর্তব্য।

শশীমোহন ও বাঁশরীভুষণ

নানা খবরের কাগজে প্রকাশিত দুটি সংবাদেয় প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। একটি খবর এইরূপ—

শ্রীহট্ট জেলার ইছামতী গ্রামের কৈয়জ আলী নামক এক দুদ্দান্ত ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তি কত নারীর যে সর্বনাশ করিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহার ভয়ে কেহ তাহার বিরুদ্ধে নাগিশ করিত না, স্বয়ং শাস্তিও

দিত না। রঘুব-চক নিবাসী শশীমোহন দে নামক একজন সাহসী যুবক কয়েক জন পাটনীজাতীয় লোকের সাহায্যে এক রাত্রিতে কোন পাটনী জ্রীলোকের গৃহে ঐ লোকটার প্রাণবধ করিয়াছেন। শশীমোহন হত্যাকাণ্ডের স্বীকার করিয়াছেন, ও, বলিয়াছেন, যে, কৈয়ঙ্গ আলী বলবান লোক বলিয়া দরকার হইলে পাটনী লোকগুলির সাহায্য লইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা কিছু করে নাই; হত্যাকাণ্ডের জন্ত তিনিই একা দায়ী। মোকদ্দমা চলিতেছে।

দ্বিতীয় খবরটি এই—

গত ২১শে ফাল্গুন শনিবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় শ্রীমতী সূর্য্যমণি দাসী নামী একটি সম্ভা জ্রীলোক ঈডেন গার্ডেন বেড়াইতে গিয়া সঙ্গীতারা হইয়া রাস্তার পাশে বসিয়া থাকেন। তখন একটা গোরু সৈনিক তাহাকে একলা দেখিয়া নিজের অসদৃশ্য জানায়। সূর্য্যমণি স্বীকার করায় হুবৃত্ত বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাকে কোন নির্জন স্থানে লইয়া যাইবার সময় জ্রীলোকটির ক্রন্দন শুনিয়া বাশরীভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক এক যুবক লাধি মারিয়া গোরুটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সূর্য্যমণির উদ্ধার সাধন করেন। ইত্যবসরে নরপশুটা উঠিয়া পলায়ন করে।

এরূপ অবস্থায় সকল যুবকেরই এইরূপ প্রশংসনীয় কাজ করা উচিত।

লবণের গুরু

অধিকাংশ সভ্যের মতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রথমে লবণের গুরু মণকরা পাঁচ সিকার পরিবর্তে দশ আনা করিয়া দেন। তাহাতে লবণের দাম সেরকরা এক পয়সা কমিত। অতঃপর গবর্ণমেন্ট এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন। ইহাতে গবর্ণমেন্টের ধামাধরা লোকের সংখ্যা অনেক। এই পরিষদ ব্যবস্থাপক সভার নির্ধারণ উল্টাইয়া দিয়া পাঁচ সিকা শুদ্ধই বজায় রাখেন। তখন সরকার

বাহাদুর বিষয়টি আবার ব্যবস্থাপক সভার নিকট পেশ করেন। ইতিমধ্যেই দেশের অবস্থা এত ভাল হইয়া গিয়াছে, যে, উহার অধিকাংশ সভ্য নিজেদের পূর্ব্ব নির্ধারণের মামা পরিত্যাগ করিয়া শুধু আবার পাঁচ সিকাই করেন! এরূপ অব্যবহিতচিত্ত লোকদিগকে দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন করা মহা ভ্রম।

জাতীয় ভাষা

রাষ্ট্রীয় পরিষদে সম্প্রতি শেঠ গেবিন্দ্রদাস এই প্রস্তাব করেন, যে, ভারত গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা-পরিষদে সভ্যদিগকে হিন্দী বা উর্দুতে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হউক এবং তাহা ছাপাই বার ব্যবস্থা করা হউক। তিনি বলেন, জাতীয় ভাষা ব্যতীত স্বরাজ অর্থশূন্য হইবে, এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা করা অপেক্ষা মাতৃভাষা রক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

সমগ্র ভারতের কিছা শুধু ব্রিটিশশাসিত ভারতের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা হিন্দী বা উর্দু নহে। যদি অধিকাংশের মাতৃভাষা তাহা হইত, তাহা হইলেও অল্পাংশের মাতৃভাষাগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, ভোটের জোরে কেবল হিন্দুস্থানী চালান উচিত হইত না। ব্যবস্থাপক সভায় মাতৃভাষা না চালাইলেই যে তাহা রক্ষিত হইবে না, এমন নয়। লীগ অব নেশন্সের কার্যনির্বাহ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় হয়। কিন্তু লীগের সভ্য সাতাশটি দেশে আরও বিস্তর ভাষা প্রচলিত আছে। লীগে তাহা চলে না বলিয়া সেগুলি লোপ পাইতেছে না। মাতৃভাষার রক্ষা এবং উন্নতির দোষ্টা আমরাও অল্পবয়স করিয়া থাকি, কিন্তু সীমান্ত রক্ষা করা অপেক্ষা ব্যবস্থাপক সভায় মাতৃভাষা চালান গুরুতর কর্তব্য বলিয়া মনে করি না। গুরুতর মনে করি বা না-করি, গুরু মনে করিতাম, যদি দেশের মাতৃভাষা একটাই হইত, এবং তাহা অবহেলা করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ইংরেজী চালান হইত।

ইহা সম্ভব, যে, ইংরেজী জ্ঞানেন না এমন কোন কোন ব্যক্তি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন বা হইতে

পারেন। ইংরেজী বক্তৃতা, প্রস্তাব ও তর্কবিতর্ক তাঁহারা বুঝিতে পাবেন না বা পারিবেন না। কিন্তু হিন্দী বা উর্দু বুঝিতে অক্ষম সভ্যের সংখ্যা ইংরেজী না-জানা সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং হিন্দী উর্দু চালাইলে কাজের অসুবিধা বেশী বই কম হইবে না।

সমগ্রভারতে প্রচলিত যদি কোন ভারতীয় ভাষা থাকিত, তাহা হইলে, “জাতীয় ভাষা ভিন্ন স্বরাজ অর্থশূন্য হইবে,” শেঠজির এই উক্তিই আলোচনা আবশ্যক মনে করিতাম। বর্তমানে কিন্তু সেরূপ কোন দেশী ভাষা নাই। হিন্দীভাষীরা তাঁহাদের ভাষা ভারতব্যাপী করিবার যে-সব সূচেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন, ভারতের সর্বত্র হিন্দী শিখাইবার ব্যবস্থা করা, সূচেষ্টা। কিন্তু ভোটের জোবে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বহু ভাষার মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুস্থানী চালাইবার চেষ্টাকে আমরা সূচেষ্টা মনে করি না, অক্ষ গোড়ামি মনে করি। অস্ত্রান্ত দেশী ভাষাগুলি কি অপরাধ করিল ?

সমগ্রভারতীয় প্রচেষ্টাসমূহে বাঙালীর স্থান

ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পণ্যশিল্প, প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক সমিতি, কমিটি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার মধ্যে কোন-কোনটা গবর্নমেন্টের দ্বারা গঠিত, অনেকগুলিই বেসরকারী নেতাদের দ্বারা গঠিত। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাহার অনেকগুলিতে বাঙালী মোটেই নাই; কিম্বা যদি থাকে ত বঙ্গের লোকসংখ্যার অল্পপাতে যত থাকা উচিত, তত নাই। ইহার কারণ কি, বাঙালীদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি বাঙালীদের অযোগ্যতাই ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য, অযোগ্যতা ছাড়া কোন কোন স্থলে অন্য কারণও থাকিতে পারে। যে কারণেই হউক, অনেক প্রদেশের লোকদের বাঙালীদের প্রতি মনের ভাব ভাল নয়। সেইজন্য কখন কখন বাঙালীদিগকে বাদ দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টাও হইতে পারে। কিন্তু একপ

চেষ্টা দ্বারা কেবল যে বাঙালীদের অনিষ্ট করা হয় তাহা নহে, সমগ্র ভারতেরও অনিষ্ট করা হয়। ভারতীয় মহাজাতির ক্ষুদ্রতম অংশও অবশেষে বা বর্জ্যনীয় নহে। ভারতবর্ষের অল্পসংখ্যক জায়বান বুদ্ধিমান লোক বহু পূর্ব হইতে “অস্পৃশ্য” ও “অনাচরণীয়” লোকদিগকে মনুষ্যোচিত মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পরে রাজনৈতিক দায়ে পড়িয়া অল্প লোকেরাও ইহাতে আন্তরিক বা মোখিক যোগ দিয়াছেন। যাহা বা বাংলাকে বাদ দিয়া অগ্রসর হইতে চান, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহাদের বুঝা উচিত, যে, পরে দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বাংলার প্রতিও রূপাকটাক্ষ করিতে হইবে।

সমগ্রভারতীয় যে-সব প্রচেষ্টা ভাল, বঙ্গের নেতৃস্থানীয় লোকদের তাহাতে যোগ দেওয়া উচিত, উদাসীন থাকা উচিত নয়।

ডাকমাণ্ডুল কেন কমিল না

ডাকমাণ্ডুল কমাইবার প্রস্তাব এবারও বজেট-বিতর্কের সময় করা হইয়াছিল; কিন্তু না-মঞ্জুর হইয়াছে।

জাপানে লোকদের জনপ্রতি গড় আয় ও ব্যয় ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী; বাচিয়া থাকিবার খরচ বেশী। তথাপি জাপানে এক-একটি পোষ্টকার্ডের দাম দেড় সেন বা দেড় পয়সা; চিঠির নিম্নতম মাণ্ডুল তিন পয়সা; ধববের কাগজের নিম্নতম মাণ্ডুল আধ পয়সা।

কর্তারা বলিতে পারেন, জাপান ছোট দেশ, সেখানে সংবাদপত্র পোষ্টকার্ড ও চিঠি বেশী দূর লইয়া যাইতে হয় না; সুতরাং কম মাণ্ডুলেই ডাকবিভাগের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। আচ্ছা, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অপেক্ষা একটা বড় দেশেরই দৃষ্টান্ত লউন। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৩,০০০ বর্গ মাইল। আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের আয়তন ৩০,২৬,৭৮২ বর্গ মাইল; আলাস্কা প্রভৃতি ধরিলে ৩৭,৪৩,৫২২ বর্গ মাইল। যাহা হউক, তাহা না ধরিলেও ইউনাইটেড স্টেটস ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ বড়। এত বড় দেশে পোষ্টকার্ডের মাণ্ডুল এক সেন্ট অর্থাৎ দু পয়সা মাত্র। অথচ আমেরিকার এই দেশে মানুষদের সাংসারিক খরচ

ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশী। তদনুরূপ বেশী বেতন দিয়াও যদি তত বড় দেশে দু'পয়সা পোষ্ট-কার্ড চালান যায়, তাহা হইলে তা'র চেয়ে ছোট দেশ ভারতবর্ষে উহার ডাক-বিভাগের অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেতনভোগী দেশী কর্মচারীদের দ্বারা এক পয়সার পোষ্ট-কার্ড কেন চালান যাইবে না?

বিরুদ্ধবাদীদের একটা আপত্তি এই, যে, ডাকমাণ্ডুল কমাইলে তাহার সুবিধা গরীব চাষাভূষারা পাইবে না এবং পোষ্টকার্ড ও খামের কাটুতি বাড়িবে না। কিছু যে বাড়িবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। গরীব চাষাভূষাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহাদের সুবিধা নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু জাপান বা আমেরিকার মত বেশী লোকের সুবিধা হইবে না বটে। তাহার জন্ত দায়ী কর্তারা স্বয়ং। দেশের সব লোককে লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টাও করিব না, অথচ বলিব, সস্তা পোষ্টকার্ডের সুবিধা গরীব চাষাভূষা ও শ্রমিকেরা পাইবে না, সুতরাং ডাকমাণ্ডুল কমাইবার দরকাব নাই; এ এক চমৎকার ভণ্ডামি!

ডাকমাণ্ডুল কমানটাও শিক্ষাবিস্তারের একটা উপায়। শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিতে হইলে চিঠি পোষ্টকার্ড ছাড়া পুস্তক পাঠাইবার ডাকমাণ্ডুল এবং খবরের কাগজ পাঠাইবার ডাকমাণ্ডুলও কমান উচিত। যেমন শিক্ষা-বিভাগটাকে গবর্নমেন্ট আয়ের উপায় মনে করেন না, ডাক-বিভাগকেও কতকটা সেইরূপ জাতীয় উন্নতির উপায় স্বরূপ মনে করিয়া তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলেও তাহাতে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। এই বিভাগে মোটা মাহিনার ফিরিঙ্গী ও ইংরেজরা যে-কাজ করে, তা'র চেয়ে কম বেতনে ভাল ও বেশী কাজ করিবার দেশী লোক পাওয়া যায়। এই প্রকারে ব্যয়সংক্ষেপ করা উচিত।

ডাকবিভাগের কতকগুলি অন্তায় ব্যবস্থা আছে; তাহার সংশোধন করা উচিত। ন্যূনতম দু'পয়সা খরচে বহি বিদেশে যায়, ভারতবর্ষেও উহা বহির ন্যূনতম মাণ্ডুল; কিন্তু হওয়া উচিত ভারতের পক্ষে এক পয়সা। বিলাতে চিঠি পাঠাইতে হইলে আমাদেরিগকে দিতে হয় দুই আনা অর্থাৎ সওয়া দুই পেনী; কিন্তু ইংরেজ-

দিগকে ভারতে চিঠি পাঠাইতে হইলে লাগে দেড় পেনী। অর্থাৎ ধনী দেশ কম খরচে যে-সুবিধা পায়, গরীব দেশ সেই সুবিধার জন্ত অনেক বেশী ডাকমাণ্ডুল দিতে বাধ্য হয়। আমেরিকায় চিঠি পাঠাইতে হইলে আমাদেরিগকে দিতে হয় তিন আনা, কিন্তু আমেরিকার লোক ভারতবর্ষে চিঠি পাঠায় পাঁচ সেন্টে অর্থাৎ মোটামুটি দশ পয়সায়। এ ক্ষেত্রেও ধনী দেশ কম খরচে যে-সুবিধা পাইতেছে, গরীব দেশকে সেই সুবিধার জন্ত বেশী খরচ করিতে হইতেছে।

ডাকমাণ্ডুল সম্বন্ধে এবৎসর এবং পূর্বে পূর্বে বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব তর্কবিতর্ক হইয়াছে, তাহাতে উহা কমাইবার পক্ষে যাহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহারা জাপানের, আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের বা অন্ত কোন-কোন দেশের দৃষ্টান্ত কখনও দিয়াছেন বলিয়া পড়ি নাই। অথচ কোন কোন দৃষ্টান্ত আমবা একাধিক বার আমাদের ইংরেজী ও বাংলা মাসিকে দিয়াছি। অন্ত সম্পাদকেরাও দিয়া থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যদের মত উচ্চপদস্থ লোকেরা মাসিক পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, এরূপ ছুরাশা পোষণ করিবার আশ্পর্ক আমাদের নাই; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যে-সব ভারতীয় ইংরেজী দৈনিকে সমসাময়িক মত (contemporary opinion) বলিয়া নানা কাগজের মত উদ্ধৃত হয়, তাহাতে পর্য্যন্ত মডার্ন রিভিউয়ের মত, প্রস্তর-যুগের বলিয়া, কখন উদ্ধৃত হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে জাপান ইয়ার বুক, হুইটেকাস' ম্যালম্যানাক, স্টেটসম্যান্স ইয়ার বুক প্রভৃতি যাহা বাহির হয়, এবং দৈনিক কাগজে যাহা বাহির হয়, সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন ব্যবস্থাপকেরই মর্যাদাহানির সম্ভাবনা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকবিদ্যা শিক্ষা

এমন এক সময় ছিল, যখন বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবের দেশী ইংরেজী খবরের কাগজের সম্পাদক অনেক স্থলে ছিলেন বাঙালী। এখন বাঙালী অপেক্ষা অগ্রাগ্র প্রদেশের লোকই এইসব অঞ্চলে দেশী ইংরেজী কাগজের

সম্পাদকতা অধিক স্থলে করেন। প্রত্যেক প্রদেশের লোক যদি নিজের সব ব্রকম কাজ নিজেরাই করিতে পারেন, তাহাই সাধারণতঃ সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা ও ব্যবস্থা। কিন্তু যদি কোন প্রদেশের লোককে কোন কাজের জন্ত অল্প কোন প্রদেশের লোক আমদানী করিতে হয়, তাহা হইলে যে-প্রদেশ নিকটতর, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি দূরতর প্রদেশ হইতে লোক আনিতে হয়, তবে বুদ্ধিতে হইবে নিকটতর প্রদেশের লোকের অযোগ্যতা বা অল্প কোন দোষ ঘটয়াছে। বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই, আগ্রা-অযোধ্যা, দিল্লী ও পঞ্জাবে, হয়ত বিহারেও, বাংলা ডিঙাইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে সাংবাদিকরা গিয়া কাজ করিতেছেন। অল্প যে-কোন প্রদেশের লোক যত উন্নতি করিতে পারেন করুন, তাহাতে সম্ভাব্য ভিন্ন অসন্তোষের কোন কারণ নাই। কিন্তু যখন আমরা দেখিতেছি, যে, যে-কারণেই হউক, উত্তর ভারতে বাঙালী সাংবাদিকের স্থান না হইয়া অল্প প্রদেশের সাংবাদিকের স্থান হইতেছে, এমন কি বাংলাদেশেই একজন মাদ্রাজী সাংবাদিক পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টারী হইতে আরম্ভ করিয়া একখানি প্রাচীন ইংরেজী দৈনিকের অন্ততর সম্পাদক ও মালিক পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, তখন বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কেন এরূপ হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি প্রধান অধ্যাপকের পদে কয়েকজন অবাঙালী অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা যোগ্য কি অযোগ্য, তাহা বলিবার বা প্রমাণ করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যে, বাঙালী নিজের বাড়ীতে কেন পরাজিত হইলেন? সাংবাদিকের কাজেও তেমনি বাঙালীদের পরাজয়ের কারণ অসুসন্ধান ও নির্ণয় করা আবশ্যিক।

আমরা সম্প্রতি এলাহাবাদ গিয়াছিলাম। সেখানে শিক্ষাদানকার্যে ব্রতী সুবিখ্যাত কোন অধ্যাপকের মুখে শুনিয়া আসিলাম, এলাহাবাদে যে সিবিলাৰ্বিসাদির জন্ত সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার কোন ইংরেজ পরীক্ষক বলিয়াছেন, বাঙালী পরীক্ষার্থী ছেলেরিগকে দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা হয়; কিন্তু তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের

বাহিরের অনেক জ্ঞাতব্য জিনিষ পড়ে নাই, জানে না, সমসাময়িক নানা জাগতিক ব্যাপারের বিষয় অবগত নহে। ইহা সত্য হইতে পারে। কারণ, আমাদের একজন ভারতীয় পুস্তক প্রকাশক একবার বলিয়াছিলেন, স্থূল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য জ্ঞানগর্ভ ইংরেজী বহি (অবশ্য বাজে উপভাসের কথা তিনি বলেন নাই) বাংলা দেশে সকলের চেয়ে কম বিক্রী হয়। ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রী হইতে আমাদের নিজের যাহা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাও এরূপ। আমরা যে মডার্ন রিভিউ নামক মাসিক কাগজ বাহির করি, তাহার গ্রাহকও বাংলা দেশেই সবচেয়ে কম, যদিও ভারত-বর্ষে দেশী সব ইংরেজী মাসিকের মধ্যে ইহারই কাঁচিতি বেশী। ইহার সম্পাদকীয় লেখার অপকর্ষ বা উৎকর্ষের বিচারক আমরা নহি; কিন্তু ইহার প্রধান প্রধান লেখকদের যে-সব প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, এবং ইহাতে যত নির্দোষিত প্রবন্ধাংশ ছাপা হয়, তাহা পড়িলে পৃথিবীর নানাবিষয়ে যত জ্ঞান জন্মে, অল্প কোন ভারতীয় মাসিক পড়িলে তত জ্ঞান জন্মে না বলিলে সত্য কথাই বলা হইবে। আমরা ইহা সম্ভব মনে করি, যে, বাঙালীর ছেলেরা মডার্ন রিভিউ ও অন্যান্য ভাল ইংবেজী মাসিক পত্র কম পড়েন, হয়ত প্রধানতঃ গল্পপ্রধান বিলাতী বা দেশী মাসিক পড়েন, ইহা তাঁহাদের জাগতিক সমসাময়িক বিষয়ে অল্প কোন কোন প্রদেশের ছেলেরা চেয়ে কম জ্ঞানের অন্ততম কারণ। যাহা হউক, কারণ সম্বন্ধে আমাদের হয়ত কিছু ভ্রম হইতে পারে, বিশেষতঃ মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি মাসিক পত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়ত কতকটা ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে, বাঙালীর ছেলেরা বুদ্ধি বেক্রপ, জাগতিক নানা বিষয়ের জ্ঞান সেক্রপ নহে। সম্ভবতঃ তাহাদের জ্ঞানের এই অন্ততর জন্ত তাহারা বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও অনেক স্থলে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়, এবং নানা বিষয়ে ওয়াকিফ-হাল না হওয়ায় তাহারা উৎকৃষ্ট সাংবাদিক হইতেও পারে না।

আগে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলেজ ছিল না। এখন সকল প্রদেশেই এইরূপ কলেজ স্থাপিত

হইয়াছে। কিন্তু সেকালেও অনেক উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন। তেমনি, যদিও ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংবাদিক প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, তথাপি এ-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কয়েকজন সাংবাদিক-কৃতিত্ব দ্বারা সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজের মত 'ও জীবিত কয়েক জন বাঙালী সম্পাদকও আছেন।' কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, শিক্ষাদান-বিদ্যা ও সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার প্রয়োজন নাই। রীতিমত শিক্ষা না পাইয়াও অনেকে ভাল শিক্ষকও ভাল সাংবাদিক হইতে পাবেন বটে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রী ও সাংবাদিকক্ষেত্রী শ্রেণী হিসাবে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আগে আগে ও সব দেশেই নানাপ্রকার শিল্পী কারিগর ও মিস্ত্রী কারখানায় দেখিয়া শুনিয়া হাতে-হেতেরে কাজ শিখিত; এইরূপ রীতির কতকগুলি সুবিধাও আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব দেশেই শিল্প কারিগরী প্রভৃতি শিখাইবার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতেও সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও আমি, এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করি। আমি প্রথম প্রথম সখ ও বাতিকের বশবর্তী হইয়া সাংবাদিকের কাজ করিতাম। তাহার পর যখন কলেজবিশেষের কর্তাদের সহিত মতের মিল না হওয়ায় অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিলাম, তখন পেশাদার সাংবাদিক হইলাম। আমি দৈনিক কাগজ কখনও চালাই নাই, মাসিক চালাই। তাহাতেও কিন্তু শিক্ষার অভাব বরাবর অনুভব করিয়াছি, এখনও করিতেছি। রাষ্ট্রনীতি, আইন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, যুদ্ধ, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য, চাক্র ও কাক্র শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্যের রীতিনীতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে লোকচলাচল, শ্রমিক-সমস্যা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিবারণ, বেস্তাবৃত্তির জন্ত দেশবিদেশে জীলোক আমদানী রপ্তানী নিবারণ, প্রভৃতি কোন বিষয়েরই চলনসই রকমেরও জ্ঞান না থাকায় আমাকে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ

করিতে হয়। তবে, অনেকদিন এই কাজ করিতেছি বলিয়া কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লইতে পারি। কিন্তু অতঃপর যাহারা সাংবাদিক হইবেন, তাঁহাদের হাতুড়ে হইলে চলিবে না। ভাল সাংবাদিক হইতে হইলে উক্ত নানা বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান এবং অন্ততঃ প্রথম চারি পাঁচটির মধ্যে একটির বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। ইহাও সঙ্কোচের সহিত বলিতেছি; কারণ, এমন কোন বিদ্যা হঠাৎ মনে পড়িতেছে না, যাহা সাংবাদিকের কাজে না লাগিতে পারে।

সাংবাদিকদের নিজের সুবিধার জন্তই যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা নহে। জগতের ও দেশের হিতের জন্তও ইহা আবশ্যিক। সত্য বটে, আমাদের দেশে অনেক লোক অন্ত কাজের ও অন্তবিধ শিক্ষার অভাবে শিক্ষকের বা সাংবাদিকেব কাজ করেন (আমি স্বীকার করিতেছি আমিও তাহা করিয়াছি)। কিন্তু দেশের মঙ্গল করিতে হইলে, গালাগালি ও দলাদলিতে পারদর্শিতার পবিত্র অস্ত্রবিধ এবং শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। খবরের কাগজের সৃষ্টির পূর্বে যে-শ্রেণীর লোক যতই প্রভাবশালী থাকুন না, বর্তমান জগতে খবরের কাগজের প্রভাব খুব বেশী। বক্তাদেরও প্রভাব বেশী বটে, কিন্তু খবরের কাগজে তাঁহাদের বক্তৃতার অনুলেখন বাহির না হইলে তাঁহাদের প্রভাব স্থানে ও কালে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। এইজন্য সংবাদপত্রে যাহারা লেখেন ও যাহারা কাগজ চালান, তাঁহাদের খুব যোগ্য লোক হওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নতির জন্ত স্মার মাইকেল স্ট্রাডলারের সভাপতিত্বে যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত হইয়াছে। সম্প্রতি মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টির বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিষয়ে পিছাইয়া থাকা উচিত নয়। টাকার অভাব ইহার আছে বটে। কিন্তু ইহার কয়েকটি অধ্যাপকের পদ আছে, যাহার বেতন খুব বেশী, কিন্তু কাজ কিছুই নাই বা অতি সামান্য। বস্তুতঃ এমন অধ্যাপকের নাম করা যাইতে পারে যাহার বা যাহাদের দ্বারা এপর্য্যন্ত একদিনও অধ্যাপনা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্তৃপক্ষ ইহা জানেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এখনও “কর্তৃত্বভূত” গ্রন্থ। কাহারও কিছু করিবার জো নাই। সংস্কার করিতে গেলেই স্বার্থান্বেষী, দলের উপাসকেরা সংস্কারকদের মিথ্যা নিন্দায় ধামাধরা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে থাকে।

তাহা হইলেও সাংবাদিক-বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা উচিত। কোন কোন বিষয়ের অধ্যাপনা বর্তমানে অল্পকথা কোন কোন অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবসাদারী

আমাদের দেশের দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, পরাধীনতা প্রভৃতির মূলে যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে প্রধানতম একটি হইতেছে আমাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষা যেমন দ্রুত মানুষকে ষোল আনা মানুষ করিয়া তোলে, এমন আর অন্য কিছুতে হয় না। সকল দেশবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে যে আমরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার দিকে অনেকখানি আগাইয়া যাইতে পারিব, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এইসকল কারণে আমরা যখন দেখি, যে, কোন কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তিসংঘের ইচ্ছা-বা-অনিচ্ছা কৃত অপরাধে দেশের শিক্ষার প্রসারে বাধা পড়িতেছে বা, অপর কোনরূপ অপকার হইতেছে, তখন সত্যি আমাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। শিক্ষার কার্যে যে বা যাহারা বাধা প্রদান করে, তাহারা দেশের বিশেষ অমঙ্গলকারী। যাহারা ইচ্ছাপূর্বক দেশের শিক্ষাপ্রণালী ধারাপ করে, তাহারা যথার্থই স্থগার পাত্র।

আজকাল সাধারণের চক্ষে একটি বিষয় খুবই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ইহা ব্যবসাদারী স্কুল-কলেজ পরিচালনা। এরূপ ধরণে স্কুল-কলেজ যে পূর্বে কেহ চালাইতেন না, এমন নহে; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাসংস্কার চেষ্টা সর্বত্রই হইতেছে বলিয়া এবং এইসকল লোকেরা কোন কোন স্থলে কিছু অধিক বাড়াবাড়ি করিতেছে বলিয়া জিনিসটা লইয়া সকলেই আলোচনা করিতেছেন।

আমরা একটি এইরূপ ব্যবসাদারী স্কুলের কয়েকজন

শিক্ষকের নিকট অল্পসন্ধান করিয়া জানিলাম, যে, স্কুলের মালিক নানা উপায়ে নিজের পকেট পূর্ণ করিতে এত ব্যস্ত, যে, তাহার ব্যবস্যাচেষ্টার সম্মুখে শিক্ষার কথা, শ্রায়-অশ্রায়ের কথা কিছুই স্থান পায় না। স্কুলে যতজন শিক্ষক রাখা উচিত, এই স্কুলের মালিক তাহা অপেক্ষা বহু অল্প-সংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে স্কুল চালনা করেন। ফলে শিক্ষকের অভাবে সকল বিষয় উপযুক্তরূপে স্কুলের ছাত্রগণ পড়িতে পায় না এবং শিক্ষকগণও অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য কোন কার্যই ভাল করিয়া করিতে পারেন না। শিক্ষকগণকে প্রথমতঃ বেতন কম দেওয়া হয় এবং উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে খাতায় যাহা বেতন লেখা হয়, বস্তুতঃ তাহা অপেক্ষা কম দিয়া অবশিষ্টাংশ স্কুলের মালিক পকেটেই করেন। এক-একটি ক্লাশে যতগুলি ছাত্র রাখা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অনেক অধিক সংখ্যক ছাত্র রাখা হয়, ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য যখন-তখন কটিন বদলান ও ভঙ্গ করা হয় এবং প্রমোশন প্রভৃতি বিষয়ে স্কুলের মালিক নানা অজ্ঞায় অবিচার করেন। এইরূপে ব্যবসাদারীর খাতিরে শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, এবং ইহার বিষে বহু ছাত্রের জীবন ভুল বা কুশিক্ষার ফলে ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। পয়সার লোভে যাহারা ঋণ্ডে ভেজাল দিয়া সমাজস্থ অপার লোকের দেহের সর্বনাশ সাধন করে, এইসকল শিক্ষার ক্ষেত্রের ভেজালদার ব্যবসায়ীগণও তাহাদেরই সমতুল্য দেশশত্রু। সকলের উচিত এইসকল স্কুল যাহাতে ব্যক্তিগত লাভের উপায় না থাকিয়া অবিলম্বে শুধু শিক্ষার উদ্দেশ্যেই চালিত হয় তাহার চেষ্টা করা। উপায় আন্দোলন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জাগ্রত করিয়া তোলা। নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার আশা করি এদিকে বিশেষ করিয়া নজর দিবেন।

ক্ষোভের বিষয় এই, যে, অনেক ব্যবসাদারী স্কুলের পরিচালক-সভার সভ্যের মধ্যে আমরা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেলোর” নাম দেখিতে পাই। ইহারা উচ্চ শিক্ষার হস্তাকর্তা বিধাতা হইয়াও কেমন করিয়া চক্ষু খুলিয়া একদল বালকের মানসিক সর্বনাশ সাধিত হইতে দিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষার

ক্ষেত্রে ব্যবসাদারী অতি জঘন্য ব্যাপার। এইসকল “ফেলো”গণ কেমন করিয়া তাহার সমর্থন করিতেছেন, তাহা আমাদের কেহ বুঝাইয়া দিবেন কি ?

অ্যাথিনিয়াম্ ইনষ্টিটিউশন্

পূর্ব কলিকাতার অ্যাথিনিয়াম্ ইনষ্টিটিউশন্ একটি ব্যবসাদারী স্কুল ; অর্থাৎ ইহা সাধারণের জন্ত, সাধারণের পয়সায়, সাধারণের দ্বারা চালিত নহে ; ইহার মালিক ব্যক্তিবিশেষ। এই স্কুলের ছাত্র অনেক এবং আয়ও যথেষ্ট, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সকল ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। সম্প্রতি এই স্কুলের মালিক (নিজের স্কুলের কমিটির সাহায্যে) একটি কাণ্ড করিয়া স্কুলের শিক্ষকমহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় যে স্কুল-সংক্রান্ত নূতন নিয়ম-কানুন করিয়াছেন, তাহার ফলে স্কুলের হেড মাষ্টারের ক্ষমতা বিশেষরূপে বর্ধিত হইয়াছে। অ্যাথিনিয়াম্ ইনষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার আজ বহুকাল ধাবৎ স্কুলের উন্নতির জন্ত প্রাণপণ করিয়া থাটিয়া আসিতেছিলেন। নূতন নিয়ম-কানুন হওয়াতে তাঁহার ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়া পাছে স্কুলের মালিকের ক্ষমতা বর্ধি হয় সেই ভয়ে হঠাৎ, উপযুক্ত নোটস জারী না করিয়া, কমিটির একটি মিটিং ডাকিয়া মালিক মহাশয় এমন একটি প্রস্তাব গ্রাহ্য করাইয়া লইলেন, বাহার ফলে তিনি নিজে স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া গেলেন এবং ষষ্ঠার্থ যিনি হেড মাষ্টার, তিনি হইয়া গেলেন জয়েন্ট হেড মাষ্টার।

হেড মাষ্টার যিনি ছিলেন, তিনি খুবই যোগ্যতার সহিত নিজের কাজ করিতেছিলেন। এরূপ স্কুলে তাঁহাকে আসনচ্যুত করাটা বিশেষ অশ্রদ্ধা ও অপমানকর হইয়াছে। যে-স্কুলে ব্যক্তিগত প্রাধান্ত বজায় রাখিবার জন্ত উপযুক্ত হেড মাষ্টারের সম্মান নষ্ট করা হয়, সে-স্কুল সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কর্তব্য ? আমরা জনসাধারণকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্ন করিতেছি।

শুনিয়াছি, অ্যাথিনিয়াম্ ইনষ্টিটিউশনের কমিটির সভ্যদিগের অন্ততম হইতেছেন সার্বেজ কলেজের ডা:

পি সি মিত্র ও অধ্যাপক জে আর ব্যানার্জী মহাশয়। ইহারা কি কমিটির উল্লিখিত মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন ? যদি ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞাতসারে এরূপ অশ্রদ্ধা সাধিত হইল কেমন করিয়া ? ডা: মিত্র ও অধ্যাপক ব্যানার্জী উভয়েরই দেশসেবক বলিয়া খ্যাতি আছে। ব্যক্তিগত প্রাধান্ত রক্ষা ও উপযুক্ত শিক্ষা দান যে কোন স্কুলে হওয়া কত কঠিন তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁহাদের স্কুলে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত নয় কি ? তাহারা এবিষয়ে কি করিতেছেন ?

ভারতের সেনাদলের ভারতীয়তা-পাদন

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকর্তাদের কেহ কেহ এই দেশকে নিজেদের অধীন রাখিবার জন্ত দরকারমত এমন সব যুক্তি প্রয়োগ করেন, যাহা ভণ্ডামি-প্রসূত ভিন্ন আর কিছু মনে করা যায় না। যেমন ধরুন, একটা যুক্তি আছে, যে, যে-দেশের শত-করা ৬৭ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে, সে-দেশে স্বরাজ চলিতে পারে না। বাস্তবিকই পারে কি না তাহার আলোচনা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে যে-শিক্ষার বিস্তার দীর্ঘকাল-ব্যাপী ইংরেজশাসন সত্ত্বেও এত কম হইয়াছে, তাহার জন্ত দায়ী কে ? তোমরা নিজে সার্বজনিক অবৈতনিক শিক্ষা দিবে না, গোখলে-প্রমুখ দেশহিতৈষীদের এতদ্বিষয়ক চেষ্টায় বাধা দিবে, অথচ বলিবে, নিরক্ষর দেশকে স্বরাজ দেওয়া চলে না, এ কেমন কথা ?

কর্তাদের এইরূপ আর-একটা যুক্তি আছে, যে, আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মিলে ভারতকে আত্মশাসন-ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু বাহারা এই কথা বলে, তাহারাই আবার ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় হইতে দিতেছে না। বরং আগে ভারতীয় সেনাদলের যে-যে অধিকার ছিল, এখন তাহার কোন-কোনটি লুপ্ত হইয়াছে। আগে সিপাহীরা আর্টিলারী অর্থাৎ গোলন্দাজী বিভাগে কাজ পাইত, এখন পায় না। কে সাচেবের সিপাহীঘৃদ্ধের ইতিহাস হইতে জানা যায়, সেকালে গোরা সৈন্তেরা পর্যন্ত কখন কখন দেশী সেনা-

নায়কের অধীনে যুদ্ধ করিত। এখন দেশী সেনানায়কদের সে-অধিকার ত লুপ্ত হইয়াছেই, সিপাহীদের নেতৃত্বও ইংরেজ অফিসারদের হাতে গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, গুটিকতক দেশী লোককে এই নেতৃত্বের নিম্নতম ও নিম্নতর কয়েকটি কাজ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা অতি সামান্য।

ভারতীয় সৈন্তদলকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সিপাহীদের ছোট হইতে সকলের বড় পর্যন্ত সকল সেনানায়ক দেশী হওয়া চাই, গোরা সাধারণ সৈন্ত ও ইংরেজ ছোট বড় সব সেনানায়ককে শীঘ্র শীঘ্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদায় দেওয়া চাই, এবং একমাত্র ভারতীয় সিপাহীদিগকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজী, আকাশযোদ্ধাদল—সকল দলে, প্রবেশাধিকার ও শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হওয়া চাই। কিন্তু ইংরেজরা এরূপ স্বার্থান্ধ, যে, ভারতীয় সৈন্তদলের এইপ্রকার ভারতীয়তা-পাদন তাহারা অসম্ভব মনে করে। অনেক ইংরেজের এইরূপ অকপট বিশ্বাস থাকিতে পারে। কিন্তু যাহারা জানে, যে, ইংলণ্ডও এক সময় পরাধীন ছিল, ফ্রান্সও বিজিত হইয়াছিল, আমেরিকাও পরাধীন ছিল, অথচ এখন এইসব ও অগ্র অনেক স্বাধীন দেশের সম্পূর্ণ জাতীয় সৈন্তদল আছে, তাহারা যদি বলে, যে, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণরূপ জাতীয় ফৌজ থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে তাহাদের উজ্জ্বল অকপটতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

যে কারণেই হউক, ভারত গবন্মেণ্ট সিপাহী সৈন্তদলের ভারতীয়তা-পাদনের জন্য একটা কমিটি বসাইয়াছিলেন। তাহার রিপোর্টের একটা সংক্ষিপ্তসার সরকার প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম, ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে বিলাতী স্যাণ্ডহাউসের মত একটা সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কমিটি সুপারিস করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের আগে কেন তাহা স্থাপিত হইতে পারে না, সংক্ষিপ্তসারে তাহা লেখা নাই। বিলম্বের এই একটা সুবিধা আছে, যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে লোকে কথটা ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে ও জগতে যত ঘটনা ঘটিবে, তাহার মধ্যে ঐ

কলেজটা স্থাপন না-করিবার পক্ষে যুক্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এই কলেজে ছাত্র লওয়া হইবে প্রধানতঃ প্রাক্তি-যোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া—সেরূপ পরীক্ষা দিবার অধিকার সকল প্রদেশের, জাতির, ধর্মের ও শ্রেণীর লোকদের থাকিবে। কমিটির ইহা অগ্রতম সুপারিস। ইহা সমর্থনযোগ্য।

এই কলেজে কমিটি প্রতিবৎসর যত ছাত্র লইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহারা যদি **সকলেই** ঠিক ঠিক সময়ের মধ্যে শিক্ষিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং কাজ পায়, তাহা হইলে ১৯৫২ দশকে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর পরে সিপাহীদের সেনানায়ক অফিসারদিগের অর্ধেক হইবে ভারতীয়, অর্ধেক ব্রিটিশ থাকিবা যাইবে। তার পর কি হইবে, অর্থাৎ সমুদয় অফিসার ক্রমে ক্রমে কোন কালেও ভারতীয় হইবে কি না, সে-বিষয়ে কমিটি একেবারে চুপ! ভারতবর্ষের প্রতি এতটা স্ত্যাবিচার ও বদান্ততা করিয়া ফেলিয়া কমিটি বোধ হয় স্তম্ভিত ও হায়রান হইয়া পড়িয়াছেন! তাই আর বাকসুপ্তি হয় নাই। যাহা হউক, প্রত্যেক সামরিক ছাত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বা বাচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অফিসারদের অর্ধেক ভারতীয় হইতে পঁচিশ বৎসরের পরিবর্তে পঞ্চাশ বৎসর লাগিতে পারে। ততদিনে, জগতের পরিবর্তনে, ইংরেজরা আমাদের হস্তাকর্ষ-বিধাতা থাকিবার মত শক্তিশালী থাকিবে কি না, কে জানে?

কমিটির আর-একটা সুপারিস এই, যে, ভারতীয় সৈন্তগণকে পোলন্দাজী বিভাগ, আকাশযুদ্ধ বিভাগ প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে—অবশ্য ইংরেজরা যেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া এইসব দলে ভর্তি হয় সেইরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া। এই প্রস্তাবটিও ভাল।

কিন্তু কমিটি যেরূপ প্রস্তাবই করুন না, তাহা যে কার্যে পরিণত হইবে না, সরকারী সংক্ষিপ্তসারের ভূমিকাতাই গবন্মেণ্ট তাহার আভাস দিয়াছেন। বলিয়াছেন, কমিটির যে-সব বিষয় আলোচনা করিবার কথা নয় এবং অধিকার ছিল না, এরকম অনেক বিষয়

বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যাপারটি ত শুধু ভারতবর্ষীয় নয়, ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপার; অতএব কমিটির রিপোর্ট সাম্রাজ্যিক রক্ষা-কমিটি (Imperial Defence Committee) কর্তৃক বিবেচিত হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। সাম্রাজ্যের স্যার শিবস্বামী আইয়ার একজন খুব বড় মডারেট বা উদারনৈতিক। তিনি যথাসাধ্য গবন্মেণ্টের স্বমতলব ও স্বকার্যের প্রশংসা করেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদলবিষয়ক সব প্রশ্ন ও সমস্যা উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মত লোকও বলিতেছেন, গবন্মেণ্টের গৌরচন্দ্রিকাটা হইতে মনে হয়, কাজে কিছু হইবে না।

যদি কমিটির সব সুপারিস কার্যে পরিণত হইত, তাহা হইলেও তাহা ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবীর অনুরূপ হইত না। অতএব, কোন সুপারিস যদি কার্যে পরিণত না হয়, তাই ভাল। একটা মত আছে বটে, যে, যা পাওয়া যায় তা খুব কম হইলেও লওয়া ভাল, এবং পরে আরও বেশী চাওয়া ভাল। কিন্তু যাহা যথেষ্ট নয়, ন্যায্য পাওয়ার অনুরূপ নয়, তাহা লইলে ন্যায্য যাহা তাহা যাইবার পথে বাধা ঘটে। কর্তারা যেমন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাদি সম্পর্কে বলিতেছেন, “এইগুলি ভাল ছেলের মত সঙ্কট-চিন্তে চালাইয়া দেখাও, যে, তোমরা লাম্বাক হইয়াছ, তারপরে আরও কিছু দেওয়া যায় কি না, দেখা যাবে”, তেমনি সামরিক কমিটির প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধেও বলিতে পারেন,

“১৯২২ সাল পর্যন্ত কি হয় দেখা যাক, তোমরা কেমন রাজভক্ত থাক ও লাম্বাক হও দেখা যাক, তারপরে বিবেচনা করা যাবে।” অতএব ভারতীয় কোন রাজনৈতিক দল যদি কমিটির সুপারিশগুলি অনুসারে কাজ হওয়ার জন্য দাবী করেন, তাহা হইলে মহাভ্রম করিবেন।

কানীতে একশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন, যাহাদিগকে পূর্ণভাগী বলে। তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ণ করিয়া দেওয়া চাই। এইজন্য তাঁহারা গৃহস্থের দ্বারে গিয়া বলেন, “বহী লেজ্জ,” “উহাই লইব”, এবং কেহ পাত্রটি ভরিয়া দিলে “বহী লিয়া”, “উহাই লইয়াছি” বলিয়া চলিয়া যান।

আমাদিগকেও পূর্ণভাগী হইতে হইবে। আমাদিগকে বরাবরই অল্প কিছু দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংরেজ রাজনৈতিকদের আর-একটা চাতুরী আছে, যে, তাহারা অল্প কিছু দিলেই তাহাদের মধ্যে একদল চাঁৎকার জুড়িয়া দেয়, “সর্বনাশ! মহাবিপদ উপস্থিত! ভারত-বর্ষকে এমন কিছু দেওয়া হইতেছে যাহাতে মহা বিপ্লব ঘটবে, এবং সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ উচ্ছন্ন যাইবে!” ইত্যাদি। ইহাকে বলে রাজনৈতিক দোকানদারী। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমরা এই

কোলাহল শুনিয়া ঘেন মনে করি, যে, অতি অপূর্ণ রত্ন আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে, এবং তাহার জন্য কাড়াকাড়ি করি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে, ইংরেজেরা কার্যতঃ আমাদিগকে যখন যাহা দিয়াছে, তাহার কিছুই আমাদের ক্ষায়া পাওয়ার তুলনায় গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা অতি সামান্য, এবং তাহাতে বিস্তর অনিষ্টকর খাদ মিশান আছে।

বার্কেন্‌হেডের বিরক্তিকর পুনরুক্তি

ভারতসচিব লর্ড বার্কেন্‌হেড আবার তাঁহার পুরাতন বুলি ঝাড়িয়াছেন—“পূবামাত্রায় আমাদের সহিত সহযোগিতা কর, ভারতশাসন-সংস্কার আইন অনুসারে যতটা কাজ হইতে পারে কবিতা দেখাও, তাহার পর তাহাতে আমাদের সন্তোষ হইলে আমরা আরও কি করা যাইবে বিবেচনা করিব,” এইরূপ মর্মের কথা। কিন্তু সহযোগিতা করিলে কর্তারা কি আকাশের চাঁদ আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, এবং কখন দিবেন, তাহা বলিবার নাম-গন্ধ নাই। কখন দিবেন, তাহা ত তিনি বলিতেই পারেন না; কারণ তিনি কোন তারিখের দাস নহেন (“not a slave to dates”)। কিন্তু তারিখের দাসত্ব হইতে স্বাধীনতা সম্বন্ধে, ১৯২২এর আগে যে ভাবতশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা হইতে পারে, তুলিয়াও তাহা বলিতেছেন না।

বার বার ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক ধবরের কাগজে বলা হইয়াছে, যে, নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রথম তিন বৎসর ত পূর্ণ সহযোগিতা হইয়াছিল। তখন কর্তারা কেন কিছু করেন নাই? স্বরাজ্য দলের ঘোষিত বাধাদান নীতি সম্বন্ধে তাঁহারা দ্বিতীয়বার গঠিত অধিকাংশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে যে কার্যতঃ সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং বর্তমান সভাগুলিতেও করিতেছেন, তাহাতে ভারতসচিবের মত বদলায় নাই। ভারতবর্ষে যত রাজনৈতিক দল আছে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির যত নির্দোষিত সভ্য আছেন, বিন্দুমাত্র বাধাদানের চিন্তাও যদি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলেও কি আকাশের চাঁদ পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে? কখনই না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে ইংরেজ রাজনৈতিকরা বলিতে আরম্ভ করিবেন, “বাঃ, আমরা কেমন খাসা শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছি! কেহ আর বাধাদানের নামমাত্র করে না, সমালোচনার কথাটি মাত্র নাই, প্রজ্ঞাকুল সন্তোষের গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন! অতএব ১৯১৯ দশকে প্রবর্তিত ভারতশাসনসংস্কার আইন অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকুক।”

“কংগ্রেস আর জাতীয় নাই”

“হিন্দুর ভবিষ্যৎ”

বার্কেনহেড আর-একটা বড় হাসির কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের কংগ্রেস নাকি এক সময়ে জাতীয় ছিল, এখন আর জাতীয় নাই। কিন্তু কংগ্রেস স্বরাষ্ট্রদলের নামান্তর হইবার পূর্বেও সরকার তাহাকে জাতির প্রতিনিধি মনে করিতেন না; অসহযোগ নীতি কংগ্রেসে গৃহীত হইবার পূর্বেও তাহা জাতির প্রতিনিধি বিবেচিত হইত না। আরম্ভের দিক্ হইতে ধরিলে বলা যায়, স্বরাষ্ট্রে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের বিচ্ছেদের আগে উহা দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমলাতন্ত্র দ্বারা উপহাসিত হইত; ১৯০৭এর পর কয়েক বৎসর উহা চরমপন্থী বা গরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিজ্ঞপভাজন ও বিদ্বেষের পাত্র ছিল, এবং উহাতে উভয় দলের একত্র সমাবেশের পরও গবর্নেন্ট কখন উহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। স্মাশন্টাল লিবার্যাল ফিডারেশান বা জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ জন্মিয়া অবধি বৈধ আন্দোলন করিতেছেন এবং বরলাভের আশা করিতেছেন। তাঁহাদের উপরও ত সরকারের নেক নজর হইল না।

যে-মাছটা পলায় সেইটায় যেমন বড়, অতীতও তেমনি মহিমাময়! কংগ্রেসের ইতিহাসে গবর্নেন্ট কখনও উহাকে জাতীয় মনে করেন নাই, উহার কথায় কান দেন নাই। সুতরাং এখন, উহা জাতীয় নয়, বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে বন্ধা নিজেই হাঙ্গাম্পান হন।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের অধিবাসী সব ধর্মসম্প্রদায়, সব জাতি, সব শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস হউক বা না হউক, কংগ্রেসের প্রধান দাবী যে স্বরাজ, মুসলিম লীগেবও প্রধান দাবী তাহাই, জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের প্রধান দাবীও তাহাই, অ-ব্রাহ্মণদলেব প্রধান দাবীও তাহাই। অবশ্য অবাস্তব বিষয়ে সকলের দাবীতে কিছু কিছু তফাৎ আছে। কিন্তু সকলেই যখন স্বরাজ বলিতে ঔপনিবেশিক আশাসন-অধিকার বুঝে এবং তাহা চায়, তখন তাহাকেই জাতীয় দাবী মনে করা যুক্তিসঙ্গত। তাহাই জাতীয় দাবী বলিয়া মানিয়া লইয়া গবর্নেন্ট যদি বলেন, যে, সব দলের লোক একত্র হইয়া অবাস্তব বিষয়েও প্রভেদবর্জিত একটি রাষ্ট্রীয়কার্য পরিচালন বিধি বসড়া প্রস্তুত করুন, তাহা হইলে তাহা করা অসাধ্য হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করা ত ইংরেজ রাজনৈতিকদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং তাঁহাদের পূর্ন ধরিবার প্রবৃত্তিই সর্বদা সক্রিয় হইয়া আছে।

মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর হইতে প্রকাশিত শান্তিবর্ভা নামক কাগজে “হিন্দুর ভবিষ্যৎ” নাম দিয়া যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমিতেছে, আর ২৫ বৎসর সেইরূপ ক্রমিতে থাকিলে তাহাদের “ধ্বংস অনিবার্য”। সম্পাদক বলিতেছেন,

এই সংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কারণ প্রচলিত বিবাহপ্রথা। ইহাদের বিবাহযোগ্য কস্তার সংখ্যা অতি কম। দুই বা আড়াই শত টাকা পণ না প্রদান করিলে কোন পুরুষই বিবাহ করিতে সক্ষম হয় না। পণ ব্যতীত আরও দেড় শত টাকা বিবাহের বস্ত্রাদি এবং সামাজিক বিধি পালন করিতে প্রয়োজন হয়। এই সত্ত্বে তিন বা চারিশত টাকা সংগ্রহ করা সকলের ভাণ্ডে জুটিয়া উঠে না। সেজন্য প্রায় অর্ধেক পুরুষ বিবাহ কবিত্তে পারে না, চির-কোমার্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যে অতি কষ্টে এই টাকা সংগ্রহ করিয়া বিবাহ কবে, সেও বয়ঃপ্রাপ্ত উপযুক্ত মেয়ে পায় না। টাকা সংগ্রহ করিয়া ৩৫।৪০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তখন স্ত্রীর বয়স অধিক হইলেও ৮।৯ বৎসর মাত্র। স্ত্রী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন স্বামী বার্লুকো উপনীত হয়। কেহ বা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এই সকল কারণে ইহাদের সম্ভানসংখ্যা অধিক হয় না। বালবিধবা বা বিধবার সংখ্যা অনেক বেশী। প্রকৃতির দুর্গমনীয় শক্তিকে সংকত করিবার শক্তিও সকল বিধবার সমান থাকে না। সেজন্য জগৎহত্যাও বিরল নহে।

আমাদের নিজ পল্লী বশোহরের চাকুরিয়ায় প্রায় ১০ ঘর নাপিত, ৫ ঘর কামার, ১৫ ঘর তেলি, ৩ ঘর ধোপা বাস করিত। ২০ বৎসর মধ্যে নাপিত ২ ঘর, কামার ১ ঘর এবং তেলি ৫ ঘর আসিয়া পৌছিয়াছে। নাপিতের মধ্যে যে দুই ঘর এখনো আছে, তাহাদের দুইজন মাত্র বিবাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু দেনার ব্যতিব্যস্ত। অপর জন বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর আর টাকার সংস্থান করিতে পারে নাই। একজন তেলি ৪৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রীর বয়স ৬ বৎসর মাত্র। ইহার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। অধিকাংশ ধোপার বংশ লোপ পাইয়াছে, বর্তমানে প্রয়োজন অমুদ্রপ ধোপাই মিলিতেছে না।

খাজুর নিকটবর্তী একটি পল্লীতে ১২ ঘর বেহারী বাস করিত। জনসংখ্যায় তাহারা ছিল এক শতেরও উপর। বর্তমানে মাত্র দুই ঘর আছে, আর সকলেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক বাড়ীতে তিন ভাই বাস করে, তাহাদের মধ্যে মাত্র জ্যেষ্ঠের বিবাহ হইয়াছে, তাহাও ৪০ বৎসর বয়সে। তিন ভাই চাকুরী ও চাষ করিয়া যে সামান্য টাকা জমাইতে পারিয়াছিল, তাহা ব্যতীতও একশত টাকা গ্রাম্য জমিদারের নিকট ধার করিয়াছিল। সেই টাকা তিন ভাই ষাটটি আন ৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারিয়া গোপনে বাস্তবিক্তি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে পারিলে এইসকল সম্প্রদায় রক্ষা হইতে পারে। প্রত্যেকেই বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত, কিন্তু সামাজিক কীতি তাহার প্রবল অন্তরায়। যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ইহাদের বিধবা-বিবাহে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে কার্যসিদ্ধি হইতে পারে। ইহার আর কোন সহজ উপায় নাই।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞ সম্প্রদায়ের বিবাহের পন-প্রথা প্রচলিত আছে।

কিন্তু সে কন্ডার বিবাহ। কন্ডার বিবাহ বাধ্য হইয়া সকলকেই দিতে হয়। সেজন্য এই কল সপ্তদ্বারের মধ্যে আর্থিক দুর্দশা ব্যতীত লোকসংখ্যা হ্রাসের ভয় নাই। কিন্তু নিম্ন সপ্তদ্বারের মধ্যে প্রচলিত পণপ্রথার হিন্দুর সংখ্যা এতল ভাবে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি কেন্দ্রে প্রচারক প্রেরণ করিয়া এইরূপ পুশপণের প্রথা রহিত করিবার এবং আমোদন করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, পণপ্রথা বন্ধ করা এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করা ব্যতীত বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আর কোনই আশা নাই।

ব্রাহ্মণসভা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ভাল হয়। মৈমনসিংহে অনেক শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী জমিদার আছেন। তাঁহারা প্রতিকাবচেষ্টা করিলে সফল করিবে। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় এবার বঙ্গীয় হিন্দুসভার অধিবেশনে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। এই বিষয়টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাঁহার পক্ষে কাজ করা একটুকুও কঠিন হইবে না।

বাংলাদেশের অস্ত্রান্ত্র জেলাতেও এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু সমুচিত প্রতিকার-চেষ্টা হইতেছে না। কিছুই হইতেছে না, বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। বিধবাবিবাহ পূর্ষাপেক্ষা বেশী হইতেছে, কিন্তু পঞ্জাবের তুলনায় বঙ্গে বিধবাবিবাহ অল্পই হইতেছে।

বাঙালী বিধবার পঞ্জাবে বিবাহ

অনেক বাঙালী বিধবার পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইতেছে। যে-যে পুরুষ ও নারীর মাতৃভাষা এক, সচরাচর তাহাদের মধ্যে বিবাহই হইয়া থাকে, এবং তাহাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সচ্চরিত্র এবং পরিবার প্রতিপালনকর্ম সাহারই সহিত বিবাহ হউক, তাহাতে আপাত্ত বা অসন্তোষের কোন কারণ নাই। অসং লোকের সহিত বিবাহ অবাক্কনীয়—সে যে প্রদেশেরই হউক।

ভারতবর্ষে একটি প্রবল স্রসংহত জাতি গঠিত হইবার বাধা অনেক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হয় না, সে এক বাধা। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে বিবাহ হয় না, তাহা আর-এক বাধা। পঞ্জাবে ও বঙ্গে ঔদ্যাহিক সঙ্ঘ হইলে এই বাধা কতকটা অতিক্রান্ত হইবে।

বাঙালীর কিন্তু ভাবিবার দুটি বিষয় আছে। পাকীর অভাবে বা মহারথাতায় বাংলা দেশে অনেক পুরুষের বিবাহ না হওয়ায় তাহাদের বংশলোপ, স্রুতরাং বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। বাঙালী বিধবাদের বিবাহ বন্ধই হইলে এই বংশলোপ ও সংখ্যা হ্রাস কতকটা নিবারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে-সব

বিধবার বন্ধে বিবাহ না হওয়ায় পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইতেছে, তাহাদের মনে যদি তজ্জন বন্ধের প্রতি বিরাগ ও ঘেঘের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাহা তাহাদের সন্তানদের মনেও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা। ইহা প্রদেশে প্রদেশে সন্তাবের কিছু অন্তরায় হইতে পারে। যে-সব হিন্দু-বিধবা, যে-কারণেই হউক, মুসলমানী হন, তাহাদের নিজের হিন্দু-বিষেব ও তাহাদের মুসলমান সন্তানদের হিন্দুবিষেব উৎপন্ন হওয়া যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তেমন কোন বাঙালী হিন্দুবিধবাকে অগত্যা ভিন্ন প্রদেশে বিবাহ করিতে হইলে বাংলার প্রতি তাঁহার ও তাঁহার সন্তানদের অসন্তোষ জন্মিলে তাহা বিস্ময়েব বিষয় হইবে না। ইহা অবশ্য আমাদের অল্পমান। কাহারও এরূপ অসন্তোষ জন্মে নাই জানিতে পারিলে আশ্চর্য্য হইব। বাংলা, পঞ্জাব প্রভৃতি সব প্রদেশই ত ভারত-বর্ষেরই অংশ।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ২০শে চৈত্র যাদবপুর্বে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে এখন প্রধানতঃ কয়েক প্রকারের বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা প্রায়ই চাকরী দ্বারা বা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহে সক্ষম হন। ইহাতে দেশের উপকার হইতেছে। ইহার স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন :—

“বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সাহায্যে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রসার করাই বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে এপধ্যন্ত এই ইনস্টিটিউটে তিনটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। যথা :—মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এতদ্ব্যতীত একটি কৃষি-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এইজন্য একশত বিঘা জমি চাই। কর্পোরেশন এবং ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের নিকট এইজন্য আবেদন করা হইয়াছে।”

“এখনও অনেক কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। লেবরেটরী পূর্ণাঙ্গ করার জন্য টাকার প্রয়োজন। আরও কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন এবং সার্কেলারি ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ দ্বারা সমস্ত ছাত্রের বাসস্থান এখানে করা প্রয়োজন। তাহা না করিতে পারায় আমাদের উদ্দেশ্যমুহুরূপ শিক্ষাদানের বিঘ্ন ঘটতেছে। তার পর, এখনও শিক্ষা-পরিষদের ঘরের পরিমাণ প্রায় চারি লক্ষ। এইসমস্ত অভাব-অভিযোগ পূরণ করার ভার দেশবাসীর উপর। আমি আশা করি, দেশের ধনী, মনী ভ্রম্মহোদয়গণ এদিকে মনোযোগ দিবেন এবং বাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার উপায় করিবেন।”

জাতীয় এই প্রতিষ্ঠানটির অধ্যাপকেরা সরকারী কোন

শিক্ষালয়েব অধ্যাপকদের চেয়ে কম যোগ্য নন। অথচ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিদেশীদের পরিচালিত বা সরকারী কলকারখানায় কাজ পান না। আচার্য্য বায় এদিকে স্বদেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকার বাহাদুর এবং বিদেশী বণিকগণ আমরা বিদেশী পণ্য বর্জন বা বয়কট করিলে বড় ক্রুদ্ধ হন; কিন্তু নিজেরা যে আমাদের প্রতিষ্ঠানাদিকে বয়কট করেন, তাহাতে দোষ হয় না। “মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।” সে যাহা হউক, আমাদের ভাল প্রতিষ্ঠানগুলির আমরা যেন সর্বদা সমুচিত আদর ও সাহায্য কবিত্তে তুলিয়া না যাই।

ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া আচার্য্য রায় বলেন :—

‘স্বামী আরের জন্ম তোমরা বড় বাস্তব। একটি চাকুরী পাইলেই তোমরা বাঁচিয়া যাও। ইহা তোমাদের তুল ধারণ। যত ছোট হোক না কেন, নিজে নিজে ব্যবসা করিতে শিখ। সেইজন্যই তো এখানে তোমাদিগকে হাতে হেতেরে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকরী খুঁজিতে গিয়া তোমরা এই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া থাক। তোমরা বলিবে মূলধন কোথা? আমার মনে হয়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও একাত্মতা থাকিলে মূলধনের অভাব হয় না। মনে রাখিবে, এই দুই গুণ জীবনে সাফল্যলাভের উপায়।’

—

বঙ্গ ও পাঞ্জাবে কাগজের কারখানা

কলে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্ম পঞ্জাবে একটি বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। ইহার কোম্পানীর অংশ বিক্রীত জন্ম খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশে আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস কোম্পানী নামক কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। কতক টাকাও উঠিয়াছিল। যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে ক্রীত হইয়া আসিয়া শ্রামনগরে পড়িয়া আছে। কাগজে দেখিলাম, এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কাজও চলিবে না। এই ব্যর্থতার কারণ কি? সফলতার ইতিহাস এবং বিফলতার ইতিহাস, দুই-ই কাছে লাগে। সফলতার ইতিহাস হইতে শিক্ষা যায় কেমন করিয়া কার্য-সিদ্ধি হয়, বিফলতার ইতিহাস হইতে ভুল-ভ্রান্তি পবিহার করিতে শিক্ষা যায়। এইজন্য আসাম ও বঙ্গের প্রস্তাবিত কাগজের কাবখানাটি কেন অল্পেরে বিনষ্ট হইল, তাহার কারণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ প্রকাশ করিলে দেশেব উপকার হইবে।

বঙ্গীয় নারীশিক্ষার মন্তনামতা

গত ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় দেশী ও ইউরোপীয় মহিলাদের যে-সভায় বঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, যে, ইহার উদ্যোক্তাগণ খুব কার্যাত্মক। চারি দিনের অধিবেশনে অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সেগুলিও রিপোর্টে আছে। এইজন্য ইহা মূল্যবান। সভাতে নারীদের নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। সবগুলিই বিবেচনার যোগ্য। আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, বঙ্গে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সান্ত্বনয় অসন্তোষজনক। ইহা অতি সত্য কথা। তাহার পূর্ব বলা হইয়াছে, যে, এই প্রদেশের প্রত্যেক বালিকা অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য, এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। শিক্ষায়ত্নী প্রস্তুত করিবার বর্তমান বন্দোবস্ত যে ভাল ও যথেষ্ট নয়, তাহাও ঠিক বলা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট প্রভৃতি যে-সব সভাসমিতির দ্বারা দেশের শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হয়, তাহাতে নারী সভা থাকা যে প্রয়োজন, ইহাও সত্য কথা। বালিকা ও তরুণীদের দেহের উন্নতি সাহায্যে হয়, ব্যায়ামাদির দ্বারা তাহার ব্যবস্থার ঐচ্ছিক সম্বন্ধে সভায় যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অবিলম্বে তাহাতে মন দেওয়া গবর্নমেন্টের ও দেশবাসীর কর্তব্য। ইউরোপের ছোট ছোট মেয়েদের স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যের তুলনা কবিলে কাজ পায়। বঙ্গে অতীত কাল হইতে যে-সব কারুশিল্প চলিয়া আসিতেছে, তৎসমূহের উন্নতির চেষ্টা, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রেখাঙ্কন শিক্ষা, এবং চারু ও কারু শিল্প গৃহস্থালীতে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে পাবা যায় তদ্বিষয়ক শিক্ষা, প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সভা সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এই বিষয় সম্পর্কে প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত কারুশিল্পের পুনরুজ্জীব প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে, বালক বা বালিকাদের শিক্ষা, সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, গবর্নমেন্টের কিংবা খৃষ্টীয় মিশনারীদের হাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যে-সকল শিক্ষিতা বাঙালী মহিলা এই সভার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন, আশা করি, এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আছে।

বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলন

বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বক্তৃতা অতিশয় সারবান ও স্বয়ংগ্রাহী হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি জ্ঞাতির বংশগত অস্পৃশ্যতা ও অনাচারণীয়তার বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রীয় যুক্তি চান, তাহারা তাহা এই বক্তৃতায় পাইবেন। এই বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত ও রক্ষিত হওয়া উচিত। সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাব মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

“অমুমত শ্রেণীর লোকদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখার বিরুদ্ধে এই সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অস্পৃশ্যতা ঘূর্ণিত করিয়া তাহাদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অমুমতি দিতে বলিতেছে।”

“যে-সকল হিন্দু বলপূর্বক অন্তর্গত হইয়াছে, তাহাদিগকে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুধর্মে পুনঃগ্রহণের নিমিত্ত এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে।”

“অহিন্দুকর্তৃক যে সকল হিন্দুনারী বলপূর্বক অপহৃত হইয়াছেন, সেইসকল নারীকে শুদ্ধিদ্বারা হিন্দুসমাজে পুনঃগ্রহণ জন্ত এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে।”

কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলার রায়

প্রায় ২ বৎসব আগে লক্ষ্মোয়ের নিকটবর্তী কাকোরীতে রেলপথে একটা ট্রেনে ডাকাতি হয়। তাহার তদন্তের ফলে এক বিস্তৃত রাজস্রোহ ও বিপ্লবের ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। সরকারপক্ষ এইরূপ বলেন। লক্ষ্মোয়ে স্পেশ্যাল জজ হামিটন সাহেব এই মামলার বিচার করেন। ভারতবর্ষে যে-সমস্ত ষড়যন্ত্রের মামলা হইয়াছে এই মোকদ্দমাটিকে তাহার মধ্যে বৃহত্তম বলা হইয়াছে। ইহাতে আসামীদের বিরুদ্ধে আড়াই শত সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। যে-সব লোককে গবন্মেণ্ট বিনা বিচাবে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার না করিবার এই কারণ দেখান হয়, যে, তাহা করিলে আসামীদের বিরুদ্ধে যাহারা সাক্ষী দিবে, বিপ্লবীরা বা তাহাদের সঙ্গীরা তাহাদের প্রাণ বধ করিবে। বক্ষ্যমাণ মোকদ্দমা কিন্তু প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং ইহাতে ২৫০ জন লোক সাক্ষী দিয়াছে। তাহাদের কাহারও প্রাণবধ হওয়া দূরে থাকুক, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নাই। এখন গবন্মেণ্ট কি বলিতে চান?

এই মোকদ্দমায় ২২ জন আসামীর মধ্যে ৩ জনের প্রাণদণ্ড, এক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এক জনের ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, দুই জনের ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ছয় জনের প্রতি ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আদেশ বে-আইনী

হইয়াছে বলিতে পারি না, কারণ সমুদয় সাক্ষ্য পড়ি নাই। তবে, এতগুলি যুবকের এরূপ ভীষণ শাস্তি হইলে স্বভাবতঃ লোকদের সহানুভূতি তাহাদের দিকে যায়। এইজন্য জজ যদি মবকার পক্ষের মোকদ্দমা-পরিচালকের অনুরোধ অনুসারে অল্পবয়স্ক এবং ষড়যন্ত্রের সহিত গোণভাবে লিপ্ত আসামীদের প্রতি দয়া করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। দেশকে স্বাধীন করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় অনেকে ডাকাতি আদি দুষ্কর্ম করিয়া ফেলে। উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ভাল বলিয়া দুষ্কর্মের শাস্তি হওয়া উচিত নয়, বলিতেছি না; দণ্ড কিছু লঘু হইলে ভাল হইত বলিতেছি।

চীনের স্বাধীনতা-সমর

চীনের দক্ষিণেব অর্থাৎ ক্যান্টনের দল ও উত্তরের দলেব গৃহবিবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে। দক্ষিণেব দল চীনকে স্বাধীন ও বিদেশীদের সর্বপ্রকার প্রভুত্ব-পাশ হইতে মুক্ত করিতে চায়। আমাদের আন্তরিক কামনা, তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক। তাহার উত্তরের দিকে বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছে। তাহার চীনের সর্বত্র জয়যুক্ত হইয়া চীনে এক অখণ্ড সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, চীনের, এশিয়ার ও জগতের কল্যাণ হইবে।

উত্তরেব দলকে ইংরেজরা অনেক দিন হইতে সাহায্য করিয়া আসিতেছে, এরূপ কথা নানা সূত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা বিশ্বাসযোগ্যও বটে।

চীনে যুদ্ধের যত খবর ভারতবর্ষে আসিতেছে, তার প্রায় সবই ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ছাঁকনীর ভিতর দিয়া। স্বতরাং সত্য খবর কতটা আসিতেছে বলা কঠিন। ফরাসী কোন কোন কাগজ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, যে, বিলাতী কাগজে প্রকাশিত সব খবর যেন সত্য বলিয়া মানিয়া না লওয়া হয়। নান্দিনে ইংরেজরা যে গোলাবর্ষণ করে, চীনেরা বলে তাহার ফলে দু হাজার চীন মারা গিয়াছে, এবং অর্ধেকটা সহর বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইংরেজ গবন্মেণ্টের মতে ইহা মিথ্যা কথা। কিন্তু বিধাতা একমাত্র ইংরেজদিগকেই সত্যবাদী এবং অন্য সকলকে মিথ্যাবাদী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

এ পর্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে আমেরিকা ও জাপান পুরামাত্রায় ইংবেজদের সঙ্গে যোগ দিবে মনে হয় না। কারণ, সেদুপ যোগ দেওয়ায় তাহাদের লাভ নাই। জাপান চীনে নিজের বাণিজ্য বাড়াইতে চায়, আমেরিকাও তাহা চায়। চীনদিগকে চটাইলে সে-

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন যদি প্রেসিডেন্ট কুলিজ ইংরেজদের সঙ্গে ধোঁগ দেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার প্রতিযোগী দল দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। তাহাতে তাঁহার পক্ষে কিছু ভোট কমিয়া যাইতে পারে।

সম্মিলিত নির্বাচন

ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধি নির্বাচনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী এই, যে, যে-কোন ধর্মের ও জাতির লোকেরা নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারেন, এবং তাহাদের পক্ষে বেশী ভোট হইবে, তাহারা নির্বাচিত হইবেন। তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অথচ কিছু ভাল বন্দোবস্ত এই, যে, সাধারণ নির্বাচন ছাড়া কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়েব নির্দিষ্ট কয়েক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা তাহারা নির্বাচিত হইবেন। নিকৃষ্টতম বন্দোবস্ত, সাধারণ নির্বাচন ছাড়া কেবল সম্প্রদায়বিশেষ দ্বারা তাহাদের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন। এই নিকৃষ্টতম বন্দোবস্তই ভাবতবর্ষে প্রচলিত আছে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রধানতঃ মুসলমানদের ইচ্ছামুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদের কয়েক জন নেতা বলিতেছেন, যে, তাহারা কয়েকটি সর্বোচ্চ স্থিতীয়প্রকার নির্বাচনে রাজী হইতে পারেন; কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা অমুমোদিত হইলে পর তবে তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারে। কোন কোন সর্ব এইরূপ :—

সিন্ধুদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক করিয়া একটা আলাদা নূতন প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের অধীন করিতে হইবে। সিন্ধুদেশের অনেক হিন্দু ও মুসলমান এই প্রস্তাবের বিরোধী। আমবা বাহিরের লোক; আমাদের জিজ্ঞাসা, একটা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের ব্যয় নির্বাহ করিতে সিন্ধুদেশ পারিবে কি?

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ও ঘৈষাজ্য আদি ভাবত-শাসনসংস্থার আইন অমুমোদিত হইয়াছে। আমবা বাহিরের লোক জিজ্ঞাসা করিতেছি, এইসব বন্দোবস্তের খরচ উক্ত প্রদেশ দিতে পারিবে কি?

ঐ দুই প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী। কোহাট ও লড়কানার মুসলমানেরা যেরূপ স্বশাসন-প্রিয়তা

ও সভ্যজীবনধারণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রস্তাবিত নূতন বন্দোবস্তে হিন্দুদের খুব আগ্রহ হইবার কথা নয়।

আর-একটি সর্ব, পঞ্জাবে ও বঙ্গে লোকসংখ্যার অনুপাত অনুসারে মুসলমান ও অমুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ণীত হইবে; এবং বর্তমান অল্প যে-সব প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহাতে সংখ্যায় নূন সম্প্রদায়-দিগকে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কিছু বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইবে। এই সর্ব অনুসারে কাজ হইলে ফল এই হইবে, যে, পঞ্জাবে ও বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী বলিয়া তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হইবে, এবং অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম বলিয়া সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি পাইবে। সংখ্যায় নূন সম্প্রদায়েরা প্রত্যেক প্রদেশেই সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি পাইবে, এই নিয়ম হইলে পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুরাও তাহার সুবিধা পাইত, কিন্তু পঞ্জাব ও বাংলার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব করা হইয়াছে। অল্প যে-সব প্রদেশে এখন ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহাতে মুসলমানরাই সংখ্যায় কম, সুতরাং তাহারা সংখ্যার অতিরিক্ত প্রতিনিধি পাইবে। এরূপ একপেশে বন্দোবস্তের আমরা বিরোধী। হয় সর্বত্রই কেবল মাত্র সাম্প্রদায়িক সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হউক, কিম্বা সর্বত্রই সংখ্যায় নূনদিগকে কিছু বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হউক। কেবল মাত্র মুসলমানদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোথাও একরকম সর্ব, কোথাও অল্প রকম সর্বের প্রস্তাব করিলে তাহা গ্রহণীয় হইবে না।

শিশু ও বালকবালিকারা নির্বাচনে কোথাও ভোট দিবার অধিকারী-নহে। বঙ্গে তাহাদিগকে বাদ দিলে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের সংখ্যা অল্প সব সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয় না। সুতরাং এই প্রদেশে মুসলমানদের বেশী প্রতিনিধি পাইবার দাবী জায্য নহে। ইহা সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া মডার্ন রিভিউয়ে দেখান হইয়াছে।

বঙ্গে নারীনিগ্রহ

ঘরে বাইরে এই প্রদেশে নারীনিগ্রহ বহুবৎসর ধরিয়া চলিতেছে। বাংলা খবরের কাগজ খুলিলেই ইহার অন্ততঃ দুই একটা সংবাদ প্রত্যহ চোখে পড়ে। কোন কোন সংবাদ অতি ভাষণ। গবর্নমেন্টের ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার আশু প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

সম্মানবীর প্রত্যেক সংখ্যায় ১৩২২ সাল হইতে নারী-নিগ্রহের আত্মপুঙ্খিক তালিকা দেওয়া হইতেছে। কেবল ২৪শে চৈত্রের কাগজখানিতেই যে পঞ্চাশটি অত্যাচারিতা নারীর বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হয়, যে, তন্মধ্যে ২২ জন সখা, তিনজন বিধবা, চারিজন কুমারী, বাকী চৌদ্দ জনেব অবস্থা অজ্ঞাত। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে, বিধবাদের উপরই অধিকাংশস্থলে দুর্য্যক্ত লোকেরা অত্যাচার করে, এই ধারণা বর্তমান তালিকা অনুসারে সত্য নহে। মোটের উপরও সত্য না হইতে পারে। অত্যাচারিতা পঞ্চাশটি নারীর মধ্যে ১৫ জন মুসলমান, ৩০ জন হিন্দু, বাকী ৫ জনের ধর্ম অজ্ঞাত। ইহা হইতে বঝা যাইবে, যে, নিগ্রহীতাদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা কম নহে। সচ্চরিত্র ও বিবেচক মুসলমানেরা অবশ্য অত্যাচারী ও অত্যাচারিতাদের ধর্মনির্বিশেষে পাশবিক অত্যাচারকে ঘৃণা করেন। কিন্তু যাহারা সাম্প্রদায়িক অন্ধতা বশতঃ মনে করে, যে, ধর্মিতা নাবী হিন্দু এবং অভিসূক্ত ব্যক্তি মুসলমান হইলে সংবাদটাই মিথ্যা কিম্বা নারীটিরই দোষ ছিল, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, মুসলমান পুরুষেই মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার বড় কম স্থলে কবে না। ৫০টি অত্যাচার-সংবাদের মধ্যে ২৫টিতে অত্যাচারীরা কেবল মুসলমান, ১০টিতে অত্যাচারীরা কেবল হিন্দু, তিনটিতে অত্যাচারীরা হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত দল, এবং বাকী ১২টির বিশেষ বৃত্তান্ত জানা নাই। ইহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই ভাবিবার বিষয় এবং লজ্জার কারণ আছে। কেবল দুইটি ঘটনায় দুর্য্যক্ত হিন্দু মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। তদ্বিষয়ক তদন্ত বা মোকদ্দমার ফল অজ্ঞাত। অধিকাংশ স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমান এবং অত্যাচারিতারা হিন্দু। বঙ্গের মুসলমান ও হিন্দু পুরুষ ও নারীগণ আগিয়া মাতৃভূমির কলক অপনোদন করুন।

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য

বিনা বিচারে যে-সকল লোককে রাজবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি তাহাদের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা করুণ মনোযোগী, খবরের কাগজে তাহাদের নানা ব্যারামের সংবাদ হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এবিষয়ে তাহাদের অভিযোগ যথাস্থানে পৌছে, না, মাঝপথে মারা যায়, তাহা বুঝিবাব উপায় নাই। ওরা এপ্রিল তারিখের বেঙ্গলী ও অন্ত কোন কোন কাগজে ছাপা হইয়াছিল, যে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কতেগড় সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত এবং নলিনীকান্ত রায় নানা ব্যাধিতে

ভুগিতেছেন। কোন প্রকার ব্যায়ামের, এমন-কি ভ্রমণেরও বন্দোবস্ত না থাকায় তাহাদের পীড়া বাড়িতেছে। একটি সর্দীর্ণ জ্বরগ্নয় তাহাদিগকে দিনরাত থাকিতে হয়। জেলের এলাকাত্তর স্থানে মুক্তবায়ুসেবনের কয়েকটি ভাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও এবং জেলের অধ্যক্ষের নিকট বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তাহাদিগকে ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ু সেবনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। শুনা যায়, যে, স্থানীয় কর্মচারীরা বলেন, যে, বাংলা-গবর্নমেন্টের একটি হুকুমে তাগদের হাত পা বাঁধা। হুকুমটির তাৎপর্য্য এই, যে, বন্দীদের জন্ত মুক্তবাতাস, খেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বাংলা-গবর্নমেন্টের সম্মতিক্রমে করিতে হইবে। কিন্তু যদিও বহুসংখ্যক দরখাস্ত ও স্বাক্ষরকলিপি বাংলা গবর্নমেন্টকে পাঠান হইয়াছে, তথাপি এই সম্মতি আসে নাই।

বেঙ্গলী প্রভৃতি কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা যদি নির্ভুল সংবাদ হয়, তাহা হইলে তাহা বড় চমৎকার ব্যাপার। রাজবন্দীনিগের স্বাস্থ্যের জন্ত যাহা প্রকার, তাহা করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু বাংলা গবর্নমেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা করিবার জো নাই। প্রথমতঃ, ইহাই ত এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। আর যদি ব্যবস্থা তাহাই হয়, তাহা হইলে দরখাস্ত ও স্বাক্ষরকলিপি সত্ত্বেও সম্মতি দেওয়া হয় না কেন? বাংলা গবর্নমেন্ট বলিতে অবশ্য বুঝায় সর্কোলিল বঙ্গের গবর্নর বাহাদুর। দরখাস্ত আদি একাধিক তাহাদের কাছে পৌছায় না, হয় ত কোন কর্মচারীর মারফতেও পৌছায় না। কোন সেক্রেটারী বা আণ্ডার-সেক্রেটারী বা অধ্যক্ষ কর্মচারী কি তাহা চাপা দিয়া রাখেন না, তাহার উপর একটা যা হোক কিছু নিষেধাত্মক হুকুম দিয়া কাজ খতম করেন? এই বিষয়ে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট্‌স্‌ এসোসিয়েশনের সম্পাদকের বন্দী সেক্রেটারিয়েটের সহিত পত্র ব্যবহার করা উচিত।

রাজবন্দীদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত দৈনিক আহারের প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ হুকুম ত নাই, যে, বাংলা গবর্নমেন্টের সম্মতি না যাইলে তাহাদিগকে খাইতে দিতে পারা যাইবে না। তাহা হইলে মুক্ত বাতাস, খেলা ও ব্যায়ামের বেলায় কেন এরূপ হুকুম করা হইয়াছে?

কলিকাতা অনাথ-আশ্রম

সম্প্রতি এই আশ্রমের সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাব সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে, আশ্রমটিতে এক শত অনাথ বালকের ভরণপোষণ হয়।

গত ৩০ বৎসর ধরিয়া আশ্রম এই সংকার্য করিয়া আসিতেছেন। এই কার্যে সর্বসাধারণের সাহায্য করা [অবশ্যকর্তব্য]। ঠিকানা—বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাইকেলে পৃথিবীভ্রমণ

খ্রীষ্টাব্দে অশোক যুগোপাধ্যায় ও অম্বা যে কয়েকজন বাঙালী যুবকের সাইকেলে আধ্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর ভ্রমণের বৃত্তান্ত গত চৈত্রের প্রবাসীতে শেষ হইয়াছে, তাঁহারা সাইকেলে পৃথিবীভ্রমণের জয় বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের গত ২০শে চৈত্র চাকলা জাহাজে করাচী হইতে ইরাক দেশে যাইবার এবং ২৪শে চৈত্র বসরা পৌছিবার কথা ছিল। বাঙালী জাতি তাঁহাদের এই সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার উদ্যমের সাক্ষ্য কামনা করিবে।

“ধাতুরূপ-মহারব”

সংস্কৃত ভাষায় যত ধাতু আছে, সমুদয় পুরুষ, কাল, ব্যাচ প্রভৃতিতে তাহাদের রূপ কোন বহিতে পাওয়া যায় না। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস্ দেবনাগর অক্ষবে এক-খানি বৃহৎ পুস্তকে তৎসমুদয় মুদ্রিত করিতেছেন। সংস্কৃত অভিধান যেমন সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও চতুষ্পাঠীতে রক্ষিত হয়, এই গ্রন্থও সেইরূপ রক্ষিত হইবার যোগ্য। মূল্যাদি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় জ্ঞেয়।

লর্ড লিটনের পরামর্শ

লর্ড লিটন যে-বক্তৃতা দিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তাহাতে বলেন, হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া ধর্মবিষয়ক নহে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত। তিনি বলেন, শান্তির একমাত্র পথ, ধর্মসম্প্রদায় অহুসারে দল গঠন না করিয়া রাজনৈতিক মত অহুসারে তাহা গঠন করা। ইহা শান্তির একটি উপায় বটে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা থাকিতে ইহা কেমন করিয়া অবলম্বিত হইবে?

নেপালে রেলওয়ে

নেপালের সীমার মধ্যে প্রথম রেলওয়ে খোলা সন্ধ্যার বিষয়। আশা করা যায়, ইহার দ্বারা নেপালের পণ্যশিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইবে, এবং লোকদের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি হইবে ও সংহতি বাড়িবে।

স্মার উইলিয়ম সিম্পসনের সাক্ষ্য

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে দেখিলাম, কলিকাতার অন্যতম দূতপূর্ব প্রধান স্বাস্থ্যকর্মচারী সিম্পসন সাহেব বলিয়াছেন, যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভারতীয় ডাক্তারেরা তিন বৎসর পরীক্ষার পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, যে, ওলাউঠার টীকা শতকরা ৮০ জনকে ঐ ব্যারাম হইতে রক্ষা করে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারদেরই সাহায্যে সিম্পসন আবিষ্কার করেন, যে, ওলাউঠা বাতাসের দ্বারা সংক্রামিত হয় না; দূষিত জল, দুধ ও মাছির দ্বারা হয়। ইহা ভারতীয় ডাক্তারদের প্রশংসার বিষয়।

ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব

সম্রাতি বোম্বাই প্রদেশে নানা স্থানে ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব হইয়া গিয়াছে। বোম্বা ও সাম্রাজ্যস্থাপক তাঁহার যে যশ আছে, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ উভয়েই জয়লাভের বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছিলেন। কেবল মুন্সেই যে তাঁহার প্রতিভা খেলিত, তাহা নহে। সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনের বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছিলেন। শত্রুমিত্র সখ্যমী বিধর্মী নিবিশেষে সকল নারীর সম্মান রক্ষা এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বিষয়ে তিনি তাঁহার যুগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি সচরাচর হিন্দুদেরই বন্দনীয় বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সম্মান পাইবার অধিকারী। কারণ, তাঁহার জীবন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহার মত এত বড় একটি মাহুষের জন্ম দিবার সামর্থ্য সকল ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মাহুত্বম ভারতবর্ষের আছে।

ভ্রম-সংশোধন

১২৪ পৃষ্ঠার ৩ষ্ঠীনে চিত্রের চিত্রকরের জীবিতকাল ১৪৪২—১৪৪২ স্থলে ১৪৪২—১৪২৪ হইবে।

১৪১ পৃষ্ঠা; ১ম স্তম্ভ, ২২ পংক্তি, “আইন” হইবে “স্বদেশীয় ও অন্তর্জাতিক আইন”। ১৪২ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২ পংক্তির পর বসিবে, “অর্থনীতি ইতিহাসাদি বিষয়ের অধ্যাপনা সেই সেই বিষয়ের এম্-এ শ্রেণীর সহিত হইতে পারে”।



মৃত্যুদূত

শিল্পী শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৭শ ভাগ

১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

২য় সংখ্যা

বর্ষ-শেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুব পশ্চিম পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে ।
অন্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি'
ছড়ায় ঐশ্বর্য্য তার ভরি' দুই মুঠি ।
বর্ণ-সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিছু মহিমা ।

এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি',
—কত ভালোবেসেছিছু আমি ।

অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি' আপন চারিধার ✓
জীবন মৃত্যুরে দিলো করি' একাকার ; ✓
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে ✓
ভরি' দিলো অপূর্ব্ব অমৃতে ॥ ✓

হৃৎকের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী ।

কতদিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইসারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বন্ধ বিধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জ্ঞানিয়াছি তারে ॥

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্ণিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে-লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে মনে।
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে।

ঐহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রম্বিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানব-জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিত যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জ্ঞানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জলি'
জ্ঞানি তাহা সকলের বলি'।

ধূলির আসনে বসি' ভূমায়ে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাক দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে তুষ্কর যজ্ঞযাগ,
 আমি তার লভিয়াছি ভাগ ।
 মোহবন্ধ-মুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
 তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয় ।
 যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লজ্জিল অনায়াসে,
 স্থান মোর সেই ইতিহাসে ॥

শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি যতবার ভুলি কেন নাম,
 তবু তাঁরে করেছি প্রণাম ।
 অস্তুরে লেগেছে মোর স্তব্ব আকাশের আশীর্বাদ ;
 উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ ।
 এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
 মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হ'বে ॥

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন,
 মৃত্যু, তুমি ঘুচাও স্তম্ভন ।
 কত কি গিয়েছে ঝ'রে, জানি জানি কত স্নেহ শ্রীতি
 নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি ।
 মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
 ওগো শেষ, অশেষের ধনে ॥

৩০শে চৈত্র ১৩৩৩

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পত্র *

(১)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহু

তোমার জন্মদিনের জন্তে তিনটে ধাঁধা চেয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তুমি নিজেই এমন একটি ধাঁধা তৈরি করেছ যে, আমি তার কিনারা করতে পারুনি। তোমার চিঠি যখন এস তখন তোমার জন্মদিন পেরিয়ে গেছে—তোমার সেই গেল-জন্মদিনে আমার ধাঁধা পৌঁছেবে কি ক’রে? তা ছাড়া আর-একটা মুশ্কিল আছে—আমি অনেক রকম লেখা লিখেছি, কিন্তু জেনে শুনে ইচ্ছে ক’রে ধাঁধা লিখিনি। আমার অনেক লেখা অনেক লোকে ধাঁধা ব’লে মনে করে, কিন্তু সেরকম ধাঁধা ত কারো ভালো লাগে না। কিন্তু রোসো—মনে পড়ছে অনেক দিন আগে যখন তুমি জন্মাওনি, হয়ত তোমার মাও জন্মানিনি, তখন ছেলেদের জন্তে কখনো কখনো হৈমালি তৈরি করেছি। তারি থেকে তিনটে তোমাকে পাঠাই—আম্ছে বছরের জন্মদিনের আগে হয়ত তুমি পাবে।

(১) তিন অক্ষরের কথা। প্রথম ও শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে কাণ থাকে না। শেষ দুটো অক্ষর ছেড়ে দিলে মান থাকে না। সমস্তটা ছেড়ে দিলে প্রাণ থাকে না। = **কামনা**

২) চার অক্ষরের কথা। প্রথম দুটো অক্ষর একটি প্রাণী, শেষ দুটো অক্ষর তার বন্ধন। সমস্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাঁধা পড়লে সেই প্রাণীর অবস্থা।

(৩) তিন অক্ষরের কথা। তার প্রথম অংশটাকে

* “প্রবাসী” এবং অন্তান্ত মাসিকপত্রে বিজ্ঞাপনের উত্তরে যেটি একটি মেয়ের লেখা কবির এই কবিতাটি চিঠি আমরা পাইয়াছি। শেষ কবিতাটি রচনা করিয়া কবি তাঁহার পূর্বপ্রতিভার স্বপক্ষে ধরিলাম।

—সম্পাদক, “প্রবাসী”

ইংরেজি শব্দ ব’লে ধ’রে নেওয়া যেতে পারে। তারো যা মানে বাকি অংশটারও দেই মানে, সমস্ত কথাটারই সেই একই মানে। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩০২

শুভাকাঙ্ক্ষী

“রবি-বাবু”

(২)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহু

তুমি আর ফুলদিদি দুই বোনে আমার দুই ধাঁধার উত্তর ঠিক বের ক’রে দিয়েছ। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার বাবা ধাঁধার উত্তর বের করবার বয়স পেরিয়ে গেছেন। আমার তৃতীয় ধাঁধার উত্তর হচ্ছে ‘সংগীত’। Song গীত। প্রথম অংশটাকে ইংরেজি শব্দ ব’লে ধ’রে নিলে তারও যা মানে, তার পরের অংশেরও সেই মানে, সমস্ত কথাটারও সেই মানে।

আমি কেমন আছি জানতে চেয়েছ। খুব ভালো আছি। ছেলে-বেলায় অস্থির করলে খুসি হতুম, ইঙ্গুলে যাওয়া বন্ধ হ’ত। কিন্তু তখন শরীর এত সুস্থ ছিল যে, শরীরের উপর ভারি রাগ হ’ত। এখন শরীরটাকে অত্যন্ত সুস্থ ব’লে কেউ দোষ দিতে পারবে না—বেশ অনেক দিন ধ’রে অস্থির ক’রে আছে। ছুটি গিয়েছি। প্রায় সমস্ত দিন, রাজ হুপুর পর্যন্ত বাইরে ব’সে থাকতে পাই—কেউ বক্তৃতা করতে ডাকে না, তুমি ছাড়া কেউ ধাঁধা চেয়ে পাঠায় না, চিঠি লিখলেও জবাব দিইনি। ছেলেবেলায় ছুটির দিনে খেলা ছিল মাটির উপর ধুলো নিয়ে, আজ ৬৫ বছর বয়সে আমার খেলা নীল আকাশের উপর ভাবনা নিয়ে। কিসে ভাবনা? সেই বয়সে মন কিরে গেছে ব’লেই তোমার বয়সের মেয়ের চিঠির জবাব দিতে

ডাক্তারের নিষেধ মানিনে। আমার একটি সঙ্গিনী আছে, তার বয়স তিন—তাকে দিনের মধ্যে পাঁচ ছ বার বাঘেব গল্প বলতে হয়। আমার অল্প সব কাজ গিয়ে এই একটাতে এসে ঠেকেছে। আমার মনিবটি বড় শক্ত, কিছুতে ছুটি দেয় না।

আমার জন্মদিনের জন্তে ঘে খাতাটি পাঠিয়েছ ঠিক দিনে সেটি খুলে। আমাদের দেশে দোকানদাররা বৎসরের প্রথম দিনে নতুন খাতা খোলে। আমিও আমার ৬৫ বছর বয়সের দিনে তোমার হাতেব দেওয়া নতুন খাতা খুলে। কিন্তু আজকাল খাতা ভর্তি করবার মত মূলধন বেশি নেই। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ডাক্তারের কড়া হুঁমে চিঠিপত্র লেখা কমিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু তুমি লিখেছিলে এক বছরের মধ্যে তুমি ভালো মেয়ে হ'য়ে উঠবে তাই শুনে তোমাকে আমার এই শেষ আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে উঠলে সবাই আমার চিঠির গুণব্যাখ্যা করবে এ লোভ সামলাতে পারলুম না।

তা ছাড়া তুমি আমাকে আবার একটা মস্ত লোভ দেখিয়েছ। আমাকে বলেছ, আমি “খুব ভালো লোক।” তোমাকে আমি চিঠি লিখেছি এই হচ্ছে ত্বার একটিমাত্র প্রমাণ। এত সহজে এত বড় ব্যাতি আমার জীবনে আর কখনো পাইনি। এ জগতে ছুঃসাধ্য ভালো কাজ ক'রেও “ভালো” উপাধি সব সময়ে মেলে না। তাই তোমার কাছ থেকে আমার “ভালো” উপাধি আরো পাবা ক'রে নেবার জন্তে এই চিঠিখানি লিখলুম। অতি অল্প দিনেব

মধোই জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেব। অতএব এ চিঠির উত্তরে তোমার কাছ থেকে দ্বিতীয় প্রশংসাপত্র পাবার আশা নেই। ফিরে এসে যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয় তাহ'লে দেখতে পাবে “রবিবাবু” তোমাদেরই মত ছোট ছেলে-মেয়েদের বন্ধু। দৃষ্টব তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৭ আগষ্ট ১৯২৫

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

লিখতে যখন বলো আমায়

তোমার খাতার প্রথম পাতে

তখন জানি, কাঁচা কলম

নাচবে আজও আমার হাতে।

সেই কলমে আছে মিশে

ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,

সেই কলমে সাঁঝের মেঘে

জুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।

সেই কলমে শিশু দোয়েল

শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি।

পারুল দিদির বাসায় দোলে

কনক চাঁপার কচি কুড়ি।

খেলার পুতুল আঞ্জো আছে

সেই কলমের খেলা-ঘরে ;

সেই কলমে পথ কেটে দেয়

পথহারানো তেপান্তরে।

নতুন চিকন অশথ-পাতা

সেই কলমে আপুনি নাচে।

সেই কলমে মোর বয়সে

তোমার বয়স বাঁধা আছে ॥

৮ই বৈশাখ ১৩৩৪

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রীনিকেতন

ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীপে; হয়ত কোনো গাছ নিষ্কীব, এই আত্মহানির সে জবাব দিলে না—সে তার পত্রপুষ্প বিকশিত করলে না, সে মুচ্ছিত হ'য়েই রইল। যে গাছেব অন্তরে রসের ধারা আছে বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্র পুষ্পে বিকশিত হ'য়ে উঠে। বিশ্বপ্রাণের আত্মানে এখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনই ত উৎসব।

আমাদের দেশেও নিম্নত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিম্নতই নিঃশব্দিত। যেখানে সে-বাণী লাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসব-ক্ষেত্র রচিত হয়; সৃষ্টি-কার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে একদিন এই আত্মনবনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আত্মনাকে যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলব্ধি ক'রে একটি সৃষ্টির সূচনা হ'ল। কোথায় যে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে না। অধ্যাক্রিয়-লম্পাতে পর্ত্তশিখরে নিশ্চল কঠিন ভূবার যেদিন গ'লে যায়, সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন্ কোন্ দেশকে ফল-শালী ক'রে সাগরে গিয়ে পৌঁছেবে সেদিন তা কেউ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু গতি যেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেগে আপনার ভাগ্যকে বহন ক'রে চলে। কত বিচিত্র শাখায় যে তার পবিপতি হ'বে সে তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা যে, তার কল্পশক্তি মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একলা দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন আমরা কোনো একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলাম, তাই নিয়ে আত্মাভিমানের ছোট কথাটি আজকের কথা নয়। আমাদের আনন্দ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে

আমাদের ইচ্ছার মিলন হ'বার চেষ্টা জেগেছে; সেই মিলন-সাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আজ তপস্কার দীক্ষাগ্রহণের স্মরণের দিন। আজ মনকে নম্র কর, আপনার মধ্যে যে-দীনতা রয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন কর—আনন্দে এবং গৌরবে। আজকে বিচার ক'রে দেখতে হবে যে-কাজের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কি। আমাদের উদ্ভট্ট নিয়ে আমরা দাতা বৃত্তি করতে চাইনি। দেশের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তি মুচ্ছিত হ'য়ে পড়েছে তাকে সতেজ ক'রবার সঙ্কল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈমন্তই আমাদের সকলের চেয়ে বড় অপমান—বাইরের অপমান তারই আত্মঘাতিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার সহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে ও চীনে প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ব-বোধের স্বত্বশ্রেষ্ঠ আয়ুজ্যল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আমাদের কোন্ ভাগ্য দোষে সমাজের সেই ব্যাপক ব্যবস্থার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। রাজশক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন ক্ষুর্ভিকে চারদিক থেকে নিরস্ত ক'রে দিলে। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে-খাদে সহজে সঞ্চারিত ক'রত, ব্যবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সুবিধা ক'রবার জন্তে তারই মাহুত মাহুত বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে। এই বাঁধগুলিই হচ্ছে সহর। এ আমাদের দেশের প্রাণ-প্রকৃতির মূলে যা দিয়েছে। সহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তীব্রতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাহিরে ঘন দুঃখের ছায়া বিরূপ অন্তহীন। অন্ন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আনন্দ নেই; আলোর পর আলো একে একে নিবল। যদি দেখতুম যা হারিয়েছি,

সঙ্গে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেলুম তাহ'লেও সাক্ষ্য পাওয়া গেল সেত কলকারখানার জিনিষ, আপিস-আদালতের জিনিষ, বেচা-কেনার জিনিষ, সে ত অপ্রকাশ প্রাপের জিনিষ নয়। তাতে স্ববিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেখানে আপনাকে উপলব্ধি করে না,—সেখানে যেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীরের অভিসারে সে আপন কুল খোঁয়াতে বসেছে।

এ দুর্গতি কিসে দূর হ'বে?

ছোট ছোট আত্মকুল্যের দ্বারা ত হ'বে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবে তালিকা প্রস্তুত করে দেখা সমস্তকে ঝুঁক'রে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায়-প্রশাখায় ছড়ানো, সে হ'চ্ছে প্রতিহত চিন্তাধারার গুণত। মানুষের চিন্তা যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে। তার থেকে সে যা-কিছু ফল পায় সে-ফল তত মূল্যবান নয় যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্ম-শক্তির উপলব্ধি। এতেই তার সকলের চেয়ে বড় আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড় পরিচয় হ'চ্ছে, সে সৃষ্টি-কর্তা। আমাদের এই আপন সৃষ্টি-শক্তির মধ্যে আমরা বিশ্বস্ততার স্পর্শ পাই। তার সঙ্গে সহযোগিতাতেই আমাদের গৌরব, আমাদের কল্যাণ। যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ, সেইখানেই আমাদের যত কিছু দুর্গতি। যেখানে বিশ্বসৃষ্টিতে আমাদের কাজের বিধান নেই, কেবল ভোগের বরাদ্দ, সেইখানে ত আমরা পশু। মানুষ আপন ভাগ্যকে আপনি গ'ড়ে তোলে, সেই তার আপন জগৎ। আত্মকর্তৃত্বের, আত্ম-সৃষ্টির সেই জগৎ যদি হারিয়ে থাকি, তবে সবই হারিয়েছি। মানুষের মধ্যে যিনি ঈশ্বর আছেন তাঁর উদ্বোধন করতে হ'বে। আমরা

এই গ্রামের দ্বারে এসে সেই দেবতাকে ডাকছি, অন্তরের মধ্যে রুদ্ধ-দ্বার হ'য়ে রয়েছেন ব'লে যার পূজা হচ্ছে না। মানুষ জুড়ের মতন হ'য়ে রয়েছে শুষ্ক কাঠের মতন, যার ফল নেই, ফুল নেই। মানুষের এত বড় অবমাননা ত আর হ'তে পারে না।

প্রশ্নকারী বলতে পারেন, তেত্রিশ কোটির তোমরা কি করতে পার? কিন্তু বিধাতা তো তেত্রিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেননি? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন তুমি কী করছ? যে কার্যক্ষেত্রে তোমার সেখানে তুমি নিজেই সত্য করেছ কিনা? তেত্রিশ কোটির কি করতে পারি, এ প্রশ্ন দ্বারা করেন তাঁরা সত্যকাজের পথকে বন্ধ করেন। ছঃসাধ্য সাধনের চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। যারা আমাদের চারদিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বলতে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন ক'রে চলবে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোট ভায়গায় সার্থক ক'রে তুলি, তাহ'লে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস ক'রো না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হ'লেও দিবিজয়ী। আপনার অন্তরের দানতাকে দূর করো; তপস্বীকে সার্থক ক'রে তোল; তাহ'লে এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হ'বে—শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হ'য়ে ছায়াধান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে। *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* শ্রীনিকেতন সাপ্তাহিক উৎসবোপলক্ষ্যে কবিতা বক্তৃতা তার সারসংক্ষেপ। বক্তা কর্তৃক লিখিত।

খোয়াজা ইমাম আবুলফতেহ ওমর-বিন-ইব্রাহীম-অল-খৈয়ামা

সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রী অমৃতলাল শীল

আজকাল বাঙ্গালী পাঠকেরা সকলেই ওমর খৈয়ামের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি কবিতা [চতুর্দশী কবিতা] ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে ফিটস্জিভল্ড্ (Fitzgerald) তাঁহাকে আপনার দেশবাসী ও ভাষাভাষীদের কাছে ইবানের কবি রূপে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর নানা ভাষাতে ঐ কবিতাগুলি অনুবাদিত হইয়াছে; অস্ত্র ইউরোপীয় কবিরাও খৈয়ামের মূল কবিতা আপনার আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় কবিরা ফিটস্জিভল্ড্‌র কবিতাগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। খৈয়ামেব দেশবাসীরা, কিন্তু, তাঁহাকে কোন কালে কবির আসন দেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই ইরানে পার্সী ভাষায় তজকরাৎ-উল-শোয়বা [কবিদের বিবরণ] অনেক-গুলি লেখা হইয়াছে; এরকম কোনও পুস্তকে কোনও লেখক তাঁহাকে কবি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কয়েকখানি তারীখ-উল-হুকমাতে [দার্শনিকদের ইতিহাসে] তাঁহার নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। যে প্রাচীনতম গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা ১১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত; ও তাহার নাম চহার-মকাল। তাহার প্রণেতা কবি নিজামী উরুসী খৈয়ামের কাছে দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই খৈয়ামকে ভাল করিয়া জানিতেন। খৈয়াম সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের দেখা কথা, পরের কাছে শোনা কথা নহে, অতএব বিশ্বসনীয়। তিনি খৈয়ামের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে একমত না হইলেও তাঁহাকে একজন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান, বৈয়াকরণ, দার্শনিক, ইতিহাসজ্ঞ, কারী, (১) চিকিৎসক, ও গণিত এবং ফলিত জ্যোতিষী রূপে জানিতেন।

চহার-মকাল শব্দের অর্থ চার পর্ক, উহা চাব ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিজামী বড় ষ্ট্রবড পদ্য-লেখকদের কথা, দ্বিতীয় ভাগে পদ্য-লেখক কবিদের, তৃতীয় ভাগে নজুমী [ফলিত জ্যোতিষী]-দের ও চতুর্থ ভাগে চিকিৎসকদের কথা লিখিয়াছেন। তিনি কেবল তৃতীয় ভাগে ফলিত জ্যোতিষীরূপে খৈয়ামের কয়েকটি গল্প দিয়াছেন। তাঁহার পর জমাল উদ্দীন কফতী, শহব জোরী, দগলৎ শাহ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখকেরা খৈয়ামকে হকীম [দার্শনিক] ও নজুমীরূপেই বর্ণিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই খৈয়ামেব সম্বন্ধে হুজ্জৎ-উল-হক [হুজ্জৎ = প্রমাণ। হক = সত্য। সত্যের প্রমাণ স্বরূপ, Authority, যে বিধানের বচন বা অবজ্ঞা সত্যের প্রমাণ স্বরূপ, যাহার আদেশে উপর আর তর্ক করা চলে না] অ-অলম-ইলম-ইউনান [ইউনান দেশেব বিদ্যায় অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়] ও অলম-জমা [সেকালের সর্বাঙ্গীণ] বড় বিদ্বান, greatest scholar of the age] শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কবি বলেন নাই।

ইরানে বিদ্বান মাঝেই পদ্যরচনা করিতে অভ্যাস করেন ও পদ্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করেন। যে কিছু পদ্য রচনা করিয়াছে সে-ই যদি কবি হয় তবে অবশ্য খৈয়াম কবি ছিলেন। একজন ইউরোপবাসী পাবসা ভাষায় পণ্ডিত ইরানের শ্রেষ্ঠতম সূফী কবি (mystic poet Moulana Room) মওলানা রুমের শ্রেষ্ঠতম কাব্য গ্রন্থ মস্নবীর অনুবাদ করিয়া পরে ঐ কবিতার সহিত খৈয়ামের কবিতার তুলনা করিয়াছেন, ও নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, খৈয়ামের কবিতাতে মওলানা

(১) বেদ যেমন সূর করিয়া পড়িতে হয়, সেইরূপ কোরাণও বিশেষ সূর ও উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়। ইহা এক বিশেষ

প্রকার বিদ্যা (Science)। এবিদ্যাকে “কিররৎ” ও পাঠকে “কারী” বলে। কোরাণ সাত প্রকার সূরে পড়া যায়। খৈয়াম সকল প্রকার সূরে পড়িতে পারিতেন, ও এবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

রুমের কবিতার মত সূক্ষ্ম ও উচ্চ ভাব নাই, ও খৈয়াম্ সুরা সম্বন্ধে এত কবিতা লিখিয়াছেন যে তাঁহাকে অহঙ্কারী সুবোম্মত ও মাতাল কবি (A Study in vanity and Dipsomania এবং Bacchanalian Poet) বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সমালোচনা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি খৈয়ামের ভাব গ্রহণ কবিত্তে পারেন নাই। মওলানা রুমের মস্নবীর সহিত খৈয়ামের কবিতা তুলনা করিয়া সমালোচক নিজেই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, কেননা অনেক সমালোচকের মতে ঐ মস্নবীখানি জগতের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের মধ্যে একখানি, ও খৈয়ামকে তাঁহার ভাষাভাষীরা কবি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। অরবী, পার্সী ও উর্দু কবিতা বিশেষতঃ গজল হইতে, ‘সুরা, সাকী, গুল ও বুল বুল’ এই চারটি শব্দ তুলিয়া লইলে, কবিতার কবিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচ্য কবির সুরা শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত করেন। ভারতের ঐশ্বর্য ভক্ত কবিরাজ বলেন, “হরি-রস-মদিবায় মাতিঙ্গ সকলে।” এখানে মদিয়া যে বাস্তব সুরা (alcohol) নহে তাহা ইউরোপীয়েরা সহজে বুঝিতে পারেন না। পার্সী ও উর্দু কবিরের মধ্যে গ্রাহ্য কখনও সুরা স্পর্শ করেন নাই, তাহার আশ্রয় কিরূপ জানেন না, তাঁহাদের কবিতাও সুরার গুণবর্ণনা-পূর্ণ। ইরানে নিজে হাতে ঢালিয়া সুরাপান প্রায় কেহ কবে না। ধনবানদের গৃহে অতিথি আসিলে একটি জ্বলন্ত যুবতা দাসী বাদা [বড় পাত্র Decanter] হইতে জামে (wine-glass) ঢালিয়া একটি পোয়ানে [tray] রাখিয়া গৃহ-কণ্ঠার সম্মুখে ধরে। সম্মানিত অতিথিকে গৃহকর্ত্তা স্বহস্তে জাম দেন, সমান পদের লোককে দিতে হইলে দাসীকে দিতে আজ্ঞা করেন। এই পরিবেশন-কারিণী দাসীকে সাকী বলে। সুরা-বিক্রয়ের দোকানেও সাকী (Bar maid) থাকে। ভারতে এপ্রথা নাই; ভারতের কবির কখনও সাকী দেখেন নাই, তথাপি উর্দু গজলে সাকী ও শবাব শব্দের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইরানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে খোরাসান প্রদেশ, তাহার প্রধান নগর নেশাপুর একটি বহু প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্র। নেশাপুরের একটি পাঠশালায় ঐশীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি খৈয়ামকে বিদ্যার্থীরূপে দেখিতে পাই।

এই নগরেই তাঁহার জন্ম, বাপ, ও মৃত্যু হইয়াছিল। পরে, ইরানের সম্রাট জলাল উদ্দীন মলিক শাহ যখন প্রাচীন পঞ্জিকা সংস্কার করিয়া আপনার নামে নূতন সম্বৎ চালাইবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি মান-মন্দির স্থাপন করিলেন, তখন খৈয়ামকে তিন জন প্রধান গণিতজ্ঞ জ্যোতিষীদের মধ্যে একজন রূপে দেখিতে পাই। এই জ্যোতিষীরা মিলিয়া যে সারণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার নাম “জীচ মলিক শাহ” [Malikshahi Astronomical Tables] রাখা হইয়াছিল; কিন্তু যেকারণেই হউক, ঐতিহাসিকরা ঐ সারণী প্রস্তুত করিবার সম্মান একমাত্র খৈয়ামকে দিয়াছেন। মলিক শাহের সংস্কৃত জলালী সম্বৎ (Jalali Era) ১০৭২ ঈশাব্দের সায়েন মহাবিশুব সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হইয়াছে ও এখনও প্রচলিত আছে। তাহার পর খৈয়ামকে নেশাপুরে দার্শনিক পণ্ডিত ও নজুমী [ফলিত জ্যোতিষী] রূপে দেখিতে পাই। তিনি বোধ হয় রাজ-সরকার হইতে বিদ্বানরূপে কিছু বৃত্তি পাইতেন। তিনি আপনার গৃহে বসিয়া দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। একরূপ অবস্থার অধ্যাপকরা ছাত্রদের কাছে এখনও বেতন স্বীকার করেন না। তাঁহাকে অন্য কোনও অর্থকরী কার্য্য কবিত্তে দেখি না। ফলিত জ্যোতিষের বিচার করাইতে দূর দেশ হইতেও তাঁহার কাছে লোক আসিত তাহাতে বোধ হয় কিছু হদিয়া [দক্ষিণা] পাইতেন। ইসলাম-জগতে দর্শন-শাস্ত্র বড় অদৃত ছিল না। খৈয়ামের সমসাময়িক একজন ফকীহ [ধর্মশাস্ত্রবিদ] দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এখনও ইসলাম-জগতে সম্মানিত। দর্শনের ঐশ্বরবাদ কোরানেব মতের বিরুদ্ধ, সেইজন্য রাজসম্মতাবলে বলীয়ান মোজাররা তাঁহাকে কাফের বলিয়া গীড়ন করিতে ছাড়েন নাই।

খৈয়াম অন্তরে দার্শনিক ছিলেন; তিনি যতদূর সম্ভব মুসলমানদের আচার ও শাস্ত্রেব আজ্ঞা মানিয়া চলিতেন; যখন ইচ্ছা হইত নমাজ উপাসনা করিতেন, রোজাও করিতেন; কিন্তু এগুলিকে ফর্জ [যবজ্য কর্তব্য ধর্ম] ও স্বর্গে যাইবার একমাত্র পথ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। কখন কখন বিক্রম করিতেও ছাড়িতেন না, যেমন তিনি বলিয়াছেন :—

“আমাকে যদি উপাসনার প্রতিফল স্বরূপ স্বর্গ দাও, সে ত বেতন হইল, তোমাব করুণা ও দয়ার দান কোথায় ?” আবার কোরাণের নিষেধ সত্ত্বেও সুরাপান করিতেন।

কোবাণে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমুসারে মুসলমান প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ উপাসনা করিতে বাধ্য। নমাজের সময় হইলে মসজিদের মিনার বা কোনও উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া একজন লোক উপাসকদের উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে। এই ব্যক্তিকে “মোয়জ্জিন” ও ঐ ডাককে “অজ্ঞান” বলে। অজ্ঞানের শব্দ শুনিতে পাইলে সহস্র প্রয়োজনীয় কর্মত্যাগ করিয়া মসজিদে যাইতে হয় ও সকলকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একত্রে একই ভাবে, একই ভাষায়, কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন প্রণত হইয়া উপাসনা করিতে হয়। ঐশ্ব্যাম মসজিদে গিয়া উপাসনাও করিতেন, আবার বলিতেন, ‘ঈশ্বর কি ঘড়ীর অধীন ? একস্থানে একত্রিত হইয়া একই প্রকার ব্যায়াম করিয়া একই সময়ে একই ভাষায় উপাসনা করা বাহ্য প্রতারণার রূপান্তর মাত্র, ঈশ্বর এত সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন।’ তাঁহার এইরূপ উক্তি বা বিজ্ঞপ্তি শুনিয়া লোকে তাঁহাকে নিরীশ্বর কাকের ভাবিত। পরকাল সম্বন্ধেও তিনি কোরাণেব আজ্ঞা বিশ্বাস করিতেন না।

কোরাণে আছে যে, মও মিনেরা [বিশ্বাসী মুসলমানেরা] বহিঃক্ষেত্রে [স্বর্গে] যাইবে। বহিঃক্ষেত্রে একটি নির্মল-শীতল-জলপূর্ণ তড়াগ থাকিবে, তাহার নাম “কওসর” বা কোসর; তাহার চারিদিকে নানাপ্রকার সুদৃশ্য গায়ক পক্ষীপূর্ণ ফল ও ফুলের স্বন্দর বাগান থাকিবে; বাগানে চারটি নহর [ছোট নদী] থাকিবে, তাহাতে বিশুদ্ধ সুরা, মধু, দুগ্ধ ও মিষ্ট শীতল জল প্রবাহিত হইবে; বাগানে মোমিনদের জন্ত নানা রত্নখচিত সুবাসিত অট্টালিকা থাকিবে; মোমিনেরা আপনার কর্মমুসারে এক হইতে আটটি কৃষ্ণ-নয়না স্থির-ধৌবনা হুর পাইবে ও উৎকৃষ্ট মূল্যবান বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া ঐ অট্টালিকায় অনন্তকাল বাস করিতে পাইবে, ও নানাপ্রকার উপায়ে সুস্বাদু খাবার পাইবে; এইরূপে সকল প্রকার শারীরিক সুখ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে পাইবে। এই বিশ্বাসকে বিজ্ঞপ্তি করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

“লোকে বলে, স্বর্গে কৃষ্ণনয়না হুর থাকিবে ও সেখানে বিশুদ্ধ সুরা ও মধু থাকিবে। তবে আমি যে সুরা ও কামিনী পূজা করি, তাহা উচিত কার্য্য করি। কেননা পরলোকেও ত ইহাই থাকিবে ॥”

“সাদুবা বলেন, হুবের সহিত বহিঃক্ষেত্রে ভাল। আমি কিন্তু বলি, ইহাপেক্ষা আব্দুরের সুরা অনেক ভাল ॥ যাহা নগদ পাইতেছ তাহা লও ও ভবিষ্যতেব ধারের আশা ছাড়িয়া দাও। কেন না ঢাকের বাদ্য দূর হইতে শুনিতেই ভাল। [ভাবিয়াতে বা ধারে নদীপূর্ণ সুরা পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া এখন নগদ যে এক ক্ষুদ্র পাত্র সুরা পাইতেছ তাহা খাইয়া লও, ভবিষ্যতের আশার কথা, ঢাকের বাদ্যের মত, দূর হইতে শুনিতেই ভাল ॥]”

কোরাণের আজ্ঞামুসারে পবকালে যে স্বর্গে এরূপ স্থল শারীরিক সুখভোগের দ্রব্য থাকিবে তাহা ঐশ্ব্যাম বিশ্বাস করিতেন না। তিনি কোরাণেব পরলোক, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বকে বিজ্ঞপ্তি করিয়া বলিয়াছেন—“সুরাপান কবিলে স্বর্গ কিম্বা নরকে যাইবে ? (এই প্রশ্ন করিতেছ ?) কে বা নরকে গিয়াছে ? কে বা স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে ?” “হায় ! পরলোক হইতে কেহ ফিরিয়া আসিল না, আসিলে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতাম। পরলোকের যাত্রীদের পরিণাম কি হইল ?”

তিনি যে সময়ে ইরানে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-সময়ে সে-দেশে মুসলমানদের দুই প্রধান শাখা শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিবাদের চলিতেছিল। আবার, শিয়াদেরও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতেছিল, দেশ রক্তারক্তি ও অশান্তি-পূর্ণ ছিল, কিন্তু তিনি নিজে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তিদ্বারা জানা যায় না। প্রবল-পরাক্রান্ত খলীফাদের বংশধর তখন নামে ইসলাম-জগতের প্রধান হইলেও কার্য্যতঃ ইরানের প্রবল সম্রাটদের আজ্ঞাকারী ছিলেন, তাহার পূর্ব ক্ষমতা পাইবার জন্ত নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কোন ধর্ম ভাল, কোন পথ স্বীকার করা উচিত, সে-কথা লইয়া সকলেই তর্কবিতর্ক করিত। এই তর্কিকদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

“কতগুলি (লোক) ধর্ম ও মার্গ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে। কতগুলি লোক বিশ্বাস ও সম্মতের দোলায়

তুলিতেছে ॥ হঠাৎ গুপ্তস্থান (আকাশ) হইতে একবাণী শুনিতে পাইল। রে অজ্ঞান! সত্য পথ ইহাও নহে, উহাও নহে ॥”

দেশের দু’তিনটি মোজার উত্তেজনা একবার নেশাপুরের জনসাধারণ খৈয়ামকে কাফের স্থির করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি কিছুকালের জন্ত পলাইয়া মক্কার প্রধান মসজিদে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি মোজাদের উপর বাগ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“তুই তিনজন মূর্খ এমন ভাবিয়া থাকেন। মূর্খতার দ্বারা বিবেচনা করেন, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ॥ যদি কেহ গাখামিতে তাঁহাদের মত গাখা না হয়, তবে তাহাকে তাঁহারা কাফের ভাবেন ॥”

খৈয়াম মসজিদগামী উপাসকদের শ্রদ্ধা করিতেন না; তাহারা যে সত্য সত্যই উপাসনা কবিত্তে যাত্নেন তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তাহাদের বিক্রপ করিয়া বলিয়াছেন :—

“আমি মসজিদে আসিয়াছি বটে, কিন্তু অভাবে পড়িয়া আসিয়াছি। ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নমাজ উপাসনা করিতে আসি নাই। একদিন আমি একখানি সজ্জাদা [ছোট দরি, যাহা পাতিয়া নমাজ পাঠ করে] চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানি হারাইয়া গিয়াছে তাই আবার আসিয়াছি।”

তিনি সাধুরূপী ভক্তদের বিক্রপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

“সুবা পান কর না বলিয়া তুমি গর্ষ করিয়া থাক। কিন্তু এমন শত কার্য্য কর, সুরা যাহার দাস মাত্র। [সুরাপান করা অপেক্ষা অনেক বড় পাপ কর।]”

তিনি বর্তমান সময় আনন্দে কাটাইতে বলিয়াছেন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও পবকাল চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। “যে দিন গত হইয়াছে, তাহাকে স্মরণ করিও না। আগত বলা, যাহা এখনও আসে নাই, তাহার জন্ত চিন্তা করিও না। যাহা এখনও আসে নাই ও যাহা গত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিও না। বর্তমানে আনন্দে থাক ও জীবন নষ্ট করিও না।”

তিনি অল্পে তুষ্ট ছিলেন, বেশীর লোভে সংসাবে লিপ্ত হইতে অথবা পবের সেবা করিতে চাহিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—“এই পৃথিবীতে যাহার কাছে আখ্যানি ঋটি আছে। যাহাব বসিবাব একটি আচ্ছাদন আছে ॥ যে কাহারও সেবক নহে। বা যে কাহারও প্রতিগ্রাহী নহে, সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সুখী ॥”

তিনি পুরুষকে ত্যাগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। “যতক্ষণ তোমার ধন, বস্ত্র, স্ত্রীর কামিনী ও স্ত্রীর পাত্রেব অভিলাষ আছে। অথবা ঢোলের বাজ অথবা বাশরী তান শুনিবার ইচ্ছা প্রবল আছে ॥ ঈশ্বর জানেন এসকলই কামনার লোভ উৎপাদক। যতক্ষণ তুমি এগুলিকে ত্যাগ করিতে না পার পুরুষ নও।”

তিনি জানিতেন একরূপ ত্যাগের উপদেশ দিলে ধনবান ভোগীবা বিরক্ত হয়, তাই তাহাদের বিক্রপ কবিত্তা বলিতেছেন—“এই বড় লোকেরা যাহাদের অনেক বিষয় আছে। তাহারা ক্রোধ ও দুঃখে আপনার জীবনের প্রতিই সর্বদা বিরক্ত থাকেন ॥ কিন্তু যাহারা তাহাদের মত লোভের বশীভূত নহে। মজাব কথা যে তাহাদের মাহুষ বলিয়াই গণনা করেন না ॥”

খৈয়াম ঈশ্বরে ও অদৃষ্টে নির্ভরশীল ছিলেন, তাহার নির্ভরতা ভারতের আকাশমার্গী অপেক্ষা কম নহে। “যদি তুমি চাও যে তুমি ঈশ্বরের রহস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর। কখনও এমন পছন্দ করিও না যে কোনও জীব তোমার দ্বারা পীড়িত হউক ॥ মৃত্যুকে ভয় করিও না আহাবের জন্ত চিন্তা করিও না। এই দুইটি আপনার নির্দিষ্ট সময়ে নিশ্চয় আসিবে।”

“বিচারক [বিধাতা] যে আশারীয় তোমার ভাগে (অদৃষ্টে) দিয়াছেন। তাহাপেক্ষা এক অণু প্রমাণ কম হইবে না। অথবা বেশী হইবে না ॥ যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। যাহা আছে তাহাতেই স্বাধীনভাবে থাকা উচিত ॥”

খৈয়াম আবু-অলী-সৌনার (Avecenna-৯৮৩-১০৩৬ঈ) মতাবলম্বী দার্শনিক ছিলেন। কোবাণে মাদক দ্রব্য মাত্রই অস্পৃশ্য, অতএব সুরাপান নিষিদ্ধ। খৈয়াম সুবা-পান করিতেন, কিন্তু সুরাপান করিতেন বলিয়া তাহাকে

বদ্ধ মাতাল (Bacchanalian poet) বিবেচনা করা ঠিক হয় না। ষাঁহাবা স্বরূপকে অপবিজ্ঞ বিবেচনা করেন না, ও স্বরাপান করেন, তাঁহাদের সকলকেই মাতাল বলা যায় না। তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানকেই স্বরাপান করিবার অধিকারী বলিয়াছেন।

“যদিও স্বরা হবাম, কিন্তু জ্ঞান কি? কে খাইবার অধিকারী? কোন্ স্থানে? কতটা? কাহার সহিত খাওয়া উচিত? এই চারটি কথা যে বুদ্ধিতে পাবে না, সে যেন স্বরাপান না করে। কেবল বুদ্ধিমানেরা স্বরাপান করিবার অধিকারী।”

স্বরাপান করিবার অধিকারী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “সম্রাট, হকীম [মহামহোপাধ্যায় বিদ্বান্ Doctor] ও মত্ত মাতালের স্বরাপান করিবার অধিকার। যদি এই তিনটির এক প্রকার না হইতে পার, তবে খাইও না, কেন না উহা শজ্জ। [সম্রাট সকলে হইতে পাবে না, হয় বিদ্বানদের মত অল্প মাত্রায় খাও, নয় মত্ত মাতালের মত খাইয়া মাতলামি কর। মাতালেব মত খাইলে উহা শজ্জ।]”

তিনি স্বরার পরিমাণও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। “যদি তুমি স্বরাপান করিতে চাও, তবে বুদ্ধিমানের সহিত খাও। অথবা প্রিয়র-সহিত হাসিতে হাসিতে খাও। বেশী খাইও না, বারবার খাইও না, গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না (অর্থাৎ এত খাইও না যে মনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেল)। অল্প খাও, কখন কখন খাও, একান্তে বসিও খাও (অথবা লুকাটয়া খাও)।”

“যদি স্বরাপান করিতে চাও, দেখিও বুদ্ধিভট্ট হইও না। জ্ঞানশূন্য হইও না, ছুট ও মূর্খের সহিত এক প্রকোষ্ঠে হইও না। যদি ইচ্ছা কর যে স্বরা তোমার পক্ষে হলাল হউক, তবে কাহাকেও বট দিও না ও পাগল হইও না। [কোরানের আজ্ঞানুসারে জ্বা সকল অবস্থাতেই হরাম, খৈয়াম সে কথা অগ্রাহ করিয়া বলিতেছেন, অল্প পরিমাণে খাইলে হলাল, বেশী খাইলে হরাম।]”

দার্শনিক অবু-অলী সীনা স্বরাপান করিতেন; তিনিও স্বরার গুণ গান করিয়াছেন—“স্বরা মত্ত মাতালের শজ্জ ও বুদ্ধিমানের বন্ধ। উহা অল্প মাত্রায় তিরিয়াফ [সর্ব-রোগ-

হর ঔষধ] ও বেশী মাত্রায় কাল কুট। বেশী খাইলে তাহার দোষ অল্প নহে, কিন্তু অল্প খাইলে তাহার গুণ অনেক।”

খৈয়ামকে সম্মান করিয়া নিমন্ত্রণ না করিলে তিনি কোথায়ও যাইতেন না, তিনি রাজাদের দ্বারেও অনাহূত যাইতেন না। দেশের সম্রাট ও প্রাদেশিক রাজারা তাঁহাকে সম্মান করিয়া আপনাদের সহিত সমান মসনদে বসিতে স্থান দিতেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি সামান্ত গৃহস্থ-সন্তান ও স্বরাপায়ী হইলেও বিদ্বান দার্শনিক রূপে সমাজে ও দেশে সম্মানিত ছিলেন; তিনি বদ্ধ মাতাল (Bacchanalian poet) হইলে এ সম্মান পাইতেন না। তিনি যেমন উদার দার্শনিক ছিলেন, সেইরূপ ভোগ্যময় সজ্জ করিতে পারিতেন না। তিনি ভগ্ন সাধুদের বিজ্ঞপ করিয়া বলিয়াছেন—

“একজন সাধু এক বেস্তাকে দেখিয়া বলিলেন, তুই মাতাল। তুই কেবল অল্প লোকদের আপনার ফাঁদে কেলিবার চেষ্টা করিস্। জীলোকটি উত্তর করিল, আমাকে প্রকাশ্যে যাহা দেখিতেছ, আমি ঠিক তাহাই। কিন্তু তোমার যেমন বাহু বেশ, তুমিও কি তাহাই?”

ইসলামের অধর্ম বিষয়ক আইন অনুসারে কেহ কোরানে বর্ণিত ধর্মের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে সে কাফির; কেননা কোরানের আজ্ঞাগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের উক্তি; তাহাদের কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। বলিলে তাহার একমাত্র শাস্তি শিরচ্ছেদন। খৈয়াম দার্শনিক, অতএব তাহার মত কোরান বিরুদ্ধ; কিন্তু মনে যাহাই ভাবুন বা বিশ্বাস করুন, তিনি সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না। সেইজন্য তিনি হুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—

“জ্ঞাতের গৃহ রহস্য যাহা আমার মস্তিষ্কে সংগ্রহ করা আছে। বলিতে পারি না, কেননা তাহা হইলে আমার বিপদ হইবে। সংসারী জীব মধ্যে (অর্থাৎ শাসক ফকীহ সম্প্রদায়ে) যখন কেহ উপযুক্ত লোক নাই। তখন আমার মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।”

তিনি মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে এই কবিতাটি রচনা

করিয়াছিলেন, ও শেষ কয় দিবস প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন :—

“হে ঈশ্বর, আমি আপনাব জীবনে তৃপ্ত হইয়াছি ।
আপনার দুঃখিত মন ও বিস্তৃত হস্ততেই তৃপ্ত হইয়াছি ॥
তুমি যখন শূন্য হইতে সৃজন করিয়া থাক [নাস্তি হইতে
অস্তি করিয়া থাক] তখন আমাকে আমাব এই অনন্তিত্বে
গণ্ডী হইতে বাহিব করিয়া আপনাব মহান অস্তিত্বের
কাছে লইয়া বাও ॥”

মৃত্যু

খৈয়ামেব ছাত্রদেব মধ্যে অনেকে লক্ষপ্রতিষ্ঠা বিধান,
ঐতিহাসিক, গ্রন্থকর্তা ছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র,
ঐতিহাসিক আবু-উল-হসন অল-বেহকী তাঁব মৃত্যু সম্বন্ধে
লিখিয়াছেন, তিনি একদিন সূর্য শরীবে বু-অলী-সীনার
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “অল শিফা” পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ
পুস্তকের পাঠস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন, ও আমাকে
বলিলেন, “ছাত্রদের ভাক আমি ওসীয়ে, (১) করিব।”
ছাত্রেরা আসিলে কিছু উপদেশ দিলেন, পরে সকলকে
সঙ্গে লইয়া নমাজ উপাসনা করিলেন। নমাজের পর
প্রার্থনা করিলেন, “হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমার জ্ঞান
ও ক্ষমতা মত চিনিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহা ছাড়া তোমার
কাছে যাইবার আমার অস্ত্র সম্বল নাই, অতএব ইহা
দ্বারাই আমাকে ক্ষমা ও উদ্ধার কর।” এই প্রার্থনার
পরই তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিল; মৃত্যুর পূর্বে
তাঁহার কোনও প্রকার বোগ হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়
তিনি আশ্রম-মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, ও
মৃত্যুর স্তম্ভ প্রস্তুত ছিলেন।

সময়

খৈয়ামকে ৪৬৭ হিজরী [১০৭৪-৭৫ খ্রি] মলিক
শাহেব নব প্রতিষ্ঠিত মান-মন্দিরে প্রধান গণিতজ্ঞ
জ্যোতিষী রূপে দেখিতে পাই। ইহাব পূর্বে তিনি
নেশাপুরে বিদ্যা অর্জন করিয়া হকীম [দার্শনিক] ও
গণিতজ্ঞ রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মেব

সময় অথবা বয়স সম্বন্ধে নিশ্চয় রূপে কিছুই জানা নাই।
১০৭২ হিজরীে জলালীসম্বৎ প্রচলিত হইলে ও মলিক শাহী
সারণী গণিত হইলে তিনি মানমন্দিরের কাজ ত্যাগ
করিয়াছিলেন কি না কিছুই জানা নাই। ৫০৮ হিজরীতে
[১১১৪-১৫ খ্রি] তিনি বোখাবাব রাজার স্ত্রী ফতি
জ্যোতিষ দ্বারা বিচার করিয়া শিকারে যাইবার দিন ও
সময় স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর চহর-
মকাল প্রণেতা কবি সিজামীতে [৫৩০ হিঃ ১১৩৫-৩৬ খ্রি]
তাঁহার গোর দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার ‘কয়েক’
বৎসর পূর্বে তাঁহার কাল হইয়াছিল। অন্ত্যস্ত গ্রন্থ
হইতে তাঁহার মৃত্যু সময় ৫১৭ হিঃ [১১২৩-২৪ খ্রি]
সম্ভেদ করা হয়, কিন্তু মৃত্যুর বৎসর নিশ্চয় রূপে জানা
নাই।

বংশ

তাঁহার পূর্বপুরুষ বা বংশ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই।
তবে ‘খৈয়াম’ শব্দ দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে,
তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা বস্তাবাস (tent) প্রস্তুত করিয়া
জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহার আদি বাসস্থান সম্বন্ধেও
মতভেদ আছে। কেহ বলে, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বলখ
প্রদেশের শমশাদ নামক গ্রামবাসী ছিলেন; কেহ বলে
অজ্ঞাবাদবাসী ছিলেন; আবার কেহ বলে নেশাপুরেই
বাস করিতেন। তবে সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার
জন্ম নেশাপুরে হইয়াছিল, সেইখানেই চিরজীবন বাস
করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্তার উল্লেখ কেহ
করে নাই, অতএব কিছুই জানা নাই।

খৈয়াম কবি ছিলেন না। ইরানে বিদ্বান মাত্রেই
আপনাব মনের ভাব পদ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনিও
তাঁহাই করিয়াছিলেন। আত্মতুষ্টি ছাড়া পরকে তুষ্ট করা
কোন কালে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কতকগুলি পার্সী ও
অল্প কয়েকটি অববী রুবাই ছাড়া তিনি আর কোনও
প্রকার পদ্য রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবিতাবস্থায়
বা অল্প পরে কেহ তাঁহার উক্তিগুলি একত্রিত করে
নাই। প্রাচীনতম সংগ্রহে মাত্র ১৫৮টি রুবাই ১৮৬০
হিজরীে লেখা পাওয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার
রচিত বলিয়া প্রচলিত রুবাইর সংখ্যা অনেক

(১) যে উপদেশ উপদেশকের মৃত্যুর পর প্রতিপালিত হয় তাহাকে ওসীয়ে বলে। Will.

বাড়িয়া গিয়াছে। ফিট্‌স্‌জিয়ার্ল্ডই (Fitzgerald) সর্বপ্রথমে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে থৈয়ামকে কবি বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। যে কবিতাগুলি বহু কাল থৈয়ামের রচিত বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি আজকালকার অল্পসঙ্কানে অল্প লোকের উজ্জ্বল সংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে, অতএব এখন ঐগুলিকে সন্দেহাত্মক বলা হয়। কোন্‌গুলি থৈয়ামের রচনা নিশ্চয়রূপে বলা অসম্ভব। কবিতাতে ভণিতা দিবার নিয়ম নাই। থৈয়ামের জীবিতাবস্থায় তিনি স্বয়ং অথবা অন্য কেহ তাহার রচনা সংগ্রহ করে নাই, অথবা করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করে নাই। এখন কেবল ভাষা অথবা ভাব দেখিয়া বিচার করা নিরাপদ নহে। তাহার এক কবিতা হইতে বোধ হয় তিনি স্বাপ্নান করিতেন ও সেই কথা লুকাইতেন না।—

“লোকে বলে আমি সুরা-পায়ী—হাঁ আমি তাহাই।
লোকে বলে আমি উন্নত মাতাল—হাঁ আমি তাই।

আম যদি সুরা হই, মসজীদগামা হই, বিধর্মী হই বা নিবীশ্বর হই। ঈশ্বর জানেন ও আমি জানি, আমি যাহা আছি তাহাই।”

তাঁহাব সকল কবিতা সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, নিশ্চয়রূপে কিছুই জানা নাই তবে তাঁহার রচিত বলিয়াই এগুলি প্রসিদ্ধ। তাঁহার নানা প্রকার উক্তি (যাহা থৈয়ামের রচিত বলিয়া প্রচলিত) এখানে লেখা হইল, এখন পাঠক মহাশয়েরা স্বয়ং বিচার করিয়া বলুন তিনি কি ছিলেন। তিনি স্বয়ং ত বলিয়া গিয়াছেন

মন দানম্‌ ও, চুন কি হস্তম্‌ হস্তম্‌।

আমি জানি ও ঈশ্বর জানেন, আমি যে-প্রকার আছি, তাহাই আছি।

[পার্সী পদ্যের অনুবাদগুলি যতদূর সম্ভব এক-একটি শব্দ ধরিয়া literal করা হইয়াছে, কেবল ভাব গ্রহণ করা হয় নাই।

[শ্রীঅনুভূতলাল দীল।]

পরভূতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(৩)

রাজধানীতে সবে বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করিয়াছে। খাটি সহরের মধ্যে অবশ্য ঋতু-রাজ্যের আবির্ভাবের চিহ্ন বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু ভবানীপুর, বালিগঞ্জ প্রভৃতির মাঠ, বাট, পথের ধারের গাছে পাতায় তাঁহার রজনী উদ্ভবীয় ক্ষণে ক্ষণে বাতাসে ঝিলিক্‌ হাওয়া যাইতেছে। শীতকালের সঙ্কটের অসহনীয় ধোঁয়ার ঘবনিকা ধানিকটা অন্ততঃ সবিয়া যাওয়াতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখন তবু নিঃশ্বাস লইয়া প্রাণ একটু জুড়ায়; নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় করিয়া কয়লার গুঁড়া ত ফুস্‌ফুসের ভিতর টানিয়া লইতে হয় না।

বাড়ীখানি মাঝারি গোছেব। ভবানীপুরের নিরাশ্রয় এক পথের উপরেই। রাস্তার ওপারে একসার কৃষ্ণচূড়া ও বর্লবামচূড়া গাছ, তাহাতে রঙের আশ্রয় ধরিয়া গিয়াছে। অল্পদূরে ছোট একটি পুকুর, কয়েকটা হাঁস তাহার জলে খুব ব্যস্তভাবে ডুব মারিয়া মারিয়া বিসের ঘেন সন্ধান করিতেছে। পথটার পথিকের সংখ্যা বিশেষ অধিক নয়। গাড়ী বা মোটর অনেক পরে পরে এক-একখানা চোখে পড়ে।

বাড়ীর ছাদেব উপর দুইটি যুবতী দাঁড়াইয়া। একটির বয়স বছর বাইশ তেইশ হইবে, সীমন্তে চণ্ডা সিন্দূরের রেখা, গৌরবর্ণ কপালেও মস্ত বড় একটি সিন্দূরের টীপ,

পরিধানে একখানি পেঁয়াজী রঙের শাড়ী ও সেই রঙেই একটি লেশভূষিত নেমিছ। চুল বেশ পরিপাটী করিয়া বাঁধা। গায়ে গহনা বেশী নাই।

আর একটি আমাদের পূর্ব পরিচিতা ভানুমতী। কয়েকদিন হইল সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। শরীর তাহার আগের চেয়ে কিছু সারিয়াছে; মুখ চোখ কিন্তু আগেরই মত বিষন্ন, শ্রীহীন। অল্প যুবতীটি তাহার বড় বোন, কলিকাতাতেই ইহার বিবাহ হইয়াছে। অভাগিনী ভগিনীর আগমন-সংবাদে, কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়া মাস খানিকের ছুটি মঞ্জুর করাষ্টয়া সেও বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে তাহার একমাত্র শিশুকন্যা দুর্গা। তাহার আর্ন্তনাদে ব্যতিব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ সে বোনের কাছে আসিতে পারে নাই; এখন চাকরের সঙ্গে তাকে বেড়াইতে পাঠাইয়া সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বোনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভানুমতীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া শোভাবতী জিজ্ঞাসা করিল, “কি ভাবছি, ভাই?”

ভানুমতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, “কি আর ভাবব, মেজদি? আমার ত ভাল কথা ভাববার কিছু নেই! নিজের অদৃষ্টের ভাবনা ছাড়া আমার আর ভাবনা কি?”

শোভাবতী বলিল, “অত মন খারাপ করে থাকিস্‌না বোন; ওতে পেটের ছেলের অনিষ্ট হয়। তোর যা হবার তা হয়েছে, এখন ছেলের যাতে কোনো দিক দিয়ে খারাপ কিছু না হয়, তা তাকে দেখতে হবে। এমন কি সেদিন যে খ্রীষ্টানী ধাত্রী মাগীর উপর অত রাগ করুলি মাছ খেতে বলেছিল বলে, আমার মনে হয়, দরকার হ’লে তোর তাও খাওয়া উচিত।”

ভানুমতী ঘুণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, “ছি, ছি কি বলিস্, মেজদি? কলকাতায় থেকে থেকে তুইও খ্রীষ্টান হ’য়ে গেছিস্ দেখছি। আমি বিশ্বা, এমন অনাচার করলে আমার স্বর্গগত স্বামীর অপমান করা হবে না?”

শোভাবতী বলিল, “তা যা বলিস্ ভাই, অত আচারের

খুঁতখুঁত আমার নেই। যাদের ভালমন্দ আমাদের কাছে সবার বাড়া, তাদের জন্তে অনাচার করতেও আমি পেছাই না। আচার বড় না মাছ বড়? এই ত সেবার ঠর অস্থির সময় ডাক্তাবে মৃগীব জুস্ করে দিতে বললে; বাগ্‌ডী ত শুনে কাটা নিয়ে মারতে এলেন। আমি লুকিয়ে কলের ঘরে ঠোভ জেলে ক’বে দিলুম। তাতে কি আমার খুব বেশা পাপ হয়েছে? আর হ’য়ে থাকে ত হয়েছে।”

ভানুমতী বলিল, “তুই স্বামীর জন্তে করেছিস্। তিনি খুসি হয়েছেন, এই তোর ঢেব। হিন্দুর মেয়ের কাছে স্বামীর চেয়ে বড়ত আর কিছুই নেই। কিন্তু আমি যদি এখন মাছ-মাংস খাই, আমার স্বামীব আত্মা কি তাতে অসন্তুষ্ট হ’বে না?”

শোভাবতী বলিল, “কে বললে তোকে যে অসন্তুষ্ট হ’বে? সে কি চায় না যে তার বংশের একমাত্র হুলাল স্বহৃদ সবল হ’য়ে জন্মাক? তুই নিজের ঠিক মত বস্ত্র না করলে ছেলে স্বহৃদ হ’বে না। মায়ের দুধ না পেলে তার গায়ে বল হ’বে কোথা থেকে? এসব ত ভেবে দেখতে হয়? না শুধু আচার নিয়ে থাকবি, তারপর যা হয় হ’বে? শেষে কি দেখতে চাস্ যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল উদয়টাই জ্ঞানদার ঘবদোর দখল ক’বে বসেছে, আর হ’তে পয়সা ওড়াচ্ছে?”

ভানুমতীর দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, “আমি বৈচে থাকতে তা হ’তে দেব না। আর কেউ না জাহ্নক, আমি জানি যে আমার স্বামীর মরণে মূলে ঐ হতভাগা। সে যেন তাঁকে মারবাব জন্তে ব্রত নিয়েছিল। রাত্রিদিন কেবল তাঁর অনিষ্ট চিন্তা করেছে এক মনে, ঠেকে দেখলে সে যে কি ক’রে তাকাত, সে যদি দেখতে। ওঁর যা কিছু সবার উপর মুখ-পোড়ার লোভ। তোকে বলব কি দিদি, আমারই বলতে মুখে আসছে না, আমার উপর কুদৃষ্টি দিতেও সে ছাড়েনি। উনি আমাকে বারণই ক’রে দিয়েছিলেন একলা ওর সামনে যেতে।”

ভবানী তাহাদের পিছনে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, “ভগবান আছেন দিদি, ভগবান

আছেন। কার সাধ্য নিজে ঠিক থাকলে সতীলক্ষ্মার কোনো অনিষ্ট করে? এই নখে ক'রে তার গলা ছিঁড়ে ফেলতুম না?”

শোভাবতী বলিল, “এখন ভালয় ভালয় ছেলটি হ'য়ে যাব তবুই বাঁচি। শ্বশুরীকে অনেক ব'লে ক'য়ে ত রেখেছি, দেখি সে-সময় আসতে দেয় কি না। মা নেই আমাদের, বড় বোন না দেখলে আর কে দেখবে? অবিশ্রি ভবানী ত রয়েইছে; সে মায়ের চেয়ে কম কিছু করবে না। তবু আমি এলে, তোর মনটা একটু ভাল থাকত। প্রথমবার মানুষ ভয়েই আধমরা হ'য়ে থাকে।”

ভবানী বলিল, “কিছু ভেগেনা বাছা; যতক্ষণ আমি বুড়ী বেঁচে আছি, ততক্ষণ ভাষার যত্নের কোনো ক্রটি হবে না। বাবু বলছিলেন ঐষ্টানী নর্স আনবেন। আমি মুণের উপরই ব'লে দিলাম, ‘কেন আমি কি কোন নর্সের চেয়ে কাজ কম জানি?’ এই যে তোমরা এতগুলি ভাই বোন হ'লে জাপুরে; ক'টা ঐষ্টানী এসেছিল তোমাব মায়ের অন্তে?”

ভাষমতী বলিল, “সে কথা ঠিক ভাই, মেজদি। ভবানী যতটা প্রাণের টানে করবে, এমন কোনো মাইনে-করা নর্স করবে না। তাব উপর সব নর্সের ভাই, কাজ ভাল না, বড় যত্নাও দেয় এক একটা। সে দিন ভাড়াটীদের সেজ বো বললে এক নর্সের কাহিনী—”

এমনসময় দুর্গা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া জোটাতে শোভাবতী তাহাকে সাহায্য দিতে গেল। ভবানীরও নীচে কাজ ছিল, সে নামিয়া গেল। ছাদের উপর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল একাকিনী ভাষমতী।

দিনের বেলাটা তাহার একরকম করিয়া কাটিয়া যাইত। শোভাবতী ও ভবানীর অবিশ্রাম চেষ্টায় সে এন্ডা বসিয়া ভাবিবার বড় একটা অবসর পাইত না। নিত্যস্ত কার্যগতিকে শোভাবতীকে সবিন্দু যাইতে হইলেও সে দুর্গাকে বোনের ঘাড়ে ফেলিয়া যাইত। মেয়েটি এমনই লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ অবতার যে তাহাকে সামুলাইতে গিয়া তাহার মাসীব প্রায় নিজেবই নাম ভুলিয়া যাইবার অবস্থা হইত, তা সে তত্ত্ব কথা

চিন্তা করিবে কি? পাড়ার মেয়েরাও মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিত। কাজেই দিনেব বেলাটা সঙ্গিনীর অভাব ভাষমতী প্রায়ই হইত না। কিন্তু সন্ধ্যাব সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকেব ভিতরটাও যেন আধাবে ভবিয়া উঠিত। তাহাব বিগত জীবনের স্মৃতি সার বাধিয়া তাহার চোখের সামনে ছায়া-চিত্রের মত নাচিত্তে আরম্ভ করিত। কাদিতেও তাহাব ইচ্ছা হইত না। শোক যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিত। ইচ্ছা হইত কোনো রকমে এই আশাহীন দুর্ভাগ্য জীবনকে শেষ করিয়া দেয়। বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার আর লাভ কি? সে যতটা পাইয়া হারাইল, এমন জগতে কয়টা মেয়ের অদৃষ্টে জোটে? পাইবার বোগ্যতা তাহার কিছুই ছিল না। মধাবিন্ত গৃহস্থ ঘরের চাব মেয়েব এক মেয়ে সে; পিতা টাকাকড়ি কিছু অপব্যাপ্ত পরিমাণে তাহার পিছনে ঢালিয়া দিতে পারেন নাই। তবু সে রাজস্বাগী হইয়া শ্রমবগৃহে পা দিয়াছিল। তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসায় বুক ফাটে নাই এমন মানুষ সেদিন কয়টা ছিল?

এই কথা মনে আসিতেই সর্বপ্রথম তাহার মনে আসিত উরয়ের মুখ। এই লোকটি যেন তাহাব অদৃষ্টাংশে ধুমকেতুর মতই উদিত হইয়াছিল। তাহাকে দিয়া প্রমদাংকনের বংশেব কাহাবও কোনো ভাল কোনো দিন হয় নাই, এবং হইবেও যে না সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। জ্ঞানদার প্রতি তীব্র ঈর্ষা তাহাব প্রতি কথায় কাজে এমন তাবে ফুটিয়া উঠিত যে, নিত্যস্ত জড় বুদ্ধিব ও তাহা চোখে লাগিত। ভাষমতীবি বিবাহের সময় স্বপ্ন ঘরের ছেলের দাবীতে সে অবাধে উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহার মনে যে কোনো কল্যাণ-ইচ্ছা নাই তাহা নববধূ নূতন চোখেও ধরা পড়িয়াছিল। তাহার পরত সে স্বামীর কাছে সব কথা শুনিয়াই। স্বামীবি প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য অনিষ্ট-কামী এই দেবরটিবি প্রতি ভাষমতীর একটা তীব্র বিষেব জন্মিয়া গেল।

উদয় একটু মুক্তিলাই পড়িয়াছিল। আগে জ্যাঠা মহাশয়েব বাড়ীতে তাহার বিশেষ গতিবিধি ছিল না, তাহাকে কেহ যে ভাল চোখে দেখে না সেটা তাহার

বিশেষ ক্ষেপে জানা ছিল বলিয়াই। কিন্তু ভানুমতীও
অপূর্ণ হৃদয় মুখের যে একটা আকর্ষণ ছিল, সেটা
এড়াইয়া চলিবার ক্ষমতা তাহার অসংযত মনের ছিল না।
স্বতবাৎ কাবণে অকারণে সে যখন তখন আসিয়া জুটিত,
এবং ভানুমতীও ঘরের সামনে ক্রমাগত ঘোবাঘুরি করিত।
ভানুমতী অবশ্য তাহাকে অভ্যর্থনা কবিবার বিন্দুমাত্রও
চেষ্টা করিত না; এমনকি ঘব হইতে বাহিরও হইত না;
তবু পরদার ফাঁকে যদি তাহাকে দু চাববাব দেখা
যায় তাহাতেই উদয় ক্লান্ত হইয়া যাইত। জাননা
ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, রাগে তাহাব সর্কাজ জন্মিয়া যাইত।
চক্ষুজ্জ্বাব খাতিরে সে উদয়কে কিছু বলিতে পারিত না;
কিন্তু বাগটা একেবারে হস্তমণ্ড করিতে পারিত না।
তাহাব ঝাঁঝ একটু-আধটু ভানুমতীকেই পোহাইতে
হইত। ইহা লইয়া দু চাবটি খণ্ড যুদ্ধও হইয়া যায়।
সন্ধি হইতে অবশ্য বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু ভানুমতীর মনে
উদয়ের প্রতি যে গভীর ঘৃণা আর ক্রোধ জন্ম হইতেছিল,
তাহার পরিচয় পাইলে উদয়ের উৎসাহ সম্ভবতঃ অনেক
পরিমাণেই কমিয়া যাইত। ভানুমতী নিজের ইচ্ছায় এবং
আমীর নিষেধে, কোনোদিনই উদয়ের সঙ্গে নিতান্ত বাধ্য
না হইলে কথা বলিত না; বলিলেও দুই চারিটার বেশী
নয়; কাজেই উদয়ের প্রতিবিম্ব একই রকম চলিতেছিল।

ভবানী আসিয়া খবর দিল, “ওগো ভানু, তুচ্ছ ?
তোমাব গুণের দেওব যে তোমার খোঁজ নিতে কলকাতা
অবধি ধাওয়া ক’রে এসেছেন ?”

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, ভানুমতীও
সেই রকম চমকিয়া উঠিল। একি, তাহার চিন্তাই শেষে
গ্রহণ করিয়া আসিল নাকি ?

ভবানী নীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, “বাবাকে বল্গে
না, আমায় ব’লে কি হবে ? হতভাগা এখানে এল
কি করতে ?”

ভবানী নাক সিঁটকাইয়া বলিল, “কেন তা কি
জানি ? বাবুও তাকে মহা আদর ক’রে বসিয়ে কথাবার্তা
কইছেন, সে ত একবার তোমাকেও দেখে যেতে চায় ;
কর্ত্তামশায় নাকি তাকে বিশেষ ক’রে ব’লে দিয়েছেন।”

“বলেছেন না ছাই,” বলিয়া ভানুমতী সিঁড়ি দিয়া

নামিতে আরম্ভ করিল। মাথায় কাপড় ছিল না, সেটা
বেশ দীর্ঘ কবিয়াটানিয়া দিল।

নীচে ভানুমতীর পিতার শয়ন-কক্ষে বসিয়া উদয়
তাহার সহিত কথা বলিতেছিল। তাহাকে উত্তমরূপে
জলযোগও কবানো হইয়াছে যে তাহাব চিহ্ন ঘরে ঢুকিয়াই
ভানুমতী পাইল। পিতাব অতি ভক্ততায় তাহার গা
জলিয়া গেল। ইহাকে এত আদর দেখাইবাব কি
প্রয়োজন ছিল ? শোভাবতীই সম্ভবতঃ জলখাবার
গোছাইয়া দিয়াছে। তাহাব সহিত খুব একপাল ঝগড়া
কবিবে বলিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল।

ভানুমতীকে দেখিয়া উদয় মহা ব্যস্তভাবে উঠিয়া
দাঁড়াইল, এবং গভীর ভক্তিতে একটা প্রণাম করিয়া
ফেলিল। পাছে সে পা ছুঁইয়া ফেলে, এই ভয়ে
তাড়াতাড়ি সাত হাত পিছাইয়া গিয়া ভানুমতী বলিল,
“থাক থাক, আপনি বসুন।”

উদয় বলিল। বসিয়া বলিল, “আপনার শরীর ত
বিশেষ ভাল দেখছি না, বোঁঠান। জ্যাঠামশায় তারি
ব্যস্ত হয়েছেন, বল্লেন ‘চিঠিতে ত ঠিক খবর কিছু
পাওয়া যায় না, উদয়। তুমি নিজে গিয়ে মাঝে একবার
দেখে এসো।’”

ভানুমতী মনে মনে বলিল, “জ্যাঠামশায় পাঠিয়েছেন
না তোমার মুণ্ড।” মুখে বলিল, “না, আমার শরীর
আগের চেয়ে ঢের ভাল আছে; শরীর মশায়কে
বলবেন।”

ভানুমতীর পিতা মহেশবাবু বেহাইয়ের বদান্ততায়
একেবারে গলিয়া গিয়া বলিলেন, “তা ত তিনি
পাঠাবেনই বাবা; তিনি যেমন মানুষ তাঁর উপযুক্ত
কাজই করেছেন। তাঁর ঘরে মেয়ে দিয়ে কি আমি কম
অভয় পেয়েছিলুম ? নিতান্ত বিধাতার নিধান ! তা
মায়ের আমার শরীর নিতান্ত খারাপ যাচ্ছে না ত।
মোটের ওপর আগের চেয়ে ভালই আছে। তবে
চেহারা আর ভাল কি দেখবে বল ? তোমরা ওকে কি
দেখেছ আর এখন কি দেখছ।” এই বলিয়া তিনি
ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ভানুমতীকে অতি উত্তমরূপে

দেখিয়া লইয়া উদয় বলিল, “বহু ন না বোঠান, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?” মহেশবাবুকে সন্ধান করিয়া বলিল, “ওঁকে ডাক্তার-টাক্তার দেখান হয়েছে ত ? প্রথমবার অনেক রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল ।”

মহেশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “কই, তেমন ভাল ডাক্তার ত দেখানো হয়নি ? পাড়াতেই একজন লেডী ডাক্তার আছেন, অনেককাল কাজ করে তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই একদিন এসেছিলেন’থে গেছেন । তাঁকেই ডাক্ব মনে করেছিলাম । তা তুমি যদি বল ত—”

উদয় মহা ব্যস্ত হইবার ভান করিয়া বলিল, “না, না, ও সব লেডী ডাক্তার-ফাক্তারের কথা নয় । ওরা জানেই বা কি ? ভাল দেখে স্পেশালিষ্ট আনতে হবে ; ট্রেন্ড নর্স আনতে হবে । এখন থেকে সব ঠিক করা দরকার । আমার জানা বেশ ভাল লোক আছে, আপনি অল্পমতি দেন ত আমি আজই গিবে সব ঠিক করুতে পারি ।”

মহেশবাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন, বলিলেন, “বেশ ত বাবা, তা হ’লে ত আমি বেঁচে যাই । গিল্লি নেই, কি করে যে কি হ’বে ভগবানই জানেন । তবু ভাল ডাক্তার, নর্স থাকলে অনেকটা ভরসা । তোমার জানা যদি ভাল বিচক্ষণ লোক থাকেন, তুমি তাঁদেরই ঠিক কর ।”

উদয়ের আশ্বাসিতা এবং পিতার ভদ্রতার আতিশয্যে ভাষ্কর্য্যের সন্ধান জলিয়া গেল । এ হতভাগাকে কোথায় ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করা হইবে, না তাহাকে লইয়া যত ঘরের কথা ! বুড়া হইলে মাষ্করের মাথার ঠিক থাকে না যে বলে, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয় । নিষ্কর নিযুক্ত ডাক্তার ও নর্স যে উদয় কি মন্তব্যে আনিতে চাহিতেছে, তাহাই বা কে জানে ? কোনো শুভ ইচ্ছা কি তাহার মনে থাকা কখনও সম্ভব ? যদিও উদয়ের সাম্নে বেশী কথা বলিবার তাহাব একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দায়ে পড়িয়া সে বলিয়াই ফেলিল, “সে কি বাবা, মিসেস্ মিস্ত্রীকে কথা দিয়ে রাখা হয়েছে ; এখন অস্ত্র ডাক্তার কি করে ঠিক করবেন ? তাঁকে না জানিয়ে কিছুই করা চলে না ।”

উদয় মুখ গম্ভীর করিল । মহেশবাবু টাকে হাত, ব্লাইতে-ব্লাইতে বলিতে লাগিলেন, “ও তাইত, তাইত, আমার মনে ছিল না । এখন ত আর কাউকে বলা চলে না ।”

পাছে তাহার আসন্ন মাতৃশ্বের আলোচনা আরো বেশী উদয়ের সাম্নে হয়, এই ভয়ে ভাষ্কর্য্য তাত্তাতি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল । যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়াই উদয়কে কোনো বিদায় সন্তাষণ করিল না । বাবা তাহার সহিত যত খুসি আশ্বাসিতা করুন, কিন্তু ভাষ্কর্য্যকে সে ভুলাইতে পারিবে, একথা যেন স্বপ্নেও মনে না করে ।

বাহিরে আসিয়াই সে ভবানীর খোঁজ করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না । শোভাবতীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া দেখিল, সে পাশের বাড়ীর এক বোঁএব সঙ্গে দিব্য জমাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে । অগত্যা সে আবার ছাদেই ফিবিয়া গেল ; উত্তেজনায় তাহার তখনও পা কাঁপিতেছিল, ছাদেরই এক কোণে সে বসিয়া পড়িল । অনেকক্ষণ একলাই বসিয়া রহিল ।

শোভাবতী তাহার খোঁজে আসিয়া বলিল, “ওমা, একলাটি অন্ধকারে কি করছিস্ ব’সে ?”

ভাষ্কর্য্য বলিল, “কবু’র আর কি ? তোমরা যা ঘট ক’রে অতিথিসৎকাব আরম্ভ করেছ, আমার ত দেখে দুই চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেছে ।”

শোভাবতী তাহার কথার ঝাঁঝে হাসিয়া বলিল, “তা যাই বলিস, কুটুম ত ? একটু আদর আপ্যায়ন না করলে তোর স্বস্তরই বা ভাববেন কি ? তিনিই পাঠিয়েছেন যখন ?”

ভাষ্কর্য্য বলিল, “কখনো তিনি পাঠননি । ও মুখপোড়া মিছে কথা বলছে । তিনি আর ওকে চেনেন না ।”

ভবানী সিঁড়ি হইতে ডাকিয়া বলিল, “ওগে, শোভা, তোমার মেয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ করছে, বাছা । সে আর কারো হাতে থাকবে না, ঘরময় ভাত ছিটছে ।”

“আঃ, কি লক্ষ্মী মেয়েই হয়েছে আমার ।” বলিয়া শোভাবতী নামিয়া গেল । ভবানী আসিয়া ভাষ্কর্য্যের কাছে বসিল ।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? তোকে খুঁজে-খুঁজে ত হায়রান হ’য়ে গেলুম।”

ভবানী বলিল, “গিয়েছিলুম একটু নিজের কাজে। তোমার গুণধর দেওর কোথায় এসে উঠেছে, কি করতে এসেছে, সব খোঁজ নিয়ে এলুম।”

ভানুমতী বলিল, “আচ্ছা মেয়ে তুই বাপু। পুলিশে কাজ নিলেই পারিস। অত খোঁজ কোথায় কার কাছে পেলে ?”

ভবানী হাসিয়া বলিল, “আমরা রাষ্ট্রপুত্রের মেয়ে বাচ্চা, বাঙালীর ভাত খাচ্ছি ব’লেই কি আর ঘরের কোণের বৌ হ’য়ে থাকতে পারি ? দরকাব হ’লে আমরা কল্যাণী মকদকে মেরে শুইয়ে দিতে পারি।”

ভানুমতী বলিল, “কি খবর আনলি ভাই বল্ না।”
ভবানী বলিল, “রোস, এখন কি আর সব জানতে পেরেছি ? সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম, ছোড়া বেরিয়ে কোন্ দিকে যায়, দেখবাব জন্তে। দেখলুম বেরিয়ে গাড়ীটাড়ী মিলে না, পায়ে হেঁটেই চলল। কাছেই কোথাও থাকে বুলুম। পেছন পেছন খানিকদূর গেলুম, আন্নাঝই করেছিলুম তোমার পিসখাণ্ডীর ওখানে উঠেছে। সঙ্গে হস্তভাগা নবাও এসেছে দেখলুম। যেমন গুণের মনিব, তার তেমন গুণের চাকর। আমায় দেখে জিগগেস করলে, ‘কিগো দিদি, ভাল আছ ?’ এদিকে কোথায় চলেছ ? আমি বললুম ‘এই যাচ্ছি দু পয়সার পান আনতে। তোরা ববে এলি, কতদিন থাকবি ?’ বললে ‘এসেছি ত কাল সবে, এখনও অনেকদিন থাকব, ছোটবাবু জরুরা কাজে এসেছেন।’ জাবলুম ‘দাঁড়াও, বুড়ী পিসি ঠাকুরপের সঙ্গে কোনো গতিকে ভাব করতে হচ্ছে, তা না হ’লে হরদম এখানে যাওয়া আসা চলবে কি ক’রে ! ছোটবাবুর স্কররী কাজের খবর নিতে হবে ত ?’

ভানুমতী উত্তেজিত হইয়া বলিল, “আমি গোড়ার থেকেই জানি লক্ষীছাড়া মিছে কথা বলছে। শশুবমশায় আমায় দেখতে পাঠিয়েছেন না আরো কিছু ! নিজের কোন্ কুমৎলবে এসেছে কে জানে ? বাবার কাছে এসে এসে কি ঘটনা আত্মীয়তার ! সে নাকি ভাল ডাক্তার ঠিক

ক’রে দেবে, নস’ ঠিক ক’রে দেবে। বাবাও যেমন মানুষ চেনেন না।”

ভবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, “দেশ বাচ্চা, ভাল চাও ত ওসবের খার দিয়ে যেয়ো না। তোমার একটা ভাল মন্দ ঘটিয়ে দিতে পারলে ও ছোড়া ত এখন রাজ্যার রাজ্যস্থি পাবে। তারই চেষ্টায় আছে, ওকে কিছুতে কোনো কিছু মধ্য হাত দিতে দিও না। কোথা থেকে ডাক্তার আনবে কে জানে ? ঘুমু খেয়ে ডাক্তারেই কত জারগায় কেলেকারী করেছে, তার ঠিকানা আছে ? মেজদিদি আসে ভাল, না হয় এই বুড়ী আর খাই মিলে তোমার সব কাজ ক’রে দেব। দেখো এখন, একবিন্দু অস্বস্তি হবে না। আশা ভরসা সব তোমার এই সন্তানের ওপর, কত সাবধানে এখন চলতে হবে ! দাঁড়াও না, দুদিনের মধ্যে সব খবর আমি নিচ্ছি। পিসি ঠাকুরপ বোকা সোকা মানুষ আছেন, তাঁর পেট থেকে কথা বার করতে বেশী দেরী হ’বে না।”

ভানুমতী বলিল, “তিনি আর কি জানেন, বুড়ো মানুষ। তাঁকে কি আর কিছু বলছে ?”

“অল্পখন্ন বিছু ত জানবে ? বাকিটা আমি আঁচ ক’রে নিতে পারব।”

ভানুমতী বলিল, “দেখ, তোকে আগের থেকে ব’লে রাখছি। তখন ত আমি থাকব শুয়ে প’ড়ে, যদি ঠাকুরপো ছেলে দেখতে আসে, কি কোলে নিতে চায়, কখনও দিবি না। তাতে যে যা ভাববার ভাববে। ওর চোখে বিষ আছে। অত বড় জলজ্যান্ত মানুষটাকে খেলা।”

ভবানী হাসিয়া বলিল, “আও বাচ্চা তুমি আর আমাকে শিখোতে এসো না। আমি তোমার চেয়ে মানুষ কম চিনি নাকি ? যেমন কুকুর তার তেমন মুণ্ডরের ব্যবস্থা করতে আমি জানি। চল এখন নীচে, সন্ধ্যাটা ছাদে থাকা ভাল না।”

(৪)

দুপুর বেলা খাইয়া-দাইয়া উদয় বলিল, “ও পিসিমা, আমি একটু কাজে বেরাচ্ছি ; যিবুতে হয়ত রাত হবে।

আমার জন্তে ব'সে থেকে না। ভাত ঢাকা দিখে রেখে দিও ; নবা রাজে আমার বেড়ে দেবে এখন।”

পিসিমা বুঝা হইয়াছেন, চোখেও ভাল দেখেন না, কানেও কিছু কম শোনে। তিনি তখন হাঁড়ি, শিশি, বোতল প্রভৃতিতে মজ্জা আচার চাটনৌ প্রভৃতি বাহির করিয়া রোদে দিতে ব্যস্ত ছিলেন ; উদয়ের কথায় উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, “কি বলি রাজে নবা ভাত রাখবে ? কেন আমি কি মন্দ রাঁধি তার চেয়ে ? আজ মাছের ঝালটার কেমন স্বাদ হয়েছিল ! বুড়ো একথাল ভাত খেল শুধু তাই দিয়ে।”

উদয় হাসিয়া বলিল, “কি আপদ ! নবা রাখলেই হয়েছে আর কি। তা নয় গো তা নয়,” বলিয়া পিসির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “বলছি কি যে আমার আজ ফিবুতে রাত হবে, ভাত ঢাকা দিখে রেখে। নবা বেড়ে দেবে, তুমি আর আমার জন্তে ব'সে থেকে না।”

পিসিমা এবার শুনিতে পাইয়া বলিলেন, “ও তাই বল ! আচ্ছা তা রেখে দেব এখন। হ্যারে, কাল যে বোমাকে দেখতে গেলি, কেমন দেখে এলি ? সেই আসবার পর একদিন গিয়েছিলুম, তারপর কাজের খান্দায় আর যেতে পারিনি। শরীর কেমন আছে ?”

উদয় বলিল, “বিশেষ ভাল ত কিছু দেখলুম না। আগের চেয়ে রোগা ঠেকল, রংও আগের চেয়ে ময়লা হ'য়ে গিয়েছে মনে হ'ল।”

পিসিমা বলিলেন, “ওমা, তাই নাকি ? তাহ'লে ত বেটা ছেলে হবে। আমার ভুবন যে বছর হ'ল, সে বছর আমার রং কি হ'ল, ঠিক যেন হাঁড়ির কালি, শরীর কেমন হ'ল, ঠিক যেন সলতেটি। আর ক্ষীরির বেলা, এই মোটা হ'লুম। রং হ'ল হস্তেলের মত—”

পিসিমার রূপ বর্ণনায় বাধা দিয়া উদয় বলিল, “হাঁ, ওতে নাকি কিছু বোঝা যায়, পিসিমা। আমি বলছি দেখো মেয়ে হবে।”

পিসিমার বড় ছেলে ভুবন ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে তাহার কথার শেষাংশটুকু শুনিতে পাইল। হাসিয়া

বলিল, “তুমি ত তা বলবেই, মেয়ে হলে তোমার ত পোয়াবারো হে !”

উদয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “হাঁ তুমিও যেমন ! আমি কেবল সেই ভাবনাই ভাবছি আর কি ? পরের টাকায় আমার অত লোভ নেই। এক পেলে সবই পেতুম ত আলাদা কথা ছিল। ওসব ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই।”

ভুবন বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া বলিল, “না তা কি আর আহ ? ছ'লাখ টাকা অমনি সহজ কথা কি না ? তুমি যে কত বড় শুকদেব গোলামী তা ত আর আমার জানতে বাকি নেই। সারাক্ষণ বোধ হয় জপ করছ : মনে মনে বোঠানের যেন মেয়ে হয়, বোঠানের যেন মেয়ে হয়।”

উদয় বলিল, “তুমি মস্ত বড় thought reader হ'য়ে উঠেছ যেহে। আর কি জপ করছি, তাও জেনে ফেলেছ নাকি ? তা হ'লে ত ভয়ের কথা।”

ভুবন ঠাট্টা করিয়া বলিল, “কি, কোন চন্দ্রখার মধুর নাম নাকি ?”

উদয় বলিল, “হ্যাঁ, সেই নামটি যেটি তুমিও সব-চেয়ে জপ কর। আচ্ছা, আমি এখন চল্লম, তের কাজ প'ড়ে আছে।”

পিসিমা ইহাদের ঠাট্টা-তামাসা কিছুই শুনিতে পান নাহ। নিজের শিশি, বোতল, লইয়াই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, “ও বড় বোমা, এখানে এসে একটু বসোনা মা। বুড়ী মানুষ সব কাজ কি আমি একলাহ করুব, আর তোমরা পটের বিবি হ'য়ে ব'সে থাকবে ? এই সকালের রান্নাটা ত একলাহ প্রায় সারলুম।”

বোমটা-দেওয়া একটি বউ ভাড়াভাড়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, “এই খানটায় বোসো বাছা, দেখো যেন চড়াইয়ে কি কাকে মুখ-টুক না দেয় আচারে। আমি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই গিয়ে।”

শাশুড়ী গড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বউ প্রথমে বারান্দায় শানের উপরেই বাসিয়া পড়িল। তারপর এখার ওখার চাহিয়া নিজেব শয়নকক্ষ

হইতে একটি ফুল লতা পাতা চিত্রিত মাহুর বাহির করিয়া আনিয়া বিছাইল; একখানি বাংলা উপস্তাস আনিতেও তুলিল না। তাহার পর আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া উপস্তাস পাঠে মন দিল। মাথার কাপড়টা তাহার ঘোঁষাতে দেখিতে কখন খসিয়া পড়িয়া গেল।

এটি পিসিমার বড় ছেলে ভুবনের বো। মেজ ছেলে কাননেরও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বউ এখনও ঘর করিতে আসে নাই। বড় বোঁএর নাম বিজ্ঞনবালা, মুখখানি মন্দ নয়, চোখ দুটি বেশ বড় বড়, তবে নাকটি কিছু চাপা। রংটাও নিভান্ত বাঙালীর ঘরে যেমন হইয়া থাকে তাই। বাপের বাড়ীর লোকে বলে উজ্জল শ্রামবর্ণ, শব্দের বাড়ীর লোকে বলে কালো।

উপস্তাস পড়া সবে মাত্র শুরু হইয়াছে, এমন সময় কে একজন পিছন হইতে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। এ হাতের স্পর্শ ভুল করিবার নয়। বিজ্ঞন খড় মড় করিয়া উপস্তাস ফেলিয়া দিয়া, প্রাণপণে তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “আঃ, কি কর তার ঠিক নেই; এখনি যদি মা বেরিয়ে আসেন?”

ভুবন তাহার চোখ ছাড়িয়া দিয়া পাশে বসিয়া পড়িল। উপস্তাসখানা ছুড়াইয়া লইয়া বলিল, “ওরে বাপরে! ‘মাধবীকরণ?’ তার চেয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারত নিয়ে পড়না? এর চেয়ে আধুনিক কিছু জোটাতে পারলে না?”

বোঁ ঠোট উন্টাইয়া বলিল, “আধুনিক বইয়েত তোমাদের বাড়ী ছেয়ে রয়েছে কিনা! আজ সকালে ঠাকুরপোর ঘরে এইখানা দেখলুম, তাই নিয়ে এলুম। তা না হ’লে এখানে ত ছাপার অক্ষরের নামও দেখবার জো নেই।”

ভুবন কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল, “আ্যা, উদয়ের ঘরে গিয়েছিলে কেন? এরই মধ্যে খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। তাই সে আমার মুখের ওপর ব’লে গেল যে, রাত্রি দিন তোমার নাম জপ করে।”

বিজ্ঞনবালা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “থাক্, থাক্, আর নাকি সাজতে হবে না। উদয়ের ঘবে যাইনি গো, গিয়েছিলুম তোমার সহোদর ভ্রাতা কাননের ঘরে। আর

উদয় ঠাকুরপো যা আমার নাম জপ করে তা যামাব জানাই আছে। এমন অপসরীর মত বোঁঠান ঘরের কাছে থাকতে আমার মত কাল পেঁচার নাম জপ করতে যাবে কেন?”

ভুবন তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, “আহা তোমার বড় আকশোব্ হচ্ছে, না? বেচারী বোঁঠান, সবাই মিলে কেবল তাকে হিংসাই করছে।”

বিজ্ঞনবালা মুখ ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, “হিংসে আমি কিসের দুঃখে করতে যাব শুনি? তার রূপ আছে, তারই আছে। ভূমি যদি আশা তোমার গুণধর মামাতো ভাইটির মত তার রূপের ধ্যান করতে বসতে ত আলাদা কথা ছিল। সত্য, ঠাকুরপোর রকম সকম বুঝি না কিছু। এদিকে ত হিংসের বাচেন না বেচারীর ছেলে হচ্ছে ব’লে, পারেন ত নখে ক’রে ছেঁড়েন। ওদিকে আবার টানও আছে বোঁঠানের ওপর।”

ভুবন বলিল, “কি করে বল। মুন্সিগেই প’ড়ে গেছে। অতবড় জমিদারী হাতে আসতে-আসতে ফসকে গেল, এক কম আকশোষের কথা তার মত মাহুরের কাছে। টাকার জন্তে ও নিজের বাপের গলায় ছুরী দিতে পারে, ভাইয়ের খ্রী ত চুলোর যাক্। এখনও আশায় আশায় আছে যে জমিদারী গেলেও, নগদ ছয় লাখ তার হাতে আসতে পারে, যদি বোঁঠান দয়া ক’রে ছেলের জন্ম না দিখে, মেয়ের জন্ম দেন।”

বিজ্ঞনবালা কোতুহলে চোখ বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন গো, মেয়ে হ’লে সে টাকা পাবে না?”

ভুবন বলিল, “না, সে এক মস্ত ইতিহাস, জান না? টাকাটা ছিল বড় মামার জ্যাঠামশায়ের। বুড়ো জামদারীর ভার ছোট ভাইয়ের ওপর দিয়ে পাটের না কিসের ব্যবসা করত। একেবারে টাকায় লাল হ’য়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুড়োর ছেলে ছিল না, থাকবার মধ্যে এক মেয়ে। সেই মেয়ে বিন্দুবাসিনী মাসি, মা এখনও ষাঁর অত গল্প করেন। মেয়ের খুব ঘটী ক’রে বিয়ে দিয়েছিল বুড়ো, ঘর বর সব ভালরকম দেখে। গহনাই দিয়েছিল মেয়েকে পঞ্চাশ হাজার টাকার; নগদে আর জিনিষ-পত্র আরো পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু জামাইটা ছিল পাজী

কিছু দিন পরেই জানা গেল যে, জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, নগদ টাকা সবই সে খুইয়েছে, এখন গহনাগুলি নিয়ে বিক্রী করাবাব জন্তে জীকে মারধোর স্বপ্ন করেছে। বুড়ো গেল বিষম চটে, মেয়েকে নিয়ে আস্তে সেইদিনই লোক গিয়ে উপস্থিত। বড় মামুষ বেহাইকে চটাতে মেয়ের খুন্তর শাশুড়ী সাহস করলে না; দিলে পাঠিয়ে। মেয়ের গায়ে তখনও কালো কালো দাগ, স্বামীর ছড়ির চিহ্ন। সেইদিনই উকিল ডাকা হ'ল, উইল হ'ল। মেয়েব নামে কিছুই দিল না বুড়ো; নগদ টাকা যা ছিল সব লিখে দিল বড়মামার নামে। মাসির ছেলে পিলে হয়নি, হবারও সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই জমিদারী ত মামাদের হাতে এমনই ফিবে এল। কিন্তু উইলে ব্যবস্থা রইল বংশে কোথাও ছেলে থাকতে, মেয়েতে ও টাকা পাবে না। এখন বৌঠানের ছেলে হ'লে অবশ্য উদয় ভায়ার অদৃষ্টে জুটেবে কাঁচকলা, তাদের নিজেদের অংশের জমিদারী ত বাপ-বেটায় মিলে দিবা ফুঁকে দিয়েছেন; এখন সংসার চালানই ভার। মেয়ে হ'লে ত নবাব হয়ে যাবে।”

বিজ্ঞান বলিল, “এইজন্যে সারাক্ষণ কেবল করছে ‘বৌঠানের মেয়ে হবে বৌঠানের মেয়ে হবে’। ছেলে হ'লে বোধহয় মাথা কুটে মরবে।”

ভুবন বলিল, “পচিশ ত্রিশ বছর আগে হ'লে বোধহয় সাধু সন্ন্যাসীকে টাকা দিয়ে যাগ-যজ্ঞ লাগিয়ে দিত, যদিই তারা ছেলেটাকে মেয়ে ক'রে দিতে পারে।”

স্বামী জীতে তাহার বারান্দার যে অংশে বসিয়া কথা বলিতেছিল, তাহা সদর দরজার পাশেই। দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ ছিল না, ভেজান ছিল মাত্র। অনেকক্ষণ ধরিয়াই একটি প্রোচা জীলোক দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদের কথাবার্তা সে ভাল করিয়া শুনিতে না পাইলেও, যা দুচার কথা শুনিতে পাইতেছিল তাহাতেই উত্তেজনায় তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। জীলোকটি যে ভবানী তাহা বোধহয় না বলিয়া দিলেও চলে। সে পিসিমাব সহিত আলাপ জমাইবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর ভিতর

চুকিবার আগেই গলার স্বর কানে আসাতে, বাহিরেই দাঁড়াইয়া গেল।

কিন্তু ভাল করিয়া ত সব কথা জানা দরকার? এখান হইতে তা শুনিবাব সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা সদর দরজার কড়াটা বেশ জোরে জোরে নাড়িয়া সে ডাঙিয়া বলিল, “কে আছে গো? দোরটা একটু খুলে দিবে যাও।”

ভুবন একহাতে জীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলে মাথা দিয়া, লম্বা হইয়া মাতুরেব উপর শুইয়া পড়িয়া ছিল। কিছু দূবে মাতার শয়নকক্ষ হইতে গভীর নাসিকাধ্বনিব শব্দ তাহাদের জানাইয়াই দিতেছিল যে, এখন শুদিক হইতে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই। হঠাৎ ভবানীব ডাকে ব্যস্ত হইয়া ভুবন একলাফে উঠিয়া পড়িল, বৌও ঘোমটাটা অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিয়া একাগ্র মনোযোগ সহকারে আচার, চাটনী হইতে মাছি তাড়াইতে বসিয়া গেল।

‘ভুবন নবজ্ঞাণে’ টানিয়া খুলিয়া দিতেই ভবানী ভিতরে চুকিয়া আসিল। বিজ্ঞনবালাকে দেখিয়া বলিল, “কি গো বোমা, তোমার শাশুড়ী ঠাকুরণ ঘুমিয়েছেন নাকি?”

স্বামী উপস্থিত থাকাতে বিজ্ঞনবালা কথার উত্তর না দিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, তাহার পূজনীয় শাশুড়ী ঠাকুরাণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বটে। ভবানী তাহার কাছে আসিয়া, বসিয়া বলিল, “অন্য সময় ত ফুবসং পাই না। ভাললুম এখন কাজকর্ম নেই, একটু পিসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এক পাড়ায়ই থাকি, কিন্তু দেখাশোনা ত হয় না।”

ভুবন ভবানীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। দুপূর্ব বেলাটা ঘুমাইবারও জো নাই তাহা হইলে শাশুড়ী উঠিয়া বকিয়া ভূত ছাড়াইবেন, স্তত্রাং জাগিয়াই যখন থাকিতে হইবে, এবং সব-চেষ্টে প্রিয় সঙ্গীটিও অবস্থাগতিক পলাতক, তখন গল্প করিবার একজন লোক পাইয়া বিজ্ঞনবালা খুসিই হইল। মাথার কাপড় একটু খাটো করিয়া দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, মা একটু শুয়েছেন। তা ভূমি বোসো না! তিনি উঠবেন এই একটু পরেই। দিদি কেমন আছেন?”

ভবানী বলিল, “এখন ত মোটের ওপর ভালই। সবাই

বলা কণ্ঠ্যতে এখন ছুঁ ঘি ফল টল ভাল ক'বে থাকে।
যা চেহারা হ'য়ে গিয়েছিল। এখন তবু গায়ে কিছু
সেঁরেছে।

বিজ্ঞনবালা হাসিয়া বলিল, “তাই নাকি? তবে যে
ওবাড়ীৰ ঠাকুরপো দে'খে এসে বললে চেহারা বড় খারাপ
হ'য়ে গিয়েছে। মা শু'নে বললেন তাহ'লে ঠিক ছেলে
হবে। ঠাকুরপো বললে, “না মেয়ে হবে।”

ভবানীর শুনিয়াই রাগে গা জ্বলিয়া গেল। সে বলিল,
“ছোট বাবু ত সে কথা বলবেই মা, যার স্বার্থ যে
দিকে।”

বৌ বলিল, “ওমা, সবাই এ খবর জানে দেখছি,
এক আমিই জানু'হুম না। আজই শুনু'ম।”

ভবানীরও এ খবর ভালভাবে কিছু জানা ছিল না।
সে কথা বাহির করার ইচ্ছায় বলিল, “ভাল ক'রে আর
কি জানি মা? এমনি খানিক খানিক জানি। তা
ছোটবাবু নগদ টাকা যখন অত পাচ্ছে, তখন আর আমার
বাছাকে অত হিংসে করে কেন? এমনিতে পোড়াকপালীর
যা অদৃষ্ট।” সে বাহির হইতে ছয় লাখ কথাটা শুনিতে
পাইয়াছিল। তাই আশ্চর্য্যে একটা ঢিল মারিয়া দেখিল।

বিজ্ঞনবালা বলিল, “টাকা পাচ্ছে কি রকম?
এখন কি ঠিক হ'য়ে গেছে নাকি? মেয়ে হয় যদি দিদির,
তবেই পাবে ছেলে হলে ত আধপয়সাও পাবে না; তাই
না বলকাতায় এসে জুটেছে? দেশে বোধহয় আব
টি কুতে পারুল না। দিদির আর কত দেবি?”

ভবানী বলিল, “দেবী আর কি? মাস দেড় বড় জোর
হবে!”

বিজ্ঞনবালা বলিল, “ঠাকুরপো তার আগে বোধ হয়
আর এখন থেকে নড়ছে না। যদি শস্তর-বাড়ী যায়, দিন
কয়েকের জন্তে মাঝে।”

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, “ই্যা গা, বৌ ঘরে আনতে
চায়না? কেন, সোমস্ত বয়সের ছেলে? অতদিন যে ভাসুর
শস্তর-বাড়ী কাটিয়ে এলু'ম তা ছুবারের বেশী ত
ছোটবাবুর বোয়ের মুখ দেখিনি। চিরকালটা বাপের
বাড়ীই থাকবে নাকি বৌ?”

বিজ্ঞন বলিল, “কে জানে বাছা, ঠাকুরপোর মতিগতি

বুঝি না। বউ দেখতে ভাল না ব'লে নাকি মনে ধরে'
না। এমন কথাও ত ভদ্রলোকের ঘবে শুনি নি। বাঙ্গালী
গেবন্ত ঘরের মেয়ে কি আবার পরীর মত দেখতে হয়?
দিদির মত চেহারা কালে ভদ্রে এক-আধটা দেবা যায়।
এই ত আমরাও আছি কালো, তাই ব'লে কি আর
আমাদের নিয়ে ঘর করছে না?”

ভবানী বলিল, “কিসে আর কিসে, ধানে আর তু'ষে।
তোমার সোয়ামী' আর ঐ ছোটবাবু, একি এত কথা
হ'ল? তোমাদের আপন লোক মা, তোমাদের কাছে
বলতে নেই, কিন্তু ছোটবাবুর রকমসকম ভাল না।”

বিজ্ঞনবালা বলিল, “সে কথা সত্যি, যি। আমরা বৌ'
মাছুষ, আমাদের ত আর বলবার নেই কিছু, কিন্তু ওরা
চাল-চলন আমার কাছেও ভাল ঠেকে না।”

ভবানী বলিল, “ভাল হ'লে ত ভাল ঠেকবে, মা?
জামাই যতদিন বেঁচে ছিল, ভাসুরকে ওব সামনে শুধু যেতে
মানা ক'বে দিয়েছিল। তা তোমার শাস্ত্রী ত এখনও
উঠলেন না দেখছি। আমি তবে এখন উঠি বাছা,
তোমার আবার কাঁজ-কর্ম আছে।”

বিজ্ঞন বলিল, “না না, বোসো, কাজ আর কি? ও
বেলার মাহ তরকারি আজ ঢেং আছে, হুটো আলুভাতে
ভাত সেজ ক'রে নেওয়া বইত নয়?”

ভবানী বলিল, “ওমা, সে বুড়ী রাধুনী মাগী পালিয়েছে
বুঝি? নিজেদেরই এখন রাধতে হচ্ছে?”

বিজ্ঞনবালা বলিল, “পালিয়েছে কি আজ? এখন
আমিই হাঁড়ি ঠেলছি। কিছু বললে মা বলেন, আমরা
কি জমিদারী আছে না লাখ লাখ টাকা আছে, যে
দশটা চাকর রাখব? তোমার বাপকে বোলো রাধুনী
রেখে দিতে।”

ভবানী হাসিয়া বলিল, “সত্যি মা, তোমাদের দেশে
মেয়ে ছেলের বড় খোয়ার। ছেলেও বাপ মায়ের সম্মান
যতখানি, মেয়েও তাই; কিন্তু মেয়ের অদৃষ্ট কিছুই
জোটে না, তা লাখপতির মেয়ে হোক না কেন? তা না
হ'লে তুমিই কি আর দশটা রাধুনী রাখতে পারতে না?
তোমার ভাইরা রাখছে না?”

বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় প্রীত হইয়া বিজনবালা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, “রাখছে না আবার? যেমন পোড়া দেশে জন্মেছি। তা দিমির মেয়ে হ’লেও তার ভাবনা নেই। জামিদারী ত পাবে টাকা না হয় নাই পেল?”

ভবানী বলিল, “এটাও অন্ডায় না, বাছা? মেয়ে ব’লে লাখ লাখ টাকা হাত ছাড়া হ’য়ে যাবে? ভগবান করুন যেন ছেলেই হয়। না; আমি উঠি, বেলা গেল।”

ভবানী উঠিয়াই পড়িল। বিজনবালা আচারের হাড়ি-কুড়ি তুলিয়া ভাড়া করে লইয়া চলিল।

বীরভূমের শর্করা-নিষ্প

শ্রী গৌরীহর মিত্র

১—চিনি

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে চিনি অত্যন্তম। আজকাল বিদেশীয় চিনি আমাদের স্বদেশী চিনিকে পরাজিত করিয়াছে। বেশী দিনের কথা নয়, এই অল্পদিন পূর্বে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইত। আজকাল কলকারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা প্রকার শাকসবজী, গাছ-গাছড়া ও ফলমূল এমন-কি কয়লা এবং আলকাতরা হইতেও চিনি প্রস্তুত হওয়ায় আমাদের দেশী চিনি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। তবে কতকগুলি নিষ্ঠাবান হিন্দুপরিবারে এখনও দেশীচিনি ব্যবহৃত হয় বলিয়া কোথাও কোথাও অতি সামান্য পরিমাণে আজিও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীরভূমের বহু পল্লীতে চিনি প্রস্তুত হইত। বীরভূমে প্রায় বিদেশীয় চিনি কিনিবার প্রথাই ছিল না। দেশী চিনি না হইলে আমাদের ঠাকুরদেবতার ভোগই হইত না। আজকাল সকল জিনিষেই ভেজাল হইয়াছে। অল্প গুড় মিশান বিদেশী চিনি আজকাল দেশীচিনি বলিয়া বাজারে চলিয়া গিয়াছে। আমরা ধর্ম্মরক্ষার ভানে ঐরূপে প্রস্তুত চিনিকে দেশী চিনিরূপে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর দেবতার ভোগে লাগাইতেছি। এবং জানিয়া শুনিয়া এইরূপে ধর্ম্মরক্ষা হইল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি।

আমাদের দেশ সোনার দেশ। এখানকার মাটি এমন স্তম্ভর যে, তাহাতে যে-কোন চাষেই বেশ ভাল ফসল পাওয়া যায়। আখের চাষ এখানে প্রায় সর্ব্বত্রই হয়, কিন্তু আমাদের অমনোযোগিতার জন্ত তাহাতে লাভ হয় খুব কম। একটু চেষ্টা করিলে মাটির পাট ভাল করিয়া সার ও জলের সুব্যবস্থা রাখিয়া ভাল বীজ লাগাইতে পারিলে অতি অল্প আয়াসেই এখান হইতে প্রায় চারিগুণ অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্বে এদেশে আখের চাষ খুব বেশী হইত—যত্নেব জন্ত ফসলও বেশী পাওয়া যাইত। এখন যত্নের অভাবে ভাল ভাল পুকুর পুষ্করিণী বুজিয়া যাওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রধানতঃ এই আখের গুড় হইতেই বীরভূমে চিনি প্রস্তুত হইত।

বীরভূমের কুঁখুটিয়া, ছবরাজপুর, পণ্ডিতপুর, তাঁতিপাড়া, রাজগঞ্জ, করমকেল, জামথলে, রামপুর, মল্লিকপুর, কালিপুৰ, মহদরী, ভেড়ামারি, হজরতপুর, খোটালী, উপুন্দীকুড়ামিঠা, বোলপুরের সম্মিকট আদিত্য-পুর প্রভৃতি গ্রামে চিনি প্রস্তুতের কারখানা ছিল, এখন যে-সমস্ত কারখানা প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই-সমস্ত গ্রামের মধ্যে ছবরাজপুরের সম্মিকট কুঁখুটিয়া গ্রাম চিরদিনই চিনির জন্ত দেশ-বিদেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত। পূর্বে এখানে খুব বড়রকমের চিনির কারখানা ছিল। দৈনিক ১০০/০ একশত ১৫০/০

দেড়শত মণ চিনি তৈয়ারি হইত। এখন এই বৃহৎ কারখানা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই এক ঘরে চিনি প্রস্তুত হয়। বাকী যাহারা চিনি প্রস্তুত করিত, তাহাদের বংশধরেরা এখন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমরা সম্প্রতি এই কুঁখুটিয়া গ্রামে গিয়া এই চিনির কারখানা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এবং এতৎসম্পর্কে স্থানীয় চিনি ব্যবসায়ীগণের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র রুজ মহাশয় ও অন্ত্যায় ব্যবসায়ী এবং কারিকরগণের কারখানা পরিদর্শন ও তাঁহাদের সহিত এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলাপ আলোচনার ফলে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, এই স্থলে তাহাই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিদেশে যেমন বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার সাহায্যে দৈনিক লক্ষ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত করা যায়, এখানে সেরূপ কিছুই হয় না। পূর্বে এ জেলার লোকে ইক্ষু পেষণ করিয়া রস বাহির করিবার জন্য মহাশাল (কাঠনির্মিত পেষণ-যন্ত্র) ব্যবহার করিত। এখন লৌহ-নির্মিত রোলার ব্যবহার করা হয়। মহাশাল দ্বারা ইক্ষু ও ভালরূপ পেষণ হইত না। কাজেই বেশী রসও বাহির করা যাইত না। পেষণ করিবার অভাবে অনেক পরিমাণ রস ইক্ষুতেই থাকিয়া যাইত। এখন এই লৌহ-নির্মিত রোলার সেই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে। মহাশাল হইতে ৫০।৬০ ভাগ রস বাহির হইত কি না সন্দেহ। লৌহনির্মিত রোলার দ্বারা ভাল ইক্ষু হইতে এখন ৮০ ভাগ রস বাহির করা যায়। এই রস হইতেই গুড় তৈয়ারি হয়।

যাহারা ইক্ষুর চাষ করিয়া গুড় তৈয়ারী করে তাহারা চিনি প্রস্তুত করে না। কুঁখুটিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র রুজ মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণ চিনির কারবার করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্বয়ংও কয়েক বৎসর পূর্বপর্যন্ত এই কার্বারে প্রবৃত্ত ছিলেন। সম্প্রতি এই কারবার একপ্রকার তুলিয়া দিয়াছেন। রুজ মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বলেন যে, চিনি প্রস্তুত করিতে গুড়কে রসে পরিণত করিতে হয়। ইক্ষু হইতেও প্রথমতঃ রস বাহির

করিয়া গুড় তৈয়ারি করিতে হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, এই দুইবার রস লইয়া 'ভিয়ান' করা একান্তই প্রথাবিরুদ্ধ কার্য। এই নিমিত্ত তাহাদের গ্রামবাসিগণ বিদেশ হইতে আগত গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত করেন। নিজ কৃষিজাত গুড় হইতে তাহারা চিনি প্রস্তুত করেন না। ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, আখের চাষ করিয়া গুড় এবং চিনি দুইই করিতে গেলে আমাদের বংশ লোপ পাইবে, ইহাই আমাদের বংশপরম্পরায় প্রবাদ। এইজন্য তাহারা গুড় কিনিয়া চিনি তৈয়ারি করিতেন। সাঁওতাল পরগণা হইতে বস্ত্র গুড় এখানে বিক্রয় করিতে আনিত। গ্রামের ছায়াশীতল প্রান্তরে হাজার হাজার গুড়ের গাড়ী একটি বড় রকমের মেলার গায় মনে হইত। রুজ মহাশয় বলেন যে, তিনি এককালীন ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার গুড় ক্রয় করিয়া চিনি তৈয়ারি করিতেন। তাহার মত গ্রামের অনেকেই ঐরূপ টাকার গুড় কিনিয়া চিনি তৈয়ারী করিতেন। বুঝিয়া দেখুন এখানে কত বড় বৃহৎ চিনির কারখানা ছিল। এইসমস্ত চিনি কান্দি, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইত; এবং অন্ত্যায় দেশ হইতে পান-কারীরা আসিয়া চিনি লইয়া যাইত।

বিভিন্ন উপায়ে চিনি প্রস্তুত-প্রণালী

(১) প্রথমতঃ ৩/ তিন মণ গুড়কে নাদে চাপাইয়া জাল দেওয়া হয়। পরে উহা হইতে রস তৈয়ারি হইলে তাহাকে ছাকিয়া অপর নাদে ঢালিয়া লওয়া হয়। এই রসের তিন ভাগের এক ভাগ পুনরায় নাদে ঢালিয়া জাল দিয়া চিনির 'পাক' তৈয়ারি করিতে হয়। ঠিক মত 'পাক' হইলে পর তাহাকে ঘরের ভিতর ছিদ্রবিশিষ্ট বড় নাদে বা পাতনায় ঢালিয়া চারদিন ঠাণ্ডা হইতে দিতে হয়; এবং উহা ঠাণ্ডা হইলে বাঁশের মাচার উপর তুলিয়া পাটাশেওলা চাপা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে নীচের ছিদ্র খুলিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ গুড়ের তরল অংশ ঝরিয়া নীচে পাত্রে জমা হয়। পাটাশেওলার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা গুড়ের তরল অংশ সমস্তই নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। নীচের

পাত্রেই এই তরল অংশকে 'কোংরা' গুড় বলা হয়। এই 'কোংরা' গুড় পিঠা এবং মুড়ি দিয়া খাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। গুড়ের কঠিন অংশই চিনি। যতটা অংশ কঠিন অর্থাৎ চিনি হয় ততটা অংশ ফুরিয়া বা চাছিয়া লইয়া পুনরায় পাটা-শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। যে পর্য্যন্ত না নাদের সমস্ত অংশই চিনিতে পরিণত হয় সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করা হইয়া থাকে। নাদের সমস্ত অংশ চিনিতে পরিণত হইতে অন্ততঃ ২৫ পচিশ দিন সময় লাগে। চিনি তৈয়ারি হইলে তাহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া মুদগর দিয়া পিটাইয়া আউড়িতে (অন্ধকার শুষ্ক ঘর) বস্তা বন্দী করিয়া রাখা হয়। নাদের তলদেশ হইতে যে চিনি পাওয়া যায় তাহাকে ছিটনীর চিনি বলে। এই দেশী চিনির রঙ লাল আভাযুক্ত; এবং ইহা আশ্বাদন কালে ঠিক চাপাফুলের সৌরভের সূত্রাণ অহুত হয়। ঐ তিন মণ গুড়ে ত্রিশ সের হইতে এক মণ পর্য্যন্ত চিনি পাওয়া যায়। বাকী সমস্তই 'কোংরা' এবং 'গাদ'। 'গাদ' বিক্রীত হয় না। গরুর খাদ্যের জন্ত কতক অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট একেবারে অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। নিম্ন-প্রদত্ত হিসাব হইতে বোঝা যাইবে যে, কোংরা গুড়ের মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে। ঐরূপভাবে চিনি তৈয়ারি করিতে কারিকরের সঙ্গে আর একজন মজুরের প্রয়োজন হয়। সে দৈনিক ছয় আনা হিসাবে তাহার মজুরী পাইয়া থাকে। এখন ৩/০ তিন মণ গুড়ের দাম ২২ বাইশ টাকা এবং তাহা হইতে যে ১০ ত্রিশ সের চিনি পাওয়া যায় তাহার দর ১০ আট আনা সের হিসাবে ১৫ পনের টাকা। বাকী 'কোংরা' বিক্রয় করিয়া নুনাধিক ১২ বার টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং কারিকর ২২ বাইশ টাকার গুড় ক্রয় করিয়া পরে চিনি এবং 'কোংরা' বিক্রয় করিয়া ২৭।২৮ সাতাশ আটশ টাকা আশ্বাজ পায়; এবং উহা হইতে পাটা-শেওলা, কয়লা, ক্ষার দ্রব্য ও মজুরীর খরচ জন্ত কিছু বাদ যায়। এই হিসাবে একজন কারিকর ২৫ পচিশ দিন পরিশ্রম করিয়া কারবার চালাইলে প্রত্যহ ১। ১।০ এক টাকা পাঁচ সিকা হিসাবে উপায় করে।

পূর্বোক্তপ্রতি প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(২) অল্পপরিমাণ চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে সাধারণতঃ বালি গুড়কে শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া একটি বড় পাটার উপর রাখিয়া প্রস্তরের চাপ দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে গুড় হইতে তরল পদার্থ বা 'কোংরা' বাহির হইয়া যায়। পরে কাপড় হইতে গুড়ের কঠিন অংশ লইয়া পাটার উপরে পিতলের মাপা সের বা ঘটির দ্বারা ঘষিতে হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ ঘষিত হইলে ঐ কঠিন গুড় চিনিতে পরিণত হয়। এই চিনি প্রথমোক্ত প্রণালী মত প্রস্তুত চিনি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

(৩) সময় সময় চুবড়ীতে গুড় রাখিয়া পাটা-শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। ৭।৮ সাত আট দিন এইরূপ ভাবে গুড় থাকিলে তাহা হইতে 'মাং' (গুড়ের তরল অংশ) বরিয়া যায়। চুবড়ীর ভিতর যে কঠিন অংশ থাকে তাহাই চিনিরূপে পাওয়া যায়। ঐরূপভাবে প্রস্তুত চিনিকে 'দলো' চিনি বলে। চুবড়ীর নিম্নভাগে যে তরল গুড় থাকে তাহা এবং 'মাং' পুনরায় গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে আবার ঐরূপ ভাবে পাটা-শেওলা চাপা দিয়া রাখিয়া 'গোড়' চিনি প্রস্তুত করা হয়। 'গোড়' চিনি প্রস্তুত করিবার সময় যে 'মাং' গড়াইয়া পড়ে তাহা গরম করিয়া 'চিটে' গুড় প্রস্তুত করা হয়। এই 'চিটে' গুড় তামাক মাথাইতে এবং মদ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) আবার সময় সময় গুড় 'চলিসা' (এক বস্তা গুড়) শক্ত ভাবে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। তাহা হইতে গুড়ের তরল অংশ নীচের পাত্রে ঝরিয়া পড়ে। 'চলিসা' নামাইয়া তাহা হইতে ধূলা ময়লা ধুইয়া বাছিয়া পুনরায় শক্তভাবে 'চলিসা' বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। পরে গুড় শক্ত হইলে তাহাকে শুকাইয়া পিটাইয়া চিনি প্রস্তুত করে। তদনন্তর চিনি আউড়িতে বস্তাবন্দী করিয়া রাখা হয়।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ১০।১২ দশ বার কোটি টাকা মূল্যের চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হয়। পূর্বে কুঁখুটিয়ায় গুড়ের মণ ২ ছই টাকা এবং চিনির মণ ৭।৮ সাত আট টাকা ছিল; এবং প্রতিযোগিতাও বেশী

ছিল না। তাই এখানে দৈনিক ১০০/০ একশত ১৫০/০ দেড় শত মণ চিনি তৈয়ারি হইত। এখন গুড়ের দর ছয় টাকা হইতে ৮ আট টাকা; এবং এখানকার চিনি ১৬ সোল টাকা হইতে ২০ কুড়ি টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে হয়। এখন বিদেশী চিনির মণ ১২ বার টাকা হইতে ১২।০ সাড়ে বার টাকা। -বিদেশী চিনির দর সম্ভা বলিয়া কুঁখুটিয়ার চিনির কাটতি কমিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই দেশী চিনির কারবার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এই গ্রামের বোগেন্দ্রজ লাহা প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি আপনাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ না করিয়া কুঁখুটিয়ার নাম ও পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এই স্থানের উৎপন্ন অধিকাংশ চিনি হেতমপুর রাজবাটীর ঠাকুর দেবা এবং অবশিষ্ট কতক অংশ অম্মা প্রভৃতি স্থানের দেব-সেবার জন্য সংগৃহীত হয়।

বর্তমানে এখানে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহা খুবই অল্প। কারিকরের বেতনের এবং গুড়ের মূল্য ও পারিশ্রমিকের আধিক্যবশতঃ এখানকার চিনির দর বিদেশী চিনির দর অপেক্ষা অগত্যাই অত্যধিক বেশী হইয়া রহিয়াছে। মূলতঃ এই কারণবশতঃই বিদেশজাত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া আমাদের দেশের চিনির কারবার আস্ত বিলোপের আশঙ্কায় মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে। অতিশয় ক্ষোভ ও মর্মান্তিক দুঃখের সহিত আক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ-বাবু বলিলেন—“যদি মাটি এবং এই গ্রামের প্রান্তে প্রবাহিত নদী (সা) র বালি হইতে চিনি তৈয়ারি করা সম্ভবপর হয়, তবেই আমরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারিব নতুবা আমাদের কারবার শেষ হইয়াছে এবং বাহা আছে তাহাও অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।”

২—মোরকা

বীরভূমের মোরকা একটি অতি উপাদেয় বস্তু এবং ইহার খ্যাতি দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন বিবিধ প্রকার ফল রক্ষার বহুবিধ প্রণালী

অবলম্বিত হইতেছে; কিন্তু বহুদিন পূর্বে বীরভূমের প্রাচীন রাজা তাহার রাজধানী নগর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহের বহু মোদক পরিবার স্থাপন করিয়া এই ফল-রক্ষণ-প্রণালী ব্যপদেশে মোরকার স্থাপ্তি করেন। নগর রাজধানীর সন্নিকটে সুদূর বিস্তৃত জঙ্গল মধ্যে হরীতকী, আমলকী, বেল, শতমূলী ও অম্মা প্রভৃতি বিবিধ ফল মূল সংগৃহীত করিয়া এই মোরকার কারবার প্রচলিত করেন। বীরভূমের রাজা নগর রাজধানীতেও বহুবিধ ফলের চাষ করিয়া তৎসমুদয়ের বহুবিধ উন্নতিসাধন করেন, এই নিমিত্ত নগরের কুল, বেল, আম প্রভৃতি ফল বীরভূমের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

বীরভূমে ইংরেজ আসিয়া নগরের পরিবর্তে সিউড়িতে রাজধানী স্থাপন করেন। ফলে নগরের মোদক পরিবার মধ্যে অধিকাংশ সিউড়ীতে আগমন করিয়া অম্মা মিষ্টানের সহিত ঐ মোরকার কারবার সমভাবে চালাইতে থাকে। মোরকা তৈয়ারি করিতে হইলে পূর্বে হরীতকী আমলকী প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলসমূহ প্রথমতঃ জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। পরে শর্করার সহিত পাক করিতে হয়। কিন্তু এই প্রাথমিক সিদ্ধ কার্যের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট মোদক পরিবার ছিল। তাহারা এবং তাহাদের পরবর্তী পরিবার ভিন্ন এই সিদ্ধ কার্য কেহই করে না। প্রবাদ—তাহা করিলে ছুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত এখনও আমলকী হরীতকী ফল সেই প্রাচীন পরিবারবর্গ কর্তৃক প্রথমতঃ সিদ্ধ হইয়া গাড়ী গাড়ী সিউড়ীতে চালান আইসে। স্থানীয় মোদকগণ তাহাই ধরিদ করিয়া মোরকা প্রস্তুত করে।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় মোদকগণ শতমূলী পেঁপে, কুম্ভাগু, পটল, উচ্ছে, লঙ্কা, পাতি ও কমলালেবু, ওল, বাঁশ, শাল-গম, আম, আদা, আনারস, মূলা, আলু, কামরাজা তেঁতুল, করঞ্জা, নাসপাতি, আপেল, নারিকেল প্রভৃতি ফল মূল হইতে মোরকা প্রস্তুত করে। এই মোরকা একপ্রকার সংরক্ষিত ফলমূলাদি (Preserved fruits) ইহা অনেক-দিন পর্যন্ত আবাদ্য থাকে।

অধিকাংশ মোরকাই ১০ আট আনা, ১০/০ দশ আনা সের দরে বিক্রয় হয়। তবে ফলবিশেষে মূল্যের তারতম্য অসু-

সাগ্রে সেইসকল ফল হইতে প্রস্তুত মোরবার ও মূল্যের তারতম্য হয়। এমন কি সময় বিশেষে কোনো কোনো ফলের মোরবার ১ এক টাকা হইতে ১০ পাঁচ টাকা দরে বিক্রয় হয়।

সিউড়ী সহরে সকল মোরবারের দোকানে সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মোরবার প্রস্তুত থাকে। সাধারণতঃ এই মোরবার কারবারে সের প্রতি ৮ ছই আনা হইতে ৮ তিন আনা পর্যন্ত লাভ থাকে।

এই মোরবার অতি স্বাদু; তবে এ অঞ্চলে এই মোরবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। অন্ততঃ ইহা সাধারণভাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩—মিষ্টান্ন

বীরভূমে প্রস্তুত যাবতীয় মিষ্টান্ন অপেক্ষা বীরভূম বাসু-

সাই উৎকৃষ্ট। এই বাসুসাইএর প্রতিযোগিতা করিতে এ পর্যন্ত কেহই সমর্থ হয় নাই। ইহার উপকরণ মূলতঃ খি, ময়দা ও চিনি এবং সামান্য কিছু মসলা।

৪—কাটা বাতাসা

বীরভূমের অন্তর্গত ছবরাজপুর একটি চৌকী ও গওগ্রাম। এখানে রেল স্টেশনও আছে, এই ছবরাজপুরে একপ্রকার অতি অল্প ওজনের বৃহদাকারের চিনির বাতাসা তৈয়ারি হয়। ইহাকে “ছবরাজপুরের কাটা বাতাসা” বলে। এক-একটি আধসের তিনপোয়া ওজনের বাতাসার ব্যাস দেড় হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এই অতি বৃহদাকার বাতাসা বহু প্রদর্শনীতে বহু প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছে।

সিংহলে প্রবাসী বাঙ্গালী

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বাংলার পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করিতেছে। বাংলাদেশ এখন তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বাংলায় যতই অক্ষমতা, দুর্বলতা, অসমস্তা, মশকের উৎপাত থাকুক না কেন, বাংলায় এমন জিনিষ আছে যাহা হইতে “গৌড়-জনেরা” নিরবধি আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অর্থের অঘেষণে বাঙ্গালী বিশেষে পড়িয়া থাকিলেও তাহার মনের কোণে সুজলা-সুফলা মলয়জ-শীতলা নদীমাতৃকা বাংলার ছবি প্রতিনিয়ন্তৃজাগিয়া থাকে। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, ‘বাংলা’ সঙ্গীত বাঙ্গালীদের সংহত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বেধানাই থাকুক না কেন নিজেদের ভিতর মেলা-মেশা সামাজিকতা নানা বিষয়ে আলোচনা দ্বারা তাহাদের চারিদিকে বাংলার একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীগণের কর্মকাহিনী শ্রীযুক্ত

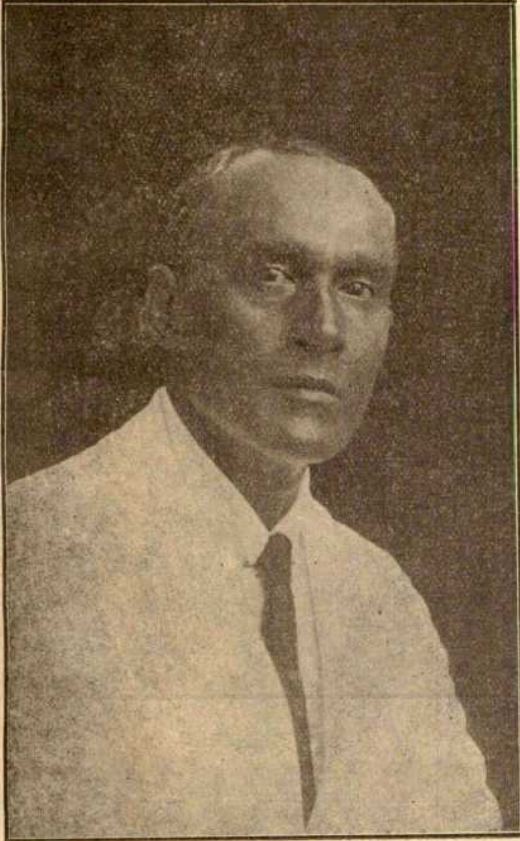
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কেবল ভারতবর্ষের ভিতরে যে-সব বাঙ্গালী আছেন তাহাদের কথা লেখা হইয়াছে। বাঙ্গালীরা এখন ভারতের বাহিরে গিয়াও নিজেদের কর্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। এই প্রবন্ধে সিংহলের গুটিকতক প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিচয় প্রবাসীর পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

১। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

সিংহলের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাসিন্দা। তাঁহার প্রবাস-কাল ১০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। জন্মস্থান বরাহ নগর, ২৪ পরগণা জেলায়। পিতার নাম ষ্ঠোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

ইনি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজে অধ্যয়নকরার পর বোম্বেতে ডিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হন। ১৯১০ সালে এখান হইতে ইলেক্ট্রিক্যাল

৭ বৎসর যাবত আছেন। ইনি কলিকাতার মালি-বাগানের (বর্তমান সিমলা বিডন স্ট্রীট) কাশী ঘোষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ স্বর্গীয় যত্ননাথ ঘোষ মহাশয়



শ্রী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পান। পরে বোম্বে সহরেই ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং সিক্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর কাজ করেন। এ কাজে এক বছর থাকার পরে বোম্বাই বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ ইনস্পেক্টর-এর কাজ করেন।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিংহলের পোষ্টাফিসের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ লইয়া আসেন। বর্তমানে টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগে অস্থায়ী ভাবে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-এর কাজ করিতেছেন।

২। শ্রীযুক্ত অজরনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত অজরনাথ ঘোষ বি-এ মহাশয় সিংহলে প্রায়



শ্রী অজরনাথ ঘোষ

বেঙ্গলী (Bengali) এবং হিন্দু পেট্রিয়ট (Hindoo Patriot) এর সম্পাদকতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরীক্ষার পর তমলুক জামিণ্টন স্কুলে শিক্ষক হইয়া যান। সেখানে ১৯১৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত দেড় বছর কাজ করেন। ১৯১৬ সালে মহীশূরে সর্দার লক্ষ্মীকান্ত রাজার্স (বর্তমান মহারাজের ভগ্নীপতি)-এর সেক্রেটারী হইয়া যান। সেখানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। এর পর সিংহলে গলের পরমানন্দ স্কুলে অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ৭ বছরের মধ্যে তিনি সিংহলের নানাস্থানে

বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। বর্তমানে কাণ্ডি সহরের নিকটে নওয়াল পিটিয়াতে অতুষ্কদ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

অতুষ্কদ কলেজটি ঘোষ মহাশয় তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় গড়িয়া তুলিতেছেন। পূর্বে এই বিদ্যালয় কেবল পাঠ-শালার আকারে ছিল। তাঁহার চেষ্টায় এখন ইহা সেকেন্ড গ্রেড স্কুলে পরিণত হইয়াছে। এই কাজে তাঁহাকে নানা বাধা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিয়া যান নাই। তাঁহার উৎসাহের জন্ত অনেক ধনী এবং নেতৃস্থানীয় লোক তাঁহার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের নিজস্ব অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই অট্টালিকা শেষ হইলে ইহা সহরের মধ্যে একটি সুরম্য গৃহ হইবে। বাড়ীর নকশাতে ঘোষ মহাশয় সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্যের সাহায্য লইয়াছেন। এই বিদ্যালয় স্নাঘার বিষয় হইবে। কারণ ঘোষ মহাশয়ের প্রথম হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইতেছে। বিদ্যালয়টি সমাপ্ত হইলে বাঙ্গালীদের কিছু বলিবার থাকিবে।

৩। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এখানে পাঁচ বৎসর আছেন। তাঁর জন্মস্থান হাবড়া জেলায় গোবর্দ্ধনপুর গ্রামে। ইনি উলুবেড়ি হাইস্কুল ও বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীরামপুর গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রাল উইভিং ইনস্টিটিউট হইতে পাশ করিয়া কিছুদিন বঙ্গলক্ষ্মী ও ভারত অভ্যুদয় মিলে কাজ করেন। ইহার পর বোম্বে, মেদাস' ক্রিম-ভাই ইব্রাহিম ও মথুরা দাস গোকুলদাসের মিলে প্রথমে শিক্ষানবীশ ও পরে সহকারী রূপে পাঁচ বৎসর কাজ করেন।

বর্তমানে সিংহলে সিংহল স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং (Cylon Spinning and Weaving Co.)তে বয়ন শিক্ষকের (weaving master) কাজ করিতেছেন। এই মিল সিংহলে হইলেও ভারতের মূলধনে এবং ভারতীয় কারীগরের অর্মে চলিতেছে।



শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় মিলের যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞ এবং মজুরদের বন্ধু; তাঁহার উপদেশ কলের মালিকেরা বহু বার গ্রহণ করিয়াছে, এবং কোম্পানী সেজন্য অনেকবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

৪। শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতার টেকনিক্যাল কলেজে প্রায় ৩ বৎসর লেকচারারের কাজ করিতেছেন। জন্মস্থান বাগনাপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান; ইহার পিতামহ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ভূদেব-বাবুর বন্ধু ছিলেন। পিতার নাম শ্রীউত্তরলাল মুখোপাধ্যায়। ইনি ১৯১৪ সালে উত্তর পাড়া গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী কলেজ

হইতে ৩-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্ত বিলাত যাত্রা করেন। শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পান। দেশে

৫। শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুরের তেলীরবাগ গ্রামের বিখ্যাত দাশগুপ্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ



শ্রী দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্তন করিয়া গুজরাট প্রদেশের ক্যাঙ্গে সহরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিতে দুই মাস এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেন। পরে টাটা-কোম্পানীর কোচীন রাজ্যের অয়েল মিলের কারখানায় ৫ মাস কাজ করিয়া ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কাজ লইয়া আসেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিক্ষকতা ছাড়াও অভিনয়ে স্থান অর্জন করিয়াছেন। এখানে ওয়াই, এম, সি, এ (Y. M. C. A.)র ড্রামাটিক ক্লাবে একাধিকবার অভিনয় করিয়াছেন। কলকাতার দৈনিক পত্র মর্গিং লীডার তাঁহার নাট্য-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে।



ডাক্তার ভূপেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দাশগুপ্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় কল্পকাকুমার দাশ গুপ্ত মহাশয় বরিশালে ওকালতি ব্যবসায়ে যশ অর্জন করিয়া-ছিলেন।

ঢাকা কলেজ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্যতার দরুণ বৃত্তি পান। এম-বি পাশ করিয়া বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে যুদ্ধ-বিভাগে যোগ দেন। এই কাজের জন্ত যুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাবের নানা স্থান, উত্তর পশ্চিম

সীমান্ত ডেরা-ইসমাইলখান প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয়। পরে মেসোপটোমিয়ায় যান। সেখানে অবস্থান-কালে ইহাকে পারস্য ও দক্ষিণ রাশিয়াতে যাইতে হইয়াছিল। দুই বৎসর যুদ্ধ-বিভাগে কাজ করিয়া বিলাতে শিক্ষার জন্ত গমন করেন। বিলাতে D. T. M., H. D. P. H., M. R. C. P এবং L. M ডিগ্রী পান।

ইহার বিলাতে অবস্থানকালেই কলম্বো সহরের জন্ত একজন হেলথ অফিসারের প্রয়োজন হয়। কলোনিয়াল সেক্রেটারীর কাছে একাজের জন্ত আবেদন করিয়া ইনি কাজটি প্রাপ্ত হন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলম্বোয় কাজ লইয়া আসেন। বর্তমানে সিংহলের দক্ষিণ প্রদেশের হেলথ অফিসার হইয়া গল সহরে বাস করিতেছেন।



ডী হেমেননাথ মুখোপাধ্যায়

কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী রোগের উপশমের জন্ত টিনকোমালে, গল, কাতরাগাম, হামবানটোটা প্রভৃতি

স্থানে ইনি যে-কর্ম করিয়াছেন সেজন্ত কলম্বোর দৈনিক পত্রসমূহ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছে।

৬। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইহার জন্মস্থান বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা জেলা। পিতার নাম নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮ বৎসর বয়সে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এখানে আসেন। এখন বেতার বিভাগে কাজ করিতেছেন। এখানেই তিনি টেলিগ্রাফের শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতজ্ঞ। বাঙ্গালীদের যখন কোন সম্মিলন হইয়া থাকে, তখন গান গাহিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দ দিয়া থাকেন।



অধ্যাপক ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র সর্কাধিকারী

৭। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সর্কাধিকারী

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সর্কাধিকারী ডি-এসসি

(লণ্ডন) পি-এইচ. ডি (লণ্ডন) সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ শাস্ত্রের অন্ততম অধ্যাপক ।

ইনি স্বধিকল্প ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারীর পৌত্র ও অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্র, ও স্ত্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ও পরলোকগত কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভ্রাতৃপুত্র ।

সর্বাধিকারী মহাশয় ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রয়েল কলেজ অব সায়েন্সে উদ্ভিদজাততত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত হন । ১৯২৪ সালে ইনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডি-এসসি ও পি-এইচ-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডবল ডক্টরেট ডিগ্রী পান এবং হাকসলি স্বর্ণপদক পুংস্কার ও বৃত্ত লাভ করেন । ১৮৯৮ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাক্সলির স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্বর্ণপদক ও বৃত্ত প্রতিষ্ঠিত হয় । ভারতবাসীর মধ্যে ডাক্তার সর্বাধিকারী সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন । এতদ্ব্যতীত ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিস্টেন্স পুরস্কার ও বৃত্তি, মোজলে পুরস্কার ও বৃত্তি, কাণেগী বৃত্ত প্রভৃতি ছয়টি পুংস্কার লাভ করেন । পরে বার্লিন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটোরিতে কয়েকজন মনোষির নিকট হইতে উদ্ভিদজাততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ও স্বস্বীয় ছয় বৎসর ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় থাকিয়া উদ্ভিদের বংশোৎপত্তি (Heridity of plants) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন । বিলাতে সেক্রেটারী অব্ স্টেট ইহাকে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততম অধ্যাপক নিৰ্ব্বাচিত করিলে, ডাক্তার সর্বাধিকারী ১৯২৬ সালে সিংহলে আসেন । ছয় মাস পরে সিংহল হইতে সাম্রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস বিটিশ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সমিতি, প্যারিস বিজ্ঞান একাডেমি (Congress of the Universities of the Empire, British Association Meetings for the Advancement of Science, Paris Academy of Sciences) প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিক সভায় যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে লণ্ডনে ও প্যারিসে প্রেরণ করা হইয়াছিল । তিনি তথায় বিশেষ সূচ্যুতি অর্জন করিয়াছেন । তাঁহার গবেষণার জন্য ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি (Royal Society) ডাক্তার সর্বাধিকারীকে একটি পুংস্কার প্রদান করিয়াছেন ।

তিনি নিজে যেরূপ উদ্ভিদতত্ত্বের অমূল্য গবেষণা করিতেছেন, ছাত্রদেরও তেমনি এবিষয়ে তত্ত্বপ্রবণা দিতেছেন ।

সিংহলের প্রবাসী বাঙ্গালীদের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হইল । অল্প যে-সব বাঙ্গালী ৬ মাস বা ১ বছর দেড় বছর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে । *

যামিনীকুমার ঘোষ, এম-এসসি, বি-এল (মহম্মদসিংহ) শিক্ষক—মানিঙ্গা হিন্দু কলেজ (জাফনা), ৬ মাস ।

প্রবোধ সেন, এম-এ, (কলিকাতা) শিক্ষক—জাফনা হিন্দুকলেজ প্রায় এক বছর ।

প্রভাত সেন বি-এ, (কলিকাতা) হেডমাষ্টার, কাবা দ্বীপ হিন্দু হাইস্কুল, ৬ মাস ।

(প্রবোধ সেন, এবং প্রভাত সেন দুই ভাই ছিলেন) ।

রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি-এ (ঢাকা) শিক্ষক—প্রিয়বত্ন হাইস্কুল, ডোডানডুয়া ১৯০ বছর প্রায় । স্বদেশে ২৯ (বরিশালের বিখ্যাত নেতা স্বর্গীয় অম্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনেয়) সিংহলের বিখ্যাত নেতা অনায়েবল্ স্ত্রীর রামনাদনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন—২ বছর প্রায় ।

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এম, এ, (কলিকাতা) বৌদ্ধ বালিকা কলেজ, প্রিন্সিপাল ।

কালিদাস নাগ, এম-এ, (বর্তমানে ডি-লিট) কলিকাতা, প্রিন্সিপাল—মাহিন্দ্র কলেজ (গল), ১০ মাস ।

মিস্ গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় সভাব্যমিতিতে বাংলার গানের প্রচার করিয়াছেন । তাঁহাদের সময় বিশেষ ভাবে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত “জন-গণ-মন-অধিনায়ক” গানটির প্রচার হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় কবির অমূল্যমতি লইয়া “প্রাবিড় উৎকল বঙ্গ” এই পদের

* এই সংখ্যার জন্য আমি শ্রীযুক্ত অক্ষরনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট ঋণী।—লেখক ।

স্থলে—“দ্রাবিড় সিংহল বঙ্গ” করিয়া লইয়াছিলেন। সিংহলী ভাষার নাট্যকাব জন ডি দিল্লী তাঁহার নাটকের গানে স্বর দিতে কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালী গায়ককে আনিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সংগ্রহ করিতে পারি ।

সিংহলীদের অস্বাভাবিক অভাব হইতে গানের অভাবটা খুব চোখে পড়ে। সেক্সপিয়রের বিখ্যাত উক্তি “যাহার হৃদয়ে সঙ্গীত নাই সে হত্যা করিতে পারে” খুবই সত্য এবং সিংহল সম্বন্ধে খাটে। সিংহলীরা সর্বদাই বেল্টের সঙ্গে ছুরা রাখে; এবং সামান্য কারণেই ছুরীর অপব্যবহার করিয়া থাকে। খবরের কাগজেই প্রায়ই খুন-খাবাবি খবর পাওয়া যায়। এটা বোধ হয় সঙ্গীতের অভাবেরই কারণ। সাধারণ লোকদের ভিতর গান ত একেবারেই নাই; ইংরেজী শিক্ষিতদের ভিতর যে-সব সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তা নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণীর, খেলো ইংরেজী গান—ইংরেজীতে যাকে বলে Rag time song, যেমন We have no banana (আমাদের কদলী নাই—) এই গান কলম্বোতে সবচেয়ে বেশী চলিত। অস্বাভাবিক গানে “Why did I kiss that girl?” “Horse ye why do you put your tail up?” ইত্যাদি। গানের দিকহইতে বাঙ্গালী বোধ হয় সিংহলে স্তন্যম অর্জন করিতে পারে।

সিংহলে বাঙ্গালী ছাত্র

কলম্বোতে সময় সময় পালী, বা বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন কিংবা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ত বাঙ্গালী ছাত্র আসিয়া থাকে।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাসুধ কলম্বোর বিদ্যোদয় পিরিবেন-এ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পালির অধ্যাপক পণ্ডিত নিতাইবিনোদ গোস্বামী ধর্মপদ অধ্যয়ন করিতে এখানে আসিয়াছিলেন।

দুই বছরের মধ্যে (১৯২৫-২৬) ৫ জন ছাত্র লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্ত আসিয়াছে।

সিংহলে বাঙ্গালী বৌদ্ধ

সমগ্র সিংহলে প্রায় ১০১২ জন বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছেন। ইহারা সকলেই ভিক্ষু। সকলেই চট্টগ্রাম-বাসী। একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, ত্রিপুরা জেলায় লাকসামের কাছে কোনো গ্রামে। সে গ্রামে নাকি অনেক বৌদ্ধ আছেন। একজন ভিক্ষু কাস্তির নিকট লক্ষ্যাত্মক বিহারে থাকেন। প্রায় ১৫ বছর ধরিয়া সিংহলে আছেন, পালি এবং সিংহলী ভাষা ভাল জানেন। আমার সঙ্গে বাংলা বলিতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইতেছিল। বাংলার ভিতর খুব সিংহলী টান ছিল।

সিংহলবাসী ও বাঙ্গালা ভাষা

মাঝে মাঝে দুই-একজন লোক চোখে পড়ে, যাহারা বাংলা ভাষা জানেন। ইহাদের ভিতর অধিকাংশই ভিক্ষু। আয়ুর্কেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবাব জন্ত বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতায় যে-সব সিংহলী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবাব জন্ত আসে তাহাদের বাংলা শিক্ষা করিতে হয়; কিন্তু দেশে ফিরিয়া গেলে পর ইহারা বাংলা ভাষার চর্চা রাখে না বলিয়া ভুলিয়া যায়।

কলম্বোর আয়ুর্কেদ চিকিৎসক বুদ্ধদাস মহোদয় বাঙালা ভাষা বেশ জানেন। বিদ্যোদয় পিরিবেনের অধ্যাপক রেভারেণ্ড দেবরক্ষিত সেরা বাংলা জানেন। প্রবাসী বাণিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি পালির অধ্যাপক ছিলেন।

এক দৈনিক কাগজে পড়িয়াছিলাম, বিদ্যোদয় পিরিবেনএ বাংলার ক্লাস খোলা হইবে; এখনো হয় নাই। পরে হইতে পারে।

যাহারা বাংলা শিখিয়া থাকে, তাহারা বাংলা সাহিত্য বা রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিবাব জন্ত শেখে না, কাছেই বাংলার প্রসারের ভেতন সম্ভাবনা নাই। ইংরেজী শিক্ষিত যাহারা, তাহাদের বাংলা শিক্ষার আগ্রহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল

রবীন্দ্রনাথ কয়েক বার সিংহলে আসিয়াছেন এবং বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। লোকেরা ৫ টাকা

খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ সঙ্ঘে জানিতে বা তাঁর বই অধ্যয়ন করিতে লোকেদের আগ্রহ একটুও বাড়েনি। সময় সময় ইহারা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া থাকে, এবং তাহাকে বিখ্যাত প্রাচ্য কবি (Great Eastern poet) আখ্যা দিয়া থাকে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। খুব কম লোকেই তাঁহার বই পড়ে। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এখানকার এক বড় দোকান রবীন্দ্রনাথের Personality এবং Nationalism এই দুই পুস্তক ২০ কপি করিয়া বিক্রী করিতে আনিয়াছিল। এই বই শেষ করিতে তাহাদের দু'বছর লাগিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে সত্য-সত্যি তাঁহার কত আদর, তাঁহার শিক্ষার আদর্শ এবং জাতীয়তার আদর্শের সহিত বর্তমান সিংহলের আদর্শের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সিংহল

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বক্তৃতা করিতে

যাইবার সময় কলকাতা হইয়া গিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সোসাইটী নামে একটি সমিতি তাঁহার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এই সংলগ্নে একটি পুস্তকালয় ও হোটেল আছে। জ্ঞাননার তামিল স্বামী বিপুলানন্দ বিবেকানন্দের শিষ্য। ইনি মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম সঙ্ঘে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে গোটা দুই হিন্দু স্কুল আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে এখানে বক্তা এবং কর্মী মাঝে মাঝে পাঠান দরকার। ভারত হইতে মিশনারী বায় আমেরিকার খৃষ্টানদের হিন্দু করিতে, কিন্তু ঘরের কাছে সিংহলে হিন্দুদের আগে হিন্দু করা দরকার। যদিও তাহারাও দ্রুত সিংহলীদের মত স্বেচ্ছা হইয়া উঠিতেছে, তবু এখনও তাহারা নিজেদের জাতীয়তা হারাইয়া ফেলে নাই। ইহারাই ভারতের ডাকে সাড়া দিবে। সিংহলীরা দিবে না।

সঙ্গীতে পরিবর্তন

শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(৩)

ইংরাজী ১৮৮০ সালের বৈশাখ মাসে আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে বৈশাখ-উৎসব-উপলক্ষে গান-বাজনা হইয়াছিল, আমাদের বাড়ীর নিকটেই তাঁহার বাড়ী। যখন সেখানে গান বাজনা হইত আমি সংবাদ লইতাম এবং সেখানে গিয়া শুনিতাম। গায়কের মধ্যে শ্রীরামপুরের একজন বক্তৃক্ষ জমিদার স্বর্গীয় রামদাস গোস্বামী এবং আর একজন পেন্‌গুনগ্রাপ্ত ভদ্রলোক, তাঁহার নাম শ্রীমাচরণ চক্রবর্তী (ইনি বিখ্যাত শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য)। রামদাস বাবু রত্নল বস্কের শিষ্য। গান-বাজনা হইতেছিল; অন্ত্যন্ত শ্রোতাগণ ছিলেন, আমিও শুনিতে গিয়াছিলাম।

গান-বাজনা বন্ধ হইলে পর, সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন, “তোমার খেয়াল শিক্ষা হইল না বলিয়া দুঃখ করিও না। রামদাস-বাবুর নিকট তুমি ঙ্গদ শিক্ষা কর; তিনি তোমাকে যত্ন করিয়া শিখাইবেন।” সেন মহাশয় খেয়াল অপেক্ষা ঙ্গদের শ্রেষ্ঠ এবং ঙ্গসাংবাদ করিতে লাগিলেন এবং রত্নল বস্কের ঘরের ঙ্গদের তুল্য ঙ্গদ আর নাই বলিয়া পরিচয় দিলেন। রামদাস-বাবুও আমাকে গান শিখাইবেন বলিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে আমি গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাড়ীর নীচের ঘরে দুইজন ভদ্রলোক, একজন গান করিতেছিলেন

এবং অপরটি সোনার বাজাইতেছিলেন। আমি বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। রামদাস-বাবু নীচে আসিয়া আমার স্বরবোধ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত কণ্ঠে স্বগম্ বাহির করিতে বলিলেন। আমার বাঁশী বাজানি পূর্বে অভ্যাস ছিল এবং গানও অল্প অল্প করিতে পারিতাম বলিয়া স্বর বাহির করা কঠিন হইল না। যে দুইটি গান দুইজন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, রামদাস-বাবু সে দুইটি আমাকেও শিখাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথম গানটি কোকব বেলাবল, “সুভ সগন সুভ লগন ছত্র ধরাউ, আত্ম মিলি পণ্ডিত লগন ধরাউ”; দ্বিতীয় গানটি সিদ্ধ, “কঠিন দুখ পায়ে মোহন প্যারে তেহারে দরশন বিন ঘড়ি পল ছন দিন রয়ন পড়ত নহি চয়ন।” গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি গান দুইটি তিন চারি বার গাহিলাম; পরে আমি একলাই দুইটি আস্থায়ী গান কবিতাম। সেদিন প্রাতঃকালে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল; রামদাস-বাবু আমাকে পুনরায় বৈকালে আসিতে বলিলেন, আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম; গোস্বামী মহাশয় সে-সময়ে পাশা খেলিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া খেলিতে-খেলিতে গান দুইটির অন্তর্য শিখাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গেই গান করিতে লাগিলাম, পাঁচ সাত বার গান করিবার পর আমি একলাই গান করিলাম। দুই একস্থানে ভুল হইল, কিন্তু তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া দিলেন। গুরুদেব তাষুবার সহিত গান করিতে বলিলেন। তাষুবা ধরিতেই পারি না, স্বব কেমন করিয়া ছাড়িতে হয় জানি না, গান করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। প্রায় সপ্তাহ কাল পরে তাষুবার স্বর ছাড়িতে পারিলাম এবং ঐ দুইখানি গান দুই ভুকের বলিয়া এই কয় দিনে আদায় হইয়াছিল, তাহাও তাষুবার সহিত গান করিতে পারিলাম। ভাল বড় ভাল হইল না, ভালের জন্ত তিনি বলিলেন, পরে হইবে।

পরদিন - হইতে আমার গান শিক্ষা আরম্ভ হইল, গুরুদেবের আদেশ হইল প্রাতে দুই ঘণ্টা, অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা এবং রাত্রে দুই ঘণ্টা শিক্ষা করিতে হইবে, প্রাতে

স্ববসাধনা অর্থাৎ মন্ত্র-মন্তক-সাধন এবং অন্ত্র সময়ে গান শিক্ষা এই বন্দোবস্ত হইল। আমি তদনুযায়ী শিক্ষা ও সাধনা করিতে লাগিলাম, মাস দুই মধ্যে চারি পাঁচখান আদায় হইল, কিন্তু সেগুলি সাধনভাবে পরিষ্কার (অর্থাৎ ‘সুরিলি’) হইল না। ক্রমে ক্রমে সময়ে বাড়াইতে হইল এবং তাঁহার আদেশ মত এক-একখানি গান একশত বার করিয়া সাধন করিতে লাগিলাম। মুসলমান গুস্তাদেবা এক-একটি গান পাঁচ শত বাব, এবং কোন কোন গান এক সহস্র বাব গান করিয়া তৈয়ার করিয়া রাখে। এই নিমিত্তই উহাদের গান মিষ্ট, এক্ষণে আর এ-প্রথা নাই। আমাদেরও গানেব পুঞ্জি যেমন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সাধনার কালও অল্প হইতে লাগিল। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল, যেখানে গোস্বামী মহাশয় গান করিতেন সেখানে আমাকেও লইয়া যাইতেন এবং সঙ্গে গাওয়াইতেন। যে গান আমাকে শিখাইতেন সেই গান গাহিতেন এবং আমাকে কখনও একলা গাওয়াইতেন, কখন কখন সঙ্গে গান করিতে বলিতেন। এই সময়ে শ্রীধামপুর হইতে নিমাইচরণ ঘোষাল নামে একজন (আমারই সমবয়স্ক) গান শিখিবাব নিমিত্ত গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইল। আমাদেরও শিক্ষার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল, একসঙ্গেই আমরা গুরুদেবের নিকট থাকিতাম এবং শিক্ষা ও সাধনা উত্তমরূপেই হইতে লাগিল। তিন বৎসর এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর গুরুদেব আমাদেরকে শ্রীধামপুরে লইয়া যান এবং আমাদের গান শুনাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ গুণীদিগকে আহ্বান করেন। তখন প্রাচীন গুণী ও গায়কমণ্ডলীর মধ্যে গোপাল চক্রবর্তী (মুলো গোপাল), মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধু বাঁড়ুয়ে এবং আরও দুই-চারিটি শ্রীধামপুরে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। আমরা একমাস সেখানে ছিলাম; প্রত্যহই সকালে, বৈকালে ও রাত্রে ক্রমদ গান হইত।

কাশী ফিরিবার সময় বিষ্ণুপুর, কাশীপুর, হেতমপুর প্রভৃতি বাস্তস্থান এবং গুণীদিগের গান বাজনা দেখিবার সুবিধা ইচ্ছা আমরা গুরুদেবকে জানাই এবং তদনুযায়ী তিনি তৎ তৎ স্থানে পত্র লিখিয়া জানাইলেন। আমরা

যথাসময়ে প্রথমে কাশীপুরে যাই; সেখানে কাসিম আলি খাঁ (রবাবী) ছিলেন। সন্ধ্যার সময় খাঁ সাহেবের বীণা-বাদন হইল। শ্রোতাগণের মধ্যে রাজা এবং আমবাই কয়জন। খাঁ সাহেব একঘণ্টা আলাপ করিয়া গান করিলেন এবং বিষ্ণুপুরের একজন মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বাজাইলেন। বীণার সঙ্গে গান বন্ধে আলি খাঁর স্তনিয়াছিলাম আর এই স্তনিলাম; পরে আর স্তনিতে পাই নাই।

পরদিন প্রত্যুষেই খাঁ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অত্যন্ত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও প্রাতে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমাদের গান হইল ও খাঁ সাহেব বীণাতে সংগত করিতে লাগিলেন। আমরা “হুরিমিন হুরমণ” ললিত রাগেব গান কবিলাম। খাঁ সাহেব বড়ই খুসী হইলেন এবং তিনিও “সঘন বন ছায়ো” ললিতের ঋণদ গান করিলেন এবং বীণাতে সংগত করিতে লাগিলেন। রাজাও অত্যন্ত খুসী হইলেন। আহা-রাস্তে পুনরায় বৈকাল বেলায় বীণা আবৃত্ত হইল ও খাঁ সাহেব সাময়িক রাগ আলাপ ও গান করিলেন। সন্ধ্যার পর আহ-রাস্তে রাজার সহিত রামনা-বাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। কলাবিৎদিগের মতের সহিত কথকদিগের মত মেলে না, অনেক স্থলে কলহও হয়, অথচ খাঁ সাহেবরা হাতে-কলমে অর্থাৎ যন্ত্রে কিছা কণ্ঠে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন। আমাদের গান এবং বিষ্ণুপুরের ঢঙ্কের গান বিভিন্ন রকমেব হইলেও তাহাতে যে বিশেষত্ব নাই তাহা বলা যায় না। যহুভট্ট নামে একজন গায়ক সেখানে ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভাল ছিল এবং তিনি অসাধারণ মেধাবীও ছিলেন। কিন্তু ভাল মাথা থাকিলেই যে কাহাবও নিবট শিল্প স্বাকার করিবেন না ইহা হইতে পারে না। রাজা এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়কে একটি ঘটনা শুনাইলেন। যহুভট্ট কোন সময়ে দরবারী কানেডা গান করিতেছিলেন এবং কাসিম আলি খাঁ স্তনিতেছিলেন। গান শেষ হইবার পর খাঁ সাহেব বীণাতে ঐ রাগের আলাপ করিলেন এবং পরে একখানি গান করিলেন। স্পষ্ট দেখা গেল,

ছুইজনের পানে বহু ভেদ। ভট্ট মহাশয় খাঁ সাহেবকে বলিলেন, আমাকে বীণা শিখান। খাঁ সাহেব বলিলেন, “বীণা নিজ বংশ (অওলাদ) ব্যতীত কাহাকেও শিখাইবার আদেশ নাই। তবে তুমি সেতার কিছা গান শিখিতে পার।” ভট্ট মহাশয় বলিলেন, “আমি বীণাই শিখিব; আপনি যদি না শিখান তবে অশ্রু শিখিব।” ইহারা উভয়েই রাজ-দরবারে থাকিতেন; খাঁ সাহেব যখন দরবারে বাজাইতেন ভট্ট মহাশয় রাজকর্মচারীদের ঘবে লুকাইয়া থাকিয়া সেই বাজনা অভ্যাস করিতেন। এইরূপ পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল। খাঁ সাহেব কেবল শুণী ছিলেন না, তিনি একজন গণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীত দ্বারা যৌগিক উপদেশ দিবার শক্তি তাঁহাতে ছিল তাই তিনি মধ্যে মধ্যে রাজার বিনামূল্যেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপদেশ দিতেন। কোন সময়ে ভট্টজী সেতাবাদ বাজাইতেছিলেন এবং রাজা স্তনিতেছিলেন, এমন সময়ে খাঁ সাহেব হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভট্ট মহাশয় তন্ময় হইয়া সেই-সকল তানগুলি বাজাইতেছিলেন যেগুলি লুকাইয়া শিখিয়াছিলেন। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভট্টজী, এই তানগুলি কোথায় শিখিলে?” ভট্টজী বলিলেন, “এগুলি আমাদেরই ঘরের।” খাঁ সাহেব বলিলেন, “এ বিষ্ণুপুরের ঢং কখনই নহে; তুমি চুরি করিয়া শিখিয়াছ।” একথা বলিয়া রাজাকে বলিলেন, “আপনার চাকরদের জিজ্ঞাসা করুন, ভট্টজী তাহাদের ঘরে লুকাইয়া থাকেন কি না এবং আমি যখন বাজাই তখন সেগুলি লুকাইয়া অভ্যাস করেন কি না।” অংশ ভট্টজী ধরা পড়িয়া গেলেন, সত্য কথা বলিলে হয়ত কাশীধামের অর্জুনজীর মত তিনিও খাঁ সাহেবেরই নিকট বিজ্ঞালাভ করিতে পারিতেন। চুবি করিয়া কেহ কেহ বিজ্ঞা অর্জন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তথাপি গুরু নাম লোপ করা কর্তব্য নহে। রাজা এইরূপ কথোপকথনের পর আমাদের উৎসাহ দিয়া বলিলেন, “গুরু-সমীপে থাকিয়া গুরুর সেবা করিয়া বিজ্ঞা শিক্ষা কর।”

পরদিন প্রাতেই আমরা কাশীপুর হইতে বিষ্ণুপুর যাত্রা করিলাম। সেখানে স্বর্গীয় রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র (নাম স্মরণ নাই) আমাদের অতিশয় যত্নের

সহিত আত্মপুরুষে গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় গায়ক ও বাদকদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং অনেকক্ষণ গানবাজনা হয়। আমাদের গানের সহিত তাঁহাদের গানের স্বর মেলে না এবং বোল বাগীরও স্থানে স্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তবে রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয়ের স্বরচিত গানগুলি শ্রবণে এবং লয়ে আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল। আমি গুরুদেবের আদেশানুসারে ৩৪ খানি গান মিশ্র মহাশয়ের একজন ছাত্রের নিকট শিক্ষা করি। সেখানকার একজন গায়ক একটি আশাবরী গান করিয়াছিলেন। আমি পূর্বে উহা গোপাল চক্রবর্তী (হুলো-গোপাল) মহাশয়ের নিবট শুনিয়াছিলাম। এটি রাগমালার গান, অর্থাৎ কল্যাণ, ভূপ, শঙ্করা ও হিঙোল, এই চারি রাগে চারি পদ গাওয়া যায়। চারি তালেও চারি পদ গাওয়া যায়; এক-একটি রাগেও চারি পদ গাওয়া যায়। উহা মৎপ্রণীত অল্প পুস্তকে দিখাছি বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। বৈষ্ণু পণ্ডার গান কি-রূপে নষ্ট হইয়াছে বুঝবার উপায় নাই। আমি এই গান পরে উক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করি।

বিষ্ণুপুর হইতে আমরা হেতমপুরে আসি, কিন্তু সেখানে কোন গায়ক (পশ্চিমের শিক্ষা) দেখিলাম না। সবই বিষ্ণুপুরী ঢং। একাদিন গান-বাজনা হইয়াছিল; পরদিন আমরা কাশী রওনা হই।

(৪)

কাশী আসিয়া আমাদের শিক্ষা ও সাধনা পূর্ববৎ হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শুনা গেল কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নামক একজন গায়ক কাশীতে আসিয়াছেন। তিনি ধ্রুপদ গানও করিতে পারেন এবং সেতারও বাজাইতে পারেন। বাঙ্গালীটোলায় আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার গান হইয়াছিল; আমরাও উপস্থিত ছিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গলার স্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং মোটা; তাহার স্বর নীচে থাকে; ক্রমে শুনা গিয়াছিল। তিনি ইংরেজী সঙ্গীত ভক্ত। যাহা হউক তাঁহার গান লয়ে স্বরে ভাল বলিতে হইবে। আমাদের গানও হইল; গুরুদেব নূতন নূতন গান

করিলেন, আমরা সঙ্গে স্বর দিতে লাগিলাম। পরে আমি ও নিমাই জুড়িতে গান করিয়াছিলাম, কৃষ্ণধন-বাবু রামদাস-বাবুর গান শুনিয়া বলিলেন, “গোটা কতক ধ্রুপদ আমি স্বরলিপি করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি; অল্পমতি পাইলে আপনার নিকট যাইব।” গুরুদেব বলিলেন, “তাহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? তবে স্বরলিপি দ্বারা কি শিক্ষা হইবে বুঝিতে পারি না।” কৃষ্ণধন-বাবু তৎক্ষণে একটি বক্তৃতা সংক্ষেপে দিলেন এবং বলিলেন যে, স্বরলিপি ভিন্ন বিদ্যা রক্ষা করিবার অল্প কোন উপায় নাই। গুরুদেব বলিলেন, “স্বর পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা হয় না, গুরু সমীপে সাধনার দ্বারা শিক্ষা হয়। তবে আপনারা যদি স্বর সাধনা উঠাইয়া দিতে চাহেন তাহা হইলে ভিন্ন কথা।” কৃষ্ণধন বাবু বলিলেন, “এসমস্ত বিষয়ে আপনার বাটিতেই কথাবার্তা হইবে। আমি কল্যাণ আপনার বাড়ীতে প্রাতে যাইব।”

পরদিন যথাসময়ে কৃষ্ণধন-বাবু গুরুদেবের বাড়ীতে আসিলেন, আমরা “আনন্দী গগবন্দী” দেশকার রাগে শিক্ষা করিতেছিলাম। কৃষ্ণধন-বাবু স্বরলিপি করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে গাহিতে অহুরোধ করায় তিনি গান করিলেন,—আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা আবার গান করিলাম; কৃষ্ণধন-বাবু পুনরায় স্বরলিপি পরিবর্তন করিলেন এবং তদনুযায়ী গান করিলেন। অনেকটা হইল বটে, কিন্তু স্বর ও তাল কাটা কাটা বোধ হইতে লাগিল। গুরুদেব বলিলেন, স্বরলিপি সাহায্যে গান শিক্ষাব কোনই সম্ভাবনা নাই, পরন্তু গানগুলির স্বর জবাই করা হয়। কৃষ্ণধন-বাবু পুনঃপুনঃ নিদ্রেরই কথা অর্থাৎ স্বরলিপি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বুঝাইতে লাগিলেন। গুরুদেব অগত্যা এই কথাগুলি বলিয়া নিস্তদ্ধ হইলেন, “তাহা হইলে সাধনা ও গুরু এই দুইটি শব্দ তোমরা উঠাইয়া দিতে সক্ষম করিয়াছ।” কৃষ্ণধন-বাবু আরও দুই তিনখানি গান স্বরলিপি করিয়া সে-যাত্রা চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, “এক বৎসর পরে আমি পুনরায় আসিব এবং ভাল ভাল গানগুলির স্বরলিপি করিয়া লইব।”

কলিকাতায় মহাপ্রদর্শনী সভা যে-বৎসর হয় সেই বৎসরে কৃষ্ণধন-বাবু কাশীতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১০১৩

খানি ধ্রুপদ স্বরলিপি দ্বারা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন। গুরুদেব আমাদেরকেও ভাল ভাল ধ্রুপদগুলি (অর্থাৎ যেগুলি লম্বে সুরে ভাল) গাহিতে বলিলেন। গুরুদেব গানের খাতা বাহির করিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণধন-বাবুকে ইচ্ছামুযায়ী গানগুলি বাছিয়া লইতে বলিলেন। গ্রীষ্ম ঋতু চারিমাস ধরিয়া কৃষ্ণধন-বাবু ভাল ভাল গানগুলি আমাদের গান করিতে বলিলেন এবং নিজে স্বরলিপি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কণ্ঠেও গান করিতেন। তিনি সেতার বাজাইতে পারিতেন বলিয়া যে যে স্থানে স্বরলিপিতে কুলায় না সেখানে কণ্ঠেই দেখিয়া লইতেন। গুরুদেব পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, যেখানে মীড়ের কাজ আছে সেখানে গুরুকরণ ও কণ্ঠে সাধন ভিন্ন আদায় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কৃষ্ণধন-বাবু 'না-ছোড়-বান্দা' হওয়ায় গুরুদেব তাঁহাকে ঐ প্রকার অবসর ও সুবিধা দিয়াছিলেন। তখন হারমোনিয়ম যন্ত্র বেশী ব্যবহার লোকে করিত না। ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন স্বরলিপির প্রচাৰ বৃদ্ধি হইল তেমনি হারমোনিয়ম যন্ত্রের ব্যবহারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কৃষ্ণধন-বাবু স্বরলিপি করিলেন বটে, কিন্তু গানগুলি কখনো শুনান নাই। তাঁহার পুস্তকে ধ্রুপদ-গুলি আছে বটে, কিন্তু কোন গায়ক ঐ পুস্তক দেখিয়া শিক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ৪০ বৎসর গত হইয়াছে; গানগুলি পুস্তকেই স্বরলিপি করা রহিয়াছে; শুধু তাহাই নহে; ধ্রুপদ গানগুলিও রাগাস্তর ও ভাষাস্তর করিয়া সঙ্গীত বিদ্যাটির মূলে তিনি একপ্রকার কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

যে সমস্ত ধ্রুপদ তিনি স্বরলিপি করিয়া পরে পরিবর্তন করিয়াছেন সে-সবগুলির তালিকা দেওয়া কঠিন; তবে কতকগুলি সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এ স্থানে দিলাম।

১। “আনন্দী জগবন্দী”; ইমন কল্যাণ রাগের গান; গানটি চারি তুকের (পদের)। কৃষ্ণধন-বাবু স্বরলিপি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে সঙ্কারী, আভোগ নাই এবং আস্থায়ী ও অন্তব্রতে বোল পরিবর্তিত হইয়াছে। এ গানটি দেশকার রাগেও গাওয়া যায়। গানের যে স্থান হইতে দেশকার রাগের সম্ভব সে স্থান কৃষ্ণধন-বাবুকে

বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পুস্তকে এ কথার উল্লেখ করেন নাই।

২। “ধ ম গ মা গব”; ইমন কল্যাণের স্বরগ্রাম। ইহার আস্থায়ী, অন্তব্রতে বোল পরিবর্তিত। সঙ্কারীতে তান আছে, কিন্তু পুস্তকে তাহা দেওয়া হয় নাই। অনেক বলেন ধ্রুপদে তান নাই বা তান চলে না; আমরা গমক তান শিখিয়াছিলাম এবং দিয়াও থাকি।

৩। “তেবো হি ধান ধবত”; কল্যাণের গান। ইহার বোল বাণী পরিবর্তিত এবং তানসেন কৃত বলিয়া পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আমরা গোপাল নামক রচিত বলিয়া জানি।

৪। “তাকত হু তেহারি”; ইমন কল্যাণের গান। কৃষ্ণধন-বাবু ভূপালী রাগে কোথা হইতে পাইলেন? আমবা তাঁহার সম্মুখে ইমন কল্যাণ রাগেই গান করিয়াছিলাম।

৫। “আনন্দ ভয়ো মেরে”; কেদারা রাগের গান; কৃষ্ণধন-বাবু হাছির রাগে করিয়াছেন; বোলও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত। লক্ষ্মীবাবু (বর্তমানে কাশী নিবাসী) কেদারাতেই গান করিয়া থাকেন।

৬। “শ্রাম সি ঘনশ্রাম”; মেঘ রাগের গান এবং কৃষ্ণধন-বাবু মেঘরাগেই স্বরলিপি করিয়াছিলেন। পুস্তকে গোড়মজার কি করিয়া করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

৭। “নাদনগর বসায়ো”; দরবারী টোড়ির গান। এ গানের স্বরলিপি করিবার জন্য কৃষ্ণধন-বাবুকে সেতারের সাহায্য লইতে হইয়াছিল; ইহাতে মীড়ের কাজ অনেক আছে এবং সুরের ব্যবহার অতিশয় সূক্ষ্মরূপে আছে। তিনি ইহাকে গুজ্জরী টোড়ি করিয়াছেন এবং গানেরও বোল পরিবর্তিত করিয়াছেন।

৮। “বিষহরণ বুধ বিনায়ক”; তিলক কামোদের গান। কৃষ্ণধন-বাবু ইহাকে কর্ণাট রাগ কেমন করিয়া করিলেন?

এইরূপ অনেক গান আরও আছে বাহার বোল ও সুর পরিবর্তন করিয়া “রাগের” নাম ও “গানের” সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পুস্তক বোঝাই করিয়াছেন, কিন্তু বাহার নিকট

ঐগুলি পাইয়াছেন তাঁহার নাম একেবারে উল্লেখ করেন নাই। গানগুলি কিন্তু এখনো রত্নল বন্ধের বলিয়া অনেক জানেন এবং সে-ঘরের ঋপদ রামদাস-বাবুই গান ধরিতেন। আমি, নিমাই এবং উপেন্দ্রচন্দ্র রায় রামদাস-বাবুর শেষ ছাত্র। ছুইজন পরলোকপ্রাপ্ত; আমি বর্তমান আছি এবং বলিবারও সাহস রাখি। ৪০ বৎসর পূর্বে ঐ সকল ঋপদের যে-অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে যে-অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে, স্বরলিপি সাহায্যে ঋপদগুলিকে রক্ষা করিতে গিয়া কৃষ্ণধন-বাবু ধ্বংসই করিয়াছেন। তিনি আহমদ খাঁর (সেতারী) নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও শিখাইতে পাবেন নাই। তাঁহার পুস্তক দেখিয়া যদিও কেহ কেহ শিক্ষা করিতে সাহস করিয়াছেন তাঁহাবা সফলকাম হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমার মনে হয় স্বরলিপি প্রথা প্রথম এই

শিক্ষা দেয় যে, “গুরুকরণ প্রথা অনাবশ্যক” এবং দ্বিতীয় কাজ এই করে যে, স্বরগুলিকে তালের মধ্যে আনিয়া শুধু “তাল গান” করায়।

রামদাস-বাবু যে-সমস্ত ঋপদ গান করিতেন সমস্তই উৎকৃষ্ট এবং বাছিয়া বাছিয়া রত্নল বন্ধের নিকট শিখিয়াছিলেন। এই কথা তিনি বলিতেন এবং লোক-পরম্পরায়ও ইহা শুনা গিয়াছে যে, রত্নল বন্ধের মত ঋপদ আর শুনা যায় না। সেই বিস্তৃত সঙ্গীতের পরিবর্তন করিয়া কৃষ্ণধন-বাবু যে কি লাভ হইল, তিনিই জানেন। কিন্তু গুরুর নাম স্বীকার না করায় তাঁহাকে গুরুধ্বংসী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আমরা ইহাই জানি যে, একবর্ষ ধাহার নিকট শিক্ষা করা যায় তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য। আজকাল ইহার বিপরীত দেখা যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রকাশকের বিড়ম্বনা

শ্রী সরসীবালা বসু

এক

‘নেলী আট-বছর-বয়সে’ পিঠের উপরও বেণী ঝুলাইয়া খাতা, পেন্সিল, স্কেট, বই বগলে লইয়া যখন পাড়ার মিশনরী স্কুলে পড়িতে যাইত, তখন হইতেই সে পশু লিখিতে বা পায়রার বাধিতে শিখিয়াছিল। একদিন সে “কথামালা”র গল্প পড়িয়া নিজের বাদামী রঙের খাতায় বড় বড় অক্ষরে পশু লিখিয়াছিল :-

কুহুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।

তার দাদা হিরণ্ময় তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বি-এ ক্লাসের ছাত্র এবং বাব্বালা, ইংবেঙী সাহিত্যের রসজ্ঞ সমঝদার। হিরণ্ময় তাহার পেন্সিল হারাইলেই ছোট্ট নেলার

খাতাপত্র খানাতল্লাসী করিতে আসিত। চোরাই-মাল কখনো ধরা পড়িত, কখনো পড়িত না; ধরা পড়িলে সে নেলীকে ধমক দিয়া যখন বলিত,—“পোড়ারমুণী মেয়ে, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়—এ নীতিবাক্য যদি ছ’বছর না পড়তে পড়তেই ভুলে যাস, তা হ’লে তোর গতি কি হ’বে?”

নেলী ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিত,—“বাঃ রে, আমি হুড়িয়ে পেয়েছি—দালানে পড়েছিল”।

কথাটা গিখাও নয়, কিন্তু নেলীর আইন ও হিরণ্ময়ের আইন মিলিত না। নেলী বলিত—কুড়ান জিনিষ যে পায় তার। হিরণ্ময় বলিত—কখনই নয়, জিনিষ যার তাবই দাবী, তা সে যে কেহই কুড়াইয়া পাক না কেন। ইহাতেও নেলী হার মানিতে না চাহিলে সে উদাহরণ

দেখাইত, “আচ্ছা, তোর পুতুলের হারছড়া একজন স্কুলের মেয়ে কুড়িয়ে পেলে তুই জানতে পারলে কি করিস?” নেলী স্বচ্ছন্দে উত্তর দিত—“সেই মেয়ের কাছ থেকে তখনি সেই পুঁতিরমালা ছিনিয়ে নেই।” তখন হিরণ্ময় হাসিয়া “নিজের হারানো জিনিষ দেখিতে পাইবামাত্র কাড়িয়া লইবার” দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গেলেই, কিঞ্চি বিপদ ঘটিল। অর্থাৎ চোরাই মাল উদ্ধার করিবার জন্তই তাহাকে কিছু ঘুষ দিতে হইত। যাহা হউক, অতঃপর একদা দ্বিপ্রহরে নেলীর অল্পপস্থিতিতে হিরণ্ময় তাহার হারানো কলমটি খুঁজিতে গিয়া নেলীর বাদামীরঙের খাতা হাতড়াইয়া কলমের পরিবর্তে সেই ছইছত্র কবিতা আবিষ্কার করিয়া বসিল এবং চোখেমুখে কৌতুকের এক ঝলক আভা লইয়া খাতা হাতে তখনকার মত নিজেরই পাঠগৃহে ফিরিয়া গেল। সেদিন ছিল হিরণ্ময়ের শনিবারের পূরা ছুটি। বেলা দু’টার সময় ঝির সহিত আয়ো কতকগুলি সজিনীপরিবেষ্টিত নেলী গল্প-হাস্তে রাজপথ মুখরিত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হিরণ্ময়ের বিধবা পিসিমা এতক্ষণে ঘর-গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করিয়া জপতপ-অস্ত্রে আহারে বসিয়া ছিলেন; হিরণ্ময় নেপথ্যের সাড়া পাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজের “মিটন” বন্ধ রাখিয়া নেলীর সেই খাতা লইয়া বসিল; এবং খুব কুঁকিয়া-পড়িয়া মনোযোগী ছাত্রের ভায় টানাসুরে জোরে জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিল :—

কুকুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,

ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।

“ওগো তোমাদের নেলীকে পৌছে দিয়ে গেছ”— বাড়ীর বাহির হইতে অভিভাবকের উদ্দেশে এই বার্তা ঘোষণা করিয়া মেয়ের দল লইয়া ঝি চলিয়া গেল। নেলী লাফাইতে-লাফাইতে বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই যেমন তাব দাদার কঠোর আবৃত্তি শুনিতে পাইল অমনি—“আ—মা—হাঁ—হাঁ” করিতে করিতে দাদার ঘরে ঢুকিয়া দাদার সহিত কাড়াকাড়ি স্বরু করিয়া দিল। অবশ্য শারীরিক বলের অভাব পূরণ করিয়া ফেলিল কঠোর প্রবল অলুনাট্যিক ধর্মির দ্বারা। পিসিমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“বলি হ্যাঁ হিরণ্ময়, এই

তিন’পর বেলা, এতক্ষণে যদি দুটো পিণ্ডির জোগাড়ে বন্ডাম, তাও কি তোরা থিব্ হ’য়ে গিলতে দিবিনি? তুই বুড়ো থোকা ঐ একরত্তি মেয়ের সঙ্গে লেগেচিস্ কিসের জন্তে? অসেজবৌ, তোকে আর ছেলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে হ’বে না, এসে নিজেব বুড়ো থোকাখুঁকিদের সামাল্ দে। আমার এখন ওঠার জো নেই।”

সেজবৌর—ওরফে হিরণ্ময়ের মাতার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; তিনি তখন থোকাকে ঘুম পাড়াইবার অজুহাতে নিজেই ঘুমে অচেতন। যাহা হউক, পিসিমার চীৎকারের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। হিরণ্ময় বিব্রোহের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া সহজেই সজিব প্রস্তাব স্বরু করিল। সে বলিল, “আচ্ছা, সত্যি বল দেখি নেলী, আমার হাড়ের কলমটা তুই নিয়েছিলি কি না। খুব সত্যি কথা বল, এই আমার চোখে চোখ রেখে। চোখের পলক পড়লেই বুঝ্ ব মিথ্যে বল্ছিস্।”

ঠিক এইসময় হিরণ্ময়ের সহপাঠী স্বধেন্দু দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—“ইস্, কিসের জেরা চলছে?”

হিরণ্ময় বলিল,—“বা চ’লে থাকে মাঝে মাঝে, অর্থাৎ আমার হাড়ের কলমটি খোয়া গেছে।”

স্বধেন্দু বলিল, “আর অমনি তুমি নেলীকে ধ’রে পীড়ন স্বরু ক’রে দিয়েচ, এ তোমার ভারি অজ্ঞান। ও ছেলে-মালুম, বোঝে না তাই। আয়রা হ’লে মানহানির মোকদ্দমা কবুতাম।”

স্বধেন্দুর ওকালতিতে অনেক সময় নেলী খুব সহজেই অব্যাহতি পাইত; সেজন্ত স্বধেন্দুকে সে প্রীতির চক্ষেই দেখিত। এখনও সে তার ভীতচকিত আঁখিব দৃষ্টি স্বধেন্দুব মুখের উপর ধরিয়া সহজেই তার কৃপাভিক্ষা করিল। স্বধেন্দু নেলীর হাত-ছুটি ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—“নেলী, সত্যি কথা বল, কলম নিয়েছ, কি না; তোমায় কালই আমি একটা হাড়ের কলম এনে দেব।”

নেলী মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিল লইয়াছে। স্বধেন্দু কহিল, “কোথায় পেয়েছিলে?”

নেলী কহিল, “স্নানেব ঘরে।”

হিরণ্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “ওহো, মনে প’ড়ে গ্যাছে। পরশু দিন জ্ঞান করতে গিয়ে দেখি কানে কলম গৌড়া; খুলে চৌবাচ্চার পাড়ে রেখে আর মনেই ছিল না”

সুধেন্দু নেলীর দিকে চাহিয়া কহিল, “আচ্ছা, সে কলমটা নিয়ে এস গিয়ে দেখি।”

নেলী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

হিরণ্ময় কহিল, “যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?”

নেলী কহিল, “আমু সেটা নিয়ে নিয়েছে।” আমু নেলীর একজন বিশেষ বন্ধু। এমন-কি, শোনা যায়, নেলীর সহিত অল্প-দিন-পূর্বে তার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

হিরণ্ময় রাগিয়া উঠিয়া কহিল,—“রাক্ষসী, আমার জিনিষ আমায় না ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তুই দিতে গেলি কোন্ হিসেবে?”

এইবার নেলীর চোখদুটি জলে টলটল করিয়া উঠিল।

সুধেন্দু কহিল, “দেখ বন্ধু, জগতে বেহিসেবী কাজও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, সেগুলোর হিণেব চাওয়াই বেহিসেবী।”

হিরণ্ময় কহিল,—“দেখ সুধেন্দু, এ তোমার ঠিক ওকালতি হচ্ছে না। ও আমুকে আমার জিনিষ দিতে গেল কি জন্তে, তার জবাব কি?”

সুধেন্দু কহিল,—“জবাব এই যে, কলমটা পেয়ে আপাততঃ বেশ খুশী মনে নিজেবই বই-শ্রুটের সঙ্গে সাক্ষিয়ে গুজিয়ে ও স্থলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তুমি যখন খোঁজ করবে তখন ফিবে দেবার ইচ্ছে যে ছিল না, তাও নয়। এদিকে আমু কলমটা দেখে চেয়ে বসে—তখন প্রথমটা বার-দুই ও দিতে চায়নি—কিন্তু সে যখন বলে যে তোর দাদা ত তোকে খুব ভালবাসে, দিয়ে দিলে কিছু বলবে না, তখন নিজের দাদাব ভালবাসার মান রক্ষার জন্তেই কলমটা ও দান ক’রে বসে—এই হচ্ছে ওর সওয়াল জবাব।”

অবাক হইয়া হিরণ্ময় কহিল,—“এ ত উকীলের ওকালতী হে—আসামীর জবানবন্দী কই?”

মাথা নাড়িয়া সুধেন্দু কহিল,—“আসামীরও এই জবান-

বন্দী—হয় না হয় নেলীকে জিজ্ঞেস কর—কি বল, নেলী?”

নেলী সহজেই স্বীকার করিল, অগত্যা হিরণ্ময় কহিল—“আচ্ছা সুধেন্দু, মান্‌গাম নেলীরও এই কথা—কিন্তু তুমি এ তত্ত্ব আগে হ’তে জানলে কোথেকে?”

সুধেন্দু মুকব্বিখানা ভাবে হাসিয়া কহিল—“ওহে, গল্প লিখতে হ’লে সাইকলজি অধ্যয়ন করতে হয়, অমনি নয়।” বলা দরকার যে, ইতি মধ্যেই বন্ধু-মহলে উদীয়মান গল্প-লেখকরূপে সুধেন্দু খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, হিরণ্ময় সুধেন্দুব দিকে চাহিয়া কহিল—“বেশ, এখন যে কলমটা তুমি সত্যি কথা বলার জন্তে নেলীকে পুস্কার দিতে চেয়েছিলে সেটা তা হ’লে আমাকেই এনে দিও। যা নেলী—পিসিমা ডাকচেন।”

নেলী কিন্তু মুক্তি পাইয়াও যাইবার অল্প প্রস্তুত হইল না। তার বাতাতানি তখনও দাদার হাতে। সেই খাতার দিকে তৃপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধেন্দু ভিতরের খবর জানিত না। সে কহিল—“কলম আমি তোমাকেই এনে দেবো নেলী—তোমার ইচ্ছে হয় দাদাকে দিয়ে, না হয় দিয়ে না। দাদার টের পয়সা আছে, আবার কিনে নেবে।”

এ আশ্বাসবাণীতেও নেলী প্রস্থানোদ্যত হইল না। হিরণ্ময় মুচকি হাসিয়া কহিল—“দ্যাখ নেলি! পিসিমা এখনো খেয়ে ওঠেন-নি। এক ছুটে গিয়ে ছাদ থেকে খানিকটা মিষ্টি কুলের আচার নিয়ে এসে দে। অবিশ্যি হাতটা ধুয়ে যাস—নইলে পাপ হবে। তা হ’লেই এখনি তোরা খাতা ফেরত দেবো।”

অতঃপর সুষ্ট মনে, অবিত পদে নেলী দাদার প্রার্থিত জিনিষ আনিতে ছুটিল।

সুধেন্দু হাসিয়া কহিল—“নিজের আগেকার চুরিবিদ্যে আবার বোন্টিকেও শেখান হ’চ্ছে—এটা কিন্তু ভারি অগ্রায় ভাই।”

হিরণ্ময় কহিল—“এ মোটেই চুরি নয়—না ব’লে চেয়ে আনা মাত্র।” লেখক হ’তে চলেছ, এ জিনিষটা একটু-

আধটু অভ্যাস করিতে না শিখলে চলবে কেন হে ?
এখন শোনো, আমার ভগ্নী কবিতা লিখেছেন :—

“কুতুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।”

ওহ হো—এই যে আর-একটি কবিতা রয়েছে—এটা
তো দেখিইনি—

এক ছিল এক শেম্মাল তার ছিল তিনটি ছেলে,
একদিন সে গাছে কাঁঠাল পেকেছে দেখতে পেলে—
বাঃ বাঃ—কি ছন্দ, কি ভাব, কি মিল।”

সুধেন্দু বহিল—“তাই বুঝি বেচারী খাতাখানি
জন্তে চুরি ডাকাতি করিতেও রাজি হ’য়ে গেল। তা এ
তোমার ভাবি অভ্যাসে ভাই—তুমি না ব’লে পরের জিনিষ
এমন ক’রে দেখ কোন্ অধিকারে ? ছেলে-বেলাকার
এই ছন্দমিলহীন কবিতাগুলিই ভবিষ্যতে হয়তো সুছন্দে
পরিণত হ’য়ে উঠবে।

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হিরণ্ময় কহিল,—“তা হ’লে
ছনিয়ায় ঘাসেরই মতন কবি গজাতো।”

সুধেন্দু কহিল,—“তা না জন্মালেও এটা ঠিক যে
জন্মেই কেউ ছন্দ, ভাব, মিলযুক্ত কবিতা লিখতে
শেখে না। শিক্ষা আর অভ্যাসে ক্রমেই সে-শক্তি আয়ত্ত
হয়। তবে হ্যাঁ, কবি-প্রতিভা প্রকৃতির দান। মানুষের
নিজের উপার্জন ওখানে বেশী নেই।”

নেলী আচার লইয়া ফিরিয়া আসিল। হিরণ্ময় খাতা
ফিরাইয়া দিতেই সে খুসী মনে তখনি ছুটিয়া পলাইল,—
‘চোবাই মালের ভাগ লইবার জন্তেও অপেক্ষা করিল না।
তুই বন্ধু আচার লইয়া তৃপ্তির সহিত উহার রসাস্বাদনে
নিমুক্ত হইয়া কবিত্ব-রসেরও আস্বাদ লইতে মনোনিবেশ
করিল।

তুই

বছর-দশ পরে পশ্চিমাঞ্চলের কোনো একটি সহরের
সরকারী হাসপাতালের বস্পাউণ্ডের মধ্যে ডাক্তার-বাবুর
বাঙ্গলোবাড়ার অন্তঃপুরে দুটি তরুণী মধ্যাহ্ন অবসরে
গল্প কথায় নিমগ্ন। জানালা দিয়া হেমন্তের শীতের স্বর্ণাভ
শূন্য-কিরণ ঘরের মেঝের স্বচ্ছপ্ত একটি পাঁচ সের

শিশুর শয্যাকে উদ্ভষ্ট করিয়া তুলিতেছে। শিশুর স্বননী
আমাদের সেই দশবৎসর আগেকার নেলী, এখন সুন্দরী
যুবতী। সুন্দরী আমরা এইখানেই স্থানীয় একজন
রাজকর্মচারীর পুত্রবধূ; পাশাপাশি বাড়ী থাকায়
দ্বিপ্রহরে দু’জনার প্রাত্যহিক মিলন ঘটয়া থাকে আমরা
একখানি খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছিলাম, “এ
গল্পটা ভারি চমৎকার হ’য়েছে, বেদান—তুই যদি একবার
দিস্ তা হ’লে আমি ঠুকে দেখিয়েই তোকে ফেরৎ
দিই।”

নেলী কহিল,—“ওসব হিজিবিজি কাউকে দেখাবার
নয়, আমরা—তুই পাগলামী করিস্—দে খাতাখানা তুলে
রাখি—তোরতো প’ড়ে আর পুরোনো হ’বে না।”

আমরা ঠোট ঝাঁকাইয়া কহিল, “নিজের বরকেও দেখা-
বিনা, অপরকেও দেখতে দিবি না। লিখেছি, বুঝি
শুধু নিজের চিত্ত সাজাবার জন্তে ? সত্যি, আমার
এমন হিংসে হয়।”

হাসিয়া নেলী কহিল,—“হিংসেয় কি ইচ্ছা হয়
জনি ?”

—“সবাইকে তোর এই গল্পগুলো জোর গলায়
পড়িয়ে শোনাতে ইচ্ছা হয়। তোর ডাক্তার-বাবু কি
মানুষ ভাই, হাড় মাংস কেটে কেটে রক্তমাংসের জ্যান্ত
মানুষগুলোর মন ব’লে যে জিনিষটা আছে তা যেন
বেমালুম ভুলে ব’সে আছে ; এমন কাঠখোঁটো লোককে
তুই ভালবাসিস্ কি ক’রে, বেদান ?”

আমরা খোলা চুলের গোছায় দ্বিধা টান দিয়া নেলী
কহিল,—“সতী হ’য়ে সতীর কানের কাছে পতিনিদ্দা
করিস্ কোন্ মুখে ? তোর মেয়ে হ’লে তাকে আমি
কখনো বউ করিতে পারব না।”

আমরা কহিল—“না করিস্ ব’য়ে যাবে। তোর ছেলে
যদি বাপের ধারা পায় তো এমন কাঠ-গোয়ার ছেলেকে
আমি মেয়েও দেব না।”

ঠিক এই সময় এক সঙ্গে দু’তিন জোড়া সজুতা
পদধ্বনি হওয়ায় আমরা তন্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—
“তোমার বর আব দেওর আসছে ভাই—আমি পাগাই।”

নেলী আমার আঁচলে টান দিয়া কহিল,—“আগেতো

কথা কইতিস্—আজকাল দেখলেই ছুটে পালাস্ কোন্ হিসেবে ?”

আম্মা কহিল,—“পালাতাম না এখনো—কিন্তু তোমার বর যখন তোমায় আমাদের বাড়ী পর্যন্ত বেড়াতে দিতে চান না, তখন আমিই বা কেন তাঁর সঙ্গে কথা ক’য়ে নিজের মান খোয়াই।”

আম্মার সঠিক উত্তরের আঘাতে নেলীর মুখে কালো ছায়া পড়িল। ঠিক এই সময় বিকাশ বাহির হইতেই বলিয়া উঠিল—“বউদি, কলকাতার কুটুন্স মশাইরা এসেছেন, দ্বার খোলো।”

আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে দরোজা খুলিয়া দিয়া নেলী অতিথিদের আহ্বান করিয়া লইল। আগন্তুক হিরণ্ময় আর স্বধেন্দু। আম্মা ও নেলী তাহাদের দু’জনকেই প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল। আম্মা উভয়ের আগ-গোড়া সাজসজ্জা দেখিয়া লইয়া সপ্রশংসদৃষ্টিতে কহিল—“বাঃ সমস্ত ধন্দরের পরেছ যে।”

বিকাশ কহিল,—“yes, all ধন্দর।”

হিরণ্ময় কহিল,—“ধন্দর আমাদের সর্বস্ব। ধন্দরই গতি, ধন্দরই মুক্তি।”

আম্মা কহিল,—“একটু আশ্তে বল, দাদা—এটা সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের বাড়ী।”

হিরণ্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—“তা বটে, কিন্তু আমরা যে ধন্দরেরই প্রচারক—সরকারী, বেসরকারী আমাদের ভুল হ’লে ত ক্ষতি নেই।”

বিকাশ কহিল—“আপনাদের ক্ষতি না হ’লেও এক পক্ষের হয়ত মারাত্মক ক্ষতি হ’তে পারে।”

স্বধেন্দু কহিল—“আচ্ছা, ওকথা পরে হ’লেও চলবে। এখন নেলি, বেমন আছ, নতুন থোকা কই? বাঃ দিব্য ফুটফুটেটি হয়েছে, দ্যাখ দ্যাখ হিরণ্ময়, যেন একটি মোমের পুতুল ঘুমচ্ছে—উঠলে একটু চটকাতে পারি যে।”

হিরণ্ময় কহিল—“পসিমাতো নেলীকে আর থোকা কে নিয়ে যাবার জন্তে ভারি ব্যস্ত। ডাক্তার সাহেবকে তাই বলতে এসেছি। তারপর আম্মা, তুমিও এখানে। বেশ দুই বন্ধু কাছাকাছি আছ, গল্পগুস্তব খুব চলে বোধ হয়।”

বিকাশ কহিল,—“তা খুব চলে। আম্মা বউদিও

ভারি ভাল মানুষ, প্রায়ই আমাদের ভাল ভাল পিঠে, খাবার, এইসব ভৈরী ক’রে খাওয়ান।”

নেলী সচকিতে কহিল, “সত্যিইত, আমার একটুও হ’স্ নেই, দাদাদের নিশ্চয় খাওয়া হয়নি। ঠাকুর-পো, তুমি একটু ঠাকুরকে হাসপাতাল থেকে ডেকে দাওনা, তাই; এফুনি ছুটি ভাত চাপিয়ে দিক্।”

হিরণ্ময় কহিল—“ব্যস্ত হবার দরকার নেই; জলটল্ খেয়েছি; একপ্রস্থ আরও খেতেও রাজি আছি। ভাত যে কোনো সময় হ’লেই চলবে। ওহে বিকাশ-বাবু, ডাক্তার কোথায়?”

বিকাশ কহিল, “এফুনি আসবেন—আচ্ছা, আমি ঠাকুরকে ডেকে আনি।”

বিকাশ চলিয়া গেল। নেলীও আপাততঃ কিছু জল-খাবারের বন্দোবস্ত করিতে চলিল। হঠাৎ সেই খাতাখানার দিকে দৃষ্টি পড়ায় স্বধেন্দু কহিল,—“ওহ্ হো, আমার দেওয়া সেই খাতাখানা না? মনে আছে নেলী, বলেছিলাম খাতা-খানা ভর্তি ক’রে আবার আমাকেই ফেরত দিতে?”

নেলী ক্ষিপ্রহস্তে খাতাখানা সরাইয়া কেলিবার পূর্বেই সেখানি আম্মা তুলিয়া লইয়া স্বধেন্দুর হাতে দিয়া কহিল, “খাতা কবে ভর্তি হ’য়ে গেছে, স্বধেন্দু-দা! আর সত্যি বলছি, গল্পগুস্তা এমন চমৎকার। কোনোটা পড়লে চোখে জল আসে, কোনোটা পড়লে হাসিতে পেট ফেটে আসে, আবাব কোনোটা—” নেলী হতাশ ভাবে আম্মার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—“কেন আমার জালাস্, আম্মা?” তারপর সে ছলছল চোখে ঘরের বাহির হইয়া গেল। সামান্য কারণে নেলীর কণ্ঠে যে করুণস্বর বাজিয়া উঠিল, দুই বন্ধুরই কানে তাহা বড় বেহুয়া বাজিল, বিস্মিত দৃষ্টিতে আম্মার দিকে চাহিয়া স্বধেন্দু কহিল,—“গল্প লিখেছে, তার জন্তে এত লুকোচুরি কিসের তাতো। ব্যলাম না। ছেলেবেলাকার পাগলামী এখনো যায়নি বুঝি?”

আম্মা চুপি চুপি কহিল, “না, তা নয়। ডাক্তারবাবু ওসব পছন্দ করেন না। একবার নেলী তাঁকে আমোদ ক’রে বলেছিল যে, সে মাসিক কাগজে গল্প লিখবে, সে যা

ডাক্তারবাবুর রাগ—বল্লে, মেয়েমানুষ, কুলের কুলবধু হ'য়ে যার তার কাছে নাম বের করা, এসব ভারি দোষ।”

হিরণ্ময় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “বেশ মানুষ ত। এ লোকের দেখছি নিজেরই ব্যায়রাম আছে, তা আবার অস্ত্রের চিকিৎসা করে কি?”

স্বধেন্দু ততক্ষণে খাতাখানি খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠা পড়িতে মন দিয়াছে। বেশ পরিষ্কার মেয়েলী অক্ষরে লাল কালীতে লেখা :—

“বড়দা, স্বধেন্দুদা—

ছেলেবেলাকার হিজি বিজি লেখা

পড়ে হেসেছিলে কত ;

আজিকে আবার কালীর আঁচড়

ছড়ানো কুড়ান যত ;

সব জমা ক'রে ধ'রে দিচ্ছি পায়,

হাসি মুখে লও তুলি’;

অপটু হাতের ভুল চুক যাহা

স্নেহ-ভরে যেও তুলি’।

—তোমাদের আদরের নেলী।”

স্বধেন্দু স্মিতমুখে পাতার-পর-পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। হিরণ্ময় কহিল,—ছেলেবেলায় সেই শেয়াল-কুকুরের কবিতা-লিখিয়ে নেলী দেখছি সত্যিই গল্প লিখতে শিখে গেছে। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'য়ে গেল, হে স্বধেন্দু।”

স্বধেন্দু কহিল,—“লিখতে হিজিবিজি ত সবাই পারে। এ দেখছি কলমের জোর আছে। বেশ ঝুঁকিয়ে ভাষায় লিখতে পেরেছে। মেয়েটার ক্ষমতা আছে। বাড়ী নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া পড়তে হবে।”

হিরণ্ময় কহিল,—“না হে, না, খাতাখানা নিয়ে যেয়ো না। ছেলেবেলাকার সেই ব্যাপার মনে আছে তো? এখনিত দেখলে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।” স্বধেন্দু কহিল,—“এখনকার কান্নার ভেতর গলদ আছে—আমার কথা শুনলে তো?”

নেলী ছুই খালা খাবার আনিয়া মেঝেয় রাখিয়া কহিল,—“মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল খাও, দাদা। ভাতও চাপিয়ে দিচ্ছে। উনি আসবেন এইবার।”

“পালাই আমি—” বলিয়া, আম্মা প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সাধীর দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া গেল। নেলী কিন্তু তাব অর্থ বুঝিল না।

ডাক্তার ঘরে আসিয়া অতিথিদের সাদরস্বাগত করিয়া তখন পর্য্যন্তও জলযোগ না করার জন্ত অনুরোধ করিলেন। অগত্যা দুইবন্ধু খাবারের খালার নমুখে বসিয়া গেল। তার পর কথায়-কথায় হিরণ্ময় নেলীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। অমনি ডাক্তারের অতিথিসংস্কারের উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল; তিনি কহিলেন—“বাড়ীতে জ্বীলোক কেউ নেই, আমার ত রাত দিনের অধিকাংশ সময় হাসপাতালেই বাটে। বিকাশ, প্রকাশ এদের দেখাশোনা করে কে? তারপর ছোটখোকা এখানেই জন্মেছে,—হঠাৎ কল্‌কাতায় গিয়ে সেখানকার জলহাওয়ায় লিভারের দোষ হওয়া খুব সম্ভব।”

হিরণ্ময় নিজের স্মৃতিত, বলিষ্ঠ দেহখানির দিকে তাকাইয়া কহিল—“কল্‌কাতার জলবাতাসেই কিন্তু এই কাঠামোখানা তৈরী হয়েছে, মশাই। কল্‌কাতার নিশ্চয় কোরো না—দিনকতকের জন্ত যাবে বই ত নয়।”

ডাক্তার মুখ কালো করিয়া কহিলেন,—“একেত কল্‌কাতায় আজকাল যে হুজুগ চলেছে। আপনারা বাড়ী-শুদ্ধ লোক ত নন-কো-অপারেশনে মেতে আছেন। এদের দেখাশোনা—

বাধা দিয়া হিরণ্ময় কহিল,—“ওহো, তোমার বুঝে সেই ভয়। আমরা নন-কো-অপারেটর, তা বাড়ার ভেতর মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক কি?”

স্বধেন্দু খোঁচা দিয়া কহিল,—“আহা, বুঝতে পারছ না, ইনি সরকারের চাকর। ওর জী যাবে নন-কো-অপারেটরদের বাড়ী, যদি সরকার একটা কৈফিয়ৎ তলব ক'রে বলেন?”

হাসিতে ঘর ভরাইয়া হিরণ্ময় কহিল,—“যত সব পাগলামা।”

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—“আচ্ছা মশাই, যে সরকারের অঙ্গগ্রহে আপনারা রামরাজ্যে বাস করছেন, জন-কতক লোক হৈ-চৈ ক'রে তাদের পেছনেই ফেউ

লেগেছেন কেন? এগুলো কি পাগলামি বা মাতলামি নয়?”

হিরণ্ময় আবার হাসিয়া কহিল,—“ডাক্তার, তোমার স্বপ্ন আছে। আমার পাগলামীটা তুমি মায় স্বপ্নস্ফুর্তি আভ্যাসে যোগ ক’বে ফিরিয়ে দিলে। ব্যস্ এই পর্য্যন্ত—তোমার ঘরে ব’সে আব স্বদেশী-আন্দোলন ক’রে তোমার বিব্রত করিতে চাই না। আপাততঃ তুমি খডা চূড়োপুলো খুলে একটু বাঙালী সেজে বোসো। স্নানাহারের উদ্যোগ কর—কথাবার্তা পবে হবে। আমরা কিন্তু রাতের ট্রেনেই ফিরিব।”

তিন

মাস-পাঁচ-ছয় পরে। হাসপাতাল হইতে বেলা একটার সময় ডাক্তার যখন বাঙলায় ফিরিতেছেন সেইসময় ডাকপিয়ন কয়েকখানা চিঠি ও একটি রেজিষ্ট্রি বুক পোষ্ট দিয়া সহি লইয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার কোতুলভবে তিনখানি চিঠিই জ্বর নামে অপরিচিত হস্তাক্ষরের দ্বিগুণা খুলিয়া ফেলিলেন।

একখানিতে লেখা :—

মহাশয়া,

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের “সহযোগিনী” পত্রিকাব ক্ষত একটি গল্প পাঠাইলে বাধিত হইব।

বিনীত সম্পাদক

আর একখানিতেও ঐ ধরনের লেখা।

তৃতীয়খানির লেখক হিরণ্ময়—

নেলি।

বই পেয়ে তুমি খুব আশ্চর্য্য হবে জানি। সেইটেই চাই। তোমার খাতাখানি স্বধেন্দু আগাগোড়া প’ড়ে ভারী খুশী হ’য়ে একজন প্রকাশককে দেখাতে সে আগ্রহ ক’রে ছাপতে চাইলে, বললে বেশ লেখা, আর বেশ সমন্বয়পযোগী, এ বাজারে খুব কাটবে। বইখানা ছ’মাস হ’ল বেরিয়েছে। আমরা কলকাতায় ছিলাম না, দেশের কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তাতেই তোমায় এক কাপি পাঠানো হয়নি। ডাক্তারকে দেখিয়ে—সে নিশ্চয় প’ড়ে খুশী হবে। খোকাবাব কেমন আছে? ইত্যাদি।

স্বধেন্দু এককোণে লিখিতেছে—

চিবায়ত্ত্বতীষু—

তোমার সাহিত্যসাধনা সকল হোক। প্রথম রচনাই বেশ আশাশ্রদ। আশা করি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবায় তুমি দিন দিন কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। বইর নাম “কালীর আঁচড়”ই রেখেছি; এ আঁচড় কিন্তু সহজেই বুকে পড়ে।

—স্বধেন্দুদা

বইখানার আবরণ খুলিয়া ডাক্তার দেখিলেন মরক্কো-চামড়াব বঁধাইএর উপর সোনার জলে লেখা “কালীর আঁচড়”। লেখিকার নাম নীচে জলজল করিতেছে,—শ্রীমতী নীলা মিত্র। ডাক্তারেরও চক্ষু দু’টা জলিয়া উঠিল—আনন্দে নয়, রাগে—অভিমানে।

তিনি যাহা ভালবাসেন না, অবিশ্বাসিনী পত্নী তাহাই করিয়া বসিল। অন্তঃপুর্ব্ববাসিনী হিন্দুকুলবধু আজ হাজার লোকেব আলোচনার বিষয়, তার পবিত্র নাম আজ যে-সে উচ্চারণ করিবে। পরপুরুষ, অপরিচিত রাম-শ্রাম আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। হায়, হায়, নারীমর্যাদা, সতীর পবিত্রতা,—অকলঙ্ক গুণ ফুলের সহিত যাহার তুলনা, এইসব বহির্জগতের উত্তাপে তার সে সৌন্দর্য টিকিবে আর কি প্রকারে! মনের মধ্যে খুব খানিক উন্মাদ লইয়া ডাক্তার অন্তঃপুর্বে আসিলেন। নেলী তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া সদ্য-জাগ্রত খোকাবাবুর তৃষ্টিসম্পাদনে নিযুক্ত ছিল। তাহার কোলের কাছে বইখানা ও চিঠিগুলো ফেলিয়া দিয়া ডাক্তার রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—“যা ভালবাসি না তাই। আমার ঘবে ব’সে, আমারই অন্ন খেয়ে, আমার সঙ্গেই লুকোচুরি। এতো যদি নাম জাহির করবার ইচ্ছে, যাও কেন না থিয়েটারে, সার্কাসে, বায়োস্কেপে, খুব নাম হবে। —ছিঃ ছিঃ, অবশেষে আমার নাম ডুবলে—ঝাঁটা মার এইসব স্বাধীন জেনানাদের মাথায়। দেশের লোক আবাব এদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। গুপ্তির পিণ্ডি পাড়ছেন।”

স্বামীর অনুযোগ বান পাড়িয়া লইবার মধ্যেই চিঠিগুলি নেলী পাড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিল এবং বইখানি

দেখিয়া বুঝিতে তার বাকী রহিল না যে, স্নেহময় দাদারা তাহাকে অতিমাত্রায় চমৎকৃত করিবার জন্তই ঘৃণাকরেও তাহাকে কোনো কথা না জানাইয়া বই ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, আত্মদোষ ক্ষালনের জন্ত এবং কতকটা সত্য স্বীকারের জন্ত সে মুহূর্তে বলিল, “আমায় বুঝা দোষ দিচ্ছ। আমি কোনো কথাই জানি না। দাদারা আমাকে কিছু বলে যাননি তা।”

মেঝের সপক্ষে জুতা ঠুকিয়া স্বামী কহিলেন, “জাাকা সাজতে ভারি পটু। বলি মোহাগ ক’রে লেখাগুলি দাদাকে দিচ্ছেছিলে, তবেই ত সে পেয়েছিল, না তারা চুরি ক’রে নিয়ে গেছে? তা যদিই হয়, এখন তাদের আমি জেলে দিতে পারি। তাছাড়া, এসব মাথামুণ্ড তোমার লেখবারই বা কি দরকার ছিল, শুনি? খেয়েদেয়ে কি আর কোনো কাজ পাওনি? ছুনিয়ায় যারা নেহাৎ হতচ্ছাড়া ভণ্ডুয়ে তারাই ব’শে ব’শে এইসব রাবিশ জিনিষ লেখে, আর পড়ে যারা তারাও এদেরই ছুড়িদার।”

একটি কথা না কহিয়া নেলী নীববে উঠিয়া স্বামীর স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেল। স্নানান্তে আতাবে বসিয়াই ডাক্তার মাছের খোল ভাতে মাখিয়া একগ্রাস মুখে দিয়াই ঝোলের বাটী ঠেলিয়া কেলিয়া দিয়া কহিলেন, “হিন্দুস্থানী ঠাকুরে আর কত ভাল রাখবে; বাড়ীর গিন্নি লেখাপড়াতেই ব্যস্ত, এসব সংসারের কাজে চোখ দেবার তাঁর অবসর কই?”

যাহা হউক, অতঃপর ডাক্তার আহায়াস্তে বিশ্রাম করিতে গেলে নেলী আর-একবার তার প্রথম সাধনাব ফল সেই বইখানিকে কোলে লইয়া বসিল। স্বামীর নিকট অপরিসীম লাঞ্ছনা-গঞ্জন্য কারণ হইলেও, এই তার মানসজাত ভাবশিশুগুলির নবকলবর তার মনে নূতন আনন্দের শিহরণ জাগাইতেছিল—সংসারের কাজকর্মের অবসরে, নিরালো রজনীর কর্মহীন ক্ষণে, সে এগুলিকে কলমের মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তার কল্পনাদৃষ্টি প্রত্যক্ষ-সংসারের পারপাশ্বিক গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া কত কি দেখিয়াছে, অনুভব করিয়াছে। তাহারি চিত্র সে আপন মনে সরল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছে, তাহাতে যে কুলনারীর কি মহিমা স্পষ্ট হয় তাহা সে বুঝে

নাই,—চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারে নাই। তাই স্বামীর কঠোর মন্তব্যগুলি শ্রবণ করিতে করিতে তার ডাগর চোখ ছুটিতে জল ডরিয়া আসিতে লাগিল।

চার

ডাক্তার ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড হাইন-বোর্ডের উপর লেখা “মিত্র এণ্ড রায়, পুস্তকপ্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট” দেখিয়াই দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, অর্ধবয়স্ক একজন ভদ্রলোক টেবিলের সম্মুখ চেয়ারের উপর বসিয়া নিকটেই উপবিষ্ট দুইজনা ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—“আমুন মশাই ফি বই চান?”

ডাক্তার কহিলেন,—“আজ্ঞে ‘কালীর জাঁচড়’-ইখান। কি আপনার দোকানে পাওয়া যাবে?”

ভদ্রলোক কহিলেন, “পাবেন বৈ কি, খুব পাবেন। আমাবাই এই বইখানার প্রকাশক—গোল এজেন্সি-আমাদের হাতে। বহুন মশাই—আর কিছু বই চাই?”

আজ্ঞে না, বলিয়া ডাক্তার বেঞ্চির একপাশে বসিয়া পড়িলেন, ইতিমধ্যে ভদ্রলোকদের একজন প্রকাশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বইখানার বেশ নাটকি, মশাই। অথচ আপনি বলছিলেন এ বইখানি লেখিকার প্রথম রচনা, আর বয়সও তাঁর বেশী নয়।”

প্রকাশক কহিলেন, “সে সত্যি কথা। চেষ্টা করলে আর হাত পাকলে উনি একজন নাম-করা লেখিকা হ’তে পারবেন। এই দেখুন, আজকালকার ভাল (dull) বজ্রেরও তিনমাসের মধ্যেই এ বই ছ’শো কেটে গেছে। বদেশী গল্প যে ছ’টো লিখেছেন, খুব প্রাণ দেলে না লিখলে এমন লেখা কলম থেকে বেরোয় না।”

দ্বিতীয় ভদ্রলোক কহিলেন,—“খুব লেখাপড়া জানা, পাশ-টাস করা বোধ হয়—থাকেন কোথা?”

প্রকাশক কহিলেন,—“থাকেন শুনিছি মঃস্বলে কলেজেপড়া মোটেই নন। বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখেছেন। এই নিন মশাই আপনার বই—দাম দেড়টাকা।”

দাম্‌ দিয়া বই লইয়া ডাক্তার দোকান হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথের উপর আসিলেন। তাঁহার মনে হইল—কি ভয়ানক, কুলের কুলবধু, বই লিখিয়া এখন তার পরিচয় লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। এমন-কি, বয়সলইয়া পর্যন্ত আলোচনা, ইহাপেক্ষা নারীর অপমান আর কি হইতে পারে? এখনি ইহার উচিত বিধান করিতে হইবে।

কিছু পথ অতিক্রম করিয়া আরিসন্‌ রোডের মোড়ের উপর একখানি লালরঙের বাড়ীর সম্মুখে পিতলের ফলকে “হিমাকর ব্যানার্জি, এম-এ, বি-এল, উকীল, হাইকোর্ট” দেখিয়াই ডাক্তার সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। জনৈক ব্যক্তি বা-হাতি একখানি সুসজ্জিতগৃহে একাকী বসিয়াছিলেন। বলিয়া উঠিলেন—“কি চান্‌ মশাই?”

ডাক্তারের সহিত চোখোচোখি হইতেই আবার বলিয়া উঠিলেন,—“সুভাষ যে—আরে, তুমি কোথেকে? কালই তোমার কথা হচ্ছিল। এসো, এসো, ঘরে এসো।”

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “আজ সকালেই এসেছি। মহতাপ্রমে নেমেছি। একটা জ্বরুরি কাজ আছে। একটা উকীল ঠিক ক’রে দিতে পার?”

হিমাকর কহিলেন,—“আরে ভায়া, আমি তো নিজেই উকীল। কি করিতে হবে বল না?”

ডাক্তার কহিলেন,—“না ভাই এসব পয়সাকড়ির মামলায় বন্ধুবান্ধবকে উকিল দেওয়া আমার প্রিন্সিপল নয়। তুমি তোমার জানা একটা উকীল ঠিক ক’রে দাও। আজই দরকার—পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে আমি এসেছি।”

হিমাকর সুভাষের সহপাঠী, সুভাষের পাঠ্যাবস্থার খামখেয়ালীভাব তাহার খুব জানা ছিল। সে আর দ্বিধা নী করিয়া কহিল,—“বেশ, আমার সঙ্গে কাছারী চল, ঠিক ক’রে দিচ্ছি। তোমাব খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত? স্বচ্ছন্দে আমার এখানে এসেই উঠতে পারবে। তা না হোটেলের উঠতে গেলে। নাও, একটা সিগারেট খাও।”

ডাক্তার কহিলেন, “হোটেলের খেয়ে এসেছি; এই সিগারেটই যথেষ্ট। বেলাতো এগারোটা বেজে গেছে, কোর্টে যাবে কখন?”

“এই যে, পোষাকটা প’রে আসি। খেয়ে একটু বিশ্রাম না ক’রে ধাঁধাঁ ক’রে দৌড়লেই অসুখ হয়। বোসো তুমি। হাতে ওখানা কি বই হে? “কালীর আঁচড়” আজকাল বে-খা ক’রে গল্পের বই পড়তে শিখেছ তা হ’লে? ষ্টুডেন্ট-লাইফে ও সবার উপর তুমি যে খড়গ-হস্ত ছিলে।”

ডাক্তার উত্তর দিলেন না। হিমাকর-বাবু কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্দবমহল হইতে পোষাক পরিয়া আসিয়া বন্ধুকে লইয়া রাস্তার মোড়ের মাথায় ট্রাম ধরিবার জন্ত যাত্রা করিলেন।

পাঁচ

দিনতিনচার পরে রবিবারের দ্বিপ্রহরে আবার বন্ধু-ভবনে হিমাকরবাবুর সহিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ। হিমাকর বন্ধুসম্মুখনে খুব খুসী হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “এসো, এসো, সেই দেখা ক’রে গিয়ে একেবারে ডুব মেরেছিলে যে। বোসো, বোসো, খবর কি? “কালীর আঁচড়” বুঝি শ্রীমতীর লেখা।—এমন সুখবরও লুকুতে হয়? I congratulate you on your having such an enlightened wife.”

বন্ধুর প্রসারিত করখানি ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার স্নানমুখে কহিলেন—“মকদ্দমা যে টেকে না হে! জ্বর জ্বানবন্দী চায়—তাকে কি আমি কোর্টে এনে দাঁড় করাতে পারি।”

হিমাকর কহিলেন, “ব্যাপারটাতো আমার কাছে তুমি আগাগোড়াই লুকিয়ে রাখলে। তুমি কি করি, বল? তোমার জ্বর অমতে manuscript (পাণ্ডুলিপি) পাবলিশার ছেপেছে, এই অজুহাতে তুমি যেন নালিশ করলে। কিন্তু পাবলিশার স্পষ্টই আদালতে বলেছে যে, হিরণ্য ঘোষ (লেখিকার ভাই) manuscript (পাণ্ডুলিপি) তাকে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে হিরণ্য-বাবু সন্দেহ আগে তোমার দেখা করা

উচিত। আর, সত্যিই তাই, নইলে পাবলিশার লেখা পেলে কোথা? শ্রীমতী কি বলেন?”

ভিতরের কথা ফাঁপ করিবার ইচ্ছা ডাক্তারের আদৌ ছিল না। শ্রীমতীর নিকটে গিয়া এসবের জবাবদিহি চাহিলে কোনো ফলই হইত না; কেবল একটা হাসির গরুরা উঠিত মাত্র। ডাক্তারের উদ্দেশ্য—বইখানির প্রচার বন্ধ করা। সেক্ষেত্রে প্রকাশককেই জব্ব করিবার ফন্দি লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু মতলব অল্পব্যয়ী কাজ হইল না। প্রকাশক আদালতে হিরণ্ময় ঘোষ ও স্বধেনু রায়কে দায়ী করিতেছে। উপরন্তু আদালত লেখিকার সাক্ষ্য তলব করিয়াছে। “অগত্যা মহাবিপদ!” বন্ধুর প্রশ্নে বিবর্ণ মুখে ডাক্তার জবাব দিলেন।

“শ্রীমতী আর কি বলবেন? মোট কথা, বইখানার আমি বিক্রি বন্ধ কর্তে চাই। আর জীকে দেশের সামনে আনতেও আমি রাজি নই।”

হিমাকরের চক্ষে আলোক ফুটিল, তিনি কহিলেন, “তুমি কি তোমার জীব লেখার পক্ষপাতী নও?”

ডাক্তার কহিলেন—“মোটাই না; তুমি তো জানই গল্পের ওপর ছেলেবেলা থেকেই আমি চটা। এখন সেই উৎপাত কি না আমারই ঘরে।”

হিমাকর কহিলেন,—“বেশ, তা প্রকাশকের কাছে গিয়ে আপোষে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। মকদ্দমা চালাবার দরকার নেই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি স্বভাষ, আজ আমার তোমার ভাগ্যের ওপর হিংসে হচ্ছে। যদি বদলাবার ব্যবস্থা থাকত, তা হ’লে আমার গৃহিণীটিকে বুঝতে পারতুম কি না—, তিনি পড়াশোনার নামেই আংকে ওঠেন। ছেলের আখ্যানমঞ্জরীর পড়া, তাও ব’লে দিতে অক্ষম।”

কাঠহাসি হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন—“নিশ্চয়ই তিনি রন্ধনে দ্রোণদী,—তরকারীতে ছুন মশলা নিশ্চয়ই তিনি ওজন করে দিয়ে থাকেন।”

হিমাকর কহিলেন, “সে-কথা অপলাপ করলে পাপ হয়। সে পাপ করতে আমি রাজি নই—কিন্তু একথাও মিথ্যা নয় যে, মধ্যে মধ্যে তাঁর তরকারী ছুনও পুড়ে

যায়, আলোনাও হ’য়ে থাকে। দুধও হ’য়ে যায় বা কুহুরেও হাঁড়ি যায়। তা উঠলে কেন হে? শ্রীমতীব গল্প ছ’একটা ক’রে যাওনা, শুনি।”

“আবার দেখা হবে”—বলিয়া ছাতা লইয়া ডাক্তার ততক্ষণে বাড়ীর বাহির হইয়া প্রকাশকের দোকানের পথ ধরিলেন, প্রকাশক সৌভাগ্যবশতঃ একাই ছিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া নিতান্ত ভয়ভাব দায়ে কহিলেন,—“আমুন মশাই, কি খবর?”

ডাক্তার বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, “দেখুন মশাই, মকদ্দমা আমি চালাতে চাই না। আপনি কেবল দয়া ক’বে “কালীর আঁচড়” বইএব সব কাগজ আমায় দিয়ে দিন। বই আমি বাজারে বিক্রী করতে রাজি নই।” নিক্ষেপ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রকাশক কহিলেন,—“এই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, প্রথম দিনেই তা আপনি এসে আমাব একথা জানানোতে পারতেন।—মিথ্যা আদালতের হায়রাণটা আর হ’ত না।—দু’দিন দোকান বন্ধ ক’রে আমায় সেই কোর্টে ছোটোছুটি করতে হয়েছে। বিক্রি-সিক্রি সব বন্ধ, বাজারেও দুর্গাম রটেছে যে manuscript (পাণ্ডুলিপি) চুবি ক’বে ছেপেছি। আমরা এই ব্যবসা ক’রে খাই মশাই—অত বড় বড় লোকের সঙ্গে কাজ-কারবার। মিথ্যে আমায় এ দুর্গামের ভাগী করলেন। আজ সকালেই হিরণ্ময়বাবুকে খুব দশ কথা শুনিয়ে এসেছি। আর চশমা চোখে সেই স্বধেনুবাবু, তাঁর দু-দুখানা বই আজ তিন বছর নাগাদ ছেপে বিক্রি করছি—জিজ্ঞেস করুন তাঁকে আমার কথা—”

দীর্ঘ বক্তৃতার অবকাশে হাঁফাইয়া উঠিয়া ডাক্তার কহিলেন—“যা হবার তা হ’য়ে গেছে, মশাই। আমায় এখন আপনি কাগজগুলি দিতে পারবেন?”

—“স্বচ্ছন্দে—এই যে বাঁধাই আছে। এই স্ব-কামুটে এদিকে আয়তো?”

তৎক্ষণাৎ একটি মুটের মাধ্যমে আঁধা কাগজের বোঝা প্রকাশক তুলিয়া দিয়া আলমারিতে যে পঁচিশখানা বাঁধাই বই ছিল তাহাও—দিয়া দিলেন।—অতঃপর হিসাবের বহি

বাহির করিয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া যেমন তিনি চোখ তুলিয়াছেন, দেখিলেন ডাক্তার ফুটপাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশক হাঁকিলেন—“অ—মশাই, একটু দাঁড়িয়ে যান, হিসেবটা মিটিয়ে দিই—গোটা পঞ্চাশ টাকা আপনার দেনা দাঁড়িয়েছে।” “এটা আপনি বাখবেন—আপনার ক্ষতিপূরণ সমেত” একখানা একশ টাকার নোট আগাইয়া দিয়া এই কথা কয়টি বলিয়া ডাক্তার স্বরিতপদে পথ হাঁটিতে লাগিলেন।

ছয়

গ্রীষ্মের প্রথম জ্বালাদীপ্ত দিবসের শেষে তখনও ধরণীর দেহ মন্দসমীরণের শিথিলবীজনে মোটেই শীতল হয় নাই। পশ্চিম-আকাশে শুক্ল-সপ্তনীর চাঁদ রূপার জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে মাত্র।—হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডের বাগানে আধফোটা বেল মলিকার মুহূগন্ধ ঈষৎ আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যগ্র।—সেই সময় নেলী নিম্নের শয়নগৃহের জানালায় দাঁড়াইয়া কম্পাউণ্ডের হাতার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত একটি অগ্নিস্তম্বে দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা পিছন হইতে আত্মা আসিয়া তার কাঁধে হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিল—

“হ্যাঁ ভাই, এই গরমে আগুন পোহাবার সখ হ’ল কার—ডাক্তারবাবু, না রোগীদের?”

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার সে বলিয়া উঠিল,—“ওমা, রাশি রাশি কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে যে, হাঁসপাতালের পুরোনো নথিপত্র নাকি?”

বড় জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নেলী কহিল,—“আমার চিতা-সাজানো হয়েছে, আত্মা। একদিন না বলেছিলি, ‘লিখে লিখে খাতা বোঝাই কর্চিস্ কার জন্তে—নিজের

চিতা সাজাবার জন্তে কি?’ এখন বোঝ্ সে কথা সত্যি কিনা।”

আত্মা যেন চাবুক খাইয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার সেই লেখার সমাধি হচ্ছে বুঝি। আর তুমি স্বহস্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস্?”

কামাভরা হাসি হাসিয়া নেলী আর্জকণ্ঠে কহিল—“কি করব তুমি বলতে চাস্?”

উগ্রকণ্ঠে আত্মা কহিল—“কি আবার করবি, বিদ্রোহ করবি—মাপ্ করিস্ বোন, এ অভ্যাচার পশুতেই করে, আর নির্বিচারে সয়ে যায় যারা ভারও পশু ছাড়া আর কিছুনা।”

নেলী মুহূষরে কহিল,—“তা জানি আত্মা, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তারই জ্বালানো সাজে যে সেই আগুনে সব কিছু অসত্য বা অন্যায়কে পোড়াবার শক্তি রাখে—দে-শক্তি সবার মধ্যে নেই বোন।

আত্মা অবাক হইয়া কহিল,—“কিন্তু এই যে একটা খাম খেয়ালের বশে একজন অবিবেচক তোমার প্রতিভার উন্মেষকে এমন ক’রে হত্যা করলেন, এর বিরুদ্ধে বলবার কি তোমার কিছু নেই, নেলী?”

চাকর আসিয়া থোকাকে দিয়া গেল। নেলী থোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তার চোখে মুখে চুমা লইয়া বলিয়া উঠিল,—“এই থোকার মুখ চেয়ে আমি সব ভুলব আত্মা—আর যদি আমার আশা না ব্যর্থ হয়, তা’হ’লে যে সাধ, যে মুকুলিত কামনা আত্ম আমার বুকের মধ্যে আগুনের হৃদয় মুষড়ে গেল, এই শিশুর জীবনে তাকেই আমি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।”

আত্মা সে কথায় কান না দিয়া অদূরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিব লেলিহান শিখাব দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজেও অকারণে রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল।



বেদ-কথা

[স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় যখন ঐতবেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রকাশ করেন সেই সময়ে বৈদিক যাপযজ্ঞগুলির তাৎপর্য্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যার জন্য উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থে একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া মূল গ্রন্থকে স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। ভূমিকা লেখাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যতদূর লেখা হইয়াছিল তাহাতে বেদ এবং তদন্তর্গত যাপযজ্ঞগুলির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ভূমিকার কিয়দংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলর ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের অনুপ্রাণিত-রূপে পুনর্লিখিত হইয়া সেনেট হলে প্রদত্ত হয় এবং আচার্য্যদেবের সর্গারোহণের পূর্বে “বজ্র-কথা” নাম দিয়া সেস্তলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকার অবশিষ্টাংশ এতদিন পাওয়া যায় নাই। অতদিন হইল তাঁহার লাইব্রেরীর অনাধ্যাপক পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি খাতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি বৈদিক প্রবন্ধ আছে। অনুমান হয়, ঐ প্রবন্ধগুলিই সেই ভূমিকার অবশিষ্টাংশ। এইরূপ মূল্যবান প্রবন্ধগুলি কালে কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়—এই আশঙ্কায় বেদ-কথা নাম দিয়া ধারাবাহিক ভাবে সেগুলি “মানসী ও মর্মান্বণী”তে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি নানাহানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় তাহাদের স্থানে স্থানে সামান্য অসঙ্গতি ও পুনরাবৃত্তি দোষ লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য সংশোধনেও উপায় দেখি না। বিশেষজ্ঞ স্বীয়মতলীকে এবিষয়ে মনোযোগী দেখিলে হৃদয় হইবে। —শ্রী জগদীশ বাসুদেব]

১। বেদের বিতরণ

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে বেদবাক্য বিবিধ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেওয়া কিছু কঠিন। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে দেবতার স্তুতিবাক্যের নাম মন্ত্র; এবং যে-বাক্যে ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগ, তাৎপর্য্য বা প্রশংসা বলা হয় তাহাই ব্রাহ্মণ।

“ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্ত। অধে মবস্ত বর আ পৃথিবা আরে শত্রুণ কুণ্ঠি দর্শবীরঃ ॥

তৈত্তিরীয় সংহিতা ১২।৩।৩

এই একটি মন্ত্র; সোম নামক দেবতা উহার উদ্দিষ্ট। ঐ মন্ত্রে সোমকে বলা হইতেছে, “অহে সোম, তুমি ভদ্র (অর্থাৎ মঙ্গলময়) এই স্থান হইতে শ্রেয়ঃ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) অবস্থানে প্রয়াণ কর বৃহস্পতি তোমার পুরোগামী হউন, তখন পৃথিবীর মধ্যে বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) স্থানে তোমার অবস্থিতি ঘটবে; তুমি সর্বাধিকারী বীর, তুমি (সেইখানে থাকিয়া) শত্রুগণকে দূরে অপসারিত কর।” এই মন্ত্রটি ঋক মন্ত্র হইলেও ঋগ্বেদ সাহিত্যে যে শাকন শাখা এখন প্রচলিত আছে, তদ্ব্যতীত ইহার স্থান নাই। পরন্তু যজুর্বেদ সাহিত্যে তৈত্তিরীয় শাখা মধ্যে এই ঋক মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সোম দেবতাকে স্তুতি করা হইতেছে

ও তাঁহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বাইবার ক্ষমতা প্রার্থনা করা হইতেছে।

এখন দেখিতে হইবে এই মন্ত্রটি কোন যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে কিরূপে বিনিয়ুক্ত হয় এবং কেনই বা সেই অনুষ্ঠানে বিনিয়ুক্ত হয়।

অগ্নিষ্টোম নামক সোম যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে সোমদেবের আহুতি দিতে হয়। তজ্জন্ত সোমলতা ক্রয় করিয়া শকটে চাপাইয়া সমারোহের সহিত যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইতে হয়। সোমলতাকে শকটে চাপাইয়া লইয়া বাইবার সময় হোতা নামে ঋত্বিক কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করেন। “ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি” ইত্যাদি মন্ত্রটি তদ্ব্যতীত প্রথম। এ বিষয়ে ঐতরেয় নামক ঋষি বলিতেছেন—“সোমায় ক্রীতায় প্রোহমানায় অমুক্ৰুহি ইত্যাহ অংমুর্হা”।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড।

অর্থাৎ সোম ক্রয় করিয়া যখন শকটে বহন করা হয়, তখন সেই সোমের উদ্দেশে বহন-ক্রিয়ার অমুকুল মন্ত্র পাঠ কর—অংমুর্হা নামক ঋত্বিক হোতা নামক ঋত্বিককে এই আদেশ দিবেন। তৎপরে ঐ মন্ত্রের বলিতেছেন “ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি” “ইত্যাহা” (অর্থাৎ অংমুর্হার আদেশ পাইয়া) হোতা “ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি”, ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। ঐ মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য কি তৎসম্বন্ধে ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন—“অংমুর্হা বাব লোকো ভদ্রস্তম্ভাসাবাব লোকঃ জেহান, স্বর্গমেব তন্মোকঃ যজমানঃ গময়তি।”

ঐ মন্ত্রে যে মন্ত্র এই বিশেষণ পাঠ আছে তাহাতে এই লোককে অর্থাৎ এই ভুলোককেই ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলময় বলা হইতেছে। ঐ যে শ্রেয়ঃ পদ আছে—স্বর্গ-লোকের বিশেষণ। স্বর্গলোককেই জেহান বলা হইতেছে। অর্থাৎ ভুলোক ত ভদ্র বাটে, স্বর্গলোক তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ—অহে সোম, তুমি এই ভুলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে চল। সোমলতা—সোমদেবতা যাহাতে বর্তমান সেই দোমলতা এতক্ষণ যজ্ঞভূমির বাহিরে ছিল, সেই স্থান ভুলোকের সদৃশ। এখন সোমকে যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, ঐ যজ্ঞভূমি স্বর্গের সদৃশ। সোমকে যেন প্রার্থনা করা হইতেছে, তুমি এতক্ষণ ভুলোকে ছিলে, এখন স্বর্গলোকে চল। এই মন্ত্রের এই এই অংশের ঐ তাৎপর্য্য। অতএব সোমকে শকটে চাপাইয়া যজ্ঞভূমিতে লইয়া বাইবার সময় ঐ মন্ত্রেব পার্থক্যতা। বস্তুতই মন্ত্রটি এই অনুষ্ঠানে বিনিয়োগের উপযুক্ত। এই অনুষ্ঠানে ঐ মন্ত্রটি বিনিয়োগের ফল কি? “স্বর্গমেব তন্মোকঃ যজমানঃ গময়তি”—ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন, সোমকে এই সময় ঐ মন্ত্রদ্বারা এইরূপে প্রার্থনা করিলে যজ্ঞমানকেই স্বর্গলোকে লইয়া যাওয়া হয়। উহার ফল যজ্ঞমানের স্বর্গলাভ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে আছে “বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্ত” বৃহস্পতি তোমার (অর্থাৎ সোমের) পুরোগামী হউন। এই মন্ত্রাংশ সম্বন্ধে ঐতরেয় বলিতেছেন যে “ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মেব আত্মা এতৎ পুরোগমক ন বৈ ব্রহ্মস্বয়ং বিদ্যাতি,—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি—বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয়। বৃহস্পতি সোমের পুরোগামী হইলে বর্তমান অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকেই শকটবাহিত সোমের পুরোগামী করা হয় এবং যে

অমুঠানে ব্রাহ্মণ সহায় থাকেন সে অমুঠানে কোন ঝিট [অনিষ্ট]
অম্মে না। কাজেই বৃহস্পতিকই সোমের পুরোণামী হইতে প্রার্থনার
সার্বকতা।

ঐ মন্ত্রেব তৃতীয় চরণ সম্বন্ধে ঐতরের বলেন, “অধেষমবস্ত বর আ
পৃথিব্যা ইতি দেবযজ্ঞনং বৈ বরং পৃথিব্যে দেবযজ্ঞন এক এনং তদব-
সায়য়তি” অর্থাৎ পৃথিবীতে দেব-যজ্ঞনই (যজ্ঞভূমি) শ্রেষ্ঠ স্থান। মন্ত্রের
এই অংশ পাঠে সোমকে দেবযজ্ঞনই স্থাপন করা হয়।

চতুর্থ চরণ সম্বন্ধে বলেন, “আরে শত্রুন কুণ্ঠি। সর্ববীর ইতি
শিবস্তম্বেব অম্মে তৎপাণানং ভ্রাতৃব্যং অপবাহতে”—ঐ চরণ পাঠে
যজ্ঞমানবে দোষ্টা পাপকাতী শত্রুকে পরাস্ত করা হয়।

উক্ত দৃষ্টান্ত হইতেই মন্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সম্পর্ক বুঝা যাইবে।
মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদবাক্য। মন্ত্র দ্বারা দেবতার স্তুতি হয়, দেবতাকে
প্রার্থনা জানান হয়। সেই মন্ত্রেব তাৎপর্য্য কি, কোন্ অমুঠানে উহা
প্রযোজ্য, কেন উহা সেই অমুঠানে প্রযোজ্য, উহার প্রয়োগের ফল কি
ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বুঝাইয়া দেন।

ব্রাহ্মণের আবার দুই অংশ—বিধি এবং অর্থবাদ। “সোমায় জীতায়
প্রোহমানায় অমুজহি ইতাহ অম্বয়্য।” সোমজয়ের পর বহন-কালে
তদমুকুল মন্ত্র পাঠ কর—এই মন্ত্রে অম্বয়্য [হোতাকে] অমুজা দিবেন।
ইহা বিধি। আবার “ভজ্রাবন্তি শ্রেয়ঃ প্রেহি ইত্যাহাৎ”—ভজ্রাবন্তি শ্রেয়ঃ
প্রেহি ইত্যাদি মন্ত্র হোতা পাঠ করিবেন, ইহাও বিধি। ব্রাহ্মণের তৎ-
পরবর্তী অংশ—বাহাতে ঐ বিধির সার্বকতা ও উদ্দেশ্য বৃত্তান হইতেছে
“অরং বাব লোকো ভজ্রস্তম্বাদিসাবেব লোকঃ শ্বেরানু স্বর্গমেব তল্লোকং
যজ্ঞমানং গনয়তি” ইত্যাদি অংশ ঐ বিধি সম্পর্কে অর্থবাদ।

বদ্বারা মনন করা যায়—দেবতার উদ্দেশ্যে মনন করা যায়—তাহাই
মন্ত্র। কোন্ সময়ে কোন্ উপলক্ষে সেই মনটি বিনিমোণ করিতে হইবে
তাহা না জানিলে কেবল মন্ত্রটি জানিয়া লাভ নাই। ব্রাহ্মণ সেই সময়
ও সেই উপলক্ষ বিধিবাক্য দ্বারা বলিয়া দেন। কর্মকাণ্ড মতে মন্ত্রের
ইহা ভিন্ন অস্ত্র প্রয়োজন নাই। সেইজন্য কল্পশূত্রকারেরা বলিয়াছেন,
মন্ত্র কর্মকরণ মাত্র। বাহার সাহায্যে কর্ম অমুষ্ঠিত হয় তাহাই মন্ত্র।

বিধিবাক্য ও অর্থবাদ বাক্যের নাম ব্রাহ্মণ হইল কেন, স্থির উত্তর
দেওয়া কঠিন। উত্তরকালে ব্রহ্ম শব্দে অপংকারণ আত্মা বুঝাইত।
বেদান্ত মধ্যে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আত্মা—যাহা বৃহৎ তাহা ব্রহ্ম। আত্মা
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা জ্ঞানকাণ্ডের কথা।
কর্মকাণ্ডে ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্য মাত্র বুঝায়। বেদবাক্যই ব্রহ্ম। বে-
সকল ব্যক্তি যজ্ঞামুষ্ঠান বিষয়ে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন তাঁহা-
দিগকে ব্রহ্মবাদী বলিত। ঐতরের ব্রাহ্মণে ‘ব্রহ্মবাদী’ এই উপাধিটি নাই,
কিন্তু তাঁহাদের মতামতের সমালোচনা বহু স্থানে আছে। যে-সকল ঐতরিক
বা যাজ্ঞক যজ্ঞমানের যজ্ঞ যজ্ঞামুষ্ঠান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান
ছিলেন তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদ সম্পত্ত অমুষ্ঠান
করিতেন, অধ্বায়া যজুর্বেদ-সম্পত্ত কর্ম করিতেন, উল্লাতা সামগান
করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে তাঁহাদের সকলেরই উপর কর্তৃত্ব করিতে হইত।
সকলকেই অমুজা দিতেন, সকলেরই ভ্রম সংশোধন করিতেন। সকল
বেদেই তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকিত। ব্রহ্মবাক্যের স্বাধাধ তাৎপর্য্য তিনিই
বুঝিতেন। এইজন্যই তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। হইতে পারে অতি
প্রাচীনকালে চতুর্বেদবিৎ ব্রহ্মা নামক ঋষিকেরা যে-সকল বেদবাক্য
কহিয়াছিলেন তাহাই ব্রাহ্মণ।

অতি প্রাচীন কালেই বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই
বর্ণত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। উপরে ঐতরের ব্রাহ্মণ হইতে অর্থবাদ বাক্য

উদ্ধৃত করা গিয়াছে। তাহাতে আছে “ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মৈব আত্মা
এতৎ পুরোণবমকঃ”—ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য এ হলে ব্রহ্ম শব্দে ব্রাহ্মণ
বর্ণ বুঝিয়াছেন। বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ (বর্ণের দেবতা)
ছিলেন, (তাঁহার নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি)। ঐ, মন্ত্রাংশ উচ্চারণ করিলে
ব্রাহ্মণকে [ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্যক্তিকে] সোমের পুরোণামী করা হয়। ব্রহ্ম
বাক্যের তাৎপর্য্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়াই ব্রাহ্মণবর্ণ ব্রাহ্মণ নাম পাইয়াছে,
তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

কর্মকাণ্ড মতে বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণাস্ত্রক। মন্ত্র ছাড়িয়া অবশিষ্ট বেদবাক্য
সমস্তই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বিবিধ—বিধি ও অর্থবাদ। বিধি আবার
বিবিধ। কোন বিধির উদ্দেশ্য অপ্রকৃত প্রবর্তন, কাহারও উদ্দেশ্য অজ্ঞাত
জ্ঞাপন।

“অগ্না বৈষ্ণবং পুরোভাণং নিবর্ণতি দীক্ষশীমায়ম্”—দীক্ষণীয়া
ইষ্ট্যাগে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোভাণ নিবর্ণন করিবে ইত্যাদি কর্ম
কাণ্ডগত বিধিবাক্য অপ্রকৃত প্রবর্তক। “আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ”
ইত্যাদি জ্ঞানকাণ্ডগত বিধিবাক্য অজ্ঞাত-জ্ঞাপক।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪)

৮/রামেস্বরস্বর ত্রিবেদী

হিন্দু জাতি

এই হিন্দুজাতি যুগ যুগান্ত ধরে নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে
অন্ততঃ ১০,০০০ বৎসর জীবিত রয়েছে। প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই
বিলুপ্ত হ’য়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু জাতি আজও তার প্রাচীন বুনরাবাদের উপর
পাড়া রয়েছে।

প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হ’ল, এক হিন্দুজাতি জীবিত রইল,
কেন ?

এমন দিন ছিল যখন আমরা নিজের দেশের ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা,
সাধনা, বিশিষ্টতা, বৈলক্ষ্য্য সব ভুলে যাচ্ছিলাম, হারকে বন্দী করলে
যেমন দশা হয় আমাদের তেমন দশা ঘটছিল। কিন্তু এখন আমরা কি
দেখতে পাচ্ছি ? যে-রকম ক’রে হিন্দু সভ্যতা ভারতের ইতিহাসে আটশত
বৎসর সংগ্রামের পর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আবার সেইসব লক্ষণ দেখা
যাচ্ছে। এর মানে এ নয় যে ইউরোপের শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন,
আমরা কিছুই নেব না—সমস্তই ত্যাগ করব ; তা নয়। বর্জ্জন ভারতের
ধাং নয়। ভারতবর্ষের ভিতর যে একটা বিরাট প্রসিক্তা আছে, সেই
বৃত্তক্ষা-শক্তির বলে সে সমস্ত জিনিসকে গ্রাস ক’রে আত্মসাৎ ক’রে নেয়।
পশ্চিমের দর্শন বিজ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না—তাদের ভারতীয়
ভারতীয় শুদ্ধমাসী ক’রে রাখব। ত্যাগ করলে কি হ’ল ? বিগত
৩০০০ বৎসরের মধ্যে কত কত জাতি এদেশে প্রবেশ করেছে, তারা এসে
নিজদের সভ্যতা এই ভারতে প্রোথিত করবার চেষ্টা করেছে।

হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে একা, ঋগ্বেদের মধ্যে অশ্বত্থ,
বিভক্তের মধ্যে সামঞ্জস্য, ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টি—এক কথার বছর মধ্যে
একের প্রতিষ্ঠা করা। সেইজন্য হিন্দু মনকে সংগ্রাহক মন (synthetic
mind) বলে। ঐ মন বর্জ্জন করে না, গ্রহণ করে ; প্রত্যাখ্যান
করে না, সমাধান করে। সে মন বিবিধকে বিলুপ্ত করে না, বিচিত্রকে
মণ্ডিত করে না, নানাত্বকে ব্যাহত করে না। ঐ মনের স্বধর্ম্ম নানাকে
একাত্ম্যে গ্রহণ ক’রে, বৈচিত্র্যকে সংহত ক’রে, বহুকে অদ্বাদ্বীভাবে
সংবদ্ধ ক’রে সকলের মধ্যে রাশি-বন্ধন রচনা করা। হিন্দু মনের এই
বৈশিষ্ট্যের নিদান কি ? হিন্দুজাতির ঐ চিন্তনরীতি উৎস কোথায় ?

উৎস ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের বনিত্বতা (Immanence of God and Solidarity of Man) সম্বন্ধে তার চিরবন্ধমূল নিরূপিত স্বদৃঢ় সংস্কার।

হিন্দু সাধনার চরম কথা—চরাচর স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিষের মধ্যে ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্তি।

ইউরোপ আমাদের শেখাচ্ছে বটে “All men are born equal”—‘সব মানুষ জন্মগত সমান’। একথা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক নয়; কারণ আধারের আবিলতার অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-জ্যোতির স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। কিন্তু, তাহা হ’লেও মূলতঃ, তথ্যতঃ সব জীবই ব্রহ্ম।

একথা যদি ঠিক হয়, প্রত্যেক জীব যদি শিব হয়,—তবে যে আমরা মূর্তিমের উচ্চত্বের অভিজ্ঞাত হিন্দু আভিজাত্যের অভিমানে কোটি কোটি নিম্নত্বের হিন্দুকে অবজ্ঞাত—এমন কি অস্পৃশ্য ক’রে বেখেছি, এর সমর্থন কোথায়? দেশের এই চরমশার বিনে নিম্নবর্ণের হিন্দু যা-দিককে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি এবং যাদের untouchable (অস্পৃশ্য) ক’রে রেখেছি—তারা যদি হিন্দু সমাজ পরিভাষ্য ক’রে মুসলমান বা খৃষ্টান হ’য়ে যায়, তবে হিন্দুদের আরও বলবান হ’বে।

যতদিন প্রকৃত হিন্দুত্ব হিন্দুজাতির মজ্জাগত ছিল, ততদিন এই অস্পৃশ্য সমস্তা সমস্তক উত্তোলন করতে পারে নাই। এমন কি এই সকল অবজ্ঞাতের মধ্যেও অনেক সাধু মহাত্মা আবিস্কৃত হ’য়ে উচ্চবর্ণের পূজা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। এইজন্য আমার মনে হয়, যদি অস্পৃশ্য-সমস্তার প্রকৃত সমাধান করতে হয়, তবে আমাদের সেই প্রাচীন যুগের উন্নতির ভাবে ভাবিত হ’তে হবে।

এ প্রশ্নে শুদ্ধির কথা কিছু বলতে চাই। বর্তমানে ভিন্নধর্মী ব্যক্তি—মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি—যদি বেচ্ছায় শুভ বুদ্ধির প্রেরণায় হিন্দু হ’তে চায়, তবে তাকে আমরা গ্রহণ করব কি না? আমি আমাদের মুসলমান ও খৃষ্টান ভ্রাতৃগণকে বলতে চাই যে, তারা যদি হিন্দুধর্মকে স্ব স্ব ধর্মের দীক্ষিত করবার অধিকার স্বাধীন ভাবে পবিচালন করবার দাবি রাখেন, তবে হিন্দুদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?

আমাদের নিজের দিক হ’তে কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করবেন—এ তোমরা ক’বচ কি? হিন্দু ধর্মত কোনোদিন প্রচারক ধর্ম (proselytising religion) ছিল না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একি হিন্দুর উপযুক্ত কথা? আর জিজ্ঞাসা করি একি ভারত-ইতিহাসের সমগ্রস কথা? রাজপুতনার অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়, কোকনের চিংপাবন ব্রাহ্মণ এবং ভারত-বর্ষের নানা প্রদেশের শাকদ্বীপী বিপ্রের কথা নাই বা তুলিলাম। কিন্তু গারো নাগা কোল ভিল প্রভৃতি পার্শ্বজাতি এবং কেরল কুল্লু প্রভৃতি আর্ঘ্যেতর জাতির কথা মন থেকে কি ক’রে মুছে ফেলি? হুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যখন আর্ঘ্যজাতি এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হ’ল, তখন তারা একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির ও ভিন্ন রকমের সভ্যতার সংস্পর্শে এল। কিছুদিন দ্রাবিড়দের সঙ্গে খুব সংঘর্ষ চলল—অনার্য জাতি ‘দাম’ ‘দম্বা’ এই সব আখ্যায় আখ্যাত হ’তে লাগল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অনার্যের আখ্যায় আখ্যাতের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান লাভ করলে—এমন কি অনার্য দেবতার পর্ষাও আর্ঘ্যদের মণ্ডলীর মধ্যে আসন পেতে বসল।

কেহ কেহ আশঙ্কা করছেন যে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করলে ও শুদ্ধির প্রচলন করলে বর্ণাশ্রমধর্মের অস্বাভাবিকতা সম্পন্ন করা হ’বে। এ আশঙ্কা আমি অমূলক মনে করি। যে বিকৃত বর্ণাশ্রমের ফলে ধর্ম ঠাকুরঘর ছেড়ে রাস্তাঘরে প্রবেশ করেছেন (যা দীর্ঘকাল ধরে হ’ল), হযত ঐ বিকৃত ধর্মের পায়ে একটু আঁচ লাগতে পারে; কিন্তু

প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠিত বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা হবে না। আমি স্বয়ং বর্ণাশ্রমের গুরুপাতি। আমার মতে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজই আদর্শ সমাজ। গীতার ভগবান বলেছেন :—

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ”—

একথা যদি সত্য হয় তবে সমস্ত জগতে চতুর্বর্ণ্য থাকতেই হবে। সকল সমাজেই এমন সব লোক আছেন, যাদের ভিতর সম্বলিত প্রধান, উঁচর ব্রাহ্মণ। যাদের মধ্যে রজোত্তম প্রধান জরাজনিত। যাদের রজোত্তমে তমের অনুবেশ, তারা বৈশ্য। আর যারা তমঃপ্রকৃতি, তারা শূত্র। শূত্র প্রকৃতি—শূত্র জাত নয়। ঐ চাতুর্বর্ণ্যের গুণ-বৈষম্যই কর্ম-বিভাগের ভিত্তি।

আরও স্মরণ রাখবেন প্রাচীন ভারতের স্বর্ণ যুগে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম যখন একটা সমাজে প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন এই বর্ণবিভাগ সমাজের পক্ষে একটা কঠিন নাই-মড়ন-চড়ন নিগড়-খ্যা ছিল না। তখন উচ্চ তিন বর্ণের প্রত্যেকের পক্ষে অমূল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের আলোচনা করলে দেখা যায়, কয়েকজন ক্ষত্রিয় বিপ্রদ্বারা ক’রে বৈদ-বিভাগে সহায়তা করেছিলেন—এমন কি কেহ কেহ বৈদমন্ত্রের ঋষি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাতিথি, হিরণ্যনাভ এবং কণ্ণুর—উল্লেখ করা যেতে পারে।

ব্রাহ্মবক্ষ্য সংহিতায় দেখতে পাই ব্রাতক-ব্রতবারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ব্যবস্থা ছিল যে, তিনি কৃতদাস, গোপালক, নাপিত, কুলমিত্র ও অর্চনী—ইহাদের পৃষ্ঠ পক্ষ প্রহর করতে পারতেন।

এখন আমরা রাঢ়ী, বারেন্দ্র এক পংক্তিতে ভোজন করি না, কিন্তু মহাভারতের সভাপর্বে রাজহর্য যজ্ঞের বিবরণে দেখতে পাই ব্রাহ্মণ-ভোজনে শূত্র দাসেরা অন্নাদি পরিবেশন ক’বে।

(ব্রহ্মবিদ্যা, চৈত্র ১৩৩০) শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হজরত মুহম্মদের প্রতিভা

বিশ্ব যখন সত্যাপথ হারিয়ে ফেলে অস্ত্র এক পুণ্ড্রগময় দুর্গম পথে অভিধান-চালিয়ে নেয়, বিশ্ব-মানব যখন মানব ধর্ম ছেড়ে নানারূপ জড়-ধর্মগহী হ’য়ে পড়ে, তখন মহাপুরুষগণ স্বর্গের শান্তি নিয়ে আসেন মানবের কল্যাণার্থে, বিশ্বকে মুক্তি দিতে। হজরত মুহম্মদকে বুঝতে হ’লে তিনি সমগ্র ইসলামকে কতটুকু সত্য দিয়ে খাঁটি ক’রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটুকু বুঝতে হবে।

আমরা ইসলামের যে-সকল আদেশ নিষেধের প্রচলন দেখতে পাই, এগুলো হ’ল জীবাত্মার আনন্দ উপভোগের এক সুপ্রদত্ত পথ। এই আদেশ নিষেধ সমুদয়কে নিত্যস্থ বিকৃত ক’রে পালন করার মত বিভ্রম আঁড়ান নাই। আধুনিক মুসলমান, বিশেষ ক’রে বাঙালার মুসলমান কিন্তু এসব আদেশ নিষেধের বড় একটা ধার ধারে না। তারা ইসলামের আদর্শ সত্যটুকুকে কত ক্ষুদ্র গভীর ভিত্তিতে নিবদ্ধ ক’রে রেখেছে।

মুসলমান হজরত মুহম্মদকে আদর্শ ধ’রে জীবন বাঁচা শুরু করে হ’লে তাদের গর্ভ। কিন্তু বিরাট যে মহাপুরুষ, যিনি তপস্কার কর্পে, প্রেম এবং বিচিন্তায় জগতের শ্রেষ্ঠ মনোবীদের অস্তিত্ব, কল্পনাতীত সত্যিকার ক’রে জানে? তাঁর ভিতরের দৌলভ্য, চিন্তার উদ্যততা আর মানবধর্মকে আমাদের কল্পনা নিত্যস্থ আড়াল ক’রে চলেছে।

বর্তমান মুসলমান সমাজ হজরত মুহম্মদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। হয়ত একথা শুনে অনেকে আঁকড়ে উঠবেন। মহাপুরুষের পায়ে জীবনের সব লক্ষ্য উজাড় ক’রে দিলে, তাঁকে শ্রদ্ধা করা হয় না; তাঁকে সত্যিকার

অর্থোমিত্রের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কারণ সকল অবস্থার জাতিকে রাখিতে হইলে ইহা অপেক্ষা ধাতুর উপাদান আর কমান বাইতে পারে না।

গাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাঁহার ভাত ও রুটী কমাইয়া তাহাব পরিবর্তে ডিম, মাংস বা দুধ খাইতে পারেন এবং সকালে সুগের ডাল ভিজা—১ ছটাক, মাখন, ১ তোলা ও মিহনি ও ১৫ ছটাক ও বিকালে নিম্ন তালিকাভয়ের যে কোন একটা অনুসারে ভাল ধাবার খাইতে পারেন।

১। চিড়া	...	...	১ ছটাক	} মূল্য—০/০
কলা	...	...	২ টা	
দুধ	...	...	১ পোয়া	
জুড	...	...	১১ ছটাক	
২। মোহন ভোগ (হজি ১ ছটাক ...				} মূল্য—০/০
চিনি—১ ছটাক, খি ১ তোলা	—			
আটার পাউরুটি	...	১ ছটাক		
কমলা লেবু	...	১ টা		

বালকদিগের পক্ষে দুধ, ছানা, ডিম, মাখন বেশী আবশ্যিক। বাল্যকালী বর্ষমান খাদ্য দুধ-ছানা-ডাল জাতীয় জিনিষ, মাখন এবং কল উপযুক্ত পরিমাণে নাই। এইসকল উপাদান কম থাকিলে শরীরের যথোচিত পুষ্টি হয় না।

(আর্থিক উন্নতি, ভাদ্র ১৩৩৩) শ্রীঅমূল্যচরণ উকিল

ওমর-গুরু আবু আলি সিনা

পারস্যদেশে আবু আলি সিনার মত চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্য সৃষ্টকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও সূক্ষ্মবুদ্ধি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ওমর, আবু আলি সিনাকে গুরুপণে বরণ করিয়া, তাঁহারই অনুমোদিত বাণী প্রচার দ্বারা পারস্য দেশে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ছিলেন।

আবু আলি সিনা পারস্যের বোখারা শহরে ৩৭৩ হিজরিতে (৯৮০ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইবন শালি খান (১) বলেন, দশ বৎসর বয়সের সময় আবু সিনা সমগ্র কোরাণ, সাহিত্য, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ইউক্লিড, ও মিশর দেশীয় পণ্ডিত টলেমির গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়া এতই প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, সতের বৎসর বয়সে সমানন্দ বংশীর রাজকুমার মনহরের চিকিৎসার জন্য রাজপ্রাসাদে তাঁহার আহ্বান হইয়াছিল।

রাজকুমার আবু আলি সিনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে নিজ পুত্র-পাঠাগার ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি বোখারা ত্যাগ করিয়া খাওয়ারজাম নগরে গমন করেন। তৎকালী রাজা মামুন সর্বশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে আবু আলি সিনাকে রাজ-দরবারে আহ্বান করেন। এই সময়ে মামুনের রাজ-সভা বিদ্যানগরী মিলন-মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল।

গজনির হুলতান মামুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে লুণ্ঠন-হত্যাচারী দস্যু বলিয়া পরিচিত হইলেও স্বদেশে নানা স্বগুণবিমণ্ডিত ছিলেন। তিনি

যেমন বিজ্ঞানমুরাণী বিজ্ঞোৎসাহী, সাহিত্যিক ও বিদ্যানগরের অশ্রমদাতা ছিলেন, তেমনি অল্প রাজার রাজ্য হইতে প্রশিদ্ধি বিদ্যানগিকে হলে বলে কোণে নিজ রাজ-দরবারে আনিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। হুলতান মামুন আবু সিনার পাণ্ডিত্য-শ্রুতিভার মুগ্ধ হইয়া বরাবরই অন্তরে অন্তরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহাকে আপন রত্নভাণ্ডার পাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

আবু সিনা বোখার রাজকুমার কর্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া মামুন খাওয়ারজাম শাহের রাজদরবারে আশ্রয় পাইয়াছেন শুনিয়া হুলতান মামুন আবু আলি সিনাকে দশর তাঁহার বাঞ্ছনভায় প্রেরণ করিবার জন্য পত্রসহ একজন দূত প্রেরণ করেন।

আল বিরুনী, আবুল হাসান খাওয়ার, এবং আবু নাসার আবাক এই তিন জন বিদ্যান হুলতানের উদ্বারতা ও আশ্রিত-বাৎসল্যের কথা জানিতেন। ইঁহারা তিন জনে হুলতান মামুনের রাজসভায় যোগদান করিবার সম্মতি প্রদান করেন। আবু আলি সিনা ও আবু গাল মাস ইহি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। হুলতান মামুন বিলম্ব সম্বন্ধে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়া বলপূর্বক খাওয়ারজাম বাজ্য অধিকার করেন। আবু সিনা পলাতক শুনিয়া তাঁহার চিত্ত অস্থির করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা করেন, যিনি আবু আলি সিনাকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে প্রচুর পুস্তক ও রাজ-সম্মানে ভূষিত করিবেন।

আবু সিনা খাওয়ারজাম শহর হইতে পলায়ন করিয়া আফ-গোপন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

তিনি কুবাসের বাজার এক আত্মীয়কে কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করেন। রাজস্বাক্ষর তদীয় চিকিৎসক আবু আলি সিনাকে রাজদরবারে উপস্থিত করেন। রাজা প্রথম দর্শনেই হুলতান মামুন প্রেরিত চিঠি হইতে আবু সিনাকে চিনিতে পারেন। তিনি সর্বশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আবু সিনাকে নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। তিনি এই সময়ে কুবাস রাজ্যের মন্ত্রিগণে অধিষ্ঠিত করেন। কুবাস শহরে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রশিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ “সীফ” রচনা করেন।

হুলতান মামুনের অত্যাচারের ভয়ে তিনি অন্তরিন পরেই রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রায় নগরে অবস্থান করেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমাণ জীবন তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে। মকতুমি অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ উনরের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৪২৭ হিঃ অব্দে (১০৩৭ খ্রিঃ) হামদান নগরে ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবু আলি সিনার ৬৬-সংখ্যা আশিও স্থিতিশীল করিয়া কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার যতগুলি গ্রন্থের সম্মান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একশত চম্পণ, গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দশখানি, দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে পনেরখানি, উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাঁচখানি, কুড়িখণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ, ইহা ব্যতীত স্থপতিত আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীও তিনি গ্রীক হইতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন।

আবু সিনার পারস্ত ও আরব্য ভাষায় লিখিত কবিতা সুস্তিমান “বিদ্রোহ”। এই বিদ্রোহ-অস্তিত্বান দেশাচার, স্বকীয়, ভগ্নমী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে। আবু সিনা অত্যন্ত পিঙ্গালা-বিসাদী ইঙ্গেন। তাঁহার অনেক কবিতা হরা স্বরাপাও ও নারী প্রশংসাবাদে পূর্ণ।

(কম্বোজ, ফাল্গুন ১৩৩৩)

শ্রীহরেশচন্দ্র নন্দী

শামন

শ্রী হিন্দুভূষণ দেব

শৈশবে পিতৃহীন হইয়া এবং অৰ্ধ ও অভিভাবকের অভাব অতিক্রম করিয়াও বৎসরের পর বৎসর যখন জেলা স্কুল হইতে পদক পারিতোষিক প্রভৃতি সম্মান লাভ করিতে লাগিলাম তখন স্নেহাঙ্ক জননী কেন, বিন্মিত অনেক প্রতিবেশীরও মনে হইয়াছিল, কালে আমি একটা কেট-বিষ্ট হইবই। তাঁহারা অধিকতর বিন্মিত হইলেন যখন আমি বি-এ পরীক্ষায় সরস্বতীর দ্বারে লাক্ষিত হইয়া কেটজ ও বিষ্টজ এই উভয় পদেরই দাবী পরিত্যাগপূর্বক সূদূর পল্লীগ্রামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নীচু আঁকের মাষ্টারের পদে বৃত্ত হইলাম। দেবদ্ব-ত্যাগে ক্ষুণ্ণ মনকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইলাম, দেশমাতৃকার এই দুর্দশার দিনে ওসব বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ামাষ্টাররূপী স্বার্থশূন্য "নেশন-বিজ্ঞার" হওয়াই ত প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য।

বেতন ধার্য হইয়াছিল ২৩৮০/০,—ষ্টাম্পের অজুহাতে এক আনা কাঁটা হইত। পড়াইতে হইবে গুনিলাম, ৭ম শ্রেণীতে ইতিহাস, ৬ষ্ঠতে ভূগোল, ৪র্থতে ইংরেজী ব্যাকরণ এবং ৩য়তে অঙ্ক শাস্ত্র। মাসিক পারিশ্রমিকের অল্পপাতে দৈনিক পরিশ্রমের অসামঞ্জস্য দেখিয়া সামান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় প্রবীণ প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাকে সান্ধনাচ্ছলে বলিলেন যে, এইরূপ অল্প বেতনে ঐরূপ বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ একটা পরম সৌভাগ্য। সুচারু রূপে কার্য সম্পাদন করিলে মাত্র তিন বৎসর পরে আমার দক্ষিণা ২৫০ অর্থাৎ নগদ ২৪৮০/০ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, সে-বিষয়েও ইঙ্গিত করিলেন; এহেন সুযুক্তি এবং প্রলোভন প্রদর্শনেও কিন্তু আমার নবীন মন কেবলই আর-একটু অধিক বেতন ও শিক্ষাদানের আর-একটু অল্প সুযোগ লাভকেই শ্রেয় বলিয়া মানিতে লাগিল।

যাহা হউক, যখন স্বার্থ বলি দিয়া 'নেশন-বিজ্ঞার' হইতে আসিয়াছি তখন অত তুচ্ছ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া

মনকে ধ্বংস করা অসুচিত। অতএব ২৩৮০/০ আনাতেই জাতিগঠন বেশ জোরে চলিতে লাগিল। কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা লাভেই বুঝিলাম অল্প বেতনে অধিক বিষয়ে অধ্যাপনার সুযোগই আমাদের একমাত্র সুযোগ নহে; আরো বহু সুযোগই আমাদের ভাগ্য ঘটে। এই সুযোগের স্ফলভতার গুণে কর্মপ্রাপ্তির প্রায় এক বৎসরের মধ্যে 'কুটিন'-চিহ্নিত বিরাম ঘণ্টার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। অল্পপস্থিত শিক্ষক-দিগের অল্পপস্থিতির গুরুভার উপস্থিত শিক্ষক-দিগের অনিচ্ছুক স্বল্পে চাপাইয়া দেওয়া স্কুলের নিয়ম ছিল, এবং তাহার ফলে পূর্বাঙ্কে কিছুমাত্র আভাস না পাইয়াই সম্পূর্ণ অতর্কিতে কখনও ২য় শ্রেণীর সংস্কৃত ব্যাকরণের 'তদ্বিত,' ৮ম শ্রেণীর চাপক্য-শ্লোকের ব্যাখ্যা, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর 'বনভারসেনসন' আবার কখনও বা ৩য় শ্রেণীতে ইংরেজী পঞ্চ 'বোডেসিয়া', ও ১ম শ্রেণীতে সংস্কৃত পঞ্চ 'সীতা-হরণ' পর্যন্ত করিতে হইত; এমনকি স্কুমারমতি শিক্ষার্থীদিগকে চিত্রাঙ্কণ বিজ্ঞাতেও পারদর্শী করিবার অবসর ঘটত। শরীরের সামর্থ্যের ও মনের জোরের একান্ত অভাব না ঘটিলে, মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তওদেবকে সাক্ষী রাখিয়া বিদ্যালয়-সংলগ্ন অপরিসর প্রাঙ্গণে বালকদিগকে সারিবদ্ধ করিয়া বিবিধ ও বিচিত্র ভঙ্গী সহকারে অঙ্গ-চালনা দ্বারা তাহাদের অর্দ্ধাশন-ক্ষিণ ও ব্যাধি-দীর্ণ দেহবাষ্টগুলিকে সুপুষ্ট করিবার ব্যর্থপ্রয়াসের সুযোগেরও অভাব ঘটত না। একধায় দক্ষিণার বহর যাহাই হউক পাকা নেশন-বিজ্ঞার হইবার সর্ববিধ সম্ভব ও অসম্ভব সুযোগ সর্বদা সকল শিক্ষকের সমভাবে জুটত।

অদৃষ্টের পরিহাস কিন্তু এমনই যে, কর্তৃপক্ষের এবিধ সর্বাদীন সুব্যবস্থা সত্ত্বেও আমার জাতিগঠনের কার্য সহজে সুসম্পন্ন হইতে পায় নাই। আমার এই মহতী

প্রচেষ্টার স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইল তাহাদেরই দ্বারা, যাহাদের শুভার্থে এই স্বদূর পল্লীগ্রামে অত অল্প বেতনে অত অধিক বিষয়ে শিক্ষাদানে আমি স্বীকৃত হইয়াছিলাম। বিদ্রোহী-বৃন্দের প্রায় সকলেরই নাম ক্রমে স্মৃতির পিচ্ছিল পথ হইতে অপসৃত হইয়াছে, বাকি আছে মাত্র বিশেষ কয়েকটির। এই কয়েকটির মধ্যে আজ সকলের চেয়ে মনে পড়ে দুটিকে—“নোলক-পাঁচু” ও “গোদাবরী”। বৎসরের পর বৎসর নবকুমার ক্রোড়ে ধারণ করিয়াও কোনটিকে দীর্ঘকাল বক্ষে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মৃতবৎসা জননী ‘পাঁচু ঠাকুরের’ তৃপ্তিসাধন-মানসে তাহার নবজাত শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন ‘পঞ্চানন’, এবং যমকে ভুলাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় তাহার কচি নাকে নোলক ভুলাইয়া দিয়াছিলেন। মাতৃ-দত্ত নাম ‘পঞ্চানন’র সহজ অপভ্রংশ ‘পাঁচু’র সহিত তাহারই উপনৃত নোলকটিকেও চিবস্বর্ণীয় করিয়া ছাত্রসংসদে তাহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল—নোলক-পাঁচু। দ্বিতীয় বালকটির অভিনব নামকরণেব ইতিহাস সঠিক মনে নাই, তবে ‘গোদাবরী’ নামটি পেতৃক নহে, ষোপাঙ্কিত বা সতীর্থ-প্রদত্ত। শরীরের অপর অঙ্গের সহিত পদযুগলের অসামঞ্জস্যই হয়ত সেটির উৎপত্তি। নামকরণেব ইতিহাস যাহাই হউক, এই ‘গোদাবরী’ই ছিল পালের গোদা। প্রতি শ্রেণীতেই বৎসরাধিক অবস্থানের কলে বিন্যা-বুদ্ধিব বুদ্ধি তাহার যতই হউক, অসম্ভব বুদ্ধি পাইয়াছিল তাহার বয়স এবং দুঃসাহস। এছটির কল্যাণে দুবিনীতদের দলপতি সে সহজেই হইয়াছিল। সকল প্রকার অশিষ্ট আচরণের মূলে ছিল এই ‘গোদাবরী’ ও তাহার সুগটু শিষ্য ‘নোলক পাঁচু’।

আমার কর্মলাভের কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার নানা উৎপাত করিয়া আমাকে নিজেদেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিল এবং সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে, বিনাযুদ্ধে আমার বশতা স্বীকাব করিতে তাহারা একান্ত অনিচ্ছুক। তাহারা দুজনেই তখন ঈর্ষ শ্রেণীর ছাত্র। অভ্র উপভব করিয়া অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটাইয়া প্রত্যহ তাহারা শান্তি-ভঙ্গের চেষ্টা পাইত। একদিন তাহাদের শ্রেণীতে বাজলা হইতে ইংরেজীর তর্জমা শিখাইতে-ছিলাম; “নোলক-পাঁচু”কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে খায়

কি এব ইংরেজী কি? ”সে কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই ‘গোদাবরী’ তাহাকে শিখাইয়া দিল, ‘এই বল না, সে খায় ঘাস।’” ছাত্র-শিক্ষকের “এই সপ্তাহব্যাপী অশোভন ঘন্থেব একটা চরম নিষ্পত্তি করিতে সেদিন পূর্কালেই স্থির করিয়াছিলাম। সুতরাং দলপতিকে দলিত করিবাব মানসে পাঁচুর পরিবর্তে তাহাকেই বলিলাম, “বেশ তুমিই বল।” সে বলিল, “ওকেত জিজ্ঞেস করেছেন, ও বলুক।” আমি বলিলাম, “এতক্ষণ ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কিন্তু এখন তোমাকে বলতে বলছি, তুমিই বল।” তাহাতে সে বীরদর্পে বলিল, “সে কে এবং খায় কি তা আমি জানব কি করে? হয়ত ঘাস খায়।”—তাহার এই উত্তর সমাপ্তির পূর্বেই তার পৃষ্ঠে মস্তকে এবং সর্কাদেই সরবে ও সবলে মুষ্টি প্রয়োগ আরম্ভ হইল। কোনও ছাত্রকে শারীরিক শাস্তি দিবার নিষেধবিধি বা তাহা ভঙ্গের কুকল তখন আদৌ স্মরণ ছিল না। বাস্তবিকই কয়েক দিবসের বিরক্তি ও সেদিনের উত্তেজনায় আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া সকল কথাই বিস্মৃত হইয়াছিলাম; মনে ছিল কেবল মাত্র ‘গোদাবরী’কে এবং সেই প্রাচীন ঋষি বাক্য “Spare the rod” ইত্যাদি। এই সাবগর্ভ উপদেশবাণীর বিরাম-বিহীন অমুসরণ কতক্ষণব্যাপী হইয়াছিল মনে নাই, কেবল মনে পড়ে আশি সচেতন হইয়াছিলাম ‘গোদাবরী’র সক্রমণ আর্ন্তনাদে। এইরূপে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া এবং কমা-ফুল্টপ্-হীন অনর্গল মুষ্টি-বৃষ্টিতে চাপা পড়িয়া প্রথমতঃ সে হতভয়প্রায় হইয়া গিয়াছিল। পবে নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া বিকৃত স্বরে গোঁড়াইতে লাগিল, “আর কথুনো করবো না সার, এবারটা মাপ করুন।” তাহার এই কাতর সন্ধি-প্রার্থনায় নিবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, অস্ত্রান্ত ছাত্রেরা, মাঘ ‘নোলক-পাঁচু’ পর্যন্ত আতঙ্কে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ভয়-মলিন মুখ ও স্পন্দন-বিমুখ শবীর দেখিয়া ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’ এর তাৎপর্য ও সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাব কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেই দিন হইতে শান্তিভঙ্গের কোনও চেষ্টা আর লক্ষিত হয় নাই এবং স্বয়ং ‘গোদাবরী’ বলিয়াছিল, “এটা ক্ষ্যাপা মাষ্টার, বকুনির ধার খাবে না, কোন দিন সত্যিই মেরে ফেলবে, যে গোয়ার রে

বাবা।” প্রহারের বহর ত’ সে নিজেরই ঘাচাই করিয়া দেখিয়াছে এবং আমার স্পৃষ্ট শরীরটা সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে না হইলেও সেদিক্ হইতে দেখিলে নেহাৎ তাক্সিয়া করিবার ছিল না।

কিন্তু এই ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’ নীতিতে বাগ মানিল না যে ছেলেটি সেটি নারায়ণ মিত্র। পাতলা ছিপ-ছিপে চেহারা, রংটা উজ্জ্বল না হ’লেও শ্রাম বর্ণ। বড় বড় চোখদুটি বুদ্ধিতে চঞ্চল এবং মুখে সব সময়ই ছুটামির হাসি। ৩য় শ্রেণীতে তখন সে পড়ে। বয়স তার মোটে তের, কিন্তু পাকামিতে ছিল একেবারে প্রবোধ। ছুটামির ধারা তার ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নিজালস পণ্ডিতের বিনা-অহুমতিতে শিখাচ্ছেদ বা পাছুকা অপহরণ, শিক্ষকের সহিত বাকযুদ্ধ বা অনর্থক অবাধ্যতা, প্রভৃতি শাস্তিভঙ্গের সাধারণ উপদ্রবগুলিকে সে নিতান্ত সেকেলে ইতরামি বলিয়া মনে করিত এবং বাহারা ঐ পথ অবলম্বন করিত তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। ছাত্রদের অদ্ভুত নামকরণ তাহারই কল্পনা-প্রসূত এবং সকল শিক্ষকেরই শারীরিক বা অস্ত্র ক্রটি অবলম্বনে সে একটি ছড়া রচনা করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সে তাহার আধুনিক ভক্ত-রসিকতায় সহপাঠীদিগকে মোহিত ও শিক্ষকবৃন্দকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত। শুনিয়াছিলাম একবার পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপনাকালে শেষের ঘণ্টায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সকল ছাত্রকে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিয়া এবং সন্তর্পণে সকল দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া সে চলিয়া যায়। বিজ্ঞানদের ছুটির কোলাহলেও তাঁহার নিজাভঙ্গ ঘটে নাই, এমনই সময়ে দ্বার-সমূহ বন্ধ হইয়াছিল। সেই নিশ্চিন্ত গৃহে শান্তিদেহে পরম শাস্তিতে স্তম্ভনিদ্রায় তিনি শান্তিদূর করিতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাকালে নিজাভঙ্গে তিনি সেই অন্ধকারে গৃহের দ্বার-অদ্বৈত টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতিতে যথেষ্ট বাধা ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তারতরুর সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকেন। তাঁহার ভয়-কম্পিত আর্দ্রস্বরে আকৃষ্ট হইয়া মালী আসিয়া পড়াতে ব্রাহ্মণ শ্রীজই উদ্ধার পান। পরদিবস বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট অভিযুক্ত হইলে নারায়ণ মিত্র সমস্তই স্বীকার করিয়া বলে, সে কোনও অসদৃশিপ্রায়ে ঐরূপ করে

নাই, সমস্ত দিন দাক্ষণ পরিশ্রমের পর পণ্ডিত মহাশয়ের নিজাকর্ষণ হইলে তাঁহার অবাধ স্তম্ভনিদ্রার জন্মই সে ঐ প্রকার স্বব্যবস্থা করিয়াছে, স্তম্ভরায় ইহাতে দোষ কিছু হইতে পারে বলিয়া সে মনে করে নাই। বাহা হউক প্রধান শিক্ষক তাহাকে বলিয়া দিলেন অধ্যাপনা কালে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে নিজাভঙ্গই বিধেয় এবং গুরুপ আচরণ আর যেন কখনও সে না করে।

কয়েক মাস পরে পণ্ডিত মহাশয়ের আর একদিন নিজার উদ্বেক হইলে সে সকল ছাত্রদের বলিল, “তোরা সব চুপ কর”। ক্ষণকাল পরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিজা একটু গভীর হইলে তাঁহাকে আগ্রহিত করিবার অছিলায় সে এত জোরে নাড়া দিতে লাগিল যে নিজাভঙ্গ তাঁহারত হইলই, উপরি যথেষ্ট সন্দেহ হইল যে, শরীরের আরও কিছু ভঙ্গ, হইয়াছে। এই নিজাভঙ্গের ফলে তিনি তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার নিজা আর তিন রাত্রি ছোড়া লাগে নাই। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভৎসনায় সে বলে, “আজ্ঞে আপনিইত যুম ভাঙাতে বলেছিলেন; একটু অসাবধান হ’য়ে পড়েছিলাম তাই লেগে গেছে মাপ করবেন।”

আর একবার শুনিয়াছিলাম কোনও এক শিক্ষককে জব্ব করিবার অদ্ভুত কন্ধ্যী। তামাক সেবন তাঁর একটু বেশী প্রিয় ছিল বলিয়া প্রতি ঘণ্টার শেষে তিনি ধূমপান করিতেন এবং ভৎসংক্রান্ত আয়োজনের নিমিত্ত মালীর মাসিক সন্তোষ বিধান তাঁহাকে করিতে হইত। তাঁর ঘণ্টায় নারায়ণ মিত্র সেদিন জল খাইতে বাহিরে আসিয়া মালীকে সশব্দ্যন্তে বলিল, “সার তামাক চাচ্ছেন শীগগির সেজে নিয়ে যা, আমাদের ক্লাশে আছেন।” পরে মালীকে তামাক লইয়া ক্লাশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, স্টান প্রধান শিক্ষকের নিকট গিয়া বলিল, “আমাদের ক্লাশে ছাত দিয়ে বড় জল পড়ছে, সার আপনি একবার চলুন।” তারপর সে নিজের জায়গায় গিয়া শান্ত ছেলের মত বলিল। শিক্ষক ত তখন মালীকে বকিতেছেন। সে বেচারী ধতমত হইয়া বলিতেছে, “আপনি ত মোটে এইমাত্র তামাক চাইলেন।” এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া যেই সে হ’কাটি দিতে যাইবে অমনি প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রবেশ

করিলেন। ছাদ পর্যবেক্ষণের কথা বিশ্বত হইয়া তিনি বিশ্বয়ে নির্ঝাঁকু হইয়া কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া গেলেন। শিক্ষকটির লজ্জায় মাথা নত হইয়া গেল। বুঝিলেন নারায়ণকে কয়েক দিন পূর্বে শাস্তি-বিধানের ফলে তাঁর এ দুর্গতি। এইরূপে অভাবনীয় উপায়ে লালিত হইয়া শিক্ষকগণ নারায়ণের সহিত অবশেষে অহিংসা অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন। ফলে তাহাকে বিরক্ত না করিলে সেও বড় একটা কিছু করে না।

তাহার এই নিম্পৃহতা দূর করিতে চেষ্টা করিল 'গোদাবরী'। আমার প্রহারপ্রভাবে পরাভব স্বীকার করিলেও, উপযুক্ত প্রতিশোধের স্বযোগ সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাই নারায়ণ মিত্রের শরণাপন্ন হইয়া আমার বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। নারায়ণ অনর্থক ভুললোককে কষ্ট দিতে চাহিল না। গোদাবরী বলিল, “দুয়ে, মারের ভয়ে পেছোস্ কাপুরুষ কোথাকার!” নারায়ণ মিত্র বলিল, “মার টারের কি ছাই ভয় দেখাস্, ওসব এ শর্মা খোড়াই কেয়ার করে।” এটা যে তার বৃথা অর্থশূন্য আশ্ফালন নহে তা পরীক্ষা করিবার স্বযোগ আমার শীঘ্রই মিলিল।

গ্রীষ্মাবকাশের ৩৪ দিন পরে তাদের জেগীতে আঁক কষাইতেছিলাম। ছুটির আঁক যে সব ছেলে আনে নাই তাদের শাস্তি দিয়াছি, ৩৪ টার পর আটক থাকিয়া প্রত্যহ অন্যান্য ৩টা করিয়া আঁক কষিয়া শোধ দিতে হইবে। দণ্ডিত ছাত্রদিগের মধ্যে নারায়ণ মিত্র অল্পতম। কিন্তু অল্প ছাত্রেরা যখন যথাসাধ্য অঙ্ক কাষিতেছিল সে নির্ঝাঁকুর নিলিপ্তভাবে বসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ক্রমেই আমার ঐর্ষ্য-চ্যুতি ঘটতেছিল। ৪৪টার পর যখন সকল ছাত্রই একে একে অঙ্ক দেখাইয়া চলিয়া গেল, তখনও দেখি সে পূর্ববৎই অটল। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিলাম, “নারায়ণ, তুমি ছুটিতে একটা আঁকও কষনি কেন?”

সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, “আজ্ঞে সময় পাইনি।” আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “প্রায় মাস দেড়েকের ছুটিতে একটা আঁক কষিবার সময় পেলেন না?”

সে পূর্ব-গাঙ্গীর্ষ অক্ষয় রাখিয়া বলিল, “আজ্ঞে না।”

আমি তখন ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, “এখন ত সময় পাচ্ছ, করছ না কেন শুনি?”

সে বিজ্ঞভাবে জবাব দিল, “আজ্ঞে, ছুটির জন্ত যখন আঁক কষা এবং আমি আঁক যখন কষছি না, তখন বুঝতেই পারছেন ছুটির আমার বিশেষ দরকার নেই।”

আমি ঠোট চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “তার মানে?”

সে অমান বদনে বলিল, “আজ্ঞে তার মানে হচ্ছে, ছুটির পর বাড়ীতে গিয়াও ব'সে থাকব, তা এখানেও আছি; বাড়ীতে বরং নিঃসঙ্গ থাকতে হ'বে, এখানে তবু আপনার সঙ্গলাভ ঘটবে।” এত বড় স্পর্ধা! আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলা! কথা শেষ করিতে না দিয়াই তাহার প্রত্যেক অঙ্গে আমার সঙ্গলাভের বিপুল পুলক বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই অনুভব করাইতে লাগিলাম। ‘গোদাবরী’র প্রহারের দ্বিতীয় ও পরিবর্তিত সংস্করণ চলিতে লাগিল। নারায়ণ কিন্তু কোনওরূপ কাতরতা বা চাকল্য প্রকাশ করিল না। কিছু পরে দেখি হাতের বেতটা ফাটিয়া তাহার মস্তকের একস্থানে আঘাত করাতে সে স্থানটা রক্তাক্ত। রক্ত দেখিয়াই বেতটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। নারায়ণ তখন পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল, “আজ্ঞে, আর একটা এনে দেব সার?” মনের ক্ষোভে ও রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি নির্জ্বল লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলাম।

প্রহারের মাত্রা অত্যধিক হওয়াতে বাস্তবিকই আমার অল্পতাপ হইতেছিল। শাসনে অকৃতকার্যতার ক্ষোভে এবং এই অল্পতাপে এখানে সকল চক্ষুর অন্তরালে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। একটু পরে নারায়ণ মিত্র সেখানে আসিয়া আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি আর্দ্রস্বরে বলিলাম, “নারায়ণ, কেন অত মার খেলি?”

সে চকিতে নত হইয়া আমার পা দুটো ধরিয়া সকাভবে বলিতে লাগিল, “আপনি দুঃখ করছেন কেন সার, আমার কিছু লাগে নি।”

সেই দুর্বিনীত বালকের এই কাতর কণ্ঠ শুনিয়া দুঃখটা আমার হঠাৎ বাড়িয়া গেল।

তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, “কেন নিজে কষ্ট পেলি, আর আমাকেও দিলি?”

সে বলিল, “আপনার অবাধ্য আর কথনো হ’ব না সার; কালই সমস্ত আঁক আপনাকে দেখাব।” তখনও সে পা ছাড়ে নাই; মিনতির স্বরে বার বার বলিতে লাগিল “আপনি সার মিছে কষ্ট করছেন, এরকম মার আমার প্রায়ই হয়; সত্যি বলছি, সার, আমার লাগেনি। আজ, সার, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আপনার অবাধ্য আর কথনো হ’ব না।”

পরদিনই সে সমস্ত অঙ্ক আনিয়াছিল এবং তদবধি আমার এতটা জীবনে তার মত শাস্ত, বাধ্য ও ভয় ছাত্র আর দেখি নাই। তার এই বাধ্যতায় ছাত্রেরা বিজ্ঞপ করিলে সে বলিত, “কি জানিস? মাষ্টার মশাই খালি বাবার মত মারে না, মেয়ে আবার মার মত কাঁদে যে।” আমি তাহার কাছে কাঁদিয়াই জিতিয়াছি তাহাতে লজ্জা নাই।

সে আমার একান্ত অসুগত হইয়া পড়িল। অসুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, সে পূর্বে মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুপরিচিতি ছিল। কিন্তু তার মাতৃ-বিয়োগের পর পিতার শাসন ও মাতার স্নেহ, এছটির স্থান কেবল প্রথমটি অধিকার করিল। পরে আবার বিমাতার শুভানুগমনে ও শুভানুধ্যায়ে সে শাসন অমাহুয়িকতায় পরিণত হইল। তখন হইতে স্ববুদ্ধি অপেক্ষা দুর্বুদ্ধি পরিচালনে সে কৃতী হইয়া উঠে। সকল শাসনকেই সে অগ্রাহ করিয়া চলিত এবং কাহারও বশতা স্বীকার করিত না। কিন্তু আমার নিকট

সেদিন এতটুকু স্নেহের আভাষ পাইয়াই সে আমার অসুগত হইয়া উঠিল। তার পর প্রায় সমস্তক্ষণই আমার বাড়ীতে থাকিয়া সে পড়া শুনা করিত। আমিও তার মিষ্ট ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলাম। তাহার সুপ্ত মেধা ক্ষিপ্ত ক্ষুরিত হইতে লাগিল।

* * * *

তিন বৎসর পরে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে সুসজ্জিত বিদ্যালয় ভবনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রকৃতই সেদিন সুপ্রভাত। তাহারই একটি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুউচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তাহাকে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছে। কৃতী ছাত্রটিকে সম্মানিত করিবার জন্য এই হৃন্দর আয়োজন। অক্ষুট আনন্দ-কলরবের মধ্যে ছাত্রটি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে আমার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া সভাস্থ অন্ত সকলকে সমুদয় অভিবাদন করিল। ছাত্রবৃন্দ বিরাট জয়োন্মাদে তাহাদের বিজয়ী বন্ধুকে বরণ করিয়া লইল। আমার প্রতি নারায়ণের এই প্রকার পরিচয়ে ও তাহার বিপুল গৌরবে আমার চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

এখন সে উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। তথাপি এ দরিদ্র শিক্ষকই তাহার সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়। তাহাকে দেখিলে আমার কেবলই মনে পড়ে বেত্রাঘাতের শাসনের চেয়ে স্নেহের শাসন কত শ্রেয়।

সত্তর বৎসর

(১৮৫৭—১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীহট্টে পঠদশায় — ১৮৬৬-১৮৭৪ (পূর্বাহ্নবৃত্তি)

(১১)

এই প্রথম লেমনেড খাওয়ার প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়িল। সেই বছরেই বোধ হয়, কিংবা তার পরের বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে একদিন হঠাৎ অতি প্রত্যাশ হইতে আমার পাংলা দান্ত আরম্ভ হয়। বাবা এ সকল বিষয়ে সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিবারবর্গের খবর রাখিতেন। কাহারও অতি সামান্য অসুখও প্রায় তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারিত না। এ সময়েও মা শ্রীহট্টের বাগায় ছিলেন না। আমি বাবার কাছেই শুইতাম। অত ভোরে পাখানায় যাইতেছি দেখিয়া বাবা শশব্যস্ত হইয়া আমার সঙ্গে উঠিয়া আসিলেন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে শ্রীহট্টে প্রায় সর্বদাই বিস্মৃচিকার উপদ্রব হইত। এ বছরও সহরে কলেরা দেখা দিয়াছে। আমার সামান্য পেটের অসুখেই বাবা অত্যন্ত ভয় পাইলেন। সেদিন কাছারীতে গেলেন না। এইজন্য আমার অসুখের কথা সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। অপরাহ্নে আদালতের যত উকীল, হাকিম, ও অন্যান্য কর্মচারী আমাকে দেখিতে আসিলেন। লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল। আমার দান্ত তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বেশ পিপাসা আছে। এই পিপাসার উপশমের জন্ত ডাক্তার আমাকে লেমনেড দিতে বলিলেন। অমনি বাজার হইতে লেমনেড আসিল। অবশ্য মুসলমানের কলে, মুসলমানেরই তৈয়ারী, মুসলমানের ছোঁয়া লেমনেড। বাবা কিন্তু নিজের হাতেই সেই লেমনেড গ্রাশে ঢালিয়া আমার মুখে ধরিলেন। এই লেমনেড খাইয়া যে মার খাইয়াছিলাম, তখনও সে-কথা ভুলি নাই। এবার বাবার উপরে তারই শোধ তুলিবার জন্ত সেই ঘর ভরা লোকের মাঝখানে, মুসলমানের ছোঁয়া

জল কিছুতেই মুখে লইব না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রাহিলাম। বাবা কহিলেন, “এ’তে দোষ নাই। ঔষধেতে অনেক আচার বিচার চলে না। ঔষধ সকল অবশ্যতেই নারায়ণের প্রসাদ বা চরণামৃতের মতন—ঔষধরূপে নারায়ণ।” এইরূপে অনেক সাধ্য-সাধনার পরে আমি অনেক কঁড়েলি করিয়া শেষে বাবার নিজের হাতে মুসলমানের লেমনেড খাইলাম।

(১২)

বাবা এদিকে আমার জাতকুল রাখিবার জন্ত ইংরেজী পড়া বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার অন্তরিকে এই লেমনেড খাওয়ার কিছু দিন পূর্বে বা পরে, পুত্র-স্নেহ-পরবশ হইয়া অজ্ঞাতসারে আমাকে নিজের হাতে সাহেবীয়ালায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ-সাহেব নামে এক ইংরেজ শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। তিনি সপরিবারে কিছু দিন শ্রীহট্টে বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় শ্রীহট্ট হইতেই অবসর লইয়া বিলাতে চলিয়া যান। শ্রীহট্ট ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার “বাংলার” বাবতীয় ভারী ভারী আসবাব নীলাম হয়। বোধ হয় শ-সাহেবের এগারো বার বছরের একটি বালক ছিল। জজ সাহেবের আসবাবের মধ্যে এই বালকের ব্যবহারের উপযোগী ছোট চেয়ার, টেবিল, আলনা, টেপয বা জিপদী প্রভৃতি ছিল। বাবা এই নীলামে সাহেব বালকের এই আসবাবগুলি আমার জন্ত কিনিয়া আনেন। ইহার ফলে আমি এগারো বার বছর বয়স হইতেই চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হই। মাতুষের নিত্য ব্যবহার্য আসবাবের ও বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহার মনের সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ বাবা

ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। অতি অল্প লোকেই এই মোটা কথাটা সচরাচর তলাইয়া দেখেন। ইংরেজ বালকের ব্যবহারোপযোগী টেবিল ও চেয়ারের ভিতর দিয়া বাল্যকালেই আমার ভিতরে সাহেবীয়ানার দিকে একটা ঝোঁক জন্মিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী সাহিত্যের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বোবনে এই আসক্তিতা কতকটা উৎকট আকারেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কথা যথা সময়ে কহিব।

(১৩)

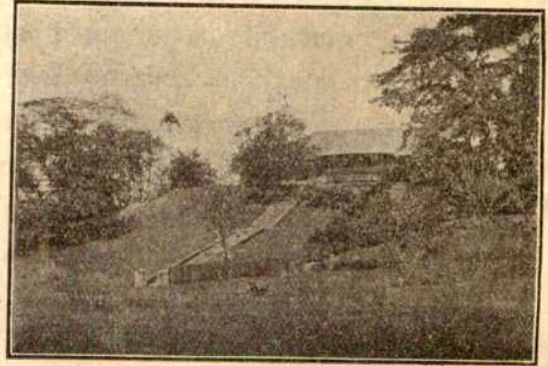
কহিয়াছি যে আমরা বৈষ্ণব গোসাইদিগের শিষ্য হইলেও আমাদের আত্মীয় কুটুম্বেরা প্রায় সকলেই ঘোর শাক্ত ছিলেন। কেবল আমার মাতৃকুলই যে শাক্ত ছিলেন তাহা নহে, বাবার মাতৃকুলও শাক্ত ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ কৰ্ম উল্লেখ সহরে বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে বাবার একজন আপনার মাস্তুত ভাই ছিলেন। ইহাকে আমি জ্যেষ্ঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের বাসার নিকটেই আমার এই জ্যেষ্ঠামহাশয় তাঁর এক আত্মীয়ের একই হাতায় বাস করিতেন। এঁরা দুজনে সহরের “কারণ-সাধকদিগের” একরূপ দলপতি ছিলেন বলিলেও হয়। এমনও শোনা গিয়াছে যে, জ্যোৎস্না রাত্রে রাজপথে চলিতে চলিতে ইহারা মাঝে মাঝে নদী ভ্রমে শুখনা ডঙ্কায় সাঁতার কাটিবার প্রয়াস পর্যন্ত করিতেন। একবার নাকি ইহাদের একজন বাতাসা ভাবিয়া ‘টিকিয়া’ চিবাইয়া ‘মা! এ কি করিলে, বাতাসার স্বাদ পর্যন্ত তুলিয়া দিলে’ বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠামহাশয় একবার শুষ্ঠ-নিশুষ্ঠ-বধের যাত্রার পালা দেখিতে যাইয়া যে বালককে চণ্ডী সাজাইয়া আসরে নামান হইয়াছিল তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ‘মা মা’ বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

ইহাদের বাসায় “কারণের” এতটা ব্যবহার ছিল বলিয়া আমি আমার জ্যেষ্ঠামহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের ওখানে যাইয়া খাইতে সর্বদাই বড় নারাজ ছিলাম। তিনি আমার জন্ত কত যত্ন করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন, কিন্তু খাইতে বসিয়াই আমার মনে হইত যে, এসকল

ভাল ভাল তরকারীতেই বুঝি মদ দেওয়া হইয়াছে। মাকে আসিয়া একথা বলিতাম। মা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু, এত মদ খাওয়া খান তাঁদের খাদ্যে মদ দেওয়া হয় না— ইহা আমার ধারণাতেই আসিত না। বাল্যকাল হইতে সেই যে মদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল ইহাতেই আমাকে এই দীর্ঘ জীবনে অশেষ প্রলোভনের মধ্যেও সুরা পানের অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। বস্তুত প্রলোভন বলিলাম এও কেবল একটা কথার কথা মাত্র। কারণ মদ্যের প্রলোভন যে কি ইহা আমি এ জীবনে অনুভব করি নাই।

(১৪)

১৮৬৯ ইংরেজীতে খ্রীষ্টে আবার গভর্নমেন্ট ইন্সুল স্থাপিত হয়। পাদ্রীদের ইন্সুল ছাড়িয়া যাহারা হিন্দুধর্মের



মনারায়ের টিলা

(প্রাচীন সরকারী ইন্সুল-গৃহ ১৮৬৯-১৮৭৫)

ও হিন্দু সমাজের ইচ্ছত রাখিবার জন্ত নিজেরা নূতন ইন্সুল করিয়াছিলেন তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই গভর্নমেন্ট ইন্সুলের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার বাবা ইহাদের মধ্যে ছিলেন। গভর্নমেন্ট ইন্সুল প্রতিষ্ঠার সময়ে দুর্গাকুমার বসু মহাশয় সেখাট মিশনারী ইন্সুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনিই নূতন গভর্নমেন্ট ইন্সুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হন। সেখাট ইন্সুলের অগ্রাগ্রহ শিক্ষকেরাও গভর্নমেন্ট ইন্সুলে আসিয়া শিক্ষক হন। ইহার ফলে সেখাট ইন্সুল একরূপ উঠিয়াই যায়। একরূপ বলিতেছি এই জন্ত যে, তখনই ঐ ইন্সুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল কিনা ঠিক মনে

নাই। আর এও অল্পমান হয় যে, গভর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষেরা পাদ্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই এই নূতন গভর্ণমেন্ট



প্রাচীন সরকারী ইস্কুল গৃহের পশ্চাভাগ

ইস্কুল স্থাপন করেন নাই। পাদ্রীরাও বোধ হয় আর এই ভার বহন করিতে পারিতেছিলেন না।

বলিয়াছি যে, শ্রীহট্ট সহরের নিকটে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। ইহারি একটির উপরে একটা বড় পাকা কোঠা ছিল। এই কোঠাতে তখন বারিক আফিন পাবলিক ওয়ার্কসের দপ্তর ছিল। এই বাড়ীতেই গভর্ণমেন্ট ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পাহাড়কে ‘মনারায়ের টিলা’ কহিত। এখন গভর্ণমেন্ট ইস্কুল আর সেখানে নাই। সহরের মাঝখানে নদীর ধারে উঠিয়া আসিয়াছে। স্থানটি অতি মনোরম। সহরের কোলাহল হইতে দূরে। একেবারে উত্তর প্রান্তে বলিলেই হয়। টিলার নীচ হইতে একটা পাকা সিঁড়ী কোঠার বারাণ্ডা পর্য্যন্ত গিয়া উঠিয়াছে। ইস্কুলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সমস্ত সহরের দৃশ্যটা আমরা দেখিতে পাইতাম। পাহাড়ের নীচে খানিকটা সমতল ভূমি ছিল। সেটাই আমাদের খেলার মাঠ ছিল। দক্ষিণ দিকে টিলার গা বাহিয়াও আমরা ইচ্ছা হইলে উপরে উঠিতে পারিতাম। নামিবার সময় সিঁড়ি দিয়া না নামিয়া অনেকেই পাহাড়ের গা দিয়া ছুটিয়া নামিত। উত্তরদিকে একটা গভীর খাদ ছিল। সেই খাদ দিয়া স্বর্ণার জল কল কল করিয়া দিবানিশি প্রবাহিত হইত। ইহারি পূর্বদিকে আর একটা অপেক্ষাকৃত নীচ টিলা ছিল, এখনও আছে। আমার বাল্যকালে এই টিলায় জঙ্গ সাহেব থাকিতেন।

সুতরাং আমরা বালকের দল সে দিকে বড় যাইতাম না। বোধ হয় ১৮৭২ কি ১৮৭০ ইংরেজীতে গভর্ণমেন্ট ইস্কুল মনারায়ের টিলা হইতে উঠিয়া সহরের মাঝখানে, লাল-দিঘী নামে একটা বড় দিঘী আছে তাহার পশ্চিম পাড়ে উঠিয়া আসে। এখান হইতে এখন নদীর ধারে উঠিয়া গিয়াছে।

(১৫)

আমাদের ইস্কুল সহরের এক প্রান্তে হইলেও আমরা হাটিয়াই ইস্কুলে যাইতাম। সেকালে শ্রীহটে দুখানা মাত্র গাড়ী ছিল। একখানা টমটম, আর একখানা সাধারণ চার চাকার গাড়ী। দুখানাই দুইজন উকিলের ছিল। একজন নিজেই তাঁহার টমটম হাঁকাইয়া আদালতে যাইতেন। ইহার বংশধরেরা এখন কে কোথায় আছেন জানিনা। অন্ত গাড়ীখানা ছিল ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের। ইনি একজন খুব বড় জমীদার ছিলেন। ইহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রায় স্বধর্ম চৌধুরী বাহাদুর এখন সহরের একজন গন্যমান্য লোক। অনাররি মেজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অন্ততম পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী আসাম ব্যবস্থাপক সভায় কিছুদিন পূর্বে স্বরাজ্যদলের দলপতি ছিলেন। আমার বাল্যকালে শ্রীহটে দুর্গাচরণ চৌধুরী ও ব্রজনাথ চৌধুরী এই দুজনের দুখানা গাড়ী ছিল। তবে ইহারাও যে সর্বদা গাড়ী চড়িয়া আদালতে যাইতেন, তাহা নহে। সহরের সকল সম্ভ্রান্ত লোকেরাই পায়ে হাটিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব লে যাইতেন। তবে হাকিম এবং উকিলদের সঙ্গে একজন লোক খুব বড় বাঁশের ছাতা তাঁহাদের মাথার উপরে ধরিয়া বাইত। এ ছাতার পরিধি সাত আট হাত হইবে। ইহারাই নখী-পত্রের বোচকাও পিঠে বাধিয়া লইয়া যাইত। এই ছাতাই সেকালে আমাদের সহরে বড়লোকের নিদর্শন ছিল। এখন যেমন, তখনও সেইরূপ, সাড়ে দশটায় ইস্কুল বসিত ও চারিটায় ছুটি হইত। মাঝখানে দেড়টা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টা খেলার ছুটি হইত। এই ছুটির সময়ে এখনকার মত আমার বাল্যকালে ইস্কুলের হাতায় কোন খাবার জিনিষ বিক্রী হইত না। ছেলেরা বাড়ী হইতে কোন জলপানির পয়সাও পাইত না। ছুটির

পরেই বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে যা কিছু খাইতে হইত। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্ট সহরেও এখনকার মতন সন্দেশ রসগোল্লা বা লুচী, কোচুরী, গজা প্রভৃতি খাবার মিলিত না। ছানার সংবাদ তখনও সে দেশে পৌছায় নাই। বাজারে এক জিলাপী মাত্র পাওয়া যাইত। আটা ময়দা মিলিত না, সহরেও প্রস্তুত হইত না, বাহির হইতেও আমদানি হইত না। নারিকেলের মিষ্ট দ্রব্যই গৃহস্থেরা বিশেষ বিশেষ পরীাহে বা যজ্ঞাদিতে ব্যবহার করিতেন। এই সকল মিষ্টান্নে স্ননিপুণ স্ত্রী-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যাইত। নারিকেলের চিঁড়া জিরা এবং গন্ধাজলী নামে সন্দেশ আঞ্জিও পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। আমার বাল্যকালে এছাড়া আর কোন মিষ্টান্ন আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। আর এ সকল বাজারে মিলিত না। বালকেরা চারিবেলাই ভাত খাইত। প্রাতঃকালে গরম ভাত এবং ঘিই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইাসের ডিম ভাতে কিম্বা কোন তরকারী ভাতেও পাইতাম। দশটার সময় স্নানান্তে আবার ভাত ডাল ও একটা মাছের তরকারী দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া ইস্কুলে যাইতাম। ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈকালে আবার ভাতই খাইতাম। এ সময় নিরামিষ ব্যঞ্জনাদিই বেশী থাকিত। আমার এক জ্যেষ্ঠাইমা আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার আপনার জ্যাঠা বা কাকা কেউ ছিলেন না। এই জ্যেষ্ঠাইমা আমাদের পরিবারভুক্ত ঠিক ছিলেন না। তবে তাঁহার সন্তানাদি কেউ ছিল না। অসহায় বৈধব্যে বাবা তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করেন। এই ভাবেই ইনি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া যান এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই অতিবাহিত করেন। ইহার পাকশালে যে নিরামিষ রান্না হইত আমাদের ইস্কুল হইতে আসিয়া খাইবার জন্ত তাহা রাখা হইত। এইরূপে মধ্যাহ্ন আহার অপেক্ষা এই বৈকালের আহারেই বেশী তরিতরকারী মিলিত।

(১৬)

আমাদের বাসায় আমরা প্রায় আট দশ জন বালক-ছিলাম। অনেকেই আমাদের সম্পর্কিত; দু একজন

একেবারে নিঃস্পর্কিতও ছিলেন। সহরে থাকিয়া লেখা-পড়া শিখিবার কোন ব্যবস্থা ইহাদের ছিল না। বলিয়া ইহাদের অভিভাবকেরা বাবাকে আসিয়া ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার সুবিধা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। আমাদের প্রাচীনেরা অন্নদান অপেক্ষাও বিদ্যাদানকে পুণ্যতর কর্ম বলিয়া ভাবিতেন। এ সম্বন্ধে বাবা কোনদিন কোন অনুরোধ সাধ্যাতীত না হইলে অগ্রাহ্য করিতেন না। এইজন্ত আমার নিজের ভাই না থাকিলেও সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত প্রায় আট দশজন বালক আমাদের বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেন। প্রতিদিন ইস্কুল ছুটি হইলে আমরা সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিতাম। মা প্রায়ই নিজের হাতে আমাদের সকলকে খাওয়াইয়া দিতেন। একটা বড় গামলায় একরাশ ভাত লইয়া বসিতেন আমরা বৃত্তাকারে তাঁহার সম্মুখে ও পাশে বসিয়া যাইতাম। আমার ভগিনীও আমাদের সঙ্গে বসিয়াই খাইত। এ খাওয়ানর কথা জীবনে ভুলিব না। মরণেও ভুলিয়া যাইব কিনা জানিনা। কারণ এ কেবল সামান্য ভাত-ডাল খাওয়ান ছিল না। ইহা আমাদের পরিবারে একরূপ প্রতিদিনের বাৎসল্য-উৎসব ছিল।

আর এ কথা মনে আছে ও চির দিন মনে থাকিবে এইজন্ত যে, এই খাওয়ানের ভিতর দিয়া আমার মায়ের চরিত্রের একটা দিক আশ্চর্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কত বছর ধরিয়া এইরূপে দিনের পর দিন ইস্কুল হইতে আসিয়া সকলে মিলিয়া মায়ের হাতে খাইয়াছি। কিন্তু একদিনও আমি মায়ের সন্তান বলিয়া এক কণা মাছ বা অন্য স্নাত্ত বস্তু অপর অপেক্ষা বেশী পাই নাই। ক্ষুধায় অধীর হইয়া খাইতে বসিয়াছি, মুহূর্ত্ত বিলম্ব সঘনা, কতবার চাহিয়াছি, যে প্রথম গ্রাস আমার মুখে পড়ুক, কিন্তু সেই বৃত্তের মধ্যে আমি পাশেই বসি আর মাঝখানেই বসি, যেখানেই বসিনা কেন, সর্বদাই অপর সকলের পরে মায়ের হাত আমার মুখের কাছে আসিত। ইহাতে আমি চটিয়া যাইতাম। মা কেবল এই খাওয়াইবার সময় নহে অন্য সময়েও বাড়ীতে কোন বিশেষ খাবার হইলে বা বাবার মকেলদিগের নিকট হইতে

কোন মিষ্টান্নের বা ফলাদির ডেট আসিলে আব সকলকে না দিয়া কখনও আমাকে, তাব একটুও দিতেন না। মার এই ব্যবহারে আমি কেবল চটিয়া যাইতাম, তাহা নহে, কিন্তু ক্রমে আমার এই ধারণা হয় যে, ইনি আমার বিমাতা। আমার নিজের মা আমার শৈশবেই স্বর্গাবোহন করিয়াছেন। বড় হইয়াও এ সন্দেহটা একেবারে যায় নাই। তখন মা একদিন আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁব কথাগুলি কতকটা এখনও আমার মনে আছে। মা कहিলেন—

“এখন তুই বড় হইয়াছিস, এখনও কি বুঝিবি না, কেন আমি তোব আগে অপার ছেলেদের যত্ন ও আদর করি। তাদের মা এখানে নাই। আমার আদর-যত্নে একটু ক্রটি হইলে তাদের প্রাণে কত লাগিবে। তোমাকে ইচ্ছা করিলেও আমি অমত্ন কবিতে পারি না। তাহাদের অবত্ন হওয়া অতি সহজ।”

আমি कहিলাম—“তা যেন হ’ল। কিন্তু রূপা (আমাব ছোট ভগিনী) যত যত্ন পায় আমি ত তাও পাই না। আমাব আগে রূপা সর্বদাই খাইতে পায় কেন?”

মা कहিলেন—“এসংসারে যা আছে সকলি তোমার ও তোমাবি থাকিবে। রূপা ত দু’দিন পরে পরের ঘবে চলিয়া যাইবে। এও কি বুঝ না?”

যখন ইহা বুঝিলাম তখন মাকে একথা বলিবাব আর অবসব পাইলাম না।

(১৭)

আজিকালি বাংলার তথাকথিত ভদ্র হিন্দু সমাজে আহারে ব্যবহারে জাতিবিচার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অভ্যক্তি হইবে না। ষাট বৎসর পূর্বে কলিকাতাতেও এবিষয়ে এতটা উদারতা বা ঐদাসীন্দ্ৰ দেখা যায় নাই। শ্রীহট্টের মতন প্রান্তিক জেলায় জাতের খুবই কড়া কড়ি ছিল। তবে আমাদের সমাজে কোনওদিনই যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব ছিল এমন বোধ হয় না। আমার বাল্যে শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে উচ্চশ্রেণীকে “ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোক” कहিত। কলিকাতা অঞ্চলে যে-অর্থে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের গ্রাম কথাটা ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে আমার বাল্যকালে

আমাদিগের মধ্যে “ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকেব” গ্রাম এই কথা ব্যবহৃত হইত। ভদ্রলোক বলিতে আমরা কায়স্থ ও বৈদ্যকেই বুঝিতাম। ব্রাহ্মণ ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র এই ভাবটাই ছিল। কিন্তু ইহারা যে, কায়স্থ বৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ এই ভাবটা ছিল না। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, ঢাকার এত কাছে হইলেও আমাদের অঞ্চলে বঙ্গালী কোলীন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণেরা সকলেই “বৈদিক”। বরেন্দ্র বা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সে জায়গায় নাই। কিম্বা রাঢ় বা বরেন্দ্রভূমি হইতে কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের পূর্ব পুরুষ আদিতে শ্রীহট্টে গিয়া থাকিলেও নূতন সমাজে এসকল ভেদ আগাইয়া রাখেন নাই, কিংবা বাধিতে পারেন নাই। আমাব বাল্যকালে রাঢ়ী বরেন্দ্র এসকল কথা পর্যাস্ত শুনি নাই। আমাদের ব্রাহ্মণেরা যে “বৈদিক” শ্রেণীই ইহাও জানিতাম না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই এই মাত্র জানা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে আবার শ্রেণী-বিভেদ আছে ইহা সাধারণ লোকে জানিত না। তবে সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল ব্রাহ্মণেব হাতে খান না ইহা জানা ছিল। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সমাজের সকল ব্রাহ্মণের যখন নিমন্ত্রণ হইত তখন প্রায় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র পাকশাল প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। এসকল নিমন্ত্রণে কলিকাতা অঞ্চলে বাহ্যকে ফলার বলে তাহাব ব্যবস্থা ছিল না। দই, চিঁড়া কিংবা ডাতেরই ব্যবস্থা হইত। ইতর শ্রেণীর জন্তই দই-চিঁড়ার আয়োজন হইত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা বৈদ্যদিগের জন্ত ভাতেবই ব্যবস্থা কবিতে হইত। আর তখন প্রায় প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের জন্ত পৃথক্ “হাড়ির” সংস্থান না করিলে চলিত না। এই যে ব্রাহ্মণেরা একে অন্তের হাতে খাইতেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহাদের মধ্যেও একটা জাত-বিচার ছিল। তবে কে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একথা সাধারণ লোকে জানিত না, এ প্রশ্নও তারা কবিত না। ব্রাহ্মণেরা প্রায় সকলেই পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন। কায়স্থ, বৈদ্যাদি তখন আমাদিগের সমাজে মোটামুটি শূদ্র পর্যায়েরই পড়িতেন। কায়স্থেরা যে পতিত ক্ষত্রিয়, এ কথা তখনও উঠে নাই। শ্রীহট্টের বৈদ্যদিগেবও উপনয়ন সংস্কার হইত না। তাঁরা উপবীত

ধারণ করিতেন না। বৈদ্যে কায়স্থে আদান-প্রদান হইত। এইসকল কারণে সকলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আর লৌকিক বিদ্যায় এবং ধন-সম্পত্তিতে ইহারাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিজেদের জীবিকার জন্ত ইহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। শূদ্রের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় ইহা আমরা কখনও জানিতাম না। আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদিতে দেবতার নিকটে অন্ন-বাজ্ঞনাদি ভোগ দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরাই ভোগ রাখিতেন এবং আমাদের পুরোহিতেরা নিঃসঙ্কোচে আমাদের বাড়ীতে দেবপূজা উপলক্ষে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কলিকাতা অঞ্চলে শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই কেবল দেবতাকে অন্নবাজ্ঞনাদি ভোগ দেওয়া যায়। কায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের জাতির নাকি এ অধিকার নাই। তাঁরা কেবল দেবতাকে কাঁচা ভোগই দিতে পারেন। আমরা এ অজুত কথা শুনি নাই। আমাদের জেলায় এক্ষণে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব পূর্বে কখনও ছিল না। কালবশে এখন এই ভাবটা নব্য-শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে গছাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে “অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী” হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব যে রক্ষা পাইত এ কথাটা জানা ছিল, এবং এমন দুই একটি ব্রাহ্মণ পরিবার আমাদের অঞ্চলে ছিলেন, যাহারা “শূদ্রের অন্ন” গ্রহণ করিতেন না। তবে ইহারা সকলেই বিষয়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাদের ছোটখাট জমিদারী ছিল। টাকা লগ্নি করিয়াও অর্থ উপার্জন করিতেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে শাস্ত্রীয় ব্যবসায় বা কর্ম-অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ইহারা তাহা অবলম্বন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিতেন না। নিজেদের জমিদারীর জোরে ব্রাহ্মণ্যকে ঠেকা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমার বাল্যকালে কেবল একটি মাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা জানিতাম, যাহারা কায়স্থ-বৈদ্যদিগেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। বুন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ মোহান্ত ব্রজবিদেহী শাস্ত্রদাস বাবাজী এই পরিবারের লোক ছিলেন। পূর্বাশ্রমে ইহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী। ইনি আমার সতীর্থ ছিলেন। একই বৎসব শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট ইন্সকুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ

করিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্ত আসিয়া ভর্তি হই। তারাকিশোর-বাবুর পরিবারের লোকে শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বেশ একটু জমিদারী তাঁহাদের ছিল, এবং কুসীদ-ব্যবসায়ও করিতেন বলিয়া ইহারা “অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী” হইতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে আরও দু'পাঁচটি বিষয়ী ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলেন, যাহারা শূদ্রের দান গ্রহণ করিতেন না। এ ছাড়া শ্রীহট্টে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই শূদ্র-মুখাপেক্ষী ছিলেন। অন্ন-ব্রাহ্মণের ভদ্র লোকদিগের নিকটে আবদ্ধ হইয়া ইহারা দে-কালে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যজন-যাজন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও ইহারা অধিকাংশ স্থলেই সেই ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষাও লাভ করিতেন না। পূজা-পদ্ধতির হাতে লেখা পুঁথি ইহাদের বাড়ীতে থাকিত। সেই পুঁথি মুখস্থ করিয়াই ইহারা যজ্ঞমানদিগকে মন্ত্র পড়াইতেন, নিজেরাও দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করিতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অভিধানের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক ছিল না বলিলেও হয়। বড় বড় ভদ্র লোকদিগের গ্রামের টোল ছিল। এসকল টোলে ভিন্ন গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ বালকেরা আসিয়া ব্যাকরণ এবং স্মৃতি পড়িতেন। কিন্তু যাহারা টোলে পড়িয়া কোন উপাধি পাইতেন, তাঁহারা সাধারণ যজন-যাজন ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না। হয় নিজেরা টোল খুলিতেন, না হয় দুর্গোৎসবাদিতে সম্রাস্ত গৃহস্থের বাড়ীতে “তন্ত্রধারকের” কর্ম করিতেন। এসকল বৃহৎ সম্রাস্তাদিতে পুরোহিত ছাড়া এক একজন তন্ত্রধারক থাকিতেন। তন্ত্রধারকেরা পুরোহিতকে মন্ত্র পড়াইয়া পূজার অর্থাদি দেওয়াইতেন। এই সাধারণ পুরোহিতেরা অতি অল্পই লেখাপড়া জানিতেন। পূর্ক পুরুষদিগের সংগৃহীত পুঁথি মুখস্থ করিয়াই ইহারা পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিতেন।

(১৮)

এসকল অবলম্বনে নানা কৌতুককব গল্পেরও স্রষ্টা হইয়াছিল। একটা গল্প সেদিন শ্রীযুক্ত সন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। এক ব্রাহ্মণ যুবক একবার

সাবিজ্ঞীভূত করাইতে যান। তাঁহার পিতাই এসকল ব্রত কবাইতেন। কিন্তু এদিনে অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি ব্রতের পুঁথি হাতে দিয়া পুত্রকে পোরোহিত্য করিতে যজ্ঞমানের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। পুত্র এই পুঁথি লইয়া যজ্ঞমান-বাড়ী যাইয়া ব্রত করাইতে লাগিলেন। সাবিজ্ঞী-ব্রতের অমুষ্ঠানে এক জায়গায় লেখা ছিল “সপ্তসুত্রেণ বেষ্টয়িত্বা”... ইত্যাদি। অর্থাৎ সাতটা সুতো ঘারা ব্রতের স্থানকে বেষ্টন করিতে হইবে। পুরোহিত-পুত্র

হাতেব লেখা পুঁথিতে ‘স’ ‘কে’ ‘ম’ পড়িয়া বসিলেন। সুতরাং সপ্ত সুত্রেণ না পড়িয়া সপ্তমুত্রেণ বেষ্টয়িত্বা পড়িলেন। পড়িয়া ব্রতকারিণীকে কহিলেন, “ঠাহুরাপী, একটু উঠিতে হইবে এবং এই বেদীর চারিদিকে গাতবার মৃত্তাগণ করা প্রয়োজন। মহিলাটি আরও পূর্বে এই ব্রত করিয়াছিলেন।” সুতরাং পুরোহিত-পুত্রের বিদ্যার এই পরিচয় পাইয়া ঠাহাব আব এই বার ব্রত-গম্যাপন করিতে হইল না।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের পরাধীনতার স্বরূপ

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষ নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিল না কেন, কেন ভারতবর্ষ এই দীর্ঘ সাত শত বৎসর ধরিয়া পরাধীন রহিয়াছে,—দেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পাওয়া গিয়াছে কি? অনেকেই এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের সম্যক আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও এ-বিষয়ের পূর্যাপূরি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে অনেকেই এই সম্বন্ধে অনেক আংশিক সত্য নির্দেশ করিয়াছেন। আমিও আংশিক ভাবেই কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজারা যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে জানিতেন না, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেন না তাহা নহে। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেই নিজেদের বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এমন-কি অহিংসবাদী বৌদ্ধ রাজারাও সময়-ক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, বরং গৌরবই মনে করিতেন; বাঙ্গালার বৌদ্ধ

পাল রাজাদের ইতিহাসই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভাব-তের হিন্দু রাজারা যে কর্তব্যবোধেই যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়াই নিরন্তর হইতেন তাহা নহে। যুদ্ধ করিয়া পবেব রাজ্য অধিকার করা ও নিজের রাজ্য বিস্তার করাই ছিল পরম গৌরবের বিষয়; বহু নরপতিকে পরাস্ত করিয়া রাজচক্রবর্তি লাভ করাই ছিল ভারতীয় রাজাদের পক্ষে চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ঐশ্বর্যমহাভিষেক, অশ্বমেধ, রাজস্বয় প্রভৃতি যজ্ঞামুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে; সার্কভোমস লাভ কবাই ছিল এইসকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ‘সর্বক্ষত্র-স্কক’ ‘একরাট্’ মহাপদ্বনন্দ এবং ‘সর্ববাজোচ্ছেত্তা’ সমুদ্রগুপ্তের কথা স্মরণ করিতে পারি। তক্ষশিলা-বিজয়ী কুরুরাজ ‘সর্বভূমি’ জনমেজয় শুঙ্গরাজ পুণ্ড্রমিত্র (দ্বিংশমেধ-বাজী) এবং সাতবাহনরাজ ‘দক্ষিণাংশপতি’ শাতকর্ণি নিজেদের বহু-বিস্তৃত বিজয়-কীৰ্ত্তি স্মরণাতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই দুই দুইবার করিয়া অশ্বমেধের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বস্তুত দিগ্বিজয়ী হওয়ার অনন্তসাধারণ যত্নালাভই ছিল প্রাচীন ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির চরম আদর্শ। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা পরম্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জয়-পরাজয় লইয়াই শত শত বৎসর কাটাইয়া দিলেন, অথচ একজন ক্ষত্রিয় বীরও আপনার বিজয়বাহিনী লইয়া বহির্ভারতে বিজয়ে বাহির হওয়া দূরে থাকুক, ভারতের সীমা-রেখাটি পর্যন্ত অতিক্রম করিলেন না। অবশ্য ইতিহাস অল্পদৃষ্টান্ত করিয়া এই সাধারণ উক্তি দুই চারিটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশ্মীররাজ যুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের (খৃঃ ৭৩৩-৬২) বিজয়-অভিযানের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি তুখার বা তুরস্করাজ্য এবং তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতখানি স্থায়ী রাজ্যরক্ষার অমুরোধে ও কতখানি বিজয়-গৌরব লাভের অভিলাষে তাহার এই সমরভিযান, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাশ্মীরের ইতিহাস ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র; এবং কাশ্মীর ভারতের এক সীমা-প্রান্তে অবস্থিত ও প্রায় তিন দিকেই বহির্ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যের দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং কাশ্মীররাজ কর্তৃক দুই এক বার বহির্ভারতে যুদ্ধযাত্রা ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাসের ব্যতিক্রম বলিয়াও সঙ্গতরূপে ধরা যায় না। এই গেল স্থল-পথের কথা। জল-পথেও যে ভারতবর্ষ দুই এক বার রাজ্য-বিস্তারের প্রয়াস করে নাই তাহা নয়। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে তামিল দেশের চোল রাজাদের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তামিল-সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র চোলের (খৃঃ ১০১৮-৩৫) নৌবাহিনী বঙ্গ সাগর অতিক্রম করিয়া নিম্ন ব্রহ্মদেশের অঙ্গুর্গত পেগু ও মার্ভাবান নামক স্থান দুইটি তামিল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল; আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জও তামিল নৌবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। তথাপি স্থল-পথেই হোক বা জল-পথেই হোক ভারতীয় সৈন্যদল কর্তৃক ভারতবর্ষের বাহিরে রাজ্যজয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বাললেই চলে। ভারতীয় রাজারা চিরকালই পরম্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অর্থাৎ আত্ম-কলহেই ব্যাপৃত ছিলেন, এ কথা অনায়াসেই বলা যায়। আমি জানি, এইখানে

অনেকেরই মালয়-উপদ্বীপ (বৌদ্ধ মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত), কাষোজ (জ্যোৎস্না অশ্বখামার বংশোদ্ভব শৈব ধর্ম-মহারাজগণ), বর্ণিও (রাজা মূলবর্ষন), যবদ্বীপ, স্রমাজা (শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজবংশ), এবং মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ-সমূহের কথা মনে হইবে। সত্য বটে এইসকল স্থানে ভারতীয় হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিল এবং তথায় নূতন নূতন রাজবংশেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এইসকল দেশ কোনও ভারতীয় রাজশাক্ত দ্বারা বিজিত হয় নাই; ভারতীয় জনসাধারণ বারিঞ্জ্যের জন্তই হোক, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই হোক অথবা অস্ত্র-যে-কোন কারণেই হোক, এইসকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সূত্রেই সে-সকল স্থানে তাহাদের আধিপত্যও স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে তথায় নব নব রাজবংশেরও অবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এইসকল উপনিবেশিক রাজ্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ভারতীয় ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল; ভারতীয় রাজশাক্তের সহিত ইহাদের কোন সংশ্লিষ্ট ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতি শ্রীবালপুত্র দেব ধৃষ্ণী নবম শতাব্দীতে নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহারই অমুরোধে বাঙলার তৎকালীন পাল রাজা দেবপাল উক্ত বিহারবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যয়নির্বাহের জন্ত পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এইরূপ দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অতি সামান্য সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাহা ছাড়া এইসকল দেশ সভ্যতার ও শক্তিতে অপেক্ষাকৃত অবনতই ছিল; এবং তথায় উপনিবেশ ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতবাসীদের যে খুব বেশী যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ পাই না। সুতরাং এইসমস্ত উপনিবেশিক রাজ্য-সমূহকে কিছুতেই দিগ্বিজয়িন্দ্র ভারতীয় রাজ-শক্তির বিজয়-প্রচেষ্টার ফল বলা যাইতে পারে না।

বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশেষত্বই এই যে, এখানকার প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটগণেরও দিগ্বিজয়

ও রাজচক্রবর্তির লাভের সমস্ত আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম আগাগোড়াই ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের বাহিরেও যে দেশ আছে, সেখানেও যে দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার ও সমর-গৌরব লাভ করা যাইতে পারে একথাই কখনও এদেশের নরপতিগণের মনেই উদ্ভিত হয় নাই; এই আকাঙ্ক্ষাই কখনও তাহাদের প্রাণে জাগে নাই। কেন জাগে নাই, তাহার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। ভারতবর্ষের বিশালতাই যে, এই বিশেষ বিজয়-বিমুখতার একটি প্রধান কারণ তাহা সহজেই বোঝা যায়। স্বদেশেই যখন বিজয়-গৌরব-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে, তখন স্বভাবতই বিদেশ-বিজয়ে প্রেরণা থাকে না। ভারতীয় রাজারা ভারতবর্ষেই তাঁহাদের বিজয়-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন, তাই বিদেশের দিকে সমর-বাহিনী পরিচালনা করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা তাঁহারা কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের এই গৃহপরায়ণতার আর-এক কারণ ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য। দেশেব সম্পদ্রাশিই বৈদেশিক বিজয়ের অন্তর্জাতিকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া লয়, এই কথা ভুক্তভোগী ভারতবাসীকে আব নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কাজেই রত্নগর্ভা ভারতভূমির রাজকীয় বিজয়লিপ্সা যে কখনও কোন বিদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, ইহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই। ভারতীয় রাজশক্তির এই আত্মহতার তৃতীয় কারণ ভারতবর্ষের সীমা-রক্ষক সুদুর্গম পর্বত-শ্রেণী। যে অত্রৈদৌ গিরি-শ্রেণী পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের দ্বাররক্ষকরূপে মণ্ডক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই গিরি-শ্রেণীই চিবকাল ভারতবর্ষের বিজয়-কামী ক্ষাত্রশক্তিকে বহির্দেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়াছে। চতুর্থ কারণ এই যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভারকেন্দ্র অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের পূর্ব ভাগে নিবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতে যে কয়টি হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাব কেন্দ্র ছিল হয় পাটলিপুত্রে, না হয় কাশ্মীরে; পুরুষপুর অর্থাৎ পোশোয়ারের কুষণ সাম্রাজ্যকে যথার্থ হিন্দু সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। পাটলিপুত্র বা

কাশ্মীর হইতে ভারতের বহির্ভাগে সাম্রাজ্য নিষ্কৃত করা অনায়াসসাধ্য ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এইসমস্ত কারণও ভারতবর্ষের এই অসাধারণ বহির্বিমুখতার যথোচিত হেতু নির্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। চীনদেশ বিশালভায় ও সম্পদ্রাশিতায় ভারতবর্ষ হইতে হীন নহে এবং মধ্য-এশিয়ার পর্বতসমূহও ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা-রক্ষক গিরি-শ্রেণী হইতে কম দুর্গম নহে। তথাপি এক সময় চৈনিক রাজ-শক্তি সুদূর কোরিয়া হইতে পারস্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল; বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত কিপিন বা কপিশাও ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এমন-কি ভারতবর্ষের অন্তর্গত কাশ্মীর, চিত্রল প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরাও তখন চীন-সম্রাটের প্রাধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর-এক দিকে পারস্ত-সম্রাটেরাও এক সময় বাহলুক হইতে মিশর দেশের পশ্চিম প্রান্ত, পারস্তোপসাগর হইতে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীর এবং সিন্ধুনদ হইতে গ্রীস দেশ, এই বিশাল ভূখণ্ডের উপর রাজত্ব পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইসকল ঐতিহাসিক তথ্যের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, যে দুর্দ্বর্ততা ও অমিত পরাক্রম মানুষকে সাগবগিরি লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায় এবং মরভূমি অতিক্রম করিতেও অল্পপ্রাপিত করিয়া তোলে, সেই দুর্দ্বর্ততা ও সেই পরাক্রম বৃষ্টি স্বধ-সম্পদের নীলানিকেতন ভারতবর্ষের মাটিতে কখনও উদ্ভূত হয় নাই। যে শৌর্য-প্রভাবে মহাবীর হানিবল স্পেন, ফরাসী ও আল্পস্ অতিক্রম করিয়া ইতালিতে বহু বৎসব যাত্ৰা রোমের অধিতীয় শক্তিকেও সম্ভ্রুত করিয়া তুলিয়াছিল, যে দুর্দ্দম বিজয়াকাঙ্ক্ষা ফিলিপ-তনয় আলেকজান্ডারকে প্রচণ্ড ঝড়ার বেগে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর ও বিশাল পারস্ত-সাম্রাজ্যের উপর দিয়া বিপাশার তীর পর্যন্ত ছুটাইয়া আনিয়াছিল, সে শৌর্য ও সে বিজয়াকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাই না। বস্তুত চীন, পারস্য, রোম বা আরবের মত সাম্রাজ্য গড়িবার প্রতিভা এবং আলেকজান্ডার হানিবল, নেপোলিয়ানের মত অসাধারণ বীরত্ব ও পরাক্রম

ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষে কখনও বীরত্বের চর্চা হইত না, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। স্বদেশের সংগ্রাম-কাহিনী, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের বীরত্ব-গাথা, এবং মহাপদ্মনন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন ও পুলকেশী, রাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর ইতিহাস স্মরণ করিলেই এ কথা সত্যতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের বিশেষত্বই ছিল এই যে, ইহা বরাবরই ভাবতবর্ষের মধ্যে লীয়াবদ্ধ; ইহা কখনও বিশ্বজগৎকে চমকিত করিয়া দেয় নাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষ কখনও আপন বীরত্বের প্রভাবে বিশ্বচেতনার মধ্যে বিশ্বের আসন গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, তাহার কয়েকটি কারণ আলোচনা কবিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই কারণ-গুলিও যথেষ্ট নহে। ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির এই বিশ্ব-বিমুখতার প্রধান কারণ বোধ হয় আর্ধ্য মনোবৃত্তি। ভারতবর্ষের শত্রুজীবী ক্ষত্রিয়গণের মনে এমনি এক অদ্ভুত আত্মতুষ্টি, আর্ধ্যত্বের গর্ব বা আত্মাভিমান ছিল, যার ফলে তাহারা স্বভাবতই বিদেশের প্রতি বিমুখ ছিল এবং কখনও কোন বিদেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে নাই। কারণ যাহাই হোক, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতীয় রাজশক্তি কখনও বিদেশ-জয়ের উদ্যম করে নাই। এই নিষ্ক্রিয়তার যে কি ফল হইয়াছিল তাহাও আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

ভারতবর্ষ কখনও বিদেশ আক্রমণ করে নাই বলিয়া বিদেশীয়েরা যে ভাবতবর্ষকে নিষ্ক্রান্তি দিয়াছিল তাহা নহে। বৈদেশিক বক্তাস্রোতের মুখে শাইবার, বোলান প্রভৃতি গিরিসঙ্কট যে কতবার ভারতবর্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিল, এবং কতবার যে শক-যবন-পহ্লব, হুন গুজ্জর ও তুর্কী যোগলের আবির্ভাব প্রোতে ভারতের শ্রমল ক্ষেত্র প্রাণিত হইয়া গিয়াছিল, এ দেশের বৈদেশিক-আক্রমণ-সঙ্কল ইতিহাস-পাঠকের কাছে তাহা অবদিত নহে।

শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোবী যে-দিন থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইল ক্ষেত্রে আজমীর-পতি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিলেন (খৃঃ ১১৯২), সেই দিন হইতে আমরা

সাধারণত ভারতবর্ষের অধীনতার দিন গণনা করিয়া থাকি। মুসলমান-বিজয়ের সময় হইতেই আমাদের পরাধীনতার ইতিহাস আঁস্ত হইয়াছে এবং সাত শত বৎসরের পর আজও আমাদের সেই অধীনতার অবসান হয় নাই, এসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কিছুতেই সত্য নহে যে, মুসলমানের অধীনতাই ভারতবর্ষের প্রথম অধীনতা। মুসলমানের আবির্ভাবের পূর্বেও ভারতবর্ষ বহুবার অল্পাধিক পরিমাণে বৈদেশিকের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের অধীনতার মূল কারণ অল্পসম্মান করিতে হইলে এবং মুসলমান ও ইংরেজের অধীনতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রাক্-মোস্লেম যুগের অধীনতা সম্বন্ধেও সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকালে কোনো সময় অল্প বা আসিবিয়-গণ ও তৎপরে মিদিয়গণ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া লইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগে পারস্যরাজ কুরুষের আক্রমণকেই প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। তৎপর দারয়বৌষ অথবা দরায়ুস (খৃঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) গন্ধার এবং সিন্ধুনদের উপত্যকা, এই দুই প্রদেশ পারস্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের আক্রমণ-সময় পর্য্যন্ত এই প্রদেশ দুইটি পারস্যের অধিকারেই ছিল। তার পর ঘোর দুর্ভোগের মত ভারতের বক্ষে ছুটিয়া আসিল ম্যাসিডোনিয়ার বিজয়-বাহিনী এবং দুই বৎসরের জন্ত (খৃঃ পূঃ ৩২৭-২৫) হিন্দু-কুশের পাদদেশ হইতে বিপাশার তীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ স্বদেশের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই আক্রমণের সমস্ত স্মৃতি ভারতের অন্তর হইতে যেন পরম দুঃস্বপ্নের মতোই বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু যে গ্রীক একবার ভারতের সম্পদ-ভাণ্ডারের সম্মান পাইয়া গেল, তাহার হৃদয় হইতে ছুরাকাজ্জ্বল অগ্নিশিখা নিবিয়া গেল না। সে অগ্নিশিখা বার বার ভারতের অভিমুখে লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে। আলেকজান্ডারের আক্রমণের বিশ বৎসর পরেই (৩০৫ খৃঃ

পূঃ) সেলুকাস্ ভারতবর্ষ পশ্চিম সীমান্তে সশস্ত্র উপস্থিত হইল; কিন্তু এবাব ভারতীয় বীর চন্দ্রগুপ্ত মোর্যের নিকট দুর্জয় গ্রীক শৌর্যকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইল। তার প্রায় একশত বৎসর পরেই আবার স্বযোগ বুদ্ধি বিজয়-লোলুপ গ্রীক অঙ্গ ভারতের প্রতি উদ্ভূত হইয়া উঠিল। প্রথমেই (২০৭ খৃঃ পূঃ) সিরিয়ার সম্রাট এন্টিওকাস্ হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া স্বভাগ'সেন নামক একজন ভারতীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হন। আর ঠিক এই সময়ই ভারতের ক্ষাত্রশক্তি নিক্রাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল। কাজেই এন্টিওকাস্ এবার যে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া গেলেন, সেই দ্বার-পথে বৈদেশিক আক্রমণের খরস্রোত দুনিবার বেগে ভারতের দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্রাবল দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের স্বাধীন-শাস্তিকে অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। এই সময়ই ডিমিট্রিওস্, ইউক্রেটাইডিস্ প্রমুখ "যুদ্ধদুর্মণাঃ" "যুগদোষভূবাচাঃ" দুইবিভক্ত যবনেরা সমগ্র উত্তর ভারতকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উত্তর-ভারতের কেন্দ্রবর্তী মধ্যমিকা (চিতোর) এবং সাক্তে (অযোধ্যা) ও ইহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তার পর ইহাদেবই পদাশ্রয়ণ করিয়া ছুটিয়া আসিল শক, পল্লব, ইউচি-কুষণ, হুণ গুজ্জর ও তুর্কী। ইহাদেব আক্রমণের ইতিহাস ভারতের অতি গভীর বেদনার কাহিনী। সে-বেদনা ভারতবর্ষকে বহু যুগ ধরিয়া পরম ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। শুধু এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুলতান মহম্মদের আক্রমণ অথবা মোহাম্মদ ঘোরীর ভারত-বিজয়ের পূর্বেও ভাবতবর্ষকে বার বারই বৈদেশিক বাহুবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল; বারবারই ভারতবর্ষকে বিজ্ঞতার হস্ত হইতে অধীনতার দুঃখ-যজ্ঞে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পাবসীকদেব আক্রমণ রাজপুতানার মরুভূমির সীমা-প্রান্তেই ব্যাহত হইয়াছিল; কিন্তু আলেকজান্ডার গ্রীকবাহিনী-সহ বিপাশাব পশ্চিম তটে পদার্পণ করিয়া-ছিলেন এবং সে-স্থান হইতে সিদ্ধনদের মোহনা পর্যন্ত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাঘাতে জর্জরিত করিয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্তী গ্রীকগণেব (ডিমিট্রিওস্, মিনান্দার প্রভৃতি) আক্রমণ কিন্তু আরও অগ্রগত হইয়া দক্ষিণে চিতোর এবং পূর্বে অযোধ্যাকে পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তৎপরে শকরা উত্তরাপথে গঙ্গার, পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, মথুরা, মালব ও গুজরাত এবং দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কণ প্রদেশ পর্যন্ত করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। আর পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে গাজিপুর পর্যন্ত নম্র দেশ এক সময় কুষণদের বশতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। শুধু তাই নয়, অসভ্য বর্বর হুণরাও এক সময় উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মধ্য ভারত পর্যন্ত সমগ্রদেশের উপর এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বতরাং দেখিতেছি পরাধীনতার দুঃখভোগ ভারতবর্ষের ভাগ্যে নূতন নয়; পারস্তবাজ কুরুষের (খৃঃ পূঃ ৫৫৮-৫২৯) সময় হইতে গজনীপতি সুলতান মহম্মদের (খৃঃ ৯৯৭) সময় পর্যন্ত ভাবতবর্ষ বহুবার পরাধীনতার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে।

কিন্তু একথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না যে, দুঃখই দুঃখের শেষ নহে; দুঃখ মাত্রই অকল্যাণ নহে। দুঃখকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ কবি তাহার উপরই আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভব কবে। পরাধীন হওয়াটাই তেমনি চবম দুর্গতি নয়। চরম দুর্গতি হয় তখনই, যখন আমরা দুঃখকে সাধনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারি না। পরাধীনতাও মৃত্যু বহন করিয়া আনে তখনই, যখন আমরা তাহাকে আমাদের শুভ সাধনার দ্বারা কল্যাণগামী করিয়া লইতে অসমর্থ হই।

এখন দেখা যাক, ভারতবর্ষ তাহার এই শোণ-পুনিক-পরাজয় ও পরাধীনতাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও দুঃখকে একান্ত করিয়া স্বীকার করে নাই; ভারতবর্ষ চিরকালই আত্মাকে দুঃখের উপর জয়ী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাই ভারতবর্ষের অন্তর হইতে এই শাস্ত-বাণী উদ্বেষিত হইয়াছিল—

"নহি কল্যাণকৃতং কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" কল্যাণকৃতং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্রীয় জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ তার কল্যাণকে কখনও স্নান হইতে দেয় নাই। কল্যাণ

সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় পরাক্রমকেও অকল্যাণের
গ্লানি হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিল। শুধু তাই নয়,
অল্পনিপুণ দুর্ভিক্ষ শত্রুকেও ভারতবর্ষ কল্যাণ-ধর্মে দীক্ষিত
করিয়া একান্ত আপনায় করিয়া লইতে পারিয়াছিল।
তাই দেখিতে পাই যখন ধর্মদেব, শক ঋষভদত্ত, কুষণ
বাহুদেব ভারতবর্ষের কল্যাণ-ধর্মকে স্বীকার করিয়া লইয়া
ভারতবর্ষেরই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। তাই
দেখিতে পাই, যে “যুগদোষ-জুবাচারঃ” যবনেরা একদিন
প্রলম্ব-শঙ্খ ফুৎকার কবিত্তে করিতে ভারতের সমরাজ্যে
অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই যবনবাহী আব-এক দিন প্রত্যাগমন
কালে মৈত্রীমন্ত্রের উদগাতা শাক্য ঋষির মূর্ত্তি নির্মাণে
নিবিষ্ট হইয়াছে; তাই বিদিশা নগরের এক প্রান্তে যবন-
দূত হেলিওডোবাস্ ভক্তিনয়ন ক্রমে স্বীয় উপাস্ত দেবতা
ভগবান্ বাহুদেবের উদ্দেশ্যে গুরুদণ্ডস্ত নির্মাণ করিতেছে
এবং “নমস্তাগোঃপ্রসাদঃ” ভারতের এই মহামন্ত্রকেই
সত্যধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। যে দুর্দান্ত শকগণের
প্রবল সংঘাতে একদিন উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন প্রকম্পিত
হইয়াছিল, আর-এক দিন সেই শকরাই ভারতীয় ধর্ম-
প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভারতের কল্যাণ-
ধর্মে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই মহাকল্প রাক্ষুসের
পত্নী “নন্দসি অকসা” ভগবান্ শাক্যমুনির উদ্দেশ্যে স্তূপ
এবং সর্বাঙ্গবাদী সজ্জের জন্ত বিহার নির্মাণ করাইয়া
দিতেছেন; দৌনীকপুত্র নহপান-জামাতা শক উসবদাত
(ঋষভদত্ত) ব্রাহ্মণদিগকে গো-স্বর্গ দান করিতেছেন,
তীর্থস্থানে আশ্রয়শালা এবং পথিকদের জন্ত “আরাম
তড়াগ-উদপান” নির্মাণ করাইতেছেন। সেইজন্তাই
যখন দেখা যায়, স্লেচ্ছ কুষণরাজ কপিঞ্চ নাগার্জুন, অশ্বঘোষ,
বজ্রমিত্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য্যদের পৃষ্ঠপোষকতা
করিতেছেন ও সমগ্র বৌদ্ধ জগতেব প্রতিনিধিদিগকে
লইয়া বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘাত আহ্বান করিতেছেন, তখন
আমরা বিশ্বয় প্রকাশ করি না। এইরূপে ভারতবর্ষ
ধর্মের দ্বারা বিজ্ঞেতাকেও জয় করিয়া লইয়াছিল। যে
বিজ্ঞেতৃগণ ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তিকে পরাস্ত করিয়া
ভারতবর্ষকে অজ্ঞাঘাতে কৃতবিক্ত করিতে ক্রটি করে
নাই, সেই বিজ্ঞেতৃগণই প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সহিত ভারতের

ধর্মশক্তির নিকট বিজয়গর্ভকে অবলম্বিত করিতে বাধ্য
হইয়াছিল।

এইরূপে ভারতবর্ষ কল্যাণ ধর্ম দ্বারা বহু পরাক্রম ও
পরাদীনতার মধ্যেও নিজেই গ্লানি ও দুর্গতি হইতে মুক্ত
রাখিতে পারিয়াছিল। শুধু তাই নয়, এইরূপেই ভারতবর্ষ
ধর্মবিজয়ের দ্বারা অল্পবিজয়ের গৌরবকে গ্লানি করিয়া দিয়া
বিজ্ঞেতাকেও জয় করিয়া লইয়াছিল। ইহাই ভারতবর্ষের
বিশেষত্ব, ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের শিক্ষা।

যে-সময় ভারতবর্ষের ক্ষাত্রশক্তি সফলতার চবম
সীমায় পৌঁছিয়াছিল, যে-সময় ভারতবর্ষের বাহুবলের
নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া গ্রীকবীর সেলুকাসকেও
হিন্দুকুশের অপর পারে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল এবং
যে-সময় গন্ধার হইতে তাল্লিশি এবং হিমাচল হইতে
কুষা পর্যন্ত সমগ্রদেশ পাটলিপুত্রের বাজসিংহাসনভলে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে-সময় অকস্মাৎ ভারতবর্ষের
সৈন্যবাস-সমূহে বিজয়-ভেবী নীরব হইয়া গেল, রণ-
তুরঙ্গের হ্রেষাধ্বনি দিগন্তের বাতাসে মিলাইয়া গেল।
সেদিন ভারতের ঋষি সত্রাট প্রিয়দর্শী অশোক জয়স্বাক্ষার
পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শাক্যমুনির ধর্মসংঘে আশ্রয়
লইয়া বজ্রকণ্ঠে দিকে দিকে ঘোষণা করিলেন—

“এষে চ মুখমুতে বিজয়ে দেবানাং প্রিয়স যো
ধ্রমাবিজয়ো।”

অর্থাৎ অজ্ঞেব দ্বারা যে বিজয়লাভ তাহা
অতি তুচ্ছ, ধর্মের দ্বারা যে-বিজয় সেই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ
বিজয়। যেদিন এই মহাবাহী উদ্ভোষিত হইল সেইদিন
হইতে ভারতের ইতিহাসে এক মহান যুগান্তর উপস্থিত
হইল। সেইদিন হইতে ভারতের নগরে প্রান্তরে “ভেরী-
ঘোষ” সংগ্রামবার্তা রটনা না করিয়া ধর্মবার্তা ঘোষণা
করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে ভারতের দূতগণ
ছুটিয়া চলিল দেশে বিদেশে সমরঘোষণা লইয়া নহে,
ধর্মের বাণী শাস্তির বাণী লইয়া। তাহারা গেল সমস্ত
দেশে “ছয় শত যোদ্ধা দূরে” গেল সিরিয়াম, মিশরে,
সাইবিনিতে, এপিরাসে মৈত্রীর বাণী লইয়া; তাহারা
চোল, চের, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র ও তাম্রপণিতে (সিংহল)
আর গেল স্বর্গভূমিতে (ব্রহ্মদেশ)। সেইদিন হইতে

ভারতের নেশা ধরিয়া গেল ধর্মবিজয়ে—; সেই নেশায় ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়া জয় করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে। নেশা ধবিল কেন? কারণ, ভারতের সেই রাজর্ষি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট অশোক বলিয়াছেন, “যে চলধে এত-কেন হোতি সবতা বিজয়ে পিতিলসে সে; লখা সা হোতি পিত্তি ধর্মবিজয়ি।” অর্থাৎ এই যে বিশ্ববিজয়ের প্রেরণা তার মূলে রহিয়াছে প্রীতি-রস, আর এই প্রীতি লাভ হয় ঐ ধর্ম-বিজয়ের দ্বারাই। এই যে “প্রীতি-রসের” নেশা, এই যে মৈত্রীলাভের দুর্গিবার কামনা, তাহারই তাড়নায় ভারতবর্ষ বিশ্বজয়ের জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। আর রাজর্ষি অশোকের অনুপ্রাণনায় ভারতবর্ষ একবার যে প্রীতি-রসের স্বাদ পাইল সমগ্র এশিয়া জয় করিয়া তবে তাহার এই স্বাদ-লিপ্সা চরিতার্থ হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ কখনও বহির্ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে প্রয়াস করে নাই; ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস খৃষ্টিয়াও এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, সাম্রাজ্যের তুফায় কোনো ভারতীয় নবপতি সৈন্ত-বাহিনী লইয়া ভারতের বাহিরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, ধর্মের দ্বারা বিশ্ববিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষের চিন্তকে কখনই পরিত্যাগ করে নাই; একটা বিশ্বব্যাপী ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনের বৃহৎ কামনা ভারতবর্ষের অন্তরে চির-জাগরুক হইয়া বিদ্যমান ছিল।

তাই দেখিতে পাই, যে-সময় শক পহলুগী কুষণ হুণরা দহ্মাদলেব মত পুনঃ পুনঃ আসিয়া ভারতের দ্বাবে কুরাঘাত করিতেছে, ঠিক সেই সময়ই অপর দ্বার দিয়া ভারতের সাধকগণ বিশ্ববিজয়ে বাহির হইতেছেন। যে-সময় বৈদেশিক আক্রমণকারীদের অস্ত্রের ঝঙ্কনায় গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়ই ভারতের ধর্মবানীর উদ্গাতারা ধর্মের বিজয়-কেতন উড়াইয়া বিশ্বজয়-বাদ্য অগম্য হইয়াছেন। যে-সময় যুৎসু সৈনিকগণের সংগ্রাম-কোলাহলে ভারতের গগন মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, মুমূর্ষু যোদ্ধার রক্ত-স্রোতে ভারতের মাটি প্রাণিত হইতেছিল এবং দারুণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে দেশে প্রলয়-সূচনা হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ই

ভারতবর্ষ এশিয়ার ধর্ম ক্ষেত্র বা তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; এবং বিদেশগামী ভারতীয় সাধক ও ভারত-গামী বৈদেশিক তীর্থযাত্রীদের পারস্পর্যে বিশ্ব মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হইতেছিল। এইরূপে চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, শাম-কাষোজ, বলী-সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ ও মধ্য এশিয়ায় ভারতের ধর্ম, ভারতের সভ্যতা চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের সহিত, মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিল। এমাত-কি, যে দুর্জয় শত্রুরা ভারতবর্ষকে শুধু অস্ত্রাঘাতই করিয়াছিল, ভারতবর্ষ তাহাদিগকেও ধর্মদানের দ্বারা আশ্বাস করিয়া লইল। কারণ ভারতের সেই ধর্মবিজয়ী ঋষি-সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ভারতবর্ষকে বলিয়াছিলেন—

“নাস্তি এতাবিসং দানং যারিশং ধর্মদানং* * ধর্মসম্ব-দ্ধোবা” অর্থাৎ ধর্মদানের দ্বারা দান আর নাই, ধর্ম সম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধ আর নাই। ভারতবর্ষ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্রাটের এই মহাবানী ভুলিতে পারে নাই। তাই শত্রুকেও অস্ত্রাঘাতের বিনিময়েও ধর্ম দান করাই তাহার সাধারণ অঙ্গ এবং বিশ্বের সঙ্গে ধর্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করাই ছিল তাহার আদর্শ। তাই সমগ্র এশিয়া একদিন ভারতবর্ষকে পরম আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল; সেই মৈত্রীকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্তই ভারতবর্ষ আসিয়া-ছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, হিউএনসাং, ইংসঙ; আর ভারত হইতে গিয়াছিল কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ, কুমারজীব ও গুণবর্ধন, পরমার্থ ও দীপদব। আর ভারতের ঐ ধর্মদানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষেরই সেবায় আশ্রয়-নিয়োগ করিয়াছিল আমাদের বৈদেশিক শত্রু মৌর্যাদি ও হেলিওডোরাস কপিৎ ও বাহুদেব, উদয়দাত ও ব্রহ্মদামন।

এই “ধর্মদান” ও “ধর্মসম্বন্ধের” ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষ বহু দিন পরাজয়কেও জয়ে পরিণত করিতে পারিয়াছিল, বিজয়োল্লাসকেও লজ্জিত করিয়া দিয়াছিল এবং অধীনতার মধ্যেও কল্যাণকে প্রাণিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিন্তু তার পর একদিন আসিল যখন ভারতবর্ষের অন্তরে কলুষ প্রবিষ্ট হইল, ভারতবর্ষ তাহার উচ্চ আদর্শ

হইতে লুপ্ত হইল এবং তাহার শ্রেষ্ঠ সম্রাট মহর্ষি অশোকের বাণী বিশ্ববণের অঙ্ককারে বিলীন হইয়া গেল। সেই-দিন হইতে পরাজয় ও পরাধীনতা ভারতবর্ষে দুর্গতিকেই বহন করিয়া আনিয়াছে; তখন হইতেই আমাদের দুঃখ-দুর্ভাগ্য একান্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। যে আত্মার শক্তিতে ভারতবর্ষ একদিন দুঃখ-দুর্ভাগ্যকেও কল্যাণপ্রদ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল, ভারতবর্ষ আর-এক দিন সেই শক্তিকেই হারাইয়া বসিল। তাই তাহার নিজের সামাজিক বিধানও উদ্ভবের নিগড়রূপেই আত্ম-প্রকাশ করিল; তাহার ধর্মবিধান তাহাকে অধর্মের অঙ্ককারের দিকেই পথ নির্দেশ করিল; এবং সেইজন্তই বৈদেশিক বিজ্ঞতার বিজয়ধ্বনি ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে মৃত্যুর প্রলয়-শব্দের মতই শোনা গেল। তাই মহম্মদ বিনু কাশিম, সুলতান মামুদ, মহম্মদ বোরী, মহম্মদ খিলজি প্রভৃতির ভারত-বিজয়-কাহিনী আমাদের চক্ষু এত লজ্জা, এত অপমান ও এত লাঞ্ছনা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন এইসব বিজ্ঞতা ভারতবর্ষে দেখা দিল, সেদিন ভারতবর্ষের আত্মা হীনবল, তাহার বাণী বিশ্বত ও তাহার আদর্শ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তাই সেদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যথার্থ “ধর্ম-সম্বন্ধ” স্থাপিত হইতে পারে নাই এবং সেইজন্তই এই উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে এতখানি বেদনা ও এতখানি অপমান নিহিত ছিল।

আজও আমাদের সেই বেদনা ও সেই অপমানের অবসান হয় নাই। কারণ আমাদের মধ্যে এখন আর সেই “ধর্মের দীপনা” নাই; সেই ধর্মদান ও ধর্মবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা আজ নিজেদের মধ্যেই যথার্থ ধর্ম-সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আর সেইজন্তই ভারতবর্ষের যাহা প্রকৃত স্বারাজ্য তাহাও আজ আমাদের কাছে ছিন্নভিন্ন হইয়াই রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যে বৈদেশিকের পশুশক্তি বা অস্ত্রশক্তির

নিকট পরাক্রান্ত হইয়াছে ইহাই দুঃখের বিষয় নহে। ভারতবর্ষ যে অস্ত্রশক্তির উপরেও আত্মার শক্তিকে জয়ী করিয়া রাখিবার অপূর্ণ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাই দুঃখের বিষয়। বাহির হইতে যে অধীনতা আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছে তাহাই আমাদের অস্তবকে ব্যথিত করিতেছে না। আমাদের বেদনার মূল কারণ, আমরা আর আমাদের চিন্তের স্বাধীনতা দ্বারা বাহিরের মানিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না, বাহিরের অধীনতাকে চিন্তের প্রবল অস্বীকারের দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিতেছি না। আমাদের আত্মা বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাহিরের অধীনতাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা আজ পরের হাত হইতে অধীনতাকে পাইয়াছি, ইহাই সত্য কথা নহে। সত্য কথা এই যে, আজ আমরা আমাদের অন্তর হইতে যথার্থ স্বাধীনতাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, আমরা আজ আমাদের মহামুক্তিব বাণীকেই বিশ্বত হইয়া গিয়াছি।

ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে। কিন্তু কেবল অন্ধ আক্রোশে বাহিরের নিগড়টাকে আঘাত করিতে থাকাই সে স্বাধীনতা-লাভের প্রশস্ত উপায় নহে। চিন্তকে মুক্তি দান কবাই বাহ্য মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ, অধীনতা মাত্রই মোহ বা মায়া। আর আঘাতের দ্বারাই মায়াব বন্ধন ছেদন করা যায় না, সে-বন্ধন ছেদন করার একমাত্র অস্ত্র জ্ঞান, চিন্তের উদ্বোধন। আমরা যদি আজ অন্তরের ভিতর হইতে স্বাধীনতাকে লাভ করিবার সাধনা না করিয়া পরাধীনতাকে দূব করিবার তীব্র কামনায় কেবল পরকে আঘাত করিতে থাকি, তবে বাহিরের নিগড় বতই ছিন্ন হোক না কেন আমরা উর্ধ্বনাভের মত বাবে বারেই আমাদের বন্ধনজাল নিজেরাই রচনা করিতে থাকিব।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(২)

গৃহকর্ত্রী হৈমবতী সম্রাস্ত ঘরের মেয়ে, সম্রাস্ত ঘরেরই বধূ। তাঁহার স্বস্তরবাড়ীর বৃহৎ পরিবার ছিল; তাহাদের চাল-চলন সমস্তই সনাতন কালের। এই পরিবারে শৈশব উত্তীর্ণ হইয়াই তাঁহাকে পা দিতে হইয়াছিল। বহু দুঃখবেদনার স্মৃতি বহু অপমান ও গল্পনার ব্যথা তাঁহার সে-পরিবারের সহিত জড়িত। সে-সকল বেদনা ও ব্যথা যে কেবল তাঁহার আত্ম-মৰ্যাদা ও অহমিকাতেই ঘা দিয়াছিল তাহা নয়, তাঁহার মাতৃস্নেহের উৎস-মূলেও নির্মম আঘাত করিয়াছিল। অল্পবয়সেই হৈমবতী তিনটি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। কিন্তু স্মৃতিকা-গৃহের অত্যাচারে এক মাস বয়স না হইতেই দুইটি শিশুই তাঁহার কোল শূন্য করিয়া বিদায় লইয়াছিল। হৈমবতী তখন গৃহের বধূ মাত্র; ছেলে দুটি যাওয়াতে তাঁহার মনে স্মৃতিকাগৃহের বিরুদ্ধে যে বিজ্রোহ জাগিয়াছিল অভিভাবিকাদের নিকট তাহা তাঁহার প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। তবু মাতৃস্নেহেব বশে সে-কথা না বলিয়া তিনি পারেন নাই। শান্তা, নন্দ প্রভৃতি বয়ো-জ্যোষ্ঠারা বধূর এই লজ্জাহীনতা ও অকাল-পকতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। বেহায়া বোএর ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিদান দিতেও তাঁহা ছাড়েন নাই। তবু হৈমবতীর তৃতীয় সন্তান সকল আচার ও অত্যাচারের হাত এড়াইয়া কোনো প্রকারে বাঁচিয়া উঠিল। সকলে বলিল, “মেয়ে সন্তান যমের অর্কচি, ও ত বাঁচবেই।” দুইটি সন্তান হাবাইয়া যাহাকে পাইয়াছিলেন স্বভাবতই তাহার উপর হৈমবতীর ক্ষুধিত ও বঞ্চিত মাতৃস্নেহের সমস্ত উচ্ছ্বাস গিয়া পড়িল। বাড়ীর লোকের চোখে ইহা অসহ্য ঠেকিত। “একটা কালো রোগা মেয়ে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কিসের? তার শুধু রে পথি রে জামা রে কাপড় রে, একটা না একটা লেগেই আছে।”

মেয়েটি অত্যন্ত দুর্বল ক্ষীণজীবী ছিল, কিন্তু এই-সব বাক্যজালার ভয়ে হৈমবতী একদিনের জন্যও প্রাণ খুলিয়া তাহার যত্ন-আদর করিতে পারেন না। যতটা মন চাহিত তাহার অর্ধেক করিবার আগেই ভয়ে লজ্জায় ও বাক্যবর্ষণের চোটে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইত। মেয়েকে বুকে চাপিয়া তিনি তাঁহার সন্তান-সেবার সকল ক্রটির জন্য যেন তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেন। কিন্তু সে মেয়েও মার দুঃখ বৃক্ষের বেষ্টনিন বাঁচিল না। আট নয় বৎসর বয়স হইতেই মাতাব কোল চিরশূন্য করিয়া দিয়া সেও একদিন তাহার ভাইদের পথে চলিয়া গেল। কিন্তু মার বুকে তীব্র অহুশোচনার একটা জ্বালা রাখিয়া গেল। স্বামীর অর্থ ছিল, ক্ষমতা ছিল, তবু যে হৈমবতী কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় কোনো চেষ্টাই কবিতো পাবেন নাই, ইহাকে তিনি আপনাদের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ক্রমশ তাঁহার স্বামীর মনেও সংক্রামিত হইয়া উঠিল। জীকে লইয়া তিনি বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন। কোথা হইতে পরের একটি মেয়ে ঘরে আনিয়া জুটাইলেন। মেয়েটির যত্ন-আদরেই যে-ঘটা পড়িয়া গেল বাঙ্গালীর কোনো মেয়ের ডাগো ইতিপূর্বে তেমন জুটিয়াছিল কি না সন্দেহ।

আপনাদের অজ্ঞাতে এমনি করিয়া তাঁহারা কন্যা পালনের যেন ব্রত লইয়াই বসিলেন। কোথায় কাহার মেয়ের মা মরিয়াছে, হৈমবতীর স্বামী তাহাকে কুড়াইয়া আনিলেন—আমার জী মেয়ে বড় ভালবাসেন! কোথায় কাহার মেয়ের সমাজে স্থান মিলিল না, হৈমবতী বলিলেন, “আহা থাক, ও আমার মেয়েই হ’য়ে থাক।” দিনে দিনে কন্যাহীনার শূন্য গৃহ কন্যায় কন্যায় ছাইয়া গেল।

কিন্তু মানুষের সামর্থ্যের ত একটা সীমা আছে। স্বামী-

জীবন দৈনিক ও আর্থিক শক্তিতে যখন আর কুলাইল না, তখন তাঁহারা তাঁহাদের খেলার খেলায় একটা গম্ভীর টানিতে বাধ্য হইলেন। মাহুষ কিন্তু তাঁহাদের সহজে নিষ্কৃতি দিল না। হৈমবতীর প্রাণঢালা সেবা-যত্নে মাতৃজ্ঞানাত্মক এই মেয়েগুলি মায়ের অভাব কোনো দিন বোধে নাই। লোক-সমাজে তাহারা যেন ক্রমে হৈমবতীর গুণপনার জীবন্ত প্রতীকস্বরূপ হইয়া উঠিল। মেয়ে লইয়া যে যেখানে যে-কারণে অসুবিধায় পড়ে সেই তাঁহার শরণ লইতে চায়। অর্থ দিয়াও লোকে তাঁহার কাছে মেয়ে রাখিয়া বাইতে লাগিল।

আমার মৃত্যুর পর এই বন্ধুপ্রাণীময়ী তাঁহার জীবনের অবলম্বন হইল। জীবনে তিনি বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন, নারীজন্ম লাভের জন্মই। তাই মেয়েদের দুঃখমুক্তির পথের পাথর ধোগাইতে যথাসাধ্য করাই হইল। এখন তাঁহার একমাত্র ভ্রত। বয়স হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শিশুকন্যাদের পালন করার ভার আর তিনি নইতেন না। এখন তাঁহার আশ্রমে আসিত সেই মেয়েরা জীবন-সংগ্রামে সাহায্যহীন হইয়া যুঝবার শক্তি পাইতেছে না।

নানা স্বর্ণীকৃত দিয়া ঘুরিয়া গৌরীও একদিন এইখানেই আসিয়া জুটিল। প্রথম যখন শব্দ তাহার শিক্ষাব্যবস্থার ভাব লইয়া দেখিল, সংসারের মাঝখানে থাকিয়া কেবল দিনে একবার শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়িয়া গৌরীর কোনো লাভই হইতেছে না, তখন সে বলিল, “গৌরী, তুই ইন্সুলে পড়বি চল্। এই পঞ্চাশ জন মাহুষের মাঝখানে একলা তোর কিছু হওয়া শক্ত। বাড়ীতে যতগুলি মেয়ে আছে তার মধ্যে একজনও ত এসবের ধার ধারে না; তুই মাঝ থেকে কিছু কবুতে গেলে নিজেও অনভ্যাসের লজ্জায় পেরে উঠবি না, পরেও ঠাট্টা কবুবে। তা ছাড়া এখানে তোর সুবিধা ও অসুবিধা কেউ বুঝবে না, এমন-কি তুই নিজেও না। মাহুষ হ’তে হ’লে আর যারা সে-পথে চলছে তাদের সঙ্গে একটু যোগ রাখা মরকার।”

গৌরী বলিল, “হ্যাঁ, তা আমি বেশ বুঝি। এখানে ত আমার সকল কাজের উৎসাহ-দাজীটি দিনে একবার

এসে আমার পাখীপড়া পড়িয়ে যান। অর্দ্ধেক জিনিষ ত তিনি নিজেই বোঝেন না। শুধু দেখলেই আমার সমস্ত উৎসাহ উবে যায়। ঠিক অপরাধই বা কি? একটা মাহুষের ত আর সব শক্তি থাকে না।”

বাড়ীর অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শব্দ ও হরিকেশব জোর করিয়াই গৌরীকে একটা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। তাহার নিরীহ শিক্ষয়িত্রীর কাজটা হাত-ছাড়া হইয়া যাওয়াতে তিনি বড়ই মনঃস্থ হইলেন। দুই তিন দিন ধরিয়া বাড়ী বসিয়া সব বইগুলি ব্যাখ্যা পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন তিনি পড়াইতে কোনো খানে ভুল করেন নাই। বুঝলেন না তবু তাঁহার এ শক্তি কেন?

গৌরী এতবড় বিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই ইন্সুলটা তাহার মনে বেশ একটা স্থায়ী ও গভীর রকম ছাপ আঁকিয়া দিল। ইন্সুল বলিতে তাহার মনে অতি শৈশবের যে অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু ছিল, সে দেখিল ইহার সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। তাহার বিবাহের পূর্বে ছয় সাত বৎসর বয়সের সময় বাড়ীর কাছেই একটা বিদ্যালয়ে মাসে চাব আনা মাহিনা দিয়া সে পড়িতে বাইত। রোজ দশটার সময় ময়লা কাপড়-পরা একটা ঝি তাহাদের উঠানে আসিয়া “ও গৌরী ইন্সুলে চল্‌সে” বলিয়া ডাক দিত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বই স্টেট হাতে নোলক মাকড়ী মলপরা সিঁথি তুলিয়া ঝুটিবাধা ছোপানো ও কোঁচানো শাড়ী পরা খালিপায় কতকগুলি ছোট ছোট মেয়েও উঠানে ঢুকিয়া পড়িত। গৌরী তাহাদের সহিত তাহাদেরই মত বেশভূষা করিয়া ইন্সুলে বাইত। সে ইন্সুলে একখানি মাত্র ঘরে চার পাঁচটি ক্লাশ হইত। একজন বিধবা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি একলাই সব ক্লাশের মেয়েদের পড়াইতেন। এক ক্লাশের মেয়েদের সেলাই কিংবা অঙ্ক কিংবা হাতের লেখা করিতে দিয়া তিনি অন্য ক্লাশে চলিয়া বাইতেন। যেন সব কটা মেয়েকে কোনো রকমে খানিক বসাইয়া রাখাই যথেষ্ট। সেখানে ঘটা বিভাগের কোনো বালাই ছিল না। ছোট ছোট মেয়েরা যদি নিতান্তই গোলমাল করিত ত উপরের ক্লাশ হইতে

একটি ১১১২ বছরের মেয়েকে তাহাদের শাস্ত করিয়া পাঠে মনোযোগী করিতে পাঠাইতে হইত। গুরুমা সময় মত তাহার পাঠটা পরে লইতেন।

এখানে আসিয়া গোরীর মনের শৈশবের সে ইস্কুলের স্মৃতি লজ্জায় ঘেন কোথায় লুকাইয়া গেল। সকাল হইতে মস্ত মস্ত পাঁচ ছয় খানা গাড়ী মেয়ে বোঝাই করিয়া ক্রমাগত ষাণ্ডা-আসা করিতেছে; তিন চার খানা বাড়ী জুড়িয়া দুইতিন শ মেয়ে ঘরে ঘরে পনের বোল জন শিক্ষ-দ্বিতীর কাছে কত রকম বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে; কোথাও গান হইতেছে, কোথাও ড্রিল হইতেছে। মস্ত মস্ত ঘণ্টা দিনে পাঁচ সাত বাব বাড়ী কাপাইয়া বাজিয়া উঠিতেছে, এত অর্থ ও শক্তির সমবায়ে এত বিরাট আয়োজন! না জানি এখানকার মেয়েরা কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তী ও বিদ্যাবতী হইয়া উঠে। গোবী বিন্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা উজ্জল ভবিষ্যতের ছবিও ফুটিয়া উঠিল। মনটা আনন্দে নৃত্য করিয়া বলিল, “আমার জীবন আজ হইতে সার্থক হইতে চলিল।”

সে দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল যে, ইস্কুলে পড়িতে আসার পক্ষে তাহার বয়সটা কিছু আশ্চর্য্য রকম বেশী নয়। তাহার চেয়ে অনেক বড় মেয়েরাও এখানে আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া নেহাৎ ছেলে মানুষের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। যে-বয়সের মেয়েদের সে বাড়ীতে দুই তিন ছেলের মা হইতে দেখিয়াছে তাহারাও যে এমন শিশুর মত হাসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতে পারে গোরী তাহা কোনদিন ভাবে নাই। দেখিয়া তাহার মনের অকাল বার্ক্যটাও ঘেন খসিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

ইস্কুলের যাহাবা শিক্ষয়িত্রী তাহাদের অধিকাংশেবই বয়স অল্প হইলেও গোরীর চক্ষে তাহা অসম্ভব রকম বেশী ঠেকিতে লাগিল। দুইচাব জন ত সত্যসত্যই তাহার মায়েব বয়সী। এত বয়সেও যে মেয়েমানুষ অবিবাহিত থাকিয়া-লেখাপড়ার চর্চা ও অর্থ উপার্জন করিতে পারে এরকম ধারণা গোরী স্বপ্নেও করিতে পারিত না। সে পিতার মুখে শুনিয়া বলিয়াছিল বটে যে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবে। কিন্তু গৃহসংসারের বাহিরে এমন

একেবারে সম্পূর্ণ নিজের হাতে নিজের সমস্ত ভার লইয়া যে মেয়েরা কখনও থাকিতে পারে তাহা গোরীর কল্পনার অতীত ছিল। তাহার কল্পিত আত্মনির্ভর ও এই আত্মনির্ভরে যে আকাশ-পাতাল ঐভেদ তাহা সে দুই চার দিন দেখিয়াই বুঝিল। পুরুষেব সাহায্য এবেবারে না লইয়াও যে জীলোক স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে দাঁচিয়া থাকিতে পারে দেখিয়া গোরীর মন হইতে দুর্ভ বনার একটা বোঝা নামিয়া গেল। কেমন একটা গর্কে মনটা ভরিয়া উঠিল।

প্রথম পরিয়ে বিদ্যালয়ের যে আশ্চর্য্য সুন্দর ও মহান্ রূপ গোরী দেখিল তাহা তাহার নিজের চোখের দৃষ্টির গুণ হইলেও তাহাই তাহার নূতন জীবন-পথের একটা উজ্জল আলোক-স্বরূপ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এ আলোকে সে তাহার পন্থা স্থানে অনায়াসেই পৌছিতে ভাবিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। ইস্কুলের অধ্যক্ষ মেয়ের মত খাওয়াদাওয়া হাসি-খেলায় সঙ্গে পড়াশুনাতো এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সে দেখিতে পারিল না। ইহা তাহার কাছে একটা ব্রত হইয়া দাঁড়াইল, গুরুবাক্য তাহার বেদ-বাক্য হইয়া উঠিল।

সে বাড়ী আসিয়া শব্দংকে বলিল, “দাদা, এক-একটা ক্লাশে এক বছর ক’রে কেন থাকতে হয়? যে যেমন তাড়াতাড়ি পারে, তা’কে তেমন ক’রে এগিয়ে যেতে দেয় না কেন?”

শব্দর বলিল, “তাতে তোঁর লাভটা কি হ’বে?”

গোবী উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, “না হ’লে আমি সকলকে দেখাব কি ক’রে যে আমিও নিজের সব ভার নিজে নিতে পারি? বড় যে গোবী হ’য়ে যাবে। তুমি জান না ত, আমাদের ইস্কুলের মেমনলিনী দিদি আর তাঁর বোন দু’জনে মিলে কত বোঙ্গার করেন? তাঁরা একখানা বাড়ীই ক’রে দিয়েছেন নিজেরদের মাকে। অবিশি তাঁর বোন ড.জার ব’লে বেশী বোঙ্গার করেন। তাঁর আবার গাড়ী আছে, তা ছাড়া ভাইকে বিলেত পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বাড়ীতে একজনও পুরুষ মানুষ নেই। কি আশ্চর্য্য বল ত।”

শব্দর বলিল, “হ্যাঁ, আশ্চর্য্য বটে! তাই ব’লি তোঁরও

সুখ হয়েছে আমাকে বিলেত পাঠাবার! আচ্ছা তা না হয় কিছুদিন পরেই পাঠাস। আমি বেশী বুড়ো হয়ে যাব না।”

কিন্তু গৌরীর নিজের উৎসাহ যতখানি বাড়িয়া যাইতেছিল, আর সকলের কাছে সেই পরিমাণ উৎসাহ ত সে পাইলই না, বরং নানাদিক্ দিয়া বাধা পাইতে লাগিল। সে পিতামাতার আদরিণী কন্যা হইলেও বাড়ীর বড় মেয়েদের মধ্যে সেই একমাত্র নিরঙ্কুশ; কাজেই সংসারে সকলেই তাহার কাছে একটু সাহায্যপ্রার্থী ছিল। যখন এ ভাবিত, ‘আমার ছেলেটা একবার ধরলে বাঁচি’, সে ভাবিত, ‘আমার সেলাইটা একটু শেষ ক’রে দিলে কাল কাজে লাগে’, আর একজন ভাবিত, ‘ভাঁড়ারটা একহাতে গোছাচ্ছি একটু এসে হাতও দৈয় না’, তখন গৌরী বই খাতা লইয়া ঘরের কোণে গিয়া লুকাইলে সকলেই বিরক্ত হইত। নরম করিয়া হইলেও হুইচার কথা শুনাইতে তাহারা ছাড়িত না। বলিত, “বাবা, আমরা উদয়াস্ত সংসারে হিম্ সিম্ খেয়ে ম’রে গেলাম, তুই বেশ আছিস; বিবিটি সেজে ইঙ্কলে গেলি, আবার বাড়ী এসেই নিজের বই মুখে দিয়ে বসলি। শাশুড়ী-ননদের ভয় ত নেই যে কারুর মুখ চেয়ে চলতে হ’বে।”

গৌরীর এই সাধনাকে যে সকলে বিবিয়ানার রূপান্তর মাত্র ভাবিত, ইহাতে অপमानে ও বেদনায় তাহার মনটা একেবারে মুস্‌ড়াইয়া যাইত। সে আগের তুলনায় বেশভূষা অনেক কমই করিত, কিন্তু প্রতিদিনই ইঙ্কল যাইতে হইত বলিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হইলে চলিত না। তাছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদের যে অঙ্গগুলি ভদ্রবেশের নামে চলিত, সেগুলির কোনোটি বাদ দিয়াই বা ইঙ্কলে যায় কি করিয়া? তবু সকলের কথায় দুঃখ পাইয়া সে যথাসাধ্য বাহ্যাবলীকৃত পোষাক করিয়াই ইঙ্কল যাওয়া স্বক্ করিল। প্রথম দুই একদিন কেহ কিছু বলিত না; কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী সকলেরই বিস্তৃত দৃষ্টি যে তাহার উপর আসিয়া পড়িত ইহা বুঝিতে গৌরীব দেয়ী হইত না; সে লজ্জায় সজুচিত হইয়া যাইত। শেষে একদিন একজন মেয়ে তাহাকে ডাকিয়াই বলিল, “দেখ ভাই, তুমি আগে কখনও ইঙ্কলে পড়নি, তাই তোমায় ব’লে দিচ্ছি। তোমার মত বড়

মেয়েদের এরকম ক’রে ইঙ্কলে আসা ভাল দেখায় না। লোকের সামনে দিয়ে রাস্তায় গাড়ীতে ওঠ, এখানে এত লোকজনের মধ্যে আস, আমাদের মত কাপড়চোপড় তোমার পরা উচিত।”

গৌরীর যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। সে অল্প মেয়েদের মতই পোষাক-পরিচ্ছদ ধরিল। বাড়ীতে সকলেই বলিতে লাগিল, “গৌরী ইঙ্কলে পড়তে গিয়ে দিনকার দিন মেম হ’য়ে উঠছে।”

গৌরী নয়টার সময় ইঙ্কল যাইত, পাঁচটার বাড়ী ফিরিত। এই দীর্ঘকালটার ভিতর জলম্পর্শও তাহার করা হইত না। মা সঙ্গে খাবার দিতে চাহিলে ঠাকুরমা পিসিমা বাধা দিতেন। “ইঙ্কলের বিস্তলো থিরিষ্টান; তাদের জল খাইয়ে আর অর্ধশের ভার বাড়িও না।” গৌরী কিছু বলিত না; কারণ আজকাল সে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সকল বিচার মানিয়াই চলিত।

ইঙ্কলে যে সেলাই শিখাইত, সে ছিল মুসলমান দরজি। “একে পুরুষমাছুষ তাতে মুসলমান-ওর কাছে বিধবা মেয়ে সেলাই শিখবে?” ঠাকুরমা গেলেন স্কেপিয়া। নানা গোলমালে ইঙ্কলে গিয়া পড়াশুনা করা গৌরীর দায় হইয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, “আমি বোর্ডিঙে গিয়ে থাকুব; বাড়ীতে আমার পড়াশুনা হয় না।”

ঠাকুরমা বলিলেন, “ওমা, সেখানে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে তুই খাবি দাবি কি ক’রে? একেবারেই কি মেলেছ হ’য়ে উঠলি?”

শুধু এই সামান্য কারণে মা বোনকে চটাইতে হরি-কেশব চাহিলেন না। গৌরীকে আর কোথাও রাখা যায় কি না চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে এক হিন্দুবিধবাব্রাহ্মে জায়গা পাওয়া গেল। সেখান হইতেই ইঙ্কলে পড়িতে বাইবার অসুবিধাও সংগ্রহ করা হইল।

ছোট একটি দোতলা বাড়ী। আসুবাবপত্নী কিছুই নাই; মেয়ের উপর মাহুর পাতিয়া মেয়েরা পড়াশুনা কবে, তাহারই উপর আবার বিছানা পাতিয়া ঘুমায়ে। সমস্ত কাজকর্মই মেয়েদের নিজেদের করিতে হয়।

কেবল গোড়া বাসন মাজিয়া দিবার ও বাজার করিয়া দিবার জন্য একটি ঝি আছে।

গৌরীর এত কাজকর্ম করা ও এমন ভাবে থাকা কোনো দিন অভ্যাস ছিল না। তবু সে ইহাতেই রাজি হইল; ভাবিল স্বাবলম্বন ও সরলজীবনযাত্রাপ্রণালীই তাহার মত মেয়েদের আদর্শ হওয়া উচিত।

আশ্রমের কর্ত্তা সধবা। তাঁহাকে দেখিয়াই কিন্তু গৌরীর প্রথম খটকা লাগিল। মেয়েদের কাপড়-চোপড় সবই মোটা থান, মার্কিনের সেমিজ ও বোম্বাই চাদর; কিন্তু কর্ত্তার পরণে রঙিন ঢাকাই সাড়ী, লেস-দেওয়া পেটিকোট, জরিদার ব্লাউস ইত্যাদি। জুতা, মোজা, গহনা, এসেন্স, পাউডার পমেটম কিছুরই জুটা নাই। চেয়ার টেবিল, আয়না আলমারি, খাট, সকল আসবাবই ঘরে শোভা পাইতেছে। স্থানে বাসরের মত ইহা গৌরীর চোখে বিসদৃশ ঠেকিল। মেয়েগুলির সবই অল্প বয়স, তাহাদের দীনবেশের ও স্নান মুখের পাশে তাহাদের মাতৃস্থানীয়র এবকম সালস্বারা মুক্তি দেখিলে মনে হইত কে যেন একটা প্রহসন অভিনয় করিবার জন্য এই মা ও মেয়েগুলিকে সাজাইয়া আনিয়াছে।

চোখের দৃষ্টিতে যাহা কিছু মন্দ লাগে তাহাকেই বর্জন করিতে গেলে সংসার চলে না। সুতরাং গৌরীকে থাকিতেই হইল। কিন্তু সে দেখিল একত্রে বৈধব্যের নিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন চর্চা করিতে গেলে বিদ্যাচর্চাটা তাহাকে বাদ দিয়াই চলিতে হয়। ব্রাহ্মণের মেয়ে বলিয়া রান্নার পালাটা তাহারই বেশী করিয়া পড়িত, কারণ অল্প জ্ঞাতের মেয়েদের হাতে সকলে খায় না। ঝি-চাকর নাই, কাজেই কর্ত্তার ঘরের কাজ-কর্ম, চা দেওয়া, এমন-কি মাছ রাঁধা পর্যন্ত মেয়েদেরই করিতে হইত। তাহার উপর ছিল কাপড় কাচার পালা, সেলাইয়ের পালা ও হিসাব রাখার পালা ইত্যাদি। যে মেয়েরা সেইখানে থাকিয়া সেইখানেই পড়িত তাহারাজ-কর্ম সারিয়া সময়মত নিজেদের পড়াশুনা করিতে পাবিত। কিন্তু যাহাকে সারাদিন ইস্কুলে কাটাইতে হয় তাহার পক্ষে ইহা শক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কুদৃষ্টান্তে মেয়েদের অপকার হইবে বলিয়া কর্ত্তা

গৌরীকে একটা কাজও মাপ করিতেন না। তিনি বলিতেন, “এক জায়গায় থাকতে হ’লে সবাইকে একচালে চলতে হ’বে। তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব’লে তোমার জন্তে ত আমরা আলাদা নিয়ম করতে পারি না। এখানে সবাইকেই গরীব হ’তে হ’বে।”

এক হাত গহনা বাজাইয়া কর্ত্তা উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইতেন; গৌরীর তাহা পালন করিতেই নয়টা বাজিয়া যাইত। ইস্কুলে যাইবার আগে অর্ধেক দিন তাহার ভাত খাওয়া হইত না।

পরীক্ষার সময় আসিয়া পড়িল। গৌরী আর এখানে কিছুতেই থাকিতে চায় না। তাহার বড় ভয় পাহে সে ফেল হইয়া যায়। শব্দ তাহার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

এমনই দিনে সন্ধ্য তাহার মাসিমার খবর আনিয়া শব্দকে দিল। শব্দ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া সেই দিনই হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করিয়া গৌরীর বিষয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিল।

(৩)

সকাল-বেলায় রোদ আসিয়া ছাদে পড়িয়াছে। হৈমবতী মেয়েদের লইয়া আচার রোজে দিতেছিলেন। ঘরের কোলের সঙ্গ বারান্দায় একটা পাটি বিছাইয়া নিস্তারিণী, দক্ষিণের হাওয়ায় একটু আরাম পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এইটি হৈমবতীর চিরকথা গোষা। কাল রাত্রে তাহার বাতের ব্যথা ও হাঁপানি অত্যন্ত বাড়িয়াছিল বলিয়া, সারা রাত সে ঘুমাইতে পায় নাই। সকালে শরীরটা হাল্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি ও তন্দ্রায় তাহার সর্বাপেক্ষ অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দায় আর এক কোণে বসিয়া চপলা ও চঞ্চলা একটা পোষাক তৈয়ারি করিতেছিল; একজন কাটিয়া ও টাঁকিয়া দিতেছে আর একজন কল চালাইয়া সেলাই করিতেছে। গৌরী সেই-খানে দরজার মুখে একটা মোড়া পাতিয়া কলেজের বই, ও খাতা লইয়া নোট মিলাইতেছিল।

হৈমবতী বলিলেন, “চপলা, তোমার ত আত্ম ছুটি আছে। বাড়ীর কাজ-কর্মগুলো একটু দেখো। আমাকে

এখুনি বেরোতে হবে, সেই মেয়েটির অস্থির আঙ্গ বড় বাড়াবাড়ি। যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা আঙ্গ সারাদিনের মধ্যে ক'রে ফেলতেই হ'বে।”

গৌরী খাতা ও বইটা নামাইয়া রাধিয়া বলিল, “মাসিমা, আমরা আপনার কিছু সাহায্য করিতে পারি না?”

মাসিমা বলিলেন, “না মা, এ তোমাদের মত কচি মেয়ের কাজ নয়। আমাদের পোড়-খাওয়া হাড়ের এই সব কাজ সাজে।”

চকলা হৈমবতীর ঘর হইতে একটা মোটা চাদর ও ছোট ব্যাগ আনিয়া দিল। হৈমবতী ব্যাগটা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া চাদরটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলেন; সঙ্গে গাড়ী কিম্বা লোকজন কিছুই লইলেন না। আঙ্গ দশ বৎসর এই ভাবে একলা একলাই তিনি পথে ঘাটে ঘুরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলিতেন “গাড়ী চড়তে আর লোকের মাইনে দিতে আমার যা খরচ হ'বে, তাতে আমার তিনটে মেয়েও খবপোষ কুলিয়ে যায়।”

হৈমবতী বাহির হইয়া গেলে চকলা বলিল, “মাসিমার কিন্তু ধন্নি সাহস ভাই! ওই এদোপড়া গলিব ভিতর রাজ্যের মুসলমান বস্তি পেরিয়ে দিনের পর দিন একলাটি হেঁটে যাওয়া-আসা করছেন। আমরা হ'লে ভয়েই মরে ভুত হ'য়ে যেতাম।”

গৌরী বলিল, “গরীবের দেশে কাজ করিতে হ'লে এমন ক'রেই করিতে হয়। ঢাকাই শাড়ী প'বে মোটর চ'ড়ে দরোয়ান পাইক সঙ্গে ক'রে যত দিন আমাদের দেশের মেয়েরা সৌখীন দেশোদ্ধার করবে ততদিন দেশের কোনো আশা নেই।”

চপলা বলিল, “মেয়েদেরই শুধু শুধু গাল দিচ্ছ কেন? আমাদের দেশের পুরুষরা যে পুরুষের বড়াই করেন, তাঁরাও সব দেশের কাজ করিতে গিয়ে ট্রাভেলিং এলাওন্স' যত, নেন, চাকরী করলে তার সিকিও মাইনে পেতেন না।”

চকলা বলিল, “নিস্তারিণী দিদি, তুমি যদি ভাই, একটু খাড়া হ'য়ে উঠতে পারতে, তাহ'লে তোমাকে একটা

দেশোদ্ধারের চাকরী আমি কোনো রকমে জুটয়ে দিতাম। বেশ ছু পয়সা হাত ক'রে নিতে পারতে। পরকালের জন্মে আর ভাবনা থাকত না।”

নিস্তারিণী অতি সহজ অন্তর্ভুক্তি মাহুষ। সে বলিল, “ও বাবা! আমি ভাই, ক'র অক্ষর জানি না, দেশোদ্ধার করব কোথা থেকে?”

চকলা বলিল, “ওমা, তাও জান না, নিস্তারিণী-দি? লেখাপড়া শিখলেই ত মেম হ'য়ে যাবে। যে যত মুখ্য হয়, সেই তত সহজে দেশোদ্ধার করিতে পারে। এই সনাতন প্রথা।”

নিস্তারিণী বলিল, “কেন ভাই, বোকা মাহুষ দেখে ঠাট্টা করু? ও সব তোমাদের কাজ তোমরাই করো। অনেক ছুঃখ ভোগ করেছি; আবার নতুন জালে জড়াতো চাই না।”

গৌরী বলিল, “নিস্তারিণী দিদি, তোমার কিন্তু এক দিকে কপাল ভাল। কোথাকার চাটগায়ের মেয়ে তুমি, কলকাতা সহরে মাসিমার কাছেই বেছে বেছে এসে জুটলে কি ক'রে?”

নিস্তারিণী বাতগস্ত শরীরটা অনেক কষ্টে গৌরীর দিকে ঘুরাইয়া বলিল, “সে-কথা আর বল কেন ভাই? আর জন্মের অনেক পাপের সঙ্গে একটা কিছু বড় পুণ্য করেছিলুম যার জোবে এমন লক্ষ্যের পায়ে ঠাই মিলেছে। দেখতে একে কুচ্ছিত ছিলুম, তার উপর আবার একটা পা বাঁকা; কাজেই সহজে যে পার করা যাবে না তা বাপ মা বেশ জানতেন। বাবার সাতটি মেয়ের শেষে জন্মেছিলুম যেমন রূপ তেমনি কপাল নিয়ে। ছয় মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই বাবার বাড়ীখানা বাঁধা পড়ল, মার হাতে শাখা সঞ্চল হ'ল, জমিজমা সব বিক্রী হ'য়ে গেল। তার উপর স্ত্রীকরা আর মূদির তাগিদে ত বাড়ীও ছাড় প্রাণস্ক হ'বার যোগাড়। অত ঠেলা আর সহিবে কেন? বাবা শেষে মরে হাড় জুড়োলেন; কিন্তু ভাইগুলিকে গেলেন পথে বসিয়ে। সর্ব্ব স্ব বেচলেও ধারশোধ হ'বার উপায় রইল না। যে বোনগুলোর জন্মে তাদের এমন দশা হ'ল তারা তখন সবাই বেশ চাকরে আমার ঘর করছে,

তাদের পায় কে ? কাজেই ভাবেনের যত রাগের চোট এসে পড়ল আমাব উপর।”

চঞ্চলা বলিল, “বেশ বাঁহোক, নিস্তারিণী-দি ! তোমাকে কি উপস্থাসের প্লট দিতে কেউ বলেছে ? মাসিমার কাছে কি ক’রে এলে তাই ব’ল না !”

নিস্তারিণী গল্পে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, “তাই ত বলছিলুম। আগের কথাটা না বললে টপ্ ক’রে ভিড়িয়ে এসে কি শেষের কথা বলা যায় ? আমি বাপু বোকা মানুষ, অন্য রকম বলতে জানি না।”

গৌরী বলিল, “তুমি ভাই, ওদের ক্ষেপানো শুনো না। যেমন বলছিলে তেমনি ব’লে যাও।”

নিস্তারিণী শ্রান্ত শরীরটা একটু মোড়া দিয়া হাই তুলিয়া বলিল, “তারপর যা বরাতে ছিল তাই ঘটল। পাড়ার মুদির দোকানে খাতা লিখত একটা মা-বাপে-ধোনো ছেলে ; তাকেই ধ’বে এনে আমার ভাইরা বিনে-পুচায় আমাকে গছিয়ে দিলে। সেই থেকে যত থোয়ার শুরু হ’ল। আমার একটা কথা একটা কাজ যদি অপছন্দ হ’ত ত অমনি ছাতার বাড়ি লাঠির বাড়ি পিঠে পড়তে শুরুিত। এমনি নিলক্ষ্য মানুষটা যে পাশের বাড়ী বাড়ী ছাদে ছাদে মেয়ে-পুরুষ আমার কান্না শুনে জমা হ’য়ে গেলেও খোলা দরজার সামনে আমার উপর অত্যাচার করিতে তার এতটুকু বাধত না। অত ব্যথার মধ্যে আমি লজ্জায় ম’রে যেতুম, তবু তার লজ্জা হ’ত না। মারধোর ক’রে অত-শুলো মানুষের সামনে দিয়ে দিয়া গট-গট ক’রে বেরিয়ে চ’লে যেত। পাশের বাড়ী থেকে ছাদের আলসে ভিড়িয়ে মেরো এসে আমার চোখে মুখে জল দিয়ে তুলত।

“বোকার মত একদিন বলেছিলুম—স্বামী হ’য়ে তুমি আমার এমন হেনস্তা কর লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না। তাতে বললে কি—‘বেশ ত ! স্বামীর হেনস্তা ভাল না লাগে, আর কারুর হেনস্তায় যদি মুখ খুব উচু হ’য়ে ওঠে তবে তারির চেষ্ঠা দেখো। আমার তোমাকে কিছু দরকার নেই।’

“ওমা, সতি সতি তার পরদিন সকালে উঠে দেখি বাড়ীভাড়া মুদির দার সব কেলে রেখে কোথায় চ’লে গেছে। এই আসে, এই আসে, ক’রে সারাদিন পথ চেয়ে

ব’সে রইলুম; কিন্তু কারুর আর দেখা পাওয়া গেল না। বাড়ীওয়ালা খবর পেয়ে বলে—‘এখুনি আমার ভাড়া চুকিয়ে উঠে যাও’; মুদি বলে—‘আমার সব পাওনা গণ্ডা না পেলে আমি ঘরের ঘটি বাটি উঠিয়ে নিয়ে যাব।’

“আমি ত কেঁদে মরি, কোথায় যাব কি করব ভেবেই পাই না।”

চঞ্চলা বলিল, “মাগো, স্বামী নয় ত ছবমন্ ! অমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। গৌরী, ভূই, ভাই ঢের নিশ্চিন্ত আছি।”

নিস্তারিণী জিত কাটিয়া বলিল, “ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। আমার যা করেছে, তা করেছে তবু যেখানে আছে বেঁচে-বর্ষে থাক। মাসিয়া যতদিন আছেন আমার কোনো ভাবনা নেই। মাসিমার এক মামাতো বোন আর ভগ্নীপতি থাকতেন আমাদের পাশের বাড়ীতে। আমার কান্নাকাটি শুনে তাঁরা বললেন, যে, এর একটা ব্যবস্থা কর্তে হ’বে। ছপুর রাত্রে খিড়কীর দরজা খুলে তাঁদের বাড়ী পালিয়ে এলুম, আবার ভোর না হ’তেই তাঁরা দিলেন আমার কল্কাতায় চালান ক’রে। এমনি ক’রে স্বামীর শ্বশুর আর পরের অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।”

চপলা বলিল, “সত্যিই ভাই, তোমার নামে গল্প লেখা যায় দেখছি। আমার দেখ না, একেবারে সোজাছত্রি ইতিহাস, মা গেল ম’রে, বাপ এনে মাসিমার ষাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।”

গৌরী বলিল, “আর চঞ্চলা, তোমার ইতিহাসটা কি ? আরব্যোপস্থাসের মত সবাই নিজের নিজের কাহিনী ব’লে ফেল।”

চঞ্চলার চঞ্চল জিহ্বা হঠাৎ খামিয়া গেল। মুখখানা একবার মুহূর্তে রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর একটু খামিয়া মুখটা ভার করিয়া সে বলিল, “আমার মা আমাকে বেঁচে থেকেই বিদায় ক’রে দিয়েছে। সে কাহিনী সকলের চেয়েই সংক্ষিপ্ত।”

চপলা চঞ্চলার ইতিহাস সমস্তই শুনিয়াছিল। চঞ্চলার পিতা বেহারের একজন স্বনামধন্য আইনজীবী ছিলেন,

মা বাঙালী অভিনেত্রী। পিতামাতা দুইজনেরই ইচ্ছা ছিল চঞ্চলাকে ভঙ্গসমাজে পালন করিয়া বিবাহ দেওয়া; কিন্তু পিতার সংসারে ত চঞ্চলার স্থান ছিল না, কাজেই তিনি কষ্ণার লালন-পালনের উপযুক্ত অর্থ দিয়া হৈমবতীর কাছে কন্ঠাটিকে রাখিয়া যান। দুই এক বৎসর অন্তর মাঝে মাঝে দেখিতেও আসিতেন। ছেলেবেলা চঞ্চলা ইহাকে কাকা বলিত। বড় হইয়া সব জানিবার পর সে আর এই মিথ্যা সম্পর্কের অভিনয় করিতে রাজি হয় নাই; তাই তখন হইতে তাহার অভিভাবকের আসা-যাওয়াও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন খবরই প্রায় আজকাল আর সে পায় না।

চঞ্চলার মুখ দেখিয়া ও কথা শুনিয়া গৌরীর তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে অনেক দিন এখানে আসিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়টা বেশীর ভাগই তাহার উপর-উপর ছিল; কাহার অন্তরে যে কি বেদনা লুকাইয়া আছে তাহা সে জানিত না। আজ নিস্তারিণীর দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া সে সত্যই ব্যথিত হইয়াছিল। নিজেই সে অতি ভাগ্যহীনা বলিয়াই ভাবিত। কিন্তু বাহিরে যতই নূতন-নূতন মানুষ দেখিতেছে ততই তাহার এ বিশ্বাস টুটিয়া যাইতেছে। দেখিতেছে জগতে তাহার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখের বোকাই মানুষ বহে। তাহাতেও মানুষ বাঁচিয়া আছে, কাজ করিতেছে, ভাঙিয়া পড়ে নাই। সাংসারিক স্ব্থের আশা তাহার জীবনে হয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই যে সব দুঃসহ দুঃখের জালা ইহা ত তাহাকে কোনোদিন সহ্য করিতে হয় নাই। তাহার দুর্ভাগ্যের জন্ত পিতামাতা শোক করিয়া সেটাকে তাহার চক্ষে যত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, হৈমবতীর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, ও নিস্তারিণীর আজন্ম নিপীড়নের সহিত তুলনা করিলে তাহা কি আর তেমন থাকে? গৌরীর নিজের কাছেই নিজের দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেক ছোট হইয়া আসিতেছিল।

চঞ্চলা দুইটা কথা বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। গৌরীই তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, স্বভাবঃ এই ব্যাপারটাতে সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। চপলা গৌরীকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, “তুমি ভাই,

চঞ্চলাকে ও কথা না জিজ্ঞেস করলেই পারতে! ওর কথা কি কিছু শোননি?”

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, “কৈ, না! আমি ত কিছু জানি না।”

চপলা তাহাকে সমস্ত কথাই বলিল। শুনিয়া গৌরী আপনার প্রশ্নের জন্ত সজ্জিত হইল বটে; কিন্তু চঞ্চলার উপরও তাহার কেমন একটা রাগ আসিল। চঞ্চলা গৌরীর সহিত এক ঘরে থাকিত, একই জিনিষপত্র ব্যবহার করিত। তাহার অতীত ইতিহাস শুনিয়া গৌরীর বাল্যের সংস্কার মাথা জাগাইয়া উঠিল। মনে হইল চঞ্চলার স্পর্শে তাহার সমস্ত অন্তর্ভুক্তি হইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলার বিলাসের আড়ম্বর ছাড়িয়া এখন সে ব্রহ্মচর্যের সকল নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিত। আজ মনে হইল তাহার কঠিন ব্রহ্মচর্যের সমস্ত গৌরব এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। লুকাইয়া তাহার সহিত এতখানি মাখামাখি করার অপরাধের জন্ত গৌরীর সমস্ত মনটা চঞ্চলার উপর জুঁক হইয়া উঠিল। এত বড় একটা দুঃখ ও অপমানের ইতিহাস যে তাহার পিছন হইতে সমস্তক্ষণ তাহাকে বিধিতেছে—সে কথা ভাবিয়া মনটাকে তাহার প্রতি একটুও সদয় করিতে গৌরী পারিতেছিল না। মানুষের কত বিচিত্র রকমের দুঃখ আছে; দিন দিন তাহার পরিচয় পাইয়া নিজের দুঃখটাকে সে অনেক ছোট মনে করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু চঞ্চলার এই নূতন দুঃখের ব্যথায় তেমন সমবেদনা ত তাহার জাগিল না। যে দুর্ভাগ্য লইয়া সমাজে সে জন্মিয়াছে এবং যাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার আজন্ম চেষ্টার ফলেও সে কৃতকাৰ্য্য হয় নাই তাহার জন্ত গৌরী যেন চঞ্চলাকেই অপরাধী স্থির করিল।

চপলা বলিল, “চঞ্চলা বড় অভিমানী মেয়ে। ও হত মনে করবে ছেনে-শুনেই তুমি ওকে অমন প্রশ্ন করেছ। তুমি যে জানতে না সেটা ওকে গিয়ে একবারটি বল।”

গৌরীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু বলিতে গিয়া সে যাহা বলিবে তাহাতে চঞ্চলার অভিমান যে আরোই আহত হইবে না এবিষয়ে তাহার নিজেরই সন্দেহ ছিল। সেই ভয়ে চপলার কথায় সে ঠিক সাহ্য দিতে পারিল

না। কেবল বলিল, “আজ থাক্ ভাই, ও সব নিয়ে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।”

চপলা চলিয়া গেলে গৌরী হৈমবতীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর শ্রান্তদেহে হৈমবতী ফিরিয়া আসিয়া ছাদে বসিয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার স্নান ও মধ্যাহ্ন-আহার হয় নাই। মেয়েদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। একজন পাখা আনে, একজন জল আনে, একজন বা ছাতা-চান্দর তুলিয়া রাখিতে দৌড়ায়। হৈমবতী বলিলেন, “তোমরা এত ব্যস্ত হ’চ্ছ কেন? যার যার নিজের কাজ করো গে, আমি আপনি জিরিয়ে নাওয়া-খাওয়া করুব এখন।”

খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া সকলে সরিয়া গেল।

গৌরী ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। হৈমবতী বলিলেন, “কি গৌরী, তোমাব কি চাই?” গৌরী বলিল, “আপনি শ্রান্ত হয়ে এসেছেন; আপনাকে বেশী ব্যস্ত করুব না। শুধু একটা কথা বলতে এসেছি। আমার সকলের সঙ্গে থাকায় নানা অসুবিধা হয়। আমাকে একটা ছোট খাট আলাদা ঘর দেওয়া যায় কি না, একবার দেখবেন।”

মাসিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “চঞ্চলার সঙ্গে তোমার অসুবিধা হ’বার ত কথা নয়। কি হয়েছে বল দেখি। আমি চঞ্চলাকেও জিজ্ঞাসা করুব।”

গৌরী বলিল, “না মাসিমা, দয়া ক’রে চঞ্চলাকে এবিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি বা হয় ভেবে আমাকে বলবেন।” (ক্রমশঃ)

সৃষ্টি-রহস্য

[স্বপ্নেদ সংহিতা, দশম মণ্ডল, ১২২ স্তক]

শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্-এ, বি-এল

১
যাহা নাই তাহা ছিল না তখন, যাহা কিছু আছে
তাহাও নয়;
ছিল না পৃথ্বী, ছিল নাকো ব্যোম—যার ‘পব’ আর
নাহিক হয়।
কোথা কার স্থান? কিছু কি আছিল, আবরণ করি’
রহিত যাহা?
ছিল কি অস্ত গহন গভীর? কোথায়, কেমনে থাকিবে
তাহা?

২
মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাজি ছিল না, ছিল না দিন;
কোথায় তাহার, কোথায়? তখন দিবস রজনী
প্রভেদহীন।

অনিঃসৃত-বায়ু সেই এক আত্মা-মাত্র—ছিল না দেহ,
বসিত শুধুই স্বধায়; অস্ত্র ছিল না কিছুই, ছিল না কেহ।

৩
তমশারে শুধু তামসে ঘিরিয়া ছিল যে অগ্রে তমস, আর
অপ্রভিন্ন সলিল ব্যাপ্ত, কোথায় বিশেষ নাহিক যার।
গুহ্রে আছিল যে আচ্ছন্ন বিরাট সর্ব শূন্যতায়,
সেই এক, সেই সর্বব্যাপী জন্ম লভিলা তপশ্রায়।

৪
কামনাব হ’ল উদয় অগ্রে, যা হ’ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবির পৰ্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ

নিরুপিতা সবে মনীষার বলে—উভয়ের সংযোগেব ভাব
অ-সং হইতে হইল কেমনে সত্তের প্রথম আবির্ভাব।

৫
উর্দ্ধে ও অধে, অথবা পার্শ্বে তিষ্ঠাকৃভাবে বিতত, সারা
দিগদিগন্তে বিধাবি’ পড়িল ইহাদেব সেই রশ্মিধারা;
বেতোধা যাহারা, মহিমা যাহারা, সম্ভব হ’ল তাদের, নদা
উপরে প্রবাহিত রহিল, এবং নিম্নে তাহার রহিল স্বধা।

৬
কে জানে প্রকৃত? ইহলোকে এর তত্ত্ব কহিবে কে-ই
বা সে-ই?
কেমন করিয়া, কোথা হ’তেই বা, এল বিচিত্র সৃষ্টি এই?
কোথা হ’তে হ’ল সম্ভব এর? কে বলিতে পারে
সে সন্ধান?
দেবতাবা হ’ল সৃষ্টির পর; কোথা থেকে এল? কেই
বা জানে?

৭
এই যে সৃষ্টি—এ হ’ল কিরূপে? কেহ কি করিল,
অথবা—নয়?
কাহা হতে হ’ল? কে জানে স্বরূপ? সেখানে
পরমব্যোমে যে রয়,
সে-ই জানে এর যে অধ্যক্ষ, তার চেয়ে আর জানে
না কেও,
সেই জানে সব স্থনিশ্চিত; কে জানে—হয়ত জানে
না সেও!



[কোন মাসের “প্রবাসী”র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদের কাছে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যিক; পরে আসিলে ছাপা না-হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ “প্রবাসী”র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যিক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

“কবি”

গত চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুত হীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের “কবি” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। লেখাটিতে পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট কবিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিলাম। সাধারণতঃ তিনি পূর্ব বাঙ্গালা ও উত্তর বঙ্গের কবিদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেও যে কবিরা বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা অমূল্য হইলে এখনও প্রমাণ মিলিবে। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন পুরাকালে কবি-গান হইত। কিন্তু উহা বার্থ নহে; কলিকাতাতে বর্তমানে কবি গান না হইতে পারে—পূর্ববঙ্গে এখনও এই গানের সমধিক প্রচলন আছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুত্র-অর্চনাদি পদ্ধতি প্রকাশের জন্য তিনি এখনও বাস্তব আছেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রসিদ্ধ স্বার্থে দৃঢ় ভক্তিই জাতীর উন্নতির মূল। শাস্ত্রের মনগড়া ব্যাখ্যা, কল্পিত স্বার্থ, আত্মসম্মতি এবং জাতি-বিষয়ে উন্নতি হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীজীব ত্রায়াতীর্থ

নানা জাতির আদর্শ প্রার্থনা

বিগত ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীমহেশচন্দ্র বোস মহাশয়ের লিখিত “নানা জাতির আদর্শ প্রার্থনা” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম।

তিনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সমগ্র মুসলমান সমাজে একই প্রার্থনা (নামাজ) ও তাহার অনুবাদ এই—

“আমি নিশ্চয়ই তাহার সন্তুষ্টি হইলাম। যিনি দো এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি কখনও মনে কবি না যে তাহার অংশী আছে। ঈশ্বর অতি মহান...”।

হে ঈশ্বর, নিঃসন্দেহ তোমা হইতেই আমরা সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। তোমা হইতেই আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। আমরা অকৃতজ্ঞ নহি। বাহ্যিক আমাদের অবাধ্য তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকি ও তাহাদিগকে পরিত্যাপ করি। হে ঈশ্বর, আমরা তোমারই অর্চনা করিতেছি। তোমাকেই প্রণিপাত করিতেছি। তোমারই উপাসনা করিতেছি। আমরা তোমারই কৃপাভিধারী। তোমারই শান্তি আমাদের প্রার্থনা। নিশ্চয়ই তোমার শান্তি কাকেরপক্ষের ক্ষম নিদ্রিষ্ট।”

কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদের নমুনা বারং বারং কিছই বোঝা যায় না। লেখক হিন্দু। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে যদি তাহার সম্যক জ্ঞান থাকে তবে নামাজ সংক্রান্ত যে কোন প্রমাণিত পুস্তকে দেখিতে পাবেন যে, কোরাণের “হুরাকাতেরাই” নামাজের প্রকৃত মূলমন্ত্র। অথচ লেখকের অনুবাদগুলির আদোষাংশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, সেই “হুরাকাতেরাই” অনুবাদটি কোথাও নাই।

উচ্চতম আদর্শ প্রার্থনা বলিয়া নামাজের যে উপরোক্ত অনুবাদগুলি লেখক দিয়াছেন তাহা তিনি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন ও কিরূপে অবগত হইলেন যে, ঐগুলিই নামাজের আদর্শ উচ্চতম প্রার্থনা?

এক্ষেপে প্রকৃত নামাজ কি, সে-সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রকৃত নামাজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া

হিন্দু-সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?

চৈত্র মাসের প্রবাসী পত্রিকার কাশীধামের এক সভার কথা “হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে পূজাপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তি বলিয়া যে-কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। অসত্য কথা এই, “শাস্ত্রের মধ্য দিয়া অনুন্নতদিগের অধিকার দিলে শাস্ত্রের মর্যাদা নষ্ট হইবে।...” ইত্যাদি।

কাশীধামে “আর্য্য সম্মেলন” নহে, “আর্য্য সম্মেলন” সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তিনি সম্ভব্য প্রকাশ করেন যে, “শাস্ত্রের, মধ্য দিয়া অনুন্নতদিগকে অধিকার প্রদান চিরন্তন সঙ্গীত, আমি যে এই অধিকার প্রদান শব্দ ব্যবহার করিতেছি—তাহা উন্নতি বিধান অর্থে প্রযুক্ত। যে-সকল অনুন্নত জাতির হরাপান ব্যাভিচার দ্রুততা প্রভৃতি দোষ অত্যধিক ছিল, তাহাদিগের সেই-সমস্ত দোষ নিবারণ সঙ্গীতসম্পন্ন সমাজই ‘শাস্ত্রের মধ্য দিয়া’ করিয়াছেন। পানাহারে একাকারতা উন্নতি বিধান নহে, তাহা শাস্ত্রের মধ্য দিয়াও হয় না। শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, কথাকাটা ব্যবহার করিয়া যথোচ্চ অধিকার দানের ব্যবস্থা করিলে শাস্ত্রের মর্যাদা নষ্ট হইবে।”

তর্করত্ন মহাশয় কৃত ‘ধর্মসিদ্ধান্ত’ নামক শ্রুতি সংগ্রহ ১৩১৩ সালে বঙ্গবাসী শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সর্বজাতির উন্নতি বিধানার্থ শাস্ত্রীয় মত তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সর্বজাতির



দুশার চিত্রের খসড়া

শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা]

পবিত্রভাবে পবিত্রস্থানে সমারমান হইয়া মনে একাগ্রতার জন্ম আল্লার প্রশংসা-বাচক বলনা করা। তৎপরে ‘সুরাফাতেহা’ বাহা নামাজের মূলমন্ত্র তাহা বীর স্থির চিত্তে পাঠ করা এবং তাহার সহিত ফেরাশেব যে-কোন অংশ পাঠ করা ও অপরূপে ক্রিয়া-কলাপাদি সম্পাদন করা।

এক্ষেণে ‘সুরাফাতেহা’ অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্ত প্রশংসাই ধোঁদার। তিনি বিশ্ব-ত্রদাওব প্রভু, তিনি অতি দয়ালীল ও ক্ষমাশীল। তিনি বিচারদিনের অধিপতি। হে ঈশ্বর আমরা তোমারই উপাসনা করিতেছি ও তোমারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কবিত্তেছি। তুমি আমাদের সত্য সত্য পথ দেখাও। বাহাদিগের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ তাহাদিগের পথে চালিত কর। কিন্তু বাহার তোমার বিরাগ-ভাজন ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাদিগের পথে আমাদের গণ্য করা করিও না।

ইসলামের নমাজকে সাম্প্রদায়িক বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যেক প্রার্থনাকারী কেবল নিজেব ও তাহার সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করে না। সমস্ত মানবজাতির মুস্তিব জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করে। হিন্দুধর্মের যে প্রার্থনাটিকে পৃথিবীর মধ্যে অধিষ্ঠার প্রার্থনা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের ‘সুরাফাতেহা’ নামক মন্ত্রটির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে প্রত্যেক স্থানে বলা হইয়াছে যে ‘আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও’ ইত্যাদি; কিন্তু আমাদের মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে ‘আমাদিগকে অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদায় মানব জাতিতে সত্য সত্য পথ দেখাও।’ ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কোন মন্ত্রটি সাম্প্রদায়িক, অমুদার ও বিশ্বপ্রেমিকতা পূর্ণ। এবং কোন প্রার্থনাটি সার্বভৌমিক প্রাণনারূপে গৃহীত হইতে পারে।

দানেশ আহমদ

হিন্দুর ভবিষ্যৎ

বৈশাখ সংখ্যা ‘প্রবাসী’ ১৪৬ পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রসঙ্গ নিবন্ধে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ‘হিন্দুর ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা এবং প্রবন্ধটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার উল্লেখ সম্পাদক মহাশয়ের অজ্ঞাতে একটু ভুল হইয়াছে। ‘হিন্দুর ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধটি আমি ‘আয়তনান্তিতে’ প্রেরণ করি। আয়তনান্তির ৪ঠা চৈত্র তারিখে ৪৭শ সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর মৈমনসিংহ জেলাব জামালপুর হইতে প্রকাশিত শান্তিবর্তী নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয় সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহা তাহাব নিজের লিখিত নহে।

এবন্ধের আলোচ্য স্থান মৈমনসিংহ জেলা নহে, যশোহর জেলা।

কামার, কুমার, তাঁতি, ধোঁপা, বেহারী, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা-হ্রাসের প্রতি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য প্রদান করা একান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যশোহর জেলার জমিদার নড়াইলের শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং নগডাসার রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথ-ভূষণ দেব রায় এবং বর্তমান মন্ত্রী মাণ্ডার শ্রীযুক্ত যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়গণ যদি কামার, কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলন এবং কস্মাপণ বিষয়ে আন্দোলন করেন তবে ষষ্ঠার্থই কল হইতে

পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি কয়েকটি নাপিত যুবক বিধবা বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে আর কেহই অগ্রসর হইতেছে না।

বহু ৩০।৪০ বৎসর বয়স ব্যক্তিও বিবাহ করিতে পারিতেছে না। ইহার অবজ্ঞাতাবী পরিণাম সংখ্যা হ্রাস। গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছিল, যশোহর জেলার লোক-সংখ্যা ১৭,০৩,৩৭১ জন। তৎপরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় লোক-সংখ্যা ১৭,২২,১৭৪ জনে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই দশ বৎসর কাল মধ্যে যশোহর জেলার ২১১৭৩ জন লোক হ্রাস পাইয়াছে।

নড়াইলের ধীরেন-বাবু নমঃশুদ্ধের উন্নতি-কল্পে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে, কিন্তু কেহই হতভাগ্য নাপিত, ধোঁপা, কামার, কুমার, তাঁতি, বেহারী প্রভৃতিদের প্রতি লক্ষ্য কবিত্তেছেন না।

যশোহরের তাঁতের কাপড় এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। বহু দূরদেশে পর্য্যন্ত যশোহরের কাপড়, গামছা প্রভৃতি চালান যাইত। আজ তাঁতীর বংশই লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। যশোহরের নিকটবর্তী নীলগঞ্জ পাড়াটি তাঁতী ঘাবাই পূর্ণ ছিল, আজ তাহা ষষ্ঠার্থই শ্রমশূন্য-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বহু সন্ধানও ৪টি বেহারী কোথাও একত্রিত করা যাইতেছে না। দশ গ্রামে একজন কামার মিলে না। লোকের দৃষ্টাবে কুস্তক-করেব ব্যবসায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। দিন দিনই যুন্নয়-পাত্রের অভাব অস্বস্ত হইতেছে। লোক না থাকিলে ব্যবসায় চালাইবে কে? বঙ্গীয় হিন্দু সভা কি এই উপেক্ষিত সম্প্রদায়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিবেন? ব্রাহ্মণ-সভা ইহাদের বিধবা বিবাহে সম্মত প্রদানে বা পাত্রীয় ব্যবস্থা দানে কি সচেষ্ট হইবেন? হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে আর কে রাখিবে?

দেশীয় শিল্পী-সম্প্রদায় লুপ্ত হইলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও বিদেশীর হস্তগত হইবে; হইতেছেও তাহাই। যশোহরের নাম্‌দুপুং থানায় কাগজী নামক এক সম্প্রদায় ছিল, তাহার দেশীয় প্রথা কাগজ তৈরী করিত। আজ যশোহর জেলার কোথাও তাহাদের স্থান মিলে না। মিলের কাগজ আমদানী হইলেও জিনিষপত্র বাঁধিতে এবং নানা কাজে কাগজ তুলট কাগজ প্রচলিত ছিল। শিল্পীর লোপে সে ব্যবসাও বিনষ্ট হইয়াছে।

ভিন্ন জেলা এমন-কি রাঙ্গপুর বাহিরের লোক আসিয়া ধুন্নয়র কাজ করিতেছে। বাহিত নামক এক হিন্দু সম্প্রদায় আছে, বাহারী, নাহর প্রস্তুত করিত, ক্রিয়াকর্মে চোঁল বাজাইত এবং নৌকায় লেপ তোবক প্রস্তুত করিত, তাহাদের কাজ মুসলমানের অধিকার ক্রিয়ায়। কারণ ইহাদের সংখ্যা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়।

বন্ধেব স্ববীক্ষণ বিবেচনা করুন হিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রকৃতই তনমাজের কি না।

শ্রী অবলাকান্ত মজুমদার

ছাতনায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বক্তব্য

গত চৈত্রের প্রবাসীতে ‘ছাতনায় চণ্ডীদাস’ বাহিব হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—

১। ছাতনার বাসনী আসল নহে। যে-স্থানে তাঁহার পূজা হয় সে-স্থানে শবের উল্লেখ নাই। মূর্তি কিন্তু শবাক্রূড়া। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানিনি মহাশয় সে-সম্বন্ধে কিছু না বলার প্রবন্ধে বিশ্বস্ততার ভঙ্গাব ঘটাইয়াছে। বিশালান্দীর ধ্যানের সঙ্গে ঐ মূর্তির মিল আছে।

২। 'বাসলী-মাহাত্ম্য' বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন বিশ্বদত্ত মহাশয় ছাতনাহইতে বাসলী-মাহাত্ম্যেব একখানি পুঁথি আনিয়াছেন। রাধানাথ দাস ছাতনার লোক, তিনি কবিতাষ পুঁথিতে বাসলীর প্রায় সব কাহিনীই লিখিয়াছেন। তাহাতে বর্ণ্য হাঙ্গামার সময় দেবীদাস ছাতনার গিমাছিলেন। পুঁথিতে চণ্ডীদাসের কোনো প্রসঙ্গ নাই। ছাতনার লোক হইয়া রাধানাথ এত বড় ভুল কবিলেন কেন? আব সংস্কৃতের লেখক একেবারে বাপ-মাতৃব নাম ধরিয়া কবি বলিয়া এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটার এত জোর দিল ইহার অর্থ কি হুস্পষ্ট নয়? পুঁথির লেখা হালের।

৩। পদ্মাবলীর মধ্যে ২৯৩, ৩১০, ৩৪৩ পদেও রমকিনীর উল্লেখ আছে। কেবল একটি পদেই 'রমকী-সঙ্গতি' আছে একথা ঠিক নহে।

৪। নলপুর বা নল নগর হইতে নামুর নাম হইয়াছে একথা আমি বলি নাই। নলপুরের প্রবাদ আছে হুতরাং হইতে পারে বলিয়াছি। নলপুর হইতেও নামুর যে একেবারে হয় না এমন কথাই বা কে জোব করিয়া বলিবে? তার পর জ্ঞানপুর হইতে নামুব হইতে পারে। নামুপুর হইতে, নলপুর হইতে নামুব হইতে পারে। চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র-শাসনে নামু-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। ধর্মশালদেবের তাম্রশাসনে ভগবান নল নারায়ণ নাম পাওয়া যায়। মিথিলার রাজা ছিলেন নামু-দেব। হুতরাং একটা গ্রামের নাম নামুপুর বা নলপুর থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি!

৫। হুমুর হাট হইতে হুমুর নাম কেবল অবিখ্যাত নহে, হান্তোদ্দীপক। ছাতনার দেয়রয়ার পূর্ক পুরুষের নাম, কাহিনী সব মনে রাখিল আর অত বড় কবির বাসস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিল না, নাম মনে রাখিল না। আজ হুমুর হাট খুঁজিয়া তাহার বাসভূমি বঙ্গনা করিতে হইল। আজ চারশো বছর ধরিয়া বৈষ্ণব কবিরা কি হুমুর হাটের বঙ্গনা রচিয়া আসিয়াছেন? মাহু কতটা জেনী হইলে তবে এইসব অবাস্তব কথা সাহিত্যক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পাবেন আমি ভাবিয়া পাই না। আমরা এ কাজ কবিলে লোকে বলিত চন্দ্রাধিক্য!

৬। বাসলী ধর্মঠাকুরের জীবন দেবতা হইয়াছেন কতদিন? হাজার বৎসর আগে অভিনব স্তম্ভের শিখা ক্ষেত্রাজ মালিনী-বিজয় তত্ত্ব বাসলী দেবীর নাম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাত্তম মহাশয় বলেন—বাগীশ্বরী হইতে বাসলী হইতে-পাবে। খৃঃ ২য়, ৩য় শতাব্দীতে বাগীশ্বরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মঞ্জুশ্রীর শক্তি। বাসলী বাগীশ্বরী হইলে নামুরের মূর্ত্তিই ঠিক। আমাদের নব প্রকাশিত বীথুস বিবরণ ৩য় খণ্ডে আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কবিয়াছি।

৭। ছাতনার নিত্য নূতন প্রবাদ গজাইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যেই সেখানে চণ্ডীদাসের মেলা বসিয়াছে, হুতরাং প্রবাদ সৃষ্টি পথ খোলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিশ্বদত্ত একবকম প্রবাদ শুনিয়াছিলেন, আমি একরকম শুনিয়া আসিয়াছি, ইতিপূর্বে সাহানা মহাশয় একরকম শুনিয়াছিলেন, আজ বিভ্রানিধি আর একরকম শুনাইলেন।

৮। ছাতনার ইঁটের লেখা দেখিয়া মনে হয় হামীর উত্তর ও উত্তর এক ব্যক্তি। ১৪৭৩ শকে অর্থাৎ ১৫৫৪ খৃঃ তিনি ছিলেন। ছাতনার চণ্ডীদাস যদি কেহ থাকেন তিনি ঐ সবয়েই ছিলেন। নামুরের মহা-কবির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নাই।

৯। বিভ্রানিধি মহাশয় ক্রমাগত এক উত্তর পর বেরপ আর এক উহ চাপাইয়াছেন তাহাতে ২৫ পৃষ্ঠা প্রবন্ধের ৭৫ পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে তবে গলদ পরিষ্কার হয়। মুসলমানে রাজাকে ধরিয়া লইয়া গেল, আর চণ্ডীদাস গান করিতে করিতে ও দেবীদাস বিশ্বদত্ত হস্তে তার অমুগমন করিলেন, মুসলমানে রাজাকে ছাড়িল দেবীদাসকে (বোধ হয় বংশ-রক্ষার লক্ষ্য) ছাড়িল, চণ্ডীদাসকে হত্যা করিল। আর সবাই সে কথা ভুলিয়া গেল, কেবল একজন লোক মনে রাখিল। এইসব রায় বাছাছুরে উহ। বৈষ্ণব দাস পদ্ধতীতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মিলনের কথা বলাষ তিনি প্রেব করিয়াছেন এবং নিজে পুরীযাত্রার কল্পনা করিয়া গঙ্গাঙ্গলে বাহা শুদ্ধ হয় নাই, খীর বিজ্ঞানামুতে তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন। ২৫ পৃষ্ঠা জুড়িয়া এমন উহ অনেক আছে। কিন্তু আর নয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বোশেখ শেষের মাঠ

জসীম উদ্দীন

বোশেখ শেষে বালুর চরে বোরোধানের থান
সোনার সোনা মেলিয়ে দিয়ে কাড়িয়ে নেছে প্রাণ।
বসন্ত সে বিদায়-বেলা বুকের আঁচলখানি
গেঁয়ো নদীর ছ'পাশ দিয়ে বেখায় দেছে টানি'।
চৈত্র-দিনের বিধবা চর সাদা ধানের 'পবে
নতুন বরষ ছড়িয়ে দিল সবুজ থরে থরে।
না জানি কোন্ গেঁয়ো তাঁতী গাঙ চলিবার ছলে
জল-ছোয়া তার শাড়ীর পাশে পাড় বুন য় চ'লে।

মধ্য চরে আউস ধানের সবুজ পারাবার
নদীর ধারে বোরোধানের দোলে সোনার পাড়।
চৈত্র-দিনেব বৈরাগিনী সবুজ আঁচল-কোণে
মুখখানিরে আবছা ঢেকে লাজল বিয়েব কনে।
মাথায় তাহার বক-শিশুবা মেলিয়ে কোমল ডানা
সাধা সাধা মেঘের মত উড়ায় চাদরখানা।
গেঁয়ো পথে চলতে আজি অনেক মার্মা লাগে,
বুকেব 'পরে পা দিলে ধান জড়িয়ে ধরে তাকে।

অমন সবুজ অমন কোমল মাটির সাথে মিশে
কে পার ভাই চলতে তারে পায়ের তলে পিষে !
হাটে যাওয়ার পথটি ত তাই অনেক হ'ল ঘোর—
কাজল তলার ও পাশ দিয়ে দিগুনগরের মোড় ।
তার পরেতে হালট গেছে একটু আঁকা বাঁকা
গরুর পায়ের খুরে খুরে ছবির মত আঁকা ।
সেখান দিয়ে চলতে চাষী সকল কথা তোলে
বন্ধু ভাইএর কাঁধটি ধ'রে খানের কথা তোলে ।
সাত পুরুষেও এমন ফসল দেখিনি কেউ চোখে
মেঘ যেন কেউ বিছিয়ে দেছে তাদের গৈয়ো চকে ।
চাষীর মুখে তারিক শুনে খান শিশুরা তাই
হেলে ছলে লাঞ্জে আকুল নাই লুকোবার ঠাই ।
আকাশ ছিল সুনীল যখন ছিল না মেঘ লেখা
তখন চাষী শুকনো মাঠে দিয়ে লাঙল-রেখা ;
আকাশের ওই দেবতা সাথে পেতেই যেন আড়ি
ধূলু ধূলু ধূলু চোতের ধূলোয় খানকে দিল ছাড়ি' ।
তারা যেন সৈন্ত তাহার পাতাল-পাথার কাড়ি'
আনল অথই মেঘের বাহার সবুজ স্নেহে কাড়ি' ।

আকাশ হ'তে নামল না মেঘ পাতাল হ'তে আনি'
সারা মাঠের বুকের 'পরে হর্ষে দিল টানি ।
দেবতা যেন হারার ভয়ে সুনীল আকাশ মেঘে
চাষার সবুজ ক্ষেতের মেঘে বর্ষে থেকে থেকে ।
ও গো চাষী, গায়ের চাষী, সেলাম তোমার পায়,
বাড়ী তোমার উজানচরে কিষা গরুর-গায় ;
ম্যালেরীয়ায় মবুছ তুমি কখন জ্ববুবু
সারাটা দিন মবুছ খেটে পাণিনি খেতে তবু !
লক্ষ টাকা দেশকে দিয়ে হয়নি তোমার নাম ;
দেশের ভরে প্রাণ দেওয়াটাও নয়কো তোমার কাম ।
একলা যে কোন্ বনের ধারে নাম-না-জানা গাঁয়ে,
সারাটা দিন রৌদ্রে পুড়ে সাজাও মেঠো মায়ে ।
সব ছনিয়ার ধোরাক জোগাও নিজেই থেকে তুচ্ছ,
অভাগারা ! তাও বোঝে না এইটে বড় দুখ ।
খোদার ছোট যদিও তুমি, অনেক ছোট নয়,
স্বপ্তি করার চাইতে পালন তুচ্ছ কেবা কয় ।
তোমার গৈয়ো মাঠটি আমার মক্কা হেন স্থান,
সাধ ক'রে আজ লুটিয়ে সেখা জুড়াই সকল প্রাণ

অরূপ রতন

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রী সাহানা দেবী

বাহিরের ভুল হানবে যখন

অন্তরের ভুল ভাঙবে কি,

বিষাদ-বিষে জলে শেষে

তোমার প্রসাদ মাড়বে কি ?

রৌদ্র দাহ হ'লে সারা

নাম্বে কি ওর বর্ষাধারা ?

লাজের রাজা মিটলে হৃদয়

প্রেমের রক্তে রাঙবে কি ?

যতই যা'বে দূরের পানে
বাধন ততই কঠিন হ'য়ে
টানবে নাকি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল-হাওয়া লাগবে বেগে
নয়ন-জলের আবেগ তখন
কোনই বাধা মানবে কি ?

II

II { সা রা পা । মা জা রা । সা রসঃ মঃ জা । রা সা (না) - ।
বা হি ০ রেবু তু ল্ হা ০০ ন্ বে ষ খ ন্ ন্

সা গা গা । গা গা সা । জা - মা । জমা পমা জরা }
অ ০ স্ত রেবু তু ল্ ভা জ বে কি ০ ০০ ০০ } II

II মা পা - । পা পা - । গা গা - । ধা পা - । মপা মা জা । রা সা রা ।

বি বা দ বি ষে ০ জ লে ০ শে ষে ০ তো ০ মা র প্র সা দ

নসা না সা । নসা রজা রা II II

মা জ বে কি ০ ০০ ০

II { মা পা পা । পা পা - । পা পা - । পা পা গা । ধা - গা । ধা গা - ।
রো ০ জ দা হ ০ হ'লে ০ সা রা ০ না ম্ বে কি ঙ র
অ ভি ০ মা নে বু কা লো ০ মে ষে ০ বা দ ল হাওয়া ০

ধা সা গা । ধা পা ধা } মা পা - । পা পপা ধনা । পধা পা মা । গা মা - ।

ব ০ ধা ধা রা ০ } লা জে র বা জা ০ ০০ মি ই লে জ দ য
লা গ বে বে গে ০ ন য ন জ লে ০ বু আ বে গ ত খ ন্

মপা সা জা । রা সা রা । নসা মা সা । নসা রজা রা II II

প্রো ০ মে র র দে ০ রা ০ জ বে কি ০ ০০ ০

কো ০ ন ই বা ধা ০ মা ০ ন্ বে কি ০ ০০ ০

{ না না - । না মপা না । না সা - । সনা সা - । সপা পা - । মগা মা - ।

{ যত ই যা বে ০ হু বে র পা ০ নে ০ বা ধ ন ত. তই ০

মপা মা জা । রা জা - । রা মা জা । রা সা রা । ধনা না ধনা । না সা - ।

ক. ঠি ন হ য়ে ০ টা ন্ বে না কি ০ ব্য থা র টা নে ০

সম্পাদকের চিঠি

(৮)

জেনীভা সহর জেনীভা হ্রদের তীরে অবস্থিত। সহরটি যেখানে অবস্থিত, হ্রদ সেইখানে শেষ হইয়াছে। রোন নদী হ্রদটির জননী। উহা হ্রদের পূর্ব প্রান্তে হ্রদে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম প্রান্ত দিয়া যেখানে বাহির হইয়াছে, জেনীভা সহর সেইখানে অবস্থিত। জেনীভা হ্রদের অল্প নাম লেমান। হ্রদটির জল অতিশয় স্বচ্ছ এবং নীলবর্ণ। শীতকালে ইহার জলে ৩৩ ফুট গভীর স্থানেও একটি শাদা চাকুতি রাখিলে তাহা দেখা যায়; গ্রীষ্মকালে জল কিছু ঘোলা হওয়ায় তাহা ২১ ফুট গভীরতা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর থাকে। পুরাকালে অপেক্ষাকৃত অসভ্য যুগে ইউরোপের অনেক স্থানে লোকে নিরাপদ থাকিবার জন্ত হ্রদের জলে খুঁটি পুতিয়া তাহার উপর ঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিত। এইরূপ ঘরগুলিকে হ্রদ-গৃহ (Lake Dwellings) বলা হয়। জেনীভা হ্রদে তীরে এইরূপ কতকগুলি হ্রদ-গৃহের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। জেনীভা হ্রদে কখন কখন মরীচিকা দৃষ্ট হয়।

জেনীভা খুব প্রাচীন সহর। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্বে ইহা প্রাচীরে ঘেরা ছিল। রাস্তাগুলি তখন সংকীর্ণ ছিল, ও তাহা হইতে জল-নিকাশের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে র্যাডিক্যাল অর্থাৎ আমূলসংস্কারক দলের ক্ষমতা লাভের পর নগরটি আধুনিক প্রণালীতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন নগরপ্রাচীর ভাঙিয়া সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, রাস্তাগুলিকে প্রশস্ত ও পাকা করা হইয়াছে এবং হ্রদ ও নদীর তীরে পাকা পোস্তা ও ঘাট নির্মিত হইয়াছে। রোন নদীর যে-অংশ জেনীভা সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে দুটি ছোট দ্বীপ আছে। একটিতে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত বাগান করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষা-

নীতিকার রুসোর মূর্তি আছে। এই স্থানটিতে কয়েকবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

১৯২০ সালে জেনীভার লোক-সংখ্যা ১,৩৫,০৫৯ ছিল; এখন কিছু বাড়িয়াছে। তা ছাড়া, এখানে লীগ অব নেশন্স-প্রভৃতির অধিবেশনের সময় প্রতি বৎসর কিছু দিনের জন্ত নানা দেশের লোক আসায় লোকসংখ্যা কিছু বাড়িয়া যায়। জেনীভা ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ইহা বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও সাহিত্যিকের জন্মস্থান বা বাসভূমি। এখানে কয়েকটি প্রাচীন গির্জা, শিক্ষায়তন প্রভৃতি আছে। সেই পীটারের গির্জাটি ১১২৪ দশকে নির্মিত। যে শিক্ষায়তনটি ১৮৭৩ দশকে জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তাহা ধর্মোপদেষ্টা ক্যালভিন কর্তৃক ১৫৫৯ দশকে স্থাপিত হয়। ইহার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থসংগ্রহ বেশ বড়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মুখে নানা জাতির খৃষ্টীয় ধর্মসংস্কারকদের মূর্তি আছে। রুশীয় গির্জা, বড় ডাকঘর, এবং অনেকগুলি মিউজিয়াম দেখিবার জিনিষ। রুসো মিউজিয়ামটি ছোট। ইহাতে রুসোর নানা রকম ছবি, তাঁহার নানা গ্রন্থের নানাবিধ সংস্করণ প্রভৃতি আছে। তাঁহার কোন কোন বহির হস্তলিপি প্রভৃতিও আছে। জেনীভার মানমন্দিরটি উৎকৃষ্ট। সহরটিতে পণ্যশিল্প শিখাইবার অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ঘড়ি নির্মাণ, রসায়নবিদ্যা, ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান হয়। এখানে হাসপাতাল প্রভৃতি জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান অনেক আছে। জেনীভার কাছে সাত শত বৎসর আগে হইতে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার মেলা বসে। তাহাতে ইটালীয়, স্পেন ও ফরাসী দোকানদারেরা নানারকম জিনিষ বিক্রী করে।

জেনীভা হ্রদ ও রোন নদী দ্বারা সহরটি দুইভাগে বিভক্ত। সাতটি সেতুদ্বারা উভয় অংশ সংযুক্ত।



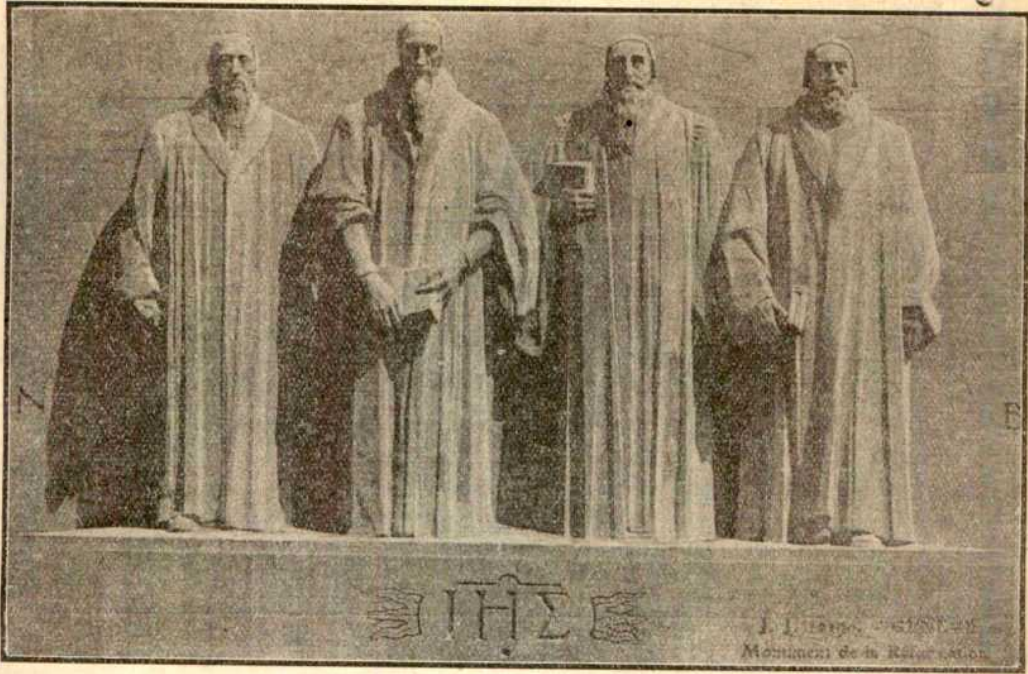
জেনীভায় রুসোর প্রস্তর-প্রতিম

জেনীভা হ্রদের পোস্তার সমান্তরাল রাস্তাটির উপর অনেকগুলি হোটেল আছে। এইগুলির সামনে কোন ঘরবাড়ী নাই এবং এইগুলি হইতে হ্রদ ও পর্বতের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় বলিয়া, ধনী ও ফ্যাশনেবল লোকেরা এইসব হোটেলে থাকে। তন্মধ্যে একটিতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি একদিন চা-পান ও একদিন মাধ্যাহ্নিক আহার করিয়াছিলাম। হোটেলটির কামরা, হল প্রভৃতি বড় বড়, আস্বাবও উৎকৃষ্ট; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য, আমি যে অপেক্ষাকৃত সস্তা ছোট হোটেলটিতে ছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হয় নাই।

হ্রদের উত্তরতীরস্থিত পোস্তা ও থাটগুলির সমান্তরাল রাস্তার কিয়দংশের পাশ দিয়া সুন্দর গাছের সারি আছে। এই পোস্তায় ও রাস্তায় অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় জ্ঞানী পুরুষ বালকবালিকা দলে দলে বেড়াইতে আসে। রবিবার ও অশ্রাচ্ছট্র দিনে ত খুবই ভিড় হয়। এই সব দিনে ষ্টীমার ও অশ্রা সব রকম ছোট বড় জলযানে এত ভিড় হয়, যে, মনে হয় যেন সারা সহরের লোক আমোদ-প্রমোদের জন্য বাহির হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের ক্ষতি

বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল হয়, স্ততরাং কর্ণশক্তিও বাড়ে। অবরোধ-প্রথা না থাকায় মেয়েরাও পূর্ণমাত্রায় উপকৃত ও আনন্দিত হইবার সুযোগ পায়। আমরা যখন পাশ্চাত্য লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে চাই, তখন মনে রাখিতে হইবে, যে, আমাদের প্রতিযোগিতা এমন সব জাতির সঙ্গে যাহাদের নরনারী উভয়েই স্বস্থ, শিক্ষিত ও সর্ববিধ কার্যনির্বাহে সমর্থ। জেনীভা হ্রদের উভয়তীরে ঘাটে ঘাটে বিস্তর চা কফি ও খাবারের দোকান আছে। ঘাটে ষ্টীমার নৌকা প্রভৃতি লাগিবা মাত্র, যাত্রীরা, যাহার যেখানে ইচ্ছা, নামিয়া যায় এবং ছায়াতরুর নীচে রক্ষিত চেয়ারে বসিয়া “জলযোগ” করে, এবং তাসখেলা, পড়া প্রভৃতি বাহার যাহা ইচ্ছা করিতে থাকে। এই প্রকারে থোলা স্বাস্থ্যকর জায়গায় প্রায় সমস্তটা দিন কাটাইয়া তাহারা অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসে। জলযান ছাড়া অনেকে রেলও যাতায়াত করে। যাহাদের নিজের মোটর গাড়ী আছে, তাহারা তাহাতে বেড়াইতে যায়।

জেনীভা যে ক্যান্টন বা জেলার প্রধান সহর, সেই



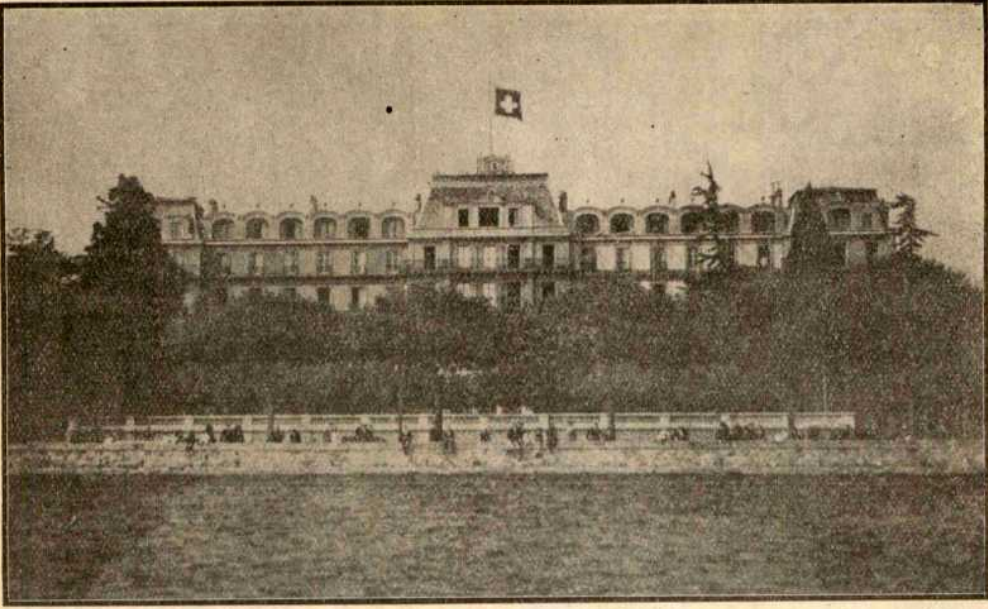
জেনীভায় রিকর্মেসন স্মৃতি-মূর্তি

জেলার জমী স্বভাবতঃ উর্বর না হইলেও অধিবাসীদের পরিশ্রমে উর্বর হইয়াছে। এইজন্য তরি-তরকারীর বাগান, নানাবিধ ফলের বাগান, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা এই ক্যান্টনের লোকেরা খুব রোজগার করে। একদিন বিকালে ছোট একটি মোটর-নৌকায় হ্রদ পার হইয়া দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটি চা-কফির দোকানে “জলযোগ” করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা বাস্তা দিয়া অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাহার ধারে কয়েকটি ছোট ছোট ফলের বাগান দেখিলাম। সামান্য এক আধ কাঠা জমীতে কত ছোট ছোট ফলের গাছে কত ফল ফলিয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যে-সব গাছের ডাল লতানিয়া নয়, সেইরূপ অনেক গাছকেও বেড়ার তারের উপর দিয়া লতার মত শাখা বিস্তার করান হইয়াছে। এক একটি ডালে এত ফল ধরিয়াছে, যে, মনে হয় যেন ভাঙিয়া পড়িবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নির্বাহ করা হয় বলিয়া জুইজাবল্যাণ্ডে সব জেলাতেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র, ফলের বাগান প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। জুইসুরা চাষ ছাড়া অল্প অনেক

কাজের দ্বারাও উপার্জন করে; যথা, ঘড়ি নির্মাণ, মুগপাত্র নির্মাণ, গণিতযন্ত্র নির্মাণ, বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ, ইত্যাদি।

জেনীভা মোটর উপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা-গুলি মন্দ নয়। তবে, তাহাতে স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য, নৈপুণ্য বা বৈচিত্র্য বেশী কিছু নাই। সেরাটি যত বড়, সে হিসাবে হোটেলের সংখ্যা অনেক বেশী। তাহার কারণ, জুইজাবল্যাণ্ডে পৃথিবীর সব মহাদেশ হইতে লোক আসে উহার সৌন্দর্য্য দেখিতে, স্বাস্থ্যলাভ করিতে, এবং নানা অন্তর্জাতিক সভাসমিতিতে যোগ দিতে।

আমি যখন জেনীভা ঘাই, তখন তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছুটির সময়। সুতরাং আমি কেবল অট্টালিকাগুলির বহির্দেহ এবং কয়েকটি কামর দেখিয়াছিলাম, কর্ম্মনিরত অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ দেখি নাই। হলে অনেক অধ্যাপকের আবক্ষ মূর্তি দেখিলাম। তাহাদের মুখ বুদ্ধির পরিচায়ক। দেখিবার সময় মুখগুলির উগ্রতা-বিহীন শান্ত সংযত ধীর ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ও ফিরঙ্গীদের



জেনীভা জাতিসংঘের সম্মেলন-গৃহ

অনেকের মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন, মাহুশগুলা চটিয়া রাগিয়াই আছে, যেন কাহাকেও আক্রমণ করিতে বা বশ্যতাস্বাকার করাইতে যাইতেছে। ইউরোপে ঠিক এই ধরণের চেহারা বেশী চোখে পড়ে নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। এদেশে ইউরোপীয়রা বিশেষতঃ, ইংরেজরা, অহুভব করে, যে, তাহাদের অস্বাভাবিক প্রাধান্য ও প্রভুত্ব রক্ষার একটা প্রধান উপায় বাহ্য ও মানসিক মারমুর্তি পরিহার না করা। কিন্তু তাহাদের নিজের দেশে—স্বাধীন দেশে, তাহাদের এক্রপ ব্যবহার অনাবশ্যক, এবং তথায় চোখরাডানি সহ্য করিবার লোকও খুব কম।

নানাজাতির খৃষ্টীয় ধর্মসংস্কারকদের মূর্তিগুলি গম্ভীর-ভাবোদ্দীপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে এই মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ। প্রাচীরটির একটি অংশের ছবি দেওয়া হইল। ক্যালভিন, জন নক্স, হুগু প্রভৃতির এই মূর্তিগুলির নীচে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত বচন খোদিত আছে। প্রাচীরটির পাদদেশে একটি কৃত্রিম জলপ্রোত প্রবাহিত। তাহার জল স্বচ্ছ ও নির্মল। তাহাতে শ্বেতপদ্মের মত ফুল ফুটিয়া

রহিয়াছে। দেখিয়া আমার কবিকায়ীদের বর্ণিত প্রেম-ভক্তিকমলশোভিত অনন্ত জীবনপ্রোতের কথা মনে পড়িয়াছিল।

জেনীভার অগ্র একটি স্মারক প্রস্তরমূর্তি স্বাধীনতা-প্রিয় জুইস্দের ইতিহাসের একটি ঘটনার কথা লোককে ভুলিতে দেয় না। ১৫১৯ ঈশাব্দে ফিল্বেয়ার্ বারুতেলিয়ে নামক এক বীর পুরুষের ফাঁসী হয়। যেখানে তাঁহার ফাঁসী হয়, এখন সেখানে একটি অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। সেই কারণে বোধ হয় ফাঁসীর ঠিক জায়গাটিতে তাঁহার মূর্তি রাখিবার জগ্ৰ তাহা বাড়ীটির প্রাচীরসংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। ফিল্বেয়ার্ বারুতেলিয়ে নিজের ধর্মবুদ্ধিসম্মত মত প্রকাশের অধিকার ত্যাগ না করায় তাঁহার ফাঁসী হয়। যে তারিখে তাঁহার ফাঁসী হইয়াছিল, প্রতি বৎসর সেই তারিখে জেনীভার নাগরিকেরা মূর্তিটিকে পুষ্পমালাবিভূষিত করিয়া এবং বক্তৃতা দি করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

লীগ অব নেশন্সের সেক্রেটারিয়াটের (দপ্তরখানার) জগ্ৰ ভূমী কেনা হইয়াছে, বাড়ী এখনও নির্মিত হয় নাই। এখন যে-সব বাড়ীতে লীগের আফিসাদি আছে, তাহা

অন্য উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল। লীগের ইন্টার-ন্যাশনাল লেবার আফিস (অন্তর্জাতিক শ্রমসম্পর্কীয় আফিস) তাহার জন্ম নির্মিত বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। ইহা বৃহৎ, কিন্তু ইহার স্থাপত্যের প্রশংসা করিতে পারা যায় না। ইহার একটি সোপানাবলীর পার্শ্বস্থিত দেওয়ালে রঙীন কাচের বৃহৎ ছবি আছে। তাহাও আমার উৎকৃষ্ট মনে হইল না। বাহিরে যে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি আছে, তাহাও মূর্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে।

এই লেবার আফিসে আমি দুই একবার মাত্র গিয়াছিলাম। তাহা হইতে ইহার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক মত প্রকাশ করা যায় না। তবে, আমি যেমন ইউরোপের কোন কোন দেশে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি, তেমনি কোন প্রতিষ্ঠান দুই একবার দেখিয়াও যাহা মনে হইয়াছিল, তাহা বলা চলিতে পারে—তাহার মূল্য যাহাই হউক। একটা ধারণা আমার এই হইয়াছিল, যে, এই আফিসে প্রাচ্য-দেশের লোক খুব কম। এটা শুধু ধারণা নয়, ইহার একটা প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জাপান ও ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি। জাপান স্বাধীন দেশ, পৃথিবীর প্রবলতম চারিটি দেশের একটি। লীগে জাপান টাকাও দেয় বিস্তর। কিন্তু দেখিলাম, একটি ছোট কামরায় কেবল দু'জন জাপানী ভদ্রলোক কাজ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, জাপানের পক্ষ হইতে যত লোকের আফিসে কাজ করা উচিত তত লোক নাই। তাঁহারাও বলিলেন, যে, জাপান সম্বন্ধে রিপোর্টাদি লিখিবার জন্ম দুটি মাস্থ্য যথেষ্ট নহে। ভারতবর্ষেরও কেবল দুটি মাস্থ্য অত বড় আফিসে কাজ করেন। তাহার মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস অস্থায়ীভাবে কাজ করিতেছিলেন। কোন স্থায়ী কাজ তিনি পাইবেন কি না, এখনও ঠিক হয় নাই। রিপোর্ট লেখা তাঁহার কাজ। তাহার জন্ম তাঁহাকে আফিসের সময় ছাড়া অন্য সময়ও খাটিতে হইত, দেখিয়াছি। কুরিয়ান্ নামক আর-একটি ভারতীয় লোক এই আফিসে কাজ করেন। ইনি ত্রিবাঙ্কড়ের লোক। ইহার কাজ স্থায়ী। এই আফিসের

ইউরোপীয় কতকগুলি কর্মচারীকে গল্পগুহব করিয়া সময় কাটাইতে দেখিয়াছিলাম।



ডাঃ রজনীকান্ত দাস

আগে হইতে সময় নির্দিষ্ট করিয়া একদিন এই আফিসের ডিরেক্টর মশ্রু আল্‌বেয়ার্ টমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইনি ফ্রান্সের লোক। মশ্রু টমা নমস্কার ও করকম্পনানন্তর তাঁহার কামরায় আমাকে বসাইলেন। কথা বড় বেশী হইল না। তিনি অবাধে ক্ষত ইংরেজী বলিতে পারেন না। সাধারণ নানাবিষয়ে ২৩ মিনিট কথা হইবার পর তিনি এক্রূপ ভদ্রী করিলেন মনে হইল, যে, তিনি নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, আপনারা বড় ব্যস্ত লোক, আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। তাহাতে তিনি সায় দিলেন! বলিলেন না, “না মশায়, এমন আর কি ব্যস্ত? বসুন না,” ইত্যাদি। ভদ্রতা অনেক সময় আমাদিগকে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতে বাধ্য করে। তিনি যে তাহা করিলেন না, ইহা এক দিক্ দিয়া ভাস বটে। কিন্তু আমি বিদেশ হইতে লীগের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হইলেও, সম্পূর্ণ অজ্ঞও নহি; সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি আমাকে এক-আধটা প্রশ্নও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহার সেরূপ কোন কোতূহল দেখিলাম না। বোধ হয় সবুকারী রিপোর্ট এবং ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয়দের লেখা ভ্রম-বৃত্তান্ত ও অগ্রান্ত বহির্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ম ইহার যথেষ্ট মনে করেন।

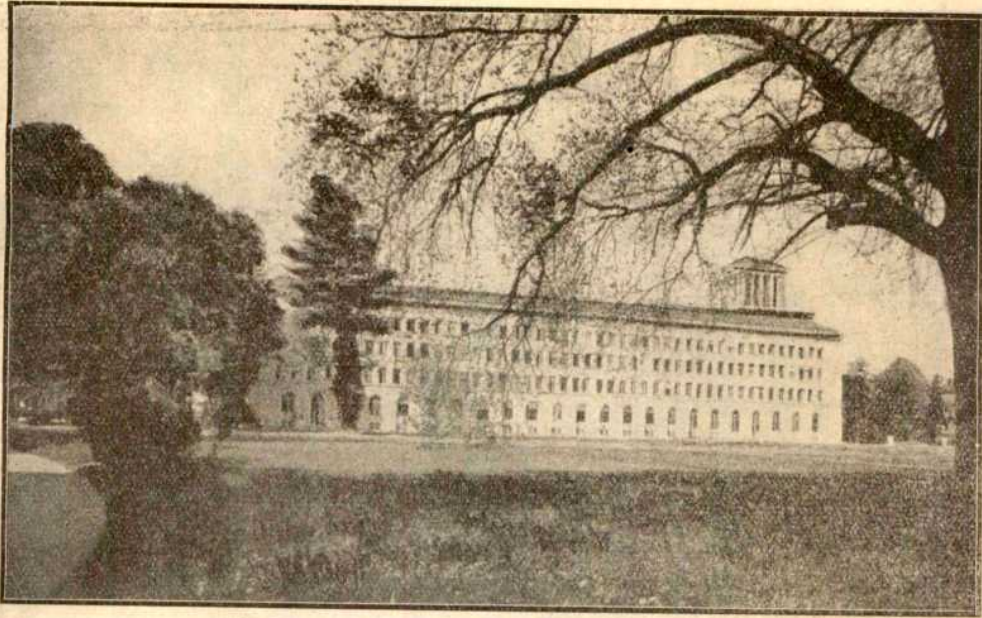
অন্তর্জাতিক শ্রম আফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর মিস্টার



ফ্রান্সের মিঃ এলবার্ট টমাস—জেনীভার অন্তর্জাতিক শ্রমিক-
সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল

বাটলার ইংরেজ। টমা সাহেবের সঙ্গে মূল্যকাৎ শেষ
করিয়া ইহার নিকট গেলাম। ইহার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত
দীর্ঘকাল কথা হইয়াছিল; কিন্তু ইনিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে
নিজে হইতে আমাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। ইহাদের
এনের মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই ভাব বিদ্য-
মান, যে, ভারত সম্বন্ধে খাঁটি খবর যাহা কিছু জানিবার
আছে, তাহা শ্রমিকদের মুখ ও লেখনী হইতে সম্পূর্ণরূপে
জানিতে পারা যায়। কথাপ্রসঙ্গে আমি বাটলার
সাহেবকে বলিলাম, ভারতবর্ষ স্বশাসন-ক্ষমতা লাভের যে
রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে কলেজের বিতর্ক-
সভাগুলি উহার যেরূপ সাহায্য করিতে পারে, লীগও

সেইরূপ পারিবে। তিনি চূপ করিয়া রহিলেন, ইহা না
কিছুই বলিলেন না। আমার বলা উচিত ছিল, লীগ
তাহাও পারিবে না। কারণ, কলেজের বিতর্ক-সভা-
গুলিতে ছাত্রেরা তবু ভারতবর্ষের স্বরাজ, স্বাধীনতা
প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে, লীগ তাহাও
পারে না। অন্তর্জাতিক শ্রম আফিস সম্বন্ধে আমি
বলিলাম, এই আফিস যদি ঠিক ঠিক কাজ করে, তাহা
হইলে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের কিছু উপকার হইতে পারে।
কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে জ্রীলোকদের সংখ্যা কম
নয়। সেইজন্য আমি বলিলাম, পুরুষেরা জ্রীলোকদের
অভাব অভিযোগ হুঃখ সব সময় জানিতে বুঝিতে পারে
না, কিম্বা তাহা জানাইতে ইচ্ছুক বা ব্যগ্র হয় না; এই-
জন্য জ্রীলোকদের পক্ষ হইতে তাহাদের কথা জানাইবার
নিমিত্ত কোনও ভারতীয় শিক্ষিত ও যোগ্য জ্রীলোককে
জ্রীজাতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে জেনীভায় পাঠান
উচিত। আমি বলিলাম, এ যাবৎ ভারতীয় পুরুষ ও জ্রী-
জাতীয় শ্রমিকদের জগৎ পুরুষ প্রতিনিধিরা যে-প্রকারে
যাহা বলিয়াছেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত শিক্ষিতা
মহিলা জ্রীলোকদের জগৎ তাহা বলিতে পারিবেন।
বাগ্মতা, সাহস এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞান, কিছুই তাঁহার
অভাব হইবে না। কিন্তু, আমি ইহাও বলিলাম, ভারত
গবর্নমেন্টের ইহার মত কোন মহিলাকে পাঠাইবার
সম্ভাবনা নাই। তখন মিঃ বাটলার বলিলেন, শ্রমিক
আফিস স্বাধীন ও সাক্ষাৎভাবে কোন মহিলা প্রতিনিধিকে
আহ্বান করিতে পারেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি, এ
বৎসরও কোন ভারতীয় মহিলাকে আহ্বান করা হয়
নাই। ভবিষ্যতেও হইবে কি না, বলা যায় না।
সম্ভাবনা কম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও যে নারী
শ্রমিকদের প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত একমাত্র শিক্ষিতা,
নারী, তাহাও নহে, শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও
তাহাদের হিতসাধনে নিরত শিক্ষিতা নারীও আছেন।
যেমন, আহমেদাবাদের শ্রীমতী অননুয়া বাই। ভারতীয়
শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে কথা উঠায় আমি বলিলাম,
তাহারা যে অপেক্ষাকৃত কম কার্যক্ষম, তাহার একটা
প্রধান কারণ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা। অবশ্য যথেষ্ট



অন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের নবনির্মিত গৃহ (জেনীভা)

খাদ্যাভাব এবং অস্থিহতাও অন্যতম প্রধান কারণ। আমি বলিলাম, সর্বসাধারণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে গবন্মেণ্ট এপর্যন্ত কোন উৎসাহ দেখান নাই, বরং কখন কখন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, যে সৈন্যদলে শিক্ষিত সৈনিক বেশী, তাহার রণদক্ষতা বেশী। স্বতরাং শ্রমের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা শ্রমিকদিগকে অধিকতর কার্যদক্ষ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? মিস্টার বাটলার বোধ হয় চতুর লোক; কেন না, তিনি কথা বলিতেছিলেন কম, শ্রোতার কাজটাই ভাল করিয়া করিতেছিলেন। এখন কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিলেন, “ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষার চাহিদা (demand) আছে কি?” আমি বলিলাম, “আছে।” ইহার বেশী আমি তখন কিছু বলি নাই। কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনে বিঁধিয়া আছে। বাস্তবিকই কি একটা ভাল বা ভাল বলিয়া স্বীকৃত জিনিষের চাহিদা না থাকিলে গবন্মেণ্ট কোন দেশে তাহার বন্দোবস্ত করেন না? ধরুন, বসন্তের জ্বর টীকা দেওয়া। ভারতবর্ষে ইহা চালাইবার খুব চেষ্টা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু

অনেক প্রদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে ইহার চাহিদা নাই-ই, বরং প্রতিকূল ভাব আছে। ইংলণ্ডেও প্রথম ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। শিক্ষার কথা ধরুন। জাপানে যে সার্বজনীন শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা চাহিদার দরুন নহে; সম্রাট মুৎসুহিতো নিজেই তাহা করাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেও গত শতাব্দীতে যে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহাও চাহিদার জন্ম নহে।

মিঃ বাটলার শ্রমিক আফিস হইতে প্রকাশিত কিছু বই ও রিপোর্ট দিতে চাহিয়াছিলেন; তাহা দেশে ফিরিবার পর পাইয়াছি। শ্রমিক আফিস হইতে প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ নামক মাসিক পত্রের সহিত মডার্ন রিভিউ ও ওয়েলফেয়ারের বিনিময়ে মস্যা টমা রাজী হওয়ায় ঐ কাগজ আমি পাইতেছি এবং আমাদের দুখানি পাঠাইতেছি।

অন্তর্জাতিক শ্রম আফিসের লাইব্রেরী মূল্যবান। শ্রম, শ্রমিক, পণ্যশিল্প, কলকারখানা দি বিষয়ক নানাদেশীয় পুস্তক, রিপোর্ট ও সর্ববিধ সংবাদের ইহা সংগ্রহাগার। এইসকল বিষয়ে ঘাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহারা এখানে



7111 Genève. L'Université et le Muséum

জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়

যত উপকরণ পাইবেন, অল্প কোন একটি লাইব্রেরীতে বোধ হয় তত পাইবেন না। ইহার আস্বাবের সব বা অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় কাঠ হইতে নির্মিত। তাহার জন্ম ধনুবাদটা ভারতবর্ষ পাইয়াছে, কি মনিব ইংলণ্ড পাইয়াছে, মনে পড়িতেছে না। লীগের নিজের লাইব্রেরীতেও, বেশী না হইলেও, বিস্তর বহি আছে। সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কালে উহা বড় লাইব্রেরী হইবে। ইহার জন্ম কি কি রকম বহি কেনা হয়, উপহার দিলেই বা কি কি রকম বহি ইহাতে রাখা হয়, জানি না, বুঝিতে পারি না। গ্রন্থকার মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সম্মতিক্রমে গত বৎসর ২ই মার্চ আমি ডাকে রেজিষ্টারী করিয়া নিম্নলিখিত বহিগুলি লীগ লাইব্রেরীতে উপহার পাঠাইয়াছিলাম :—

Rise of the Chirstian Power in India, in five volumes ; Story of Satara ; History of Education in India under the Rule of the East India Company ; Ruin of Indian Trade and Industries ; and Colonization in India.

কিন্তু যখন আমি সেপ্টেম্বর মাসে লীগের লাইব্রেরী

দেখি, তখন বহিগুলি আমার চোখে পড়ে নাই। কোন কোন বহি লীগ লাইব্রেরীতে রাখা না রাখা কি ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের কোন প্রকার নির্দেশ অনুসারে হয় ?

একমাত্র ভারতবর্ষীয়েরাই যাহার পরিচালক ও মালিক এরূপ কোন ভারতবর্ষীয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ লীগ দেশের লাইব্রেরীর পাঠকক্ষের টেবিলে দেখিলাম না। অল্প বহু বহু সাময়িক পত্র রহিয়াছে দেখিলাম। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রভাব যে প্রতিষ্ঠানে খুব বেশী, তাহাতে মডার্ণ রিভিউ না থাকিতে পারে। কিন্তু হিন্দুস্থান রিভিউ এবং ইণ্ডিয়ান রিভিউও দেখিলাম না। যুবকদের খ্রীষ্টিয়ান সভার মুখপত্র ইয়ং মেন্ অব্ ইণ্ডিয়া নামক মাসিকটি টেবিলে দেখিলাম। কেবলমাত্র দেশী খ্রীষ্টিয়ানরা উহার পরিচালক, মালিক বা কর্তা নহেন ; বিদেশী লোকও আছেন। ভারতীয় সাপ্তাহিকের মধ্যে পুনর্নির্দেষ্ঠ অব্ ইণ্ডিয়া টেবিলে রহিয়াছে দেখিলাম। ইহা খুব যোগ্যতার সহিত পরিচালিত। আমি লীগের তথ্য-প্রচার বিভাগের (Information Sectionএর) প্রধান কর্মচারী মিষ্টার কামিংস্কে বলিয়াছিলাম, ভারতীয় সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্র-সমূহের প্রতিনিধিত্বানীয় উপযুক্তসংখ্যক

কাগজ লাইব্রেরীর টেবিলে রাখা হয় না ; ভারতীয় যে-সব সাময়িক পত্রিকার সব-চেয়ে বেশী কাঁটতি, তাহার একটিও সেখানে নাই ; অধিকাংশ রকম বাজনৈতিক মতের মূখ-পত্রও তথায় নাই। তিনি বলিলেন, “আমি ফরোয়ার্ড পাই” (যদিও তাহা টেবিলে রাখা হয় না)। আমি বলিলাম, “আমি মাসিক ও ত্রৈমাসিকের কথা বলিতেছি।” তিনি বলিলেন, “যে-সব কাগজের প্রকাশকেরা লীগকে বিনামূল্যে কাগজ পাঠান, তাঁহাদেরই কাগজ রাখা হয়।” তদনুসারে আমি লীগ-লাইব্রেরীতে মডার্ন-রিভিউ এবং ওয়েলফেয়ার পাঠাইতেছি। কিন্তু সে দুটি টেবিলে রাখা হইতেছে কি না, জানি না।

একদিন আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত ভিল্নভ্ নামক স্থানে রম্যা রল্ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেখানে ভিলা অল্গা নামক ভবনে তাঁহার পিতা ও ভগিনীর সহিত বাস করেন। ভিল্নভ্ রেল্ জেনীভ্ হইতে প্রায় ৬৬ মাইল। প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। ষ্টীমারেও যাবা যায়, এবং তাহা অধিকতর প্রীতি-করও বটে ; কিন্তু তাহাতে সময় বেশী লাগে। লন্ডনে আমাদিগকে ট্রেন বদলাইতে হইল। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়াছিলাম। গাড়ী ও বেকিগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভারতবর্ষের তৃতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর মত নোংরা নয়। ভারতবর্ষে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অল্প যে-সব অসুবিধা আছে, তাহারও কিছুমাত্র সুইজার-ল্যান্ড বা ইউরোপের অন্য কোন দেশে দেখি নাই। কারণ, দেশগুলি স্বাধীন। আমাদের দেশে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে হইলে টিকিট ক্রয়, সংকীর্ণ ফাটক দিয়া প্লাটফর্মে প্রবেশ, এবং তৎকালে কখন কখন ঘাড়-খাড়া প্রহারসম্ভোগ, ধাক্কাধাক্কি করিয়া গাড়ীতে প্রবেশ, স্থান্য স্থানাভাব, গাড়ী ও বেকিগুলির অপরিষ্কার অবস্থা, পায়খানার নোংরা অবস্থা ও জলাভাব, ইত্যাদি হইতে নরকের কিছু ধারণা জন্মে। এরূপ অবস্থার জন্য আমরা যে কতকটা দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রেলের কর্তৃপক্ষ যদি সব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করেন, যথেষ্ট জল বোগান, এবং পরিচ্ছন্নতার প্রতি কড়া নজর রাখেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ উন্নতি নিশ্চয়ই হইতে পারে।

ভিল্নভ্ স্টেশনে নামিয়া কিছুদূর হাঁটিয়া ভিলা অল্গা পৌছিতে হয়। ভিলা অল্গার অব্যবহিত নিকটের রাস্তাটির দুদিকে এমন ঘনপত্রাবলী বিশিষ্ট দুই সারি ছায়াতরু আছে, যে, রোদ ত দূরে থাক, অল্প বৃষ্টি হইলে তাহাও বোধ করি গায়ে লাগে না। রম্যা রল্ ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী মাদলিন্ আমাদিগকে তাঁহাদের বাগানে বসাইলেন। আমার জামাতা শ্রীমান্ কালিদাস নাগের নিকট হইতে তাঁহারা আমার নাম শুনিয়াছিলেন। কালিদাস ক্রান্তে অধ্যয়ন করিবার সময় রল্ মহাশয়কে মহাত্মা গান্ধী সখস্বীয় পুস্তক রচনায় কিছু সাহায্য করিয়া ছিলেন। এই সূত্রে রল্ পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। রল্‌র বয়স যাটের উপর। তখন অল্প দিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে সবে আরোগ্য লাভ করিয়া ছিলেন। এইজন্য স্বাস্থ্য ভাল দেখাইতেছিল না। তাঁহার চক্ষু স্বনীল, প্রতিভায় সমৃদ্ধ। মুখে দান্তিকতা বা তরুণ কিছু লেশমাত্র নাই। তিনি ইংরেজী বলেন না, তাঁহার ভগিনী বলেন। তাঁহার সহিত অল্প ঘাঘা কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা শ্রীমতী মাদলিনের মধ্যবর্তিতায়। তাঁহাদের অধ্যয়নকালের টেবিলে শ্রীমান্ কালিদাস ও শ্রীমতী শান্তার ফোটোগ্রাফ দেখিয়া আমি আহ্লাদ প্রকাশ করায় শ্রীমতী মাদলিন্ হাসিয়া বলিলেন, “আপনাকে দেখাইবার জন্য উহা ওখানে রাখা হয় নাই ; উহা এমনিই সব সময় টেবিলের উপর থাকে।” রম্যা রল্‌র বৃদ্ধ পিতা ভারতবর্ষের লোক আসিয়াছে শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ও আমাদের সহিত করকম্পন করিলেন। তাঁহার বয়স নব্বই পাব হইয়াছে। সেরূপ বয়সের পক্ষে তিনি এখনও বেশ সোজা ও শক্ত আছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ যে আনন্দ ও সম্মানের বিষয়, তাহা তাঁহাকে ইংরেজীতে জানাইলাম। তাঁহার কন্ঠা তাঁহাকে তাহা ফরাসীভাষায় বলিলে তিনিও আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

রম্যা রল্‌র গ্রন্থাবলীর ভারতবর্ষে কিরূপ প্রচার, সে-বিষয়ে কথা উঠিলে, আমি বলিলাম, ভারতবর্ষে ক্রোধ বেশী লোক জানে না, এই জন্য জ্যা জিওর্জ (জন ফিঃ টা-ফার) প্রভৃতি বহির ইংরেজী অম্ববাদ ইংরেজী-জানা অনেক লোকে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী সখস্বীয় তাঁহার ক্রোধ

বহির যে ইংরেজী অমুবাদ ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে, তাহারও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় আমিই বলিলাম, জ্যা ক্রিস্তফের বাংলা অমুবাদও ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। তখন শ্রীমতী মাদলিন্ বলিলেন, “ই, উহা ‘কলোলে’ বাহির হইতেছে বটে।” তাহাতে আমাদের দলের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি বাংলা জানেন? কেমন করিয়া শিখিলেন?” তিনি বলিলেন, “অল্পপুত্র জানি, কালিদাস কিছু শিখাইয়া ছিলেন।” রবীন্দ্রনাথের ইটালী-ভ্রমণ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, আমরা জানিতে পারিলাম, তথায় দার্শনিক ক্রোচের সহিত রবীন্দ্রনাথের যাহাতে সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার জন্ত কিছুপ চেষ্টা হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ক্রোচে মুনোলিনির দলের লোক নহেন বলিয়া এই চেষ্টা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা ধন ভিল্‌নেতে হোটেল ডি বায়রনে ছিলেন, তখন তাঁহাদের যে ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল, শ্রীমতী মাদলিন আমাদিগকে তাহা দেখাইলেন। আমরা অবগত হইলাম, রল্যা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “শ্রীকান্ত” উপন্যাসের ইংরেজী অমুবাদের ইটালীয় অমুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম, জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক কার্যের কথা উঠিলে রল্যা বলিলেন, “তাঁহার কবি-জনোচিত কল্পনা-শক্তিও আছে।” তাহাতে আমাদের দলের এক জন এই মর্মের কথা বলিলেন, যে, ভারতবর্ষে কবি-প্রতিভা, দার্শনিক প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রভৃতির কার্য আলাদা আলাদা করিয়া সম্বন্ধ-বিহীন ভাবে দেখা হয় না; সমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া জাগতিক সকল বিষয়ের একটি সমগ্রসীমিত ধারণা করাই ভারতবর্ষের আদর্শ ও লক্ষ্য। তখন রল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আদর্শমুখায়ী পুস্তক কোন ভারতীয় লিখিয়াছেন কি? আমি বলিলাম, “আমি তা জানি না।” তিনি জানিতে চাহিলেন, “তেমন উপযুক্ত লোক কেহ আছেন?” আমি আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল মহাশয়ের নাম কুরিলাম। রল্যা জানিতে চাহিলেন, তিনি এখনও কেন

লেখেন নাই। অবশ্য এরূপ প্রশ্নের উত্তর শীল মহাশয়ই দিতে পারেন। আমি কেবল বলিলাম, “হয়ত তিনি নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহান, অথবা হয়ত তিনি মনে করেন ইহার জন্ত এখনও তিনি প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, কিম্বা ক্রমাগত নূতন অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা তাঁহার ধারণা অল্পবল্প পরিবর্তিত হইতেছে, ইত্যাদি।”

রল্যাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। ঘড়ি দেখিয়া বুঝা গেল, শীঘ্র ঐন ছাড়িবে। স্মৃতবাং দ্রুত চলিতে লাগিলাম। আমাদের দলে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ। তিনি দৌড়িয়া আগেই গাড়ীতে উঠিলেন। রজনী-বাবুও উঠিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। আমি বুড়া মাছ, দৌড়ের প্রাতিযোগিতায় অসমর্থ; স্মৃতবাং বলা বাহুল্য, আমি অনেক দূরে সকলের পশ্চাতে ছিলাম। সিটি দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কিন্তু রজনী-বাবুর জ্যৈষ্ঠ দূর হইতে হাত নাড়িয়া গাড়ী থামাইতে অমুরোধ করিলে, কণ্ঠস্থ মহিলা দেখিয়া গাড়ী থামাইলেন এবং বলিলেন, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন। তখন রজনী-বাবুর জ্যৈষ্ঠ আঙ্গুল বাড়াইয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, আমার জ্যাঠা মহাশয়কে আমি কেমন করিয়া ফেলিয়া যাইব? তখন কণ্ঠস্থ আরো কিছুকণ গাড়ী থামাইল এবং আমি গাড়ীতে উঠিতে সমর্থ হইলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী উঠার দ্বারা ব্যাপারটির বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ইহা দেখান যে, বিদেশী কোথাও কোথাও কখন কখন অপরিচিত সাধারণ লোকদের জন্তও কণ্ঠস্থাররা এক-আধ মিনিট গাড়ী থামায়। আমাদের দেশে প্রকৃত বা স্থানীয় হোমরাচোমরা ইংরেজ বা ফিরিকীর জন্ত কখন কখন ঐন অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু দেশী লোকদের জন্ত নয়।

গত সেপ্টেম্বরের ষে-দিন লীগের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের শেষ বৈঠক বসে, তাহার আগের দিন “ভারতীয়” প্রতিনিধিরা মাধ্যাহ্নিক ভোজে কয়েকজন ভারতীয় ও অন্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আমিও ছিলাম। নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা ছিল, সন্ধ্যা একটার সময় ভোজ আরম্ভ হইবে। ভারতীয়দের সময়জ্ঞান ও নিয়মনিষ্ঠা কম, ইউরোপ-প্রবাস-কালে এরূপ

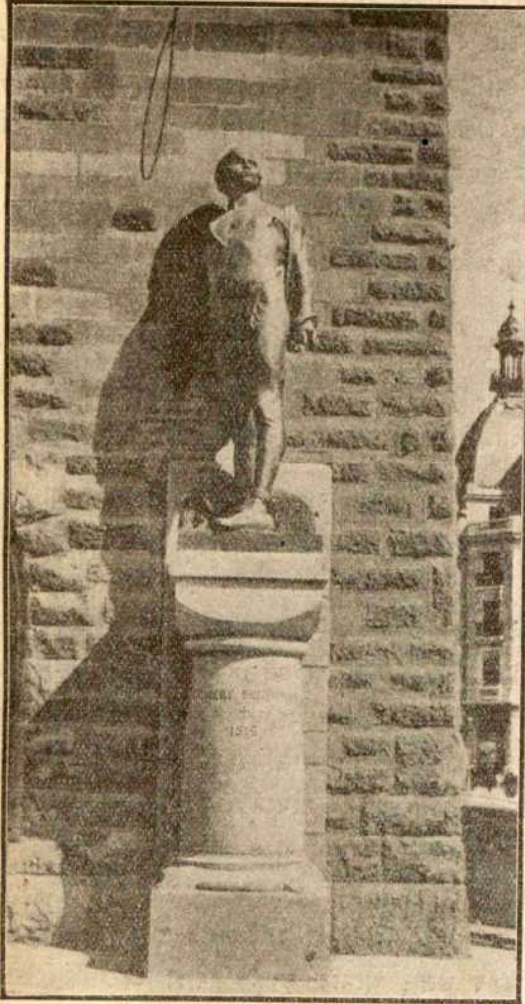
অপবাদের কারণ না জন্মাইবার চেষ্টা আমি বরাবরই করিতাম। সুতরাং, ইউরোপীয় রান্না আমার পক্ষে যুথরোচক না হওয়া সত্ত্বেও এতক্ষণ ক্ষুধা না থাকিলেও, আমি ঠিক সময়ের আগেই গিয়াছিলাম। কিন্তু পরিবেষণ আরম্ভ আর হয় না। তাহার কারণ পরে বলিতেছি। “ভারতীয়” প্রতিনিধিদলের একজন অতিবৃদ্ধ পলিতকেশ ইংরেজ বোধ হয় বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছিলেন। তিনি বারবার বলিতেছিলেন, “I wonder if we are to have any lunch at all to-day,” “আজকের মধ্যাহ্ন-ভোজনটা অদৃষ্টে আছে কিনা, বুঝতে পারছি না।” এই ভ্রলোকটি কথা-প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লীগ্‌ স্যাসেমেন্ট্রীর বৈঠকগুলো লাগছে কেমন?” আমি বলিলাম, “হু একটা ভাল বক্তৃতা শোনা মন্দ নয়; কিন্তু ক্রমাগত বক্তৃতা ও তাহার অনুবাদ বড় একত্রে লাগে—ঠিক যেন ইস্কুলে অনুবাদের পাঠ্যচর্চা।” * তিনি বলিলেন, “কত গুলি বক্তার সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে—তাহাদিগকে একটি নোকায় করিয়া জেনীভা হ্রদের মাঝখানে লইয়া গিয়া টুপ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া।”

ভোজ আরম্ভ হইতে দেরী থাকায় আমি একজন ভারতীয় প্রতিনিধির সহিত কথা কহিতেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, স্নইজার্ল্যান্ডে কোন্ কোন্ আয়গা দেখিলেন। আমি বলিলাম, ভিল্নভে রম্যা রলার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, রম্যা রলী কে? আমি বলিলাম, তিনি ক্রান্তের একজন প্রতিভাবান্ গ্রন্থকার ও বিশ্বপ্রেমিক, আশ্রম্যানীর সহিত যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া স্বদেশ-বাসীদের অপ্রিয় হইয়াছেন, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, ইত্যাদি। ইহাতেও তিনি “গা করিতেছেন” না দেখিয়া আমি বলিলাম, রলী মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিয়াছেন যাহাতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের আলোচনাও আছে। তখন ভ্রলোকটি জিজ্ঞাসিলেন, “বহিখানা ইংরেজী, না ফ্রেঞ্চ?” আমি বলিলাম, “ফ্রেঞ্চ, কিন্তু আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ইংরেজী

অনুবাদ বাহির হইয়াছে, এবং তাহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে।” ভ্রলোকটির শেষ প্রশ্ন এই—“বহিখানি কি আপনি জেনীভা আসিবার পর প্রকাশিত হইয়াছে, এবং উহার বিষয় কি আপনি এখানে আসিয়া শুনিয়াছেন?” উত্তর—“উহা দুই তিন বৎসর হইল বাহির হইয়াছে, এবং অনুবাদও আমি ইউরোপ আসিবার অনেক আগে, পূর্ব বৎসর, বাহির হইয়াছে।” এইরূপ কথোপকথনের পর আমার অনেক বার মনে হইয়াছে, যাহাদের বিশ্বসাহিত্যের অন্ততঃ খবরগুলোও জানা নাই, তাঁহাদের মত লোকের বিদেশে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নহে।

অবশেষে বেলা ২।।০ টার কিছু আগে বা পরে পূর্বোক্ত ক্ষুধিত বৃদ্ধ ইংরেজ বলিয়া উঠিলেন, “Here at last they come—like royalty!” “এত-ক্ষণে এঁরা আসছেন—রাজারাজ্ঞার মত।” তাঁহারা তাইকাউন্ট সেন্সিল ও লেডী সেন্সিল। তাঁহারা হইলেন প্রধান অতিথি। ভোজ আরম্ভ হইল। আগে হইতে এক একটি কার্ডে প্রত্যেক অতিথির নাম ছাপিয়া প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারের সামনে টেবিল রাখা হইয়াছিল। আমি পাশ্চাত্য আদবকায়দা ও ভোজনরীতিতে অনভ্যস্ত। সুতরাং আমাকে দুই ইংরেজ মহিলার মাঝখানে স্থান দেওয়ায় আমি সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুই জনেই অতিশয় ভদ্র; আমার ভুলচুক যাহা হইতেছিল, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্যও করেন নাই। একদিকে ছিলেন লেডী সেন্সিল। তিনি বর্ষীয়সী, স্বাস্থ্যও খারাপ মনে হইল। সম্পূর্ণ বধির; কিছু শুনিতে হইলেই কানের নিকট যন্ত্র ধরেন। আমি কিছু বলিতে চাহিলে আমার দিকে টেলিফোনের কথা কহিবার কলের মত জিনিষটি আগাইয়া দিতেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “ভারতবর্ষ দেখিতে ইচ্ছা আছে, বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড আক্কাইন্ আমাদিগকে নিমন্ত্রণও করিয়াছেন।” তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, “কিন্তু, মিস্টার চ্যাটার্জি, আমার সাপের ভয় ভয়ানক বেশী।” আমি বলিলাম, “মহাশয়া, আমার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে; মফঃস্বলেই বাড়ী; কিন্তু এ পর্যন্ত আমি, সাপুড়ের কাছ অনেকবার সাপ

* লীগে ইংরেজীতে বক্তৃতা হইলে ঠিক তাহার পরেই ফ্রেঞ্চ অনুবাদ এবং ফ্রেঞ্চে বক্তৃতা হইলে ঠিক তাহার পরেই ইংরেজী অনুবাদ হয়।



ফিলিবার্ট বার্থলিম্যরের মনুমেন্ট

দেখিলেও, বহু অবস্থায় সাপ দেখিয়াছি বোধ হয় দু তিন-বার মাত্র। আপনি ভারতবর্ষে গেলে আপনাকে খুব ভাল ভাল জায়গাই দেখান হইবে; সাপের সঙ্গে আপনার

সাক্ষাৎকার হইবার সম্ভাবনা কম।” আমার ডান দিকে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি মিস বেজ, এম্-এস্‌সি, অষ্ট্রেলিয়ার ডেলিগেট। প্রোচা। ভারতবর্ষে তিন সপ্তাহ বেড়াইয়াছেন। জয়পুর দেখিয়াছেন। আবার অধিকতর দিনের জন্ত এদেশে আসিবেন বলিলেন। পূর্বোক্ত ক্ষুধিত ইংরেজটির স্থান হইয়াছিল ঠিক আমার সম্মুখে। তিনি দেখিলাম খুব শিপ্রকারিতার সহিত ডিশের পর ডিশ সাফ করিতেছেন।

পুঃ—একটা কথা যথাস্থানে লেখা হয় নাই। আমি মডার্ণ রিভিউয়ের জন্ত জেনীভা হইতে প্রথম যে এক কিস্তি বিবিধ প্রসঙ্গ পাঠাই, তাহা লীগ ডাকঘরে রেজিষ্টারী করিয়া পাঠান হয়। রেজিষ্টারী করিবার ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, প্যাকেটটাতে কি আছে। উত্তরে বলা হয়, সংবাদপত্রের জন্ত লেখা ও ফোটোগ্রাফ। তাহাতে সে প্যাকেটটি রসীদ দিয়া গ্রহণ করে। এক বৃহস্পতিবারে ইহা ঘটে। তাহাই ভারতবর্ষে ডাকে কিছু পাঠাইবার দিন। পরবর্তী শনিবারে প্যাকেটটি ফেরত আসে—এই ওজুহাতে যে উহাতে চিঠি আছে! বলা বাহুল্য, উহাতে চিঠি ছিল না। ডাকের পূর্বোক্ত কর্মী বা অস্ত্র কেহ উহা খুলিয়াছিল। এই খোলার কাজটা রেজিষ্টারীর রসীদ দিবার আগে করিলেই ঠিক হইত। তাহা হইলে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইত, যে, উহাতে চিঠি নাই, এবং প্যাকেটটির কলিকাতা পৌছিতে এক সপ্তাহ বিলম্ব হইত না। এক সপ্তাহ বিলম্ব হওয়ায় আমার লেখাগুলি অক্টোবরের কাগজে বাহির না হইয়া নবেম্বরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। অবশ্য, প্যাকেটটি কে খুলিয়াছিল এবং খুলিবার উদ্দেশ্য কি ছিল, বলিতে পারি না।



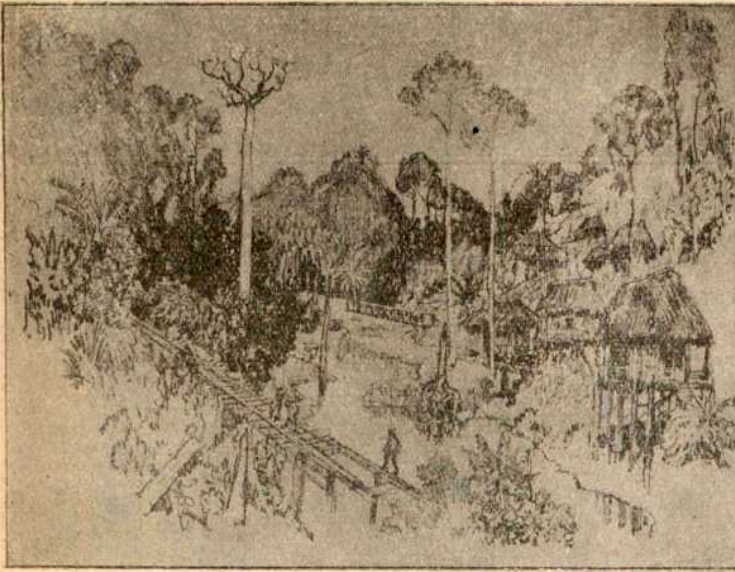
জোসেফ পেন্নেল—

১৯২৬ সালের ২৩এ এপ্রিল তারিখে ফিলাডেলফিয়ার “হুইসলার” “খামখেয়ালী” চিত্রকর জোসেফ পেন্নেলের মৃত্যু হইয়াছে। পেন্নেল হুইসলারের একজন ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্ধ অনুকরণ

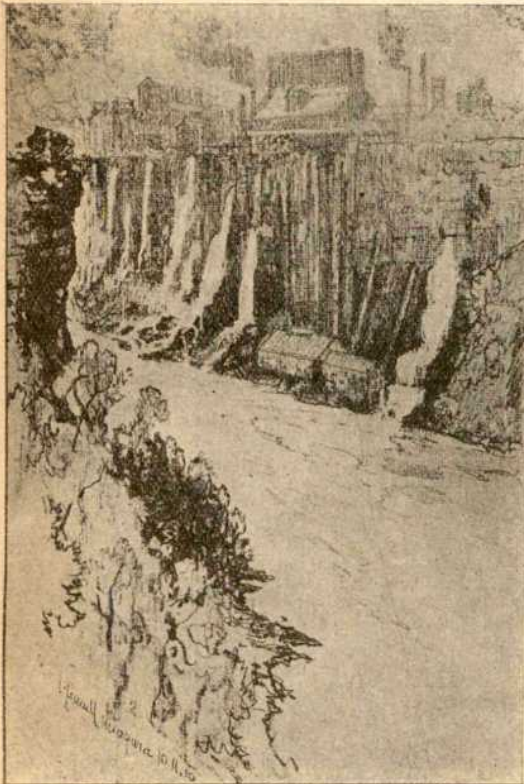
করিতেন না। চিত্রশিল্পে পেন্নেল আপন বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঘরে বসিয়া আপন কল্পনার সাহায্যে চিত্রশিল্পে দক্ষতা লাভ করেন; তাঁহার এই সহজাত গুণটিকে তিনি অন্ধ কাহারও দ্বারা সংযত হইতে দেন নাই। তিনি আপন মনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ ঠাইলো



জোসেফ পেন্নেল
(তাঁহার ছাত্র হেনরী জিগিয়ার কর্তৃক অঙ্কিত) ।



পানামা খাল



নাংগার জলপ্রপাত

এমন চমৎকার 'বি আঁকিতে ও 'এঁচিং' করিতে লাগিলেন যে চারিদিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে ও বিশ্ব্যাত ভ্রমণকারীরা তাঁহার দ্বারা তাঁহারই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত চিত্রিত করিবার জন্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই ভাবে তিনি অনেক ভ্রমণকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। বার্বার্ড শ সঙ্ঘে তাঁহার কতকগুলি চমৎকার ছবি আছে। হেনরী জেমসের অনেকগুলি বই ইনি চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার দুটি এঁচংয়ের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম, পানামাখাল ছবিখানি সঙ্ঘে কলাবিদেরা বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন।

চীনের জাগরণ—

আজ মহাচীনের মহাজাগরণ শুরু হইয়াছে ; যে গাঢ় ঘুমে সে আচ্ছন্ন ছিল ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সে-ঘুম তাহার প্রথম ভঙ্গ হইয়াছে এবং সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত চীনে অন্তর্বিপ্লব, বহির্বিবাদ লাগিয়াই আছে। খৃঃ পূঃ ২৮০০ সন হইতে চীনদেশের

ইতিহাস সংগৃহীত আছে। চীন মহাদেশ পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসভ্য দেশ। কিন্তু সেই অতীতযুগ হইতে আজ পর্যন্ত চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা ভেমন উৎসাহ হয় নাই যেমন হইয়াছে ১৯১২ সন হইতে—যখন চীনেরই এক মহাপুরুষ স্তান-ইয়াং-সেন সমগ্র চীনে এক সাধারণ-প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সুস্থ চীনকে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। আজ গৃহ-বিবাদ, অন্তর্বিপ্লব দাবালনের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে, দেশের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ সহর সাংঘাইয়ের ধন-জন-সম্পত্তি আজ বিদেশী শক্তির করায়ত্ত এবং বিদেশী নৌবাহর পীতঙ্গাগরের উপকূলে কামান দাগিবার উদ্দেশে মুঠমুঠ গর্জন করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, চীনের এই জাগরণের সহিত 'রেড' ঝুঝির বিশেষ যোগ আছে এবং পাকা-পোঙ্ক রাজতন্ত্র ছাড়িয়া সহসা একেবারে প্রজাতন্ত্রের চরম বিকাশ এই বোলশেভিক্সের মোহে পড়িয়া চীন ধ্বংসের পথেই চলিয়াছে। চীনের বাহিরের লোকেরা যাহাই মনে করুক চীনের গণতন্ত্রবাদীরা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন যে, বোলশেভিক বা অল্প কোনো বিদেশীয় প্রভাব এখানে টিকিবে না, চীন চীনই থাকিবে। তাহারাই ইহাও বলিতেছেন যে, আজ উত্তর চীন ও চক্ষিণ চীন পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয় দলেরই ভিতরের উদ্দেশ্য এক ;—চীন হইতে সমস্ত বৈদেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করিতে উভয় দলই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

চীনে আজ যে বোলশেভিক প্রভাব লক্ষিত হইতেছে তাহার মূলে আছেন মস্তুর এক দীন দরিদ্র শিক্ষক—বোরোডিন। ইনি বহুকাল পূর্বে ডাঃ স্তান-ইয়াং-সেনের সহিত বন্ধুত্ব-মুহুর্তে আবদ্ধ হইয়া চীনের শিক্ষা বিস্তারকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি চীনকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে ডাঃ স্তান-ইয়াং-সেনের মৃত্যুর পরও বোরোডিন ডাঃ স্তান-ইয়াং-সেন প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার যুবক-পুত্র সান-ফু কর্তৃক পরিচালিত কুয়োমিনটাং দলের প্রাণস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। ইনিও উত্তর চীনের সামাজ্যতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার জন্ত উৎসুক। মাত্র দিন কয়েক পূর্বে ইঁহার পত্নী উত্তরচীনের (শিকিং রাজসরকার) বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিবার জন্ত ধৃত হইয়াছেন।

চীনের বর্তমান মনোভাব বুঝিতে হইলে চীনের অধিবাসীদের নিকট হইতেই তাহা জানা আবশ্যক। হুনভা পশ্চাত্য সংবাদপত্র-সেবীদের কল্পিত বা অর্জসত্য কথা শুনিলে ভুল করা হইবে। অধুনা চীনে কি কি ভাব-বিপ্লব ঘটিয়াছে, পিংয়ের সিং-হু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক বিখ্যাত পণ্ডিত এস, ইউই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

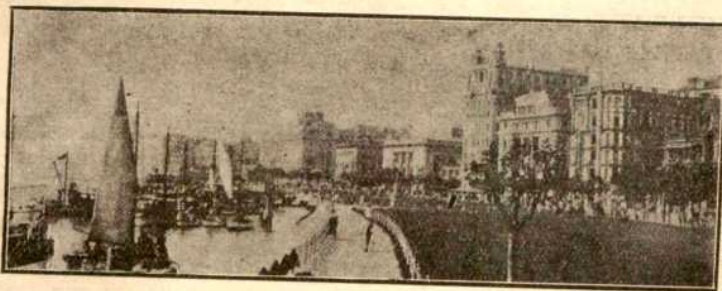
“চীনে বর্তমানে যে যুগ চলিতেছে তাহা যুদ্ধ-বিবাদের যুগ—বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে চীনকে মুক্তি পাইবার জন্ত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এবং ভিতরের দিকে চীনদেশে চীন-রাজতন্ত্রের যথেষ্টচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত ১৯১১ সাল হইতে অস্ত্রবিদ্রোহ চলিয়াছে। যতদিন চীনে সমস্ত বৈদেশিক শক্তি বিতাড়িত হইয়া এক সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন এই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে।

“শিল্প-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক কথায় ‘কালুচারের’ দিক হইতে চীনের জাগরণ হ্রস্ব হইয়াছে ১৯১৭ সন হইতে। চীনের অশিক্ষা দূর করিয়া সাধারণের মনোবৃত্তি জাগ্রত করিবার বিপুল আয়োজন চলিয়াছে এবং চীনে একটিও অশিক্ষিত লোক থাকা পর্যন্ত এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না।

“কিন্তু বৈদেশিক শক্তি-সমূহের কূট সজ্জা-সর্ভ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত চীন বিশেষভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিগত ৮০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে অস্ত্রায় সজ্জা-বন্ধনে চীন ‘আটপেটিটে’ বাঁধা পড়িয়াছে। যতদিন না



ডাঃ সেনের স্বযোগ্য পত্নী (ফার-কোট গায়ে) ও তাহার পুত্র মেয়র সান-ফুর পত্নী।



সাংঘাই বন্দর

(অধুনা ইংরেজ, ফরাসী ও ইয়াকিদের দ্বারা স্বরক্ষিত) ।

বৈদেশিক শক্তিসংঘ চীনের প্রতি এই আন্তর্জাতিক অস্ত্রায় অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া পৃথিবীর জাতিসংঘে চীনের স্থায় স্থান ছাড়িয়া দিবে ততদিন পর্যন্ত চীন এই অস্ত্রায়ের প্রতিকারকল্পে প্রাণপণ করিবে।

“চীন আজ কোনো বৈদেশিক শক্তির নিকট কোনো বিশেষ অধিকার ভিক্ষা করিতেছে না, তাহার থাধা স্থায় প্রাণ্য তাহা প্রাপ্ত হইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে।”

চীনের একা-বন্ধন আজ অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। চীনের চল্লিশ কোটি অধিবাসীই আজ কুয়েমিনটাং দলের পররাষ্ট্রনচিব ইউজিন চেনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে যে, “বৈদেশিক সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অত্যাচারের প্রতীকার করিতে চীন কখনই ছাড়িবে না।”

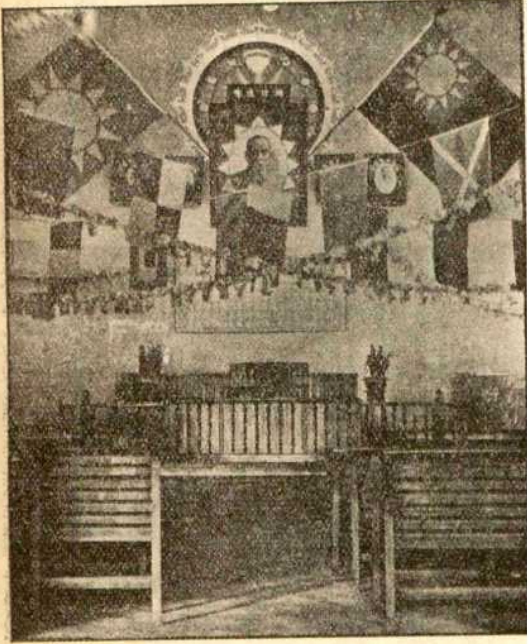
ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি স্বত-কায় জাতিসমূহ এককাল চীনে যে অত্যাচার-করিয়া আসিতেছিল এখন তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। চীনের জাগ্রত প্রজাশক্তির কাছে তাহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। তাহার

প্রায় সকলেই সত্য ও কল্পিত ভয়ে স্বরক্ষিত সাংঘাই সহরে আশ্রয় লইতেছে।

সহরে সহরে খুন জখম গুপ্ত হত্যা অব্যাহত চলিতেছে এবং যতদিন না একদল আর একদলকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারে ততদিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। চীনের সমস্ত বড় বড় বন্দরে এককাল বৈদেশিক শক্তির একছত্র অধিকার ছিল। বর্তমানে চীনের জনসাধারণ এইগুলি অধিকার করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বৈদেশিক

শক্তির কাঁটার বেড়া দিয়া সমস্ত বন্দরগুলি ঘেরিয়া ফেলিয়াছে ও কামান বন্দুক লইয়া সব সময় প্রস্তুত আছে।

১৯১২ সালে ডাঃ স্তানইয়াং-সেনের জীবিতাবস্থায় কুয়োমিনটাং দল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ চীনের শতকরা ৫৫ জন লোক এই দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র চীনই যে এই বশভুক্ত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কুয়োমিনটাং দল হাঙ্কোতে ইংরেজ শক্তিকে বিশেষ লালিত করিয়া সম্প্রতি সাংঘাই বন্দর অবরোধ করিয়াছে কারণ এই সাংঘাই বন্দরই অন্তর্জাতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল একথা তাহার জানে।



ক্যাণ্টনে জাতীয় সম্মিলনী-গৃহে ডাক্তার স্তান-ইয়াং-সেনের প্রতিকৃতি। এখানে প্রতি সোমবার প্রাতে ডাঃ সেনের স্মৃতির উদ্দেশে জাতীয় দল অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকেন।



বামদিক হইতে—মাইকেল বোরোডিন—কুয়োমিনটাং দলের মন্ত্রী, অস্ত্র একজন রুসীয় মন্ত্রী; জেনারেল ষ্টালেন—রুসীয় এবং সেনাধ্যক্ষ চিয়াং কাই শেক।

কুয়োমিনটাং দলের প্রচারকগণ দলেদলে চীনের সর্বত্র প্রচার করিয়া ফিরিতেছে ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণকে



ক্যাণ্টন হইতে উচাং-এর পথে কুয়োমিনটাং সৈন্যদল

উত্তেজিত করিতেছে। এইসকল বৈদেশিক শক্তির সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে—ইহারা চীনের সমস্ত বন্দর দখল করিয়া খুসীমত শুল্ক আদায় করিতেছে, সমস্ত জলপথে যথেষ্ট নৌকা দ্বীপার প্রভৃতি চালাইয়া চীনের বহির্বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে এবং চীনের কোনো আইন মানিয়া চলিতে ইহারা প্রস্তুত নহে। ইহারা নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী চলিতেছে ফিরিতেছে।

অথচ, এই বৈদেশিকগণ পৃথিবীর সর্বত্র চীনসম্বন্ধে এমনভাবে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে যেন চীনের জনসাধারণ তাহাদিগের উপর অস্ত্রায় অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বশ্ব লুণ্ঠন ও অকারণ হত্যা শুরু করিয়াছে। এই ওজুহাতে ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট কুলিজ চীনে আমেরিকার অধিবাসীদের রক্ষাকল্পে এক বিরাটবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। ফরাসী ও ইংরেজরাও সৈন্য লইয়া প্রস্তুত আছে।

কিন্তু কুয়োমিনটাং দল দমিবার নহে; তাহার স্বাধীনতার জন্ত মৃত্যুপণ করিয়াছে; ইহারা বঙ্গার দলের মত ধর্ম্মের ভাণ করে না—ইহারা একটি মাত্র দোহাই পাড়ে—তাহা স্বদেশের স্বাধীনতা। চীনদেশকে শাসন করিবার শ্রাঘ্য অধিকার ইহারা দাবী করে।

এই দলের একাগ্রতা ও মৃত্যুপণ দেখিয়া বৈদেশিক শক্তিসমূহ প্রায়ই সন্ধিবিগ্রহের কথা তুলিতেছেন, কিন্তু চীনের বন্দরসমূহ দখলে না আসিলে কুয়োমিনটাং দল সন্ধি করিবে না।

সব-চাইতে মুগ্ধল হইয়াছে জাপানের; প্রাচ্য ও প্রতিবেশী এই জাতির বিরুদ্ধে যাইবে কি না ইহা লইয়া সে মহাভাবনার পড়িয়াছে; অথচ ইংরেজ ও আমেরিকানরা তাহাকে স্তায়ধর্ম্মের ওজুহাতে চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে।

চীনের বর্তমান অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার সময় আসে নাই; চীনের সংবাদ বিকৃত হইয়া আসিতেছে—তবে এইমাত্র স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই কুয়োমিনটাং দলের প্রভাবে চীন আজ যেভাবে জাগিয়াছে এমন জাগরণ তাহার কখনো হয় নাই এবং সম্ভবতঃ চীনের চিরন্তন স্বাধীনতার ইহাই স্বত্রপাত।

‘কুয়োমিনটাং’ শব্দের অর্থ এই—কুয়ো অর্থ দেশ, মিন—জনসাধারণ ও টাং—সম্ভব; অর্থাৎ জনসাধারণের কবলে দেশকে আনিবার জন্ত সম্ভব। দেশপ্রেমই এই সম্ভবের মূলমন্ত্র।

কুয়োমিনটাং দলের উদ্দেশ্য—এই তিনটি—

১। দেশবাসীর সভ্য অধিকার স্থাপন—চীন মহাদেশকে সকল বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে মুক্ত করা; কামানের মুখে যে-সকল অস্ত্রায় সন্ধি-সন্তে চীন স্বীকৃত হইতছিল সেগুলির উচ্ছেদ করা।

২। প্রজাতন্ত্র স্থাপন—দেশের লোককে শিক্ষিত করা ও সত্য প্রজাতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে সকলকে জ্ঞানদান করা।

৩। দেশবাসীর জীবনযাত্রা—দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর করা; ব্যবসা বাণিজ্যে চীনের অধিকার সর্বপ্রাণে রক্ষা করা; চীনের স্ত্রী ও বালক শ্রমিকদল বর্তমানে যে বৈদেশিক কলকারখানায় সামান্য বেতনে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে তাহা বন্ধ করা।

স্বর্গীয় ডাক্তার স্তান-ইয়াং-সেন সর্বপ্রথমে এইসকল মতবাদ প্রচার করেন এবং তিনি চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হইয়া এই কুয়োমিনটাং-দল প্রতিষ্ঠিত করেন। চীনের বর্তমান জাগরণের মূলে একমাত্র তাহার বিপুল উদ্ভম ও কর্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমরা আশা সংখ্যায় এই মহাপুরুষের জীবনী প্রকাশ করিব। বর্তমান



সাংঘাইয়ের ইংরেজ-ভৃত্য ভারতীয় সৈন্যদল

সংখ্যা প্রবাসীর অল্প কয়েকজন চীনের জাতীয় স্বাধীনতার একটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্যারিসোহন সেনগুপ্ত মহাশয়।

কুয়োমিনটাং-দল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইহার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; সর্বপ্রথমে চীনের ছাত্রসম্প্রদায় ইহার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হয় এবং ডাঃ স্তান-ইয়াং-সেনের মৃত্যুর পরই ক্যান্টন শহর ইহাদের অধিকারে আসে। টি ভি স্নং নামক একজন স্বযোগ্য ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের রাজস্ব সচিব হইয়া এই দলের ধনবল বৃদ্ধি করিতে সুরু করেন।

ডাঃ সেন জীবিতাবস্থায় যাহা করিতে পারেন নাই তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুচররা সেই কার্য করিতে সক্ষম হন; অতি দ্রুত দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ডাঃ সেনের স্বযোগ্য পত্নী ও পুত্র সান-ফু এই দলের স্বযোগ্য সেনাপতি চাং কাই শেক, পররাষ্ট্রসচিব ইউজিন চেন প্রভৃতি প্রবল বিক্রমে ডাঃ সেনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যু ও দৈহিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্যান্টন হইতে সর্বত্র বিজয়যাত্রা করেন এবং দক্ষিণের সকল খণ্ডনেতাকে পরাজিত করিয়া সাংঘাইয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। এই পরাজিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উ-পি-ফু একজন। এদিকে পিকিং হইতে বিভাজিত খ্রীষ্টান সেনাপতি ফেংও সদলবলে ইহাদের সহিত যোগদান করেন। কুয়োমিনটাং দলের স্ত্রায় ফেংএর দলও স্ববিহার সমর-পদ্ধতিতে শিক্ষিত। এখন ইহাদের বিরুদ্ধে তিনটি প্রবল দল যুদ্ধ করিতেছেন; প্রথম—উত্তর চীনের পিকিং সরকার, দ্বিতীয়—খণ্ডনেতা চাং সো লিন—বৈদেশিক শক্তির ইহাকে সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া কুয়োমিনটাংদলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে; পরাজিত সেনাপতি উ-পি-ফু ইহার সহিত যোগ দিয়াছেন, এবং তৃতীয় বৈদেশিক শক্তিসমূহ। কিন্তু যেভাবে কুয়োমিন-টাং দলের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অদূর-

ভবিষ্যতে সমগ্র চীনে এই কুয়োমিনটাং দল ছাড়া অল্প কোনো শক্তি থাকিবে না। আমরা ভবিষ্যতে চীনে বোলশেভিক প্রভাব সম্বন্ধেও আলোচনা করিব।

পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় ইংরেজ ও ফরাসী—

পাশের ব্যঙ্গচিত্র দুইটিতে গতবৎসরের নোবেল শান্তি-পুরস্কার লইয়া কৌতুক করা হইয়াছে। ইহার প্রথমখানি কোনো ফরাসী চিত্রকরের অঙ্কিত ও দ্বিতীয়টি মস্কোর ইজডেস্ত্রিয়া নামক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম ছবিখানির ভাব এইরূপ—ইংরেজ চেম্বারলেন, ফরাসী ব্রিয়ঁ এবং জার্মান ট্রেসমান পৃথিবীর শান্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কিছুই করেন নাই বরঞ্চ সমগ্র পৃথিবী এখন অশান্তির আঁকর হইয়া আছে।



মুসোলিনি—তোমরা ত নোবেল-শান্তি-পুরস্কার পাইলে! আমি বেচারী কি দোষ করিলাম!



শান্তি পুরস্কার পাইয়া ক্রান্ত হইয়া ইংরেজ চেম্বারলেন ও ফরাসী ব্রিয়ঁ।

একটু বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় চীন, সিরিয়া ও মরক্কোর

তরফ হইতে তিনজন প্রতিনিধি তাহাদিগকে দস্তাবাদ

জানাইতে আসিয়াছে। এই তিনটি দেশই

এখন যুদ্ধ ও অন্তর্বির্গবে পূর্ণ।

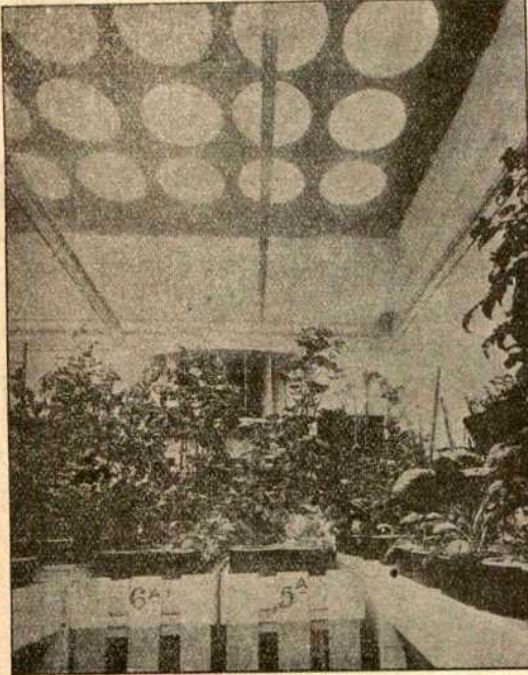
ইহারা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা নিজেদের দেশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই করিয়াছেন। মুসোলিনিও ঠিক তাহাই করিতেছেন অথচ তাহাকে অত্যাচারী, অশান্তিকারী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া

হইয়াছে। এই তিন জনকে শান্তি পুরস্কার পাইতে দেখিয়া মুসোলিনি বলিতেছেন—“তোমরা ত পাইলে; কিন্তু আমি বেচারী কি দোষ করিলাম।”

দ্বিতীয় ছবিখানিতে চেম্বার লেন ও ব্রিয়ার্কে চীন, সিরিয়া ও মরক্কোর প্রতিনিধিরা ধন্ববাদ দিতে আসিয়াছেন। ছবিখানির বক্তব্য এই যে, চীনে, সিরিয়াতে ও মরক্কোতেও তোমরা অজ্ঞায় অত্যাচারের চূড়ান্ত করিতেছ এবং এই তিনটি দেশকে শোষণ করিবার কোন চেষ্টারই ফ্রাঙ্ক দেখিতেছি না, অথচ তোমরাই শান্তি-পুরস্কার পাইলে।

কৃত্রিম আলোকে বৃক্ষপালন—

শীতপ্রধান দেশে যথেষ্ট আলোক ও উত্তাপের অভাবে অনেক বৃক্ষলতা বাচিয়া থাকিতে পারে না অথচ বৃক্ষতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হইলে সকলপ্রকার গাছের সঙ্গে পরিচয় রাখা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিউইয়র্কের বয়েস টমসন ইনস্টিটিউটে কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে



কৃত্রিম আলোকে বৃক্ষপালন

ঐশ্বর্যপ্রধান দেশের বৃক্ষসমূহকে সঞ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাশে সেই ইনস্টিটিউটের একটি কৃত্রিম আলোকপূর্ণ কক্ষের ছবি দেওয়া হইল। ছাদের ছিন্ন দিয়া আলোক-রশ্মি আসিয়া একটি কাঁচের আবরণে প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকে সমান ছড়াইয়া পড়ে ও এই আলোক ও উত্তাপে গাছগুলি সজীব থাকে। কিন্তু আলোক ও উত্তাপের মাত্রাধিক্য ঘটলে গাছগুলি মরিয়া যায়।

শক্তিমানের জয়—

ইংরেজীতে survival of the fittest বা যোগ্যতমের জয় বলিয়া একটা কথা আছে। পাশের ছবিতে তাহারাই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। একটি ছুর্কল ‘ভাগলাস্ ফার’ গাছকে তাহারই কোনো শক্তিমান প্রতিবেশী গ্রাস করিয়া নির্ঝিন্দে হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। বড়গাছটিকে কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ছবির

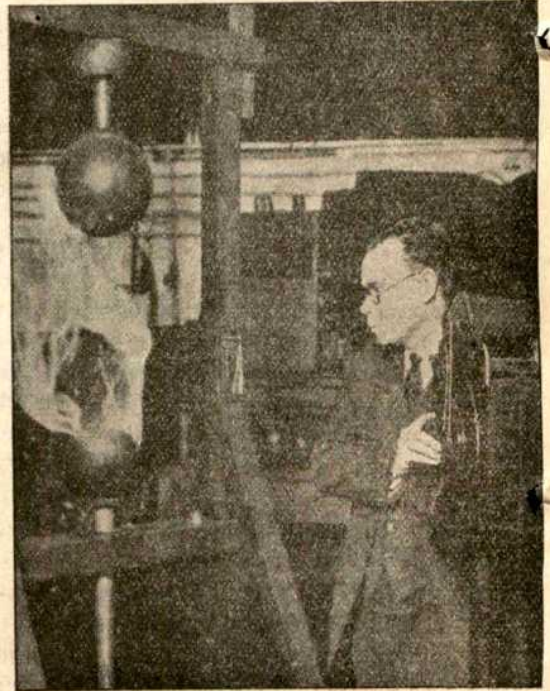


গাছের ভিতরে গাছ

ভিতরের ও বাহিরের অংশ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের গাছের। প্রথম গাছটি শতাব্দিক বংশের ধরিয়া এইভাবে আক্রমণকারী ভিতরে আবদ্ধ ছিল। বড়গাছটি ইহাকে কেবল করিয়া এককাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

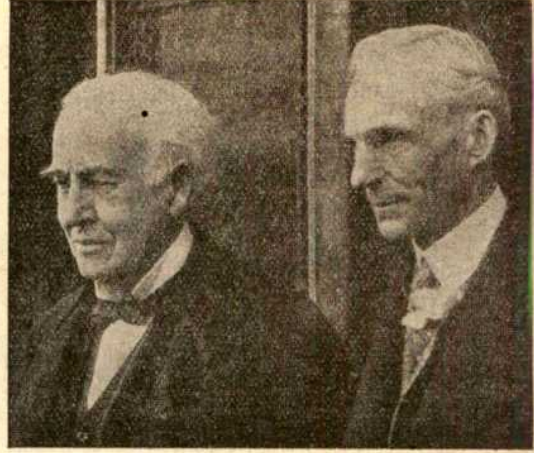
মিঃ জে, ডব্লিউ লেগ ও তাঁহার নূতন আবিষ্কৃত ক্যামেরা—

আমেরিকার ওয়েস্টিংহাউস কোম্পানীর ইলেক্ট্রিক রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার



বিদ্যুৎ-বলকের আলোকচিত্র

নয়র মিঃ জে, ডব্লিউ লেগ একটি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ক্যামেরা নির্মাণ করিয়াছেন। এই ক্যামেরায় সেকেন্ডে ২৬০০ ফোটাগ্রাফ লওয়া যায় এবং বিদ্যুৎবলকে পর্যাপ্ত যথার্থ চিত্রে ধরিতে পারা যায়। আজ পর্যন্ত আর কেহ বিদ্যুৎবলকের ছবি তুলিতে সমর্থ হন নাই, একটি চলিত প্রবাদই আছে ‘বিদ্রোহের মত দ্রুত’। এখন এই প্রবাদবাক্যের কোনো সার্থকতা রহিল না। এই ক্যামেরায় সাহায্যে বিদ্যুৎবলকের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও সমাপ্তি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। পাশের ছবিতে এই ক্যামেরায় তোলা একটি বিদ্যুৎবলকের চিত্র দেওয়া হইয়াছে।



আমেরিকার ছই মনীষী—

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারী এডিসনের অনীতিতম জন্মদিনে আমেরিকার অপর আবিষ্কারী ফ্রেড্রিপতি মনীষী হেনরী ফোর্ড তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন। এই

এডিসন ও কোর্ড

একটিবার মাত্র ছই মনীষী একত্রে ছবি তুলাইয়াছেন। পাশাপাশি এই ছই বৈজ্ঞানিকের ছবি আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(৭)

কুমারিল ভট্ট

শঙ্করাচার্যের গুরু কুমারিল ভট্ট সম্বন্ধে কোন বাংলা বই আছে কি, থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীকমলেশ্বর চলিহা

(৮)

বারুণী-স্নান

মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত হইলে, সেই দিবসে বারুণী স্নান হয়। ঐ দিবস যদি শনিবার হয় তাহা হইলে মহা-বারুণী হয় এবং ইহার সহিত আরও কয়েকটি যোগ মিশ্রিত থাকিলে মহা-মহা-বারুণী হয়। এই বারুণী স্নান কোন্ সময় হইতে এবং কি কারণে এতদ্বন্দে প্রচলিত হইয়াছে?

“অনাদি”

(৯)

গরুর আড়ালে যুদ্ধ

মুসলমানগণের ভারতে আগমনের সময় হইতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ হিন্দুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময়, সম্মুখে গরু রাখিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে?

শুনা যায় ইংরেজ ভরতপুরের এবং মণিপুরের যুদ্ধে গরু সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিয়া অতি অল্পশ্রমে যুদ্ধ জয় করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আছে?

শ্রীচুমানন্দ

(১০)

আকবর কর্তৃক মন্দির নির্মাণ

ভি, এ, স্মিথ সাহেব তাঁহার “আকবর” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন বুল্কাবনের প্রধান মন্দির, “গোবিন্দ মন্দির”, “সদনমোহন মন্দির,” এবং “গোপীনাথের মন্দির” আকবরের আজ্ঞায় নির্মিত হইয়াছিল। অল্প পুস্তকে দেখিতে পাই বাঙ্গালার হিন্দুগণ (চৈতন্যের যুগে) ঐ সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। কোন্ সিদ্ধান্ত সত্য?

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল।

(১১)

নারিকেলের খোলা

নারিকেলের খোলা কি কাজে লাগে এবং তাহার পাইকারী জেতা কাহার? কি দরে বিক্রয় হয়? ইহা ঘারা শাঁখা ইত্যাদি তৈয়ারী এ-দেশে হয় কি না?

শ্রীশচীন্দ্রমোহন দেন

মীমাংসা

(১)

লাইব্রেরী পরিচালনা

লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে বাংলার এখনো কোনো পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। মারাঠী, গুজরাতী, কন্নাদ ও তেলুগু ভাষার এই বিষয়ের কতকগুলি পুস্তক আছে। ইংরেজীতে এই সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে। বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের জন্য লিখিত নিম্নলিখিত বইগুলি কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে দেখিতে পাওয়া যাইবে :

Borden (W. A.) "Scheme of Classification for the Libraries of Baroda State," Baroda, 1911 (দাম জানা নাই)

Dickinson (A. D.) "Punjab Library Primer" (Punjab University Publication.) Lahore, 1914. দাম ২/- টাকার মতন হইবে।

Dutt (Newton M.) "Baroda Library System" (Pamphlet) Baroda, 1917. Baroda Central Library তে লিখিলে ইহা বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

Guha (S. C.) "On Classification of Books in our Libraries." Madras (Srinivas Varadachari) 1921. Out of print.

Kudalkar (J. S.) "Baroda Library Movement" Baroda Central Library ; 1919. মূল্য ২/- টাকা।

"Library Miscellany (Trilingual Quarterly, in English, Marathi and Gujarati) Now out of print. 3 or 4 vols, 1912-14 প্রতি খণ্ড ২/- টাকা।

Mehta (B. H.) "Hints on Library Administration in India" Surat ("Santi Sadan") 1913. ২/- টাকা।

Watkins (L. T.) "Libraries in High Schools" (Bureau of Education Pamphlet N. 8) Calcutta (Govt. Ptg). মূল্য চারি আনা।

[এতদ্ব্যতীত "Principles of Book-Selection in a Library Institute" নামক যে প্রবন্ধ Modern Review ডিসেম্বর ১৯২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা Manual of Indian Librarianship নামক আরও পুস্তকের এক অধ্যায়। (এ পুস্তক আশিগুণ্ড প্রকাশিত হয় নাই।)

বিদেশী পুস্তকগুলির মধ্যে A. L. A. Manual of Library Economy নামক ক্রমশঃ প্রকাশিত পুস্তকের যে অধ্যায় বাহির হইয়াছে তাহা প্রথমেই দেখিয়া লওয়া ভাল। প্রতি অধ্যায়ের দাম পূর্বে ছিল ১০ সেন্ট, এখন ২৫ সেন্ট বা ১০/৮/- আনা। Chicago, (American Library Association) 1911-27.

বর্ণাকরণ (অর্থাৎ Classification of Books) বিষয়ে বিদেশে

Dewey (M.) "Decimal Classification" অনুসারেই অনেক লাইব্রেরী চলে। এই পুস্তকের দাম ৩ ডলার; কিন্তু ইংলণ্ডে ২ পাউণ্ডের কমে বড় বিক্রয় হয় না। আমাদের দেশের গরীব লাইব্রেরীগুলি এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Abridged edition \$ 1. 50) লইতে পারে।

ভারতে লাইব্রেরী পরিচালনা বিষয়ে বরোদা, মহীশূর, পাঞ্জাব ও অন্তর্দেশ বাংলাদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। All Bengal Library Association একটা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার। যদি বাংলায় এই সম্বন্ধে একখানিও গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে কিছু কাজ হইত।

গ্রন্থাগারিক

(৩)

মুকুন্দরামের কবিকল্প চণ্ডী

মুকুন্দরামের কবিকল্প-চণ্ডী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হৃদিকেশ বসু লিখিত "চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী" দুই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার এইরূপ গ্রন্থ এই প্রথম। দুই খণ্ডের দাম বারো টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। কবিকল্প-চণ্ডীর আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

১৩১৫ সালের "নব্যভারত"ে শ্রীযুক্ত বিবেকর উট্টাচার্য্য চণ্ডী সম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

শ্রী হরেশচন্দ্র দাস
শ্রী হুম্মার চক্রবর্তী
শ্রী বতীন্দ্রনাথ বসু

(৫)

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে এপর্যন্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। গত ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসের 'Calcutta Review' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শ্রীমান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, মহোদয়ের লিখিত 'History of the Bengali Stage' নামক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত হুম্মার কুমার দে এম্-এ, ডি-লিট মহাশয়ের "প্রাচীন বাংলা নাটক ও তাহার অভিনয়" শীর্ষক হুচিভিত্তিক প্রবন্ধ এই বৎসরের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র দ্রষ্টব্য। তিনি তাঁহার রচিত 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের বিতরণ খণ্ডে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই বিতরণ খণ্ডও লীজাই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ ফরওয়ার্ড (Forward) পত্রিকায় লেখেন।

শ্রী হরেশচন্দ্র দাস
শ্রী হুম্মার চক্রবর্তী

(৩)

প্রবাদ-বাক্য

(২) অহির পঞ্চানন—পঞ্চানন (সহাদেব) হিন্দুদের দেবতা, তাঁহার কোন সময় ভাবের বিরাম নাই, সর্বদাই অহির; কখনও যুদ্ধ করিয়া শত্রু দমন করিতেছেন, আবার কখনও বা গায়ে ভদ্র মাখিয়া শিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রমানে বিচরণ করিতেছেন। আমাদের মধ্যেও দুই একজন এইরূপ ধরণের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কোন মতের স্থিরতা নাই অর্থাৎ সর্বদাই নানাপ্রকার কাজ লইয়া ব্যস্ত। তাহাদিগকেই “অহির পঞ্চানন” বলে।

(৭) আদা জল খেয়ে লাগা—সকালে আদা ও মুন খাইলে শরীর ভাল থাকে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা অনেকটা কম বোধ হয় এবং তাহা হইলেই কাজ করিতে একান্ত্রতা আসে। যে ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্য সিদ্ধিকল্পে যত্নবান হয় তাহার উদ্দেশ্যে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

(৮) আবাচে গল্প—আবাচ মাস বৃষ্টি বাজলার মাস, বাহিরের কোন কাজ করা যায় না, তখন দিন কাটাইবার প্রধান অবলম্বন—নানা প্রকার খেলা ও নানা প্রকার খোস গল্প করা। যে ব্যক্তি কাজের সময়ে নানা প্রকার খোস গল্প বলিয়া সময় নষ্ট করে, তাহার গল্পকে আবাচে গল্প বলে।

(১১) লাগে টাকা দেবে পৌরী সেন—বাজলার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক গ্রামে (কাহারও মতে বহরমপুরে) সেন পরিবারে পৌরী সেন বসবাস করিতেন। তিনি জাতিতে হর্যণ বণিক, তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরারিধর। তিনি নিজ ভাগ্য বলে ও দৈবানুগ্রহে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই ধনের সম্যক ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়া দীনদুখীদিগকে এবং সাধারণের হিতকর কার্যে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতেন। বাহারই অর্থের প্রয়োজন হইত তিনিই পৌরী সেনের নিকট অর্থ সাহায্য পাইতেন, কেহই কোন দিন তাহার নিকট হইতে বিদ্রুণ হন নাই। ইহা হইতেই ‘লাগে টাকা দেবে পৌরী সেন’ কথাটির উৎপত্তি। (Hooghly Past and Present)

(১২) ফোতো বাবু—পূর্বে গণিতগণ এবং ধনী ব্যক্তিগণ রাজসভার নিমন্ত্রিত হইয়া নানা প্রকার সাজসজ্জা করিয়া তথায় বাহিতেন। মূর্বরণ এবং দরিদ্রগণ তথায় বাহিবার অসুস্থি পাইত না, তজ্জন্ত তাহার নানাপ্রকার সাজসজ্জা করিয়া লোক দেখাইবার জন্য পথে পথে বেড়াইয়া বেড়াইত। এখনও বাহার ভিতরে গরীব, কিন্তু বাহিরে বাবুগিরি করে তাহাদের ফোতো বাবু বলে।

(১৪) ভবি ভোলবার নয়—ভবি বা ভবানী নামে একটি বালিকা তাহার মাতাপিতার নিকট অজ্ঞায় আবহাওয়ার করিয়াছিল। তাহার তাহাকে ভুলাইবার জন্য কতরকম জিনিস মিলেন শেষে এহার পর্যন্ত করিলেন, তথাপি সে নিজের জন্ম ছাড়িল না, বলিল, “তোমরা বাই দাও, বাই কর, ভবি ভুলবার নয়।” কেহ কোন জন্ম ধরিলে বহু প্রলোভনে বা বহুবিশ্রান্তেও তাহা পরিত্যাগ না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

—সরল বাঙ্গালা অভিধান

(১৬) পেরাজ ও গেল, পয়জারও হ'লো—এক ব্যক্তি পেরাজের ক্ষেতে চুকিয়া পেরাজ চুরি করিতেছিল। এমন সময় ক্ষেত্রবাসী আদিরা উহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে ‘পাছুকাষার’ রীতিমত প্রহার করিয়া পেরাজগুলি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। তখন সে মনের দুঃখে বলিয়াছিল, ‘আমার পেরাজও গেল, পয়জারও হ'লো’।

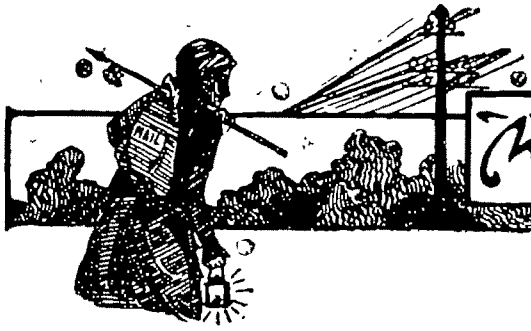
(১৭) নিরানবুইয়ের ধাকা—এক গ্রামে এক ছুতার বাস করিত, সে দৈনিক প্রায় ১০-১৪ টাকা আয় করিত, এবং তাহা হইতে কিছুই সঞ্চয় না করিয়া ঐ টাকার দ্বারাই তাহার এবং তাহার জীর ভোজন ব্যাপার সমাধা করিত। ঐ ছুতারের এক হর্যণ-বণিক বন্ধু ছিল। ঐ বণিকের পুত্রের প্রতিদিন ছুতারের পত্নী জল আনিতে বাইত এবং বণিক পত্নীর সহিত তাহাদের ভোজনের পারিপাট্যের কথা বলিত, কিন্তু বণিক-পত্নী লজ্জায় তাহাদের শাকান্নের কথা ব্যক্ত করিত না। সে বাটীতে আসিয়া ভৎসনা করিত ও বলিত—ছুতার রোজ আনে বোজ খায়, তাহার এত আহারের পারিপাট্য আর তাহাদের এত অর্থ থাকিতেও শাকান্ন ভোজন। ইহার প্রতিকারকল্পে বণিক একদিন সম্ভাব্য পর ছুতারের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল এবং গোপনে একটি টাকার তোড়া ছুতারের বিহানার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। বন্ধু চলিয়া গেলে ছুতার উহা দেখিয়া মনে করিল, উহা তাহার বন্ধু রাখিয়া দিয়াছে এবং তখনই বাহুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বণিকের নিকট ঐ টাকার কথা বলিলে সে উহা নিজের বলিয়া স্বীকার করিল না। তখন ছুতার ঘরে ফিরিয়া ঐ টাকা গণিয়া দেখিল উহাতে ২২ টা টাকা রাখিয়াছে, তখন সে মনে মনে ভাবিল, আমি কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই; এক্ষণে ঈশ্বর আমাকে এই টাকাগুলি দিয়াছেন। কাল ইহাতে এক টাকা দিয়া ইহাকে পুরা একশত করিব। পর দিন ছুতার বাহা আয় করিল, তাহা হইতে একটাকা সঞ্চয় করিয়া বাকী কম আনার মধ্যে আহারের ব্যয় নির্বাহ করিল। তরপর সেই একশত টাকাকে দুইশতে পরিণত করিবার জন্য তাহার বাসনা হইল এবং প্রতি দিন কিছু কিছু সঞ্চয় করার তাহা ক্রমে চারিশত হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর তাহার ভোজনের পারিপাট্য আর নাই এখন বণিকের যে দশা, তাহারও সেই দশা। বণিক ইহা শুনিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, “ভাই এবার আমাকে সেই নিরানবুই টাকা ফিরাইয়া দাও।” ছুতার বলিল, সে কিম্বদন্তি? তখন বণিক সকল কথা বুঝিয়া বলিল, “তোমাকে নিরানবুই এর দ্বারা ফিরাইবার জন্যই আমি বেছারা তোড়াটি ফেলিয়া দিয়াছিলাম।” ছুতার বন্ধুর টাকাগুলি ফেরত দিল, কিন্তু তাহাকে এই নিরানবুইয়ের ধাকা সামলাইতে আজীবন পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা জমাইতে হইয়াছিল। এই গল্প হইতে “নিরানবুইয়ের ধাকা” এই প্রবাদের উৎপত্তি। সরল বাঙ্গালা অভিধান।

লাইব্রেরিয়ান, তরুণ শক্তি সাহিত্য মন্দির

কাশীপুর।

শ্রীবিধুভূষণ মীল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু



দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

ত্রিশবার্ষিক শিবাজী উৎসব—

এবার ভারতের নানা স্থানে ত্রিশবার্ষিক শিবাজী উৎসব হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রে বাংলায় ১২০৪)৫ সালে এই উৎসব প্রথম সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারেও কলিকাতায় ও বাংলার নানা-জেলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাই সরকার এই উৎসবের মিছিলে কড়াকড়ি করার উদ্যোক্তাপন কোনরূপ মিছিল বাহির করেন নাই। সুরাটে, বরোদার ও ঢাকার মিছিল লইয়া হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ হইয়াছিল।

দশমবার্ষিক হিন্দু মহাসভা—

গত সপ্তাহে পাটনার ডাঃ সুপ্রের সভাপতিত্বে ১০ম বার্ষিক হিন্দু মহাসভার সম্মিলন হয়। সভার অস্তিত্ব প্রত্যাশার সহিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

মুসলমান গুণাগণ এতদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালার নারী ও শিশু হরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মহাসভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এক্ষণে হিন্দু মহাসভা বাঙ্গালার হিন্দু সভার নেতাদিগকে এতৎসম্পর্কে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া হিন্দু মহাসভাকে জানাইতে অনুরোধ করিতেছে এবং যুবকসমূহ গঠন করিয়া সম্ভবতঃ ভাবে এই অত্যাচার বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত ও বাহ্যতে প্রতি ক্ষেত্রে এই সমস্ত অপরাধীগণ দ্বারা দণ্ড পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছে। এই সভা হিন্দু সাধারণকে সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে হিন্দু নারী ও শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত যেকোনো সম্ভব পঠন করিতে ও অস্তিত্ব কার্যে হিন্দুদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছে।

এই সভা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে, অস্পৃশ্যদিগকে বিদ্যালয়ে, মন্দিরে অবাধ অধিকার দানের জন্ত, কুপ শাস্তির অধিকার দানের জন্ত অনুরোধ করিতেছে।

হিন্দু মহাসভা বিশ্ববাসের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সমস্যা গ্রহণ করিতেছে যে, (ক) যাহাতে বিশ্ববাণ সতীধর্মের আদর্শ রূপরসম করিতে পারেন ও বাকী জীবন সম্মানে যাপন করিতে পারেন এক্ষণে বাড়িতে অথবা আশ্রমে বিশ্ববাসিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) হিন্দু সংসারের অনেক উৎসবাদিতে বিশ্ববাসিগণের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয় ইহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(গ) ইঁহারা বাহ্যতে কুশল না বান এবং অস্তঃকর্তার কবলে পতিত না হন এক্ষণে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রী—

বিগত ৪ঠা মে কলিকাতায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী বিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যাত্রীদের অত্যাচার অভিযোগ দূরীকরণার্থ নানা বিষয় সভার আলোচিত হয়। কলিকাতায় সভার

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আদান গ্রহণ করেন। বোম্বাই এ শ্রীযুক্ত নাদিম সভাপতি হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত সরকার কর্তৃক দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সংবাদে ভারতবাসী মাঝেই হুগু হইয়াছেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীরাও ইহাতে আনন্দ-জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী যে এই কার্যের জন্য সর্বস্বপোষণা বোণা লোক, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার পতীর স্বদেশপ্রেম, জীবন-ব্যাপা ত্যাগ ও সাধনা তাঁহাকে সকলের আদর পাওয়া করিয়া তুলিয়াছে; তারপর এই প্রৌঢ়বয়সে ভগ্নবাহ্য লইয়া হৃদয় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েক বৎসর থাকিতে সম্মত হইয়া তিনি নূতন করিয়া যে ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিলেন, তাহা তাঁহাকে লোকচক্ষে আরও মহৎ করিয়া তুলিবে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর চেষ্টায় প্রবাসী ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা হয়।

ভারত শাসন সংস্কার তদন্ত—

দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌ পত্র মেজর গ্রেহাম পোল একথানা চিঠিতে জানাইয়াছেন যে লর্ড হিউমার্ট ভারতীয় শাসন সংস্কার তদন্ত কমিশনের সভাপতি হইবেন বলিয়া শুদ্ধব। লর্ড রেড্‌ক্লিফ ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলে লর্ড হিউমার্ট ইংলণ্ডের লর্ড চীফ জাস্টিসের পদ পাইয়াছিলেন। মিঃ গ্রেহাম পোল আরও জানাইয়াছেন যে এই কমিশন সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের কাগজগুলির হরেরও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। স্ট্রাটফোর্ড রিভিউ পত্র মন্তব্য করিয়াছেন যে এই পর্যন্ত ভারতীয় শাসন সংস্কারে দেশীয় রাজাদের অবস্থা এবং ভারতীয় সৈন্য বিভাগের বিষয় অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে এই দুইটি বিষয়কে আর অবহেলা করিলে চলিবে না।

ভাবতীয় ছাত্রীর কৃতিত্ব—

পণ্ডিত শ্রীমলাল নেহরুর কন্যা কুমারী শ্রীমতী নেহরু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

লাহোরের অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দাশ গুপ্তা লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা সম্মানে পাস করিয়া সম্রাতি ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করিতেছেন। সেখানে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে পদার্থ করিবেন।

বাংলার

পূর্ববঙ্গে ঝড়—

পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থানে ঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া বাইতেছে। ঢাকা, মুলীগঞ্জ, কয়লাপুত্র, মাধারীপুর, চট্টগ্রাম

প্রকৃতি স্থানে ঝড়ের প্রকোপ খুবই বেশী হইয়াছিল। বহু লোকের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। নোয়াখালিতে বোম্ব হ্রস্ব ঝড়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। এখানে লোকের প্রায় দেড়লক্ষ নষ্ট হইয়াছে। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা হইতেও যুগ্মাভ্যাসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব স্থানের বিপন্ন লোকদের সাহায্য অত্যাৱশ্যকীয়।

জলাভাব—

বাংলার নানা স্থান হইতে ভীষণ জলাভাবের সংবাদ আসিতেছে। সহযোগী বাকুড়া-দর্পণ বাকুড়াব অত্যন্ত জলাভাবের সংবাদ দিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের অনেক জেলার কাগজেও ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

খাদি-প্রতিষ্ঠান—

প্রতিষ্ঠানের ১৩৩৩ সালের বার্ষিক “হিসাব-নিকাশ”এ প্রকাশ “প্রতিষ্ঠানের কাজেব হিসাব-নিকাশ খঁতাইয়া দেখিলে একঘাটা অতি সহজেই ধরা পড়ে যে, প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় বস্ত্র-শিল্পের সমস্ত অব্যবহার্য দূর করিতে না পারিলেও বস্ত্রশিল্পে সাফল্য লাভের পথ অনন্তবন্ধে খুঁজিয়া গুলিয়াছে।

“এই বৎসরেই সোদপুরে মহাস্ত্রা গান্ধী প্রতিষ্ঠানের কলাশালার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। এই কলাশালাটির প্রতিষ্ঠা সমগ্রভারতের বিক্ষিপ্ত হইতেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এখানে অত্যন্ত আধুনিকতম নিম্নোক্ত সমস্ত উপায়ে খাদির উন্নতি বিধানের চেষ্টা চলিতেছে।”

তিন বৎসর আগে খাদিপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাসে ২০ মণ মাত্র বর্তমানে তাহার মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭০ মণ। বিক্রয়ের বিক্ষিপ্ত দিগাংশ এই উন্নতির চিহ্ন সুপরিষ্কৃত। তিন বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠান মাসে ৭ হাজার টাকার বেশী খাদি বিক্রয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্তমান তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ ২২ হাজার টাকা।

খাদির কাজের কেন্দ্রও যাবে যাবে সারা বাঙ্গলায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিন বৎসর আগেও খাদির কাজ বাঙ্গলায় ছই একটি জেলা ছাড়া আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু এখন প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ একটি করিয়া কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। বিক্রয়-কেন্দ্রের পরিমাণ তাহার সর্বশুদ্ধ ১৮টি এবং উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৩টির কম নহে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙালী—

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জাহ্নবীর মাসে ভারতে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত তিন জন বাঙালী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরীর জন্ম মনোনীত হইয়াছেন—

- ১। অন্নদাশঙ্কর রায় (বিহার-ওরিশা; ইনি প্রথম হইয়াছেন)
- ২। শীতেন্দ্রলাল মজুমদার (বাংলা)
- ৩। এইচ. বন্দ্যোপাধ্যায় (“)

বাঙ্গলার বেকার সমস্যা—

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কর্তৃদাতী সমিতির সেক্রেটারী বাঙ্গলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গজনভীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করেন। মিঃ গজনভী মনোযোগপূর্বক ইহার কথা শুনে, এবং বলেন যে আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি শুধু ক্রমাগত কেরানীই তৈরি করিতেছে, ঐ জন্মই বাঙ্গলার বেকার সমস্যা এত বাড়িয়া চলিয়াছে ও বেকারদের এইরূপ দুর্দশা দেখা

দিয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া কার্যকরী শিক্ষার প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। সমবায় প্রণালীতে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পের প্রচলনের উপরই এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। মিঃ গজনভী বলেন, তিনি ইতোপূর্বেই এতৎসম্পর্কীয় কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন। গান্ধীবাদীদের দ্বারা ও দ্বাধাবণ স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। সেক্রেটারীকে মিঃ গজনভী বেকার সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাহার কি যুক্তিপদ্ধতি আছে, তাহা তাহাকে জানাইতে বলেন এবং আশা দেন যে, এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি বখাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী—

গত মাসে হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাজুগ্রামে দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ডাক্তার প্রমথনাথ দত্ত অধ্যাপনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

সম্মিলনীতে অষ্টাশ্র প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গীয় কোজদারী সমোশিত আইন ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের তিন রেগুলেশন অনুসারে সরকার বহু সংখ্যক দেশবাসীকে আটক রাখিয়াও ভারতের অর্থ ও অস্ত্র দেশে চলিয়া যাওয়ার ঘোষণা যে ক্ষতি হইতেছে— এই দুইটি বিষয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রস্তুত প্রবাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হউক।

(২) এই সম্মিলনী স্বতন্ত্র-প্রস্তুত কার্যকে গঠনমূলক কার্য বিবেচনা করেন এবং সকলকে স্বতন্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করেন।

(৩) সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ফলে বহুস্থানে দাঙ্গা হাজ্জামা হইয়াছে। সম্মিলনীর অনুরোধ কংগ্রেসের সভ্য ও কর্মীগণ ঐ মনোমালিন্য দূর করিবার জন্ত বখাসাধ্য চেষ্টা করুন।

(৪) বিনাযয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের আবশ্যিকতা এই সম্মিলনী স্বীকার করেন। কিন্তু দেশবাসী সরকারের ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে সেপ্টেম্বরের ৩২২ নং প্রস্তাবে শঙ্কিত হইয়াছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমুদায় বিষয় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে শিক্ষা কার্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া সম্মিলনীর অস্তিমত সরকার ঐ উদ্দেশ্যে যে কর স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সম্মিলনী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

(৫) মহিলার সম্মান রক্ষার জন্ত খড়সিংহ বাহাদুরের আশ্রয়-ত্যাগের প্রশংসা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৬) চীনদেশে সৈন্য প্রেরণের জন্ত সরকারের নীতির নিন্দা এবং চীনদেশবাসীগণের কার্যে সহায়ত্ব প্রকাশ করা হয়।

আগামী বৎসরে চরিত্র পরগণার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বৈঠক হইবে।

বাঙালার রাজবন্দী ও বাঙালী—

পঞ্জাবের গুরুদ্বার আন্দোলন সংক্রমে যে সমস্ত শিশু কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাহাদিগের মুক্তির উদ্দেশ্যে শিশু নেতাগণ গুরুদ্বার সংস্কার আইন কার্যে পরিণত করিতে সহায়তা করিয়াছেন এবং পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে সেই মর্মে সর্ববাদিসম্মত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সমস্ত শিশুবন্দীকে অব্যাহতি না দেওয়াতে সেই মন্তব্য অবজ্ঞাত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিবাদস্বরূপ আইন পরিষদের শিশু সদস্যগণ একযোগে সনত্তপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মৈমনসিংহের চাকুসিহির লিখিতেছেন—

“কিন্তু বাংলা প্রব্রুশেন্ট সমস্ত ভারতের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্বদেশবৎসল বহু যুবককে অধ্যাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের এই আচরণের বিরুদ্ধে বাংলার নেতৃবর্গের কি আর কোনও কর্তব্য নাই?”
আরও লক্ষ্যের বিষয়—

“বাঙ্গালার রাজবন্দীদের বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখার অস্তু নাগপুরে প্রতিবাদ হইতেছে। শুধু কথার প্রতিবাদ নহে। যতদিন পর্যন্ত আটক বন্দীদের মুক্তি না হয় বা তাহাদের অপরাধের প্রকৃত আশালতে বিচার না হয় ততদিন পর্যন্ত নাগপুরবাসী অস্ত্র-আইন অমান্য করিবে। এই অস্ত্র আইন অমান্য উপলক্ষে নাগপুরে ২৪শে এপ্রিল তারিখে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ৬ হাজার লোক তাহাতে যোগদান করিয়াছিল, কতিপয় মহিলাও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অস্ত্র আইন অমান্য করিবার জন্য ছইজন বেসামান্যক বৃত্ত হইয়াছিল, ঐ দিন প্রাতে মুক্তিসাভ্য করিয়া তাঁহারা মিছিল পরিচালিত করিতেছিলেন। ২৬শে এপ্রিল সহরের বড় বড় রাস্তা দিয়া মুক্ত তরবারীধারিণী ২ জন মহিলাকে বিরাট শোভাযাত্রা সহ লইয়া যাওয়া হয়।”

বাংলার কলেবা—

বাঙ্গালার সর্বত্র এবার কলেবর প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯২৫ সনে বাঙ্গলা দেশে কলেবর ৩৪০০০ হাজার লোক মারা গিয়াছিল, ১৯২৬ সনের মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৬০০০০ হাজার। এবারকার মৃত্যুসংখ্যা আরও বেশী হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। ম্যালেরিয়া, কালাজরের গড়েই কলেবরতে বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুসংখ্যা বেশী। গত ৩০ বৎসরের হিসাবে প্রকাশ যে গড়ে বার্ষিক ১ লক্ষ লোক বাংলা দেশে কলেবরতে মারা গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, গল্পিতে বিশুদ্ধ পানীর জলের অভাবই কলেবর বিস্তারের প্রধান কারণ। এই গ্রীষ্মকালে পানীর ঝাল, বিল, নদীনালা সব শুকাইয়া যায় এবং গ্রামের লোকেরা ‘কাঁদা খেলা’ জল খাইতে বাধ্য হয়। ফলে কলেবর ও আমাশয় অনিবার্য। তাহার উপর বর্ষার জল পড়িলে এই রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠে। অতএব কলেবর দূর করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বাঙ্গলার পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় কলেবর টিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু ইহাতেই কি এই মহামারীর প্রকোপ কমিবে?

দিনাজপুর ও আসামে শুদ্ধি—

হিন্দু মিশনের সহকারী সম্পাদক ব্রজচাঁদী বিজয়কৃষ্ণ জানাইয়াছেন দিনাজপুর জেলার ষোড়শাটে গত ২৯শে এপ্রিল ৩ শত খৃষ্টিয়ান ও বড়বাণী পরিবার সোঁদাংহে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী সত্যানন্দজী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও সকলকে দীক্ষা দিয়াছেন।

গত ৩০শে এপ্রিল স্বামীজী শুদ্ধি সংগঠন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্বন্ধে রঙ্গপুর গাইবান্ধায় এক হিন্দুসভার বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন—সকলেই হিন্দু মিশনের কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উত্তর গোঁহাটীর শ্রীযুক্ত পোখামী এপ্রিল মাসের শেষ ১৫ দিন আশাম কামরূপ জেলায় ভ্রমণ করিয়া ১২টি কাওহারী পরিবারকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাহার প্রচারের ফলে অনেক উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শুদ্ধি উৎসবে গৌরবিত্য করিয়াছেন।

ঢাকায় নমঃশূদ্র সভা—

সম্প্রতি ঢাকা জেলার চৌকীবাটা নামক স্থানে নমঃশূদ্রগণের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক মহাশয় নমঃশূদ্রগণকে সম্ববদ্ধ হইতে এবং তাহাদের সম্বাদনগণকে শিক্ষা প্রদানে যত্নবান ও সাম্প্রদায়িক হান্ধামা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও আইন সভা, লোকালবোর্ড, জিলা বোর্ড প্রভৃতিতে নমঃশূদ্র সমস্ত মনোনিয়ন এবং অধিক সংখ্যার তাহাদিগকে চাকুরীদান করার জন্য সরকারের নিকট প্রার্থনা করিয়া একটি প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত হয়।

বাধ্যতামূলক ব্যায়াম—

বাঙ্গালার স্কুল ও কলেজে শারীরিক ব্যায়াম চর্চা ও ডাক্তারী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাংলা সরকার তাহাদিগের ব্যায়াম সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার সাহায্যে এক কার্যপদ্ধতি তৈয়ারী করিয়াছেন। যে সকল বালকবালিকা বিদ্যালয়ে যার, বাহাতে তাহাদিগের প্রত্যেককে সাধারণভাবে ব্যায়াম-শিক্ষা দেওয়া হয় ও উহা বাহাতে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যের অংশীভূত করা হয়, সেই বিধে লক্ষ্য রাখিবার এই কার্যপদ্ধতি গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জিমিনাটিক, সঁতার কাটা, খেলা-ধুলা প্রভৃতি যে-সমস্ত ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় সেগুলি ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। বাহাতে ব্যায়াম প্রত্যেক বালক-বালিকা বয়সোপযোগী হয়, ব্যবস্থা সেই ভাবে হইবে। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বাহাতে সম্যক পরিচালিত হয়, সেই রকম ব্যায়াম প্রবর্তিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে বিনা ব্যয়ে এই দেশে যে সমস্ত ব্যায়াম প্রচলিত আছে, সেগুলি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। প্রতি বৎসর শিক্ষকদিগকেও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া কার্যপদ্ধতিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ডাক্তারের পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগের পক্ষে শরীরচর্চা ইত্যপেক্ষেই বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। মহিলাদিগের পক্ষেও যে পরীক্ষার চর্চা আবশ্যিক তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ড্রিল কিংবা অস্ত্র কৌশলকম ব্যায়ামেব প্রবর্তন হওয়া আবশ্যিক। পরীক্ষার চর্চা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য ইতঃপূর্বে একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। সরকার সেই প্রস্তাবানুসারে কাজ করিতে সম্মত করিয়াছেন। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে প্রচলিত কার্য পরিচালিত করিবার জন্য সরকার হইতে অর্থব্যয় করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং কলেজের ছাত্রদের সাময়িক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গলা প্রব্রুশেন্টকে অনুমোদন করিবার এক প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী—

রথটারের সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের বাৎসরিক আয় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর

তাহাদের মাত্র ১০২৭২৩ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ববৎসর ২১৯০৪৪ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল।

ডাইরেক্টরগণ বলিতেছেন যে, মোটরবাস সমূহের প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য এবং কলিকাতার দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দাঙ্গার জন্যই ট্রাম-কোম্পানীর এত অধিক কমিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ট্রামের ভাড়া কমান হইয়াছে এবং তাহার ফলে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শান্তি-সজ্জা—

শান্তি-সজ্জার সম্পাদক নিম্নলিখিত নিবেদনটি প্রেরণ করিয়াছেন :—
নরপশু কর্তৃক ধর্ষিতা এবং সমাজ কর্তৃক অবহেলিতা মাতৃজাতির উদ্ধারের জন্য “শান্তি সজ্জা” আজ জাতির সেবা করিতে সমুৎসুক। আশা করি, উক্ত সজ্জাকে সেবা-কার্যে সহায়তা করিতে প্রত্যেক সহায়ক দেশবাসীই উপযুক্ত অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। মাতৃ-জাতির উপর দিয়া আজ যে অত্যাচার-উৎপীড়নের বজ্রা বহিয়া বাহিতেছে তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নারী-জাতির তত্ত্বাবধানে ও অভিধানে হিন্দু সমাজ আজ ধ্বংসের পথে পাইয়া বসিয়াছে। মাতৃজাতির সতীত্ব রক্ষা করিয়া এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে বাঁচাইতে হইলে কর্ত্ত্বের বজ্রাৎ কাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। কার্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব হিসাবে এ কার্য খুব শক্ত হইলেও “শান্তি সজ্জা” তাহার ক্ষুদ্র শক্তি মায়ের দেবার নিয়োজিত করিয়া কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা শিশু হইলেও ইতঃমধ্যেই দুইটি নির্ধ্যাতিতা রমণীর উদ্ধার সাধনে হস্তক্ষেপ করিয়া সফলকাম হইতে পারিয়াছেন।

এখন আমাদের সামুদ্রিক অসুস্থতা—জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে “শান্তি সজ্জাকে” সাহায্য করিয়া আমাদিগকে এই মহান কার্যে প্রোৎসাহিত করেন। এই উদ্দেশ্যে চাই তাগী, ব্রহ্মচারী ও সমাজহিতকারী সন্ন্যাসীর দল যাহারা মায়ের সেবার পুজারী হইতে চাহেন। ১১০, বৈষ্ণবানাং দেকো লেনে খোজ লইলে সজ্জার সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বিধবা বিবাহ—

মেদিনীপুর—

মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত তিলস্তপাড়া মধ্য ইংরেজী স্কুল-প্রাঙ্গণে বিগত ৪ঠা বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন ৩টার সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থে গোঁকুলচক্-নিবাসী মাহিবা জাতীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ বেঙ্গার পুত্র শ্রীমান সদয়চরণ বেঙ্গার সহিত শ্রীমতী চম্পাবতী নাম্নী নবম-বর্ষীয়া বিধবার শুভ পরিণয় সংঘটিত হইয়াছে। উপস্থিত অনেকে বিবাহোত্তে আহ্বাদি করিয়াছিলেন।

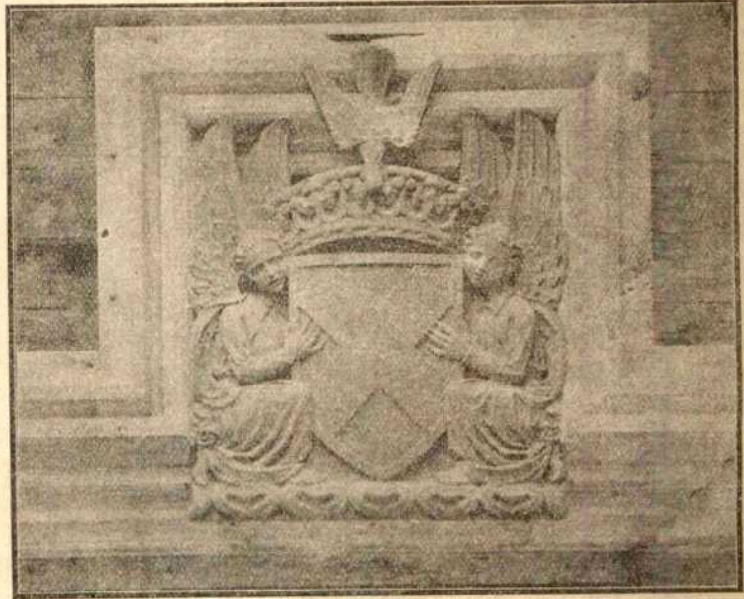
পাবনা—

পাবনা জেলার বেড়ার থানার অন্তর্গত পুরুপার হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন রায় লিখিতেছেন—

“হিন্দু সমাজের মধ্যে অনেকে আপন আপন বিধবা কস্তার ও ভগিনীর পুনরায় বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু স্বজাতি ও পুরহিতগণ পোরোহিত্য করিতে অস্বীকার করায় তাহারা বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এবং হিন্দুসভা অবহিত হইয়া এই কার্যের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করুন।”

বাঙ্গালী ভাস্কর ৮ফণীন্দ্রনাথ বসু—

১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে আমরা বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম ও তাহার তৈয়ারী কয়েকটি



সেন্ট জন স্মৃতি-গীর্জার অংশবিশেষ

(৮ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক নির্মিত)

প্রস্তর-মূর্তির ছবিও প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ডে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৮৮ খৃঃ ২রা মার্চ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বহর গ্রামে রায় চৌধুরী বংশে ফণীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাহার পিতা স্বর্গীয় তারানাথ বসু রায় চৌধুরী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ যখন ১১০ বৎসরের বালক তখনই তাহার ভিতরে কৃতিত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মাটি দিয়া পুতুল ইত্যাদি প্রস্তুত করাই তাহার খেলা ছিল। স্কুলে অঙ্ক না কবিয়া সে হুল্লর হুল্লর ছবি আঁকিয়া বসিয়া থাকিত। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার পি, মিত্র মহাশয় ফণীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যায় এইরূপ পারদর্শিতা দেখিয়া তাহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, “তারানাথ-বাবু, আপনার এই পুতুলটিকে আমাকে দান করুন, আমি ইহাকে বিলাতে পাঠাইয়া মানুস করিয়া আনি।”

ফণীন্দ্রনাথ যখন নগরী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, তখন তাহাকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতা ইউজার-আর্টস্‌ লেভেলের ভর্তি করান হয়। সেখানে ১ বৎসরের মধ্যে সমস্ত কোর্স শেষ করিয়া তিনি গভর্নমেন্ট আর্টস্‌ লেভেল হন এবং সেখানেও এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত



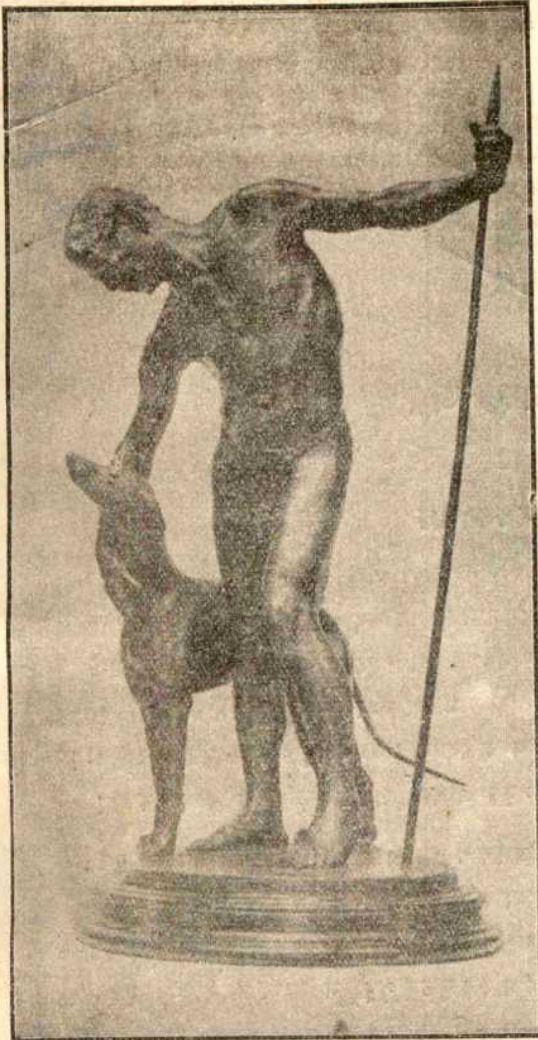
জন্ দি ব্যাপটিষ্ট

(৮ ফণীন্দ্রনাথ বসু নির্মিত ব্রোঞ্জ মূর্তি)

কোন শেষ করিয়া কেলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি ছবল-
হাটির রাজকুমারদের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দেন এবং কুমারেরা
হইতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
তিনি উচ্চতর আর্ট-শিল্পের প্রবল ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া অল্প কিছু
পুরস্কার না লইয়া বিলাত যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সেজন্য



সেন্ট জর্জ মূর্তি-গীজার আর-একটি অংশ



শিকারী ও কুকুর
(ফণীন্দ্রনাথ বসু নির্মিত)

একটি বৃত্তি প্রার্থী হন। ছবলহাটির কুমারদয় এ-প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে মাসিক ৭৫ টাকার একটি বৃত্তি ও বিলাত বাইবার অর্ধেক খরচ দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯০৪ সনে, ফণীন্দ্রনাথ নিজ চেষ্টা ও উজ্জোগে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে স্বদূর ইতালী দেশে গমন করেন। তখন তিনি ইংরেজী ভাষার সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং ইতালীয় ভাষাও কিছুই জানিতেন না। ইতালীতে কিছুকাল থাকিয়া একজন শিক্ষকের পরামর্শে ফণীন্দ্রনাথ স্কটল্যান্ডের এডিনবরা সহরে শিক্ষালাভ করিতে গমন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানকার রয়েল ইনস্টিটিউসনে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাঁহাকে “Clever Bose” বলিয়া ডাকিত এবং তিনি বিখ্যাত ভাস্কর পার্সি পোর্টসমাউথ (Percy Portsmouth, A. R. S. A.) সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল পাইয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে

পার্সি পোর্টসমাউথ সাহেবের পরামর্শে ফণীন্দ্রনাথ ভাষ্য শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯০৭ সনে তাঁহার “শিকারী” ও “বাজ-ধেলোয়ড়” দুইটি কটিংস চিত্র এবং শিল্প প্রদর্শনীতে (Scottish Arts and Industrial Exhibition) প্রদর্শন করিয়া স্থাতি অর্জন করেন। অল্প কয়েক বৎসর পরেই তিনি নিজের কৃতিত্বে ২৩টি বৃত্তি পাইয়া নিজ ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হন। তিনি এডিনবরা হইতে বৃত্তি পাইয়া প্যারিস নগরে শিল্পী রোঁস্টার নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে ইটালীর বড় বড় ভাস্করের শিল্পকলা দেখিয়া এডিনবরা সহরে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯১৩ সনে নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এইরূপ ২০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে ফণীন্দ্রনাথ কটিংস একাডেমীর (Scottish Academy) শ্রেষ্ঠ উপাধি A. R. S. A. উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। ইতিপূর্বে ৭৫ ব্যতীত কোন বিদেশী কোন লোক A. R. S. A. উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। এই উপাধির সহিত মাসিক ৩০০ শত টাকার একটি বৃত্তি নির্ধারিত আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডন-নগরে ফণীন্দ্রনাথের তৈয়ারী “শিকারী” মূর্তিটি বরোদার গাইকোয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাইকোয়ার এই তরুণ শিল্পীকে বরোদার রাজস্রাসাদ কয়েকটি প্রস্তর-মূর্তিতে সম্বৃত্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। ১৯১৪ সনে গ্রীষ্মকালে ফণীন্দ্রনাথ বরোদার আসেন। কিন্তু কাজের নানারূপ অসুবিধায়, তিনি পুনরায় বিলাত গমন করেন। প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি মহারাজার কাজ শেষ করেন। তাঁহার তৈয়ারী মূর্তিগুলি বরোদার হস্তশিল্প প্রাসাদে রক্ষিত আছে।

দেশের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এদেশে তিনি কখনও বিদেশী জিনিষ ক্রয় করেন নাই। আরও কয়েক বৎসর অর্থ সঞ্চয় করিয়া বাকী জীবন ভারতবর্ষে বাস করিবার এবং ভারতের লুপ্ত শিল্প জাগাইবার প্রবল বাসনা তাঁহার অন্তরে ছিল। *

মহম্মদসিংহে বিধবা বিবাহ—

বিগত ৩০ শে আশ্বিন মহম্মদসিংহ হিন্দু হিতসাহিনী সভার উদ্যোগে গবর্গাঁওর জনিয়ার শ্রীশতদলবিহারী চাকলাদারের অর্থ সাহায্যে এক বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সভার সহরের ছোট, বড় প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। পাত্রীর পিতার নাম হরকিশোর সরকার, নিবাস সহরের এলাকায় রায়পালা গ্রামে; পাত্রের নাম মনোমোহন দত্ত, নিবাস টাঙ্গাইল, আড়রা গ্রামে। উভয়েই কারস্ব। রায় শশধর বোষ বাহাদুর ও শশিত রাজেন্দ্র-কুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাতৃষণ এন্-আর-এ-এস সাহায্যে শাড়ী এ জেলায় আর ছ’ একটি বিধবা বিবাহ হইবে।

এই সম্পর্কে হিন্দু মিশন যথেষ্ট কার্য করিতেছেন।

বাঁকুড়া অভয় আশ্রম—

বিকুপুর্, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ২২ শে ও ২৩ শে চৈত্র আশ্রম দেবক-গণ বন্দর ফির করেন। জেলা সন্মিলনের বিকুপুর্ অধিবেশনে বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের উদ্যোগে একটি বন্দর প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনীতে বাঁকুড়া জেলার উৎপন্ন বন্দরও দেখান হয়। বিকুপুর্ মোট ২০০ টাকার বন্দর বিক্রি হয়।

বালিগঞ্জ চিত্ররঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়—

আমরা উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯২৫ সালের বার্ষিক কাণ্ডবিনয়ণী পাইয়াছি।

* পরলোকগত ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথের আত্মীয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বহুর লিখিত একটি বিবরণের মার সকলন।

আলোচ্য বৎসরে বিদ্যালয়ে ২০ জন ছাত্র ছিল। ছাত্র-বিভাগ ও শিল্প-বিভাগ দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। এই বিদ্যালয়টি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও একটি ছাত্র পরিষদের পুরীকার উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক—

কলিকাতার মার্কেল প্যালেসের অধিকারী বিখ্যাত

চিত্র-২২

সংগ্রাহক ও দাতা পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের গত মাসে মৃত্যু হইয়াছে।

কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক বালাজীবনে হিন্দুশুলে বিদ্যালয় শিক্ষা করেন। তিনি সৌন্দর্য্যগ্রাহী এবং কলাবিদ্যার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পিতামহের সংগৃহণ সমূহের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি চিত্র-শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার জগৎ-বিখ্যাত মার্কেল-প্যালেসের চিত্রসম্ভার ভঁহার চেষ্টায় অনেক পুষ্ট হইয়াছিল।

জয় স্বাধীনতা জয়

(বর্তমান চীনের জাতীয় সঙ্গীত)

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে বিমুক্তি, স্বাধীনতা, বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ,
শান্তি সাথে মৈত্রী করি' আনো আনো বিচিত্র সংবাদ ;
মূর্ত কর পৃথিবীতে দশেক সহস্র নব রূপ ।
দানব সমান দৃষ্ট, শ্রেতাজ্ঞা সমান সৌম্য ভূপ
সর্বশীর্ষে উর্দ্ধব্যোমে বিস্তারিয়া মহিমা মহান
এস হে নীরদ-রথ—বায়ু তাহে অথ বেগবান,
এস এস হে রাজন, তেজস্বর্ষ্যে বিতাড়ো আঁধার,
ঘৃচাও এ দাসত্বের অন্ধকার নরক-আগার ।
খেতচন্দ্রা ইউরোপা, বিধাতার হে হুলালী স্ততা,
গৃহ তব দৈন্ত্যহীন—স্বপ্রচুর-অন্ন-মদ্য-যুতা ।
আমি ভালবাসি মুক্তি, মুক্তি মোর প্রিয়া মোর বধু,
দিবসে সে চিন্তা মোর, রজনীতে স্বপ্ন সেই মধু ।
পিতৃভূমি প্রিয়তম, তোমার বেদনা দেয় ব্যথা !
মুক্তি আশে ছুটি তাই, ছুটি লভিবারে স্বাধীনতা ।
চঞ্চল সে স্বাধীনতা মুষ্টি হ'তে ছুটিয়া পালায় !
দুঃখহ্যাক লক্ষ ভ্রাতা দাসত্ব-পেষণে গুমরায় !
বায়ু বহে মনোরম, শিশির শোভিছে ঝলমল,
স্নিগ্ধ গন্ধে-পুষ্পদল স্রবাসিত করে ধরাতল,

কত নর হেরি ঐ রাজ্য লভি' ভুঞ্জে শত স্বপ্ন,—
কেমনে ভুলিব তবু স্বদেশের যন্ত্রণা ও দুখ ?
পিকিংএ হোথাও হের বাহ্য সম হিংস্রক সম্রাট
প্রণতি মাগিছে দস্তে বিলুপ্তিয়া সিংহাসনপাট !
অসহ বেদনা ! হায়, মৃত আজ মৃত স্বাধীনতা !
সমৃদ্ধ এশিয়া আজ মরুভূমি—বিশাল শুষ্কতা !

এ বিংশ শতাব্দী মোরা গড়িয়া করিব নব যুগ ;
আজি ভরি' বীৰ্য্যবস্ত্র দৃষ্ট শত মানবের বুক
জাগিছে একক আশা, ধনিয়া উঠিছে এক স্বর—
“গড়িব নূতন পৃথ্বী, নব স্বর্গ, গ্রানি করি' দূর ।”
দাসত্ব-বিনত পিষ্ট লক্ষ চিত্ত স্বদেশের মম
জাগুক অত্যাচ গর্বে কোয়াংটাং হিমালয় সম ।

নাগলেণ্ড*, ওয়াশিংটন, বিমুক্তির দুর্জয় সন্তান,
এশিয়ার কোটা চিন্তে মূর্ত হও, করো শক্তিমান ;
হে হিহ্মান, আদি পিতা, কোথা পথ, দাও হে অভয়,
এস মুক্তি, স্বাধীনতা, করো জ্ঞান, জয় তব জয় ।

* Napoleon



খেলা
শিল্পী শ্রী সারদাচরণ উকিল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



['পুস্তক-পরিচয়'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

সর্বস্বত্বাধারী—(কবিতাপুস্তক) নজরুল ইসলাম প্রণীত।

বর্ষাণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

কাজি নজরুল ইসলামের কবিতার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক আছে কি? তাঁহাকে বৃত্তিতে হইলে তাঁহার একখানি বইই যথেষ্ট। ভগবান পাখীকে একটিমাত্র ছর দিরাছেন। সে তাঁহার সেই একটানা সঙ্গীত অশ্রান্ত, অরূপ ভাবে গাহিয়া যায়। শ্রোতার ভাললাগা মঙ্গলাগার অপেক্ষা রাখে না। একরকম হইতে দেখিতে গেলে, নজরুল ইসলাম সাহেবও বিহঙ্গের সমতুল্য। তাঁহারও একঘেয়ে হইবার ভয় নাই।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি আমাদিগকে যে বিজ্রোহ, বিদ্রব, স্বাধীনতা ও ঐক্যপাতের গান শুনাইয়া আসিতেছেন “সর্বস্বত্বাধারী” তাঁহারই নূতনতম কবিতা। প্রথম বারে “অগ্নিবীণার” পঙ্কজন শুনিয়া তাঁহার বিস্মিত ও চমকিত দেশবাসীরা ভাবিয়াছিল যে, এত দিনে আমাদের দেশেও বৃত্তি অ্যাঙ্গোরার বিজয়বাণ্ড অথবা মস্তোজর রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কিন্তু সেই একই হ্রদের দ্বাদশতম পুনরাবৃত্তিতে লোকে বৃত্তিতে পারিয়াছে যে, এই বার বাংলা দেশের চিরপরিচিত, সনাতন, নিষ্কলুষ ঢাকের বাণ্ড মাত্র।

হ্রদের সাথ যেমন ঝোলে মিটে না, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি এই বিজ্রোহের খেলা খেলিয়া পূর্ণ হইবার নহে। কাজি সাহেব শিশুর মত বেলোয়াড়ী জিনিষ ভাবিয়া ভাবেন যে, ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিলাম। ধর্ম ও নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পর্যন্ত সকল বন্ধনের উপর তাঁহার নিদারুণ আক্রোশ। এই সাম্যবাদী কবিব মতে সব মানুষ সমান—“আদম হইতে হুগু ক’বে এই নজরুল তবু সবে”—অর্থাৎ সৃষ্টির আদিম হইতে চরমবিকাশ পর্যন্ত সকলে—“কমবেশী ক’রে পাপের ছুরীতে পৃথ্য করছে জবেহ।” হুতরাং তাঁহার কাছে “চোর ডাকাত”, “দুষ্টিবাদী”, “বারাঙ্গনা”, “কুলীমস্তুর”, “নারী”, “রাজ-প্রজা” সাধারণ মনুষ্য সকলেই মাসতুত ভাইবোন। ‘বারাঙ্গনা’কে দেখিলেই তাঁহার মনে হয় :—

“আমাদেরই কোনো বন্ধু স্বজন আত্মীয় বাবা কাকা
উহাদের গিতা; উহাদের মুখে মোদেরই চিকু ঝাঁক।
অমূল্য যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হ’তে পারে দেবী—
তোমরাও কেন হবে না পুত্র্য বিমল সত্যসেবী—”

এইসকল প্রলাপ বাক্যের কৈফিয়ৎ হিসাবে কাজি সাহেব অশুচি বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার মনের অবস্থা আর স্বাভাবিক নাই। “দেখিয়া শুনিয়া কেপিয়া গিয়াছি, ভাই বাহা আসে কই মুখে।” কিন্তু তিনি

কি দেখিয়া কি শুনিয়া ক্যাপামির এই চরম সীমার পৌঁছিলেন? তাঁহাকে একজন বিখ্যাত কবাসী লেখকের একটি উক্তি মনে রাখিতে অমরোধ করি। “মানুষকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহার কাছ হইতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করিতে নাই।”—সে টাকা হিসাবেই হউক কিম্বা যণ হিসাবেই হউক।

কাজি নজরুল ইসলামের ভাষা তাঁহার ভাবেরই মত বিজ্রোহী। বাঁহারা চণ্ডীদাস হইতে ববীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের রচনা পড়িয়া বাংলা ভাষার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই নূতন ভাষা অবাধ্য। একথা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, “কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুহু আমিই কি বৃত্তি তার কিছু?” আমরা অবাধ হইবা ভাবি এই নতুন কথাটা জানিয়াও তিনি অকাতরে কবিতা লিখিয়া যাইতে পারেন কি করিয়া? কিন্তু নজরুল সাহেব সংক্রান্ত সব ব্যাপারই এক একটা দুর্বোধ্য হৈয়ালি। তাঁহার কাব্য হৈয়ালি; তাঁহার কবিত্ব হৈয়ালি; তাঁহাকে যে তাঁহার ভক্তবৃন্দ “নবযুগরবি” বলিয়া থাকে তাহাও একটা হৈয়ালি; সবচেয়ে বড় হৈয়ালি এইটা, কি দেখিয়া বাংলা দেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যিক সঙ্গ্রাম বিনা বাক্যব্যয়ে এই অসম্বন্ধ প্রলাপভাবীকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

ন

রসজলনিধি—রসাতার্য কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম.-এ প্রণীত। প্রথমভাগ। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ত্র্যস্তবর্ষে—ছয় টাকা। বিদেশে—দশ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতীয় রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। গ্রন্থকার আশা দিয়াছেন, ভারতীয় রসমুদ্রা বহুদূর করিয়া এইরূপ আরো নয়টি রত্ন আহরণ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রাখেন। এরূপ উৎসাহ প্রশংসনীয় হইলেও হ্রদের সহিত বলিতে হইতেছে অপর্যাপ্ত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকে উক্ত বা রচিত সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নে ইংরাজী তর্জমা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি তত্ত্বশ্রেণীভূক্ত অথবা প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানবাদের নিদর্শন ইহা নির্ণয় করিতে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হয়। তত্ত্বশ্রেণীভূক্ত হইলে অত্যন্তিক আমরা দুব হইতেই স্ফটিকের নমুনা করিয়া বিহার লইতাম; কিন্তু গ্রন্থকার ইহাকে জড়বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তক বলিয়াই মনে করেন। ভারতের বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিতান্তই ভগণ অবস্থায়; এই প্রাচীন পুস্তকেব আবির্ভাব যতই আশার উদ্রেক করে।

প্রথমেই মুখবন্ধ আলোচনা করা যাক। গ্রন্থকারের মতে—
১২৫০০০০০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে রসবিদ্যার প্রচলন ছিল। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে এই মত যতই শাস্ত্রসম্মত হউক না কেন আধুনিক ভূতত্ত্ব ইহার সমর্থন করে না, বলাই বাহুল্য। নৈসর্গিক ব্যাপারে অনুসন্ধান না করিয়া অগুণ্যবাক্যে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি আধুনিক বিজ্ঞানের ধারার পবিপন্থী। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু মাত্ৰ পক্ষেপ্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাচাই করিয়া লইবে, ইহাই হইল নব্য-বিজ্ঞানের লক্ষ্য। স্তব্ধাং যে-সকল পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক আদিম মানবের জন্মস্থান নিরূপণ করিতে চাহেন সেগুলি খণ্ডন না করিয়া শুধু দার্শনিক আলোচনা করিলে প্রায়ের সমাধান হয় না, বলাই বাহুল্য। বৈজ্ঞানিক মত-বাদ ধ্রুব সত্য নহে, পরীক্ষালব্ধ সত্যকে কোনরূপে ব্যাখ্যা করাই মতবাদের লক্ষ্য—অজ্ঞাতপূর্ব পরীক্ষালব্ধ সত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মতবাদও বদলাইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মত ত্রাস্ত হইতে পারে কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্রন্থকার বা অস্ত্র কেহই এমন কোন প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপিত করেন নাই বাহাতে পৌরাণিকমতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি।

আধুনিক ভূতত্ত্বমুখারী পৃথিবীর বয়স কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম বর্ধাক্ষরে, প্রাগাধুনিক, অগ্নাধুনিক, মধ্যাধুনিক, বহ্নাধুনিক, অস্ত্রাধুনিক, উপাধুনিক ও আধুনিককাল। * ইহার মধ্যে বহ্নাধুনিক তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর ও উপাধুনিক কাল একলক্ষ বৎসর পূর্বের। বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস মানবের জন্ম সময় এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী। স্তব্ধাং কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ভারতীয় সভ্যতার কল্পনা করিয়া গ্রন্থকার যে-পৌরব অনুভব করিয়াছেন তাহা বংশীদার হইবার সৌভাগ্য সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

আর্য্যপণের উপপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে, কিন্তু কেহই সম্ভবতঃ এতদূর অগ্রসর (?) হইতে পারেন নাই। পুরাণের নজির দেখাইলে আমাদিগকে নির্বাক থাকিতে হইবে, কিন্তু গ্রন্থকার সামান্য একটু ভুল করিয়াছেন। যদি তিনি বলিতেন যে, এই কলিকাতা মহরই কোটি কোটি বৎসর পূর্বে প্রাচীন রসবিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা হইলে বিষয়টি বেশ জমকাল হইত। বাহা হইক এই “শাস্ত্রসম্মত” মতের স্বপক্ষে তিনি যে প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন, চুঃখের বিষয়, তাহা নিতান্তই অশাস্ত্রীয় হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দুরসায়ন সম্বন্ধীয় বহুমূল্য গ্রন্থে রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক বৌদ্ধযুগে লিখিত একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগে ধুওকনাথ—কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম শুকবংশীয়া রামচন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন রসায়ন সম্বন্ধীয় সাহিত্যে রসেন্দ্র-চিন্তামণি একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। প্রতিটুকু বশতঃ হউক অথবা অনবধানতা বশেই হউক বেচারী ধুওকনাথ গ্রন্থকারের হস্তে দণ্ডকনাথে পরিণত হইয়াছেন এবং যে হেতু হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা শূরবান্ধী রামচন্দ্র পিতৃসত্যরক্ষার্থে চতুর্দশবর্ষকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন স্তব্ধাং সূর্য্যবংশীয় বংশে রামচন্দ্র ত্রিংশৎ বছর রচয়িতা আর কে হইতে পারে ? এরূপ প্রমাণ অকাট্য, ইহার বিপক্ষে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহার পরই গ্রন্থকার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে-ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক। আচার্য্যের সঙ্গে এ মসীর প্রলেপ

লাগিবে না সত্য, কিন্তু এক্ষণে বেদাদি বরদাষ্ট অস্ত্রের পক্ষে অসাধ্য। বাহার হিন্দুরসায়ন বাসায়নিক-ঐতিহাসিক সাহিত্যে বৃণ্যস্তর আনিয়া-ছিল, বার্ত্তলোর স্ত্রার ঐতিহাসিক রাসায়নিক, সিলভারী লেভীর স্ত্রার প্রাচ্য-ভাষাবিৎ এবং সম্ভ্রতি আর্হেনিয়াসের স্ত্রার মহারথী যে-গ্রন্থের প্রশংসা শতমুখ হইয়াছিল তাহার গ্রন্থকারকে অশিক্ষিত ছাত্র (untrained student), অগুণ্য সমালোচক (amateur critic) প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান বিষয়ের শিক্ষক, এম-এ উপাধিধারী (ত্রেয়ী) কবিরাঙ্গ ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে স্বরচিত পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। যিনি ধুওকনাথকে দণ্ডকনাথ বলিয়া ভুল করেন, বোদ্ধান্ত্রকে রামচন্দ্র সাজাইয়া দেন নৈই পবম-পণ্ডিত গ্রন্থকারের পক্ষে মূর্খ প্রফুল্লচন্দ্রকে এইভাবে অভিহিত করা বেশ শোভা পায়।

শুধু ইহাই নহে, মুখবন্ধটি আরো অনেক মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ; পুস্তকখানি যেন প্রফুল্লচন্দ্রের অজ্ঞতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। অর্কপ্রকাশ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; গ্রন্থকারের বিশ্বাস ইহার রচয়িতা লঙ্কেশ্বর বাবণ। প্রাচীন প্রামাণিক রাসায়নিক কোন গ্রন্থে ‘অর্ক’ শব্দের উল্লেখ মাত্রও নাই, ইহা শাস্ত্র শব্দ আরকের রূপান্তর মাত্র। এই গ্রন্থে কৈরিক্স রোগ অর্থাৎ কিরিক্স বা পর্ন্তু গীর্জপণের আনতি সিকিলিস রোগের নিদান ও ঔষধ বর্ণিত আছে। স্তব্ধাং ইহাকে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফেলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কোনই ভুল করেন নাই। এই গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কৃত্রাপি আরকের (এসিডের) উল্লেখ নাই। ইহা গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন, স্তব্ধাং অক্সেব আরক (mineral acid) প্রাচীন ভাবে অজ্ঞাত ছিল, পর্ন্তু গীর্জ বা অস্ত্র কোন বৈদেশিক জাতি এদেশে পরবর্ত্তী কালে ইহা প্রচলন করে ইহা বলিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কোন মারাত্মক ভুল করেন নাই নিশ্চয়। এক শুধু অর্ক-প্রকাশের উপর নির্ভর করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের ভুল ধরিতে যাওয়া নিতান্ত গুণ্ডতার কাজ হইয়াছে। যে-গ্রন্থের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, বাহাতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদেশিক জীবনের প্রতিচ্ছায়া বর্ত্তমান। তাহাকে রাবণ-বিরচিত গ্রন্থ বলিয়া বড়াই করিলে মিথ্যা জাত্যাভিমান বর্দ্ধিত হইতে পারে, সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না নিশ্চিত। আর যে-গ্রন্থেব অসাবিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার পনেরো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাব অবতারণা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কবিরাঙ্গ ভূদেব মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোকে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরসায়নের ইতিহাস প্রকাশিত হইলে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার এই গ্রন্থ সাধারণ গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বার্ত্তলো বলিয়াছেন,

“বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন মনোভা অধ্যায় সংযুক্ত হইয়াছে।”

ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলাব প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্মানস্বরূপে “বিজ্ঞানার্চাধ্য” উপাধিতে ভূষিত করিবার সময় বলেন, “* * * রাসায়নিক জগতে ভারত (প্রফুল্লচন্দ্রের) প্রতিপত্তি মুখ্যতঃ হিন্দুরসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিশাল গ্রন্থে বিস্তৃত রহিয়াছে;” “এই গ্রন্থ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া তুল্যসম্পাদনালী। অস্ত্র কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে একথা না বলা চলিলেও, ইহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে চরম নীমাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।”

পাণ্ডিত্য রসায়নে যৌব অভ্যস্ত কবিরাঙ্গ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্ভবতঃ বাসায়নিক জগতের পিতামহ, হুইন্ডেনেব নোবেল একাডেমীর তত্ত্বাবধায়ক আর্হেনিয়াসের নাম জ্ঞাত নহেন। আর্হেনিয়াসের কীর্ত্তি, ক্লাপ যৌষণ

* Eocene, Oligocene, Myocene, Pliocene, Pleistocene, Subrecent and Recent.

কথা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। আর্হেনিভাসের রচিত পুস্তক “আধুনিক জীবনে বসায়নের প্রভাব” (Chemistry in Modern life) নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দুসভ্যতার মৌলিক বিবৃতি বলিলেও চলে এবং আর্হেনিভাসও পুস্তকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার স্ব স্ব আকার ত্বরিত্যাহেন।

মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে অবিকল্পিত বলা নিম্নরূপে। মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধর্মস্বাধীনতা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যে বিচিত্র সাহিত্য ইউরোপে সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা তাহারি ভারতীয় আদিম অপকৃষ্ট সংস্করণ। ৩০০ পৃষ্ঠার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ হইবে।

“জম্বুকনয়ক বসি বসি কল্পন সম্ভব।
ককৌটি শিশু-মারক গো-শুক্র নমোত্তর।
অজোষ্ট ধর মেঘাণা মহিষস্ত বসি তথা।
মূত্রাণি হস্তিকরত মহিবীধব বাক্সিনাম্।
পোজাতীনাঃ শ্লিঃ পুংসাঃ পুংসাঃ বীজা তু যোজ্যেৎ।”

ম্যাক্বেথের বর্ণিত মারাবিনীর কটাহের (Witch's Cauldron) উৎপত্তি কি এই শ্লোক হইতেই? যাহা হউক আধুনিক যুগে যে কোন লোক বিশেষতঃ তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত কেহ এরূপ স্বল্পচিন্তাপন্ন শ্লোক সাধারণের পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত করিতে পারেন তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই ধারণা করিবেন। আলোচ্য গ্রন্থে হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত কবির কবেকটি প্রকৃতি দেওয়া হইয়াছে। একটি লগ্না বাটক।

“দশ টঙ্কমস্তো গন্ধো যুতেন সহ গালিতঃ।
কণ্যাকান্তব মধ্যো তং নিশিষেধার পঞ্চকম্।
অগ্নিন স্তম্বে দৃষ্টে গন্ধে ক্রিষ্টকঃ নব সারকম্।
মরিচানি তু পিষ্টানি পঞ্চতোলানি বারিণি।”

ইত্যাদি ইত্যাদি।

২২৪ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ গন্ধক, যুত, নবসারক ও মরিচ প্রভৃতির সমন্বয়ে নানা প্রকার প্রক্রিয়ায় পব স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। বসি বাহুল্য, গ্রন্থকারের কথায় ভুলিয়া অথবা দেবনাগরীর প্রকারের অতি অস্বাভাবিকঃ যদি কেহ এ পর্বীক্ষা আরম্ভ করেন তবে কস যে কি দাঁড়াইবে তাহা অবজ্ঞা বলিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু শ্লোকটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নবসারকম্ ও বাংলা নিশাদল একই পদার্থ। কোন প্রাচীন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা উল্লেখ নাই। ইহা পারস্ত নৌসাদর শব্দের সংস্কৃত অপভ্রংশ হস্তরঃ মুসলমান রাজত্বের সময় শব্দটি সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত হইবে একপ মনে করিলে মারাজক ভুল নাও হইতে পারে। যাহা হউক এসকল শ্লোকের প্রামাণিকতা লইয়া অথবা কলহ কবির আবশ্যকতা নাই। এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কি হইবে তাহা গ্রন্থকার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি না জানি না। প্রকৃত বাস্তবিক হস্ত এত অধিক মূল্য দিয়া পুস্তক কিনিবার সামর্থ্য নাই কিন্তু গন্ধ বা অশ্লিষ্ট অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী মহলে ইহা বেশ কাটিবে। স্বর্ণ-করণের মধ্য প্রয়োজন্যের আশায় এই জাতীয় লোকের অনেকেই পুস্তক ক্রিনিতে আরম্ভ করিবে, ফলে পর্বীক্ষার পরিণাম যাহাই হউক গ্রন্থকারের তহবিল পূর্ণ হইয়া আসিবে। মুখ্যতঃ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তিত কবির ক্ষমতা বাঞ্ছন, কিন্তু যে-সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্যে তিনি এই ইলজাল সাধিত করিতে চাহেন তাহাদের স্বপ্ন যে কোন রাসায়নিকের নিকট সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। গ্রন্থকারের সতে পারদ যথেষ্ট পরিমাণ

স্বর্ণকে “উদরহ” করিলেও তাহার ভার বৃদ্ধি হয় না (মুখ্যতঃ XIV)। অল্পতঃ ৩১২ পৃষ্ঠায় ইহাবই সালকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, নব্যরাসায়নের জন্মদাতা আন্তোয়ান লোবোঁ ল্যাভোয়িয়ার (Lavoisier) জন্মের পূর্বে কেহ একথা বলিলে হয়ত লোকে চিন্তা কবির দেখিলেও দেখিতে পারিত কিন্তু স্থল তুগাধস্ত আবিষ্কারের পর একথা লোকে উপহাস ভিন্ন আর কিছুই করিবে না। যাহা পর্বীক্ষার সত্যের বিরোধী তাহা জাহির করিবার কি আবশ্যকতা আছে? গন্ধক ও পারদ সম্মিলিত হইয়া যে-পদার্থের সৃষ্টি হবে তাহা বাহির হইতে দেখিলে স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে একরূপ পরিমাণও স্বর্ণ নাই।

যাহা হউক গ্রন্থকারের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধিৎসার যুগে এ জাতীয় পুস্তক শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হইতে পারে না। প্রকৃততঃ ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু জড় বিজ্ঞানের আপকায়িত হইবার মূল্য কতটুকু? বিশেষণে পিত্তিত ভারতবাসীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তক অতিশয় হীন ধারণা পোষণের সহায়তা করিবে। আশা করি, গ্রন্থকার এই জাতীয় অন্ত কোন পুস্তকে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া মহত্তর উদ্দেশ্যে সক্তি রাখিবেন।

শ্রী সুবোধকুমার সজ্জমদার

শ্রীভাগবতামৃত-কণা—মহামহোপাধ্যায় শ্রী শিবনাথ

চক্রবর্তী বিবচিত, কবিরাজ শ্রীকামপ্রিয় গোপালী সম্পাদিত। শ্রীকৃষ্ণ কানাই সেবা সমিতি, ভাঙ্গনঘাট, পোঃ নদীয়া হইতে প্রকাশিত। দেবকীন্দন প্রেস—মালিকতলার পাওরা ঘাট। মূল্য ৮।

শ্রীমদ্রূপ গোপালী কৃত শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বিবনাচক্রবর্তী মহাশয় শ্রীভাগবতামৃত কণা নামক এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। শ্রীমদ্রূপ গোপালী মহাশয় ইহাব বঙ্গমুদ্রা করেন। শ্রীকৃষ্ণ কামপ্রিয় গোপালী মহাশয় শ্রীমদ্রূপ গোপালী মহাশয়ের উপর নির্ভর করিয়া মধ্যো মধ্যো শাস্ত্র-সম্মত তাত্ত্বিকাদি যোগ্য কবির এই গ্রন্থকে আরও মূল্যবান করিয়াছেন। ইহাতে, যিনি উপাত্ত তাহার স্বরূপ কি, তিনি উপাত্ত কেন—ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে।

সটীক বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিদ্যা কৰ্ত্তৃক সংস্কৃত

ভাষায় সংগৃহীত ও চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুবাদিত। প্রকাশক বর্গীশ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রাপ্তিস্থান শ্রীঅমল্যরতন ভট্টাচার্য্য ৩০ নং ককিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেন, বিভিন্ধুটি পোঃ, কলিকাতা, মূল্য ১০।

বর্গীশ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিদ্যা মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা, মন্ত্র মহোদধি, তন্ত্রবাক্য, পিঙ্গলগুরু ; বামল প্রভৃতি ৭৪ খানি গ্রন্থ হইতে দার সংগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থে সম্মিলিত কবিরাজছেন। ইহাতে বিষ্ণুবিষয়ক সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই লিখিত আছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে এমন প্রামাণিক গ্রন্থ আর নাই বলিলেই চলে। বাড়লা ভাষায় অনুবাদ বুঝে প্রাপ্ত হইয়াছে—সাধারণের বুঝিবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হইবে না। পুঁথির তাকারে চরকাব কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি-কল্যাণ—শ্রীনিবাস বহু।

প্রাপ্তিস্থান বঙ্গীষ হিতসাধন মণ্ডলী, ৭০, আগহাট্টা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরনাথ মৈত্র মহাশয় কর্তৃক পরিচালিত বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী বাংলাদেশের অশেষ কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন। এই মণ্ডলীর সেবকরূপে লেখক মহাশয় গ্রামে গ্রামে চিত্র-সাহায্যে প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা, আলোক-বাতাস-পূর্ণ আঁতুড় ঘর, আঁতুড় ঘরের পরিচ্ছন্নতা, জন্ম হইতে স্বাস্থ্যকর উপায়ে শিশুর পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয়ে নানা বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। সেইসব বক্তৃতা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক নানা চিত্র-সংযোগে এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে শিশুর জন্ম-মৃত্যুর হার, গর্ভদেহার, গর্ভিণীর কর্তব্য, প্রসবের পূর্বে কর্তব্য, প্রসবকালীন কর্তব্য, প্রসূতি-পরিচর্যা, শিশু-পরিচর্যা, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুর ছোট্টাচে রোগ ও তাহার প্রতিকার এবং শিশুর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ আলোচনা আছে। কিছুদিন পূর্বে প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় “প্রসূতি-পরিচর্যা” নামে এই জাতীয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি এই বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বাঙালীর ঘরে শিশুমৃত্যু অত্যধিক, এবং ছুই তিনটি সন্তানের জননীরা অধিকাংশ স্থলেই ভগ্নবাহ্য অথবা অকালে ইহলোক হইতে অপসারিত। বাঙালীর এ অল্প পুষ্ক-বস্ত্রা অমুদ্রব করিয়া বাঙালী জাতিকে বাঁচাইবার ও হৃদয় করিয়া গড়িবার ত্রুত বাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বাঙালীর পরম বন্ধু। যিনি কেশের ড়াল, ভবিষ্যতে যিনি বংশ রক্ষা করিয়া দেশের ও ধর্মের সেবা করিবেন, এবং যে নারী জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন—সেই সন্তানের জন্ম ও সেই নারীর জাতি-জন্মান-কার্য সম্পন্ন করাইবার লক্ষ্য আমরা এক পুস্তিকময় অঙ্ককাব পুষ্ক নির্দেশ করি। ফলে, আজ বাঙালীর বংশধারা রুদ্ধগতি, বাঙালী নারী জীর্ণ ও বাঙালী জাতি জীবনের সর্বপক্ষে অনগ্রসর। প্রত্যেক বাঙালী পুষ্ক ও নারী জামুন যে, প্রসূতিই দেশের জননী ও শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। ইহারিগকে হ্রস্বপরিচর্যা পালন করা কেবল কর্তব্য নয়, ধর্ম। এই জাতীয় পুস্তকে দেশের প্রভুত কল্যাণ হইতেছে। সর্বসাধারণকে আমরা পুস্তকটি পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রাচীন ভারতে গোমাংস—খানী ভূমানন্দ। ১, মুখার্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

ঋগ্বেদের যুগ হইতে মহাভারতীয় যুগ এমন-কি অশোকের যুগ পর্যন্ত নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অমুদ্রাধান করিয়া লেখক ভারতে গোমাংস প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তিকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারত বেলকে যখন অত্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে তখন বৈদিক ত্রিষা, আচার ও বেদান্তমোহিত গোমাংস ব্যবহার ভারত আজ ত্যাগ করিতে পারে না। ভারত যখন সম্পূর্ণ বেদপন্থী ছিল তখন সে খাড়াখাণ্ডের ক্ষুদ্র গভী স্বীকার করে নাই এবং স্বীকার করে নাই বলিয়াই বিভিন্নচারী শক, হ্রণ প্রভৃতিকেও সে আপনার সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। আজ গোমাংস-ভক্ষণের গভী টানিয়া ভারত মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে আপনা হইতে ঘৃণার দুরে রাখিতেছে। এই দুটুকরণ চেষ্টার ফলে আজ মুসলমানের সঙ্গে তাহার বিরোধের শেষ নাই, ও হিন্দুসমাজ বিপদাশ্রিত। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে হইলে ও মুসলমান সমস্ত সমাধান করিতে হইলে হিন্দুকে গোমাংস সম্বন্ধে অন্ত বৈধী কঠোর হইলে চলিবে না। তাহারই শাস্ত্রে গোমাংস ব্যবহার অমুসৌচিত; হতরাং সে-সম্বন্ধে তাহাকে সংস্কারমুক্ত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মুসলমানকে গ্রহণ করিবার ও হিন্দুসমাজের বলবৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে।

লেখকের উক্ত মন্তব্য হিন্দুসমাজের চিন্তনীর ও বর্তমান কালে ইহার আলোচনা গুঁই বাহনীয়। তবে লেখককে একটি কথা মনে রাখিতে

হইবে যে, ভারতে মহাপুষ্ক যুদ্ধের অহিংসা ধর্মের যে অঙ্কত ধাবন আসে, তাহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। সে উচ্চ ধর্মদর্শনের আভাসও বৈদিক কাল হইতেই হিন্দু-ধর্মগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্র পুস্তকও যেমন স্বীকার করিয়াছেন, পুস্তক না-করার উচ্চ মতকেও তেমনি স্বীকার করেন নাই। আর মানুষের মধ্যে হিংসা-ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও অহিংসভাবের অভাব নাই। গোমাংস গ্রহণে মুসলমানকে স্বীকার করার সুবিধা হস্তে ধরিতে পারে, কিন্তু ভারতের প্রকৃতি সে-বিষয়ের কঠোর সহায়ক তাহা বিবেচনা ও আলোচনার বিষয়। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র গোমাংসই কি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়?

রমানাথ—শ্রীমতীশচন্দ্র দেন, এম-এ, বি-এল। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্তী চার্জার্স এন্ড কোং লি, ১৫ কলেজ স্টোর, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

বইখানিকে ঠিক উপভাস বলা চলে না। ইহা একটানা একটি গল্পের মত। কিন্তু গল্পও ভাল জমে নাই।

গুপ্ত

(১) **সরল ধাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—**ডাক্তার শ্রীহৃদ্রীমোহন দাস প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ২০ টাকা।

(২) **শিশুমঙ্গল প্রথম শিক্ষা—**ডাক্তার শ্রীহৃদ্রীমোহন দাস প্রণীত। মূল্য ১০/-

প্রাপ্তিস্থান ১০২ আগার সার্কিটার রোড, কলিকাতা

১৮ বৎসর পূর্বে ডাক্তার হৃদ্রীমোহন দাস কলিকাতা বেডিকেল

ব্রাহ্মে শিশু-মন্ডল নিবারণের উপায় স্বরূপ উত্তর কলিকাতার একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র ও হৃদ্র-ভাণ্ডার সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট ৮৮ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। সে-সময় মিউনিসিপ্যালিটি সে-কথার কর্ণপাত করেন নাই। জনপ্রিয় ডাক্তার বেটীজী, সরকারকে শিশুমঙ্গলের ব্যবহার লক্ষ্য অনেকবার অনুরোধ করেন। তাঁহার কাগজপত্র জঞ্জালের বুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৯২০ সালে হৃদ্রীমোহন দাস সদস্য ঘারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয় প্রস্তাব করাইয়াছিলেন। তাহার ফলে গভর্নমেন্ট একটি শিশুমঙ্গল কমিটি নিযুক্ত করেন। তার নীলয়তন তাহার সভাপতি, ডাক্তার বেটীজী সম্পাদক, ডাক্তার হৃদ্রীমোহন দাস, বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্য। এই কমিটি কর্তৃক যখন একটি শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হয়, সভ্যহলে তহানীজন পতরণ কমিটির প্রস্তাবিত শিশুমঙ্গলের লক্ষ্য ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সবকারী তহবিলে সে টাকার হ্রদ বাড়িতেছে।

হৃদ্রীমোহনের সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশু-পালনের বার্তা প্রচার করিতেছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পছলে গ্রন্থকার ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালনের তত্ত্বগুলি এমন সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে অতি অজ্ঞশিক্ষিত জ্ঞানোন্মত্তও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গর্ভিণী পরিচর্যা, প্রসব ও শিশুপালন কার্য হৃদস্পন্দ করিতেছেন। ইন্ডেন হাঁসপাতাল, ডাক্তার হাঁসপাতাল, ডিক্টার বোর্ডের অধীন বাই-শিক্ষা-জ্যৈষ্ঠ-সমূহ এই পুস্তক পঠিত হইতেছে।

গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার ধাত্রীদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ রহিয়াছে। সেই কর্তব্য লক্ষ্যনের ফলে যে এই বাঙ্গালা দেশে প্রতিবৎসর আড়াই লক্ষ শিশু ও ত্রিশ হাজার জননী অকালে কালক্রমে পতিত হইতেছে, সে-কথাটা গ্রন্থকার পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। চরিত্রহীনতার দরুণ কুৎসিত রোগ হয় এবং ঐচ্ছিক প্রত্নতি ও শিশু মারা যাব, এই বিষয় প্রমাণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

“বয়স্ক মেয়ে ও পুরুষদের সাবধান করে বলবে যে, চরিত্রহীন হ’লে যে কেবল নিজের সর্বনাশ হয় তা নয়, কিন্তু শিশুহত্যাও ভাগী হ’তে হয়। এই রোগের অনেক সময় বাহিরে লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অল্পচ-রোগ ভিতরে থাকে, তাই থেকে অস্ত্রের শরীরে যায়। ১২ বৎসব পর্যন্ত এর জের থাকে, এমন ঘটনাও জানা আছে।”

শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যার অল্পতা বা অভাব বশতঃ অনেকে এখনও অশিক্ষিত মেসী বাই বাড়া প্রসব করাইয়া থাকেন। তাহাদের শিক্ষার জন্য হুন্দরী-বাবু “শিশুমঙ্গল প্রথম শিক্ষা” নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। জরায়ু প্রভৃতির প্রতিকৃতি ও ছবির সাহায্যে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এই গ্রন্থে তাহার সঙ্কেত রহিয়াছে। বাহাতে গ্রামে গ্রামে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কিংবা পল্লীমঙ্গল সমিতির অধীনে ঐক্লপ শিক্ষার অনেকগুলি কেন্দ্র হয় গ্রন্থকারের এবং ডাক্তার বেটেলির এই অভিপ্রায়।

আমরা আশা করি, প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও সেবাসমিতি এই পুস্তক দুইখানি ক্রয় করিয়া বিতরণ করিবেন এবং শিক্ষিত ধাত্রী ও অশিক্ষিত ধাত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ঘরে ঘরে এই পুস্তকগুলি গৃহ-পঞ্জিকার স্থায় পঠিত হওয়া উচিত।

হ

★ বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ—

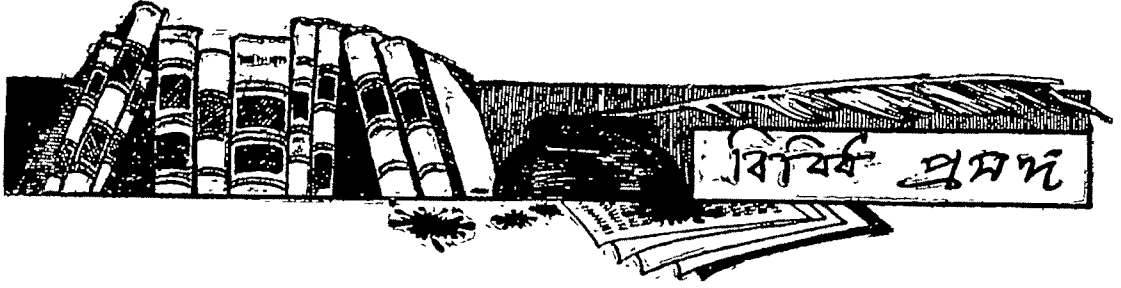
“The Origin and Development of the Bengali Language” নামে দুই খণ্ডে অষ্টাংশিত কুলস্ক্যাপ আকারের শতাত্তর সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থ বহিঃ-সৌন্দর্যে যেমন নয়নানন্দ হইয়াছে, অন্তঃ-সৌন্দর্যেও—বিষয়-সৌরবে আলোচনা-পদ্ধতিতে এবং লিপিকৌশলে—তেমনি চিত্তহারী হইয়াছে। গ্রন্থের লেখক সাহিত্যচর্চা ক্ষীণত্ব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় উৎপত্তি, বিকাশ ও পবিণতির যেকণ পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সম্বলিত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে এত দিন পরে বঙ্গভাষা-ভাষিকগণের সবেষণা ও আলোচনার বহুবিঘ্নসকল সংকীর্ণ পথটি আজ পরিষ্কৃত ও রাজপথে পরিণত হইল। কিরূপে যে কোল-স্রবিড় তিব্বতী-বর্মী নারদী ভাষায় ডালপালা—হো-মুণ্ডারী মাল্তো-ওরাও লেপচা-ভেটি কোচ-মেচ গারো মু. কুকী চীন লুশাই-খাসী প্রভৃতি স্লেজ,

অনাধু, ইতরাধ্য কথ্য-গ্রাম্য-উপ-অপাদি-নামক উপেক্ষিত ভাষার এবং আধ্য-ভারতবর্ষ সংস্কৃত প্রাকৃতের তত্ত্ব ও তৎপর্য্য ভাষাগুলির শব্দ-সাগরে স্নান কবিয়া আধ্যানার্য্য বাঙ্গালার মৌলিক ঘূর্ণিয়া বর্তমান কৈলীস্থ লাভ হইল, শব্দবিজ্ঞানবিৎ হুনীতিবাবু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তাহা সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী সংস্কৃতের তৎসমা হুহিতা বা দৌহিত্রী জ্ঞানে যাহারা আজিও আধ্যামির মোহে মাতৃভাষায় অনার্য্য সংশ্রব সহ্য করিতে পারেন না, বাঙ্গালাভাষায় চিত্ত-ক্লম্বিকার এমন অনেকেরই দৃষ্টি এই ভাষাবিজ্ঞানের ধারানৈবদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাকরণধানি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করিবে। তাহারা দেখিবেন যে, বাঙ্গালীর অত্যন্তীতের পূর্বপুরুষগণের অনার্য্য প্রভব আধ্যানস্বাক্ষরপুত সেই বাঙ্গালীই কোন্ কোন্ রসায়ন সংযোগে আজ বিশ্বসাহিত্যের এই বাঙ্গালার পরিণত হইয়াছে। পানিনি মুক্তনাদের তত্ত্ব ও তৎসম ছাচে ঢালা বাঙ্গালী-ব্যাকরণকারগণও দেখিবেন যে, তাহাদের বাঙ্গালী ব্যাকরণ লেখা হয় নাই, কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন তাঁহার “গৌড়ীয় ব্যাকরণে” ঠিক এক শতাব্দী পূর্বে যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন এবং যাহা কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “শব্দ-তত্ত্ব” হইতে বিদ্যমানিধি যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গালী ব্যাকরণের পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় বৈয়াকরণিক লেখমালায় ভিতর দিয়া অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, হুনীতিবাবুর লেখনীমুখে সেই ব্যাকরণই আজ পর্যন্ত ও সর্বদ্বন্দ্বম্বরতা লাভ করিল। গ্রন্থকার ইহাতে ভারতীয় আধ্যানার্য্য শব্দ ব্যতীত পূর্ভ গৌড় ইংরেজী আরবী-পারসীক প্রভৃতি বহু বৈদেশিক ভাষায় শব্দসংশ্রব বিশদ ভাবে প্রদর্শন করিয়া প্রায় দশ সহস্র বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তি আলোচনা ও ধ্বনি-বিচার কবিয়াছেন।

এপর্যন্ত এই বিভাগের বস্তুগুলি পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সকলগুলিইই আলোচনা অস্বাধিক আংশিক, এবং phonology ও morphology আলোচনার বৈজ্ঞানিক হুত্বের সাহায্যে অস্বাধিক বিচারিত হইলেও তৎসমস্তই অনুসরণ-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলায়, ধ্বনি এবং গঠন বিজ্ঞানের ধারানিষ্ঠতার অননুসৃত ও অকিঞ্চিৎকর; তাহাদের অধিকাংশই একমার্গী ও সংস্কৃত-মূল্যবোধী। পারিগার্হিক অনার্য্য-ভাষামূল্যলন-প্রবণতা অত্যন্তই যে, একপা সংস্কারবদ্ধ-সিদ্ধান্তের হেতু তাহা বলাই বাহুল্য। স্বথের বিষয়, উপস্থিত গ্রন্থের লেখকে তাহার সম্ভাব, বহুভাষায় সংশ্রবজাত স্রবের বিকাশ ও মুক্ত সংস্কারের ফলে আমরা এমন একখানি গ্রন্থ হাতে পাইলাম, যাহা ভারতীয় কোনও, প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যে অন্ত্যাবধি লিখিত হয় নাই—এবং যাহার গোববে আজ বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী গৌরবান্বিত। আমরা ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই ঐতিহাসিক ব্যাকরণ-ধানির বাঙ্গালী সংস্করণ দেখিবাব আশার রহিলাম।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য



বঙ্গে নারীনির্যাতন

গত বৎসর আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বাংলা দেশেই নারীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ বেশী কেন শুনা যায়?” ইহার উত্তর দিতে পারি নাই। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে, অস্ত্রান্ত্র প্রদেশেও এরূপ অত্যাচার হয় কি না, অল্পসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু যে দোষ, কলঙ্ক, লজ্জা আমাদের আছে, তাহা অন্তরেও থাকিলে—এমন কি অন্তরে তাহা অধিকতর পরিমাণে থাকিলেও, আমাদের দোষ, কলঙ্ক ও লজ্জার ফালন বা অপনোদন হয় না, কিংবা আমাদের দোষ, গুণে পরিণত হয় না। সুতরাং নিজেদের দোষ কমাইবার নিমিত্ত, অস্ত্রান্ত্র প্রদেশে কি হয়, তাহার খবর লওয়া অনাবশ্যক ও অমুচিত, কিন্তু যদি এরূপ হয়, যে, অস্ত্রান্ত্র প্রদেশে আগে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, কিন্তু এখন ঘটে না; কিংবা এখন ঘটিলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাও প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলে, কি কি কারণে এবং কি কি উপায় অবলম্বন দ্বারা অস্ত্রান্ত্র প্রদেশে এরূপ অত্যাচার অতীত ইতিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, বা বর্তমানে অস্ত্রান্ত্র প্রদেশে এরূপ অত্যাচার ঘটিলে তাহা দমনের কি কি উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা তত্ত্বপ্রদেশ-নিবাসী আমাদের কোন বাঙালী পাঠক জানিলে সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে বঙ্গদেশের সাহায্য ও উপকার হইতে পারে।

ডাক্তার মুন্সে অল্পদিন হইল, পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তথাকার কেহ কেহ ছুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গে নারীনির্যাতন সম্বন্ধে উদাসীন, এবং কোন প্রকার সাহায্য করে না। পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গ, এবং পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া যে কোন উদাসীন আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। কিন্তু সমস্ত দেশই যে

ইহার প্রতিকারে যথেষ্ট সচেষ্ট নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাক্তার মুন্সে মূখে ইহাও শুনিলাম, পূর্ববঙ্গের লোকেরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকদের সহায়ত্বভূতি ও সাহায্য চান। সহায়ত্বভূতি অনেক সময় ফাঁকা কথাযাত্র। প্রকৃত সহায়ত্বভূতি থাকিলেও অনেক সময় কেহ কেহ কার্যতঃ কোন সাহায্য করিতে পারেন না বটে। তথাপি সাধারণতঃ ইহা মনে করা ভ্রম নহে, যে, সহায়ত্বভূতি খাটি কিনা ও তাহার পরিমাণ কত, তাহা সাহায্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ হইতে বুঝা যায়। এই জন্ত, নারীনির্যাতনের প্রতিকারকল্পে বঙ্গের কোন এক অংশের লোক সেই অংশের লোকদের নিকট এবং অস্ত্রান্ত্র অংশের লোকদের নিকট কি কি প্রকারে কিরূপ সাহায্য চান, তাহার কেজো রকমের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অত্যাচারিতা ও অত্যাচারীর জাতিধর্মনির্কিশেষে এই দৌরাষ্ট্র্য ও পর্দা দেশ হইতে উন্মূলিত হওয়া চাই। কেহ ঘেন মনে না করেন, ইহা অসম্ভব।

আমাদের দেশে অনেকে মনে করে, যে, নরনারীর সম্পর্ক-বিষয়ক নীতিতে আমরা ইংলণ্ড ও অস্ত্রান্ত্র ইউরোপীয় দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই ধারণা সত্য কিনা তাহার বিচার করা এখন অপ্রাসঙ্গিক। এস্থলে আমার কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, নারীর উপর অত্যাচার বিষয়ে ইউরোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইউরোপে নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ক যে দুর্নীতির কথা তথাকার অনেক মোকদ্দমা হইতে প্রমাণিত হয়, তাহা অল্প রকমের। এবং বা দল বাধিয়া কুমারী, সধবা, বিধবা নারী হরণ ও তাহা উপর পাশব অত্যাচার, তাহাকে লুকাইয়া রাখা, তাহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে সরাইয়া সরাইয়া লইয়া যাওয়া অত্যাচারের পর তাহার প্রাণবধ—এপ্রকারের ঘটনা আধুনিক ইউরোপের কোথাও ঘটে বলিয়া পড়ি নাই শুনি নাই। গত বৎসর কিছুকাল ইউরোপের ভিন্ন ভি

দেশে ছিলাম। অনেক সময় তথাকার খবরের কাগজও পড়িয়াছি, কিন্তু একরূপ একটি ঘটনার সংবাদ কোন কাগজে দেখি নাই। আমাদের দেশে যত অত্যাচার হয়, তাহার অনেকগুলির খবর কাগজে বাহির হয় না, মোকদ্দমা তদপেক্ষাও কম ঘটনা লইয়া হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, কাগজে যাহা বাহির হয়, তাহা অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে, একরূপ ঘটনা ইউরোপে ঘটে না।

ইউরোপেও আমাদের দেশে এই প্রভেদের কারণ কি, আমরা তাহার সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হয় ত অসমর্থ। কিন্তু দুই একটা কারণ যাহা মনে হইতেছে, তাহা বলিব।

পাশ্চাত্য দেশসকলে দুশ্চরিত্রতা নাই, এমন নয়; খুব আছে। সেই জন্ত সেই সব দেশেও বেস্তাবৃত্তি আছে, তাহার জন্ত “শ্বেতদাস ব্যবসা” (White Slave Traffic) আছে। নানা উপায়ে ও কৌশলে অল্পবয়স্ক ও পূর্ণ-বয়স্ক যুবতীদিগকে ভুলাইয়া প্রতারণা করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে নানাস্থানে চালান করিয়া তাহাদিগকে পাপ-ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া হয়। পাশ্চাত্য দেশসকলে নারীর এইপ্রকারের দুর্গতি আছে; এবং তাহা আমাদের দেশেও আছে। যাহা ইউরোপে নাই, তাহা এই বাংলাদেশের সেই সব ভীষণ পৈশাচিক বলপ্রয়োগসাহিত অত্যাচার যাহার এক বা একাধিক সংবাদ বাংলা কাগজের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় পাওয়া যায়। ইউরোপ ও বাংলাদেশের এই প্রভেদেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা যে-সব কারণের কথা বলিব, তাহা সর্ববাদিসম্মত হইবে, কিংবা আমাদের কোন ভ্রম হইতে পারে না, আমরা একরূপ মনে করি না। কিন্তু যাহারা আমাদের লাস্ত মনে করিবেন, তাহাদের মতে যাহা প্রকৃত কারণ তাহা নির্দেশ করা তাহাদের কর্তব্য হইবে।

ইউরোপীয় সমাজে নারীরা একরূপ শিক্ষা ও সুযোগ প্রাপ্ত হন, যে, তাহারা কেবল তাহাদের জীবন যাত্রাই পরিচিত নহেন। অর্থাৎ কেহ ভাল লেখক বলিয়া পরিচিত, কেহ সাংবাদিক, কেহ শিক্ষক, কেহ টাইপ-লেখক, কেহ কেরানী, কেহ কারিগর, কেহ দোকানদার, কেহ বণিক, কেহ দর্জী, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ ঐতিহাসিক, কেহ অধ্যাপক, কেহ মন্ত্রী, কেহ

ব্যবস্থাপক, কেহ ধর্মোপদেষ্টা, কেহ চিত্রকর, ইত্যাদি। এই জন্ত ইউরোপে, নারী দেখিলেই, বা কোন নারীর উল্লেখ হইলেই, সেই জীবটি যে কেবলমাত্র জীজ্ঞাতীয় জীব এবং সমাজে জীবই তাহার একমাত্র বৃত্তি বা কার্য, অন্ততঃ সর্বপ্রধান বৃত্তি বা কার্য, একমাত্র এই চিন্তাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য হয় না;—যেমন পৃথিবীর কোন দেশেই কোন নর দেখিলে বা তাহার উল্লেখ হইলেই সে যে পুংজাতীয় দ্বিপদ প্রাণীবিশেষ, ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক ও অনিবার্য চিন্তা নহে, বরং ইহাই জিজ্ঞাস্য হয়, যে, এই দ্বিপদ প্রাণীটির সমাজে স্থান কি, কাজ কি, ইত্যাদি। এই অবস্থায় আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে নারীর জীব অপেক্ষা মনুষ্যত্বের দিকে চিন্তা কিছু অধিক ধাবিত হইবার কথা। পুরুষের পুংজাতীয়ত্ব ও নারীর স্ত্রীত্বের দিকেই যদি চিন্তা বেশী ধাবিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব না বাড়িয়া জন্তুবৃত্তা বাড়ে, স্তত্রাং ইন্দ্রিয়-পবায়ণতাও বাড়ে। অন্তর্দিকে, যদি সমাজে নারীর জীব ছাড়া অন্ত কার্য ও বৃত্তিও থাকে, তাহা হইলে আত্মা ও হৃদয়মন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে নারীর মর্যাদা নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বলা বাহুল্য, আমরা নারীদিগকে সহধর্মিণীত্ব ও মাতৃত্ব ত্যাগের হাশ্বকর উপদেশ দিতেছি না। পুরুষের পরিবারের স্বর্ভা হইলেও যেমন কেবল তাহাই নহেন, নারীদেরও তেমনি পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব ছাড়াও মনুষ্যত্ব কিছু আছে, তাহাই বলিতেছি।

অনেকে ইউরোপের সামাজিক অবস্থা অতি জঘন্য মনে করেন। তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না, যে, আমাদের অবস্থা খুব ভাল। কে ভাল, কে মন্দ, সে চিন্তা আপাততঃ মন হইতে দূর করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি। কেবল আমাদেরই দুর্গতি ও দুরবস্থার কারণ শাস্ত্র ও ধর্ম ভাবে নির্ণয় করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

ইউরোপে অবরোধ প্রথা নাই, ঘোমটা দিবার প্রথা নাই। এই দুই প্রথার সপক্ষে যাহা বলা যায়, তাহা অবগত আছি। ইহা হইতে যে কুফলের উৎপত্তি হইয়াছে এখন তাহাই আমাদের বক্তব্য। ইহা ব্যতিরেকেও যে হিন্দুত্ব থাকিতে পারে, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রদেশ, সারা ফাশগাত্য

তাহার প্রমাণ। ইহা যে ইসলামের সহিত অভিন্ন নহে, নব্য তুরস্ক তাহা দেখাইয়াছে, এবং ভারতবর্ষেও বোম্বাই অঞ্চলের কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার দেখাইয়াছেন। ইহার কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া নব্য তুরস্কের নেতারা ইহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন।

অবরোধ প্রথা এবং মুখখানি সম্পূর্ণ অবগুপ্তিত করিয়া রাখার উদ্দেশ্য নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা, এইরূপ কথিত হয়। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। তাহা নারীরা বলিলেই ভাল হয়। অবরোধ ও অবগুপ্তন নারীর জীবনের উপরেই যৌক দেয়—পুরুষ ও নারী উভয়ের সাধারণ মনুষ্যত্ব বিস্তৃত হইয়া যেন কেবল নরনারীর জাস্তব সম্বন্ধটাই মনে রাখে। ফলে অবরোধ ও অবগুপ্তন যে কোতুংলকে সদা আগ্রত রাখে, তাহাতে সাম্প্রিক ও পবিত্র চিন্তার সহায়তা করে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে নারীদেরও মানসিক ক্ষতি হয়। তাঁহারা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলে ঝড়সড় হইয়া পড়েন, সামান্য বিপদেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন, এবং অল্প চিন্তা অপেক্ষা কেবল যেন এই চিন্তা লইয়াই বিব্রত থাকেন, যে, কোন্ ছুটে পুরুষ তাঁহাদের উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। একরূপ মানসিক অবস্থা সাম্প্রিকতার ও শাস্তদীরচিত্ততার সহায়ক নহে। অবরোধ ও অবগুপ্তন নারীদের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মানসিক বল বৃদ্ধির অন্তরায়। ইহা যে-সব দেশে প্রচলিত, তথাকার পুরুষদের স্বভাবের উৎকর্ষেরও ইহা পরিচায়ক নহে। ইহা হইতে অহুমান করা অন্তায় নহে, যে, তথাকার পুরুষেরা ঈর্ষান্বিত। যে-নারীদিগকে অবরুদ্ধ ও অবগুপ্তিত করিয়া রাখা হয়, তাঁহাদের আত্মীয়দের সম্বন্ধে এই অহুমান করা অস্বাভাবিক নহে, যে, অন্তঃপুরের বাহিরে নারীর রক্ষায় তাঁহারা অক্ষম; এবং ঐ নারীদের অনাত্মীয় পুরুষদের সম্বন্ধেও স্বভাবতঃ এই অহুমান হইতে পারে, যে, তাহারা একরূপ দুশ্চরিত্র, যে, তাহাদের হাত হইতে নারীদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় অবরোধ ও অবগুপ্তন। এই দুইটি অহুমান একত্র করিলে, অবরোধ ও অবগুপ্তনের দেশসমূহের পুরুষদের স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি পায় না।

যাহাদের দেশে অবরোধ নাই, তাহারা যদি জিজ্ঞাসা করে, “তোমাদের দেশের পুরুষেরা যদি মোটের উপর সচ্চরিত্র, তাহা হইলে নারীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা কেন?” তাহা হইলে কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? “তোমাদের যদি নারীরক্ষার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে অবরোধ তুলিয়া দাও না কেন?” এই প্রশ্নেরই বা উত্তর কি? বস্তুতঃ অবরোধ প্রথা না থাকিলে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সাহস বাড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য, ইহা সত্য নহে এবং ইহা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে, যে, আমাদের দেশের সব পুরুষ পৌরুষহীন বা চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট। আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহা অবরোধের সমর্থকদের বিবেচনার জন্য লিখিতেছি। অবরোধ না থাকিলে নারীরা কুচরিত্র হইবেন, এই মিথ্যা সম্বন্ধের জবাব নারীরা দিবেন। আমরা কেবল বলিব, “মহারাজের নারীরা সকলে বা বেশীর ভাগ কুচরিত্রা নহেন, অথচ তথায় অবরোধ নাই।”

নারীরা যে পুরুষের লোভের বস্তু, অতএব তাহা-দিগকে লুকাইয়া রাখা দরকার, অবরোধ ও অবগুপ্তন যেন জোর গলায় ইহাই বলে; যুক্তিসঙ্গত শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে নারীরা যে ঘরের বাহিরেও লোকহিতসাধনাদি করিতে পারেন, তাহা বলে না। যাহা লোভের বস্তু বলিয়া লুকাইয়া রাখা হয়, মানুষের প্রবৃত্তি সেই দিকে বেশী ধাবিত হইবার কথা। এইজন্য যে-সব দেশে ও সমাজে অবরোধ ও অবগুপ্তন যত বেশী প্রচলিত, তথাকার পুরুষদের জাস্তব প্রবৃত্তি বিশেষ এবং নারীলালসা তত প্রবল হইতে পারে। বাংলা দেশে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অবরোধ ও অবগুপ্তনের চলন যত বেশী, তাহার অন্তর্ভূত পুরুষদের চরিত্র তদনুরূপ কিনা, এবং তাহাদের দ্বারা নারীনির্ধ্যাতন তত বেশী হয় কিনা, পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিবেন। অবরোধ ও অবগুপ্তন না থাকিলে নারীরা যে অধিকসংখ্যায় শিক্ষিতা ও জনহিতসাধিকা হইতে পারেন, বাংলা দেশের সহিত দক্ষিণভারতের তুলনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

অবরোধ ও অবগুপ্তন আমাদের দেশে—বিশেষতঃ বড় সহরে, নারীদের স্বাস্থ্যহানি, দৈহিক দুর্বলতা এবং অকাল মৃত্যুর একটি কারণ। ইউরোপের কোন সহরে একদিন

কাটাইয়া তথাকার নারীদের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং পা ছুঁথানার বলিষ্ট পুষ্ট গঠন দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাদের স্বাস্থ্য আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা কত ভাল। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। শারীরিক বল থাকিলে নারীদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মে।

ইউরোপে নারীদের কেবল মাত্র বা প্রধানতঃ জীৱনের উপর কোঁক না দিয়া তাহাদের সাধারণ মনুষ্যত্বের চিন্তাও যে সর্বসাধারণে করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ, তথাকার নারীরা দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা পাইয়া নানা বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পান। শিক্ষার সুযোগ তাহারা আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে বেশী পান, নানা কারণে। পাশ্চাত্য দেশে, মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মত এতটা বেশী প্রান্ত ধারণা নাই বলিয়া তথাকার লোকেরা উহার উপকারিতা ও প্রয়োজন অধিক অনুভব করে। মোটের উপর দেশের লোকেরাই ইউরোপে শিক্ষানীতির ও শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ন্তা বলিয়া তাহারা এই উপকারিতা ও প্রয়োজন-বোধ অনুযায়ী কাজ করে। হুতরাং মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত তথায় ভাল। দ্বিতীয় কারণ, শৈশবে বা অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয় না বলিয়া তাহারা উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তৃতীয় কারণ, তথায় অবরোধ প্রথা না থাকায় শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প-ব্যয়সাধ্য; ছাত্রীদের স্কুল ছাড়ায়াতও গাড়ীর উপর নির্ভর করে না। চতুর্থ কারণ, দেশের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া মেয়েরা দেহমনেব শক্তি আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষালাভে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে পারে।

নারীদিগকে রক্ষা করা পুরুষদের একান্ত কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না করিলে বা করিতে না পারিলে পুরুষ যে পুরুষ নামেরই ঘোঁষা নহে, তাহা ভীকরাও লজ্জার খাতিরে স্বীকার করিবেন। কিন্তু পুরুষরা যদি খুব সাহসী ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও তাহারা ত সব সময়ে সব জায়গায় নারীদিগকে রক্ষা কবিবাব জন্ত উপস্থিত থাকিতে পারেনা। যেখানে ও যে সময়ে তাহারা উপস্থিত থাকে না, সে ক্ষেত্রেও তাহাদের

বিজ্ঞেমের খ্যাতি নারীরক্ষার কতকটা সহায়তা করে বটে, কিন্তু তাহাতেও নারীদের রক্ষা সম্পূর্ণরূপে হয় না যদি তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার উপযুক্ত সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক বল, ও দৈহিক শক্তি বা থাকে। তাহারা ই সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত বাহারা নিজেদের নিজে রক্ষা করিতে পারে।

দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাইয়া পাশ্চাত্য নারীরা নানাদিকে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এই কৃতিত্ব শুধু বুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তির নহে। নানা বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের, মরুভূমির, অসম্ভা জাতিদের দেশের ভিতর দিয়া একাকী দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিবার সাহস ও সামর্থ্য তাহারা দেখাইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কৃতিত্বে তাহাদের নিজের উপর বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অধিকন্তু সামাজিক পরিবেষ্টন তাহাদের সহায়। বঙ্গের নারীদের ঐরূপ কোন শিক্ষা নাই, কৃতিত্বও নাই। সামাজিক মত, পরিবেষ্টন ও প্রথা তাহাদিগকে পঙ্গু ও সাহসহীন করিয়াছে। তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে অবলা; তাহাদিগকে রাখাও হইয়াছে অবলা করিয়া। তর্কহীন এবং উল্লেখের স্থলে কোন কোন জাতির নারীকে দেবী বলা হয় বটে। কিন্তু তাহারা অস্তঃপুরে ও বাহিরে সচরাচর যে ব্যবহার পান, তাহা দেবীর উপযুক্ত নহে। দেবীর যে শক্তি ও তেজ থাকিবার কথা তাহা বঙ্গীয় সমাজ নারীদের হৃদয়মন হইতে পিষিয়া বাহির করিয়া তাহাদের পরিচারিকাত্ব, জীৱ ও জননীত্ব টুকু বাকী রাখে। জননীত্ব তাহাদের থাকে, কিন্তু মাতৃত্বের উপযুক্ত হইবার মত সুযোগ ও ব্যবহার তাহারা পায় না।

তার্কিকরা বলিবেন, বঙ্গনারীদের সকলেই এরূপ নহেন, সকলেই এরূপ ব্যবহার পান না। আমরাও তাহা বলিতেছি না। যেহেতু নমুনা অনেক বেশী পাওয়া যায়, তাহা হইতেই সমাজবিশেষের বিচার হয়। অনেক অস্তঃপুরে নারীদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়, তাহার অল্প সংবাদই খবরের কাগজে বাহির হয় ও আদালত পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই বঙ্গীয় সমাজকে কলঙ্কিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইহা গেল ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা। কিন্তু সামাজিক সম্মানবুদ্ধির জন্ত এবং লোকাচার দেশাচারের অমুসরণ করিবার জন্ত যাহা করা হয়, তাহা কম নিষ্ঠুরতা নহে। কলিকাতা সহরে ও অন্তর্য অন্তর সহরে পুরুষ অপেক্ষা নারীর মৃত্যুর হাব অনেক বেশী। এই কারণে কলিকাতার স্বাস্থ্যকর্মচারী ইহাকে মাতৃহত্যা নগর বলিয়াছেন। একরূপ ভীষণ মৃত্যুর হারের কারণ যথেষ্ট আলো ও বাতাসহীন গৃহে দিন রাত বাস, বাল্য-মাতৃহত্যা, অপকৃষ্ট স্মৃতিকাগার, সম্ভ্রান্ত হইবার পর যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়া, রোগের সময় উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা না হওয়া ইত্যাদি। তন্মিত্ত, জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া অমাহুষ্য করিয়া রাখা আর এক নিষ্ঠুরতা।

এইরূপ নানাপ্রকারে বঙ্গনারী নগণ্য-বিবোচনা ও অবহেলিতা হওয়ায় নিজেদের শক্তিসামর্থ্য সঞ্চক্ষে আত্ম-হীন হইয়াছেন। সুতরাং তাহারা যদি স্বয়ং নারী-নির্ধ্যাতনের প্রতিকার চেষ্টা করিতে না পারেন, তাহা ততটা তাহাদের দোষ নহে, যতটা সমাজের।

বাঙালী পুরুষেরা কেন নারীরক্ষা সঞ্চক্ষে উদাসীন বা অসমর্থ, তাহারও অনেক কাবণ আছে। অধিকাংশ বাঙালী গ্রামে বাস কবে, সহব বাংলা দেশে খুব কম। অধিকাংশ বাঙালী কৃষিজীবী ও নিরক্ষর। বাহাদের নারীদের উপর অত্যাচার হয়, তাহারা অধিকাংশস্থলে “নিম্ন”শ্রেণীর গ্রাম্য লোক, কৃষিজীবী ও নিরক্ষর—যদিও সব স্থলে নহে। ইহারা নানা কারণে দুর্বল, নিষ্পেজ ও নির্বীৰ্য্য হইয়াছে। সামাজিক চাপে তাহারা পিষ্ট। “নিম্ন” শ্রেণীর লোকেরা “উচ্চ” শ্রেণীর সামাজিক শাসনে ও লোকাচার-দেশাচারে পিষ্ট। তাহাদের মাথাটা নত এবং শিরদাঁড়াটা বাঁকা হইয়াই আছে; তাহাদের নিকট অত্যাচার দমনের তেজের প্রত্যাশা করেন কেন? “উচ্চ” শ্রেণীর গ্রাম্য লোকেরাও সমাজ, লোকাচার, দেশাচারের ভয়ে আড়ষ্ট। গ্রাম্য লোকদের উপর দ্বিতীয় চাপ জমিদারদের ও তাহাদের নায়েব গোমস্তা নগদী প্রভৃতির। তৃতীয় চাপ, পুলিশের চৌকিদার, কনষ্টেবল, জমাদার প্রভৃতির। এবং সর্বোপরি বিদেশী শাসন-যন্ত্রের চাপ ও সকলের উপর আছেই। এই প্রকারে নিষ্পেষিত

লোকদের কাছে বীরত্ব ও তেজস্বিতার আশা করা যুক্তি-সম্মত নহে। আর একটা কারণেরও এখানে উল্লেখ করা দরকার। পূর্বে পূর্বে শতাব্দীতে বাঙালীরা সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করিত কিনা, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; বর্তমানে গ্রাম্য কৃষিজীবী নিরক্ষর বাঙালী সিপাহী হয় না, ইহারই উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধে অনভ্যস্ত হওয়ায় অজ্ঞাঘাত ও রক্তপাতের ভয় বাঙালীর বেশী। মুসলমান বাঙালীর অজ্ঞতায় ও রক্তপাতের ভয় অপেক্ষাকৃত কম এই জন্ত, যে, তাহারা অধিকতর মাংসান্ধ এবং জবাই করিতে ও শিকার করিতে অভ্যস্ত। আমি স্বয়ং নিরামিষান্ধী ও শিকারে অনভ্যস্ত হইলেও, যেরূপ অভ্যাসের ফল যাহা তাহা লিখিতে বাধ্য। হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালীতে আব একটা প্রভেদ এই, যে, মুসলমানেরা জাহাজে লঙ্ঘর হইয়া বিদেশে যায়, হিন্দুরা লঙ্ঘর হয় না। তাহাতেও উদ্যম ও সাহসের তারতম্য হয়।

নগরবাসী “উচ্চ” শ্রেণীর বাঙালীরা গ্রামবাসিনী নারীদের উপর অত্যাচারে কতটা ব্যথিত বা উদাসীন ঠিক জ্ঞান না। তাহারা যে কতকটা উদাসীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার একটা কারণ, মমত্ব-বোধের অভাব। বহুবৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ একবার পঞ্জাব গিয়াছিলেন, তখন সৌর্যসেনের পাঠানেরা একটি পঞ্জাবী হিন্দু বালিকাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এবিষয়ে পঞ্জাবী ভ্রাতৃলোকদের উদাসীনতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে তাহাদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করায় এক জন বলিলেন, “সে বেনের মেয়ে” (বানিয়াকি লড়কী)—যেন তাহা হইলে “উচ্চ” শ্রেণীর হিন্দুদের তাহার সঞ্চক্ষে কোন কর্তব্য নাই! এইরূপ একটা ভাব বাঙালী “ভ্রতৃ” লোকদের মনের কোণে লুকাইয়া আছে কি না, জানি না। অর্থাৎ আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য; তারা মাহিষ্য, যোগী, বেহারী, বৈরাগী, ইত্যাদি; তাহাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার হইলে আমাদের কি?

নারীনির্ধ্যাতনের সংবাদ প্রতিনিয়ত পাইয়া বাঙালী সম্প্রদায়েরা, যে সব অঞ্চলে এইরূপ ঘটনা ঘটে, তথাকার অধিবাসীদের উদ্দেশে অনেক দিষ্কার ও উত্তেজনাবাক্য

প্রয়োগ করেন। তাহা করা স্বাভাবিক এবং তাহার জন্ত সম্পাদকেরা দোষী নহেন। নারীদিগকেও ইতিহাসপ্রথিত রাজপুত্র বীরাজনা ও কাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাদেয় কথা শ্রবণ করাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব ধিকার ও উত্তেজনাব্যক্তি পড়ে কে? দেশে যে নিরক্ষর—বিশেষতঃ গ্রামবাসীরা। আর কাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাদে ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়া, যাহাদের মধ্যে অবরোধ ও অবশুষ্ঠন নাই। ধিকার ও উত্তেজনাব্যক্তাদি হইতে যদি কোন স্বল্প ফলিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আগে তাহা পড়িবার ক্ষমতা জন্মান চাই। সুতরাং সার্বজনীন শিক্ষা চাই।

পুরুষ বা নারী বিপন্ন অবস্থায় একাকী নিতান্ত অসহায় হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস কখন কখন সাহসের সঞ্চার করে। এই কারণে একরূপ ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে মানুষ কোন অবস্থাতেই আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ না করে।

আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে বলিয়াছি, যে, অত্যাচারিতা নারীরা যে সবাই বিধবা তাহা নহে। তথাপি ইহা সত্য, যে, সধবারা বালবিধবাদের চেয়ে অন্ততঃ একজন বেশী রক্ষা-বিশিষ্ট। তন্নিম্ন, বালবিধবারাও মানুষ বলিয়া প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বশবর্তী। বাল্যমাতৃতা না ঘটায় তাহাদের স্বাস্থ্য ও চেহারা সমান বয়সের সধবাদের চেয়ে সাধারণতঃ ভাল। এই সব কারণে ছবৃত্ত লোকেরা তাহাদিগকে প্রভাবিত করিতে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে অধিক প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং নারী-নির্যাতন হ্রাস করিতে হইলে, বাল্যবৈধব্যের উচ্ছেদ সাধন তাহার একটি উপায়। ইহা দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে; বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিয়া, এবং বাল-বিধবাদের বিবাহ দিয়া।

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যে-যে কারণে বাংলা দেশে নারীনির্যাতন হইয়া থাকে, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অল্প-সারে তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিলাম। এই সব কারণ শীঘ্র লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম। তত দিন কি আমরা নারীরক্ষার কোন চেষ্টা করিব না? অবশুই করিব। তাহার নানা উপায়ের আলোচনা অনেক কাগজে অনেকবার করা হইয়াছে। আমরাও করিয়াছি।

এরূপ অত্যাচার নিবারণ নিশ্চয়ই মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এই বিশ্বাসে সাহস ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলে আমরা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ হইব। বর্তমানে নারীরক্ষার জন্ত যে কমিটি সমিতি আছে, তাহার সত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক, সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধিও আবশ্যক।

শিবাজীর ত্রিশতবার্ষিক জন্মোৎসব

শিবাজীর ত্রিশতবার্ষিক জন্মোৎসব ভারতবর্ষের নানাহানে সম্পন্ন হইয়াছে।

শিবাজী হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দুত্বকে বড় করিয়া ভারতীয়ত্বকে ষাট করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। যে সব হিন্দু তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া প্রজ্ঞাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহা করিয়াও, তাঁহারা যদি এই সব প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের উপর জোর দিতেম, যে, তিনি হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে যোগ্য লোকেন গুণগ্রাহী ছিলেন; তাঁহার অনেক উচ্চ ও নিম্ন গাংস্থ মুসলমান কর্মচারী ছিল; তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সাধুলোকদিগকে দান করিতেন; কোরান্ কোথা পাইলে তাহার কোন অসম্মান না করিয়া সম্মান করিতেন; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন; মুসলমানের উচ্ছেদসাধন তাহার উদ্দেশ্য ছিল না; এবং মুসলমান শাসকেরা স্বদেশী প্রজাপালকের মত শাসন না করিয়া অত্যাচারী বিদেশী বিজ্ঞতার মত শাসন করায়, স্বদেশী স্বাধীন ধর্মরাজ্য স্থাপনে তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল; তাহা হইলে ঠিক হইত। অনেক বক্তা তাহা করিয়াছিলেন।

কোন মানুষ সর্বধর্মাবলম্বী হইতে পারে না। কিন্তু যিনি যে ধর্মেরই লোক হউন, ভাল কাজ করিলে সকল ধর্মের লোকেরই তাঁহাকে প্রজ্ঞা করা উচিত। অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু তিনি আদর্শ ভারতীয় নৃপতি ছিলেন বলিয়া সকল ধর্মের ভারতীয়ের প্রজ্ঞাভাজন, কেবল বৌদ্ধদের নহে। শিবাজীকেও তদ্রূপ ভারতীয়

বার বলিয়া সকল ধর্মের লোকের শ্রদ্ধা করা উচিত। বর্তমান সময়ে যদি কোন খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানের নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রভুত্ব নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান নেতা হিন্দুদেরও শ্রদ্ধাভাজন হইবেন।

শিবাজী উৎসবের উদ্যোক্তারা কোথাও কোথাও একটি ভুল করিয়াছিলেন—যেমন কলিকাতার প্রদ্বানন্দ পার্কে। ঠাহারা শিবাজীকে দেবতা-বিশেষের অবতার বা অংশ মনে কবেন, তাঁহাদের তাঁহাব মূর্তি পূজা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উৎসবের ইহা একটি অজ্ঞ হওয়া উচিত নয়; কারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বা অংশ বোধে পূজা করে না। এই জন্ত প্রয়োজন মত পূজার বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র স্থানে হিন্দুদের জন্ত রাখিয়া, সার্বজনিক উৎসবের জন্ত অত্র স্থান নির্দেশ করা উচিত ছিল।

প্রদ্বানন্দ পার্কের উৎসবে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার পূর্ণ প্রতিবেদন খবরের কাগজে বাহির না হওয়ায় আমি আমার কথিত একটি বিষয়ের আলোচনা এখানে করিতেছি।

শিবাজীর প্রতি আগে আগে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বড় অবিচার করিয়াছে। কিশেড ও রলিফের মত আধুনিক ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সেরূপ অবিচার করেন নাই। কিশেড লিখিয়াছেন :—

Shivaji has, by a curious fate, suffered more at the hands of historians than any other character in history. They have, one and all, accepted as final the opinion of Grant Duff, which again was based on that of Khafi Khan. And while judging Shivaji with the utmost harshness, they have been singularly indulgent to his enemies. The thousand basenesses of Aurangzeb, the appalling villainies of the Bijapur and Ahmednagar nobles have been passed over with a tolerant smile. The cruel trick, by which Ghorpade betrayed Shivaji, has provoked no comment. Shivaji, however, is depicted as the incarnation of successful perfidy, a Caesar Borgia," etc.

কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক এই প্রকারে শিবাজীর প্রতি ছায় বিচার করিলেও, ইংরেজী বিশ্বকোষগুলি এখনও তাঁহাব প্রতি অবিচার করিতেছে। সকলের

চেয়ে বড় ইংরেজী বিশ্বকোষ এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার শেষ সংস্করণে আছে :—

By dint of playing off his enemies against each other and by means of treachery, assassination and hard fighting, Sivaji won for the Mahrattas practical supremacy in western India. In 1659 he lured Afzal Khan, the Bijapur General, into a personal conference, and killed him with his own hand, while his men attacked and routed the Bijapur army.....Sivaji was an extraordinary man, showing a genius both for war and for peaceful administration. But he always preferred to attain his ends by fraud rather than by force."

শিবাজীর কোনই দোষ ছিল না, ইহা কোন ঐতিহাসিক বলিবেন না—কোন সাম্রাজ্যসংস্থাপক সম্পূর্ণ সাম্বিক অহিংস উপায়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। শিবাজী তাঁহার শত্রুদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিতেন, তাঁহার এই নিম্না উদ্ভূত অংশে করা হইয়াছে; কিন্তু ইংরেজরা যে ভারতবর্ষ দখল করিবার জন্ত অনেকস্থলে একই পরিবারের লোকদের মধ্যে, জাতি ও আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যেম্বর বামনদাস বসুর লিখিত "ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান শক্তির অভ্যুদয়" নামক ইংরেজী ইতিহাসে দেখান হইয়াছে। এক ব্যক্তি কোন অস্ত্রায় কাজ করিলে তৎসদৃশ অন্তরূপ কোন কাজ সংকাজ হয় না। কিন্তু ইংরেজরা অস্ত্রেরা নিজেদের কৃত অপকৃষ্টতর কাজ গোপন করিয়া অস্ত্রের ছিত্রাঙ্কষণ করিলে তাহা পক্ষপাতভূত হয়। শিবাজী যে বলপ্রয়োগ অপেক্ষা প্রতারণাই বেশী পছন্দ করিতেন, তাহা সত্য নহে; ইংরেজ সাম্রাজ্যস্থাপকদের পক্ষে তাহা সত্য হইতে পারে। তাঁহার সৈন্যবল, অর্থবল, তাঁহার শত্রুদের চেয়ে কম ছিল; স্বতরাং সমৃদ্ধ যুদ্ধ সব সময়ে তিনি কবিত্তে পাবেন নাই, কখন কখন কৌশলে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ কৌশল সব সেনাপতিরা আধুনিক রণনীতির অংশরূপে শিক্ষা ও অবলম্বন করিয়া থাকেন। আক্ষজাল খার সহিত তাঁহার ব্যবহারের কথা পরে বলিতেছি।

চেমাসের এন্সাইক্লোপীডিয়া এখনও শেষ পর্য্যন্ত বাহির

হয় নাই; উহা এম্বাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা অপেক্ষা নূতন। তাহাতে শিবাজী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"The founder of the Mahratta power was Sivaji, a freebooter or adventurer. whose father, Shahji Bhonsla, was an officer in the service of the last King of Bijapur. By policy or by force, he eventually succeeded in compelling the several independent Hindu chiefs to acknowledge him as their leader and with the large army then at his command overran and subdued a large portion of the emperor of Delhi's territory."

এখানে শিবাজীকে বলা হইতেছে দস্য, এবং ভাগ্যাদেশী। বিজ্ঞতা মাত্রেরই শত্রুর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া থাকে, তাহাদের দোষগুণের বিচার এখানে করিতেছি না। কিন্তু শিবাজী দস্য ছিলেন না, এবং নিজের জ্ঞান খনসঞ্চয়ের চেষ্টাও করেন নাই।

আফজাল খাঁর সহিত তাঁহার ব্যবহারের প্রকৃত বৃত্তান্ত অধ্যাপক যতুনাথ সরকার সমুদয় মারাঠি, ফারসী ও ইংরেজী মৌলিক উপাদান পড়িয়া লিখিয়াছেন। ইংরেজদের রাজাপুরের ফ্যাক্টর অর্থাৎ কুঠিয়ালায় স্থাপিত কোন্সিলকে ১৬৫৯ খ্রীশাব্দের ১০ই অক্টোবর যে চিঠি লেখেন, তাহা সমসাময়িক। সরকার মহাশয় তাহাও ব্যবহাব করিয়াছেন। আফজাল-বদেব প্রকৃত বৃত্তান্ত তল্লিখিত ইংরেজী শিবাজী-চবিত্তেব তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। তাহা হইতে অল্প একটু নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The command of the expedition against him (Shivaji) went abegging at the Bijapur Court, till Afzal Khan accepted it. Afzal Khan did not prefer an open contest with Shiva. . . . Indeed he was instructed by the Dowager Queen to effect the capture or murder of Shiva by *pretending friendship* with him and offering to secure his pardon from Adil Shah. . . . The Bijapuri General had accepted the command in a spirit of bravado, and even boasted in the open Court that he would bring Shiva back a captive without having once to dismount from his own horse. . . . then came Afzal's envoy with the invitation to a parley. . . . Shiva sent the envoy back with Gopinath Pant, his own agent, agreeing to Afzal's proposal of an interview, provided that the Khan gave him a solemn assurance of safety. . . . Through Gopinath Pant Shiva

vowed that no harm would be done to Afzal, during the interview, and Afzal, on his part, gave similar assurance of his honesty of purpose. . . . Shiva mounted the raised platform and bowed to Afzal. The Khan rose from his seat, advanced a few steps, and opened his arms to receive Shiva in his embrace. The short slim Maratha only came up to the shoulders of his opponent. Suddenly Afzal tightened his clasp, and held Shiva's neck in his left arm with an iron grip, while with his right hand he drew his long straight-bladed dagger and struck at the side of Shiva. Shiva groaned in agony as he felt himself being strangled. But in a moment he recovered from his surprise, passed his left arm round the Khan's waist and tore his bowels open with the blow of the steel claws. Then with his right hand he drove the *bichhwa* into the Khan's side".

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতায় আমি এইসব কথা বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে, শিবাজী উৎসবের স্তম্ভসমূহ হইতে সভাপতিদিগের স্বাক্ষরযুক্ত এক একখানি চিঠিতে ইংবেজী এম্বাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষগুলির ভ্রম নিরসন করিয়া তাহা এম্বাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রকাশক-দিগকে এবং চেম্বার্সের এম্বাইক্লোপীডিয়ার প্রকাশকদিগকে পাঠান হউক।

আমি ইহাও বলিয়াছিলাম, যে, শিবাজী কেবল হিন্দুদের বীর নহেন, সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির বীর। আমার দেহে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া যে আমি ইহা বলিতেছি, তাহা নহে; বিদেশী অহিন্দুবংশজাত লোকেরাও অনেকে ইহা স্বীকার করেন। বিখ্যাত বিদ্বান খ্রীষ্টিয়ান পাদরী ডাক্তার ম্যাকনিকল (Rev. Dr. N. MacNicol, M. A., D. Litt) বলেন :—

"Shivaji belongs to no class or caste. He is a national possession. India has every right to set the Maratha warrior-king in a high place among those whom she remembers with gratitude."

রেলওয়ে-যাত্রীদের দিবস

ভারতবর্ষে রেলওয়ে ও ষ্টীমারের যাত্রীদের—বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নানা দুঃখ কষ্ট ও লাহন আছে।

এই সকলের প্রতি সর্বসাধারণের ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত একটি প্রস্তাব হয়, যে, ৪ঠা মে ভারতবর্ষের সর্বত্র এইজন্ত সভা হইবে। বোম্বাইয়েব সভায় বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। তথাকার সমিতির লোকবল এবং আয়ও বেশ আছে। কলিকাতার সভায় লোক খুব কম হইয়াছিল। বিখ্যাত বক্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রেলের যাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণার্থ তিনি যাহা যাহা করা কর্তব্য বলিয়াছিলেন, সবগুলিই সমীচীন। সকল রাজনৈতিক দলের বহিষ্ঠুত বাগ্মতাবিহীন প্রবাসী-সম্পাদককে সভাপতি নির্বাচন করা সভাস্থলে লোক বেশী না-হওয়ার একটি কারণ। অল্প কারণ, আলোচ্য বিষয়টি রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নহে, স্বতরাং তাহা হইতে কোন উত্তেজনা ও ছদ্ম্বকের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহার একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। সভাস্থলে তাহার উল্লেখও করিয়াছিলাম।

আমাদিগকে যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন অবস্থা-ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া উচিত নয়, যাহাতে অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়। কারণ, তাহা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, যে-সব অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যবহার পরাধীনতার আত্মঘাতিক, মাছুষ প্রকারান্তরে তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া যায়; স্বতরাং তাহার হেঁট মাথাটা উঁচু এবং বাকি শিরদাঁড়াটা সোজা হইতে চায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাটা আকাশ হইতে পড়িবে না। পরাধীনতাটা অবশ্য সব-চেয়ে বড় জাতীয় অপমান। কিন্তু ছোট ছোট অপমান অভ্যাসগুলা দূর করিবার চেষ্টা যদি আমরা না করি, তাহা হইলে সকলের চেয়ে বড় অপমানটাকে যে আমরা সত্য সত্যই অপমান মনে করি, তাহার প্রমাণ কি? অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে কবিত্তে করিতে মাছুষের তেজস্বিতা লুপ্ত হইয়া যায়, ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মদামন-বোধ সম্বন্ধে সে অসাড় হইয়া যায়। সেইজন্য রেলওয়ের টিকিট ক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া অতিরিক্ত যাত্রীতে ঠানা গাড়ীতে মালের মত বোকাই হওয়া পর্যন্ত

তৃতীয় ও অনেক সময়ে মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ধাক্কাধাক্কি, গালাগালি, প্রভৃতি যাহা সম্বন্ধে কবিত্তে হয়, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা না করিলে আমরা যে দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন অবস্থার উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইবে।

তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে পাঁয়থানা, জল, ও আলোর স্ববন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ঐশ্বর্যকালে বৈজ্ঞানিক পাখা থাকি উচিত। হাবড়ার মত বড় বড় যে-সব ষ্টেশনে যাত্রী বেশী, তাহাতে প্রাটফর্ম যাইবার ফাটক খুব বড় করিয়া দিয়া ঠেলাঠেলি এবং পাহারাওয়ালার টিকেটপ্রদানের দুর্ব্যবহার নিবারণ করা উচিত। রেলওয়ের কর্তৃপক্ষদের সহিত যাত্রীদের বিক্রোতা ও ক্রোতার সম্পর্ক। তোমাদের যাত্রাঘাতের বন্দোবস্তেব বিনিময়ে আমরা তোমাদিগকে পয়সা দি। অল্প সব ব্যবসাতে বিক্রোতার ক্রোতাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করে। কিন্তু বেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর এক একটা পথে একচেটিয়া ব্যবসা থাকায় বিক্রোতা হইয়াও তাহাদের কর্মচারীবা টিকিটক্রোতা যাত্রীদিগকে অপমান ও কখন কখন প্রহারও করে। একচেটিয়া ব্যবসাই অবশ্য ইহার একমাত্র কারণ নহে। রেল ও ষ্টীমারের কর্তৃপক্ষেরা রাজার জাত বলিয়া উদ্ধত এবং দুর্ব্যবহার করিতে সাহসী। এইজন্য যাত্রীদের দুঃখ-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতিকার পূর্ণ স্বরাজ লাভে। কিন্তু তাহার অল্প ইচ্ছা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

৩. ট্রেন অর্থাৎ যে-সব ট্রেন বহুদূরগামী এবং যাহাতে যাত্রীদিগকে রাজিধান করিতে হয়, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও শুইবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ইহাদের টিকিটের পয়সাতেই যাত্রীগাড়ীর লাভ হয়। ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া লাভ দেখাইবার কোন অধিকার রেল কর্তৃপক্ষের নাই। বাসগৃহ, আফিস, আদালত, স্থলযান, জলযান, আকাশযান, কোনটিরই এমন কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনীয় বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত নয়, যাহাতে মাছুষের স্বাস্থ্যহানি হয়। বিলাসের উপকরণ না থাক, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চাই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে ভাড়া

দেয়, তাহা তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার যতগুণ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণ জায়গা দখল করে ও সুবিধা ভোগ করে। ইহা অন্যায্য এবং অবাঞ্ছনীয়।

বর্ষের বিবাহ ও আধুনিক বিবাহ

বোধহয় সব দেশেরই অসভ্যযুগে কোন কোন স্থলে অবিবাহিতা পাত্রীকে বঙ্গপূর্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার রীতি ছিল এবং হয়ত কোন কোন স্থলে ইহাতে পাত্রীর সম্মতি উহা থাকিত। এইজন্য কোন কোন অসভ্য সমাজে এখনও বরণপক্ষ ও কস্তাপক্ষের যুদ্ধের অভিনয় হইয়া থাকে। কস্তাহরণপূর্বক বিবাহ নিশ্চয়ই অসভ্য ও অভদ্র, কিন্তু অল্প অনেক অসভ্য প্রথার মত ইহা হইতেও কিছু শিখিবার আছে। অসভ্য সমাজে যে যুবক কস্তাপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জীসংগ্রহ করিত, সে তাহার দ্বারাই প্রমাণ করিত, যে, সে আবদ্ধক হইলে অত্যাচারীর হাতে হইতে জীকে রক্ষা করিতে পারিবে, এবং জীর অপমানকারীকে শাস্তি দিতে পারিবে। বাংলাদেশে অনেক নারী হত্যা ও ধর্ষিতা হয়। এইজন্য বরের অন্ত্যস্ত গুণের পরীক্ষার সঙ্গে, জীকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি না, তাহারও পরীক্ষা হওয়া দরকার। এমনই ত বরের দর বড় চড়া; হুতরাং একপ পরীক্ষার কথা কোন কস্তার পিতা তুলিতে সাহসী হইবেন মনে হয় না। কিন্তু বরদের নিজেই আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য নারীরক্ষার সামর্থ্য অর্জন করা উচিত। বাংলা দেশের পুরুষদের অনেকের যথেষ্ট পৌরুষ না থাকায় লজ্জার সহিত নারীদিগকেও আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভ করিতে অসুযোগ করিতে হইতেছে।

ধর্মিতা নারীর আত্মীয়দের পাতিত্যা

হিন্দুসমাজে এ পর্যন্ত এই দস্তুর চলিয়া আসিতেছিল, যে, কোন নারী ধর্মিতা হইলে—বিশেষতঃ অহিন্দু কতৃক ধর্মিতা হইলে, সমাজে আর তাহার স্থান হইত না।

এখন কোথাও কোথাও মন্দের ভাল এই হইয়াছে, যে, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহাকে সমাজে লওয়া হয়। ইহা নূতন নহে। সিন্ধুদেশ বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হইবার পর যে-সব হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোক অগত্যা মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম পুনরবলম্বন-প্রার্থীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দুসমাজে স্থান দিবার জন্য দেবল স্মৃতি রচিত হইয়াছিল।

বর্তমানে ঠাহারা ধর্মিতা নারীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাহারাই ভ্রাতৃনিষ্ঠ নহেন। এরূপ নারীর কোনই দোষ নাই। পাতিত্যা যদি কাহারও হওয়া উচিত, তাহা হইলে নারীরক্ষা-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ধর্মিতা নারীর স্বামী ও অল্প আত্মীয়দেব হওয়া উচিত। গুণাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সকলের না থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্মিতা বা অপহৃত্য নারীদের আত্মীয় যে সব পুরুষ প্রমাণ করিতে পারিবেন না, যে, তাহারাই নারীরক্ষার জন্য বা অপহৃত্য নারীর উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদেরই পাতিত্যা ঘটা উচিত, ধর্মিতা বা অপহৃত্য নারীদের নহে।

রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান

আমরা পাশ্চাত্য বাঙালীরা মনে মনে এই সম্ভাষণ-টুকু লাভ করিতে পারিতাম, যে রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই ইউন, তাহার মনে মনে নিশ্চয়ই এই দুঃখটা আছে, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতা অল্পসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এবার তাহার সে-দুঃখ দূর হইল, এবং আমাদেরও লুঙ্ঘিত উল্লাস চূর্ণ হইল। কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি প্রবর্তকসংঘের উৎসবে তাঁহাকে যে অভিনন্দিত করা হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, তিনি নিতান্ত মন্দ ছেলে নন—পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম হইয়াছেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, এবং দ্বিতীয় শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গাঙ্গী। এই খবরটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কি কি বিষয়ে হইয়াছিল এবং পরীক্ষক কে কে হইয়া-

ছিলেন, তাহা জানিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্তগণ কোতুলক হইবেন।

প্রবর্তকসংঘ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন অভিনন্দন-রীতি অসঙ্গত অসুস্থ হইবে কি না, তাহাও অসুস্থানের বিষয় হইবে।

শান্তিপুরে শিক্ষকসমিতির অধিবেশন

শান্তিপুরে বঙ্গীয় শিক্ষকসমিতির ১৫ অধিবেশন সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে, সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরষচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি, শিক্ষালয়গুলির উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক বিবেচক জনোচিত কথা ছিল। আমাদের দেশে শিক্ষকদের—বিশেষতঃ অধ্যাপন শ্রেণীর শিক্ষকদের, বেতন বড় কম। বাহারা নিজের ও পরিবারবর্গের গ্রামাচ্ছাদনের চিন্তায় নিত্যস্ত বিভ্রত, তাহাদের সমুদয় শক্তি কখনও কর্তব্য-সম্পাদনে নিয়োজিত হইতে পারে না। এইজন্য নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকদেরও এমন একটা ন্যূনতম বেতন নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা সপরিবারে সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। আগে আমাদের দেশে শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। সে কালও আর নাই, সুতরাং সেরূপ ব্যবস্থাও আর প্রবর্তিত হইতে পারে না।

মৈত্রেয় মহাশয় বিদ্যালয়ের জন্ত ও ছাত্রাবাসের জন্ত বহুব্যয়সাধ্য গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। ঘর বাড়ীর আদর্শ খুব উঁচু করিলে শিক্ষার আসল জিনিষটার দিকে দৃষ্টি দিবার সামর্থ্য না থাকিতে পারে। ছাত্রেরা স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে থাকে, ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা ছাড়া, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ বাড়ীতে থাকিবার অভ্যাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, বেরূপ বাড়ীতে তাহারা পিতৃগৃহে থাকে না, পরেও হয়ত থাকিবে না।

বিদ্যালয়ে গবর্নেন্ট-ষে-সব সর্ব্ব সাহায্য দিয়া

থাকেন, তদনুসারে টাকা লইবার সামর্থ্য অনেক বিদ্যালয়ের কমিটির থাকে না। সুতরাং সর্ব্বগুলি অপেক্ষাকৃত সহজে পালনীয় করা উচিত।

আগে আগে গবর্নেন্ট-ধনী লোকদিগকে শিক্ষার জন্ত দান করিতে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহার জন্ত যত টাকার আবশ্যক, গবর্নেন্টের তাহা দিবার প্রবৃত্তি নাই, সামর্থ্যও সম্ভবতঃ নাই। সুতরাং ধনী লোকদিগকে পূর্বে রীতি অনুসারে উৎসাহিত করা উচিত। মৈত্রেয় মহাশয় এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন।

ছাত্রদের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দৈহিক উন্নতির জন্ত ব্যায়ামক্রীড়াদির যেরূপ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যত শীঘ্র তদনুসারে কাজ হয় ততই ভাল। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের একবার জলযোগের ব্যবস্থা হওয়ার আবশ্যক। অল্প অনেক রকম ব্যয় আছে, যাহা না করিলেও চলে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্ত যথাসাধ্য ব্যয় করা গবর্নেন্টের ও দেশের লোকদের কর্তব্য। দৈহিক শিক্ষা তাহার একটি অবজ্ঞনীয় অঙ্গ। সকল রকম ব্যায়াম ও ক্রীড়া সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী নহে। এইজন্য ডাক্তার ও ব্যায়াম-শিক্ষকের পরামর্শ অনুসারে প্রত্যেকের উপযোগী ব্যায়াম-ক্রীড়াদির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহা ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই সম্বন্ধে না করিলে চলিবে না।

কলেজের ছাত্রদের নিমিত্ত সাময়িক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত কি না, সে-বিষয়ে মত-ভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, এরূপ শিক্ষা সকলেরই হওয়া উচিত, যাহাতে আত্মবিস্মারক জন্ত অজ্ঞব্যবহারে সামর্থ্য ও দক্ষতা জন্মে এবং অজ্ঞাঘাতের ভয়টা দূর হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়াও আমরা দাঙ্গা-ভাঙ্গ ও জনতা-ভাঙ্গের ওজুহাতে গুলিবর্ষণের রূপায় বৃদ্ধিতে পারিতেছি, গুলি যত নিষ্কণ্টক হয় মানুষ তত মরে না। ইহা হইতে এরূপ অসুস্থান

করা অযৌক্তিক নহে, যে, অল্প অল্পের প্রয়োগও অব্যর্থ নহে—যাহার উপর তলোয়ার, বর্ষা বা ছোরা চালান হইবে, সেই মরিবে, এটা অমূলক ভয়। তবে কিনা ভীতির তর্কশক্তি কম নয়। সে বলিবে, “গুলি ছুড়িলে বা অস্ত্র অস্ত্রগলনা করিলে কেহ না কেহ মরে; যে মরিবে সে অস্ত্র কেহ না হইয়া আমিই ত হইতে পারি, অতএব যঃ পলায়তি স জীবতি।” সাহসীর নিয়তিবাদ অস্ত্র রক্ষণ। সে তুর্ক প্রবাদ অনুসারে বলে, “ছুটি দিন মৃত্যু হইতে পলায়ন বুঝা—১ম, ২য়-দিন মৃত্যু অদৃষ্টে লেখা আছে; ২য়, ৩য়-দিন উহা অদৃষ্টে লেখা নাই। তুমি পলাও আর যাই কর, নির্দিষ্ট দিনটিতে মরিবেই; অনির্দিষ্ট দিনটিতে তুমি কিন্তু মরিবে না—পলাইলেও মরিবে না, না পলাইলেও মরিবে না। অতএব, কোন দিনই পলানটা বেকুবী।”

যাহা হউক, অস্ত্র-চালন শিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিলে এবং অস্ত্রাঘাতে শরীর হইতে অন্ততঃ ২১ বার রক্ত-পাত হইলে ভয় ভাঞ্জে ও সাহস বাড়ে। অতএব যুবা বয়সের ছাত্র-ছাত্রী ও অস্ত্র সকলের অস্ত্র শিক্ষা হওয়া ভাল।

রেজিস্টারী-করা গ্রাডুয়েট্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব গ্রাডুয়েট্ অর্থাৎ বি-এ প্রভৃতি উপাধিধারী প্রাথমিক ও বার্ষিক টাকা দিয়া রেজিস্টারীভুক্ত হন, প্রতিনিধি নির্বাচনে তাহাদের অধিকার আছে। অষ্টাষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ নিয়ম আছে। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী কত, নীচের তালিকায় তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে, কলিকাতার ফী সর্বাপেক্ষা বেশী। রেজিস্টারীভুক্ত উপাধিধারীদের সংখ্যা কম রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়াছে কিনা অজ্ঞেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাথমিক ফী	বার্ষিক ফী	বিলম্বের ফী	কম্পাউন্ডিং ফী
কলিকাতা	১০	১০	১০	১০০
পাটনা	৫	৫	১০	৪০
এলাহাবাদ	৫	২	১০	২০
পঞ্জাব	১০	২	১০	২৫
বোম্বাই	৫	২	২	১০
মাদ্রাজ	৩	১	১০	৫

যদি কেহ এককালীন কম্পাউন্ডিং ফী দেন, তাহা হইলে তাহাকে আর বার্ষিক ফী দিতে হয় না।

কেহ উপাধি পাইবামাত্রই রেজিস্টারীভুক্ত হইতে পারেন না, অনেক বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে রেজিস্টারীভুক্ত হইতে পারেন। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কত বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার তালিকা নীচে দিলাম।

কলিকাতা	দশ বৎসর
পঞ্জাব	দশ বৎসর
মাদ্রাজ	সাত বৎসর
পাটনা	ছয় বৎসর
এলাহাবাদ	তিন বৎসর

উপরের দুটি তালিকা হইতে দেখা যাইবে, অধিক-সংখ্যক উপাধিধারী রেজিস্টারীভুক্ত হওয়ায় কলিকাতা যত বাধা দেয়, অত্র কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সমান বা তাহা অপেক্ষা বেশী বাধা দেয় না।

মহাজাতি-সংঘের চাকরী

যে-সব দেশ লীগ্ অব্ নেশন্স অর্থাৎ মহাজাতি-সংঘের সভ্য, তাহাদিগকে তাহার ব্যয় নির্বাহার্থে বার্ষিক টাকা দিতে হয়। লীগের মোট বার্ষিক ব্যয় বৃত্ত, তাহা (১৯২৭ সালের অস্ত্র) ১০:৫টি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। লীগের সভ্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নির্দিষ্টসংখ্যক ভাগ টাকা দিতে হয়। আমরা ১৯২৭ সালের লীগ্ বাজেট হইতে নীচের তালিকায় দেখাইয়াছি কোন্ রাষ্ট্র কতভাগ টাকা দেয়। পূর্বে ১৯২৬ সালের বাজেট হইতে এইরূপ এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। কোন্ রাষ্ট্রের কত লোক লীগের স্থায়ী চাকরী করে, তাহাও তালিকায় দেখাইয়াছি। তাহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষ টাকা দেয় বিস্তর (সাত লক্ষের উপর টাকা), কিন্তু ভারতীয় লোকেরা তদনুরূপ কাজ লীগ্ আফস-গুলিতে পায় না; কোন প্রাজ্যজাতিই টাকার অল্পপাত্রে কাজ পায় না।

রাষ্ট্র	প্রদত্ত টাকার ভাগ-সংখ্যা	চাকরীর সংখ্যা
গ্রেটব্রিটেন (বিলাত)	১০৫	২০৭
ফ্রান্স	৭২	১৭৮
জার্মানী	৭২	১৫

রাষ্ট্র	প্রদত্ত টাকার ভাগ-সংখ্যা	চাকরীর সংখ্যা	রাষ্ট্র	প্রদত্ত টাকার ভাগ-সংখ্যা	চাকরীর সংখ্যা
ইটালী	৬০	৫৬	বুলগেরিয়া	৫	২
জাপান	৬০	২	পারস্য	৫	১
ভারতবর্ষ	৫৬	২	ভেনিজুয়েলা	৫	১
চীন	৪৬	৩	বলিভিয়া	৪	০
স্পেন	৪০	৮	লিথুয়ানিয়া	৪	৩
কানাডা	৩৫	৭	এস্টোনিয়া	৩	০
পোল্যান্ড	৩২	১৩	লাটভিয়া	৩	৪
আর্জেন্টিনা	২২	১	আবিসিনিয়া	২	০
ব্রাজিল	২২	১	আল্‌বানিয়া	১	০
চেকোস্লোভাকিয়া	২২	৮	কম্বোডিয়া	১	০
অস্ট্রেলিয়া	২৭	৪	ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র	১	০
হাঙ্গাৰ	২৩	১২	গোয়াটিমালা	১	০
ক্রোয়েশিয়া	২২	৩	হাইটি	১	০
সার্ব ক্রোট ও			হাণ্ডুয়াস	১	০
স্লোভেনীয়দের রাজ্য	২০	৬	লাইবেরিয়া	১	০
বেলজিয়াম	১৮	১৭	লুক্সেমবুর্গ	১	২
সুইডেন	১৮	৪	নিকারাগুয়া	১	০
সুইজারল্যান্ড	১৭	১২২	পানামা	১	১
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৫	১	পারাগোয়ে	১	০
চিলি	১৪	০	সালভাদর	১	০
ডেনমার্ক	১২	৮	আমেরিকা	০	৭
ফিনল্যান্ড	১০	২	আর্মেনিয়া	০	১
আয়াল্যান্ড	১০	১০	জুগোস্লাভিয়া	০	৩
নিউজিল্যান্ড	১০	২	কম্বিয়া	০	৮
কিউবা	৯	১	তুরস্ক	০	১
নরওয়ে	৯	৬	রাষ্ট্রহীন	—	১
পেরু	৯	০	জার্মানী গত বৎসর ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে লীগের সভ্য হইয়াছে ; প্রথম হইতে সভ্য থাকিলে জার্মানরা নিশ্চয়ই ফ্রেঙ্কদের সমান চাকরী পাইত। জার্মানদের ক্ষমতা এই বৎসর একটা নূতন আশ্রয়-সেক্রেটারী জেনারালের পদ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং আরও কয়েকটা নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষ গোড়া হইতেই সভ্য, এবং টাকা দেয় ৪টি পাশ্চাত্য ও ১টি প্রাচ্য দেশ ছাড়া সকলের চেহে-বেশী। কিন্তু ভারতীয়েরা চাকরী পাইয়াছে মোটে দুটি।		
গ্রাম	৯	১			
অস্ট্রিয়া	৮	১২			
হাঙ্গেরী	৮	৪			
গ্রীস	৭	২			
দক্ষিণগোয়ে	৭	১			
কোলাম্বিয়া	৬	১			
পোর্টুগাল	৬	১			

ভারত অপেক্ষা অনেক কম টাকা দেয় এক্ষণ দেশের লোক অনেক বেশী চাকরী পাইয়াছে। যে-সব বাষ্ট্র লীগের সভ্য নহে এবং চীনা দেয় না, তাহাদেরও কোন কোনটির লোক ভারতীয়দের চেয়ে বেশী কাজ পাইয়াছে। কোন অন-ইউরোপীয় দেশের প্রতি কর্ষে নিয়োগ সম্বন্ধে লীগ জ্ঞায়বান্ হইতে পারে নাই। জাপান ইটালী সমান টাকা দেয়, কিন্তু কাজ পাইয়াছে ইটালীর সিকি। তাহা হইলেও, এবিষয়ে একটু লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে। চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা টাকা দেয় অনেক কম, কিন্তু কাজ পাইয়াছে বেশী। চীন ইংরেজদের অধীন নহে বলিয়া কি? শ্রামদেশ টাকা দেয় ভারতবর্ষের যষ্ঠাংশেরও কম, কিন্তু কাজ পাইয়াছে ভারতবর্ষের অর্ধেক; পারস্য টাকা দেয় ভারতবর্ষের একাদশাংশেরও কম, কিন্তু কাজ পাইয়াছে উৎসাহ অর্ধেক। এই দুটি প্রাচ্যদেশ স্বাধীন, ইংরেজদের অধীন নহে; ভারত ইংরেজদের অধীন। এইজন্যই কি ভারতবর্ষের প্রতি এইরূপ বিচার হইতেছে?

চীনেরা পাশ্চাত্য বিদেশীদিগকে যে পরদেশী পিশাচ (ফরেন ডেভিল) মনে করে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

চীনেরা যে স্বদেশে কুকুরের সমান বিবেচিত হয় তাহাতে ভারতীয়েরা বিস্মিত হইবে না। কানপুরে যে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা-বিশেষের স্মারক রূপ আছে, তাহা দেখিবার জন্য ভারতীয়দিগকে ভিতরে বাইতে দেওয়া হয় না—অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেওয়া হইত না। তাহাদিগকে যে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, এক্ষণ কোন ইস্তাহার নাই বা ছিল না। যে ইস্তাহার ছিল বা আছে, তাহা “Dogs are not allowed”, “কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ।” ভারতীয় কেহ ঢুকিতে চাহিলে পাহারাওয়াল বলি বা বলিত, “হুকুম নেহি হায়” এবং হুকুম দেখাইতে বলিলে ঐ “কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ” ইস্তাহারটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিত। গত খৃষ্টীয় শতাব্দী যখন নব্বইয়ের কোটায়, তখন মিস্টার কেন্-এই বিষয়ে বিল্যাতী পার্লামেন্টে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

কুকুর ও চীনদেশের মানুষ

চীনদেশের সাংহাই সহরটা পাশ্চাত্য বিদেশীদের অধিকৃত; চীন অংশও একটি আছে, তাহা নগণ্য। তথাকার মিউনিসিপালিটি এই বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। মিউনিসিপালিটি বাগানে একটা ইস্তাহার আছে, “কুকুর ও চীনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।” সম্প্রতি (চীনেরা যুদ্ধ করিতে জানেন দেখিয়া?) এই বিদেশীরা নিজেদের মহানুভবতা দেখাইবার জন্য একটা প্রস্তাব ধার্য করিয়াছে, যে, চীনদিগকে বাগানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। চীনেরা নিজের দেশের সাগানে ঢুকিতে পাইবে—কি বিশ্বয়কর অপূর্ণ সমাশয়তা! কিন্তু হঠাৎ এত বেশী সমাশয় হওয়া ভাল নয় ভাবিয়া বিদেশীরা প্রস্তাবে দুটা সর্গ জুড়িয়া দিয়াছে, যে, চীনে অশান্তি দূর হইলে এবং প্রস্তাবটি (বিদেশী) করদাতাদের আর এক সভায় অল্পমোদিত হইলে, তদনুসারে কাজ হইবে। অতএব আপাততঃ বিদেশীদের মতে চীনেরা নিজেদের দেশে কুকুরদের সমশ্রেণীস্থ হই রহিল।

বেঙ্গল গ্রাম্যশাসনাল ব্যাক ফেল হওয়া

বেঙ্গল গ্রাম্যশাসনাল ব্যাক ফেল হওয়ায় কেবল যে তাহার অংশীদারদের ও বাহাদের টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালীর চালিত কারবাবের প্রতি লোকের বিশ্বাস কমিয়া যাওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ক্ষতি হইয়াছে। ইংরেজদের এবং অল্প সংজ্ঞাতিরই কোন না কোন ব্যাক ফেল হওয়ার সংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য বহুবিধৃত, এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত কারবার তাহাদের অনেক আছে। এই জন্য দু একটা কারবার দেউলিয়া হইলেও তাহাদের জাতীয় অক্ষমতা বা অল্প বদনাম হয় না। আমাদের তেমন কারবার অল্পই থাকায় আমাদের উপর অবিশ্বাস লোকের সহজেই হয়। মাস্ত্রাজের আর-বুধনটরা যখন “ফেল হুই”, তখন প্রতারণা অপরাধে তাহাদের বড় সাহেবের জেল হইয়াছিল। তিন বৎসর আগে ইংরেজদের এলায়েন্স ব্যাক ফেল যে ব্যক্তিবিশেষের

জুয়াচুরীর জন্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইংরেজদের ব্যাঙ্ক ফেল এইরূপ আরও বিস্তর হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের জাতীয় অক্ষমতা বা অবিশ্বাস-তার কথা উঠে নাই। বেঙ্গল শ্রাশ্রমাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার কারণ কাহারও জুয়াচুরী, এরূপ অপবাদ উহার শত্রুরাও দেয় নাই। সম্প্রতি যে ব্যাঙ্ক অব্‌ তেইওয়ান নামক বৃহৎ জাপানী ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করে, তাহাতেও জাপানীদের কোন বদনাম হয় নাই। অধিকন্তু জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া উহার গবর্নমেন্টের আদেশ ও সাহায্যে উক্ত ও অন্যান্য সব জাপানী ব্যাঙ্কেব কাজ পূর্ববৎ চলিতেছে।

অবশ্য, আমাদের দেশী মহাজনী কারবার না চলিলে বিদেশীরা খুব খুদী হয়। যখন পঞ্জাবের পীপলস্‌ ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তখন কোন একটি সহরের ইংরেজবা ভোক্তা দিয়াছিল এবং যে-প্রদেশে ঐ সহর অবস্থিত তাহার সাট ভোক্তা-সভাপতির কাজ করিয়াছিল।

বাঙালীদের ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খুব বেশী দক্ষতা, হুশিয়ারী ও সততা সহিত চালান উচিত, অংশীদার ও ডিপজিটব-দের স্বার্থবক্ষার্থ, দেশের কল্যাণ ও সুনামরক্ষার জন্ত, এবং শত্রুদের বিক্রম ও উল্লাসের কারণ না জন্মাইবার নিমিত্ত।

বেঙ্গল শ্রাশ্রমাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের রিপোর্টে দেখা যায়, গত এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্ক হইতে খুব বেশী লোক খুব বেশী টাকা উঠাইয়া লইতে চাওয়া এবং ততবেশী নগদ টাকা উহার হাতে না থাকায়, টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। মুখে মুখে গুজব রটিয়াছিল এবং পরে খবরের কাগজেও দেখা গেল, যে, রাজনৈতিক দলাদলির জন্ত ইহা ঘটিয়াছে। ইহা সত্য না হইলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। বিস্তর নিরপরাধ লোকেব সর্বনাশ করিয়া এবং জাতীয় অযোগ্যতা সম্রমাণ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা অতিশয় ছুঁচোমি। ইহা কেহ বা কোন দল না করিয়া থাকিলেই স্বার্থের বিষয়। এবিধ ও অন্ত সব আলোচনা ও অহুমান বন্ধ করিয়া এখন সাহায্যে ব্যাঙ্কটি আবার খোলা হয় ও ভাল ভাবে চলিতে পাবে, তাহার আলোচনা ও চেষ্টা করাই কর্তব্য।

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য

আর্ল উইন্টারটন সহকারী ভারতসচিব। তিনি পালেমেন্টে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, যে, একজন রাজ-বন্দী আত্ম-হত্যা করিয়াছে, এবং দু জনের যক্ষ্মা ছিল বা আছে বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। অস্ত্র সকলের স্বাস্থ্যের খবর তিনি জানেন না। অথচ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই রকমের অস্ত্র লোকেরাই ভারতের ভাগ্যান্বিত। তাঁহাবাই বলেন, যে, ভাবতেব মঙ্গল ও উন্নতিব জন্ত তাঁহারা দায়ী ও এই দায়িত্ব তাঁহারা ভারতীয়দেব হাতে অর্পণ করিতে ততদিন রাজ্য-নন যত দিন তাহারা তাঁহাদিগকে নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট করিতে না পারিবে। আত্মহত্যা ছাড়া, বন্দী-দশায় সংক্রামিত ব্যাধিতে মৃত্যু কয় জনের হইয়াছে, মানসিক রোগ কত জনের হইয়াছে, যক্ষ্মা ছাড়া অস্ত্র গুরুতর ব্যাধি কত জনের হইয়াছে, আর্ল উইন্টারটন তাহা জানেন না, কিম্বা বলেন নাই। খবরের কাগজ খুলিলেই আজকাল ছুরকমের খবর চোখে পড়িবেই—প্রথম, নারীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ, বাহার জন্ত কোন কোন সামাজিক প্রথা ও কতকগুলি লোকের ভীকৃত্য কিম্বৎপরিমাণে দায়ী এবং দুর্বৃত্তদেব পৈশাচিক স্বভাব অধিকপরিমাণে দায়ী; দ্বিতীয়, রাজ-বন্দীদের নানাবিধ বোগ ও অস্ত্র অস্থবিধার সংবাদ। প্রথম শ্রেণীব সংবাদেব জন্ত দেশের লোকেরাই বেশী দায়ী হইলেও গবর্নমেন্ট ও কতকটা দায়ী এইজন্ত, যে, নারী-নির্যাতন বন্ধ করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট বিশেষ কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীব সংবাদেব জন্ত গবর্নমেন্ট সম্পূর্ণ দায়ী।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব

ব্রিটশালে স্মার আন্দার রহিমের সভাপতিত্বে মুসলমানদের যে কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :—

"This conference is of opinion that a constitution should be devised for India on the basis of a federation of autonomous provinces with the dom-
nion status, the function of the Central Government

being confined to the administration of subjects directly concerned with the whole of India, such as the Army, Navy and Air Force, foreign and interprovincial relations, communicating, currency, fiscal policy, relation between India and England and other dominions and between British India and the Native States."

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব সাবেক কংগ্রেসের এবং আধুনিক কংগ্রেসের একটি আদর্শ ও বুলি। এবিষয়ে একটি কথা ভাবিবার জন্য নীচে কিছু লিখিতেছি। মুসলমানদের কনফারেন্সে যে-প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের উল্লেখ আছে, তাহা প্রত্যেক প্রদেশের জন্য, না সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য, পরিহার করা যাইতেছে না। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মানে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মত রাজনৈতিক অবস্থা ও অধিকার। যদি মুসলমান কনফারেন্স প্রত্যেক প্রদেশের এইরূপ অবস্থা চান, তাহা হইলে আমরা তাহার বিরোধী। কারণ প্রত্যেক প্রদেশের এরূপ অবস্থা ও অধিকার হইলে সমগ্র ভারতের একতা, সংহতি (solidarity) এবং স্বাধীন হইবার ও থাকিবার শক্তি জন্মিবে না। তন্নিম্ন, এরূপ অবস্থায়, যে-সব প্রদেশে (যেমন বাংলায় ও সিন্ধুদেশে) মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, তথায় তাহারা হিন্দুদের উপর এখনই বৈরুপ অত্যাচার করিতেছে, সেই অত্যাচার আরও বাড়িবার সম্ভাবনা। হিন্দুরা যে-সব প্রদেশে সংখ্যায় বেশী কোথাও সেরূপ অত্যাচার করে নাই।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব কোন কোন বিষয়ে আমরাও চাই। কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার ব্যবস্থা এমন ভাবে করা উচিত, যাহাতে তদ্বারা ভারতীয় মহাজাতির একতা, সংহতি ও শক্তি হ্রাস না পায়। আমরা বাহা লিখিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ১৮৫৮ সালের ১৩ই জুলাই বিলাতী প্যারলিমেন্টের ভারতে ইংরেজদের বসবাস করা সম্বন্ধীয় কমিটিতে জিজ্ঞাসিত কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে বুঝা যাইবে। প্রশ্ন মেজর জি উইনগেটকে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং উত্তর তিনি দেন। যথা—

"7771, you speak of the dangers that arise from a central Government, and you say that it leads to a community of aims and feelings that might be dangerous?—"Yes, I think that if there be any one subject in which the whole population of India would be interested, that is more likely to be dangerous to the foreign authority than if a question were simply agitated in one division of the empire; if a question were agitated throughout the length and breadth of the empire, it would surely be much more dangerous to the foreign authority than a question which interested one Presidency only.

"7772, Mr. Danby Seymour.

Is what you mean this, that all the people of India might be excited about the same thing, at the same time?—Yes."

তাৎপর্য। আপনি কেন্দ্রীভূত গবর্নেন্ট হইতে যে বিপদ ঘটতে পারে, অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ ভারতীয়দের নহে। প্রবাসীর সম্পাদক) তাহার কথা বলিতেছেন; এবং আপনি বলিতেছেন, যে, ইহা হইতে যে লক্ষ্যের ও মনোভাবের একতা জন্মে তাহা বিপজ্জনক হইতে পারে? "হী, বসি এমন কোন বিষয় থাকে যাহাতে ভারতবর্ষের সব লোকের স্বার্থ জড়িত ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা ভারতসাম্রাজ্যের একটি মাত্র অংশে আন্দোলিত ব্যাপার অপেক্ষা, বিদেশী কর্তৃপক্ষের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক হইতে পারে। যদি সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একটি প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন হয়, তাহা নিশ্চয়ই একটি মাত্র প্রেসিডেন্সীতে আন্দোলিত প্রশ্ন অপেক্ষা বিদেশী কর্তৃপক্ষের পক্ষে অধিক বিপজ্জনক হইবে।"

"মিস্টার ডানবি সীমুর—আপনার কথার অর্থ কি এই, যে, ভারতবর্ষের সব লোক একই সময়ে একই বিষয় লইয়া উত্তেজিত হইতে পারে?" "হী।"

ভারতবর্ষের আসল শাসননীতি কি তাহা মহারাজীর ঘোষণাপত্র, লর্ড সাহেবদের দরবারী বক্তৃতা, এবং তদ্বিধি অল্প লোক-দেখান জিনিষ হইতে বুঝা যায় না; বুঝা যায় উপরে উদ্ধৃত প্রস্তোত্তরের মত জিনিষ হইতে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চান না, যে, সমুদয় প্রদেশের সমুদয় লোক একই সময়ে কোন একটা বিষয় লইয়া উত্তেজিত বা চঞ্চল হয়; তাহারা চান, আমরা গ্রামের, জেলার, বা, জোর, প্রদেশের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকি। অতএব প্রাদেশিক স্বাভাব্য এমন রকমের হওয়া উচিত, যাহাতে সমগ্র ভারতের সব লোকদের একত্র হইবার ও একত্র কাজ করিবার অনেক বিষয় থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস হইলে তাহা হইবে না।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব

বরিশালের মুসলমান কনফারেন্সে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন দুই রকমের হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের জ্ঞাত প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিবে। প্রতিনিধিরা যে ধর্মাবলম্বী লোক হইবেন, কেবল সেই সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। ইহা গেল এক রকম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব। দ্বিতীয় প্রকার নির্বাচনে আর সব ঠিক থাকিবে, কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি সব সম্প্রদায়ে ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন যেরকমেরই হউক, আমরা এই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিটারই বিরোধী। ইহা জাতিগঠনে এবং জাতীয় সংহতি ও শক্তি বর্ধনে বাধা জন্মায়। ইহা মাহুষকে নিজেকে সমগ্র জাতিটির অংশ ভাবিয়া সমগ্রজাতির হিত-চেষ্টা করিতে না শিখাইয়া, শিখায় নিজেকে ক্ষুদ্রতর একটি দলের অংশ বলিয়া ভাবিতে ও তাহারই জ্ঞাত চেষ্টা করিতে।

ধর্মসাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব প্রতিনিধিটার মোটের উপর একটি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মাহুষের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ধর্মভেদ অনুসারে ভিন্ন নহে। স্বতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। কোন সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হইলেও যোগ্যতা ও দেশহিত চেষ্টা দ্বারা খুব প্রভাবশালী হইতে পারেন, এবং আত্মরক্ষা করিতে পাবেন। এক লক্ষ পার্শ্বী যদি ইহা করিতে পারিয়া থাকেন, সাতকোটি মুসলমান কেন পারিবেন না।

সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের আর-একটা গুরুতর দোষ এই, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা ন্যায্য-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্দিষ্ট করা হয় নাই, হইতে পারে না। যে সম্প্রদায় যত ছোট ও দুর্বল, ততঃ তাহারই স্বার্থরক্ষার জ্ঞাত তত বেশী ও ভাল বন্দোবস্ত ও চেষ্টা হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের নীচেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ;

অথচ তাঁহাদের চীৎকার বেশী বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের জ্ঞাত বন্দোবস্ত করিতেছেন, প্রত্যেক প্রদেশের তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ান, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শ্বী, ব্রাহ্ম, আদিমনিবাসী প্রত্যেক জাতি, প্রকৃতির জ্ঞাত তাহা করিতেছেন না—করা সম্ভবপরও নহে। সমুদয় হিন্দুকে কেবল মাত্র একটা দল ভাবিলে চলিবে না। দক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণে দলাদলি আছে। দেশের বন্ধুরা বাংলা-দেশেও নমঃশূদ্ৰদিগকে জ্ঞাত নানা হিন্দুর বিরোধী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায় ও দলকে খুশি করিতে হইলে ন্যূনকল্পে পাঁচ শত দলের জ্ঞাত আলাদা আলাদা প্রতিনিধির বন্দোবস্ত কবিতো হইবে। এরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন দেশে কখন হয় নাই, হইবেও না।

উপরে যে দ্বিতীয় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের ভোটারসমষ্টি দ্বারা নির্বাচনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু তাহা চালাইতে হইলে এই আইনও হওয়া উচিত, যে, এই প্রথা দশ বৎসর পরে উঠিয়া যাইবে ও তখন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না। এখন যাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে, তাহাদের যখন মত হইবে তখন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব উঠিয়া যাইবে, ইহা কাজের কথা নয়। অনিষ্টকর প্রতিনিধির আশু অনির্দিষ্ট রকম দীর্ঘ হইতে না দিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট রকম অল্পায়ু করা উচিত।

সিদ্ধুর জ্ঞাত স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা

মুসলমানরা আর-একটা দাবী করিতেছেন, যে, সিদ্ধু দেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আলাদা করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র গবর্ণরের ও ব্যবস্থাপক সভার অধীন একটি প্রদেশ করা হউক। তাহার কারণ সহজবোধ্য। সিদ্ধুদেশে মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী; কিন্তু সমুদয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা ন্যূন অংশ। স্বতরাং মুসলমানরা চান এমন একটি প্রদেশ যাহাতে তাঁহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতে পারেন। বর্তমান

ব্যবস্থাতেই সিন্ধুদেশে সংখ্যানুমান হিন্দুদের উপর যে-অত্যাচার হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের এরূপ প্রস্তাবে অসম্মতিই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, সিন্ধুর মোট রাজস্ব বাহা, তাহাতে একটি আলাদা প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের ব্যয় চলিতে পারে না। বাকী টাকাটা কে দিবে?

অন্ত একটা কথাও আছে।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া যাইবার অনেক আগে, বঙ্গের অন্ধ্রপ্রদেশের আগে, প্রদেশ-বিভাগ যেরূপ ছিল, তাহাতে বঙ্গ বিহার ওড়িশা ছোট নাগপুর একটি প্রদেশ ছিল এবং তাহাতে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী ছিল। এখন মুসলমানদের সিন্ধু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের মত হিন্দুরাও ত প্রস্তাব করিতে পারেন, যে, সাবেক স্বেচ্ছা বাংলায় সেই সেই অংশ পুনঃসংযোজিত করা হউক যাহার দ্বারা হিন্দুরা নবগঠিত বঙ্গে আবার সংখ্যায় বেশী হইতে পারে। বর্তমান বিহার-ওড়িশা প্রদেশের অনেক অংশে বাংলা কথিত ও পঠিত হয় এবং ওড়িশার শিক্ষিত লোক মাজেই বাংলা বুঝেন। এইরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধে মুসলমানরা কি বলেন?

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের পঞ্জাব-সম্বন্ধিত কোন কোন জেলা বঙ্গত: প্রাকৃতিক পঞ্জাবেরই অংশ। তাহা পঞ্জাবের সহিত যুক্ত হইলে পঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতে পারে। এরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধেই বা মুসলমানরা কি বলেন? চালবাজিটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠা ও ভারতশাসনসংস্কার আইন চালাইবার জন্তও মুসলমানরা দাবী করিতেছেন। এবিষয়েও জিজ্ঞাস্য, এরূপ শাসন-ব্যবস্থার খরচ দিবার ক্ষমতা ঐ প্রদেশের যখন নাই, তখন ঘাট্টিটা পূর্ণ কে করিবে?

অন্ত বক্তব্য এই, যে, ঐ প্রদেশ ভাবত আক্রমণের পথে অবস্থিত এবং ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয় সীমার রপারের অধিবাসী লোক বিস্তৃত আছে এবং এপারের মুসলমান সিপাহীও বিস্তৃত আছে। সীমার উভয় দিকের

লোকের লুটতরাজে সাহচর্য্য অনেকবার প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে আপনাদিগকে বিদেশীর বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিবার খোঁক খুব আছে, এবং ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা তাঁহারা বিদেশী মুসলমানদিগকে বেশী আপনার লোক মনে করেন। এ অবস্থায় ভারতসীমান্ত বক্ষার ভার সাফাৎ বা পবোম্বভাবে সীমান্তের মুসলমানদের হাতে যাহাতে বেশী পরিমাণে যাইয়া পড়ে, এরূপ কোন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতের সৈন্যদল যখন ভারতীয়দের তাঁবে আনিবে, এবং উহাতে সব প্রদেশের ভারতীয়রা নেতা ও সিপাহী রূপে অবাধে জাতিবর্ণনির্বিণ্ণে প্রবেশ করিতে পারিবে, তখন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিতে পারে। অবশ্য গবন্মেণ্ট এখনই মুসলমানদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তাহা আমাদের সম্মতিক্রমে হইয়াছে, ইহা বলিবার সুযোগ আমরা দিতে চাই না।

স্ত্রীর আন্দার রহিমের বক্তৃত্তা

বরিশালে মুসলমান কনক্যারেন্সের সভাপতিরূপে স্ত্রীর আন্দার রহিম যে-বক্তৃত্তা করিয়াছেন, তাহাব স্মরণে ঠিক তাঁহার বিখ্যাত আলিগড়ের বক্তৃত্তার মত নয়;—কিছু নরম, একেবারে “মৃদুং দেহি” নহে। নরম হইবার কারণ বুঝা সহজ। পড়িতে শুনিতে ভাল এমন কথাও এই বক্তৃত্তায় আছে। কিন্তু সমস্তটি মন দিয়া পড়িলে নষ্ট হইতে পারা যায় না।

তিনি বলিয়াছেন, যে, পোনাবাসিয়ায় মুসলমান জরতীর উপর গুলিবর্ষণ দ্বারা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, এখানে রেস্পন্সিবল্ গবন্মেণ্ট অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট দাবী গবন্মেণ্ট নাই। কি আশ্চর্য্য আবিষ্কার! তিনি যখন গবন্মেণ্টের একটা অঙ্গ ছিলেন, তখন কি স্বক্ৰমে জনসাধারণের নিকট সব কাজের জন্ত দায়ী হইতেন? তখন কি জুলুম, জবরদস্তী, “বে-আইনী আইন” জব্দী, এসব কিছুই হইত না? দায়িত্বপূর্ণ শাসনের কথা উঠেই বা কেন? ভারতশাসনসংস্কার আইন দায়িত্বপূর্ণ

গবর্নেন্ট প্রবর্তিত করিয়াছে, একথা ত আমলাতন্ত্রেরও উক্তি বা দাবী নহে। উক্ত আইন অনুসারে দায়িত্বপূর্ণ গবর্নেন্ট ক্রমোন্নতিস্থত্রে অল্প অল্প করিয়া স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইবে, ইহাই বলা হইয়াছে।

রহিম সাহেবের ইহা একটা মস্ত অভিযোগ, যে, পটুয়াখালিতে হিন্দুবা সভ্যগ্রহণ করিয়া হুকুম অমান্ত করায় আদালতে বিচার করিয়া তাহাদের শাস্তি হইতেছে; অথচ পোনাবালিয়ায় মুসলমানরা হুকুম অমান্ত করায় তাহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইচ্ছাপূর্বক তুলিয়া যাইতেছেন, পটুয়াখালিতে নিরস্ত্র দুটি চারিটি হিন্দু নিজেদের ধর্ম্মাধিকার স্থাপন জন্য নিরুপদ্রব ভাবে হুকুম অমান্ত করিতেছে, কাহাকেও মারিতে যাইতেছে না। পক্ষান্তরে পোনাবালিয়ায় বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলমান বাহবলে ও অন্ত্রবলে হিন্দুদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে জনতাভঙ্গ করিতে বলায় তাহারা, আদেশ পালন করা দূরে থাক, তাঁহাকে ও অন্ত্র সর্বকারী লোকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। এই দুই প্রকার আদর্শলজ্জনে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা বুঝা খুব সোজা। রহিম সাহেব বুঝিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে উপায় কি? পোনাবালিয়ায় ৩৭ রাউণ্ড গুলি নিষ্ক্ষেপের প্রতিবাদ আমরা করিয়াছিলাম, অন্ত্র অনেক অমুসলমান সম্পাদকও করিয়াছিলেন; কিন্তু সশস্ত্র মুসলমান জনতার আচরণের সমর্থন করিতে পারি নাই।

মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য সম্বন্ধেও রহিম সাহেব অনেক আংশিক সত্য আংশিক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে, হিন্দুরা নামাজের সময় মসজিদের সামনে গীতবাদ্য বন্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহা হইলে আপোষে মিটমাট হইল না কেন? কারণ কি এই নহে, যে, তিনিও অন্ত্র মুসলমান নেতারা ও তাঁহাদের অহুচরেরা এই জেদ ধরিয়াছিলেন, যে, সব মসজিদের সামনে সকল সময়েই গীতবাদ্য বন্ধ করিতে হইবে?

তিনি সাধারণভাবে বলিয়াছেন বটে, যে, দেশের সব সম্প্রদায়ের লোকদের সর্বকারী রাস্তা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অন্ত্রের সমান

অধিকারে বাধা না দেয়, অপরের বিরক্তিকর বা অনিষ্টকর কাজ না করে, অপরের উপর উৎপাত না করে। কিন্তু মুসলমানরা যে কত মন্দির ও মূর্ত্তি অপবিত্র করিয়াছে, শবদাহে বাধা দিয়াছে, সংকীর্্তনদল আক্রমণ করিয়াছে, লোকদের নিজের গৃহাভ্যন্তরে পূজাপাঠে ভঙ্গন গানে বাধা দিয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতার সব-চেয়ে অঘণ্ট, লজ্জাকর ও ঘৃণ্য অংশ সেইটা যেখানে তিনি নারীদের উপর মুসলমান নরপশুদের কৃত অত্যাচারসমূহকে সেক্সুয়েল ইরেগুলারিটি বা জীপুরুষসম্বন্ধীয় অনিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে-সব অমুসলমান কাগজ নারীনির্ধ্যাতনের বিরুদ্ধে খুব বেশী লেখালেখি করেন, তাঁহারা অত্যাচারী ও অত্যাচারিতাদের জাতিধর্ম্মনির্কির্শেষে এই পাপ ও পৈশাচিকতার নিন্দা করেন; কিন্তু রহিম সাহেব মুসলমান নারীদের উপর মুসলমানের অত্যাচার সম্বন্ধেও কোন কড়া কথা বলিতে সাহস করেন নাই; অথচ এরূপ অত্যাচারের সংখ্যা কম নহে। রহিম সাহেব বলিয়াছেন, ব্যভিচার বলাৎকারাদি গর্হিত কাজের শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামীয় শাস্ত্রে যেমন কঠোর এমন আর কোন শাস্ত্রেই নহে। তাহা সত্য কিনা, জানি না; কারণ আমরা ইসলামীয় শাস্ত্র পড়ি নাই। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমানদের ব্যবহারে ত এরূপ ব্যবস্থার কোন পরিচয় পাই না। কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে, জানিতে চাই। তাহা হইলে প্রয়োজন-স্থলে তাহার দাবী হইবে। মুসলমানরা বহুস্থলে হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারী মুসলমানের আদালতে পক্ষ সমর্থন জন্য চাঁদা তুলিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারীদেরও পক্ষাবলম্বন করিয়া যোকদ্দমা চালাইবার জন্য চাঁদা তুলিয়াছেন বা সমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, পড়ি নাই। অত্যাচারিতা হিন্দুনারীর পক্ষ তাঁহারা কেহ অবলম্বন করিবেন, এরূপ হুয়াশা আমাদের নাই। মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারের প্রত্যেকটি সংবাদ যে সত্য, ইহা আমরা বলি না; কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সংবাদ যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহা পুনঃ পুনঃ আদালতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ অত্যাচার যে মুসলমানরাই বেশী করে, অত্যা-

চরিতাদের বেশী অংশ যে হিন্দুনারী, এবং এই উপায়ে যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। অমুসলমান নারীরক্ষাসমিতি অত্যাচারিতা মুসলমান নারীর পক্ষ অবলম্বন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। কুষ্টিয়ার মধু শেখ অত্যাচারিতা হিন্দুনারীর সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অমুসলমান কাগজে তাহার প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

অধিকাংশ ভারতীয়—বিশেষতঃ বঙ্গীয়—মুসলমান যে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ভারতীয় হিন্দুদের বংশধর, এই কথাটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করার রহিম সাহেব বড় চটিয়াছেন। তাহা বা অনেক নিম্ন নিম্ন প্রকৃত পূর্বপুরুষ-দিগকে বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে আরব মোগল পাঠান তুর্কের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক সত্যের উদ্ঘাটন অস্বীকার হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে অমুসলমানদের কোন বদ্ মতলব নাই; কারণ তাহারা আরব তুর্ক পাঠান মোগলদিগকে ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে না। “শুদ্ধ”র জন্মও মুসলমানদিগকে হিন্দুর বংশধর প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, শক হুন গ্রীক ভারতীয় অনার্য আদিম জাতি প্রভৃতির বিস্তার লোক স্বর্ণযুগীয় কাল হইতে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া আসিতেছে।

রহিম সাহেব বলিয়াছেন, যে, সংখ্যাবহুল হিন্দু বা তাহাদের ক্ষমতার বিরূপ ব্যবহার করিবে, সে-বিষয়ে মুসলমানদের উদ্বেগ আছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম। কিন্তু যে-কোন প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তথায় মুসলমানেরা হিন্দুর উপর যেরূপ ষড় অত্যাচার করিয়াছে, তাহার সমতুল্য তত অত্যাচারের দৃষ্টান্ত হিন্দুবহুল প্রদেশ সকল হইতে রহিম সাহেব বাহির করিতে পাবেন কি? মালাবার, পাবনা, কোহাট, লড়কানা, প্রভৃতির মত হিন্দু-অত্যাচার-ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি? কল্লিত বাজে উদ্বেগের উল্লেখ নেতৃস্থানীয় কোন লোকের করা উচিত নয়। বড়োদাতে রাজা হিন্দু; মুসলমানরা তথায় সংখ্যায় কম। অথচ সেখানেও শিবাজী উৎসবে মুসলমানেরা উপলব্ধ করিয়াছে।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত গণিত অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া ধৈ-কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যায়, ভূতপূর্ব হাইকোর্ট জজ ও শাসন-পরিষদের ভূতপূর্ব সভ্যের তেমন মিথ্যা কথা বলিবার নিবৃত্তি। রহিম সাহেব নিজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—“they are steadily declining in wealth, education and political influence।” কোন সম্প্রদায়ের ধন কিরূপ বাড়িতেছে কমিতেছে, তাহার কোন হিসাব নাই। রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবের হ্রাসবৃদ্ধিরও হিসাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি যে মুসলমানদের মধ্যে হইতেছে, তাহার হিসাব আছে ও তাহা দেখাইতেছি। রহিম সাহেব বাংলা দেশে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলার কথাই বলি। ১৯২৫-২৬ সালের বঙ্গীয় শিক্ষা-বিপোর্টে দৃষ্ট হইবে, যে, ১৯২৪-২৫ সালে কলেজ-সমূহে মুসলমান ছাত্র ২৮৫৩ ছিল; ১৯২৫-২৬ সালে তাহা বাড়িয়া ৩১৭৮ হয়। সকল রকমের শিক্ষালয়ে মুসলমান ছাত্রছাত্রী ১৯২৪-২৫ সালে : ১৮৫৯০ ছিল; তাহা বাড়িয়া পর বৎসর ১০৫২৬৬ হয়। মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় সকলে মুসলমান ছাত্রছাত্রী ১৯২৪-২৫ সালে যথাক্রমে শতকরা ১৪.৬ ও ১৭.২ ছিল; তাহা বাড়িয়া ১৯২৫-২৬ সালে শতকরা ১৫.০ ও ১৭.৬ হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এইরূপ ছিল:—

বৎসর।	হিন্দু।	মুসলমান।
১৯২৪-২৫	৫২৭২৬৫	৬৮৭৩৯২
১৯২৫-২৬	৬২২৭১৯	৬৯৬২৬৫

প্রাথমিক হিসাব লইলে দেখা যায়, ১৯২৫-২৬ সালে হিন্দু ছাত্রী ছিল ১৩৯৬১১, মুসলমান ছাত্রী ছিল ১৯১২৮৩। মুসলমান ছাত্রীরা সংখ্যায় এক বৎসরে শতকরা ৫.৫ বাড়িয়াছে; হিন্দু ছাত্রীরা সংখ্যায় তত বাড়িতে পারে নাই, কেবলমাত্র শতকরা ৩.৫ বাড়িয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা ভাল নয় সত্য, কিন্তু তাহার অবনতি হইতেছে না, উন্নতিই হইতেছে।

রহিম সাহেবের বক্তৃতার আরও অনেক সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু আর জায়গা নষ্ট না করিয়া শেষ কথা একটা বলি। তিনি শেষের দিকে বলিয়াছেন:—

"Politics, whatever the cynic may say, is the noblest occupation of the ablest men of the community."

তিনি বলিতেছেন, সমাজের যোগ্যতম লোকদের মহত্তম চেষ্টার স্থল রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র। এই কথাটা তিনি না বলিয়া অল্প কেহ বলিলে ভাল হইত। গোথলের মত লোক রোজগারেব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে-পথ ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক কাজ করিয়াছিলেন। রহিম সাহেব বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত যত রকম স্বকারী চাকরী জুটাইতে পারিয়াছেন, করিয়াছেন। মস্তিষ্ক চাকরীটা না-পাওয়ায় তাঁহার বড় দুঃখ হইয়াছে। এখনও তিনি তাহা পাইলে করিবেন। এইজন্যই বলিতেছি, উদ্ধৃত কথাগুলি কোনও ভাগী লোকের মুখে শোভা পাইত। তবে যদি "অকুপেশন" কথাটা তিনি সেন্স রিপোর্টের অর্থে অর্থাৎ পেশা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। খিলাফৎ যুগের যেরূপ সম্বাদ হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতি পেশাটা মন্দ বোধ হয় না। এইরূপ পেশা টিলক স্বরাজ্য কণ্ড এবং বঙ্গের গ্রামপুনর্গঠন যুগ সংশ্লিষ্ট কোন কোন অমুসলমান কর্মীও অবলম্বন করিয়াছিলেন। রহিম সাহেব মুসলমানদের একটি খবরের কাগজের জন্ত ছয় লক্ষ টাকা এবং তবলিগ ও তাজিমের জন্ত ছয় লাখ টাকা চাহিয়াছেন। এই টাকা যদি সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহার সম্বাদের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? উহা পেশাদার রাজনৈতিকদের হাতে গড়িবে কি?

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

ভারত গবর্নমেন্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষের এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। নামটা এজেন্ট না দিয়া অধিকতর সম্মানজনক কোন নাম দিলে ভাল হইত। যাহা হউক, নির্বাচন খুব ভাল হইয়াছে। বাঙ্গালৈতিক জ্ঞানে, ত্যাগে, কর্তব্যনিষ্ঠায়, ব্যক্তিগত ও চরিত্রে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট এই কাজের উপযুক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কাহারও নিকট ধারণা হইবে না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে স্বরাজী প্রভুত্ব

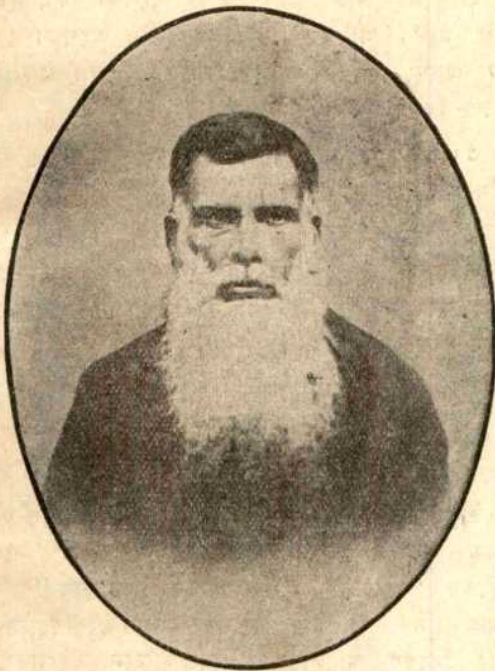
কলিকাতার মেয়র আবার স্বরাজী শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তই হইলেন, এবং কমিটিগুলিতেও স্বরাজীদেরই প্রভুত্ব বজায় রহিল। স্বরাজবাবুর চেষ্টায় নূতন কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনে দেশী লোকদের ক্ষমতাবৃদ্ধির পর হইতে স্বরাজী দলের হাতেই এই ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের আমলে কলিকাতার চক্ষুগোচর ও নাসিকাগোচর কোন উন্নতি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই; যদিও ইহাও বলা উচিত, যে, তদ্রূপ কোন অবনতিও লক্ষ্য করি নাই। গুপ্ত কোন উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকিলে তাহার বিষয় অবগত নহি। নানাদিকে উন্নতি খুব যে দৃষ্কার ও সম্ভব তাহা সবাই জানে। দেশীয় লোকদের প্রভুত্বে—বিশেষতঃ সর্বোপেক্ষা অধিক দেশভক্তির স্পর্ধা বাহারা করেন তাঁহাদের প্রভুত্বে—যদি কেবল ইংরেজ পাড়াগুলিই ফিট্ ফাট্ থাকে, দেশী পাড়ার কোন উন্নতি না হয়, তাহা হইলে নূতন মিউনিসিপাল আইনের সার্থকতা কি?

স্বরাজী দলের একটা খুব সুবিধা এই ছিল, যে, তাঁহারা অল্প কোন দলের সাহায্য না লইয়া বা মুখোপেক্ষা না করিয়াও নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন। দলে একরূপ পুরু তাঁহারা ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও যে তাঁহারা কলিকাতার দেশী পাড়াগুলির উন্নতি করেন নাই, পূর্ববৎ ইংরেজ পাড়াতেই টাকা ঢালিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের প্রশংসার বিষয় নহে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে অল্প কোন দলকে প্রাধান্ত লাভ করিতে হইলে হয় ত ইংরেজদের সাহায্য চাই, হয় ত তাহাদিগকে কণ্ট্র্যাক্টাদি দিয়া খুশি করা চাই। দেশের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক নহে। অবশ্য দেশী লোকদের মধ্যে লুটের টাকার ভাগবাটোয়ারাও যে ভাল, তাহাও নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, স্বরাজীদের প্রবলতা এক সময়ে এমন ছিল, যে, তাঁহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যুগ না দিয়াও, কেবল সংকল্পশীলতার দ্বারাই, নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ কৃতিত্বের প্রশংসা তাঁহারা অর্জন করিতে পারেন নাই। এই তৃতীয় দফায় পারিবেন কিনা, বলিতে পারি না।

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভাগলপুরের স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতার মাসিক আয় দশ টাকা মাত্র ছিল। ছাত্রাবস্থায় রাজিতে পড়িবার জন্ত প্রদীপের তেল কিনিবার পয়সা না জুটায় রাস্তার বাতির আলোকে তিনি পড়িতেন। সবুকারী বৃত্তি এবং সদাশয় লোকদের সাহায্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এল পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন।



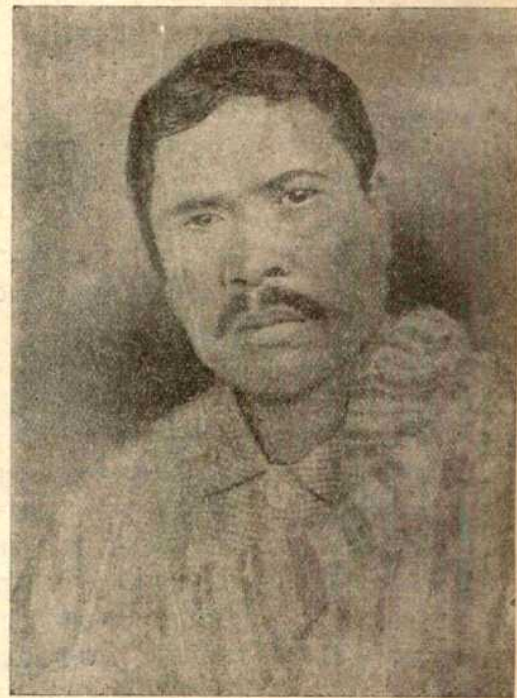
স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাবিভাগের কাজে প্রবৃত্ত হইয়া প্রধান শিক্ষক থাকিবার সময় তাঁহার মনে হইল, যে, তিনি বড় ক্ষমতা-প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। এইজন্ত তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া ওকালতীতে প্রবৃত্ত হন। কয়েক বৎসর ওকালতী করিয়া তাহা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তাহাও তিনি ত্যাগ করেন। তিনি ভাগলপুরের নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান, এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। এই সব পদের কাজ তিনি যোগ্যতা ও আয়নিষ্ঠার সহিত করিয়াছিলেন।

স্বরাপাননিবারিণী সভা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, প্রভৃতি নানা সভাসমিতির সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি একাধিক উৎকৃষ্ট বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের লেখক। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কল্যাণামাতা দৌহিত্রাদি সকলের মধ্যে যে-কেহ চেষ্টা করিলে তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত বাহির হইতে পারে।

উমাপদ রায়

স্বর্গীয় উমাপদ রায় মহাশয় কয়েক বৎসর হইল, সিটি-



স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়

স্কুলের শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়াছিলেন। তিনি দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। তিনি “জীবনালোক” “ভগিনী ভোরা”, “পুরুষকার” প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই তিনটি গ্রন্থ অমূল্য; কিন্তু তাঁহার ভাষা ও রচনারীতি একরূপ ছিল, যে, এগুলি পড়িলে অমূল্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি এই বৎসর এবং ইহার পূর্বেও কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রতম পরীক্ষক ছিলেন।

বাংলাদেশে বিরলা পরিবারের দান

গত ১৫তম মাসের প্রবাসীতে আমরা বিবিধ প্রসঙ্গে জনৈক ধনী মাড়বারীর দান সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদেরকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি তাহা প্রকাশার্থ লিখিলে সম্মত হইতাম। কিন্তু তিনি তাহা ছাপিবার অনুমতি দেন নাই। তাহা পড়িয়া বুদ্ধিতে পারিয়াছি, আমরা অজ্ঞতা বশতঃ বিরলা পরিবারের প্রতি অবিচার করিয়াছি। তাহার জ্ঞাত আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা নিন্দনীয় হইলেও, বিরলা পরিবার যে প্রশংসা-ভাজন, তাহা স্তবের বিষয়। মানুষের নিন্দা সত্য হওয়া অপেক্ষা প্রশংসা সত্য হওয়াই সুখকর।

পত্রলেখক বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, যে, বিরলা পরিবার প্রতি বৎসর নানাদিক তিন লক্ষ টাকা জনহিতকর কার্যে ব্যয় করেন, এবং এই টাকার অধিকাংশই বাংলা দেশে ব্যয়িত হয়। এই প্রকার সদ্ব্যয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পত্রলেখক দিয়াছেন।

তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। আশা করি, তাহাতে তাঁহার আপত্তি হইবে না।

“আর-একটি কথা এই, যে, রাজা বলদেব দাস বিরলা বাংলা হইতেই ধন আহরণ করিয়াছেন, ইহা ঠিক- নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইহার আটটি মিল আছে, এবং বহু ব্যবসার কেন্দ্র আছে। এইসকল স্থান হইতেও তাঁহার প্রভূত ধনাগম হয়, যেমন বাংলা দেশ হইতেও হয়। সুতরাং, ‘উপার্জন-ক্ষেত্রেই দান করা উচিত,’ এই নীতি যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দিল্লী এবং রাজপুতানার অনেক স্থান তাঁহার দানের উপর সমানভাবে দাবী করিতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি, যে, বাংলা দেশের জগন্নাথ তাঁহারা বেশী অর্থব্যয় করেন। “..... একথাও ঠিক বলিয়া মনে হয় না, যে, বিরলা পরিবারের বাংলা দেশের প্রতি প্রজ্ঞা-প্রীতি কম। বরং কথাবার্তায় শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলার ও যুগলকিশোর বিরলার বাংলা দেশের প্রতি মনোবোধ দেখিয়াছি।” “বিবাহ সেই প্রদেশে হইয়াছিল বলিয়া সেই অঞ্চলের অথবা নিকটবর্তী প্রদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁহারা এই লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।”

লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

১। আমরা যত লেখা পাই, সমুদয় প্রকাশ করিবার

জায়গা প্রবাসীতে হয় না, যদিও আমরা মথ্যে মথ্যে ১৪৪ পৃষ্ঠার অধিক পৃষ্ঠা দিয়া থাকি। এইজন্য অনেক লেখা ছাপিতে বহু বিলম্ব হয়। ইহাতে লেখকেরা স্বভাবতঃ বিরক্ত হন। এই কারণে আমরা একটি অস্বরোধ করিতেছি। কোন লেখক যখন লেখা পাঠাইবেন, তখন তাহার উপর অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন, যে, কোন্ তারিখ পর্যন্ত তাহা ছাপা না হইলে উহা ফেরত চাই। তা ছাড়া, যিনি যখন লেখা ফেরত চাহিবেন, তখনই তাহা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে।

২। দীর্ঘ লেখা ছাপিতে অসুবিধা ও বিলম্ব হয়। এক-একটি লেখায় দুই হাজার অপেক্ষা বেশী শব্দ না থাকিলেই ভাল হয়। তাহা অপেক্ষা কম হইলে ক্ষতি নাই। বাহাতে আড়াই হাজার অপেক্ষা বেশী শব্দ আছে, এরূপ লেখা মনোনীত হইলেও প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

৩। প্রবন্ধাদি পাঠাইবার সময় তাহাতে কত শব্দ আছে লিখিয়া দিলে ভাল হয়।

৪। অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ হাতে আছে। তাহা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কেহ যেন না ভাবেন, যে, দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা আমাদের রীতি এবং তাহা ছাপিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

কবিতা-চুরির অভিযোগ

শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শনা দেবী লিখিয়াছেন, যে, শ্রীযুক্ত গটক নামক একজন লেখক তাঁহার “পত্র-লেখা” নামক পুস্তকের “কর্মচক্র” নামক কবিতাটি ঢাকার “শান্তি” নামক মাসিক পত্রিকায় নিজের বলিয়া ছাপাইয়াছেন। ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক মনে হইলে উক্ত পত্রিকাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসীর সম্পাদক।

চিত্র-পরিচয়

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর রঙিন চিত্র-খানি (মৃত্যুদূত) রেশমের উপর অঙ্কিত। ঘোবনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ইরাণী হুন্দরী পরপারের সম্বল ‘মালা’ ও প্রাণঘাতী ছুরিকার পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে। প্রাণময় ঘোবন প্রাণঘাতী দ্রব্যের পণ্য লইয়া মৃত্যুদূতের কঠোর মূর্তি ধরিয়াছে—চিত্রে শিল্পীর এই ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে।



হরপার্বতী

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
বরোদা

[প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নাগমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৭শ ভাগ

১ম খণ্ড

আমৃত, ১৩৩৪

৩য় সংখ্যা

নববর্ষ

(শান্তিনিকেতন)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সম্মুখের ধরে গাছের পাতা সূর্য্যকিরণ প্রতিদিন পান করেছে, গাছের মজ্জায় তার তেজ গোপনে জমিয়ে তুলেছে, পৃথিবীকে দিয়েছে তার ছায়া, আকাশকে দিয়েছে ঋতুতে ঋতুতে তার শ্রামলতার বৈচিত্র্য—যা তার দান করুণা তা সম্পূর্ণ করে অনায়াসে আজ বিদায় নিয়েচে—তার চ’লে যাওয়ার মধ্যেও শান্তি ও সৌন্দর্য্য। নবীনকে স্বীকার করে নমস্কার করে সে গেল। দেহেতে দেহেতে নবকিশলয়ে বনভূমি আনন্দিত।

আমাদের বয়স থেকে যে-বৎসরটি গেল, সেই বৎসরের প্রসারিত গল্পের ভিতর দিয়ে যা কিছু আনন্দের রস ও দুঃখের তাপ জীবনের মজ্জার মধ্যে সঞ্চয় করেছে, তা সার্থক হোক। কিন্তু পাতাটি সহজেই যাক ব’রে। পুণ্যতনের সেই সহজে যাওয়ার মধ্যেই নতুনের সহজে

আসার ভূমিকা হোক। মনের মধ্যে কোনো বিকলতা কোনো গ্লানি না থাকে যেন, মিথ্যে সব নালিশ ফ্লার মধ্যে জীর্ণ হয়ে যাক। নইলে নতুনের রং ঠিক হবে না, তাতে জরার কালিমা পড়বে। স্বার উদঘাটিত হবে দাঁও, নববর্ষের সূর্য্যকিরণ অন্তরে প্রবেশ করুক। আজ এই বিকশিত শিবীষ-বনের গন্ধ-হিল্লোলে অমরযৌবন। দেবতার যে উত্তরীয়ের স্পর্শ বিকীর্ণ হচ্ছে উদ্যান চিত্তকে সে আগ্রহ করুক।

২

বাইরের যা কিছু ঘটনা তাকেই চরম ক’বে জানে পশু। তাই বাইরে যখন ক্লপণতা তখন তারা কোনো উপায় খুঁজে পায় না, তারা বিনাশ পায়। বাইরেই তাদের অবস্থান, বাইরেই তাদের ধ্বংস।

মাহুষ আত্মাতে সৃষ্টিশক্তি অল্পভব করে। তাই,

আপন মহিমাতে সে আশ্রয় নেবে এ কথা ভুলতে পারে না। তার পক্ষে অক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা ভিক্ষুকতা, অক্রিয়ভাবে আঘাত পাওয়া কাপুরুষতা, অক্রিয়ভাবে অন্তকে অবলম্বন করা অধীনতা। মানুষই বলেছে—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

অর্থাৎ পরবশতায় বাহিরের আরাম থাকতে পারে কিন্তু আত্মার দুর্গতি। কেননা স্বকর্তৃত্ব আত্মার ধর্ম। লোভে, ভয়ে বা অভ্যাগে যার সেই নিজের ভিতরকার ধর্ম নান হয়ছে সে জীবলোকে বেঁচে আছে পশুপক্ষীদের সঙ্গে এক পর্যায়ে, কিন্তু সে মবেচে যে-ক্ষেত্রে মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করে ধন্য। বিশ্ববিধাতাকে পাই তাঁর সৃষ্টিশক্তিতে—আত্মারও পরিচয় পাওয়া যায় তার সৃষ্টির উছোপে।

সেই পরিচয়ের উৎকর্ষ কখন হয়? যখন দেখি সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির উপকরণের চেয়ে বড়। উপকরণকে তিনি আপনার অঙ্গকূল করে নেন। নিজের জীবনকে মানুষ নিজে সৃষ্টি করবে, এইখানে তার আত্মার কর্তৃত্ব। তার স্বপ্ন দুঃখ, লাভ ক্ষতি, খ্যাতি নিন্দা, বা-কিছু বাইরে থেকে তার ভাগ্যের দান, এসমস্তকে উপকরণরূপে সে পেয়েচে, এই নিয়ে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হ'বে। চিত্রশিল্পী যে-রেখা, যে-বর্ণ, যে-পট, যে তুলি, এমন-কি যে-বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন সেগুলিকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তারা তুচ্ছ। আংশিক আকারে তাদের অর্থ নেই, স্থায়িত্ব নেই, তারা আবর্জনা। কিন্তু রূপকার তাদের সমস্তকে নিয়ে যখন তাঁর চিত্তের কোনো একটি ধ্যানকে রূপের সম্পূর্ণতা দেন—তখন তারা নিত্যতার মহিমা লাভ করে। তখন তারা কেউ বাইরের মূল্য দাবী করে আপন আংশিকতাকেই উগ্র করে দেখায় না। উপকরণ তুচ্ছ হ'লেও গুণী তাকে নিয়ে যখন আপনাকে প্রকাশ করেন তখন সেই সমগ্ররূপের সৃষ্টি নিত্যধর্ম লাভ করে, যে নিত্যধর্ম সূর্য্যচন্দ্রে, সৃষ্টিকর্তার হাতের কাজের যে-রস সেই রস ফুটে ওঠে ছবিতে। আমাদের জীবনকেও যে পরিমাণে সম্পূর্ণতা দিই সেই পরিমাণে আপন স্বপ্ন দুঃখ, আপন ধনসম্পদের চেয়ে সে বড় হ'য়ে ওঠে, স্বতরাং

সে-সমস্ত ঢাকা পড়ে। তখন সেই জীবনের মধ্যে নিত্যধর্ম প্রকাশ পায়। নিজের জীবনসৃষ্টিতে যারা গুণী তাঁদের আমরা বলি অমর।

এই অমরতা বাহ্যকালের অমরতা নয়। যা পূর্ণ, যা স্বন্দর, তা যতক্ষণই থাকে ততক্ষণই নিজেকে প্রকাশ করে। একটি ছোট বনফুল, সে নিত্যেরই রূপ, সে অল্পকালের মধ্যে ঝরে গেলেও চিরকালের ধন। তেমনি যে মানুষের মধ্যে আত্মা সমস্ত বাহ্য উপাদানকে আত্মসাৎ করে জীবনকে নিজের করে প্রকাশ করেছে, তার খ্যাতি থাক আর না থাক, কালকে সে বিস্তৃত আকারে অধিকার করুক আর না করুক তার মধ্যে নিত্যেরই প্রতিরূপ দেখা দেয়। যে-কাল খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ছায়া, সেই অসম্পূর্ণ কালকে সে জয় করে।

এই শিরীষ ফুল, এ যে স্বন্দর হ'য়ে ফুটেছে এই এর সার্থকতা—অনামর নিন্দা বা মৃত্যু কিছুতেই এই সার্থকতাকে নষ্ট করতে পারে না। সৃষ্টির ইতিহাসে এই যে নিত্যের লীলা, সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব, এর আর অবসান নেই। সেই লীলার সঙ্গে আত্মার সৃষ্টিকর্মের যদি স্বপ্ন তাল মেলাতে পারি তাহ'লে প্রত্যেক নিমিষেই অমৃতের স্বাদ পাব।

আজ নববর্ষে এই কথাটি আমাদের মনে ধনিত হোক যে, যেন বাহিরের অবস্থার উপরে জয়ী হ'তে পারি। যেন আত্মশক্তিতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়, বহু বিষয়ে পরাস্ত হ'য়ে না থাকে। অন্তরে আছেন যে-প্রভু বাহিরে দাস যেন তাঁকে অবমানিত না করে। বাধাবিঘ্ন দৈত্যের মধ্যে চিত্ত বারবার ম্লান হয়, বারবার আপনাকেই অবিশ্বাস করি, বাহিরের উপরই আস্থা রাখি, আত্মার এই পরাভবকে একান্ত সত্য বলে যেন না মানি। আত্মার গতিপথে উত্থানটাই সত্য, পতনটা চরম নয়—এই বার্তাকেই আজ নববর্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করি, আর জামৃত্যু-ক্ষতির কুহেলিকা-অন্তরালে যে জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন, প্রাণের ষাঁর ক্ষয় নেই, ঐশ্বর্য্যের ষাঁর অন্ত নেই, আনন্দের উৎস যিনি, তাঁকে আজ নমস্কার করি।

১ বৈশাখ, ১৩৩৪।

গোতমের ধৰ্ম্মে আত্মার স্থান

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

প্রথম প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, গোতম একজন পুণ্ড্র বা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই পুরুষই কৰ্ম্ম করে, কৰ্ম্মফল ভোগ করে; এই পুরুষই ইহলোক পরলোকে বিচরণ করে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-ফল গোতমই কি গোতমের শেষ কথা? কর্ত্ত্বরূপে প্রকাশিত পুরুষই কি পুরুষের প্রকৃতরূপ?

না, ইহা গোতমের চবম কথা নহে; ইহা সংসার-তত্ত্ব, সংসার-তত্ত্ব চরম তত্ত্ব নহে। সম্ + স্ত্ব ধাতু হইতে ‘সংসার’ শব্দ। ‘স্ত্ব’ ধাতু গতিশব্দক। সংসার নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, জীবজন্তু পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া থাকিত হইতেছে। সংসার গতিশীল, কখন স্থিতিশীল নহে। মনুষ্যালোক দেবলোক প্রভৃতি যাহা কিছু কালের অধীন, সে সমুদায় লইয়াই সংসার। ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সংসারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসংসার অনিত্য ও অশাস্ত। যতদিন দেবমনুষ্যাদি এই অনিত্য সংসারে আবদ্ধ থাকে, তত দিন তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া বাস করে, সংসারে কৰ্ম্ম করে এবং কৰ্ম্মফল ভোগ করে। অনাদি কাল হইতে এইভাবে সংসার চলিয়া আসিতেছে।

কল্প

এক এক কল্পের প্রারম্ভে, এক এক সংসারের আরম্ভ, কল্পান্তে ইহার বিনাশ। নূ ন কল্পে আবার নূতন সংসার এবং প্রলয়ে ইহার বিনাশ। কেবল পার্থিব জীবেরই যে উৎপত্তি ও বিনাশ তাহা নহে—ইন্দ্র ব্রহ্মাদিও কল্পারম্ভে জন্মগ্রহণ করে—কল্পান্তে আবার জীন হইয়া থাকে। এইরূপ কল্প-কল্পান্তরে সংসারের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে। এক এক কল্প কি সূক্ষ্ম কাল তাহা কল্পনা কবা অসম্ভব। কল্প-পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্ত গোতম কয়েকটি উপমা দিয়াছেন, একটি উপমা এই :—

লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত একটি নগর; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার ইহা এক যোজন। ইহা সৰ্বপ-বীজে পরিপূর্ণ। একজন লোক যদি শতবৎসর পর পর এক-একটি সৰ্প-বীজ গ্রহণ করে, এইরূপে কালে নগরের সৰ্প-কণিকার সংখ্যাও নির্ণীত হইবে, কিন্তু তখনও কল্প শেষ হইবে না।

(সংযুক্ত ২।১৮২, ইং সং)

এই প্রকার শত সহস্র কল্প অতীত হইয়াছে। সংসারও বহু-কল্পান্তর চলিয়া আসিতেছে। কে ইহার আরম্ভ কল্পনা করিতে পারে?

সংসার অবিভাঙ্গ্যমূলক

এই যে অনাদি সংসার, ইহা কৰ্ম্মমূলক। যে দুঃকৰ্ম্ম করে, তাহার হয় হীন গতি, আর যে সাধু কৰ্ম্ম করে, সে সুগতি লাভ করে। ব্রহ্মাদি দেবগণও কৰ্ম্ম-ফলে নিজ নিজ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। মানবলোক, স্বর্গ-লোক সমুদায়ই কৰ্ম্মের ফল।

ভারতের প্রায় সমুদায় দর্শন ও ধৰ্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য—কিসে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। গোতমের ধৰ্ম্মেরও মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার হইতে মুক্তিলাভ। তাহার ধৰ্ম্মে যাহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা এই পৃথিবীতেই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাহা-দিগকে আর সংসার-গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এ ধৰ্ম্মে যাহারা নিম্ন সাধক, তাহারাও মুক্তি লাভ করিবে, তবে এ ক্ষম্মে নহে। এক মাত্র সিদ্ধ পুরুষই মুক্ত, আর সকলেই বদ্ধ। কেবল মানবই যে বদ্ধ তাহা নহে; ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মাদি দেবগণও সংসার-আবর্তে ঘূর্ণমান হইতেছে। সংসার অবিদ্যা-প্রসূত। যাহারা সংসারে বিচরণ করিতেছে তাহারা সকলেই অবিদ্যা-গ্রস্ত। এমন-কি মহাব্রহ্মাও অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পাবেন নাই। তিনিও নিত্য নিত্য বিবেক-বিহীন। তিনিও অনিত্য ও

অশাস্ত বস্তুকে নিত্য ও শাস্ত বস্তু বলিয়া মনে করেন (মজ্জিম ১৩২৭—৩২৮ ; সংযুক্ত ১১৪২ ইত্যাদি)। একমাত্র মুক্ত পুরুষই অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছেন।

পুরুষ কে ?

তাহা হইলে মুক্ত পুরুষও আছেন, অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষও আছে। বদ্ধ পুরুষও পুরুষ এবং মুক্ত পুরুষও পুরুষ।

এখানে প্রশ্ন তবে পুরুষ কে ? বুদ্ধের সমসাময়িক ধর্ম্মাচার্য্যগণ বলিতেন আত্মাই পুরুষ। এবিষয়ে বহু মত-ভেদ ছিল। দেহ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার প্রভৃতিকে বহু আচার্য্য আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গোতম দেহাদিকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

সংকায়-দৃষ্টি

সে-সময়ের একটি প্রচলিত মতকে গোতম “সংকায় দিট্ঠি” (= সংকায়-দৃষ্টি) নাম দিয়াছেন। সংকায় = সংকায় ‘সং’ অর্থে অস্তিত্ববান। ‘সংকায়’ অর্থাৎ দেহাদি সং। বৌদ্ধ-ধর্মে কায় বলিতে সাধারণতঃ রূপ (অর্থাৎ দেহ), বেদনা (ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ, স্বখ দুঃখ বেদনা, Sensation), সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই কয়েকটি বুঝায়। দেহ বিষয়ে সংকায়-দৃষ্টি এই—(১) দেহই আত্মা, (২) আত্মা দেহবান, (৩) আত্মাতে দেহ এবং (৪) দেহে আত্মা। দেহ বিষয়ে এই চারি প্রকার দৃষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটির প্রত্যেকটির বিষয়েই ঐ প্রকার দৃষ্টি, যথা (১) বিজ্ঞানই আত্মা, (২) আত্মা বিজ্ঞানবান, (৩) আত্মাতে বিজ্ঞান এবং (৪) বিজ্ঞান আত্মা।

রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ ; প্রত্যেকটিতে চারি প্রকার দৃষ্টি। স্বতরাং বিংশতি প্রকার সংকায়-দৃষ্টি হইতে পারে (পটি-সম্বিদা মগগ, ১১৪৩-১৫১)। গোতম এই মতকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন (মজ্জিম ৩১৭ ১৮ ; সংযুক্ত ১৫৮-১৫৯, ইত্যাদি)। তাহার মতে দেহাদির সহিত আত্মার মৌলিক কোন সম্বন্ধ নাই।

আত্মা ক্রি নহে

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই গোতম পাঁচ জন ভিক্ষুকে এবিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই :—

“হে ভিক্ষুগণ! দেহ আত্মা নহে। দেহ যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইত না। (ক) এবং তাহা হইলে দেহ বিষয়ে বলিতে পারিতাম ‘আমার দেহ এই প্রকার হউক, আমার দেহ এপ্রকার না হউক’। (খ) যেহেতু দেহ আত্মা নহে, সেইজন্ত দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং সেইজন্ত দেহ বিষয়ে বলিতে পারি না যে ‘দেহ এই প্রকার হউক, বা এই প্রকার না হউক’।”

ইহার পরে গোতম বেদনা (= স্বখ দুঃখাদি বেদনা), সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান বিষয়ে উক্ত প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া, উক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন।

ইহার পরে তিনি বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর—দেহ নিত্য না অনিত্য ?”

“হে ভদন্ত! অনিত্য।”

“যাহা অনিত্য, তাহা স্বখ না দুঃখ ?”

“হে ভদন্ত! দুঃখ।”

“যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরীতগামধর্ম্মা, তাহার বিষয়ে কি এই প্রকার বলা যায় যে, ‘ইহা আমার’, ‘আমি ইহা’, ‘ইহা আমার আত্মা ?” (গ)।

“হে ভদন্ত! না।”

ইহার পরে বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার এবং বিজ্ঞান-বিষয়েও উক্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়া উক্ত ভাষাতেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, এ সমুদায় আমার নহে, এ সমুদায় আমি নহি এবং এ সমুদায় আমার আত্মা নহে।

ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন—এ সমুদায় অতীতই হউক বা অনাগতই হউক বা বর্তমানই হউক, অধ্যাত্মই (অর্থাৎ অন্তরস্থ) হউক বা বহিঃস্থই হউক, বৃহৎই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক, হীনই হউক বা শ্রেষ্ঠই হউক, দূরস্থই হউক বা নিকটস্থই হউক—এ সমুদায়েব কোনটির বিষয়েই বলিতে পারি না—‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহা আমার আত্মা’।

বিনয়পিটক, মহাবগ্গ ১:৬৩৮—৪৫ ; সংযুক্তনিকায় ৩:৬৭, ৬৮ ইং সং)।

গোতম এস্থলে বলিলেন, দেহাদি পঞ্চস্কন্ধ আত্মা নহে।

দেহাদি আছে ইহা অপরেও স্বীকার করিত, গৌতমও স্বীকার করিতেন। পার্থক্য এই—অপরে বলিত, দেহাদি আত্মা; গৌতম বলিতেন, দেহাদি আত্মা নহে। ‘দেহ আমার আত্মা’—ইহার অর্থ এই যে, দেহই আমার বিশেষত্ব, দেহই আমার স্বরূপ, দেহ না থাকিলে আমি থাকিব না। বেদনা বিজ্ঞানাদি আমার আত্মা ইহার অর্থ এই সমুদায়ই আমার বিশেষত্ব, আমার স্বরূপ; এ সমুদায় না থাকিলে আমি থাকিব না। অপরে দেহ-বিজ্ঞানাদিকে পুরুষের বিশেষত্ব এবং স্বরূপ বলিয়া মনে করিত, কিন্তু গৌতম তাহা মনে করিতেন না। সাধারণ মতের সহিত গৌতমের মতের পার্থক্য এই হলে।

আত্মা নিত্য

কোন কোন পণ্ডিত বলিতেছেন যে, উদ্ধৃত অংশে গৌতম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এ কথা যে কোথায় আছে, আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, গৌতম এস্থলে আত্মার নিত্যত্ব, অবিকারিত্ব ও স্থায়িত্বই ঘোষণা করিয়াছেন।

আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। উদ্ধৃত স্থলে আমরা তিনটি অংশকে (ক), (খ), (গ), দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি। দেহ বেদনাদি কোন আত্মা নহে—এ সমুদায়স্থলে তাহাবই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি যুক্তি নিম্নে সরল ভাষায় ব্যক্ত হইল।

(ক) যাহা ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে তাহা আত্মা নহে।

(খ) যাহার উপরে আমার পূর্ণ দত্ত্ব নাই, তাহা আমার আত্মা নহে।

(গ) যাহা অনিত্য, দুঃখময় এবং পরিবর্তনশীল তাহা আত্মা নহে।

গৌতম যখন বলিলেন, ব্যাধিগ্রস্ত বস্তু আত্মা হইতে পারে না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আত্মা ব্যাধির অতীত। যখন বলা হইল যাহার উপরে আমার কর্তৃত্ব নাই, তাহা আমার আত্মা নহে, তখনই বুঝিতে হইবে আমার আত্মা আমার সম্পূর্ণ অধীন। আর যখন

বলা হইল অনিত্য, দুঃখময়, এবং পরিবর্তনশীল বস্তু আত্মা নহে, তখনই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, আত্মা নিত্য, স্থায়ী এবং অবিকারী।

গৌতম যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অল্প প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার উপায় নাই। গৌতম আত্মা স্বীকার করিতেন এবং এই আত্মা স্বাধীন, নিত্য, নির্বিকার এবং স্থায়ী স্বরূপ।

অপর দিক হইতে বিচার করা যাউক। কল্পনা কর একব্যক্তি গৌতমকে এইপ্রকার প্রশ্ন করিল :—

“ভগবন্! এই সংসারে যদি এমন একটি বস্তু পাওয়া যায় যাহা ব্যাধির অতীত, যাহার উপর আমার পূর্ণ কর্তৃত্ব, যাহা নিত্য, স্থায়ী এবং অবিকারী—সেই বস্তুকে কি আমি আমার আত্মা বলিতে পারি?”

গৌতম নিশ্চয়ই বলিবেন, “ইহা নিশ্চয়ই তোমার আত্মা।”

কিন্তু আমরা বাস করিতেছি সংসারে; সংসারে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই অনিত্য এবং বিস্তারী। সুতরাং গৌতমকে কেহই ঐ নিত্য বস্তু দেখাইয়া দিতে পারিত না।

অনিত্য সংসারে নিত্য বস্তু দেখান যায় না; ইহাতেই কি বলিতে হইবে নিত্য বস্তুই নাই? সাধারণতঃ শ্বেত ভল্লুক নাই, ইহাতেই কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে শ্বেত ভল্লুক বলিয়া কোন প্রাণীই নাই? সাধারণতঃ শ্বেত ভল্লুক না থাকিতে পারে কিন্তু অস্তিত্ব আছে। এইরূপ অনিত্য সংসারে নিত্য বস্তু দৃষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু নিত্য জগতে নিত্য বস্তু থাকিতে পারে।

গৌতম কখন বলেন নাই যে, নিত্য জগৎ নাই বা নিত্য জগতে ঐ প্রকার নিত্য আত্মা নাই। যখনই তাঁহার নিকট আত্মার বিষয় প্রশ্ন উঠিত, তখন দেহাদিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ প্রশ্ন উঠিত, এবং গৌতম দেহাদি বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মতত্ত্ব ও অনাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, দেহাদি আত্মা নহে এবং কোন কোন স্থলে এপ্রকারও বলিয়াছেন যে, এই বাহ্য জগৎও আমার আত্মা

নহে। এই সমুদায় আলোচনার মধ্যে যদি ‘আত্মা নাই’ এই প্রকার কোন অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং কেহ যদি সমগ্র আলোচনা হইতে ঐ অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া জনসমাজকে প্রদর্শন করেন এবং বলেন—এই যে গৌতম বলিতেছেন—‘আত্মা নাই’—ইহার উত্তরে আমরা বলিব দেহাদিতে আত্মা নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়াই গৌতম ঐ স্থলে বলিয়াছেন—‘আত্মা নাই’। ‘নিত্য আত্মা অসং’ এই প্রকারের কোন কথা কোন স্থলে তিনি বলেন নাই।

আর যদি ইহাও কল্পনা করা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র ভাবেও কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, ‘আত্মা নাই’ তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, পরিবর্তনশীল সংসারে ‘আত্মা নাই’ অর্থাৎ এই সংসারে এমন বস্তু দেখান যায় না যাহা নিত্য, স্থায়ী এবং যাহা আমার সম্পূর্ণ অধীন।

আত্মা আছে

গৌতম এক সময়ে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! যাহা তোমাদের নয়, তাহা বর্জন কর; তাহা বর্জন করিলে চিরকাল তোমাদের হিত ও সুখ হইবে।”

কি তোমাদের নয়?

হে ভিক্ষুগণ! দেহ তোমাদের নয়, ইহা বর্জন কর; ইহা বর্জন করিলে চিরকাল তোমাদের হিত ও কল্যাণ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার... বিজ্ঞান তোমাদের নয়, ইহা ত্যাগ কর; চিরকাল তোমাদের হিত ও কল্যাণ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! যদি কেহ এই ক্ষেত্রে তুণ কাষ্ঠ শাখা গলাল-সমূহ সংগ্রহ করিয়া দগ্ধ করে বা সে সমুদায় লইয়া যাহা ইচ্ছা করে, তোমরা কি বলিবে এই ব্যক্তি আমাদের সংগ্রহ করিতেছে, দগ্ধ করিতেছে এবং আমাদের লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতেছে?”

ভিক্ষুগণ বলিল, “হে ভদ্র! না।”

“কি ক্ষুদ্র নয়?”

“কারণ এ সমুদায় আমাদের আত্মাও নয়, আত্মকীয়ও নয়।”

“সুতরাং হে ভিক্ষুগণ! দেহ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান বর্জন কর, এসমুদায় তোমাদের নহে। এসমুদায় বর্জন করিলে তোমাদের হিত ও সুখ হইবে।” (মজ্জিম ১।১৪০-১৪১; সংযুক্ত ৩.৩৩-৩৪। সংযুক্ত ৪।৮১-৮২ অংশে আরও বিস্তৃত)।

এস্থলে বলা হইতেছে যে, দেহ বেদনাদি আত্মাও নহে, আত্মকীয়ও নহে। এ সমুদায়কে বর্জন করিতে হইবে। যখন বলা হইল এ সমুদায় বর্জন করিলে চিরকাল হিত ও সুখ হইবে, তখন বুঝিতে হইবে এ সমুদায় বর্জন করিলেও পুরুষ বর্তমান থাকে।

তুণ-কাষ্ঠের উপমাটির প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যিক।

তুণ-কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করিলে আমাদের দগ্ধ করা হয় না। কারণ তুণ-কাষ্ঠাদি আমি নহি। তুণ-কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করিবার পরেও আমি বর্তমান থাকিব। গৌতম বলিতেছেন, দেহাদির সঙ্গেও আমার এই প্রকার সম্বন্ধ। যদি দেহাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তথাপি আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব না, দেহাদি ধ্বংস হইবার পরেও আমি বর্তমান থাকিব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—আমি দেহবিজ্ঞানাদির অতিরিক্ত বিচ্ছিন্ন। দেহবিজ্ঞানাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও যাহা বর্তমান থাকে, তাহাই আমি। অর্থাৎ আমরা যাহাকে আত্মা বলি আমি সেই আত্মা। গৌতম আত্ম-বাদী। অথচ দেহাদিকে অনাত্ম বস্তু বলিয়া বর্ণনা করাতেই জগতে উচ্চা পড়িয়া গিয়াছিল—“গৌতম আত্মা মানে না।”

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এখন Mrs. Rhys Davids (মিসেস রিস ডেভিড্‌স্) মনে করেন পূর্বোক্ত অংশ দ্বারা আত্ম-বাদই সমর্থিত হয়। এক সময়ে তিনি অন্ধরূপ মনে করিতেন। পূর্বমত বিষয়ে এখন বলিতেছেন, “I was very blind” অর্থাৎ “আমি অতি অন্ধ ছিলাম (Buddhist Psychology : Supplementary Essays, পৃঃ ২০৪, পাদটীকা; ১৯২৪ সংস্করণ)।

অহং এবং অশ্মি

গৌতমের ধর্মে ‘অহং’ এবং ‘অশ্মি’ এতদ্ব্যয়ে পার্থক্য করা হইয়াছে।

অহং—আমি;

অশ্মি—আমি আছি; আমি হই (এই প্রকার)।

জ্ঞান এবং আত্ম-জ্ঞান এই দুই এক নহে। পাশ্চাত্য দর্শনেও Consciousness এবং Self-consciousness এ পার্থক্য করা হইয়াছে। জ্ঞান বলিলেই যে আত্ম-জ্ঞান বুঝিতে হইবে তাহা নহে। জ্ঞানে আত্ম-ভাব নাই। এইরূপ অহং বলিলে বুঝিতে হইবে কেবল ‘আমি’; ইহার মধ্যে ‘আমি আছি’ কিংবা ‘আমি এইপ্রকার’ এ প্রকার ভাব নাই। ‘অশ্মি’ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে আত্ম-জ্ঞান আছে। ‘অশ্মি’তে জ্ঞাতৃত্ব-ভাব বর্তমান, কিন্তু ‘অহং’এ জ্ঞাতৃত্ব-ভাব নাই। অহং = বিশুদ্ধ ‘আমি’, ‘নির্গুণ আমি’, ‘আত্ম-জ্ঞান-বিরহিত আমি’; ‘অশ্মি’র স্তরে আত্ম-জ্ঞান প্রকাশিত। যখন ‘অহং’ বুঝিতে পারে যে ‘আমি আছি’ বা ‘আমি এই প্রকার’ তখনই ‘অহং’ ‘অশ্মি’তে পরিণত হয়।

এই বিষয়ে এক সময়ে খেমক নামক ভিক্ষুর সহিত অপরাপর ভিক্ষুর আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে খেমক বুদ্ধের অহুশাসনই (ভগবতো সাসনং) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে অনূদিত হইল। অনেক স্থলে ‘অহং’ এবং ‘অশ্মি’ অনূদিত হয় নাই।

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘আয়ুস্মান্ খেমক কি মনে করেন যে রূপাদি পঞ্চ উপাদান স্বচ্ছই আত্মা বা আত্মকীয়?’

খেমক। আমি এ সমুদায়কে আত্মা বা আত্মকীয় মনে করি না।

ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন—“আমি এই পঞ্চ উপাদান-স্বক্ষে অশ্মি ভাব উপলব্ধি করিয়াছি; কিন্তু আমি মনে করি না যে ‘অশ্মি’ এবং ‘অহং’ এক।

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই যে ‘অশ্মি’, ইহা কি? রূপই কি এই ‘অশ্মি’ কিংবা এই ‘অশ্মি’ রূপ হইতে ভিন্ন?”

এই বিষয়ে এক সময়ে ভিক্ষুগণের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল।

ইহার পরে পঞ্চস্বক্ষের অবশিষ্ট চারিটি স্বক্ষের বিষয়েও ঠিক ঐ ভাবেই প্রশ্ন হইয়াছিল। নিম্নে চারিটি পৃথক পৃথক প্রশ্নকে একসঙ্গে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

ভিক্ষুগণ বলিলেন—

এই যে ‘অশ্মি’ ইহা কি বেদনা, না সংজ্ঞা, না সংস্কার, না বিজ্ঞান; কিংবা ইহা ইহার প্রত্যেকটি হইতেই পৃথক?

খেমক বলিলেন—না, কোনটিই নয়, পৃথকও নহে।

ইহার পরে খেমক ভিক্ষুগণকে এই প্রশ্ন করিলেন।

উৎপল বা পদ্ম বা পুণ্ডরীকের গন্ধ বিষয়ে কি বলা যায় যে, ইহাদিগের পত্রই গন্ধ বা বর্ণই গন্ধ বা রসই গন্ধ?

ভি। না, এ প্রশ্নের বঙ্গা যায় না।

খে। তবে কি বলিলে ইহাকে সম্যক ব্যক্ত করা যায়?

ভি। ইহা পুষ্পের গন্ধ এই প্রকার বলিলেই ইহা সম্যক ব্যক্ত করা যায়।

ইহার পরে খেমক বলিলেন—

“এই প্রকার আমিও বলি না যে রূপই ‘অশ্মি’; কিংবা ‘অশ্মি’ রূপ হইতে পৃথক। ইহাও বলি না যে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ইহার প্রত্যেকটিই ‘অশ্মি’; কিংবা প্রত্যেকটিই ‘অশ্মি’ হইতে পৃথক।

সমগ্র পঞ্চ উপাদানস্বক্ষে এই ‘অশ্মি’ ভাব পাইতেছি; কিন্তু আমি মনে করি না যে, ‘অশ্মি’ এবং ‘অহং’ এক (পঞ্চ উপাদানস্বক্ষে অশ্মীতি অধিগতং; অয়ং অহং অশ্মীতি চ ন সমুপাস্মামি) সংযুক্ত ৩।১২৯—১৩০।

এ স্থলে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হইল—

(১) দেহ বেদনাদি পঞ্চ উপাদান স্বক্ষ।

(২) ‘অশ্মি’।

(৩) অহং।

দেহাদি হইতে ‘অশ্মি’ ভাব উৎপন্ন হয় কিন্তু ‘অহং’ এবং ‘অশ্মি’ এক নহে।

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক

‘অহং’ এবং ‘অম্মি’—এতদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখান হইল—ইহার মধ্যে গভীর দার্শনিকত্ব লুকাইয়া রহিয়াছে। এখানে আমরা বেদান্তের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। ‘অহং’ অর্থ ‘আমি’ ‘বিশুদ্ধ আমি’। ‘অম্মি’র মধ্যে ‘আমি আছি’ বা ‘আমি হই এই প্রকার’ এইরূপ জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে।

বেদান্তের ভাষায় অহং পারমার্থিক আত্মা; এবং ‘অম্মি’ মূলক আমি ব্যবহারিক আত্মা।

পারমার্থিক আত্মা অব্যবহার্য্য, ইহা দেশ-কালের অতীত; সুতরাং ইহাতে কোন পরিবর্তন নাই। কিন্তু ব্যবহারিক আত্মা কালের অধীন, সুতরাং ইহা পরিবর্তনশীল। পারমার্থিক আত্মা স্বরূপে অবস্থিত; কিন্তু ব্যবহারিক আত্মা অবিদ্যা-প্রসূত।

এই সমুদায় স্থলে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই—এবং এই প্রকার আলোচনায় গোতম ‘আত্মা’ শব্দ ব্যবহারও করেন নাই। বেদান্তের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়াই আমরা ‘আত্মা’ শব্দ ব্যবহার করিলাম। ভাষা যাহাই হউক না কেন কথাটা এই—‘অহং’ অপরিবর্তনীয় সত্তা—সমুদায় পরিবর্তনের মধ্যে ইহা অবিকারীরূপে বর্তমান। আর ‘অম্মি’ ভাব পঞ্চকল্পমুগক; ইহার উৎপত্তি আছে, পরিবর্তন আছে এবং বিনাশও আছে।

‘অহং’ নিত্য এবং পরিবর্তন-রহিত; আর ‘অম্মি’ ভাব পরিবর্তনশীল। ‘অহং’ এও ‘আমি’ এবং ‘অম্মি’তেও আমি। অপরিবর্তনশীল ‘অহং’ হইতে কি প্রকারে পরিবর্তনশীল ‘অম্মি’ এর উদ্ভব হইল—তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

অবিদ্যা

অদ্বৈত বেদান্তের মতে অজগৎ অবিদ্যামূলক এবং আমরা যাহাকে ব্যবহারিক আত্মা বলি তাহাও অবিদ্যা-প্রসূত। গোতমও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন; তবে তিনি সব সময়ে বেদান্তের ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উৎপত্তি বিষয়ে গোতম একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—সেটি পটচ্চ-সমুদায়; ইহার সংস্কৃত

প্রতিশব্দ ‘প্রতীত্য-সমুৎপাদ’। কি প্রকারে বিজ্ঞানাদির উৎপত্তি হয়, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। উৎপত্তিব্রহ্ম এই :—

(১) প্রথমে	অবিদ্যা—
(২) ইহা হইতে	সংস্কার,
(৩) „	বিজ্ঞান,
(৪) „	নাম-রূপ,
(৫) „	ষড়্ভূতন,
(৬) „	স্পর্শ
(৭) „	বেদনা,
(৮) „	তৃষ্ণা,
(৯) „	উপাদান,
(১০) „	ভব,
(১১) „	জন্ম,
(১২) „	জরা-মরণাদি।

এখানে উৎপত্তিবাদের ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। কেবল এই মাত্র জানা আবশ্যক যে, মানবজীবনের মূলে অবিদ্যা। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন হয়। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই—গোতম বাহাকে ‘অহং’ বা ‘আমি’ বলেন, তাহা প্রতীত্য-সমুৎপাদের বাহিরে।

সাংখ্য-দর্শনের মতে সমুদায় উৎপত্তির মূলে ‘প্রকৃতি’। এই প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্రిয়াদির উৎপত্তি। সাংখ্যের পুরুষ এসমুদায়ের বাহিরে।

সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত-দর্শনের উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উভয় দর্শনের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষ বহু এবং বেদান্তের আত্মা এক। বহু বৈদান্তিক সাংখ্যের বহু পুরুষের স্থলে এক আত্মা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি-তত্ত্বকে বৈদান্তিক মতে পরিণত করিয়াছেন। বেদান্তে প্রকৃতির বহু নাম; সর্বজনবিদিত নাম অবিজ্ঞা। বেদান্তের আত্মা অবিজ্ঞার বাহিরে।

এখন গোতমের মত, সাংখ্য-মত এবং বেদান্ত-মত—এই কয়েকটি মতের সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে।

(১) গোতমের প্রতীত্য-সমুৎপাদ, সাংখ্যের প্রকৃতির বিকার এবং বেদান্তের অবিন্যাস বিবর্ত একই শ্রেণীর।

(২) গোতমের ‘অহং’ বা ‘আমি’, সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের আত্মা—একই শ্রেণীর। এই তিনটিই নিত্য ও অবিকারী এবং বিকার বিবর্তাদির বাহিরে।

অমীমাংসিত তত্ত্ব

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, তিন মতেই একদিকে পরিবর্তন প্রবাহ; অপর দিকে অবিকারী নিত্যবস্তু। এস্থলে প্রশ্ন এই:—সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং অবিকারী; তখন সে কেন প্রকৃতিতে জড়িত হইয়া সংসারদশা প্রাপ্ত হয়? বেদান্তের আত্মা এক নিত্য, নিষ্ক্রিয় এবং অবিকারী। এই আত্মাই বা কি প্রকারে অবিন্যাস বশবর্তী নানাপ্রকার সংসারগতি লাভ করে? এ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের কোন প্রকার সম্ভাবনায়ক উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং কখন পাওয়াও যাইবে না। যদি আমরা কল্পনা করিয়া লই যে, একটি বস্তু নিত্যই অবিকারী, কোন প্রকার যুক্তি দ্বারাই এই অবিকারীর বিকারত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না। এ সমস্যা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই।

গোতমও ইহার কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম একদিকে নিত্য অবিকারী ‘অহং’ বা ‘আত্মা’; অপর দিকে অবিন্যাসমূলক পঞ্চকন্ড। এই দুইয়ের সংযোগে কি প্রকারে ‘অস্মি’ ভাব উৎপন্ন হইল? আর এই দুইয়ের সংযোগই বা কি প্রকারে সম্ভব?

‘অনমত্তগং’ প্রকরণে (সংযুক্ত ২।১৭৮—১২৩) গোতম বলিয়াছেন যে, এই সংসার অনাদি; ইহার আরম্ভ কল্পনা করা অসম্ভব। তিনি বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, মানব-জীবনের আরম্ভ নাই। স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিকারী ‘অহং’এর ‘অস্মি’ ভাব-প্রাপ্তি তর্কগম্য নহে; অনাদিকাল হইতে ‘অহং’এর এই ‘অস্মি’ ভাব চলিয়া আসিতেছে। আমরা ‘অস্মি’ ভাবমূলক পুরুষকে দেখিতেছি এবং সাধারণ ভাবে ইহার প্রকৃতিও জানিতেছি। কিন্তু ‘অহং’ বস্তুটি কি? এইমাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, ইহাই পুরুষের স্ব-রূপ। মুক্তপুরুষ স্ব-রূপে

অবস্থিত। কিন্তু স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেব-মানব সকলেরই দৃষ্টির অতীত।

মুক্ত পুরুষ দৃষ্টির অগোচর

মাহুষ দেহ, বেদনা, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া সংসারে বাস করে এবং মনে করে দেহ বেদনা বিজ্ঞানাদিই আমি, দেহবিজ্ঞানাদি আমার এবং এই সমুদায়ই আমার আত্মা। গোতম বলেন, এই বিশ্বাস অজ্ঞানতা-প্রসূত—মানবের সংসারাবস্থা অবিন্যাস-মূলক। এই সংসারাবস্থা জীবকে দেখিয়া মানবের পারমার্থিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন যাহারা দেহ-বিজ্ঞানাদিকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা ইহজীবনেই সম্যক দর্শন করেন, সম্যক অমুভব করেন যে, দেহাদি আমি নহি, দেহাদি আমার, নহে এবং দেহাদি আমার আত্মা নহে। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ অমুভব করিয়া তাঁহারা অনাসক্তভাবে সংসারে বাস করেন। ইহারাই মুক্তপুরুষ, ইহারাই তথাগত।

দেহাদির কার্য দেখিয়াই মাহুষ মাহুষের বিচার করে। কিন্তু মাহুষ দেহাদিকে অতিক্রম করে, তখন দেহাদির কার্য দেখিয়া তাহাকে কি প্রকারে বিচার করিবে, তাহাকে কি প্রকারে দেখিবে, কি প্রকারে তাহাকে অমুভব করিবে? এ প্রকার মাহুষ মানব-জ্ঞানের অগোচর। গোতম বলেন, দেবগণও এপ্রকার পুরুষের সন্ধান পান না।

যমককে সন্ধান করিয়া গোতম বলিয়াছিলেন,

“এই দৃষ্ট পৃথিবীতেই প্রকৃতপক্ষে সত্যসত্যই মুক্ত পুরুষকে উপলব্ধি করা যায় না” (সংযুক্ত ৩।১১২ পৃঃ)।

অমুরাধ নামক ভিক্ষুকেও তিনি ঐ কথাই বলিয়াছিলেন (সংযুক্ত ৩।১১৮; ৪।৩৮২ পৃঃ)।

উদান নামক গ্রন্থে গোতমের এই উক্তিটি পাওয়া যায়:—

“যাহার অন্তরে কোপ নাই, যিনি জন্ম-জন্মান্তর অতিক্রম করিয়াছেন। যিনি বিগতভয়, সুখী এবং অশোক, তিনি দেবগণেরও দৃষ্টির গোচর হয়েন না” (উদান ২।১০)।

মুক্ত পুরুষের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গৌতম একস্থানে এইপ্রকার বলিতেছেন :—

“ইহু, ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও অপর সমুদায় দেবগণ অব্বেষণ করিয়া বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু ব সন্ধান পান না, (অর্থাৎ এপ্রকার সন্ধান পান না) যে মুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান (এই বিশেষ বস্তুকে) * আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এ প্রকার কেন? হে ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই দৃষ্ট পৃথিবীতেই মুক্ত পুরুষ জ্ঞান-গোচর নহেন।” (মজ্জিম ১১৪০; অলগদ্ব দূপম সূত্র)।

পুরুষ যতক্ষণ দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণই জ্ঞান-গোচর হয়। মুক্ত পুরুষ অনাশ্রিত, তিনি দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন না; এইজন্ত তাঁহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। তিনি দেবগণের দৃষ্টিরও অগোচর।

মজ্জিমনিকায় হইতে গৌতমের যে উক্তি উদ্ধৃত হইল—ঠিক উহার পরই গৌতম বলিতেছেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি এই প্রকার বলি, এই প্রকার ব্যাখ্যা করি; কিন্তু তবুও কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মুষা ও অসত্য বাক্যে অন্ত্রায়রূপে এই দোষারোপ করে যে ‘শ্রমণ গৌতম বিনায়ক (অর্থাৎ বিনাশক); তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ বি-ভব (অর্থাৎ অনস্তিত্ব) প্রচার করেন’। হে ভিক্ষুগণ! আমি যাহা নহি, আমি যাহা বলি না সেই বিষয়ে এই সমুদায় ভদ্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসৎ, তুচ্ছ, মুষা ও অতুত বাক্যে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে, শ্রমণ গৌতম

বিনায়ক, তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন” (মজ্জিম ১১৪০ পৃঃ)।

প্রকৃতপক্ষে গৌতম ‘বিনায়ক’ নহেন; তিনি যে কেবল ব্যবহারিক আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, তিনি দেশকালাতীত পারমার্থিক আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন। দেশকালাতীত বলিয়া আত্মার স্বরূপ দৃষ্টির অগোচর। ইহার বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে বেদান্তের ভাষায় কেবল বলা যায় ‘নেতি’, ‘নেতি’ ইহা নয়, ইহা নয়।

উপসংহার

আলোচনা করিয়া আমরা গৌতমের মত বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম :—

(১) আত্মা-নিত্য, নির্বিকার ও স্থায়্যরূপ। ইহা বেদান্তেরও মত।

(২) সংসার-অবিদ্যা-মূলক। সামসারিক পুরুষ অবিদ্যা-গ্রস্ত। কি প্রকারে নিত্য নির্বিকার আত্মা বিকার-গ্রস্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে। তাহা মীমাংসা করা যায় না। বেদান্তেরও এই মত।

(৩) অবিদ্যা-গ্রস্ত পুরুষ কেবল বিজ্ঞান-প্রবাহ নহে; ইহা নিত্য আত্মারই ব্যবহারিক রূপ।

(৪) মুক্ত আত্মা দেশ কালের অতীত। দেশ কাল-মূলক ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দেশকালাতীত বস্তুকে জ্ঞান যায় না। এইজন্ত মুক্ত আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

সুতরাং বৈদান্তিকগণের ভ্রায় গৌতমও আত্মবাদী। গৌতম আপনাকে আত্মবাদী বলেন নাই; কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমরা আত্মবাদী বলিতে পারি।

* আমরা পূর্বে (প্রবাসী, ১৩৩২ চৈত্র, পৃ ৮৬৩) শিলাচাঁরের অনুসরণ করিয়া অন্ত প্রকার পদবিভাগ করিয়াছিলাম। অন্তকার পদবিভাগ অধিকতর মুক্তিযুক্ত।

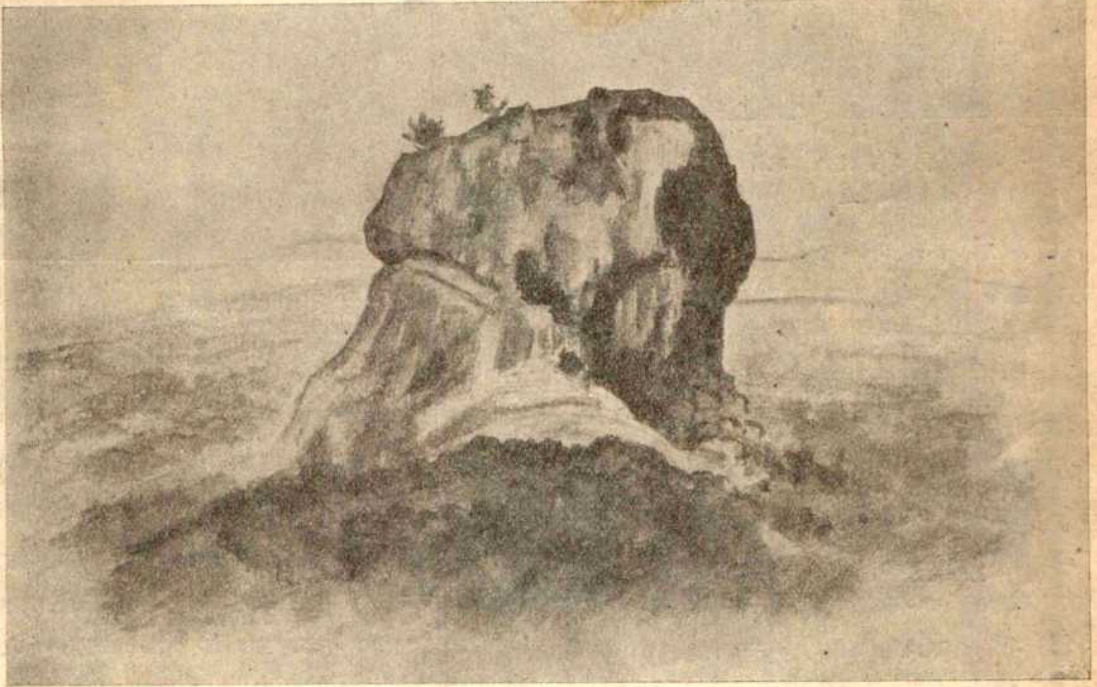
সিংহলের প্রাচীন চিত্রকলা

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের সভ্যতা ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হ'য়ে বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধধর্মের বিরাট বোধিজ্ঞান-তলে ভারতীয় শিল্পকলা বেড়ে উঠেছিল। ভারতের পরিচয় সিংহলের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে চিত্রে পরিস্ফুট। সিংহলের রাজারা বিহার, স্তূপ নির্মাণ করা এবং মন্দিরের দেওয়াল এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত— বৌদ্ধচিত্রে ভ'রে ফেলা পুণ্যকার্য্য মনে কর্ত।

এবং চেষ্টার নিয়োগ কর্তে হ'ত না, তাই তারা তাদের আবেষ্টনকে এমন কি দৈনিক ব্যবহারের নগণ্য তৈজস-পত্রকেও সৌন্দর্য্যে ভ'রে তুলতে পেরেছিল।

এই প্রবন্ধে সিংহলের বৌদ্ধবিহারের চিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি। সিংহলের চিত্রকলাকে মোটামুটি তিন যুগে ভাগ ক'রে ফেলা যেতে পারে।



সিগিরিয়া শৈলের দৃশ্য (দূর হইতে)

সিংহলের প্রাচীনকালের সামাজিক শ্রেণীবিভাগে শিল্পী এবং কারুদেব একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল। ভরণ-পোষণের জন্ত তারা রাজার নিকট হ'তে বিনা-করে জমি ভোগ কর্ত; কিন্তু রাজার আস্থানে যখন কাজ কর্ত তখন বিনাপরিশ্রমে কাজ কর্তে হ'ত। তখন লোকদের অবসর ছিল অনেক। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত সকল শক্তি

১ম যুগের চিত্র—৭ম শতাব্দীর সিগিরিয়ার ফ্রেস্কো চিত্র।

২য় যুগের চিত্র—পোলানাকরয়াতে ডেমল মহাসেদ্বার ১২শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্র।

৩য় যুগের চিত্র—১৮শ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরের চিত্রাবলী।



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

এটা উল্লেখ করা দরকার, যে, প্রথম দুই যুগের চিত্রকে ফ্রেস্কো চিত্র ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে ; কিন্তু শেষ যুগের চিত্রকে ফ্রেস্কো ব'লে উল্লেখ করা হয়নি। এর কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ফ্রেস্কো চিত্র সাধারণ চিত্র থেকে পৃথক জিনিষ। অঙ্কণ ও বাগের চিত্রাবলী ফ্রেস্কো চিত্রের উত্তম উদাহরণ। ইটালীতে চার্চের প্রাচীন খৃষ্টীয় চিত্রসকল ফ্রেস্কো চিত্র। ফ্রেস্কো চিত্র এমন কোনো প্রথায় আঁকা, যাতে রংটা স্থায়ী হয়। রোদ বৃষ্টিতে বহুশত বৎসর খোলা থাকলেও ছবি সহজে নষ্ট হয় না। ফ্রেস্কো চিত্রে দেওয়ালে প্রথম একটা আস্তর দেওয়া হয়। এই আস্তরের বিশেষ একটা গুণ এই, যে, রংটা এর ভিতর ব'সে যায় তাতে রং সহজে চ'লে যায় না। ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী মধ্যযুগের সিংহলী শিল্পগ্রন্থে (Mediaeval Sinhalese art) এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ফ্রেস্কোচিত্রের টেকনিক বা কারিগরির বর্ণনা এই বইতে পাওয়া যাবে। অল্প চিত্র খালি দেওয়ালের উপর আঁকা। দেওয়ালে লেগে থাকার জন্য রংয়ের সঙ্গে আঠা দেওয়া হয়। গঁদ, তেঁতুলবিচি,

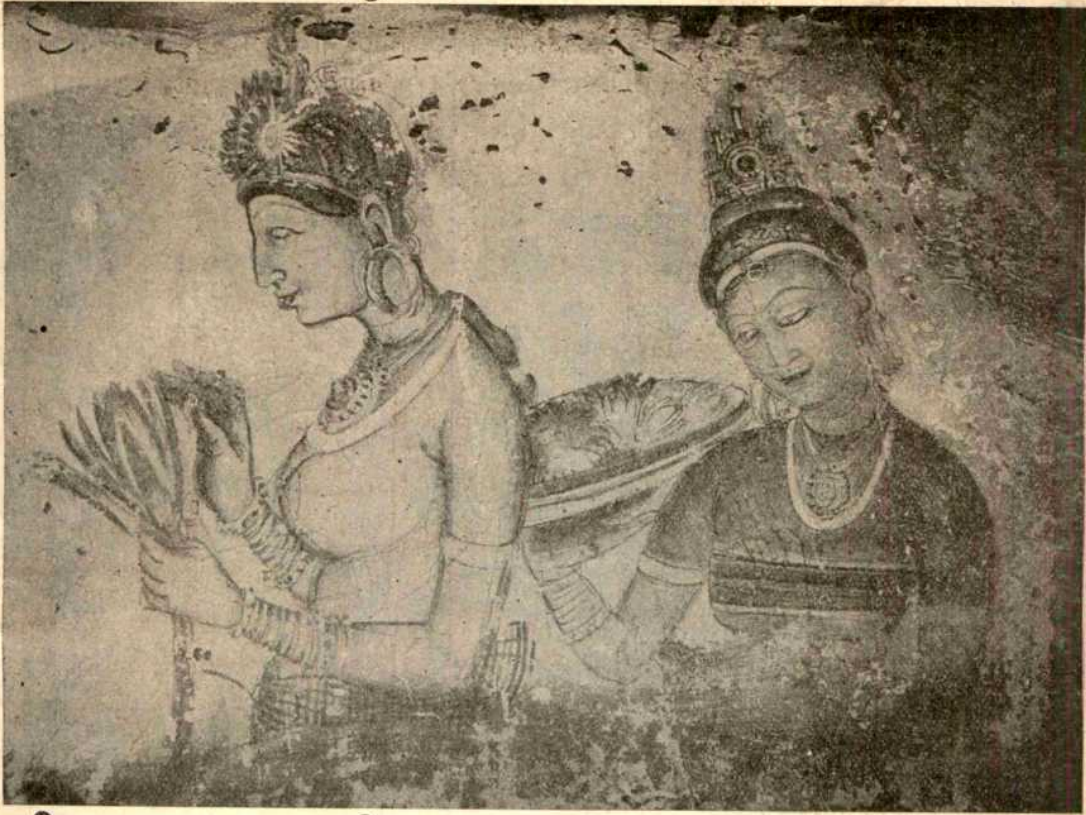


সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

শিরিষ, ভাতের মাড় ইত্যাদি আঠা রংয়ের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সিংহলে ভাতের মাড় ব্যবহার করা হয়। এই চিত্র ফ্রেস্কোচিত্রের স্থায় স্থায়ী হয় না, এবং বৃষ্টির জল লাগলে উঠে যায়।

সিংহলের অল্প সকল চিত্র থেকে সিগিরিয়ার চিত্রই বেশী পুরাতন, এবং বেশী বিখ্যাত। সিগিরিয়া বা সিংহ-গিরি, নাম থেকেই বোঝা যায় সিগিরিয়া শৈলের ইটের তৈরী মস্ত বড় একটা সিংহের মূর্তির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে। সিংহের মূর্তি পূর্বে কিরূপ ছিল এখন কল্পনা করতে পারি না, কারণ প্রকাণ্ড দুই থাণ্ডা ছাড়া অল্প অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেছে।

রাজা কাশ্যপ তার পিতা ধাতু সেনকে নির্দ্বয়ভাবে হত্যা করে। সে ভাইয়ের প্রতিশোধ এড়াবার জন্য সিগিরিয়া শৈলের উপর একটি দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করে। এই শৈল-দুর্গ থেকে কাশ্যপ ১৮ বৎসর চারদিকের প্রদেশের উপর



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর কটো। (৭ম শতাব্দী)*

রাজত্ব করে। কিন্তু অবশেষে তাকে শত্রুসৈন্যের সামনে
যেতে হয়েছিল। তার ভাই বিপুল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ
করে। কাশ্যপ যখন দেখল পরাজয় নিশ্চিত, তখন শত্রুর
হাত হ'তে নিষ্ঠুর মৃত্যু এড়াবার জন্য নিজের গলা কেটে
ফেলে আত্মহত্যা করে। সিগিরিয়ার ইতিহাস রহস্যে
পূর্ণ।

সিগিরিয়া পাহাড়ের উপরিভাগ একেবারে সমতল।
পুরাতন অট্টালিকা এখন আর নাই, কেবল তার ভিত্তি-
মাত্র অবশিষ্ট আছে। কষ্টিপাথরের দুইটি সিংহাসন
আছে। এখানে রাজা সভাসদদের নিয়ে বসতেন এবং
প্রার্থীদের দর্শন মঞ্জুর করতেন। রাজার জীবিতকালে
কর্মচারী প্রহরী সৈন্য শিল্পী প্রভৃতিদের আনাগোনা
যায়গাটি নিশ্চয়ই খুব কোলাহল-মুখর ছিল, কিন্তু এখন
সব নিস্তব্ধ। রাজবৈভবের মহিমা চিরকালের জন্য লোপ

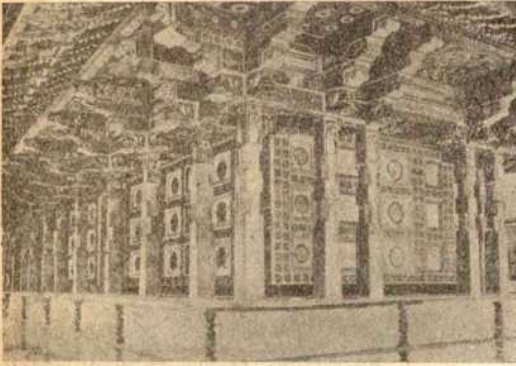
পেয়েছে, কিন্তু চতুর্দিকে নিসর্গের বিচিত্র বর্ণ-ব্যঞ্জনায়,
পাখীর স্রমধুর সঙ্গীতে প্রকৃতির উৎসব নিত্য অবিরাম
চলেছে।

সিগিরিয়া জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ ৮০০ শত
ফুট ঝাড়া উঠে গেছে। পাহাড়ের উপর থেকে দৃশ্য
অতিশয় মনোরম দেখায়। সবুজ বনের ঢেউ দিগন্তে
মিশে গেছে। নির্জন প্রান্তরে সিগিরিয়া একা জেগে
আছে।

কুমারসম্ভবে কালিদাস দেবতাত্মা হিমালয়কে অমর
করেছেন। কত কবির লেখনী কত চিত্রকরের তুলি
জাপানের ফুজিকে ধন্য করেছে। সিগিরিয়ার মহিমা
কীর্তন করতে কি কোন কবি নেই? একবারের জন্য
চোখে পড়লেও এর মাধুর্য ভোলা যায় না। ভোর
বেলায় দূর থেকে একে দেখলাম, ডাঙুল পাহাড়ে ঠঠবার

* সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ছবিগুলি সিংহলের আর্ট ইনস্টিটিউটের মিঃ সি, এফ, উইন্সরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সময়। ঐক ভীমকান্ত ছবি। দিক্চক্রবালে কুয়াশা-ঢাকা নীল ছায়া। শিবের ঘন ধ্যানী মূর্তি। সন্ধ্যায় রেস্ট হাউসের বারান্দায় ব'সে দেখছিলাম। রেস্ট হাউস পাহাড়ের তলা থেকে আধ মাইল দূরে। নীল আকাশের পটের উপর সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত সিগিরিয়া। মাঝে মাঝে শ্বেতলা-ধরা শিলা, তারি উপর সূর্য্যাস্তের দীপ্তি প্রতিহত হ'য়ে বলসিত হচ্ছিল। শিলার উপর যে লাল আভা, তা বদলে হ'ল কমলা রং, আর কমলা হ'ল



কাণ্ডির দালনা মালিগাওয়া বা দস্ত বিহারের স্তম্ভের সারি এবং চিত্রাবলী

৩য় যুগের চিত্র অথবা ১৮শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের চিত্র

বেগুনী, বেগুনী হ'ল পরে নীল। অবশেষে অন্ধকারে গেল ডুবে আলোকের খেলা। অন্ধকার ঘনিষে যখন রাত এল, কালো আকাশে রূপালী ছড়িয়ে দিল দেখা ক্ষীণ চন্দ্রকলা। সিগিরিয়ার কালো সিলউয়েট মূর্তি তখন আকাশের রক্তপটে। ঝাঁঝি পোকার একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর বিকট আওয়াজ আকাশের বিরাট নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করছিল। অন্ধকারে ভানা ঝাপটিয়ে কোথায় তারা চলেছিল!

এ পর্যন্ত সিগিরিয়ার চিত্র সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এমন চমৎকার যে, চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতিও ঘন আটের একই কাজ।

সিগিরিয়া কাল এবং মানুষ উভয়েরই দৌরাণ্ড্য থেকে স্বরক্ষিত। কারণ খুব উঁচু এবং দুর্গম স্থানে ছবি আঁকা হয়েছে। ছবি এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে আঁকা হয়েছিল;

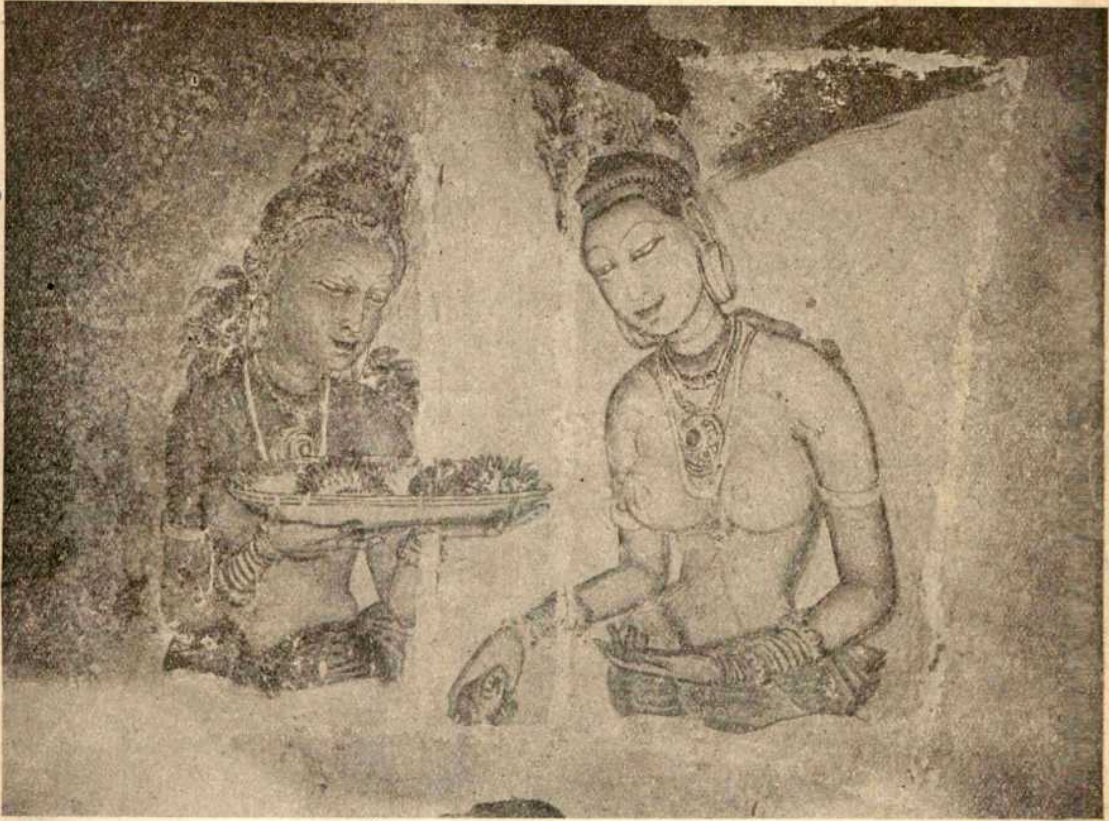
বাইরের দেওয়ালটা বহু পূর্বে ধসে গিয়েছে। ছবি যে-পাহাড়ের গায়ে আঁকা, তা ভিতরের দিকে হেলান। কাজেই রোদ বৃষ্টি ছবিতে পড়তে পারে না। আগে ছবির কাছে ত একেবারেই যাওয়া যেত না। এখন



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রূপায় সেখানে যাওয়া কতকটা সূর্যম হ'য়েছে। দড়ির মই বেয়ে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু এত উঁচু থেকে দড়ির মই ঝুলছে যে, উপরে ওঠবার সময় নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যেতে পারে। পাহাড় সেখানে একেবারে দেওয়ালের মতন খাড়া নেবে গেছে। যারা মাথা ঠিক রাখতে পারবে না, তাদের এখানে ওঠবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

কিন্তু একবার উপরে উঠতে পারলে আর ভয় নেই। ছবির ঠিক নীচেই কাঠের প্লাটফর্ম দেওয়া আছে।



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

বাইরের দিক্ তারের জালে ঘেরা কাজেই সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে ফিরে ছবি দেখা যেতে পারে।

মোট ২১টি রমণীমূর্তি আছে। রাণী এবং পরিচারিকা-দের ছবি প্রায় প্রমাণ আকারের মাছঘের সমান কেবল কোমর পর্যন্ত আঁকা, শরীরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ খোলা বা পাতলা আঁট জ্যাকেট দেওয়া। চোখের চাহনৌ শরীর-গঠন এবং ভঙ্গিতে খুব বেশী রকমের জীহ্বলভ ভাব। অ্যানাটমী ঠিক, এবং খুব সন্তবতঃ অঙ্গটার চিত্র অপেক্ষাও বেশী শুদ্ধ। এর থেকে মনে হয়, সিগিরিয়ার চিত্রকরেরা যে নিছক কল্পনার জোরেই ছবি এঁকেছে, তা নয়; নিশ্চয়ই জীবন থেকে অধ্যয়ন করেছে।

সিগিরিয়ার সৌন্দর্য তার জোরাল এবং সুনির্দিষ্ট রেখায়। শিল্পী যে রেখা টেনে গেছে কোথাও ভয় বা

সন্দেহ নেই। ফ্রেস্কোতে একবার ভুল এঁকে ফেলে তা শোধরাবার উপায় নেই। যা আঁকাবার একেবারেই এঁকে ফেলতে হয়। সিগিরিয়াতে দু'এক জায়গায় ভুল ভুইং রয়েছে, তা বোঝা যায়। ভুল ভুইং-এর উপর কালো লাইন টেনে শুদ্ধ করা হ'য়েছে। কাজেই ভুল শুদ্ধ দু'রকম ভুইংই একসঙ্গে চোখে পড়ে। অঙ্গটার রংয়ের প্রার্থ্যা; সিগিরিয়ার রংয়ের দৈন্ত্র পেরিমাটি এবং ফিকে লাল হচ্ছে প্রধান। যেখানে গভীর রংয়ের প্রয়োজন হয়েছে, যেমন, চুল অথবা চোখের তারা ইত্যাদি, সেখানে সবুজ রং ব্যবহার করা হ'য়েছে। কলঙ্কার বাছুরে সিগিরিয়া চিত্রের প্রতিলিপি রাখা হ'য়েছে। নকল মূল চিত্রেরই অতুলন হ'য়েছে।

সপ্তমশতাব্দী থেকে একেবারে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে পড়তে হয়। মাঝের এই লম্বা ফাঁকে চিত্রের নিদর্শন



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানাক্সার) ১২শ শতাব্দীর চিত্র পাই না। দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রেস্কোর একমাত্র নিদর্শন পোলানাক্সার [ডেমলমহাসেয়া] বিহারে। এ সময়কার অধিকাংশ বিহারই ইটের তৈরী। ইটের দেওয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো পাথরের উপর আঁকা ফ্রেস্কোর ন্যায় তেমন স্থায়ী হয় না, কাজেই ডেমলমহাসেয়ার চিত্র ছাড়া এসময়-



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানাক্সার) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

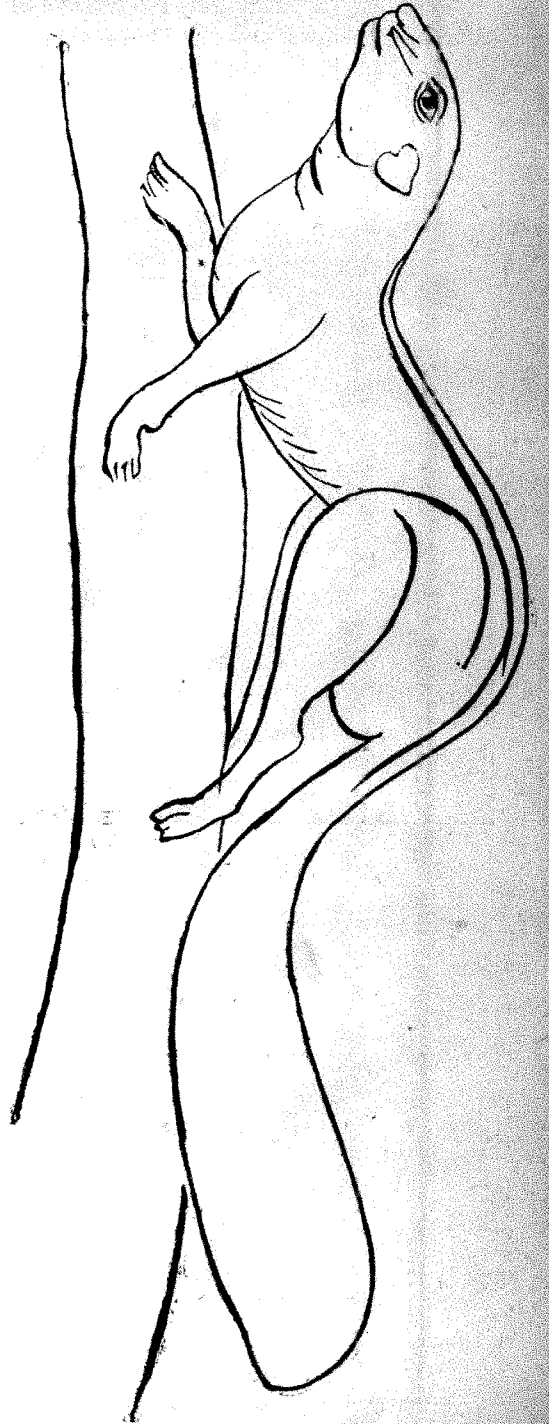
কার ফ্রেস্কো লোপ পেয়েছে। ডেমলমহাসেয়া বিহারের চিত্র বহু শত বৎসর রোদ এবং বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করেছে, কারণ এর ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। আবর্জনা স্তুপ পরিষ্কার করে চিত্র উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে এখন এর যত্ন করা হচ্ছে, কিন্তু অনেক দেরী হয়েছে। ছবি একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে কলঙ্কার যাহুঘরে এর যে প্রতিলিপি রাখা হয়েছে, তা একেবারেই কিছু হয় নাই। মূলের যে সৌন্দর্য্য এবং গাভীর আচ্ছাদিত তা এর ভিতরে একেবারেই নেই। মূলের রেখায় যে ছন্দ এবং কমনীয়তা আছে, প্রতিলিপিতে তা মোটেই ধরা পড়ে নাই। আটের একটি বড় নিদর্শন



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

বা অজন্টার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিরও প্রতিদ্বন্দ্বী, চিরকালের
অন্ত একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেল।

আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট লিখেছে—“পোলানারুয়ার
মধ্যযুগের এই বিহারে যেমন আশ্চর্য্য রকমের বৌদ্ধ
চিত্র রহিয়াছে, সিংহলের অন্ত কোথাও প্রাচীন বিহারে,
অন্ততঃ যেসব বিহার এখনও বর্তমান আছে, খুব সম্ভবতঃ
ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর নাই। সাক্ষি, ভারত, অমরাবতী, বরভূদর প্রভৃতি স্থানের পাথরের খোদাই
যেই অসম্পূর্ণ বস্তু দেয় তাহাই এখানে রঙীন চিত্রে
স্বাভাবিক ভাবে নিপুণ তুলিকার অঙ্কনে সব আখ্যান
যথার্থ এবং স্পষ্ট ভাবে বলিতেছে। ডেমল মহাসেয়াতে



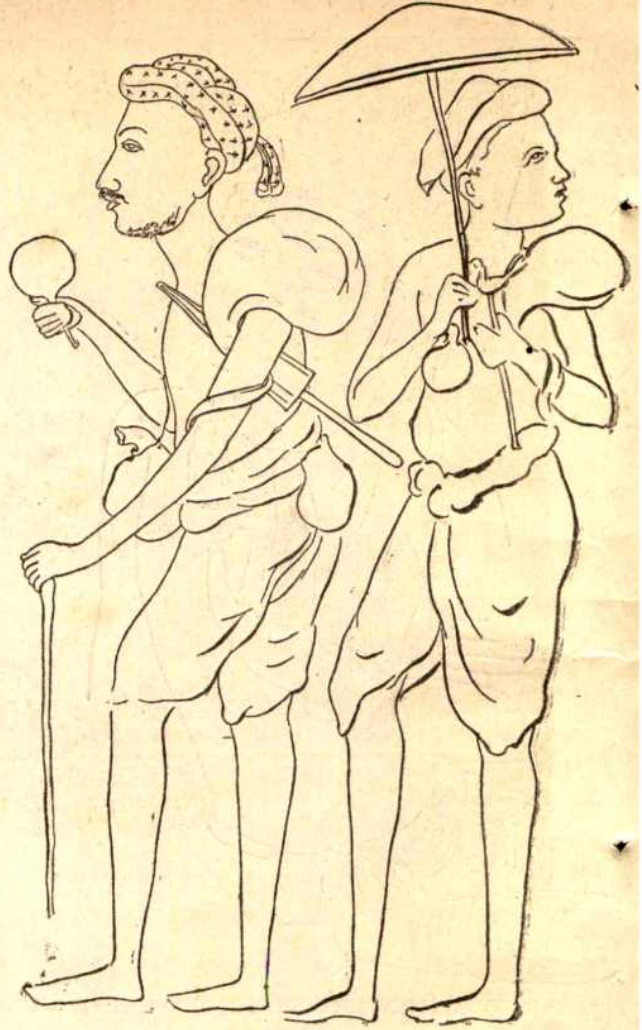
ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র
এখনো এমন সকল চিত্র আছে যাহা অজন্টার শ্রেষ্ঠ চিত্র
সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।”



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট কিছু অত্যাশ্চর্য্য করেনি। ডেমল মহাসেয়ার চিত্রগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে থাকত অজ্ঞতার দ্বারা এগুলিও আটের জগতে অপূর্ণ জিনিস হ'তে পারত। ছবিগুলি এখন একেবারে অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে কিছুই বোঝবার জো নেই। ৩৪টা মূর্তির ট্রেসিং আমি নিজে নিতে পেরেছিলাম। এই বিহারের চিত্রের কথা আমি পূর্বে শুনি। ভাঙ্গা মন্দিরে ঢুকে যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে এই অপূর্ণ জিনিস দেখলাম তখন বিশ্বাসে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। সিগিরিয়ার শৈলী (স্টাইল) অজস্র থেকে আলাদা রকমের; কিন্তু এই বিহারের শৈলী অজ্ঞতার খুবই কাছাকাছি।

শেষযুগের চিত্র যা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছে, তা খুব conventional এবং ওর ভিতর জীবনের গতি নেই; কিন্তু এর ভিতর শিল্পের আলঙ্কারিক দিকটা পুরো মাত্রায় রয়েছে, শিল্পীদের এবিষয়ে বংশানুক্রমে একটা

তীর্থ-যাত্রী
কেলানী বিহার (কেলানী) ৩য় যুগের চিত্র

স্বাভাবিক বৃত্তি আছে যাতে তারা অতি সহজেই কৃতকার্য্য হয়। দেওয়ালের সমস্ত জমিতে চিত্র এবং তার ফাঁক (space) ঠিক ভাবে ভাগ করা আছে। ছবির সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণ এই ফাঁকের উপর নির্ভর করে। ফাঁকই ছবির বিভিন্ন অংশের সমান ওজন ঠিক রেখে ছবিটিকে সংহত করে।

এযুগের মাল্লুষের চিত্রে দেখা যায় অনেক সময় তার মাপ জোক ঠিক নেই এবং প্রায়ই প্রাচীন মিশরের চিত্রের দ্বারা আড়ষ্ট। চিত্র ছাড়াও সিংহলের হালের মাটার অনেক রকম পুতুলে মিশরের প্রভাব স্পষ্ট।



সিগিরিয়া ক্রেশ্চোর ফটো

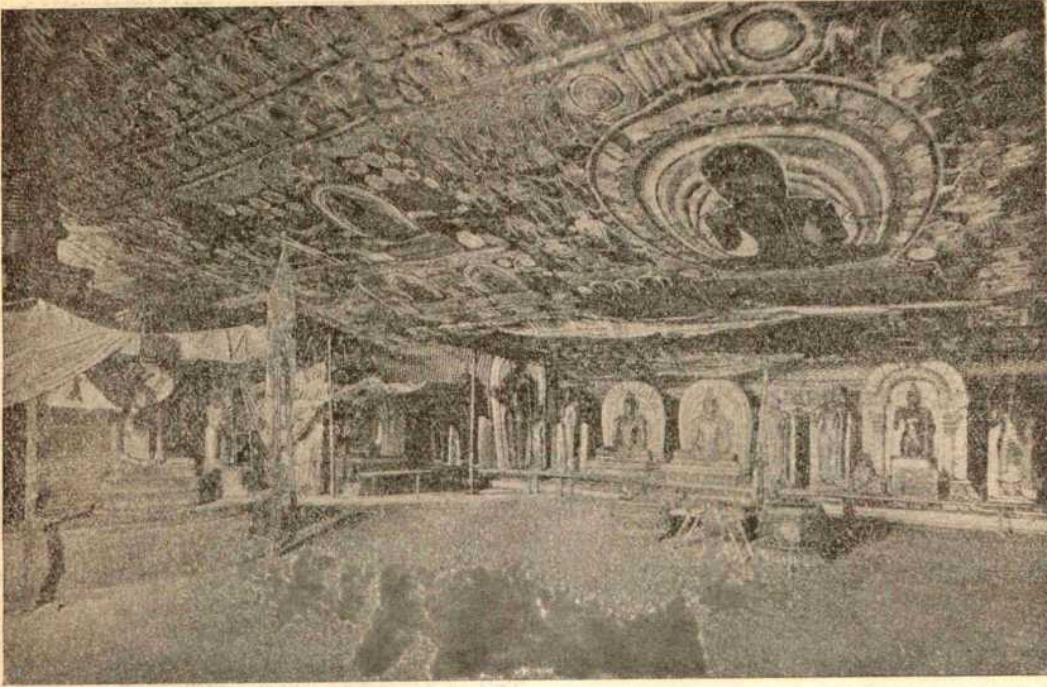
যাক্ ; মানুষের অ্যানাটমীর কথা বলছিলাম । তার আপ জোক ঠিক না হ'লেও এই ভুলটা তেমন চোখে পড়ে না । কারণ চিত্রের বিশেষ কোনো বস্তুর বা বিশেষ কোনো অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশেষ ক'রে অনুভূত হয় না । যদি কোনো এক অংশে দৃষ্টিপাত না ক'রে দূর থেকে সমগ্রটা একেবারে দেখা যায়, তবে বোঝা যাবে সমস্ত দেওয়ালের বিভিন্ন চিত্র ডুবে গিয়ে একটা নক্সা চিত্রে পরিণত হয়েছে । এবিষয়ে ভাল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কলম্বো থেকে ৬ মাইল দূরে কেলানী বিহারের চিত্রে ।

এযুগের শিল্পীদের বলা যেতে পারে কারিগর আর প্রথম যুগের শিল্পীরা হ'ল আর্টিষ্ট । এযুগের শিল্পীদের বাংলার পোটোদের সঙ্গে তুলনা করা চলে । এরা হচ্ছে

folk আর্টিষ্ট । বাংলার পোটোদের চিত্র সিংহলী কারিগরদের চেয়ে অনেক বেশী মোলায়েম, কিন্তু আলঙ্কারিক শিল্পে ও হৃদয় কারুকার্যে তারা সিংহলীদের চেয়ে হীন ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হ'ল ডাঙ্গুল বিহারের চিত্র । এই চিত্র এই সময়কার অন্ত্যন্ত বিহারের চিত্র থেকে কিছু পৃথক্ । কাণ্ডির রাজা কীর্ত্তিশ্রী অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিহার সংস্কৃত ও চিত্রিত করেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই বিহারের চিত্র কিরূপ ছিল জানবার জো নেই । কারণ পুরাতন চিত্র আর নাই, সমস্ত বিহারই নতুন ক'রে আঁকা হয়েছে ।

ডাঙ্গুল বা কাণ্ডি অঞ্চলের চিত্রে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব আছে । এর কারণ কাণ্ডির রাজারা, যাদের জন্ম এই শিল্প উৎসাহিত হয়েছে, সিংহলের লোক নয় ; তারা দাক্ষিণাত্য



ডাধুলবিহারের ছাদের চিত্রাবলী, ১৮শ শতাব্দী

থেকে সিংহলে এসেছে রাজত্ব করিতে। কাণ্ডির বিহারের নাম দালদা মালিগাওয়া বা দণ্ড বিহার (এখানে বুদ্ধের দণ্ড রক্ষিত আছে), আশগিরিয়া বিহার, মালওয়াও বিহার, গঙ্গারাম বিহার, আদাহন মালুয়া বিহার, লঙ্কা তিলক বিহার। শেষের বিহারটি কাণ্ডি সহর থেকে ৬ মাইল দূরে, অপর গুলি সহরের ভিতরে।

মাডালের আলু বিহার বা আলোক বিহারের চিত্রও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাল উদাহরণ। ত্রিপিটকের বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধ ঘোষ এই বিহারে বাস করতেন। এই যুগের চিত্রের উদাহরণ পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত স্থানে। এসব স্থান সবই সমুদ্রের ধারে। কালুতারা, ছিককাডুয়া, ভোডানডুয়া, আহাদ্দমা ইত্যাদি।

এটা খুব আশ্চর্য্য যে দেশের লোকেরা এবং বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এইসকল প্রাচীন চিত্রের মর্যাদা বোঝে না; তারা প্রাচীন চিত্র তুলে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় জমকাল কুংসিং রংয়ের ছবি আঁকতে পছন্দ করে।

বর্তমান কালের চিত্র সম্বন্ধে দুয়েক কথা ব'লে উপসংহার করি।

হালের চিত্রকরদের হাতে বৌদ্ধচিত্র অবনতি এবং দুর্গতির চরম সীমায় নেবেছে। বুদ্ধ একজন মোটামোটা ইংরেজরূপে উপস্থিত; পোষাকেই কেবল তফাৎ, হ্যাট কোটের পরিবর্তে চীঘর পরা। নৃপতি শুদ্ধোদনের পরিবারের মহিলাদের ছবি নাচওয়ালা মেয়েদের ছায়া; মুখে রং ঘষা। অঙ্কণ-রীতির দিক থেকে বিচার করলে রং, রেখা ও ছন্দের লেশমাত্র নাই। কাজেই এই চিত্রের মূল্য কানা কড়িও নয়। রংয়ের যে অসামঞ্জস্য এবং ভীষণ রকম জমকালো ভাবে, যেন ভাঙ্গা টিনের কেনেস্তারা বাজিয়ে চীৎকার করছে। বাড়ীতে যে সব বৌদ্ধ চিত্র রাখা হয়, তা ভীষণ রকমের জাম্পান গুলিওগ্রাফ। তার আর বর্ণনা না করলাম।

কাণ্ডি অঞ্চলে এখনও সাবেকী ধরণের বংশানুক্রমিক

আর্টিষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু মন্দির চিত্র করতে তাদের আর ডাক পড়ে না। তাদের কাজ দেশের লোকেরা পছন্দ করে না। কাজেই তারা পশ্চিমের কিউরিও শিকারীদের জন্য ছোট খাট জিনিষ তৈরী ক'রে থাকে। কাঠের পাটায় আঁকা এদের ছবি পাওয়া যায়। ছোট খাট বাক্স কোটা এরা স্ফন্দর ক'রে চিত্রিত ক'রে থাকে।

সিংহলবাসীরা তাদের নিজের সব হারিয়েছে। শিক্ষায়, দীক্ষায় শিল্পে, সঙ্গীতে, এবং জীবনের প্রাত্যহিক প্রত্যেক খুঁটি নাটি ব্যাপারে পশ্চিমের অনুসরণ ক'রে থাকে। তারা তাদের বেশ বদলিয়েছে, ব্যক্তিগত নামও অধিকাংশ স্থলে ইউরোপীয় অথবা দেশী বিলাতী মেশান, যেন ডেনিয়েল গুণ বর্জন। এরা নিজেদের সমস্ত ঘুচিয়ে পূরাপুরি সাহেব হ'য়ে যেতে চায়—কোনে রকমের দেশী পরিচয় যেন লজ্জার কারণ। অন্ধ পরানুকরণই হচ্ছে এখন একমাত্র জাতীয় উদ্দেশ্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাই এক বক্তৃতায় সিংহলকে ছোট ইংলণ্ড (Little England) বলে উল্লেখ করেছিলেন।



সিগিরিয়া শৈলে উষ্ণির সিঁড়ি চিহ্নিত স্থানে প্লাটফর্ম দেখা যাইতেছে
এখান হইতে স্রোত দেখা যায়

পরভূতিকা

শ্রী সীতা দেবী

ভবানীর ফিরিতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। পিসিমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে ঠিক করিল ভানুমতীর সন্ধ্যার জলযোগের ফল, মিষ্টি প্রভৃতি কিনিয়াই লইয়া যাইবে, কারণ বাড়ী গিয়া ফের আসিতে হইলে একেবারেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। অতএব বাড়ীর দিকে না গিয়া সে সোজা দোকানের দিকে চলিল।

বাড়ী ফিরিতেই ভানুমতী বলিল, “বাপ রে বাপ, গল্প

পেলে আর তুই কিছু চাস না। আমাকে আজ খেতেও দিবি না নাকি?”

ভবানী হাসিয়া বলিল, “দিচ্ছি গো দিচ্ছি, তবু ভাল যে খাবার কথাটা মনে আছে। এমনিতে ত দশবার বললে একবার খেতে চাও না, আজ একটু দেরি হয়েছে কিনা তাই।”

ভবানী তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার খাবার ঠিক করিয়া

আনিল। ভানুমতী খাইতে বসিলে, সে তাহার কাছে বসিয়া পিসিমার বাড়ী কি কি দেখিয়া এবং শুনিয়া আসিল, তাহারই বর্ণনা আরম্ভ করিল।

সব শুনিয়া ভানুমতী বলিল, “ওমা, তুই এ টাকার কথা জানুতিস্ না? আমি কবে শুনেছি।”

ভবানী বলিল, “তোমরা না বললে আর আমি জানুব কোথা থেকে বাছা? ভগবান করুন, এখন ভালয় ভালয় একটি বেটা ছেলে হ’য়ে যায়, তাহ’লেই সব দিক্ রক্ষা হয়।”

ভানুমতী বলিল, “বেটা ছেলে না হ’য়ে মেয়ে হ’লেই কি আর? তবে ছেলে হ’লে শ্বশুরের, স্বামীর বংশ থাকবে, মেয়ে হ’লে সেটা থাকবে না এই যা।”

ভবানী রাগিয়া বলিল, “তোমার এক কথা! কেন মেয়ে হ’লে ক্ষতিটা কম কি? ছয় লাখ টাকা হাতছাড়া হ’য়ে যাবে, সেটা বুঝি কিছু না? আর যে চিরকাল তোমার দুঃখমণী করুল, সেই চোখের সামনে ব’সে দুহাতে তোমার হস্তের ধন ওড়াবে, তা দেখতে পারবে?”

ভানুমতী ভবানীর রাগে হাসিয়া বলিল, “বাবাঃ, তোরা রাজপুত্ররা বড় হিংস্কে কিঙ্ক। যাকে দেখতে পারিল না, তার নামেই জলে যাস। এইজন্তেই ইতিহাসে তোদের কথা এত লিখেছে।”

ভবানী বলিল, “তা বাছা, আমরা গরম দেশের মানুষ আমাদের মেজাজ গরম। যে দুঃখমণী করে, আমরাও তার দুঃখমণীই করি, আর যে ভাল করে দরকার হ’লে তার জন্তে জানও দিতে পারি। তোমার ঐ লক্ষ্মীছাড়া দেওর যদি টাকা পায়, তা হ’লে আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাবে। ভগবান কখনো এমন অজ্ঞায় হ’তে দেবেন না।”

ভানুমতী বলিল, “ও কথা বলিস্ না রে। ভগবানের জ্ঞান-অজ্ঞান মানুষে বোঝে না। তা না হ’লে আমার অমন দেবতার মত স্বামী চ’লে গেল।” সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

ভবানী নীচে নামিয়া গেল, যদিই রান্নাঘরের দিকে কোনো কাজ থাকে। সে দুই দণ্ড বসিয়া থাকিতে পারিত না, নিজের নিদিষ্ট কাজ শেষ হইয়া গেলে, অজ্ঞের কাজ কাড়িয়া লইয়া করিতে বসিত। এইজন্ত বাড়ীর অজ্ঞ বি

চাকরেরা তাহাকে বেশ খানিকটা খাতির করিয়া চলিত, যদিও তাহার চড়া মেজাজ এবং কটকটে কথার জন্ত আড়ালে সবাই তাহার নিন্দা করিতেও ছাড়িত না। শোভার মেয়ে দুর্গার কল্যাণে এই ক’দিন অবশ্য তাহার সময় কাটাইবার উপায়ের বিশেষ অভাব ছিল না।

নীচে গিয়া ভবানী দেখিল, রান্নাঘরের কাজ একরকম হইয়াই গিয়াছে, দুর্গাও নিতান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মতনু মায়ের পাশে বসিয়া ইন্জিন্ গাড়ী লইয়া খেলিতেছে। তাহাকে লইয়া এখনি যে পাগলের মত দিক্‌বিদিকে ছুটাছুটি করিতে হইবে, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অগত্যা ভবানী ঘর হইতে এক রাশ কাপড়, সূতা ছুঁচ কাঁচি প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল, এবং রান্নাঘরের দরজার কাছে বসিয়া একখানা অর্দ্ধসমাপ্ত ছোট কাঁথা লইয়া দ্রুতগতিতে সেলাই করিতে শুরু করিল।

শোভাবতী বলিল, “বুড়ো হয়েছিস্ কে বলবে? চোখের ত দিবি তেজ আছে। রাজ্জেই সেলাই ক’ছিস্? আমি ত পারি না।”

ভবানী বলিল, “আমি নামেই বুড়ী বাছা। বয়সই হয়েছে, শরীরের ত ক্ষয় হয়নি? সেই চৌদ্দ বছর বয়সে রাঁড় হয়েছে, স্বামীর ঘরও কবুতে হয়নি, ছেলেপিলে মানুষও কবুতে হয়নি। কাজেই গতরে শক্তি আছে।”

বাহিরের দরজার কড়াটা সজোরে বাজিয়া উঠিল। ভবানী সেলাই ফেলিয়া সেইদিকে চলিল। দরজা খুলিয়াই দেখিল উদয় দাঁড়াইয়া। সঙ্গে তাহার আর একটি কে ভল্লোলক, তাহাকে ভবানী পূর্বে কখনও দেখে নাই।

অভ্যাগতদ্বয়কে ভিতরে আহ্বান করিবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া ভবানী বলিল, “কাকে চান?”

উদয় জিজ্ঞাসা করিল, “মহেশবাবু বাড়ী নেই?”

ভবানী বলিল, “বাবু এখনও বেড়িয়ে ফেরেন-নি।”

উদয় বলিল, “আচ্ছা, তা বোঠানকে খবর দাও, এলাম যখন একটু দেখা ক’রে যাই।”

ভবানী অগ্নানবদনে বলিল, “ওমা, ভানুও বাড়ী নেই। মেজ দিদিমণির সঙ্গে আজ তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে একটু ঘুরে আসতে গেছে।”

উদয় চৌকাঠের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,

ভবানীর অভ্যর্থনার আতিশয্যে অগত্যা আবার বাহির হইয়া গেল। ভবানী দরজাটা ভেজাইয়া দিল। খিল লাগাইয়া আসিবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় জনিল উদয় তাহার সঙ্গীটিকে বলিতেছে, “বৌঠানরূপ গোলাপ ফুলটির চারপাশে এই যে কাঁটা বড়োটি, একে পার হওয়া শক্ত। ইচ্ছা করে এক খাপ্পড় দিতে, কি মুক্কটী আনা চাল।”

বন্ধু বলিল, “হ্যাঁ, রূপসী কৈকেয়ীর সঙ্গে বাপের বাড়ীর ঝি কুঁজী মম্বরা ত থাকবেই। বেটির চেহারা দেখনা, ঘেন ফোঁজের সেপাই। কে বলবে মেয়েমানুষ ? তোমায় বোধ হয় তুলে আছাড় দিতে পারে।”

ভবানী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া মনে মনে বলিল, “ভগবান দিন দেন ত দেখিয়ে দেব যে সত্যিই তুলে আছাড় দিতে পারি। নচ্ছার, হতভাগা ছোড়া, মুখের ওপর বলতে সাহস হয় না ? দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আমাকে শোনান হ'ল। তোর বাড়িভাতে ছাই না দিই ত আমি রাজপুতের বেটা নই।”

সে ফিরিয়া আসিয়া আবার সেলাই লইয়া বসিল। সময় আর বেশী নাই, অথচ কাজ প্রায় সবই পড়িয়া আছে। ভানুমতী নিজে কিছুই করে না, তাহার বা মনের অবস্থা তাহাকে জোর করিয়া কিছু বলাও চলে না। শোভাবতী দুদিনের জন্ত আসিয়াছে, তাহার উপর দুর্গা তাহাকে সারাক্ষণই এত ব্যস্ত করিয়া রাখে যে, তাহার দ্বারা আর কিছু হইবার জো-টি নাই। ভানুমতীর মা থাকিলে কথা ছিল না, তিনি না থাকিতে মায়ের সব কর্তব্যই প্রায় ভবানীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এ ভার লইয়াছে, স্ত্রুতরাং ইহা লইয়া কাহারও সহিত ঝগড়া চলে না।

কাঁথাখানা প্রায় শেষ করিয়া তবে ভবানী উঠিল। ভানুমতীকে খাওয়াইতে হইবে, তাহার বিছানা করিতে হইবে। কর্তার খাওয়ারও সব ব্যবস্থা সে না করিয়া দিলে চলিবে না। রাধুনীটা নুতন, সে শুছাইয়া কোনো কাজ করিতে জানে না। ভবানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, “বুড়ী মবুলে এদের কি হ'বে কে জানে ? ভানু ত কুটো ভেঙ্গে ছুপান করতে পারেনা, সে করবে ছেলে মানুষ।

তার ওপর রাজ্যের যত দুশমন তার পেছনে। বাক, যতদিন আমি আছি কোনো বেটার সাখি নেই তার চুলের আগা ছোঁয়। তার একখানা হাড়ও আস্ত রাখব না আমি।” উদয়ের উদ্দেশ্যে যত রকম গালাগালি তাহার জানা ছিল, সব ক'টা বর্ষণ করিতে করিতে সে আপনার কাজে চলিয়া গেল।

দিনগুলো একটার পর একটা, প্রায় একই ভাবে কাটিয়া চলিল। ভানুমতী শুইয়া, বসিয়া, বোনের সঙ্গে গল্প করিয়া, দুর্গাকে লইয়া খেলিয়া কোনোরকমে সময় কাটায়। ভবানী দিনরাত কাজে ব্যস্ত, স্ত্রবিধা পাউলেই পিসিমার বাড়ী গিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর সঙ্গে চাঁৎকার করিয়া খানিক গল্প করিয়া আনে। তিনি অনবসর থাকিলে বিজনের সঙ্গেই গল্প করে। বুড়ীর কাছে উদয়ের প্রশংসা করে আর বোয়ের কাছে প্রাণ খুলিয়া তাহার নিন্দা করে। তবে এমন সময় দেখিয়া যায়, বাহাতে উদয়ের সামনে না পড়িতে হয়। উদয় সেই যে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভবানীকে গাল দিয়া বিদায় হইয়াছিল, তাহার পর আর মহেশবাবুর বাড়ীর ছায়া মাড়ায় নাই। মহেশবাবুর প্রতি তাহার বিরাগ বিশেষ কিছু ছিলনা, কিন্তু ভবানী এখন খোলাখুলিভাবে শত্রু পক্ষে দাঁড়ানোতে, তাহার যে আর গিয়াও কোনো লাভ নাই তাহা সে বুঝিয়াই লইয়াছিল। মাঝে-মাঝে আপশোষ করিয়া ভাবিত, “যুত্তোর, রাগের মাধ্যম সেদিন বুড়ী বেটীকে না চটালেই পারতাম।”

আর এক জায়গায় ভবানীকে প্রায়ই দেখা যাইত, কিন্তু তাহার খবর সে ভানুমতী বা শোভাবতীকে দিত না। লেডী ডাক্তার মিসেস মিত্র সন্ধ্যার পর বড় একটা আয় কাজে বাহির হইতেন না। তাহার বয়সও হইয়া পড়িয়াছিল কিছু বেশী, টাকা-কড়িরও বেশী কিছু অর্থাৎ ছিল না। কাজেই সহজে নিজের আরামের ব্যাঘাত তিনি ঘটতে দিতেন না। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর মাতুর বিছাইয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িতেন, দাসী বসন্ত তাহাব গা হাত পা টিপিয়া দিত। বসন্তকুমারী ছাড়াও বাড়ীতে আর একটি ঝি ছিল, সে রান্নাঘরের কাজ করিত। বাহিরের কাজ তিনি কোচম্যান সহিশের দ্বারাই করাইয়া লইতেন, বাড়ীতে চাকর রাখা পছন্দ করিতেন না।

বসন্ত এবং মিসেস্ মিঞা, দুইজনের সঙ্গেই ভবানী খুব ভাব জমাইয়া লইয়াছিল। তাহার নানারকম গল্প এবং আদবকায়দারূপে কথায় লেডীডাক্তার খুসি ছিলেন। বসন্ত খুসি ছিল অল্প কারণে। মনিবটি কিছু কড়া এবং হিসাবী হওয়াতে, তাহার পান দোস্তা, সুগন্ধী তেল, সাবান প্রভৃতিব খরচ চালানো মাঝে-মাঝে মৃদু হইয়া উঠিত। ভবানীর বদান্ততায় আজকাল তাহার কপাল ফিরিয়াছিল। এ সব ত সে চাহিলেই পাইত, এমন কি ভবানী তাহাকে কথা দিয়া রাখিয়াছিল যে ভানুমতীর যদি ছেলে হয় তাহা হইলে বসন্তকে একখানা গরদের শাড়ী ত দিবেই, হয় ত বেনারসীও দিতে পারে।

বসন্ত বলিত, “দিদি, তোমার ভাই বরাত-জোর আছে, খাসা মনিব পেয়েছ। কে বলবে যে তুমি বাড়ীর ঝি। যেন তোমারই ঘর সংসার। টাকা পয়সা যত খুসি খরচ কব, কোনোদিন তোমায় না বলেন। আর দশা দেখ আমার। কাজ ভারী নয় বটে, কিন্তু একটি পয়সা নাড়বার জো নেই, মাগী তখনই ধ’রে ফেলে।

“ছেলে না পিলে। কার জন্তে পয়সা জমাচ্ছে জানিনা। একখানা ভাল কাপড় শুদ্ধ কিনে পরে না, হাতে ত এসে ইস্তিক দেখছি ঐ মরা সোনার বালা ছুঁগাছি। বাক্সেও নেই কিছু। কোথাও যদি যেতে হ’ল, তা বার করলে সেই সেকলে এক লালপেড়ে গরদ, দেখে দেখে চোখ প’চে গেল।”

ভবানী বলিত, “আমার ভানু বেঁচে থাক। কোনোদিন আমার ওরা ঝিয়ের চোখে কি দেখেছে? জামাই শুদ্ধ কখনো একটি কড়া কথা কোনদিন বলেনি। পোড়াকপাল আমাদের বাছা, তাই অমন ছেলে অকালে বেঘোরে মারা গেল।”

বসন্ত একদিন কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ গা দিদি, ওরা তোমায় মাইনে দেয় কত ক’রে? খাওয়া পরা, ধোপা, সব খরচাই ত দিচ্ছে?”

ভবানী হাসিয়া বলিল, “মাইনে আমার কে দেবে লো? সংসারই ত আমার হাতে। ভানু মাসে মাসে যে দেড় হাজার করে টাকা পায়, তার কি একটা সে আঙ্গুল দিয়ে ছোঁয়? বাবু এ’নে আমার কাছে দেন, আমি আবার বাবু

হাতে দিয়ে ব্যাঞ্ছমা পাঠাই। যা দু দশ টাকা খরচ লাগে, আমিই করি, কোনদিন সে খোঁজও নেয় না। শ্বশুরবাড়ী যখন ছিল, জামাই মাসে মাসে তাকে একশ’ টাকা ক’রে হাতখরচা দিত। তাও কি মেয়ে কখনও নিজের হাতে নাড়াচাড়া করেছে? আমিই তার কাপড়-চোপড় করাতুম, যখন যা দরকার কিনেকেটে আনতুম। আমার হাতে মাথুয কিনা, মা মাসীর মতই আমার মানে, ঝি ব’লে ত কোনো দিন অমান্তি করেনি।”

বসন্ত বলিল, “বেশ আছ তুমি দিদি। দেড় হাজার টাকা আমরা কখনও এক সঙ্গে চোখেও দেখিনি।”

ভবানী উঠিয়া পড়িল। বলিল, “মাই ভাই, এখন। আর এরপর ত এত ঘন ঘন আসতে পারব না। এতদিন মেজদিদি ছিল, ভানুকে কে’লে আসতে পারতুম যখন তখন। তা কাল সে শ্বশুরবাড়ী চ’লে যাচ্ছে, এখন আর কার কাছে রেখে আসব? তা তুই যাস মাঝে মাঝে।”

শোভাবতী তাহার পর দিনই চলিয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী হইতে জোর তলব আসিয়াছিল। শাশুড়ীর কাজ চলেনা বউ ঘরে না থাকিলে, এবং শাশুড়ীর ছেলেরও মন ভাল থাকেনা। কাজেই একজন প্রকাশ্যে এবং আর একজন গোপনে নিজের নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে বড় উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়াছিল। অগত্যা শোভাবতীকে শ্বশুরবাড়ী ফিরিতে হইল। ভবানীকে বলিয়া গেল, “সময়মত খবর দিস। যেমন ক’রে পারি আসব।”

ভানুমতী বলিল, “তোমার স্বামী বড় স্বার্থপর মেজদি, নিজের অস্ববিধাটুকুই দেখল। আজ না হয় কাল, তুই ত যেতিসুই, কিন্তু আমার কথাটা একটু সে ভেবে দেখলেন। আমার ত সারাজীবন একলাই কাটাতে হ’বে, তবু তুই ছিলি, গল্পগাছা ক’রে ছদও নিজের পোড়া কপালের কথা তুলে থাকতুম, এখন সারাদিন একলা ব’সে কি ক’রে সময় কাটবে?”

শোভাবতী মুখ স্নান করিয়া বলিল, “কি করব-ভাই, মেয়েমানুষের জীবন পরাধীন, হুকুম তামিল না ক’রে ত উপায় নেই। নইলে তোকে এই অবস্থায় একলা ফেলে আমি কখনও যাই? পুরুষ মানুষকে কি আর আমাদের মাছুষ ভাবে? আমরা কেবল তাদের আরাম স্ববিধার

জ্ঞ আছে। আমাদেরও যে কিছু দরকার থাকতে পারে তা তাদের মাথায়ই আসেনা। খাওয়া পরা আর থাকবার জায়গা জুটলেই মেয়ে মানুষের ঢের হ'ল, তার আবার কিসের দরকার? যাই হোক, খবর পেলে আমি যেমন ক'রে পারি চ'লে আসব। শাশুড়ী তখন আর না করুতে পারবেনা।”

শোভাবতীর গাড়ী চলিয়া গেল। ভানুমতী চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। ভবানীকে বলিল, “কি ছাই-ডম্ব সব শেলাই করছিলি, আমায় কিছু কিছু দেনা? হাঁ ক'রে সারাদিন ব'লে থেকে থেকে আমি এইবার পাগল হ'য়ে যাব। মাগো, একটা দিনও যে আমার আর কাঁহিতে চায় না। এখনও সারাজীবন প'ড়ে রয়েছে।”

ভবানী তাহাকে কতকগুলি সেলাই আনিয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, “এই ছেলেটি হ'য়ে গেলেই অনেকটা ভাল লাগবে, দেখো এখন। একটা নাড়বার চাড়বার জিনিষ হ'লেই সময় ছ ছ ক'রে কোথা দিয়ে চ'লে যাবে।”

দিন দশ বারো কাটিয়া গেল। হঠাৎ মাঝরাতে ভানুমতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ভবানীকে ঠেলিয়া ডাক দিল, “ও ভবানী, ভবানী ওঠ, আমার শরীর বড় ধারাপ লাগছে।”

ভবানী বিদ্যুদ্পৃষ্টের মত ঝট করিয়া খাড়া হইয়া বসিল। আলো জালিয়া ব্যস্ত হইয়া ভানুমতীর কাছে আসিয়া তাহাকে প্রাণের উপর প্রাণ করিয়া চলিল, উত্তর দিবার অবকাশও তাহাকে দিল না।

ভানুমতী বলিল, “অতশত আমি জানি না, বাপু, তুই বাবাকে খবর দে, তিনি মিসেস্ মিষ্ট্রিকে ডেকে পাঠান। মাগী ক'সে গাল দেবে এখন আমাকে, মাঝরাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম।”

ভবানী মুখ ঘুবাইয়া বলিল, “আহা, গাল দেবে না আর কিছু। টাকাগুলি গুণে নেবার বেলা কিছু কম নেবে নাকি? ঐ হ'ল ওদের কাজ, অত রাত বিরাট বাছতে গেলে ওদের চলে নাকি? ধাইয়ের কাজ ক'রে ক'রে বুড়ী ত হ'য়ে গেল।”

ভানুমতী ভীত কণ্ঠে বলিল, “বড় ভয় করুছে কিন্তু রে।

মেজদিটা বলেছিল খবর দিলে আসবে। এতরাতে এখন তাকে কে খবর দেয়?”

ভবানী তখন ডাকাডাকি করিয়া বাবুর ঘুম ভাঙাইতে ব্যস্ত ছিল, সে ভানুমতীর কথার কোনো উত্তর দিল না। মহেশবাবুকে তুলিয়া দিয়া নীচে চলিল, রঘুয়া চকরের সন্ধানে। ভানুমতী ভয়ে, আশায়, উৎকণ্ঠায় ঘরঘর ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অগ্নিকণ্ঠের মধ্যেই এই বাড়ীটির অন্ততঃ সকলের ঘুম ছুটিয়া গেল। ঘরে ঘবে আলো জলিল, রান্নাঘরের উনানে আগুন পড়িল। মিসেস মিড্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া পড়িলেন, পিছনে তাঁহার ব্যাগ হাতে শ্রীমতী বসন্ত।

মহেশবাবু তাঁহাকে দেখিয়া ঘেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন, “এই যে আশুন আশুন, বড় ভাবনাঘই পড়েছি। ভানু উপবের ঘরে রয়েছে। আর কাউকে খবর দেবার দরকার আছে কি? কোনো ডাক্তার কি নস'?”

মিসেস মিড্র তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “কিছু দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার মেয়ের বয়স ঠিক, স্বাস্থ্যও মোটের ওপর ভালই; আমি ত কোনো বিপদের আশঙ্কা করি না।”

ভবানীর সঙ্গে তিনি উপরের ঘরে চলিলেন, ব্যাগ হাতে বসন্তও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মহেশবাবু তাহাদের পিছন পিছন আসিতে আসিতে বলিলেন “ও ভবানী, ভানুর পিশাখাশুড়ী ঠাকরণের বাড়ী একবার খবর দিলে হ'ত না? হাজার হোক, তারা নিজের লোক, খবর দেওয়াটা উচিত।”

ভবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না বাবু না, এখন ওসবে দরকার নেই। এতরাতে কেউ আসবেও না, কাল সকালে খবর দিলেই চলবে। মেজদিদির বাড়ী সকালে যাবে রঘুয়া, সেই সঙ্গে ওবাড়ীতেও ব'লে আসবে এখন।” তাহার ভয় ছিল পাছে সংবাদ পাইয়াই উদয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কিছু অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে।

মিসেস মিড্র হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভানুর মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে

দেখিয়া বলিলেন, “ভয় পেয়ে গিয়েছ দেখি মা লক্ষ্মী। কিছু ভাবনা নেই। এ ত আর অস্বপ্ন-বিস্বপ্ন নয়, সাধারণ জিনিষ, ঘরে ঘরেই হচ্ছে।”

ভানুমতীও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “ঝাঝরাজে আপনাত্তম ভাবিয়া দিলাম, খুব অস্ববিধা হয়েছে নিশ্চয় আপনাত্তম?”

লেডী ডাক্তার আর একপালা আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “কিসের অস্ববিধা মা? আমাদের কাজই হ’ল এই। বাচ্চারা কি আর আমার টাইম দেবে আসবে, তারা নিজের টাইমেই আসবে। শীতকাল হ’লে একটু অস্ববিধা হয় বটে, না হ’লে আর কি? এইত দিন দুই আগে একটা কেস্ ক’রে এলুম মাঝ রাত্রে। সে বেটা বড় ভুগিয়েছে। তাকে শেষ অবধি—” তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে হওয়ায় থামিয়া গেলেন। বসন্তকে তড়া দিয়া বলিলেন, “নে নে চট্ ক’রে সব গোছগাছ করে নে, সন্ডের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভবানীকে জিগগেস কর না কোথায় কি আছে। ঘরখানা একবার ফিনাইল জলে ধুয়ে নিলে হয়; তা এত রাত্রে কি স্বেবিধা হবে?”

ভবানী বলিল, “কেন হবে না মা? যা যা দরকার তুমি বল, এখন সব করাচ্ছি। বাঘের দুধ দরকার হয় মেয়ের জন্তে তাও এনে দেব। তোমার উপরই ভরসা মা, দেখ আমার বাছার যেন কোন বিপদ-আপদ না হয়।”

মিসেস মিত্র বলিলেন, “বিপদ হবে কিসের দুঃখে? নিজের মুখে নিজের কথা বলতে নেই বাছা, কিন্তু এই পচিশ বছর প্র্যাক্টিশ করছি, কখনও একটি কেস্ বিগড়ায়নি আমার হাতে। তবে প্রথমবার একটু টাইম নিতে পারে এই যা। তাতে ঘাবড়াবার কি আছে?”

বাকি রাতটুকু দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। রঘুয়া খবর লইয়া শোভাবতীর শস্তরবাড়ী গেল। ফিরিয়া আসিল একলাই। ভবানী ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে মেজদিদি এল না?”

রঘুয়া বলিল, “না বুড়ী মাইজিত বড় অস্বপ্ন, তাঁকে ফেলে আসতে পারুল না। আবার বিকেলে খবর

দিতে বলেছে, জামাইবাবুও আসবেন বিকালে খবর নিতে।”

“তবে ত কেতাখ হলুম,” বলিয়া ভবানী রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দু-মিনিট বাদে ফিরিয়া আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল “পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলি?”

রঘুয়া জানাইল যে সে গিয়াছিল। মাইজি অল্প পরেই আসিবেন।

সমস্ত দিনটা আশায় উৎকর্ষায় একরকম কাটিয়া গেল। মহেশবাবু কন্ঠার মমতায় তাহার ঘর হইতে বেশী দূরে যাইতেও পারিতেছিলেন না, আবার তাহার কাতরানিতে ঘরের কাছে টিকিতেও পারিতেছিলেন না, পাগলের মত কেবল এ-ঘর ও-ঘর উপর নীচ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভবানী একলাই দশটা মাস্তবের কাজ করিতেছিল, এবং সবাইকে বকিয়া ভূত ছাড়াইতেছিল। পিসিমা আসিয়া একবার দেখিয়া গিয়াছেন, শোভাবতী আসিতে পারে নাই। মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে কখন কি হয় খবর দিতে বলিয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা মিসেস্ মিত্র ও বসন্ত খাইয়া দাইয়া আসিলেন বাড়ী গিয়া। ভবানীকে চুপিচুপি বলিলেন, “রাতটাও নেবে হয়ত বাছা, এখানেই আমার বিছানা ক’রে দাও।”

রাত একটা প্রায় হইবে। আঁতুড় ঘরের জীলোক ক’টি ছাড়া সবাই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই সময় খাজী বি সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মিসেস্ মিত্র বলিলেন, “যাক্, শিগগির হ’য়ে গেলেই ভাল, কষ্টে মেয়েটার আর জ্ঞান নেই। ভয় পেয়োনা বাছা, ভয়ের কিছু নেই।”

হঠাৎ শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দন শোনা গেল। ভবানী ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, তাহার পর মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। অশ্রুটকণ্ঠে বলিল, “হায় ভগবান শেষে মেয়েই হ’ল।”

লেডী ডাক্তার ভবানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ওকি বাছা! মেয়ে ছেলে কি সন্তান নয়? সবে জন্ম নিচ্ছে, তাকে দেখে ওরকম ক’তে আছে? এই বৈচে থাক্, দেখো মাঘের নত আদরের ধন হবে। কি

হৃদয় দেখতে হয়েছে দেখ, ঠিক যেন গোলাপের কুঁড়িটি।”

ভবানী বলিল, “সে কি বুঝি না মা? মেয়ে, ছেলের চেয়ে কম কিসে? আর যদি পাঁচটা হবার আশা থাকত ভাই, তা হ’লে একে ত মাথায় ক’রে নিতুম। কিন্তু এই যে সব মা, আর ত হবে না! ভাইর যে সর্ব্বশ্রম যাবে, তার চার দিকে শত্রু, এখন তারা ত আরো পেয়ে বসবে। লাখ লাখ টাকা যাবে তাদের হাতে, তখন তারা কি আর এদের আস্ত রাখবে? পথের কাঁটা, দূব কবুবার জন্তে উঠে প’ড়ে লাগবে। এতদিন যে কিছু করতে পারেনি, হাতে পয়সা ছিল না ব’লেই না? হে ভগবান, এ কি করলে?”

মিসেস্ মিত্র সাহসের স্বরে বলিলেন, “কি আর করবে বাছা, এখন ওঠ, মেয়েকে দেখ। যা হ’য়ে গেছে তার ত চারা নেই, এ ত মাহুঘের হাত না?”

ভবানী হঠাৎ তাহার হুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “দোহাই মা, তুমি ইচ্ছা করলে এর বিহিত কর্ত্তে পার একটা। যা চাও তুমি তাই দেব।”

লেডী ডাক্তার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আমি কি করব গা? আমি ত আর বিধাতা নই যে মেয়েকে ছেলে ক’রে দেব? এখন ছাড়, পোয়াতিকে দেখি, তার এখনও হুঁস্ হুঁস্ ভাল ক’রে। ও বসন্ত, নে নে শিগগির ক’রে তোর কাজ সেয়ে নে।”

ভবানী বলিল, “ওর এখন হুঁস্ হুয়ে কাজ নেই মা, আমি যা বলছি শোন। তোমার কোনো পাপ হবে না মা, যা হবার আমাবই হবে। তোমায় হাজার টাকা দেব, দু হাজার চাও, দুহাজার দেব। এ মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও, তোমার বাড়ীতে দু দিনের যে খোকাটি রয়েছে, মা মরা, তাকে এখানে দিয়ে যাও। আমরা তিন প্রাণী ছাড়া কেউ জানবে না, সব দিক রক্ষে হ’বে। সেও কায়স্থের ঘরের ছেলে, কোন অশ্রায় হবে না। এ মেয়েকে তুমি বাঁধ মা, পালতে যত টাকা লাগে, আমি দেব।”

মিসেস্ মিত্র গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, “তুমি বল কি বাছা! এমন কথা বাপের জন্মে শুনি নি। শেষে কি বুড়ো বয়সে জেল খাটব?”

ভবানী বলিল, “কে তোমায় জেলে দিচ্ছে মা? জানবে কে? বাড়ীর সকলে ত মড়ার মত ঘুমচ্ছে, ভাইরও এখনও জ্ঞান হয়নি। জানবার মধ্যে তুমি, আমি আর বসন্ত। তা ও বেটাকে ঠাণ্ডা রাখবার ভারও আমি নিলুম। দোহাই মা তোমাব, অমত কোরো না। তোমায় হাজার টাকা এখনি গুণে দিচ্ছি। বসন্তকে দুশ’ দিচ্ছি।”

বসন্ত এতক্ষণ ভাইমতীকে লইয়া ব্যস্ত ছিল; সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার মনিবের কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, “নিয়ে নাও মা, নিয়ে নাও। এক বছরেও তোমার এত রোজগার হবে না। আর আমার কথা যদি বল, আমার চারটুকরো ক’রে কাটলেও একথা আমার মুখ দিয়ে বেরবে না। গিয়ে নিয়ে আসব খোকাটাকে?”

মিসেস্ মিত্রের মনে তখন ধর্ম্মবুদ্ধি এবং নোভেল প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ভবানী দেখিল সময় বহিয়া যায়, ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া লোহার সিঁদুক খুলিয়া তাড়া তাড়ি নোট বাহির করিয়া আনিল। এবার টাকা আর সে ব্যাংকে পাঠায় নাই, প্রসবের সময় যদিই প্রয়োজন হয়, বলিয়া ঘরেই হাজার দুই টাকা জমা করিয়া রাখিয়াছিল। মিসেস্ মিত্রের হাতে হাজার টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল, “এই নাও মা, আবেগ চাও আরো গিয়ে কাল দিয়ে আসব।” বসন্তর হাতেও দুশো টাকার নোট গিয়া পড়িল।

গরীব ছোট লোকের মেয়ে সে এত টাকা কখনও একসঙ্গে হাতে পায় নাই। পাছে ইহা হাত-ছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। নিজের কাপড় চোপড় ঠিক কবিয়া লইতে লইতে ব্যস্ত হইয়া বলিল, “হেই মা, অমত কোরোনা, হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলতে নেই। যাই খোকাকে নিয়ে আসি?”

লেডী ডাক্তার মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। বসন্ত দবজা খুলিয়া ভীরের মত বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভবানী সন্তোষাতা শিশুটিকে লইয়া তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিল। তাহার অনিন্দ্যহৃদয় মুখের দিকে চাহিয়া এই কঠোরহৃদয়া প্রৌঢ়ারও চোখ বারবার জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। রাজার নন্দিনী হইয়া যে জন্মিল,

তাহাকে আজ স্বার্থের খাতিরে সে কোথায় নির্ধারিত করিতেছে? কিন্তু ভাষুর স্বার্থ তাহাকে দেখিতে হইবে, এবং উদয়ের খোঁতা মুখ ভোঁতা করিতে হইবে। পাণ যাহা হইবার হউক, ভগবান বা মাছুষে তাহাকে যে শাস্তি বিধান করুক, সে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। রাজপুত্রের মেয়ে ভয়ে কখনও পিছায় না।

মিসেস্ মিড্র ভাষুকে ঐষ দিতে দিতে বলিলেন, “রাঁধুনী মাগীকে ভোর না হতেই কোনো গতিকে বিদায় করতে হবে। তাহেই রেখে এসেছি কিনা বাড়ীতে, তা সে কুজুকর্ণের বেটা এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে বাড়ী ফাটাচ্ছে। এখন কিছু জানবে না, কিন্তু পরে খোকর আরগায় খুকী দেখলে নানা কথা তুলতে পারে। মাইনে পায় নি এক-মাসের ব’লে, যাব যাবও করছে। দেখ ত বসন্ত এল বুঝি?”

বসন্ত যেমন দ্রুত গতিতে গিয়াছিল, তেমনিই দ্রুত গতিতে ফিরিয়াছে। সদর দরজা খোলার সামান্য শব্দটুকু শোনা যাইতে না যাইতে সে আসিয়া উপরের তলায় উপস্থিত হইল। কোলে তাহার কবলে জড়ানো শিশুটি।

মিসেস্ মিড্র রট্ করিয়া ছেসেটিকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া ভবানীকে বলিলেন “কি জামা টামা তোমরা শেলাই করেছ বাছা, গোটা দুই দাঁও একে। আর বসন্ত, মেয়ে নিয়ে তুই এখুনি বেরো, তোকে এখন আর আসতে হবে না। পথে বেরিয়েই গাড়ী করুবি, বাছার ঘেন ঠাণ্ডা কিছুতে না লাগে। বাড়ী গিয়ে ওকে ঢাকাটুকি দিয়ে শুইয়ে রাখবি, রাঁধুনী মাগী ভোরে উঠতেই তাকে গাল মন্দ দিয়ে খুব একটা ধুম ঝগড়া বাধিয়ে দিবি। আমি গিয়েই তাকে বিদায় করুবি, খুকীর কাছে তাকে যেতেও দিস্ না, তাহ’লে দশ কথার সৃষ্টি করুবে। যা বেরো এখন শিগ্গির।”

বসন্ত শিশু কন্ডাটিকে উত্তমরূপে কবল ও কাঁধায় জড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। খোকাকে নূতন জামা, মোজা প্রভৃতি পরাইতে পরাইতে ভবানী বলিল, “ছেলে দেখতে ত মন্দ না, তবে রং তেমন ফরসা নয়।”

লেডী ভাষুর বলিলেন, “বেটা ছেলে, রং নিয়ে

কি হবে? তবু খুব কালোও না। বাঙালীর ঘরে যেমন হয়, মাঝামাঝি তাই হয়েছে। ওমা, মা লক্ষ্মী যে চোখ খুলে তাকাচ্ছ দেখি! দেখ, দেখ, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে। ভবানী, এদিকে নিয়ে এস, আলোর কাছে। এই দেখ মা।”

ভাষুমতী শিশুর দিকে তাকাইয়া বলিল, “ভবানী খুব খুসি হয়েছিল, না? ওকি কাঁদচিস্ নাকি? এখন আর কাঁদবার কি?”

ভবানী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “না মা, আর কাঁদব না। আহা, আজ জামাই বেঁচে থাকলে!”

মিসেস্ মিড্র বলিলেন, “ওসব কথা এখন আর কেন গো? যে গেছে সেত গেছেই, এখন যে এল তাকে নিয়ে আনন্দ কর। কৈ শাঁখ চাঁখ বাজাও, বাড়ীর লোক ত এখন অবধি জানুই না।”

ঘোররোলে পাড়া কাঁপাইয়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল। মহেশবাবু বিছানা ছাড়িয়া আলুথানু বেশে ছুটিয়া আসিলেন। “কি হল ভবানী, কি হল? মা আমার ভাল ত?”

ভবানী খোকাকে তাঁহার সামনে তুলিয়া ধরিয়া বিজয়ের হাসি হাসিয়া বলিল, “খোকা হয়েছে বাবু, আপনার বাড়ী রাজা এসেছে। কৈ গিনি বার করুন।”

দুই আঙ্গুল দিয়া শিশুকে একটু আদর করিয়া মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, “গিনিত দুহাতে ক’রে ও ছড়াবে ভবানী, গরীব দাদামহাশয় আর ওকে একটা গিনি দিয়ে কি করবে? তবু নিয়ম মেনে চলা ভাল, এই নাও দাদামণি,” বলিয়া তিনি শিশুর গোলাপী মুঠির মধ্যে ছটি গিনি ঢুকাইয়া দিলেন। খোকা হওয়ার আশায় তিনি গিনি পকেটে করিয়াই শুইতে গিয়াছিলেন। ভাষুমতীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মা আমার ভাল আছে ত?”

মিসেস্ মিড্র বলিলেন, “দেখি আছে, ওর সেরে উঠতে কিছু দেরী হবেনা। আচ্ছা, আমরা তাহ’লে একটা গাড়ী ভেঁকে দিন, এখনও রাত রয়েছে, সঙ্গে একটা লোক হ’লে ভাল হয়। এই ওষুধ রেখে গেলাম, এক দাগ খাইয়ে দিয়েছি, তিন ঘণ্টা পরে আর এক দাগ। সকালেই আমি



মুসাফির

শিল্পী শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

এসে পড়ব এখন। ভবানী ত রইল, ও প্রায় ধাত্রীর কাজ আমার সমানই জানে; মা লক্ষ্মীর কোনো অসুবিধা হবেনা।”

বাড়ীর কি চাকর সবাই শাঁখের শব্দে উঠিয়া পড়িয়াছিল, দরজার কাছে তখন রীতিমত ভীড়। সবাই থোকা দেখিতে ব্যস্ত। রঘুয়া গাড়ী ডাকিতে চলিল। মহেশবাবু মিসেস মিত্রকে বলিলেন, “আপনাব কিটা?”

মিসেস মিত্রের হাণ্ডব্যাগটি তখন প্রায় পের্ট ফাটিয়া মরিতেছে। তিনি সেটিকে হাতে করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আহা সে হবে এখন। তার জন্তে তাড়া কিসের? আমি ত এখনো দশ বারো দিন আসব। আচ্ছা, আসি এখন। আপনার চাকরটা একটু চলুক তবে আমার সঙ্গে।” মহেশবাবুও লেডী ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেলেন।

পূর্বের আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিল। তার পর ফিকা গোলাপী, তারপর ভগ্নভগ্নে সিঁদুরে লাল। রাস্তাঘাট সজীব হইয়া উঠিল। ঘোড়ার গাড়ী চলিল, কেবীওয়ালার ডাক শোনা গেল। এ বাড়ীর সকলে মাঝরাতে জাগিয়া এখন ঘুমে ক্লান্ত হইয়া চোখ বগড়াইতে লাগিল। ভবানী সকলকে কাজে লাগাইয়া দিল, তাড়াহুড়া দিয়া। রাধুনী বলিল, “তোমার মুখ চোখ যা হয়েছে দিদি, আয়নায় দেখ গিয়ে। সব ধকল যেন তোমাকেই পোয়াতে হয়েছে।”

ভবানী বলিল, “নে নে, উহুনে আঁচ দিগে যা। আমার ভাবনা ভাবতে হবে না। এখুনি হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জল দিতে হবে।”

হঠাৎ সদর দরজার সামনে ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড এক মোটারকার আসিয়া থামিল। গাড়ীব দরজা খুলিয়া এক লাফে বাহির হইয়া আসিল উদয়, তাহার পিছন পিছন একজন ইংরাজবেশধারী ব্যক্তি, ও একটি কালো মেমসাহেব। দুজনেরই হাতে ব্যাগ।

কাহারও অসুস্থতির অপেক্ষা না রাখিয়া উদয় এক থাকায় সদর দরজা খুলিয়া সকলকে লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই আসিয়াছিল যে, কাহারও পরোয়া সে আজ করিবে না। সিঁড়ির মুখের কাছে আসিতেই মহেশবাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এস বাবা এস, এরা কে?”

উদয় পরম গম্ভীর মুখে বলিল, “ইনি এখানকার এক জন খুব বড় midwifery Specialist, আর ইনি নস। জ্যাঠামশায় টেলিগ্রাম করেছেন এঁদের যেন বৌঠানের জন্তে রাখা হয়। কাল আমার খবর পেতে বড় দেরি হ’ল, তা না হ’লে কালই আসতাম। বৌঠান কোথায়, এখনও কি খুব কষ্ট পাচ্ছেন?”

মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, “না বাবা, এখন ভালই আছে। ভালয় ভালয় কাল রাজেই তার ছেলেরি হ’য়ে গেছে, খুব বেশী কষ্ট পায়নি। ধাত্রী যিনি ছিলেন, তিনি খুব বিচক্ষণ মানুষ, কোন বিপদ হয়নি তাঁর হাতে। এস না, থোকাকে দেখবে?”

থোকাকে দেখিতে উদয়েব বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। তাহার মুখে একবারে যেন কে কালি মাড়িয়া দিল। কি করিবে তাহাই যেন সে স্থির কবিতো পারিতেছিল না। হতবুদ্ধির মত সিঁড়ির মুখেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে এক ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া বাঙালী সাহেবটি বলিল, “We had better get a move on. Our services are not required, it seems,” কালো মেম সাহেবটি থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপর হইতে ভবানী জলন্ত দৃষ্টিতে ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল। উদয় যখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইহাদের লইয়া ফিরিয়া চলিল, তখন সে মনে মনে বলিল, “যাক্, তোর এমুখ যে দেখতে পেলাম, সেও আমার এক সান্না। পাপ যা করবার তাত করলুমই।”

সমস্ত দিন ধরিয়া থোকাব দরবার চলিতে লাগিল। বুড়ী পিসিমা আসিলেন, বিজনবালা আসিল, বাড়ীর ছেলেরাও আসিল। এমন কি শোভাবতী শুদ্ধ আসিয়া জুটিল, শান্তদীর অসুস্থ এবং গালাগালি উপেক্ষা করিয়া। ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল, “দেখি দেখি, আমাদের রাজপুত্রকে। ওমা, ভালর রং মোটেও পায়নি। কি যে ছাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলো হচ্ছে, সব কালো। তা বেটা ছেলে, ওর কিছু ব’য়ে যাবেনা। আমার বেয়েটারই বিয়ে দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে। ভবানী, থোকার জন্তে এই ক্রক, টুপী আর মোজা এনেছি, উঠিয়ে রাখ। টুপী একটু বড়ই হবে বোধ হচ্ছে।”

ভবানী বলিল, “তা হোক, ও কি আর এইটুকুই থাকবে নাকি? বড় হয়ে পড়বে। তোমার শাস্ত্রী কেমন আছে?”

শোভাবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “আছে একরকম ভালই, তবু কাউকে বাড়ী থেকে নড়তে দেবেনা। তাকে না বলেই এক রকম পালিয়ে এসেছি, গিয়ে গাল খাব এখন।”

খোকা চারিদিকের আনন্দ কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে লাগিল। দুপুরের দিকে তাহার দর্শনপ্রার্থীর দলও কমিয়া আসিল। মিসেস মিত্র স্নানাহার সারিয়া, এক মুখ পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া দর্শন দিলেন। ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি নাকি? বড় যে শুকনো দেখাচ্ছে। পো-পোয়াতি ভাল ত?”

ভবানী বলিল, “ভালই আছে মা। এতক্ষণ লোক জনের ভীড়ে নাইবার খাবার সময় পাইনি।” তারপর ফিশ ফিশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “খুকী কেমন আছে?”

মিসেস মিত্র বলিলেন, “দ্বিবি ঘুমছে, বেশ ঠুং বাচ্চা, তার জন্তে কোনো ভাবনা নেই। গিয়েই রাধুনী মাগীকে বিদায় করেছি, এরপর আর কাকপক্ষীও জানবেনা। চল এখন রুগীকে দেখি।”

রোগিনী ভালই ছিল, তাহাকে বেশী কিছু দেখিতে হইলনা। খানিকক্ষণ গল্পস্বল্প করিয়া লেডী ডাক্তার বিদায় লইতে উঠিলেন। ভবানী তাঁহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, “বাকি টাকাও নিয়ে যাও মা, দেনা পাওনা শিগগির শিগগির চুকিয়ে নেওয়া ভাল।” বলিয়া সে টাকা বাহির করিতে লাগিল।

মিসেস মিত্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, “আচ্চা দাও বাচ্চা, মেয়েটার জন্তে নিলুম। তা না হ’লে আমি আর পাপের বোঝা বাড়াইতাম। আমি ত বড় মাছুষ নই, একটা বাচ্চা ভাল ক’বে মাছুষ করতে খরচ কত।”

ভবানী কাদিতেছিল, বলিল, “রাগে আর লোভে প’ড়ে মহাপাপ করেছি মা, রাজার মেয়েকে পথে বসিয়েছি। তার যাতে কোনদিক দিয়ে কষ্ট না হয়, তুমি দেখো।

টাকার জন্তে ভেবোনা, যত টাকা লাগে আমি যেমন ক’রে পারি ছুটিয়ে দেব।”

মিসেস মিত্র বলিলেন, আর বাচ্চা, কেঁদে কি হবে? যা হবার তা হ’য়ে গেছে। অবস্থা অনাদর কিছুই হবে না, যতদিন আমি বেঁচে আছি। তারপর ভগবানের ইচ্ছা।” তিনি টাকা লইয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

ভানুমতী ভবানীকে ডাকিয়া বলিল, “হারে, সবাই চ’লে গেল নাকি? মেজদি কোথায়, ডাকন্য একটু পল্ল করি।”

ভবানী বলিল, “বেশী কথা তোমার এখন না বলাই ভাল বাচ্চা। আচ্চা, দিচ্ছি ডেকে শোভাকে।”

শোভাবতী আসিতেই ভানু বলিয়া উঠিল, “আচ্চা, খোকার কি নাম হবে ভাই? খুব স্বন্দর দেখে একটা নাম বল না।”

শোভাবতী বলিল, “রোস, একটু ভেবেত বলতে হবে? তোর শশুরবাড়ীর ধাঁচের নাম রাখবি নাকি?”

ভানুমতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না, না, ও সব মেয়েলী নাম, আমার একটুও ভাল লাগেনা। ছেলের নাম হবে ঠিক ছেলের মত। বড় হ’য়ে যেন লোকের কাছে নাম বলতে লজ্জা না পায়।”

শোভাবতী বলিল, “তবে ঘটোৎকচ কি বীরবাহু এই রকম একটা রাখ বিছ। মেঘনাদও রাখতে পারিস ইচ্ছা করলে। ছেলের যা গলা হয়েছে, এনামটা দ্বিবি মানাবে।”

ভানুমতী বলিল, “যা যা, সব তাতে চালাকি! কেন শুনতে স্বন্দর অথচ বেশ ছেলের মত নাম ভুভায়তে নেই নাকি? আচ্চা বেশ, বীরবাহু না হোক, আমার ছেলের নাম রইল স্ববীর।”

শোভাবতী বলিল, “বেশ ত, মন্দ কি? তা বীর-পুরুষ যে ভয়ানক চেঁচাচ্ছে, ওকে একটু ঠাণ্ডা কর।”

বয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। খবর পাইয়া প্রমদারঞ্জন রোগজীর্ণ শরীর টানিয়া কোন পতিকে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি আকবরী মোহরেরব মালা দিয়া শিশুর মুখ দেখিয়া, তাহাকে কোলে লইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে জল চক্ চক্

করিতে লাগিল। খানিক পরে সুবীরকে ভবানীর কোলে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, “বেহাই মশায়, আপনার পরামর্শই ঠিক। বোমা খোকাকে নিয়ে কিছুকাল এখন এখানেই থাকুন। ছোট ছেলে, কখন কি দবকার হয়, মফঃস্বলে, সহর হ’লেও সব জিনিষ সব সময় পাওয়া যায়না। যত্ন আদবের কোনো ক্রটিই এখানে হবেনা, তা জানি। আর টাকা যখন দরকার আগাকে জানালেই তারপব দিন পাবেন।”

মহেশবাবু বলিলেন, “আর ক’টা দিন থেকে যান না? খোকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক, ভাল ক’রে।”

প্রমদাবাবু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আব মায়ার বন্ধনে জড়াব না নিজেকে। খোকা বেঁচে থাক, ভাল থাক, দুব থেকেই তাকে আশীর্বাদ করুব। উদয় আসে-টাসে এদিকে?”

মহেশ বাবু বলিলেন, “কৈ না, খোকা যেদিন হল, সে-দিন একবার এসেছিল ডাক্তার আর নর্স নিয়ে। তখন আর দরকার নেই শু’নে চ’লে গেল, ছেলেকে দেখেও যায়নি।”

উদয়ের জ্যাঠামশায় বলিলেন, “ছ’ লাখ টাকা হাত ছাড়া হওয়ার ছুখটা খুবই লেগেছে দেখছি। যেমন বাপ তার তেমন বেটা। সারাদি আর ঐ লক্ষ্মীছাড়া মিলে যদি যত বদ খেয়াল ক’রে নিজেদের জমিদারীর অংশটা না খোয়াত তাহ’লে আজ আর ছোড়াকে পরের টাকার প্রত্যাশায় হাঁ ক’রে থাকতে হ’ত না। এককালে বাজে খরচ আমরাও কি না করেছি? কিন্তু সময়ে সামলেও গেছি।”

মাসখানিক কাটিয়া গেল। ভানুমতী আজকাল বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। খোকার জন্ম নিন্তা নুতন গহনা আর পোষাকের ফরমাস করিয়া বাড়ী শুদ্ধ লোককে সে উত্সুক করিয়া তুলিয়াছে। মহেশবাবুর কোন পছন্দ নাই বলিয়া তিনি মেয়ের কাছে ক্রমাগত বকুনি খাইতেছেন। ভবানী গাল খাইতেছে অস্ত্র কারণে। বুড়ো বয়সে তাহার নাকি ভীমরতি হইয়াছে, সে কেবল

টাকা জমাইবার চেষ্টা করে। খোকার সিন্ধের জামা যদি প্রতি মাসেই ছোট হয়, এবং প্রতি মাসেই করাইতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার কি মাসে দশ বিশ টাকা পোষাকে খরচ করিবার যোগ্যতাও নাই? টাকা কড়ির ভার ইহার পব ভানুকে নিজের হাতেই লইতে হইবে দেখা যাইতেছে। ভবানী হাসে, কথা বলেন।

এক দিন সন্ধ্যার পর ভবানী কোথা হইতে বেড-ইয়া ফিরিল। ভানুমতী বলিল, “কোথায় গিয়েছিলি? ছেলেটা ভারি চোঁচাচ্ছে, কিছুতেই তাকে রাখতে পারছি না।”

ভবানী বলিল, “তোমার ধাত্রী ঘে চল্ল গো, তাই একটু তার ওখানে গিয়েছিলুম, দেখা কর্তে।”

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাচ্ছে সে? আর আসবেনা?”

ভবানী বলিল, “আব আসবেনা বোধ হয়। বলে, বুড়ো ত হলুম, আর কতকাল থাকিব? ছেলেগিলেও কিছু নেই। কে তার এক পিসি মরেছে, ওর নামে এক বাড়ী রেখে গেছে গিরিভিতে, সেইখানে গিয়ে থাকবে বললে।”

ভানুমতী বলিল, “ওমা আমার সঙ্গে আর দেখাই হ’লনা তবে? বেশ মাছুষটা, ঠিক মায়ের মত ক’রে আমায় যত্ন করেছে। খোকার ভাতে তাকে সোনার হাব দেব ঠিক করেছিলুম, ভাল বেনারসী শাড়ী দেব।”

ভবানী বিষন্ন মুখে বলিল, “টাকা পাঠিয়ে দিও মা, তারা সেখান থেকেই খোকাকে আশীর্বাদ করবে সেই ঝি মাগী বসন্ত, তাকেও কিছু দিও, সেও খুব যত্ন ক’বে তোমার কাজ করেছে।”

ভানুমতী বলিল, “তা দেব বৈ কি, সকলবে দেব। তোকে ত খোকা বিয়েই করবে, কাজেই সব চেয়ে বেশী লাভ তোরা।”

ভবানী হাসিবার চেষ্টা করিল, তারপর ভানুর অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গীতে পরিবর্তন

শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(৫)

স্বরলিপি বাঁরা ঋপদ নষ্টই হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত
আবণ দেওয়া যাইতেছে। “সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা”
নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতা নগরীতে সঙ্গীত-চর্চা
উত্তমই হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মাসিক পত্রিকাতে
একবার একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি। “শুভ সগন
শুভ লগন” বলিয়া একটি গান আছে। ইহা ‘মোবারক
বাদী’ অর্থাৎ আশীর্বাদী এবং জন্ম-উৎসব অথবা বিবাহ
অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে গীত হইয়া থাকে। ৪৫ বৎসর
পূর্বে যাহাকে ‘কোকব বেলাবল’ বলিয়া শিক্ষা
করিয়াছিলাম এক্ষণে উহা ‘শুভ বেলাবল’ বলিয়া
শুনিতছি। কেবল ইহাই নহে; বোল বাণীও পরিবর্তিত
ও অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। গানটি উক্ত পত্রিকাতে
এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

শুভ লগন শুভ লগন ছত্র ধরে মাই।
শোভাক্রি পণ্ডিত লগন ধবো মাই।
নন্দনন্দন কি যুগ যুগ জিএ।
এয়দি মোবারক চন্দ্র মোবারক।

আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা এইরূপ :—

শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউ।
আজ নিলি পণ্ডিত লগন ধরাউ।
নন্দনন্দন তুমি যুগ যুগ জিবো।
আয়সো বড়ো আয়সো চন্দ্র মোবারক।

ইহার স্বরগ্রাম :—

কোকব—ঝাঁপতাল।

র গ	স স র	গ মা	গ গ গ
শু শু	স গ ন	শু শু	ল গ ন
র র	প প ধ	মা মা	গ গ গ
ছ .	ত্র . .	ধ রা	উ . .
			। । ।
স স	মা গ মা	প প	স স স
আ জি	মি . লি	প ৭	ডি . ত
ধন প	প ধ মা	মা মাপ	গ গ গ
ল গ	ন . .	ধ রা	উ . .

ন ধ	ন ধ ম	স স	। । ।
ন নু	ধ . ন	ল ন	তু . ম
। । ।	। । ।	। । ।	। । ।
স গ ব	গ গ মা	গ র	স স স
যু গ	যু . গ	জী .	বো . .
। । ।	। । ।	। । ।	। । ।
স স	মা গ মা	প প	স স স
আয়	মো . .	ব চো	যা য দে
ধন প	প ধ মা	মা মাপ	গ গ গ
চন্	ত্র . .	মো বা	র ক .

রাত্রের যেমন কল্যাণ-জাতীয় রাগ আছে (অর্থাৎ
কেদারা, হাছীর, পুরিয়া, ইমনকল্যাণ, ভূপালী) সেইরূপ
দিনের বেলাবল জাতীয় রাগ আছে; ইহার দিনের
কল্যাণ। ইমন বেলাবল, দেবগিরি, দেবশাল, কোকব,
আলাহিয়া, শাখী প্রভৃতি বেলাবল জাতীয়। উক্ত
গানটিকে কোকব বলিয়া শিখিয়াছি। এই রাগ সম্পূর্ণ;
ইহার গাঙ্গার বাদী, এবং ঋষভ বিবাদী। অনেকে
বিবাদীকে ‘বর্জিত’ বলেন, কিন্তু স্থি বুদ্ধিতে বুঝিতে
চেষ্টা করিলে দেখিত পাইবেন যে বিবাদী অথবা কোন
একটি স্বর বর্জিত করিলে সম্পূর্ণ রাগ জাতিগত হইতে
পারে না। এবং যেখানে দুইটি স্বর বর্জিত সেখানে
দুইটিকেই বিবাদী বলিতে হইবে। বিবাদী শব্দে রাগ-
লষ্টকারী বুঝায়, অর্থাৎ যে স্বর প্রযোগে বাদী স্বর নষ্ট হয়
তাহাই বিবাদী। উক্ত রাগে গাঙ্গার বাদী এবং নিষাদ
সম্বাদী; ঋষভ বিবাদী, ভৈরব ঋষভের সমষ্কৃতি হেতু
বিবাদিস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বরগ্রাম দেখিলে স্বরের
স্থলরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কণ্ঠে পরিষ্কার দেখায়।
বাদী, বিবাদী, সম্বাদী, অম্বাদী এই চারিটি বিষয়
তত্ত্বকারগণই তদ্বীক্ষণে তদ্বীক্ষণ দ্বারা ইহা ভাল করিয়া
বুঝাইতে পারেন কারণ বাদী ও বিবাদী অথবা বাদী ও
সম্বাদী একসঙ্গে দুটি তার অথবা সারিকা দ্বারা যদ্বৈ
দেবান যায়, কণ্ঠে দুটি স্বর এক সঙ্গে বাহির হয় না।
মন্দ্রতার, মন্দ্রমধ্য অথবা মধ্যতার বামহস্তের তর্জনী-ও

অনামিকা দ্বারায় বীণাতে বাজান হইয়া থাকে, অল্প যন্ত্রে হইতে পারে না; সেইরূপ বাদী, বিবাদী প্রভৃতি বিষয়-গুলিও বীণাযন্ত্রে বুঝান যায়; অতথাঃ অসম্ভব। তত্রাপি এইসকল বিষয় লইয়া গায়কেরা তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। সধাদপত্রেও যে-সকল স্বরলিপি বাহির হইতেছে তন্মধ্যে কেবল বাদী ও সধাদী (নিতান্ত অশাস্ত্রীয়ভাবে) দেখা যায়; বিবাদী, অল্পবাদী উল্লেখ দেখা যায় না। তাহার কারণ বিবাদীও বর্জিতই হইয়াছে ও অল্পবাদী ‘বুঝিয়া’ লইতে হইবে। যে-সমস্ত বিষয় সাধনার অন্তর্গত, এমন-কি সাধনা করিলেও লকলের দৃষ্টিগোচর হয় না, স্বরলিপি দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করা প্রত্যারণর নামান্তর মাত্র।

উক্ত পত্রিকাতে ভৈরব রাগ সম্বন্ধে কোন মহাপুরুষ লিখিয়াছেন যে ভৈরব রাগে কোমল নিষাদ লাগিবে। আমরা বহু গুণী ও তন্ত্রকারদিগের গান বাজনা শুনিয়াছি কিন্তু কোথাও ভৈরবে কোমল নিষাদ শুনি নাই। তবে বোধ হয় যে ‘গমান’ এই তিনটি স্বর মীড় দিয়া লইতে গেলে নিষাদের স্বরটির একটু নরম হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ পূরা মীড় গাছার হইতে নিষাদ পর্যন্ত দেওয়া কঠিন বলিয়া উক্ত লেখক ভৈরব রাগের রূপ পরিবর্তন করিতে চাহেন। কোন কোন লেখক হিন্দীভাষা শিক্ষার্থে উপদেশ দিয়াছেন যে, দুই একটা ভজন লিখিলেই হিন্দী ভাষা আয়ত্ত হইবে এবং “ব” কে “ও” ও “খ” কে “খ” বলিলেই হিন্দীভাষার জ্ঞান হইবে এবং হিন্দী গানও গাওয়া যাইবে। হিন্দী ভাষাতে দুটি ‘ন’, দুটি ‘জ’, ও তিনটি ‘শ’ এর ব্যবহার বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ ব্যায় শুদ্ধ হয়; বাঙ্গলা ভাষাতে যত, পত জ্ঞান বহুপরে হয় অর্থাৎ ব্যাকরণ না পড়িলে জ্ঞান হয় না। সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে নবীন গায়কেরা ব্যাকরণ ও ভাষা লইয়া উক্ত পত্রিকাতে অনধিকারচর্চা করিয়াছেন; তাই আমিও আত্মকাহিনী ছাড়িয়া এত কথা বলিলাম।

কৃষ্ণনবাবু চারি মাস কাশীতে ছিলেন এবং প্রত্যহ রামদাসবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমাদেরকে দিয়া ভাল ভাল গানগুলি গাওয়াইতেন এবং নিজে স্বরলিপি করিতেন,

কিন্তু অবশেষে তিনি একটি গানও না শুনাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সে বৎসর মহাপ্রদর্শনী সভা কলিকাতায় হইয়াছিল। আমাদেরও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু “বহু সমারোহ” যেখানে গুরুদেব সেখানে যাইতেন না, কারণ, ঐ সকল স্থানে গেলে তাঁহার মাথা ঘুরিত। মহাপ্রদর্শনী-সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে রামদাসবাবু আমাদেরকে লইয়া শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন। সে-সময়ে অনেক গায়ক ও গুণী কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল এবং দুতিন মাস বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল। গুণীদিগের মধ্যে মহেশবাবু খেয়ালী এবং তাঁহার শিষ্য শ্রাম লাহিড়ী যে খেয়াল গাহিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা এতাবৎ পাই নাই। অলৌ বক্স্ ধামারী ও তাঁহার শিষ্য অঘোর চক্রবর্তী নানাপ্রকার সুরের কাজ দেখাইয়া গিয়াছেন। গোপাল মল্লিক মুদঙ্গী ও তাঁহার পুত্র বিপিন (আমার বাল্যবন্ধু) কি মুদঙ্গী বাজাইয়া গিয়াছেন! এখন অধিকাংশ বোল যেন ঢোলের বাজনার মত শুনা যায়; ইহাদের বোল বাজনা দক্ষিণী ধরনের অর্থাৎ বড় কড়া। কলিকাতা হইতে অনেকে শ্রীরামপুরে আগিতেন এবং কেবল যে গানবাজনা হইত তাহা নহে, সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা প্রশ্নোত্তর হইত ও আমাদেরও শিক্ষা হইত। তখন শিখাইতে পারিলেই যেন বোঝা হালকা হইয়া যায় গুরু একরূপ মনের ভাব ছিল এবং শিষ্যেরাও শিক্ষা করিয়া আনন্দ পাইতেন।

যথাসময়ে আমরা কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। শিক্ষা ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া আসিতে লাগিল। গুরুদেবের শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। তথাপি তিনি শুইয়া শুইয়াও “গোড় মল্লারের ওখানটা দেখে নেও ত; মেঘ মল্লার ও মিঞা মল্লার এবং দরবারী কানাড়ার খোঁচগুলো দেখে শুনে নেও” এইরূপ বলিতেন। এমন গুরুই বা আজকাল কোথায়? পীড়িত অবস্থাতেও ৩৪ বৎসর অল্প অল্প করিয়া শিক্ষা দিতেন। আমারও পেটের চিন্তা আরম্ভ হইল; চাকরী করিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দিন পরে গোখামী মহাশয়ের কাশীলাভ হয়; আমিও টেলিগ্রাফ অফিসের চাকরী লইয়া স্থানান্তরে বদলি হইয়া যাই; গান-বাজনাও এক হিসাবে শেষ হইল।

(৬)

চাকরী উপলক্ষে ১৫/১২/০০ বৎসর নানাস্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। অনিয়মিত চাকরী করিতে হইত বলিয়া সঙ্গীতচর্চা নিয়মিতভাবে হইতে পারে নাই। কলিকাতায় যে দুই তিন বার ছিলাম তাহাতে সেখানে ভবানীপুর, বহুবাজার, ইটালী, সিমলা প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গান-বাজনা হইয়াছিল। তখন দুই চারি জন ভাল গায়ক এবং যুবকী এমন দেখা গিয়াছিল যাহারা স্বরলিপির প্রায়ক ছিলেন না। তখন হারমোনিয়ম যন্ত্রটি মাত্র দুই এক স্থানে দেখা দিতেছে, কিন্তু স্বরলিপি প্রথাও আরম্ভ হইয়াছে। ওস্তাদেরা যেমন গুরুমুখে শিক্ষা করিয়াছেন সেইরূপ গান করেন; স্বরলিপি দেখিয়া কেহ গান করেন না। কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে আসিয়া স্বরলিপির প্রাধান্য দেখিলাম। এ স্থানের একজন জমিদার শ্রীযুক্ত চাকচরণ মুখোপাধ্যায় উক্ত স্বরলিপির বড়ই গুরুপাতী। তিনি স্বরলিপি করিয়া গান করিতে পারিতেন; কৃষ্ণবনবাবও ঐরূপ ছিলেন, কিন্তু তিনি হারমোনিয়ম বাজাইতে পারিতেন না। চাকচাবু হারমোনিয়মে সেইগুলি নকল করিয়া লইতেন, পরে এসময়ে তুলিতেন। আমার নিকট হইতে প্রায় একশত ধ্রুপদ গান স্বরলিপি করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন; গাহিতেও পারিতেন কিন্তু তাঁহার পুস্তক দেখিয়া কেহ ঐগুলি শিক্ষা করিতে পারে নাই। যে বিজ্ঞা সাধন-সাপেক্ষ, সাধন করিলেও যে সকলেই সফলমনোরণ হইবেন তাহা নহে, সেই বিজ্ঞা পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা করা যায় না। এসময়ে আমি চাকচাবুকে বহু প্রকারে বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বুঝিয়াও পুস্তকে ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও শিক্ষা দিতে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় তাঁহার স্বরলিপি-পুস্তক বুধাই হইল।

মজঃফরপুর হইতে কাশীধামে চাকরীর শেষ কয়েক বৎসর কাটাইলাম। মনে করিয়াছিলাম যথাসময়ে চাকরী হইতে অবসর লইয়া সঙ্গীত-চর্চা উত্তমরূপে করিব এবং দুই একটি ছাত্র তৈয়ার করিব, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পরিশ্রমে অসমর্থ হওয়ায় তাহা হইল না। ১০/১৫

বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব স্থির করিয়া “স্বরলিপি-সংগ্রহ” পুস্তক লিখিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম কাশীতে “সঙ্গীত মহাসম্মেলন” হইবে। শুনিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বরোদা ও দিল্লীর সভার কথা মনে হওয়াতে সম্মেলন সভা একটা বাহু আড়ম্বর মাত্র মনে হইল। বহু-বাহুবদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু লিখিবার বা বলিবার নিমিত্ত অম্লরোধ করায় আমি একটি ছোট লেখা সভার কর্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনোনীত না হওয়ায় উক্ত লেখাটি (স্বরলিপি প্রথার বিরোধী) সভায় পঠিত হয় নাই। আমি উহা পুস্তকাকারে “প্রাচ্য সঙ্গীত-তথ্য” নামে সাধারণকে জ্ঞাত করিয়াছি। কর্তৃপক্ষেরা হিন্দু-সঙ্গীতকে ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই করিতে চাহেন। তাহাতে যে আমাদের সামগ্রীটির স্বরূপ পরিবর্তিত হইতেছে তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিবেছেন না। আমার বক্তব্যের সারাংশ এই যে, স্বরলিপির দ্বারা আমাদের সঙ্গীতের আসল রূপটি প্রকাশ হইতে পারে না এবং যাহা রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা কাগজে কলমে থাকিলেও কণ্ঠে কেহ ঠিক বাহির করিতে পারেন না। প্রথমে ক্ষেত্রমোহন ষ্ট্রোগোশামী, পরে কৃষ্ণবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার পরে চাকচরণ মুখোপাধ্যায় এবং অন্ত্যস্ত অনেকে স্বরলিপি দ্বারা নিজেদের শিক্ষার উপায় করিয়াছেন বটে, কিন্তু অত্র কেহ সে উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গুরুহীন বিজ্ঞা কখনো হইতেই পারে না এবং স্বরলিপিকর্তাগণ অত্যাবশ্যকীয় পরিশ্রম ও সাধনার (গুরু সমক্ষে এবং স্বাধীনভাবে) লাঘব করিবার তথাবঞ্চিত একটি উপায় বাহির করিয়া ধ্রুপদের ধ্বংস করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন; এই আমার ধারণা।

কাশীতে মহাসম্মেলনের সময় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাটখণ্ডে মহাশয় আসেন এবং আমার নিকট চারখানি ধ্রুপদ (চারি রাগের) স্বরলিপি দ্বারা শিক্ষা করেন। আমি তাঁহাকে গান করিতে বলায় তিনি “পরে হইবে” বলিয়া চলিয়া যান। পরে তিনি অনেকবার এদিকে

আসিচ্ছিন, কিন্তু আমাকে গানগুলি শুনান ত দূরের কথা, আমার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি যখন ঐ গানগুলি ৪:৫ দিন ধরিয়া আমাব নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনের ভাব “বিজ্ঞা প্রচার” ছিল, পরে যখন প্রচার-কার্য্য কিরূপ হইবে দ্বিধাশা করায় “পরে হইবে” উক্তব পাওয়া গেল তখনই বুঝা গেল যে ইনিও পুঁথি বোঝাই করিতে চাহেন এবং গুরু নাম করিতে না হয় তাহারই চেষ্টায় আছেন।

কয়েক বৎসর পরে উক্ত সম্মেলন সভা লক্ষৌ মহা-নগরীতে বসিবার কথা শুনা গেল। চারিদিকে হলদুল পড়িয়া গেল, কোথায় কার কাছে ভাল গান আছে, কোথায় কে ভাল ঠুংরী গাহিতে পারে ইত্যাদি প্রকারের canvassing আবস্ত হইল। আমার নিকট তিন চাবি-খানি পত্র আসিল, তন্মধ্যে একখানির উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি। পত্র-লেখক লক্ষৌএর একজন জমিদার এবং সঙ্গীতজ্ঞ, নাম ঠাকুর নবাবআলি খাঁ। তিনি আমাকে লেখেন, “শুনিয়াছি আপনার নিকট উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ আছে। আপনি অল্পগ্রহ করিয়া সমস্ত ধ্রুপদগুলি যদি পাঠান তবে উপকৃত হইব। আমি অনেক ধ্রুপদ ছাপাইয়াছি (স্বরলিপি করিয়া) তন্মধ্যে যদি আপনার ধ্রুপদগুলি থাকে তবে সেগুলি বাদে অন্তগুলি লইব এবং বাকী ফেরৎ দিব।”—এই ভাব। তাঁহার উত্তবে আমি জানাইলাম যে, আমি সমস্ত ধ্রুপদ গান এবং সরগম বাহা শিক্ষা করিয়াছি পুস্তকাকারে ছাপাইতেছি এবং ছাপা হইলেই পাঠাইয়া দিব। সমযান্তরে আমি ঠাকুর সাহেবকে বইগুলি পাঠাই এবং তন্মধ্যে হইতে কিংদংশ সভায় পঠিত হইবার জন্য তাঁহাকে অহুবোধ করি। তাহা ত হয়ই নাই; পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই।

অপিচ একটি বালক চন্দ্রশেখরকে তিনখানি ধ্রুপদ

শিখাইয়াছিলাম এবং উক্ত সম্মেলন সভায় যখন সে যায় তখন আমি তাহার মাতুলকে বলিয়া দিয়াছিলাম যেন ঐ তিনখানি গান সেখানে তাহাকে দিয়া গাওয়ান হয়। তাহাও হয় নাই। ইহাতে কি বুঝা যায়? উক্ত মহা সম্মেলন বসিবার সময় ময়মনসিংহ জেলার তদ্বর্ত্ত গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর চৌধুরী মহাশয় কাশীধামে ছিলেন। তাঁহারও ধারণা—স্বরলিপি ওধাতে গান শিক্ষা হইতে পাবে। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহারই আশ্রয় দ্বারা ৮:১০ টি ধ্রুপদ আমার নিকট হইতে স্বরলিপি করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আমাকে শুনান হয় নাই। আমার বিশ্বাস যে, ঐ গানগুলি তাঁহার পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া একেবারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঐ ধ্রুপদগুলি আদায় করিতে এবং সাধন দ্বাবায় লয়ে সুরে তৈয়ার করিতে দুই তিন বৎসর লাগে, কিন্তু স্বরলিপি কবিত্তে গেলে ৪:৫ দিনেই হয় এবং তাহাই হইয়াছে। পুস্তক মধ্যে দিচ্চা থাকে না। শিক্ষা দ্বারাই উহা রক্ষিত হয়। স্বরলিপি পুস্তকে বর্ণ অথবা বোল থাকে, সুর কোথায়?

সাধনা না হইলে সিদ্ধি হইতে পারে না এবং সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে একাগ্রতা চাই, পরিশ্রম চাই, একনিষ্ঠতা চাই এবং পথ-প্রদর্শক জীবন্ত গুরু চাই। সঙ্গীতের আসল স্বরূপ দেখিতে হইলে কোন প্রকারের ফাঁকি চলিবে না। তাই যে ভীষণ পরিবর্ত্তন বিগত ৫০ বৎসরে চক্ষুর-সম্মুখে দেখিলাম তাহার বিরুদ্ধে দুই চারিটি কথা বলিলাম। স্বরলিপি দ্বারা আমাদের সঙ্গীতের স্বরূপ দেখান যায় না এবং সঙ্গীত শিক্ষা কখনো হইতে পারে না। ইহাই আমার ধারণা।

সমাপ্ত

লাটের স্পেশাল

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মাথের ঝিগ্রহর। আন্ধিনায় রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া বেণু সর্দার সম্মুখে একখানি পাথরের খালায় এক রাশ সর্ক-চাকলি, লইয়া মাধ্যাহ্নিক জলযোগের উপক্রম করিতেছিল। রজনীন ভিজ্রা গাম্ছা-খানিতে মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া জী বিরাজ পিঠার কাঠ হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় আহ্বান আসিল, “সর্দারের পো। বাইরে এসতো একবার।”

দফাদারের বর্ধষব শুনিয়া বেণু উঠিয়া পড়িতেছিল, বিরাজ তাড়াতাড়ি কহিল, “মুখের ‘গাম্’টা খেয়ে যাও গো।”

“হু’খানা খেয়ে আমার পেট ভরবে নারে, বিরাজ। তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি এন্ধুনি আসছি।”

বেণু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেল।

মিনিট দশ পর ফিরিয়া আসিয়া হতাশস্বর বেণু কহিল, “আমার আর তোর হাতের সর্কচাকলি খাওয়া অদেষ্টে নেইরে, বিরাজ। দে দিকিন্ পাগড়ীটা এখুনি আবার বেরোতে হ’বে।”

“এই ভর ছুপুর্বে আবার কোন্ গোড়ার মুখের মুখ পুড়েছে যে, তোমায় যেতে হ’বে?” বিরাজ কহিল।

“টেচাসুনিরে পাগলী। লাটের গাড়ী আসছে, পাহারায় যেতে হ’বে। দে পাগড়ীটা। দাঁড়াও গো দফাদার দা, পাগড়ীটা বেঁধে যাচ্ছি।” ঘরের দিকে চাহিয়া বেণু কহিল।

বাহির হইতে জবাব আসিল, “একটু চট্-পট্-সেরে নাও, সর্দারের পো। যেতে হ’বে আবার পাকা ছ’কোশ।”

পাগড়ী বাঁধা শেষ হইলে বিরাজ হু’খানা সর্কচাকলি হাতে করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিল, “আমার মাথা খাও, এই হু’খানি গালে দিয়া এক ঘটি জল খেয়ে যাও। সেদিনও গড়েছি, খেলে না, কোথায় মড়া আগলাতে গেলে! আজ—”

“এখন খেলে আর হাঁটতে পারব নারে, বিরাজ। সাঁঝে গাড়ী পার ক’রে দিয়ে পহর রাতেই ফিরে আসব। তুই উছনে একটু জল বসিয়ে রাখিস্ পিঠেগুলো ডালো ক’রে ঢেকে রাখগে।” বলিয়া পিষ্টক-স্তূপের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া লাঠি হাতে বেণু চৌকীদার বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সর্কাপেক্ষা প্রীতিকর এই খাচ্ছটি অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও সে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে পারিল না। পিঠাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া বিরাজ গাম্ছায় চোখ মুছিল।

ঘরের বিয়টিকে ভো বেণু কোনমতে কাটাইয়া আসিল, কিন্তু পথে আর এক বিয় উপস্থিত, একটি স্বল্পজল অন্ধকার ডোবার ধারে বেণুব সাত বছরের পুত্র মনাই বঁড়স্ট নাচাইয়া ‘চ্যাং’ মাছ ধরিতেছিল। প্রত্যহ ঝিগ্রহরে এইটি ছিল তাহার নিত্যকর্ম। বেণু তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্ত অতি লঘুপদে আসিতেছিল কিন্তু মনাইকে ফাঁকি দিতে পারিল না। পিতার পরিচিত নীল পাগড়ী সে দূর হইতেই দেখিয়াছিল, কিন্তু পিতা অস্ত্র পথে চলিয়া যাইবে ভয়ে ভাবে ভীতিতে কোনো রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। বেণু সতর্ক পদে নিকটে আসিতেই, সে ছিপ ফেলিয়া এক লম্ফে পথের মাঝখানে উঠিয়া আসিল এবং তাহার পোষাকের প্রাস্ত মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, “কোথা যাচ্ছ, বাবা?” বেণু বিপদে পড়িল। সত্য কথা বলিলে মনাই সঙ্গে যাইবার জিদ-ধরিবে। একটু ভাবিয়া কহিল, “কালীতলায়।”

জগতে মনাইয়ের ভীতির একমাত্র স্থান ছিল এই বারোয়ারী কালীতলা। সেখানে ষত ভূত আর শ্বেতের আড্ডা, কোন স্ত্রে এই তত্বটি তাহার শিশু মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়া ছিল। কালীতলার নাম শুনিয়া সে এক পা

পিছাইয়া গিয়া কহিল, “সাঁঝের আগে ফিরবে বাবা, জানলে?”

পুত্রের শঙ্কাবিহীন দৃষ্টি দেখিয়া বেণু কহিল, “সাঁঝের আগেই ফিরব মনাই, তুই ঘরে যা।” তাহার পর পুত্রকে একটি চুমা দিবার অভিপ্রায়ে দুইহাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে তুলিতে বাইতেছিল, এমন সময় পিছনে দফাদার কহিয়া উঠিল, “পথে দাঁড়িয়ে আর দেবী কোরোন, সর্দারের পো, বেলা ভাটিয়ে আসছে।”

অগত্যা মাথা নীচু করিয়া পুত্রের গালে তাড়াতাড়ি একটা চুমা দিয়া বেণু কহিল, “ঘরে যা মনাই তোরা মা পিঠে নিয়ে ব’সে আছে।” পিঠার কথা শুনিয়া সে ছিপগাছি তুলিয়া লইয়া বিনাবাক্যে বাড়ীর পথ ধরিল এবং কিছুদূর গিয়া গলিব মোড়ের বেত-ঝোপের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া পিতাকে অবশ্য অবশ্য সম্ভ্যার পূর্বে ঘরে ফিরিবার জন্ত দ্বিতীয় বার উপদেশ দিয়া গেল।

(২)

শীতের ছোট শেষ বেলাটি অনেকক্ষণ পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতি চম্পিশ হাত অস্তুর চৌকীদার নাম ধারী এক-একটি মানব-সন্তান লাঠি ঘাড়ে করিয়া লাটের স্পেশালের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া খোলামাঠের তীব্র হাওয়ায় শীতে কাঁপিতেছিল। গাড়ী আসিবার সময় ছিল সম্ভ্যায়, কিন্তু রাজি, প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল গাড়ী তখনও আসিল না। বেণু অধীর হইয়া উঠিল। দিব্য চক্ষে সে দেখিতে পাইল, পাথরের থালায় সরুচাকুলি সাজাইয়া এতক্ষণে বিরাজ প্রদীপ জালিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বেণু জিজ্ঞাসা করিল, “গাড়ীর খবর কি, দফাদার দা?”

দফাদার নিজেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, “মালিক হজুরের হুকুম তামিল করুতে এসেছি। থানা থেকে ব’লে দিলে সাঁঝ বেলায় যাবে গাড়ী, এখন তো রাত এক পহর। কাঁথাখানাও আনি নি।” দফাদার মাথার পাগড়ী খুলিয়া গায়ে জড়াইল। শীত তখন ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল।

বসন্ত: গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘট। পাঁচেক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গণ্ডগ্রামের চৌকীদারের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে নাই।

এমন সময় মেঘ করিয়া আসিল। চৌকীদারের দল প্রমাদ গণিল। ইহার পর যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রাণ লইয়া গৃহে ফেরা অসম্ভব, এ কথা দফাদারকে স্পষ্ট-ভাষায় জানাইতে কেহই দ্বিধা করিল না। দফাদার একটি ছোট পুটুলী উচু করিয়া ধরিয়া কহিল; “শীতের ঝুণ সন্ধে নিয়ে এসেছি। আর দেখি।” ইজিতটা সকলেই বুঝিল, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে “বোম্ বোম্ ভোলানাথ” শব্দে স্থানটি মুখর হইয়া উঠিল এবং গঞ্জিকার ধূমে অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। দফাদার ডাকিল, “সর্দারের পো, কোথায় গা?”

বেণু জবাব দিল “উহু। আমি থাক না, দফাদার দা।”

এক কালে সে পুরানস্তুর গঞ্জিকা-সেবী ছিল কিন্তু বৎসর তিনেক হইল বিরাজ তাহাকে তাহার শাখা সিঁচুরের দিব্য দিয়া নেশা ছাড়াইয়াছে; সেই অবধি বেণু গাঁজার কলিকা স্পর্শ করে নাই। শীতের ঝুণ সেবন করিয়া চৌকীদারের দল কিছুক্ষণের জন্ত নিশ্চল হইল। কেবল মাত্র বেণু দুই হাঁটু মুড়িয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হুস্! হুস্!

“উঠে দাঁড়া সব। লাঠি ঘাড়ে ঠিক হ’লে সামনে চেয়ে থাক।”

‘দফাদার হাকিল।

হুস্! হুস্! গাড়ী চলিয়া গেল—মাল-গাড়ী।

বিরক্ত হইয়া চৌকীদারেরা অদৃষ্টকে অভিনন্দিত মিল। দফাদার কহিল, “শীতের ঝুণ আর একবার তৈরী করে’ নাও দেখি, শীত ভয়ে ভাগবে।”

ঐষ সেবন চলিতে থাকিল, দূর হইতে বেণু ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

রাজি দশটায় দুই এক ফোটা বৃষ্টি পড়িল। বেণু কোনো ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সন্ধ্যা চার পাঁচ জন করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ভূমি-শস্যায় আশ্রয় লইয়াছে।

বেণুর মনে হিংসা হইল। সর্কাজ তখন অসহ্য শীতে আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল; পদতলের পাথরের ছাড়িগুলি মনে হইতেছিল বরফের টুকরার মত। কিছু দূরে তাবের

বেড়ায় হেলান দিয়া দফাদার ঘুমাইতেছিল। বেণু কিছুক্ষণ কি ভাবিল তাহার পর দফাদারের গাঁজার সরঞ্জামের পুটলীটি বাহির করিয়া আনিল। কলিকায় আগুন দিয়া সে মুহূ স্বরে কহিল, “কিছু মনে করিস্নি, বিরাজ! তোর শাখা-সিঁচুব অক্ষয় হোক! আজ এক টান না টান্লে আর বাঁচব না। বোম্। বোম্।”

অনেক দিনের অনভ্যাস, কলিকায় বার দুই দম দিতেই বেণুব মাথা ঘুরিয়া উঠিল, লাইনের দিকে ঠিকুরিয়া পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, “মাথায় একটু জল দাও গো, দফাদার দা! সারা পিরুখিম ঘুবুছে।” তাহার আড়ষ্ট-কণ্ঠ হইতে কথাগুলি বাহিব হইল অতি কৌশ্বরে, তাহাতে দফাদারের নিজাভঙ্গ হইল না।

মধ্য রাত্রি। হিমসিক্ত আচ্ছাদনের নীচে কুণ্ডলী করিয়া তল্লাচ্ছন্ন প্রহরীর দল কাঁপিতেছিল। এমন সময় দূরের কোনো সজাগ প্রাণীর কণ্ঠ শোনা গেল, “লাটের গাড়ী! লাটের গাড়ী!”

প্রদীপ্ত আলোক-ফলকে নিশীথের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া রক্ত-চক্ষু লৌহ দানব ছুটিয়া আসিল। চৌকীদারের দল কাঁপিতে কাঁপিতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেবল উঠিল না একজন। যেখানে বেণু সর্দার পাহারায় ছিল সেখান হইতে অতি ক্ষীণ একটি আর্জনার শোনা গেল—মুহূর্তের জন্ত; এঞ্জিন কোনও অজ্ঞাত বস্তুতে বাধা পাইয়া একটু তুলিল কিন্তু তাহার গতি মন্বব হইল না।

স্পেশাল চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইল যে লাটের গাড়ী নিরাপদে সহরে পৌঁছিয়াছে।

বেণু সর্দারের নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড যখন সহরের ‘মর্গ’ হইতে শতদীর্ঘ হইয়া ফিরিয়া আসিল তাহার পূর্বেই বিরাজের সন্মুখাঙ্গুলি শুধাইয়া কাঁঠ হইয়া গিয়াছে।

চম্পায় হিন্দু-উপনিবেশ

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপনের পর থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোচনা চলছে। তখন থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষত্বটি জানবার চেষ্টা হচ্ছে। সেই আলোচনায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের অনেক কথা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু ভারতীয় প্রতিভা যে সেই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্মকে ভারতের গণ্ডীর বাইরেও প্রচার করেছিল, সেই কথাটাই সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েনি। যদিও সময়ে সময়ে যবদ্বীপে বা শ্রামে বৌদ্ধ মন্দির লোকচক্ষুর গোচরে পতিত হয়েছে, যদিও জাপান বা চীনে অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ মূর্তি অনেক সময় দেখা গেছে, যদিও বালিদ্বীপে এখনও ব্রাহ্মণ্য-

ধর্মের পরিচয় পাওয়া গেছে, তবু সে সব চিহ্নকে ঐতিহাসিকরা অগ্রাহ্য করেছিলেন বহুকাল। তাঁরা সেই সবকে ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ বলে মানতে চাইলেন না। এ সম্বন্ধে শেষে কাজ আরম্ভ করলেন ফরাসী ও ডাচ পণ্ডিতরা। চীন, জাপান, শ্রাম, চম্পা, কাশ্মিরিয়ায় যে এক সময়ে “বৃহত্তর ভারত” স্থাপিত হয়েছিল, তাব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন ফরাসী পণ্ডিতরা। আব যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ সম্বন্ধে ডাচ পণ্ডিতরা অল্পসন্ধান শুরু করলেন। যখন এইসব দেশে “বৃহত্তর ভারত” সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল, তখন ভারতবর্ষ সে-বিষয়ে একেবারে নির্বিকার ছিল। তার কারণ হচ্ছে এই যে, সে-বিষয়ের আলোচনা ইংরেজ তখনও

আরম্ভ করেননি। ইংরেজীতে এ-বিষয়ে কোন বই লেখা হয়নি বলে, ভারতবর্ষীয়দের দৃষ্টি এখনও সেদিকে পড়েনি।

দ্বিতীয় রাজবংশ

(পূর্ব প্রবন্ধে আমরা বলেছি কি ক'রে ভারতীয়গণ চম্পারাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করলে ও ক্রমশঃ কি ভাবে সেখানে হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত হ'ল। এখন আমরা সেই হিন্দু রাজ্যের ক্রমবিকাশের কথা বলব।) চম্পার প্রথম রাজবংশ “শ্রীমার” দ্বারা স্থাপিত হয়। সেজন্য তাঁর রাজবংশ “শ্রীমার রাজকুল” নামে খ্যাত। সেদেশে দ্বিতীয় রাজবংশ আরম্ভ হয় খৃঃ অব্দ ৩৩৬ থেকে ও ৪২০ অব্দ পর্যন্ত থাকে। দ্বিতীয় রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম—“ধর্ম মহারাজ শ্রীভদ্র বর্মণ।” এদেশের ইতিহাসে আমরা ভদ্রবর্মণ নামে আরও রাজা পাই। সেজন্য এই রাজাকে আমরা ১ম ভদ্রবর্মণ বলে উল্লেখ করছি। তাঁর এক শতাব্দী আগে চম্পায় হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে হিন্দু সভ্যতা সেখানে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। হিন্দু সভ্যতার যা যা অঙ্গ সে সকলই চম্পায় এসে স্থান পেলে। এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ প্রথমে চম্পায় হিন্দু বণিকরা এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছে, ক্রমশঃ তারা বসবাসও আরম্ভ করল। শেষে যখন রাজশক্তিও হিন্দুদের হাতে এল, তখন সেখানে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু আচার-ব্যবহার গিয়ে হাজির হ'ল। রাজার উৎসাহ পেয়ে সেখানে হিন্দুদেব-দেবীর ক্ষুদ্র মন্দিরও স্থাপিত হ'তে লাগল, রাজা দেবপূজার ক্ষুদ্র যথেষ্ট ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম যে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক গুণী ছাড়িয়ে ভারতের বাইরে গিয়েছিল, সে কথা আজকাল অনেকেই জানেন ও তার প্রমাণও চীন, জাপান, তিব্বতে রয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম যে, কখনও ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারে এধারণাই অনেকের ছিল না। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা ক'রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হিন্দুধর্মও গ্রামদেশ, চম্পা, যবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হয়েছিল। চম্পায় যখন প্রথম রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল তখনই হিন্দু-

মন্দির সেখানে তৈরী হ'তে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় রাজবংশের ধর্ম মহারাজ শ্রীভদ্রবর্মণ যখন রাজা হন, তখন তিনি সেদেশে শিবমন্দির স্থাপন করেন। প্রথম ভদ্রবর্মণের নামে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে, ফরাসী ঐতিহাসিক M. Finot সেগুলির পাঠোদ্ধার করেছেন। সেই শিলালিপির অক্ষর দেখে পণ্ডিতরা অস্বীকার করেন যে, প্রায় ৪০০ খৃঃ অব্দে শিলালিপিগুলি প্রচারিত হ'য়েছিল। তাঁর শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। শৈব ধর্মের বিস্তার চম্পাদেশে তাঁরই সময় আরম্ভ হয়। শিবপূজার ক্ষুদ্র বা অল্প অল্প দেবপূজার ক্ষুদ্র সেদেশে তখন ব্রাহ্মণ পুরে হিতের প্রয়োজন হয়েছিল। সম্ভবতঃ সেদেশে তখন যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরাই পুরোহিতের কার্য করতেন। ভারতবর্ষ থেকে শুধু পূজার ক্ষুদ্র কোন ব্রাহ্মণ নষ্টদায় চম্পায় গিয়েছিল কিনা তার কোন ইতিহাস এখনও আমরা পাইনি। হয়ত চম্পাদেশে যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণের স্থান কেহ কেহ গ্রহণ করেছিল। শিলালিপিতে আমরা অনেক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাই।

আগে বলা হয়েছে যে, ধর্মমহারাজ শ্রীভদ্রবর্মণ শিবের উপাসক ছিলেন। তিনি Mi-son-তে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই শিবের নামকরণ হয় ধর্ম মহারাজ ভদ্রবর্মণেরই নাম অনুসারে “ভদ্রেশ্বর।”। প্রতিষ্ঠাতা রাজার নাম অনুসারে দেবমূর্তির নাম রাখা প্রথা চম্পা-দেশে খুব প্রচলিত ছিল। ভদ্রবর্মণ রাজার আর-একটি শিলালিপিতে আমরা এই ভদ্রেশ্বর শিবের উল্লেখ পাই। তাতে লিখিত আছে “ভদ্রেশ্বর-স্বামিপাদপ্রসাদাৎ।” চম্পাদেশে শিবপূজার প্রচলন খুব বেশী হয়েছিল। শিবকে আমরা চম্পায় নানারূপে ও নানা নামে দেখতে পাই, যেমন ‘কুন্ড’, ‘মহেশ্বর’, ‘পশুপতি’, ‘ঈশান’। সেদেশে শিবের স্থান যে খুব উচ্চ ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, চম্পার রাজধানী চম্পাপুরের রক্ষক দেবতা হ'লেন—মহাদেব। রাজা ভদ্রবর্মণ “ভদ্রেশ্বর” শিব স্থাপন করেন। শিব-মন্দিরের কাছে যে জমি ছিল তা গোবাস্তর স্বরূপে দান করেন ও ঘোষণা করেন যে, সেই জমির আয়ের ছয় অংশ রাজা গ্রহণ করবেন ও বাকি দশ অংশ

শিবপূজার জন্ত ব্যয়িত হবে। তিনি ভবিষ্যৎ রাজাদের উদ্দেশ্য ক'রে এই কথা বলেন যে, যেন কোন রাজা এই দেবোত্তর দানের উপর হস্তক্ষেপ না করেন। সূত্রে বিষয়— তাঁর এই প্রার্থনা বিফল হয় নি, কারণ আমরা জানি তাঁর পরে অনেক রাজা ঠিক এই জায়গায় অনেক মন্দির স্থাপন করেছেন ও সেইসব মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্ত আরও অনেক দেবোত্তর জমি ও অর্থদান করেছেন। সেইসব মন্দিরের ধনসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই রকমে হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ শৈবধর্ম, চম্পাদেশে প্রাধান্য লাভ করল। চম্পায় হিন্দুধর্মের এই যে বিস্তার, তার কারণ হয়ত এই যে, হিন্দুধর্ম সে সময় এই হিন্দু উপনিবেশে রাজধর্ম হয়েছে। হিন্দুধর্ম রাজার ধর্ম হওয়াতে, সেখানকার সাধারণ লোকদের মধ্যে সেই ধর্ম গ্রহণ করবার একটি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। আর হিন্দুধর্ম বোধ হয় সাধারণ লোকদের মনকে তার পূজাপদ্ধতি ও উৎসবের মধ্য দিয়ে জয় করতে পেরেছিল।

এতক্ষণ আমরা চম্পাদেশকে “হিন্দু উপনিবেশ” ব'লে বর্ণনা ক'রে এসেছি। কিন্তু এখানে উপনিবেশ ঠিক বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ভারতবর্ষ থেকে প্রথমে একদল বণিক সে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যায়, পরে একদল ভারতবাসী কোন উপায়ে সেখানকার রাজস্ব হস্তগত করে। সেখানে এই রকমে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হ'বার পর, সেইসব হিন্দুদের কিন্তু স্বদেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রইল না। ভারতবর্ষের কোন রাজা বা সম্রাট তাঁর প্রজাদের দ্বারা স্থাপিত এই রকম কোন উপনিবেশের উপর নিজের অধিকার বিস্তার করেন নাই। সেখানকার হিন্দুরাও স্বদেশের কোন রাজার সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা করেন নি। এই রকমে শ্রামদেশ বল, বা কাছোড়িয়া বল, বা চম্পা বল, সবদেশই স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পৃথক পৃথক রাজ্যরূপে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বড় বড় রাজা বা একছত্রাধিপতি সম্রাট ধারা হয়েছিলেন, তাঁদের রাজ্য ভারতবর্ষের বাইরে বোধ হয় বিস্তৃত হয়নি। আর তাঁদের রাজ্য বা সাম্রাজ্যও তাঁদের মৃত্যুর পর অধিককাল স্থায়ী হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাই যেন আলাদা আলাদা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে

উঠা; সেই ধারা ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েও হাজির হয়েছিল। তাই যখন হিন্দুরা ভারতের বাইরে গিয়ে রাজ্য বা উপনিবেশ স্থাপন করলে, তখন সেগুলি পৃথক রাজ্য রূপে পরিণত হ'ল। তারা সে সময়কার নিজেদের দেশেব কোন রাজাকে অধিপতি ব'লে স্বীকার ক'রে নিল না, বরং নিজেদের স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করেছে। তার ফলে এই হয়েছে যে ভারতবর্ষ তার উপনিবেশের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে পাবেনি। সেইজন্তে ভারতবর্ষ যে তার সম্ভানদের এদেশের বাইরে কোন উপনিবেশ স্থাপন করতে পাঠিয়েছিল ভারতবর্ষে তার কোন প্রমাণ আমরা এখন খুঁজে পাচ্ছি না। যা কিছু প্রমাণ তা আমরা পাচ্ছি সেই উপনিবেশের মন্দিরে, শিলালিপিতে ও সাহিত্যে।

তবে সূত্রে বিষয় আমরা একটা উদাহরণ পাই, যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, চম্পাদেশের এক রাজা নিজের রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হন। সেই রাজার কথা আমরা আগে একবার উল্লেখ করেছি অত্র প্রবন্ধে, তাঁর নাম—গঙ্গারাজ। তিনি প্রথম ভদ্রবর্মণের পুত্র। তাঁর কথা আমরা শিলালিপিতে পাই, চীনা ইহিতেও পাই। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, গঙ্গারাজের রাজ্যোচিত গুণ, “বীৰ্য্য” “শ্রুতি” ছিল। যদিও রাজ্যত্যাগ ক'রা শব্দ (“রাজ্যং ত্যক্ত্বা”) তবুও তিনি কোন কারণে নিজের রাজসিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর রাজ্য-ত্যাগের কারণ আমরা শিলালিপিতে পাই না, সেটা চীনা বই থেকে পাওয়া যায়। চীনা বই থেকে আমরা জানি যে, তাঁর ভাই কোন অজানা কারণ বশতঃ তাঁর মাতার সঙ্গে রাজধানী থেকে চ'লে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি ব'লে, গঙ্গারাজ নিজের রাজসিংহাসন ত্যাগ করলেন। তখন হঠাৎ তিনি স্থির করলেন যে, সেই সুদূর চম্পাদেশ থেকে ভারতবর্ষে আসবেন। এ আসার উদ্দেশ্য বোধ হয় গঙ্গানদা দেখা। সম্ভবতঃ তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'য়েছিল, তাই তিনি গঙ্গানদা দেখে পাপক্ষয় করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। প্রবাসী ভারতবাসীর বোধ হয় এই একমাত্র উদাহরণ যখন প্রবাস থেকে ভারতবাসী তীর্থযাত্রার ভারতে এসেছেন। তবে তিনি কোথায় এলেন ও তাঁর পরিবর্তী ইতিহাস কি সে-সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শাসন-পদ্ধতি ✓

চম্পার রাজবংশ হিন্দুরাজবংশ, স্বতরাং তার শাসন-পদ্ধতিও ভারতীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। চম্পা বা শ্যাম দেশের শাসন-পদ্ধতি দেখলে আমাদের দেশের আগেকার কালের শাসন-পদ্ধতির কথা মনে হয়। ঠিক যেন হিন্দু দণ্ডনীতি সমুদ্রপারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চম্পার রাজসভা ঠিক যেন হিন্দু রাজসভা, সেখানে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী ও পণ্ডিতদের আমরা দেখতে পাই। হিন্দুরাজারা যেমন শাস্ত্র-শাসনে পরিচালিত হ'তেন, চম্পার রাজারাও সেই-রকম শাস্ত্রবাক্যকেই প্রধান স্থান দিতেন। আর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের পরামর্শদাতা, অবশ্য সব সময়েই রাজা যে ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারে চলতেন তা নয়।

শাসনের সুবিধার জন্য চম্পাদেশটি তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইসব প্রদেশ-গুলির নাম একেবারে ভারতীয়। এটি ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বলতে হবে। প্রদেশগুলির নাম :—(১) অমরা-বতী—উত্তর চম্পায়। এ প্রদেশে ইন্দ্রপুত্র নদ ছিল, সেটি এক সময়ে চম্পার রাজধানী ছিল।

(২) বিজয়—মধ্য চম্পায়। এখানকার প্রধান সহর, ১০০০ অব্দ থেকে চম্পার রাজধানী হয়েছিল।

(৩) পাণ্ডুরঙ্গ—দক্ষিণ চম্পায় অবস্থিত।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। এই তিনটি প্রদেশ তৃতীয় হরিবর্ষের রাজত্বকালে ৬৮ অংশে বিভক্ত ছিল। তৃতীয় হরিবর্ষ ১০৭৬ অব্দ থেকে ১০৮০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে সাবা চম্পারাজ্যে ৩০,০০০ পরিবার ছিল। শিলালিপি থেকে আমরা জমির দুটো ভাগের নাম পাই—(১) প্রমার ও (২) বিজয়। শাসনের জন্য যে বিভাগ সেটির নাম প্রমার, ও সামন্তদের যে বিভাগ সেটির নাম বিজয়। চীন বই থেকে জানা যায় যে, এক-একটি গ্রাম বা সহরের লোক-সংখ্যা তিন থেকে ৫০০ পরিবার ছিল, অনেক সময় ৭০০ পরিবারও থাকত। রাজধানীতে আরও বেশী পরিবার বাস করত, যেমন ১০৬৯ খৃঃ অব্দে বিজয়ে ২৫৬০টি পরিবার বাস করত। আর-একটি বিভাগের নাম আমরা পাই, সেটি হচ্ছে—বিষয়। পাল ও গুপ্ত রাজাদের শিলালিপিতেও আমরা “বিষয়ের” উল্লেখ পাই, সেখানে বিষয় “জেলা” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এইভাবে চম্পায় হিন্দু শাসন-প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সেই শাসন-প্রথা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যখন ভারতবর্ষে মুসলমান রাজারা প্রবলপ্রভাবে রাজত্ব করছিলেন, সে-সময়ও চম্পায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন ভারতবর্ষে তোগলক বংশের তথা পাঠান সাম্রাজ্যের পতন হ'য়ে আসছিল, সেই সময়ই চম্পায় হিন্দুরাজ্যের বিলোপ হয়।

সত্তর বৎসর

শ্রী.বিপিনচন্দ্র পাল

সামাজিক চিত্র। (ব্রিটিশ সহরে)

(১৯)

ব্রিটিশ সাহায্যপ্রদান স্থানে। সহরে সাহারাই খনসম্পদে হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার বাল্যকালে আমরা সাহায্যগকে শুড়ি বলিয়া ভাবিতাম। এইজন্য

সহরের ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকেরা ইহাদিগের সঙ্গে পানাহার করিতেন না।

“হস্তিনা তাড়িতেনাপি ন গচ্ছেৎ শুভিকালয়ম্”

এই প্রাচীন অশুশাসন অরণ করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ

কায়স্থাদি ভদ্রলোকেরা সাহাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেন না। আমবা, বালকের দল, প্রায় সর্বদাই জ্যেষ্ঠ-দিগেব মুখে এই শ্লোকটা শুনিতাম। আমার বাবা সাহাদিগের বাড়ীর পুকুরে পা পর্য্যন্ত ধুইতেন না। সহরের বড় বড় ধনী সাহারা তাঁহার মজ্জল ছিলেন। ইহার বর্ষোপলক্ষে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আসিলে যতক্ষণ করাস হইতে হুকো না সরান হইয়াছে, ততক্ষণ তাহাতে বসিতেন না। মুসলমানদিগের জন্ত যেমন ফরাসের সম্মুখে স্বতন্ত্র কেদারা বা চেয়ার সাজান থাকিত, সাহাদিগের জন্তও সেই ব্যবস্থা ছিল। ইহার আজিকালিকার কথা, “অম্পৃশ্যজাতি” বলিয়া গণ্য ছিলেন। অথচ বিদ্যাবুদ্ধিতে, কিংবা ধনসম্পদে ইহার ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অপেক্ষা হীন ছিলেন না। খ্রীষ্টের সাহারা সকালে প্রায়ই বৈষ্ণবকায়স্থদিগের ছেলেমেয়ে আনিয়া নিজেদের পুত্রকন্তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ার চেষ্টা করিতেন। দরিদ্র বৈষ্ণবকায়স্থেরা টাকার লোভে উপযুক্ত মূল্য লইয়া সাহাদিগকে নিজেদের পুত্রকন্তা বিক্রয় করিতেন। বিক্রয় বলিতেছি এইজন্য যে ইহা স্বজাতির মধ্যে বিবাহের যে বরপণ বা কস্তাপণ গৃহীত হয় সেরূপ ছিল না। সাহাদের পরিবারে কোন কায়স্থবৈদ্য বালক-বালিকার বিবাহ হইলে তাহার আঁর কায়স্থবৈদ্য সমাজে থাকিতে পারিত না। পিতৃপরিবারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চিরদিনের মতন ছিন্ন হইয়া যাইত। মেয়েরা বিবাহের পরে বাপের বাড়ী আসিতে পারিত না; ছেলেরাও নিজেদের পিতৃমাতৃকুলের স্বজনদিগের সঙ্গে পানাহার করিতে পাইত না। মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান হইলে হিন্দু যেমন একেবারে জাতিচ্যুত হয়, সাহাদিগের বাড়ী বিবাহ করিয়া বৈদ্যকায়স্থ ছেলে-মেয়েরাও সেইরূপ হইত। অধিকাংশ স্থলে গোপনেই এসকল সম্বন্ধ হইত। মা বাপ লুকাইয়া কস্তা বিক্রয় করিতেন। সাহারা দেখিতে বৈদ্যকায়স্থ অপেক্ষা হীন নহেন। বিশেষতঃ ইহাদের জীলোকেরা হুন্দরী বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রূপের মোহে অনেক সময় প্রাপ্ত-বয়স্ক কায়স্থবৈদ্য যুবকেরাও নিজেদের অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতে সাহা বাড়ীতে যাইয়া লুকাইয়া বিবাহ করিতেন। আমার বাল্যকালে খ্রীষ্ট সহরের কায়স্থবৈদ্যেরা নিজেদের

পরিবারস্থ বালকদিগের জন্ত এই কারণে সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। কোন কারণে কোন বালক বা যুবক স্থল হইতে যথাসময়ে বাড়ী না ফিরিলে ইহাদের মুখ শুধাইয়া যাইত।

একদিন আমাদের বাসাতেও এইজন্য একটু উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার এক মাসতুতো ভাই তখন আমাদের বাসায় থাকিয়া খ্রীষ্টের জিলাস্থলে পড়িতেন। ইনি আমা অপেক্ষা তিনচার বছরের বড় ছিলেন। চিক্রণ শ্রামকান্তি, টানা চোখ, উন্নত নাসিকা, সুগোল স্তন্য দেহযষ্টি, প্রথম যৌবনের সাড়া পাইয়া তখন অতি স্নন্দর হইয়া উঠিয়াছে। একদিন শনিবারে তিনি স্থল হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁহার খোজ-খবর নাই। মা প্রথমে নিজেই চারিদিকের আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। ইহাতে কোন ফল হইল না। তখন অগত্যা বাবার কানে কথাটা তুলিতেই হইল। ইহার কিছুদিন পূর্বে দুই একটি কায়স্থ বালক এইরূপে স্থল হইতে পলাইয়া গিয়া গোপনে সাহাবাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিল। আমাদেরও সেই আশঙ্কা হইল। অনেক খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। পরদিন রবিবার। সেদিনও তাঁহার খোজখবর মিলিল না। এই দুই দিন মায়ের চোখের জল থামে নাই। সোমবার পূর্নাত্মে স্থলে যাইবার সময় ভায়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত। বাবা ভয়ে কোন কথা বলিলেন না। মা, ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া চোখের জল সধরণ করিলেন। ফলতঃ সে-সময়ে খ্রীষ্টের কায়স্থবৈদ্য পরিবার সকল সাহাদের ভয়ে একরূপ ভুড়সড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ভয়ে নিজেদের ছেলেদিগকে শাসন করিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইতেন না, কি জানি তারা গোঁসা করিয়া সাহার বাড়ীতে যাইয়া জন্মেব মত জাতিচ্যুত হইয়া পড়ে।

এখন আমরা জানিয়াছি যে, সাহারা এবং স্ববর্ণবণিকেরা কোনদিন নীচ জাতি ছিলেন না। প্রাচীন বর্ণবিভাগে ইহার বৈষ্ণব ছিলেন, অথচ ইহাদের পূর্বপুরুষেরা বর্ণাশ্রমই মানিতেন না। যুগাবতার ভগবান বৃহদেব প্রাচীন বৈদিক সমাজের ব্যবস্থা একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া দিয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞ এবং যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব

একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নূতন বৌদ্ধ সমাজে বর্ণভেদ ছিল না। শ্রমণ ও গৃহস্থ, বৌদ্ধেরা এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং বৌদ্ধ সমাজের শক্তি নষ্ট হইলে আধুনিক অথবা মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এই যুগসন্ধি সময়ে যে-সকল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ নিজেদের শীল ও সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন নাই, ব্রাহ্মণেরা তাঁহা-দিগকে অস্পৃশ্য করিলেন। এই ভাবেই সাহা, স্ববর্ণবণিক, যোগী প্রভৃতি আধুনিক হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হইলেন। নতুবা কুলে, শীলে, বিদ্যায় বা বিনয়ে, সদাচারে বা সাংসারিক সম্পদে ইহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না এবং হীন নহেন। ইহারা ব্রাহ্মণের নিকটে নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস এবং সমাজ-ব্যবস্থা বিসর্জন দিতে নারাজ হইয়াই ব্রাহ্মণ্য-প্রধান হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন। বিগত ২৫১০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাই এসকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন। আমার বাল্যকালে এসকল কথা কারও জানা ছিল না, স্বতরাং তখনকার লোকে সাহাদিগকে গুঁড়ি ভাবিয়াই সমাজের বাহিরে রাখিয়াছিল। হিন্দু সমাজ এখনও প্রকাশ্যভাবে এই পুরাতন অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। তবে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে একদিকে যেমন বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ সাহা, স্ববর্ণবণিক এবং যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যতার মূল কারণ জানিয়া তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা এখন আর ইহাদিগকে আগেকার মতন হীন চক্ষে দেখেন না।

(২০)

সহরের হিন্দু সমাজে সাহা এবং একদিকে অন্তর্গত কায়স্থবৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বেশ একটা রেবারেঘি ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রকারের কৌমগত (communal) বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না। জমী-জেরাং লইয়া যেমন হিন্দুতে হিন্দুতে সেইরূপ হিন্দু মুসলমানেও মাঝে মাঝে দাঙ্গা-

হানামা হইত। কিন্তু ধর্ম লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও কোন ঝগড়াঝাটি হইত না। শ্রীহট্ট সহরের, এবং বোধ হয় সমগ্র জেলার মধ্যেই, সহরভঙ্গীর মজুমদারেরা মুসলমান সমাজের অগ্রণী ছিলেন। আমার বাল্যকালে সৈয়দ বক্ত মজুমদার মহাশয় এই পরিবারের কর্তা ছিলেন। ইনি অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। একাধিকবার “হজ্জ” করিয়া হাজী উপাধি পাইয়াছিলেন। ধনে, মানে, বিদ্যায়, শীলতায় ইহারা সহরে অতিশয় সম্মান বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইহাদের বাড়ীতে সহরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমারৎ ছিল। যেমন প্রাসাদ, সেইরূপ তার সাজসজ্জাও ছিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান। ভিতরে বেলেয়ারী ঝাড়লঠন-শোভিত বৈঠকখানা, ইংরেজী ক্যানাসনে সজ্জিত। বড় বড় ইংরেজ রাজকর্মচারীরা শ্রীহট্টে যাইলে ইহাদের আতিথা গ্রহণ করিতেন। তখন শ্রীহট্ট বাংলার ছোটলাটের এলাকাভুক্ত ছিল। লার্টসাহেব সফরে যাইয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলে মজুমদার মহাশয়দের বাড়ীতে সমারোহ সহকারে অভ্যর্থিত হইতেন। আসামে একটা পৃথক শাপন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইলে তদানীন্তন বড় লার্ট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩ ইংরেজীতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। সে-সময়ে, আমার মনে আছে, মজুমদার সাহেবেরা খুব ঘটা করিয়া তাঁহাকে ভোজ দিয়াছিলেন।

কিন্তু সেকালে শ্রীহট্টের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই জানিত যে, মজুমদার মহাশয়দের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। হিন্দু সমাজে তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস দস্তিদার। দস্তিদার নবাবী উপাধি। দাস কৌলিক পদবী। আমার মায়ের মাতামহ বংশ দাস ছিলেন। ইহাদেরও দস্তিদার উপাধি ছিল। হরমণি দস্তিদার নামে আমার এক মাতুল ছিলেন। তিনি সচরাচর গ্রামের বাড়ীতেই বাস করিতেন। সহরে আসিলে আমাদের বাসাতেই উঠিতেন। সে সময়ে প্রায়ই মজুমদার সাহেবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহারা নিজেদের জ্ঞাতি বলিয়াই অভির্থনা করিতেন।

শ্রীহট্টের উপকণ্ঠেও এক ঘর দাস দস্তিদার ছিলেন। শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে ইহাদের শ্রেষ্ঠ আসন ছিল।

মজুমদার সাহেবদের মতন না হউক, ইহারাও গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। হরমণি দস্তিদার মহাশয় ইহাদেরও জ্ঞাতি ছিলেন। তখন আমরা জানিতাম মজুমদার এবং দস্তিদার, উভয় পরিবার একই বংশের। এক শাখা কোন কারণে মুসলমান হইয়া পড়েন, আর-এক শাখা হিন্দুই থাকিয়া যান। দস্তিদারদের তখনকার একমাত্র কুল-প্রদীপ নবকৃষ্ণ দস্তিদারের এক ক্রাশে আমি পড়িয়াছি। তখন ইহার সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠ বান্ধবতাও জন্মিয়াছিল। কিছু দিন হইল নবকৃষ্ণ দস্তিদার মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন।



স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ দস্তিদার

তাহার পুত্রদের মধ্যে এখন বোধ হয় একজন আসামে হাকিমি করেন, প্রাদেশিক সার্ভিস ভুক্ত। আর একজন কিছু দিন পূর্বে নতুন আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। মজুমদারেরা যে এককালে ইহাদের জ্ঞাতি ছিলেন, দস্তিদারেরা ইহা স্বীকার করিতেন। সেকালে মজুমদারেরাও এসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিতেন না। রাত্যকালে আমরা জানিতাম যে, শ্রীহট্টের মুসলমান

মজুমদারেরা এবং হিন্দু দস্তিদারেরা উভয়েই হবিগঞ্জের অন্তর্গত দাস পাড়া গ্রাম হইতে আসিয়া সहरতলীতে বাড়া করেন।

(২১)

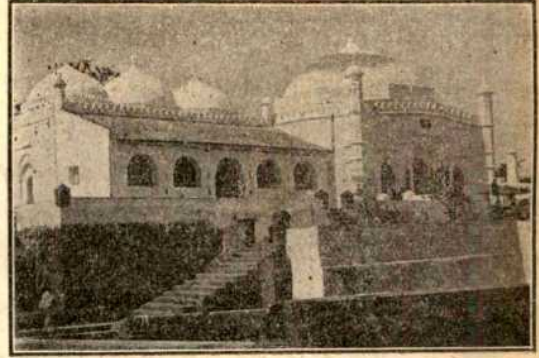
সহরের দক্ষিণে নদী। এই নদীর নাম সূরমা, সুরমা নহে। অনেকে সূরমাকে সুরমা ভাবিয়া থাকেন। সূরমা ফার্সী শব্দ, অর্থ কাজল। এই কাজল অর্থ-দ্যোতক ফার্সী সূরমা শব্দের নামেই আমাদের নদীর নাম হইয়াছিল। এই নদী যখন মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশিত হয় তখন তাহার জল নাকি কালিন্দীর জলের মতন কজ্জল বর্ণের ছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণ দিয়া এই সূরমা নদী প্রবাহিত। নদীর পরপারে খিত্তা নামে একটা বড় গও মুসলমান গ্রাম আছে। খিত্তার মুসলমানেরা সে অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ লাঠিঘাল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাদের লাঠির প্রতাপে নিকটবর্তী হিন্দু মুসলমানেরা উভয়েই সর্বদা শঙ্কিত থাকিত। মহরমের সময় ইহারা যখন ভাবোন্মত্ত হইয়া লম্বা লম্বা লাঠি উচাইয়া, দীন দীন রবে সহরের মাঝখানে দিয়া তাজিয়ার কবর দিবার জন্ত ইদগার ময়দানের দিকে ছুটিয়া যাইত, তখন বাস্তবিকই লোকে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। অত্যাচার গ্রামের তাজিয়ার সঙ্গে পাঁচজন কনেষ্টবল ও একজন হেড-কনেষ্টবলই শান্তিরক্ষার জন্ত থাকিতেন, কিন্তু খিত্তার আখড়ার তাজিয়া যখন বাহির হইত তখন পুলিশসাহেব স্বয়ং এবং মাটি দিবার দিনে আপনি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া এই মুসলমান-বাহিনীর সঙ্গে ছুটিতেন। এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে হইত না তাহা নহে, কিন্তু সে মাথা ফাটাফাটি হইত মুসলমানে মুসলমানে, লাঠালাঠি হইত এক আখড়ার সঙ্গে আর-এক আখড়ার, হিন্দু মুসলমানে কোন দিন কোন বিবাদ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা সহরের অত্যাচার হিন্দুদিগের সঙ্গে ইদগার ময়দানের চারিদিকের ছোট ছোট টিলাতে বাইয়া জনতা করিয়া বসিতাম। মাঝখানে লাঠিখেলা আগুনখেলা প্রভৃতি হইত। নির্ভয়ে, শান্তিতে, ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে লইয়া এই তামাসা দেখিতাম।

তখন মুসলমানের পক্ষ উপলক্ষে এসকল আমোদ-প্রমোদে হিন্দুরা নিষিদ্ধ যোগদান করিতেন। আর মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের পক্ষাহে তাহাদের আমোদ-প্রমোদে অকুণ্ঠ সহকারে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন।

(২২)

শ্রীহট্ট বলশতাব্দী হইতে মুসলমানদিগের একটা পীঠস্থান হইয়া আছে। সহরের উপকণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সাহজালালের সমাধি আছে। এই সমাধির সংশ্রবে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ইহাকে সাহজালালের দরগা বলিয়া জানেন। সাহজালাল চিরকুমার ছিলেন। জীবনে নাকি কখনও তাঁহার এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয় নাই। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রমণীমুখ দর্শন করেন লাই। এইজন্ত তাঁহার মরণের শতাব্দিক বর্ষ পরেও তাঁহার কবরের নিকটে কিংবা কবরসংলগ্ন মসজিদের চত্বরে জীলোকদিগের প্রবেশ-অধিকার নাই। জীলোকেরা মসজিদের নীচে, দরগার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া পীর সাহেবের উদ্দেশে নিজেদের ভক্তি-অঞ্জলি অর্পণ করেন এবং দরগায় সিম্নি দেন। মুসলমান এবং হিন্দু মহিলা উভয়েই সমভাবে সাহজালালের মসজিদ দেখিতে যাইয়া এইরূপে এই দরগা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টের সাহজালালের দরগা যেমন একটা মুসলমানেদিগের পীঠস্থান, দুর্গাবাড়ী সেইরূপ হিন্দুদিগেরও একটি ছোটখাট পীঠস্থান। কেহ কেহ কহেন যে, তন্মোক্ত ৫২ পীঠের মধ্যে শ্রীহট্ট একটা পীঠ। সত্যিদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে পড়িয়া এসকল পীঠস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্টে সত্যীর হাত পড়িয়াছিল। শ্রী হস্ত হইতেই শ্রীহট্ট নাম হইয়াছে। অজ্ঞান সত্য কি মিথ্যা জানি না। তবে আমার বাল্যকালে কথাটা শোনা ছিল। আর এইজন্তই শ্রীহট্টের দুর্গাবাড়ী সে-অঞ্চলে হিন্দুদিগের নিকটে একটা পীঠস্থান হইয়াছিল। হিন্দু যাত্রীরা শ্রীহট্টে যাইয়া একদিকে যেমন দুর্গাবাড়ীতে পূজা দিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ সাহজালালের মসজিদ



সাহজালালের মসজিদ

পরিভ্রমণ না করিয়া এবং সাহজালালের দরগাতে সিম্নি না দিয়া ফিরিতেন না।

কলতঃ সে অঞ্চলের হিন্দুরা সাহজালালকে নিজেদের দেবতার আসনে না তুলিয়া ছাড়েন নাই। সাহজালালকে তাঁহারা মহাদেবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু সম্মানসূচী এবং মুসলমান কবির মিলিয়া গাঁজা দিয়া সাহজালালের সিম্নি দিতেন। এই গাঁজার সিম্নি দিবার সময়ে একটা পদ গান করা হইত।

“হো! বিশ্বেশ্বর লাল!

তিনলাখ পীর সাহজালাল!”

হিন্দু দেবতা মহাদেবের সঙ্গে শাহজালালের সম্পর্ক থাকুক আর না থাকুক, আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল, যাহাতে মুসলমান তীর্থ-স্থান মক্কার সঙ্গে শিবের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক মহাশক্তিশালী শিব-লিঙ্গ নাকি কা'বার মন্দিরে বন্দী হইয়া আছেন। কিন্তু মহাপ্রলয়ের শক্তি রাখিলেও এই শিব-লিঙ্গ মুক্ত। তবে ইহার মাথায় যদি কোনও নিষ্ঠাবান হিন্দু একটি বিষপত্র দিতে পারে, তাহা হইলে ইনি অমনি প্রলয়-ছঙ্কারে জাগিয়া উঠিয়া দুনিয়ার সমুদায় মুসলমানকে নিঃশেষে নষ্ট করিবেন। কিন্তু মুসলমানের দেবতাও শিবের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। কোনও উপায়ে কোনও শিবোপাসক হিন্দু মক্কার চতুঃসীমানার মধ্যে যাইবা মাত্র কা'বার মন্দির চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। তখন মুসলমানেরা চারিদিক অন্বেষণ করিয়া সেই হিন্দুর

সন্ধান পাইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া নিজেদের ধর্ম ও সমাজকে বাঁচাইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের আর কোথাও এ কাহিনী প্রচলিত আছে কি না জানি না। আমার বাল্যে শ্রীহট্টে ইহা খুবই প্রচলিত ছিল। আর এও একটু একটু যেন মনে পড়ে, হিন্দুর শিবকে এই “তিন লাখ পীর” সাহজালালই মক্কায় নিয়া বন্দী করিয়া রাখেন, একথাও তখন শুনিয়াছিলাম। গাঙ্গার সিন্ধি ও মজ্জের সঙ্গে ইহার কোনও নিগূঢ় যোগ আছে কি ?

(২৩)

শ্রীহট্ট সহরে বহুদিন হইতে একটা মণিপুরী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম মণিপুর যুদ্ধের পরে ইংরেজ মণিপুরের পরাজিত রাজা গন্তীর সিংহকে শ্রীহট্টে আনিয়া রাজবন্দী করিয়া রাখেন। গন্তীর সিংহ যে-বাড়ীতে ছিলেন আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টের লোকেরা তাহাকে মণিপুরী রাজবাড়ী কহিত। গন্তীর সিংহকে আমি দেখি নাই। তাঁহার কোন ছেলপিলে ছিল কি না তাহাও জানি না। তবে আমার বাল্যকালে সহরে অনেকগুলি মণিপুরী বাস করিতেন। সহরের পূর্বপ্রান্তে নদীর ধারেও একটা বড় মণিপুরী পাড়া ছিল। সহরের প্রায় মাঝখানেই মণিপুরী রাজবাড়ী ছিল। ইহার আশেপাশেও অনেক-গুলি মণিপুরী বাস করিতেন। মণিপুরীরা বোধ হয় একসময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। পরে বৈষ্ণব হইয়া যান। সমগ্র মণিপুর এখন বৈষ্ণব, রাধা-কৃষ্ণের উপাসক—শ্রীগৌরাক্ষমহাপ্রভুর পন্থাবলম্বী। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের গোঁসাইয়েরা মণিপুরীদিগের গুরু, নবদ্বীপ ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। মহাপ্রভুর জন্মতিথি, দোল-পূর্ণিমায় বিস্তর মণিপুরী যাত্রী প্রতি বৎসর নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। অত্যাশ্রয় বৈষ্ণব পরীহেও আসেন। মণিপুরের আধুনিক সামাজিক ইতিহাস হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্মের প্রচার-প্রচেষ্টার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত-স্থল। বৈষ্ণব গোষ্ঠামীপাদেরা সমগ্র মণিপুর সমাজকে নিজের মন্ত্র-শিষ্য এবং বৈষ্ণব-আচারে প্রবর্তিত ও বৈষ্ণব সাধনে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু সমাজের গন্তীর ভিতরে আনিয়াছিলেন। মণিপুরের প্রাচীন কথা কিছুই জানি না। তবে তাহাদের বর্তমান স্বভাব, প্রকৃতি ও

রীতি-নীতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষ-পরম্পরায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে মহাপ্রভুর “অনর্পিতচরী” উল্লভোজ্জল রসশ্রী ভক্তিলাভে ইহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। রসের অহুশীলন মণিপুরীদিগের সহজসিদ্ধ। মনে হয় ইহার চিরদিন, এমনই সহজ সৌন্দর্যের উপাসক ছিল। মণি-পুরীদিগের বাড়ী দেখিলে দেবালয় বলিয়া মনে হইত এমনই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গাছপালা এমনই সমস্তে রক্ষিত, তৈজসাদি এমনই ঘসা মাজা ও যা সামান্য আসবাব থাকিত তাহা এমনই পরিপাটী করিয়া বারাণ্ডায় ও ঘরের ভিতরে সর্বদা সাজান থাকিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। যেমন ইহারা ইহাদের ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, সেইরূপ কি জ্ঞা, কি পুরুষ সকলেই নিজেদের এই দেহপুরীকেও সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত। আমার বাল্যকালে কখনও নোংরা মণিপুরী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ফুল দিয়া নিজের অঙ্গ সাজাইয়া রাখিত। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কাণে ফুলের দোল পরিত। পুরুষেরা কখনও কখনো ফুলের এবং কচি পল্লবের মালা ধারণ করিত। আর রমণীদের ললাটে চন্দন তিলক এবং পুরুষদিগের ললাটে চন্দনের ছাপ ত থাকিতই—ইহা ছাড়া বাহ এবং বক্ষও প্রায় সর্বদাই চন্দনচর্চিত থাকিত। মণিপুরীরা দেখিতে গৌরবর্ণ, কেহবা উজ্জল শ্যামবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ মণিপুরী পূর্বে কখনও দেখি নাই। ইহাদের দেহ স্ত্রগোল স্তঠাম, চোখ কোমল ও স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হইত। মুখের গঠন মঙ্গোলিয়া জাতিদিগের ছাঁচে গড়া। চক্ষু আকর্ষণীয়ত হইলেও নাক খাঁদা, কিন্তু ইহাতে মণিপুরীদিগের সহজরূপকে নষ্ট করিত না। মণিপুরীদিগের সমাজে—এখন কিরূপ জানি না—বাট সন্তর বৎসর পূর্বে বাল্য বিবাহ ছিল না। চৌদ্দ-পনেরর ত কথাই নাই, আঠার-উনিশ বছর পর্যন্ত মণিপুরী বালিকারা অনুচা থাকিত। এ অবস্থায় মণিপুরী সমাজে বরকত্তার পছন্দ অপছন্দ উপেক্ষা করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। বোধ হয় ইহাদের মধ্যে একপ্রকারের গাঙ্কর্ব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। মণিপুরী সমাজে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। অবরোধ-প্রথা ত ছিলই না, বরঞ্চ মণিপুরী মহিলারা, আত্মকাল বাহাকে ইংরেজীতে ইকনমিক ফ্রীডম্ কিংবা আর্থিক স্বাধীনতা কহে, ইহাও ভোগ করিতেন। ইহারা নিজেদের স্বামীর বা পুত্রের কিংবা পরিবাবের অন্তান্ত পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। বরঞ্চ এমনও শোনা যাইত যে, মণিপুরে মহিলারাই পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতেন, পুরুষেরা এক-প্রকার নিজনিজ পরিবারের অন্নদাস হইয়াই থাকিতেন। শ্রীহট্টেব মণিপুরী সমাজেও ইহার কতকটা প্রমাণ পাইতাম। অন্ততঃ কোন মণিপুরী জীলোক যে কেবল ঘরে থাকিয়াই গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিতেন, অর্থোপার্জনে স্বামীর সহায় ছিলেন না, এমন দেখি নাই। মণিপুরী জীলোকেরা ঘরে যেমন গৃহকর্ম করিতেন, সেইরূপ নিজেদের অথবা পরিবাবের পুরুষদিগের তৈয়ারী পণ্য মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রী করিতেন। সন্তানবতী জননীরাও মাথায় মোট ও পিঠে কাপড় দিয়া নিজেদের ছদ্ম-পোষা শিশুকে বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী জিনিষ ফিরি করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী “থেন” ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। মণিপুরীরা সস্তা মশারীও বুনিতেন। ইহা ছাড়া কাঠের কাজে ইহাদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সহরের চেয়ার টেবিল ইহারা হোঁগাইতেন। বাঁশ এবং বেত দিয়া মোড়া, পেটি প্রভৃতিও মণিপুরীরাই প্রস্তুত করিতেন। এই সকল শিল্পে ইহারা অসাধাবণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে বথ-যাত্রার দিন খুব সমারোহ হইত। শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা মণিপুরীদিগেব একটা বিশেষ পর্ব ছিল। প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন মণিপুরী গৃহস্থের বাড়ী হইতেই এক এক খানা রথ রাজপথে বাহির হইত। এমন হাঙ্গা, এমন স্তম্বর সজ্জিত, এমন রসকলার নিদর্শন বোধ হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশের রথে দেখা যায় না। মণিপুরীরা বাঁশ দিয়া এই রথ নির্মাণ করিতেন। চাকাও বাঁশেরই হইত কি না মনে পড়ে না। ইহা অসম্ভব হইলে, এসকল রথের চাকাতেই কেবল যা কিছু কাঠ থাকিত, আর সবই বাঁশের ছিল। রথের ঠাট বাঁশের, কিন্তু তাহার

আন্তরণ পাতার। কাঁটাল পাতা দিয়াই অধিকাংশ স্থলে রথের চালা ও বেড়া গাঁথা হইত। আর কচি আমের পল্লব কিংবা বকুলের ডালে মাঝে মাঝে চাপা ও অন্ত স্নগন্ধ ফুল গাঁথিয়া রথ সাজান হইত। চন্দনচর্চিত দেহে, গুলঞ্চের মালা পরিয়া মণিপুরীরা যখন হরিধ্বনি করিয়া, খোল কর্তাল সঙ্গে কীর্তন গাহিয়া সারি সারি রথ রাজপথে টানিয়া লইয়া যাইতেন, তখন সহরের এক আশ্চর্য শোভা হইত। এসকল রথ এমন হাঙ্গা বলিয়া যে ভারসহ ছিল না এক্ষণ নহে। এই রথেব উপরেই মাহুঘ চড়িয়া কলা, আনারস প্রভৃতির হবির লুঠ দিতে দিতে যাইতেন। কিন্তু মণিপুরী রাস শ্রীহট্টেব মণিপুরী সমাজে সর্বপ্রধান উৎসব ছিল। এ রাস এক অপূর্ব দৃশ্য ছিল। মণিপুরীরা অত্যন্ত-সঙ্গীত-রসজ্ঞ এবং নৃত্য-রসজ্ঞ। সঙ্গীতের চর্চা ঘরে ঘরে। মহিলার প্রায় সকলেই নৃত্যগীত শিখিয়া থাকেন। এই রাসযাত্রায় ইহারা বাংলা দেশের মতন মূর্তি রচনা করেন না। নিজেরা রাস-লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বা নাট মন্দিরে পল্লীর সকল বালক-বালিকা মিলিয়া এই অভিনয় করেন। বৃত্তাকারে সজ্জিত বালক-বালিকারা প্রাঙ্গণটা ঘেঁষিয়া পাড়াইয়া যান। অট নয় বছরের বালক বালিকা হইতে আঠাব বছরের অনুঢ়া যুবতী পর্যন্ত এই অভিনয়ে সামিল হইয়া থাকেন। বৃত্তের বাহিরে ইহাদের পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরু-জনেরা মিলিয়া খোল কর্তাল সহকারে রাসলীলা কীর্তন করেন, আর ইহাদের বালক-বালিকারা হাতে হাতে ধরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অতি মুহুমু্বে নৃত্যকলা সহকারে এই লীলার অভিনয় করেন। যাবা রাসে নাচে তাহাদের একটি করিয়া কৃষ্ণ সাজে ও তাহার দু পাশে দুইটি করিয়া রাধা সাজিয়া থাকে। দেশে বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন স্তম্বর, এমন নির্মল, এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই। আমার বাল্যকালে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাব সময়ে এই জীবন্ত মণিপুরী রাস দেখিবার জন্ত সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত।

কণ্ঠ পাথর



শেষ মধু

বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায়
চৈত্র-কমলের শূন্য ক্ষেত্রে,—
মৌমাছির ডাক দিয়ে যাব
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে :—
আয়রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে ঘর পত্র-স্বরা,
গাছের তলার আঁচল বিছায়
ক্রান্তি-অলস বসুন্ধরা।

সন্ধ্যা নে খুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব বরেনি,
কুপ্পপথের প্রান্তধারে
আকল রয় আগুন পেতে।
আয়রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন শুকনো ঘরা,
প্রোভেব নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ ঘরা।

শুনি যেন কানন-শাখায়
বেলা-শেষের বাজায় বেণু ;
মাঝিরে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধ-বেণু।
কাল যে-কুহুম পড়বে স্বরে
তাদের কাছে নিসর্গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
—এই বছরের মৌচাক্ষেতে।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাইরে দেরি, করিস্ তব,
শেষেব দানে ঐরে সাজায়
বিদায়-দিনের দানের ভরা।

চৈত্রমাসের হাওবার কাঁপা
দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলম্ব-দাঁহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে, জানি।
বা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ করে সব নিবি এবার,
বাবার বেলায় থাক চলে থাক
বিলিরে দেবার নেশায় মেতে।

আয়রে, ওরে মৌমাছি আয়,
আয়রে, পোপন মধুহরা,
চবন দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা।।
(সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদ-কথা

২। মন্ত্র

যেদেব অষ্টর্গত মন্ত্র ত্রিবিধ—ঋক্, যজু ও সাম। শ্রৌতযজ্ঞকার
কাত্যায়ন এই ত্রিবিধ মন্ত্রের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন :—যাহার অক্ষর,
চরণ ও অবদান নিয়মবদ্ধ তাহাই ঋক্। অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্য, এ
কালে যাহাকে পঞ্চ বলে, তাহাই ঋক্। যথা—

“আশুঃ শিশানো বুভো ন ভীমো

ঘনায়নঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাং।

সংজ্ঞান্ননোঃ নিমিষ একবীরঃ

শতং সেনা অজয়ৎসাকমিল্লঃ।।” (১০।১০৩।১)

এই মন্ত্রটি ঋক্, ইহার ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্, উহা চারি চরণ,
প্রত্যেক চরণে এগার অক্ষর।

যে মন্ত্রের অক্ষর চরণ বা অবদান সম্বন্ধে কোনই নিয়ম নাই, তাহা
যজুঃ। অর্থাৎ এ কালে যাহাকে পদ্য বলে, তাহাই যজুঃ, যথা—

“ব্রহ্ম সাক্তং তন্মে দ্রিষতং।।”

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১ কাণ্ড, ১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক।)

ইহার অক্ষর বা চরণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।

“দেবস্তাহং সবিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতিনাং বাজজিতাং বাজং জেযম্।।”

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।৩।৩)

এই আর-একটি যজুর্মন্ত্র। ইহাও ঐরূপ পদ্য।

যে যজুর্বাক্য গান করা যায়, তাহাই সাম। ঋক্মন্ত্র অথবা যিগা গান
করিলেই উহা সামে পরিণত হয়, যথা—

“অভিত্বা শূর নোহু মোহ দুষ্কাইব খেনবঃ।

ঈশানমন্ত জগতঃ স্বদুর্শনীশানমিল্লতচ্ছ বঃ।।”

ইহা একটি ঋক্, ইহার ঋষি বশিষ্ঠ, দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদ সাংহিত্যের
৭ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের মধ্যে ২২ সংখ্যক মন্ত্র এইটি। গান করিবার
সময় ইহাতে মাঝে মাঝে অক্ষর বসাইতে হয়, অনেক অক্ষর বিকৃত হয়,
তখন উহা সাম মন্ত্রে পরিণত হয়। যথা এই ঋক্টি রথন্তর নামক সাম
গীত হইলে এইরূপ দাঁড়ায়।

প্রস্তাব। হম্। অভিত্বা শূর নোহুমো বা।

উদগীত। ওম্বা দুষ্কা ইব খেনব ঈশানমন্ত জগতঃ

স্ববা ঈশাং।।

প্রতিহার। আ ঈশান মা ইন্দ্রা।

উপস্রব। স্বদুর্শা ওবা হা স্ববা।

নিধন। অম্।

গানটির পাঁচ অংশ—উল্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ষী নামক তিনজন ঋত্বিক ইহা গান করেন। প্রস্তোতার অংশ প্রস্তাব, উল্গাতার অংশ উল্গাহ, প্রতিহর্ষীর অংশ প্রতিহার। উপর্য উপলগাতার গায়, আর নিধনাংগ তিন জনে মিলিয়া গান করেন।

এই নামটির নাম রণধর। এ কালে বাহাকে রাগ-রাগিণী বঙ্গে, সাম তাহারই তুল্য।

ক্রৌড়সুত্রকার কাত্যায়ন আর-এক রকম মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম নিগদমন্ত্র বা প্রথমমন্ত্র। ঋত্বিকরা পরস্পর সম্বোধন-কালে বা পরস্পর অমুক্তা আদেশ দিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বেদের ব্রাহ্মণ্যংশে এইরূপ প্রথমমন্ত্র অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে যথা—“অগ্নয়ে মধ্যমানায় অমুক্তাহি” ইত্যাহ অগ্নয়ুঃ। অগ্নিমহনবে সময় অমুক্ত্যু হোতাকে অমুক্তা দিবেন—মধ্যমান অগ্নির অমুক্তুল মন্ত্র পাঠ কর—“অগ্নয়েমধ্যমানায় অমুক্তাহি” এই অমুক্তাটি একটি প্রথমমন্ত্র, অতএব ইহা যজুমন্ত্রেরই অন্তর্গত। সাধারণ যজুঃ হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ যজুমন্ত্র প্রারোম্ভকালে উপাংশ (অমুক্তে) উচ্চারণ করিতে হয়, আর প্রথমমন্ত্রের উদ্দেশ্যই বধন আদেশ দেওয়া, তখন প্রথমমন্ত্র উচ্চরণে বসিতে হয়। সাধারণ যজুমন্ত্র সকল সাহিত্য মধ্যে নিবদ্ধ আছে, প্রথমমন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাওয়া যায়। ফলে ঋক যজুঃ সাম, পদ্য গায় ও গান। এই তিন প্রকারের ভিন্ন চতুর্থ প্রকারের মন্ত্র হইতে পারে না।

এই ঋক-যজুঃ-সামময়ী বেদ-বিদ্যার নাম ত্রয়ো বিদ্যা। মন্ত্র ত্রিবিধ ভিন্ন চতুর্বিধ হইতে পারে না, কয়েই ত্রয়ো নামের সার্থকতা।

বৈদিক সমাজে এই ত্রিবিধ মন্ত্র যজুঃ-কর্মে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদী ঋত্বিকেরা ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে প্রশংসা করিতেন, দেবতাকে আবাহন করিতেন; যজুর্বেদী ঋত্বিক যজুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাব উদ্দেশ্যে হব্যদান করিতেন বা বিবিধ কর্মসম্পন্ন করিতেন। সামগ ঋত্বিকেরা সামগান করিয়া দেবতার স্তুতি কবিতেন।

এইসকল মন্ত্র ঋত্বিক-সমাজে মুখে মুখে প্রচারিত হইত। ব্রহ্মশাস্ত্র লিখিত হইত না, সম্ভবতঃ লেখন-প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বেদ-মন্ত্র মুখে মুখেই রক্ষিত হইত। কালক্রমে ঐ সকলের একত্র সঙ্কলন আবশ্যক হইয়া উঠিল। একত্র সঙ্কলন না করিলে মন্ত্রগুলি লোপের আশঙ্কা ছিল। অনেক সময়ে অনেক বেদ লোপ পাইয়াছে, এইরূপ স্তুতি আছে। এসিদ্ধি আছে—কৃষ্ণবৈপায়ন ব্যাস এই মন্ত্র সকল সঙ্কলন ও বিভাগ করিয়া সাহিত্যকারে নিবদ্ধ করেন। পৌরাণিক মতে কৃষ্ণ-বৈপায়ন আপনাদের চারিজন শিষ্যকে ঋক যজুঃ সাম ও অথর্ব এই চারিবেদ বিভাগ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাহারা আপনাদের শিষ্যগণকে ঐ আপন আপন বেদ শিক্ষা দেন। কালে কালে ঐ সকল বেদ শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে বহু শাখায় ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া যায়।

এই পুরাণ-কথার মূলে যে ঐতিহাসিক-কিংবদন্তী আছে, তাহার কতটুকু প্রামাণিক তাহা নিরূপণের কোন উপায় নাই। বেদের অধ্যাপকগণ বহু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেদ তাহারা মুখে মুখে রাখিতেন ও তাহাদের শিষ্যরাও অধীত বেদ মুখে মুখেই প্রচারিত করিতেন। দেশভেদে ও কালভেদে এইরূপে বেদের নানা পাঠভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। এই পাঠভেদে বিবিধ শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ মনে করা বাহিতে পারে।

পুরাণে এইরূপ পাঠভেদে উপর বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে প্রচারিত বিবিধ শাখার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণাদিতে ক্রিরাপে বেদের শাখাবেদ উপর হইল তাহাও সবিস্তর বিবরণ দেওয়া আছে। ঐসকল ইতিহাস কতদূর প্রামাণিক, তাহা বিতর্কের বিষয়। কুর্শপুরাণে উক্ত আছে, ঋগ্বেদের মোটের উপর ২১ শাখা, যজুর্বেদের

১০০ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা ও অথর্ববেদের ৯ শাখা। বস্তুতঃ এতগুলি শাখা কোনও কালে ছিল কি না এখন প্রতিপন্ন করা কঠিন।

চরনবাহ নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের কেবল পাঁচটি শাখার নাম আছে—শাকল, বাকল, অম্বলান, শাখ্যান ও মাধুকায়ন। চরনবাহ (কৃষ্ণ ও স্ত্রী উভয়) যজুর্বেদের ৮৬ শাখার উল্লেখ করিয়াছেন, সামবেদের ১২ শাখার ও অথর্ব বেদের ৯ শাখার নাম দিয়াছেন। চরনবাহতারের সময়েই অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ং বীকার করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে এক কালে ২১ শাখা বর্তমান ছিল, তাহা বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত সভ্যত্ব সামস্রমী মহাশয় ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, শাকল্য (শাকল্য মুনির শত শিষ্যের মধ্যে পাঁচ জন—শিশির, বাকল, মাধ্য, বাৎস্ত ও অম্বলান) —ঋগ্বেদের শাখাত্তে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে শাকল্য শিষ্যদিগের নাম মুদগল, গোম্বল (গালব), বাৎস্ত, শালীষ, শিশির। বায়ুপুরাণে নাম মুদগল, গেলক (গালক?), খালীষ, মাৎস্ত, শৈশিরেয়। শাকল্য প্রতিহার নামক টীকাগ্রন্থে নাম মুদগল, গেলুন (গোবুন?), বাৎস্ত, শৈশির, শিশির (শারীর?)। বলা বাহুল্য লিপিকর-প্রমাদ বহু স্থানে নাম গ্রন্থের কারণ।

(মানসী ও মর্শ্ববাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) ৮রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সভাপতির অভিভাষণ

(বিহার-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন)

সারা ভারতবর্ষটা এক করে ঝাঁকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত নক্ষত্রল আমার নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধরে বাংলায় নামে—বাঙালীর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে রেখেছি।

বহুতর বর্ষের সুসন্ধান সংঘর্ষে বিহার ভাব ও ভাবার বহুদেশের সঙ্গে এখন ঘটটা বিভিন্ন হয়ে পড়েছে, একদিন যে ততটা ছিল তা মনে হয় না। অতীতের ভূগোলে একটা বিস্তার প্রদেশ ছিল তার নাম গোড়; মিথিলা ও বঙ্গদেশ সেই পক্ষ-গোড়েরই অন্তর্গত, সেই মিথিলাই—মগধ, ক্রমে বিহার; হতরাং একদিন মৈথিলী ভাষাগত স্বাভাবিকতাই হরধুনী তরঙ্গিণীর সহিত প্রবাহিত হয়ে আরি বঙ্গ-কবিগণের কাব্যকে অক্ষত করেছিল।

ঈগতের প্রচলিত ভাষা সকলের মধ্যে বঙ্গভাষা ভেজে, নাধুর্ঘ্যে, অর্থবোধক সারল্যে ও সহজ সৌন্দর্য্যে কিছুতেই হীনশক্তিধারিণী মন্দমনোহারিণী নয়।

বঙ্কিমবাবুর দৈবী-শক্তির প্রভাব যে বাংলা ভাষাকে কেবলমাত্র সর্বজনবরণ্য করে দিয়ে গেছে তা নয়, যে বাদশাহী এক সময়ে জমি ক্রয় করার পাট্টার দেড়শত কথার মধ্যে অন্ততঃ পঁচানব্বইটা হুওজে, ওয়ালফে, খোস মেজাজে, বহাল তব্বিতে গোছেব না থাকলে দণ্ডনধারী আদালত-গ্রাহ বলে মনে করতেন না,—পরে আবার ক্রি-পুস্ত্রে পত্র-ব্যবহারে ইংরাজি ভাষা প্রয়োগ না করলে সভ্যতার ক্রটি হয় মনে করতেন, তাঁদের বিস্তৃত বাংলা শিখতে লিখতে পড়তে প্রবৃত্ত কার সেই বঙ্কিমের প্রভাবই।

বিকৃত পার্শ্ব-মিশ্রিত অতি প্রাচ্য গদ্যের দিন গেছে; সংস্কৃতও এখন আর কচি ছেলে মনে করে বাংলা ভাষাকে ধমকের চোটে “এইখানে ব’সে থাক, খবরদার নাওয়াটুকু ছেড়ে উঠানে নাসিননি” না বলে তার সঙ্গে একত্রে ব’সে আপনাদের স্বপ্ন-দৃশের কথা কন; কিন্তু সম্প্রতি ধীরে ধীরে এক নতুন উৎপাত—নতুন ভূতের উপর্য বাংলা সাহিত্য-

সংসারের মধ্যে দেখা দিয়েছে। লেখক মাত্রেই সাধ নিজের একটা মৌলিকত্ব—নিজের একটা বিশিষ্টতা প্রদর্শন করা; তা ব'লে না সরস্বতীর হাত-পা ভেঙ্গে বাড় মুচড়ে দেওয়া ত মৌলিকত্বও নও—বিশিষ্টতাও নয়, আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কলা প্রদর্শনও নয়।—“তখন ঘরে ঘরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল আমাদের গিরিবালা”—এ মন্দ নয়—মন্দ নয় কেন, বেশ। তবে “সন্ধ্যার প্রদীপ অন্ধকারের বুকখানা একটু নরুণ দিয়ে চিরে যখন-উঠানের এক পাশে দাঁড়ান বো’ঠানের বাঁ-দিককার গালে আলোর ঈষৎ তপ্ত চুম্বন পৌঁছে দিলে, তখন নীহার-বালানামের মনের ভেতর একটা যে চমকের বেছাগ বেজে উঠল তা সে কোন মতেই ঠাণ্ডাতে পাঞ্জো না, কদলীকান্ত বলুর মনের ভাব বুঝতে পেরে শব্দহীন ভাবায় নীরবে বোঝো—তা’লে আমি বাব চলে কিন্তু এখান থেকে, ঐ দেখ-এখনি আসছে এখানে ঝড়ের বেগে ময় ও টুই দুলিয়ে এলো চুল।” সাহিত্য-জগতের এ সব বিকস্মিত্য যে পঁজার মজল। ওর সঙ্গে আবার দ্বিতীয় উপপাত প্রত্যেক জেলার লোকের বেন একটা জিদ দাঁড়িয়েছে যে, জোর-জবরদস্তি যা ক’রে পারি নীর-ইক্ কি যশোর-ইক্ কি ঢাকা-ইক্ কিয়া কর্ত্তকর্ত্তাগুলোকে ধ’রে নিয়ম-ভঙ্গের পত্ত্তি-ভোজে বসিয়ে দি।

বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির কথা-এসঙ্গে অনেক বিজ্ঞ লোকই ব’লে থাকেন যে, উন্নতি ত ছাই পাঁশ, কেবল উপভাসের ছড়াছড়ি। যদি সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে দিয়ে আপনারা আপনাদের ঘর সাজাতে চান তবে শিশুপাঠ্য, বালক-বালিকা-পাঠ্য, কিশোর-কিশোরী-পাঠ্য উপভাস যথাসাধ্য চেষ্টার রচনা করতে প্রবৃত্ত হোন। লজ্জার কথা নয় কি—এই সাহিত্য-সম্রাটের ছড়াছড়ির দিনে—নভেল কাবুলী বীরের আশ্চর্য্যময় যুগে Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Midshipman Easy, Peter Simple, Twenty Thousand Leagues under the Sea, A Trip to the Moon গোছের উপভাস লেখক এমন বাঙালী একজনও জ্ঞান-নি। এই রকম বই হ’লে ছেলে-মেয়েদের ডেকে আর জোর ক’রে পড়তে বসাতে হবে না, আনন্দ-প্রদ ব’লে তা’রা বই ছেড়ে সমর-সমর ভাত খেতেও বাবে না। অথচ কত নূতন বিষয় জ্ঞানবার জন্ত তাদের মনে কৌতুহল জন্মাবে।

এই বিহারে ব’সে সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-কাব্যাদি রচনার কত মনোবী যে বঙ্গমাতার পবিত্র অঙ্গ অলঙ্কৃত করেছেন বা করছেন, তার সঠিক তালিকা আমার জ্ঞান নেই। পাটনার কথা মনে হ’লে আমার স্মৃতিতে প্রথমে মুর্শ্টিমান হন স্বর্ণগত বলদেব পালিত মহাশয়। বলদেব-বাবু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা পদাবলী লেখার একটি চেষ্টা করেন। ‘পালিত কবিতাবলী’ ব’লে একটি পুস্তিকার সেগুলি প্রকাশিত হয়।

বঙ্গারে ব’সেই ডাক্তার তারকনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় বাংলাকে তাঁর “স্বর্গলতা” দান ক’রে গেছেন।

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের প্রতিভার কাছে, বঙ্গ, বিহার উভয় প্রদেশই ধপ্পী। কঠোর দর্শনশাস্ত্রকে অতি প্রিয়-দর্শন ক’রে তিনি সাহিত্য-সম্মিদের সুখমা বুদ্ধি ক’রে রেখে গেছেন। পাটনা কলেজের একজন বাঙালী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র শর্মা “বারুণী-বিলাস” ব’লে একখানি নাটক রচনা ক’রেছিলেন। ঐযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় যদিও তাঁর অমূল্য প্রহের অধিকাংশই ইংরাজি ভাষায় লিখেছেন, কিন্তু প্রবন্ধ-পুস্তকহারে তিনি আজও বাংলার অনেক মাসিক-পত্রকে সুগন্ধে আমোদিত করছেন। তাঁর পূর্বে বিহারে ব’সে ঐতিহাসিক-তত্ত্ব এত আলোচনা কেহই করেননি। তবে যোগেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর মহাশয়ের নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুর থেকে হাত পাকিয়েই আমার পরম স্নেহের পণ্ডিতকবি বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ‘বঙ্গবাসী’র সম্পাদক হন। ইদানীং

উপভাস প্রকাশে বীরের নাম প্রসিদ্ধিলাভ ক’রেছে তাঁদের মধ্যে ঐযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহার অঞ্চলেই অনেক দিন কাটিয়েছেন। উপভাসকারদের মধ্যে বীর নাম আজকাল বাংলার পাঠক-সমাজে অতি পরিচিত, সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিহার থেকেই লেখার বাহার করিয়ে তুলেছেন। আমার পরম মেহভাজন হুম্মদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মিষ্ট গল্পগুলির কল্পনার স্রুতিকাপার গয়া।

আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চির-কল্যাণীয়া অমুরগা দেবী নামটি কাঞ্চনোজ্জ্বল অক্ষর অমর অক্ষরে লিখিত থাকবে।

আমি বেন দিয়া চক্ষে দেখছি, বঙ্গভাষা অতি নিকট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সার্বজনীন শিষ্ট ভাষা ব’লে আদৃত হবে। বাংলার স্রুতি চারের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের প্রভাব হুম্মর পাঞ্জাবের পঞ্জরের মধ্য পর্যন্ত সরলা দেবীর প্রতিভার বৈভব-বলে প্রবেশ লাভ করেছে।

(উত্তরা, চৈত্র ১৩৩৩)

শ্রী অমৃতলাল বসু

মেদিনীপুর সাহিত্য-সভা

অতীতকালের মেদিনীপুরের সাহিত্যের দাবী এই যে, কবিকল্প, মুকুন্দরাম এই মেদিনীপুরেই চম্পীকাব্য রচনা করেন। এই মেদিনী-পুরেই ঘনরাম তাঁর ধর্ম্মদঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। শিবায়ণের গ্রন্থকার কবি রামেশ্বরও মেদিনীপুরের অধিবাসী।

আধুনিক যুগে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম স্মরণ করলে হৃদয়-মন পবিত্র হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করেছেন তাহা চিরস্মরণীয়। সাহিত্যিক নন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক রাজেন্দ্রনাথ বসু এখানে জন্মগ্রহণ না করলেও মেদিনীপুর বহু বৎসর তাঁহার কর্ত্ত্বর্হ ছিল।

যে মানুষ জন্ম-চিন্তায় বা রোগের আলায় বিব্রত থাকে তার দ্বারা সাহিত্য, ভাস্কর্য্য বা চিত্রের সৃষ্টি হয় না। আমাদের দেশের লোকের সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টি করার মত উৎসৃষ্ট শক্তি আছে কিনা তাই দেখতে হবে। প্রাসিদ্ধাচরণের সংস্থান ক’রে এবং রোগের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রে যে শক্তি উৎসৃষ্ট থাকে তার দ্বারা আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করি।

ধাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানের (Sociology) চর্চা ক’রে থাকে। তাঁরা জানেন যে, মানুষের উত্তরাধিকার দুই প্রকার—দৈহিক ও সামাজিক। সমাজ-বিজ্ঞানবিদগণ বলেন যে, কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করেছে ব’লে আমরা যতটা দৈহিক দোষ-গুণ (Physical inheritance) পাই, অজ্ঞাত অধিকরণ ও অসুসরণ (Social) তার চেয়ে বেশী দোষগুণ লাভ করি।

সঙ্গলভের দোষগুণ অনেক; দেশে জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তার করতে পারলে আমাদের বাড়ীর শিশুরা আরও বেশী পরিমাণ মানসিক-দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করবে। শিক্ষার বিস্তারে সাহিত্যের প্রসার বাড়ি, গভীরতা ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সাহিত্য শিক্ষিত ভ্রমলোকের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। সাধারণ শিক্ষিত ভ্রমলোক মানব-জীবনের অনেক সংগ্রাম, দুঃখ, তাপের সহিত অপরিচিত। মুটে মজুর প্রভৃতির সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাহারা নিজে যেমন জানে, শিক্ষিত ভ্রমলোক তেমন বোঝেন না। প্রতিভাশালী ব্যক্তির কল্পনার অবশ্য অপরের সুখ-দুঃখ কতকটা বুঝতে পারেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সঘনো জানা ও কল্পনার জ্ঞান মধ্য বশেষে প্রভেদ আছে।

যারা সব রকম শ্রমের কাঁধ করে তারা জ্ঞানবান্ হ'লে সাহিত্যে নতুন রসের সৃষ্টি হ'ত—বাংলা সাহিত্য অনেক উৎকৃষ্ট হ'ত।

স্কটল্যান্ডের কবি বান্‌স্ চাবীর ছেলে। সকলেই জ্ঞানেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে লিখিত তাঁহার অনেক কবিতা কত হৃদয় ও আন্তরিকতাপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এইরূপ ২১ জনের কথা ব'লে আমরা অহঙ্কার ক'রে থাকি। কিন্তু একুশ গোরবেও লজ্জা আছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরও আধ্যাত্মিক ভাব বৃদ্ধি বার ক্ষমতা আছে। স্ততরাং আমরা শিক্ষা পেলে যে আরও কত উন্নত হ'তে পারিতাম তা বেশ বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে গর্ব ক'রতে গিয়ে স্মরণ ক'বা ধরকার, শিক্ষা পেলে আরও হয়ত কেহ কেহ একুশ হ'তে পারত।

একটা দেশের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম লোক বেশী হ'লে সাহিত্যের প্রসারও বেশী হয়। আমাদের দেশে কোন একখানা ভাল বহিরও এক সংস্করণ বিক্রী হ'তে কয়েক বছর লাগে।

জাপানের সম্রাট ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অমুশাসন প্রচার করেন যে, তাঁর রাজ্যে বিভ্রাৎলয়হীন গ্রাম থাকবে না, বা অশিক্ষিত কোন লোক থাকবে না। আজকাল সেখানকার শতকরা ৯৯ জন বালক-বালিকা স্কুলে যায়। সেখানে রিকশাওয়ালারও ধবরের কাগজ পড়ে। ইউরোপের অনেক দেশের চেয়ে জাপানে বইএর রোঁকানও নাকি বেশী। আদাহী নামে জাপানের একজন দৈনিক পত্রের কাগজ আছে। সেখানকার কাঁচিতি প্রতিদিন ২১ লক্ষ। আমাদের দেশের সমুদায় দৈনিক কাগজের বিক্রীও ২১ লক্ষ হ'বে না।

সম্মতি আমি ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে এসেছি। আমাদের দেশে যে-সব বই ছাপা হয় তার মধ্যে বেশীর ভাগ স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। এতি বছর জার্মেনীতে যত বই ছাপা হয়, ভারতবর্ষে তত হয় না—অথচ জার্মেনীর লোকসংখ্যা আমাদের দেশের লোক-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। জার্মেনী ও চেকো-স্লোভাকিয়াতে জার্মেন ও চেক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু আমি ঐ দুই ভাষার কোনটাই জানি না। সে-সব দেশে রেলওয়ে স্টেশন দেখলাম, কোন কোন কুলীও একটু একটু ইংরেজী বোঝে। ফ্রান্স বা অষ্ট্র অষ্ট্র যারগায় ভ্রমণকালে রেলের Seat Reserve করেছি। ইউরোপে বার্ষিক রিজার্ভ করতে হ'লে তার ক্ষুদ্র আলাদা টাকা দিতে হয়। এদেশে তা' নয়। ইউরোপে রেল বসবার জায়গাও রিজার্ভ করতে পারা যায়। দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে হ'লে আমি সীট রিজার্ভ করতাম। রেলের সব মজুরসাই পড়তে পারে। তারা সীটএর নম্বর দেখে, যাত্রীর জিনিষপত্র ঠিক জায়গায় রেখে দেয়। রবীন্দ্রনাথ জার্মেনীর বার্লিন ও ড্রেসডেনের হোটেল থেকে সে দেশে বস্তুতা করেছিলেন। দেইসব হোটেলের Waiters, Porters ও Liftmen প্রভৃতিও জার্মেন ভাষায় অনুচিত রবিবাবুর বই পড়েছে এবং সে-সব পুস্তকে তাঁর দস্তখত নিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। প্রতিদিন তাঁর টেবিলের উপর অনেক Visting Card, বই ও তাঁর ফটো জড় হ'য়ে থাকত। তিনি অবশ্য এই সব গুলিতেই নিজের নাম দস্তখত ক'রে দিতেন। আনন্দের বিষয় এই যে, সে-দেশের চাকর-চাকরানীয়াও জল্পলোকদের মতই একজন বিশেষের কবির বই পড়ে এবং তাঁর নিজের হাতের স্বাক্ষর পাবার ক্ষুদ্র ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। চেকো স্লোভাকিয়াতে ঠিক এই রকম ব্যাপার। জার্মেনী ও চেকো-স্লোভাকিয়াতে সাহিত্য খুব প্রসার লাভ করেছে।

কোন জাতি মহৎ হ'লে তাদের সাহিত্যও মহৎ হয়। আবার সাহিত্য মহৎ হ'লে জাতিও মহৎ হয়। প্রতিভাশালী লোকের লেখার জাতি বড় হয়। কোন বুগে আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত

রচিত হয়েছিল, তার দ্বারা এখনও যে কত লোকের চরিত্র গঠিত হচ্ছে তার তুলনা নেই। কোন কোন ইউরোপীয়ান বলেছেন যে, তুলসী-দাসের রামায়ণ দ্বারা হিন্দীভাষী লোকদের চরিত্রের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, বাইবেল খ্রিস্টানদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাস, বাস্কীক ও তুলসীদাসের জন্ম ইহাই প্রমাণ করে যে, আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল।

আমরা গর্ব ক'রে থাকি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, ইংরেজী সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের চেয়ে অনেক উন্নত। তবুও ইংরেজেরা অনেক পুস্তকের অনুবাদ ক'রে থাকেন। অসম্ভব জাতির ছড়া গান প্রভৃতির অনুবাদ ক'রেও তাঁরা নিম্নোদেব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। কিন্তু আমরা অনুবাদ করি না। অনুবাদের দ্বারা সাহিত্য পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ লাভ করে। আমরা গানের কল ফুল, পাতার তারিফ করি, কিন্তু মাটির রসের প্রশংসা করি না। রসই পবিত্রীত হ'য়ে যে কল ফুল, পাতার পরিণত হয় সে-কথা আমাদের মনে হয় না। সাঁওতাল, জুলু বা হট্টকট্টদের ছড়া বা গানে সাহিত্যিক বিশেষত্ব না থাকলেও তার রস রূপান্তরিত হ'য়ে বিশিষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টির সাহায্য করে।

ভারতবর্ষে হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা ৮ কোটি এবং গুজরাটী ভাষা বলে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ। কিন্তু তবুও হিন্দী সাহিত্যের চেয়ে গুজরাটী সাহিত্যের বৈচিত্র্য বেশী। পার্শ্ব ও ভাট্টিয়ার enterprising জাতি। এই কারণে হিন্দীর চেয়ে গুজরাটী সাহিত্য বেশী সমৃদ্ধ। কেহ কেহ “বাঁট বাঙ্গলা সাহিত্য” সৃষ্টির পক্ষপাতী; তাঁরা আমাদের সাহিত্যের উপর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব চান না। তাঁদের অভিলাষকে আমি প্রত্যাখ্যান করি, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য যে এখন বিদেশী প্রভাব বর্জিত হ'তে পারে বা হওয়া উচিত, ইহা আমি প্রত্যাখ্যান বা সত্য ব'লে মনে করি না।

প্রত্যেক মানব মানবের বন্ধু। মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবে জাতি-ভেদ নাই। তাই আমরা সকলে মিলে তা উপভোগ করতে পারি। যদি সে-রকম না হ'ত তবে আমরা সেন্সপীয়াবের সৃষ্ট সাহিত্য বৃদ্ধিতাম না বা ইংরেজ বাস্কীকির রামায়ণ বৃদ্ধিতাম না। অস্ত্র ভাষা থেকে অনুবাদ করলেই সাহিত্য বিজাতীয় ভাবের বিচুরী হ'বে, তাহা মনে করা ভুল।

বাঙ্গলা নাটক সংস্কৃত নাটকের ধারায় সৃষ্ট নয়। সম্পূর্ণ ত্রিভুজ আদর্শে রচিত। বাঙ্গলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও উপন্যাস বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবু তা বাঙ্গালীর ঘরেরই জিনিষ।

পূর্বেই বলেছি, মানসিক উদ্ভূত শক্তি থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বোধ হয় বাঙ্গলার জীবনী-শক্তি কমে যাচ্ছে। চেষ্টা করলে আমরা তা বাড়াতে পারি। ১৯২১ সালের Censusএ বাঙ্গলার লোক-সংখ্যা ১৯১১ সাল থেকে কমেছে ব'লে দেখা যায়। আমি যে-জেলান অধিবাসী সেই বাঁকড়া জেলাতেই সব-চেয়ে বেশী কমেছে। নীচের তালিকা থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

জেলার নাম	প্রতি হাজারে লোক-সংখ্যা কত কমেছে
বাঁকড়া—	১০.৪
বীরভূম—	৯.৪
মুর্শিদাবাদ—	৮.০
নদীয়া—	৬.৫
মেদিনীপুর—	৫.৫
পাবনা—	২.৭
মালদহ—	১.৮
যশোহর—	১.২
হুগলী—	৯

কমেছে বেশী পশ্চিম বঙ্গ,—হিন্দুপ্রধান জেলায়। মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গে লোক-সংখ্যা বেড়েছে। মোটের উপর বাঙ্গলাদেশে লোকসংখ্যা অল্পই বেড়েছে। এর প্রতিকার যে কি তা অনেক স্থলে বলা হয়েছে; এখানে নতুন ক'রে আর কিছুই বলব না। এর প্রতিকার না হ'লে সাহিত্যের ক্ষতিতে বাধা পড়বে। যে জাত ম'রে যেতে বসেছে তার কি স্থিতি করবে? জীবনীশক্তি না বাড়লে সাহিত্য স্থিতি হয় না।

বাঁকড়া সহজে লোক বেড়েছে। কিন্তু জেলার লোক কমেছে। গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, চিকিৎসা হয় না। বাঙলা দেশ গ্রাম-প্রধান। বঙ্গেশহিতৈষীর গ্রামের উপর নজর দিতে হবে। বাঙলাকে বড় ক'বা মানে গ্রামকে বড় করা। গ্রামের উন্নতি না হ'লে সাহিত্যের উন্নতি হবে না। সাহিত্যের উন্নতি করবার উপায়, গ্রামবাসীর সাহিত্যস্থিতির হযোগ ক'রে দেওয়া।

কেবল শিক্ষিত বাবুর দ্বারা জাতির উন্নতি হবে না। আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যু বৃদ্ধি বেশী। মায়েরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব না জানলে এই শিশু-মৃত্যুর নিবারণ হবে না। অজ্ঞাত বহু কারণের মধ্যে এইজন্যও নারী-জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বেশী দরকার।

মিউনিসিপ্যালিটি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কড়া আইন করতে পারে। কিন্তু অশিক্ষা নানা দোষের আকর। শিক্ষা না হ'লে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটির কড়া আইনের দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না।

মহুসহিত্যের শাসন আমরা পালন করি না। মহুস ব্যবস্থা অনুসারে জলাশয়ে নিষ্কবন ত্যাগ করা এবং অজ্ঞাত প্রকারে জলাশয় দূষিত করা নিষিদ্ধ; অথচ এই কাজটি বাঙ্গালীই বেশী করে।

শিশুদের শিক্ষা মায়েদের দ্বারা হইবে বেশী হয়। প্রেসাইটের মধ্যে একটা কথা আছে, শিশুদের ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের স্কুলে দাও, তার পরে যেখানেই তারা যাক গ্রাহ্য করি না। প্রথম শিক্ষা মায়েদের কাছেই হয়। মানবজীবনের প্রভাতে শিক্ষার মূল্য বেশী। তাই মায়েদের দ্বারা শিক্ষার মূল্যও বেশী। স্বতরাং মায়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে দে-শিক্ষার অন্তরায় অনেক। যেমন, (১) মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ; (২) মেয়েদের স্কুলের গাড়ীর ধরচ বেশী। শিক্ষা রিপোর্টে দেখতে পাই, ত্রিধাকুর ও মালাবারে মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষাভিমাত্রী বাঙলা দেশের চেয়েও বেশী। গোঁড়ালের ঠাকুর সাহেব (রাজা) নিয়ম করেছেন যে, তাঁর রাজ্যে বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে—কিন্তু বালকদের নয়। এর কারণ তিনি বলেন, পবিত্রারের গৃহিণী শিক্ষিত হ'লে বালকবালিকারা অশিক্ষিত থাকবে না। কেবলমাত্র পরিবারের পুরুষ শিক্ষিত হ'লে শিশুরা অশিক্ষিত থাকতে পারে। স্ত্রী শিক্ষিত হ'লে লজ্জা স্বামীও শিক্ষিত হবে। গোঁড়ালের রাজা হিন্দু।

আমাদের দেশে অনেক কাব্য, অনেক নাটক এবং বহুসংখ্যক অজ্ঞাত বহি অতীতকালে রচিত হয়েছে। তার সংখ্যা নেই। পিকিনের ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিতে ২৫,০০০ সংস্কৃত, পালি বা তাহা হইতে অনূদিত গ্রন্থ আছে। কোন বাঙ্গালী অধ্যাপক আমাকে বলেছেন, ২০,০০০ জৈন গ্রন্থ তাঁর জানা আছে। এই সব দৃষ্টান্ত হ'তে পুরাকালে আমাদের দেশের সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বে শিক্ষাবিস্তার কিরূপ ছিল তা Census না থাকায় জানা যায় না। হেল্পানীর আমলে প্রথমে আমাদের নিজস্বের ইউনিভার্সিটি বা কলেজ ছিল না, কিন্তু পাঠশালা ছিল। মিটার এ্যাডাম্‌স্ কোম্পানীর আমলে দেশী বৃত্ত পাঠশালা ছিল বলেন, এখন স্কুল ও কলেজ সমস্ত মিলেও তত নাই। শুধু লিখবার পড়বার ক্ষমতা তখন অনেক লোকের ছিল। সাহিত্যও তখন তাই প্রকার লাভ করেছিল। পোবিন দাস জাতিতে কামার ছিলেন। তাঁর বাঁকড়া সকলের উপভোগের জিনিষ। সে-যুগে

এম-এ, পি এইচ ডি, ডি, এস-সি না থাকলেও সাধারণ লেখাপড়া জানা লোক বেশী ছিল। বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য-মঙ্গল বাঙলা ভাষায় রচিত। তা পড়বার জন্য অনেকে লেখা-পড়া শিখতেন। নারীরাও লেখা-পড়া শিক্ষা করতেন। বৈষ্ণব স্ত্রীলোকরা আজকালকার খ্রিস্টান মিশনারীদের মত অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তার করতেন।

এইটি সাহিত্য-সভা। এইজন্যে এই কথা ব'লে বক্তৃতা শেষ করি, যে, জাতির উত্তর শক্তি ও জীবনী-শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাঙালী, সামাজিক নৈতিক ও কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় যা কিছু পরিবর্তন আবশ্যক, তা করতে হবে। এইরূপে সকল দিক দিয়ে, উন্নতি করতে পারলে আমাদের সাহিত্যিক চেঁচা সফল হবে।

(মাধবী, ফাল্গুন ১৩৩৩)

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামায়ণে সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ

কর্ম্মা ও আদর্শ জনগণের নিত্যভঙ্গ যে-সময় শাস্ত্র নির্দিষ্ট আছে, সেই ব্রহ্ম যুদ্ধের্তে রাজারাও নিত্য হইতে উৎখিত হইতেন। পাছে ঠিক সময়ে নিত্য ভঙ্গ না হয়, একজন নিত্যভঙ্গ করিবার বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্তিধারী বন্দী (বন্দনাকারী) হ'ত, মাংস, স্ত্রীপাঠক-পানি-বাধক ও পারকরণ রাজত্ববনে সমাপ্ত হইয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজসুপার্বলী কীর্তন করিতে থাকিত। ইহার উপর নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত পরি দ্রবুভি-ধন হইতে থাকিত।

রাজ-অন্তঃপুরে স্ত্রী ও নপুংসক পরিচারকগণের ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের মধ্যে বাহারী স্নান-কার্যের ভারপ্রাপ্ত তাহারা স্নানের জন্য আনয়ন করিয়া যথারীতি স্নানার্থী স্নান-কার্যের সহায়তা করিত। বস্ত্র-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরিচারক বা পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া উপস্থিত থাকিত।

অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে তখন কেবল রাজপুত্রদিগের নয়—প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই বোধ হয় মুক্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

জ্যোতিষগণকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রণাম করিতে হইত। গুরুজনের সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইত, ততবারই নিজ নাম উচ্চারণপূর্বক কৃতান্তলিপিতে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হইত।

গুরুব্যক্তি কোন বস্ত্র প্রদান করিলে কৃতান্তলিপিতে তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তক স্পর্শপূর্বক দাতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিল।

গুরুজন স্নেহের পাত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার মস্তক আশ্রয় করিতেন।

প্রণামের নানাপ্রকার রীতিই প্রচলিত ছিল। গুরুজনকে ভূমিতে গড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিধি ছিল। সাধারণ জনগণ অসাধারণ জনকে মস্তক নত করিয়া মস্তকে হস্ত স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিত। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত ব্যক্তি দুই হস্ত যুক্ত করিয়া তাহা মাথায় বদ্ধ রাখিয়া সম্মান দেখাইতেন; বিজীঘণ এইরূপে বদ্ধাঙ্গুলি মস্তকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতাকে সম্মান অভিব্যক্তির জন্য ইচ্ছাছিলেন। অমৃতবেবা স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। হুমহান রামকে একপেও প্রণাম করিতেন। উচ্চ সভাসদ বা কর্তৃচািরগণও দূরে বাহন রাখিয়া গদব্রজে রাজসভায় আসিয়া রাজার পাদ বন্দনা করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেন। অতিথি বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন।

করমর্দন প্রথাটি বৈদেশিক প্রথা নহে। রাম হস্তী এইরূপে করমর্দন করিয়াই পরস্পর আশ্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। দশরথও রামকে হস্ত ধরিয়াই গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। শুধু রামায়ণে

নহে, বৈদিক সাহিত্যেও এই প্রকার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য শ্রম্ভকর্তা আর্ষভাগকে বলিতেছেন—আমার হস্তে তোমার হস্ত অর্পণ কর, চল নির্জনে যাই। এইরূপ ভাব হইতেই যে পরে করমর্দন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোলাকুলি বা আলিঙ্গন প্রথাও হুপ্রাচীন।

রাজা বাম্পুত্র অথবা তেমনট বাক্তিরী পুরতর কোন শ্রেণে প্রবেশে বাম্পুরী হইতে শব্দ-দুন্দুভি ধনিত হইত।

জয়স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান করিবার রীতিও সে কালের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুন্নি ষড়িগিকে অভ্যর্থনা করা ও কুশল প্রমাদি দ্বিজ্ঞাসার রীতি একটু পৃথক ছিল। রাজা ও ষড়ি সাক্ষাৎ হইলে সে সঙ্গমে অধ্যাক্ষ-তত্ত্ব ও রাজনীতি এই উভয় চর্চাই হইত।

ষড়ির রাজদর্শনে অশীর্ষক করিতেন, কিন্তু সাধারণ লোক রাজদর্শনে শ্রদ্ধার সহিত উপঢৌকন প্রদান করিত। কোথাও গমন কালে সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে করিয়া যাইবার রীতি ছিল। ভারতের নবী উত্তরও কালে সর্বত্রই গুরু পুরোহিত তারপর রাজকীয় মহিলাবর্গ, অতঃপর রাজ-মন্ত্রীদিগের পত্নীরা গমন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারত কিন্তু জীব সম্মান সংসারের সকলের চেয়ে উপরে ছিল। শ্রী পৃথক্কর্তা হইলেও সমাজের নৈতিক বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য জীকে ধর্মগ্রন্থে স্বামীর অধীন ও অমুখস্বামী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল।

কুসংস্কার সকল সমাজেই অল্প-বিস্তর আছে।

এখন জীলোকেরা বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া বোদন করিয়া থাকেন। কিন্তু রামায়ণের যুগে উদরে করাঘাত করিয়া বোদনের রীতি ছিল। শূর্ণপাণ্ডা উদরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিয়াছিল। সীতা এক স্থলে বাহু উর্দ্ধে তুলিয়াও বোদন করিয়াছেন।

শপথ করিবারও এইরূপ নানা কুসংস্কারজনক বিধান ছিল। বানী স্ত্রীকে পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন। হুময়ান মলয়, মল্লর, বিছা, হুমের, দর্দীর পর্বতের নাম ও ফলমূলের উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল। কৈকেয়ীও ভরতের নামে শপথ করিয়াছিলেন।

অপবিত্র অবস্থায় শরন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইত।

আমরা বিপদে অশ্রয়স্থলে তুচ্ছ তৎপথের উল্লেখ করি। রাবণ যখন নিঃসহা। সীতার সম্মুখে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থনা করিয়াছিল তখন জানকী রাবণ ও তাঁহার লিঙ্গের দূরত্বের মধ্যে একখণ্ড ভূমি রাখিয়া নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

যাত্রাকালে দক্ষিণ পদ অগ্রে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার রীতি আছে, কিন্তু গম্ভীর স্থানে পঁছহিতে যে বাম পদ অগ্রে স্পর্শ করাইতে হয় তাহার রীতি এখন নাই। হুময়ান প্রথম বামপদ অর্পণ করিয়া লক্ষ্যপর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ সংস্কারের যুক্তি—পণ্ডিতেরা বলেন, শত্রুপুত্রীতে বাম পদ অর্পণই শত্রু-অয়ের নিদান।

লৌকিক আমোদ-প্রমোদ বা নীতি-বিরুদ্ধ কোন খেলা-খেলার কথা রামায়ণে এক রকম নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পুরাণ কীর্তন ও গীত-নাটক ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের আভাস রামায়ণে পাওয়া যায়।

বৈদ্য শিখার মৎস্য শিকার একটি হুপ্রাচীন রীতি। রামায়ণে এই প্রকার জিহ্বা না ধাক্কিলেও রাগক-হলে এক স্থানে তাহাব উল্লেখ আছে।

রামায়ণে প্রায় কোন স্থলেই রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাগণ যে রক্ষণ করিতেন তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই না। কিন্তু মহিলাগণ যে একেবাবেই রক্ষণ-কার্যে অগ্রসর হইতেন না তাহা নহে। সীতা বনে

যে নিজে হস্তে রক্ষণ করিতেন রামায়ণের এক স্থলে তাহান আভাস আছে।

(সৌরভ, ফাল্গুন ১৩৩৩)

৩কেন্দারনাথ মজুমদার

সভ্যতায় বর্বরতার বীজ

গাধা ও ঘোড়া একই পরিবারের, কারণ এদের পরস্পর মিশ্রণ (inter-breed) সম্ভব। গাধার পরিবর্তন একটুও হয় নাই। এরা অতি প্রাচীন কালেও যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে।

আগে গাধার খুব কদর ছিল; যেখানে চাকা চলত না সেখানেই গাধা বাহকের কাজ করত। ভারতবর্ষে এখনও মহিষের খুব কদর। এরা মাল টানে ও দুধ দেয়, কিন্তু জগতের অজানা স্থানে এদের আর চল নেই।

গাধায় ও ঘোড়ায় মিলে খচ্চর হয়েছে। গাধার মত তার সহগুণ ও অবিচল পদক্ষেপ এবং ঘোড়ার মত তার আকাব, গতি ও সামর্থ্য। স্পেন, যুক্ত-রাজ্য, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে এদের চল খুব বেশী।

আমেরিকার এক জাতীয় বুনো মোষ ছিল, তাদের বলত বিষণ (Bison)। এরা মেরিন নদীর ধার থেকে রক্ষী পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করত। এরা এখন আর নাশ হয়ে গেছে। ভারতে বুনো মোষও অনেক। আফ্রিকার মোষ এখনও পোষ মানেনি। এরা যেমন একাও তেমন বলবান ও নির্ভীক।

আমেরিকার বিষণবা আমল ক্ষেত্র ভালবাসে, ইউরোপের বিষণবা ভালবাসে জঙ্গল; কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ার বিষণবা ভালবাসে জলাভূমি। দেখা যায়, বোড়েরা এখনও তাদের পূর্বাভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। পোষ মানালেও এখনও তারা জঙ্গল জলা-ভূমি ভালবাসে।

আগে বোড় সাধারণতঃ ভারবাহী (draft) রূপে ব্যবহৃত হত। এখন কিন্তু গরু ও বোড় মানুষ পোষে তাদের দুধ ও মাংসের জন্যে। ভারতবর্ষে কিন্তু বোড় এখনও ভারবাহী। গো-জাতির আর একটি বিশেষ শ্রেণী মুলি (Mulley)। এদের সিং নেই। মানুষ এদের কৃত্রিম নির্বাচনের দ্বারা (Artificial selection) তৈরী করেছে।

ছাগল ভেড়া হচ্ছে পার্শ্বত্যা জানোয়ার। সব মহাদেশের দুর্ভাগ্য পার্শ্বত্যা প্রদেশে এরা বাস করে। ভালুক ও নেকড়েরা এদের তাকিয়ে সমতল ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। এদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়ার বাস করত। আমেরিকার এদের নিয়ে আংল হয়েছে। এশিয়া হচ্ছে মানবের বাল্য ক্রীড়াভূমি ও সভ্যতার আদি স্থান। একটা সময় ছিল যখন মানুষের শিশুগণনই একমাত্র ব্যবসার ছিল। ছাগল ভেড়ার যে বহুবিধ উন্নত অবস্থা আমরা দেখতে পাই তা মাত্র আজ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মানুষ তৈরী করেছে। মানুষ এদের কোনও বুদ্ধির কাজে লাগায়নি। দুধ ও শস্যের জন্যে এদের এত আদর। অমূল্যবানের দ্বারা মানুষ সেটা এদের খুব বাড়িয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি একটুও বাড়তে পারেনি।

পোষা শূয়ার, ইউরোপ এশিয়া-মাইনর এবং আফ্রিকায় যে বুনো শূয়ার দেখতে পাওয়া যায় তাদেরই বংশধর। পোষা হলেও খুব শীঘ্র এরা ফের বুনো হয়ে যায়। সাধারণতঃ আমরা যাকে বুনো শূয়ার বলি, তার প্রামাণ্য—পালিয়ে গিয়ে বুনো হয়ে গ্যাছে। এরা হেঁচি হেঁচি দল বেঁধে থাকে, এবং পর্বতের প্রান্তি এদের খুব সহায়কৃত। কিন্তু খাবার সময় এরা ভয়ানক খার্পণ।

বক্সা হরিণ শীতল প্রদেশে বাস করে। ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার উত্তর মেদা অঞ্চলে এদের বাস। আমেরিকার বক্সা হরিণ

একটু পৃথক জাতীয়। সেদেশে এদের কারিবাউ (Caribou) বলে। সাইবেরিয়া এবং লাপ্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এদের দুধ মাংসও খায় এবং এদের ভারবাহিরূপে ব্যবহার করে।

মরু-সমুদ্রের জাহাজ হচ্ছে উট। এরা বাস করে উত্তর-আফ্রিকা, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায়। বস্ত্র অবস্থায় এদের এখন পাওয়া যায় না।

আরবী উটের একটা কুঁজ এবং ব্যাকটিয়ার উটের দুটো ক'রে কুঁজ থাকে। প্রমোক্তবধর বাস আরব এবং উত্তর-আফ্রিকায় এবং দ্বিতীয় জাতীয় বাস কক্সাপরের উপকূল থেকে সাইবেরিয়া, তিব্বত চীন পর্যন্ত। কোনও উট চড়বার উপযোগী, কোনও উট মরুভূমির, কোন উট বরফান দেশের, কোন উট পার্বত্য প্রদেশের উপযোগী।

উটের মেরুদণ্ড ঘোড়া এবং গরুর মত দোজা। উটু কুঁজ দুটো হচ্ছে চর্কি দিয়ে তৈরী। উটের দৈর্ঘ্য অতি অল্পত।

অনাদি কাল থেকে এরা একই রকমের আছে। এরা রাগলে গারে খুঁতু দেয়। বোকা তোলার সময় হাঁটু পেড়ে বসে। বোকা বেশী ভারি হ'লে চীৎকার করে, আর উঠতে চায় না। দক্ষিণ আমেরিকাতে হামা বলে এক রকমের উট আছে। এবং পেরুতে এর আর এক রকমের জাত আছে তাদের বলে আলপাকা।

হাতী দু রকমের—ভারতবর্ষের (Elephas Indicus) এবং

আফ্রিকার (Elephas Africanus)। আফ্রিকার হাতী কার্ণে-জিয়ানরা ছাড়া আর কেহ গৌর মানায়নি। এদের কান মস্ত মস্ত, খ্রী পুরুষ উভয়েরই দাঁত আছে, কপাল নিচু (convex) এবং স্বভাব অতি ভয়াবহ।

কত কালের লালন-পালনের ফল একটা—কুকুর। কিন্তু একটা হাতীকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে কয়েক মাসের মধ্যে তাকে প্রাণের উপযোগী করা যায়।

এক অষ্টেলিয়া ছাড়া সব মহাদেশে হাতী ছিল। এখন ইউরোপে হাতী না থাকলেও ম্যামথ (Mammoth) এবং উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকায় ম্যাসটোডন (Mastodon) হাতীর হাড়গোড় পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিদেরা (Geologists) বলেন, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর থেকেই তারা অন্তর্জান হয়েছেন। যতদূর ইতিহাসের দৃষ্টি চলে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সর্বপ্রথম হাতী ইওসিন যুগে (Eocene) ইজিপ্টে বাস করতো। তখন এর চেহারা ছিল একটা ছোট ঘোড়ার মত, দাঁত—ছোট বুনো শূয়ারের মত, কিন্তু শুঁড় খুব দীর্ঘ ছিল।

(উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

বাসুদেবানন্দ

“প্রাচীন ভারতে রাজ-কোষবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা”*

(Administration of Finance in Ancient India)

শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক

কোষ—সম্ভাজ রাজ্যের এক অঙ্গ বা “প্রকৃতি”

প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রকারগণ রাজ্যকে সম্ভাজ বা সম্ভ-প্রকৃতিক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। রাজ্যের সেই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতির নাম—(১) স্বামী, (২) অমাত্য, (৩) জনপদ বা রাষ্ট্র (৪) দুর্গ, (৫) কোষ, (৬) দণ্ড বা বল ও (৭) মিত্র বা সূত্ব। এই প্রত্যেকটি সূত্ব বা অবিকল না থাকিলে রাজ্যের কল্যাণ নাই। শুক্রাচার্য এই সম্ভাজ রাজ্যকে মানুষী-তত্ত্বের প্রতিকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া স্বামী বা রাজাকে এই রাজ্যনেহের মস্তকরূপে, অমাত্যবর্গকে নেত্ররূপে, মিত্র বা সূত্বকে কর্ণরূপে, কোষকে মুখরূপে, দণ্ড বা বলকে মনো-

রূপে, দুর্গকে হস্তরূপে ও রাষ্ট্র বা জনপদকে ইহার পাদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুখদ্বারা আহাৰ্য্য বস্তু গ্রহণ করিয়া মানুষ শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। রাজ্যেব পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্তও কোষরূপ মুখের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। ইংরেজীতে আমরা রাজার যে শক্তিকে “Majesty” বলি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই প্রতাপ বা প্রভাব নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—“স প্রতাপঃ প্রভাবশ্চ যন্তেজঃ কোষদণ্ডজম্”—রাজার কোষ ও দণ্ড হইতে সমুৎপন্ন যে তেজঃ, তাহাই তাহার প্রতাপ বা প্রভাব। কোষ ও সৈন্য সুরক্ষিত ও সুব্যবস্থিত রাখিতে পারিলেই রাজার “Majesty” বা প্রভাব বর্তমান থাকে। আজ আমরা এখানে কেবল কোষ-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের নিমন্ত্রণে, ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে Public Lectureরূপে বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে পঠিত প্রবন্ধ।

প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়

বর্তমান সময়ে ভারত-সরকারের সহিত প্রাদেশিক-সরকার সমূহের রাজস্ব লইয়া যে রূপ সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বা থাকি উচিত—আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচীন উত্তরাপথের বা দক্ষিণাপথের কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যের সহিত তদধীন ঋণ্ড ঋণ্ড সামন্ত রাজ্যগুলোর সেরূপ কোন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ছিল কি না তাহার কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। প্রাচীন ভারতে যে কোন রাজতন্ত্র-প্রদেশের ভিতর কিরূপভাবে রাজস্ব-বিভাগ পরিচালিত হইত, এখানে তাহাই যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে যে যে বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান—(১) নানাবিধ রাজস্ব, ভাগধেয়, কর, বলি ও ভূস্বের উৎপত্তি-কাহিনী ও তাহার তত্ত্বকথা; (২) কোন কোন বিষয়ে করাদি আদেয় ছিল ও তাহার হার; (৩) করসংগ্রহকারী ও তদ্বিনিয়োগকারী রাজ-পুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ; (৪) আপদ সময়ে নূতন করাদি প্রবর্তনের বিধি; (৫) সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকা ও তাহার হিসাবরক্ষকগণের কবণীয় ব্যবস্থা; ও (৬) রাজ্যের আয়ব্যয়ের দায়িত্ব-ভার। এই বিষয়গুলি ছাড়া আরও প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অস্তান্ত কথা যথা-সম্ভব উল্লেখ করা গিয়াছে।

কোনও এক প্রসঙ্গে [১।১৩ অধ্যায়] নীতিবিশারদ মহামতি কোটিল্য রাজ্যের প্রথম উৎপত্তি ও প্রজার সহিত তাঁহার কিরূপ সংবিৎপাণন (রক্ষা) থাকিবে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“মাৎস্তজ্ঞান্যভিভূতাঃ প্রজা মনুঃ বৈবস্বতঃ রাজানং চক্রিরে। ধাতু-যজ্ঞভাগং পণ্যদ্রব্যভাগং হিরণ্যং চাস্য ভাগধেয়ং একম্বরামাহঃ। তেন ভূতা রাজানঃ প্রজানং যোগ ক্ষেমবহাঃ। তেষাং কিস্বিং দণ্ডকরা হরন্তি যোগক্ষেমবহাঃ প্রজানাম্। তস্মাদ্ভূতঃ ভাগসারথ্যক্য অপি নিরপত্তি—তন্যৈতদ্ ভাগধেয়ং বোধমান্ গোপায়তীতি”।

প্রথম কর-সৃষ্টির কল্পনা

এই উদ্ধৃত সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে রাজা ও প্রজার মধ্যে রক্ষণমূল্য ভাগধেয় বা কর লইয়া যেপ্রকার এক চুক্তিনামা চলিয়া আসিতেছে তাহার পরিষ্কার স্মৃচনা দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের এই পণ্ডিত যখন এত স্পষ্টভাবে এই চুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—তখন

তদপেক্ষা প্রাচীনতর সময় হইতেই রাজনীতিশাস্ত্রের এই মত-বাদ যে চলিয়া আসিতেছিল এইরূপ মনে করা অসম্ভব হইবে না। বর্তমান সময়েও আমরা রাজার বা সরকারী শাসন-প্রণালীর কোন দোষ বা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাত্ তাহাদের কার্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়া থাকি—“প্রজার নানাপ্রকার কর-স্বত্বাদি দিয়া থাকে, স্বতরাং রাজা প্রজা হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে স্বরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না কেন? রাজা ত প্রজার ভূতিতে ভূত-অতএব তিনি প্রজার সেবক বা ভূতা। এখন দেখা যাউক কোটিল্যের বাক্যের অর্থ কি তিনি লিখিতেছেন—প্রজাগণ মাৎস্তজ্ঞান্যে বা অস্বাভাবিকতায় ক্লেশ-ভোগ করিয়া বৈবস্বত মনুকে সর্বপ্রথম রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন যে, তদীয় রক্ষা-কার্যের বেতন স্বস্ত্র তিনি প্রজা কর্তৃক উৎপন্ন ধাতুর ষষ্ঠ অংশ ও পণ্যের (বিক্রেয় দ্রব্যাদির) দশম অংশ ও অস্তান্ত কারণে রাজপ্রাপ্য তৎ-তৎ-প্রদেশ-প্রসিদ্ধ হিরণ্য (নগদ মুদ্রা) ভাগধেয়রূপে প্রজার নিকট হইতে পাইবেন। এই ভাগধেয়-রূপ ভূতি গ্রহণ করিয়া তিনি প্রজাগণের যোগ ও ক্ষেম সাধন করিতে পারিবেন। [“অলভ্যলাভো যোগঃ স্তাৎ ক্ষেমো লব্ধস্ত পান্নম্” ইতি যাদবঃ।] রাজার আদেয় দণ্ড (অর্থদণ্ড লব্ধ ধন) ও কর রাজ্যের কিস্বিং (চৌর্যাদিজনিত নানারূপ পাপ) দূর করিতে ও প্রজার যোগ-ক্ষেম-সাধক হইতে পারে। এই নিমিত্ত আরণ্যক ঋষিগণও তাহাদের উল্লেখিত লব্ধ ধাতাদির ষষ্ঠভাগ রাজাকে প্রদান করিতেন এবং ভাবিতেন—

“এই ভাগধেয় তাঁহারই লভ্য—যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন”। রাজা করদায়ীকে রক্ষা করেন তাই গৌতমও ধর্ম্মসূত্রে রাজাকে “তদ্রক্ষণ-ধর্ম্মী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রজার রক্ষা বিধানের মূল্যরূপেই রাজা রাজস্ব বা কর পাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম বা কর্তব্য হইল প্রজার রক্ষাকার্য্য এবং উহার মূল্য স্বরূপ হইল প্রজা-প্রদত্ত করে বা ভাগধেয়ে তাঁহার অধিকার। কিন্তু তাহাতে অধিকারী বলিয়া তিনি প্রজার দুঃখ-দৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উৎপাদন সহকারে যথেষ্টভাবে মূলোচ্ছেদনপূর্বক যদি

নিজপ্রাপ্য আদায় করিয়া লয়েন, তাহা হইলে সে রাজাকে নিজ কর্তব্যবিমুখ, স্বতরাং অপ্রশংসার পাত্র, বলিয়া মনে করা হইত।

করতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতে রাজার প্রধান লক্ষ্য থাকিত— স্বরাজ্যের প্রজা-সমূহ “দণ্ড-করসহ” কি নয়, অর্থাৎ রাজবিধেয় দণ্ড ও করের মাত্রা তাহারা সহ করিতে পারিবে কি না। এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই দণ্ড-করাদির প্রণয়নও সংগ্রহ করা হইত। মহাভারতের একস্থানে কোষোৎপাদনে রাজার উৎপীড়ন ক্ষমাই বলিয়া উল্লিখিত হইলেও—

“নান্দান পীড়য়িষেহ কোশঃ শক্যঃ কুতোবলম্।

তদর্থঃ পীড়য়িষ্য চমোঘং প্রাপ্তুং ন নোহিহঁতি ॥” ১৩.১৩৬

তাহাকে কখনই অত্যাচারিত হইতে হইবে না এইরূপ শতশত উপদেশও মহাভারতের অন্তঃসং ও নীতিশাস্ত্রে ও স্মৃতি প্রভৃতিতে উল্লিখিত পাওয়া যায়। “ভূমি মালিকার পুষ্পোচ্চানে ঘাইয়া পুষ্প তুলিয়া আনিলেই তোমার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে, পুষ্পবৃক্ষটি উন্মূলিত করিবার অধিকার তোমার নাই। গোপালকে বৎসগানোপযোগী ছন্দ রাখিয়া দোহন করিতে হইবে। মধুকর-বৃন্তি অবলম্বন করিয়া তোমাকে অল্পাঙ্গ কর সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত রাখিয়া প্রজার হিতকর কার্যে ব্রতী থাকিতে হইবে। অত্যাচার প্রজার বিরাগে তোমার রাজ্যনাশ হয়, তোমার সিংহাসনচ্যুতি অবশ্যজ্ঞাবী”— এইপ্রকারেই প্রাচীন শাস্ত্রকরণ রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধে রাজাকে সর্বদা অপ্রমাদী থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম প্রথম কল্পিত কর প্রজাকে সহ্য করাইতে পারিলে তিনি ক্রমশঃ করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ব্যাঘ্রী নিজ অপত্যজাতকে তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা দংশন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু অপত্য-স্নেহবশতঃ সেই তীক্ষ্ণদংশনেও এমন একটা মুহূর্ত্ত থাকে যে, অপত্য তজ্জন্তু কোন বেদনা ভোগ করে না। জলোকা মাছষের রক্ত পান করে বটে, কিন্তু মাছষকে তাহা বুঝিতে দেয় না। মুষিকও অনেক সময় নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থিত

মাংস কাটিয়া লইয়া যায়, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি তাহাতে জাগ্রতও হয় না। এইভাবেই নরপতি প্রজাবর্গকে নিজ প্রজা বা সম্ভতিক্রমে মনে করিয়া যুদ্ধ উপায়ে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া কর-সংগ্রহকারী রাজকর্মকরদিগকে উপদেশ দিয়া দিতেন। তাই মহাভারতকার পুনরায় একস্থানে লিখিয়াছেন—

“অমেনানেন দেয়েন বর্দ্ধমানং প্রদাণয়েৎ।

ততো ভূমন্ততো ভূমঃ ক্রমবৃদ্ধিং সমাচরেৎ ॥” ৮৮।৭

প্রথমতঃ অল্প অল্প করিয়া প্রদান করিলে পর যখন প্রজা সমৃদ্ধতর হইবে, তখন বর্দ্ধিত হারে তাহার নিকট হইতে রাজ্য আদায়ের উপায় করিয়া লইবেন। ‘তারপর আরও একটু অধিক তারপর আরও একটু অধিক’ এইরূপে ক্রম-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। আপদকাল ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে রাজা কখনও অশাস্ত্রীয় কর লইতে পারিতেন না। সর্বপ্রকার করাদি ও তাহার হার নিয়মিত ছিল। তাহার ব্যতিক্রম রাজা করিতে পারিতেন না। কর-প্রণয়নে ও তৎসংগ্রহে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা থাকিত না। শাসন-প্রণালীর সৌকর্য্যার্থ প্রজাগণও ধর্মবিহিত করাদি প্রদান করিতে বাধ্য হইত।

বর্তমান সময়ে ভারত-সরকারের সর্বাপেক্ষা প্রধান আয়ের পথ ভূমি-কর (Land-revenue) এবং তাহা নগদ টাকায় সংগৃহীত হয়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে অধুনাতন ভূমিকরের মত কোনও কর প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভূ-স্বামিত্ব কাহার? রাজার না, প্রজার? এই সমস্তাপূর্ণ প্রশ্নের বিচার এই প্রবন্ধে চলিতে পারে না, কারণ ইহার সমাধানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীন কালের যে, সমস্ত ভূমি-বিক্রয় সম্পর্কীয় বা ভূমি-দান বিষয়ক তাম্র-শাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মর্ম নিপুণভাবে গ্রহণ করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, বোধ করি, তখনকার দিনে প্রজারাই ভূমির প্রথম স্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য হইত। পরে, ক্রমশঃ রাজাকে ভূমিপতি বলা হইতে থাকে। ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ, তাই কৃষ্ট ভূমির প্রধান উৎপাদ যে ধাতাদি তাহার ভাগ দেওয়াই সর্বপ্রথম প্রধান কর বা বলি ছিল এবং কৃষ্টভূমি

অতিভোগ, মধ্যম ভোগ ও অল্প ভোগ অনুসরণ করিয়া এই ভাগধের হার দশমভাগ, অষ্টমভাগ বা ষষ্ঠভাগরূপে নির্দিষ্ট ছিল। ইহা কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ের কথা—কিন্তু পরে সাধারণতঃ ধাতাদির ষষ্ঠভাগই বলিরূপে ধার্য্য হইয়া গৃহীত হইত। প্রথম কোনও পতিত ভূমিখণ্ডে জনপদ নিবেশকালে রাজাকে দেখিতে হইত যে, প্রত্যেক নূতন গ্রামে ১০০ হইতে ৫০০ কুল বা গৃহস্থের বাস থাকে এবং গ্রামটি শূদ্র-জাতীয় কর্ণবহুল হয়। এইপ্রকার ১০টি, ২০০টি, ৪০০টি ও ৮০০টি গ্রাম-সমষ্টির বর্ণাক্রমে নাম ছিল “সংগ্রহণ,” “কার্ব-টাক” (cf. Thana Town), “দ্রোণমুখ” (cf. S. D. Town) ও “স্থানীয়” (cf. D. T. Town)। এইসমস্ত স্থানে রাজা ঋত্বিক, আচার্য্য, রাজা পুরোহিত ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে “ব্রহ্মদেয়” সংজ্ঞক ক্ষেত্রভূমি দণ্ড-কর রহিত করিয়া দান করিতেন। রাজকীয় বিভিন্ন শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষগণ, সংখ্যায়ক প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণ, “গোপ” নামক দশ-গ্রামাধিপতি ও “স্থানিক” নামক নগর চতুর্ভাগাধিকারী ও অশ্রম্য বড় বড় কয়েকজন রাজতৃত্যও বিক্রয় ও আধানের অধিকার বর্জ্জনে বিনাম্বরে এইরূপ ক্ষেত্রাদি ভোগজন্য পাইয়া থাকিতেন। কৃষকগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রবিহিত রাজদেয় ভাগাদি কররূপে দিতে স্বীকৃত থাকিত তাহারাই “কৃত-ক্ষেত্র” (কর্ষণ-বপন-যোগ্য) পাইত এবং যাহারা “অকৃত” (সাধ্য সৌষ্ঠব) ক্ষেত্র কর্ণ-যোগ্য করার চেষ্টা করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইত না বরং সে-ক্ষেত্রকে হল-প্রয়োগের উপযোগী না করিতে পারিলে তাহারা ক্ষতিপূরণ জন্ত রাজাকে কিছু দিত। এমনকি, সেই অবস্থায় অনেক সময় রাজা তাহাদিগকে ধান, পশু ও হিরণ্য (নগদ টাকা) দিয়াও অল্পগ্রহ করিতেন। কিন্তু এইরূপ পরিহার (exemption) ও অল্পগ্রহ করিতে যাইয়া রাজাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত যেন তদ্বারা রাজ্যের কোষ-ক্ষয় না ঘটে।

শুক্রবিধি ও তাহার হার

ঠিক বর্তমান কালের প্রথমে প্রজার ষোপাঙ্কিত আয়ের উপর যেভাবে যত হারে কর নির্দিষ্ট হইতেছে

প্রাচীন সময়ে তদ্রূপ আয়কর বিহিত না থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক প্রজাকেই কোনও না কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্ৰত্যক্ষ কর দিতে হইতই। কি পশুরক্ষক, কি হিরণ্যের বৃদ্ধি-প্রযোক্তা (স্বদখোর), কি পণ্যব্যবহারী বণিক, কি ফলমূলাদি বিক্রেতা সকলকেই নিয়মিত হারে নানা প্রকার শুদ্ধাদি দিতে হইত। নিষ্ক্রাম্য (exported) ও প্রবেশ্য (imported) উভয়বিধ পণ্যজাতের উপরই শুকের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতে কোন পণ্যই ইহার জাতি-ভূমিতে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানে বিক্রীত হইতে পারিত না। এই বিধি একটু কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা মধ্যবর্তী ক্রেতৃগণের হস্ত-পরিবর্তন হইতে পণ্যের রক্ষা সাধন করিয়া তাহার মূল্য সহনোপযোগী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। পরদেশজাত পণ্য রাজ্যের নিজ জনপদে বা নিছের জনপদ-জাতপণ্য স্বরাজ্যস্থিত হুর্গে, নগরে ও নিগমে প্রবেশ্য হইলে তৎ-তৎ-পণ্যের যাহা মূল্য তাহার পঞ্চভাগ রাজ্যদেয় শুদ্ধ—ইহাই সামান্য নিধি। কিন্তু পুষ্প, ফল, শাক, শুদ্ধ মৎস্য ও মাংসাদির শুদ্ধ ষষ্ঠভাগ; ক্ষৌম, ছুলাদী সূক্ষ্ম বস্ত্র, লৌহময় ও ধাতুজ দ্রব্যাদি, চন্দনাদি, সুরা, গজদন্তনির্মিত ও চর্মনির্মিত দ্রব্যাদির শুদ্ধ দশভাগ বা পঞ্চভাগ; এবং অশ্রম্য বস্ত্র, চতুর্দশ ও দ্বিপাদাদি জন্ত, সূত্র, কার্পাস, গন্ধদ্রব্য, ভৈষজ্য, কাষ্ঠ, যুত্তা-গাদি, তৈলাদি স্নেহময় পদার্থ, ক্ষার, লবণ ও পট্টাদির শুদ্ধ বিংশতি ভাগ অথবা পঞ্চবিংশতি ভাগ বিধেয় ছিল। শস্য, হীরক, মণিমুক্তা প্রবালাদির উপর কোন শুদ্ধ ভাগ রাজবিধি নির্দিষ্ট থাকিত না,—জহরী বা তল্লক্ষণনিদগণ এইপ্রকার পণ্যের উপর যে শুদ্ধ ধার্য্য করিয়া দিতেন—তাহাই রাজ্যের প্রাপ্য ছিল। নানারূপ অপবোধ প্রযাণিত হইলে রাজবিহিত যে অর্থদণ্ড অপরাধীকে দিতে হইত তদ্বাণ্ড রাজকোষের বেশ আয় হইত। শুদ্ধ প্রসঙ্গে এইরূপ আয়ের একটু পরিচয় দিতেছি। লৌহ লবণাদি খনিজ বস্তুর তৎ-তৎ-খনিতে ক্রীত হইলে ক্রেতাকে ৬০০ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত, পুষ্পবাট ও ফলবাট হইতে পুষ্প বা ফল গৃহীত হইলে ৫৪ পণ, শাকাদির ক্ষেত্র হইতে শাকাদি হইলে ৫২ পণ এবং অশ্রম্য শস্যও তৎ-তৎ-ক্ষেত্রে বিক্রীত হইলে গ্রহীতাকে ৫৩ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। যে-দ্রব্যের যে-

শুক বিহিত ছিল, তাহার পঞ্চভাগ লওয়ারও একটা বিধান ছিল। তাহার সংগ্রহের ভার দ্বারাধ্যাক্ষের উপর অর্পিত ছিল। এবং সেইজন্যই এই করের নাম ছিল “দ্বারাদেশ”। তবে উপবি উল্লিখিত শুদ্ধ-সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রকার অসুগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাজ্যে গ্রস্ত থাকিত।

সেকালে অনেকগুলি শিল্প-বাণিজ্য রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। নৌনির্মাণ, খনি, দারু প্রভৃতির বন, হস্তিবন ও অন্যান্য আরও কতকগুলি বিভাগের কেবল যে রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল তাহা নহে, সেইসমস্ত বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যাদির কারবারও রাজকীয় ছিল, এমন-কি ইহার মধ্যে বত কারবার রাজ্যের একমুখ অর্থাৎ একচেটে ছিল। রাজ্যের হস্তে নাশ্ত এইসকল একমুখ কারবার দ্বারা প্রজার বহুমুখ উপকার সাধিত হইত। রাজকীয় কারখানা বা কর্মশালা অনেক লোক কর্মকর নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে সমর্থ হইত। বর্তমানকালীন মধ্যবিস্ত প্রজার অনিয়োগ সমস্যা (unemployment question) বোধ হয় এই কারণেই তদানীন্তন রাজাদের আলোচন ও পূরণ করিতে হইত না। সে যাহা হউক, খনিজ দ্রব্যসমূহের মধ্যে লবণ একটি প্রধান দ্রব্য ও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুজাতের মধ্যে অন্ততম। প্রত্যেক প্রজাকে যেমন এখন রাজপ্রণীত লবণ-শুল্কের কিছু পরিমাণে ভাগ অপ্রত্যক্ষভাবে বহন করিতে হয় প্রাচীনকালেও প্রায় তদ্রূপই ছিল। লবণ কিম্বা অস্ত্র বস্তুর আকর কর্মান্তের কার্য বহুব্যয়সাধ্য ও বহুলোকের প্রযত্নসাধ্য বিবেচিত হইলে রাজারা তাহা ভাগে বা প্রক্রয়-প্রথায় পণ্ডন বা ইজারা দিতেন এবং লঘু ব্যয়সাধ্য ও লঘু প্রযত্নসাধ্য আকরগুলি নিজ অধ্যক্ষগণের পর্যবেক্ষণেই রাখিয়া দিতেন। আকরজাত লবণ কর্মান্ত হইতে ব্যবহারোপযোগী হইয়া নিষ্পন্ন হইলে লবণাধ্যক্ষকে নিয়মিত ভাগ সংগ্রহ করিতে হইত ও নিজ বিভাগে প্রস্তুত লবণের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইত। পূর্ক-বর্ণিত নির্দিষ্ট ভাগ ও প্রক্রয়লব্ধ লবণ সম্বন্ধে ব্যাজী নামক শুদ্ধ তাহাকেই সংগ্রহ করিতে হইত। এই ত গেল রাজ্যের নিজ রাজ্যোৎপন্ন লবণ

সম্বন্ধে বিধি। আগন্তু অর্থাৎ পরদেশজাত লবণের কারবার যাহারা করিত তাহারা প্রথম ক্রয়-সময়ে ব্যাজী ও রূপিক নামে প্রসিদ্ধ শুদ্ধ দিয়াই খরিদ করিত এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা পরদেশ-জাত লবণ ব্যবহার জ্ঞাত খরিদ করিত তাহারাও শুদ্ধ দিয়া ও রাজ-পণ্যের ছেদ-জনিত ক্ষতির পূরণার্থ বৈধরণ নামক এক-প্রকার শুদ্ধ দিতে বাধ্য ছিল। বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্ত কেহ রাজ্যের অসুখমতি ব্যতিরেকে লবণের কারবার করিলে তাহাকে উত্তমদণ্ড অর্থাৎ ১০০০ পণ মুদ্রা অর্থ-দণ্ডরূপে দিতে হইত। স্বদেশজাত আকরজ ও খনিজ দ্রব্যাদি ও তন্নির্মিত পণ্য দ্রব্যাদির রক্ষা (protection) সম্বন্ধে পূর্বতন রাজগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন বলিয়াই প্রজারা জীবন-যাত্রা নির্বাহে তত কিছু ক্রেশ ভোগ করিত না। তাহার প্রমাণ এই লবণের কারবার।

রূপ-বিভাগ (Mint) ও লক্ষণাধ্যক্ষ

পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারেও রাজদেয় কর-দণ্ডাদির পরিশোধে ধাতু-নির্মিত মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার ভাবতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। স্বর্ণ, রক্ততাম্র ও তাম্রময় মুদ্রার ব্যবহারই প্রাচীন কালে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। দীনাব, পণ, অর্দ্ধপণ, পাদপণ, অষ্টভাগ পণ, মাষ, অর্দ্ধ মাষ, কাকণী, অর্দ্ধ কাকণী প্রভৃতি মুদ্রার বহুবিধ নাম ছিল—স্বরূপতঃও ভারতের নানা প্রদেশে তৎতৎ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। দীনার স্বর্ণ-নির্মিত, পণ্যাদি চতুষ্টয় রূপনির্মিত এবং মাষাদি তাম্র-নির্মিত ছিল। বিশুদ্ধ স্বর্ণাদি দ্বারা কখনই মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত না। রাজদণ্ডাদি পণ—নামক মুদ্রা দ্বারাই অধিকতর ভাগে সংখ্যাত হইত। এই পণ নামক “রূপ্য-রূপে” (অর্থাৎ রূপার মুদ্রাতে) চাক্ষ-ভাগ তাম্র ও কালায়স রক্ত (রাঙ) সীস বা রসায়নের এক ভাগ এবং একাদশ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকিত। উল্লিখিত অন্যান্য মুদ্রাতেও এই অনুপাতেই খাদ মিশ্রিত থাকিত। বিশুদ্ধ ধাতু দ্বারা মুদ্রাসকল নির্মিত হইত না বলিয়া লক্ষণাধ্যক্ষ বা টঙ্কশালাধ্যক্ষের বিভাগ হইতেও রাজ্যের বেশ আয় হইত। এখনও মুদ্রার মূল্য নির্ণয়

লইয়া ভারতবর্ষে কত গোলযোগ চলিতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাজার আদেশে নির্মিত লাঞ্জনযুক্ত এই মুদ্রা কারবারে বা রাজকোষের জমার ক্ষতি, কোনও সাধারণ লোকের বা রাজপুঙ্খের গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না [অর্থাৎ ইহা legal tender রূপে ব্যবহৃত হইত]। ধাতু-নির্মিত মুদ্রার পরীক্ষা জ্ঞাত একজন রাজ-কর্মচারী থাকিত, তাহার নাম 'রূপ-দর্শক'। একশত পণে আটপণ (রূপিক সংজ্ঞক) পাঁচ পণ (ব্যাঙ্গী সংজ্ঞক) বা সাড়ে বার পণ পারীক্ষিক সংজ্ঞক বাটার ব্যবস্থা দেওয়ার ভার এই রূপ-দর্শকের উপর স্থাপিত থাকিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে শাসন-সরকার যে-রীতি অবলম্বন করিয়া পত্র মুদ্রা বা কাগজ মুদ্রার প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং যে মুদ্রাতে অধুনাতন লক্ষণাধ্যক্ষ সরকার-পক্ষে মুদ্রাতে উল্লিখিত টাকার সংখ্যা তদ্বাহককে চাওয়া মাত্র ধাতুনির্মিত মুদ্রা দ্বারা পরিশোধের অস্বীকার করিয়া থাকেন—তদ্রূপ কাগজ মুদ্রার প্রথা প্রাচীন ভারতে কখনও ছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু এখন আমবা কখনই একরূপ বুঝি না যে, যত টাকা মূল্যের পত্রমুদ্রা সরকারী আফিস হইতে বাজারে প্রচলন জ্ঞাত নিজস্ব হয় তদনুরূপ ধাতুমুদ্রা রাজকোষে নাই।

বিবিধ আয়-মুখ

নিম্নে উল্লিখিত দুর্গাদিসংজ্ঞায় পরিচিত সাতটি বিষয় রাজস্বোৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট। এই সপ্তায়তন আয় শরীরের মধ্যে সপ্তযষ্টি প্রকারের আয়ের পথ উল্লিখিত আছে। যথা—

(ক) ১। ঘটদেয়াদি নানাক্রম শুদ্ধ। ২। নানাক্রমকার রাজদণ্ড-লব্ধ আয়। ৩। তুলা ও মান সংক্রান্ত আয়। ৪। নাগরিক বিভাগের আয়। ৫। লক্ষণাধ্যক্ষের অর্থাৎ টঙ্কশালার আয়। ৬। মুদ্রাধ্যক্ষ বিভাগের [pass-port বিক্রয় জ্ঞাত] আয়। ৭। স্বরাবিভাগের আয় (Excise)। ৮। স্থনা বিভাগের (slaughter house) আয়। ৯। স্বত্রাধ্যক্ষের আয়। ১০-১২। এবং তৈল, ঘৃত ও ক্ষার বস্তুর কারবার-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার

ব্যতিক্রমজনিত আয়। ১৩-১৪। রাজ-সৌবর্ণিক ও রাজপণ্যশালার আয়। ১৫। বেথাদের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থদ্বারা আয়। ১৬। ও দ্যুত বা জুয়াখেলায় নিয়ম-জনিত আয়। ১৭। বাস্তবিকোপজীবীগণ (architects) হইতে লব্ধ আয়। ১৮-১৯। ও কারু শিল্পীগণের দেয় শুদ্ধাদি হইতে আয়। ২০। নগর দেবতাধ্যক্ষের আয়। ২১। দ্বারা দেয়। ২২। বাহিরিক অর্থাৎ বট-নর্তকাদি হইতে গ্রাহ্য শুদ্ধ দ্বারা আয়। এই দ্বাবিংশতি উপায় দ্বারা লভ্য রাজস্ব দুর্গসংজ্ঞক।

(খ) ১। সীতা বা কৃষিসম্বৃত আয়। ২। প্রসিদ্ধ ধাত্তাদির যজ্ঞভাগ। ৩। বলি-নামক ধর্ম দেবতা বিদগ্ধক কর। ৪। ফলবৃক্ষাদি সম্বন্ধীয় রাজদেয় কর। ৫। বণিকদের দেয়। ৬। নদীপাল বা ঘাটরক্ষকদের দ্বারা প্রাপ্য আয়। ৭। তর-নামক (জল-কর)। ৮। নৌ-বিভাগের আয়। ৯। ছোট ছোট পট্টন নামক নগর সম্ভ্রাত আয়। ১০। এবং বিবীত বা ব্রহ্মভূমি সম্ভ্রাত আয়। ১১। বর্জনা (পথকর)। ১২। রজ্জু নামক কর (বিষয়পতিদেয় ভূমির জরিপ জ্ঞাত কর)। এবং ১৩। চোর রজ্জু নামক কর (সম্ভবতঃ গ্রামদেয় চৌকিদারী টেবিস)। এই ত্রয়োদশ উপায়ে লব্ধ রাজস্ব রাষ্ট্র-সংজ্ঞক।

(গ) স্বর্ণ, রজত, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, লোহ, লবণ, ভূমিধাতু (সম্ভবতঃ কদলা প্রভৃতি), প্রস্তর ধাতু ও রসধাতু এই দ্বাদশ ধনিজ পদার্থের রাজকীয় কারবার-জনিত রাজস্বোৎপত্তি। এই আয় ধনি-সংজ্ঞক।

(ঘ) কুম্ভাদি কুম্ভমবার্ট, ফলবার্ট, পুগাদি যজ্ঞ, কেদার (ধাত্তাদি জেত্র) ও মূলবাপ (হরিত্রা, অত্রিক প্রভৃতি ক্ষেত্র) এই ছয়টি স্থানে উৎপন্ন বস্তু হইতে প্রাপ্ত আয়। আমেরিকায় এইরূপ বহুলভাবে সরকার পরিচালিত ফলমূল্যাদির উৎপত্তি ও ব্যবসায়ের ব্যবস্থা অদ্যাপি আছে। এই আয় সেতু-সংজ্ঞায় পরিচিত।

(ঙ) পশুবন, মৃগবন, জবাবন (প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠাদির বন) ও হস্তিবন, এই চারি স্থান হইতে লভ্য আয় বন-সংজ্ঞায় পরিজ্ঞাত।

(চ) গো, মহিষ, ছাগ, মেঘ, গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও

অশ্বতর (বেসর) এই আটটি পশুর রক্ষণ পোষণ বর্জন দ্বারা যে রাজকীয় কারবার (Farm) তাহা হইতে লব্ধ হয়। ইহা ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত।

(ছ) স্থলপথ ও জলপথ এই দুইটি উপায়ে যে রাজস্ব লাভ হইত তাহা বণিক পথ-সংজ্ঞায় জ্ঞাত ছিল। নগর হইতে নগরান্তরে পণ্যবাহী বণিকদের যাতায়াতের জন্য যে রাজমার্গ বিস্তৃত ছিল তদ্ব্যবহার জন্য তাহাদের নিকট হইতে এবং সমুদ্র-ব্যবহারী বণিকদিগের নিকট হইতে রাজ্যের যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত তাহাই এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপরি উল্লিখিত উপায়ে উৎপন্ন রাজস্ব দ্বারা রাজ্যের মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম মূল আয়। ধাতাদি ভাগ দ্বারা লভ্য আয়ের নাম ভান। জ্বাদি মাণিয়া লইবার সময় নিয়মিত হারে কিছু বেশী লইবার দক্ষণ যে আয় তাহার নাম ব্যাজী। নদী প্রভৃতির ঘাটে দেয় বা ঐ শ্রেণীর যে যে আয় তাহা পরিষ নামে পরিচিত। সমগ্র গ্রামাদি হইতে প্রাপ্য যে হিবণ্য বা ধাতাদি প্রতিনিয়ত ছিল তাহার নাম রূপ্ত। লবণাদি দ্রব্য হইতে শত প্রাশ্নে যে অষ্টভাগাদি গৃহীত হইত তাহার নাম রূপিক এবং রাজ্যদ্বারে প্রমাণিত অপরাধ-জনিত দণ্ডাদি হইতে যে আয় তাহার নাম প্রত্যয় আয়। এইরূপ আরও বহু প্রকার কর ও শুদ্ধের পারিভাষিক নাম প্রাচীন অর্থ-শাস্ত্রে ও নীতি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, পিণ্ডকর, সেনা-ভক্ত, উৎসঙ্গ, পার্শ্ব, পরিহীনক, তর, চৌরগ্রহণিক, হট্ট, উদকভাগ, নৌকা-হাটক প্রভৃতি। শিল্পিগণকে শুদ্ধের পরিবর্তে মাসে একদিন করিয়া রাজ্যকে খাটিয়া দিতে হইত। সেই দিন-কার্য্যই তাহাদের শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই কার্য্যের দিনে তাহারা রাজবাড়ী হইতে ভক্ত বা অন্ন আহ্বারার্থ পাইত। ইহার অপর নাম “বিষ্টি”। এখন রাজ্যকোষ হইতে যে যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহার একটি তালিকা দিতেছি।

নানাবিধ ব্যয়সুখ

১। দেবপূজা (যজ্ঞাদি) পিতৃপূজা ও পক্ষাদি

সময়ে ব্রাহ্মণ, বাল, বৃদ্ধ, আতুর ও অনাথদিগকে দান করার জন্য ব্যয়।

২। রাজ্যের মঙ্গল জন্য স্বস্তিবাচন ব্যয় অর্থাৎ শাস্তিক ও পৌষ্টিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যয়।

৩। অন্তঃপুরস্থিত মহাদেবী (পাটরাণী) ও অন্যান্য দেবীগণ এবং রাঙ্গকুমারদিগের ভরণপোষণ ও ভোগ-বিলাস নিমিত্ত ব্যয়।

৪। রাজপাকশালার ব্যয়।

৫। দূতবিভাগীয় ব্যয়।

৬-১০। কোঠাগার, আয়ুধাগার, পণ্যাগার, কুপ্যগৃহ ও নানাদ্রব্যের কক্ষান্ত বা কারখানার কার্য্যজন্য ব্যয়।

১১। বিষ্টি অর্থাৎ আকস্মিক ক্রিয়া আগতিত হইলে কর্তৃকর দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পাদন জন্য ব্যয়।

১২-১৫। হস্তি, অশ্ব, রথ, ও পদাতি এই চতুর্দশ সেনারূপী রক্ষণাদি ব্যয়।

১৬। গো-মহিষাদি পশু রক্ষণ জন্য ব্যয়।

১৭-২০। পশু, মৃগ, পক্ষী, ও সিংহব্যাঘ্রাদি ব্যাল জন্তুর বাট রক্ষণাদি ব্যয়।

২১-২২। কাষ্ঠ তৃণবাটের রক্ষণাদি ব্যয়।

এই ষাটবিংশতি প্রকার ব্যয় উপদ্রব-শূন্য সময়ে শাসন-প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে চালাইবার জন্য অবশ্যসম্ভাবী। কিন্তু এই ব্যয়গুলি বহন করিতে রাজসরকার কি পরিমাণ অর্থ রাজ্যকোষ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়। রাজত্বত্যাগের বেতন নির্দেশ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া বোটিলা একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম (দানাদিক্রিয়া) ও অর্থের (লোক-হিতকর ব্যয়বহুল কার্য্যের) প্রতিবন্ধ উৎপাদন না করিয়া, ও সর্বপ্রকার আয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পুরদুর্গ ও জন-পদের শক্তি-সামর্থ্য পর্যালোচনা করিয়া রাজ্যকে রাজ্যের সমগ্র আয়ের একপদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ দ্বারা [“সমুদয় পাদেন”] যাবতীয় বিভাগের রাজপাদোপজীবীগণের বেতনাদি খরচ নিষ্পন্ন করিতে প্রয়াসবান হইতে হইবে। সর্বদা আয়ব্যয় সম্যক্রূপে অবলোকন করিয়া রাজসরকারকে রাজ্য চালাইতে হয়। এই কথা সত্য বটে যে, দণ্ড বা

সৈন্তের বলে বলীয়ান থাকিলে শাসনপ্রণালী ঠিক চলিবার সম্ভাবনা, কিন্তু সৈন্তবিভাগ ঠিক রাখিতে হইলে কোষের প্রয়োজন অধিক। কোষ ও বল সন্তোষরাজ্যের এই দুই প্রকৃতির সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবিদগণ তাহা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন।

সাময়িক বিভাগের ব্যয়

“বল-মূল্যে ভবেৎ কোশঃ কোশমূলং বলং স্মৃতম্” শুক্র-নীতির এই বাক্যটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নহে যে, রাজাকে বা

রাজসরকারকে সৈন্তবিভাগের জন্ত প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রতিবৎসর খরচ করিতে হয় ও তাহা করাও উচিত। কিন্তু এইমাত্র বলিয়াছি যে, কোটিল্যের মতে সৈন্তবিভাগ প্রভৃতি সমস্ত সরকারী বিভাগের মোট খরচ রাজ্যের সমগ্র আয়ের এক চতুর্থাংশ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া বিধেয়। কেবল সৈন্ত-বিভাগের খরচ কুলাইবার জন্ত মোট রাজস্বের প্রায় একতৃতীয়াংশ বা ততোধিক অংশ ব্যয় করিবার প্রয়োজন, বোধ হয়, ভারতের অতীত নৃপতিগণ বা তাহাদের মন্ত্রীপরিষৎ বা রাজস্ব-সচিবগণ কখনই অস্বপ্ন করিতেন না।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দোল রাগের ছয়টি রাগিণীর মধ্যে গত পৌষ সংখ্যায় পুরিয়ার রূপবর্ণন, আলাপ ও গান প্রকাশ হইয়াছে। এবারে জয়ন্তী (জ্যৈষ্ঠ) রাগিণীর রূপবর্ণন আলাপ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল।

জয়ন্তী

ধ্যান অথবা রূপ বর্ণন

কাঞ্চনচাক্র কমনীয়বদন।
মুখারবিন্দ-মধু-ব-গীত-রস।
পতিং স্বরস্তী নিত্য-ধ্যান-নিমগ্ন।
না জয়ন্তী হিন্দোলস্ত বরাদন।

ভাবার্থ—

খাঁহার বর্ণ স্তবর্ণের ছায় ও মুখ কমনীয়, খাঁহার কমল-বদন হইতে মধু-ব গীত স্রবিত হইতেছে এবং যিনি নিত্য ধ্যানমগ্ন তিনিই হিন্দোলের পত্নী জয়ন্তী।

ঠাট বা কড়ি কোমল ইত্যাদির বিষয় বর্ণন।

জয়ন্তী ষাড়ব-প্রোক্ত।
গকম-স্বর-বর্জিত।
গান্ধার-স্বর-বাদিনাং
সংবাদী ধৈবত-স্বরঃ
তীত্র-মধ্যম-সংযুক্ত।
ঋষভঃ কোমলঃ স্বরঃ ॥

ভাবার্থ—

জয়ন্তী ষাড়ব জাতি, ‘প’-বর্জিত, ‘গ’-বাদী, ‘ধ’-সংবাদী, কড়ি-ম এবং ‘ঋ’ কোমল

অস্থায়ী ।

সনা	সা	গা	-া	জা	ধা	না	ধা	জা	গা	-া	গা	জা	গা
তে০	০	না	০	তো	০	০	০	০	০	ম্	না	০	০
জা	-া	সা	-া	সা	না	ধা	জা	ধা	সা	-া	সা	জা	গা
০	০	০	০	তা	০	০	০	০	০	০	না	তে	০
না	সা	গা	জা	-া	গা	-া	গা	গা	জা	-া	সা	-া	
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	নে	০	
সা	সা	সা	সনা	সনা	সা	জা	-া	সা	-া	॥			
তে	রে	না	তে০	না০	০	তো	০	০	ম্				

অন্তর্য ।

গা	জা	ধা	না	সর্গ	-া	সর্গ	সর্গ	-া	সর্গ	সর্গ	গা	-া	
তো	০	০	০	০	ম্	নে	না	০	তে০	০	না	০	
গা	া	জা	-া	সর্গ	-া	-া	সর্গ	না	ধা	জা	-া	গা	া
নে	০	০	০	রি	০	০	রে	০	০	০	০	০	০
গা	জা	ধা	-া	জা	না	ধা	জা	গা	-া	না	সা	গা	জা
না	০	০	০	০	০	০	তে	না	০	তে	০	০	০
জা	গা	-া	জা	সা	-া	"সা	সা	সা	সনা	সনা			
না	০	০	০	নে	০	তে	রে	না	তে০	না০			
জা	-া	সা	-া"	॥									
০	০	তো	ম্										

সঞ্চারী ।

জা	-া	গা	গজা	গা	জা	সা	-া	সা	না	ধা	সনা	গা
তে	০	রে	না০	০	০	নে	০	তো	০	০	০	ম্
গা	-া	গা	জা	গা	-া	সা	গা	জা	ধা	জা	গা	-া
না	০	তা	০	না	০	নে	তে	রে	০	০	০	০
গা	জা	-া	সা	-া	।							
নে	০	০	রি	০								

আভোগ ।

জা	গা	জা	ধা	সর্গ	-া	সর্গ	সর্গ	সর্গ	জা	সর্গ	-া	
না	০	০	০	০	০	নে	তে	তো০	ম্	না	০	
সর্গ	না	ধা	সর্গ	সর্গ	ধা	জা	গা	-া	জা	ধা	জা	গা
তা	০	০	০	০	না	০	০	০	নে	০	০	না
গা	জা	জা	গা	-া	গা	জা	-া	সা	সা	সা	সা	
তে	০	০	০	০	না	০	০	নে	"তে	বে	না	
সনা	সনা	জা	-া	সা	-া	॥						
তে০	না০	০	০	তো	ম্							

জয়ন্তী—চৌতাল ।

(ঞ্রপদ)

ভাঁত ভাঁতকে ভড়ে বড়ে
 ঐ সো বেব না বুঁ ভার ।
 একন উত্তম নবাবত, একন মধমনাবত,
 একন নেক্স গুনাবত
 একন রাথো খালী কর বিকদার ।
 একন দেত রিক্ত, একন লেত রিক্ত,
 একন কো ফরোরন দে, একন কো হাত টাপর দে
 মাপত ভিধ দার দার ।
 একন কো নরক দেত, একন কো স্বরগ দেত,
 তানদেন প্রভু রচো সংসার ॥ তানদেন ।

“সঙ্গীত-চন্দ্রিকা” ।

অস্থায়ী ।

১' ০ ২ ০ ৩ ৪ ১' ০
 গা ফা । গা গা । ফা সা । সা -া । সা না । ফা সা । সা -া । সা গা ।
 ভাঁ ০ ত ভাঁ ০ ত কে ০ ভ ড়ে ০ ০ ঘ ০ ০ ০
 ২ ০ ৩ ৪ ১' ০ ২
 ফা গা । ফা ঘা । ফা গা । ফা -া । গা ফা । সা সা । না ঘা ।
 ০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০ ০ ০ সো ০
 ০ ৩ ৪ ১' ০ ২
 ফা ফা । ঘা সা । নুসা সা । গা ফা । ঘা না । ঘা ফা ।
 ০ বে ঘ না ০ ০ কুঁ ভা ০ ০ ০ ০ ০
 ০ ৩ ৪
 গা ফা । ফা গা । না ফা ।
 ০ ০ ০ ০ ০ র

অস্তর ।

{ ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 ফা ঘা । ঘা ফা । সা সা । সা সা । সা না । সা সা ।
 এ ০ ক ন ০ উ ত ম ন বা ব ত
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 সা -া । গা গা । ফা সা । না ঘা । না ঘা । ফা গা }
 এ ০ ক ন ম ঘ ম না ০ ব ত ০
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 ফা ঘা । ফা ফা । গা গা । গা ফা । সা সনা । সা সা ।
 এ ০ ক ন নে ক শু না ০ ব ০ ০ ত

১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 সাঁ া । গাঁ গাঁ । -া গাঁ । ফাঁ ধা । ফাঁ ফাঁ । সঁ সঁ ।
 এ ০ ক ন ০ রা ধো ০ ০ ০ থা লো
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 সঁ না ফাঁ । না ধা । ফাঁ গাঁ । গাঁ ফাঁ । ফাঁ গাঁ । না ফাঁ ॥
 ক ০ ০ র- মি ০ ক দা ০ ০ ০ ০ ব

সংগারী ।

১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 ফাঁ গাঁ । গাঁ গাঁ । ফাঁ সা । সা -া । সা সনা । সা সা ।
 এ ০ ক ন ০ ০ দে ০ ত রি ০ ঝ ত
 ১ ০ ২ ০ ৩ ৪
 না ধা । ফাঁ ধা । সা সা । সা গাঁ । গাঁ গাঁ । ফাঁ গাঁ ।
 এ ০ ক ন ০ ০ লে ০ ত রি ঝ ত
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 গাঁ ফাঁ । ফাঁ ধা । ধা না । ধা ফাঁ । ফাঁ গাঁ । ফাঁ গাঁ ।
 এ ০ ক ন কো ০ ক বো র ন দ য়ে
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 গাঁ -া । গাঁ ফাঁ । ধা সঁ । সঁ -া । সঁ সঁ না । সঁ সঁ ।
 এ ০ ক ন ০ কো হা ০ ত টা ০ প র
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 সঁ না । ধা ফাঁ । গাঁ গাঁ । গাঁ ফাঁ । গাঁ ফাঁ । সা সা ।
 দ য়ে ০ মা ০ গ ত ০ ০ ভি ০ থ
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 সা সা । সা গাঁ । ফাঁ গাঁ । ফাঁ ধা । ফাঁ গাঁ । ফাঁ সা ॥
 ধা ০ ০ ০ ০ রঁ ধা ০ ০ ০ ০ র

আভোগ ।

১' ০ ২ ০ ৩ ২
 { গাঁ ফাঁ । ধা সঁ । সঁ সঁ । সঁ না । সঁ সঁ । সঁ সঁ ।
 এ ০ ক ন ০ কো ন র ক দে ০ ত
 ২' ০ ২ ০ ৩ ৪
 সঁ -া । সঁ না । ধা সঁ । না ধা । না ধা । ফাঁ গাঁ }
 এ ০ ক ন ০ কো ধ র গ দে ০ ত
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 গাঁ -া । গাঁ ফাঁ । ধা ফাঁ । না ফাঁ । ধা ফাঁ । ফাঁ গাঁ ।
 তা ০ ন সে ০ ন ঞ্জ ভূ র চো ০ ০
 ১' ০ ২ ০ ৩ ৪
 ফাঁ বা । না ধা । ফাঁ গাঁ । গাঁ ফাঁ । ফাঁ গাঁ । না ফাঁ
 সং ০ ০ ০ ০ ০ সা ০ ০ ০ ০ র

অগুস্ত রদ্যার শিল্প-পরিচয়

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ

কবি ও শিল্পীর দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম নাই, কাল নাই; সমস্ত দেশ ও জাতি, কাল ও ধর্মের অতীত এক অভিনব জগতে বাস করিয়া তাঁহারা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের ও সকল কালের মানব জাতির জ্ঞান অনন্ত স্বধার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া অফুরন্ত বসেব সৃষ্টি করেন। বাঙলা দেশের কবির স্রষ্টি শুনিবামাত্র এক মুহূর্তেই স্ফুটসারল্যাণ্ডের পথচলা পথিকের প্রাণটি সমবেদনা, সহানুভূতি ও একান্তবোধে ঝঙ্কত হইয়া উঠে, অন্তরের একটি কোণ হঠাৎ বেদনার পীড়িত হয়; রেণেসান্স যুগের ইটালীর তরুণ চিত্রকর রাফেলের “মাতৃমূর্তি” দেখিবামাত্র বাঙলা দেশের মায়ের চিত্র আপন সন্তানটিকে কোলে লইয়া চুম্বন করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত হইয়া উঠে; নবম শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের নটরাজের নৃত্যরূপ দেখিয়া বিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্কর রদ্যার অন্তরে বিচিত্র ভাবোন্মাদনায় নৃত্য সঞ্চারিত হয়। এই করিয়াই অতীত ভারতের কালিদাস, ইন্দ্রগুপ্ত, শেক্সপীয়ার, জার্মাণীর গায়টে, ইটালীর দান্তে চতুর্থ কাল-সমুদ্র পার হইয়া আমাদের নিত্য আশ্রয়স্থল আপন জন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহারই জোরে বাঙলা ও ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে যতখানি দাবী করে, ঠিক ততখানি দাবীই আজ ইটালী করিতেছে, জার্মাণী করিতেছে, করিতেছে আমেরিকা, করিতেছে জাপান।

এই নিয়মেই আজ শিল্পী অগুস্ত রদ্যাও পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইবার দাবী করিতেছেন; ভাস্কর রদ্যার শিল্পীপ্রাণের মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্প-ধারা পরমাতিথে ও সৌহার্দ্যে পাশ্চাত্য শিল্পধারার সঙ্গে সখী-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিল। রদ্যা শিল্প-সৌন্দর্যের আত্মাটিকে অনেক সাধনায়, অনেক আরাধনায় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; কাজেই যে আশ্রয় পাশ্চাত্য শিল্প-ধারার

সঙ্গে তাঁহার পরিচয়-সাধন করাইয়া দিয়াছিল, সেই আশ্রয়ই ভারতবর্ষের শিল্প-ধারার মধ্যে। তাঁহার অন্ত-দৃষ্টি উন্মোচন করিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল।

যুরোপ-ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসানে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্ত এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল ইটালী ও পরে ফ্লোরেন্স। এই বিরাট আন্দোলন সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে নতুন করিয়া গড়িয়াছে; যুরোপের এই নবোদ্বোধন পাশ্চাত্য শিল্প-কলাকেও নতুন রূপ দিয়াছে এবং তাহার মধ্যে বিচিত্র প্রাণরসের সঞ্চার করিয়াছে। এই নবরূপ ও প্রাণরসের স্রষ্টা ছিলেন জিয়োটো, বাটচেলি, এঞ্জেলো, রাফেল, রামব্রান্ট, ইত্যাদি শক্তিশালী ভাস্কর ও চিত্রকরেরা। ইহার শুধু পাশ্চাত্য জগৎকে নয়, সমগ্র পৃথিবীকে রসে ও সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং অনাগত যুগের জ্ঞান অফুরন্ত স্বধাভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নবোদ্বোধন যুগের এঞ্জেলো-রাফেলসঞ্চারিত শিল্পকলার যে-ধারা যুরোপের পুঞ্জীভূত মনোবালির শির মাঝখানে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ফরাসী শিল্পী রদ্যা সেই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন এবং সেই স্রোতে নবরসধারা বহাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শিল্পভাষার সহিত হয়ত ভারতীয় শিল্পভাষার কোন মিল নাই কিন্তু তিনি যে অক্ষর রসভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে অমৃতরস পান করিলে আমাদের জাতিভ্রষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই; বরং আমাদের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারটি নবরসধারার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হইবার আশা আছে। মানব জীবনকে স্বধায় ও সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিবার ব্রত বাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন রদ্যা তাঁহাদের অন্ততম।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং তাহার পর

জীবনের প্রায় স্বর্নীয় চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া রদ্যা শিল্পসৃষ্টির জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। ইহার আগে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের অবকাশ কোথাও পায় নাই বরং সকল দিক হইতে নিন্দায়, বিরূপ সমালোচনায় তাঁহার স্ফূটনোন্মুখ প্রতিভা অকালে ঝরিয়া পড়িবার আশঙ্কায় বারংবার চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। রদ্যার প্রদীপ্ত প্রতিভা শত জনের সহজ দৃষ্টিকে ভাস্করের মত তীব্র জ্যোতিঃপাতে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সাধনার প্রথম বিকাশকে কেহ উড়াইয়া দিয়াছে নকল বলিয়া, কেহ বা তুচ্ছ করিয়া এড়াইয়া গিয়াছে কুৎসিত বলিয়া, কেহ বা বলিয়াছে তক্ষশিল্পের প্রাথমিক নিয়মগুলিই ইহার আয়ত্ত হয় নাই। রদ্যা প্রথম হইতেই অতি পুৰাতন শিল্পধারাকে এমন নূতন করিয়া নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা তৎপ্রবর্তিত ধারাকে এমন একটা নবরূপ দিয়াছিল যাহাতে তাঁহার শিল্পসৃষ্টি প্রথম হইতেই সহজ গতাভ্যুগতিক পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়া একটা বিশিষ্ট পথে যাত্রা করিয়াছিল। তাঁহার নিজস্ব নবপ্রবর্তিত এই ধারা পশ্চিমের কথাসমালোচকদের অভিধাননিবন্ধ সূত্রগুলিকে অতিক্রম করিয়া শিল্প-জগতে এক নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিল।

সাঁইজিংশ বৎসর বয়সে রদ্যা প্যারীর প্রদর্শনীতে প্রথম তাঁহার শিল্প-নিদর্শন প্রেরণ করিলেন। পূর্ণ সুগঠিত দেহ, উলঙ্গ দণ্ডায়মান একটি মানব মূর্তি, গ্রীক ধবণের গড়ন, প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা যেন দেহের প্রতি গতিছন্দের সঙ্গে নাচিতেছে, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যেন মাংস-বহুল ঢেউ খেলানো পেশীগুলির উপর দিয়া উপছাইয়া পড়িতেছে। রেখার সেই কোমল লতানো ভঙ্গিমা নাই, শিল্পীর হাতুড়ির প্রত্যেকটি নিয়মিত আঘাত ইহার প্রতি অণুকে শরীরের প্রত্যেকটি বিভিন্ন অংশকে জীবন্ত করিয়াছে। কিন্তু জীবন ইহার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে লীলায়িত হইয়া উঠে নাই। এযেন এই মাত্র ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া গা মোড়া দিয়াছে, এখনও তাহার নিমীলিত নয়নে ও মুখে স্বপ্নাবেশ—এক হাতে চুলগুলিকে মুঠি করিয়া ধরিয়া, আর একহাত

সজোরে সঙ্কুচিত করিয়া নিজাব জড়তা ভাঙ্গিবার চেষ্টা যেন সর্বত্র সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। রদ্যা প্রথম ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'The man awakening to Nature'—জাগরণোন্মুখ মানুষ—নামটিতে অতি স্পন্দন করিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। চারিদিকে এই যে জীবন নানান ছন্দে, নানান রূপে লীলায়িত ইহারই সাড়া পাইয়া এই আদিম মানব অভিনব স্পন্দনে জাগিয়া উঠিয়াছে। রদ্যা নিজেও—যে এই জীবন ও সৌন্দর্যের নবানুভূতিতে জাগিয়া উঠিলেন, তাহারও প্রতীক হইয়া উঠিল এই মূর্তিটি।

কিন্তু প্রদর্শনীতে যাহারা ছিলেন বিচারক তাঁহাদের প্রাণ কবিত্বপূর্ণ কল্পনায় সাড়া দিল না। রদ্যা নাম বদলাইলেন "তাম্রযুগের মানুষ"। কর্তৃপক্ষদের চোখে মূর্তিটি ভাল লাগিল কিন্তু তাঁহারা যে মতামত প্রকাশ করিলেন তাহাতে রদ্যার শিল্পীচিন্তা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রদ্যাকে তাঁহারা 'প্রতারক' বলিয়া গালি দিলেন, জালিয়াত বলিয়া কলকটাকা পরাইয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "মূর্তিটি নকল, আসলের ছাঁচ মাত্র, নহিলে এমন সর্কাদৃশ্যের মূর্তি হইতে পারেনা। ব্রসেল্‌স্ প্রদর্শনী হইতেও একই জবাব আসিয়াছিল কিছু দিন আগে। সকলের সম্মুখে দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া রদ্যার বিকাশোন্মুখ প্রতিভা এইভাবে মসীলিষ্ট হইল। দুই বৎসর পরে কর্তৃপক্ষদের চোখে তাহাদের অন্তায় বিচার ধরা পড়িল কিন্তু যে ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের অন্তায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহাতে রদ্যার প্রতি সুবিচার করা হইল না।

এই ব্যাপারের পর হইতে মৃত্যুর শেষদিনটি পর্যন্ত রদ্যার শিল্পসৃষ্টি লইয়া সমগ্র যুরোপীয় শিল্পজগতে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। একদিকে নিন্দায় শতমুখ সমালোচককুল, অন্যদিকে প্রশংসায় মুগ্ধরসিক স্রবন—সংখ্যায় দুইই প্রবল। ধ্যানলব্ধ বাণীধারা অহুপ্রাণিত ও তাহাব প্রচারে আগুমান তাঁহার St. John the Baptist ভাস্কর শিল্পের প্রাথমিক নিয়মকে অতিক্রম করার অপরাধে নিন্দিত হইল। লগুনে রয়্যাল গ্যাকাডেমিতে তাঁহার শিল্পসৃষ্টি কোন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল না। ইংলণ্ডে যাহারা আর্টে স্বাস্থ্যরক্ষার কর্তা তাঁহারা চাঁৎকার

করিয়া উঠিলেন, “রত্নাকে সামলাও”—জোলা ফরাসী সাহিত্যে যে দুর্গাতির প্রচার করিয়াছেন, রত্না আর্টে তাহাই করিতেছেন। আমেরিকায় এই অভিযোগই প্রতিধ্বনিত হইল। শিকাগোতে তাহার “চুধন” মূর্তি একটি গোপন প্রকোষ্ঠে অর্গলবদ্ধ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি হইতে নিরাসিত করিয়া রাখা হইল। ষ্টকহোলমের প্রদর্শনী রদ্যার খেচ্চার একটি দান অগ্রাহ্য করিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন।

কিন্তু একদিকে যেমন এই অজস্র নিন্দা ও গালিবর্ষণ, অন্যদিকে তেমনি যুরোপের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি ও প্রশংসা। ইংলণ্ডে এক বিরাট শিল্প সম্মিলনীতে তাহাকে প্রকাণ্ডে অভিনন্দিত করা হইল; প্রাণের মন্দির-চত্বরে তাহার অপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি ‘চিস্তাময়’ বিরাট সমারোহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তথাকার শিল্পীকুল রদ্যার গাড়ার ঘোড়া বন্ধনযুক্ত করিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া গেল। মহাযুদ্ধের ভেরী-নির্ঘোষে সমগ্র যুরোপীয় জগৎ যখন কম্পিত তখন ফরাসী দেশ তাহার শ্রেষ্ঠ শিল্পীসম্মানকে শ্রেষ্ঠতম সম্মান প্রদান করিল সরকারী চিত্রশালায় (Museum) তাহার মঞ্চরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাহার শিল্পসৃষ্টিগুলিকে একটা বিশেষ স্থান দান করিয়া।

চিরাচরিত পন্থার অল্পসরণ ও অল্পবরণকেই বাহারা শিল্পচর্চার একমাত্র পথ বলিয়া জানিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টি ও বিচার নূতন সৃষ্টি, নূতন বিকাশ এবং প্রতিভার প্রথম চরণপাতে এমনি করিয়াই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে; কিন্তু ছিট্রাহেষয়ী বিচারকের উদ্ধত বাক্য ও স্পষ্টিত লেখনী জলন্ত প্রতিভার সমক্ষে লজ্জায় অবনমিত হইয়া পড়ে। আসল কথা হইতেছে, সূক্ষ্ম শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় ‘ভেমজেনী’ বলিয়া কোন জিনিস নাই, জনসাধারণ কখনও প্রতিভাবান্ রসপ্রসার স্ববিচারক হইতে পারে না কিংবা সূক্ষ্ম রসান্বাদনের স্বতঃস্ফূর্তবৃত্তি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। শিল্পী কিংবা কবির সৃষ্টি জনসাধারণের বোধশক্তির কিংবা গ্রহণ শক্তির পরিমাপকে গ্রাহ্য করিয়া চলে না, সে চলে আপন পন্থা অল্পসরণ করিয়া। পাঠক ও দর্শক যদি তাহার সঙ্গে সমপদবিশ্বেপে চলিতে

না পারে এবং সেই জন্তেই নিন্দায় শতমুখ হইয়াও উঠে তাহাতে শিল্পী কিংবা কবির কিছু যায় আসে না। তাহাকেই বলি শিল্পীগুরু অথবা কবিগুরু যিনি পাঠকের বোধ-শক্তির বা গ্রহণ-শক্তির সমভূমিতে নামিয়া আসেন না বরং শত নিন্দামুখর কর্তৃক অগ্রাহ্য করিয়া দিনে দিনে জনসাধারণকে আপন প্রতিভাধারা আকর্ষণ করেন এবং সর্বশেষে তাহাদিগকে স্বীয় বোধ ও অল্পভব-শক্তির সমুন্নত শিখরে উন্নীত করেন। সেই হিসাবে রদ্যাকে বলি শিল্পীগুরু।

রেপের্সাস্ যুগের শিল্পসাধনার মুক্তধারা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; মরানদীর বদ্ধজলে যে পাশ্চাত্য শিল্প বিকাশ লাভ করিল প্রাণরস বলিয়া তাহার কিছু ছিল না। যাহা কিছু আপাতমধুর, যাহা কিছু তালে লয়ে মুহূর্ত্তে মনকে চঞ্চলতায় নাচাইয়া তুলে, যাহা কিছু সহজবোধ্য এবং বর্ণোজ্জ্বল, যাহা কিছু কোতুহলোদ্দীপক, যাহা কিছু পৌরাণিক তাহারই মধ্যে শিল্পসাধনা বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল; জনসাধারণের সৌন্দর্য্যবোধ সেই সীমার মধ্যেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই শিল্প ও সাহিত্যে এমন সময় আসে যখন তাহার স্বাধীন মুক্তধারা কতকগুলি ব্যাকরণের নিয়মসূত্র এবং গতানুগতিক পন্থার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহারই মধ্যে রস ও সৌন্দর্য্যের সম্মান লাভ হইয়াছে মনে করিয়া শিল্পী সাহিত্যিক ও জনসাধারণ আত্মপরিতৃপ্তি লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রোমকশিল্পের ইতিহাসে এই ব্যাপারটিই ঘটিয়াছিল। দশম একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া মোগলশিল্প সাধনার বিকাশ পর্যন্ত ভারতবর্ষের শিল্পইতিহাসে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইল। প্রাচীন রোমে অথবা হিন্দু ভারতে ধ্বংসের প্রতিনিবৃত্তি আর হইল না, কিন্তু বর্তমান যুরোপে রদ্যার প্রমুখ প্রতিভাবান্ শিল্পীরা সেই ধ্বংসপথযাত্রী শিল্পধারায় যুতসঞ্জীবনীস্থধা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। রদ্যার বুকিলেন, সমসাময়িক শিল্পীকুল শিল্পের জীবন-উৎস হইতে অনেকদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি দেখিলেন, জীবনের চারিধারে যাহা অতি তুচ্ছ

অথচ অতি প্রিয় ও নিকটতম, যাহা অতি অবহেলায় সহজ দৃষ্টির অগোচরে পড়িয়া আছে অথচ যাহা অতি স্বাভাবিক, যাহা প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তেব এবং তাই বলিয়া মাহুষের বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে চম্কাইয়া দেয় না— তাহারই মধ্যে অনন্তরস ও সৌন্দর্য্য-সুধার উৎস আত্মগোপন করিয়া আছে। রদ্যার শিল্প প্রচেষ্টায় ইহারাই নবরূপে ফুটিয়া নবচ্ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্য যে ব্যাকরণেব স্রজের মধ্যেই লুকাইয়া নাই, একথা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম হইতেই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও ঘাইতে পারিয়াছিলেন। জানিয়া শুনিয়াই নয়, নিজের কবিত্বের স্বজনী শক্তির প্রেরণাতেই তাঁহার অল্পভূতি অভিনব সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এ হিসাবে রদ্যাকে অভীত মিশর, ভারত, গ্রীক ও চীনদেশের শিল্পীদের সঙ্গে একাসনে স্থান দিতে পারা যায়।

ভগবানের সৃষ্টি-লীলা নানাভাবে, নানাদিকে বিচিত্র-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; তাঁহার সৃষ্টি প্রকাশ ত আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি-হস্তটি আমরা দেখিয়াছি কি? রদ্যা তাঁহার কল্পনা দৃষ্টিতে সেই অপরূপ হস্তটি দেখিয়াছেন এবং তাহাকে শিল্পরূপ দিয়া ইন্দ্রিয় জগতে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সে হস্ত কোনো অতীন্দ্রিয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় নয়, কোনো অপারিষ্যব রহস্ত দ্বারা তার ইন্দ্রিয়রূপ আবৃত নয়, এর রূপ ও সৌন্দর্য্য, এর অর্থ ও অল্পভূতি, দেখিবামাত্রই আঁখির ভিতর দিয়া মর্মে গিয়া সাড়া জাগায়, আঁখি নিবিষ্ট করিয়া দেখিবার মত বিশেষ কিছুই নাই; একটি বন্ধুর কর্ণশ্রবণে প্রস্তুত থাওয়া, তাহারই মধ্য হইতে যেন একটি সুপুষ্ট, সুদৃশ্য সবল জীবন্ত হস্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; কোমল অথচ দৃঢ়, রূপে উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট বৈশাখী স্নেহের গড়নে ও সৃষ্টিলীলার লীলাময় এই হস্তটি। এর সঙ্গে যেন বন্ধুর পাখরটির একটা প্রাণের যোগ আছে, রূপে ও অরূপে, স্তম্ভের ও বন্ধুরে যেন নিবিড় আলোয় আবদ্ধ হইয়া আছে। ভগবানের এই করবিধৃত যে লীলাপট্টটি ফুটিয়া রহিয়াছে ইহাবই মধ্যে বাবতীয় সৃষ্টির

মূল সুরটি অপূর্ণ রাগিনীতে অনাদিকাল হইতে অনন্ত রূপে ধ্বনিত হইতেছে। মনে হইতেছে, স্তম্ভের হাতটির মধ্যে আর একটি প্রস্তুত থাওয়া; তাহারই মধ্য হইতে ফুটিয়াছে একটি সজ্জাত ফুলের মত শুভ্র স্বকোমল শিশু—প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন তার ‘নবনী ছানিয়া’ গড়া হইয়াছে। ভ্রূগন্ধ-কারের মধ্যে যে কুঁড়ি এত মল সুপ্ত ছিল, ভগবানের সৃষ্টি-হস্তটি তাহাকেই আজ এতদিন পরে সূর্য্যালোকের মধ্যে বাহির করিয়া আনিয়াছে। নবরূপালোকের ‘শিশুর আঁখি ঝলসাইয়া গিয়াছে, দুই হাত দিয়া সে তাই সমস্ত মুখপট্টকে আবরিয়া রাখিয়াছে; ধরণীর বায়ুম্পর্শে তার জীবন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, পা দুটি সে তাই এদিক ওদিক ছুঁড়িতেছে। এই ত সহজ বিষয়টি কিন্তু সমস্ত শিল্পবস্তুটি কি অপরূপ রূপে মণ্ডিত; ভাবে ও রূপে ইহার প্রত্যেকটি অণু প্রাণবান।

একদিকে রদ্যা যেমন করিয়া রূপাতীত বস্তুকে রূপ দিলেন এবং তাহা অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিল, তেমনি আর একদিকে এই জীবজগতের প্রতিদিনের একটি সংগ্রাম এমন স্বকোমল অথচ এত সহজে রদ্যার শিল্পীহস্তে রূপলাভ করিয়াছে যে তাহাকে দেখিবামাত্র প্রত্যেকটি মানবের প্রতিদিনের স্রাস্ত্র সংগ্রামের চিত্রটি চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। মাহুষের মধ্যে এই যে দেবাস্তরের সংগ্রাম—মাহুষেব যে আত্মা সে চাহে সংসারের সকল পঙ্কিলতা হইতে মুক্তি। অসীমের দিকে তার যাত্রা, সে চাহে ইন্দ্রিয়াতীতকে লাভ করিতে। যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা স্তম্ভ তাহারই উদ্দেশ্যে সে আপনাকে উর্দ্ধমুখী করিয়া রাখে। আর রক্তমাংসের যে দেহ সে চাহে তার পঙ্কিলতার মধ্যে আত্মাকে টানিয়া ডুবাইয়া রাখিতে, সে নিজেও চাহে ইন্দ্রিয়-ভোগের পশুর মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে—এই যে সংগ্রাম ইহা চলিয়াছে অনাদি কাল হইতে। কত কবি, কত শিল্পী ত ইহাকে লইয়া শিল্পসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এত সহজে, এমন স্তম্ভ করিয়া কেহ বলিতে পারিয়াছে কি? রদ্যার এই শিল্প সৃষ্টিটিতে মাহুষের যে উর্দ্ধমুখী আত্মা তাহা রূপ লইয়াছে মাহুষেরই দেহের রূপে এবং

রক্তমাংসের যে দেহ তাহা রূপ লইয়াছে পশুর দেহে। মানব দেহরূপী যে আত্মা তাহা কি প্রচণ্ড শক্তিতে পশুদেহ হইতে মুক্তি কামনা করিতেছে! দুটি হাত সজ্ঞারে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত দেহটিকে তাহারই সঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া পশুদেহ হইতে বিচ্যুত হইবার কি অদ্ভুত প্রয়াস! সমস্ত মুখটির উপর শক্তি ও সংগ্রামের কি অপূর্ণ লীলা! সমস্ত শির উপশিরা ও মাংসপেশীগুলির কি অদ্ভুত নর্দন! আর পশুদেহটির—মাংসের মধ্যে যাহা অন্তর—ঠিক উন্টো গতি। সে কিছুতেই আত্মাকে তাহার মধ্য হইতে মুক্তি দিতে চাহিতেছে না; পিছনের পা দু'টি দিয়া সজ্ঞারে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত দেহভার পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া সে আত্মাব উর্দ্ধমুখী গতিকে ব্যাহত করিতেছে। ঐ সম্মুখ ও পিছনের পা চারিটির এবং তাহার পশ্চাত্তাগের মাংসপেশীগুলির গড়নে প্রতিরোধের ইঙ্গিত অদ্ভুত রূপ লাভ করিয়াছে। আত্মার উর্দ্ধগতির সঙ্গে দেহ যেন কিছুতেই প্রতিরোধের সমতা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। প্রচুব শক্তি প্রয়োগ করিয়াও পশুর পা গুলি কিছুতেই যেন স্থিতিলাভ করিতেছে না। ভাষা এই শিল্প সৃষ্টিটি বর্ণনার কতটুকু দাবী রাখে?

“দেহ ও আত্মা” যদি হইয়া থাকে রূপক, “ঝড়কে” তাহা হইলে বলিব ঝড়েরই সত্যরূপ। ঝড়ের যে বিকট উল্লাস, প্রচণ্ডবেগ, বাধাবন্ধহাবা উদ্দামগতি তাহাকে এমন করিয়া পাথরের মধ্যে রূপ দিল কে? শিল্পে ত নটরাজ ছাড়া ইহার তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাই না। স্থিতিশীল অচল পাথরের মধ্যে এমন গতিবেগের সঞ্চার শিল্পীর কি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয়! সম্মুখ পানে ইহার গতি, চোখে মুখে কপালের কুঞ্জে সর্বত্র ইহার উৎকণ্ঠার উৎকট লীলা, মুখের গড়নে ক্লিষ্টতার সুপরিষ্কৃত আভাস, পশ্চিমের ঝড়ো বাতাস ইহার উদ্দাম কেশরাশিকে লইয়া কি উল্লাদ নৃত্যই না জুড়িয়া দিয়াছে, কোথায় কোন্ দিগন্ত যেন ইহাদের সব উড়াইয়া লইয়া যাইবে। অথচ থোকা থোকা চুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ায় লুকোচুরী এই ঝড়ের উদ্দামতার মাঝেও যেন একটা একটানা স্রের মতন বাজিতে থাকে।

ঝুঝা গেল রদ্যার আর্টের প্রথম বিশেষত্বই হইতেছে শিল্পবস্তুর সঙ্গে দ্রষ্টার সহজ আত্মীয়তা বোধ; শিল্পী যাহা বলিতে চাহেন, যে ভাব প্রকাশ করিতে চাহেন অতি সহজেই কি করিয়া তাহা মানুষের মর্মে গিয়া সাড়া জাগায়, কি করিয়া সে ভাবজগতে শিল্পীর সহিত এক হইয়া যায়, রদ্যার শিল্প সৃষ্টিগুলি দেখিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই যে সহজ ও সরল ভাব-বোধ, ইহা সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাকেই রূপ দিতে গিয়া রদ্যা দেহের সৌন্দর্যের দিকেও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং এই সৌন্দর্য্যকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন মাংসের দেহের সহজ গতি ও লীলা-ভঙ্গিমার মধ্যে এবং চর্মের শুভ্র আলোকোজ্জ্বল্যের মধ্যে। নগ্ন দেহের উপর সূর্যালোক যে আনন্দে নাচিয়া বেড়ায়, শুভ্র চর্মের উপর যে স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্য দিনের আলোকের প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের ভিতর দিব্য আপন ধর্ম বজায় রাখে, তাহাকেই তিনি অপূর্ণ কৌশলে রূপ দিতে শিখিয়াছিলেন দেহের প্রতি অঙ্গের গঠন ভঙ্গিমার (Modelling) ভিতর দিয়া। এই শিল্প কৌশল তাঁহাকে ভাবসৃষ্টির দিক দিয়া বেশীদূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু মানব-দেহের যে সহজ মৈহিক সৌন্দর্য্য চিরকাল মাংসের চোখ ও মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিয়াছে সেই সৌন্দর্য্যকে রদ্যা কখনও তুচ্ছ বলিয়া ভাবেন নাই। নানাভাবে নানারূপে দেহের সেই সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলার প্রচেষ্টা, তাঁহান সৃষ্টিতে কি অপূর্ণ সার্থকতাই না লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে তিনি কোথাও কোথাও গ্রীক অথবা রোমেন্স শিল্পীদিগকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রদ্যা কখনও সৌন্দর্য্যকে পৃথক পৃথক ভাবে পদার্থতত্ত্ববিদের মত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই; তাঁহার শিল্পদৃষ্টি মানুষকে দেখিয়াছে সমগ্র ভাবে—সেই সমগ্র ভাব ও সৌন্দর্য্যটিকে মনের মতন করিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া হয়ত কোনো অঙ্গ বিশেষ অথবা ভঙ্গি বিশেষকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাধান্য দিতে হইয়াছে। এই হিসাবে রদ্যা বিশেষ করিয়া ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিতেই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং এইখানেই

ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা আমরা অনুভব করিতে পারি। “ইভ্” “ঝড়” “চিরবসন্ত” “জরাগ্রস্ত রূপোপজীবনী” “চুষন” “সন্দেহ” “রোমিয়ো জুলিয়েৎ” প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনগুলি একটু তলাইয়া দেখিলেই উপরোক্ত কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করা সহজ হইবে।

কলাবিদের সত্যদৃষ্টি হইতেছে সহানুভূতির দৃষ্টি, কল্পনার দৃষ্টি; রূপরসগন্ধসৌন্দর্য্যময় এই পৃথিবীর রোগজরাঞ্জীর্ণ ক্লেশপঙ্কিলতাময় এই পৃথিবীর অফুরন্ত ভাবের ও রূপের প্রতি অপার মমত্ববোধের দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দিয়া যিনি এই পৃথিবীর সব কিছুকে দেখিয়াছেন, পটের উপর তাঁহার তুলি অবলীলায় খেলিয়া যায়, পাথরের উপর তাঁহার বাটালী আপন মনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া চলে। শিল্পী যে দৃষ্টিতে, যে ভাবে ও রূপে এই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে দেখিয়াছেন, ভাব রূপ ও দৃষ্টির সেই সমভূমিতে সকলকে দাঁড় করাইবায় প্রয়াস হয়ত শিল্পীকে করিতে হয় না এবং হয় না বলিয়াই শিল্পীর ভাবদৃষ্টির মধ্যে আমরা অনেক সময়ই প্রবেশ করিতে পারি না এবং সেই হেতু শিল্পসৃষ্টিকেও বুঝিতে ভুল করি। রদ্যাকেও সেই হেতু অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন, তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার শিল্প-সৃষ্টিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিয়াছেন, “তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা (proportions) রক্ষা করিয়া চলেন নাই, তিনি নর-নারীর নয় দেহকে সৌন্দর্য্য জগতে অভিযুক্ত করিয়া আট্টে দুর্নীতির প্রেতর দিয়াছেন; সহজ দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে যে ভাবে দেখে রদ্যা তেমন করিয়া তাহাদের রূপ দান করেন নাই, অনেক সময়ই তাহা বিকৃত বলিয়া মনে হয়; “রূপোপজীবনী”র হাতগুলি অত্যধিক পরিমাণে লম্বা, তা ছাড়া মানব জীবনের এমন একটা কুৎসিত কল্পনাকে এমন করিয়া রূপ দিবার দরকারই বা ছিল কি? মানুষের জীবন ত এমনি নানান দুঃখে কুঞ্জী পঙ্কিলতায় ডারাক্রান্ত হইয়া আছে, সে বোঝা বাড়াইয়া লাভ হইল কি?” এই রকম কত কথাই বলা হইয়াছে। ইহারা শিল্প-সমালোচনায় ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কলা কৌশলের বিচারই

করিয়াছেন কিন্তু শিল্পের যা অতীন্দ্রিয় রহস্য, দেখার অতীত যে রূপ, সেই রূপ ও রহস্যের সন্ধানে ইহাদের চিত্ত আকুল হয় নাই। সে সন্ধান ষাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন রদ্যার সৃষ্ট সৌন্দর্য্য জগতের মধ্যে, তাঁহার অতীন্দ্রিয় রহস্যজগতের মধ্যে কি করিয়া বহুদিন ডুব মারিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়।

কিন্তু সত্যই কি রদ্যা নয়-দেহকে রূপ দিতে গিয়া দুর্নীতির প্রেতর ও কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন? সত্যই কি তিনি নয়-দেহের সৌন্দর্য্যকে, নর-নারীর প্রেমলীলাকে লালসার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন? এই শিল্প-সৃষ্টিগুলি ষাঁহারা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া দেখিয়াছেন, মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে ষাঁহারা প্রকৃতির বিচিত্র লীলারই এক রূপময় প্রকাশ বলিয়া জানিয়াছেন, নর-নারীর প্রেম-প্রীতিকে ষাঁহারা সহানুভূতির দৃষ্টিতে অন্তরে অনুভব করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের গতিভঙ্গী, তাঁহাদের চোখা-চোখি, তাঁহাদের নিবিড় প্রেমের নিবিড়তম আলিঙ্গন, হাশ্বে ও স্পর্শে পুলক-শিহরণ, তাঁহাদের স্বপ্নালস দৃষ্টি, ইত্যাদিকে ষাঁহারা সুমধুর সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন রদ্যা কখনও নর-নারীর লালসাবহিতে ইন্ধন যোগান নাই। বরং রক্তমাংসের সহজ সত্য সঙ্ঘটকে প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিযুক্ত করিয়া মানুষের অনুভূতিকে উন্নত ও প্রশস্ত করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। রদ্যা মানুষের যৌবনকে অস্বীকার করেন নাই। তাহার সমস্ত লীলাকে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

রদ্যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা (Proportions) সর্বত্র রক্ষা করিয়া চলেন নাই। হয়ত হাতটা-পাটা বাস্তবিকই লম্বা কিন্তু রদ্যা কখনও তাঁহার সৃষ্টিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতির দিকে মনোযোগ দেন নাই। ইহারা তাঁহাব শিল্প-দৃষ্টিতে বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। তিনি খুঁজিয়া-ছিলেন শিল্পবস্তুর প্রাণ এবং সেইটিকে রূপ দেওয়াই ছিল তাঁহার স্বকঠিন প্রয়াস এবং প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রয়াসই থাকে তাহা। কথাটাকে রদ্যার “জরাগ্রস্ত রূপোপ-

জীবনী”র প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে; কুস্তপৃষ্ঠ, লোলচর্ম, বিগত-সৌন্দর্য্য, পক্ষ রক্ষকেশ এই বৃদ্ধা মরণ সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে বসিয়া অতীতের কত কথাই না ভাবিতেছে। তাহার বেদনাময় স্থিতি তাহাকে পীড়িত করিতেছে, সমস্ত মুখটির উপর তাহারই ছায়া। যে কুস্তীতার একটা স্বচ্ছ আবরণ ইহার সমগ্র দেহকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং যাহা সাধারণ দৃষ্টিকে হঠাৎ বিব্রোহী করিয়া তোলে তাহাকে শুধু কুস্তী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় কি? ইহার লোল কুঞ্চিত তাপদন্ড চর্ম কত বৎসরের কত ঘটনাবহুল ইতিহাস আপাত-কুৎসিত আবরণের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; ইহার স্তল রক্ষ বিরলকেশ মস্তিষ্কের উপর দিয়া কত গ্রীষ্মের খর রৌদ্র, কত বর্ষার ঝড় ও বারিপাত, কত শীতের কুহেলি-সম্পাত, বহিয়া গিয়াছে। তাহারই স্তল ইতিহাস ইহার প্রতি অণুতে অণুতে মুখের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। হয়ত ইহার নদীতে, ইহার নৃত্যে, ইহার আঁখির চপল কটাক্ষে, ইহার দেহের বিলোল ভঙ্গীতে কত রাজার বিলাস

লিস, কত ধনীর প্রাসাদ, কত রসিকের প্রেমোদভবন শু ও মণিত হইয়াছে—হয়ত ইহার সেবায়, ইহার আশ্র-বলোপে, ইহার পরিচর্যায় কত ক্লিষ্ট ও পীড়িত জন শাস্তি পাইয়াছে। কিন্তু এসব আজ দূর অতীতের কথা; জীবনের যাহা সব চাইতে ভয়ানক, সব চাইতে ভীষণ যে জরা আজ তাহারই ছায়া ইহার উপর পড়িয়াছে; মরণ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ইহার জীবনতটে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের “কঙ্কাল” যেমন করিয়া তাহার চিকিৎসাবিভার পাঠকটিকে বলিয়াছিল তার বিগত যৌবনের কথা, এই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাও তেমনি করিয়া আমাদের বলিতে পারে, ‘সময় ছিল যখন আমার ছিল এই পটল চেরা চোখ, যাহার বিলোল কটাক্ষে লুক্ক হইয়া তোমাদের মত কত পতঙ্গ আমার রূপ-বহিতে ঝাঁপ দিয়া মরিতে আসিয়াছে। আমার এই স্তল দেহের মধু-স্ফুট কত কুস্তবীথিকা ভরিয়া উঠিয়াছে, আমার প্রাণরসের উচ্ছ্বসিত পেয়ালা কত তৃষ্ণার্জ্বজন পান করিয়াছে। আজ তোমরা যাহা দেখিতেছ চিরকাল আমি তাহাই ছিলাম না’। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার

রূপ-সৌন্দর্য্যময় যৌবনই সত্য, আর এই জরাগ্রস্ত বার্ককা ইহাই মিথ্যা একথা কে বলিবে? দুইই সত্য, যৌবনকে যদি স্বীকার করি, মৃত্যু-প্রতীক্ষায় স্থির বার্ককাকেই বা তাহা হইলে অস্বীকার করিব কি করিয়া? রদ্যাও তাহাকে অস্বীকার করেন নাই, এবং করেন নাই বলিয়াই বার্ককের এই আপাত-কুৎসিত রূপ তাহার নিকট সত্যই কুৎসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। ইহার জরাগ্রস্ত রূপ যে ভাবরহস্যকে নিরন্তর দেখা দিতেছে, রদ্যা সেই রহস্যেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাহাকেই সকলের সমক্ষে রূপদান করিয়াছেন।

“রূপোপজীবনী”র মূর্তিটি দেখিয়া কাহারও চিত্ত যদি ভয়ে ভীত হইয়া থাকে, “বিদায়ের” বিষয় প্রতিমাটি দেখিলে তাহার চিত্ত করুণায় শাস্ত ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবেই। একটি রক্ষ কর্কশ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করিয়া যে মুখ-পদ্মটি ফুটিয়াছে, কি করুণ কি বিষাদময় তাহার দৃষ্টি। বাক্য তাহার স্তল, দৃষ্টি তাহার সজল, যে প্রিয়-বস্তু হইতে সে বিদায় লইতেছে তাহার চন্দ্র তাহাবই উপর নিবদ্ধ, কম্পিত ওষ্ঠপুটের উপর অঙ্গুলি দুটি রাখিয়া এক দৃষ্টে সে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে : সমস্ত প্রস্তর-খণ্ডটির, তাহারই মধ্যে রূপায়িত অবিস্মৃত কেশদামের এবং সমস্ত দেহটির গতি ঐ প্রিয় বস্তুটির দিকে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে বিদায় তাহাকে লইতেই হইবে। বাহিরে এই শাস্ত মুখশ্রী এবং ভিতরে এই বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনা এই মূর্তিটিকে কি অপূর্ব্বরূপে মণ্ডিত করিয়া আছে।

প্যারিস রদ্যা-মিউজিয়মটি না দেখিলে, তাহার শিল্প-সৃষ্টিগুলির অতীন্দ্রিয় রহস্যের মধ্যে চিত্তকে স্বেচ্ছা-বিহার করিতে না দিলে শিল্পাচার্য্য রদ্যাকে বিছুতেই ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইয়া উঠিতে পারা যায় না। যুবোপীয় ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে, নবোদ্বোধন যুগের এঞ্জেলোর পরে যদি কোনো ভাস্করের নাম করিতে হয় তবে রদ্যার নামই করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে আজও কেহ এই শিল্পাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনাগত যুগের কোলে হয়ত রদ্যা অপেক্ষাও প্রতিভাবান শিল্পী নীরবে

শিল্প সাধনায় নিযুক্ত আছেন, *। তিনি যেদিন আত্ম-

* ইটালী দিয়াছে এঞ্জেলোকে, ফরাসী দিয়াছে রদ্যাকে; শুনা যাইতেছে নয়ওয়ে তাহার নিহৃত ফ্রেডে আর এক শিল্পকে সবস্বৈ লালন করিতেছে—গুস্তাভ ভীগলান্ড (Gustav Vigeland) তাঁহার নাম। কেহ কেহ বলিতেছেন যেদিন তাঁহার শিল্পকলাগুলি লোকচক্ষুর সন্মুখে প্রকাশিত হইবে, সেদিন রদ্যার প্রতিভা ম্লান হইবে।

প্রকাশ করিবেন সেদিন হয়ত রদ্যার জ্যোতি তাঁহার আড়ালে পড়িয়া ম্লান হইয়া যাইবে; কিন্তু রদ্যার সৌন্দর্য-জগতে যাহা দান তাহা সত্য এবং স্থায়ী, চিরদিন অম্লান জ্যোতিতে তাহা আপনি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

দুই বার রাজা

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাজে-পোড়া ঠুঁটো তালগাছটা উঠানের পাশে দাঁড়িয়ে, যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশকে ঠাট্টা করছে। অথচ স্রিয়মান, বিষন্ন।

বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর আছে, উচু তাকিয়াটায় ঘাড় শুঁজে উবু হ'য়ে শুয়ে অমর হাঁপানির টান টান্ছে। ভক্তার খানিকটা জ্বাক্‌ডায় কি একটা ঝাঁঝালো গুণ্ড ঢেলে দিয়ে ব'লে গিয়েছিল শুঁকতে। তাতে টান কমা দূরে থাক, রগ দুটো বাগ্ না মেনে একসঙ্গে টনটন ক'রে উঠেছে। বন্ধুরোজ্জ কতগুলি দড়ি পাকিয়ে মাথার চারপাশটা সজোরেই বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। এখন ভীষণ লাগছে তাতে। কিন্তু দড়িগুলি খুলে কেলেতে পর্যন্ত জোরে কুলোয় না।

বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মাঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আগাতে ইচ্ছে করছে না। পরিক্রান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখখানি—

প্যাকাটির মতো লিক্লিকে দেহ,—একটা টিক্‌টিকি যেন। এই একটুখানি টিকে থাকার বিকল্পে সমস্তটা দেহ ষড়্‌যজ্ঞ করছে! তার কী আর্সনাদ! যেন একটা ভূমিকম্প বা বজ্রা!

মায়, বিবাদস্রিষ্ট মুখখানির পানে চেয়ে অমরের মনে পড়ল হঠাৎ, কবে কার মুখে গান শুনেছিল—‘সে যে আসে আসে আসে’; শেলিও এ কথা বিশ্বাস ক'রে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল—তারপর একশ বছর এক এক ক'রে

খসেছে। দিন আর এলো না। বসন্ত যদি এলই,—মহামারি নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রেয় চোখ ভ'রে রোজের রোদন।

‘আজি হ'তে শতবর্ষ পরে’—। সেদিনও পল্লবমর্ম্মরে কোটি কোটি ক্রন্দন অমরশিত হবে। প্লেটোও ‘ত’ কত আগে স্বপ্ন দেখেছিল, বার্ণার্ডশও দেখেছে। ‘সে ক'বে গো কবে?’

অমরের হঠাৎ ইচ্ছে করল একটা কবিতা লিখতে—সমস্ত বিশ্বাসকে বিদ্রূপ ক'বে। ভূয়ো ভগবান আর ভূয়ো ভাগবাস। যেমন ভূয়ো ভূত!—মনে পড়ে, বায়রণ, মনে পড়ে সোপেন-হার।

যজ্ঞায় অতিষ্ঠ হ'য়ে অমর বাইরে বেরিয়ে এল, উঠানে। সেই ঠুঁটো তালগাছটার শুঁড়ি ধ'রে হাঁপাতে লাগল। দুজনে যেন মিতা; একসঙ্গে আকাশের তারাকে মুখ ভেঙে ভয় দেখাচ্ছে।

সমস্ত আকাশে কিন্তু নিস্তরঙ্গ ঔদালীস্ত।

বড়ের পর যেমন অরণ্য।—টান্টা পড়েছে।

মা বল্লেন—নাই বা গেলি কলেজে আজ। একটা ছাতাও ত নেই। যে রোদ্—

অমর বল্লেন—হাজিরা থাকবে না। তা ছাড়া মাইনে না দেওয়ার দরুণ কি দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা দেখে আসি।

অবস্থা আর এর বেশী কি সম্ভব হবে? ছ'মাসের মাইনে দেবার শেষ তারিখ উৎরে গেছে দেখে নাম লাল কালিতে কেটে দিয়েছে।

সরোজ বল্লে—তুমি ফ্রি না?

৬ ছ' হাত দিয়ে বুকের ঘাম মুছে অমর বল্লে—তা হ'লে সুপারিশ লাগে,—ঐ যে মোড়ের ভেতলা বাড়ীর বারান্দায় ব'সে যিনি মোটা চুরুট টানেন তাঁর। তিনি আর প্রিন্সিপ্যাল ত আমার মার এই ছেঁড়া কাপড়, বন্ধক দেওয়া ছ'খানি সোনার বালা, এই ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের-করা খোলার ঘরটা দেখতে আসেন নি। অ'বুজি একটা করেছিলাম বটে, সুপারিশ ছিল না ব'লে বাতিল হ'য়ে গেল। সোজা হ'য়ে আছো যেন নারিজ্য তার সত্য পরিচয় দিতে শেখেনি। আর মহীনকে চেন ত?—বাইকে যে আসে—ফ্রি। বাড়ী থেকে মাইনে বাবদ যা টাকা আসে, তা নিয়ে 'পিকাডিলি' টিন কেনে, সেলুনে ব'সে দাড়ি কামায়।

মা হতাশ হ'য়ে বল্লে—উপায় কি হবে তবে?

যেন হঠাৎ একটা বাড়ীর ভিৎ খ'সে গেল; কাদায় খ'সে গেল চলন্ত গাড়ীর চাকা।

অমর বল্লে—ভিজিট পাবে না জেনে ডাক্তার যখন স্কাক্‌ডায় ভোটকা-গন্ধওলা খানিকটা নাইট্রিক এসিডের মতো কি ফেলে ব'লে গিয়েছিল এ রোগে কেউ মরে না, তখন আশ্বস্ত হ'য়ে আমাকে তোমার বুকে নিয়ে কি বলেছিলে? বলেছিলে—ঠাকুর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, এইটুকুই শুধু চাই। বেশ ত, আবার কি! কাল যদি ফের টান ওঠে, তোমার এ ভুতুড়ে হাতুড়ে ডাক্তার না ডাকলেও বঁচে উঠব।

পরে ঢোক গিলে ফের বল্লে—তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতই বাজ্জে রাঁধুনে মা। হয়, খালি ঝাল, নয় খালি জুন। পরিবেশন করতে পর্যাপ্ত ভালো শেখেনি।

জামাটা খুলে ফেলে। ছাব্বিশ ইঞ্চি বুক, কঁধের মত হাত পা, পিঠটা কুঁজো, মাথার চুলে চিরুণী পড়ে না,—তবু মনে হয় যেন একটা উদ্ধত তর্জনী।

মা পাখা ক'রে ঘামটা মেয়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে

দিতে লাগলেন। যেমন ক'রে পুরুত তার নারায়ণ শিলা গন্ধাজলে ধোয়,—ততখানি যত্নে।

সরোজ বল্লে—তা কি হয়? সামান্য কটা টাকার জন্য 'কেরিয়ার' মাটি করার কোনো মানে নেই। আমি দেব টাকা, মাইনে দিয়ে দিয়ে কাইন শুকু।

মা'র বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমর বল্লে—কিছু লাভ নেই তাতে। তা ছাড়া পার্সেন্টেজ নেই। হুয়ায় ছ' বার ক'বে টান ওঠে—বানান ভুল নিজে ঘোষ-মাষ্টারের সঙ্গে তর্ক করা অবধি প্রিন্সিপ্যাল চলে না আর, খালি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। 'গোষ্ট'কে যদি অনবরত 'ঘোষ্ট' ব'লে চলে একঘণ্টা ধ'রে,—তা আর যার সহ্য হোক, আমার হয় না ভাই। বিনয় সহকারে প্রতিবাদ করলাম, মাষ্টার ত বেগেই লাল। প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে নালিশ—আমি নাকি অপমান করেছি। আমি বললাম—'উনি 'গোষ্ট'কে' বলেন 'ঘোষ্ট', 'পিয়াস'কে বলেন 'পায়াস',—। তাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উচ্চারণগুলি কি ঠিক? উনি ভাবলেন, ঠগর বাড়ী বরিশাল ব'লেই বুঝি ঠাট্টা করছি আমি।

সরোজ বল্লে—প্রিন্সিপ্যাল কি বলেন?

—বলেন, প্রোফেসর তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। তাঁকে কয়েকটি কবুবার তোমার রাইট নেই। ফের এমন বেয়াদবি কর ত কাইন কবুব। অদ্ভুত! তাছাড়া, আমি বিরক্ত হ'য়ে গেছি, সরোজ।

একটু থেমে বল্লে—আমি কি বিরক্ত হ'য়ে এ গেছি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। আমাদের যিনি পোয়েটি পড়ান, তিনি আবার উকিল। চাপকান প'রে ছুটতে-ছুটতে হাজির, এক গালা পানে মুখটা ঠাসা,—কোটসের 'নাইটিংল' পড়াবেন। ডাক্তার যেমন ছুরি দিয়ে মড়া কাটে ভাই, তেমনি ক'রে কবিতাটা দ'লে পিষে হুমড়ে চটকে একেবারে কারা-চিংড়ি ক'রে ছাড়লেন। ঠগর ব্যাখ্যা শুনে এত ব্যথা লাগল, যে মনে হ'ল বেচারী কীটস যদি ছাত্র হ'য়ে শুনত ঠগর পড়া, ত বেঞ্চিতে কপাল চুকে চুকে আত্মহত্যা করত। কি সে চোঁচানি, পানের ছিবড়ে ছিটকে পড়ছে,—ভয়ে নাইটিংলের প্রাণ খ'য়ে গেছে। 'ক্লথ' এর কথা যেখানে আছে, সেখানটায় এসে ঠগর কি

বিপুল হাত ছোড়া—ও-জায়গাটা মুখস্থ ক'বে এসেছিল নিশ্চয়ই। রুথ-এব গল্প কি, বাইবেলের সঙ্গে কোথায় তার অমিল এই নিয়ে তুমুল তর্ক, তুমুল আফালন। 'খুব সোজা' ব'লে বই মুড়ে কৌটোর থেকে গোটা চার পান মুখে পূরে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন আলপাকার পাল তুলে। বোধ হয় অনেকদিন বাদে একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলেন।—তখনো ভালো ছাত্রেরা বইয়ের ধারে-ধাবে মাষ্টারের শব্দার্থ টুকে রাখছে ও পরস্পরে রুথের শব্দরবানী নিয়ে পরামর্শ করছে। ভাই সরোজ, আর জ্যোৎস্নারাতে কীটস্ পড়া চলবে না কোনোদিন।

পরে মাকে দুই বাছ দিয়ে জড়িয়ে ধ'বে বসে—তুমি ভাবছ মা যে তোমার ছেলে বি-এ পাশ করতে পারুল না ব'লেই ব'য়ে গেল? নয় মা, নয়। জান?—যারা খুব বড় হয়েছে তাদের শব্দের অর্থ জানতে মা'র গয়না বন্ধক দিয়ে কলেজে পড়তে আসতে হয়-নি। এ দিন যাবে, এ কথা ত তুমিই বেশি বিশ্বাস কর। দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তারপর কালো ঝড়ো রাজিই আসে, তাতেও ভড়ুকাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমন পঙ্খ পক্ষাহত ক'রে বানিয়েছেন ব'লে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।

মা মিশ্রির জল ছেকে দুই কাঁচের গ্রাসে ক'রে দুই বন্ধুকে ভাগ ক'রে দিলেন। বসেন—আর একটা গয়নাও ত নেই—

—বরদার মা। আমার কলেজে পড়া এইখানে থতম্। আমি এই ফাটা ফুস্ফুস নিয়েই লড়ব। তুমি আমার মা, আর ঐ তালগাছটা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, —কতকালের চেনা।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কি করবে তা হ'লে এখন?

—কবিতা লিখব। তুমি হেসো না, সরোজ। কথাটা তারি বেতলা শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু আমি সত্যিই লিখব এবার। আমার সমস্ত প্রাণ চেষ্টায়ে উঠতে চাইছে।

সরোজ হেসে বসে—তা হ'লে আর কবিতা হবে না।

—না হোক। সোজা সত্য কথা বুক হুঁকে আমি খুলে ব'লে দিতে চাই। সৌন্দর্যের আবরণ দিয়ে কুৎসিত

নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্তেই না তোমরা ভগবান বানিয়েছ! যে কথা কনফুসিয়াস, বায়রণ, স্কাইনবার্ণ বা হুইটম্যান পর্যন্ত ভাবতে পারেনি—

তেমন আবার কি কথা আছে?

—দেখো। যে কথা ভেবেছিল খালি চ্যাটার্টন।

সরোজ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সহসা পাংশু হ'য়ে বসে—
বরদার, অমর। ও রকম মারাত্মক ঠাট্টা করোনা।

অমর উরাসীনের মত বসে—মারাত্মক ঠাট্টাই বটে।
জান, বিধাতা যদি তোমাদেব প্রকাশ কবি হন ত এই পৃথিবীটা তাঁর প্রকাশে ছন্দপতন।

কিন্তু না, সত্যি সত্যিই সে রাতে অমর কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বসল কবিতা লিখতে। মেটে মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়েছে, স্নান বাতির আলোয় সেই মুখখানির যেন তুলনা নেই। ঐ মা'র মুখখানি নিয়েই একটা কবিতা লেখা যায় হয়ত,—যেন বহু জন্মের হাসি-কান্নার ধন।

সন্ডে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে,—কিন্তু একটা লাইনও কলমের মুখে উঁকি মারছে না। 'বিট'-এর পুলিশ থানিক আগে চেষ্টায়ে পাড়া মাং ক'রে জুতোর ভারী শব্দ ক'রে চলে গেছে। আবার সেই নিঃশব্দতা,—প্রকাশ করতে না পারার ব্যাধার মতোই অপরিমেয়।

অমরের মনে হ'ল, ভাষা ভারি দুর্বল, খালি ভেঙে পড়ে। লিখতে চাইছিল—এই জীর্ণ পৃথিবী, এই দানবী সভ্যতা,—সব কিছুই প্রকাশে তুল বিধাতার,—এঁচড়ে-পাকা ছেলের ছিবলামি। এলিন-ড্রাইভার যেমন ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে হায় হায় ক'রে ওঠে,—তেমনি অকারণে ভুল ক'রে খেলাচ্ছিল এই পৃথিবীটা বানিয়ে ফেলে ভগবান তারায় তারায় চীৎকার ক'রে উঠেছেন,—অজ্ঞতাপে দগ্ধ হচ্ছেন।

এত বড় যে ব্যবসাদার,—সেও দেউলে হ'ল ব'লে।
কবে লালবাতি জলবে,—প্রশ্নের? তারই কবিতা।

লেখা যায় না। খালি সন্ডেটা পুড়ে পুড়ে নিঃশব্দে হ'লে দীপ নিবে যায়।

বিকেলের দিকে অমর সরোজের বাড়ী গেল। পাশেই বাড়ী,—লাগাও টিনের ঘরে একটা গাড়ি পর্যন্ত আছে।

শ্বেত পাথরের মেঝে,—ছুটো দেয়াল প্রায় বইয়ে ভরা,—ছবি খান তিন চার, সেক্সপীয়র, শেলি আব বার্বার্ড' শ'র। একটা চেয়ারের ওপর বই গান্ধা করা,—মেঝেতে কাৎ হ'য়ে শুয়ে সরোজ, একজামিনের পড়া পড়ছে। আর ঘরের এক কোণে ষ্টোভ্ জালিয়ে তার বোন্ চায়ের জল গরম করছে আর দাদাকে বকছে সিগারেট খায় ব'লে।

অমরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেয়েটি আরো খানিকটা জল কেটুলিতে ঢেলে দিয়ে বলে—মাই বল দাদা, বোহিমিয়াটা আর ঘাই হোক আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা। নইলে—

সরোজ উঠে প'ড়ে বলে—এস, অমর বসো।.....তুই লক্ষ্মী দিদি, পরেরটা ভেঙ্গে দিবি আমাদের? দেখ না চট ক'রে—

বোন্ চ'লে গেলে সরোজ তাড়াতাড়ি দরজার পরদাটা টেনে দিয়ে শুধোল—এমনিই কি এসেছ, না কোনো কাজ আছে?

অমব সোজা হ'য়ে বলে—আমাকে কয়েকটা টাকা লাও,—এই গোটা কুড়ি।

সরোজ হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চৈচিয়ে উঠল—লুসাই, লুসাই, ও লুসী।

বোন্ হ'হাতে মরদার ডালাটা নিয়ে এসে পদার ফাঁকে চোখ রেখে বলে—কি হুকুম মশাইয়ের?

সরোজ বলে—চাবিটা দিয়ে দেয়াল থেকে কুড়িতে টাকা বার ক'রে দে ত শিগ'গি।

ঘরে ঢুকে মরদা চটকাতে-চটকাতে লুসী বলে—কিসেব জন্তো শুনি?

—উড়োতে। তুই দে খুলে। ফকরদালালি করিস্ নে।

দেয়াল খুলতে খুলতে লুসী বলে—দাঁড়াও না। দিচ্ছি এবার। ঠিক মতো হিসাব দিতে না পারলে রাজে ঘুম থেকে উঠে কে চা ক'রে দেয়, দেখব।

ব'লে চ'লে গেল। পদাটা খানিক দূলে স্থির হ'ল।

টাকা দিয়ে সরোজ বলে—যদি আবার বিপদে পড় বলতে সঙ্কোচ ক'র না।—

চা খেতে-খেতে অমর ভাবছিল সংসারে এ একটা কি চমৎকার ব্যাপার? উজ্জল স্বাস্থ্য,—স্বচ্ছল অবস্থা,—কল্যাণী বোন্! নাম তার লুসী!

পেছন থেকে কে অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলছিল—একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, যদি নেন—

সরোজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে—অমর। খালি পা, যে আকড়া দিয়ে কালি-পড়া লঠন মোছে তেমনি কাপড় পরনে,—হাঁপানির টানে বরঝরে পাঞ্জর ছুটো বোঁকে উঠছে,—কথা কইতে পারছে না।

সরোজ তফুনিই কাগজটা নিয়ে দাম দিল, কথা কইল না কোনো। বরঞ্চ ভারি লজ্জা করতে লাগল ওরই।

ট্রাম চলল। চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে অমর পা পিছলে প'ড়ে যেতেই সবাই রোল ক'রে উঠল। হাঁটুটা চেপে ধ'রে 'কিছু-না' বলে' অমর কাগজের বাগলটা নিয়ে কাশতে লাগল। পরে ভিড়ের মধ্যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। সরোজ নেমে আর খোঁজ পেলে না তার।

ফুস্ফুসটা ঘেন কে চুষে শুবে ফেলেছে।

অমর একটা গাছতলায় ছুটো হাত মাটিতে চেপে টান্ হ'য়ে ব'সে আকাশের বাতাস নেবার জন্তে গলাটা উঁচু ক'রে ধরেছে। কে ঘেন ওর টুটিটা টিপছে, ভিজা গামছার মতো ফুস্ফুসটা চিপে ফেলছে।

কাগজের বাগলটার ওপর মাথা রেখে শুতে যেতে দেখে—পাশাপাশি ছুটো বিজ্ঞাপন। একটা এক ছাত্র পড়াবার জন্তে, আরেকটা কোন্ অরক্ষণীয় পাত্রীর জন্ত পাত্র চাই। যেমন-কে-তেমন হ'লেই চলে—ঠিক এই কথা লেখা আছে।

টান্টা যদি একটু পড়ে বিকেলের দিকে,—অমর ভাবছিল,—তবে কোথায় গিয়ে আগে আন্জি পেশ করবে? টিউশানির খোঁজে, না পাত্রীর?

আগে ভাবত—এক মুটো ভাত একখানি কুঁড়ে ঘর, আর-একটি নাবী। এখন মনে পড়ছে আরোও কত কথা। হাঁপানিতে ভুগবে না, ঝড়ে কুঁড়ের চাল উড়ে যাবে না, ভাতে রোগের বীজ থাকবে না, ন'রীর ঠোটে কালকূট থাকবে না। এত! তবে।—

ক্লান্ত কাক ক'কাই, আর ক'কাই ও কাশে মাটির ওপর মাঘের ছেলে।

পাঁজরা ছোটো খানিক জিরোলে তারপর কষ্টে পথ চললে। চলতে চলতে প্রথম ঠিকানাটাতেই ঠিক ক'রে এল—যেখানে মাষ্টার চায়।

বাড়ীর কর্তা ঘাড় ঝাঁকিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে শুধোলেন—কদ্দর পড়া হয়েছে?

অমর বললে—বি-এ পড়ছি।

—কালকে আই এর সার্টিফিকেটটা নিয়ে এস। দেখা যাবে।

একদিন খুব জোরে হাঁপানি উঠলে মা রাগ ক'রে অমরের গলার সবগুলি মাছুলি ছিড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল, আর অমর রাগ ক'রে ছিড়ে ফেলেছিল—ম্যাট্রিক আর আই-এর সার্টিফিকেট দুটো।

মাছুলিগুলির মধ্যে একটা সোনার ছিল বলে' মা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে বাস্তে রেখে দিয়েছিলেন, অমরও ভালো হ'য়ে এক সময়ে সার্টিফিকেট দুটোর ছেঁড়া খণ্ডগুলি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল একটা চোকো-লেফাকায়। আঠা দিয়ে সেই সার্টিফিকেট আজ জোড়া দিতে বস্।

কর্তা বহুক্ষণ সার্টিফিকেটটা নেড়ে চেড়ে দেখে জাল নয় প্রতিপন্ন করে' বল্লেন—কিসে ছিড়ল?

—একটা ছোট্ট ছুঁই বোন আছে,—নাম লুসাই,—ছুঁই ক'রে ছিড়ে ফেলেছে।

কর্তা ঘাড়টা বার চারেক তুলিয়ে বল্লেন—‘আচ্ছা বাপু, বানানু কর ত' থাইসিস’।

পরে বল্লেন—বেশ। বল তা ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি? আকবর কত সালে জন্মেছিল? এখান থেকে কি করে' ডিক্রগড় যেতে হয়?

অমর বললে—আমি ত পড়াব ইংরিজি আর অক। আমাকে এ সব প্রশ্ন কেন করছেন?

কর্তা খাপ্পা হ'য়ে বল্লেন—আজ-কালকার ছেলেগুলো ছ-পাতা মুখস্ত ক'রেই পাশ মারে। আমাদের সময় আমরা কত বেশী জ্ঞান্তাম।

কর্তার ছেলে পাশেই ছিল। একটু বেগাড়া রকমের।

বল্লেন—যা যা জ্ঞান্তে তাই বুঝি জিজ্ঞেস করছ বাবা। মাষ্টারদের যে প্রশ্নটা ভালো করে' জ্ঞান থাকে, সেইটেই পরীক্ষায় দেন, আমি বরাবর দেখছি। যেন কাগজ দেখবার সময় অস্থবিধায় পড়তে না হয়।

বাপ একটু দ'মে গিয়ে বল্লেন—আচ্ছা, একটা ইংরেজি রচনা লেখ ত,—দেখি তোমার ইংরিজির কত দোড়। একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় ত' টুহু।

অমর বললে—কি লিখব? ক পাতা?

কর্তা বল্লেন—লেখ, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি। একশ শব্দের বেশি নয়। এরকমই আসে পরীক্ষায়।

টুহু একটু হেসে বল্লেন—বাবা, যোলা ‘থিয়োরেম’ থেকে একটা ‘এক্সট্রা’ দাও না কষতে।

বাপ চ'টে বল্লেন—যা, ও সব কি দেব? দেব মানসাক।

টুহু জোরে হেসে বললে—ওটা বুঝি তুমি জান। না?

কর্তা রচনার কি বুঝলেন, তিনি জানেন,—তবে দেখলেন হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। বল্লেন—বেশ। তবে কি না, ইতিমধ্যে একজন বহাল হ'য়ে গেছে। নইলে তোমাকেই নিতুম।

টুহু অক্ষুণ্ণ হয়ে বললে,—কিন্তু বাবা, ইনি ভালো, এঁকে আমার—

অমর শুধু বলতে পারলে—এ সব কেন লেখালেন তবে?

কর্তা বল্লেন—লেখা ত তোমাদের অভ্যাস হ'য়ে আছে। কালে ত জীবনের পেশাই হবে। বরঞ্চ সাবেক কালের এন্ট্রান্স পাশ করা বুড়োর কাছে একটা রচনা দেখিয়ে নিয়ে তোমার লাভই হ'ল। একটু প্রাক্টিসও হ'ল লেখার। তা ছাড়া রচনার ‘সাবজেক্ট’ টা ত খুবই ভাল,—কি বল? জান হে বাপু, সে-কালের এন্ট্রান্স তোমাদের এ কালের পাঁচটা এম্-এর সমান,—সেটি মনে রেখো।

অমর বললে এবার—উনি কততে পড়াবেন?

—পনেরো টাকা।



কিশোর

শিল্পী সাল্লো বতিচেল্লী
(১৪৪৪-১৫১০ খৃষ্টাব্দ)

—আমাকে দশটা টাকা দেবেন না হয়। দরকার হয়
তু' বেলা এসেই পড়াব তু'ঘণ্টা ক'রে।

তুই বললে—হ্যাঁ বাবা, একেই—

কর্তা বলেন—বেশ আসবে কাল। আর শোন, এ
কোঁর্ষ ক্লাশে পড়লে কি হবে, এদের ইংরিজিটা বেশ একটু
দাঁত-কামড়ানো। বাড়ী থেকে একটু প'ড়ে আসবে
রোজ। আর আমি কাল সকালবেলাই একটা ক্রটিন
ক'রে রাখব,—কবে আর কখন কি পড়াতে হবে।
বুঝলে? একটু ঝিমিয়ে কম।

রোজ শেষ রাতেই টান্টা টেনে আসে। তাই নিয়েই
অমর বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, পাছে আগের ঠিক করা
মাষ্টার চেয়ার বেদখল ক'রে নেয়,—দশটাকা থেকে নটাকা
বারো আনায় নেবে।

কেওড়া-কাঠের একটা খুঁরো তক্তাপোষ,—ওপরে
একটা চাটাই পর্য্যন্ত নেই। ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকাদের
বৈঠকখানা বসেছে।

কর্তা একটা জল-চৌকি টেনে নিয়ে কাছে ব'সে
বলেন—এই ক্রটিন ক'রে দিয়েছি, দেখে নাও। ঐ
চারঘণ্টা ক'রেই রইল,—সকালে দুই, বিকালে দুই।
নইলে ত সেই মাষ্টারকেই রাখতাম,—দিয়ে চেহারার,
দেখলেই মনে হয় ছেলে মানুষ করতে পারবে। এম এ
পাশ।

পরে বিড়বিড় ক'রে বলেন—এখুনিই এসে পড়বে
হয়ত। একটা ভাঁওতা মেরে দিতে হবে।

দরজা ঠেলে ভেতরে যে এল,—অমর তাকে দেখে
একেবারে অবাক হ'য়ে গেল,—মহীন। বোধ হয় বেচারার
অনেকদিন আউটারাম ঘাটে গিয়ে চা খেতে পারেনি,
তাই বুঝি এ চাকরিটা বাগাতে চেয়েছিল।

অমর প্রশ্ন করলে—তুই কবে এম-এ পাশ করলি
মহীন?

মহীন সিঁকেব কুমাল বা'র ক'রে ঘাড়ের ঘাম মুছে
বলেন—তুই পাশ করিস্নি নিশ্চয়। পনেরো তা হ'লে
আর জোটেনি। 'খাইসিস্' বানান পেরেছিল ত?

ব'লেই বাইকে ক'রে ছুট দিলে।

কর্তা বলেন—দেখলে কাণ্ডটা। ভাঁড়িয়ে জোচ্চ ব্রি
ক'রে ঠকাতে এসেছিল,—ভাগ্যিস রাখিনি পরে
চৌকিটা আরো একটু কাছে টেনে বলেন—পড়াও ত
বাপু, শুনি।

ছেলে বলে—তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে নাকি বাবা?

কর্তা বলেন—দেখি না কেমন পড়ায়,—ম'নেগুলো
সব ঠিক বলতে পারে কি না। হ্যাঁ, আরও ক'রে
দাও,—

অমর বলে—কি ভাবে আরও করব, তাও যদি ব'লে
দেন।

কর্তা ঘাড় চুলকে বলে—তা হ'লে আর তোমাকে
মাষ্টার রেখেছি কেন?

—কি হ'লে আপনার মনোমত হবে, তাও ত একান্ত
জানা দরকার দেখছি। নইলে—ছেলে রেগে বললে—
আমি আজ কিছুতেই পড়ব না বাবা, তুমি এরকম
করলে। তুমি যাও চ'লে।

তৃতীয় পক্ষের ছেলে। বাপ জলচৌকিটা নিয়ে চ'লে
গেল।

যাওয়া মাত্রই ছেলে উঠে দরজায় খিল্ এঁটে একটা
বালি-কাগজের ছেঁড়া খাতা বার ক'রে বহে—একটা
কবিতা লিখেছি মাষ্টার মশাই। শুনবেন? একটা হাস
দুই সাদা ডানা মেলে জলে ভাসছিল,—কতগুলি পাখি
ছেলে তাকে ধ'রে কেটেকুটে কাটলেট বানাচ্ছে—

স্বকুমার ছেলে—ছুটি কালো চোখে স্বগভীর স্বদূর
কৌতুহল, যেন ছুটি মণির প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারে কি
অজস্রসন্ধান করছে।

অমর শুধু বলে—এখন ওসব থাক্। এবার পড়ি
এসো।

ছেলে অবাক হ'য়ে বলে—কেন বলুন ত,—বাবা
কবিতার নাম শুনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খড়ম নিয়ে তেড়ে
আসেন, যা প'ড়ে প'ড়ে কাঁদেন,—আর আপনিও কবিতা
ভালোবাসেন না? তবে, আমাদের বইয়ে এত কবিতা
লেখা কেন? শুনেছি, আমাদের দেশে এক প্রকাণ্ড কবি
আছেন, তিনি না কি ছেলেবেলায় আমার মতো ইস্কুল

পালাতেন। আমার ইচ্ছা একটুও ভালো লাগে না,—
যেন খানিকটা কুইনি।

গায়ে থাকি সার্ট, পবনে ফিন্‌ফিনে কাপড়, কুচকুচে
কালো পাড়,—খালি পা,—চোখের পাতার ওপরে বড়
একটা তিল।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি ভাই ?

—কিশলয়। বড়দি রেখেছিল। বড়দিই ত আমাকে
কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল। ঠাঁয় মবাব পব আমি
একটা লিখেও ছিলাম,—দেখবেন সেটা ? উনি দেখে
পেলে কত স্থখী হতেন যে, অস্ত্র নেই।

—তুমি কি আজ পড়বে না ?

—রোজই ত পড়ি।—দেখুন ছেলেবেলায় একটা
কবিতা পড়েছিলাম,—তারার বিষয়, ইংরিজিতে।
আমার ভালো লাগেনি। তাবাকে আমার কি মনে হয়
জ্ঞানেন ? যেন কাবা অনেকগুলি বাতি জ্বালিয়ে নীচেব
অ'হুধদের খুঁজছে, যারা বড়দির মতো কেঁদে কেঁদে ম'রে
গেল। আমার এক এক সময় মনে হয় ঐ বড় তারাটা
যেন বড়দি। এখান থেকে একজন যায়, আর আকাশে
একটি ক'রে বাড়ে। আমি ঐ তাবাটাকে নিয়ে কতদিন
একটা কবিতা লিখব ভাবছি, পারি না। হয় না।

অমর অঙ্কের খাতাটা মুড়ে রেখে বসে—নিয়ে এস ত
ভাই তোমার কবিতার খাতাটা।

পুরো মাস গুজরানো হয়নি,—দিন বারো পড়ানো
হয়েছে মাত্র। পয়লা তারিখ অমর হাত পাতলে মাইনের
জন্ত।

কর্তা বসে—সাত তারিখের আগে হবে না। হ'তে
হ'তে সত্তেরো তারিখে এসে ঠেকল।

অমর অবাক হ'য়ে বললে—বারো দিনের মাইনে এই
তিনটাকা সাড়ে তিন আনা ?

কর্তা ঘাড় বঁকিয়ে বসে—কেন হিসেবেব এক চুলও
চুল বার করতে পারবে না। নিয়ে এসো ত কাগজ,
একটা কল অফ পি. ক'বে ফেল। দু'দিন আসনি,—তা
ছাড়া একদিন সাত মিনিট আর দু'দিন সাড়ে চার মিনিট
লেট ক'রে এসেছিলে—

অমরের ইচ্ছা হ'ল মাঝে ছুঁড়ে টাকা তিনটা। কিন্তু
মাব পরনের কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—পুরোনো
বইয়ের দোকানে সস্তায় একটা খুব ভালো বই দেখেছিল,
যাবার সময় সেটাও কিনে নিয়ে যেতে পাবে।

সকাল বেলাতেই হাপানি উঠেছিল সেদিন। তবুও
কুঁজো হ'য়ে ঢিকোতে ঢিকোতে পড়াতে চলল। কিশলয়
বলে—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ? বুকে হাত বুলিয়ে দেব।

—নাও।

কতগুলি বই গাদা ক'রে তার ওপর মাথাটা রেখে
অমর শোয় আর কিশলয় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে
গল্প শোনে—

শেলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বায়রণকে
দেশ থেকে। নাট হামসুন ট্রাম-কণ্ডাক্টরি করত।
ডট্টমডস্বিকে ফাঁসি কাঠে তুলে নামিয়ে দিয়েছিল,—গোর্কি
থাক্ত উপোস ক'বে,—মুসোলিনি তিন্মা করত পুলের
তলায় ব'সে।—

কিশলয় উৎকর্ষ হ'য়ে শুন্তে শুন্তে বুকের আরো
অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

অমর ঐ স্বকোমল সূচাক বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির পানে
চেয়ে চেয়ে অনেক কথা ভাবে,—হয়ত এর মধ্যে
ভবিষ্যতের ঋষি কবি তন্ময় হ'য়ে আছেন।

হঠাৎ হুজনে শিউরে আঁকে উঠল—জানালার
কার পকোনো ঝাঁঝালো দুই চক্ষু দেখে।

কর্তা বস্তু দরজায় পা দিয়ে থাকা মেরে বসেন—খোল
দরজা শিগগিব—

কিশলয় ভয়েভয়ে দরজা খুলে দিলে।

বর্তা এক ঝাঁকানিতে অমরের হাতটা টেনে শোয়া থেকে
তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ব'লে উঠলেন, না পড়িয়ে
শুয়ে শুয়ে উনি কবিতা শোনাচ্ছেন। গরচা পয়সা দেওয়া
হয় কিসের জন্ত শুনি ? নবাবজাদার মতো তরুপোষে
গা ছড়িয়ে জিরোবার জন্ত নয়। যাও বেরিয়ে এছনি—
অমর বসে—তবে বাকি মাইনেটা দিয়ে দিন—

—মাইনে দেবে না, আরো বিছা। যা বাকি ছিল,

সমস্ত এই বেদাদবির জন্ত ফাইন,—কিছু পাবে না, যাও চ'লে।

দেনা টাকাটা দিয়ে নিশ্চয় আরেকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে।

পশলার বুড়ির পর ঘোলা আকাশে চাঁদ উঠেছে,—মরা, মিউনো,—পথের পাঁককে ঠাট্টা করুতে।

ইপানির টানে কাঁকড়ার মতো কুঁকড়ে অমর নিঃশ্বাসের জন্ত ফুসফুসের কস্বেৎ করছিল।

চোখ বুজে খালি একটি ছবি আঁজও দেখছে—বিষণ্ন, অথচ একটি স্বকোমল ছবি।

বন্ধু মৃত্যু শয্যায়। অমর দেখতে গিয়েছিল। শেফালির মতো শাদা ধবধবে বিছানা,—তার ওপর এলিয়ে আছে ক্লান্ত তনুর কমনীয় কাস্তি,—ভাটায় জল-শ্রোত যেন জিরোচ্ছে। চারপাশে রাশি রাশি ফুল স্ত পীকৃত হ'য়ে আছে,—বাতাস মধুর হ'য়ে গেছে তাই। কারো মুখে একটি রা নেই, সবাইর মুখে নম্র বেদনার শীতল একটি ছায়া,—সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশাস্তি। শিয়রের ধারে খান কয়েক বই,—আত্মীয়ের মত শুদ্ধ বেদনায় ঘেঘাঘেঘি ক'রে বসেছে, আর কয়েকখানি পুর্বোনা চিঠি। নিষ্ঠুর ডাক্তার পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে আছে—মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

শুধু, পাথের ওপর ছুটি হাত রেখে একটি ছুঁখী মেয়ে বোবার মতো ব'ণে আছে,—যেন বিদগ্ধের প্রতিমা। মুখখানি ভারি মলিন ও উদ্বাস, তাইতে এত স্তম্ভর।—মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

অমরের সেদিন মনে হয়েছিল,—মৃত্যুও একটা বিলাসিতা। মেয়েটির বকের ব্যাধাটি যেন এক অমূল্য বিস্ত। এত মরা নয়, মিশে যাওয়া। যেমন মিশে যায় ফুলের গন্ধ বাতাসে,—যেমন গ'লে যায় সূর্যাস্তলালিমা অন্ধকারে।

সন্ধ্যায় টান্টা ফের পড়লে অমর বালিশের তলা থেকে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি বের ক'রে ঠিকানা ঠাহর করুতে চলল।

মা প্রশ্ন করলেন—কোথা যাচ্ছিস?

—পাজীর খোঁজে। তোমার কতদিনের ইচ্ছা। অপূর্ণ রাখা অহুচিত মনে হচ্ছে।

এককালে অবস্থা ভালো ছিল; বাড়ীর চেহারায় দেখলে বুঝা যায়। এখন একেবারে গঙ্গাঘাতী বৃত্তি।

এখনো পাত্র জোটেনি। অমরের যেন একটু আসান হ'ল।

বহু কথা-বার্তার পর শ্রামাপদবাবু বল্লেন—ছেলেটি কি করেন? কত চাহিদা?

—বি-এ পড়ে। এতদিন মা'র গয়না বাঁধা দিয়ে চলছিল—আর চলেনা। চাহিদা,—পড়া খরচ ছ' বছর,—আর নগদ হাজার খানেক টাকা।

শ্রামাপদবাবু তাতেই স্তব্ধ ছিলেন। তার কারণ আছে,—দরাদরি করুতে গিয়ে কেবলই দাঁও ফসকেছে। তা ছাড়া মেয়ের ইতিহাসও বড় ভালো নয়; বৈধতে ত নিতান্ত ক্লুপাই,—এত কুৎসিত, যে, ঘাটের মড়ার পর্য্যন্ত নাকি দাঁতকপাটি লাগে।

অমর বল্লেন—ছেলেটির কিন্তু এক ব্যারাম আছে,—ইপানি। প্রায়ই ভোগে।

শ্রামাপদবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লেন—এমন আর কি শক্ত ব্যারাম। ওতে ত আর কেউ মরেন। বয়েস কালে সেরেও যেতে পারে। তা, আপনি বি ছেলের বন্ধু মেয়ে দেখে যাবেন একেবারে?

অমর বল্লেন—স্বাঞ্জে না, আমিই পাণিপ্রার্থী,—ওটা একেবারে বিয়ের রাতে সেরে ফেললেই চলবে। দিন ঠিক ক'রে খবর দেবেন আমাদের, ঠিকানা রইল।

শ্রামাপদবাবুব মনে অনেক প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠলেও কোনোটাই আঘোল দিলেন না। খালি মেয়ে পার করুতে পারবেন,—তাও অবশি বাষট্টি বছরের বড়োর কাছে নয়,—এই খবর গিরিব কানে দিতেই গিল্লি উলু দিয়ে উঠলেন। বাড়ীতে সোরগোল প'ড়ে গেল। বাড়ীর এক কোণে একটি কুৎসিত কালো মেয়ে দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল খানিক।

মা বল্লেন—জানা শোনা নেই, কেমন না কেমন মেয়ে,—একেবারে কথা দিয়ে এলি?

অমর রাগ ক'রে বললে—আর তোমার ছেলেই বা কি গুণধর মা, যে একেবারে পরী তার ডানা ছুটো স্নগে ফেলে রেখে ফাষ্ট ক্লাশ ফিটনে চ'ড়ে তোমার পদ্মবনে এসে দাঁড়াবেন। শাঁখ বাজাও মা। গুণে গুণে হাজারটি নগদা টাকা,—আর দু' বছর পড়া থরচ।

মা অপৰ্য্যাপ্ত খুসি হ'য়ে গেলেন। বিয়ে হ'য়ে গেলে কাশী যাবেন, এমন সম্বলও সম্ভব হ'ল।

অমর বললে—তোমার ছেলের এই ত চেহারা,—একটা আবুস্থলার চেয়েও অধম। তার ওপর বুকের পাঞ্জরায় ঘুন ধরেছে। যা পাও, তাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ো।

মা বললেন—মেয়ে যদি খোঁড়া হয়?

—কি যায় আসে তাতে? তোমার ছেলে যে কুঁজো। টাকাগুলি ত' চকচকে হবে।

সরোজ বললে—কবে প্রেমে পড়লে হঠাৎ? ফরাদা হাওয়ায় পর্দা বেফাঁস হ'য়ে গেল বুঝি?

লুসী সে ঘরে ব'সেই সেলাইর কল চালাচ্ছিল, বললে—কবে পড়েছেন উনি পাঁজি দেখে তারিখ লিখে রেখেছেন কি না! আব জন্মে পড়েছিলেন, এ-জন্মে পেলেন।

সরোজ বললে—পড়তে মন যাচ্ছিল না মোটেই, ঘুম পাচ্ছিল। লুসীকে বললাম,—কল চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে দিদি। এবার থামাতে পাবিস্, আমি অমরের সঙ্গে বেরোচ্ছি। দে ত চাবিটা।

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পিঠের ওপর চুল মেলা, মাস্তাজি মেয়েরা যেমন ক'বে শাড়ী পরে তেমনিই ধরণ শাড়ী পরার, দুটি হাতে সোনার কঙ্কন, সূঁচ সূঁতো পরাবার সময় চোখেব কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ললাটে আভা।

ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিষই সওয়া করলে ছ'জন,—বান্ধ বোঝাই ক'রে। টোপর পর্য্যন্ত। তিনটে মুটে।

ফেরবার মুখে আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বয়সে কিছু বড়।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—কি করছ আজকাল?

—বিয়ে করছি। চূড়ান্ত। আর তুমি? টিউশানি পেলো?

—পেয়েছি একটা। স্বসামান্য। ঐ গলির বাকের লাল বাড়ীটা।

—ও! কত দেয়?

—কিঞ্চিৎ। ল-কলেজের মাইনে সাড়ে সাতটাকা।

সরোজ চোখ বড় ক'রে বললে—সাড়ে সাতটাকা?

লজ্জিত না হ'য়েই বললে বন্ধু—হ্যাঁ, তাই সই। মাইনেটা ত' চ'লে যায়। আর কি বেয়াড়া এঁচড়ে-পাকা ছেলেই পড়াতে হয়, তাই। এইটুকু বয়স থেকেই পত্ত মেলাতে শিখেছে। ভাগ্যিস বাপ মা'র 'নাই' নেই এতে, নইলে উচ্চমে যাবার স্কেল্ড খোঁড়া হচ্ছিল আর কি! মা ব'লে দিয়েছেন, ফের পদ্ম মেলালে বেত মারতে। তিনটে খাতা প্রায় ভরতি ক'রে ফেলেছে তাই। সব গুলি পুড়িয়ে ফেলেছি কাল।

অমর বললে—খুব কাঁদলে?

—বাপের চড় চাপড়ও ত কম খায়নি। মা তার হাতের শিল নিয়ে পর্য্যন্ত তেড়ে এসেছিল। কবিতা লিখতে গিয়েই না ছেলেটা এবার অঙ্কে একেবারে গোজা পেলো।

অমরের মনে পড়'ছিল, সেই থাকি সার্ট, কোমবে কাপড়ের সেই ছোট আলগা বাধুনিটি,—সেই তরল জ্যোৎস্নার মতো দুটি চোখ, সেই বাসি-কাগজের হেঁড়া-খোঁড়া খাতাটা, পেন্সিল দিয়ে লেখা কবিতা, নাম "বড়দি বা বড় তারা",—একদিন ছোট কচি হাতখানি দিয়ে বুকটা আস্তে একটু ড'লে দিয়েছিল।

অমর ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে—রোজ শেষ রাত্রেই হাঁপানিটা চেগে আসে। একটা ইন্জেকশান দিয়ে দিন, যাতে অন্ততঃ আজ রাতটা রেহাই পাই। আজ আমার বিয়ে কি না।

ডাক্তার বিম্বিত হলেন বটে। যাবার সময় অমর টেবিলের ওপর একটা নিমন্ত্রণপত্রও রেখে গেল।

বউ-ভাতে ত' কাউকে খাওয়াতে পাববে না, তাই ধার

দলে দলে অলকার অলোক স্তম্ভরী
আনে অদ্ভুত ভয়'
ছয়টি ঋতুর উপহার :
শরত দিয়াছে লীলা কমল-কলিকা
হেমন্ত দিয়াছে কুম্ভ-কুম্ভ-মালিকা
অলকানারীর অলকায়
লোধ পুষ্প রেণু প্রলেপে
পাণ্ডুলিপি ফুটাল আননে
শান্ত শীত ঋতু ;
অশান্ত বসন্ত এসে .

কুটিল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশে
চূড়াপাশে গের্গে দিল নব কুক্ষবক
গ্রীষ্ম দিল বর্ণ-মূলে শিরিষ কুম্ভ
বর্ষা-শেষে দিয়ে গেল সীমন্ত প্রদেশে
সারা প্রকৃতির স্তব্ধ শিহরণখানি
কদম্ব কুম্ভে !

দিব্য রাসলীলা-মত্ত নায়ক নায়িকা
অনন্ত-যৌবন-বসে উন্নত বিহ্বল
বিহারিছে নিশিদিন নিত্য-প্রেমোৎসবে
বল্লভর বিরাট্রিছে এই বঙ্গলোকে,
হেথা নাই অতৃপ্তি অভাব,
অশ্রু হেথা আনন্দেই রবে,
তাপ শুধু প্রেমের উত্তাপ
যৌবনেই বয়সের অচঞ্চল স্থিতি
বিরহ সে প্রণয়কলহ !
এ হেন ভোগেব স্বর্গে
যুগ যুগান্তর ধরি' যক্ষবর করিলে বিহার
প্রেমের অমূল্য হার
পর্যাইল যক্ষিনী প্রেমসী ;
তবু যবে ভাগ্যশশী
আচম্বিতে রাহুগ্রস্ত হ'ল একদিন
কি দৈন্ত-পাথর মাঝে হইলে পতিত !
জান—তবু জান তুমি
প্রেমের আশ্রয়-ভূমি

তোমাগতপ্রাণ সেই প্রিয়তমা তব
কি ভাবে কাটায় কাল
তোমারি বিরহে নিশিদিন
রবির বিরহে ম্লান বিসৃষ্ট মলিন
শিশির মথিত গন্ধপ্রায়,
মলিন করেছে আঁধি বিরহের ভূরি অশ্রুজল,
দীর্ঘশ্বাস হরিয়াছে বিস্মৃতির স্নিগ্ধ বর্ণে-চ্ছাস
কখনো সে বিরহিনী দেবতা সকাশে
যাচে প্রিয় মিলনের বর
কত তুলিকায় বর্ণে সযত্নে বিকাশে
বিরহ-বিকৃত ক্ষীণ তব মূর্তি চিত্র পটে তার
বারম্বার
কত উন্মাদিনীপারা
তোমার মধুর কথা প্রিয় শাবিকারে গায় পুছি
কখনো টানিয়া তাব মৌন বীণাখানি
চাহে গাহিবাবে তব নামাঙ্কিত গান
কে জাগাবে তান ?
অভ্র তরুর ধারা অবিশ্রাম সাধিতেছে বাদ,
আর্দ্র তরুী মাঝে হার স্বর নাহি ফুরে,
বৃথা খোঁজে ঘূরে
বিস্মৃত মুচ্ছনাগুণি বিকল-হৃদয় !
হেন প্রেমসী বিন্দু প্রেমামৃত-ধারা
যুগ যুগান্তর কবি' পান
কোন বলে বলীয়ান
হইয়াছে হে যক্ষ-প্রবর ?
মাত্র সঙ্কটসর
প্রিয়ার মধুর সঙ্গ বঞ্চিত হইয়া
উন্মত্তের প্রায়
ভোগস্বর্গ অলকায়
ভোগস্বত্তি শূন্য বাহিয়া চাও যেতে ?
তোমাদের স্বরগেতে
ক্রেম বুরি শুধু চাওয়া আর সমা প্রাণ পূরে পাওয়া ?
ভোগী দেবতার দল
তাই বুঝি সর্ব কার্যে এমন দুর্বল ?
অভাব-মরণ-ভরা মরতের শিশু

কি সহিষ্ণু সহজ সবল সৰ্ব্ব কর্মে সৰ্ব্ব প্রেমে,
দেখে যাও শিখে যাও স্বর্গ হতে নেমে
দাঁড়ায়ে এ ধরণীর ধূলির উপরে ;
মর্ত্য বিরহের এই মৃত্যু-যজ্ঞ হ'তে
বুঝে যাও কোন্ মতে
না দিয়েও দেওয়া যায়, না পেয়েও পাওয়া যায়,
না বেঁচেও বাঁচা যায় অনন্ত জীবনে,
বিরহের মিলনের জনমের মরণেব
আদিহীন অন্তহীন উদ্বাহ বন্ধনে ।

আমাদের মাটি-মা'র ভাব-ভঙ্গ-খানি
অন্তহীন অভাবেতে গড়া ।
জননীর অন্তবের মৌন স্নেহ-ধারা
সবুজের উৎস হ'য়ে ফুটে ওঠে লতায় পাতায়
সহসা বিবর্ণ হ'য়ে যায় ।
ভরি' দিয়া দিগ্বিদিক সুষমা-সৌরভে
একান্ত নীববে ফোটে ফুল
ক্ষণতরে আমাদের করিয়া আকুল
সহসা অজ্ঞাতে ঝ'রে পড়ে ।
জাগে স্বর—ক্ষণতরে এ জীবন করিয়া মধুর
আচম্বিতে থেমে যায় ;
রেখে যায় প্রাণে শুধু অতৃপ্তির রেশ
এই ভাবে সব হয় শেষ
স্বপ্ন-শাস্তি-সৌন্দর্য্য-সম্ভার
চকিত পরশ দিয়ে চকিতে মিলায় বারবাব ।
ফুলেই মতন
ফুটে ওঠে অতর্কিতে আমাদের হৃদয়ের ধন,
ক্ষণতরে বৃকে ধরি, দিই তারে ক্ষণিক চূষন,
দিন-স্তরের পুষ্পসম সহসা কখন ঝ'রে পড়ে ।
অতৃপ্তি অভাব দুঃখ বিরহ মোদের
নিভা সত্য নির্দম একান্ত সত্য নহেক বল্লনা
নহে মাত্র বর্ষব্যাপী শাপ-পরিহাস ।
জন্মে জন্মে এই ভাবে মোরা সবে আছি
তা'ব'লে কি যাচি,
হে স্বর্গ-প্রবাসী যক্ষ ।

মোদের মর্ত্যের 'পরে তোমাদের স্বর্গ আনিবারে ?
কখনো না—কখনো না ।
করিয়াছি বৃথা চেষ্টা জনমে জনমে
পশিয়াছি স্বর্গলোকে নিজের পৌরুষে,
প্রাণ-শূন্য হ'য়ে গেছি
ভ্রান্তিহীন বন্দহীন গতিহীন স্বর্গেব রোরবে
ঝাঁপায়ে পড়েছি পুনঃ অসহ তৃষ্ণায়
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দুঃখ-ভরা ধরণীব বৃকে
দেবত্বের মৃত্যুহীন জড়ত্ব বর্জ্জিয়া
জাপায়েছি পুনরায় দুর্ব্বার আবেগে
মৃত্যু-ভরা নয়তবে অমর মহিমা ।
অন্তহীন পরমায়ু পাই নাই মোরা
তাই ত এ জীবনের মুহূর্ত্তেবে অনন্ত করেছি
আবেগের তীব্রতায় ।

আমাদের স্বথ শাস্তি রূপ সৃষ্টি চকিতে মিলায়
তাই ত মোদের কবি
যুগে যুগে এঁকে যায় মৃত্যুহীন ছবি
চকিত মুহূর্ত্ত-পটে ক্ষণিকের বক্ষ-রক্ত-রক্তিম-উজ্জ্বলে
তাই ত বিকাশে
আমাদের গুণী শিল্পী স্রষ্টাব হাতে
মর্ত্যের অপূর্ব্ব এই মৃত্যুহীন রূপ ।
জীবন ত অন্তহীন দুরাশার স্তপ
তাই ত মোদের চাওয়া এমন নিবিড়—
গাছ পাতা ফুল পাখী করে আসে ভিড়
আসে আলো আসে ছায়া আসে জ্যোৎস্না আসে অন্ধকার
মৌন স্তরে যেন বলে যায় বারম্বার,
“এখুনি যে ঝ'রে যাবো ম'রে যাবো হাম
দেখে নাও শুনে নাও ভালবেসে নাও—”
অস্তিম আবেগ-ভরে তাই
ক্ষুদ্র তুচ্ছ সবাকারে বৃকে নিতে ধাই ।
মৃগযুগান্তর ধরি' অন্তহীন ভালবাসাবাসি
মৃত্যুহীন লোকে—
সে কেমন বুঝিতে চাহি না ।
শুধু দেখি একদিন অল্প মনে পথে যেতে যেতে
অচিন্ত্য অসীম এক মাহেজ্ঞক্ষেপেতে

চকিতে ভাসিয়া উঠে একখানি মুখ
আঁচিতে বলে উঠি—“ভ’রে গেল—
ভ’রে গেল বুক” !
তারপরে কত হাসি কত অশ্রু আশা নৈরাশ্রের
জালবোনা !
ঐ ছুটি আঁখি যদি শুধু ক্ষণতরে পড়ে এই মুখ ‘পরে
জাগে যদি তাহে মৌনভাষা
সারাটা জীবনভরা অতৃপ্তি নিরাশা
আনন্দে সহিয়া যাই
পাই আর নাহি পাই—
নিমেষের বোঝাপড়া বেঁধে দেয় বৃকে
নিষ্ঠার দুর্ভেদ্য বর্ষ,
জীবনের সর্ব কৰ্ম
সর্ব সার্থকতা আর সকল ব্যর্থতা
অমর বিশ্বাসভরে দীপ্ত হ’য়ে ওঠে,
শেষ দিনে শেষ নিঃশ্বাসের সাধে ছোট
“চির প্রাণ চির প্রেম”—মহা জয়গান।

হে স্বর্গ-বিরহী !
মর্ত্যের মিলন-লীলা শুনাহু তোমায়;
আছে বৈধা শুনিবারে মর্ত্যের বিরহ-যজ্ঞ-গায় ?
এখানে ও মরণ মহান
আমাদের চিরসঙ্গী ;
মৌন ধীর প্রেমিকের মত চূপে চূপে
যে শিখাল মিলন-মেলায়
সামাগ্ৰেব অসীমতা—তুচ্ছের গরিমা,
যে বুঝাল সীমার মহিমা—
মৃত্যুর মাধুরী এই অন্তহীন জীবন-প্রবাহে—
সেই মৃত্যু রহি রহি অকস্মাৎ উন্নত উৎসাহে
চূর্ণ করি’ ধ্বংস করি’ আশা নিষ্ঠা বিশ্বাস নির্ভর
ইন্দ্রন যোগায় এই অনির্করণ বিরহ-পাবকে ;
তার সে প্রচণ্ড তাপ
সেই জ্বালা ভীষণ দাহন—
যদি সহিবারে পার—
এস তবে স্পর্শ ক’র মর্ত্যের বিরহ-যজ্ঞ-পূত হতাশন।

জীবনদোলা

শ্রী শাস্তা দেবী

(৪)

হৈমবতীর রান্নাঘরের উন্টাদিকে একখানা ঘর ছিল
কাঠের; তাহার মুখ বাড়ীর ভিতর দিকে নয়, বাহিরে।
কে একজন জমিদার তাহার আসবাবপত্র গুদাম করিয়া
রাখিবার জন্য ঘরটা ভাড়া লইয়াছিল। দিবারাত্রি তাহা
বন্ধ পড়িয়া থাকিত। ঘরের গায়ে করোগেটেড আয়রনে
ঢাকা সানের মেঝে দেওয়া একটা বারান্দা ছিল; ভিতর
দিকে তাহার মুখ।

হৈমবতীর মেয়েদের কাজে বড় উৎসাহ আর এই
বারান্দাটা অকারণ পড়িয়া নষ্ট হয় দেখিয়া শঙ্কর ও সঞ্জয়
সেখানে পাড়ার গরীবলোকের ছেলে-মেয়েদের একটা

নাইটস্কুল করিবার আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছিল।
মেয়েদেরই পড়াইবার কথা, কিন্তু প্রথম দুই এক সপ্তাহ
সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য হৈমবতীর অহুমতি লইয়া
ছেলেরা যাওয়া-আসা করিত। কাজে উৎসাহ ছিল
সকলের চেয়ে চপলা, চঞ্চলা ও গৌরীর। ইহারাই বিশেষ
করিয়া কাজের ভার লইয়াছিল।

ইস্কুলের আসবাবের মধ্যে ছিল তিনটি বড় বড়
হারিকেন লঠন। কোমরে ছোট ছোট গামছা কিম্বা
কাপড় জড়াইয়া নয়গাত্র তিনদল ছোট ছেলেমেয়ে দাড়িবাধা
গ্লেট পেন্সিল ও ছিন্নমলাট বই খাতা লইয়া তিনটি আলো
ঘিরিয়া মেঝের উপর মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে বসিত।

তাহাদের একজনের মাথার ছায়ায় আর একজনের বই অন্ধকার হইয়া যায়। জমাগত এপাশ-ওপাশ করিয়া কোনো রকমে একটু আলো খুঁজিয়া পিছনের দল বই দেখে। গায়ে গায়ে বসার দক্ষণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সমস্তক্ষণ ঠেলা-ঠেলি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্তরে নাগিশ চলে।

ছেলেমেয়েদের আসিবার সময় হইয়াছিল; অল্পক্ষণ আগেই একটা প্রচণ্ড দম্কা হাওয়ায় চারিদিকে ধূলাবালি খড়কুটা উড়াইয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। বারাণ্ডাটা জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা কোথায় বসিবে সেই ভাবনায় সবলে ব্যস্ত। গোরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটা মস্ত ঝাঁটা লইয়া জলটা ঝাঁটাইয়া উঠানে ফেলিতেছিল, চপলা একখানা ছেঁড়া তোয়ালে দিয়া অবশিষ্ট জলটুকু মুছিয়া তুলিতেছিল। চঞ্চলার দেখা নাই।

বাহিরের দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল। বুড়ী কি নেড়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দরজা খুলিয়া দেখে শঙ্কর, সঞ্জয় ও অপূর্ব। সে ফোন্সলা মুখে একটু সলজ্জ হাসির বেশ টানিয়া বলিল, “দিদিমণি গো, মাষ্টারবাবু সব এয়েছে।”

গোরী বলিল, “ভিতবে আসতে বল।”

চণ্ডা লালপাড় দেওয়া একটা মারাঠি চাদর গলায় জড়াইয়া অপূর্ব সকলের আগে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, “আজ বড় একটা মুন্সিলে পড়া গেছে। আপনাদের কার কি মত হ’বে জানি না, তবু জিনিষটা ব’লে রাখি। সকালে ছেলের প্লেট বিনে’ এই পথে কেটার জিয়া করে’দিতে আসছিলাম, এমন সময় এ-পাড়ার মেথরানী আমায় গ্রেপ্তার করলে। সে বলে, ‘বাবু আপনারা গবীব ছুঃখীকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন; ওরা ত সব ভাল জাত, ওদের সবাই শেখাতে পাবে; কিন্তু আমার ছেলেটার এত বুদ্ধি; ছোটজাত ব’লে বেউ তাকে এক অন্ধর শেখাবে না। আপনাদের পায়ে ধরছি বাবু, একে একটু মাহুষ ক’রে দিন।’ এখন কি করা যায় বলুন।”

সকলের আগে চপলা বলিল, “ওমা, সে মেথরের ছেলে। তাকে নিয়ে কি ক’রে চলবে?”

গোরী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তাহার

মনে হইল ঠিক উচিত কথাটা হয়ত সে বলিতে পারিবে না।

অপূর্ব অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, “আপনারা দেশের কাজ করিতে নেমে যদি মেথর চামার বিচার করেন, তাহ’লে এদেশের আশা যে কতখানি তা বোঝাই যাচ্ছে।”

সঞ্জয় বলিল, “বিচারের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ঐ একটা ছেলেকে যদি ক্লাশে নি তাহ’লে বাকী চল্লিশটিকে ত্যাগ করিতে হ’বে।”

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, “বিস্ত্র অন্যায়েকে প্রজ্ঞ দিয়ে দেশের সেবা কি প্রকৃত সেবা?”

শঙ্কর বলিল, “যারা অবুঝ অন্ধ, তাদের শিক্ষার পথ বন্ধ ক’রে দিয়ে একজন মাত্র মেথরের ছেলেকে নিয়ে কাজ করায় দেশের অপকার বই উপকার নেই। এরা যদি কিছু বুঝত তাহ’লে এদের কথা মেনে চলাটাকে আমি অন্তায় বলতুম। এখন বলতে পারি না, কারণ ওদের সংস্কার মজ্জাগত।”

গোরী বলিল, “বিস্ত্র পুঁথি প’ড়ে বুঝলেও দেশের ও মনের সংস্কার কি একদিনেই ছাড়া যায়? এতকাল ধ’রে রক্তে যে-সব সংস্কারের বীজ জন্মা হয়েছে তাকে একদিনে ছেড়ে দেওয়া কি সহজ?”

সঞ্জয় মুখ তুলিয়া গোরীর দিকে চাহিয়া বলিল, “সহজ না হ’লেও জানীকে তা ছাড়তে হ’বে। বিশেষতঃ সমাজেব দণ্ড থায়া বিনা অপরাধে সহ্য করেছেন তাঁরাই যেন আবার অপরকে বিনা দোষে দণ্ড না দেন তা দেখতে হ’বে।”

গোরী বলিল, “শক্তির অভাবে কোনো মাহুষ যদি একটু স’রে দাঁড়ায়, তাতেও ও কি তার অপরকে দণ্ড দেওয়া হয়?”

গোরীর মনে কেবলি চঞ্চলার কথা ঘুরিতেছিল। অপূর্ব বলিয়া উঠিল, “নিশ্চয়! যে কাজ একের বেলা অনায়াসে করব, সে কাজ অপরকে প্রত্যাখ্যান করা মানেই তাকে বঞ্চিত করা এবং দণ্ড দেওয়া। এ ত ভীকৃতাব রূপান্তর মাত্র।”

সঞ্জয় গোরীকে বিব্রত দেখিয়া বলিল, “হ্যাঁ, ভীকৃতাব এটা হ’তে পারে স্বীকার করি। কিন্তু সমাজ ও সংস্কারের

খাতিরে, অভ্যাসের ও স্বভাবের দোষে এইরকম সহস্র ভীকৃত্য কি আমরা প্রত্যাহ করছি না? তাতে যদি আপাত-দৃষ্টিতে কারো কোনো ক্ষতি দেখা না যায় তবে আমরা সেগুলোকে অপরাধ বলে গণনা করি না, কারণ হাজার হোক মানুষ মানুষমাত্র, দেবতা নয়। তার কাছে আমরা পরিপূর্ণতা আশা করতে পারি না। তবে যদি এই ভীকৃত্যর জন্যে কোনো মানুষকে আমরা তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করি তাহলে সে ভীকৃত্যকে খুব সহজে মার্জনা করা চলে না।”

অপূর্ব সঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, “এই বিশুদ্ধ বক্তৃতাটা কি তোমার নিজের মনের কথা?”

গৌরী লজ্জিত হইয়া বলিল, “সঞ্জয়বাবু আমাকে নেহাৎ অসহায় দেখে একটু সাহায্য করছিলেন। যে কাজটাকে আপনি ভীকৃত্য বলে বোঝেন সেটাকে মানুষের দুর্বলতার দোহাই দিয়ে আপনি যে আঁকড়ে পড়ে থাকেন না তা আমি জানি।”

সঞ্জয় কথা ঘুরাইয়া বলিল, “যাক, বাজে বক্তৃত্য — কোনো কাজ হবে না। কাজের কথাটা আসলে দরকার। ছেলেটার পড়ানোর কি করা যায় দেইটা ভাবতে হবে। আর সকলকে আমরা ছাড়তে পারব না, কিন্তু ওরও একটা ব্যবস্থা করা চাই।”

শঙ্কর বলিল, “খুব সহজ একটা ব্যবস্থা হচ্ছে —ওকে একলা আলাদা পড়ানো। তাতে অবিজ্ঞি সময় যাবে।”

অপূর্ব বলিল, “রোজ আবার অতটা সময় কে ‘স্পেন্সার’ করতে পারবে?”

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, “ঃ, ভারি ত সময়। কুড়িমিনিটে ওর প্রচুর পড়া হইয়া যাবে। গৌরী, তুই নে না ছেলেটাকে। খুব ত নিষ্ঠাবতী আছিস, দেখি সত্যি একটা কাজে তোর কতখানি সাহস!”

গৌরী লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, “আমি? বাড়ীতে সকলে শুনে কি বলবে?”

শঙ্কর বলিল, “কে তোর বাড়ীতে বলতে যাচ্ছে? আর প্রতি কথায় যদি অত বাড়ীকেই মেনে চলতে হয়,

তবে বাড়ীর লোকের অমতে এখানে না এসে বাড়ীতে থাকলেই ত হ’ত।”

অপূর্ব বলিল, “আমি নিতে পারতাম কাজটা। কিন্তু বরাবর ত আমার এখানে প্রবেশাধিকার থাকবে না।”

সঞ্জয় বলিল, “আমার বাড়ী বড় দূর, নাহ’লে আমার ওখানে যদি রাত ন’টার পর যেতে পারত ত আমি পড়িয়ে দিতুম ওকে।”

বরাবর তাহাকেই সকলে লজ্জায় ফেলিতেছে দেখিয়া গৌরী বলিল, “আচ্ছা, আমি কালকে ঠিক ক’রে বলব, তার আগে আপনারা কেউ ভার নেবেন না।”

চপলা বিস্ফারিতনেত্রে তাহাব দিকে তাকাইয়া বলিল, “মাগো, গৌরী, এত বাহ বিচারের পব শেষে মেথর চেলা জোড়ালে?”

ছেলেরা আশ্বে আশ্বে একটি একটি করিয়া আসিয়া জুটে লাগিল। আজ নাম লেখাইবার পালা। ঝাঁঝ মল ও ডুরে শাড়ী পড়া ছোট একটি মেয়ে আসিয়া চপলার আঁচল টানিয়া বলিল, “গুরুমা, আমার নাম ফেনী লিখোনি। মা বলেছে আমার নাম মেনকা হুন্দুরী মামী।”

চপলা বলিল, “তোর বাবার নাম কি?”

ফেনী বলিল, “তা জানি নি। মা বলে দেবে এখন।” ছোট ছোট লাল গাম্‌ছা পরা তিনটি ছেলে আসিয়া খুব মিহি ও ভাঙা স্বরে চৈচাইয়া বলিল, “আর গুরুমা, আমাদের নাম বাঁকা, টেরা আর ভেংচু। ঠাকুমা বললে ওতেই হবে, আর ভাল নাম নেই।”

ফরদামত একটি মেয়ে তেলকালী মাথা ছেঁড়া একটা সিন্ধের ক্রক পরিয়া আসিয়া বলিল, “গুরুমা গো, আজকে মাসি আর মা এমন মারপিট করেছে যে বাবা তাদের ঘরে খিল দিয়ে দিচ্ছে। ঘরের ভিতর খুব গালাগালি করছে, তাই আমি পালিয়ে এলুম।”

ছেলে মেয়েদের পড়া আরম্ভ হইলে হৈমবতী একবার সহাস্যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর শঙ্করকে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

হৈমবতীর ঘরে গিয়া শঙ্কর একটা ছোট ঝল-চৌকির উপর বসিল। মানুষের উপর পা ছড়াইয়া দেওয়া পিঠ

দিয়া হৈমবতী বলিলেন, “দেখ গৌরীকে নিয়ে একটা মুন্সিলে পড়েছি। তোমার সাহায্য না নিলে উপায় নেই।”

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, “গৌরী এতকাল ত বেশ সহজই ছিল, আজকাল আবার কি মুন্সিল বাধাচ্ছে?”

হৈমবতী বলিলেন, “বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু তবু আশ্রমের দিক দিখে একটু অসুবিধার কথা। তুমি চঞ্চলাকে দেখেছ ত?”

শঙ্কর বলিল, “হ্যাঁ, ওই যিনি পড়াতে আসেন, খুব বুদ্ধি আছে আর কথার খুব ধার।”

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ সেই। গৌরী এসে পর্যন্ত ওর সঙ্গেই থাকত। এক এক ঘবে দুটি তিনটি ক’রেই মেয়ে থাকে। কাল হঠাৎ সে বললে যে, একলা একথানা বর চায়। চঞ্চলা মেয়ে ভাল, তার সঙ্গে যদি কিছু গোলমাল হ’য়ে থাকে সহজেই মিটে যাবে। কিন্তু কি যে হয়েছে তা গৌরী নিজেও বলবে না, চঞ্চলাকেও জিজ্ঞাসা করতে দেবে না। এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ওর সঙ্গেই কিছু হয়েছে। তুমি একটু খোজ নিয়ে আমাকে বল।”

ছোট ছেলেরা কাহার কয় পাতা পড়া এবং না পারিলে কে কি শাস্তি পাইবে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। ভেংচা বলিল, “গুরুমা হাতছাড়ি করবে না, আমি জানি।”

ফেলী বলিল, “কোটি কোটি কালীর দিব্যি বলছি—গুরুমা টেককে কাল বেঁউচিতে দাঁড় করিয়ে দেবে।”

টেক বলিল, “বেঁউচি যে নেই রে।”

ফেলী বলিল, “তবে কেলাসে নামিয়ে দেবে।”

টেক বলিল, “ইস্ দিলেই হ’ল র নীচে আর কেলাসই নেই।”

তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে-শুনিতে গৌরী ও চপলা ঘরে ফিরিতেছিল। শঙ্কর বাহিরে আসিয়া বলিল, “গৌরী, একবার এদিকে গুনে যা।”

গৌরী বিরক্ত হইয়া বলিল, “আবার কি গুনে হবে? এই একপাল গরু তাড়িয়ে এলাম; এখন আবার

আমি তোমার মেথরেব ছেলেকে পড়াতে যেতে পারব না।”

শঙ্কর বলিল, “না, না, তোকে কিছু করতে হবে না। আগেই চট্‌চিস্ কেন? আমার সঙ্গে অবিশি আজন্ম তোর ঝগড়ার সম্পর্ক, বকাবকি করতে পারিস্, কিন্তু পরের কাছে এতকাল ত তোব সুনামই ছিল, আজ কাল আবার ঝগড়াকাটি আরম্ভ করবেছিস্ যে?”

গৌরী বলিল, “আবার কার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে গেলুম? আমার অভ তোমার মত কুঁতুলে নাড়ী নেই।”

শঙ্কর বলিল, “নেই যদি তবে চঞ্চলা না উজ্জ্বলা কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ কি নিয়ে?”

গৌরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, “আমি তার সঙ্গে এক ফোটাও ঝগড়া করিনি। বিশেষ একটা কারণে কেবল আলাদা থাকতে চেয়েছি।”

শঙ্কর বলিল, “সে ত মেয়ে খুব ভাল শুনেছি।”

গৌরী বলিল, “ভাল হ’তে পারে; তাই ব’লেই ত এতদিন জানি, কিন্তু শুধু নিজে ভাল হ’লেই ত জগতে চলে না। আত্মীয়স্বজন যদি ভাল না হয়, তাহলে কি সমাজে মানুষকে কেউ গ্রহণ করে?”

শঙ্কর বলিল, “ওবাবা, আমার মেজপিসে ত অনেক লোকের টাকা মেরেছেন, আরো অস্ত্রাস্ত্র সংকার্য্যও প্রচুর করেছেন, তা’ব’লে কি আমি একঘরে হ’ব?”

গৌরী রাগিয়া বলিল, “ছোড়া,—তোমাকে আর ভ্রাকামি করতে হবে না। যেন দিন দিন কি হচ্ছে? তুমি নিশ্চয়ই সব বুঝতে পেরেছ, শুধু শুধু আমাকে জালিও না।”

শঙ্কর বলিল, “আচ্ছা, ধূল্যাম যেন সবই বুঝেছি। কিন্তু চঞ্চলার মা বাবা যদি মন্দই হয়, তাতে চঞ্চলার কি? তার এই প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠেও ভাল হওয়ার কি তোমরা এই পুঙ্কর দেবে?”

গৌরী বলিল, “সেইভাবেই ত আমি চঞ্চলাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে বারণ করেছিলাম; শুধু আমি আস্তে আস্তে দূরে স’রে গেলে কাকর ত কোনো ক্ষতি হ’ত না।”

শঙ্কর বলিল, “কিন্তু ভোরই বা কি লাভ হ’ত ? মাল্লষকে ত্যাগ করার ছুটো কারণ থাকতে পারে। এক হচ্ছে তাকে কোনো অপরাধের জ্ঞান শাস্তি দেওয়া, আর এক হচ্ছে নিজেকে তার স্পর্শ কি সঙ্গদোষের হাত হ’তে রক্ষা করা। তুমি তাকে শাস্তি দিতে চাও না, কারণ জিনিষটা গোপনে করুছ এবং তার সঙ্গকে তোমার পক্ষে ক্ষতিকর ব’লে বিশ্বাস কর না; তবে তোমার কাজটার উদ্দেশ্য কি হ’তে পারে ?”

গৌরী রাগিয়া বলিল, “অত শত তর্কের কথা আমি জানি না, বাপু। আমাব যেন কেমন লাগে।”

শঙ্কর বলিল, “গৌরী, তুই সংসারে বড় হুবি ব’লে তোকে নিয়ে কত বাধা ঠেলে আমি বেরিয়েছি। এমনি ক’রে কি তুই আমার শ্রম সার্থক করবি ? আমি সঞ্জয়দের মত বিশ্বের হিত করতে পারব না, কিন্তু তবু তাদের সামনে আমার মুখ উচু ক’রে আমি চলতে পারি এই গৌরবে যে, আমাদের মত পরিবারের থেকে ভোর মত মেয়েকে এনে আমি সকল তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতার উপরে তুলবার আশা রাখি। সে কথা তুই ভুলে যাস নে।”

গৌরী চূপ করিয়া গেল। শুধু শঙ্কর নয়, সেও ত অপূর্ণ সঞ্জয়ের কাছে ছোট হইতে লজ্জাবোধ করে। জন্মগত শুচিবাহুকে সে ছাড়িতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু ইহাদের কাছে ছোট হইয়া যাইতেও যে আত্মসম্মানে বড় বেশী ঘা লাগে। আর শঙ্কর যে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু প্রকৃত হিতার্থী, তাহাকে সে ব্যথা দেয় কি করিয়া ?

শঙ্কর বলিল, “বলু আর গোলমাল বাধাবি না। সেদিন সঞ্জয় বলছিল যে, চঞ্চলার মত সাহসী মেয়ে সে দেখেনি। কোনো কাজে যেন তার ভয় ব’লে জিনিষ নেই। এই প্রশংসাটা তোর নামে যদি শুনতে পেতুম ত আমার অনেক দুঃখ সার্থক হ’ত।”

গৌরীর কেমন একটা ঈর্ষা হইল। যে চঞ্চলাকে সে অস্পষ্ট বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতে চায়, সে অনায়াসে যাহা পাইল, গৌরী এতদিনের সাধনায় ত তাহা সঞ্চয় করিতে পারিল না। নিজেকে সর্বদা বেড়া দিয়া খরিয়া রাখিলে কখনও সে তাহা পারিবে না।

গৌরী বলিল, “তুমি ভয় পেও না, দাদা। আমি তোমার মুখ হেঁট করব না।”

(৫)

ভোর না হইতে আকাশ কালো করিয়া মেঘ নামিয়াছে। তাহার সঙ্গেই এই গ্রীষ্মের দিনে তীব্র ভীষণ বাতাস যেন মাল্লষের সর্কাদে ছুঁচ ফুটাইতেছে। গাছপালা তাহার আঘাতে অবিশ্রাম কাঁদিয়া চলিয়াছে। দরজা-দানাদা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, মনে হয় যেন কোন শতহারা পথিকের দল এই ঘোর দুর্ঘ্যোগে মাল্লষের করুণা ভিক্ষা করিয়া ঘরে ঘারে জ্রত কর হানিয়া ফিরিতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল তবু প্রকৃতির এ প্রলয় খেলার শেফ নাই। বাহিরের আকাশে দৃষ্টি চলে না। ঘন মেঘের গায়ে কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘ সুপারি-গাছের দীর্ঘ পাতাগুলি ঝড়ের বেগে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, যেন ভীত শিশুর দল হাত বাড়াইয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। পথে ছুটি একটি লোক।

ঘরের আলো প্রলয়ের কালিয়ায় মলিন হইয়া আছে। তাহার উপর কাণে আসিতেছে একটা না একটা চাপা কাতরানির শব্দ। আশ্রমের ছোট একটি মেয়ে পিছলে পড়িয়া গিয়া হাতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ফৈমবতী সকালে বাহির হইয়া গিয়াছেন এখনও ফেরেন নাই। কোথাও বোধ হয় ঝড়ে আটক পড়িয়াছেন।

অবিবাহিত তরুণ চিকিৎসক সঞ্জয়কে দিয়া ফৈমবতী মেয়েদের চিকিৎসা সচরাচর করাইতেন না পাছে লোকে কিছু কুৎসা রটনা করে, কিন্তু আজ এই দুর্ঘ্যোগের সন্ধ্যায় আর কাহাকেও সহজে পাওয়া যাইবে না বলিয়া চাকরটা গিয়া তাহাকেই ধরিয়া আনিয়াছে। চঞ্চলা ছোট মেয়েটির হাতখানা ধরিয়া বসিয়াছিল, পাছে সে টানা হেঁচড়া করিয়া কিছু করিয়া বসে।

সঞ্জয় আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ক্রমাগত বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া শুশ্রূষাকারিণী মাথাটা রেগানীর বালিশের উপর রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে। মুখ দেখা যায় না। সঞ্জয় বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। এ এ ? তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ঘরের ভিতর জুতার শব্দ পাইয়াই চঞ্চলা উঠিয়া বসিল। সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, “ওঃ আপনি। আমি কি বকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।”

চঞ্চলা বলিল, “কেন? আপনি কি এখনও ছেলেবেলার মত অন্ধকারে শাঁখচুম্বীর ভয় করেন নাকি?”

সঞ্জয় বলিল, “শাঁখচুম্বী দেখলে ত ধ’রে ঘাড় মটকে দিতাম। হঠাৎ মনে হয়েছিল স্বর্গ থেকে দয়া ক’রে কে নেমে এসেছে, তাই ভয়ে চমকে উঠেছিলাম।”

চঞ্চলা সলজ্জহাস্তে মুখখানা নামাইয়া লইল। কিন্তু বিস্মিতও হইল; কি বলে এ যুবক? রোগী দেখিতে আসিয়া রোগীর সম্মুখে এরকম প্রলাপ বাক্য ত ইহার মুখে শোভা পায় না। ইহার মুখে এমন কথা শুনিতে সে কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সঞ্জয় তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “আপনি আমাকে পাগল-টাগল কিছু ভাবছেন, না? ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আপনাকে দেখে আজ এমন একজনকে মনে প’ড়ে, গেল যে, আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমার একমাত্র বোন, আমাদের সকলের দিদি ছিলেন যিনি, তিনি কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হ’য়ে পড়লে ঠিক আপনার মত এমনি ক’রে হাতের কাজ হাতে রেখে শুধু মাথাটা বালিশে দিয়ে জিরিয়ে নিতেন। তাঁর হেঁট-করা মাথা ঘাড় সমস্তর ভঙ্গী অবিকল আপনার মত ছিল। কোনোখানে একটু প্রভেদ নেই। যাক সে কথা, এখন আমার কাজটা আগে সেরেনি।”

সঞ্জয় ছোট মেয়েটির হাতখানা তুলিয়া লইল। তারপর চঞ্চলার সাহায্যে যথাসাধ্য পরিপাটি করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া তাহাকে একটা ঘুমের ঔষধ দিয়া দিল। চঞ্চলা ক্ষিপ্রহস্তে তাহার সমস্ত কার্যে সাহায্য করিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে ঘরে গৌরী আসিয়া পড়িল। দুইজনে একমনে কাজ করিতেছে দেখিয়া সে আর কিছু করিতে আগ্রহসর হইল না; তাহার কেমন যেন মনে হইল ইহারা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি চায় না। গৌরীর একটু বিরক্ত লাগিল। তাহার পর সে নিজেকেই বুকাইল;—ইহা ত স্বাভাবিক জিনিষ মাত্র। বিশেষ মানুষ বিশেষ

মানুষের সঙ্গে চায়, তৃতীয়ের উপস্থিতি সে সঙ্গে-স্বত্ব ত মাটি করিয়াই দিতে পারে। গৌরী বলিল, “অনিমার ত হাত বাঁধা হ’য়ে গেছে দেখছি; তবে আমি আর অকারণ দাঁড়িয়ে কি করব? যাই, কালই ত আবার দেখা হ’বে।”

সঞ্জয় বলিল, “হ্যাঁ, কাল আপনার বিশেষ ছাত্রটিকেও একবার দেখে যাব। ওকে নিয়ে আপনি আমাদের অশেষ উপকার করেছেন। আপনার সন্মুখাস্তে অনেক কাজ হ’বে।”

গৌরী নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল—সঞ্জয় বলিতেছে, “আসি তবে। সেই ছেলেবেলাকার কচি মনটা আজ আট বৎসর পরে যেন আবার জেগে উঠল। মনে প’ড়ে গেল কেমন ক’রে সেদিন কেঁদেছিলুম।”

গৌরী আর দাঁড়াইল না। ভাবিল, পরের কথা আমার কি শোনা উচিত?

চঞ্চলা উদ্গ্রীব হইয়া বলিল, “তিনি কোথায় গেলেন?”

সঞ্জয় বলিল, “আমরা পার্টনায় থাকতেই তিনি মারা গিয়েছেন। সবে দু বছর তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কে জানে হয়ত আপনার সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষের কোনো যোগ আছে!” নইলে আপনার প্রত্যোট চলা-ফেরা পর্যন্ত দিদির মত কেন?

চঞ্চলা মুখখানা নামাইয়া বলিল, “সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব আর না থাকাই ভাল।”

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, “কেন, আমার মত ভববুরেব সঙ্গে সম্পর্কও রাখতে চান না নাকি? দিদি ছাড়া আমার আব বোন নেই, তাই আমার কিন্তু ওদিকে একটু লোভ আছে।”

চঞ্চলা বলিল, “আমাকে আপনি চেনেন না তাই বলছেন; চিন্লে আর ও কথা বলতেন না।”

সঞ্জয় বলিল, “আপনাকে ত খুব ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। চিন্লেই ভয়ে ছুট মারব এমন আকাজক্ষা আমার মোটেই হচ্ছে না। পরিচয়টা দিয়েই ফেলুন না। অবশ্য তার আগে আমার নিজের পরিচয় দেওয়া উচিত। আমার বাবা হৃষিকেশ গাঙ্গুলী ওইদিকেই ওকালতী করতেন।

বহুকাল বেহারেই ছিলেন। এখন কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে দেশে রয়েছেন।”

সঞ্জয় দেখিল, চঞ্চলার মুখ আরক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার কি ঘটিল সে বুঝিল না। সে বলিল, “আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হ’লেন? এত অল্পদিনের আলাপে এত আত্মীয়তা পাতানো আমার বোধ হয় অসম্ভব হচ্ছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।”

চঞ্চলা সামলাইয়া লইয়া বলিল, “না, আপনার কোনো অসুস্থ হয়নি। অসুস্থ আর একজনের হয়েছিল, সে কথা আপনাকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। অপরের অসুস্থ্যের জন্য আপনার উপরই রাগ হয়েছিল, সেটা আমারই দোষ হয়েছে।”

সঞ্জয় বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া বলিল, “নিশ্চয় আমারও কোনো দোষ আছে যার জন্যে আপনি বিরক্ত হয়েছেন। দয়া ক’রে সেটা কি আমাকে বলবেন?” অপরের দোষ ব’লে সেটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করবেন না।

চঞ্চলা বলিল, “আপনার বাবাকে আমি চিনি।”

সঞ্জয় চূপ করিয়া তাকাইয়া রহিল। চঞ্চলা বলিতে লাগিল, “তিনি বহুকাল আমার অভিভাবক ব’লে পরিচিত ছিলেন। এখানে তিনিই আমাকে রেখে যান।”

সঞ্জয় খানিকটা ভীত ও খানিকটা আশাব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি আপনি আমারই কোনো আত্মীয়া?”

চঞ্চলা আরক্তমুখে বলিল, “হ্যাঁ, অত্যন্ত নিকট আত্মীয়া। আমার অভিভাবকই যে আমার পিতা তা আমি পরে জানতে পারি।” আপনি হয়ত এখনও সে কথা জানেন না।

সঞ্জয়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল। একি রহস্য? সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে না জাগিয়া আছে? চঞ্চলার অস্তিত্বের কথা তাহার পূজনীয় পিতার জীবনের এ রহস্যবৃত্ত অধ্যায়ের কথা সে ত কোনো দিন শোনে নাই। চঞ্চলার কথা মিথ্যা নয় ত? কিন্তু কেন অকারণে বিশেষ করিয়া তাহার পিতার নামে সে এ মিথ্যা কথা রটাইবে? পিতা কি বিবাহ করিয়া চঞ্চলার মাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন না তার চেয়েও অসুস্থ কিছু করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। শুধু বলিল, “আমার পিতা আপনার ও আপনার মা’র উপর কতখানি অসুস্থ্য করেছিলেন আমি জানি না। কিন্তু আপনার কথা সত্য হ’লে অসুস্থ্য যে করেছেন সে নিশ্চয়। আমি পিতার সমস্ত অপরাধের জন্য আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমাকে ক্ষমা করবেন কি?”

চঞ্চলা কথা বলিল না। ভালবাসা ও আক্রোশের একটা স্বন্দ্র তাহার মনের ভিতর চলিতেছিল। এই সঞ্জয় আত্মীয় স্বজন বন্ধু আশ্রিত সকলের আদৃত, সকলের সম্মানার্থ, হয়ত একদিন দেশের স্বপুত্র বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবে; অথচ ইহারই ভগিনী হইয়া সে আজ লোকের কাছে নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিবার অধিকারী নয়। কেন, কেন? সঞ্জয়েরই বা এ সমাদর লাভে কি নিজস্ব কৃতিত্ব আছে, আর তাহারই বা কি পাপে সে এমন বঞ্চিত? ইচ্ছা করিতেছিল এখনই সঞ্জয়কে এখান হইতে দূর করিয়া দেয়, লোক-সমক্ষে বলিয়া বেড়ায় কেমন পিতার পুত্র সে। কিন্তু আবার সেই সঞ্জয়ের উপরই মনটা তাহার ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। বয়সে সে চঞ্চলার চেয়ে বেশ বড়, তবু ছোট ভাইটির মত কেমন ‘দিদি’ বলিয়া একদিনের এই কয়েকটা মুহূর্তেই বত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। খুব শৈশবে সে মাকে চিনিত, ভালবাসিত, কিন্তু তারপর হইতে কই আর কোনো দিন আত্মীয়ের দেখা কি ভালবাসার কোন স্পর্শ সেত পায় নাই। আজ এতদিন পরে যাহাকে পাইল, সে ত সত্যি তাহার আত্মীয়, তাহার আপনার ভাই। তাহাকে সে কেমন করিয়া দূর করিয়া দিবে? কোনো রকমে ইহাকে ক ধরিয়া রাখা যায় না? এ সম্বন্ধ কি লোকচক্ষেও চিরস্বামী করা যায় না? চঞ্চলার মনের ভিতরটা হাজার চিন্তায় কলনায় সম্ভব অসম্ভব কত কি ভাবের ধাক্কায তোলপাড় করিতেছিল। সে অনেক কষ্টে বলিল, “আজ আমাকেও ক্ষমা করবেন, আমি বেশী কথা বলতে পারছি না। যেদিন ভাই ব’লে ডাকতে পারব কিংবা সকল সম্পর্ক ভুলে যেতে পারব সেদিনই আবার আপনার সঙ্গে অনায়াসে সহজভাবে কথা বলব।”

চঞ্চলা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। তাহার হই চোখ

দিয়া বর বর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আবার
বুষ্টি জোরে নামিয়া আসিল। গাছপালা ছলিয়া ছলিয়া
মাথা নাড়া দিয়া বিশ্বকে যেন পথে বাহির হইতে
মানা করিতেছিল। সন্ধ্য তাহারই ভিতর বাহির হইয়া
পড়িল। কোনো মানুষ তাহাকে বারণ করিল না।
কেবল তীব্র বুষ্টিধারা বাতাসের সঙ্গে স্রব মিলাইয়া বলিতে
লাগিল—‘না’ ‘না’ ‘না’।

পূবে হাওয়ার দাপটে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ একবার

উড়িয়া যায়, এক টুকরা নির্মল আকাশের আলো হাসিয়া
উঠে; আবার উন্নত বর্ষণে সমগ্ৰ বিশ্ব কুরাসায় লুপ্ত হইয়া
যায়। পথ নাই, আলো নাই, সঙ্গী নাই। সন্ধ্য একবার
ধামে একবার চলে। ভিতর-বাহিরের এই অশাস্ত ঝটিকা
জলধারায় ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছিল;
মনে পড়িতেছিল চঞ্চলার আরক্ত মুখের উপর অশ্রুর
প্রাবন।

(ক্রমশঃ)

কাব্য-আলোচনা*

অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার দে, ডি-লিট (লণ্ডন), পি-আর-এস

কবি মোহিতলাল তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থ ‘বিশ্বরঙ্গী’তে যে স্বতন্ত্র
স্বরটি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তার গতি ও প্রকৃতি দু-একটি কথার
নির্দেশ করা যায় না। পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন তিনি তাঁর প্রথম কবিতার
অর্থ্য রচনা করে সন্তুর্ণণে বঙ্গবাণীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন
তিনি অতি বিনীতভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন—

করি ঘরে ঘারে স্বপনের ফিরি—
স্বপন-ব্যাপারী আমি।

তখন কবি শুধু ভাব-বিলাসী শ্রীতি-কল্পনার আনন্দে আত্মহারা।
কিন্তু এই শ্রমমুগ্ধ স্বপন-পসারী তাঁর নিঃসঙ্গ হৃদয়-বীণায় যে আনন্দের
স্রব বাজাতে শুরু করেছিলেন, আজ সেটি যেন বেদনার মুচ্ছনার
মুক্তিত হ’য়ে অপক্লপ ঝড়ার তুলেছে—

দ্রিঘামা বাসিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
মণি সে বিশ্বরঙ্গী।

কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর সমস্ত আনন্দের স্বধারস এই
বেদনার প্রাণম্পর্শী নিগূঢ় আভাসে আরও হৃদয় হ’য়ে উঠেছে, কিন্তু
এইটি বিশ্বয়কর ও অচিন্তনীয় যে, কবি-জীবনের প্রায়ভেদই তিনি কামনার
শতনরী-হারে বেদনার বিশ্বরঙ্গী-মণি গাঁথতে চেয়েছেন। শিব-সাধনার
চেয়ে শব-সাধনার নেশা তাঁকে অধিকন্তর আকুল করেছে—

হৃদয়ের সোহাগ পাইনে মোটে, হৃদয়ের নেশার ঘুর লেগেছে;

আলোর আশা আর করিনে, অন্ধকারে স্রব জেগেছে।

সন্ত-মরার মুখ যে হাশে—কোথার আছে তেমন হাসি?

শিবের চেয়ে শবের শোভা!—শিব যে হেথার মুচ্ছা গেছে।

এ ই অধ্যাত্মগতীর নৈরাশ্রের ছায়া তাঁর প্রথম রচনায় যে পড়েনি,

এ কথা বলা যায় না; কিন্তু তাঁর নবীন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সেই
মনোরম হারার উপর অমৃতের রেখা টেনে দিয়েছিল। কিন্তু এই
ভাবান্তিরেকের যে অবশ্যস্বাবী পরিণাম, তাব আভাসও তিনি তাঁর প্রথম
রচনার অনুভব করেছিলেন। স্বপ্নের মধ্যে বাস করলেও, স্বপ্নের পর
যে নির্গম আগ্রহ আছে, সেই আসন্ন আগ্রহের আশঙ্কাও তাঁকে নিশ্চিন্ত
হতে দেয়নি।

এই আশঙ্কা, এই সন্নিহিত বেদনার ছায়া তাঁর বর্তমান রচনায় আবণ্ড
ঘনিয়ে উঠেছে। প্রথম প্রায়ুটের শ্রাম-সমাবাহ, মেঘমন্ত শ্রাবণের
স্নিগ্ধ-নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। ‘বিশ্বরঙ্গী’র কবি এখনও
স্বপন-পসারী; কবি-প্রকৃতির অনুবৃত্তী কল্পনা-প্রবণতাকে তিনি সম্পূর্ণ
এড়াতে পারেননি। হৃদয় ও ভাবের অপূর্বতার ভিতরে এই হৃদয়কুলগী
ও শিল্পী-কবি কাব্য-সম্মীর যে রঙ্গীন রঙ্গপট ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন,
তার চিরচঞ্চল প্রতিচ্ছায়া, আকাশের বহুরঙ্গী নীলিমার মত, গানের
মুকুরে স্পষ্ট ও জাগ্রতরূপে প্রতিবলিত হ’লেও, তাঁর নিজের কাছে চিরদিন
অনায়ত্ত ও অপরিমেয়—

পানেরি আড়ালে মাড়া দেয় শুধু

সে অপ্সরা,

বাহির ভুবনে এই বাহ্যপাশে

দিবে না ধরা।

ইহাই বুকি সমস্ত কল্পনাবিলাসী কবির, ভাবপ্রাণ idealist-এর
অন্তরের আক্ষেপ। অন্তর ও বাহিরের, বাস্তব ও অবাস্তবের এই দ্বন্দ্ব
চিরন্তন, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব তখনই প্রবল হ’য়ে ওঠে যখন স্বপনবিলাসী তাঁর
ধ্যান-সাধনার অশবীরী বাণীকে অন্তরের পদ্মাসন থেকে বাহিরের স্ব-
দ্রুতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেন। স্বপন-পসারী হ’লেও কবি
রূপের উপাসক, তিনি জীবনকে সৌন্দর্যের চক্ষে দেখেছেন; কারণ
তিনি রূপের মধ্যই কপাতীতের, জীবনের মধ্যই মহাজীবনের আভাস
দেখেছেন। তিনি শুধু নিজের মনোরাজ্যে অপূর্ণ ঐশ্বর্যকে সৃষ্টি করে,

* বিশ্বরঙ্গা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। প্রবাসী-কার্যালয়।
মূল্য ২০ টাকা।

বাস্তব জীবন ও জগতের সংযোগ হারিয়ে, অতীজ্ঞর ভাবের খেলা নিয়েই বিভোর হননি, একটা অপরিষ্কৃত গীতোচ্ছ্বাসেই তাঁর কাব্য-মাধনা পরিসমাণ হইল। যিনি এরূপ রূপের উপাসক, তাঁর দেবতা হৃদয়—পূজা চান না, ভালবাসা গ্রহণ করেন। এ ভালবাসা শুধু কল্পনার জিনিষ নয়; এই আত্মা আনন্দ দেহের তৃপ্তিতেই জেগে ওঠে।

হৃদয়ের স্রবস রার্থি, ওঠে শুবি' সব রস
—কণ্ঠ-সিক্ত গীত-রসায়নে,
ও রূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপবস,
দেহ-দীপ ছালাহু যতনে।

এই-দেহ-বাস বা বস্ত-বাস আমাদের কবির বর্তমান রচনার আরও নিবিড়রূপে দেখা দিয়েছে। যেমন আত্মা ছেড়ে দিয়ে দেহের মূর্তি নেই, তেমনি দেহ ছেড়ে দিয়ে আত্মার মূর্তি অসম্ভব। বস্ত-জগৎটা কবির কাছে ছায়াময় হয়নি বলেই, তাঁর মানস-প্রতিবিম্ব অপরূপ কাম্য-সৌন্দর্যে মত্ত হইয়াছে। পাঁচটা ইল্লিরের ঘর রুদ্ধ করে' শুধু কাল্পনিক মানস-প্রতিমার দিব্যজ্যোতিতে তাঁর গান পর্যাবসিত হয়নি; বরং, তিনি চোখে রূপ, দেহে স্পর্শ, অন্তরে অনুভূতি নিয়ে সুন্দরী প্রতিমার মধ্যে যে জ্যোতির্ময় দেব-আত্মা আছে, তাঁকেই দেহ-ভূমি থেকে মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক সময়ের গীতি-কবিতার মন যে দেহকে ছাড়িয়ে উঠছে তা' নয়; আধুনিক কবিতা দেহকে অস্বীকার করে' বাস্তব জগৎ ও জীবনকে অপমান করেছে। এই কবিতার মানস-আত্মার আদার অভূষিত আছে, কিন্তু দেহ-আত্মার তীব্র ক্ষুধার ক্রন্দন নেই। এই নিরুদ্বেগ, ভাবপন্থী, আধুনিক গীতিকবিতাকে লক্ষ্য করে আমাদের কবি তাঁর নূতন “মোহ-মুগুর” লিখেপ করেছেন—

উচ্চ মুখে ধোয়াইয়া রজোহীন রক্তনীর মলিকা-মাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা ছবি,—
কল্পনার স্রোতাবনে মধু চুবি' নীরন্ত অধরে,
উপহাসি' দুঃখবারা ধরিতীর পূর্ণ পরোধরে,
বুড়ু মানব লাগি' রচি' ইল্লজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি-বাসব ?

এই কবিতার শ্রুতানকে উদ্দেশ্য করেই আমাদের কবি ক্ষুদ্র-চিত্তে বলেছেন—

কভু বা কবিরে নৃত্য শব্দহীন অর্ধরাতে
নিশাচরী বিগ্নন অঙ্গনে,
বস্তারিবে অলঙ্কার মালিনী কি প্রহরিতে
কঙ্কালের কেয়ুরে কঙ্কণে।
তার মাঝে কোথা ভূমি ? হা অভাগ্য পুরোহিত।
কোথা আশা কোথা সে পিপাসা ?
প্রাণধ্বজে দেহ কোথা ? কোথা রক্ত স্থললিত ?
সঞ্জীবন-শক্তি-মস্ত-ভাষা ?

এ কথা সত্য যে, দেহের বন্ধন থেকে মানস-মুক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আদর্শ; কিন্তু দেহকে স্বীকার করে না নিল এ দেহ-মুক্তির উপায় নেই। যেমন শ্রীমন্নিবে চুক্ত হ'লে প্রথমে নাট-মন্দিরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তেঁনি আত্মার পৌড়িবাব পথেও এই দেহই স্বপ্ন-দুঃখের নাট-মন্দির। দেহ-বাস্তবের ক্ষুদ্র অনুভূতির উপবই বৃহত্তর শাস্ত্র সাহিত্যের ভিত্তি। সেইজন্য আমাদের কবি দেহকে উপেক্ষা করেননি,

শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন। দেহ সত্য বলেই জীবনের স্বপ্ন দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিকট সত্য। ধরণীর রূপবসে তাঁর প্রাণ মাতোয়ারা—

দেহ ভবি' কব পান কবোক্ষ এ প্রাণের মদিরা,
খুলা মাখি' খুঁড়ি' লগু কামনার কাচমণি-হীরা।
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্বনয়ন করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব তর্জ্জর—
আমরা বর্ষব !

কিন্তু এই দেহ-বাস প্রকৃতপক্ষে দুঃখ-বাস, কারণ যেখানে সন্ন্যাসের সস্তা দেখানোই বেদনার অনুভূতি। দার্শনিক Schopenhauer মানবের এই চিরন্তন বেদনার বন্দনা গান কবেছিলেন বলেই, কবি তাঁহাকে নমস্কার করেছেন; কিন্তু কবি এ বেদনা হতে মুক্তি চান না। দেহ-ধর্মকে রোধ করে', শুধু জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রাণহীন শিলার মতন নির্বিকার চিত্রে বঁচে থাক, বঁচে থাক না, ম'রে যাওয়া দার্শনিক দ্বিবাচকে দেখেছেন যে, এই জীবনের নিগূঢ় সত্য-দুঃখ, কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেই যে স্বপ্ন আছে, এই মৃত্যুর মধ্যেই যে অন্ততের আশ্বাস আছে, তা' বুদ্ধি জ্ঞানযোগী দার্শনিক কখনও পাননি।

যুগবদ্ধ পশু আমি ?—ভরিতেছি মৃত্যুর ষ্পর্শ
তপ্ত শোণিতের ধারে ? না, না, সে যে মধু উৎসর।
ছই হাতে মুক্ত করি পূর্ণ দেই মধুচ্ছত্র প্রতি পূর্ণিমা।

ধরণীর যুগপক্ষে মানুষ যা' জীবনের রস বলে' পান করছে, তা' বুদ্ধি স্বধা নয়, কালকূট—তাব শ্রেমণ্ড বুদ্ধি “মোহের মঞ্জরী ভরা বিষ-বীজ ধরা অঙ্কলে।”

তবুও এই ধরণীর রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধের উদ্ভাসনা মানুষ অস্বীকার করতে পারে না; দেহ ও প্রাণের রক্তময় বেদনাকে উপেক্ষা করা যায় না।

জীবনের দুঃখস্বপ্ন বারবার ভুলিতে বাসনা
অমৃত করে না লুক্ক, মরণেবে বাসি আমি ভালো।
যাতনাব হাহারবে গাই গান, তৃষ্ণার্ত রসনা
বলে, “বন্ধু! উগ্র ওই সোবরস ঢালো, আরো ঢালো।
তাই আমি রমণীর মারারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতো গোধূলির আলো।
আমাবি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপধানি আলো।

* * *

কোথা হ'তে আসি কিবা তোথা যাই—কি কান্ড অরণে ?
চলিয়াছি এই স্বপ্ন। সন্ধ্যা চলে ওই গ্রহস্তারা।
ভয়, পাছে খেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্-চক্ষ-অস্তরালে হ'য়ে যাই উদয়াস্ত-হার।
আমারে হারাই যদি। যদি মরি স্বধীর মরণে।
যাথা আর নাহি পাই শেষ হয় নয়নের ধার।
বল, বল হে সম্রাসী। এ চেতনা চিরতরে হবে না' ত' হার।

* * *

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা।
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ স্বপন।
যমধারে বৈতরণী, সেখা নাই অন্ততের আশা
ফিরে ফিরে আসি তাই ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ।

এই অন্ধ-মালিকার—মৃত্যু হুটী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল নাবী গাঁথে করিয়া চরন—
পুরব পবিত্র গলে, চেয়ে থাকে মুখে তাঁর অতৃপ্ত-নয়ন।

এই কবিতা দুটির আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবে করা গেল, তার কারণ এই মূলভাবটি অবলম্বন ক'রে কবির অনেকগুলি রচনা বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে। ‘স্পর্শবসিক’ কবিতায় এই ভাবটিই নূতন পাণ্ডে নূতন ক'রে পরিবেশন করা হয়েছে। অন্ধের কাছে সমস্ত জগতের অসুস্থতি রূপে নয় স্পর্শ, গন্ধ, শব্দে। কিন্তু শুধু স্পর্শের মধ্যে যার সমস্ত চেতনা সীমাবদ্ধ এইরূপ কোন দৃষ্টিহীন স্পর্শবসিককে কল্পনা ক'রে কবি তাঁর মুখে ইন্দ্রিয়-চেতনার চেতন দেহীর স্নিগ্ধ বেদনার আভাস দিয়েছেন—

অন্ধ আমি, গন্ধ তাই দিশে দিশে করে দিশাহারা,
চিরদিন মধু করে মধুব বঞ্চনা—
করাঙ্গুলি স্তত হয়, হেরি না যে কাটার পাহারা,
দৃষ্টিহীনে করে সবে বুধাই পল্লব।
সে বেদনা কঠে মোর গীত হ'য়ে বাজে,
বাধার বৃহৎ হ'য়ে সে ফুল বিরাজে,
অশ্রুজলে আঁর্ হর জীবনের এ মরু সাহারা,
প্রাণের পীরিত্তি মোর হর নিঃশব্দ।

কবি তাঁর মৃত্যু-শোক কবিতায় এই দেহদেবতার যে-বন্দনা করেছেন তাহা বাল্যলা সাহিত্যে অপূর্ণ। দেহ নশ্বর, কিন্তু প্রেম কেন দেহের কাদাল? প্রত্যেক দেহের একটি যে নিজস্ব গঠন আছে, তার মত হৃদয়ের জগতে আর কিছু নেই, তাই—

একবার হ'লে গন্ত,
এ ছারা-আলোকে আর গড়িবে না
কায়ারানি তার মত।
সেইজন্তই মনের মমতা দেহের জন্ত পাগল।
তোমারেই চিনি যে দেহ-দেবতা।
প্রলয়ের একাকার,
তুমিই বৃদ্ধি বহুবিধ রূপে
তোমারে নমস্কার।
দেহে দেহে তুমি এত অভিনব।
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব?
হাসি ক্রন্দন তব উৎসব।
পীরিত্তির পারাবার।
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে
আরতি যে অনিবার।

আর্টের দিক থেকে, এই দেহ-বাস বা হৃৎ-বাস আমাদের কবির রচনার সোনার কসল ফলিয়েছে। এই বেদনার প্রেরণা কবিকে বহিষ্কৃতের দিকে উদ্ভূত ও উদ্ভূত ক'রে দিয়েছে; অসুস্থতির শক্তি তীব্র হয়েছে বলে Pre-Raphaelite কবিদের মত তাঁর বহিষ্কৃতি আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে। সেইজন্ত তাঁর ধ্যান স্বরময়, তাঁর চিন্তা চিত্রময় হ'য়ে উঠেছে।

To think in terms of the concrete ভাবে দেখা ও বর্ণের সীমানার মধ্যে ধরা, চিরচঞ্চল কল্পনার প্রতিচ্ছবি ভাষা ও ছন্দের গটে প্রত্যক্ষ ক'বে তোলা,—তাঁর আর্টের এই বিশেষত্বটি তাঁর পূর্বোক্ত ভাবচিন্তার অসুস্থত্ব। এই অপূর্ণ চিত্রাঙ্কণশক্তি তাঁর রচনার

সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু ইহার সবচেয়ে হৃদয় নিদর্শন পাওয়া যায়, তাঁর দুইটি কবিতায়। ‘শিউলির বিয়েতে শুধু স্বভাবাঙ্কন নয়, সমস্ত কবিতাটি পড়তে পড়তে যে মধুর চিত্রটি সজীব হ'য়ে ফুটে ওঠে, তার পরিকল্পনার মিষ্টতা ও নির্মাণ-শিল্পের নৈপুণ্য দু'একটি উদ্ভূত ছত্র থেকে বোঝা যাবে না। ‘দীপশিখার’ সমস্তটি কতকগুলি নিপুণ চিত্রের সমাবেশ।

এইরূপ অনেকগুলি কবিতায় এই রূপসমৃদ্ধ আর্টিস্টি চেষ্টা করেছেন শুদ্ধ একটা ছবি আঁকতে—সেই ছবির মধ্যে ভাবটি ধীরে ধীরে দীপ্ত হ'য়ে আপনি ফুটে উঠেছে। তাঁর ‘বীধন’ ‘মৃতশিখা’ ‘মুঘুর ডাক’ ‘কম্বা শরণ’ ও ‘কালাপাহাড়’ এই শ্রেণীর রচনা। এইসকল কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্য একটি অবস্থা, একটি mood বা একটি atmosphere-এর আলোচনা-স্থিতি। ইতিহাস-বর্ণিত কালাপাহাড়কে উপলক্ষ্য ক'রে কবি শুধু march of the Iconoclast-এর একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবনে, সমাজে ও ধর্মে স্বপ্নাকার আবর্জনার মত, যে-সব প্রাণশক্তিরোধী অনাচার ও কুসংস্কার থাকে বেকন idol বা অসত্যের প্রতীক বিগ্রহ বলেছেন—

আমি হ'তে যত বেদনা জমেছে বন্ধনহত বার্ষহাস—
সেই সমস্ত পুঞ্জীভূত অসত্য ও অপমান এই বিগ্রহধ্বংসী, কালপুরুষের মত নির্দম, অসত্যদেবতার চিরন্তন শত্রুর করাল দণ্ডেব আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু শিলা কর নিমজ্জন।
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন।
নাই ব্রাহ্মণ স্নেহে যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে। মানুষের বুকে রক্ত চাই।

বা ‘ভদ্রুর তা’ ঋতাকার মুখে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু এই প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অপূর্ণ ধ্বংসলীলার মধ্যে নব সৃষ্টির আয়োজনও রয়েছে।

ব্রাহ্মণ-যুবা ববনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহি সাথে।
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে।
মরুর মর্দ বিদারি' বহিছে স্বপ্নার উৎস পিপাসা-হরা।
কলোলে তার বস্ত্রার রোল! কুল ভেঙ্গে বুঝি ভাসায় ধরা।
ওরে ভয় নাই। মুকুটে তাহার নবাকর্ণ ছটা, ময়ূখ-হার।
কাল নিশিখিনী লুকায় বসনে। সবে দিল তাই নাম তাহার

কালাপাহাড়।

ইতিকথার এইরূপ নূতন imaginative interpretation-এর চেষ্টা তাঁর নুবজাহান ও জাহাঙ্গীর কবিতাতেও দেখা যায়।

পূর্বে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে, কবির মনের মধ্যে যে objectivity বা বস্তুপ্রাপ্ততা রয়েছে, তাতে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ কল্পনাধরণতার এক অভিনব পরিণতি ঘটেছে। একদিকে কেবলমাত্র ভাবোন্মাদনা, অল্পদিকে কেবলমাত্র বস্তুমোহ... এই বাস্তব কল্পনার বিবার উত্তীর্ণ হ'য়ে তাঁর আর্ট একটি সরল ও সুস্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাব্যলক্ষ্মী তাঁর চক্ষে কল্পনার বিব্যাঞ্জন মাঝিয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু দেহ বাস্তবের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সংযোগ তাঁকে অপূর্ণ শিল্পী ক'রে তুলেছে। কবির স্বভাব-ধর্মকে তিনি ষাটো করেননি, কিন্তু সেইসঙ্গে শিল্পী সংযমকেও তিনি বরণ ক'রে নিয়েছেন। সেইজন্ত, মুখ্যতঃ কাঠামোটি lyric হ'লেও, তাঁর কবিতা অনেকটা narrative বা dramatic-এর দিকে ঝুঁকেছে। হুতরা ‘নুবজাহান ও জাহাঙ্গীর’ ‘মৃত্যুও নচিকেতা’ প্রভৃতি কবিতায় তিনি অসামান্য সিদ্ধিলাভ করেছেন। খুব উঁচু কথা, খুব হৃদয় বিচার,

খুব উদার তত্ত্বচিন্তা কবিতায় কাজে লাগে না, যদি সেগুলি কবির অনুভূতির ভিতর দিয়ে শিল্পীর নির্মাণ-নৈপুণ্যে আত্মপ্রকাশ না করে। “যম ও নটিকেতা”র উপনিষদের ইতিহাসের ছায়াটুকু গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ইহাতে মৃত্যুযজ্ঞের যে স্থল পরিকল্পনা আছে, সেটি মোটেই দার্শনিক বিচার, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাণ বা সমস্তার সমাধান নয়। কবি যা বলতে চেয়েছেন সেটি নিত্য অমুহূত সামান্য কথামাত্র; কিন্তু বৈদিক যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা মানসিক setting-এর ভিতর দিয়ে সেই শাস্ত্র কথটি বিচিত্র হ’য়ে ফুটে উঠেছে। যাব জন্মের দুর্দল ও মলিন, মৃত্যু তার মহাভয়, বৃণবদ্ধ পশুর মত জীবযজ্ঞভূমে সে সহস্রবার মৃত্যুযজ্ঞে সন্মত করে; কিন্তু যে মহাপ্রাণ আপনায় প্রাণধন বিশ্বের প্রাণে বিলাইয়া দেয়, আপনাকে আগনি জগতের যজ্ঞরূপে বলিদান করে, সেই মৃত্যুকে আশ্রয় আরাম বলে বুঝতে পারে, সেই নিঃশেষে ম’রে গিয়ে মৃত্যুজয়ী হয়। যজ্ঞের পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে এই কথাটি অতি নিপুণতার সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এইখানেই কবি ও শিল্পীর পরিচয়।

কবি মোহিতলালের নিখুঁত লিপিকুশলতার পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

তবে মোহিতলাল বাঙ্গালী পাঠকের অপরিচিত নন। তিনি ছন্দকৌশল ও শব্দমন্ত্রে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করে সকল সাহিত্যানুরাগীর মন আকর্ষণ করেছেন। নিরর্থক বাক্যাভ্যর্থক বা কথার অসম্ভাবহার তাঁর অজ্ঞাত এবং শব্দের বন্ধার বা ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর কাণ অজ্ঞাত। এইজন্য অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ এবং stanza form-এ তিনি তিনি যে-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা খুবই সফল হয়েছে। বাস্তবিক,

শব্দনির্বাক্ষণে বা ধ্বনিব সৃষ্টিতেই শিল্পীর পরিচয়, কাব্য এই gift of phrasing বা শব্দসৃষ্টির শক্তিই প্রকৃত প্রতিভার লক্ষণ। এই হিসাবে তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতায় যে-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা আশ্চর্যকর। বাঙ্গালী কবিতায় বড় বেশী দেখা যায় না। কিন্তু এই technique-এর সৌষ্ঠব সার্থক হ’ত না, যদি তাঁর ভাব ও ধারণার স্পষ্টতা ও বৈচিত্র্য না থাকত।

রোমান্টিক ভাবে অনুপ্রাণিত হ’লেও, নিখুঁত কারিগরি হিসাবে মোহিতলালের কবিতাগুলি ক্লাসিক আর্টের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। Concrete details বা খুঁটিনাটির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য আছে ব’লেই শব্দচয়নের পটতা ও পৌরবে তাঁর কবিতার ভাব-কল্পনা শাণোল্লিখিত হীরক-খণ্ডের মত পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। বিদেশী কবিদের মধ্যে Landor ও Tennyson এবং দেশী কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়ালের প্রভাবই তাঁর কবিতায় বেশী দৃষ্ট হয়। এইসমস্ত কবির কাছ থেকে তাঁর শিক্ষা হয়েছে—নিজ-সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ-নৈপুণ্য ও নির্মাণ-কৌশল।

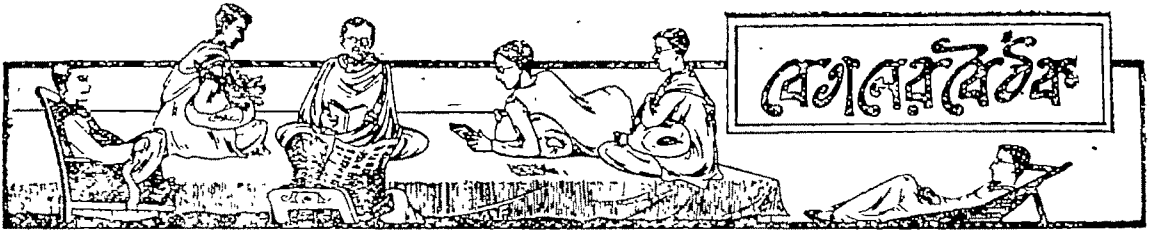
কবি নিজেই আক্ষেপ করেছেন যে, তাঁর কাব্যলক্ষীর পূর্ণ ফাটি ছন্দ ও ভাবের পটে ধরা পড়ে না। এ কথা তাঁর পক্ষে একেবারে সত্য না হ’তে পারে। কিন্তু তাঁর কাব্যলক্ষীর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ কবিতা বাঁধার যে বিড়ম্বনা তাতে সন্দেহ নেই। আমরা এ প্রবন্ধে তার চেষ্টা করিনি; শুধু তাঁর অপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে যে-আনন্দ উপভোগ করেছি, এবং সেই উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব কথা মনে হয়েছে, তাই কিছু আভাস এখানে দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

নির্বাক্ষণযট্‌ক

শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত আমি নই,
নহি ব্যোম ভূমি না বা তেজ বায়ু হই,
নহি শ্রোত্র স্পর্শ আমি নহি নেত্র জ্ঞান,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ১
নহি সপ্তধাতু আমি নহি পঞ্চ বায়ু,
নহি বাকু পাণি পাদ না উপস্থ পায়ু,
নহি পঞ্চকোষ আমি নহি আমি প্রাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ২
নহি ঘেষ রাগ মোর স্নোভ মোহঘোর,
নহি মদভাব নাহি মাৎসর্য মোর,
নহি ধর্ম অর্থ কাম নাহি মোক্ষ প্রাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৩

না পুণ্য না পাপ নাহি স্থখ দুঃখ ভোগ,
না তীর্থ না মন্ত্র নাহি বেদ যাগ যোগ,
না ভোজন না ভোক্তা না ভোজ্য উপাদান,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৪
না বন্ধু না মিত্র নাহি গুরু শিষ্য ধ্যান,
পিতা নাহি মাতা নাহি নাহি জ্ঞাতী জ্ঞান,
নাহি শত্রু নাহি জন্ম নাহি তিরোধান,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৫
আমি নির্বিকল্প মোর নাহি রূপকায়,
সকল ইন্দ্রিয়ে বিভূ আমি সমুদায়,
নাহি অসঙ্গত নহি মুক্তি পরিমাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৬



জিজ্ঞাসা

(১২)

পশু-পক্ষী সম্বন্ধীয় পুস্তক

পশু-পক্ষী সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কিনা ? হইবা থাকিলে তার নাম কত ও কোথায় পাওয়া যাইবে ?

শ্রী জহিরুল এসলাম

(১৩)

ঈশ-লাঙ্গল

এমন কোন অঙ্গরামের ঈশ-লাঙ্গল আছে কি বাহাতে ২১ শত একর জমী অল্প খরচে চাষ দেওয়া চলে ? উহাতে খুব বর্ধাতে কাজ চলে কি ? বরি থাকে কোথায়—এবং নাম কত ? এ, সি, ডে

(১৪)

“আলুকাডা”র দাগ

কাপড়ে “আলুকাডা”র (Coaltar) দাগ কিরূপে উঠান যাইতে পারে। কেহ জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

শ্রী কোমলেন্দু কুমার সেন বার

(১৫)

মাছের আঁশের মৃত্তা

মাছের আঁশ হইতে যে নকল মৃত্তা প্রস্তুত হয়, তাহা আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় কিনা ? তাহার প্রস্তুত-প্রণালী কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী শিবপ্রসাদ দাস চৌধুরী

মীমাংসা

(গত বৎসরের ৭০ নং)

কাপড়-কাটা পোকা

পিশপলিকা কেরোসিন তৈল প্রয়োগে অতি সহজে তাড়াইয়া দেওয়া যায়। দোকানের আলমারীর খুঁটিগুলির তলার কোরোসিন তৈল দিলে কখনও খার পিশপলিকা উপরে উঠিবে না। ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকেই এরূপ প্রয়োগে বেগ ফল পাইয়াছেন। একটা কাপড়ের ইকরার কেরোসিন তৈল ভিজাইয়া সর্বদা খুঁটির মধ্যে লাগাইয়া রাখিলেই হইবে।

শ্রী বীরেশমোহন সেন

(গত বৎসরের ৭৪ নং)

খেজুর গুড়

খেজুর গুড় তৈয়ার হইলে পর উহার মধ্যে কিছু তেঁতুল দিলে আর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তেঁতুল অল্প পরিমাণে দিতে হয়, তাহা না হইলে নিষ্টতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তেঁতুল ছাড়া অল্প কিছু বেগুয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে বেশী পরিমাণে গুড় হয়, সেখানে সহজগুড় তেঁতুলই সর্বতোভাবে উপযোগী।

শ্রীমতী ইলাবতী সেন

(২)

বাংলা শটহাণ্ড

বাংলা শটহাণ্ডের হরফ সীসার অক্ষরে ছাপা মোটেই সুবিধাজনক নহে এবং তাহার ব্যবহৃতও কোথাও নাই। লিখো এবং ব্রক এই দুই উপায়ে মাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। গভর্ণমেন্ট অফিসের দ্বারা

বেগমের বৈঠক

শটহাণ্ডের যে উৎকৃষ্টতম প্রণালী আছে আমি তাহাতে শিকা লাভ কবিয়াছি হুতরাং এমতদ্বয়ে অমুসন্ধিৎসকে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় জানাইতে পারি। ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই টিকানায় আমার সহিত পত্রালাপ করিলে সুখী হইব। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল, বাংলা শটহাণ্ড প্রকাশ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

শ্রী প্রভাতকিরণ বহু

(৬)

প্রবাদ বাক্য

খয়ের থা,—এই শব্দটিই অন্তর্ভুক্ত। কোন থা সাহেবের সহিত ইহার সংশব নাই। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ “খয়ের থাং”। ইহা স্রাস্তী ভাষার একটি যৌগিক শব্দ।

খয়ের=সুত, মঙ্গল।

থাং=ইচ্ছা করা।

হুতরাং খয়ের থাং=সুতচেহ।

মো-সাহেবগণ সর্বদাই প্রভুর শুভেচ্ছা বলিয়া নিজকে প্রকাশ করিতে থাকে, তাই তাহার—খয়ের থাং।

পার্শ্ব অনভিজ্ঞগণ ইহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ইহা বর্জমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। অর্থ না বুঝার দরুন “থাং” শব্দকে তাহার “থা” মনে করিয়াছে এবং তাহা হইতেই “খয়ের থা” শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

(২)

বত দোষ নন্দ বোধ

বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দুর্দান্ত ছিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না এবং সর্বদাই অত্যাচার উৎপাদিত করিতেন। তাহার উৎপাতে ব্রজবাসীগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। তাহাদের মনে এরূপ একটা ধারণা জন্মিল যে, নন্দ যোনের ছেলে ব্যতীত কেহ কোন অস্ত্রায় আচরণ করিতেই পারে না। হুতরাং অস্ত্র দ্বারা অসুস্থিত কোন অস্ত্রায় কার্যের ক্ষমতা শ্রীকৃষ্ণকে দারী করিয়া নন্দ যোনের নিকট অভিযোগ করিত। এরূপ নাগিন প্রায় সর্বদাই চলিত। নন্দ বোধ যখন জানিতে পারিলেন যে, সকল কার্যের ক্ষমতা কৃষ্ণ দোষী নয় তখন তিনি এরূপ মিথ্যা অভিযোগে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“বত দোষ নন্দ বোধ”।

সেই হইতেই এ প্রবাদের সৃষ্টি হয়।

পটল তোলা—অর্থায় মরিয়া যাওয়া। পটল=চোখের পাতা। যুতুর সময় চোখের পাতা উন্টিয়া যার হুতরাং পটল তোলা অর্থে মৃত্যু।

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

(১১)

নারিকেলের খোলা

নারিকেলের খোলা দ্বারা আমাদের দেশে বোতাম এবং হাঁকার খোল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) ইহার বোতামের ক্যান্টারী আছে; তথায় ইহা দ্বারা কোর্টের অল্প কাল বোতাম প্রস্তুত হয়। তাহার এবং যশোহরের অন্তর্গত বেদিয়ার ও কুমিল্লার হাঁকার ক্যান্টারী হইতে এই নারিকেলের খোলা পাইকারী দরে ক্রয় করা হয়। এই সমস্ত স্থানে পত্র লিখিলে মূল্যাদির বিষয় সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। আমাদের দেশে বোধ হয় ইহার দ্বারা শাখা ইত্যাদি প্রস্তুত হয় না।

শ্রী অমলনাথ মুখোপাধ্যায়



[কোন মাসেব "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদের কাছে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যিক ; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আব পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যিক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

রেলওয়ে যাত্রী দিবস

প্রবাসী ব্র্যেট সংখ্যার প্রকাশ্য সম্পাদক মহাশয় বেল-যাত্রীদের বিবিধ অহবিধার বিষয় বিবিধ প্রশ্ন নিবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আমি একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যাত্রীদের গমনাগমনের ও বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি অবশ্য রেল কোম্পানী উদ্যোগী। কিন্তু যাত্রীদের আয়ত্বত কর্ত্তের ফলও অপূর্ণ যাত্রীদের পক্ষে কম অনিষ্টজনক হয় না। প্রত্যেক পাড়ীর উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত জানালা ধাক্কা সত্ত্বেও বহুলোক গাড়ীর মধ্যেই থুথু, কাশি, ও নাকের সিকুনি ফেলিয়া থাকে। ইহা যে অস্ত্রের পক্ষে কত যুগাজনক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। যদি গাড়ীতে থুথু ফেলিবার জন্য একটা নির্দিষ্ট জরিমানার আদেশ থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় কেহ থুথু ফেলিতে সাহস করিত না।

তাহার উপর ভিড়ের দিনে ঘরি কেহ একবার গাড়ীতে উঠিতে পারিল তবে বাহ্যতে আর কেহ সে গাড়ীতে উঠিতে না পারে তাহার জন্য দণ্ডায় থাকি, চলন্ত গাড়ী হইতে লোককে ঠেলিয়া কেলি আমি নিজে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন কি নারী হইলেও অনেক উঠিবার সময় সাহায্য করেন না।

বেল কোম্পানীকে তাহার বোধ-ক্রটি সংশোধনের জন্য অভিযুক্ত করিবার পূর্বে অবশ্য নিজেদের দোষগুলি সংশোধন করা আবশ্যিক।

রেলওয়ের বহু ষ্টেশনে পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে পানীয় জলের ব্যবস্থা সর্বাপ্রাণে করা কর্তব্য। যশোহর ই, বি, বেলের একটা বড় ষ্টেশন, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও জলের কোন বন্দোবস্ত করাইতে পারি নাই।

অনেক ষ্টেশনে ট্রেণ ২১ মিনিটের অধিক দাঁড়ায় না। একটা বা দুইটা মাত্র দরজা দ্বারা মেয়েদের উঠা এবং নামা চুই করিতে হয়। মহাযাত্রী পুরুষ ব্যক্তি যদি একটু অধিক ক্ষিপ্ততা অবলম্বন না করে তবে হয় জিনিয়ের ক্রিয়বংশ, না হয় মেয়েরাই নামিতে পারে না। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় যদি উঠা নামার সময় একটু লক্ষ্য করেন তবে ট্রেণ ক্ষণকাল বিলম্বে ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ কোন ষ্টেশনে কোন মাষ্টার মহাশয় সে দিকে লক্ষ্য করেন না। "সম্পাদকের চিঠি" প্রবন্ধে দেবিলার ইউরোপেও নারী বা প্রাচীন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন হইলে ট্রেণ বিলম্ব করে। আমাদের দেশে তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক।

গঙ্গাস্নান বা এইরূপ কোন ঘোষণার সময় মালগাড়ীতেও পোলা শুড়ার দ্বায় লোক বোঝাই করা হয়। মুখে ভিন্ন কার্যতঃ ইহার কোন প্রতিবাদ হয় না। যদি কেহ মাল গাড়ীতে না উঠেন তবে যাত্রী-গাড়ী অতিরিক্ত পাইবেনই ইহা বুঝাইবার কোন ব্যবস্থা থাকে না। অল্প লোককে পরিচালন করিবার প্রতিষ্ঠান না থাকায়

আমাদের মনুষ্যত্বের অভাব-স্বত্ব বহু উদাহরণ প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

শ্রী শ্রবলা কান্ত মহোদায়।

"নানাজাতীর আদর্শ প্রার্থনা"

(প্রভাস্তর)

এই মৌর্য প্রবন্ধে লেখক নমাজ বিশ্লেষণ করিয়া নিম্ন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৌলবী দানেশ আহম্মদ জৈঠের প্রবাসীতে ইহা প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত মুসলমানদিগের প্রার্থনাও সার্বভৌমিক। এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য এই :—

(১) লেখক নমাজের যে অনুবাদ দিয়াছেন, সে অনুবাদ যে ভুল মৌলবী সাহেব তাহা বলেন নাই। স্তরং তিনি স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে অনুবাদ ঠিকই হইয়াছে। অনুবাদ যখন ঠিক এবং মন্তব্য যখন ঐ অনুবাদ-সম্মত, তখন ঐ মন্তব্য বিষয়ে কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

(২) মৌলবী সাহেব 'হুয়া ফাতেহা'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই হুয়া নামাজ নহে। ইচ্ছা করিলে ইহা বর্জন করা যাইতে পারে। নমাজের পূর্বে কেহ এই অংশ পাঠ করেন, কেহ করেন না।

এ অংশ পাঠ না করিলে কোন প্রকার অপরাধ হয় না বা নামাজ অন্তত্ব হয় না। নামাজ পাঠ ও 'নামাজ' এক জিনিষ নহে।

(৩) মৌলবী সাহেব উক্ত হুয়ার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অসম্মত। ঐ হুয়া একটা অংশ এই :—

"আমাদিগকে সরল সত্য পথ দেখাও"।

মৌলবী সাহেব বলেন "আমাদিগকে" অংশের অর্থ "পৃথিবীর সমুদায় মানব জাতিকে"।

মৌলবী সাহেব বিশ্বশ্রুতিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সমুদায় মানব জাতির জন্য প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত। এক্ষণে তাহাকে ধর্মবাদের দিওঁছি। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা যে ভুল তাহা পূর্বোক্ত হুয়া হইতেই প্রমাণিত হয়। উক্ত হুয়াতে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথমতঃ—এক শ্রেণীর লোকের প্রতি ঈশ্বর অমুগ্ধ হইবেন। (ধোঁহাংগিরের প্রতি তুমি অমুগ্ধ কর) —হুয়ার এই অংশ হইতে সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়তঃ—আর এক শ্রেণীর লোকের প্রতি ঈশ্বর বিরক্ত ("বাহারা তোমার বিরাগ ভাজন"—হুয়ার এই অংশ হইতে সিদ্ধান্ত)।

উক্ত হুয়াতে অবশ্যই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের জন্য প্রার্থনা করা হয় নাই। ইহারা 'পথজট' ও ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন হইয়াই ছিল।

লেখক মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ফ্লোরান্সেস্থ চিত্রশিল্পী লোকদিগের জন্তও প্রার্থনা করিয়াছেন।

(৪) নামাজে কাকেরগণ বর্জিত ও অভিশপ্ত হইয়াছে এবং ‘হুয়া কাতোহা’তেও কাকেরগণ (বা পঞ্চমুখ লোক) : বর্জিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রার্থনা অবশ্যই সর্ববাদি-সম্মত হইতে পারে না। লেখক সর্ববাদি-সম্মত প্রার্থনাকেই ‘সার্বভৌমিক’ প্রার্থনা বলিয়াছেন। মৌলবী সাহেব ইহার অল্প প্রকার অর্থ করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন।

(৫) লেখক হিন্দু কি অহিন্দু ইহা বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, তিনি মুসলমান ধর্মের সত্তেও ‘কাকের’ নহেন। অন্ততঃ তাঁহার মুসলমান বক্তৃতা এবং পরিচিত মুসলমানগণও এই প্রকার বলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সঙ্গীতে পরিবর্তন

গত বৈশাখ সংখ্যা হইতে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত “সঙ্গীতে পরিবর্তন” নামক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। এই প্রবন্ধটির নাম “সঙ্গীতে পরিবর্তন” কিন্তু ইহাতে পরিবর্তন বা সে বিষয়ে আনিবার কিছুই নাই।

প্রথমতঃ কাসিম আলি খাঁ কাশীপুর রাজদরবারে ছিলেন না। তিনি ত্রিপুরা রাজদরবারে ছিলেন। স্বর্গীয় যদুভট্ট মহাশয় প্রথমে সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শিক্ষা কবিয়াছিলেন তৎপরে গোবরডাঙ্গার এন্ডিস্থ প্রবাসী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চিমের ঢং হইতে পৃথক্ “বিষ্ণুপুত্রের ঢং” বলিয়া তিনি একটা কথা লিখিয়াছেন কিন্তু এ কথার কোন অর্থই হয় না। বিষ্ণুপুরের শিক্ষা পশ্চিমের শিক্ষা। বিষ্ণুপুরের মহারাজ

তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনকে আনাইয়া রাজদরবারে রাধিয়া বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত প্রচার করেন।

হরিনারায়ণ-বাবু বিষ্ণুপুর যাইয়া “রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয়ের জাতপুত্রের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এইরূপ লিখিয়াছেন।” লেখক সঙ্গীত-গুরু স্বর্গীয় রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রামশঙ্কর মিশ্র কবিয়াছেন। আরও আশ্চর্যের কথা লিখিয়াছেন তাঁহার জাতপুত্র সত্যকে। কারণ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন কালেই জাতপুত্র ছিল না। আর এক কথা রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গান যদি তিনি শুনিয়াছেন তাহা হইলে হরিনারায়ণ বাবুর বয়স ১০০ এক শত বৎসর হওয়া উচিত। “কৃষ্ণধনবাবু স্বলিপি সাহায্যে প্রণবগুলি রক্ষা করিতে গিয়া দেগুলি ধ্বংস করিয়াছেন”—এইরূপ উক্তি বিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত বুদ্ধ ব্যক্তি যে লিখিতে পারেন তাহা আমাদের ধারণারই অতীত।

শ্রী জৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য

সিংহলে প্রবাসী বাঙালী

ক্রোড় মাসেব প্রবাসীতে শ্রীমৎপ্রভুনাথ গুপ্ত সিংহল প্রবাসী বাঙালীদের সহকারী প্রবন্ধে একটু ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আমি সেখানে “ধর্মপদ” পড়িতে গিয়াছিলাম। বাস্তবিক তাহা নহে, বিশ্বভারতী হইতে আমাকে বৃত্তি দিয়া “অভিধর্ম” অর্থাৎ ধর্ম শাস্ত্র পড়িবার জন্য সেখানে পাঠান হয়। আমি সেখানে এক বৎসর থাকিয়া “অভিধর্ম” পাঠ করিয়া উৎকৃষ্ট প্রমাণ-পত্র পাইয়াছি। শাস্ত্র-নিকেতনে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মত বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিৎ আগাধের নিকট হইতে সিংহলে “ধর্মপদ” অধ্যয়ন করিতে যাওয়া অত্যন্ত হাস্তকব ব্যাপার।

শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের চিঠি *

ও

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু

কর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কখনই আপনাদের প্রবৃত্তিবৃ উপর ক্ষয় লাভ করা যায় না। কর্ম হইতে দূরে থাকিয়া প্রবৃত্তিকে চাপা দিলে তাহাকে মনের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখা হয়, তাহার হাত হইতে স্বার্থ ভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অতএব তুমি সর্বদাই মঙ্গলকর্মে নিজেই নিযুক্ত রাখিবে—যখনই দেখিবে তোমার অহংকার বা ক্রোধ

উদ্যত হইয়া উঠিতেছে তখনই বুঝিবে তোমার কর্ম মিথ্যা হইতেছে—নিজেকে মোঃমুক্ত করিবার এইত একমাত্র উপায়। বনের মধ্যে তাড়া পাইলে তবেই যেমন শিকার-গুলি বাহির হইয়া পড়ে এবং তখনই যেমন তাহাদিগকে বধ করিবার উপযুক্ত অবসর—তেমনি কর্মের তাড়নাতেই আমাদের মনের গোপনতা হইতে দিপুগুলি বাহির হইয়া পড়ে—সেই সময়েই তাহাদিগকে মারিবে বলিয়া যদি লক্ষ্য রাখ তবেই তাহারা ধ্বংস পাইবে নহিলে অস্থিমজ্জার মধ্যে তাহারা জড়াইয়া থাকিবে।

বিলাত-যাত্রার বিবরণ তোমরা আমার পত্র প্রায় জানিতে পারিবে। যাত্রারস্তুর পূর্বপত্রখানি এবার

* এই পত্রগুলি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়কে লিখিত হইয়াছিল।

শিলাইদহে বসিয়া লিখিয়াছি ছুটির পরে তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।

পরশ শুক্রবারে আমরা যাত্রা করিব। তোমরা আমার বিদায়কালের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—
২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়েষু

কোনো জীবকে কোনো কারণে কাহারো মারিবার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা কবিয়াছ। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেন না প্রাণের প্রতি প্রাণের একটি স্বাভাবিক মমতা আছে। পেন্দিন একটা বিবাস্ত্র সাপ মারিয়া আনিয়াছিল দেখিয়া আমি মনে আঘাত পাইলাম। আমাদের এ বাড়ীতে বড় বড় ইঁদুর অত্যন্ত অনিষ্ট করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একটা খাঁচায় ধরা পড়িয়া বিষম ভীত ও বিপন্ন হইয়াছিল দেখিয়া আমার মনে বড় লাগিয়াছিল। কিন্তু এটা গেল হৃদয়ের কথা। কিন্তু ব্যবহারের দিক্ থেকে দেখিতে গেলে দেখা যায় কোনো প্রাণীকে কোনো কারণেই মারিব না একথা বলিলে কাজ চলিবে না। মশা মারিব না, ছারপোকা মারিব না, সাপ বাঘ মারিব না বলিলে নিজে মরিতে হইবে। এমন উপদেশ দিলেও কেহ মানিবে না। পাঁহাড়ের ক্ষেতে ফসল পাশীতে নষ্ট করে এখানকার চাষারা গুলি করিয়া ক্ষেত রক্ষা করে—আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু একথাও বলিতে পারি না মানুষ আপনার অন্ন পাশীকে দিয়া নষ্ট করাইয়া হৃর্ভিক্ষে মরিবে। মানুষের শক্তি বিচিত্র, সে নানা কাল্পে প্রবৃত্ত—তাহার সেই কর্মক্ষেত্রে মধ্যে বনের পশুও আবির্ভাব তাহার পক্ষে বিষম ব্যাঘাতকর। এককালে যখন পেটাভেলের ঘরটাতে আমরা ছিলাম তখন ব্যাঙের উৎপাতে ঘরে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। এই সব কারণে মানুষের সঙ্গে পশুর এক জাগরণ বিরোধ আছেই। মানুষ যেখানে সহর বানাইয়াছে সেখানে হইতে পশু তাড়াইয়াছে। যেখানে

তাহার চাষের ক্ষেত সেখানে এককালে পশুদের আবাস ছিল। পৃথিবীতে যতটা জাগরণ মানুষ অধিকার কবিয়াছে সে জাগরণ কত পশু থাকিত তাহার সীমা নাই—তাহারা স্থান ও আহার না পাইয়া মরিয়াছে। এ সকল কারণে তোমার এ সমস্তার সন্তুস্তর দেওয়া কঠিন। অবশ্য বিনা কারণে পশু হত্যার কোনো সমর্থন বা যায় না সে-কথা বলাই বাহুল্য। আসল কথা আমার বিশ্বাস একদিন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ পশুদিগকে আবৃত না করিয়া নিজের সভ্যতার প্রয়োজনকে রক্ষা করিতে পারিবে। পশু-জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের একটা পূর্ণতর সামঞ্জস্য সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে থাকিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাহা না ঘটিলে আমাদের সভ্যতা অসম্পূর্ণ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল মাত্র হৃদয় দিয়া সেই সামঞ্জস্য সাধন হইবে না; উপায়-উদ্ভাবনা বুদ্ধি বা করিতে হইবে। নতুবা পশুর ভিড়ে মানুষের অগ্রসর হইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ইতি। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

The Lingle
Darjeeling

কল্যাণীয়েষু—

প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষত্ব আছে, সন্দেহ নাই। জীবনের দুঃখে তাপে নৈরাশ্রে সেই বিশেষত্বই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। যাহাকে আমরা প্রতিকূলতা বলি তাহাই যদি আমাদের আত্মকূল্য না করে তবে আমরা ভীত, আমরা অপদার্থ, আমাদের আত্মা যে আমাদের অবস্থার চেয়ে অনেক বড় ইহাই সকল দুঃখ-দুর্ঘটনার মধ্যে আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে।

আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়েষু—

সত্যো মিথ্যায় মিলাইয়া মানুষ জীবন বহন করে সেটা কেবল তাহার দুর্বলতার জ্ঞাত। সেটা যে তাহার পক্ষে কর্তব্য এমন কথা কেহই বলে না।

কেবল একটা বিচার করিবার আছে তাহা এই— বাহিবে মিথ্যার মত দেখিতে এমন অমিথ্যা অনেক আছে যেমন পবিত্রাস, কিশা কল্লনার স্বেচ্ছাকৃত গীলা, কিংবা উন্নতকে বিপদ বা অন্তায় হইতে বাঁচাইবার জ্ঞাত কৌশল। অর্থাৎ যে মিথ্যা অন্তায় করিবার জ্ঞাত সত্য গোপন তাহা যোলো আনা মিথ্যা। কিন্তু ভাল করিবার জ্ঞাত মিথ্যার বিপদ আছে। কারণ কোন্টা স্বার্থই ভাল অনেক সময়েই আমরা নিজের সুবিধার দ্বারা তাহার বিচার করি এবং উপস্থিত মত যাহা ভাল, পরিণামে তাহা মন্দ হইতে পারে। কিন্তু মিথ্যার চেয়েও মন্দ আছে যেমন নরহত্যা সেখানে অন্তবের মধ্যে আপনাই বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, অন্তায় বা নিষ্ঠুর হত্যা বাঁচাইবার জ্ঞাত মিথ্যা বলা যায়। বস্তুত সত্যকেও যেখানে আমরা বিসর্জন দিব সেখানে বড় একটা সত্যের খাতিরেই তাহা করিতে হইবে। কোন্ সত্যটা সেই পরিণামেই বড় তাহা সত্যপ্রিয় সত্যপরায়ণ ব্যক্তি আপনাই বৃদ্ধিতে পারে—কিন্তু যে মানুষ সহজেই প্রত্যাহই তুচ্ছ কারণে সত্যকে নষ্ট করিতে অভ্যস্ত তাহার পক্ষে এ কথাটা বোঝা অসম্ভব। তোমার প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ নহে। কথাটা পরিষ্কার করিতে হইলে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন করে। ইতি। ২০শে কাঙ্ক্ষিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়েষু—

তুমি যে প্রশ্ন করেছ সে-সম্বন্ধে মুখে মুখে আলোচনা না হলে কথা পরিষ্কার হ'বে না। অতএব সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হ'বে। বড় চিঠি লেখবার মত সময় পাইনে।

মোটের উপর কথাটা হচ্ছে এই যে, কোন একটা বিশেষ বাক্যকে সত্য বলে না—জগতের নানা পদার্থের সঙ্গে আমাদের নানা সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ সত্য হ'লেই আমাদের জীবন সত্য হয়—সেই সকল সম্বন্ধে আমরা যদি প্রবঞ্চক কপট কুপণ ভীক বা স্বার্থপর হই তাহ'লেই সমস্ত জীবন দিয়ে আমরা মিথ্যা। কিন্তু বিষয়টি বড়। সংক্ষেপে সব কথা বলা চলবে না। ইতি। ২১ কাঙ্ক্ষিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়েষু—

অধ্যাপক ফুশে প্রভৃতি অতিথিদের নিয়ে বয়েকদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। আজ তাঁরা চ'লে গেছেন, এখন কতকটা ছুটি পেয়েছি।

তুমি নিজের সঙ্গে যে সংগ্রামের কথা লিখেছ সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ত চলতে হ'বে। কবেই বা নিষ্কৃতি পাব? আমাদের দেহের প্রাণ রক্ষাও ত নিবস্তুর সংগ্রাম। আমাদের চরিত্রও একটা মানসিক প্রাণক্রিয়া—আমাদের মধ্যে যেটা মন্দ তারই সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমাদের মধ্যে যেটা ভাল সে বসিষ্ঠ হ'য়ে উঠে। এই লড়াই একেবারেই যদি না থাকত তাহ'লে আমাদের চরিত্র নিষ্কর্ষ হ'য়ে পড়ত। হারুতে হারুতেও আমরা জিতব।

এসম্বন্ধে বাহির থেকে কোনো পরামর্শ দেওয়া শক্ত। তবু একটা কথা এই বলা যায়—চরিত্রকে সত্য ও সবল করার একমাত্র উপায় কর্ম। প্রত্যেক মানুষকে অন্তঃস্থ কর্মের মধ্যে এমন একটি কর্ম করতে হ'বে যেটি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কর্ম। এই কর্মেই ধীরে ধীরে বন্ধন ক্ষয় করে নইলে কেবল মনে মনে বিতর্ক ক'রে আমরা বল পাইনে। ইতি—১ জানুয়ারী ১৩২০

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুদ্রিত পুরাতন পুস্তক

শ্রী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

কেবল নূতন বস্তু ও নূতন বিষয়ের প্রতিই যে মানুষ আকৃষ্ট হয় তাহা নহে। পুরাতনের প্রতিও স্বভাবতঃ মানুষের আকর্ষণ আছে। আমরা পুরাতন আত্মীয় স্বজনের সম্মিলনে আনন্দ লাভ করি। বহুদিন পরলোকগত পিতৃ পিতামহের ব্যবহৃত কোন বস্তু বা তাঁহাদের হস্তাক্ষর দর্শনে পুলকিত হইয়া থাকি। প্রাচীনতাব প্রতি মানুষেব এই যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও কৌতুহল ইহাই পুরাতন জ্ঞানের মূল।

সম্প্রতি আমার পুস্তকালয়ের আসমারী পরিষ্কার করিবার সময় কয়েকখানি পুরাতন পুস্তক দেখিতে পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পুস্তকগুলির কোনখানি ৫৩ বৎসর কোন খানি ৪০।৪৫ বৎসর বাবৎ আমার অধিকারে রহিয়াছে। আমার বহু পুরাতন গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি পোকায় কাটিয়াছে। কতকগুলি কেহ কেহ না বলিয়া লইয়াছেন এবং ছুঃখের বিষয় কেহ কেহ পুস্তক পড়িতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই। হিন্দিতে একটি প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি অস্ত্রকে পুস্তক পড়িতে দেন তিনি নির্দোষ। এবং যিনি অস্ত্রের নিকট পুস্তক হাওলাত লইয়া ফেরত দেন, তিনি অধিকতর নির্দোষ। যাহা হউক, আমি বর্ষানুস্মে নানা স্থানে নীত হইয়াছি, নানা প্রকার লোকের সংস্রবে আসিয়াছি, তথাপি এখনও যে কতকগুলি পুরাতন গ্রন্থ ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থাতেও আমার নিকট রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়েব একখানি গ্রন্থ। পুস্তকখানি ১০৩ বৎসরের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। অক্ষর দেখিয়া মনে হয় দিসার টাইপ নহে—কাঠের টাইপ, গ্রন্থের আখ্যাপত্র নাই, ভূমিকার কিয়দংশ মাত্র আছে। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া গ্রন্থের নাম জানিবার উপায় নাই।

রাজার গ্রন্থাবলীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, একখানি “পথ্য প্রদান” নামে আখ্যাত। বিজ্ঞাপনের শেষাংশে “১২৩০ সাল ১৫ই পৌষ” লেখা আছে। গ্রন্থাবলীতে ইহার যে, ইংবেজী বাংলা আখ্যাপত্র (Title page) সংলগ্ন আছে তাহাতে বাংলায় “শ্রদ্ধা ১৭৪৫ ও ইংরেজীতে ১৮২৩” লিখিত আছে, স্মরণ্য গণনা ১২৩০ সাল মিল হইতেছে।

গ্রন্থখানির বহুস্থানে হস্তাক্ষরে সংশোধন করা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজার জীবন চরিতে বাংলায় রাজার নাম স্বাক্ষরের যে প্রতিলিপি আছে, এবং মিস্ মেয়ী কার্পেন্টারের “The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy.” গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ১৩৪ পৃষ্ঠার পর রাজার স্মৃতি পুত্র রাধাপ্রসাদ বায়কে লিখিত রাজার যে একখানি বাঙলা পত্রের প্রতিলিপি (লিথো) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে আমাদের নিকট রক্ষিত গ্রন্থেব সংশোধনগুলি যে রাজার নিজ হস্তাক্ষর তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থখানির শেষাংশে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি শুদ্ধিপত্র আছে। সে সময়ে ছাপাখানার উন্নতি হয় নাই। বহুসংখ্যক ছাপার ভুল থাকিলে গ্রন্থ প্রকাশ বিফল হইতে পারে বোধ হয় এইজন্যই রাজা কেবল শুদ্ধিপত্রসংযোজন পর্যাপ্ত নহে মনে করিয়া হাতে লিখিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তর্কশ্লে একথা বলা যাইতে পারে যে, রাজা এই শ্রমসাধ্য কার্য্য অস্ত্রের দ্বারাও করাইতে পারেন, এবং লেখকের হস্তাক্ষর হয়ত রাজার হস্তাক্ষরের অনুরূপ ছিল।

২। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানিও উক্ত মহাত্মার রচিত। একখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

“পরমাত্মনে নমঃ।

প্রমুখত্বীয় এবং তদুত্তর

বিত্তরসার্থ

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক

দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল

২৫ আশ্বিন শকাব্দা: ১৭৭০

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

স্মৃতরাং এখানি ৭২ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।
রাজ্যের গ্রন্থাবলীতে এখানি “চারি প্রশ্নেব উত্তর” নামে
প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীতে ইহার কোন আখ্যা-
পত্র ছাপা হয় নাই। গ্রন্থের শেষে “ইতি বৈশাখ ৩০ শক
১৭৪৪” লিখিত আছে স্মৃতরাং ২৬ বৎসর ৩ মাস পবে ইহা
দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছিল। এই স্মৃতির্ধকালের মধ্যে
এই গ্রন্থ আর মুদ্রিত হয় নাই। বোধহয় ইহার কারণ
এই যে, প্রথম প্রচারের ৭৮ বৎসর পরেই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে
রাজা বিলাত গমন করেন। বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো-
পাধ্যায় তেলিনীপাড়ার জমিদার ছিলেন। তৎকালে
দেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ অশিক্ষিত লোক রাজ্যের
প্রধান সহযোগী এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভার (যাহা পরে
কলিকাতা ব্রহ্মসমাজ ও এক্ষণে আদিত্যব্রহ্মসমাজ নামে ব্যাত
হইয়াছে) সহিত বিশিষ্ট রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। পরে তিনি
তেলিনীপাড়াতেও উপাদনার জন্ত ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন
করিয়াছিলেন।

৩। সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সম্বলিত মুদ্রবোধ
ব্যাখ্যাপত্র। এখানি আশী বৎসর পূর্বে ছাপা হইয়াছিল।
আখ্যাপত্র ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে লিখিত। বাঙ্গালা
আখ্যাপত্র এইরূপ—

“বোপ দেবীঃ

মুদ্রবোধ ব্যাকরণঃ।

শব্দ সাধন মুক্তাবলী।

প্রথম খণ্ডঃ।

চৌতাল্লা.নিবাসি শ্রীলক্ষ্মীমৎ শিবচন্দ্র বিদ্যাভাচম্পতি

কর্তৃক সংশোধিতঃ।

শ্রীমত্তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রোগ্রামীলিতোদীপনী।

নামা শেষ বিশেষ বোধনকরী জ্ঞানাসুরা রোপনী।

বালানাং ঝটিতি প্রবোধ জননী সংস্কার সম্পাদিনী।

ধীর শ্রীজয়শঙ্করবাকলিতা ভূয়াং সত্যসোদিনী।

১৭৬২ শকাব্দে

শ্রীরামপুরে চন্দ্রোদয় যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৫৪ সাল।

এই গ্রন্থ উক্ত যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলিকাতা নগরে ভাস্কর
যন্ত্রে অথবা মেং রোজেরো সাহেবেব পুস্তকাগারে তত্ত্ব
করিলে পাইবেন।”

ইহার মুখবন্ধ বা বিজ্ঞাপনটি এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত
হইল। পাঠকগণ ইহাতে ৮০ বৎসর পূর্বের পণ্ডিতী
বাঙ্গালার নমুনা দেখিতে পাইবেন।

“শ্রীহরিঃ।

পাতুবঃ।

মহামহিম মহোদয় শ্রীলক্ষ্মীমর্ষিশিষ্ট বুদ্ধিমু

শাস্ত্র দাস্ত্র মাস্ত্র গণ্য মহাশয় সমুহ সমীপেষু।

যথা যোগ্য বিনয় পুংসর

নমস্কারাশীনিবেদন মিদং।

এতদ্দেশের মধ্যে সংপ্রতি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া
অনেক মহাশয় কৃতী বুদ্ধিমান ধনবান হইয়াছেন। কিন্তু
ঈশ্বরীয় যে মূল সংস্কৃত ভাষা যাহা হইতে তাবৎ সাধুভাষা
নির্গত হইয়াছে এবং যে ভাষা দ্বারা ভক্তলোকের দৈব-
কৃত্যের পবিত্রতা এবং সভ্যতা পাণ্ডিত্য শুদ্ধাশুদ্ধ যত গুণ
ব্রহ্ম নীর্থ ইত্যাদি বিবেচনা হয় তাহার প্রতি যত পূর্বক
অনুশীলন কবাতে প্রায় অনেকের উৎসাহ নাই, যেহেতুক
শব্দ সাধন গ্রন্থ ব্যাকরণাভিধানাদি অতি কঠিন জ্ঞান
করিয়া বাল্যকালাবধি আলস্য প্রযুক্ত পাঠ করেন নাই।
তাহা পঠিত না হইলেও সংস্কার হইতে পারে না। সংস্কার
শব্দের অর্থ শুদ্ধ লিখন পঠন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শোধন শক্তি।
পরমেশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য সৃষ্টির মধ্যে কোটি কোটি পদার্থ

প্রকাশ করিয়াছেন যদিও তাহার প্রত্যেকের নাম সকল মনুষ্যের জানিবাব প্রয়োজন নাই তথাপি যৎকিঞ্চিৎ বাহা সভ্য সমাজে ব্যবহার আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে হয়। অতএব হে বন্ধু মহাশয় সকল। এই বিবেচনা করিয়া বালক শিক্ষার নিমিত্তে মুক্তবোধ ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণ অবধি অব্যয় শব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক লক্ষণ দর্শাইয়া প্রত্যেক পদ ও তৎসাধন প্রকার এবং মূলের সকল সূত্র প্রকৃত অর্থের সহিত সাধু ভাষায় সংগৃহীত হইল। বিজ্ঞ-

গণ সমীপে প্রার্থনা যে স্বীয় স্বীয় গুণ দ্বারা এতৎ পুস্তক সংগ্রাহকের আন্তরিকতা এবং অনবধানতাদি ক্ষত্র সত্তাবিত দোষ গ্রহণ না করেন। এই পুস্তক যদি আদরপূর্বক সকলের গ্রহণ হয় তবে এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ এই রীতি ক্রমে প্রকাশ হইবেক ইতি।

উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীতারকনাথ শর্ম্মণঃ ।”

এই গ্রন্থখানি ১২৮১ সাল হইতে অর্থাৎ ৫৩ বৎসর বাবৎ আমার পুস্তকালয়ে রহিয়াছে।

সম্পাদকের চিঠি

(২)

জেনীভায় এক দিন সকাল বেলা অল্প কিছু কাঞ্চ সারিয়া হোটেলে ফিরিতেছি, এমন সময় দুটি লোক ফরাসী ভাষায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল। সঙ্গে সত্যোক্তচন্দ্র গুহ ছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা এই। রাত্ৰায় এক পত্রকেশ বিদেশীকে দেখিয়া লোক দুটির কোতুহলের উদ্রেক হয়। তাহাদের মধ্যে এক জন চিত্রকর, অল্প জন তাহার সহকারী, বা পুস্তকপ্রকাশক, বা ঐরূপ আরোকিছু। লীগ অব নেশন্সের বৈঠক উপলক্ষে নানা দেশের যে সব প্রতিনিধি ও অল্প লোক তখন জেনীভায় আসিয়াছিল, তাহাদের ছবি আঁকিয়া ও প্রকাশ করিয়া বিক্রী করা তাহাদের উদ্দেশ্য। আমারও ছবি তাহারা আঁকিয়া প্রকাশ করিতে চাওয়ায় আমাকে রাজী হইতে হইল। নির্দিষ্ট সময়ে হোটেলে আসিয়া চিত্রকর অঙ্কার লাভার ছবি আঁকিল। তাহার পর জিজ্ঞাসিল, আমি সমুদয় ছবিযুক্ত এল্‌বাম ক'খানা কিনিব, নিজের ছবিই বা ক'খানা কিনিব। আমি উত্তর দিবার পর তাহারা চলিয়া গেল। কিছু দিন হইল, এল্‌বামগুলি ও ছবিগুলি আসিয়াছে। আমার ছবির সহিত আমার সাদৃশ্য নাই, সকলেই বলিতেছে। যাহা হউক, চিত্রকর ও প্রকাশকের

টাকা বোজগার উদ্দেশ্যটা সফল হইয়াছে। সে বিদ্যাটা তাহাদের জানা আছে। তাহাদের এল্‌বামে নানা দেশের ১১১ জন মহিলা ও ভদ্রলোকের ছবি আছে।

লীগ অফ নেশন্স সভার অধিবেশন শেষ হইয়া যাত্রায়া আমি জেনীভা হইতে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তখনও লীগ কোন্সিলের (অর্থাৎ লীগের কার্য্য-নির্বাহক সমিতির) অনেক অধিবেশন হইতে বাকী ছিল। কিন্তু লীগের নানাবিধ কমিটি সমিতি প্রভৃতির মীটিং সমস্তে আমার যে অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হইয়াছিল, তাহাতে আমার আরো বেশী দিন জেনীভায় থাকিবার উৎসাহ জন্মে নাই।

ইউরোপে নিজের নিজের পোষাক ছাড়া আর সব দরকারী জিনিষ হোটেলওয়ালারা দেয়। রেল-গাড়ীতেও রাজ্যে ঘুমাইবার বিছানা বালিশ কথল রেলের কর্তৃপক্ষ দেয়। এই জন্ত ইউরোপ বেড়াইতে হইলে বেশী জিনিসপত্র সঙ্গে না লওয়াই ভাল। আমি কিন্তু গ্রীষ্ম থাকিতে থাকিতে ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইয়াছিলাম বলিয়া গ্রীষ্মের উপযোগী পোষাক ও অল্প নানা বস্তু বিহীন জিনিষ আমার সঙ্গে ছিল। সেগুলো সঙ্গে লইয়া ইউরোপ ভ্রমণে অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি তাহা দেশে ফেরত

পাঠাইবার উপায় সম্বন্ধে অসুস্থদান করিতেছিলাম। এমন সময়, এলাহাবাদস্থিত কায়স্থ পাঠশালার আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত জেনীভায় দেখা হইল। তিনি ১৫ বৎসর আমেরিকায় ছিলেন, তথায় শিক্ষা সমাপনানন্তর কারখানায় বড় কাজ করিতেছিলেন। জামশেদপুরে তাতা কোম্পানীর লোহা ও ইস্পাতের কারখানায় হাজার টাকা বেতনে কাজ পাইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। পথে তাঁহার বন্ধু জেনীভাপ্রবাসী ডাক্তার রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমাব গোটাকয়েক বাক্স প্যাটরা তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজী হইলেন। আমি কলিকাতা পৌঁছিবাব মাসাধিক পূর্বে তিনি জিনিষগুলি আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

জেনীভা হইতে বার্লিন রেল প্রায় ২২ ঘণ্টার পথ। একদিন প্রাতে প্রায় ১১টার সময় জেনীভা ছাড়িয়া তার পর দিন প্রায় ৯টার সময় জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে পৌঁছিলাম। বার্লিনের স্টেশন একটা নয়। আমি কোনটায় নামিব স্থির করিতে পারি নাই। ট্রেনের কণ্ডাক্টার জার্মান হইলেও অল্প স্বল্প ইংরেজী বলিতে পারিতেন। কাইজার হোফ হোটেলে যাইব বলায় তিনি আমাকে ঠিক জায়গায় নামাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী মার্কিন মহিলা শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায়জায়া আমাকে স্টেশন হইতে হোটেলে লইয়া যাইবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অল্প স্টেশনে গিয়াছিলেন। এইজন্য আমি হোটেলে পৌঁছিবাব পর তিনি যখন ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে বলিতেছিলেন, “রামানন্দ বাবু আসেন নাই,” তখন আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহার সৌজন্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমি যে শনিবার বার্লিন পৌঁছি, সে দিন রবিবার সেখানে ছিলেন না; তখন তিনি জার্মানীর নানা সহবে বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। সোমবার তাঁহার ড্রেসডেনে বক্তৃতা করিবার কথা।

ভেনিস, প্যারিস, লণ্ডন ও জেনীভায় অসংখ্য মুসাফিরদের মত আমাবও গাঁটরী প্যাটরা চুড়ী আফিসের কর্মচারীরা পরীক্ষা করিয়াছিল। বার্লিনে এরূপ কোন উপদ্রব দেখিলাম না। স্টেশন হইতে সোজা হোটেলে গেলাম। পর্যটকদিগকে এই প্রকারে ত্যক্ত না করাটা জার্মানদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পর্যটকরা ক্রেতা, বিক্রেতা নয়। তা ছাড়া, জার্মানীতে জার্মান জিনিষের চেয়ে সস্তা মাল বিক্রী করিবার জন্ত দু'চারটা ব্যাগে করিয়া জিনিষ লুকাইয়া আনিবে, এরকম বেকুব মুসাফির বেশী নাই।

জার্মান ভাষার বহি ও কাগজ অনেক দেখিয়াছিলাম। এক একটা জার্মান শব্দের দৈর্ঘ্য এবং জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমার ভয় ছিল, না জানি কথিত জার্মান কিরূপ কটমট হইবে। কিন্তু যখন জার্মান কথিত হইতে শুনিলাম, তখন কর্কশ মনে হইল না, বরং কাহারও কাহারও মূর্খ ভলই লাগিল। বস্তুতঃ জার্মান শ্রুতিকটু ভাষা না হইবারই কথা। জার্মানীতে বহু জগদ্বিখ্যাত সংগীত-নাট্যক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ দেশের ভাষার গীতোপযোগিতা থাকিবারই কথা। কিন্তু ইহা কেবল মোলায়েম নহে; ইহাতে খুব জোরও আছে।

ড্রেসডেনে রবিবার বক্তৃতা শুনিবার এবং জার্মান ভাষায় “ডাকঘর” নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্ত আমি সোমবার প্রাতে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মোহন বসুর সঙ্গে বার্লিন হইতে রওনা হইলাম। সেখানে ছপরের পর পৌঁছিয়া সোজাসুজি কবির হোটেলে গেলাম না, আগে সহরটা কতক কতক দেখিয়া লওয়া স্থির হইল। বস্তুতঃ সন্ধ্যার পর, এবং তাহার পর অভিনয়। প্রথমে আমরা স্টেশনের নিকটস্থ রেস্টুর্যাঁতে মধ্যাহ্নের আহার সারিয়া লইলাম।

ড্রেসডেন পুরাতন সহর, স্যাক্সনি রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা এল্ভের উভয় তীরে অবস্থিত। সহরের দুই অংশে যাতায়াতের জন্ত কয়েকটি স্তম্ভের সেতু আছে। তন্মধ্যে আলবার্ট সেতু স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অট্টালিকা ও সেতুসমূহের স্থাপত্য, চিত্রশালা,

উদ্যানাবলী, নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির জন্ত ডেস্‌ডেন্‌ বিখ্যাত। আমবা রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রথমে গেলাম চিত্রশালা দেখিতে; উহা মিউজিয়মের অন্তর্গত। চিত্রশালার প্রবেশদ্বারে প্রায় পৌছিয়াছি, এমন সময় একজন ফোটোগ্রাফার চট্‌করিয়া ক্যামেরা খাটাইয়া আমাদের একটু দাঁড়াইতে বলিল। হয়ত সে ভাবিয়াছিল রবীন্দ্রনাথকে পাকড়াও করিয়াছে। তাহা না হইলেও, সাড়ীপরিহিতা হিন্দুমহিলার ছবি তোলা ত তাহার ভাগ্যে হয় ত আর ঘটবে না। সে ছবি তুলিয়া লইল; আমাদের একে বালিনে একখানা পাঠাইতে বলিয়াছিলাম, তাহা পাঠায় নাই।

ডেস্‌ডেনের চিত্রশালা, ইটালীর বাহিরে, ইউরোপের বৃহত্তমগুলির মধ্যে একটি। ইহাতে প্রায় ২৪০০ ছবি আছে; অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ইটালীয় ও ফ্রেমিশ চিত্রকরদের আঁকা। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী স্বয়ং চিত্রশিল্পী; কোন ছবি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিলে আমাদের দেখিতে বলিতেছিলেন। রাফেলের সিষ্টিন্‌ ম্যাডোনা (মাতৃমূর্তি) চিত্রশালার অমূল্য সম্পত্তি বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা অস্ত্রান্ত ছবির সঙ্গে দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা হয় নাই; একটি আলাদা কামরায় কেবল এই ছবিটি রাখা হইয়াছে। এখানে সর্বদাই বহু দর্শক বসিয়া বসিয়া ইহা দেখে। কেহ কেবল ছবিটির সৌন্দর্য্য দেখে, কিন্তু অনেকেই যিশুর মাতার ও যিশুর ছবি বলিয়া ভক্তির সহিত ইহা দর্শন করে। চিত্রশালায় আরো কয়েকটি সুবিখ্যাত ছবি আছে। কিন্তু উহাতে রক্ষিত বড় বড় কয়েকটা ফ্রেমিশ চিত্রের স্থলকায় নগ্ন স্ত্রীলোকদের চিত্র ললিতকলার দিক্‌ দিয়াও আমার ভাল লাগে নাই।

আমরা যখন ছবি দেখিয়া দেখিয়া কক্ষ কক্ষে ঘুরিতে ছিলাম, তখন একটি জার্মান স্ত্রীলোক আমাদের ইংরেজীতে বলিল, “আপনার সহিত দু’এক মিনিট কথা কহিবার অল্পমতি পাইতে পারি কি?” আমি বলিলাম, “আপনি ভুল করিতেছেন;—আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নহি, যদিও তাঁহার দেশে আমারও বাড়ী, এবং তাঁহার পুত্রবধূ আমাদের সঙ্গে আছেন বটে।” স্ত্রীলোকটি তখন তাহার সঙ্গী অস্ত্র কতকগুলি স্ত্রীলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করিয়া বলিল, “আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা বলিতেছিল, ‘না; উনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ’।” চিত্রশালা হইতে আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। এখন সেখানে কোন রাজা নাই, সমগ্র আর্মেনী সাধাবণতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদটি আমরা কেবল বাহির হইতে দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার সময় তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বেশ অন্ধকাল। প্রাসাদসংলগ্ন যে বাড়ীতে মণিমুক্তা স্বর্ণরৌপ্য হস্তিদন্তেব্র জব্যাদি রাখা হয়, তাহা খোলা ছিল। তাহার সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। একজন রক্ষী আমাদের ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত অহরায় দেখাইল। ভারতবর্ষ কত দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু নিজে দরিদ্র।

চিত্রশালা হইতে আমরা একটি অন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। ইহাতে ইউরোপের সব দেশের এবং আমেরিকার বহুসংখ্যক আধুনিক ছবি সেখানে হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে কোন ছবি যায় নাই। অল্পসংখ্যক ছবি আমার মন্দ লাগে নাই। কিন্তু অধিকাংশ ছবিই অতি আধুনিক রীতিতে অঙ্কিত বলিয়া এবং চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকায়, আমি তাহাদের রস গ্রহণে সর্থ্য হই নাই। কতকগুলি ছবি একরূপ ছিল, যে, সেগুলি কোন্‌ বাস্তবিক বা কল্পিত জিনিষ, প্রাণী, ভাব বা দৃশ্যের ছবি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। এইটুকু কেবল বুঝিলাম, যে, রং ফলাইয়াছে ভাল। অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর হাতায় একটি উদ্যান ও পুষ্পের প্রদর্শনীতে পৃথিবীর নানা দেশের বিখ্যাত উদ্যান-সমূহের ছোট ছোট প্রতিকল্প রক্ষিত হইয়াছিল। তা ছাড়া, কল্পিত নানাবিধ অস্ত্রের বাগানের নমুনাও সেখানে ছিল। ফুলের প্রদর্শনীর শোভা বর্ণনার যোগ্য, কিন্তু বর্ণনার ক্ষমতা আমার নাই।

প্রদর্শনী দুইটি দেখা হইবার পর আমি ট্রামে হোটেল ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথের নিকট গেলাম। ট্রামে খুব বেশী ভিড় ছিল, অনেকে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বৃদ্ধ বিদেশীকে গাড়ীতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দু’একটি বালিকাও অস্ত্র কোন কোন যাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার জন্ত জায়গা করিয়া দিল। বিদেশী ও অপরিচিত হইলেও, বয়োবৃদ্ধের সুবিধা করিয়া দিবার

শিষ্টাচার জামেনীতে আছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। কবির হোটেলের তখন তিনি ছাড়া তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত তারাচাঁদ রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ লাল, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এবং শ্রীমতী নির্মলকুমারী দেবী ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার কিছু পূর্বে আমরা একটি প্রকাণ্ড হল গেলাম। দেখিলাম, হল একটিও জায়গা খালি নাই, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে, শ্রোতাদের মধ্যে বেশী রকম একটি অংশ স্ত্রীলোক। ইংরেজীতে বক্তৃতা বুঝিবার লোক সেখানে অনেক ছিল, কিন্তু বোধ হয় ইংরেজী না-জানা লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাহারা পণ্ডিত তারাচাঁদ রায় কথিত অনর্গল জার্মান অনুবাদ হইতে কবির বক্তৃতা বুঝিল। পণ্ডিতজীব গলাও বেশ দরাজ। রিপোর্টার অনেক ছিল। তাহাদের মধ্যেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম নয়। একজন নারী রিপোর্টারই সকলের চেয়ে কম বাদ দিয়া রিপোর্ট লিখিতেছিলেন মনে হইল। বক্তৃতার পর কবি তাঁহার কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এগুলি, বিশেষতঃ “দি ফ্রেসেন্ট মূনের” কবিতাগুলি, শ্রোতাদের এত ভাল লাগিয়াছিল, যে, কবি যত কবিতা আবৃত্তি করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আবৃত্তি তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।

বক্তৃতা ও আবৃত্তির পর আমবা ভিড় ঠেলিয়া কষ্টে গাড়ীতে উঠিলাম এবং থিয়েটার গৃহে গেলাম। সেখানেও একটিও জায়গা খালি ছিল না। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাহারও কাহারও পোষাক বেশ মজার হইয়াছিল;—বিশেষতঃ সূখার সাড়ী। ইউরোপীয়েরা বাঙালীদের পোষাক যত দেখে, আমবা তাহাদের পোষাক তার চেয়ে অনেক বেশী দেখি। তথাপি আমরাও বোধ করি ইউরোপীয় পোষাক অনেক সময় ঠিক মত পরিতে পারি না—ফ্যাশন ত খুব আধুনিক প্রায়ই হয় না। অমল সাক্ষিয়াছিল একজন অভিনেত্রী। যে-সব বালক অমলের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিল, তাহারাও অভিনেত্রী। প্রাণের চেক ও জার্মান থিয়েটারঘরের “ডাক ঘর” অভিনয়েও অভিনেত্রীরা ঐ ঐ ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল। কবি ড্রেসডেন ও প্রাণে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

বালকেরা কেন এই সব বালকের ভূমিকার অভিনয় করে না। উভয় সহরেই উত্তর পাইলেন, বালক অভিনেতা পাওয়া যায় না বলিয়া। কিন্তু বাঙালী অনেক ছেলে অমলের ভূমিকার বেশ অভিনয় করিয়াছে। ড্রেসডেনে অভিনয়ের পর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সাতিশয় সন্মানের সহিত কবির উদ্দেশে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন এবং দর্শকেরাও তাঁহার প্রতি বিপুল সন্মান প্রদর্শন করিলেন।

ড্রেসডেন সহরের স্থাপত্য বাল্কিনের স্থাপত্য অপেক্ষা আমার উৎকৃষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মনে হইয়াছিল।

ড্রেসডেনে দেখিলাম, কবিকে সকাল সন্ধ্যা তাঁহার নানা বহির জার্মান সংস্করণে অল্পস্ব স্বাক্ষর করিতে হইতেছে, তাঁহার ফোটোগ্রাফ সহি করিতে হইতেছে, মূল্যাকাতের ভাসে (ভিজিটিং কার্ডে) দস্তখত করিতে হইতেছে। হোটেলের চাকর চাকরানী প্রভৃতি সামান্য অবস্থার লোকরাও তাঁহার বহি কিনিয়া দস্তখত কবাই-তেছে। তাছাড়া ফোটোগ্রাফার ও চিত্রকবও কাহাকেও কাহাকেও আসিডে দেখিলাম। একজন চিত্রকর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার ছবি আঁকিল। সেটা ঠিক না হওয়ায় আবার আঁকিল। সেটাও ঠিক হইল না। কবি আমাকে বলিলেন, “দেখুন ত, এটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছবি হইয়াছে কি না।” বলিয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ তাহা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মাইকেলের ছবি বলিয়াই সহজে চালান যায়।

ড্রেসডেন হইতে কবির সহিত আমরা সকলে বাল্কিনে ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেনে অনেক কথা হইয়াছিল, অধিকাংশই ভুলিয়া গিয়াছি। অল্পস্ব স্বা মনে আছে, তাহা বলিতে গেলে ভাষাটা হইবে আমার, স্ততরাং সে চেষ্টা করিব না। দু-একটা কথার কেবল উল্লেখ করিব।—কবি বলিলেন, “সুজলাং সুফলাং শান্তশ্রামলাং মাতরম্, সব ঋতুতে বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের সব অংশের প্রতি তেমন প্রযোজ্য নহে, যেমন ইউরোপের অনেক অংশের প্রতি প্রযোজ্য।” আমি ইউরোপের যতটুকু দেখিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমারও ঐ কথা মনে হইয়াছে। পৃথিবীর যে-ভূখণ্ডে দেবতার এমন স্থপালন, তাহার অধিবাসীদের

সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা করা সোজা নয়, যদিও অসাধ্যও মোটেই নয়। কবিকে তাঁহার কোন ইউরোপীয় কৃত্তী সম্পাদক বন্ধু বলেন, যে, ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনা ও সমস্তাদি বিষয়ে কোন ভারতীয় লেখককে যদি তিনি পৃথিবীর ঘটনাস্রোত ও অবস্থাচক্রের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া প্রবন্ধাদি লিখাইয়া পাঠান, তাহা হইলে তাহা মুদ্রিত হইবে, এবং ভারতবর্ষের ঠিক অবস্থা বুঝিতে পাশ্চাত্যদের সুবিধা হইবে। ট্রেনে কবির সহিত কথা হইতেছিল, আমাদের দেশের কাহার কাহার দ্বারা এই রকমের প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। কাহারও নাম করিয়া আমরা কোন আলোচনা করি নাই। অত্যন্ত কথার মধ্যে আমি একটা কথা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম, আমরা নিজেদের পরাধীনতা ও নানা দুঃখদৈন্তে এমন অভিভূত, কিম্বা ষাহাবা অভিভূত নহেন, তাঁহারাও তৎসমুদায়ের প্রতিকার-চিন্তায় ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে এত ব্যাপৃত, যে, পৃথিবীর সমস্তাসকলের জ্ঞানলাভেব এবং আমাদের সমস্তাগুলিকে তৎসমুদায়েরই একটা অংশ মনে করিয়া সমগ্র সমস্তার আলোচনা করিবার আমাদের অনেকেই প্রবৃত্তি, অবসর ও অভ্যাস নাই। এইজন্য ইউরোপীয় সম্পাদক ঠিক বে ভাবের প্রবন্ধ চাহিয়াছেন, তাহা লিখিবার বহু লোক অনায়াসেই পাওয়া যাইবে, মনে হয় না। কবি আমার কথায় সায় দিয়াছিলেন।

বালিন স্বভাবতঃ বালুকাভীর্ণ অল্পচ এক ভূখণ্ডের উপর নির্মিত; বালিন্টক সাগরের পৃষ্ঠদেশ হইতে উহা কেবলমাত্র একশত ফুট উচু। সুতরাং বালিনের স্বাভাবিক দৃষ্টেব অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। কিন্তু মানুষের যতটা সাধ্যায়ত্ত, বালিনের জন্ত তাহা করা হইয়াছে। ইহার কলকারখানা, পণ্যশিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষালয়, চিত্তবিনোদনের নানা স্থান ও উপায়, সভ্যতার উৎকর্ষসাধনের নানা ব্যবস্থা, ইহাকে জগতের নগর-সমূহের মধ্যে উচ্চস্থান দিয়াছে। ইহার লোকসংখ্যাও খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮০৪ দশমাব্দে ইহা ১,৮২,১৫৭ জন মানুষেব বাসস্থান ছিল। ১৯১৯ সালে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ১৯,০২,৫০৯ হয়। ১৯২০ সালে সহরতলীর

কতকগুলি স্থান ইহার সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার লোক সংখ্যা ৩৮,০৩,২০১ হয়। সহরের মাঝখানটা এখন প্রায় কেবল বাণিজ্যের জন্তই ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ বাড়ী ইষ্টকনির্মিত। অনেক বড় বড় অট্টালিকা আছে বটে, তবে স্থাপত্য একঘেয়ে রকমের। সহরের সকলের চেয়ে ভাল রাস্তাব নাম উণ্টেবু ডেন্ লিগেন্, অর্থাৎ “লেবু বীথিকা”—যদিও লেবু ছাড়া অন্য গাছও এই রাস্তার ধারে আছে। বালিনের বৃহত্তম লাইব্রেরীতে ১৭,৫০,০০০ মুদ্রিত পুস্তক এবং ৫০,০০০ হস্তলিপি আছে। সহরটি জাতীয় নানাবিখ্যাত ব্যক্তির মূর্তিতে শোভিত। নানা প্রকার স্থলের সংখ্যা খুব বেশী। বালিন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম না হইলেও, উহা ১৮০৯ সালে স্থাপিত হইয়া থাকিলেও, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সকলের মধ্যে উহার স্থান উচ্চ। সুবিখ্যাত বহু অধ্যাপক এখানে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন। বর্তমানে ইহার অধ্যাপক সংখ্যা মোটামুটি ৬০০ এবং ছাত্র সংখ্যা ১২০০০। নৃতত্ত্ববিষয়ক ও অন্য নানাবিধ মিউজিয়ম এখানে আছে। চিত্রশালাও অনেকগুলি। পণ্যশিল্প শিক্ষা দিবার উচ্চতম ও বৃহত্তম বিদ্যালয় শালটেনবুর্গে স্থিত। ইহা বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম।

কাইজার হোফ হোটেলে দেশী বিদেশী কয়েকজন অপরিচিত ও পূর্বপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। টলষ্টয়ের বন্ধু ও চরিতাখ্যায়ক পল্ বিরুৎকফ্কে এখানে দেখি। তিনি অতি বৃদ্ধ, ক্র পৃথ্যন্ত শাদা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অথর্ব নহেন। তিনি সম্রাটবংশজাত, কিন্তু ত্রমিক দলে যোগ দিয়াছেন। বলিলেন, অধ্যাপক কালিদান নাগ বিশ্বভারতীর জন্ত রুশিয়ায় প্রকাশিত যে সব সংস্কৃত গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন, তাহা একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে; কি উপায়ে পাঠাইতে হইবে, জানিতে পারিলেই প্রেরিত হইবে। বিরুৎকফ্ মহাশয়ের মুখে রুশিয়ার অবস্থা শুনিয়া আমাদের ঐ দেশ দেখিবার ইচ্ছা প্রবলতর হয়। হোটেলে নরওয়ের অধ্যাপক ঠেন্ কোনো ও তাঁহাব পত্নী বহিত দেখা হইল। শান্তিনিকেতনে ইহাদের প্রতিবেশী ছিলাম বলিয়া ইহাদের সহিত আগে হইতে পরিচয় ছিল। ইহার শ্বশুর বাড়ী বালিনে। সেখানে অধ্যাপক কোনো রবীন্দ্র-

নাথ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে একদিন সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজ এবং গল্প বেশ জমিয়াছিল। আমি যখন লগুন যাই, তখন বিচারপতি চারুস্র ঘোষ ও তাঁহার পত্নী সেখানে ছিলেন; কিন্তু সেখানে তাঁহাদের সহিত দেখা হয় নাই। দেখা হইল বার্গিনের কাইজার হোফ হোটেলে। কিছু কথাবার্তাও হইল। দেশে থাকিতে ঘোষজায়া মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটে নাই; এখানে তাহা হইয়া গেল। এই হোটেলে হায়দরাবাদের স্বর্গীয় বিজ্ঞানার্চাধ্যক্ষ অধোবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিতও পরিচয় হইল। ইনি কি কারণে দেশে আসিত পারেন না, তাহা নুতন করিয়া বলিবার দরকার নাই। দেশে আসিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে; তবে স্বদেশ-মনের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হয় এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া মাতৃভূমি দর্শন করিতে চান না। কথাবার্তায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, দেশভক্তি এবং জগতের বর্তমান অবস্থার বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইলাম। এই হোটেলে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর জামাতা ব্যারিষ্টার রঞ্জন পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে, তিনি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কেশব-নাথের সহিত লগুনে একজায়গায় থাকিতেন ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব আছে।

১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বার্গিনের মহিলা চিত্রশিল্পী কাথে কল্‌ভিজ্ ও তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি সাধারণতঃ জার্মেনীর জনসাধারণের জীবনের, তাহাদের ছুঃখদারিদ্র্যের, এবং তাহাদের উপর অভ্যাচার উৎপীড়নের ছবি আঁকিয়া থাকেন। অতীত কালের ছবিই বোধ হয় বেশী। চট্টোপাধ্যায়-জায়া একদিন শ্রীমতী প্রতিমাদেবীকে ও আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করাইবার জন্ত লইয়া গেলেন। বার্গিনের যে অংশে গরীব লোকেরা থাকে, তিনি সেই অংশে বাস করেন। এই অংশে কিছু কলিকাতার ইংরেজ পাড়া অপেক্ষা কম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হইল না। শ্রীযুক্ত কাথে কল্‌ভিজ্ অতিশয় যত্নেব সহিত আমাদিগকে তাঁহার সব

ছবি দেখাইলেন। তিনি পুত্রহীনা বৃদ্ধা, একটি নাতির ফোটোগ্রাফ আমাদিগকে দেখাইলেন। তাঁহার আঁকা চবি জার্মেনীর ছুঃখী ও উৎপীড়িত লোকদের অবস্থার জীবন্ত চিত্র। দেখিলে প্রাণে তাহাদের প্রতি সমবেদনা জাগে, এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাহারা এই ছুঃখ ও উৎপীড়নের কারণ, তাহাদের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়। যখন জার্মেনী সাধারণতঃ হয় নাই ও তাহার সম্রাট স্টিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এই মহিলার অঙ্কিত চিত্রাবলী থাকায়, সম্রাট বলেন, যে, সেগুলি অপসারিত না হইলে তিনি প্রদর্শনী দেখিতে যাইবেন না। ইহা হইতেই তাঁহার শক্তি ও কৃতিত্বের কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বার্গিনের স্বন্দব সহরভগ্নীতে নদীর তীরে উদ্যান-শোভিত একটি বাড়ীতে মেগেল নামক এক যুবা ডাক্তার থাকেন। বয়স ২৯। বাড়ীটি তাঁহার বিধবা শাশুভীর। ডাক্তার এই মহিলার একমাত্র কঙ্কাসন্তানকে বিবাহ করিয়াছেন। চিকিৎসায় ডাক্তার মেগেলের বেশ পসার হইতেছিল। তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু গবেষণা করিতেছেন এবং কি ফল পাইয়াছেন; তাহা আমাদিগকে দেখাইলেন, এবং অমুরোধ করিলেন, যে, এ বিষয়ে তিনি নিজে কিছু ছাপিবার পূর্বে আমি যেন কিছু না লিখি। ডাক্তার মেগেলের একটি ৫৬ বৎসরের খুব স্তষ্টপুষ্ট ছেলে ও ২৩ বৎসরের একটি মেয়ে আছে। ছেলেটি তাহার বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “বাবা, যদি তুমি ইদ্রুগলার ব্যারাম ভাল করিতে চাও, তা হ’লে তাদের শরীরে রোগের বিষ কেন ঢুকিয়ে দাও?” ইদ্রুগলের শরীরে ক্যান্সার রোগ সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয় বলিয়া ছেলেটি এই প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহার বাবা কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। ছেলেটি তাহার মায়ের সঙ্কেত অনুসারে আমাকে নমস্কার করায় আমি তাহাকে কোলে লইতে গেলাম। তাহার মা বলিলেন, “আপনি ওকে কোলে নেবার চেষ্টা করবেন না, ও বড় ভারী।” আমি বলিলাম, “আমার ভারী ছেলে কোলে

নেওয়ার অভ্যাস আছে ; আমার এক নাতনী খুব ভায়া ।” এই কথা ছেলেটির মা তাহাকে জার্মেন ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার আমার প্রতি ছেলেটির সম্মান ও শ্রীতির ভাব খুব বাড়িয়া গেল । যাহার নাতনী তাহারই মত ভায়া, সে ত তবে সামান্য লোক নয় ।

আমি যখন বার্লিনে ছিলাম, তখন তথায় একটি পুলিশপ্রদর্শনী হইতেছিল । প্রদর্শনীর একটা বিষয় ছিল বিপ্লবচেষ্টা কেমন করিয়া দমন করা ও ব্যর্থ করা যায় । এই প্রদর্শনীর কোন কোন অংশ কেবল দেশী ও বিদেশী পুলিশ কর্মচারীদিগকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল ।

গত মহাযুদ্ধে জার্মেনীর দুঃখদারিত্ব্য কিরূপ বাড়িয়াছিল এবং এখনও তথায় কিরূপ দুঃখদারিত্ব্য আছে, তাহা আমরা খবরের কাগজে অনেক পড়িয়াছি । কিন্তু ড্রেসডেন ও বার্লিন সহরে আমি ত দারিদ্র্যের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখিলাম না । রাত্রিকালে ত বার্লিন ইক্ষুপূবী মনে হইত । বেলে জার্মেনীর ভিতর দিয়া যাতায়াতের সময়ও দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন দেখিলাম না । ইহার কারণ দুইরকম হইতে পারে । জার্মান জাতি খুব বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও শিল্প-নিপুণ । তাহারা সম্ভবতঃ যুদ্ধ শেষ হইবার পর এই কয় বৎসরে তাহাদের পূর্ব অবস্থার খুব কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে ; সুতরাং এখন আর দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখা বাইতেছে না । দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে, যে, আমবা ভারতবর্ষে যাহাকে দারিদ্র্য বলি, বোরতর যুদ্ধের সময়ও সেরূপ দারিদ্র্য জার্মেনীর হয় নাই ; সুতরাং তাহার কোন চিহ্ন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই । সম্ভবতঃ এই দুটা কারণেই আমি জার্মেনীতে দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন দেখি নাই । বস্তুতঃ, ইউরোপ অনেক স্থলে যাহাকে দারিদ্র্য বলে, আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক সেরূপ অবস্থার পৌছিলে আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিবে ।

জার্মেনীর লোকদের খুব মানসিক আতিথেয়তা আছে । সকল রকমের মত, চিন্তা, ভাব, আদর্শ তাহারা বুদ্ধিযোগে বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে, ইচ্ছুক । সব রকমের মত চিন্তা-আদির কম বেশী শ্রোতা ও পাঠক জার্মেনীতে পাওয়া যাইতে পারে । প্রচলিত মত বিশ্বাস চিন্তাধারার

বিপরীত বলিয়াই কোন কিছু জার্মেনীতে অগ্রাহ, অশ্রাব্য, অপাঠ্য হয় না । অবশ্য সকল জার্মানু পরমতসহিষ্ণু ও পবনত সঙ্কে কোতুহলী নহে । কিন্তু ঐরূপ লোক তাহাদের মধ্যে অনেক আছে, ইহাই আমার বক্তব্য । অন্ততঃ কতকগুলি ঐরূপ লোক যে জাতির মধ্যে নাই, তাহারা হৃদয় মন আত্মার কুণ্ঠিতে (কাল্পনিক) বড় হইতে পারে না ।

ড্রেসডেন ও বার্লিনের রাস্তায় ইস্তাহাবে ‘Ver-botten’ কথাটা যেন একটু বেশী দেখিলাম । শুনিলাম, সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে ইহা আরও বেশী ছিল । ইহার মানে “নিষিদ্ধ” । নিষেধের মাজাটা জার্মেনীতে বোধ হয় আগে বেশী ছিল, যেমন আমাদের দেশে আছে ।

বার্লিনে এক দিন এক মহিলার বাড়ীতে শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর ও আমার সাক্ষ্য আহারের নিমন্ত্রণ ছিল । তাহার স্বামী এক জন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, কিছু দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে । তিনি স্বয়ং এক জন বিদুষী ও বিখ্যাত অভিনেত্রী । তাহার স্বামীর গ্রন্থ সংগ্রহে এবং নানাদেশের মূর্তি সংগ্রহে খুব উৎসাহ ছিল । বহু ধীরে হিন্দু শিল্পীদের নির্মিত মূর্তি প্রথম ইহাদের বাড়ীতে দেখিলাম । ইহাদের লাইব্রেরীও বেশ বড় । ইনি অন্ততঃ এক দিন জার্মেনীর কোন একটি ভাল নাটকের অভিনয় দেখিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এবং আমার জন্য একটি বক্স ভাড়া করেন । কিন্তু আমি ইউরোপপ্রবাসকালে ৮ টার মধ্যে রাত্রির আহার শেষ করিয়া ঘুমাইবার নিয়ম রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম বলিয়া অভিনয় দেখা হয় নাই ।

বার্লিন হইতে আমরা চেকোস্লোভাকিয়া সাধারণতঃ প্রবাসীরা প্রাগ্ যাই । চেক ভাষায় ইহাকে প্রাগ বলে । ইংরেজী ও ইটালীয় ভাষার অনেক শব্দ ল্যাটিন হইতে উৎপন্ন । ইংরেজী ও জার্মানের অনেক কথা একই ধাতু হইতে উৎপন্ন । ইংরেজী ও ফরাসীর অনেক শব্দ ল্যাটিন ধাতু হইতে উৎপন্ন । এইজন্য ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যান্ড ও জার্মেনীতে রাস্তা ঘাট রেলওয়ে ধীয়ার দোকানের ইস্তাহাবের অনেক কথা আমার নিতট সম্পূর্ণ অপরিচিত বোধ হয় নাই । কিন্তু প্রাগে আনিমা প্রথম

মনে হইল, একেবারে এক নূতন দেশে আসিয়াছি। কারণ, চেকভাষার সহিত পূর্বোক্ত সব দেশের ভাষার খুব দূর স্ঘর্ষ। হোটেল, টেলিগ্রাফ, রেডিও, প্রভৃতি জগদ্ব্যাপী কয়েকটা কথা ছাড়া এখানে আমার জানা অল্প কোন কথা চোখে পড়িল না। কতকগুলি রুশীয় দোকান এখানে দেখিলাম। তাহার সাইনবোর্ডে রুশীয় অক্ষরে নাম লেখা রহিয়াছে। রুশীয় অক্ষর দেখিতে রোমক অক্ষরের মত, কিন্তু কোন কোনটা যেন ইচ্ছা করিয়া রোমক অক্ষর উল্টা করিয়া বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। ছোট ছেলেরা প্রথম ইংরেজী অক্ষর চিনিবার পর উহার ছাপার অক্ষর স্থিতিতে গিয়া যেমন মধ্যে মধ্যে উল্টা করিয়া লিখিয়া ফেলে, রুশীয় অক্ষর কখন কখন সেইরূপ মনে হয়।

প্রাগ শেখনে রবিবাবুকে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত অধ্যাপক ভিটারনিজ ও অধ্যাপক লেজনার আসিয়াছিলেন। ভিটারনিজ প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক, লেজনার উহার চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক। ইহারা উভয়েই কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেই উপলক্ষে ইহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল।

শীতের জন্ম যদিও রাতে কষ্টল ব্যবহার করিতাম, তথাপি ড্রেসডেন ও বার্লিনে রাতে খুব ঘাম হইত। প্রাগেও তাহাই হইতে লাগিল। জ্বর হইত না, শারীরিক দুর্বলতাও অনুভব করিতাম না। কিন্তু ঘাম এত বেশী হইত, যে, রাতে একবার উঠিয়া ভিজা নিদ্রার পোষাক বদলাইয়া পুনর্বার আর এক প্রস্থ নিদ্রার পোষাক পরিতে হইত। এই জন্ম একজন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া স্থির করিলাম। অধ্যাপক ভিটারনিজের কনিষ্ঠ পুত্র মাক্স ডাক্তার। তিনি আমাকে প্রাগের অভিজ্ঞতম ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার লী খুব বেশী নয়। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেহ পরীক্ষা করিলেন, প্রশ্নও অনেক করিলেন, কিন্তু কোন যান্ত্রিক বিকৃতি বা অল্প কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন, হয় ত যথেষ্ট পুষ্টি হইতেছে না, কিম্বা জেনীভায় যে দস্তুরোগের চিকিৎসা করা হইয়াছিল, সেই রোগের চিকিৎসার পূর্বে বিষাক্ত জিনিষ

রক্তের সহিত মিশিয়া থাকিবে। একটা ঔষধও তিনি দিলেন। রাতে পশমী নিদ্রার পোষাক ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। আমি স্ত্রী সব পোষাক আগেই শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এইজন্ম আবার স্ত্রী পোষাক কিনিতে হইল। মাক্স বলিলেন, তাঁহার মা কিনিয়া দিবেন। অধ্যাপক-পত্নী আমার একটা পশমী রাত-পোষাক লইয়া সেই মাপের দুটা স্ত্রী পোষাক আনিয়া দিলেন। দোকানদার বেশী দাম লয় নাই। ভিটারনিজ পরিবারের সকলেই বড় ভদ্র ও সহদয়।

প্রাগের একটা বিশেষত্ব এই, যে, ইহাব অনেক প্রতিষ্ঠান চেক ও জার্মানদের জন্ম আলাদা আলাদা; বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা, থিয়েটার আলাদা, বক্তৃতার হল আলাদা। শুনিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনও আলাদা, কিন্তু আমি তাহা নিজে লক্ষ্য করি নাই। রুশীয়দেরও কিছু আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, যেমন ১৯২১ সালে স্থাপিত উজ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় খুব পুরাতন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহার ছাত্রসংখ্যা দশ হাজার ছিল। চেক ও জার্মানদের সব প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা হওয়ায় রবিবাবুকে তাহাদের জন্ম আলাদা করিয়া বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই খুব জনতা ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। “ডাক ঘর” চেক ও জার্মান ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। চেক থিয়েটারের দৃশ্যপট ও পোষাক বেশী দামী বোধ হইল। চেকো-স্লোভাকিয়ায় জার্মানদের চেয়ে চেকদের সংখ্যা বেশী। উচ্চ সরকারী চাকরী পাওয়া জার্মানদের পক্ষে সহজ নহে। সরকারী সাহায্য জার্মান প্রতিষ্ঠানগুলি কম পাইয়া থাকে। সব বিষয়েই জার্মান ও চেকদের মধ্যে রেঘারোষ আছে মনে হইল। আগে চেকোস্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। অষ্ট্রিয়ানরা জার্মান, তাহাদের ভাষাও জার্মান। চেকরা দীর্ঘকাল এই অষ্ট্রিয়ান জার্মানদের অধীন থাকিয়া সেই সময়কার অসুবিধা ভুলিতে পারিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথের একদিনকার আবৃত্তির আগে অধ্যাপক লেজনার

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অনাবশ্যক লম্বা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তিনি বাংলা জানেন।

চেচ্‌বা রবীবাবুকে যে সাহায্য ভোজ দেয়, তাহাতে অধ্যাপক লেখনী তাঁহাকে বাংলায় অভিনন্দিত করেন। সভাস্থলে কেবল আর একজন ইউরোপীয় বাংলা বুঝিতেন। তিনি আগে বোম্বাইয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার কন্সাল বা বাণিজ্যদূত ছিলেন। নাম মিণ্টার ও পার্টোল্ড্‌। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ ভারতীয় লেখিকাদের সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিতেছেন। অধ্যাপক লেখনী আমাকে পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার বাংলা বক্তৃতাটা কেমন হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, মন্দ নয়, কিন্তু উচ্চারণ ভাল হয় নাই। তিনি বলিলেন, উচ্চারণ ঠিক হইবে এ আশা তিনি করেন নাই। এই ভোজের সময় এক বর্ষীয়সী চেক মহিলা আমার পাশে বসিয়া ছিলেন। কোন্টা নিরামিষ কোন্টা আমিষ দ্রব্য, তিনি তাহা বলিয়া দেওয়ায় তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার একটা প্রশ্ন নিমন্ত্রিত ভারতীয়কে জিজ্ঞাস্য বলিয়া আমার মনে হয় নাই। তিনি শুধাইলেন, “ভারতীয় জ্যৈষ্ঠলোক-দিগকে অকালে বুড়ো দেখায় কেন?” তাঁহার সামনেই এক ভারতীয় মহিলা বসিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও অভ্যাগতকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তিনি শিষ্টাচারসঙ্গত মনে করিলেন। “আমিও পান্টা জবাব শুধাইতে পারিতাম, “ইউরোপে অনেক বুড়ীও কেন কৃত্রিম উপায়ে বয়স লুকাইতে চায়, ইউরোপে জ্যৈষ্ঠলোকদের বয়স জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ কেন”, ইত্যাদি। কিন্তু আমার সেকলে প্রাচ্য আদবকায়দায় বাধা দিয়াছিল। আমাদের দেশে কৃত্রিম প্রসাধনের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেক মেয়েকে তাহাদের প্রকৃত বয়স অপেক্ষা ছোট দেখায়। অকাল-বার্দ্ধক্যও যে অনেকের না হয়, তা নয়। এই ভোজ ছাড়া অধ্যাপক ভিণ্টার্নিঙ্ক ও অধ্যাপক লেখনী আলাদা আলাদা দিনে রবিবাবু ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয় দিনেই সহরের বিস্তর মান্তগণ্য পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। খাবার ছিল নানা রকমের ও প্রচুর। সংগীতের আয়োজনও বেশ ছিল। ভিণ্টার্নিঙ্ক মহাশয়ের চা-পার্টিতে পিয়ানোতে

ক্রইটসার সোনাটা অনিলাম। আমি পাস্‌কাত্‌ সংগীত বুঝি না। রবিবাবু খুব প্রশংসা করিলেন। অধ্যাপক লেখনীর পার্টিতে এক চেক ভজ লোক গান করিলেন। তাঁহার গলা এমন মোটা ও জোরাল, যে মনে হইতেছিল যেন ঘর ফাটিয়া যাইবে। তিনি পবে নিজেই পরিচয় দিলেন, যে, তিনি ফুটবল খেলোয়াড়। গলাটা পালোয়ানের মত বটে।

ভিণ্টার্নিঙ্ক পরিবারে আমাদের সকলের একদিন মাধ্যাহ্নিক আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। ইহা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। অধ্যাপক-পত্নী হিন্দু গৃহিণীর মত আমাকে সব জিনিষ বেশী করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজী জানেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার মাস্ক বলিলেন, মা বলিতেছেন আপনি কিছু খান না, সেই ক্ষণ আপনাকে রাখে ঘাম হয়। আমি বলিলাম, তুমি আমার ডাক্তার; তুমি তোমার মাকে তোমার রোগীর গোপন কথা কেন বলিলে? মাস্ক হাসিয়া বলিলেন, মাকে বোর্গার এরূপ গোপন কথা বলায় দোষ নাই। অতঃপর অধ্যাপকপত্নী পায়সের মত একটা জিনিষ খুব বেশী করিয়া আমার পাতে ঢালিয়া দিলেন।

আর এক দিন আমরা এক ধনী চেক কবির নিমন্ত্রণে রবিবাবুর সঙ্গে তাঁহার উদ্যানবাটিকা ও লাইব্রেরী দেখিতে গিয়াছিলাম। লাইব্রেরীর বাড়িটো এবং বহি-গুলির বাধাই বেশ সুন্দর। এখানে চেক কবি রবিবাবুকে বৃষ্টির মধ্যে বাগান দেখিতে লইয়া যাওয়ায় তিনি ভিজিয়া যান ও পবে অসুস্থ হন। এই উদ্যানবাটিকা প্রাগ্‌ হইতে অনেক মাইল দূরে। যাইবার সময় দুই দিকে দেখিলাম ছোট ছোট গ্রামেও সুন্দর ছুতলা তেতলা হোটেল রহিয়াছে। মাঠে পুরুষ ও জ্যৈষ্ঠলোকেরা আপাদ-মস্তক মোটা শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া ও ভারী ভারী বুট পরিয়া চাষের কাজ করিতেছে। সেইরূপ পোষাক-পর্যায় লোকদিগকে মাঠ হইতে গরুর গাড়ীতে ও ঘোড়ার গাড়ীতে শস্ত আনিতেও দেখিলাম। এতদ্ব্যতীত নদীর আঁকা বাঁকা স্রোত এক জায়গায় নূতন কৃত্রিম সেতু খালে ঢালাইয়া নৌচালনের সুবিধা করা হইয়াছে, দেখিলাম।

প্রাণের একটি ইস্কুল আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এখানে রাস্তায় কুড়ান অনাথ ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের গান ও নৃত্য বড় সুন্দর। নানারকম সুন্দর কারুকার্য দ্বারা তাহারা রোজগারও করে। জন্মাবধি উভয়হস্তহীন একটি ১৮।১৯ বৎসবের ছেলে কেবল পায়ের সাহায্যেই সুন্দর কারুকার্য করিতেছে দেখিলাম। কৌতুক দেখাইবার জন্য সে পায়ের দ্বারাই দিগ্বাশলাইয়ের বাক্স ধরিল, কাঠি বাহির করিল, বাক্সের পাশে ঘষিয়া আলিল, মুখে চুরুট তুলিল, এবং তাহাতে আগুন ধরাইল। আমাদের দেশে এইরূপ অঙ্গহীন অনাথ ছেলেদের কি দশা হয়?

প্রাণ খুব পুরাতন ও সুন্দর সহর। ৭২২ ঈশাব্দে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আমি কিন্তু উহা ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই। নানাকারণে মন ভাল ছিল না। তা ছাড়া, কতকটা অধ্যাপক লেজনার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি একদিন ঠিক সময় নির্দেশ করিয়াও আসিতে ও কিছু দেখাইতে পারেন নাই। যখন জেনীভায় ছিলাম, তখন তিনি আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাণে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমাদের সুন্দর প্রশংসা দেখিবেন না কি?” প্রাণে আমার কোন সাহায্য করিতে পারিলে তিনি সম্মানিত ও আনন্দিত হইবেন লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তিনি কিছু করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার আত্যন্তিক বৃদ্ধি ইহার দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বলিয়া ইংরেজরা বর্ণনা করেন। কিন্তু অস্ট্রিয়া দেশে ত লোকসংখ্যা খুব বাড়িলেও দারিদ্র্য হয় না। প্রাণে বাল্লিনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছি। প্রাণের কথাও বলি। ১৮৮০ সালে উহার লোকসংখ্যা ছিল ২,৯৩,৮২২; ১৯২১ সালে উহা হয় ৬,৭৬,৬৫৭। যখন গত (১৯২৬) অক্টোবর মাসে সেখানে যাই, তখন অধ্যাপক লেজনার মুখে শুনিলাম লোকসংখ্যা

আট লাখের উপর হইয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্যের চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। রাস্তায় একটাও ভিখারী নাই। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের জন্য যথেষ্ট ঘরবাড়ী তাড়াতাড়ি তৈরী করা কঠিন। এইজন্য দূর হইতে দেখিলাম কতকগুলি পুরাতন রেলগাড়ী বাসগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

নানারকম কল, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া ও কার্পাসের নানাবিধ জিনিষ, দস্তানা প্রভৃতি প্রাণে তৈরী হয়। চেকোস্লোভাকিয়া ভারতবর্ষে চিনি এনামেলের জিনিষ, কাঠের জিনিষ, কাপড় প্রভৃতি চালান করে। আমরা ইউরোপের কোন্ দেশে কি জিনিষ তৈরী করিয়া পাঠাই?

প্রাণের একখানি প্রধান চেক্‌ সংবাদপত্রের দুজন প্রতিনিধি ভারতবর্ষের অবস্থা জানিবার জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা কি টুকিয়া লইলেন, কিই বা ছাপিলেন, বলিতে পারি না।

রাজ্যে বাম হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে আমি প্রাণ হইতে জেনীভায় ফিবিয়া আসিয়া সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া দেশে ফিবিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় খুব ভাল ডাক্তার আছেন, এই কারণ দেখাইয়া শ্রীমান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ আমাকে ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাইতে বলিলেন। সুতরাং ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করিলাম। ট্রেনে রবিবার অহুহ হন। শ্রীমান প্রশান্ত, শ্রীমতী নির্মলকুমারী দেবী ও আমি খাইবার গাড়ীতে বসিয়াছি, এমন সময় সেই গাড়ীতেই উপবিষ্ট এক জাপানী ভদ্র লোক উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, “আপনি রবাস্ত্রনাথ ঠাকুর কিনা, জিজ্ঞাসিতে পারি কি?” আমি বলিলাম, “আমি রবাস্ত্রনাথ নহি। তিনি এই গাড়ীতেই নিজের কামরায় আছেন।” তখন জাপানীটি ফিবিয়া গিয়া নিজের জায়গায় বসিলেন।



বিদেশ

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা—

দক্ষিণ-আফ্রিকা

দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসীদের ভারতীয়দের স্থপ-স্থবিধা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারত সরকার মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে তথাকার এক্সেক্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সংবাদ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীরাও এই নিয়োগে সুখী হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতের বোগহুত্র স্থায়ী হইবে। তদ্রূপ 'জাঞ্জিবাৰ ভয়েস' নামক স্থবিধায় দৈনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় একজন ভারতীয় হাই কমিশনার নিয়োজিত হইলে ইন্দো-আফ্রিকান বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবে।

ডাঃ হুদীজ বহু

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত আইওয়া টেটের অধ্যাপক ডাঃ হুদীজ বহুর পথিচ আমাদের পাঠকবর্গের নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বহুদিন আমেরিকা প্রবাসী। যদিও তাঁহার বিদ্যে কোন অভিযোগ আনীত হয় নাই তথাপিও ইংরেজ সরকার নানা ছলে তাঁহার ভারতে আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

সম্প্রতি কতকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্র অভিযোগ করিয়াছেন যে তিনি (ডাঃ বহু) "উদ্ধৃত সহকারে" ভারত সরকারের "মহৎ প্রস্তাব" উপেক্ষা করিয়া "স্বেচ্ছায়" ভারতের বাহিরে রহিয়াছেন। ডাঃ বহু একখানি পত্রে লিখিয়াছেন * সংবার পত্রগুলির এই অভিযোগ একেবারে ভুল। তিনি লিখিয়াছেন ভ্রমিক সমস্ত মিঃ বিয়েট গত কেক্সারী মাসে পার্লামেন্ট মহাসভায় প্রায় করেন যে তাঁহাকে (ডাঃ বহু) ভারতে অবেশ করিতে কেন বাধা দেওয়া হইতেছে এবং তাঁহার বিদ্যে আনীত তথাকথিত অভিযোগগুলির পূর্ববিচার হইবে কি না। উত্তরে সরকার গণ্ডীয় মন্ত্রী বলেন মিঃ বহু যে কোন সময় ভারত প্রবেশের অমুমতি পাইতে পারেন। ইহা পর হইতে বহুবার আবেদন করিয়াও তিনি ভারত প্রবেশের অমুমতি পাইতেছেন না। এই এসঙ্গে বলা দরকার যে ডাঃ বহুর তাঁহার বুদ্ধা মাতাকে দেখিবার জন্য ভারতে আসিবার অমুমতি চাহিয়াও পান নাই।

তাঁহার উক্ত চিঠিতে ডাঃ বহু আরও লিখিয়াছেন যে বিগত মহা-যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

* এই পত্রখানি জুন মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সুতরাং ব্রিটিশ সরকার এখন হঠাৎ তাঁহাকে ব্রিটিশ ভারতে অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের ইংরেজ রাজদূতের নিকট জানান যে, তিনি একসময়ের দুটি লইয়া বিদেশে যাইবেন তাঁহাকে যেন ভারত হইতে নিরাপদে আসিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে ইংরেজ রাজদূত জানাইয়াছেন যে তাহা সম্ভব হইবে না। এই ক্ষণ ডাঃ বহু প্রায় করিতেছেন...

"আমি ইংরেজের প্রজা নহি এবং পাঁচ বৎসর ভাবতে বাম না করিলে ইংরেজের প্রজারূপে গণ্য হইতেও পারিব না...কাজেই কোন আইনের বলে ভারতের ইংরেজ সরকার অথবা দেশের নিরপরাধ অধিবাসীকে ভারত-বর্ষে আটকাইয়া রাখিতে চান? ইহাতে মনে হয় আমি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ভয়াবহ দোষ করিয়াছে এবং আদালত বিচারের পূর্বেই দণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি।" এরূপ বিচার গ্রহণন না করিয়া প্রাক্তন আদালতে বিচার করিবার সাহস কি অভিযোগকারীদের নাই?

স্কটল্যান্ড বর্ণ-বিষয়

এডিনবারার (স্কটল্যান্ড) ভাবতীয় ছাত্র সম্ভব সম্পাদক সাংবাদ-পত্রে একখানি পত্র লিখিয়া তথাকার ভারতীয়দিগের দুর্দশা কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পত্র হইতে জানা যায় যে, স্কটল্যান্ড তথা-কথিত সভ্য দেশে ভারতীয়েরা নানাভাবে কি প্রকার অসম্মান, লাঞ্ছনা ও নির্ধ্যাতন সহ্য করিতেছেন। ভারতে জন্মান যদি এতটী অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধের শাস্তি ভারতীয়গণ স্বাধীন দেশে গিয়াও পাইতেছেন।

ছাত্র-সম্ভব সম্পাদক জানাইতেছেন যে,—এখানে আসিলে উদ্ধৃত সাম্রাজ্যবাদী খেতাবদিগের জাতি-বিষেবের চূড়ান্ত প্রমাণ পড়া যায়। এবং তাঁহারা বড় আশা লইয়া গ্রেটব্রিটনে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা আগমন করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্র হইতে তাঁহাদের যেন চোখ ফুটে। ইহার পরেও যদি গ্রেটব্রিটনে আসিতে সাধ হয়, তবে সমস্ত প্রকার নির্ধ্যাতনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই যেন তাঁহারা এখানে আগমন করেন।

এখানকার ভারতীয়গণ সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যদিগের মতই জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হন। শুধু একটীমাত্র ব্যাপার হইতেই ইহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। গত ৩০শে এপ্রিল "স্কচ ম্যান" নামক এডিন-বারায় এক সংবাদপত্রে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে, ১১নং চামান স্ট্রীটে বাসস্থানের অতি হালকা বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু তথায় ভারতীয়গণকে গ্রহণ করা হয় না।

এখানকার সামান্য একজন বাড়ীওয়ালী কিম্বা অতি সাধারণ অবস্থার খেতাব পঞ্চম ভাবতীয়দিগের সহিত আদানপ্রদান করিতে চুপা বোধ করে। স্কটল্যান্ড হইতে ভারতীয়দিগকে কালচামড়ার অপবাধে

বহিষ্কৃত করিবার জন্ত যেন একটা হুনিরস্রিত অভিব্যক্তি চলিয়াছে। এডিনবারার একটি প্রধান রেস্টোরাঁ। ভারতীয় ছাত্রদের সমন্বয়গণকে জানানাইয়াছেন—“২৩শে তারিখ হইতে কোন ভারতীয়কে রেস্টোরাঁয় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।” কারণ তাহারা কৃষ্ণকায়।

দুর্ভাগ্যের ইহাই চরম নহে। এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পর্যন্ত বর্ণ-বিষেব রূপ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। এখানকার স্কচ ছাত্রগণ যেন ভারতীয়দের সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করে। কোন সামাজিক ভাবে মেলামেশা দূরে বসে। তাহারা ভারতীয়দের সহিত কথাই বলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎসরিক সামাজিক সম্মিলনে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও দুইজন ভারতীয়কে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ভারতীয়দিগকে বর্ণের অপরাধের জন্ত রয়েল মেডিক্যাল সোসাইটিতে, সি-টি-সিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তর-দ্বান ক্রীড়াঘ ভোগ দিতে দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষ

তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রী—

রেলওয়ে বোর্ড আপাতী বৎসর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের নানাকল্প হুবিধার জন্ত দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শিশুশ্রম বিল—

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার আপাতী অধিবেশনে মাননীয় মিঃ তাৎ ১৯২৭ সনের “শিশুশ্রম বিল” নামক একটি বিল উপস্থাপন করিবেন। এই বিল উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য বর্ণনাশ্রমকে মিঃ তাৎ বলিয়াছেন :—

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের অপরাধীদের হিসাবনিকাশ হইতে জানা যায় যে, অত্যন্ত অপরাধীদের অধিকাংশই ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবার পূর্বে হইতেই দ্রুতগতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা ট্রেণে ভ্রমণ করেন তাহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন যে, সামান্য মাত্র গোবাক পরিয়া কদাকার, ক্ষুদ্র এবং অরাজকীয় কতকগুলি বালক-বালিকা দুই এক পয়সা সাহায্যের জন্ত যাত্রীদিগকে প্রতি ট্রেনেই বিরক্ত করিয়া থাকে। প্রত্যেক বড় বড় সহবেই দেখা যায় যে, গৃহহীন, মধ্যলহীন এবং অকর্ণণ্য বালক-বালিকার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা জীবিকাধিকারের জন্ত কোন কাজ করে না; কেবল জনসাধারণের ঘরার উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটায়। রাত্রিকালে চুরি করিয়া ট্রেণে চড়িয়া এই সমস্ত ভিক্ষুক এক সহর হইতে অপর সহরে যাইয়া আশ্রয় লইয়া যখন কোনপ্রকারেই আহার জুটে না তখন ইহারা অন্তর্য কার্য আরম্ভ করে। অমূল্যকালে জানা যায় যে, কতকগুলি দুষ্টলোক আছে যাহারা এই সমস্ত হতভাগ্য বালক-বালিকাগণকে দ্রুতগতি শিক্ষা দেয় এবং তাহাদের দ্বারা দ্রুতগতি কসাইয়া লইয়া লব্ধ জিনিষের একটা অংশ গ্রহণ করে। এই সমস্তের প্রতিরোধ করাই বর্তমান বিলের উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত বালকবালিকা অসহায়, গৃহহীন, অরহীন এবং বয়স্ক হইবার তাহারিগণকে আশ্রয় দিতে হইবে। যাহারা এই হতভাগ্য বালক-বালিকাগণকে মনোযোগে প্ররোচিত করে তাহারিগণকে প্রেরণা করিয়া

করিয়া যথোচিত শাস্তি দিতে হইবে। তারপর ইহাদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই স্কুলে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে হতভাগ্য বালকবালিকাগণ নিজেদের জীবিকাধিকার করিতে সমর্থ হয়। এতদ্বির যুবক-অপরাধীদের অপরাধের বিচার করিবার জন্ত বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ইহাদের বিচার ও শাস্তির জন্ত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ের কথা এইবিলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

মহিলার কৃতিত্ব—

বিহার সরকার এই বৎসর ছয় জন ছাত্রকে শিক্ষালাভের জন্ত বিদেশে প্রেরণ করিবেন। তন্মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নয়না দেবী মনোনীত হইয়াছেন। বিহারী মহিলাদিগের মধ্যে তিনিই শিক্ষালাভের জন্ত প্রথম বিদেশে যাইতছেন।

অহিফেন—

দেশীয় রাজ্যগুলিতে অহিফেনের চাষ কমাইবার জন্ত এবং যাহাতে দেশীয় রাজ্যে উৎপন্ন অহিফেন, ব্রিটিশ ভারতে এবং পূর্ব-এশিয়ায় অবৈধভাবে চালান না হইতে পারে, সেজন্য ভারত গবর্ণমেন্ট দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে লইয়া সিমলায় এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। এই বৈঠকে বড়লাট এক হুদারী বক্তৃতায় অহিফেন সম্পর্কে ভারত-গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অহিফেনের চাষ কমাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন।

ইউরোপে জাতি সজ্জব তত্ত্বাবধানে জগদ্ব্যাপী বৈধ ও অবৈধ অহিফেন ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্ত অথবা বহল পরিমাণে অহিফেন চাষ কমাইবার জন্ত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে বৈঠক বসিয়াছিল, ভারত-গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ভারতের অহিফেন ব্যবসায় বন্ধ না করিলেও সংযত করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে সে কথা বড়লাট স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং বক্তৃতাশ্রমে এবং বাকপুতনায় অহিফেনের চাষ যে গবর্ণমেন্ট বহু কমাইয়া দিয়াছেন, সে কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বড়লাট তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, পূর্ব-এশিয়ায় দেশগুলিতে এবং ভারতেও অহিফেনের চাহিদা এত অধিক যে, লোকে লোভের বশবর্তী হইয়া অহিফেনের অবৈধ ব্যবসাকে প্রবৃত্ত হয়। ইহা রোধ করা কঠিন হইলেও তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী—

জবলপুরের ক্ষত্রিয় সভা এবং হিন্দু নেতাদের উদ্যোগে গত মাসে মহাসমারোহে মহারাণা প্রতাপের জন্মতিথি-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাণার একখানি বৃহৎ চিত্র সুসজ্জিত করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রায় দশ হাজার লোক এক মিছিল বাহির করে।

বাংলা

বাকুড়ায় সাঁওতাল সমিতি—

পরিষ্কৃত ও আচার ব্যবহার হুনিরস্রিত করণার্থ বাকুড়া জেলার সাঁওতালগণ এক সমিতি গঠন করিয়াছে। গ্রামের মণ্ডলগণ এই সমিতির সভ্য। তাহারা গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া স্থির করিয়াছে—

১। কোন সাঁওতাল নরনারী আর বাঙ্গালীর জার পাতলা কাপড় পরিধান করিবে না।

২। কোন সাঁওতাল আর শুঁড়ির দোকানে মদ খাইবে না।

৩। কোন সাঁওতাল জীলোক আর বাঙ্গালীর অমুকরণে চুড়ি হাতে দিবে না।

৪। সাঁওতাল জীলোকেরা আর সাঁওতাল ভিন্ন অস্ত্র কোন জাতির বাড়ীতে নাচ গান করিতে যাইবে না।

এই চারটি নিষেধের মধ্যে যে কোন একটি নিষেধ লঙ্ঘন করিলে তাহাকে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি দেখাইয়া দিবে যে কোন সাঁওতাল শুঁড়ির দোকানে বসিয়া আছে সে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবে।

উক্ত বিধি নিষেধগুলি তাহাদের মুখের কথা নহে। তাহারা তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছে। প্রতিদিনই সমস্ত গণে সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া নিষেধ অমান্যকারী বসিয়া করিতেছে।

সামাজিক শাসন বড়ই গুরুত্ববাহী। যে জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে না দিবে সকল সাঁওতালই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত সকল সংশ্রব-ত্যাগ করিবে। এই শাসনের ভয়ে টাকাও আদায় হইতেছে।

আমরা এইসকল কথা শুনিয়া কয়েকটি সাঁওতাল বস্ত্রীতে গিয়া শুনিলাম যে প্রত্যেক নরনারী এই বিধি নিষেধ রক্ষার জন্য দুচন্দ্র করিয়াছে।

—বীকুড়া-দর্পণ

অন্ধ ছাত্রের কৃতিত্ব—

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীহরোচন্দ্র রায় এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতে শ্রীনন্দেন্দ্রনাথ সেন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন।

বঙ্গীয় জেলাতন্ত্র কমিটি—

বঙ্গীয় জেলা তন্ত্র কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) ওয়ার্ডবাদের কার্যের অবস্থার উন্নতি সাধন ; (২) ওয়ার্ডার এবং অস্ত্র জেলা কর্তৃকারীদের শিক্ষিত করিবার জন্য স্কুল স্থাপন ; (৩) কয়েদীদিগকে কর্তৃকারী নিয়োগের হ্রাস বিধান ; (৪) জেলাবের কর্তৃকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, কেরাণীর কাজ এবং জেলা শাসনের কাজ পৃথকীকরণ ; (৫) বড় বড় জেলে কয়েদীদিগকে একত্র করণ ; (৬) বিভিন্ন জেলের কয়েদীদিগকে পৃথক করণ ; (৭) সকল জেলে সেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ ; (৮) জেলের মধ্যে চরিত্র সংশোধনের উপায় বিধান ; এবং (৯) মুক্তির পর কয়েদীদের জন্য বস্ত্র লওয়া।

রবীন্দ্র জয়ন্তী—

পটিল বৈশাখ রবিবার সাক্ষ্যদীপালোকে মরমনসিংহ রবীন্দ্র সঙ্ঘের উদ্যোগে পৃথকসকল টাউন হলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবিশ্রম রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্পপল্লব শোভিত আলোক মণ্ডিত উৎসব বৈদীর একান্তে কবিশ্রমের তৈলচ্ছিন্ন স্থাপিত ছিল। সভায় রবীন্দ্র সাহিত্যমোদী বহু নরনারী উপস্থিত

ছিলেন। শ্রদ্ধাধিনি সহকারে স্বত্বিক বরণের পর স্বরস্বর সংযোগে একটি বৈদিক মন্ত্র গান হয়। তারপর উদ্বোধন সঙ্গীতান্তে কবিশ্রমের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপক কবিতাটি পঠিত হয়।

সভায় কবিশ্রমের কতিপয় কবিতা আবৃত্তি হয়। মধ্যে মধ্যে একাতন বাদন হইয়াছিল।

স্বস্তি বচনে সভাপতি বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে বাঙালী ভাষার ক্রম-বিকাশের ধারা আলোচনা করিয়া একটি হললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মহৎ দান—

(১) হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের নিকটবর্তী বাহিরখণ্ড গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভট্ট মহাশয় তাঁহার বাস-ভবনের নিকটে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে প্রায় ২০২২ শানি গ্রামের বালকদের শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ছিল। ভট্ট মহাশয় তাঁহার অশেষ করুণাশ্রমে এই স্থল প্রতিষ্ঠাকালে স্থূল ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা এবং স্থূল গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় ২০ হাজার টাকা দান করিতেছেন। তাঁহার এই মহৎ কার্যে ২০২২ শানি গ্রাম প্রভূত উপকৃত হইল। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষাদানের এই সুযোগ প্রদান করিয়া তিনি সমগ্র দেশেরই মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

(২) চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ ২৪ নং গোরাইদ রোড হইতে জানাইতেছেন যে, মিঃ বিপিনচন্দ্র মল্লিকের মারকৎ মিঃ তেজপাল বসুনাথ ১ হাজার টাকা উক্ত হাঁসপাতালে দান করিয়াছেন। এবং হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ উহা ধন্যবাদে, সহিত গ্রহণ করিতেছেন।

টাকা অনাথ আশ্রম—

অমূল্যমান অনাথ বালক বালিকাদিগকে এই আশ্রমে প্রতিপালন, অন্নবস্ত্র এবং লেখাপড়া এবং জীবিকা নির্বাহোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। এ-পর্ধ্যন্ত আশ্রমের অনেক বালক প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে এবং ১০টি বালিকা বিবাহিতা হইয়া স্বখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। বর্তমানে এক মাস হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ১১টি বালক ও ১২টি বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে—আরও ১০১২টির স্থান আছে। আশ্রমের সন্ত্য ও সহানুভূতিকারিগণের নিকট নির্বন্ধাতিশয় নিবেদন যে নিম্নলিখিত কোন প্রকারে সাহায্য করেন :—(১) অর্থ বা বস্ত্র বা খাদ্য দান অথবা ইহা সংগ্রহ এবং নূতন সন্ত্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। (২) ৮ বৎসরের নূন নিবাস্ত্র বালক বালিকা পাঠাইলেও বাধিত হইবে। (৩) প্রধান অর্থাৎ এক মাস শিশুর জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী।

শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম—

আমরা শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ১৩০০ সনের বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। বিগত বর্ষে আশ্রমেব কার্যের প্রসার হইয়াছে ও বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

বন্ধে বিধবা-বিবাহ—

মরমনসিংহ

বর্তমান সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মরমনসিংহ জেলার মদন ধানার

এলাকাধীন জঙ্গীপুর গ্রাম নিবাসী মৃত বৈষ্ণবদাসের বিধবা কন্যা শ্রীমতী অমৃতহুম্মারী দাসীর সহিত উক্ত গ্রামের শ্রীমান প্রিশিনচন্দ্র দাসের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ ও উন্মত্তের সহিত বিবাহে যোগদান দিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে এই প্রথম নিধবা-বিবাহ। শ্রীযুক্ত গয়ানাথ চৌধুরী ও তাহার সহকর্মীগণ বিধবা-বিবাহ ও ধর্মিতা নারীর সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ চাঁদী কৈবর্ত সমাজে ৫টি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই সমাজ বহু বিতৃত এবং অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল।

১। বর শ্রীঅধর চন্দ্র দাস পিতার নাম ৩৩৩৩৩৩৩৩ দাস বয়স ৩৫ বৎসর, সাং কাগমার। কন্যা শ্রীমতী সনোমোহিনী পিতা শ্রীনীতানাথ দাস সাং টাঙ্গাইল। বয়স ১৭ বৎসর।

২। বর শ্রীকান্তিচন্দ্র দাস, বয়স ৩০ বৎসর, পিতা ৩৩৩৩৩৩ দাস সাং বেড়াডোম। কন্যা শ্রীমতী সুশীলা হুম্মারী। বয়স ১৭ বৎসর পিতা শ্রীহুহুচন্দ্র দাস সাং আশকপুর।

৩। বর শ্রীতারিণীচরণ দাস বয়স ২৮ বৎসর, পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস সাং বালা। কন্যা শ্রীমতী রাজেশ্বরী বয়স ১৪ বৎসর, পিতা হরচন্দ্র দাস সাং পোড়াবাড়ী।

৪। বর শ্রীপঞ্চানন দাস, বয়স ৪৬ বৎসর, পিতা ৩৩৩৩৩৩ দাস সাং ঢালান। কন্যা শ্রীমতী রাধাশ্রী বয়স ১৮, বৎসর পিতা ৩৩৩৩৩৩৩৩ দাস সাং বেড়াডোম।

৫। বর শ্রীহর্যনারায়ণ দাস বয়স ৩০ বৎসর, সাং দাইরা। কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বয়স ১৪ বৎসর, পিতা গয়ানাথ দাস (৮ বৎসরে বিবাহ ৯ বৎসরে বিবাহ হয়।) এই সমাজে বালা-বিবাহ অর্থাৎ ৭-৮ বৎসরেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া থাকে।

কিন্তু ২২রা জ্যৈষ্ঠ টাঙ্গাইল মহকুমায় মির্জাপুর থানার অধীন করড়া কাউন্সিলরী নামক গ্রামে নমঃশূত্র সমাজের ভিতর একটি বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঢাকা

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ “বিক্রমপুর যুবক-সম্মিলনীর” প্রচেষ্টায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার এলাকাধীন নোয়াদা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রাজবংশীর বিধবা কন্যা (বয়স ১০ বৎসর) সহিত গোবিন্দপুর নিবাসী শ্রীগদাধরচন্দ্র রাজবংশীর সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে উক্ত সমাজে আরও ২টি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

মেদিনীপুর

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার তিলস্তপাড়া বিধবা-বিবাহ-সভার উদ্বোধনে মেদিনীপুর জেলার, সব থানার কাপাসুরী গ্রামে তেলী জাতীয় শ্রীযুক্ত নাম সাউর পুত্র ২০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান কুমারনারায়ণ সাউর সহিত মোহাড়া নিবাসী ৩৩৩৩৩৩ সাউর কন্যা ১৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীমতী শান্তালা দাসীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ-সভায় তিলস্তপাড়া বিধবা-বিবাহ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ মাইতি ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মাইতি ও পার্শ্ববস্ত্র গ্রামসমূহের প্রায় ২০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।

নদীয়া

গত ২৮শে বৈশাখ, বুধবার নদীয়া-জেলা দত্তপালিয়া গ্রামের ৩৩৩৩৩৩-প্রদার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গঙ্গাপ্রদার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দধবল নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী শ্রেহলতা দেবী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাইকগাড়া—রাণীরোডে এই বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তারকবাবুর (কন্যার পিতা) সমাজস্থ বিশিষ্ট ভক্তমহোদয়গণ বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকিয়া শুভ কাণ্ড সম্পন্ন করাইয়া-ছিলেন এবং বরপক্ষীয় বন্ধুবান্ধবগণও উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

গত ১১ই বৈশাখ বেড়া থানার অন্তর্গত সিংহাসন জোয়ারিপাড়া নিবাসী শ্রীঅনাথবন্ধু প্রামাণিকের সহিত রাক্ষস নিবাসী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের বিধবা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দাসীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্র পাত্রী নমঃশূত্র জাতীয়। স্থানীয় নমঃশূত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও অনেক ব্রাহ্মণ, কাহন্য ভ্রমলোক বিবাহ সভার উপস্থিত থাকিয়া এই বিবাহ অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছিলেন।

সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন:—

সকল ঠিক হইতে বিধবা বিবাহের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইলেও একদল লোক আজও আইনের কুটর্ক তুলিয়া এই সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য অনেকস্থলে তাহাদের এই চেষ্টাও সফল হইবা থাকে। ভারত বর্ণমন্ডল ১৮৫৬ সনে আইন প্রণয়ন করিয়া বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। এখন এইরূপ বিবাহের সম্ভাবনা তাহার পিতার বিস্তার আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বলিয়াই বিবেচিত হয়। কবেক বৎসর পূর্বে মিরটের অধিবাসী মিঃ রাধেলাল তাহার বিধবা কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দেন। পণ্ডিত ঘাসিরাম তাহাকে সাহায্য করেন। ইহাতে তৎপাকার পণ্ডিত সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। মিরটের প্রতিপত্তিশালী লোকগণ এক সভায় সমবেত হইয়া এই দুষ্কার্যের জন্য মিঃ রাধেলাল ও পণ্ডিত ঘাসিরাম প্রভৃতিকে সমাজচ্যুত করেন। অতঃপর ইহাদের বাড়ীতে সকলের খাওয়াদাওয়া এবং বাওরা-আসা বন্ধ হইয়া যায়।

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত ঘাসিরাম এবং মিঃ রাধেলাল ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারা অনুসারে উপরোক্ত মোড়লদের নামে একটি অভিযোগ উপস্থিত করেন। নিম্ন আদালত পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তিকে ৩০০ টাকা জরিমানা এবং তাহা পরিশোধ না করিলে চারিমাস কারাবন্দের আদেশ হয় এবং সেই সঙ্গে আরও দুইজনকে ২০০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড এবং তাহা পরিশোধ না করিলে তিন মাস করিয়া কারাবন্দের আদেশ হয়। অতঃপর দায়রা আদালতে আপীল করা হয়। এখানেও মামলার সাবেক রায় বাহাল থাকে। আপীলকারীগণ তখন আবার হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্যাগট তাহার রায় নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। এইরূপে বার বার ব্যর্থমনোবণ হইয়া বিধবা বিবাহের প্রতিবাদীদল মনের দ্রুখে নিরস্ত থাকিয়া দণ্ডভোগ করিতে বাধ্য হয়। পঞ্চায়েতের দেশের উচ্চতম বিচারালয়ের বিধানে স্থিরকৃত হইল যে, বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী প্রচেষ্টাকে চূর্ণ করিতে যাওয়া সর্বতোভাবে বে-আইনী। আশা করি, ইহার পর বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আইনের ভীতিমূলক আব কোনও প্রকার ভ্রান্ত-ধারণা বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

সঙ্গে একটি দিনের জন্তেও প্রীতি-বিনিময় হয়েছিল তাকে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করলে। টাইম্-অফুনারে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে কি স্বপ্ন!

রাজা।

কেন নয়? সবাইর চেয়ে উচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়-লঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মালা, গায়ে সিল্কের লাম্বী জামা, জীবনে এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা জামের জুতো,—হু-মাস টিউশানি করে যা জোটেনি।

ছেলেরা চোঁচামিচি করছে, মেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ছে ও বর্ষার জলধারার মতো কলরব করছে। বন্ধুরা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে যাচ্ছে। চিকের পেছনে বর্ষায়নী মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে,—উলু দিয়ে দিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। উলু দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হয়ে গেল দেখে একটি মেয়ের স্রোতের মতো কি স্বচ্ছ হাসি।

এ বাড়ীতে আজ যেখানে যা হচ্ছে সবই ত অমরের জন্ত। খাবার নিয়ে আশাকুঁড়েতে কুকুরগুলি যে লড়াই বাধিয়েছে, তাও। যা কিছু বাজনা, যা কিছু হাসি, যা কিছু কোলাহল!

ঐ যে নিভৃত দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী ওর ছুটি হাত জুলে ওর চুলেব খোঁপাটা ঠিক করে গুছিয়ে নিচ্ছে, চুলের কাঁটাগুলি ফের ভালো করে গুঁজে দিচ্ছে,—সেও ত তারই জন্ত!—অমর ভাবছিল। নইলে আজ রাতে মেয়েটি কখনো এই নীল শাড়ীটি পরত না, মাথায় কখনো গুঁজত না ঐ শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললে বটে, কিন্তু অমর ঘাড় ভেঙে রইল, মুখ তুলে চাইল না। পাছে ভুল ভেঙে যায়। বালি একটি কথাই মনে পড়ছিল তখন।

লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম আপনার বউয়ের? অমর বলেছিল—অহুপমা।

লুসী ধপ করে বলে ফেলেছিল—ওমা! আমরা ভালো নাম যে তাই। বলেই রাঙা হয়ে উঠে মুচকে হেসেছিল একটু।

পাছে তেমনি রাঙা হয়ে উঠতে না পারে। পাছে—

অহুপমা নিজে কুৎসিত হ'লেও আশা করেছিল ছবির পাতায় রাজপুত্রের যে ছবি দেখেছিল,—পক্ষীরাজ যোড়ায় চড়া না হ'লেও তেমনিই সুকান্ত হ'বে তার শ্রিতম! ভাবলে—ক'ড়ে আঙুল দিয়ে কপালে এক টোকা মারলেই ঘাড়গুঁজে প'ড়ে যাবে বুঝি।

তবুও ত স্বামী। ডাক্তার এসে আর দড়ি দিয়ে কপাল বেঁধে দেয় না, সারারাত্রি অহুপমাই কপাল টিপে দেয়। কখনো অনাবশ্যক বল প্রয়োগ করে বসে। রাগ করেই হয়ত।

অমর সবচেয়ে ঘৃণা করত নিজের এই কদর্য ব্যাধি-টাকে। আর-স্বর্ণা করে, যে মুখটা তাব নতিয়াই নতিনটা দাঁত আছে কিনা অন্যকে গুণে দেখাবার দ্রষ্টা সর্বদাই মেলে রয়েছে,—সেই মুখটাকে। অহুপমা নাম বললে নাম গেথেছে তিলোত্তমা।

মা কেঁদেছিলেন বটে একটু, এক ফাঁকে এক এক করে নোটগুলি গুণেও নিয়েছিলেন বার চারেক।

হঠাৎ একদিন কয়েকখানি আঁচলের খুঁটে বেঁধে কাশী চলে গেলেন। বলে গেলেন—বউ ত হয়েছে। বেঁধেও দেবে, বুকে মালিশও করবে। আমি দিন কতক ধর্য করে আসি, জিরিয়েও আসি।

শ্রামাপদবাবু এসে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। অমর আপত্তি করলে না। বললে—এ ক'দিন না হয় কোনো একটা মেসেই থাকব। কারো হাত বুলিয়ে না দিলেও চলবে। তবে শিগগিরই যেন আসে।

বাড়ী ফিরে এসে শ্রামাপদবাবু মনে মনে বলছিলেন—এবার মর, মর, বিধবা হ,—বাবাঃ, কাঁটাটাত' খসেছে গলা থেকে। বন্ধুদের বন্ধন—হুম'ণ বস্তাও পিঠে করে বওয়া যায়—কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটা কি হায়রানি করেই মেরেছিল! তবু যদি—

তারপরের ব্যাপারটা একটু আকস্মিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

সন্ধ্যার দিকে রাস্তাতেই খুব জাঁক ক'রে হাঁপানি উঠে গেল। একটা গাড়ি ঠিক কর্তে রাস্তার মধ্যে আসতেই বেছ'সের মত একটা মোটর অতি আচম্কা একেবারে ছড়মুড়িয়ে এসে পড়ল কাঁধের উপর। তার পর ঘষড়াতে ঘষড়াতে—

শ্যামপদবাবুর কাছে খবর গেল। অল্পময় একবার যেতেও চাইল কেঁদে। বাপ বুঝিয়ে বললেন—এখন গিয়ে

কি আর এগোবে বল? পদ্মায় না হোক কলতলাতেই শাঁখা ভাঙলে চলবে। পানটা আর চিবোস্নি, মা।

মা'র কাছে তার পৌঁছল না। ঠিকানা বদল করেছেন।

আরো একবার রাজা। সবাইর কাঁধের ওপর।

ওর জন্তাই ত আজকের সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! ওর জন্তাই

ত লুপ্তির চোখে এক বিন্দু অশ্রু!

যক্ষ-কবি

শ্রী কালিদাস নাগ

কবি কবি,
তুমি নাকি একে গেছ চিরন্তন বিরহের ছবি
মেঘদূত-পটে?
এ ধরার চিরন্তন বিরহের গান
চিররাত্রি দিনমান
বাজিয়া বাজিয়া নাকি উঠে তব মেঘমগ্ন শ্লোকে?
যুগে যুগে বিরহীর দল
নিবিড় বেদনাধাতে হইয়া বিহ্বল
পেয়েছে সাক্ষ্য নাকি তোমার ও অমর সঙ্গীতে?
এই প্রশ্ন কখন চকিতে
জাগিয়া উঠিল এক বিরহীর বুকে
কর্মহীন স্বপ্নভরা এক আষাঢ়ের
অশ্রাস্ত বর্ষণে;
বহুবীর অধ্যয়নে ম্লান ছিন্ন মেঘদূতখানি
বুকের উপরে নিল টানি,
হৃদি-রক্ত-নর্ভনের স্তব্ধ মন্দ তালে
মন্দাক্রান্ত। হৃদ গাঁথা পরিচিত শ্লোক
নির্জ্বলে পড়িয়া গেল।
পাঠ পরিহরি'
সহসা ভ্রুকুটি করি'
অতৃপ্তি-বেদনা-মাখা সুরে

ব'লে গেল স্বর্গবাসী কবি যক্ষবরেরে উদ্দেশি':

বিরহের এ বিরটি কাব্য-সৃষ্টি মাঝে

জীবন্ত বিরহ কোথা কবি?

স্বর্গের অধিবাসী একে গেছ স্বর্গভোগ ছবি;

বর্ষব্যাপী মর্ত্যের প্রবাসে

শিখ নাই বুঝ নাই মর্ত্যের বিরহ।

স্বজিয়াছ মায়া-অলকার কল্পলোক

যেথা অহরহ

অলঙ্কষ মনোরম প্রাসাদের মাঝে

প্রিয় স্বর্গস্তীর সুরে গুমরি' গুমরি' গীত বাজে,

স্বমোহন ইন্দ্রধনু স্বপনের মত!

সুরে বর্ণে সুধমায় করে একাকার

চারিধার ভ'রে গেছে নিত্যবসন্তের মহোৎসবে,—

নিত্যপুষ্পপাদপের কাছে

উন্মত্ত ভ্রমর পায় নিত্যনিমজ্জণ,

পদ্মগন্ধ। পুষ্করিণী—মরালের মালা গাঁথা বুকে;—

নিত্য উঠে কেকারব ভবন-শিখর

নিত্য তার কলাপ-বিকাশ,

নিত্যজ্যোৎস্না ভরেছে আকাশ!

চুরি করি' চপলার চাক চপলতা

তড়িৎ চাহনিখানি দিখিদিখে হানি'

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙালী—

বিহারের শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বর্তমান বর্ষে ভারতবর্ষে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এ সংবাদ



শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষায় তিনি একুনে ১২১৪ নম্বর পাইয়াছেন। এ-পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষায় কেহই অত বেশী নম্বর প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রী বিজ্ঞেন্দ্রলাল মজুমদার—নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাপড়া নিবাসী ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়লাল মজুমদার



শ্রী বিজ্ঞেন্দ্রলাল মজুমদার

মহাশয়ের পুত্র, উক্ত পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান ও বাঙালী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি আই, এম্, সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী অপর্ণা দাশগুপ্তা—

গত মাসে আমরা কুমারী অপর্ণা দাশগুপ্তার রাজকীয় বৃত্তি প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলাম। কুমারী অপর্ণা প্রবেশিকা হইতে সমস্ত পরীক্ষাতেই বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ১৯২২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ



কুমারী অপর্ণা দাশগুপ্তা

হন। এই পরীক্ষায় তিনি ৫১৭ নম্বর পাইয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে মধ্য পরীক্ষাতেও তিনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিংশ স্থান অধিকার করিয়া ৪৫০ নম্বর পান। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত শতকরা প্রায় ৬০ নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি এম্, এ পরীক্ষায় জন্ম প্রাপ্ত হইতেছিলেন।

বাকুড়া অভয় প্রাশ্রম—

আশ্রমের জ্যেষ্ঠ মাসের বিবরণীতে প্রকাশ যে গত মাসে কন্সটিগণ ধানবাদ, আসানসোল, বালীগঞ্জ, আশ্রা, রাঁচি, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বন্দর প্রচারকল্পে ভ্রমণ করিয়াছেন।

কৃতী বাঙালী ছাত্র—

পাটনা নিউ কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত ডি, কে, মুখোপাধ্যায় ইংলণ্ডের



মিঃ ডি. কে. মুখোপাধ্যায়

কালিশিল্প বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিহার ওরিসা শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেন। এ পর্যন্ত আর কোন ভারতবাসী এই ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন নাই।

যশোহর-খুলনা যুবক সম্মেলন—

গত মাসে সংবাদিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে যশোহর-খুলনা যুবক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাবে বাঙ্গালী রাজবন্দী ও মুক্তি আন্দোলনে বাঙ্গালী যুবকগণের কাণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যুবকদিগকে অনুরোধ করেন :—

“বিস্তর কাজ পড়িয়া আছে। শুধু কর্ম্মীর অভাব। সকল স্থানে যে, একই বাধাবিধি নিয়মে কাজ করিতে হইবে, এমন কোন ছায়ের বিধান নাই। প্রথম কাজ, বিভিন্ন স্থানে যুবকদিগের সজ্জবদ্ধ হওয়া। সজ্জবদ্ধ হইয়া সেই সকল স্থানের উপযোগী যে সকল কাজ করা সম্ভব বা প্রয়োজন, সেই সকল হাতে লইতে হইবে। যুবকদিগের নিজেদের

মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করা প্রকৃত কাজের ভিত্তি। বাহারা কাজ করিবেন, তাহাদিগের যদি দেশের সম্বন্ধে, অপর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও অস্বাভাবিক জাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তাহারা কি প্রকারে জ্ঞানের বিস্তার করিবেন বা কাজের প্রকৃত পথ বাহির করিবেন? আমি মনে করি যুবক সজ্জবর সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে জাতব্যবিষয়পরিপূর্ণ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয় স্থাপন করা।”

মাতৃজাতি সেবক-সমিতি—

গতমাসে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সরলা দেবীর সভানেতৃত্বে মাতৃজাতি সেবক সমিতির ৭ম বার্ষিক সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কার্য্য-বিবরণীতে জানিতে পারা যায় যে, সমিতি ক্রমেই বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য্য-বিবরণী পাঠের পর বক্তারা মাতৃজাতির প্রকৃত হৃদয়কার ব্যবহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বর্তমান সময়ে বাহাতে নারীগণ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষিতা, স্বাবলম্বী ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন প্রকৃত গৃহিণী হইয়া উঠিতে পারেন, এজন্য সকলকে বধাসাধ্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন।

বঙ্কিম-ভবন—

বঙ্কিম হুসন্তান ৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী কাঁটালপাড়া, নৈহাটি স্টেশনের নিকটে। ই, বি, রেলওয়ে বহুদিন যাবৎ এই সম্পত্তি অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মধ্যে ইহার প্রতিবাদকল্পে সাহিত্য-পরিষদ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলাফল জনসাধারণ জ্ঞাত নহেন। সম্প্রতি রেলওয়ে কোম্পানি ইহা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টি হইতে এই পুণ্য স্থান রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। আশা করা যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় আবাসস্থল রক্ষা করিতে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইবে না।

খুলনা জেলা সম্মেলন—

গত মাসে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে খুলনা জেলা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙালার গ্রাম সমূহের দুর্দশার কথা বিবৃত করিয়া আচার্য্য রায় বলেন “স্বাধীনতা লাভের নানাপ্রকার মন্তভেদ দেখা দিয়াছে। অনেকেই অনেক প্রকার কর্ম্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পল্লীগঠন বিষয়ে সকলেই একমত, এই পল্লীই আমাদের সাধারণ মিলন ক্ষেত্র। এখানে আমরা সকলেই রাজনৈতিক মন্তভেদের কথা বিস্মৃত হইয়া একতাহুতে আবদ্ধ হইতে পারি—একযোগে কাজ করিতে পারি। এই জন্তই আমি দেশের নামে, দেশমাতৃকার নামে সকলকে আহ্বান করিতেছি,—আপনারা পল্লীর উন্নতি সাধনে প্রস্তুত হউন।”



['পুস্তক-পরিচয়'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

কাব্য-দীপালি... (কবিতা-সংগ্রহ)—শ্রী নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত, কলিকাতা, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত, ২৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এই পুস্তকখানি হাতে লইয়াই ইহার সাইজ, স্থিতিস্থিতি ঢাকনি, (আবরণী) সোনার জলে চিত্রিত মলাট (প্রচ্ছদপট), কাগজ, ছাপার অক্ষর, মার্জিন ও স্পেশ (space) এবং মাঝে মাঝে পৃষ্ঠারস্তে ও পৃষ্ঠাশেষে চিত্রিত এক-রঙা ছবিগুলি দেখিয়া মনে হইল সম্পাদক নরেন্দ্রবাবু ও প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স এই বইখানিকে বিরাগাদি ব্যাপারে প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত করিতে চেষ্টা, যত্ন ও অর্থ ব্যয়ে কৃতিত্ব হন নাই। ভিতরের টাইটেল পেজখানি (নামলিপি) স্থিতিস্থিতি, কিন্তু কাগজের রঙের জন্ত একটু দুষ্টকটু হইয়াছে। ১৭খানি রঙিন চিত্রও পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির উপরের আবরণীতে রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো কবিতার দুই এক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের বর্ধমান ও অন্ত্যস্ত দুই একখানি ছাড়া কোনো ছবিই আমাদের ভাল লাগিল না। এইসকল চিত্র দ্বারা কবিতাগুলির গৌরবহানিই হইয়াছে।

বইখানিতে ছাপার ভুলও যথেষ্ট আছে।

এই গেল বাহিরের দিক। ভিতরের বিচার কবি ও কাব্য লইয়া; ইহাতে মতভেদ আছে। নরেন্দ্র-বাবু নিজের রুচি ও বিচার অনুযায়ী কবি ও কবিতা নির্বাচন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, যদি তিনি গুণে ও পক্ষে চার পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি না লিখিতেন। তখন এইটুকু লিখিলেই সমালোচকের কর্তব্য শেষ হইতে যে, “নরেন্দ্রবাবু এই পুস্তকে আপনার খুসীমত ৭০ জন বঙ্গ-কবির ১৫১টি কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উপহার দিবার পক্ষে বইখানি চমৎকার হইয়াছে।” কিন্তু সম্পাদক মহাশয় গুণে লিখিয়াছেন—“একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করবার চেষ্টা করছি। বর্তমান যুগের ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পুণ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আমি একেবারে আজকের দিনের সত্ত্ব-সমাগত কয়েকটি তরুণ কবির হৃদয় রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করছি।” এবং পক্ষে লিখিয়াছেন,

“আমার দেবীর দেউলের দ্বারে এ যুগের যত কবি এনেছে তাদের পূজার অর্ঘ্য.....

তাদেরই ভাবের সাগর ছানিয়া মনের মাণিক তুলি গড়েছি আমার এই দীপালির দীপ্ত প্রদীপগুলি।”

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণতম রাধারাগী দত্ত (সম্পাদকের স্নেহাম্পদা অনুজ্ঞা—বার কবিখ্যাতি নাকি “ইতিমধ্যেই সর্বশেষ প্রচারিত হয়ে পড়েছে”)—পর্যন্ত সকল কবির শ্রেষ্ঠ রচনা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। নরেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত কবিতাগুলি যদি বাঙলা কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়, তাহা হইলে বাঙলা কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সৌভাগ্যের

বিষয়, এইসকল শ্রেষ্ঠ কবিতা ছাড়াও এইসকল কবিদের এমন অনেক কবিতা আমরা দেখিয়াছি বাহাতে আমাদের কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধ মনে হয়। এই সংগ্রহ দেখিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন।

বহু মাথা ঘামাইয়াও কবিতাগুলি কি ভাবে সজ্জিত হইয়াছে তাহার কবিতা পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ যদি স্বক হন (সময় হিসাবে) তাহা হইলে স্বর্ণকুমারী তাহার পরে আসেন কি করিয়া? যদি স্বর্ণকুমারীই আসিলেন তাহা হইলে বিজ্ঞেন্দ্রনাথ বাবু গেলেন কেন? কবির বয়স ও জন্মকাল ধরিয়া যে কবিতা সজ্জিত হয় নাই তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। কবি-খ্যাতি হিসাবেও যে এই কবিতা সজ্জিত হয় নাই তাহাও মনে হইতেছে। এরূপ ‘এলো পাভাডি’ ভাবে কবিতা বাজাইয়া সম্পাদক মহাশয় অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ হইতে রাধারাগী দত্ত পর্যন্ত ৭০ জনের স্থান হইল, চেনা চেনা কয়েকটা নাম ইহার মধ্যে পাইলাম না। যেমন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বত্সরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, রাধাচরণ চক্রবর্তী, নিরুপমা দেবী, নরেন্দ্র দেব ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ইহার কবিতা ছাপিতে অনুমতি দেন নাই। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন সকলে অনুমতি দেন নাই, হুতরাং এসম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

কয়েকটি কবির কবিতা-নির্বাচন মোটেই ভাল হয় নাই। সংক্ষেপে ইহার বিচার করা কঠিন। আমরা নামমাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-নির্বাচন দুর্ভাগ্য। বিশ্বভারতীর প্রকাশিত চরনিকাতেও তাহার কবিতা ভাল মত নির্বাচিত হয় নাই। এখানেও হয় নাই। শ্রীমতী কামিনী রায়ের নির্বাচন একেবারেই ঠিক হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের নির্বাচন ভাল হইয়াছে, কিন্তু তাহার কবিতা আরো দেওয়া উচিত ছিল। আমাদের মতে অন্ত্যস্ত কবিদেরও অনেক ভাল কবিতা বাদ পড়িয়াছে ও অপেক্ষাকৃত খারাপ কবিতা স্থান পাইয়াছে। মনে হয় যেন সম্পাদক মহাশয় ও তাহার সহকর্মীগণ সকল কবির সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, এই ধরণের নির্বাচনে কবিদিগকে অপমান করাই হইয়াছে—তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর যেগুলি কবিতা নহে, সেইগুলিই দীপালিতে স্থান পাইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে বলিতে পারি না, কিন্তু বিজ্ঞেন্দ্রনাথের দুই-একটি ভাল কবিতা বোঁজ করিলে পাওয়া বাইত।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচন ছন্দের দিক দিয়া করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেগুলিতে ছন্দের কোন কসরৎ দেখান হইয়াছে এমন কবিতাই লওয়া হইয়াছে, তাহার কবিত্বশক্তির পরিচায়ক কবিতাগুলি স্থান পায় নাই।

তরুণ কবিদের অনেকগুলি কবিতাও কাব্য-সংগ্রহে দিবার উপযুক্ত হয় নাই, কয়েকটি কবিতার রুচিও ভাল নহে। বিদেশী ও বঙ্গদেশী কবিদের অঙ্গ ভাবানুকরণ ও ছন্দের মার-প্যাচ ছাড়া অনেক-গুলিতে কবিতা একেবারেই নাই। তবে যাহারা বীজ দেখিয়া বৃক্ষ বঙ্গনা

করিতে পারেন তাহার। হয়ত এইগুলিতেই এইসকল কবিদের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া লইবেন।

মোটের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, এতগুলি পরস্পর ব্যয় করিয়া এত সুবিধা লইয়া যেখানে কাজ হইয়াছে সেখানে একটুকু পরিশ্রম করিলেই এবং পাঁচজন রসজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া কাজ করিলেই একখানি চমৎকার কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করা যাইত। এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রকাশিত গ্রন্থখানি সম্পাদকের অধিক নিন্দার কারণ হইবে। তবে তাঁহার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। প্রকাশকের চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার।

ন

আরতি—শ্রী বিমলাচরণ মৈত্রেয়। ডি, এম্ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ১৬৮। ১৩৩৪।

বাঙলার সাহিত্যিক মহলে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মৈত্রেয় সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্বে তিনি মাঝে মাঝে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কবি—তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার রচিত এই কাব্য-গ্রন্থ পাইয়া আমরা প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম—কিন্তু আমাদের বিস্ময় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। 'আরতি'র কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে এবং সেগুলি পাঠ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। এই কাব্যগ্রন্থ কবিকে চিরদিন কবি-মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

দরিদ্রের ক্রন্দন—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। দি বুক কোং, লিঃ ৪৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৪। পৃঃ ৩৩২। ১৩৩৪। (২য় সং)

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে যখন এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখনই এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

বাঙলার পল্লীগুলি দিন দিন ধ্বংসের পথে বাইতেছে। পল্লীর উত্থান-পতনের উপর দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে, একথা সর্ববাদিসম্মত। এই গ্রন্থে লেখক পল্লীগুলির অবনতির পরিণাম, কৃষকগণের প্রকৃত অভাব-অভিযোগের কথা ও জগৎজোড়া শিল্প-বিপ্লব কি ভাবে আমাদের গ্রাম্য রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া এবং সামাজিক গ্রন্থিগুলিকে শিথিল করিয়া মজুরদের চারিত্রিক ও দৈহিক অনিষ্ট সাধন করিতেছে সেইসকল সমস্তার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি পল্লীগঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে যে আদর্শ এই পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছে দেশের পল্লীসেবকগণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হইবেন। পুস্তকের ছাপা, বাঁধা ও প্রচ্ছদপটের চিত্র সুন্দর হইয়াছে।

ত্রিলোচন (উপন্যাস)—এস, জি, মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক দি বুক কোং লিঃ, ৪৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১১।

মজুমদার মহাশয় নূতন লেখক। কিন্তু এই বইখানিতে তাঁহার সুনিপুণ লিপি-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। উপন্যাসের প্লটটি ভাল ও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। আমরা আশা করি, তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানিই পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি চমৎকার হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

প্র



শ্রী হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

হিনি আই,সি,এস্ পরীক্ষায় বাঙলা হইতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইয়াছেন

বিদ্যুৎ

শ্রী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

খ-দ্যুতি, নভোদূত,
অপরূপ, অদূত
বিদ্যুৎ বিকমিক্
চমকে ওই ;

হাওয়া ডাকে শনশন,
গুরু দেয়া গরজন,
দিন হ'ল আধিয়ার,
পাহু কই !

ক্রুর হাসি মুখে কা'র,
কা'র বাঁকা তলোয়ার,
কা'র বৈধা বক্ষের
রক্তদাগ ;

কা'র পদনখ-কচি,
কা'র মণিমালা শুচি,
কোন্ দূর দেবতার
বহিষাগ !

ওকি সেই সবনাশা
বজ্রের আগ-ভাষা,
ধ্বজ্জি-নয়নের
তীক্ষ্ণ শর ;
ওকি কাল আধি-কোণে
চেয়ে দেখা আনু মনে
স্মরহর-সম্মিত,
বিষাধর ।

কা'র চলা ওই পথে
দুর্গম পর্বতে—
কোন্ দূর অজানার
অন্বেষণ ;
পুণ্যের ভোগ শেষে
ফিরে মর্ত্যের দেশে
ধ্বজা তুলে যাত্রীকে
হর্ষমন !

ওকি আনে মেঘজল,
ওকি আনে ফুল ফল,
ওকি আনে সব-ভাঙা
ঝঞ্ঝা-রোল ;

ওকি আনে শ্যামলতা,
ওকি আনে কলকথা
ওকি আনে প্রাবনের
অশ্রু-দোল !

খ-দ্যুতি, নভোদূত,
অপরূপ, অদূত
বিদ্যুৎ বিকমিক্,
চমকে ওই ;
হাওয়া ডাকে শন শন,
গুরু দেয়া গরজন,
দিন হল আধিয়ার,
পাহু কই !

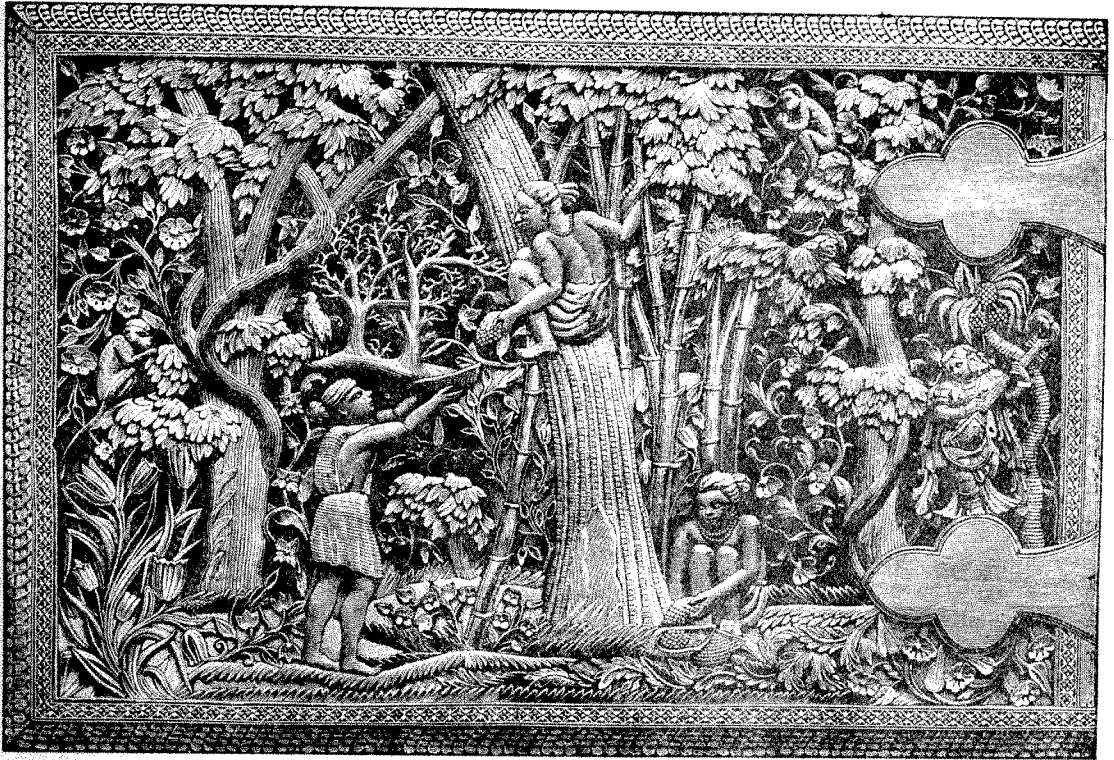
দাক্ষিণ্য

শ্রী কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়

বহু পাশ্চাত্য দেশে প্রবাদ আছে, যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কুকুর; কেননা, আদিম অবস্থায় মানুষের প্রধান সহায় ছিল ঐ জন্তুটি এবং এখনো মানুষের গৃহস্থালীর মধ্যে নিজগুণে স্থান পায় ঐ জীবটি। সেই মত বলা যায়, যে, সভ্যতার প্রধান সহায় কাঠ।

তাইতে এখন পর্যন্ত মনুষ্য-জগতে নানারূপে কাঠের ব্যবহার প্রায় সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

কাঠের গুণাবলী অশেষ এবং তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্রও অগণিত। একটি প্রবন্ধের মধ্যে তাহার এক শতাংশও বিবৃত করা যায় না। সুতরাং এখানে সে চেষ্টা

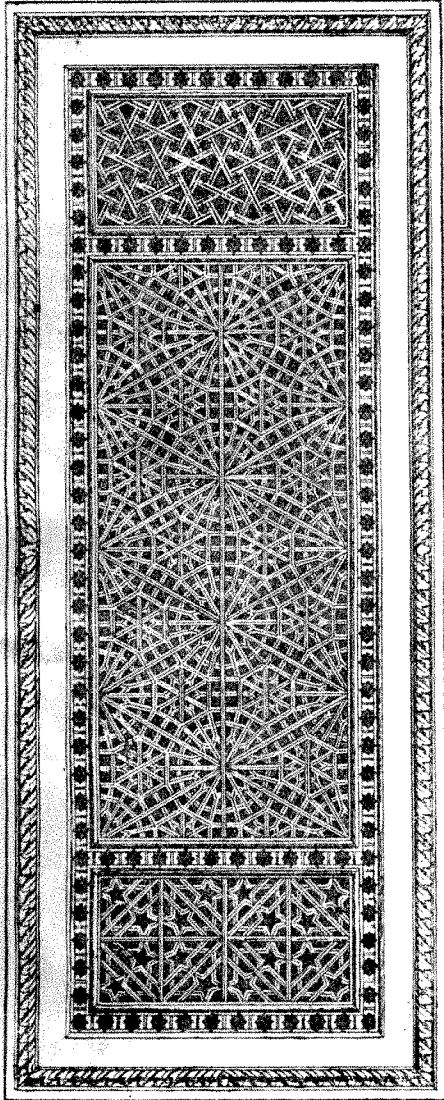


ত্রিবাঙ্কুরী চন্দন কাঠের বাজের ডালার উপর থোড়াই

সভ্যতার আরম্ভ হয় অগ্নিপ্রজ্জ্বালনের সঙ্গে সঙ্গে। কবে, কখন, কে ইহা আবিষ্কার করে, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই, যে, মনুষ্য-প্রজ্জ্বালিত অগ্নির প্রথম ইন্ধন ছিল কাঠ। এবং সেই হৃদয় অতীতকাল

না করিয়া কেবলমাত্র ললিত শিল্পে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিব।

মনুষ্যসমাজে যেমন রূপের বিচার হয় বর্ণ আকৃতি ও অন্বসৌষ্ঠব দ্বারা, দাক্ষিণ্যে সেইরূপ কাঠের বিচারও



উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের জালির (পিজরা) কাজ।
খোদাই নজা করা শিশু কাঠের ঝাপ (Movable Screen)

হয় বর্ণ আকৃতি—যথা স্বাভাবিক রেখাপাত বা আলেখ্য—
ও গঠন দ্বারা।

প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে গঠন অর্থে কি বুঝায়।
কাঠের অঙ্ক গাঁইট-, ফাটল-, বা ব্রণ-বিহীন, আঁশ সূক্ষ্ম,
সকল অংশের গুরুত্ব সমান এবং গাত্র সহজে মসৃণ
(পালিশ) হইলে, ইহাই উত্তম গঠনের লক্ষণ এবং প্রধানতঃ
ইহার উপরই কাঠের কার্যকারিতা নির্ভর করে। অবশ্য
ইহা ভিন্ন অল্প অনেক গুণের জন্ত বিভিন্ন প্রকার কাঠের

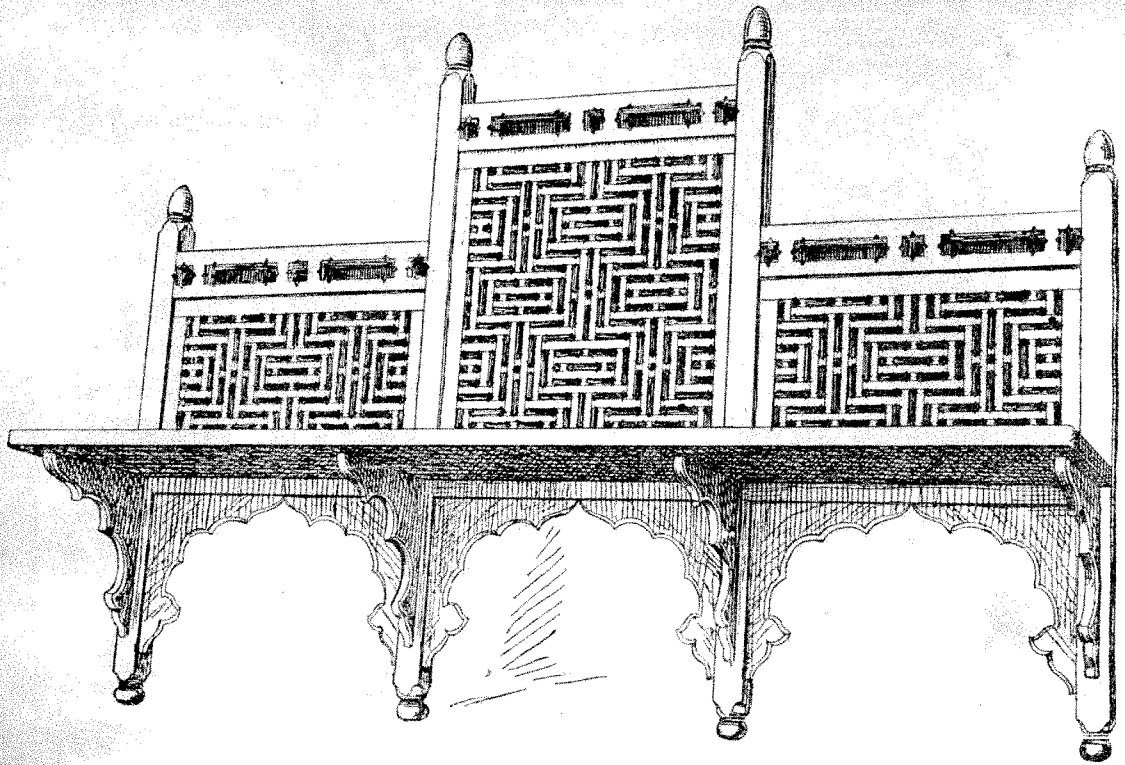
আদর হয়; যথা স্থিতিস্থাপকত্বের জন্ত বিলাতি অ্যাশ,
উইলো, হিকরি ইত্যাদি খেলার সরঞ্জামের (যথা ক্রিকেট,
ব্যাট্) জন্ত, সবদিকে সমানে ও সহজে কাটা যায় বলিয়া
মুত্ৰাকনের খোদাই (উড্ কাট্) কার্যে বক্স কাঠ, স্তম্ভের
জন্ত চন্দন ও কপূর, ইত্যাদি।

যাহা হউক, সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে ব্যবহার ও
সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্ত যে সকল কাঠের ব্যবহার হয় এবং
শিল্পীর কারুকৌশল যে প্রকার কাঠে সুন্দর ও স্থায়ী ভাবে
প্রদর্শিত হয়, তাহার জন্ত দৃঢ়, সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত, স্থায়ী (উই
বা ঘূর্ণ যাহাতে সহজে ধরে না), যাহা অত্যধিক কঠিন
নহে (যাহাতে কঠিন বা খোদাই বিশেষ শ্রমসাধ্য না হয়),
যাহাতে জু বা জোড় লাগাইলে ফাটিয়া যায় না, এইরূপ
কাঠের আদর বেশী।

যে সকল কাঠের এই সকল রূপ ও গুণ আছে, সে সবই
যে সাধারণের নিকট পরিচিত, তা নয়। আমাদের বেশে
প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপ অনেক কাঠের ব্যবহার
প্রচলিত। যথা, বৃহৎসংহিতা-লেখক নিম্নলিখিত কাঠের
ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:—

আসন	পিয়াশাল Pterocarpus Marsupium
স্পন্দন	Abies Pindrow (silver fir ?)
চন্দন	চন্দন Santalum Album
হরিদ্র	হলছ Adina Cordifolia ?
স্তরদাক	দেবদারু Cedrus Lebani Deodara
তিন্দুকী	আবলুস, তেন্দু Diospyros Ebenum
শাল	শাল Shorea Robusta
কাশ্মাধ্য	কাশ্মাল ? Odina Wodier
অঞ্জন	অঞ্জন Hardiwickia Binata
পদ্মক	পদ্ম, ধূপ Juniper Macropoda
শাক	সেগুন, টীক Tectona Grandes
শিশুশপা	শীতসার, শিশু Dalbergia Latifolia and Dalbergia Sissoo

এই সকলের মধ্যে এখন প্রচলন আছে চন্দন,
দেবদারু, আবলুস, শাল (অল্প বিস্তর), সেগুন ও শিতুর।
ইহার মধ্যে সেগুন ও শিশু কাঠই এদেশে সর্বাপেক্ষা



পঞ্চাবের “পাঁচরা” কাজের কুলুঙ্গী (Bracket)

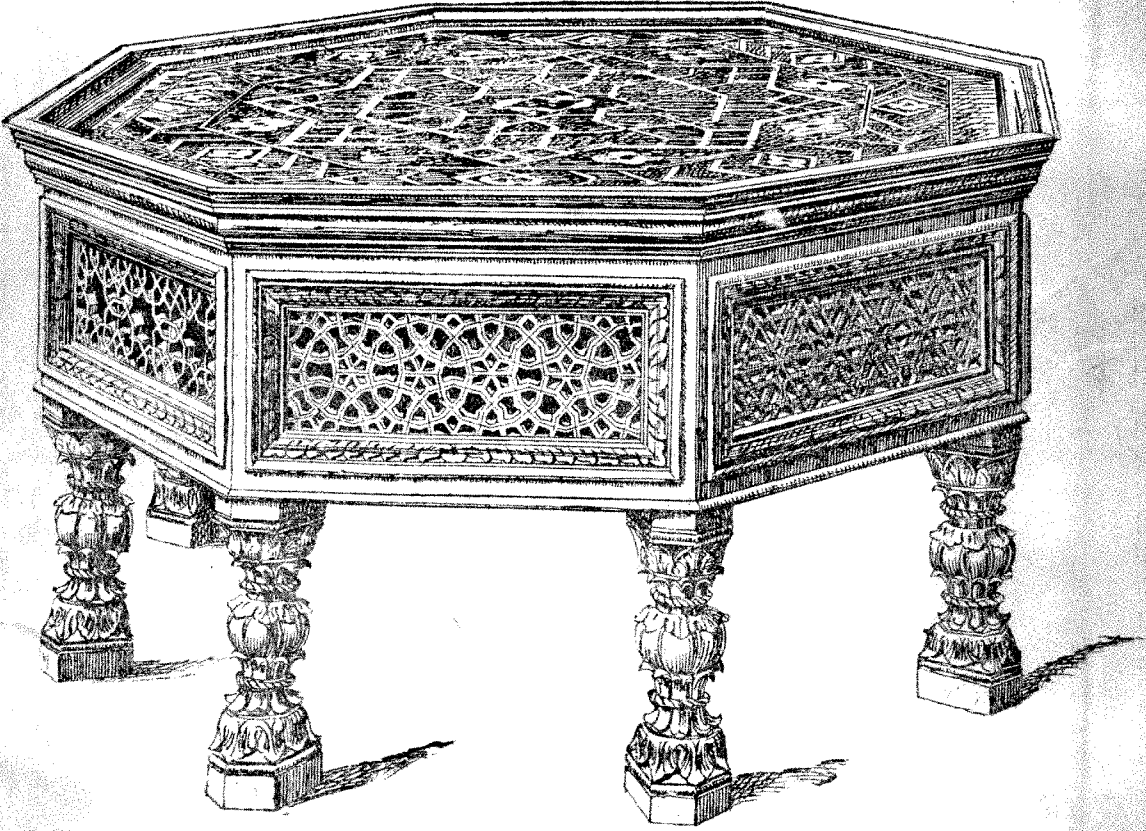
অধিক ব্যবহৃত হয়। কেননা, এই দুইটি সর্বপ্রকার শয্যাধার, আসন ও অস্ত্রাঙ্ক কাঠব্যাদির উপযুক্ত, যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে কাজ করা সহজ।

আবলুস, চন্দন, শীতসার (Rosewood বা Blackwood), আখরোট ইত্যাদি মূল্যবান কাঠ, স্বতরাং সাধারণের পক্ষে এগুলির ব্যবহার সম্ভব নহে। আমাদের দেশে আরো কতকগুলি কাঠ আছে, যাহার আদর হওয়া উচিত কিন্তু লোকে তাহার গুণাবলি না জানায়, সেগুলির ব্যবহার যথেষ্ট হয় না; যথা গাম্ভীর (Gmelina arborea), ভেক (Chloroxylon Sweetania), শিরীষে (Albizia Lebbek), পানিসাজ (Terminalia Myriocarpa) ইত্যাদি।

বিদেশী অনেক কাঠের যথেষ্ট স্থান আছে; যথা মেহগনী, ওক, বিভিন্ন প্রকার পাইন, বিলাতী আখরোট (Walnut) ইত্যাদি। তন্মধ্যে মেহগনী কাঠের খাতির সর্বাপেক্ষা অধিক এবং সেইজন্য এদেশেও লোকে

মেহগনীর নামে অজ্ঞান হয়। অনেকেরই জানা নাই যে, মেহগনী দুই প্রকারের হয়; বেউড বা হণ্ডুরাস (Baywood বা Honduras Mahogany) এবং স্প্যানিশ (Spanish বা San Domingo Mahogany)। ইহার মধ্যে প্রথম প্রকারের কাঠ নামেই মেহগনী, আসল নাম বেশী নয়, এবং, এমন কোনও আশ্চর্য রূপ বা গুণও নাই যাহা অল্প সাধারণ আসবাবী কাঠে নাই, আছে কেবল মাত্র নামের মোহ। স্প্যানিশ মেহগনী অতি সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট কাঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এদেশীয় উৎকৃষ্ট শীতসার এবং শিশু উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভিন্ন কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট নহে।

আরও আশ্চর্য্য এই, যে, আমাদের দেশী শীতসার (black wood) বিলাতে চালান যাইয়া বিলাতফেরৎ হইয়া যখন রোজউড (Rose wood) নামধারণ করেন, তখন সকল দেশেই তাহার স্থান মেহগনীর উপরে হইয়া থাকে।



পঞ্জাবী চৌকী। খোদাই, সংযোজন ও “পিঙ্করা” জালির কাজ। শিল্পকাঠ

যাহা হউক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, যে, প্রত্যেক রকমের দারুশিল্পের উপযোগী কাঠ আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। না পাওয়া আশ্চর্য্য; কেননা, এদেশে, ইক্ষন ভিন্ন অল্প কাজের উপযোগী (অর্থাৎ কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত) প্রায় ১৬০০ প্রকার বৃক্ষ আছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ স্যার জে ডি হকার বলিয়াছেন*, যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভিদ সম্পদে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী।

দারুশিল্পের বিভিন্ন প্রণালী ও উপায়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান; যথা :—

- ১। বর্ণবিজ্ঞাস—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম
- ২। উৎক্ষেপ বা ক্ষোদন (বাটালীর কাজ)

৩। কর্তন, সংযোজন ও তাহার আনুসঙ্গিক অস্ত্রান্ত্র ছতার মিত্রীর কার্য (cabinet-making)।

নিপুণ শিল্পী চিত্রে কাঠের দ্রব্যটির পরিকল্পনা করিলে ঐ উপায়গুলির দ্বারা তাহার নির্মাণ সম্ভব হয়।

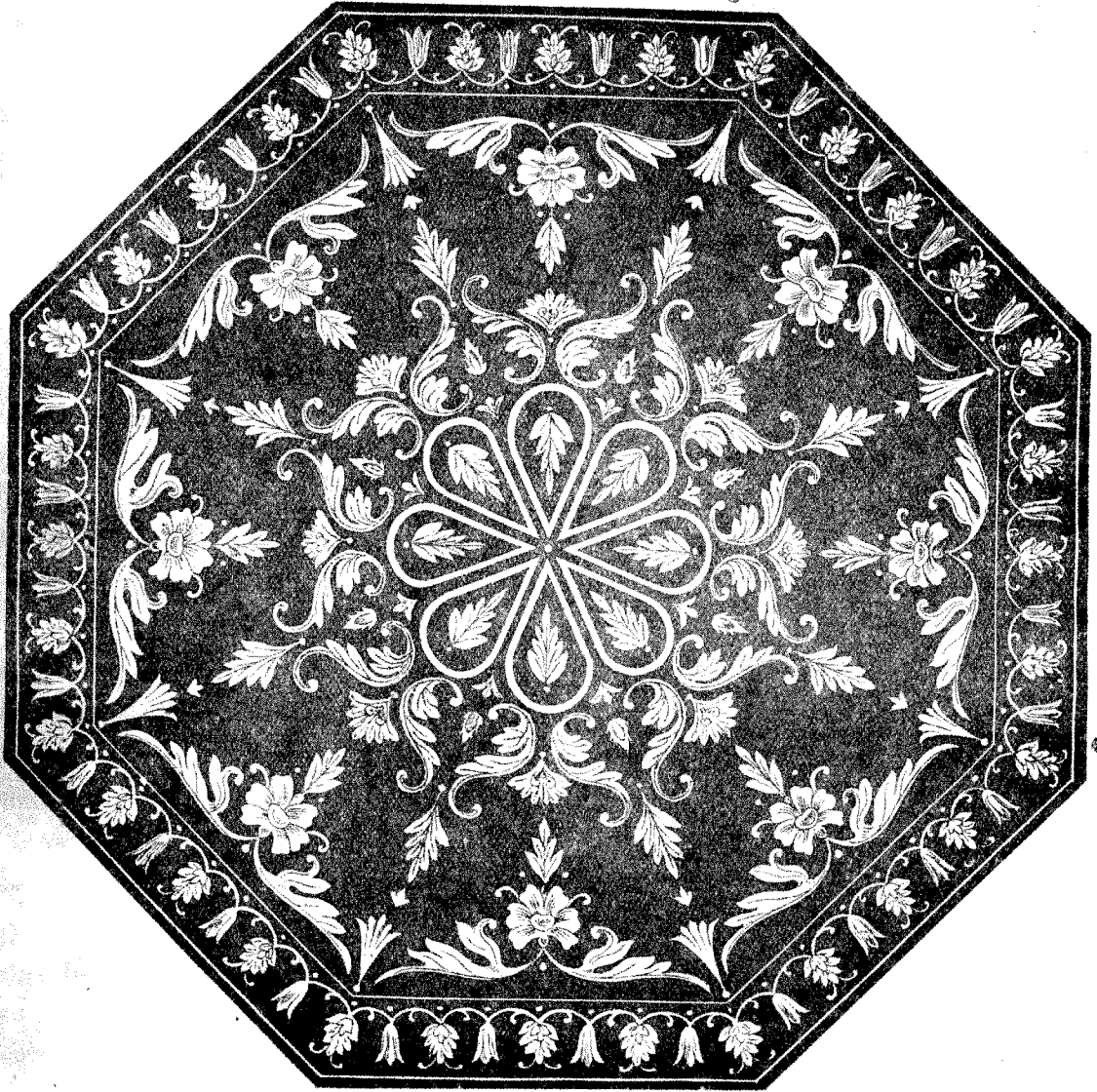
বর্ণবিজ্ঞাস—স্বাভাবিক। এদেশে নানাবর্ণের কাঠ পাওয়া যায়, যাহাদের স্বাভাবিক সুন্দর রং আছে। সেই সকল কাঠ সুবিচার করিয়া সংযোজন করিলে বিচিত্র বর্ণবিন্যাস করা যায়। এইরূপ কয়েকটি কাঠের বর্ণনা নিম্নে লিখিত হইল।

শ্বেত—চন্দন, ভেক (অতি উত্তম আসবাবী কাঠ, মাল্লাজী), গাম্ভার (উত্তম আসবাবী কাঠ), বৃক।

পীত—হলুহ, কাঁঠাল।

লোহিত } বক্তচন্দন (মাল্লাজী), পাজোক (আন্দামান
ও
রক্তাভ } ও ব্রহ্ম দেশস্থ) আন্দামানী পাজোক অতি

* Sir J. D. Hooker, Flora of British India.....
“perhaps the richest and certainly the most varied Botanical area on the surface of the globe.”



আবলুস কাষ্ঠে হাতীর দাঁতের “বসান” (inlaid) কাজ (টেবিলের উপরিভাগ)। দেশী মুসলমানী নক্সা

উৎকৃষ্ট আসবাবী কাষ্ঠ), টুন (হিমালয়ের পাদদেশের
জঙ্গলের কাষ্ঠ)।

কৃষ্ণ—আবলুস।

পীতাম্ব পাটল—সেগুন, চাপা, জারুল।

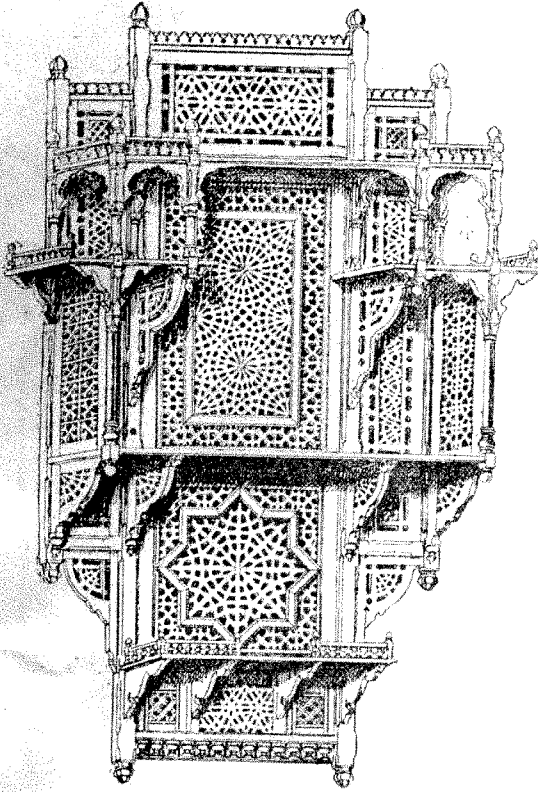
আখরোট বা খদিরবর্ণ—আখরোট (কাশ্মীর)।

কৃষ্ণাভ গাঢ় লোহিত—শিশু, শীতসার

গাঢ় বেগুনি—শীতসার (কাষ্ঠ অতি সুন্দর আলেখ্য-
যুক্ত)

স্বেত ও কৃষ্ণ বা পীত ও কৃষ্ণ মিশ্রিত—শিরীষ,
আন্দামানের জেত্রা আবলুস।

কৃত্রিম উপায়ে যে কোন কাষ্ঠকে যে কোন বর্ণে
রঞ্জিত করা যায়। তবে সে বর্ণ স্থায়ী হয় না এবং কাষ্ঠ-



পিজরা কাজের ড্রাকেট

গাঠের রেখাপাত ও আলেখ্য (grain and figuring) তাহাতে ঢাকা পড়ে বলিয়া অধিকাংশ স্থলে কৃত্রিমবর্ণ সৌন্দর্যের হানিই করে। ভিন্ন ভিন্ন কাঠের সংযোজনে প্রস্তুত দ্রব্যের সৌন্দর্য স্থায়ী এবং সেগুলিতে কাঠগাত্রে শোভাহানি হয় না। তবে এইরূপ কাঠ সংযোজন বিশেষ সাবধানে করা কর্তব্য, যাহাতে কঠিন ও নরম, শুষ্ক পরিপক্ব (seasoned) ও কাঁচা কাঠ একসঙ্গে যুক্ত না হয়।

কাঠে খোদাই কাজ দারুশিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ। খোদাই প্রায় সকল প্রকার আসবাবী কাঠেই চলে, কিন্তু আঁশ অত্যন্ত মিহি এবং সমান না হইলে বাটালী সকল দিকে সমান চলে না এবং কাঠ কঠিন না হইলে স্থল্য কারু-কার্য বাটালীর কোপের সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। বলা বাহুল্য, কাঠগাত্র নির্মল এবং গাইট বা ফাটল শূন্য হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

খোদাই কার্যের যত্নপাতির মধ্যে কয়েক প্রকার বাটালি, কম্পাস, কাঁটা ও শলাই প্রধান। এক ইঞ্চির

ষোড়শ অংশ হইতে এক ইঞ্চি প্রমাণ চওড়া, সরল ও বক্র মুখের ১২ হইতে ৭০৮০টি এই প্রকার বাটালি ও শলা এইরূপ কার্যে ব্যবহৃত হয়। এদেশের কারিগররা ২০২৫টিতেই কার্য চালাইয়া লয়।

বাটালীর কার্য সামান্য আঁচড় কাটা হইতে অতি গভীর, এমন কি সম্পূর্ণভাবে কাঠ ভেদ করিয়া আলির কাজ পর্যন্ত, সমস্তই একই প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে।

এই প্রকার কারু-কার্যে শিল্পীর হস্ত-কৌশল, পরিকল্পনা এবং সামঞ্জস্য-জ্ঞান, তিনটি সমান থাকা উচিত। যথা, প্রশস্ত কাঠথণ্ডে স্থল ও গভীর কার্য যেরূপ শোভন হয়, অল্প আয়তনের কাঠে সেরূপ হয় না। আবার স্থল কার্য বিশেষ সমীচীন ভাবে ও সামঞ্জস্য রাখিয়া না করিলে, তাহা পরিমাণে যতই অধিক হইবে, ততই সমস্ত কার্যটি জঙ্গল ঘোপের মত দেখাইবে।

পরিকল্পনায় রেখাপাত যতটা সম্ভব দৃঢ়, স্থল ও ঋজু (firm and even) রাখা উচিত। “অষ্টাবক্র” রেখাপাত কারুকার্যে পরিণত হইবার পর শুদ্ধতা না হইয়া চক্ষুর কষ্টদায়ক হওয়াই সম্ভব, যদিও ঐ প্রকার রেখা সমীচীন ভাবে সমান্তরালে স্থাপিত হইলে রেখাসমষ্টি শুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেশের শিল্পীর কোন না কোন প্রকার বিশেষ কাঠের উপর “টান” আছে। ইহার কারণ, যে শিল্পী যে কাঠের উপর কাজে অভ্যস্ত, অত প্রকার কাঠ তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন বা নরম হওয়ায়, সে বাটালির চাপের আন্দাজ পায় না, সুতরাং প্রতি কোপে তাহার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এদেশে কাশ্মীরী কারিগর আখরোট কাঠে, সাহারানপুর, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের শিল্পী শিশু বা শীতসারে, দক্ষিণ মাদ্রাজ মহীশূর ও ত্রিবান্ধুরের শিল্পী চন্দন কাঠে কাজ করা ভাল মনে করে। ব্রহ্মদেশে সেগুন আবলুস খিট মিন ইত্যাদি ও সিংহলে আবলুসের চলন আছে।*

বিদেশে ওকের, বিশেষ বিলাতী ওকের, প্রচলন সর্বাপেক্ষা

* আধুনিক “শিক্ষিত” সমাজে (কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি সহরে) সেগুন ও মেহগনী এই দুইটি মাত্র প্রচলিত। তাহার কারণ ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের বুদ্ধি বিবেচনায় এই দুইটি কাঠ শ্রেষ্ঠ

অধিক। তাহার পরে আখরোট, মেহগুনী, সিকামোর, ও সস্তার কাজে পীত পাইনের ব্যবহার প্রচলিত।

খোদাইয়ের কাজ পালিশ করা উচিত নহে। ইহাতে সুন্দর শলাকার ও বাটালীর কার্যের সৌন্দর্য্যহানি হওয়া সম্ভব। সকল দেশেই এই প্রকার কার্যে বিশেষ নক্সা ও ক্ষোদনের রীতি প্রচলিত আছে; যথা, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরল জ্যামিতির রেখাপাতে “পিঞ্জরা” কাজ। এই সকল রীতি প্রধানতঃ সে-দেশের প্রস্তর-ভাস্কর্যের প্রথার উপর নির্ভর করে।

সর্বশেষে আসবাবী ও সাধারণ কৰ্ত্তন সংযোজনের ব্যাপার (ছুতারের কাজ)। আসবাবের পরিকল্পনায় সরল রেখা ও সমতল গাজের সন্নিবেশ যত বেশী হয়, ততই জিনিষটি দেখিতে সুন্দর হয়। বক্র রেখা বা ঢালু গাজের পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য ও অল্পপাত রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষ নিপুণ শিল্পী ও বিশেষ দক্ষ কারিগর ভিন্ন অন্য কাহারো পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এদেশে অনেক আধুনিক আসবাব বিলাতী চিপেনডেল ধাঁচে তৈরী করার চেষ্টা হয়। ফলে “মাকড়সার ঠ্যাং” জাতীয় অপূৰ্ণ দোআঁশলা জিনিষের সৃষ্টি হইয়া যায়।

এ দেশে প্রাচীনকালে আসবাব পত্রের বিশেষ ব্যবহার ছিল না। খাট পালক ও পিঁড়া চৌকি বাদে ছিল কেবলমাত্র রাজাদের সিংহাসন। কিন্তু ঐরূপ যে সকল প্রাচীন জিনিষের আকার আমরা প্রাচীন চিত্রে বা মন্দির-গুহাইত্যাদির ভাস্কর্য্য শিল্পে দেখিতে পাই, সে সকলে সরল ঋজু দৃঢ় রেখার সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার হিসাবে বক্র বা তির্য্যক রেখার মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আসবাব-পত্রে অলঙ্কার হিসাবে খোদাই ইত্যাদি কারুকার্য্য অতি সংযমের সহিত করা উচিত। চারিহাত উচ্চ ও দুইহাত চওড়া আলমারিতে একহাত কার্ণিস ও আছোপাস্ত খোদাইয়ের কাজ থাকিলে আলমারীটি “দামী” হইতে পারে, কিন্তু কোন কোন প্রদেশের সালস্ততা মহিলার মত তাহাও চক্ষুশূল বিশেষ মাত্র।

গৃহসজ্জায় রুচির মূল্য অনেক। হুঃখের বিষয় অনেকের ধারণা রুচির অর্থ “অর্থব্যয়” এবং “সাহেবী দোকান”। এখানকার অধিকাংশ সাহেবী ফ্যাশানের আসবাব, এদেশের

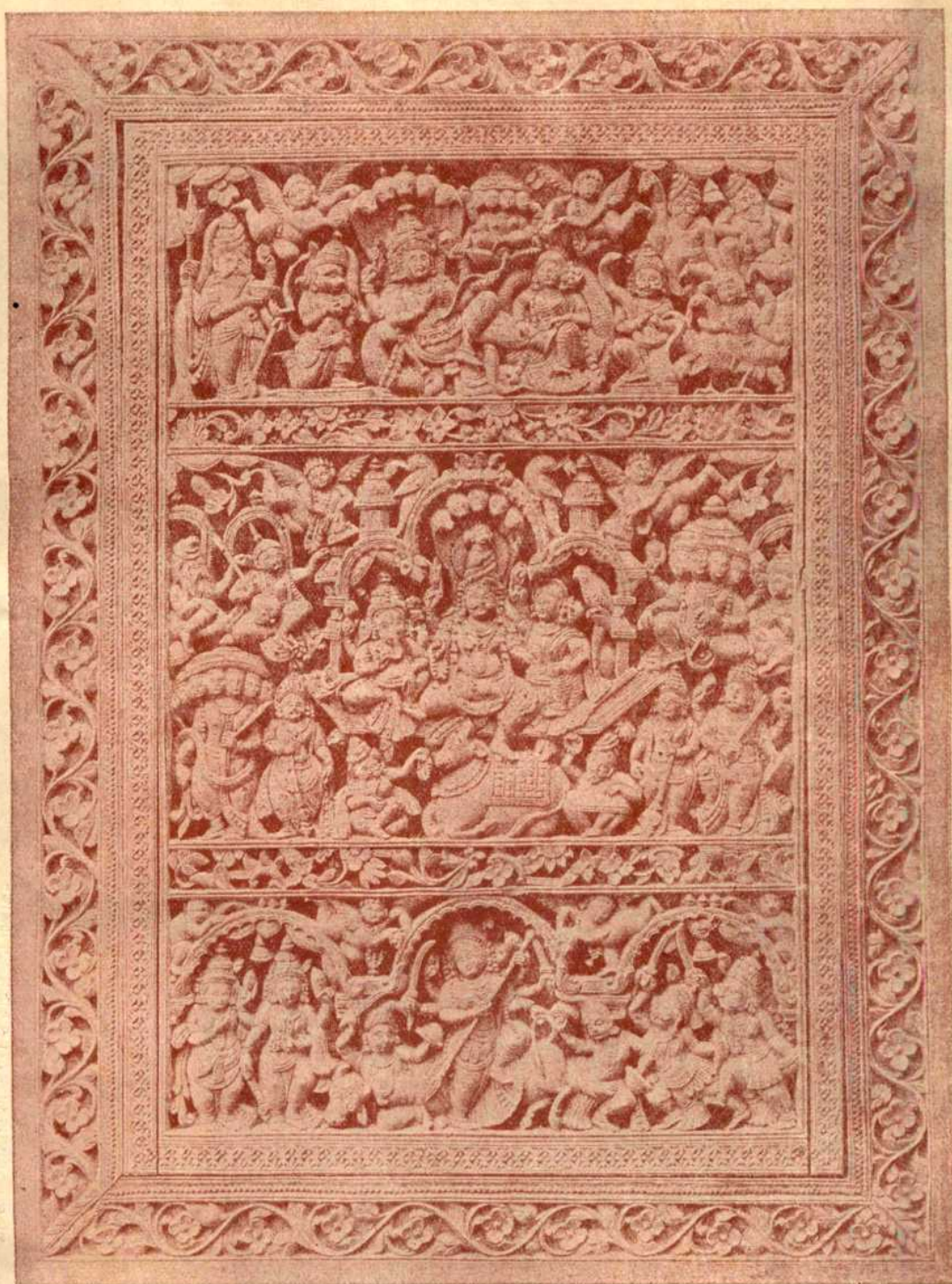
বা বিদেশের, কোনখানেই রুচি-সঙ্গত নহে। বিশেষে অনেকগুলি আসবাবের দ্বারা গৃহসজ্জা হয়। সেগুলির পর-স্পরের সহিত সামঞ্জস্য ও সমতা থাকা উচিত। অল্প জিনিষে—সুদৃশ ও সুকৃতি সঙ্গত হইলে—গৃহের যা শোভা হয়, গৃহকে আসবাবের দোকানে পরিণত করিলে তাহা সম্ভব নহে।



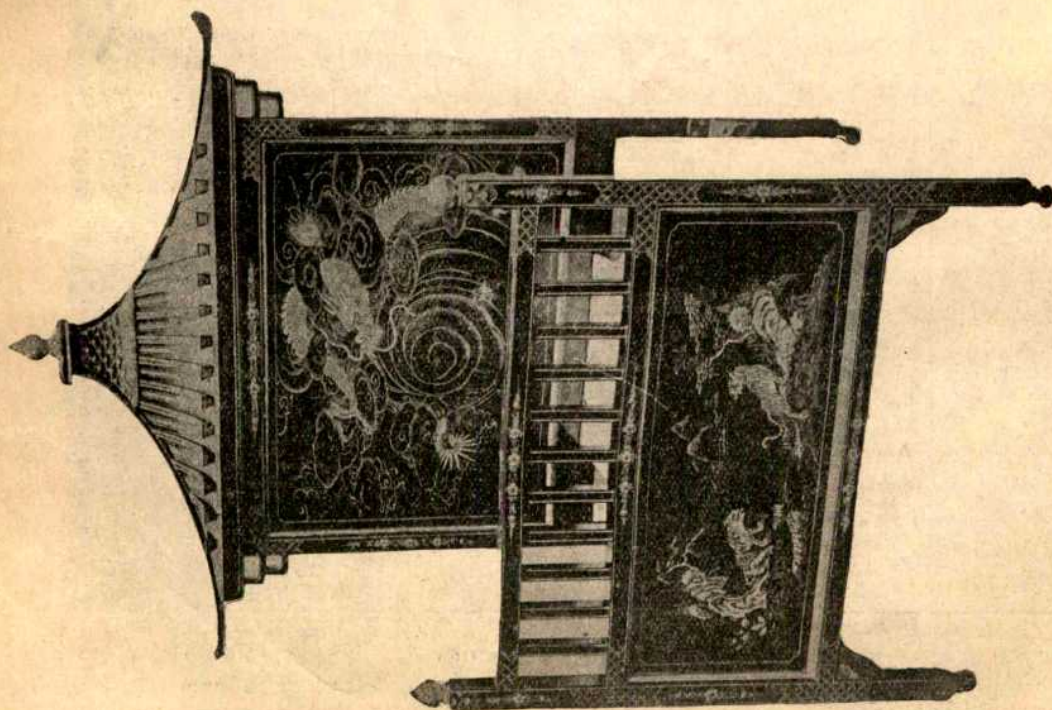
লাকালেপন দ্বারা কৃত্রিম বর্ণচিত্রিত (lacquered) পালঙ্কের পায়া। মাল্লাজী

কাঠের উপর বিশেষ প্রকার তৈলবর্ণের সাহায্যে চিত্রা-কনের (lacquering) কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

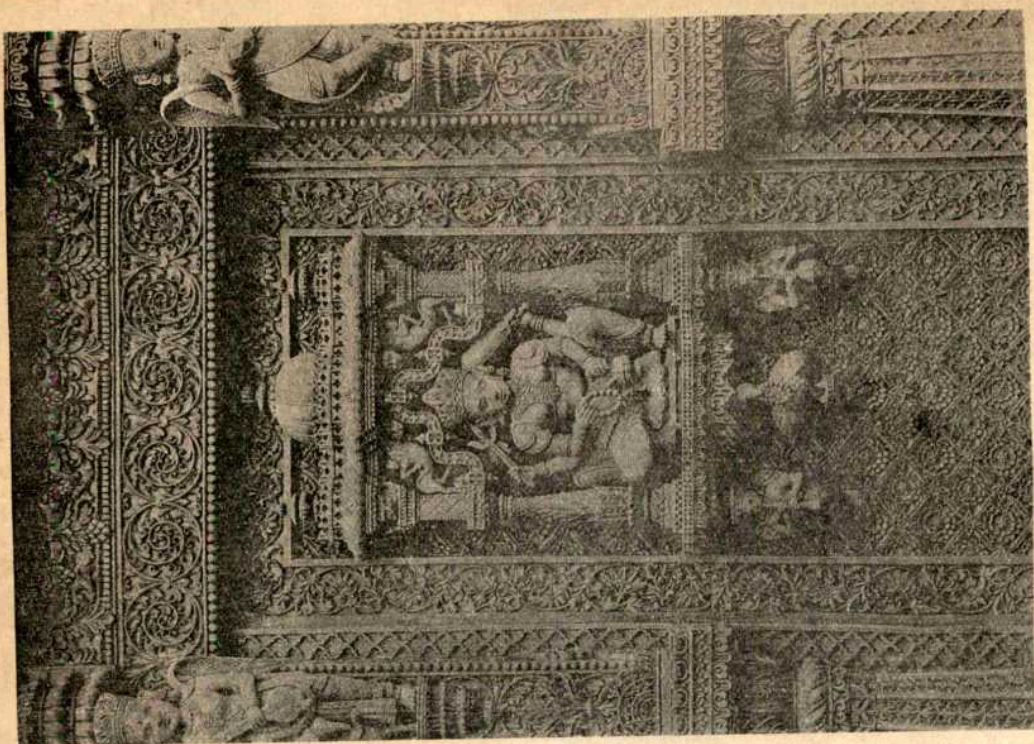
জাপান, চীন ইত্যাদি মঙ্গোলীয় দেশে এবং আমাদের দেশেও কাঠের গাজ প্রথমে কোন এক প্রকার বর্ণের “জমী” দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর বিভিন্ন বর্ণে তুলির সাহায্যে চিত্রাকনের প্রথা আছে। চিত্রটি অঙ্কিত হইবার পর আর এক পর্দা স্বচ্ছ তৈল পালিশ দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। এই প্রকার



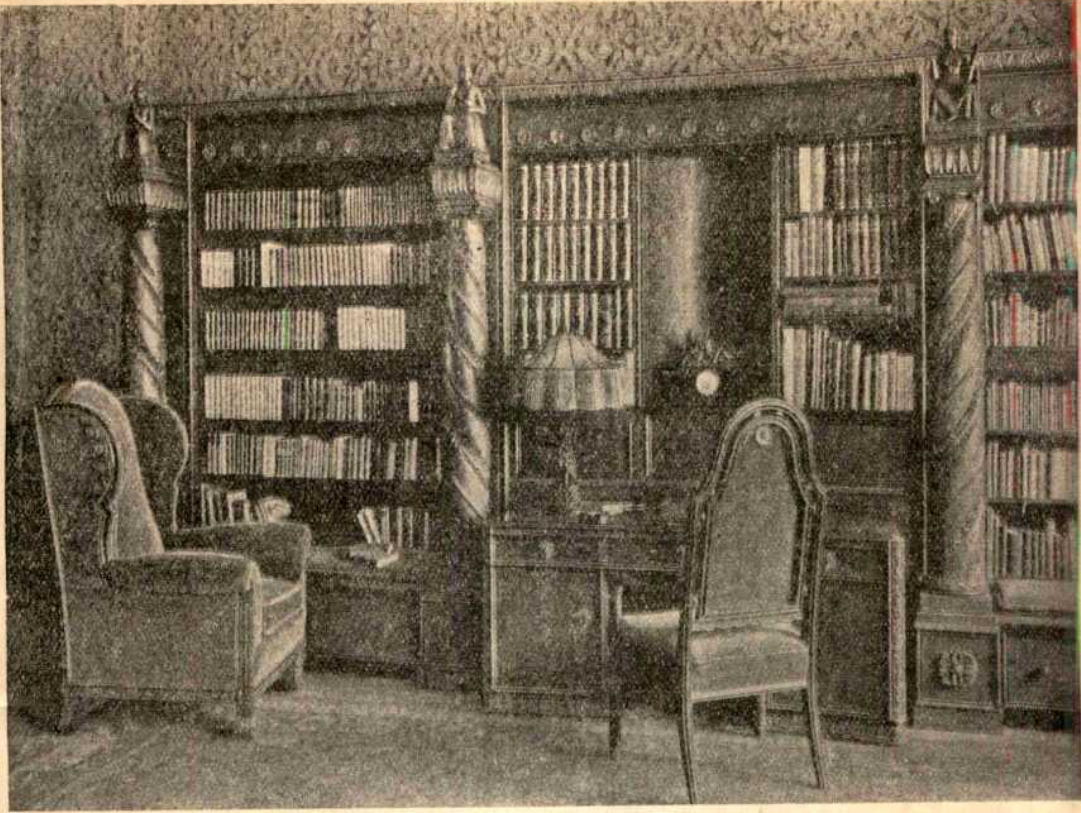
কানাড়ার চেলন-কাঠে খোদাই ।



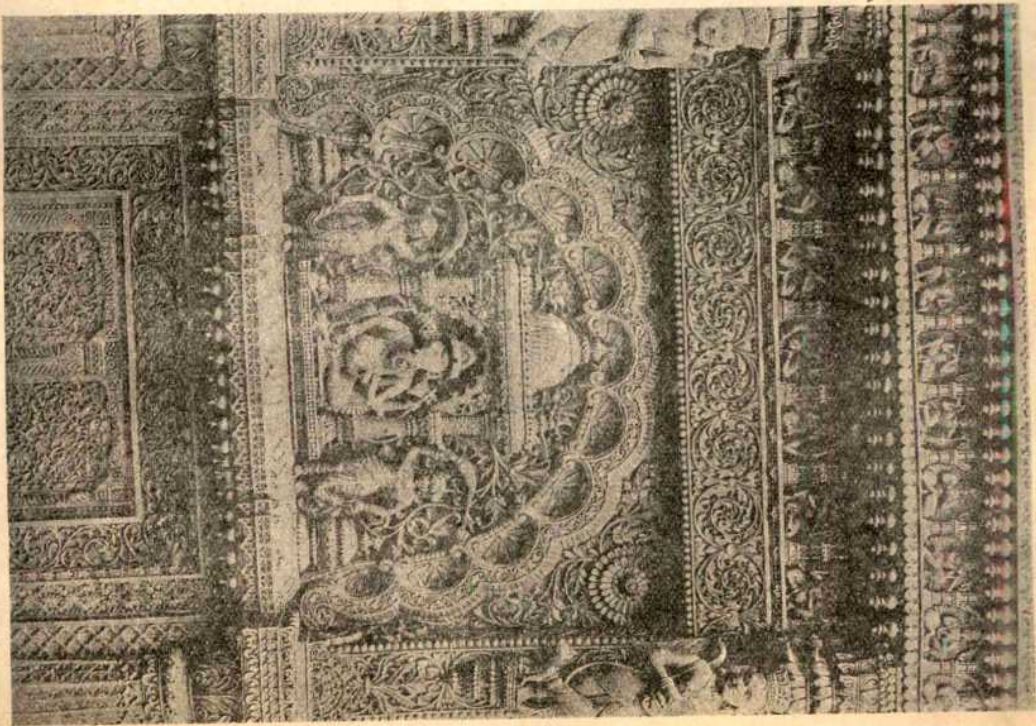
পালঙ্ক । জাপানী পরিষ্কলনা ও কৃত্রিম বর্ণে চিত্রাঙ্কন
(Japanese lacquer work bedstead)



শীতসার কাঠে খোদাই । আহমেদাবাদ । ঝুঁপের অংশ (Movable Screen)



আধুনিক জার্মানীর আসবাব-পরিকল্পনা । বইয়ের আলমারী, লিপিবার টেবিল, চেয়ার ও আরামচেয়ার । ঘরের একপাশে সমস্ত সাজান ।



শীতলার কাঠে খোদাই । আহমেদাবাদ । ফঁটের অংশ (Movable Screen)



আহমেদাবাদী ছবির ফ্রেম। শীতসার কাঠে বক্ররেখা জালীর কাজ

চিত্রাকর্ষনের অনেক ভিন্ন উপায় আছে। সে সকল এস্থলে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

এদেশের ঐ প্রকার চিত্রণ স্থায়ী নহে এবং অধিকাংশ স্থলে চিত্রের পরিকল্পনাও বিশেষ সরল নহে। কেবলমাত্র বর্ণমাবেণ হিসাবে সেগুলি অতি সুন্দর। কাশীর কাঠের খেলনা এই প্রকার কার্ণের নিকট উদাহরণ।

এই সকল উপরোক্ত প্রথা, বাহার অধিকাংশ এখনো এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার সম্মিলিত নিপুণ শিল্পী অনেক সুন্দর আস্রাবের পরিকল্পনা করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তাহার কারণ এদেশে তাহাদের আদর নাই। বিদেশে যথেষ্ট আছে, কিন্তু বাহাদের মারফৎ এই দেশের কারিগরের অব্যাদি বিদেশে পৌছায়, তাহারাই সমস্ত লাভ

গ্রহণ করে। কারিগরের অবস্থা পূর্ববৎ অদ্যভক্ষ্য হুণ্ডাই থাকে।

এ দেশের রাজা রাজড়া জমীদারবর্গ অনেক অর্থব্যয় করিয়া বেক্রপ আস্রাব দ্বারা প্রাসাদ বা গৃহ সজ্জিত করেন, বিদেশী সমঝদার ব্যক্তিদের নিকট তাহা হাশ্রকর ও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন প্রথমে হীরক আবিষ্কৃত হয়, তখন সে দেশস্থ আদিম কাক্রীগণ পুরানো ছাট, ছিন্ন কোট ও টাই ইত্যাদির বদলে বহুমূল্য হীরক দিত। তাহাদের নিকট ছিন্ন জীর্ণ বিদেশী বস্ত্র স্বদেশী হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে হইত।

আমাদের দেশে এরূপ বুদ্ধিযুক্ত অর্থশালী লোকের অভাব নাই।



চীনের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নেতৃত্ব—

ডাঃ সান ইয়াং সেনের মৃত্যুর পর চীন মহাদেশে অনেক শক্তিশালী পুরুষ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনই অসুখাবনমোগ্য। গতবারের পঞ্চশত্রে আমরা ছই একজনের আংশিক পরিচয় দিয়াছি। ডাঃ সেনের অযোগ্য পত্নী ও তাঁহার পুত্র

ফেং য়ুশিয়াং—জাতীয় সৈন্যদলের সৈন্যধ্যক্ষ, একজন অতি দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার প্রাণ নিয়ত উন্মুখ, তিনি অতি দরিত্রের মত বাস করেন। তিনি বলেন—চীনে সর্বপ্রধান আবশ্যক সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, লিখিতে পড়িতে পারে না এমন একজনও যাহাতে দেশে না থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কেবলমাত্র



সেনাধ্যক্ষ—ফেং য়ুশিয়াং

সান ফুর প্রভাব চীনে এখন খুব বেশী। অস্বাভাবিক নেতার মতো সৈন্যধ্যক্ষ চিয়াং কাইশেক, মার্শাল ফেং য়ুশিয়াং ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউজিন চেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা তিনজনেই জাতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। চীনের ইতিহাসে ইহাদের নাম চিরদিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে। চ্যাং সোলিন ও য়ুফু—ইহারাও শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক হইলেও দুর্বল জীবনশক্তি: স্বয়ং প্রভুত্বের জন্য চেষ্টা হইতেছেন। ইহাতে তাঁহারা দেশের শক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।



চিয়াং কাইশেক



ইউজিন চেন

কৃষক সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, পূর্ব প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদের তিনি আমল দেন না।

চিয়াং কাইশেক—এই মহাশক্তিশালী সৈন্যদায়েকে দেখিলেই চীনের দৌড়াগ্য-স্বর্ঘ্য যে উদ্ভিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক, তাঁহার মুখখানি সদা হাস্যময়, অথচ এই লোকই কর্তব্য-কার্যে কিরূপ অবিচলিত ও কঠোর, দেখিলে অবাক হইতে হয়।

ইউজিন চেন—পররাষ্ট্র-সচিব। ইনি পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নির্ভীক মহাপুরুষ। চীনার বৈদেশিক রাষ্ট্রতন্ত্র ইনি আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

মুক্তির নিমিত্ত ইঁহাকে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইতে হয়। 'শক্তি'র এই সকল লীলা বহু হিন্দু পুরাণের বিষয়। দুর্গতি হইতে তারণ করেন বলিয়া ইনি দুর্গা।



মহিষ-মর্দিনী, জাভা, ১৩শ শতাব্দী

দুর্গা—

বৈদিক উপাখ্যানে উষা, সরস্বতী প্রভৃতি দুই একটি ব্যতীত নারী-দেবতাদের সহিত আমাদের বিশেষ সাক্ষাৎ ঘটে না। তবে মাঝে মাঝে ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রানী—এই ধরণের সাধারণ উল্লেখ আছে। কিন্তু তৎ-কালীন বহু প্রচলিত অনার্য্য-তন্ত্রে দেবীদেরই অত্যন্ত প্রাধান্য দেখা যায়। পুরুষ দেবতাদের অপেক্ষা তাহারা সংখ্যায় বেশী। বর্তমান যুগের হিন্দু-ধর্ম অনেকটা এই অনার্য্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত। আদিম যুগে এই সকল অনার্য্য দেবীদের সত্তা ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল তাহা আমরা সঠিক অবগত নহি, তবে সাধারণতঃ বলা যায় যে ওই সকল দেবীর অধিকাংশই ভীষণা, এই সকল ভয়ঙ্করী দেবীরই ক্রমবিবর্তনে বর্তমান হিন্দুধর্মে একটি প্রবল বলশালী দেবীরূপে পর্যাবসিত হইয়াছে; তিনি স্বতই শক্তি-রূপিনী অথবা পুরুষদেবতাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। ইনিই এক আদ্যাশক্তিরূপে পরিকল্পিত এবং কল্পে কল্পে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। ইঁহার উপাসকেরা শাক্ত নামে অভিহিত। তাত্ত্বিক ধর্মও এই মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর সকল কর্মের, সকল বিকাশ ও প্রকাশের মূলে ইনি। দেবতাদের মধ্যে শিবের সহিত ইঁহাকে দ্বিতীয় সঙ্ক্ষে যুক্ত করা হইয়াছে। দেবতাদের ও মানবের

শক্তি ও দুর্গা ব্যতীত অসংখ্য নামেও ইনি সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। চণ্ডিকা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, কালী, মহাকালী, কটালবদনী প্রভৃতি ইঁহারই নাম। কালী অঙ্ককারের দেবতা হইলেও আদি জননী।

দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করিয়া মহিষমর্দিনী বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে মহিষমর্দিনী দুর্গার যে রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে এইখানে প্রকাশিত ছবিখানি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এটি একটি প্রস্তর মূর্তির ছবি, সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। এই মূর্তিটি জাভাতে পাওয়া গিয়াছিল এবং সম্প্রতি বিখ্যাত মিঃ রন কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া বোষ্টোন বাহুবুরে রক্ষিত হইয়াছে। বহুহস্তা দেবী মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ নিরতা। দেবী মহিষের মস্তক কাটিয়া ফেলিলে অসুর নিজ মূর্তি ধরিয়া লড়িতেছে। ইহাই হইল মূর্তির বিষয়।

রস সাহেব আরো একটি মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি বোষ্টোনের বাহুবুরে উপহার দিয়াছেন। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। মূর্তিটির প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ ভারতবর্ষ। সেই মূর্তিটির ছবিও এখানে দেওয়া হইল।

এই মূর্তিটি কালো ও কর্কশ বালুপ্রস্তর নির্মিত। স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে; একটি বাহু নাই। দেবী তটুবাছ ও কর্ণিত মহিষমুণ্ডের

বিখ্যাত চীনা অভিনেতা—

চীনের রাষ্ট্রীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদিতেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটয়াছে। শিল্পকলা ও নাট্য-জগতের পরিবর্তনও বিশেষ আশ্চর্য-জনক। চীনা অভিনয় চীনে যথেষ্ট সমাদৃত হইলেও এতদিন বাহিরের লোকে ইহার ভেতন প্রশংসা করিত না। সম্প্রতি



দুর্গা, দাক্ষিণাত্য, ৭ম শতাব্দী



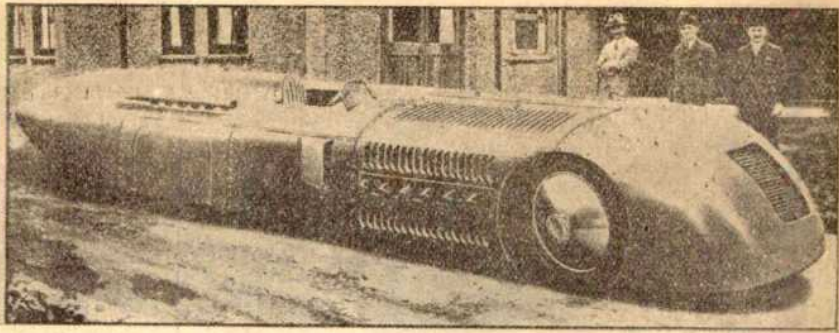
চীনা অভিনেতা মি ল্যাং ফ্যাং

পিকিংয়ে একজন এমনি প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাব হইয়াছে যে পাশ্চাত্য জগতও চীনের অভিনয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহার নাম মি ল্যাং ফ্যাং। অভিনয় করিয়া সম্ভবতঃ ইনিই পৃথিবীর সবচাইতে বেশী উপার্জন করেন। সম্প্রতি ইনি আমেরিকায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

উপর দণ্ডায়মান। একটি বাহুতে অভয়হস্ত মুদ্রা, অন্য একটিতে তর্জনী মুদ্রা। অস্বাভাবিক হাতে, খড়্গ, তীর, চক্র, ত্রিশূল, খেটক শব্দ ও ধনু বিধৃত। দুই স্বর্গেই তুণ। মস্তকে মুকুট, হস্তে কঙ্কণ, বক্ষে কাঁচুলি ও পরনে ধুতি। এই বৃহৎ মূর্তিটির ভাস্কর্য্য-শিল্প অতীব মনোহর এবং বোষ্টোন যাদুঘরে এই মূর্তিটিই ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

জগতের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটরগাড়ী ও তাহার চালক—

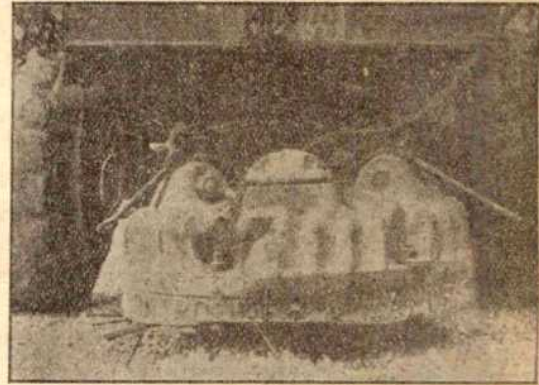
পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ছবিতে পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটরকার ও তাহার চালকের ছবি দেওয়া হইল। মোটরখানি 'মিট্রা সান্‌বিম' জাতীয়। চালকের নাম মেজর এইচ. ও. ডি. সিগ্রেভ। ইনি ঘটায় ২০৩ মাইল বেগে এই গাড়ীখানি চালাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে



দ্রুততম মোটরগাড়ী ও তাহার চালক

দ্রুততম মোটরগাড়ী ঘণ্টায় ১৫৬ মাইলের অধিক বেগে দৌড়াইতে পারে নাই। আমরা নিম্নে সকল প্রকার যন্ত্রবান ও প্রাণীর দ্রুত দৌড়ের যে রেকর্ড আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে মেজর সিগ্রেভ কি অবাধ্য সাধন করিয়াছেন। ইহা সমগ্র জগতের রেকর্ড, কোন বিশেষ প্রদেশের মাত্র নহে।

যন্ত্র বা প্রাণী	চালক	কোন দেশীয়	গতিবেগ
১। বিমান পোত	বন্নেট	ফ্রান্স	ঘণ্টায় ২৭৮'৫ মাইল
২। মোটর কার	মেজর সিগ্রেভ	...	২০৩'৭৯ মাইল
৩। রেল গাড়ী	...	ফ্লোরিডা	১২০ মাইল
৪। মোটর নৌকা	...	ইংলণ্ড	৮০ মাইল
৫। জাহাজ ইউ, এস, এস, কোলে	...	...	৪৩'৭৫ মাইল
৬। ঘোড়া	রোমার	আমেরিকা	১ মিনিট ৩৪ চারের পাঁচ সেকেন্ডে এক মাইল
৭। মানুষ	পি হুর্সি	ফিনল্যান্ড	৪ মিনিট ১০'৪ সেকেন্ডে এক মাইল



পথ-পরিষ্কারক যন্ত্র

বিপদই দূর হইয়াছে তাহা নহে; সংগৃহীত লৌহখণ্ডগুলি নানাভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে আরও দাঁড়াইতেছে।

আমরা কাদি কেন—

লস এঞ্জেলসের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেসিল ই রেনল্ডস্‌ মানুষের কান্না সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ আধুনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে—

কান্না জিনিষটা প্রাণজগতের আত্মপরায়ণতার পরিচায়ক; হাঙ্গামা মনুষ্যজগতের সামাজিকতা ও পরপারায়ণতা সূচনা করে অর্থাৎ আমরা নিজেদের জন্ত কাদি ও পরের জন্ত হাঙ্গামা। নবজাত শিশু সংসারে অবতীর্ণ হইয়াই ক্রন্দন করে বলিয়া মনে হয়। চীৎকার করিয়া না কাদিলেই সকল শিশুই যে কাদিবার মত মুখের ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাহা দেখিয়াছি। মাতৃগর্ভের অন্ধকার হইতে বাহিরের জগতের সুখ্যলোক ও দীপালোক চোখেমুখে পড়িয়া তাহাকে প্রথমটা পীড়া দেয় এবং তাহার প্রথম প্রকাশ হয় মুখমাসে ও পেশীর সঙ্কোচনে, ইহাকেই আমরা কান্না নামে অভিহিত করিয়া থাকি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরা সন্থদে ক্রন্দন করে। শিশু মানবের প্রথম ভাষার ক্ষুরণ এই বিরক্তি জ্ঞাপন করে। এই চীৎকার

অভিনব উপায়ে রাস্তা পরিষ্কার—

বড় বড় সহরের প্রত্যেক রাস্তায় প্রায়ই ঘোড়ার নাল, পেরেক ইত্যাদি নানাপ্রকারের লৌহখণ্ড পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, খালি পায়ে যাহারা পথ চলে তাহাদের পক্ষে এবং মোটর গাড়ীর চাকার পক্ষে এইগুলি অনেক সময় মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এই আপদ দূর করিবার জন্ত নেভাদার একজন বৈজ্ঞানিক এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি বৃহৎ কাঁচা লৌহকে (Soft Iron) চাকার উপর বসাইয়া ও বিদ্যুৎ সংযুক্ত করিয়া এই যন্ত্র নিশ্চিত হইয়াছে। বিদ্যুৎসংযোগে লৌহখণ্ডটি একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয় এবং ছোটবড় সকলপ্রকারের লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া লয়। এই যন্ত্রদ্বারা শুধু যে পথের



কান্নার ছবি

কান্না নহে, কান্নার প্রকাশ মুখমাংসের সঙ্কোচন বিকোচনে। আলোক-রশ্মি হইতে চক্ষুকে বাঁচাইতে গিয়া শিশুর মুখে এই ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সাধারণ মুখভাবের এই বিকৃতিতেই চক্ষে অশ্রু উৎপন্ন হয়।

বস্তুতঃ কান্না হইতেছে মানুষের অসহায় অবস্থাজ্ঞাপক। পূর্বে আমরা অশ্রুকে ক্লান্তি বা অবসাদের ফল বলিয়া মনে করিতাম কিন্তু বহু গবেষণা করিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি যে উহার সহিত মনের বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। মুখের মাংস ও পেশীর সঙ্কুচনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু আপনাই আসিয়া থাকে। একটু অল্প আয়াসেই যে কেহ চক্ষে জল আনিতে পারে।

দুইটি শিশুর কান্নার ছবি এখানে দেওয়া হইল। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দুইটি মুখে প্রায় একই প্রকার সঙ্কোচন বিকোচন হইয়াছে।

নিউইয়র্কে চীনা-শোভাযাত্রা—

চীনের জাতীয় জাগরণ যে আরম্ভ হইয়াছে তাহার একমাত্র প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর সর্বত্র, কি স্বদেশে, কি বিদেশে সকল চীনবাসীর মনে



নিউইয়র্কে চীনা শোভাযাত্রা

স্বদেশের স্বাধীনতার এক বিরাট স্বপ্ন জাগিয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক চীনদেশীয় সকল লোকেরই এখন একমন একপ্রাণ। চীনের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহার প্রমাণ এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকৌশল চীনে টিকিল না। জাপানেও এককালে চীনের মত বৈদেশিক প্রভাব বিরাজ করিত কিন্তু যেদিন বৈদেশিক প্রভুরা বুঝিতে পারিল যে জাপানে এক সর্বব্যাপী জাতীয়তার উদ্বোধন হইয়াছে তখন শুধুমাত্র কার্যিক শক্তি দেখিয়াই নহে, জাপানের মনের সেই একাগ্রতা দেখিয়াই বৈদেশিক শক্তির একে একে সরিয়া পড়িল। চীনেও সেই মানসিক শক্তি জাগিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের অনেক জাতিই চীনকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নিউইয়র্কের প্রবাসী চীনারা একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া চীনের স্বাধীনতার জন্য তাহাদের একান্তকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বহু আমেরিকান এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া চীনের এই জাগরণকে সম্মান করিয়াছেন। ‘চীন—চীনবাসীদের জন্ত’ একথা তাহারা বলাবলি করিতে-ছেন, ভারতবর্ষকে ভয়তবাসীর হইবে আমরা ব্যথিত হইয়া তাহাই ভাবিতেছি।

ইতালীর জননায়ক মুসোলিনি—

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বেনিটো মুসোলিনির জন্ম হয়। তাহার পিতা একজন সাধারণ কামার ছিলেন এবং মুসোলিনীকে অত্যন্ত কড়া-শাসনে রাখিতেন। তিনি যখন রক্তোত্তপ্ত লৌহখণ্ডে হাতুড়ির ঘা মারিতেন ও আগুনের ফুলকি চারিদিকে ছুটিতে থাকিত তখন বালক মুসোলিনির ভয়ে চোখ বুজিবার বা অস্ত্রদিকে চাহিবার জো ছিল না। এক দৃষ্টে সেই অলস্ত আগুনের দিকে তাহাকে চাহিয়া থাকিতে হইত।



মুসোলিনি-জায়া

এই ভাবে তাঁহার 'ডিসিগ্নিন' স্বরূপ হয়। পিতার কড়া শাসন সত্ত্বেও বালক মুসোলিনি অত্যন্ত দৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁহার অত্যাচারে তাঁহার সহানুভূতির উত্থাপন হইয়া উঠিত। তাঁহার মা ছিলেন গ্রামের পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী, তাঁহার নিকটেই মুসোলিনীর শিক্ষার পত্তন হয়। তিনি বহু কষ্টে তাঁহার দুই সন্তানটিকে সামলাইয়া চলিতেন। সেই শিশু বয়স হইতে তাঁহার দৃষ্টিতে এমন একটা ভয়ঙ্কর একাগ্রতা ও কঠোরতা ফুটিয়া উঠিত যে তাঁহার কোন কাজে বাধা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

পিতার কামার-শালায় শিক্ষা-নবিশী করিয়া তিনি যন্ত্রের শক্তিতে একান্ত বিখ্যাত হইয়া পড়েন। যন্ত্র ও বুদ্ধি-কৌশলে প্রকৃতিকে শাসন করিবার একটা মোহ শৈশব হইতেই তাঁহাকে পাইয়া ধরিয়াছিল। শৈশবের কঠোর শিক্ষা ও একাগ্রতা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে এমন নির্ভীক ও শক্তিম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুভয় কাহাকে বলে মুসোলিনি তাহা জানেন না।

ছবিতে আমরা সাধারণতঃ মুসোলিনীর যে কঠোর মুখ দেখিয়া থাকি সাধারণ অবস্থায় তাঁহার মুখখানি একেবারেই সেইরূপ নহে। তিনি কঠোরে নিজের মুখখানি কঠোর করিয়া তুলিতে ভালবাসেন। সহজ অবস্থায় তাঁহার মুখে একটা নারীহীন কমনীয়তা সর্বদা বিরাজ করে; তাঁহার চক্ষু স্বপ্নময়, দৃষ্টি গভীর, আকৃতি হৃদয়। বস্তুতঃ দিব্যর সময় তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তখন তাঁহার চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই যেন লক্ষিত হয় না। তাঁহার গলার স্বর গভীর ও স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বাভাবিক বক্তৃতাদক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে এখন কম আছে। লোকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারও অত্যন্ত মৃদু। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। তাঁহার সব চাইতে বড় গুণ তাঁহার সতেজ মনুষ্যত্ব ও ঐকান্তিক দেশ-প্রীতি। ফাকি কাহাকে বলে তিনি জানেন না; দেশের মঙ্গলের জন্ত তিনি সর্বস্ব পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় "কালো শার্ট"র জন্ত তিনি সর্বদা মরিতে প্রস্তুত। অতীত ইতালীর প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা; ভবিষ্যৎ ইতালী গড়িয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

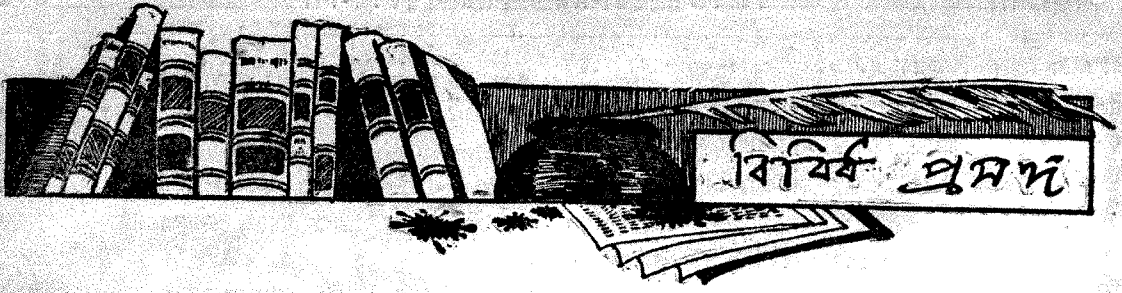
তাঁহার কথায়—

"অনেকে বলেন আমি নিজের প্রভুত্বের জন্ত সব কিছু করিতে



মুসোলিনীর বংশধর

পারি, আমি ইহা অধীকার করি। আমার স্বদেশ ও স্বজাতিকে আমি কৃতদাস করিবার জন্ত দেশের শাসনভার হস্তে লই নাই, আমি দেশ জননীর বিশ্বস্ত ভূত্যের মত তাঁহার সেবার ভার লইয়াছি। দেশের সেবাকে আমি আমার চরম ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করি, আমার ভক্তির মধ্যে ফাঁকি নাই। মাঝে মাঝে যে কঠোরতা আমাকে অবলম্বন করিতে হয় তাহা আমি খেলাচ্ছলে বুঝীমত করি না; আমি ব্যক্তিগত কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হই, দেশের মুক্তি চিহ্নস্বরূপ করিবার জন্ত আমি বর্তমানে মাঝে মাঝে কঠোর না হইয়া পারি না। সকল মানুষ কার্যকর পরিশ্রম করিবে ইহাই আমার কাম্য। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি সেখানে সবাই পরিশ্রমী, পরমুখাপেক্ষীর স্থান সেখানে থাকিবে না। আমার কামনা খুব অধিক নহে, আমার প্রতিদিনের সাধনা একটি লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছে। আমার সমস্ত জীবনও সেই লক্ষ্য লাভের চেষ্টায় ব্যয়িত হইবে।—সেই কাম্য এই—ইতালীর লোককে আমি সবল, স্বস্থ, সমৃদ্ধ, মহৎ ও স্বাধীন করিতে চাই। ইদ্বর আমার ঐকান্তিক চেষ্টাকে সফল করুন, আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করুন।"



প্রবর্তক সংঘ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

প্রবর্তক সংঘ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা বিষয়ে আমরা জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা একখানি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের মন্তব্য পড়িয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রবর্তক সংঘ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তখন পাই নাই, দেখি নাই; উহা আমাদের নিকট পরে আসিয়াছে। উহা পড়িয়া বুঝিলাম, যে, প্রবর্তক সংঘ, প্রথমে অরবিন্দ তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাহার পর গান্ধী, এবং তাহার পর রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, ইহাই বলিয়াছিলেন; ইহাদের শ্রেষ্ঠতার ক্রম নির্দেশ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা তাঁহারা করেন নাই। আমরা আমাদের ভ্রমের জন্ত দুঃখিত।

ইংরেজী দৈনিকটিতে যেরূপ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, তাহার কারণ ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অভিনন্দনপত্রটির ভাষা এরূপ, যে, উহা কাহাকেও পড়িতে শুনিলে, স্বয়ং না পড়িলে, উহার অর্থ সম্বন্ধে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

নির্ব্বাচনাদি সম্বন্ধে কংগ্রেস কমিটির নির্দ্ধারণ

গত মে মাসের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি ব্যবস্থাপক সভার জন্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান রীতি এবং অগ্রান্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কংগ্রেস কমিটির এই সব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে খবরের কাগজে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। আমরাদিগকেও কিছু লিখিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে, কেবলমাত্র জাপান ব্যতীত, পৃথিবীতে

আর যত শক্তিশালী দেশ বা রাষ্ট্র আছে, তাহার সবগুলিই ইউরোপে অবস্থিত, কিংবা ইউরোপীয় লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত। এই পাশ্চাত্য শক্তিশালী দেশগুলি কি প্রকারে শক্তিশালী হইয়াছে? এই সব দেশের সব লোকের ধর্ম্ম-মত এক নহে, শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থও এক নহে। সত্য বটে, পাশ্চাত্য সব দেশই খৃষ্টিয়ান দেশ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু খৃষ্টিয়ানদের মধ্যেও ক্যাথলিক আছে এবং নানা শাখায় বিভক্ত প্রটেস্ট্যান্ট আছে। সকলের সাধারণ নাম খৃষ্টিয়ান হইলেও, ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্ত পুড়াইয়া মারা বা অন্য প্রকারে প্রাণবধ করার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানদের দাঙ্গা মারামারির মত “ধর্ম্ম” হইতে উৎপন্ন দাঙ্গা মারামারি পাশ্চাত্য দেশসকলে আগে ত খুবই হইত, এখনও অল্পস্বল্প হইয়া থাকে। ধর্ম্মমতের পার্থক্য ছাড়া অস্ত্র রকমের মত-ভেদ এবং স্বার্থের পার্থক্যও পাশ্চাত্য দেশসকলে আছে। খনী কারখানার মালিক এবং কারখানার শ্রমজীবী মজুরদের মধ্যে সম্ভাব নাই। তাহার জন্ত দাঙ্গা মারামারিও কখন কখন হয়। আয়ারল্যান্ডের মত দেশে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ বশতঃ খুব মনোমালিঙ্গ ছিল, এবং তাহা অনেক সময় সাংঘাতিক আকার ধারণ করিত। আয়ারল্যান্ডে গবর্নেন্ট কর্তৃক ভূস্বামীদের সমুদয় স্বত্ব ক্রীত হইয়া কৃষকদিগের হস্তে অর্পিত হওয়ায় এই বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে, কিন্তু সকল পাশ্চাত্য দেশে এখনও তাহা হয় নাই।

পাশ্চাত্য দেশসকলে ধর্ম্মমত ও অগ্রান্ত নানা বিষয়ে মতভেদ ও স্বার্থভেদ থাকা সত্ত্বেও তাহারা সকলেই স্বাধীন, এবং অনেকগুলি দেশ খুব শক্তিশালীও হইয়াছে। তাহার অগ্রান্ত কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই, যে, যে সকল বিষয়ে দেশের সকল লোকের স্বার্থ এক, তাহা

পাশ্চাত্য দেশগুলি একে একে বৃদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সেই সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্ত তাহারা সম্প্রদায়গত মতভেদ ও শ্রেণীগত স্বার্থকে নিম্নস্থান দিয়া সাধারণহিত সাধনে ও সাধারণ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। সর্বোপরি, তাহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার বা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে। এই যে বোধ, মনের এই যে ভাব এবং এই যে তাহার বাহ্য প্রকাশ, তাহাকে সংক্ষেপে স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ বলা যাইতে পারে। এই স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ বিকার-বশতঃ অনিষ্টও খুব হইয়াছে। স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ প্রভাবে অনেক দেশের লোক অল্প দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, উহার ধন লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া আসিতেছে, এবং উহার অধিবাসীদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চ আসন হইতে অবনমিত করিয়া দ্বিপদ পশু-বিশেষে পবিত্র করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ উপায়ে কেবলমাত্র স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার ও স্বদেশের হিত সাধনে ব্যাপৃত থাকিলে, তাহা নোষের বিষয় ত নয়ই, পরন্তু এই-রূপ স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ ব্যতিরেকে কোন দেশেরই মঙ্গল হইতে পারে না।

আমাদের দেশেও স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ ব্যতিরেকে কখনও জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পূর্ণ স্বাধীনতার আকার ধারণ করিবে, কিনা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাধীনতার নামান্তর হইবে, তাহার বিচার এখানে করিব না। কেবল ইহা বলাই এখানে যথেষ্ট, যে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলেও স্বাধীনতা-প্রাণীকরণ প্রয়োজন।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় ও ঐহিক স্বার্থ আলাদা আলাদা কিনা, জমীদার ও রায়তের স্বার্থ আলাদা কিনা, ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ আলাদা কিনা, মহাজন ও শ্রমিকের স্বার্থ আলাদা কিনা, তাহার বিচারও এখানে করিব না। স্বীকার করা যাক, যে, এইসকল ভিন্ন ভিন্ন মানবসমষ্টির পৃথক পৃথক স্বার্থ আছে। তাহা স্বীকার করিয়াও ইহাই বলিতে চাই, যে, এইসকল সংকীর্ণতর স্বার্থের উপরে দেশের সাধারণ স্বার্থ একটি আছে, যাহা রক্ষা করিতে হইলে সংকীর্ণতর স্বার্থগুলিকে দ্বিতীয় স্থান দিয়া সাধারণ স্বার্থের জন্ত একতাবদ্ধ হইতে হইবে। কোনও সম্প্রদায় বা শ্রেণীর সংকীর্ণতর সব স্বার্থও বিদেশীয় প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ বিদেশীয় প্রভুত্ব আমাদের কোন একটা সমষ্টির স্বার্থের দিকে বরাবর দৃষ্টি না রাখিয়া কখনও এক সম্প্রদায় বা শ্রেণী, কখন বা অল্প সম্প্রদায় বা শ্রেণীর দিকে ঝুঁকিয়া ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া রাখাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত আবশ্যক মনে করিবে, এবং বরাবর তাহাই করিয়া আসিতেছে।

অতএব বিদেশীয় প্রভুত্বের পরিবর্তে দেশী লোকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সর্বোপরি প্রয়োজন। দেশী ব্যবস্থাপক ও শাসকসমষ্টি কেবলমাত্র কোন এক বা দুই সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা গঠিত না হইয়া, যোগ্যতা অনুসারে নানা সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা যাহাতে গঠিত হয়, একগুণ উপায় অবলম্বন করা উচিত। ইংলণ্ডে ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে খুব ঝগড়া আছে, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে মতভেদ আছে, ভূস্বামী ও কৃষকদের স্বার্থভেদ আছে, কৃষক ও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীকারী লোকদের মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য আছে; তাছাড়া, র্যাডিক্যাল, লিবার্যাল, শ্রমিক, টোব্যী প্রভৃতিদের রাজনৈতিক মতভেদ আছে। তথাপি তথাকার প্যারলিমেণ্ট অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভায় এই সব ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টির জন্ত আলাদা আলাদা নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং এক একটি সমষ্টির দ্বারা নিজেদের আলাদা প্রতিনিধিদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থাও নাই। এইজন্ত সকল সমষ্টিই সকল ভোটার বা নির্বাচককে একত্র ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হয়। ফলে কখনও টোব্যী বা রস্পশীল, কখনও বা লিবার্যাল বা উদারনৈতিক মতের প্রতিনিধি সংখ্যা বেশী হয়; প্যারলিমেণ্টে কোন সমষ্টিরই সংখ্যাধিক্য ও প্রভুত্ব স্থায়ী হয় না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একবার শ্রমিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যও হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, যে, আগামী নির্বাচনে প্যারলিমেণ্টে আবার শ্রমিকদের জিত হইবে। ইংলণ্ডে প্রতিনিধি নির্বাচনের যে নিয়ম চলিত আছে, তাহাও নিখুঁত নহে; কিন্তু তাহা আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন রীতি অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। কারণ, তাহা ইংরেজদিগকে এই শিক্ষা দেয়, যে, তাহাদের একটি সর্বোচ্চ সাধারণ স্বার্থ আছে, যাহা রক্ষিত না হইলে ইংলণ্ডীয় প্রটেস্ট্যান্ট, রোমান ক্যাথলিক, ভূস্বামী, কৃষক, শ্রমিক, ধনিক, প্রভৃতি কাহারও মঙ্গল নাই। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের প্রথায় গবর্ণমেন্ট মুসলমানদিগকে, খৃষ্টিয়ানদিগকে এবং অল্প কাহাকেও কাহাকেও স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দিয়া এই শিক্ষা দিতেছেন, যে, দেশবাসী সকল লোকের কোন একটি সাধারণ সর্বোচ্চ স্বার্থ নাই, মুসলমানের স্বার্থ আলাদা, খৃষ্টিয়ানের স্বার্থ আলাদা, ইত্যাদি। ফলে মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, হিন্দু, প্রভৃতি সকলেই গোলাম হইয়া আছে, কাহারও দাসত্ব ঘটিতেছে না।

অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রথা লর্ড মন্টগের আমলে প্রথম প্রবর্তিত হয়। উহার প্রবর্তনের আগে ঐ বড় নাটের তরফ হইতে করেকজন মুসলমান নেতাকে এই

সংকেত পাঠান হয়, যে, তাঁহারা তাঁহার নিকট গিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই দাবী করুন, যে, যেহেতু মুসলমান সম্প্রদায়ে স্বার্থ আলাদা, অতএব তাঁহাদিগকে নিজেদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক, এবং তাঁহাদের ‘রাজনৈতিক গুরুত্ব’ অনুযায়ী তাঁহাদিগকে তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কিছু অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দেওয়া হউক। এই প্রস্তাবে সাম, দান, দণ্ড, ভেদ, এই নীতিচতুষ্টয়ের শেষ নীতি অবলম্বিত হয়। ভারতসচিব লর্ড মর্লীর জীবন-স্মৃতিতে দেখিতে পাই, তাঁহার একটি চিঠিতে তিনি বড়-লাট মিণ্টোকে লিখিতেছেন, “you started the Muhammadan hare,” “আপনিই ত মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দাবী করিতে প্ররোচিত করেন।” মোলানা মহম্মদ আলীও কংগ্রেসের সভাপতি রূপে কথিত তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, “It was a command performance,” “লর্ড মিণ্টোর নিকট স্বতন্ত্র প্রতিনিধির দাবী লইয়া মুসলমান নেতারা যে গিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে।”

যাহারা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি পাইয়াছেন, তদ্বারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক উন্নতি কতটা হইয়াছে, তাহার বিচার তাঁহারা করিবেন। আমরা কেবল ইহাই বলিব, যে, এই প্রথা দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় নাই, দেশী লোকের রাজ-নৈতিক অধিকার ও কর্তৃত্ব বাড়ে নাই, স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পাইয়াও মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান ইংরেজের সমান হইতে পারেন নাই, হিন্দুর যে গোলামী তাঁহাদেরও সেই গোলামীই আছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসী সমুদয় সমষ্টির লোকেরা যদি একত্র তাঁহাদের সমুদয় প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যে এক, এই বোধ জন্মিবে, রক্ষিত হইবে ও দৃঢ়তর হইবে। তদ্বারা স্বাভাবিকতা বজ্রমূল হইবে।

অনেকে মনে করেন, যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিগণের স্বতন্ত্র নির্বাচন হইতে একলক্ষ্যে ঐরূপ স্বাভাবিকতায় পৌছা যাইবে না। সেইজন্য তাঁহারা চান, যে, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক সেই সেই ধর্মাবলম্বী স্বতন্ত্র প্রতিনিধি থাকিবে, কিন্তু তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন, সকল সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা, এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু ইহাতেও সাম্প্রদায়িক আলাদা আলাদা স্বার্থের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইতেছে। এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থায় আপত্তি আছে। যাহা হউক, যদি মুসলমানেরা ইহাতে রাজী হন, তাহা হইলে ইহা কয়েক বৎসরের জন্য পরীক্ষিত হইতে

পারে। পরীক্ষার সময় ছয় বৎসর অপেক্ষা বেশী হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু দশ বৎসরের পর আর কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি থাকিবে না, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন

ভারতবর্ষে নানা ধর্মমত প্রচলিত। জাতি এবং শ্রেণীও অনেক। শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত ও জাতীয় সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি সাম্প্রদায়িক আলাদা আলাদা প্রতিনিধির দরকার হয়, তাহা হইলে সকলের চেয়ে কম শিক্ষিত, সকলের চেয়ে দরিদ্র, সকলের চেয়ে স্বার্থরক্ষায় অসমর্থ যাহারা, তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে কোল ভীল মুণ্ডা সাঁওতাল প্রভৃতি যে-সব আদিম জাতি আছে, তাহারা এইরূপ লোক। হিন্দু সমাজের বাউরী প্রভৃতি জাতি এইরূপ লোক। কিন্তু ইহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার না দিয়া, দেওয়া হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী ও শিক্ষিত মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগকে। আমরা কাহারও জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি না। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টির জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সমষ্টির স্বতন্ত্র প্রতিনিধি থাকা উচিত, নতুবা ব্যবস্থা কখনও ত্রাসজন্য হইতে পারে না। যদি বলেন, যে, প্রত্যেক সমষ্টির জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনেব্যবস্থা করা কার্যতঃ অসম্ভব, তাহা হইলে আমবা বলিব, অসম্ভবতঃ দুর্বলতম, অশিক্ষিততম, দরিদ্রতম যাহারা তাঁহাদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করুন। তাহা করা হয় নাই, এবং হইবেও না। বর্তমান স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথা যে কিরূপ অসম্ভব ও অন্যায্য, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ধর্মসম্প্রদায় ভেদে সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের আমরা বিরোধী তিনটি প্রধান কারণে। প্রথমতঃ, ধর্মসম্প্রদায়ভেদে মানুষের রাষ্ট্রীয় ও ঐহিক স্বার্থ আলাদা নহে; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই ও কার্যতঃ দেওয়া অসম্ভব; এবং তৃতীয়তঃ, সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার করিয়া লইলে, যে-সব নিরক্ষর, গরীব, অসহায় লোকদের স্বার্থ-রক্ষার সর্ব-চেয়ে বেশী দরকার, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি না দিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইবে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও শক্তিশালী কোন কোন সমষ্টিতে।

ভারতের প্রতি হিন্দু মুসলমানের মনের ভাব

ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। অল্প যে-সব সম্প্রদায় আছে, তাহারা সংখ্যায় নূন। ভারতীয় স্বাধীনতা বাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইতে পাবে, তাহার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই পৃথিবীব্যাপক দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিই অধিক অনুরক্ত হওয়া আবশ্যিক। হিন্দুদের পক্ষে তাহা সহজ; কারণ, হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা, বাস প্রভৃতি সমস্তই ভারতবর্ষজাত ও ভারতে স্থিত। জৈন, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতিদের পক্ষেও তাহা ঐ কারণে সহজ। দেশীয় খৃষ্টিয়ানদের পক্ষে তাহা তত সহজ নহে; কারণ, তাহাদের ধর্ম বিদেশ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর পাশ্চাত্য কোন খৃষ্টিয় দেশের লোকেরা নিজের দেশ অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের প্রতি অধিক অমুরাগ অমুভব বা প্রদর্শন কবে না। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, আধুনিক খৃষ্টিয় ধর্মের সহিত স্বাধীনতার বিরোধ নাই। ভারতীয় খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে ভারতীয় নানা প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, প্রভৃতির চর্চা অনেকে করিতেছেন। অধিকন্তু, ভারতীয় খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা বেশী না হওয়ায়, তাহারা যদি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবাপন্ন হইতেন, তাহা হইলেও ভারতীয় স্বাধীনতায় খুব বেশী ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিতেন না। ভারতে হিন্দুর নীচেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। তাহাদের ধর্ম বিদেশ হইতে আগত। সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতি কতকটা বিদেশী, কতকটা ভাবতীয়। অতএব, ভারতীয় স্বাধীনতার সর্বসম্প্রদায়ব্যাপিতা মুসলমানদের মনে ভাবের উপরই অধিক নির্ভর করে। ইহার মানে ভাল কবিয়া বুঝা দরকার। ইহার মানে অনেকে এইরূপ বুঝেন, যে, মুসলমানেরা ভারতের স্বাধীনতাতে সম্মতি না দিলে ভারতবর্ষ কখনও আত্মকর্তৃত্ব লাভ কবিতো পারিবে না। আমবা ঠিক তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, মুসলমানেরাও যদি দরদস্তুর না কবিয়া স্বাধীনপ্রচেষ্টার অন্তরের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত সোজা হইবে। কিন্তু যদি যোগ না দেন, তাহা হইলেও স্বাধীনতা অর্জিত হইবে, কিন্তু এই কৃতিত্বের গৌরব হইতে এবং এই কৃতিত্বের জন্য যে দৃঢ় দেশহিতব্রত চরিত্রের প্রয়োজন, সেই চারিত্রিক সাধনার অংশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবেন।

অনেকে মনে করেন, মুসলমানদের আন্তরিক ও কার্যতঃ যোগ ব্যতিরেকে, অন্ততঃ বাহ্য সম্মতি ব্যতিরেকে, স্বাধীনতা লব্ধ হইবে না। ইহার মধ্যে এইটুকু সত্য আছে, যে, স্বাধীনতার প্রচেষ্টার সহিত মুসলমানদের অন্ততঃ বাহ্য যোগ না থাকিলে, শাসক ইংরেজ জাত এই ওজর করিতে

থাকিবে, যে, যেহেতু মুসলমান ও হিন্দু মত এক নহে, অতএব স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা বলি, এই ওজর করা সত্ত্বেও, অধিকাংশ ভারতীয় দৃঢ়তার সহিত স্বাধীনতার সংকল্প করিলে ইংরেজকে ভারতীয় স্বাধীনতা হইতেই হইবে। ভারতীয়েরা সামান্য যতটুকু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য চেষ্টা সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা ত সামান্যই করিয়াছেন, হিন্দুদের মধ্যেও অধিকাংশ হিন্দু চেষ্টা কবেন নাই; কারণ, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত বলিয়া এই অধিকাংশ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন নাই। শতকরা যে ৬.৭ জন লিখনপঠনক্ষম, তাহাদেরও অনেকে জাতীয় প্রচেষ্টায় যোগ দেন নাই। মোটের উপর হাজারে একজন যোগ দিয়াছেন কি না সন্দেহ। তথাপি কিছু ফল লব্ধ হইয়াছে।

এই কারণে আমরা বলি, মুসলমান ও যত্ন সব সম্প্রদায়ের লোককে স্বাধীনতার মঞ্চে দৌড়িত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকুক, “ভারতবর্ষ আমাদের হিন্দুদের দেশ, মুসলমানরা বিদেশী, দেশের উপর তাহাদের কোন দাবী নাই,” এইরূপ মনের ভাব পরিত্যক্ত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সকলও সকলের মনে দৃঢ় হউক, যে, “যদি আর একজনও আমার সঙ্গে যোগ না দেয়, তাহা হইলেও আমি গন্তব্য পথে চলিব, এবং দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করিব।”

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মোট অধিবাসীর সংখ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে নীচে লিখিত হইল।

মোট অধিবাসীর সংখ্যা	২৪,৬২,৬০,২০০
মোট হিন্দু	১৬,৩১,৪৪,৭০০
ব্রাহ্মণ্য হিন্দু	১৬,২৭,১২,১৮৮
আর্যসমাজী	৪,২৬,৬৮২
ব্রাহ্ম	৫,৮৩০
শিখ	২৩,৬৭,০২১
জৈন	৪,৫৫,৮৫৫
বৌদ্ধ	১,১৫,৯০,৮১৫
পারসী	৮৮,৪৬৪
মুসলমান	৫,৯৫,৪৪,৩০১
খৃষ্টিয়ান	৩০,২৭,৮৮১
ইহুদী	১২,২২১
আদিম অধিবাসী	৬২,০৪,১৬৭
অজ্ঞাত	১৭,৭৪,

উপরে বলিয়াছি, হাজারে একজন ভারতীয় রাষ্ট্র

অধিকার লাভ প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছে কিনা, সন্দেহ। যাহাযা যোগ দিয়াছে, তাহার প্রধানতঃ অমুসলমান, এবং মুসলমানদের যোগ দেওয়া না দেওয়ার কথা না ভাবিয়াই তাহার কাজ করিয়াছে। তাহাতেও কিছু ফল ফলিয়াছে। সুতরাং সব হিন্দুবা যদি চেষ্টা করে, সে চেষ্টা সফল হইবেই। মুসলমানেরা যোগ দিলে ভাগ, না দিলে দুঃখের বিষয়; কিন্তু তাঁহারা যোগ না দিলে বিশ্বরথের চাকা অচল হইয়া থাকিবে না। যাহারা আইনবিরুদ্ধ উপায়ে দেশকে স্বাধীন করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে, স্বাধীনতা হইয়াছে, জেলে গিয়াছে, তাহার সবাই অমুসলমান। তিন নম্বর রেগুলেশন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে যাহারা বিনা বিচারে বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, স্বাস্থ্যহারাইয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাহার সবাই অমুসলমান। “মুসলমানেরা প্রাণপণ করিতেছে না, অতএব আমরা প্রাণপণ করিব না; মুসলমানেরা বন্দের শতকরা ৫৪ জন, অতএব ফাঁসী, ক্ষয়রোগ আদিতে মৃত্যু, বীপ চালান, বিচারান্তে কারাদণ্ড, এবং বিনাবিচারে স্বাধীনতালোপ যাহাদের হইবে তাহাদের শতকরা ৫৪ জন মুসলমান হউক, তবে আমরা দেশের জন্ত নিজেদের বিপন্ন করিব,” এরূপ প্যাক্ট বা চুক্তি বেহিসাবী প্রাণধরী বাঙালী যুবকেরা কেহ চায় নাই। তাহার বিজ্ঞানোচিত ও ভাল কাজ করিয়াছে কিনা, তাহা এখন বিচার্য নহে। এখন বক্তব্য এই, যে, তাহার যাহাকে অজ্ঞান অত্যাচার অবিচার মনে করিয়াছিল, তাহাতে প্রাণে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সব সম্ভাব্যেব লোক তাহাদের কার্যে যোগ দিতেছে কিনা, তাহার তাহা ভাবে নাই। ভারতবর্ষ অল্প যাহা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াছে, তাহা আইনসম্মত ও বৈআইন-উভয়বিধ চেষ্টার সাফল্য ও পরোক্ষ ফলে এবং ঘাত-প্রতিঘাতে পাইয়াছে, এবং মুসলমানরা হিন্দুদের সহিত যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও পাইয়াছে। অতএব, মুসলমান যোগ দিলে ভাল, নতুবা অমুসলমানরাই স্ববাক্ত স্থাপনের চেষ্টা করিবে, এইরূপ মনোভাব লইয়া কাজ করাই উচিত। স্বরাজ স্থাপনের দায়টা যদি হিন্দুরই হয়, কিন্তু স্বরাজের ফলভোগ করার অধিকারটা যদি মুসলমানেরও হয়, তাহাই হউক। বৃটিশ-শাসিত ভারতের ২৪,৬২,৬০,২০০ জন অধিবাসীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু, মুসলমান সিকিরও কম। মুসলমানেরও চেষ্টার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু হিন্দুর চেষ্টার কি কোনই মূল্য নাই?

ভারতীয় সকল মুসলমানের মনের ভাব কিরূপ, জানি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের অনেকে যে ভারতীয় অমুসলমান ও ভারতীয় মুসলমান অপেক্ষা

বিদেশী মুসলমানদিগকে অধিকতর আত্মীয় মনে করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার একটা সোজা প্রমাণ এই, যে, যুদ্ধে ব্যাপৃত কিম্বা যুদ্ধে বিপন্ন তুর্কের জন্ত ও রিফের জন্ত বিশ্ব ভারতীয় মুসলমান টাকা দিয়াছে, কিন্তু তুর্কিগণিতে বিপন্ন ভারতীয় হিন্দুর কথা দূরে থাক, ভারতীয় মুসলমানের জন্তও টাকা দেয় না। অথচ বিদেশী মুসলমানরা ভারতীয় মুসলমানদের জন্ত একটা কানাকড়িও খরচ করে না, তাহাদের প্রতি কোন দরদ বা শ্রদ্ধা দেখায় না। যাহারা গোলামী করে, এবং স্বাধীনতার চেষ্টায় যোগ দিবার আগে দরদস্তুর করে, তাহাদিগকে শাসকশোষক-জাতির ইংরেজ ভিন্ন অল্প কোন স্বাধীন জাতির লোক মৌখিক সম্মানও দেখাইতে পারে না, আন্তরিক শ্রদ্ধা ত দূরের কথা। কামাল পাশা ভারতীয় মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা বেশ বক্তৃতা করিতে পার বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় আমাদের জন্ত না লড়িয়া আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রু ইংরেজদের ফৌজবৃদ্ধ হইয়া লড়িয়াছিল। আমরা সুলতানকে রাখিব কি না, থলিকা রাখিব কি না, সেটা আমাদেরই ভাবিবার কথা। তোমাদের কথা শুনিবার আমাদের দরকার নাই তোমরা নিজেদের চবথায় তেল দাও গিয়া।” তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য এইরূপ। ভারতবর্ষে আর থাকিবেন না বলিয়া যে-সব মুসলমান আফগানিস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাজরিনদিগের কি দশা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। ইবন সাদের নেতৃত্বে হেজাজে সমগ্র মুসলমান জগতেব যে মন্ত্রণাসভা হইয়াছিল, তাহাতে মোলানা মহম্মদ আলির মুকস্বিধানা ত ঘটেই নাই, অধিকন্তু ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ কোন খাতির হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস বর্গের “স্টার” (The Star) নামক কাগজের জন্ত একজন সাংবাদিক রিফ্দের বন্দী নেতা আব্দুল করিমের সহিত রিইউনিয়ন দীপে দেখা করেন। তাঁহার এই সাফল্য-কারের বৃত্তান্তে, সাফল্য-কারের পূর্বে আব্দুল করিমের জেলার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাপা হইয়াছে। যথা—

“I don't think Krim will see you, much less talk to you”, said Captain Sagnes, and he went on to say: “He prefers to plough a lonely furrow. So far he has not been interviewed by anybody, and he firmly refused to see or have anything to do with the Moslems who are Indians.” They sent a delegation to interview him, but Krim threw up this hands and said: “Send them away. I will have nothing to say to them or their people.”

তাৎপর্য। জেলার বলিলেন, “করিম তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন

বলিয়া বোধ হয় না, কথা বলা ত দুইয়ের কথা। তিনি একান্তে থাকি গল্প করেন। কেহ এপার্থক্য তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে পারে নাই; এবং যে-সব মুসলমান ভারতবর্ষে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে বা তাদের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতে তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন।” তাহারা তাঁর সঙ্গে মুলাকাতের ক্ষুদ্র প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল, কিন্তু করিম হস্ত উৎক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও, বিদায় দাও; আমি তাহাদিগকে বা তাহাদের স্বজাতীয় সখ্যাদিগকে কিছুই বলিতে চাই না।”

ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে বিদেশী মুসলমানদের তাজিলার ভাব থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় মুসলমানরা অনেকে বিদেশী ভাইদের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহারা বরং বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা ভারতবর্ষ বিজিত দেখিবে, তবু হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া ভারতবর্ষকে অন্য দেশের সমকক্ষ করিবে না। আমরা যত দূর জানি, সব ভারতীয় মুসলমানের মনের ভাব একরূপ নহে, কাহারও কাহারও বটে। কয়েক দিন হইল লাহোরের মুসলিম আউটলুক নামক কাগজ লিখিয়াছে, যে, ইংবেঙ্গরা ভাবতবর্ষ ছাড়িয়া গলেই মুসলমানরা ভারতবর্ষ দখল করিবে। কিন্তু মুসলিম আউটলুকের মতে ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজ্য হইবে না, আফগানরা ভাবত আক্রমণ করিয়া দখল করিবে। ইহা লিখিয়া মুসলিম আউটলুক বড়ই আরাম ও ক্ষুণ্ণি বোধ করিতেছে। কিন্তু চীনের, আফগানিস্থানের, তুর্কিস্থানের, পারস্যের, সিরিয়ার, আরবের, তুরস্কের, মিশরের, এবং মরক্কোর মুসলমানেরা অন্য কোন দেশের মুসলমানদের দ্বারা স্বদেশ বিজিত দেখিতে চায় না, তাহারা স্বাধীন হইতে ও থাকিতে চায়। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের অনেকের মতি-গতি অন্য রকম। এক জন ভারতবর্ষীয় মুসলমান লণ্ডনের “দি ইণ্ডাস” (The Indus) নামক কাগজে লিখিয়াছেন :—

We, Mussalmans, may be callously indifferent to the gravest events at home, but every gentle rustle of leaves in far-off Turkey or Africa is accompanied by the wildest and most unnatural breaking of our dear, sympathetic hearts. Millions of our own poor countrymen are dying of exposure and starvation. We cannot clothe or feed them; we are too poor. But we can afford to send millions of rupees to support wars in distant lands in which we have no interest except that they concern some people who also happen to call themselves Mussalmans. Such is our wholehearted generosity that we do not even mind not getting simple thanks for the “widow's mite” we can so ill-afford. Our co-religionists' affection for us is so deep and sincere, that they cannot bear to go through the futile and awkward formality of displaying their gratitude in any way; they content themselves with just feeling it! This is the most remarkable part of the whole heartbreaking business. As a Mussalman somewhat bitterly remarked: “They don't care a damn for us. They see that we are fools, idiots

and naturally take advantage of the fact. But apart from that, we don't exist for them. And we go on running after them like a pack of snivelling dogs. Damn fools, that's what we are.” I wish I could disagree. No one can fail to observe that this great “Muslim brotherhood” exists only for us, Indian Mussalmans. No one else has a notion of it. Turkey may go to the dogs, but the fact does not trouble either the Moroccans, or the Egyptians, or the Persians, or the Afghans, or anyone else. Yet our Indian Mussalmans butt in and “kick up an infernal row.” The poor, gallant Riffs were fighting for their very lives. The Indian Mussalman made some futile demonstration of sympathy, otherwise not a Mussalman from Egypt to China raised his little finger. Were the English out of India to-day and we fighting the Hindus, not a “brother” would come to our aid, unless for purely personal reasons. And yet—, I put forward a test question before a Punjabi Muslim friend of mine, I asked him what he would do in the event of India (Indian India, that is to say) being attacked, say by the Afghans! After an unsuccessful attempt, to avoid a direct answer, he confessed that he would take the Afghan side! This sort of fanaticism is even more prevalent among the newly converted than among the older Mussalmans. It is perfectly comic how a person, whose, perhaps, father became a Mussalman, or quite possibly who has himself just embraced Islam, waxes eloquent about “our great Muslim culture,” “our great Muslim tradition,” and of course, “our great Muslim brotherhood.”

The whole position is entirely false. utterly impossible.

তাৎপর্য। আমরা ভারতবর্ষের মুসলমানেরা নিজের দেশের গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে হৃদয়হীনভাবে উদাসীন থাকিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধ তুরস্ক বা আফ্রিকার গাছের পাতার বৃহৎ সন্ধ্যার শব্দে আমাদের সমবেদনাপূর্ণ আত্মরোগোপাল হৃদয়গুলি যথাস্থাবিক রকমে ভাঙিয়া যায়। আমাদের নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব লোক অনবরতগৃহাভাবে মারা যাইতেছে; আমরা তাহাদিগকে খাইতে পরিতে দিতে পারি না। কিন্তু আমরা দূর দেশে যুদ্ধের সাহায্যার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠাইতে পারি; সে-সব যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই; সম্বন্ধ কেবল এইটুকু, যে, তাহাতে যাহারা জড়িত তাহারা আপনাদিগকে মুসলমান বলে। আমাদের বদান্ততা এমনই পূর্ণহৃদয়প্রসূত, যে, যাহাদিগকে আমরা টাকা পাঠাই তাহারা যে আমাদের দিকে ধন্যবাদ দেয় না, তাহা আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের প্রতি আমাদের বিদেশী সখ্যাদিগের ভালবাসা এত গভীর ও আন্তরিক, যে, তাহারা আমাদের প্রতি কোন প্রকার ব্যর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাহ্য নৌকিকতার কষ্টও সহ্য করিতে পারে না; তাহারা শুধু কৃতজ্ঞতাটুকু অমুভব করিয়াই সন্তুষ্ট। আমাদের বিদেশী সখ্যাদিগের গৃহ হৃদয়ভঙ্গ ব্যাপারের এইটাই সকলকার চেয়ে চমৎকার অংশ। একজন মুসলমান ভিক্ষতার সহিত মন্তব্য করিয়াছিলেন, “তারা আমাদের ক্ষুদ্র হিন্দুসকলকে কেয়ার করে না। তারা দেখে যে, আমরা বেকুব আহাম্মক, হতভাগ স্বভাবত আমাদের বোকামি হইতে যতটা সুবিধা পাইতে পারে, তাহা ছাড়ে না। কিন্তু এই প্রকারে তাহাদের লাভের কারণ হওয়া ছাড়া তাহাদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব নাই। আর আমরা তাহাদের পেছনে পেছনে কুকুরের মত নাকে কাদিতে কাদিতে ছুটি। গোম্মার যাবার উপযুক্ত বেকুব যাকে বলে, আমরা তাই।” আমি ইহার সঙ্গে একমত হইতে না পারিলে স্থগী হইতাম। এটা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,

যে, ছনিয়জোড়া “মুসলিম বেরাদরী” কেবল আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের শুদ্ধই আছে। আর কোন দেশের মুসলমানদের এরূপ কোন ধারণা নাই। তুরস্ক পোল্যান্ড গেলও মরক্কো, মিশর, আফগানিস্তান পায়স্ত বা অন্ত কোথাওকার মুসলমানের কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু আমাদের ভারতীয় মুসলমানরা মহা সোরগোল উপস্থিত করে। বেচারী সাহসী রিকরা প্রাপণ করিয়া লড়িতেছিল। ভারতের মুসলমানেরা তাদের সহিত যুধা সমবেদনার বাহুলক্ষণ দেখাইয়াছিল; তা ছাড়া চীন হইতে বিশর পর্যন্ত কোন দেশের মুসলমান তাদের ক্ষম্ব একটা কড়ি আড়লও ঢুলে নাই। যদি আজ ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, এবং আমরা হিন্দুদের সঙ্গে লড়ি, তাহা হইলে কোন ‘তাই বেরাদর’ আমাদের সাহায্য করিতে আসিবে না—বহি কেহ আসে, সে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার ক্ষম্বই আসিবে। কিন্তু তথাপি—। আমার এক পঞ্জাবী মুসলমান বন্ধুকে পরীক্ষা করিবার ক্ষম্ব একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছিলাম। আমি হুধাইয়াছিলাম, ‘আফগানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে তুমি কি করিবে?’ বন্ধু প্রথমে মোজাহজি উত্তর না দিবার বিকল চেষ্ঠা করিয়া শেষে বলিলেন, ‘আমি আফগানদের দলে ভিড়িব।’ এই রকমের ধর্ম্মান্ততা বুনিধাধী মুসলমানদের চেয়ে নবনীকিত মুসলমানদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। হুত বাহার বাবা কিধা সে নিজেই মুসলমান হইয়াছে, সে যখন বাহ্যিকতার সহিত “আমাদের মহান মুসলিম সভ্যতা,” “আমাদের মহৎ মুসলিম ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত মত বিশ্বাস,” এবং, অবশ্য, “আমাদের ক্ষম্বজোড়া মুসলিম বেরাদরী”র বিষয়ে বাগ্মজাল বিস্তার করিতে থাকে, তখন ব্যাপারটা চুড়ান্তরকম হাস্যকর হইয়া উঠে।

সমুদ্র ব্যাপারটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ও অসহ্য।

এই ভারতীয় মুসলমান লেখকের পঞ্জাবী মুসলমান বন্ধু ভারতবর্ষ আফগানদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আফগানদের সঙ্গেই যোগ দিবেন। তিনি এবং মুসলিম আউটলুকের সম্পাদক বোধ হয় ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে, মুসলমান মোগল ও মুসলমান পাঠানের যুদ্ধটা মিথ্যা কথা, মোগল কেবল হিন্দুকেই মারিয়াছিল, পাঠানও কেবল হিন্দুকেই মারিয়াছিল, এবং নাদির শাহের আদেশে যখন দিল্লীতে লুট ও হত্যা-কাণ্ড হইয়াছিল, তখন দিল্লীর বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন একজন মুসলমানেরও কোন ক্ষতি বেইজ্জতি হয় নাই, প্রাণ ত যায়ই নাই, কেবল হিন্দুদের ধন প্রাণ গিয়াছিল এবং তাহাদের বাড়ী হইতে লুণ্ঠিত সব ধন নাদির শাহ দিল্লীর মুসলমানদিগকে নিঃশেষে দান করিয়া ফকীর হইয়া মক্কায় হজ করিতে গিয়াছিলেন।

ভারতীয় জাতি গঠনে মুসলমানরা খুব প্রয়োজনীয় উপাদান। দেশ যেমন হিন্দুদের, তেমনি মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকলেরই। উহা কোন দলিলের জোরে বা বংশের জোরে কাহারও হইতে পারে না। যে-কেহ খাটিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া বিপদের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়া উহা সমুদ্রি শ্রী স্বাস্থ্য সভ্যতা স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিবে রক্ষা কবিবে, উহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষাও গৌরবময় করিবে, সেই, কেবল সেই, ভারত-বর্ষকে “আমার দেশ” বলিবার অধিকারী, অন্ত কেহ

নহে। এই উচ্চ সাধনার দ্বারা এই উচ্চ অধিকার লাভ করিতে কেহ যদি অগ্রসর না হন, বঞ্চিত রূপাপাত্র তিনিই হইবেন, কিন্তু বিধাতার কাজ বন্ধ থাকিবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে।’

পৃথিবীর নানাজাতির লোকসংখ্যার অনুপাত

“জিওপলিটিক্” নামক ইউরোপীয় কাগজ হইতে কলিকাতার “দি উইক্” একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, পৃথিবীতে কোন্ সালে কোন্ জাতির মানুষ শতকরা কত ছিল। যথা:—

জাতি।	১৮০০ সালে।	১৯০০ সালে।	১৯২৫ সালে।
শ্বেতকায়	২৩.৯	৩৩.৯	৩৫.৩
ভারতীয়	২১.৯	১৭.৩	১৭
প্রাচ্য	৭.৭	৫.৮	৫.৪
পূর্ব এশিয়া জাত ৩৭.৪		৩২.৯	৩০.৯
নিগ্রো	৫.২	৫.৯	৫.৮
মালয়, লাল			
ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি ৩.৯		৪.৯	৫.৬
	১০০	১০০	১০০

ভারতীয়েরা যে সংখ্যায় কমিয়া গিয়াছে, তাহা নহে, সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু অন্ত কোন কোন জাতি, বিশেষতঃ শ্বেতকায়েরা, অধিকতর রকম বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারতীয়দের অনুপাত কম হইয়া গিয়াছে। শ্বেতকায়েরা খুব বেশী বাড়িয়াছে এই প্রস্ত, যে, তাহারা পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ডের মালিক, এবং সর্বত্র অবাধে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে; বোগে মৃত্যু তাহাদের মধ্যে কম, অনশনে অর্দ্ধাশনে মৃত্যু নাই বলিলেও চলে। ভারতীয় লোকেরাও অতীতকালে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং জাভা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এখন যে বহুকাল হইতে ভারতীয়েরা আর বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে না, তাহার নানা কারণ আছে। সমুদ্রযাত্রায় পাতিত্য ঘটে, এই বিশ্বাস একটা কারণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ায় সকল দিকেই উদ্ভমশীলতার ভ্রাস আর একটা কারণ। ষ্টেট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ ব্যবসা এবং সমুদ্রপথে যাত্রী ও মালবহন ব্যবসা নষ্ট করা হয়। তাহা পর বিলাতী অন্ত ইউরোপীয় ও জাপানীদের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এই দুই ব্যবসাতে নিজের পূর্ব স্থান আর অধিকার কবিতে পারে নাই। তৃতীয় কারণ, ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংরেজের উপনিবেশ সকলে কুলি করিয়া লইয়া গিয়া

তাহাদের পরিশ্রমে শ্বেতকাষেবা ধনী হইলেও, তাহাদিগকে, “কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলেই পাজী,” নীতি-অনুসারে পরে নানা উপায়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া হয়। চতুর্থ কাণ, ইংলণ্ডেব কোনও উপনিবেশে এবং আমেরিকায় ভারতবর্ষীয়েরা অবাধে গিয়া বসবাস করিতে পারে না, বা নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার পায় না। ভারতীয়দের সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি না হওয়ার কয়েকটি কারণ শিশুমৃত্যুর আধিক্য, নিবার্য রোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব, অনেকের আজীবন অনরকট, এবং ঘনঘন হুর্ভিক্ষ।

যুবকদের জন্ম কাজ ও প্রাথমিক শিক্ষা

সাধারণতঃ আমাদের দেশে বেকার-সমস্যা যে খুব একটা কঠিন সমস্যা, তাহা অনেকে অনেক বার বলিয়াছেন। অনেকে একথাও বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন, যে, নেতাদের আহ্বানে যুবকেরা দেশের কাজ করিবার জন্ত ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু নেতারা নিজের নিজের কাজ হাসিল করিলেন বটে কিন্তু যুবকদিগকে কোন কাজ দিলেন না, যদিও তাহারা পেটভাতায় খাটিতে রাজী ছিল।

আমরা একটা কাজের কথা বলিতে চাই, যাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

যে-দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, এরূপ কোন দেশ কোন দিকেই বেশী উন্নতি করিতে পারে না। যে কোন দিকেই উন্নতি করিতে চান, শিক্ষার আবশ্যক। কোন দেশের সকল ছেলে-মেয়ে ও প্রাপ্ত-বয়স্ক নরনারী লিখনপঠনক্ষম ও শিক্ষিত হইলে, তাহা নিরক্ষর ও অশিক্ষিতের দেশ অপেক্ষা উন্নত ও শক্তিশালী হইবেই। দেশকে শিক্ষিত করিতে হইলে সব বালক-বালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার গোড়াপত্তন হয়, প্রাথমিক শিক্ষায়। মোটামোটি ইহা ধরা যাইতে পারে, যে, পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা পায়। ব্রিটিশশাসিত বাংলা দেশে এরূপ বালকবালিকার অর্ধাং ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৭৩,৪২,৫৫৮। ১৯২৫-২৬ সালের সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে দেখিতে পাই, ১৯২৬ সালের ৩১শে মার্চ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে ১৬,৫০,৫৫৫টি বালকবালিকা পড়িতে-ছিল। অর্থাৎ বৎসর ছেলেমেয়ের পড়া উচিত, তাহার নিকরও কম পড়িতেছিল। যাহারা পড়িতেছিল তাহাদের জন্ম পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৫০,৯২৬। মোটামোটি আরও দুই লক্ষ পাঠশালা হইলে বাকী

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বন্দোবস্ত হইতে পারে। এই দুই লক্ষ পাঠশালা যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহাব প্রত্যেকটির জন্ত অন্ততঃ একজন করিয়া পণ্ডিত বা গুরুমহাশয় আবশ্যক ধরিলেও দুইলক্ষ শিক্ষিত বেকার লোকের এখনই অন্নসংস্থান হয়, এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তাররূপ দেশের মহা উপকার সাধিত হয়। ইহা সাক্ষাৎ ভাবে স্বরাজ, দেশমাতৃকার পূজা, দেশের জন্ম আত্ম-বলিদান প্রভৃতি কোন উদ্দেশ্যক উন্মাদক ব্যাপার নহে; সামান্য পাঠশালার কথা। কিন্তু ইহা বড় বড় আর সব জিনিষের ভিত্তি। এইজন্ম এই কাজটি করিতে হইলে কত টাকা লাগিবে, তাহারও একটি হিসাব নিতেছি।

পূর্বোক্ত সরকারী শিক্ষারিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, পাঠশালার এক একটি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিবার বাবিক ব্যয় ৩৬৫। ১৯২১ সালে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়ে বৎসে ৭৩,৪২,৫৫৮ ছিল, এখন হয়ত ৭৫,০০,০০০ হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের শিক্ষার ব্যয় আরও কিছু বেশী ধরা যাক, যাহাতে উহা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে। ৩৬৫ এর জায়গায় মাথা পিছু ৪৮ ধরিলে পঁচাত্তর লক্ষ ছেলেমেয়ের বাবিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় তিন কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ বার্ষিক তিনকোটি টাকা ব্যয় করিলে ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে একটি পয়সাও বেতন না লইয়া বাংলাদেশের সমুদয় ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, অধিকন্তু বর্তমানে বেকার ন্যূনকমে দুই লক্ষ লোককে জনহিতকর কাজ দেওয়া যায়। দুই লক্ষ কম করিয়া ধরিয়াছি। তিন লক্ষ বেকার লোকের কাজ হইবে, বলিলে আরও ঠিক বলা হইত।

কেবল এই দুই বা তিন লক্ষ লোকেরই যে কাজ হইবে, এমন নয়। পঁচাত্তর লক্ষ ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্ত বিস্তর পুস্তক চাই, কালি কলম কাগজ চাই, স্লোট পেন্সিল চাই। স্ততবাং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে আরও অনেক লোকের কাজ ছুটিবে। গ্রন্থকার, ছাপাখানার লোক, পুস্তকবিক্রেতা, কাগজনির্মাতা ও বিক্রেতা, কালিকলম স্লোটপেন্সিল নির্মাতা ও বিক্রেতা প্রভৃতির কাজ ও আয় বাড়িবে।

প্রাথমিক শিক্ষা যাহারা পাইবে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছেলেমেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে, কতকগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত যাইবে। স্ততবাং উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা বাড়িবে, শিক্ষক ও অধ্যাপক আরও নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং পুস্তক কালি কলম কাগজ পেন্সিল আদির কাটুতি বাড়ায় গ্রন্থকার মুদ্রাকর কাগজ-ওয়াল প্রভৃতির সংখ্যা ও আয় বাড়িবে।

এখানে কথা উঠিতে পারে, যে, কেবল কেতাবী

শিক্ষার বিস্তার হইলে কেরানীগিরির উমেদার ও বেকারের সংখ্যা বাড়িবে। তাহা নহে। যত বেশী লোক শিক্ষা পাইবে, তাহাদের কতক অংশ শিক্ষালয় সকলেই কাজ পাইবে। তা ছাড়া, আমরা ত. কোথাও বলি নাই, যে, কেবল কেতাবী শিক্ষাই দিতেই হইবে। কৃষি শিক্ষা দিতে হইবে, শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা দিতে হইবে। কতক বৃত্তি শিক্ষা আছে যাহা প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযোগী, কতক মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের উপযোগী, কতক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযোগী। প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা এখানে বৃত্তি শিক্ষার কথা বলিলাম কেবল আগন্তি নিবসনের জন্ত। এখানে আমাদের প্রধান বক্তব্য প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে। তাহার আনুমানিক ব্যয় তিন কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স না বসাইয়াও কিরূপে নির্বাহিত হইতে পারে তাহা বলিতেছি।

বাংলার লোকসংখ্যা অল্প যে-কোন প্রদেশের লোক-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, এবং সরকারী ট্যাক্স খাজনা আদায় মোট আদায়ের জন্ত কোন প্রদেশ অপেক্ষা বহু কম হয় না। অথচ বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে ভারত গবন্মেণ্ট যে বাংলার গবন্মেণ্টকেই সকলের চেয়ে কম টাকা প্রাদেশিক সরকারী খরচের জন্ত বাখিতে দেন, তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশ।	১৯২১ সালে	১৯২৭-২৮ সালে আয়।
	লোক-সংখ্যা।	
বাংলা	৪,৬৬,৯৫,৫৩৬	১০,৭৩,৭৯,০০০
মাদ্রাজ	৪,২৩,১৮,৯৮৫	১৬,৫৪,৮০,০০০
বোম্বাই	১,৯৩,৪৮,২১০	১৫,০৮,০০,০০০
আগ্রা-অযোধ্য	৪,৫৩,৭৫,৭৮৭	১২,৯৪,৫০,০০০
পঞ্জাব	২,০৬,৮৫,০২৪	১১,১৩,০০,০০০

ভারত গবন্মেণ্ট মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে আদায়ী যত টাকা মাদ্রাজ ও বোম্বাই গবন্মেণ্টকে রাখিতে দেন, বাংলা গবন্মেণ্টকে অন্ততঃ তত টাকা রাখিতে দিলে বাংলা দেশে সব ছেলেমেয়ের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত তিন কোটি টাকা অনায়াসেই খরচ করা চলে। আপত্তি উঠিতে পারে, যে, বাংলা গবন্মেণ্টের হাতে এই আরও তিন কোটি টাকা দিলে ভারত গবন্মেণ্টের ব্যয় নির্বাহ হইবে কেমন করিয়া। কিন্তু যে-কোন বৎসর আফগানিস্থান বা অন্ত কোন সীমান্ত বা অন্তর যুদ্ধ হইলে ভারত গবন্মেণ্ট অনায়াসেই কুড়ি পঁচিশ কোটি টাকা অতিবিক্ত খরচ করেন। মহাযুদ্ধের সময় গরীব ভারতবর্ষকে গবন্মেণ্ট দেড়শত কোটি-টাকা “স্বেচ্ছাকৃত” দান করাইয়াছিলেন ধনী গ্রেটব্রিটেনকে! স্বতরাং ইহা

বুঝা খুবই সোজা, যে, ভারত গবন্মেণ্ট অনায়াসেই বাংলা গবন্মেণ্টের হাতে পোনে এগার কোটি টাকার পরিবর্তে পনের ঘোল কোটি-টাকা থাকিতে দিতে পারেন।

শুধু তাই নয়। সমগ্র ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের ৫ হইতে দশ বৎসর বয়সের সব ছেলেমেয়ের অবৈতনিক শিক্ষার জন্ত যে পনের ঘোল কোটি-টাকা বার্ষিক ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহাও ভারত গবন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে অনায়াসে করিতে পারেন। সভ্য স্বাধীন দেশ সকলের গবন্মেণ্ট শিক্ষাকে বেক্সপ আবশ্যক মনে করেন, বিদেশী ভারত গবন্মেণ্ট সেইরূপ মনে করিলে, অত্যাশ্চর্য্য কম প্রয়োজনীয় বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই শিক্ষার জন্ত ব্যয় বাড়ান যায়।

বাংলা গবন্মেণ্টের আয় বৃদ্ধিই যে একমাত্র উপায়, তাহা নহে। ব্যয়-সংক্ষেপও অনেক হইতে পারে। বাংলা দেশের পাঁচটি ডিভিঞ্নে পাঁচজন কমিশনার ও তাঁহাদের অফিস ও আমলা আছে। এই পদগুলি উঠাইয়া দিলে শাসন-কার্যের কোনই ক্ষতি হয় না, অথচ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়। ভারতের কমিশনারহীন কোন প্রদেশ বহু অপেক্ষা কুশাসিত নহে। প্রত্যেক জেলার পুলিশের উচ্চতম কর্তা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক জেলায় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছে। ২৭টি জেলার পুলিশ ইন্স্পেক্টরদের বেতন কিছু কিছু বাড়াইয়া দিয়া অনাবশ্যক কতকগুলি উপরের কাজ ছাটিয়া দিলে খুব ব্যয় সংক্ষেপ হয়, অথচ শাসনকার্যের কোন ক্ষতি হয় না।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা করা না-করা গবন্মেণ্টের ইচ্ছাপ্রাপ্ত বটে; কিন্তু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত যে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, দেশের লোক একমত হইয়া তাহা বলিলে এবং শিক্ষামন্ত্রী এইরূপ টাকার দাবী করিলে ফল হইতে পারে। গবন্মেণ্ট শিক্ষামন্ত্রীর কথা না শুনিলে তিনি ইন্তকা দিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ আদর্শপরায়ণ তেজস্বী মন্ত্রী এপর্যন্ত বঙ্গে কেহ হন নাই।

একণে, আমরা নিজে কি করিতে পারি, দেখা যাক। সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে দেখিলাম, এক একটি পাঠশালার জন্ত গড়ে বার্ষিক ১২২/৬ খরচ হয়। এই ১২২/৬ স্বয়ং দিতে পারেন, এরূপ বিস্তর লোক দেশে আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের নিজের ব্যয়ে এক একটি পাঠশালা চালান উচিত। তাহারা যদি কোন সরকারী বা সরকারীসাহায্য-প্রাপ্ত কলেজে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাহারা দেশের লোকের কাছে দেখান হইয়া আছেন। সেই

দেনা শোধ করা উচিত। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগেব ১৯২৫-২৬ সালের সরকারী রিপোর্টে, এই সব কলেজেব ছাত্রপ্রতি বার্ষিক খরচ এবং তন্মধ্যে সরকারী টাকার অংশের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। ছাত্রদত্ত বেতনাদি হইতে ব্যয় সঙ্কলন না হওয়ায় সরকারী টাকা দিতে হয়। নীচের তালিকায় ১৯২৫-২৬ সালে ছাত্রপ্রতি মোট খরচ এবং সরকারী অংশের পরিমাণ দৃষ্ট হইবে।

কলেজ	ছাত্রপ্রতি মোট বার্ষিক ব্যয়	সরকারী অংশ
প্রেসিডেন্সী	৫০৭	৩৬৬
ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট	৪১৫৮১	৩২৫১০
কলকাতা	৫২৪১৪	৪৩৩৮০
সংস্কৃত	৬১৪৮০	৫৬৪৮০
কৃষ্ণনগর	৫২৪৮০	৪২৬৮০
চট্টগ্রাম	২১৭৮৫	১২৬৮০
রাজশাহী	২০৭১২	১১১১১
সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ সমূহ	১০৮০	২৩৮২

গবন্মেণ্ট যে টাকা দেন, তাহা প্রজাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ট্যাক্স হইতে দেন, এবং এই ট্যাক্স সাফাৎ বা পরোক্ষভাবে বহু পরিমাণে কৃষক কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোকদের পরিশ্রম হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং আমবা যাহারা সরকারী বা সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পড়িয়াছি, তাহারা সকলেই শ্রমিকদের নিকট ঋণী। তাহাদের ও তাহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়া এই ঋণ শোধ করা আমাদের উচিত। আমরা তাহাদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যয় করিলে তাহা অল্পগ্রহ নহে, ঋণশোধ মাত্র।

যিনি যত বৎসর যে কলেজে পড়িয়াছেন, তদনুসারে হিসাব করিয়া ঋণের পরিমাণ স্থির করিয়া ও তাহাতে আদায় স্বয়ং যোগ দিয়া যদি ঠিক মোট সেই টাকাটি দেশের লোকদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলেও ঋণশোধ হইবে না। ছাত্রাবস্থায় ঐ টাকার সাহায্য পাইয়া আমরা যে যে-দিকে যত উন্নতি করিয়াছি, সমুদয়ই অংশতঃ ঐ সাহায্যপ্রাপ্তির ফল। এইজন্য ঐ সাহায্যের মূল্য ঠিক টাকা আনা পাইয়ে নির্ধারণ করা যায় না। কেহ যদি ২০১২ বৎসর পর্যন্ত পিতামাতা বর্জক পালিত

হইবার ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত, পিতৃগৃহের ঘরভাড়া, মাতৃগৃহের মূল্য, গোষ্ঠগৃহের মূল্য, পিতামাতার পরিশ্রম, খাণ্ডেব মূল্য, শিক্ষার সর্ববিধ ব্যয়, প্রভৃতির সমষ্ট নির্বয় করিয়া থোক টাকাটা স্বদসমেত পিতামাতাকে দিয়া মনে করে, পিতৃঋণ মাতৃঋণ শোধ হইল, তাহা হইলে সে জন-সমাজে নির্বোধ বলিয়া হাত্যাম্পদ এবং অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘণিত হয়। অত্বেরা পিতামাতার মত আমাদের হিত-সাধন না করিলেও, তাহাদের কৃত সাহায্যের মূল্য ও টাকা আনা পাইয়ে পরিমিত হইতে পাবে না।

যাহারা সরকারী বা সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পড়েন নাই, সম্পূর্ণ বেসরকারী কলেজে পড়িয়াছেন, তাহাদের যে কোন ঋণ নাই, তাহা নহে। বেসরকারী কলেজের ছাত্রেরা সন্তান প্রায় সেইরূপ শিক্ষা পান, যাহার জন্য অল্প অনেক বেশী খরচ হয়। এই জন্য তাহারা অল্পবেতনভোগী বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের নিকট ঋণী।

সুস্থ কলেজের শিক্ষা ছাড়া আমরা সভ্য সমাজে থাকার দক্ষ অজ্ঞাতসারে অল্পকরণ দ্বারা যে শিক্ষা পাই, তাহার নিমিত্ত সমাজের নিকট ঋণী। এই অজ্ঞাতসারে প্রাপ্ত শিক্ষার পরিমাণ ও মূল্য খুব বেশী। শৈশবে নেকড়ে বাঘ বা ভালুকের দ্বারা অপহৃত ও পালিত কোন কোন মানবশিশুর বৃত্তান্ত আমরা অনেকে পড়িয়াছি। তাহারা মানব সমাজে বড় হইতে না পারায় মানুষের মত হইতে পাবে না, কতকটা জন্তুর মতই থাকিয়া যায়। ইহা হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে, যে, মানুষের সন্তান হইলেই মনুষ্যোচিত সব গুণ ও শক্তি লাভ করা যায় না, মানবসমাজের পরিবেষ্টনেরও প্রয়োজন। সমাজ হইতে আমরা আশৈশব অজ্ঞাতসারে যত প্রকারে উপকৃত হই, তাহার জন্য ঋণী থাকি। জনহিতসাধন দ্বারা সেই ঋণশোধ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। সার্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সেই ঋণশোধের অগ্রতম উপায়।

অন্য অনেক লোকে যেরূপ আয় ও আনামের জন্য বিস্তার পবিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, জমিদারেরা বিনা পরিশ্রমে সেইরূপ আয় ও আনাম পান। ইহার জন্য

তাহারা কৃষক ও অন্ত্র শ্রমিকদের নিকট স্বামী। অতএব জমিদারীর প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা চালান প্রত্যেক জমিদারের কর্তব্য। জমিদারেরা যদি এই প্রকারে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে নিজেদের উপকৃত ও লাভবান হইবেন। জমিদার ও রায়বাদের বর্তমান সম্বন্ধ এবং জমীর বর্তমান বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবে না। পরিবর্তন হইবেই। জমিদাররা যদি কর্তব্যপরায়ণ ও দৃঢ়বান হন, তাহা হইলে এই পরিবর্তন বিনা মনোমালিন্যে, বিনা বিবাদে, বিনা রক্তপাতে হইবে; তাহা না হইলে পরিবর্তন অব্যাহিতরূপে ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই একা একা বার্ষিক ১২২১/৫ খরচ করিয়া এক একটি পাঠশালা চালাইবার সামর্থ্য নাই। তাহারা নূনকল্পে একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে বার্ষিক ৩৬৫ ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিবেন—অবশ্য নিজেদের বাড়ীর ছেলেমেয়ে ছাড়া। এইরূপ মাসিক পাঁচ আনা সন্ধান করিতে অনেকে সমর্থ হইবেন। তাহারা তাহাও পারিবেন না, তাহারা স্বয়ং বাড়ীতে নিজ পরিবারবর্গের বাহিরের অন্ততঃ একজন লোককে প্রাথমিক শিক্ষার সমান কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া দিবেন।

নেপাল ও আফগানিস্তান

আমরা হিন্দু মুসলমানের মনের ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, যে, কোন কোন ভারতবর্ষীয় মুসলমান আফগানদের দ্বারা ভারত জয় ও দখল অব্যাহতীয় মনে করেন না, বরং প্রার্থনীয়ই মনে করেন। আফগানিস্তানের লোকসংখ্যা হইটেকাবের পঞ্জিকায় এক জায়গায় আছে পঞ্চাশ লক্ষ, আর এক জায়গায় আছে ছেচল্লিশ লক্ষ। চেচানের এন্ডাইক্লোপীডিয়ায় মতে উহার লোকসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ, ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্টের মতে ৬৩,৮০,৫০০। সকলের চেয়ে বেশী আন্দাজটা অর্থাৎ চৌষট্টি লক্ষই ধরিলাম। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩২০০ লক্ষ, অর্থাৎ আফগানিস্তানের পঞ্চাশ গুণ। অথচ এহেন ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকর্তারা আফগানিস্তানকেও ভয় করেন এবং আফগানদের নাম

করিয়া আমাদিগকেও জুছুর ভয় দেখাইয়া থাকেন; ইহার কারণ কি? আফগানিস্তানের ৬৪ লক্ষ লোকদের মধ্যে জ্রীলোক, শিশু ও অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে। তাহারা যুদ্ধ করিবে না। উর্দ্ধসংখ্যা ৩০ লক্ষ আফগান যুদ্ধ করিবে। ভারতবর্ষে যাহাদিগকে ইংরেজেরা অঘোঙ্কা বলেন এবং যাহাদিগকে অঘোঙ্কা বানাইবার বা অঘোঙ্কা করিয়া রাখিবার জন্ত তাহারা দায়ী, তাহাদিগকে বাদ দিলেও শিখ, জাট, রাজপুত, ভোগরা, গাঢ়ওয়ালী, মরাঠা, পুরুবিহা, গুরখা প্রভৃতি আছে। ইহাদের মধ্য হইতেই ত ত্রিশলক্ষের অনেক গুণ বেশী ঘোঙ্কা পাওয়া যাইতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রের ও সরঞ্জামের এবং যুদ্ধশিক্ষাদানের জন্ত টাকার প্রয়োজন। তাহাও আফগানিস্তানের চেয়ে ভারতবর্ষের বেশী আছে। তবে কেন এত আফগানের ভয়? একটা কারণ, ক্রিশিয়া আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। আর একটা কাবণ, আফগানরা স্বাধীন বলিয়া বত উৎকৃষ্ট যুদ্ধশিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম তাহাদের হইতে পারে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের মৈত্রাদিগকে তত উৎকৃষ্ট যুদ্ধশিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম দেয় না। আর একটা কারণ, স্বাধীন আফগান স্বদেশের জন্ত যুদ্ধ করিতে যে তেজ দেখাইবে, বেতনের দাস সিপাহীরা তাহা না দেখাইতে পারে। আর একটা এই সম্ভেহ ইংরেজদের আছে, যে, ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় মুসলমানেরাও সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহারা আফগানদের সহিত যোগ দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব জাতির সমর্থ পুরুষদিগকে যুদ্ধ শিখিবার সুযোগ দিলে, অন্ততঃ ঘোঙ্কা বলিয়া স্বীকৃত জাতিদিগকে সর্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধশিক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সরঞ্জাম দিলে এবং দেশের লোক যাহাতে সন্তুষ্ট হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তদ্রূপ পরিবর্তন হইলে, ভারতবর্ষের কোনও প্রতিবেশীকে ভয় করিবার কারণ থাকে না। যুদ্ধবিষয়ে আফগানিস্তানের কোন চিবন্তন শ্রেষ্ঠতা নাই। আকবর বাদশাহের আমলে উহা ভারতের অধীন ছিল, রাজা মানসিংহ উহার শাসনকর্তা ছিলেন। সেনাপতি হরী সিং নালুয়ার নেতৃত্বে শিখরাও উহা জয় করিয়াছিল।

যে-সব ভারতবর্ষীয় মুসলমান আফগানদের দ্বারা ভারতবর্ষ-জয় কামনা করেন, তাহারা ভারতের রাজত্বে

অশীদার জুটাইতে চাহিতেছেন কেন? তাহারাত্তর বীরপুরুষ; এবং তাহাদের সংখ্যা আফগানদের দশগুণেরও বেশী। আফগানরা রাজা হইলে স্বাধীনতার প্রধান অংশটা তাহারাই লইবে। তার চেয়ে ভারতীয় মুসলমানরাই সব কিছু একচেটিয়া করিয়া ফেলিলে মন্দ হয় না।

ভারতবর্ষের সীমার একদিকে আফগানিস্থান যেমন স্বাধীন, আর এক দিকে নেপালও তেমনি স্বাধীন। আফগানিস্থানের নৃপতির মত নেপালের নৃপতিও “হিঙ্গু-ম্যাড্রেস্টী” বলিয়া ইংরেজীতে উল্লিখিত হন। নেপালের লোকসংখ্যা হইটেকারের পঞ্চিকা অনুসারে ৫৬,৩২,০২২, চেষার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়া অনুসারে ৫৫ লাখ এবং ভারতীয় সেল্যাস্ রিপোর্ট অনুসারে ৫৬ লাখ; মোটামুটি আফগানিস্থানের সমান। সাহস,রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধাত্মরাগেও গুর্খারা আফগানদের চেয়ে একটুও নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে একজনও কখনো সানন্দে বলে নাই, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে নেপালীরা ভারতবর্ষ জয় করিবে। ওটা ভারতীয় হিন্দুদের কল্পনাজগৎনার বিষয়ই নহে। ভারতীয় হিন্দুরা মনে করে, যে, ইংরেজরা চলিয়া গেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, এবং আফগানিস্থান ও নেপাল, তিব্বত ও চীন প্রভৃতির সহিত বন্ধুভাবে বাস করিবে। স্বদেশের স্বাধীনতা কামনা সবাই করে। অনেক ভারতীয় মুসলমানও নিশ্চয়ই করেন। কোন কোন ভারতীয় মুসলমান যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখা অপেক্ষা আফগানের অধীন দেখিতে ইচ্ছুক, তাহাৎ কারণ কি এইরূপ একটা চিন্তা বা ভাব, “আমরা যখন ভাবতবর্ষে প্রধান বা প্রভু হইতে পারিব না, কারণ হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, তখন বরং আমাদের ধর্মতাই আফগানরা হিন্দুদের রাজা হউক, তবু যেন হিন্দুরা স্বাধীন বা প্রধান না হয়” ? এইরূপ হিংস্রটে স্বভাব চীনদেশের মুসলমানদের নয়। ভারতীয় মুসলমানরা ভারতবর্ষের অধিবাসী-সমূহের মধ্যে শতকরা ষত জন, চীনের মুসলমানরা চীনের মোট অধিবাসীর তার চেয়ে অনেক কম অংশ। ভারতবর্ষে মুসলমানদের বতটা প্রভাব প্রতিপত্তি, চীনে মুসলমানদের তার চেয়ে অনেক কম। তথাপি চীনের কোন মুসলমান নিজের দেশকে আফগান, পারসীক, আরব বা

তুর্ক দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছে বলিয়া কখন কোথাও পড়ি নাই, শুনি নাই।

অনেক ভারতীয় মুসলমানের এই যে পরদেশী পরদেশী ভাব, ইহার জন্ত আমরা কেবল মাত্র মুসলমানদিগকেই দোষ দি না। তাহাদের দোষ আছে। তাহাদের অনেকে ভারতীয়ের বংশধর বলিয়া প্রকৃত পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা বিদেশীর বংশধর বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেওয়া পছন্দ করেন। অনেকেরই স্বদেশী মুসলমান ও হিন্দু অপেক্ষা বিদেশী মুসলমানের প্রতি কার্যতঃ দরদ বেশী। কিন্তু অনেক হিন্দু যে ভারতবর্ষকে কেবল নিজেদেরই দেশ মনে করেন, সেটা তাঁদের ভুল ও দোষ। তাহাদের মধ্যে অনেকে যে মুসলমানদিগকে অবজ্ঞেয় ও অস্পৃশ্য এবং সমান সমান ব্যবহারের অযোগ্য মনে করেন, সেটাও তাহাদের দোষ ও ভুল।

মুসলমানভূয়িষ্ঠ প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি

এমন প্রদেশ ভারতবর্ষে কয়েকটি আছে, যাহার অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেকের অধিক মুসলমান। যেমন বাংলা, পঞ্জাব। উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশেও মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী, কিন্তু উহার শাসনকর্তার পদ গবর্ণরের মত নহে এবং উহার ব্যবস্থাপক সভাও নাই। বালুচীস্থানও ঐরূপ প্রদেশ। এই ছুটি প্রদেশকে গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভায়ুক্ত প্রদেশে পরিণত করা হউক, মুসলমানদের এই একটি দাবী। সিন্ধুদেশে মুসলমানের সংখ্যা অর্ধেকের উপর। উহা এখন বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত এবং বোম্বাইয়ের লাট ও ব্যবস্থাপক সভার অধীন। মুসলমানরা চান, যে, সিন্ধুকে বোম্বাই হইতে আলাদা করিয়া উহার একজন স্বতন্ত্র গবর্ণর নিযুক্ত করা হউক এবং উহার আলাদা ব্যবস্থাপক সভাও হউক। এই তিনটি নূতন গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভায়ুক্ত প্রদেশের দাবীর একটা কারণ এই, যে, হিন্দুবা এই প্রকারের অনেকগুলি প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, অতএব মুসলমানদেরও আরও কতকগুলি এইরূপ প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হওয়া চাই। কিন্তু চুংখের বিষয়, নূতন তিনটা “গবর্ণরপ্রদেশ”

গঠিত হইলেও হিন্দুভূমিষ্ট প্রদেশের সংখ্যা মুসলমানভূমিষ্ট প্রদেশের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী থাকিবে। হিন্দুভূমিষ্ট থাকিবে ছয়টি; যথা—মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার-ওড়িশা, ও আসাম। মুসলমানভূমিষ্ট প্রদেশ হইবে পাঁচটি; যথা—বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচীস্থান, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ।

কংগ্রেস কমিটির দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে আছে, যে, সিন্ধুর ভাষা আলাদা বলিয়া সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশ করা হউক, এবং সেই কারণে অন্ধ্রদেশ ও কর্ণাটকেও আলাদা প্রদেশ করা হউক। তাহা হইলে হিন্দুভূমিষ্ট প্রদেশ হইবে আটটি। উৎকল, অন্ধ্রদেশ ও কর্ণাটক অপেক্ষা আগে হইতে স্বতন্ত্র গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভার দাবী করিয়া আসিতেছে, এবং চারিটা প্রদেশে ছড়াইয়া থাকায় উৎকলীয়দের অস্ববিধাও বেশী। স্বতরাং গ্রাম্যস্বারে উৎকলকেও আলাদা প্রদেশ বানাইতে হইবে। তাহা হইলে হিন্দুভূমিষ্ট প্রদেশ হইবে নয়টি। তাহার পর যদি গুজরাতি, মরাঠী, তমিল, মলয়ালম, প্রভৃতি ভাষাভাষীরা নিজেদের এক একটা প্রদেশ চায়, তাহা হইলে এইগুলি সবই হিন্দুভূমিষ্ট প্রদেশ হইবে। স্বতরাং ভারতবর্ষে যতগুলো হিন্দুভূমিষ্ট প্রদেশ, মুসলমানভূমিষ্ট প্রদেশও ততগুলো চাই, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই। তবে যদি কালক্রমে প্রত্যেক প্রদেশে, অন্ততঃ অধিকাংশ প্রদেশে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, তখন কাহারও চালবাজি ব্যতিরেকেও মুসলমানভূমিষ্ট প্রদেশই বেশী হইবে। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম প্রচার করুন, অল্প ধর্মের সমালোচনাও করুন; তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বলপ্রয়োগ, ছেল্লা চুরি বা নারীর উপর অত্যাচার কিম্বা অস্ববিধ অবৈধ উপায়ে দল বাড়াইবার চেষ্টা যেন কোন মুসলমান না করেন। এই উপায়গুলো গর্হিত ও জঘন্য; ইহাতে মুসলমান সমাজের প্রকৃত কোন লাভ হয় না। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা কতকগুলো কাল্পনিক দোষের উল্লেখ করিয়া মুসলমানদের নিন্দা করিতেছি। আমরা জানি পূর্বে পূর্বে অনেক ধার্মিক মুসলমানের চরিত্র ও সংকার্যের প্রভাবে, এবং মুসলমানসমাজে অনেকটা

সামাজিক সাম্য থাকায় মুসলমান ধর্মের বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু বলপ্রয়োগাদি দ্বারা এবং বিকৃত জাতির নারীদিগকে বাজেয়াপ্ত করিয়াও যে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ ইতিহাসে আছে। সেক্ষেপ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা, ভাষা ও আয়

বালুচীস্থানকে একটি গবর্ণরশাসিত ব্যবস্থাপকসভা-সম্বিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাবে কংগ্রেস কমিটি সম্মতি দিয়াছেন। কি গ্রাম্য কারণে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে, বুঝিলাম না। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তি অনুসারে ভারত-বর্ষকে নূতন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভক্ত করিতে রাজী। তদনুসারে কংগ্রেস কমিটি সিন্ধু, অন্ধ্র ও কর্ণাটকের আলাদা আলাদা গবর্ণরশাসিত প্রদেশ হওয়ার সম্মত। কিন্তু ব্রিটিশশাসিত বালুচীস্থানে প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে পষতো ভাষাই সকলের চেয়ে বেশী লোকে বলে, এবং তাহার প্রায় একতৃতীয়াংশ অল্প লোক বালোচী ভাষায় কথা বলে। অতএব ভাষার ভিত্তি অনুসারে প্রদেশ পুনর্গঠন করিতে গেলে বালুচীস্থানকে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের সামিল করাই উচিত। কারণ, শেষোক্ত প্রদেশেবও প্রধান ভাষা পষতো।

ব্রিটিশশাসিত বালুচীস্থানকে ষাঁহারা একটি গবর্ণরশাসিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন এবং ষাঁহারা তাহাতে সায় দিয়াছেন, কোন পক্ষই উহার লোকসংখ্যার বিষয় অবগত আছেন মনে হয় না। উহার লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ৪,২০,৬৪৮। অর্থাৎ উহাতে কলিকাতার পাঁচ আনা রকম লোক বাস করে, এবং দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম পার্শ্বত অঞ্চল ছাড়া বাংলার ছোট ও বড় প্রত্যেকটি জেলার লোকসংখ্যা উহার অনেকগুণ বেশী। জিজ্ঞাস্য করি, যদি ব্রিটিশ বালুচীস্থানের জন্ম একজন আলাদা গবর্ণর ও একটা আলাদা ব্যবস্থাপক সভা চাই, তাহা হইলে মৈমনসিং জেলা কি দোষ করিল? উহার লোকসংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০, ব্রিটিশ বালুচীস্থানের বার গুণ। ব্রিটিশ বালুচীস্থানের লোকেরা কি এতই ধনী,

তাহারা কি এতই বেশী ট্যাক্স দেয়, যে, গবর্ণরের বেতন, সেক্রেটারিয়েটের খরচ, ব্যবস্থাপক সভার খরচ, এবং অন্যান্য সব খরচ তাহারা দিতে পারিবে?

শিক্ষার বিস্তার তথায় কিরূপ হইয়াছে, তাহারও খবর লওয়া দরকার। কারণ, রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার জন্য শিক্ষিত লোক চাই। ব্রিটিশ বালুচীস্থানের প্রধান জাতিদের মধ্যে মোট পুরুষ কত, এবং তাহাদের মধ্যে দেশভাষী ও ইংরেজী লিখিতে পড়িতে জানে মোট কয় জন, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি।

জাতি	পুরুষের সংখ্যা	লিখনপঠনক্ষম	ইংরেজী-জানা
সৈয়দ	১০৫৬৭	৪৩৩	১৫
লাসী	১২৩৬৫	২২৮	০
পাঠান	২৫৮৮২	১২৫১	৭৮
জাট	৩৫০২৫	৩৬৬	২
ব্রাহ্মী	৮৮২৬১	৭৮৩	১৪
বালোচ	২৫৫৬৩	৮০৬	২১

সমুদয় প্রদেশটাতে প্রধান জাতিদের মধ্যে অল্পস্বল্প ইংরেজী জানে মোট ১৩০ জন। এই এক শত ত্রিশজন (না হয় ধরুন ২০০) সামান্য ইংরেজী-জানা লোক কেরানীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও সভাপতি, শাসনপরিষদের সভ্য, মন্ত্রী প্রভৃতি একটা প্রদেশের সব পদের রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবে।

ব্রিটিশ বালুচীস্থানকে গবর্ণরশাসিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাব যাহারা উত্থাপন ও অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাদের অজ্ঞতা ও অবিবেচনায় অবাক হইয়াছি।

উহার সওয়া চারি লক্ষের কম অধিবাসীরা রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে এই ব্যয় নির্বাহেব জন্য ভারত গবন্মেণ্টের খুব বেশী সাহায্য লইতে হইবে। তাহার মানে, ভারত গবন্মেণ্ট অন্যান্য প্রদেশের লোকদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে ব্রিটিশ বালুচীস্থানে কিছু দান থরত্ন করিবেন। এইরূপ অন্যান্য খরচ করিবার অধিকার কোন গবন্মেণ্টের নাই; এবং ব্রিটিশ বালুচীস্থানেরও এইরূপ পরের ধনে পোন্ধরি করিবার কোন অধিকার নাই।

ব্রিটিশ বালুচীস্থান হইতে রাজস্ব আদায় কত সামান্য

হয়, তাহারও কিছু আনুমান্য দিতেছি। ভূমির কব মোট রাজস্বের একটা প্রবান অংশ। ব্রিটিশ বালুচীস্থান হইতে গবন্মেণ্ট ভূকর পান কেবল ২,৩২১,৩২ টাকা; এবং চেয়ে অনেক জমিদারের বেশী আয় আছে। গবর্ণরশাসিত সব প্রদেশের মধ্যে আসামের মোট ভূকর নকলের চেয়ে কম; তাহাও কিন্তু ১,০৫,৫৩,২৪৭। তাহার পর ধরুন ইনকম্ ট্যাক্স বা আয়কর। ১৯২৪-২৫ সালে বালুচীস্থান ২৮,৫৭২ টাকা ইনকম্ ট্যাক্স দিয়াছিল। গবর্ণরশাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে আসাম সকলের চেয়ে কম আয়কর দিয়াছিল; তাহাও কিন্তু ২৩,৭২,৫৬০ টাকা তার পর দেখুন আবকারীর আয়। ১৯২৪-২৫ সালে উহা আসামে ৬৫,২৫,২৮, বালুচীস্থানে ৬,৪২,৮১৭ হইয়াছিল। যে প্রদেশ হইতে গবন্মেণ্টের আয় এত কম, তাহার গবর্ণরের বেতনাদি ব্যয়নির্বাহে অসামর্থ্যের অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশকেও গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভা সমন্বিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা মোটে ২২,৫১,৩৫০ মাত্রা অর্থাৎ বাংলা দেশের মৈমনসিং, ঢাকা, জিপুরা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বাথরগঞ্জ ও রংপুর জেলা অপেক্ষা এবং অন্যান্য প্রদেশের সারন, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, দক্ষিণ আর্কট, তাঞ্জোর, মালাবার ও গোরখপুর জেলা অপেক্ষা উহার লোকসংখ্যা কম। বালুচীস্থান ও উ-প-সীমান্ত প্রদেশ গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভা সমন্বিত হইলে তাহাদের নিজের নিজের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ত হইবেই, অধিকন্তু তাহাদের প্রত্যেকের কয়েকজন করিয়া প্রতিনিধি দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে থাকিবে। কিন্তু অধিকতর লোকসংখ্যা, অধিকতর শিক্ষা ও সভ্যতা, অধিকতর ট্যাক্স দান স্বেচ্ছা ও বড়ের ও অন্যান্য প্রদেশসমূহের উল্লিখিত ছেলাগুলির ঐ সব তথিকার নাই! তাহা হইলে মানেটা এই দাঁড়াইতেছে, যে, বালুচীস্থান ও উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের লোকেরা অতিমানব, তাহাদের প্রত্যেকের সর্বপ্রকার শক্তি সামর্থ্য ও অধিকার ভারতের অন্যান্য জায়গার এক এক ব্যক্তির শক্তিসামর্থ্য ও অধিকার অপেক্ষা বহু বহু গুণ বেশী।

একথা ছাড়িয়া দিয়া এখন দেখি, গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি ঠাট বজায় রাখিবার মত টাকা উ-প-সী প্রদেশের আছে কি না। আসাম সকলের চেয়ে কম আয় বিশিষ্ট গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভাসম্বিত প্রদেশ। কেবল উহার সহিত তুলনা করিলেই চলিবে। আসামে ভূকর আদায় হয় ১,০৫,৫৩,২৪৭ টাকা, উ-প-সী প্রদেশে হয় ২৩,১২,২২৪ টাকা, অর্থাৎ আসামের সিকিও কম। আসামে আয়কর আদায় ১২২৪-২৫ সালে হইয়াছিল ২৩,৫২,৫৬০ টাকা, উ-প-সী প্রদেশে ৬,৫৪,৮১৬ টাকা। আসামে ঐ সালে আবকারীর আয় হইয়াছিল ৬৫,২৫,২৩৮ টাকা, উ-প-সী প্রদেশে ৫,৩৮,১১২ টাকা। আয়ের এই কয়টা দফা হইতেই বুঝা যাইবে, গবর্ণর, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করা উ-প-সী প্রদেশের পক্ষে অসম্ভব হইবে, উহাকে ভারত গবন্মেণ্টের সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু অল্প সব প্রদেশের টাকা লইয়া তাহা হইতে উ-প-সী প্রদেশে দান করিবার অধিকার ভারত গবন্মেণ্টের নাই—বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে, ঐ অল্প প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতেই টাকার অভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অবহেলিত হইতেছে।

উ-প-সী প্রদেশকে স্বতন্ত্র একভাষাভাষী বলিয়াও আলাদা গবর্ণরশাসিত প্রদেশ বানাইবার প্রস্তাব সমর্থন করা যায় না। এখানে পশ্চো বলে ১২,০২,০২৬ জন, গঞ্জাবী বলে ১০,০০,২৫৫ জন; অর্থাৎ প্রায় সমান সমান। পশ্চোর হিসাবে বালুচীস্থানের সহিত, গঞ্জাবীর হিসাবে পাঞ্জাবের সহিত ইহাকে জুড়িয়া দেওয়া উচিত।

শিক্ষায় এই প্রদেশ অত্যন্ত অনগ্রসর। ইহার সওয়া দুই লক্ষ লোকের মধ্যে দু লাখের উপর মুসলমান। তাহাদের সম্বন্ধে সেন্সস রিপোর্টে লেখা হইয়াছে,

“The local Muhammadans, who are mainly Pathans, though handy enough with the rifle or sword, are by no means addicted to penmanship; in every thousand of each sex only 24 males and 1 female can read and write.”

“স্থানীয় মুসলমানরা প্রধানতঃ পাঠান; তাহারা বন্দুকের চালিতে বেশ পাত্রে, কিন্তু কলমের প্রতি আসক্তি র কোনদেই নাই। প্রতি হাজার পুরুষে ২৪ জন ও প্রতি স্ত্রীলোকে একজন লিখিতে শিখিতে পারে।”

আফিস আদালতের কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার জন্ত কমবেশী ইংরেজী জানা দরকার। কিন্তু উ-প-সী প্রদেশের ২০ ও তদুর্দ্ধ বয়সের ইংরেজী জানা পুরুষদের সংখ্যা ২,২৬৬ জন মাত্র! বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় এবং অনেক সহরের প্রত্যেকটিতে এর চেয়ে বেশী ইংরেজীজানা লোক আছে।

সিন্ধুদেশের লোকসংখ্যা (৩২, ৭২, ৩৭৭) মৈমন-সিংহের লোকসংখ্যা (৪৮, ৩৭, ৭৩০) অপেক্ষা কম, ঢাকার লোকসংখ্যার (৩১, ২৫, ২৬৭) প্রায় সমান। সিন্ধুর প্রধান ভাষা সিন্ধী বলা হয় বটে, কিন্তু নিজেদের ভাষা বলিয়া তথাকার হিন্দুরা হিন্দী চালাইতে ও মুসলমানরা উর্দু চালাইতে ব্যগ্র; ফলে সিন্ধীভাষীর সংখ্যা ১৯১১ সালে ৩০,০৭,০০০ হইতে ১৯২১ সালে কমিয়া ২৬,১৮,০০০ হয়।

সিন্ধুদেশের সরকারী আয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব সরকারী স্ট্যাটিষ্টিক্যাল গ্যাবল্টাকে দেওয়া নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ের ও সিন্ধুর কোন কোন খবরের কাগজে দেখিয়াছি যে, এখন উহার স্বতন্ত্র গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভা না থাকা সত্ত্বেও উহার আয় হইতে উহার ব্যয় সংকুলান হয় না। সরকার নামক স্থানে সিন্ধুনদে বাধ বাঁধিয়া কৃত্রিম খাল দ্বারা উহার জল বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে সেচন করিলে সিন্ধুদেশে ফসল বেশী হইবে ও উহার আয় যথেষ্ট বাড়িবে, এইরূপ আশা অনেকে করিতেছেন। কিন্তু অনেকে আশঙ্কাও করিতেছেন, যে, এরূপ সফল না হইতেও পারে। যদি হয়ও, তাহা হইলেও এখন বাধ দিতে ও খাল নির্মাণ করিতে যে বহু কোটি টাকা লাগিবে, তাহা কিম্বা তাহার হ্রদ দিতে সিন্ধুদেশ অসমর্থ; তাহা বোম্বাই গবন্মেণ্টকে দিতে হইবে।

আমরা গবর্ণরশাসিত নূতন প্রদেশ বানাইবার প্রস্তাবটি আলোচনা প্রধানতঃ লোকসংখ্যা, ভাষা, ও আয়ের দিক দিয়া করিলাম। যেমন কেহ স্বতন্ত্র সরকারী পাতিতে চাহিলে সংসারখরচের টাকার একান্ত আবশ্যক, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাই। ইহাই আয়ের কথা তুলিবার কারণ। যদি টাকাই না জুটে, তাহা হইলে অল্প যুক্তি বা আপত্তির আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীনিকেতনে শিক্ষানবিশ গ্রহণ

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনে উন্নতপ্রণালীর কৃষি, পল্লীগ্রামেব স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি, হাতের তাঁতে ধুতি সাড়া তোমালে স্তরকণ আসন বোনা, ভেড়ার লোম হইতে কমল বোনা, রঙে কাপড় ছোপান, বৃন্দাবনী জয়-পুৰী প্রভৃতি ধরণে কাপড় চিত্রিত করা, চামড়া কষ করা, ডিম্বের ব্যবসা, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল কাণ্ডেব শিক্ষানবিশ লওয়া হয়। বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীনিকেতনেব শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বহুকে বীরভূম জেলার স্কুল ডাকঘরের ঠিকানায় চিঠি লিখিলে পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যাত্রা

কিছুদিন পূর্বে বঙ্গের ও ভাবতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অনেক কাগজে এই সংবাদ বাহির হয়, যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডচগবর্নমেন্ট জাভা দ্বীপে আগমন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত লোককে ডচ গবর্নমেন্টের নিমন্ত্রণ করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ডচ জাতি শাসকশোষক সাম্রাজ্যাদিপতি জাতি এবং জাভাতে গতবৎসর বিদ্রোহও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানবিক আদর্শের কোন মিল নাই। এইজন্য এ বিষয়ে ঠিক খবর জানিবার নিমিত্ত আমরা রবীন্দ্রনাথকে শিলঙে চিঠি লিখি। জানিতে পারি, যে, ডচ গবর্নমেন্টের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার তাহা গ্রহণেব সংবাদ মিথ্যা। প্রকৃত সংবাদ যাহা তাহা আমরা মডার্ন রিভিউ কাগজে ছাপিয়াছি। কিন্তু আমরা যত দূর জানি, যাহারা আগে ভুল সংবাদ ছাপিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ভ্রম সংশোধন করেন নাই। একমাত্র ঢাকার ঈষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্‌ মডার্ন রিভিউয়ে মুদ্রিত ঠিক খবর ছাপিয়াছেন। প্রকৃত সংবাদ নীচে দিতেছি।

বলী দ্বীপে হিন্দুসভ্যতা আলোচনার জন্য কোন সংস্কৃত পণ্ডিতকে তথায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

সেখান হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও সে সম্বন্ধে তথ্য গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করিবারও তাঁহার ইচ্ছা আছে। তিনি নিজে বোধ হয় সেখানে অল্প দিনই থাকিবেন; সম্ভব হইলে কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অহুসন্ধানের জন্য রাখিয়া দিয়া আসিবেন। কাজটিকে তিনি গুরুতর প্রয়োজনীয় মনে করেন। জাভা গবর্নমেন্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কবেন নাই। সেখান হইতে যাহারা এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাঁহারা পুণ্ডিতস্ববিৎ; আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহ যোগিতা পাইলে তাঁহাদের সম্মান কার্যের সুবিধা হইতে পারিবে।

রবীন্দ্রনাথ যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবেন, তাহাতে বাংলা দেশের এবং জগতের সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক লাভ হইবে। এইজন্য, তাঁহার বিদেশ ভ্রমণে অল্প কোন উদ্বেগ না থাকিলেও, তাহা বাঞ্ছনীয়। বলী দ্বীপের হিন্দুসভ্যতা আলোচনা, তথা হইতে ভারতীয় ইতিহাসেব উপাদান সংগ্রহ ও তথ্য গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবে। যাহাদের এবিষয়ে অমুরাগ, বিদ্যাভক্তি, কার্যতৎপরতা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ বিচার করিবার শক্তি আছে, এরূপ লোক অপ্রাপ্য না হইলেও খুব সহজে প্রাপ্য নহে। আশা করি, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অন্ততঃ দুইএক জন লোকও পাইয়াছেন।

তিনি যে নিজে বেশীদিন বাহিবে থাকিবেন ন, ইহাও ভাল খবর। কারণ, বিশ্বভারতীর বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও, আমাদের দেশের অল্প অনেক কাজের মত ইহারও সাফল্য এখনও ইহার প্রতিষ্ঠাতার মনোযোগ এবং কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। তিনি ইহার প্রাণ, এবং তাঁহাতে কর্মঠতা, বিদ্যাভক্তি, মনস্বিতা, কবিশ্রুতিভা, সাহিত্যিকতা ও মানবপ্রেমের একত্র সমাবেশ বশতঃ তিনি ইহার সকল কার্য ও চেষ্টার ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ। অধিকন্তু আমরা জানি ইহার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা তাঁহার সান্নিধ্যের আনন্দ ও উপকার হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিতে চান না।

জাভার ডচ শাসন বিরূপ

জাভার ডচ গবর্নমেন্টের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার তাহা গ্রহণের সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিতে আমবা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাহা একটু খুলিয়া বলা দরকার। ডচ জাতি সাম্রাজ্যাধিপতি শাসকশোষণ জাতি। তাহার পৃথিবীর লোককে নানা উপায়ে এই মিথ্যা কথা জানাইতেছে, যে, তাহাদের প্রবর্তিত উপনিবেশশাসন-প্রণালী পৃথিবীর মধ্যে আদর্শস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সত্য এই, যে, তাহাদের অধীনস্থ জাভা স্খ্যাত্রাদির আধবাসীরা নিজেদের দাসত্ব ও দুর্দশার উচ্ছেদ লাভনের জন্য গত বৎসর বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা-লাভ-চেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার পর প্রায় দুই হাজার “বিপ্লবপ্রয়াসী” কারারুদ্ধ হইয়াছে;—পশ্চিম স্খ্যাত্রায় ৭০০, জাভায় ১৫০০। জাভার ডচ আইন অনুসারে বিচার হইলে ইহারা দণ্ডিত হইতে পারিত না; তথাপি তাহাদের শাস্তি হইয়াছে। আমাদের দেশে যেমন গবর্নমেন্ট বিনা বিচারে ৩০০ রেগুলেশন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে লোকের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ, জাভাতেও তেমনি তথাকার ডচ গবর্নর জেনার্যাল, তাহাদের দ্বারা “দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা” অর্থাৎ বিদেশীর শাসন ও প্রভুত্বের অনিষ্ট বা বিনাশ ঘটবার আশঙ্কা করেন, তাহাদিগকে বিনা বিচারে নির্বাসিত করিতে পারেন। সেই জন্য প্রায় ৮০০ লোককে (ঠিক সংখ্যা জানা নাই) নিউগিনি দ্বীপের একটা নরমাংস-ভোজী অসভ্য লোকদেব অধুষিত ম্যালেরিয়া-পূর্ণ অংশে নির্বাসিত করা হইয়াছে। অনেকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। কতকগুলি লোককে হুসা-কাছাঙ্গানে ডাকাত ও নরহত্যা কয়েদীদের সঙ্গে জেলে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্তর অনেকের ১০ হইতে ২০ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে।

জাভা, স্খ্যাত্রা প্রভৃতির “বিদ্রোহী”রা ইহা সত্ত্বেও দমিয়া যায় নাই, বা নিরাশ হয় নাই। তাহারা মনে করে, এই বিফল চেষ্টা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা

ভবিষ্যতে আরও শৃঙ্খলার সহিত ও যথেষ্ট আয়োজন করিয়া কাজ করিতে সমর্থ হইবে, এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

ডচদের অত্যাচারের কাহিনী জানিয়া শুনিয়া ডচ গবর্নমেন্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা পেশাদার সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক গুরুতর খবর সম্বন্ধে যখন অজ্ঞ, তখন অনেক খবর রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত থাকা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় হইবে না, এই ভাবিয়া তাঁহার জাভা যাত্রা সম্বন্ধে ঠিক খবর জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং জানিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, যে, ডচ শাসনতন্ত্রের সহিত তাঁহার ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দর্শনের কোন সম্বন্ধ নাই।

শশীমোহন দের অব্যাহতি

শ্রীহট্ট জেলার কয়েক উদ্ভীন নামক একটা ছুরাখা অনেক নারীর সর্বনাশ করিয়াছিল। শেষে পবিত্রা পার্টনী নামী এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবতী বধূর সতীত্বনাশ করিতে গিয়া সে নিহত হয়। তাহার হত্যার অপরাধে শশীমোহন দে নামক একজন আঠার বৎসরের বালক এবং তাহার তিনজন সঙ্গী দায়রা সোপর্দ হয়। বিচারে তাহারা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা সাতিশয় সন্তোষের বিষয়। নারীর সতীত্ব নাশে চেষ্টিত ছুরাখার প্রাণবধ করিয়াও নারী রক্ষা একান্ত আবশ্যক পুণ্যকর্ম। ইহার জন্য শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কার হওয়াই উচিত। বঙ্গের সর্বত্র ঋজুবাহাদুর ও শশীমোহনের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে।

বঙ্গে নারীনির্যাতন

অস্তঃপুরে ও ঘরের বাহিরে নারীনির্যাতন অবিরাম চলিতেছে। হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু নির্যাতন বন্ধ করা প্রকৃত কাজ। তাহার চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে না। বাংলা দেশে এত পশুপ্রকৃতির মানুষ, এত ভীকু কাপুরুষ আছে ভাবিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়াই আছে। উৎপীড়িতা, অত্যাচারিতা, ধর্মিতা

বালিকা ও যুবতীদের ক্রন্দন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। বঙ্গের অধিকাংশ পুরুষ বধির, বা শুনিয়াও শুনিতেছে না। অস্তঃপুরিকাদের নিকট খবর পৌছাই কঠিন, পৌছিলেই বা পিঞ্জরের পাখী তাঁহারা কি করিবেন? শিক্ষিতা ও কতকটা অবরোধমুক্তা নারীর সংখ্যা বেশী নয়, এবং তাঁহারা এখনও অধিকাংশ স্থলে শিক্ষিত পুরুষদের উপহাসবিদ্বেষের পাত্র। কেহ কেহ আবার নিজেদের আরাম ফ্যাশন প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত।

এই নৈরাশ্রজনক অবস্থার মধ্যেও অল্পসংখ্যক ত্রায়বান সহৃদয় সাহসী লোকের অত্যাচার দমন চেষ্টা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া নারীহিতৈষীদিগকে কাজ করিতে হইবে। সকল গ্রামে নারীরক্ষাসমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত।

“পাগল হরনাথ”

“পাগল হরনাথ” বা “ঠাকুর হরনাথ” নামে পরিচিত স্বর্গীয় হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাইয়ের “হরনাথ সমিতি”



“পাগল হরনাথ”

তাঁহার সম্বন্ধে যে ইংরেজী কাগজ পত্র পাঠাইয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার জন্মের তারিখ ১৮৬৫ সালের ৩রা জুলাই। “বাঁকুড়াদর্পণ” “সময়” হইতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তারিখ ১৮৭০ সালের ১৮ই আষাঢ় লিখিত হইয়াছে। “সময়” বলেন :—

১৮৮৫ খৃঃ অঙ্গে ইনি বাঁকুড়া জিলার কুচিয়াকোল ইনষ্টিটিউশন হইতে এন্ট্রাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অঙ্গে বর্দ্ধমান রাজ কলেজ হইতে তদানীন্তন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে বি-এ পড়েন। কিন্তু ধর্মের দিকে তাঁহার চিত্ত একরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে, লেখাপড়া আর ভাল লাগিতেছিল না। ফলে তিনবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াও তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বাঁকুড়া জিলার কোনও একটু স্কুলে ৬ মাসের জন্য শিক্ষকতা করেন। তৎপরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর স্টেটে কর্ম প্রাপ্ত হইয়া কাশ্মীর গমন করেন। এই কাশ্মীর হইতেই তাঁহার ধর্মজীবনের বিকাশ হয় ও তিনি সাধারণে পরিচিত হন। বহু ভক্ত তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ক্রমে ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাঁহার আশ্রম স্থাপনের আবশ্যকতা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, পুরী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার আশ্রম আছে।

ইহার বাঙালী, গুজরাতি, মাদ্রাজী, বিহারী ও হিন্দু-স্থানী ভক্তেরা সর্বসাধারণের জন্য ইহার সম্বন্ধে অনৌকিক-ঘটনাবর্ণিত বহি লিখিলে ভাল হয়।

সুভাষচন্দ্র ও উইন্সটন

বিলাতী পালেমেন্টে সহকারী ভারতমন্ট্রি লর্ড উইন্সটনের মুখ দিয়া বিনাবিচারে বন্দীকৃত বাঙালীদের সম্বন্ধে অনেক বহুবার কথিত মিথ্যাকথা নিঃসৃত হইয়াছে। উইন্সটন জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাকথা বলিতে অসমর্থ সাধু পুরুষ কিনা, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে, যে, ভারতবর্ষের সর্বকারী আফিম-বিশেষ হইতে তাঁহার কাছে যে-সব মিথ্যা কথা প্রেরিত হয়, তাহাই তিনি বাইবেলবাক্যের মত বিশ্বাস করিয়া আবৃত্ত করেন। উইন্সটন বলিয়াছেন, “এই সব বন্দীদের অপরাধ সম্পূর্ণরূপে (আপ্টু দি হিণ্ট) প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।” ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই সব রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে কথামাত্র প্রমাণও কখনও কোন আদালত বা বিচারকের সম্মুখে স্থাপিত হওয়া দূরে থাক, বন্দীদের নিকটও উপস্থিত করা হয় নাই। উইন্সটন বলেন, অল্প বন্দীদিগকে একজন, সুভাষ বহুকে দুইজন জজের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সহকারী ভারতমন্ট্রি বলেন, “এই সব লোকের বিচার প্রকাশ্য আদালতে এই জ্ঞপ্তি করা হয় না, যে, তাহা

হইলে সাক্ষীদিগকে বিপ্লবীরা খুন করিবো।” ইহা বহুবরাবর্ণিত পুরাতন মিথ্যা যুক্তি। ইহার অসত্যতা “বিপ্লবীদের” বহু আধুনিক প্রকাশ্য বিচারে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আধুনিক কাকেরী যড়যন্ত্রের মামলা। ইহার বিচার এক বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। আড়াই শত লোকের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কেহ নিহত হওয়া দূরে থাক, কাহারও গায়ে নখের আঁচড়টা পর্য্যন্ত লাগে নাই।

শাসক জাতিসকলের সেনাদল অস্ত্রশস্ত্র অর্থবল এবং স্বার্থরক্ষার জন্ত সৃষ্টিত দলবদ্ধতা ও একতা আছে। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তাহারা ভীক। যাহারা সত্য ও ত্রায়কে পদদলিত করে, তাহারাও সত্য ও ত্রায়ের শক্তি ও শ্রেষ্ঠতা কার্যতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়; কারণ, তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, যে, তাহারা ত্রায় ও সত্যের অমুগত আচরণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা যে কিরূপ প্রকৃত নেতৃত্ব-বিহীন, কিরূপ একতাশূন্য, তাহাদের কিরূপ ছত্রভঙ্গ অবস্থা, তাহা এই রাজবন্দীদের ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। রাজনৈতিক যত রকম মত ও দল দেশে আছে, তাহার সংবাদপত্রসমূহে বিনাবিচারে কাহাকেও বন্দী করা নির্মিত হইয়াছে। অথচ এবিষয়ে সকল দলের সম্মিলিত কর্তব্য নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। হইবে কেমন করিয়া? দেশের কল্যাণ, দেশের সম্মানরক্ষা ত প্রথম, প্রধান, বা একমাত্র লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য দলকে বড় করা, এবং “নেতাদের” ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও স্বার্থ রক্ষা করা।

আমাদের নৈতিক অধঃপতনেরও অনেক প্রমাণ আছে। একটা এই :—

মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বলিয়াছেন, বাংলাদেশে যে-সব নারী গুপ্তাদের দ্বারা অপহৃত ও অত্যাচারিত হয়, তাহাদের সকলে বা অধিকাংশ আগে হইতেই ভ্রষ্টা ছিল বলিয়া এরূপ হয়। লর্ড লিটন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতনারীদের এরূপ কোন নিন্দা নহে, এবং তিনি পরে ভারতনারীদের সতীত্বগৌরব কোন প্রকার “যদি” বা “কিন্তু” বর্জিত ভাবে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রতি সকল দলের সকল কাগজে ও বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে কত কটু কথা বর্ষিত হইয়াছিল। মিঃ সেনগুপ্ত উক্ত প্রকার জঘন্য কথা যে বলিয়াছেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিম্বা তাহার জঘন্য ক্রটি স্বীকার করেন নাই। ইহা তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ শৈফুদ্দীন কিচলু প্রভৃতির সম্মুখে বলিয়া-

ছিলেন। তথাপি তাঁহার নিন্দা কয়খানি কাগজে, কত বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে হইয়াছে? “মাকড় মারিলে ধোকড় হয়”, প্রবাদের ইহা একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

স্বভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি

শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র বসুকে যে কোন প্রকার সঠে আবদ্ধ না করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতীব সন্তোষের বিষয়। ইহা সরকার বাহাদুরের দয়া নহে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন দোষ করে নাই, তাহাকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখাটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার। অস্বাভাবিক



শ্রী স্বভাষচন্দ্র বসু

ব্যবহার হইতে স্বাভাবিকতার দিকে অগ্রসর হইলে তাহাকে দয়া বলে না। ইহা সরকার বাহাদুরের ত্রায়নিষ্ঠার দৃষ্টান্তও নহে। কারণ, যদি স্বভাষচন্দ্রকে বন্দী করা অস্বাভাবিক হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে সরকার খালাস দিতেন, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্যভঙ্গের ওজুহাতে খালাস দেওয়া হইত না; বলা হইত, তিনি নির্দোষ, অতএব খালাস দেওয়া গেল। স্বাস্থ্যভঙ্গের ওজুহাতটাও সম্পূর্ণ সত্য মনে হয় না; কারণ,

তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া ত তাঁহার মুক্তির অনেক পূর্বেই জানা গিয়াছিল। তখন কেন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই? তদ্বিষয় স্বাস্থ্যভঙ্গই যদি মুক্তির একমাত্র বা প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহারই মত বা তাঁহার চেয়েও বেশী মারাত্মক পীড়াগ্রস্ত বিনাবিচারে বন্দীকৃত অল্প লোকদিগকে কেন খালাস দেওয়া হয় নাই?

যান্ত্রিক ঠিক কি কারণে যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, জানি না। তিনি বিখ্যাত লোক। তাঁহার কথা ভারতে ও ভারতের বাহিরে লোকে জানিয়াছে। বন্দীদশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অল্প কোন কোন দেশের অনেক লোক ভারতের কতকগুলি সর্বকারী কর্মচারীকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী মনে করিবে, এই আশঙ্কা কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর হইয়া থাকিবে। হরত ইহা স্বভাষচন্দ্রের মুক্তির একটি কারণ। যাহা হউক, তিনি শীঘ্র সম্পূর্ণ স্বস্থ হইয়া আবার লোকহিতে রত হইতে সমর্থ হউন, ইহাই আগাদের আন্তরিক বাসনা।

ওলাউঠার টীকা

বঙ্গে স্বাস্থ্যবিভাগের পরিচালক বেণ্টলী সাহেবের দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে। কিন্তু তিনি যে সমুদয় লোককে ওলাউঠার টীকা দিয়া দেশ হইতে, অন্ততঃ কলিকাতা হইতে, ওলাউঠা তাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমবা সমীচীন মনে করি না। ওলাউঠার টীকা যে উহার নিশ্চয়ই নিবারক, তাহা এখনও নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় নাই। দেশে বিস্তৃত পানীয় জল ও খাটি তাজা ভেজালবিহীন খাদ্য জোগাইবার বন্দোবস্ত আগে চাই। নদীর জল, পুকুরের জল, কূপের জল ও কলের জল যাহাতে মলমূত্র দ্বারা ও রোগবীজ দ্বারা দূষিত না হয়, তদুপযুক্ত শিক্ষা ও ব্যবস্থা চাই। যাহাতে মলমূত্রের দ্বারা বোগ সংক্রামিত না হয়, তৎসমুদয় এরূপ ভাবে নিষ্কিপ্ত, রক্ষিত, প্রোথিত ও ব্যবহৃত হওয়া চাই। এইরূপ সমুদয় ব্যবস্থা না করিয়া শুধু টীকা দ্বারা ওলাউঠা কোন্ দেশ হইতে নিমূল করা হইয়াছে, জানিতে চাই।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি দয়া

রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে রকম গাড়ীতে বসিতে দাঁড়াইতে যতটুকু জায়গা পায় এবং তাহাদেব অল্প স্থবিধা (অর্থাৎ অস্থবিধা) যত, তাহা বিবেচনা করিলে তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চেয়ে বেশী ভাড়া দেয়। যাত্রীগাড়ী হইতে রেল কোম্পানীর লাভ প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া হইতেই হয়। তথাপি অপমান লাঞ্ছনা ও নানা দুঃখ ভোগ তাহাদের একচেটিয়া। তাহাদেব প্রতি রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ কেমন সদয়, তাহার একটা উদাহরণ ১৯২৫-২৬ সালের রেলওয়ের একাউন্ট্যান্ট-জেনার্যালের রিপোর্টে পাওয়া যায়। যে ষ্টেশনে ট্রেনে যাত্রীদের টিকিট সচবাচর দেখা হয় না, সেখানে হঠাৎ একদিন টিকিট চেক করায় দেখা গেল, ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর, ৩০ জন ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর এবং ১৬০ জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বিনা টিকিটে সফর করিতেছে। তাহার মধ্যে ২৭ জন ইন্টারমিডিয়েট ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর নামে রেলওয়ে আইন অনুসারে মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকতর ধনী ও ভাড়া দিতে অধিকতর সমর্থ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহারও বিরুদ্ধে কেন মোকদ্দমা করা হইল না, তাহার কারণ রিপোর্টে লেখা নাই।

পূর্ববঙ্গে রেল বিস্তার

পূর্ববঙ্গে নদী খাল সব ক্রমে ক্রমে মজিয়া অববাহার্য হওয়ায়, কচুরী পানায় আচ্ছাদিত হওয়ায়, ঐ অঞ্চলের নানা অনিষ্ট হইতেছে। মাল ও যাত্রীর জন্য পূর্ববঙ্গে জলপথ ও জলযানই যথেষ্ট হইত, যদি জলপথ নক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা হইত। তাছাড়া, ভাল রাস্তা নির্মাণ করিয়া মোটর গাড়ী চালাইলেই হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বৎসরে তথায় ৪০০ মাইল রেলপথ হইবে। ইহাতে যাত্রাতর ও বাণিজ্যের যে স্থবিধা হইবে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই ৩১৫ লক্ষ টাকার দুই তৃতীয়াংশ বিলাতের লোক পাইবে; বিলাতী পালোমন্টের মেম্বর মিঃ সুইফট্‌ ম্যাকনীল পার্লামেন্টে ১৮৯০ সালের ১৪ই আগষ্ট বলিয়াছিলেন, “হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, যে, ভারতে রেল বিস্তারের জন্য ব্যয়িত প্রত্যেক শিলিংের মধ্যে ৮ পেনী বিলাতে আসিয়া পৌঁছে।” বাণিজ্য-

* “It has been computed that out of every shilling spent in railway enterprise [in India], 8d. makes its way to England.” Hansard's Parliamentary Debates, Vol. 248, p. 1051.

বিস্তার যাহা হইবে, তাহা প্রধানতঃ বিলাতী জিনিষেরই হইবে, এবং তাহার দ্বারা গ্রাম্য কাবিগরদের অন্ন মাঝাইবে। ম্যালেবিয়া বাড়িবে। নৌকানির্মাণ ও বহায় নিযুক্ত বিস্তর লোকের অন্ন মাঝাইবে। জলপথের অবনতি হওয়ায় আরও নানা প্রকারে দেশের অবনতি হইবে।

কলিকাতার ভাইস্-চ্যান্সেলারের

উপর আক্রমণ

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সবকার ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়া নানাদিকে যশাসাধ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত করিবাব চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার নিয়োগে যে দলের লোকদের চাইগিরি যায় যায় হইয়াছে, তাহারা নানা মিথ্যা কথা বটাইয়া তাহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সব মিথ্যা কথা ফরোয়ার্ড লিখিয়াছিল, অল্প অনেক কাগজে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু ফরোয়ার্ড দোষ বা ভ্রম স্বীকার করে নাই। ভাইস্-চ্যান্সেলারের অঙ্গুলিনির্দেশে পরীক্ষায় পাশ ফেল বেশী হয়, এই যে ধারণা, ইহাকেই ভিত্তি করিয়া ফরোয়ার্ড যদুবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিল। চাইয়েবা ইহার দ্বারা যে নিজেদের দেবতাকেই অপদস্থ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। আগেকার কর্তার আমলে পরীক্ষায় খুব বেশী পাশ তাঁহাব আদেশে হইত বলিয়াই, এখন এই মিথ্যা কথা রটন হইয়াছিল, যে, যদুবাবু আদেশে ফেল বেশী হইতেছে। সত্য কথা কিন্তু এই, যে, যদুবাবুর এ বিষয়ে কোনই আদেশ ছিল না, থাকিতে পারে না, এবং মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই। যদুবাবুর নিয়োগে অনেকের চাইগিরি গিয়াছে, এবং তাহাদের আশ্রিত অনেকের “উপরি পাওনা”ও গিয়াছে; আক্রোশের ইহা অগ্ন্যন্তর কারণ।

বর্মা অয়েল কোম্পানীর দান

রেজুন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী বিদেশী অনেকে লাখ দুলাখ টাকা দান করিয়াছে। সকলের চেয়ে বড় ও প্রশংসনীয় দান বর্মা অয়েল কোম্পানীর ১৫ লাখ টাকা। কলিকাতা ক্লাইব স্ট্রিটের বিলাতী কর্তারা, এবং বড় বাজারের ক্রোড়পতি মাড়োয়ারী-ভাটিয়াবা দেখিগা শিখুন।

কলিকাতায় বক্রীদ

এবাব কলিকাতায় বক্রীদ, মাল্লুদের পক্ষে, শাস্ত ভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছে—গোকদের পক্ষে নয়। টেটস্ম্যান বলিতেছেন, ইহা পুলিশের অর্ধাৎ টেগার্ট সাহেবের বন্দোবস্তের ফলে যতটা হিন্দু-মুসলমানের সন্তোষের ফলে ততটা নহে। স্ততবাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, গত বৎসর যে কয়েক বার কলিকাতায় সাংঘাতিক দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহা নিবারণ করাও পুলিশের সাধ্যায়ত্ত ছিল, কিন্তু নিবারণের যথেষ্ট বন্দোবস্ত হয় নাই। কেন হয় নাই?

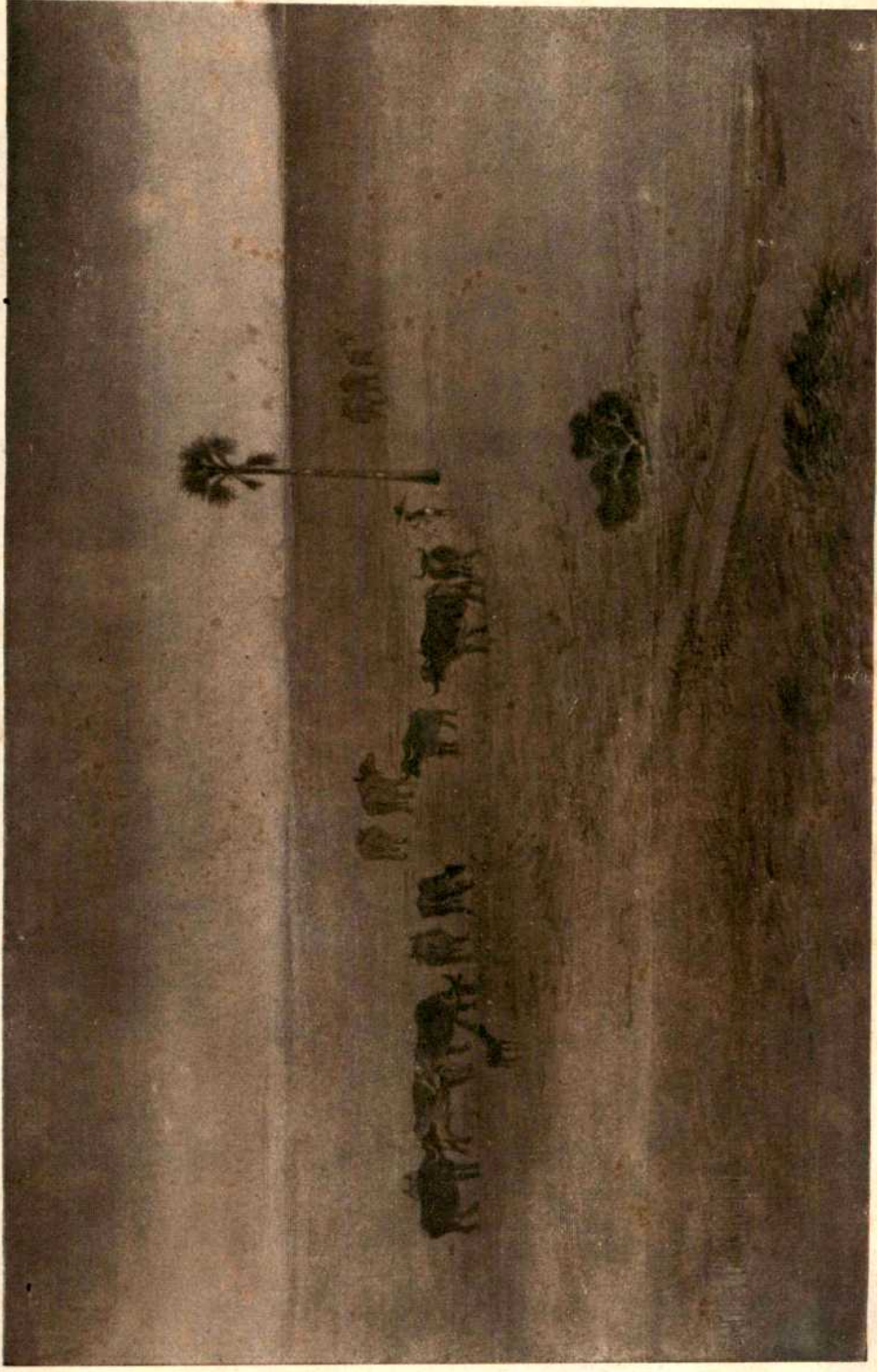
এডিনবরাহ বর্ণবিষেব

এডিনবরাহ নাচের হলে ও কতকগুলো ভোজনালয়ে অশ্বেতকায় বলিয়া ভারতীয়দিগকে যাইতে দেওয়া হইবেনা, ঐদবল স্থানের কর্তাবা এরূপ নিয়ম করায় এডিনবরাহ প্রবাসী ভাবতীয় ছাত্রদের ও এখানকার ভাবতীয়দের ক্রোধ হইয়াছে। হইবারই কথা। পৃথিবীতে, ইউরোপে, এডিনবরাহ মত বা তার চেয়ে সস্তায় উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর শিক্ষার আয়গা অনেক আছে। আমাদের ছাত্রেরা যেন সেই নব জায়গায় যান। ভারতীয় বলিয়া ভাবতীয়দিগকে নৃত্যশালায় যাইতে না দেওয়াটা অপমানকর বটে; কিন্তু বিলাতী নৃত্যশালাগুলায় গেলে বিদ্যা বাড়ে না চরিত্রের উন্নতি হয় না; স্থল লাভের উদ্য অপেক্ষা নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট উপায় এবং জাহ্নগাও আছে।

শ্বেতবায়েরা আমাদের গায়েব রং ময়লা বলিয়া আমাদেরকে অবজ্ঞা করায় আমরা চটি। কিন্তু যে-মেয়ে ফরুসা নয়, তার বিয়েতে জামাই বাবাজিরা ও জামাইয়ের বাপমায়েরা বেশী দাম আদায় কেন করেন? সে গুণবতী এবং তার গঠন ও মুখ চোখ নাক সুন্দর হইলেও যেন। কাল পাঁচপাঁচি মেয়ের ত কথাই নাই। এটা কি বর্ণবিষেব বা বর্ণঅবজ্ঞা নয়? তখন বাবু সাহেবরা চটেন না কেন?

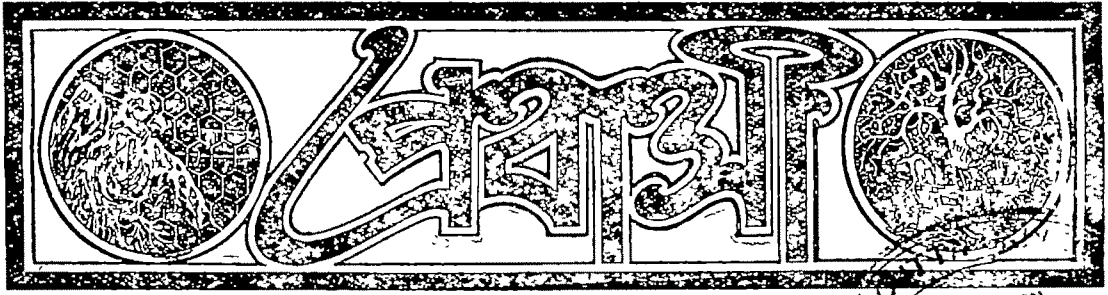
ভ্রম সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর পৃষ্ঠক-পরিচয়ে ডাঃ হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের (Origin and Development of the Bengali Language and Literature) সমালোচক শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—ভ্রমক্রমে-মুদ্রিত শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য নহেন।



গোচারণের মাঠ
শিল্পী শ্রী অরুণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাসী প্রেস, কলিকাতা]



“सत्यम् शिवम् सुन्दरम्”

২৭শ ভাগ

ধর্মবোধ

(5)

মনের স্বধর্মকে এককাল উপেক্ষা ক'রে এসেছি, তাই আজ শিক্ষা একটা সমস্তা হ'য়ে উঠেছে।

জ্ঞানের সম্বন্ধে যে-কথা, ধর্মবোধ-চর্চার সম্বন্ধে তা' আরো বেশি ক'রে খাটে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা কারখানায় তৈরি পদার্থ হ'লে তা আপনি আপনার প্রতিবাদ করে। তাকে যদি বাহ্য পদার্থ ক'রে তুলি তবে তা ব্যর্থ হবে, কেননা সেটা আধ্যাত্মিক। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সে তো ক্লাসে শেখাবার বিষয় নয়, বিশ্বের সর্বত্র থেকেই যে তার উদ্বোধন। বন্ধুত্ব জিনিষটি কি তা জানুবার জন্তে বৈজ্ঞানিক বা তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারে যেতে হয় না, সহজ কথাটি এই যে, বন্ধু আনন্দ দেন। তেমনিই সহজ ক'রে উপনিষদের ঋষি বলেছেন,—এষ হ্যেবানন্দয়াতি,—ইনিই আনন্দ দিয়ে থাকেন। বিশ্বে আমাদের আত্মা যা কিছুতেই আনন্দ পায় তার মধ্যে দিয়েই সেই পরমাত্মীয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। বিশ্বের মধ্যে যদি কোথাও আনন্দতত্ত্ব না থাকত তাহ'লে আপনার চরম-সত্যকে সন্ধান করবার ইচ্ছামাত্র থাকত না—তাহ'লে জড়নিয়মের চরকায় আমাদের জীবনের মুহূর্তগুলি ঘুরে ঘুরে একটালম্বা সূতো কেটে চলত যে পর্যন্ত না মৃত্যু এসে হঠাৎ তাকে নিরর্থক বিচ্ছিন্ন ক'রে দিত। “নিয়মের কল চলেছে” ব'লে মাল্লবের আত্মা কোনো দিন গান গায়নি। সে গেয়েছে, এষ হ্যেবানন্দয়াতি—ইনিই আমাদের আনন্দ দেন। আনন্দের স্পর্শেই আত্মা আপন আত্মীয়ের সন্ধান পায়, বলে “এষোহ্য পরম আনন্দঃ” আমাদের এতে আনন্দের সম্বন্ধ,—আইনের সম্বন্ধ নয়। যে অংশে আমি জড়, যে অংশে আমি অনাত্মা, সেই অংশেই আমি আইনে চালিত; যে অংশে আমি জাত্মা, আমি স্বাধীন, সেই অংশে বিশ্বের মধ্যে আমি সেই সম্বন্ধের স্বাদ পাই যে-সম্বন্ধ আনন্দের। আমাদের চিত্তশক্তির অপূর্ণতাবশত সত্যের সূক্ষ্মতর অনির্কচনীয় রূপটি আমরা সর্বত্র দেখতে পাইনে। পরম পুরুষ যিনি পরম এক তাঁর বাণী আমরা সেখানেই পাই যেখানে আমাদের অভিজ্ঞতায় একের উপলব্ধি একান্ত ভাবে ঘটে। সেই একই অনির্কচনীয়। আমরা যাকে ভালোবাসি আমার চৈতন্যের মধ্যে সে একটি পরিপূর্ণ এক। পথের লোক, যারা হাজার হাজার নানাবিধ কত

কীর সঙ্গে মিলিয়ে আছে, আমার কাছে যারা একরূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়, তারা কেউ কেউ হয়ত আমার পরিচিত, কেউ কেউ হয়ত আমাব কাছে লাগে, কিন্তু তাদের চরম ঐক্য আমার কাছে উপলব্ধিগোচর নয় ব'লে তারা আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে না—অর্থাৎ আমার আত্মা আমার কাছে যেমন অনিশ্চিত স্বপ্রকাশ এক, তারা তেমন নয়। কিন্তু আমার বন্ধু এক সত্যরূপে আমার আপনানি মত, এমন কি আমার আপনানি চেয়েও সুস্পষ্ট। এইজন্তেই ভগবানকে ভক্ত বলেছেন, বন্ধু। বন্ধু অনির্কচনীয়, বন্ধু আপনিই এক, আপনাতেই আপনি চরম। সত্যের সেই আত্ম-পর্যাপ্ত চরমতার রূপ আমরা স্তম্ভর পদার্থের মধ্যে দেখি। আমার চক্ষু হাজার হাজার জিনিষের উপর দিয়ে চ'লে যায়, কাউকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করে না। পদাঙ্কল করে। পদাঙ্কল আপন রূপের ছন্দে আপনানি মধ্যে সম্পূর্ণ একটি এককে প্রকাশ করছে। আমার কাছে সে বস্তু-নীহারিকার অংশ নয়, সে আপনিই চরম। সেখানে আমি সত্যের অনির্কচনীয় একরূপকে দেখতে পাই—তাকেই বলি স্তম্ভব,—সে আমার কাছে আপনাকে এক-স্বরূপে উপলব্ধ করায় আপন সত্তাতেই,—কোনো প্রয়োজনের প্রলোভনে নয়, কোনো উপকায়েব আশ্বাসে নয়। তখন আমার মধ্যে যে-এককে জ্ঞানি আমার বাইরে সেই এককে দেখতে পাই—স্তম্ভের মধ্যে আত্মা আপনাকেই প্রসারিত দেখে, তাতেই আনন্দ। সত্যের এই অনির্কচনীয় এক-স্বরূপকে বিশুদ্ধভাবে, নিষ্কামভাবে দেখবার জন্তে মনকে বিশুদ্ধ করবার প্রয়োজন আছে, কেননা সত্যের স্তম্ভর প্রকাশকে নিষ্কামভাবে অহৈতুকভাবে অহুভব করাতেই তার স্বার্থ উপলব্ধি। এইজন্তেই ধর্মসাধনার একদিকে চারিত্রের বিকাশ, আর একদিকে বোধশক্তির বিকাশ। জলাশয় খনন করা যেমন দরকার, জলধারা তার চেয়ে কম দরকার নয়।

যিনি সত্য, তত্ত্বরূপে তিনি এক, বোধরূপে তিনি আনন্দ। সেই অসীম এককে জ্ঞানের দ্বারা জেনে শেষ করা যায় না, আনন্দকে বোধের দ্বারা অহুভব করা যায়। তাই উপনিষদ বলেছেন :—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥

সত্যের স্বর্গভীর রসরূপকে আত্মার মধ্যে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা, এবং সেই বোধের পূর্ণতা দ্বারাই সংসারের বর্ষকে পবিত্র করা, হ্রস্ব করা, মাহুষেব সঙ্গে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধকে কল্যাণময় প্রীতিপূর্ণ করা এই যদি মাহুষের জীবনের লক্ষ্য হয়, এবং সেই লক্ষ্যসাধনকেই যদি ধর্ম-সাধন বলে, তবে তার প্রথম সরল শিক্ষাবিধি মনকে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত করা। সে তো ক্লাসের মধ্যে না, পুঁথির শ্লোকের মধ্যে সমাহিত হয়ে না। বিশ্বের মধ্যে অনির্কচনীয়ের উপলব্ধি সেই বিশ্বের ক্ষেত্রেই করতে হবে। নানা কৃত্রিম বাধায় যদি তার সঙ্গে আমাদের আনন্দের পরিচয় প্রতিহত হয় তাহ'লে দিনে দিনে আমাদের চিত্তেব সহজ বোধশক্তি অসাড় হ'তে থাকে, তখন বিশ্বব্যাপারে কেবল আমরা যন্ত্রকে দেখি, আত্মীয়কে দেখিনে, অর্থকে দেখি, পরমার্থকে দেখিনে। সেই বোধশক্তির বিকার যখন ঘটে তখন ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যেতে পারে এই প্রশ্নটি কঠিন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। কেননা পূর্বেই বলেছি আনন্দময়কে বোধের দ্বারাই পাওয়া যায়, জ্ঞানের দ্বারা নয়। সেই বোধকে উদ্বোধিত করবার প্রেরণা বিশ্বের সর্বত্র আছে। আকাশে আলোকে তার বাণী। সেই বাণীর কাছে দাঁড়িয়ে থলে রেখে দেওয়া, মনকে জাগতে দেওয়ার অবসর দেওয়া আমাদের সাধনার গোড়ার পথ। অধিকাংশ স্থলে সে পথ বন্ধ হয়েছে ব'লেই আমরা নানাপ্রকার অহুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে বেড়াই,— তাতে ফল যদি না পাই তাহ'লে চিত্তের অসারতা ও উপায়েব কৃত্রিমতাকে দোষ না দিয়ে ধর্মের সত্যকেই অবিখ্যাস করি,—দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে আলোককে অস্বীকার করি, একথা ভুলে যাই, আলোক তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, বোধের দ্বারাই পাওয়া যায়।

(২)

আমাদের ভাবতবর্ষের সাধনার একটি বিশেষত্ব আছে। সে আমাদের জ্ঞানায় বিশ্বের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দকে আপন চৈতন্যের ভিতর অহুভব করাতেই মুক্তি। আমি যখন ইউরোপে ছিলাম তখন এই বাণীটিই

আমাকে প্রতিদায়িত ভারতবর্ষের দিকে টেনেছিল। সেখানে নানা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রের মধ্যে জীবন-সমস্যা সমাধানের বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে নিবিষ্ট ছিলাম, কিন্তু মনের একটি ক্ষুধা কিছুতেই যাচ্ছিল না। উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে, তরুণতার সৌন্দর্যের মধ্যে আমাদের চিত্ত আনন্দিত হ'য়ে যে অমৃত গ্রহণ করে, তারই অভাব অহুভব করেছি। এবং এইটেও অহুভব করেছি যে, যারা লোক সমাজে নানা কাজে ব্যাপৃত, তারা এ অমৃতকে ভুলে যায়। একে সমস্ত জীবনের অন্তর্গত ক'রে নিতে জানে না, একে বাইরের ভাবে দেখে। প্রশংসিত প্রাচুর্যবশত যুরোপীয় প্রকৃতিতে কর্মোদ্যম প্রবল। যুরোপীয় সাধক সেই কর্মোদ্যমের মধ্যেই ব্রহ্মের সেবা করতে চান। এইটেও খুব বড় কথা, এইটিকে বেন আমরা শ্রদ্ধা করি, এই চেষ্টা যাদের মন থেকে প্রতিনিয়ত আকাশ পাচ্ছে তাঁদের প্রশংসা করি। সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, ভারতবর্ষে যারা বিশ্বের মধ্যে আত্মাকে প্রসারিত ক'রে ব্রহ্মকে অন্তর্বর্তম করতে চেয়েছেন, তাঁরাও বড় সাধনা করেছেন। যখন সমুদ্রপারে সেই লোকালয়ে নানা কোলাহলের মধ্যে ব্যস্ত হ'য় ছিলুম তখন আকাশের ডাকে ভারতবর্ষ আমাকে ডেকেছিল। আমার মনে একটি ক্ষুধা ছিল, সে-ই প্রবলরূপে আমাকে টেনেছিল। যুরোপের বড় বড় শহরের মধ্যে, জনতার কোলাহল ও কর্ম-ব্যাপারের প্রবলতার মধ্যে প্রতিনিয়তই অন্তরে একটি আত্মান শুন্তে পাচ্ছিলুম সেই স্ববিপুল বস্তুরিরল অবকাশের, যার মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বহিরা প্রশংসা করেছিলেন :—

যো দেবোহ্মৌ যোহপস্ব যো বিশং

ভূবনমবিবেশ

য ওষধিসু যো বনস্পতিসু তস্মৈ দেবায়

নমো নমঃ ।

—এই নমস্কারটির অভাব অত্যন্ত অহুভব করেছি।

বারেবারে মনে পড়েছে আমার আবাস-গৃহের বাইরে যে-গাছটি প্রত্যহ বাড়ছে সে কি বাণী নিয়ে অগেলা ক'ছে স্বর্ঘ্যোদয়ের ও স্বর্ঘ্যাস্তের আকাশের তলে দাঁড়িয়ে? সেই গাছটি একটি সহজ তানপুরার মত, তাতে জীবনসদীতের

একটি মূল সুর বাজছে, যে সুর শান্তির সুর, সামঞ্জস্যের সুর। এই গাছ প্রাণের প্রথম জন্মসঙ্গীত নিয়ে পৃথিবীকে প্রাণীন্দ্র বাসযোগ্য ক'রে তুলেছে। এর ফুলে পাতায় প্রাণের প্রথম সৌন্দর্য-বিকাশকে সব-চেয়ে সহজরূপে দেখছি। এতেই যেন স্তম্ভের মূল সুর, তাই যা কিছু স্তম্ভ, ফুলের সঙ্গে কবি তাকে যাচাই ক'বে দেখে। এই যে প্রাণ আপনার হৃদয় শক্তিকে স্তম্ভ ক'বে বিশ্ব জুড়ে নিয়ত প্রকাশ করছে—এ যেন একটি গানের ভূমিকা, তার ধূম। এই ভূমিকা প্রাণ-সঙ্গীতের বিক্ষিপ্ত সুরগুলিকে স্তম্ভ একের পরিণতিতে সহজে মিলিয়ে দেবার কথা বলছে। সেইজন্মেই মানুষের ক্রান্ত বিস্মৃত চিত্তকে বনম্পতি শান্তিতে অভিষিক্ত করে। বনের মধ্যে প্রাণের যে বেদমন্ত্র, শাস্তিমন্ত্র অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে, আমাদের দেশের বনচারী ঋষিরা নিয়ত তা শুনেছেন, এই তরুচ্ছায়্যায় নানা ঋতুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে এই নমস্কার-বাণী তাঁরা শুনেছেন—

যো দেবোহর্যো যোহপ্সু যো বিশ্বং

ভুবনমাবিবেশ

য ওষধিষু যো বনম্পতিষু তস্মৈ দেবায়

নমো নমঃ।

—এবং এই বাণীদ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আত্মার যে যোগ

সেটি সহজ হয়েছে। যেন মন দিই, যেন স্তম্ভে পাই সকাল-বেলার আলোক যে-সুরে বাজছে, প্রত্যেক পল্লব পুঙ্খিত হ'য়ে উঠছে, তৃণরাশি অঞ্জলি তুলে ধ'রে আকাশকে বলছে—দাও দাও দাও, ড'রে দাও। সেই সুর বাজে তোমাব ঘরের দ্বারে যে গাছ দাঁড়িয়ে আছে তাতে, প্রভাতের আলোকে, রাত্রির অন্ধকারে, পত্রের মর্ম্মব-ধ্বনিতে, নানা ঋতুর উৎসবে। মনে মনে ভাবি কত বড় বাণী স্তম্ভে এল ধরণীতে, যেদিন তরু শ্রামল বেশে কিশোর প্রাণকে বহন ক'রে নিয়ে এল, প্রাণের পদধ্বনি দিনে দিনে ধ্বনিত হতে লাগল বর্ণে গন্ধে রূপে। সেই গাছ আমাব ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে। আমার যা প্রার্থনা তার আহুত্যা করছে। কৃতজ্ঞচিত্তে আনন্দিতভাবে সহজবোধের সঙ্গে এটিকে যদি দেখি তবে পৃথিবীতে আনন্দ-লোককে ঘরের দ্বারে পেতে পারি, নইলে অশ্রু কোথাও তা পাবনা। গানে আছে “বাজাও আমারে বাজাও,” যে সুর সহজ হ'য়ে বাজছে তরুলতার মধ্যে, অবিকৃত হয়ে বাজছে শিশুর প্রথম হাসিতে, যে সুর বাজছে সন্ধ্যা-মালতীর গোপন সুরে, যে সুর বাজছে ধরণীর ধূলিতে বিচিত্র বর্ণে বর্ণে—সেই সহজ সরল সুরের মত ক'রে স্তম্ভের কর, সার্থক কর, বাজাও আমারে বাজাও।

প্রাচীন ভারতীয় রাজকোষের আয়-ব্যয়

অধ্যাপক শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক

প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা কত হারে বাৎসরিক বেতন উপভোগ করিতেন এবং তাহা কিরূপে রাজসরকারে আয়-ব্যয়-তালিকার (Budget) খরচ দিকে ভুক্ত হইত তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শাসন সংরক্ষণে প্রধান কর্মচারীদের বেতন

ঋজিক, আচার্য্য ও মন্ত্রী (Prime-minister), রাজ-

পুরোহিত, সেনাপতি (Commander-in chief), যুবরাজ (Crown-Prince), রাজমাতা (Dowager Queen) ও পটমহিষী এই আটজনের প্রত্যেকের বাৎসরিক বেতন ৪৮০০০ পণ (১ পণের মূল্য আনুমানিক ৯০ হিসাবে ধরিলে বর্তমান সময়ে প্রায় ৩০০০০ টাকা) অর্থাৎ মাসিক প্রায় ২৫০০ টাকা করিয়া ধার্য্য ছিল। দৌবারিক (Lord Mayor of the Palace or Inspector-

General of Palace Police), অন্তঃপালিক (অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠ রাজভৃত্য), প্রশাস্তা (বহুনাগারাদিকৃত), রাজস্ব-বিভাগের সমাহর্তা (Collector-General of King's revenue) ও সমিধাতা (কৃত্যাকৃত্যবিষয়ে অর্থের বিনিয়োক্তা = Chancellor of the Exchequer), এই পাঁচজনকে প্রত্যেকে ২৪০০০ পণ লইতেন। অন্তান্ত রাজকুমার ও তাঁহাদের মাতারা (অর্থাৎ যাহারা পটমহিষী নহেন), নাগরিক (City Governor), পৌর-ব্যবহারিক (Chief Justice of the City), কার্যাস্থিক (যিনি প্রভৃতি রাজকীয় শিল্পবাণিজ্যাদির প্রধান অধ্যক্ষ), মন্ত্রিপরিষদের অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রপাল ও অন্তঃপাল—ইহারা প্রত্যেকে ১২০০০ পণ হিসাবে পাইতেন। শ্রেণীমুখ্য, হস্তীমুখ্য, রথমুখ্য ও প্রদেষ্ঠা (কণ্টকশোধনাধিকৃত, District Executive Officer) প্রত্যেকে ৮০০০ পণ হিসাবে এবং সেনাবিভাগের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিব অধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে এবং জীব্যবনপাল (Chief forest-conservator) ও হস্তিবনপাল ৪০০০ পণ হিসাবে পাইতেন। রথচর্চাশিক্ষক, রাজভিষক, অশ্বদমক, মহাতক্ষা, (Chief Engineer), যোনিপোষক (Firm overseer) ইহাদের বেতন ২০০০ পণ হিসাবে। সুরাধ্যক্ষ, স্থপাধ্যক্ষ প্রভৃতি নিম্নবর্তী অধ্যক্ষগণের প্রত্যেকের বেতন ১০০০ পণ। সংখ্যায়ক (Accountant), লেখক, প্রভৃতি ছোট ছোট রাজভৃত্যেরা বৎসরে ৫০০ পণ পাইতেন। এইভাবে নিয়োগের তারতম্যামুসারে কর্মচারীরা ৫০০, ২৫০, ১২০ ও এমন-কি ৬০ পণ পর্যন্ত বেতন লাভ করিতেন। কিন্তু কাপটিক প্রভৃতি চারগণের প্রত্যেকের বেতন ছিল ১০০০ পণ করিয়া। কেবল যে আজকালই উপযুক্ত রাজকর্মচারীদের কর্মকরণাবহার হঠাৎ হৃত্য ঘটিলে—বাজী মৃত ব্যক্তির পোস্ত পুত্রদ্বারাদির ভরণ-পোষণের সহায়তার জন্ত রাজকোষ হইতে অর্থাদি দানের ব্যবস্থা করেন তাহা নহে, প্রাচীনকালেও এরূপ মৃত ব্যক্তির পুত্রদারগণ ও তাহার পোস্তবর্গের মধ্যে যাহারা বালবৃদ্ধ বা ব্যাধিত তাহারাও রাজার অর্থানুগ্রহ লাভ করিতেন। [“কর্মজ্ঞ মৃতানাং পুত্রদ্বারা ভক্তবেতনং লভেদনং বালবৃদ্ধব্যাধিতাশ্চৈবাং অনুগ্রাহাঃ” ইতি

কৌটিল্যঃ]। রাজসরকারে বিভিন্ন বিভাগের স্থিতি-নিবন্ধন এইরূপ রাজকোষের ব্যয়ের বিধান ব্যবস্থিত ছিল। রাজভৃত্যগণের কার্যপটুতা ও পারদর্শিতা লক্ষিত হইলে—তাহাদের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও হইত।

সরকারী ঋণ

নৃপতিগণ সংগৃহীত রাজস্বের এক চৌথদ্বার শাসন-ব্যয় নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টাই করিতেন। সে-কালে রাজগণ সঞ্চয়প্রথা বেশ মানিয়া চলিতেন। কামন্দক তাঁহার নীতিসারে লিখিয়াছেন, কোষজ ব্যক্তি যঃ সেই কোষেরই প্রশংসা করিতেন যাহা প্রয়োজনীয় ব্যয় সহিতে পারিত—“ধর্মার্জিতঃ ব্যয়ঃ সহঃ কোষঃ কোষজ-সম্মতঃ”। কি কি উদ্দেশ্যে কোষ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন “ভূতানং ভরণং দানং ভূষণং বাহনক্রয়ঃ। স্বৈর্য্যং পবেণ্যজ্ঞাপচ-দুর্গসংস্কার এবচ। সেতুবন্ধ-বণিক্কর্ম-প্রজামিত্র-পরিগ্রহঃ। ধর্মকর্মার্থ-সিদ্ধিচ্চ কোষাদেতৎ প্রবর্ততে ॥ কোষ-মূলো হি রাজ্যেতি প্রবাদঃ সার্বলৌকিকঃ এতৎ সর্বাং জহাতীহ কোষব্যসনবান পঃ ॥” (১৪।৩১-৩৩ উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত বিষয়গুলির ব্যয়-বহন করিতে হইলে রাজকোষ সর্বদাই নানারূপ ধনরত্নে পূর্ণ রাখিতে হইত। এবং রাজকোষ পূর্ণ থাকিত বলিয়াই সম্ভবতঃ ভ্রগণকে যুদ্ধবিগ্রহ কিম্বা জনসাধারণের যোগক্ষেমকর অন্ত কোনও আত্মায়িক কার্যের ধরচ কুলাইবার জন্ত সরকারী-ঋণ (Public debt) পদ্ধতির আশ্রয় লইয়া থাকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সুদ দেওয়ার জন্ত ও পরে মূলটাকার পরিশোধের জন্ত রাজকোষের ব্যয় বৃদ্ধি করিতে ততটা বাধ্য হইতে হইত না। তবে আপদকালে বৃদ্ধি বা সুদ দ্বারা অর্থগ্রহণ যে কতকটা বিধেয় ছিল, তাহা শুদ্ধাচার্য্যও বলিয়াছেন, যথা—“ধনিকৈভ্যো ভূতিং দত্ত্বা স্বাপত্তৌ তদ্ধনং হরেৎ। রাজা স্বাপৎসুভীর্ণতং স্বং দত্ত্বাৎ স্ববুদ্ধিকম্ ॥ (৭।২।১১) অর্থাৎ বিপদ উপস্থিত হইলে ধনিকের নিকট হইতে বুদ্ধিযৌক্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, পরে বিপদ হইতে উজ্জীর্ণ হইলে তিনি তাহা সুদ সহ পরিশোধ করিবেন কিন্তু দণ্ড-সম্মত অর্থ ও ভাগদেয় ও শুদ্ধ যদি নাও লাভ করেন,

তথাপি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সৈন্ত রক্ষিত হইতে পারে এতটা অর্থ সর্ব্বদা তিনি কোষে সঞ্চিত রাখিবেন [“নগ-দুভাগ শূন্যকৃত বিনা কোশাদ্ বলস্ত চ। সংবক্ষণং ভবেৎ সম্যগ্ যাবদ্ বিংশতি বৎসরম্। তথা কোশস্ত সদ্ধার্বাঃ স্বপ্রজ্ঞা-রক্ষণক্ষমঃ” ॥ (৪।২।১৩)

• অর্থ ব্যসনে “প্রণয়” সংজ্ঞক করাদি

রাজ্যকোষেব যতটা আয় হইবে তদপেক্ষায় অল্প ব্যয়ে শাসনকার্য্য সমাধা করিয়া রাজ্য অবশিষ্ট নীচী নামক ধন-কোষে প্রবেশ করাইয়া রাখিবেন, যেন বিপদে তদ্বারা উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। পূর্বে একবার কথিত হইয়াছে যে, রাজ্য শাস্ত্রানুসারে পরিচালিত কর ব্যতীত অন্য কোন অত্যাচারমূলক করাদি নিরুপদ্রব সময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু রাজ্যে যুদ্ধাদিরূপ কোন উপদ্রব ও উপপ্লবাদি উপস্থিত হইলে কিম্বা রাজ্যকোষে কোন কাবশে ধনেব হ্রাস লক্ষিত হইলে, তিনি প্রজা-বর্গকে তাহা না জানিতে দিয়া, কিরূপ কৌশলে কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন তাহার কিছু উল্লেখ এই স্থানে করা হইতেছে। এইসমস্ত উপায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণানুসারে না হইলেও বিপদ-সময়ের আত্যয়িক উপায় বলিয়া তাহা ক্ষম্য বিবেচিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত: আনায্য হইলেও, রাজ্য যে ইহা অবলম্বন করিয়া রাজ্যকোষ পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে নুপতিগণ প্রচলিত শাস্ত্রবিহিত করাদির আয় দ্বারা অনেক সময় রাজ্যশাসন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেন না,— তাই অর্থব্যসন উপস্থিত হইলে রাজ্যগণ যে যে উপায়ে কোষ পূর্ণ করিতে পারেন তাহারও বর্ণনা প্রাচীন রাজ-নীতি-শাস্ত্রে লিখিত পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে, প্রাচীন রাজ্যারা কেহ কেহ অর্থকুচ্ছে পড়িয়া অবিভক্ত ধাতু মুদ্রাও নির্মাণ করাইয়া তাহা বাজারে প্রচলিত করাইয়াছেন। মুসলমান আমলেও প্রত্যেকের বাধ্যতামূলক যে কর রাজ্যের ছিল তাহা ‘আসল’ বলিয়া গৃহীত হইত এবং অর্থব্যসনসময়ে রাজ্য যে অতিরিক্ত কর উঠাইয়া লইতেন তাহাকে ‘আবওয়াব’ বলা হইত। প্রাচীন রাজ্যগণ এইরূপে

যে অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিতেন—তাহার নাম ছিল ‘প্রণয়’-কর, ইহা মাগিয়া বা বাচঞা করিয়া লইতে হইত। কি কর্ষক শ্রেণী, কি বণিক শ্রেণী যাহাদের উপর যে হারে ভাগ ও করাদি দেওয়া নিয়মিত ছিল কৃচ্ছ্র সময়ে তাহাদের নিকট হইতে তদপেক্ষা বর্দ্ধিত হারে করাদি যাচঞা দ্বারা বাড়াইয়া লইতে পাবা যাইত। কর্ষকগণের নিকট যজ্ঞ-ভাগের পরিবর্তে তৃতীয় বা চতুর্থ ভাগও যাচিত হইত। এই অতিরিক্ত করের সংগ্রহ-ব্যাপারে অরণ্যজাত দ্রব্য ও জোড়িয়ার অর্থ স্পৃষ্ট হইতে পারিত না। অনেক বিপদের সময় রাজস্ব-বিভাগের রাজস্বচারিগণ কৃষকগণ দ্বারা গ্রীষ্মে ক্ষেত্রের অতিরিক্ত আবাদ করাইয়াও অর্থলাভের উপায় করিয়া লইতেন। এমন-কি কুশীলব (নাট্যব্যবসায়ী ও রূপাজীবী (বেশা) নিজ নিজ স্বোপার্জিত ধনের অর্দ্ধ-ভাগ রাজ্যকে বিপদ সময়ে দিতে বাধ্য হইত। মনে রাখিতে হইবে যে, এই বর্দ্ধিত হার অস্থায়ী। বৎসরে একবারের অধিক এইরূপ প্রণয় করের সংগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। ব্যসন কাটিয়া গেলেই পূর্বে প্রচলিত হাবে কর চলিতে থাকিবে। এইভাবে বিশেষ অর্থলাভ না হইলে, সাধনীয় কোন প্রয়োজনীয় কার্যের ভাগ করিয়াও রাজ্য সমাহর্তার সহায়তায় পৌবজানপদগণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিতে পারেন এবং নিজ কর্ষচারিগণকে সর্ব্বাগ্রে সেই কার্যের নিষ্পাদন জন্য চাঁদারূপে অতিমাত্রায় অর্থ দেওয়াইতেন। তৎপর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট নগদ টাকা চাঁদারূপে চাহিয়া লইতেন। রাজ্যকোষের এইরূপে কৃচ্ছ্র সময়ে ষাঁহার অর্থ-সাহায্য করিতেন রাজ্য তাঁহাদিগকে পদ-পদক-ভূষণাদিরূপ বহুমান চিহ্ন প্রদান করিতেন। অর্থ-ব্যসনে পাষণ্ড দ্রব্য, সংযজ্ঞব্য ও দেবজ্ঞব্যও ছলে গৃহীত হইত। দেবতাদ্ব্যাক্ষের সমায়ত্তা লইয়া রাজ্য নগরে ও জন-পদে প্রতিষ্ঠিত দেবতাগণের সম্পত্তি ও অর্থও একত্র সংগৃহীত করাইয়া লইতেন। অনেক সময় এক রাজ্যের মধ্যেই দেবতার চৈত্য ও সিদ্ধ পুরুষের পীঠস্থান নির্মাণ করাইয়া তৎসমীপে যাজ্ঞ-তামাসার ব্যবস্থা করাইয়াও অর্থ সংগ্রহের উপায় করিতেন। দেবতা ও দানবের নানারূপ দৃষ্টি-ভয় দেখাইয়া তৎপ্রতীকারার্থ নগদ টাকা উঠাইয়া লইয়া তদ্বারাও রাজ্যকোষে অর্থগণের

চেষ্টা করিতে ক্রটি করা হইত না। প্রাচীন ভারতের চার প্রথা যে কিরূপ পাকাভাবে গঠিত ছিল—অর্থকৃষ্ণে, অর্থলাভ জন্ত উদ্ভাবিত উপায়ের প্রসঙ্গেও তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গৃঢ়পুরুষ বা গুপ্তচরদিগের সাহায্য দ্বারাও রাজা ও রাজমাত্যগণ অনেক অসাধু উপায়ে টাকা উঠাইয়া লইতেন। তবে এই উপায়গুলি দুষ্ট অর্থাৎ রাজদেবী ও অধাশ্রিত ব্যক্তিদের উপরই প্রযুক্ত হইত—ধার্মিক বা সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তিদের উপর নহে। কখন সিদ্ধ পুরুষের বেশধারী চর জন্তকবিদ্যা বা মায়াবিদ্যার বলে লোককে ধনাঢ্য করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে, বলিয়া প্রকাশ করিয়া রাজদেবীকে কৌশলে সর্বস্ব-হরণের পথে আনয়ন করিত। কখন বণিকের বেশধারী চর বৃহদাকার কোন বাণিজ্যের ছলে অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া নগদ টাকা ধ্বংসরূপ লইয়া পরে সেই উত্তমর্ঘের অর্থশেষের উপায় করিয়া লইত। কখনও সাধ্বী নারীব বেশধারিণী ছুশ্রীজ্ঞা জীলোক দ্বারা দুষ্যজ্ঞকে উন্মাদিত করিয়া গুপ্তচরেরা সেই জীলোকের বাড়ীতেই সেই ব্যক্তিকে ধরাইয়া দিয়া রাজদ্বারে তাহার সর্বস্ব-হরণের ব্যবস্থা করাইতে পারিত। এইরূপ মাতৃব্যঞ্জন জীলোকদ্বারা ও ভৃত্যব্যঞ্জন, কর্মকব-ব্যঞ্জন, চিকিৎসকব্যঞ্জন প্রভৃতি গৃঢ়পুরুষ দ্বারা—পুত্রমারণ বেতন দানে কুট মৃত্যাদান, কুটমৃত্যু নির্মাণার্থ যন্ত্রাদি উপকরণ প্রাপ্তি, ঔষধছলে বিষ প্রয়োগ প্রভৃতি নানা-প্রকার ছিল প্রযুক্ত দোষেব উদ্ভাবন করিয়া ছুট লোকদের সর্বস্ব হরণ করাইয়া রাজা অর্থকৃষ্ণ-সময়ে কোষসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রের কার্য-বশতঃ এইরূপ অন্যায্য রীতিদ্বারা অর্থসংগ্রহ অনেকই সমর্থন করিতে পাবেন। মহাভারতের একস্থানে উল্লিখিত আছে—“ন কোশঃ শুদ্ধশৌচেন ন নৃশংসেন জাতুচিৎ। মধ্যমং পদমাস্থায় কোশ-সংগ্রহণং চরেৎ।” সুতরাং কেবল পবিত্র উপায়ে সর্বদা কোষসঞ্চয় সম্ভাবিত নহে। শুক্রাচার্যের মতেও বিপদ উপস্থিত হইলে রাজা দণ্ডলঙ্ক ও ভূমিলঙ্ক করের ও বাণিজ্যলঙ্ক শুকেব বুদ্ধিদ্বারা অর্থাগমের উপায় করিয়া লইতে পারিতেন; এমন-কি তীর্থভূমি ও দেবদর্শনজনিত কর ও গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাই

তিনি লিখিয়াছেন—“দণ্ডভূতাপ শুদ্ধানামাধিক্যাৎ তৌশ-বর্দ্ধনম্। অনাপদি ন কুর্কীত তীর্থদেবকরগ্রহাৎ॥” শত্রুর বিনাশ জন্ত সৈন্য সংরক্ষণে উদ্যত নৃপতির বিশিষ্ট দণ্ড ও শুদ্ধাদির গ্রহণ তিনি অল্পমোদন করেন।

রাজকোষ-সম্পর্কীয় রাজকর্মচারী—সম্মিধাতা সমাহর্তা প্রভৃতি

রাজকোষ-সম্পর্কীয় বাজতৃত্যগণের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন “সম্মিধাতা”। কোষে প্রবেশ্য সর্ববিধি দ্রব্য ও নগদ টাকা তিনি সম্যগ্ভাবে নিধান করেন বলিয়া তাহাব নাম “সম্মিধাতা।” নানা শ্রেণীর নিম্নস্থ কর্মচারী মহায়-রূপে লইয়া নিচব কর্ম অর্থাৎ দ্রব্য-হিরণ্যরূপ রাজস্ব সংগ্রহ করাই তাহার কাজ ছিল। তিনি অষ্টাদশ “তারের” একতম,—মহামাত্য বা মহামাত্র পর্যায়-ভূক্ত রাজ-কর্মচারী। ইংবেজীতে তাঁহাকে “Chancellor of the Exchequer” বলা যাইতে পারে। রাজার কোষ-গৃহ (স্বর্গবস্ত্রাদি নিধানস্থান) পণ্যগৃহ (বিক্রয় দ্রব্য সন্নিবেশ স্থান), কোষ্ঠাগার (উদরোপযোগী তৈল-স্বতাদি-নিষ্কেন-স্থান) কুপ্যগৃহ (সারদাক্ষ বেণু প্রভৃতি রক্ষণস্থান), আয়ুধাগার ও বস্ত্রনাগার এই ছয়টি বিভাগের উপর অব্যক্ষণ-ভার তাঁহার উপর সমর্পিত থাকিত। সুতরাং কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি ছয়টি অধ্যক্ষের উপরেও তাঁহা অধি-কার বিস্তৃত ছিল। তাঁহাকে রূপ-দর্শকের পরীক্ষিত রত্ন ও হিরণ্য এবং মাপ-বিষয়ে অনুম ও নূতন ধাতু, পণ্য, কুপ্য ও আয়ুধ সংগ্রহ করিতে হইত। এই ধনেব আহরণ ব্যাপারে কোনও প্রকারের বিপর্যায় ঘটিলে তিনি অপরাধীকে দণ্ড-বিধি আইনঅনুসারে দণ্ড দেওয়াইতে পারিতেন। সম্মিধাতার আরও একটি চমৎকার কর্তব্য ছিল। বিগত এক শত বৎসরের জনপদোখিত ও নগরোখিত আয়ের হিসাব তাঁহাকে জানিয়া রাখিতে হইত। জিজ্ঞাসা মাত্র তাহা তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন। কোষের ব্যয়িতাবশিষ্ট (balance) তাঁহার জানা থাকা চাই।

নানাতাবে উৎপন্ন রাজস্বের পারিভাষিক নাম সমুদয় (Revenue)। এই সমুদয়ের প্রবর্তনকাৰী উচ্চপদস্থ মহামাত্যের নাম সমাহর্তা। জুর্গাদি পূর্বোক্তাধিত সাতটি

ধনাগম স্থানের অধিপতিরূপে তিনি কাজ করিতেন। রাজবিধি অনুসারে প্রাপ্য ষাবতীয় রাজস্বের সমাহরণ-কার্য এই অমাত্যের উপর ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার এক-মাত্র লক্ষ্য থাকিত কেমন করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। তদ্বিপরীত কিছু হইলে তাহার প্রত্যেক-চেষ্টাও তাহার কর্তব্য। প্রত্যেক জনপদের চতুর্ভাগের উপর স্থানীক নামক যে রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাহার অধীনস্থ হইয়া দশগ্রামাধিপতি বা পঞ্চগ্রামাধিপতিরূপে গোপনামক রাজ-পুরুষ কার্য করিতেন তাহারা সকলেই এই সমাহর্তার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রাজাদের কর-শুল্কাদি সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু দুর্গ বা নগরের স্থানীক ও গোপগণ সমাহর্তার তত্ত্বাবধানে না থাকিয়া নাগরিকের (City-governor) অধীন থাকিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। নগরের গোপগণের অধিকার স্থান-বিশেষে দশকূল, বিংশতিকূল অথবা চত্বারিংশৎ কুলের উপর বিস্তৃত। সে ঘাটা হউক,—কোন গ্রাম বা কূল হইতে রাজার কি পরিমাণ খাজ, পশু, হিরণ্য কুপ্য ও বিষ্টি উথিত হয়, কোন গ্রাম বা কূল পরিহার (কর-মুক্তি) ভোগ করে, কোন গ্রাম বা কূল সৈন্য-বিভাগের জ্ঞাত কত লোক যোগাইয়া দেয়, কোন গ্রাম বা কূলেব সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নানাবিধ শস্তাদির উৎপত্তি জন্ম কোন গ্রামে কত প্রকার ক্ষেত্র আছে, কোথায় কতটি কর্কক, গোরক্ষক, বণিক, কারুকব, কর্মকর ও দাস আছে, এবং কত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্ত আছে, প্রত্যেক বাড়ীতে কত সংখ্যায় কুলপুরুষ ও কুলস্ত্রী আছে এবং তন্মধ্যে কাহার কত বয়স, ব্যবসায় ও চরিত্র, কাহার ক্ষিরূপ জীবিকা দ্বারা কত আয় ও কুটুম্ব ভরণের জন্ত কাহার কত ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলি এই কর্মচারিগণ নিবন্ধ-পুস্তকে (record) লিখাইয়া রাখিতেন। নিয়মিত ভাগধেয় ও শুল্কাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে সমাহর্তা প্রদেষ্টা-পুরুষদের সহায়তা লইয়া প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে পারিতেন। অর্থ লোভে রাজকর্মচারিগণ রাজ্যাব প্রাপ্য অর্থের কোনরূপ ক্ষয় ঘটাইয়া দেন এবং প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন না করেন ভঙ্কজ সমাহর্তগণ নানা-ব্যাঞ্জন-গুঢ় পুরুষদের সাহায্য লইয়া কাজ করিতে পারিতেন।

গাণপিক প্রভৃতি হিসাব রক্ষকগণ

প্রত্যেক বিভাগীয় অধ্যক্ষকে তাঁহার অধীনস্থ কার্মিক কারণিক প্রভৃতি কর্মচারী দ্বারা ষথা-সময়ে নিজ বিভাগের সর্বপ্রকার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিবন্ধ-পুস্তকে লিখাইয়া লইতে হইত এবং বৎসরে নির্দিষ্ট সময়ে তাহা অক্ষপটলে (record office) গণনানিযুক্ত রাজপুরুষদের (গাণনিকদের) উদ্ধতন কর্মচারী মহাক্ষপটলিকের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইত। ষথাসময়ে হিসাব না দিতে পারিলে কার্যের প্রকার-ভেদে অধ্যক্ষগণের বিভাগীয় হিসাব-রক্ষকগণকে হিসাব প্রস্তুত করিবার জ্ঞাত অতিরিক্ত সময় লইয়াও দিতে পারা যাইত। হিসাবে তুল-ভ্রান্তি লক্ষিত হইলে তাঁহাদিগকে, এমন-কি, তাঁহাদের অধ্যক্ষকেও দণ্ডভোগ করিতে হইত এবং রাজ-সরকারের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহাদিগকে তাহা ষথানিয়মে পূরণ করিয়া দিতে হইত।

রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয়ের মূল ক্ষমতা কাহাতে পর্য্যবসিত?

রাজকোষ হইতে প্রয়োজনীয় কার্যে অর্থ ব্যয় করার জ্ঞাত মূল দায়িত্ব কাহার ছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হইতে পারে। বর্তমান সময়ে রাজস্ব-সচিব (Finance Member) প্রধানতঃ রাজস্ব কমিটির (Finance Committee) সহায়ে এই ব্যাপারে দায়ী ও ক্ষমতাবান এবং প্রজার যোগক্ষেমবহ কার্যাবলীতে অর্থ-ব্যয়ের অর্থ নির্দেশ তিনিই করিয়া দিতে পাবেন গত্য, কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণের অহুমোদন ও সমর্থন না পাইলে অনেক বিষয়ে তিনি সেই প্রচ করিয়া বা করাইয়া লইতে পারেন না। তারপর শাসন-কর্তাদের যে অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, তদ্বারা তাঁহারা সর্বপ্রকার আয়-ব্যয়ই সিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। প্রাচীন কালেও দেখা যায় যে, নূতন দুর্গ-নগর-জনপদ-নিবেশ, নূতন ক্ষেত্রাদির আবাদ, কি সন্ধি-বিগ্রহাদিরূপ ব্যয়বহুল ক্রিয়াকলাপে তজ্জ্ঞাত তৎসদ-বিভাগীয় সরকারী অধ্যক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সমিধাত্ম-নামক যে প্রধান অমাত্যের কথা এই মাত্র বলা হইয়াছে, তিনি না হয় রাজকোষ হইতে প্রয়োজনাথ অর্থ বাহির করিয়া দিলেন,

কিন্তু কোষসম্বন্ধীয় আয়ব্যয়ব্যাপারে মূল ক্ষমতা মন্ত্রী-পরিষদের হস্তেই পর্যাবসিত ছিল, কারণ রাজা মন্ত্রী-পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজকোষ-সম্বন্ধে কোন নীতিই অবলম্বন করিতে পারিতেন না। মহুর মতও এই বিষয়ে স্পষ্ট। তিনি বলেন (মহুরসংহিতা, ৭।৫৬ ইত্যাদি) সমুদয়-নিরূপণ (রাজস্ব-নিরূপণ) ও লক্ষ-প্রশমন অর্থাৎ লক্ষকোষের সংকার্যে বিনিয়োগ এই উভয় কার্যে রাজা সচিবগণের সহিত চিন্তা-পরামর্শ করিবেন। তদীয় অর্থশাস্ত্রে রাজতন্ত্র রাজ্যেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া মহামতি কোটিল্য পূর্বাচার্যদিগের মত উত্থাপন করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে-সমস্ত গুরুতর বিষয়ের ক্ষমতা রাজাকে অমাত্যবর্গের পরামর্শের উপরই নির্ভর করিতে হইত তন্মধ্যে রাজ্যের আয়-ব্যয় কৰ্ম একতম। সুতরাং প্রাচীন কালে করাদি-দ্বারা রাজকোষে হিরণ্যাদির উৎপাদন ও উৎপাদিত হিরণ্যাদির প্রয়োজনীয় কার্যে বিনিয়োগ এই উভয় কার্যই মন্ত্রী-পরিষদের উপরই মূলতঃ অর্পিত ও পর্যাবসিত ছিল। অল্প ভাবে দেখিতে গেলে ইহাও বলা যায় যে, রাজস্ব সেকালে প্রজার আয়ত ছিল, কারণ রাজা অত্যুৎপীড়ক হইলে প্রজাবর্গ রাজস্বের কররূপ ভূতি বদ্ধ করিয়া দিয়া নূতন রাজ নির্বাচনের উদ্যোগী হইয়া উঠিত। প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহার

উপসংহারে এই বলা যাইতে পারে যে, পূর্বকালের

ভাবতীয় নৃপতিগণ রাজকোষ কি প্রকারে রাজপুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষিত হইতে পারে, কি উপায়ে রাজ-প্রাপ্য শস্ত ও পণ্য-সম্পৎ বৃদ্ধি পায়, কিসে দৈব-জ্ঞানিত উপসর্গাদি নিবারিত থাকে, কিসে পরিহার-ভূমির হ্রাস পায়, কি রকমে বা নগদ মুদ্রার সঞ্চয় ঘটে ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা অবহিত থাকিতেন এবং কোন নিযুক্ত রাজভৃত্য রাজকোষস্থিত ধন-সম্পত্তি গোপনে নিজলাভের লোভে বৃদ্ধি বা হ্রদে প্রয়োগ না করেন, রাজ-পণ্য দ্বারা নিজে বাণিজ্য ব্যবসায় না করেন, উৎকোচাদি লোভে আদায়ের নিয়মিত সময়ে রাজস্ব আদায় না করেন, নির্দিষ্ট আয়ের পরিহানি না ঘটান ও ব্যয়বৃদ্ধি না করেন, অথবা রাজ-দ্রব্যের ভোগ স্বয়ং না করেন, রাজ্যের প্রাপ্য উত্তম দ্রব্যাদির পরিবর্তে রাজকোষের জন্ত অসার বস্তু গ্রহণ না করেন, কিম্বা উৎপন্ন সম্পূর্ণ আয় নিবদ্ধ-পুস্তকে আবে-পিত না করেন বা পুস্তকারোপিত ব্যয় জন্ত চিহ্নিত তথ্য খরচ করিতে না দেন এবং আয়-ব্যয়ের পর অবশিষ্ট নীচী নামক শুদ্ধ আয় রাজকোষে প্রবেশ না করেন তৎপ্রতিও তাঁহারা সর্বদা জাগ্রত থাকিতেন। যেখানে প্রজার মধ্যে সর্ববিষয়ে সভ্যতা প্রবিষ্ট, যেখানে জাতির বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানিত গৌরব অক্ষুণ্ণ—সেখানে, কি প্রাচীনকালে, কি মধ্যযুগে, কি বর্তমানে সর্ব সময়েই রাজগণকে প্রায় একই উদ্দেশ্যে—প্রজার হিতের জন্তই—রাজ্য পরিচালন করিতে হইয়াছে ও হয়, তবে বিভিন্ন, সময়ের কার্য-প্রণালীর পার্থক্য মাত্র লক্ষিত হয়—এই বিশেষ।

চণ্ডীদাস-গণ

শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু

প্রাচীন কবিগণের ভণিতা পর্যালোচনা করিলে, নানা-প্রকার গরমিলের মধ্যেও, অনেক কবির ভণিতা দেখায় যে এক-একটা নির্দিষ্ট ধারা ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। যেমন কাশীরাম দাসের বিশেষত্ব ছিল এই যে,

তিনি “অমৃত-সমান মহাভারতের কথা গুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে” শুনাইয়াছেন। কৃত্তিবাস নিজেকে “গণিত” “বিচক্ষণ” প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন, যাদবর বসু “গুণরাজ ধান”—ভণিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন;

ইহা ব্যতীত শিবের গানে কালিদাস, মনসামঙ্গলে বংশীদাস, চণ্ডীকাব্যে কমললোচন ও মাধবানন্দ, ধর্মরাজের গীতে ঘনরাম, মহাভারতে অভিরাম প্রভৃতি কবিগণ—সাধারণতঃ “দ্বিজ” আখ্যায় নিজেদের বিভূষিত করিয়াছেন ; ধর্মমঙ্গলে রামাই পণ্ডিত, শিবায়নে রামেশ্বর, মনসামঙ্গলে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত মহাভারতে সঞ্জয়, ভাগবতে নরহরি প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ নিজ নিজ নামের সঙ্গে কোন বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একই কবি একাধিক নির্দিষ্ট প্রধায় নিজেদের ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন, শিবায়নে রামকৃষ্ণদেব নিজেদের রামকৃষ্ণদাস ও কবীচন্দ্র উভয়রূপেই ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন ; সেইরূপ আমরা একই পুথিতে কেতকা দাস ও ক্ষেয়ানন্দের ভণিতা পাইতেছি ; চণ্ডীকাব্যে “কবিকঙ্কন” ও “মুকুন্দ” এই উভয় প্রকার ভণিতার বিশিষ্টতাই অধিক। কিন্তু এইরূপ নানা-প্রকার বিভিন্নতার মধ্যেও প্রত্যেক কবির এক-একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা কষ্টকর হয় না।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে এইরূপ বিশিষ্টতা আরও স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

এইরূপ ভণিতা চরিতামৃতের সর্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্য ভাগবতের ভণিতা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জ্ঞান।

বৃন্দাবন দাস তছু পরমুগে গান ॥

চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতা দিয়াছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য-প্রদায়-পদ-দ্বন্দ্ব।

আদিপঞ্চ জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

লোচনদাস সর্বত্রই তাঁহার গুরু নবহরির উল্লেখ করিয়াছেন যেমন,—

শ্রীনরহরিন্দাস—পদ করি আশ

লোচনদাস গুণ গায়। ইত্যাদি।

কর্ণানন্দে যদুনন্দনদাস আচার্য্য প্রভুর কছা হেমলতার উল্লেখ করিয়া ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রী আচার্য্য প্রভুর কছা শ্রীল হেমলতা।

প্রেম-কল্পবটী কিবা নিরমল ধাতা ॥

সে ছই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।

কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

এইরূপ ভণিতার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কোন প্রকার পালাগানে, অথবা কাব্যে, যেখানে একটা আখ্যায়িকা লইয়া ধারাবাহিক রচনা আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে কোন কোন পদ বা অধ্যায়ের অন্তে কোন ভণিতা অথবা ভণিতার বিশিষ্টতার নিদর্শন না থাকিলেও, সেই সেই পদ বা অধ্যায় যে ঐ পালা বা কাব্য রচয়িতার রচনা তাহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না। কিন্তু বৃহৎ পদাবলী সাহিত্যেব অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের প্রকৃত রচয়িতার সম্বন্ধে স্থির ধারণা করিবার জন্য আমরা প্রথমের ভণিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। যাহারা পদাবলী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানেন যে, ইহাতে কত গলদ চুকিয়াছে। এক কবির পদ অল্প কবির ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে, কোন কোন অর্ধাচীন লেখক স্বরচিত পদ ইচ্ছা করিয়া অন্তের ভণিতায় ঢালিয়াছেন, কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য যে ভাবে বৈষ্ণব মহাজনগণের মন্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইসকল আবর্জনার মধ্যেও প্রকৃত সত্য খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যে-সকল পুত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি, ভণিতা পর্য্যবেক্ষণ তাহাদের অত্যন্তম। মনে করুন, কোন রচনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নামে চলিয়া যাইতেছে; যদি তাহাতে রূপরঘুনাথের উল্লেখ করা ভণিতার দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা সাধারণতঃ এই ধারণা করিতে পারি যে, ঐ রচনা সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই হইবে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কেবল এই প্রকার ভণিতা দেখিয়াই আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে পারি না; কারণ অনেক ভণিতার মধ্যে যে জুয়াচুরি আছে তাহাও আমরা বলিয়াছি। তবে ভণিতা দ্বারা যে একটা প্রাথমিক ধারণা হইতে পারে তাহাতে অসুভাষ্য সন্দেহ নাই—; তৎপর অসুভাষ্য বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এইরূপ ভণিতার কষ্টপাথবে ঘসিয়া পদাবলীর মধ্যে প্রকৃত চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় কি না আজ আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৮৬ ও ৮১৫ সংখ্যক পদে আমরা আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাই, ২২১, ৬৮৩ সংখ্যক পদে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে; ২, ২৭, ৩০ প্রভৃতি সংখ্যক অনেক পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়; ২৭৩, ৪৬১ প্রভৃতি সংখ্যক বহুপদে আবাব দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে; ৪৮৩, ৫২২ সংখ্যক পদে দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে; ১ এবং ৬২৬ সংখ্যক পদে দীন হীন চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত। ইহা ব্যতীত বাহুলীপূজক চণ্ডীদাস, বড় চণ্ডীদাস, ও শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পদের সংখ্যাও অনেক। অতএব আমরা আদি চণ্ডীদাস, বড় চণ্ডীদাস, বাহুলীগণের চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস, দীনহীন চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, ও শুধু চণ্ডীদাস উল্লেখ করা ভণিতা পাইতেছি। এখন দেখা যাউক, চণ্ডীদাসের রচিত কোন পুস্তকে ভণিতার কোন নির্দিষ্ট ধারা পাওয়া যায় কিনা।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতা দৃষ্ট হয়—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাঞ।
অথবা, গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী-গণে।
অথবা, বাসলী চরণ শিরে বন্দী।
গাইল বড় চণ্ডীদাসে।

উক্ত গ্রন্থে ৪১৫টি পদ আছে তাহার একটি পদেও দ্বিজ, দীন, দীনহীন, আদি, কবি প্রভৃতি বিশেষণ-যুক্ত ভণিতা পাওয়া যায় না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই বাহুলীগণের বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট ধারা ছিল। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আমরা এই একটি আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইতেছি, অতএব আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব। উক্ত ভণিতা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, বাহুলীগণের চণ্ডীদাস ও বড় চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ বড় চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক ছিলেন, এবং তিনি নিজেকে বাসলীগণের চণ্ডীদাস রূপে ভণিতায় প্রচার করিয়াছেন। যেহেতু কৃষ্ণকীর্তনের একটি পদেও দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিশেষণ-যুক্ত ভণিতা পাওয়া যায় না, অতএব আমরা বলিতে পারি যে, বড় চণ্ডীদাস

এইসকল আখ্যায় কখনও নিজেকে প্রচার করেন নাই। কাজেই এই ভণিতা-সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রভৃতি বড় চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। আমাদের এই প্রাথমিক ধারণা কতদূর সত্য, এখন তাহাই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব।

যে দুইটি পদে আমরা আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাইতেছি সেই দুইটি পদই হৈয়ালীর মত। কিন্তু যখন আদি চণ্ডীদাস বলিয়া ভণিতা আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটি পদের একটিও আদি চণ্ডীদাসের রচিত নয়, —সেই আদি চণ্ডীদাস যিনিই হন না কেন, তিনি এই পদদ্বয় রচনা করেন নাই। কারণ তাঁহার সময়ে নিজেকে “আদি” আখ্যায় প্রচার করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। “আদি” শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যখন এই পদদ্বয় রচিত হইয়াছিল, তখন একাধিক চণ্ডীদাসের প্রচার হইয়াছে; তাই এই আদি আখ্যায় দ্বারা কোন একজন চণ্ডীদাসকে বুঝান হইয়াছে, যিনি অন্যান্য চণ্ডীদাসের পূর্ববর্তী। কোন তার্কিক হয়ত বলিতে পারেন যে, আদি চণ্ডীদাসের সময়েই যদি অন্যান্য চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদি চণ্ডীদাসের এইরূপ ভণিতা প্রদানের সার্বকতা অসম্ভব করা যায়। আমরা বলিব যে, এই অসম্ভবও প্রমাণ-বিরুদ্ধ; কারণ চরিত্রানুসারে যে ভাবে রামানন্দ রায় ও বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে একজন চণ্ডীদাসের কথাই মাত্র জানা যায়; বিশেষতঃ এমন কোন রচনা এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই যাহাতে একই সময় একাধিক চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন, এমন কথা আমরা জানিতে পারি। আর এই আদি চণ্ডীদাসের রচিত কেবল মাত্র দুইটি পদই যখন আমরা পাইতেছি, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দুই পদের চণ্ডীদাস হইতে অন্যান্য চণ্ডীদাসকে এইভাবে পৃথক করিবার কোনই দরকার ছিল না, কারণ এই দুইটি পদের সাধারণ বিশেষত্ব বিছুই নাই, তাহাদের লোপেও পদ-সমূহের কোন বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই দুইটি পদ এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল যখন একাধিক চণ্ডীদাস প্রতিষ্ঠা

অর্জন করিয়াছিলেন, এবং ইহা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের কবির দ্বারা রচিত, যে সম্প্রদায়ের সাধনার আভাস আমরা এই দুই পদে কিছু কিছু পাইতেছি। সেই কবি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্র এই দুই পদ চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছেন; কিন্তু আদি চণ্ডীদাসের স্বক্ষে এই রচনার ভার চাপাইলে বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অধিকতর সুবিধা হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অন্ত্যস্ত চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া একেবারে সেই আদিগুরুর অন্তরালেই আশ্রয়গোপন করিয়াছেন। সাহিত্যের বাজারে ইহা দিনে-ডাকাতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে এই দুইটি পদ বাদ দেওয়া সঙ্গত, কারণ তাহা কোন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই বিশ্বাস করা যায় না। এবং আদি চণ্ডীদাস বলিয়া যে কোন চণ্ডীদাস প্রচারিত হইয়াছিলেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রায় একশত পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। উক্ত পদাবলীতে ৮০০টি পদ আছে, তাহার মধ্যে যখন প্রায় ১০০ পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দ্বিজ চণ্ডীদাসকে দুই কথায় বিদায় দেওয়া চলে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকীর্তনের একটি পদেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা না পাওয়াতে আমাদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছে যে, বড়ু চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাস নহে। বাসুলী-সেবক চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি রামী ধোবানীর সহিত সহজিয়া সাধনা করিতেন; চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই রামী ধোবানীকে উল্লেখ করা সহজিয়া সাধনার অনেক পদও চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। এইসকল প্রমাণের উপরে যদি আমরা নির্ভর করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, বাসুলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস একজন সহজিয়া সাধক ছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, সহজিয়ারা জাতিভেদ মানে না, অতএব সহজিয়া চণ্ডীদাসের নিকট দ্বিজ আখ্যার কোন বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে না। কাণ্ডেই যে চণ্ডীদাস দ্বিজ বলিয়া নিজের আভিজাত্য প্রচার করিয়াছেন, তিনি কখনই সহজিয়া-পন্থী ছিলেন না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি অবলম্বন

করিয়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাসুলী-পূজক বড়ু চণ্ডীদাস দ্বিজচণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কৃষ্ণকীর্তনে কি এইরূপ একটি পদেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায় না? সাহিত্যসেবীমাত্রকেই আমরা এই বিষয়টি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিবার আছে। পদাবলীর হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি আমরা অমূল্যমান করিয়া দেখিয়াছি যে, ভ্রাতৃহাতে এমন অনেক পদ আছে যাহা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা-সমষ্টিত হইয়া স্থান পাইয়াছে। দুই একটি এই প্রকার পদ আমরা এই স্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯৪ নম্বরের পুঁথির প্রথম পদটি নিম্নলিখিত আকারে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

সে, কি আজু দেখিছ রঙ্গ ।
আজু গিয়াছিছ জোমুনা সিনানে
দুই চারি সখি সঙ্গ ॥
একে কাল দেহ বসন ভূষণ
চূড়াটি টালিএ বামে ।
হেরষ অরুণ তাহে রারগিত
বেড়িয়া কুহর দামে ॥
তার মাঝ দিয়া মউরের পাখা -
হেলিছে ছলিচে বায় ।
ভ্রমর রবির শুতার তরঙ্গ
লহরি তেমতি প্রায় ॥
তাহে সসধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরচনা ।
তাহার সৌরভ পায়্যা অলিকুল
তাহে করে মানাপনা ॥
... ..
এতদিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি না শুনি কানে ॥
এমন হুরতি গড়ে কোন বিধি
দিন চণ্ডীদাসে ভণে ॥

কিন্তু পরিষদ হইতে প্রকাশিত পদাবলীর ৫৬ নম্বরের পদটি প্রায় এইরূপ আকারেই আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাইতেছি। উক্ত ২৩৯৪ নম্বরের পুঁথির ষষ্ঠ পদটি দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়; কিন্তু পদাবলীর ২৬৯ নম্বরের পদে তাহাই সামান্ত পরিবর্তনের

সহিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উল্লিখিত আছে। এই-সকল ঘটনা দৃষ্টে আমাদের ইহাও সন্দেহ হয় যে, দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পরি-বর্তিত হইয়াছে। কাজেই এই দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অল্পসন্ধান না করিয়া আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের রচিত একখানা গীতি-কাব্যের ২১ পত্র সংগৃহীত আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছি, এবং তাহা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইস্থানে ঐ কাব্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল। তাহাতে প্রায় ৬০টি পদ আমরা পাইয়াছি। ঐ ২১ পত্রের মধ্যে ৭৫০ নম্বরের পত্রে ২০০১ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, এই দীন চণ্ডীদাসের একমাত্র এই কাব্য-খানিতেই যত পদ আছে, তাহা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে প্রকাশিত পদাবলীর সংখ্যার প্রায় সমান। উক্ত ৬০টি পদের মধ্যে কয়েকটি পদে “দীন চণ্ডীদাস” “দীনধিন চণ্ডীদাসের” ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু “বড় চণ্ডীদাস” কি “দ্বিজ চণ্ডীদাস,” ভণিতায়ুক্ত পদ, একটিও পাওয়া যায় না, এবং কোথাও বাসলীর নাম উল্লেখ করা ভণিতা নাই। এই-সকল কারণে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দীন চণ্ডীদাস বাসলীগণের বড় চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। নরোত্তম বিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের চণ্ডীদাস নামে এক শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সৰ্বগুণে।

পাণ্ডিত্য খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতি দীনে ॥

এই চণ্ডীদাসই যদি দীন চণ্ডীদাস হন, তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, বড় চণ্ডীদাসের অনেক পরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পদগুলি পাঠ করিয়াও আমাদের এই ধারণা হয় যে, তিনি পরবর্তী কালেই লোক। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস যিনিই হউন না কেন, তিনি যে শক্তিশালী লেখক ছিলেন তাহাতে অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই। যে ৬০টি পদ আমরা পাইতেছি, তাহার একটি

পদ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজ-দেবীগণ রাস উৎসবে যোগদান করিবার জন্য যে ভাবে ছুটিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা পদাবলীর ৩৯৩ নম্বরের পদে এই ভাবে রহিয়াছে—

কেহ বা আছিল দুহু আবর্তনে

চুলাতে রাখি বেশালি।

তাজি আবর্তন হই আগমান

এখন সে গেল চলি ॥

কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিবে

দুহু করায় পান।

শিশু ফেলি ভ্রমে চলি গেল ভ্রমে

স্তনি মুবলীর গান ॥ ইত্যাদি

প্রায় এইরূপেই এই পদটি আমাদের দীন চণ্ডীদাসের পুথিতে পাইতেছি। ইহাতে এই সন্দেহটাই আমাদের মনে উঠিতেছে, যে, দীন চণ্ডীদাসের পদ হইয়াই দ্বিজ চণ্ডীদাসের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কবির দুই হাজারের বেশী পদের সন্ধান আমরা একখানা পুথিতেই পাইতেছি, তাহার সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইলে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের স্থমীমাংসা হইবে। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আরও একটা শেষ কথা আমরা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি। অনন্ত-প্রায় পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে আমরা দ্বিজ ভণিতার কবি প্রায় পাইতেছি না। বৈষ্ণব কবিগণের প্রচলিত ভণিতা “দীন হীন” “অধম” “মূৰ্খ” দাসামুদাস” ইত্যাদি। এইরূপ বিনয়ের সহিতই বৈষ্ণব কবিগণ নিজকে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন বড় কবিই নিজকে “দ্বিজ” আখ্যায় বিভূষিত করেন নাই। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ধর্মের স্রোত যে-ভাবে বঙ্গদেশকে প্রাবিত করিয়াছিল, তাহাতে গা ভাসাইয়া যে ব্যক্তি “দ্বিজ” আখ্যা লইয়া গৌরব অলুভব করিতে পারে, সে কবিও নহে, বৈষ্ণবও নহে, ইহা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে। তবে কিনা “দ্বিজ মাধব” “দ্বিজ ভীম” “দ্বিজ জামাদাস” প্রভৃতি গুটিকতক নগণ্য কবির দুই একটি বৈষ্ণব পদ আছে, তাহা জানা যায়। ইহারা কেহই দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা ব্রহ্মচর্যধর্মের গভীর মধ্যে থাকিয়াই দুই একটি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন

বলিয়া মনে হয়। এইসকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অনেকে “বড়ু” ও “দ্বিজ” একার্থবোধক বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের অনেক পূর্বে বর্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে জয়দেবেরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন। সেই সময়ে “বড়ু” কি অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই; আর সেই চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আমরা প্রায় অজ্ঞই রহিয়াছি। অতএব সেই “বড়ু” শব্দ লইয়া আমরা এখানে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তথাপি সত্য নির্ধারণের জন্ত আমরা বলিতেছি যে, যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, চৈতন্যদেবের পরবর্তী কোন বৈষ্ণব কবি “দ্বিজ” ভণিতায় নিজকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য রহিলাম।

কবি চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে পরিষদ সংস্করণের পদাবলীর ২২১ ও ৩৮৩ নং পদে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এই ২২১ নং পদটি পদকল্পতরু (পরিষদ সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৫-৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২২২ নং পুথির ৪৭ সংখ্যক, ২২৮ নং পুথির ২১ সংখ্যক, এবং ৩৩০০ নং পুথির ৪৫ সংখ্যক পদেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এইসকল পুস্তকে শেষ চরণ

চুইটির কি কি বিভিন্ন পাঠ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বিষ খাইলে দেহ ঘাইবে, রব রহিবে দেশে।
বাগলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে ॥

পঃসং

বিষ খাইলে দেহ ঘাবে, রব রবে দেশে।
বাগলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

তঙ্গ।

বিষ খাইলে দেহ ঘাবে, রব রহিবে দেশে।
কলঙ্ক ঘুঘিষ লোকে নিশেধিল চণ্ডীদাসে ॥

বি পু ২৯২

বিষ খাইলে দেহ জাবে বব রৈব দেশে।
বাগলি আদেশে কহিব, কহে চণ্ডীদাসে ॥

বি পু ২৯৮

বিস খাইলে দেহ জাবে, রব রহিবে দেশে।
বাগলি আদেশ কবি কহে চণ্ডীদাসে ॥

বি পু ৩০০

এই পাঁচখানা পুথির তিন খানাতে “কবি” ভণিতা পাওয়া যায় না। ৩৮৩ নং পদেও “কবি চণ্ডীদাসের” ভণিতা নাই, কেবল পাঠান্তরে আছে। অতএব আমরা “কবি চণ্ডীদাসের” অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করি।

অধুনা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি। আদি ও কবি চণ্ডীদাসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি। “দীন চণ্ডীদাস” “দীনহীন চণ্ডীদাস” “দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস” ইহা একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা, এবং এই দীন চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্তী কালের লোক। দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব নাই, দীন চণ্ডীদাসের পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিতেছে।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ *

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আজকাল আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বিষয়

* The Origin and Development of the Bengali Language : by Suniti Kumar Chatterji, M. A. (Calcutta), D. Lit. (London), Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics and Lecturer in English and Comparative Philology in the University of Calcutta, in Two Parts, Part I, Introduction, Phonology; Part II, Morphology. Calcutta University, Pp. xci+1179; Rs. Twenty.

বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে পশ্চিমের পণ্ডিতগণের দিকে না তাকাইলে উপায় নাই। ভাষা বা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশী খাটে। ভারতবর্ষের পাহাড়-পর্বতেও কোথায় কোন জাতির কি ভাষা এবং তাহা কেনন কি, এ তত্ত্ব ভারতবাসী অল্পই আলোচনা করিয়াছেন; বাহারা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু করিয়াছেন তাঁহারা পশ্চিম দেশের। বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও মানবজাতির তত্ত্বসংগ্রহে অসাধারণ অমুরাগ থাকায় তাঁহারা যে যত পারিয়াছেন অদ্ভুত অধ্যবসায়

ও পরিভ্রমে আমাদের নিজেরই ভাষা-বিভাবার বহু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া মাথা হেঁট করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রিগ্যানন, বীমস, হরনগে, জুল-ব্লক প্রভৃতি বাহ্য করিয়াছেন তাহার তুলনায় ভারতবাসীর কার্য অতিসামান্য—যদিও রবীন্দ্রনাথ, ভাটভারকর, রামেন্দ্রচন্দ্র, ও যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি কতক-কতক উপদেশ তত্ত্ব আমাদের দিয়াছেন। বাহাই হটক, বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনো ভারতীয় ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত বা সমর্থ হইয়াছেন এমন কোনো ভারতবাসীকে ইহার পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায় নাই। অধ্যাপক ত্রীমুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নামে পুস্তকখানি রচনা করিয়া কেবল বঙ্গভাষার নহে, সমগ্র ভারতবাসীরই ঐ কলঙ্ক দূর করিয়া মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানি নির্দেশ করিয়া আমি আমার পক্ষের সহিত বলিতে পারিব যে, কিরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাকরণ রচনা করিতে হয় ভাবতবাসী তাহা জানে।

গ্রন্থকার অতি যুক্তিযুক্ত-ভাবেই প্রথমে পঞ্চপ্রদর্শক পূর্ববর্তী ঋষি-পঞ্চকে ধরেই ভাষার নমস্কাব করিয়া নিজের আরাধ্যাকে আবিভূত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আর তাঁহার প্রতিপাদনীয় যে বাবু তাঁহার নক্ষকে নিরন্তরকার বাস্তব মত একটি ঋক্ তুলিয়া বলিয়াছেন যে, কেহ ইঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও শুনিতে পায় না; আবার কাহারো নিকটে নিজেই ইনি নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। মূল ঋক্টি অতি চমৎকার। পাঠকগণ নিজেই ইহার বাদ্য অলুপ করুন :—

উত স্বঃ পঞ্চম্ ন দর্শন বাচম্
উত স্বঃ শৃণ্ব ন শৃণোত্যোনাম্ ।
উতো ঋতম্ তদ্বং বি সশ্রে
জায়েব পত্যো উশতী হুবাশাঃ ।

বঙ্গবাক্য যে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের নিকটে নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এই ব্যাকরণের পাঠককে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই গ্রন্থখানি প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত—ভূমিকা, ধ্বনিপ্রক্রিয়া (Phonology), ও রূপপ্রক্রিয়া (Morphology)। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বাহ্য কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাঠকের জ্ঞাতব্য হইতে পারে গ্রন্থকার তাহা পূর্ব-শব্দিকের পণ্ডিতগণের মতামত পর্যালোচনা করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভূমিকা দেখাইয়াছেন। ভূমিকার পাঁচটি পরিশিষ্ট আছে। গ্রিগ্যানন সাহেব ভারতের নব্য ভাষা ভাষাগুলির বর্ণাকরণ করিয়া কতকগুলিকে বাহ্যবর্গ (Outer Group) নাম দিয়া ভাগ করিয়াছেন। ইহার তন্মুখে তিনি যে-সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন গ্রন্থকার সে-সমস্তকে প্রথম পরিশিষ্টে অতি দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভারতীয় নব্য আধ্যাত্ম্যের সহিত দ্রাবিড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য আলোচনা করিয়া প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টির কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে দেখান হইয়াছে। ত্রয়োদশনসমূহে লক্ষ বঙ্গদেশের প্রাচীন স্থানগুলির নাম তৃতীয় পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে বঙ্গভাষার শব্দাবলীর (ভৎসন, অর্জ্ব তৎসম, তত্ত্ব, দেশী ও বিদেশী) আলোচনা। আর পঞ্চম পরিশিষ্টে বাঙালার বর্ণ ও বানানের আলোচনা। ধ্বনি-প্রক্রিয়া ও রূপপ্রক্রিয়ার আলোচনা ঐ নাম দুইটিই প্রকাশ করিতেছে। সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি তালিকাতেই ক্ষুদ্রাক্ষরে সূত্রিত ৯৯ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে। অতএব গ্রন্থকার কি কি আলোচনা করিয়াছেন ইহা বলা অপেক্ষা কি কি আলোচনা করেন নাই ইহাই বলা সহজ।

আমরা দেখিতেছি, বাঙালী ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ জানিতে হইলে বাহ্য কিছু জ্ঞাতব্য গ্রন্থকার তাহার কিছুই বার দেন নাই। সংক্ষেপে ও অদলোচনে বলিতে হইলে ইঁহাই বলিব, বর্তমান সমালোচক এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক নূতন কথা শিখিয়াছেন, গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য তিনি বহুদানে মুগ্ধ হইয়াছেন, বাঙালী ভাষা আলোচনার জন্য এই গ্রন্থখানি তাঁহার নিত্য সহচর হইয়া থাকিবে। পুস্তকখানির একটি স্তম্ভের ত্রুটি ত্রিভঙ্গরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আলোচিত বিষয়-সমূহের বর্ণনাক্রমে একটি বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া হয় নাই। পাঠককে এক্ষত্বে অত্যন্ত অহবিধা ভোগ করিতে হয়।

এই বিপুল গ্রন্থের প্রত্যেকটি কথার গ্রন্থকারের সহিত প্রত্যেক একমত হইবেন, ইহা আশা করা যায় না; আর অনৈক্য হইলেই যে, সেই-সেই স্থানে গ্রন্থকারেরই ত্রুটি, তাঁহার অনৈক্য হইতেছে তাঁহার নহে, ইহারও নিয়ম নাই। তবে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া ভাল, ইহাই মনে করিয়া নিম্নে দুই-একটা কথার উল্লেখ করিতেছি।

ধ্বনিপ্রক্রিয়া (পৃঃ ৩০২) উক্ত হইয়াছে মধ্যবর্তী ভারতীয় আধ্যাত্ম্যের অ অ বাঙালার ওকার-রঞ্জিত অ অথবা ও হয় আর আ অ হয় আ। যেমন, শ ত > শ অ > শ; ঘা ত > ঘা অ > ঘা। এ নিয়মটি একবারে টিক বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকারেরই উদাহরণ লওয়া যাউক। কা ল অথবা কা লো 'কৃষ্ণবর্ণ' < কা ল অ < কা ল ক কিন্তু কা লা? তিনি বলেন, * কা লা ক > কা লা অ > কা লা। এইরূপে তাঁহার মতে এ কা < * একা ক = * একা ক। এতাদৃশ স্থলে তিনি যে,—আ ক বোপে এক-একটি কল্পিত পূর্ব গ্রহণ করিতেছেন তাহার বিশেষ অমায় নাই। রূপপ্রক্রিয়া (পৃঃ ৩৫৮) এই বিষয়টির পুনরুৎপত্তি করিয়া না গা ক, ধ মা ক, বি সি আ ক প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ তুলনার জন্য এদর্শিত হইয়াছে। এখানে আদেশিক ভাষার মূল নাম না গা, ধ মা, বি সি আ (তুলনীয় প ম্ভা, প ধ ক) প্রভৃতিতে সংস্কৃত করিয়া (সম্ভবত বিভক্তিযোগ্য করিবার সুবিধা হইবে এই উদ্দেশ্যে) এরূপ আকার প্রদান করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা * কা ল ক প্রভৃতি কল্পনার অমূল্য কিছু পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। বাঙালার টা পা, কা টা প্রভৃতি আছে। সুনীতি-বাবু মতে ইহাদের মূল বলিতে হয় * চম্পা অ < * চম্পা ক, * ক টা অ < * ক টা ক। কিন্তু আমরা প্রাকৃত পাই চ ম্প অ < চম্পক, ক ট অ < ক ট ক। এই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনা আশ্রয় করিবার দোষ নাই। মা ধা ম শ্ত ক (> ম থ অ) হইতে না হইয়া * ম শ্ত ক (> * ম থ অ) হইতে, শা লা শ্রা ল ক (> শা ল অ) হইতে না হইয়া * শ্রা লা ক (> * শা লা অ) হইতে, গো রা মৌ র ক (> গো র অ) হইতে না হইয়া * গো রা ক (> * গো রা অ) হইতে, গো রা লা গো পা দ ক (> গো আ ল অ) হইতে না হইয়া * গো পা লা ক (> * গো আ লা অ) হইতে হইয়াছে বলা যায় না। পে চা পে চ ক হইতে, পি ঠা পি ঠ ক হইতে, পে ডা পে ট ক হইতে, গো রা পা দ ক হইতে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। স্বয়ং সুনীতি-বাবুও ইহা বলিতেছেন (পৃ. ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০)। এখানে যদি এরূপ হয়, তবে কা লা, চে লা (পৃ. ৩২৭) প্রভৃতি স্থলে এরূপ না হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

“প্রাচীন ভারতীয়-আধ্যাত্ম্যের ব হে ট ক (১)... > মধ্য ভারতীয় আধ্যাত্ম্যের ব হে ড অ > প্রাচীন বাঙালার ব হে ড, ব হ ডা (সর্কানন্দ) > নবীন বাঙালার ব হ ডা (পৃ. ৩৩৪)।” ইহা দ্বারা সুনীতি-বাবু আমাদেরই সমর্থন করিতেছেন। প্রাচীন বাঙালী * অ থা ডা (অ ক্ষ বা ট ক), নবীন বাঙালী আ থ ডা (পৃ. ৩২২); প্রাচীন ভারতীয়-আধ্যাত্ম্যের বি ভী ত ক (বি ভী ত ক)... > *

বি. ভী ট ক > মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা ব হে ড় অ > নবীন ভারতীয় আর্যভাষা ব হে ড়া; প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা আ ঙ্গা ত ক > * আ ঙ্গা ট ক > মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা অ ঙ্গা ড় অ > নবীন ভারতীয়-আর্যভাষা তা ম ড়া; ইত্যাদি (পৃ. ৬৯০); আবার, ভা ড়া (ভা ট ক) (পৃ. ৬১৫); সুনীতি-বাবু এই সকল উক্তি আমারই অমূল্য, তাঁহার নহে। *স বি স ব (<স ব প) হইতে স রি সা (পৃ. ৩৭৪), ইহাবও দ্বারা তিনি আমাকেই সমর্থন করিতেছেন, নিজেই নহে। এই হিসাবে শা ঙ্গা শব্দ পা র দ হইতে না হইয়া * পা রা দ হইতে (পৃ. ৩৫০) ইহা তিনি বলিতে পারেন না।

তিনি লিখিয়াছেন ষা ঙ্গা (ষা ঙ্গ-), (পৃ. ৩১৬); শাঁ ষা (শ ঙ্গ-), (পৃ. ৩২২)। মূল শব্দের শেষে হাইকেন দেওয়ার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলা হয় নাই; অনুমান হয়, ষা ঙ্গা ও শাঁ ষা র শেষ আকারের সমাধানের জন্য মূল শব্দটিতে আরো কিছু যোগ কবিত হইবে। অত্বে ষা ঙ্গা দুইটি শব্দ হইতে যথাক্রমে ষা ঙ্গ, শাঁ ষ হইতে পারে, ষা ঙ্গা, শাঁ ষা নহে। আমাব মনে হয় এখানে আদল শব্দ দুইটি হইতেছে ষা ঙ্গ ক, শ ঙ্গ ক। সংজ্ঞার্থে -ক প্রত্যয় (এ সম্বন্ধে পাবিনি বহু আলোচনা করিয়াছেন, ভাষ্যাকরও তাহা হইতে ইহা বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন।) বিশেষ বকরের ষা ঢ় ই ষা ঙ্গা, বিশেষ বকরের শ ঙ্গ ই শাঁ ষা।

অত্বে (পৃ. ৩৪৮) এই বিষয়টি পুনরুল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে: “the আ in the form কা লা is an affix giving a definite force, the black one and this can only be from some affix like আ ক with a definiteness that come to be associated with a আ: Cf. ঘো ড়া টা horse-that-big-one that horse; but ঘোড়াটি horse-that-little-one-that twice little horse.”

কেবল কা লা কা লা টি ‘the black one’ বুঝায় কি? কা লা, ষ লা; কা লা, গো রা; এখানে কোনো definite force আছে বলিয়া হো মনে হইতেছে না। বৈষ্ণব পদাবলীর যোগে বা তাড়ন প্রসঙ্গে ত্রীকৃষ্ণকে ক লা পদে বুঝায় সত্য, কিন্তু, তাহা স্বতন্ত্র কথা। তখন তাহা বিশেষণ নহে, বিশেষ্য। আর যদি বা এখানে ঐকল কোনো definiteness থাকে, তথাপি কা টা, টা পা, ইত্যাদি হলে আছে কি?

পূর্বের যাহা লিখিত হইল তাহাতে মূল বিচার্য বিষয়টি এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার অত্বে আ আ বাঙলায় কখনো ওকারবলিত আ অথবা ও, কখনো বা আ হইয়া থাকে। বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান।

পৃ. ৩০৬ মা ঙ্গ কা ঠ; সুনীতি-বাবু বলেন, এখানে মা ঙ্গ স ঙ্গা হইতে। স ঙ্গার অর্থ এখানে পাই না। মধ্য হইতে বলিলে কোনো ক্ষতি দেখা যায় না।

পৃ. ৩১৩, স ও বা র শব্দের আলোচনায় ঐ অর্থেই অ ষ বা ব শব্দটিকে মনে করা যাইতে পারে। মাঘ ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন। শেষ অংশের সহিত ভূ ষাতুর সম্বন্ধ মনে হয় না, V ভূ ষাতুর সম্বন্ধ।

পৃ. ৩১৫ হা ল কা শব্দের সমাধানে লা ঘ ব শব্দের কোনো স্থান আছে মনে হয় না। এখানে মূলত ল ঘু ক হইতে বর্ণবিপর্যয়ে হ লু ক, তাহার পব ক্রমশ *হ লু ক অ, হা ল কা। আ ল তা প্রভৃতির আন্ত আকারের জায় (পৃ. ৩১৪) এখানেও আন্ত আকারের সমাধান হইতে পারে।

পৃ. ৩২০ ভা ঙ্গ শব্দের ভা ব স্তি শব্দের যোগ দেখান হইয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ভা তি (পভা) হইতে হইয়াছে।

পৃ. ৩২৪, আমি মনে করি দিয়া শ লা ই শব্দের পূর্ব যোগ দী প-নহে, দী প ক। ইহাতে আকারের সমাধান হয়, অর্থও সঙ্গত হয়।

পৃ. ৩২৮, “জে ঠা (জ্যে ঠা তাত); পৃ. ৩২৬ “খুড়া (খুড়-কুড়+তাত)।” আমার মনে হয়, জে ঠা র মূল জ্যে ঠ ক, খুড়া র মূল কুড় ক (> খুড়ড অ)। সংজ্ঞার্থে ক প্রত্যয়। যেমন, আ ষ ক হইতে আ ঙ্গা ‘মাতামহ’ (আ ষি কা হইতে আ ই ‘মাতামহী’)। জে ঠ তাত, খুড় তাত (বিশেষণ), ইত্যাদি হলে তাত শব্দের যোগ আছে জে ঠ-তাত=জ্যে ঠ তাত ক, খুড় তাত=কুড় তাত ক। নীচে দেখুন। মরাগীতে চুল তা ‘খুড়া’ (চুল তী ‘খুড়ী’)। এখানে শেষ অংশ তা <তা অ <তাত। আমবা বলি জে ঠ তু তা, (অথবা জা ঠা), খুড় তু তা (অথবা তু ত)। সুনীতি-বাবু বলেন (পৃ. ৫০৩, দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৯২) জা ঠ-উতা, খুড়-উতা ইত্যাদির মধ্যে একটা তকব আনিয়া জুটিয়াছে (“t is intrusive”)। আমার মনে হয় (দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৯২), এখানে তকার আগম নহে। জে ঠ তা < জে ঠ তা অ < জ্যে ঠ তাত; খুড় তা < খুড়ড তা অ < কুড় তাত; যেমন পূর্বোক্ত মরাগী চুল তা < *চুল তা < *চুল তা অ < কুড় তাত। -উত < *উত অ < পুত্র ক। জে ঠ তা+উত=জে ঠ তু ত, খুড় তা+উত=খুড় তু ত। পূর্বোক্ত জে ঠ তা, খুড় তা ত যথাক্রমে জে ঠ তা+উত, খুড় তা+উত হইতে অসম্ভব মনে হয় না।

পৃ. ৩৬৪, উক্ত হইয়াছে বাঙলা পি জ রার মূল সংস্কৃত পি জ র, কিন্তু বস্তুত ইহা প জ র (প জ র ক)। অনুমানিক বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার কখনো-কখনো ইকার হয়; যথা, ম জ্জা > *ম জ্জা > মি জ্জা (পালি)। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য কর ত জে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

পৃ. ৩৮১, মা উ প (মা ত্ত, মা উ নী, মা নী, ইত্যাদি) শব্দের সহিত মা ঙ্গ শব্দের সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। আমার ইহা মনে হয় না। ঈশান-বাবু জাতক অনুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়া-হিলাম তাহা পরিবর্তন করিবার কারণ এখানে দেখিতেছি না।

ত্রী-স্রাতি বুঝাইতে বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালিতে যথাক্রমে মা ত্ত গ্রা ম ও মা ত্তু গা ম শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। আমার মনে হয়, আলোচ্য গদ্যটির মূল ইহাই। ইহাব বিরুদ্ধে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, মা ত্তু গা ম শব্দের শেষ মকারের লোপ সম্বন্ধে। সুনীতি-বাবু নিজেই এইরূপ লোপের উদাহরণ দিয়াছেন, যথা ক দ ম হইতে কা দা, (পৃ. ৩৪৭), না ম হইতে না (পৃ. ৫০২)। এইরূপে মা ত্তু গ্রা ম (> মা ত্তু গাম) > *মা উ গা অ > *মা উ গা > *মা উ গা < মা উ গ > মা গা। ঠিক যেমন ত্রা ত্ত জা রা হইতে ক্রমশ ভা উ জ > ভা জ, (পৃ. ৩০৭)। অর্থের পরিবর্তন কারণবিশেষে পারে হইয়াছে।

পৃ. ৪৭২, আমার বিশ্বাস, ছোট শব্দের মূল কুড় (কুড় ক)। অত্বে সময়ে এই পত্রিকাতেই কুড়ের খেলা প্রবন্ধে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

পৃ. ৪৯৩, “t seems to be intrusive in টাট (> ও ট ট, ও ঠ)।” ইহা মনে লাগে না। ইহাব মূল হইতেছে তু ও।

পৃ. ৫০২, বহুত শব্দের যোগ বহু বস্ত শব্দের সহিত, ইহা মনে হয় না। হেমচন্দ্র প্র ভূ ত শব্দের সহিত যোগ বলিয়াছেন।

পৃ. ৫০৭, ষা ষা শব্দের মূল কি? পালিতে দ ঙ্গা < ত ঙ্গা।

ন দ্বা সংস্কৃত আকার ধারণ করিয়া থাকা, য দ্বি ক। (“ধ্বিকর্য প্রবৃত্তো লোকঃ”—শ্রীমদ্রামায়ণের হরিদ্যোপনিষৎ) ।

পৃ ৬৫৪, ই ত ন শব্দের মূল দ জ্ঞ প ব ন (হ্রস্বত-শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ), পালি দ জ্ঞ পোন ।

পৃ ৬৬৪, উ জ্ঞান (* উ দ্যা প ন) ; কিন্তু পালিতে পড়িয়াছি উ জ্ঞ ব ন ।

পৃ-৬৬৩, “পো আ তী, পো যা তী, পো হা তী ।” মনে হয়, হ্রস্বত-বাবুর মতে ইহার ব্যুৎপত্তি পো ত + আ ত + ই । ইনাস্তরে (জাত-কর বঙ্গানুবাদ-সমালোচনায়) বলিয়াছিলেন ইহার মূল প্র ভা ব তী (পালি প জ্ঞ প তী) । ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই

যে, প্রাকৃত শেখের -তী-টার-ই অধ্বা-দী হইবার কথা । ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তৃতীয় অক্ষরে ষ্ট্রাক পড়ায় দ্বন্দ্বটি প আ ব তী হওয়ার ঐক্য পরিবর্তন হইতে পারে নাই । তুলনায় সব জ্ঞা < স প জ্ঞা, সরাসী স-ব র.তী ; ম স্তি ম তি, ন র স-স্তী (সর স্ব তী), পৃ ৭০২ ।

পৃ-৬৬২, ধো ল স ও মুখস (অনেক স্থানে ধো লো স, মুখো স) শব্দের ব্যুৎপত্তি, পূজ্যপাদ বিজ্ঞাননাথ বলিতেন, যথার্থে স্থ লি ত কো শ, ও মু খ কো শ ।

এই গ্রন্থানির বাঙলা অনুবাদ বেবিবার দ্বিতীয় অমর্য উৎসহ হইয়া থাকিলেন । গ্রন্থকার ইহা দ্বারা দ্রষ্ট উপকার করিবেন ।

পরভূতিকা

শ্রী সীতা দেবী

৭

উজ্জী নদীটি নামে নদী হইলেও, তাহাতে গরমের সময় জল বড় দেখা যায় না । বালির চড়া প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে, মাঝে কেবল সৰু রূপার হারের মত একটি ক্ষীণ জলস্রোত বিকসিক করিতেছে । গিরিধির বার-গুপ্ত পল্লীর যত মানুষ রোর পড়িতে-না-পড়িতে এই নদীটির ধারে আসিয়া জোটে । বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আসে স্বাস্থ্যের খাতিরে বায়ু সেবন করিতে, যুবক যুৱতী বালক বালিকারা আসে ফুটি করিতে । ছোট জলস্রোতটির মধ্যে নামিয়া পড়িয়া, জলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া একটা মস্ত আমোদ ।

তিন চারিটি বালক বালিকা সন্ধ্যার একটু পূর্বে নদীতে নামিয়া মহা কোলাহল সহকারে খেলা কবিত্তে আরম্ভ করিয়াছিল । তাহাদের শ্রামবর্ণ কচি কচি হাত-পা-গুলি জলের মধ্যে প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইতেছিল । পরস্পরের গায়ে জল আর ভিজা বালি ছুঁড়িয়া মারা ছিল তাহাদের খেলার প্রধান অঙ্গ । বালক দুটি একেবারে বেপরোয়া হইয়া খেলায় মাতিয়াছিল । বালিকা দুটি খেলায় যোগ দিলেও বাহাতে কাপড়-চোপড় একেবারে না ভিজিয়া যায়, এবং মাথার চুলের চেয়ে বালির পরিমাণ বেশী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবারও একটু একটু চেষ্টা করিতেছিল ।

সন্ধ্যা সূর্যালোক যখন ক্রমে নিভিয়া আসিল, বালির চর, জল ও দুইতীরের গাছপালার উপর হইতে রক্তাভ আলো মুছিয়া গিয়া, ক্রমে কালিমার অবগুষ্ঠন নামিয়া আসিতে লাগিল, তখন চরের উপর উপবিষ্ট একটি তরুণী ডাকিয়া বলিল, “সীতা, বেলা, শিগ্গির উঠে এস জল থেকে । একেবারে আধার হ’য়ে এল, এরপর বাড়ী গিয়ে তোমাদের মায়েব কাছে খুব বকুনি খাবে ।”

ছোট মেয়ে দুটি শাড়ীর প্রান্ত হইতে জল নিঙড়াইয়া ফেলিয়া, চুল কাড়িয়া জল হইতে উঠিবার জোগাড় দেখিতে লাগিল । ছেলে দুটি উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না, দ্বিগুণ উৎসাহে মত্ত বড় বড় বালির গোলা পাকাইয়া সকলের গায়ে ছুঁড়িতে লাগিল । সব ছোট মেয়েটি তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে কান্দ-কান্দ গলায় বলিয়া উঠিল, “মাসিমা, দেখ পল্ল একেবারে আমার চোখ কানা ক’রে দিচ্ছে, বারণ করলেও শোনে না ।”

যে যুবতীটি তাহাদের জল হইতে উঠিবার জন্য ডাক দিতেছিল, সে এই বার সন্ধিনীর সঙ্গে গল্প ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল । জলের ধারে আসিয়া, ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া বলিল, “উঠে আস, ভিজে একেবারে ভূত হয়ে গেছিস্ যে । পঞ্চ, তুমি ওর চোখে বালি দিয়েছ কেন ?”

পঞ্চ বলিল, “ও আসে কেন ছেলেরা সঙ্গে খেলতে ? ঘরে ব’সে পুঁতুল খেললেই পারে। ছিঁচ্কাঁদুনী খুকি। কই বেলা ত কাঁদছে না ?”

যুবতী একটু হাসিয়া মেয়েটিকে টান দিয়া জল হইতে উঠাইয়া সহিয়া চলিল। বড় মেয়েটি নিজেই উঠিয়া কাপড়-চোপড় বাড়িয়া তাহাদের সঙ্গ লইল।

যে যুবতীটি এতক্ষণ একলাই বালির উপর বসিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল, “চল্লি নাকি, কৃষ্ণা ? তাহ’লে আমিও উঠি।”

কৃষ্ণা বলিল, “তোমার এত সাত তাড়াতাড়ি উঠবার কি দরকার ? আমি এগুলোকে বাড়ী পৌঁছে আবার আসছি। এই ত সব সন্ধ্যা হ’ল, এর মধ্যে ঘরে ঢুকে কি করবি ? আর ত ক’টা দিন মাত্র ছুটি বাকি আছে, একটু গল্প-শ্রবণ ক’রে নেওয়া যাক, এরপর ত আবার ঘানিতে জুততে হবেই নিজেদের।”

অন্য মেয়েটি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “তা চল বরং তোদের বাড়ীর সামনেই ঘোরা যাবে। এখানে একলা ব’সে থাকতে, গাটা কেমন ছম্ছম্ করে। পাড়ার ছোড়াগুলোও বড় বড়, সেদিন প্রভা বল্ছিল সম্ভার সময়কে একটা তার গায়ে ফুল না কি ছুঁড়ে মেরেছিল।”

কৃষ্ণা বলিল, “প্রত্যেক মেয়ের উচিত বেড়াতে বেরবার সময় একটা চাবুক সঙ্গে রাখা, আর এবকম বাদরামি দেখলে আর কথাটি না ব’লে এইসব রসিক-চুড়ামণিদের আগাগোড়া চাবুকে দেওয়া। তা হ’লে এঁদের রসাদিক্য একটু কমে বোধ হয়। আমার গায়ে অবশ্য কেউ কিছু ছোড়েনি, কিন্তু গুটি দুই তিন ছেলে ঠিক ক’রে নিয়েছে যে, আমার একটা guard of honour দরকার। যখন যেখানে যাই, দেখি অন্ততঃ চারগজের মধ্যে তারা কোথাও-না-কোথাও আছে।”

কৃষ্ণার সঙ্গিনী লাভণ্য হাসিয়া বলিল, “অমন রাণীব মত চেহার দেখলে আমাদেরই সখ হু guard of honour হ’তে, ওরা ত পুরুষ মানুষ। তোমার নাম কে যে কৃষ্ণা রেখেছিল আমি তাই ভাবি। আমাদের দেশে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন চের দেখা যায়, কিন্তু তোমার বেলা

হয়েছে দেখছি পদ্মলোচনের নাম কাণা। তোমার নাম কৃষ্ণা না হ’লে তপতী হ’লে ঠিক মানাত।”

কৃষ্ণা বলিল, “আর ত বুড়ো বয়সে নাম বদলানো চলে না, তা না হ’লে তোমার দেওয়া নামটাই বাহাল করতাম। ইউনিভার্সিটির কলাণে নামটা ছাপার অক্ষরেও উঠে গেছে অনেকবার, এখন বদলালে আমাবই মুন্সি। কৃষ্ণা রায় ব’লে বি-এ পাশ ক’রে, তপতী রায় ব’লে চাকরী নিতে গেলে কেউ ত চাকরী দেবে না ?”

লাভণ্য বলিল, “তুই আব কদিন চাকরী করবি ? দুদিন পরেই লাল বেগারসী পরে কার-না-কার ঘর আলো করতে চ’লে যাবি। নিতান্ত মা বাবা নেই তাই এতদিন ছাড়ি আছি, পিছন থেকে ঠেলা দেবার লোক থাকলে এতদিনে তিন ছেলের মা হ’য়ে বসতিস্।”

কৃষ্ণা বলিল, “ভাগ্যে নেই ! আমার বিয়ে করবার উৎসাহ খুব যে বেশী তা বলতে পারি না। বিয়ে জুটলে আমাদের দেশে সব মেয়েই কবে, কিন্তু তাতে তাদের লাভটা যে কি হয়, তাতে দেখি না। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে আরো ক’টি অনাহারে কাটাবার প্রাণী জুটিয়ে দিয়ে যায় মাত্র। বিয়ে ক’রে শারীরিক, মানসিক, বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে, এমন একটা মেয়ের নাম কর ত ?”

লাভণ্য বলিল, “যা, যা, পাকামি করতে হবে না ! উন্নতির জন্তেই সবাই বিয়ে করে আর কি ? একদলের মা বাপে বর জুটিয়ে দেয়, মেয়েব খাওয়া-পরাই একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার ভেবে, আর একদল নিজেই জোঁটায় প্রাণের দায়ে, না জুটিয়ে তাদের শাস্তি থাকে না ব’লে।”

কৃষ্ণা বলিল, “আমি দুই দলেরই বাইরে পড়ব। মা বাপও নেই যে বাড়ি থেকে নামিবে নিশ্চিন্ত হবে, আর আমারও এখন এত ভুতে ধরেনি যে, একটু হাড় জালাবার লোক না জুটলে শাস্তিই পাব না। আমি ত ভাবছি সেই আমেরিকা যাবার স্বপ্নাংশিপটা জোঁগাড় করব, এর পরেই বহর। চাকরী ক’বেই যখন চালাতে হবে, তখন যাতে একটু ভদ্র গোহর মাইনে পাওয়া যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। এ কি আর একটা জীবন ! কোন রকমে বেঁচে থাকা, তত্ত্বপোষের ছারপোকাগুলো ঘেমন থাকে।”

কথা বলিতে বলিতে তাহার বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাঠের মাঝখানে, ছোট বাংলো-ধরণের বাড়ীটি। তাহাদের প্রতি খোলা দরজা জানালার পথে আলোর স্রোত জীড়াচক্ষু শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া যেন বাহিরের তৃণশয্যার উপর নুটাইয়া পড়িতেছিল। রাম্মার গন্ধে সামনেব জমিটি ভরপূর। কৃষ্ণা বলিল, “বাঙালীর বাড়ী যে তা লোকে একমাইল দূর থেকে বুঝবে। এমন ফোড়নের গন্ধ বার করবার সাধ্য আর কোনো জাতের নেই।”

লাবণ্য বলিল, “তুই এক মহা মেমসাহেব। আমার ত খুব ভাল লাগে রাম্মার গন্ধ। সব-কিছুতেই তুই এতও আকর্ষিত থাকতে পারিস বাপু। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানিস? হয়ত রবিবার গোরাব মত তুইও কোনো সাহেবের মেয়ে, ভাগ্য-বিপর্যয়ে বাঙালীর ঘরে এসে পড়েছিস। রংটা ত মেমের কাছাকাছি আছেই, মেজাজ এবং পছন্দগুলিও ঠিক সেইরকম।”

বাড়ীর সম্মুখে বসিবার জগৎ খান দুই স্বর্ধ পুরাতন তক্তপোষ পাতা ছিল। তাহারই একটা ক্রমাল বসিয়া ঝড়িতে ঝড়িতে কৃষ্ণা বলিল, “বোস্ এইখানে। আগে কি ধুলো! সাধে এখানে একখানা শাড়ী এক-দিনের বেশী ছুদিন পরা যায় না? পাড়গুলোর কাছে আধ হাত করে লাল ধুলোর আর একটা পাড় তখুনি দেখা দেয়।”

লাবণ্য বসিয়া বলিল, “আমাদের ধুলোর দেশ, ধুলো ত থাকবেই? একটা সাহেব বিয়ে করে বরকের দেশে চলে যা না? अच्छা সত্যি বল, আমি যা বলছিলাম তাই হ’লে তুই খুসি হ’স? তোর ত দেশী কোনো জিনিষের উপর বিন্দুমাত্রও টান দেখি না?”

কৃষ্ণা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “মোটাই হই না, এবং তোর আলমস্বের স্বপ্ন সত্যি হ’বার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। আমার মা বাপ নেই বটে, নিস্কট আত্মীয়ও কেই আছে ব’লে জানা যায় না। কিন্তু আমি যে কাদের মেয়ে কোথা থেকে মাসীমা আমায় জুটিয়ে ছিলেন, সবই পরিষ্কার করে জানা আছে, সে-সব নিয়ে রহস্যাবৃত উপাশ্রাস স্রষ্টি বৃষ্ণার কিছু মাত্র উপায় নেই।

দেশী জিনিষ আমার ভাল লাগে না তাই বা ডেকে কে বলল? দেশের মনগুলো ভাল লাগে না ব’লে তি দেশের ভালগুলোও ভাল লাগে না?”

লাবণ্য বলিল, “তোর কাছে কি যে ভাল, আর কি যে মন্দ তা বুঝাবাবও আমার সাধ্য নেই। থাক্ গে। তুই ফির্ছিস কবে রে?”

কৃষ্ণা বলিল, “পরের ‘উইকে’ যে-দিন ভাল সদ্যী পাব, নেদিনই যাব। মাঝে চেঞ্জের ভাবনা না থাকলে একলাই যেতাম, কিন্তু কুলি ডাকাডাকি, জিনিষ টানাটানি করতে ভাল লাগে না, তাই কারো সঙ্গেই যাব। দেখ এদিকে আমি একেবারে আর্থ্য নারী, মেমসাহেবী ‘ফর্গুয়ার্ডনেস্ আমার একেবারে নেই।”

লাবণ্য বলিল, “অন্ততঃ একজগৎ ত তের একটা বর দরকাব। পথে ঘাটে জিনিষপত্র বইবে, আর ভোর মত রূপসীর একটা দরওয়ান দরকার, সে কাজও করবে।”

কৃষ্ণা বলিল, “কেন রে? আমি কি ট্রাফিক সুপারিন্টেনডেন্ট হ’তে যাচ্ছি? চিরজন্ম আমি কি ট্রেনেই ঘুরব যে তার জন্তে এত পাকাপাকি ব্যানহ?”

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি শ্রৌটারমণী বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, “ওমা, কৃষ্ণাও ফিরেছে যে। আমি ভাবি মেয়েগুলো একলাই এল বুঝি। বিকেলে ত কিছু খেয়েও বেরোওনি এক পেছালা চা ছাড়া। চল গরম গরম লুচি ভাজছে। ছুখানা খেয়ে নেবে, বেগুন ভাজা দিয়ে। লাবণ্য, এস মা। তোমাকে যে আর এ দিকে দেখি না বড়?”

লাবণ্য বলিল, “এই বাড়ীর বাইরেই সকলের সঙ্গে দেখাটা হ’য়ে যায় কিনা, কাজেই বাড়ী আসবার আর চাড় থাকে না। আজ কৃষ্ণা-সকাল সকাল ফির্ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটলাম।”

বাড়ীর গৃহিণীর পিছন পিছন কৃষ্ণা আর লাবণ্যও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রান্নাঘরের বারান্দায় দুখানা বড় বড় পিড়ি পাতিয়া তিনি বলিলেন, “এইখানে বোসো মা, ভিতরে যা গরম। বামুন ঠাক্কন, দিদিমণিরের জল-খাবার দিয়ে যাও।”

কৃষ্ণা জুতা খুলিয়া পায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, “বাবা, তি পরিমাণ বালিই জমেছে জুতোর মধ্যে। একখানা বাড়ী প্রাষ্টার করা হ’য়ে যায়। এদেশে হয় ‘টপবুট’ পরা উচিত, নয় খালি পায়েই হাঁটা উচিত।” সে পা মুছিয়া লাবণ্যের পাশের পিড়িতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, “তোব আসনে কি পিড়িতে বস। দেখলে, সত্যি আমার পেট ফেটে হাসি আসে। যেন শুবি কি বস্‌বি, ঠিক করিতে পার্‌ছিস না। না মামী-মা?”

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, “অভ্যাস নেই কিনা মা। ওর মাসীর ঘরে চিরকালই টেবেলেই খেয়েছে। আমাদের যদি এখন কেউ কাঁটা চামচে খেতে বলে তাহ’লে আমরা খোঁচাখুঁচি ক’রে রক্তপাত ক’রে বসি। তবু ত কৃষ্ণা খুব মানিয়ে চলতে জানে। মেমেদের স্কুলে বোর্ডিংএ মাছষ কোনোরকম ফিরিঙ্গী-আনার ধার ধারে না। আমাদের সঙ্গে সমানে ভাল ভাত খাচ্ছে, খালি পায়ে বেড়াচ্ছে। কেবল স্নোশাও নোংরামী দেখলে বড় খুঁৎ খুঁৎ করে।”

মেমের খাওয়া সারিয়া উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণা যে ঘরে শোয় সকলে সেই ঘরে আসিয়া বসিল। ঘরখানি ছোট, গৃহসজ্জাও কিছুমাত্র নাই, কিন্তু কোথাও ধুলার কণাটি নাই। ছুটি ছোট তক্তাপোষ ঘরের দুইধারে, বিছানাগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মাঝে একটি ছোট টেবল, তাহার উপর কাগজেমোড়া মস্তবড় এক পুস্তিকা। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, “এটা ত দেখে যাইনি? কখন এল?”

গৃহিণী বলিলেন, “তুমি বেয়িয়ে যাবার পরেই এসেছে। আমি অমনি রেখে দিয়েছি, খুলে আর দেখিনি, ভিতরে কি আছে।”

কৃষ্ণা বড়দাড়ি কাটিয়া পার্শেল খুলিয়া ফেলিল। বাহির হইল এক মস্ত বড় ছবি।

কৃষ্ণা বলিল, “ওমা মাসীমার ছবি, যেটা কলকাতার ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট কর্তে দিয়ে এসেছিলাম। বাঁধিয়ে পাঠাল না কেন ছাই। আমি ত তাই কর্তে

বলে এসেছিলাম। আবাব গিয়ে আমাকে বাঁধাতে দিতে হবে।”

লীলা বেলায় মা বলিলেন, “তা ছবিটা বেশ ভালই হয়েছে। নিতান্ত শেষ বয়সেব নয় দেখছি, বছর চল্লিশ বয়সের হবে। এদানীং বড় রোগা হ’য়ে গিয়েছিলেন, চুলটুলও সব উঠে গিয়েছিল। এ ছবিটাতে বেশ মোটা-সোটা, সাজ-পোষাকও বেশ আছে দেখছি।”

লাবণ্য বলিল, “হ্যারে কৃষ্ণা, তোর মাসীমা ত দেখছি বেশ সাবেক কালের গহনা গাঁটি পরতেন, কাপড়খানাও গরদ ব’লে মনে হচ্ছে। তা তোকে এত মেম বানিয়ে গেলেন কেন?”

কৃষ্ণা বলিল, “নিজের হয়ত কোনো কারণে মেম হ’য়ে উঠতে পারেননি, অথচ ইচ্ছাটা ছিল। আমাকে দিয়ে সে সাধটা মিটাবার চেষ্টা করেছিলেন আর কি? চৌদ্দ পনেরো বছর অবধি ত শাড়ীর মুখ দেখিনি। তালগাছের মত লম্বা আর শিড়িছে রোগা ছিলুম, হাঁটু বের ক’রে বেড়াতে ভয়ানক লজ্জা করত, অথচ মাসীমা কিছুতেই শাড়ী কিনে দিতেন না। বোর্ডিংএ অল্প মেয়েদের খোসামোদ ক’রে তাদের শাড়ী চেয়ে নিয়ে পরতুম। আমার নাম রেখেছিলেন ‘ক্রিষ্টিনা,’ আমি গায়ের জোরে তাকে কৃষ্ণা ক’রে নিয়েছি।”

লাবণ্য বলিল, “কোথাকার গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে, তোর এ সব ধাতে সহবে কেন? বীক্টিফ খাস্?”

কৃষ্ণা বলিল, “দূর হ, এমনি মাছ মাংসই আমার ভাল লাগে না তা বীক্টিফ। মাসীমার কাছে শুনেছি আমার মা বাবা নাকি ভারি সাহিত্যিক বৈষ্ণব ছিলেন, সেই রক্তের গুণ থেকে গেছে আর কি?”

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, “সবটা থাকেনি। তোমার স্বভাবে মা বৈষ্ণবের মাথা হেঁট ক’রে থাকার ভাব একেবারে নেই। নিতান্ত তোমার মাসীর কথা অবিশ্বাস করা যায় না তাই; তা না হ’লে তোমার চেহারা ধরণ-ধারণ, পছন্দ কিছুই গরীব বৈষ্ণবের ঘরের মত নয়। কোনো রাজা-রাজাড়ার বাড়ীর মেয়ে হ’লেই তোমাকে ঠিক মানাত।”

কৃষ্ণা বলিল, “হ্যাঁ, রাজার মেয়ে আমি যা, তাও

দশা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তা হ'লে আর মা মবুতেই ধাত্রীর হাতে ফেলে সবাই স'রে পড়ত না। ভাবলে আমার কি যে রাগ হয় মামীমা, কি বলব। মা বাপই না হয় ছিল না, তাদের তিনকুলেও কি কেউ ছিল না? এমন ক'রে বিলিয়ে দিতে তাদের মনে একটু বাধল না। মামীমা যদি আমায় না নিতেন, তাহ'লে তারা হয়ত আমাকে নর্দমাতেই ফেলে দিত। কে জানে, হয়ত বা কখনও দেশ ব্রিদেশে ঘুবুতে ঘুবুতে আমার কোনো গুণবান আত্মীয়ের সন্ধান মিলে যাবে। যদি চিনি, তাহ'লে তাদের যা শোনান শোনাও তা আমি মনে মনেই ঠিক ক'রে রেখেছি। মনে করেছি বিলাত হ'য়ে এসে ভাল কাজকর্ম যদি কিছু পাই, টাকাকড়ি কিছু কবুতে পারি, তাহ'লে তাঁদের সন্ধান খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব। বাড়ালী ঘরের আত্মীয় ত, টাকার গন্ধ পেলে ঠিক এসে জুটবে।”

লাবণ্য বলিল, “তা আশ্চর্য্য নয়। আচ্ছা, এখন উঠি। ছবিখানা তু'লে রাখ তা না হ'লে বাচ্চারা দেখলে এখনি টানাটানি ক'রে নষ্ট করবে।”

গৃহিণী বলিলেন, “দাঁড়াও মা, একলা যেও না। তজ্জুয়া তোমাকে আলো নিয়ে পৌছে দিয়ে আসুক। পাড়াটা ভাগ না, রাত-বিরাতে মেয়েদের একলা পথে ঘাটে না চলাই ভাল।”

লাবণ্য চলিয়া গেল, গৃহিণীও কাজে গেলেন। ঘরের জানলা-দরজাগুলি বেশ ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া কৃষ্ণা আসিয়া নিজের বিছানায় বসিল। এতক্ষণ নিজের অতীত জীবনের গল্প করিয়া, এখন সেইসবল স্মৃতিচিহ্নই একটার পর একটা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

অতি শৈশবের কথা তাহার কিছুই মনে পড়ে না। বালাকালের স্মৃতি তাহার এই গিরিধির সঙ্গেই জড়িত। এখানের পথে ঘাটে মাঠে খেলা করিয়াই সে মানুষ হইয়াছে। তাহার মামীমাকে বিশেষ কাজকর্ম করিতে সে দেখে নাই, কালেভদ্রে নিভাস্ত টানাটানি করিলে তিনি একটা-আধটা ‘কলে’ যাইতেন। অথচ তাহাদের দিন বেশ স্বচ্ছলভাবেই কাটিত। বাড়ীটা অবশ্য তাঁহার নিজের ছিল, কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য দিকেও বিশেষ ব্যয়নকোচ প্রকাশ

পাইত না। কোথা হইতে টাকা আসিত সে খবর জানিতে পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই কৌতূহল ছিল, কিন্তু কেহই বোধ হয় সেটা জানিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিসেস্ মিহ্ন নিজে জীঠান ছিলেন। কৃষ্ণাকেও তিনি সেই সমাজের মতে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ ছিল না। সামান্য রকম বাংলা লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত খুব যে তিনি স্নেহ ঘর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাবার্তা হইতে মনে হইত না। একরকম রাগারাগি করিয়াই তাঁহারা পৃথক হইয়া যান। মিসেস্ মিহ্নকে তাঁহার বাপের বাড়ীর সকলে জোঁগাড় করিয়া ধাত্রীবিন্যা পড়িতে পাঠাইয়া দেন। পাশ করিবার পর তিনি নাকি আর একবার স্বামীর ঘর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খোঁজ করিয়া জানা যায় যে, স্বামীটি ইতিমধ্যেই একটি গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়া স্নেহে স্বচ্ছন্দে ঘর-করনা করিতেছেন। ইহার পর আর তিনি কখনও স্বামীর খোঁজ করেন নাই। কলিকাতায় তাঁহার প্র্যাক্টীশ ভালেই ছিল, পয়সার অল্প কোনোদিন তাঁহাবে ঠেকিতে হয় নাই।

কৃষ্ণা যখন তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনে আসিয়া জুটল, তখন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা। কাজকর্ম হইতে অবসর লইয়া, তিনি গিরিধিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণাকে অতি যত্নেই তিনি পালন করিয়াছিলেন। মাতার স্নেহ হয়ত তাঁহার বঠোর স্বভাবে ছিলই না, কাজেই সে দিক দিয়া এই নিম্ন-নীড়চ্যুতা শাবকটি কিছু বঞ্চিতাই হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার আদর-যত্ন, পড়াশোন, কোনো কিছুই জটী হয় নাই। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়ই ইহার ক্ষয় তিনি করিতেন। নিজে ভাল লেখাপড়া শেখেন নাই এ দুঃখ তাঁহার থাকিয়াই গিয়াছিল। কৃষ্ণাকে তিনি কলিকাতার খুব ভাল মেমের স্কুলে দিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার খুব ভাল শিক্ষা হয়। শিক্ষা বলিতে অবশ্য তিনি মেমসাহেবীই বুঝিতেন। তাহার নাম, তাহার চাল-চলন, সব বাহাতে নিখুঁত ফিরিঙ্গী ভাবের হয়, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু মেমের সঙ্গে সর্বদা তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। সে থাকিয়া থাকিয়া এমন থাকিয়া

বসিত যে, হাজার শাসনেও তাহাকে বাগ মানান যাইত না।

এইরূপে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার আগেই নিজের ক্রীষ্টনা নাম বদলাইয়া করিল কৃষ্ণ। ক্রফগুলি নীচের ক্লাশের যোগেদের মধ্যে বিতরণ করিয়া, ‘পকেট মনি’ জমাইয়া, শাড়ী কিনিয়া পরিল। সখ করিয়া দিন কতক মাহমাংস শুদ্ধ হাড়িয়া দিল। মিসেস মিড্র যেষ্টের রকম-সকম দেখিয়া তাহাকে খাট মিম করা সম্বন্ধে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে সে যখন বহর সতেরো বয়সে বলিয়া বসিল, “আমি গীর্জা ফিল্ড যাব না, আমার ভাল লাগে না,” তখন তিনি একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পবেই কৃষ্ণার এই পালিকা মাতাটি পরলোকে গমন করেন। তাহার পর হইতে জগতে কি একেলা সে! নিতান্ত বন্ধুত্বের খাতিরে সে ছুটিতে দিন কাটাইবার একটা স্থান পায় মাত্র, কিন্তু বিশ্বসংসারে তাহার দাবী কোথায়? কাহাকেও সে জোর করিয়া কি বলিতে পারে, “আমার ভার তোমায় লইতে হইবে, না লইয়া তুমি যাইবে কোথায়?” তাহার জন্মেব জন্ম দায়ী যাহারা, তাহারা ত আজ সকল নালিশের পরপারে। পালনের জন্ম দায়ী যিনি তিনিও ইহলোকে নাই, থাকিলেও তাহার উপর কোনো দাবী চলিত না। সমাজ বা সংসারও তাহাকে এগনও কাহারও সহিত এমন বন্ধনে বাঁধে নাই, যাহাকে সে কিছু দিতে পারে বা যাহার কাছে জোর করিয়া কিছু চাহিতে পারে। একেলা, একেলা, এই মায়ার বন্ধনময় জগতে সে একেবারে বন্ধনহীন। সে কাহারও নয়, তাহারও কেহ নয়।

ভাবিতে ভাবিতে, আপনার অজ্ঞাতনামে, কখন তাহার ছুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। লীলার ডাকে তাহার চমক ভাঙিল।—চোখ মুছিয়া সচেতন হইয়া দেখিল, ঘূহ জ্যোৎস্নার আলো ঘরখানিকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, অনেক রাত হইয়া থাকিবে। পাশের ঘরে ছোট বোক-কে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা সজোবে এবং সরবে চলিতেছে।

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল। ছেলেকেই এখনি খাইতে বসিবে, গৃহিণীকে তখন একটু সাহায্য করা দরকার, তা

না হইলে ছেলে-মেয়েরা ভাত খায় যতখানি, মার খায় তাহার দ্বিগুণ, এবং ঘুমাইতে তাহাদের বারোটা বাজিয়া যায়।

পাড়ারই এক ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতা যাইতেছিলেন। কৃষ্ণারও ছুটি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল, আর সপ্তাহখানিক মাত্র বাকি। সেটুকু এটুখানে কাটাইয়া যাইতে পারিলে অশ্রু সে খুসিই হইত, কারণ কলিকাতায় ফিরিতে বেশী আগ্রহ হইবার তাহাব কোনোই কারণ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে আবার হয়ত সুবিধা মত সঙ্গী নাও মিলিতে পারে। কাজেই আর সাতটা দিন গিরিধিতে কাটাইবার মায়া ত্যাগ করিয়া সে সকালে উঠিয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সহিত যাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিতে। তাহার সঙ্গী ছিল লীলা।

বেলা সাড়ে সাতটার বেশী হইবে না, কিন্তু এরই মধ্যে রোজের তেজ বেশ একটুখানি শ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণার উজ্জল গোরবর্ণ মুখ থাকিয়া থাকিয়া আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, রেশমী ছাতাতেও তাহার কোনোই সুবিধা হইতেছিল না। লীলা রোদ গরম সব অগ্রাহ্য করিয়া মনের আনন্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণার ডাকে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিতেছিল। গিরিধির পথের লাল ধূলা তাহার চকল চরণাঘাতে উড়িয়া উড়িয়া তাহার মাথার চুল অবধি রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল।

নিতান্ত এলোথেলো নিরাড়ম্বর ভাবে বাড়ীর বাহির হওয়া কৃষ্ণার কুস্তিতে লেখে নাই। এত সকালেও তাহার চুল বেশ পরিপাকী করিয়া এলো খোঁপা বাঁধা। পরণে একটি সবুজ রঙের ডয়েলের ব্লাউজ এবং সবুজ পাড়ের একটি শাড়ী। কাঁধে বেশ চওড়া একটি ‘গোল্ড ষ্টোনে’র ব্রোচ। পায়ে সাদা রেশমী মোজার উপর উঁচু হীলের সাদা জুতা। পথে যে ছুই চারিটি গাছ তখন চলিতেছিল, প্রত্যেকেই এই রূপসী তরুণীকে বেশ একটু ভাল করিয়া না দেখিয়া গেল না, কারণ তাহার সৌন্দর্য্যট, বাঙালী

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অপেক্ষা অনেকখানি উচ্চদরের ছিল, এবং উহা সম্বন্ধে কৃষ্ণার সচেতনতারও অভাব ছিল না। মেয়ে মহলে ইহা লইয়া সমালোচনা চলিত যথেষ্ট। কৃষ্ণা যে খুবই স্বন্দরী কি না, সে-বিষয়ে মতভেদ অনেক সময় দেখা গেলেও, সে যে অবস্থার অতিরিক্ত বিলাসিতা করে, এ বিষয়ে কোনই মতভেদ দেখা যাইত না। কোথাকার কুড়নো মেয়ে তার ঠিক নাই, তাহার আবার অত বিবিধনো কেন বাপু? এ সব সমালোচনা কখনও যে কৃষ্ণার কাণে না যাইত, তাহা নহে, কিন্তু নিজের স্বন্দর সম্মত নাসিকা অবজ্ঞায় কৃষ্ণিত করিয়া সে যেন আরো শিগুণ উৎসাহে আপনার মতেই চলিতে থাকিত।

নির্দিষ্ট গৃহে পৌছিয়া, কৃষ্ণা ছাতা মুড়িয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। একটি ছোট ছেলে তাহাকে খবর দিল যে মা বাড়ী নাই, বাবা বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। অভাবপক্ষে তাঁহারই সহিত কথাবার্তা করিয়া সব স্থির করিয়া লওয়ার আশায় কৃষ্ণা ছেলোটর পিছন পিছন বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্থামী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কৃষ্ণা বলিল, “আমি একজন সখী খুঁজছি। আপনারা যাচ্ছেন শুনে, জান্তে এলাম কবে যাবেন। আমি সঙ্গে এলে কি আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে?”

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, “অসুবিধা হবে কি রকম? অসুবিধা হ’লে আপনারই হবে। আমার ছেলে-মেয়েগুলো কি রকম জানোয়াব দেখেছেন ত? আপনার হাড় জালিয়ে তুলবে এক ঘণ্টার মধ্যেই। পঞ্চু নাকি সেদিন বেলায় চোখে বাগি দিয়ে দিয়েছে?”

কৃষ্ণা বলিল, “কোথায়? খেলতে খেলতে একটুখানি লেগে গিয়ে থাকবে। আমার হাড় খুব শক্ত, সহজেই জলে না। আপনারা কি পরশু যাবেন?”

পঞ্চু বাবা বলিলেন, “গাড়ী রিসার্ভ ক’রে যেতে হবে আমাদের, তা না হ’লে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গিম্মির বড় অসুবিধা হয়। পরশু না পাই, ত তার পরদিন যাব।”

কৃষ্ণা বলিল, “আচ্ছা, আমি আসি তাহ’লে। আমার টিকিটটাও আপনি তাহ’লে ক’রে দেবেন। আমি বাড়ী গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

গৃহস্থামী বলিলেন, “টাকার জন্তে বিছু ওড়াতাড়ি নেই। একটা ‘একট্টা’ টিকিট আমার গাড়ী রিসার্ভের জন্তে নিতেই হয়েছে, আপনি যখন হয় টাকা দিতেই হবে।”

কৃষ্ণা আবার লীলাকে লইয়া পথে বাহিব হইয়া পড়িল। পথ এখন তাতিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে। লীলার খালি পায়ে পাছে ফোঁস পড়িয়া যায়, এই ভয়ে কৃষ্ণা তাহার হাত ধরিয়া খুব বন্দন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হিসাব করিতে করিতে চলিল, তাহার হাতে কত টাকা আছে, এবং তাহার খরচ কত পড়িবে। খোপা এখনও তাহার কাপড় দিয়া যায় নাই, সেও এক মুস্থিলের কথা। বাড়ী গিয়াই চাষরটাকে তাহার সম্মানে পাঠাইতে হইবে। টাকার হয়ত এবটু টানাটানিই পড়িবে। টিকিটের দাম দিয়া, গাড়ীভাড়া, কুলিভাড়া, প্রভৃতির জন্ত টাকা দশ হাতে রাখিলে, লীলা, বেলাদের কিছুই কিনিয়া দেওয়া চলিবে না। নিতাস্ত তুই চারি আন দামের জিনিষ দিতে তাহার কিছুতেই মন গুঠে না। প্রতিবার ছুটির সময়েই প্রায় তাহাকে ইহাদের বাড়ী আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহার বিছু কৃষ্ণার কাছে থাকিবার বা খাওয়ার খরচ লন না। তাই, পরের অন্ন ধ্বংস করা লজ্জা কাটাইবার জন্ত কৃষ্ণা প্রতিবারেই ছেলেমেয়েদের তত্ত্ব বেশ কিছু খরচ করিয়া উপহার কিনিয়া আনে, অথবা ঘাইবার সময় কিনিয়া দিয়া যায়। ইহারা তাহার পালিকা মাতার অনেক কালের বন্ধু। সেই হিসাবে কৃষ্ণাকে বাড়ীর মেয়ের মতই আদর যত্ন করেন, কিন্তু বিনা প্রতিদানে কেবল উপকার গ্রহণ করিতে কৃষ্ণার দৃষ্ট মন বড়ই সঙ্কচিত হইয়া পড়ে। তাই সে এই উপায় বাহির করিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার যে রকম টাকার টানাটানি, কি করিয়া সে সে কি করিবে, বিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পিছন হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, “কি গো স্বন্দরী, এত উর্দ্ধ্বাসে কোথায় চলেছ?”

কৃষ্ণা পিছন ফিরিয়া লাগণ্যকে দেখিয়া বলিল, “কোথাও চলছি না, বাড়ী কিবুছি। পঞ্চুদেব বাড়ী গিয়ে-ছিলাম যাওয়ার ঠিক কর্তে। তুই কোথায় যাচ্ছিল এখন? কবে যাওয়া ঠিক করব? আস না।”

লাবণ্য বলিল, “না ভাই, এখন আর যাব না, অনেক-
গুলো শেলাই বাকি, বাড়ী গিয়ে তাই নিয়ে পড়ব এখন।
জানিস ত মা এসব কিছুই পারেন না, ভাইবোনদের সব
শেলাই আমাদের ছুটির সময় এসে ক’রে দিতে হয়। তা
পঞ্চদশ বাড়ী যাবার ক্ষেত্রেই এত সাজ করেছিস? কার
মনোহরণ করবার ক্ষেত্রে এত ঘটা? বাড়ীর ছোটতম
যুবকটিরত বয়স আট বছর, তাকেই ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায়
আছিস নাকি? বাবা, শাড়ী, ব্লাউজ, ম্যাচ-করিয়েই
অল্প লোকে পরে, তোর আবার জুতো মোজা ছাতা অবধি
ঠিক মানান-সই হওয়া চাই। “সবুজ” ছাতার নীচে
টুকটুকে মুখখানি বেশ ফুলেব মত দেখাচ্ছে। দিনে
ক’ঘণ্টা এ বিষয়ে study করিস রে?”

কৃষ্ণা তাহাকে চিমটি কাটিয়া বলিল, “চক্ষিণ ঘণ্টাই।
আমার আর ভাববার কি আছে বল? তুই কবে যাচ্ছিস,
বলি না?”

লাবণ্য বলিল, “দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই যাব হয়ত।
এবার বাবাই দিয়ে আসবেন, বল্লেন, কাজেই আর সঙ্গীর
ভাবনা ভাবছি না।”

কৃষ্ণা বলিল, “এবার কিন্তু গিয়েই চোখ কান খাড়া
রাখিস। যদি কোন কাজ খালি হয়, তখনি আমাকে
জানাতি। আমার আর ঐ খ্রীষ্টানী স্কুলে কাজ করবার
মোট ইচ্ছা নেই। তা ছাড়া মাইনেও বড় কম, আমার
একলা মাছষেবই খরচ চালানো দায় হ’য়ে ওঠে। সত্যি
এবার আমেরিকা যাবার স্কারশিপটা পেলে বেঁচে যাই।
এই অর্ধ পয়সার হিসাব ক’রে চলতে চলতে আমার ত
প্রাণ গেল।”

লাবণ্য বলিল, “মেয়ে স্কুলেব চাকরী ত হরদমই খালি
হচ্ছে, ভাই। আসল চাকরীর সন্ধান পেলেই সব
লেজ তুলে চম্পট, বিশেষ ক’রে অল্পবয়সী টিচার-
গুলি। তাদের চাকরী নেওয়া নিতান্ত একটা সময়
কাটাবার occupation, বর যতদিন না জোটে। মিসেস
চন্দ্র ত বলেন, এবার সব married টিচার নেবেন, নয়ত
এমন দেখে নেবেন, যাদের বছর পঞ্চাশ বয়স হ’য়ে
গিয়েছে, তা হ’লে তারা আব হ’য়াস কাজ ক’রেই পালাবে
না। সত্যি, term-এর মাঝখানে কাজ ছেড়ে দিলে

মেয়েদের বড় ক্ষতি হয়। তা মাইনে কিন্তু এখানেও খুব
বেশী না, তা আগে থেকে ব’লে রাখছি। ওখানে যা
পাচ্ছিস, তার চেয়ে বড় জোর দশ পনোরো টাকা বেশী
হ’তে পারে।”

কৃষ্ণা বলিল, “ভাই বা মন্দ কি? তেল সাবান
ইত্যাদির খরচটা ত উঠে যাবে?”

লাবণ্য তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, “নে
নে, থাম, আর বেশী বড় মানুষী ঢং দেখাতে হবে না।
তুই বুঝি মাসে দশ পনোরো টাকার তেল সাবান মাখিস?
এইক্ষেত্রে সবাই তোর এত নিম্নে রটায়, যা বা না করবি,
তাও ব’লে বেড়াবি।”

কৃষ্ণা বলিল, “নিম্নে করুল ত বয়ে গেল। আর
কারো টাকায় ত করি না? নিজের টাকায় যদি আমি
মাসে আড়াই মণ তেলও মাখি, তাতে তাদের গায়ে
ফোঁস পড়ে কেন বে? আমার কেউ নেই ব’লে বুঝি
আমাকে সার্বাঙ্গ ছেঁড়া কাপড় পরে আর ছাই মেখে
বেড়াতে হবে! দেখ, এইক্ষেত্রে আমার আরো অনেক
বেশী টাকা হাতে পেতে ইচ্ছা করে। যদি ইচ্ছা হয়,
আমি মুঠো মুঠো ক’রে রাস্তায় ফেলে দেব, ইচ্ছা হয়ত
কাউকে পাঁচশ টাকা কি হাজার টাকা দিয়ে দেব।
সংসারে যজ্ঞ এই দেখি যে, পরের দুঃখটা লোকে খুব
উপভোগ করে, পরের সঙ্গে ভেউ ভেউ ক’বে ক’দবার
লোক সর্বদাই জুটবে, কিন্তু পরেব সুখসমৃদ্ধিতে হাসবার
লোক বড় কম। কারো কিছু সুখের কারণ হয়েছে
শুনলে বেশীর ভাগ লোকেরই যেন গলায় ভাত আটকে
যায়।”

লাবণ্য বলিল, “তা ত ধাবেই। সংসারে হিংস্রটের
ত অভাব নেই? আচ্ছা, তুই এগো, গরমে একেবারে
লাল হ’য়ে গেছিস। আজ বিকেলে যাব এখন।”

কৃষ্ণা লীলাকে লইয়া আবার চনিতে আরম্ভ করিল।
বাড়ী পৌছিয়া, জুতা মোজা খুলিয়া, কাপড় বদলাইয়া সে
জিনিষ গোছানোর কাজে লাগিয়া গেল। বই খাতা
প্রভৃতি বাহা কিছু বাহিরে ছিল, সব জোগাড় করিয়া এক
জায়গায় আনিয়া রাখিল। চাকরটাকে ধোপার বাড়ী
পাঠাইয়া নিজের ট্রাক খুলিয়া তাহার ভিতরকার জিনিষ-

পক্ষ সব বেশ পরিপাটি করিয়া গুছাইতে লাগিল, তাহা না করিলে সব জিনিষ ইহার ভিতর কুলায় না। কাপড়-চোপড় নাড়ানাড়ি করিতে করিতে দুই টুকরা রেশম বাহির হইল। একটি কিকা নীল রংএর অশ্রুটি সোণালী। নিজের ব্লাউস তৈয়ারী করিবে বলিয়া কৃষ্ণা এ দুটি টুকরা কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু ছুটির মধ্যে আলস্র করিয়া আর সে কিছু করে নাই। এখন হঠাৎ ঞ্গুলির উপর চোপ পড়াতে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। তাবিল, “এইগুলো দিয়ে লীলার একটা, বেব্বার একটা জামা হ’য়ে যাবে। কিছু খেলো জিনিষও হবে না, বেশ দামী সিঙ্ক। তা হ’লে এখনকার মত ঠীকার টানাটানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। থোঁকাকে এখন থেকেই কিছু ভাল দেখে কিনে দেব এখন। কিন্তু সময়ই বা কোথা? আজ ছপু’রেই যদি আবখ্যার ওখানে গিয়ে সেলাই স্বরু করি, তা হ’লে হয়। দেখা যাক্।”

ইতিমধ্যে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ধোঁপা আর ষণ্টাখানেকের মধ্যেই কাপড় লইয়া আসিবে। বানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণা তখন স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া, তাড়াতাড়ি ভাল ভাত বাহা পাইল, সুখে ছুটি গুজিয়া, সে রেশমের টুকরা ছুটি ও শেলাইয়েব লব সরঞ্জাম লইয়া লাবণ্যদের বাড়ী যাইবার জন্ত পথে বাহির হইয়া পড়িল। আর বেশী দেবি করিলে হয়ত গরমের জন্ত আর রাস্তায় চলাই যাইবে না।

লাবণ্য বলিল, “কিবে, হঠাৎ যে এমন অসময়ে?” কৃষ্ণা বলিল, “মহা কাজ নিয়ে এসেছি। লীলা, বেব্বার এ জামা দুটো কাপড়ের মধ্যে শেষ করিতেই হবে। তোর প্যাটান বইটা শিগগির বার কর্।”

সারা ছপুর কেবল কাটা, জোড়া দেওয়া, সেলাই কবা চলিতে লাগিল। দুই সখীরই ঘেন আর নিখাস ফেলিবার সময় নাই। লাবণ্য মাঝে একবার নাওয়া-খাওয়া করিতে উঠিয়া গেল। তাহার ছোট ভাই বোনরা ছ-চার বাব ঘরের ভিতর ঘোরাঘুরি নাচানাচি করিয়া

গেল, কিন্তু কৃষ্ণার বিষম গম্ভীর ভাব দেখিয়া আর বেশী কিছু করিতে সাহস করিল না।

বিকালের দিকে কৃষ্ণার ঘাড় পিঠ সব ব্যাণ্ড করিতে আরম্ভ করিল। আর কাজ করা চলিবে না বুঝিয়া সে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া উঠিয়া পড়িল। লাবণ্য বলিল, “এই চা খেয়ে যা! সারাদিন ব’সে থেকে ঠিক এই সময় উঠ’ছিস্ যে বড়? এখন তোকে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে মা আমাকে খুব বকবেন।”

কৃষ্ণা মিনতি করিয়া বলিল, “না ভাই যাই এখন। গরমে মাথা কেমন করছে, বাড়ী গিয়ে আর এববার স্নান করব। আর ধোঁপাটাও কাপড় দিয়ে গেল কিনা দেখতে হবে। আমার আবার কালকের মধ্যে সব গোছগাছ হওয়া চাইত? পরন্তু যদি ওরা গাড়ী রিসর্ভ পায় ত পরন্তুই চ’লে যাবে, সেদিন আর কিছু গোহাবার সময় পাবো না।”

লাবণ্য বলিল, “তা হ’লে কাল রাতে এসে আমাদের সঙ্গে খাবি, কথা দিয়ে যা। কবে থেকে ভাব’ছি, তোকে একদিন খেতে বলব, তা এর অস্বস্তি, ওর অস্বস্তি লেগেই আছে। আর এই ছোট ক্রকট রেখে যা, আমি ওটা শেষ ক’রে রাখব।”

কৃষ্ণা রাজী হইয়া জিনিষ-পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ধোঁপা কাপড় দিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার খুব ভাল একটা ঢাকাই শাড়ী দেখে নাই। চাকর আসিয়া খবর দিল যে, ধোঁপা বলিয়াছে শাড়ী সে কাল পরন্তু মধ্যে নিশ্চয় আনিয়া দিবে, “আচ্ছাসে তৈয়ার” হয় নাই বলিয়া সে আজ আনে নাই

“পরন্তু আসলে ত আমি কৃতার্থ হ’য়ে যাব একেবারে,” বলিয়া বিরক্তিতে জ্র কুঞ্চিত করিয়া সে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। গরমে তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। একখানা খবরের কাগজ পাঠ করিয়া বাতাস খাইতে খাইতে সে ভাবিল, “এত রোদের মধ্যে না এলেই পাবতাম।”

বানিক পরে উঠিয়া পড়িয়া সে স্নান সারি” আসিল। কালো চুলেব রাশে বাতাস করিতে করিতে জিনিষ-পত্র গোছানয়ন মন দিল। বেলা ছুটিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, “দিদিমণি, তুমি চ’লে যাচ্ছ ? এবারে আমার খেলনা দিয়ে গেলে না ?”

কৃষ্ণা বলিল, “এবার ভোর জন্তে হুন্দর সিন্ধের ফ্রক তৈরি করছি। দেখিস্ এখন কাল।”

বেলা উৎসুক হইয়া বলিল, “না, এখন দেখব।” কৃষ্ণা বলিল, “এখন ত এখানে নেই। সেটা লাবণ্য দিদির কাছে আছে, সে শেলাই করছে। কাল শেলাই হ’য়ে গেলে নিয়ে আসব।”

রাত্রি হইয়া আসিল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া জিনিষ-পত্র বেনীর ভাগ গোছাইয়া, কৃষ্ণা আজ কিছু সকাল সকালই শুইয়া পড়িল। ধোপা তাহার শাড়ী না দেওয়াতে মনটা তাহার একটু বিরক্ত হইয়াই রহিল। সারা রাত প্রায় স্বপ্ন দেখিল যে, হারানিধির অশেষণে সে গিরিধিময় ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই পঞ্চদশ বাড়ীর চাকর খবর দিয়া গেল যে, কালই গাড়ী রিসার্ভ পাওয়া গিয়াছে, সূতরাং তাহাদের যাত্রা স্থির। কৃষ্ণার মহা তাড়াতাড়ি লাগিয়া গেল। চাকরকে এবার ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া সে ছুটল লাবণ্যদের বাড়ী শেলাই শেষ করিতে। সারাদিন দুই বন্ধু অবিশ্রাম খাটিয়া ফ্রকগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। বিকাল হইয়া আসিল দেখিয়া লাবণ্য বলিল, “আর এখন বাড়ী গিয়ে কি করবি ? মুখ হাত এখানেই ধুয়ে নে, কাপড় ছাড়তে চাস্ তাও দিচ্ছি। একেবারে রাত্রে খেয়ে দেয়ে যাস্। আমাদের বাড়ী খেতে বেশী দেবি হয় না, সব বাচ্চা-কাচ্চা দল, ন’টার মধ্যেই খাওয়া চুকতে হয়।”

চুল ঝুঁকিয়া, মুখ হাত ধুইয়া দুই সখীতে বাড়ীর সামনেই একটু বেড়াইতে চলিল। লাবণ্য বলিল, “লীলার ফ্রকটাই বেশী ভাল হয়েছে, তবে মেয়েকে কেমন মানাবে বলতে পারি না। বুরংটা শ্রামবর্ষে সব সময় মানায় না।”

কৃষ্ণা বলিল, “কেন, লীলা এমন কিছু ত কাল নয়, একরকম মানিয়ে যাবে এখন। কিই বা করি বল ? এখানে ত আর ইচ্ছামত জিনিষ সব সময় পাওয়া

যায় না ? খোকাকে খেলনা কিনে দিলাম, আট দশ টাকা খরচ ক’রে, তাও কিছু পছন্দ মত জিনিষ হ’ল না।”

খাওয়ার ডাক পড়ায় তাহারা ভিতরে চলিল। ফিরিতে রাত হইয়া গেল, কাজেই আসিয়া শুইয়া পড়া ছাড়া কৃষ্ণার আব কিছু করিবার রহিল না।

বিদায়ের সময় বাড়ীর সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। লীলা, বেলা, দিদিমণির দেওয়া নূতন সিন্ধের ফ্রক পরিয়া তাহার সহিত ষ্টেশনে যাইতেছিল, কাজেই তাহাদের মুখে তখনও হাসি। কৃষ্ণা অনাস্বীয় হইলেও, এবাড়ীতে আস্বীয়ার ব্যবহার পাইত এবং করিতও। তাহারও মনটা এই শিশুগুলিকে ছাড়িয়া যাইতে একটু কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু জগতে কিছুই প্রতি মমতা করিয়া লাভ কি তাহার ? সে ছোট খোকাকে কোলে লইয়া, চুমা খাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “এবার গিয়েই একটা তার ক’রে দিও মা। সেবার তোমার চিঠি আসতে ছ’ সাত দিন দেরি হ’ল, আমি ত ভাবনায় মরি। মেয়ে ছেলে হাজার শক্ত সমর্থ হ’লেও তাণের পথে ছেড়ে দিয়ে প্রাণে স্বস্তি থাকে না।”

ট্রেন ছাড়িতে একটু দেরি আছে দেখা গেল। কৃষ্ণা সে সময়টুকু লীলা, বেলাকে লইয়া প্লাটফর্মে ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, তখন লীলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “জান দিদিমণি, মা বলেছেন, এর পরের বছর থেকে আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব আর আসব। আমিও স্কুলে ভর্তি হব কি না ?”

কৃষ্ণা বলিল, “পরের বছর আমি হয়ত বিলেত চ’লে যাব, কি ক’রে তুমি যাবে আসবে আমার সঙ্গে ?”

লীলা বলিল, “ই, তুমি বিলেত যাবে কেন ? সেখানে ত কেবল মেমরা যায়।”

কৃষ্ণা বলিল, “আমিও ত মেম ? দেখিস্ না, লাবণ্য-দিয়া আমার মেম সাহেব ব’লে ডাকে ?”

বেলা ঝাঁকড়া চুল শুকু মাথাটা দোলাইয়া বলিল, “না, তুমি কক্ষনো মেম না। তুমি ত শাড়ী পর। মেমরা

ঘাঘরা পরে, আব শাদা মোজা পরে, পা বার ক'রে বেড়ায়।”

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। চাকরের হাতে লীলা, বেলাকে গছাইয়া দিয়া কৃষা গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীর ভিতর ইতিমধ্যেই মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পক্ষু ও তাহার ছোট ভাই জানলার পাশে বসিবার

অধিকার সাব্যস্ত করিতে মুষ্টিযোগের স্মরণ নইয়াছে। কৃষা ভিতরে আসিতেই তাহাদের পিতা হাসিয়া বলিলেন, “এই দেখুন, কি রকম সব জন্তু নিয়ে আমার ঘাঘরা আসা করিতে হয়। আপনি আবার আমাদের অস্থিতি করার ভাবনা ভাবছিলেন।”

এ নগাঃ

পল্লী-সংস্কার-কার্যে অর্থের কথা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এ-কথা আজ হলের মত সহজ সরল বোধ হইতেছে যে, পল্লীর সমষ্টিগত উন্নতিই হইল দেশের উন্নতি—দেশোন্নতি পূৰ্ব্বক কোনও জিনিষ নহে। পল্লীগুলিকে ধর্মে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ধন-সম্পদে উন্নত করিতে পারিলে দেশকেই উন্নত করা হইল। সুতরাং পল্লীর উন্নতি ভিন্ন দেশোন্নতি অপর কিছু নহে। তাই বিপ পচিশটা সহর শিক্ষা-নীক্ষায়, ধনসম্পদে উন্নত হইলেও দেশ যে, তাহার পক্ষেতে পল্লীর সর্ব প্রকার দীনতার কুণ্ঠিত হইয়া থাকে একথাটা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। পল্লীর সংস্কার অত্যাবশ্যক, এজ্ঞ কৰ্ম্ম চাই, ধন চাই। কৰ্ম্মের কথা বলিব না, তাহার অস্তাব নাও হইতে পারে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পল্লীতে কৰ্ম্মের অস্তাব নাই, তা হ'লে অর্থই বা আসিবে কোথা হইতে? সংস্কারের জন্ত বহু অর্থের প্রয়োজন। পল্লীবাসীর নিকট পল্লীজীবনই ভরসাভাষ্য দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, ছাবেলা পেট ভরিয়া আয়ের সংস্থান হইয়া উঠিতেছে না, অন্নচিন্তা চমৎকার। অল্প বিষয়ে ভাবিবার চিন্তিবার অবসর নাই—তা দে মতই ভবিষ্যৎ উন্নতিকর হোক না কেন। আজ বাঁচিলে ত কাল। আজকের বাঁচাটাকেই জিয়াইবা রাখা মুশিল। দু'চারজন ত্যাগী কৰ্ম্মকে বাদ দিয়া, এইত হইল পল্লীর সাধারণ লোকের ভিতরকার কথা। যেমন চলিতেছে সেইটাইত ক্রমে অচল হইয়া আসিতেছে—তাহা হইতে কতটুকুই বা দেওয়া চলে বার উপর নির্ভর করিয়া পল্লী-সংস্কারের জগন্নাথের রথ সচল হইয়া উঠিবে? আমাদের অনেক অনুষ্ঠান সভা সমিতির তিরোধানের একমাত্র কারণ অর্থান্ধতা, সুতরাং পল্লীসংস্কারের অর্থের দিক্‌টা যদি আমরা প্রথমেই খুব ধোবতার সহিত সমাধা করিয়া না লই তবে অজ্ঞান অনেক প্রতিষ্ঠানের জায় পল্লীসংস্কার-প্রচেষ্টাও মধ্যপথে অচল হইয়া পড়িবে, দেখবজু দাশ পল্লীসংস্কার কল্পে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ কত জানি না, তাঁর বাঞ্ছিত পল্লীসংস্কার কল্পে যে পল্লীসমিতি গঠনের চেষ্টা চলিতেছে—কাগজেপত্রে দেখা যায়, কয়েকটি পল্লীতে পল্লীসমিতি স্থাপিতও হইয়াছে—ঐ সকল সমিতির গঠনকার্যে অর্থের সংকুলান কোথা হইতে হইবে বা হইতেছে? উপযুক্ত ধনভাণ্ডার হইতে ত? অপর কোথাও হইতে ত? চালা টাকা আসিতেছে এবং পল্লীতে পল্লীতে তাহার দ্বারা শিক্ষা, চিকিৎসা, জলাশয় খনন, খানাদোবা জরাজীর্ণ—কি পরিষ্কার করা ইত্যাদি কার্য চাৰিতে থাকিল ইহাতে যেমন দেশ-অ-

বোধের কন্মতি থাকে তেমনি স্বাবলম্বনের মূলনীতি হু হয়। এত অর্থই বা সংগ্রহ হইবে কোথা হইতে? সেইজন্য মনে হয় প্রত্যেক সমিতির সহিত অজ্ঞানভাবে যদি একটি করিয়া অর্থহীন ব্যবসায় চলিতে থাকে ত তাহার লাভ হইতে গঠন-কার্য হুচল্লরূপে লিভ হইতে পারে। মাসিক বা বাৎসরিক টাকা কিবা ত্যাগীকৰ্ম্মের শারীরিক পরিশ্রমে কার্য বেশীদূর আগাইবে বলিয়া মনে হয় না, যেনও ২১১ টা পল্লীতে বিশেষ কোনও দেশভক্তের দানের অর্থে কতক কার্য হইতে পারে মাত্র কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। সর্ব্বত্র ইহা সম্ভবও নয়, এই ব্যবসায়ের মূলধন Share Systemএ শেরার হিনাবে, তোলা উঠে তাহাতেও আশাহুত্ব অর্থ সংগ্রহ সম্ভবপর নয়, কারণ গঠন-কার্য বহু ব্যয়সাধ্য। সম্ভবতঃ ২১০ হাজার টাকা মূলধন চাই, Share Systemএ যত অল্পই হউক তোলাব আবশ্যকতা এই যে, ইহাতে ব্যবসায় প্রত্যেকের স্বার্থযুক্তি একটা বেগ থাকিবে, বাকি অর্থ দেশবদ্ধ-পল্লীসংস্কারের ধন-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হউক। বৈশাখ সংবা প্রবাসীতে ‘ভাণ্ডার’ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত ‘সমস্যা ও আদর্শ-পল্লী’ প্রবন্ধে উপরোক্ত Share Systemএ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় পাটাইয়া তাহার লভ্যাংশে পল্লীসংগঠন কার্য চালাইবার আলোচনা আছে, তবে তিনি মাত্র Share বিক্রয় বরা মূলধন তোলাব কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই বিশেষ সম্ভেদ, কারণ কোনও পল্লীর এমন সচ্ছল অবস্থা নহে যে, Share শেরার বিক্রয়ে সম্ভবতঃ ২১০ হাজার টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। তিনি যে হুত্ব সরবরাহ, Poultry প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন তাহা খুব সুচিন্তিত। মোটামুটি কথা—প্রত্যেক সমিতির সহিত একটি করিয়া অর্থকরী ব্যবসায় চালাইবার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত দরকার, উহার মূলধন কতক—চতুর্থা সম্ভব—পল্লীবাসীদের কাছে Share বিক্রয় দ্বারা সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ—যেই অল্পটাই বেশী হইবে—দেশবদ্ধ-পল্লীসংস্কারের ধনভাণ্ডার হইতে বিনা হুদে দেওয়া হউক। এমন নিয়মও অদ্বৈত নয় যে পল্লীবাসীরা যত অর্থ সংগ্রহ করিবেন তাহার ৩ কি ৪ ভাগ অর্থ ধন-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইবে কি এমন কিছু। এই ব্যবসায় পরিচালনা পদপর উপরিতন সমিতি—যেমন পল্লীগুলির মহকুমী, মহকুমার উল্লর ছেলা সমিতি কিবা বোর্ড করিবেন, এ বিষয় চিন্তা করিবার ইচ্ছা দেশবদ্ধ-পল্লীসংস্কার সমিতির প্রধান কর্ম্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুরাতনী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

১

পুরাতন বাস্ত-ভিটা, অতি উচ্চ শিখবে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান ; বিজ্ঞান-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভোতলে বেষায় স্বদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার,
নভোরত তরুশির—নীলে ও শ্রামলে একাকার ।—
তারি পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেঘুর ।
অশ্বখ, তিস্তিড়ী, তাল, শিমুলের কচিং সিঁদূর,
বেণুশীর্ষ, আশ্র আশ্র পনসের ঘনপত্রভার
ঢেকে আছে ধরণীয়ে । উর্দ্ধে শৃঙ্গ মহা নীলাঘর,
নিম্নে হরিতের মেলা ; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুপুখে কাননের উদাস মর্ম্মর,
নীরব উদয়-অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান ।—
এই মোনী প্রকৃতির হ্রস্ববিড় অরণ্য-বাসর,
এই হোর কবি-ধাত্রী—জনহীন সবুজ অশ্রান ।

২

আমার নয়নে শুধু বর্ণ আর বিপুল প্রসার—
নিতরূপের ছায়া, মেঘ-মায়া সন্ধ্যায় প্রভাতে,
দৃষ্টি মোর ডুবে যায় নীর-হীন নীরব-শোভাতে—
ধরণীর চতুঃসীমা-ভরা ওই বিটপী-বিধার ।
কাণে নয়—প্রাণে জাগে হৃগম্ভীর ধ্বনি অনিবার,
বসি যবে মহামোনী স্ববিরাট কানন-সভাতে—

স্বদূর-কালের শ্রোত মেঘ-মল্ল মুগ্ধ-মাঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে বৃকে—অতীতের শুক হাহা কার ।
দাঁড়ায় আমারে ঘিরে' মোর সেই পিতৃ-পিতামহ—
বৃং-কালের সাক্ষী, বহুযুগ-যুগান্ত স্বপন
ভরি' দেয় আশিপাতা । জন্ম মৃত্যু-ভাবনা হুঃসহ
ভুলে যাই, চিন্তে মোর কল্পনার নৌল আলেপন
স্নিগ্ধ করে সর্ব ব্যথা ; পুরাতন এ বন-ভবন
বহিছে কত না স্মৃতি, তারি ধ্যান করি অহরহ ।

৩

জ্যোৎস্নারাতে, ভয় পূজামণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে
যে গম্ভীর কালো ছায়া প্রেতসম উঠিছে গুমরি',
হেরি' তাবে মনে হয় আন্ধও সেই উৎসব-বীশরী
বাজিছে ককণ সুরে, আধ'-আলো অন্ধকার-তীরে—
সেদিনের প্রতিবিম্ব কাঁপে মোর নয়নের নীরে ।
গৃহে আসি' কবে কোন্ নববধু নুপুর বিমরি'
রেখেছিল পা' ছায়া নি যে ইষ্টক-ফলক উপরি—
সে ওই রয়েছে পড়ি' এক কোণে ভবন-বাহিরে ।
স্মৃতির সমাধি 'পরে বসে' দেখি সেদিনের ছবি,
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে,
চেয়ে থাকি, যেই দিকে অস্ত গেছে গৌরবেশ রবি,
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথ-স্বপনে ।
যে স্বর ফুরায়ে গেছে, কিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি ।

উর্বশী ও পুরুষ

শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

(২)

পুরুষের গৃহ হইতে উর্বশী স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে।
আসন্ন-বিরহ-কাতর পুরুষ উর্বশীকে পিছন হইতে ডাক
দিয়া বলিতেছেন—হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে—

“দাঁড়াও, জায়া। গহন তোমার মনোভাব, বিরূপ আমার উপর।
এস পরম্পরের মনের কথা আমরা বুঝিয়া বলি, আমাদের উত্তরেরই
অবিদ্যৎ কল্যাণের ও হৃদয়ের জঙ্ঘা।”

মাছুষের মনোময় চেতনায় নামিয়া আসিয়াছিল
বৃহত্তর অতিমানসের আনন্দময়ী জ্যোতির্ময়ী উষা।
উপরের দিব্যসত্তা যখন এই জগতে প্রথম প্রকাশ পায়,
তখন সাধকের প্রাকৃত স্বভাব তাহাকে চাহে প্রাকৃত
চেতনারই মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে তাহার দ্বারা প্রাকৃত
বৃত্তি চরিতার্থ করিতে। * চিরন্তন সংস্কার-বশে,
অতীতের অভ্যাসের বশে মাছুষ তাহার প্রাকৃত প্রকৃতিতে
দেহ-প্রাণ মনকে প্রথমেই এই দিব্য চেতনায় তুলিয়া
ধরিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইতে চাহে না, পারে না। উপরের
যাহা কিছু উপলব্ধি হয় তাহা নীচের ক্ষুদ্র অহমিকার
তৃপ্তির জন্ত, ভোগের জন্ত ব্যবহার করিতে সে চেষ্টা
করে। মনোময় পুরুষের এই প্রয়াসের ফলে বৃহত্তর অধ্যাত্ম
চেতনা লোপ পাইতে থাকে, স্ব-স্থানে প্রস্থান করে। কিন্তু
একবার বৃহৎ আনন্দ আশ্বাসন করিয়া, মাছুষ সহজে তাহা
ছাড়িতে চাহে না, তাহার সহিত বুঝা-পড়া করিতে চাহে,
কেন, সে দিব্য উষা তাহার অন্তর্গত হইবে না, তাহার
মাছুষী চেতনার আনন্দ ও কল্যাণ বর্দ্ধন করিবে না।

* সরমা-পণি কণোপকথনঃ (১০ মণ্ডল-১০৮ সূক্ত) এই তথ্যটি
ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রাকৃত চেতনার শক্তি পণির উপরের জ্যোতি
চুরি করিয়া নিজেদের পর্বত-গুহার কঠিন জড়চেতনায় লুকাইয়া রাখিয়া-
ছিল—স্বর্গের দৃষ্টী সরমাকেও লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া নিজেদের
দলভুক্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। সরমা হইতেছে সাক্ষাৎ বুদ্ধি,
বোজেরা হয়ত ইহাকেই ‘বোণি’ নাম দিয়াছেন, পাশ্চাত্যের ভাষায়
Intuition।”

তখন দিব্য উষা উত্তর দিতেছে—

“আর আমাদের কথাবার্তার কি হইবে? আমি যে তোমার
জগৎ ছাড়িয়া স্ব-স্থানে পরপারের প্রতিষ্ঠানে চলিয়া আসিয়াছি। হে
জীবপুরুষ। তোমারও সত্য সত্তা এই পারাস্বরেই, এখান হইতে
উদ্ধৃত হইয়া তুমি অপরা প্রকৃতির মধ্যে নামিয়া জন্ম লইয়াছ। আমাকে
পাইতে চাও, আমার তবে আমার এখানে উঠিয়া এস; আমি
ত সহজে ধরা দিবার জিনিষ নই—পুনরন্তঃ পবেহি, ছরাপনা বাত
ইবামহম্মি।”

ইন্দ্রও এক সময়ে ঋষি অপত্যকে এই ধরণের কথাই
বলিয়াছিলেন (১ মণ্ডল, ১৭০ সূক্ত)। শুধু চিন্তাবিক্রির
জোরে ইন্দ্রের যে দিব্য-জ্ঞান তাহা পাওয়া যায় না
(অধীতং বিনশ্যতি); মাছুষের ভুল এইখানে যে মনের
সহায়ে সে মনের উপরে উঠিতে চায় (অতি মনসে),
মনকে উপরের কাছে শাস্ত করিয়া উৎসর্গ করিয়া
দেয় না (অশ্রভামিন্ন দিৎসসি।) তাই মধুচ্ছন্দাও
বলিতেছেন (১-৪-৪) দিব্যজ্ঞা (বিপশ্চিতং) ইন্দ্রের
জ্ঞানে যদি জ্ঞানী হইতে চাও তবে উঠিয়া পারাস্বরে
চল (পরেহি)।

বৃহত্তর, ভূমার আনন্দ ভোগ করিতে হইলে মাছুষকে
দেহ প্রাণ মনোময় প্রকৃতির অপসার্ক হইতে মুক্ত হইয়া
সং-চিং আনন্দময় পরাধ্ব (পবে অধ্ব ১-১৬৪ ১২) উঠিয়া
যাইতে হইবে—একথা সত্য, মাছুষের মধ্যে মাছুষী সত্তার
এই আগ্রত আরতনেই দিব্যের প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু সেই-
জন্ত ঐ পরাধ্ব সম্পূর্ণ স্থিতি লাভ করিয়া তবে অপসার্ককে
শুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, দিব্যের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া
সেখান হইতে তাহারই প্রতিভার মাছুষী তরুকে দিব্যরূপ
দিতে হইবে। নতুবা প্রাকৃত প্রকৃতিকে অসংস্কৃত রাখিয়া
তাহারই মধ্যে থাকিয়া দিব্য প্রকৃতিকে নামাইতে চেষ্টা
করিলে, সে চেষ্টা সফল হয় না। কিন্তু জীবপুরুষের প্রশ্ন,
উপরে সে উঠিবে কোন্ শক্তিতে? উপরের দেবী নামিয়া
আসিয়াছিল সকল শক্তি লইয়া, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে

চাহিলাম সেও চলিয়া গেল, আমার শক্তি-সামর্থ্যও দেখি লোপ পাইল—

“উক্ত পতির প্রেরণা কেল্লাচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর বেগ নাই, আর তাহার ধারা জ্ঞানজ্যোতি অধিগত হইতেছে না। কোন অধ্যাপক সম্পদই লাভ হইতেছে না। তপশক্তি হীনবীৰ্য্য, ইচ্ছন পাইতেছে না। দিব্যশক্তি সব আমাকে উর্দ্ধে চালাইয়া লইতেছে না, বৃহৎকৈ সচেতন সন্নিহা তাহার উর্বার অবকাশে আমার জীবনের নূতন জ্ঞানময় রূপ গড়িয়া তুলিতেছে না।”

এ রকম হইতে বাধ্য, যদি সাধক নিজের না উঠিয়া, উপরকে নীচে নামাইয়া নীচের প্রকৃতি দিয়া তাহাকে বাধিয়া রাখিতে গড়িতে চেষ্টা করে। উর্ধ্বশী এ কথার উত্তরে পুঙ্করবাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে—

“আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা তোমার কল্যাণের জন্ত। আমার স্বপ্ন-গৃহের জন্তই আমি দিব্যসম্প হাতে করিয়া আছি—তাই ঐ ঐহিকের গণী পার হইয়া আমি চাহিতেছি বৃহৎ গতি, আমি চলিয়াছি স্বপ্নে। তথায় যদি আমার সহিত মিলিত হইতে পার, তবে দিব্যরাজ্যে কখন আমাদের আর বিচ্ছেদ হইবে না, তবেই নিবন্ধিহ দিব্য আনন্দের ভোগ তোমার হইবে।”

বৃহৎ আনন্দের দিব্য ভোগের স্ব-গৃহ (স্বং দমং) বা স্বস্থান-(অন্তং অর্থাৎ যেখানে বা বাহ্য সত্য সত্তা) হইতেছে তুবীয় মহর্লোক, অতি-মানসের ভূমি—পরা বা দেবী প্রকৃতি। তাহার অস্তিত্বে, এ পারেই যে ব্যক্ত আধার বা অপরা প্রকৃতি তাহাই হইতেছে উর্ধ্বশীর স্বপ্নের ঘর। বৃহৎ চেতনা প্রথমে নামিয়া আসিয়াছিল মনোময় চেতনায় পূর্ক চিত্তরূপে, তাহাকে উপরের চেতনার পূর্কভাস পূর্কাস্বাদ দিবার জন্ত, সেইদিকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্ত, আবার সে উঠিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিতেছে, মনোময় চেতনাকে সঙ্গে করিয়া উর্দ্ধে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্ত। তাই উর্ধ্বশী আবার বলিতেছে—

“আমি যখন তোমার গৃহে ছিলাম তখন দিনে তিনবার তুমি আমাকে উপভোগ করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আমার তৃপ্তি সাধন করিয়াছ। তোমার ভিতরের যে উর্দ্ধমুখী আকাঙ্ক্ষা তাহাই আশ্বাসে আমি তোমাতে প্রকট হইয়াছিলাম—তুমি বীরসাধক, তাই তুমি আমার সিব্য তত্ত্বের রাজা হইতে পারিয়াছিলে।”

সাধকের পক্ষে দিন হইতেছে প্রকাশের কাল * অর্থাৎ যে অবস্থায় সাধক পায় নব নব উপলব্ধি সিদ্ধি ক্রমগতি ;

* ইলাহীসম্পদে হুদিনে অল্পাঃ—৩-২০-৪ ; ইলার পদ বা প্রতিষ্ঠান কি পবে ন্যাখ্যাত হইয়াছে।

আর রাজি হইতেছে সাধকের সাধনা যখন বাহ্যতঃ স্তম্ভিত হয়, অন্তর্মুখী হইয়া আবাব নূতন প্রকাশের জন্ত প্রস্তুত হয়। সাধনা দিব্যজ্ঞানের পরম্পরায় এই রকমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকাশের সময় জীবপুরুষ তিনবার দিব্য প্রকৃতিকে আলিঙ্গন দিয়া থাকে—কারণ প্রকাশের তিনটি ক্ষেত্র—দেহ প্রাণ মন ; বৈদিক ঋষির ভাষায়, পৃথিবী অন্তরীক্ষ চৌ।

উপরের চেতনার প্রথম বিকাশ ছ্যালোকে বা মানস প্রতিষ্ঠানে—মানস রূপান্তর দিয়াই দিব্যজীবনের আরম্ভ, সূর্য বা জ্ঞান দেবতা ইহাব অধিষ্ঠাতা। তারপর সাধকের মধ্যে সেই চেতনা আরও নামিয়া আসে, আরও গাঢ় হয়, তখনই প্রাণস্তরের রূপান্তর, বায়ু বা প্রাণশক্তি তাই অন্তরীক্ষেব অধিদেবতা। সকলের শেষে দৈহিক প্রতিষ্ঠানে জীবের দিব্য নবরূপ জাগ্রত মূর্ত অটুট হইয়া দাঁড়ায়—দিব্যকে এই পার্শ্বব সত্তায় কুঁদিয়া তুলিতেছেন যে দেবতা—তিনিই অগ্নি, এইজন্তই অগ্নির এত প্রাধান্ত, আমরা ইতিপূর্বে বসিষ্ঠের জন্মকথা যে স্মৃষ্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি সেইখানেই বলা হইয়াছে—

“তিনজনে ভুবনে ভুবনে রেষ্ট্রি করে (রেষ্ট্র অর্থ আনন্দ-ঘন—বসু ষাটু), তিনটি সন্তানের উৎপত্তি তাহাতে—তাহারাই হইতেছে আর্ধ্য, বাহার জ্যোতিকে সমুখে করিয়া চলিয়াছে। তিনটি তপ্তজ্যোতি উষাব সহিত সর্কদা সম্মিলিত।” *

অন্ততঃ আছে, “হে রূপজ্ঞ অগ্নি! তিনটি তোমার আয়ু, তিনটি উষা তোমার জনয়িত্রী।”†

উর্ধ্বশীর তিবোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে রাজি—নজং—আসিতেছে, তাহার মধ্যে সাধকের জাগ্রত অতুভূতি আশার কিছু দেখিতেছে না ; উপরের আশ্বাসবাণীতেও আর শ্রদ্ধা হইতেছে না। তাই পুঙ্করবা আবাব বলিতেছে—

“তোমার আবির্ভাবে যে দীপ্ত হৃৎসংবদ্ধ শক্তিরাজি আমার মধ্যে সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আমার কল্যাণের জন্ত বাহার আমার সাধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাহার আনিয়া দিয়াছিল হৃৎসংবদ্ধ, নব জাগরণে সেইসব তীব্র আবেগ এখন দেখি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, জ্যোতির ধারা-সমূহও দিব্যশ্রীর নিকে চাহিয়া আর গর্জিয়া উঠিতেছে না।”

* জয়ঃ কৃষ্ণি ভুবনেঃ রেষ্ট্রঃ, ত্রিশ্রঃ প্রজাঃ আর্ধ্যাঃ জ্যোতিঃ-অগ্রাঃ। চয়ঃ ঘর্ষাসঃ উষসঃ সচ্যন্তে—

৭-৩৩-৭

† জীনি আবুবাী তব জাহবেদঃ তিশ্রঃ জাজানীঃ উষঃ তে—৩-১৭-৩।

উর্কশী তখন পুরুষকে তাহার সত্যরূপ, তাহার জীবন-ব্রতের কথা স্বরণ করাইয়া প্রদর্শিত হইতে উপদেশ দিতেছে—

“জীবপুরুষ যেদিন জীবন-প্রতিষ্ঠানে নামরূপ ধরিয়া জন্ম লইয়াছে, সেই দিনই তাহার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে দেবশক্তিরও জন্ম লইয়াছে। তাহার দেহ-প্রাণ-মনের নিগূঢ় সত্তার আপনা হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে উপরের জ্যোতিরূপ রসায়িত ধারা—স্বলোকের অমৃতনিয়াম (বর্ষটী-রূপঃ—৫-২-১১) ; এই অমৃতত্ব, এই দিব্য আনন্দরসই পুষ্ট হইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে মানুষের সত্যপুরুষ। পুরুষকে দিয়া দেববৃন্দ চাহিতেছে দ্ব্যঙ্গলকে—অজ্ঞানের প্রাকৃত চেতনার শক্তিরাজীকে ধ্বংস করিতে, বৃহত্তের আনন্দে মানস চেতনাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে (বর্গলোকের অমৃতত্ব চুহানা—কাঠিক সংহিতা)।”

কিন্তু কই সে দিব্যশক্তি সব ? মানুষ হইয়া দেবতাকে ধরা যায় কি প্রকারে ? হাত বাড়াইলেই যে তাহার অদৃশ্য হইয়া যায়। মনোময় জীব দেখিতেছে—

“অমানুষী সত্তা সব যেই মানুষের চেতনার আসিয়া ধবা দিয়াছে, মানুষ যেই চেষ্টা করিয়াছে তাহারিগকে আরক্তাধীন করিতে, অমনি তাহার নিজের দিব্যরূপ বিসর্জন দিয়াছে, তাহার বাণের মুখে হরিণীর মত, রথের নখুখে অধীনীর মত ভরে গলায়নগণ হইয়াছে।

“তাই ত, মরজীব আমি, সেই সব অমর সত্তাকে স্থলভূমিতে, প্রাপ্ত কর্তব্য-প্রেরণায়, আমার অঙ্গের স্পর্শে স্পর্শে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে পারিলাম না—স্বর্গের এই সব শক্তির তাহাদের স্বরূপ প্রকট করিল না, আমাব পার্থিব প্রাণশক্তিও দিব্য অব্যবগে উচ্ছল চকল হইয়া উঠিল না।”

কিন্তু একদিন এক সময়ে তাহার বিশ্বাস প্রজ্ঞা যেন আসিয়াছিল—

“উর্কশী যেদিন বিদ্রোহের মত জ্বলিতে জ্বলিতে আমার মধ্যে অবতীর্ণ হইল, সেদিন আমার সকল কাম্য অমৃত-ধারায় বহিয়া আনিয়াছিল, সেদিন যেন বীর দিব্যপুত্র আমার কর্ণের জাগ্রত আয়তনে জন্মিল—বোধ হইল আমার সে দিব্যজন্ম উর্কশীই পাণ হইতে পারাঙ্গুরের উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে প্রদারিত করিয়া চলিয়াছে।”

উর্কশীর কথা—

“বধার্থ পুরুষ। তোমার এই নবজন্ম সত্যধর্মের জ্যোতি ধারণ করিবার, পালন করিবার জন্ত। সেই উদ্দেশ্যেই আমার ওজঃশক্তি তোমার মধ্যে আমি ঢালিয়া দিয়াছি। তোমার সাধিক চেতনায় প্রতিমুহূর্ত্তে আমার দিব্যজ্ঞান তোমাতে ব্যস্ত করিয়া ধরিয়াছি। কিন্তু তুমি ত শেষ পর্য্যন্ত অবহিত হইয়া আমার কথা শুনিলে না—আগে কর সত্যরূপ, পরে জ্ঞান কথা।”

দিব্যলোকের হুহিতাকে—স্বর্গের জ্যোতি দোহন করিয়া আনে যে শক্তি তাহাকে—মরজীব যদি আকাজক্ষা করে তবে সর্বপ্রথমে এবং সর্বদেশেও চাই এই পণ যেন মরদৃষ্টি দিয়া তাহাকে সে না দেখে, প্রাকৃত ধর্মকে অসিদ্ধ করিবার জন্ত যেন দিব্যধর্মের অমুরাগী সে

না হয়। কিন্তু উর্কশীর এ কথা পুরুষা শুনিয়াও শুনিতেন না। মানুষ ব্যস্ত আশু ফলের জন্ত, উপরের সত্যকে কোন রকমে ধরিতে কি না ধরিতেই তাহাকে সরাসরি কর্তব্যজীবনে রূপ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। পুরুষা দেখিতেছে তাহার মধ্যে “দেব হুহু” জন্মিয়াছিল, দিব্য জ্যোতির তিরোধানে সে এখন ত্রিহমান, যেন কাঁদিয়া আকুল, মানুষের এই দিব্যপুত্র হইতেছে তাহার তেজোময় সত্যরূপ, তাহার স্থব্রিত জীবপুরুষ ; এই অগ্নিরূপী দিব্যজীব তাহার মধ্যে জন্মিয়া পুরাতন মানুষটিকে (পুষ্ঠানদের the old Adam এবং the son of man এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে) ভস্মসাৎ করিতে করিতে, সেখানে নূতন দিব্য মানুষকে বৈশিষ্ট্য করিয়া চলে। পুরুষা ব্যস্ত এই দেবপুত্রের জন্ত—পুত্র-লাভেই ত সিক্তি, জীবনের সার্থকতা। সিক্তি মোহে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না—অথবা তাহার আকুলতা যেন নিজের জন্ত কিছু নয়, পুত্রই যেন জন্ম লইবার জন্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহার এই স্বরা—

“কবে আমাদের পুত্র সত্যই জন্মিত হইবে ? পিতা বলিয়া আমাকে জানিবে, আলিঙ্গন দিবে ; আর সে রোদন করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না। হে স্বর্গের দেবী, তোমার আমার এক মন প্রাণ—এ সম্প্রদায়কে কে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে তবে ? অগ্নিময় পুত্র তোমার কেন তবে ঐহিকের জীবনের আয়তনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না ?”

উর্কশী সাস্তুনা দিয়া আশ্বাস দিয়া বলিতেছে—

“কোন আশঙ্কা করিও না। পুত্রের অদ্রল হইবে না। আপন লক্ষ্যে সে একাগ্রচিত্ত, তাহাতে সার্থকতার জন্ত, কল্যাণের জন্ত তাহার কঠোর বার্ষ্পত্য গর্জন—ক্রন্দন তাহা নয়।* আমি যে হেতু সত্য গর্ভে ধারণ করিয়া আছি, তাহা তোমাব জন্ত তোমারই অভিমুখে প্রচালিত করিতেছি। কিন্তু তুমি এপারে চলিয়া এস—মোহের বশীভূত হইয়া থাকিলে তুমি আমাকে কখন পাইবে না।”

মরিয়া হইয়া, প্রাণপণ করিয়া পুরুষা তখন বলিয়া উঠিলেন—

“আজ এখন হইতেই তবে এই দিব্যপুরুষ পরশারত্ব পরমের দিকে চলুক উঠিয়া পড়িয়া—আর যেন তাহাকে ফিরিতে না হয়। তাহা না পারে, মৃত্যুরই কোলে যেন সে শায়িত হয়, উদ্ধাম উল্লাসে বৃকেরা যেন তাহাকে উদরসাৎ করে।”†

* অন্তর আছে—“বৃহস্পতিঃ...মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন...রবেন অধমং তমাসি...কনিজদং”—৪-৫০-৪, ৫।

† এই পারাঙ্গুরের গরম হইতেছে স্বলোকের সত্তার পরিপূর্ণ, অন্তর জ্যোতি, অক্ষর মঙ্গলস্থিতি—স্ববৎ জ্যোতিরভবঃ শক্তি (৬-৪৭ ৮) ; এই স্ববৎ পরিপূর্ণ যে-জ্যোতি এখানে বৃকের দোহান্য নাই, ইহা হইতেই লক্ষ্য করিয়া মানুষ চলিয়াছে—স্ববৎ জ্যোতিঃ অব্যকং নসীমহি (১০-৮৩)।

উর্কশীর কথা—

“কেন, পুরুষা, তুমি ভয় করিতেছ? উর্কশের পথে চলিতে তোমার পতন হইবে না, মৃত্যুও হইবে না, অমঙ্গলের শক্তি—বুকেরাও তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমার সহায় যে-সব দিব্যশক্তি তাহারও কিছু জীলোকের মত দুর্বল নয়, বুকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে গৃহবৃক।”*

উর্কশী যে মর্ন্ত্যে আসিয়াছিল তাহা বিনা উদ্দেশ্যে নয়, বৃথায় নয়—

“আমি স্বরূপ ছাড়িয়া মানুষী চেতনার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি, মানুষী চেতনার যে রাত্রি তাহাতে আমি চারি বৎসর কাটাইয়াছি। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তোমাতে বৃহৎ জ্যোতির প্রকাশ বতটুকু হইয়াছে দিব্যদ্বিষের সেই তটটুকু ভগবিন্দুই আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে তাহা দিয়াই তুমি এখনও আমাকে বাধিয়া রাখিয়াছ।”

উপরের জ্যোতি সর্বদাই নীচে অবতরণ করিতে চাহিতেছে, জাগ্রতের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া ধরিতে—রূপের মধ্যে আপনাকে ধরিয়া দেওঘাতেই যেন স্বরূপের সার্থকতা। মানুষ তাহার প্রাকৃত চেতনাব মধ্যে এই উপরের আলো বতটুকু স্বীকার করে, আপন তপ্ততপস্যা দিয়া তাহার সম্বন্ধনা করে, ততটুকুতেই উপরের সস্তার যেমন তৃপ্তি মানুষের নিজেরও তেমনি সার্থকতা। তাই বৈদিক ঋষি বলেন, মানুষ দেবতাকে নিজের মধ্যে জন্ম দিতেছে, দেবতাও মানুষকে নিজের মধ্যে তুলিয়া জন্ম দিতেছে—গীতার কথায়, পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ; উভয়ে উভয়কে সৃষ্টি করিতেছে, সমৃদ্ধ করিতেছে। এই পবম্পরের স্বীকরণ ও আদানপ্রদান বতটুকুই হউক না কেন—স্বল্পম্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং।

তখন পুরুষবার চেতনা হইল, হৃদয় গ্রন্থি তাহার টুটিয়া গেল; নিজের স্বরূপ, উর্কশীর স্বরূপ, তাহাদের সত্য সম্বন্ধ বুঝিয়া অসুভব করিয়া পুরুষা বলিয়া উঠিল—

“উর্কশী আমার প্রাণের মধ্যে নামিয়াছে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে; আমার সকল আরতুনই সে মুক্ত প্রচারিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। উর্কশীর নিকটে আমি জ্ঞান পাইয়াছি তাই আমি এখন ‘বসিত’ পরম জ্যোতির্ময়। আমার সিদ্ধি আসিয়াছে—আমার আনন্দ উপভোগ উর্কশীর মধ্যে, উর্কশীর স্পর্শে হৃদয় আমার তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।”

বৃহত্তর জ্যোতি প্রথমে নাগে মনের মধ্যে—মন পাইয়াছে দিব্য চেতনার কিছু আভাস, কিন্তু প্রাণ তাহা কিছু পায় নাই, প্রাণ রহিয়াছে পূর্বের অসংস্কৃত প্রাকৃত অবস্থায়—

* ‘বৃক’ অর্থ নেকড়ে বাঘ, আর ‘গৃহবৃক’ হইতেছে গৃহ-রক্ষক সারমেয়। বৈদিক সারমেয় আবার সরমার তনয়। সরমা কে তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের শেষ পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।

† ‘চার’—এই সংখ্যা পূর্ণতাজাপক। মানুষের পূর্ণ সস্তারও আছে চারিটি স্তর—সেই প্রাণ বন আর তুবীর (বেদে বাহাকে বলা হয় ‘ত্রিধাতু’ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় মহলোক)।

তখন মন চাহে উপরের আনন্দ বটে, কিন্তু সে মনের পিছনে যে আবেগ তাহা অন্তর প্রাণের বাসনা। এই প্রাণকে যতক্ষণ খুলিয়া ধরা হইতেছে, এই প্রাণের বাসনাময় ক্ষেত্র যতক্ষণ বৃহত্তর স্পর্শ না পাইতেছে ততক্ষণ উর্কশী চঞ্চলা অনধিগম্যা—প্রাণ যখন উর্কশীর বৃহৎ চেতনায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তখনই জাগ্রত হলে অব্যর্থ রূপ লইয়া জীবের প্রকট হইবে।

উর্কশী তখন মানুষের জীবনত্বের লক্ষ্য কি, তাহা উন্মোচন করিবার উপায় কি—সিদ্ধি কোথায় ও সাধনা কি তাহার মূলমন্ত্র বলিয়া উপসংহার করিল। লক্ষ্য হইতেছে বৃহত্তর চেতনায় স্বর্গলোকে অমৃতত্ব উপভোগ করা। সেজন্য লাভ করিতে হইবে দেবত্ব—দেবত্ব লাভ করিতে হইলে, চাই নব জন্ম—এই নবজন্ম আসিবে পুরাতন জন্মকে দেবতাদের কাছে আত্মত্যাগ দিতে দিতে, দেবতাদের নিকট হইতে কল্যাণকে আনিতে আনিতে, ইহাই যজ্ঞ। মানুষকে অমৃতত্ব দিতে চায় না, পুরাতন জন্মেব প্রাকৃত স্বভাবের মধ্যে বাধিয়া নিজেদের ভোগে ব্যবহার করিতে তাহাকে এইভাবে ধ্বংস করিতে চায় মৃত্যুর অসত্যের তামস শক্তি সব। দেবশক্তিকে ধরিয়া ধরিয়া এই দল্যশক্তিকে প্রতিনিয়ত সজাগ সতর্ক অপ্রতিহতভাবে হটাইয়া চলিতে হইবে— জীবপুরুষের এই ক্ষমতা নৈসর্গিক, কারণ সেইলার পুত্র—ইলা* হইতেছে দিব্যজ্ঞান, ঋষিদৃষ্টি মানুষের অন্তরাত্ম প্রতীক্ষিত ইলায়াম্পদে।

“হে ইলার তনয়! এখন তবে দেবতাদের ইজিত তুমি বুঝিলে। তাহারাই তোমাকে শিখাইয়া দিতেছেন কিরূপে তুমি মৃত্যুর সব শক্তিকে বশে আনিতে পার, কেমন করিয়া তোমার সম্ভান দেববৃন্দকে আত্মত্যাগ দিয়া যজ্ঞ করিবে, আর তুমিই বা কোন্ পথে স্বর্গে যাইয়া বৃহত্তর জ্যোতির্ময় আনন্দ উপভোগ করিবে।”

* ইলা, সরস্বতী আর মহী বা ভারতী—এই দেবীত্বের নাম ঋগ্বেদে প্রায়ই একত্র পাওয়া যায়—১-১৩৩-২; ১-১৪২-২; ২-৩৮; ৫-৫-৮। দিব্যাবাক; সত্যের যে ছন্দময় ব্যক্তিময় প্রকাশ তাহারই ত্রিমূর্তি ইলা। ইলাদের সহিত আরও দুইজনকে যোগ করিতে হয়, তাহার সন্মত ও দক্ষিণা। এই পাঁচজনে দিব্যজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা—মহী=Vast consciousness, ইলা=Revelation, সরস্বতী=Inspiration, সরমা=Intuition, দক্ষিণা=Discrimination (অবিস্ম)। বর্ষা হউক, ইলা সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিতেছে, ইলা যেথা গগ্যা সাহিনা গী: (৩-৭-৫)—সেই বৃহত্তর বাণী যখন বৈচিত্র্যের মধ্যে গগনার বিষমীভূত বা গোচরীভূত হইয়া প্রথম দেখা দিয়াছে তখনই তাহা ইলা; ইলা হইতেছেন ‘দেবী যুতপদী (১০-১০-৮), তেজোঘন গতি তাহার; মানুষের মধ্যে মানুষের পিতা হইয়াও পুত্ররূপে যখন অগির জন্ম তখনই মনোময় পুরুষের জীবের বিশেষ সত্য প্রকাশের জন্ম ইলার অবিতর্কিত—ইলাং অকৃত্বন মনুষ্যস্ত শাসনী; পিতৃর্বাং পুত্রো মমকস্ত জায়তে (১-৩১-১১)।

ঋষি টলস্টয়ের একখানি চিঠি

রম্যা রল

মহাত্মা টলস্টয়কে আমি প্রথম চিঠি লিখি সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা; ১৮৮৭ সালের মে মাসে তাঁকে চিঠি লিখিবার একটা তাগিদ আসে; তরুণ যৌবনের সংশয়-সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা নির্ভরভূমি খুঁজিতেছিলাম। আমি আছি—কারণ আমি অশুভব করিতেছি—এই অপরাধ অশুভতির উপর ভূমায় আমার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম—সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস আমার *Credo Zunia Verum* শীর্ষক প্রবন্ধে স্মৃতিত হইয়াছে। (“আত্মদর্শন,” প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ ব্রহ্মব্যা)।

সে সময় টলস্টয় ‘শিল্প বস্তুটা কি?’ (*What is Art*) লিখিয়াছেন। শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে বিষম একটা খটকা লাগিল; টলস্টয়কে আমি বুঝিতে পারিলাম না। সেই সময় তাঁকে যে চিঠিখানি লিখি তাব দুই চারিটি টুকরা মাত্র আমার ভায়েবীতে টোকা ছিল। তার সাহায্যে আমার মনের অবস্থাটার কিছু আভাস দিই :—

আমার চিঠি

মহাত্মন! আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমার আপনাকে চিঠি লিখিবার তুঃনাহস দিয়াছে। অপরিণতমতি এই নীন ভক্ত আপনাকে কতকগুলি নিরর্থক উচ্ছ্বাস স্তমাইতে আশ্রয় আপনার সম্মুখে আসে নাই। সে-ভাবে আপনার প্রতি অমর্যাদা দেখাইতে আমি পারি না, কারণ আমি আপনাকে নিবিড় ভাবে চিনি... ..

মৃত্যু আমার চারিদিকে যেন এক কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে; আপনার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অশুভব করিয়াছি যেন প্রতিহৃত্তে মৃত্যুব ছায়াপাত—বিশেষত আপনার আইভান্ দিলিচ (Ivan Ilitch) পাঠে

আমার মন যেন অস্থির হইয়াছে। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছি এই যে প্রতিদিনের কেজো জীবন এটা আমাদের সত্য জীবন নয়। এক দিকে জীব জীব স্বার্থবটিত সংঘর্ষ, অন্তঃক্ষে এক অশুভ শাস্ত জীবনের মধ্যে গভীর সমন্বয়; সংঘর্ষ কমাইয়া এই সমন্বয়ের দিকে যতই অগ্রসর হইব জীবন ততই সত্য হইয়া উঠিবে। আমাদের খণ্ড সত্তাকে অশুভ অসীম প্রাণের সাগরে ডুবাইয়া বিলীন করিয়া দিতে হইবে—ইহাই আমাদের আপনার বাণী। এ বাণীতে আমার সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছি—আমার সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা আপনার পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে...। আমি বুঝিয়াছি আমাদের স্বার্থ আমাদের অহংবোধকে দূর করিতে হইলে, সেই মহান ত্যাগটি সত্য করিতে হইলে একটি জিনিষ প্রয়োজন—সমস্ত নৌখিন কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস দূর করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণত্বতে নিযুক্ত হওয়া। আপনি বলিয়াছেন—চিন্তার ক্ষমতা, স্বপ্নের প্রশাস্তি আনিতে হইলে, ক্ষুদ্র আমিষের অন্তঃ চেতনাব জাল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদের একমনে পরসেবার, লোক-হিতকর কার্যে—শারীরিক শ্রমসাধনে লাগিতে হইবে। সেই ত জীবনের পরম আশীর্বাদ.....ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিয়া যাওয়া। মহাত্মন! আমি প্রাণপণে ভুলিতে চাই—আমি বিশ্বাস করি ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিতে পারিব।

কিন্তু একটি প্রশ্ন কিছুতেই মন হইতে ত্যাগাইতে পারিতেছি না; তুচ্ছ অহমিকার কবল হইতে মুক্তি কেবল হাতের কাজের ভিতর দিয়া হইবে একথা এতটা জোরের সঙ্গে আপনি কেন বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না; এই প্রশ্ন আমার সমস্ত স্বপ্ন মনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। শিল্পের প্রতি আপনি নির্দয় হইয়াছেন কেন? শিল্প কি আত্মোৎসর্গ-সাধনের একটি প্রকৃষ্ট-উপাদান নয়? আপনার নূতন প্রবন্ধ ‘কি করা

দরকার,” পাঠ করিয়া দেখি তার মধ্যে শিল্পের স্থান সব কিছুই নীচে। শিল্পশ্রমকে আপনি আক্রমণ করিয়াছেন অথচ আপনার বিরুদ্ধতার কোন কারণ দেন নাই। যদি আমি আপনাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। বুঝিতেছি আপনি শিল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা ও ভোগলিপ্সা দেখিয়াছেন; আপনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রামকে শিল্প যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বঙ্কিত করিয়া তুলে, শিল্পমাদকতা ততই আমাদের স্বার্থপরতাকে বাড়াইয়া চলে। হায়, স্বীকার না করিয়া উপায় নাই তথাকথিত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই কাছে শিল্প আভিজাত্যগর্বী ইন্ড্রিয়লিপ্সা মাত্র।

কিন্তু শিল্প কি ইহা ছাড়া আরও কিছু নয়? সূক্ষ্ম একদল সত্য শিল্পীর কাছে ইহা কি সব নয়? তাহাদের কাছে একমাত্র শিল্পই যে স্বার্থকে ভুলিতে, ভূমার মধ্যে ডুব দিয়া সৃষ্টির অপরিণীত আনন্দ উপভোগ করিতে দেয়। সেই অবস্থায় যতাই বা আমাদের কি করিতে পারে? যত্ন যে তখন মরিয়াছে, শিল্পী যে যত্নবশত হইয়াছে।

আমি কি ভুল বকিতেছি? যদি ভুল করিয়া থাকি আমার শুধরাইয়া দিন। আমি শিল্পের প্রেমে ডুবিতে চাই—কারণ উহার সাহায্যে আমার এই দীনহীন ‘আমির’ কারা-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারি। যে-সব কালবৃত্ত জাতি সভ্যতার চাপে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহাদের আরোপের একটি বড় উপায় কি খাঁটি শিল্প নয়?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। হাতের কাজকে আপনি মস্ত বড় স্থান দিয়াছেন, কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে যদি মনের যোগ না থাকে আপনি কি তাহাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন? চিন্তাকে বলি দিতে, শিল্পকে অস্বীকার করিতে আপনার কি কোন অনুরোধোচনাই হইবে না? আর শুধু আমরা চাহিলেই কি চিন্তাকে ও শিল্পকে উড়াইয়া দিতে পারি?

আমার দেশ ফ্রান্সে, এবং ইউরোপের প্রায় সর্বত্র দেখি অবিশ্বাসীদের ভিড়, পল্লবগ্রাহীদের ফড়ফড়ানি,—চারিদিকেই ঐশ্বর্যের অন্ধকার। ইহার মধ্যে একজনকেও

পাইতেছি না—যিনি গুরু হইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যান। আপনার উপদেশ আমার বিশেষ প্রয়োজন.....

রম্যা রল্লা

টলষ্টয়ের চিঠি

৩ঠা অক্টোবর ১৮৮৭

সোদরপ্রতিমেষু

রম্যা রল্লা! তোমার প্রথম পত্রখানি পাইয়াছি; ইহা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পূর্বেই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সময় পাই নাই। তাহা ছাড়া ফরাসী ভাষায় জবাব লিখিতে আমার বেশ পরিশ্রম হয়। বড় করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কারণ আমার বক্তব্যটি ভাল করিয়া না বুঝাব দরুনই তোমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

প্রশ্ন করিয়াছ: আমাদের স্বামী সৃষ্ণের জন্ত হাতের কাজ একান্ত প্রয়োজন কেন? সেই কাজের সঙ্গে যে-সব জিনিষের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই যেমন শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি—সেইসব মানসিক ক্রিয়া-কর্ম কি তাহা হইলে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে?

এই ধরনের প্রশ্নের জবাব আমার সাধ্যমত আমার (What to Do?) গ্রন্থে দিয়াছি; সে বইখানির ফরাসী অনূবাদ বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। শারীরিক শ্রম বা হাতের কাজকে আমি একটা নূতন ধর্ম বলিয়া খাড়া করিতে চাই নাই; শুধু ইহা যে একটি সহজ প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ এবং ইহার প্রয়োগ যে সকল অকপট মানুষের কাছেই প্রথম হইয়া দেখা দেয়, সেই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের সভ্যতাম্পর্কী সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বার্থ ও নীচ শয় ধংসোন্মুখ; ইহার মূল কারণ এই যে, দীনদরিদ্রের পরিশ্রমের স্বযোগ লইয়া আমরা ভ্রমরল অধিকাংশই সকল শ্রমের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া বসিয়াছি; শুধু এই মাত্রাত্মক ক্রটি সংশোধন করিবার জন্তই শ্রমভার সকলেরই স্বীকার করা উচিত। অশিক্ষিত মন্দভাগ্য যে অগণ্য মানুষ পুরাকালের ক্রীতদাসের মত আমাদের জন্ত প্রাণপাত

করিতেছে তাহাদের আত্মবলিদানের তুলনায় আমরা ভয়
সভ্যেরা কতটুকু করি তাহা ভাবি কি ?

এই মূলগত বৈষম্য দূর করিতে যদি চেষ্টা করি তবেই
বুঝা যাইবে আমরা কতটা সরল এবং খুশির ধর্ম (দার্শনিক
দিকেরই হোক আর লোকহিতের দিকেরই হোক) আমাদের
জীবনে কতটা সত্য হইয়াছে।

এই বৈষম্য নিবারণে সফল হইতে হইলে প্রথমেই এই
উপাধ এই ব্রত লইতে হইবে যে, আমাদের নিজের কাজের
তার অপবের ঘাড়ে না চাপাইয়া যেন নিজের করিতে
চেষ্টা করি। শারীরিক নানা হেয় কার্যে অস্ত্রের সাহায্য
আমরা লইতে যতদিন দ্বিধা বোধ করিব না ততদিন কি
দার্শনিক কি হিতাহিতানিক কোন ধর্মই আমাদের সত্য
হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিব না।

অপরের সেবা যথাসম্ভব কম গ্রহণ করা, এবং যতটা
বেশী সেবা অপরকে করা যায় তাহার বিধান করা, সর্বো-
পেক্ষা কম দাবী করা ও সর্বোপেক্ষা বেশী দান করা, ত্যাগ
করা, ইহাই আমার কাছে সহজতম সরলতম নীতি।

এই নীতিই আমাদের জীবনকে একটি সুসজ্জত
তাৎপর্য দেয়। ইহা হইতে যে সুখ আসে তাহা সকল
দ্বিধা বাধা ও সন্দেহকে ভাসাইয়া দেয়। মানুষের মানসিক
বৃত্তি শিল্প বিজ্ঞানাদির স্থান লইয়া তোমার মনে যে-সমস্যা
জাগিয়াছে তাহাও একদিন এই অল্পপম তৃপ্তির দ্বাবনে
ভাসিয়া যাইবে।

সুতরাং ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতক্ষণ না আমরা
আমাদের কাজে অপরকে উপকৃত হইতে দেখি ততক্ষণ
আমরা সত্য সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি না।
যাহাদের জন্ত আমরা কাজ করিতেছি তাহারা যদি সুখী
হয় তাহা হইলে সুখের উপর সুখ হইল। কিন্তু তাহারা
যদি হুঁস নাও বা করে তাহা হইলেও আমাদের সেবা
করিয়া যাইতে হইবে। আমার আত্মতৃপ্তির ভিত্তিই যে
ঐখানে—আমার কাজ অপরের কাছে নিরর্থক নয়,
অকল্যাণকর নয় এই বিশ্বাসেই যে আমার সুখ।

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কাজ ছাড়িয়া মানুষ যদি
এই সাধারণের সেবার কার্যে নামিয়া আইসে তাহা হইলে
বুঝিতে হইবে তাহার সরল নৈতিক দায়ীত্ববোধ আপন।

হইতেই তাহাকে টানিতেছে। গ্রন্থকার বই লেখেন,
ছাপিতে ছাপাখানার মানুষদের খাটাইতে হয়; স্বরূপ
সঙ্গীত রচনা করেন, সেগুলির প্রচার করিতে কত ওস্তাদ-
বাজনদারকে খাটান প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক গবেষণা
করিবেন তাঁর যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে খাটবে কত
লোক; চিত্রী ছবি আঁকিবেন তার জন্ত তুলি রঙ পট
প্রস্তুত করিতে হাজার লোক ব্যস্ত। এই-সব শিল্প-
বিজ্ঞানের কাজ মানুষের কাজে লাগিতে পারে আবার
সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়—অনেক সময় অকল্যাণকরও হইতে
পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমার এক দিকে এই-
সব কাজ যাহার জন্ত অপরকে খাটাইতে হয় অথচ যাহাব
মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ-জনক; অন্যদিকে আর-এক
শ্রেণীর কাজ যাহার জন্ত কাহাকেও খাটাইতে হয় না
অথচ যাহার সবগুলিই মানুষের উপকারে আসিবে।
এমনি কত কাজ চারিদিকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের
টানিতেছে। ঐ দেখ কে একজন শ্রান্ত হইয়া ইগাইতেছে
—উহার বোঝাটা খানিক বড়; গরীব চাবী রোগে
অকর্মণ্য, তার ক্ষেতের কাজ খানিক করিয়া দাও; দেখ, ঐ
কে আহত, তার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দাও;—এমনি কত সহস্র
ছোটখাট সেবার আহ্বান চারিদিক হইতে আসিতেছে,
সেগুলি করিতে কারো সাহায্য দরকার নাই। একা
করিয়া যাও। তখন যে সেবা করিল এবং যাহার সেবা
করা হইল দুজনেই পরম তৃপ্তি পাইবে। নিজের হাতে
গাছ পোতা, পশুদের সেবা করা, কুপ পরিশোধন করা—
এই-সব কাজে মানুষের উপকার যে হইবে তার সন্দেহ
নাই সুতরাং এরকম কাজে প্রত্যেক খাটি মানুষের
আগেই যাওয়া উচিত। অনেক কাজই সবার সেবা
বলিয়া বড় গলায় প্রচার করা হয় কিন্তু বিচার করিলে
দেখা যায় তাহার অনেকগুলিই ভুল।

ভবিষ্যৎদর্শী ঋষিদের স্থান আমাদের মাথার উপরে;
কিন্তু ঐ নামটায় যথেষ্ট সুরীষা হয় যে-সব ধর্মব্যবসায়ী
ঋষিদের মুখোশ পরিয়া ভাবে—তাহারা সত্যই ঋষি
হইয়াছে বলিয়া তেমন লোকের অভাব এ জগতে নাই
এবং তাহারা বেশ ঋষির ব্যবসা চালাইতেছে।

শিক্ষার বলে কেহ ঋষি হইতে পারে না যাহার

গভীর বিশ্বাস আছে যে, সত্য তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইবেই, সত্যের বাহন না হইয়া তাঁর উপায় নাই—এমন মানুষই স্ববি হন। এই বিশ্বাস কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায় এবং এই বিশ্বাসসিদ্ধ হইতে হইলে কর্মের ক্ষেত্রে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান এই ত্যাগ এই আত্মোৎসর্গের উপর গড়িয়া ওঠে। প্রসিদ্ধ গুলী লুলী (Lulli) যখন পাচকের স্থায়ী কাজ ছাড়িয়া বেহালা হাতে করিয়া অনিশ্চয়তার বুক ঝাঁপ দেন, কত বিপদ কত দুঃখ তাঁকে ঘিরিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেই সঙ্গীতজ্ঞের আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া সহস্র ত্যাগের দ্বারা তিনি তাঁহার গুলী নাম সার্থক করিয়াছেন, তাঁর কর্মক্ষেত্রে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীত-পরিষদের যে মামুলী ছাত্র, মামুলী গুণ বাক্যই তাহার কর্তব্য শেষ হইল ভাবে, কোথায় তার ত্যাগের অবকাশ? তাহার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ত দেখি না শুধু দেখি বেশ আরামে তার সৌখীন অবস্থাটি উপভোগ করিয়াই সে গুলী।

হাতের কাজ একদিকে প্রত্যেক মানুষের একটি কর্তব্য, অতীতকালে সেটি বহুলোকের জীবনে আশীর্বাদের মত হইয়া আছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মস্তিষ্কের কাজ অল্পসংখ্যক লোকের অধিকার ও কল্যাণের আধার। কাহার উহাতে অধিকার আছে কাহার নাই তাহার বিচার হইবে ত্যাগের দ্বারা। শিল্পী বা পণ্ডিত তাহার আদর্শ-জীবনের অল্প তাহার অবকাশ ও তাহার স্বপ্নস্বচ্ছন্দ্য কতটা উৎসর্গ করিয়াছে? যে মানুষ হাতের কাজ করিয়া আপনার ও স্বজনবর্গের জীবিকানির্বাহ করে এবং সেই সঙ্গে তার ক্ষুদ্র বিশ্রামক্ষণ, তার নিজস্ব সময়টুকুও চিন্তা ও সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত করে সেই সত্য মানসিক ক্ষেত্রে কর্ম করিবার অধিকারটি প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু যে মানুষের সহস্র নৈতিক দায়িত্ব এড়াইয়া, শিল্প বিজ্ঞান-প্রীতির অছিলা করিয়া সমাজতন্ত্রের পরগাছা হইয়া বাঁচিতে চায়, সে শুধু মেকী শিল্প ও খুঁটো বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি করিবে। খাঁটি শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস স্বথ স্ববিধা নয় আত্মদান।

“কিন্তু তাহা হইলে শিল্প-বিজ্ঞানের দশা কি হইবে?”

এই প্রশ্ন কত বার শুনিয়াছি। এমন লোকেরা প্রশ্ন করেন যাদেব না আছে শিল্প-বিজ্ঞানের বালাই, না আছে উহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয় যেন বিশ্বমানবহিত ছাড়া তাঁহাদের অন্য চিন্তাই নাই—যেন তাঁহাদের মনগড়া শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া মানব-সভ্যতার আর উন্নতি নাই।

শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কবে না এমন হুবুহি মানুষের অভাব নাই, আবার এমন মজার লোকও আছে যে সেটা স্বীকার করানই জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে কবে! এমন মতভেদ হয় কেন? ঐ ত চাষী চাষ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কৈ তাহাদের কাজের আবশ্যকতাটা স্বীকার ত কেউ কবে না। আবার তাহার প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতেও কেউ ক্ষেপে না। কাজ হইয়া যায়—কাজটা দরকারী এবং সকলেরই তাহাতে উপকার এটা আমবা বুঝি, ইহার আবশ্যকতায় আমরা সন্নিহান হই না, সেটা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হওয়া ত দূরের কথা! শিল্প ও বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রের কর্মীদেরও ঠিক এক অবস্থা, তবু তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতে এত লোক এত গলদঘর্ম হয় কেন?

আসল কথাটা এই :—খাঁটি কর্মী শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ অধিকারের দাবী করে না; তাহারা সৃষ্টি করিয়া যায়, সেই সৃষ্টিতে সকলের কল্যাণ হয় সেই যথেষ্ট; তাহার অল্প কোন দাবীদাওয়া অথবা তার দলিল ও প্রমাণের দরকার আছে তাহা ভাবে না। কিন্তু তথাকথিত অনেক পণ্ডিত ও শিল্পী বাহারা জানে যে, সমাজের যত জিনিষ গ্রাস তাহারা করে তার তুণনায় তাহাদের সৃষ্টি একেবারেই নগণ্য। তাহারা সর্কোপেক্ষা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, তাহাদের কাজ ছাড়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণ আর নাই। এই জায়গায় পুরুতের দলের সঙ্গে ওদের একটা মিল দেখা যায়।

খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান মানুষের অল্প কর্মপ্রচেষ্টার মতন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; তাহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা বা অপ্রমাণ করা দুই নিরর্থক।

বিজ্ঞান ও শিল্প যে আজ সমাজে মিথ্যার মুখোপ পরিয়া

ভগ্নামী করিতেছে তাহার এষ্টা গুরুতর কারণ এই যে, শিল্পী জ্ঞানী প্রভৃতি তথাকথিত “সভা” দল সকলে মিলিয়া একটা নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মাঙ্ক ‘পুরুত’দের মত গর্ব্বাঙ্ক এই দলটি আভিজাত্যের মোহে অধীর। এদের জাতটা মামুলা জাতের মতই অশুভকর, কারণ যে-আদর্শের দোহাই দিয়া এরা জাতিভেদ সৃষ্টি করে সেই আদর্শই ইহাতে ধূলয় লুটাইতে থাকে। সেইজন্যই খাটি ধর্ম্ম শিল্প বিজ্ঞানের জায়গায় মেরিতে সমাজ ভরিয়া বাইতেছে।

শিল্প ও সাহিত্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট অপরাধ করিয়াছে; যে বস্তু সাধারণ মানুষকে পৌছাইয়া দিবার ব্রত লইয়া শিল্প ও সাহিত্য আবির্ভূত হয় এবং যাহা প্রচার করিতে মহা ব্যস্ত বলিয়া ভাগ করে ঠিক সেই বস্তু হইতে শিল্প ও সাহিত্যই মানুষকে কতটা বঞ্চিত করিয়াছে তাবিলে লজ্জা হয়। অথচ অন্তত মুখেও যে দায়ীঘট্টা স্বীকার করে তাহাতেই প্রমাণ হয় তথাকথিত শিল্প ও সাহিত্য কত অপরাধী ও নৈতিক দায়ীত্ব বোধে কত দুর্ব্বল।

“শিল্পেব জন্তই শিল্প” “বিজ্ঞানের জন্তই বিজ্ঞান” বলিয়া এক দল লোক কত বুলিই কপ্‌চাইল। কিন্তু এখন মানুষ বুঝিয়াছে, তাদের সার্থকতা এইখানে যে শিল্প বিজ্ঞান নিখিলমানবের চিরন্তন উত্তরাধিকার। সকল মানুষেরই উহাতে অধিকার আছে এটি সভ্যতার পাণ্ডাদের স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখন ঐ বস্তুগুলি কি মানবের চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া উঠে? আসল আর বুটোর মধ্যে প্রভেদটা ধরা যায় কিরূপে? এসব প্রশ্নের জবাব ত বড় একটা পাণ্ডারা দেন না। বরং তাহারা চাল দিয়া বুঝাইতে চান যে, সভ্য জ্ঞান ও কল্যাণ যে আসলে কি তাহা প্রকাশ করা যায় না; তাহাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা শক্ত।

কিন্তু এটা মিথ্যা কথা। যুগে যুগে বিশ্বমানব তার অপরিণীম্য বিবর্তনের ভিতর দিয়া যদি কিছু করিয়া থাকে ত সে এই জ্ঞান ও কল্যাণের ধ্যান ও ধারণা। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সভ্যতার পাণ্ডাদের পক্ষে সুবিধার হয় না কারণ ইহা প্রমাণ করিয়া দেয় যে জ্ঞান ও কল্যাণকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের জায়গায় শিল্প ও বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত

করিতে চেষ্টা করা শুধু নিরর্থক নয় অনিষ্টকর। যুগে যুগে মানুষ শিবজ্ঞানের রূপটি নির্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধকগণ চীন ইন্দী ও মিশর দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানীর দল গ্রীক দর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেকেই স্পষ্টভাবে শিবজ্ঞানের ধ্যান ধারণার সাক্ষ্য দিতেছেন।

যাহা কিছু মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক-প্রাণ হইয়া মিলিতে সাহায্য করে তাহাই শিব-জ্ঞানের দান; যাহা কিছু ভেদের সৃষ্টি করে তাহাই অশিব, তাহাই অসুন্দর।

এই অমোঘ মন্ত্রটি সকল জীবই জানে, সকলের প্রাণে ইহা গ্রথিত আছে।

মিলন বাহার সাহায্যে গড়ে তাহাই জ্ঞান তাহাই বিশ্বমানবের কল্যাণকর। এই কল্যাণ যদি শিল্প ও বিজ্ঞানের পাণ্ডাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এটি তাহাদের ভোলা উচিত নয়; যে শিল্প ও যে বিজ্ঞানের সাধনায় ঐ কল্যাণ হয় শুধু তাহারই চর্চা যদি পাণ্ডারা করেন তবেই স্বীকার করিব তাঁরা সত্যধর্ম্মী। কিন্তু তাহা হইলে ভেদমূলক আইন বিজ্ঞান, অর্থ-শোষণ অর্থনীতি ও ধন-বিজ্ঞান ও মৃত্যুমূলক যুদ্ধবিজ্ঞান কোথায় পাড়ায়? ইহাদের যে একমাত্র উদ্দেশ্য একদল মানুষের উচ্ছেদ করিয়া অল্প এক দলকে সামগ্রিকভাবে বাড়ান। সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে ইহাদের ত কোন যোগই দেখি না, তবু কেন এইসব তথাকথিত বিজ্ঞান এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে? আজকাল দেখি শিল্প-ভোগে অশক্ত, অর্থবর্ষদের লালসার অবলম্বন অথবা স্তব্ধ-পুষ্ট নিষ্কর্ম্মাদের খেলা হইয়া পাড়াইয়াছে; তবু এই শিল্প কেন এত লোককে টানিতেছে? এ শিল্পের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হইতেছে?

কতকগুলো বিষয়ে খবরের সংখ্যা বাড়াইয়া গেলেই “জ্ঞান” মিলে না। জানিবার বস্তু এ জগতে অসংখ্য; অনেকের চেয়ে বেশী জানিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। কোন জিনিষ কতটা মানব-কল্যাণের সহায়ক তাহাদের গুরুত্ব ও ক্রমোন্নয়নে নিজের জ্ঞানের মধ্যে গ্রহণ করা ইহাই একমাত্র পন্থা।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল অরণ্যে কোন্টিকে বাছিব? যাহার সাহায্যে এমন জীবন গঠন করা যায় যাহাতে মানুষকে সব-চেয়ে কম দুঃখ ও সব-চেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারি তাহাই আমার কাছে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান; এবং আমাদের তুচ্ছতম কাজেও যখন শিব হৃদয়ের ছায়া পড়িবে, তখন সেই জীবনকেই সর্বোচ্চ শিল্প বলিব। কিন্তু যে-সব ভণ্ড শিল্প-বিজ্ঞান বিশ্বমানবকে ঠকাইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে কল্যাণধর্মী শিল্প-বিজ্ঞানের স্থান কোথায়?

আজকাল সমাজে শিল্প ও বিজ্ঞান বলিয়া যে-সব জিনিষ চলে তাহার অধিকাংশই একটা বিরাট বুদ্ধরূপী মাত্র। এককালে ছিল ধর্মের বুদ্ধরূপী এখন তাহার স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে শিল্প-বিজ্ঞানের বুদ্ধরূপী। চোখে ঠুলী দিয়া দিয়া আরামে আমরা আছি। কিন্তু মনে নাই যে, অনেক জিনিষই চোখে পড়িতেছে না। চোখের ওই ঠুলীটা দূর করিয়া ফেলিয়া একেবারে গোড়া হইতে নূতন চোখে সব জিনিষ দেখিতে হইবে। গন্তব্য পথের সন্ধান করিতে হইবে। বর্তমান প্রলোভন পথ তুলাইতে চেষ্টা করে। হাত অথবা মাথা খাটাইয়া আমরা পাই, ক্রমশঃ সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছি, ক্রমশঃ বনিয়াদীদের ধাপে উঠিয়া সভ্যতার নব্য পাণ্ডা হইয়া গর্ব অহুভব করিতেছি। আর্থানদের মত ‘কালচারের’ নামে প্রায় মুচ্ছা পাই আর কি। এত কষ্টে জাতে উঠিয়া এত বামনাই করিয়া হঠাৎ আগাগোড়া সবটাকে অবিশ্বাস করিতে হইলে অনেকখানি সরলতা ও সত্য নিষ্ঠা থাকা দরকার; সত্য ও কল্যাণের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা না থাকিলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু নাস্ত্রঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়; যে কেহ প্রাণের মধ্যে সাড়া পাইয়াছে জীবনের সমস্তা তোমার মত যাহাদিগকে আকুল করিয়াছে, তাহাদের সত্যের পথ না ধরিয়া গতি নাই। মোহের আবরণ যতই মধুর হউক, সকল কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিত্তকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। যে মানুষ অন্ধভাবে তার গৌড়ামিকে আঁকড়াইয়া থাকে তাহার কথা বলিয়া লাভ নাই। যুক্তির ক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক অনেক হৃদয় বক্তৃতা হইতে পারে কিন্তু সত্যের দিকে এক পাও অগ্রসর

হওয়া যায় না। সমস্ত যুক্তি গৌড়ামির খোঁটার খাচাইবে, সকল সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। গৌড়ামী শুধু ধর্ম নয় তথাকথিত সভ্যতার রাজ্যেও আছে, দুই-ই মূলতঃ এক বস্তু। গৌড়া ক্যাথলিক বলিবে, “আমরা কি যুক্তি মানি না? মানি বই কি; তবে যুক্তিকে শাস্ত্র ও আচারের উপরে যাইতে দিই না, কারণ তাহাদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য সত্য রহিয়াছে।” সভ্যতার পাণ্ডা বলিবে, “আমার সমস্ত যুক্তি শিল্প ও বিজ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যায়। কারণ উহাদের মধ্যে আমি সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ দেখি। মানবের সমস্ত জ্ঞান আমাদের বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত; পূর্ণসত্যকে এখনও বিজ্ঞান ধরিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে পারিবে এবং আমাদের শিল্পের উদার ভিত্তির উপর সত্যশিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠা।” ক্যাথলিক বলিবে, “মানুষের বাহিরে একটি মাত্র বস্তু পূর্ণ ভাবে আছে সেটি হইতেছে সন্থ (church)।” আর সংসারী বলিবে, “মানুষের বাহিরে আছে শুধু সভ্যতা।” ধর্ম অন্ধসংস্কার লইয়া আলোচনা করিতে যুক্তির দুর্বলতাটা আমরা সহজেই ধরিতে পারি, কারণ, সেই সংস্কার আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু যে করে তার কাছে একটি মাত্র ধর্ম, একটি মাত্র সত্য আছে যেটি বিশ্বাস সে বিশ্বাস করে। অথচ সেটা যুক্তিধারা সে প্রতিপন্ন করিয়াছে বলিয়া তার ধারণা। সভ্যতা-সংস্কার লইয়াও আমাদের সেই একই অবস্থা; আমরা বিশ্বাস করি যে, লগতে শুধু একটি মাত্র খাটি সভ্যতা আছে, সেটি আমাদের; অথচ নিজেদের অর্থোজিকতাটা মোটেই আমরা দেখিতে পাই না। আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি সকল যুগ সকল জাতির মধ্যে আমাদের এই যুগ এই জাতিই সত্য সভ্যতার অধিকারী। যে কয়েক কোটি লোক ইউরোপ খণ্ডে বাস করে তাহারাই সকল খাটি বিজ্ঞান ও শিল্পের মালিক!

জীবনে সত্যের প্রকাশ অতি সহজ; এই সত্যকে ধরিতে বিজ্ঞান দর্শনের গভীর জ্ঞান না হইলেও চলে, কিন্তু একটি জায়গায় নাস্ত্রবাদী না হইলেই নয়—সমস্ত মূঢ় সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে “নেতি” বলিয়া উড়াইয়া দিয়া পূর্ণ মুক্ত চিত্তে দাঁড়াইতে হইবে। হয় শিশুর মত সরল হইতে

হইবে, অথবা দেকার্ত (Descartes) এর মত বলিতে হইবে, “আমি কিছু জানি না, কিছু বিশ্বাসের বশে মানিয়া লই না; আমি অল্প কিছুই চাই না, শুধু বুঝিতে চাই এই যে, যে-জীবন আমরা ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহার অর্থ কি, ইহার সত্য সার্থকতা কোথায়?”

এই প্রশ্নের সরল স্বচ্ছ ও পূর্ণ উত্তর মানুষ যুগের পর যুগ পাইয়াছে। আমার স্বার্থ আমাকে শিখায় যে, জগতের যত ধনসম্মান সৌভাগ্য আমার হউক। কিন্তু আমার জ্ঞান আমায় দেখাইয়া দেয় যে, ঐ ইচ্ছাটি শুধু আমার একলার নয়, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রাণীর। সুতরাং আমি একা সমস্তটা দখল করিতে গেলে ইহারা আমায় পিষিয়া মারিবেই। যে-স্বপ্নের জন্ত আমি লালায়িত তাহা আমি একচেটিয়া করিতে পারি না। কিন্তু স্বপ্নের পিছনে ধাওয়াটাই ত জীবন! স্বপ্ন না পাওয়া, স্বপ্ন পাওয়ার জন্ত চেষ্টা মাত্র না করা—সে ত মৃত্যু।

যুক্তি বলে : জগতের নিয়মে সকলেই নিজের নিজের স্বপ্ন চায় সুতরাং আমি একা সব স্বপ্ন কখনও পাইব না এবং পুরাপুরি বাঁচাও সেইজন্ত আমার অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এই নিখুঁত যুক্তিটা অটল থাকিলেও দেখি আমি দিব্য বাঁচিয়া আছি এবং স্বপ্ন খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের বলিতে হয়—মানুষ নিজেকে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে আমাকে যদি ভালবাসে তবেই আমার স্বপ্ন-সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু এটা যে অসম্ভব ব্যাপার। ইহা কখনও হয় না; তবুও আমরা ত পাশাপাশি আছি; আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা আমাদের শক্তি সৌভাগ্য ও সম্মানের অন্বেষণ কিসের আভাস দেয়? আমরা ঐ সবার ভিতর দিয়া পরকে আপন করিতে চেষ্টা করিতেছি—নিজেকে মানুষ যতটা ভালবাসে তাহা অপেক্ষা আমাকে বেশী ভাল বাসাইতে প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু সকলেই দেখি আমা অপেক্ষা নিজেকে বেশী ভালবাসে সুতরাং সেই চরম তৃপ্তি আর ভাগ্যে ঘটিল না। কত মানুষ এমনি অল্পভব করে—এ সমস্যার সমাধান করিতে পারে না—হতাশ হইয়া জলিয়া পুড়িয়া বলে—এ জীবন কিছুই না, শুধু একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কিন্তু তবু বলি ঐ সমস্যার সমাধান অতি সহজ এবং

আপনা হইতে আমাদের কাছে দেখা দেয়; একটি মাত্র অবস্থায় আমরা স্থবী হইতে পারি যখন পৃথিবীর জীব নিজেদের যত ভালবাসে তাহা অপেক্ষা অল্পকে বেশী ভালবাসিবে। এইটি সত্য হইলে নিখিলবিশ্ব আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

আমি মানুষ এবং আমার চৈতন্য আমাকে সর্ব-সাধারণের স্বপ্নের মর্মগত নিয়মটি দেখাইয়া দিতেছে। সে নিয়ম আমাদের মানিতে হইবে—আপনাকে যতটা ভালবাসি তাহা অপেক্ষা অপরকে ভালবাসিতে হইবে।

এই ভাবে জীবনকে চালাইলে তাহার এমন একটি অপূর্ণ তাৎপর্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবে যাহা আমরা কখনও দেখি নাই। সৃষ্টির মধ্যে জীব জীব হিংসা দেখি—এক অল্পকে ধ্বংস করিতেছে দোষী, কিন্তু ইহাও সত্য যে, জীব জীব প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে—এক অল্পকে সাহায্য করিতেছে। ধ্বংসের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই—প্রাণের ধারা পুষ্ট হইতেছে প্রেমের আদান-প্রদানে। এই প্রেম বাহিরে জীব জীব মৈত্রী ও অন্তরে অল্পপম মাধুর্যের রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। বিশ্বমানবের ইতিহাস আমি যতটুকু বুঝিয়াছি—আমি দেখিয়াছি যে, মানবসভ্যতা সমুৎপাদনে চলিয়াছে একটি শক্তির প্রেরণায়—সেটি পরম্পরের প্রতি প্রীতির টান; এইখানেই জীবের একা-সিদ্ধির অটল ভিত্তি। এইটি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করা এবং এই অল্পপম নিয়মটি জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা—ইহাই আমার কাছে ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপনির্দেশ। মানুষ তার অন্তরের অল্পভূতি ও বাহিরের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়া ঐ সত্যটিকেই ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শুধু বোধের মধ্যে ধরা নয়—প্রাণের গভীরতম প্রেরণায় ঐ সত্যের অসংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য দেখা। মানুষের সব-চেয়ে বড় তৃপ্তি, বড় মুক্তি, বড় আনন্দ ত্যাগ ও প্রেমে। এই অনন্ত পথটি দেখাইয়া দেয় প্রজ্ঞা, এবং জীবনের আবেগ মানুষ সেই দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যাহা তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যদি তাহা তোমার কাছে অস্পষ্ট বোধ হয় তাহার কঠোর সমালোচনা করিও না। আমার আশা আছে বর্মার রঁলা!

একদিন তুমি এ জিনিষটি পরিক্ষাব ও স্পষ্ট করিয়া ধরিবে।
আমি এখন যে ভাবে দেখিতেছি তাহার একটু আভাস
তোমায় দিলাম। ইতি

লিও টলষ্টয়

[ঋষি টলষ্টয়ের বে চিঠিখানির অনুবাদ আজ বাঙলার পাঠক-
পাঠিকাদের উপহার দিতেছি, সেই মহামূল্য লিপি রল' মহোদয়

প্যারিসে আবার দেখান। ইহা তাঁর জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ
বলিয়া তিনি কাছে রাখেন; কোন এক অপরিচিত কয়ালী যুবকের
সমস্তা হ্রস্ব করিতে এবং তাহাকে নিজের প্রেমের আদর্শটি বুঝাইতে
টলষ্টয় কি পরিশ্রম করিয়াছেন! এইখানেই ত তাহার মহত্ব। এই
ঋষি-বর্ণ রল' পরিণোধ করিয়াছেন টলষ্টয়ের জীবনী লিখিয়া। এই
লিপির উপর বলায় মন্তব্য ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।]

ঘরে ও বাহিরে

শ্রী বিজয়রাজ শর্মা

বাড়ীটা বহু কালের পুর্বানো। সেকালে ধরণের নীচ নীচ
ছাদওয়ালা পাঁচ ছয় মহল বাড়ী। তাহারি সব শেষের
মহলটিতে পূর্বিমাদের বাস। ছাদের কড়িঙলা বাকিয়া
ছাদটা কাপড়ের সানিয়ানার মত মাঝখানে থানিকটা
ঝুলিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর মাঝখানে ঢালু জায়গা
পাইয়া বৃষ্টির জল ক্রমাগত ছাদে বসিয়া ভিতরটা অনেক-
খানি ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ফাঁপা চূণ স্বরকির চাবড়া-
গুলি ধসিয়া বরগার গায়ে গায়ে ধসিয়া আধুনিক শিল্পীদের
রহস্যঘন চিত্রের মত অনেক কিছুত-কিমাকার নক্সা
কাটিয়াছে। বহু বর্ষের জলধারা ছাদের ফাঁকে ফাঁকে
অল্পে অল্পে গড়াইয়া আসিয়া হৃদে সাপের গায়েব খোল-
সের মত আঁকা-বাঁকা ও কুদৃশ্য সারি সারি বিবর্ণ রেখা
টানিয়া গিয়াছে। মেজের সান উঠিয়া উঠিয়া প্রতি ঘরেই
তিন চারিটা করিয়া গামলা-প্রমাণ গর্ত। কত কালের
রোদ ও বৃষ্টি খাইয়া দরজা জানালাগুলি আপন ইচ্ছামত
প্রতি বৎসর বাড়িয়া কমিয়া বাকিয়া-চুরিয়া বদলাইয়া যায়।
এখন তাহাদের বন্ধ করিতে গেলে কোনটা বা লাগে না
কোনোটা বা মাঝখানে এক বিঘ্ন ফাঁক হইয়া থাকে।
জানালায় গরাদে ও চৌকাঠের লোহার আংটার সহিত
নারকেলদড়ি কি ছেঁড়া কাপড়ের পাড় বাঁধিয়া কপাটের
শিকলের সঙ্গে কোনো প্রকারে তাহাদের যোগাযোগ
রাখিতে হয়। তিন চার পুরুষের পদচিহ্ন বুকে ধরিয়া
ইট বার-করা সিঁড়িগুলি যেন আপনাদের দীনতা স্বরণ

করিয়া ক্রমে ধরিজীর কোলে মিশাইয়া বাইবার চেঁচায়
তলার দিকে চার পাঁচ আঙ্গুল করিয়া নামিয়া গিয়াছে।

উঠানে একটা গোয়াল-ঘর ও একটা ঢেঁকিশাল ছিল।
বহু বৎসরের অব্যবহার ও অমেরামতীতে আজ তাহা
হুইটা ভাঙা ইটের স্তূপ মাত্র। কিছু কাল এক জোড়া-
গোথুরা সাপের বাসাও সেখানে হইয়াছিল।

বাড়ীর অপর সরিকেরা নিজেদের মহলগুলি কেহ
আগাগোড়া ভাঙিয়া আধুনিক বিলাতী-ক্যাসানে
গড়িয়াছে, কেহবা হুইতলার উপর তিনতলা তুলিয়াছে,
কেহ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা দালান আনাচ কানাচ
বিরিয়া বাসস্থান বাড়াইয়া স্থাপত্যশিল্পের মুগ্ধপাত
করিয়াছে, কেহ পুরানো বাড়ীকে খাড়া রাখিবার জন্য প্রতি
বৎসর নতন নতন জায়গায় নতন নতন তালি লাগাইয়া
চলিয়াছে আর কেহ বা পূর্বপুরুষের কীর্তির উপর
হস্তক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহাকে তিলে তিলে ধ্বংস-স্তূপ
হইয়া যাইতে দিতেছে। সব জড়াইয়া সাবেক বাড়ীখানা
এখন একটা বিচুড়ীস্থাপত্যের অপূর্ণ ও রহস্যময় গোলক-
ধাঁধা।

সেই বিচিত্র বাড়ীর ভগ্ন-প্রায় শেষ মহলটাতো আজ
অস্ত্রাশ্রয় বাড়ীর মত ভাইফোটার উৎসব। একটি মাত্র
বোনের হুইটি ভাই। ছোটটি নিতান্ত ছোট, পাঁচ বৎসর
সবে পার হইয়াছে। বড়টি বছর কুড়ি। তাহাকেই
ভাইফোটার উপহার দিবার জন্য পূর্বিমার সমস্ত

আয়োজন। কাল হইতে এই লইয়াই সে ব্যস্ত। পাড়ার অন্ত্র মেয়েদের মত শাস্তিপুবে ধুতি-চাদর লইয়া পচিশ-ত্রিশ টাকার বাজার-খরচ হাতে করিয়া সে বাপের বাড়ী আসে নাই, স্বামীঘরে ভাইদের ডাকিয়া আদর-আপ্যায়ন করাও তাহার সাধ্য নাই। সে যে বিধবা মায়ের বিধবা মেয়ে। তাহার উৎসবের যত ঘট, যত প্রাচুর্য তাহার অধিকাংশেরই বাহিরে কোনো প্রকাশ নাই।

সারা বৎসব দাদার ছেঁড়া ধুতিগুলির মাঝখান সেলাই ও রিপু করিয়া সে পরিত। পূজার সময় জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাহার তিন ভাইবোন তিনথানা নূতন কাপড় পাইত, কারণ জ্যাঠামহাশয় ছিলেন সওদাগর আপিসের বড়-বাবু এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃহীনদের প্রতি এ কর্তব্যটা করা তিনি উচিত মনে করিতেন। কিন্তু পূর্ণিমা কোনো দিন সে নূতন কাপড় পরে নাই। পূজার পর দেখিতে দেখিতে ভাই-ফোঁটা আসিয়া পড়ে। তাহার ভাইদের সেই একটি মাত্র বোন কি করিয়া ভাইদের শুধু হাতে সে ফোঁটা দিবে? ছোট ভাইটিকে আট আনা পয়সা খরচ করিলেই একখানা কাপড় দেওয়া যায়। মাকে লুকাইয়া জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ীর ঝিকে দিয়া মাঝে মাঝে বড়ি বিক্রি করিয়া সে যে দুই চার আনা সংগ্রহ করে তাহারই পুঞ্জি হইতে সে কাপড় একখানা আনানো চলে। কিন্তু দাদাকে ত আর খোলাই-করা কাপড় একখানা না দিয়া পারা যায় না। কোথায় পাইবে সে তাহার জন্ত আড়াই টাকা তিন টাকা? ভবিষ্যতের আশাও তাহার কিছু নাই যে, আজ না হউক দুই বৎসর বাদে দিবে? তাহার যে জীবন-প্রভাতেই অদৃষ্ট লিখন আগাগোড়া জানা হইয়া গিয়াছে। তাই বৎসরান্তের ঐ একটি মাত্র নূতন কাপড়ও সে রাখিয়া দেয় ভাই-ফোঁটায় দাদাকে দিবে বলিয়া।

কাল রাত জাগিয়া সে রসবড়া ও নারিকেলের সন্দেশ করিয়া রাখিয়াছে; ছানার খাবারের বড় দাম; বেশী দেওয়া যায় না। সকালে দাদার জন্ত চার পয়সা দামের দুইটি ও খোকার জন্ত দুই পয়সা দামের দুইটি সন্দেশ আনাইয়াছে। একটি দিলে খোকা বড় রাগ করিবে, তাই কম দামের দুটিই আনাইতে হইল। খোকা

ত এমনিতেই বলে, “দ্বিদিটা পচা, আমাকে কিছু দেয় না।”

বেলা হইতে চলিল। পূর্ণিমা সেই সকাল হইতে ধান দুর্ধা চন্দন ইত্যাদি সাজাইয়া স্নান সারিয়া বসিয়াই আছে। দাদা রাজীবের দেখা নাই। খোকাটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আল্পনার গণ্ডীর বাহির হইতে খাবারগুলির দিকে লুঙ্গ দৃষ্টি দিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাটুদিকে নাচিতেছে। কি অল্পবয়সের স্ত্রী!

“দ্বিদি, আমাকে দাও না ভাই, ওই সন্দেশটা। আমার খুব ভাল লাগবে। আচ্ছা, এখন একটা দাও, অম্বটা পরে দিও।”

দ্বিদি বলিল, “মাঃ বোকা ছেলে! বড় ভাইয়ের আগে ছোটকে ফোঁটা নিতে নেই।”

খোকা বলিল, “ফোঁটা ত চাইনি, সন্দেশ নেব খালি। ওই বড়টা দিলেই হবে।”

দ্বিদি বেচারী তাহার সঙ্গে আর পারে না চোখ ফিরাইলেই হয়ত ছোঁ মারিয়া দৌড় দিবে। অথচ দাদার কি বুদ্ধি! আজকার দিনেও সকাল-বেলা সাত তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। কখন যে আসিবে, স্নান করিবে তাহার ঠিক নাই। কাজের মাঝবের কাজ থাকে, পাঁচ জন ভাত্র লোকের সঙ্গে যাওয়া-আসা করিতে হয় জানি; কিন্তু আজ বছরকার দিনের এই সকাল বেলাটুকুও কি ঘরে থাকিলে ভাত্রলোকদের কিছু অসম্মান করা হইত? কাল রাত হইতে পূর্ণিমা যে উৎসাহ সঞ্চয় করিয়াছিল, তোর হইতে এই বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত তাহাকে জিয়াইয়া রাখিয়া রাখিয়া ক্রমশই তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইচ্ছা করিতেছে আল্পনাটার উপর জল ঢালিয়া খাবারের থালাটা খোকাকে ধরিয়া দিয়া কাপড়খানা আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দেয়।

বেলা ঠিক এগারোটার সময় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘর্ষাক্ত কলেবরে একতোড়া ফুল হাতে করিয়া রাজীব আসিয়া ঘরে ঢুকিল। পায়ের ধূলিমলিন জুতা জোড় প্রায় পূর্ণিমার আল্পনার উপরই ছিটকাইয়া ফেলিল, গায়ের চাদর ও ঘর্ষসিক্ত জামাটা ফেলিল খোকার নূতন কাপড়-খানার উপর। তার পর চীৎকার জুড়িল, “মা, সাংগির

আমার তেল আর সাবানটা দাও; আমাকে এখনি কাজে বেরতে হ'বে। এই পূর্ণি, আমাকে একখানা ধোপ কাপড় দিতে পারিস? এ প'রে ত আর ডল্লোকের সামনে বেরোনো যায় না।”

মা রাজীবর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “এইত ঘরের মধ্যেই কুলুসিতে তেল সাবান রয়েছে, বাবা; নিজে দেখে কি কোনোদিন জিনিষ নিতে শিখবি না? বুড়ো বয়স পর্যন্ত কত আর আমি হাতে হাতে তেলটি জলটি খড়কেটি জুগিয়ে আসব? এই আশ্রিত করেছি, এখনই কি ধুয়ে আবার ঘরে ছুটতে পারি?”

রাজীব রাসিয়া বলিল, “না পার, আমি অমনিই চান করছি। তোমরা কোথায় যে কি রাখ, অত আমি খুঁজতে পারি না।”

সে হনু হনু করিয়া কলতলায় ছুটিয়া চলিল। পূর্ণিমা ধোলাইকরা নূতন কাপড়খানা হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, “আজ যে ভাইফোঁটা তা কি তুলে গেছ? নেয়ে এই কাপড়খানা প'রে এস, ফোঁটাটা নিয়ে তবে বেরিও।”

রাজীব খুসী হইয়া বলিল, “ধাক্কা, বাঁচিয়েছিল। আজ সরমাদিদির বাড়ী আমার ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন আছে, ভাগ্যে নূতন কাপড়খানা রেখেছিলি, তাই লোকের বাড়ী যেতে পারব। মস্ত ভোজ্য সেখানে আজ। আমাদের সমিতির সব কর্মীরা আসবে।”

পূর্ণিমার মুখখানা স্নান হইয়া গেল। সে কিছু না বলিয়া কাপড়খানা দাদার হাতে তুলিয়া দিল। মা তেল সাবান হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, “ভাবি আমার মস্ত সাতমহলা বাড়ী, তাই ছেলে তেলটা খুঁজে বার করতে পারলেন না।”

রাজীব বলিল, “আমার অনেক কাজ আছে, তেল খুঁজে খুঁজে বেড়াবার সময় হয় না।”

মা চলিয়া গেলেন। ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিতে গেলে মাছটা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, শেষে ছেলেরই খাইতে পাইবে না।

রাজীব স্নান সারিয়া চুল আঁচড়াইয়া হাতঘড়িটা হাতে বাধিতে বাধিতে বলিল, “পূর্ণি, দেখত মা'র হাত-বাক্সে

আনা দুই পয়সা আছে কি না। অনেকটা দুব যেতে হ'বে, হেঁটে হেঁটে আর পারি না।”

পূর্ণিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, “এখনি বেরোবে কি, দাদা? ফোঁটাটা নিয়ে যাও।”

রাজীব হাসিয়া ঘরের ভিতর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, “হ্যাঁ তাইত। তুলে গিয়েছিলাম। এই দাঁড়াছি, চট্ট ক'রে দিয়ে দে। বেশী বেলা হ'য়ে গেলে সরমাদি আবার রাগ করবেন।”

পূর্ণিমার চোখে জল ভরিয়া আসিল। জুতাপায়ে চৌকাঠের গোড়ায় দাঁড়াইয়া আপন মা'র পেটের বোনের ফোঁটা লইতেও তর সহিতেছে না, কোথাকার এক পাতানো বড়মামুষ দিদির নিমন্ত্রণের তাড়ায়। ইচ্ছা করিল বলে, “আমার ফোঁটা মনে মনেই রইল, যাও, তোমার আর অত হতভাক্তা করে' নিতে হ'বে না।” কিন্তু বলা হইল না। অমন কথা বলিলে মা রাগ করিবেন; তাছাড়া দাদার মুখের উপর অমন করিয়া কথা সে ত কোনোদিন বলে নাই। পূর্ণিমা বলিল, “জুতাজোড়া খুলে বোস, নইলে দেব কেমন ক'রে?”

“আঃ, তোদের শাস্তরের জালায় আর পারি না,” বলিয়া রাজীব হুড়মুড় করিয়া পিড়ির উপর গিয়া বসিয়া পড়িল।

ফোঁটা লইয়া বলিল, “একটা মিষ্টি হাতে তুলে দে। এত বেলায় অতগুলো বেলে সেখানে আর কিছুই খাওয়া হ'বে না।”

পূর্ণিমা হাত না তুলিয়া বলিল, “তোমার যা খুসী তুলে নাও, আমি খোকাকে ভাকতে যাচ্ছি।”

রাজীব তাহার কথায় লক্ষ্য না করিয়া একটা নারিকেলসন্দেশ গালে পুরিয়া চান্দরটা কাঁধে ফেলিতে ফেলিতে তোড়াটা বগলে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পূর্ণিমা আসিয়া দেখিল পিড়ির সামনে সাজানো থালা রেকাবগুলি ঠিক তেমনি রহিয়াছে, কেহ যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা বোঝা যায় না।

খোকা দেখিয়াই আনন্দে নাচিয়া উঠিল, “দিদি, আমি তোমার আঁকা পিড়িতে ব'সে এইবার সব সন্দেশগুলো খাই। কি মজা, দাদা আজ সব রেখে দিয়েছে।”

থোকাতে ফোঁটা দিয়া দিদি বলিল, “সব কি খেতে পারবি, ভাই? আচ্ছা, যতগুলো পারিস্খা।”

থোকা দুই হাতে তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার স্বতিতে এমন কাণ্ড সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। মা কিম্বা দিদি কোনোদিন তাহাকে একটার বেশী দুইটা মিষ্টি ত দেয় না। মিষ্টিটা বড় হইলে আবার আধখানা ভাঙিয়া রাখিয়া দেয়। আজ একি হ'ল? দিদি একটাও ত তাহার পাত হইতে সরাইয়া রাখিল না।

কিন্তু ভাতের কাটিটা হাতে করিয়া মা ‘হাঁ, হাঁ,’ করিয়া আসিয়া পড়িলেন। “ক'রুলি কিরে হাবা মেয়ে; থোকা যে সব এঁঠো ক'রে দিলে। আচ্ছা নবাবের ঘরের বোই তুই হয়েছিস বাছা। ওই দুখালা খাবার কি ব'লে নষ্ট ক'রুলি?”

পূর্ণিমা কথা কহিল না। মা আবার বলিলেন, “রাধতে রাধতে এঁটোটা ছুঁই কি ক'রে? ওরে পূর্ণি নে আর রাগ দেখাতে হবে না। ছেলেমানুষ এঁঠো করেছে করেছে, একটু আলাদা ক'রে রাখ্। আমরা না হয় না খাব; ওরা দুভাই খাবে এখন। ও চারপাঁচ দিন ঠিক থাকবে।”

পূর্ণিমার সেদিকে না তাকাইয়া রাজীবের ছাড়া কাপড় গামছা গেঞ্জিগুলো কাচিয়া বোদে মেলিয়া, তেল সাবান কলতলা হইতে সরাইয়া ময়লা চিকনৌ পরিষ্কার করিয়া ছাদে বড়ি শুকাইতে চলিয়া গেল।

“ছেলেটা সত্যি বড় অবুঝ” বলিয়া মা নিজেই থোকায় হাতে চার পাঁচটা মিষ্টি গুঁজিয়া দিয়া খালাটা সরাইয়া লইলেন।

পূর্ণিমার ভাই-ফোঁটার উৎসব শেষ হইয়া গেল। পাশের বাড়িগুলোতে তখন দই মিষ্টি মাছ ভরকারী লইয়া হাঁকাহাঁকি চলিতেছিল। রান্নার গন্ধে সমস্ত পাড়াটা ভরিয়া গিয়াছে।

* * * *

কলেজে রাজীবের নাম ছিল ‘ব্রিলিয়ান্ট’ ছেলে বলিয়া। কিন্তু সে ঠিক সময় ক্লাশে আসিত, নোট লিখিত, টিউটোরিয়াল ক্লাশে খাতা জমা দিত এবং অধ্যাপকের সংশোধনগুলি দাপ দিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিত। ইহাতে ছেলেমহলে তাহার সুনামের হানি হইতে লাগিল।

একদল ছেলে বলিত, “ওটা ব্রিলিয়ান্ট-না কচু! ‘বুফওয়াম’ কোথাকার, শুধু মুখস্থ বিদ্যা কপ্চায়। পৃথিবীর কোনো ধর রাখে না! কেবল নোট আর বই, বই আর নোট। কলেজে যেন ওকে কেউ ঝাড়ুদারের কাজ দিয়েছে, তাই সবার আগে এসে ধম্মা দিতে থাকে! ডিগ্রী নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? ঐ ক'রেই বাঙালী জাতটা গেল।”

রাজীব মনে করিল, সত্যিই সে বড় সেকলে। দেশের এত বড় বড় সমস্যার কথা ভুলিয়া, মানব প্রেম, বিশ্বমৈত্রী, সোসিয়ালিজম্, সমাজসংস্কার, সাহিত্য, শিল্প, কোন-কিছুর কথা না ভাবিয়া সে কিনা মূর্খের মত বই মুখস্থ করিতেছে। তাহার মত মস্তিষ্ক যদি এমনি অপব্যয়ে নষ্ট হয় তবে আর দেশ রসাতলে যাইবে না কেন?

কিন্তু ভাবিল না যে মস্তিষ্কার আর এতটু উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেশকে রসাতল হইতে স্বর্গে প্রমোদন দিবার চেষ্টা করিলে এই দুই চার বৎসরেই রসাতলের উপর তিনচার প্রহু মাটি পড়িয়া নাও যাইতে পারে। অগত্যা রাজীব ব্যাকরণ শেষ হইবার আগেই সাহিত্যচর্চা স্বরূপ করিল, লাইন টানিতে না শিখিয়াই আর্ট ক্রিটিক হইয়া উঠিল। ইংরেজী বই আর সে পড়ে না, ‘বন্টনেটাল’ আধুনিক সাহিত্যের অনুবাদই তাহার নিত্য সহচর। ঘরের জগদ্ধাতীর ছবিটা সরাইয়া ফরাসী আর্টিস্টের একটা ছবির একরঙা ছাপা কপি আনিয়া টাঙাইয়াছে, কারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে জাগাইতে হইলে ভিতরে বাহিরে সেই রকম আবহাওয়ার দরকার। কিন্তু একলা কি জগতে কোনো কাজ হয়? বিশ্বমৈত্রী কিম্বা সোসিয়ালিজম্ কোনোটাই খোলে না বিনা সঙ্গে। রাজীবের একটি দল জুটিল। তাহার ভিতর হুট একটি কলেজের ছেলে। বিশেষ বন্ধুতা কিন্তু বৈশীরা ভাগই এই অকাজে জীবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক অনেককাল চুকাইয়াছে। তাহাদের দুই চারজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ অনেক দিন পার হইয়াছে, তাই আঠারো কুড়িদের গলা ধরিয়া ছাড়া তাহারা হাঁটে না।

রাজীব তাহার সেকলে মনটাকে পালিশ করিয়া করিয়া শীঘ্রই এই ত্রিশ-বত্রিশদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল; এমন কি অনেকে বলিত আধুনিকতায় রাজীব আর বছর

খানিকের ভিতরই ইহাদের ছাড়াইয়া উঠিবে। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বক্তৃতাশৈলীর কাছে কুড়ি যে অনেক আধুনিক।

বি-এ, পরীক্ষায় রাজীবের সফলতা সম্বন্ধে অধ্যাপকেরা যতই সন্মিহান হইতে লাগিলেন, তাহার শিঙাড়া বন্ধুরা ততই তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। দলের পাণ্ডা প্রভঞ্জন বলিল, “রাজীব, কলেজটা ছেড়ে দাও হে; পাঠশালার পড়া আর কত কাল আওড়াবে? এটা ননকোঅপারেশনের যুগ, জান ত?”

প্রস্তাব শুনিয়া মা বলিলেন, “হ্যাঁয়ে, দু-বছর যে মাইনের টাকা গুলুলাম, সে কি সব জলে দেবার জন্তে?”

ছেলে বলিল, “জলে যা গেছে তাত গেছেই। পরীক্ষা দিতে হ’লে আরো ত এক শ’ দেড় শ’ তার উপর জলে যাবে।”

মা বলিলেন, “তোদের পেটে ধরেছিলুম; আমার যা কিছু তোদেরই পিছনে গিয়েছে ছুঃখ নেই। কিন্তু ওই বিধবা মেয়েটার গলার হারছড়াও যে বাঁধা দিতে হ’ল তোরা মাইনে দেবার জন্তে, সেটা কি তোকে উদ্ধার ক’রে দিতে হ’বে না?”

ছেলে বলিল, “পাশ ক’রে ত চলিশ টাকা মাইনের কেরাণীব চেয়ে উচ্চ পদের আশা নেই; সে আমি অম্মনিও আনতে পারব।”

মা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন; অগত্যা রাজীব পরীক্ষা দিল, কিন্তু পাশ হইল না। বলিল, “ফিসেব এই টাকা ক’টা আমি বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তাও মার জন্তে নষ্ট হ’ল।”

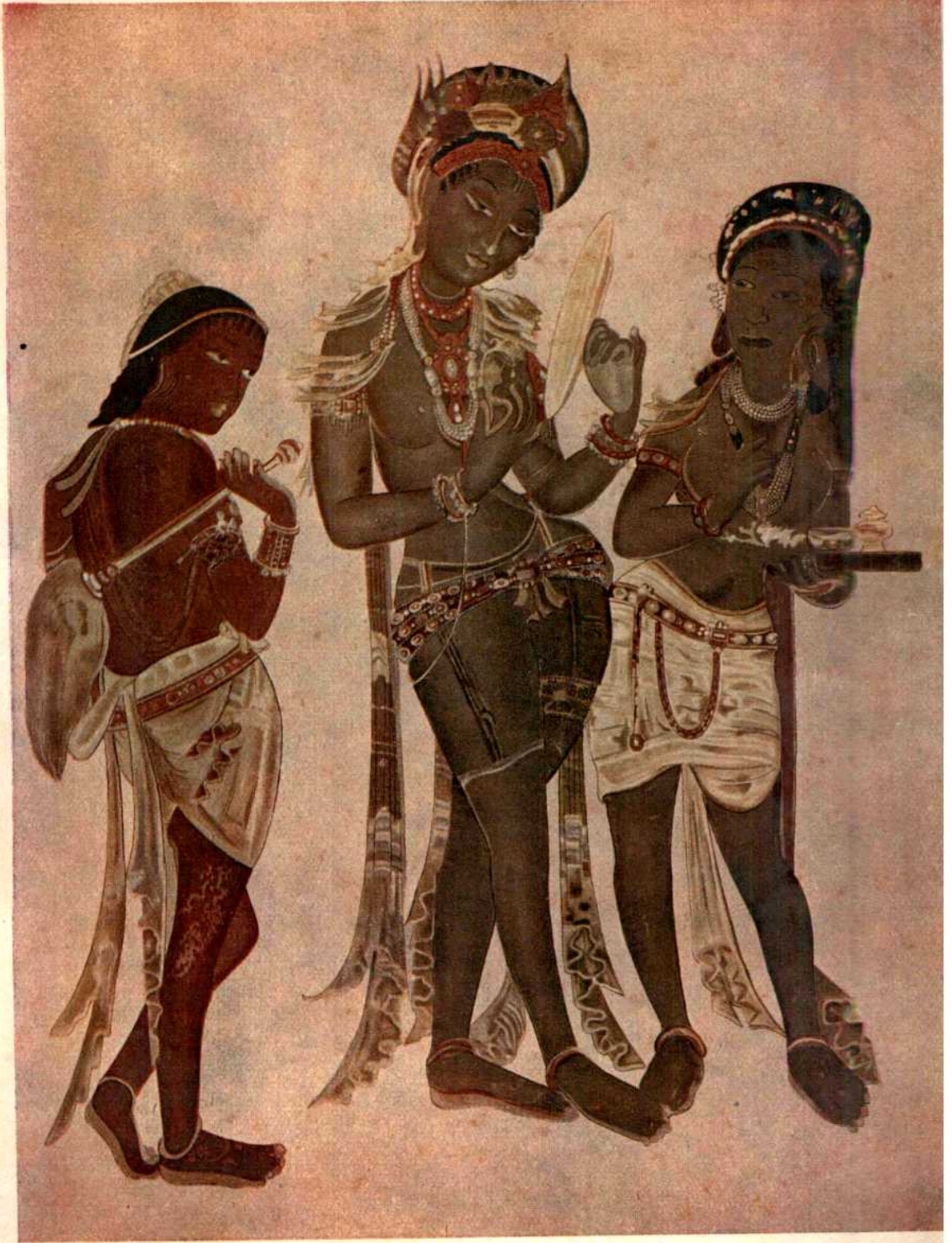
রাজীব পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া পুরাপুরি সমিতির কাজে লাগিল। দেশের স্বর্গারোহণের সিঁড়ি আরো এক ধাপ বাঁধাইতে আব দেবী নাই।

* * *

সমিতির অন্ততমা নায়িকা শ্রীমতী সরমাসুন্দরীর বাড়ী আজ সভ্যদের ভাই-ফোটার নিমন্ত্রণ। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী, দেউড়িতে পাগড়ী-বাঁধা গালপাট্টাওয়ালা দরওয়ান দাঁড়াইয়া, বাবুদের সে-ই আনিয়া বসিবার ঘরে

বসাইতেছে। ঘরের আসবাব-পত্র বিলাতী কেতায় সাজানো, কোথাও কোনো খুঁৎ নাই। কিন্তু অতিথিদের অধিকাংশেরই বেশ-ভূষায় দারিদ্র্য উকি মারিতেছে। অভাবের দীনতার উপর বিলাসেবু একটা পালিশ পড়িয়া দারিদ্র্যের অনাড়ম্বর সহজ স্ট্রিকুও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বিলাসের পূর্ণাঙ্গ আয়োজনের কাছে তাহা একটা ডেঙচানির মত দেখাইতেছে।

সরমাসুন্দরীর শশুর পাটের দালানী করিয়া অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীর ব্যবসায় সেই অর্থ উপভোগ ও অপব্যয় করা। যতদিন শশুর বাঁচিয়াছিলেন, বধূকে অসুখ্য সম্পত্তি করিয়া দাসীপবিতৃতা অন্দরমহলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি আপনার নবজ্জিত আভিজাত্যটা সযত্নে বাঁচাইয়া চলিতেন। সরমার সম্মান হয় নাই; বিরাট একটা বাড়ীর অন্দরের অতল গহবরে শুধু একদল দাসীর মধ্যে সে একলা হাঁপাইয়া উঠিত। একটু বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; ইংরেজী ও বাংলা নাটক নভেল পড়িবার মত বিদ্যা সে-বয়সে সে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহার ধনী শশুরের বাড়ীতে হীরা জহরত অপেক্ষাও পুস্তক দুর্লভ ছিল। তাই সরমার কাজ ছিল খড়খড়ি ও ছাদের আলিসার পাশ হইতে লুকুনেজে বাহিরের পৃথিবীর পানে তাকাইয়া থাকা আর আপন মনে সম্ভব অসম্ভব উপক্ৰান্তের জাল বোনা। তাহার পক্ষীর বহর দিনকার দিন যত বাড়িতেছিল, বাহিরের উপর তাহার লোভটা ততই ছরস্ক হইয়া উঠিতেছিল। পাইলে সে যেন এখনি সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ঘুলুঘুলির ভিতর হইতে সরমা এ বাড়ীর সমস্ত অতিথি অভ্যাগত, দেনদার, পাওনাদারের চেহারা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। পথে যে কলেজের ছেলের দল, কেরাণীবাবুর পাল, কাবুলী মহাজন, খোঁট্টা মুটে, উড়িয়া ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টিয়ান নার্স, নিত্য আনাগোনা করিত তাহাদের কেহ সবমাকে কোনো দিন দেখে নাই, কিন্তু তাহারা সকলেই ছিল সরমার পরিচিত। কে কখন কোন্ পথে আনাগোনা করে তাহা সরমা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দিতে পারিত। সবমাব বৃদ্ধ শশুর যখন তাঁহাব অগাধ সম্পত্তি নিষ্কণ্ডা পুঞ্জের হাতে তুলিয়া দিয়া সরমার কারাগারেব



রাজ্যের প্রসাধন
অঙ্কণ গুহা চিত্রাবলী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

['সহনা' প্রবন্ধ]

প্রহরীর কাজ ফেলিয়া মরজগতের মায়া কাটাইয়া গেলেন তখন সরমার বেশ বয়স হইয়াছে। সাধারণ বাঙালীর ঘরের মেয়েরা সে বয়সে গিন্নী বাম্মী হইয়া মেয়ের বিয়ের ভাবনায় আহার নিদ্রা তুলিয়া বসে। সরমার ছেলে-মেয়ের বালাই ছিল না; এককালের বাহিত মুক্তির স্বাদ পাইয়া সে নিজেকে লইয়াই মাতিয়া উঠিল। কৈশোরে কি প্রথম যৌবনে যে স্বাধীনতা তাহাকে সহজ আনন্দ দিতে পারিত, আজ অসময়ে তাহা যেন তাহাকে উদ্ধাম মস্তভায় নাচাইয়া তুলিল।

সরমা এখন আর খোলা গাড়ী ছাড়া চড়ে না, বায়োস্কোপ থিয়েটার না দেখিয়া দিন সমাপন কবে না। বাজারে কোনো জিনিষের দরকার হইলে সে মাইনে-করা সরকারদের ছুটি দিয়া আপনি গাড়ী চড়িয়া বাজারে যায়, সভাসমিতিতে মেয়েদের জায়গায় না বসিয়া নিরীহ স্বামীটিকে টানিয়া লইয়া পুরুষদের মাঝখানে আপনার স্বাধীনতা সগৌরবে ঘোষণা করিয়া আসন লয়। কারণে অকারণে সর্ব্বঘণ্টে তাহার আনা-গোনার শেষ নাই।

কিন্তু স্বাধীনতার এই রকম নিরুদ্ধেশ আশ্বালনে সরমার মনে একটা খটকা লাগিতেছিল। তাহার সাময়িক উদ্ধামতার ভিতর তাহার বয়সের স্বৈর্য্যটা এক একবার মাথা জাগাইয়া উঠিতেছিল। লজ্জা আসিয়া বলিতেছিল, “একি পাগলের খেলা?” অথচ ইহাকে ছাড়িয়া স্থির হইয়া ঘরেও সে বসিতে পারিতেছিল না।

সরমার দুব সম্পর্কের দেবর নীরদ বৌদিদির স্বাধীনতার উৎসবের একজন উৎসাহী কর্মী ছিল। নীরদ বলিল, “বৌদি, তুমি একটা কাজে নাম। তোমার এত বুদ্ধি, এমন অর্থও অবসর, তার উপর এই প্রচণ্ড উৎসাহ, তোমার মত মেয়ের জন্মই দেশ তাকিয়ে আছে।”

সরমা তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। কি কাজ সে করিবে, কেমন করিয়া করিবে, কাহাদের লইয়া করিবে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। সে তাহাব দেবরের উৎসাহী-সমিতিতে নাম লিখাইয়া ফেলিল। কারণ

সমিতির প্রধান মূলধন উৎসাহের অভাব সরমার ছিল না। উৎসাহীরা তাহাদের নূতন লাভে আনন্দে অধীর। তাহারা আজ চরকা কাটা, কাল সাহিত্যের স্বপ্ন দেখা, পরন্তু সঙ্গীতসঙ্গত করা, পরদিন সমাজসংস্কারের বক্তৃতা করা ইত্যাদি যে কাজে যখন লাগিত সরমা মহা উৎসাহে তখনই তাহাতে যোগ দিত। সরমার কথা ধার ছিল খুব। কাজেই সকল বিষয়ে তাহাকে দিয়া একটা প্রবন্ধ পড়াইয়া কার্য্যারম্ভ করিলে সভা জমিত ভাল। ইহাতে সরমার মনটা খুব খুশী ছিল। কাজের একটা অছিলায় নিত্য খানিকটা নূতন মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া বহুকালের কাব্যাত্মক মনকে ধোরাক জোঁগানাও হইত আবার অবধা চাপলোর আত্মগ্লানি হইতে মনকে মুক্ত রাখাও চলিত। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়।

কার্য্যকরী সভা ও উৎসবসভা মিলাইয়া উৎসাহী সমিতির সভার বৈচিত্র্য ছিল অসাধারণ, প্রায় প্রতিটাই নূতন। সেদিন ছিল লাত্ত-ধিতীয়ার উৎসবসভা।

* * *

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বসিবার ঘরে কোচে কুসিতে জন পনের কুড়ি পুরুষ ও তিন চারটি মহিলা তখনও ধৈর্য্য সহকায়ে মধ্যাহ্নভোজনের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। দেয়ালে টাঙানো পুষ্প-স্তবকও ও মালা এবং ফুলদানির ভিতরের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের গন্ধে রন্ধনশালার গন্ধ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

নীরদ রান্নাঘর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, “বৌদির এখনও চিংড়িমাছেব কাটলেট ভাজা হয়নি; প্রভঞ্জন-বাবু, আপনার বোধহয় ক্ষিধের চোটে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত হজম হ’য়ে গেল! রাজীব-বাবু ত মুখ শুকিয়ে এতটুকু!”

রাজীব ক্ষুব্ধ জ্বালা চাপিয়া সহাস্তে বলিল, “আমরা উৎসাহী, এত অল্পেই খাবাব উৎসাহ কি নিভতে পাবে? বাড়ী থেকে না খেয়ে বেরিয়েছি, যাতে এখানে এসে খাবারের উপর সম্পূর্ণ স্ববিচার করতে পারি।”

তদ্বী স্তম্ভরী ছোট একটি মেয়ে ঘাড় ধুবাইয়া বলিল, “বাড়ী থেকে না খেয়ে বেরিয়েছেন, কি রকম? আজ না ভাইফোঁটা? আপনার বোন আপনাকে অমনি

ছেড়ে দিলে ? আমার ত ভাইদের খাইয়ে আসতেই বেলা একটা হ'রে গেল।”

রাজীব একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “গরীবের বোনের ভাইফোঁটা, খাওয়াও বা, না খাওয়াও তা।”

মেয়েটি রাজীবের মুখের দিকে তাকাইয়া মেয়েটি বলিল, “তবুও কষ্ট ক'রে করা।”

রাজীব কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, “কষ্টলাষের একটা মস্ত উপায় হচ্ছে, কিছু না থাকা; আমার বোনের সেই উপায়টা আছে, কাজেই কষ্ট তাকে করতে হয় না।”

রন্ধনশালার তদারক শেষ করিয়া স্বসজ্জিতা সালকারা সরমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে একরাশ ফুলের মালা ও রূপার থালায় ধানদুর্ধা ও চন্দন। পিছন পিছন একটি ভৃত্য একটা পিতলের বড় থালার উপর একটা শাঁখ, তামার একটা ঘট ও নানা রকম খোলা ফুল লইয়া ঘরের মাঝখানের টেবিলের উপর রাখিল। উজ্জ্বল সরমাকে দেখিয়া নম্রহাস্তে মুখ আলোকিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সরমা রূপার থালাটা নামাইয়া বাজুবন্ধ-পর্য্য তাহার শুভ স্বন্দর হাতখানি দোলাইয়া বলিল, “আজ আমি সকলের বড়; আমি কাউকে প্রণাম করতে-টবুতে পারব না। আমায় যারা প্রণাম করবে, তাদের অনেক আশীর্বাদ করব।”

চারিধারে ঘুরিয়া তাকাইয়া হাসির প্রসাদে বদ্ধবর্গকে তৃপ্ত করিয়া সরমা বসিয়া পড়িল। নিমজ্জিতা আর তিনটি মেয়েকে কাছে ডাকিয়া সরমা একজনের হাতে চন্দনের বাটি, একজনকে ধানদুর্ধা ও একজনকে চূর্ণ ফুলগুলি দিল। সরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলের গলায় এক এক ছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিল। নীরদ হাসিয়া বলিল, “বৌদি, ভাইফোঁটার এটাও কি একটা অঙ্গ ? দাদা কিন্তু রাগ করতে পারেন।”

সরমা স্বন্দর তর্জনীটি রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের উপর রাখিয়া বলিল, “ববরদার ! একটিও কথা বলবে না। আজ তোমরা সবাই আমার ছোট ভাই।” রাজীব ও তাহার বয়স্করা কৃতার্থ হইয়া গেল। প্রভঞ্নের মত শিংভাঙ্গার দল একটু মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসিল।

শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণের মধ্যে অল্পবয়স্কা সেই

মেয়েটি সকলকে এক একটা চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিল। মেয়েরা সকলে সরমার দুইধারে একটা বৃত্তের মত ঘিরিয়া বসিল। ছেলেরা একে একে তাহাদের পুষ্পগুচ্ছের অর্ঘ্য হাতে নমস্কারের ভঙ্গীতে আসিয়া যুক্তকরে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে লাগিল। প্রথমজনের পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েদের ঘিরিয়া ছোট ছোট বিজলীর বাতি বৃত্তাকারে পায়ের তলায় জলিয়া উঠিল। বাহির হইতে একবার রাজীব শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল।

তারপর আহারের পালা। মেয়েদের পরিবেশনে আকর্ষণ আহার করিয়া সকলে যখন উঠিল তখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রভঞ্জন বলিল, “আজকার ব্যাপারটা ত খুব ‘সকশেশফুল’ হ'ল, সরমাদি। এর পরেরটা ত এমন সরস জিনিষ নয়। কিন্তু তোমাকে সেটা সরস করে তুলতে হ'বে।”

সরমা বলিল, “কি এবার সাহিত্যসভা, সঙ্গীতসভা, শ্রমিকসভা, আনন্দসভা, দেশহিতসভা না কোনটা ?” প্রভঞ্জন বলিল, “না, এবারকার মত ও সভাগুলো ত হ'য়ে গিয়েছে; এবার আমাদের দরিদ্রবন্ধু সভার ‘ওপনিং মিটিং’। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ গরম গরম লেখা চাই।”

নীরদ বলিল, “রাজীব খুব একটা করুণ রকম গান লিখে দিতে পার না ?”

সরমা বলিল, “প্রবন্ধটা আমি লিখব। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ক্যান্টিন্স আমার বেশী জানা নেই।”

প্রভঞ্জন বলিল, “তাতে কি ? এবছর ত সবই আমাদের প্রায় ওপনিং সেরিমনির উপর দিয়েই গেল। তাতে বেশী খুঁটিনাটির দরকার হয় না। উৎসাহ আর উত্তেজনা জাগাতে পারলেই হ'ল।”

অল্পবয়স্কা মেয়েটি টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, “আপনাদের যেরকম সভার বহর দেখছি, তাতে এক বছর ত সব কটার উদ্বোধন করতেই লেগে’ যাবে। তারপর এবছরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতরা আসছে বছর পর্য্যন্ত আপনাদের সাহায্যের আশায় ব'সে থাকবে ?”

রাজীব বলিল, “তা কেন ? আমাদের সভাগুলি ত সাময়িক কার্য্যউদ্ভাবের জন্য নয়। আমাদের দেশে

শ্রমিকদের হুঃখ, দুর্ভিক্ষের কান্না, ইত্যাদি ত নিত্য লেগে আছে। এগুলির উচ্ছেদসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। এবছর সব গোড়াগুলো বেঁধে নি, তারপর আসছে বছর থেকে আসল কাজ হ'বে।”

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, “শ্রমিক সভার অধিবেশনের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা যদি কাঁদে তবে কি আপনারা তাদের সাহায্য করবেন না?”

প্রবন্ধন বলিল, “নিশ্চয়ই না। প্রত্যেক ছোট হুঃখের কান্নায় যদি কাঁদি তবে বড় হুঃখ মোচন করতে কখনও পারব না।”

সরমা বলিল, “কালইত তোমার সভার দিন পড়ছে। দরিদ্রবন্ধুসভার দিন ত আবার চাঁদা সংগ্রহ আছে। তা' বাজে তর্ক না করে' চাঁদার পরিমাণটা ঠিক করে' নেওয়া থাক্ এস; যাতে কাল সবাই শূন্যহাতে না আসে।”

নীরদ বলিল, “এক টাকার কম চাঁদা নেই; তারপর বেশী যে যা পারে দেবে।”

সরমা তাহার স্বম্বর হাত ঘুবাইয়া বলিল, “আমি পঁচিশ টাকা দেব, যদি আপনারা সব জড়িয়ে একশ' তুলে দিতে পারেন।”

ছোট মেয়েটি টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, “উদ্বোধনে অত টাকা এখন কি হ'বে?”

রাজীব বলিল, “আমাদের স্থায়ী ফণ্ডে জমা থাক্বে। আপনি কত দেবেন?”

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, “আপনি যত দেবেন তত।” তাহার খোঁপা হইতে একটা ফুল খসিয়া পড়িল। রাজীব তুলিয়া পকেটের ভিতর রাখিল। তাহার বুক ঠেলিয়া একটা দোখনিঃখাস উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

সভা ভাঙিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। যাইবার সময় ছোট মেয়েটি বলিল, “রাজীব-বাবু, আসছে-সভায় সব লেখার চেয়ে আপনার গানটা কিন্তু স্বন্দর হওয়া চাই।”

রাজীব একটু ম্লান হাসি হাসিল।

রাজীব যখন ঘরে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়াছে। উঠানে পা দিয়াই দেখিল মা রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িটা তাকে তুলিয়া রাখিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া

মা বলিলেন, “ওমা, রাজীব এতক্ষণে এলি? আমি বলি, আজ বুঝি তুই আর বাড়ীতে খেলি না। তাই এই শেষ বেলায় হাঁড়িটা তুলে রাখছিলাম।”

রাজীব বলিল, “ওমা, আমার ত দুপুরে নেমস্কন্ন ছিল, তা তুমি জানতে না?”

মা একটু রাগ করিয়াই বলিলেন, “কই বাছা, আমাকে আর তুমি বললে কোথায়? আমি আরো আঙ্গ ভাই-কোঁটা ব'লে চার আনা দিয়ে ভাল মাছটা আনলাম; তা তুমি এগারটায় এলে, যেই আমি মাছটা নামালাম অমনি হট হট ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলে। মিথ্যে আমি সারাটা দিন হাঁড়ি কোলে ক'রে বসে রইলুম; বিকেলটায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, উঠে দেখি স্থূয়ি ডুবে গেছে, আঙ্গ আর ভাত খাওয়া হ'ল না।”

রাজীবের মনে কিসের একটা খোঁচা লাগিল সে চর্র চোষা গিলিয়া আসিল, আর তাহার মা আঙ্গ অনাহারেই রহিয়া গেলেন। কিন্তু আবার পূর্ণিমার উপর রাগ হইল। সে ত নিমন্ত্রণের কথা দুপুরে শুনিয়াছিল; রান্না না হয় হইয়া গিয়াছিল, তবু মাকে খবরটা ত দেওয়া যাইত।

রাজীব বলিল, “পূর্ণিকে ত আমি ব'লে গিয়েছিলুম। তার কি একটু ঘটে বুদ্ধি ক'রে বলা উচিত ছিল না?”

মা বলিলেন, “তুই তার খাবার খাস্নি ব'লে সে রাগ ক'রে আঙ্গ কান্নার সঙ্গে কথাই কইলে না। এই সন্ধ্যায় উঠে দেখি তারও ভাত খাওয়া হয় নি।”

রাজীব লজ্জিত ভাবে বলিল, “তুমি গোটা কয়েক মিষ্টি দিয়ে জল খাওয়া একটু।”

মা বলিলেন, “খোঁকা সেই হু'থালো শুদ্ধই এ'ঠে' ক'রে দিয়েছে।”

রাজীব বলিল, “বাক্সার থেকে কিছু আনিয়া নিলে হয় না?”

মা বলিলেন, “এই এত পয়সার মাছ তরকাগি মিষ্টি একদিনে খরচ হ'য়ে গেল, আবার আঙ্গ পয়সা খরচ করুব আমাব জন্তে? সিকের ছুটো পাটালি গুড় তোলা আছে, তাইতেই হ'বে এখন।”

রাজীব মনে মনে ভাবিল, সাহিত্যে করুণবৎ সৃষ্টি

কবুতে হলে, জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য বেদনার আদ পাওয়া দরকার। এই দুঃখই আমার সম্পদ; এর জন্তে কেঁবে লাভ নেই।

সকালে উঠিয়া রাজীব পূর্ণিমাকে বলিল, “পূর্ণি, তোর সেই খাবারগুলো আন, আমি খাব।” পূর্ণিমা একটা কথাতাই গলিয়া গেল। থালা দুই থানা দাদার পাতের কাছে সাজাইল। রাজীব যত পারিল খাইয়া পূর্ণিমাকে বলিল, “শোনু, একটা বড় মুষ্কিলে পড়েছি; আমাকে চারটে টাকা দিতে পারিস?”

পূর্ণিমার রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সে বলিল, “সেই হার-বাধার আর পাঁচটা টাকা প’ড়ে আছে। শীত আসছে, মনে করেছিলাম একটা গরম গায়ের কাপড় কিনব।”

রাজীব বলিল, “আচ্ছা, তুই এখন দে, আমি পরে তোকে দেব।”

মনে মনে বলিল, “যদি না পারি, তাতেই বা দুঃখ কি? ছোট দুঃখের কামায় কাঁদলে বড় দুঃখ মোচন কবুতে পারব না কোনোদিন। আমাদের দুর্ভিক্ষের স্বায়ী কণ্ঠে এ টাকা জমা থাকবে, সে পূর্ণিরও গরম ভাগ্য।”

* * *

দরিদ্রবন্ধুভায় রাজীব চারটাকা দিয়া সভায় হৈ হৈ বাধাইয়া দিল। প্রভঞ্জন বলিল, “রাজীব, তোমার প্রাণটা এত বড় জান্তাম না।”

সরমা বলিল, “রাজীব-বাবু, আপনি যে কেবল গানই হৃদয়ের লিখেছেন তা নয়, দানও করেছেন হৃদয়। যে-দুঃখ হৃদয়কে টলায় না তাতে সাহিত্যের রস জমে না। আপনি সত্যিই দরিদ্রের বন্ধু।”

রাজীব একটু স্নান হাসি হাসিল। তাহার মায় অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া সে দেশজননীর প্রতি আজকার এই পানটি লিখিয়াছিল।

কিরিবার পথে সেই ছোট মেয়েটি ভ্রষ্ট করিয়া বলিল, “রাজীব-বাবু, আপনার ভারী অভায়। আমি ঠাট্টা করুন ব’লেই অমন চারটে টাকা আপনি জলে দিলেন। আপনার মা হয়ত কত অসুবিধায় পড়বেন।”

রাজীব মুখখানা নীচু করিয়া পকেট হইতে সেই ফুলটা বাহির করিয়া একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল।

* * *

সে শীতে পূর্ণিমার গরম কাপড় হয় নাই।

‘গ্রাম্য গীতি-কবিতার বারাবে’

শ্রী হিরণ্ময় মুনসী

বাংলার গ্রাম্য গীতি-কবিতা কাব্যকুসুমোদ্যানের স্বেত শতদল, ভাব-জগতের বহুমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালী ও বাংলার বিশেষত্ব যাহা কিছু তাহার অনেকখানিই এই গ্রাম্য গীতি-কবিতা বা ছড়া পাঁচালীতেই নিহিত। যদিও বর্তমান বঙ্গভাষা বা কাব্যসাহিত্য দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তথাপি পুরাতনকে ছাড়িয়া দিলে তাহা সর্বাঙ্গস্বন্দ্র হয় নাই বলিতে হইবে।

ইহাকে সর্বাঙ্গস্বন্দ্র করিতে হইলে, বিশ্ববাণীর পাদপীঠতলে, ইহার আসন বড় করিতে হইলে, বাংলার

শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করিয়া বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের একটা বিরাট কর্তব্য সম্মুখে রহিয়াছে। বাংলার গ্রাম্য গীতি-কবিতা, গাথা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহারা সেই কর্তব্য সম্পাদন করুন ও দীনা, কাঙ্ক্ষালিনী বঙ্গবাণীকে নব নব ভাবশ্রীতে জগৎপুজ্যা রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে সাজাইয়া তুলুন।

মৈমনসিংহের পল্লীগাথা সংগ্রহ করিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সেই কর্তব্যের কতকটা সম্পাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমিও এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি।

পল্লীপ্রধান বাংলার ছায়াশীতল পল্লীতে নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে এইসব পল্লীগীতি-কবিতা প্রভৃতি শোনা যায়। অসংখ্য প্রকারের গ্রাম্য গীতি-কবিতা আছে, তন্মধ্যে একটির কথা প্রবাসীর পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই গ্রাম্য গীতি-কবিতাকে ‘বারাবে’ কহে। যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার সর্বত্রই এই গীতিকবিতা বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বৈকালে যখন খররোজের তাপ অন্তগামী সূর্যের সহিত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসে, তখন মাঠে মাঠে ‘সবুজের’ ছড়াছড়ির মাঝখানে হইতে এই গানের স্বরের রেশ ‘গাছড়ান’ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া কেমন যেন পাগল করিয়া তোলে।

মাঠে নিড়ানী বা টাঙ্গি দিতে দিতে সারিবন্দীভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা বলিয়া বলিয়া মাথাল মাথায় সমবেত চাষী ‘পরিয়াত’ গণ মিলিতকণ্ঠে এই গান গাহিতে থাকে। তবে বাঁশের আড়বাঁশীতেই এই গান শোনা যায় ভাল।

বারাবে প্রায় ৩০।৪০ রকমের আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কাব্যাংশে অতি উচ্চস্বরের। এই গানেরও বিভিন্ন পদ বা পালা আছে। পদবিশেষের সুরবিভিন্দও বিভিন্ন। সাধারণতঃ—ইহা ভাটীয়াস্বর হইয়া গাওয়া হয়। নিয়ে একটি ‘বারাবে’ দিলাম। বারাবেটি পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া বর্ণিত।

বসন্ত বৈশাখে রাধা ভাবিত সদায়
কৃষ্ণের বিরহ প্রাণে সহন না যায়।
বলিয়া গেলেরে কৃষ্ণ ‘আসিব স্মরিত’
বিলম্ব দেখিয়া নিরীক্ষণ করি পথ।
জ্যৈষ্ঠের যন্ত্রণা যত সহন না যায়,
খিয়ের * অনল ওঠে জলিয়া সদায়।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে গরজিয়ে,
এত দুঃখ দিলি বিধি বোর মাথা খেয়ে।
শ্রাবণে অশেষ দুঃখ হেন নাহি মোর মনে,
এ ছার জীবন আমি রাখি কি কারণে।
ভাদ্রের ভরিল ঝলে যমুনার কূল,
তাহাতে উঠিল ফুটি কমলের ফুল।
ভ্রমর ভ্রমরী যেমন মধু করে পান,
এইমত ছাড়িয়া গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমার।
আখিনে অধিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘর,
আনন্দের অবধি নাই গোবুল নগর।
কার্তিকে করিলেন প্রভু বৃন্দাবনে রাস,
কৌতুকে বসেছেন কৃষ্ণ গোপী চারিপাশ।
অগ্রহায়ণে অশেষ দুঃখ হেন নাই বোর মনে,
অনুকণ পড়ে মনে নন্দহৃত ধনে।

* খিয়ের—মানে বুলিলাম না, বোধ হয় হিয়ার হইবে।

পৌষমাসের পীড়া ওঠে বিপত্তী,
প্রভুর বিরহনীতে তনু হয় কল্লিত।
মাঘমাসে মোর মরণ হ’ত সেও ছিল মোর ভাল,
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যবে মথুরাতে গেল।
ফাল্গুনে ফুটিল যত নানাবিধ ফুল,
ভ্রমর ভ্রমরী ডাকে একে সমভুল।
চৈত্রিতে চিন্তিত রাধা চিন্ত নাহি রে স্থির,
অনুসর রাখন...পিরীত।*

অক্লুর হরিয়া নিল রথে নারায়ণ,
ফিরিয়া না দিলে কৃষ্ণ আমার দরশন।
শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলাম অতিবড় সাধে,
ছাড়িয়া গেলেরে কৃষ্ণ কোল অপরাধে।

এই বারাবেকে “রাধার বারাবে” বলে। ইহা শ্রীমতী রাধার বিচ্ছেদপদের একাংশ। বিচ্ছেদপদ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। স্মৃষ্টি স্বর সম্বন্ধে সমবেত কণ্ঠে সবুজ মাঠের মাঝে কৃষকগণ যখন এই বারাবে ধরে, তখন প্রকৃতই যেন রাধার বিরহ-বেদনা ঘনীভূত মূর্তিতে প্রকট হইয়া বিরহিনী রাধার প্রতি সমবেদনায়, ব্যথায় শ্রোতার প্রাণ বিবশ করিয়া তুলে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, ‘মেঘদূতের’ কবির কাব্য নিরক্ষর চাষারি বোঝে না। স্তত্রাং তাহার প্রকৃত রস বা সৌন্দর্য্য কতিপয় শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রাম্য গীতি-কবিতা প্রভৃতির প্রকৃত রস কোন সমাজ বিশেষের মাঝে আবদ্ধ নয়। পাড়ার ছলে বাগ্দী হইতে তর্করত্ন, বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় সকলেই এরস পানে সমান অধিকারী। ইহাই প্রকৃত গণসাহিত্য।

‘রাধার বারাবেতে’ আমরা পাই, রাধার বিরহ-বিধুর হৃদয়ের আবেগময় ভাবোচ্ছাস। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী রাধা একেবারে উন্মাদিনী হইয়াছেন। মাসের পর মাস কাটিতেছে, রাধিকার হৃদয় শ্যামবধূর বিচ্ছিন্নতিল তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইতেছে।

এই গ্রাম্য গীতি-কবিতায় সেই ভাবটি কেমন ফুটিয়াছে! এখন এইসব গীতি-কবিতার মূল্য কতটুকু বাংলার কবিসমাজ তাহার বিচার করুন।

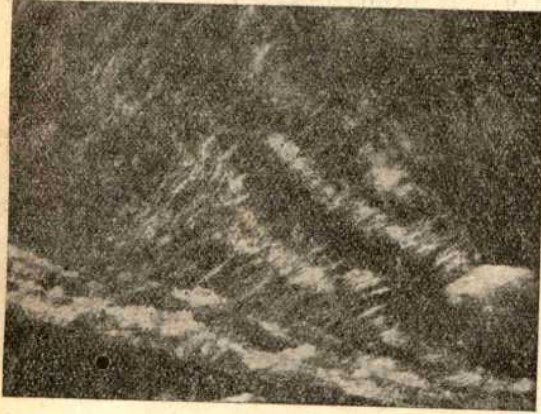
পূর্বে যে ৩০।৪০টি বারাবের কথা বলিবার একে একে সবগুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে, দুঃখের বিষয় আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও এইসব গাথার রচয়িতার নাম জানিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, এইসব নাম অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়েরই রচিত।

* সম্পূর্ণ পদটির মর্মেচ্ছার করিতে পারি নাই।

মেঘ

শ্রী কৈদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস

মেঘ শব্দে মাহুঘের মনে রহস্তের অন্ত নেই; সৃষ্টির আদিম প্রাতে সদ্যজাত মানবশিশু চকিতে একদিন বর্ষার ঘনঘটা দেখে কি ভেবেছিল জানি না, কিন্তু মাহুঘ যেদিন আপনাকে প্রকাশ করবার ভাষা পেল সে দিন হ'তে আজ পর্যন্ত এই মেঘ নিয়ে অনেক কবিতা ও কাব্য সে ক'রে



দিল্লিস মেঘ

“ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বুষ্টিতে, শ্রামবর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ 'পরে—
তবু সে হুঃস্থ সুগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজের—”

—রবীন্দ্রনাথ

এসেছে। আমাদের দেশের ঋগ্বেদেই নাকি সর্বপ্রথম মাহুঘের মনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে; এই ঋগ্বেদে মেঘের বন্দনা আছে। এই বন্দনা থেকে মেঘসম্বন্ধে আদিমানবের মনোভাব আমরা কতকটা কল্পনা ক'রে নিতে পারি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান ও সভ্যতার এত উন্নতি সত্ত্বেও মেঘসম্বন্ধে আমাদের মনোভাব প্রায় ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে মেঘকে পর্জন্ত নাম দেওয়া হয়েছে। “পর্জন্ত অর্থে বৃষ্টির মেঘ ও তাহার দেবতা। তাঁহার আকৃতি গাভীর পালান বা কোষা বা

জলের দৃতি অর্থাৎ মোশকের তায় (৫।৮৩৮।-২; ৭।১০১। ৪)। তিনি বুয়রূপী (৫।৮৩।১)। তিনি ওষধি ও পৃথিবীকে বীর্ধ্যবতী করেন। তিনি রথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জলভরা মোশকের মুখ খুলিয়া নিয়ে জলবর্ষণ করেন; বিদ্যা ও বজ্র তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করে। তিনি উদ্ভিদ-পোষক ও পশু-পোষক।……পর্জন্তদ্বারা উদ্বোধিত হইয়া ভেকগণ রব করে (৭।১০৩।১১)।”

[বেদবাণী—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঋগ্বেদের ৫ মণ্ডল ৮৩ সূক্তে পর্জন্তের যে বর্ণনা আছে নিয়ে তাহার অংশবিশেষের অনুবাদ দেওয়া হ'ল—

…বৃষের মত সেই আরাবে হুকারি' ছুটিয়া ধয়ে যায়
বরষি' জল—
সে জল শক্তির আধার ও মূর্তি, গর্ত লভে তায় ওষধি-
দল।

* * * *

রথী সে কশাঘাতে যেমন প্রশাসিয়া অশ্বে দ্রুত পথে
চালায়ে ধায়,
এই এ নভোদেব তেমনি লয়ে যান সলিলদায়ী দূতে
প্রবল বায়;

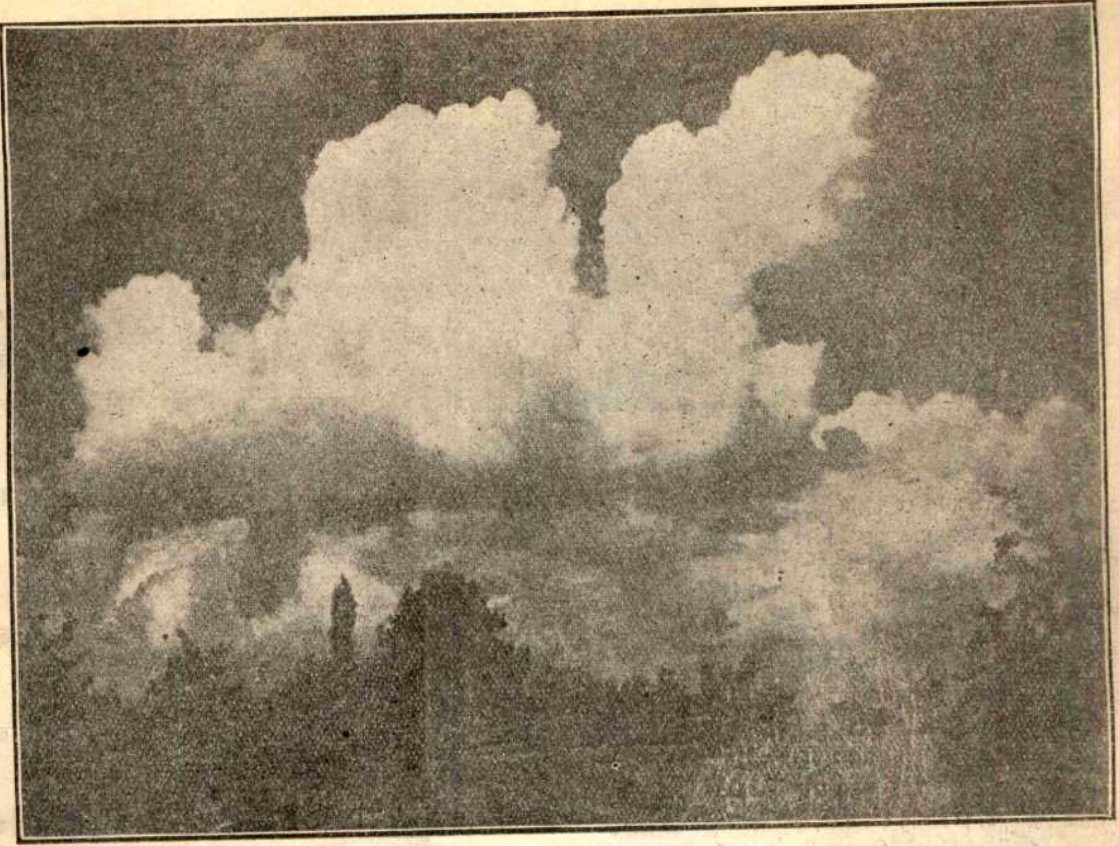
আকাশ আবরিয়া যখন তিনি ঘন করেন বর্ষার অন্ধকার
তখন চোদিকে ফুকারি' উঠে যেন সিংহগর্জন বারম্বার।

* * *

শব্দ কর মেঘ, তোল হে হুকার, ধরার গর্তে জাগুক প্রাণ,
চড়িয়া জলরথে এস হে ঘুরি' ঘুরি' বেড়াও চোদিকে
শক্তিমান,

সলিল-ভরা যেই মোশক রহে তব বীধন খুলি' কর নিম্নমুখ,
অঝোর জলধারে সমান করি' দাও উচ্চ নীচ সব, হে জল-

মুক!



কুমুলাস বা পশমগাঁঠ মেঘ

“ঈশানের পুঞ্জমেঘ অকবেগে ধেয়ে চ’লে আসে
বাধা-বন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি’ দার্য, ধারা ।

*

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁধি,
বিছাৎ-বিনোদ শৃঙ্খল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ’লে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী !”

—রবীন্দ্রনাথ

হে মেঘ স্তমহান্ ! জলের কোশা তব উপুড় করি’ দাও
ধরণী’ পর,
নদী ও খাল বিল সলিলে ভরি’ ভরি’ উছসি’ ছুটে যাক্
উতরতর—
কর হে সিঞ্চন তোমার শীত স্নেহ, ঘূতের সাথে তাহা
মিশিয়া যাক্,
যে গাভী বধহীন তাদের তরে আজ সুপেয় জলাশয়
ভরিয়া যাক্ ।

[বেদবাণী—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের অন্তর্বাদ]

ঋক্বেদের ১০ মণ্ডল ১২৩ সূক্তে বেন’ নামক এক
দেবতাকেও জল-দেবতা বলা হ’য়েছে ।

বেদের-ঋষি হ’তে আরম্ভ ক’রে আধুনিকতম কবি
পর্যন্ত সকলেই মেঘের গান গেয়েছেন । কালিদাসের
মেঘদূত জগৎ-প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । তাঁর ঋতুসংহার
কাব্যেও মেঘের চমৎকার বর্ণনা আছে ।

বাঙলার আদি কবি জয়দেবও মেঘের স্তম্ভর বর্ণনা
দিয়েছেন । সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ষা-অভিলাষ-গানে



বজ্রমেঘ

“পাগল হ’য়ে বাতাস এল,
ছিদ্র মেঘে এলোমেলো
হচে বরিষণ;
জানি না দিগ-দিগন্তরে
আকাশ ছেঁয়ে কিসের তরে
চলছে আরোহণ;
পৃথিবী গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে,
তরঙ্গী সব বাঁধা ঘাটের কোলে,
আজি পথের ছই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ ঘারে,
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে।”

—রবীন্দ্রনাথ

মেঘের যে মূর্তি কবিরা কল্পনা করেছেন তা অপূর্ণ।
আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ মেঘ সম্বন্ধে
অনেক কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-বিষয়ক
কবিতা পৃথিবীতে অতুলনীয়।

ইংরেজ কবি শেলীর মেঘ সম্বন্ধে একটি কবিতা
আছে। এই কবিতার কাব্য ও বিজ্ঞান উভয়ই চমৎকার।
আমরা নীচে সেই কবিতাটির প্রায় যথার্থ অনুবাদ
দিলাম।—

মেঘ

তুষা-দঙ্ক পুষ্প লাগি’ আমি আনি নব জলধারা—
বারিষি তটিনী হ’তে, বক্ষে বহি’ সলিল-সম্ভার;
নিদাঘের রৌদ্রে যবে বৃক্ষপত্র স্বপ্নে মাতোয়ারা,
আমি তাহাদের লাগি’ স্নিগ্ধ ছায়া করি যে বিস্তার।

পক্ষ-বিধ্বনে মোর ঝরি’ পড়ে শিশিরের কণা,
স্পর্শে তার বিকশিয়া উঠে যত কোরক কোমল—
বৃক্ষ জননীর বক্ষে দোল খেয়ে যবে শান্তমনা
সন্তান ঘুমায়, মাতা—রৌদ্রালোকে নর্তন-চঞ্চল!
শিলা-শেলরাশি কত উল্লসিয়া ঢালি ধরণীতে,
গ্রামল প্রান্তর-ভূমি পরিধান করে খেতবাস
বিগলিত বৃষ্টিধারে ঝরি কতু আপন খুসীতে—
বজ্রের গর্জনে কতু খল খল হাসি অটহাস।

নিম্নে গিরিচূড়া ’পরে থরে থরে বিছাই তুষার,
অবিশাল দেবদারু গুমরিয়া উঠে বেদনায়;
শুভ্র গিরি-উপাধানে ক্রান্ত করি’ ক্রান্ত শিরভার
ঘুমাই অদীর্ঘ রাত্রি আলিঙ্গিয়া রুদ্ধ ঝটিকায়।
অভভেদী মোর সেই আবাস-মন্দির-চূড়া ’পরে,
বিদ্যুৎ সারথি মম, বসি’ রহে স্তব্ধ অচপল;
নিম্নে গুহাগর্ভে কোন শৃঙ্খলিত অশনি গুমরে—
মুক্তি লাগি’ রহিরহি পশুশ্রমে গর্জন-বিহ্বল!
মৃত্তিকা, সলিল উদ্ধে মুহুমুদ সমীর দোলায়—
মোর কর্ণধার মোরে নিয়ে যায় গগনে গগনে—
অনৌল বারিষি-গর্ভে অশরীরী প্রিয়া ডাকে তায়—
প্রেমের আহ্বান, আহা, উপেক্ষিবে প্রেমিক কেমনে!
কত নদী নির্ঝরিণী, পাহাড় পর্বত-চূড়া কত,
মনোহর সরোবর, তৃণ শ্রাম শতেক প্রান্তর—
গিরি-শিরে, নদী-বুকে স্বপ্ন শুধু দেখে অবিরত,
প্রেয়সী সর্বত্র তার—তবু নিত্য রহে অগোচর।
আমি যবে নীলাধরে নীল হাসি কুড়াই সতত—
বিগলিত হ’য়ে সে যে ধরণীতে ঝরে ঝর ঝর।

রক্তরাঙা সূর্য্যোদয়—উদ্ধা-চক্ষু মেলিয়া গগনে
ঝাঁপ দেয় প্রজলন্ত পক্ষের পালক বিস্তারিয়া
মোর পৃষ্ঠদেশে যবে ভাসি আমি মস্থর পবনে,
মৃতকল্প শুকতার। পাণ্ডুহাসি উঠে যে হাসিয়া।
ভগ্ন গিরি চূড়ে, যথা মুহূর্তের তরে রয় ব’সে
অদৃশ্য ঈগল পাখী স্বর্ণ ডানা করিয়া বিস্তার—
গিরি-চূড়া কম্পমান, ভূমিকম্প সঘনে নির্ধোয়ে
ভগ্ন মেঘ-চূড়ে তথা নবাকরণ শোভে চমৎকার।

আলোকিত বারিধির বক্ষ হ'তে গোধূলি-বেলায়
অন্তগামী সূর্য্য ফেলে তুষাতুর আতপ্ত নিঃশ্বাস ;
সুদূর অধর হ'তে ধীরে যবে নামে এ ধরায়—
শব-আচ্ছাদন সম সাদাহের আরক্তিম বাস ।
গুটাইয়া ডানা মোর অভভেদী গিরির চূড়ায়
কপোত-মাতার মত বিমাইয়া ক্লান্তি করি নাশ ।

সুন্দরী রক্তময়ী ভাস্কর-প্রতিমা অলকার—
মর্ত্যের মাহুখে যারে নাম দিল জ্যোৎস্নাময়ী শশী,
আমার অঙ্গন-তলে নৃত্য করে অতি লঘুভার—
নিশি-বায়ু বিস্তারিত শুভ্র মেঘ উঠে যে উল্লসি—
ছেঁড়ে আস্তরণ যবে নিঃশব্দ সে চরণ প্রহারে—
নৃত্য-শব্দ শুনিবারে পায় বুঝি স্বর্গের অঙ্গরী ;
আবরণ খুলে যায় ছিন্ন পথে ভয়ে উঁকি মারে
চাঁদের পশ্চাতে রহি' কুতূহলী তারকাসুন্দরী ;
আমি ছুটে যাই বেগে পিছে তারা করে গুঞ্জরণ—
ছুটে যায় পুঞ্জ পুঞ্জে যেন স্বর্ণ-ভ্রমরের দল ;
বিস্তারিয়া চলি আমি ছিন্ন-মেঘ নভ-জালায়ন—
ক্রমে মনে হয় যেন বারিধি, সায়র, নদীজল,
ছিন্ন-পথে খসে-পড়া খণ্ড খণ্ড স্থনীল গগন—
চন্দ্র তারা প্রতিবিম্ব তারি মাঝে শোভিছে চঞ্চল ।

রবি-সিংহাসনে আমি ঘিরি কভু আগুন-শোভায়—
শশীরে ঘিরিয়া রাখি বলমল দীপ্ত মুক্তাহারে ;
মোর গাজবাস যবে খুলে যায় প্রবল বাতায়—
অগ্নি-গিরি-স্রাব স্নান, তারা কাঁপে প্রচণ্ড প্রহারে ।
আমি রচি উচ্চসেতু বারিধির একুলে ওকুলে,
উত্তাল তরঙ্গ নিম্নে করে যবে উন্নত নর্ভন—
নিরঙ্কু সে চন্দ্রাতপ রবিকর নাহি পশে তুলে,
সুস্তরুপী শৈলমালা উচ্ছে করে আমারে ধারণ ।
লক্ষরঙে রঞ্জিত সে বিজয়-তোরণ-দ্বার দিয়া
আমি ছুটে যাই বেগে সঙ্গী মোর হিম অগ্নি ঝড় ;
পবনের শক্তি যবে মিলে মোর সঙ্ঘেতে আসিয়া
সূর্য্য অগ্নিচক্র উর্দ্ধে বিচ্ছুরিত করে স্নিগ্ধ কর—
রঙে রঙে সে তোরণ দীপ্ত হাসি উঠে যে হাসিয়া
বৃষ্টিস্নাত ধরা নীচে হাস্য করে অপূর্ণ সুন্দর ।



করোনা বা মুকুট মেঘ

রবি-সিংহাসনে আমি ঘিরি কভু
আগুন শোভায়,—
শশীরে ঘিরিয়া রাখি বলমল
দীপ্তমুক্তাহারে ।

মাটি ও জলের কন্ডা মেঘ আমি হাস্যলাস্যময়—
উর্দ্ধ নীল আকাশের আমি প্রিয় পালিত-কুমারী,
বৃষ্টিরূপে মুক্তিকা ও বারিধির রঞ্জে পাই লয়,
নাহিক বিনাশ মম আমি শুধু বহরূপধারী ।
বৃষ্টি অবসানে যবে নিঃকলঙ্ক স্থনীল গগন—
দিগন্ত প্রাঙ্গণতল দিকে দিকে বাধাবন্ধহারা ;
উর্দ্ধে শূন্য নীলাধর চন্দ্রাতপ করে বিরচন,
শান্ত সমীরণ আর দীপ্তকায় রবিরশ্মিধারা ।
আমি হাসি সেকৌতুকে আপন সমাধি-স্তুত 'পরে,—
সদ্যজাত শিশু কিংবা কবরের প্রেতমূর্তিসম
সলিল-গহ্বর হতে পুনঃ উঠি স্থনীল অধরে—
ভাঙি নীল চন্দ্রাতপ আরবার, উল্লাসে নির্ধম ।



জলপ্তস্ত মেঘ

“নিবিড় ঘনঘটা আকাশ ঘিরে—
গগনে গজরাজ গরজি’ ফিরে।
তার তুষার ফাটে বৃক—
শুষ্ক জলমূক—
সহসা পরে দিগ্ধি নদীর নীরে—
ভাবিছে ধরণীতে নামিবে কিরে।
তীরেতে ধমধম কাশের বন।
আকাশে মেঘে মেঘে চলিছে রণ—
সহসা গজরাজ
ভুলিয়া সব লাজ
ডুবায়ে শুঁড়খানি নদীর নীরে
নিবিড় ঘনঘটা গগন ঘিরে—।”

মেঘদূতের ষষ্ঠ মেঘের জন্ম ও বংশাবলী দিয়েছিলেন—
“জাতংবংশে ভুবনবিদিত পুষ্করাবর্তকানাম্” ইত্যাদি।
তবে বেচারী যক্ষের অবস্থা শোচনীয় ছিল তাই
কবি তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত ক’রে বলেছেন,
“ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ সন্দেহার্থাঃ
ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ—এবং যক্ষের এ রকম
করার কারণ দেখিয়েছেন যে, কামার্তা হি প্রকৃতি-
রূপণাশ্চৈতন্যশ্চৈতন্যে।

কিন্তু এ গেল কাব্যের দিক। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে
মেঘের আলোচনা এবার করা যাক। ত্রিভুবনবিদিত
পুষ্কর বংশে জন্ম কিনা, কিম্বা মেঘদূতের কার্য্য করতে
পারে কিনা বিজ্ঞান তার বিচার করে না। বিজ্ঞান
মেঘের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও একেবারে অন্ধ। সে দেখে,
প্রকৃতির কোন্ বিপর্য্যয় হেতু নীলাকাশে হঠাৎ এই
বিজাতীয় পদার্থটির আবির্ভাব হয়, কি কি কারণে এর
উদ্ভব, কত কাল এবং কত উর্দ্ধে এর স্থিতি, কিসে এর
পরিণতি; আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে এর শ্রেণী বিভাগ
ও নামকরণ; মেঘের অট্টহাসি নামে কাব্যে যে
জিনিষটার বর্ণনা আছে সেই বিদ্যুতেরই বা স্বরূপ কি
ইত্যাদি।

এখনকার দিনে বিদেশে মেঘের জন্ম সম্বন্ধে মতভেদ
বিশেষ নাই। কিন্তু মেঘের নামকরণ অনেক রকম
হ’য়ে গেছে। এ সব নামকরণ প্রধানতঃ তার আকৃতি
আর তারপর তার প্রকৃতি অনুযায়ী।

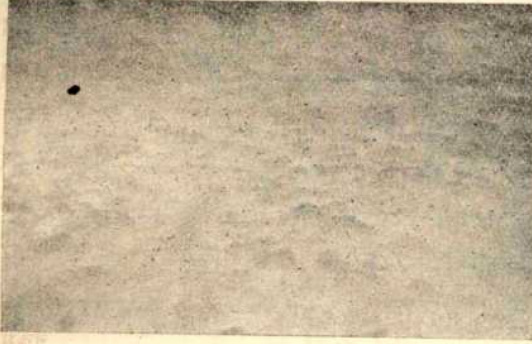
জে বি লামার্ক নামক একজন বৈজ্ঞানিক ১৮০১
খৃষ্টাব্দে প্রথম মেঘের শ্রেণীবিভাগ ও ফরাসী ভাষায়
নামকরণ করেন, কিন্তু তাঁর দেওয়া নাম প্রচলিত হয়নি।
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লুক হ্যাগয়ার্ড মেঘের শ্রেণী বিভাগ ক’রে
ল্যাটিন নাম দেন। বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় মেঘ
প্রধানতঃ তাঁর দেওয়া নামেই চ’লে আসছে। তার পরে
নানা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে কিছু কিছু পরিবর্তিত
হ’য়ে যে নামগুলি বর্তমানে চ’লে গেছে তা এই—

ক্যুমুলস্ (Cumulus) বা “পশমগাঁঠি” (wool pack)।
জোর এক পশলা বুষ্টি হবার খানিক পরে আকাশে
এ রকম মেঘ দেখা যায়। সাধারণতঃ এটার উপরের
ভাগ ক্রমেই ছড়াতে আরম্ভ করে, তখন এর কোলে
বিদ্যুৎ চমকতে থাকে। উপরের অংশ বেশ মোটা
হ’য়ে ছড়িয়ে কামারশালের নেহাই (anvil) এর মত হ’লে
বাজ পড়া ও জোরে বুষ্টি পড়া খুবই সম্ভব হয়। এ রকম
মেঘের নাম—ক্যুমুলো-নিম্বস্ (Cumulo-nimbus) বা
বাজপড়া মেঘ। অল্টো-ক্যুমুলস্ (Alto-cumulus)
ক্যুমুলসের মতই কিন্তু অনেক উপরে থাকে।

সির্রস্ (Cirrus) অত্যাচ্ছন্ন মেঘ। তুষার-জালে

পরিপূর্ণ এই মেঘ ২৫০০০ থেকে ৩৬০০০ ফুট উপরে থাকে।

ম্যামাটো-কুমুলস্ (Mimato cumulus) — কুমুলস্ মেঘ ভেদ করে বায়ুস্ত্রোত নীচে নামতে থাকলে মেঘের এই প্রকার আকৃতি হয়।



কোদালে-কুড়ুলে মেঘ—ম্যামাটো কুমুলাস

“শ্রমান উজ্জল দিন বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান।
মেঘখণ্ড ধরে ধরে
উদাস বাতাস ভরে
নানা ঠাই ঘুরে মরে
হতাশ সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতখান।”

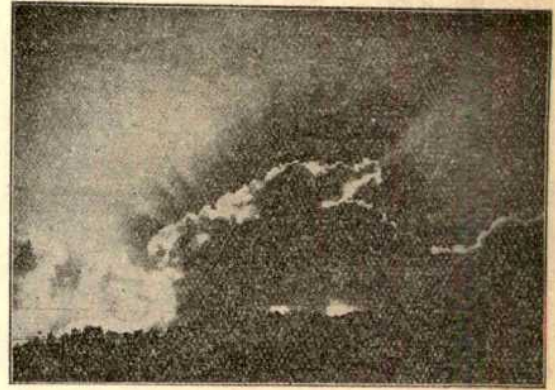
রবীন্দ্রনাথ

জলস্তুম্ব (water spout) এক প্রকার মেঘ। ঘূর্ণী-বায়ুর মধ্যে বাতাসের চাপের প্রভেদ হওয়ায় এই মেঘ জন্মায়। করোনা (Corona—মুকুট) সূর্য বা চন্দ্রের পাশে আলোর চক্রের নাম। পাতলা মেঘের জালে সূর্যের বা চন্দ্রের আলো পড়ায় এ রকম হয়। মেঘে জলের বিন্দু যত ছোট থাকে তত বড় চক্র হয়।

এ রকম নামকরণের প্রধান উদ্দেশ্য, কোন মেঘে কি হয় তাই ঠিক করার চেষ্টা। যেমন কোন মেঘে বজ্র পড়ে বেশী, কোনোটা বৃষ্টি হয় বেশী, আবার কোনটা শিলা-বৃষ্টির প্রধান কারণ। মেঘের এ রকম জাতিভেদ করার মূলে আব-হাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টা।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় (১৮৫৪ খৃঃ) ফরাসী নৌবাহিনী রুশিয়ার সিবাশ্তোপল বন্দরের সামনে নোঙ্গর ফেলে অবরোধ করেছিল। হঠাৎ ভীষণ ঝড়

উঠে এ বাহিনীকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলে। এই ঘটনায় ফরাসী বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া পড়ে যায়। ইহাদের মধ্যে ফরাসী জ্যোতির্বিদ লেভেরিয়ার (Leverrier) প্রথমে ঠিক করেন যে এই ঝড়ের উৎপত্তির ব্যাপার একেবারে গোড়া থেকে খোঁজ নেওয়া উচিত। তিনি জানতে পারেন যে, এই ঝড় মহাসমুদ্রের দূর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মধ্য-ইয়োরোপের উপর দিয়ে তুমুল কাণ্ড করে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই ঝড়ের ইতিবৃত্ত খোঁজ করা দরকার, তা হ'লে কিসের জন্ত অমন ভয়ানক ঝড় হ'ল আর কেনই বা সেটা থেমে গেল তা জানা যেতে পারে। এই অল্পসন্ধানেই আবহাওয়ার তত্ত্ব-বিজ্ঞান (Metereology and Weather Forecast) জন্মগ্রহণ করে ও মেঘের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটা সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়।



রৌপ্য-পাড় মেঘ

“যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উজ্জতকণা বিকাশে।”

রবীন্দ্রনাথ

তারপর ধীরে ধীরে অনেক তথ্য বেরিয়েছে, যদিও এখনও এ বিষয়ে খুব বেশী জ্ঞান আমাদের হয়নি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি অঙ্গের মত এটার এখনো নিম্নম-কাতুন ভাল করে বোঝা যায়নি।



কুমুলাস মেঘ ও ট্রাটাস মেঘ

“দ্বিধা সঙ্কল মেঘ-কঙ্কল দিবসে
ববশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
শণিতারাহীনা অকতামসী যামিনী
কোথা তোরা পুর-কামিনী—
আজিকে হুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে কুক পবনে,
চমকে দীপ্ত কামিনী;
শুশ্রূষনে কোথা জাগে পুর-কামিনী।”

রবীন্দ্রনাথ

মেঘের জন্ম বাতাস ও অদৃশ্য বাষ্পকণা থেকে। কি
ক’রে তা হয় বলছি।

এক পাত্র ঠাণ্ডা জল নিয়ে তাতে আঁস্তে আঁস্তে সোরা
মিশাতে থাকুন। ধীরে ধীরে সোরা জলে দ্রব হ’য়ে মিশে
যাবে। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন যে আর জলে সোরা
গোলা যাবে না। এ রকম হওয়ার কারণ এই যে
কোনও নির্দিষ্ট তাপে কতটা জলে কতটা সোরা দ্রব
হয় তার একটা অল্পপাত আছে। সেই অল্পপাত
পার হ’লে সোরা জলে আর মিশবে না, জলের নীচে
পড়ে থাকবে।

এখন ঐ জলের পাত্রটি গরম করুন। দেখবেন জলে
আরও সোরা দ্রব হচ্ছে। কারণ গরম হওয়ার সঙ্গে
সঙ্গে জলের সোরা দ্রবীভূত করার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে।
এখন ক্রমে ক্রমে জল গরম ক’রে সোরার পরিমাণ বাড়িয়ে
যান। শেষে দেখবেন যে, জল ফুটছে কিন্তু আর সোরা
গুলছে না। এখন ঐ ফুটন্ত জল ছেকে অল্প পাত্রে ঢালুন,
প্রথমে দেখবেন, পাত্রে শুধু নির্মল জল রয়েছে। পরে
যতই জল ঠাণ্ডা হবে ততই সোরা দ্রব হ’য়ে পৃথক হ’য়ে
নীচে পড়বে। তাহার কারণ জলের তাপ কমে যাওয়াতে
সোরা দ্রব ক’রে রাখবার ক্ষমতাও কমে যায় সুতরাং যতটা
সে দ্রব ক’রে রাখতে পারে তার অধিক বা কিছু সোরা
সেটা আলাদা হ’য়ে পড়ে।

বাতাসও ঠিক এই রকমে জল (বা জলীয় বাষ্প)
শোষণ করে এবং বাতাসের তাপ যত বাড়ে ততই জল
শোষণের ক্ষমতাও বাড়ে। এখন গরম অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে
যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে, বাতাস হঠাৎ কোনও
কারণে ঠাণ্ডা হ’য়ে গেলে সে পরিমাণ থাকতে পারে না,
সুতরাং সেখানে (বায়ু-মণ্ডলের সেই অংশে) যতটা বাষ্প
বেশী আছে সে সব পৃথক হ’য়ে যায়। এই পৃথকীকৃত
বাষ্পই কুয়াশা বা মেঘ।

কুয়াশা বা মেঘের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য নেই
তবে সাধারণতঃ বিভিন্ন কারণে এদের উৎপত্তি। পৃথিবীর
উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধির জন্তে কুয়াশা হয়। কিন্তু মেঘের
জন্ম সাধারণতঃ বাতাসের চাপের হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ শৈত্য-
হেতু।

এই জলীয় বাষ্প বায়ুশ্রোতে খুবই উপরে নীতল
অংশে গেলে তুষার (snow) বা শিলা (hail) রূপ
ধরে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহি

শ্রী বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়

† বাঙালীর পক্ষে বাংলা দেশের গঙ্গা শুধু তো জলের ধারা নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। জলের ধারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সেই অনেক বেশিটি অনির্জনীয়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজন্য গঙ্গা বাঙালীর মনে প্রাণে যে বিচিত্র ও গভীর আনন্দ আনে, তাহার প্রতি আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী যে নিরন্তর মমত্ববোধ আছে, ঠিকটি তাহার রস বোঝা এমন কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্ভবপন নয় বাঙালীকে অন্তরঙ্গভাবে যে জানে না। এইজন্য ডাণ্ডিবাসী বণিক টেম্‌স নদীর তীরকে উৎপীড়িত ও তাহার জলপ্রবাহকে কলুষিত করিতে যে পরিমাণে সঙ্কোচ বোধ করে, গঙ্গাতীরে তাহা করে না।

ভাষামাত্রের মধ্যেই একটা আভিধানিক অর্থের এবং ব্যাকরণগত নিয়মের ধারা আছে, বিদেশী শব্দতত্ত্ববিদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে আর একটি ঐশ্বর্য আছে, যাহা তাহার বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি, যাহা পৃথিবীর চারদিকের বায়ুমণ্ডলের মত, যাহার ভিতর দিয়া আলো আসে, বর্ণ বিভাসিত হয়, যাহা প্রাণকে সমীকৃত করে, অথচ যাহাকে পকেটে লওয়া যায় না, সিঁদুক ভরা চলে না, যাহাকে রক্তের মধ্যে পাই, নিঃশ্বাসের মধ্যে অনুভব করি, যাহা আমাদের প্রাণের সামগ্রী।

ইংরেজি শিখিবার জন্য বাঙালীর যে প্রাণপণ গরজ, তাহার মধ্যে তাহার ঋণবজালার তাগিদ আছে; কলেজের পরীক্ষা ও জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে এই ভাষাই তাহার প্রধান অবলম্বন। একথা এক রকম জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, যে-কোনো ইংরেজ যে-পরিমাণে বাংলা জানে, তাহার চেয়ে যে-কোনো শিক্ষিত বাঙালী অনেক বেশী পরিমাণেই ইংরেজি জানে। তবু ইংরেজি ভাষার যে স্বরূপটি চর্চগত নয়, যাহা তাহার অর্থগত, যাহা তাহার বস্তু নয়, যাহা তাহার প্রাণ, অর্থাৎ

শব্দসাধনায় যাহা আর্থিক নহে যাহা পারমার্থিক, যাহা ইংরেজের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, খেলাধুলা, স্বস্তি-ফার, পুরাণ ইতিহাস, আলাপ আলোচনার বিচিত্র প্রাণময় তন্তুযারা গ্রথিত, অতি অল্প বাঙালীই তাহাকে ঠিক মতো আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে। এই ইংবেজিই রস-সাহিত্যের ইংরেজি। এই ইংরেজি ঘনিষ্ঠ ভাবে না জানিলেও তবু মোটামুটি ইংরেজি সাহিত্য ভেঁা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে গভীর ভাবে, নিঃসংশয় ভাবে তাহার সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া ভোগ ও বিচার করা যায় না। তাহা লইয়া কান্স চলে, খবরের কাগজ চলে, এমন কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার উপাধি পাওয়াও চলে, যদি তাহার পরীক্ষক সাহিত্যরসজ্ঞ ইংরেজ না হয়, কিন্তু তাহা লইয়া ইংরেজি সাহিত্যগত আত্মীয়তা চলে না। অর্থাৎ যদি সেইটুকু বিনা লইয়া কোনো একজন ইংরেজ কবির নাড়ীনক্ষত্র, প্রাণের কথা অতি নিঃসৃতভাবে আলোচনা করিতে যাই, তবে তাহা একই কালে হাস্যজনক ও শোকাবহ হইয়া উঠে। বাঙালী তাহার বাবু-ইংরেজী লইয়া ইংবেজ মহলে অনেক হাসি হাসাইয়াছে, কিন্তু এত বড়ো প্রকাণ্ড পক্ষা ও হাস্যকরতার সৃষ্টি সে আজও করে নাই, তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি ভাষা, ইংবেজি সাহিত্য যে কি তাহা সে যথেষ্ট জানে, প্রকার সহিত সে উপলব্ধি করিতে পারে, যে, ইহাকে লইয়া মুকুর্বিআনা করিতে গেলে সেটাতে নিজেকেই অপদস্থ করার সাংঘাতিক বিপদ আছে।

কিন্তু বাংলা কাব্য সম্বন্ধে ইংরেজের মনে সেরকম প্রজ্ঞাপূর্ণ দ্বিধা বোধ হয় স্বাভাবিক নয়। তাহাই প্রমাণ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহিখানাতে। এই দীর্ঘায়তন গ্রন্থের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে লইয়া স্থলহস্তে তিনি টানাছেড়া করিতে করিতে চলিয়াছেন, মনে এতটুকু ভয়

ডর সঙ্কোচ অথবা আপন অপরিহার্য অক্ষমতা সঙ্ক্ষে নব্রতর লেশমাত্র লক্ষণ কোথাও নাই। এই দুঃসাহসিকতার পুরস্কারও তিনি পাইয়াছেন, ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খেতাব পাইয়াছেন; যাহারা পরীক্ষক তাঁহারা বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য সঙ্ক্ষে টম্‌গনের অপেক্ষাও আনাড়ি। তাঁহাদের অঙ্ক সাহসের একটি মাত্র কারণ এই, যে, পরীক্ষার বিষয়টি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী কবি—পরীক্ষার্থী ইংরেজ এবং বাংলার কোনো বিদ্যালয়ের পূর্বতন ইন্সলমাষ্টার। বিষয়টি সঙ্ক্ষে তাঁহার জ্ঞানই বা কি রকম, বোধই বা কি রকম, তাহা জানা তাঁহাদের পক্ষে বাহুল্য এবং সে সঙ্ক্ষে সন্দেহ করা কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। যদি কোনো ফরাসী কবিকে লইয়া টম্‌গন এতখানি প্রগল্ভতা করিতেন, তবে পরীক্ষকেরা নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। কোনো জর্মন কবির কথা বলিলাম না। কারণ জর্মন কাব্যের প্রতি যথেষ্টাচার করিলে বর্তমান কালে ইংলণ্ডে সেটা সাহিত্যিক দণ্ডবিধির কোঠায় আসে কিনা সন্দেহ আছে, অন্তত জুরিদের জায়বোধকে আগ্রহ না করিতেও পারে। বাংলা কাব্যবিচারে একজন ইংরেজের যোগ্যতা সঙ্ক্ষে পরীক্ষকগণ গোড়াতেই যেমন নিঃসংশয়, ফরাসীসাহিত্য-বিচারে তাঁহার যোগ্যতা সঙ্ক্ষে গোড়াতেই তাঁহাদের তেমনি সংশয় হইত। কারণ বিদেশীর পক্ষে পরভাষার মর্মস্থানে প্রবেশ দুঃসাধ্য, একথা জানিবার জন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক-সভার সমস্ত হইবাব প্রয়োজন হয় না।

উপাধিপরীক্ষায় মার্কলাভ করিবার পক্ষে একটা গুণ হয়তো এই গ্রন্থে আছে। সেটা তথ্যসংগ্রহ। এই সংগ্রহের যে অংশ পরীক্ষার্থীর সে অংশ ভুলে জীর্ণ, যে অংশ প্রচার যোগ্য তাহা একেবারেই তাঁহার নিজের নয়। শুধু তথ্য নহে, কবির রচনা সঙ্ক্ষে অনেক অভিমতও তিনি তাঁহার বাঙালী বন্ধুদের নিকট হইতে ঋণগ্রস্ত ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকল মতের সহিত তাঁহার মত সম্পূর্ণ মেলে নাই, মাঝে মাঝে এমন কথা বলিয়া তিনি আপন স্বাধীন বুদ্ধির মর্যাদারক্ষা করিয়াছেন। বিচার দৌড়ের চেয়ে

কলমের দৌড় যেখানে বেশি হয়, সেখানে আত্মাভিমানের খাতিরে সমালোচককে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। এক পক্ষ যেখানে জানে এবং অন্য পক্ষ জানে না, সেখানে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য স্বাভাবিক, কিন্তু শেষ পক্ষ যদি বিচারকের পদ পান, তবে সেই অনৈক্যটাকে সহজেই তিনি নিজের গৌরবের বিষয় করিয়া লইতে পারেন।

বাঙালী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভালো-মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক। কেবল এইটুকু বলা দরকার, যে, এখনো পণ্ডিতী ভাষায় ইহার শ্রেণী নির্ণয় করিয়া ইহাকে জাহ্নবীর নমুনা-ভাণ্ডারেব মধ্যে বাক্সবন্দী করিবার সময় হয় নাই। যে সকল পাঠক বর্ধার্ঘ্যই বাঙালী বোঝে, তাহাদের কাছে এখনো ইহা ছায়ায় আলোয় বিচিহ্ন রহস্তে প্রকাশিত। সুতরাং কেবলমাত্র তথ্যতালিকা ও ইতস্তত-বিশিষ্ট অভিমতগুলি জোড়া দিয়া ইহার আলোচ্য রচনা করা অভিজ্ঞ বাঙালী লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য। ছবির টুকরাগুলিকে জোড়া দিয়া তাহাকে সমগ্র করিয়া তুলিবার যে ইংরেজি খেলা আছে, সে খেলা খেলিতে হইলে টুকরাগুলিকে কোনোমতে জুড় করিলেই চলে না—ছবির ঐক্যবোধটা মনে থাকে চাই। টম্‌গন টুকরাই জুড়িয়াছেন, কোনো ছবিকে জুড়িয়া তোলেন নাই। কেননা গুরুতর অনভিজ্ঞতা বশত ছবিকে সম্পূর্ণভাবে চেনা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। জোড়া দিয়া কাঁধা তৈরি হইতে পারে। সে কাঁধায় ঢাকা দেয়, প্রকাশ করে না। কবির কাব্য ও জীবন লইয়া টম্‌গন যেমন জবড়জব্ব করিয়া জোড়াভাড়া দিয়াছেন, সে যেন একটা অঙ্ক টর্বেডো ঝড়েব লীলা, বটগাছ চড়িয়াছে ইমারতের মাথায়, ঘরের চাল পড়িয়াছে দৌঘির জলের মধ্যে—আছে সকলি, কিন্তু সেই থাকার দ্বারা জ্ঞানের বা ভোগের বিষয় অস্বীকার ঘটে। অজিতকুমারের মত কোনো কোনো বাঙালী রবীন্দ্রনাথের রচনাবৈচিত্র্যকে একটা সহজ ঐক্য দান করিবার জন্ত জোড়ার্গাধার পথে না গিয়া কাব্যকে নিছক তর্কে চোলাই করিয়া লইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাঁহাদের নিম্নের আরকেন্ট বোতলের মধ্যে নিমগাছকে যেমন অত্যন্ত সহজ ঐক্য দান করিয়াছেন এও সেই রকম। কিন্তু যাই হোক,

ইহার বাঙালী, বাংলা ভাষাটী জানেন, বাংলাসাহিত্যকে আত্মীয়ের মতো বোঝেন, আপন আপন প্রকৃতি অল্পমাত্র কবির কাব্যকে ইহার কোনো-না-কোনো দিক হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন; সে উপলব্ধির মূল্য আছে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের নিঃসংশয়তা অন্তর্যমানে নহে। তা ছাড়া ইহার মধ্যে যদি ঐক্যদেশিকতা, থাকে তবে অল্প পাঠকদের উপলব্ধিগত বিচারের দ্বারা তাহার পূরণ ও সম্প্রশোধন ঘটে। সকল দেশের সাহিত্যেই এইরূপ ক্রিয়া চলিতেছে।

কিন্তু যে মানুষ বাংলা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে জানেন এবং বাঙালীর আন্তরিক জীবনযাত্রা যাহার পক্ষে কেবলমাত্র যে অন্ধকার তাহা নহে, যাহা তাহার সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সংস্কারের দ্বারা বিকৃতভাবে দৃশ্যমান—তিনি যদি নানা তথ্য ও মতের উল্লেখের যোগে কোনো বাঙালী কবির একটা মূর্তি ও বাংলাকাব্যের একটা চিত্র অসংশয় আত্মবিশ্বাসের সহিত রচনা করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে একটা কিছুত ব্যাপার না ঘটয়া থাকিতে পারে না। কবির কাব্য ও তাহার জীবনের সমস্ত কাজের উপর তিনি ক্রমাগতই কেবল খাবল মারিয়াছেন। নারিকেলের রস ও শাঁস কোথায় আছে তাহার সমগ্র ধারণা যাহার নাই, সে উক্ত ফলটাকে যেমন অদ্ভুত অনভিজ্ঞতার সহিত কখনো কামড় দিয়া, কখনো মুঠা দিয়া খাবল মারিতে থাকে এও তেমন। নিজের অক্ষমতার অত্যাচার সে নারিকেলের উপর প্রয়োগ করে। অন্তর্য এই অপরাধের দায়িত্ব তেমন অমার্জ্জনীয় না হইতেও পারিত;—কিন্তু যে সত্য অস্বাভাবিক ভোগার্থী অতিথিদের নারিকেল সম্বন্ধে ধারণা আরো অসম্পূর্ণ, সেখানে এই ফলের রসতত্ত্ব বিচারে নিজেকে গুরু বলিয়া প্রচাণ করা ত্রাসজনক নয়। কিন্তু কোনো কবিব প্রতি নম্রতার সহিত স্নায়চরণ করিবার ইচ্ছাও সেই ক্ষেত্রে অনেকের মনে অলস হইয়া উঠে যেখানে বিচারের অযোগ্যতা ধরা পড়িবার আশঙ্কা অল্প।

এই গ্রন্থ ছাপা হইবার পরে আমাদের কোনো ইংরেজ বন্ধু আমাদের কাছে লিখিয়াছিলেন যে, এই বই কয়েক পাতা পাঠ করিয়া ইহা শেষ পর্যন্ত পড়া তাহার পক্ষে

একেবারে দুঃসহ হইয়াছিল। তাহার কারণ, এই গ্রন্থে লেখকের যে স্পষ্টিত আত্মপ্রতিমান প্রকাশ পাইয়াছে তাহার যোগ্যতার সহিত তাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই।

টমসন তাহার ৩২৫ পৃষ্ঠা বোঝাই করিয়া যে সব ভুল সংবাদ ও ভুল তর্জমা জমা করিয়াছেন, যদি প্রশস্ত স্থান ও দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে। তবুও, to err is human, এবং বিদেশী সাহিত্য ও কবি সম্বন্ধে তথ্যের ভুল করা গুরুতর অপরাধ নয়। কিন্তু যেখানে তাহার চিরায়ত ইঙ্গুলমাষ্টারের চৌকিতে বসিয়া আমাদের উপর সম্পূর্ণ জোর দিয়া তিনি বাঙালী কবির প্রতি যুগোপীয় লেখকদের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে ঐচ্ছিক রক্ষা করা কঠিন। “রাস ও রাণী”র মধ্যে তিনি ইবসনের Dolls' Houseর আঁচ পাইয়াছেন। তিনি কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইংলও ইবসনকে যে চিনিয়াছে সে বেশি দিনের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন “রাজা ও রাণী” লিখিয়াছিলেন তখন কমলজিৎ ইংরেজ ইবসন পড়িয়াছিলেন। হয় তো ভুল বলিতেছি, হয়তো অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন—টমসনের মতো আমাদের কথা বলিবার ঐক্যত্ব আমাদের নাই,—কিন্তু একথা নিশ্চিত, ইবসনের খ্যাতি তখনো বাংলা দেশে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই জ্ঞাতের আন্দাজী কথা তাহার গ্রন্থে আরো অনেক আছে; তাহার কারণ যেখানে সন্দেহ নাই, ভয় নাই, যেখানে পদবী পাইবার পক্ষা অত্যন্ত সহজ, সেই ক্ষমিতেই আমাদের আগাছা প্রবল হইয়া উঠে।

এ তো গেল আমাদের কথা। তার পর যেখানে তিনি কাব্যগত কোনো তথ্যকথা সম্বন্ধে ছই চক্ষু বুজিয়া গম্ভীর গলায় রায় দিয়াছেন সেখানে তাহার যে অহমিকা সেটা সাহিত্যিক নহে, সেটা সাম্প্রদায়িক। কবির বাবো জীবনদেবতার যে আইডিয়া নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই একথা স্বীকার করিলে ক্ষতি ছিল না। ভারতবর্ষে আমরা গ্রামদেবতা, কুজদেবতা, গৃহদেবতা, ইষ্টদেবতাকে মানি। সে মানা fetish মানা নয়। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে সীমাহীনতাকে

অসীম বলে না। সকল সীমার মধ্যেই তিনি অসীম, এই জন্ত ভক্তগণ সীমায় সীমায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন। অসীম আকাশ আমার গৃহসীমার মধ্যে খণ্ড আকাশরূপেই আমার বিশেষ প্রিয়—অথচ পরমার্থত সেই আকাশ সীমাধর্মী নহে—পরমাকাশ অসীম না হইলে প্রত্যেক গৃহেরই মধ্যে তাহা খণ্ডাকাশ হইতেই পারিত না। তেমনি পরমাত্মা অসীম বলিয়াই প্রত্যেক জীবাত্মায় তিনি বিশেষ,—সেই কারণেই বিশেষ আত্মায় পরমাত্মার সহিত বিশেষ মিলনেই,—স্বতরাং সীমাবদ্ধ মিলনেই,—আমাদের আনন্দ। বস্তুত খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের মধ্যে এই তত্ত্বই প্রধান। খৃষ্টানরা ঐতিহাসিক দেশে কালে সীমাবদ্ধ খৃষ্টের মধ্যেই পরম পুরুষের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া পরিজ্ঞান কামনা করেন। ঘনিষ্ঠ আশ্রয় প্রত্যাশায় অনন্ত আকাশকে আমরা গৃহমধ্যে খণ্ড আকাশ করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু নিজের সীমার দোষে সেই খণ্ডতাকে আমরা বিকৃত করিতে পারি। আকাশকে একান্ত অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারের আকাশ করা অসম্ভব নহে, তাহাকে আলোকহীন আকাশ করিতে পারি, তাহাকে বিরূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া অন্ধকার আকাশ করিতে পারি। কবি তাই তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে বলিয়াছেন, “হে আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে কি আমার জীবনের বিকৃতির দ্বারা পীড়িত করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি আমার এই জীবনের সীমাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া পুনরায় ইহাকে নূতন রূপ দাও।” অর্থাৎ আমার জীবনের সীমার মধ্যে যদি ছন্দের স্বয়ম্বা থাকে, তবে যিনি অসীম তাঁহাকে হ্রস্ব করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আমারই জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। সেই প্রকাশেই আমার চরিতার্থতা। আর জীবনে যদি ছন্দের বিকার ঘটে তবে অসীমের প্রকাশ অচ্ছন্ন হয়।

এই জীবনদেবতাকে কবি কখনো পুরুষভাবে কখনো স্ত্রীভাবে দেখিয়াছেন। ইহাতেও টম্‌সনের বুদ্ধি কিছু হুঁচট খাইয়াছে। যেমন গাছের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এমন কি অচেতন বিশ্ববস্তুর সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিতে ভারতীয় বুদ্ধিতে বাধে না, তেমনি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিকে

একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া অচ্ছব করিতে সে আতঙ্কিত হয় না। কবিও নিজের জীবনের মধ্যে যে সকল পরম আবির্ভাব, যে সকল নিবিড় রস নানা উপলক্ষ্যে অচ্ছব করিয়াছেন নিঃসন্দেহেই তাহার মধ্যে কখনো পুরুষের কখনো নারীর ভাব পাইয়াছেন। সেই উভয় ভাবের মধ্যেই আনন্দের অসীমতা। এই জন্তই জীবনদেবতাকে তাঁহার পক্ষে প্রিয়তম বলাও যত সহজ, প্রেমসী বলাও তত সহজ।

এই গেল তত্ত্বের দিকের কথা। কাব্যের রূপ সম্বন্ধেও যেখানে কথা কহিয়াছেন সেখানেও ইঙ্গুল-মাষ্টারের জোর গলায়। বাঙালী পাঠকমাজেই জানেন কবির লেখা গান-গুলি প্রায়ই বারো লাইনের। টম্‌সন্ ইহার মধ্যে নিছক কৃত্রিমতার আভাস পাইয়াছেন। কাব্যসমালোচকের মুখে এমন কথা প্রত্যাশাই করা যায় না। কবিমাজেই নিজকৃত শাসন নিজের লেখার উপর প্রচার করেন। সেটাতে অধীনতা নাই, সেটাতে কর্তৃত্ব। এই স্বপ্রতিষ্ঠিত শাসনের সীমার দ্বারাই স্বয়ং বিশ্ববিধাতাও সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের দেহে নাকের দুই পাশে দুই চক্ষু, মাথার দুই পাশে দুই কর্ণ, বক্ষের দুই ধারে দুই বাহু, যোজনা করিয়াছেন। করতলের পাঁচ পাঁচ আঙুল দুই হাতে কেবল যে সমান করিয়া গণিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, এ-হাতের আঙুলের সঙ্গে ও-হাতের আঙুলের আকৃতিও একই রকমের। এই সমস্ত বিচার করিয়া আমার বিশ্বাস টম্‌সন্ সাহেবও বলিবেন না যে, নরদেহ রচনা করিবার সময় বিশ্বকবির প্রতিভা ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই তিনি পুনরাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। টম্‌সন্ সাহেব এই প্রসঙ্গে সনেট কাব্যরূপের চতুর্দশ পদের কোনো উল্লেখ করেন নাই। সনেটের পদশাপনসঙ্গীতায় টম্‌সন্ সাহেব কোনো অবজ্ঞা বোধ করেন না। তার কারণ, স্কুলমাষ্টারের কাছে সনেট সুপরিচিত,—কিন্তু ষাটশপদীর কোনো নজিরের দলিল তাঁহার জানা নাই। সে কথাও যাক। টম্‌সন্ যদি তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাহিরে অল্পমাত্র অল্পসন্ধান করিতেন, তবে খবর পাইতেন যে, আত্মীয়ী অন্তরা প্রভৃতি ভাগ অঙ্গদ্বারা আমাদের সঙ্গীতের একটা কলেবর-বিভাগ আছে। তাহারই অঙ্গসরগ

করিয়া কবিতাগুলিকে সাধারণত ঘাদণ পদ আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

ইঙ্গ-মাষ্টারীর চূড়ান্ত হইয়াছে যেখানে নৈবেদ্য গ্রন্থের কবিতাগুলিকে একশো সংখ্যায় আবদ্ধ দেখিয়া কবির প্রতি সমালোচক হৃদয় প্রয়োগ করিয়াছেন। চৌকিয়ার লোক দিয়া উঠিয়াছে, যেন তাহার বৃষচ্ছ লগ্নের অনিমেষ দৃষ্টিতে বমালজ্জ্বল চুরি ধরা পড়িল। চিন্তা করিয়া, চেষ্টা করিয়া ঠিক একশোটা কবিতা টানাটানি করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন তাহার কোনো আভ্যন্তরিক প্রমাণ কি তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে পাইয়াছেন? কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে খবর পাইতেন, একশোটির অনেক বেশি কবিতা লেখা হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ছাপা হয় নাই, কিছু কিছু এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমওয়ারালার বুড়িতে ঠিক একশোটা করিয়া আম গণিয়া যে খরিদদার বলে, যেহেতু বাংলা দেশের আমগাছ আজুল গণিয়া গণিয়া একশোটা করিয়া আম ফসায় অতএব এ আম পান্‌না, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আমগাছকে সে আপনার ছাত্র বলিয়াই কল্পনা করে, এবং সেই আমগাছকে ফুল মার্ক না দিয়া ফেল করিবার পক্ষে তাহার বিশেষ আনন্দ আছে।

এ তো গেল বাহিবের কথা। তারপরে লেখক কবিতার গুণ দোষ বিচার এমনভাবে করিয়াছেন যাহাতে উপাধিপরীক্ষার পরীক্ষকেরা সম্মত হইয়া না করিতে পারে যে, তিনি বাংলাকাব্যকে নিশ্চিত ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে গভীরভাবে বুঝিবার অধিকারী নহেন। তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজি সাহিত্যকে যদি খাল বাংলায় ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যায়, ইংরেজি সাহিত্যকে যদি ইংরেজের জ্ঞান, বোধ ও দৃষ্টি দিয়া দেখিবার চেষ্টা একটুও না থাকে, যদি ইংরেজি ভাষার মধ্যে যে জাহ্ন আছে তাহা অল্পভব করা আমাদের পক্ষে স্বভাবত বা অশিক্ষাবশত অসাধ্য হয় তবে এই সাহিত্যের কতই অল্প অংশ বাঙালীর অধিগম্য হইতে পারে। শুধু তাই নয়, তাহাদের ভাষায় যাহাকে banal বলে, তা ছাড়া এ সাহিত্য আর কোনো বিশেষণের যোগ্য

হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত বোধ করি তাহার জ্ঞান আছে। যদিও নিশ্চিত বলা কঠিন তবু আশা করি তিনি এতটুকু বাংলা জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিবেন যে, বাইবেলের যে বাংলা তর্জমা সাধারণ্যে প্রচলিত তাহাতে বাইবেলের মতো এমন গ্রন্থেরও কিরূপ হাস্যকর দুর্গতি ঘটিয়াছে। তাহার কারণ এ নয় বাংলায় ভালো তর্জমা হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, তাহারা জ্ঞানেন না যে, বাংলা তাহারা জ্ঞানেন না, তাহারা তাহাদের অশিক্ষার ভিতর দিয়া এক জিনিষকে আর এক জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন। অভিধান মিলাইলে শব্দার্থের কোনো অপরাধ পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ভাষার রস, যাহাকে ইংরেজিতে taste বলা যাইতে পারে, তাহা তাহার অর্থবস্তুর চেয়ে অনেক বেশি। তাহার উপলব্ধি যদি না থাকে তবে অল্প রসদৃষ্টির যোগে সাহিত্যের ব্যবহার করিতে গেলে তাহা নিতান্ত ক্রিমিনাল হইতে পারে, অস্বস্ত। মিডিল মামুলার অধীনে আসিতে পারে। টম্‌সন বাংলা ভাষার যে অগাধ বোধের ভিতর দিয়া বাংলা কাব্যকে দেখেন তাহাকে তাহার ইংরেজি ভিতর দিয়া ইংরেজি লইবার সময় যে, কিরূপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। এমন অবস্থায় যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে মাঝে মাঝে এক কথায় ভিজ্রি ভিসুমিস্ করিতে থাকেন, তখন তাহার হাকিমী সম্বন্ধে নালিশ কার কাছে তুলিব? সে কি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপরীক্ষা-সমিতির কাছে?

এমন কোনো ইংরেজি কাব্যসংগ্রহ নাই যাহার মধ্যে টেনিসনের The Lady of Shallott আদরের স্থান পায় নাই। ইংরেজি ভাষা, ভাব, তাহার পৌরাণিক ইতিহাসের সঙ্গে যাহার নিরতিশয় বনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই এমন সাহিত্য-রসজ্ঞ বাঙালী পাঠকের কাছে ইহা যে কতদূর নীরস ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে তাহা, যে-ইংরেজের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তিনিও বুঝিতে পারিবেন। উক্ত পাঠক "Bearded Barley" কে "দাড়িওয়ালা ধব" তর্জমা করিয়াও যদিবা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন তবু সমস্ত কবিতাটির মধ্যে মর্কজ্ঞানী চিন্তার ব্যবহারযোগ্য খাদ্যের অভাব দেখিয়া তিনি যদি

ইহাকে অশ্রদ্ধা, এমন কি, অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু তবু উক্ত বাঙালী পাঠক অবজ্ঞা করেন না; বলেন, আমি বৃদ্ধিতে পারিলাম না। অবজ্ঞা যে করেন না, তাহার কারণ এ নয় যে, করিলে উপাধিপন্নিকায় তাঁহার পাস্ কবা অসাধ্য হইবে। তাহার কারণ এই যে, তিনি জানেন, ইংরেজ এই কবিতাব মধ্যে যে-রস পান, কেবল মাত্র অনভিজ্ঞতাবশতই সেই রস পাইবার অধিকার তাঁহারও নাই। সে তাঁহার ভাগ্যের দোষ, কাব্যের দোষ নয়। টেনিসনের "In the Valley of Clauteret" নামক কবিতাটিও ইংরেজ সংগ্রহকার-দের বরমাল্য পাইয়া থাকে। জানিনা ফরাসী বা জার্মান ভাষায় ইহার তর্জমা হইয়াছে কি না—এবং সেই তর্জমার জোরে ইহা সেই সেই ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা ক্ষুদ্র কোণও অধিকার করিতে পারিয়াছে কি না। ইহার সম্পদ যে কি, এবং "All along the Valley," ও "Living Voice" ও "Voice of the Dead" বাক্যের বারবার পুনরাবর্তনের মধ্যে কি যে জাহ্ন আছে তাহা অতি অল্প বিদেশীর কাছেই অসুভব-গম্য। কিন্তু নিঃসন্দেহই ইহার শব্দযোজনায় মধ্যে এমন একটি সঙ্গীত আছে যাহা অধিকারী ব্যক্তির মনে রস জোগাইয়া তোলে। "Deepening thy voice with the deepening of the night" ইহার মধ্যে যদি কোনো মাধুর্য থাকে তাহা শব্দার্থের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, ভাষার অনির্কচনীয়াতায় মধ্যে

তাহা অবগুষ্ঠিত, ভাষার দরদ নাই যে বিদেশী বর্ণী সমালোচকের মনে, সে যখন ইহার অবরোধ ভাঙিয়া চৌধ আদায় করিতে আসে তখন হতাশ হইয়া সে কি ক্ষাপ্তা হইয়া উঠিবে না? টমসন্ সাহেব তেমনি মেজাজ লইয়া মাঝে মাঝে যখন কেপিয়া উঠিয়াছেন তখন সেটাকে তাঁহার সাহিত্যিক ত্রায়পরতা বলিব, না, কথাটা সচ হইলেও, সেটাকে অত্রায়পরতা বলিব? যথার্থ ভাবে সাহিত্যরসের বিচার করিবার শক্তি যে সকলেরই আছে তাহা বলি না। অতএব তাহার অভাব দেখিলেও সহ্য করা চলে, কিন্তু উপকরণ ও শিক্ষার অভাবে সাহিত্যের বাহির দ্বারেই যে মাহুষ বাধা পায়, সে যদি সেখানেই আপন হাতে উচ্চ মাচা বাঁধিয়া বিচারকের আসন খাড়া করে সেটা কি স্বদৃশ? কেবল কল্পনা-শক্তির অসুজ্ঞতাবশত নয়, অজ্ঞতার অশক্তিবশত যখন সমালোচক নিজের আত্ম-বিশ্বাসকে খর্ব না করিয়া কবির কাব্যকে খর্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ভ্রম কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। কারণ এই স্পর্ধা দ্বারা বাঙালী কবির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, অসুদৃশ ভাষাজ্ঞান লইয়া কোনো যুরোপীয় কবির প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে এই ইংরেজ লেখক সাহস করিতেন না। আমাদের দেশের ধাতনামা কবির প্রতি এই অসঙ্কোচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতির প্রতি পদে পদে তিনি অহঙ্কৃত অসম্মান প্রকাশ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছেন।

রেভারেণ্ড টমসনের পণ্ডিতম্মত্বতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টমসনের বহির বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া একটি হাত্তোদ্দীপক কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন তরবারিচালননিপুণ ব্যক্তি অস্ত্র এক জনের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু

তলোয়ারটা এমন পাতলা ও এমন তীক্ষ্ণ ছিল এবং তলোয়ারী এমন লঘু হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথা কাটিয়া-ছিলেন, যে, সে বৃদ্ধিতেই পারে নাই, যে, তাহার মাথা কাটা গিয়াছে। দর্শকেরাও বৃদ্ধিতে পারে নাই। তলোয়ারী তখন কি করেন? নিজে যে খুব দক্ষতার

সহিত অঙ্গ চালনা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একটু নম্র কণ্ঠিতমুণ্ড ব্যক্তির নাকের কাছে ধরিলেন। অমনি সে হাঁচিতে না হাঁচিতেই তাহার মাথাটা মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হইলেও এত সূক্ষ্ম, যে, তাহা রেভারেণ্ড টম্‌সন অসম্ভব করিতে পারিবেন না। তাহার পণ্ডিতম্মতার মাথা কাটা গেলেও তিনি জীৱন্ত মাছুষেরই মত বেশ চলা-ফিরা ক্রিতে থাকিবেন। কিন্তু তাহা বাঙালী কবি ও অন্তান্ত লেখকদের পক্ষে নিরাপদ নহে;—কখন কাহার উপর চড়াও করিয়া বসিবেন, বলা ত যায় না। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নম্র ব্যবহার করেন না। কিন্তু টম্‌সন সাহেবের বহিতেই তাহার মাল মশলা আছে। একজ্ঞ করিয়া ব্যাখ্যার হামানদিস্তায় পিষিয়া ঘুটিয়া দিলেই চলিবে। তখন সেই নম্র টম্‌সন নিজে ব্যবহার করিতে পারিবেন, অস্ত্র কেহও তাহার নাকের কাছে ধরিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর এটি টম্‌সনের দ্বিতীয় বহি। প্রথমটির দীর্ঘ সমালোচনা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। হয় ত তাহারই ফলে তিনি দ্বিতীয় বহিটিতে স্বীকার করিয়াছেন, যে, প্রথমটিতে কোন কোন বিষয়ে কিছু ভ্রম আছে।

টম্‌সন সাহেবের সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। বিছু চিঠি লেখালেখি এবং কথাবার্তাও হইয়াছিল। একবার তিনি বাংলার কথোপকথনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষা বাংলার দুই তিনটা বাক্য বলিয়াই সে চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। ভারতবর্ষে থাকিবার সময় তাহার এই ধারণা ছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের বাংলা বহি কোন বিদেশী ভাষায় তর্জমা করিবার জন্য বিদেশী অম্ববাদকের ভাল করিয়া বাংলা জানিবার দরকার নাই; কোন বাঙালীকে বহিটির মানে দ্বিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া বিদেশী অম্ববাদক নিজের মাতৃভাষায় অম্ববাদ করিতে পারেন। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন বটে, যে, বিদেশী অম্ববাদকের নিজের মাতৃভাষায় দখল থাকা দরকার। অম্ববাদ কার্যের সহজ-

সাধ্যতা সম্বন্ধে তাহার এই অদ্ভুত ধারণা এখনও বোধ হয় আছে। নতুবা তাহার এই অপূর্ণ দ্বিতীয় বহি তিনি লিখিতেন না।

টম্‌সন সাহেবকে হাস্যাম্পদ করিবার জন্য কোন বাঙালী জ্যাঠা ছেলে গম্ভীর ভাবে তাহাকে বতকগুলি শব্দের অদ্ভুত অম্ববাদ করিয়া দিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও টম্‌সন সাহেব বাংলা-বিদ্যার দোড় যে কত দূর, তাহা প্রমাণিত হইতে বাকী থাকে না। কিন্তু তাহার বহিটির কোন কোন অঙ্গগা পড়িয়া তাহার পাণ্ডিত্যভিমান সম্বন্ধে আমার এ ধারণা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হাসির উপকরণগুলি তিনিই স্বয়ং যোগাইয়াছেন। তাহার কয়েকটি পাঠকলো সামনে ধরিবার আগে অন্য দু-একটা কথা বলি।

পুস্তকখানির ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, যে, তিনি রবিবাবুর সব বহি পড়িয়াছেন, যদিও পুস্তকালিকায় তিনি একথাও কতকগুলি বহি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, সেগুলি তিনি দেখেন নাই। পড়ার মানে যদি চোখ বুলান হয়, তাহা হইলে তাহা তাহার দৃষ্ট বহিগুলি সম্বন্ধে তিনি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যদি তিনি অধ্যয়ন অর্থে পাঠ (reading) কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে অবিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি? বিযুক্ত শর্মা বলিয়াছেন, মাছুষের টাকা থাকিলে তাহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতিও হয়—“অর্থাদ্ ভবতি পণ্ডিতঃ”। তিনি আজ-কালকার দিনে রাঁচিয়া থাকিলে অধিকন্তু ইহাও বলিতেন, যে, রাজনৈতিক প্রভুত্ব কোন জাতির লোকদের থাকিলে সেই জাতির লোকেরা পরাধীন জাতির ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য লইয়াই অন্নগ্রহণ করে। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, যে, টম্‌সন যত অল্প বাংলা জানিয়া বাঙালী কবির উপর মূল্যবান করিয়াছেন, ফরাসীভাষা তত অল্প জানিয়া কোন ফরাসী কবি সম্বন্ধে বহি লিখিতে সাহস করিতেন না—তেমন আম্পর্ক ও দুঃসাহস তাহার হইলে দুর্দ্বাণও কি হইত তাহা আমরা জানি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা ইংরেজের অধীন এবং তিনি ইংরেজ, সেই কারণে তিনি আমাদের ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষার্থী ছিলেন, চেয়েও

কম বাংলা জানিয়া অগাধিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক হইয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের উপর বহি লিখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ ফিলসফি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি দর্শনের আচার্য্য না হইতে পারেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যাচার্য্য যে নিশ্চয়ই, তাহা এই উপাধির প্রভাবে আমাদের কাছে মানিতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পদবী “ঠাকুর” কেন হইল, তাহার বড় চমৎকার কাব্য টমসন্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেকালে সরকারী ইংরেজ কর্মচারীরা দেশী ব্রাহ্মণ চাকর্য্যদিগকে “ঠাকুর” বলিত, এবং তাহা হইতেই কবির পূর্ব পুরুষরা “ঠাকুর” বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাংলা-দেশের আরও শত শত ব্রাহ্মণ পরিবারের যে সব লোক সেকালে ইংবেজের চাকরী করিত, তাহারা কেন “ঠাকুর” বলিয়া পরিচিত হয় নাই? কবি নিজে এই অপূর্ব ইতিহাসটি ইতিপূর্বে কখনও শুনে নাই, যদিও তাঁহার নিজের পারিবারিক ইতিহাস এবং বাংলা শব্দার্থের উৎপত্তিসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান টমসন্ অপেক্ষা অল্প স্বল্প বেশী হইবারই সম্ভাবনা। টমসন্কে অতঃপর কোন হাঙ্গরসিক বলিয়া দিতে পারে, যে, কবির পূর্বপুরুষ রাধুনী বামুন ছিলেন বলিয়া তাঁহার ঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এবং তাহা তিনি তৃতীয় কোন বহিতে লিখিয়া বসিতেও পারেন। এইজন্য এখন হইতেই বলিয়া রাখা ভাল, যে, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। হাঙ্গরসিক-দিগকেও বলি, “অরসিকেষু রসস্ত নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ,” তাঁহার অভীত কালের কবির এই প্রার্থনাটি যেন ভুলিয়া না যান।

রবীন্দ্রনাথের বংশ পিরালি, পিরালী বা পীরালী ব্রাহ্মণ। টমসন্ বলিতেছেন, পিরালি শব্দের উৎপত্তি “পীর+আলি”—প্রধান মন্ত্রী হইতে, এবং পীর+আলি যে ফারসী, তিনি তাহাও বলিয়াছেন। আমি ফারসী জানি না; কিন্তু অভিধানে দেখিয়াছি, যে, পীর ফারসী কথা, মুসলমানদিগের সাধু পুরুষদিগকে পীর বলা হয়, এবং আলী আরবী শব্দ। বস্তুতঃ পিরালি শব্দের জনশ্রুতি-মূলক ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ, “যশোহরের মুসলমান রাজা পীর

আলীর অন্তর্গতজনিত, মতান্তরে অল্পের আত্মাণ জন্ম দোষাশ্রিত ব্রাহ্মণশ্রেণী বিশেষ,” বলিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে লেখা আছে; এবং আমরাও বরাবর এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি।

টমসন্ সাহেবের বহিতে মধ্যে মধ্যে একরূপ ইঙ্গিত আছে, যে, তিনি বাংলা ও ফারসী ছাড়া সংস্কৃতও জানেন। একরূপ বহুভাষাবিদ লোককে ইংলেণ্ডে যত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে।

এখন টমসনের গোটাকতক কথার অমূল্য দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

তিনি “কবিওয়ালার” মানে লিখিয়াছেন, “poet-fellows”! তিনি জানেন না, যে, “কবি”র একটা মানে, “একশ্রেণীর গান; ইহাতে চিত্তান, পরচিত্তান, ফুকা, মেলতা, মহড়া ও খাদ এই কয় অংশ থাকে”; জানেন না, যে, “কবি” গাওয়া যায়, সুতরাং “কবিওয়ালার” মানে “কবি-গানকারী”। “কবি” যে এক শ্রেণীর গান, তাহার একটা প্রয়োগ দিতেছি। মেদিনীপুরের জাড়া গ্রামের জমীদারদের বাড়ীতে এক কবির লড়াই সম্বন্ধে গল্প আছে, যে, একদলের মূল গায়ের জাড়াকে গোলোক বৃন্দাবনের সহিত তুলনা করেন। তখন অগ্রদলের অধিকারী উঠিয়া গাহিলেন,

“কি কোরো বল্লি, জগা, জাড়া গোলোক-বৃন্দাবন।

কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড?

সামনে আছে মাণিককুণ্ড, কোথায় মূলো দরশন।—

কবি গাইবি, পয়সা নিবি, খোসামুদী কি কারণ?”

মাণিককুণ্ড জাড়ার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এখানে বড় বড় মূল্য উৎসব হয়। যিনি উত্তোর গাইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যয়ের অর্থসহজবোধ্য। গোলোক-বৃন্দাবনে ত্রীকুণ্ড থাকেন, কিন্তু জাড়ার নিকটবর্তী মাণিককুণ্ডে থাকেন বড় বড় মূল্য।

নববিবাহিত দম্পতির কথোপকথন বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আছে, তাহাতে বালিকা বধু বলিতেছে, যে, সে আয়ী-মার কাছে শুইতে বাইতেছে। মাতামহীকে আয়ী বলে; কোথাও কোথাও মাতামহীর মাতাকে আয়ী-মা বলে। টমসন্ আয়ী-মার মানে করিয়াছেন “nurse”

“নাস” অর্থাৎ দাই বা ধাই। “আগ্নী” ও “আয়া” যে এক নয়, ততটুকু জ্ঞানও তাঁহার নাই।

“চলিত ভাষা”র মানে তিনি করিয়াছেন “walking language” অর্থাৎ কিনা যে-ভাষা হাঁটিয়া বেড়ায়, বলা বাহুল্য ইহার অর্থ কথোপকথনের ভাষা, প্রচলিত ভাষা।

রবীন্দ্রনাথের একটি বহির নাম “শব্দতত্ত্ব”। “শব্দতত্ত্ব” কথাটির মানে টম্‌সনের মতে “sound and reality”, অর্থাৎ “ধ্বনি ও সত্তা”। বলা বাহুল্য ইহার অর্থ শব্দ-বিজ্ঞান বা ভাষাবিজ্ঞান। টম্‌সন্ এইরূপ ভাণ করিয়াছেন, যে, তিনি রবিবাবুর সব বহি পড়িয়াছেন। যদি “শব্দ-তত্ত্ব” তিনি পড়িতেন, তাহা হইলে ঐ বহির নামটির এমন অদ্ভুত মানে করিতেন না।

“ছুটির পড়া” রবিবাবুর আর একটি বহি; ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটির সময় পড়িবার জন্ত অভিপ্রেত। টম্‌সনের বহিতে ইহা ইংরেজীতে “Chhutir Pada” লেখা হইয়াছে। স্মরণ্য ইহা “ছুটির পদ”ও পড়া যায়। টম্‌সন্ ইহার মানে করিয়াছেন, “Verses in Leisure”, অর্থাৎ “অবসর সময়ে রচিত পদ্য”। বলা বাহুল্য এই “পড়া”গুলি গদ্য।

“গীতপঞ্চাশিকা” রবিবাবুর আর একটি বহির নাম; টম্‌সন্ ইংরেজীতে লিখিয়াছেন “Gitapanchashika”। এই ইংরেজী অক্ষরসমষ্টি “গীত-পঞ্চ-শিকা”ও পড়া যায়। স্মরণ্য, আব যায় কোথা? টম্‌সন্ জমনি মানে করিলেন, “Five Loops of Song”। অর্থাৎ কিনা রবিবাবু শিকায় তুলিয়া রাখিবার জন্ত কতকগুলি গান রচনা করিয়াছেন! সেগুলি, রূপকভাবে কিহা সত্য সত্যই, পাঁচটি শিকাতে ঝুলান থাকে! টম্‌সন্ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেক বাঙালী কবির নাম করিয়াছেন,

যেন সবই তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু সত্য সত্যই যদি তিনি প্রচলিত সব বাংলা কাব্যের সহিত পরিচিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের চৌরপঞ্চাশিকা তাঁহার জানা থাকিত, এবং পঞ্চাশিকার মানে পঞ্চাশের সমষ্টি না করিয়া তিনি পাঁচটি শিকা করিতেন না।

“অরুণ রতন” আর একটি পুস্তকের নাম। টম্‌সন্ মানে করিয়াছেন, “The Ugly Gem” অর্থাৎ কিনা “কুৎসিত রত্ন”। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ পরমপুণ্যকেই রূপহীন নিরাকার রত্ন বলিয়াছেন।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। দে-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বহির নামেরই এমন অদ্ভুত মানে করিয়াছে, সে যে তাঁহার সব বহি পড়িয়াছে, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? অক্সফোর্ড অতি প্রাচীন হু বিশ্বাত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অনেক বিদেশীভাষার অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদেরও বিদ্যা কি টম্‌সনের মত? তাহা হইলে ত অক্সফোর্ড পণ্ডিতের জায়গা না হইয়া পণ্ডিতমূর্খের জায়গা হইবে।

অরবিন্দ ঘোষ যখন হাজতে ছিলেন, তখনকার বৃত্তান্ত কাগজে লিখিয়াছিলেন। তাহার এক জায়গায় বলিয়া-ছিলেন, জেলে তাঁহাকে একটি বাটী দেওয়া হইয়াছিল। ইহা জল খাইবার জন্ত, ভাল খাইবার জন্ত, স্নানের জন্ত, শৌচাগারের জন্ত, প্রভৃতি সব কাজের জন্তই ব্যবহার করিতে হইত; অতএব তাঁহার মতে ইহা ভারত-বর্ষের ইংরেজ সিবিলিয়ানদের মত। কেন না এই সিবিলিয়ানরা সকল রকম সরকারী কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। অরবিন্দ টম্‌সনের বহি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, শুধু ইংরেজ সিবিলিয়ানরা নহ, কোন কোন ইংরেজ পাদরীও অনায়াসে সব কাজ করিতে সমর্থ।



নৃত্য

নৃত্য ক্রমিক বলে তাহা ব্রাহ্মবির অস্ত্র দণ্ডপক বলিয়াছেন—

“গাত্রবিক্ষেপমাশ্রয়ে সর্বাভিনয়বর্জিতম্।

আঙ্গিকেন্দ্রপ্রমাণেন নৃত্যং নৃত্যবিদ্যে বিদ্যমিতি।

অস্ত্রদৃঢ়াভিহিতং নৃত্যং নৃত্যং তানলরাশ্রিতম্।

উদ্ধতং তাণ্ডবং প্রোক্তং লাস্ত্রস্ত্রং হৃদুনারকম্।”

তালবান রসাত্রে বিদ্যাসদস্যে অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্য বলে। নান্য-প্রকারে অঙ্গ হস্ত হর—চালিত হয় বলিয়া নৃত্যের আর-একটি নাম হইয়াছে ‘অঙ্গহর’। নৃত্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; কেননা, তালের দিকে কোঁক, অর তালে তালে অঙ্গবিক্ষেপের দিকে কোঁক মানুষের প্রকৃতিতে দৃঢ়স্বভাব। মানুষ যখন নিতান্ত অসত্য অবস্থার ছিল, তখনও মানুষ নৃত্য করিয়াছে। সভ্যতার প্রথম স্তরে নৃত্য সকল জাতির মধ্যেই উদ্ভেদিত ভাবসম্ভোত ছিল। যে অমুকরণ-পদ্ধতির প্রয়োগে নাটকের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাই আবার অমুকরণনীয় নৃত্যের (pantomime) জনক। অতি প্রাচীনকালে দেশান্তরবোধে ভাব বা ধর্মভাব প্রকাশ করা নৃত্যের রীতি ছিল।

শারীরবিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মনে আনন্দ হইলে শরীরের উপর যে-সব ক্রিয়া হয়, নৃত্যও সেইমাত্র শারীরিক ক্রিয়ার স্ফূর্তি হইয়া থাকে। নৃত্য শরীরের ক্ষিতর যে তেজের সঞ্চার হয়, তাহা সমস্ত শরীরে চারিধে থাকে। কাজেই নৃত্যে দেহের অপকার সাধন না করিয়া পুষ্টিসাধনই করিয়া থাকে। শারীরিক ব্যায়ামে দেহের যেকোন বিকাশ ও পরিণতি হয় নৃত্যও সেইরূপ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র নৃত্যকে ‘দৃশ্যসঙ্গীত’ নাম দিয়াছে। এই দৃশ্য-সঙ্গীত বা নৃত্য চার না কে? এমন যে গভীর প্রকৃতির দার্শনিক সোক্রাটস্ (Socrates) তিনিও নিজে নৃত্য করিতেন; তবে তাঁর নৃত্য ছিল ব্যায়ামের অবলম্বন। সারা ছনিয়ার মধ্যে এক্ষেত্রে বেয়াধী করিয়াছেন শুধু একজন পণ্ডিত; তাঁর নাম Cecero; তিনি বলেন, মাতাল বা পাপল না হইলে কোন অহলোকে নৃত্য করে না।

ডেভিড বন কিলিষ্টাইনস্ (Philistines) ধ্বংস করিয়া কিরিস্তা আসেন, তখন হীক্সামগীরা নৃত্য করিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। ডেভিড খুষ্টের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন, যখন তিনি শিলো (Shiloh) হইতে Ark কিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সেভিলের (Seville) ক্যাথেড্রালে (Cathedral) উচ্চ বেদির (High Altar) সম্মুখে মে বা ক্রন মাসের শেষে যখন খুষ্টদেহের (Corpus Christi) উৎসব হয়, তখন বালফেরা নাচে। প্রাচীন গ্রীসে যুতব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখাইবার সময় নৃত্যের ব্যবস্থা হইত। আড্রাস্টাসের (Adrastus) পুত্রার সিসিয়নে (Sicyon) নাচের খুব ধুম হইত। যুতব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য একটি উৎসবেরও অনুষ্ঠান হইত। এই উৎসবের নাম ছিল ‘আনথেস্টেরিয়া’ (Anthesteria)। ইহাতে আমাদের রাসের নৃত্যের মত মণ্ডলাকারে রমণীরা নাচিত।

বর্মার, চীনের, জাপানের আরও কত আরগার যুতদের সম্মানের জন্য নাচের সরঞ্জাম বেশ আশোজনক।

মহাদেব সকল সময় নৃত্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম

‘নটরাজ’। এপর্যন্ত যত ‘নটরাজ’ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সবই নৃত্যশীল।

গণেশও কতকটা বাপের ধাত পাইয়া সময়ে সময়ে নাচিয়া থাকেন। তাঁর এই নৃত্যশীল মূর্তির নাম ‘নৃত্যগণেশ’। কার্তিকের নৃত্যমূর্তি কোথাও পাওয়া যায় না। ‘নৃত্যগণেশ’ ‘নৃত্যসরস্বতী’র নৃত্য বড়ই হুম্মর। কৃষ্ণও নাচিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার রাসের নৃত্য ভারত-বিখ্যাত। কবি জয়দেব ‘নৃত্যতি যুগতিজনন সমং’ প্রভৃতি পদে তাঁর নৃত্যমূর্তি ভক্তের স্বপ্নে মূর্তিত করিয়া রাখিয়াছেন। কৃষ্ণের নৃত্যগোপালমূর্তি রসজন্মের আনন্দ বর্ধন করিয়াই থাকে। কালীর-সর্পের মস্তকে কৃষ্ণের জয়মূর্তি নৃত্যে কত তত্ত্বই নিহিত। স্বর্গের দেবতারও নাচ খুব ভাল বাসেন। উর্ধ্বানী, মেনকা প্রভৃতি অঙ্গরা তাঁহাদের আমোদ দিয়া থাকেন। গন্ধার্ব-কঙ্করা নাচকে তো পেশা করিয়াই রাখিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইতেন, গান কবিতেন, সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেও ছাড়িতেন না। প্রাচীন ভারতে নৃত্য গৃহস্থশ্রমে খুব প্রচলিত ছিল। ঋষিরা গীতবাদ্যের সঙ্গে নৃত্যেরও অনুমোদন করিয়াছেন। আমোদের জন্য স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন, রমণীরা তাম্রবর্ণের সুরাপাত্র হাতে করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য কবিতেন—“যদ্ উল্লস্ববর্ণানং ঘটানং মণ্ডলং মহং।” তখন সুরাপাত্রের একটি নাম ছিল ‘ঘটা’। ভীষ্ম মৃত্যুশয্যায় যুধিষ্ঠিরকে নৃত্য গীত বাস্তব শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আগেকার সভ্যমতিতে নৃত্য-গীত আলোচনা প্রধান বিষয় ছিল। স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে নৃত্য করাও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। অর্জুন যে নাচ-গানের ওস্তাদ ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। কৃষ্ণ বলরাম নৃত্য-গীতে খুব পটু ছিলেন। শাস্ত্রমুগ্ধা গঙ্গা স্বামীর সম্মুখে নৃত্য করিতেন। বাদবরমণীরা নৃত্য করিতেন। বলরাম রেবতীকে নিয়া নাচিতেন, কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে, অর্জুন সুভদ্রার সঙ্গে নাচিতেন। বাদবেরা নিজের নিজের বধুর সঙ্গে নাচিতেন। হুম্মরী রমণীরা রামচন্দ্রের সম্মুখে নাচিতেন। কচ ও দেববানী তপোবনে থাকিতেন-; তাঁরা সেখানে নাচিতেন, গায়িতেন, বাজাইতেন।

বৈদিকযুগেও স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে নৃত্য করিয়াছে। ঋগ্বেদের জন্তও লোকে নৃত্য করিত। বৈদিক অনুষ্ঠান ‘মহাব্রতযজ্ঞে’ স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত। মহাব্রতে নাচ গান বাজনার অবধি ছিল না। ঋগ্বেদে মন্দিরা বাজাইয়া নাচের কথা আছে, মন্দিরকে তখন ‘মাদ্যাটী’ বলিত।

প্রাচীন ভারতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে নৃত্যকলার বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। নৃত্য সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ। বিলাতে যে নাচে সে গান বা অভিনয়ের ধার নাও ধারিতে পারে, তবু সে একজন বড় নৃত্যকারী হইতে পারে। ভাবতের নৃত্যে কিন্তু সেসুপ হইবার বোঝা নাই। গীত ও নাট্যকে বার দিয়া নৃত্য হইতেই পারে না। নৃত্যের অনন্তব্যক্ততা নাই। আমাদের দেশে যিনি নৃত্যকুশল হইবেন তাঁহাকে গীতজ্ঞও হইতে হইবে, অনেক সময় অভিনয়েও পারদর্শী হইতে হইবে। পানব সঙ্গে নৃত্যের মুখ না এদেশে শুভই একটি। ভারতীয় নৃত্য মূর্তিতে হইলে শব্দভঙ্গী ও অঙ্গ-ভঙ্গীর শাস্ত্র ভাল করিয়া জানিতে হয়; কেননা, নৃত্যের আধ্যাত্মিক বা অর্থগানে প্রকাশ না হইলেও, হাবভাবে একটু হইয়া পড়িবেই। ভারতীয় অস্ত্রাঙ্গ কলার জায় যদিও নৃত্যবিস্তার আজ অবনতি হইয়াছে,

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক
আদি কৈবর্ত	১৮২৭৪	১৮৫৭৭
কলু	৫০৪০০	৪৫৪৭১
কাম্বা	১৩৩৪৯৫	১২৩০২২
কার্ব	৬৭৮২০৭	৬১৮৮২৯
কুখোর	১৪৬৮৩০	১০৭৮২৩
কুম্ভা	১০৩৫১২	৭৭২৩৫
ময়রা	৬৪৫০৭	৫৭০২৭
মুচী	২২৫০৮২	১৯১৬১২
নমঃশূদ্র	১০১৯০৫৭	৯৮৭২০২
নাপিত	২০০৫২১	২১৩৬১৭
মুনিয়া	৩৬৯১৯	২১৮০৩
পোহ	৩০০৩৪	২৮৮৩৬০
রাজবংশী	৮৯৭০৩৫	৮৩০০৭৬
রাজপুত	৮০৫০৮	৪৪৯৭৫
সদগোপ	২৭০২১১	২৬৩০২৫
সাহা	১৮৪১৯০	১৭৫৫৪১
সোণার বেনে	২৫৭৬৩	২০৪৭৮
সুত্রধর	৮৭৬৭১	৮০৯০৬
তাতি ও তব্ব	১৬৯৯০১	১৪৯৭১২
তেলি ও তিলি	২০৮১৭৫	১৮৭৭৫১

যে সকল জাতি, সম্প্রদায় বা প্রদেশে স্ত্রীলোকের ভাগ বেশী সেখানে যদি বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া কর্তব্য হয় তাহা হইলে সেখানে পুরুষের ভাগ বেশী সেখানে বিধবা-বিবাহের প্রচলন সমর্থন এবং তজ্জন্ত চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের যে-সকল জাতি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে তাহা নিবারণের প্রধান উপায় বিধবা-বিবাহ। অস্ত্রান্ত্র প্রদেশের কতক জাতিব পক্ষেও ইহা সত্য।

১২২১ সালের census অনুসারে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের (কেবল-মাত্র বহাদুরের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধ সংগ্রহে) মধ্যে পুরুষের তুলনায় প্রতি হাজারে ৯৫৪ স্ত্রীলোক আছে। প্রদেশ বা রাজ্য অনুযায়ী তালিকা দৃষ্টে উপরোক্ত census অনুসারে দেখা যায় যে, আসাম, বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, বোম্বাই-স্টেটস, মধ্য-ভারত, গোবালির স্টেট, কাশ্মীর, মহীশূর, পঞ্জাব স্টেটস এবং রাজপুতানা, অর্থাৎ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই হিন্দু স্ত্রীলোক অপেক্ষা হিন্দু পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধভাব পত্নীত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা যথার্থই বিধবা তাহাদের সম্বন্ধেই একপ বিবুদ্ধভাব প্রযোজ্য; শিশু বা বালবিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; এবং সামাজিক পবিত্রতা এবং স্ত্রী ও যুক্তিসঙ্গত সামাজিক নীতির খাতিরে যখন কাহাকেও চিরকাল বিপত্নীক থাকিতে সমাজ বাধ্য করে না তখন বিবাহ কবিত্তে ইচ্ছুক এমন কোন বিধবার চিরবিবাহার ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কর্তব্য নহে।

১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ পর্যন্ত ভারতের হিন্দুর সংখ্যা হাজার প্রতি ৪টি কমিয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রতি হাজারে ৫১টি বাড়িয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, হিন্দু বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ বিধি এবং সেন্সাস অনেক স্ত্রীলোকের গর্ভবতী হইবার বয়সে সম্ভান না হওয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের অত্যন্ত কারণ।

বালবিধবাদিগের চরিত্রা নিবারণ করিবার উপায় বাহাতে বালবিধবা

না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ যদি বালবিবাহের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইত কিংবা উহা অপ্রচলিত হইত; যদি বালিকাদিগের অন্তান ১৮ বৎসরের পূর্বে বিবাহ না হইত তাহা হইলে একটিও বালবিধবা থাকিত না। কিন্তু দুঃশেষ বিষয় যে, এইরূপ অবস্থা হওয়া অসুদূরপরাহত, সুতরাং সমস্ত বালবিধবার বিবাহ দেওয়াই অসম্ভব সঙ্গুপায়। চিরকুমারী অপেক্ষা পবিত্র ভালবাসার কলে স্নাতক কম পবিত্র নহে। (বিশ্বনাথী, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর জন্ম-কথা

পৃথিবী কিরূপে জন্মলাভ করিল, এবিষয়ে অধুনা তিনটি প্রধান মত বা প্রকল্প (থিওরি) দেখা যায়, যথা—(১) নীহারিকা-প্রকল্প (Nebular hypothesis), (২) উল্কাপিণ্ড-প্রকল্প (Meteoritic hypothesis) এবং (৩) গ্রহ-প্রকল্প (Planetesimal hypothesis)।

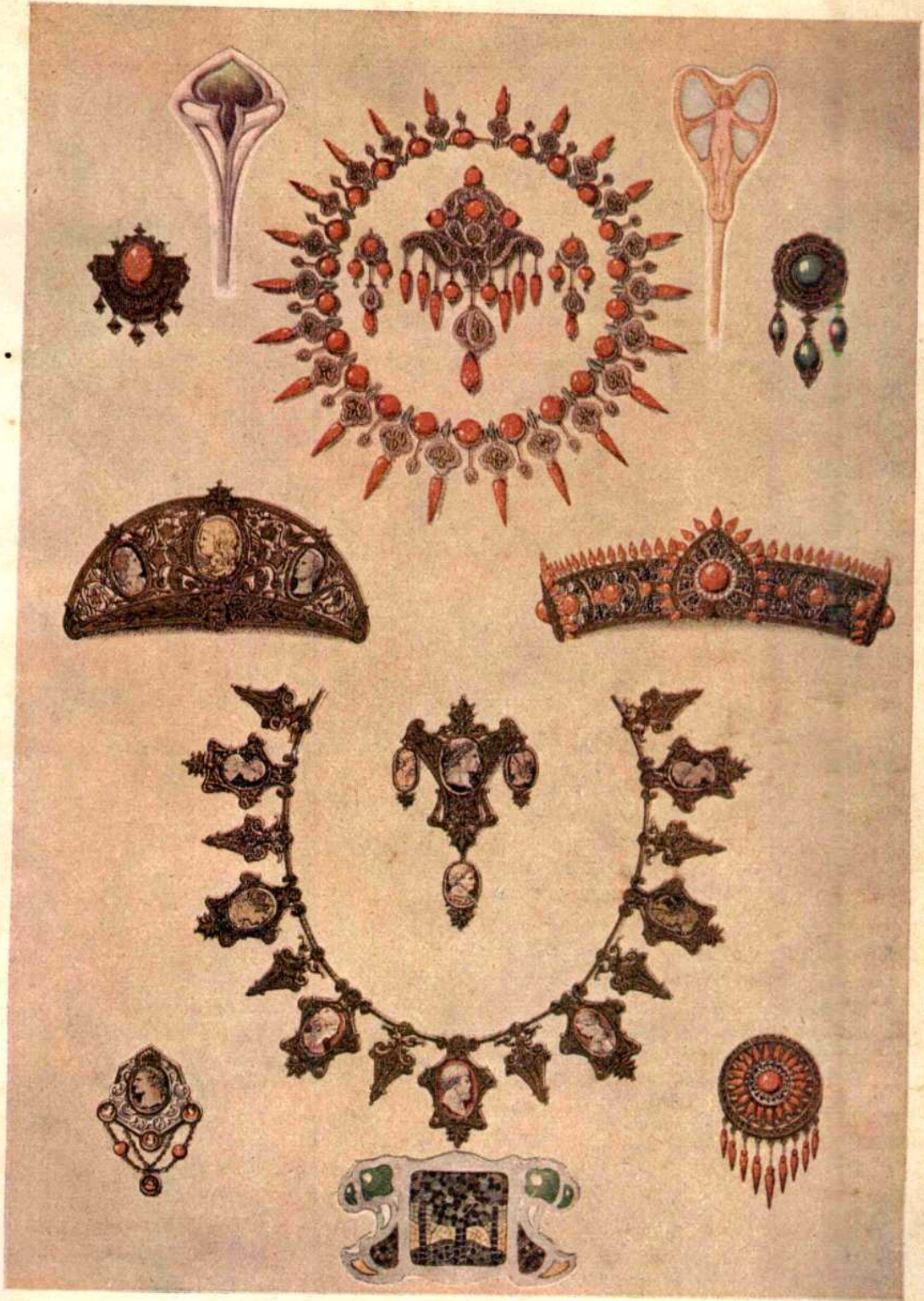
(১) নীহারিকা-প্রকল্প :—

অশ্রুসিক্ত জ্যোতিষী লাপ্লাস (Laplace)কেই এই প্রকল্পের উদ্ভাবিতা বলা যাইতে পারে। এই মতানুসারে আমাদের এই সৌর-জগৎ আদিতে অতীব উত্তপ্ত গ্যাস বা নীহারিকা-পিণ্ড ছিল; আর ঐ পিণ্ড ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইত। উহার ব্যাস ছিল ৬০০,০০০,০০০ মাইলেরও অধিক, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সৌরজগৎ যতটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে, ততটা স্থান জুড়িয়া ঐ পিণ্ড অবস্থিত ছিল।

উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই যেমন তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে ও আকারে ছোট হইয়া যায়, ঐ উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ডও সেইরূপ শূন্য তাপ বিকিরণ করার ফলে কালক্রমে তাপহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আকারেও ক্ষুদ্র হইতে থাকে এবং বাহিরের অংশটা একটা অঙ্গুরীয়কের আকার ধারণ করে। পরে আবার অভ্যন্তরের শেষ দিকে আর-একটি নূতন অঙ্গুরীয়ক উৎপন্ন হয়। এইরূপে একটির পর একটি করিয়া এককেন্দ্রিক (concentric) অঙ্গুরীয়কের আবর্তিতা ঘটে।

ঐ গ্যাস-অঙ্গুরীয়কগুলির সন্নিবেশ যে সমান পরিমাণে ঘন ছিল, তাহা নহে। যে-সকল স্থান অপেক্ষাকৃত গাঢ় ছিল, আরতনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের চতুর্দিকে গ্যাসকণাগুলি জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে কতকগুলি গ্যাস-গোলকের (spheres) সৃষ্টি হয়। এই-সকল গোলক এক একটি মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে ঘূর্ণিতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গেই আদিম গ্যাস-পিণ্ডের ঘূর্ণনের (rotation) অমূলক আবর্তিত (revolution) হইতে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক গোলকেই দুইটি কবিতা গতি উৎপন্ন হয়—একটি ঘূর্ণন, অপরটি আবর্তন। এই দুইটি গতিই অবশ্য আদিম গ্যাস-পিণ্ডের ঘূর্ণনের ফল মাত্র। এইসকল গ্যাস-গোলকেই আমাদের আধুনিক গ্রহনমূহ। উপগ্রহগুলি আবার এক-একটি গ্রহ-দেহ হইতে পৃথকীকৃত প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ; আর চন্দ্র পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ মাত্র।

কালক্রমে ঐ সকল উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড বা গ্রহগুলি যতই শীতল হয়, উহাদের আকারও ততই ছোট হইতে থাকে। উহাদের অধিকাংশই গ্যাস হইতে তরল ও তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আদিম অল্পবয়স্ক গ্যাসপিণ্ডের কেন্দ্রস্থল আজিও জ্বলন্ত অবস্থায় সূর্য্যরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এই অসীম কালে তাপ-হ্রাস হইয়া অত্যধিক উত্তাপকে নিঃশেষ করা দূরে থাকুক, উহার বিশেষ কিছু দ্রবীভূত করিতে পাবে নাই।



আধুনিক ও অত্যাধুনিক 'প্যারিফ্যাশন' শ্রেষ্ঠ গহনার নিদর্শন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

['গহনা' প্রবন্ধ

অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া সূর্যের তাপ বিশেষ ক্রাস হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় চন্দ্র জন্মিয়া একেবারে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, উহার সমুদ্রও জন্মিয়া বয়স হইয়া গিয়াছে। এই বয়সক্রান্তির উপর সৌর-কিরণ প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই। চন্দ্রের কলঙ্ক—অনালোকিত পর্বত-গহ্বর বা ছায়াসর প্রদেশ মাত্র বুঝিতে হইবে। এমন কি, চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলেও বাষ্পাংশির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কিন্তু বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি (Jupiter) এখনও এত উত্তপ্ত রহিয়াছে যে, উহার বায়ুমণ্ডলে জল ও বায়ুর মূল উপাদান দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের এই পৃথিবী চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অবস্থার উপনীত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ গ্যাস অবস্থায় আছে; কিন্তু উপরিভাগ বা ভূপঞ্জর (crust) নীরট ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আর ইহার বায়ুমণ্ডল ও জলরাশি (hydro-sphere) এই কঠিন আবরণের (litho-sphere) উপরে অবস্থান করিতেছে এবং এই কঠিন ভূপঞ্জরের নীচেই তরল পদার্থ অবস্থিত;—বহুকাল ধাবৎ এই মতটি প্রচলিত ছিল; কেহ ইহার আগন্তিক করেন নাই। কিন্তু আধুনিক অনেক পণ্ডিত উক্ত মতবাদে সন্দিহান হইয়া অল্প মত প্রচার করিয়াছেন।

(২) উৎপত্তি-প্রকল্প:—

এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সৌরজগতের সর্বত্র উৎপত্তি-কণা বিরাজমান। উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের মতো এত প্রচণ্ড যে, আঘাতজনিত উত্তাপের প্রভাবে উহার গ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে। এইসকল উৎপত্তি-ক্রমশ: একত্র হইয়া যতই আকারে বড় হইতে থাকে, ততই উহাদের অপর উৎপত্তিকে আকর্ষণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ আকর্ষণের ফলে, এই পিণ্ড ক্রমাগত বড় হইয়া পড়ে ও ঘাতপ্রতিঘাতের ফলস্বরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই-রূপে সূর্য, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহণের উৎপত্তি হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাপবিকিরণ করার ফলে, ক্ষুদ্রতর পৃথিবী অধুনা এই কঠিন অবস্থায় পৌঁছিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত নীতল হইলেও অভ্যন্তরভাগ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ।

(৩) গ্রহ-প্রকল্প:—এই প্রকল্প অনুসারে পৃথিবী প্রথমে নীতল ছিল, কিন্তু ক্রমশ: দ্রবতরু হইয়াছে। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই সৌরজগৎ নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নীহারিকা-পিণ্ডের মধ্যে গাঢ়তর স্থানের (knots) চতুর্দিকে নীহারিকাকণাগুলি পুঞ্জীভূত হইয়াই গ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছে। স্তরে স্তরে নীহারিকা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের এই পৃথিবী ক্রমশ: এতাদৃশ বৃহৎ আকার ধারণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে উত্তাপ আসিল কোথা হইতে?—এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন যে, অভ্যন্তরীণ আকৃষ্ণনের ফলে তাপ উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই তাপ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইতে ক্রমশ: পরিধির দিকে বিস্তৃত। এইসকল পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, পৃথিবী যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসর্গের ফলে কেন্দ্রদেশের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল।

যদি স্বীকার করা যায় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং উহা নীতল ভূপঞ্জর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অভ্যন্তরভাগ হইতে এই উত্তাপ ধীরে ধীরে ভূপঞ্জরে সংক্রমিত হইতেছে এবং তথা হইতে উহা শূন্য বিকীর্ণ হইতেছে। কাজেকাজেই সমস্ত পৃথিবীও ধীরে ধীরে ক্রমশ: আকারে ছোট হইয়া পড়িতেছে। আর পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ আকৃষ্ণনের ফলে যত ছোট হইতেছে, অপেক্ষাকৃত নীতল বর্হিভাগ কিন্তু তত আকৃষ্ট হইতে পারিতেছে না। সুতরাং অধিকতর আকৃষ্ট অভ্যন্তরভাগের উপরে থাকিতে গিয়া বৃহত্তর বহির্ভূপঞ্জর ভূবড়াইয়া উঠুনিচু হইতেছে।

এই আকৃষ্ণন-ভূপঞ্জরের উত্থানপতন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসর্গের প্রধান কারণ।

আকৃষ্ণন-প্রকল্প স্বীকার করিলে ভূ-পৃষ্ঠ যে ধীরে ধীরে বসিল যাইতেছে, এ-কথাও অস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, বৃষ্টির ফলে স্থলভাগের খোঁচ মাটি নদীপথে, পরিণেবে সমুদ্রতলে আশিয়া নিয়ত সঞ্চিত হয়। তাহার ফলে সমুদ্রতল কণ্ঠপ বা ক্যান্সিয়ান ভূদের তল-বেশের স্তার ক্রমশ: উচ্চ হইয়া উঠে। আর এই খোঁচাট মাটির অভাবে স্থলভাগের উপরি পৃষ্ঠ ক্রমাগত নীচু হইয়া যায়। সুতরাং স্থলভাগের ভার অপেক্ষাকৃত কম ও সমুদ্রতলের ভার পূর্ণাঙ্গা অধিক হইয়া পড়ে। কাজেকাজেই ভূপৃষ্ঠের সাম্যভাব রক্ষার জন্য সমুদ্রতল হইতে তীরস্থ স্থলভাগের দিকে একটা পার্শ্ব-চাপ (lateral thrust) প্রযুক্ত হয়। তাহার ফলে স্থলভাগের উপরে স্থানে স্থানে উপত্যকার সৃষ্টি ঘটে; কে-খাও কোথাও বা ভূপৃষ্ঠ ভূবড়াইয়া উঠে ও পর্বতশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। অধিকন্তু যে-স্থানটা বসিয়া যায়, তাহার চাপের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত তরল প্রস্তররাশির মধ্যেও একটা প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং ভূবর্তী উর্দ্ধগামী স্থানের দিকে ও উহার তলদেশে আশিয়া উপস্থিত হয়। এই-জন্মই সচরাচর উচ্চ পর্বতের নিম্নদেশে আগ্নেয় প্রস্তরস্তর (batholithic mass) দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকল্প অনুসারে পর্বতের উৎপত্তি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসর্গ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনার ব্যাখ্যা সহজবোধ্য হইলেও ইহার কয়েকটি দোষ দেখা যায়; যথা—

(১) এই প্রবাহের বেগ যতই অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হউক না কেন, উহা বর্তমান পর্বতশ্রেণীর উন্নয়নের (elevation) পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না।

(২) এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমভিমুখী পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যে পর্বতমালা না আছে, এমন নহে। এই আকৃষ্ণন-প্রকল্পের সাহায্যে প্রশান্ত-মহাসাগরের অদূরবর্তী পর্বতমালার উৎপত্তি সম্ভবপর হইলেও বহুদূরবর্তী হিমুত্স, ককেশস প্রভৃতি পর্বতশ্রেণীও উদ্ভব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

(৩) এমন-কি, প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরস্থ পর্বতশ্রেণীও আকার দেখিলে মনে হয় উহা স্থলভাগের চাপের ফল নহে। এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের ধমুকাকার পর্বতমালাকে দেখিলে মনে হয় যে, উহারা ভূপঞ্জরের উণ্টা অর্থাৎ সমুদ্রভিমুখী চাপের ফলে, স্থলভিমুখী গতির ফল নহে। ফলত: এইসকল পর্বতমালার চক্রাকার (loop) ভাবে সমুদ্র হইতে স্থলভিমুখী ভূপঞ্জরের পার্শ্বচাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন।

(৪) এই মত অনুসারে কোন একস্থানে পর্বতশ্রেণীর উৎপত্তি এবং কিছুকাল পরে উহার পরিহারেরও ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

(৫) পৃথিবীর তরুণ অবস্থায় যেমন ঘন ঘন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসর্গ হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। ইহার কারণও আকৃষ্ণন-প্রকল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৬) কিরূপে দীর্ঘকাল পরে ভূপঞ্জর চালিত হইতে পারে, তাহাও এই মতের সাহায্যে সম্যক ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৭) রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রভাবে অনেক উচ্চ পর্বতও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমতলপ্রায় হইয়া পড়ে। ভারতের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, বিষ্ণু প্রভৃতি পর্বতগুলি এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইসকল উচ্চ অর্ধচ চাপ সমতলকে প্রায়-সমতল (pene-plain) লে। ইহাদের উৎপত্তিও আকৃষ্ণন-প্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত :—পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে ইঁহারা যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা এই—

(১) তাপবিকিরণের ফলে পৃথিবী বর্তমান শীতল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। অতীত অতীত গ্যাসপিণ্ডের পক্ষে শীতল হইতে অসম্ভব হইয়াছে। অতীত কাল অতিবাহিত হওয়াই সম্ভব। ইঁহারা মনে করেন, বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে পৃথিবীর পক্ষে কোটি কোটি বৎসরই যথেষ্ট।

(২) সূর্য্যোজ্জ্বল্যের কাল।—সূর্য্য নাকি দুই কোটি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া পৃথিবীকে বর্তমান হারে তাপ বিতরণ করিতে পারে না।

(৩) পৃথিবীর আন্তরিক গতির উপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব।—সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে সমুদ্রে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চন্দ্র ক্রমশঃ হইলেও অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার তাহার প্রভাবই বলবত্তর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পূর্বে পৃথিবীর আন্তরিক গতির বেগ বেশী ছিল, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার কম সময়েই পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার ঘুরিতে পারিত। জোয়ারের বিপরীত টানের ফলেই পৃথিবীর আন্তরিক গতিবেগ ক্রমশঃ কমিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থায় আসিতে এক কোটি বৎসরের কম সময় লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত :—অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর বয়স ছয় হইতে দশ কোটি বৎসর।

(প্রকৃতি, বসন্ত সংখ্যা ১৩৩৩) শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

জলের রোগারোগ্যশক্তি

মস্তিষ্ক-প্রদাহে মস্তকে শীতল জল দ্বারা ধারা প্রদান করিলে বথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নাসিকা হইতে রক্তপাতে শীতল জলের নস্ত-গ্রহণে সফল দর্শে।

প্রত্যহ এতদ্বারা জলের নস্ত লইলে, গীনস্বর্য্যবিকৃতি ও কাসাদিরোগ প্রশমিত হয়।

বাত বা অজীর্ণরোগে রোগী বা ঝাঁহাদের অস্ত্র ক্রিয়াশীল নহে, ঝাঁহাদের পক্ষে বস্তিকর্ষ বা মলদ্বারে শীতল জলের পিচ্কারী প্রয়োগ প্রত্যক ফলপ্রসূ।

পেট ব্যথা হইলে পেটের উপর একখানা মোটা কাপড় রাখিয়া একটি বোতলে ফুটন্ত গরম জল ভরিয়া সেক দিলে শীতল জলই বেদনা কমিয়া যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, রায়ে নিম্নার পূর্বে শীতল জল ও প্রত্যয়ে গরম জল পান করিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূরীভূত হয়। বসন্ত প্রকৃতি চর্মরোগে শীতল জলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া কাপড় শরীরে জড়াইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

গরম জল পান করিলে বমি হইয়া থাকে। শিশুদিগের আক্ষেপ (convulsion) রোগে মস্তকে বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়।

নাসারোগ, সর্দি ও মাথাব্যথা রোগে 'নাসাপান' উপকারী। নাসিকা দিয়া জল টানিয়া লইয়া নাসারন্ধ্র পরিষ্কৃত রাখা উচিত; ইহাতে নাসিকার দুর্গন্ধ হয় না ও নাসারন্ধ্রে কোনো ময়লা জমিতে পারে না। আয়ুর্বেদ মতে, সূর্য্যের অশ্রুদ্বারা দুইপের পর্যন্ত শীতল জল পান করিলে, বাতিক ও পৈতৃক রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া মনুষ্য শত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকেন।

শৈত্য মায়েই স্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য বৃদ্ধি করে ও রক্তকে সংযত করিয়া থাকে। সুতরাং রক্ত-রোধার্থ শীতল জল ও বরফ উপকারী।

সংজ্ঞাহীন রোগীর মূলে শীতল জলের ছাট দিলে বোগী শীতল হইতে লাভ করে। কোনো স্থানে আঘাত লাগিলে জলপটি উত্তম ব্যবস্থা।

হাত পা মচকাইলে শীতল জলের ধারাবা বা সজল হরাসারের গটিতে ব্যথা কমে। কঠিন আঘাতজনিত স্নায়বিক অবদানে রোগীকে মাথা নীচু করতঃ শান্তি করিয়া গরম জলের ধারা উপযুক্তরূপে তাপ যোগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নবজাত শিশুর শ্বাসরোধে একটি তাণ্ডে গরমজল ও একটিতে শীতল জল রাখিয়া স্নানকণের অস্ত্র উচ্চজলে আকর্ষণ ডুবাইয়া অব্যবহিত পরে শীতল জলে পূর্কোজ্জ্বল্যে নিমজ্জিত করিলে, শিশু শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে।

সন্ধিপত বাতরোগে প্রথমতঃ উত্তপ্ত বাষ্প ও পরে শীতলজলে সেই অংশ নিমজ্জিত রাখিলে চমৎকার ফল দর্শিয়া থাকে।

সন্ধিরোগে গরম জলে স্নান উপকারী। নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করিলে শরীর নবল ও লাভাণ্যবুজ হয়।

শিষ্টক ভক্ষণজনিত অজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অজীর্ণতা দূরীভূত হয়।

(আয়ুর্বিজ্ঞান, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রীচিন্তাঞ্জন আচার্য্য

কনোজরাণী রাজ্যশ্রী

রাজ্যবর্ধন যখন দুর্গদিগকে পরাজিত করিয়া কিরিয়া আমিলেন, তখন মাতাপিতা কেহই আর ইহলোকে নাই। ছোট ভাই হর্ষবর্ধনের অশ্রুদ্বারা বাধা হইয়া তাহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইল।

তিনি প্রথমেই গোড়বাজ শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মোঘলরাজ্য গ্রহণার্থে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিয়া লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

মোঘলরাজ্য অধিকার করিয়া দেবগুপ্ত শ্রীকণ্ঠরাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজ্যবর্ধন ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ভণ্ডার অধিনায়ককে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজা করিলেন। তিনি মালবরাজ্য দেবগুপ্তকে অতি অনার্য্যেই পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে গোড়বাজ শশাঙ্ক আনিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যবর্ধনকে এলোভন দেখাইয়া বিষাস ঝুটাইয়া নিজ গৃহে আনাইয়া তাহাকে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত করেন। হর্ষবর্ধন বহু সৈন্য লইয়া কাতকুন্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বীর বালকের বয়স তখন মাত্র বোল বৎসর। পথে সেনাপতি ভণ্ডার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ভণ্ডা সজলনয়নে তাহাকে রাজ্যবর্ধনের হত্যা এবং অত্যাগিনী বন্দিনী রাজ্যশ্রীর দুঃখের কাহিনী জানাইয়া বলিল, রাজ্যশ্রী কাতকুন্ডের কারাগার হইতে নিষ্কাশ্য হইয়া করজ্ঞান মাত্র সঙ্গিনী লইয়া বিদ্যাপর্কতের দিকে চলিয়া গিয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যাপর্কতে পৌঁছিয়া ভগিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে হর্ষবর্ধন দিবাকর মিত্র নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, নিকটেই অরণ্য মধ্যে এক রমণী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আত্মহত্যার সজ্জা প্রস্তুত হইতেছে। হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ দিবাকর মিত্রকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহারই ভগিনী রাজ্যশ্রী স্বামীর মৃত্যু-শোক অধীর হইয়া

অগ্নিতে আত্মবিসর্জনের কবিতা উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজ্যশ্রী শ্রীও ভাই হর্ষ ও স্বামীও বন্ধু দিবাকরের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজ্যশ্রী আত্মবিসর্জনের সঙ্গত ত্যাগ করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীকে লইয়া কান্ধকুন্ডে ফিরিলেন বটে, কিন্তু মৌর্যরাজ্যে কিল্লপে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায় তাহা লইয়া বড়ই মুগ্ধ হইল। রাজ্যশ্রী এসময় মাত্র তেবো বৎসরের বাসিন্দা। কান্ধকুন্ডের মন্ত্রীরা তাই হর্ষবর্দ্ধনকেই মৌর্যের রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন কিন্তু কিছুতেই ভগিনীকে বঞ্চিত করিয়া কান্ধকুন্ডের রাজ্য হইতে স্বাক্ষত হইলেন না। কিন্তু অবশেষে তিনি ভগিনীর সহিত একযোগে রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। রাজ্যশ্রী এই রাজ্যের স্বার্থাধিকারিণী। তাই হর্ষবর্দ্ধন কান্ধকুন্ডের সিংহাসনেও আরোহণ করিলেন না এবং মহারাজ উপাধিও গ্রহণ করিলেন না; তিনি শুধু রাজপুত্র পিলাদিত্য উপাধিতেই সন্তুষ্ট রহিলেন।

এই সময় হইতে হর্ষবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠরাজ্যের শাসন-কার্য্য কান্ধকুন্ড হইতেই চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে বর্দ্ধন বংশের শ্রীষ্ঠ রাজা এবং মৌর্যবংশের রাজ্য সংযুক্ত হইয়া একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হইল। পরবর্তী কালে হর্ষবর্দ্ধন দিগ্বিদ্যের বিধিগত হইয়া উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যশ্রী কনোজের রাণী হইলেন। সেই সময় রাজ্যশ্রী স্বামী-পুত্রহীন। তেবো বৎসরের বাল-বিধবা। তাঁহার দুই বৎসরের স্নেহভাই হর্ষবর্দ্ধনই তাঁহার একমাত্র সহায়। যুদ্ধ বিগ্রহ-রাজ্যশাসন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য হর্ষবর্দ্ধনই করিতেন। রাজ্যশ্রী তখন হইতে ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করিলেন। ইহাই তাঁহার বৈধব্যপ্রসূ জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল। এইরূপে রাজ্যশ্রী পরবর্তীকালে পরম বিদ্বাং বালিকা খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

সম্রাটের বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন কান্ধকুন্ডে একটি ধর্ম্ম মহাসভা আহ্বান করেন। সেই সভায় দেশ বিদেশ হইতে সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক মহাপণ্ডিত হিউএন সাঙ। সেই সভায় হিউএন সাঙ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আর একদিন এই ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিবিধ ধর্ম্মমত লইয়া এই সভায় মহা মহা পণ্ডিতগণের মধ্যে তুমুল তর্ক ও আলোচনা হইত। শ্বেতবর্ণের বৈধব্যবোধধারিণী রাজ্যশ্রী প্রত্যহই এই সভায় হর্ষবর্দ্ধনের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনা শুনিতেন এবং মাঝে মাঝে অসঙ্কোচে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মের এইসমস্ত জটিল তর্ক বুঝবার মত বিদ্যা তাঁহার ছিল। আর এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, সেই সময় ভারতবর্ষে বৈদ্যের অবরোধ-প্রথা আজকালকার মত এমন তীব্র ছিল না।

রাজ্যশ্রীর পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন ছিলেন সূর্য্য-উপাসক। তাঁহার স্নেহপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ছিলেন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। দ্বিতীয় পুত্র হর্ষবর্দ্ধন প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মেই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্দ্ধা ছিলেন বৌদ্ধ, এবং রাজ্যশ্রী নিজেও ছিলেন বৌদ্ধ ব্রতাবলম্বিনী এবং বৌদ্ধ সম্রাটের মতবাদই তাঁহার সব-চেয়ে প্রিয় ছিল।

(বেণু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রাচীন ভারতের কয়েকটি রঞ্জক পদার্থ

নীল রংয়ের ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। “পাখা-সপ্তমতী” হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশেই মেঘদেব কাঁচুলি নীল রংয়ে রঞ্জিত হইত, কিন্তু মদন মহোৎসবের সময় কুহুম ফুলের রং ব্যবহৃত হইত। নীল রংয়ের শাডী খানাদেব দেশের মহিলাগণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় রঞ্জকগণ মঞ্জিষ্ঠা হইতে টুকটুক লাল রং প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়াছিলেন। ভারতীয় মঞ্জিষ্ঠা এবং বিলাতী মাডার (madder) একই পিণ্ড।

মঞ্জিষ্ঠার মূল জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ জল প্রথমতঃ রূবারিক (Ruberithric) এসিডে পরিবর্তিত হইয়া পরে এলিড্রাফিনে পরিণত হয়। এই রাসায়নিক উপাদান এলিড্রারিনই লাল রং উৎপন্ন করে।

অনেক নান্দলিক ক্রিয়া-কলাপে আমাদের দেশে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র আজকালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেকালে কুহুম ফুল হইতে লোকে কুহুম রং প্রস্তুত করিত। আজকালও পশ্চিম ভারতে অনেক আনন্দ উৎসবে কুহুম ফুলে ঘারা রং করা বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

খদির-বৃক্ষের বক্ষল জংশে সিদ্ধ করিয়া কাপ প্রস্তুত হইত এবং সেই কাপ ঘাণা বস্ত্র রঞ্জিত হইত।

অধুনা Ferrous Sulphate ও Nitric Acid এর সংমিশ্রণে যে Nankin Yellow বা Iron Buff Colour প্রস্তুত হয় তাহা দেকালের লোকে গেবী মাটির সাহায্যে করিতেন।

লাক্ষ্য হইতে যে লাল রং প্রস্তুত হয় তাহার ইংরেজী নাম ‘Crimson Red’। পূর্ব্বকালে মহিলাগণ লাক্ষ্যবনে চরণধূলি রঞ্জিত করিতেন।

কাপড়ে রং-বে-রংয়ের ছাপা দেওয়ার পদ্ধতিও প্রথম আমাদের দেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

আমাদের দেশীয় জিনিষ বিদেশে পাঠাইয়া হস্ত অংগা প্রতি-যোগিতায় পারিবার না, কিন্তু আমরা যদি স্বদেশী রং ব্যবহার করি তাহা হইলে বিদেশী রং যে এদিকে আসিতে সাহস পাইবে না তাহাও ক্রম সত্য।

(বাঁশরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস

মাছি

অনেক বাড়ীতে দেখা যায় যে, দিনের বেলায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে মাছি ঢাকিয়া বসিয়া থাকে এবং রাত্রিতে ঘোমালের উপর আলোকাতরার প্রলেপের মত অসংখ্য মাছি। কতক বাড়ীতে ইহার অপেক্ষা কম মাছি দেখা যায়। তাহার কারণ, ঐ-সব বাড়ীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আছে এবং বাড়ীর লোকে কোন খাদ্যদ্রব্যই অনাবৃত রাখিয়া দেয় না ও দিনে অন্ততঃ একবার মাছি তাড়াইয়া দেয়।

মাছি যে কেবল আত্মাভোগ করে তাহা নয়, মাছি অতি নোংরা জীব। কোন মৃত জন্তু বা পচা জিনিষের উপর হইতে উঠিয়াই সরাসরি ইহার বাড়ীতে আসিয়া ঢুকে। আসিবার আগে হাত-পা মুছিয়া আসে না; একবারে আমাদের ধাবারের উপর বা আমাদের হাত, মুখ ও কাপড়ের উপর আসিয়া বসে এবং ময়লার কণা ও রোগের বীজ রাখিয়া যায়। ইহাদের পায়ে সরু সরু ছোট ছোট চুল থাকায় পাগুলি ময়লা বহনের খুব উপযোগী।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মাছিতে টারফরেড, যক্ষ্মা, কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য অনেক রোগের বীজ বহন করিয়া লইয়া যায়। এক-একটি মাছি প্রায় আড়াই লক্ষ রোগবীজ বহন করিয়া বেড়ায়। কেবল যে পা ও অন্যান্য অঙ্গের সহিত রোগবীজ যায় তাহা নহে; মাছি বসিলে পর যে কালো দাগ পড়ে সেই দাগেও রোগবীজ থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এইরূপ একটি কালো দাগে প্রায় পাঁচ হাজার বীজ পাওয়া গিয়াছে।

রাসায়নিক, খাবার জারণায় বা খাবারের দোকানে যাহাতে মাছি না ঢোকে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। মাছি মারিবার একপ্রকার আঠালো কাগজ পাওয়া যায়, সেই কাগজ অথবা মাছি-ধরা বাঁদ কিম্বা তরল বিষাক্ত দ্রব্য দিয়া মাছি তাড়াইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। তরল বিষাক্তের মধ্যে formalin মিশ্রিত জল একটি। আধ গেলান জলে formaldehyde সলিউশনের (40 per cent solution) এক চামচ ঢালিয়া ইহা তৈয়ারী করা যায়। একটি শালায় এই জল রাখিয়া যেখানে মাছির উপজব বোধী সেখানে ব্যাটরা রাখিবে। তবে এই জলে হেলেমেয়েরা যেন হাত না দেয়, ইহা বিজ্ঞ। মাছি মারিবার আব-একটি তরল জিনিস হইতেছে দুই আউন্স জলে এক ড্রাম potassium bichromate ঢালিয়া তাহাতে একটু চিনি মিশাইয়া দেওয়া। ইহা বিজ্ঞ নহে। এই জল ছোট ছোট ভিনে করিয়া বাড়ীতে নানা জায়গায় রাখিবে। Pyrethrum powder ঘরে পুড়াইলে মাছি আড়াই হইয়া মরিয়া যায়। তাহাও পর কাঁট দিয়া সেগুলিকে পুড়াইয়া ফেলিলেই হইল।

মরা হাঁহুর, পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বাড়ীতে জমিয়া পড়িলেই তাহা হইতে মাছি জন্মায়। প্রতিদিন এইসব জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত। অনেক সময় জমিতে দিবার জন্ত গাদা করিয়া সার রাখা হয়। তাহাতেও মাছি জন্মায়, ইহা নিবারণ করিতে হইলে Chloride of lime বা Sulphate of iron আধ সের আন্দাজ এক গ্যালন জলে মিশাইয়া সেই জল সার-গাদার উপর ছিটাইয়া দিবে।

(ওরিয়েন্টাল ওয়াচম্যান এণ্ড হেরাল্ড অব হেলথ)

আয়াল গাও ও ভারতবর্ষ

অনেকেই জানেন যে, বর্তমানে আয়ালগাও ও ভারতবর্ষ অনেক বিষয়ে পরস্পর সদৃশ। অন্যান্য বিষয়ে যতই সাদৃশ্য থাকুক না, একটি বিষয়ে পরস্পরের সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। সে সাদৃশ্য এই যে, আয়ালগাও ও ভারতবর্ষ উভয়েই গ্রাম-প্রধান দেশ। বর্তমানের প্রতিদ্বন্দিতার দুইটি দেশই আজ গ্রামা সভ্যতাকে হারাইয়া বসিযাছে। এই জায়গায় উভয়ে সমান; কিন্তু প্রভেদ এই যে, আয়ালগাও আজ আপনাব গ্রামগুলিকে হুমস্কৃত করিয়া তুলিয়াছে, আর ভারতবর্ষ দে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে মাত্র।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের লোপ অতিরিক্ত কর্তার, ধর্ম্মমোহ, সামাজিক বৈষম্য, নাবিজ্ঞা, দেশভাগ, অর্থনৈতিক অধঃপতন, হুমিষ্কার বৈষ্য, শিল্পকলার অভাব, ইত্যাদি নানা রোগ আয়ালগাওর উপর দিয়া গিয়াছে; ভাষাতত্ত্ব সে-সবে অভিজ্ঞ। আয়ালগাও কিন্তু পোড়া হইতেই তাহার দারিদ্র্য দূর করিয়া দেশবাসীর মনে নূতন ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

দুচ্ছ হইতে যুত ও মাধন তুলিবার কারখানা, কৃষি সমিতি, বণিক সমিতি, পশুপালন সমিতি, ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান বেশ সাফল্যের

সহিত পরিচালিত হয়। হাতে বুননের কাজ, জেলু তৈরীর কাজ, নানাবিধ কারুকার্য ইত্যাদি সমবায় প্রণালীতে করা হয়। বহু স্থানে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যও সমবায় প্রণালীতে হইতে থাকে।

ইহার ফলে দেশে ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে। অধিবাসীদের পরস্পরের দায়িত্ববোধ বাড়িতে থাকে। আয়ালগাও সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হইবে।—

“সমবায় আন্দোলনের ফলে সামাজিক একটা জাগরণ আসিয়াছে এবং সে-সব লোক এক পল্লীতে বাস করে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থের ঐক্য-বোধ জাগিয়াছে। জাতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় লোকের মনকে এত বিকিপ্ত করে যে, এক ক্ষেত্রে সকলের মিলন অসম্ভব মনে হয়। অনেকে বলে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলে সমস্তা আরো জটিল হইয়া পড়িবে। অপর কাহারও সহিত মতভেদ না থাকিলে আইরিশম্যান যেন বাঁচিবে না। এইসব কারণে সমবায়-প্রচেষ্টার উন্নতির পথে বিপদ ছিল অনেক। অনেক সময় প্রচণ্ড বাগ-বিতণ্ডা ও রাগায়াগির মধ্যে সভাসমিতি করিতে হয়। ভবুও সব বিপদই কাটিয়া গিয়াছে। আজ আয়ালগাওবাসীর মনে এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জাতি, ধর্ম বা রাজনীতি কিছুতেই মানুষের সহযোগে কর্তব্য করিবার শক্তিতে বাধা দিতে পারে না। যে-সমস্ত বিভিন্ন কর্তব্য দ্বারা মানুষের জীবন পরিপুষ্ট হয় তাহা আজ যথোপযোজ্য পাত্রের দ্বারা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বার্থের যে সাম্য দেশবাসীর মধ্যে তাহার উপলব্ধি হইয়াছে।

(ফর্যাল ইণ্ডিয়া)

কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রী

[বাংলা ভাষায় পুরাতন মাসিকপত্রিকাসমূহে এমন

অনেক প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলি আজ অবধি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, অথচ যেগুলির সারবস্তা যথেষ্ট এবং যেগুলি সর্বকালের পাঠকের পক্ষেই সমান উপযোগী। এমন অনেক প্রবন্ধ আছে যেগুলির লেখক হয়ত খ্যাতনামা নন, অথচ প্রবন্ধগুলি শিক্ষাপ্রদ। আমরা এখন হইতে কষ্টপাথর বিভাগে পুরাতন পত্রিকা হইতে ঐ জাতীয় প্রবন্ধসমূহের সার প্রবন্ধকারগণেরই ভাষায় সংকলন করিয়া দিতে থাকিব। এবার নিম্নে পুরাতন একটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।]

প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা

কোন আর্কের দীর্ঘবাসে, কোন এণরীর প্রেমোচ্ছাসে, কোন বীরের উদ্যোনিয়, কোন ভক্তের ভক্তি-সাধনার ভাষার উত্তর কে দ্বির করিবে?

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্যশ্রোত গীতশ্রোত, রচনাশ্রোত এবং চিন্তাশ্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবরপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব-বিদের গবেষণার লক্ষ্য—এই প্রাচীন কবি গায়ক লেখক ভাবুকের কাব্য-গীতরচনা-চিন্তার সংগ্রহ। তাহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিবাহ। ভাষাতত্ত্ব-

বিদ্যুৎ বৃক্ষেণ যে, এসকল না বৃক্ষিলে ভাষার কলেবরপুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবরপুষ্টি না বৃক্ষিলে ভাষাও প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেইজন্যই প্রাচীন কাব্যগীতবচনাচিন্তা বৃক্ষিবার ক্ষমতা ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম ব্যয় আশাস ও অধ্যবসায় স্বীকার।

নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে কল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই কল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ কল কি, কাব্যমোহী মাত্রেই বিদিত আছে। এ কল স্বয়ং একটা প্রেমার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিন্তার একটা গভীরতা, হৃদের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ লাভ। অবিকল্প প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছাসেব একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব ভাব, একটা সারল্য স্বাভাবিকতা অকপটভাব আছে, যাঁহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক কল।

নবীন সাহিত্য সম্যকরূপে বৃক্ষিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্তনরূপে বুঝা চাই; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন বীজ কল্পে, কত দিনে ক্রমবিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই।

নবীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবদ্ধ শব্দবিছাদ বচনাধিপালী বৃক্ষিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যে ভাব ভাষা ছন্দোবদ্ধ শব্দবিছাদ বচনাধিপালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বৈদিক নাস্কৃত হইতে ভাষাসংস্কৃত, ভাষাসংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আশ্র বান্দলা, আশ্র বান্দলা হইতে মধ্য বান্দলা, মধ্য বান্দলা হইতে আধুনিক বান্দলার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বান্দলা ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাসজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানমাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাসজ্ঞানের ক্ষমতা প্রাচীন কাব্যগীতবচনাচিন্তার আলোচনায় প্রয়োজন।

ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শিবা শ্রায় প্রভৃতিব পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পাঠের লক্ষণ স্থপষ্ট রহিয়াছে।

আর বাহ্যকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানেব অভিত প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।

কোন ভাষার প্রণালীবিশুদ্ধ অভিব্যক্তি সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষাবিজ্ঞান সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই।

শাস্ত্রাত্মক বাহ্যকে তত্ত্ববিচ্ছেদ বলেন, ভাষার উদ্দেশ্যবোধন প্রায়ই তাহা ঘটবার সম্ভাবনা। শিক্ষাবিস্তারের সহিত ভাব ও ভাষাও একটা আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের আদায় হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য বিজ্ঞাতীয় আদর্শের অনুগামী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক গুণে উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যেব যে সংযোগ তত্ত্ব, যে ধ্রুবাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যেব সংযোগতত্ত্ব অবিচ্ছিন্ন রাশিবার ক্ষমতা প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কত সহস্র বৎসর বৈদিক-যুগ জাতীয় হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক বাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার-ব্যবহারের চিত্র সাজ নাই; কিন্তু সেব যুগে তৎসমুদয়ের কেনন স্থপষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব জাতীয় যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক, ও ব্যাখ্যাসিক অবস্থা বৃক্ষিবার ক্ষমতা তৎকালের রীতিনীতি, আচারবিচার, প্রণালীপদ্ধতি জ্ঞানিবার ক্ষমতা, প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—প্রাচীন কাব্যগীতবচনা-চিন্তাব বহল আলোচনার প্রয়োজন।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন বোধেই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদি অকপটভাব ও স্বাভাবিকতার আশ্র; দ্বিতীয় নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষা ইতিহাস ও ব্যাকরণ-সংকলন এবং ভাষাবিজ্ঞানবচনা; চতুর্থ, প্রণালীবিশুদ্ধ অভিব্যক্তিপ্রণয়ন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় জাতীয় জীবনেব ইতিবৃত্তজ্ঞান। এইসকল প্রয়োজনসিদ্ধির ক্ষমতা প্রাচীন কাব্যগীতবচনাচিন্তার আলোচনা অপরিসার্য।

(সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১)

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্তর বৎসর

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

২৪

আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত—গ্রামে। পূজাব সময় আমরা সকলেই বাড়ী বাইতাম। আমি একটু বড় হইলেই পূজার ফুল তুলিয়া, বিষপত্র বাছিয়া তাহার অংশীদার হইয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় ধূপ-ধুনা জ্বালাইতাম। মগুপে ঢুকিবার অধিকার

ছিল না, কিন্তু বারান্দায় উঠিয়া বড় বড় ধুছটিতে ধূপ দিয়া মগুপ-ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিতাম। খড়-মাটি দিয়া প্রতিমা নির্মিত হয়, স্বচক্ষে দেখিতাম, ইহা সত্য। কিন্তু বিশ্ব-বর্জীর রাত্রি পর্যন্ত এই প্রতিমাতে পুস্তক-বুদ্ধি থাকিলেও সপ্তমী দিন প্রত্যুষে পুরোহিত যখন ‘বলাবধূকে’ আন করাইয়া মন্ত্রপুত করিয়া দুর্গা-প্রতিমার পাশে আনিয়া

রাখিতেন, তখন হইতে প্রতিমাতে আর প্রতিমা-বুদ্ধি থাকিত না। পূজার ক’দিন এ’ষে মাটির পুতুল, কিছুতেই ইহা ভাবিতাম না। নবমী দিন সন্ধ্যা-স্মারতির সময় মনে হইত, যেন বিজয়ার আসন্ন-বিরহ ভাবিয়া দেবী বাস্তবিক কাঁরিতেছেন। বিজয়ার সন্ধ্যার পরে প্রতিমা বিসর্জন দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে প্রাণে ঘোর অবসাদ আসিত। এখন, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, এ অবসাদ কেন হয়, তাহা বুঝি। তিন দিনের নিববচ্ছিন্ন উল্লাস ও উৎসাহের পরে উৎসবের অবসানে, এ প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। কিন্তু বাল্যে এ জ্ঞান হয় নাই, হওয়ার কথাও ছিল না। স্মৃতবাং বিজয়ার অবসাদ যে দেবতার বিরহ হইতে হয় নাই, ইহা বুঝিতাম না। তখনও দেবতার বিশ্বাস ছিল, তবে এ দেবতা যে কি বস্তু এ প্রশ্নই মনে কখনও উঠে নাই। দেবতা মানুষের মতনই, অথচ মানুষ নহেন, এতটুকু ধারণা হইয়াছিল।

এইসকল পারিবারিক পূজাপার্কণের ভিতর দিয়া যাকিছু ধর্মশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। এ শিক্ষা মতের শিক্ষা ছিল না, ভাবের শিক্ষা এবং অহুভূতির শিক্ষাই ছিল। প্রথম যৌবন পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা বেশী কিছু বোধ জন্মে নাই; তার পবেও জন্মিয়াছে কি না, সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারি না। এইসকল পূজাপার্কণের ভিতর দিয়া অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস সাধন করিয়া-ছিলাম। এই সাধনই ধর্মসাধনের গোড়ার কথা। আমরা চোখে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি, এসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, তাহার অতীতেও যে-বস্তু আছে, ইহাই ধর্মসাধনের বিনিয়াদ। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত পূজাপার্কণের ভিতর দিয়া ধর্মজীবনের এই ভিত্তি গাঁথা হইয়াছিল, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আর এইজন্যই নিজে দে-সকল পূজাপার্কণ বর্জন করিয়াও আমার মা-বাবা যে-সকল পূজা করিতেন, তাহা যে পাপ-কার্য, এ অপরাধের কথা কখন কল্পনাও করি নাই। আমার পক্ষে এখন এসকল পূজার অহুষ্ঠান পাপ হইতে পারে; পাপ হইবে, মিথ্যা আচরণ বলিয়া, যাহা আমি বিশ্বাস করি না তাহার ভাগ করিব বলিয়া; কিন্তু আমার পিতৃ-মাতৃকুলের গুরুজনেরা ঐ সকল প্রতিমাপূজাতে যে

পাপাচরণ করিতেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

আমাদের শ্রীহট্টে বাসায়ও প্রায় সর্বদাই ব্রত-পূজা প্রভৃতি হইত। প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। মা প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। এছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে মা সাবিত্রীর ব্রত করিতেন। সারা মাঘমাস প্রতি রবিবারে সূর্যের ব্রত করিতেন। এসকল ব্রতের “কথা” মাঘের কাছে বসিয়া আমিও শুনিতাম। আর ব্রতশেষে প্রসাদের ভাগ ত পাইতামই।

২৫

শ্রীহট্ট সহরে মাঝে মাঝে যাত্রাগান হইত। আমাদের বাসাতেও হইত, প্রতিবাসীদের বাড়ীতেও হইত। আমি প্রায় সর্বত্রই এসকল যাত্রা শুনিতে যাইতাম। আমার বাল্যকালে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা ব্যতীত রাম-বনবাস, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি যাত্রাও হইত। কিন্তু আমাদের বাসায় মা কিছুতেই নিমাই-সন্ন্যাস বা রাম-বনবাসের পালা হইতে দিতেন না। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, বোধ হয় এইজন্যই রামের বনবাস বা নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিতে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। কৃষ্ণ যাত্রার মধ্যে ঢাকার ৬কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের ‘স্বপ্নবিলাস,’ ‘রাই-উদ্দাদিনী’ এবং ‘বিচিত্র বিলাস’—এই তিনটি পালার কথাই বিশেষ মনে আছে। এসকল পালা মহাজন-পদাবলীর অহুত্বেরে রচিত। অনেক সময় গোস্বামী মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার সদীতে প্রাচীন পদ যোজনা করিয়া দিতেন। রদের অহুত্বভিত্তিতে এসকল পদ মহাজন-পদাবলী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। শ্রীহট্ট সহরে সেকালে মাঝে মাঝে ভ্রলোকদিগের বাসায় পুরাণ-পাঠও হইত। কিন্তু এই পুরাণ-পাঠে কোন প্রকারের লোক-শিক্ষা হইত না। অনেক স্থলে একখানা পুথি জলচৌকির উপরে রাখা হইত। আর তাহারই সম্মুখে থালা বা রেকাবী থাকিত। আমন্ত্রিত ব্যক্তির ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ঐ বাঁধা পুথিকে প্রণাম করিয়া ঐ থালার উপরে নিজেদের প্রণামী রাখিয়া দিতেন। এই পুরাণ-পাঠটা অনেক সময় গৃহস্থের পুরোহিত বা গুরুঠাকুরের জন্ত কিঞ্চিৎ অর্থ-সংগ্রহের একটা উপায় মাত্র ছিল।

আমাদের বাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর যখন নিজে আসিতেন, তখন তিনি এই পুবাণ-পাঠ উপলক্ষে “অধ্যাত্ম রামায়ণ” কিছু কিছু পড়িতেন, অন্তঃসময়ে তাঁহার পুথিখানা বাঁধিয়া জলচৌকির উপর সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার অবর্তমানে আমাদের বাসায় যখন পুরাণ-পাঠ হইত, তখন কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পর্য্যন্ত এইরূপে বাঁধা থাকিত না। আমার মনে পড়ে, ছ একবার আমার জ্যেষ্ঠতাত ভাই— ইনি বাবাব মুহূবী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাংলা নজীর খাড়ায়া দিয়া মুড়িয়া পুরাণ বলিয়া এই পাঠের সময় রাখিতেন। এই প্রচ্ছন্ন নজীরকেই লোকে প্রণাম কবিয়া প্রণামী দিয়া যাইতেন। কখনও কখনও—আমাদের পরিবারে হয় নাই—কিন্তু অন্তত এমনও শুনা গিয়াছে যে, দুই বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপ মুড়িয়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকের ধর্মবিশ্বাস কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এইসকল ঘটনা এবং কাহিনীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ পাঠেব উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ-সংগ্রহ করা।

সহবে যখন যেখানে পূজাপার্কণ হইত অথবা যাত্রা-গানাদি হইত সেখানেই নিমন্ত্রিতদিগকে নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী প্রণামী দিতে হইত। ষাঁহার নিজেদের বাড়ীতে পূজা-পার্কণ বা যাত্রাগানাদির ব্যবস্থা করিতেন তাঁহার এই সূত্রে তাঁহাদের প্রণামীর টাকা ফেরত পাইতেন। ষাঁহাদের বাড়ীতে যে বৎসর পূজাপার্কণ বা যাত্রাগানাদি হইত না, তাঁরা এই পুবাণ পাঠের উপলক্ষে এই টাকা ফেরত পাইতেন। কেহ কেহ পুরাণপাঠের প্রণামী নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেন; কিন্তু অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থেরা এই প্রণামীর টাকা নিজেদের গুরুপুরোহিতকেই দান করিতেন।

২৬

শ্রীহট্টে থাকিতেই আমি হিন্দুমানীর বন্ধন ছিঁড়িতে আবিস্ত করি। আমার ধর্মবিশ্বাসের যে বিশেষ পরিবর্তন হয়, তাহা নহে। ফলতঃ তখন পর্য্যন্ত আমার অন্তরে কোন ধর্মজিজ্ঞাসার উদয়ই হয় নাই। জিজ্ঞাসা জাগে সন্দেহ হইতে। তখন পর্য্যন্ত

ধর্মবিশ্বাস সঘন্থে আমার অন্তরে বাস্তবিক কোন সন্দেহ জাগে নাই। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতা সত্যই আছেন কি নাই; এ প্রশ্ন মনে ওঠে নাই। পরেই বনেও কখনও উঠিয়াছিল কি না মনে নাই। ঈশ্বর আছেন একজন, যিনি ছনিয়ার মালিক, সকল হিন্দুতেই এ বিশ্বাস করেন। আমার বাবাও এই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। এই একেশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতায় বিশ্বাসের যে কোন বিরোধ আছে, ইহা তিনি ভাবিতেন না। ফলতঃ যখন তিনি দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাপ্রতিমার নিকটে প্রণাম করিতেন, তখন এই দেবতা যে ঈশ্বর নহেন এই সন্দেহই তাঁহার অন্তরে জাগিত না। আবার কালীপূজাব সময়ে কালী যে ঈশ্বর নহেন, ইহা তিনি ভাবিতেন না। দোতের সময় রাধাকৃষ্ণ যে ঈশ্বর নহেন, এরূপ কল্পনাও করিতেন না। যখন ষাঁহার পূজা করিতেন, তখন তাহাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন, অথবা ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞান করিতেন। এই হাওয়ার মধ্যেই আমি বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম। যেমন হিন্দুর দেবদেবী সঘন্থে তেমনি মুসলমানের উপাস্ত সঘন্থেও বাবার ঈশ্বর-বুদ্ধি দৃঢ় ছিল। ঈশ্বর যে এক, এই ঈশ্বর যে মাটী ও খড়ের প্রতিমা নহেন, এই ঈশ্বর যে রক্তমাংসের মানুষ নহেন, এসকল সামান্য কথা তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন। মোসলেম সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অন্তরূপ বিশ্বাস পোষণ করা সম্ভব ছিল না। ধর্ম ধর্ম যে কোন বিরোধ আছে, তাঁহার কথায়-বার্তায় কখনও এ ভাব প্রকাশ পাইত না। মুসলমানের ঈশ্বর এক ও হিন্দুর ঈশ্বর অল্প, একজন তিনি কখনও করেন নাই। এইজন্য মুসলমানের পক্ষাঘাতে তিনি মুসলমান বন্ধুদিগের সঙ্গে দ্বন্দ্বমিত্তে লৌকিকতার আদান-প্রদান করিতেন। বন্ধু-ঈদের সময় প্রতিবাসী মুসলমান জমীদারের বাড়ীতে ভেট পাঠাইতেন। বোধ হয়, খৃষ্টমাসের সময়ে জহ্নসাহেবের বাড়ীতেও আমাদের বাড়ী হইতে এইরূপ ভেট যাইত।

২৭

প্রচলিত হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস না জন্মিলেও, হিন্দুর আচারবিচারের বাঁধাবাঁধির বিরুদ্ধে অতি অল্পবয়স

হইতেই আমি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কহিয়াছি, আমাদের শ্রীহট্টের বাসায় প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। শ্রীহট্টে খুব উৎকৃষ্ট কলা পাওয়া যায়। কলা, দুধ, চিনি এবং আতপ চাউল শনির ভোগে লাগিত। সোমবার ও শুক্রবার শ্রীহট্টে হাটবার ছিল। এই দুই দিন চারিদিকের পল্লী হইতে তরী-তরকারী ফল ও অগ্ন্যান্ত পণ্য হাটে আসিয়া জমা হইত। প্রতি শুক্র-বারের হাট হইতে আমাদের বাসায় শনির সেবার জন্ত যখনকার যে ফল তাহা যত্ন করিয়া কিনিয়া আনা হইত। কলা বারমাসই আসিত। একবার শনিবারে পুরোহিত শনির ভোগ সাজাইতে গিয়া কলা পাইলেন না; চাকরকে ডাকিলেন। সে বলিল, হাট হইতে সে শনির বরাদ্দ কলা কিনিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। মা তখন সহরের বাসায় ছিলেন না, আর মা যখন বাসায় থাকিতেন না, তখনই আমার ভাগ্যে যত অনর্থ ঘটিত। বাবার কাশে শনির কলা নাই, একথাটা গেল। অমনি তিনি মাজেরাস্থলে গিয়া অল্পসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। চাকরের উপরে তদ্বী আশ্রয় হইল। সে কৈফিয়ৎ দিল, কলা সে আনিয়াছিল, সে বলা কি হইয়াছে, এখন সে জানে না। বোধ হয় সে ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছিল যে, আমিই শনির সে কলা খাইয়াছি। দেবতার নৈবেদ্যের কলা বা অল্প কোন ফল আমি যে খাইতে পারিতাম না, এমন নহে। এসকল বিষয়ে দেবতার ভয় অপেক্ষা আমার লোভ তখন খুব বেশী হইয়া গিয়াছে। আর হওয়ারই কথা। 'দুর্গাপূজা বা কালীপূজার সময়ে যে ছাগ-শিশু বলি দিবার জন্ত আনা হইত, বলির পূর্বে যে তাহাদের প্রতি অনেকের লোভ পড়িত না, এমন কথা সাহস কবিয়া বলা যায় না। শনির সেবার কলাতে আমার লোভ হয় নাই, এ কল্পনা করি না। বোধ হয় আমিই এই কলা খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমিই যে এ অপরাধে অপরাধী, বাবা কথাটা শোনামাত্রই ধরিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র খড়ম তুলিয়া আমাকে মারিতে যান। আমি এই আক্রমণের মুখে ছুটিয়া পলাইলাম। বাবাও আমার পিছনে

পিছনে ছুটিলেন। আমাদের হাভাতেই আমার এক পিসতুত ভাই ছিলেন। আমি একেবারে ছুটিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে বধু ঠাকুবাণীব ঘবে গিয়া ঢুকিলাম। আমাদের অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দু-আচারে মামাশুশরের পক্ষে ভাগিনেয়-বধূর মুখদর্শন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনা-ক্রমে মামাশুশর ভাগিনেয়-বধূর মুখ দেখিলে তখনই শ্রান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। সুতরাং বাবা আমার পিছনে পিছনে আমার পিসতুত ভাইয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; আমিও সেদিন তাঁহার প্রহার হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

২৮

প্রহাবের ভয়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাস গড়িয়া উঠে না। ভিতরে যার দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি আছে, সে-প্রবৃত্তিও কখন নষ্ট হয় না। আহাাঁদির সম্বন্ধ হিন্দুমানীর বিধিনিষেধ আমি কোন দিন মানিতাম বলিয়া মনে পড়ে না। যাদের জল চল নাই, তাদের ছোয়া পানীয়েয় বা ধান্যের প্রতি কোন দিন আমার কোন প্রকারের বিতৃষ্ণা ছিল না। অতি শৈশবে এসবল নিষিদ্ধ খাদ্যাদি খাইতাম না। কিন্তু খাইতে কোন দিন ভিতরে কোন অপ্রবৃত্তি ছিল না। একটু বড় হইলে এসকল বিধিনিষেধ অনর্থক বন্ধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানুষ যাহাকে বন্ধন ভাবে, তাহাকে কখনই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে পারে না। আমিও একটু বড় হইবার পরে পানাহার সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু-সমাজের ছুৎমার্গকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করি। আমাব বাবা এসকল মানিয়া চলিতেন। কিন্তু ইসলাম সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া এসকল সম্বন্ধে তাঁহার কোন সরল শ্রদ্ধা থাকি সম্ভব ছিল কি না, সন্দেহ হয়।

আমার মুসলমানের তৈরী লেমনেড খাওয়ার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। এই লেমনেড খাইতে আমার মনে কেশাগ্র পরিমাণ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। বাবার কঠোর শাস্তিতেও মুসলমানের ছোয়া জলের প্রতি আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণার উদয় হয় নাই। কালী দুর্গা প্রভৃতি যখন মানিতাম, প্রাণ খুলিয়া দুর্গোৎসবের সময় পূজার অহুষ্ঠানে যোগ দিতাম; আর্ত হইলে চোখ বুজিয়া কালীর

নিকটে মানত করিতাম; তখনও হিন্দু-আচারে যাহাকে অভক্ষ্য বলে তাহা ভক্ষণ করিতে কিঞ্চিৎকালও কুণ্ঠিত হই নাই। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টে একটি মাত্র পাউরুটাবিশ্বুটের দোকান ছিল। এই দোকানেই আমার আটা ও ময়দা পাওয়া যাইত। এই সময়ে আমাদের দূর সম্পর্কে এক ভাগিনেয় কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া আমাদের শ্রীহট্টের বাসাঘ আসিয়া উঠেন। ইনি আমার অপেক্ষা বয়সে একটু বড় ছিলেন। বোধ হয় ইহার স্বধনেরা কলিকাতায় সামান্য ব্যবসায় করিতেন। সেই উপলক্ষে তিনি কিছুদিন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইনি মুসলমানের পাউরুট-বিশ্বুট যথেষ্ট খাইয়াছিলেন। তাহার নিকটেই আমার ও আমাদের বাসার অন্যান্য বালকদের এই অভক্ষ্য ভক্ষণে দীক্ষা লাভ হয়। খাতা-পত্র বাঁধিবার জন্ত কাই দরকার হয়। এই কাই প্রস্তুত করিবার জন্ত ময়দা কিনিবার অফিসায় আমরা সহরের পাউরুটাবিশ্বুটের দোকানে চুকিতাম। আর এক পয়সার ময়দা কিনিয়া হাতে ধরিয়া লোককে দেখাইতে দেখাইতে এই দোকান হইতে বাহির হইতাম; কিন্তু জামার পকেটে অথবা ধুতির ভিতরে গরম গরম রুটি-বিশ্বুট লইয়া আসিতাম; এবং অভিভাবকেরা রাত্রে শুইতে গেলে এগুলি বাহির করিয়া সকলে খাইতাম। এইরূপে শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার জাত-বর্ণের বিচারের বন্ধন ভিতরে ভিতরে একেবারে ভাঙিয়া যায়।

২২

শ্রীহট্টে অনেক দিন হইতেই একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। কে ইহার স্থাপয়িতা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন কালিকাদাস দত্ত মহাশয় প্রথম যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। ইনি পরে কুচবেহারের দেওয়ান হন। ইারা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপন করেন, বোধ হয় কালিকাদাস দত্ত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে শ্রীহট্টে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। শ্রীহট্টে আমার পঠদশার সময়ে, কালিকাদাস দত্ত

মহাশয়, মৈমনসিংহে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ ব্রাহ্মসমাজেব ইতিহাসে তাঁহাব উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। সে ১৮৫৩-১৮৬৩ ইংরাজীর মধ্যে। আমি শ্রীহট্টে বাই ১৮৬৬ ইংরাজীতে। শ্রীহট্টেব ব্রাহ্ম-সমাজের আমার প্রথম স্মৃতি—রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা হয় তাহাব সঙ্গে জড়িত। এই বক্তৃতা হয় নয়সড়ক স্কুলে। আবছায়ার মত মনে পড়ে যেন বন্ধু ছিলেন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়। সে বক্তৃতা বুঝিবাব আমার তখনও বয়স হয় নাই। বক্তৃতার কথাও কিছু মনে নাই। কেবল মাত্র এটুকু মনে আছে যে, সে বক্তৃতা শুনিতে অনেক লোক গিয়া-ছিলেন, আমিও সে-সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইহার কিছুদিন পবে বোধ হয় ১৮৬৮-৬৯ ইংরাজীতে, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় শ্রীহট্টে বাইয়া আমাদের ইস্কুলে আমি যে শ্রেণীতে পড়িতাম, সে শ্রেণীতেই ভর্তি হ'ন। সীতানাথ-বাবু এখন সীতানাথ তত্ত্ববিশ্বকোষ; সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজেব বর্তমান সভাপতি। সীতানাথ-বাবুর বাড়ী শ্রীহট্টে, আমাদেরই অঞ্চলে। ইহার এক পিতৃবা কলিকাতায় বড়বাজারে কড়াই-পটিতে ব্যবসা করিতেন। সেই সূত্রে শ্রীহট্টে বাইবার পূর্বেই সীতানাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতুত ভাই শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে হইতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রথম শিষ্যদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। শ্রীনাথ-বাবুর সংসর্গে সীতানাথ বালক হইলেও কলিকাতাব ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টে বাইয়া সীতানাথ আমার সহপাঠীদিগের মধ্যে কতকটা নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার উদ্যোগে শ্রীহট্টে একটি ছাত্রসমাজ বা ছাত্রদিগের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে ব্রাহ্ম সমাজের নিজের কোন বাড়ী হয় নাই। স্থানীয় বাৎসরিক বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মদিগের সামাজিক উপাসনা হইত। এই-খানেই এই ছাত্র-সমাজেরও সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সন্দরীমোহন দাস আমার সহপাঠী ছিলেন। বোধ হয় ইহার কিছুদিন পূর্বেই তাঁহাব পিতৃ-বয়োগ হইয়াছিল। সন্দরীমোহনের বড় দাদা ব্রাহ্মসমাজ-ঘোঁসা

ছিলেন। স্বন্দরীমোহন বোধ হয় তাঁহার নিকট হইতেই ব্রাহ্মমতে প্রথম দীক্ষাগ্রাস্ত করিয়াছিলেন। স্বন্দরীমোহন সীতানাথের এই ছাত্রসমাজের সভ্য হন। আমাদের ইচ্ছার আরও কতকগুলি বালক ও যুবক ইহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। এইরূপে একটা ছোট ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠে। কিন্তু আমি ইহাদের সঙ্গে যোগ দেই নাই। সীতানাথ এবং স্বন্দরীমোহন আমাদের ক্লাসে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি কোনদিনই পড়াশুনাতে ভাল ছিলাম না। ইচ্ছলে ইহারা যখন প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বসিতেন, আমি তখন অনেক দূরে ও নীচে পড়িয়া থাকিতাম। সুতরাং ইহাদের সঙ্গে কোনপ্রকারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ যোগ ছিল না। মৃত্যুমত লইয়া আমি তখনও মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করি নাই। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রবল অবিশ্বাস তখনও জন্মে নাই। সুতরাং ধর্মের মতবাদের দিক্ দিয়া সীতানাথ প্রভৃতির ব্রাহ্মসমাজ আমাকে টানিতে পারে নাই। হয়ত পারিত, সহজ বাল্যবন্ধুত্বের আকর্ষণে। কিন্তু সে বান্ধবের তখনও স্মৃতিপাত হয় নাই। সীতানাথ, স্বন্দরীমোহন আমাকে ও আমার মত পড়ায় অপটু সমপাঠীদিগকে জামলেই আনিতেন না। তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোন প্রকারের সংস্রবে আসার ব্যাঘাত সৃষ্টিয়ায়। অভিমান অভিমানকে জাগায়; বিনয়কে জাগাইতে পারে না। পড়াশুনার তাঁহাদের সঙ্গে আমি আঁটিয়া আসিতাম না; সে আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, সে চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু তাঁরা ইহার সঙ্গে যে আবার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা জুড়িয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা সহ্য হইল না। সুতরাং যাহারা ইহাদের উপাসনা-প্রভৃতিকে উপহাস করিত, আমি তাহাদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। যেমন একদিকে কতকগুলি নূতন ইংরাজী-নবীশ কেশবচন্দ্রের প্রতি অভ্যস্ত অমুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ আবার এক শ্রেণীর ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী কেশবচন্দ্রের বিরোধী এবং বিদ্বেষী হইয়াও উঠিয়াছিলেন। ইহারা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজের খুব কুটি কাটিতেন। ইহাদের মুখে ব্রাহ্মসমাজের বিক্রপ এবং কুৎসা শুনিয়া আমি

বেশ আনন্দ লাভ করিতাম; এবং ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠিলেই এসকল বিক্রপ ও কুৎসার আবৃত্তি করিয়া আত্মপ্রসাদ সন্তোষ করিতাম। ইহার মূল কারণ ছিল আমার সহপাঠী ব্রাহ্ম বালকদিগের ধর্মাভিমান।

তবে আহাৱাদির আচারবিচারে যেমন কার্য্যতঃ হিন্দুয়ানীর সমর্থন করিতাম না সেইরূপ ধর্মের মতবাদ সম্বন্ধেও কোন দিন গৌড়ায়িত পক্ষপাতী ছিলাম না। ব্রাহ্মসমাজের কথা বিশেষ তখনও জানি নাই। তবে প্রাচীন হিন্দুয়ানী ও নবীন ব্রাহ্মসমাজের মাঝখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছেন, এ কথাটা ছাত্রাবস্থায় শ্রীহট্টে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। লোকমুখে কেবল এই মাত্র শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আদিম বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার যুবক অমুরাগেরা যেভাবে ও যে-পরিমাণে ইংরাজের অমুরাগে একটা নূতন ধর্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন দেবেন্দ্রনাথ তাহার বিরোধী হইয়াছেন। এই-জন্ত আমার শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি দেবেন্দ্রনাথের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীহট্টের যুবক ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বাদ বিতর্কে আমি গৌড়া হিন্দুয়ানীর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মহর্ষির মধ্য পথের উল্লেখ করিয়াই কেশবচন্দ্রের নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপক্ষতা করিতাম। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার তখনকার মনোভাব প্রকাশ পাইত। কেশবচন্দ্রের যুবক অমুরাগদিগের ধর্মাভিমানের উত্তাপই ইহারও মূলেও ছিল।

৩.

কহিয়াছি যে, আমার বাল্যশিক্ষায় বাবা চাপক্য-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। এইজন্য আমার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে হুঁহু অবস্থায় কখনও কঠোর শাসন ব্যতীত আর কিছু পাই নাই। এই সময়ে কোনদিন আমার হাতে এক কপর্দক পর্য্যন্ত পড়ে নাই। কাগজ কলম বই খাতা যখন যাহা প্রয়োজন হইত বাবা তাহা বাজার হইতে আনাইয়া দিতেন। বছরে এক জোড়া জুতা বরাদ্দ ছিল। কেবল এই জুতা কিনিবার

সময় কোন বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে বাজারে যাইতে পাইতাম। নতুবা অন্য সময়ে কখনও বাজারমুখো হইতে পর্য্যন্ত পারিতাম না। ১৮৭২ ইংরাজীর পূজার সময়ে আমি বোল বছরে পা দিয়াছি আর এই সময়েই সর্বপ্রথম বাবা আমার হাতে পূজার বাজারের কোন কোন সাজ-সজ্জা কিনিবার জন্য কিছু টাকা দেন। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বেলায়ারী লণ্ঠন ও হুদওয়ালগির ও শামাদানই বৎসামান্ত ছিল। পূজার সময়ে মোমবাতির আলো দিয়াই যথাসম্ভব রোশনাই করা হইত। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে কলাগাছ পুতিয়া তার সঙ্গে চেরা বাঁশ বিধিয়া সারি সারি মাটিব প্রদীপ দিয়া সন্ধ্যা-আরতির সময় আলোকমালা বচিত হইত। তখনও কেরোদিন তেলের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এই বৎসরই (১৮৭২) প্রথমে আমার হাতে টাকা পড়াতে আমাদের বাড়ীতে হিন্কেসের ডবলউইক ওয়াল ল্যাম্প যায় (Hink's Double Wick Wall Lamp)—সেই আনন্দের স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে।

কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদর্শনে আমাব জুর্গোৎসবের স্মৃতি লিখিয়াছিলাম। এই দীর্ঘ জীবনে নানা প্রকারের বহু আনন্দ-উৎসব দেখিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি—কিন্তু আমাদের বাড়ীতে যে জুর্গোৎসব হইত তার মতন আনন্দ-উৎসব জীবনে কখনও দেখি নাই। এখনও তার আমেজ প্রাণে লাগিয়া আছে। শরতের প্রাতঃ-সূর্য্যের আলোকে এখনও প্রাণে সে-আনন্দের সাদা জাগে। জুর্গোৎসবের পূর্ব্বের পক্ষকে পিতৃপক্ষ কহে। আজিকালিকাব বালকেরা বোধ হয় পিতৃপক্ষের কোন পরিচয়ই পায় না। আমার বাল্যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যুষে প্রায় সকল ভক্ত গৃহস্থই প্রাতঃস্নান করিয়া আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। সেই তর্পণের মধ্যে পল্লীর সমস্ত অলাশয়ের তীর মুখরিত হইয়া উঠিত। সে-দৃশ্য ও সে-মস্ত্রের ধ্বনি এখনও যেন চোখে ভাসিতেছে ও কাণে জাগিতেছে।

পিতৃপক্ষ আসিলেই আমরা বুক্তিতাম, পূজার আর দেবী নাই। মহালয়ার দিন হইতেই দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থলেরও ছুটি হইত। বাবা নিয়মিতরূপে মহালয়ার পার্কণ শ্রাদ্ধ করিতেন, কোন বৎসর বা সহরেই এই শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পূজার জন্ত বাড়ী যাইতেন; কোন কোন বৎসর বা বাড়ীতে যাইয়াই এই শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই বাড়ী যাওয়ার আনন্দ জীবনে ভুলিব না। বৎসরান্তে আমাদেরকে পাইয়া গ্রামবাসীরা কি আনন্দ! আর পূজার আনন্দ! তার তুলনা দিতে পারি পর-জীবনে এমন কিছু পাই নাই। পৌত্তলিকতা; কাহাকে বলে, তখনও তাহা জানি নাই। কিন্তু ওই প্রতিমা দেখিয়াই অপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতাম। তার পর পূজার সময়ের অতিথিঅভ্যাগতের অভ্যর্থনার আনন্দ। বাধন হইতে প্রাতদিনের চণ্ডীপাঠ। অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু সেই পাঠের ধ্বনিই যেন “জংকর্ণ নায়েন” ছিল। পূজার পূর্ব্ব হইতেই গ্রামে গ্রামে গানের দল গড়িয়া উঠিত। সন্ধের যাত্রার দল নহে। আমাদের দেশে এসকলকে “সখী-সংবাদের” দল কহিত। ইহার একরূপ পদাবলীই গান করিত। তখন জানি নাই এখন বুঝিয়াছি যে, এইসকল সন্ধের কীর্তনের দল কখনও বা মান, কখনও বা বিরহ, কখনও বা কুস্তভঙ্গ পালাই গান করিত। দুই তিন দল মিলিয়া এক আসরে পদস্পরের প্রতিযোগিতা হইত। কলিকাতা অঞ্চলেও এক সময়ে এইরূপ গান হইত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের “এচাল ও সেকাল”—এ ইহার বর্ণনা আছে। মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দারেরা একে অন্নের সঙ্গে “কবির লড়াই” করিতেন। পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বাবা আমাদের বাড়ীতে নবমীদিন রাজির পূর্ব্ব কখনও এই কবিগান হইতে দিতেন না। দশমী দিনই আমাদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে “গ্রাম নিমন্ত্রণ” হইত। সে-কথা স্মরণ করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজে জাত বর্ণের বিচার সঙ্ঘেও কতটা সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহা বুঝিতে পারিতেছি। জাত কুলের মর্যাদা ছিল, কিন্তু জাতভিমান ছিল না। একই জাতের বা শ্রেণীর মধ্যে কুলমর্যাদা লইয়া রেবারেবি হইত

বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বা জাতের মধ্যে কোন প্রকারের প্রতিযোগিতা ছিল না। আর অতি নিম্নজাতির লোকের মধ্যেও একটা অপূর্ণ আত্মনন্দন বোধ ছিল। গ্রামের যে-সকল অসহায় গরীবেরা বার মাস প্রয়োজন মত অকুঠা সহকারে আমাদের বাড়ী হইতে চাল, ডাল, ছন, তেল চাহিয়া লইয়া যাইত, পূজার সময় অথবা অন্তান্ত উৎসব উপলক্ষে যে ভাবে ও যে লোকের মারিফতে গ্রামের ব্রাহ্মণ ভক্তলোকদিগের নিমন্ত্রণ হইত সেই ভাবে ও সেই লোকের মারিফতে গ্রামের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদিগের নিমন্ত্রণ না হইলে তাহারা কখনও আমাদের বাড়ীতে পাত পাড়িতে আসিত না। আর বাবা যেমন ব্রাহ্মণ ভক্তলোকদিগের ভোজনের সময়ে একরূপ গললগ্নীকৃতবাসে যাইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সেই মত যাহাদিগকে অস্পৃশ্য কহে তাহারা যখন আপনাপন জাতের পংক্তি করিয়া উঠানে খাইতে বসিত, তখন বাবাকে তাহাদেরও অভ্যর্থনা করিতে হইত। আমি বড় হইলে পরিবেশনের ভার আমার উপরেও পড়িয়াছিল, আর সে-সময়ে মনে আছে, মা আমাকে সর্বদা কহিয়া দিতেন, এসকল গরীব লোকদের বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিবে। তাঁর সে কথাগুলি পৃথক মনে আছে। তিনি কহিতেন—“তোমার বাড়ীতে ভক্তলোকেরা যারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন তাঁরা খাইতে আসেন না। তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে যা খাইতে পান না এমন কিছু তুমি ইহাদিগকে দিতে পার না। আর ইহারা কি খাইলেন না খাইলেন সে-কথা লইয়া কখনও জটলা করিবেন না। গরীবেরা নিমন্ত্রণ বাড়ীতেই ভাল জিনিষ খাইতে পায়। আর তাদের মুখেই ভক্তপরিবারের স্নান-দুর্গাম রটে। তারা তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে তাদেরই বেশী করিয়া যত্ন ও আদর করিবে।”

প্রাচীন গ্রাম্যজীবনের সাম্য সঙ্কে আরেকটা কথা মনে পড়িল। আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন খুব বড় জমিদার ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু। আমাদের অঞ্চলের তেলীদিগের মধ্যে সামাজিক পংক্তিভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা এক-একটা মোটা মুলীবাঁশের উপরে দশ পনের জন করিয়া সার দিয়া খাইতে বসিত। কলা-পাতায় খাদ্যাদি পরিবেশন হইত, আর কাঁসার বা পিতলের ঘটিতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘুটি হইতে চারি পাঁচ জন মিলিয়া পান করিত। একবার এই জমিদার জাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেকের অন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পিড়ি পাতিয়া থালা গ্লাস সাজাইয়া করবোড়ে যাইয়া তাহাদিগকে আহার-স্থলে ডাকিয়া আনিলেন। বয়ঃক্রোষ্ঠদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জাতিবর্গ খাইতে চলিলেন। খাবার-ঘরের দরজায় যাইয়া ইহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহস্থামী করবোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে বসিতে অস্বস্তি করিলেও ইহারা নড়িলেন না। তখন তাঁর কি অপরাধ হইয়াছে ইহা জানিবার জন্য অল্পনয় করিতে লাগিলেন। ক্রোষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপাত্র হইয়া কহিলেন যে, “তুমি কি আমাদের অপমান করিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ? তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাস আছে—আমরা গরীব, তোমাকে যখন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখনত এইরূপ পিড়ি সাজাইয়া খাইতে দিতে পারিব না। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমাদের আর সামাজিকতা চলে না; আমরা তোমাদের বাড়ীতে আর জলগ্রহণ করিতে পারি না।” জমিদার-মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল। টাকার জোরে যে তিনি স্বজনবর্গের চাইতে উঁচু হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইল। পরে প্রাচীন রীতি অনুসারে মুলীবাঁশ ও কলাপাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে হইল।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৬)

চঞ্চলা যখন ঘরে আসিয়াছে গৌরী তখনও ঘুমায় নাই। অনিয়ার হাত বাধা হইয়া যাইবার পর তাহার ঘরে গৌরী গিয়াছিল। সেখানে আপনার উপস্থিতিটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া বেশ খানিকটা বিরক্ত হইয়াই সে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বিরক্তিটা আরও একটু বাড়িল যখন স্তনিল, ঘরের ভিতর একলা চঞ্চলার কাছে সঙ্ঘ তাহার আট বৎসর আগেকার কি সব স্থিতির কথা ব্যক্তি হইতে বলিয়া যাইতেছে। তবু গৌরী মনে করিয়াছিল যে, চঞ্চলা হয়ত এখনই ফিরিয়া আসিবে এবং আপনা হইতেই এমন ছুই চারিটা কথা বলিবে যাহাতে গৌরীর মনের সমস্ত বিরক্তিটা কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু চঞ্চলা ত ফিরিয়া আসিল না। কলেজের বই-বাতাশুলা লইয়া পাতা নাড়া-চাড়া করিয়া গৌরী অনেকক্ষণ পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু চঞ্চলা বুঝি এই আসে এই আসে করিয়া বইয়ের পাতায় তাহার মন এক বিন্দুও বসিল না। কোতুল ও একটা বিরক্তিতে তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল। এত রাত্রি হইয়া যাইতেছে তবু চঞ্চলা আসে না কেন? আশ্রমের বাড়ীতে রোগীর ঘরে ডাক্তারের সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত কথাবার্তা বলার অর্থ লোকচক্ষে যে কি চঞ্চলা কি তাহা জানে না? গৌরীর ইচ্ছা করিল আর একবার সে ঘরে গিয়া চঞ্চলাকে একটা ডাক দেয়; কিন্তু এ কয়দিন চঞ্চলার সঙ্গে তাহার কথাবার্তা খুব বেশী নাই বলিয়া কান্ধটা শোভন হইবে কিনা তাহার সন্দেহ হইল। সে শ্রান্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাতে সে খাইত না।

বিশ্রান্তাশ্রমের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া এবং চঞ্চলার সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব বিচিত্র কল্পনা করিয়া গৌরীর যখন মনে হইতেছিল রাত বুঝিবা ভোর হইয়া যায়, তখন

চঞ্চলা ধীর পাদক্ষেপে ঘরে ঢুকিল। সঙ্ঘ যাইবার পর বাস্তবিক তখন ঘটা হুই মাত্র কাটিয়াছে। গৌরীর অধীর মনের কাছে তাহাই সারারাত্রি বক্তা মনে হইতেছিল।

চঞ্চলা মনে করিয়াছিল গৌরী ঘুমাইয়াছে। অনিয়ার ঘরে বুড়ী ঝিকে শুইতে বলিয়া সে একতক্ষণ শয়নভীর ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার উন্মত্ত মনটাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। একটা দুঃস্থ হিংসা ও রাগে তাহার বুকের ভিতরটা যেন জ্বলি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে আপনাকে আর সামলাইতে না পারিয়া রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ চাপিয়া বিছানায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু ভিতরটা কি তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল? কাঁদিয়া মনের জ্বালাটা নিভাইয়া দিতে ত সে পারিল না! কান্ধাটা ভিতরে ভিতরে গুমুরাইয়া যেন বজ্রের মত জ্বলিয়া গর্জিয়া উঠিতে চাহিতেছিল; তাহাতে বর্ণের চিহ্ন নাই।

চঞ্চলা বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমাজ সংসার মানুষ ধর্ম সকল কিছুই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই করিয়া দিতে পারিলে যেন অজ্ঞ তাহার মনের শাস্তি হয়। মনে পড়িল আজ ছয় সাত বৎসর আগেকার কথা।

তাহার পিতা তখন তাহাকে হুই এক গাস অন্তর দেখিতে আসিতেন। সে তাঁহাকে বলিত “কাক-বাবু”। সেই সন্ধ্যা-হাস্তময় স্নেহার্জ মুখের ছবি তাহার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে কাছে টানিয়া মাথায় একটা থাবা দিয়া প্রায়ই তিনি বলিতেন, “চঞ্চল, তুই বড় হ’লে ডাক্তার হবি?” সে বলিত, “ভয় করে, কাক-বাবু!” কেমন আশ্বাসভরা স্বরে তিনি বলিতেন, “ভয় কি রে? তুই ডাক্তার হ’লে আমাদের সব অস্থখ সারিয়া দিবি।” স্নেহভরে এমনি কত কথাই তিনি তাহাকে বলিতেন।

প্রতিবার তাঁহার সঙ্গে তাহার জন্ম আসিত নূতন কাপড় জামা খেলনা বই কত কি !

কিন্তু একটা আঘাতেই সেই অতদিনের সম্পর্ক সেই রক্তের বন্ধনও অনায়াসে ছিন্ন হইয়া গেল। এই কি পিতার প্রাণ ? কই সঞ্জয়কে আজ এমনি করিয়া ছাড়িয়া যান দেখি তিনি !

চঞ্চলা কি অপরাধ করিয়াছিল ? যিনি সত্য অপরাধী তাঁহারই অপরাধের বোঝা দিন দিন যেন আরও ভারী না হয়, এক মিথ্যাকে ঢাকিতে শত মিথ্যার সৃষ্টি যেন না করিতে হয়, এইজন্য সে মিথ্যার বন্ধন কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল মাত্র। সেই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া নিরাশ্রয়া বালিকা কতকালে তিনি অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিলেন।

কিন্তু সঞ্জয় যদি আজ সত্যই তাঁহাকে অপমানও কবে, মহা অপরাধেও তাঁহার ও বিশ্বের কাছে অপরাধী হয় তবে কি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন ? হীনতম পক্ষে পড়িলেও এই সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহার সমস্ত দেহ মন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবে। মানুষ বাৎসল্যের কত গান গাহিয়াছে, কত বন্দনা করিয়াছে, সে বাৎসল্য কি প্রাণ হইতে উৎসারিত রসধারা না সুবিধাবাদীর অবসর বিনোদন ? রক্তের বন্ধনে না হইলে এমন হিসাব আসে কোথা হইতে ?

এই যে বৈষ্ণব সাহিত্যে পরের সন্তানকে আপন করিয়া বাৎসল্যের সুরধনৌ বহাইয়া দিয়াছে, সে কি সমস্তই ভূবা কথা ও ধ্বনির মালা দিয়া তৈয়ারী ? এ মিথ্যার সঙ্গীত কি করিয়া এত দীর্ঘকাল টিকিয়া রহিল ? স্বার্থে মানে এতটুকু ঘা লাগিলে যেখানে আপনার সন্তানকে মাজ্জ্ব অনায়াসে ছাড়িয়া ফেলে সেখানে পরের সন্তানকে লইয়া একি বাৎসল্য না সখের খেলা ?

কত ভুল আঘাতে কাচের শৃঙ্খলের মত তাহার চারিদিকের এই বাৎসল্যের বন্ধন ভাঙিয়া ধসিয়া পড়িয়াছিল তাহাই মনে করিয়া আজ চঞ্চলার ঠোঁটে ক্রুর বিজ্রপের হাস্ত খেলিয়া যাইতেছিল। মানুষের ভালবাসার চেয়ে পশুব ভালবাসা সত্য বেশী অটল বেশী। অসহায় সন্তানকে সে ত্যাগ করে না। এইত মাত্র কয়বৎসর আগে হৈমবতী

তাঁহার এক বন্ধুকে হাঁসপাতালে পৌড়িত অবস্থায় দেখিতে যাইবার জন্য চঞ্চলা নিষ্কারিণী প্রভৃতি দুই তিন জনকে সঙ্গে করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। হাঁসপাতালে একটা সুন্দর স্বতন্ত্র ঘরে একলা শুইয়া সুন্দরী একটি মহিলা অসহিষ্ণু ভাবে কাহার জন্ম যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হৈমবতী গিয়া পাশের চেয়ারে বসিলেন। চঞ্চলা ঘরের শেষপ্রান্তে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী ক্ষীণ স্বরে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “এদিকে এস না, মা ! দেখি তোমার কেমন চেহারা !”

বোগীর অঙ্কুর খেয়ালে একটু হাসিয়া চঞ্চলা কাছে আসিল। তাহার আজও মনে আছে কি করুণ চোখে রোগিণী তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ চঞ্চলার হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। হৈমবতী শুধু বলিলেন, “ছি, অমন কান্নাকাটি করে না।” রোগিণী অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, “কৈদে আর কি হবে ? তাকে ত আর পাব না।” চঞ্চলার হাতখানা তিনি যেন ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন।

তারপর তাহারা আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ায় নাই। হৈমবতী চঞ্চলাকে বাড়ী আসিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, “চঞ্চলা, মেয়েটির কান্না দেখে মনটা বড় খারাপ হ’য়ে গেল, না ?”

চঞ্চলা বলিল, “হাঁ মাসিমা, বেচারীর বুঝি মেয়ে ম’রে গেছে ?”

হৈমবতী বলিলেন, “মরেনি, পর হ’য়ে গেছে ?”

চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। হৈমবতী বলিলেন, “চঞ্চলা, তোমারই মা আজ তোমার জন্তে কাঁদছিলেন।”

চঞ্চলা চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, “না, না, না, কাকা-বাবু বলেছেন, আমি যখন এখানে আসি তারপরই আমার মা মারা গেছেন।” কিছুতেই চঞ্চলা এ কথা বিশ্বাস করিতে চায় নাই। ছেলেবেলাকার দেখা সেই মা’র জন্ম তাহার নিঃসঙ্গ মন বারবার কাঁদিয়াছে, তাহাকে পাইবার জন্য কত অসম্ভব কল্পনা করিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ স্বপ্নের মত মিথ্যা হইয়া গেলে কি আনন্দ হয় ভাবিয়া মাতৃস্নেহবিক্ত শিশু মনকে আপনি ভুলাইয়াছে, কত

বার ভাবিয়াছে হয়ত মা আসিয়া অকস্মাৎ একদিন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিবে, “ওরে, আমি মরিনি, তোর কাকা-বাবু ভুল করেছিল। আমি হারিয়ে গিয়ে-ছিলুম।” কিন্তু আজ যখন শুনিল এই তাহার মা বাঁচিয়া রহিয়াছে তখন মনে বিশ্বাস জাগিল কই? মা! এই কি মা? সত্য মাগের ছবি তাহার মন হইতে কবে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঞ্চিত ভূষিত শিশু যে মাতৃমুষ্টি পড়িয়া মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, সেত এমন নয়। সে অপরূপ রূপে ঘর আলো করিয়া মধুব হাশ্বে সকল জালা জুড়াইয়া ছুই বাহুব নিবিড় বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া বুকের ভিতর তাহাকে লুকাইয়া অজস্র স্নেহেব প্লাবনে তাহাকে ডুবাইয়া দিবে। সেই মহায়শী সাম্রাজ্য-মুক্তি কই? একি দীন মাতৃ-স্নেহ? একবার তাহার হাতখানা মাত্র স্পর্শ করিয়াই ছাড়িয়া দিল।

হৈমবতী তাহার অবিশ্বাস দেখিয়া তখন আর কিছু বলেন নাই। কিন্তু কথাটা চঞ্চলার মনে ঘুরিতেছিল। তখন তাহার বাহিরের শৈশব বহু দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই অন্তরের শিশুকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিত। হইতেও পারে, এই স্নানমুখী করুণ-নয়না সুন্দরীই হয়ত বা তাহার মা। কেন তাহার মা তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন জানিতে ইচ্ছা করিত।

চঞ্চলা হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ, মাসিমা, সত্যিই যদি তিনি আমার মা, তবে আমাকে কোনো দিন কাছে নিয়ে যান না কেন?”

হৈমবতী বলিলেন, “তুমি তাতে অশেষ দুঃখ পাবে মা, তাই নিজেকে বঞ্চিত ক’বে তোমার মা তোমাকে পরের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ তাঁর স্বৈচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত।”

চঞ্চলা বুঝে নাই। বহু বেদনা দিয়া ও পাইয়া হৈমবতী সে-কথা চঞ্চলাকে বুঝাইয়াছিলেন। অবশেষে চঞ্চলা বুঝিল; কিন্তু তাহার সমস্ত ভালবাসা আক্রোশ হইয়া গাৰ্জ্জিয়া উঠিল। মা ত তাহাকে আপনা হইতেই ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মিথ্যার ভাণ করিয়া যে পিতা তাহার সত্য সম্পর্কে দয়ার অবমাননা করিতে আসে কোনো সম্পর্ক রাখিতে চায় না সে তাহার সঙ্গে।

সে বলিল, “আমার বাবা যদি আমাকে মেয়ে বটে ঘরে স্থান না দিতে পারেন, সখস্টটুকুও স্বাকার করতে না চান তাহ’লে আমি তাঁর এক পরশও আর চাই না। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”

একথা শুনিয়াই স্বষিকেশ আসা-যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। একটা বোঝাপড়াও করিতে চাহিলেন না; কেবল মাসের শেষে তাহার জন্ম কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন। চঞ্চলা বলিল, “মাসিমা, আপনি আমাকে অনেক দিয়েছেন, কিছুদিনের জন্তে যদি আমার অঙ্গের ভারটুকুও নেন, তাহ’লে আমার আর এ অপমান সহ্যে হয় না। আপনার স্নেহের স্বর্ণ আমি প্রাণ দিয়ে শোধ করতে চেষ্টা করব, কিন্তু ও টাকা আমি ছোব না।”

টাকাও বন্ধ হইয়া গেল। নাট্যশেষের মত পিতাও কস্তার মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা পড়িয়া গেল। তাহার পর কেহ আর কাহারও খোঁজ রাখে নাই। তাহার পিতার স্নেহের এই পরিণাম; এই ভালবাসা, এই দায়ীত্ব-বোধ!

চঞ্চলার রাজি এমনি করিয়াই ভোর হইল তাহার একটু দূরেই আপনার বিছানায় পড়িয়া কত রাত পর্যন্ত গোবী চঞ্চলার অধীর দেহমনের আক্ষেপ অশ্রুব করিয়াছে। ঘুম তাহারও চক্ষে আসিতেছিল না; কিন্তু তবু চঞ্চলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও তাহার হইতেছিল না।

গৌরী নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। চঞ্চলা তাহার কে যে রাত জাগিয়া তাহার জন্ম সে মাথা ঘামাইয়া মরিতেছে? সে এখানে আসিয়াছে আপনার উন্নতির জন্ত এবং পরবোর জন্তও বটে। কিন্তু যে পরের সঙ্গে সকল সম্পর্কই চূকাইয়া দিতে চায় এবং গৌরীর ভাবনায় চিন্তার যাহার কিছুই আসে যায় না সেই পরের চিন্তায় এত মত্ত হইয়া উঠাও কি একটা পাগলামি নয়? এমন পাগলামি ত তাহাব কোনো দিন ছিল না। আজ হঠাৎ তাহাকে ইহা পাইয়া বসিল কেন?

ভাবিতে ভাবিতে মাঝরাত্রে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলা যখন তাহার ঘুম ভাঙিল দেখিল ঘরে চঞ্চলা নাই।

(৭)

সকালবেলা জানালা দিয়া মুখ বাহির করিতেই চূর্ণ বৃষ্টির কণায় গোরীর মুখ ও মাথার চুল ভিজিয়া গেল। মেঘলা আকাশের ফিকি রৌদ্র ও ভিজা বাতাসে দিনের চেহারাটা অনেকখানি স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। বাহিরে তাকাইতেই গোরীর মনে হইল যেন কাহার স্নেহসিক্ত হাতের সীতল স্পর্শে তাহার সমস্ত অবসাদ কাটিয়া গিয়াছে। শরীরের অবসাদের সঙ্গে মনের বিরক্তিও অনেকখানিই দূর হইয়া গিয়াছিল বলিয়া চঞ্চলার প্রতি মনটাও তাহার অনেকখানি সদয় হইয়া উঠিল। সারা রাত্রি এমন করিয়া কাটাইয়া সকালবেলাই সে কোথায় গেল একটু খোঁজ করিতে ইচ্ছা করিল।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া গোরী অনিবার ঘরে গিয়া দেখিল চঞ্চলা অনিবার চুল ও বেশ-ভূষার একটু সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। দীর্ঘ জাগরণের ক্লান্তিতে তাহার সতেজ ও স্বন্দর মুখশ্রী রোদপোড়া ফুলের মত শুকাইয়া গিয়াছে। এক বাড়ির ঝড়ে তাহার ভিতরে বাহিরে কি যেন একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের হালি নিভিয়া গিয়া তাহাকে চেনা যায় না প্রায়। গোরীর সমস্ত মনটা করুণায় ভরিয়া গেল। তাহারই এত কাছ দিয়া কাল সারারাত যে ঝড়টা বহিয়া গেল, তুচ্ছ কি একটা অভিমানের বশে সে তাহা ফিরিয়াও দেখে নাই। তাই আজ কল্পনার চোখে অন্ধকার রজনীর কোলে সেই একান্ত নিঃসঙ্গ সন্তপ্ত মানুষটির বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসের ছবি ফিরিয়া দেখিয়া নিজের হৃদয়হীনতায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

মনে পড়িয়া গেল নিজের জীবনের সেই প্রথম দুঃখ-বোধের দিনের কথা, যেদিন পিতার মুখে আপনার মন্দভাগ্যের কথা সে শুনিয়াছিল। পিতা-মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে বসিয়াই সেদিন সমস্ত বিখটা তাহার কাছে শূন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পৃথিবীর যা কিছু স্বথশাস্তি, আনন্দ আরাম, মানমর্যাদা যেন সেই একটা কথার জালায় কে পুড়াইয়া দিয়াছিল। তবু তখনও বৈধব্যে

প্রকৃত মর্ম্ম সে বোঝে নাই, অনাথ অসহায়ের জীবন কি তা' কল্পনাও করিতে জানে না। তারপর দিনে দিনে তিলে তিলে যত সে বুঝিয়াছে, জগৎকে চিনিয়াছে, আপনার ভাগ্যলিপি স্পষ্ট করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, ততই সে অন্তরের আগুন তাহার বঞ্চিত জীবনের প্রতি রন্ধে রন্ধে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবু আজও তাহার পৃথিবীতে আপনার বলিবার মানুষ আছে। কিন্তু চঞ্চলার ত কেহ নাই। যাহারা আছে তাহারা ত থাকিয়াও নাই। যুহা যাহাকে নিঃসঙ্গ করে সে পাইয়া হারায়ে; কিন্তু এ যে না পাইয়াই হারানো। চিররক্ষিতা চঞ্চলা!

চঞ্চলার যে মন্দভাগ্যের ইতিহাস একদিন গোরীকে তাহার প্রতি বিরূপ করিয়াছিল, আজ তাহাই তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল। সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তিগণ গর্ব্বিতা তেজস্বিনী চঞ্চলার প্রতি গোরীর মনে একটা ঈর্ষা জাগিয়াছিল। তাহার ইতিহাস সেই ঈর্ষার উপর বিভূষা ছুড়িয়া গোরীকে সম্পূর্ণ বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। আজ ব্যাধাতুরা চঞ্চলার স্নান মুখ গোরীর মনে বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিল।

কাল রাত্রে চঞ্চলাকে সে যখন দেখিয়াছিল উৎফুল্ল মুখে সঙ্গয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে, তখন ত তাহার মুখে এই কল্পার কোনো ছায়া দেখে নাই; ফিরিয়া যাইতে যাইতে সে যাহা শুনিল তাহাও ত বন্ধুত্বের স্বতি-কথার মধুব আলোচনা মাত্র। কিন্তু তাহার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, চঞ্চলার দেখা নাই। গোরী কল্পনার সে অদেখা মুহূর্ত্তগুলির ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গীহীনা চঞ্চলার মনে বাল্যস্মৃতি জাগাইয়া সঙ্গম তাহার বন্ধুত্বকে নূতন কবিতা গড়িয়া তুলিতেছিল। কিন্তু বাল্যের ভিত্তিমাত্রের উপর যৌবনের বন্ধুত্ব কি সকল সময় গড়া যায়? তাহাতে অগ্র মাল-মশলা আপনি আসিয়া পড়ে। এখানেও কি আর তাহা হয় নাই?

গোরী মানসচক্ষে দেখিল, চঞ্চলার মন্দভাগ্যই এখানে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গমও চঞ্চলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এই অদৃশ্য শত্রু চঞ্চলার সকল স্বথ-শাস্তি শুবিয়া থাইতেছে। চঞ্চলার মন্দভাগ্যের ইতিহাস

কেবল কাণে শুনিয়া গৌরীর দেহের ব্রাহ্মণ-রক্তধারা
অশুচিত্তার আশঙ্কায় শিরিয়া সরিয়া গিয়াছিল, আজ
চোখে তাহার ক্লিষ্ট বেদনাহত মুক্তি দেখিয়া সেই মন্দ-
ভাগ্যেব প্রতিই গৌরীর অস্তবের ব্রাহ্মণ্য তাহার দাক্ষিণ্য
ও করুণা জাগাইয়া তুলিল।

কাছে আসিয়া একেবারে অকস্মাৎ চঞ্চলার হাতখানা
ধরিয়া গৌরী বলিল, “চঞ্চলা, তোমার মুখখানা যে, ভাই,
একেবারে শুকিয়ে গেছে। তুমি একটু শোও গিয়ে,
তোমার কাজগুলো আমি ক’রে দিচ্ছি।”

চঞ্চলা বিম্মিত হইয়া গৌরীর মুখের দিকে তাকাইল।
এই গৌরীই না আজ কতদিন তাহাকে এড়াইয়া
চলিয়াছে? আজ আবার সে এত কাছে আসে কেন?
চঞ্চলা একবার হাতখানা সরাইয়া লইতে গেল, কিন্তু
পারিল না। গৌরী তাহাকে গলা জড়াইয়া একেবারে
বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, “ইস, কি হ’য়ে গেছে।
কাল সারারাত ঘুমোও নি, আমি টের পেয়েছি। যাও
শীগগির মুখ-হাত ধুয়ে ঘরটা শুদ্ধকার ক’বে শুয়ে পড়
গিয়ে। আমি তোমার খাবার নিয়ে যাব এখন। আর
মাসিমাকে বলব যে, তোমার আজ শরীর খারাপ
আছে।”

চঞ্চলাকে প্রায় টানিয়া গৌরী ঘরের বাহির করিয়া
দিল। তাহার পর ফিরিয়া অনিমার কাপড়-চোপড়
বদলাইয়া চুল আঁচড়াইয়া মুখ ধোওয়া খাওয়া ব্যাঞ্ছ
দেখা ইত্যাদি সারিয়া একটা বাংলা গল্পের বই এক হাতে
দিয়া তাহাকে জানালার ধারে বসাইয়া দিল।

সারাদিন চঞ্চলার খুঁটি-নাটি সমস্ত কাজ গৌরী করিয়া
বেড়াইল। হৈমবতীকে বলিয়া তাহার সমস্ত খাবার
ইত্যাদি উপরে পৌছাইয়া দিয়া আসিল; চঞ্চলাকে মোটে
ঘর হইতে বাহির হইতে দিল না।

সন্ধ্যায় সঞ্জয় আসিল অনিমাকে একবার দেখিতে এবং
নাইট ইন্সুলের ছেলেদের তদারক করিতে। আজ তাহার
একলার আসিবার পালা ছিল, কিন্তু সে কোথা হইতে
অপূর্ব ও সঞ্জয়কে জোপাড় করিয়া দলে বেশ ভারী হইয়া
আসিয়াছে। অনিমার হাতটা যেভাবে ভাঙিয়াছে
তাহাতে আর একজন ডাক্তার আনিবার যে বিশেষ

দরকার ছিল তাহা মনে হয় না; বাস্তবিক হাতখানা
ভাঙেই নাই, শুধু হাড়টা সরিয়া গিয়াছে মাত্র কিন্তু
তবু সঞ্জয় শঙ্করকে সর্জে না করিয়া অনিমার ঘরে ঢুকিল
না।

ঘরের ভিতর কে যে আছে সঞ্জয় হয়ত মুখ তুলিয়া
দেখিতই না, যদি না শঙ্কর গৌরীকে দেখিয়া কণ্ঠ বলিয়া
উঠিত। শঙ্কর বলিল, “কি হয়েছে রে, গৌরী, অমন
ক’রে প’ড়ে গেল কি ক’রে, বেচারী?”

গৌরী বলিল, “বৃষ্টিতে সিঁড়িটা বড় পিছল হয়েছিল,
তাই—”

গৌরীর গলার স্বরে সঞ্জয় চমকিয়া মুখ তুলিয়া
তাকাইল। গৌরী দেখিল ঝড় কেবল এক জায়গাতেই
বহে নাই, সঞ্জয়ের মুখের সমস্ত দীপ্তি এবং হানিও তাহা
নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে ঝড়েতে শুধু সে যে
হুইয়া পড়িয়াছে তাহা নয়; তাহাকে দেখিলে মনে হয়
সারারাত সে যেন কোনো দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে।
তাহার মুখের আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছে
বটে, কিন্তু চোখে আগুনের হলুদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গৌরী কল্পনায় যে নাট্যলীলার ছবি দেখিয়াছিল,
সঞ্জয়কে দেখিয়া তাহার সত্যতা সন্দেহে তাহার মনে আর
কোনো সন্দেহ রহিল না। যৌবনের মাধুর্য্য-বল্যম্বুতির
রসে মধুরতর হইয়া এই দুইটি মানুষকে যে পরস্পরের
কাছে টানিয়া আনিতেছিল তাহা বুঝিতে তার থাকি
কি আছে? কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা অস্তুরালে বসিয়া
যে বজ্র হানিয়াছেন তাহার আঘাত কি ইহার কাটাইয়া
উঠিতে পারিবে, না পারিবার কোনো উপায় আছে?

চঞ্চলা চপলা ও গৌরী যখন ছেলেদের সঙ্গে এই কাজে
নামিয়াছিল তখন গৌরীর বিশ্বাস ছিল কাজে একাগ্রতা
ও নিষ্ঠা দেখাইয়া কাজ কাহাকে বলে সে সকলকে
দেখাইয়া দিবে! কিন্তু চঞ্চলার মত চট্-করিয়া সকল
কাজের হালটা আগে আসিয়া ধরিবার ক্ষমতা তাহার
ছিল না বলিয়া মনের ইচ্ছা যতই প্রবল হোক এবং কাজে
নিষ্ঠা যতই গভীর হোক, সঞ্জয় ও শঙ্করের চোখে সে
চঞ্চলার পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। নিজের আচার
নিষ্ঠা বজায় রাখিতে গিয়া কার্যক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বের

গৌরবের যে আরও হান করিয়া বসিতেছিল। অথচ এমনি করিয়া ক্রমশ পিছন হইতে পিছনে চলিয়া যাইতে তাহার আত্মসম্মানেও লাগিতেছিল। যে শব্দর এত আশা করিয়া তাহাকে আনিয়াছিল সেই শব্দরের চোখেও যে ইহাতে সে ছোট হইয়া যাইতেছে, তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা দলিত করিয়া ফেলিতেছে—এই লজ্জাও ভিতরে ভিতরে কয়দিন ধরিয়া তাহাকে খোঁচা দিতেছিল। সে ত সংসারকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সংসারও আপন-র প্রয়োজনের গভীর ভিতর হইতে তাহাকে অতি শৈশবেই ছাটিয়া দিয়াছে, তবে সংসারের তুচ্ছ আচা-বিচারকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া বাহিরকে কেন সে প্রাচীর তুলিয়া আড়াল করিতে চায়? গঙ্গাজল তাত্র-কলসের বন্ধনীতে বাঁধা পড়িলে ঘর পদে পদে তাহার পবিত্রতা বাঁচাইয়া চলে, কিন্তু বাহিরের চলন্ত স্রোতধিনী অপরের অঙ্গের সকল অশুচিভা ও অপবিত্রতা বুক পাতিয়া লইয়া তাহাদেরই পবিত্র করিয়া দেয়; ইহাতে তাহার অশুচি হইবার কোনো ভয় নাই।

গৌরীকে যে আপনার ব্যক্তিত্বের আড়ালে ফেলিতে বসিয়াছিল আর যাহার চোখ দিয়া তাহার নিজের ভাইও তাহার বিচার করিতে স্বপ্ন করিয়াছিল সেই চঞ্চলা ও সঙ্কল্প দুইজন মানুষকেই আজ নির্ভর বিধাতার হাতে ক্রীড়নকের মত অর্শহায় দেখিয়া গৌরী যেন অকস্মাৎ তাহাদের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্কল্পের দিকে তাকাইয়া আপনা হইতেই গৌরী বলিল, “সঙ্কল্পবাবু, আমরা রুগীকে দিয়ে রুগী দেখাই না। আপনার ঘে-রকম চেহারা দেখছি ভাতে আজ ত ঘর থেকেই আপনার বেরোনো উচিত ছিল না। ছোড়াটাই আজ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি দেখবে এখন; আপনি এখানে ব’সে একটু জিরোন দেখি; মাসিমাকে ব’লে আপনার তত্ত্বের একটা ব্যবস্থা ক’রে আসি।”

গৌরীকে এমন সম্ভ্রতিভভাবে এতগুলো কথা বলিতে দেখিলে অন্তর্দীন হইলে সঙ্কল্প বিশেষ বিস্মিত হইত; কিন্তু আজ চঞ্চলার বদলে গৌরীকে এখানে দেখিয়া সে এতটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, তাহার কথাব নূতনত্বের দিকে নজর দিবার অবসরই তাহার হয় নাই। চঞ্চলার

আসন্ন উপস্থিতির ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া সে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। খানিক পরে গৌরী নিজের হাতেই একগেলাস ঘোলের সরবৎ ও এক রেকাবী আম ও সন্দেশ লইয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্কল্পের সম্মুখে সেগুলো নামাইয়া রাখিয়া বলিল, “নি, এই ক’টা খেয়ে ফেলুন। খেটে খেটে নিজেকে প্রাণগুলোই যদি বার ক’রে ফেলেন তবে বিশ্বের যে কাজগুলো ঘাড়ে করেছেন সেগুলো করবেন কি ক’রে বলুন দেখি। সত্যি, পৃথিবীতে যে মানুষদের সবচেয়ে নিজের যত্ন করা উচিত, তারাই যে কেন সকলের চেয়ে নিজেকে ত্যাগিয়া করে আমি ভেবে পাই না।”

এতক্ষণে সঙ্কল্প হাসিয়া বলিল, “যত্ন করাই যাদের কাজ তাঁরা এইরকম বোকা লোকদেরই বেছে বেছে বেশী যত্ন করেন ব’লে ওতে আমাদের একটা মস্ত লাভও হয়।”

শব্দর বলিল, “গৌরী, তোর ঘোলেব সরবতের বাহাছরী আছে; সঙ্কল্পের প্রলয়-গম্ভীর মুখে আজ যে হাসি ফোটাতে পারে সে কম লোক নয়। আমি আজ যখন ওব বাড়ীতে গেলুম তখন ওর মুখ দেখে মনে হয়েছিল—বোধহয় কাল রাত্রে ঝড়ে একসঙ্গে ওর জীপুজকণ্ঠা সব বাড়াচাপা প’ড়ে মারা গেছে। সেই রাগে ও পারে ত স্বয়ং বিধাতাকেই ধ’রে গলা টিপে দেয়।”

সঙ্কল্প আর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসিটা তাহার দ্ব্যস্তীর্ণ্যের চেয়েও গৌরীকে বেশী দমাইয়া দিল। গৌরীর মনে পড়িয়া গেল কতকাল আগের দেখা তাহার পিতার মুখের সেই স্নান হাসি। সিঁহুর লোহা পরা লইয়া মার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে যখন বাবার কাছে রায় লইতে গিয়াছিল, তখন তিনি এমনি হাসি হাসিয়াই গৌরীকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌরী বুঝিল, সঙ্কল্পের দুঃখটা নিতান্ত একটা চোখের নেশার রোম্যান্সের ব্যাপার নয়; ইহাতে গভীর কিছু আছে। পিতার বেদনার্লিষ্ট মুখের হাসি দেখিয়া তাহাব বুকটা যেমন টনটন করিয়া উঠিয়াছিল তেমনি করিয়াই আজ তাহাব বুকটা হঠাৎ ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল, এতকাল পরে ঠিক সেই তন্ত্রীটিতে আঘাত পাইয়া।

গৌরী বলিল, “জীপুত্র ম’বে যাওয়ার চেয়েও বড় দুঃখ মানুষের আছে। এমন দুঃখও আছে যুত্যাশোকই একমাত্র যে দুঃখকে শেষ ক’বে দিতে পারে।”

চঞ্চলার মুখখানাই গৌরীর বাববার মনে পড়িতেছিল।
সঙ্গরকে যদি সে কোনো বন্ধনে বাঁধিয়া থাকে তবে তাহার কলে বেদনা ছাড়া আর কি মিলিবে হৃজনের ভাগ্যে ? যদি সে-বন্ধন সত্য বন্ধন হয় তবে যুত্যা ছাড়া আর কিছু কি সে বন্ধন-ব্যথা ঘুচাইতে পারিবে ?

সঙ্গর একবার গৌরীর মুখের দিকে ডাকাইল। দেখিল শব্বরের মত পরিহাসের হাসির লেশমাত্র তাহাতে নাই, পরের বেদনায় লোকদেখানো সহায়ভূতির নকল গান্ধীর্ঘ্যও নাই ; সে মুখে যাহা ফুটিয়াছে তাহা প্রকৃতই দরদীর ব্যথা। উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারার তাড়নায় সঙ্গরের মুখ চোখ সমস্ত লাল হইয়া উঠিল। সে নিতান্ত পুরুষমানুষ, তাহাতে রোগীর ঘরের ডাক্তার তাই কোনো প্রকারে আপনাকে সামলাইয়া লইল।

গৌরী দেখিল আলোচনাটা ঠিক পথে যাইতেছে না ; সঙ্গরের বেদনায় সহায়ভূতি প্রকাশ করাই ত কেবল প্রয়োজন নয় ; তাহার মনটাকে অন্তরিক্তে ঘুরাইয়া দিতে হইবে।

বাহিরে পড়িয়া ছেলেরা আসিয়াছিল, ছোট্ট অনিয়ার ব্যাণ্ডেজও বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। গৌরী বলিল, “দেখুন, কাল যে আপনি আমার নতুন ছাত্রটিকে দেখবেন বলেছিলেন, চলুন আজ তাকে দেখাই। আপনি তাকে দেখলেই চিন্তে পারবেনই না, এমন কি তার জাগকর্তা অপূর্ব-বাবুও তাকে চিন্তে পারবেন না।”

বাহিরে টিনের চালের তলায় বারাণ্ডায় ছোট ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের বই খাতা চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া বিরাট একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছিল। গৌরীদেব-বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কেবল একটা মিহি গলা শোনা গেল, “গুরুমা, ভেঙা কেন আমার শেলেটে নিকে দিলে ?”

গৌরী সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া ডাকিল, “ভারাচাঁদ।”

বারাণ্ডার খুঁটির আড়ালে দূরে অন্ধকারে দেয়ালের

গায়ে ঠেস দিয়া একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়াছিল, গৌরীর ডাকে সে অগ্রসর হইয়া আসিল। দিবা সান্দা ধূধুপে ধূতি কোর্টা পরা, নতুন বই খাতা প্লেট হাতে, স্ক্রীক সাবান দিয়া মাজা ঘসা চক্চকে। ছেলেদের মাঝখানে অপূর্ব দাঁড়াইয়াছিল ; সে লাফ দিয়া সামনে আসিয়া বলিল, “কিরে তারা, তোকে এমন বাবুসাহেব সজিয়ে দিলে কে ? নেংটি-পরা মূর্তি থেকে একেবারে এত বড় প্রোমোশান ?”

ভারাচাঁদ সব ক’টা দাঁত বাহির করিয়া বলিল, “এজ্ঞে, গুরুমা কাপড়, সাবং, তেল মত দিয়েছেন।”

সঙ্গর হাসিয়া বলিল, “কে বলবে মেথরের ছেলে ? একেবারে যে বামুনঠাকুরটি বানিয়ে তুলেছেন।”

গৌরী বলিল, “ভারাচাঁদের একটা ছোট বোন আছে, কাল থেকে সেটাকেও আনতে বলেছি। একবার ত আমার জাত গেলই, দুবার ক’রে যখন যেতে পারবে না, তখন নির্ভয়ে যত খুসী অনাচার করতে পারবে। মরার বাড়ি ত গাল নেই ; জাত যখন মবেইছে তখন তার আর বেশী ক্ষতি কি হবে ?” শব্বর বলিল, “রাত-রাতি তুই এতবড় রিকশার হ’য়ে উঠলি, তোর হ’ল কি ?”

গৌরী বলিল, “রাতারাতি ভূমিকম্প হ’লে বেলায় আর চামারের ঘর এক হ’য়ে যায়, আমার জাত ত নেহাৎ ছোট কথা।”

ছেলেরা সার বাঁধিয়া ছলিয়া ছলিয়া নাম্তা পড়িতে আরম্ভ করিল ; সঙ্গর বলিল, “আজ আমি যাই, এরাই আপনার সাহায্য করবে এখন।”

গৌরী যেন নিতান্ত অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, “একটু দাঁড়ান, চঞ্চলার কাল থেকে শরীরটা ধারাপ। তাকে একটু দেখে একটা গুণ দিয়ে যেতে হবে।”

সঙ্গর একটু যেন ভীতভাবে বলিল, “শব্বরকে বলুন না ?”

গৌরী বলিল, “না, না, ছোড়দার ডাক্তারীতে আমার একফোটাও বিশ্বাস নেই ; আপনি আসুন। ত ছাড় মাসিমা ছোড়দাকে মেয়েদের ডাক্তারী করার অহু-তি ত দেননি।” সঙ্গর আপত্তি করিতে পারিল না। গৌরীর সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইল। (ক্রমঃ)

আষাঢ়-শেষে

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

তরুণ আষাঢ় আজি ফিরে যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া

ভগ্ন প্রাণে পুঞ্জ মেঘ-উপহার লয়ে !

শুধু হায় এনেছিল ব'য়ে

নবীন আশার বাণী, তাই গেল নীরবে কহিয়া

রজনীগন্ধার কাণে যুথিকার মুহূ পরিমলে ।

কটকিত কেয়া-বনে, পল্লবিত ভূঁইটাপাদলে ।

আর কা'র লাগি'

এনেছিল কোন্ অর্ঘ্য স্বদূরে মায়াপুরী হ'তে,

অপিজল ঘন কেশে ভীত হেসে ব্যাকুল মরতে,

কেহ নাহি জানে । তাই সে বিরাগী

সঞ্চিত বেদনা তা'র দিল মেঘে, দিল বরিষণে,

পুষ্পিত কদম্ব-তলে, পরিম্লান রেণু-পরশনে ।

আজি তা'র যাত্রা-পথে ঘন ঘন বাজিছে মাদল ;

বিরহীর দল

দাহরীর উচ্চ রোলে ব্যথাঘন বরষা-নিশীথে,

বিদায়-পথিকে দিল ঘন অশ্রু-বাপ্প-উপহাব ।

আজি তাই বিষন্ন আষাঢ়

বিদায়-বেদনা-ভরে সস্রুণ গীতে,

প্রবণ-স্বাধারে তা'র ডাকি' দিল সজ্জিত সভায় ।

ত'র পরে ধীরে ধীরে মাগি' নিল প্রশান্ত-বিদায় ।

তোথায় সে কতদূর শুভ্রশীর্ষ হিমাজির শিরে—

উত্তরের পথে,

স্বপ্নহীন দীর্ঘশ্বাসে কামচারী পুঞ্জ মেঘবধে,

আষাঢ় চলিল ফিরে নয়নাশ্রু-নীরে,

পুঞ্জিত বেদনা বহি' রিক্ত দীন বিরহীর বেশে,

আজি তা'র বিদায়ের আয়োজন-শেষে,

কেহ নাই শুধাবার ;—

হে বিরহী তরুণ আষাঢ়,

আজি মোরে কহ ধীরে,

কা'ব লাগি' চলিয়াছ ফিরে

তপস্তুার আয়োজনে বিদ্রুতের বহ্নিজ্বালা বহি'—

হে কিশোর মিজ মোর, যাও মোরে কহি' !

কোথায় সে প্রিয়া তব, যা'র লাগি' চলিয়াছ খুঁজি'

দেশ হ'তে দেশান্তরে, নদীগিরি কন্দর লজ্জিয়া

অশ্রু-বাপ্পে শূন্যতল ভবি',

আতুর বনজ-বায়ু নবপুষ্প-দৌরভ আহরি'

তোমার ধূসর-কেশে স্নান হেসে দিল স্মরভিয়া !

বিমুগ্ধা প্রিয়ার লাগি' বলিয়াছ আজি তাই বুঝি—

দূরে দূরে ঘুরে মরি' ক্লান্ত-কায়ে আশিঙ্গলধারে ।

প্লাবিতা পর্কত-নদী তবু হায় দেখা হ'ল নায়ে !

হে চির-তরুণ বন্ধু, আজি তব বিদায়ের দিনে,

চাহি' দূর ছায়া-স্নান শ্রামল বিপিনে,

বিরহ-ছায়ায় মোর ভরি' উঠে সকল অন্তর ।

শ্রাবণ আসিছে জানি ভরি' নদ-কান্তার-প্রান্তর

দিশে দিশে কলরোল তুলি'

নীপশাধা নীরবে আকুলি'

আজিকে চলিলে তুমি বারিসিক্ত বনবীথি দিয়া

মম্বর গমনে,

বহি' মনে মনে

ব্যাকুল চিন্তার ভার, রহি' রহি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া

বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নিখিলের চিত্ত আকুলিয়া

স্বপ্ন পরিচয়ে,

নিষ্ঠুর দয়িতা লাগি' নব-প্রেম, নব-বাণী ল'য়ে !

গহনা

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

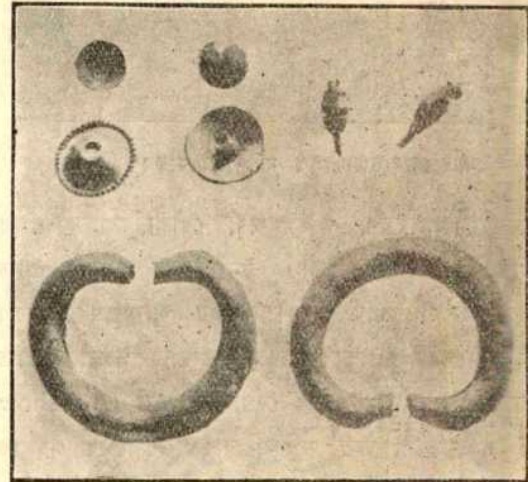
দেহের শোভা বৃদ্ধির কৃত্রিম উপায় বসন ও ভূষণ।
ভূষণের মধ্যে গহনা সর্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার
করিয়া আছে। ভূষণের প্রতি এই আকর্ষণ মাহুষের
কত কাল হইতে রহিয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব।



প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে গৃহিণীর মনোরঞ্জন

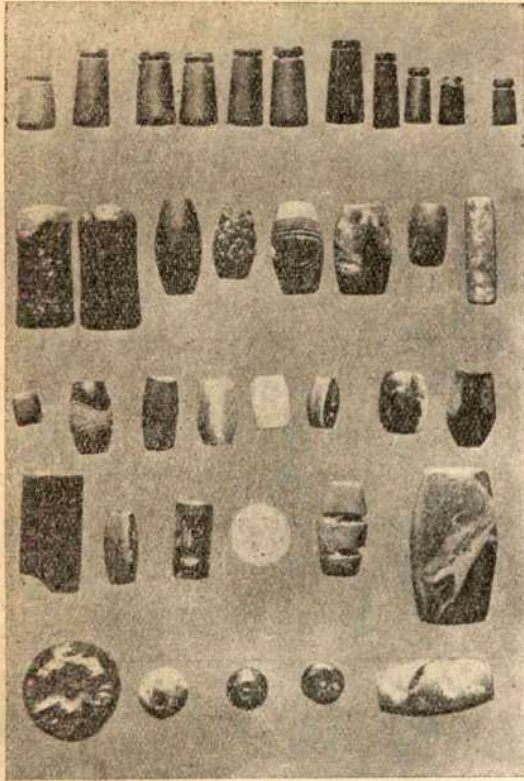
ভূষণের প্রতি আকর্ষণের কারণ কি? ফ্রেজার
ফ্রেয়েড হইতে রাম শ্যাম যহু সকলেই তারত্নরে বলিবেন,
“আমি জানি, আমি জানি”। তাঁহারা যাহা বলিবেন,
তাহা গল্পের কবিরাজ মণিশয়ের গো-সন্ধান হইতে যুদ্ধ

জয় পর্যন্ত সর্ব ব্যাপারে হরীতকী ব্যবহার মত নানা-
মতাবলম্বী মনস্তত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ নিজ নিজ মত অনুসারে
পৃথিবীর স্বাবর জন্ম যাবতীয় ব্যাপারের উৎপত্তির
কারণ বলেন। হইতে পারে তাঁহাদের কথাই ঠিক,
হইতে পারে হরীতকীর সর্বরোগদুঃখহারী ক্ষমতা আছে।
এ বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার, স্পর্ধা বা শূহা,
কোনটাই লেখকের নাই।



মোহেঞ্জো দড়ো। “মল” ও কর্ণফুল

আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে এরূপ “কেন”র বিচার করা
অসম্ভব। কেননা, সাধারণতঃ সমাজে গহনার সম্পর্কে
যে সব পরস্পরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নানা প্রকার আকর্ষণ ও
বিকর্ষণ শক্তির খেলা দেখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে বিচারের
ক্ষমতা আমাদের নাই। অক্ষয়কুমার দত্তের বিচার-ক্ষমতা
সকলের থাকে না। তবে মোটামুটি দেখা যায়, যে,—
তত্ত্ব, থাইযুক্ত বরকর্তা, ও পলাতক দেউলিয়ার গহনার



মোহেঞ্জো দাড়োতে প্রাপ্ত মণিকারের কারুকার্য নিদর্শন

প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা স্বর্ণ, রৌপ্য, বা কাগজের মুদ্রার প্রতিনিধি বলিয়া। কন্যাকর্তার গহনার প্রতি আকর্ষণ সর্পের প্রতি পক্ষীশাবকের আকর্ষণের ন্যায়। মহিলাদিগের ও ভারতীয় নৃপতিগণের গহনার প্রতি আকর্ষণ প্রধানতঃ “লোক দেখান”র জন্ত (to show off)। যাহারা উক্ত মহিলা বা রাজস্ববর্গের গহনার সংস্থান যোগায়, আভাবিক অবস্থায় তাহাদের ঐ সকল গহনার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। মস্তিষ্কবিকৃতি হইলে আকর্ষণ হইতে পারে।

সে যাহাই হউক, ইহা প্রামাণিক সত্য, যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব ভূষণ হিসাবে গহনার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তবে অতি প্রাচীনকালে যে সকল পদার্থ অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইত, সে সকলের মধ্যে অনেক কিছুই এখন বিপরীত সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

আদিম মানব যে দেহের শোভা বৃদ্ধির চেষ্টা করিত,

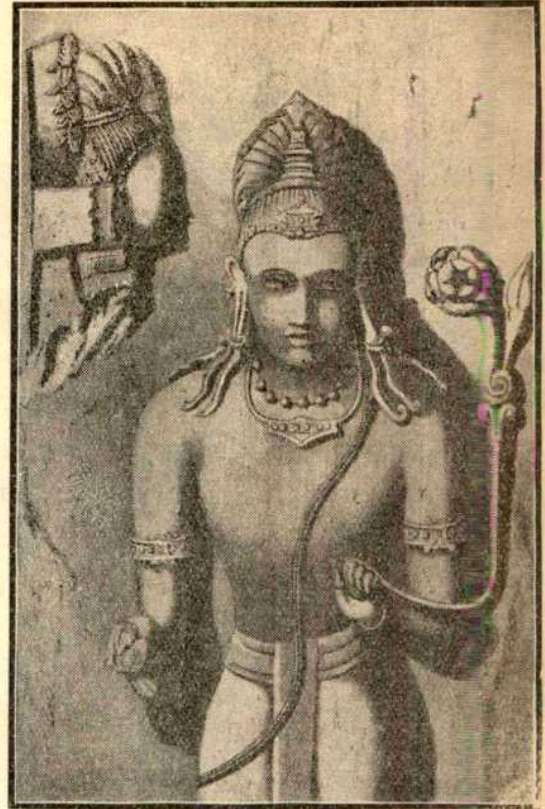
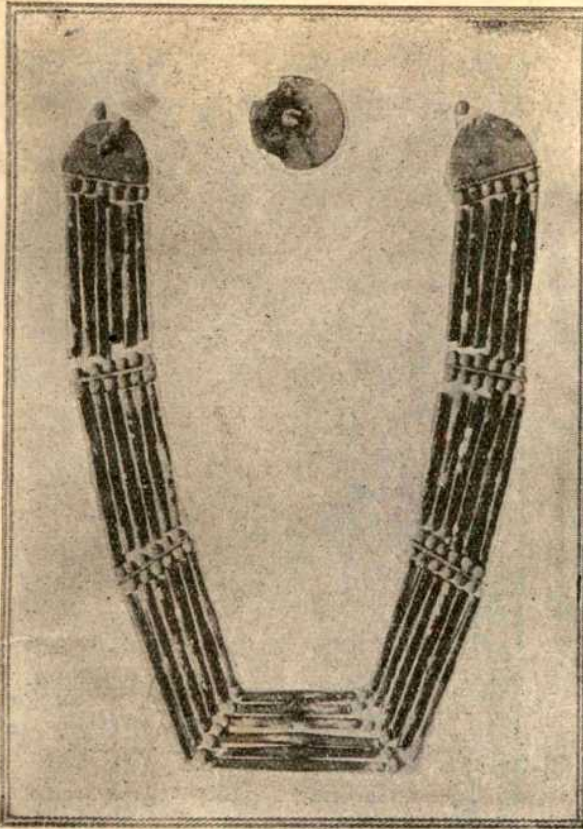
তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথম, আদিম মানব-রচিত চিত্র বা মূর্তি, দ্বিতীয়, তাহার ব্যবহৃত গহনা। এই সকল দেখিলে মনে হয়, যে, প্রাচীনকালের গৃহকর্তাকে পরিবার পরিজনের অলঙ্কারের সংস্থান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। মস্তক প্রস্তর বা উপলথণ্ড, কুকুর বা অগ্র কোন



উত্তর ভারতের কুম্ভা। প্রাচীন পরিকল্পনা

শ্বাপদের নখ ও দন্ত, ভল্লুক-আদি হিংস্র জন্তুর চোয়াল বিহুক বা শুক্তি ইত্যাদিতে ছিদ্র করিয়া, পশুতোম বা পশুচর্ম নির্মিত সূতার সাহায্যে অলঙ্কার-অভিলাষী ব্যক্তির অঙ্গে তাহা সংলগ্ন করিয়া দিলেই কাজ হাসিল হইয়া যাইত। সে গহনার না ছিল বাচাই, না ছিল বানী।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ আদর্শ গহনার ব্যবহার চিরস্থায়ী হইল না। মাহুযের “টুকুর দেওয়া” রোগ অতি প্রাচীন ও অতি সংক্রামক। সূতরাং সহজলভ্য পশুর-অস্থি বা উপলথণ্ডে লোকের বাসনার তৃপ্তি হইল না। ক্রমেই উজ্জলবর্ণযুক্ত প্রস্তর বা উপল, দুর্লভ হস্তিদন্ত ইত্যাদি, কুকুর দন্ত বা বিহুকের স্থান অধিকার করিল। পরে ধাতু ও অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা ধাতু গলান ইত্যাদির আবিষ্কার হইলে পর ধাতুনির্মিত গহনার ব্যবহারও প্রচলিত হইল।



মোহেগো দড়ো। উপরে কর্ণফুল নীচে স্বর্ণখচিত উপরত্বের হার

অবশ্য কারুকার্যের ক্ষমতার বিকাশ প্রস্তর-যুগের মনুষ্যেরও হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ের শিল্পীও শিল্প-নৈপুণ্যের সাহায্যে সাধারণ পদার্থকে অসাধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং স্থলে স্থলে সে প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

প্রস্তর যুগের পর তাম্র, বর্ষ-লৌহ বা কাংস যুগ। (Copper or Bronze Age)। এ সময়ের অলঙ্কারে শিল্পীর প্রভাববিস্তারের স্বত্রপাত হয়, এবং বোধ হয় সেই সময় হইতেই মানুষের গৃহস্থালীতে গহনা অনর্থক প্রচলিত হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে স্বচ্ছন্দবনজাত পাত্রের পশুর অস্থি বা সহজলব্ধ নদীতটজাত উপলের দ্বারা গৃহীণীর মনোরঞ্জন ক্রমেই হুমুসাধ্য হইয়া পড়ে। কেননা, ধাতুখণ্ডকে বিশেষ আকৃতিযুক্ত বা ধাতুর পাতের উপর চিত্রাঙ্কন না করিলে তাহা সহজে অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইত না।

উদয়গিরি (উড়িষ্যা কটক), গলায় নূতন ধরণের দোলক। বাহ্যে নূতন ধরণের “বাজুবন্দ”, গলায় বৃহৎ মুক্তামালা (স্বর্ণনির্মিত মুক্তাগোলক), মস্তকে শিরস্ত্রাণ স্বরূপ মুকুট

কাংস-যুগেই শিল্পী প্রস্তর কণ্টন, ধাতুর উপর প্রস্তর সংযোজন ইত্যাদির কৌশল উদ্ভাবন করে। পরে লৌহ-যুগে এই শিল্প বিশেষ অগ্রসর হয়। কাচ, মিনা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শিল্পের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গহনারও রূপ, আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। তাহার পর, ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে গহনার ব্যবহার ও গহনা নির্মাণ ও রচনা, কলাবিশেষে পরিণত হয়। এখনও সেই বিদ্যা বর্তমান রহিয়াছে, যদিও তাহার অবনতি হইয়া তাহা ফ্যাশন- (fashion) রূপ ছদ্মনামে পরিচিত।

মহুয়াচরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, যে-কোনো যতই দুশ্রাপ্য সেটি মনুষ্যের নিকট ততই বাঞ্ছনীয়, সুতরাং ততই মূল্যবান। এই কারণে যে অলঙ্কারের উপাদান যত দুশ্রাপ্য বা যে গহনার শিল্পকার্য যত

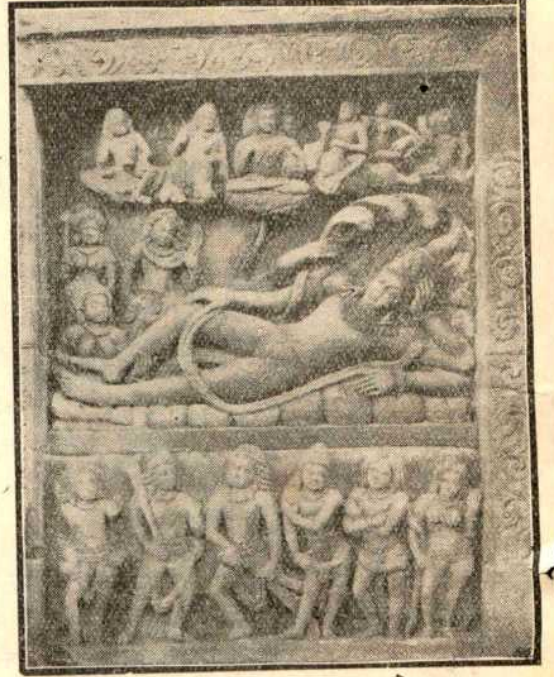


ভারত (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী), স্থল হস্ত ও পদের গহনা। অস্ত্র গহনার সমরেখাপাত (৫ম যক্ষ্মিনী)

দুঃসাধ্য, সেই গহনা ততই বাঞ্ছনীয় ও মূল্যবান মনে করা হয়।

অবশ্য ইহা সত্য, যে, স্বরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ বলিয়া দুইটি নিগূঢ় হৃদয় জ্ঞান বা গুণ মাল্লবের আছে। কিন্তু সংসারে (অন্ততঃ পক্ষে বর্তমান সময়ে) প্রভূত অর্থবলের পরিচয় দিবার ইচ্ছা এই নিগূঢ় হৃদয় জ্ঞানের প্রকাশকে

সহজেই অভিব্যক্ত করিয়া ফেলে। “আপকুচি খানা, পরকুচি পরনা” এ তো প্রায় খনার বচনের সামিল হইয়া গিয়াছে। গহনা-ব্যবহার শাস্ত্রে পরকুচি শব্দের অর্থ পরকে “তাক লাগিয়ে দেওয়া”, এবং সে কার্য্যে পূর্বোক্ত হৃদয় জ্ঞানের ধার অপেক্ষা অর্থবলের ভার অধিক কার্য্যকর।



দেওগড় (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী), মুকুট, ও কর্ণা (দুটগংবন্ধ) ও হারের পরিকল্পনায় ভগ্নরেখাপাত। নীচের সর্ব দক্ষিণের জীলোকের নূতন ধরণের মেথলা। (বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা)

স্বরুচিসম্বৃত গহনা শতকরা দুই এক জনের অঙ্গে দেখা যায়, “মানানসই” ও স্বরুচিসম্বৃত, যুগপৎ এই দুই গুণ যুক্ত গহনা সহস্রে একজনেরও হয় কি না সন্দেহ। এরূপ হইবার আরও একটি কারণ আছে। স্বচ কবি বর্ন্স (Burns) বলিয়া গিয়াছেন—

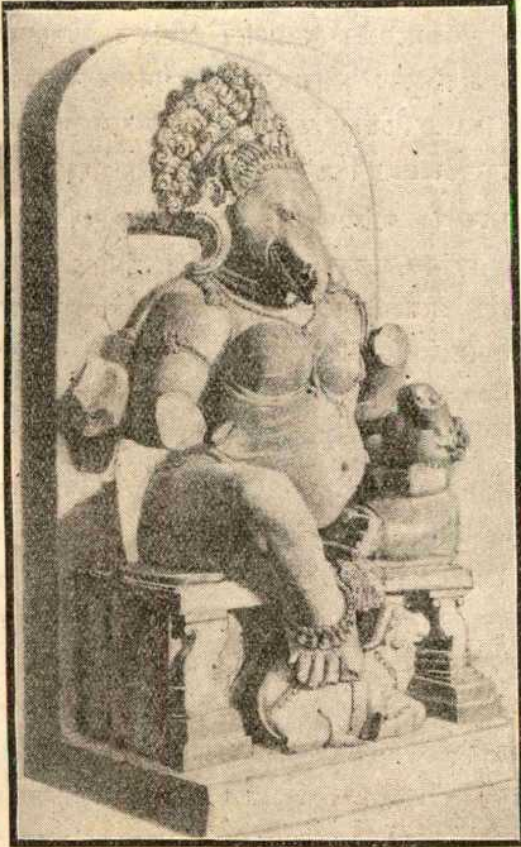
Some hae meat but canna eat,
Ithers hae na that wad eat it.

অর্থাৎ যাহার সঙ্গতি আছে তাহার ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, আবার ভোগ করিবার যাহার ক্ষমতা আছে তাহার সঙ্গতি নাই।

দুঃখাপ্য স্তরায় মূল্যবান হওয়াই যে গহনার উপাদানের

প্রধান উপযোগিতার পরিচয়, তাহার উদাহরণ কাচ। এই কাচ অথর্কবেদের সময় অশ্বমেধ যজ্ঞে বলির অশ্বের অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, চরকের সময় স্ফটিক অপেক্ষা অধিকগুণসম্পন্ন বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে এবং চাণক্যের সময় কাচমণি নামে রাজবৃত্তাগারে স্থান পাইয়াছে। এখন গহনানির্মাণের ক্ষেত্রে কাচের স্থান কোথায় ?

অনেকে বলিবেন, যে, যে-মণি যত মহার্য, তাহার শোভা, ছাতি ও স্থায়িত্ব (কাটিয় ইত্যাদি গুণের জন্য) ততই অধিক। ইহা সত্য, যে, হীরক, পদ্মরাগ (চূণী), নীলমণি (নীলা) ইত্যাদি মণি, গোমেদ বৈদূর্য্য ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ মণি অপেক্ষা অধিক ছাতি ও শোভা-যুক্ত এবং কঠিন। কিন্তু চূণী ও নীলা একই পদার্থ, কেবল

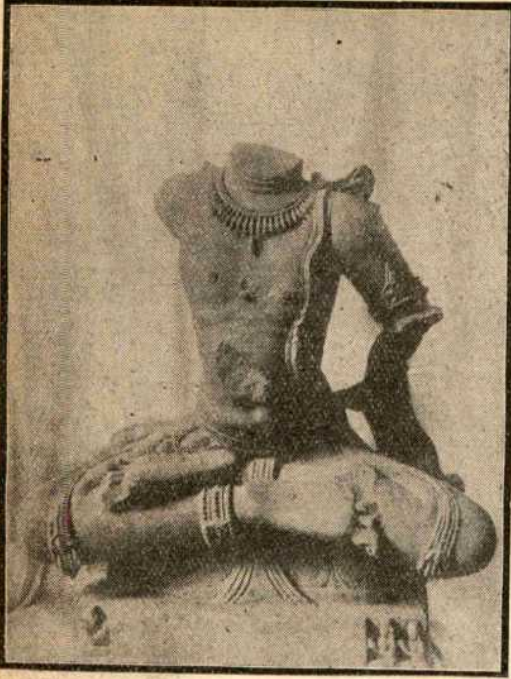


যাহ্নপুর (উড়িষ্যা)। পদে নূপুরযুক্ত “মল”। কর্ণে বিরাট অখণ্ড (জোড়হীন) কুণ্ডল (গণেশ)



বাদামী (খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) উপরের যুগল মূর্তির ও নীচের বিরাট মূর্তির গহনায় অল্প আদিম ও নতুন পরিকল্পনার মিশ্রণ (বিহু)

মাত্র বর্ণের প্রভেদ। তবে চূণী অধিক মূল্যবান ও অধিক আদৃত কেন ? উত্তর এই, যে, চূণী নীলা অপেক্ষা দুপ্রাপ্য। মুক্তা অপেক্ষা পুলকমণি (opal) রূপে, বর্ণে, ছাতিতে, স্থায়িত্বে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে আয়তনের পুলকমণির মূল্য দশ মুক্তা, সেই আয়তনের মুক্তার মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশমুদ্রা। কারণ মুক্তা পুলকমণি অপেক্ষা দুপ্রাপ্য।



সারনাথ, (খৃঃ অষ্টম—দশম শতাব্দী) কঠোর মণিখচিত হার। শুণ্ডাকৃতি দোলক সমষ্টির সন্নিবেশ। বাহ ও গুলফে দৃঢ়সংবদ্ধ স্বর্ণালঙ্কার।
কোনাকর গহনার সহিত সাদৃশ্য। (বোধিসত্ত্ব?)

উপরোক্ত কারণ বা যে কারণেই হউক, মহুয্য-সমাজে শ্রেণীবিভাগের ন্যায় ভূষণসামগ্রীর উপকরণের মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ হইয়া গিয়াছে; যথা, ধাতু মধ্যে স্বর্ণ, প্লাটিনম (বিদেশে পালাডিয়ামও) উত্তম, রৌপ্য মধ্যম ও কাংসতাম ইত্যাদি অধম। খনিজ প্রস্তর ইত্যাদির মধ্যে হীরক সর্বোত্তম (স্বভাবকুলীন); পদ্মরাগ নীলমণি মরকত (পান্না) উত্তম; বৈতুর্ষ্য, পুলক, গোমেদ, ফিরোজা, পুষ্পরাগ বৈক্রান্ত, কর্কটন ইত্যাদি মধ্যম; স্ফটিক, রাজাবর্ত, ব্রহ্মসুত্রময়, তামড়া ইত্যাদি অধম। প্রাণীজ পদার্থ মধ্যে মুক্তা উত্তম; প্রবাল, বিশেষ প্রকার কচ্ছপের খোলা (tortoise shell), হস্তিদন্ত, মুক্তাশুক্তি (Mother of pearl) মধ্যম; শঙ্খ, শৃঙ্গ, অস্থি ইত্যাদি অধম।

ইহা ভিন্ন অম্বর (amber), জেট (jet, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কঠিন অঙ্গার বিশেষ) ইত্যাদি কয়েকটি পদার্থ গহনার ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীতে স্থান পায়। বিদেশে পক্ষিপালক অতি সভ্য ও অতি অসভ্য উভয়েরই অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে।

এই সকল শ্রেণীবিভাগ আধুনিক সময়ের মতামতসারে

দেওয়া হইল। প্রাচীন কালে এইরূপ ভাগ ছিল না। এককালে ইস্পাত ও লৌহবিশেষ মণিকাঞ্চনের সমান স্থান পাইত। এখনো বাঙ্গালী হিন্দু সধবার মণিবন্ধে লৌহ অতি আদরের স্থান পায়।

দেশ ও কালের প্রভেদে রুচিরও পরিবর্তন যথেষ্ট দেখা যায়। যাহা একদেশের মতে সুন্দর তাহা অন্য দেশে কুৎসিত, এককালে যাহা সৌন্দর্য্য ও রুচিবোধের পরিচায়ক ছিল, এখন তাহাকে হেয় জ্ঞান করা হয়। প্ৰাচ্যাত্ম রমণীর পালকের শিরঃসজ্জা এদেশে কুরুচির পরিচায়ক; আবার এদেশের পায়ে গহনা—বিশেষে মাড়বারদেশীয়—বিদেশে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া গণ্য। সুবৃহৎ নখ ও নাকছাবি আমাদের চক্ষের উপর দিয়াই সামান্য ত্রিশ-বৎসরের মধ্যে অভিজাত্যের স্থান হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। আবার তাগা, বাজুবন্দ ইত্যাদি যাহা লম্বাহাত জ্যাকেটের অত্যাচারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, হাতকাটা ব্লাউসের কুপায় সে সকল পুনর্বার নূতনরূপে দেখা দিতেছে। চন্দ্রহার ত ফ্যাশন-রাছর কবলে গিয়াছে। ওদিকে পাইজের শিশুদের চরণে ফের দেখা দিয়াছে।

তবে কি মার্জিত রুচি ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের ভিত্তি কোনও চিরন্তন সত্যের উপর স্থাপিত নাই? এ দুই প্রশ্নের বিচারের ভার মনস্তত্ত্ববিদ ও ললিত-কলা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপর দেওয়াই উচিত। তবে সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, যে, রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ যদিও দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে পৃথক্ হয় এবং একই দেশে একই সময়ে ও সমাজে ভিন্ন-রুচিহীলোকঃ দেখা যায়—কারণ সমাজ, পরিবার ও শিক্ষাস্থলের আপেক্ষিক প্রভাবের উপর লোকের রুচিবোধ অনেক ধানি নির্ভর করে—তবুও একথা সত্য, যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সুন্দর জিনিষ আছে যাহার সৌন্দর্য্য, দেশকালপাত্রনির্বিশেষে অধিকাংশ সভ্য লোকেরই (অর্থাৎ যাহারা সুন্দর ও অসুন্দরের প্রভেদ বুঝেন) রুচিতে ভাল লাগে। কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাশ্মীর উপত্যকা, তাজমহল বা উদয়পুরের প্রাসাদ যে কোন দেশের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি-যুক্ত ব্যক্তির নিকট সুন্দর লাগে ও বহুকাল ধরিয়া লাগিয়া আসিতেছে।

আবার ইহাও দেখা যায়, যে, যাহারা এই দেশে বা বিভিন্ন দেশে স্ফুট ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান যুক্ত বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে প্রচণ্ড মত্ত-বৈষম্য উপস্থিত হয়। যথা, বিদেশে প্রাগ্‌রাফেল ও রাফেলপরবর্তী চিত্রকলা, এপষ্টাইনের ভাস্কর্য্য কলা, এদেশে ভারতীয় চিত্রকলা ইত্যাদি।



অঙ্কট।। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী। মুকুট ও বাহুর গহনার রচনা কার-
কৌশল ও পরিকল্পনা দ্রষ্টব্য

এই সকল কারণে মনে হয়, যে, স্ফুট ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার কতক অংশ স্বভাবজাত এবং কতক অংশ ক্রমবিকাশিত। এই শেষোক্ত কোন পথে, কি ভাবে এবং কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উপর মানুষের রূপ-উপলব্ধির (perception of beauty) মাত্রা, সূক্ষ্মতা ও তদ্বিষয়ক মতাবলী (degree, fineness and creed) নির্ভর করে। যিনি স্বাধীনচেতা ও যাহার স্বভাবজাত রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রবল, তাহার রূপ-উপলব্ধির স্বভাবজাত ও অর্জিত (acquired) অংশ, দুই-ই পরস্পরকে পরিপোষণ করে; যাহারা গুরুবাদী, তাঁহাদের গুরু উপর স্বভাবজাত অংশের নির্মাণ বা পরিপোষণ দুইই নির্ভর করে।

সকল জ্ঞান—ও জ্ঞানী লোক—যেমন বিকারের পথে যাইতে পারে, সেইমত রূপরসজ্ঞানেরও বিকৃতি হয়। চিত্তের অবসাদ দূর করার জন্ত, কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার চেষ্টায়, বা বিকারগ্রস্ত মনের তৃপ্তির নিমিত্ত—এইগুলির মধ্যে যে কোন কারণেই হউক, নিত্য নূতনের চেষ্টায় মানুষ



প্রথিত গহনা। পরিকল্পনা ও রচনা
সুন্দর। যক্ষিণী। বাটিনমারা,
ভারত।



গুলকে ও হস্তে গহনার বাহুল্য। উক্ত
দৃঢ় সংবদ্ধ গহনার কারুকার্যের ও
কল্পনার অভাব। প্রথিত গহনা
সুপরিকল্পিত ও কারুকার্য যুক্ত।
(অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছাচে ঢালাই
ও ডাই কাটা (Die cutting)
প্রক্রিয়ার জ্ঞানের অভাব?) ভারত
হৃদয়না যক্ষিণী।

অনেক কিছু জিনিষ বা প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাহার সঙ্গে সৌন্দর্য্যজ্ঞান, রুচি বা প্রকৃত গুণীর কল্পনার বিকাশের অল্পই সম্পর্ক থাকে বা কিছুই থাকে না। হৃৎকের বিষয় এই, যে, এই প্রকার সৃষ্টি, প্রকৃত গুণীর সৃষ্টি অপেক্ষা পরিমাণে বহু শত গুণ অধিক, এবং সেই কারণে এই প্রকারে সৃষ্ট পদার্থের চলও অধিক। কেননা, মনুষ্য-সমাজে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার অভাব আছে এবং ললিতকলার ক্ষেত্রে এই অভাব অতি দারুণ।

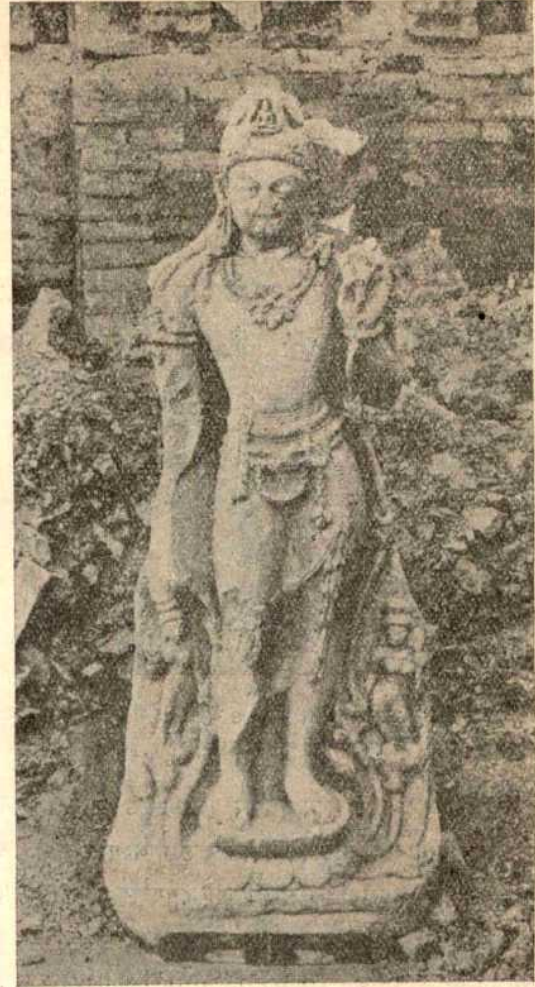
কখনও কখনও বহুকাল পরে পরে এরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় যাহাদের একাধারে, স্বাভাবিক রূপরসবোধ, মার্জিত রুচি, স্বাধীন চিন্তা, সুস্পষ্টভাবে স্বপ্রকাশ করিবার প্রবল ক্ষমতা, ও নেতৃপদের উপযুক্ত প্রচণ্ড যুদ্ধদেহি ভাব থাকে। ইহাদের প্রভাবে দেশে স্বরুচির ভাব আবার জাগ্রত হয় ও বিস্তর আবর্জনা দূর হইয়া যাহা প্রকৃতই সুন্দর ও যাহা প্রকৃতই মহান, তাহা যথাস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বসাধারণের নিকট প্রকট



তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মণিখচিত স্বর্ণের ঢুল। খৃঃ ৩য় শতাব্দী

হয়। এই সকল মহাপুরুষের জ্ঞান ও চিন্তার প্রকাশের ফলেই মানবের রূপরসজ্ঞান সজীব ও ক্রমোন্নতিশীল হইয়া থাকে। কারণ, লোকসভ্যতা ও লোকরুচি (culture and taste of the mass) চিরকাল সর্বদেশেই পশ্চাৎমুখী—যাহা অতীত যাহা গত তাহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে—এবং সেই কারণে উহা ক্রমেই হ্রাস হইয়া বিকৃত ও আবর্জনাপূর্ণ হয়। কারণ, যে শক্তি কেবল মাত্র পশ্চাৎমুখী, তাহা কালের প্রবাহে ভাসিয়া অগ্রসর হইলেও তাহার বিকাশ ও বৃদ্ধি অসম্ভব, তাহার বিকার ও ক্ষয় অনিবার্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এক কথা, ললিতকলার ক্ষেত্রে সাধারণের মত বা রুচি জড়তা ভিন্ন অস্ত্র কিছুই আনে না।

অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এই জড়তা ভিন্ন ধনগর্ব নামক



মঞ্জরী। সারনাথ। খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী। গলদেশের ও কটিকের গহনা। গহনা শিল্পে পরিকল্পনা ও রচনা শক্তির উৎকর্ষের নিদর্শন

আরও একটি মারাত্মক বিষ আছে, যাহার কারণে এই শিল্পের অবনতি সকল দেশেই অতি সহজে হয়। গহনার ব্যবহার যতই চলিত হউক, তবুও ইহা সত্য, যে, বিশেষ অর্থবল না থাকিলে ইচ্ছামত গহনা গড়ান সম্ভব নহে, এবং বিশেষ অর্থশালী ক্রেতার সাহায্য ভিন্ন কোনও শিল্পীর পক্ষে গহনার কার্য করাও সম্ভব নহে। এখন, ইহা সর্বজনজাত, যে, প্রভূত ধনবল ও উর্বর কল্পনা বা স্বরুচি একত্র সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। সুতরাং ধনীরা কল্পনা-বর্জিত গতানুগতিক মত অনুসারে গহনা নির্মাণ ভিন্ন শিল্পীর অগ্নি গতি নাই। সে প্রকার গহনায় স্বরুচি বা

সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় কতটুকু থাকে, তাহা বলা বাহুল্য।

সমাজেও সাধারণতঃ গুণীর গহনা অপেক্ষা ধনীর গহনারই অধিক খ্যাতি হয়। তাহার কারণ, অলঙ্কারের যাচাই বা আদর হয় কেবল মাত্র মূল্যের দ্বারা। প্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত চিত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ শিল্পীর পরিকল্পিত বা নির্মিত গহনার সেরূপ মূল্যাধিক্য এদেশে কেহ শুনিয়াছেন কি? স্তূতরাং দেখা যাইতেছে, যে, গহনার ক্ষেত্রে—অন্ততঃ পক্ষে এদেশে—শিল্পীর স্বরুচি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, কল্পনা, বা কারুকৌশলের বিশেষ আর্থিক সার্থকতা নাই; অতএব তাহার বুদ্ধিচাতুর্য্য বা কলাকৌশল প্রয়োগের নিমিত্ত প্রলোভনও নাই।



খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর বাইজাণ্টাইন তুল (Byzantine)

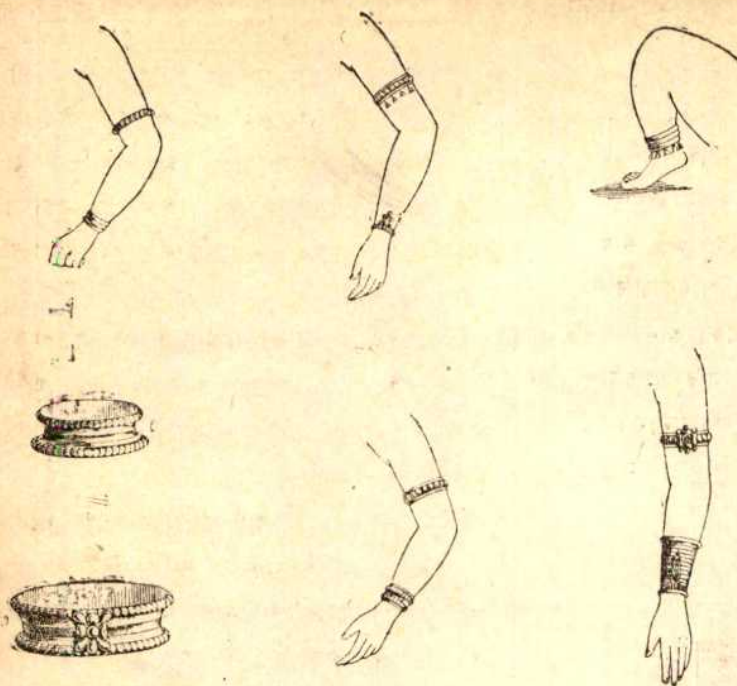
সভ্যতর দেশে—অর্থাৎ যে-সব দেশে রূপরসজ্ঞানের সমাদর আছে—গহনা-শিল্পের অবস্থা ঠিক একরূপ নহে। ধনীর সমাদর সে-দেশেও আছে এবং সে-দেশেও গহনার বিষয়ে ধনগর্ব্বের অসংস্কৃত বর্করোচিত পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সে পরিচয় সে দেশের সমাজে সম্মানের সহিত গৃহীত বা আদৃত হয় না।

এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশের এই প্রভেদের কারণ এইমাত্র, যে, সে সকল দেশে প্রকৃত রূপরসজ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের প্রভাবও এদেশের অপেক্ষা অনেক অধিক। এই প্রভাব যে চিরকালই

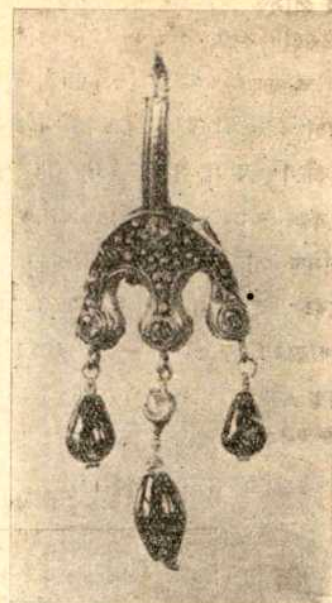


অঙ্কিত। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী

ছিল বা চিরস্থায়ী হইবে, তাহা নয়। সে দেশেও প্রথম প্রথম যাহারা জনসাধারণকে ললিতকলা বা রূপরসজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন পথ প্রদর্শন করেন, তাহাদিগকে এদেশের অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক তীব্র শ্লেষ, বিজ্ঞপ, সমালোচনা



খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িয়ায় হস্ত ও পদের গহনা। স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ-চাতুর্য্য ও চাক-পরিচালনার (elegance in design) অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন



খৃঃ দশম শতাব্দীর বাইজাণ্টাইন ছল (Byzantine)

ও বাধা সহ্য করিতে হয়। কারণ, সে সকল দেশে অল্প শিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষা যুক্ত “সবজাস্তার” সংখ্যা এদেশ অপেক্ষা শতগুণ অধিক।

কিন্তু সে সকল দেশের সৌভাগ্য এই যে, যে সকল জ্ঞানী এইরূপ পথ-প্রদর্শন-ব্রত ধারণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন, স্বদক্ষ, নির্ভীক ও অমিত-তেজা ব্যক্তি নেতৃপদ ধারণ করেন। সুতরাং জন-সাধারণের অন্ধ মত যতই প্রবল হউক, তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করা তাঁহাদের শক্তির অসাধ্য হয় না।

এ অভাগা দেশে যাহার জ্ঞানের লেশমাত্রও আছে, তাহার হয় উৎসাহের অভাব, নয় আয়াসকাতরতা ঘটে। সুতরাং এদেশে আছে কেবলমাত্র হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ ও ততোধিক অনিপুণ অহুঙ্করণ, ফলে কিছুত-কিমাকারের জন্ম—নহিলে অতীত রীতির (রূপরস বা কলাকৌশলের নহে) সমাধিমন্দিরধ্বংসস্তূপের পূজারূপ “কবর পরস্তুি।”

জাগ্রত রূপরসজ্ঞানের বিষয়ে এদেশের নিজস্ব যাহা কিছু অতীতে ছিল, তাহা লুপ্তপ্রায়, নূতনের ক্ষীণ আভাস

মাত্র পাওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডেও বিগত শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত তিন শতাব্দী ব্যাপী এইরূপ জড়ভাব ছিল। চিত্রকলায় ইটালীর অন্ধ অহুঙ্করণ এবং অগ্রান্ত শিল্পে ও ললিতকলায় ইয়োরাপের নানা দেশের—বিশেষে ফ্রান্সের ও অষ্ট্রিয়ার—অহুঙ্করণই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া গণ্য হইত।

এই জড়তা ও মৌলিকত্বের অভাবের বিরুদ্ধে গত শতাব্দীর শেষে ঐ দেশের কয়েকজন মনোবী ব্যক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে জন রস্কিনের নাম করা উচিত। ইহার অক্লান্ত প্রয়াস, তীব্র ও নির্ভীক সমালোচনা এবং রূপরসজ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রদর্শনের ফলে ঐ দেশে লোকমত জাগ্রত হয়। রস্কিনের পরেই উইলিয়াম মরিস, দাস্তে গাব্রিয়েল রসেটি, এডওয়ার্ড বরন জোনস, মিলে, এই কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা উচিত। মরিস অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থাতেই এক ভ্রাতৃমণ্ডল (Pre-Raphaelite Brotherhood) গঠন করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল ললিতকলা ও শিল্পে মৌলিকত্বের অহুঙ্করণ।

এই প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃমণ্ডলের প্রধান সভ্য ছিলেন মরিস ও এডওয়ার্ড বরনু জোনস।

অক্সফোর্ড হইতে শিক্ষালাভের পর মরিস স্থাপত্য কার্য (architect) শিক্ষার জন্য ট্রিট নামক স্থপতির নিকট শিক্ষা-নবিশরূপে কার্য করেন। সেই সময়ে ইনি ও বরনু জোনস অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ঐ পত্রিকা অল্প দিন পরেই উঠিয়া যায়; কেননা ইংলণ্ডের “শিক্ষিত” জন-সাধারণের মতের সহিত উহার মতামতের মিল ছিল না। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের ফলে রসেটি ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হন।



সায়নাথ বোধিসত্ত্ব (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। গলদেশের হার সকলে চারি প্রকার পরিকল্পনা। মধ্যস্থরে মণিখচিত স্বর্ণপুষ্পমালা ও তাহার কেন্দ্রে বৃহৎ জড়োয়া “খামি”। মুক্তামালার সঙ্গে সর্বনিম্নস্থরে স্বর্ণখটার সারি। কটিবন্ধে বক্ষ ও ভগ্নরেখাপাতে কারুকার্য।
 (“ছাচে ঢালাই” ও “ভাই কাটা”
 প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ?)

রঙ্গিনের প্রচণ্ড আক্রমণ ও এই রূপরসজ্ঞ কবি ও শিল্পিসংজ্ঞের চেষ্টা, এই দুইয়ের ফলে আধুনিক ইংলণ্ডে ললিতকলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যাহা কিছু মৌলিক বা নিজস্ব, সে সকলের স্তূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডের কলা ও রূপরসজ্ঞান বিষয়ে ইহাদের মতামতের ছাপ গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

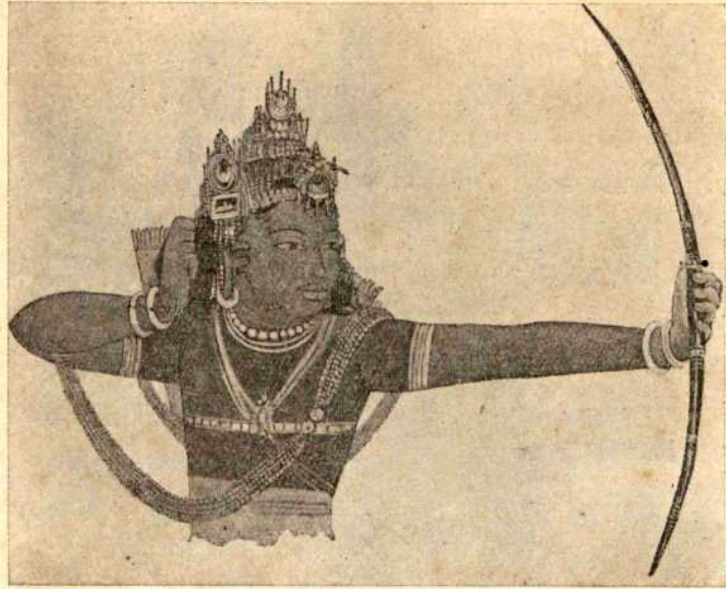
অল্প সকল সভ্য দেশেই ললিতকলা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কারণ, জাতির মধ্যে প্রাণ থাকিলেই যাহা নূতন, যাহা সজীব, তাহার বিদ্রোহ, বিকাশ, ও জয় অবশ্যজ্ঞাবী।

আমাদের দেশে গহনার ব্যাপারে ঠিক এই প্রকার অবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন লুপ্ত ঐতিহাসিক যুগের (মোহেঞ্জো দাড়োতে) যে সকল গহনা-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণকার ও মণিকারের কারুকৌশল তখনই এদেশে বেশ অগ্রসর হইয়াছিল—যদিও উহা কাংসযুগের (অর্থাৎ লৌহব্যবহার আবিষ্কারের পূর্বের সময়কার)। মোহেঞ্জো দাড়ো সন্ধ্যা বিশেষ এখনো কিছু জানা যায় নাই, সুতরাং ভারতীয় শিল্পের ধারাবাহিক উৎকর্ষের ক্রমে উহা আসিবে কিনা, তাহা বলা যায় না। তবে সেখানে গহনা যাহা পাওয়া গিয়াছে, সে সকলের অল্পরূপ অনেক গহনা এদেশে এখনো প্রচলিত আছে।

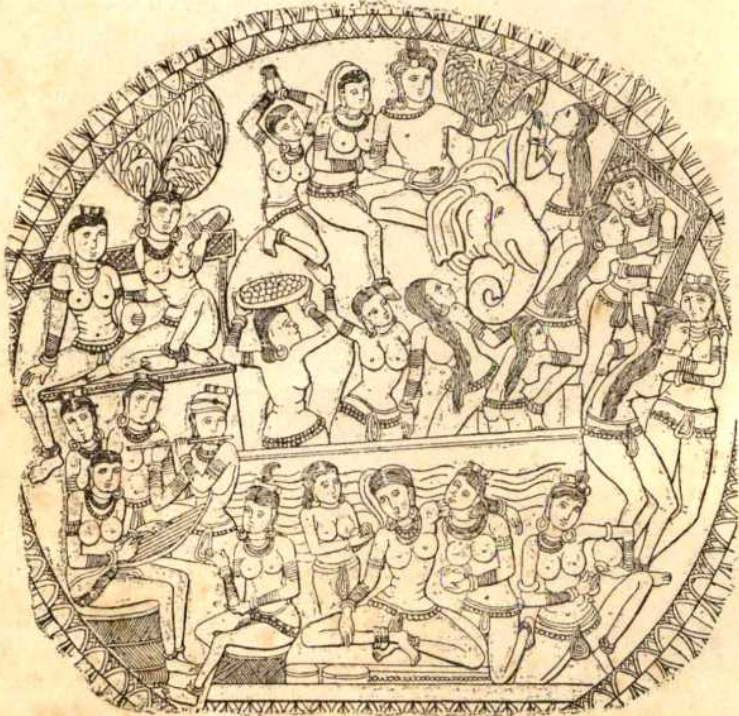
ঋগ্বেদে দেবতাদের গহনার বর্ণনা অনেক আছে। ঋতুর বর্ণনায় উজ্জল স্বর্ণাভরণের জ্যোতিষ্মন্ত পিঙ্গল দেহকাস্তি, স্তম্ভর সমহারশোভিত ইত্যাদি কথা পাওয়া যায়। অশুরদিগের বিষয়েও বর্ণনা আছে, যে, তাহাদের মণিকাঞ্চনের গহনা প্রচুর ছিল। রামায়ণ মহাভারতে কুণ্ডল, কবচ, কিরীট, বলয় ইত্যাদির ছড়াছড়ি আছে। তবে এসকল গহনার উপাদান ও নাম কি ছিল, তাহাই কেবল জানা যায়; আকৃতি বা আয়তন সন্ধ্যা বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অবশ্য অধিকাংশ নাম অনেক কাল পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল ও তাহাদের আকৃতি ইত্যাদি আমরা প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ও বিগ্রহ বা অঙ্কণ, ইলোরা, বাঘ ইত্যাদি স্থানের প্রাচীরগাত্রে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে দেখিতে পাই।



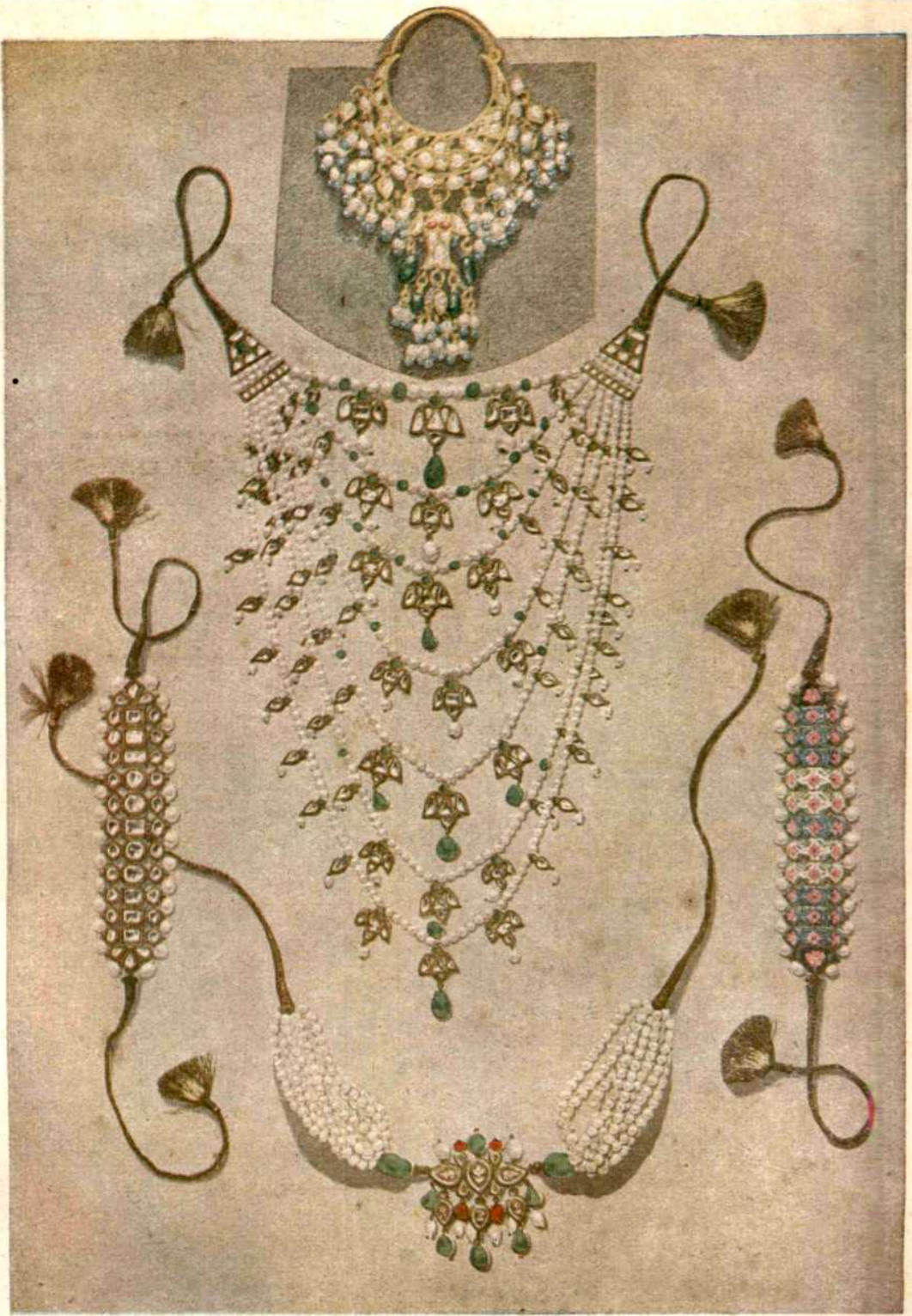
উড়িয়া। কোণার্ক। খৃঃ দ্বাদশ
শতাব্দী। কঙ্কন, বলয়, বাজু,
পাইজোর ও পদভূষণ। মণি-
নংযোজিত দৃঢ়সংবদ্ধ
গহনার নিদর্শন।



অজন্টা। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী। যোদ্ধাবেশে নৃপতি বা অস্ত্র সম্ভ্রান্ত পুরুষ। মুকুটে
অতিবৃহৎ মণি (বা মিনা ? মিনা হওয়াই সম্ভব) বক্ষোপরি লব্ধমান মণিময়
ধাতু (স্বর্ণ) রজ্জ্ব তুণীর-বন্ধনীরূপে ব্যবহার।



অমরাবতী। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। গহনায় আদিম পরিকল্পনা ও গহনাবাহুল্য



ভূতপূর্ব ভারত-সাম্রাজ্যী আলেকজান্দ্রার বিবাহে মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত উপহার
ভারতীয় অলঙ্কার। অকণ্ঠিত মণি-বিছাসের নিদর্শন

(Gems cut en Cabochon)

অর্থশাস্ত্রে কয়েকটি মুক্তাহারজাতীয় গহনার বর্ণনা আছে। যথা—

“শীর্ষক (মধ্যে একটি বৃহৎ দুই পার্শ্বে সমান মুক্তা সম্বলিত), উপশীর্ষক (মধ্যে পাঁচটি বৃহৎ দুই পার্শ্বে সমান মুক্তা সম্বলিত), প্রকাণ্ডক (মধ্যে একটি বৃহৎ দুই পার্শ্বে ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন মুক্তা যুক্ত), অবঘাটক (সকল মুক্তা সমান), ও তরল গ্রন্থিবদ্ধ (মধ্যে বর্তিত হীরা দুই পার্শ্বে মুক্তা), এই কয় প্রকার মুক্তার যষ্টি (মালা) হইয়া থাকে।



অজটা। আদিমযুগ (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) বিপুল কঙ্কন ও বাজু। বৃহৎ ধাতুহার। উপরে বৃহৎ হারের আধুনিক নিদর্শন (দার্জিলিং ভুটিয়া স্ত্রীলোক)

“একহাজার ও আট যষ্টি (ছড়া) মুক্তার মালায় ইন্দ্র-চ্ছন্দ হার নির্মিত হয়। তার অর্দ্ধসংখ্যায় বিজয়চ্ছন্দ। চৌষটি যষ্টিতে অর্দ্ধহার। চুয়ান্ন যষ্টিতে রশ্মিকলাপ। বত্রিশ যষ্টিতে গুচ্ছ। সাতাইশ যষ্টিতে নক্ষত্রমালা। চব্বিশ যষ্টিতে মানবক, তদর্দ্ধে অর্দ্ধমানবক।

“ঐ হার সকলের কেন্দ্রে একটি মণিযুক্ত হইলে ঐ সকল নামের সহিত মানবক শব্দ যোগ করিতে হয় যথা ইন্দ্রচ্ছন্দ মানবক।

“যদি হারের সকল মুক্তার ছড়া শীর্ষক প্রকৃতি হয়, তবে সেই হারকে ‘শুদ্ধহার’ বলা হয়, বা হারের সকল ছড়া যদি একই প্রকৃতির হয় (অর্থাৎ কেবল শীর্ষক অথবা কেবল উপশীর্ষক ইত্যাদি; একটি শীর্ষক, অন্যটি উপশীর্ষক, আরেকটি অবঘাটক, এইরূপ নহে) তবে তাহাকেও শুদ্ধহার বলা হয়। কেন্দ্রে মণিযুক্ত হারকে অর্দ্ধমানবকও বলা হয়।

“কেন্দ্রে তিনটি বা পাঁচটি ফলকাকৃতি মণিযুক্ত হারকে ফলক হার বলা হয়। এক ছড়া মুক্তার মালার নাম শুদ্ধ একাবলী। তাহার মধ্যস্থলে একটি মণি যুক্ত হইলে তাহার নাম যষ্টি। তাহা স্বর্ণমণি (সোনার মটর দানা) মিশ্রিত হইলে তাহার নাম রত্নাবলী। একটি মুক্তা একটি স্বর্ণমণি (সোণার মটর দানা) পরপর স্থাপিত হইলে তাহার নাম অপবর্তক।

“হারের মুক্তার যষ্টির মধ্যে স্বর্ণসূত্র (এক ছড়া মুক্তা, একটি সোণার তার, আবার এক ছড়া মুক্তা) থাকিলে সেই হারের নাম সোপানক। ঐ প্রকার হারের কেন্দ্রে মণিমাণিক্য থাকিলে তাহার নাম মণিসোপানক।

“উপরোক্ত বিবরণে শির, হস্ত, পাদ, কটি ইত্যাদি স্থলের গহনা গঠনের উপায় দত্ত হইল।”

ইহা ভিন্ন অত্র কোন প্রকার গহনার বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে নাই, যদিও মণি-সংযোজন (জড়োয়া) কার্য ইত্যাদির যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয়, যে, স্বর্ণকার ও মণিকারের শিল্প তখনই অনেক থানি অগ্রসর হইয়াছিল। স্বর্ণকারের বিবিধ প্রকার কার্যের এইরূপ বর্ণনা আছে যথা :—

“ঘন (নিরেট), ঘন স্থষির (নিরেট শৃঙ্গগর্ভ যথা বাটি গেলাস) সংযুজ্য (বাল দেওয়া Soldering), অবলেপ (প্রলেপ দেওয়া), সজ্জাত্য (বেষ্টন কার্য, যথা কটিবদ্ধ), বাসিতকং (গিলটি করা), এই কয় প্রকার কারুকর্ম।”

ইহা ভিন্ন স্বর্ণালঙ্কারের প্রকৃতি অল্পসংখ্যক নাম



প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীন খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর কেশবন্ধন ও শিরোভূষণ এবং কর্ণের ছল। (উড়িষ্যা)। আধুনিক—মধ্যে আধুনিক চীনদেশীয়া মহিলা। দক্ষিণে ফরাসী মহিলা, শিরে টায়রা কর্ণে ঝুমকা ছল, গলদেশে মুক্তামালা। বামে ইংরাজ মহিলা, শিরে চ্যাপলেট (chaplet), কর্ণে ছল।

আছে; যথা—পূর্বাভ (কাপা), অষ্ট মণিদংঘোজন (jewel setting) ইত্যাদি।

সে সময়ে জড়োয়ার কার্যে যে প্রকার স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত তাহা দশভাগ স্বর্ণে চারভাগ রৌপ্য বা তাম্র মিশ্রিত (১৭ ক্যারট), বা সমান ভাগে মিশ্রিত স্বর্ণ ও তাম্র (১২ ক্যারট)।

অর্ধশাস্ত্রের সমসাময়িক ভারতে গহনা-শিল্পের কারু-কার্য বেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; যদিও ঐ গহনা-গুলির আকার ও আয়তনে বেশ কিছু আদিম (archaic) ভাব পাওয়া যাইত। যথা, গলায় স্থূল বেলনাকার (cylindrical) কারু-কার্য খচিত ধাতুখণ্ডের মালা, হস্তে অতিপ্রশস্ত (overwide) ব্রেসলেট, পায়ে বৃহৎ “বাকমল” ও গুলফ হইতে জজ্বা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৈচান মল, কর্ণে প্রকাণ্ড ঝুলান কুণ্ডল, এই সকল গহনা তখনকার দিনে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তখনই অনেক সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত গ্রথিত গহনা ব্যবহৃত হইত, ও এই সকল গহনার মধ্যে কয়েকটি অতি সুন্দর-আকৃতি ও কারুকার্যভূষিত ছিল।

মণি কর্তন ও মন্ডন করণ, ছিন্ন করা ইত্যাদি কার্যে এদেশের মণিকারগণ তখনই অতি আশ্চর্য্য কুশলী ও বিদগ্ধ ছিল। তাহার প্রমাণ এখনও পিপারোয়া পাত্র (Piparawa Vase) মধ্যে প্রাপ্ত নিদর্শন সকলে বর্তমান এবং প্রাচীন বিদেশীয় লেখকগণও সেকথা প্রশংসার সহিত বলিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে খাটি এদেশীয়, ও বিদেশী প্রভাবযুক্ত—যথা গ্রীক (গান্ধার),

পারসীক—এদেশজাত অনেক প্রকার গহনার ব্যবহার প্রচলিত হয়। ক্রমেই গহনার আকৃতি ও আয়তন সংস্কৃত ও মার্জিত-ভাবাপন্ন হয়। ওজন অপেক্ষা রচনা ও কারু-কৌশলের আদর সে সময় বাড়িতে থাকে। অজ্ঞতার চিত্রাবলী, এবং মথুরা, উড়িষ্যা, ইত্যাদির ভাস্কর্য-শিল্পে একই অঙ্গে পরিহিত নানা প্রকার গহনার পরিকল্পনা ও রচনা দেখা যায়।

এই সকল গহনার প্রকৃত রূপ গঠন ইত্যাদি আমরা অজ্ঞতা, বাঘ ইত্যাদি গুল্মা মন্দিরের প্রাচীরচিত্রে এখনো দেখিতে পাই। সেই সকল চিত্রে ও সমসাময়িক মন্দিরগাত্রস্থ মূর্তির অঙ্গে যে সকল গহনার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, যে, ঐ সময়ে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণকার ও মণিকার ইত্যাদির কারুকৌশল সর্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে হিন্দু অলঙ্কার-শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। আকারে, প্রকারে, রচনানৈপুণ্যে সে সময়ে অলঙ্কারের বৈচিত্র্য সর্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।*

খৃঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গহনা-শিল্পের ঐরূপ উচ্চ আদর্শ বর্তমান ছিল; কিন্তু ঐ সময়ের গহনায় ক্রমবিকশিত শিল্প-কৌশল ও নিখুঁত ভাব ভিন্ন কোনও বিশেষত্ব ছিল না। কারণ, বোধ হয় তখনই পূর্বকালের শিল্পীর কার্যের উৎকৃষ্ট অনুকরণ এবং সেই দ্রব্যের আরও সংস্কৃত নিদর্শন প্রস্তুত

* তুলনার জন্ত ঐ সময়ের বাইজান্টাইন—প্রাচীন ইয়োরোপের সভ্যতম শিল্পীজাতি—দুইটি নিদর্শনের চিত্র দেওয়া হইল।

করাই শিল্পীর আদর্শ হইয়া পড়ে, যাহার ফলে শিল্পীর কল্পনায় জড়তা আসে।

অজ্ঞা চিত্রাবলীতে এদেশীয় গহনা-শিল্পের নয় শত বৎসরের ইতিহাস (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত) অঙ্কিত আছে। ঐ চিত্রাবলীর গহনা যে কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের শিল্পের নিদর্শন নহে, তাহার প্রমাণ এই, যে, উহার মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (২ম ও ১০ম গুহা), তাহার সহিত সমসাময়িক আধ্যাবর্ত্তের (সাঁচি ও ভাকট) ভাস্কর্য্য শিল্পে অঙ্কিত গহনার সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। প্রথম যুগেই যখন এত সাদৃশ্য, তখন পরবর্ত্তী কালের গহনাও একই প্রকার হওয়া স্বাভাবিক। কেননা কালের প্রবাহের সহিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল।

প্রথম যুগের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ প্রথম) গহনা অতি স্থূল, ও স্থূল কারুকার্য্য অপেক্ষা গঠনবৈচিত্র্য্য বিষয়েই অপূর্ণ। অতি বৃহৎ আকার ও গঠন দেখিয়া মনে হয়, যে, ঐ সকল গহনা ফাঁপা তাম্র পিত্তল কাংস বা স্বর্ণপাতের নিৰ্ম্মিত ছিল। নিরেট হইলে সাধারণ ধাতু হিসাবেই উহা ভারী স্বর্ণ হইলে ত অসম্ভব গুরুভার; কর্ণভরণ নিরেট হইলে কান ছিঁড়িয়া যাইত।

ইহার পরের যুগের গহনা অনেক অধিক কারুকার্য্য-যুক্ত হয়। বিশেষে গ্রথিত গহনা—মুক্তা বা নল, বর্ন্তুল বা অল্প কোন আকৃতির ছিদ্রযুক্ত ধাতুখণ্ড—অতিশয় প্রচলিত হয়। এইরূপ গ্রথিত (মালা গাঁথা) গহনা সর্বদা ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ঐ ধাতুখণ্ড মণিমুক্তা-সম্বলিত হইতে থাকে। মণিমুক্তার ব্যবহার অবশ্য পূর্বকালেও ছিল (শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সময় (খৃঃ প্রথম শতাব্দী) ঐ সকলের আকার ও আয়তন অল্পসারে বিস্তারের কার্য্য অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হইতে থাকে। মণিসকলের কর্ণে কোণযুক্ত আকারই আদর্শ ছিল (cutting en cabochon)।

ইহার পর বিশেষ আকারযুক্ত দৃঢ়সংবদ্ধ (গাঁথা নহে) বা এক খণ্ডে প্রস্তুত গহনা—যথা বলয়, কবচ,

কুণ্ডল ইত্যাদি—ব্যবহৃত হইতে থাকে, ও ঐ সকলের আকৃতিবৈশিষ্ট্যও আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধাতু-তন্ত্র (wire), “পেটাই কাজ”, ধাতুরজ্জু (twisted wire) ও সঙ্গে সঙ্গে মণিসংযোজিত ধাতুর (জড়োয়া) গহনার ব্যবহারও দেখা যায়। ক্রমে গহনার আকৃতি, নিৰ্ম্মাণপদ্ধতি (যথা অতি স্থূল স্বর্ণ বা রৌপ্যের “কটিক কাজ” (filigree) মণিমুক্তা দ্বারা বর্ণ-বিভ্রাস, মণিকর্ষন-পদ্ধতি (মিনার ব্যবহারও বোধ হয় এই সময়ের) ইত্যাদিতে বিশেষ লালিত্য, বৈচিত্র্য্য ও নিপুণ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞটার শেষের যুগের (খৃঃ পঞ্চম হইতে সপ্তম, শতাব্দী) গহনার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

নৃপতিদিগের মুকুট, স্ত্রীলোকদিগের শিরোভূষণ, উচ্চপদস্থ পুরুষদিগের কাকী বা মেথলা (অনেকের মতে সম্ভবতঃ ইহা যজ্ঞোপবীতের আবরণ, কেননা ইহার ব্যবহারও একরূপ; ইহা পদস্থ যোদ্ধাদিগের ভূগীর-বন্ধন ছিল*), কিন্তু বোধ হয় গল-দেশের হার, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কটি-বন্ধ—সম্মুখে বন্ধনী- (brooch) যুক্ত-স্ত্রীলোকদিগের মেথলা, চন্দ্রহার, ইত্যাদিতে অতিশয় মার্জ্জিত রুচি, নিপুণ শিল্পীর কারুকৌশল, জ্ঞানী কলাবিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও রূপরসজ্ঞের পরিকল্পনা একাধারে সকলই পাওয়া যায়। গহনায় স্থূল ও স্থূলের বিচার, আয়তনের সংমিতি (proportion), স্থূল কারুকার্য্য এবং মণি সংযোগে আকার আয়তন ও বর্ণচ্ছায়ার বিচার ও বিভ্রাস, এই সকল উচ্চ জ্ঞানের শিল্পজ্ঞান, ঐ স্বদূর প্রাচীন কালের ভারতে কিরূপ প্রথর ছিল, তাহার সাক্ষ্য অজ্ঞটার চিত্রাবলী আজও দিতেছে।

আশ্চর্য্য এই যে, সমগ্র অজ্ঞটার চিত্রাবলীতে কোথাও নাসিকার (নথ, ফুল, নোলক, নাকছাবি ইত্যাদি), পদাঙ্গুলির গহনা (চুটিকি, নুপুর বা আংটি) দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও কর্ণের “মাকড়ি ছল”, মণিবন্ধের বলয় ব্রেসলেট, ও বাজু তাবিজ অঙ্গুরীয়ক (আংটি) ইত্যাদি গহনার বিভিন্নপ্রকার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কোণযুক্ত মণিকর্ষন পদ্ধতিরও কোনও বিশেষ পরিচয় অজ্ঞটায় পাওয়া যায় না।

* অজ্ঞা চিত্রাবলীতে যোদ্ধ পুরুষের জ্ঞের ভূগীর বন্ধন দ্রষ্টব্য।



অজ্ঞাট। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী। গহনার সূচ, বাহ্যল্যদোষ বর্জন ও পরিকল্পনায় সূক্ষ্মভাবের বিকাশ।
দৃঢ়সংবদ্ধ গহনা নির্মাণে দক্ষতার পরিচয়।

অজ্ঞাটার শেষের যুগে গহনার ব্যবহারে ও ধারণ-পদ্ধতিতে বিশেষ মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গহনার বাহ্যল্য বা অশোভন ব্যবহার কোথাও পাওয়া যায় না। পাণ্ডের গুলফের গহনা (মল-পাইজোর বা নুপুর) সাঁচি বা অমরাবতীর মূর্তির স্তায় স্থূল বা বহুসংখ্যক নহে এবং সর্ব অঙ্গের গহনার মধ্যে সামঞ্জস্য (অসামঞ্জস্য-দোষবিহীনতা) আছে।

সাঁচি (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) ও অমরাবতীর (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দী) গহনা এবং অজ্ঞাটার প্রথম যুগের গহনায় (নবম ও দশম শতাব্দী, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) বাহ্যল্য, অসামঞ্জস্য ও গঠনবিকৃতি এই তিনই আছে, কিন্তু অজ্ঞাটার ও অমরাবতীর কোন কোন গহনার (যথা “বাজুর” গহনা ও কুণ্ডল) কারুকাণ্ডের ও গঠনের বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট।

ভারুটের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) গহনায় দৃঢ়সংবদ্ধ

যাহা কিছু, তাহার মধ্যে রচনা বা গঠনের বিশেষত্ব কিছুই নাই, বরং গুলফের গহনা অনিপুণ ও বাহ্যল্যদোষযুক্ত। কিন্তু ধাতুহারের রচনায় ঘনচতুর্ভুজ নলখণ্ডের (rectangular hollow pieces চারকোণা নলের খণ্ডের) বিস্তারিত সূক্ষ্ম ও শোভন, সন্দেহ নাই।

ঐ সময়ের উড়িষ্যার উদয়গিরি রাণীগুপ্তার গহনা অতি স্থূল ও কদাকার।

খৃঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি স্বর্ণময় গহনা এক বৌদ্ধ স্তূপে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কর্ণাভরণ (কুমকা-জাতীয়) বিশেষ। উহাতে তখনকার শিল্পীর সূক্ষ্ম কার্যের ও পরিকল্পনার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর (কুবান যুগের) গহনার পরিচয় মথুরার ঐ কালের ভাস্কর্য্য শিল্পে আমরা পাই। তাহাতে হার ভিন্ন অল্প গহনার বিপুল আকার ও বাহ্যল্য এই দুই দোষ আছে। কিন্তু হারের গঠন ও রচনা দুই সূক্ষ্ম।



অমরাবতী। তুল গহনা ও গহনার বাহ্যিক আদিম অসংস্কৃত রূপের নিদর্শন (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)

খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-শিল্পে (দেওগড়, উদয়গিরি, গোয়ালিয়র ও বিহার) গহনার নিদর্শনে দেখা যায়, যে, বাহ্যিক ও বিপুল আকার এই দুই দোষ দূর হইয়াছে এবং সর্কাদ্বয়ের গহনায় শিল্পীর কল্পনা ও অপূর্ণতার (originality) পরিচয় পাওয়া যায়। দৃঢ়সংবদ্ধ কণ্ঠভরণ, মুকুটের নূতন পরিকল্পনা, ইত্যাদির স্বত্বপাতও এই সময়ে লক্ষিত হয়। দেওগড়ের একটি মূর্তিতে জীলোকের নূতন প্রকার মেখলা (চন্দ্রহার) ও মেখলাবন্ধনার নূতন পরিকল্পনা দেখা যায়।

খৃঃ পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দীর গহনার নিদর্শন, পশ্চিম ভারতে অজ্ঞাটা, বাদামা, এলুরা ও এলিফ্যান্টা, এবং উড়িষ্যায় মুক্তেশ্বর মন্দিরে পাওয়া যায়। ইহাই বোধ হয় পরিকল্পনা, উদ্ভাবন ও অপূর্ণতার হিসাবে হিন্দু গহনাশিল্পের চরম উৎকর্ষের যুগ। ইহার পরবর্তী

যুগের কোণার্ক ভাস্কর্য্য-শিল্পের গহনার রচনা ও নির্মাণ-কৌশল অত্যাশ্চর্য, কিন্তু সে-সকল গহনার পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রশংসার অধিকাংশ ঐ পূর্ব যুগের শিল্পীদের প্রাপ্য। তাহাদেরই কল্পিত ও উদ্ভাবিত কলার ক্রমোন্নতি হইয়া কোণার্ক যুগের হিন্দু গহনা-শিল্পের আবির্ভাব হয়। এই যুগের (খৃঃ পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী) গহনার পরিচয় অজ্ঞাটার বিবরণীতেই দিয়াছি।

কোণার্কের (খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী) গহনার বিশেষ পরিচয় কি দিব? সে যুগের প্রত্যেকটি গহনা তখনকার ললিতকলার রত্নকল-উজ্জল নিদর্শনবিশেষ। কারুকার্যের নৈপুণ্য, স্বল্প অথচ দৃঢ় রেখাপাতে, লালিত্যে ও গঠনকৌশলে সে-সকল অতুলনীয়। দৃঢ়-সংবদ্ধ, গ্রথিত, সুদৃঢ়ভাঙিত (hammered), মণি-

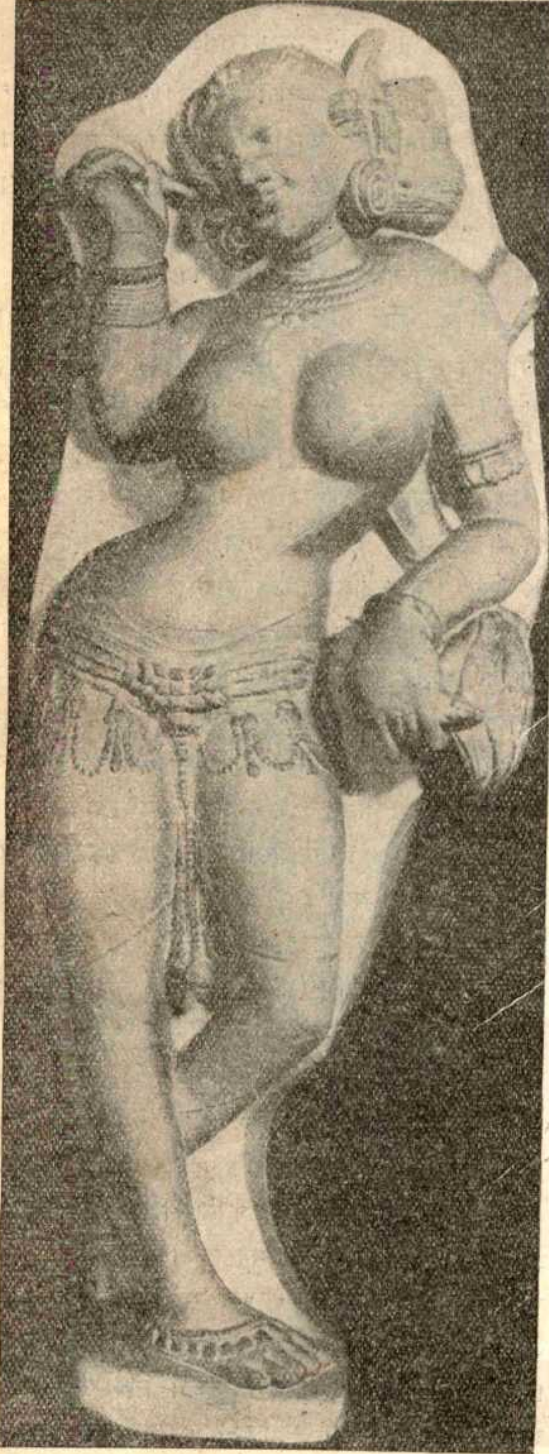
সংযোজিত, পৃথিত (কাঁপা) ইত্যাদি সকল পদ্ধতির অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ঐ সময়ের শিল্পে পাওয়া যায়।

মণিকর্তন, মিনা ইত্যাদি অল্প কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ ভিন্ন অঙ্গ কোন বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য বা পূর্বদেশীয় গহনাশিল্পী অজ্ঞাটা ও কোণার্ক যুগের শিল্পীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, ইহা নিঃসন্দেহ; এমন-কি এ যুগের শিল্পী তাহাদের সমকক্ষ কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তুলনার জন্য পাশ্চাত্য গহনা-শিল্পের রাজধানী প্যারিসের সর্বশ্রেষ্ঠ গহনা-শিল্পের (প্যারিস ইত্যাদি প্রদর্শনীতে সর্বোচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত) কয়েকটি নিদর্শন ও মহারানী অংলেক্জান্ডার বিবাহের ঘোতুক রূপে দত্ত (অতএব অত্যাশ্চর্য) ভারতীয় গহনার কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইল। অজ্ঞাটার শেষ যুগের ও কোণার্ক ইত্যাদির গহনার সহিত পাঠক তুলনা করিয়া দেখিবেন।

পূর্বে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইলা বুঝা যায়, যে, গ্রথিত বা সংলিষ্ট (linked) অলঙ্কারের ব্যবহার এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিত। অর্থশাস্ত্রের মালা-নির্মাণ বিবরণ এই প্রবন্ধেই লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মপদে (খৃঃ পূঃ বা খৃঃ ১ম শতাব্দী) রাজকোষাধ্যক্ষের কন্যার জন্য মেখলা নির্মাণের বিবরণ আছে। ঐ অলঙ্কারের প্রধান অংশ একটি স্বর্ণময় মণিযুক্ত ও মণিখচিত ময়ূর। ময়ূরের দুই পাশে পাঁচশত করিয়া এক সহস্র লোহিত স্বর্ণময় ময়ূরপক্ষ (পালক) ছিল। অতএব সেই গহনায় অন্তত পক্ষে ১০০১টি মণিমাণিক্য ও কারুকার্য-খচিত অংশ ছিল। সুতরাং স্বর্ণের উপর অলঙ্কারে এদেশের শিল্পী তখনই অতিশয় দক্ষ।

একথণ্ডে নির্মিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গহনা (যথা বলয়, অনন্ত, হাম্লি) কিন্তু ঐ আদিযুগে বিশেষ সুদৃঢ় বা সুগঠিত হইত না। ভারত সঁচি অমরাবতীর ঐ প্রকায গহনা অতি বৃহৎ ও কুৎসিত। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়, যে, ঐ যুগের শিল্পী বোধ হয় স্বল্প ঢালাই ও কুন্দন (কোঁদা, turning, lathework) কার্ঘ্যে ততটা সিদ্ধহস্ত ছিল না, সুতরাং স্থূল ঢালাই করিয়া হাতুড়ী ও ছেনী বাটলী দ্বারা কার্ঘ্য সম্পন্ন করিত। ঠিক ঐ কারণেই বোধ হয় কণ্ঠহার ইত্যাদিতে প্রথমতঃ সমস্ত অংশ সমরেখায় রচিত



উড়িষ্যা। খৃঃ দশম শতাব্দী। অশোকবৃক্ষ-দলনরতা যুবতী

হইত। পরে কুম্ভন ও সূক্ষ্ম ঢালাইয়ে দক্ষ হইলে শিল্পী তাহার পরিকল্পনায় ভগ্ন রেখা, শুণ্ডাকৃতি লম্বমান অংশ ইত্যাদির সমাবেশ করে।

স্বর্ণ-রৌপ্যের সংঘাত (ঝাল দেওয়া) বিদ্যাও এদেশে বহুপ্রাচীন; সূত্রাং স্বর্ণস্থলনির্মিত (filigrain) অলঙ্কার-নিৰ্মাণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

এই প্রবন্ধের ত্রিবিধ চিত্রগুলির পরিচয়

ইয়োৰোপীয় গহনা—

চিত্রের সর্কোপরিভাগে—দুইটি অত্যাধুনিক চুলের কাটা (ফরাসী পরিকল্পনা)। উপকরণ স্বর্ণ, মৃত্তাশুক্তি (Mother of pearl), মিনা এবং উপরত্ন (Semi-precious stones)।

উপরি মধ্যভাগ—কণ্ঠাভরণের চিত্র। চিত্র মধ্যে দুইটি “হুল” এবং একটি দোলক (pendant ধুকধুকি)। কণ্ঠাভরণের শুণ্ডাকৃতি দোলকসকলও কোণার্কের পরিকল্পনার মত। মণিসংযোজনও প্রাচীন ভারতীয় প্রথার। মণিগুলি কোণশূলভাবে কঙ্কিত। হুল ও দোলকের পরিকল্পনা মণিসংযোজন ইত্যাদি সমস্তই ভারতীয় মতে। গহনার প্রস্তুতকারক পেটিটো নামক প্রসিদ্ধ পারী নগরস্থ অলঙ্কারনিৰ্মাতা (ফরাসী)।

মধ্যভাগে—একটি চিত্রণি ও একটি মুকুট (Tiara)। মণিকর্তন-প্রথা ভারতীয় প্রথার সদৃশ কিন্তু পরিকল্পনা ও চিত্রণিতে “কামিও” (Cameo) সন্নিবেশ ফরাসী “এম্পায়ার” আদর্শ অনুযায়ী।

অধোমধ্যভাগ—“এম্পায়ার” আদর্শের কণ্ঠাভরণ ও দোলক (ফরাসী)।

অধোদক্ষিণভাগ—ভারতীয় আদর্শের হুল (ফরাসী প্রসিদ্ধ জহরী নির্মিত)।

সর্বনিম্নে—ক্রচ্ (বন্ধনী) স্বর্ণনির্মিত, ভারতীয় প্রথায় নানাবর্ণের মণিগু (কোণশূল) সন্নিবেশে উপল-চিত্র (Mosaic) অঙ্কন। অত্যাধুনিক ইংরাজী পরিকল্পনা।

উপরোক্ত গহনাগুলি প্রদর্শনী সকলে পুরস্কার প্রাপ্ত।

ভারতীয় গহনা—

উপরে সুমকা। স্বর্ণ, মুক্তা, মিনা এবং কোণবিহীনভাবে
কর্তিত মণি দ্বারা নির্মিত। কোণবিহীন মণি সমাবেশে
বর্ণের স্নিগ্ধতাব দ্রষ্টব্য। ১৮শ শতাব্দীর দিল্লীর
গহনা।

অল্প সকল গহনা, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক মহারাণী
আলেকজান্দ্রাকে বিবাহযৌতুকরূপে প্রদত্ত ভারতীয়
অলঙ্কার। বর্ণসমাবেশের লালিত্য, পরিকল্পনার স্পষ্ট
প্রকাশ ও কঠোর জ্যোতিষ্করণবিহীনতা দ্রষ্টব্য। তাবিজ,
মোহনমালা ও হার

অঙ্কটা। রাজ্যীর প্রসাধন, রাজ্যীর অঙ্গের গহনা—

শিরে মুকুট (ভাস্কর ও স্বর্ণ নির্মিত) বর্জ্য লাক্ষার মণি-
সংযোজিত। গলদেশে বৃহৎ মুক্তামালা (মণিহীন)
বাজুবন্ধ, মেখলা, বলয় (দৃঢ়সংবদ্ধ ও গ্রথিত)।
পায়ে কারুকার্যবিহীন “মল”। চামরধারিণীর মণিবন্ধে
বৃহৎ গহনা (আধুনিক উড়িয়ার গহনা)।

অঙ্কটায় নাসিকার গহনার চিত্র নাই। ত্রয়োদশ
খৃঃ পর্যন্ত অঙ্ক কোন এদেশীয় মূর্তি বা চিত্রে ও তাহার
নিদর্শন পাই নাই। স্বতরাং নাসিকার গহনা অহিন্দু
বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ *

বাণী যার অভিক্রমি* স্বপ্নের সহস্র তোরণ
শাস্ত-শিব-রূপোত্তমে ধ্রুবলোকে করিল আরতি,
মস্ত্রে যার উদীরিত মধুচ্ছন্দা বিশ্বের ভারতী
ভারত-ভারতী-মুখে, তাঁরে আজ করি গো বরণ,—
অতীত-কীর্তির কূলে ভারতের বাণী-আহরণ,
তারি যোগ্য পুরোধার পদে। মোরা ক্ষুদ্র স্বপ্নমতি,
উৎসাহ-অধীর,—সত্য-স্বপ্নের হে স্বস্ত-সারথি।
হোমভঙ্গ-পূত হস্ত রাখ শিরে শঙ্কা-নিবারণ।

হেরিয়াছ তুমি, কবি, হেথা মহামানব-সাগরে
বিরাট মিলন-মেলা!—ভারতের সে তীর্থ-প্রমাণ
দেখি মোরা দেশে দেশে লেখা আছে অক্ষয় অক্ষরে।
সসাগরা ধরিত্রীরে নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণ সমান
একদা হেরিল যারা, তাহাদেহি শ্রেষ্ঠ বংশধরে
পূজে আজ এই ‘মহা-ভারত’র নব প্রতিষ্ঠান।

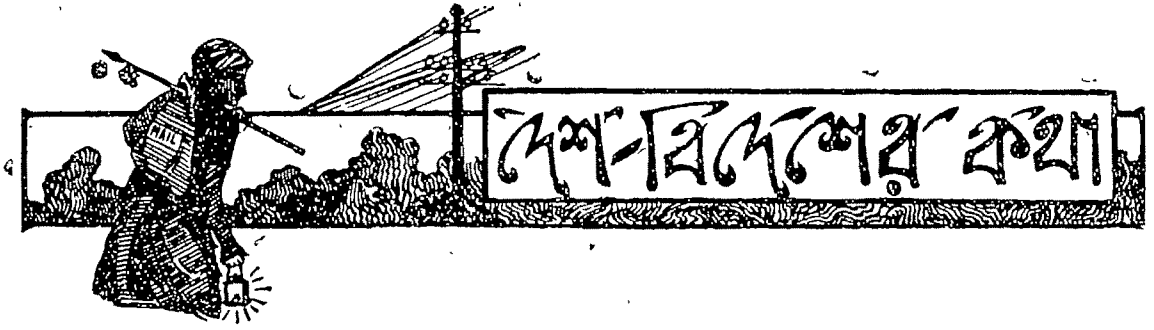
শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

তিমির-গহন পূর্বে গগন করি* মন্বন জ্যোতির্ময়
দৃপ্ত দান্ত দীপ্ত কান্ত ঘোর দুঃস্বপ্ন কে নির্ভয়
রশ্মি-শায়কে দীপ্তি-পাবকে বিনাশি* দৈত্য অন্ধকার
পূত নির্মল হেম-উজ্জল জাগিল মহান নির্বিকার।
দশ দিক যার স্নেহসন্তার লভি* বন্দনা করিছে গান,
ক্ষুদ্র ক্লিন্ন অধম শির জ্যোতির পরশে-নুগ-প্রাণ,
স্বপ্ন গোপন সজাগ চেতন, অত্যাশ শিরে হানিছে কর,
অজীরে জীবন, কলুষ-নাশন কে রে এ ভীষণ শক্তির
জগৎ-জীবন-জগৎ-পোষণ রবি রবি এরে জ্যোতির্ময়,
করি* মন্বন পূর্বে গগন সর্ব জগৎ করিল জয়।

মধু-বক্ষিম দৃঢ়-ভাষিম উষা পুষা দুই অগ্রদূত
বঙ্গ-গগন-তিমির-হরণ দুই দিগ্‌জয়ী কী অদ্ভুত
রবি-পঙ্খার ভাতি-সঞ্চার করিয়া ঘোষিল স্বপ্রভাত,
ক্ষুদ্র-নয়ন দৃপ্ত-গমন রবি করে পিছে নয়নপাত,
হাসে দশ দিক, হাঁকে কুহ পিক, হাসিল ভুবন ভূগ ও ফুল,
বঙ্গ-ভারতী-কিরণ-আরতি লভিয়া তুলিল মুখ রাতুল,
তাহার গোপন-যতেক বেদন করিল হরণ রবির কর,
ভারতী-বক্ষ বঙ্গ-কক্ষ আধারবিহীন সুভাষর,
মানব-চিত্ত-নিহিত-বিস্ত জগৎ-নয়নে সমুজ্জল,
আসিত ক্রিষ্ট অপনাবিষ্ট হইল প্রবল যা দুর্বল,
কাব্য-কমল, মেলি* শত দল হর্বমন্ত ফুলমুগ,
নিরাশা-তিস্ত কান্তি-রিক্ত মানব আজিকে-পূর্ণস্বর!
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ উদিশাছে রবি জ্যোতির্ময়,
করি* মন্বন পূর্বে গগন সর্ব জগৎ করিল জয়।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

* রবীন্দ্রনাথের যবদীপ গমন উপলক্ষে বৃহত্তর ভারত পরিষদের
গন্ধ হইতে রচিত।



বিদেশ

ফরাসী রাষ্ট্রনেতার ইংলণ্ড-ভ্রমণ—

ফরাসী রাষ্ট্রের সভাপতি ম্যাসিরে ডুমার্ক (M. Doumergue) সম্প্রতি রাজ-অতিথিরূপে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ দিয়া এই ভ্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিশেষ দৌহর্দ্য পরিলক্ষিত হয় নাই বরং সময় সময় উভয় শক্তিতে রাষ্ট্রীয় মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এই মনোমালিন্য ঘুচাইবার প্রয়াস পান ও তাঁহার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সাকল্যমণ্ডিত হয়। সেই চেষ্টার ফলেই বিভিন্ন রাষ্ট্র আঁতাত কর্ভিয়ার্ল (Entente Cordiale) সৃষ্টি হয় এবং তিনি “ইউরোপের শান্তি-প্রদায়ক” রূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই দৌহর্দ্য-বন্ধনের ফলেই বিগত মহাসমরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মিত্রশক্তিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কাজেই ফরাসীরাষ্ট্রপতির ইংলণ্ডের বাকিংহাম প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণকে ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী কাগজগুলি পূর্ণস্বাগতের ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও তাঁহাকে “British Nation's Guest of Honour” (ইংরেজ জাতির মাননীয় অতিথিরূপে) আখ্যা দিয়াছে।

ফরাসী জনসাধারণ ও ফরাসী কাগজগুলিও রাষ্ট্রপতির এই সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের মতে এই আদান-প্রদানে আঁতাত কর্ভিয়ার্লের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হইল। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া একখানি ফরাসী কাগজ লিখিয়াছে, “ইহাতে মনে হইতেছে যেন দুইটি পুরাতন মিত্র বহুবর্ষ ছাড়াছাড়ির পর আবার একে অত্রকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।”

সোভিয়েট-ইংলণ্ড সংঘর্ষ—

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বহুদিনের বিস্তৃত বয়স্ক মত একে অপরের কবকম্পন করিল—কিন্তু হঠাৎ সেই সময়েই ইংলণ্ড-সোভিয়েট সংঘর্ষের স্থচনা দেখা দিল। বিগত ২৪শে মে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বাল্‌ডুইন পার্লামেন্টে ইংলণ্ড-সোভিয়েট সন্ধির অবসান হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিছুদিন হইতে সকলের মনেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। ইংলণ্ড যে সোভিয়েটেব কার্য-কলাপ ভাল চক্ষে দেখিতেছে না তাহার নির্দ্বন্দ্বিতা কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এই সংঘর্ষের আসর কারণ হইতেছে ইংবেজদের দুইখানি সরকারী রাষ্ট্রনৈতিক দলিল অপহরণ। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ অস্বস্তান করেন, দলিলগুলি ইংলণ্ড-বিরূদ্ধ সোভিয়েট আড্ডা আরুসে লুকাইত আছে। সেই সন্দেহের বশে আরুস-আড্ডা খানাতল্লাসী হয়, কিন্তু দলীল দুখানি পাওয়া যায় নাই। সরকারের সন্দেহ হইয়াছে যে, খানাতল্লাসীর সময় দলীল দুইখানি পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, খানাতল্লাসীতে এমন অনেক কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে যাহাতে নাকি প্রমাণিত হয় যে, আরুস সরকারী দলিল-পত্র সরাইবার একটি আড্ডা। সোভিয়েট সরকার

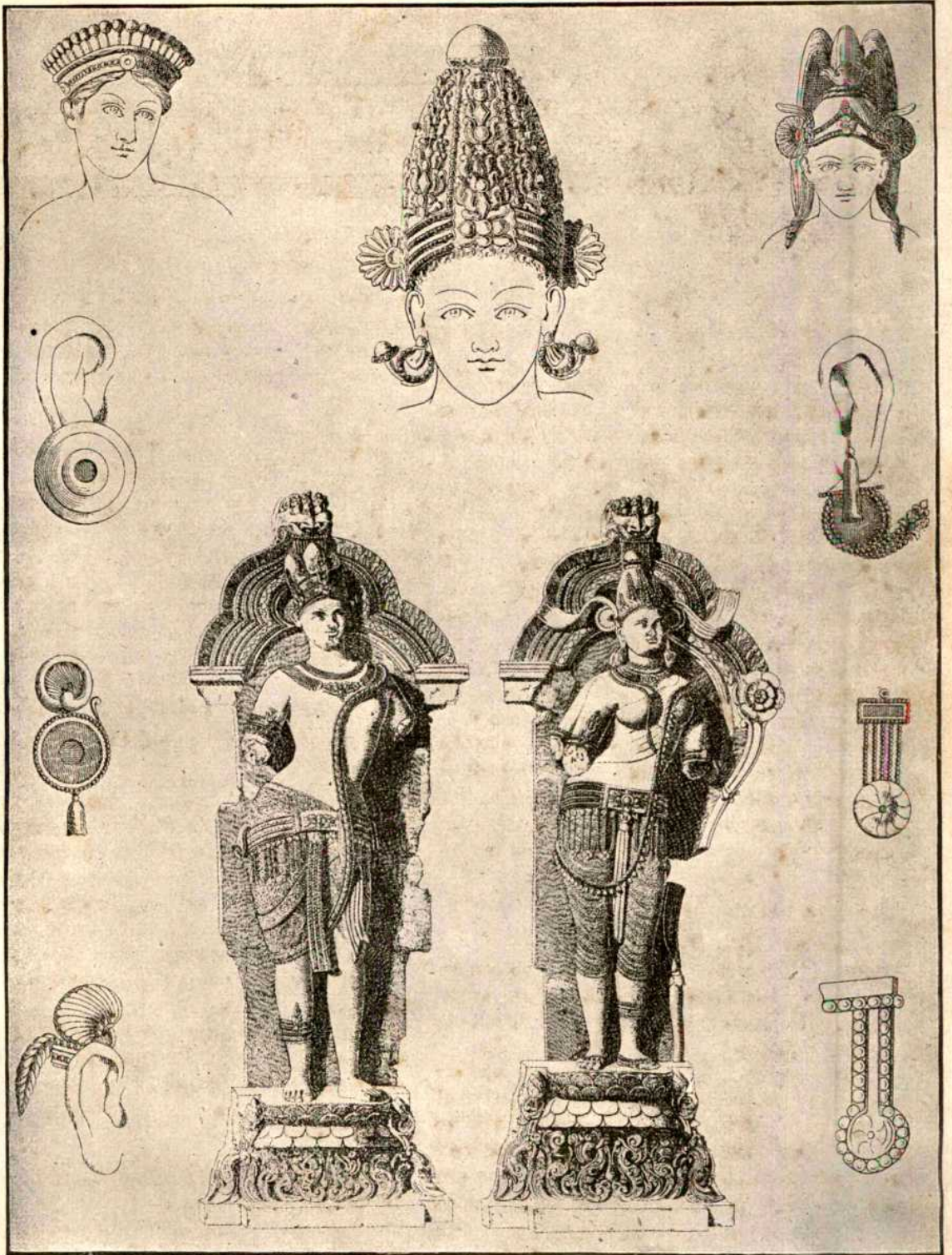
আরুস-আড্ডার কার্য-কলাপ সমর্থন করার ইংলণ্ড-সরকার তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইলেন। এই সংঘর্ষে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল কাগজগুলি খুব খুশী হইয়াছে। কিন্তু অমিকদল এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে এবং আরও অল্প প্রকাবের অহবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই বিরোধের অব্যবহিত পরে আর-একটি ঘটনা ঘটায় ঐ আশঙ্কা আরও প্রবল হইয়াছে। ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদী দুই একটি শক্তির চাল-চলনে সোভিয়েট সরকারের মনে সন্দেহ হইয়াছে যে, উহারা তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য বড়বন্দ করিতেছে। ঘটনাটি এই:—পোল্যান্ডস্থিত সেভিটের রাজদূত মস্কোএ আসিবেন বলিয়া বন্দন দূতাবাস হইতে বাহির হইতেছিলেন, তখন একটি তরুণ-ক্লশ গুলি করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ড ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বোস্‌নিয়া সহরে একটি সাব-যুবক কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যার কথা মনে করার। সেই হত্যাকাণ্ডের ফলে সারা ইউরোপে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেভিটেরদূতকে যে যুবকটি হত্যা করিয়াছে সে নাকি রাজতন্ত্রবাদী। ইহাতে ফ্রান্সের হাত আছে মনে করিবার কারণ এই যে, পোল্যান্ড ফ্রান্সের নিকট অনেক খুশী। মহাযুদ্ধের অবসানে বন্দন অষ্ট্রিয়া, জার্মানি ও রুশিয়া ভাঙিয়া পোল্যান্ড নতুন করিয়া সৃষ্টি হয় তখন ফ্রান্স তাহাকে সাহায্য করে।

রুশ সরকারের কৈফিয়তের প্রত্যুত্তরে পোল্যান্ড জানাইয়াছে যে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং এইরূপ তাহারা সমস্ত কতিপূরণ করিবে। সোভিয়েট সরকার এই ব্যাপারে ইংলণ্ডকেও সন্দেহ করিতেছে। তাহারা বিদেশী গুপ্তচরদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। মস্কোর ইংরেজ রাজদূত এই গুপ্তচরদিগের সহিত দূতাবাসের সম্পর্ক অস্বীকার করা সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার সে কথায় প্রত্যয় পান নাই। কারণ বিলাতের পার্লামেন্টে “আরুস খানাতল্লাসী” “লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্নিক সদস্য ও ভূতপূর্ব সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রি মিঃ পন্‌সনবী স্বীকার করিয়াছেন যে, গুপ্তার নিয়োগ, জাল-ভ্রমচুরী প্রত্যেক দেশের (ইংলণ্ডেরও) পররাষ্ট্র বিভাগেব কার্যের একটি প্রধান অঙ্গ।” এই ইংলণ্ড-সোভিয়েট মনোমালিন্য ও সংঘর্ষের ফলে কি ঘটিবে তাহা অচিরেই দেখা যাইবে।

চীনের দাবা—

সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রগুলির মিথ্যা প্রচারের ফলে চীনের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত কথা জানা দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ-চালিত বিশ্বদূত রয়টার কিছুদিন পূর্বে আকস্মিক সংবাদ দেয় যে, চীনের জাতীয়দল (কুয়েমিংটাং) দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। এ সংবাদ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। জেনারেল চ্যাং কাইসেক ও জেনারেল ফেং উসিয়াং উভয়ে বিভিন্ন দলভুক্ত হন নাই। তাহারা পরস্পরের সহযোগিতার



খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার শির ও কর্ণের গহনা। পুরুষ ও স্ত্রীর গহনা সমুদায়।

ভারতীয় গহনা-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন

জাতীয় শত্রু চ্যান্সোলিনের বিরুদ্ধে পূর্ণবেগে অভিযান চালাইতেছেন এবং পিকিং দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

বিশ্বাভার "গ্যাস্‌বারী উইকলী" নামক একখানি শ্রমিক কাগজে জেনারেল ফেঙ্গ্‌উসিয়াং চীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও জাতীয় দলের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। চীনের জাতীয়দলের দাবী কি ইহা পাঠেই স্পষ্ট হইবে। তিনি লিখিতেছেন :—

"(১) আমরা চাই ব্রিটিশ নৌবহর ও সেনানীর অবিলম্বে চীন পরিত্যাগ। আমাদের যত্নেয়া ব্যাপারে বিদেশীয় হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করিব না।

(২) আমরা চাই ব্রিটিশ সরকার, মিশনারীপণ ও বণিকগণ চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেন অযথা হস্তক্ষেপ না-করে।

(৩) প্রত্যেক ব্রিটিশকে আমরা বুঝাইতে চাই যে, অ-সম সন্ধির দৃশ্য অতীত হইয়াছে। এইসব সন্ধি-সর্ভের মূলে যে ঘোর অজ্ঞার ও অবিচার আছে তাহা চীনারা ক্ষমরক্ষণ করিয়াছে এবং উহা লোপ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে। ব্রিটিশ-সরকার ৪০ কোটি চীনার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে যেন চেষ্টা না করেন।

(৪) আমরা চাই ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী জাতি চীন দেশে চীনাদের অনভিপ্রেত পণ্য যেন বিক্রয় না করে। চীনারা তাহাদের প্রয়োজন অমুযায়ী পণ্য কিনিবে। বাণিজ্যে তাহাদের পূর্ণ স্বাভাব্য থাকিবে এবং তাহাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা অমুসারে তাহারা বাণিজ্যসূচক নির্ধারিত করিবে। এ ব্যাপারে বিদেশীয় হস্তক্ষেপ তাহারা সহ্য করিবে না।

(৫) চীনের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে সমস্ত বাধাকে তাহারা দূর করিতে চায়। কিন্তু একথাও আমরা বলিতে চাই যে, আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার শত্রু নহি, কিম্বা বিদেশীদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিবেচনা নাই। যদি গ্রেটব্রিটেন বা অন্য কোন দেশের জাতীয় প্রতিনিধিরা আমাদের দেশে আসিতে চান, তবে আমরা স্নাত্ত-ভাবে পরম সমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিব এবং আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করিব।"

ইংলণ্ডের শ্রমিকদল চীনের জাগরণে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। শ্রমিকদের কতিপয় বিখ্যাত সদস্য কুয়োমিংটাং সমিতির নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন :—

"গ্রেটব্রিটেনে শুধু সম্বন্ধে শ্রমিকরাই যে আপনাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একরূপ নহে—অন্যান্য নরনারীও আপনাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহারাও চীনের স্বাধীনতা দাবী স্বীকার করিতেছেন।"

চীনের এই জাগরুত্ব দাবী অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে-সকল সাম্রাজ্যবাদী চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চায় ও অন্তর্যভাবে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগকে নানব-স্বাধীনতার শত্রু আখ্যা দেওয়া ঠিকই হইবে।

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও দক্ষিণ আফ্রিকা—

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তসামান্য-মুচক সর্বভুলি সেখান-কার সমস্ত শিক্ষিত ভারতীয়ের মনঃপূত হয় নাই। সেই নীমান্দা-সর্ভে ভারতীয়দের সমস্ত দাবী গ্রাহ্য হয় নাই। হতব্রাহ্ম অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয়দের দাবী-দাওয়া লইয়া যে তুমুল আন্দোলন হ্রস্ব হইবে একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় এই সর্ভকে "সন্ধান-

মুচক" বলিয়া আখ্যা দেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিত ভারতবাসীরা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। আফ্রিকার জনিকালের সম্পাদক মিঃ হুত্রফ্যা আহার ইণ্ডিয়ান ভিউস নামক কাগজে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কোন ভারতীয়ই এই সন্ধি-সর্ভকে ভুয়া ভিন্ন অস্ত্র আখ্যা দিবে না।" বাহা হউক শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রীয়া কার্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার চেষ্টায় ভারতীয়দের অবস্থা-বিপর্বার দৃষ্টিবে বলিয়া অনেকেরই আশা করেন।

পূর্ব-আফ্রিকা—

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু পূর্ব-আফ্রিকার ভারতীয়-নির্ধাতন উপশম হয় নাই। ইণ্ডিয়ানস্ এন্ড পুস্তিকার মোম্বাসা (পূর্ব-আফ্রিকা) হইতে একজন ভাবতীয় পত্র-প্রেরক লিখিতেছেন :—

১৯১৯ সালের অর্থনৈতিক কমিশনের সুপারিশের ফলে ভারতীয়দের বিশেষ অধিবিধা হইয়াছে। ইহার সুপারিশের ফলে এশিয়বাসীদের এক-অঞ্চলে আসা বদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতীয় বণিক, ভারতীয় মজুরদের চেষ্টায় ফলে এই প্রদেশের সম্পদ বাড়িয়াছে। কিন্তু বর্ণবিষয়ের প্রবল চেষ্টা দে-সব কথা চাপা দিয়াছে।

অন্যান্য আরও কয়েকটি বে-আইনি বিধান পূর্ব-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের বিশেষ অধিবিধার হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২৩ সালের একটি আইনের বলে ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে ও তাহাদিগকে উচ্চভূমিতে বসত বাড়ী নির্মাণ অথবা বসবাস করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মোম্বাসাতে ভারতীয়গণকে ভূমী বিক্রয় বদ্ধ করা হইয়াছে এবং নাইরোবিতে ভারতীয় ইদপাতাল নির্মাণ বন্ধে যে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল—ইউরোপীয়দের প্রতিবাদের ফলে তাহা বদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সেখানে ভারতীয় অমিকদিগকে জোরপূর্বক শাটাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

ব্রিটিশ গায়না—

ব্রিটিশ গায়নার সম্পদ আহরণ করিবার মানসে ইংরেজগণ কিছুদিন হইল সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্ভ্রুতি সেখানে ভারতীয় শ্রমিক আমদানী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কনওয়ার মহারাজ সিংহ ভারতীয় শ্রমিকদিগের স্বার্থসংরক্ষণার্থ একটি ফিল্ম দিরাছিলেন। কিন্তু পারলা-মেটের দুইজন সদস্য অমুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, ঐ ফিল্ম কার্যে পরিণত করিতে হইলে বহু পরচা পড়িবে এবং ফিল্ম ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে-সকল সর্ভ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রাজী হওয়াও অসম্ভব। তাহাদের ইচ্ছা গায়না-সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতির জ্ঞান অল্প পরচায়, ভারতীয়দিগকে কোন একরূপ অধিবিধা না দিয়া তাহাদের পরিপ্রসঙ্গেই বেশটি সম্পদশালী করিতে চাহেন। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিক পুনরায় ঠকিতে চায় না। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বেনারসী দাস তত্ববোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ব্রিটিশ গায়নার ভারতীয় শ্রমিক বসতি করিবার কল্পনা অপ্রাঞ্জলি দিতে হইবে কারণ কনওয়ার মহারাজ সিংহের জ্ঞানসম্পন্ন প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে ভারতীয়ের সেখানে বাইতে কোন মতেই রাজী হইবে না।"

ফিজী—

কলিকাতার অন্তত্ববাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত বেনারসী দাস তত্ববোধী তাহার একটি ইংরেজ বন্ধু লিখিত একখানি পত্র ছাপাইয়াছেন। পত্রখানিতে ফিজীতে ভারতীয়দের অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। তাহার মর্মার্থ এই :—

ফিজীতে আর ৩০ হাজার ভারতবাসীর বাস। তাহাদের অধিকাংশ

চিনির ব্যবসাবে কাজ করে। ইহাদের মধ্যে ৭ হাজার মুসলমান, ২০ হাজার তামিল এবং বাকি সমস্ত হিন্দু। হিন্দুদের অধিকাংশ মধ্য প্রদেশের অধিবাসী। এখানে অনেকগুলি বোম্বাই ও পাঞ্জাবী দরজী কাজ করে। অমিকদের অধিকাংশই কৃষি-দ্রব্য, চিনি, তুলা, কলা, উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। অনেক ষ্টোরিকিয়ার ও মোটর চালকের কাজ করে। প্রত্যেক অমিকের দৈনিক আয় গড়ে দুই শিলিং।”

পত্রলেখকের মতে কিজীতে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্ভাব্য দিন দিন বেশী হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সেখানেও হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্দ দেখা গিয়াছে। তিনি বলেন, ফিজী-প্রবাসী ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যাপারে আরও সুব্যবস্থা হওয়া দরকার।

রোডেশিয়া—

রোডেশিয়ার ভাবতীয় নির্ধাতন সম্পর্কে মিঃ সি. এক, এণ্ড রুজ জুলাই মাসের সভার বিভিন্ন ও অন্তান্ত ভারতীয় কাগজে ভয়াবহ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, বোডেশিয়ার মিউনিসিপ্যাল সমিতি “লাইসেন্সিং বিল” নামক একটি আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম করিয়াছে। আইনের একটি ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে।

“কোন দোকান-স্থাপনের লাইসেন্স বিবার পূর্বে যদি ইহা সপ্রমাণিত হয় যে, প্রার্থিত দোকানটি স্থাপিত হইলে সেইগল্পীর আশ-পাশের সম্পত্তির মূল্য হ্রাস হইবে তবে সেই দোকানদারকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।” মিউনিসিপ্যাল সভার সমস্ত সঞ্চলেই ইউরোপীয় বশিক। তাহাদের সকলেইই জয়গত বিশ্বাস যে, ভারতীয়দের স্থাপিত দোকানের আশ-পাশের (ইউরোপীয়) দোকানের মূল্য নিকর কম হইবে, কাজেই এই আইনের কাবিত্তে ভারতীয় দোকানদারগণকে একঘরে করা হইতেছে।

দক্ষিণ রোডেশিয়াতেও বর্ণবিষেব চরম মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। যদিও “জায়েসী নদীর দক্ষিণে সকল সভ্য অধিবাসীর সমান অধিকার” ব্যপ্তির প্রবর্তক সিসিল রোডসের নাম অমুযাবী এই প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে বখন শ্রীমতী নাইডু এই প্রদেশ ভ্রমণ করেন তখন তথাকার ভারতীয়দের এত দুর্গতি ছিল না। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহাদের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটয়াছে। তাহার কারণ দক্ষিণ বোডেশিয়ার দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন (Responsible Govt.) ও দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী কতকগুলি ইউরোপীয়ের দক্ষিণ রোডেশিয়ার গমন। দক্ষিণ বোডেশিয়ার দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ অথবা নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা হইয়াছে। কারণ বোধহয় এখানে স্বাধীনতার আশাদন পাইলে তাহারা সর্বত্র এই-প্রকার দাবী উত্থাপন করিবে। ভারতীয়দিগকে একঘরে করিবার প্রচেষ্টাও যে সেখানে না হইতেছে তাহা নহে। তাহার একটি নিদর্শন পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। মিঃ এণ্ডরুজ শীঘ্রই দক্ষিণ রোডেশিয়া যাত্রা করিবেন। তাহার প্রচেষ্টার ফলে কি হয় তাহা দেখা যাক।

কেনিয়ায় ভারতীয়ের জীবনের মূল্য—

কেনিয়া হইতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত সংবাদটি আসিয়াছে :—

কোন এক রবিবারে রাজিকালে কেনিয়ার মিটা নামক জনৈক প্রাচীনের গোলাবাড়ীতে ভারতীয় কুলীরা নৃত্য-গীত কবিত্তেছিল। ইহাতে মিটনের গোলাবাড়ীর পার্শ্ববর্তী গোলাবাড়ীর অধিকারী অ্যালেন নামক আর একব্যক্তির সাতা ও শ্রীপুত্রের মূসের ব্যাঘাত হওয়ার অ্যালেনে নৃত্য-গীত বন্ধ করিবার জন্ত আদেশ দেয়। কিন্তু কুলীরা বলে যে, তাহার

মিটনের গোলাবাড়ীতে নৃত্য-গীত করিতেছে, কাজেই অ্যালেনের কথায় তাহার নৃত্য-গীত ধামাইতে বাধ্য নহে। ইহাতে যেতদ্রুতি বাগে আত্মহারা হইয়া উঠে এবং নিজের বন্দুকে গুলি গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। তাহার এই-প্রকার আচরণে যথু নামক একব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া বলে, “ইহা মিটনের গোল-বাড়ী, আপনি চলিয়া যান।” তাহার এই প্রকার উক্তিতে অ্যালেন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং মাথুকে বন্দুকের বাট দিয়া গারে ও মাথায় আঘাত করিতে থাকে। ফলে মাথুও কয়েকদিন পরে মৃত্যু হয়,—বিচারের সময় আসামী বলে যে, মাথু ভ্রমাত্মক মাতাল হইয়া তাহাকে ছুরি মারিতে আনে এবং সে নিজের আত্মরক্ষার জন্ত মাথুর মাথায় বন্দুক দিয়া আঘাত করে। ইউরোপীয় জুরীগণ অ্যালেনের কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন এবং আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্র—

সম্প্রতি বিলাতের ভারতীয় ছাত্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ইণ্ডাস পত্রিকায় মিঃ ভাকচা লিখিতেছেন :—

জাপানী ও চীনা ছাত্রেরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত ও নিজেদের দেশের-সমস্তা সমূহের সমাধানের উপায় নিরূপণের জন্ত ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। তাহারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, ডেনমার্ক প্রভৃতি নানাদেশে উপযুক্ত স্তরক অধীনে শিক্ষা পাইবার জন্ত উৎসুক। আকর্ষণ সরকার আকর্ষণ ছাত্রদের মধ্যেও এরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছেন; ভারতীয় ছাত্রেরাই শুধু শুধু অল্পকোর্ড, কেবিশ্বজ, লণ্ডন, এডিনবরা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কি জন্ত যে অথবা ভাড় করে তাহার কারণ বোকা ছুফর। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত শিক্ষাভিলাষী ভারতীয় বুঝ কি জন্ত যে লণ্ডনে অথবা অল্পকোর্ডে আসে তাহা আশ্চর্য। তাহারা কি জানে না যে, সে-বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিতে হইলে সর্কায়ে ডেনমার্ক তৎপরে ফ্রান্স অথবা জার্মেনীতে বাওয়া দরকার।

আমেরিকায় হিন্দুস্থানী স্টুডেন্ট (The Hindustanee Student, 500 Riverside Drive, New York City, U. S. A.) আমেরিকায় প্রবাসাভিলাষী ভারতীয় ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের সম্পাদকের নিকট হইতে তথাকার সংবাহ লইতে নির্দেশ দিতেছেন :—

American Academies Club, Jehangir Wadia Bldg., 1st Floor, Esplanade Road, Fort, Bombay; The American Club, 121 Esplanade Road, Calcutta; The Indian Students Union, 221 Gower Street, W. C. I., London, England; Association des Hindus de Paris, 17 Rue de Sommerard, Paris, V France; Verein der Inder in Zentral Europa E. V., Knesbeck-Str., 8-9 Berlin, Germany. Also consult American Express Company's offices.

ভারতবর্ষ

চীনে ভারতীয় মিশন—

বোম্বাই-এর ২৩শে জুনের ধববে প্রকাশ, হিন্দুস্থানী সেবাদলের জেনারেল সেক্রেটারী ডাক্তার হার্ডিয়ার ক্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, চীনে বর্তমানে যে মিশন পাঠান হইতেছে, তাহাতে

মহিলাদিগকে লওয়া অনন্তর, এজ্ঞা মহিলাদের দরখাস্তগুলি দেখে কোন বিবেচনা করা হয় নাই। শ্রীমতী নবোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে মিশনের জন্ম লোক বাছাইয়ের নিমিত্ত একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। মোট ২৫২ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। দরখাস্তকারীদের মধ্যে ৩৪ জন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট, ১৬ জন আর্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রাজুয়েট, ১৫ জন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার, ৮ জন মেডিক্যাল ছাত্র এবং ১২ জন শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। প্রথম বাছাইয়ে ৬০ জন লোককে বাছাই করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিস্তৃত খবর জানিতে চাওয়া হইয়াছে। পরে চূড়ান্ত বাছাই হইবে। ছাড়পত্র লইবার জন্ম সেবাদলের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী তুলনীচরণ গোস্বামী গভর্নমেন্টের সহিত লেখালেখি চালাইতেছেন; ছাড়পত্র পাইলে শীঘ্রই মিশন চীনে রওনা হইবে।

নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—

নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রী শ্রীমতী মনোরমা লেট উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্ম ৪০০০০ টাকা দানের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। শ্রীমতী মনোরমা তাহার বিবাহ-উৎসব উপলক্ষেও বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ৬০০ টাকা দিয়াছেন।

বাংলা

কচুরী-পানার ধ্বংস—

স্বায়ত্বশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাজী গজনভী সাহেব সম্প্রতি “কচুরী”-পানার সমস্তু মনোনিবেশ করিয়াছেন। কচুরী পানার বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশের, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের, সর্বশাসন সাধন করিয়া আসিতেছে। কচুরী পানার রক্তবীজের ঝাড়—শ্রাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ কোন স্থানেই হইতে ইহাকে একেবারে উচ্ছেদ করা যায় নাই। ব্রহ্মদেশ হইতেও যে ইহা একেবারে দূর করা সম্ভব হইবে মন্ত্রী মহাশয় ইহা আশা করেন না।

কি উপায় অবলম্বন করিলে কচুরীপানার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কি ভাবে কচুরী দেশের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ম বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট মিঃ কালীপদ মৈত্রকে স্পেশাল অফিসাররূপে নিযুক্ত করেন। তাহার রিপোর্টে কচুরীপানার ধ্বংস লীলার যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভয়াবহ। রিপোর্টে প্রকাশ :—

“এই কচুরীপানা যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসিগণের কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহা কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা ধারণাই করিতে পারিবেন না। এই কচুরী পানার পূর্ববঙ্গের জলপথসমূহ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। স্থানে স্থানে কচুরী এত বেশী জমা হইয়া থাকে যে, একশত ফিট পরিমিত জলপথের কচুরীপানা পরিকৃত করিতে অনেক সময় একঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়া থাকে। অথচ পূর্ববঙ্গে জলপথই হইল একমাত্র বাতায়নের পথ। অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কচুরীপানার পথ আটকাইয়া বাওয়ার দরুন চাউলাদির আয়দানী-রপ্তানীর বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে।

“ঢাকা বিভাগের অষ্টগ্রাম, নীলকী ও মিঠামাইন নামক থানাজয়ের মধ্যবর্তী প্রায় ১০০ বর্গ মাইল চাষের জমি কচুরীপানার অত্যাচারের জন্মই কৃষকগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বহু কৃষক ভিটামাটি ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। কচুরীপানা কেবল চাষের জমির অনিষ্টসাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনেক স্থলে ঘাসের জরিও

নষ্ট করিয়াছে। প্রথম কৃষকগণ ঘাসের পরিবর্তে কচুরীপানা গরুর খাইতে দিত; কিন্তু অনেক গরুই উহা সহ্য করিতে না পারায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

“পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানেই কচুরীপানা পানার জলের পুকুরিগীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া ঐ সকল গ্রামের বাস্য নষ্ট করিয়া দিতেছে। আজ এই কচুরীপানার জন্মই পূর্ববঙ্গে জলপথ বন্ধ, কৃষিকে পরিত্যক্ত।”

কচুরীপানার ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত এ পর্যন্ত অনেক কমিটি কন্সারেন্স হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বরিশালের ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের কথার বলিতে হয় যেন সরকার এই সমস্তা লইয়া খেলা করিতেছেন। আচার্য্য বহুর নেতৃত্বে যে তদন্ত সমিতি বসিয়াছিল তাহার সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু গ্রীকিতস্ নামক একজন ইংরেজ আবিষ্কৃত “প্রেস” দরুন বাংলা সরকার অথবা অজ্ঞপ্ত অর্থব্যয় করিলেন। কিন্তু এখন তাবিবার সময় আসিয়াছে। মিঃ মৈত্র তাহার রিপোর্টের একস্থলে বলিতেছেন—“গত দশ বৎসর এদিকে কিছুই করা হয় নাই। যদি একই সময় কচুরীপানা ধ্বংসের চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে উহা কিছুতেই ধ্বংস করা যাইবে না। অবশ্য অনেকে ভাবিতে পারেন যে, একটি আইন প্রণয়ন করিলেই কচুরীপানা ধ্বংস করা যাইবে; কিন্তু কচুরীপানা আজ গারোপাড়া হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত; কাজেই কাজটি খুব দোজা নহে, তাহা ছাড়া আইন প্রণয়ন করা সহজ কিন্তু তাহা কাজ লাগান খুবই কঠিন। অনেকে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বঙ্গের ইরিগেশন ডিপার্ট-মেন্টকে জলপথ ও বিলসমূহ কচুরীমুক্ত করিবার ভার দেওয়া হউক। হিাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলপথ ও বিলসমূহের কচুরী আক্রান্ত-স্থানের পরিমাণ ৯,৮১১২ একর। প্রতি একর কচুরী পরিকৃত করিতে ২০ টাকা দরকার। এই হিসাবে ৯৮১১২ একর কচুরী মুক্ত করিবার খরচ লাগিবে প্রায় দুইকোটি টাকা এবং এই টাকা গবর্নমেন্টের পক্ষে দেওয়া বখনিই সম্ভবপর নহে।”

বর্তমান মাসে ঢাকার “কচুরী” পানার সমস্তা আলোচনা করিবার জন্ম একটি মজলিস বসিবে। হয়ত এইজন্ম নতুন কর বাধ্য হইবে। কারণ মিঃ মৈত্র তাহার রিপোর্টে আভাস দিয়াছেন :—

“কচুরী-আক্রান্ত স্থানসমূহ হইতে প্রেরিত মালের উপর ট্যাগ বসান ও ঐ ট্যাগের টাকা দিয়া জলপথসমূহ পরিষ্কার রাখা উচিত। এতদ্বারা মালবাহী নৌকার উপর ট্যাগ বসান দরকার। কচুরীপানা ধ্বংস সম্বন্ধে একটি সেন্টাল বোর্ড গঠিত হইবে এবং উহাতে দশজন সদস্য থাকিবে। এই বোর্ডই ট্যাগের হার নির্দ্ধারিত করিবেন। এই সেন্টাল বোর্ড কর্তৃক ইরিগেশন বিভাগ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতিকে কোন স্থানের কচুরী পরিষ্কার করিবার ভার লইতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে।”

মন্ত্রী মহাশয় বাহাতে কচুরীপানার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া সকলকাম হইতে পারেন এবিষয়ে দেশবাসী নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন।

বাংলা সরকারের জেল রিপোর্ট—

বাংলা সরকারের ১৯২৬ সালের জেল শাসন সম্বন্ধীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্যবর্ষে বাঙ্গলার জেলগুলিতে কয়েদীর সংখ্যা সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। কলিকাতা, ঢাকা এবং পাবনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পটুয়াখালী জেলে সত্যাগ্রহী কয়েদীদের ভিড়ই প্রধানতঃ ইহার কারণ। জেলে কয়েদীদের সংখ্যার দৈনিক গড়—১২৭৭২ জন ছিল। ১৯২০ সাল হইতে দীর্ঘে দীর্ঘে কয়েদীদের সংখ্যা কমিয়াছে। এ বৎসর জেলে কয়েদীর সংখ্যা ১৫০২৭

জন ছিল। বেয়ে করোী এবং বেভার করোীদের সংখ্যা প্রায় সমানই ছিল।

করোীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রিপোর্টে প্রকাশ, করোীদের স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আলীপুরের জুভিনাইল স্কুলে ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক অগণ্যবাদের চরিত্র সংশোধনের স্কুল প্রতিষ্ঠা এই বৎসরের একটি প্রয়োজনীয় সংস্কার। কিশোর-বয়স্ক করোীদের মধ্যে বাহ্যিক উপভুক্ত, তাহারিগণিক সম্বন্ধই বাঁকুড়ায় পাঠান হইবে। তথায় তাহাদের জন্ত ইংলণ্ড এবং মাদ্রাজের আদর্শ বোরস্টাল স্কুলের অনুরূপ স্বতন্ত্র স্কুল করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বন্দীর বাবস্থাপক সভার আগামী অবিশেষণে উপস্থিত করিবার জন্ত একটি বোরস্টাল স্কুল বিলের মুনাবিদা করা হইয়াছে।

বিশ্বভারতীতে দান—

মিশরের রাজা ফৌদ বিশ্বভারতীকে আত্মীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক সহ একটি পুস্তকাগার প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্বভারতীতে ইনলান সভ্যতা-চর্চার উদ্দেশ্যে একজন অধ্যাপক নিয়োগের জন্ত হায়দ্রাবাদের নিজাম এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বাংলায় নূতন কংগ্রেস দল—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যানির্বাহক সমিতির নূতন নির্বাচনের ফলে শামসুল-ব্যানাজী দল কার্য-নির্বাহক কমিটিতে স্থান লাভ করেন নাই। প্রকাশ ঐ দল আবার কংগ্রেসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্ত একটি নূতন দল গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি সভায় এই নূতন দল কি ভাবে কার্য করিবে, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। এই নূতন দল কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কার্য করিবে এবং এই দল “ইণ্ডিপেন্ডেন্ট কংগ্রেস দল” নামে পরিচিত হইবে। এই দলের উদ্দেশ্য হইতেছে কংগ্রেসের কার্য ও গঠন-পদ্ধতি একপন্থায়ে সংকুচিত করা বাহাতে কংগ্রেস প্রকৃতভাবে দেশের ও দেশের মঙ্গল করিতে পারে, কৃষক ও শ্রমিকদিগকে সম্বলিত করা এবং কংগ্রেস কৰ্ম্মিগণ কর্তৃক সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্ত কংগ্রেসের ভিতরে ভিতরে যে একটা আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে বাধা দেওয়া। এতদ্বিত্ত জিলা কংগ্রেস কমিটিগুলি বাহাতে নিজেদের স্বাভাব্য বজায় রাখিতে পারে তজ্জগত এই দল বিশেষ চেষ্টা করিবে। যদি এই দলের উদ্দেশ্য কতকাংশে সফল হয় তাহা হইলে আগামী নবেম্বর মাসে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির নব নির্বাচনে এই নূতন দল ও বর্তমান কংগ্রেস অধিকারী দলের মধ্যে যে আবার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নূতন দল আশা করে যে, যখন এই দল সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবে তখন এই দল মাদ্রাজ বোম্বাই এবং যুক্ত প্রদেশে হইতে সমর্থনকারী পাইবে।

বাঁকুড়া অভয় আশ্রম গ্রন্থাগার—

এক বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয় যে, প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। এই আশ্রম সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য চাহিতেছেন।

পরলোকগত জগন্নাথ দেব—

আমাদের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, শিলচর নন্দীলাস্কুলের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যাপক, শিলচর গবর্ণমেন্ট হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীজগন্নাথ দেব বি-এ, বি-টি, মহাশয়ের বিগত ৭ই জুন তারিখে মৃত্যু হইয়াছে। আজীবনকাল তিনি “শ্রীহট্ট-কাছাড়-অনুসন্ধান-সমিতির” সহযোগী সম্পাদক ছিলেন তিনি “প্রাচীন লাউড়” “দেকালের লোকশিক্ষা” প্রভৃতিও কাছাড়ের অনেক

প্রাচীন কীর্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। তিনি শিলচর-শিক্ষা-পরিষদের এবং তাহার মুখপত্র “শিক্ষা-দেবক” পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। “কমলা” “শ্রীভূমি” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে তাহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের বিষয় তিনি “বাংলা ভাষার ইতিহাস” নামক তাহার সব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই।

পণ্ডিত কীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও সাহিত্যিক পণ্ডিত কীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গত ৩রা জুলাই ৬৪ বৎসর বয়সে বাঁকুড়াতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একাধারে কবি, উপস্থাপক ও নাট্যকার ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া প্রথম জীবনে স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তিনি শ্রীশ্রী পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের একজন নিষ্ঠাভক্ত ছিলেন। তিনি কিছু দিন “অলৌকিক রহস্য” নামক একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া ছিলেন।

বীর শশীমোহন দে—

শ্রীহট্ট জেলায় ফয়েজউদ্দিন নামক একজন লম্পট অনেক নারীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশেষে পবিত্র পাটনী নাম্নী একটি



শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে

তেজস্বিনী যুবতীর উপর তাহার কুদৃষ্টি পড়ে। ছুরাক্সা ফয়েজ তাহার বাড়ীতে বলপূর্বক প্রবেশ করিলে পর সে নিহত হয়। এই হত্যাপররাধে শ্রী শশীমোহন দে নামক একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ও তাহার তিনটি সঙ্গী দায়রা দোষী হয়। জজ ও জুরী একমত হইয়া শশীমোহনকে

নির্বোধ সাব্যস্ত করিয়া খালসা দিয়াছেন, এ-সংবাদ আমরা গত মাসে দিয়াছি। বাংলার সর্বত্র অত্যাচারিতা নারীগণের করুণ ক্রন্দনে পরিপূর্ণ। যদি বাংলায় যুবকগণ বীর শশীমোহনের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন তবে নারীর সত্যজননকারী নরপশুদের অত্যাচার দূর হইবে।

১ বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

মৈমনসিংহ

কিশোরগঞ্জের নিকটবর্তী সাবিত্রী দাসী নামী একটি বাল-বিধবার সহিত মহেন্দ্রচন্দ্র করণ নামক এক যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

২০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ মনোহর নমঃদাসের সহিত আলসা সাকিনের কনিকা ১৬ বৎসর বয়স্ক বাল-বিধবা বস্তার বিবাহ হইয়াছে।

গত ৩০শে বৈশাখ পাবতলা গ্রামে ৩০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ বসন্তকুমার সরকারের সহিত মৃত নরোত্তম নমঃদাসের ১৬ বৎসর বয়স্ক বাল-বিধবা স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছে।

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার টাঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাসের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র দাসের সহিত কররা নিবাসী পরলোকগত চরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের বাল-বিধবা কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা শুভ পরিণয় টাঙ্গাইলে হুসম্পন্ন হইয়াছে।

টাঙ্গাইলের দক্ষিণ পূর্বদিকস্থ পাথরাইল গ্রামের সন্নিগটে গ্রামে নমঃশূর সমাজে ২৫টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

২৪ পরগণা

বাল্লাকপুর দেবীপ্রসাদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্ততম শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় ৩নন্দলাল পাল মহাশয়ের অন্তর্দিশ বয়স্ক বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীকে যথাবিধি হিন্দুমতে বিবাহ করিয়াছেন।

করিদপুর

পাংসা বিধবা-বিবাহ সমিতির চেয়ারম্যানী জেলার অন্তর্গত গজরা গ্রামে গত ১৪ই আষাঢ় তারিখে ইনাটপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত নবদীপচন্দ্র হালদারের বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিজয়াহরিনীর সঙ্গে গজরা গ্রামের শ্রীযুক্ত হেমলালচন্দ্র হালদারের বিবাহ হইয়াছে। বব ও কস্তার বয়স যথাক্রমে ৩০ ও ১৪।

মেদিনীপুর

গত ৯ই আষাঢ় রবিবার দিবস তিলস্তপাড়া বিধবাবিবাহসভার প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সবঙ্গ থানার এলাকাধীন তিলস্তপাড়া গ্রামনিবাসী মহিষা জাতীয় ৮সিদ্ধেশ্বর মাইতিব পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র মাইতির (বয়স ২৫ বৎসর) সহিত নবরঙ্গপুর গ্রামের ৮শিবনারায়ণ মাইতির বিধবা কন্যা (বয়স ১৮ বৎসর) শ্রীমতী বিধুম্ভা দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বাঙালী রাজবন্দী—

ব্রহ্মদেশে ও বাংলায় আবদ্ধ (জেলে এবং অন্তরীণ) রাজবন্দীদের অনেকেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ একেবারে মরণের সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য অধাপক জ্যোতিষচন্দ্র বোম্ব ইনসিন জেলে মরণাপন্ন কাতর সংবাদ পাইয়া তাঁহার বৃদ্ধা জননী, বাল্লালাব গবর্ণমেন্টের নিকট মৃতপ্রায় পুত্রকে ভিক্ষা করিয়া এক আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদন-পত্রের উত্তরে সরকার মামুলীভাবে জানাইয়াছেন, তাঁহার দরখাস্ত 'চীফ সেক্রেটারীর' নিকট প্রেরিত হইল। অতঃপর এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পত্র বাবহার করিতে হইবে। উপায়হীনা বিধবা বৃদ্ধা জননী, কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আশা-ভরসা পাইলেন না। রাজবন্দী জীবনলাল, হরিকুমার প্রভৃতি অনেকেই ছুরাবোধ্য রোগে ভুগিতেছেন।

মেদিনীপুরের ভীষণ ভুববস্থা—

কেলেঘাই বজা-সাহায্য কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মহাপাত্র, পোষ্ট মঙ্গলামাড়া, জেলা মেদিনীপুর (জেল ষ্টেশন—বাগিচক) হইতে লিখিতেছেন,—“গত ১৯২৬ সালে কেলেঘাই নদীর বজা-পীড়িত মেদিনীপুর জেলার পট্টালপুর, ভগবানপুর, সবঙ্গ, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি থানা বহু গৃহ ভূমিসাৎ ও সম্পূর্ণ ফল নষ্ট হইয়া এ অঞ্চলকে অস্তঃসারশূন্য করিয়াছিল। গত ৪ঠা জুনব প্রবল ঝড়-বৃষ্টি এদেশের যে কি ভীষণ ক্ষতি কবিয়াছে, তাহার পূরণ হইতে যে আবও কতকাল লাগিবে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। এ অঞ্চলের প্রায় সমস্তই কাঁচা ধব। বিচালীর চাল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে; বাতাসের বেগে বহু গৃহ ভূমিসাৎ ও অর্ধশতিত হইয়া মানুষের বান্দব অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। পানেন চাষে বহু শ্রমজীবী কালতিপাত করিত; এ অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯৫১৬ পানের মাচা বা বরোজ ভূমিসাৎ হইয়া গৃহস্থের ও শ্রমজীবী সকলেরই সর্বনাশ করিয়াছে। মে মাসের শেষে প্রত্যহ ২১ পশলা হিসাবে বৃষ্টি হওয়ার, দরিদ্র কৃষকগণের অতিকষ্টে সংগৃহীত ৭৮ টাকা মণ দরে খরিদ যে বীজ-ধান্য প্রায় সমস্ত মাঠে বপন কবিয়াছিল, অতিরিক্ত বৃষ্টি হেতু প্রায় সমুদ্র মাঠ ১৫১৬ দিনেরও অধিককাল ২১৩ ফুট জলের নীচে থাকার সে সমস্ত একেবারে নষ্ট হইয়াছে, আব দরিদ্র কৃষকগণ নিরুপায় হইয়া দীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।”

“গত বৎসর বজাপ্রাণবনের পর, বিলিফপাট সমুহ চলিয়া যাওয়ার পর যথাসময়ে লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও পুলবন্দী বিভাগের বীধ মেয়ামতাদি বিলিক কার্য আরম্ভ হওয়ার অনেক শ্রমজীবী ও দরিদ্র কৃষক ক্ষমি-জ্ঞানগা, গরু-বাছুর ও তৈজসপত্রাদি বন্ধক দিয়া ও বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে বীজধান্য সংগ্রহ করিয়াছিল ও সংসার প্রতিপালন করিতেছিল। এখন সকলেই নিরুপায়। এ বৎসর বীজধান্যের অভাবে শতভরা অন্ততঃ ৭০১৭৫ বিঘা জমি অনাবাদি থাকিবে। উহাতে দেশের ভাবী অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, ভাবিবার কথা। এ অঞ্চলের পালপাড়া নামক একটি অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থাযুক্ত গ্রামের ১৪৪ জন লোকের মধ্যে ৮৪৬ জন লোক প্রতিমাসে ১২ দিনও খাইতে পাইতেছে না। গার্মেন্ট ও শস্যদ্রব্য দেশবাসীর সাহায্য ব্যতীত এদেশ একেবারে ক্ষণেই পরিণত হইবে। আমরা যে কোনও রিলিফ পাটিকে সাহায্য করিবার ক্ষম প্রস্তুত আছি।”



শ্রীভাবকুমারকাক্সিলালিখিত * শ্রীমুত্তাক্ষর ওড় চিত্রিত

সকাল বেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই পিতাম্বর গুরুত্ব পিতোমবাবু একটা দেড় বিঘত আন্দাজ হাই তুলিয়া ও সেই সঙ্গে চিনে পটকা ছোড়ার মত তিনটা তুড়ি নাগিয়া স্বগত বলিলেন, “হুন্নে হ’য়ে উঠেছি। কি কুক্ষণেই যে পুত্রাম নরক ‘এডয়েড’ করবার জন্তে এ কাজ করতে গিয়েছিলাম—উঃ, কেঁদে, কোকিধে, গালিয়ে, চৈচিয়ে গিমি যেন ‘মেনিন্জাইটিসে’র মত মাথার ভিতরটা ছারখারে দিতে ব’সেছে; আর ছেলেটা ‘আওয়ারে’, ‘হাফ-আওয়ারে’, ‘কোয়ার্টারে’ গির্জের ঘড়ির মত হাজামা ক’রে ঘূমের পাট একেবারেই তুলে দিয়েছে! এর পর একদিন কিছু একটা ক’রে বসব ব’লে রাখছি—পিতোম সাগোল রাগ করে না, করে না, করে না; কিন্তু করে যখন...তখন হু... ম্...”

পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠ কে বলিল, “ওগো, এখানে অঙ্ককারে সিদ্ধকটার ভিতর অবধি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, এটা একটু বারান্দায় বার ক’রে দাও ত। রিং থেকে সেফটিপিনটা যে কোথায় খুলে পড়ল—কিছুতে যদি হাতড়ে পাচ্ছি।”

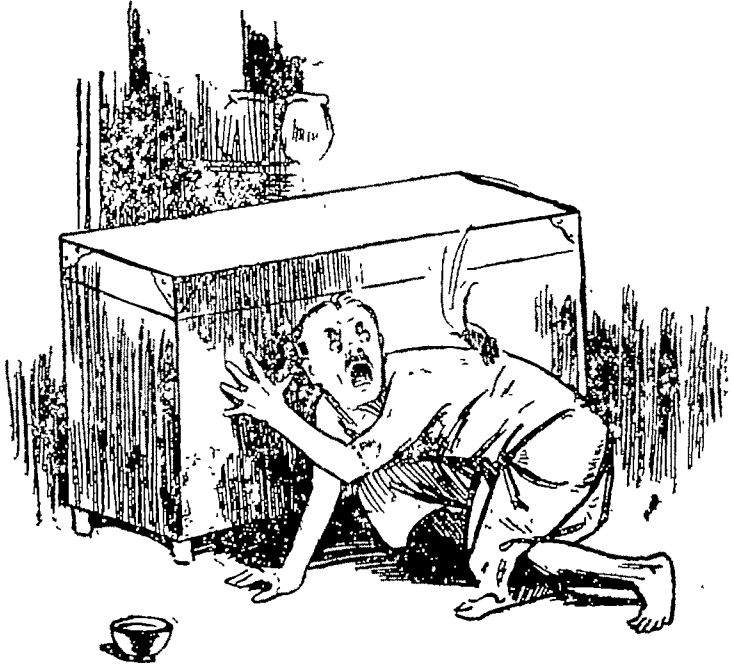
পিতোমবাবু মনে মনে গর্জিয়া উঠিলেন, “অভ্যাচার, অনাচার, অরাজকতা! সেফটিপিন পাচ্ছ না ব’লে আমি এখন ঘূমের চোখে তোমার পিতামহের আমলের জাহাজী সিদ্ধকটা কাঁধে ক’রে দোড়াদোড়ি করি! জাহান্নমে যাক তোমার সেফটিপিন।”

বাহিরে মিহি গলায় বলিলেন, “মেথেকে ডেকে বসনা সিদ্ধকটা বার ক’বে দিতে; আমার শরীরটা ভাল নেই তেমন।”

নারীকণ্ঠ কিছু উচ্চ উঠিল, “বেলা ৬টা হ’য়ে গেল এখনও বিছানায় শুয়ে গা মোড়ামুড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমার খেটে খেটে প্রাণ গেল আর উনি শুধু আরাম করবেন। এস বসছি শিগ্গীর বাইবে, নইলে কুক্ষণে হবে।”

পিতোমবাবু একবার নেপথ্যে পরোলোকগতা মাতৃ-দেবীকে স্মরণ করিয়া হুড় হুড় করিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভাঁড়ারের সিদ্ধকটি নিরামিষ চালভাল ও আমিষ ইঁদুর-আরগুণায় বেশ পূরা ছুই কি আড়াই মণ হইবে। পিতোমবাবু তাহা তুলিতে চেষ্টা করিয়া, না

পারিয়া তাহাতে কাঁধ দিয়া ঘর্ষাক্ত কালবরে দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আন্দোলনে ভীত হইয়া একটি নেংটি ইঁদুর এক ছিদ্রপথে সিন্দুক হইতে তড়াক করিয়া বাহির হইয়া পিতোমবাবুর গলার উপর অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাব শিরদাঁড়া বাহিয়া নামিয়া গেল। পিতোমবাবু, “আরে, আরে” বলিয়া ইঁদুরটিকে তাড়াইতে গিয়া একটু বেসামাল হইয়া মেঝের উপর গিম্বি বন্ধিত একবাটি সরিষার তেলের উপর বসিয়া পড়িলেন।



গিম্বি তারস্বরে চীৎকার করিয়া

উঠিলেন, “এক ফোঁটা কাক্স আড়াইঘণ সিন্দুকটি—কাঁধ দিয়া দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

কবুতে এসে অমনি পোয়াখানেক তেল উন্টে বসল। বাবারে বাবা, আমি ত আর পারিনে—সেই কোন্ রাজ্য থেকে নহু খুড়োকে সেধে সেধে ঘানির তেল আনাই; তার হ'য়ে গেল! বলি, রোজ যে এক গলা গিলে উজাড় কর, তা বায় কোথায়? একটা কাঠের বাক্স নেড়ে সরাকৈ গিয়ে যে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তেলের বাটি উন্টে গোলায় গেলে একেবারে?”

পিতোমবাবু, “এ্যাডিং ইন্সান্ট টু ইন্জুরী” বলিয়া কি-একটা বলিতে গেলেন; তাহাতে উন্টা উৎপত্তি হইল। গিম্বি আবার হাঁকিয়া উঠিলেন, “আরে বেখে লাও তোমার ইন্জুরী—ইন্জুরী আদালতে বলো গিয়ে; —এক পয়সার যার দেহে সামর্থ্য নেই সে আবার ইন্জুরী বলে, মুখে আগুন অমন ইন্জুরীর!”

পিতোমবাবু অস্থযোগের হুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “আরে বাবা...” বিস্তৃত কেসে-কথা শোনে? গিম্বি আরও খাঞ্চা হইয়া উঠিলেন, “তোমার বাবাকে যা বলতে চাও, তাঁকে গিয়ে বলো। আমি কিসে তোমার বাবা হ'লাম শুনি? এক বাটি তেল উন্টে আবার রস বদুবাব

চেঁটা হচ্ছে! দু'ব হও এখুনি আমাব ভাঁড়ার থেকে, নইলে ঐ বাকি তেলটুকুনও মাথায় ঢেলে দেবো বলছি।”

পিতোমবাবু দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সত্য সত্যই কিছু উত্তেজিত হইয়াছেন। তিনি তাই গেল্লির উপর তেলের ছোপটুকুকে পরাজয়ের টীকা রূপে বহন করিয়া অক্ষত দেহে অবিলম্বে ভাঙার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্নান করিতে কবিতে পিতোমবাবু ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই যে ব্যবহার ইহাই কি চিরন্তন? সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, “কুন্তলা, বেঙ্কলা কি তবে পত্নী-সম্বন্ধনীর-পীড়িত কবির পরিহাস মাত্র? ‘পতি পরম গুরু’ এ মন্ত্র কি জ্রীলোকের মর্মে স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহার চিরঞ্জীতে আশ্রয় লইয়াছে? দেহ-গোদেব উপব এ কি নিদারুণ বিষ-ফোঁড়া! পিতোমবাবু নিজ চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মাথায় ঘটির পর ঘটি জল ঢালিয়া চলিয় ছেন—চোবাচ্চা নিঃশেষ, তাহাতে জ্বল্লেপ নাই। হঠাৎ স্নান-গারের বাহির হইতে তীক্ষ্ণ কাঠ কে বলিল, “খুব যে নবাবী ক'রে সব জলটুকু খরচ ক'রে রাখছ—কসেত জল

নেই—আমরা কি সব শালপাতায় গা হাত পা পুঁছে
স্নানের কাজ সাব্ব নাকি? রাস্তার কল থেকে ৪।৫
বার্ণি জল তুলে তবে তুমি আফিস যাবে, বুঝলে?”

পিতোমবাবু আতঙ্কে স্নানের জল ছাপাইয়া ঘামিয়া
উঠিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অশ্রুমনস্কতার দোহাই
দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নির্দয় নারী-
হৃদয়ে তাঁহার সে বেদনাপূর্ণ আবেদন “স্বাকামো” বলিয়া
অভিহিত হইল। অগত্যা তিনি বার্ণি হস্তে রাস্তায় জল
আনিতে বাহির হইলেন। ভাবিয়াছিলেন মেথোকে
উৎকোচ-দানে বশ করিয়া উন্মুক্ত রাস্তাপথে বার্ণি হস্তে
বিচরণ করার অপযশ হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবেন।



এমন সময়ে পিছনে কে “হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ” করিয়া অটহাস্ত
করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন
নেপেন ভাড়াটী।

কিন্তু মেথো তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ির পথে “মা
ঠাকরুণ ডাকতেছেন” বলিয়া উপর তলায় উধাও হইয়া
গেল। প্রথম দুই বার্ণি জল পিতোমবাবু লোক-চক্ষুর
অস্তরালে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। কিন্তু তৃতীয়
বার্ণি লইয়া তিনি সবে দরজার গোড়ায় পা দিয়াছেন

এমন সময় পিছনে কে “হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,” করিয়া
অটহাস্ত করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া
দেখিলেন নেপেন ভাড়াটীকে। নেপেন ভাড়াটী তাঁহার
সহিত এক আফিসে কাজ করে—এবং সময় পাইলেই
অবাস্তর কথা বলিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করে। এই
ভাবে ধরা পড়িয়া পিতোমবাবু লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া
উঠিলেন। নেপেনবাবু বলিলেন, “আরে সাঙুল মশায়,
দিন দুপুরে জল চুরী ক’রে কোথায় পালাচ্ছেন?”

পিতোমবাবু কোন উপায়ে আত্ম-সম্মান বজায়
রাখিবার জন্ত বলিলেন, “আর ভাই, চাকর বেটা
পালিয়েছে, দুর্দশার পার নেই—ব’ল কেন?”

উপরের বারান্দা হইতে ঘন ক্রুদ্ধ দেহখানি! অর্ধেকের
অধিক বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেথো চাঁকর
করিয়া উঠিল, “বাবু, শিগ’গির করুন, মা-ঠাকরুণের চানের,
বেলা হ’য়ে যাচ্ছে।”

“হে ধরণী ধিমা হও! এ কি নিদারুণ অপমানের
আস্তনে আমায় পুড়িতে হইল!” পিতোমবাবু এক-
মিনিটে তিন চার বার রং বদলাইয়া করুণ নেত্র নেপেন-
বাবুর দিকে চাহিয়া কোনো কথা না বলিয়া বার্ণিটা
তুলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। নেপেনের অটহাস্তে
পথ-ঘাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে-ধ্বনি যেখানে পিতোম-
বাবু জীর নিকট এক বার্ণি জল কম আনার জন্ত
জবাবদিহি করিতেছিলেন সেখানেও পৌছিল।
পিতোমবাবু ক্ষণেকের জন্ত কি যেন একটা আতঙ্কে
শিহরিয়া উঠিলেন। জী বলিলেন, “ও আবার কি রকম,
চং করুছ?”

পিতোমবাবু বলিলেন, “কিছু না, আফিসের বেলা
হ’য়ে গেছে।”

জী বলিলেন, “এখানে ভাত বাড়া আছে নিয়ে বেয়ে
আফিসে বেরও। ফেরবার পথে ছোটো ভাব কিনে-
এনো—মেথো বল্লে, তোমাদের আফিসের কাছে পাওয়া
যায়।”

দুই হস্তে দুইটি ভাব লইয়া নিজে আফিস হইতে
গৃহাভিমুখে যাইতেছেন ও নেপেন ভাড়াটী তাঁহার সহকর্মী-
দিগের নিকট উক্ত ঘটনার সরস ব্যাখ্যা করিতেছে, এই

চিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়া পিতোমবাবু কল্পিত চরণে আফিসের দিকে রওনা হইলেন।

আফিসে ঢুকিয়াই তিনি দেখিলেন, নেপেন ভাড়াটী জন দশেক ছোকরা-গোছের কর্মচারী পরিব্যাপ্ত হইয়া কি যেন একটা অভিনয় করিতেছে। পিতোমবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সহিত এ অভিনয়ের খুব নিকট কোন যোগ আছে। তিনি মুখ ফিরাইয়া কোন কল্পিত সরল রেখা অনুসরণ করিয়া স্টান নিষ্কের টেবিলে গিয়া বসিলেন। নেপেন ভাড়াটী যে-সকল কর্মচারীদিগকে লইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারা একে একে নিষ্কের নিষ্কের টেবিলে গিয়া বসিতে লাগিল। কেহ কেহ পিতোমবাবুর টেবিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া, “বাক্ আপ্ পিতোমবাবু” বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গেল,—যেন পিতোমবাবু তাহাদের নিকট সাঙ্ঘ্যের জঙ্ক কখনও আবেদন করিয়া-ছিলেন। একজন বলিয়া গেল, “ব্রাদার, তোমার শুন্‌ছি বড় দুঃসময় চলেছে।—আমাদের পাড়ার ভুটানী বাবার একটা মাহুলী জোগাড় ক’রে ধারণ কর না; দেখ অব্যর্থ গ্রহশাস্তি হবেই হবে—বল্ব বাবাকে তোমার কথা?”

পিতোমবাবু নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, “না, না, তোমার অত পরোপকার করিতে হবে না।” বলিয়া ব্যস্ততা দেখাইবার জঙ্ক একটা আধমুণে লেজ্বারে টান দিতে যাইয়া টেবিলে ও নিষ্কের ধূতিখানার উপর একটা লালকালির দোয়াত উল্টাইয়া ফেলিলেন। রাগে ক্ষোভে পিতোমবাবু পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। কাপড়ে কালি লাগা দেখিলে সুভাষিণী, অর্থাৎ পিতোমবাবুর গৃহিণী, তাঁহাকে কি যে না বলিয়া লাস্তিত করিবেন তাহা পিতোমবাবু ভাবিতেই পারিলেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন পঙ্কীভয়বিজ্ঞস্ত কোনো এক আগ্নেয়গিরির ভ্রায় ধুমায়িত, কল্পিত ও বিচলিত ঠিক সেই সময় নেপেন ভাড়াটী আসিয়া পিতোমবাবুর থুংনিতে হাত দিয়া গাহিয়া উঠিল—

দাদারে আমার,
দরগায় লাগাও সিঁড়ি,
পীরের কুপায় হবেন গিন্নি
তোমা পরে সদয়া...ভাইরে সদয়া আ আ...।”

পিতোমবাবু বহু বর্ষের অনভ্যাস ভুলিয়া হঠাৎ পশ্চিমাই-বিধবাসী ভিক্ষুভিক্ষুর মত সংহারমুগ্ধি ধরিয়া জলিয়া উঠিলেন। একবার “দি লাষ্ট ড্রু” বলিয়া সিংহনাদ করিয়াই পিতোমবাবু কুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের নীচ হইতে “ওয়েষ্ট পেপার বাক্‌সেট”টা ভুলিয়া লইয়া নেপেন ভাড়াটীকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। নেপেন আশ্চর্য্যাকার জ্ঞত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পিতোমবাবু তাহার পশ্চাতে “রাস্‌কেল, রাস্‌কেল” বলিয়া চীৎকার



ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত-ওয়েষ্টপেপার পিতোমবাবু;
উদ্ভতবজ্র ইন্দ্রের স্ত্রায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন।
এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আফিসের
ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন।

করিতে করিতে ছুটিয়া সিঁড়ির নিকট তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত-ওয়েষ্টপেপার পিতোমবাবু উদ্যত-বজ্র ইন্দ্রের স্ত্রায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আফিসের ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন।

তাঁহার মেম সাহেব সে-দিন তাঁহাকে গল্‌দা চিংড়ি সহিত তুলনা করিয়া কি বলিতে চিত্ত কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত ছিল। সম্মুখে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভীষণ চট্টয়া গেলেন ও বড়বাবুকে ডাকিয়া নেপেন ভাড়াটীর ৫ ও পিতোমবাবুর ১০ জরিমানার ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন। পিতোমবাবু অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করা সত্ত্বেও সাহেবের কঠিন প্রাণে দাগমাছ পড়িল না।

(২)

জরিমানার কথাটা পিতোমবাবু গিন্নির কাছে অনেক দিন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু মাসান্তে সুভাষিনী যখন তাঁহার নিকট হইতে বেতনের টাকা গুণিয়া লইতেছিলেন তখন ১০ কমে দেখিয়া পিতোমবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, “এ কি ১০ কমে কেন ?”

পিতোমবাবু, “আমি এই কি না.....” বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া তুল পথে ঢোক গিলিয়া বিষম খাইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্বার স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলে পর গিন্নি আবার তাড়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “সত্যি কথা বল বলছি নইলে অনর্থ হবে! রেস খেলেছ? বাজি হেরেছ? কি কবেছ?”

পিতোমবাবু বলিলেন, “না জরিমানা দিয়েছি। সেদিন কি রকম মাথাটা গরম হ’য়ে উঠল.....”

“তাই কি রাস্তায় মারপিট করেছিলে? ওমা কি হবে গো! বুড়ো বয়সে শেষকালে মাঝামাঝি ক’রে থানা পুলিশ বলে! ওগো মাগো, আমায় কিনা এও শুন্তে হ’ল!”

পিতোমবাবু যতই বলেন, “আবে না না, থানা নয়, পুলিশ নয়, আফিসে...” গিন্নির ততই শোক বাড়িয়া চলে, “ওগো তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে শেষকালে—মুখে চূণ-কালি মাখলে, আমাব এ কি লজ্জা হ’ল!”

এমন সময় নহু খুড়া আসিয়া পড়ায় গিন্নি পিতোমকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ে কাছ ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও ডুকুবাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, “ও নহু-খুড়া, বুড়ো বয়সে মারপিট...”

নহু-খুড়া গর্জিয়া উঠিলেন, “ইস্ট্রুপিড, পাষাণ কোথাকার, তুমি জালোকের গায়ে হাত তোল!”

পিতোমবাবু দেখিলেন তিনি ক্রমে গভীর হইতে অতল জলে গিয়া পড়িতেছেন। তিনি এবার প্রাণপণ করিয়া গিন্নির কান্না খুড়ার গর্জনে সব ডুবাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “পুলিশেও যাইনি, সুভাষিনীকেও মারিনি। ন্যাপা ভাড়াটীকে সিঁড়ির মোড়ে চেপে ধ’বে-ছিলাম বলে সাহেব জরিমানা কবেছে।”

গিন্নি বলিলেন, “ও, আফিসে গিয়ে বুঝি ঐ সবই করা হয়?”

নহু-খুড়া বলিলেন, “তা আগে বলনি কেন?”

সুভাষিনী এতক্ষণ পুলিশ-সংক্রান্ত কলঙ্ক-ভীতি হইতে সামলাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এখন স্বস্তির দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ছেলেছোকরাদের মত ধস্তাধস্তি করিতে তোমাদের একটু ঘেন্নাও কি হয় না? দশ দশটা টাকা! এখন কি তোমার বাঁজুরেপনার জন্তে খোকাব ছুধ বন্ধ করব, না, সকলে নিরিমিষ খেয়ে দিন কাটাব?”

নহু-খুড়া বিচারকার্যনিরত সেলামেনের ত্রায় মুখ কবিয়া বলিলেন, “না না, শিশু বহুপান বন্ধ করা কদাপি উচিত হইবে না। তদ্ব্যতীত, গীতাঘর অনবধানতাবশত যে অবিশুদ্ধকারিতাব কার্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার উচিত হইবে আগামী এক মাস কাল ট্রায়ে আফিস যাতায়াত না করিয়া পদব্রজে গমনাগমন করা।”

সুভাষিনী অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া আনন্দে মুখ উজ্জ্বলিত করিয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ, নহু খুড়া! হেঁটে হেঁটে আফিসে যেতে হ’লে, ওনার রসের কেঁড়ে একটুখানি হাফা হ’য়ে আসবে—ছেব লামৌ করাও একটু বন্ধ হবে।”

পিতোমবাবু নহু খুড়ার দিকে একবার বিষনেত্রে তাকাইলেন; কিছু বলিলেন না। সুভাষিনী খুড়া মহাশয়ের রায়ে বিশেষ প্রীতি হইয়াছিলেন। তিনি খুসী মনে স্বামীকে বলিলেন, “তুমি যাও ত গো ছ-পয়সার

কচুরী নিয়ে এসে। মেথো খোকাকে খেলা দিচ্ছে।
নস-খুড়া একটু ব'সে চা-টা খেয়ে যাও।”

নস-খুড়া একটা নিকেলের ডিবা বাহির করিয়া তাহা
হইতে একটিপ তীব্রগন্ধ নস্র গ্রহণ করিয়া একটি মাসাধিক-
কাল রক্তকদর্শন-বঞ্চিত রুমালে নাক মুখ মুছিয়া বলিলেন,
“বিলক্ষণ, তা তোমরা যদি বলো, তাহা হইলে কি আমি
তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পাবি?”

পিতোমবাবু ছয়টি পয়সা হস্তে লইয়া খাবারের
দোকানে কচুরী আনিতে চলিলেন। মনে হইল কচুরী
না হইয়া যদি নস্র খুড়ার জন্ত বিষ আনিবার জন্ত এ যাত্রা
হইত তাহা হইলে তাঁহার অন্তবে অন্তত কিছু হুখের সঞ্চার
হইত। যে-ব্যক্তি পুরুষ হইয়া উৎপীড়িত পুরুষের বেদনা
বুঝে না, বরং তাহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা
করে, তাহার উপযুক্ত পুংস্কার বিষই, কচুরী নহে। হঠাৎ
মনে হইল কচুরী খাইয়াও ত কেহ কেহ কলেরা হইয়া
মারা যায়—নস্র-খুড়াকেও বাসী দেখিয়া কচুরী খাওয়াইতে
পারিলে তাঁহারও হয়ত একটা ভালমন্দ খটিতে পারে।
দোকানে পৌছাইয়া পিতোমবাবু বলিলেন, “বেশ ভাল
বকম বাসী কচুরী আছে?”

দোকানদার অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া
রহিল; বলিল, “সে কি মশাই—বাসী কচুরী কি আবার
কেউ বিক্রি করে নাকি?” যেন কলিকাতাব ময়রার
অভিধানে বাসী বলিয়া কোন শব্দই নাই।

পিতোমবাবু বলিলেন, “আরে বাপু, কুকুরকে
খাওয়াতে হবে—সস্তা টস্তা ক’রে দাওনা, থাকে ত।”
ময়রা অগত্যা, যেন খুবই অনিচ্ছার সহিত, তাঁহাকে এক
ঠোঙা কচুরী বাহির করিয়া দিল। পিতোমবাবু সানন্দে
কচুরী লইয়া গৃহে চলিলেন। মনে মনে বলিলেন,
“কলেরা না হোক অন্তত দু চার দিনের জন্ত ঘর থেকে
বেরনো বন্ধ হবে ত।”

একখানা কচুরী মুখে দিয়াই নস্র-খুড়া বলিলেন,
“খুঃ, খুঃ, ছা, ছা, এই কি অজ্ঞকার কচুরী না কি?
বাবাজি, তোমাকে ময়রা ঠকাইয়াছে। এ কচুরী নিদেন
পক্ষে তিন দিবসের বাসা মাল।”

গিন্নি বলিলেন, “বলি, তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে

দোকানে গিয়েছিলে নাকি? যাও শিগ্গির খাবারটা
বদলে নিয়ে এস। এদিকে চায়ের জল ফুটে উঠল; কোনো
কাজ কি তোমায় দিয়ে হবে না?”

পিতোমবাবু নিজের সযত্নকল্পিত প্রতিহিংসার পথ
এমন করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া মরীয়া হইয়া
বলিলেন, “না, না, ও কিছু ভেতন বাসী নয়; হাত-গরম
না হ’লেই কি খাবার বাসী হয়; খান না, খুড়ো মশায়;
কিছু হবে না।”

খুড়া শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, “না বাবাজি,
আমার আর বাসী খাইবার স্বপ্ন নাই।”

গিন্নি হাঁকিলেন, “শি...গ্গি...র যাও বলছি।
নইলে তোমায় রাত্রে ভাতের বদলে ঐ কচুরী খেয়েই
থাকতে হবে।”

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া পুনর্বার ঠোঙা হস্তে পথে
বাহির হইলেন। মুখখানা তাঁহাব হস্তস্থিত বাসী কচুরী
অপেক্ষাও শুষ্ক, স্থান।

(৩)

ট্রামেব পয়সা না পাওয়াতে আজকাল পিতোমবাবু
আফিসে প্রায়ই ‘লেট’ হইতে আরম্ভ করিলেন। বড়বাবু
তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, একথা স’হেবের
কাণে গেলে মুক্তি হইবে। পিতোমবাবু তাঁহাকে বলি-
লেন যে, কোন ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহার বর্তমানে
ট্রামে যাতায়াত করিবার সংস্থান নাই—কি করিবেন?
বড়বাবু বলিলেন, যেমন কবিয়া ইউক আফিসে গময়ে না
পৌছাইলে বিপদ অনিবার্য।

পিতোমবাবু গৃহে ফিরিয়া জীকে বলিলেন, “আফিসে
‘লেট’ পৌছানতে বড়বাবু শাসিয়েছেন ‘রিপোর্ট’
করবেন, বুঝলে?”

গিন্নি বলিলেন, “কেন, পথে কি খেলা ক’র নাকি?
দেয়ী হয় কেন?”

“সকালে বাজার ক’বে, তোমার ফুট-ফরমাস খেটে,
ভাত পেতে দেয়ী হ’য়ে, তারপর যদি ট্রামের গয়সা না
পাই তা হ’লে ‘পাংচুয়াল’ হ’তে হ’লে আফিসে দৌড়ে
যেতে হয়।”

স্বভাষিণী বিষকণ্ঠে উপদেশ দিলেন, “তবে এঁকটা দিন নৌড়েই যেও।”

হতাশা ও গত্যস্তরবিহীনতা পিতোমবাবুকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “না, ট্রামেই যাব; আলবাৎ যাব।”

গিন্নি আরও জোরে বলিলেন, “অমন ক’রে জানোয়ারের মত চেঁচাচ্ছ কেন? মারবে না কি?”

পিতোমবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ মারব, যদি ফের আমার কথার উপর কথা বল ত মারই খাবে।”

গিন্নি বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়া ধড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “তুমি আজ নিশ্চয় মদ খেয়ে এসেছ! তা নইলে আমার মারতে ঠঠ! থাক আজ ঐ ঘরে বন্ধ হ’য়ে, আজ তোমার খাওয়া-দাওয়া বাদ; দেশা ছুটলে পর আমার কাছে মাপ চাইবে, তবে তোমার আমি ছাড়ব। ঝাঁটা মার অমন পুরুষমানুষের মুখে! চামানের মত কথা শোন একবার; বলে কি না মারবে! ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি”

পিতোমবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, “খোল বলছি দরজা, তা নইলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।”

“ভাঙনা ক্ষেমতা থাকে ত। তারপর বাড়ীওয়ালকে গুণ্ণকার দিও।”

পিতোমবাবু দড়াম করিয়া দরজায় একটা লাথি মারিলেন। পায়ে লাগিল বটে, তবে দরজার কিছুই হইল না। ডাকিলেন, “মেধো, মেধো!” শুনিলেন গিন্নি বলিতেছেন, “ওদিকে ঘাস যদি মেধো ত ঝাঁটা মেরে বিদেশ করব।”

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া একটা বেতেব চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। আফিস হইতে ফিরিয়া কিছু খাওয়া হয় নাই; কি করিবেন? একথানা “প্রবাসী” পড়িয়াছিল তুলিয়া লইলেন। প্রথমে চোখে পড়িল একটি প্রবন্ধ “নরনারীর সমান অধিকার।” পিতোমবাবু ভাবিলেন, “হায়রে, সে-রকম স্বদিন কি আমাদের কখন হবে?”

তিন চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। কয়েকবার

ডাকাডাকি করিয়াও স্বভাষিণীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একবার “তোপসে” মাছ ভাজার একটা উগ্রমধুব গন্ধ দমকা হাওয়ার সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পিতোমবাবুর রসনায় বান ডাকাইয়া দিয়া আবার মিলাইয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ওগো, লক্ষ্মীটি, দরজা খোল, খিদেয় প্রাণ গেল, আমি দৌড়েই আফিস যাব, দরজা খোল।” শুনিলেন ভঙ্জিতমৎস্তজড়িত গ্রিহায় নস্ব খুঁড়া স্বভাষিণীকে বলিতেছেন, “না, না, খুলিয়া কাজ নাই। মাতাল মানুষ পুনরায় যদি প্রহার আবস্ত করে, আমি এ বয়সে রোধ করিতে পারিব না।”

দরজা বন্ধই রহিল। পিতোমবাবু “প্রবাসী” গল্প ও প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একথানা ছবি। একজন লোক আদেশ করিবার ভ্রায় ভঙ্গিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। চক্ষু দিয়া তাহার অপূর্ণ স্রোতি নিঃসারিত হইতেছে। তাহার সম্মুখে দলে দলে লোক—কেহ কর-জোড়ে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত। এক পার্শ্বে গুটিকয়েক হস্তী ও অশ্ব উজ্জ্বল আত্মসমর্পণ-মুদ্রায় উপস্থিত রহিয়াছে। ছবিটির নীচে বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

অদ্ভুত ইচ্ছা-শক্তি

পথহারা চলৎশক্তিরহিতপ্রায় পথিক মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ “ওয়েসিস্” দেখিতে পাইলে যেমন নিঃশ্বাসে প্রাণে পুনর্জন্মের আশ্বাস পাইয়া পুনর্বার চালা হইয়া উঠে, পিতোমবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, বন্দিত্বাশা, নস্ব খুঁড়া, তোপসে মাছ সব তুলিয়া আধভাঙা বেতের চেয়ারখানার উপর যতটা পারেন সোজা হইয়া বসিলেন। তাহার অন্তরে যেন কোটি বিহঙ্গম কোনো এক নূতন উষার আশা-স্বর্ঘ্যেব পানে চাহিয়া গাহিয়া উঠিল, “আর ভয় নাই; দুখ হ’ল অবসান।”

পিতোমবাবু পাঠ করিলেন :—

অদ্ভুত ইচ্ছা-শক্তি

“ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে মানুষ কি না করিতে পারে? পৃথিবীতে এই যে এত বিফলতার জন্মন, এত উৎসাহিত্তের

শ্যাকুল আশ্রয়লাভ, ইহার মূলে রহিয়াছে ইচ্ছাশক্তির অভাব বা অশিক্ষিত ভাব। শিক্ষিত ইচ্ছা-শক্তি মানুষকে তেমনি করিয়াই ক্ষমতাশালী ও অপরের মনের উপর প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে যেমন কবিয়া শিক্ষিত-মানসপেশী কুস্তিগির বা যুগ্ম-যোদ্ধা অকাতরে অপরের উপর শারীরিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আমাদের শিক্ষা অল্পসাবে চলিলে আপনি বর্তমানে যতই পরনির্ভরশীল, কাপুরুষ ও অপরের উপর প্রভাবহীন হউন না কেন, তিন মাসের ভিতর আপনার কথায় লোকে উঠিবে বসিবে, আপনার চোখের চাহনির সম্মুখে উদ্যত-ছোবা গুণ্ডাও হটিয়া যাইবে, অদম্য আত্মনির্ভরশীলতা আপনাকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আসীন করিয়া দিবে।

“এ শক্তি লাভের জন্য আপনাকে কিছু থাইতে হইবে না, কিছু ধারণ করিতে হইবে না। নিছক মানসিক শক্তির উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা আপনি দিনে দিনে অধিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।

“এ শক্তি আপনার ভিতরেই আছে। আমরা মাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব।

“নীচের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রী প্রভাবানন্দ স্বামী

পোষ্ট বক্স ৩৩১৩, কলিকাতা।”

পিতাম্বর বা ভাবিলেন, “কি আশ্চর্য্য; আর আমি একটা সামান্য নারীর দ্বারা উৎসাহিত হ’য়ে কি করব তা ভেবে কুল পাচ্ছি না। কালই আমি স্বামীজিকে চিঠি লিখে সব ঠিক ক’রে ফেলব।”

গভীর রাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া স্ত্রীভাষিনী দেখিলেন, তাঁহার স্বামী অঘোরে নিদ্রা দিতেছেন। মুখ তাঁহার কি এতটা বিজ্ঞানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত। স্ত্রীভাষিনী মনে মনে বলিলেন, “মমের এমনই গুণ বটে। পেটে ভাত পড়েনি একটাও, ঘুমের ঘোরে মুখ করেছে যেন ওকে এক লাটের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে।”

(৪)

প্রভাবানন্দ পিতাম্বরকে লিখিলেন,

“আপনি যে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্য

আপনাকে আমি সপ্রশংস সম্ভাষণ করিতেছি। আপনি এই পত্র লিখার সঙ্গে-সঙ্গেই শক্তিশক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

“এখন আপনাকে বলি, ইচ্ছা-শক্তি কি। “আমবা যখন সম্ভ্রমে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করি বা কোনোরূপ ইচ্ছামুসারে কার্য্য করি তখন একথা আমরা কদাচ মনে করি না যে, আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে কোন কিছু আছে যাহার উপর আমাদের কার্য্য বা ইচ্ছা কোন-রূপে নির্ভর করে। বস্তুত আমাদের যে মন তাহার মধ্যে সম্ভ্রান্ততার ক্ষেত্র অতিশয়ই স্বল্প-পরিসর। আমাদের যে অনভিব্যক্ত-অনুভূত মনঃক্ষেত্র তাহা সর্বদাই আমাদের সম্ভ্রান্ত চিন্তা ও কার্য্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছে। যে ব্যক্তি বহুকাল কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোন এক প্রকার মনোভাব পোষণ করিয়াছে সে যদি কখনও জোর করিয়া তাহার বিপরীত কিছু করিতে যায়, তাহা হইলে সম্ভ্রান্ততার ক্ষেত্রে তাহার সেইরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে তাহা করিতে পারিবে না; কারণ তাহার মনঃক্ষেত্রের প্রত্যেক আপাতঅনুভূত প্রাস্ত হইতে সে বিপরীত দিকে আকর্ষিত হইবে। এইজন্য সম্ভ্রমে কোনো প্রকার কার্য্য চিন্তা বা ব্যবহার উত্তমরূপে করিতে হইলে সর্বদা আমাদের সমগ্র মনঃক্ষেত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

“আপনি যদি অপরের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অক্ষম হ’ন, তাহার কারণ এই যে, আপনি আজন্ম কাল সম্ভ্রমে ও অজ্ঞানে এই ধারণাই মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে, আপনি অপর হইতে অধম। এ মনোভাব আপনাকে দূর করিতে হইবে।

* * * *

“আপনি পত্রোত্তরে ১৩।০ টাকা আমায় পাঠাইলে আপনাকে আমি মনঃলিখিত পুস্তক “অজুত ইচ্ছাশক্তি” পাঠাইয়া দিব। পুস্তকানুগত নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিলেই আপনি ক্রমে ক্রমে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীকে পদতলে আনিতে পারিবেন।”

পিতাম্বর বা ভাবিলেন নিম্নের ঘড়িটি বন্ধক দিয়া ১৫৯ সংগ্রহ করিয়া স্বামী প্রভাবানন্দকে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

“অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি” আসিল। ছাদের ঘবে লুকাইয়া বসিয়া পুস্তকের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া পিতোমবারু বুঝিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি আছে অনেক, কিন্তু তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই ছত্রভঙ্গ ইচ্ছাশক্তি একত্র করিতে হইলে তাহাকে কোন কঠিন কার্য্য প্রত্যাহ একাগ্রমনে কিয়ৎকাল ধরিয়া করিতে হইবে। যথা, সূতার জট ছাড়ান। অনেকটা সূতা জট পাকাইয়া তাহা একমনে খুলিতে থাকিলে বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তি শীঘ্রই ঐ জটের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। পিতোমবারু গিম্বিব “ক্রোশের” সূতার বাণ্ডিল একটি অপহরণ করিয়া ছাদের ঘরে লইয়া খুলিয়া জট পাকাইয়া ফেলিলেন। তারপর জট ছাড়াইবার পালা। পিতোমবারু যতই একদিক খুলেন উহা ততই অপব দিকে দ্বিগুণ জট পাকাইয়া যায়। তিন দিন ধরিয়া পিতোমবারু তাঁহার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তির কণাগুলি একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিলেন সূতায় ঘে জট সেই জট।

গিম্বি তাঁহাকে ঘন ঘন ছাদের ঘরে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘাণে-পাণে সব গেরস্ত মানুষের বাড়ী; বৌ-ঝিরা ছা’দে বড়ি দিতে, চুল শুকুতে ওঠে; তুমি ছাদে কিসেব স্ত্রী ঘোরাঘুরি ক’র, ব’ল ত ?”

পিতোমবারু বলিলেন, “না ঘোরাঘুরি ত করি না; এই একটু বিশ্রাম হয়।”

সম্মিষ্টচিত্ত গৃহিণী সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া একদিন হঠাৎ যখন স্বামী এক মনে সূতার জট খুলিতে ব্যস্ত, সেই সময় ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাশীকৃত সূতা দেখিয়া ত তাঁহার চক্ষু স্থির। তিনি বলিলেন, “ওমা, বড়ো বয়সে তুমি কি শেষে ঘুড়ি উড়ুতে আরম্ভ করলে না কি ? ছি, ছি, লোকে বলবে কি ? ধবরদার আর তুমি ছাদে উঠে এ সব করবে !”

স্বামী বলিলেন, “ঘুড়ি আবার কোথায় উড়াই; একি ঘুড়ির সূতা ?”

“তাইত, এ দেখছি আমার বুনবার সূতো ! এ তুমি কোথায় পেলে ? আমি ব’লে সূতো নেই দেখে খোঁজা করে মারধোর করলাম, মেথেকে কত গাল দিলাম। দেখ দিখিন; আর তুমি সূতোটুকু নিয়ে এখানে থেলা করছ।

ওমা কি ঘেমা; তুমি ফের যদি আমার সূতোয় হাত দেবে ত দেখতে পাবে।” বলিয়া তিনি জট পাকানো সূতার রাশি লইয়া চলিয়া গেলেন।

পিতোমবারু অতঃপর আকস্মিক অবসব সময় টোয়াইন সূতা জট পাকাইয়া ও খুলিয়া দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পাঠ শেষ করিলেন।

(৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম “আমি”।

স্বামীজি লিখিয়াছেন “আমি কে ? আমি সব । আমি সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু, আমি পালনকর্তা ব্রহ্মা, আমি সংহারক মহেশ্বর। আমার মধ্যেই সৃষ্টি, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা। আমি ছাড়া আর কিছু নাই।”

দ্বিতীয় পাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রকে নিজের উপর বিশ্বাসবান করা। উপায় প্রত্যাহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে ১০০ হইতে ১০০০ বাব “আমি মাহাত্মা” সূতক কোন মন্ত্র জপ করা। ইহাতে সজ্ঞানে অজ্ঞানে সর্বতোভাবে মানসক্ষেত্র আত্মবিশ্বাস-বারিতে সিল্প সঙ্গ হইয়া উঠে।

প্রথম সাতদিন পিতোমবারু জপ করিলেন, “আমি বেলুন অপেক্ষা উজ্জ্বল্যামী, নায়েগারা অপেক্ষা প্রবল, সমুদ্র অপেক্ষা বিশাল ও গভীর, হিমালয় অপেক্ষা উচ্চ, তুষার হইতে শুষ্ক, সূর্য্য হইতে প্রখর; আমি সর্বাপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।”

তারপর পনের দিন তিনি মনে মনে পৃথিবীর সকল বস্তু ও মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমা অপেক্ষা তুমি বহনিয়ে। হে জলধর, হে পর্বত, হে বৃক্ষ, আমা অপেক্ষা তোমরা ক্ষুদ্র। হে স্যাণ্ডো, হে হাকেনস্মাট, হে গামা ও ইমাম বক্স, তোমরা আমা হইতে বহুদূরবল। হে নেপোলিয়ান, তোমা হইতে আমি বড় বোদ্ধা; চাণক্য, আমি তোমাপেক্ষা বিচক্ষণতর রাজনীতিবিদ; কালিদাস, তোমা হইতেও আমি বড় কবি; সেন্সপীর, তোমা হইতেও আমি বড় নাট্যকার। হে ধবণীর অধিবাসী, তোমরা আমার পদে প্রণত হও।”

এইরূপে পিতোমবারু বহু অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে সেই পাঠে আসিলেন যাহাতে কি করিয়া

অপরকে নিজইচ্ছানুসারে কার্য করান যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ যে-ব্যক্তিকে বশ করিতে হইবে তাহার

রহিল। বাবু বুঝিলেন মেধোর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে ও সে তাঁহারই ইচ্ছায় এখন নড়িবে চড়িবে।

তিনি আবার বলিলেন, “মাধব !” মেধো এবাব সত্যই

ভয় পাইয়া বলিল, “আজ্ঞে বাবু কি বলছেন ?”

২. অনন্তিতে তাহার ঘাড়ের ঠিক মধ্যদেশে এককালীন ৫।১০

মিনিট কাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইবে ও মনে মনে বলিতে হইবে, “তুমি আমার দাস (বা দাসী), তুমি আমার কথামত কাজ করিবে, —অনুগ্রহ করিবাব তোমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন, আমার আজ্ঞাবহ; তোমার নিজেব বলিয়া কোন ইচ্ছা নাই।” তৎপরে (কয়েক দিবস এইরূপ কবিবার পরে) একদিন তাহার চোখে চোখে চাহিয়া তাহাকে ধীর শাস্ত কর্তে, সকল তীব্রতাবর্জিত ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার পক্ষে তাঁহার আদেশ মত কার্য না করা স্বভাবতই অসম্ভব। ইহার পর তাহাকে যাহা বলা যাইবে সে তাহাই করিবে।



পিতোমবাবু—“রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান.....ইত্যাদি”

সুভাষিনী—“আ মরণ,.....”

পিতোমবাবু দিন পনের আড়ালে আড়ালে সুভাষিনী ও মেধোর ঘাড়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া তাহাদেব বাসন্তে বাধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন

তিনি মেধোকে সিঁড়ির নিকট ধরিয়া অবদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া ধীর শাস্তকর্তে বলিলেন, “হে মাধব, আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস। পরমপিতা ভগবান তোমাকে আমাপেক্ষা নিম্নতম অলঙ্কৃত করিবার জন্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, হে মাধব, তুমি তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রার নির্দেশ অঙ্গুসরণ কর। এই পাচুকা-যুগল বহন করিয়া তুমি আমার কক্ষে স্থাপন কর।”

মেধো বাবুর বখা এতটাও বুঝিতে না পারিয়া জ্ঞাবাচ্যাকা খাইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মূখের দিকে চাহিয়া

পিতোমবাবু বলিলেন, “জুতোজোড়া নিয়ে ঘরে রেখে এস।”

মেধো তাঁহার পা হইতে জুতোজোড়া খুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিল; তাহার পশ্চাতে পিতোমবাবু বিজ্ঞানোন্নয়ন-গর্ভিত বদনে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইলেন।

গিন্নি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতে ছিলেন। তিনি জুতাহস্তে ভৃত্য ও তৎপশ্চাতে থালি পায়ে বাবুর এই অপকৃপ মিম্বিল দেখিয়া ক্ষণিকের জন্ত হতবুদ্ধি হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপরে পিতোমবাবুকে সম্বোধন করিয়া তির্যাসা করিলেন, “এ কি-?”

পিতোমবাবু গৃহিনীর মুখে এরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সময় হইয়াছে। এইবার তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইবে। তিনি মেধোর হস্ত হইতে চটিজোড়া লইয় পায়ে দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, “রে নারী, অষ্টিতে তোমার স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়াছ কি? তাহা আমাব পদতলে। আইস আপন প্রকৃতি দত্ত স্থান পূর্ণ কর। অল্পখা হইবার নহে, তুমি আমার দাসী, আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার জীবনের সার্থকতা।”

সুভাগিনী প্রথম একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল স্বামী সম্ভবতঃ কোন “অ্যামেচার” থিয়েটারের পালায় নামিয়াছেন; এ তাহারই “রিহাসাল” হইতেছে। তাঁহার মেজাজটাও আজ একটু ভালই ছিল, তাই তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আ মরণ, রস করবার ইচ্ছে ত সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে বেরিয়েছ কেন? চল এই ঘরে, তোমার পালা শুনিগে।”

পিতোমবাবু বলিলেন, “প্রিয়ে, এ যে-সে অভিনয় নহে। ইহা জীবন-নাট্য। তুমি আমার দাসী—চিরকালের—আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার পূর্ণতা ও স্থিতি।”

গিন্নি নিজের ভুল বুঝিলেন। বলিলেন, “ও, তাই না কি? আচ্ছা দেখা যাবে কে কার মুনিব।”

পিতোম বাবু একটা ঘরের দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “যাও।”

গিন্নি বলিলেন, “তুমি যাও না।”

পিতোমবাবু হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন, “নাও বল্গি এঙ্কুনি।”

গিন্নি ভাবিলেন হয়ত স্বামী আবার নেশা-টেশা করিয়াছেন তাই আত্ম-রক্ষার্থে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন ও ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিলেন।

একাধারে এরূপ দুইটি জয়ের আনন্দে পিতোমবাবু বিভোব হইয়া ছাদে গিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে আফিসের কাপড় পরিবার জন্ত ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বার বন্ধ। বহু চীৎকার করিলেন, বহু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা, বাসার কাপড়ে ও বাজারের খাবার

খাইয়া পিতোমবাবু আফিসে গেলেন। জয়েব মধ্যেও পরাজয়ের ভেজাল পাইয়া আনন্দটা তাঁহার কিছু কমিয়া গেল।

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন বাড়ীতে কেহ নাই, শুধু মেধো। সে একটা তালা ও চাবী তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, “মা ঠাকরণ বাপের বাড়ী গেছেন, আমায় ছুটি দিয়েছেন, আমি চল্য়।”

পিতোমবাবু বলিলেন, “সে কি? আর খাওয়া-দাওয়া, তার কি ব্যবস্থা?”

মেধো বলিল, “বাড়ীতে চাল-ডাল ছুন-তেল কিছুই নেই; মা ঠাকরণ টাকা পয়সাও কিছু দিবে যান নি।”

পিতোমবাবু পকেটেহাত দিয়া দেখিলেন মাত্র সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। তিনি মেধোকে বলিলেন, “তুমি যাও।” মেধো চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া পিতোম বাবু দেখিলেন, ঘরে বাজ-প্যাটার কিছুই নাই—মায় বিছানাপত্র আয়না চিরুণী সব লইয়া গিন্নি শুধু ঘবে খালি তক্তাপোষটা ও একখানা চেয়ার মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া দেখিলেন একটা টিনে কয়েকটা আদা আর শুকন লঙ্কা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে এক বুড়ি ঘুটে। পিতোমবাবু হতাশ হইয়া সাড়ে তিন আনা পয়সা-পকেটে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শব্দরালয় ঠাকুর-পুতুর; ট্রামে ও গাড়ীতে অনেক মাইল ও অনেক পয়সার মামলা। দারুণ ক্ষুধা, ক্ষুণ্ণবৃত্তি করিতেই পয়সা কটা ফুরাইয়া গেল; তারপর পিতোমবাবু যুৎভট কোন উষ্ট্রেব ত্রায় শব্দরালয়ের পক্ষে দেহটাকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পথে বহুবার বিশ্রামের জন্ত ও জল খাইবার জন্ত বসিয়া ও শেষের দিকে একটা আলু-বোঝাই গরুর গাড়ীর চালকের রূপায় তাহার উপর চড়িয়া রাত্রি ২টার সময় পিতোমবাবু শব্দরালয়ে পৌছিলা। স্বয়ং শব্দরমহাশয় তাঁহাকে দরজা খুলিয়া আলো ধরিয়া শয়নাগারের দিকে আগাইয়া দিলেন। শুধু একবার তিনি অস্থযোগের স্বরে বলিলেন, “ছিঃ বাবাজি, অন্ততঃ ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েও তোমার ওসব নেশা-টেশা করা উচিত নয়।”

পিতোমবাবু ক্লান্তি ও অবসাদের তাড়নায় তাঁহার কথার প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না। অবশ্য

কলঙ্কের বোঝা বহিয়া শয়ন করিলেন। জী বলিলেন, “কি গো মূনিব ঠাকুর, এসেছ? বলি হেঁটে হেঁটে ত পায়ের নড়া খইয়ে এসেছ—এখনও কি আমি তোমার দানী-বানী?” পিতোমবাবু সকল ইচ্ছাশক্তি পত্নীর পদে বিসর্জন দিয়া বলিলেন, “না গো না; আর কখনও অমন কথা আমি মুখে আনব না। ঘরে কিছু খাবার আছে?”

(৬)

পিতোমবাবু ‘অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি’ গ্রন্থটি রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া আজকাল আবার ঠিক পূর্বের ছায় জীব কথামত ঘুম হইতে ওঠেন, বাজারে যান, ছেলেকে খেলা দেন, আপিস যান, মাহিনা আনিয়া জীকে বুঝাইয়া দেন, ওঠেন বসেন। কিন্তু, প্রাণে তার দারুণ অশান্তি। গিন্নি তাঁকে বড়ই কড়া শাসনে রাখেন, তার সিগারেট খাওয়া বারণ—সাম্রাজ্যবাদের জন্য এক ঘণ্টার অধিক বাহিরে থাকা বারণ—কোন প্রকার বদহজমের অর্থাৎ সর্বপ্রকার মুখরোচক খাদ্য খাওয়া বারণ—বন্ধুবান্ধবকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা বারণ—আরও কত কিছু বারণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মেধোর, খোকার, নস্থ খুড়ার, আরও কতলোকের মন জুগাইয়া চালাতে হয়,—প্রত্যহ শতবার শুনেতে হয় তিনি অকস্মাৎ, নিলজ্জ, বেহায়া ও নির্দোষ।

মরিয়া হইয়া শেষাবধি পিতোমবাবু একদিন পরম শত্রু নেপেন ভাড়াড়ীর শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন, “ভাই নেপেন, জানহিত ভাই, আমার কেমন ক’রে দিন কাটছে। কি ক’রে, ভাই, বাড়ীতে একটু নিষ্কেষর মত স্থখে শান্তিতে থাকতে পারি তার একটা উপায় বলতে পার? তুমি বুদ্ধিমান লোক, ইচ্ছে করলে পাববে একটা উপায় বলে দিতে।”

নেপেনবাবু তাঁহাকে বহু প্রমত্ত করিয়া অবশেষে একটা পরামর্শ দিলেন।

দিন কয়েক পবে একদিন রাত্রে তরকারীতে হুন বেশী হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীমণি পিতোমবাবুর পাতে এক হাতা গরম জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, “এবার খাও

কম হুন লাগবে এখন। কাজ নেই কোন, শুধু খুঁতধরা বাই হয়েছে। এরপর তুমি হোটেল গিয়ে চারগুণ পয়সা দিয়ে ভাত খেও।”

পিতোমবাবু রাগ করিয়া না খাইয়া উঠিয়া গেলেন। খাবার ঘরের বাহিরে গিয়াই কিন্তু তাঁহার মুখ কি একটা অপূর্ণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙিতেই স্ত্রীমণি দেখিলেন পিতোমবাবু মশারুর দিকে পা তুলিয়া, “মা মা” বলিয়া ডাকিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে নিজের বুছাছুঁ চুষিতেছেন। প্রথমে তিনি, উজ্জন, গর্জন, গালিগালাজ দিয়া দেখিলেন কিছুই হইল না। পিতোমবাবু তন্তু-পোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এক বিরাটাকৃতি নৈত্য-শিশুর স্তন্য হাত পা ছুঁড়িয়া ক্রমাগত “মা মা” করিতে লাগলেন। গিন্নি ভয় পাইয়া নস্থ খুড়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

খুড়া আসিয়া টানাটানি করিয়া পিতোমবাবুকে ঘেরেতে নামাইয়া দিতেই পিতোমবাবু হামা দিয়া ঘরময় “হুহু, কাব; হুহু, কাব,” বলিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

গিন্নি এবার সত্য সত্যই ভয় পাইয়া মধ্য কান্নাকাটি ছুড়িয়া দিলেন। নস্থখুড়া দৌড়াইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার এরূপ ব্যায়রাম কখনও দেখেন নাই। তিনি নিজ অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, “এ্যাঁকউট নার্সিং ব্রেক-ডাউন, রোগীকে কোন প্রকার নাড়া চাড়া বা উত্তেজিত করিবে না। দু’খ চাহিতেছে, দু’খ খাওয়াইয়াই রাধ। পরে আসিয়া দেখিব, কি হয়।”

সকলে ধবাধরি করিয়া পিতোমবাবুকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া কখন হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন কখন বা “গ, গ, গ, গ,” বলিয়া চৈৎকার বা অথবা হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশুরা যেমন ক্রমাগত চিৎ হইতে উবুড়, উবুড় হইতে চিৎ হইয়া দৈহিক “এনাজির” সন্যবহার করে, পিতোমবাবুও সেইরূপে ব্যায়ামের কাজ করিয়া ঘাইতে লাগিলেন। একবার নস্থখুড়া অনবধানতাবশত পিতোমবাবুর পায়ের কাছে আসিয়া বসতে জুঁড়া-নিরন্ত পিতোমবাবুর পদসঞ্চালনে দূরে নিষ্ফল হইলেন।

কেহ দেখিল না যে, পিতোমবাবুর মুখখানা ইহাতে কি এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বভাষিণীর কেশ ধরিয়া একবার পিতোমবাবু সহাস্ত বদনে ঝুলিয়া পড়িলেন। স্বভাষিণীকে বহুকষ্টে সেই দৈত্য-শিশুর কবল হইতে রক্ষা করা হইল।



...‘কিভিং বটলে’ দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন।

খাওয়া লইয়া আর এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। ঘরময় ছুঁচের ঢেউ খেলিয়া গেল, দুই তিনটি পেয়ালা, তিন চারিটি বাসী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মেঝেতে গড়াইতে লাগিল; পিতোমবাবু সেই দুহুস্তোতে ছপাং ছপাং করিয়া হামা দিয়া বেড়ইয়া বিছানার উপর হইতে টানিয়া স্বভাষিণীর আদরের লঙ্কো ছিটের নতুন লেপখানা সেই দুহুস্তোকে ফেলিয়া মাথামাথি করিয়া এক নব দক্ষযজ্ঞের সূচনা

করিলেন। স্বভাষিণী আজ জীবনে প্রথম বিপদের মুখে পরাক্রান্ত হইয়া ছল ছল নেত্রে এই তাণ্ডব অভিনয় নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

স্বভাষিণী বাটি করিয়া দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া পিতোমবাবুকে অগত্যা থোকার “কিভিং বটলে” দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। নহুখুড়া নম্র লইতে লইতে বলিলেন, ‘জুর্গা জুর্গা’।

তিন চারদিন অতিশয় যত্নেব সহিত শুশ্রূষা করিয়া পিতোমবাবুকে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। স্বভাষিণী শয়নকালে তাঁহাব পা টিপিয়া দেন। নহুখুড়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাওয়া করেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, “সম্পূর্ণ শাস্তি ও আরাম দেখিয়া চাই; নতুবা পাগল হইয়া যাইবাব ভয় আছে।”

(৭)

কয়েক দিন হইল পিতোমবাবু আবার আপিস যাইতেছেন। নেপেনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভায়া, আছ কেমন? মনেত হচ্ছে খেয়ে দেয়ে তোফা ফুল্ছ।”

পিতোমবাবু নিজের বাম চক্ষু ঈবৎ নিমীলিত করিয়া বলিলেন, “ছুছ।”

বৃহত্তর ভারত*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যবদ্বীপ যাবার পূর্বাঙ্কে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চারিদিকের দাবীর দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের 'নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবীর আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হ'য়ে যার দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবী সত্য হয়, অন্তরে সেখানেই দানব শক্তি উদ্‌ঘোষিত হ'য়ে ওঠে। দানব সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পাবিনে সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হ'য়ে ওঠে। আজ একটা আকাজক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেচে, যে-আকাজক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্মান করিতে চায়। সেই আকাজক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ কবেচে। সেই আকাজক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করুচে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্ধরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সঙ্গীর্ণ সৌম্যবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কালে ও বর্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত ক'রে রাখে ব'লে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্তেই জানে কর্মে সে দুর্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে, “দাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” অর্থাৎ ভাবনাই হচ্ছে সাধনার স্থষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো ক'রে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পৌছয় না, এবং অতি-ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হ'তে হয়। আপনার কাছে আপনার পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। আপনার পরিচয়কে সঙ্গীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্ছে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোট পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইবেব দিক থেকে দেশেব এমন কোনো মূর্তি দেখিনি যার মধ্যে দেশেব ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে-গড়া কলকাতা সহরের মধ্যে ভাবতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা স্বগভীর ও স্বদূর-বিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম ব'লেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্তে বাস করিতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভাবতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিন্তের ঐক্যধাবা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমালয়ের স্বচ্ছ থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত লক্ষ্যমান এই গঙ্গানদী সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্তার স্মৃতিযোগ-সূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে ক'রে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেচি, আব হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয়ে এমন একটা চিরন্তন রূপ, যা সমগ্র ভাবতের; যা একদিকে দুর্গম, আব একদিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যাহ প্রাণময় হ'য়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্য-মাত্র নেই।

তারপর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে শুরু করলাম। তখন আলেকজান্ডার থেকে আরম্ভ ক'বে ক্লাইভের

* বৃহত্তর ভারত পবিত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়-সম্বর্ধনা উপলক্ষে।

আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বাববাব কি-রকম পবাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিনক্ষণ তারিখ ও নামমালা সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করবেছি। এই অগোববের ইতিহাস-মরুতে রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনীর ওয়েসিস্ থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মনস্ত পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবাব চেষ্টা করা হ'ত। সকলেই জানেন সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কি রকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টঙের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দেশেব মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কি রকম উপবাসী হ'য়ে ছিল। দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটাকে গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রবণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমবা দীন ব'লে জানি তাহ'লে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস প'ড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অস্তবাব মধ্যে পাইনে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো করে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হুয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগোরব-অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে ব'সে ব'সে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার ক্ষমতা মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্তবর অত্যাঙ্কি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তিব স্বপ্নমূলক উপকরণ রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আশ্রয়-সেদিন যে একবারে চ'লে গেছে তা বলতে পারিনে।

যে ভারার আলো নিবে গেছে, নিজের মধ্যেই সে সঙ্কুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্ত। এই দৈন্তের গভীর মধ্যেও তার প্রতি মুহূর্ত-গত কাজ হয় তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তাব সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে ক'বে বিশ্বের

সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত ব'বে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলেব আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বাববার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহং-সীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মাহুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড় কথা, নেপুনেব ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কি ক'বে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত ক'বতে পাবে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পাবলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানব-সভ্যতার সৃষ্টি-কার্যে তার স্থান হ'ল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠ-বেড়ালীরও স্থান হ'য়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটবে নিজের শাদাঘেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই ছুই তটভূমির বিচ্ছেদ-সমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনাব রূপক। সেই সীতাই ধর্ম, সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা স্তন্যরী, সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটবেব মধ্যে প্রভূত খাদ্য-সঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালীব সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন ববেছিল এইজন্তেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদ-রেখা চিহ্নিত ববেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতিব পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটর-কোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, হুংখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা;—সৈন্ত দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গোরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড় বড় অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত বরেনি।

আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পর-

১. জাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়ত সেকালে অনেকে লাভ ক'রে থাকবেন ; কিন্তু ভারতবর্ষ, অল্প দেশের মতো, ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম অরণ করে না । বীর্ষ্যবান দহ্মাদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি ।

২. অহংকেই যে-মানুষ পরম ও চরম সত্য ব'লে জানে সেই বিনাশ পায় ; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায় । বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবনাতেই এই অহং-ভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক । এই আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে-নি । এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল । স্তত্রাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয় । এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তাহ'লেই আমরা ধন্য । আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্ত মস্তকের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে । এই কথাটি যদি ঐব ক'রে মনে রাখতে পারি তাহ'লে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহ'লে আমরা নিজেকে বিশেষ ক'রে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজগ্রে আমাদের নতুন ক'রে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না ।

৩. ক্ষুধা হ'লেই মানুষ অম্লের স্বপ্ন দেখে । আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানাকারণে সব-চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছে । এইজগ্রে নিরন্তর তারি ভোজটাই স্বপ্নে দেখছি । তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক ব'লে উপেক্ষা করবার উজ্জ্বল আজকাল প্রায় শোনা যায় ।

৪. কিন্তু এই পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌছতে হয় । সেই ব্যগ্র-তার তাদ্ভনায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া পারিবাণ্ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন ব'লে ভাবনা করতে হয় । অর্থতত্ত্বেও তাই, এখানে আমাদের কারো কারো কল্পনা বলশেভিজম্, কারো সিণ্ডিক্যালিজম্, কারো বা সোস্যালিজম্‌য়ের পোলকর্বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে । এসমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে

নেই—আমাদের দুর্ভাগ্য-তাপদগ্ধ হাল আমাদের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে । এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে “Made in Europe”-এর মার্কি ঝলক মেবে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমবা দেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে অভিজুতি-বিশ্বলভাব মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই । অথচ, পূর্বেই বলেছি, নিজের ব্যক্তি-স্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গ'ড়ে তুলতে পারি । পলিটিক্স ইকনমিক্সের বাইরেও আমাদের গৌরব-লোক আছে একথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব । বিশ্বসহীনের মতো নিজের সত্যে অজ্ঞতা ক'রে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশ-কুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না ।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিল্কের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায়নি । ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ । নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়নি তাতেই তার পরিচয় । অজ্ঞকে সত্য ক'রে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অজ্ঞকে আপন ক'রে উপলব্ধি । আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে । এইজগ্রেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হ'লে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয় । আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলি-কলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই । কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হ'য়ে

উঠেচে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয়নি, এই যোগ উদ্যত তরবারীর জোরেও নয়—এই যোগ কাউকে হুঃখ দিয়ে নয়, নিজে হুঃখস্বীকার ক’রে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে-সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায়নি বলে আমরা এ’কে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এ’কে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও ব’য়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানীর স্বগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্তৃত হতেছিলাম তখন একথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেচে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হ’ল। সত্যের যে-বজ্রা একদিন ভারতবর্ষের দুইকূল উপচিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল, ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা তলায় নেমে আসচে, কিন্তু তাব জল-সঞ্চয় আজো দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হ’য়ে আছে। এই কারণেই, সেইসকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ঋব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেইসময়ে ধারাবাহিকভাবে এমন সকল সাধু-সাধকদের জন্ম হয়েছিল—তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন—যারা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্ম-বিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তারা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজন-মূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেননি। তাঁরা একেবারে সেই পোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মাহুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ঋব। অর্থাৎ তাঁরা ভারতের সেই মস্তই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনাদের মধ্যে এক ক’রে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক বোদ্ধা অনেক লড়াই করেছে, বিদেশী ছাঁচেঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্তি লিখিত হয়েছে। সে-সব

বোদ্ধারা আজ তাঁদের রুত কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন—কিন্তু আজো ভারতের প্রাণ-শ্রোতের মধ্যে সেইসকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে। সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তাহ’লে তারি জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হ’য়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টি-শক্তির সচেষ্টিতা।

বৌদ্ধধর্ম সম্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনায় গুহা-গহ্বরে চৈতন্যবিহারে বিপুল শক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপৰ্য্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে, তখন বুঝতে পারি বৌদ্ধধর্ম মাহুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েচে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পছন্দ করেনি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার-কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কি প্রভূত ও পরমার্চ্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি-মহিমায় সে-সকল দেশ মহিমাম্বিত হ’য়ে উঠেচে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখ, দেখবে তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাললে দ্বাদ্ধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রী-ধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্য বেশকুয়া ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েচে তা নয়; সৃষ্টি করবার সৃষ্টিশক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে—সে কি পরমাত্মত সৃষ্টি! এইসকল দ্বীপেরই আশে পাশে আরো তো অনেক দ্বীপ আছে সেখানে আমরা “বরব্দর” দেখিনে কেন, সে-সব জায়গায় আকরবট-এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন? সত্যের জাগরণ-মন্ত্র যে সেখানে পৌছায়নি। মাহুষকে অহুঃকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মাহুষের সৃষ্টি শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এতবড়ো গৌরবের কথা আর কি কি আছে?

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গোরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা বলে গোরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গোববের মাল-মসলা ভগ্নপুথি থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি ক'রে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুঁথাতন গোরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের দিক! অহঙ্কার কববার জন্তে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক ক'বে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই; বাইরের

লোককে চমক লাগাবার জন্তে যেন তাকে অলঙ্কার মাত্র না করি, যেন নিজেবই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্তেই তার সম্মান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহঙ্কারমুক্ত ক'রে সত্যের অমৃতমন্ডের ক্রিয়াটি দেখে যেন নত্ব হ'তে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই তাহ'লেই আমার চিন্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসরূপ হ'বে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হ'য়ে সার্বিক হ'য়ে উঠবে।

সম্পাদকের চিঠি

(১০)

ভিয়েনাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নির্মলকুমারী দেবী ও আমি ইম্পেরিয়াল হোটেলে ছিলাম। বার্লিনে ও প্রাগে যে যে হোটেলে ছিলাম, ভিয়েনার এই হোটেলের বিল তার চেয়ে কম হয় নাই; কিন্তু অন্য দু-জায়গার হোটেলের মত সুবিধা এখানে আমি সব বিষয়ে পাই নাই।

আগের চিঠিতে লিখিয়াছি, প্রাগ হইতে ভিয়েনা আসিবার পথে রবীন্দ্রনাথ অস্থস্থ বোধ করেন। ভিয়েনায় আসিয়া দেখা গেল, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। তথাকার বিখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক ওয়েঙ্কেব্যাক্কে ডাকা হইল। তিনি আসিয়াই কবির ভিয়েনায় যে-বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং পোলাণ্ড ও রুশিয়া যাইতেও নিষেধ করিলেন। ঐ দুই দেশে যাইবার জন্ত প্রাগ হইতে পাসপোর্ট লওয়া হইয়াছিল। কবি ও তাঁহার সঙ্গে সাত জন লোকের রুশিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। তাহার মধ্যে আমিও ছিলাম। কবির যাওয়া বন্ধ হওয়ায় আমারও যাওয়া বন্ধ হইল। কিন্তু কবি যদি যাইতেন, তাহা হইলেও আমার যাওয়া ঘটত না; কারণ আমি কয়েক দিন পরেই

পীড়িত হই। আমার আর কখনও ইউরোপ যাইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং এ যাত্রা রুশিয়া দেখা না হওয়ায় আর হয়ত সে-দেশ দেখা হইবে না। সেখানে মুটে মজুর কবির চাষারা এখন অন্য কোন শ্রেণীর লোকদের চেয়ে নিকট বিবেচিত হয় না; সকলের রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান, সামাজিক মর্যাদাও সমান। কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি। এরূপ দেশের প্রকৃত অবস্থা কি-প্রকার এবং সকল রকম কাজকর্ম কেমন চলিতেছে, তাহা সাক্ষাৎ দেখিবার জিনিষ; কিন্তু দেখা হইল না।

অধ্যাপক ওয়েঙ্কেব্যাক্ কেবল চিকিৎসক নহেন। নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, এবং তাঁহার কথোপকথনের ক্ষমতা তাঁহার লোক-প্রিয়তার অন্যতম কারণ। বস্তুতঃ তিনি কবিকে দেখিতে আসিয়া এত গল্প করিতেন, যে, তাঁহাকে খুব বড় ভাস্কর বলিয়া না জানিলে লোকে মনে করিতে পারে, যে, তাঁহার অবসর অসীম, কোন কাজ-কর্ম নাই। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও কথোপকথন-প্রিয়তা কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধতম ভাস্করের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। একদিন তিনি কবিকে দেখিতে আসিয়া

প্রথমতঃ ৪০।৪৫ মিনিট গল্প করিলেন; তাহার পর বলিলেন, “একবার আপনার নাড়ীটা দেখিতে পারি কি?” তাহার পর আবার গল্প। ২০।২৫ মিনিট পরে বলিলেন, “আপনার পিঠটা একবার খুলিবেন কি?” তিনি ৩৫ বৎসর পূর্বে গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন, এখন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির সভাপতি ও ভিয়েনার প্রধান চিকিৎসক। তিনি বলিলেন, “আমি চিকিৎসাব্যবসায়ে রুতী হইয়াছি বটে, কিন্তু কবি হইলে, যাহা কিছু সত্য, শিব ও সূর্যের তাহার দর্শন পাইলে আনন্দিত হইতাম।” তাহার পর বলিলেন, যে, তাঁহার একটি ছেলে আর্টিষ্ট হইয়াছে, ডাক্তারের কাজ করে; তাহাতে তাঁহার নিজের অভিলাষ কতকটা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার পুত্র যে তাঁহার একটি মূর্তি নির্মাণ করিয়াছে, তাহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “Even my wife says it is good,” “এমন কি আমার স্ত্রীও বলেন, মূর্তিটা ভাল হইয়াছে!” একদিন তাঁহার সহিত কথা-প্রসঙ্গে কবিতার বহি বিক্রী কিংবা কবিদের ঐরূপ কোন অর্থাগমেব কথা উঠায় (আমার ঠিক মনে নাই), রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে বলিলেন, “কবিদের একটা কৃতিত্বের জন্ত দুটা পুরস্কার পাইবার কোন দাবী নাই।” তাঁহার ব্যবহৃত শব্দগুলি আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু যখন শুনিয়াছিলাম, তখন এই বুঝিয়াছিলাম, যে, কবিদের যে অন্তরের চোখ খুলিয়া যায়, ইহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়; সুতরাং যশ বা অর্থাগম যথেষ্ট না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অতি গভীর অর্থযুক্ত কথা বলিবার ক্ষমতায় ডাক্তার ওয়েস্টব্যাক চমৎকৃত হন।

তিনি একদিন কবিকে এমন একটা ঔষধ দিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার আরোগ্যলাভের সুবিধা হইলেও দুর্বলতা খুব বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল। পর দিন তিনি আসিয়া দেখিলেন, রবীন্দ্রনাথের রোগের উপশম অনেকটা হইয়াছে, কিন্তু তিনি দুর্বল হন নাই। ইহাতে ডাক্তার বিস্মিত হইয়া এই মত প্রকাশ করেন, যে, তাঁহার দেহের বৃদ্ধি খুব মজবুত। ইহাতে আমরা খুব আশাব্যস্ত ও আহলাদিত হইয়াছিলাম।

আগের চিঠিতে বলিয়াছি, আমার রাজ্যে বড় ঘাম হইত। এইজন্ত ডাক্তার ওয়েস্টব্যাকের পরামর্শ লওয়া স্থির ছিল। তাঁহাকে বলাতে বলিলেন, “আমার রোগীদর্শন-কক্ষে যাইবেন না। সেখানে রোগীদের এক লম্বা ফর্দ আছে; তার নীচে আপনার নাম ঢুকিয়া লইলে আপনার পালা আসিবার পূর্বেই হয়ত আপনাকে চলিয়া যাইতে হইবে; আর যদি উপরেব দিকে কোথাও আপনার নামটা ঢুকাইয়া দি, তাহাই হইলে অন্ত বোগীরা অসন্তুষ্ট হইবে ও রাগ করিবে। সুতরাং আমি আপনাকে হোটেলের দেখিয়া যাইব।” একদিন তাহাই করিলেন। দেহের আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রে কোন খুঁত পাইলেন না। অল্প নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যথা—“আপনার মানসিক জালা যন্ত্রণার কারণ কিছু আছে কি?” “আপনার বাড়ীর জন্ত মন কেমন কবে কি?” যাহা হউক, তিনি একটা ঔষধ দিলেন, এবং বলিলেন, যে, শীত পড়িবার পূর্বেই শীত ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া ভাল; যদি তাহা না পারি, তাহা হইলে ইতালীর বা ফ্রান্সের দক্ষিণে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে বলিলেন। সেখানে আমার কোন পরিচিত লোক নাই, জেনীভাতে আছেন, বলায় জেনীভাতেই থাকিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিয়াছিলাম। ডাক্তার ওয়েস্টব্যাকের ফী বেশী নয়।

কানের একটা দোষ থাকায় আমি ভিয়েনার বড় গলা-কান-নাক চিকিৎসক অধ্যাপক নয়ম্যানের চিকিৎসাকক্ষে যাই। দু-দিনের চিকিৎসাতেই একটু উপকার হইয়াছিল। এই ডাক্তারটি বেশ একটু মজার লোক। প্রত্যেক দিনের চিকিৎসার পর তিনি আমার মুখে একটা লজ্জুস পুরিয়া দিতেন। শুধু আমার মুখে নয়;—শ্রীমান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমাকে তাঁহার চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতেন, তাঁহার মুখেও লজ্জুস দিতেন। শুনিয়া আমোদ বোধ করিয়াছিলাম, যে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার চিকিৎসাধীন হওয়ায়, তাঁহার মুখেও লজ্জুসের প্রবেশলাভ ঘটয়াছিল। ডাক্তার নয়ম্যানও ফী বেশী লন নাই।

ভিয়েনা সহরেই গলা-নাক-কানের চিকিৎসার জন্ত

৩৮টি চিকিৎসালয় আছে। সেখানে যে এসব রোগ বেশী বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে; পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কোন রকম রোগ, বৈকল্য, অসুবিধাকে অদৃষ্টের দোষ বলিয়া মানিয়া লয় না; প্রতিকারের চেষ্টা করে। আমরা একটি চিকিৎসালয়ে গিয়া দেখিলাম, রোগবশতঃ এক প্রোট বাক্তির বাগ্‌যন্ত্র কাটিয়া ফেলিতে হওয়ায় তাহার জায়গায় কৃত্রিম বাগ্‌যন্ত্র বসান হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে লোকটিকে দু-একটি করিয়া কথা বলিতে শিখান হইতেছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন লোকটি এক সঙ্গে ছয়টি মাত্রার (syllable) শব্দ বা শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করিতে পারিত, তাহার পরই হাঁফ ছাড়িত। একটি স্বস্থকায় যুবক স্বভাবতই তারতরু কথা বলে। তাহার স্বরটি সাধারণ লোকদের মত করিবার চেষ্টা হইতেছে। একটি হৃষ্টপুষ্ঠ স্বস্থদেহ যুবতী জীলোকের স্বর স্বভাবতই ভাঙাগলা লোকদের মত। তাহার স্বর সাধারণ লোকদের মত করিবার চেষ্টা হইতেছে। একটি গরীব পরিবারের পাঁচটি ছেলে। বড়টি নয় বৎসরের, ছোটটি দুই বৎসরের হইবে। তাহাদের মা তাহাদের চিকিৎসার জন্ত আনিয়াছেন, দেখিলাম। তাহাদের কেহই “র” ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পাবে না, তাহার জায়গায় একটা অল্পনাসিক শব্দ করে। তাহাদের পিতারও এই দোষ ছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জন্মিবার আগেই তাহার সেই দোষ সারিয়া যায়। স্বতরাং ডাক্তার বলিলেন, ছেলেগুলির এই দোষ অতুষ্করণ হইতে উৎপন্ন নহে, পিতার নিকট হইতে দৈহিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছেলেগুলির এই “র” উচ্চারণের অক্ষমতার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। যাহা করিতেছেন, তাহা আমাদের কাছে দেখাইলেন, এবং “র” ও অল্পনাসিক ধ্বনির মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহারও আলোচনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি ডাক্তারকে বলিয়াছিলাম, যে, “ল” ও “র” এর অদল-বদল হয়, আবার “র” ও “ড়” এর অদল-বদল হয়। মূর্খণ্য “ণ” এর উচ্চারণ “ড়” র মত। তা ছাড়া ইহাও বলা যায়, যে, স্থল বিশেষে “র” ও “ন” এর অদল বদল হয়। যেমন কোন কোন জেলায় “রাড়ী”কে “নাড়ী” বলে, এবং

শুনিয়াছি খুলনা অঞ্চলে খেজুর-রস বিক্রেতারা “নস নাথবা” অর্থাৎ “রস রাখবা” (রস রাখিবেন) বলিয়া খেজুর-রস ফেরী করে।

“র” উচ্চারণে অসমর্থ পাঁচ ভাইয়ের ছোটটি অনেক লোকের সামনে অল্প ভাইদের মত রবারের নলের মুখে কথা বলিতে কোন মতেই রাজী হইল না। ডাক্তার তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া তাহার মেজাজ ভাল করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, ছেলেগুলি খুব গরীব পরিবারের। কিন্তু ইউরোপে জাতিভেদ না থাকায় ডাক্তার তাহাদের সামাজিক মর্যাদা আদির বিচার না করিয়া ছোটটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে পারিয়াছিলেন।

আমি ইউরোপের যে কয়টি দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এক মাত্র ভিয়েনাতেই রাস্তায় ও সার্কসনিক বাগানে কৃশ ও বিবর্ণ শিশু দেখিয়াছিলাম, যদিও তাহারাও আমাদের দেশের সাধারণ শিশুদের চেয়ে সুস্থ সবল। ভিয়েনাতেই প্রথম আমি রাস্তায় ভিখারী দেখিলাম। তাহাদের হাতে একটা করিয়া টিনের বাস্ক এবং তাহাতে জার্মান ভাষায় কিছু লেখা রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ হয়ত কোন পরহিতসাধক প্রতিষ্ঠানের জন্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে, যেমন আমাদের দেশে কেহ কেহ ট্রামে ও রেলগাড়ীতে বাস্ক-হাতে করিয়া থাকে। কিন্তু নিজের জন্ত ভিক্ষাও অনেকে করিতেছে, মনে হইল। একজন পাদরী একটি অদ্ভাশ্রমের জন্ত ভিক্ষা করিতে আমাদের হোটেলের আসিয়াছিলেন।

এইসব দেখিয়া বুঝিলাম, গত মহা যুদ্ধে ইউরোপের মধ্যে অস্ত্রীয়া খুব দুঃখ ভোগ করিয়াছে। দারিদ্র্যও তাহার খুব বাড়িয়াছে। অস্ত্রীয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল। এখন উহা একটি ক্ষুদ্র দেশ। হাঙ্গেরী আলাদা হইয়া গিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া আলাদা হইয়া গিয়াছে। ইটালী কিছু ভূখণ্ড নিজের বলিয়া দখল করিয়াছে। পোল্যান্ড স্বাধীন হইয়াছে। ইত্যাদি। কিন্তু অস্ত্রীয়া এখন ছোট হইলেও উহার পূর্বেকার ঐশ্বর্যের পরিচয় এখনও ভিয়েনার শোভা-সমৃদ্ধিতে পাওয়া যায়। আমি ইউরোপে যে কয়টি সহর দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে ভিয়েনা সন্দেহাত্মক মনে হইয়া-

ছিল। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আগে ভিয়েনা দেখিয়াছিলেন; তিনি আমাকে দুই এক দিনে যতটা দেখা যায় দেখাইলেন। ভিয়েনার প্রধান রাস্তা রিংট্রাসে খুব প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহা পাদচারী পথিকদের জন্য চারিটি ও মোটর আদি যানের জন্য তিনটি পথে বিভক্ত। মাঝপানের পাদপথ দুটির প্রত্যেকের দুই পাশে গাছের সারি এবং এক-একটি গাছ ঘিরিয়া ফুলের কেয়ারী আছে। আলোকস্তম্ভগুলির লগ্ননের কিছু নীচে ফুলগাছ ঝুলান আছে। অষ্ট্রিয়াব সম্রাটের ঐতিহাসিক পুরাতন প্রাসাদের বাগান সাম্রাজ্যের সময়ও সর্বসাধারণের জন্য মুক্তদ্বার ছিল। তাহার পাশে যুবরাজের জন্য স্থশোভন ও বৃহৎ প্রাসাদ নির্মিত হয়। কিন্তু তাহাতে বাস করিবার স্থাপন তাহার হয় নাই। এখন অষ্ট্রিয়া সাধারণতঃ। ইহার প্রাসাদগুলি মিউজিয়ম ও চিত্রশালা-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বেলভেডিয়াম নামক প্রাসাদের ভিতর আমি গিয়াছিলাম। অট্টালিকাটি চমৎকার। তাহাতে রক্ষিত বড় বড় তৈলচিত্র, আসবাব প্রভৃতি খুব সুন্দর। বাগানে সরোবর, ফোয়ারা প্রভৃতি এখনও স্বরক্ষিত অবস্থায় আছে।

চিত্রশালাগুলির ভিতর ও বাহির অতি সুন্দর। যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হওয়ায়, শুনিলাম, অনেক ছবি অল্প কোন কোন দেশ দাবী করিয়া লইয়া গিয়াছে। তথাপি, যাহা আছে, তাহাও দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। চিত্রশালা-গুলির অভ্যন্তর মূল্যবান প্রস্তরে নির্মিত। ভিয়েনার পাল্লেমেন্ট গৃহের সম্মুখভাগ দেখিলে মনে সম্রাটের উদয় হয়। আমি ভিয়েনার সব দ্রষ্টব্য হর্ম্য, প্রতিষ্ঠান, ও স্থান দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহারও একটি একটি করিয়া বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা বলিতেই হইবে। এখানে শিক্ষা ভালই হয়—বিশেষতঃ চিকিৎসা বিদ্যায়। কতকগুলি ভারতীয় ছাত্রের ভিয়েনা যাওয়া উচিত। আমি যে জাহাজে বোম্বাই হইতে ভেনিস্ বাই, তাহাতে একজন ভারতীয় আই-এম্-এস ডাক্তার ছুটি লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, গল-নাক-কানের রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি ভিয়েনা যাইবেন।

সেখানে আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতেও আমার এই ধারণা হয়, যে, এইসব ইঞ্জিয়ার রোগের চিকিৎসা ভিয়েনায় ভাল শিক্ষা করা যায়। সেখানে থাকিতে হিসাব করিয়া-ছিলাম, মাসিক ১২০।১৫০ টাকা খরচে ভারতীয় ছাত্রেরা ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। জানি না, অন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের হারের পরিবর্তন বশতঃ এখনও ঐ টাকায় চলিতে পারে কি না। ভিয়েনায় শিক্ষা লাভ করিতে হইলে অবশ্য জার্মান শিখিতে হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান শিখিবার মত জার্মান কয়েক মাসেই শিখিয়া ফেলা যায়।

আমরা একদিন ভিয়েনার কয়েকটি বড় গির্জা দেখিতে গিয়াছিলাম। জার্মান না জানায় উপাসনায় যোগ দিবার সম্ভাবনা আমাদের ছিল না; আমরা কেবল গির্জার বাহির ও ভিতর দেখিলাম, এবং কত লোক উপাসনার জন্য আসিয়াছে দেখিলাম। সবগুলিরই অভ্যন্তরে বড় বড় খুটী ছবি আছে। উপাসনার সময় খুব মোটা ও লম্বা মোম বাতি জ্বালা হয় এবং পাদরী মহাশয় সম্রাটপাদক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কোন গির্জাতেই লোক বেশী দেখিলাম না, যদিও সে দিন রবিবার ছিল।

একদিন আমরা চারজন বাঙালী হোটেলে বন্ধের অঙ্কেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশীর অল্পকূলে বাংলা দেশের আন্দোলনের প্রথম সময়কার কথা বলিতেছিলাম। সে-সময়ে আমি এলাহাবাদে থাকিতাম। এইজন্য অনেক কথা আমার নতুন লাগিতেছিল। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত কিভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহার খাতি খবর তাহার মুখ হইতে শুনিতে খুব ভাল লাগিতেছিল। ইহা তখনকার অলিখিত ইতিহাসের এক অধ্যায়। আমরা যে দিন হোটেলে এইসব কথা বলিতেছিলাম, সেটা যে ৩০ শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর, রাধীবন্দনের দিন, তাহা আমাদের মনে ছিল না; পরে তাহা আমার মনে পড়ে।

একদিন হাঙ্গেরীর লোকদের একজন প্রতিনিধি ইম্পেরিয়্যাল হোটেলে উপস্থিত; উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়া তিনি কবে হাঙ্গেরী যাইবেন তাহার প্রতিশ্রুতি লওয়া। কবি অল্প খাকায় ডাক্তার ওয়েক্কেব্যাক কোন মতেই তাহাকে কবির সহিত দেখা

করিতে দিলেন না। ভিয়েনার বক্তৃতাও তখনকার মত ডাক্তার মহাশয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও আমরা পৌছিয়া দেখিয়াছিলাম, উদ্যোক্তারা সহরময় দেওয়ালে বড় বড় ইস্তাহার দিয়াছে এবং খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়াছে। বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় আশাভঙ্গজনিত উদ্বেজনাও হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার ওয়েস্টব্যাক্ সব দায়বু'কি নিজের ঘাড়ে লইয়াছিলেন। কবি পরে ভিয়েনায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, হাঙ্গেরার রাজধানী বুডাপেস্টেও গিয়াছিলেন। সেখানকাব অধিবাসী হাঙ্গেরীয়গণ বংশত হুন ও প্রাচ্য। এইজন্য তাহারা রবীন্দ্রনাথকে নিজের লোক বলিয়া দাবী করে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তথায় বেরূপ সংবর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়।

কয়েকদিন ভিয়েনায় থাকিবার পর আবার জেনীভা যাইবার সময় হইল। একদিন সন্ধ্যার পর ট্রেনে উঠিলাম। শ্রীমান্ প্রশান্ত আমার নিকট হইতে পাঁচ শিলিং লইয়া ট্রেনের কণ্টাকটরুকে দিলেন এবং আমাকে প্রাতে এক পেয়লা কোকো এবং দিনের বেলা অল্প পানীয় খনিজ জল দিতে বলিলেন। তাহার দাম পাঁচ শিলিং হয় না। কিন্তু বাকীটা সে ব্যক্তিকে বক্শিশ দেওয়া হইল, ইহা উহু' রহিল। সে পরদিন সকালে এক পেয়লা কোকো দিয়াছিল, ছোট এক বোতল খনিজ জলও দিয়াছিল, কিন্তু দুপুর বেলা জুরিকে ট্রেন বদলাইবার সময় বলিল, “আপনি কোকো ও জলের দাম বাবতে আমার তিন শিলিং ধারেন, আপনার বন্ধু আমাকে যে পাঁচ শিলিং দিয়াছিলেন সেটা আমার বক্শিশ।” লোকটার সঙ্গে দরদস্তুর করিতে ভাল না লাগায় তাহাকে তিন শিলিং দিলাম।

বলিয়াছি, দুপুর বেলা জুরিক্ পৌছি। তাহার আগে ভোর রাতে জীবনে প্রথম তুষার-আচ্ছাদিত ভূমি ও বৃক্ষাবলী এবং তুষারপাত দেখি। পার্শ্বত্যা প্রদেশের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম পাহাড়ের গা শাদা। আর একটু আলো হইবার পর দেখিলাম, পাইনগাছের ডালপালাগুলিও শাদা এবং সমতলভূমির উপরও কে যেন চূণ ছড়াইয়া দিয়াছে। তখন আমার মনে হইল,

বোধ করি রাতে তুষারপাত হইয়াছে। কিন্তু তখন অক্টোবর মাসেব তৃতীয় সপ্তাহ চলিতেছে। তখন কি আলসের পার্শ্বত্যা অঞ্চলেও এত শীত হইতে পারে? এইজন্য মনে সন্দেহ হইতেছিল, যে, সত্য সত্যই তুষার পড়িয়াছে কি না। কিন্তু যখন প্রভাতে সেন্টএন্টন গ্রাম এলেবর্গ ষ্টেশনে ট্রেন থামিল, তখন আর সন্দেহ রহিল না; দেখিলাম পাতলা পৈঞ্জা তুলার মত হাল্কা তুষাব রেলের কর্মচারীদের লম্বা লম্বা কাল কাল কোটের উপর পড়িতেছে। পরে জেনীভায় চিঠি পাইয়া জানিতে পাবি, যে, আমি ভিয়েনা ছাড়িবার দুদিন পরে সেই সহরেও তুষার পড়িয়াছিল।

ভিয়েনা হইতে থে-ট্রেনে জেনীভা যাইতেছিলাম, তাহার গাড়ীগুলি উষ্ণবাস্পবাহী নলের দ্বারা গরম রাখা হইতেছিল। জুরিক্ পৌছিবার পর, একটা জেনীভা-গামী গাড়ী কাটিয়া ষ্টেশনের সুপ্রশস্ত ময়দানে বাধিয়া দিয়া, ট্রেনটা অস্ত্রদিকে চলিয়া গেল। অস্ত্র ট্রেন সেই গাড়ীটাকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জেনীভা যাইবে।

ট্রেন হইতে বিচ্ছিন্ন গাড়ীটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। আমি দীর্ঘকাল গরম গাড়ীতে থাকার পর সেই ঠাণ্ডা গাড়ীতে প্রচণ্ড শীতে প্রায় দেড়ঘণ্টা রেলের ময়দানে দিলাম। যখন প্রায় রাত্রি নয়টার সময় জেনীভা পৌছিলাম, তখন বৃষ্টি হইতেছিল। ষ্টেশন হইতে নামিয়া হোটেল যাইবার সময়ও কিছু ভিষ্ণিয়াছিলাম। জেনীভা পৌছিবার পরদিন সন্ধ্যার আগে বেড়াইবার সময় খুব জোরে বৃষ্টি আলিয়াছিল। তাহাতেও হয়ত ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষ আগেই কোথাও হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

জেনীভায় ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল। তাহা পরে ভবল্ নিউ-মোনিয়ার পরিণত হয়। প্রথম বাব জেনীভা থাকা কালে থে-হোটেল ছিলাম, এবারেও সেইখানেই ছিলাম। এই হোটেলের নিরিখ অস্ত্র অনেক হোটেলের তুলনায় কম হইলেও আমি এই হোটেলের ধেরূপ যত্ন পাইয়াছিলাম ও আরাম পাইয়াছিলাম, অস্ত্র কোথাও তাহা পাই নাই। ইহার অধ্যাক্ষের ভাল বৃষ্টিমান্ বলিয়া খ্যাতি আছে এবং প্রত্যেক কামরায় ইংবেজী

জার্মান ও ফরাসী বাইবেল রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী হোটেলের অধ্যক্ষকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকাইতে বলিলেন। ডাক্তারটি বেশ ভাল চিকিৎসাই করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ফী আমাদের মুজায় সাড়ে পাঁচ টাকার সমান। কোন কোন দিন তিনি ছুঁবার আসিতেন। তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা শুশ্রূষাকারিণী নাম রাখা হইয়াছিল। কিন্তু নাসের দ্বারা বিশেষ কিছু হইত না, যদি বঙ্গনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী খুব যত্ন না করিতেন। রজনীবাবুর স্ত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সোনিয়া চব্বিশ ঘণ্টা নাসের সহিত পাশের একটি ঘরে থাকিতেন এবং আমার জন্ত যাহা কিছু করা দরকার সব করিতেন। তিনি আমার কষ্টাদের মত আমার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারি ব না। পীড়ার সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান্ প্রশান্ত আমার খোঁজ খবর লইয়া ও অন্যান্য প্রকারে আমার সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আমি আরোগ্য লাভ করিবার আগে হইতেই ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যে, আরোগ্যলাভ করিবার পরই আমি যেন দেশে ফিরিয়া যাই। আমি পীড়িত হইবার পূর্বে একটি জার্মান জাহাজে দেশে ফিরিবার জন্ত তাহাতে যাত্রা লইয়াছিলাম ও সিকির অধিক অগ্রিম ভাড়া দিয়া-ছিলাম। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও কামরা লইয়াছিলেন। কিন্তু উহার ইউরোপ হইতে রওনা হইবাব দেবী ছিল। সুতরাং আমি উহার কামরা ছাড়িয়া দিলাম, তাহাতে আমাব অনেক টাকা লোকসান হইল। টেলিগ্রাফ করিয়া একটা ফরাসী জাহাজে স্থান লইলাম। ইহা মাসে দুই হইতে এই নবেম্বর (১৯২৬) কলোম্বো যাত্রা করে। আমি তখনও একা রেলের যাইবার মত বল পাই নাই। এইজন্ত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ আমাকে মাসে দুই পৌছাইয়া দিতে রাজী হইলেন। তাঁহার নিকট আমি অন্যান্য সাহায্যের জন্তও গুণী। ৪ঠা জেনীভা হইতে রওনানা হইলাম। ট্রেনে একজায়গায় সত্যেন্দ্র বলিলেন, “দেখুন ত, আমাদের পাশের কামবায় একটি মহিলা রহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বাঙালী।

একজন ভদ্রলোক রহিয়াছেন, তাঁহাকে ইটালিয়ানের মত দেখাইতেছে।” আমি গিয়া দেখিলাম, স্ত্রীর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কন্যা এবং তাঁহার জামাতা মিঃ বি সি সেন। তাঁহাদের সঙ্গে আগে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও নাম-জানাজানি ছিল। ট্রেনে দেশের নানা কথা হইল—নিজনিজ গৃহে রসগোল্লা প্রস্তুত করা হইতে ১৯২৬ সালের এপ্রিল মে মাসে কলিকাতা ও বঙ্গের অন্যান্য জায়গার দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পরে মাসে দুই পৌছিলাম। সেন মহাশয়েরা জেনীভা হইতেই হোটেল ঠিক করিয়া আসিয়া-ছিলেন। আমরা তাহা করি নাই বলিয়া এবং পরদিন এই ভিন্ন ভিন্ন লাইনের অনেক জাহাজ বন্দর ছাড়িবে বলিয়া হোটেলগুলিতে অনেক আগন্তকের আমদানী হওয়ায় আমাদের কোন হোটেল জায়গা পাইতে দেবী হয়। শেষে আমরা ব্রিষ্টল হোটলে গেলাম।

পর দিন আমি আমাজোন্ নামক ফ্রেঞ্চ জাহাজে উঠিলাম। সত্যেন্দ্র পৌছাইয়া দিলেন। জাহাজ ছাড়িবার আগে তিনি ডেকে দণ্ডায়মান আমার একটা ফোটোগ্রাফ জেটী হইতে লইলেন। একটি ফরাসী স্ত্রীলোক জেটীতে গান করিতে ও একজন ফরাসী পুরুষ বেহালার মত একটা বাজনা বাজাইতে লাগিল। জাহাজের যাত্রীরা তাহা-দিগকে কিছু কিছু বক্শিশ ছুড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ ছাড়িল। ডেকে দাঁড়াইয়া দোঁখিতে লাগিলাম, যতক্ষণ আমাকে দেখা যায় সত্যেন্দ্র ততক্ষণ জাহাজের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাহার পর তিনিও অদৃশ্য হইলেন, আমিও অদৃশ্য হইলাম। তাঁহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—বাঙালী বলিয়া এত টান। আগেই জানিয়াছিলাম, জাহাজে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ভারতীয় লোক কেহ নাই। তাহার জন্ত এবং আমি ফরাসী না জানায়, দেহের দুর্বল অবস্থার মনটা বড় বিষণ্ণ ছিল। পরে জানিতে পারি তৃতীয় শ্রেণীতে বন্সার্না নামক একটি পার্সী যুবক ও কৃষ্ণ নামক একটি অক্সফোর্ডের পাশকরা মাল্লাজী যুবক আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দু একবার দেখা কথাবার্তাও হইয়াছিল; কিন্তু জাহাজের কণ্ট্রোলার তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিসীমায় আসিতে



আমাজোন জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান প্রবাসী-সম্পাদক

নিবেশ করিয়া দেওয়ার পরে কেবল তাঁহাদিগকে দূর হইতে কোন কোন দিন নমস্কার করিতে পারিতাম, কথাবার্তা আর হইত না।

জাহাজে আমি কিরূপ নিঃসঙ্গ ছিলাম, মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আগেই একবার প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ক্রেঞ্চ জাহাজটিতে থাইবার ঘরে বা অগ্ন্যস্ত্র বিন্দুমাত্রও জাতিভেদ বর্ণভেদ ছিল না, এইটি উহার প্রশংসার কথা। অগ্ন্যস্ত্র বিষয়ে উহার কোন উৎকর্ষ দেখি নাই। আমার কামরায় যে ফরাসী ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি সৈনিক কর্মচারী। বেশ ভদ্র। ইংরেজী কথার মধ্যে জানেন ‘ফিনিশ’ আহ্বারের সময় নিজার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে ও অগ্ন্যস্ত্র সাধারণ কোন কোন বিষয়ে আমাদের ইঙ্গিতে ইসারায় ঠারেঠোরে কথা হইত।

আমি জাহাজে ও ইউরোপ প্রবাসকালে নিয়মিত ডায়রী লিখি নাই, দু তিন দিনের সামান্য দু একটা কথা লেখা আছে, আর সমস্ত স্মৃতি হইতে লিখিতে হইয়াছে। ডায়রী রাখিলে ভাল করিতাম।

জাহাজে একজন জাপানী যাত্রীর চালচলন বেশ মজার লাগিয়াছিল। লোকটি ইংরেজী ও ফরাসী বলিতে পারে। পুরুষ ও জ্বালোক উভয় রকমের যাত্রীদের সঙ্গেই নিজে উদ্বোধনী হইয়া আলাপ পরিচয় করিতেছিল। কথাবার্তা যে খুব গুরুতর বিষয়ে তাও নয়। একদিন এক ইংরেজীভাষিণী জ্বালোককে নিজের পোষাকের কাপড়টা যে কত টেকসই তাই বলিতেছিল। লোকটি কিন্তু খাটি ইউরোপীয় নহে এরূপ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছিল না। ডেকে আমার সঙ্গে একই বেকীতে কোন কোন দিন দীর্ঘকাল বসিয়াছিল, কিন্তু একবারও আমার সঙ্গে কথা বলে নাই। এ গেল জিনিষটার একটা দিক্। অগ্ন্যস্ত্রকে, আমি নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পরাধীন দেশের লোকের সঙ্গে কেন লোকে যাচিয়া আলাপ করিবে?

এক চীনদেশীয় যাত্রী আপনা হইতে আমার সহিত কথাবার্তা জুড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার উচ্চারণ এমন, যে, আমি কষ্টে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার কাছে এই একটা নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ শুনিলাম, যে, ১৩৩ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ চীনের অধীন ছিল, তাহার পর ইংলণ্ডের অধীন হইয়াছে! এইরূপ ঐতিহাসিকজ্ঞানসম্পন্ন লোক চীনে আরও আছে কি?

কষ্টে আঠারটা দিন কাটাইয়া শেষে কলোম্বোর কাছাকাছি আসিলাম। যেদিন প্রাতে কলোম্বো পৌছিবার তার আগের রাত্রে গভীর অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিলাম। ঘুম সাধারণতঃ ভাল করিয়া হইত না, কিন্তু পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিতাম ও তাহার পর স্নান করিতে যাইতাম। কলম্বো পৌছিবার দিন কিন্তু অনেক রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়া দূরে আলোকমালা দেখিয়া বুঝিলাম, সিংহলের নিকটে আসিয়াছি। ডাঙার কাছে আসিয়াছি, অশ্বত মাছের দেশের নিকটবর্তী হইয়াছি, ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পোষাক আঁটিয়া বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন জাহাজ বন্দরে লাগিবে, কখন ডাক্তারের

দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া জাহাজে হইতে নামিতে পারিব। শীঘ্রই তাহা ঘটিল। জেনীভা হইতে আমি শ্রীমান্ প্রশান্ত মহলানবীশের পরামর্শ অনুসারে কলম্বোর বাণিজ্যশুল্ক আফিসের অন্ততম কর্মচারী শ্রীযুক্ত সিন্নাটাবীকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আনন্দ কলেজের চিত্রবিদ্যাশিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকেও চিঠি লিখিয়াছিলাম এবং এখানে বাড়ী হইতেও তাঁহার কাছে তার গিয়াছিল। ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইবার পর বাহিরে আসিবামাত্র একটি যুবক আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মি: চাটার্জি? আমি সিন্নাটাবী।” আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তখন জিনিষপত্র লইয়া তাঁহার সহিত একটি নৌকায় বাণিজ্যশুল্ক আফিসে গেলাম। সেখানে জেটিতে নৌকা লাগিবার আগেই দেখি, মণীন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। বহুদিন পরে বাংলা কথা বলিয়া বড় সুখ হইল। মণীন্দ্রবাবু আগে হইতেই শূভা ও কাপড়ের কলের অন্ততম কর্মচারী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাসায় আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাণিজ্যশুল্ক আফিসে একটুও দেরী হইল না। তাহার পর শ্রীযুক্ত সিন্নাটাবী আমাকে ভূপেন্দ্রবাবুর বাসায় পৌছাইয়া দিলেন। ভূপেনবাবু তখনও মিল হইতে বাড়ী আসেন নাই। তাঁহার পত্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী আভামমীর সহিত পরিচিত হইলাম। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি আমার কথাদের চেয়ে ছোট। তথাপি “আপনি” বলিয়া কয়েকবার কথা বলিলাম। তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, “আমাকে আপনি বলিবেন না।” তখন হইতে “তুমি” আরম্ভ হইল। ভূপেনবাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের গুণে চিরপরিচিত আত্মায়ে মত ছিলাম। দীর্ঘকাল পরে বাঙালীর বাড়ীতে থাকিতে পাইয়া বড় আরাম বোধ হইল। গুরুতর পীড়ার পর জাহাজে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসায় আমার বিশ্রাম করিতেই তিন দিন কাটিয়া গেল, কলম্বো দেখা হইল না। ২৫শে নবেম্বর সন্ধ্যার পর কলম্বো ষ্টেশনে রেলগাড়িতে চড়িলাম। পর দিন প্রাতে তালাইমার ষ্টেশন পৌছিলাম। সেখান হইতে জাহাজে অল্পপরিসর প্রণালী পার হইয়া ভারতবর্ষের ধনুছোট বন্দরে আসিতে

হয়। এই জাহাজে আমাদের দেশী লোকেরা যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া আমার জিনিষপত্র উন্টাপাট্টা করিয়া পরীক্ষা করিয়া ছিল একরূপ ইউরোপে কোথাও কেহ করে নাই। ধনুছোটতে রোদে ট্রেন দাঁড়াইয়াছিল। কোথাও গাছ পালা বা অশ্রু কিছুই ছায়া নাই। তৃষ্ণা পাওয়ায় বরফ লেমনেড চাহিলাম। ট্রেনের লোক দুই তিন বার বলিল, আনছি আনছি, কিন্তু আনিলাম না। কলম্বো হইতে টমাস কুকের মারফৎ তার করিয়া গাড়ীতে জায়গা রিজার্ভ করিয়াছিলাম, এবং ইহাও নিশ্চিত, যে, সে তার ধনুছোট পৌছিয়াছিল; কেননা, রেলের একটি কর্মচারী আমাকে পারের ষ্টীমারেই আপনা হইতে বলিয়াছিলেন, “আপনার তার পাওয়া গিয়াছে।” কিন্তু গার্ডকে জিজ্ঞাসা করায় সে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল সে কিছু জানে না। বাস্তবিকও দেখিলাম, অনেক গাড়ীতে অনেক ইংরেজের নাম লেখা কার্ড লাগান রহিয়াছে, কিন্তু যে কর্মচারীটি জাহাজে আমাকে আমার তার প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি অনেক অহুস্কার করিয়াও আমার নামযুক্ত কার্ড কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন একরূপ একটা কার্ড একটা খালি গাড়ীতে লাগাইয়া দিলেন। পারের জাহাজে বাণিজ্যশুল্ক বিভাগের দেশী কর্মচারীদের ব্যবহার (ইংরেজদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার হয় নাই), ষ্টেশনে গার্ডের তাচ্ছিল্য, ট্রেনের ভোজন-কক্ষের বরফলেমনেডওয়ালাদের অমনোযোগ, ইত্যাদি হইতে বুঝিতে বাকী রহিল না, যে, আমি আবার “আমার দেশ” নামক ভূখণ্ডে আসিয়াছি; নতুবা এত সম্মান আদর আর কোথায় সম্ভবে?

সেতুবন্ধরামেশ্বরের মন্দিরের এক পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহ করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মোতীরাম। আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু আমি তখন ঘরমুখো। এ যাত্রা রামেশ্বরম্ দেখিবাক্ অভিলাষ ত্যাগ করিলাম। মোতীরাম দয়া করিয়া আমার জন্ত একজন বরফলেমনেডওয়াল ডাকিয়া দেওয়ায় আমার তৃষ্ণানিবৃত্তি হইল ও আমি তাঁহাকে কিছু বকশিস দিলাম।

ধনুছোট হইতে যে ট্রেন মাদ্রাজ আসিতে হয়, তাহার গাড়ীগুলার বাকরানি বড় বেশী। বালুকাতীর্ণ অঞ্চল দিয়া রেলগাড়ী আসে বলিয়া ধূলা ও গরম বড় বেশী।

যাহা হউক, কোন প্রকারে মাহুরা পর্যাস্ত আসিয়া তথাকার
একিনীয়ার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে গরম
গরম ভাত তরকারী দই মিষ্টান্ন আদি পাইয়া
হুতুষ হইলাম। মণীন্দ্রবাবু তাঁহাকে বলিলে হইতে তার
করিয়া দিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে মাল্লাজ ষ্টেশনে
পৌছিয়া দেখিলাম আমার জ্যেষ্ঠ জামাতার ভ্রাতা রামচন্দ্র

আমার জন্ত মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার
সহিত তাঁহাদের মাতুল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের
বাটীতে উপস্থিত হইলাম। স্ততরাং বলা বাহুল্য খুব
আরামেই একদিন সেখানে বিশ্রাম করিলাম। তাহার
পর আবার রেলের উঠিয়া ৩০শে নবেম্বর হাবড়া
পৌছিলাম।

মুক্তি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরস্বন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতন পীড়া হ'তে,
দিয়োনা ছলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
কোভের বিক্ষেপ-বেগে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার পুষ্পবনে
যে সাহস দিলে তুমি স্বকুমার যুথীর জীবনে,—
নির্ময় বর্ষণঘাতে শঙ্কাসূত্র প্রদগ্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি' তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্তে ঝরি' পড়ে তৃণ শয্যা'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনয় অন্তরে
স্বগন্ধে রচিয়া তোলে; দাও সেই অক্ষুদ্র সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার স্বন্দর সীমায়;—ঈধাশূত্র সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা ॥

(২)

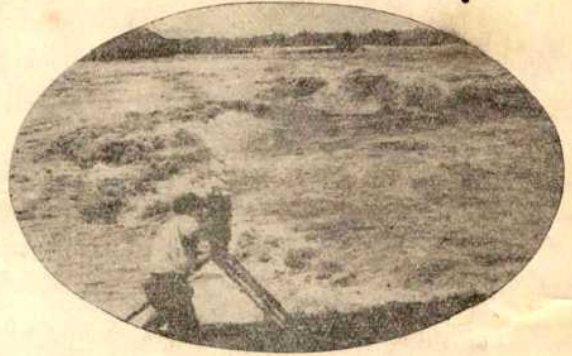
আপনার কাছ হ'তে বহুদূরে পালাবার লাগি',
হে স্বদূর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বান-বাণী। আজ তব বাজুক বাঁশরী,
চিত্তভরা শ্রাবণ-প্রাবনরাগে,—যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুদ্র কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছি নিশ্চল
সারাদিন পথপার্শ্বে; বেলা হ'য়ে এল অবসান,
ঘন হ'য়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি। দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হ'তে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সঙ্গীতে উদাসী,—সেই মতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্তে শূন্তে পূর্ণ হোক সুর,
নিয়ে যাক পথে পথে, হে অলক্ষ্য, হে মহাস্বদূর ॥



মিসিসিপি বন্যা—

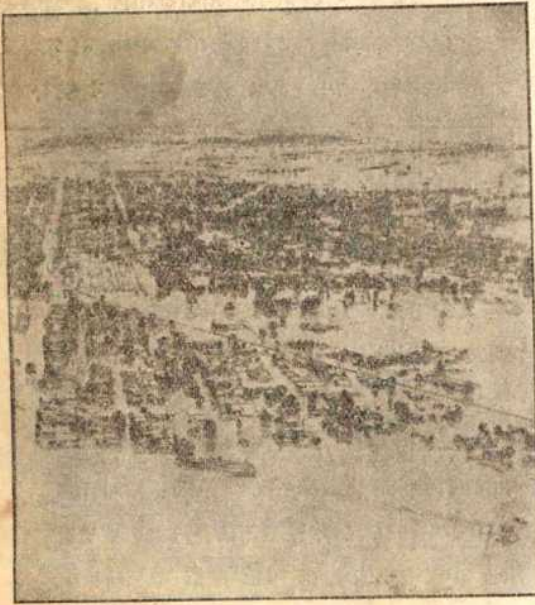
কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার মিসিসিপি নদীতে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছিল সাময়িক সংবাদ-পত্রাদিতে আমরা তাহার সংবাদ পড়িয়াছিলাম। এমন ভীষণ বন্যা পৃথিবীতে কম হয়। কত ঘরবাড়ী, পশু-পক্ষী ও মানুষ যে এই বন্যার নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমেরিকার বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও মিসিসিপি নদীকে কিছুতেই হাঁহারা বাগ মানাইতে পারিতেছেন না। গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই নদীতে ১৩ বার এইরূপ ভীষণ বন্যা হইয়াছে। মনে হয় এই দুর্দান্ত জলপ্রোতের কাছে মানুষের সকল শক্তি পরাজিত হইয়াছে। মিসিসিপির খামখেয়ালীপনার সহিত পরিচিত থাকা নতুন এতাবৎকাল নদীতীরবর্তী সহরগুলিকে বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা কেহ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র উচু বাঁধ দিয়া সহরগুলিকে

হইল। বাঁহারা এই প্রোত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, এই ক্ষুরধার জলপ্রোতের সহিত তুলনায় বিখ্যাত নায়গারা প্রপাতও অকিঞ্চিৎ-



মিসিসিপি বন্যার উন্নত জলপ্রোত

কর মনে হইয়াছিল। কিরূপে ভবিষ্যতে এরূপ বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিকেরা তাহার চেষ্টায় আছেন।



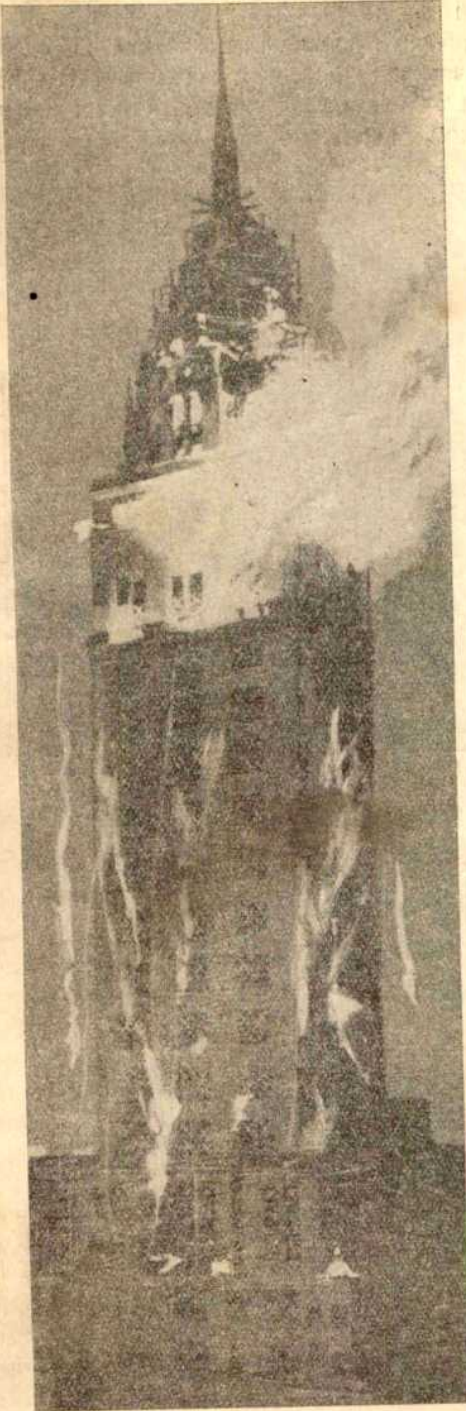
মিসিসিপি বন্যায় জলমগ্ন সহর

ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু প্রবল জলের তোড়ে সকল বাঁধই ভগ্ন হইয়াছিল ও নিউঅর্লিন্স প্রভৃতি সহরগুলি কিছুকাল প্রায় জলমগ্ন হইয়া ছিল। পাশে জলমগ্ন সহরের একটি ছবি দেওয়া হইল। এই সহরকে রক্ষা করিবার জন্য ডিনামাইটের সাহায্যে সহরবাসীরাই বাঁধের নানা অংশ উড়াইয়া দেয় এবং সেইসকল পথে উন্নত জলপ্রোত সমুদ্রের দিকে বাহিতে থাকে। এইরূপ একটি জলপ্রোতের ছবিও এখানে দেওয়া

নিউইয়র্কের অত্রাংলিহ প্রাসাদ ও অগ্নিকাণ্ড- সমস্যা—

আমেরিকার ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেন মাটির পৃথিবীর সহিত সখ্য ত্যাগ করিয়া আকাশের সহিত নিকট সখ্য হ্রাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তলার পর তলা উঠাইয়া বাড়ীতে বদিয়াই তাহারা আকাশের নাগাল পাইতেছে। পাঁচতলা দশতলা বাড়ী নিউইয়র্কে খোলা-বাড়ীর সামিল। ৫০ তলা বাড়ী তুলিতে পারিলে তবু কতকটা মনের শান্তি হয়। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের বারম্বার নিবেদন সত্ত্বেও আকাশ-ধরার এই নেশায় মাতিয়া আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে এই সকল গগনচুম্বী প্রাসাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। এইসকল হুউচ্চ বাড়ী নির্মাণের বিরুদ্ধে এতদিন হাতেকলমে কোন ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি এইরূপ একটি বাড়ীর ৩৮ তলার উপর আগুন লাগায় ও আগুনের কোন প্রতিবিধান না হওয়াতে আমেরিকা-বাসীরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীটি নূতন নির্মিত হইতেছিল। ৩৮ তলা পর্যন্ত তৈরী হইবার পর আরো উপরে কাঠের ভাড়া বাঁধিয়া কাজ চলিতেছিল। একদিন সন্ধ্যার পর এই কাঠের ভাড়ায় আগুন লাগে। বাড়ীটির যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও সেদিন রাত্রে নিউইয়র্কের লোকেরা প্রায় আকাশের উপর আগুনের এই তাণ্ডব লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ফায়ার ব্রিগেড সকল রকম সজ্জায় লইয়া গিয়াও এই আগুনের নাগাল পায় নাই; জলের গাইপ অত উপরে নেওয়া যায় না, জলের চাপও এত অধিক করা যায় নাই বাহাতে ৩৮ তলার উপরে জল উঠিতে পারে।

চারঘণ্টা কাল আগুন জলিয়া আপনিই নিবিয়া যায়। পাশের ছবিতে দেখুন প্রজলন্ত কাঠের টুকরা কিরূপ ভাবে নোচে পড়িতেছে।



অত্রংলিহ প্রাণাদে অগ্নিকাণ্ড

বাহা হউক, আমেরিকায় বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে লোকের হাঁ করিয়া আগুনের শোভা দেখা ছাড়া গতাস্তর ছিল না।

চীনের ভাগ্যদেবতা বা অদৃষ্ট—

আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে চলিত গল্প ও উপাখ্যানে অদৃষ্ট ও পুরুষকার নামে দুই দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহারা সর্বদাই পরস্পরের সহিত বিরোধে ব্যস্ত এবং নানা ভাবে একে অত্রের উপর প্রাধান্ত প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই দুইজনের কলহে মধ্যস্থ হইতে গিয়া চরম মধ্য একজনের ক্রোধ উদ্বেক করিয়া মন্ত্যের কত রাজাই যে বিপদে পড়িয়াছে যাত্রাগানে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন চিত্রকরেরা কেহই এই অদৃষ্ট-দেবতার চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া যান নাই।



চীনা 'অদৃষ্ট'

যাত্রাগানেও তাঁহাকে শাস্ত্র মাহুয়ের মূর্তিতে দেখিতে পাই। চীন মহাদেশে অদৃষ্ট-দেবতার মূর্তি বিভিন্ন—তিনি রত্ন ভরস্কর। সেখানকার কবি ও চিত্রকরগণ অদৃষ্টের যে মূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা পাশের ছবিতে কতকটা বুঝা যাইবে। বহুকাল যাবৎ চীনের বৃকের উপর মৃত্যু ও হত্যার যে ভীষণ জীবা মূর্তি হইয়াছে এই দেবতার মূর্তির সহিত সে-সকলের কিছু যেন সামঞ্জস্য আছে।

মিস্ ফু ফু ওং—

অধুনা চীনে যে রাষ্ট্রীয় জাগরণ মূর্তি হইয়াছে তাহাতে চীনামহিলাদের প্রভাব খুব বেশী। সুবিখ্যাত সান্‌ইয়াং সেনের পত্নী জাতীয় দলের



মিস্ ফু ফু ওং

নেতা। অনেক মহিলাও সৈন্ত-দলে নাম লিখিয়াছেন। মিস্ ফু ফু ওং ক্যান্টনে জাতীয় দলের একজন সেনাধ্যক্ষ। ইনি সৈন্তপরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষতা ও ধীরচিন্তার পরিচয় দিতেছেন।

চলচ্চিত্রে জানোয়ার—

সভ্যজগতে বায়োস্কোপই এখন মানুষের চিত্তবিনোদনের বড় খোরাক জোগাইয়া থাকে। বায়োস্কোপকে সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার

জন্ত ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর জিনিষ দেখাইতে হয়। এরোগেন হইতে ঝাঁপাইয়া পড়া, বড় বড় বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি, মারামারি, যুদ্ধ ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণের মন ভোলে না। জানোয়ার-জগৎও বায়োস্কোপে চিত্রিত হইয়া লোকের আনন্দ বিধান করে। এইসকল জানোয়ারদের বশ করিবার জন্ত বায়োস্কোপ পরিচালক-দিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় ও অনেক বিপদ-আপদের মুখে পড়িতে



শান্ত জল-মহিষ



বিষা

হয়। হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার সর্প গরীলা গিবন ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র ও বিশালকায় জন্তুরা যেমন বেগ দেয় তেমনই অর্থোপার্জনেরও সাহায্য করে। আগে লোকে জন্তুদের মুখোদ পরিয়া ও চামড়া গায়ে দিয়েই কাজ সারিত, কিন্তু তাহাতে দর্শকদের মন উঠে না, তাহার 'অলজ্যাস্ত' প্রাণীদের ছবি দেখিতে চায়। শুধু বায়োস্কোপে ছবি তুলিবার জন্তই আজকাল দলে দলে ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা-আমেরিকার গভীর জঙ্গলে হানা দিতে হুঁর করিয়াছে। বাহাদের ব্যবসা-বুদ্ধি প্রথর তাহার। নানা প্রকার হিংস্র জানোয়ার ধরিয়া আনিয়া রীতিমত চিড়িয়াখানা করিয়া সেখানে রাখে ও তাহাদের নানা ধরণের শিক্ষা দেয়; এবং বায়োস্কোপ পরিচালকদিগকে জন্তু ভাড়া দিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন

নীচে ও ২৫ তলা-মাটির উপরে, হোটেলটি তৈয়ারী করিতে ১২ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ইহাতে ৩০০০ ঘর আছে। এই হোটেলের আসবাব-পত্রাদির কিছু তালিকা এই—চেয়ার ৭ হাজার, বেট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টেবল্ রুথ, ৩ লক্ষ তোয়ালে, ৪৮ হাজার মদের পেরালা, ৩৬ হাজার ফুট ছবির ফ্রেম, ৬ হাজার ছবি। হোটেলের চাকর ও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার।



ভল্লুকের হাসি

করে। এখানে আমরা বায়োস্কোপের তিনটি জানোয়ারের ছবি দিলাম। অরণ্যে বাহার। ভীষণ ও নরবাতী, মানুষের হাতে পড়িয়াই তাহার শান্তশিষ্টভাবে মানুষের নির্দেশমত মুখভঙ্গী করিয়া ছবি তুলাইতেছে। প্রথমটি একটি বঙ্গ মহিষের ছবি—ইহারিগকে জলমহিষ বলে। ইহার। অত্যন্ত হিংস্র, মানুষের সান্নিধ্য ইহাদের অসহ্য, অথচ এই বেচার। একটি মেয়েকে কাঁধে লইয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দ্বিতীয় ছবিটি গিবনজাতীয় একটি বনমাছুবের; হস্তরসিক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহার নাম বিম্বো। তৃতীয়টি একটি কুক্কভল্লুকের ছবি। হস্তরসের ভূমিকায় ইনি বিশ্বের সহিত পাল্লা দিতে হুঁর করিয়াছেন।



হিবার্ডের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন

ফ্রেডারিক হিবার্ড সমস্ত হোটেলটিকে আপনার খুশীমত সাজাইয়াছেন ও স্থানে স্থানে তাহার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন স্থাপিত করিয়া হোটেলের দৌলন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা হোটেলের ড্রিং-রুমে প্রস্থিত একটি প্রস্তর-মূর্ত্তির ছবি এখানে দিলাম। এই মূর্ত্তিটি সর্বজনপ্রশংসিত।

মানুষের গতি (যন্ত্রের সাহায্যে নয়) কি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে?—

দেহতত্ত্ব-বিশারদ ইংরেজ অধ্যাপক এ ডি হিলের ধারণা—‘কালি-ফোর্গিয়ায় চালস্ ডব্লিউ প্যাডকের ৯ মিনিট ৫ সেকেন্ডে ১০০ গজ দৌড়ের পর একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানুষের দৈহিক গতিবেগ চরমে পৌঁছিয়াছে। মানুষের শরীরের বর্তমান নির্মাণ-কৌশল বিবেচনা করিলে ইহা অপেক্ষা দ্রুতগতি মানুষের আয়ত্ত নহে।’ হিল সাহেব এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। শরীরতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা উড়াইয়া দিবার নহে। তিনি দৌড়াপায়ে সেরা খেলোয়াড়দের শরীর ও

বিখ্যাত ভাস্কর ফ্রেডারিক হিবার্ডের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন—

বিখ্যাত ভাস্কর ফ্রেডারিক হিবার্ড শিকাগোর স্ট্রিডেল হোটেল সজ্জিত করিবার ভার পাইয়াছেন। এই হোটেলটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় হোটেল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাড়ীটি ২৯ তলা, ৪ তলা মাটির



বিখ্যাত দৌড়বাজ প্যাডক্

গতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্যাডক যে গতিবেগ দেখাইয়াছে ভবিষ্যতে কেহ কেহ হয়ত সেকেন্ডের ভগ্নাংশ দিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে পারে—অর্থাৎ ১০০ গজ দৌড়াইতে প্যাডকের যে সময় লাগিয়াছে কেহ হয়ত তাহা অপেক্ষা এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ কম সময়ে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারে কিন্তু তাহার চেয়ে আরো কম সময়ে ১০০ গজ দৌড়ান অসম্ভব। প্যাডক যে বেগে দৌড়াইয়াছে মাইল হিসাবে তাহা ষটায় সাড়ে চব্বিশ মাইল। ইহাই মানুষের গতির শেষ। এখানে আমরা দৌড়র মুখে প্যাডকের ছবি দিলাম। অধ্যাপক হিল দেখাইয়াছেন যে এই সময়ে তাহার দেহে ৯ ‘অববল’ (হস পাওয়ার) শক্তি কার্য করিতেছিল।

অষ্ট্রিয়ার নির্বাসিত রাজপুত্র—

বিগত মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী যুক্তরাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছে আমরা সকলেই তাহা অবগত আছি। সেই সম্মিলিত মহারাষ্ট্র এখন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে, চেকোস্লোভাকিয়া, জুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি নূতন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কোন কোন অংশ বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। প্রাচীন রাজতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। রাজবংশ নির্বাসিত। আমরা এখানে নির্বাসিত রাজপুত্র ‘অটোর’ ছবি দিলাম। রাজপরিবারের সহিত ইনিও স্পেনে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছেন। যিনি

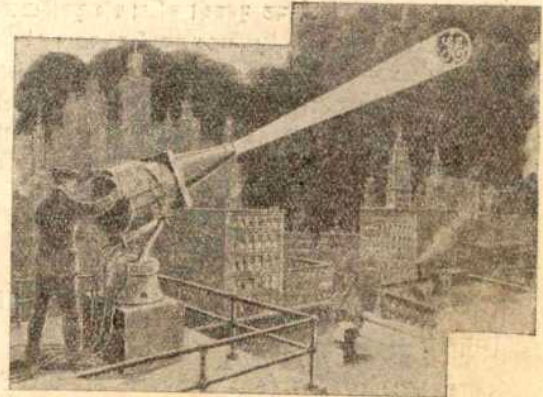


নির্বাসিত রাজপুত্র অটো

একদা দম্ভাট পদবাচ্য হইতেন তিনি এখন বীজগণিতের দম্ভাট। সমাধান নিযুক্ত। ইহাকেই বলে রাজ-ভাগ্য!

বিজ্ঞাপনের নূতন পদ্ধতি—

আজকাল ব্যবসায়ের মূলকথা হইতেছে বিজ্ঞাপন। জিনিষ ভাল হউক মন্দ হউক বিজ্ঞাপনের উপরেই জিনিষের কাঁচিতি নির্ভর করে। পাশ্চাত্যদেশে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার নানা অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক সময় আমাদের চরম কল্পনাকে



অভিনব বিজ্ঞাপন

প্ৰায় প্ৰাপ্ত করে। মানুষের মুখ, টাক কিছুই বাদ যাইতেছে না। আমরা এখানে অভিনব বিজ্ঞাপনের আর একটি নমুনা বিলাম, সার্জিসাইট কামানের সাহায্যে আকাশে বা মেঘের গায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথা অল্প সকল প্রথাকেই পরাজিত করিয়াছে।

সুবিখ্যাত জাপানী গায়িকা—

অতি অল্পকালের মধ্যে জাপান যেকোন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়াছে পৃথিবীর অল্প কোন দেশ সেজন্য পারে নাই। জাপানের রপ্তা ও বাণিজ্য ব্যাপারে বৈদেশিক প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট; এমন কি কলাশিল্পেও জাপান অধুনা পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণ করিতেছে। আমেরিকা ইংলও ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি দেশের রঙ্গমঞ্চে আজকাল

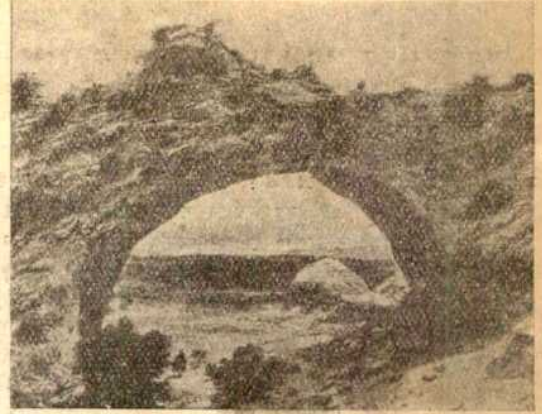


ভিয়েনায় জাপানী গায়িকা

অনেক জাপানী অভিনেতা অভিনেত্রী, গায়ক গায়িকা, নর্তক নর্তকী দেখা যায়। ইহাদের অনেকেই প্রভূত ধন অর্জন করিয়াছেন। এখানে যে জাপানী মহিলাটির ছবি দেওয়া হইল তিনি জোভিতা ফুরেগুসু এই স্পেনদেশীয় নামে এখন জগদ্বিখ্যাত। ইনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা সহরে সম্প্রতি ইতালীয় গানে যথেষ্ট নাম করিয়াছেন।

স্বভাব-সেতু—

প্রকৃতিও যে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিয়া মানুষের সুবিধা করিয়া দেয় পাশের ছবিতে তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। আর্জেন্টিনার

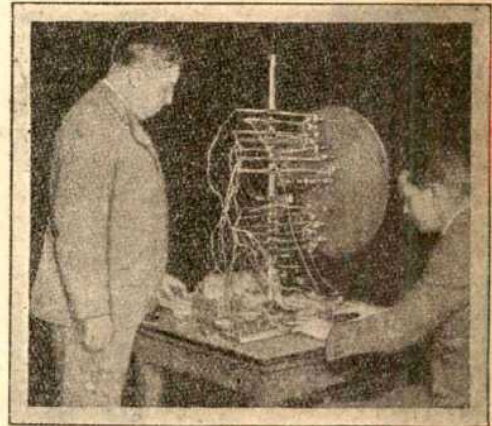


স্বভাব-সেতু

অনতিদূরে এই সেতু অবস্থিত। যে পাহাড় দ্বারা এই সেতু নির্মিত তাহা বালু-প্রস্তর জাতীয়। সম্ভবতঃ বালু-প্রস্তর কর প্রাপ্ত হইয়া এই চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

আলোক-সঙ্গীত—

নিউইয়র্কের বৈজ্ঞানিক সমিতি একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রে কেবল মাত্র আলোকরশ্মির সাহায্যে চমৎকার স্বরলব্ধ বাদ্য হয়। একটি ঘূর্ণমান ধাতুচক্রের স্থানে স্থানে ছিদ্র



আলোক-সঙ্গীত-যন্ত্র

আছে, এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক নীপের আলোকরশ্মি সঞ্চালিত করিয়া যে ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই এই স্বরের উদ্ভব। ইচ্ছামত ছিদ্রের সংখ্যা কম বা বৃদ্ধি করিয়া স্বরেরও তারতম্য করা হয়।

নাড়ী পরীক্ষার যন্ত্র—

ভাল রকম নাড়ী দেখা তিকিৎসাবিজ্ঞার সবচাইতে বড় অঙ্গ কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে অনুভূতি এত অধিক নহে যে তিকিৎস নাড়ীর গতি সব সময় বুঝিতে পারে। এইজন্য নাড়ী দেখিবার একটা সহজ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সচেষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি বাল্টিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার রুডল্ফ গোল্ডস্মিট এই যন্ত্র-নিৰ্মাণে সফল হইয়াছেন। একটি মহিলার নাড়ী পরীক্ষারত ডাক্তার গোল্ডস্মিটের ছবি এখানে দেওয়া হইল। ইনি ভূতপূৰ্ব কাইজারের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা ছিলেন। এই যন্ত্রের একটি অংশ পরীক্ষার্থীর কজিতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং

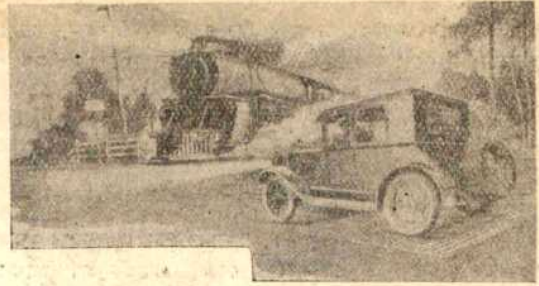


নাড়ী-পরীক্ষার যন্ত্র

নাড়ীর চলাচল ইত্যাদি যন্ত্র সাহায্যেই একটি কাগজে রেখার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। স্নায়ুগুণের সমস্ত ফিরা ইহাতে নিতুলভাবে ধরাপড়ে। এই যন্ত্রদ্বারা বিষয়, ভয়, অমুগ, বিরাগ প্রভৃতি মনের অবস্থাগুলিও সঠিক নির্দ্ধারিত হয়। বদ্য, কফি চা পিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্য মানুষের দেহের কি অনিষ্ট করে এই যন্ত্রের দ্বারা তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মোটর ও রেলের সংঘর্ষ নিবারণ—

রেল লাইনের উপর দিয়া যে সকল জায়গায় মোটরের বাস্তা গিয়াছে সে সকল স্থানে অনেক সময় গুল্মের লোকের অসাবধানতার জন্য দুর্ঘটনা ঘটে, ভয় ক্রমে রাস্তার গেট বন্ধ না করাতে অনেক সময়ই ট্রেন ও মোটর সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনা নিবারণকল্পে ওহিওর একজন বৈজ্ঞানিক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যন্ত্রটি একটি বৃহৎ লোহার পাতের মত, রেলরাস্তা ও মোটর রাস্তার সংযোগস্থলে মোটর রাস্তার উপর এটিকে রাখা হয়। লোহার পাতের উপর লম্বা লম্বা গোলাকার রুল বসান আছে। যখন রাস্তা পরিষ্কার অর্থাৎ ট্রেন আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন রুলগুলি সম্মুখের দিকে ঘুরিয়া মোটরকে সামনের দিকে বাইতে দেয়। কিন্তু লাইনের উপর ট্রেন আসিলেই যন্ত্রকোশলে রোলারগুলি উটপিকি ঘুরিতে আরম্ভ করে, সেই অবস্থায় কোন মোটর

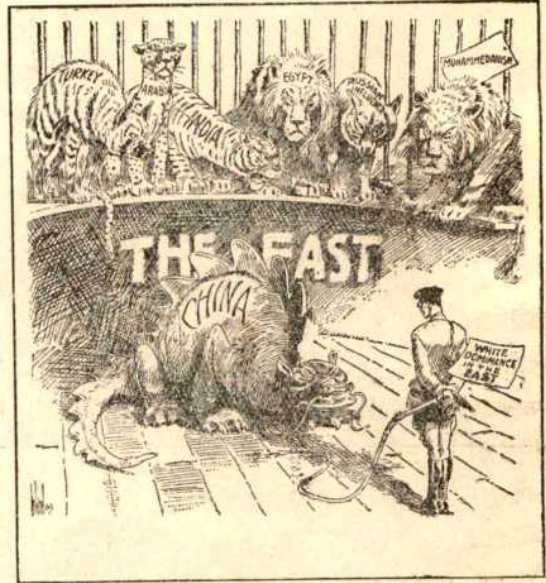


মোটর ও রেলের সংঘর্ষ-নিবারণী যন্ত্র

আসিয়া পড়িলে তাহা কিছুতেই সম্মুখে অগ্রার হইতে পারে না। সর্বত্র এই যন্ত্র ব্যাহত হইলে অনেক অকারণ দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

চীন ও খেত-জাতিসংঘ—

আয়ালাগোর একজন চিত্রকর এই ব্যঙ্গ চিত্রটি আঁকিয়াছেন। ছবিখান ভাবটি এই—খেতজাতিসংঘ চীনের মত অতিকার জন্তকে কাবু করিতে পারিতেছে না এই দৃশ্যটি তুরস্ক, আরব, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি প্রাচ্য

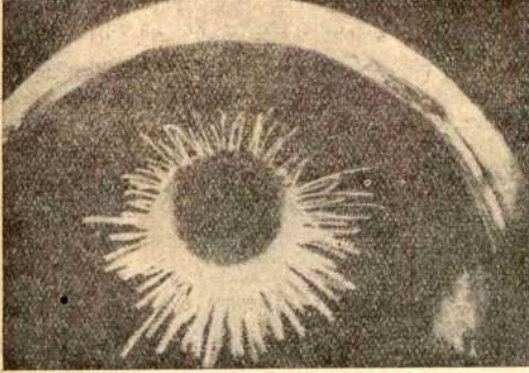


চীন ও খেত-জাতি-সংঘ

জন্তগণ বাঁচার বাহিরে আসিয়া দেবিতোছে ও ভাবিতেছে খেতকার জাতিদের ক্ষমতা কি কমিয়া আসিয়াছে।

উত্তাপহীন আলো—

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গৃহ-আলোকিত করিবার পদ্ধতিও উন্নত হইতেছে। চকমকি টুকিয়া কাঠ আলাইয়া ঘর আলো



জেলি-মাছের শোভা

করা হইতে, তৈলদীপ, কোরোসিন আলো, চর্বির আলো ইত্যাদিই ক্রমবিবর্তনে গ্যাসের আলোক ও বৈদ্যুতিক আলোক দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে আলো ভাল হইতেছে বটে কিন্তু আলানি বস্তুর অধিকাংশ শক্তি উত্তাপরূপে নষ্ট হওয়াতে বৈজ্ঞানিকেরা সন্তুষ্ট নহেন। সকল

ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতেছি উত্তাপ বত বেনী আলোও তত উজ্জ্বল, অর্থাৎ উত্তাপরূপে যত শক্তি নষ্ট হইবে আলোও তত বেনী হইবে। অলাকের দৃষ্ট উত্তাপরূপে শক্তি নষ্ট হইতে দিতে বৈজ্ঞানিকগণ নারাজ, তাহার উত্তাপহীন আলোর আবিষ্কারে চেষ্টিত আছেন। বিজ্ঞান একাজে এখনও সফলতা লাভ করে নাই বটে কিন্তু প্রকৃতি যে এই ধরনের আলোক বিতরণ করে তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জোনাকি পোকা যে আলো দেয় তাহাতে উত্তাপ বিন্দুমাত্র নাই, অর্থাৎ সমস্ত শক্তিই এখানে আলোকে রূপান্তরিত হয়। বিখ্যাত শ্রজলও জেলি মৎস্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকদিগের উত্তাপহীন আলো আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানে সেইরূপ একটি জেলিমাছের ছবি ছিলাম। নায়গ্যাসো সমুদ্রে ইহার হাজারে হাজারে বাস করে এবং ইহাদের গায়ের আলোকে সমুদ্র উদ্ভাসিত থাকে। ছবিতে দেখুন মাছের গায়ের আলো জলকণার উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ণ 'শোভা' বিস্তার করিয়াছে। এক একটি জেলিমাছ এত অধিক পরিমাণ আলো দেয় যে দেখিলে বিশ্বাস হইতে হয়, অথচ ইহাদের দেহ ঠিক সাধারণ মাছের মতই ঠাণ্ডা। জোনাকিপোকা বা মাছের দেহের এই আলোকের কারণ যথাযথ নির্দিষ্ট হইলেই উত্তাপহীন আলোকও সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে, বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ বিবেচনা করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার কবলেঞ্জ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উইলিয়ম আর্চার নামক ইংরেজ লেখকের কয়েক রকমের বহি আছে। একথানা ভারতবর্ষে বেড়াইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখা; নাম “ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ফিউচার,” অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও ভবিষ্যৎ। লেখকের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার তিনখানা নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন নামজাদা ইংরেজ লেখক জর্জ বাবুনাড’শ। আর্চার তাহার ভারতবিষয়ক বহিতে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম, ললিত-কলা প্রভৃতির নিন্দা করিয়া ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন। শ তাহার ভূমিকায় আর্চারের এই মনোভাব ও মতের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তাহার ভূমিকায় এক জায়গায় বলিতেছেন, “If western civilization is not more

enlightened than Eastern we have clearly no right to be in India”; “যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান ও নীতি বিষয়ে প্রাচ্য সভ্যতা অপেক্ষা উন্নততর না হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই আমাদের ভারতবর্ষে থাকিবার কোন অধিকার নাই।” এইরূপ ধরনের কথা তিনি আরও বলিয়াছেন। তাহার উক্তিগুলির আলোচনা করিবার পূর্বে বলা দরকার, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতা সব বিষয়ে এক জিনিষ নয়; ইংলণ্ড কোন কোন বিষয়ে অগ্রাগ্র পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কম সভ্য; ভারতীয় সভ্যতারও অগ্রাগ্র প্রাচ্য সভ্যতা হইতে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে।

শ ও আর্চার ধরিয়া লইয়াছেন, যে, ইংরেজরা ভারত-বর্ষে আসিয়াছিল ভারতীয় লোকদিগকে স্বীয় উন্নততর

সভ্যতা দিবার জন্ত। এখনও যে এই মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায় ইংলণ্ডের নামজাদা লেখকরা পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ দখল, ভারত শাসন ও ভারতে থাকিবার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত অজ্ঞ। যাহারা ঠিক কথা জানে, তাহাদেরও কেহ কেহ ঐ সব বিষয়ে কিছু বলিবার সময় অপ্রকৃত কথা বলে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল টাকার জন্ত, ব্যবসার দ্বারা ধনী হইবার নিমিত্ত। রাজশক্তিও অর্জন করিয়াছিল ধনী হইবার নিমিত্ত। এখন ইংরেজরা ভারতবর্ষে আছে টাকার জন্ত, ব্যবসা বাণিজ্য রক্ষার জন্ত, প্রভুত্ব রক্ষার জন্ত। ‘আমি প্রভু’ এই বোধেই একটা স্বপ্ন আছে; তা ছাড়া, রাজনৈতিক প্রভুত্ব থাকিলে অধীন দেশের বড় বড় সরকারী পদ দখল করিয়া বেশ রোজগার হয়; তার চেয়ে নিয় পদে নিযুক্ত করিয়াও বিশ্বের ইংরেজের বেকার অবস্থা ঘুচান যায়, এবং নিজের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যেরও খুব সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। চীন ভারতবর্ষের চেয়ে বড় দেশ এবং তার লোকসংখ্যাও ভারতের চেয়ে বেশী। অথচ চীনে ইংরেজ নিজের তত জিনিষ বিক্রী করিতে পারে না এবং নিজের তত কারখানা স্থাপন করিতে পারে নাই, যত ভারতবর্ষে পারে ও করিতে পারিয়াছে। তাহার একটা প্রধান কারণ, ভারত ইংরেজের অধীন, চীন নয়। ইংরেজদের ভারত দখল করিয়া বসিয়া থাকিবার আর একটা প্রধান কারণ এই, যে, ভারতের বুলিয়াই ইংরেজ এত বড় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষের সৈন্য ও ভারতবর্ষলক টাকার জোরে ইংলণ্ড আরও অনেক দেশকে অধীন করিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্য বলিতে ইংলণ্ডের বিশেষ কিছু থাকিবে না, বর্তমান ঐশ্বর্য্যও থাকিবে না।

সুতরাং, ইংরেজরা বেশী সভ্য বলিয়া ভারতবর্ষকে নিজের মত সভ্য করিবার নিমিত্ত এদেশে আসিয়াছিল ও এদেশে আছে, এই দুইটাই মিথ্যা কথা। ইংরেজরা যে যে উপায়ে ভারতের প্রভু হইয়াছে, তাহাও যে উৎকৃষ্টতর সভ্যতার পরিচায়ক, তাহা বলিতে পারি না। তাহাদের কোন কোন শক্তি ও গুণ যে ভারতীয়দের চেয়ে বেশী

ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; নতুবা তাহারা প্রভু হইতে পারিত না। কিন্তু এই সব গুণই যে সঙ্গুণ ছিল এবং এই সব শক্তিই যে উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মনীতিপ্রসূত, তাহা নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। কৌতূহলী পাঠক মেজর বামনদাস বসুর লেখা ইংরেজদের ভারত দখল করিবার ও রাজত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার ইংরেজী ইতিহাস পড়িতে পারেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনও প্রথমতঃ ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। পরে যখন দ্রষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্ত কিছু টাকা দিল ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইল, তাহারও প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সন্তায় কর্ম্মচারী পাওয়া, বিলাতী জিনিষের কাটতি বাড়ান, এবং শিক্ষিতদের মনোভাব বিজাতীয় রকমের করিয়া দিয়া স্বাধীনতার জন্ত বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমান।

ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্ত ইংরেজরা এদেশে আসে নাই, এবং এখনও তাহাদের ভারতবর্ষে থাকিবার কারণ ও উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সভ্য করা নহে। তাহারা এখানে আছে টাকার জন্ত, প্রভুত্বের জন্ত, এবং পৃথিবী ব্যাপী ব্যবসা ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত ভারতবর্ষ দখল করিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক বলিয়া। ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার নিমিত্ত ইংরেজদের আসিবার প্রয়োজন এই জন্ত ছিল না, যে, ভারতবর্ষ অসভ্য দেশ ছিল না, এখনও নহে। তাহার সভ্যতার প্রকৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে কতকটা ভিন্ন। উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার এখন করিব না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ জীবনযাত্রা-প্রণালী, মত, বিশ্বাস, আদর্শ, সামাজিক ব্যবস্থা প্রভৃতির দোষ ও গুণ উভয়ই আছে। মোটের উপর কোনগুলি ভাল, ইহাও তর্কের কোঁকে বলিলে ভুল হইতে পারে। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের গত শতাব্দীর দু'এক জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, যিশুর উপদেশ সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়াছিলেন, সভ্যদাহ নিবারণের জন্ত তখনকার বড়লাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তখনকার গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাষাণ মনে করিতেন। তিনি কিন্তু প্রতীচ্য অপেক্ষা প্রাচ্য সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া

মানিয়া লন নাই; বরং প্রাচ্যের নিম্নার দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

যে সামান্য কল্পনাই ইংরেজ ও অল্প পাশ্চাত্য লোকেরা ভারতীয় সভ্যতায় কিছু ভাল দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, শতাব্দীদিককে বলিয়াছেন, “the occidental renegades who swell the heads of our Indian students by assuring them that we are crude barbarians compared to them”। “পাশ্চাত্য স্বাধীনতাগামী অধম লোকগণের বাহারা ভারতীয় ছাত্রদিগকে এই বলিয়া অহঙ্কৃত করিয়া তুলে যে আমরা তাহাদের তুলনায় অসভ্য।” ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এরকম “স্বদলভ্যাগী” কোন লোকের মত উদ্ধৃত করিব না। করিব স্যার টমাস মন্রোর মত, যিনি একজন প্রধান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যসংস্থাপক ও সাম্রাজ্যগঠক ছিলেন। আজকালকার শাসনকর্তাদের মত তিনি প্রজাদের হইতে দূরে থাকিতেন না, তাহাদের সহিত খুব মিশিতেন এবং সেই জন্য তাহাদের দোষগুণ ভাল করিয়া জানিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একটি প্যালেমেন্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় তিনি হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধীয় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন :—

I do not exactly understand what is meant by the ‘civilization’ of the Hindus. In the higher branches of science, in the knowledge of the theory and practice of good government, and in an education which, by banishing prejudice and superstition, opens the mind to receive instruction of every kind from every quarter, they are much inferior to Europeans. But if a good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, capacity to produce whatever can contribute to either convenience or luxury, schools established in every village for teaching reading, writing and arithmetic, the general practice of hospitality and charity among each other, and, above all, a treatment of the female sex, full of confidence, respect and delicacy, are among the signs which denote a civilized people—then the Hindus are not inferior to the nations of Europe, and if civilization is to become an article of trade between the two countries, I am confident that this country (England) will gain by the import cargo.

তাপর্য্য। হিন্দুদের সভ্যতার (বা হিন্দুদিগকে সভ্য করার) মানে কি, আমি ঠিক বুঝি না। বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখাদিগকে, দেশশাসনের তত্ত্ব ও তাহার অনুসরণ, এবং যাহা পূর্বসংস্কার ও কুসংস্কার দূর করিয়া সকল শিক্ হইতে সর্বপ্রকার উপদেশ লাভ করিবার জন্য মনকে মুক্তবার কবে এরূপ শিক্ষা—এই সকল বিষয়ে তাহারা ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু কৃষির উৎকৃষ্ট প্রণালী, পণ্যশিল্পের কাজে অপ্রতিম

নৈপুণ্য, হবিয়া ও বিলাসের সকল সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা, পড়া লেখা ও হিন্দী-শিখাইবার লক্ষ্য প্রত্যেক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, পরস্পরের মধ্যে আতিথেয়তা ও ঐতির সার্বজনিক অনুসরণ, এবং সর্বোপরি, নারী-জাতিব প্রতি বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার, যদি জাতির সভ্যতা-ব্যঞ্জক লক্ষণের মধ্যে গণিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুবা ইউরোপীয় জাতিদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, এবং যদি সভ্যতা ইংলণ্ড ও ভাৰতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের সামগ্রী হয়, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইংলণ্ড আয়দানী মাল দ্বারা লাভগান হইবে।

মন্রো যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর এক শতাব্দীর উপর সময় অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কোন কোন বিষয়ে ভাৰতবর্ষের ও ইংলণ্ডের উন্নতি অবনতি হই-ই হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর ভারতবর্ষ সম্ভবতঃ অসভ্য হইয়া যায় নাই।

পাশ্চাত্যেরা আমাদেরকে সভ্য বলিলেই আমরা সভ্য, অসভ্য বলিলে অসভ্য হইয়া যাইব, এমন নয়; আমাদের সভ্যতা বা অসভ্যতা তাহাদের মত-নিরপেক্ষ। তবে, যে, আমি মন্রোর মত উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ এই, যে, বার্নার্ড শ বলিতেছেন, পাশ্চাত্যেরা ভারতীয়দের চেয়ে সভ্য না হইলে তাহাদের ভারতে থাকিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু মন্রো বুঝিয়াছিলেন, যে, কোন কোন বিষয়ে হিন্দুবা ইংরেজদের চেয়ে সভ্যতর, অর্থাৎ তিনি তল্লিতল্লা বাধিয়া অবিলম্বে বিলাত চলিয়া যান নাই। তিনি তিন দিন, তিন সপ্তাহ বা তিন মাস ভাৰতবর্ষে থাকিয়া ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বনিয়া যান নাই। ১৭৮০ সালে ভারতবর্ষে আসিয়া ১৮০৭ পর্য্যন্ত এদেশে থাকিয়া বিলাত যান। ১৮১১ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া আবার ভারতে আসেন। ১৮১২ সালে মাদ্রাজের গবর্নর মনোনীত হন। ১৮২৭ সালে তাহার মৃত্যু হয়। হায়দার আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মহীশূরের নূতন বন্দোবস্ত, কানাড়া শাসন, রায়তওয়ারী জমীর বন্দোবস্ত, ইংলণ্ডে ভারতীয় আইন-প্রণয়নে সাহায্য ইত্যাদি নানা কাজ তিনি করিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতে শীতকালে পরিব্রাজকদের চেয়ে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞানহীন বার্নার্ড শ অপেক্ষা তাহার মতের মূল্য আছে। যে যে বিষয়ে তিনি ভারতীয়দিগকে ইউরোপীয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন, সেই সব বিষয়ে তিনি ও তৎকালীন ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নিজেদের সমান শ্রেষ্ঠ করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথচ

নিজে ভারতবর্ষে অমের মায়া কাটাইতেও পাবেন নাই, স্বদেশবাদীগণকেও ভারত ত্যাগ করিতে বলেন নাই। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষকে সভ্য জানিয়াও তিনি, বাবুনার্ড শ'র পবামর্শ মন্থয়ান্নী, ভারত ত্যাগ করেন নাই; যে যে বিষয়ে ভারতবর্ষ তাঁহার বিবেচনায় নিকৃষ্ট সেই সব বিষয়ে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টাও করেন নাই; অথচ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নাই। তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা কেন ভারতবর্ষে ছিলেন? নিশ্চয়ই, অস্তুতঃ অংশতঃ, প্রভুত্ব করিবার জন্ত ও ধনী হইবার জন্ত।

বাবুনার্ড শ'র সব কথার আলোচনা করিবার জায়গা নাই, দরকাবও নাই। আরো দু-একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

Archer went to see for himself, and instantly and uncompromisingly denounced the temples as the shambles of a barbarous ritual of blood sacrifice, and the people as idolaters with repulsive graces through their noses.

তাৎপর্য্য। আর্চার (ভারত-অনুগামী পাশ্চাত্যদের কথার না ভুলিয়া) মন্দির দেখিতে গেলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কোন রকম না করিয়া দেবমন্দিরগুলাকে রক্তমাখা বলিদান রূপে অসভ্য ক্রিয়াকলাপের কসাইখানা বলিয়া এবং ভারতবর্ষের লোকগুলাকে নাকি কুৎসিত ময়না-পর্য্য পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিলেন।

ভারতবর্ষের মুসলমানাদি অহিন্দুদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। হিন্দুদের কথাই বলি। তাহাদের দেবমন্দির-সমূহের মধ্যে কালীদুর্গা প্রভৃতি শাক্ত মন্দিরেই পশু বলি হয়, অনেক জায়গায় পশু বলি না দিয়াও দুর্গাপূজা হয়। বাকী অসংখ্য দেবমন্দিরে পশুবলি হয় না। সুতরাং, যদি মন্দিরে বলি হইলে তাহাকে কসাইখানা বলিতে হয়, তাহা হইলেও সমুদয় হিন্দুমন্দিরকে কসাইখানা বলা ঠিক নয়। বলিদান হিন্দুমুসলমান ইহুদী ধিনিই করুন, তাহা আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। কিন্তু বলিদান না করিয়া কেবল উদরপূর্তির জন্ত পশুবধই কি বলিদানের চেয়ে ভাল? যে পশুগুলা হত হয়, তাহাদের পক্ষে বলিদানের জন্ত হত হওয়া বা কেবল বাহুঘের ভোজনের জন্ত হত হওয়া একই কথা। তাহারা বলিতে পারে, “প্রভু, তোমরা আমাদের মন্দিরে মার, মসজিদে মার, কসাইখানাতে মার, সব

জায়গাতেই মৃত্যু মৃত্যুই।” ভারতবর্ষে সমুদয় শাক্ত-মন্দিরে যত পশু বলি হয়, ভারতীয় ইংরেজ ক্রিষ্টীয়দের প্রাত্যহিক আহারের জন্ত তাহা অপেক্ষা কম পশু হত হয় না, বরং বেশী হয়। বলির পশুর মাংস মাছুষে খায়, দেবতা খান না; কসাইখানার পশুর মাংসও মাছুষে খায়। সুতরাং ইংলণ্ডে কোন মন্দিরে পশু বলি হয় না, ভারতবর্ষে কোন কোন মন্দিরে পশু বলি হয়, বলিয়া ভারতবর্ষটা ইংলণ্ডের চেয়ে অসভ্য দেশ, এটা বাজে কথা। আসল কথা, কোন্ দেশে কত পশুবধ হয়? ইংলণ্ড ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট দেশ। অথচ সেখানে, ভারতবর্ষের হিন্দু যত পশু বলি দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী পশু কসাইখানায় হত হয়; কারণ, মাংস বিলাতের লোকদেব প্রধান খাদ্য

কিন্তু তর্ক উঠিতে পারে, দেবতা পশুবধে তৃপ্ত হন, এই বিশ্বাসটা কি কুসংস্কার ও অসভ্য বিশ্বাস নহে? আমবা মনে করি, ইহা কুসংস্কার ও অসভ্য বিশ্বাস, এবং হিন্দুধর্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে প্রাচীন উপনিষদগুলি, তাহা একরূপ কুসংস্কার সমর্থন করে না।

এতটুকু বলিয়া পাশ্চাত্যদিগকেও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। নরহত্যা পশুহত্যা অপেক্ষা ভাল, ইহা পাশ্চাত্যরা বলিতে পারিবেন না। তাঁহারা কিন্তু, স্বদেশরক্ষার জন্ত নয়, নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত নয়, অস্ত্র দেশ ও জাতিকৈ অধীন করিবার জন্ত ও তাহাদের ধনে ধনী হইবার জন্ত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য মাছুষের প্রাণবধ করিয়াছেন, এবং এখনও এই হত্যা কার্য্য চলিতেছে। পাশ্চাত্যদের ভূমিস্বত্বা, প্রভুত্বলালসা ও অর্থগৃহুতার ফলে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কত জাতি নিম্মূল বা প্রায় নিম্মূল হইয়াছে। পাশ্চাত্যদের পক্ষ-সমর্থনকারী কেহ বলিতে পারেন, কিন্তু এগুলো ত বলি—নরবলি—নয়; ভারতবর্ষে যে মন্দিরে, দেবতার প্রীত্যর্থ, পশুবলি হয়। তাহার উদ্ভরে আমি বলি, পশু-হত্যার সঙ্গে ধর্মের যোগ, দেবতার যোগ, এইটাই ত আপনাদের দোষের বিষয় মনে করেন? আচ্ছা; যুদ্ধে নরহত্যার সঙ্গে ত আপনাদের ধর্মের যোগ স্থাপন করিয়াছেন। যুদ্ধে যাইবার আগে গির্জায় উপাসনা হয়; যুদ্ধ-

জয়ের পর গির্জায় গড়কে ধ্বংস দেওয়া হয় ; যুদ্ধে জিত বা যুদ্ধজয়ে ব্যবহৃত পতাকা গির্জায় রক্ষিত হয় । কেন তাহা করা হয় ? কার্যতঃ এই বিশ্বাসে নহে কি, যে, যুদ্ধে যাইবার আগে গড়কে স্তুতি করায় তিনি খুসি হইয়া তাঁহার পূজকদিগকে শত্রুশক্যীয় মাহুঘেরহত্যায় কৃতিত্বের পুণ্ডরিক দিয়াছেন ? সেই পুণ্ডরিকের জন্তই ত তাঁহাকে ধ্বংস দেওয়া হয় । অথচ শত্রুশক্যীয় লোকেরাও মাহুঘ, এবং প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদের সব বা অধিকাংশ অভিযান ধর্ম্মসংগত কারণে অনুষ্ঠিত হয় নাই ।

যে-সব গির্জায় যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধজয়ের জন্ত প্রার্থনা হয়, এবং যুদ্ধজয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, যুদ্ধপতাকা রক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়, যুদ্ধে হত “বীর”দের নাম মন্দির-ফলকে খোদিত থাকে, তাহাতে রক্তের কোন দাগ পড়ে না, বীভৎস রক্তগন্ধ বহে না বটে ; কিন্তু দেবতার সহিত হত্যার সম্পর্করূপ যে কারণে পশুবলির নিষিদ্ধ পাশ্চাত্যেরা করিতেছেন, তদপেক্ষা গুরুতর নরহত্যারূপ কার্যের যোগ গড়ের সহিত ঐদৃশ গির্জায় স্বীকৃত হয় না কি ? নরহত্যার সহিত গড়ের সম্বন্ধ স্থাপন কি পশুহত্যার সহিত দেবতার সম্বন্ধ স্থাপন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সভ্যতার পরিচায়ক ?

ভারতবর্ষের সব হিন্দু (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) নাকে নখনোলকবেশর-পরা পৌত্তলিক, এটাও একটা আবিষ্কার বটে ! পুরুষদের মধ্যে কেহই নখ ও বেশর পরে না । পুরুষজাতীয় শিশুদের এক আধ জনকে নোলক পরিতে দেখা যায় বটে । মেয়েদের নাকের গহনা পরা এখনও কতকটা চলিত আছে, কিন্তু কমিয়া আসিতেছে । এবং শ নিজেই যাহা বলিয়াছেন, “the eastern toleration of noserings is not justified by the western toleration of earrings,” “পাশ্চাত্য দেশে ইয়ারিং বরদাস্ত করা হয় বলিয়া প্রাচ্যেব নখবেশরনোলক বরদাস্ত করা যাইতে পারে না,” তাহার অঙ্কুরণে আমরা কি বলিতে পারি না, “পাশ্চাত্য মেয়েরা ইয়ারিং দুলাদি ব্যবহার করে বলিয়া প্রাচ্য মেয়েদের নখবেশর প্রভৃতিকে অসভ্যতর মনে করা যাইতে পারে না ?”

নাকের গহনা সম্বন্ধে আরো একটা কথা বলা দরকার । “গহনা” প্রবন্ধে শ্রীমান্ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়া-

ছেন, যে, প্রাচীন ভারতে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, নখ বেশর নোলক বা অস্ত্র কোন নাকের গহনা প্রচলিত ছিল না । সুতরাং ইহা মনে করা যাইতে পারে, যে, উহা ভারতীয় আর্থাদের উদ্ভাবিত বা ব্যবহৃত অলঙ্কার নহে, অস্ত্র কোথাও হইতে আমদানী ।

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধেও দু-একটা কথা বলি । আদি-মূর্তিপূজা কিম্বা মূর্তির সাহায্যে পূজা করি না । কিন্তু সেই কারণে, যাহারা তাহা করেন, তাঁহাদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি না । মৃত ও জীবিত অনেক মূর্তিপূজক বা মূর্তির সাহায্যে পূজকের বিষয় অবগত আছি, যাহাদের সাধুতা ও ভক্তি প্রশংসার উদ্বেক করে । মূর্তিপূজকদের কোন পূজামূর্তানে বীভৎস বা নীতিবিগর্হিত কিছু থাকিলে তাহা অবশ্যই সাদৃশ্য নিন্দনীয় । তাজিবদের, কাপালিকদের কোন কোন ক্রিয়াকলাপ, দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী উৎসর্গ প্রথা এই শ্রেণীভুক্ত । কিন্তু সে সব অমূল্যবাদ দিলে হিন্দুদের মূর্তিপূজা, রোমান ক্যাথলিকদের মূর্তিপূজার সদৃশ । ক্যাথলিকদের মধ্যে পাদরীর কাছে পাপ স্বীকার, আগেকার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ-প্রভৃতি সম্পর্কে কুৎসার কথা ইতিহাসে লেখা আছে । কিন্তু এই সকলের জন্ত পাশ্চাত্য জাতিদিগকে শ বা আর্চর অসভ্য বলেন নাই । পাশ্চাত্য বলিতে প্রধানতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার লোকদিগকে বুঝায় । খৃষ্টিয়ান বলিয়া পরিচিত লোকদের সংখ্যা ইউরোপে ২৭,৪৭,৬০,০০০ । তাহার মধ্যে ১৮,১৭,৬০,০০০ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক সুতরাং মূর্তিপূজক । উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় খৃষ্টিয়ান বলিয়া পরিচিত লোকদের সংখ্যা ১৩,২৩,০০,০০০ তাহার মধ্যে ৭,৩২,০০,০০০ অর্থাৎ অর্ধেকের উপর ক্যাথলিক অর্থাৎ মূর্তিপূজক । সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য জাতিদের অধিকাংশ লোক মূর্তিপূজক । তাহা সম্বন্ধে যদি পাশ্চাত্যেরা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে হিন্দু বাই বা পৌত্তলিক বলিয়া অসভ্য বিবেচিত কেন হইবে ?

মূর্তির পূজা অপেক্ষা অধিক পৌত্তলিকতা টাকার পূজা ও সাম্রাজ্যবাদের পূজা । তাহা পাশ্চাত্য জাতিদের খুব আছে ।

শ সহমরণ প্রথার এবং জগন্নাথের রথের চাকায় আত্ম-বলিদানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুটির কোনটিই এখন প্রচলিত নাই। আগে কি কি নিষ্ঠুর রীতি বা কুসংস্কার কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার দ্বারা জাতিবিশেষের সভ্যতা অসভ্যতার বিচার হইতে পারে না। জীৱ, দাস-দাসী, কর্মচারী, ও অন্তান্ত লোকের সহমরণ অতীত কালে ইউরোপে ও অন্তঃ সব মহাদেশে প্রচলিত ছিল। সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক বহিতে তাহার বৃত্তান্ত আছে। ভারতবর্ষে আদিম যুগে ইহাও প্রচলিত ছিল। ঐবৈদিক সময়ে সহমরণের পরিবর্তে বিধবাব দ্বিতীয় পতি গ্রহণ প্রচলিত হয়। তাহার পরবর্তী কোন সময়ে, স্বামীর চিতা হইতে উঠিয়া বিধবাকে “মগ্রে” বাইবার যে আদেশ আছে, তাহা স্বার্থপর লোকেরা “অগ্রেঃ” ফাইবার, আগুনে পুড়িয়া মারবার, আদেশে পরিবর্তিত করে। সহমরণ এই প্রকারে আবাব প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ বাংলা, অযোধ্যা ও রাজপুতানায় প্রচলিত হয়, দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ইহা নিষিদ্ধ ছিল, পঞ্জাবেরও সীমান্ত প্রদেশ সকলে চলিত ছিল না। আকবর বাদশাহেব আমলে ইহা নিষিদ্ধ হয়। ইংরেজদের আমলে রাজশক্তি তাহাদের হাতে ছিল বলিয়া তাহারা ইহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তখনকার হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায় এবিষয়ে ইংরেজের সহায় ছিলেন, এবং সতীদাহের বিক্ষুব্ধ প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন। রাজশক্তি তাহার মত লোকদের হাতে থাকিলে, কোনও বিদেশী বাহ্য ব্যক্তিরকেও ইহার উচ্ছেদ সাধিত হইত।

বার্ণার্ড শ অসভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ সতীদাহের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও তাহার মধ্যে জীৱ খেচ্ছায় মরণ অনেক ছিল (যাহার সমর্থন আমি একটুও করি না)। কিন্তু তিনি আমেরিকায় লিফিং নামে পরিচিত নৃশংস নিগ্রোনাহ রীতিব জন্ত আমেরিকার পাশ্চাত্য লোকদিগকে কেন অসভ্য বলেন না, এবং তাহাদিগকে সভ্য করিবার জন্ত ইংরেজদিগকে আমেরিকা দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে কেন বলেন না?

আগে আগে জগন্নাথের রথের নীচে বৎসরের মধ্যে

একবার বা দুইবার কোন কোন লোক নিজেই নিজেপ করিয়া আত্মহত্যা করিত। তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। সে-রীতিও এখন আর নাই। তথাপি আমাদের অসভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ শ তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কারখানা চালাইবার প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর ৬৭৮১০ বৎসরের শিশুদের দ্বারাও তথায় অমাতৃমৃত্যু পরিশ্রম করাইয়া তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত ও অন্ধায়ু করা হইত। প্রধানতঃ লর্ড শ্যাকটসবেরী (মৃত্যু ১৮৮৫) প্রভৃতির চেষ্টায় এই সব নিষ্ঠুরতা নিবারণিত হয়। মাতৃহত্যার দ্বারা ধর্মবুদ্ধি বা কুসংস্কার বশত আত্মহত্যা করিলে তাহাও অবশ্যই গর্হিত কাজ এবং অসভ্যতার লক্ষণ; কিন্তু টাকার জন্ত আত্মহত্যা-বিনীতা অপরের অঙ্গবৈকল্য, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু ঘটাইলে তাহা কি উহা অপেক্ষাও গর্হিত কাজ ও অসভ্যতার চিহ্ন নহে?

শ রোমানদের দ্বারা বৃটনদের পরাজয়ের সহিত ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয়দের পরাজয়ের তুলনা করিয়া নিজের বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা কত বেশী এবং সেই জন্ত তাহার তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা কত বেশী, তাহা এই তুলনা দ্বারা ই বুঝা যায়। রোমান-বিজয়ের সময় ব্রিটনরা ছিল আদিম অবস্থায়। তাহাদের না ছিল সাহিত্যদর্শনাদি, না ছিল সভ্যজনোচিত পরিচ্ছদ, না ছিল অন্তান্ত সভ্যতার অঙ্গ। হিন্দুদের এই সব যাহা ছিল, তাহার উল্লেখ নিম্নোক্ত। প্রাচীন কালে হিন্দুরা নিজেরদের দেশের বাহিরে সমগ্র ইউরোপ অপেক্ষা বিস্তৃত ভূখণ্ডে নিজেরদের সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিল, এবং বিস্তার বর্ষের নরখাদক জাতিতে সভ্য করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন ব্রিটনরা সেসকল কিছু করে নাই, এ বিষয়ে অধিক লিখিব না। শ ইংরেজদের একজন প্রধান লোক। তিনি যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গওঁমুখ, তখন অস্ত্রে পরে কা কথা?

কোন দেশের লোকদের কি কি বদগুণ, দোষ, সামাজিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার আছে, কেবল তাহার দ্বারা তাহাদের সভ্যতা অসভ্যতার বিচার করা যায় না।

কেবল মন্দ খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহা সব দেশেই খুব বেশী পাওয়া যাইতে পারে। দেখিতে হইবে, কোন দেশের সভ্যতার আদর্শ ও লক্ষ্য কি। তদনুসারে বিচার করিলে মানব-জাতির মধ্যে হিন্দুদের স্থান নীচে হইবে না। পাশ্চাত্য জাতিবা পরেব দেশ দখল ও তাহাদের ধন প্রাণ মান স্বাধীনতা হরণ করিয়া সাম্রাজ্যের ও ঐশ্বর্যের অহঙ্কার করা গৌরবের বিষয় মনে করে। হিন্দুবা কখন পরদেশ জয়, লুণ্ঠন, উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি করে নাই, বলিতেছি না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ধন পুঞ্জীভূত করা তাহাদের সভ্যতার আদর্শ ছিল না, এখনও নাই। সত্যের উপলক্ষি, জ্ঞান আহবণ, আত্মায় উৎকর্ষ সাধন, তাহাদের সভ্যতার লক্ষ্য। যে-প্রাণীর লোকদেব জীবনের ইহাই প্রধান সাধনা, হিন্দু চৈন ও বৌদ্ধদের সমাজে তাহাদেরই প্রধান স্থান, অস্ত্র কাহাবও নহে। এই আদর্শের বিকৃতি খুব হইয়াছে, হইতেছে, কিন্তু অল্পদূরগণও খুব হইয়াছিল, এখনও কিছু হইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ আদর্শের কোন লোক নাই, বলিতেছি না। কিন্তু সেরূপ আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার অঙ্গিমজ্জাগত নহে। পাশ্চাত্য ও ভাবতীয় সভ্যতার তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; তাহা করিবার মত যোগ্যতার দাবী আমি করি না। এখানে কেবল এই কথা বলিতে চাই,

যে, আমাদের আদর্শ পাশ্চাত্যদের আদর্শের চেয়ে খারাপ নয়।

কোন জাতি বিজ্ঞাতির বিদেশীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা তাহার সভ্যতা পরখ করিবার একটা কষ্টপাথর। পাশ্চাত্য জাতিরা বিদেশের বিজ্ঞাতিকে পরাজিত করিয়া হয় তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, নয় তাহাদিগকে অধীন রাখিয়া তাহাদের শ্রম ও ধন আত্মসাৎ করিয়াছে এবং শোষিত বা অপহৃত ধন স্বদেশে আনিয়াছে। হিন্দুবা চম্পা, কাছোজ, জাভা, হুমাত্রাদিতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তথাকার আদিম নিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধন করে নাই, তাহাদের ধন ভারতবর্ষে লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে বর্ষের দরিদ্র অবস্থায় রাখে নাই। তাহাদিগকে সভ্য করিয়া, তাহাদের শক্তির বিকাশ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ স্থাপত্যতাস্থার্যাদি কীৰ্ত্তি স্থাপন করিতে হিন্দুবা ন্যর্থ করিয়াছিল, যাহা দেখিয়া এখনও পাশ্চাত্যেরা বিস্মিত হয়, এবং যাহার তুলনা হিন্দুদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষেও নাই। শ্বেত পাশ্চাত্য জাতিরা ত অনেক অশ্বেত অসভ্য জাতিকে অধীন করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের অধীন এমন একটিও অশ্বেত জাতি দেখাইতে পারিবে কি যাহারা তাহাদের প্রভাবে সভ্য হইয়া এমন কিছু করিয়াছে যাহাতে জগৎ বিস্মিত হয় এবং যাহার তুলনা শ্বেতজাতিদের নিজের দেশে মিলে না?

বঙ্গের প্রতি গবর্নমেন্টের অবিচার

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সমগ্র ভারতের কংগ্রেস কমিটি গত বোম্বাইয়ের অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব দাখিল করেন। তাহার একটি এই, যে, প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুদের ও মুসলমানদের সংখ্যা যত, আবশ্যক বোধ হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের সেই (লোক) সংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট থাকিবে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের দেড়গুণ হয়, তাহা হইলে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যার দেড়গুণ হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভাবতবর্ষের প্রধান দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারিত হওয়া উচিত, কংগ্রেস কমিটি এই নীতির

সমর্থন করেন। যদি এক এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে এক এক প্রদেশেব সকল সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার সমষ্টি অনুসারে, অর্থাৎ এক এক প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারিত সভ্যদের সংখ্যা যেরূপ আছে, তাহা প্রাদেশিক লোকসংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট হয় নাই। নীচে ১৯২১ সালের সেলস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকসংখ্যা এবং ভাবতীয়দের প্রতিনিধির সংখ্যা দেখান হইতেছে।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা।	ইউরোপীয় প্রতিনিধির সংখ্যা।
মাদ্রাজ	৪,২৩,১৮,২৮৫	১৫	১
বোম্বাই	১,২৩,৪৮,২১৯	১৪	২
বাংলা	৪,৬৬,৯৫,৫৩৬	১৪	৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৫৩,৭৫,৭৮৭	১৫	১
পঞ্জাব	২,০৬,৮৫,০২৪	১২	০
বিহার-ওড়িশা	৩,৪০,০২,১৮৯	১২	০
মধ্যপ্রদেশ ও			
বেবার	১,৩২,১২,৭৬০	৬	০
আসাম	৭৬,০৬,২৩০	৩	১
দিল্লী	৪,৮৮,১৮৮	১	০
ব্রহ্মদেশ	১,৩২,১২,১২২	৩	১
আজমের-মেরোয়ারা	৪,৩৫,২৭১	১	০

ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দের প্রতিনিধি নহে; বরং তাহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকে। উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে, বঙ্গদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার লোকসংখ্যার অনুরূপ নহে। অধিকন্তু, বাংলাদেশে ইউরোপীয় প্রতিনিধির সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। তাহার ফল পাড়াইতেছে এই, যে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে কথা বলিবার যথেষ্টসংখ্যক লোক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে ত নাই-ই, অধিকন্তু যে কয়জন আছেন, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা সকল প্রদেশের চেয়ে বেশীসংখ্যক ইউরোপীয় প্রতিনিধি বঙ্গের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। বঙ্গের ইউরোপীয়দের প্রতিনিধির সংখ্যা অল্প যে-কোন প্রদেশের ইউরোপীয়দের প্রতিনিধিদেব চেয়ে বেশী করিবার কারণ এই বঙ্গা হইবে, যে, বঙ্গে ইউরোপীয়দের খুব বেশী মূলধন পাটিতেছে। কিন্তু তাহার ক্ষমতা তাহার ত বাংলা দেশ হইতে খুব বেশী ধন শোষণ করিতেছে; তাহাই ত বঙ্গের আশ্রয় অকর্মণ্যতা অমনো-যোগের যথেষ্ট শাস্তি। তাহার উপর আবার বাঙালীদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা বেশীসংখ্যক ইউরোপীয় প্রতিনিধি বঙ্গের ঘাড়ে চাপান কি অত্যাশ্রয় শাস্তি নয়?

প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উহার প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দিষ্ট হইলে, কোন প্রদেশের কত প্রতিনিধি হওয়া উচিত, তাহা দেখাইতেছি। ইহা গণনা করিবার ক্ষমতা যে-কোন প্রদেশের বর্তমান প্রতিনিধি-সংখ্যা স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ আদর্শ বা মান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা বোম্বাইকেই মান ধরিয়া গণনা করিব। বোম্বাইকে মান ধরিবার কারণ, উহার লোকসংখ্যা প্রেসিডেন্সী ও প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম। উহার ইউরোপীয়সমভূত মোট

প্রতিনিধিসংখ্যা ১৬; লোকসংখ্যা ১,২৩,৪৮,২১৯ অর্থাৎ মোটামুটি দুই কোটি। তাহা হইলে বোম্বাইয়ের প্রতি সাড়ে বার লক্ষ অধিবাসীর ক্ষমতা এক এক জন প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়, ধরা যাইতে পারে। এই নিয়ম সর্বত্র খাটিয়াইলে কোন প্রদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা কত হওয়া উচিত এবং এখন কত আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

প্রদেশ	বর্তমান প্রতিনিধি সংখ্যা।	যাহা হওয়া উচিত।
মাদ্রাজ	১৬	৩৪
বোম্বাই	১৬	১৬
বাংলা	১৭	৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	১৬	৩৬
পঞ্জাব	১২	১৬
বিহার-ওড়িশা	১২	২৭
মঃ প্রঃ-বেয়ার	৬	১১
আসাম	৪	৬
দিল্লী	১	০
ব্রহ্মদেশ	৪	১০
আজমের-মেরোয়ারা	১	০

যাহা হওয়া উচিত, সেরূপ হইলে মোট নির্ধারিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১২০ হয়। বিলাতের মত ছোট দেশে হাউস অব কমন্সের সভ্যসংখ্যা ৬১৫; তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের মত বড় দেশের ব্যবস্থাপক সভায় ১২০ জন প্রতিনিধি কম বই বেশী নয়।

কংগ্রেস-কমিটিও ধর্মসম্প্রদায় দুইটির প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট করিতে রাজী। সঙ্গতি (consistency) ও ত্রায়ের অনুরোধে তাহাদের এই প্রস্তাবও ধার্য করা উচিত, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে নির্ধারিত হউক। তাহা করিবার মত স্মরণীয়তা ও সাহস কমিটির আছে কি?

বর্তমানে প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের যে-সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহা গবন্মেণ্ট করিয়াছেন, তাহার ক্ষমতা কংগ্রেস দায়ী নহেন। আমরা দেখাইয়াছি, লোকসংখ্যার অনুপাতে ঐ সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট হয় নাই। ঠিক কি নিয়মে বা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিরূপ যোগ্যতা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যা অনুসারে যে উহা নির্দিষ্ট হয় নাই, তাহাও নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। এই তালিকাতেও বোম্বাইকে মান ধরিয়াছি। তাহাতে

এক এক লক্ষ লিখনপঠনক্ষম লোকের এক এক জন প্রতিনিধি হয়।

প্রদেশ।	লিখন- পঠনক্ষম।	ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম।	বর্তমান প্রতিনিধিসংখ্যা।	কত হওয়া উচিত।
আসাম	৪,৮৩,১০৫	৭৮০২	৪	৪
বাংলা	৪২,৫৪,৬০১	৭৭৩১৬১	১৭	৪২
বিহার-ওড়িশা	১৫,৮৬,২৫৭	১৩২,০৬২	১২	১৫
বোম্বাই	১৬,৪৫,৫০৩	২৭৬৩৩৩	১৬	১৬
ব্রহ্মদেশ	৩৬,৫২,০৪০	১১৩৪১৩	৪	৩৬
মঃ প্রঃ—বেরার	৬,৩৩,২৯৩	৬২৭০৬	৬	৬
মালদ্বীপ	৩৬,২১,২০৮	৩২৮০৮৩	১৬	৩৬
আগ্রা-অবোধা	১৬,৮৮,৮৭২	১৭৫২০২	১৬	১৬
পঞ্জাব	৮,৩৩,৪২২	১৩২৫০৫	১২	৮

এই তালিকা অনুসারেও, অর্থাৎ শিক্ষাবিসয়ক যোগ্যতা, শিক্ষার বিস্তৃতি ও লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইলেও, বঙ্গের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

যে প্রদেশ হইতে মোট রাজস্ব যত আদায় হয়, তদনুসারেও প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। কোন্ প্রদেশ হইতে মোট রাজস্ব কত আদায় হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের

যে-নব আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেন্টে প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোথাও প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে আদায়ী সকল রকম রাজস্বের সমষ্টি দেখান হয় নাই। প্রত্যেক রকম রাজস্বেরও আদায় প্রদেশ অনুসারে দেখান নাই। এইজন্য, উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত, কেবল কয়েক রকম প্রধান প্রধান রাজস্বের পরিমাণ তুলন করিয়া তাহার সমষ্টি নির্ণয় করিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ আমি জলসেচন (ইরিগেশন) বিভাগের আয় ধরি নাই, এইজন্য, যে, বাংলা দেশে জলসেচনের জন্ত নির্মিত লাভজনক সরকারী খাল একটিও নাই। সামান্য কয়েক মাইল বাহা আছে, অল্প অল্প অনেক প্রদেশের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। তাহা আমি পরে দেখাইতেছি। জলসেচন-বিভাগের আয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, যে, সমুদয় প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হয়। যদি জলসেচন-বিভাগের আয় ধরা যায়, তাহা হইলেও বাংলা দেশে আদায়ী রাজস্ব কেবলমাত্র বোম্বাই অপেক্ষা কয়েক লক্ষ টাকা কম হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজস্ব বাংলা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, যদি ঐ দুই প্রদেশে ও বঙ্গে মদ্যপান ও অস্ত্রাস্ত্র নেশা উঠিয়া যায়, এবং স্বতন্ত্র আবগারী বিভাগের আয় নামমাত্র হইয়া যায়।

১৯২৪-২৫ সালে পাঁচটি প্রদেশে কয়েকটি প্রধান বাবতে যে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

বাবত।	মাদ্রাজ।	বোম্বাই।	বাংলা।	আগ্রা-অবোধা।	পঞ্জাব।
পাট রপ্তানী শুল্ক।	০	০	৩৭৫৬৩২০	০	০
ইনকাম ট্যাক্স।	১৩১৫৬৩৬৫	৪০৩৭৭০২৪	৫৫৪৭৩২৩০	৭৮৮৭০৮২	৬০৬৭১০২
লবণ-শুল্ক।	১৮২২১৭২৭	১৭৩৩৩২০২	২৩৫২০৮২৭	৭০০০০০ *	৩০০০০০ *
জমীর খাজনা।	৬১৫০৫৮৭	৫১৬৫২৮১৫	৩১.৭৩৫৮৭	৬৭১০৮৫৩৪	৩৫৩৬৮১২০
আবকারী।	৪২০৫২০৭১	৪১৫০২১০২	২১৫৫৩৪৪৩	১৩২২৭৯২	১১৪৭৪৪০
ষ্ট্যাম্প।	২৪১৫১২৭৪	১৭৮০৬৪৮৪	৩৩৬৬৭৭৫৭	১৭৪৪০০৩১	১১৬৬১৩৭৭
অরণ্য-বিভাগ।	৫৫৭৩৭৬১	৭০৭২৬৪	২৪৭৫৫২২	৬২২১২৮৭	৩৭২৭৩১২
কার্পাস শিল্পশুল্ক।	২০৩৭৬৪	১৮৭০৩০৮৩	২৬২৫১৮	৬৮৮৫৫৮	১২২৬৮
মোট।	১৭৩৩৪১৮২২	১২৪৬২০৭৭৪	২০৫৬৩১৫৮৪	১২০২৭৫২২১	৭১৭২০৬৬২
জলসেচন।	২৮২৫৪২০৪	১২৮৫১২১৫	২৩৬১৩	১৩১২৩৮৪৪	৬৮৬১৬৪২৮
একুনে।	২০১৫২৬০৬৩	২০৭৫৪২৬৮২	২০৫৮২২১২৭	১৩৩৪৬২৮৩৫	১৪০৪০৭০৭৭

* আগ্রা-অবোধার ও পঞ্জাবের লবণশুল্ক বাবতে আদায়ী টাকা সরকারী হিসাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখান নাই; উত্তরপ্রদেশের লবণরাজস্ব বিভাগের আয় বলিয়া মোট ১০৭০৫০০৬ টাকা লিখিত আছে। ইহার মধ্যে উত্তরপশ্চিমদীপান্ত, পঞ্জাব, আগ্রা-অবোধা প্রভৃতির লবণশুল্কের আয় আছে। আমি লোকসংখ্যা অনুসারে ঐ টাকার আনুমানিক যত আগ্রা-অবোধা ও পঞ্জাবের হইতে পারে, তাহা বসাইয়া দিয়াছি। অনুমানে বয়ঃ বেশী ধরিয়াছি, তবু কম নহে।

তালিকাতে পাঠক দেখিবেন, যে, আমি জলসেচন-বিভাগের আয় প্রথমে ধরি নাই। তাহার কারণ বলিতেছি। বাংলা দেশের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় জল-সেচনের জন্ত গবর্নমেন্ট প্রায় কিছুই করেন নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। কৃত্রিম খাল কাটিয়া জলসেচনের ব্যবস্থা বাংলা দেশে গবর্নমেন্ট কত কম করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার সুবিধার

জন্ত ঐরূপ খালের জল পাঁচটা প্রদেশের কত একর করিয়া জমীতে যোগান হয়, তাহা দেখাইতেছি। অঙ্কগুলি ১৯২৪-২৫ সালের। মাদ্রাজ ৩৫২৪৬১ একর, বোম্বাই ৩৩৩৪১১৩ একর, বাংলা ১৫০৬০৭ একর, আগ্রা-অবোধা ১৮৭৮২৪৮, পঞ্জাব ২২৭১৭৮৫। যাহা লাভজনক ঐরূপ কৃত্রিম জলসেচনের ক্যানাল বা খাল বঙ্গে এক মাইলও নাই; মাদ্রাজে ৪০৪২ মাইল, বোম্বাইয়ে ৫৬৯৮ মাইল,

আগ্রা-অযোধ্যায় ১৪৫২ মাইল ও পঞ্জাবে ৩৪৩৮। এগুলি প্রধান ও শাখা খালের দৈর্ঘ্য; বিতরণের খালের দৈর্ঘ্য আরও অনেক বেশী। অতএব বলিতে হইবে, জলসেচন বিষয়ে বাংলা দেশের প্রতি সরকার বাহাদুরের বিশেষ রূপা আছে। যে প্রদেশে জলসেচনের খাল কাটা প্রায় হয়ই নাই, সেখানে জলসেচনের রাজস্ব খুব কম পাইলে তাহা গবর্ণমেন্টের দোষ, প্রদেশের লোকদের দোষ নহে। সুতরাং জলসেচন-রাজস্ব কম বলিয়া তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা এই কৃষ্টির অল্পপাতে কম হইতে পারে না।

আবকারীর আয় সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হইবে। প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা বাংলার অর্ধেকেরও কম, অথচ তাহার আবকারীর আয় বঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ। মাদ্রাজের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে ৪৪ লক্ষ কম, অথচ আবকারী আয় বঙ্গের দ্বিগুণেরও বেশী। আবকারীর আয় কম বলিয়া আয়ের এই কৃষ্টির অল্পপাতে বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা কম হইতে পাবে না।

যাহা হউক, জলসেচন ও আবকারীর আয় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার যুক্তিযুক্ততা যদি ধর্তব্য না হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, বঙ্গে মোট রাজস্ব যত আদায় হয়, তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা তদনুরূপ নহে। জলসেচনের আয় বাদ দিলে দেখা যাইবে, পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে পঞ্জাবের আয় সকলের চেয়ে কম। পঞ্জাবের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার রাজস্ব অনুসারে যদি ১২ হয়, যাহা বর্তমানে আছে, তাহা হইলে বঙ্গের ৩৫ হওয়া উচিত; কিন্তু এখন আছে ১৭, অথবা ইউরোপীয় বাদ দিলে ১৪। যদি জলসেচনের রাজস্ব মোট রাজস্ব গণনায় ধরা হয়, তাহা হইলে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে আদায়ী রাজস্ব সর্বাপেক্ষা কম হয়। তাহার বর্তমান প্রতিনিধি-সংখ্যা ১৩। তাহা হইলে বঙ্গের রাজস্বের আধিক্য বিবেচনা করিলে তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা হওয়া উচিত ২৪ জন। অবশ্য, রাজস্বের অল্পপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নিদিষ্ট হইলে মাদ্রাজ বোম্বাইয়েরও প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িবে।

আমি দেখাইলাম, কি লোকসংখ্যা, কি দেশী ভাষায় ও ইংরেজীতে লিখলপঠনক্ষমের সংখ্যা, কি মোট রাজস্বের পরিমাণ, যে দিক দিয়াই দেখা যাক, বাংলা দেশের যত প্রতিনিধি পাওয়া উচিত, আমরা তত পাই নাই। বাংলা দেশকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং পরোক্ষভাবে উক্ত সভার বাহিরে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রভাবহীন করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা কম রাখা হইয়াছে, আমার এই সন্দেহ গোপন করিতে

চাই না। ভারতশাসনপ্রণালীর পরিবর্তন আবশ্যক কি না, এবং আবশ্যক হইলে কিরূপ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত যে কমিশন বসিবে, তাহার সম্মুখে যে-সব বাঙালী সাক্ষ্য দিবে, তাহার এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিলে ভাল হয়। বঙ্গের প্রতি অবিচারে সমস্ত ভারতবর্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কারণ, বাংলা দেশ এখনও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান বিষয়ে নগণ্য হয় নাই।

বঙ্গের আবকারীর আয়ের অল্পতা যদি সম্পূর্ণরূপে এপ্রদেশে নেশার জিনিষের অল্পব্যবহারজনিত হইত, তাহা হইলে সন্তোষের বিষয় হইত। কিন্তু বঙ্গের আবকারী রাজস্বের অল্পতার তাহাই একমাত্র কারণ নহে। এ প্রদেশে কোন কোন নেশার জিনিষের উপর আবকারী ট্যাক্স অল্প কোন কোন প্রদেশের হার অপেক্ষা কম। কাটুতি বাড়ান ইহাব উদ্দেশ্য কিনা বলিতে পারি না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে হইতে পারে না। কেবল ইহাই বক্তব্য, যে, বঙ্গে সব নেশার জিনিষের উপর ট্যাক্সের হার অত্যন্ত প্রদেশের উচ্চতম হারের সমান হইলে আয়ও বাড়ি এবং নেশার জিনিষের ব্যবহার কিছু কমে। অবশ্য, আমি চাই, ঐযথার্থে এবং বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ভিন্ন, নেশার জিনিষের বিক্রী ও ব্যবহার একেবারে বন্ধ হওয়া। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন খুব বেশী ট্যাক্স বসাইয়া কাটুতি কমান ও যথাসম্ভব আয় বাড়ান কর্তব্য।

বঙ্গের প্রতি অজ্ঞায় ব্যবহারের আর এক দৃষ্টান্ত অনেক বার দিয়াছি। এখন আর একবার, মোট আদায়ী রাজস্বের তুলনায় বাংলা দেশ কত সামান্য টাকা সরকারী সব রকম কাজ চালাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পায়, তাহা বলিতে চাই। অনেক বার বলিয়াছি, বঙ্গের লোকসংখ্যা অল্প সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, বোম্বাইয়ের ও পঞ্জাবের দ্বিগুণের চেয়েও বেশী, আগ্রা-অযোধ্যায় ও মাদ্রাজের চেয়ে বেশী। অথচ বাংলা দেশকে তাহার খরচের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট এই বড় পাঁচটা প্রদেশের মধ্যে সব চেয়ে কম টাকা দেন। নীচের তালিকায় ১৯২৪-২৫ সালে প্রত্যেক প্রদেশের মোট আদায়ী রাজস্ব এবং ১৯২৭-২৮ সালের জন্য মোট বরাদ্দ আয় দেখাইলাম। মোট রাজস্ব উপরের ছত্রে জলসেচন-রাজস্ব বাদ, নীচের ছত্রে রাজস্বসমেত দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ।	মোট রাজস্ব।	বজেটে বরাদ্দ আয়।
মাদ্রাজ	১৭৩৩৪১৮২২	১৬৫৪৮০০০০
	২০১৫২৬০৬৩	
বোম্বাই	১৯৪৬২০৭৭৪	১৫০৮০০০০০
	২০৭৫৪২৬৩২	

প্রদেশ।	মোট রাজস্ব।	বছরে বরাদ্দ আয়।
বাংলা	২০৫৬৬১৫৮৪	১০৭৩৩০০০
	২০৫৮২২১২৭	
আগ্রা-অযোধ্যা	১২০২৭৫২২১	১২২৪৫০০০
	১৩৩৪৬২৮৩৫	
পঞ্জাব	৭১৭২০৬৬২	১১১৩০০০০০
	১৫০৪০৭০২৭	

এই তালিকায় পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে, যে-সব প্রদেশের মোট আদায়ী রাজস্ব বাংলা দেশের চেয়ে কম, তাহাদিগকে নিজের নিজের ব্যয়ের জন্য ভারত

গবন্মেণ্ট বাংলা দেশের চেয়ে বেশী টাকা রাখে দিয়াছেন।

এইরূপ একটা কথা শুনা যায়, যে, মোট আদায়ী রাজস্ব হইতে কোন্ প্রদেশ কত টাকা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখে পাইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার পড়ে লর্ড মেইনেব উপর। তিনি সিবিলিয়ান, পূর্বে আগ্রা-অযোধ্যা লর্ড ছিলেন। শুনা যায়, বাংলা দেশের উপর তাঁহার অপ্রসন্নতার কারণ থাকায় তিনি এইরূপ ভাবে টাকা বাটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে বাংলা গবন্মেণ্টকে বহু পরিমাণে উপবাসী থাকিতে হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্মী অয়েল কোম্পানীর দান

বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অনেক দান করিয়াছেন, করিতেছেন; এ পর্যন্ত সকলের চেয়ে বেশী দান করিয়াছে বর্মী অয়েল কোম্পানী। তাহার দানের পরিমাণ এক লক্ষ পোণ্ড, বর্তমান মুদ্রা-বিনিময়ের হারে প্রায় ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। এই টাকাটা যদিও কোম্পানীর ইংরেজ অংশীরা ইংলণ্ডে তাহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে আনিয়া দেয় নাই, তথাপি ইহা প্রশংসার যোগ্য। কোম্পানী কোথা হইতে এই টাকাটা দিল, তাহার খাঁটি খবর জানিয়া রাখা ভাল। কলিকাতার ইউরোপীয় বণিকদের অন্ততম মুখপত্র কমাস লিখিয়াছে, যে, ১২২৬ সালে বর্মী অয়েল কোম্পানীর লাভ হইয়াছে পঁচিশ লক্ষ দুই হাজার আট শত পনের পোণ্ড, এবং এই লাভ ১২২৫ সালের লাভের চেয়ে প্রায় এক লাখ পোণ্ড বেশী। কাহারও বার্ষিক আয় পঁচিশ লাখ হইলেই যে, সে অনায়াসে এক লাখ টাকা দান করিয়া ফেলে, এমন নয়। কিন্তু যে কোম্পানীর বার্ষিক আয় ২৫ লক্ষ পোণ্ড অর্থাৎ সওয়া তিন কোটি টাকার উপর, তাহার পক্ষে তের চৌদ্দ লক্ষ টাকা একবারের মত দেওয়া কঠিন নয়। এবং যে-টাকাটা কোম্পানী দিয়াছে, তাহাও আগেকার লাভের চেয়ে অতিরিক্ত লাভের টাকা। বৎসর বৎসর এই সওয়া তিন কোটি টাকার উপর কোম্পানী ব্রহ্মদেশ হইতে লাভ পাইতেছে। তা ছাড়া, ইহার ইংরেজ কর্মচারীরা মোটা মোটা বেতন হিসাবে অনেক টাকা পায়। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন থাকিলে এবং বর্মীরা আধুনিক

বিজ্ঞান ও কলকারখানার কাজ শিখিলে এই সমস্ত টাকা তাহাদের হইত। তাহার পরিবর্তে একবারের মত বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় তের লাখ টাকা পাইল। এই টাকার অনেকটা অংশ বড় বড় বাড়ী নির্মাণে খরচ হইবে। তাহার অনেক উপাদান বিলাত হইতে আসিবে; এঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদাররা খুব সম্ভব হইবে ইংবেঙ্গ। কোম্পানীর টাকায় স্থাপিত হইবে একটি এডমিনিস্ট্রারিং কলেজ। তাহার বড় অধ্যাপকরা হইবে ইংরেজ, যন্ত্রপাতি আসিবে বিলাত হইতে। অতএব, এই দানটার অনেক অংশ ইংরেজই ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং ইহা রাস-বিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পাণ্ডিতের শিক্ষার জন্য প্রায় সর্বস্বদানের সমতুল্য কিছু নয়।

কোম্পানীর দানটা ব্রহ্মের গবর্নর স্যার হারবোর্ট বাটলারের চাপের ফল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। কাগজে দেখিতেছি, বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত সরকারী কর্মচারীরা নাচগান জুয়াখেলা প্রভৃতির প্রদর্শন দিতেছে। সুতরাং ভিতরে ভিতরে টাকা আদায়েব জন্য লোকের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে মনে করা অসঙ্গত নহে।

সংবাদপত্রের প্রকাশের আগে পরীক্ষণ

সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা একজন রাজকর্মচারীকে দেখাইবার নিয়ম কোন স্টেশন বেশে কখন কখন প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাহাকে সেন্সর

বলা হয়। তিনি খবরের কাগজ প্রকাশিত হইবার আগে সব পড়িয়া দেখেন এবং যাহা আইন-বিরুদ্ধ কিম্বা তাঁহাব বিবেচনায় অল্প কারণে প্রকাশযোগ্য নহে, তাহা বাত্ দিয়া দেন। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট “নাথক” কাগজের নামে রাজদ্রোহের মামলায় সম্পাদককে খালাস দিয়াছেন। বলিয়াছেন, যে, “লর্ড লিটন কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা দেড় মাস চলিতে দেওয়ায় ইংবেজের চিবন্তন ভেদনীতি (divide and rule policy) অনুসরণ করিয়াছেন, এইরূপ লেখায় ‘নাথক’ অস্তায় অপ্রকৃত কথা বলিয়াছে বটে, কিন্তু উহা মিথ্যাস্থ বা রাজদ্রোহের নহে।” তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, যে, বিলাতে এর চেয়ে শক্ত কথা মিস্টার কুক্ মিস্টার বল্ডউইনকে বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন, যে, বিলাতে যেটা আপত্তিজনক নহে, সেটা যে ভারতেও আপত্তিজনক হইবে না, এমন নয়। এরূপ আপত্তিজনক কথার প্রকাশ ও প্রচার তিনি দেশের নিয়োগের দ্বারা বন্ধ করিবার পদার্থ দিয়াছেন। বিলাতে যাহা আপত্তিজনক নয়, সেটা কেন এখানে আপত্তিজনক, বিচারক তাহা না বলিলেও বুঝা কঠিন নয়। বিলাতে কখন এক রাজ-নৈতিক দল প্রবল হইয়া “গবন্মেণ্ট” নাম লইয়া দেশ শাসন করে, কখন অল্প রাজনৈতিক দল প্রবল হইয়া তাহা করে; কিন্তু “গবন্মেণ্ট” যাহারাই হউক, এবং তাহার পদার্থকে যত আক্রমণই করুক এবং পদার্থের প্রতি যত মন্দ অভিসন্ধির আরোপই করুক, তাহাতে বিলাত দেশটা ইংরেজদের হাতছাড়া হইয়া পরাধীন হইবার সম্ভাবনা ঘটে না। কিন্তু ভারতে যদিও সরকারী ইংরেজদের সমষ্টি একদল, এবং দেশের লোকেরা আর একদল, তথাপি ইংরেজরাই “গবন্মেণ্ট”, আমরা কখনও “গবন্মেণ্ট” হই না। আমরা যদি ক্রমাগত অবাধে গবন্মেণ্ট নামে ইংরেজদের দোষ দেখাইতে ও আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা তাহাদের সকল অভিসন্ধি জনসমাজে প্রচার করিতে পাই, তাহা হইলে দেশটা ইংরেজদের হাতছাড়া হইতে পারে, এবং আমরাই নিজেদের দেশে গবন্মেণ্ট গঠন করিয়া ফেলিতে পারি; এই আশঙ্কা ইংরেজদের আছে। এইজন্য, ইংলেণ্ডে যাহা আপত্তিজনক নহে, ভারতে তাহা আপত্তিজনক। বিচারক এই প্রকার আপত্তিজনক লেখার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা সহুপায় নহে। ইহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, এবং সম্পাদকদের নিজে নিজেই বিচারপূর্বক লেখনীচালনার শক্তিবিকাশে বাধা ঘটবে। এইজন্য আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

“ফরোয়ার্ডে”র রাজদ্রোহের মামলা

“ফরোয়ার্ডে”র নামে রাজদ্রোহের অভিযোগে সম্পাদক ও মূদ্রাকরের যে শাস্তির হুকুম হইয়াছিল, হাইকোর্টের জজেরা আপীলে মোটের উপর তাহা কমাইয়া দিয়া এবং সম্পাদকের কারাবাস সশ্রমের পরিবর্তে অশ্রমবিরহিত করিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। একেবারে বেকসুর খালাস দিলেই ঠিক হইত। সম্পাদক ও মূদ্রাকর ক্রটি স্বীকার করিলে খালাস দেওয়া হইত, তাহা বিচার-পতি চার্লস জোষের ইচ্ছাতে বুঝা যায়। কিন্তু যাহার ধারণা, যে, তিনি কোন দোষ করেন নাই, তাহার পক্ষে ক্রটি স্বীকার মিথ্যাচরণ ত হইতই, আত্মাবমাননাও হইত। বিচারপতি জোষের সহিত গ্যাড্ডোকেট জেনারেলের উত্তর-প্রত্যুত্তরে মনে হয়, যে, ভারতীয় রাজনীতির মর্ম্মকথা জোষ মহাশয়ের অজ্ঞত্বের বাহিরে নহে। তথাপি যে সম্পাদকের সাজা হইল, তাহা কি কেবল আইনের বাধ্যতাবশতঃ? যাহাই হউক, কথার ও লেখার রাজদ্রোহ যে কার্যগত রাজদ্রোহ নহে, কার্যগত রাজদ্রোহে উদ্বেজনাও নহে, অতএব তাহার জন্য লঘু দণ্ডই যথেষ্ট, ইহা যে পরোক্ষভাবে জজদের রায়ে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা মনের ভাল।

গবন্মেণ্ট ইহা জানেন কিনা জানি না, যে, ফরোয়ার্ডে পাবনায় দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটতরাজ সম্পর্কে যেক্রপ অভিপ্রায়ের কথা লেখা হইয়াছিল, ঠিক তাহা না হইলেও কতকটা ঐ রকমের সরকারী অভিসন্ধি ছিল বলিয়া দেশের বিস্তর শিক্ষিত লোক মনে করে। হইতে পারে, যে, শিক্ষিত লোকেরা ভুল বুঝিয়াছে। কিন্তু সত্য খবর যাহা তাহা মুক্তি করিলাম।

যে মানুষগুলির সমষ্টিকে গবন্মেণ্ট বলা হয়, তাহার ঠিক অল্প মানুষদেরই মত। সুতরাং তাহাদের ভুল ভ্রান্তি দোষ ক্রটি হইতে পারে; অপকর্ম্মও তাহাদের দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু তাহারাই ইহা স্বীকার করিতে চান না। যাহা হউক, নানা মোকদ্দমার রায় হইতে এখন এতটুকু বুঝা যায়, যে, অন্ততঃ পক্ষে সরকারী বিচারকদের মতে গবন্মেণ্ট নামে লোকদের ভুল ভ্রান্তি দোষ ক্রটি হইতে পারে, এমন কি তাহাদের দ্বারা অপকর্ম্মও হইতে পারে, সমালোচনা উপলক্ষে এত দূর পর্যন্ত বলা রাজদ্রোহ নহে। ফরোয়ার্ড মামলার রায়ে দেখা যাইতেছে, যে, গবন্মেণ্ট নামধারী ব্যক্তির কোন ছদ্মভূমিকা বা গর্হিত উদ্দেশ্যবশতঃ কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বা দুর্ভিক্ষ করিয়াছেন, ইহা বলিলে রাজদ্রোহ হয়। জজেরা আইনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঠিক ব্যাখ্যা কিনা বলিবার মত আইনজ্ঞান আমাদের

নাই। আমরা কেবল এই টুকু বুঝি, যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং সাধু চরিত্রের জন্ত জগতে যে-সব মহাপুরুষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন কোন কথায় ও কাজে লোকে মন্দ অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছে,—তাঁহাদের ভুল দোষ ক্রটি ধবা, সে ত আরও বেশী হইয়া থাকে। ষাঁহারা এদেশে ও বিদেশে গবন্মেণ্ট নামে অভিহিত হন, তাঁহারা ঐ সকল মহাপুরুষদের চেয়ে উন্নতচরিত্র নহেন। সুতরাং তাঁহারা যে কখন কখন ছুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিবেন, এরূপ সন্দেহ বা বিশ্বাস করা কি নিতান্ত অসঙ্গত?—বিশেষতঃ যখন তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার অস্বাভাবিক প্রভুত্বপদবী যেনতেনপ্রকারে রক্ষা কবিতাই হইবে? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। তাহা হইলে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক যদি কোন অভিসন্ধিতে বিশ্বাস করে, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেই বেআইনী কাজ হয়, এই বুঝিয়া আমাদের সাবধানতা লাভ করিতে হইবে। সমস্ত একটা জাতিকে বা সম্প্রদায়কে রাজদ্রোহ অপরাধে জেলে পুরা যায় না; এইজন্য মুখফোড় বস্ত্র বা অসতর্ক লেখকের ঘাড়ে সকলের শাস্তির বোঝা চাপিয়া বসে। জঙ্গরা নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের রায়ে একটা রিপোর্টে দেখিলাম :—

“Writers could not, under the guise of criticism of public affairs, be allowed to indulge in attributing base, improper or dishonest motives to those who were carrying on the work of the government of the country.”

তাৎপর্য। লেখকদিগকে, সরকারী কাজকর্মের সমালোচনার ছলে, ষাঁহারা দেশের শাসনের কাজ চালাইতেছে, তাহাদের প্রতি নীচ, অজ্ঞান বা অসাধু অভিপ্রায় আরোপ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

সরকারী বা বেসরকারী কোনও লোকেরই প্রতি নীচ অজ্ঞান অসাধু অভিপ্রায় আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই, যে, যে কোন সরকারী লোক দেশের শাসনকার্য চালায়, তাহার প্রতি এরূপ অভিসন্ধি আরোপ করিলে তাহা রাজদ্রোহ বলিয়া মণ্ডনীয় কিনা। যে সব রাজপুরুষ স্বয়ং বা ষাঁহাদের সমষ্টি “গবন্মেণ্ট” নামে আইনতঃ গণনীয়, তাহাদের সমালোচনা বা নিন্দাবাদ বা তাহাদের প্রতি কুঅভিসন্ধি আরোপ হয়ত রাজদ্রোহ হইতে পারে। কিন্তু যে কেহ দেশশাসন-কার্য চালায়, তাহার প্রতি কুঅভিসন্ধি আরোপ করিলে তাহা রাজদ্রোহ হইবে, এ বড় বিপজ্জনক মত। উচ্চতম হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভাপতি ও সভ্য কন্ঠেবল ও চৌকিদার প্রভৃতি সব সরকারী শাসনকর্মীর নিন্দা যদি কালক্রমে রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সম্পাদকদের

এখন হইতে পাততাড়ি গুটান ভাল। অবশ্য, চৌকিদার প্রভৃতি সকলেই দরকার বোধ করিলে মানহানির জন্ত সম্পাদকদের নামে নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু রাজদ্রোহ ও ব্যক্তিবিশেষের মানহানি এক জিনিষ নহে। জঙ্গেরা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদিগকেই লক্ষ্য করিয়া আলোচ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের কথাগুলির ব্যাপকতার অর্থ হইতে পারে।

আপীল শুনিলার সময় আদালতে একটা কথা উঠে, যে, খবরের কাগজে গবন্মেণ্টের সমালোচনা রাজনৈতিক যুক্তজাতীয়; অর্থাৎ সম্পাদকেরা এক পক্ষ, নিজেদের কথা বলিলেন, এবং সরকার পক্ষ অপর পক্ষ বলিলেন—যেমন স্বাধীন দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটা ত তেমন নয়। সম্পাদকদের অল্প কাগজ কলম ছাপার অক্ষর ইত্যাদি। সরকার পক্ষেরও কমুনিক ও বার্ষিক শাসনরিপোর্টরূপ ঐ জাতীয় অস্ত্র আছে। কিন্তু তাঁহারা ত তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহাদের আসল অস্ত্র কাবাগার প্রভৃতি। ষাঁহা হউক, এ প্রশ্নে ইহা আমাদের প্রধান বক্তব্য নহে। রাজনৈতিক যুদ্ধের কথাটা উঠায় সরকার পক্ষ হইতে এই মর্মেণের কথা বলা হয়, যে, সাংবাদিকরা ত যুক্ত করে না, তাহারা গুপ্তহস্তার (assassin এর) মত আঘাত করে। আমরা কোন প্রকার বীরত্ব বা সাহসিকতার দাবী না করিয়া বলিতে পারি, যে, আমাদের কাছেই এই বর্ণনাটা ইন্করেস্ট অর্থৎ অযথার্থ; কারণ আমরা সম্পাদকরূপে ষাঁহা কিছু বলি, তাহা ছাপিয়া সরকার বাহাদুরকে ও সর্বসাধারণকে জানাই। আমাদের বাক্যবাণ যদি অস্ত্রাঘাত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলেও তাহা গোপনে, আঁধারে, আড়ালে থাকিয়া আঘাত নহে; তাহা প্রকাশ্য দিবালোকেই করা হয়।

বিশ্বভারতীতে নিজামের দান

বিশ্বভারতীতে নিজামের এক লক্ষ টাকা দান সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

“বোলপুর বিশ্ব-ভারতীতে” হায়দ্রাবাদের নিজামের একলক্ষ টাকা দানের সংবাদে আমরা খুব স্বীকৃতি হইতে পারি নাই। শুনিতেছি যে, নিজাম নাকি এই সর্ব্ব দান করিয়াছেন যে, ঐ টাকায় বিশ্বভারতীতে “মুসলমান সভ্যতা” শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ তাহার ফলে বিশ্ব-ভারতীতে মুসলমান অধ্যাপক ও মুসলমান ছাত্রেরাও হয়ত প্রবেশলাভ করিবে। নিজাম সমস্ত ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্ত কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং শাহা হাসান নিজামী এই ধর্ম-প্রচারের ব্যাপারে তাহার সঙ্গে কিরূপ বনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা কাহারও

জ্ঞাত নহে। 'বিশ্ভভারতী'তে এই লক্ষ টাকা দান যে, মুসলমান ধর্ম প্রচারেরই একটি অঙ্গ নহে, তাহা কে বলিবে? বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার পরিচালকগণ এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

নিজামের ইসলাম ধর্ম প্রচারের উৎসাহ আছে, ইহা সত্য; কিন্তু তিনি ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতীতে এক লক্ষ টাকা দান কবিয়াছেন, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি না। তিনি কি সর্বোচ্চ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা আমরা এখনও জানি না। যখন জানিতে পারিব, তখন প্রয়োজন হইলে আলোচনা করিব। এখন পর্য্যন্ত যাহা জানি তাহা এই। ইউরোপের অনেক লোক সংস্কৃত ও পালি শিখিয়া ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও অন্তর্গত সাহিত্যের চর্চা করেন, কিন্তু তাঁহারা হিন্দু জৈন বা বৌদ্ধ হইয়া যান না। ইউরোপীয়দের মধ্যে যাহারা আবাবী ও কারসী শিখিয়া ইসলামিক সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করেন, তাঁহারা মুসলমান হইয়া যান না। বিশ্বভারতীতে ইসলামিক সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির চর্চার জন্য নিজাম টাকা দিয়াছেন। এইরূপ চর্চা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়। সরকারী টাকায় হয়।

আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের সব ধর্মসম্প্রদায় পরস্পরের ভাল যাহা আছে তাহা জানিতে পারিলে পরস্পরকে ঠিক বুঝিবার ও প্রজ্ঞা করিবার সুবিধা হইবে। এই কারণে, কেহ যদি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সভ্যতার চর্চার ব্যবস্থা করাইতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

বিশ্বভারতীতে বিদেশী ও দেশী খুষ্টিয়ান অধ্যাপক আগে ছিলেন এবং এখনও আছেন, কিন্তু কেহ খুষ্টিয়ান হন নাই। মোলানা জিয়াউদ্দীন নামক একজন মুসলমান অধ্যাপকও আগে ছিলেন। এখন বোধ হয় নাই। মুসলমান হাদ্রও বরাবরই দু-একজন ছিল, এখনও হয়ত আছে।

বিশ্বভারতীতে মিশরের রাজার দান

মিশরের রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতীতে অনেকগুলি ভাল ভাল আরবী বহি দিয়াছেন। ইহার সম্ভাব্য হইলে স্থানের বিষয় হইবে। রামমোহন রায় বেশ ভাল আরবী জানিতেন, কিন্তু তিনি মুসলমান হইয়া যান নাই। হিন্দু সমাজভুক্ত অল্প অনেক বাঙালীও বেশ আরবী জানেন।

উচ্চ বর্ণের হল-চালন

বাংলা দেশে ব্রাহ্মণাদি কোন কোন জাতির লোকদেব স্বহস্তে লাল্ল দেওয়ার রীতি নাই। তাঁহাদের পক্ষে হল-চালন কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, জানি না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বেতনভোগী পাচকের কাজ, আদালতে পিয়াদা চাপরাসীর কাজ, প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন সামাজিক লাল্লা হয় না, হওয়া উচিতও নয়। অতএব নিজে লাল্ল দিলেও সামাজিক অমর্যাদা না হওয়াই উচিত। বন্ধের অঙ্কচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সব রকম ভাল কাজেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হল-চালনা তাহার মধ্যে একটি। এখন যে কোথাও কোথাও আবার সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ।

গ্রীক পুবাণে একটি গল্প আছে, যে, য়াটিথস্ নামক এক দৈত্য দীর্ঘকাল অজ্ঞেয় ছিল; কেন না, যতবার সে তাহার মাতা পৃথিবীকে স্পর্শ করিত, ততবারই তাহার দেহে নূতন শক্তির সঞ্চার হইত। অবশেষে গ্রীক বীর হার্কিউলিস্ তাহাকে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। সব দেশেব পৌরাণিক গল্পের মধ্যে কখন কখন গুঢ় অর্থ নিহিত থাকে। এই গ্রীক গল্পটিতেও আমরা এইরূপ অর্থ অনুমান করিতে পারি। মাটির সহিত যে দেশের লোক, বা যে শ্রমীর লোক যত কম সম্পর্ক রাখে, তাহার তত শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণে, বিলাতের লোকেবা কল-কারখানার সাহায্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা প্রভূত ধনশালী হওয়া সত্ত্বেও চাষে উৎসাহ দিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। বিলাতেব লোকদের টাকা বেশী আছে। কিন্তু ফ্রান্সের লোকেরা, জার্মানীর লোকেরা, ডেনমার্কের লোকেরা, নিজেদের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া, তাহারা বিলাতের লোকদের চেয়ে সকল অবস্থায় অধিক স্বাবলম্বী ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। অল্প সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া সবাই লাল্ল ধরুন, এ পরামর্শ আমরা দিতেছি না; দিলেও কেহ শুনিবে না। মাষ্টারী, ওকালতী, কেরানীগিরি প্রভৃতির চেয়ে চাষবাস আরামের কাজ, তাহাও বলিতেছি না। আমাদের বর্তমান বক্তব্য কেবল এইটুকু, যে, চাষের কোন কাজই অল্প কোন কাজের চেয়ে অসম্মানজনক নহে, এবং আমরা ভ্রান্তি বশতঃ চাষাদিগকে যতই বেন অবজ্ঞা করি না, তাহারাই আমাদের অন্নদাতা। বাঙালীরা যে পরিমাণে কেবল কাগজকলমকে তাবজীবী বাক্য ও লিপিগুণ বাবুর জাতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে পরাধীন ও গোলাম হইতেছে।

আমরা যদি বাচিতে চাই, তাহা হইলে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন একান্ত আবশ্যক।

মফঃস্বলের দুইচারি কথা

আমি কলিকাতার মানুষ নহি, মফঃস্বলেই আমার বাড়ী; কিন্তু প্রথমতঃ ছাত্ররূপে, এবং তাহার পর বিষয়-কর্ম উপলক্ষ্যে আমাকে জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইতে হইতেছে। এইজন্য যদিও আমার অবসর অত্যন্ত কম, যৌবনস্থলভ শক্তিও নাই, তথাপি বাহারা আমাকে বন্ধের নানা স্থান দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা অঙ্গুভব করি এবং জানাইতেছি।

রেজুন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি মেদিনীপুর জেলার বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। এই সম্মিলনীর কাজ অনেক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার একটি মাসিক কাগজও আছে। সম্মিলনীর কর্মীরা প্রশংসা-ভাজন। উহার অধিবেশন উপলক্ষ্যে কোন কোন কর্মী যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, তাঁহারা কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট টাকা পান না। ‘অথচ মেদিনীপুরে অল্প অল্প টাকা দিবার লোক যথেষ্ট’ আছেন। সম্মিলনীর মাসিক পত্রটিরও অনেক গ্রাহক হওয়া উচিত। কেন না, মেদিনীপুর বেশ বড় জেলা। যে-জেলায় প্রাতঃস্মরণীয় বিন্যাসাগর মহাশয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা ভক্তি-ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কার্যক্ষেত্র ছিল, তথায় সাহিত্যসুহাগী লোকের অভাব হওয়া উচিত নয়। অধিবেশন উপলক্ষ্যে দেখিলাম, জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিমজ্জিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বসিবার জায়গা অন্য সকল জ্যোতাদের মধ্যে না হইয়া সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চে হইয়াছিল। তিনি বেশ সৌজন্দের সহিত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ কবিতাদি পাঠের শেষ পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার ধৈর্য্য প্রশংসনীয়। তাঁহার ব্যবহার ভক্তলোকের যেমন হওয়া উচিত, তেমনই হইয়াছিল। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই। প্রকাশ্য সব রকম সভাতে সকল লোকেরই নিমজ্জিত হইতে পাবে, হওয়াও উচিত। যে-সভাব যাহা কাজ, সে বিষয়ে উৎসাহী লোকের জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশেষ সম্মানও অবিধেয় নহে। কোন ইংরেজের বাংলা সাহিত্যে অনুরাগ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও কৃতিত্ব থাকিলে বাংলাসাহিত্যবিষয়ক সভাতেও তাঁহার বিশেষ স্থান থাকা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু

এই ম্যাজিস্ট্রেটটির তাহা আছে কি না, জানি না। শুধু ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া বাংলাসাহিত্যসভায় কাহারও বিশেষ নিমজ্জিত বা সম্মানের কারণ নাই। একজন বক্তা নিমজ্জিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির অল্পপস্থিতি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, যে, “দেশী হাকিমরা দেখুন, এই সভা সিভিলাস্ নহে, স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত আছেন।” তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল, তবে কি ম্যাজিস্ট্রেট সমুদয় কার্যকলাপ বক্তৃতাাদি নির্দোষ হইতেছে কি না তাহা সাক্ষ্য ভাবে জানিবার জন্য কিবা স্বয়ং উপস্থিতির প্রভাব দ্বারা নির্দোষ রাখিবার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত আছেন? ইহাও মনে হইয়াছিল, যেমন গোবর জল ছড়া দিয়া অন্তঃস্থানকে শুদ্ধ করা হয়, তেমনি আমাদের মত লোকদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক-হিসাবে অন্তঃস্থানকে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি দ্বারা শুদ্ধ করা হইয়া থাকিবে।

আমি মৌখিক যাহা বলিয়াছিলাম, স্থানীয় কলেজের একজন অধ্যাপক তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন মোটের উপর ঠিকই লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের বেশ ক্ষমতা আছে।

মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু পরে পাণ্ডুর নিকটবর্তী ইলসোবা-মোঙলাই ইংরেজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে দেখানে গিয়াছিলাম। গ্রাম দুটি দেখিয়া কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আগে তথাকার লোকদের অবস্থা ভাল ছিল বোধ হয়। এখন পুরাতন বেমেরামত বাড়ী ও অংশস্কৃত, পানির আচ্ছাদিত ছোট বড় পুকুর বিস্তার। তা ছাড়া, আগাছা ও জঙ্গল সর্বত্র। দুটি নলকূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামের লোকদের ভাল পানীয় জল পাইবার সুবিধা হইয়াছে। গ্রাম দুটির এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, বাঙালী জাতির শিক্ষানুরাগ প্রবল বলিয়া এখানে গ্রামবাসীরা একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় চালাইতেছেন। তাহার ছাত্রসংখ্যা একশতের কিছু বেশী। ছাত্রবেতন বেশী নয়। বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যও অধিক পান না। তথাপি যে স্থানীয় লোকেরা ইহা চালাইতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে ও শিক্ষকদের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা। বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ীও নির্মিত হইয়াছে। শিক্ষাভিরেক্তব ওটেন সাহেবের মত এই, যে, ছোট ছোট আর্থিকঅসচ্ছত্তাগ্রস্ত অনেক ইস্কুল থাকা অপেক্ষা সেরূপ অনেকগুলো উঠাইয়া দিয়া বড় বড় কতকগুলি ইস্কুল রাখা উচিত। আমাদের মত সেরূপ নয়। যে সব ইস্কুলে ছাত্র অনেক বেশী, আমাদের দেশে সে সব ইস্কুলে ছাত্রেরা ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকদের নিকট আবশ্যিকমত উপদেশ, পরামর্শ পায় না; ছোট ইস্কুলে তাহা সম্ভব। অতএব, ছোট

ইন্সুলগুলিকে বেশী করিয়া সাহায্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখা উচিত। তাহার আরও একটা কাৰণ এই, যে, পল্লীগ্ৰাম-সকলের লোকদের অবস্থা এরূপ নহে, যে, তাহারা অনেক টাকা খরচ করিয়া শিক্ষার জন্ত সহরে ছেলে পাঠাইতে পারিবে। ছোট ইন্সুলগুলিতে সৰ্বসাধারণের, বিশেষতঃ ধনী লোকদের, সাহায্য করা কর্তব্য। ইলসোবা-মোঙলাই স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল বোধ হইল না। ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত হায়গায় বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য ভাল বাধা কঠিন। কিন্তু নিরাশ হইয়া হাস ছাড়িয়া দিলে ত চলিবে না। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল করিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করিবার জন্ত সকল রকম চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার কিছু চেষ্টা আছে দেখিলাম;—ম্যালেরিয়ানিবারিনী সমিতি একটি আছে।

ইলসোবা-মোঙলাই যাওয়ার কিছুদিন পরে আমি রাজ-শাহী জেলার নওগাঁ গিয়াছিলাম। তথাকার যুবকসমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে, সেখানকার বাসিন্দা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সায়্যাস মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। নওগাঁ জায়গাটি ছোট, কিন্তু অনেকগুলি ব্যাক আছে। ইহার রাস্তাগুলি বর্ষায় নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়। রাস্তা ভাল করা এবং বাস্তায় ভাল করিয়া আলো দেওয়া দরকার। শুনিলাম, ইহার সমৃদ্ধির প্রধান কারণ গাঁজার চাষ ও ব্যবসা। গাঁজা একটা নেশা, কিন্তু ঔষধেও কাজে লাগে। সুতরাং যদি কখনও এদেশে সৌভাগ্যক্রমে কেবল ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সকল রকম নেশার জিনিষ উৎপাদন ও বিক্রী নিষিদ্ধ হয়, তখনও গাঁজা কাজে লাগিবে এবং নওগাঁ একেবারে গরীব হইয়া যাইবে না। অল্প চাষও এখানে খুব আছে। জমী খুব উর্বরা। নওগাঁয়ে একটি জিনিষ দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। এখানে হিন্দুমুসলমান যুবকরা এক সঙ্গে মিলিয়া দেশহিতকর কাজ করেন। সমিতির উৎসব উপলক্ষ্যে যে একটি মহাভাবতীয় নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে সমিতির উৎসাহী ও কর্ণিষ্ঠ সহকারী সম্পাদক শ্রীমান শাহজাহান কবীর যুগিষ্ঠিব সাক্ষিয়াছিলেন। অল্প কয়েকজন অভিনেতার মত ইহারও অভিনয় বেশ হইয়াছিল। (ইহার এক ভাই শ্রীমান হুমায়ুন কবীর উদীয়মান লেখক ও কবি, বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যুবক-সমিতি ব্যায়াম, সাহিত্যচর্চা, বালিকাদিগকে সম্বলিত শিক্ষা দেওয়া, অভিনয়, আবৃত্তি, রোগীর সেবা ও অল্প প্রকারে লোকহিতসাধন প্রভৃতি নানা কাজে হাত দিয়াছেন।) এখানে গিরিজামোহন বাবুর পিতার নামে প্যারীমোহন বালিকাবিদ্যালয়, প্যারীমোহন টাউন হল ও লাইব্রেরী, প্রভৃতি আছে। বালিকাবিদ্যালয়টির বিশেষত্ব

এই, যে, ইহার পরিচালকগণ সবকারী সাহায্য গ্রহণ করেন না, বিনাবেতনে হিন্দুমুসলমান সব সম্প্রদায়ের বালিকাদিগকে শিক্ষা দেন, এবং উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায়, এমন কি শান্তি-নিকেতনেও দেখিয়াছি, ভাল আবৃত্তি করিতে পারে এরূপ বালকবালিকার সংখ্যা কম। সেইজন্য নওগাঁতে তিনটি বালিকাকে অপেক্ষাকৃত ভাল আবৃত্তি করিতে শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। এখানে মহিলা ও বালিকাদের শিল্পপ্রদর্শনীটিও বেশ লাগিল। নওগাঁতে আর একটি ভাল জিনিষ দেখিলাম, নিকটবর্তী বলিহারেব জমীদার শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু রায় ও মহাদেবপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী সকল জনহিতকর কাজে যোগ দেন, কলিকাতায় বসবাস করিয়া আমোদপ্রমোদে টাকা উড়ান অপেক্ষা নিজ নিজ গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বাস করাই শ্রেয় মনে করেন। আমি এক দিন বলিহার গিয়াছিলাম, এবং অল্পকাল হইয়া কিছু বলিয়াছিলাম। বলিহার যাইবার রাস্তা ভাল নয়। ইহার উন্নতি হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা খারাপ সরকারী রাস্তা যাহা আমি এ পর্যন্ত দেখিয়াছি, তাহা পদ্মা পার হইয়া আরিচাঘাট হইতে মাণিকগঞ্জ যাইবার রাস্তা। তাহার বর্ণনা পরে করিতেছি। নওগাঁর পুর আমি মাণিকগঞ্জেব সাহিত্য-মন্ডার বার্ষিক উৎসবে গিয়াছিলাম। সেখানে শ্রীমান কালিদাস নাগ লঠনসহযোগে ছবি দেখাইয়া বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মাণিকগঞ্জ জায়গাটি ছোট, কিন্তু শিক্ষিত লোক অনেক আছেন। হুঃখের বিষয়, আমি কেবল রাত্রিসমেত ঘণ্টা ত্রিশ ছিলাম বলিয়া অধিকাংশের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারি নাই। এখানেও সাহিত্যোৎসাহ বেশ আছে। আমি তথাকার সাহিত্যোৎসাহী লোকদিগকে একটি ছোট মাসিক কাগজ চালাইবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। বার্ষিক মূল্য একটাকা রাখিয়া আত্মমানিক-চারিশত গ্রাহক পাইলেই ইহা চলিতে পারিবে। যেসব পুরাতন জিনিষের সংগ্রহ, যেমন অপ্রকাশিত গান, ছড়া, গাথা প্রভৃতি, কেবল গ্রামের লোকদের দ্বারাই হইতে পারে, তাহা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার দিকে বেশী নজর দেওয়া এইরূপ মাসিকের পরিচালকদের কর্তব্য। তাহা ছাড়া, সাধারণতঃ মাসিকপত্র যাহা থাকে, তাহাও থাকিবে। মাণিকগঞ্জে ঐতিহাসিক খরজনীকান্ত গুপ্তের বাড়ী। তা ছাড়া অধ্যাপক দোনেশ-চন্দ্র সেনেরও উহার সহিত সম্পর্ক আছে। সুতরাং মাণিকগঞ্জনিবাসীদের সাহিত্যসেবার নজর আছে বলিতে হইবে। বিনা নজরেও অবশ্য সাহিত্যসেবা করা চলে। ব্যাস বাঙ্গালী কালিদাস ভবভূতির কোন পূর্বপুরুষ বা

প্রতিবেশী সাহিত্যিক ছিলেন বলিয়া জানা নাই। শেখপী-
য়রের পূর্বপুরুষদের কেহ কখন কোন বহি লেখেন নাই।
মানিকগঞ্জের সভার দুই অধিবেশনে একটি ছোট মেয়ে
গান করিয়াছিল। শুনিলাম, এত ছোট মেয়ে সভায় গান
করাতেও তথাকাব কতকগুলি লোক অসম্মত হইয়াছেন
ও প্রতিফুল সমালোচনা করিয়াছেন। নওগাঁ এ বিষয়ে
ভাল। সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের সস্ত্রান্ত
হিন্দুবাড়ীর বালিকারা আবৃত্তি করিয়াছিল এবং কেহ কেহ
সদীত-প্রমিতযোগিতাতেও যোগ দিয়াছিল।

আরিচাঘাট হইতে মানিকগঞ্জ যোল মাইল পথ। যাই-
বার দিন কোনপ্রকারে মোটর বাস চলিয়াছিল ও তাহাতে
ঘণ্টা-দুই আড়াই লাগিয়াছিল। যে দিন মানিকগঞ্জ হইতে
আসি, সে দিন খুব বৃষ্টি হইতেছিল। এইজন্য তথাকার
বন্ধুরা আমাদেরকে রওনা হইতে দিতে খুব অনিচ্ছুক
ছিলেন। কিন্তু আমাদের বিশেষ জরুরী কাজ থাকায়
আসিতেই হইল। মোটর চলিবে না বলিয়া একখানা
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। যাহারা আমাদের
যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহারা
যথাসাধ্য সব রকম সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু
মেয়ের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব ছিল না, এবং রাস্তা ভাল
করা ও রাখার মালিকও তাঁহারা নহেন। রাস্তায় ৭৮
জায়গায় আমাদেরকে গাড়ী হইতে নামিয়া আধ মাইল
সিকি মাইল করিয়া থালি পায়ে কাদায় হাঁটিতে হইয়াছিল,
এবং মধ্যে মধ্যে রাস্তা অপেক্ষা তাহার নীচের মাঠ ভাল
থাকায় গাড়োয়ান গাড়ী মাঠে নামাইয়া এক আধ মাইল
করিয়া হাঁকাইয়াছিল। বৃষ্টিতে কতকটা ভিজিয়া যাওয়া,
এবং প্রায় দেওয়ালের মত খাড়া সাঁকোর উঠা ও
তাহা হইতে নামার সময় গাড়ীতে বসিয়া অনিচ্ছাকৃত
কুস্তি করা বহু স্থানে ঘটিয়াছিল। এই প্রকারে অন্যান্য
পাঁচ ঘণ্টায় যোল মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আরিচা-
ঘাটে পৌছি। সেখানে পায়ে কাদা ধুইতে আমাদের
এক একজনের দুই দুই ছোট বাস্টি জল লাগিয়াছিল।
ডিক্টি বোর্ডের সভ্যরা, লোক্যাল বোর্ডের সভ্যরা, ডিক্টি
এঞ্জিনিয়ার, বা অন্য যে কেহ এই রাস্তাটি ভাল অবস্থায়
রাখিবার জন্য দায়ী, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে মানিক-
গঞ্জের এই রাস্তায় গাড়ী টানিতে বা গাড়ী ঠেলিতে
বলিলে তাঁহাদের মত মহামান্য ব্যক্তিদের অপমান করা
হইবে; তারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে করি, এমন
বেয়াদবীত আমার নাই-ই। কিন্তু তাঁহারা যদি বর্ষার
দিনে এক একবার এই রাস্তায় বাষ্পীয় যান অস্থানানিতে
আরোহণপূর্বক সফর করেন, তাহা হইলে আশা করা
যায়, যে, তাঁহাদের পৈত্রিক হাড় ক'খানা আস্ত থাকিতে
পারে। কারণ, আমাদের আছে, এবং আশ্চর্যের বিষয়

কোন পীড়া হয় নাই। আরিচাঘাটে পারের ঘাহাজ
অনেক দেয়ীতে আসায় আমরা পার হইতে পারিয়াছিলাম।
যাইবার সময় ও আসিবার সময় আরিচাঘাটে শ্রীবুদ্ধ
কিরণশঙ্কর রায়ের কর্মচারীরা থাকিয়া আমাদের
জলযোগাদির সব রকম সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যেখানে যেখানে গিয়াছি, সর্বত্র বাপ ও আহাদের
বন্দোবস্ত খুব ভাল হইয়াছিল। ইহা বলিবার কারণ এই,
যে, সর্বত্রই আহাদের বন্দোবস্ত প্রয়োজনের চেয়ে অনেক
বেশী হইয়াছিল। তাহাতে এই দুঃখ ও লজ্জা হইল, যে,
বিশেষ কিছু করিতে ত পারি না, অথচ ভদ্রমহোদয়েরা
কত যত্ন ও ব্যয় করেন। আর একটা দুঃখও হয়, যে,
যখন খাওয়া চলিত তখন এত নিমন্ত্রণ পাইতাম না।
শ্রীবুদ্ধ বিপিনচন্দ্র পালকে এই কথা বলায় তিনি বলিলেন,
“রায়্যাল ট্র্যাভিডি!” পরিহাস ছাড়িয়া দিয়া ইহা বল-
নবকার মনে করি, যে, বুদ্ধদের পক্ষে সাদাসিধা অল্প
ভোজ্যের বন্দোবস্তই যথেষ্ট এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অমূল্য;
এবং সাধারণতঃ আমাদের আতিথেয়তা ও পরিবেষণ-
রীতিব জন্ত বড় অপচয় হইয়া থাকে।

মফঃস্বলে গান শিখাইবার ও শিখিবার বন্দোবস্ত ভাল
নাই। যেখানে যেখানে গান শুনিলাম, সেখানেই আমার
মত আনাড়ির কানেও পরিচিত গান বেজরা লাগিল।
কলিকাতাতেও যে এরূপ না হয়, তাহা নহে। তথাপি
এখানে গান শিক্ষার ও গানের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।
ইহাকে কেবলমাত্র সৌখীনতার একটা অঙ্গ মনে না
করিয়া এ বিষয়ে শ্রগড় গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন।

আমি যে চারিট জায়গায় গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে
তিন জায়গায় থিয়েটারের গৃহে সভা হইয়াছিল। এই
ঘরগুলি এরূপ ভাবে নির্মিত, যে, ভাল করিয়া বায়ুচলাচল
হয় না। অনেক লোক একত্র হইলে বায়ু দূষিত হয়।
দূষিত বায়ুর মধ্যে, দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে স্বাস্থ্য খারাপ
হয়, কষ্টের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। তা ছাড়া, ব'হু
দূষিত হইলে তাহার মধ্যে বস্তুতা, অভিনয়,
গান আবৃত্তি বতটা ভাল হইতে পারিত, তাহা অপেক্ষা
অন্ততঃ কিছু মন্দ হয়। এইজন্য ঘবগুলির এ বিষয়ে উন্নতি
দরকার। আর এক বিষয়ে উন্নতির আবশ্যক আছে।
ঘরগুলিতে মহিলাদের বসিবার জায়গা বেশীর ভাগ উপরে
ও পশ্চাদ্বদিকে, এবং কিছু জায়গা উপরে দুই পাশে।
ইহাতে একটি মহিলাও সামনের পুরুষদের সমান সুবিধা
পান না। এবং মোটের উপর সমুদয় মহিলা পুরুষদের
চেয়ে কম সুবিধা পান। অবরোধ-প্রথা প্রচলিত
থাকায় আমাদের দেশের মহিলারা একেধেয়ে জীবন যাপন
করেন, বাহিরের জগতের অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু হয়
না। পুরুষদের জীবন তাঁহাদের চেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

অতএব মহিলারা ন' মাসে ছ' মাসে যদি কোথাও কিছু দেখিতে শুনিতে যাইবার একটু সুযোগ পান, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পুরুষদের চেয়ে অধিক সুবিধা দিলে বা সমান সুবিধা দিলে খুব বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান হইবে, বা তাঁহাদিগকে প্রত্যাশ দেওয়া হইবে, মনে হয় না। যাহাতে মেয়েদের দেখিবার শুনিবার সুবিধা হয়, মধ্যঃস্বেদ পূর্ব্বোক্ত থিয়েটারে ঘবগুলির তদ্রূপ পরিবর্তন এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সাধ্যাতীত নহে।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপকতা করিতেন। পরে ঔপন্যাসিক ও নাটককার হইলেন। তাঁহার অনেক নাটক রঙ্গমঞ্চে বহুদিন ধরিয়া বারবার অভিনীত হইত। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হইল। শিক্ষা একরূপ এবং জীবনের প্রধান কাজ অতীত, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একরূপ ব্যাপারের তিনি একমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ নহেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী কলেজে শিখিয়াছিলেন প্রধানতঃ বিজ্ঞান, এবং জীবনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত রসায়নীবিদ্যার অধ্যাপকও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম থাকিবে সাহিত্যিক বলিয়া।

লালা স্মার গঙ্গারাম

লালা স্মার গঙ্গারাম পঞ্জাবের একজন বিখ্যাত লোক। সম্প্রতি বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সেখানে রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভ্যরূপে গিয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া লগুনে হিন্দুমতে হইয়াছে। তিনি বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার ও কৃষিবিৎ ছিলেন। তিনি নানা-প্রকার সংকাজে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে বিধবাদের বিবাহদান ও অল্প নানাপ্রকারে তাহাদের সাহায্য করা প্রধান। লাহোর বিধবাবিবাহ সহায়ক সভার পণ্ডিত দীননাথ সিদ্ধান্তালঙ্কার ও শ্রীমুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন :—

“তিনি একজন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের, বিশেষতঃ বিধবা ও অল্প জীলোকদিগের উন্নতিকল্পে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক ধর্ম দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা একটি। এই সভার বর্তমানে সমগ্র ভারত প্রায় ৭০০ শাখা আছে। হরিদ্বার, মথুরা ও লাহোরে ৩টি বিধবা-আশ্রম আছে। গত ১০ বৎসরের মধ্যে এই সভা হইতে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রাণী ১২ হাজারের অধিক বিধবার বিবাহ হইয়াছে। বারাগানী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে বাঙ্গালী বিধবাদের অবস্থা কিরূপ, সে বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল।

তাঁহাদের হুখে দুব করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গলার অনেক গ্যাতনামা নেতার নিকট পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাওয়ায় তিনি ১৯২৫ সালে কলিকাতার লাহোর-সভার একটি শাখা গুলেন। এই শাখা বাংলার প্রকৃত হিত করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে রাজকীয় কৃষিকমিশনের সভ্যরূপে তিনি যখন এখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের বিধবাদের হুঃখের কথা তাঁহাকে জানান হয়। তাহাদের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া স্মার গঙ্গারামের স্বর্য আর্জ হয় এবং তিনি নবদ্বীপে একটি বিধবা-আশ্রম গুলিবার জন্ত প্রতিশ্রুতি দেন। এই মহানুদ্যর্ঘ্য ব্যক্তির মৃত্যু রক্ষার জন্য আমবা বাঙালী হিন্দুদের নিকট তাঁহাদের বিধবা ভগ্নী ও কস্তাদের দুর্দশা ঘুর করিতে সাধুনর অনুরোধ করিতেছি।”

আমরা সর্ব্বাস্তঃকরণে এই অনুরোধের সমর্থন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধনা

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্যে মালয় উপদ্বীপে শ্রাম কাষোজ্জ যবদ্বীপ ও বলা দ্বীপ যাইতেছেন, তাহা পাঠকেবা অবগত আছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বন্ধনার নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে এক সভার আধিবেশন হয়। বৃহত্তর ভারত পরিষদের যে কাজ, সেরূপ কাজ করিবার সম্বন্ধ প্রথমে তাঁহারই মনে উদ্ভিত হয়;—পরিষদের ও ইনষ্টিটিউটের সভার সভাপতি অধ্যাপক যতুনাথ সরকার বলেন, যে, দশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এমন একজন শিক্ষিত যুবক জুটাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন যিনি যবদ্বীপ ও বলা দ্বীপের ভাষা শিখিয়া তথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস রচনার সাহায্য করিতে পারিবেন। অতএব পরিষদই যে তাঁহার সম্বন্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহা যথার্থোপায় কাজ হইয়াছিল। অধ্যাপক যতুনাথ সরকার তাঁহাকে বৃহত্তর ভারতের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন কার্যে পুর্বাধা বলিয়াছেন—চীনজাপানে ভ্রমণ করিয়া তিনি এই কাজের সুত্রপাত আগেই করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কার্যতঃ যাহা ছিলেন, বৃহত্তর ভারত পরিষদের সভ্যত্ব স্বীকার করিয়া নামেও সেই পুরোধা পদবী গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন।

সভার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির কপালে চন্দ্রনের ফোটা দিয়া ও মস্তকে ধাত্তকুর্বী ছুঁয়াইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন ও তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি স্তম্ভের বক্তৃতা করেন। তিনি নীচু গলায় কথা বলাতে বৃহৎ হলে তাঁহার কথা শুনা যায় নাই, সুতরাং কোন কাগজে তাঁহার বক্তৃতা বাহির হয় নাই। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখান,

কত বাঙালী ধর্মোপদেষ্টা স্বদেশের মায়া কাটাইয়া ও স্বদেশের হিতসাধনার্থ দেশে থাকিবার প্রবল কারণ সঙ্গেও তিব্বৎ মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কবির সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত পিরিজ্ঞাপ্রসন্ন লাহিড়ীও স্ববচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন। পনের শত বৎসর পূর্বে কুমারজীব চীনে গিয়া চীনভাষায় যে-সব কবিতা রচনা করেন, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাহার একটি, চীন অক্ষরে লিখিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ কবিকে উপহার দেন। অতঃপর অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ইংরেজীতে কেন বলিবেন বাংলায় তাহার কারণ দেখাইয়া, ইংরেজী বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহাতে তিনি কবিকে পূর্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনাপ্রাবৃত একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। এই বক্তৃতা ইংরেজী বহু দৈনিকে বাহির হইয়াছে। ইহার পর প্রবাসী-সম্পাদক কিছু বলিবার পর কবি অভিনন্দনের উত্তর দেন। এই উত্তর বর্তমান সংখ্যায় অত্র প্রকাশিত তল্লিখিত প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। কবির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রচলিত রীতি অনুসারে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষ্যে কয়েকটি স্তুতিস্তবিত্ত কথা বলেন। সর্বশেষে কবি বৃহত্তর ভারত পরিষদের যুবা কর্মীদিগকে স্নেহ আশীর্বাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ যাত্রা

২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়াছেন। ট্রেন ছাড়িবার আগে ও ছাড়িবামাত্র সিনেমার অত্র ছবি লওয়া হইয়াছে। ২৯শে আষাঢ় তিনি মাদ্রাজ হইতে একটি ফ্রেঞ্চ জাহাজে সিঙ্গাপুর যাইবেন। সেখানে পৌঁছিতে ছয় দিন লাগিবে। তাঁহার সঙ্গে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব-ভারতী কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ চিত্রশিল্পী সুবেন্দ্রনাথ কর এবং চিত্রবিদ্যাশিক্ষার্থী শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ যাইতেছেন। হল্যাণ্ড দেশের সঙ্গীতজ্ঞ শাস্ত্রিনিকেতন-প্রবাসী ডাঃ বাকে এবং তাঁহার পত্নী আগেই রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহারা বেঙ্গুনে নামিয়া তথাকার বিখ্যাত

প্যাগোজা (বৌদ্ধ মন্দির) প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ফিরিবার মুখে সংগীতের আনন্দ রেঙ্গুনবাসী বহুদিগকে দিবার অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

ভারতশাসনসংস্কারবিষয়ক রাজকীয় কমিশন

নানা কাগজে এইরূপ জল্পনা চলিতেছে, যে, ১৯২২ সালে ভারতশাসনসংস্কারআইন পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত যে কমিশন বলিবার কথা, তাহা তৎপূর্বে শীঘ্রই বসিবে। বিলাতের রক্ষণশীল গবন্মেণ্টের পর শ্রমিক দলের লোকেরা শাসনক্ষমতা পাইতে পারে। পাছে তাহারা ভারতবর্ষকে বেশী কিছু আত্মশাসন-ক্ষমতা দিবার উদ্দেশ্যে কমিশনে খুব জায়বান ও সমাশ্রয় সভা নিযুক্ত করে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি রক্ষণশীলেরা ১৯২২এর আগেই কমিশন বসাইবে মনে হইতেছে। উহার সভাপতি ও সভ্যবৃন্দ কাহাদের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নানা কাগজে নানা রকম মত প্রকাশিত হইতেছে। বিলাতী কতকগুলি কাগজ এই ধূম তুলে, যে, উহার সভ্য কেবল এইরূপ ইংরেজদের হওয়া উচিত, যাহারা কখনও ভারতে কাজ করে নাই কিম্বা ভারতবর্ষের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং ভারতীয় কাহাকেও ইহার সভ্য করা উচিত নয়! ভারতবর্ষের হুন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যে না-গাইয়াছে, এমন ইংরেজ খুঁজিয়া বাহির করা সোজা নয়; আর ভারতের নিমকের এমনই গুণ, যে, যে-সব ইংরেজ তাহা খায় তাহাদের অনেকেই ভারতবর্ষের (বদ্-) গুণ গায়।

রাজকীয় কমিশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী ও শাসনকার্যের উৎকর্ষবিধান। কি হইলে যে ভারতবর্ষের শাসনকার্য খুব ভাল হইতে পারে, তাহা ভারতীয়রা যেমন জানে ও বলিতে পারিবে, তেমন আর কেহ নহে। আমাদের দেশের কাজ সকলের মঙ্গলের জন্ত নির্বাহিত হওয়ায় আমাদের বতটা স্বার্থ আছে, এবং আগ্রহ থাকিবার কথা, ইংরেজদের ততটা থাকিবার কথা নহে; বিশেষতঃ যখন তাহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের মঙ্গলের বিরোধ রহিয়াছে। সেইজন্ত আমাদের বিবেচনায় কমিশনের, সব না হউক, প্রায় সব

সভাই ভারতীয় হওয়া উচিত—অবশ্য প্রকাশ ও প্রচ্ছন্ন জো-হুজুমদের বাদ দিয়া। ইংবেজরা অবশ্য বলিবে, ভারতীয়েরা নিজেদের দিকে টানিয়া কথা বলিবে অতএব তাহাদিগকে সভ্য নিযুক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু স্বদেশের দিকে ঝুঁকিয়া কথা বলাটা ত অপরাধ নয়। যদি স্বদেশের জন্ত কিছু করিতে গিয়া বিদেশীর নিজের দেশের জমী ভূগর্ভস্থ সম্পত্তি ও অস্ত্র ধন, তাহাদের নিজের দেশে তাহাদের কোন অধিকার, এই সকলে হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা দোষের বটে। কিন্তু আমরা ত তাহা করিতে যাইতেছি না।

তবে, যদি ইংরেজরা এমন একটি কমিশন চান, যাহার সভ্যদের ভারতীয়দের স্বার্থ সম্বন্ধে অহুকুলতা প্রতিকূলতা কিছুই নাই, তাহা হইলে তাহা সম্ভব কিনা বলিতে পারি না। সেক্ষেপ সভ্য পাইতে হইলে রাজনৈতিকজ্ঞানসম্পন্ন এমন একটি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য জাতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার লোকেরা বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষকে শোষণ করিতেছে না, বা করিতে চায় না, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ভারতবর্ষের পণ্যশিল্পবাণিজ্যিক অধীনতা স্থায়ী করিতে এবং সেই হেতু পরোক্ষভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাও স্থায়ী করিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিলে আমরা ইচ্ছা করিলে নিজেদের পণ্যশিল্প-বাণিজ্যিক অধীনতারও উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ অহুকুলতা-প্রতিকূলতা-বিহীন, ইংরেজের লোভভয়প্রদর্শনের প্রভাবের অতীত এইরূপ কোন জাতি থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে সমুদয় সভ্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি হইবে না।

গণিকালয় হইতে বালিকাদের উদ্ধার

হুশ্চরিত্র লোকদের জন্ত বেস্তারা নিজেদের ব্যবসা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ছোট ছোট মেয়েটিকে সংগ্রহ করে, এবং তাহারা কিছু বড় হইলে তাহাদিগকে পাপকার্যে নিযুক্ত করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক এইরূপ বালিকাদিগকে গণিকালয় হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা পুলিশের আছে, এবং পুলিশ অনেককে উদ্ধার করিয়াও থাকে। ইহা

পুলিশের লোকদের সংকাজ। কিন্তু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া কোথায় রাখা যাইবে? তাহাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন নাই, থাকিলেও তাহাদের সম্মান কেহ জানে না, সম্মান জানিলেও তাহারা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলে অভিভাবকদের গৃহে স্থান পায় না। খৃষ্টীয় মিশনারীরা তাহাদিগকে আশ্রয় ও শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে কথা উঠিবে, রাজশক্তির সাহায্যে পরোক্ষভাবে খৃষ্টীয়ানের সংখ্যা বাড়ান হইতেছে। বস্তুতঃ, ইহা ঠিকও বটে, যে, নাবালক ছেলেমেয়ে যে-ধর্মসম্প্রদায়ে জাত, নাবালক হইবার পূর্বে পর্যন্ত তাহাদের ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হইবার কোন পন্থা না-করা ভাল;— তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে নইয়া যদি ধর্মাস্তর গ্রহণ করে, সে কথা স্বতন্ত্র। তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের, গণিকালয় হইতে পুলিশ কর্তৃক আনীত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। হিন্দুসমাজ তাহা এখনও করেন নাই। জজ গ্রীভস সাহেবের চেষ্ঠায় এইরূপ বালিকাদের জন্ত একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। কিন্তু ভূতপূর্ব লর্ড লিটনের চেষ্ঠা সত্ত্বেও, তাহার জন্ত যথেষ্ট টাকা উঠে নাই। তখন লর্ড লিটন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তকে ইহার জন্ত একটি ফণ্ড খুলিতে ও তাহার নিমিত্ত টাকা সংগ্রহ করিতে বলেন। বঙ্গের বর্তমান লর্ডকে সভাপতি করিয়া সে দিন কলিকাতার টাউন হলে এই উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিদেশী রাজশক্তির কোন পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকেও এই অত্যাবশ্যক সদহুষ্ঠানের জন্ত যথেষ্ট টাকা উঠিলে হিন্দুসমাজের কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইত এবং সম্মানরক্ষা হইত। কিন্তু হিন্দুসমাজের জাগরণ না হওয়ায় তাহা যখন হয় নাই, তখন অন্ত উপায়েও কাজ উদ্ধার করিতে আপত্তি করিলে চলিবে না। এখন মেয়রের ফণ্ডে যথেষ্ট টাকা উঠিলে একটা সামাজিক অকল্যাণ বিনাশের একটি উপায় কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত হইতে পারিবে। অস্বাস্থ্য হইয়াছে, যে, কেবল কলিকাতা সহরেই দুই হাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা গণিকালয়গুলোতে আছে। তাহাদের সকলকে সংপ্রভাবের মধ্যে রাখিয়া

শিক্ষা দিতে হইলে অনেকগুলি আশ্রম চাই এবং অনেক টাকা চাই। কিন্তু বৃহত্তম ও কঠিনতম কার্য্যেবও আরম্ভ ক্ষুদ্র ভাবেই হইয়া থাকে। অস্ততঃ একটি আশ্রমও আপাততঃ স্থাপিত হইলে আশান্বিত হইতে পারা যাইবে।

আশ্রমে পালিতা ও শিক্ষিতা বালিকাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। কেহ কেহ শিক্ষা পাইয়া অবিবাহিতা থাকিয়া শিক্ষা, গুণাবলি, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজ করিতে পারে বটে। কিন্তু নরনারী উভয়ের অধিকাংশের পক্ষে যাহা সাধারণ ব্যবস্থা—বিবাহ—তাহা ইহাদের জ্ঞান না করিতে পারিলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। খৃষ্টিয়ান সমাজে ও মুসলমান সমাজে এরূপ বালিকার বিবাহে বিশেষ কোন বাধা নাই। হিন্দুসমাজে বাধা রহিয়াছে। তাহারা কোন জাতিতে মেয়ে প্রথমত তাহা ঠিক করিতে হইবে। তাহা স্থির হইলে সেই জাতিতেব পাত্র স্থির করিতে হইবে। কিন্তু এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে (caste-এর) বরকছার বিবাহ বৈধ করিবার আইন হইয়াছে; তাহারা হিন্দু থাকিয়াই বিবাহ করিতে পারে। তাহা সুসাধ্য করিবার জ্ঞান অবশ্য সামাজিক মত অনুকূল হওয়া দরকার। তাহা গঠিত করিবার জ্ঞান সমাজনেতা ও সাংবাদিকগণ চেষ্টা করুন। তাহারা প্রাচীন সংস্কৃত নাটক মুচ্ছকটিকের গল্পটি জানেন, তাহারা অবগত আছেন, যে, সমাজের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন জাতিভুক্তা নহেন অথচ শিক্ষিতা ও স্বভাবগুণে শ্রদ্ধেয়া বসন্তসেনার সহিত শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ গুরুদত্তের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং সেকালে, যখন হিন্দুবা এখনকার চেয়ে হিন্দুনায়েব অধিকতর যোগ্য ছিলেন, এইরূপ বিবাহ হইতে পারিত।

নারীরক্ষা

বাংলা দেশে যে সকল বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী ধর্ষিতা হন, এবং এখনও যেরূপ অত্যাচারের সংবাদ প্রত্যহ খবরের কাগজে দেখা যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে কলিকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আগে কি মত ছিল, তাহার পুনরুজ্জ্বল অনাবশ্যক।

গণিকালয় হইতে উদ্ধৃত বালিকাদের আশ্রমের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত টাউন হলের সভায় তাঁহার বক্তৃতায় দেখিতেছি, নারীনিগ্রহের প্রকৃত স্বরূপ এখন তিনি স্বীকার করিতেছেন, এবং তাহা দমনের জন্য হলের লার্টের সাহায্য চাহিতেছেন। মেয়র নারীধর্ষণ নরপিণ্ড-দের সশ্রম কারাদণ্ডে সন্তুষ্ট নহেন, অধিকন্তু প্রকাশ্যস্থানে তাহাদের বেজাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা চান। সশ্রম কারাদণ্ডের উপর, নারীধর্ষণকদিগের নৈতিক উন্নতিব জন্য আমরা তাহাদের ভাসেক্টমি (Vasectomy) নামক অস্ত্রচিকিৎসার সমর্থন করি। আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে আইন অনুসারে ইহার ব্যবস্থা আছে। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, টাউন হলের সভায়, ধর্ষিতা নারীদিগকে গবর্নমেন্ট হইতে টকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম।

নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি নানা প্রকার নারীনিগ্রহ মুসলমানদের দ্বারা বেশী হয় বটে; কিন্তু অনেক হিন্দুও নারীধর্ষণ করে। মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার অনেক হয়। হিন্দুর দ্বারা মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার একটিও হয় না, এমন নয়। খৃষ্টিয়ান ফিরিঙ্গী ও ইংরেজের দ্বারাও এইরূপ দুর্কার্য্য হয়। ইহা দমন করিবার জ্ঞান সকল ত্রাতির ও ধর্ম্মেব সংলোকদের সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক। সকল মুসলমান এরূপ কাজের সমর্থন করে, মনে করা ঠিক নয়। কুষ্টিয়ার কুপ্রসিদ্ধ নারীনিগ্রহব্যাপারে নারীদের রক্ষার জ্ঞান সফল চেষ্টা কোন হিন্দু করে নাই, মধু শেখ নামক একজন মুসলমান করিয়াছিল। ঢাকায় একজন হিন্দু জমিদারের পত্নীকে অত্যাচার হইতে রক্ষার জ্ঞান এক মুসলমান যুবক নিজেকে বিপন্ন করিয়া চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। নারী রক্ষার চেষ্টা অগ্রজ ও মুসলমানেরা কোথাও কোথাও করিয়াছে।

মুসলমানেরা, সম্ভব হইলে, ধর্ষিতা হিন্দুনারীকে বিবাহ করিয়া বা বিবাহ দিয়া নিজের সমাজে স্থান দেয়, এবং তাহাতে তাহাদের সংখ্যা বাড়ে, ইহা নারীধর্ষণের পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্ত লোকদের প্রলুব্ধ হইবার ও প্রেরণ পাইবার একটা কারণ। অল্প দিকে হিন্দুসমাজে ধর্ষিতা নারীরা

পরিত্যক্তা হয়। তাহাতে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার করা হয়, এবং হিন্দুর সংখ্যা কমে। এখন কোন কোন স্থলে ধর্মিতা হিন্দুনারী হিন্দুসমাজে স্থান পাইতেছে। আত্মহত্যা বা বেষ্ট্রাবৃত্তি অবলম্বন করিতে ধর্মিতা নারীদিগকে বাধ্য করা অপেক্ষা তাহাদিগকে সমাজে স্থান দেওয়া শ্রেয়ঃ ও অবশ্যকর্তব্য।

নারীনগ্ন হইতে বন্ধ করিতে হইলে হিন্দুসমাজেব অন্তঃপুরে নারীর উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। তাহার এক উপায় শিশুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়া দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারা বিবাহের পূর্বেই নারীদিগের দৈহিক ও মানসিক বশ পূর্ণ বিকশিত হইবার সুযোগ দেওয়া। তাহা হইলে তাহাদের উপর অত্যাচার কম হইবে। অত্যাচারের চেষ্টা হইলে তাহারা বাধ্য দিতে অধিক সমর্থ হইবে। অন্তঃপুরে নিগ্ৰহ যে কোন কোন স্থলে মুসলমান ও হিন্দু হুবুত্তদিগকে অন্তঃপুরিকা-দিগকে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করিবার সুযোগ দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কখন কখন যে হিন্দু অন্তঃপুরিকারা আত্মহত্যা করে, তাহার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত সে দিন বেলে মাথা পাতিয়া ছুটি বধূর আত্মহত্যার চেষ্টা; একটির মাথা কাটা গিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, অস্ত্রটি গুরুতর আঘাত পায়। হিন্দুনারী রক্ষাকার্যে খুব বেশী উৎসাহী ও পরিশ্রমী একজন প্রবীণ লোকের নিকট হইতে আমরা জানিয়াছি, যে, তিনি এমন ঘটনার বিষয় অবগত হইয়াছেন, যে, “বিধবা, এমন কি সধবা হিন্দুনারী আত্মীয়দের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় মুসলমানের সহিত ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।” মুসলমান হুবুত্তদের পক্ষে ওকালতী করিবার কথা হিন্দু সমাজের ঘাড়ে অস্ত্রায় করিয়া কলঙ্কের বোঝা চাপাইবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই। কিন্তু নারীদের মঙ্গলের জন্ত আমাদের লক্ষ্য ও কলঙ্কের কথা এই নিমিত্ত বলিতে হইতেছে, যে, হিন্দুর নিজের ঘর সামলানও দরকার; কেবল মুসলমানকে গালি দিলে চলিবে না। অন্তঃপুরে অত্যাচার মুসলমান নারীদের উপরেও হয়; কিন্তু স্থল-বিশেষে অত্যাচাৰিতা মুসলমান নারী তালাক দিয়া অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইতে পারেন; কিন্তু হিন্দু নারীর

সে উপায় নাই। নিরুপায় যে, তাহার প্রতি খুব সহস্রমুখ খুব আত্মহুগত, খুব শিষ্ট ব্যবহার করা প্রকৃত ভদ্রতা ও সাদিকতার লক্ষণ। এইজন্য নিরুপায় হিন্দু অন্তঃ-পুরিকাদের প্রতি ব্যবহার সকল দেশের সকল জাতির নারীদের প্রতি ব্যবহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত।

নারীরক্ষার জন্ত পুরুষের পৌরুষ চাই, তাহা নানা কাগজে ও বক্তৃতায় শতশতবার বলা হইয়াছে। নারীরক্ষার জন্ত নারীশক্তির পূর্ণ বিকাশ যে দরকার, তাহাও পূর্বে বলিয়াছি। তন্নিমিত্ত অবরোধ-প্রথা উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক। তাহার কতকগুলি কারণ আমরা জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ইহা ঠিক কথা, যে, বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে নারীরা জড়সড় ও আত্মরক্ষায় অসমর্থই থাকিবেন; অধিকন্তু তাহারা যে পুরুষদের লোভের জ্বিনিস এই চিন্তাটা পুরুষদের ও তাহাদের মনে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। ইহা আন্তরিক সাদিকতা ও বাহ্য সামাজিক সুনীতির অহুৎস নহে। এসব কথা বিস্তারিত ভাবে জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। পাঠকদের মনে না থাকিলে আর একবার পড়িবেন। পুনরুক্তি করিব না।

অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কমাল পাশার মত

জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে ঐ সকল কথা প্রকাশিত হইবার পর আমরা, মৃত্যুকা কমাল পাশা কেন তুরস্কে পদা ও অবগুঠন প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণগুলি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে টিট্‌বিট্‌স্ হইতে উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম। তাহা এই :—

The wearer of the veil not only feels that she is the incarnation of virtue and modesty, but that the women without the veil are immodest and indecent. The veil has become a cover for hypocrisy, which I shall tear to shreds.

The veil is insanitary. Very few Turkish women are ruddy-complexioned. Hiding their faces for centuries, they have grown sallow and palefaced.

My second reason for outlawing the veil is moral. In Anatolia our men never saw a woman outside of their own immediate families of Christian women. I have lived in the European provinces of Turkey where Turkishmen were accustomed to see a little more of women, and I have lived in

Western countries, where men see women every hour of the day.

My observation convinced me that among those three classes of men, those of our Anatolian provinces who came into very little contact with women, were by nature more sensuous.

My third charge against the veil is that it has always shielded the criminal. For years some of the most cunning criminals have issued forth, masqueraded in the commodious xai (flowing white robe worn by Turkish women), heavy veil completely hiding their identity. In the three years of the Republic's life, the law has apprehended four thousand criminals, who were operating behind a woman's veil.

Any woman apprehended wearing a veil is charged with misconduct (punishable by a fine); a second offence is considered as a misdemeanour (punishable by a fine or imprisonment, or both); and a third offence is considered a felony punishable by death—"Titbits."

তাৎপর্য। অবগুষ্ঠিতা নারী কেবল যে মনে করেন, যে, তিনি মুর্জিমতা সত্যি ও লজ্জানীলতা তাহা নহে কিন্তু ইহাও ভাবেন, যে, অনবগুষ্ঠিতা নারীরা লজ্জাহীন ও অস্তব্যা। অবগুষ্ঠন ভগ্নাবির আচরণ হইয়াছে বলিয়া আমি তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।

অবগুষ্ঠন অস্বাস্থ্যকর। তুর্ক নারীদের মধ্যে অল্পেরই মুখের রং ঘাস্থ্যের জন্য লাল টুকটুকো। বহনতাকী ধরিয়া তুর্ক নারীদের মুখ লুকান থাকার তাহারা ফ্যাক্সে এবং রান গীতবর্ণ হইয়াছে।

অবগুষ্ঠনকে বেঙ্গাইনী করিবার আমার দ্বিতীয় কারণ নৈতিক। আনাটোলিয়াতে আমাদের পুরুষেরা তাহাদের অব্যবহিত প্রতিবেশী খৃষ্টীয়ান পরিবারের মধ্যে ছাড়া খ্রীলোক কখন দেখে না [অবগুষ্ঠন আমাদের পরিবার ছাড়া]। তুরস্কের যে-সব ইউরোপীয় প্রদেশে তুর্ক পুরুষেরা আরও একটু বেশী খ্রীলোক দেখিতে অভ্যস্ত, তথায় আমি বাস করিয়াছি। এবং পাশ্চাত্য দেশেও আমি বাস করিয়াছি যেখানে পুরুষেরা প্রত্যহ অতি ঘণ্টার খ্রীলোক দেখে।

আমার পর্যবেক্ষণ আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, যে, উক্ত তিন শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যে আমাদের আনাটোলিয়া প্রদেশের পুরুষেরা, বাহারা খ্রীলোকদের সংস্পর্শে খুব কম আসে, তাহারা ই স্বাভাবিক অধিকতর ইল্লিয়ত্ব-পরতর।

অবগুষ্ঠনের বিরুদ্ধে আমার তৃতীয় অভিযোগ, ইহা, আইনজোহী অপরাধবিগকে প্রেরণ ও শাস্তি হইতে রক্ষা করে। বহু বৎসর ধরিয়া তুরস্ক বন্দারসমূহের অনেকে হবিধাননক তুর্ক নারীদের স্বেতপরিচ্ছদ পরিধা অবগুষ্ঠনে আশ্রয়পাণ করিয়া দুর্ভিক্ষের জন্য বিচরণ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ-নাশারপন্থেব তিন বৎসরের জীবনের মধ্যে আইন চারি হাজার দুদমারসকে প্রেরণ করিয়াছে বাহারা নারীর অবগুষ্ঠনে চমকবেশী হইয়া কঁক করিত।

কোন নারী অবগুষ্ঠন ব্যবহারে দৃঢ় হইলে অভিমানার দ্বারা দণ্ডিত অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এই দ্বিতীয় অপরাধ করিলে জরিমানা বা কারাদণ্ড, বা উভয়ই হয়। তৃতীয়বার এক্স অপরাধ করিলে মৃত্যুদণ্ড হয়।

তুরস্কে একরূপ কড়া আইন কেন হইয়াছে, তাহা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি কবিতেনা পারিলেও এবং তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে না পারিলেও, অবরোধ ও অবগুষ্ঠন যে

তুরস্কের খুব অনিষ্ট কবিয়াছে, ইহা ঠিক, নতুবা কমালা পাশা এত কঠোর হইতেন না, তাহা বুঝিতে পারি।

অবগুষ্ঠনের সাহায্যে এদেশেও বন্দারসমূহের দুর্ভিক্ষ করে কি না, তাহা আমাদের এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলাম যিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে পুলিশ-ইন্স্পেক্টর জেনারেলের বিশ্বস্ত কেরানী ছিলেন। তিনি বলিলেন, একরূপ অপরোধ-অনেক হয় ও কিছু ধরা পড়ে।

বাংলার রাজস্বে বাংলার অংশ

আমরা কয়েক বৎসর হইতে মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে দেখাইয়া আসিতেছি, যে, বাংলার লোকসংখ্যা ও আদায়ী রাজস্ব বেশী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা গবর্নমেন্টকে সরকারী খরচের জন্য বড় বড় সব প্রদেশের চেয়ে কম টাকা রাখিতে দেওয়া হয়। বর্তমান সংখ্যাতেও এক প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা ছাপা হইয়া গিয়াছে। আজ ২৯ শে আষাঢ়ের কাগজে দেখিতেছি, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাজনসভার পক্ষ হইতে বঙ্গের লাটকে অন্ত্যস্ত কথার মধ্যে এই রূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং লাটসাহেব তাহার উত্তরে বলেন:—

There is, I think, general agreement that Bengal has cause for complaint of the financial settlement arrived at under what is known as the Meston Award. As regards finance the experience of this Presidency during the years of the Reforms has more and more demonstrated that it is impossible to be content with a theoretical demarcation of spheres of taxation, provincial and central. Practical working has shown that for the proper administration of this Industrial Province some share of the revenues now allotted to central finance must be allocated to the Province.

তাৎপর্য। মেষ্টন বিলি নামে পরিচিত আর্থিক বন্টনবস্ত্তে যে বঙ্গের অভিযোগের কারণ আছে, সে বিষয়ে, আমি মনে করি, সাধারণ ঐকমত্য আছে। আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাসনসংস্থার আইনের কয় বৎসরে বঙ্গের এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যে, রাজস্বের কোন কোন বাবদ প্রাদেশিক আর কোন গুলাই বা সমগ্রভারতীয় হইবে, ওষিষয়ে কোন রকম একটা মতবাদ অনুযায়ী পার্থক্যের কথা টানিয়া সন্তুষ্ট থাকি অসম্ভব। কার্যলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে, যে, পশাশিল্পের অল্পতম কেন্দ্রে এই প্রদেশের কার্যনির্বাহী যথাযোগ্য ভাবে করিতে হইলে, ভারত-গবর্নমেন্টকে যে যে বাবদের রাজস্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতক অংশ এই প্রদেশকে দিতে হইবে।

মেস্ট্রন বিলিতে বন্ধের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, সে বিষয়ে যদি সাধারণ ঐকমত্য বাস্তবিকই থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার কেন হয় নাই, জানিতে কৌতুহল হয়।

ভূনা যায়, বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী আইন দ্বারা নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিবেন। তিনি বাংলা হইতে সংগৃহীত বাংলার রাজস্বের আয়া ভাগ পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা, জানিতে ইচ্ছা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমানপরীক্ষার্থী

কোন কোন মুসলমান কাগজে এইরূপ অভিযোগ দেখা যায়, যে, মুসলমান বলিয়াই কোন কোন পরীক্ষার্থীকে কম নম্বর দেওয়া হইয়াছে, বা অন্য প্রকার অবিচার হইয়াছে। পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার কখন হইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু মুসলমান বলিয়াই অবিচারের কথা ধাঁহার বলেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের মুসলমানদের প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধভাব থাকিলে মুসলমান পরীক্ষার্থী (যেমন হুমায়ুন কবীর) বা মুসলমান পরীক্ষার্থিনী (যেমন হাবলুলমতীন-সম্পাদকের কন্যা) কোনও পরীক্ষায় প্রথম স্থান কি প্রকারে অধিকার করিতে পারিয়াছেন।

চাকরীর ভাগ

কতকগুলি উচ্চ চাকরী পাইতে হইলে হিন্দুদিগকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু মুসলমান, ফিরঙ্গী ও ইউরোপীয়দিগকে তাহা দিতে হইবে না। মুসলমানেরা বিনা পরীক্ষায় “ন্যূনতম যথেষ্ট” যোগ্যতা থাকিলেই শতকরা ৫৫টি চাকরী পাইবে। বলা বাহুল্য, আমরা তাঁহার বিরোধী। সকল ধর্মের লোকদের নিয়োগ সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক হইলে, যত ভাল কর্মচারী পাওয়া যাইত, এই ব্যবস্থায় তাহা পাওয়া যাইবে না; সুতরাং সরকারী কাজ যতটা ভাল করিয়া চালান সম্ভব,

তাহা হইবে না। অধিকন্তু অনেক খুব যোগ্য লোক, মুসলমান ফিরঙ্গী বা ইউরোপীয় নহে বলিয়া কাজ পাইবে না। ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, তোমরা মুসলমান হও কিম্বা নাম ভাঁড়াইয়া বিদেশী নাম লইয়া ফিরঙ্গী সাজ।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইলে মুসলমানেরা চাকরী পাইবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের যে অপমানটা নিহিত রহিয়াছে, তাহা মুসলমান নেতারা মাথা পাতিয়া লইতেছেন—কারণ, “পেটে থেলে পিঠে সয়”। কিন্তু আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অল্পসারে কোন সংপরামর্শ দিলে তাঁহারা তাহা দুর্ভাগ্যবশত মনে করিবেন। কিন্তু তাঁহারা নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য এই নিয়ম করাইতে পারেন না কি, যে, মুসলমানেরা যতগুলি চাকরী পাইবেন, তাহা কেবল মাত্র মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফল অল্পসারে দেওয়া হইবে? তাহা হইলে অন্ততঃ যোগ্যতম মুসলমান যুবকরা কাজ পাইবেন, তাঁহাদের আত্মসম্মানবোধ বাড়িবে, এবং খোসামোদ ও মোসাম্বেবী কিছু কমিবে।

জর্জ বার্নার্ড শ ও ভারতীয় সভ্যতা

জর্জ বার্নার্ড শ’র ভারতীয় সভ্যতার উপর মন্তব্য প্রকাশে এদেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদপত্রের দল এই সুযোগে শ’র মত তাঁহাদের স্বপক্ষে “নজীর” বলিয়া নৃত্য করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা ইত্যাদি কখনো ছিল না, এখনো নাই। এদেশীয়েরা ত অনেকে খুবই স্কন্ধ হইয়াছেন।

অন্যদেশে এপ্রকার মতামতের বিচার হয়, যাহার মত, তাহার সেবিষয়ে অধিকার এবং জ্ঞান কতটা আছে তাহার যাচাই করিয়া। অশ্রদ্ধের বিষয় এদেশে সেরূপ প্রথা কিছুই নাই। এখানে যে কোন বিষয়ে একজন লোক বড় হইলেই তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ইহা মানিয়া লওয়া হয়—বোধ হয় ইহা সিভিল সার্কিস-রূপ সর্ববিদ্যা-বিশারদ-মণ্ডলীর প্রভাবে।

জর্জ বার্নার্ড শ বর্তমানে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা ইহা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু তিনি মনে যাহা ভাবেন তাহাই মুখে ব্যক্ত করেন, এক্ষণে ভাবিবার কোনও কারণ এ পর্যন্ত দেন নাই। ন্যায়-বিচার ও সত্যবাদিত্বের দোষ তাঁহাকে স্পর্শায় নাই। তাঁহারই এক নাটকের নামক এক জায়গায় বলিয়াছেন, “Who am I, that I should be just?” “আমি আবার কি এমন মহাত্মা যে আমার ন্যায়-বিচার করিতে হইবে?” ইহা বোধ হয় শ’ মহাশয়ের জীবনের মূলমন্ত্র। তবে তিনি যাহা বলেন অতি স্পষ্টভাবেই বলেন এবং তাঁহার আর এক নামকের মতও “I never retract,” “আমি কথা ফিরাইয়া লইনা”—মানিয়া চলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কতটা, তাহার পরিচয় এই সংখ্যায় অন্য প্রবন্ধে আছে। কিন্তু কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে যে, গণবিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার একথা শ’ কখনো স্বীকার করেন নাই এবং ভারত সম্পর্কে অন্য অনেক মহাশয়ও মানেন না।

শ’ নিজের দেশের লোকদের বিচারে কি তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পাইবে—

তাঁহার এক বন্ধু (Sir James Barrie কিংবা Charles Frohmann) দীর্ঘ দশ বৎসর আমেরিকা প্রবাসের পর ইংলণ্ডে ফিরেন। সেই উপলক্ষে Sir F. Carruthers Gould (প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী) ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে এক ব্যঙ্গচিত্র দেন। চিত্রে শ’ মাথা নীচে পা উপরে করিয়া রহিয়াছেন (standing on his head) এবং পাশে তাঁহার বন্ধু স্তম্ভিত ও চুঃখিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। চিত্রের নীচে লেখা—was shocked to see the dear fellow still in the same position as he was when he left,—অর্থাৎ তাঁহার বন্ধু, শ’কে দশ বৎসর পূর্বে প্রবাসে যাইবার সময়, যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া সেই অবস্থাতেই দেখিয়া স্তম্ভিত ও মর্মান্বিত হইয়াছেন। ইহাই বোধ হয় শ’র প্রকৃত পরিচয়।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চাকরীর ভাগ

মুসলমানেরা সমগ্র বঙ্গে মোট সংখ্যায় বেশী বলিয়া,

কলিকাতায় খুব কম ও পশ্চিম বঙ্গে কম হইয়াও, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শত করা ৪০টি কাজ চান, এবং যত দিন ঐ অল্পপাত না হয় তত দিন তার চেয়ে বেশী চান। এই নীতি অনুসারে, তাহা হইলে, বঙ্গের কোন গ্রাম নগর জেলাতেই অমুসলমানরা সংখ্যায় খুব বেশী এবং যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হইলেও গ্রামাভ্যাসী চাকরী পাইবে না।

এই নীতিটা আর একটু ব্যাপক করা যাইতে পারে। বাংলা দেশের কয়েকটা জেলায় মুসলমানেরা বেশী বলিয়া যদি অল্প সব জেলা ও নগরে তাহারা বেশী বেশী চাকরী পাইবার অধিকারী হয়, তাহা হইলে বাংলা প্রদেশে তাহারা সংখ্যায় বেশী বলিয়া অল্প সব প্রদেশে কেন বেশী বেশী চাকরী পাইবে না? অতএব এই নিয়ম ঠিক, যে, ভারতবর্ষের সর্বত্র বিনা পরীক্ষায় মুসলমানরা অল্পতঃ অল্পতঃ চাকরী পাইবে।

বঙ্গের মুসলমান নেতারা রসিকতা বর্জিত নহেন। তাঁহারা মিউনিসিপালিটির মেথর কাডুদার প্রভৃতি কাজের শত করা ৪০টি ৫০টি চান না; এই একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু অল্প বেতনের কাজগুলি তাঁহারা সদাশয়তা পূর্বক অমুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত। তাহারা বাঞ্ছা কিন্তু বেশী বেতনের কাজগুলিতে ভাল রকম অংশ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিবাহ।

পুনায় মালিনীবাঈ পনগৌকরের সহিত গুলাব খানের বিবাহ হওয়ায় মহারাষ্ট্রে খুব আন্দোলন, কাগজে লেখা-লেখি গালাগালি, বৃহৎ প্রতিবাদ-সভা ইত্যাদি হইতেছে। তাহার চেউ বাংলা দেশেও পৌছিয়াছে। এই বিষয়টির আলোচনা করিতে হইলে কয়েকটি তথ্য জানা দরকার। মালিনীবাঈর মাতা স্বর্গীয় স্মার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগুরকরের কন্যা ছিলেন, বিধবা হইবার পর পুনর্বিবাহিতা হন। মালিনীবাঈ এই পুনর্বিবাহের অন্যতম সন্তান। স্বর্গীয় ভাগুরকর মহাশয় প্রাণনা-সমাজের নেতা ছিলেন, সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন না; জাতি মানিতেন না। মালিনীবাঈ বোধাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-টি। তাঁহার বৎস প্রায় ত্রিশ বৎসর; শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। গুলাব খা

বোম্বাইয়ের বি-এ ও বি-টি। তিনিও শিক্ষকের কাজ করেন; বয়স মালিনীবাঈ অপেক্ষা বছর দশ বেশী। বিবাহ গোপনে হয় নাই, হঠাৎ হয় নাই; ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে প্রকাশ্য নোটিস্ দিয়া রেজিষ্টারী করিয়া হইয়াছে। মালিনীবাঈ মুসলমান হইতে দূততার সহিত অস্বীকার করেন। তাঁহাকে ও গুলাব খানকে, তিন আইন অনুসারে, মুদ্রিত এই উক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে, যে, তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মে বিশ্বাসী নহেন। অতএব কোন ধর্মাহুষ্ঠান দ্বারাও ইহাদের বিবাহ হয় নাই। কেবল রেজিষ্টার দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে হিন্দুমুসলমান বিবাহ বলা যায় না। গত মার্চ মাসে দিল্লীতে বোম্বাই হিন্দুসভার ত্রিযুক্ত জয়কর প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে কার্য্যকর একতার জন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হওয়া দরকার।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের মত এই, যে, যাহাদের ধর্মমত বাস্তবিক আলাদা, যাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা রীতিনীতি চালচলন শিক্ষা দীক্ষা আলাদা তাহাদের মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। তাহার কারণ, এরূপ বিবাহে দৈনন্দিন ষিটিমিটিতে অসম্মত ঘটবার খুব সম্ভাবনা থাকে, এবং সম্ভানদের শিক্ষা দীক্ষা চালচলন চরিত্র গঠন কিরূপ হইবে তাহা একটা সমস্যা হইয়া পড়ায়। কিন্তু কোনও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী ও পুরুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়জাত হইয়াও বিবাহ করিতে চান, তাহা হইলে তাহা আইন-সিদ্ধ করিয়া নিরূপিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

ধর্মবিষয়ক নিন্দাকুৎসা

পঞ্জাবের মুসলমানরা যে ভাবে জঙ্গ দলীপ সিংহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছেন, তাহা আমরা অত্যন্ত ও অনাবশ্যক মনে করি। জঙ্গ স্বয়ং খৃষ্টিয়ান; হিন্দু বা শিখ নহেন। তিনি “রঙ্গীলা রঙ্গল” বহি খানা (যাহাতে মহম্মদের কুৎসা ছিল) খুব খারাপই বলিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই কারণে উহার লেখককে আপীলে খালাস দিয়াছিলেন, যে, যে-দ্বারা অনুসারে তাহার সাজা হইয়াছে,

তাহা তাহার প্রতি খাটে না। অতএব, মুসলমানরা তাঁহার পদচ্যুতি প্রভৃতির জন্য আন্দোলন না করিয়া কেবল এইরূপ ভাবে আইন পরিবর্তনের দাবী করিতে পারিতেন, যেন রঙ্গীলা রঙ্গলের মত বহি লেখা দণ্ডনীয় হয়।

কোন ধর্মপ্রবর্তক কেন, কোন ব্যক্তিরই কুৎসা করিয়া কিছু লিখিয়া ছাপান উচিত নহে। কিন্তু মৃত ধর্মোপদেশীদের কুৎসা নিবারণ জন্য আইন করিতে হইলে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে সংযত ও গভীর ভাবে ধর্মমতের, ধর্মশাস্ত্রের ও ধর্ম-প্রবর্তক প্রভৃতির চরিত্রের আলোচনা চলিতে পাবে। ইহা মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্য আবশ্যক। পঞ্জাবে আন্দোলনের মুখে মুসলমানরা যে শ্রবণ করিতেছেন ও করাইতেছেন, যে, তাঁহাদের শত্রু অনুসারে মহম্মদেব নিন্দাকারীর প্রাণবধ করা উচিত, ইহাতে বিপদ আছে। শুধু বিপদ নয়, এই ব্যবস্থা আমরা যুক্তিসঙ্গত ও আধুনিক জগতের উপযুক্ত মনে করি না। ঈশ্বর সকল ধর্মপ্রবর্তকের চেয়ে বড়। কাহারও নিন্দাকারীর প্রাণদণ্ড বিষয়ে হইলে, ঈশ্বরনিষ্ঠদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আগেই ঈশ্বর স্বাভাবিক নিয়মামুসারে করিতেন। কিন্তু অতীত কাল হইতে এপর্য্যন্ত যত নাস্তিকের জন্ম হইয়াছে, কেহই নাস্তিক্য প্রকাশ বা প্রচার করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই।

কথিত আছে, এলাহাবাদে স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বহুর মাতা খৃষ্টিয়ান্ মিশন স্কুলের হিন্দু বালিকাদিগকে,

“তোদের কৃষ্ণ চোর কৃষ্ণ ননী চুরী করে,

মোদের খুঁটে বিস্তৃষ্ট ভবের জাগ তরে।”

এই কবিতা স্মরণ করিয়া আবৃত্তি করিতে শুনিয়া পুত্রকে হিন্দু বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলিয়া-ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে দেবনিন্দকদের প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলে ও তদনুসারে কাজ হইলে বহু খৃষ্টীয় মিশনারীর প্রাণ যাইত। সুতরাং বিষয়, [যে, ওরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তাহা না থাকায় হিন্দুদেব উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় নাই। “তোমরা যে গোবর পূজা কর, আমরা তাহাকে ভোজন করি,” পাদরী বিশেষের এরূপ বক্তৃতা শুনিয়া হিন্দুরা হাসিয়াছে, তাহার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করে নাই।

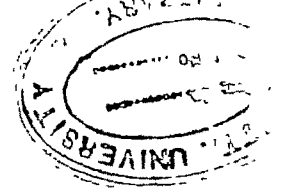


কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী
শিল্পী শ্রী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহানেন লভ্যঃ”



২৭শ ভাগ

১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৪

৫ম সংখ্যা

আহ্বান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার তরে পথের পরে কোথায় তুমি থাকো
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে ।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখো
আমার লাগি নিছতে একধারে ।
বাতাস বেয়ে ইসারা পেয়ে গেছি মিলন আশে
শিশির-ধোওয়া আলোতে ছোঁওয়া শিউলি-ছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলী-কল ভাবে
অধীরধারা নদীর পারে পারে ।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে সেথায় সারা বেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে ॥
কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাকো,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরী ।
সরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলিনাকো,
দ্বিধার ভরে ছুয়ারে করি দেরি ।

ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
 আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে;
 আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেই খানে
 বন্দী যেথা কাঁদেছে কারাগারে ।'
 পাষাণ ভিৎ টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি'
 ধূলায় চাপা অনলশিখা কাঁপায় তোলে মাটি;
 নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি';
 সেধায় ভেরী বাজাও বারে বারে ॥

আখ্যায়িক জাহাজ

সিঙাপুর বন্দর

৪শ্রাবণ, ১৩৩৪

আলাপ-আলোচনা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে নানা প্রসঙ্গে যে-সকল আলাপ হ'য়েছিল তিনি তা লিপিবদ্ধ ক'রে আমাকে দেখতে দিয়েছেন। একজনের কথা শুনে আর-একজনের যে-ধারণা হয় তার মধ্যে ছুই মনের কাজ—যে-লোক বলে এবং যে-লোক সেটা শুনে লেখে। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের মতোই এই সাহিত্যিক যৌগিক পদার্থেও মূল উপাদানের বিশুদ্ধ পরিচয় পাওয়া স্বভাবতই কঠিন। কেননা যে মন শুনে সে কোনোগ্রাফের লেখ্য ফলকের মত অনাস্রা অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল নয়। সেও প্রতিক্ষণে নিজের কথা কইচে, তার নিজের ভাবকে কাস্ত রাখা তার সাধ্য নয়। এই জন্য ইন্টারভিউ জাতীয় ব্যাপারে যে-ইতিহাস পাওয়া যায় সে ধারণার ইতিহাস, তাকে মূল বাণীর ইতিহাস ঠিকমত বলা যায় না।

আমরা যাকে স্মৃতি বলি সে আমাদের মনের একটি রচনা। স্মরণের বিষয়টা তার একটি উপকরণ মাত্র। জনশ্রুতির দ্বারা মানুষের যে-ইতিহাস-নিত্যই পড়ে উঠে তার মধ্যে প্রভূত পরিমাণেই থাকে এই ব্যক্তিগত রচনা। আমি মানুষটা সম্বন্ধে যে-ধারণা সংসারে প্রত্যহ প্রচলিত হচ্ছে বহু লোকের রচনার দ্বারা সেটা সৃষ্ট—বহুত অন্তর্য্য কাছে আমি-পদার্থের পরিচয় অত্যন্ত মিশ্রিত সামগ্রী।

কোন মুদ্রিত লেখার শেষ প্রকৃ দেখা হ'য়ে যাবার পরেও ছাপবার সময় কখনো কখনো অক্ষর উঠে যায়, তখন মুদ্রাকর সেই অক্ষরটা যেখানে ফাঁক পাও গুঁজে দেয়। সে যে ভুল করচে তা জানে না, তাতে একটা শব্দ আর-একটা হ'য়ে ওঠে। আমাদের স্মৃতি-মুদ্রাকর সর্বদাই এই কাজ করচে, গোলেমালে যে-অক্ষরটা উঠে যায় সে তাকে যেখানে সেখানে বসিয়ে দেয়। তাতে ফাঁকটা বোঝে কিন্তু কেবলি এক আর হ'য়ে ওঠে।

ঘটনার চেয়ে বাক্য সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ভাষার বিশেষত্ব আছে। আমাদের নিজের ভাববার বিশেষত্ব অল্পসারেই সেই ভাষার গড়ন তৈরি হয়। আর-একজনের চিন্তাকে সেই ভাষার মধ্যে প্যাক্ করতে গেলে তার চিন্তার গড়ন ঠিক থাকে না। কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, চিন্তার বস্তু-টাই আসল, তার গড়নটা কিছু নয়, আমি তা একেবারেই মনে করি না। চিন্তার প্রধান প্রকাশ চিন্তার আকৃতি দ্বারা। সকল সম্ভাব্য পদার্থই আপনাদের আকৃতি-ক্ষেত্রেই আপনাদের পরিচয় দিয়ে থাকে। সেই আকৃতি কেবল বাহ্যিক নয়, তার একটা আভ্যন্তরিক দিক আছে। অর্থাৎ আমি যে-সব চিন্তা প্রকাশ করি তার চেহারা কেবল যে ভাষায় তা নয়, তার প্রকৃতিগত স্বরূপের মধ্যেও। অর্থাৎ, আমার চিন্তা যে-ভাবে ঝাঁক দেয়, তার যে-সব ইসারা ইঙ্গিত, তাবকে সহজে সে ঘেরকম ক'রে সাজায় সেটার দ্বারা সে একটা আন্তরিক রূপ পায়। এই ছয়ের যোগে তবে ভাব যথার্থ প্রকাশ হ'য়ে থাকে। স্মৃতি থেকে আমার বাহ্য মুক্তি আকৃতি গেলে অল্প পরিমাণেও আমার নাক-চোখের এদিক-ওদিক হ'য়ে গেলেই সেটাকে আর আমার চেহারা বল্‌বাব জ্ঞো থাকে না। চিন্তারও তেমনি অতি অল্প বদলেও তার এমনি গভীর রদল ঘটে যে, কেবল মাত্র বস্তু-বিচার ক'বে তার নীচে, আর নিজের নাম সেই ক'রে দেওয়া চলে না।

অনেক আলাপের প্রসঙ্গ আছে যার গুরুত্ব তেমন নেই; যার বিষয়টা মোটামুটিই কোন একবাক্যে ব্যক্ত হ'লেই চলে, এমনকি যার সম্বন্ধে ভুল কবলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু যে আলাপটির ভূমিকা লিখছি সেটা তেমন জ্ঞাতের নয়। এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে লোকেব মতামত প্রবল, সেইজন্তেই যেটা বলছি সেটাকে ঠিকমত শোনার পক্ষে লোকেব মনের মধ্যেই বাধা আছে। এই কারণে, এই বিষয়টা যে-মাত্র চিন্তা করেছে সেই মাত্রই নিজের ভাষায় সেটা ব্যক্ত কবলে বিপদ কিছু পরিমাণে বাঁচে।

দিলীপকুমারের একটি মস্ত গুণ আছে, তিনি শুনতে চান, এইজন্তেই শোনার জিনিষ তিনি টেনে আনতে

পারেন। শুনতে চাওয়াটা অকস্মিক পদার্থ নয়, সেটা সাক্ষ্যক। তার একটা নিজের শক্তি আছে, বল্‌বার শক্তিকে সে উদ্বোধিত করে। যে-মাত্র বললে তার পক্ষে সে বড় কম স্বেচ্ছা নয়। কেননা, বলার দ্বারাই আপন মনের সঙ্গে আমাদের সত্যকাব পরিচয় হয়। দিলীপ-কুমার অনেক সময়ে আমাকে এই আশ্র-চিন্তা আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছেন। যখন তাঁকে কথা শুনিযেচি তখন বস্তুত সে-কথা আপনাই শুনেচি। বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে ঘরে ব'সে প্রবন্ধ লেখবার সময় এই ব্যক্তিগত আস্থানের দাবীটা স্পষ্ট ক'রে থাকে না ব'লেই সব কথা বলা হয় না এবং বলা হয়নি ব'লে নিজেই জানতে পারিনে। এইজন্ত দিলীপ যখন আমাকে কথা কহিয়েচেন তখন শ্রোতা-রূপে আমার নিজের কাজ হ'য়ে গেছে। আজ তিনি এইটেকে অস্ত্রের প্রতিগোচর করতে চান। এইখানে আমি উদ্বিগ্ন। নিজের কথা আমি নিজে ঘেরকম শুনেচি লেখায় সেটা আর একরকম শুনচি। আমার রচনারীতি থেকে দিলীপকুমারের রচনারীতি স্বতন্ত্র প্রকারের ব'লেই যে সেটা ঘটছে তা নয়—স্মৃতি জিনিষটা সম্ভাব্য সচল ব'লেই স্বভাবতই বাণীর বিপর্যয় ঘটে। বস্তুত আমাদের স্মৃতির অনেকটা অংশই বিস্মৃতি। মন আপন শক্তিকে ভারাক্রান্ত করতে অনিচ্ছুক, কেবলি তাকে চলতে হয় ব'লেই ফেলতে হয়। তাতে মোটামুটি সংসারের কাজ ভালই চলে, কিন্তু প্রতিলিখনের কাজটার সঙ্গে মনের এই অভ্যাস ভাল নয়।

এই কথা ভেবে নিজের কথা আবার নিজেকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। সেদিন ঠিক যে কথাগুলি বলেছিলুম তাকে অমূল্যবিত্ত করা শক্ত। একেতো মনে নেই, দ্বিতীয়তঃ কথাগুলি যে-পরিবেষ্টনেন মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সেই পরিবেষ্টনটি শুদ্ধ ভাষায় তুলে দিতে যে সময়ের দরকার তা আমার হাতে একেবারেই নেই।

সমাজে নারীশক্তির প্রভাব

৪ঠা এপ্রিল ১৯২৬ সাল। ফাল্গুনের সন্ধ্যা।

একটু চুপ ক'রে থেকে কবি আমাকে বল্লেন—

“পূর্ববঙ্গে এবার আগরতলা থেকে তোমায় সেদিন

যে চিঠিখানি লিখেছিলাম সে চিঠিটা লেখবার সময়ে আমার চিন্তার নানান ফাঁক দিয়ে বসন্ত-প্রকৃতির নানান ইসারা আমার চিন্তকে কি রকম ঘরছাড়া করুবার চক্রান্ত করেছিল, সে আর কি বলব।* আমি বললাম, “আপনার লেখার প্রতিছব্দে বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গীত আপনার কতখানি প্রিয়। আপনার একটি প্রবন্ধে আপনি আক্ষেপ করেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে নাগরিক জীবনের বিচ্ছেদ ক্রমেই গভীর হ’বার উপক্রম করছে।† এ আক্ষেপে আপনার চরিত্রের এই দিকটা বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে।”

কবি বললেন, “মনের যে দুর্গম গহনে তার আত্ম-বিশ্বত বাণী ছায়াপথে বিচরণ করে নিভৃত প্রকৃতির ডাক সেইখানে পৌঁছে তাকে উত্তলা ক’রে বের ক’রে আনে। এক কালে দিনের পর দিন আমার এমনি ক’রে কেটেচে। পঞ্চভূত, গল্পগুচ্ছ, চিরকুমার-সভা প্রভৃতি যখন লিখি তখন সেইরকম ধ্যানাবিষ্ট মন নিয়ে আমি নৌকাবক্ষে একান্ত একলা দীর্ঘকাল কাটিয়েছি। সকাল-বেলা আমাব একটি স্বপ্নভাষা বুড়ো চাকর, তার নাম ছিল ফটিক, আমার টেবিলের উপর কেবল একবাটি ডালের যুষ রেখে যেত। সমস্ত দিন, সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত সেই আমার একমাত্র খাওয়া ছিল। মনটা পাকযজ্ঞে দাবী থেকে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়ে কেবল লেখার কাজই ক’রে যেত।” আমি বললাম, “মাঝে কিছু খেতেন না?”

কবি বললেন, “না; একেবারে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে পতঙ্গের অনাহুত প্রবেশের উৎপাত থেকে ভোজনটাকে নিকৃষ্টপ্রব করুবার জন্তে মস্ত একটা জালের মশারির মধ্যে লুচি জাতীয় খাবারে প্রবৃত্ত হ’তাম। তখন ছিলাম

নিরামিষাশী। তাই চন্দ্রনাথ বহু মহাশয় যখন নিরামিষ খাণ্ডের আধ্যাত্মিক বাখ্যা নিয়ে আমার মতে অভ্যাস্তি কবেছিলেন আমি নিকাম ভাবে তার প্রতিবাদ করুতে পেরেছিলাম। কৌতূকের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, চন্দ্রনাথ-বাবু তখন আমিষ খেতেন।”

আমি বললাম, “এতে আপনার শরীর খারাপ হ’ত না?”

কবি বললেন, “আমার শরীরের উপর তখন আমার একটা আশ্চর্য জোর ছিল। মনে হ’ত শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। টাকা যে আছে সেটা প্রমাণ করুবার জন্তে টাকা উড়িয়ে দেবার বুদ্ধি একে বলে। খনীর পক্ষে দেউলে হওয়া সহজ।”

আমি বললাম, “কি রকম?”

কবি বললেন, “এই দেহটাকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি, কারণ বিধাতা আমাকে যে শরীর দিয়েছিলেন সে শরীর অত্যাচারে কাবু হ’তে জানত না। ব’লেই তার বিপদ ঘটল। যে-শরীর কথায় কথায় ট্রাইক্ করে, তারি মাইনে বাড়ি, খাটুনি কমে, সে আদর পায় বেশী। প্রকৃতি এবিষয়ে কেমন জানো? অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতন, দাবী আদায় করুতে দেবী করে, কিন্তু হিসাব রাখতে ভোলে না। যখন যৌবনে দেহটাকে নানা প্রকারে উপেক্ষা করি, তার উপরে অগ্রায় দায় চাপাতে থাকি, প্রকৃতি শ্রিত-হাস্যে তখন ধার দিয়ে যেতে থাকেন; বৃদ্ধিতে দেন না একদিন দেনা বন্ধ ক’রে পাওনায় লাগবেন। অবশেষে কাবুলিওয়ালার মতো লাঠি নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে যখন দরজায় ঘা দিতে সুরু করেন তখন হঠাৎ দেখা যায় সূদটা আসলকে ছাড়িয়ে গেছে।”

আমরা হেসে উঠলাম। খানিক একথা সেকথা পর কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের উচ্চাস-প্রবণতা কি ক’মে আসে? না বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের সুসত্তার সম্পর্ক আদায় কাঁচ-কলায়?”

কবি বললেন, “যাদের ভাঁড়টা কাঁচা চুইয়ে চুইয়ে তাঁদের বুদ্ধিও কমে আবেগও কমে। কিন্তু যাদের আধারে

* চিঠিটির তারিখ ছিল ১২ই কান্তন ১৩৩২। তাতে একস্থলে ছিল, “নিরতিশর ক্লাস্তির সময়ে এখানে নির্জন কুঞ্জবনে বসন্তের প্রথম সমাগমের রসাবেশ আমার সমস্ত দেহ-মনকে আবিষ্ট করেছে। উল্লাসের প্রাচুর্য যখন থাকে তখন স্বরচিত কর্তব্যের কারখানা-ঘরে নানা প্রকার কেজো। সঙ্কল্পের ঢালাই-পেটাই নিয়ে ব্যস্ত হ’য়ে থাকি, শেষকালে রিস্ত মনটা যখন কারবার বন্ধ করুতে বাধ্য হয়, তখনই প্রকৃতির দ্বাবে আতিথ্য নেবার সুসময় আসে। আজ দেই মোহিনীর হাতে সহজেই ধরা দিয়েছি; ঠিক হ’রে বলতে পারছি, “শিশুকাল হ’তে তোমাকে আমাকে পরাণে পরাণে লেহা।”

† “বর্ধারস্ত” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দোষ নেই তাদের আবেগের সঞ্চয়টা ক্ষয় হয় না, হয়তো বয়সেব সঙ্গে তার ব্যবহারটা ক'মে আসে।”

আমি বললাম, “কি রকম?”

কবি বললেন, “শিশুর প্রধান কাজ হ'চ্ছে বাহ্য বস্তু সহজে ধারণা সক্ষম করা। বিচার ক'বে অর্জন করা তার কাজ নয়। আবেগের চঞ্চলতা তার মনকে জ্ঞান্‌বার বিষয়ের উপরে আছড়ে আছড়ে ফেলতে থাকে। যে-সব জানা কেবল মাত্র বোধ-পটের ছাপ, যাকে বলে ইম্প্রেশন, এই রকম বেগের চোটে তাদের দেগে তার কাজ চলতে থাকে। জীবনের অসংখ্য অত্যাশঙ্ক পরিচয়ের বিষয় কেবল ইম্প্রেশনের রেখায় রেখায় চিত্তকলকে অঙ্কিত। বয়স যখন বেশী হয় তখন বুদ্ধির এই প্রাথমিক আহরণ ব্যাপার অনেকটা সাজ হ'য়ে আসে। তখনকার অভিজ্ঞতা অন্তরতর অভিজ্ঞতা। তখন প্রধানত যাচাই করবার বাছাই করবার কাজ, তখন বাইরের বোধের কাজটা গৌণ হয়, ভিতরের বুদ্ধির কাজটা মূখ্য হ'য়ে ওঠে। তখন শোষণ ক'রে পান করা নয়, চর্ষণ ক'রে আহার করা।”

আমি বললাম, “সেটাতে কি কোন ক্ষতি নেই?”

কবি বললেন, “ইম্প্রেশন গ্রহণ করবার যে সহজ সচেতন শক্তি, বিশ্লেষণী-বুদ্ধির একান্ত চর্চায় যারা সেটা হারিয়ে ফেলে তারা দুর্ভাগ্য। জীবনে যতদিন বুদ্ধির কাজ আছে তত দিন তার মধ্যে শিশুর শক্তি আছে, বুদ্ধির কাজ বন্ধ হ'লেই তখন মরণ-দশা আসে, শিশুর প্রকৃতিদত্ত পাথের তখনি নিঃশেষ হয়। যাদের চিত্ত-কলক শুকিয়ে কঠিন হয়েছে, বোধের ছাপ সহজে নেয় না, তারা আপন ভাবনাকে নিয়ে ইটের মতো ইমারৎ গাঁথতে পারে, কিন্তু তাকে নিয়ে মূর্তি গড়তে পারে না।”

আমি বললাম, “কিন্তু কবির ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে, তাঁরা জীবনের শেষ অবধি হৃদয়াবেগেব তাক্ষণ্য বজায় রাখতে সক্ষম হন?”

কবি বললেন, “ঐখানেই তো কবির সঙ্কট। স্বভাবের নিয়মে যে-বয়সে আবেগের একাধিপত্য, সে-বয়সটা কেটে গেলেও যদি তারি হাতে জীবনটাকে সম্পূর্ণ সঁপে রাখা হয় তবে সেটাতে লজ্জাও যেমন বিপদও তেমনি। বিধাতা যার প্রতি সদয় তিনি তার মধ্যে নবীনকে বাঁচান,

প্রবীণকেও সমাদর করেন। তার চিত্তক্ষেত্রে জল ও স্থল দুইয়েরই ব্যবস্থা থাকে, তাক্ষা যন নিয়ে সে ধারণা করিতে পারে, পাকা মন নিয়ে তার ভাবনা।”

আমি বললাম, “আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যদি—”

কবি বললেন, “ব'ল না, অত কুণ্ঠা কেন?”

আমি বললাম, “বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগ উচ্ছ্বাসের ষেটুকুও অবশিষ্ট থাকে সেটুকুও প্রকাশ করিতে আমরা উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ি কেন? অল্প বয়সে যে-সব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে এতটুকুও বাধে না, বয়সের অধুপাতে সে-সব উচ্ছ্বাস কেন আমাদের উত্তরোত্তর বিব্রতই ক'রে তুলতে থাকে অনেক সময়ের ঠিক-বুঝতে পারি না। কারণ, আমার প্রায়ই বনে হয় যে, উচ্ছ্বাস আবেগ আন্তরিক হ'লে তার প্রকাশে আমাদের সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়।”

কবি বললেন, “পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির কাজ যখন সম্পূর্ণ আরম্ভ না হয়েছে তখন আবেগকে আমরা অসম্ভব পরিমাণে বিশ্বাস করি। আমার ভালো লাগচে কিম্বা লাগচে না এইটেকেই আমরা যুক্তির জায়গায় বসাই। ক্রমে দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়াবেগ সংসারে আমাদের অনেক ঠকানু ঠকায়। এইজন্তে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ আপন আত্মপরিচয়ে সেইটেকে প্রাধান্য দিতে সঙ্কুচিত হয়। অন্তত সে এটা জানে যে, তার আবেগের উপলব্ধিকে কেউ যদি অবিশ্বাস করে তবে কোনো উপায় নেই। শুধু তাই নয়, যে-জিনিষটার প্রমাণ যুক্তির অধীন নেই আমারও যেমন তোমারও তেমনি। সেখানে আমার উপলব্ধি নিয়ে তোমার উপরে জোর পাটাতে পারি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমার আবেগের জিনিষ আমার একান্ত ব্যক্তিগত— সেখানে ইচ্ছা করলেও আর কেউ প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্তেই হৃদয়াবেগেও একটি গোপনীয়তা আছে। তার নিজের রাজ্যে সে যতবড়ই হোক তার এলাফার বাইরে তাকে মুকুট পরাতে গেলে তার অপমানেরই সম্ভাবনা।”

আমি বললাম, “কাব্যে তো কবির হৃদয়াবেগ সকলের কাছে প্রকাশ্য।”

কবি বললেন, “কখনই না। যেটা প্রকাশ্য সেটা

হৃদয়াবেগ না, সেটা কাব্য। সেই কাব্যটা সর্বজনীন। যে-নারী নৃত্য করছে সে আপন দেহ দিয়েই নাচছে। এই দেহটা তার ব্যক্তিগত, এখানে তার লজ্জা আছে। কিন্তু নৃত্যটা সর্বজনীন, সুতরাং নৃত্যের বাহনরূপে দেহটা যখন উপলব্ধ হয় তখন দেহ পড়ে যায় অন্তরালে, সে হয় গোপন।...এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা আমি বলতে চাই—সেটাকে বর্তমান সভ্য উপস্থিত কোনো কোনো যুবক যদি অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত বলে গ্রহণ করেন তাহলেও আমি পিছপাও হ'ব না। হৃদয় বলে, বসবোধ বলে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা বলে আমাদের একটা বালাই আছে। আমরা অবজ্ঞার ভাণ ক'রে সেটাকে ছাড়তে চাইলে কমলি ছাড়ে না, এমন কি আরো বেশি ক'রেই জাপটে ধরে। ঐ বিধিদস্ত জিনিষটাকে সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে শুকিয়ে ফেললে তবেই কি তোমাদের দেশের সম্বন্ধে কর্তব্য-সাধনা নিরাপদ ও সুসম্পূর্ণ হবে মনে করু? জীবনের অসম্পূর্ণতাতেই কি সাধনার সম্পূর্ণতা? তুমিও কি এখনকার সেই সমস্ত দেশাত্মবুদ্ধদের মধ্যে ধারা বলেন সংসাবে হৃদয়কে উপবাসী না রাখলেই দেশের কাজে জোর পাওয়া যায় না?****

আমি একটু বিব্রত স্বরেই বললাম, “না তা নয়, আপনি ভারি অপ্রস্তুত করেন। তবে কি জানেন? আপনিই একবার লিখেছিলেন যে বিবাহ সম্বন্ধে যত কুঠা-ভয় সে কেবল অবিবাহিত তরুণের; যাদের একবার বিবাহ হয়েছে তাদের বৃকের পাটা বেড়ে গেছে। সমস্ত আশি বছর বয়স পর্য্যন্ত দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংসার করণী তাদের কাছে সন্দেশ গেলাব মতো সহজ হয়েছে—তাতে না আছে খোলা না আছে জাঁটা।”

কবি বললেন, “ব্যস্ত হয়োনা, আমি তোমাকে ব্যাপটাইজ করতে আসিনি। বিবাহ সম্বন্ধে তুমি হীমেন থাকো, পেগান থাকো, তা নিয়ে অলুযোগ করা আমার ব্যবসা নয়, আমার কেবল কৌতূহল মাত্র। কোন্‌খানে তোমাদের বাধছে? দ্বিধাটা কি নিয়ে?”

আমি বললাম, “দেখুন আমার মনে হয় যে আজকাল যুগধর্মের গুণেই বা অশ্রু যে কোন কারণেই হোক আমরা বিবাহে বা খুঁজি আমাদের পূর্ববর্তীগণ ঠিক সে জিনিষটি খুঁজতেন না। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা,

আদর্শ প্রচেষ্টা এককথায় চরিত্রের সমগ্রতাকে সম্বন্ধে জীব কাছে একটা অন্তর্দৃষ্টি আশা করি। আগেকার যুগে হয়ত মানুষ জীব কাছে এতটা দাবী করত না ও কাজেকাজেই সে-সময়ে বিবাহ করণী চেব সহজ ছিল। কিন্তু এখনকার দিনে আমাদের দাবীদায়কের উপদ্রব বেশী হ'য়ে পড়েছে বলে সেটা পূরণ করবার মানুষ মেলাও একটু ভার হ'য়ে উঠেছে এই আমাব বলবার কথা। জানি না কথটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা?”

কবি বললেন, “আমি বুঝেছি তুমি কি বলতে চাইছ। কিন্তু শোনো বলি—তুমি জীব কাছে যে-জিনিষটি পাওয়ার জন্যে এতবড় ক'রে দেখছ সে-বস্তুটি আসলে তত বড় নয়।”

আমি বললাম, “বড় নয়!”

“—না, শোনো। তুমি বলতে চাও এই যে, আমাদের চরিত্রের মধ্যে যতরকমের বিচিত্রতা আছে তার সমস্তটাই জীব যদি সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন তবেই তাঁর ভালবাসাও মূল্যবান হ'য়ে ওঠে?—ভবে দেখ, মানুষ নীহারিকা-মণ্ডলের মতো। তার অনেকটা আছে যা তার নিজের কাছেও আপসা, যা সে কাজে খাটাতে পারে না; যা স্বপ্নের বাষ্পে এলিয়ে আছে, যাকে চোখ বুজে সে মনে করে সত্য, দায়ে ঠেকলেই দেখে ব্যবহারে তার নাগাল মেলে না। আর এক অংশ আছে যেখানে আমার জীবন দানা বেঁধে গেছে—সেটা প্রাত্যহিক ব্যবহারের পক্ষে সত্য, কিন্তু আকস্মিক বিপ্লবে হঠাৎ দেখি সেটা হয়তো সত্য নয়। একটা পূর্বো মানুষ তো এইরকম ভাবেতে বস্তুতে, কল্পনায় ও সত্যে মিশোনো, এই মানুষকে নির্দোহ নির্ভুল ভাবে যদি কোনো জীব ধারণা করতে পাবে, তবে মানুষটি সত্যই খুসি হয় মনে কর? আসলে তোমার কথটা হচ্ছে তুমি নিজেকে যে মানুষ বলে বিশ্বাস কর, কোন মেয়ে যদি তোমার সেই স্বকপোলকল্পিত সত্যকে চোখ বুজে মেনে নেয় তাহ'লেই তুমি তাকে বিবাহ করবে। এ যে তুর্কির জুলতানের চেয়েও বেশী জুলতানী। কিন্তু এতো গেল এক পক্ষের কথা। পুরুষরাই কি মেয়েদের বিয়ে করে? মেয়েরা কি পুরুষদের বিয়ে করে না? কিন্তু মেয়েরা যে সব সময়ে আদর্শ বিচার ক'রে পুরুষদের ভালোবাসে আমি তা বিশ্বাস করিনে।

কেননা, আদর্শ জিনিষের বিচার হয় বুদ্ধিতে কিন্তু ভালবাসার যোগ্যতা বিচার বুদ্ধিতে করে না, কবুলে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই বিপদ ঘটত—কারণ বুদ্ধি বড় নিম্নম।”

আমি বললাম, “তবে আপনি কি বলেন?” কবি বললেন, “প্রেমের রহস্য মানুষের ব্যক্তিত্বরূপের এক অভাবনীয় রহস্য। যে-দৃষ্টিতে মানুষ প্রেমের মিল দেখে, সে-দৃষ্টিতেই কোনো সজ্জার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। তুমি পুরাতত্ত্ব নিয়ে থাকো ব’লেই তোমার জীব মध्ये পুরাতত্ত্বাত্মরাগের আমেজ না পেলে যে তোমার চোখে যোর লাগবে না, তোমার মনে নেশা জন্মবে না এমন কোনো কথাই নাই। দৈবাৎ যদি তোমার জীব পুরাতত্ত্বে সধ থাকে সেটা উপরি পাওনা। আজ তুমি মনে কর, তোমার সঙ্গে তোমার পরিচিত কোন জীবলোকের বিদ্যায় জ্ঞানে কর্তে রুচিতে মিলে না ব’লেই তোমার বিবাহযোগ্য জীব জুটবে না।—এটা বাজে কথা। ভিতরের দিক থেকে তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসোনি ব’লেই বাইরের দিক থেকে ভালোবাসার যোগ্য গুণের একটা লম্বা ফর্দ খাড়া করেচ। এখনকার কালেও রামচন্দ্র যখন সীতাকে বিয়ে করেন তখন তিনি নিজেই হরধম্ম ভজ করেন, সীতার কাছ থেকে হরধম্ম ভজের প্রত্যাশা করেন না।”

—“কিন্তু আমাদের নানামুখী চিন্তা ও কর্তের নানা দিকের বিকাশের সঙ্গে জীব যদি সহাত্মভূতি প্রকাশ করবে একেবারে না পারে তাহ’লে—”

—“তাহ’লেও ব্যাপারটা অত্যন্ত শোকাবহ হয় না। তৎসত্ত্বেও তুমি তোমার জীবকে প্রাণমন দিয়ে ভালবাসতে পার। নিজের সঙ্গে নিজের জীব মারাত্মক অনৈক্য নিয়ে কঠিন দুঃখ পেতে-পেতেও পুরুষ তাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অস্ত নেই। মেয়ের পক্ষেও তাই। তুমি যদি বৈজ্ঞানিক হও তবে স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক বন্ধু স্রোটারার ইচ্ছে হবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রেমসী না হ’লে যদি তোমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে, তাহ’লে বুঝ ব’তুমি জীবকে ভালোবাসো না। ইন্দুমতীব যে গুণে অজ্ঞ মুগ্ধ ছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে ‘প্রিয়শিষ্যা লজিতে

কলাবিধো’, তার প্রধান কারণ লজিত-কলাবিধির সঙ্গে ভালোবাসার একটা নাড়ার যোগ আছে। কিন্তু, হু-বিদ্যায় তা নেই, ভূতত্ত্বে নেই, নৃতত্ত্বে নেই। সেদিকে মিলন হ’লে সেটা সোনার সোহাগা, কিন্তু তবুও সেটা সোহাগা, সোনা নয়।”

আমি বললাম—“তবে কি আপনি বলতে চান যে, জীব কাছে গভীর সহাত্মভূতি পাবার আশা করাটার মানেই নেই?”

কবি বললেন—“অহুভূতি জিনিষটা হৃদয়ের জিনিষ। ভালবাসার ক্ষেত্রে সেটা পাবার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় থাকে। কিন্তু ভাগ্যদোষে যদি নাও পাই তবু আমার দিক থেকে ভালবাসার অভাব না হ’তেও পারে। কতকগুলি জিনিষ না থাকলে ভালোবাসা হ’তেই পারে না ব’লে তার যে একটা ফর্দ টেনে দিয়েচ সেই ফর্দেই আমার আপত্তি। প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রার্থনীয় জিনিষ যা পাষ তাতে আনন্দ হবে—কিন্তু যদি নাও পাই? এমন কি, জীব যদি ভাল ডাক্তারি করতে পারে, যদি নিখুঁৎ আইনের পরামর্শ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয়, তবে দোষ কি? তবু সেটা অত জোর ক’রে বলা চলে না। সর্বগুণবতীকে ভালোবাসা হয়ত দুঃসাধ্য। ভালোবাসা হয়ত গুণের কিছু অভাবে খুঁসি হয়। অভাব না থাকলে সে যে বেকার হ’য়ে পড়ে। পরস্পরের মিলের উপরেই ভালোবাসা, এও একটা বানানো কথা—তার গভীরতর ভিত্তি অমিলের উপর।”

আমি বললাম—“আর একটু খোলসা ক’রে বলুন।” কবি বললেন—“দুই বিপরীত ভাঙিতে মেলবার কোঁক প্রবল, একথা জানা আছে। তার মধ্যে একটাকে বলে হাঁ-ওয়াল একটাকে বলে না-ওয়াল।

“সৃষ্টিকাণ্ডে যে বৈত আছে তার মধ্যে একদিকে গ্রহণ আর একদিকে দান। সঙ্গতব্যাপারে স্বর সমাবেশ থাকে স্থির, তার মধ্যে চঞ্চল তাল প্রবেশ ক’রে তাকে সক্রিয় ক’রে তোলে, তাকে সৃষ্টি দেয়, চরিত্র দেয়, সঙ্গীত করে। তেমনি জৈবসৃষ্টি কার্যে পুরুষের শক্তি অপেক্ষাকৃত গোণ ভাবে জীব সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় ক’বে তোলে।

“কিন্তু জীবপুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে ত নয়।

তাদের মনঃশরীর আছে এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণতঃ যে একটি প্রভেদ আছে, তাব সত্তা নির্ণয় না ক'বেও তাকে বুঝতে বাধে না। জ্ঞাপুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা কবে তাব মধ্যে মনঃশরীরের এই গভীর আত্মানটি বড় কম নয়। এখানে তাদের মধ্যে যে মিলন হয় সে মিলনেও সৃষ্টি-শক্তিকে জাগরুক করে। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ধর্মতন্ত্র গঠন, অর্থ অর্জন, তত্ত্বাধেয়ণ, জ্ঞান ও কর্মের যোগসাধন, তাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি ক'রে তোলা মুখ্য ভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টি কার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্ছে পুরুষের চিন্তাকে গোণ ভাবে সক্রিয় ক'বে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা জ্ঞানী-পুরুষের মনো-মিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করছেন তাই মেয়েদের বলেছেন শক্তি অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান মানব-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।

“স্বরোপের মতো দেশে যেখানে মেয়েরা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে সেখানে পুরুষদের কর্মোদ্যমের মধ্যে মেয়ে-দের এই প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি ব্যাপকভাবে কাজ করে। যেখানে সমাজে সেই ব্যবস্থা নেই সেখানে মেয়েদের দুই ভাগ করেছে—গৃহধর্মচারিণী ও শক্তিসঞ্চারিণী। তারা পৃথক ক'রে আছে।

“পুরুষ নারীর কাছে থেকে কেবল যে সেবাব আনন্দ চায় তা নয়, তার কাছ থেকে প্রেরণা চায়। গৃহ-ব্যবস্থার মধ্যে যে শান্তিময় স্থোভন স্থিতি, পুরুষের আরামের জন্তে তার যতই দরকার হোক, পুরুষের কর্ম-সাধনার পক্ষে এ ষেখেষ্ট নয়, যে আন্দোলনে তার সমস্ত প্রকৃতিকে উদ্যত ক'রে তোলে, বিভিন্ন কর্ম-চেষ্টার পৌরুষ প্রকাশের জন্ত সেটা তার অত্যাবশ্যক।”

আমি বললাম, “কিন্তু এ প্রেবণা দেওয়াটা কি কেবল অসাধারণ নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়?”

—“না তা নয়। একথাটার আলোচনা প্রথমেই হ'য়ে গেছে। মেয়েরা যে রহস্যময় আকর্ষণে পুরুষদের চিন্তকে টানে তাকে ইংরেজিতে বলে charm, বাংলায় তাকে বলা যেতে পারে হ্লাদিনী শক্তি। বস্তুত এ নামের দ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা করা হ'ল না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে

যেমন ধ্বনিতে গঞ্জে উদ্ভাপে আলোতে স্পন্দনে কম্পনে বর্ণচ্ছটায় মিলিত হ'য়ে একটা অপরূপ অতি সুন্দর জাল নির-স্তব বিস্তারিত ক'রে বেধেছে, যা আমাদের দেহ মন প্রাণকে অহরহ নানারকম ক'বে শিউরে দিচ্ছে, বাজিয়ে তুলছে, জাগিয়ে রাখছে, মেয়েদের হ্লাদিনী শক্তিও তেমনি, তাকে স্থূলবকম ক'রে নির্দেশ করা সহজ নয়। অনির্দিষ্ট হ'লেও তার প্রভাব প্রবল। জ্ঞানী পুরুষের এই বিভাগের ভিতর দিয়ে জীবজগতের যে একটা প্রকাণ্ড বেগের সৃষ্টি হয়েছে যে-সমাজ তাকে নানা প্রকার বাধার দ্বারা প্রতিহত ক'বে দেয়, তাব অপরিণীম প্রভাবের অধিকাংশকেই তুচ্ছতার বেড়ার মধ্যে পুবে রাখে, তারা থাকে আধমরা হ'য়ে পুরুষের জীবন-ক্ষেত্রে তাবা মজুরী ক'রে কাটায়, সৃষ্টি করতে পারে না।”

আমি বললাম—“সমাজের অবস্থা যেমনই হোক ভারত-বর্ষে গ্রীসে রোমে পুরুষের কর্ম যে দুর্বল ছিল এমন কথা তো বলা যায় না।”

কবি বললেন, “আমি সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এই সকল দেশে সমাজে ব্যাপকভাবে জ্ঞান-প্রকৃতি আপন প্রশস্ত স্থান পায়নি ব'লেই পুরুষ আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনই এমন একদল মেয়ের জন্তে একটি বিশেষ স্থান প্রস্তুত করেছিল যারা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধু। খাদ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের দেহ সহজ প্রকরণে নিজের প্রয়োজনীয় যে তাপ-পদার্থ আত্মসাৎ করে তার যদি অভাব ঘটে তাহ'লে দেহ আপনাই বিশেষভাবে কষ্টল খুঁজে মরে। ঘরের স্বকীয় প্রয়োজনে প্রদীপ জ্বলে উঠুন জ্বলে কাজ চলে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাণেব আনন্দ সাধনের জন্ত আকাশব্যাপী সূর্যালোকের প্রয়োজন আছে। সেটা ব্যক্তিবিশেষেব শিলমোহর করা আপন সম্পত্তি নয়; সেটা সর্বসাধারণের, এই জন্তেই প্রত্যেক ব্যক্তির। পাশ্চাত্য সমাজে সাধারণ পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশের অল্পকূল সেই নারীশক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত ভাবেই আছে, সেখানকাব পুরুষকে নিত্যই উদ্যমশীল ক'রে রেখেছে। প্রাচীন সমাজে যেখানে নারীশক্তিকে সেইরকম ব্যাপক ভাবে প্রচারে বাধা দিয়েছে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে তাকে পাবার ব্যবস্থা রেখেছে। এখনকার কালেব পণ্যজ্ঞীদের আদর্শে

তখনকার কালের মোহিনীদের বিচার করা ভুল। দেহতৃষ্ণা নিবারণের জন্তেই যে তারা তা নয়, তারা চিন্ততৃষ্ণা নিবারণের জন্তে। কাপুরুষের কাছেই জ্বীলোকেরা লালসার সামগ্রী, বীবের কাছে নয়। কাপুরুষ নিজের হীন প্রয়োজনেই জ্বীলোককে হীন ক'রে ফেলে। যেখানে সেই প্রয়োজনের দাবীই একান্ত নয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষই নারীমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। মুচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন্তা ক'রে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের মতো প্রহ্লাদ-যোগ্য, গৃহস্থ পুরুষের পক্ষে বসন্তসেনার সঙ্গ যে হয় এমনতর বিচারের আভাস মাত্র এই নাটকে কোথাও নাই। শুধু তাই নয়; বসন্তসেনার যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রদ্ধা করবার জো নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় তখন এই রকম নারীরা সতর্কভাবে আপন সন্তান রক্ষা করবার চেষ্টা করত, নইলে তাদের যেটি আসল কাজ সেটাই ব্যর্থ হ'ত।”

আমি বললাম—“সমাজের আশ্রয় থেকে মেয়েদের এরকম বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া কি তাদের প্রতি অত্যাচার নয়?”

কবি বললেন—“পূর্বেই বলেছি, বাঁধ বেঁধে যদি নদীর ধারা বন্ধ কর, তবে জলের জন্তে জলাশয় খুঁড়ে নেই। অবরুদ্ধ স্বভাবের নিয়মই কৃত্রিম প্রণালীকে খুঁজে খুঁজে বের করে। মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা ফ্লাদিনী সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের। যে-মেয়ের মধ্যে এই ফ্লাদিনী শক্তির বিশেষ প্রতিভা আছে সে আপনার এই শক্তিকে জানে। সে যদি এই শক্তিকে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ ভাবে প্রয়োগ করবার সহজ ক্ষেত্র না পায় তাহ'লেই তার রুদ্ধ শক্তি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটায়। সমাজের গৃহবায়ু-মণ্ডলকে এই বিকৃতির বাষ্প থেকে রক্ষা করবার জন্তেই দুই একটা জানলা একদা খোলা হয়েছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে সেটাতে সমাজকে এবং এই জেগীর মেয়েকে কঠোর আঘাত থেকে বাঁচানোই হয়েছে। পুরুষের চিন্তে শক্তির প্রেরণা সঞ্চার যে-মেয়েদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে

স্বাভাবিক, স্বক্ষেত্রে তারা আপন অপ্রীতিহত মহিমা অশুভব করিতে পারুলে তবে তাদের প্রকৃতি স্বার্থক হ'ত পারে। প্যারিসে ঘেসকল নারী তাদের স্যার্ল-সভায় মনোবা পুরুষ-মণ্ডলীকে নিজের মোহিনীশক্তির দ্বারা টেনে নিয়ে তাদের চিন্তকে আন্দোলিত ক'রে আলাপ-আলোচনার তরঙ্গ তুলতেন তাঁরা এই জাতের। তাঁরা অনেকে বিবাহিতা হ'লেও গৃহস্থের গণ্ডীকে স্বভাবতই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। স্বর্ঘ্যের আলো সহজেই যেমন গাছের মঞ্জায় মঞ্জায় প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি ক'রেই তাঁরা তাঁদের সবকালবর্তী গুণীদের মনের ভিতর নারী-লাবণ্যের কিরণ বিবীর্ণ ক'রে তাঁদের মধ্যে সফলতা সঞ্চার করতেন। নারী-প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত এই জীবনীধারার জন্তে পুরুষ-চিন্ত আপন সার্থকতার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করে একথা আমরা সব সময়ে জানি না,—এরই অভাবে যে আমাদের কৃতিত্বের কৃশতা ঘটে সে-সম্বন্ধেও সব সময়ে আমরা সচেতন নই। কিন্তু একথাটা আমরা ধ'রে নিতেই পারি পুণ্ড্রচিন্তের সম্পূর্ণতার জন্তেই নারীশক্তির প্রভাব নিতান্তই চ'ই। এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও বুদ্ধদেবের শুদ্ধ তপস্যার অন্তে হৃদ্যতার যে হৃন্দর সেবারুই এসেছিল এর মধ্যে সেই অর্থটি আছে; যিশু খৃষ্টের প্রকৃতি আপন তৃপ্তির পূর্ণতার জন্তেই মেরি মার্গার ভক্তি নিবেদনের বিশেষ অপেক্ষা করেছে। যুদ্ধে পুরুষ প্রাণ দেয় তার পিছনেও মেয়েদের প্রেরণাবাণী থাকে, রায়পুতদের ইতিহাসে তা দেখা যায়, মধ্যযুগের যুরোপীয় সজ্জিয়নের বিবরণেও তা পাই। পুরুষ এই শক্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে যখন সমাজধারায় বঞ্চিত হয় তখন ঈশ্বতন্ত্রের ছদ্মপথ দিয়ে তৃপ্তির উপায় খোঁজে এবং সেই সব কৃত্রিম উপায়ে তার পৌরুষকে পুষ্ট করে না, বিবৃত করে, আমরা তার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখতে পাই।”

ব'লে একটু থেমে বললেন, “প্রেরণার কাছ থেকে বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সহযোগিতা দাবী করাটাই সব চেয়ে বড় ক'রে তুলো না—বিবাহ রাত্রিটা নাইট স্কুলে Extension lecture-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা উৎসব নয়। নারীর কাছ থেকে যদি তার প্রেমের আত্ম নিবেদন পাও তাহ'লে সেটা তোমার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান

জিনিষ। তার কারণ এ নয় যে তাতে তোমার হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, তার কারণ এই যে তাতে তোমার বুদ্ধিতে, তোমার কর্মশক্তিতে তোমার প্রকৃতির সকল অংশেই পূর্ণতা সাধন হয়।”

আমি বললাম—“যখন কথা আপনি তুললেনই তখন এ বিষয়ে আমার মনে যে, দু-একটা প্রশ্ন প্রায়ই আগে সে-গুলি আপনার কাছে একটু খোলাখুলি ভাবেই বলি।

“এই যে জীবর ভালবাসা বলছেন, সেটা কি বিবাহের পর প্রায়ই নষ্ট হ’য়ে যায় না?—বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিবাহে পুরুষ যেখানে জীবর ভালবাসা পাবার চাইতে তাকে নিশ্চিন্ত ভাবে অধানে রাখবার গৌরবটাই বেশী কাম্য মনে করে? আমি ত আমার আত্মীয় বন্ধুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিবাহেরই যা শুক পরিণাম লক্ষ্য করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে বিবাহের মধ্যে যে সম্পত্তি-ভোগের ভাবটা গ্রথিত আছে সেটা সত্যিকার ভালবাসার মস্ত অন্তরায় না হ’য়েই পারে না। ষাঁদের আমরা স্বামী হিসাবে সচরাচর উদারপন্থী ব’লে প্রশংসা ক’রে থাকি তাঁদের মধ্যেও এই সম্পত্তি-ভোগের ভাবটা যে কি দৃঢ়মূল সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেব।

“আমার এমনি একটি বন্ধু একদিন তাঁর স্ত্রীকে আমার সামনেই বলেছিলেন, ‘তুমি অমুক যে জায়গায় যাবে ব’লে আজ বেরিয়েছিলে সেখানে গিয়েছিলে কি?’ স্ত্রী বললেন যে, সেখানে তাঁর যাওয়া হয়নি, অমুক এক জায়গায় আগে যাওয়ার দরুণ। তাতে স্বামী বললেন, ‘কিন্তু এ দ্বিতীয় জায়গায় যাওয়ার জন্তে তোমার আমার কাছে অল্পমতি নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল।’

“এখন দেখুন, একখাটায় অধিকাংশ পুরুষই হয় ত সায় দেবেন যে জীবর কাছে এই অল্পমতি চাওয়ার দাবী স্বামীর পক্ষে খুবই জায়সঙ্গত। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে এই যে যত খোঁচাটি দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে, ‘জীবর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চিরকালই স্বামীর দ্বারা দান মাত্র, জন্মস্থান নয়’—বিবাহের মধ্যে এই মনোভাবটি আমাকে বড় আঘাত করে। জানি না বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের এই দাবী-দাওয়াকে আপনি অকিঞ্চিৎকর মনে করবেন কি না।”

কবি বললেন, “জীবর প্রতি আপন কর্তৃত্ব-গৌরব সপ্রমাণ

কব্বার স্তম্ভটাকে পুরুষ যে আপন প্রাপ্য ব’লে মনে করে এটা আমাদের দেশে কেবল নয়, নানাদিক সকল দেশেই। শরীর-তত্ত্ব, বা মনস্তত্ত্বটিত যে কোনো কারণেই হোক স্ত্রীলোককে জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্তে পুরুষের উপব নির্ভর করতে হয়। সেই কাবণটাকে অবলম্বন ক’রে পুরুষ যথেষ্ট তার দাম আদায় ক’রে নিতে চায়। পেটের দায়ে যে পুরুষ অল্প পুরুষের মুখ তাকাতে বাধ্য তাকেও সেই নির্ভরের পরিমাণে আপন স্বাতন্ত্র্য বিক্রিয়ে দিতে হয়—এমন কি তার চেয়েও অনেক বেশী। এই নিয়েই ত ঘুরোপে আজকাল ধনিকে শ্রমিকে হাতাহাতি চলচে। এবং সেই একই লড়াই আজকের দিনে সেখানে মেয়ে পুরুষে। অল্পের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যা পায়, মানস-স্বাধার দিক থেকে তারা যে পুরুষকে তার চেয়ে অনেক বেশী জুগিয়ে থাকে এই স্তম্ভ কথাটি বোঝবার শক্তি অল্প লোকেরই আছে, কেন না এটা চোখে দেখবার জিনিষ নয়। প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ বড়াই করে কেন না প্রভুত্ব বর্ধকতার অঙ্গ, প্রভাব নিয়ে বড়াই করে না, সেটা গায়ের জোরের উপরের কথা।”

আমি বললাম, “কিন্তু তাহ’লে কি বলা চলে না, যে, আমাদের দেশেই হোক বা অন্য দেশেই হোক সকল ক্ষেত্রেই নারীকে একান্তভাবে পাওয়াটা প্রেমের মস্ত অন্তরায় হ’তে বাধ্য?”

কবি বললেন, “বাইরের দিক থেকে পাওয়ার একটা বিপদ নিশ্চয় আছে, তা গভীরতর পাওয়াকে অনেক সময় ম্লান করে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে হস্তগত করেচে ব’লেই সেই বাহু শক্তির অহঙ্কারে ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে জানা তার পক্ষে এত দুর্বল। নিজের অধিকারের দলিলে প্রমাণিত স্বত্বগুলির ফর্দ ধ’রে যে পুরুষ জীবর মূল্য যাচাই করে তার মধ্যে মানব-ইতিহাসের আদিম যুগের স্থূল বর্ধকতা প্রবল হ’য়েই আছে; সেই মানব মানস-পৃথিবীর আফ্রিকাবাসী। কিন্তু, তাই ব’লেই বাইরের পাওয়াটাকে বাদ দিয়ে চলাই স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের পরিপূর্ণতা, একথাটা মিথ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক মানুষের আধিভৌতিকের উপরের জিনিষ ব’লেই যে সে আধিভৌতিকের বাইরে তা নয়। আধিভৌতিককে যখন

সে আপন অদ্বীকৃত ক'রে নেয় তখনই সে আপন সম্পূর্ণতা পায়। দেহহীন প্রেতের অবস্থা যে আত্মাহীন দেহের চেয়ে ভালো তা আমি মনে করি না। শেষোক্ত পদার্থটা দিনের বেলায় উৎপাত করে তাকে ঠেকানো যায়, প্রথমোক্তটার উপদ্রব অস্বকার রাজ্যে। তাকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা মানুষ কত শত্রু থেকে কত মন্ত্র পাড়ে তার ঠিক নেই কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না। সেই ক্ষমতাই মানুষের ষপার্থ সাধনা হচ্ছে শব্দকে ত্যাগ ক'রে অর্থকে শুদ্ধে খুঁজে বেড়ানো নয় শব্দের মধ্যেই অর্থকে পাওয়া। বিবাহে তার সাধনা হচ্ছে, স্ত্রীকে মন্ত্র প'ড়ে পেয়েছি ব'লেই তাকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি এমন কথা মনে করার অপরিণীম মূঢ়তা ঘুচিয়ে দেওয়া, এই

কথা অন্তরের সঙ্গে জানা যে, মানুষকে দখল বা করলেই তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরকীয়া-সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়,—তার মানেরই হচ্ছে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্য বিবাহ যখন বর্করযুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া-সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বতন্ত্র্য আছে ব'লেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশী হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া-সাধনার যুগ এসেছে ব'লেই আশা করি। যদি এসে ৎকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।”

ধর্মের গান কতকালের ?

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

ধর্ম-মঙ্গল নামে অনেক পুথী লেখা হইয়াছিল। মঙ্গল মাত্রেই গানের পালা। ধর্ম-মঙ্গল, ধর্মের গানের পালা। ধর্ম-ঠাকুরের গাঙ্গনের সময় ধর্মের মাহাত্ম্য গান করা হইত। কদাচিৎ কোন ভক্ত ঘটা কবিয়া মানসিক শোধের সময় গান করাইত। এখন কালের স্রোত ভীষণ বেগে নূতন পথে ছুটিয়াছে; ধর্মের গায়ন আছেন কি না, সন্দেহ। বাল্যকালে দুর্গা-পূজার সময় রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান, মহাভারত গান শুনিতাম; এখন থিয়েটারী চঞ্চের থিয়েটারী গান ভিন্ন কথা নাই। রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী ধর্ম প্রভৃতির গায়নের আর উদয় হইবে না, পালাও রচিত হইবে না।

ধর্ম গায়নের মধ্যে মাত্র তিন গায়নের পালা ছাপা হইয়াছে। এক, মাণিকরাম; দুই, ঘনরাম; তিন, রামাই পণ্ডিত। অলৌকিক ঘটনায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। প্রথমে লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, পরে তাহা কবির গানে প্রচারিত হয়। সংস্কৃত-জানা কবির কলমে পুরাণ

রচিত হয়, পুরাতন পুরাণে প্রবিষ্ট হয়, কদাচিৎ নূতন উপ-পুর্বাণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন কাহিনী এই রূপে সংস্কৃত শ্লোক-বদ্ধ কিংবা দেশ ভাষায় গীত-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের দক্ষিণ পশ্চিমে ময়না নামে এক রাজ্য ছিল। একদা এক গৌড়েশ্বরের অধীনে কর্ণসেন ময়নার রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র অভয়াবীর তীরে মঙ্গল-কোটের নিকট ঢেবুরের রাজা ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে হত হন, পুত্র-শোক কর্ণসেনের রানী প্রাণ-ত্যাগ করেন। তখন কর্ণসেন বৃদ্ধ। গৌড়েশ্বর সেই বৃদ্ধের সহিত তাঁহার স্ত্রী রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। পুত্র হয় না; রঞ্জাবতীর এক পিসতাত প্রবীণা ভগিনী ছিলেন, নাম সামূলী; তিনি ধর্মের ব্রত জানিতেন। তাঁহার উপদেশে রঞ্জাবতী ধর্মের ব্রত করিয়া লাউসেন নামে পুত্রবান পুত্র লাভ করেন। ধর্মের ব্রত অতিশয় কঠিন, তাহাতে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে হয়। রঞ্জাবতী ধর্মের দাসী;

লাউসেন ধর্মের সেবক। গোড়েশ্বরের এক কুট-বুদ্ধি-শালক, নাম মহামদ, গোড়ের পাত্র। এই মন্ত্রী রাজ্য চালাইতেন, লুঠিয়া খাইতেন, গোড়েশ্বর বৃদ্ধ, নামে মাত্র ঈশ্বর ছিলেন। কর্ণসেন ভূপতি গোড়েশ্বরের প্রিয়, লাউসেন ততোধিক। মহামদ ঈর্ষাবশে লাউসেনের সর্বনাশের নানা প্রবন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ধর্মের রূপায় লাউসেনের জয় হয়, তাঁহারই বাহুবলে একদিকে কামরূপ/অস্ত্রদিকে কলিঙ্গ রাজ্য গোড়ের অধীন হয়। মহামদের মন্ত্রণাহেতু লাউসেনকে বিপদে পড়িতেও অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। পশ্চিমে সূর্য্য ষথারীতি অস্ত গিয়াছেন, রাজ্যের অঙ্ককারের সময় সূর্য্যের প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। এমন ঘটনা, পশ্চিমে উদয়, কেহ কখনও দেখে নাই, শোনে নাই। ধর্মের মাহাত্ম্যের এমন নিদর্শনও কেহ কখনও আর পায় নাই। এই অদ্ভুত-কর্মী লাউসেনকে ধরিয়া মাণিকরাম ও ঘনরামের গান।

আর এক পালা ছিল। হরিচন্দ্র রাজা ও তাঁহার পাট-রাণী মদনা অপূত্রক ছিলেন। মনে স্থখ নাই, বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বজ্রকা (বা বজ্রকা) নদীর তীরে ধর্মপূজা দেখিতে পান। ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে রাজা-রাণীকে দেখা দিয়া ধর্মপূজা করিতে বলেন; আর, পুত্র জন্মিলে তাহাকে ধর্মের নিকটে বলি দিতে বলেন। রাজা-রাণী ভাবিলেন, আগে ত পুত্রমুখ দেখিয়া পুণ্যম-নরক এড়াই, পরে ঈশ্বর যা করেন। পুত্র জন্মিল, নম হইল লুহিচন্দ্র। রাজা-রাণী পুত্র-বলিদানের অঙ্গীকার তুলিয়া গেলেন; কিন্তু ঠাকুর তুলিবার পাত্র নহেন, সেই বজ্রকার সন্ন্যাসী সাক্ষিয়া রাজা-রাণীকে হলনা করিতে গেলেন, লুহিচন্দ্রের মাংস রাণীকে দিয়া রাখাইয়া বাজাররাণীর ভক্তি পরীক্ষা করিলেন। একদিকে অপূত্রক রাজ্যরাণীর পুত্রলাভ, অস্ত্রদিকে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার, দাতাকর্ণের পুত্রবলিদানকেও পরাজয় করে। এই পালা ঘনরাম দিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের যে গান “শূন্তপুরান” নামে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হরিচন্দ্র রাজা ও মদনা রাণীর কৃত ধর্মের দেউল ও পূজা সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে।

এখন গায়নদিগের কাল দেখি। মাণিকরামের কাল

সম্বন্ধে গত বৎসর কার্তিকের ‘প্রবাসী’তে লিখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগে (১৩১৫ সালের) সবিস্তরে দেখাইয়াছি, মাণিকরাম দেড়শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ইহার তিন প্রমাণ আছে। (১) ভাষা, (২) মাণিকরামের বংশলতা, (৩) গীতসাহ কাল। কোনটাতে তাহাকে তিন চারি শতবৎসর পূর্বে লইয়া যাইতে পারে না। যে মাতৃকা দেখিয়া তাহার ধর্মমূল ছাপা হইয়াছে, তাহার লিপিকাল ১৭৩১ শক। এখানে তর্ক উঠিতে পারে, লিপিকর পুরাতন কবির ভাষা নিজের সময়ের ও জ্ঞানের মতন করিয়া কেলিয়াছে। কিন্তু এমন লিপিকর কদাচিৎ আছে, যে ছাপায় ২২৭ পৃষ্ঠার পুথীর আগাপোড়া একই নিয়মে শব্দের ও বিভক্তি-প্রত্যয়ের রপ্তান্ত করিয়া যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সামান্ত কথা তর্কিকেরা তুলিয়া যান। ভাষা দেখিয়া কালনিরপণে ভুল না হইতে পারে, এমন নয়; কিন্তু বংশ-লতা যে আছে। কবির বর্তমান বংশধরের গৃহে পুথীর এক নকল আছে। কি জানি ছাপা বইএর গীতসাহ কালে ভুল থাকিতে পারে। এই আশঙ্কায়, সে নকল হইতে পয়ারটি আনাইয়াছিলাম। তাহাতে আছে,—

সাকে রীতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে ।
দিব্ধসহ জ্ঞোপ দক্ষে যোগ তার সনে ।
বারে হল্য মহাপুত্র তিধি অব্যাহিত ।
সর্ব্বত্রি সরাগ্নি দণ্ডে বাজ হল্য গীত ।

ছাপা বহিতে আছে,

সাকেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে ।
দিব্ধসহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে । ইত্যাদি

এখানে ‘সিদ্ধি’ নাই, ‘সিদ্ধা’ নাই; আছে ‘সিদ্ধ’। ‘সিদ্ধা,’ এই শব্দ সংস্কৃতে অজ্ঞাত। সিদ্ধ = ২৪, যদিও প্রয়োগ অধিক পাওয়া যায় না। কিন্তু ‘যোগ’ না ‘যুগ’? ‘দক্ষ’ না ‘পক্ষ’? ‘দক্ষ’ আক্ষিক শব্দ নয়; আর ‘প’কে দ পড়া আশ্চর্য্য নয়। পক্ষ = ২। এখন যোগ = পাঁজির ২৭ যোগ ধরিলে পাঁচটা অঙ্ক হইয়া যায়, সেটা অসম্ভব। তা ছাড়া, যোগ = ২৭, এমনও কোথাও পাই নাই। একটি শব্দে ২৭ অঙ্ক জানাইতে হইলে ‘ভ’ বা ‘নক্ষত্র’ চিরন্তন আছে। অতএব ‘যুগ’ মনে করিতে হইতেছে। যুগ = ৪।

অর্থাৎ ৬৪৭+২৪২৪=৩০৭১; স্মৃতরাং ১৭০০ শক।
বংশলতাও এই কাল দেখাইতেছে।

উক্ত শক পরীক্ষার উপায় নাই। ‘তিথি অব্যাহিত’
যে কি, তাহা বলা দুষ্কর। মাসের নাম না পাইলে তিথির
নাম বুঝা। এমন যদি তিথি থাকে, তাহা বৎসরে একটা
মাত্র ঘটে, তাহা হইলে শক পরীক্ষা চলিত। ‘অব্যাহিত’
শব্দটা পুথীর ভুল মনে হয়। হয়ত অব্যাহত তিথি যে
তিথিতে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই। কিন্তু
তাহাতেও পরীক্ষার উপায় নাই।

“বঙ্গবাসীর” কল্যাণে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বহু
প্রচারিত হইয়াছে। ইহাব সমাপ্তিকাল স্পষ্ট লেখা
আছে,—

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকার্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
হলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়্য তিথি।
বাসমণ্ড্য যিনে সাক্ষ সঙ্গীতের পুথি ॥

রাম—৩, গুণ—৩, রস—৬, সুধাকর—১। অর্থাৎ
১৬০০ শক। এখানে এই শক পরীক্ষার উপায় আছে।
মার্গক—মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস
—সূর্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, হলক্ষণ শুক্র
পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঞ্জি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬০০
শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্র তৃতীয়া। ১লা
হওয়াতে ‘আদ্য অংশ’ও বটে। ‘বাসমণ্ড্য দিনে’—
‘বাস’ অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলায় সময় সঙ্গীত সাক্ষ
হয়। ঘনরাম বহু স্থানে ‘বাস’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।
সর্বত্র অর্থ, প্রহর। বাস আঙ্গিক শব্দও নয়। ধম=২
বটে, কিন্তু ২রা শনিবার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থভাগে (১৩০৪
সালের) হুগলী জেলাব ভাঙ্গা-মোড়া নিবাসী ৬ অধিকা-
চরণ গুপ্ত সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের বিবরণ দিয়াছেন।
ইহাতে নানা পুরাতন বিষয় আছে। শূন্যপুরাণ,
শিবায়ন, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতির বিষয়ের সহিত ধর্মের
মঙ্গল যুক্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের আরম্ভকাল এইরূপ লেখা আছে,—

বিজ্ঞ সহদেব গান পূর্বতপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একটল্লিখ সালে।

আগমের কথা ইহা কে বলিতে পারে।
কালচাঁদ স্বপনে সদয় হৈলা যারে ॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা ভুগপতি ॥

৬ গুপ্তমহাশয় দেখাইয়া গিয়াছেন, সালটি ১৪১—
১৬৫৬ শক। এই শকের ৪ঠা চৈত্র কিন্তু পূর্ণিমা ছিল না,
ছিল কৃষ্ণ চতুর্থী। ১১৪১ সালের একশত বৎসর পূর্বে
ও পরেও কিংবা ১৬৪১ শকে ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা ছিল না।
অতএব অর্থ, ১৬৫৬ শকের চৈত্রের চতুর্থ দিন, এবং
পূর্ণিমার পর চতুর্থ তিথি। বোধ হয় এই চৈত্র ‘পূর্ণিমা’
না লিখিয়া ‘পূর্ণিমার’ আছে। বারের উল্লেখ না থাকাতো
শকপরীক্ষা হইতে পারিল না।

পূর্বকালের কবি যদি ভাবিতে পারিতেন, আমরা
তাহার গান পড়িতে বসিব, তাহা হইলে সন তান্ধি নাম-
ধাম স্পষ্ট লিখিয়া যাইতেন। ঘনরাম গাহিয়াছেন,
“ময়ূভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।” “হাকন্দ পুরাণ
মতে, ময়ূভট্টের পথে জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মাত্মা।”
মাণিকরাম গাহিয়াছেন, “বন্দিয়া ময়ূভট্ট আদি কপরাম।
বিজ্ঞ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণ গান।” শুধু তাই নয়,
জগৎদেবর মাণিকরামকে শুনাইয়াছেন, “ময়ূভট্টের কথা
মন দিয়া শুন। বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি
দিয়া।” অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূভট্ট এক
অসাধারণ কবি ছিলেন, এবং সে কালে অমর
বিবেচিত হইতেন। তাহার রচিত ধর্মমঙ্গল কোথাও
আছে কি না, জানি না। মাণিকরাম রূপরামের নিকট
ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার জাড়া
গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত যুগানন্দনাথ রায় রূপরামের সংগ্রহ পালা
পাইয়াছেন। এটি ১২৪২ সালে লিখিত গোরাটান্দ দাস
মাইতি নামক এক লিপিকরের। রূপরামের খতিত পালা
আরও আছে। ১২৩৫ সালে নফরঘোষ নামক লিপি-
করের লিখিত ইছাই-ঘোষ-বধ পালা আমার এক বন্ধুর
নিকটে আছে। আমি পড়িয়াছি। যুগানন্দনাথ-বাবু
তাহার সংগৃহীত পুথী আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,
কিন্তু অবসর অভাবে পড়িতে পারি নাই। রূপরাম তাহার
গীত সমাপ্তিকাল হেয়ালীতে লিখিয়াছেন,—

সাক্ষি সিন্ধে জড় হৈলে জত সৰু হই।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রস।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই সকে গিত হৈল লেখা কর্যা লেহ।
সভাজন চার্যা ধর্ম করিবে কুল।
বারমতি সাক্ষি হৈল ধর্মের মঙ্গল।
বিসম ধর্মের মারা কহনে না যায়।
রূপরাম ঠাকুর ধর্মের নীত গায়।

এই শক ‘লেখা করা’ আমার দুঃসাধ্য। কাজেই
অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতে যাইতেছি। শাগ ও শীম, জড়
হইলে, এক বর্ষ হেতু এক দেখায়। অতএব শকের আদ্য
অঙ্ক ১। চারি বাণ = ২০, তিন যুগ = ১২, বেদ = ৪;
“রসের উপরে রস” = ৬ + ৬ = ১২। একত্রে ৪৮। “তাহে
রস দেহ”, ৬ বসাইতে হইবে। ৪৮ অঙ্কের বাঁয়ে বসাইলে
১৬৪৮ শক, তাইনে বসাইলে ১৫৮৬ শক। দুই পক্ষেই যুক্তি
আছে। কিন্তু প্রথম পক্ষে বল অধিক আছে। সমগ্র পুথী
পড়িয়া ভাষা, উদ্দেশ্য, অর্থবৎ বিচার করিলে প্রথম পক্ষের
প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমি যে ইছাইঘোষ-বধ
পড়িয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে ১৬৪৮ শক। মাণিক
রাম, অন্ততঃ ইছাইঘোষবধ পালায়, রপরামের পেছ পেছ
গিয়াছেন, দুই তিন স্থানে রপরামের পদ তুলিয়া
লইয়াছেন।

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন খেলারামেব ধর্মমঙ্গল পুথী
হইতে তুলিয়াছেন,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।

অর্থাৎ খেলারামের কাল ১৪৪২ শক। কিন্তু শরের
বাহন কি? স্রব কন্দর্পের? কিন্তু কন্দর্পের বাহন কি
ছিল? তিনি মীনকেতন। মীনবাহন ছিলেন না।
‘শরের’ কি শিবের? খেলারাম ৪০০ বৎসরের বৃদ্ধ
হইতেছেন। তাঁহার পুথী, বিশেষতঃ কাল ভাল করিয়া
দেখা উচিত।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দ্রাস থানার নিকটবাসী সীতারাম
দাসের এক ধর্মমঙ্গল আছে। আনাইয়া একবার দেখিব
মনে করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম থানার এক দারোগা
বাবু পুথী খানি লইয়া গিয়াছেন, পাইবার জো নাই।
শুনিয়াছি, সীতারাম ৩০০ বৎসরের বৃদ্ধ। দীনেশ-বাবু
লিখিয়াছেন, সীতারাম ১০০৪ সালে = ১৫১২ শকে পুথী

সমাপ্ত করেন। তিনি এই সাল কোথায় পাইলেন, তাহা
লেখেন নাই।

১৩০৪ সালে অধিকা চরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন, “এ পর্য্যন্ত
আটখানি ধর্মমঙ্গলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে।
ময়ূরভট্ট, খেলারাম, ঘনরাম, রপরাম, রামচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র,
রমাই পণ্ডিত এবং সহদেব চক্রবর্তী, এই আট জনের লিখিত
আটখানি।” ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে (= ১৩১৫ সালে) তৃতীয় বাব
সংস্কৃত “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন
লিখিয়াছেন, “রমাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দ পুরাণ, ময়ূরভট্ট,
রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, প্রভুরাম, রূপরাম,
সীতারাম, দ্বিজরামচন্দ্র, সেন পণ্ডিত, রামদাস আদক,
ঘনরাম, বলদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি কবির ধর্ম-মঙ্গল আমরা
প্রাপ্ত হইয়াছি।” এই ১৪ জন ছাড়া তিনি শ্রাম
পণ্ডিতের “স্ববৃহৎ” ধর্ম-মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন।
দুঃখের বিষয়, অন্যান্যি কেহ এই ১৫ খানি পুস্তকের
বিষয়ের ও কালের পূর্বাণুশ্চ শোনান নাই। হাকন্দ
পুরাণ ও ময়ূরভট্টে, কি লেখা আছে, তাহা জানিলেও
কৌতুহল নিবৃত্তি হয়। বোধ হয়, অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলের
“দাঁড়া” এক, কিন্তু যত গায়ক তত রপ; ভাষায় ও ছন্দে
একটু আধটু প্রভেদ। কৃষ্ণবাস রামায়ণ রচিলেন;
গায়নে রামায়ণী দাঁড়া পাইল, কৃষ্ণবাসের নানা রূপ
আবির্ভূত হইল। গানের পালার এই পরিণাম কিছুমাত্র
নূতন নয়। এই কথা বুঝিতে কিন্তু বহু পুস্তক-সম্পাদকের
বহুকাল গিয়াছে।

ঘনরামের মতে, বোধ হয় তাঁহার পূর্বের ময়ূরভট্টের
মতে, গোড়ের ঠাকুর ধর্মপাল স্বর্গগত হইলে তাঁহার
“বীর্ঘবস্ত” পুত্র গোড়েশ্বর হন। তিনি লাউসেনের
মেসো। বাদ্যপালার ইতিহাসে এক ভিন্ন দ্বিতীয় ধর্মপালের
নাম পাই না। লাউসেনী পালার নিমিত্ত দ্বিতীয় ধর্মপাল
অন্বেষণের আবশ্যকতাও দেখি না। ধর্মপালের পুত্রের
নাম দেবপাল; দেবপাল খ্রীষ্টাব্দে নবম শতাব্দীতে রাজ্য
করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুমানে দেবপাল ৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।
ধর্মমঙ্গল মতে লাউসেনের কীর্তনময়ে গোড়েশ্বর বৃদ্ধ।
এই দুই হইতে পাই, লাউসেনের জন্ম ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের

২ নিকটবর্তী সময়ে হইয়াছিল। ইহার পর অন্ততঃ একশত বৎসর অতীত হইলে তাহার জীবন চরিতে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল। অতএব অনুমান হয়, লাউসেনী দাঁড়া খ্রীষ্টের দশম এবং শকের নবম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদিত “শুভ পুরাণ” যে বস্তুতঃ ধর্মের গান, একুথানি বই নয়, ছয়খানি পুথীর সমষ্টি, তাহা পরিষৎ পত্রিকার ষোড়শ ভাগে (১৩২৬ সালের) দেখাইয়াছি। কোন্ কালেব কোন্ কোন্ গায়নের টুকরা টুকরা পালা একত্র হইয়া গিয়াছে, কে জানে। কৃষ্ণিবাসের নামে যেমন অনেক গায়ন পালা বাঁধিয়াছিলেন, এখানেও তেমন রামাই পণ্ডিতের নামে অনেক গায়নে পালা বাঁধিয়াছিলেন। অপুঞ্জক হরিচন্দ্র রাজা ও মদনা রাণী (বোধ হয়) পুত্র লাভের পর ধর্মের দেউল ও ঘটায় পূজা দিয়াছিলেন, ইহা এই গানের মুখ্য বিষয় ছিল, একাধিক গায়নের একাধিক পালায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পূজার সময় রামাই পণ্ডিত ছিলেন মনে হয়।

কিন্তু তাহার এতকাল পরে গানের উৎপত্তি যে লোকে পূর্বের ইতিহাস তুলিয়া গিয়াছিল, গায়নে কখনও রামাইকে দিয়া পূজা এবং কখনও গান করাইতেন। কবিকথা কখনও ইতিহাস নয়। ইহা গীতবদ্ধ ক্রতি-পরম্পরা। ইহার ধর্মই এই, ইহাতে দেশ কাল পাত্রের প্রকৃত সম্বন্ধ মিশ্রিত হইয়া যায়। মূল “শুভ পুরাণের” সময়ে পাঁচ পণ্ডিত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্বেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই, গোসাঞি। এই পাঁচজনের মধ্যে রামাই ও গোসাঞি পরে লাউসেনী দাঁড়ায় স্থান পাইয়াছেন, অল্প তিন পণ্ডিত পান নাই। ইহার রামাইব বহু পূর্ববর্তী, সত্য ত্রেতা ষাপর যুগের বিবেচিত হইতেন। শ্বেত, নীল, কংস বা কাংস্ত নাম দেখিয়া শ্বেত নাল গীতবর্ণ মনে করিবার হেতু নাই। মনঃক্লান্ত হইলে শ্বেত, রক্ত বা তাম্র, পীত, নীল এই পর্যায় হইত, পঞ্চমেরও স্থান হইত না। ধর্মমঙ্গলের কবিকূলে কত রাম নামের গায়ন জন্মিয়াছিলেন। খেলা-রাম, সীতারাম, ঘনরাম, রূপরাম, মাণিকরাম ইত্যাদি

পাইয়া তাহাদিগকে কল্পিত মনে কবা যেমন, বামাইকে রাঙ্গাই মনে করাও তেমন! রামাই তাম্র দিয়া “পণ্ডিত” করিতেন, সে বিধি এখনও চলিয়া আসিতেছে। কে জানে নীলাই লৌহ দিয়া, শ্বেতাই রৌপ্য দিয়া, এবং কংসাই কাংস্ত দিয়া দীক্ষা দিতেন না, কিংবা তাহাদের প্রকৃত নাম এই ছিল না। কাঁসার ও লোহার তাগা ও বালা লোকে পরিত। সে যাহা হউক, তাহার এই এই নামেই রামাই ও গোসাঞির পূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

লাউসেনের সময়ে রামাই ও গোসাঞি ছিলেন কি? ঘনরামের মতে ছিলেন। কিন্তু এটা যে ভুল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তখন গোসাঞি পণ্ডিতও ছিলেন না; তাহার পূজা-পদ্ধতি কিন্তু চলিতেছিল, এবং তাহার প্রমাণে সামুলা প্রথমে রঞ্জাবতীকে এবং পরে লাউসেনকে ধর্মের ব্রত শিখাইয়াছিলেন। অতএব খ্রীষ্টের নবম শতাব্দীর পূর্বে গোসাঞির এবং গোসাঞির পূর্বে রামাইর আবির্ভাব হইয়াছিল। গোঁড়েশ্বর ধর্মপালের সহিত রামাইর কাল-সম্বন্ধ কল্পনার হেতু নাই।

রামাই ও গোসাঞির নিবাস কোথায় ছিল, কোথায় হরিচন্দ্র রাজা ধর্মের দেউল তুলিয়াছিলেন, এবং কোথায় রঞ্জাবতী পুত্র-লাভের আশায় লৌহ কণ্টকের উপর শূইয়াছিলেন? রামাই পণ্ডিতের জন্ম ও দীক্ষা সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে, “শুভ পুরাণের” ভূমিকায় শ্রীযুত বসু মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখি, তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। সে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়, কি স্মাত, কি শাকদ্বীপী ছিলেন, তাহা জানা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন, নহিলে গানের ভণিতায় ষিদ্ধ রামাই বলিতে পারিতেন না। তাহার পৈত্রিক বাস বারিকা-পুরীতে। পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়; তাহাকে ধর্মঠাকুর পালন করেন, এবং ষষ্ঠা বয়সে তাম্র-দীক্ষা দেন। তখন তিনি ধর্মের পণ্ডিত হইয়া ধর্মপূজা প্রচার করিতে থাকেন। বংশ না থাকিলে কে তাহার পর পণ্ডিত হইবেন, এই চিন্তায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে এক কন্যা বিবাহ করেন। এই কন্যার জাতিকুল লেখা নাই।

তাহার ধর্মদাস নামে এক পুত্র জন্মে। হনিই পরে গোসাঞি পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। বোধ হয়, তিনি পিতা রামাইর পূজা-পদ্ধতির বিস্তার করেন, এবং পদ্ধতি মূলে রামাইর হইলেও তাহার পুত্রের উপাধি গোসাঞি নামে প্রসিদ্ধ হয়। ধর্মদাসকেও বিবাহ করিতে হয়, নইলে পণ্ডিত বংশ লুপ্ত হয়। কালিন্দী নদীকূলে সদা নামে এক ডোম বাস করিত, ধর্মদাস তাহার কন্যা বিবাহ করেন। ক্রমে রামাইর বংশ বিস্তৃত হয়। রামাই ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাহার পুত্র ধর্মদাস শূদ্রকন্যা জাত। একালে প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। ধর্মদাসের পুত্র ডোম কন্যা বিবাহ করেন। কাজেই তাহার বংশ ডোম তুল্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা ডোম বা বেণুকর বংশ বলিতে পারা যায় না।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্বদক্ষিণে ময়নাপুর গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশ আছে। বাঁকুড়ায় ধর্ম-পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলে, পণ্ডিত বলিলে কেহ বুঝিতে পারে না। এই অপভ্রংশ পুরাকালের সাক্ষী। ময়নাপুর বৃহৎ গ্রাম, এখানে ২২ পাড়া এবং তিনচারি হাজার লোকের বাস আছে। গ্রামের মাঝে অজি পুরাতন এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নাম হাকম্ব পোখর। বারুকীর সময় ইহার পাড়ে মেলা বসে, যাজীরা ইহাতে স্নানের জল পায় না, পুখর বুজিয়া গিয়াছে, কাদা জলই মাথায় দেয়। ময়নাপুরের তিন পাশে এখনও বন। উত্তরে ও পূর্বে মাইল খানেক দূরে এক জোড় (ক্ষুদ্র খাল) বহিয়া গিয়াছে, নাম আমূল নদী, নীচে নাম আমোদর, মান্দারণ দিয়া গিয়াছে। ময়নাপুরের ৭৮ মাইল উত্তরে এবং আর একটু দূরে পূর্বে দ্বারিকেশ্বর নদী বাকিয়া বহিয়া গিয়াছে। আমি ময়নাপুর দেখি নাই, কিন্তু ময়নাপুর-বাসীর মুখে শুনিয়া মনে হইয়াছে, গ্রাম পুরাতন, আপনি বড় হয় নাই, পূর্বকালে কেহ বসাইয়াছিল। বোধ হয়, রামাইর পৈত্রিক বাস ময়নাপুরের পূর্বদিকে দ্বারিকেশ্বর নদী কূলে ছিল। এই নদীর প্রাচীন নাম দারিকেশী। বহুকাল কোথায় ছিল জানা নাই। হয়ত সেটা এখন আমূল বা আমোদর নাম পাইয়াছে। ময়নাগড় হইতে রঞ্জাবতীকে সে স্থানে আসিতে হইয়াছিল। তমলুক

হইতে ৮ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ময়নাগড়। এই গড়ে বাইতে হইলে কালিন্দীনদী পার হইতে হইত। সেটা মেদিনীপুরের কংসাই নদীর একটা শাখা ছিল, এখন ময়নাগড়ের কাছে কালিন্দী বুজিয়া গিয়াছে। ময়নাগড় হইতে রঞ্জাবতী তমলুক দিয়া প্রথমে রপনারায়ণ এবং উপরে দ্বারিকেশ্বর দিয়া রামাইর বাসস্থানে আসিয়াছিলেন। তখন সেটা তীর্থ হইয়া পড়িয়াছে। হরিচন্দ্র রাজা বহুকাল বনভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; দৈবক্রমে মনে হয় না, রামাইর ধর্মঠাকুরের প্রসিদ্ধি শুনিয়া আসিয়াছিলেন। দ্বারিকা পুৰী, বোধ হয়, বর্তমান দ্বারকা নামের গ্রাম। কিন্তু এই নাম প্রাচীন নহে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বৈষ্ণব হইবার পর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থলের নামে দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন নামে নিকটে নিকটে গ্রামের নাম রাখিয়াছিলেন।

রামাইর নিবাস পাইলাম, কাল কত? রামাইর জন্ম বৃত্তান্তে আছে,

বৈশাখীয়া শুক্লপক্ষে জন্ম তাহার।
পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভদিনে এগব হইলা ব্রাহ্মণী।

এই পদের ভাষা আধুনিক বটে, কিন্তু দিনজ্ঞাপনের রীতি প্রাচীন। বৈশাখীয়া শূক্ল পঞ্চমী—এই যে চান্দ্রমাস ও দিন গণনা, এইটি প্রাচীন। সৌর মাস ও দিন গণনা—যেমন আষাঢ় মাসের ৯ দিন—কোন শকে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানা নাই। এক দিনে হয় নাই, অল্পে অল্পে হইয়াছে; বোধ হয় ১৫০০ শকের অধিক পূর্বে হয় নাই। আরও দেখা যাইতেছে, উক্ত জন্মদিনের বর্ণনা গ্রহাচার্যের লিখিত। কৃত্রিম কিনা, কে জানে। একটু খাটিলে ধরা পড়িতে পারে, এবং ৮০০—৯০০ শকের মধ্যে উক্ত তিথি নক্ষত্র বার পাইলে শকও ঠিক হইয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে যাইাদের চর্চা আছে, তাহারা দেখিতে পারেন।

ঘনরামের মতে ধর্মের অষ্টগৃহীত ও বিখ্যাত ভক্ত বার জন ছিলেন। (১) ভোজ মহারাজা, (২) ধূপ দত্ত, (৩) মধুর ঘোষ, (৪) মহীমুখ ব্রাহ্মণ, (৫) কালুঘোষ, (৬) হরিচন্দ্র রাজা, (৭) সদা ডোমেব পুত্র, (৮) আসাই চণ্ডাল, (৯) দ্বিজ মহীপাল, (১০) শিবদত্ত বারুই, (১১) হরিহর বাইতি, (১২) লাউগেন। ইহাদের প্রত্যেকের জীবনে ধর্মের মহিমা

প্রকাশিত হইয়াছিল, পূর্বকালের লোকেরা জানিত। স্বনবামের সময়ে, কিংবা তাহার গুরু ময়রভট্টের সময়ে সে-সব কাহিনী কীপ পড়িয়াছিল, কেহ গানে বাঁধিয়া রাখে নাই, কিংবা রাখিয়াছিল আমবা পাই নাই। ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের পূজ্য হইলে সে-সব কাহিনী সংস্কৃত পুবাণে প্রবিষ্ট হইত, কিংবা উপপুরাণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। তথাপি পরম্পরায় ভোজ মহারাজা, ধর্মের আদ্য পুজা, মহারাজার যোগ্য বটায় দিয়াছিলেন। ধূপদত্ত মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্মের দেউল দিয়াছিলেন; হরিচন্দ্র রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র বলি দিয়াছিলেন; সদা ভোমের ঘরে ব্রাহ্মণঅতিথি-রূপে ধর্ম দেণা দিয়াছিলেন, আসাই চণ্ডালের সিংহান ধানের অন্ধুর জন্মিয়াছিল; ইত্যাদি। অকিঞ্চনের ভক্তি ও তাহাব প্রতি ভগবানের কৃপা যতই হউক, বাজা মহারাজার ভক্তি, বিশেষতঃ তাহার বাহু বহুমূল্য নিদর্শনলোকের চোখেও কানে স্নিগ্ধ পাইছে; এই হেতু হরিচন্দ্র ও লাউসেন অরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ভোজরাজা এত পুরাতন যে লোকে তাহাব কীর্তি ভুলিয়া গিয়াছিল। হয়ত বা “শূন্য পুরাণের” “আদ্য ভূপতির” ধর্মের দেহার নিমাণে তিনি লক্ষ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বাঢ় অঞ্চলের রাজা ছিলেন। মাণিক দ্বীপই বা কোথায়? দ্বীপ অর্থে জল-পরিবেষ্টিত ভূ-খণ্ড নয়। নিন্ম ভূমির মধ্যে উচ্চ ভূ-খণ্ডের নামও দ্বীপ ছিল। এখন তাহা ভিত। হরিচন্দ্র রাজার সময়ে রামাই ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি কখন কোন্ ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন?

ময়না শব্দ যাহাতেই যুক্ত থাকুক, ‘মদনা’ ভিন্ন আর কিছু নয়। ময়নাপুর কি মদনা রাণীর স্থাপিত? ময়নাগড় কি হরিচন্দ্র রাজার নিজ গড়? আশ্চর্য, ময়নামতী গানের ময়নামতী, মদনাবতী; আবার, শূন্য পুবাণে মদনাবতী। সে-গানের ওড়িয়া সংস্করণে হরিচন্দ্র রাজা আছেন; আর খাড়িচন্দ্র যে হরিচন্দ্র নহেন, তাহাও নির্ভয়ে বলিব বজ্র নাই। শূন্য পুরাণেও দেখিতেছি, ধর্মপুজার যজ্ঞে মীননাথ, (হাড়ী) সিদ্ধা, চৌরদিনাথ ভোজন করিয়াছিলেন। আরও আশ্চর্য, ইতিহাসে লেখে, ধর্মপালের রাণীর নাম রঞ্জা দেবী। তিনি সাধুভাষায় রঞ্জা হইয়া পড়েন। এই রপ, কার স্বন্ধে কার মুণ্ড যোজিত হইয়াছে, কে জানে। তবে বুঝি, ভাগ্যে, সেকালের লোকে গায়নের গান শুনিত, ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি করিত, তাই আমরা একালে প্রাচীন মন্দিরের ইতস্ততঃ বিস্মিত হই এক টুকরা ভাঙ্গা ইট দেখিতে পাইতেছি। নিরঞ্জন-করতারের ভক্ত রামাই ধন্য, যিনি ছত্রিশ জাতিকে তাম্র দিয়া, ব্রাহ্মণের অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য পরিত্যক্ত জাতিকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন। আমরা তাহার মহত্ত্ব এখনও বুঝিতে পারি নাই; তিনি ব্রাহ্মণ কি বাইতি ছিলেন, সে বিচারে বলিয়া গিয়াছি। তিনিও হঠাৎ আবির্ভূত হন নাই। তাহার পূর্বে অন্ততঃ তিনজন পণ্ডিত জন্মিয়া পণ্ডিতের কানে নিরঞ্জনের নাম শোনাইয়াছিলেন। তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কেবল এইটুকু বুঝিতেছি, ধর্মের গান বহু, বহু কালের।

ভবঘুরের চিঠি

মার্কিনে ভারতবাসীদের পৌর অধিকার রক্ষার জন্ত যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়া আমার জী ও আমি ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৭) তারিখে নিউইয়র্ক হইতে নর্থ আর্থান্ লেড্ কোম্পানীর “বালিন” নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলাম। ইতিপূর্বে আমরা বালিন জাহাজে একবার ক্রান্তের সের্ভর্গ বন্দর হইতে নিউ ইয়র্কে

গিয়াছিলাম; জাহাজের কাপ্তেন, প্রধান ষ্টয়ার্ড ও ডাক্তার আমাদের বিশেষভাবে জানিতেন। কাজেই আমাদের বিশেষ খাতির করিয়া যাহাতে কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তাহার জন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক হইতে ইউরোপ যাত্রা করিবার সময় আমার জীর ব্রহ্মাইটিস্ অস্থির ছিল, সমুদ্রের হাওয়ায় ২;৩ দিনের মধ্যে অনেক উপকাব হইল।

প্রকাশিত হইয়াছিল, পূর্বকালের লোকেরা জানিত। যখন যমের সময়ে, কিংবা তাহার গুরু ময়রভট্টের সময়ে সে-সব কাহিনী ক্ষীণ পড়িয়াছিল, কেহ গানে বাঁধিয়া রাখে নাই, কিংবা রাখিয়াছিল আমরা পাই নাই। ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের পূজ্য হইলে সে-সব কাহিনী সংস্কৃত পুরাণে প্রবিষ্ট হইত, কিংবা উপপুরাণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। তথাপি পরম্পরায় ভোজ মহারাজা, ধর্মের আদ্য পূজা, মহারাজার যোগ্য অর্টার দিয়াছিলেন। ধূপদত্ত মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্মের দেউল দিয়াছিলেন; হরিচন্দ্র রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র বলি দিয়াছিলেন; সদা ডোমের ঘরে ব্রাহ্মণঅতিথি-রপে ধর্ম দেখা দিয়াছিলেন, আসাই চণ্ডালের সিংহান ধানের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল; ইত্যাদি। অকিঞ্চনের ভক্তি ও তাহার প্রতি ভগবানের কৃপা যতই হউক, রাজা মহারাজার ভক্তি, বিশেষতঃ তাহার বাহু বহুমূল্য নিদর্শনলোকের চোখেও কানে শীঘ্র পইছে; এই হেতু হরিচন্দ্র ও লাউসেন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ভোজরাজা এত পুরাতন যে লোকে তাহার কীর্তি তুলিয়া গিয়াছিল। হযত বা “শূত্র পুরাণের” “আদ্য ভূপতির” ধর্মের দেহারা নির্মাণে তিনি লক্ষ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় রাঢ় অঞ্চলের রাজা ছিলেন। মাণিক দ্বীপই বা কোথায়? দ্বীপ অর্থে জল-পরিবেষ্টিত ভূ-খণ্ড নয়। নিম্ন ভূমির মধ্যে উচ্চ ভূ-খণ্ডের নামও দ্বীপ ছিল। এখন তাহা ভিৎ। হরিচন্দ্র রাজার সময়ে রামাই ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি কখন কোন্ ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন?

ময়না শব্দ যাহাতেই যুক্ত থাকুক, ‘মদনা’ ভিন্ন আর কিছু নয়। ময়নাপুর কি মদনা রাণীর স্থাপিত? ময়নাপুড় কি হরিচন্দ্র রাজার নিজ গড়? আশ্চর্য, ময়নামতী গানের ময়নামতী, মদনাবতী; আবার, শূত্র পুরাণে মদনাবতী। সে-গানের ওড়িয়া সংস্করণে হরিচন্দ্র রাজা আছেন; আর খাড়িচন্দ্র যে হরিচন্দ্র নহেন, তাহাও নির্ভয়ে বলিবার জো নাই। শূত্র পুরাণেও দেখিতেছি, ধর্মপূজার যজ্ঞে মীননাথ, (হাড়ী) সিদ্ধা, চৌরঙ্গিনাথ ভোজন করিয়াছিলেন। আরও আশ্চর্য, ইতিহাসে লেখে, ধর্মপালের রাণীর নাম বগ্না দেবী। তিনি সাধুভাষায় বগ্না হইয়া পড়েন। এই রপ, কার স্বস্তে কার মুণ্ড যোজিত হইয়াছে, কে জানি। তবে বুঝি, ভাগ্যে, সেকালের লোকে গায়নের গান শুনিত, ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি করিত, তাই আমরা একালে প্রাচীন মন্দিরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হই এক টুকরা ভাঙ্গা ইট দেখিতে পাইতেছি। নিরঞ্জন-করতারের ভক্ত রামাই শূত্র, যিনি ছত্রিশ জাতিকে তাম্র দিয়া, ব্রাহ্মণের অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য পরিত্যক্ত জাতিকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন। আমরা তাহার মহত্ব এখনও বুঝিতে পারি নাই; তিনি ব্রাহ্মণ কি বাইতি ছিলেন, সে বিচারে বসিয় গিয়াছি। তিনিও হঠাৎ আবির্ভূত হন নাই। তাহার পূর্বে অন্ততঃ তিনজন পণ্ডিত জন্মিয়া পণ্ডিতের কানে নিরঞ্জন নাম শোনাইয়াছিলেন। তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কেবল এইটুকু বুঝিতেছি, ধর্মের গান বহু, সেকালের।

ভবঘুর্যের চিঠি

মার্কিনে ভারতবাসীদের পৌর অধিকার রক্ষার জন্ত যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়া আমার জী ও আমি ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৭) তারিখে নিউইয়র্ক হইতে নর্থ জার্সান লয়েড কোম্পানীর “বালিন” নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলাম। ইতিপূর্বে আমরা বালিন জাহাজে একবার ফ্রান্সের সেরবুর্গ বন্দর হইতে নিউ ইয়র্কে

গিয়াছিলাম; জাহাজের কাপ্তেন, প্রধান ষ্টয়ার্ড ও ডাক্তার আমাদের বিশেষভাবে জানিতেন। কাজেই আমাদের বিশেষ খাতির করিয়া যাহাতে কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তাহার জন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক হইতে ইউরোপ যাত্রা করিবার সময় আমার জীর ব্রুকাইটসে অস্থিত ছিল, সমুদ্রের হাওয়ায় ২৩ দিনের মধ্যে অনেক উপকার হইল।

আমাদের জাহাজে আমি একমাত্র ভারতবাসী এবং আমার সহযাত্রীদের মধ্যে ইংরেজ, জার্মান ও আমেরিকান। জাহাজের কাপ্তেন আমার স্ত্রী ও আমাকে কয়েকবার তাঁহার ক্যাবিনে লইয়া গিয়া নানা প্রকারের আলাপ করেন এবং একদিন আমাদের তিনজনের এক সঙ্গে ফোটো লইলেন। যতদিন জাহাজে ছিলাম প্রত্যেক দিন আমার মনে এই কথা শতবার উঠিত—“ভারতবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটি; কিন্তু ভারতবাসীর মধ্যে একজনও জাহাজের কাপ্তেন নাই, ভারতবাসীদের বাণিজ্য-পোত, রণপোত নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।



ডাক্তার ও মিসেস্ তারকনাথ দাস ও
বালিন জাহাজের কাপ্তেন “মিঃ রেন”

ভারতবাসীরা যখন ব্যবসার জন্ত, বিদ্যোপার্জনের জন্ত বিদেশে যান তখন তাঁহাদিগকে পরনির্ভরশীল হইয়া শত প্রকারের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আমি কখনও ইংরেজের জাহাজে চড়ি নাই; তবে শুনিয়াছি, যে, ইংরেজের জাহাজে ভারতবাসীকে নানা প্রকারের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যতদিন ভারতবাসীরা নিজেদের জাহাজে বিদেশ যাত্রা করিতে স্বযোগ পাইবেন না ততদিন তাঁহারা জাপানি জাহাজ, জার্মান জাহাজ বা সুইডিস্ জাহাজে ভ্রমণ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার পাইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস।”

আমাদের জাহাজ প্লিমথ্ (ইংলণ্ড) এবং সেরবুর্গ

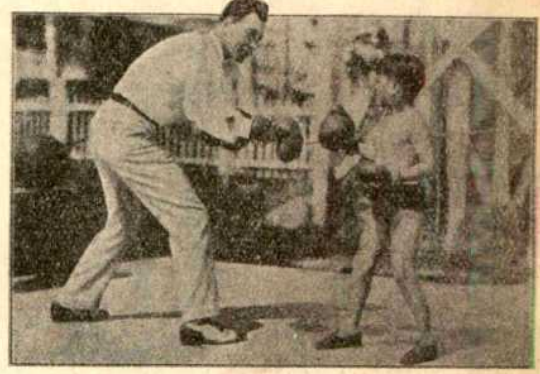
(ফ্রান্স) হইয়া ১লা মার্চে ব্রেবন (জাৰ্মানি) পৌছিল। জাহাজ হইতে নামিবার পূর্বে আমেরিকা হইতে এক তার পাইলাম, যে, আমাদের বন্ধু শ্রদ্ধেয় রিচার্ড হিল্গার, যিনি আমার অল্পরোধ অল্পপারে গত বৎসর ঋষি রবীন্দ্র-নাথকে ডুসেল্ড্রফের স্বরূপ মেলায় বক্তৃতা করিবার জন্ত বন্দোবস্ত করেন, হঠাৎ মারা গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, কারণ মিষ্টার ও মিসেস্ হিল্গার অতি অমায়িক এবং প্রকৃত সাহসি। প্রকৃতির লোক এবং আমরা তাঁহাদের বাড়িতে নিজেদের ঘরের মত ছিলাম। আমরা পর দিন পোজান্সজি ডুসেল্ড্রফে যাত্রা করিলাম এবং তথায় মিসেস্ হিল্গার ও তাঁহার পুত্র-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং আমাদের মৃত বন্ধুর কবরের উপর আমাদের শ্রদ্ধা-বাক্যক ফুল ইত্যাদি দিয়া—পর দিন “বাদেন-বাদেন” সহরে যাত্রা করিলাম। পক্ষে আমাদের ফ্রাঙ্কফুট সহরে রাত্রি যাপন করিলাম। জার্মানিতে আসার পর থেকে একটু শাস্তির ভাব প্রাণে আসিল—জার্মানিতে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ নাই বলিলেই হয়। তারপর শিক্ষিত জার্মান মাত্রেই ভারতের অতীত গৌরব ও ভারতের দর্শন সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানে এবং তাহার প্রাণের সহিত ইচ্ছা করে যে, ভারতবাসীরা একদিন স্বাধীন হউক। বর্তমানে জার্মানি এক পক্ষে শক্তিশীন; জার্মানদের দেশে বৈদেশিক সৈন্য (ইংরেজ ও ফরাসী) রাইন নদীর প্রদেশে আড্ডা গাড়িয়া বাসিয়া আছে। জার্মানির রাজকর হইতে বাৎসরিক প্রায় ত্রোড় টাকা জার্মানির পুরাতন শত্রুদের দিতে হয়। জার্মানি ইচ্ছামত জল স্থল ও বায়ু-যুদ্ধের সরঞ্জাম বৃদ্ধি করিতে পারে না। জার্মানির কতকগুলি দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছে এবং জার্মান জনসাধারণ করভারপীড়িত। কিন্তু জার্মান জাতির মধ্যে একটা অসীম শক্তির চিহ্ন দেখা যায় এবং এই পতিত ও যুদ্ধ পরাজিত জাতির উত্তম, অধ্যবসায় এবং আত্মোদ্ধারের অদম্য প্রয়াস দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। কোন জার্মান তাহাদের যুদ্ধ পরাজয়ের জন্ত তাহাদের পুরাতন শত্রুদের দোষ দেয় না। সাধারণতঃ তাহারা বলে, “আমাদের দেশের রাজনীতিবিহারন্ মন্ত্রিগণ যদি অন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের যোদ্ধাদের

মত দক্ষতা দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের এই পরাজয় হইত না।” জার্মানিতে লোকে অতীতের কথা চর্চা করিতে চায় না। কি করিয়া পুনরায় জগতের মধ্যে মহাশক্তিশালী জাতি হইতে পারিবে সেইজন্য জার্মান শিল্পক, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদপত্র-সম্পাদক, অধ্যাপক ও জনসাধারণ খাটিতে প্রস্তুত। আমার বিশ্বাস এই যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জার্মানি স্বাধীনতা-ক্ষেত্রে, ব্যবসায়, শিক্ষা-বিষয়ে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের শক্তিতে সর্বপ্রধান রাজশক্তির মধ্যে পুনরায় গণ্য হইবে। জার্মান জাতি জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য সাধনা করিতেছে। সাধনার ফলে উন্নত হইবে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

জার্মানির জাতীয় সাধনার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা এই চিঠির মধ্যে সম্ভব নয়। শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিভাবে উন্নতি-প্রয়াস চলিতেছে, তাহা যাহারা ভাল করিয়া বুঝিতে চান, তাহারা ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সভা দার ফিলিপ ডগনের লিখিত নূতন পুস্তক জার্মান শিল্পের পুনরুত্থান (Germany's Industrial Revival) পড়িবেন। তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। যদি কোন জাতি কখন বড় হইতে চায়, সে-জাতিকে অপর দেশের সঙ্গে নানা প্রকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে-জাতিকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নামিতে হইবে এবং জাতীয় বাণিজ্য-পোত গড়িয়া তুলিতে হইবে। পুরাকালে ভারত, চীন, গ্রীস্ অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল; পরে ইতালি, স্পেন, তুর্কি, ইংলণ্ডের বাণিজ্য-পোত এবং রণতরী জাতীয় উন্নতির ও প্রভাবের প্রধান সহায় হইয়াছিল; বর্তমানে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের রণতরীর ও বাণিজ্য-পোতের প্রভাব সকলের জানা আছে। যদি গত যুদ্ধে জার্মানির রণতরী ও বাণিজ্যতরী শত্রুহস্তগত না হইত, তাহা হইলে জার্মানি আজ মহাবলশালী রাজশক্তির মধ্যে গণ্য হইত। ভাবুগাই সন্ধির ফলে জার্মানি বড় বড় রণতরী নির্মাণ করিবার অধিকার হারাইয়াছে এবং জার্মানির অধিকাংশ বাণিজ্যতরী জম্মী জাতিরা বিশেষতঃ

ইংলণ্ড লইয়াছিল; কিন্তু অদম্য প্রয়াসের ফলে আজ জার্মান জাতি বাণিজ্যে উন্নতির পথে চলিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ নর্থ জার্মান লয়েড্ কোম্পানির অতীতের এবং বর্তমানের কথা বিচার করা যাউক। ৭০ বৎসর পূর্বে এই কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৯১৪ সালে যুদ্ধের পূর্বে সমস্ত জগতের মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ জাহাজ লাইনের স্থান অধিকার করে এবং সেই সময় এই কোম্পানির ৪৯৪ খানা জাহাজ ছিল; তাহার মোট “গ্রোস্ টনেজ” ২২৫,০০০ টন ছিল। যুদ্ধের শেষে এই কোম্পানীর মাত্র ৫৭,০০০ টনের ছোট জাহাজ ছিল।



জার্মানিতে ব্যায়াম-শিক্ষার নমুনা

গত ৭৮ বৎসরের যাত্রা আজ এই কোম্পানির জাহাজ ও বাণিজ্য পুনরায় খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯২৫ সালের শেষে এই কোম্পানির মোট “গ্রোস্ টনেজ” ৬১৩,১৫৬ টন এবং ৪১৮ খানি জাহাজ ছিল। এই জাহাজগুলির মধ্যে ১১৭ খানি সমুদ্রগামী বাণিজ্যতরী এবং তাহাদের মোট “গ্রোস্ টনেজ” ৩৪৮,০২০ টন। ১৯২৫ সালের শেষ সময়ে এই কোম্পানী ১২,৭৩৪ জন লোককে চাকরী দিয়াছে। ১৯২২ সালে এই কোম্পানী ২৩,৭৪৮ জন যাত্রী, ১৯২৩ সালে ৫৩,৮২০, ১৯২৪ সালে ৬০,৮০২, এবং ১৯২৫ সালে ৯১,০৯৬ জন যাত্রী বহন করিয়াছে। এই কোম্পানির সমৃদ্ধির চিহ্ন এই যে, ১৯২৪ সালে ইহার শেষের ৬০ বা ৭০ মার্কে বিক্রয় হইতেছিল এবং বর্তমানে উহা ১৪০ মার্কে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধের পর এই কোম্পানি ৩২,০০০ টনের “কলম্বুস্” নামক জাহাজ গড়িয়াছে এবং ১৯২৮ সালের মধ্যে “ইউরোপ” ও

“ব্রেসেন” নামক দুইখানি ৪৬,০০০ টনের জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজ তৈর্য্যারী সম্পূর্ণ হইবে।

আমরা যদি হামবুর্গ আমেরিকা লাইন্স, হান্সা লাইন্স ও অন্যান্য জার্মান জাহাজ লাইনের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে, তাহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে। পরাজিত এবং বিপন্ন জার্মানির রাজসরকার জাহাজ কোম্পানিগুলির উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি জার্মান গভর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, ১লা এপ্রিল ১৯২৭ সাল হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য, যে-সমস্ত কোম্পানি নূতন জাহাজ নির্মাণ করিবে, তাহাদের মধ্যে বার্ষিক প্রায় ১৩০,০০,০০০ এক কোর ত্রিশ লক্ষ টাকা সরকারের তহবিল হইতে সাহায্য স্বরূপ ঝাঁটিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে জার্মানির জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে জার্মানিতে ৬০০,০০০ ছয় লক্ষ বা ততোধিক টনের জাহাজ-নির্মাণ-কার্য চলিতেছে।

জার্মানির অন্যান্য শিল্পের যে অবস্থা ভাল, তাহা কোম্পানির অংশের মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ জার্মানির সহিত লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছে; পটাশ ব্যবসায়ে ফ্রান্স ও জার্মানি যৌথ কারবার আরম্ভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের বড় বড় ব্যবসায়ীরা জার্মানির সঙ্গে মিলিয়া ব্যবসার প্রস্তাব করিতেছে। আমেরিকা জার্মানিকে টাকা ধার দিতেছে, কারণ আমেরিকার ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়িকগণের দৃঢ়বিশ্বাস যে, জার্মানীর উন্নতি অবশ্যস্বাভাব্য।

জার্মানির লোকসংখ্যা ছয় কোটি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিতেছেন। পূর্বে জার্মানির প্রত্যেক যুবকে সামরিক শিক্ষা করিতে হইত; বর্তমানে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সহরে, নানা প্রকারের ব্যায়াম-ছেলে, মেয়ে যুবক যুবতীদের জন্য—শিক্ষার বন্দোবস্ত চলিতেছে। জার্মানীতে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রণালী

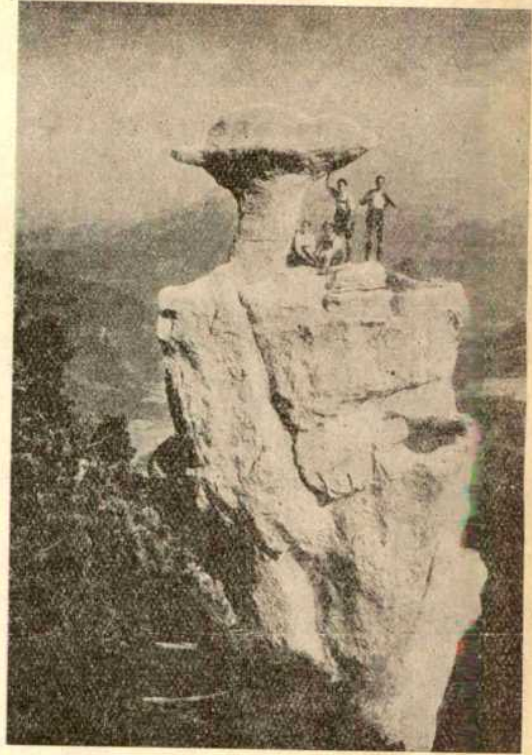
শিখাইবার জন্য প্রত্যেক বড় বড় সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালীর প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে এবং “সিনেমাতে” নানা প্রকারের ব্যায়ামের ছবি এবং রোগ-নিবারণের প্রণালীর ছবি দেখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জগতের মধ্যে জার্মানিতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং হাসপাতাল, স্যানিটোরিয়াম, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের রোগের বিশেষ চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। এই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-প্রণালী ধনী ও দুরিদ্ভের আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ গরীবলোক গরীব ভাবে থাকিয়া সর্বোৎকৃষ্ট জল বায়ু পরিবর্তক স্থানে (watering place) সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা পাইতে পারে।

আমার জ্বর ব্রংকাইটিস্ চিকিৎসার জন্য আমার বাদেন-বাদেন সহরে প্রায় একমাস অবস্থান করিলাম এবং ১লা এপ্রিল আমরা কালস্ক্রু সহর ও ইটগার্ট হইয়া মিউনিক আসিলাম। আমরা মিউনিকে দুইমাস কাল অবস্থান করি এবং ১লা জুন “বাদ রাইসেন হল্”—এ আসিয়াছি। আমরা যখন মিউনিকে ছিলাম তখন প্রত্যেক সপ্তাহে কোন পাহাড়ে বা হ্রদের স্থানে যাইতাম। এই ছোট ছোট ভ্রমণ-সময়ের কয়েকটি ঘটনার কথা বলিব।

একদিন প্রাতে আমরা মিউনিক হইতে “পার্টেন কিরুথেন” গ্রামের নিকটস্থ “ব্যাডেরিয়ান আলসের চূড়া” যাহাকে “বুগস্ স্পিটসে” বলে, দেখিতে যাইতেছি, ট্রেনে একজন ভদ্রলোক জার্মান ভাষায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি ব্রাজিলিয়ান?”। ভদ্রলোকটি একজন ব্রাজে-লিয়ান ব্যবসায়ী। তিনি তাঁহার জী ও চারটি পুত্র লইয়া জার্মানিতে কয়েক মাসের জন্য আসিয়াছেন। নানা কথা-বার্তার পর তিনি বলিলেন, “শিক্ষিত ভারতবাসী যদি ব্রাজিলে যান তাঁহাদের কোন প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না। ব্রাজিলে কৃষ্ণাঙ্গ-বিষেব নাই; অনেক নিগ্রো বড় বড় রাজনৈতিক পদ অবিকার করে। ব্রাজিলে শতকরা ৭০ জন লোক ইউরোপীয়ান ও নিগ্রো, বা ইউরোপীয়ান ও ব্রাজিলের আদিমবাসী, অথবা নিগ্রো ও আদিমবাসীর মিশ্র-বিবাহের ফল। ব্রাজিলের সরকার লোক চায়। কাজেই গতবৎসর প্রায় ছয় হাজার জাপানি-

দের জমি দিয়া বসবাস করিবার জন্ত স্বযোগ দিয়াছে।
ব্রাজিলের প্রত্যেক ধনী ও মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে-
মেয়েরা কৃষ্ণাঙ্গ খাইর ছুখে পুষ্ট হয় এবং এই চাকরাণীদের
“ব্রাক মাদার” “কৃষ্ণাঙ্গ মাতা” বলিয়া থাকে এবং সম্প্রতি
এই কৃষ্ণাঙ্গ চাকরাণীদের বা কৃষ্ণাঙ্গ মাতাদের স্মৃতিরক্ষার্থ
প্রায় এক কোর টাকার স্মৃতি-মন্দির গঠনের জন্ত
জনসাধারণ টাকা উঠাইতেছে। ইংরেজের রাজ্যে
ভারতবাসীর সম্মানের স্থান নাই বলিলে
অত্যাুক্তি হয় না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কর্মক্ষেত্র করিয়া
বাজালাই যুবক জগতে বাহির হইয়া পড়—
আমাদের বিশ্বজয় করিতে হইবে; কেবল ঘরে
বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না।

আর একদিন আমরা ব্যাভেরিয়ান আল্পসের মধ্যস্থিত
“মিটেন ওয়াল্ড্” (মধ্যবন) সহরে যাই। আমরা যখন
ট্রেনে আসিয়া প্ল্যাটফর্মে বেড়াইতেছি হঠাৎ দুইটি
১৬১৭ বৎসরের বালিকা আমাদের কাছে আসিল।
ইহাদের মধ্যে একজন আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,
“আপনি কি একজন ইংরেজ মহিলা?” আমার স্ত্রী হাসিয়া
বলিলেন, “না, বালিকা, আমি একজন মার্কিন মহিলা;
আমার স্বামী একজন ভারতবাসী।” বালিকা তখন বলিল,
“আমি একটি ইংরেজ বালিকা, প্রায় তিনমাস পূর্বে আমি
এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে একটি জার্মান
বালিকাদের বোর্ডিং স্কুলে থাকি; আমি জার্মান শিখিতেছি
এবং আমার নিকট হইতে মেয়েরা ইংরেজী শিক্ষা করে।
আমার সঙ্গী আমার স্কুলের ছাত্রী। আজ তিন মাসের
পর আপনাদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কহিয়া কত আনন্দ
হইল।” আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,
“একলা বিদেশে আসিতে তোমার ভয় হয় নাই? জার্মানিতে
তোমার কোন কষ্ট হয় কি?” মেয়েটির মুখখানা লাল
হইল এবং সে বলিল—“ইংলণ্ড ছাড়িবার সময় মনে মনে
একটু সন্দেহ হইয়াছিল, যে, জার্মান মেয়েরা আমায় হয়ত
ইংরেজ বলিয়া ঘৃণা করিবে। গত যুদ্ধের ফলে আমাদের
দেশে জার্মানীর লোককে বর্ষের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে;
কিন্তু আমার জীবনে এত দয়া, মমতা এবং সখ্যভাব অল্প
কাহারও কাছে পাই নাই। আমার সহপাঠী জার্মান



বাদ রাইফেন হলের নিকটস্থ ব্যাভেরিয়ান আল্পসের
একটি চূড়া

বালিকারা আমার নিজেদের বোনের মত ভালবাসে এবং
এই জার্মান বালিকা আমার বন্ধু।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলাম, “তুমি কিজন্ত জার্মানিতে আসিয়াছ?” তত্বতরে
ইংরেজ বালিকা বলিল, “আমি জার্মান শিখিতে চাই,
এবং আমাদের ইচ্ছা, যে, ইংরেজ ও জার্মানের মেয়েদের
মধ্যে সখ্যভাব বৃদ্ধি হয়; কাজেই জার্মানিতে আসিয়া
জার্মান শিক্ষা ও জার্মান জাতিকে ভাল করিয়া জানা আমার
উদ্দেশ্য।” এই সময়ে আমাদের ট্রেন আসিয়া পড়িল, আমরা
বিদায় অভিবাদন করিয়া গাড়িতে উঠিলাম এবং ট্রেনে
ভাবিতে লাগিলাম ইংরেজ ভারতে অত্যাচারী সন্ত; কিন্তু
ইংরেজের শক্তি, সাধনার ফল। ১৭ বৎসরের ইংরেজ মেয়ে
একলা বিদেশে শিক্ষার জন্ত সাধনা করিতে ভীত বা উৎকণ্ঠিত
নয় আর ভারতে হিন্দু সমাজ সত্যের ধূসর ধরিয়াও
স্বাভাবিক মর্যাদার ভান করিয়া, মেয়েদের শিক্ষা দিবার
স্বযোগ দেয় না এবং ৫৭.৮।১০ বৎসরের বালিকাদের

বিবাহ দেয় এবং জীর্ধ্ব রক্ষার ধূয়া দিয়া নবীন বালিকা-
দের জীর্ধ্ব-বৃত্তি চরিতার্থের বস্তুতে পরিণত করে।
ভারতে সমাজের গলিত অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত সমাজ-
বিপ্লবের প্রয়োজন। এবং যুবক ও যুবতীদের উজ্জ্বল উপর
পতিত ভারত-সমাজের মূর্তি নির্ভর করে।

আর একদিন আমরা “ব্যাভেরিয়ান্স আল্পসের” এক
ছোট গ্রামে যাই এবং সেখানে এক সুন্দর বাড়ীতে
“ক্যাথলিক নার্সিং সিস্টার্সের” আবাসস্থান দেখিলাম।
এই ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা সেবা-ধর্মে দীক্ষিত এবং
রোগীর সেবা করিয়া জীবন যাপন করেন। এই পাহাড়ের
শত শত স্থানে যিশু খৃষ্টের কাঠের মূর্তি দেখিলাম এবং

ছোট ছোট মন্দিরে যিশুর ও তাঁহার মাতা মেরির পূজার
জন্ত বাতি জলিতেছে, দেখিলাম। এসমস্ত দেখিয়া
বুঝিলাম যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে “সেবা-ধর্মের” অভাব নাই
এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিশেষতঃ ক্যাথলিকদের মধ্যে ভক্তি-
মার্গের লোক যথেষ্ট আছে। হিন্দুদের মধ্যে আজ ধর্মের
“খোঁজা” লইয়া লড়াই হয়, হিন্দুরা সেবা-ধর্ম প্রায়
ভুলিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যাক্তি হয় না; তাই না আজ
আমাদের ধর্ম ও সামাজিক জীবনে এত দৌর্বল্য।

৪ঠা জুন, ১৯২৭

ভারতপন্থী

শ্রী তারকনাথ দাস

সন্তর বৎসর

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

৩১

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমমুহুর্তে আমার কনিষ্ঠা
ভগিনীর বিবাহের সঙ্কল্প স্থির হয়। এইজন্ত এ বৎসর
পূজার পরে শ্রীহট্টে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আবার
আমাদিগকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু এই সঙ্কল্প
পাকা দেখার দিনেই ভাঙ্গিয়া যায়। তখনও আমাদের
দেশে বর পণের উৎপীড়ন আরম্ভ হয় নাই। তবে যে-
ক্ষেত্রে বরের পক্ষ কতাপক্ষ অপেক্ষা কুল-মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ,
সেখানে ‘কুলমর্যাদা’ স্বরূপ স্বল্পবিস্তর অর্থোপহার দিতে
হইত। কত দিতে হইবে, সঙ্কল্পের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহা
উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হইত। আমার ভগিনীর সঙ্কল্প
হয় ত্রিপুরা জেলায় সরাইল-পরগণার একটা বিশিষ্ট গ্রামে।
পূর্বেই বোধ হয় কহিয়াছি যে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে বৈদ্য ও
কায়স্থের বিবাহ হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
ত্রিপুরা এবং পূর্বাচাঁকর বৈদ্যেরা শ্রীহট্টের কায়স্থদিগের
অপেক্ষা বেশী কৌলীন্তের দাবী করিয়া থাকেন। যাহার
সঙ্গে আমার ভগিনীর বিবাহের কথা স্থির হয়, তাহার

বৈদ্য এবং এইজন্ত কুল-মর্যাদায় আমাদিগের অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে একটা বর-পণ দিবার কথা হইয়াছিল।
কত টাকা ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ২০০ টাকা হইবে।
ইহাতেই বর-পক্ষীয়েরা রাজী হন, এবং উভয়পক্ষের
সম্মতিক্রমে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। আমাদের অঞ্চলে
বিবাহের প্রথম মাসিক অহুষ্ঠানকে ‘পানে-খিলি’ কহে।
এই দিন বরের বাড়ী হইতে কত্তার বাড়ীতে ভেট
আসে। এবং বোধ হয় ইহার পরে কত্তার বাড়ী হইতেও
বরের বাড়ীতে যথাযোগ্য উপঢৌকনাদি যায়।
কলিকাতায় যাহাকে পাকা-দেখা বলে তাহাতে বর-
পক্ষীয়েরা কত্তাকে এবং কত্তা-পক্ষীয়েরা বরকে যাইয়া
“আশীর্বাদ” করিয়া আসেন। আমার মনে হয়, আমাদের
এই “পানে-খিলি” কতকটা ইহারই মতন। তবে
“পানে-খিলি” অহুষ্ঠানের আড়ম্বর অনেক বেশী। এই
দিনে বর কত্তা উভয়ের বাড়ীতেই নহবৎ বসে এবং সঙ্গে
সঙ্গে উৎসবের অগ্রাঙ্গ অহুষ্ঠানও হয়। আমার যতদূর
মনে পড়ে বোধ হয় এই উপলক্ষে কত্তাপক্ষীয়েরা পল্লীর

জ্যোতিষগণকে—ভ্রাতৃত্ব নিষিদ্ধ—পান সুপারী এবং ভাঁড়ে করিয়া তৈল উপহার দিয়া থাকেন। পুরুষেরাও নিমজ্জিত হইয়া তাম্বুলাদির দ্বারা অভ্যর্থিত হন—ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞাতি ভোজনও হইয়া থাকে। বাবা এই অল্পটানের সকল আয়োজন করিয়াছিলেন। বোধ হয় গ্রামের সামাজিকেরা যথারীতি আমন্ত্রিতও হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে নহবৎ বসিয়াছিল। অস্তঃপুরে পুত্রজ্ঞারা আসিয়া জড় হইয়াছিলেন। বর-পক্ষের লোকের অপেক্ষায় আমরা পথ চাহিয়াছিলাম। এমন সময় বরের পিতার নিকট হইতে একটি লোক একখানি পত্র লইয়া আসিল। তিনি পূর্বকার অজ্ঞাত টাকা অপেক্ষা আরও দুই শত টাকা বেশী—বর-পণের হিসাবেই হউক বা কুলমর্যাদার হিসাবেই হউক—চাহিয়া বসিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমার বাবাকে ভাল করিয়া চিনেন নাই। চাপ দিয়া টাকা লইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবার প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি কখনও এরূপ ছল-চাতুরী বা কল-কৌশল সহ্য করিতে পারিতেন না। বাবা ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। বরের পিতাকে লিখিলেন যে, পূর্বে যদি তিনি চাহিতেন, তাহা হইলে আরও দু'শ কেন হয়ত তার চাইতে বেশী টাকাও দিতে রাজী হইতে পারিতেন; কিন্তু বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া, সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—দেশময় একথা রাষ্ট্র করাইয়া এরূপ চাপ দেওয়াতে তিনি এক পয়সাও দিতে রাজী নন। উৎসবের আয়োজন সকলই বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে যেন একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া ঘেরিল।

পর দিবস বাবা সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন যে, এই অগ্রহায়ণ মাসেই ধ্বংস করিয়া হউক কস্তার বিবাহ দিবেন। সে-সময়ে আট দশ বৎসরের মধ্যেই সচরাচর ভদ্র পরিবারেব বালিকাদিগেব বিবাহ হইত। কিন্তু আমাব বাবা আমার ভগিনীকে যেমন ভৎকালোচিত বাংলা লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন, সেইরূপ একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে অনুঢ়াও রাখিয়াছিলেন। আমাদের অঞ্চলে সে-কালে বালিকাদের বিবাহ অল্প বয়সে হইলেও ক্রমেরা বেশীদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতেন। ২৪।২৫পু

বৎসর পর্য্যন্ত কেহই প্রায় বিবাহ করিতেন না। ২৪।২৫ বৎসরের বর ও ৮।১০ বৎসরের কস্তা বড়ই বেমানান হইত। বোধ হয় এইজন্যই বাবা আমার ভগ্নীকে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত—বোধ হয় তার চাইতেও আরেকটু বেশী অনুঢ়া রাখিয়াছিলেন। আর বেশী দিন তাহাকে ঘরে রাখা যায় না। বিশেষতঃ আদালত হইতে কস্তার বিবাহের ক্ষমতা ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহ না দিয়া সহরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। এই সম্বন্ধের পূর্বেও আরও অনেক সম্বন্ধের কথা আসিয়াছিল। সে কালের লোকেরা প্রজাপতির নির্বন্ধেই মাহুঘেব বিবাহ হয় বিশ্বাস করিতেন। কার ভাগ্যে বিধাতা কোন বর লিখিয়াছেন বলা যায় না। এইজন্য ভাল মন্দ যে-সম্বন্ধই আসুক না কেন তাহারা কোনটাই খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে পূর্বে যে-সকল প্রস্তাব আসিয়াছিল তাহা-ই মধ্য হইতে একটি বাছিয়া সেইখানেই কস্তার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বরের বয়স ২৫।২৬ হইবে। নিকটবর্তী কাছাড় জেলায় পুলিশে কর্ম করিতেন—ইন্সপেক্টর ছিলেন। বংশ-মর্যাদায় আমাদেরই সমকক্ষ বরের খুল্লতাত বাঁচিয়াছিলেন। তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করেন। বাবা এইখানেই কস্তার বিবাহ দিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু আমি তখন বড় হইয়াছি। পুত্র যে-বয়সে মিত্রের মর্যাদা লাভ করে সেই বয়সে আসিয়া পৌছিয়াছি। আমার বড় মামা তখন আমাদের বাড়ীতে। আমার এক জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠত্ব ভাই বাবার কাজ-কর্ম করিতেন। আর বাবার পারবারভুক্ত দাসী-পুত্র দাগু সিং ইঁহার সাক্ষ্যেই তাহার অমাত্যের মত ছিলেন। পারিবারিক কোন ব্যাপারে বাবা ইঁহাদের অমুমতি না লইয়া কেবল নিজের রায়ের উপরে কখনও কোন কাজ করিতেন না। নিজের মনে নূতন সম্বন্ধ করা স্থির কবিয়া সকলের আগে মাকে ঘাইয়া কহিলেন, এবং মার সম্মতি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা সম্মতি দিলেন। তারপর আমার বড় মামাকে ঘাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। আমার জ্যেষ্ঠত্ব ভাই, “দাদা” (দাগু সিং) এবং আমি

—আমরা সকলেই তাঁহার বায়ে বায় দিলাম। আমাদের সম্মতি পাইয়া বাবা বরের খুল্লতাতে লিখিলেন যে, ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যদি তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করেন এবং ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার ভাতৃ-স্পৃত্তকে আপনার কন্যা সম্প্রদান কবিত্তে রাজী আছেন। পাইকেব হাতে অমনি এই চিঠি গেল। সেদিন বোধ হয় ৯ই কি ১০ই অগ্রহায়ণ। এই চিঠি যাওয়ার পরেই আমাদের সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। আমাদের কাবই ইচ্ছা নয় যে, এখানে বিবাহ হয়। কারণ বরটি শ্রীহট্ট এবং কাছাড় দুই জেলাতেই বদ্ধ মাতাল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাবার মুখের উপরে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কবিত্তে আমাদের সাহস হয় নাই। এখন সকলে মাথায় হাত দিয়া বলিলাম। বরকে কাছাড় হইতে আসিতে হইবে, কর্ম হইতে ছুটি লইয়া। যদি কোন হেতুতে ২২শে তারিখেব মধ্যে না আসিয়া পৌছিতে পাবেন, তবেই সকল দিক রক্ষা পায়। বরের খুল্লতাতে মহাশয় বাবার চিঠির জবাবে ২২শে অগ্রহায়ণই বিবাহের দিন ঠিক করিলেন, এবং বরকে তখই ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন এ কথা জানাইলেন। তখন আমরা অন্তোপায় হইয়া আরেকটা টেলিগ্রাম জাল করিয়া বরকে তখনই ছুটি লইয়া আসিতে বারণ করিব স্থির করিলাম। সে জাল তার লেখা হইয়াছিল মনে পড়ে, কিন্তু পাঠান হইয়াছিল কিনা মনে পড়ে না। “পানেথিলির” দিন ধার্য হইল। নির্দ্ধারিত দিনে বিবাহের এই পূর্ববৃত্ত অচুঠান সব হইল। বাড়ীতে আবার নহবৎ বসিল। গ্রামেব আত্মীয় স্বজনে ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকে আমাদের বাহিরবাড়ী ভরিয়া গেল। পুরজীরা অন্তঃপুরে আসিয়া জড় হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্বেই ভবিষ্যৎ জামাতার অনেক কৌষ্ঠিকথা নানা লোকের মুখে মায়ের কানে পৌছিয়াছিল। আমাদের গ্রামের অনেক ভদ্র এবং ভৃত্যশ্রেণীর লোকেরা কাছাড়ে চাকুরী করিতেন, তাঁরা বরের স্বভাব-চরিত্রের কথা জানিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই সময়ে গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। ইহাদের কারও কারও মুখে সে সকল কথা আমাদের অন্তঃপুরে মায়ের কানে পৌছিল। যে-দিন

হইতে মা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন সেই দিন হইতেই তাঁহার আহার-নিদ্রা একরূপ বদ্ধ ছিল। এই ‘পানে-থিলির’ দিন প্রাতে তিনি আর আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বাহিবে যখন নহবৎ বাজিতেছে, লোক-সমাগমে বহির্কাটা কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে, অন্তঃপুরে পুরজীরা আসিয়া জুটিয়াছেন, সেই সময়ে মা চীৎকার করিয়া ‘মড়া কান্না’ জুড়িয়া দিলেন। একখানা বঁটি সম্মুখে রাখিয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই পাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার পূর্বে, কন্যাকে আপনি হত্যা করিয়া নিজে আত্ম-ঘাতী হইবেন। বাবা মহাসঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে কথা দিয়াছেন। আর সমগ্র দেশের লোকে জানিত তাঁহার কথা কখনও টলে না। অত্মদিকে মার এই সাংঘাতিক আপত্তি। মার সম্মতি ব্যতিরেকে এই শুভ-কর্মের সূত্রপাত হইতেই পারে না। কোন পারিবারিক ব্যাপারে পতি পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না —এষা ধর্ম: সনাতন:—বাবার ইহাই আদর্শ ছিল। স্মৃতরাং তাঁর নিজের কথা থাকুক বা যাক তাঁর মানই থাকুক বা অপমানই হউক—কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে বাবা সহধর্মিণীর এই ঘোরতর আপত্তি কিছুতেই অগ্রাহ করিতে পারিলেন না। মর্ম্মস্থদ উৎকর্ষায় একবার অন্তঃপুরে ও একবার বহির্কাটাতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা দেখিয়া আমরা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলাম। অবশেষে আমি মার কাছে যাইয়া তাঁকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, এতটা পাকা কথা পরে এই বিবাহও যদি ভাঙিয়া দিতে হয়, বাবা এ আত্ম-গ্লানি কিছুতেই সহিতে পারিবেন না। এ আঘাতে তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইবে। আমার তখন সেইরূপ ধারণাই হইয়াছিল। মা আমার কথা শুনিয়া কহিলেন,—“আর করিব কি—কপালে যাহা ছিল তাহাই হউক। বল গিয়া ‘পানেথিলি’ দিতে।” আমি বাবাকে আসিয়া সে-কথা বলার পর বিবাহের এই প্রাথমিক মঙ্গলাচুঠান হইল। এইরূপে বিবাহের ছায়াতলে আমার ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বরের রূপ কন্দর্পের মত ছিল। তখনকার হিসাবে লেখাপড়াও বেশ জানিতেন। স্বভাবচরিত্রও অস্বাভাবিক হিসাবে একরূপ নিষ্কল ছিল।

কিছু এক অতিশয় পানাসক্তিতে সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। ইহাই তাহাব অকাল-মৃত্যুবও কারণ হয়। বিবাহেব পাঁচ বৎসর পরে আমার ভাগিনী বিধবা হয়। বৈধব্যের চারি পাঁচ মাস পরে তাহার একটি কন্তাসন্তান হয়। সকলেই তারা এখন ওপারে সিঁদা পৌছিয়াছে।

৩২

ইহার বৎসরখানেক পূর্বে (১৮৭১ ইংরাজীর নভেম্বর মাসের শেষে) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শ্রীহটে যান। বিলাত ও ভারতবর্ষ এখন প্রায় “এঘর-ওঘর” হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যখন বিলাতে যান তখন এইরূপ ছিল না। রাজা রামমোহনই প্রথম বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী। তাঁহার পরে তাঁহার বন্ধু প্রিন্স ঘরকানাথ যুরোপে গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই শিক্ষার্থীরূপে বোধ হয় প্রথম বিলাত যান। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান। তবে তাঁহার কর্মজীবন বোঝাই প্রদেশেই অতিবাহিত হয়, বাংলায় নহে। ইহার পরে তিনজন বাঙ্গালী এক জাহাজে বিলাতে যাইয়া একই-সঙ্গে সিভিলিয়ান হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন—৮রমেশচন্দ্র, ৮বিহারীলাল গুপ্ত এবং ৮সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালের বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীরা পোষাক-পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, চালচলনে—সকল বিষয়েই ইংরাজের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। ইহাদিগকে নির্দেশ করিয়াই নবীনচন্দ্র ‘অবকাশরঞ্জিনী’তে লিখিয়াছিলেন :—

“সিংহচর্মে তুমি মেঘ অন্ন-প্রাণ”

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহটে যাইয়া সাহেবীভাবেই চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করেন। দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সঙ্গেও বাংলায় কথা কহিতেন কি না সন্দেহ। ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা যে-ভাবে থাকিতেন, সুরেন্দ্রনাথও সেই-ভাবেই চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহধর্মিণীও শ্রীহটে গিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যেকোন সর্বদা সাহেব সাজিয়া থাকিতেন, তাঁহার ব্রাহ্মণীও সেইরূপ বিবি সাজিয়া বেড়াইতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়িয়া সহরের সর্বত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহার গৃহিণীও সে-যুগের ইংরাজ

মহিলাদের মত মেয়েজিনে (Lady's Saddle) চড়িয়া অশ্বপৃষ্ঠে অপরাধে হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন। সে-সময়ে ম্যাককার্টিস (McCartis) নামে একজন আর্শেবী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীহটে ছিলেন। ইহার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। ইহার তিন জনে যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন আমরা বালকের দল তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য প্রায়ই রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই সময়ে সাদারুল্যাণ্ড (Sutherland) নামে একজন ফিবিনী সিভিলিয়ান শ্রীহটের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সাদারুল্যাণ্ড একজন অতিকায় পুরুষ ছিলেন। একরূপ গল্প শোনা গিয়াছে যে, ইনি যখন প্রথমে শ্রীহটে বদলী হইয়া যান, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে বা এজলাসে এমন ঢোকী ছিল না যা তাঁহার বিশাল বশু ধারণ করিতে পারে তা তাঁহার ভার সহ্য করিতে পারে। আরও গল্প আছে যে, সাদারুল্যাণ্ড সাহেব প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজের সময় একটা আস্ত মিষ্টি কুমড়া নিঃশেষ করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে শ্রীহটে গেলে সাদারুল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে অতিশয় স্নেহ ব্যবহার আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইহা বড় ভাল লাগে নাই। এই স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়া একটা অতুষ্কার ভাব উঁকি মারিত। সুরেন্দ্রনাথকে সাদারুল্যাণ্ড ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের মধ্যদা না দিয়া এইরূপে তাঁহার প্রতি অত্যাচার প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের আত্ম-সম্মানে ও স্বাভাবিক্যভিমানের আঘাত লাগে। এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া শ্রীহটের ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের এবং সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা অসন্তোষ এবং বিরোধ অলক্ষ্যে ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইয়া যে-মঞ্চে ইংরাজ বিবির বসিয়াছিলেন সেই মঞ্চে আপনার আমার পদোচিত আসন দখল করিয়া বসেন। এই হইতেই সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির আয়োজন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেন নাই যাহার জন্য ত্রায়তঃ ও ধর্মতঃ তাঁহার উপরে এমন সঠার দণ্ড বিহিত হইতে পারিত। মূল ব্যাপারটা কিছুই নহে। একটা ফৌজদারী মামলার নথীতে যে-সকল কথা লিখা

ছিল সুরেন্দ্রনাথ নিজে তাহার প্রত্যেক কথাই সত্যাসত্য নিরূপণ না করিয়া সহি করিয়াছিলেন। ম্যাস্প্রেট (Muspratt) নামে একজন সিভিলিয়ান তখন শ্রীহট্টেব জজ ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার সমুদায় নথী-পত্র পরীক্ষা করিয়া বলেন, সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ অনবধানতা (carelessness)। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কহেন যে, যে-সময়ে তিনি এই ভুল নথী সহি করেন তখন তাঁহার উপরে অত্যধিক কাজের চাপ পড়িয়াছিল। জজ সাহেব হাইকোর্টকে লেখেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকাং হইতে বঞ্চিত রাখিলেই তাঁহার এই সামান্য অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। হাইকোর্ট এবিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করেন জানি না। তবে গবন্মেণ্ট এই সামান্য অপরাধের বিচার করিবার জন্য একটা বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের মন্তব্যের ফলে সুরেন্দ্রনাথকে অধিকাং কলিকতায় ডালি মাধ্যম দিয়া সিভিল সার্ভিস হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। আমি তখন শ্রীহট্ট জেলা জুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। মোটামুটি সুরেন্দ্রনাথের মকদ্দমার সকল কথাই জানিতে পাই। তখনই এই ধারণা জন্মে যে, ইংরাজের রাজ্যে, ইংরাজের আইনে ও আদালতে ইংরাজ যদি বাঙ্গালীর পিছনে লাগে তবে বাঙ্গালীর পক্ষে সুবিচার লাভ একরূপ অসম্ভব। এই-খানেই আমার প্রথম যৌবনের স্বাদেশিকতা এবং স্বাধীনতাভাবের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে।

৩৩

শ্রীহট্টেব জুলে পড়াশুনায় আমি কোন দিনই আমার শিক্ষকদিগের কি আমার সহপাঠীদিগের গণনায় আসিতাম না। তবে মোটের উপরে বাংলা এবং ইংরাজীতে নিত্যন্ত হীন ছিলাম না। যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি তখন জজ সাহেব,—তাঁহার নাম আমার মনে নাই—একদিন আমাদের জুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া ইংরাজী রচনায় আমার ক্লাশের ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার রচনার তারিফ করিয়াছিলেন। কথাটা মনে আছে এই-

জজ সাহেব, আমার সতীর্থেরা জজ সাহেবের এই প্রশংসাবাদ আমার লেখার গুণে পাই নাই, কিন্তু পিতৃপরিচয়ে পাইয়া-ছিলাম ইহা বলিয়া জজ সাহেবের উপরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আবাদ করিয়াছিল। আসল কথাটা এই যে, আমি বাংলা কি ইংরাজী কোন ব্যাকরণই মন দিয়া পড়ি নাই এইজন্য আমার লেখাতে বিস্তর ব্যাকরণ-ভুল থাকিয়া যাইত, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মধ্যে একটা প্রাণলতা থাকিত। আমি সর্বদাই কান দিয়া ভাষার বিচার করিতাম, ব্যাকরণের জ্ঞান দিয়া নহে। আর ব্যাকরণ শুদ্ধই হোক আর অশুদ্ধই হোক আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে কখনও শব্দের অভাব অনুভব করিতাম না। প্রথম প্রথম শব্দেরও অপপ্রয়োগ হইত, কিন্তু মোটের উপরে লেখা শুনাইত ভাল। ক্লাশের বই অপেক্ষা বাহিরের বই বেশী পড়িতাম। আর এবিষয়ে আমার প্রধান শিক্ষক মহাশয় রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু—বছর-খানেক হইল ইনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—সর্বদাই আমাদের উৎসাহিত করিতেন। শ্রীহট্ট জেলা জুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার প্ররোচনায় নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া বাহিরের অনেক বই পড়িত। সেগুলি প্রায় সকলই ইংরাজী কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। এ ছাড়া—অন্তান্ত জুলের কথা জানি না—আমাদের হেড মাষ্টার মহাশয় ইংরাজী শিখাইবার সময় শব্দের মূল ধাতু সর্বদাই শিখাইতেন। Bishop Trench-এর Study of Words আমরা তাঁহার নিকট মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রচলিত ইংরাজী শব্দের প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিত। একজন অস্থিবিদ পণ্ডিতের নাম হইতে অত্যন্ত মূর্থতাবাক্যক ইংরাজী Dunce শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা পড়িয়া আমার অত্যন্ত অদ্ভুত আনন্দ-কৌতূহল হইয়াছিল। লণ্ডনবাসী ছোটলোক ইংরাজেরা “হেরারকে” “এয়ার” বলে আর “এয়ারকে” “হেরাব” বলে এবং nকে হেন্ উচ্চারণ করে এসকল কাহিনী পড়িতে বড়ই আমোদ হইত। এক ব্যক্তি ইতালীয় নগর ভেনিস—Venice লিখিতে যাইয়া একটার জায়গায় দুটো n দিয়াছিলেন। এই বর্ণান্তর সংশোধন করিতে যাইয়া একজন লণ্ডন-বাসী ইংবাজ

বলিয়াছিল, “There is only one ‘hen’ in Venice”। তাহার উত্তরে আরেকজন জিজ্ঞাসা করিলেন—ভেনিসের লোকেরা তবে ডিম পায় কোথা হইতে। Trenchএর পুস্তকে এরূপ অনেক গল্প আছে। এসকল পড়িতে বড়ই আমোদ হইত। শ্রীহট্টের স্থলে থাকিতেই এইরূপে দুর্গাকুমার বসু মহাশয় আমাদের কাছে যে ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন সেই ভিত্তির উপরেই পরজীবনে ইংরাজী ভাবার উপরে যা কিছু দখল লাভ করিয়াছি তাহা গড়িয়া উঠে। স্থলে থাকিতেই বাহিরের ইংরাজী বই কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম—আর ৮বসু মহাশয়ের প্রসাদেই শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলাম।

আমার ছাত্রাবস্থায় ছেলেদের মধ্যে একটা সংস্কার ছিল যে, ইংরাজীতে যারা একটু ভাল হয়, গণিতে তারা কিছুতেই অধিকাংশ সময় ভাল হইতে পারে না। আমারও সেই দশাই হইয়াছিল। পাটীগণিত এবং বীজগণিত আমি কিছুতেই ভাল করিয়া পড়িতে পারিতাম না। এসকল অঙ্ক কষিতে হইলে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত, কিন্তু ইহারই সঙ্গে আবাব জ্যামিতি পড়িতে খুবই ভাল লাগিত। কেন এরূপ হইয়াছিল তখন বুঝি নাই। এখন বুঝিয়াছি যে, যাহাতে কোন একটা সার্বজনীন তত্ত্বের সন্ধান পাইতাম তাহাই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিত। শুষ্ক হিসাব-পত্রে কিছুতেই মন বসিত না। পাটীগণিত এবং বীজগণিতেরও মূল তত্ত্বের সন্ধান পাইলে, বোধ হয়, তাহার প্রতি আমার এত বিতৃষ্ণা জন্মিত না। আজিকালি কিরূপে এসকল শেখান হয় জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, প্রথম হইতেই যদি কেবল কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম (formula) মুখস্থ না করাইয়া গণিতের মূল ও স্তম্ভগুলি শেখান হয় তবে অনেক বালক, যারা গণিত বিদ্যাকে তিস্ত কষাক্ষরূপে বর্জন করিয়া চলে, তাহারা তাহাতেও রস পাইতে পারে।

যেমন ইংরাজী সম্বন্ধে সেইরূপ বাংলা সম্বন্ধেও স্থলে থাকিতেই আমি অনেক বাহিরের বই পড়িয়াছিলাম।

শ্রীহট্টের স্থল ডেপুটি ইন্সপেক্টর ৮নবকিশোর সেন মহাশয় আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি আমাদের বাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন, একথা পূর্বেই কহিয়াছি। তিনি “স্থল বুক সোসাইটির” একজন এজেন্ট ছিলেন। স্থল বুক সোসাইটি প্রথম বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সেবা করিয়াছিলেন। ইহারাই বহু ইংরাজী গ্রন্থের সরল বাংলা অনুবাদ করিয়া দেশময় প্রচার করিয়াছিলেন মাঝে মাঝে ইহাদের প্রকাশিত গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী বাস্তববোঝাই হইয়া বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য সেন মহাশয়ের নিকটে যাইত। এই সূত্রে অনেক বাহিরের বাংলা বই পড়িতে পাইয়াছিলাম। “চীনদেশীয় বাজকন্ডার কথা”, “চীনদেশীয় তন্তুবায়ের কথা”, এসকল “স্থল বুক সোসাইটি”র গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ ছাড়া তখনকার খাঁটি বাংলা কথা-সাহিত্যের “গুপ্তে বঙ্গোয়ালী” এবং “কামিনীকুমার” এই জাতীয় পুস্তকও বাল্যেই পড়িয়াছিলাম। “অন্নদা-মঙ্গল” এবং “বিদ্যাহুন্দর”ও আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলাম। স্থল পাঠ্যে “চাকুপাঠ”-“পদ্যপাঠ”, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের “সস্তাব-শতক”, বঙ্গলালেব “পদ্মিনীর উপাখ্যান” কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছিল। বাংলা বর্ণমালা অভ্যস্ত হইলেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কানীরাম দাসের মহাভারত মোটের উপরে সবটাই বাড়ীতে পড়ি। ৮নবকিশোর সেন মহাশয় নূতন বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যখন যে-বই প্রকাশিত হইত তখনই তিনি তাহা কিনতেন। এই সূত্রে, শ্রীহট্টে থাকিতেই মাইকেল মন্সুদনের “মেঘনাদ-বধ”, “ব্রজাঙ্গনা” এবং “চতুর্দশ পদাবলী” পড়িতে পাই। বঙ্গমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি তাহার পরিচয় লাভ করি। সকলটাই যে বুঝিতাম এমন নহে। কিন্তু বুঝি বা না বুঝি, সেকালের বাংলা সাহিত্যের যখন যাহা হাতে পড়িত তখনই তাহা আগ্রহাতিশয্য-সহকারে পড়িতাম। প্রথম সংখ্যার বঙ্গদর্শনে “বাজ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল” সকলের চাইতে ভাল লাগিয়াছিল।

১৮৭৩ ইংরাজীতেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কথা ছিল। সেকালে ১৬ বৎসর পূর্ণ না

হইলে এই পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই পরীক্ষা হইত। শারদীয় পূজার পূর্বেই পরীক্ষার্থীর আবেদন ও ফিস পাঠাইতে হইত। ঐ সময় আমার বয়স ১৬ পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাকে সে বৎসর হেডমাষ্টার মহাশয় পরীক্ষা দিতে দিলেন না। তবে আসল কথাটা ছিল, আমি পরীক্ষা পাশ করিতে পারিব বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই। এইজন্য ভাল পড়া শুনা করিয়া ভালরূপেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব এই আশায় আর-এক বছর আমাকে স্কুলে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার সে-আশা পূর্ণ হয় নাই। এ বারও স্কুলের পড়াতে আমি বেশী মন দেই নাই।

তবে এই বৎসরে আমি সংবাদপত্রে একটু-আধটু লিখিতে আরম্ভ করি। তখনও শ্রীহট্টে ছাপাখানা হয় নাই। স্থানীয় কোন সংবাদপত্র ছিল না। ঢাকায় দুখানি বাংলা সাপ্তাহিক ছিল,—“ঢাকাপ্রকাশ” ও “হিন্দু-হিতৈষিণী”। তখন পূর্ববঙ্গের আর কোথাও কোন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি ১৮৭৪ ইংরাজীতে ঢাকাপ্রকাশ এবং হিন্দু-হিতৈষিণীতে দুই একটি লেখা পাঠাইয়াছিলাম। একটি কবিতা; হাইকোর্টের জজ অলুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমন উপলক্ষে লিখিত; হিন্দু হিতৈষিণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকাপ্রকাশেও দুটেকটা গদ্য লেখা প্রকাশিত হয়। এগুলি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কবিতাটি পয়ার মাত্র ছিল। বড় হইয়া অবধি আমি অনেক সময় কহিয়াছি যে, ১৮ বৎসরের পূর্বে যে কবিতা লেখে না সে মাতুষ নয়। ১৮ বছরের পরে যে কবিতা লেখে সে হয় পাগল না হয় কবি। আমি এ দুয়ের একটাও আশা করি নাই। স্তত্রাং সে-কবিতার কোন মূল্য ছিল না। তবে আমার প্রথম যৌবনের এই প্রয়াস উল্লেখযোগ্য দুই কারণে, প্রথম, এই সময়েই আমার অন্তরে একটু দেশাত্মবোধ জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহারই প্রেরণায় জীবনের প্রথমে এসকল রচনাতে প্রবৃত্ত হই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার এই অতি অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষার সূত্রেই শ্রীযুক্ত সুনন্দ্রীমোহন দাসের সঙ্গে প্রথম যৌবনের সখ্য-সম্বন্ধ

গড়িয়া উঠে। সুনন্দ্রীমোহন ১৮৭৩ ইংরাজীতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫/- বৃত্তি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ভর্তি হইলেন। এ বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যসেবার কথা শুনিয়া বিশেষভাবে আমাকে তাঁহার সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। এই বৎসরই নভেম্বর মাসে আমিও প্রবেশিকা পরীক্ষা দেই এবং কোনরকমে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

১৮৭৪ ইংরাজীতেই শ্রীহট্ট বাংলার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নব প্রতিষ্ঠিত আসাম শাসনের এলাকাভুক্ত হয়। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যবস্থার গুরুতর প্রতিবাদ করেন। আমার বাবা প্রতিবাদীগণের অগ্রণী-দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়। শ্রীহট্ট আসাম-ভুক্ত হওয়াতে আমার পক্ষে বিভাগের ভাগ্যে শিকা ছিড়ে। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াও এইজন্য আমি মাসিক ১০/- টাকা বৃত্তি লইয়া ১৮৭৫ ইংরাজীর প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই।

৩৬

১৮৭৪ ইংরাজী ডিসেম্বর মাসে আমার শ্রীহট্টেব ছাত্রজীবনের শেষ হয়। এই মাসের শেষ ভাগে আমি আত্মীয় পরিবারবর্গ সকলকে ছাড়িয়া একাকী সুনন্দ্র কলিকাতা প্রবাসে যাত্রা করি। এখন শ্রীহট্টের পথে রেল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা ইহা কল্পনাতেও অনিতে পারি নাই। আমার বাবা তীর্থ করিবার জন্ত এবং বিষয়কর্ম উপলক্ষে একাধিক বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে নৌকায় আসিতে হইয়াছিল। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত তখন রেল হয় নাই। কুষ্টিয়াই পূর্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমানা ছিল। তারও পূর্বে বাবা যখন সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন তখন পূর্ববঙ্গ রেলেরও পত্তন হয় নাই। সর্বপ্রথমে তিনি নৌকায়োশে কানীপর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলও তখন খোলে নাই। সেকালে কানীবত কথাই নাই, কলিকাতায় যাতায়াত করাও সহজ ছিল না। গঙ্গাস্নান



দর্পণে

(জাপানী চিত্র)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সৌজনে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

করিতে যাহারা আসিতেন তাঁহারাও একরূপ পরিবার-পরিজনেব নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াই আসিতেন। কলিকাতা সেকালে বিনুচিকার একরূপ নিত্যবিলাসভূমিই হইয়াছিল। আমি যখন প্রথম কলিকাতা যাত্রা করি তখন কলিকাতা শ্রীহট্টের অনেক কাছে যাইয়াছে। বেল হয় নাই বটে, কিন্তু মাসে দুবার করিয়া শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় এবং সপ্তাহে দুবার করিয়া ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে ষ্টীমার (Steamer) চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ষ্টীমারেই আমি শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত আসিয়াছিলাম।

প্রথম যখন শ্রীহট্টের নদীতে জাহাজ যায় তখন আমি শ্রীহট্ট জুলে পড়ি, সেকথা পূর্বেই কহিয়াছি। কিন্তু জাহাজে চাড়িয়া বিদেশযাত্রা আমার এই প্রথম। শীত-কালে জল শুকাইয়া যায় বলিয়া শ্রীহট্ট পর্যন্ত এসকল জাহাজ যাতায়াত করিত না। শ্রীহট্টের প্রায় দশ ক্রোশ নীচে ছাতক পর্যন্তই জাহাজ যাইত। এসকল জাহাজে যাত্রীর জন্ত তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। মাল বোঝাই হইয়াই আসা-যাওয়া করিত। শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে নুতন চায়ের কারবার খুলিয়াছে। এই চায়ের ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই বিশেষভাবে এসকল জাহাজ প্রথম আমাদের অঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করে। ক্রমে অন্ত্যস্ত মালও জাহাজ বোঝাই করিয়া কলিকাতার দিকে আসে। শ্রীহট্টের নিকটের পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর তেজপাতার গাছ ছিল; চায়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই তেজপাতাও শ্রীহট্ট হইতে বপ্তানী হয়। শ্রীহট্টে নারিকেল জন্মায় না বলিলেও চলে। কিন্তু সর্বত্রই প্রচুর সুপারী উৎপন্ন হয়। এই সুপারীও জাহাজে করিয়া রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে। আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি সে-সময়ে খাসীয়া পাহাড় হইতে নানা জাতীয় অর্কিড (orchid) সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় চালান হইতে আরম্ভ করে। এ ছাড়া শ্রীহট্টের সংলগ্ন চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে পাথরিয়া চূণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই চূণ বেশীরভাগই বড় বড় নৌকা বোঝাই হইয়া কলিকাতায় আসিত;—কিয়ৎ-পরিমাণে জাহাজেও আসিত। এই মালজাহাজ চড়িয়াই আমি সর্বপ্রথমে কলিকাতা রওয়ানা হই।

শ্রীহট্ট সহর হইতে ছাতক প্রায় কুড়ি মাইলের দূর। এই কুড়ি মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া ছাতকে জাহাজে চাপি। শ্রীযুক্ত হুম্মরীমোহন দাসের বাড়ী শ্রীহট্ট হইতে ছাতকের পথে পড়ে। শীতের ছুটিতে হুম্মরীমোহন বাড়ী গিয়াছিলেন। তাঁহারই একসঙ্গে আমি কলিক তায় আসিব, বাবা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদিন পৌষমাসের পূর্বাঙ্কে বেলা দশটার সময় যথার্থিত মঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া আমি স্বদূর প্রবাসে শুভযাত্রা করি। যাত্রার যন্ত্রটা আজিও ভুলি নাই। বাসগৃহের দরজায় আসন পাতিয়া মঙ্গলঘণ্টের সামনে নবধোত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিতে হইয়াছিল। সম্মুখে একখানা থালায় ধান, দুর্বা, ফুলের মালা, দধি, মধু, একটা টাকা রাখা হইয়াছিল। পুরোহিত পাশে বসিয়া মন্ত্র পড়াইলেন—

“দ্বিজ-নৃপ-গণিকা,
পুষ্পমালা পতাকা
সদ্যমাংসম্ স্তবং বা
দধি-মধু-রজতং কাঞ্চনং শুক্লধাত্বং
দৃষ্টা, শ্রদ্ধা, পঠিত্বা বা
ফলমিহ লভতে মানবঃ গন্তুকামঃ”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে নাক দিয়া নিশ্বাস পড়ে সেই পা আগে বাড়াইয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া ঘরের বাহির হইলাম। মা অম্বর হইতে বাহির বাড়ী যাইবার পথে আসিয়া মঙ্গল-চণ্ডীর ‘বিলি’ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার উত্তরীয়ের কোণে সেই বিলি বাঁধিয়া দিলেন। তার পর মাটিতে একটু থুথু ফেলিয়া বাঁ পায়ে কড়ে আঙ্গুল দিয়া সেই থুথু ঘসিয়া বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়া তাহা তুলিয়া লইয়া আমার কপালে টীপ কাটিয়া দিলেন। তখন আমি তাঁর পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। মা কেবল আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনাদ এক-মাত্র পুত্রকে বহুবিপদসঙ্কুল বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর ভিতরে কি কঠোর সংগ্রাম চলিতেছিল তখন তার ইচ্ছিতমাত্রও পাই নাই। প্রথম বিদেশযাত্রার কুতূহলে আমার মন ভরপূর হইয়াছিল, স্তত্রাং বাবা মাকে ছাড়িয়া

আস্মিতে একটুও ক্রেশ ত দূরের কথা বিশেষ ভাবনা পর্যাস্ত হয় নাই। ৬ মাস পরে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী বাইয়া শুনিলাম আমি ঘোড়ায় চড়িয়া যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, মা অমনি গিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন।

তিন দিন পর্যাস্ত জল স্পর্শ করেন নাই। অথচ তাঁর প্রাণের যে অসহ্য বাতনা হইতেছিল আমাকে কিছুতেই তাহা বুঝিতে দেন নাই। অথচ মা আমার লেখাপড়া জানিতেন না!

রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন

শ্রী নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রায় বাহাদুর

শিলাং—প্রথম দিন—২৯ বৈশাখ, ১৩৩৪

হিন্দু-মুসলমান সমস্তা সম্বন্ধে কথা উঠিলে কবির বলিতে লাগিলেন :—

“দেখুন, এ সমস্তা সহজসাধ্য নয় এবং এত জটিল যে, এর সমাধান ভাবতেই পারছি না। উভয় সম্প্রদায়ই fanatics (গোঁড়া)—হিন্দুরা প্যাসিভ (নিষ্ক্রিয়) আর মুসলমানেরা ব্যাটিভ (সক্রিয়)। অথচ উভয় সম্প্রদায়ের ‘ধর্মই’ হচ্ছে ঈর্ষাভার ভূমি। আর যেন কোন ঈর্ষাবাব সাধারণ ভূমি নেই। যুরোপে ধর্ম ত রয়েছে ‘বহু’ বার যে ধর্ম ইচ্ছা গ্রহণ করে, তাগ করে, অনুসরণ করে, পালন করে, কিন্তু ইংরেজ-ইংরেজই থাকে, করাচী করাচীই থাকে। তারা ঈর্ষার ‘জাতীয়তার’; উপরে কাজেই ধর্ম নিয়ে একপাশে কোন বিরোধ নেই। আর এদেশে সবই ‘ধর্ম’। রাজনীতিতে ধর্ম, অর্থনীতিতে ধর্ম, শিক্ষার ধর্ম, আচারে ধর্ম। শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা এ-সমস্তার সমাধান হ’লেও হ’তে পারে, কিন্তু শিক্ষার অভাব এত বেশী ও লোক এতই নিবন্ধ যে, কতদূর ভবিষ্যতে যে শিক্ষা দেশ-ব্যাপী হ’বে, তা ভাবা কঠিন।”

আমি বলিলাম—“বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সমস্তার সমাধান ত দূরের কথা—আরো জটিলতর হ’লে উঠছে। অশিক্ষিত কৃষক শ্রমীর লোকদের সঙ্গে ত কিছু পূর্বে আমাদের কোন বিবাহ-বিসম্বাহ ছিল না, কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তাদেরই প্ররোচনায় এই সাম্প্রদায়িক কলহটা বেশ জ্বলে উঠেছে।”

কবির (একটু নীবব থাকিবার পর)—“নকলের মধ্যেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাবটা জাগছে। দেখুন না মাস্তাজের সেই ব্রাহ্মণ ও নন্দ-ব্রাহ্মণ নুভমেটটা (তখন আমি বাগরগঞ্জ ও ফরিদপুরের নমঃশূত্রদের কথা উল্লেখ করলাম) ও নমঃশূত্রদের উত্থান। ধর্মের বিশ্ব-জনীন ভাবটা কি আমাদের নেতাদের মধ্যেই আছে? কংগ্রেস্‌ প্রাটিকশ্‌ কি অন্তরে ‘সাম্য’ ও ‘ঐক্য’ সম্বন্ধে নেতারা যতই বলতা করুন না কেন, ভেতরে ভেতরে সেই ‘বর্ণাশ্রমতা’ রয়ে গেছে, মনে মুখে এক না হ’লেও সেই বর্ণাশ্রমতা দূর না হ’লে, কিছুতেই কিছু হ’বে না এবং এ সমস্তারও সমাধান সম্ভব হ’বে না। ভরতপুরের হিন্দী সাহিত্য সভায় আমাকে বলতে হয়েছিল যে, ভাবার ঐক্যের উপরেও ‘জাতীয়তা’ প্রতিষ্ঠিত হ’তে পারে না। ভাবা ত হ’চ্ছে আত্ম-প্রকাশের উপায় বৈ আর কিছু নয়? আমি হিন্দী শিখলে হিন্দীতে আপনারা বা বলবেন সেটা হরত বৃদ্ধ, কি আমি যতটুকু হিন্দীতে বলতে পারব—আপনারা সেটুকুই বুঝবেন,

কিন্তু আমার প্রাণের বা মনের খোঁজ পাবেন কি ক’বে? আমার আত্ম-প্রকাশের বিশিষ্ট ও একমাত্র উপায় যখন ‘বাংলা’, তখন বাংলা বৈ আমাকে আপনারা ঠিক চিন্তে ও জানতে পারবেন না। আমি হিন্দীতে বলতা করিতে না পারায় যেমন আপনাদের কাছে লজ্জিত ও দোষী, আপনারাও তেমনি বাংলা না জানলে দোষী। আর হিন্দী চর্চার দ্বারা যে, জাতি-পৃষ্ঠনের পথ সুগম হ’বে, তা মনে করি না। যারই কোন একটা ‘বাণী’, দেশবাসীকে দিতে হ’বে, তাঁরই ঐ পূর্ণভাবে (অংশতঃ নয়) আত্ম-প্রকাশ করা চাই, সেটা কখনও ঐ প্রকার ‘শেষা’ ভাষায় হ’তে পারে না। আমি কি হিন্দীতে আত্ম-প্রকাশ করতে পারি? যার যেটা মাতৃভাষা সেটাতেই তাঁর আত্ম-প্রকাশ সম্ভব হয় এবং সেটা অল্প ভাষা-ভাষারও গ্রহণ করতে পারেন। ইংরেজী ত আমাদের শিখতেই হ’বে—এবং হ’চ্ছে। ইংরেজীটা হ’চ্ছে রাজ-নোতির ভাষা। আমাদের দেশীয় কোন ভাষার রাজনীতি-চর্চা চলে না। ইংরেজী ত পড়তেই হ’বে—বাংলা ও সংস্কৃতও পড়তে হ’বে, তার উপর হিন্দীর বোকা চাপালে—বালকেরা সে বোকা কি বহন করে উঠতে পারবে?”—এই পর্যাস্ত কথোপকথন হইলে কবিরের পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া কবিরের অন্তরে যাওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে—সে-দিনের কথা-প্রসঙ্গ স্থগিত থাকে।

দ্বিতীয় দিন—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

সম্ভাষণাদির পরে কবিরের হাতে আমার উপস্থিত একখণ্ড স্মৃতি-পাণ্ডে ও ‘প্রবাসী’ দেখে মিজাসা করলাম—“আপনার জীবন-স্মৃতি কি আবার লেখা হচ্ছে?”...কবির...“না...ওটা হয় না। আমরা গল্প লিখতে পারি, একটা চবিত্র বানিয়ে তোলা যায়, কিন্তু...আপনাকে objectify ক’রে আত্ম-চরিত্র লেখা বড়ই শক্ত। কত স্তরে স্তরে যে আমার ‘আমি’ ভুবে আছে, তাকে টেনে তোলা অসম্ভব। জীবন-চরিত্র লেখকই বা অপরের জীবনের কতটুকু দেখতে পান যে, তিনি যথার্থভাবে ‘চরিত্র’ টা আঁকবেন? জীবন-চরিত্র লেখা (তা স্ব-চরিত্রই হোক বা অপরের বচনই হোক) দুই-ই অসম্ভব।” আমি বলিলাম... “আমার ‘স্মৃতি-পাণ্ডে’ টা এইভাবে লিখেছি যে, যার সংস্পর্শে যতটুকু এসেছি তাঁর বিষয় মাত্র সেটুকুই লিখেছি; বেশী কিছু লিখতে চেষ্টা করিনি...Bertrand Russell-এর Behaviouristic Philosophy অনুসরণ ক’রে”...

কবিবর...“ঐ ঠিক করেছেন...আপনার ‘বইটে’ প’ড়ে দেখব।
বিশিনবাবু (বাবু বিশিনচন্দ্র পাল) তাঁর জীবন-কথা লিখেছেন।
আপনাকে জানাই ত শক্ত কথা। বাহ্য-ব্যবহার দেখে অপর মানুষকে
কতটা জানা যায়?”

আমি...“সেই ‘আমি’ কে বুঝে খুঁজেন...এটা আমি নব, ওটা আমি
নব...বেশে এ সেই চিন্তা-পথেই আমাদের ধ্বিরা সেই ‘ভূমি’র ও মহান
সত্য উপস্থিত হয়েছিলেন।”

আমি তখন কথটা অস্ত্র দিকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—“কিছু দিন হয়
—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের “Philosophy of the Upanishads”
পড়িলাম এবং তার forewordটা যা আপনি লিখে দিবেছেন সেটাও
পড়িছি, বইটা বেশ হয়েছে। পাঠ্যাবস্থার পাক সাংস্কারেই বই প’ড়ে
সেটার উপর কি যোর বিতৃষ্ণাই জন্মেছিল।”

কবিবর—“জ্ঞানেন্ কি? ওঁরা আমাদের মধ্যে কোন মৌলিকতা
দেখতে পান না এবং স্বীকার করেন না। এমন-কি আমাদের ‘সভ্যতা’
ও শাস্ত্রের প্রাচীনত্বটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। ‘এটা গ্রীকদের
থেকে নেওয়া, ওটা বেবিলোনি থেকে ধার-করা’ ইত্যাদি বাক্যে
আমাদের বা কিছু তার প্রতিই অবজ্ঞা—কারণ আমরা যে Subject-
people, British subjects! যুগী ও অবজ্ঞার মূল সেখানে।”

আমি—“প্রাচীন ভারতের বা কিছু জ্ঞান-সম্পদ তার বোঁজ নের
যুরোপের অস্ত্রাস্ত্র সভ্য জাতিরা, যতদূর বর্ণনা থেকে দেখার—তাতে
আপনার যুরোপের Continental countries সমূহে—অভ্যর্থনার
ও ইংলণ্ডের অভ্যর্থনার কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলাম।”

কবিবরের ঈষৎ হাস্য।

আমি—“Continentএ কোন সত্রাট বা রাজ্যও কখন সেভাবে
অভ্যর্থিত হয়নি। যুক্ত-রাজ্যে (United States) ও দক্ষিণ আমেরি-
কায়ও ত আপনাকে কত সম্মানে অভ্যর্থনা করেছে। মৃত লন্ডন-নর্থ-
ব্রিস্কের ‘ঈশ্বর-ঈশ্বর’ বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে বেশ বুঝেছিলাম যে, ইংরেজ-
দের কত বড় অহঙ্কার ও স্ব-প্রাধান্তের ভাব অন্ততঃ আমাদের সম্বন্ধে।”

কবি—“লন্ডন নর্থব্রিস্কের আত্মাভিমান ও আত্মভরিতাব কথা আর
তুলনেন না—সেটা বড়ই পীড়া-দায়ক।”

আমি—(কথটা অস্ত্র দিকে প্রধাবিত করতে বিশ্ব-ভারতীয় কথা
তুলে) “আপনার বিশ্ব-ভারতীয় স্থায়িত্ব, ভবিষ্যৎ ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে
আপনার কি ধারণা? এখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর হিলাম তখন
ভবানীপুরে মাঝে মাঝে তাঁর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতাম।
আমি তাঁর বাড়ীর অতি নিকটে ‘রসারোডের’ অপর পারে থাকতাম।
একদিন বোলপুর হ’তে ‘বিশ্ব-ভাবতীয়’ কয়েকটি বৃক—পালি কি
তিকরতীর অথবা চৈনিক ভাষার লিখিত একখানা হস্ত-লিখিত পুঁথির
বোঁজে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশুবাবু বললেন যে, সেইটে
অতি যত্নে কোন ‘লামা’ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে—সেটাকে অস্ত্র
স্থানান্তর করা সম্ভবপর নয়। তাঁরা তাঁদের পবেষণার জন্য কলিকাতার
এসে তার ব্যবহার করতে পারেন। তার পরেই বললেন, দেখুন,
ববিবাবু আর কতকাল বিশ্ব-ভারতীয় জন্ত দেশে দেশে ঘুরে ভিক্ষা
ক’রে যেড়াবেন? তাতে কি আর বিশ্ব-ভারতীকে স্থায়িত্ব দিতে পারবেন?
সেটা সম্ভব নয় ব’লেই আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ে লেগে
প’ড়ে আছি?”

কবিবর (একটু মুচ্চি হেসে)—“জগতে ত কিছুই স্থায়ী নয়, বিশ্ব-
ভারতী ত কোন্ চার। ভগবান বুদ্ধের তাঁর যে ‘আদান ও শিক্ষা’
ভারতে দিয়েছিলেন এবং যে-শিক্ষা ও উপদেশ অশোকের স্তম্ভরাজ-
চক্রবর্তীর উৎসাহে ভারতে ও জগতে প্রচাৰ হয়েছিল, সেটা কি ‘ভারত’ই
স্থায়ী হয়েছিল? তার নামটি পর্যন্ত ভারতবাসী ভুলে গিয়েছিল। আর

‘বিশ্বভারতী’ স্থায়ী হ’বে? ‘শিক্ষা’ সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা সেটাকে
একটা ‘আকার’ দেওয়া ও মূর্ত্ত করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য এবং
সেইজন্তাই চেষ্টা। স্থায়ী হবে কি অস্থায়ী হবে—কলে কি দাঁড়াবে,
সেটা ত আমার হাতে নয়, আমার নেটাই ‘কর্ম’; ‘ফলে’ আমার
‘অধিকাংশ’ নেই। আশুবাবু ত গবর্ণমেন্টের সৃষ্ট—তৎকর্তৃক পুষ্ট ও পৃষ্ঠ-
পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনার মতে গ’ড়ে তুলতে এয়াসী ছিলেন,
কিন্তু তিনি যেতে না যেতেই তার কত পরিবর্তন! পরিবর্তন সব
সময়েই হ’চ্ছে ও হবে।”

আমি—“সবই ত ‘নামরূপের’ খেলা।”

কবিবর—“হী—তার মধ্যে যেটুকু ‘চিরন্তন’ তার অঘেঘপই আমাদের
কাজ। ধ্বন—গ্রাম-সংস্কারের কথাটা, সে-সম্বন্ধে আমরা যে-মনে-ভাব—
তার কিছুকে ‘আকার’ দেওয়া কি মূর্ত্ত করে তোলাই ত ‘জীনি কতনে’
চলেছে।”

আমি—“গ্রাম-সংস্কার ও গঠনটা ত আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের
বক্তৃতায়ই ‘বিষয়’—কাজে ত কিছু দেখছি না। গবর্ণমেন্টকে গাল
দিলেই কি গ্রাম-সংস্কার হ’বে?”

কবিবর—“বুঝেছেন না—এ গালের ভেতরেই গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার
আমাদের লক্ষ্য কতটা পরিশুদ্ধ হ’চ্ছে। তাইটাই এই—আমরা ত কিছুই
করতে পারি না এবং করছিও না। গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা অসী—সবই
করতে পারে এবং করছে না—সুতরাং গবর্ণমেন্টকে গাল দিই। আমরা কি
গবর্ণমেন্ট-নিরপেক্ষ হ’য়ে একটা গবর্ণমেন্ট ঝাঁড় করিবে—আমাদের মতে
স্বাধা-বিধান ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা ক’রে—শিক্ষা ও
স্বাধা সম্বন্ধে কিছু ক’রে উঠতে পারি না? তবে করছি কি? মোহটা
কাটানো কি সহজ ব্যাপার?”

বর্তমান ‘রাজনৈতিক’ কথা-প্রসঙ্গে কবিবর বলেছিলেন—“আমরা
অনেকেই মনে করি যে শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে ‘জন-মতের শাসন’ বা
‘Democracy’ই যেন চূড়ান্ত কথা, সেটা নাও হ’তে পারে।”

তৃতীয় দিন—১১ই জ্যৈষ্ঠ

বাস্তলার আইনসভার বিগত নির্বাচনের কথা উঠিল—তখন তিন
বলিলেন।—

“দেখুন না এ ব্যাপারে কত টাকারই না অপব্যয় ও প্রাচ হ’চ্ছে।
এ ‘ছেলেমানুষির’ জন্তে। ধারা স্বভাব-কুপন—কোন একটা সংকার্যে
দুটো গরসা ব্যয় করেন না—তাঁরাই এই কাজে অজস্র টাকা-হাজায়ে
হাজায়ে, ব্যয় করেছেন। আমি জানি কোন জেলার কোন ‘রাজা’
(জমিদার) ধার নিকটে কোন সংকার্যে হস্ত-পেতে দুটো পয়সা বের
করা বায়নি, তিনিই শুনেছি ইলেক্সান-ব্যাপারে (সে চাই আবার
কাউন্সিলেরও নয়—ডিল্লীষ্টবোর্ডের ইলেক্সানে।) নাকি প্রচুর অর্থব্যয়
করেছেন। যেটা দেশের আসল কাজ—যাকে গঠনমূলক কার্য বলা হ’য়ে
থাকে—সেজন্ত টাকা নেই।

রাজনৈতিক কথা চাপিয়া আমি ‘গভীরতর বিষয়ে’ কবিবরের ‘বাণী’
শুনিকার অস্ত্র জিজ্ঞাসা করিলাম—“দেখুন বতই বয়স বেড়ে যাচ্ছে—ততই
বৃত্তা-চিন্তাটা এত প্রবলা হ’য়ে উঠছে কেন? যৌবনে কি জীবনের
মধ্যাহ্নে—ও চিন্তাটা একটীবারও মনে ওঠেনি।”

কবিবর—“জ্ঞানেন, ওটা ত একটা সোজা পাণ্ডিগণিতের কথা।
আয়ুষ্কাল ত আমাদের পূর্ণ হয়েছে; গড়পড়তা (average life) যা-তা
চের ছাড়িয়েই। (বলা বাহুল্য—কবিবর ও আমি প্রায় সমবয়স—তিনি
বছর দুয়ের ‘বড়’ হ’তে পাবেন) এখন আমরা ত extersion এর
উপরে আছি। সুতরাং যে সমস্ত কাজ-আরম্ভ করছি, সেগুলোই পূর্ণ
ও শেষ করতে পারব কি না সন্দেহ; তাতে আবার, যে বাজ সম্পন্ন

করতে বহুদিন লাগবে—দেখুন! কি আর হাতে নেওয়া যায়? তাল-গাছ হয়ে তাল খেয়েছি—এখন আর ত সে সম্ভাবনা নেই।”

আমি—“আপনার জ্ঞান মহাপুরুষের Extension-এর প্রায়জন আছে। অগতে যা দিয়েছেন—তার চেয়ে ঢের বেশী অগৎ চায়—আপনার জ্ঞান লোকের কাছে;—যতটা ‘আদার’ করে রাখা যায়, আমাদের সম্বন্ধে ত সে কথা খাটে না। আর ‘মৃত্যু’ ত “আরম্ভ”ই হয়েছে—স্মৃতি-বিভ্রম নাকি “অস্তিত্বের সূত্র” তাত হয়েছে-ই।”

কবিবর—“হী, সে কথা ঠিক—যারা গঠন খাটিয়ে হাতের শ্রমে জীবিক! অর্জন করে তারা বড়ো হ’লে শুধু ভাবে কি করে থাকে; তার যোগাড় থাকেই তারা তৃপ্ত। আমরা যাঁরা মাথার কাজ করি—তাদের সে ক্ষমতাটা হ্রাস পেলে, আর বেঁচে থাকার দরকার কি? সে ক্ষমতা শেষ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বাহ্যিক। (এ হলে আমি তাঁর পরিবারের আবেগিক দীর্ঘ-জীবনের কথা তুললে তিনি তা খোকার ও আলোচনা করে বললেন যে, “এক বড়দাদা”—যিনি বিষয়-কর্মে আর কখনও অভিনিবিষ্ট ছিলেন না—তিনিই সবাইর চেয়ে দীর্ঘ-জীবী ছিলেন।)।”। দেখুন পঁচ জনে ব’সে একটা ‘কাজের কথা’ হ’লে যিনি অল্পবয়স্ক বা তরুণ,—তিনি হয়ত বলবেন ৫১০ বছর পরে ওর ‘স্বকল’ ফলতে পারে—বিস্তৃত আমাদের মনে সেভাবের উদয় হবে কেন? তখন আমরা ত সে ‘স্বকল’ ভোগ করতে বা দেখতে পাব না—হতরং সেকাজে আমাদের উৎসাহী হওয়া অস্বাভাবিক।”

অহ মৃত্যুর কথা আলোচনা করার চেয়ে অল্প কথা তোলা ভাল বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“অবতার-বাদ সম্বন্ধে আপনার কি মত?”

কবিবর—“এই জগতের সাই ত তাঁর সৃষ্ট ছাড়া; বৃক্ষ লতা, কীট পতঙ্গ, জীব-জন্তু, সবই ত তাঁর...যাহুযেও তিনি তবে আর ‘অবতারের’ প্রয়োজন কি? সমস্ত পদার্থে ও এই নিখিল বিশ্বে তিনিই ত ‘ওতপ্রোত’?...বিকাশ বা manifestation বললে তাও ত সর্বভূতে। যাঁরা বলেন, যে, কোন ব্যক্তি বিশেষে তাঁর পূর্ণ-প্রকাশ, তাঁরা যে কি ভবনাক একটা অদৃশ্য ও অযৌক্তিক কথা বলেন তা আমি ভাবতেই পারি না...আমার কাছে ওর চেয়ে একটা অর্থশূন্য কথা আর নেই।”

আমি—“অবতার-বাদটা যেন আমাদের (ভারতবাসী ও বিশেষ-

ভাবে বাঙ্গালীরা) মজ্জাগত। “শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু” ত অনেকের মতে ভগবানু যমঃ।”

কবিবর—“আমরা যে কতবড় একটা ভাব-প্রবণ জাতি তা আর কি বলব। ওর দ্রষ্টব্য দাবী বাংলায় মাটি। শ্রীচৈতন্যদেব ত ‘অবতারদ্বার’ দাবী করেননি। আর কবলেও, তিনি ত এই ভূ-য়ে জাত। যেহেতু না... ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের ‘বৈষ্ণবধর্ম’ আর গোড়ী বৈষ্ণবধর্মে কত তফাৎ। আমাদের শুধুই emotionalism...পরকীয় প্রেমের রসাধারনে পর্যন্ত। যেমন বাঙ্গালীর ধর্মে তেমন কর্মে। সর্বত্রই ঐ ভাব-প্রবণ (dominating)। আমরা হয় “ভেঃ” “ভেঃ” রবে কাঁদব কি ‘মা’ ‘মা’-শব্দে আকাশ কাটাব...এইত? শান্তেরা ‘মা’ ‘মা’ করে কেঁদে মাটি ভেজাচ্ছেন—আর বৈষ্ণবেরা ‘প্রেম’ গড়াগড়ি বাচ্ছেন—সে গানেই হোক, আর কাঁধেই হোক। ‘অমৃত’—আঃ—কি বস্তু তাই করেছেন-যে, না কেঁদে আর থাক! গেল না—বস্তাও কাঁদেন জোতাও কাঁদেন। আমি বলি—এই কান্নাকাটার প্রয়োজনটা কি? কি কাজ হয় ওতে? এই ভাব-প্রবণতাই আমাদের দেয়েছে—কথার—কাজে—লেখার—গড়ার, রচনার—গল্প-পক্ষে সর্বত্রই সেই ভাব-প্রবণতা।”

আমি—“আপনি যদি বিলোতে না যেতেন ও পৃথিবীর সর্বত্র এতটা ঘোরা-করা না করতেন—তবে এতদিনে হয়ত একটা মস্ত ‘অবতার’ হ’য়ে বসতে পারতেন।”

কবিবর—“তা নয়, বরং ওখান হ’তে ফিরে, কি ওখানে থেকেই আরো জাদরেল অবতার হওয়া যেতো, যদি ‘কৌপীন-টোপীন’ গ’রে দেই ভাবে চলা যেত। ওদের পার্টিকিটের চেয়ে আরও।”

আমি—“বরিশালটা বেশ ছজুপের আরগা—এই ‘অবতার’ বা ‘স্বকল’দের নিয়ে। যে কোন ‘সাধু’ ‘দয়াদাসী’ সেখানে পদ-ধূলি দেবেন তাঁর পেছনেই শত শত লোক জড়ো হবে ও বহু শিষ্য-দেবক জুটেবে।”

কবিবর—“ভবে ত সেখানে একবার যেতে হবে। আপনি ‘চোলা’-সিবি কব্বে বাজী আছেন ত?”...

আমি—“খুব রাজী...চলুন না তা হ’লে আমায় কে পাষ? ‘দোতলা-তেতলা’ বাড়ীতে...চোতলা পাঁচতলা করে কেণ্ডব যখন ইচ্ছা তখন। আর কি ‘অর্থ’ ‘অর্থ’ করে ঘুরে বেড়াতে হবে?”...

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(২)

গ্রীষ্মের ছুটির পর মহানগরীর জ্বল কলেজগুলি সবে খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও সব ছাত্র-ছাত্রী বাড়ী হইতে ফেরে নাই। ক্লাশগুলিতে ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা বেশী নয়। পড়াশুনাও তেমন ভাবে আরম্ভ হয় নাই।

সাড়ে তিনটা বাজিতে-না-বাজিতে কলেজ ষ্ট্রীটে

কলেজের ছাত্রের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। ক্লাশ বসিবার সময় অত কেহ এক সঙ্গে আসে নাই, যাব যেমন সুবিধা তেমনই আসিয়াছে, কে যে আসিল, কে যে আসে নাই, তাহারও খোঁজ বড় একটা লওয়া হয় নাই। এখন সকলে এক সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দীর্ঘ অবকাশের পর বন্ধু-বান্ধবের মুখ দেখিয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। রৌদ্রের তেজ তখনও অতি প্রখর, ছেলেদের

মুখ আরক্ত ও পার্শ্বদৃশ্য ঘর্মসিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সে-দিকে কেহ বিশেষ লক্ষ্য রাখিল না। তরুণ বন্ধের দল ছাতা বহিয়া বেড়ানকে বড়ই সেকেলে মনে করে। কাজেই রোজের উদ্ভাপ সস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদের গতি কি? কেহ কেহ খাতা এবং বই মাথায় করিয়া বন্ধুর দলের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল, যাহাদের বাড়ী কিছু বেশী দূবে, তাহারা ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। যাহাদের তখন তখন বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা নাই, তাহারা কলেজ স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

একটি ছেলে দল হইতে একটু পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া ভবানীপুরের ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব আর কিছুই ছিল না, কেবল লম্বায় সে সাধারণ বাঙালীঘরের ছেলের চেয়ে কিছু বড়। রঙ তাহার উজ্জল শ্রামবর্ণ, বেশ-ভূষার পারিপাট্য খানিকটা আছে। হাতে দামী 'রিটওয়াচ', বুক পকেটের ভিতর হইতে একটি সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন পেন্‌ উকি মারিতেছে।

পিছন হইতে তাহার পিঠে চড় মারিয়া আর-একটি যুবক বলিয়া উঠিল, “কি হে, রাজপুত্র কখন এলে? ক্লাশে তোমায় দেখেছি ব’লে ত মনে হ’চ্ছে না?”

ছেলেটি পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, “কি ক’রে দেখবে? আমি ঠিক আড়াইটার সময় smartly এসে পৌছেছি। তারপর চন্দ্র, বাড়ীর খবর কি? নোলক-পর্যায় মুখটুখ কিছু হৃদয়ে বহন ক’বে এনেছ? আমি ত সারা ছুটি গোলাপী চিঠির প্রত্যাশায় ছিলাম, কিছুই ত এসে পৌছল না?”

চন্দ্রনাথ বলিল, “চিঠিগুলো এখনও ছাপা হয়নি, আর নোলকটা যদিও তৈরি হ’য়ে এসেছে তবু সেটা ঝুল্‌বার উপযুক্ত একটা খ্যালা নাক এখনও পাওয়া যায়নি। তা তোমার নিজের খবর কি শুনি? এত যে বক্তৃতা ঝাড়লে যে ক্যালকুটা ইউনিভার্সিটির এম্-এ কিছুতেই পড়বে না, এখন ত দেখছি বেশ স্বচ্ছন্দ ক’রে ঘরভাঙা বিল্ডিং থেকে বেরছ?”

আর একজন যুবক বলিল, “একি Son proposes

but mother disposes হ’ল নাকি, স্ববীর? তোমার নামখানা বিশেষ সার্থক হয়নি, বাপু। বাঙালীর ছেলের এক মাত্র বীরত্ব ফলাবাব ক্ষেত্র যা অন্তঃপুর। সেখানেও তুমি জয়লাভ করতে পার না?”

স্ববীর বলিল, “অত সস্তায় বীর নাম কিনে কি হবে? সেইজগ্রে সব বীরত্ব সঞ্চয় ক’রে রাখছি যখন ভাল occasion জুটবে সবটা এক সঙ্গে ঝেড়ে দেব যাক, এতক্ষণে একটা শুদ্ধিকার ট্রাম আসছে ব’লে মনে হ’চ্ছে। রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত মাথার চাঁদি উড়ে যাবার জোগাড় হ’ল। চন্দ্র চলনা হে আমার সঙ্গে? মেসের ঠাকুর আর চাকর ছাড়া তোমার পথ চেয়ে থাক্‌বার ত আর কেউ নেই?”

চন্দ্র বলিল, “কি তাক্সব কাণ্ড! কলিযুগের ninth wonder রাজপুত্রর আজ ট্রামে চড়বে নাকি? ট্রাম কোম্পানীর বাপ দাদা এমন কি পুণ্য করেছে? কেন তোমার ‘শেভরলে’ খানা কি হ’ল?”

স্ববীর বলিল, “মা সেখানা আজ দখল ক’রে ফালিঘাটে পুণ্য অর্জনে করতে গিয়েছেন। কাজেই ট্রাম কোম্পানীকে অগ্রহ করা ছাড়া আমার উপায় নেই। চল, চল, ট্রাম এসে পড়ল।”

হুই বন্ধু লোক দিয়া ট্রামে চড়িয়া বলিল চন্দ্রনাথ বলিল, “নিয়ে ত চললি। গিয়ে ক’ব কি আমি?”

স্ববীর বলিল, “কিঞ্চৎ জলযোগ করবে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেবে, এবং মা যদি দয়া ক’রে সময়মত ফেরেন, তা হ’লে সাড়ে ছটার সময় পিকচার প্যালেসে ব্রডলফ্‌ ভ্যালাটিনোব প্রেম করা দেখতে আসবে। এই subject এ ওর মত ভাল টিচার একটিও নেই।”

চন্দ্র কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়েই বা লাভ কি? আমাদের অদৃষ্টে অপূর্ণ হৃদয়ী ফরাসী নর্তকী, সাহার মরুভূমিতে আরব ডাকাতির সঙ্গে মারামারি, পক্ষীর জ্ব ঘোড়ায় চড়ে হৃদয়ীর পশ্চাদ্ধাবন, এসব কিছুই জুটনার সম্ভাবনা নেই। আমরা দশটা থেকে পাঁচটা মারুচ্যাট অফিসে কলম পিশব, আর বাড়ী এসে শুন্‌ব, গোকার জর,

টেপীর কান কটকট, গিম্মির মাথা-ধরা, বাড়ীওয়ালার দরোয়ান তাগিদ দিতে এসেছিল, ইত্যাদি।”

সুবীর বলিল, “আরে, এখনি হাল ছাড়লে কি চলে? এখন অন্ততঃ কল্পনা ক’রেও একটু thrilled হও। আমি ত সারাক্ষণ যত রকম আজগুবি আর অসম্ভব কল্পনা করা যায়, তাই নিয়েই থাকি। তারপর realityতে যা হ’বার তাত হ’বেই। তাই ব’লে, সেই ভাবনা ভেবে এখন থেকে আশ্রয় হ’য়ে থেকে লাভ কি?”

চন্দ্রনাথ বলিল, “তোমার পক্ষে তবু কিছু সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। আব কিছু না হোক, টাকার ছালার ওপর ত বসে আছি। এদেশে romance না জ্বোটে, ত ওদেশে গিয়ে দ্বিবি ফুটি মেয়ে আসতে পারবি, ততদিন খুসি। তোমার বিলাত যাওয়ার প্লান কি একেবারেই ভেঙে গেল?”

সুবীর বলিল, “একরকম তাইই, যে-সব conditionএ মা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী, তাতে আমি যেতে রাজী নই। তাহেই এখনকার মত কথাটা ধামা-চাপা রয়েছে।”

চন্দ্র বলিল, “তুই জোর ক’রে চ’লে যা না! এখন ত আর নাবাসক নেই। মা না হয় রাগই করবেন, কিন্তু একমাত্র ছেলেব উপর রাগ ক’রেই বা কতদিন থাকবেন?”

কথা বলিতে বলিতে ট্রাম এস্প্রানেডে তাহাদের নামিবার জায়গায় আসিয়া পড়িল। বই খাতা গুছাইয়া এক হাতে ধরিয়া নামিতে নামিতে সুবীর বলিল, “না হে, তা করা চলে না। চল বাড়ী গিয়ে সব শুনবে। এঃ, এখনও বেলায় রোদ রয়েছে। দেখ, আর ট্রামে উঠবি না হেঁটে যাবি বাকিটুকু? বেশী দূর না।”

ট্রামের রাস্তা হইতে তাহাদের বাড়ী অতি অল্পই দূরে। চন্দ্র হাঁটিতে আপত্তি করিল না। সেটুকু পথ-ক্রমপদে অতিক্রম করিয়া দুই বন্ধু একটি লাল ইটের গাঁথনী গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ীটি খুব বেশী বড় নয়, তবে দেখিতে সুন্দর। চারি পাশে খানিকটা জমি। গেট হইতে লাল স্তরকী ঢালা পথ বাড়ীর দিড়ির পদতলে গিয়া ধামিয়াছে। পথটির দুই ধারে ফুলের বাগান;—ডান পাশে বিলাতী মরশুমী

ফুল তাহাদের নীল নয়ন খুলিয়া অভ্যাগতের দিকে চাহিয়া আছে। খেত গোলাপের ঝাড় বায়ুতরে কাঁপিয়া উঠিতেছে, মার্কেল পাথরের মূর্তি বিচিত্র লীলায় দাঁড়াইয়া, ফোয়ারা হইতে গলানো হীরকেব স্রোতের স্রায় জল সবেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। একটি উড়ে মালী এইসকলের পরিচর্যায় নিযুক্ত। কোথাও ঘাস একটি বড় হইয়া গিয়াছে, সে ছোট একটি ‘লন্-মোয়ার’ লইয়া সব কাটিয়া ছাটিয়া সমতল করিতেছে।

বাম পার্শ্বেও ফুলের বাগান, কিন্তু সেদিকে আধুনিক রুচির প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না। বেলা, জুই, রক্তমী-গছা, খেত করবী, কাঞ্চনের সেখানে রাক্ষস। মার্কেল পাথরের মূর্তি, ফোয়ারা বা রঙীন মাছ কিছুই সেখানে নাই। একটি শালা কাবুলী মাঙ্কারী আশনার স্তূল সেহ লইয়া ঘাসের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, ক্রোড়া-পবায়ে দুইটি শাবক, তাহার পাশে পশমের বলের মত এদিক ওদিক গড়াগড়ি দিয়া খেলিতেছে, মাঝে মাঝে মাঝের কাছে দুই একটা চড়াপড়ও লাভ করিতেছে। বাড়ীর পিছনে ফুলের বাগান এবং ছোট একটি পুকুরিণী আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু এসকল বাহির হইতে চোখে পড়ে না।

দিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াই সম্মুখে পড়ে মস্ত ‘হল’। ইহা খুব দামী আসবাব দিয়া সাজানো, তবে সবগুলি আধুনিক রুচি-সঙ্গত নয়। বড় বড় গিণ্টি করা ফ্রেমে বাধানো ছবির ভাবে ঘরের ছাদ শুদ্ধ বেন নামিয়া পড়িয়াছে মনে হয়। চারিদিকের দেয়ালে চারখানা বৃহৎ আয়না; ঘরে ঢুকিবামাত্র চারিপাশেই নিজেদের দেখিয়া হঠাৎ অবাক হইয়া যাইতে হয়। পিতলের কাজকরা জয়পুরী টেবল, লাল মথমলে মোড়া ভারী ভারী চেয়ার এবং সোফা, উপরে সারি সারি বাতিব আধার প্রকাণ্ড ঝাড় লর্ডন, নীচে বহুমূল্য তুর্কী কার্পেট, কিছুবই অভাব নাই। ঘরখানিতে ঢুকিয়া মনে হয়, ইয়া এবাড়ার লোকেরা বড় লোক বটে, তবে এখানে বসিয়া দু’দণ্ড হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিবার কথা কাহারও মাথায় আসে না।

চন্দ্রনাথ বলিল, “বাপরে, এ ঘরে কেউ বসে নাকি?”

স্ববীর বলিল, “না, এটা আমাদের পরিবারের bad taste আর vulgarityর museum। কাঠে আর কাচে কতবকম ক’রে টাকা নষ্ট করা যায় আমার বাপ ঠাকুরদাদারা তারই competition করেছেন এর মধ্যে। নিতান্ত হোম্ব-চোম্বা অথচ বুদ্ধিহীন কোন জীব এলে আমি মায়ের আজ্ঞায় তাঁকে নিয়ে এখানে বসাই, তা না হ’লে এটা আমাদের passageরূপেই ব্যবহার হয়। আমার উপরে বসবার ঘরটা আমি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়েছি, অর্থাৎ সাজাইনি। কিন্তু সেখানে বসলে কারো অন্তরাগ্না জ্বালা জ্বালা ছাড়ে না।”

কথা বলিতে বলিতে দুই বন্ধু উপরে উঠিয়া আসিল। সিঁড়ির বাম পার্শ্বের ঘরগুলি স্ববীরের, ডানদিকের গুলি অন্তঃপুর, বদিও সম্প্রতি সেখানে অন্তঃপুরিকার একান্তই অভাব। স্ববীরের মা ও তাহার দুই তিনটি দাসী ভিন্ন এখন আর এদিকে কেহই বাস করে না।

স্ববীরের বসিবার ঘবে খান চার কাল কাঠের পালিশ করা চেয়ার ছাড়া আর বড় বেশী কিছু আসবাব নাই। আর আছে, সারি সারি বইয়ের আলমারী। দেওয়ালের গায়ে গোটা দুই ফোটোগ্রাফ ও গোটা দুই লালচে বাঁশের ফ্রেমে বাঁধানো জাপানী ছবি ভিন্ন অন্য কোন ছবি নাই। ঘরের দরজা জানালাগুলি পরদাব ধার ধারে না। তাহাদেব ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর হাওয়া যতটা না প্রবেশ করিতেছিল, রোজের উদ্ভাপ প্রবেশ করিতেছিল তাহার চেয়ে বেশী। ঘরের মাঝখানে দিলিংএ আঁটা একটি বৈদ্যুতিক পাখা। স্ববীর ঘরে ঢুকিয়াই সেটি চালাইয়া দিল।

তাহাদেব দেখিয়াই একজন চাকর ছুটিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। স্ববীর বলিল, “যা, আমাদের দুজনের চা এই ঘরে দিয়ে যেতে বল। মা ফিরেছেন নাকি?”

চাকর বলিল, “আজ্ঞে, তিনি এখনও ফেরেননি। ফিরতে সম্ভব হ’বে ব’লে গেছেন।”

স্ববীর চন্দ্রনাথকে বসাইয়া, নিজেও বসিয়া বলিল, “তা হ’লে সিনেমায় যাওয়াটা কালকের জন্তে তুলে রাখা যাক। এই রোহিণী, ভবানীদিদিকে বলগে যা আমাদের

খাবার ঠিক ক’রে দিতে। আর দেখ, চা কবুলের মত বুদ্ধি যখন তোর মাথায় নেই, তখন বুঝা চেষ্টা না ক’রে, পেয়লা, টি পট, গরম জল, চিনি-টিনি সব এইখানে দিয়ে যা, আমি ক’রে নেব।” চাকর চলিয়া গেল।

চন্দ্র বলিল, “এত বড় বাড়ীতে থাকবার মতো শুধু তুমি আর তোমার মা? এ বড় বেমানান লাগে হে! শিগগীর আরো লোক জোটাও।”

স্ববীর বলিল, “সে চেষ্টা ত আমি ছাড়া আর কারোই করছে। আমারই কেবল ওদিকে উৎসাহের অভাব। শুধু বাড়ী ভরাবার খাতির লোক জুটিয়ে আনতে বাড়ী শেষে এমনই মারাত্মক রকম ভ’রে উঠবে, যে, আমাকেই হয়ত বেরিয়ে যেতে হ’তে পারে।”

চন্দ্র বলিল, “যাতে সেবকম অঘটন না ঘটে, তার ব্যবস্থা ক’রেই আন না হয়। ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান যদি না চলে, ত’ কলকাতায় হিন্দু মেম সাহেবেরও আজকাল কিছু অভাব নেই। বি-এ, এম-এ, যা চাও, তাই পাবে। তোমার মত সুপাত্র হাতছাড়া করবে, এমন রাজী বা পাত্রীর বাপও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে বলত ঘটকালি করি। আমার সম্মানে দু-চারটি মেয়ে আছে। বিছাটা তাঁব হওয়াই চাই, এটা আমি ধ’রে নিচ্ছি, রূপসীও খুব হওয়া দরকার বোধ হয়? টাকাকড়িও চাই নাকি?”

স্ববীর বলিল, “হ্যাঁ, একাধারে সরস্বতী, উর্দুশী এবং কুবেরনন্দিনী। এর কম দাবী করব কেন? কিন্তু কার্যতঃ জুটবে হয়ত একটি খুকী, যার গরুর মত ড্যাবা চোখ এবং খাঁদা নাক, নাকের গোড়া অবধি তুল দিয়ে ঢাকা, এবং বাকিটা ঢাকা ঘোমটা দিয়ে। তাঁর বিজ্ঞা কথামালা অবধি, এবং স্বামীর চেয়ে পুখী মেনীকে তিনি সঙ্গী হিসাবে preference দেবেন; এই ভয়েই ত ওখার মাড়াতে ইচ্ছা হয় না।”

চন্দ্র বলিল, “তুমি বিয়ে না করলে ত আর ঐ রকম একটি জীব নিজের থেকে তোমার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে না? যেমন চাও, তেমন দেখেই করবে। তোমার ত আর বাপ খুড়ো, ঠাকুরদাদা দশ গড়া বেঁচে নেই যে,

জোর ক’রে গলায় একটি গৌরীদানের ছুঁপোষা শিশু ঝুলিয়ে দেবে ?”

সুবীর বলিল, “দশ গণ্ডাকে পাবা যায়, বিশেষ তারা যদি পুরুষ হয়। কিন্তু একটি মায়ের সঙ্গে পাবা শক্ত, বিশেষ তিনি যদি বিধবা হন, আর তাঁর একটি মাত্র সন্তান থাকে। আইনতঃ আমি এখন সাবালক, যা খুঁসি করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু কার্যতঃ এত বড় অক্ষম এবং নিরুপায় জীব আর নেই হে। যা কর্তব্যে যাই, তাতেই মনে হয় মা ছুঁপ পেলেন বা। অত্যন্ত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, সংসারের কোনো সাধই তাঁর মেটেনি। এখন সব সাধ তাঁর আমাকে দিয়েই মেটাবার ইচ্ছা। একটা মানুষের সমস্ত স্নেহ-মমতার অধিকারী হওয়া বড় মুন্সিলের জিনিষ। আমি এক এক দিকে তাঁর ভগবানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি মনে হয়। তুই বলছিস আমি জোর ক’বে বিলাত যেতে পারি? তা পারি হয়ত। কিন্তু ফিরে এসে মাকে আর দেখব কি না সন্দেহ। তাঁর কিছুকাল যাবৎ heart troubles জুটেছে, এত বড় ‘শক্’ সহাবে না। কাজেই চূপচাপ ব’সে আছি, যতদিনে তিনি মত দেন। চাকরীর জন্তে বিলাত যেতে হবে না, এই এক রক্ষা।”

ইতিমধ্যে জল-খাবার আসিয়া পড়িল। রুপার, পাথরের এবং চীনমাটির বাসনে টেবলটা সবখানা ত ভরিয়া গেলই, তাহাতেও জায়গায় কুলায় না দেখিয়া ভৃত্য ছুটিয়া পাশের ঘরে গেল, আর একটা ছোট টেবল আনিতে। দুইজন দাসী ততক্ষণ আধ ঘোমটা টানিয়া খাবাবের রাশ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। টেবল আনা হইলে পর সব খাবারের পাত্র তাহার উপর গুছাইয়া রাখিয়া দাসীদ্বয় চলিয়া গেল। চাকরটি, যদি তাহাদেয় আবও কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, তাহারই অপেক্ষায় দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্র বলিল, “আরো জন দশ বারো খাবে ব’লে মনে হচ্ছে হে; তাদের ডেকে পাঠাও, অনর্থক দেরি ক’রে লাভ কি? ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ তেড়ে।”

সুবীর হাসিয়া বলিল, “তুমি আরম্ভ ক’রে দাও, গলাগাটিক স্তর দিতে নেই। অন্নদের আসবার সময়

হ’লেই তারা আসবে। দেখ, চা ঢালব নাকি? না, এই সরবতেই চলবে?”

চন্দ্র বলিল, “দেখা যাক। এ কিন্তু তোদের অন্নায় বাপু! টাকা আছে ব’লে কি তা নর্দমায় ঢেলে দিতে হবে? দুটো মানুষের জন্তে যা জলযোগের ব্যবস্থা দেখছি, তাতে দশটা মানুষ বেশ পেট ভ’রে খেতে পারে। এর কতখানি ফেলা যাবে, আন্দাজ কর ত? তুই রোজই এইরকম জলযোগ করিস ত? তুই প্লেট ফল, লুচি ভাজা, তরকারী, চাটনি; সরবৎ তুই রকম, পায়ের ক্ষীর এবং কমলালেবু; সন্দেশ দু-রকম, বসগোল্লা, এবং পিঠে; তাব ওপর চা। এই ত দেখছি জলযোগের ব্যবস্থা, তোমরা পেট ভ’রে খেতে হ’লে তা হ’লে কি খাও?”

সুবীর বলিল, “রোজই কি আর অত খাই? আজ তুমি এসেছ শুনে ভবানী দিদির একটু বিশেষ রকম দিল খুলে গেছে দেখছি। নাও, আরম্ভ কর, তোমার ক্ষিদে না পাক, আমার পেট চোঁ চোঁ করছে।”

তুই বন্ধু আহা! স্বপ্ন করিস; খাইতে খাইতে চন্দ্রনাথ বলিল, “ভবানী দিদিটি কে হে? বাড়ীতে ত এক তোমার মা আছেন ব’লেই জান্তাম।”

সুবীর বলিল, “ভবানী দিদির পরিচয় দেওয়া শক্ত ব্যাপার। তিনি জন্মেছিলেন রাজপুতানী হ’য়ে, কিন্তু জীবনটা কাটিয়ে দিলেন বাঙালীর ঘরে। আমার দাদা মহাশয় যখন রাজপুতানায় কাজ করতেন, তখন ইনি তাঁদের বাড়ী য়ি হ’য়ে আসেন। কিন্তু বেশীদিন য়ি ভাবে এঁকে কাটাতে হয়নি, বাড়ীবা পাঁচ জনের একজনের মতই তিনি ছিলেন! চেহারা দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে বোঝাই যায় যে, ভগবান তাঁকে দাসী বৃত্তি করবার জন্তে সৃষ্টি করেননি। আমার মায়ের বিয়ে হ’বার পর, ভবানী দিদি তাঁর সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে ইনিই আমাদের সংসারের অভিভাবিকা হ’য়ে আছেন। একাধারে তিনি house-keeper, manager এবং cashier. তিনটে লোক রাখলেও এর চেয়ে ভাল ক’রে কাজ চলত কিনা সন্দেহ। মা ত কোনো দিনই কিছু দেখেননি সংসারের। আমাকে

মানুষকরার কাজটাও তিনি যতটা না ক'বেছেন, তার বেশী ক'রেছেন ভবানী দিদি।”

চন্দ্র বলিল, “বেশ remarkable ত হে! তাঁকে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।”

সুবীর বলিল, “স্বচ্ছন্দেই দেখতে পারিস, তিনি ত আর অসুস্থ্যাম্প্রাণ বঙ্গললনা নন, তার উপর বয়সও হ'য়েছে প্রচুর। মা আজ বাড়ী নেই। এর পব একদিন তাকে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব, ভবানী দিদির সঙ্গে দেখিয়ে দেব।”

এতক্ষণে ইহাদের খাওয়া শেষ হইল। সুবীর চা ঢালিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, “খাম, খাম, আর জায়গা নেই। এর পর নাক মুখ দিয়ে সব বেরিয়ে আসবে। ওহে বাপু রোহিণী, না অশ্বিনী, কি তোমার নাম? এগুলি সব সরিয়ে নিয়ে যাও; আর গুগুলোর দিকে তাকাতে পারছি না।” ভৃত্য তাড়াতাড়ি আসিয়া প্লেট, গেলাস প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া গেল।

টেবলের উপর পা উঠাইয়া দিয়া পানের মশলা চিবাইতে চিবাইতে চন্দ্র বলিল, “বাড়ীতে “Smoking prohibited” নাকি হে?”

সুবীর হাসিয়া বলিল “Prohibit আর কে করবে হে? বিশেষ ক'রে আমার পূর্বপুরুষগণ smoking কেন, আর যতরকম যা কিছু আছে, সবই যখন অবোধে চালিয়ে গেছেন। তবে আমিও পাছে তাঁদের পদাঙ্ক অহুসরণ করি, এবিষয়ে মায়ের ভয়ানক একটা ভয় আছে দেখি। তাঁই পাছে তিনি কষ্ট পান ভেবে বাড়ীতে আব উন্মাদুখী হবার ব্যবস্থাটা রাখি না। বাইরে অবশ্য তোমাদের পাল্লায় পড়ে যে ক'গুটা সিগারেট ধুংস করি তার খবর ত' আর তিনি রাখতে যান না। মায়ের বিশ্বাস, সব দিক দিয়েই আমি এখনও Sir Gallahad আছি। একদিন থিয়েটারে গিয়েছি শুনে মহা shocked হ'য়ে গিয়েছিলেন।”

চন্দ্র বলিল, “তোমাদের পক্ষে extra-careful হ'লেও ক্ষতি নেই। Heredity যদি মানতে হয়, তাহ'লে রক্তের মধ্যে যে পাপের বীজ থাকে, তাকে রোগের বীজের মতই

ভয় করে চলতে হয়। আমরা হয়ত যদি একবার গলাশে চুমুক দিই, তা হ'লে থেমে যেতে কিছুই কষ্ট হবে না। কিন্তু তোমরা যদি একবার স্বাদ পাও, তাহ'লে চির জীবনের মত দাসত্ব লিখে দেবে। সাবধান থাকাই ভাল।”

সুবীর বলিল, “ধাঃ, ধাঃ, সব বাজে। আমি bet করুতে পারি সব-চেয়ে দামী আর সুস্বাদু মদও যদি আমি খাই, শুধু একবার নয়, পাঁচ ছ'বারও, তাহ'লেও আমার ছাড়তে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হবে না। ওবিষয়ে আমার এক-ফোঁটাও টান নেই। নাচওয়ালীর ঘাঘ'বার পেছনে ছুটবার সখও আমার কোনোদিন হয়নি, হবেও না, এ আমি পরীক্ষা ক'রেই দেখেছি। Ideaটাই আমার nauseating লাগে। Heredity আমি মানি বটে, তবে তাই নিয়ে যে যেখানে যত ভ্রাকামী আর বোকামী করেছে, সব কিছু আমি মানতে রাজী নই। তাহ'লে ত বৈচে থাকাই দায় হয়, এবং দিবারাত্র মায়ের আঁচলেব তলায় নিজেকে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। তাঁর যদিও ইচ্ছা তাইই, নিতান্ত সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন বেরতে দেবার আগে গলায় একটি রক্ষাকবচ বুলিয়ে দিতে চান।”

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “রক্ষাকবচটি সজীব ত?”

সুবীর হাসিয়া বলিল, “তা না হ'লে আর এত আপত্তি করুব কেন? তোমার কি পিতলের কবচ হ'লেত বাড়ীর বাইরে গিয়েই খুলে পকেটে পুরতে পারতাম। কিন্তু রক্ত-মাংসের জীব বড় ভয়ানক জিনিষ হে ‘শেষ কালেতে মাথার বতন, লেপ্টে রইবেন আঠা মতন,’ এমনই, যে, প্রাণ একেবারে আইটাই করবে। অনেক কাল আগে পুরনো বঙ্গ-দর্শনের একটা গল্পে পড়েছিলাম যে, একজন চাকর নিজের জীর বর্ণনা করুছে মনিবপুত্রের কাছে, ‘কি করুব দাদা ঠাকুর? এ মা নয় যে তেড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে খেদিবে দেব। এ যে ইস্তিরী, অন্ধড়।’ নইলে আর বিলাত যাওয়া লোভও ছেড়ে দিই?”

চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, “মা বুঝি ঐ conditionও যেতে দিতে রাজী আছেন?”

সুবীর বলিল, “হ্যা, কিন্তু যে-ধরণের নৈ আমার পছন্দ, সেটা তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। কাহেই, এখন

আমার চুপচাপ ব'সে থাকা ছাড়া উপায় কি? তা না হ'লে ত দিব্যি বিয়ে ক'রে honeymoon trip এই বিলাত চ'লে যাওয়া যেত। সে কি grand হ'ত ব'ল ত? কল্পনা ক'রেই জিবে জ্বল আসে।”

চন্দ্র বলিল, “আরে, সবুরে মেওয়া ফলে। এখন থেকে অত ঘাবড়াস্ কেন? চল্ একটু বাইরের থেকে ঘুরে আসা যাক্। এই গবমে কি হবে টেকা যায়?”

দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

(১০)

জমিদার-বাড়ীতে তখনও সবাই নিদ্রিত, কি-চাকর-গুলার শুক নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ভোরের আলো সবে খোলা জানালার ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম অধিবাসীদের চোখের উপর জাগরণের তাগিদ বহন করিয়া আনিতেছে। দ্বিতলের একটি বড় ঘরে দুইটি মানুষ ঘুমাইতেছিল। এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারেও বুঝা যায় যে দু'জনেই রমণী।

একজনের ঘুমের পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে ছ' চারবার এশাশ ওপাশ কবিতা আলস্ত ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ডাকিল, “ভানু-ও ভানু, ওঠ গো। কাল সারাটা দিন ত দাঁতে কুটো দিবে কাটিয়েছ। এখন উঠে চান ক'রে, মুখে কিছু দাও, তা না হ'লে আবাব শরীর ধরাপ করবে। কাল রাত্তিরেই আমি সব জোগাড় ক'রে রেখেছি।”

আব-একটি রমণীও ভাকাডাকিতে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। দিনের আলো এখন বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল, ঘরের ভিতরটায় আব আবছায়া ছিল না। ঘরের একধারে একটি ছোট অথচ মূল্যবান পালঙ্ক, তাতে একটি মানুষই শুইতে পারে, অস্ত্র দিকে একটি তক্তপোষ। এবটা আলনা দেয়ালের গায়ে ঝাড়া হইয়া আছে, তাহাতে তিন চারখানি ধান ধুতি, একটি গরদেব চাদর এবং একটি সেমিজ রক্ষিত। ছোট একটি আলমারী এক কোণে, তাহাতে সারি সারি বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক। ঘরের অস্ত্র এক কোণে, এবটি লোহার দিম্বুক, তাহার ভিতরে যে কি আছে, তাহা বুঝিবার উপায়

নাই। যে দুইটি মানুষ এতক্ষণ এ ঘরে ঘুমাইতেছিল, তাহারা যে আমাদের পূর্বপরিচিতা ভবানী এবং ভানুমতী, তাহা বোধহয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ভবানী এখন বুদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। মাথার চুল পাকা, মুখ গভীর বলিরেখায় অঙ্কিত। গায়ের রং হলুদে তুলট কাগজের মত হইয়া উঠিয়াছে। দাঁড়াইলে বোঝা যায়, তাহার দীর্ঘ দেহ অনেকখানিই ছুইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই তাহাকে এখন আর পুরুষবেশী নারী মনে হয় না। শরীরে সে-শক্তি আর নাই। ভিতর হইতে কিসে যেন তাহার শরীর-মনের বল স্রাবিত হইতেছে। তাহাকে এখন সাধারণ বাঙালী ঘরের একটি বুদ্ধা বলিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দেওয়া যায়, যদিও চোখের দৃষ্টিতে আগেকার দিনের রক্ত তেজের বলক এখনও মাঝে মাঝে জ্বলিয়া ওঠে। আগের চেয়ে সে কথাবার্ত্তাও ঢের কম বলে।

ভানুমতী এখন প্রৌঢ়ত্বের সায়মানায় আসিয়া পৌছিয়াছে। অকাল-বৈধব্য ও সংসারের নানা দুঃখ-হাস্তস্তার আঘাত তাহাকে বয়সের চেয়েও দ্রুতগতিতে বার্ধক্যের দিকে ঠোলয়া লইয়া চলিয়াছে। তবুও এখনও হাজার লোকের মাঝে দাঁড় করাইলে সকলে একবার সন্দেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে। সে যে রাণী হইতেই জন্ম লইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাহার শুভ্র রক্তহীন মুখে, দৃষ্ট চেলার ভঙ্গীতে, আয়ত চোখের দৃষ্টিতে এখনও বর্তমান। বরিয়-পড়ার মুখে শ্বেত শতদলের যে শোভা, তাহা এখনও তাহার দেহকে ত্যাগ করে নাই। মাথার চুলে এখনও পাক ধরে নাই, অন্ততঃ উপর হইতে দেখিয়া কিছুই বোঝা যায় না।

ভবানীর ডাকে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, “ওমা, এরি মধ্যে দিব্যি রোদ উঠে গেছে দেখছি। কাল অত ঘোরাঘুরি ক'রে এমন দশা হ'য়েছিল যে একেবারে মড়ার মত ঘুমেয়েছি। অত যে স্বপ্ন দোষ রোজ রাতে, কাল তাও দোষান। যাই স্বানটা ক'রে আসি।”

ভবানী ইতিমধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। বিছানা উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, “রোস, তেল

এনে দিই। বারণ করলুম যে, একাদশীর দিনটা অমন টো টো করে বেড়িও না বাপু, শেষে নিজেই ভুগবে, তা কারো কথা শুনবার মেয়ে ত তুমি নও! এখন কিছু ভাল মন্দ না হ'লেই হয়। ওরে ও মাধী, তেল দিয়ে যা না। নবাবের বেটীদের এখনও ঘুমই ভাঙেনি নাকি?”

নবাবের বেটীদের ঘুম ভাঙিয়াই ছিল। একজন কি তেলের বাটি হাতে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর আসিয়া হাজির হইল। ভাঙ্গুমতী খাট হইতে নামিয়া একখানি পাটির উপর বসিল। গলা হইতে একগাছি সরু বিছা-হার খুলিয়া পাশে রাখিয়া বলিল, “নে, তেলটা দিয়ে দে। জানিস্ ভবানী, এইটুকু যে পরি, তাও লোকের পোড়া চোখ এড়ায় না। ভাবে, বুড়ো মাগী, বিধবা হয়েছে, তবু গয়না পরার সখ যায় না। এক এক সময় ভাবি খুলে রাখি, কিন্তু মন ওঠে না বে।”

যে ঝিটি তাহার স্বদীর্ঘ চুল খুলিয়া তেল দিয়া দিতেছিল সে বলিল, “লোকের মুখে আগুন মা, তাদের কথায় তুমি কান দিও না। তোমার ছেলে রয়েছে অমন রাজপুত্রবের মত, গলা খালি করলে তার অকল্যাণ হবে।”

পুত্রের নাম হইতেই ভাঙ্গুমতীর মুখের উপর একটি গভীর স্নেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সে হাসিয়া বলিল, “মনে আছে রে ভবানী, যেদিন প্রথম থান কাপড় পরলুম, সেদিন খোকা কি রাগারাগিটাই না করলে। বলে তোমার হাতে আর আমি খাব না, তুমি বিচ্ছিরি। তখন ত তবু ছোটটি ছিল, বড় হ'য়েই কি জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু বেশী হয়েছে? ও বছর বললুম, ‘প্রয়াগে গিয়ে এবার চুল ক'টা ফেলে আস্ব, বয়েস ত হ'চ্ছে, এখন তিখি-ধম্ম কিছু কবি,’ তাতে বলে কি, ‘অমন বেলের মত মাথা ক'বে যদি তুমি এসো, তা হ'লে আমি বাড়ীর থেকে বেরিয়ে যাব, তোমার মুখ দেখবো না। বাবা যে কেন তোমাকে টাকাকড়ি খরচ ক'রে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন তা জানি না, সবই তোমার পাড়াগৈয়ে বুড়ীদের মত।”

ভাঙ্গুমতী সব কথাই শ্রায় ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতেছিল, কিন্তু সে কোনো কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া নীরবে আপনার কাজ করিতেছিল। পাবনপক্ষে কথা না বলাই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উত্তর দিবার ভার লইয়াছিল মাধবী ঝি। সে বলিল, “দাদাবাবুর যা কথা, মা! সেটের কোলে বডটি হ'য়েছেন, এখন বিয়ে-থাওয়া দিয়ে দিলে বেশ হয়। তখন আর মাকে কেমন দেখাচ্ছে, সে-কথা বেশী ভাববেন না। যে বয়সের যা মা; একটি কৌরাণী এলে আমাদেরও বাড়ী সাজস্ত হয়। এত বড় বাড়ী সেন খাঁ খাঁ করছে, লোক নেই, জন নেই।”

ভাঙ্গুমতী বলিল, “আমাবই কি অসাধ বাছা? বয়সও হয়েছে, রোগেও ধবেছে, এখন খোকার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারি। কিন্তু ন্যতি-নাতনী দেখে মরার স্বখ কি আর এ পোড়া কালো আছে? যা সম্মাসী ছেলে, ওব জমিদার-বাড়ীর হেলের মত কোনো হাল-চাল নেই! বিয়ে কর্তেও রাজী হয় না, তা না হ'লে মিস্তিরবা কি কম সাধাসাধি করছে মেয়ে নিয়ে? ঘবও ভাল, মেয়েও ভাল। তবে একটু হোট, এই যা। তা বাড়ালীর ঘরে কিছু অসাজস্ত হ'ত না, কিন্তু ছেলের পছন্দই অল্প বকম।”

ভবানী এতক্ষণে কথা বলিল, “যে-সময়ের যেন, তেমন ত হ'বে বাছা? আজকালকাব কোনো ছেলেই কচি বৌ পছন্দ করে না, তা তোমার ছেলেই বা ক'তে যাবে কেন? তারা চায় বৌ তাদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমানে চলুক! আমি ত ভালই বলি সেটা, যলে বৌ ঘোমটা টেনে শাপুড়ী-ননদেব মধ্যে ব'সে থাকবে, আর ছেলে শুদিকে কোথায় বাইজি, কোথায় নাচওয়ালা এই সব নিয়ে ঘুরবে, সেই কি ভাল? বউ যদি সব দিক দিয়ে মন জোগাতে পারে, তাহ'লে কি আর ছেলেরদের রসব বদধেরাল হয়? তুমি বাপু, ছেলের অমতে বৌ জোট তে যেও না, তাতে ভাল হবে না, এই তোমাকে ব'লে দিলুম। দেখতে না জাননা কেমন করত তোমাকে ইং'জি শেখাবার জন্তে, গান-বাঞ্ছনা শেখাবার জন্তে? তোমার খণ্ডর ঢালাক মানুষ ছিলেন, কোনোদিন আপত্তি করেনি।”

ভানুমতী বিষম মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “সত্যি কত চেষ্টাই যে ক’রেছিলেন! আমি ছাইকপালী তবু পিশাশুড়ীর ভয়ে তাঁর কথা শুনতে চাইতুম না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে অমন মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়? মিত্তির-দের মেয়েটি নাকি দেখতে খাসা, ফোর্থ ক্লাস অবধি পড়েছে, গান-বাজনাও কিছু কিছু জানে। তবে বয়স কম, মাত্র তেরো বছর। তা ওরা মেজদাদির কাছে বলেছে আমরা যদি কথা দিই, তবে ওরা মেয়ে আরো বছর দুই রাখতে পারে, তার বেশী আর পাববে না। বনেদী ঘর, তাদের আবাব আত্মীয়-স্বজনে ছি ছি করবে। থোকাকে আজ আর-একবার ব’লে দেখতে হ’বে। মেজ-দিদি আজকালের মধ্যে একবার আসবে ব’লেছিল, তাকে নাকি ওরা অতিষ্ঠ ক’রে তুলেছে।”

ভবানী বলিল, “যাও বাছা, চান ক’রগে। পরের ভাবনা, পরে ভেবে। তবে এইটুকু ব’লে রাখি, হিন্দু-য়ানীর ঘটা করতে গিয়ে ছেলের মন ভেঙে দিও না। না হয় ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান মেয়েই বিয়ে করবে, তারাও ত মানুষ।”

ভানুমতী হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, “বুড়ো হ’য়ে তোর ভীমরথী ধরেছে দেখছি। খ্রীষ্টান বিয়ে করবে কি বকম? তাহ’লে আর আমায় এ বাড়ীতে টিক্তে হ’বে না। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, আমার ঐ এক ছেলে, তার বৌ নিয়ে আমি ঘর করতে পাব না? থোকা আমার বেঁচে থাক, সে গাকে অমন দুঃখ কখনও দেবে না।”

মাধবী বিশ্বাসের আতিশয্য দেখাইবার জন্য গালে হাত দিয়া বলিল, “দিদি, কি যে বলে তার ঠিক নেই! এ কি হৈজি-পেজির ঘর যে যা খুসি করলেই হ’ল! এই বংশে শেষে খ্রীষ্টান বউ আসবে! ওমা!”

ভবানী তাহাকে তড়া দিয়া বলিল, “নে নে, জ্ঞান সাধতে হ’বে না। তুমি যাও বাবু, চান ক’রে এসো, আমি ফলটলগুলো গুছিয়ে আনি।” বলিয়া সে শয়ন-কক্ষ ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। ভানুমতী চলিল আনের ঘরে, পিছনে তেয়ালে, ধুতি প্রভৃতি লইয়া চলিল মাধবী।

স্নানান্তে খাইতে বসিয়া ভানুমতী বলিল, “মাধী,

রোহিণীকে ডেকে জিগ্গেস করত রে, থোকা উঠেছে নাকি, তার চা-টা খাওয়া হ’য়েছে নাকি? নিজের পোড়া পেট নিয়েই ব্যস্ত আছি, ছেলেটার এখন অবধি খোজই নিলুম না।”

ভবানী বলিল, “সে এখনও ওঠেনি গো ওঠেনি, তুমি খাওত।” মাধবী তবু গৃহিণীর আত্মপালনার্থ রোহিণীর সন্ধানে চলিয়া গেল।

খাইতে খাইতে ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, “আম আনাস্-নি যে বড় এবার?”

ভবানী বলিল, “এনেছিলুম। সবে উঠেছে, দাম বেশী ব’লে গোটা দুই মোটে এনেছিল। ভাবলুম একটা থোকাকে দেব, একটা তোমার জন্যে রাখব। তা থোকা কাল বিকেলে আর-একটি ছেলেকে নিয়ে এল, একসঙ্গে জল খেল, তা দুটোই তাদের দিলুম।”

ভানুমতী বলিল, “ওমা, তাই নাকি? কে ছেলেটি?” ভবানী বলিল, “নাম ত জানি না।” রোহিণী বলিল, “দাদাবাবুর সঙ্গে আর-এক বাবু এসেছে।” উঁকি দিয়ে দেখলুম, ওরই বয়সী একটি ছেলে, একসঙ্গে পড়ে বোধ হয়। তুমি থাকলে বোধ হয় এদিকে নিয়ে আসত; খোজ করছিল, মা আছেন নাকি।”

ভানুমতাব খাওয়া শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। মাধবী থালা বাটি উঠাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেই ভবানী বলিল, “এখন আর ঘোরাঘুরি করো না। একটু জিরোও, তা না হ’লে আবার বুক টিপ্‌টিপ হুক হ’বে। থোকা চা খাওয়া হ’লেই আসবে এখন এদিকে। না হয় আমি তাকে ব’লে আসছি। হার-ছড়া গলায় দাও, ফেলে রেখে পাশে, আবার কোথা দিয়ে কে নিয়ে যাবে।”

হারটি সফ, তাহাতে মস্ত ভারী এক পদক ঝুলিতেছে। স্প্রিং টিপিলেই তাহার উপরের ডালাটি খোলা যায়, ভিতরে জ্ঞানদারঞ্জনর একটি ক্ষুদ্র ছবি। ভানুমতী একবার ডালা খুলিয়া ছবিটি দেখিয়া লইল, তাহার পর হার উঠাইয়া গলায় পরিল। ভবানী বাহির হইয়া গেল, স্ববীরের সন্ধানে।

মিনিট দশ পনেরো পরেই স্ববীর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সবে ঘুম ভাঙিয়াছে তাহার চিহ্ন এখনও তাহার

চোখ মুখ আর পোষাকে বর্জমান। ঘরে ঢুকিবাই মায়ের পিঠে মুহু একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, “কি মা, কালত খুব মন্ত এক বস্তা পুণ্য সঞ্চয় ক’রে এসেছ শুন্লাম। এখন ভাঃ ভৌমিককে ডাক্তে হবে নাকি তাই বল। তোমার পুণ্যে সবচেয়ে লাভবান হ’ন তিনিই, বেশ call এর উপর call জুটতে থাকে।”

ভানুমতী হাসিয়া বলিল, “বোস্ বোস্, এখনি ডাক্তাবু ডাক্তে হ’বে না, স্ববীর ত কিছু খারাপ করছে না। চা-টা খেয়েছিস?”

স্ববীর বলিল, “হ্যাঁ, লাল সববৎ খেয়েছি। তোমাব চাকরটি যা চমৎকার চা করে তার সঙ্গে কুলফো মালাইয়ের তফৎ বোঝা শক্ত। রোজ বলি আমাদের চা, চিনি দুধ আর গরম জল দিয়ে যেতে, তা ভক্তির আতিশয্যে কোনো দিনই সে সেটা ক’রে উঠতে পারে না। ওর জ্বালায় আমার এত দিনেব বন্ধুকে না ভাগ করতে হয়।”

ভানুমতী বলিল, “তা, চা না খেলেই বা ক্ষতি কি? ওতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ডাক্তারে বলে। আমবা যে চা খাই না, তাতে আমাদের ত কোনো অসুবিধা হয় না?”

স্ববীর বলিল, “সুবিধা যে কি হয়, তাও ত দেখি না। ভাঃ ভৌমিক তোমার কল্যাণে মাসে এক শ’ টাকা অন্ততঃ পান, আমাব এই যে তেইশ বছর বয়স হ’তে চল্ল, আমার জন্মে তেইশ টাকাও ডাক্তারকে দিতে হয়েছে কিনা সম্ভব।”

ভানুমতী স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিল, “যা যা, আর বড়াই করতে হ’বে না। ভারি না ভাল স্বাস্থ্য, তালপাতার সেপাই কোথাকার। কাল কে এসেছিল রে তোর সঙ্গে?”

স্ববীর বলিল, “ও, আমার সঙ্গে পড়ে, চন্দ্রনাথ ব’লে একটা ছেলে। নিয়ে এসেছিলাম, তোমাব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দেব ব’লে, তা তুমি ত রাত দশটায় ফিরলে। আজ আর কোথাও বেদচ্ছ না ত? গাড়ীখানা আমার চাই।”

ভানুমতী বলিল, “আমি কোথাও যাব না। তবে মেজদিদিকে সন্ধ্যার সময় একবার আনতে পাঠাবার

কথা আছে। তা সে আর কতক্ষণ লাগবে? আধ ঘণ্টা বড় জোর। তাবপর তুই গাড়ী নিস এখন।”

স্ববীর বলিল, “কাজ নেই বাপু, তুমি গাড়ী রাখ, আমি ট্যাক্সি ক’রে যাব এখন। মেজ মাসীম আসবার আগেই আমি চম্পট দেব। তাঁর সঙ্গে দেং। করতে আমি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নেই।”

ভানুমতী বলিল, “পাগলের কথা শোন! কেন রে? মেজ মাসী তোকে কামড়ায় নাকি? সে আসাব আগে পালাবি কেন?”

“তিনি ত এসেই কোন ছদ্মপোষা খুঁকীর রূপ-গুণ বর্ণনা করতে বসবেন, সে শুন্তে আমি আর বজ্র নই। তুই কান প’চে গেছে।”

ভানুমতী বলিল, “তবে তুই কি বিয়ে ক’বিই না একেবারে ঠিক করেছিস? একমাত্র ছেলে তুই এ বংশেব, তুই এ রকম ক’রে জেদ ধরলে চলে? আমাকে নাতির মুখ দেখে মরতে দিবি না?”

স্ববীর বলিল, “বুড়ী হওনি, তবু বুড়ী-গিরি না কলালে তোমার চলে না। এখনি না ম’লে তুমি কিছুতেই চলবে না?”

ভানুমতী বলিল, “আর বুড়ী হ’তে বাকিই বা কি? বাঙ্গালীর মেয়ে কুড়ি পার হ’লেই বুড়ী আর আমার ত দুকুড়ি কোন্ কালে পার হ’য়ে গিয়েছে। জানিস, কাল কালীঘাটে মিত্তিরেব জ্যোতির সঙ্গে দেখা হ’ল।”

স্ববীর বলিল, “তবে ত আমি কৃতার্থ হলাম। কি তাঁর বক্তব্য?”

ভানুমতী হাসিয়া বলিল, “কবে আমাদের দিক থেকে মেয়ে দেখতে যাবে তাই খোঁজ নিচ্ছিল। মেয়ে নাকি খুব স্নন্দর রে।”

স্ববীর বলিল, “স্নন্দর হ’লেই তাকে গিয়ে দেখতে হবে? আচ্ছা শুধু দেখলে যদি তুমি খুঁসি হওত গিয়ে দেখে আসব।”

ভানুমতী বলিল, “আচ্ছা, দেখেও যদি তাব পছন্দ না হয়, তবে আমি আর কথা কইব না। তা হ’লে একটা দিন ঠিক ক’রে মেজদিদিকে কাজ ব’লে দেব।”

স্ববীৰ বলিল, “যা খুনী ক’রগে, আমি এখন চললাম। আজ যেন বেশী ঘোরাঘুরি কোরো না। এমন-কি বামুনঠাকুরের রান্নার তদারক ক’রবার লোভও ত্যাগ কোরো। প্রতি একাদশীর পর অস্থখ করা ত তোমার এক রুটী দাঁড়িয়ে গেছে। অন্ততঃ বৈচিত্র্যের খাতিরেও ছ একবার সেটা বাদ দাও।” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভানুমতী ভবানীকে ডাকিয়া বলিল, “রান্না-বান্না-গুলো দেখিস্ একটু আদ্র। আমার অভিভাবক বাবাটি আমার আজ নীচে নামা বারণ ক’রে দিয়ে গেলেন নতুন বামনী মাগীর যা রান্নার ছিঁরি, তা ভুতেও খেতে পারে না। মেয়ে মানুষের হাতে যে আবার এমন অখাদ্য সৃষ্টি হয় তাও জান্‌তুম না। আর পাশের বাড়ীর বুড়োঠাকুরকে একটু ডেকে দিয়ে যা, গল্প-স্বল্প করি, একলা হাঁ ক’রে ব’সে থেকে আর কি ক’রব?”

ভবানী ঘাড় নাড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। এ বাড়ীর রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, খাইবার ঘর প্রভৃতি সবই নীচে। তবে বাড়ীতে লোকের সংখ্যা এত কম যে, আজকাল আর ঘটা করিয়া খাইবার ঘরে কেহই খাইতে যায় না। সাহেবও ধরনে সজ্জিত খাইবার ঘরটি তালা বন্ধই থাকে, কারণ সাহেব-স্ববাকে খানা দিয়া তাঁহাদের অল্পগ্রহ অর্জনের দিকে বর্তমান জমিদারটির একটুও উৎসাহ নাই; নিজেও সে উপরেই খায়, বসিবার ঘরে পড়ার টেবলের উপর। বাহারের ডাইনিং রুমটি মাঝে মাঝে খোলা হয়। দামী রূপাব বাসন, চীনা মাটির বাসন প্রভৃতি ভবানীব. তদারকে একবার ধুইয়া, মুছিয়া, ঝাড়িয়া ভূতেরা আবার আলমারী সাজাইয়া রাখে, তারপর দরজার আবার তালা চাবী বন্ধ হয়। ভানুমতী ত নিজেই শুইবার ঘরেই খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া লয়, ডাক্তারের হুকুমে তাহার দিনে দুইবারের বেশী সিঁড়ি ঠা-নামা করা বারণ।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। স্ববীর খাইয়া-দাইয়া, গাড়ী চড়িয়া কলেজে চলিয়া গেল। ভানুমতীরও খাওয়া-দাওয়া শীঘ্রই চুকিয়া গেল। বাকি রহিল কেবল বাড়ীর ঝি-চাকরের দল। তাহার ইচ্ছামত যখন খুসি

খাইয়া, মাদুব, কছল, চট, খবরের কাগজ যে যা পাইল, তাহাই পাতিয়া স্থখে নিদ্রা দিল। উপরের তলায় ঘরে ঘরে গরম হাওয়ার ভরে দরজা জান্‌লা বন্ধ হইয়া গেল। বৈজ্ঞানিক পাখার ডানাব ঝপ্টায় বিশেষ কিছু যে আরাম পাওয়া গেল তাহা নহে, তবু মন্দের ভাল বলিয়া ভানুমতী পাখার তলায় শীতলপাটী বিছাইয়া, একখানা যোগবাশিষ্ট বামায়ণের বাংলা অনুবাদ হাতে করিয়া দীর্ঘ দুপুরবেলাটা কোনো গতিকে কাটাইয়া দিল।

ক্রমে রোজের ঝাঁজ কমিয়া আসিল। জান্‌লা-দরজা একে একে খুলিতে লাগিল। বই মুড়িয়া রাখিয়া ভানুমতী উঠিয়া বসিয়া, তাকাইয়া দেখিল দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বড় ঘড়টার দিকে। তাহাব পর দাসীকে ডাকিয়া বলিল, “ওরে মাধী, ফলটলগুলো, আর মিষ্টি সব দিয়ে যা, অমনি ছোট বীটটাও আনিস্। থোকা কলেজ থেকে ফিরেছে কি না একটু খবর নে ত।”

মাধবী আসিল, রঙীন বেতের ডালার নানারকম ফল ও একটি বীট লইয়া, পিছনে মিষ্টি লইয়া আসিল ভবানী। ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “ছেলের আজ্ঞা মেনে আজ ভালই আছ দেখছি। না হয়, আমিই আজ ফলটলগুলো ছাড়িয়ে দিই?”

ভানুমতী বলিল, “না, না, আমি বেশ পারুব, তুই দে। সারাদিন কি হাত পা গুটিয়ে ব’সে থাকা যায়? থোকা ফিরেছে, মাধী?”

নীচে মোটরকার থামিবার ও দরজা-খোলার শব্দ শোনা গেল। “এই এলেন”, “এই এলেন,” বলিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ভানুমতী বীট লইয়া ফল কাটিতে বসিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিকঠাক করিয়া ঝির হাতে দিয়া ভানুমতী ছেলের ঘরের দিকে চলিল।

স্ববীর মুখ ধুংতেছিল। মায়ের পদশব্দে তোয়ালে দিয়া মাথা-মুখ ঘষিতে ঘষিতে বসিবার ঘরে আসিয়া বলিল, “এই যে আজ দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ে হ’য়েছে, অস্থখ-বিস্থখ কিছু করেনি ত? মাসীমার জন্তে গাড়ী পাঠাতে পার এখন, আমার আর দরকার নেই।”

ভানুমতী বসিয়া বলিল, “এই যে পাঠাব আর-একটু

পবে। যা ভয়ানক বোদ এখন। তুই যেতে বোস।
যেজদিদিকে কিন্তু আজ মেয়ে দেখার কথা আমি বলব,
তারপব ঘেন আমাকে বিপদে ফেলো না।”

স্ববীর বলিল, “না, না, তোমার ভাবনা নেই,
দেখব এখন বলেছি তখন দেখবই, যা থাকে কপালে।
আমাকে কি একলাই যেতে হ’বে নাকি? কবে এবং
কোন সময়ে? শনি কি রবিবারে দিন ঠিক কোবো, তা
না হ’লে আমি কিন্তু পারব না।”

ভানুমতী বলিল, “আচ্ছা, আস্তে শনিবারের কথাই
ব’লে দেব। একলা যাবি কেন, বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিস।
পেওয়ানজোফেও ব’লে পাঠাব, তিনিও আসবেন। এক-
আধজন বুড়ো মাস্তব সঙ্গে থাকা ভাল।”

স্ববীর বলিল, “একজন কেন দশজন বুড়ো তুমি সঙ্গে
দিও। আর খুকীটিকে কি কি জিগগেস করতে হ’বে,
তাও শিখিয়ে দিও। তা না হ’লে আমি হয়ত কি যা তা
প্রশ্ন করব, সে ভয়ে কেঁদেই ফেলবে।”

ভানুমতী বলিল, “যা, যা, সব তাতে ফাক্ত-মি।
আমারও ত অল্প বয়সে বিয়ে হ’য়েছিল, কৈ কত ভৈদে-
ছিলাম? বাঙালীর মেয়ে তেরে বছবেই বেশ নাকা-
পোক্ত হ’য়ে যায়। দেখিস এখন, কিছু খুকী নয়।”

স্ববীর নীরবে খাইতে লাগিল। “বাই, মেজদিদির
জন্মে গাড়ীটা পাঠিয়ে দিইগে,” বলিয়া ভানুমতী ঘর
হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

যবদ্বীপের পথে

১। রেলো মাদ্রাজ

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১২—১৪ই জুলাই।

আঁবোমাজ (Amboise) জাহাজ
শনিবার ১৬ই জুলাই।

উপবে পরিষ্কার আকাশ—ফিকে নীল, ধারে ধারে
দিক্‌চক্রবালের উপরেই সাদা সাদা মেঘ; সকালের বাল-
সূর্যের মিষ্টি রোদ্দুব সমস্ত উদ্ভাসিত ক’রে দিয়েছে—
নীচে সমুদ্রের কালাপানি আব এখন ঘন নীল নয়;
সকালের সূর্য্যেব কোমল স্পর্শে তার গাঢ় বঙটাও একটু
হাল্কা হ’য়ে চমৎকার দেখাচ্ছে—এ ঘেন একেবারে
ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র। কাছে কাছে, দূরে সব জায়গায়
টগ্‌বগে কেনায় ছোট ছোট ডেউ ভেঙে প’ড়ছে—এই
মধ্যে জল কেটে কেটে আমাদের জাহাজ চ’লেছে। এই
জল বেটে যাওয়ায় একটা একটানা আওয়াজ বরাবর
আমাদের জাহাজের জীবনের background বা চিত্র-

ভিত্তির মতন হ’য়ে র’য়েছে—জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, মাঝে
মাঝে ঘেন একটা সজোর ফৌস-ফৌসানি—সমস্ত
আওয়াজটা মিশে মনে যে-ভাব আনে সেটা হ’চ্ছে অ’বির
কথায় “অসীম রোমন জগৎ প্রাণিয়া ছলিছে ঘেন।”

আকাশ প্রসন্ন দৃষ্টিতে সাগরের দিকে স্নিগ্ধভাবে চেয়ে
আছে। আমাদের বাঙালী কবি রবীন্দ্রেন্তের একটি ছোট
ইংরেজী কবিতার একটি লাইন এখন মনে আসছে,—
Jove on Neptune smiles ছোটপিতা বরুণ-দেবের
উপর স্নিতহাস্যে নেত্রপাত করছেন। কালকের দিনটা
বিকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সাবা বিকাল আব সন্ধ্যা
আমরা উপরের ডেকে রেলিংয়ের ধারে ব’সে ব’সে হুটব
কুহেলী দেখে আর জলের উপর বৃষ্টি-বিন্দুপাতের শব্দ
শুনে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার সময়ও মেঘ কাটেনি, নিও
সূর্য্য অস্ত যাবার কালে এক চমৎকার ফিরোজা ডেব

খেলা আকাশে আর সমুদ্রের উপর দেখেছিলুম—সন্ধ্যার crepusale বা আলো-আধারিতে কে যেন হালকা নীলের তুলি দিয়ে আকাশ আর সাগরের উপর এক পৌছ রঙ বুলিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আজকের দিনটাও ঐ রকম জলে-ঝাপটায় কাটবে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু ভোরে উঠে প্রসন্ন আকাশ দেখে মনটা খুসী হয়ে গেল।

জাহাজে আমরা চড়েছি পরন্ত, বেঙ্গলিয়ার; ১১ই তারিখে। বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল—বারবেলা কাটিয়ে, আশা করি। মাদ্রাজ সহবে সকাল আটটায় আমাদের প্রবেশ, সেখান থেকে পাঁচটায় আমাদের প্রয়াণ। কলকাতা থেকে তার দুদিন আগে, মঙ্গলবার ১২ই তারিখে আমরা যাত্রা করি। এই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, তিন দিন ধরে একটানা রেলযাত্রা করে আর মাদ্রাজে ঘোরাঘুরি করে, জাহাজে যখন চড়লুম তখন শরীর মন দুই অবসন্ন। জাহাজ ছাড়তে সকলে একটু আরামের নিশ্বাস ফেললুম—অন্ততঃ চার পাঁচদিন শুয়ে বসে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারা যাবে, এই মনে করে। বিদেশে যাচ্ছি, তিন মাস ধরে আমাদের ভারত-ভূমি বা বঙ্গভূমির মনঃকোকনদ যে আমাদের ক'জন-হীন হয়ে থাকতে পারে সে-কথা আদৌ মনে হয়নি। ১৯১৯ সালে যখন ছাত্র হয়ে দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করি, তখন বোম্বাইয়ের আগোলো-বন্দরের ঘাট ছাড়বার সময় মনটা একটু ভার-ভার হয়েছিল, চোখের কোলও বোধ হয় একটু ভারি হয়েছিল। এবার কিন্তু সে-রকম কিছু হ'তে পারেনি। কারণ যে বিদেশে আমরা এখন চ'লেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাদের কাছে ততটা নেই—এ বিদেশ আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ এই রকম একটু ধারণা (যেটা historical sense বা ঐতিহাসিক অজ্ঞত্বের ফল) আমরা নিয়ে চ'লেছি। কাজে কাজেই দূর বিদেশ-প্রবাসের একটা চাপা আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই।

সন্ধ্যাকাত থেকে মাদ্রাজ—চল্লিশ ঘণ্টার এই রেল-যাত্রা আমরা তিনজনে মোটের উপর বেশ আনন্দেই করেছি। ববি আমাদের পাশের গাড়ীতে, একখানি কামরায় তিনি একা ছিলেন। খড়গপুরে আমাদের কাম-

রায় ঢুকল দুজন ফিরিঙ্গি রেলের লোক—মালপত্র নিয়ে। এরা যাবে মাদ্রাজ অবধি। এদের ঢুকতে দিতে হ'ল। ওদিকে কবির গাড়ীতে একদল কলেজের আর ইন্সট্রুর ছেলে ঢুক পড়ল। এরা মেদিনীপুর থেকে আসছে। কবি আসছেন মনে করে কালকেও এসেছিল, আজ এঁর দেখা পেয়েছে। Autograph hunting বা বড় লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের বাতিক দেখলুম ভীষণ সংক্রামক হয়ে পড়েছে। ছেলেরা চায় কবির হস্তাক্ষর,—ঠাঁর সামনে ছোট বড় বাঁধান খাতা, চার-পয়সানে একদারসাইজ-বুক, ঘরে সেলাই খাতা চার পাঁচ খানা খুলে ধরা হয়ে রয়েছে দেখলুম। একটা সাহিত্য-রসিক ছেলে চায়, তখন কবি ছ'ছত্র রচনা করে তার খাতায় লিখে দেন। ছেলেদের বিমুগ্ধ কর্তে তিনি চান না, অথচ দেশ কাল আর শরীর মন ঠিক কবিতা রচনার উপযুক্ত নয়। তিনি একটু কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে পড়ল, কে একজন নবীন নাট্যকার যশঃপ্রার্থী তার নাটকের গানগুলিতে স্বর দেবার জন্য কবির কাছে এসেছিল। বেশী নয়, গোটা বাইশেক গান। প্রত্যেকটিতে স্বর দিতে, এমন আর কি, বড় জোর আধ-ঘণ্টা করে সময় লাগবে—এটা কি ঠাঁর স্নেহাম্পদ অহুগামীকে বাধিত করার জন্য তিনি করতে পারেন না? স্বরের বিষয় ছেলে কয়টা উক্ত-উদীয়মান নাট্যকারের মতন নাছোড়বান্দা ছিল না। তাদের বাইরে ডেকে নিয়ে এসে মিষ্টি কথায় বলতে, তারা সঙ্কট মনে কবিকে প্রণাম করে চ'লে গেল। খড়গপুর থেকে গাড়ী ছেড়ে দিলে; সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, রাত্রিটা কবি নির্বিক্রে কাটালেন।

আমাদের গাড়ীতে যে দুটি ফিরিঙ্গি উঠল তারা দুই মিলে দু-জন মানুষ বটে, কিন্তু একজন হ'চ্ছে দেড়, আর একজন আধ। রেলের ড্রাইভার কিংবা গার্ড হ'বে। গরীব, ভালো মানুষ। বাঙ্গালোরের দিকে বাড়ী। মোটা লোকটা খুব লম্বা চওড়া, দোহার গড়ন, তার খোঁচা খোঁচা গাঁক; আর তার সহযাত্রী বোঁগা লোকটা আকারে খর্বকায়, বিরল-গোঁফদাড়ী। তারা একসঙ্গে যাচ্ছে, হয় আত্মীয় নয় সহকর্মী। এই যুড়ীটা দেখে মনে হ'ল The long and short of it। বড়টি (চেহারায় ভারি করে বলে বোধ হয়),

ছোটটির boss বা কর্তা হ'য়ে, ওইটির দ্বারা নিজের বিছানা পাতানো প্রভৃতি কাজ করিয়ে নিতে লাগল। আমাদের খাবার থেকে কিছু কিছু ভাগ দিতে ধন্যবাদের সঙ্গে নিয়ে তার সম্ব্যবহার ক'রলে। পথে বিবেচ্য ক'রে অল্পদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় প্রতি বড় ষ্টেশনে কবিকে দেখতে-আসা লোকের ভীড় দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এদের সম্বন্ধপূর্ণ কৌতূহল হ'ল।—তাঁর নামটির সঙ্গে এদের আবছা-আবছা পরিচয় ছিল। বড়টা ব'ল্লে, “আমার এক uncle (খুড়ো কি মামা যা হোক একটা কিছু) ছিলেন, তিনি বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যে। তিনি থাকলে কবির কদর বুঝতেন, তাঁর নাম ছিল মিষ্টার শেপার্ড।—আপনারা কি তাকে চেনেন?—আমরা মুকুট মুকুট মাথায়, আমরা যে কিছুই জানি না।” মাত্রাধের কাছে একটা ষ্টেশনে বৃহস্পতিবার ভোরে যখন গাড়ী থামল, দেখি প্লাটফর্মে হিন্দু রিক্রেশমেন্ট ক্লাবের সামনে এক টেবিলের উপর গরম গরম ডালের বড়া, চালের গুঁড়োর পিঠে আর একটা তরকারীর পসার খুলে, মস্ত এক হাড়ীতে চিনি দেওয়া গরম কফি আর তার পাশে বড় এক আলুমিনিয়ামের থোলা পাত্রে দুধ রেখে বুটী-বাঁধা তামিল ব্রাহ্মণ হোটেলওয়ালার ঠল খাড়া ক'রে ব'সেছে। যত তামিল তেলুগু যাত্রী আলুমিনিয়াম আর পিতলের বাটী ঘটা নিয়ে কফি আর বড়া আর পিঠে কিন্তে ভীড় ক'রেছে। আমাদের কিরিকি দুটি ব'ল্লে—“এরা চমৎকার কফি করে, আর ডালের বড়াও এদের চমৎকার। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টান ব'লে কাছে গেলে আমাদের পাত্রে কফি দেবে না, হয় তো খাবারও বেচবে না—আপনারা দয়া ক'রে আমাদের কিছু খাবার আর কফি এনে দেবেন?”

বুধবার দিন ১৩ই তারিখে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু দুপুরে এখন অসহ্য গরম হ'ল। অল্প দেশে কবির অল্পরাগী আর ভক্তের সংখ্যা দেখলুম অনেক। দেখে মনে যে খুসী হ'ল না এ কথা বলতে পারি না, যদিও এইসব কবি-দর্শনকারী লোকদের ভীড় অনেক সময়ে তাঁর পক্ষে খুব আরামদায়ক হ'চ্ছিল না। The penalties of greatness—এটা তাঁকে মেনে নিতেই হয়, উপায় নেই। প্রায় প্রত্যেক

ষ্টেশনে লোকে তাঁকে দেখতে পেয়ে উদ্বেগে প্রশংসা করছে। আর যেখানে যেখানে গাড়ী বৈশীকণ থেমেছে সেখানে তাঁর কামবার দরজা খুলে দিতে হ'য়েছে—লোক ঢুকে প্রশংসা করেছে, প্রশংসাবাদী তাঁকে শুনিয়েছে, তাঁর লেখা প'ড়ে তাদের আনন্দ আর মনে উৎসাহ লাভের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। শ্রদ্ধা আর ভক্তির আতিশয্যে তাঁর গাড়ীর সামনে বহুস্থলে আগত লোকদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হ'য়েছে; জায়গায় জায়গায় আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে, লোকে ছড়মুড় ক'রে তাঁর গাড়ীতে ঢুকে না পড়ে। তাই স্বরেন-বাবু আর আমি পালা ক'রে ক'রে তাঁর গাড়ীতে গিয়ে দরজা আটকে দাঁড়াতে লাগলুম। তেলুগুদের মধ্যে হুসার জন পরিচিত লোকও এলেন। এক ষ্টেশনে কোচনদ কলেজের ইংরেজির প্রফেসর একটি ভদ্রলোক এলেন; ক'লকাতায় ইনি কিছুকাল ছিলেন,—ক'লকাতায় থাকবার কালে বাঙলা শিখেছেন; একটি তেলুগু-মহিলা এসে বাঙলায় কবির সঙ্গে কথা কইলেন—এইরকম সব লোক এলেন। অল্প অপরিচিত লোকদের মধ্যে সকলেই বেশ সম্বন্ধপূর্ণ। একটা ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক গাড়ীর ভিতরে লা-পরওয়া ভাবে ঢুকলেন—আর একজন পিছু পিছু এসে তাঁর পরিচয় দিলেন যে, ইনি স্থানীয় এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কবির খবর যে ঠিক রাখেন তা মনে হ'ল না; কিন্তু উঠেই পরিচিতের মতন জিজ্ঞাসা ক'রলেন, “আপনি না কোকনদের কংগ্রেসে এসেছিলেন?” প্লাটফর্মের ইতরঙ্গনের প্রতি সগর্ষ দৃষ্টিনির্দেশ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেটগার গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। আর-একটি ষ্টেশনে একজন বৃদ্ধ তেলুগু ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে হাত জোড় ক'রে কবির সামনে দাঁড়িয়ে তেলুগু ভাষায় কি বলতে লাগলেন। শুনলুম ইনি স্থানীয় উকিল একজন, নামটি বায়ান্নাপস্তলু না কি, তেলুগু ভাষায় একজন কবি। ইনি ভারতের কবিগুরুকে নিজেই ভাষায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রতে এসেছেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, (৩ ঘণ্টা) অন্তর সব জায়গায় এইরকম লোকদের সঙ্গে শিষ্টাচার ক'রতে ক'রতে যাওয়া আর তার উপর একেবারে ভাদুয়ে গুমট—এটা যে কি অস্বস্তিকর তা আমরাও হ'ড় হ'ড়ে

টের পেলুম। রাজমহেন্দ্রীতে হুশো আত্মজ্ঞ কলেজের ছাত্র এসে হাজির। এরা সকলেই কাগজে কবির যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে ভুল খবর পড়ে আগের দিনেও ট্রেনে এসেছিল। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে একটি নাদাসিধে ধরণের লোক জানালা দিয়ে কবিকে একটি লেবু, এক টি কাঠের উপর বসে থাকা একাধারে ফুলদানী আর ধূপদাবী,—তাতে কিছু ফুল আর কিছু দক্ষিণী ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া আছে—আর এক টি রঙীন কাঠের নলে ক'বে ধূপ দিয়ে নীরব ভাষায় কবির প্রতি শ্রীতি জানিয়ে নমস্কার ক'বে ভীড়ের মধ্যে মিশে চলে গেল। কবির এই অজ্ঞাত ভক্তের এইরকম নির্বাক অনাড়ম্বর বাহ্য-উচ্ছাদনবিহীন শ্রদ্ধা-নিবেদনটি আমাদের বড় ভালো লাগল। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরীর উপর। গোদাবরী হচ্ছে দক্ষিণের গঙ্গা। মাহাত্ম্য পদ্ধতির চেয়েও বেশী তো কম নয়। এখানে স্নান ক'রলে বিশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। রাজমহেন্দ্রীতে নেমে একদিন থেকে স্নান করবার জন্য বিশুদ্ধ-সংস্কৃত-বহুল তেলুগু ভাষায় (যার আশ্রয় বৃত্তে আমাদের বিশেষ কণ্ঠ হ'ল না) অল্পবোধ এল এক পাণ্ডার কাছ থেকে। লোকটি সরেও না, আর তার সঙ্গে কলেজের ছাত্রেরাও তার কথায় সায় দিয়ে মাহাত্ম্য কায়দায় মাথা নাড়ে, আর ইংরেজিতে বলে—“আপনি দয়া ক'রে নামুন, এখানে থাকুন একদিন। আমাদের কিছু বলুন—এ স্থানটি কাশী'ব চেয়েও বড় পুণ্যক্ষেত্র—এখানে তো আপনি কখনও আসেননি।” রাজমহেন্দ্রীতে নামা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলা গেল। তখন তা'বা বলে, “তাহ'লে কবি আমাদের কিছু উপদেশ দিন—কোনও message বা বাণী বলুন—” তাঁর বক্তব্য যা বলবার তিনি অল্পত্র ব'লে আসছেন। হঠাৎ ট্রেনে দাঁড়িয়ে পলিটিক্যাল সর্দারের মতন দু-মিনিটের দাঁড়া বক্তৃতা দেওয়া তাঁর ধাতে নয় না, এ-কথা বলা গেল। পাণ্ডাটি কিন্তু নাছোড়বান্দা—জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে তার তেলুগু গোদাবরী-মাহাত্ম্য শোনাতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার “বৈয়ী” (অর্থাৎ বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া) সংস্কৃত নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হ'লুম—“যা ব'লেতে চা'ছ বাপু'হে, সংস্কৃতে বল, আমরা তোমার ভাষা বুঝি না—সংস্কৃত জানো না দেখছি, তীর্থগুরু হ'তে এসেছো,

সংস্কৃত জানো না? পাণ্ডা সংস্কৃত জানে না, খালি তেলুগু জানে, এই কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় স্বজ্ঞান পাণ্ডাবার আশা নেই দেখে, আর পিছনেব ছেলেদের ধাক্কাধুক্কিতে স'বে গেল। ছেলেরা এসেছিল নিচ্ছেরাই, এদের বড়ো'বা তেমন কিছু সংস্কৃতের ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারেননি। গাড়ী ছাড়বার সময়ে “রবীন্দ্রনাথ কী জয়” আর “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি উঠল।

রাজমহেন্দ্রীর পরেই গোদাবরী নদীর প্রশস্ত প্রদয়—আব লম্বা রেলের সাকো। তখন সন্ধ্যা হ'ল প্রায়। মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্তে যাচ্ছেন। ঘোলা জল, হ'ল্লে বালির রঙ গোদাবরী, দূরে পাহাড়,—দৃশ্যটি চমৎকার লাগল। গাড়ীর খোলা জানালা আব দরজা দিয়ে বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল। কবির ক্লান্ত শরীরের পক্ষে এই হাওয়া বিশেষ শ্রান্তিহর হ'ল। আমি তখন তাঁরই গাড়ীতে ছিলাম—কবি একটা আবামের নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন—“আঃ, এই হাওয়াটুকুন এসে বাঁচালে। এমন অবদম ক'রে ফেলেছিল এই গরম আর এই গাড়ীর ঝাঁকানি আর লোকের ভীড়—এখন আর কোনও কষ্ট নেই—আমার সব শ্রান্তি যেন এখন দূর হ'য়ে গেল।” দূরে অন্তগামী সূর্য্যকরোদ্ভাসিত পাহাড়ের আর গাছ-পালাব দৃশ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'ললেন—“দেখো হে, যাই বল, এই দেশের প্রতি স্বাভাবিক নাড়ীর টান ছাড়া এর সৌন্দর্য্যের জন্য আরও একটা টান আছে—এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না—মনে হয় আবার ঘুরে এসে যেন এই দেশেই জন্ম নিই।”

কবির কাছে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পরিচয় বহুবার পেয়েছি—কিন্তু দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার পথে তাঁর মুখে এই কথাগুলি আন্তরিক দৃঢ়-আত্মপূর্ণভাবে শুনে আমার মন খুবই অভিভূত হ'ল। আমিও তাঁকে ব'ললুম—“আমাদের দেশ এখন ভিতরে আর বাহিরে এই বকম হীন আর উপেক্ষিত হ'য়ে আছে। ভিতরে আমাদের এত দৈগ্ধ, এত আত্মবিশ্বাসের অভাব, এত নীচতা, সর্দীর্ঘচিত্ততা, আত্ম-কলহ আর পরাভব। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আমার

জা'তের পূর্বকথা স্বরণ ক'রে, আর আমাব জা'ত বেঁচে-
ব'র্ত্তে থাকলে পিতৃপুরুষদের গুণ্যস্বত্তি অতুসরণ ক'রে
আরও কত বড় কাজ ক'রে জগতের কাছে নিজের
অস্তিত্বকে সার্থক ক'রতে পারত, একথা মনে ক'রে যখন
এ বিষয়ে চিন্তা করি তখন স্বতঃই মনে হয়, যে যদি পুনর্জন্ম
সত্য হয় তা হ'লে যত হীন অবস্থায়ই দেশ পড়ুক না
কেন, এই ভারতবর্ষেই ফিরে এসে যেন এই দেশকে সেবা
করবার সহজ অধিকার পাই।" কবির সান্নিধ্য-লাভের
যে স্মৃৎসং আমার ঘটেছে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে অনেক
সময়ে তাঁর সঙ্গে এইরকম বহু বিষয়ে আমার ভাব-সাম্য
এই স্মৃৎসংকে আরও কাম্য, আরও মহনীয় ক'রে
তোলে।

রাত্রি নটার দিকে আমরা বেঙ্গওয়াদায় এলুম।
সেখানেও লোকসমাগম। তাঁর কামরা অন্ধকার ক'রে
দেওয়া ছিল, তা সত্ত্বেও লোকে খুঁজে বার ক'রলে
তাঁকে। আলো জালিয়ে তাঁকে দর্শন দেওয়াতে হ'ল।
প্রৌঢ় বয়সের একটি তেলুগু ভদ্রলোক ইংরেজিতে বক্তৃতা
সুধ ক'রে দিলেন—“আমরা শেক্সপিয়ার প'ড়েছি, কিন্তু
আপনাকে পেয়ে আর আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা
চের বড়ো কবি পেয়েছি।” এদের সকলের প্রশস্তির
আন্তরিকতা বুঝতে দেবী লাগে না। বেঙ্গওয়াদাব পরে
কবিকে আর ভাগবার আবশ্যকতা থেকে মুক্ত করবার জন্ত
তাঁর কামরার দরজা বন্ধ ক'রে ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়া
হ'ল, আমরাও আমাদের গাড়ীতে এসে শোবার ব্যবস্থা
করলুম। সমস্ত পথে জিজ্ঞাস্য লোকদের সঙ্গে কিছু কিছু
ব'কুতে হ'য়েছিল—যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যাচ্ছেন কেন,
“বৃহত্তর ভারত”—এর সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ, বিশ্ব-
ভারতীয় উদ্দেশ্য কি, কেমন চ'লছে বিশ্বভারতীয় কাজ
—ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪ই তারিখের ভোরে খবর নিলুম—দুরাতের গাড়ীর
ভীষণ ঝাঁকানিতে, গরমে, পরিশ্রমে, অনিদ্রায় কবির
শরীর বড়ই ধরাপ—অত্যন্ত অসুস্থ আর দুর্বল অতুভব
ক'রছেন। তাঁর এই সাতষটি বছর বয়সেও তিনি যথেষ্ট
পরিশ্রমেব শক্তি রাখেন, সহজে কাতর হন না; কিন্তু
আমাদের একটু আশঙ্কা হ'ল। মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে

এসে পৌঁছলুম। প্লাটফর্মে বিস্তর লোকের ৩-৬—ছাত্র
আর খবরের কাগজের লোক আর অল্প বিশিষ্ট ভদ্রলোক
কতজন। মাদ্রাজ শহরে সাধারণতঃ কবি যার আতিথ্য
স্বীকার ক'রে থাকেন সেই শ্রীযুক্ত টী, ভী, রামস্বামী
মহাশয় তাঁর মোটর নিয়ে এসেছিলেন। কবিকে ট্রেন থেকে
কোনও মতে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে তাতে চড়ানো গেল। এদিক
মধ্যে তাঁকে মাল্য-বিভূষিত ক'রলে আর সিনেমায় ছবি
তুলে। আমরা মালপত্রের ব্যবস্থা ক'রবার জন্য ষ্টেশনে
র'য়ে গেলুম। আমাদের সাহায্য ক'রতে লাগলেন ডাক্তার
শ্রীযুক্ত কুন্হনবাজা; ইনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল
গবেষক-ছাত্র আর শিক্ষক হিসাবে বাস ক'রেছিলেন; এখন
আড়িম্মার ষিওসার্কাকাল সোসাইটির পুস্তকালয়ে। অধ্যক্ষ,
—আর শ্রীযুক্ত অর্যস্বামী, ইনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থালয়ের
পুঁথিশালার কাষে ছিলেন। প্রেসের রিপোর্টারদের সঙ্গে
কথা কহিতে হ'ল। আর যে ফরাসী কোম্পানীর জাহাজে
আমরা যাব সেই মেসাজারিয়ার মারিতীম (Messageries
Martines) কোম্পানির তরফ থেকে তাঁদের মাদ্রাজের
আফসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এ রাজরত্নম পিলৈ ব'লে
একটি তামিল ভদ্রলোক এলেন। কবিকে তাঁর আপিসের
তরফ থেকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত এসেছেন, কিন্তু তার
সঙ্গে কবির প্রতি ব্যাক্তগত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় আপিসের
কাজ যে যেচ্ছা-প্রণোদিত সেবার আনন্দে সূর্ণ হ'য়ে
উঠেছিল, তার কতকগুলি অন্তরঙ্গ পরিচয় পড়ে গেলুম।
এঁর হাতে বড়ো বড়ো বাক্স পেটরাগুলি তুলে দিয়ে,
আমরা তিন জনে—হুবেন-বারু, ধীরেন-বারু আর আমি,
শ্রীযুক্ত কুন্হনবাজা আর অর্যস্বামীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর
আর-একখানি মোটরে ক'রে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা
হ'লুম।

মাদ্রাজে আমার এই প্রথম আগমন। মৈলাপুরে
শ্রীযুক্ত রামস্বামী বাড়া,—এটা যেন মাদ্রাজের নালীগঞ্জ।
ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালায় ঘেরা বাগান আর হাতার মধ্যে
সব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী। মাদ্রাজকে বেশ একটি
পরিষ্কার শহর ব'লে মনে হ'ল। মাত্র ষট্ট কয়েকের
অবস্থান। বেশী কিছু অবস্থা দেখা হয়নি। পাহারা-
ওয়ালারা সব থাকী গোষাক পরা। তামিল পাহাওয়ালা,

মাথায় সোনার বড়ো টুপী, কারুর কানে মাস্তানা কানফুল, কেউ না তিলক-ধারণ ক'রেছে—সোলা-হার্টের নীচে এগুলি অদ্ভুত দেখালেও মোটের উপর এদের বেশ চটপটে ছাঁশিয়ার ব'লে বোধ হ'ল।

শ্রীযুক্ত রামস্বামী মাস্তানা হাইকোর্টের একজন প্রতি-নামা উকিল। ভদ্রলোকের স্বল্প পরিচয় পেয়ে বড়ো প্রীত হ'লুম অম্বা। অতি মুহূর্তব্যী লোক, মোটেই নিজেকে কবির সম্মানে জাহির ক'রতে চান না, অথচ সর্বদাই তাঁর অতিথিদের সেবার জন্য হাজির। কবির সঙ্গে নানান রকমের লোক সদা সর্বদা দেখা ক'রতে আসছে—ইনি বিশেষ স্ফুটিত—এদিকে কবিকে বিরক্ত যাতে না করা হয় আবার ওদিকে দর্শনার্থী লোকেরা যাতে মনে না কবে যে কবি তাঁর অতিথি ব'লে তিনি কবির সঙ্গে একত্র অবস্থিতির সুযোগ পেয়ে তাঁকে একান্ত অধিকার ক'রে আছেন। আমরা ভালো দিনেই শ্রীযুক্ত রামস্বামীর অতিথি হ'য়েছিলুম। তাঁর বাড়ীতে এক বিবাহ-উৎসব ছিল, তাঁর এক পিস্তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে তিন দিন পূর্বে; বৃহস্পতিবার বেদিন সকালে আমরা পৌঁছলুম সেটা হ'চ্ছে বিবাহ-উৎসবের চতুর্থ এবং শেষ দিন—চার দিন ধ'রে আমোদ অহুষ্ঠান, কুটুপ ভোজন ইত্যাদি চলে।

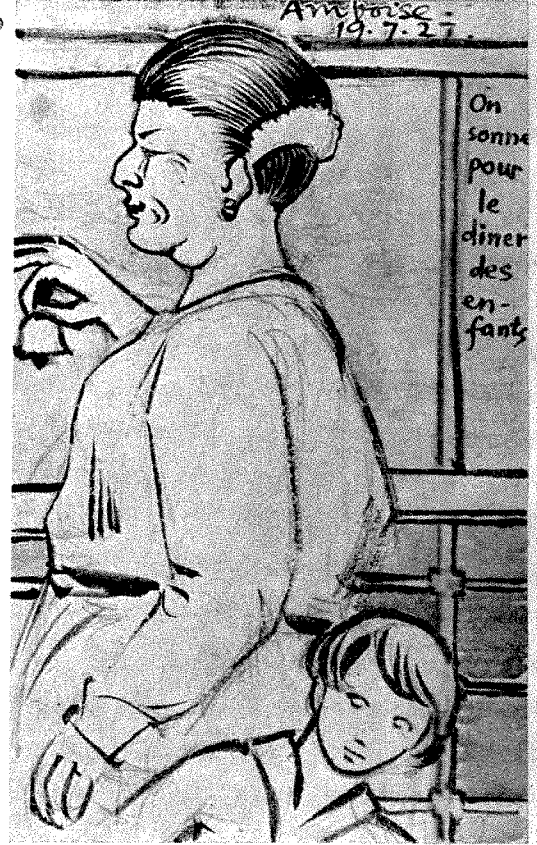
একটু বিশ্রাম ক'রে, আমাদের কার্য ঠিক ক'রে নিলুম। কবিকে সুস্থভাবে বিশ্রাম ক'রতে দেখে আমরা ঠিক ক'রলুম যে, কাছেই কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে, প্রায় ৩৪ শ' বছরের পুরাতন মন্দির, সেইটাই দেখে আসা যাবে। নীচে নেমে, তামিল ব্রাহ্মণদের বিয়ে একটা অহুষ্ঠান দেখার অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটল। বিয়ে-বাড়ী, সদরের ফটকে নহবৎখানা তৈরী হ'য়েছে; ফটকের দু-পাশে বলার কাঁদিওয়ালা ছুটি কলাগাছ, আমপাতা দিয়ে তোরণ রচনা হ'য়েছে। প্রশস্ত হাতাব মধ্যে সামিহানা টাঙিয়ে কালো ঝাঁক কাঠের চেয়ার দিয়ে অতিথিদের বসবার জন্য সভামণ্ডপ তৈরী র'য়েছে। এই সভামণ্ডপে মধ্যে বাড়ীর বারান্দার সামনে সালকাঠের দুই থামের উপর আড়কাঠ থেকে মোটা লোহার শিকলে ক'রে এক বঙান পদ্ম-আঁকা কাঠের পিড়ির দোলনা টাঙানো হ'চ্ছে।

সুন্য যে বর-বনেকে এই দোলনায় বসিয়ে দোলানো হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি সুন্দর স্ত্রী-আচার হবে—ক'নের সখী-সম্পর্কীয়া গান গাইবে। তেলুগু কানারী তামিল মালয়ালীদেব মধ্যে মেয়েদের অবরোধ-প্রথা নেই। দক্ষিণ ভারতে এটা সব-চেয়ে বেশী ক'রে আমাদের চোখে লাগে—মেয়েরা দিব্যি উন্নত মস্তকে স্বাভাবিক ভাবে চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখে মনে হয় যে, তারা জানে যে, তাদের উপযুক্ত সম্মান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় পুরুষদের কাছ থেকে তাবা পাবেই। এটা দেখে—যে দেশ বহুস্থলে বর্ষব ধর্মাস্তাব দ্বারা অহুমোদিত নাবা-নিগ্রহের আধিক্যহেতু সভ্য নামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার অবস্থায় এসেছে, বিশেষ ক'রে সেই বাংলা দেশ থেকে এগে মনে বিশেষ বিশ্বাস-পুলকের সঞ্চাব কবে। বাইবে বর ক'নেব দোলবার দোলার আশেপাশে চেয়ারে কবি-দর্শনেচ্ছু অনেক অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ব'সে আছেন। যখন দেখলুম যে তাদের ঝাঁক সঙ্গেও এই দোলাব অহুষ্ঠানটি হবে, তখন আমরা বাড়ীর একটা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম যে, আমরাও অহুষ্ঠানটি দেখতে পারি কি না। ছেলেটাব চমৎকার বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত মুখ—তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরকম উজ্জ্বল-সুন্দর মুক্তি খুবই দেখতে পাওয়া যায়। সে বললে—“নিশ্চয়ই—এদেশে গোশা (অর্থাৎ পবদা) নেই।” ইতিমধ্যে বরটিকে দেখলুম। আঠারো উনিশ বছরের ছেলে, সুন্দর মুখশ্রী, ধনীঘরের ছেলে, বি-এ পড়ছে। লুদার মতন ক'রে একথানা জরীপাড় সাদা মাস্তানা ধুতি পরা, গায়ে একটা টুইল শার্ট, হুহাতে নিবেট সোনার মোটা পাত কেটে তৈরী বালা, গলায় সোনার হাব, মাথাটি উড়ে-কামানো; ঝুঁটি ক'বে খোঁপার আকারে চুল বাঁধা, তাতে একছড়া বেলফুলের মালা জাড়ানো আছে। একপাল ছোটো-ছোটো মেয়ে আর ছেলে—এরা তার শালী আর শালা হবে, তাকে নিয়ে টানাটানি ক'রছে, আব সলজ্জ হাস্তের সঙ্গে বর তাদের চিরন্তন অধিকার এই উৎপাত উপভব সহ্য ক'রছে। ঠিক বাঙলা দেশেই মতন। আমরা চেয়ারে ব'সলুম, এমন সময়ে কটি ছেলে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সমস্ত লোকেব সামনে একটা থালায় ক'রে কয়েক গোছা আশু পান,

কাটা সুপুৰী, জাফরান-দেওয়া চিকি সুপুৰীর কুচি, আর চুন নিয়ে এল—অভাগতদের আপ্যায়নের জন্ত। সকলে এক এক গোছা পান তুলে নিলেন, চূর্ণ দিয়ে সুপুৰী দিয়ে পানের বিড়া তৈরী ক'রে খেতে লাগলেন। এইই হচ্ছে রীতি। আর একজন একটা থালায় ক'রে কতকগুলি ছোবড়া বাদ আস্ত বুনো না'রকল নিয়ে এল, সকলে এক একটি ক'রে নিলে। আর একজন একটা বড়ো রুপোর বাটিতে ক'রে খানিকটা জাফরান মিশানো গোলা চন্দন নিয়ে এল—অভাগতেরা হাতে ক'রে একটু একটু তুলে নিয়ে কপালে আর খালি গা ঘাদের তারা গায়েও মাখলে। ইতিমধ্যে মেয়েরা বারান্দায় ব'সে গান আরম্ভ করলেন, আর বরের শালীরা কনেকে এনে বরের পাশে দোয়ার পিড়িতে বসিয়ে দিলে। তাদের নির্দেশ মত বর একটি মালা লিঙ্গে প'বুলে, একটি মালা ক'নের গলায় পরিয়ে দিলে। দক্ষিণের মেয়েরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না—তাই ক'নেটিকে ভালো ক'রে দেখতে পেলুম। দশ এগারো বছরের পাতলা গড়নের মেয়ে, বেশ সুন্দরী, পরণে লাল আর হ'লুদে রেশমের চওড়া-জরা-আঁচলা এক সাড়ী, গায়ে প্রচুর গয়না, পিঠে বেণী ছলছে, মাথায় প্রাচীন ঢঙের অতি সুন্দর একটি গয়না—ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে ব'সে হাসতে লাগল। বাড়ীর মেয়েরা যত আত্মীয়া আর নিমন্ত্রিতা, আমাদের সামনে অসঙ্কোচে গান ক'রতে লাগলেন,—যেন আত্মীয়দের সামনেই। মেয়েদের চলা-ফেরার প্রতি ভঙ্গিতে মনে হ'ল যে, এরা লকলের কাছ থেকেই সমস্ত ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। শুনলুম গান হচ্ছিল রামলীলা আর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। অরেন-বাবুর ক্যামেরা ছিল সঙ্গে, বর-কনের ছবি তুলতে চাওয়ায় তখন বাড়ীর লোকেরা রাজী হ'লেন; আর একটি মেয়েকে ব'লতেই সে ছুটে গিয়ে ক'নের গয়না আরও খানকতক—বিশেষ ক'রে সাবেক ধরনের নাকের গয়না একখানি—নিয়ে এসে পরিয়ে দিলে। অরেন-বাবু হ'তিনখানা ছবি তুললেন।

এদিকে মেয়েরা দু'চার জনে মিলে প্রচলিত বিয়ের গান ক'রছেন—এই গান ঠিক গান নয়, যেন স্বর ক'রে ক'রে ছড়া বা কবিতা পড়ার মতন ব'লে বোধ হ'ল—

এমন সময়ে একটি নব-যুবক—বাড়ীর এক জামাই হ'তে পারে—আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলে, “আপনারা অন্ত গান শুনবেন? কর্ণাটা বা দক্ষিণী ধরনের গান শুনবেন, না হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির?” কর্ণাটাই শুনলে খুশী হবো, ব'লতে এই ছোকরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ক'লকাতার অতিথিদের জন্তে গান ক'রতে কাকে



“আত্মীয়া”

শ্রী অরেননাথ কর অঙ্কিত

অনুরোধ ক'রলে। তখন তরুণীদের মধ্যে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে বেশ শিক্ষিত আর মিষ্টি গলায় আলাপ ক'রে গান ক'রলেন। কে গাইলেন তা একটা ধামের আড়াল থেকে আমরা ঠিক দেখতে পেলুম না, আর বলা বাহুল্য আমরা দেখবার জন্ত চেষ্টা করাটা উচিত মনে ক'বলুম না। তারপর দুটি পাঁচ ছয় বছর বয়সের ছোটো ছোটো মেয়ে, পরণে তাদের উত্তর ভারতের লংদার মতন ঘাগরা, তার উপরে পাঞ্জাবী মেয়েদের ধরনের

কোঁড়া আর কোমরে তারা সোনার পাতায় তৈরী কোমরবন্ধ, তার মাঝে দুই পাশে দুই হাতীতে কুন্তে ক'রে মাথায় জল ঢালছে এই রকম লক্ষ্মীমূর্তি খোদাই করা, তারা একটা ছোটো গান আমাদের শোনালে। এইরূপে কবির সঙ্গীদের বিশেষভাবে সৌজন্য দেখানো হ'ল। সমস্ত জিনিষটি এমন সহজভাবে হ'ল যে কি আর বল্বে। ভারী হর্য আর মনোজ্ঞ লাগল এঁদের এই আতিথ্য।

তামিল রত্নচোকীর দলে একটি ছোকরা সানাই বাজাচ্ছিল, খালি গায়ে সোনার হার আর বাল্য পরা। কালো রঙের উপরে এই সোনার রেখায় তার স্বস্তী মুখ নিয়ে ছোকরাকে ভারী নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল;—এই বাজনার দলের ছবিও নেওয়া হ'ল। এইরূপে মাদ্রাজে পৌঁছে প্রথম দিনেই এই চমৎকার কবিত্বপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানটি দেখে পরম পরিতোষ লাভ করা গেল। যে সব জিনিস আমরা এখন প্রাচীন ভারতের কল্পলোকে কেলে কাব্যরসাস্বাদের কোঠায় রেখে দিয়েছি, আমাদের বাঙালী হিন্দু ব্যবহারিক জীবনে যে-সমস্ত সুন্দর শোভন রীতি লোপ পেয়েছে, রক্ষণশীল তামিলদের মধ্যে সেগুলি কত সহজ, কত অবলীলভাবে এখনও বিদ্যমান। Tradition বা চিরাচরিত রীতি ধ'রে চ'লে আসছে এইসব মনোহর কবিত্ব-মাথা অনুষ্ঠান; তাই উৎসবের সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে এর মধ্যকার সরলতাটুকু ঠিক র'য়ে গিয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে এই স্ত্রজ ছিঁড়ে ফেলার পরে যদি আমরা এখন এই জিনিসটির পুনরানয়ন ক'বার চেষ্টা করি,—যে বর-ক'নেকে দোলায় বসিয়ে দোল খাওয়ানো হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে বিবাহের-মাঙ্গলিক গীতি গাওয়া চ'লবে—তা হ'লে বহু স্থলে এটা কত-না “আধুনিক” আর বিসদৃশ ঠেকবে—এর সারল্যের বদলে একটা সচেতন কৃত্রিমতা এসে জিনিসটিকে একেবারে অস্তরকম ক'রে তুলবে। বাঙালী হিন্দুর ঘরে প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে মাঙ্গলিক গীতি গিয়েছে, নাচ গিয়েছে—মেয়েদের মধ্যে সখী-পরিবৃত হ'বে দোলায় চড়ার পাটও নেই। শুনুলুম মাদ্রাজে সমস্ত ভদ্রবর এই দোলন-পিঁড়ির ব্যবস্থা আছে—

মেয়েরা দেখা-সাক্ষাৎ ক'রতে এলে আবশ্যক মতন এই দোলা টাঙানো হয়, ধীরে ধীরে ছলতে ছলতে তাঁরা কথাবার্তা রহস্তালাপ কাজকর্ম ক'রে থাকেন। এইরূপ দোলার ব্যবহার উত্তরভারতে কোথাও কোথাও এখনও আছে, গুজরাটে আছে, মহারাষ্ট্রেও আছে। বাঙলা দেশের মেয়েরা এই আনন্দ-রস থেকে এখন একেবারে বঞ্চিত। আমাদের ভাগ্যে তামিল জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভ-পরিচয় এইরূপে ঘ'টল, বর-কনের দোলায় চড়া দেখে।

তারপর আমরা কপালেশ্বরের মন্দির দেখে এলুম। প্রকাণ্ড এক “টেলুকুলুম” বা মন্দিরের সাম্নেকার পুষ্করিণী—চারদিকে লম্বা অনেকগুলি ক'রে ধাপ, এত লম্বা সোজা-সোজা রেখার সমাবেশ চোখকে যেন পীড়া দেয়। সাধারণ যেমন গোপুরম্-যুক্ত দ্রাবিড়রীতির মন্দির হয়, মন্দিরটি তেমনি। পাথরের কাজগুলি মন্দ নয়—চলনসই রকমের প্রাচীনকালের পাথরের মূর্তির উপর হালে বালি-চূণকাম করে আর রং দিয়ে সেগুলিকে সুন্দর থেকে কিছুত, এমন কি বর্কর ক'রে ফেলা হ'য়েছে। শিবের মন্দির; ভিতরে লিঙ্গমূর্তি, তার সামনে বুধ নন্দীর মূর্তি। নন্দীর পিছনে দু'হাত আন্দাজ উঁচু দুই হাতে মস্ত প্রদীপ ধ'রে র'য়েছে এক চমৎকার পুরুষমূর্তি, পিতলের। মন্দির প্রদক্ষিণ ক'বার সময় দেখলুম ছোটোখাটো পাথরের মন্দিরের মধ্যে বড়ো বড়ো সব পিতলের মূর্তি,—ময়ূরে-চড়া কার্তিকেয় দক্ষিণ মূর্তি শিব, পার্শ্বতী, আর ১০৮ শৈব ভক্তদের সুন্দর সুন্দর মূর্তি,—হ'সেট—একটি পিতলের, আর একটি পাথরের। দক্ষিণে দেবতার ভক্তি এখনও পুরোপুরি বিদ্যমান—মন্দিরে আগত পূজার্থীদের মুখ দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। বড় মন্দিরের আঙিনার মধ্যেই আলাদা মন্দিরে দেবীর মূর্তি; দূর থেকে দেখা গেল, চমৎকার কালো পাথরে কাটা মাল্লবের আকারের একটি প্রমাণ মূর্তি। মুখখানি আর হাতগুলি ছাড়া কাপড় পরানো ব'লে সর্বাঙ্গ ঢাকা। দেবীর বাহন সিংহ সামনে আছে, আর সিংহের পিছনে শিবের মন্দিরের দীপধারী পুরুষের অল্পরূপ দীপধারিণী নারীর অপূর্ণ এক পিতল-মূর্তি। দ্রাবিড়দেশে এইরকম

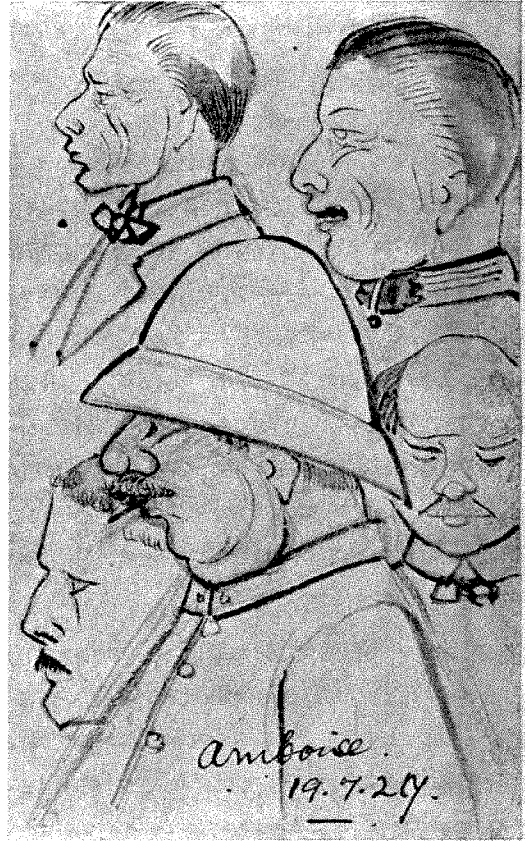
দীপধারিণীর মূর্তি খুবই সাধারণ—কিন্তু এই বড়ো মূর্তিটা দেখে চোখ খেন জুড়িয়ে গেল।

মৈলাপুরের নাম এসেছে একটি ময়ূরের থেকে—তামিলে ময়ূরকে “ময়িল” বলে। বহু পূর্বে নাকি এখানে একটি গাছের তলায় এক ময়ূর একটি শিবলিঙ্গের সেবা ক’রত, তাই থেকে এই জায়গার এই নাম। বিশ্বাস করাবার জন্য মন্দিরের ভিতরে আঁতিনায় এখনও “কীংফল” জাতীয় একটি গাছ আছে,—এই গাছের তলায় শিবলিঙ্গটি ছিল। এখন শিবলিঙ্গটিকে আর পাথরের একটি ময়ূর-মূর্তিকে পাশে একটি ছোট মন্দির তুলে তার ভিতরে রাখা হ’য়েছে। শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ীর ঘে ছুটি ছেলে মন্দির দেখাবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল এই ময়ূর-পূরণ তারা বুঝিয়ে দিলে।

মন্দির দেখে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ীতে ফিরলুম। স্নান সেবে আহারে বসা গেল। আমাদের গৃহস্বামী নিষ্ঠাবান তামিল ব্রাহ্মণঘরের কৰ্ত্তা; তাহ’লেও তিনিও তাঁর অতিথিদের সঙ্গে ব’সে গেলেন। ভোজন-টাতে ইঙ্গ-ভারতীয় আর ড্রাবিড়ী রান্নার অপূৰ্ণ মিশ্রণ ছিল। শ্রীযুক্ত রামস্বামীর খানসামা মাছের আর মাংসের দু’ তিনটি জিনিস তৈরী ক’রেছিল। বলা বাহুল্য, গৃহস্বামী এ জিনিসগুলি স্পর্শও করেননি। তারপর তাঁর আত্মীয় একটি ছোকরা আমাদের ভাত আর মাদ্রাজী তরকারী পরিবেষণ ক’রলে—দালে টক-ঝাল দেওয়া ঘূষ, যাকে “রসম্” বলে—আর টক আর নানারকম মশলা দেওয়া একটা বেশ মুখরোচক দাল। তিন চার রকমের ভাজী, পাপর, কলাইয়ের দালের বড়া, দই, ঘোল, একরকম মিষ্টি দালপুৰী যেটা নাকি বিয়ের ভোজের এক অবশ্য বর্তব্য অঙ্গ, আর মেঠাই— এই সব দিলে। কবির শরীর অস্থস্থ ছিল, তিনি খালি একটু দই দিয়ে দুটা ভাত খেলেন।

নীচে কবির সঙ্গে দেখা ক’রতে বিস্তর লোক এসেছে। তাঁর ছদ্দিন অনিদ্রার পর একটু বিশ্রাম দরকার। বোলপুরের ভূতপূৰ্ণ একটি ছাত্রের ভাই এসে দেখা ক’রলে। মালয়ালী জাতীয়, বাঙলাদেশে কখনও “না আসিয়া বেশ ভাল বাজালা বলিতে শিখিয়াছে;” খুব

বুদ্ধিমান ছেলে, এই বোল সতের বছর বয়সেই এখন বি-এ প’ড়ছে। একটি মুসলমান যুবক এসে কবির হস্তাক্ষর নিয়ে গেল, দূর থেকে তাঁকে দেখে অভিবাদন ক’রে গেল। বিকালে জাহাজে উঠতে হবে, দেখানে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে, এই কথা শুনে বাকী সকলে চ’লে গেল। ইতিমধ্যে জাহাজ কোম্পানীর শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্



জাহাজে কংসী বাত্রী
শ্রী হরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

পটিল মহাশয় এলেন। তিনি ব’ললেন যে, তাঁদের কোম্পানীর বড় কৰ্ত্তা মসিও কোদিয়্যার (M. Caudiere) কলম্বোর হেড্-আপিস থেকে এসেছেন। তিনি, আর মাদ্রাজের আপিসের কৰ্ত্তা মসিও যোবার্ (M. Jobard), আর জাহাজের কাপ্তেন, সাড়ে চারটেব সময়ে কবিকে জাহাজে সংবর্দ্ধনা ক’রে গ্রহণ ক’রবেন। আমাদের প্রথম জেণীর টিকিট, কিন্তু জাহাজ

কোম্পানী বিশেষ ক'রে প্রথম শ্রেণীর উপরে Cabine de luxe (কাবিন-দ্যো-লুক্স) এ কবির থাকবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁরা সকলেই কবির আগমনে আনন্দিত—ব্যক্তিগতভাবে আর কোম্পানীর তরফ থেকে তাঁরা কবিকে অভ্যর্থনা ক'রতে চান। জাহাজে উঠে, প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারে কবি তাঁর প্রত্যাগমনের জন্তে আগত সহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে যাতে ব'সে আলাপ ক'রতে পারেন, তার ব্যবস্থাও হ'য়েছে। জাহাজ থেকে কোম্পানী এই অভাগতদের স্বাগতের জন্ত সববৎ আর বরফের ব্যবস্থা করেছেন।

চারটের সময় কবির রওনা হবার কথা স্থির ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মোটরচালক আসতে দেৱী ক'রেছে দেখে আমাদের গৃহস্থামী স্বয়ং তাঁর মোটরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন—অশেষ তাঁর সৌজন্য। কিন্তু পথে তাঁর এক আত্মীয়ের গাড়ী পাওয়ায় তিনি আমাদের তাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত মনে কবির কাছে ফিরে যেতে পারুলেন। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তিনি বর ক'নেকে কবির কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম করালেন, কবি এদের আশীর্বাদ ক'রলেন। বাড়ীর লোকেরা মেয়ে পুরুষে সকলে তাঁকে প্রণাম ক'রলে। তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রলেন।

মাদ্রাজের দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও কারুকার্যের নিদর্শনের সরকারী সংগ্রহভাণ্ডারটি দেখলুম। সেখানে বিক্রীর জন্ত রাখা দুচারটি পিতলের নোতুন আর পুরানো জিনিষ কেনা গেল। স্বরেন-বাবু শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের জন্তও কিছু নিলেন। তারপর মিউজিয়াম দেখে আনা গেল। মিউজিয়মে বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে অমরাবতীর স্তূপের ধ্বংসাবশেষ গুটিকতক পাথরে কাটা খোদাই চিত্র, আর প্রাচীন পল্লবযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার কাল পর্যন্ত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্তি। এর মধ্যে দূর থেকে তোরণের ফ্রেমে যেন বাঁধা একটি মাহুঘের আকারের চেয়ে কিছু বড় পুরাতন বিষ্ণুমূর্তি; এটি পল্লব আমলের হবে—অপূর্ব বিরাট-দর্শন। বিষ্ণু এই মহনীয় পরিকল্পনা দেখে প্রসন্ন ভাবে মন যেন ভ'রে গেল। আর দেখবার

জিনিস হচ্ছে এখানকার ব্রহ্ম আর পিতলের মূর্তির সংগ্রহ। কতকগুলি অতি স্বন্দর নটরাজমূর্তি, বেণুলির সঙ্গে ছবির মারফৎ আমাদের পূর্ব পরিচয় ছিল—সেগুলি দেখলুম; আর সেইরকম অল্প অল্প ছোট বড় অনেক মূর্তি, আর তা ছাড়া বিস্তর অগ্ন্যান্ত পিতলের জিনিস।

ছবির সংগ্রহ সামান্য কিছু এই মিউজিয়মে আছে; রবিবর্ম্মার ভাই রাজবর্ম্মার আঁকা দু-একটি মালয়ালী ঘরোয়া ব্যাপারের ছবি—সাধারণ ইউরোপীয় ঢঙে আঁকা genre বা ঘরগৃহস্থালীর ছবি হিসাবে মন্দ নয়। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার লাগল একখানি পুরাতন দ্রাবিড়ী পট। ঠিক যেন একখানি রাজপুত যুগের আদি কালের (primitive) ছবি! একই পটে কতকগুলি বৃন্দাবন-লীলা আঁকা—শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতি। লাল জমীর উপর কী স্থির হাতে পাকা ওস্তাদের শক্তির সঙ্গে মাহুঘের গাছ—পালার আদ্যার সলীল সতেজ রেখাপাত—কী চমৎকার গাছপালা আর ফুলপাতা আঁকার ভঙ্গী! সবশুদ্ধ জড়িয়ে ছবিটির মধ্যে কি একটা যে ভাবশুদ্ধ আন্তরিকতায় পূর্ণ সরল সচল মাধুর্য ছিল তা আর কি বলবো। এই ছবির একখানা আলোকচিত্র পেলে কত আনন্দই হ'ত!

মিউজিয়াম থেকে সরকারী শিল্প ও কারু বিদ্যালয়ে গেলুম, সেখানেও কতকগুলি স্বন্দর জিনিসের সমাবেশ দেখা গেল; দক্ষিণী হাতের কাজ নিয়ে বেশ খাসা আর একটা ছোট মিউজিয়াম তৈরী হ'য়েছে। কতকগুলি ছোটো ছোটো দীপধারিণী নারীমূর্তি বড়ো স্বন্দর ব'লে বোধ হ'ল।

এই ইস্কুলের সংগ্রহশালা দেখে, এর সহকারী প্রধান কর্মচারী রাও সাহেব শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ মুদালিয়ার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে, আমরা জাহাজমুখো হ'লুম। জাহাজে যখন পৌঁছলুম, তখন চারটে। এই ষটা কয়েকের মধ্যে মাদ্রাজে মিউজিয়াম প্রভৃতি, যা নিয়ে আমাদের কোতুল তা মোটামুটি দেখে নেওয়া গেল। এটা অবশ্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী মহাশয়ের অগ্রহেই সম্ভব হ'য়েছিল।

জাহাজে গিয়ে দেখি আমাদের মালপত্র সব এসে গিয়েছে। কবির অল্পগত ভৃত্য বনমালী তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় নীচে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিলৈ মহাশয় আমাদের অপেক্ষায় আছেন। তিনি কবির জন্ম নির্দিষ্ট ক্যাবিনে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখলুম তাঁর বসবার ঘরে একরাশ পদ্মফুল দেওয়া হ'য়েছে। এটি শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিলৈ মহাশয়ের ব্যবস্থা অহুসারে। কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভাজনদের এই হৃদয় উদ্বোধন দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিলুম।

শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্, মসিও বোবারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আর জাহাজের কর্মাদী বা কাপ্তেন M. Gabrillargues (মসিও গাব্রিয়ার্গ্) এর সঙ্গে। বোবারের সঙ্গে আর কাপ্তেনের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ ক'রলুম। এঁরা যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ ক'রলেন। এদিকে নীচে ডেকের উপর কবির বিদায় দেখতে অনেকগুলি লোক এসে জড়ো হ'য়েছে। ঠিক সাড়ে চারটেয় কবিকে নিয়ে শ্রীযুক্ত রামস্বামী মোটরে ক'রে এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আর একটু পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন জজ সজীক, আর মাদ্রাজের বোধ হয় অ্যাডভোকেট জেনেরাল, আরও কতকগুলি বিশিষ্ট লোক এলেন, আর কতকগুলি তামিল মহিলা। জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই মসিও বোবার আর মসিও কোদিয়্যার কবিকে স্বাগত ক'রলেন, কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন আর কবিকে আর তাঁর সঙ্গে অভ্যাগতদের জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বসবার ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বাইরে গেলেন, যাতে কবি এঁদের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ ক'রতে পারেন। এ জাহাজের সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে ভালো ঘরটি কবির খাস ব্যবহারের জন্য দেওয়া হ'ল, আর জাহাজ থেকে বরফ সরবৎ বিতরণ হ'ল অভ্যাগতদের মধ্যে। ফরাসী জাহাজওয়াল কোম্পানী এইভাবে জগৎবরণ্য বিশ্বকবির সমাদর ক'রলেন।

ইটালীয়ান, জাপানী আর অন্ত জাতের জাহাজে সর্বত্রই কবিকে এই রকম ক'রে সম্মান দেখিয়ে কবির হ'য়ে তাঁর বন্ধুদের আতিথ্য-সংকারের ভার নিয়ে তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছে। এইরূপ শ্রদ্ধা একটা বড়ো জাতেরই লক্ষণ ব'লে মনে হয়।

জাহাজ ছাড়তে পাঁচ মিনিট বাকী, বাইরে ডেকে এসে একটা গ্রুপ ফোটো তোলা হ'ল—কবিকে মাঝখানে রেখে জাহাজ-কোম্পানীর সাহেবেরা, আর কবির প্রত্যাগমনকারীরা দাঁড়ালেন। তারপরে অভ্যাগতেরা একে একে নেমে গেলেন, আমাদের বনমালী নীচে থেকে কবিকে প্রণাম ক'বে চ'লে গেল। সিঁড়ি তোলে তোলে, এমন সময়ে আর একজন ভক্তলোক মাথায় নীল রেশমের বাঁধা পাগড়ি, সৌম্যমূর্তি, সাদাসিধে পোষাক, উপরে ডেকে এসে কবির হুহাত ধ'রে আলাপ ক'রলেন। হাঁরেজীতে “আপনি ভারতের আত্মার প্রতীক, আমাদের গর্বস্থল, দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তা আপনি বাহিরের জগৎকে দান ক'রছেন—ইত্যাদি” প্রশস্তি ব'লতে লাগলেন। ইনি মাদ্রাজের ছোট একটা দেশী রাজ্য পানাগলএব রাজা। ইনিও নেমে গেলেন, আব জাহাজের সিঁড়ি তুলতে আরম্ভ করলে।

নব্বর তুলতে, আর জাহাজঘাটা থেকে জাহাজ ছাড়তে আরও আধঘণ্টা লাগল। বন্ধুরা সকলেই প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে জাহাজ চ'লল। মাদ্রাজের হাইকোর্ট আর অন্ত অন্ত বাড়ীর চূড়ো ক্রমে দূর থেকে ভালো ক'রে দেখা যেতে লাগল। আমরা মাদ্রাজ বন্দরের পাথরে গাঁথা পোস্তার বাইরে এসে পড়লুম। সিঙ্গাপুর-মুখো হ'য়ে জাহাজ চলতে আরম্ভ ক'রলে। আমরা সতিসতিই দ্বীপময় ভারত (Island India) আর ভারতচীনের (Indo-China) দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

রাজরোষ

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১

অপরাকালে প্রয়াগ-সঙ্গমে বালুকাতে বসিয়া প্রশান্ত-ললাট নিগ্রস্থ নাথপুত্র* শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে পঞ্চাশ জন শিষ্য বসিয়া নীরবে, অবহিত চিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। কয়েক জন গৃহস্থ ও উপস্থিত ছিলেন।

গুরু কহিতেছিলেন, 'গ্রস্থি ইহ-সংসারে বন্ধন। অনেক প্রকার জটিল গ্রস্থিতে মাহুষের স্বভাব আবদ্ধ, চিত্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে না। এইসকল গ্রস্থি মোচন করিতে হইলে আয়াস ও সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই। যাহার চরণে শৃঙ্খল বদ্ধ সে অনায়াসে পথ পর্যাটন করিতে পারে না। এই ভার বহন করিয়া জীবনের দীর্ঘ পথ কেমন করিয়া অতিবাহিত করিবে? সংযম অভ্যাস কব—বাক্য সংযম, চিত্তে সংযম, আহার-বিহারে সংযম। বাক্য শাপিত অস্ত্রের ত্রায়, সংযম না করিলে অপবের মর্মে আঘাত করে। চিত্ত চঞ্চল অস্ত্রের ত্রায়, বজ্রা সংযত না করিলে অপথে-কুপথে ধাবিত হইবে। আহারের জ্ঞান ধরণী নানা সামগ্রী দান করে, অপর ভক্ষ্যের কি প্রয়োজন? মাহুষ কি ব্যাঘ্র যে মাংস ভোজন করিবে? আর বিহার? সাধু-সঙ্গই বিহার।'

একজন গৃহস্থ প্রশ্ন করিল, 'প্রভু, যাহারা সংসারে লিপ্ত, গৃহস্থ-আশ্রমে রহিয়াছে তাহাদের প্রতি কি আদেশ?'

'গৃহাশ্রমে ত সকলেই রহিয়াছে, কয়জন গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে? গৃহস্থের পক্ষেও যথাসাধ্য সংযম ব্যবস্থা। সংযম ত্যাগ করিলেই সমূহ বিপদ। এই যে সংসার, ইহা পর্ত্তনের পার্শ্বেই ত্রায়, অত্যন্ত পিচ্ছিল, গমনাগমনের পক্ষে বড় কঠিন। অসাবধান হইলেই পতন ও বিনাশ। কোন

জীবের হিংসা করিবে না, পিপীলিকাকেও পদদলিত করিবে না।'

যমুনা-বালুকাতে অশ্রুমান সূর্যের রশ্মি জ্বলিতে-ছিল, সিতাসিত সঙ্গমে গঙ্গার গুল্ল, তীব্র শ্রোত ও যমুনার অলস, মধুর, কৃষ্ণ প্রবাহ লক্ষিত হইতেছিল। পূর্বাঙ্গের বাতাস, তাহাতে জল ঠেকিয়া ছোট ছোট তবড় রচনা, যমুনার পারে হরিদ-বর্ষ ক্ষেত্র। কিছু দূরে ঘাটে কয়েকটি নৌকা বাঁধা, নাবিকেরা নৌকায় কিংবা তীরে বসিয়া গল্প করিতেছে, গ্রামের বালকবালিকা বালুকার খেলা করিতেছে।

দুই তিনখানি সজ্জিত রথ বেগে চালিত হইয়া যমুনা-তীরে উপনীত হইল। ছয় জন উত্তম-বেশ-পরিহিত যুবক রথ হইতে অবতরণ করিয়া শিষ্যপরিবৃত গুরুর অভিমুখে হস্ত-কৌতুক করিতে করিতে আগমন করিলেন। সকলের অগ্রে যে-যুবক আসিতেছিলেন তাঁহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য কিছু অধিক। উপবিষ্ট শ্রোতার মধ্যে একজন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিল, 'রাজা বিরূপাক্ষ!' সে নাম শুনিয়া সকলেই কিছু শঙ্কিত হইল। একা নাথপুত্র বিচলিত হইলেন না, নবাগত যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যেমন মধুর গম্ভীরস্বরে উপদেশ দিতেছিলেন সেইরূপ দিতে লাগিলেন।

রাজা বিরূপাক্ষের বয়স চব্বিশ বৎসর। দেখিতে সুগুরুষ, কিন্তু বিলাসিতার আতিশয্যে চক্ষু কোটরগত, রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল শ্রীবিহীন। সাদোপাঙ্গ ও তুঙ্গপ। বিরূপাক্ষ দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠাশূন্য, নিষ্ঠুর, প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী। নিকটে আসিয়া সঙ্গের এক ব্যক্তিকে ব্যদ্বচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কে? এখানে কি করিতেছে?'

হত সেই ব্যক্তি বিদুষক। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,

* নিগ্রস্থ নাথপুত্র প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর।

পিতৃশ্রদ্ধ করিতেছে। মধ্যস্থলে পুরোহিত বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে।

আর একজন কহিল, ‘না হে, ইহার নটের দল।

আজ রাতে প্রেতপঞ্চাশিকা নাটক অভিনয় হইবে তাহাই আবৃত্তি করিতেছে। এই আশানুভূতি তাহার উপযুক্ত স্থান।’

নাথপুত্র মৌনাবলম্বন করিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া ছিলেন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে তুমি? ব্রাহ্মণ?’

গুরু মাথা তুলিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, ‘আমি তোমার দাস।’

রাজা পারিষদদিগকে কহিলেন, ‘এই দেখ, এক রকম। কতকগুলি অনাথ্য, এখানে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। আর এক দল হইয়াছে, দেখিয়াছ? মুণ্ডিত শিব, মুণ্ডিত তুণ্ড, পীতবস্ত্র ধারণ কবিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়া বেড়ায়।’

রাজার সঙ্গিগণ হাসিতে লাগিল, একজন কহিল, ‘জানি বই কি! তাহাদের গুরু শাক্যবংশীয় রাজপুত্র, উন্মাদ, বীভৎস আচার, চণ্ডালেব গৃহ হইতে অন্ন ভিক্ষা করে।’

যুবকেরা অট্টহাস্ত করিয়া উঠিল। একজন হাসিতে হাসিতে কহিল, ‘রাজস্বখের অপেক্ষা ভিক্ষাভোগ উত্তম, ইহাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু এই যে লোকগুলা, ইহার কে? রাজদ্রোহী নয় ত?’

আবার হাস্তেব তবঙ্গ উঠিল। বিদ্রূপ-বাক্য শুনিয়া নাথপুত্র আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক যুবক ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘সাধু-সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ অপমান করা রাজার উচিত কর্ম বটে।’

যুবা তেজস্বী, বলবান, অথচ সৌম্যমুষ্টি। সে স্বয়ং ক্ষত্রিয়, দূর সমুদ্রে বাজার জ্ঞাতি, তাহাকে দেখিয়া রাজা চিনিলেন। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, ‘উদয়ন, তুমি এখানে? যেমন দলে মিশিয়াছ সেইরূপ তোমার প্রকৃতি হইয়াছে। কাহার সহিত কথা কহিতেছ, তোমার স্বরণ নাই? তোমার মুখে এরূপ কথা?’

উদয়ন কহিলেন, ‘সকলের মুখে এইরূপ কথা। গুপ্ত-চরেরা সে-সংবাদ দেয় না?’

রাজার সঙ্গিগণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উদয়নের অভিমুখে অগ্রসর হইল। নাথপুত্রের শিষ্যগণ তৎক্ষণাত্ উদয়নকে বেঠন করিয়া দাঁড়াইল। এরূপ স্থলে বলপ্রকাশ যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া রাজার মোসাহেবরা স্তম্ভ হইল।

নাথপুত্র হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, ‘মঙ্গল হউক।’

এই বলিয়া তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্য ও শ্রোতাগণ তাঁহার সঙ্গে গেল। রাজা চীৎকার করিয়া কহিলেন, ‘উদয়ন, আজিকার অপমান আমার স্বরণ থাকিবে।’

উদয়ন কোন উত্তর দিলেন না।

২

রাজবাটী পরিত্যাগ কবিয়া রাজা বিরূপাক্ষ কিছু দূরে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে প্রমোদ-ভবনে বাস করিতেন। রাজমাতা বর্জমান, রাজবংশেব কয়েকজন বৃদ্ধও জীবিত, রাজ-বাটীতে বিরূপাক্ষ যথেষ্টাচার করিতে পারিতেন না। উদ্যানে তাঁহাকে নিষেধ করিবার বা বুঝাইবার কেহ ছিল না। প্রমোদ-ভবনে কি হইত রাজ-বাটীতে সংবাদ আসিত, কিন্তু রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজ্যভার তাঁহার হস্তে, কে তাঁহাকে নিষেধ করিবে? রাজা কখন কখন রাজ-বাটীতে পিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া আসিতেন, অধিক কথাবার্তা হইত না। রাজমাতা মনে করিতেন বিবাহ হইলে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল থাকিবে না, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্র অসং-সঙ্গে প্রমোদে মত্ত, বিবাহের জন্ত কোনরূপ আগ্রহ ছিল না।

উদয়নের কথায় রাজা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। বাগানে ফিরিবার পথে আর কোন কথা হইল না। ‘দেখিয়াছ, কতকগুলি ভিখারীর সম্মুখে আমাকে অপমান করিল। উহার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, সর্বত্র এই কথা রাষ্ট্র করিবে।’

প্রজ্জলিত অগ্নিতে ইন্দ্রন যোগাইবার লোক অনেক আছে, রাজার বয়স্কাদিগের ত কথাই নাই। কেহ বলিল, উদয়নকে বন্দী করা হউক, কেহ বলিল তাহাকে শুলে দেওয়া হউক। সদ্ধৌদিগের মধ্যে একজনের একটু বিবেচনা ছিল। সে বলিল, ‘যদি উদয়নকে এখন শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রজারা জানিতে পারিবে যে, সে একজন প্রধান সন্ন্যাসীকে বিক্রপ করা হইতেছে দেখিয়া আপত্তি করিয়াছিল। প্রজাদের মনেব ভাব জান ত, সাধু-সন্ন্যাসীকে অপমান করিলে তাহারা ক্রোধে উন্নত হইয়া উঠে। কিছু একটা কৌশল করিয়া উদয়নকে শিক্ষা দিতে হইবে।’

একজন ব্যক্তি করিয়া কহিল, ‘মন্ত্রী মহাশয় ত উপস্থিত রহিয়াছেন, তবে আর ভাবনা কি! মহাশয়, পরামর্শ দিন।’

রাজা রাগিয়া কহিলেন, ‘পরামর্শ কি প্রয়োজন? আমার আজ্ঞা যথেষ্ট। কোন প্রজা আপত্তি করিলে তাহাকেও চণ্ডালের হস্তে সমর্পণ করিব।’

এমন সময় প্রতীহারী আসিয়া অভিবাদন করিল, ‘জয় মহারাজ!’

রাজা ভ্রভঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি?’

‘মহাবাজ, রাজমাতা মহাবাগী আপনাকে স্বরণ করিয়াছেন।’

‘এমন সময়? এখন আমি ঘাইতে পারিব না।’

‘মহারাজ, বিশেষ কোন প্রয়োজন হইবে। পুরোহিত অপেক্ষা করিতেছেন।’

‘পুরোহিত? আর কোন লোক ছিল না? উত্তম, ডাক তাহাকে।’

পুরোহিত আসিলেন, উন্নত, স্তীর্ণ দেহ, উজ্জল, আয়ত চক্ষু, বার্ককোর স্থবিরতা এখনও দেখা দেয় নাই। রাজা ও তাঁহার সঙ্গীগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা প্রণাম করিলেন।

পুরোহিত আশীর্বাদ করিলেন, বসিলেন না। কহিলেন, ‘মগধরাজের প্রধান দূত সশস্ত্র অহুচর-বর্গ লইয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়াছেন। অবিলম্বে মহারাজের দর্শনকামনা করেন।’

আকাশে বাজপক্ষীর কণ্ঠ শুনিলে ও তাহার প্রসারিত পক্ষ দেখিলে পারাবতকুল যেমন চঞ্চল, জন্তু ও শক্তি হয় রাজা ও তাঁহার সখাগণ সেইরূপ বিচলিত হইলেন। মহাপ্রজ্ঞাপাশ্বিত মগধরাজের এখানে কি প্রয়োজন?

ভক্ত মুখে বিরূপাক্ষ কহিলেন, ‘মগধরাজ কেন দূত পাঠাইয়াছেন?’

‘ঘাইলেই জানিতে পাবিবেন। কোন অমঙ্গলব আশঙ্কা নাই, তবে কালবিলম্ব কবিবেন না। রাজবাটীতে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া দূত কিছু বিস্মিত হইয়াছেন।’

রাজা বিলম্ব করিলেন না, বেশ পরিবর্তন করিয়া তখনই পুরোহিতের সঙ্গে গমন করিলেন।

তাঁহার বয়সাগণ কোন কথা না কহিয়া আপন আপন গৃহে গমন করিলেন।

রাজবাটীতে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মগধ-রাজদূত বাজা বিরূপাক্ষেব অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন কবিলেন। পুরোহিত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্তাষণাদির পর রাজা বিরূপাক্ষ কহিলেন, ‘আমার পরম সৌভাগ্য—যে, মগধরাজ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ শুনিতে পাই?’

দূত মধ্যবয়স্ক, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ। কহিলেন, ‘রাজাধি-বাজ আপনার সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ কামনা করেন। তাঁহার কন্যা নাই, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রী পরমা স্তম্ভরী। মহারাজের ইচ্ছা আপনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।’

বিরূপাক্ষ পুরোহিতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি চক্ষু নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মুখ তুলিলেন না। চিন্তা করিয়া বিরূপাক্ষ কহিলেন, ‘মাতা-ঠাকুবাণী রহিয়া-ছেন, এ প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইব। তাঁহাকে লজ্জন করিয়া আমি কিরূপে উত্তর দিব?’

দূত কহিলেন, ‘সাধু, আপনি মাতৃবৎসল পুত্রের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। রাজমাতাব আপত্তির কোন কারণ দেখি না। পুরোহিত মহাশয় কি বলেন?’

রাজা এবং দূত উভয়ে পুরোহিতের অভিমুখে দৃষ্টিপাত

করিলেন। স্মিতমুখে পুরোহিত কহিলেন, ‘এমন কুটুম্বিতা কাহার বাহনীয় না হইবে? মগধরাজের প্রস্তাবে রাজ-মাতা পরম সম্মানিত ও অমুগ্ধীত হইয়াছেন।’

বিরূপাক্ষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তিনি অবগত আছেন?’

দূত কহিলেন, ‘তাঁহার অবগতির জন্ত প্রথমেই নিবেদন করা হইয়াছে।’

‘তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।’

দূত এবং তাঁহার অনুচরদিগের রাজ্যবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা বিরূপাক্ষ পুরোহিতকে একান্তে কহিলেন, ‘ইহা আপনারই কাজ। মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন।’

‘ইহা ত কোন গহিত কর্ম নয়। বাল্যকাল হইতে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমাকে স্থায়ী দেখিলে আমাদের আনন্দ। চক্রবর্তী মহারাজাব জামাতা হইবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?’

‘আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাহে আমার সম্মতি নাই।’

‘সঙ্গদোষে। বিবাহ হইলে সুবুদ্ধি হইবে।’

রাজা রাগিয়া কহিলেন, ‘আপনার বড় স্পর্ধা! বাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছেন।’

‘ব্রহ্মপের মুখ কাহারও ভয়ে বন্ধ হয় না। সত্য কাহাকে ভয় করিবে?’

রাজা উত্তানে চলিয়া গেলেন। রাজমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

৩

সম্মানীদের সহিত কিছু দূর গমন করিয়া উদয়ন নগরে প্রবেশ করিলেন। নিদ্রের গৃহে না গিয়া রাজবাটীর নিকটে আর-একটি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ইহাতেও রাজবংশীয়েরা বাস করেন। এ বাটীতে উদয়নের সর্বদা যাতায়াত ছিল। বাহির বাটীতে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া উদয়ন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহকর্ত্তী মহাশ্বেতা প্রকোষ্ঠদ্বারে বসিয়াছিলেন। উদয়নকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন।

কহিলেন, ‘তুমি যে কর্ম শিখিতেছিলে তাহার কি হইল?’

‘শিক্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, এইবার কর্ম আরম্ভ করিব।’

‘পূর্বে সকলে রাজকর্মের চেষ্টা করিত। এখন রাজার নিকটে কর্ম প্রার্থনা করিতে কে ঘাইবে?’

‘কেমন রাজা জানেন ত?’

‘সে কথায় কাজ নাই! হতভাগ্য রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!’

তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একজন যুবতী রমণী আসিয়া মহাশ্বেতার পাশে দাঁড়াইলেন। রমণী হৃন্দরী, মহাশ্বেতার ভগিনীর কন্যা, পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়াতে মাসীর কাছে থাকেন। মহাশ্বেতা কহিলেন, ‘তোমরা কথা কও, আমি গৃহদেবতার কর্ম সান্ধিয়া আসি।’ এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

উদয়ন কহিলেন, ‘স্বজাতা!’

স্বজাতা কহিলেন, ‘কি?’

দুই জনে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিলেন। উভয়েরই কিছু সঙ্কোচ, কিছু বাধার ভাব। দুই জনে চক্ষু নত করিলেন।

উদয়ন কহিলেন, ‘একটা কথা তোমাতে বলিতেছি, তোমার মাসী কিংবা অপর কেহ যেন ডানিতে না পারেন। তাঁহাকে আমি কিছু বলি নাই।’

স্বজাতার কপোল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, আবার সে-আভা মিলাইয়া গেল। কিছু উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি কথা?’

‘রাজা আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।’

স্বজাতার মুখ মলিন হইয়া গেল, চক্ষে ভীতি-সঙ্কার হইল, হস্তের অঙ্গুলি কাঁপিল। কহিলেন, ‘রাজরোষ? কি অপরাধ?’

‘সব কথা তোমাকে বলিব বলিয়াই আসিয়াছি। আর কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না।’

উদয়নের সাগ্রহ দৃষ্টিতে স্বজাতার চক্ষু আবার নত হইল, মুখ আবার আরক্তিম হইল।

উদয়ন কহিলেন, ‘আজ বৈকালে প্রয়াগ-সঙ্গমে নিগ্রহ’

নাথপুত্র উপদেশ দিতেছিলেন, শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।’

‘তিনি ত মহাপুঙ্ঘ, সকলেই জানে।’

‘সকলে ভক্তিপূর্বক তাঁহার কথা শুনিতেছিল, এমন সময় রাজা তাঁহার কয়েক জন অসদাচারী বন্ধু লইয়া উপস্থিত।’

‘রাজার আচরণে ত প্রজারা সকলেই ভয় পাইয়াছে।’

‘তাঁহারা আসিয়াই সাধুকে বিক্রপ ও অপমান করিতে লাগিলেন। গৌতম বৃদ্ধদেবেরও নিন্দা আরম্ভ হইল। আমার অসহ্য বোধ হওয়াতে একটা কথা বলিলাম।’

‘কি বলিলে?’

‘আমি বলিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীকে বিক্রপ করা রাজার পক্ষে অসুচিত। প্রজারা তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট, সে-কথাও বলিয়াছিলাম।’

স্বজ্ঞাতা সত্তরে কহিলেন, ‘রাজার প্রকৃতি ত জান। তিনি ত কখন ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম নাই। তোমাকে কিরূপ লাঞ্ছনা করিবেন কে বলিতে পারে?’

‘তাই ত ভাবিতেছি। এখন উপায়?’

‘কিছু দিন আর কোথাও গিয়া বাস করিলে হয় না? রাজার বিবাহের কথা হইতেছে, বিবাহ হইলে শাস্ত্র-প্রকৃতি হইতে পারেন।’

‘কোথায় বিবাহের কথা হইতেছে?’

‘সন্ধ্যা হইবার পূর্বে মগধরাজের দূত রাজপথ দিয়া রাজবাটিতে পিগাছেন। মাসী বলিতেছিলেন, মগধরাজ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রাজার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।’

‘রাজমাতার মুখে শুনিয়া থাকিবেন?’

‘সেইরূপ অসুমান হয়।’

‘তুমি যে স্থানান্তরে যাইতে বলিতেছ, কোথায় যাইব? যে-কর্ম শিথিয়াছি চুই চারি দিনে আরম্ভ করিবার কথা। এখন যদি কোথাও চলিয়া যাই বাহার সহিত কর্ম করা স্থির হইয়াছে তিনি কি বলিবেন?’

‘রাজা এখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কখন কি করিয়া বসেন তাহার ত স্থিরতা নাই! তুমি কর্ম আরম্ভ করিলে এমন

সময় সহসা যদি তোমায় কারাবন্দী কবেন কিংবা আর কোন শাস্তি দেন তাহা হইলে তুমি কি কবিবে? তখন ত কর্ম বন্ধ হইয়াই যাইবে, তুমিও বিপদে পড়িবে।’

‘তুমি যেমন বলিতেছ সেইরূপ করিব। আমার বন্ধুকে বলিয়া কাল বারাণসী চলিয়া যাইব।’

‘আজ রাত্রে কোন আশঙ্কা নাই ত?’

‘রাত্রে গৃহে থাকিব না, আর কোথাও গিয়া শয়ন করিব।’

‘সেই কথা ভাল।’

কিছুক্ষণ কথা স্বগিত হইল। আবাব উদয়ন কহিলেন, ‘স্বজ্ঞাতা!’

‘উদয়ন।’

‘আমাদের নিজের একটা কথা আছে।’

স্বজ্ঞাতা নখে নখ খুঁটিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

‘তুমি ত আমার মনের কথা জান।’

স্বজ্ঞাতা পূর্বরূপ। উদয়ন তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, কহিলেন, ‘আমাদের বিবাহে ত কোন বাধা নাই। তুমি স্বীকৃত হইলেই হয়।’

মৃষ্টিমধ্যে গুত ক্ষুদ্র পক্ষিণীর দ্বায় উদয়নের হস্তের মধ্যে স্বজ্ঞাতার হস্ত কম্পিত হইতেছিল। মুদুস্বরে কহিলেন, ‘এ-কথা আমাকে কেন বলিতেছ? এখন ত স্বয়ম্বরের প্রথা নাই যে, প্রকাশ্য-সভায় তোমাব পলায় আমি বর-মালা পরাইয়া দিব?’

উদয়ন স্বজ্ঞাতার হস্ত মুক্ত করিলেন। মহাশ্বেত ফিরিয়া আসিলেন। উদয়ন তাঁহাকে কহিলেন, ‘বৈকালে বাহির হইয়াছি, এখনও গৃহে ফিরি নাই। অসুখ্যতি হয় ত এখন গৃহে যাই।’

মহাশ্বেতা সম্মিত মুখে কহিলেন, ‘এ কি তোমার গৃহ নয়?’

‘আপনাদের স্নেহেই ত আমি প্রতিপালিত।’

উদয়ন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে দূত মগধে ফিরিয়া যাইবেন সংবাদ পাইয়া রাজা বিরূপাক্ষ রাজ-প্রাসাদে আসিলেন। তাঁহাকে

দেখিয়া দূত কহিলেন, ‘বিবাহে আপনার সম্মতি জানিয়া মগধরাজ আনন্দিত হইবেন। শুভ দিন স্থির হইলে যথোচিত সমাদরের সহিত আপনাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন।’

কোথে বিরূপাক্ষের সর্বাঙ্গ জলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ওবার সম্মুখে সর্প ফণা তুলিয়া কি করিবে? প্রকাশ্যে রাজ্য কহিলেন, ‘কিছু দিন পরে হইলে ক্ষতি কি? ব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন?’

‘সে কি কথা মহারাজ! শুভ কর্মে কি বিলম্ব করিতে আছে? আপনি লক্ষ্যের অহুরোধে এমন কথা বলিতেছেন।’

স্থির অথচ সতর্ক পুরোহিত পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন, ‘মগধরাজ যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।’

রাজ্য একবার পুরোহিতের দিকে আর একবার দূতের দিকে চাহিয়া বাকশূন্য হইয়া রহিলেন। দূত অল্পচর-দিগের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। তখন রাজ্য মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া সজোরে পুরোহিতকে কহিলেন, ‘এ সমস্ত আপনাদের ষড়যন্ত্র।’

পুরোহিত কহিলেন, ‘ষড়যন্ত্র ত অসং কর্মের জ্ঞান করে। সম্বন্ধে বিবাহের ব্যবস্থা করা কি অসং কর্ম?’

‘বিবাহ করা না কবা, যে কোন সময় করা আমার ইচ্ছা। এ বিবাহ আমি করিব না।’

‘মহারাজের ইচ্ছা; প্রতিশ্রুত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিলে মগধরাজ কারণ জানিতে চাহিবেন।’

‘আমাকে আপনি শাসাইতেছেন?’

‘আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার সাধ্য কি, মহারাজ! কিন্তু মগধরাজ রাজ্যে প্রতিপালিত পুরোহিত নহেন, এ কথা আপনি কেমন করিয়া বিশ্বাস হইবেন?’

রাজ্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসাদ হইতে নিজপ্রাসাদ হইয়া পদব্রজে নগরে চলিলেন। তিনি একা যাইতেছেন দেখিয়া দুইজন ভক্তধারী রাজসৈনিক তাঁহার অহুবর্তী হইল।

উদয়ন প্রভাত-কালে উঠিয়া নিজের গৃহে আসিয়াছেন, রাজ্যে কোন বন্ধুর গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। এখন যে

ব্যক্তির সহিত কর্ম করিবার কথা তাহার গৃহে গমন করিতেছিলেন। পথে রাজ্যের সহিত দেখা! উদয়ন পথ ছাড়িয়া দিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন।

যে ক্রোধানল রাজ্যের হৃদয়ে এতক্ষণ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল উদয়নকে দেখিয়া মাজই তাহা হবিষ্যুত ছতাসনের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। গর্জন করিয়া সৈনিকদ্বয়কে কহিলেন, ‘এই ব্যক্তিকে বন্দী কর।’

সৈনিক দুইজন এমন চমকিয়া উঠিল যে, তাহাদের ভল্ল হস্ত হইতে পড়িতে পড়িতে রহিল। সংযত হইয়া একজন কহিল, ‘কাহাকে, মহারাজ?’

প্রশ্নের কারণ ছিল। পথ সঙ্কীর্ণ, লোকের গমনাগমন ত ছিলই, আবার রাজ্যের সিংহনাদ শুনিয়া পথিক চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। দুই চারি জন উদানের পাশেই দাঁড়াইল।

রাজ্য অধূলি দিয়া উদয়নকে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

সৈনিকেরা তখনও বুঝিতে পারে না। পথ চলিতে যাহাকে-তাহাকে বন্দী করা কি রকম বিচল! উদয়ন চোর-দস্যু নহেন, সম্রাট বংশের সম্রাট, রাজ্যের জাতি, কোথাও কিছু নাই, পথেব মধ্যে তাঁহাকে বন্দী! রাজ্যের মস্তিষ্কের বিকার হয় নাই ত! হয়ত রাগে প্রমোদের অধিক বাড়াবাড়ি হইয়া থাকিবে।

নাগরিকগণও বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। রাজ্যের চরিত্র সকলেই জানিত, প্রজার প্রজা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল।

একজন সৈনিক সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি অপরাধে, মহারাজ?’

রাজ্য চাঁৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘তোমরা আদেশ পালন করিবে, প্রশ্ন করিবার কে?’

সৈনিক স্তব্ধ হইল। একজন পথিক কহিল, ‘আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কি অপরাধে এই ব্যক্তিকে বন্দী করিতেছেন?’

‘তাহা হইলে তুমিও বন্দী হইবে।’

পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিল, ‘এমন রাজ্য না হইলে এমন বিচার করে কে? নগরস্থ লোককে বন্দী করিলেই ত হয়।’

রাজা কহিলেন, ‘এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী।’

সৈনিকেরা উদয়নকে ধরিতে উদ্যত হইল। মাঝে আর কয়েকজন লোক আসিয়া পড়িল। একজন উদয়নের কাণে কাণে বলিতেছিল, ‘পশ্চাতে মহামায়ার মন্দির-দেখিতে পাইতেছ না? মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে বন্দী করিবার আদেশ নাই।’ সে ব্যক্তি উদয়নকে পশ্চাদ্ধিকৈ ঠেলিতে লাগিল। মন্দিরের বৃহৎ দ্বার, তাহার পর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উদয়ন বেগে প্রাঙ্গণ পার হইয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীমূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। কহিলেন, ‘আমি ভীত, আমি দেবীর শরণার্থী।’

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দীর্ঘ, সৌম্যমূর্তি, দীর্ঘকেশ, শঙ্করমণ্ডিত মুখশ্রী, কোমল গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ‘বৎস, আশস্ত হও, অশরণকে শরণ দিবার ক্ষমতা ইহা আছে।’

উদয়ন কহিলেন, ‘রাজা মিত্রদলের সহিত সন্ন্যাসীকে অবমাননা করাতে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। এই অপরাধে তিনি আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া বন্দী করিতে আসিতেছেন।’

‘এখানে?’

‘সৈনিকদিগকে লইয়া রাজা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।’

‘এখানে রাজরাজেশ্বরের রাজ্য, এখানে রাজা-প্রাজ্ঞা সকলেই সমান।’ পুরোহিতের চক্ষু জলিয়া উঠিল। ‘মন্দির-প্রাঙ্গণে সৈনিক! রাজদ্রোহী? রাজা স্বয়ং যখন নিজের শত্রু, অপর শত্রু হইতে কতক্ষণ?’ অপর পুরোহিতকে কহিলেন, ‘আমি বাহিরে যাইতেছি, দ্বার রুদ্ধ কর। আমি ন! আসিলে দেবীর দর্শন হইবে না।’

পুরোহিত বাহিরে আসিলেন। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোহিত দেখিলেন, প্রাঙ্গণে লোক ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেছে, সর্বাগ্রে রাজা, হস্তে মুক্ত অসি, তাহার পশ্চাতে সৈনিক, সঙ্গে সঙ্গে জনতা-শ্রোত। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সকলে থম্কিয়া দাঁড়াইল, কেবল রাজা ক্ষুণ্ণপদে মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সৈনিকেরাও অগত্যা তাঁহার অঙ্গগমন করিল।

রাজা কিছু বলিবার পূর্বেই পুরোহিত মুক্ত কণ্ঠে, সকলকে শুনাইয়া, কহিলেন, ‘মহারাজ, অসি হস্তে সশস্ত্র সৈনিক সঙ্গে আপনি এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কি দেবীর স্থান না শত্রুর রণস্থল?’

বিরূপাক্ষ উন্নত বলিলেই হয়। অসংযত যৌবন, সকল প্রকার অত্যাচার, তাহার উপর মগধরাজের দূতের ভয়ে সমস্ত রাজ্যি আত্মনির্ধাতন। রুদ্ধ চিত্ত মুক্ত হইয়া রাজা ক্ষিপ্তের ছায়া হইয়া উঠিলেন, কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান তিরোহিত হইল। কহিলেন, ‘আমি দেবীর মন্দিরে আসি নাই, পলাতক অপরাধীকে বন্দী করিতে আসিয়াছি।’

পুরোহিত পূর্বের ছায়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, ‘এখানে কেহ কাহাকেও বন্দী করিতে পারে না। এ স্থান অভয়াব, ভীত ব্যক্তিকে তিনি অভয় দেন, শরণাগতকে শরণ দেন।’

রাজা একেবারে মন্দিরেব সোপানের উপর উঠিয়া, হস্তের অসি না নামাইয়া, তীব্র, রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, ‘ব্রাহ্মণ, পথ ছাড়! ভিতরে প্রবেশ করিব, দ্বার রুদ্ধ থাকে ভাঙিয়া ফেলিব।’

জনতা শিহরিয়া উঠিল। পুরোহিত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দুই হস্তে বক্ষের কাষায়-বজ্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, রাজার তরবারির সম্মুখে প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়া দিলেন। তুর্ধ্যধ্বনির ছায়া কণ্ঠনির্গমে কহিলেন, ‘প্রথমে ব্রহ্মহত্যা কর, তাহা হইলে দেবীর দ্বার সহজে ভাঙিতে পারিবে।’

সমবেত জনসংঘ হাহাকার করিয়া উঠিল। ‘সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ হইল!’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অনেকে দুই হস্ত দিয়া শ্রবণ রোধ করিল, অনেকে মন্দিরেব অভিমুখে ধাবিত হইল।

সৈনিক দুই জন ভল্লভল্ল যোজনা করিয়া, পুরোহিতের সম্মুখে রাজার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। রাজা দস্তে দস্তে নিষ্পেষিত করিয়া কহিলেন, ‘তোমরাও রাজদ্রোহী, শূলে যাইবে।’

‘রাজদণ্ড মস্তকে পাতিয়া লইব, দেবীর অভিষাপের ভাগী হইতে পারিব না। দেবীর অপমান হইলে নগর ধ্বংস হইবে।’



আনারকলি

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলাভবন, বরোদা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

রাজা বিরূপাক্ষের ওষ্ঠে ফেন এবং ওষ্ঠ-প্রান্তে শোণিত-বিন্দু দেখা দিল।

প্রজাদিগকে পুরোহিত কহিলেন, ‘তোমাদের কোন চিন্তা নাই, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। দেবীর মর্যাদা তিনি স্বয়ং অক্ষত রাখিবেন।’

প্রজারা চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত রাজাকে কহিলেন, ‘মহারাজ, আপনিও গৃহে ফিরিয়া যান। অহুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহামায়া প্রদত্ত হইবেন।’

রাজা কোন কথা না কহিয়া উত্তানে ফিরিয়া গেলেন।

৫

রাজা বিরূপাক্ষের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। মন্দিরে বলপূর্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর অভিসম্পাতের ভয়, তাহার অপেক্ষাও ভয় প্রজাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া। উদয়নকে তিনি বিনা কারণে রাজদ্রোহী বলিয়াছিলেন, এখন যদি সত্য সত্যই প্রজারা বিদ্রোহী হয়? দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্ত তিনি উত্তান হইতে নগ্ন পদে, কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া, মন্দিরে গিয়া মহা সমারোহে দেবীর অর্চনা করিলেন, দেবীকে ও পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে বহু অর্থ প্রদান করিলেন। প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবার আশায় নানাবিধ উৎসবের আয়োজন করিলেন, উৎসবে আহারের ও বস্ত্রাদি দানের মুক্ত হস্তে ব্যবস্থা করিলেন। অপর দিকে বিলাসের মাত্রা বাড়িল, রাজকর্মে কিছু মাত্র মনোযোগ নাই।

উদয়নকে নগর ত্যাগ করিতে হইল না। সকল কথা শুনিয়া মহামায়ার মন্দিরের পুরোহিত তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি নির্ভয়ে থাকুন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। রাজা মন্দিরে আগমন করিলে তাঁহাকে নিভৃত কহিলেন, ‘উদয়নকে শাস্তি দিবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। দোষ আপনায়, নিরপরাধী সন্ন্যাসীদিগকে অকারণে অবমাননা করিয়াছিলেন। ইহাতে আপত্তি করায় উদয়নের কি অপরাধ? সেখানে অপর লোক উপস্থিত ছিল, উদয়নের প্রতি অবিচার করিলে তাহার সকল কথা প্রকাশ করিবে, প্রজাগণ আরও রুষ্ট হইবে।’

রাজা উদারভাবে কহিলেন, ‘আমি উদয়নকে ক্ষমা করিয়াছি।’

পুরোহিত শ্রুতিমুখে কহিলেন, ‘সেই কথাই উত্তম।’

উদয়ন নিজের কর্মে নিযুক্ত হইলেন। গৃহে নাতা ছিলেন, আর কেহ না। মধ্যবিত্ত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, বিশেষ কোন অভাব ছিল না, উদয়নের অলস স্বভাব নহে বলিয়া তিনি কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নাতা কহিলেন, ‘উদয়ন, এইবার বিবাহ কর, নিজের সন্সার কর, আমিও পুত্রবধূ মুখ দেখি।’

উদয়ন হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, ‘বিবাহ কে-থায় স্থির করিলে?’

‘পাত্রীর জন্ত অধিক দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। মহাশেতার বোন-ঝি স্বজাতা মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়, কি বল?’

মাতার হস্তপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া উদয়ন মন্তক অবনত করিলেন, কহিলেন, ‘তুমি যেখানে স্থির করিবে সেখানেই বিবাহ করিব।’

‘তোমার নিজের কোন মতামত নাই?’

অপ্রতিভ হইয়া উদয়ন কহিলেন, ‘আমারও মত আছে।’

মাতা আনন্দে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ‘তোমার মত জানিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছি।’

‘আমার মত কেমন করিয়া জানিলে?’

‘আমার চক্ষু আছে, মহাশেতারও চক্ষু আছে, জানিত কতক্ষণ?’

আনন্দে উত্তোলিত হৃদয়ে উদয়ন জননীকে প্রণাম করিলেন।

সেই রাত্রে উদয়ন স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, কণ্টকময় মহাতরুতে পরিপূর্ণ, অরণ্যে অসংখ্য সর্প ও স্থাপদকুল বিচরণ করিতেছে। লোলজিহ্বর, নরমাংস-লোলুপ, বিপুলদেহ রাক্ষসগণ বিশাল বাহু প্রদারিত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কোথাও আর্দ্র প্রাণীর চীৎকার, কোথাও কপিতকন্ব জীবের পলায়ন। শোণিতের ত্রায় লোহিত রাগে আকাশ আচ্ছন্ন, বায়ুতে রোদনের স্বর প্রবাহিত হইতেছে।

সহসা সেই ভয়াবহ স্থানে অভয় বাণী শ্রুত হইল। আকাশ নির্মল হইয়া উজ্জল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিল, আকাশ-

সম্মল অরণ্য অদৃশ্য হইল। দেবী মহামায়া উদয়নের সম্মুখে আবিভূতা হইলেন। মন্দিরে উদয়ন যে-মূর্তি দেখিয়াছিলেন সে-মূর্তি নহে, কিন্তু দেবী সেই, সংশয়ের লেশমাত্র রহিল না। পাষণ্ডময়ী মূর্তির পরিবর্তে জ্যোতির্ময়ী, মঙ্গলময়ী, করুণাময়ী মূর্তি! উদয়নের প্রতি কোমল, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ‘ভীত হইয়া তুমি আমার নিকটে শরণ প্রার্থনা করিয়াছিলে। দেখিতেছ না, এ স্থানে নিত্য ভয়! আমাব সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে চিরভয় প্রদান করিব।’

দেবী অন্তহিতা হইলেন। গলদ্বন্দ্ব হইয়া উদয়নবে নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। স্বপ্নে বাহা দেখিয়াছিলেন জাগ্রত হইয়াও বার বার তাহাই দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট প্রত্যেক দৃশ্য মানস-চক্ষে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইল।

৬

প্রভাতে উঠিয়া উদয়ন স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহাকেও বলিলেন না। নিত্যকর্ম যেমন করিতেন সেইরূপ করিলেন। একবার মনে করিলেন মন্দিরে গিয়া পুরোহিতকে স্বপ্নকথা বলিবেন, কিন্তু সে বলনা ত্যাগ করিলেন। কত সময় কত স্বপ্ন দেখা যায়, সকল স্বপ্নেরই কি অর্থ আছে?

বৈকালে কর্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় উদয়ন নগরের বাহিরে অল্পক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ মেঘ উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিল। তাহার পরেই প্রবল ঝড়, ধূলিতে চারিদিক ভরিয়া গেল। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইবার অপেক্ষায় উদয়ন পথের পাশে বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইলেন।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল, তাহার পর মেঘগর্জন। উদয়ন দেখিলেন, দূর হইতে একটা অশ্ব ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অশ্বরোহী কোন মতে অশ্বকে সংযত করিতে পারিতেছে না। উদয়ন চিনিলেন, রাজা বিরূপাক্ষ, ভয়ে চক্ষু বিক্ষারিত, অশ্বপৃষ্ঠে স্থির হইতে পারিতেছেন না। উদয়ন মুহূর্ত্ত-কাল বিলম্ব না করিয়া, লক্ষ দিয়া অশ্বের বজ্র ধারণ করিলেন। অশ্ব লাফাইয়া উঠিয়া, কিছু দূর গিয়া স্থির হইল। রাজা বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে

অবতরণ করিলেন। দেখিলেন, উদয়ন অশ্বের পদতলে পতিত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে অপর অশ্বরোহিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। উদয়নের উঠিবার ক্ষমতা নাই। রাজার আদেশে সত্তর শিবিকা আনীত হইল। রাজা কহিলেন, ‘রাজ প্রাসাদে লইয়া চল।’

উদয়ন ক্ষৌণ্ডে কহিলেন, ‘না, আমার নিজের গৃহে বাহকেরা উদয়নকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। রাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণ নীরবে শিবিকার সঙ্গে গমন করিলেন গৃহে উপনীত হইয়া রাজা ও তাঁহার বন্ধুগণ উদয়নকে সাবধানে তুলিয়া গৃহের ভিতরে শয্যা শয়ন করাইলেন উদয়নের মাতা অশ্রুধ্বং কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বি হইয়াছে?’

রাজা সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন, ‘আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া উদয়ন আহত হইয়াছেন।’

উদয়নের মাতা কহিলেন, ‘নিজের প্রাণ দিয়াও রাজাকে রক্ষা করা প্রজার কর্তব্য।’

উদয়নের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন অপর করিয়া রাজা অধোবদন হইলেন।

রাজবৈद्य দেখিতে আসিলেন। উদয়নকে দেখিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, বাহিবে আসিলেন। রাজাকে কহিলেন, ‘শরীরের ভিতর কোথাও গুরুতর আঘাত লাগিয়া থাকিবে। স্বাসের লক্ষণ দেখিতেছি। রক্ষা পাইবার কোনও আশা নাই।’

বৈদ্য চলিয়া গেলেন। পব দিবস প্রাতঃকালে আবার আসিবেন বলিয়া রাজাও বিদায় লইলেন।

রাত্রিকার পর আকাশ নির্মল হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত-প্রায়। যুহুমন্দ, শীতল বায়ু বহিতেছে, তরুশাখায় পক্ষিগণ সন্ধ্যার বন্দনা করিতেছে। বাহিরে দিবাসসানে প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্তি, ভিতরে নিঃশব্দে মৃত্যুর আগমন!

সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা ও স্বজ্ঞাতাও আসিয়াছিলেন। মহাশ্বেতা উদয়নের মাতার সহিত উদয়নের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, স্বজ্ঞাতা গৃহের মধ্যে প্রবেশ কবিলেন না।

উদয়নের মাতা শোক সঞ্চরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। মহাশ্বেতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে উদয়নের ক্রেশ হইতেছিল। মুহূর্ত্তের
কহিলেন, ‘মা, মহামায়া আমাকে ডাকিয়াছেন।’

মহাশ্বেতা কহিলেন, ‘অমন কথা বলিতে নাই।
মহামায়ার আশীর্বাদে তুমি আবার সারিয়া উঠিবে।’

উদয়নের মুখে অতি ক্ষীণ, অতি মধুর, অতি নির্মল
হাসি দেখা দিল। কহিলেন, ‘কাল রাত্রে দেবী স্বপ্নে
আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। একবার রাজার ক্রোধ
হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত দেবীর মন্দিরে শরণ লইয়া-
ছিলাম। স্বপ্নে দেবী চিরাভয় দিবার নিমিত্ত আমাকে
দেবলোকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আর অধিক
বিলম্ব নাই, তোমরা দুই জননী আমাকে আশীর্বাদ কর
যেন মহামায়ার চরণে আমি মুক্তি লাভ করি।’

উদয়নের মাতা ও মহাশ্বেতা কি বলিবেন? নীরবে
অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের পর উদয়ন কহিলেন, ‘একবার
সুজাতা—’

উদয়নের মাতা ও মহাশ্বেতা গৃহের বাহিরে গমন
করিলেন। সুজাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে
দাঁড়াইলেন। উদয়ন কহিলেন, ‘ব’স।’

সুজাতা উদয়নের পাশে বসিলেন। চক্ষের জলে
দেখিতে পাইতেছিলেন না। উদয়ন তাঁহার হস্তের উপর
হস্ত রক্ষা করিলেন। সুজাতা দুই হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ
করিলেন।

উদয়নের কণ্ঠস্বর আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।
কহিলেন, ‘সুজাতা, মহামায়ার আদেশ, তাঁহার কাছে
আমাকে যাইতে হইবে।’

সুজাতা মন্তক নত করিলেন, কথা কহিতে পারিলেন
না। তাঁহার অশ্রু উদয়নের বক্ষে পতিত হইল।

উদয়ন কহিলেন, ‘আর আমাদের দেখা হইবে না—
ইহলোকে।’

অশ্রুজড়িত স্বরে সুজাতা কহিলেন, ‘লোকান্তরে!’

উদয়নের চক্ষে আলোক নির্ঝাপিত হইয়া আসিতে-
ছিল। কহিলেন ‘বিদায়!’

সুজাতার মুখ আরও নমিত হইয়া ওষ্ঠাধর উদয়নের
ললাটে স্পৃষ্ট হইল।

মরণোন্মুখ, মর্শ্বরিত বায়ুর হ্রাস উদয়নের শেষ
নিঃশ্বাসের সহিত কথা আনিল, ‘ছায়ায়! ছায়ায়!’

দেবীর কক্ষণ ও মানবীর প্রেম-মমতার ছায়ায় ছায়ায়
উদয়ন আনন্দলোকে গমন করিলেন।



বিগত বৃন্তমেলায় জনতার পেছনে মৃত ব্যক্তি (৩০শে চৈত্র, ১৩৩৩)

[শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর দৌজন্তে

ভাগ্যচক্র

শ্রী সীতা দেবী

পরীক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকা যে কি বিরক্তিকর ব্যাপার, তাহা গিরীশ আগে ভাবিয়া দেখে নাই। ভাবিলে বোধ হয় সহর ছাড়িয়া যাইবার পূরাপূরি ব্যবস্থা আগে হইতেই করিয়া রাখিত। তাহার বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী সকলেই যে যার পথ দেখিয়াছে, তাহাকে সন্ধান করিবার জন্ত কেহই এখানে বসিয়া নাই। পাশের বাড়ীর বহুরা গরম পড়িতে-না-পড়িতেই পোটলা-পুঁটলি বাগিচা দার্জিলিং চলিয়া গিয়াছে। গিরীশের সঙ্গে সে-বাড়ীর কোন মানুষেরই সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় নাই, কিন্তু মনে মনে সে তাহাদের সকলকেই বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিত। এত নিকটের বন্ধু বুঝি তার পরিচিতদের মধ্যেও কেহ ছিল না। এতখানি মানবপ্রীতির অবশ্য একটা কারণ কোথাও-না-কোথাও ছিল। কারণটির নাম ললিতা, বয়স বছর পনেরো ঘোলা হইবে। সে বহু মহাশয়ের ভায়া, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে, এবং প্রতিবেশী যুবক গিরীশের কবিতার খোরাক জোটায়। গিরীশের টেবলের দেওয়াল ত নীলরংএর মলাটের খাতায় ঠাশা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রাজধানীতে জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভটা কাব্যচর্চার পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়। এত গরমে কাব্য-লক্ষ্মীও হতমুখ হইবার জোগাড় করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর গিরীশ ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল। বিছানাটা যেন আগুন হইয়া আছে, শুইতে গেলে পিঠে ফোঁস পড়ে। বাবার কি অসুস্থ, বাড়ী যাইবার খরচ কোন-কালে পাঠাইবার কথা, আর এখন পর্য্যন্ত একটা পয়সার সন্ধান নাই। আচ্ছা, টাকা আশ্রক, তাহার পর কে বাড়ী যায়, দেখা যাইবে। তাহার আর যাহারই অভাব থাক, বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই, এবং বন্ধুগুলির বাড়ীঘরেরও অভাব নাই। গিরীশকে অন্ততঃ তাহার গোটা দশ বারো বন্ধু গ্রীষ্মের ছুটি কাটাইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাঠাই-

য়াছে। কাহারও-না-কাহারও বাড়ী গিয়া সে দু-টা মাস অতি স্বচ্ছন্দেই কাটাইয়া আসিতে পারিবে।

কিন্তু সম্প্রতি দুপুর-বেলাটা যে কি করিয়া কাটান যায়, তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। হোটেলের যত ঘরে যত উপভাস, গল্পের বই, মাসিক পত্র, সংবাদপত্র ছিল, সব তাহার বার দশ করিয়া পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে ত অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে, সেদিকে পা বাড়াইবার জো নাই। বিছানা এত গরম এবং গৃহ-স্বামীটির মেজাজও এত উত্তপ্ত যে, ঘুমের কথা ভাবিয়াও লাভ নাই। চাকর হতভাগাকে ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ত তাহার প্রায় ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তাহার টিকির সন্ধানও মিলিল না। কোথাও বেড়াইতে বাহির হইয়াছে বোধ হয়। গিরীশ নিজেই নীচে গিয়া চা করিয়া ফেলিবে, প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছে এমন সময় সদর দরজার শিকলটা ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গিরীশ মিনিটখানিক অপেক্ষা করিল, যদিই চাকরটা নীচে থাকে। কিন্তু দরজা খুলিবার কোনো শব্দ ত শোনা গেল না, বাহিরের শিকলটা আরও অধৈর্য্যভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। গিরীশকেই নীচে গিয়া দরজা খুলিতে হইবে, তাহা বেশ ভাল করিয়াই বোঝা গেল। ছেঁড়া চটি জোড়ার ভিতর পা ঢুকাইয়া বিরক্তমুখে সে দরজা খুলিতে চলিল।

দরজা খুলিয়াই দেখিল সামনে দাঁড়াইয়া তাহার পরম বন্ধু অতুল। বিরক্তিতা তাহার তখনই স্বর্ধ্যালোকভীত কুয়াসার মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে কোথায় ভাবিতেছে অতুল গ্রামে বসিয়া মায়ের রান্না মাছের মুড়া ধুস করিতেছে, না হতভাগা এই গরমে কলিকাতায় দাঁত বাহির করিয়া হাজির!

অতুলের পিঠে এক চড় মারিয়া সে চীৎকার করিয়া

বলিল, “তুই লক্ষীছাড়া এখানে কি ক’রে এলি রে ? আমি ত ভাবছি যে, মাসখানেক হ’ল তুই দূর হ’য়েছিস।”

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া রুমাল দিয়া মুখ ও ঘাড় মুছিতে মুছিতে বলিল, “দূর ত হয়েইছিলাম, কিন্তু কাল আবার সেখান থেকেও দূর হ’য়ে এসেছি। ঢের নাড়াপিছনেহ উপভোগ করা গিয়েছে বাবা। হাড় জালিয়ে তুলেছিল। না ব’লে ক’য়ে, সোজা লম্বা দিয়েছি।”

গিরীশ বলিল, “বেশ আহিস্ ছোঁড়া। এদিকে যে বুড়ো মা বাবা ভেবে মরবে ?”

“আরে, একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি, বিশেষ কিছু ভাববার নেই। একটু চটবে এই যা।” বলিয়া অতুল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গিরীশ তাহার সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, “কিন্তু ব্যাপারখানা কি খুলে বল ত ? বাড়ী যাবার জন্তে ত হেদিয়ে মরুছিলি। তার পর হঠাৎ এসব কি ?”

অতুল বলিল, “বিয়ে হে বিয়ে। তাঁরা আমার জন্তে এক ক’নে ঠিক করেছেন। খুব নাকি যোগ্য পাত্রী, অবশ্য তাঁদের মতে। কিন্তু টাকার জন্তে আর সব বিসর্জন দিতে আমি অন্ততঃ রাজী নাই। তাও যদি টাকাটা আমার হাতে আসত ত কথা ছিল। যাবেত বুড়ো বাপের পকেটে। কিন্তু সে যাক্। আসল কথা হচ্ছে যে, আমার আর একটি মেয়েকে ভারি পছন্দ। কিন্তু কর্তা-গিন্নির মোটেই মত নেই। বকুবকানি শুনে যখন দুই কান ভর্তি হ’য়ে উঠল, তখন সোজাসুজি স’রে পড়লাম।”

সিঁড়ি পার হইয়া দুইবন্ধুতে গিরীশের ঘরে আসিয়া পৌছল। গিরীশ বলিল, “পাঁচ মিনিট সবুর কর্। চাকর হতভাগা কোথায় যে গিয়েছে ঠিকানা নেই, ষ্টোভটা সামিই ধরিয়ে কেলেছি। এক টিন বিস্কিট ছিল সেটা গেল কোথায় ?”

অতুল ধপ্ করিয়া গিরীশের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া, ভাঙা তালপাতার পাখায় হাওয়া খাইতে আরম্ভ করিল। বলিল, “ধুন্তোর, রাখ এখন তোর আতিথ্য। গবমে গ’লে যাবার জোগাড় হ’লাম, এখন আমার চায়ের দরকার নেই। চাকর আসুক, তারপর ববক লেমনেড আনিয়ে খাওয়া বাবে। এখন বোস্ দেখি, একটু কথা বলতে দে।”

গিরীশ তাহার পাশে বসিয়া বলিল, “কি বলবি বল।”

অতুল বলিল, “দেখ তুই ত এক মন্ত কবি বাহুয। রোমাঞ্চে তোর মাথার থেকে পায়ের কড়ে আঙ্গুল অবধি ঠাসা। আমার একটু কান্ন ক’রে দে না ? এ বেশ তোর লাইনেই হবে।”

গিরীশ বলিল, “কি করতে হবে শুনি ? তুমি বাছা যদি ভেবে থাক, যে, খুব ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ক’রে, আমি তোমার মা বাবার মত বদলে দেব, আর তাঁরা টাকা-কড়ির সব ভাবনা ভুলে তোমায় যত খুসি কবিত্ব করতে দেবেন, তা হ’লে তোমাব একটু ভুল হয়েছে। বক্তৃতা করাটা আমার লাইন মোটেই নয়। বরং বিয়ের কবিতা-টবিতা লিখতে হয় ত বল।”

অতুল পাখার বাড়ী তাহার মাথায় এক ঘা দিয়া বলিল, “যে আক্ষে, কবিতার অর্ডার দেবাব জগ্নেই আমি এতদূর ছুটে এসেছি আর কি ? বাঞ্চে ইয়ার্কি না মেরে, এখন কথাটা শোন। আমাব পিতাঠাকুর যে ক’নেটি ঠিক করেছেন, সেটি দেখতে নাকি সাক্ষ্য রক্ষাকালী। কিন্তু মেয়ের বাপ আমার বাবাব ছেলেবেলাকার বন্ধু, আদ্যিকালে এক ক্লাশে প’ড়েওছিলেন বুদ্ধি। তাছাড়া বুড়োর টাকাকড়ি বেশ কিছু আছে ব’লে শোনা যায়। আমার বাবার আশা যে, মেয়েই টাকাকড়ি সব পাবে, কিন্তু সে গুড়ে বাগি হে ! আমি তলে তলে সব সঠিক ধর পেয়েছি। বিয়ের সময় গহনাগাটি, টাকাকড়ি কিছু পাবে অবশ্য, কিন্তু ঐ প’স্তই। মেয়ের মা মরেছে অনেক কাল, বাপ বুড়ো আবার বিয়ের চেষ্টায় আছে, মেয়ের বিয়ে অবধি অপেক্ষা। তবে বল দেখি, শুধু শুধু এক কাল-পেঁচা ঘাড়ে করবার আমার কি দরকার ?”

গিরীশ নারীজাতির মহা ভক্ত। এমন অবজ্ঞার স্ববের কথা শুনিয়া সে অতুলের উপর মহা চটিয়া গেল। বলিল, “তুমি নিজেও ত আর ময়ূরবাহন কার্তিকটি নও ? অত্নের রূপের বেলা বড় যে কড়াকড়ি দেখছি ?”

অতুল বলিল, “আমি কার্তিক কি হুম্মান সে বখা ত হচ্ছে না। আমি যেমন আছি, আছি। কাউক ত

আমি জোর ক’রে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করছি না ?”

গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল, “মেয়েটিকে নিজে দেখেছ ?”
তাহার কবিত্ব-প্রবণ মন এরই মধ্যে একটি অবজ্ঞাভা,
অনাদৃত কালো মেয়েকে ঘিরিয়া উপস্থাপন রচনা করিতে
আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কল্পনায় তাহার মন
বেশ খানিকটা ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

অতুল বলিল, “আমি দেবিনি হে, তবে আমার এক
ফ্রেণ্ড্ দেখেছে। সেই-ই ত সব খবর আমায় এনে
দিল।”

গিরীশ বলিল, “তা বেশ। কিন্তু আমায় যে কি
করতে হবে, সেইটাই মাঝখান থেকে শোনা হ’ল না।”

তাহার বন্ধু বলিল, “সেসব এখনও ঠিক করিনি
ভেবে। মোট কথা, তুই চল্ আমার সঙ্গে, তারপর একটা
প্ল্যান্ জুটেই যাবে। তোর মাথায় ত নানারকম বুদ্ধি
থেকে, একটা কিছু কি আর ভেবে ঠিক করতে পারবি
না ?

গিরীশ বলিল, “বেশ, আমি যাচ্ছি চল্। আমার
ত পরমে আর বিরক্তিতে হাড় ভাঙা হ’য়ে এল। কিন্তু
ট্যাক আমার খালি, তা ব’লে রাখছি বাবা। রেলওয়ে
কোম্পানী ত আমার খন্তর নয় যে মুখ দেখেই যেতে
দেবে ?”

অতুল বলিল, “নে নে আর রসিকতা করতে হবে না।
চারটে টাকার জন্তে সব অচল হ’য়ে যাবে আর কি ?
কাল সন্ধ্যায় ট্রেন, বুঝি ? ঠিক সাড়ে ছটায়। এখন
থেকে তোকে নিয়ে যাব, না তুই সোজা ষ্টেশনেই
যাবি ?”

“আমি সোজা ষ্টেশনেই যাব এখন, তোকে আর
এতদূর আসতে হবে না,” বলিয়া গিরীশ বন্ধুকে বিদায়
করিয়া দিল। সে যাইবামাত্র নিজের মাথায় একটা
চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, “যাঃ ছোঁড়াকে বরফ লেমনেড
দিতে ভুলেই গেলাম। যাক্, বিয়ের চিন্তায় এখন এত
ভরপুর হ’য়ে আছে, যে, ও সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনুবে
না।”

পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ী ডাকিয়া, পোটলা পুন্টলি সমেত
তাহাতে চড়িয়া গিরীশ ঘেন হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল।

অতুলের বাড়ী যে গ্রামে, সেটি বিশেষ বড় নয়, কিন্তু
দেখিতে বেশ ছবিখানির মত। ট্রেন হইতে তাহার
শোভা দেখিয়াই ত গিরীশ মজিয়া গেল। বন্ধুকে বলিল,
“এমন জায়গায় লোকে স্থখী না হ’য়ে বায় না। কি
চমৎকার দৃশ্য দেখ ত ! চোখ ঘেন জুড়িয়ে যায়।”

অতুলের তখন কবিত্ব করিবার অবকাশ মোটেই
ছিল না। সে তখন টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে ব্যস্ত।
গিরীশের কথার উত্তরে সে অতি সংক্ষেপে বলিল, “দৃশ্যতে
পেট ভরে না হে !”

অতুলের বাবা মা গিরীশকে সা মরেই অভ্যর্থনা করিয়া
লইলেন। কিন্তু তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে তাহার
যে বেশ খানিকটা অবাক হইয়াছেন, তাহা তাহাদেব
ধরণ-ধাবণে বোঝাই গেল। অতুল কিন্তু বাঁচিয়া গেল।
পরের ছেলের সামনে ঘরের ছেলেকে গালাগালি করা
চলেনা, কাজেই তাহার মা বাবা মনের রাগ মনেই রাখিয়া
দিলেন।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া দুই বন্ধুতে গিয়া অতুলের
ঘরে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। অতুলের একটি ছোট
বোন আসিয়া তাহাদের জন্ত পান রাখিয়া গেল। এখন
তাহাদের বৃহভেদ করিবার উপায় ঠিক করার পালা।
কিন্তু গিরীশ চট্ করিয়া কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

অতুল অত্যন্ত আশাঘিত ভাবে তাহার মুখের দিকে
চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, “কিছু প্ল্যান করবার
আগে আমার ত সব কথা ভাল ক’রে জানা দরকার ?”

অতুল বলিল, “তোমার জানতে বাকি আছে কি ?”
গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, এটা ত ঠিক যে তুই
সে মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করবি না ? এবং আর
একটি মেয়েকে বিয়ে করতে তুই একেবারে জীবন পণ
ক’রে বসেছিস্ এটাও ঠিক ত ?”

অতুল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তা এক
রকম ঠিকই।”

গিরীশ বলিল, “তা হ’লে তুই তোর বাবার কাছে
সব কথা খুলে বল না ? তিনি যদি জানেন যে, তুই অল্প

একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে কর্তে চাচ্ছি, তাহ'লে কি আর তিনি তোকে এই মেয়েকে বিয়ে করার জন্তে ছোব করবেন ?”

অতুল মুখটা অত্যন্ত বাকা করিয়া বলিল, “আহা, কিষে প্রানই বেব করলে ! আমার বাবাকে তুমি কি একটি রোমান্সভক্ত নব্য ছোকরা ঠিক কবেছ ? তাঁর কাছে গিয়ে এই সব কথা বললে, তিনি খড়মের এক বাড়ীতে আমার পিলে না ফাটিয়ে দেন ত ঢের। তাঁরা হচ্ছেন সব মাদ্ধাতার আমলেব মাদ্ধয়, বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতার পক্ষপাতী মোটেই নন। জী শুধু স্বামীর পত্নী নয়, সে পরিবারেব বউ, স্বতরাং সমস্ত পরিবার মিলে তাকে নির্দ্বন্দ্ব করবে, এই হচ্ছে তাঁদের আইডিয়া।”

গিরীশ বলিল, “তা বেশ ত। কিন্তু তুইও ত সে পরিবারের একজন ? তোরই বা কোন কথা থাটবে না কেন ? যাই বল, তোকেই ত জী নিয়ে ঘর কর্তে হবে ?”

অতুল বলিল, “নিজের বিয়ের কথায় কথা বলতে যাওয়া নাকি ভয়ানক বেহায়ামী।”

গিরীশ বলিল, “তবে কি ঘোড়ার ডিম আমাকে দিয়ে কবাত্তে চাস, তাই বল না।”

অতুল বলিল, “বাবা বলছেন, তিনি তাঁর বন্ধুকে কথা দিয়ে রেখেছেন ব'লে সে ভদ্রলোক মেয়ের জন্তে আর অন্য পাত্র খোজেননি। এখন আমি যদি বিয়ে না করি তাহ'লে বাবার মাথা অত্যন্ত হেঁট হ'য়ে যাবে। তবে আমি যদি মেয়েটির জন্তে অন্য উপযুক্ত পাত্র ঠিক ক'রে দিতে পারি, তাহ'লে তিনি আর আমাকে বিয়ের জন্তে জোর করবেন না, একথাও তিনি বলেছেন। মেয়ের বাপের টাকাকড়ির খ্যাতি আছে, কাজেই বর পাওয়া বাংলা দেশে বেশী শক্ত হওয়া উচিত নয়।”

গিরীশ খাট ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল, “তুই এই মতলবে আমাকে এখানে নিয়ে এলি নাকি ?”

অতুল বলিল, “তাই যদি হয় ত ক্ষতি কি ? তুই না বলিস্ যে, সব ভদ্র বাঙালী ছেলেরই এখন পূর্ব পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কালো আর গরীব মেয়ে বিয়ে

কবা উচিত ? এত তবু শুধু কালো, গরীব নয়। তুই সব দিক দিয়েই ঠকবি না।”

গিরীশ ভাবিয়া দেখিল সে এই রকম কথা বলিয়াছে বটে। কিন্তু তখনও সে ললিতাকে দেখে নাই। এখন তাহার পক্ষে অন্য মেয়ে বিবাহ করা অসম্ভব। ললিতা হয়ত হিমালয়ে বসিয়া তপস্বিনী গৌরীর মত তাহারই ধ্যান করিতেছে। আর সে কি না টাকার লোভে অন্য মেয়ে বিবাহ করিতে যাইবে ? এমন মহা পাপ সে কখনও করিতে পারিবে না।

অতুলের কথার উত্তরে সে বলিল, “সে তখন যা বলেছি, বলেছি। আমার মত এখন বদলে গেছে।”

অতুল অবজ্ঞাভরে বলিল, “জানাই ছিল। বক্তিয়ে কবা এক, আর কাজে করা এক। কিন্তু তোর সঙ্গে ত ঢের ঢের ছেলের আলাপ আছে ; তার মধ্যে এমন একটাও কি খুঁজে বাব কর্তে পারবি না যে রূপের বদলে রূপো নিয়েই খুসি থাকবে ?”

গিরীশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তা পারব না কেন ? কিন্তু সে ত আর এখানে ব'সে হবে না। আমরা তাহ'লে কলকাতায় ফিরতে হয়। টাকার লোভে বিয়ে করবে, এমন ছেলের অভাব কি ? বেশীর ভাগ বাঙালীর ছেলেই তা কর্তে রাজী হবে।”

অতুল বলিল, “মেয়ে যে দেখতে একান্ত সুন্দর, তা তাদের নাই বা বলি। মাঝারী গোছের বললেই চলবে। টাকার কথাটা খুব ফলিয়ে বলিস্।”

গিরীশ বলিল, “আচ্ছা, কালকের টেনেই তা হ'লে ফেরা যাবে।”

অতুল বলিল, “বাপ'রে, তাড়া দেখ। রীতিমত হুডকে গিয়েছি দেখছি। এখন কলকাতায় গিয়ে কাকে পাবি ? সব ত যে যার বাড়ী চ'লে গেছে, কলেজ খুলবার আগে কোনো শর্যার টিকিও দেখতে পাবি না। তার চেয়ে আর দুটো দিন থেকে যা না ? এফলা একলা আমার ত পেট ফুলে মরবার জোগাড় হয়।”

বন্ধুর সদৃশ উপভোগ করার উৎসাহ গিরীশের অত্যন্তই জুড়াইয়া গিয়াছিল। তবু ভদ্রতার খাতিরে সে

বলিল, “আচ্ছা, দেখা যাক। এখন একটু ঘুমনো যাক, কাল টেনে একেবারে ঘুম হয় নি।”

অতুল নিম্নের মনেই বকুবক কবিয়া চলিল, “বড়ো বাপটারও আঁকেল দেখনা। তাঁর এই বড়ো বয়সে সাধ হ’ল বিয়ে করতে। মেয়েকে সব টাকাকড়িগুলো দিলে তার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হ’তে পারত।”

গিরীশের মেজাজ গরম ছিল, সে বলিল, “ভদ্রলোক নয়, চামার বল। টাকার লোভে যারা বিয়ে করে, তারাই তোর মতে ভদ্রলোক না কি?”

অতুল উত্তর দিল না। গিরীশ খানিক পরে দিব্য নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল।

বিকাল বেলা অতুলের নিমন্ত্রণ ছিল, তাহারই এক কাকার বাড়ীতে। সে গিরীশকে জিজ্ঞাসা করিল, “একটাই ঘরে ব’সে থাকবি না কি রে?”

গিরীশ বলিল, “ঘরে ব’সে থাকবি কি ছুখে? আমি খানিকটা ঘুরে আসি। তোদের গ্রামটা বেশ ছবির মত দেখতে, একটু ভাল ক’রে ঘুরে আসা যাক।”

দুই বন্ধুতে এক সঙ্গেই বাহির হইল। অতুলকে তাহার কাকার বাড়ী ঢুকাইয়া দিয়া গিরীশ সোজা চলিতে লাগিল। বিকাল বেলাটা আর তত গরম ছিল না। গ্রামের পথে চলিতে চলিতে তাহার মনটা বেশ কবিত্বরসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। পল্লী-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য তাহার হৃদয়-লক্ষ্মীকে বড় বেশী মনে পড়াইয়া দিল। সে তাহার চিন্তায়ই তন্ময় হইয়া চলিতে লাগিল।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া দিল। গিরীশ চারিধারে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল যে, সে চলিতে চলিতে গ্রামের একটি বড় পুকুরের পাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। এইটিই বোধ হয় গ্রামের মেয়েদের বৈকালিক সভার স্থান। ভাগ্যে অনেক গুলি ঝোপঝাড় ঘাটটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ন হইলে গিরীশকে অত্যন্তই অপমানিত পড়িতে হইত। তাহার তখনই চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহার পা দুটা বিদ্রোহ করিয়া কিছুতেই নড়িতে চাহিল না।

“দেখ্ রমা, শীগ্গীর চ’লে আয় বলছি, তা না হ’লে

পিসীমা গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবেন। সত্যে যে হ’য়ে এল।”

উত্তরে শোনা গেল, “বাবারে বাবা! পাঁচ মিনিট আর সবুর কর্তে পার না? আঁধার হবার আগে বাড়ী ফিরলেই হ’ল, পিসীমা তাহ’লে কিছু বলবেন না।”

গলাব স্বরটা বড় বেশী পরিচিত যে! গিরীশের সারা শরীবে পুন্সকের শিহরণ খেলিয়া গেল। সে এখানে আসিল কি করিয়া? কোথায় দেবতাস্থা নগাধিরাজের অভ্যভেদী শিখর আর কোথায় বাংলা দেশের ক্ষুদ্র পাড়াগাঁ। কিন্তু গলাব স্বর যে একেবারে ছব্ব এক! এরকম হওয়া কি সম্ভব? নামটি রমা, ললিতা নয়। কিন্তু রমা নামটিও বেশ মিষ্ট।

ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া উকি মারিয়া দেখিবার কোতুলহ তাহাকে প্রবলবেগে সেইদিকে টানিতে লাগিল। নিতান্ত ভদ্রলোকের ছেলে, তাই সে কোনো প্রকাবে সামলাইয়া গেল। কিন্তু সেখান হইতে নড়িলও না। কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীটিকে না দেখিয়া সে যাইবে না, সংকল্পই করিয়া লইল।

সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে বড় বেশী দেবি করিতে হইল না। মেয়েব দল গল্প এবং স্নান শেষ করিয়া, কলসে জল ভরিয়া যে ঘাব গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। গিরীশের উচিত ছিল পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাওয়া, সে তাহা না করিয়া ইা করিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ফলে মেয়েগুলি পথের উপর আসিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইল এবং তাহাতে বিশেষ খুসিও হইল না।

“দেখ্ একবার লোকটার রকম, মেয়েদের পুকুরের কাছে কি রকম ইা ক’রে দাঁড়িয়ে আছে।”

রমা নামধারিণীটি অসভ্য মানুষটাকে দেখিবাব উদ্দেশে ফিরিয়া তাকাইল। গিরীশ দেখিল সে ললিতা। মেয়েটিও তাহার কলিকাতার প্রতিবেশীটিকে এখানে দেখিয়া চমকাইয়া গেল।

তাহার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, “ছেলেটাকে চিনিম্ নাকি? দেখে অমন চমকে গেলি যে?”

রমা বলিল, “চিন্বে আবার কোথা থেকে? বল্ কাতায় আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা ছেলে থাকে,

তার মতন অনেকটা দেখতে, তাই একটু অবাক লাগছিল। চল বাড়ী যাই, একেবাবে আশা হ'য়ে এল।" মেয়ে ছুটি ক্ষতগতিতে গিবীশেব দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেল।

গিরীশের এতক্ষণে যেন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, অল্প কেহ তাহাকে দেখিবার আগে সে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল। কোথা দিয়া কোথায় সে যে চলিল, তাহা লক্ষ্যও করিল না। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি কবিয়া অবশেষে সে যখন বাড়ী ফিরিল, দেখিল অতুল তখনও আসে নাই।

চাকর আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গেল। গিরীশ ফিরিয়াছে দেখিয়া সে আবার অস্থঃপুরে চলিল, তাহার জন্ত কিছু জলখাবার আনিতে। গিরীশ মনে মনে অতুলকে গাল দিতে দিতে সবে জলযোগ আবস্ত করিয়াছে, এমন সময় অতুল ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে আর একটি যুবক।

গিবীশেব সঙ্গে নবাগত যুবকের পবিচয় কবাইয়া দিতে দিতে অতুল বলিল, "এই আমার বন্ধু সুবোধ হে, যার কথা তোমায় সেদিন বল্ছিলাম।"

সুবোধ বসিয়া বলিল, "আশা করি আমার নামে বেশী কিছু আপনাব কাছে ও বলেনি?"

গিবীশ হাসিয়া বলিল, "বরং আপনাব প্রশংসাই কর্ছিল। আপনি নাকি ওকে খুবই সাহায্য কংছেন।"

ছেলেটি হাত নাড়িয়া বলিল, "আরে কিছু না, মশায়, কিছু না, কয়েকটা খবর এনে দিইছিলাম মাত্র।"

অতুল হাসিয়া বলিল, "গিরীশের সাম্নে কিছু লুকোবার নেই হে, তাকে সব কথাই আমি বলেছি।"

সুবোধ বলিল "তা আব বল্‌বিনা? ভয়ে তোর দেখছি হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যাবার জোগাড় হয়েছে।"

অতুল চটিয়া বলিল, "আমার মত দশা হ'লে, তুমি কেমন ভয় না পেয়ে থাকতে, দেখতাম। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ এক রক্ষাকালী ঘাড়ে চড়বার উপক্রম, এতে মানুষের মাথার ঠিক থাকে?"

সুবোধ আর এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া, তাড়াতাড়ি অল্প কথা পাড়িয়া বসিল। তাহার ধরণ ধারণ গিবীশেব

কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকিল, কিন্তু মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিয়া সেও গল্পে মাতিয়া উঠিল।

সুবোধ খানিক পরে চলিয়া গেল। পল্লীগ্রামের পথ শীঘ্রই জনবিরল হইয়া আসিল। জানালা দিয়া বাহিরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া গিরীশ ভাবিতে লাগিল, জায়গাটি দেখিতে বেশ বটে, কিন্তু থাকিবার পক্ষে খুব যে ভাল তাহা বলা যায় না। সম্ভার পর পেট ভরিয়া খাওয়া এবং নাক ডাকাইয়া ঘুমানো ছাড়া আর যে কি করা যায়, তাহা ত ভাবিয়া পাওয়াই শক্ত। অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিস্ হাঁ ক'রে?"

গিবীশ সে কথা উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোর বন্ধুর বিয়ে হয়েছে রে?"

অতুল বলিল, "না, কিন্তু হঠাৎ তাব বিয়ে নিয়ে তোব এত মাথা ব্যথা কেন?"

গিরীশ বলিল, "বিশেষ কোনো কারণ নেই, এমনি। সে কথা যাক্। তুই একদিন আমার ক'নে দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারিস্? আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে ছেলেটির শ্রদ্ধের জোগাড় করব, তাকে একই first-hand information দিতে চাই।"

অতুল বলিল, "সে আর শক্ত কি? তার ত মেয়ে দেখাবার জন্তে দেড় পা বাড়িয়ে আছে। আমবা মূরের কথা খসলেই হয়।"

এমন সময় ধাবার ডাক আসিল। বাম্বাঘরের সামনের দাওয়ায় দুখানি পুরানো শতবর্ষের আশন পাতা। সাম্নে একটি হারিকেন লঠন, ভাঙা চিম্নীর তিতর দিয়া ক্ষীণ আলো এবং প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। এভাবে খাওয়ার অভ্যাস গিবীশের অনেক দিনই চলিয়া গিয়াছিল। হোষ্টেলের প্রকাণ্ড ঘর, ইলেকট্রিক্ বাতি, ধাবার টেবল্ প্রভৃতি স্ববর্ণ করিয়া সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, মাছেব কাঁটা বাছিতে পাখিলেই হয়, এবং অন্নব্যঞ্জনসহ সন্ধ্যা গুটি দশ বাবে পোকামাকড় পেটে না যাব ত ঢেব।

কিন্তু অন্নব্যঞ্জনের সাক্ষাৎ যখন গিলিল, তখন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবার তাহাব অবসর রহিল না। কলিকাতার হোষ্টেল আর যে দিক দিয়াই, ঐষ্ট হোক, তাহাদের

রাঁধুনী ব্রাহ্মণ-তনয়টি যে অতুলেব মায়েঃ বাঁ পায়েব ক'ড়ে
আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়, একথা সে সত্যের খাতিরে
স্বীকারই করিল। আব এখানকাব পুত্রের মাছের সঙ্গে
রাজধানীর বিদেশাগত ববফবিহারী মৎস্যবৃন্দের যে তুলনা
হয় না, তাহাও না মানিয়া উপায় নাই।

পরদিন ভোর হইতে-না-হইতেই অতুল বন্ধুকে ক'নে
দেখাইবার জোগাড়ে লাগিয়া গেল। সোজাজুজি বাপের
কাছে গিয়া ত আর একথা বলা যায় না। কাজেই একটু
বাঁকা পথ ধরিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার দিদি
তখন বাপের বাড়ী বাস করিতেছিলেন, সে তাহার
দরবারে হাজির হইল। দিদি কথার ধরণে বুঝিলেন,
ভাইয়ের আবার মতি ফিরিয়াছে, এখন বিবাহটা ঘটিলেও
ঘটিয়া যাইতে পারে। একটুখানি হাসিয়া তিনি পিতার
সম্মতিটা আদায় করিয়া দিলেন।

ক'নে দেখার দিন ইত্যাদি চাই করিয়াই ঠিক
হইয়া গেল। গিরীশ ত আর একলা যাইতে পারে না,
কাজেই অতুলের এক বৃদ্ধ খুড়া তাহার সদী হইলেন।
বাড়ী হইতে বাহির হইবার আগে গিরীশ অতুলকে
জিজ্ঞাসা করিল, “দেখ, মেয়ে হয়ত খুব কুৎসিত নাও হ'তে
পারে। যদি চলনসই গোছের হয়, তুই বিয়ে করবি?”

অতুল বলিল “তা'লে না হয়—” কিন্তু তৎক্ষণাৎ
স্বর বদলাইয়া বলিল, “না, না, অসম্ভব! আব এক
জায়গান নিজের কাছে অর্ধমি সত্যবন্ধ, আমি আর
কাউকে বিয়ে করিতে পারব না।”

গিরীশ অতুলের বৃদ্ধ খুড়ার সহিত বাহির হইয়া
পড়িল। ক'নের বাড়ীব কাছাকাছি আসিয়া তাহার বুক
ধড়াশ্-ধড়াশ্ করিতে লাগিল। হয়ত বা ক'নের বাড়ীর
? মেয়ে-মহলে সেও আছে।

যথস্থানে পৌঁছিবামাত্র সে যে সাদর অভ্যর্থনা পাইল,
তাহাতে তাহার মনের ভিতরটা খুসি না হইয়া পারিল না।
বাঙালীর ছেলের ভাগ্যে রাজসমাদর এই একবার মাত্রই
আসে, কাজেই সেটা পুরোপুরি উপভোগ করিবার জন্ত
গিরীশ মনটাকে অত্যাধিক হইতে ফিরাইয়া আনিল।
মেয়ের পক্ষের বয়েকটি যুবক তাহার সহিত আলাপ
কবিত্তে অগ্রসর হইল, সেও শীঘ্রই নানা গল্পে ডুবিয়া গেল।

কিন্তু চোখ দুইটা তাহার দরজা জানলাব ফাঁকে ফাঁকে
কেবলি কাহার যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল।
কিন্তু সে কি ধরা দিল? অনেক হরিণনয়ন নলিননয়ন
যে অক্ষিসন্ধি দিয়া তাহাব উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহা—
সে বুঝিতেই পারিল, কিন্তু তাহাব দৃষ্টিও কি আছে ইহার
মধ্যে?

হঠাৎ গহনার রিনিঝিনি তাহার কানে আসিয়া
পৌঁছিল, ঘরখানি যেন শত সহস্র ফুলের সৌরভে ভরিয়া
উঠিল। গিরীশ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ক'নে ঘরের
ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের আকাশে তখন গোধূলি ছিল কি না জানা
নাই, কিন্তু আমাদের যুবকটির বৃকের ভিতর যে গোধূলির
বর্ণচ্ছটা ঝলমল করিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে
চিরজীবন এইক্ষণটিকে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভক্ষণ
বলিয়া স্মরণ করিত। তাহাব সামনে দাঁড়াইয়া কে এ?
এ কি রমা? না ললিতা? পরণে তার পদ্মবাগ মণির
রঙেব শাড়ী, গলায় ফুলেব মালা, কপালে চন্দনের অলকা-
তিলাকা। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র তাহাব মুখখানি
ফুল গোলাপের লাগিয়ায় ছাইয়া গেল।

গিরীশ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্য-
ক্রমে তাহার বৃদ্ধ সদীটিই ক'নেকে পরীক্ষা করার ভার
নেওয়াতে সে বাঁচিয়া গেল। তাহা না হইলে সে কিসের
উত্তবে যে কি বলিত তাহার ঠিকানাই নাই। মেয়েব
নাম, সে কি পড়ে, ঘরের কাজ জানে কি না, শেলাই
করিতে পারে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের সহস্র দিয়া মেয়ে
যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তখন গিরীশ যেন
আশমান হইতে মাটিতে নামিয়া আসিল।

ক'নেব বাপ বলিলেন, “মেয়েব আমার, আপনাদের
আশীর্বাদে পাত্রের অভাব নেই, অনেকগুলো সম্বন্ধই
এসেছে। একটি ছেলে তার মধ্যে বেশ উপযুক্ত। কিন্তু
কথা দিয়ে কথা ভাঙবার মানুষ আমি নই। মহেশবাবু
যদি কথা রাখেন, আমিও রাখব। অন্ততঃ তাঁর কাছে
সোজা জবাব পাবাব আগে আর কোথাও মেয়েব সম্বন্ধ
করছি না।”

“কাদের ছেলে গশার ?” অতুলের খুঁড়া এই প্রশ্নটি করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না।

ক’নের বাবা বলিলেন, “আরে এই যে আমাদের ও পাড়ার স্ত্রবোধ, বুড়ো অধর মিত্তিরের ছেলে। ছেলে পড়াশুনায় বেশ ভাল শুনেছি।”

গিরীশ মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারিল না। সে স্ত্রবোধের মতলব ঠিকই ধরিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিবামাত্র অতুল ছুটিয়া আসিয়া গিরীশকে হিড়হিড় করিয়া নিজেদের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে, অত মুখ হাঁড়ি ক’রে রয়েছিস কেন ? মেয়ে ভয়ানক কুৎসিৎ নাকি ? তা তোকে ত আর জোর ক’রে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে না কেউ। স্ত্রবোধকে আমি রাজী ক’রে দিতে পারি, সে টাকা পেলে আর কিছু চায় না।”

গিরীশ মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, “না, না, তোমায় কিছু করতে হবে না। মেয়েকে বিয়ে করতে আমি যথেষ্টই

—বাজী আছি।”

অতুল সন্দিগ্ধভাবে বলিল, “এঃ মহা ব্যস্ত যে দেখি। আচ্ছা, সত্যি কথা বলত ? মেয়ে কেমন দেখতে ?”

গিরীশ একটু বিপদে পড়িল। যদি বলে স্বন্দর, তাহা হইলে ত অতুলের মত বদলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া ললিতাকে কুৎসিৎই বা সে বলে কি করিয়া ? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, “কুৎসিৎ থাকে বলে তা নয়।”

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “তবে স্ত্রবোধ লক্ষ্মী-ছাড়া আমার কাছে মিথ্যে কথা বলল কেন ?”

গিরীশ বলিল, “তিনি স্বয়ং মেয়েটির পাণিপ্রার্থী কি না তাই।”

অতুল রাগে লাল হইয়া বলিল, “তা হ’লে, তার বাপ আবার বিয়ে করবে, মেয়ে টাকা পাবে না, এসবও তার বানান কথা ?”

গিরীশ ভয় পাইয়া গেল। অতুল যদি মেয়ে দেখিতে চায়, তাহা হইলেই হইয়াছে। সে বলিল, “না, না, ওগুলো বানান নয়, আজ ধা শুন্লাম তাতে আমারও ঐ রকমই মনে হ’ল।”

অতুল প্রাণ খুলিয়া স্ত্রবোধকে গাল দিতে আরম্ভ করিল। গিরীশ বলিল, “তুমি বাপু, যখন অগ্র জায়গায় হৃদয়দান ক’রে বসে আছ, তখন এত চটুবার কি আছে ? তোমার কি ইচ্ছে যে জগতের সব মেয়ের তুমি একমাত্র পাত্র হ’য়ে থাক ?”

অতুল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “মোটাই তা নয়, তবে পাঞ্জীটা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলল কেন ? সে বিয়ে করতে চায় একথা বোলাখুলি বললেই পারত ? আমি ত বলেইছিলাম যে আমি ও মেয়েকে বিয়ে করব না। দাঁড়াও, বাছার শুড়ে আমি বালি দিচ্ছি। বাবাকে আনালেই হবে যে, তুমি বিয়ে করতে রাজী, আর বিয়েটা শীগগিরই যাতে হয়, তাই চাও। পাঁচদিনের ভিতর বউ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব হে।”

গিরীশ বলিল, “আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই,” অতুল জিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু তোমার বাবা মাকে খবর দেবে না ?”

গিরীশ বলিল, “তা দিলে হয়। টাকা-কড়িও গল্প যখন আছে, তখন বাংলা দেশের কোন্ বুড়া-বুড়ী আপত্তি করবে ? ছেলে চায় রূপ, ছেলের বাপ চায় রূপো।”

বিয়ের দিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। গিরীশের বাবা এই বিবাহে আপত্তিজনক বিশেষ কিছু দেখেন নাই কাজেই তিনিও আসিয়াছেন। শুরুপক্ষেই দিন পড়িয়াছিল, কাজেই রাত্রিটি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। বর তখনও যাত্রা করে নাই, বাড়ীতে উৎসবের কোলাহল পূর্ণ-মাত্রায় চলিয়াছে। অতুলের মা বাবা ছেলের বন্ধুর বিবাহ দিয়াই ঘেন ছেলের বিবাহের সাধ মিটাইতে বসিয়াছেন। রত্ননচৌকী শুক বাদ যায় নাই।

গিরীশ ঘরে বসিয়া কল্পনাকে একেবারে লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার বন্ধুব দল তখনও আসিয়া জোটো নাই।

হঠাৎ অতুল ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “কি হয়েছে জানিস ?”

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, “কি রে ?” অতুল বলিল, “সে এখানে এসেছে। একটু আগে যখন তোর স্বন্দর-

বাড়ীর পশ দিয়ে আসছিলাম দেখলাম এক পাল মেয়ের মধ্যে সেও ঘুবেছে। ওদের কোনো আত্মীয় হবে বোধ হয়।”

গিরীশ তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া বলিল, “বেশ বেশ, আমার জন্তে যে রত্নচৌকীর আমদানী হয়েছে, সেটাকে আর বিদায় করতে হবে না, একেবারে তোর বিয়ের বাজনা বাজিয়ে বিদায় হবে।”

বরযাত্রী বাহির হইবার সময় হইয়া আসিল। মহা-কোলাহলে পল্লীপথ সচকিত করিয়া গিরীশ চলিল বিবাহ করিতে। পরের কয়েকটা ঘণ্টা কোথা দিরা যে কাটিয়া গেল তাহা সে বুঝিতেই পারিলনা। তাহার মন জুড়িয়া কেবল এই কথাই জাগিতে লাগিল, ললিতা তাহার হইয়াছে, জগতে আব কেহ, কিছু তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পরিবে না।

বাসরঘরে বসিয়া ক’নের বাড়ী ব মেয়ের দল আর প্রতিবেশিনীবৃন্দের ঠাট্টা-তামাসার চোটে বব বেচাবা ঘামিয়া উঠিল। কল্পনার, নেশা তাহার ছুটিয়া গেল। বাসবঘরে বর ছাড়া অল্প পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, কাজেই গিবীশের বন্ধুর দল দরজার কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া রসিকতার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ মেয়ে-পুরুষ সকলের ভীড় চেলিয়া অতুল ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সোজা ববের কাছে গিয়া, তাহার হাত ধরিয়া একটান দিয়া সে উত্তেজিতভাবে বলিল, “বাইরে আয় একটু।”

গিরীশ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু অতুলের অবস্থা দেখিয়া সে আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, মেয়ের দলের প্রবল আপত্তিতেও কান দিল না।

বাহিরে আসিবামাত্র অতুল বলিল, “তুই শেষে আমার এই সর্বনাশ করলি? স্ববোধকে বুথাই সেদিন গাল দিলাম, তোরা সবাই সমান।”

গিরীশ অবাক হইয়া বলিল, “আমি তোর সর্বনাশ করলাম? কি বলছিস তুই?”

অতুল বলিল, “আর জ্ঞান সাজতে হবে না। তুই মেয়ে দেখে গেলি যখন, কেন বললি না যে, সে” তোর হোষ্টেলের পাশের ডাক্তারের ভাণ্ডী ললিতা?”

গিরীশ বলিল, “হঠাৎ সে যবরে তোমার দরকার হবে তা আমি কি ক’রে জানব?”

অতুল মুখ লাল করিয়া বলিল, “না, তা আর জানবে কি ক’রে? মিথ্যে কথায় তুমিও স্ববোধের চেয়ে কম যাও না। মেয়ের নাম রমা বললে কেন আমার কাছে? পাছে আসল নাম বললে আমার মুখের গ্রাস কাড়বার সুবিধা না হয়?”

গিরীশ চটিয়া বলিল, “গুধু গুধু idiot এর মত গালাগালি করিসনে। ওর নাম যদি কলকাতায় এক, আর এখানে আর এক হয়, সেটা কি আমার দোষ? তাছাড়া তুই আমাকে বলেছিলি নাকি যে ললিতাকে বিয়ে করতে চাস?”

অতুল বলিল, “হ্যাঁ, এখন ঢের বাজে ওজর বেরবে। আমি যেমন তোমার মত বন্ধুকে ডেকেছিলাম সাহায্য করতে, তেমন তার ফল পেলাম।”

গিরীশ হাসিয়া বলিল, “আরে চটিস কেন? তুই-ই না মেয়েটিকে আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিলি? ঘাড় পেতে নিলাম ব’লে এখন গাল দিচ্ছিস কেন?”

অতুল জুড় জলন্ত দৃষ্টিতে গিরীশের দিকে চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। বর বাসরঘরে ফিরিল।



সাহিত্য-ধর্ম

অরসিকেশু বসন্ত নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ ।

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র এই তিন জনে বাহির হন রাজকন্ডার সন্ধানে। বসন্ত: রাজকন্ডা বলে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্টিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেব কবে। কর্তৃত্ব কর্তে কন্ডার নাড়ীনক্স ধরা পড়ে; তার রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণের ভিতর থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকার তিনি পৃথিবীর সকল কন্ডারই সমান দরের মানুষ—খুঁটেফুড়োনার সঙ্গে তাঁর প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রম-জিজ্ঞাসা।

আর একটিকে রাজকন্ডা কান্নের মানুষ। তিনি রাগের বাউন, হুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনে। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রম; আছে অর্থের হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হননি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চক্রিণ বছর বরদ এবং তেপান্তরের মার্চ। দুর্গম পথ পাব হয়েছেন জ্ঞানের জন্তে না, ধনের জন্তে না, রাজকন্ডারই জন্তে। এই রাজকন্ডার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাট-বাজারে নয়, স্তরের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতার ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ধারণ করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারি প্রকাশ সাহিত্যিকলায়, রসকলায়। এই কলাগণ্ডে যার প্রকাশ, কোনো সমজ্ঞতার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, “তুমি কেন?” সে বলে, “তুমি যে তুমিই, এই আমার বোধে।” রাজপুত্রও রাজকন্ডার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্তে সাম্রাজ্যকে ভাঙমূল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমার বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ধারণ চলে; কিন্তু বা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁতে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষৎ ব্রহ্মসংজ্ঞা বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে ধরন পাই আনন্দবোধে, তখন আব ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আস্তার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রমে, যে-হ্যানে, যে-ধর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পার সাহিত্যে রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা ষণ্ড আকাশ আমার আশিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ বরা পড়ে গেছে। কাঠা-বিষের দরে তার বেচা-কেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে প্রহতারা বোলা যে-অবশ্য আকাশে—তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-জগতের পক্ষে এ আকাশটা যে নিত্যস্বই বাহ্যিক মাটির নীচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানব-কীটও আছে—আকাশের কুণপতার তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদেব বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মতো। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কুর্স্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন :—

কিন্তু রূপকথায় রাজকন্ডার মন তারা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপ-বিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে-অনির্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল এ রাজকন্ডার। রাজকন্ডার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অতর্কিত ব্যবহার অস্বস্তিকর। ভালোবাসায় রাজকন্ডার জৎপদন কোন্ ছনের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্তে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্ডা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মছন করে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চোঁকো টিনের মধ্যে বদ্ধ করে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিয়া মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু রাজপুত্র এ রাজকন্ডার জন্তে টিনের বাস্তবিক গড়াবাব আভাস স্বপ্নে দেখলেও চিত্তের দম আটকে যেয়ে উঠবেন। যুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অস্বস্ত: চাঁপাকুড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যায় সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলঙ্কার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হ'ল সাহিত্যোব।

অলঙ্কার জিনিষটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা,—কীর সেই একান্ত বোধটিকে সাহিত্যে সজ্ঞাতেই শিশু-দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভূতাকে দেখি অয়োহনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাবায় অলঙ্কার, কঠোর হুঁর অলঙ্কার, হাসিতে অলঙ্কার, ব্যবহারে অলঙ্কার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলঙ্কৃত বাণীতে। সেই বাণীর সঙ্কেতস্বাক্ষরে বাজতে থাকে, “অলম্”—অর্থাৎ “বাস, আর কাল নেই।” এই অলঙ্কৃত বাক্যই হ'লে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হ'ল এক, আর সার্থক সত্য হ'ল আর। সাধারণ সত্য একেবারে বাহ্য-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাহ্য-ই-করা। মানুষমাজেই সাধারণ সত্যের কোঠার, কিন্তু যথার্থ মানুষ “সাধে না বিলল এক।” করণার আবেগে বাস্তবিক যুগে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে শব্দ কবুবাৎ জন্তে নারদকথির কাছ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা ছন্দ মলঙ্কার। যথার্থ সত্য-যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমাদের মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিন্তে, রূপকারের চিন্তে এই যথার্থবোধের সীমানা বৃহৎ বলে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক করে দেখাতে পারেন। যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণক দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুকরো কঁাকর আমার কাছে তিরুই নয়, একটি গদ্য আমার কাছে অশ্লিষিত। অথচ কঁাকর পদে গদ্য ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্রবণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে জোলাব জন্তে বৈমুখ্য ভাকতে হয়, ভাকতে পড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। গদ্য কহুই দিয়ে বা কটাক দিয়ে ঠেলাঠেলির উপায় একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এপিয়ে গিয়ে আঁকর করে।

যে-মন বর্ণীভবক বর্ণ ক'বে নের তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্জনেফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ষড়তুরাজের রাজ্যভিষেকের মস্তপাঠে ক'বরা সজ্জনে-ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাণ্ড, এই ষড়তুরাজ কবির কাছেও সজ্জনে আপন ফুলের বাধার্থী হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়া ফুল এইসব রইল কাব্যের বাহিব-দরজায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদেব জাত মেরেচে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলসে সজ্জনে-মঞ্জরী পরতে দ্বিধা করেন, বকফুলের মাগার তার বেগী লড়ালে ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু সে-কথাটা মনেও আমস পায় না। কুম্ভ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলঙ্কার মহলে তাদের ঘর খোলা—কেননা পেটের সুখ তাদের গায়ে হাত দয়নি। বিষ যদি ঝোঁলে-ডালনাং লাগত তাহ'লে স্থলরীর অধঃস্রব সন্দেহ তার উপনা অগ্রাহ হ'ত। তিনিফুল শর্ধেফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর্ন, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি ব'লেই কবি-কল্পনা তাদের নব্র নমস্কারের প্রতিপান দিতে চায় না। শিরীষফুলের সঙ্গে গোলাপজামফুলের রূপে-গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌতুক গেল, কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজন-লোভের দ্বারা লঙ্ঘিত। যে-কবিব সাহস আছে অম্মের সমাজে তিনি জাত-বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে জামজম্বুবনান্তও আবাচের অত্যাধনাতার নিল। কাব্যে দোভাগ্যক্রমে কোনো শুদ্ধকণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মনের তুণে আঘের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি অমৃত অনটন ঘটনা ব'লেই আমের প্রতি দেবতাদের আহ্বারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে কইমাছের সম্ভরণলীলা আকাশে গাধী গুড়ার চেয়ে কম স্থলর নর, কিন্তু কইমাছের নাম কব্য়ামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ'সিত হ'য়ে ওঠে এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বৈধে ওক কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'ল। সকল ব্যবহারের অতীত ব'লেই সকর বৈধে গেছে—ওক বাহনতন্ত্র ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হ'ল না, নির্বাচনের সময় কই কাংলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানভাব বা পাণ্ডিত্যে জোর কম ব'লেই এমনটা ঘটছে তা'তো মান্তে পারিলে। কেননা লগ্নী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন ব'লে বেছে নিলেন তার দৌর্ভাগ্য বা অশ্রুপ্ততার কথা চিন্তাও করেননি।

এইখানে চিত্রকলার স্ববিধা আছে। কচুগাছ আঁকতে কপকাবের তুলিতে সফল নেই। কিন্তু বনশোভাপঞ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম কুরা মুশ্লিল। আমি নিজে জাত মানা কবির দলে নই, তবু বর্ণীবনের তথা পাড়তে গেলে “বেগুন” ব'লে সামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে “কুচ্চি” ফুলের নাম বরবার বেলা কিছু ইতস্ততঃ করেচি, কিন্তু কুচ্চিফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ-কথাটা বলা দরকার, যুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে সূচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তাকে ষড়ার্থ ক'রে দেখিলে। প্রয়োজনব ছায়াতে সে রাহস্য হয়। রান্নাঘরে ভাড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ এ ছোটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হ'লেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে কার্পেট পোত তার উপরে নিজের মাধ্যমত সর্বকালের ছাপ মেখে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে, তার দ্বারাই সে সকলের কাছ পরিচিত হ'তে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে-যে

খায় বা খাচ্চুকরণ করে এটাতে তার ব্যক্তিগতপেব সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতাব গোঁবর আছে এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলঙ্কৃত।

জীবধর্ম্যে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আশ্রয়ক্ষা ও বংশরক্ষাব প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও হৃৎযতই প্রবল হোক, ব্যাপক হোক, সাহিত্যে ও অল্প কলার ব্যক্তির ভাবে ছাড়া প্রকার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয়নি। মানুষের আহ্বারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক-সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোভের অম্বাবাতিতে স্থান দেবনি।

জী পুকুরের মিলন আহার-ব্যাপারের উপরের কোঠায়, কেননা ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্ম্যের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গোঁব, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় সৈন্তের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষাব মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীর-বিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। জী-পুকুরের মনো মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে স্বেলে, তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই বেধতে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলার পে এতটা জায়গা জুড়ে বসেচে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা “প্রজনবার্ণ” নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম্য ও মানুষের চিন্তধর্ম্য উভয়ের সীমানা-বিশ্তাপ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আশ্রয়ের দাবী ক'রে পশু হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রদর হ'য়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারী মামলা চলছেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেচি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আশ্রবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত-পশুধর্ম্য মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হ'ল বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে-সাহিত্য ও কলা, সেখানে এ-বিজ্ঞান স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার হুবাবোগ্য ম্যাগেরিরা হওয়া উচিত ছিল, এ-কথাও বিজ্ঞানের, সংসারে এ কবার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অমুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে-ভর্তু উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হ'বে না, তার সমাধান কলাবসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌনমিলনের মধ্যে যে দ্রুতি মহল আছে মানুষ তাব কোনটিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় সেইটিই হ'ল বিচার্য।

মাকে মাঝে এক-একটা ফুলে বাহুকারণে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যনা প্রবল হ'য়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিলুপ্ত ক'রে দেয়। যুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চক্ৰলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হ'তেই পারে না—দেখতে দেখতে তা বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউবিতান যুগের পরে যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্য-স্বর্ধ্য তারি কলঙ্কলেণাব আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরলব্ধ নিত্যকালের নয়। যখনই পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতিমুহূর্তে স্বর্ঘ্যের ক্ষোভিতব্যকপ তার প্রতিবাদ করে, স্বর্ঘ্যের সন্তর তার অবস্থিতিসম্বন্ধে তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে যুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অধিভূত কবেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তাব সিংহাসন ধর্ম্মের রাজস্বরীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হ'য়ে উঠে কোথাও আপনাব সীমা মানতে চাষ না। তার প্রভাব মানব-মনেব সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতাব ওৎখা প'বে কোথাও সে অনধিকার-প্রবেশ কবতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি স্বভাববিক্রিত—তার ধর্ম্মই হচ্ছে সত্য সত্যকে অক্ষুণ্ণপাত কোঁতুহল। এই কোঁতুহলেব বেডাঙ্গাল এখনকার সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধব্বে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তাব পক্ষপাত ধর্ম্ম;—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বাব। বিজ্ঞানের নির্বিকার কোঁতুহল সাহিত্যের সেই বরণ-ক'রে-নেবার স্বভাবকে শরাস্ত্র কবতে উদ্যত। আজকালকাব যুরোপীয় সাহিত্যে বৌনমিলনের বৈহিকতা নিয়ে খুব-যে একটা উপজব চলতে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কোঁতুহল, বেস্টোরেসশন যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগেব লালসাব উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজস্বটাকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকাব দিনেব বৈজ্ঞানিক কোঁতুহলের উৎস্রক্যও সাহিত্যে চিবকাল টিকতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা ধন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যামঙ্গলবের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যের মধ্যেও সে স্বাক্ষ ছিল। তখনকাব দিনেব নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিষটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যাবা এই দেশার বৃন্দ হ'বে ছিল তাবা মনে কবতে পাবত না যে, সেদিনকাব সাহিত্যেব বসাকার্টের এই ঘোরাটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিষ নয়, তার আশুনের শিবাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যেব গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রং নয়, কালশ্রোতের ধাবায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বরগুপ্ত পাঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজবাজের এই হঠাৎ-সহব কল্‌কাতার বাবুমহলে কি রকম তার প্রশংসাক্ষনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পাক্টিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না;—পেটুকতার নীতিবিকল অনংবম বিচার ক'বে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আক্ৰতা এনেছে সেটাকেও এখনকার কেউকেউ মনে কব'নে নিত্য পার্থক্য; ভুলে যান, যা নিত্য তা অত্যন্তক সম্পূর্ণ প্রতিবার করে না। মানুষের বসবোধে যে-আক্ৰ আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রনের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাতি তাল ঠুকে বলতে, ঐ আক্ৰটাই দৌরলসা, নির্বিকার অলঙ্কৃতাই আর্টেব পৌকব।

এই ল্যাডট-পর গুলি-পাকানো ধূলোমাথা আধুনিকতাই একটা স্বদেশী দুষ্টান্ত বেগেছি হোলিথেলার দিনে চিংপুর বোড়ে। সেই খেলার আশির নেই, গুলাল নেই,—পিচকাবি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিলে কাগডের টুকুবা দিয়ে বাস্তার ধূলোকে পাঁচ ক'রে তুলে তাই চাংকাব শব্দে পদম্পরের গারে ডড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য কবেচে। পদস্পরকে মলিন করাই তাব লক্ষ্য, রঙীন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অব্যবহিত মালিন্তের উদ্বাস্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য-কারণ বহুদিক্তে বিনার্ধ্য। কিন্তু মানুষের বসবোধই বে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতার সকল

মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে তেই বর্কবর্তার মনস্তত্ত্বে এক ক্ষেত্রে অনন্তত ব'লেই আগতি কব'ব, অন্তত ব'লে নয়।

সাহিত্যে রনের হোলিথেলার কাঁদা-মাথামাঝির পক্ষ-সমর্থন উপায়ে অনেক গ্রন্থ করেন, সত্যেব মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ গ্রন্থটাই কঠোর। উৎসবের দিনে ভোজনপুত্রী দল বখন মাংলামির ভূতে-পওয়া মাদল-করতালেব খচোখচো-খচকার যোগে একধেয়ে প'বে পুনঃপুনঃ আবর্জিত গর্জনে পীড়িত হবলোককে অক্রমণ কবতে থাকে তখন আর্জি ব্যক্তিকে এ গ্রন্থ বিজ্ঞানী করাই অনাবশ্যক বে এটা সত্য কিনা, স্বার্থ গ্রন্থ হচ্ছে, এটা সঙ্গীত কিনা। মস্ততার আত্মবিশ্মৃতিতে এক কন উল্লাস হয়, কঠোর অক্সান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোড় আছে। মাধুর্য্যহীন সেই কচতাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালায়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে গো-কথা স্বাক্যাব কবি। কিন্তু ততঃ কিম্। এ পৌরুষ চিংপুর রাস্তার, অনবপুত্রী সাহিত্য-কলার নয়।

উপনংহাবে এ-কথাও বলা দরকার বে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অশ্রুতিহত প্রভাবে অলঙ্ক কোঁতুহলবৃত্তি চুঃশাসন-মুর্খি ধ'বে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবী কব'বে, বে দেশের সাহিত্য স্বভূতঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দোবায়োব কৈফিয়ৎ দিতে প'বে। কিন্তু যে-দেশে অত্বে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোপ'লেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল ঐচ্ছজ্ঞতাকে কাব দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারতমাগবের ওপাবে যদি প্রশ্ন করা বাব, "তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?" উত্তর পাই, "হট্টগোল সাহিত্যেব কল্যাণে নয়, হাটেবই কল্যাণে। হাটে নে ঘিরেচে।" ভারতমাগবের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিদীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যেব ঐটেই বাহাদুরী।"

(বিচিত্রা, শ্রাবণ—১০৩৪)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদ-কথা

৩। ঋগ্বেদ-সংহিতা

ঋক্ মন্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালে ঋক্-সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল। সকল ঋক্ মন্ত্রের জানিবার সম্ভাবনা থাকিল না, অনেক ঋক্ লুপ্ত হইতে চলিল, এমন সময় তৎকাল-প্রচলিত ঋক্গুলি নক্ষলন করিয়া ও শ্রেণী-বিভাগ নািয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম ঋগ্বেদ-সংহিতা।

গ্রন্থ বলিলে নির্দিষ্ট গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না। গ্রন্থ লিখিয়া রাখিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল না, আবিস্কৃত হইয়াছিল কিনা তাহা নইয়া তর্ক চলিতে পাবে। সঙ্কলিত হইলে পব এই সংহিতাও অগাধকোরা ও অধ্যয়নকর্ত্তব্য মুখেই রাখিতেন। কালভেদে ও স্থানভেদে এই সংগ্রহের মধ্যে পাঠাদি ভেদ জন্মিয়া শাখাভেদ উৎপন্ন হয়। এককালে হয়ত এই-রূপ একশতখানি শাখা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শাখাসমূহের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? বাঙ্গলার রামায়ণের সহিত যেমন বোম্বাই সংস্করণ রামায়ণের প্রভেদ, কতকটা সেইরূপ।

চরণবাহুর সময় পাঁচখানি মাত্র শাখা অবশিষ্ট ছিল। এখন কেবল একখানি মাত্র আছে, তাহাই শাকল শাখা। অথলান শ্রোতৃহস্তে সম্ভবতঃ উহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, সায়নচাৰ্য্য উহাবই

ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সায়নভাষ্যসম্মত এই শাকল শাখা মুদ্রিত করিয়া অচার্য্য বোক্ষমুল্লর যশস্বী হইয়াছেন। অস্ত্রান্ত শাখার নাম মাত্র বা স্থিতি মাত্র, অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সেইসকল শাখা যে বর্তমান শাকল শাখা হইতে অধিক ভিন্ন ছিল, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। হয়ত কতিপয় মন্ত্র অস্ত্র শাখাতে ছিল, তাহা শাকল শাখায় নাই, অথবা তাহাতে ছিল না, শাকল শাখায় আছে। হয়ত অস্ত্র শাখার মন্ত্র-গুলি ও হস্তগুলি বেঙ্গল পর পব সজ্জিত ছিল, শাকল শাখার ঠিক সেরূপ হয় নাই। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেই কতিপয় মন্ত্রের প্রয়োগ আছে, শাকল শাখায় তাহা পাওয়া যায় না। ব্রহ্মিতে হইবে সেই মন্ত্রগুলি অস্ত্র কোন শাখায় বর্তমান ছিল।

প্রচলিত ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রগুলি কিরূপে সাজান হইয়াছে? কতকগুলি মন্ত্র একত্র করিয়া একটি হুক্ত। কতকগুলি হুক্ত একত্র করিয়া একটি মণ্ডল। এইরূপ দশটি মণ্ডলে শাকল শাখার ঋগ্বেদ-সংহিতা সমাপ্ত হইয়াছে। অস্ত্ররূপ বিভাগও আছে। সমুদয় সংহিতা যেমন দশ মণ্ডলে বিভক্ত, সেইরূপ আটটি অষ্টকে বিভক্ত। কোন এক হুক্তের মন্ত্র-গুলি একজন ঋষি বৃষ্ট, কোন এক ছন্দে প্রথিত ও কোন এক দেবতার উদ্দিষ্ট। কোন দেবতার উদ্দিষ্ট, তাহা সেই মন্ত্রের তাৎপৰ্য্য ও অর্থ বিচার করিলেই প্রায় বৃত্তিতে পায়া যায়। যথা প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত প্রথম হুক্তে নয়টি ঋক্ আছে। ঐ ঋক্গুলি সমস্তই গায়ত্রী ছন্দে প্রথিত, উহাদের ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, উহাদের উদ্দিষ্ট দেবতা অগ্নি। “অগ্নি-মীড়ে পুরোহিতম্” ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রেই বুঝা যায়, উহা অগ্নি দেবতার উদ্দিষ্ট।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু এই নিয়মের বহুস্থলে ব্যতিক্রম আছে। একই হুক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি একাধিক ঋষির দৃষ্ট, একাধিক দেবতার উদ্দিষ্ট, একাধিক ছন্দে প্রথিত এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। যথা—তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ২৮ হুক্তের চতুর্থ মন্ত্রেই ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা অগ্নি; কিন্তু ১, ২, ৬ এই তিন মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী, ৩ মন্ত্রে ছন্দ উক্কি, ৪ মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ৫ মন্ত্রের ছন্দ জগতী। ঐ মণ্ডলের ৬২ হুক্তের ১, ২, ৩ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রাবরণ, ৪, ৫, ৬ মন্ত্রের দেবতা বৃহস্পতি, ৭, ৮, ৯ মন্ত্রের দেবতা পুষা, ১০, ১১, ১২ মন্ত্রের দেবতা সবিতা, ১৩, ১৪, ১৫ মন্ত্রের দেবতা সোম, ১৬, ১৭, ১৮ মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরণ।

প্রথম মণ্ডলের অনেকগুলি ঋষির প্রথিত মন্ত্র বা হুক্ত স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন ঋষি শতাধিক মন্ত্রের জষ্ঠী। উহাদের নাম শতকর্কী। ২ হইতে ৬ পর্যন্ত মণ্ডলের প্রত্যেক মণ্ডল কোন একজন ঋষি বা তাঁহার বংশীয় ঋষির দৃষ্ট। যথা—তৃতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ হুক্ত বিশ্বামিত্র দৃষ্ট; অবশিষ্ট তাঁহার পিতা গাবী বা তাঁহার পুত্র “কত” ইত্যাদি ঋষির দৃষ্ট।

প্রথম মণ্ডলের হুক্তগুলির ঋষির মধ্যে বাঁহারা শতাধিক মন্ত্র দেখিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের নাম শতকর্কী। শতকর্কী ঋষি ষোলজন :—মধুচ্ছন্দা, মেধাভিষি, শুন্যপেপ, হিরণ্যপূপ, কণ, প্রমথ, নবা, নোধ্যা, পরাশর, গৌতম, কুণ্ড, কস্তপ, কক্ষীবানু, পরুক্ষেপ, দীর্ভতমা, ও অগস্ত্য। ভিন্ন ভিন্ন জৈতাদি ঋষি-বংশও প্রথম মণ্ডলে আছে, তাঁহারা শতকর্কী নহেন।

দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত ছয় মণ্ডলের নাম মধ্যম মণ্ডল, ঐ ঋষিদের নাম মধ্যম ঋষি।

দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের ঋষি শৌনক গৃৎসমদ।

তৃতীয় মণ্ডলের “ ” “ ” গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র।

চতুর্থ মণ্ডলের “ ” “ ” গৌতম বাসদেব।

পঞ্চম মণ্ডলের “ ” “ ” ভৌম অজি।

ষষ্ঠীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের ঋষি শৌনক গৃৎসমদ।

ষষ্ঠ মণ্ডলের “ ” “ ” বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ।

সপ্তম মণ্ডলের “ ” “ ” মিত্রাবরণপুত্র বশিষ্ঠ।

অষ্টম মণ্ডলের “ ” “ ” কণ্বংশীয় ঋষিগণ।

নবম মণ্ডলের ঋষি অনেক, কিন্তু সকল হুক্তেই দেবতা সোম পবমান, অর্থাৎ ঐ দেবতার উদ্দিষ্ট ঋক্গুলি এই মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের বহু ঋষি ও বহু দেবতা।

কালক্রমে বেদের শাখাভেদ ঘটায় বিস্তৃতি রক্ষার প্রয়োজন লক্ষিত হইয়াছিল। এই বিস্তৃতি রক্ষার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ বেদের অনুক্রমণী রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে হুশাসিদ্ধ শৌনক ঋষির প্রণীত অনুক্রমণী অনেকগুলি এখনও প্রচলিত আছে। এইসকল অনুক্রমণীতে ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, দেবতা, ঋষি প্রভৃতিব উল্লেখ রহিয়াছে। ছন্দোহুমুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, অর্থাৎ-ক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, অনুবাক্যক্রমণীতে দশটি মণ্ডলের অন্তর্গত ৮৫ অনুবাকের প্রত্যেকের প্রতীক (প্রথম চরণ বা চরণাংশ) ও প্রত্যেক অনুবাকের হুক্ত-সংখ্যা বোঝান হইয়াছে। বৃহদেদেবতা প্রভৃতি প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে নানা উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। শৌনক শাকল শাখা ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্র-সংখ্যা, হুক্ত-সংখ্যা, পদ-সংখ্যা ও অক্ষর-সংখ্যা পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। এই-গণনা তাঁহার নিজ ভাষায় উক্ত ভিষোণ্য।

অধ্যায়ানং চতুঃষষ্টি মণ্ডলানং দশৈব ভু।

বর্ণানং ভু সহস্রে যে সংখ্যাতে চ বদুস্তরে।

ঋচং দশসহস্রানি ঋচং পঞ্চশতানি চ।

ঋচামনীতিঃ পাদক পারণঃ সহস্র খীতিতম্॥

শাকলা দৃষ্টে পদলক্ষনেকং

সার্কিক বেদে ত্রিহদস্রয়তম্।

শতানি চাষ্টো দশকষকং

পদানি ষট্ চৈতি চ চর্জিতানি॥

* * *

চত্বারি বা শতসহস্রানি দ্বাত্রিংশচাক্ষর সহস্রানি।

অর্থাৎ

শাকলা দৃষ্টে ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যে ১০ মণ্ডল, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্ণ, ১০১৭ হুক্ত আছে। ১০৫৮ ঋক্ মন্ত্র এবং ১৫০০০ (সার্কি লক্ষ) + ৩০০০ + ৮০০ + ২০ (দশকষক) + ৬ = ১০৮২৬ পদ এবং চারিশত সহস্র বা চারিলক্ষ এবং দ্বাত্রিংশৎ সংশ্র বা বত্রিশ হাজার (৪৩১০০০) অক্ষর আছে।

মুদ্রিত শাকল শাখার সহিত মিলাইলে দেখা যায়, শৌনক যে ঋগ্বেদ সংহিতার আলোচনা করিয়াছেন, ঠিক সেই সংহিতাই অপরিবর্তিতভাবে আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। কাত্যায়ন-প্রণীত সর্বাংগুক্রমণী প্রাচ্য ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রত্যেক হুক্তের প্রতীক সহিত, উহার ঋষি, দেবতা ও ছন্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৪। যজুর্বেদ-সংহিতা

ঋগ্বেদ-সংহিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। তৎপরে যজুর্বেদ-সংহিতা। মনে হইতে পারে ঋগ্বেদ-সংহিতা যেমন ঋক্ মন্ত্রগুলির সংগ্রহ, যজুর্বেদ-সংহিতা সেইরূপ যজু মন্ত্রের সংগ্রহ। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। ইহা আংশিক ভাবে সত্য। যজুর্বেদ-সংহিতা অক্ষর্যু ও তাঁহার

সহকারীদের যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল; এইজন্য ইহা আকর্য্যব বেন। অধর্য্যুগণ মুখ্যতঃ যজ্ঞমন্ত্র প্রবোধ করিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে স্বক্-মন্ত্রও ব্যবহার করিতে হইত। কাজেই তাহাদের জন্য সঙ্কলিত গ্রন্থ স্বক্-মন্ত্র ও যজ্ঞমন্ত্র উভয়ই স্থান পাইয়াছে। যজ্ঞসংহিতার সংগৃহীত স্বক্-মন্ত্র সংখ্যা অল্প নহে, প্রায় ৭০০। তাহাব মধ্যে অনেক স্বক্-মন্ত্র সংহিতাতেও বর্তমান, অবশিষ্ট নূতন স্বক্। কাজেই স্বক্-সংহিতা যেমন স্বক্-মন্ত্রবই সংগ্রহ, যজ্ঞসংহিতা সেইরূপ কেবল যজ্ঞসংগ্রহ মাত্র নহে যজ্ঞমন্ত্র ত আছেই, অনেক স্বক্ও আছে।

যজ্ঞসংহিতা আবার বিবিধ। কৃষ্ণ যজ্ঞসংহিতা ও শুক্ল যজ্ঞসংহিতা। কৃষ্ণ যজ্ঞসংহিতাব প্রলয়্য ব্যবহার্য্য মন্ত্রে (যজ্ঞ ও স্বক্ বিবিধ মন্ত্র) সংগৃহীত আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার মন্ত্রেব নিবোধ প্রদর্শক ও ব্যাপ্যাক্ষত্রাক্ষণও আছে। কাজেই যজ্ঞমন্ত্র ও স্বক্-মন্ত্র ও তাহাদের অনুযায়ী ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া কৃষ্ণ যজ্ঞসংহিতা। এইরূপ গওপোল আছে বনিতাই বোধ-করি বিশেষণ হইয়াছে কৃষ্ণ। শুক্ল যজ্ঞসংহিতাতে কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই। কেবল মন্ত্রগুলি (যজ্ঞ ও স্বক্) সংগ্রহ করিয়া শুক্ল যজ্ঞসংহিতা রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাংশ সংহিতা হইতে সরাইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে; ঐ গ্রন্থও শুক্ল যজ্ঞসংহিতার অনুযায়ী ব্রাহ্মণ। উহার নাম শতশখ ব্রাহ্মণ।

স্বক্-সংহিতা ও যজ্ঞসংহিতার সঙ্কলন-প্রণালীতেও প্রভেদ আছে। কৃষ্ণ যজ্ঞসংহিতাব কথা ছাড়াইয়া দিয়া শুক্লযজ্ঞসংহিতার সহিত স্বক্-মন্ত্র সংহিতাব তুলনা করা যাইতে পারে। স্বক্-সংহিতার সঙ্কলনে মন্ত্রের স্বক্ ও দেবতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। একটু যত্নের অন্তর্গত হোন মন্ত্র কোন যজ্ঞে কোন মন্ত্র বা ত্রিভি যজ্ঞে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃতীয় মণ্ডলের সমুদয় স্বক্-ই বিখ্যামিত বা তৎসংগীত স্বক্-বিশিষ্ট। নবম মণ্ডলেব সমুদয় স্বক্-পবমান দোম দেবতার উদ্দিষ্ট। এখানে সঙ্কলন-প্রণালী এইরূপ। যজ্ঞসংহিতার স্বক্ বা দেবতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। যখন শুক্ল যজ্ঞসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সংগৃহীত সমুদয় মন্ত্রই (যে দেবতার উদ্দিষ্ট হউক না) দর্শ পূর্ণমান যোগে ব্যবহার্য্য, কোন অধ্যায়ের সমুদয় মন্ত্র অগ্নিষ্টোমে ব্যবহার্য্য ইত্যাদি।

শুক্লযজ্ঞসংহিতা অপেক্ষা কৃষ্ণযজ্ঞসংহিতা প্রাচীন, ইহা পূর্বাণ-সম্মত। কৃষ্ণযজ্ঞসংহিতার ব্রাহ্মণাংশ সরাইয়া ফেলিয়া শুক্লযজ্ঞসংহিতা প্রণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুর্বাণাদিতে একটি উপাখ্যান আছে। মহামেন্তে স্বক্-সমাজে উপস্থিত হন নাই বলিয়া স্বক্-বৈশম্পায়ন পাতকগ্রস্ত হন। পাপক্ষালনার্থ তিনি শিষ্যদিগকে ব্রত অনুষ্ঠানে আদেশ দেন। শিষ্যদেব মধ্যে ব্রহ্মরাতপুত্র বাজবল্ক্য দর্পেব সহিত অস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, আমি একাকী ব্রত সাধন করিব। বৈশম্পায়ন জোখে বলিলেন, তুমি বিদ্বান্দের নিম্নাকারী, তুমি অদীত বিদ্যা কিরিয়া দাও। বাজবল্ক্যও অদীত বিদ্যা বমন করিয়া ফেলিলেন ও অধ্যাপককে ফিরাই দিলেন আবার শিষ্যগণ তিরিকপ ধরিয়া তাহা তুলিয়া লইল। তদবধি ঐ বিদ্বান্দের নাম হইল তৈত্তিরীর বেন। এ দিকে বাজবল্ক্য ক্ষতি দ্বারা স্তম্ভিত প্রসন্ন কবিলেন। স্তম্ভিত বাজী অর্থাৎ অশ সাক্ষিয়া দেখা দিলেন। তাহার বরে তিনি নূতন যজুর্বিদ্যা লাভ করিলেন। তাহাব শিষ্যেরা সেই নূতন যজুর্বিদ্যা লাভ করিলেন। ও অশ্বকপারী স্তম্ভের নামানুসারে বাজী নামে খ্যাত হইলেন। বৈশম্পায়নের শিষ্যেরা বাঁহারা পুরাতন বিদ্যা পাইলেন তাহারা ঐ “আচরণ” হেতু নাম পাইলেন চরকাক্ষর্য্য।

ঐ চরকাক্ষর্য্যদেব বেন কৃষ্ণ যজুর্বেদ। আর বাজীদিগেব বেন শুক্ল-যজুর্বেদ। উভয় বেদই কালে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণ-

যজ্ঞসংহিতার প্রধান শাখা তৈত্তিরীর সংহিতা; উহাই এখন প্রচলিত। তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণ বলিয়া বে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ উহা প্রকৃতপক্ষে তৈত্তিরীর সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড; কেননা তৈত্তিরীর সংহিতা (কৃষ্ণ যজ্ঞসংহিতা) মধ্যে যেমন কতকগুলি যজ্ঞের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আছে তথাকথিত তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণেও সেইরূপ অল্প কতকগুলি যজ্ঞের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই আছে। তৈত্তিরীর সংহিতা বিশুদ্ধ মন্ত্রগ্রন্থ এবং তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ নহে। অল্প শাখার মধ্যে মৈত্রায়নীর সংহিতা ও কাঠক সংহিতা এখনও বর্তমান; তাহাব সহিত তৈত্তিরীর সংহিতার অধিক প্রভেদ নাই।

শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মন্ত্রভাগ শুক্লযজ্ঞসংহিতা নামান্তর বাজাসনেষি সংহিতা—যাজ্ঞবল্ক্যের অপর নাম বাজসন্যের। ব্রাহ্মণ ভাগ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহার বহুশাখার মধ্যে দুই শাখা এখন বিদ্যমান আছে—মাদ্যান্দি ও কাণ্—উভয়ের মধ্যে পাঠভেদ বৎসান্ন।

৫। সামবেদ-সংহিতা

যজুর্বেদসংহিতার পর সামবেদ-সংহিতা। বে-সকল স্বক্-মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে-মুখ্যতঃ সোম যাজ্ঞের অনুষ্ঠানে—গান করা হইত, সেইগুলিই এই সংহিতাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই স্বক্-মন্ত্রের অধিকাংশ আবার প্রচলিত স্বক্-সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। তবিশাশ ৮ ও ৯ মণ্ডল মধ্যে পাওয়া যায়। কেবল ৭৫টি স্বক্-নূতন স্বক্। কাজেই ইহাকে একখানা নূতন গ্রন্থ বলাই চলে না। ইহা স্বক্-সংহিতাই কিরদংশ বাছাই করিয়া বিশেষ কার্যের জন্য সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

স্বক্-মন্ত্র কিরূপে অক্ষর যোগাদি দ্বারা সামে পরিণত করিতে হয়, তাহার জন্য স্বতন্ত্র গান গ্রন্থ আছে। একই স্বক্-একাধিক সামে গান চলিতে পারে; কাজেই এই হিনাবে সাম মন্ত্রেব সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ান যাইতে পারে।

৬। অথর্ববেদ-সংহিতা

তারপর অথর্ববেদ-সংহিতা। এখানি কিরূপ গ্রন্থ? ইহা মন্ত্রেব সংগ্রহ। অধিকাংশ মন্ত্রই স্বক্, অল্পাংশ (প্রায় ষষ্ঠাংশ) যজ্ঞ। যে সকল স্বক্-মন্ত্র শাস্তি, পুষ্টি অভিচারাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইত; শ্রোতব্যগে ব্যবহৃত হইত না সেই মন্ত্রই মুখ্যতঃ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্বক্-ই স্বক্-সংহিতাব নাই। প্রায় ১২০০ স্বক্-সংহিতার ১, ৮ ও ১০ মণ্ডল মধ্যে পাওয়া যায়; অস্ত্রান্ত্র মণ্ডলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। অথর্ববেদ-সংহিতার শৌনক শাখাব গ্রন্থ প্রচলিত আছে। পিল্পপাদ শাখার একখানি সংহিতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৮। রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী

(মানসী ও মর্ধ্যবাণী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৪)

আকবরনামায় চাঁদ রায় কেরার রায়

প্রসিদ্ধ ইতিহাস ‘আকবর-নামা’র চাঁদ রায় কেরার বাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

আকবর-নামার উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারি যে, ১৫৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে চাঁদ রায় ভূষণা চূর্ণে বাস করিতেছিলেন। চাঁদ রায় বেদার বাবের পুত্র ছিলেন। রাজা মানসিংহ উড়িষ্যার আকগান বিদ্রোহীগণকে

পরাজিত করিবার পর খাজা হুসেমান, খাজা উসমান, সেরগী ও হারবৎ খাঁ নামক পন্থাক্রান্ত পাঠান সন্ধারগণকে খলিকাবাদে (দক্ষিণ যশোর ও পশ্চিম বাঞ্চগঞ্জ) আয়গীর প্রদান করিয়া সেই দিকে প্রেরণ করেন। পশ্চিমদে তাহারা অবগত হইল যে, তাহাদিগকে আয়গীর দেওয়ার আদেশে প্রত্যাহত হইয়াছে। তাহারা স্বল্পপুর্বে আসিয়া বিজোহী হইল। রাজা মানসিংহ তাহাব পুত্র হিম্মৎসিংকে বিজোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আফগানোবা লুণ্ঠ করিতে করিতে সাতগাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সাতগাঁও অধিকারে অনমর্থ হইয়া ভূষণ চাঁদ রায়েব বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করে। আফগানোবা ভূষণ চাঁদের ৪ ক্রোশের মধ্যে আসিলে চাঁদ রায় তাহাদিগকে অত্যাচার ভাণ করে। আফগানগণের মধ্যে দিলওয়ার ও হুসেমান ভূষণচাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে। দিলওয়ার (রাজিকালে) শেচকাখ্যের ক্ষত উত্তীর্ণ হইয়া আসিলে তাহাকে ধৃত করা হয়। হুসেমান তাহা দেখিয়া সাহসপূর্বক অসিহস্তে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আইসে। এবং অশেষ আরোহণ করতঃ নিজ আভ্যন্তর অভিমুখে ফিরিয়া যাইতে থাকে। চাঁদ রায় তাহার পশ্চাদ্ভাবন করে। উসমান হুসেমানের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। চাঁদ রায়েব সৈন্তগণ আফগান জাতীয় ছিল, তাহারা বিদ্রোহাতকতা করিয়া স্বাধীনতার সহিত যোগদান করে ; এবং সকলে মিলিয়া চাঁদ রায়েবকে নিহত করে। তৎপর আফগানোবা ভূষণ চাঁদের অভিমুখে গমন করে। চাঁদের দ্বারে আসিলে চাঁদের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণ চাঁদ রায়েব আসিয়াছে মনে কবিয়া চাঁদের খুলিয়া দেয়। চাঁদ তাহাদের হস্তগত হয়। পরে ইশারীর কোণে আফগানোবা তাহার বন্দীভূত হইয়া ভূষণ চাঁদ ও দম্পতি কেদার রায়েবকে (চাঁদরায়েব পিতা) ছাড়িয়া দেয়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইশারা পরলোক গমন করেন। অতঃপর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে আমবা পুনরায় কেদার রায়েব সাক্ষাৎ পাই। রাজা মানসিংহ

চাকার ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বিজোহী উসমানখাঁ বহুসংখ্যক সৈন্ত সহ ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ঐ প্রদেশের খানাদার রাজবাহাদুর শালখাক (Qalmaq) তাহার খান পরিচায়ক কবিয়া ভাওয়ালে ইটিয়া আসিয়াছে। এই সংবাদের অহোরাত্র মধ্যে রাজা ভাওয়ালে আসিলেন এবং (ভৈরব) নদীতীরের যুদ্ধে বিজোহীদিগকে পরাস্ত কবিয়া চাকার কবিয়া আসিলেন ; এবং তাবপর (ইশারীর পুত্র দাযুদখাঁ) ও বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের ভূমিক কেদার রায়েবকে আক্রমণ কবিবার ক্ষমত একদল সৈন্তের প্রতি আদেশ দিলেন। বিজোহী আফগানগণ দাযুদখাঁ ও কেদার রায়েব সহিত যোগ দিয়া জলপথ বন্ধ করিয়া দিল। মোগলসৈন্ত আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে রাজা মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া বহু যুদ্ধের পর বিজোহীদিগকে পরাস্ত করিলেন। দাযুদ ও আফগানগণ দোনায গাঁয়ে প্রস্থান করিল। রাজা মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুরে আসিলেন। এবং অনেক আশাভরসা দেখাইয়া কেদার রায়েবকে বন্দীতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন।

১০১১ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ সংবাদ পাইলেন যে, কেদার রায় তাহাব বহুবৎ নৌবাহিনী সহ মগরাঙ্গের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং শ্রীনগরে যে মোগল খান ছিল ঐ খানার বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন। মানসিংহ বহুসংখ্যক কামানসহ একদল সৈন্ত কেদার রায়েবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কেদার রায় তাহার বহুৎ সৈন্তদল লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। বিক্রমপুরের নিকট যোরতর যুদ্ধ হইল। কেদার রায়েব অনেকগুলি গোলায় আঘাতে আহত হইয়া অর্ধমৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ কবিলেন। কিন্তু ধৃত হইয়া রাজা মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিছু পবেই তাহার মৃত্যু হইল।

(কাষস্থ সমাজ, শ্রাবণ ১৩৩৪) শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেনবর্মা

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৮)

ঘরের ভিতর এককোণে একটা ছাবিকেন আলো খুব টিম্‌টিম্‌ কবিয়া জলিতেছিল ; তাহার পাশে একখানা বই আড়াল করা। তাহারই বিরাট ছায়ায় সমস্ত ঘরখানাই প্রাণ অন্ধকার। সঞ্জয় দরজাব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গৌরী ভিতরে ঢুকিয়া গেল। অন্ধকাবেই চঞ্চলাব গায়ে হাত দিয়া ধীবে ধীবে ডাকিল, “চঞ্চলা, চঞ্চলা !”

বিছানার উপর উপুড় হইয়া চঞ্চলা পড়িয়া আছে। বাত প্রায় নষ্টা, তবু তাহাব চুল বাঁধা, মুখ ধোওয়া হয় নাই। গৌরীর ডাকে ধবধর ভাঙা গলায় সে সাড়া দিল, “কি বলছ ?”

গৌরী বলিল, “চঞ্চলা, রাত পর্যন্ত ঘরের ভিতর পড়ে পড়ে কি পাগলামি হচ্ছে ? ওঠ, দেখ, সঞ্জয়-বাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন।”

চঞ্চলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “আমাকে দেখতে ? কেন, কি দবকাব ? আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।”

সঞ্জয় বাহির হইতে তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পাইল। তাহাব ইচ্ছা করিতেছিল এখনি চলিয়া যায় ; কিন্তু গৌরীকে কিছু না বলিয়া সে কি কবিবে ভাবিয়া পাইল না। শুনিয়া ভিতরে গৌরী বলিতেছে, “দেখ, তোমার শবীর খারাপ বলে আমি সঞ্জয়-বাবুকে ডেকে

আনুগাম; এখন যদি তুমি দেখা না কর, তাহ'লে সঞ্জয়-বাবুই বা কি মনে করবেন আর মাসিমাই বা আমাকে কি বলবেন? এটা করা অত্যন্ত বিশ্রী হবে। লক্ষ্মীটি, একবার উঠে দেখা কর; দু মিনিটেই হ'য়ে যাবে।”

চঞ্চলা আর 'না' বলিতে সাহস করিল না; আপত্তি করা মানেই গৌরীর মনে কিছু একটা সন্দেহ জাগাইয়া তোলা। সে উঠিয়া হাত দিয়া এলোচুলগুলি চোখমুখ হইতে সরাইয়া আঁচলটা বাড়িয়া বুড়িয়া ঠিক হইয়া বসিল। গৌরী সঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া গলার স্বরটা একটু উঁচু করিয়া বলিল, “ভিতরে আসুন।”

ঘাড়টা অনেকখানি হেঁট করিয়া সঞ্জয় আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। তখনও ভিতরটা তেমনই অন্ধকার। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না; শুধু ছায়ার মত তিনটি মুক্তি। সঞ্জয় অন্ধকারের মাঝখানেই খাটের দিকে মুখ করিয়া বলিল, “কেমন আছেন আপনি? কি হয়েছে?”

তাহার গলার স্বরটা যে অস্বাভাবিক রকম ধরা ও অস্পষ্ট এবং প্রতি কথার শেষে কাঁপিয়া বাইতেছে তাহা বুঝিতে গৌরীর বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হইল না। এই বিনীত দীর্ঘায়ত শক্তিমান অক্লান্ত কর্মী যুবকের বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে যে বেদনার সুরটি বাজিয়া উঠিল, তাহা যেন গৌরীর বুকের ভিতর গিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পুরুষের চোখেব জল যে কি জিনিষ তাহা সে বুঝিত। কিন্তু আজ এই পুরুষটির না-দেখা অশ্রুর আমেজই যে তাহাকে এমন করিয়া টলাইবে তাহা সে ভাবে নাই। নিজের দুর্বলতা ত তাহাব জানা ছিল না। গৌরী ঘরের আলোটা আড়াল হইতে বাহির করিয়া সঞ্জয়ের মুখের দিকে না তাকাইয়াই বাহিরে চলিয়া আসিল। ঘরে থাকিতে তাহার কেমন যেন লাগিতেছিল। বাহার সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয় তাহার স্বভাবাবেগেব পরিচয় পাইতে তাহারই সঙ্কোচ হইতেছিল। তাহাব উপর আবার একথাও মনে হইল যে ঘরের ভিতর সে দাঁড়াইয়া থাকিলে ত ধরাবাঁধা কথা ছাড়া সঞ্জয়ের কিছুই বলা হইবে না।

অন্ধকারের অস্পষ্ট ছায়ামুষ্টির উপর অকস্মাৎ এতখানি আলো আসিয়া পড়িয়া চঞ্চলার মুখের সমস্ত ক্লান্তি, বেদনা, অবসাদ ও সংগ্রামের চিহ্নগুলি যেন দশগুণ বাড়িয়া উঠিল।

চঞ্চলার সে মুখ চোখে পড়িতেই সঞ্জয় বাহিরের ভদ্রতা ভুলিয়া গেল। একেবারে কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “চঞ্চলা, একদিনে এ কী হ'য়ে গেছে?”

চঞ্চলা মনে করিয়াছিল যুব প্রায়-গম্ভীর মুখ বিয়া একেবারে অপরিচিত চিকিৎসকের মত দুই কথায় সঙ্ঘকে বিদায় করিয়া দিবে। কিন্তু ইহার পর তাহার গাভীয়া টিকিল না। সে চোখের জলে সঞ্জয়ের হাতখানা ভাসাইয়া দিল। কাল সারারাত ও আজ সারাদিন ধরিয়া পিতামাতার আদুরে ছাল, নিষ্ঠুর সমাজের হাতের জোড়নক যে সঞ্জয়কে সে মনে মনে আপনার পরম শত্রুরূপে খাড়া করিয়া আপনাব সমস্ত আক্রোশ তাহার উপব ঢালিয়াছিল আজ অকস্মাৎ এক মুহূর্তেই দেবিল এত সে সঞ্জয় নয়। পিতা যাহাকে আপনার কলঙ্ক ভাবিয়া অচ্ছন্দে ত্যাগ করিয়া সকল দায়িত্বের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সেই অজ্ঞাত অপরিচিত পিতৃমাতৃভ্যক্ত ভগিনীর বেদনায় যে একদিনে এতখানি বিচলিত হইতে পারে, যে এমন করিয়া আদিয়া সকল ভুলিয়া তাহার হাত ধরিতে পাবে, পিতৃপাপের আগুন যাহাকে একরাজে এমন করিয়া দহু করিতে পাবে সেই সঞ্জয়কে চঞ্চলার জানা ছিল না। কাল যে হাশুবিকসিত মুখের আলোয় তাহার সুপ্ত ব্রাত্সেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, চঞ্চলা দেবিল আজ সে মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। এই মানুষকে এমন করিয়া আচম্কা অতবড় কঠিন বেদনা দেওয়ার জন্য চঞ্চলার মনে একটা অসুশোচনা জাগিয়া উঠিল। তাহার বেদনা ত তাহাবই রহিল, মাঝখান হইতে এই নিষ্পাপ মনটাতে এতবড় ঘা সে না দিলেও ত পারিত।

খানিক পরে মুখ তুলিয়া চঞ্চলা বলিল, “কাল আপনাকে অমন ক'রে বিদায় ক'রে দিলাম; আপনি আমাকে তার জন্তে ক্ষমা করবেন। সত্যি, সেটা আমার ভারী অন্তায় হ'য়েছিল। আমাব এতদিনে হৃৎকের ও লজ্জার ইতিহাসটা একদিনে অমন ক'রে আপনাব উপর এনে কেলাটা যে কতখানি নিষ্ঠুরের কাজ তা আজ আমি বুঝতে পেরেছি। কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই আমি অমন কাজ করিতে পেরেছিলুম। তার জন্তে আমাকে কি আপনি ক্ষমা করিতে পারবেন?”

সঞ্জয় বলিল, “চঞ্চলা, ক্ষমা করবার অধিকার আর অহঙ্কার কি আমার কাছে? ক্ষমা তুমি কোরো, আমার অপরাধী পিতাকে ক্ষমা কোরো, আর না ক্ষেপে তোমার নিকট যে অপরাধী সেই তোমার হতভাগ্য ভাইকেও ক্ষমা কোরো। যা তোমার ও আমার দুজনের তা যে আমি তোমাকে বঞ্চিত করে এতকাল ভোগ করেছে এবং পরেও করুব এ অপরাধ আমার ক্ষমা কোরো পিতামাতার সম্পত্তির কথা বলছি মনে কোবো না; সেটা ত্যাগ করা অত্যন্ত সহজ; আমি বলছি আমার সম্মানত্বের দাবীর কথা। তোমাকেও আমার সঙ্গে সমানে যতদিন আমি তা না দিতে পারুব ততদিন আমার লজ্জা রাখবার ঠাই থাকবে না। অথচ নিজে তা পরিত্যাগ করবার উপায় আমার নেই, হয়ত বা সে মহাশক্তিও আমার নেই।”

চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাইল। সেই পিতার পুত্র হইয়া সঞ্জয় এতবড়! চঞ্চলা বলিল, “আর কেউ কোনো অধিকার না দিক, তাতে আমার দুঃখ নেই। য’রা সম্মানের চেয়ে বশকে বড় কবে, তাদের কাছে জোর করে পাওয়া অধিকারই কি মস্ত জিনিষ? তার চেয়ে তুমি শ্বেচ্ছায় এসে আমার হাত ধ’রে আজ আমায় যে অধিকারটি দিলে সেইটে আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।”

সঞ্জয় ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, ‘আপনি’ ছেড়েছ বাচ্চলাম, চঞ্চলা। কিন্তু সত্যি কি আমি তোমায় কোনো অধিকার দিতে পেরেছি? এ’ত সমস্তই লুকোচুরির অধিকার, কেবল আড়ালে-আব’তালে চলচে। সত্য অধিকার দিতে হ’লে সবার আগে তোমার স্বত অধিকারই আমাকে উদ্ধার করে আনতে হবে, কারণ সেইটাই যে আমাদের সকল অধিকারের মূল ভিত্তি। ভাই হ’বার আমার ক্ষমতা কোথায়, যদি না তোমাকে আমাদের ঘরের মেয়ে করতে পারি? তুমি বাইরে থেকে গেলে তোমার শুধু নিজের ইচ্ছায় ত বোন ব’লে স্বীকার করতে পারুব না।”

চঞ্চলার মুখ স্নান হইয়া গেল। সে বলিল, “সত্যি, তোমার কাছে একটুখানি কক্ষণ ছাড়া আর ত কিছু পাবার অধিকার আমার নেই। ও কথা আমি ভুলেই

গিয়েছিলাম। তুমি যে সেই বড় ঘরের ছেলে। আমি তোমার কেউ হব কোন স্পর্ধায়?”

সঞ্জয় ব্যথিত হইয়া বলিল, “চঞ্চলা, অমন ক’রে কথা বোলো না। তুমি ত দেখছ ভাগ্য আমার দুই হাত বেঁধে রেখেছে। আমার কোন শক্তি এখানে কিছু করতে পারে না, যদি না আমি বাবার মন ফেরাতে পারি।”

চঞ্চলা বলিল, “এতদিনের আকোশ কি একদিনে যায়? স্বযোগ পেলেই তাই রাগটা ফাঁস ক’বে ওঠে। তুমিও কি বোক না যে, সেটা আসলে তোমাকে বলা নয়? বলবার আর কাউকে ত পাব না জানি; তাই যেটা তোমাকে বলা সকলের চেয়ে অস্বাভাবিক সেটাও তোমাকেই বলছি। তুমিই যে কেবল একলা ধরা দিয়েছ।”

সঞ্জয় চূপ করিয়া রহিল। চঞ্চলা আবাব বলিল, “তা ব’লে মনে করো না যে, আর কারুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জগ্রে আমি সাধুছি।”

সঞ্জয় বলিল, “তুমি যে সাধতে পার না তা আমি জানি। যদি ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হন তাহ’লে আমিই একদিন তোমাকে সাধু আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করবার জগ্রে।”

চঞ্চলা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, “কিন্তু ধীর সাহায্যে তুমি আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে চাইছ তাঁর সাহায্য নেবার আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই। তার চেয়ে আমি এতকাল যেমন একলা ছিলাম চিরকালই তেমনি থাকব।”

সঞ্জয় একটুখানি স্মিতহাস্যে চঞ্চলার রাগটা ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া বলিল, “তোমাব কোনো ভয় নেই চঞ্চলা; আমি আমার মা ছাড়া আর কারুর শরণ নেব না। তুমি চিরকাল একলা থাকতে চাইতে পার; তোমার অভিমানের যে অতখানি শক্তি আছে তাও স্বীকার করি। কিন্তু আমি যে তোমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই। তোমার জগ্রে সোনার ঘর-সংসার পেতে দেওয়া যে আমার কাজ! সে কাজে মা না সহায় হ’লে কি চলে?”

চঞ্চলা লজ্জা পাইয়া বলিল, “যার ত্রিকূলে কেউ নেই

তাকে নিয়ে আর তোমায় ঠাট্টা কর্তে হবে না। তুমি চূপ কর দেখি।”

সঞ্জয় কি একটা বলিতে বাইতেছিল; কিন্তু বাহির হইতে গোরী ডাকিল, “চঞ্চলা, তোমার জন্মে একটু গরম দুধ এনেছি, খেতে হবে কিন্তু।”

দুধটা আর একটু পরে আনিলেও চলিত, কিন্তু গোরীর আর বেশীক্ষণ সঞ্জয়কে একলা রাখিয়া যাইতে ভরসা হইতেছিল না। কি জানি যদিই কেহ কিছু দেখে কিবা শোনে তাহা হইলে আশ্রমে তাহাদের তিনজনেরই বিশেষ স্নানাম হইবে না।

গোরী ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল চঞ্চলা আরক্ত মুখখানা নীচু করিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিতেছে, সঞ্জয়ের মুখও প্রসন্ন। ঝড়-ঝড়ার দারুণ দুর্ঘ্যোগের মাঝখানে কি একটা আশার আলো দেখা দিয়াছে। আপনার উদ্দেশ্য খানিকটা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গোরী খুসী হইল। বঞ্চিত জীবনের বেদনা যে কি তাহা ত সে বোঝে। তাই সে বেদনার হাত হইতে ইহাদের পরিজ্ঞান দিবার পথ সে খুঁজিতেছিল। বাহিরের দুর্লভ্য বাধাকেও হৃদয় জয় করিতে পারে কি না একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। মনে হইল হয়ত পারিতেও পাবে। সফলতার একটা আনন্দে তাহারও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্তরে কি একটা বেদনা কাঁটার মত বিধিমা-বিধিমা উঠিতে লাগিল। সে নিঃসঙ্গ, সে চিরবঞ্চিত, সংসারে শুদ্ধ কর্তব্যমাত্রই তাহার সকল আনন্দের খোরাক খুঁজিতে হইবে। হাসিয়া সঞ্জয়কে সানন্দ অভিবাদন করিতে গিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিল। বলিতে আসিয়াছিল দুইটা মিষ্ট কথা, কিন্তু কিছুই তাহার বলা হইল না।

একদিন গোরী মনে করিয়াছিল বিলাস ও ভোগের মোহেই সংসারের সকল কিছু আঁকড়াইয়া সে বাল্য ও কৈশোবর্টা কাটাইয়াছে। সেই ভোগ ও ঐশ্বর্য্য হইতে পাছে সে আজীবন বঞ্চিত থাকে, তাই বুদ্ধি তাহার পিতা তাহার জীবনের বৈধব্যের অভিশাপের কথা তাহার নিকট হইতে এত সাবধানে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; পাছে সে ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীর বেশে পাখিব সকল

ভোগস্বপ্নে মাঝখানেই তাহা হইতে দূরে মরণকাল পর্য্যন্ত ভ্রমিতের মত পড়িয়া থাকে আব পাছে তাহার অন্ন জুটাইয়া দিবার লোক না থাকে, তাই বুদ্ধি তাহার পিতা তাহাকে আবার ঘরসংসার পাতিয়া দিবার লোভে সেই ফাদে অনেকখানি পা বাড়াইয়াছিলেন। একদিন নৃপেন্দ্র তাহাকে ইহারই লোভ দেখাইয়াছিল, ক্ষতিধর তাহাকে এইজন্মই লোভী বলিয়া নিষ্ঠুর শ্লেষ করিয়াছিল। সেদিন তাই সে সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছিল যে, তুচ্ছ ভোগ-ঐশ্বর্য্য ও বিলাসকে সে অনায়াসে পায়ের নখে ঠেলিয়া চলিয়া আসিতে পারে, আপনার অন্নও সে আপনি অর্জন করিতে পারে; এই সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া সংসারকে সে দেখাইতে চাহিয়াছিল যে, সংসারের ভোগস্বপ্ন তাহার কাছে কত ছোট জিনিস। পিতার উপরও একবার তাহার রাগ হইয়াছিল যে, এইসকল সামান্য জিনিষের জন্ত পৃথিবীর চোখে তিনি তাহাকে এত ছোট করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ তাহার অন্তর বলিতেছে যে, পিতা ভুল করেন নাই। ভোগস্বপ্ন বলিতে যে ধনরত্ন, বস্ত্র-অলঙ্কার, বিলাস-আয়াসের ছবি সে কল্পনা করিয়াছিল সেই স্বপ্নের অভাবে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে এমন মূর্খের কথা তিনি চিন্তাও করেন নাই। শৈশবে, কৈশোরে এই দিয়াই তিনি তাহাকে ভুলাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু কল্পার কোন্ জীবনব্যাপী দুঃখে যে তাহার মন কাঁদিয়াছিল আজ তাহা গোরী বুঝিয়াছে। পরের উপকার করিতে আসিয়া আজ সে বুঝিয়াছে কত গভীরভাবে সেই বেদনা তাহার অন্তরে ক্ষতস্থিতি করিয়া চলিয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও আরামের স্বপ্নের চেয়ে বড় যে মহাস্বপ্ন যে-আনন্দকে না পাওয়ার বেদনায় তাহার অন্তরের ক্ষতটা খোঁচা দিয়া উঠিতেছে, মূর্খ সে একদিন তাহাব অন্তিমতাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে নাই। কেবলমাত্র একটা মানুষের মূখের মধুর হাসি ও চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টির জন্তই যে আজন্ম মানুষের মন কাঁদিতে পারে, ইহা সে বিশ্বাস করিতেও পারিত না। জীবনে অন্তত কোনো একদিন একজন মানুষ কেবল তাহাকেই লইয়া সকল ভুলিয়া থাকিবে, তাহাকে পাওয়ার জন্ত আপনার জন্ম পর্য্যন্ত সার্থক মনে করিবে, পৃথিবীর সকল দুঃখদুশ্বেভ ভিতর

তাহার সহিত মিলনের ক্ষণিক মুহূর্তগুলিকে পারিজাতের মালার মত অন্তরের আভরণ করিতে চাহিবে, মনে করিবে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অনন্ত আনন্দ-খনি সে, এ কল্পনা পূর্বে কোনোদিন গৌরী কবে নাই। মাহুষের মনে এই স্বর্গস্থলের কামনা যে স্থগ্ত থাকে তাহা সে জানিত না।

মাহুষ বন্ধুসঙ্গ চায় বটে, তাহার চেয়েও নিজের কাহাকেও খোঁজে বটে; একথা সে মানিত, কিন্তু ঐশ্বর্য আয়াস ত্যাগ করার চেয়ে এই ত্যাগে জীবন যে এমন করিয়া শূন্য নিরর্থক অঙ্গহীন হইয়া যায়, ইহা ক'দিন আগেও তাহাকে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

চঞ্চলার মুখের সলজ্জ হাসি দেখিয়া গৌরীর আজ সবার আগে মনে পড়িল, আজ হইতে এই মাহুষটা হয়ত জগতে আর একা নয়। ইহার স্বধ্বংস, হাসিকান্না, মানঅভিমান আর কেবল মাত্র ইহার জীবনের বোঝা বাড়াইতেছে না আর একজনের আবির্ভাবে এই সমস্তই ইহার জীবনটা রসে ও আনন্দে বিচিত্র স্বন্দর করিয়া তুলিবে। আর এই স্পর্শমণির অভাবেই তাহার জীবনের প্রতিদিনের সঞ্চয় কেবল নিরর্থক ভার হইয়া উঠিবে মাত্র।

গৌরীকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সঞ্চয় হাসিয়া বলিল, “এই দেখুন, একবারে; চান্দ্রস চিকিৎসাতেই আপনার কণীকে অনেকখানি সারিয়ে তুলেছি।” গৌরী তাহাদের সকল কথা না জাহ্নক, তবু সে যে এই দেখাশুনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই, বন্ধুভাবেই তাহাদের পরস্পরেব কাছে আনিয়া দিয়াছিল, ইহা অস্বভাব করিয়াই সঞ্চয় বন্ধুর মত হাসিয়া স্বচ্ছন্দে এমন কথা বলিল। চঞ্চলার রোগটা যে শারীরিক নয় তাহা লুকাইবার সে কোনো চেষ্টাই করিল না।

চঞ্চলা কিন্তু ইহাতে একটু অস্বস্তি অস্বভাব করিতেছিল। গৌরীর কাছে এমন করিয়া ধরা পড়িয়া যাইতে তাহার ভয় ছিল। সে বলিল, “সত্যি, এতক্ষণে মাথাটা একটু ছাড়ল তবু। ক’মে আসবে আগেই বুঝতেপারছিলাম।”

চঞ্চলার দিকে একবার হাসিয়া তাকাইয়া, “আচ্ছা, আসি।” বলিয়া সঞ্চয় গৌরীর পিছন পিছন বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবার সময় কাছে আর কেহ নাই দেখিয়া সঞ্চয় গৌরীর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া বলিল, “আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন কোনো দিন তার প্রতিদান আমি দিতে পারুব না।” সঞ্চয়ের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। গৌরী কেন না বুকিয়াও মুখটা নামাইয়া লইল। গৌরীব অন্তরে একটা আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই খোঁচাটাও তাহাকে বিধিতে থাকিল।

২

চঞ্চলা একটু সামলাইয়া উঠিতেই বাহিরের কাজে-কর্মে পড়ায় শুনায় ও আশ্রমের কাজে আপেকার মত ঘুবিতে লাগিল। ছেলেদের পড়ানোর সময় ছাড়া সঞ্চয়ের সহিত তাহার বড় দেখা হইত না। যতটুকু বা দেখা হইত তাহাও তাহারা পরস্পরকে এড়াইয়াই চলিত, কারণ সকলের কাছে তাহাদের আত্মীয়তাটা প্রকাশ

হইয়া পড়িবার দুই জনেরই ভয় ছিল; কিন্তু গৌরীর সঙ্ঘর্ষে সঞ্চয় অকস্মাৎ অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল। এই মেয়েটির যে বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে তাহা সে আগেই জানিত, নতুন আবিষ্কার করিল তাহার নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাহাতেই সকল কাজে গৌরীকে টানা তাহার বাতিক হইয়া উঠিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে সে লজ্জা পাইত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনার সঙ্কোচকে সে জোর করিয়া জয় করিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল। হৈমবতী প্রায়ই বলিতেন, “সঞ্চয়, তুমি-দেখছি আমার আশ্রমে ভাঙচি দেবে, চঞ্চলাকে ত তোমাদের দলে আগেই টেনেছিলে, এখন গৌরীকেও সরালে। ওরা আর আমার ঘরের কোনো কাজই করবে না।”

প্রথমেই কথাটার অর্থ ভাল করিয়া না বুঝিয়া ভুল সম্বন্ধে সঞ্চয় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত; কিন্তু তারপব তাহার উৎসাহ আরোই বাড়িয়া যাইত। পরে চঞ্চলার সহিত সাক্ষাৎ করানোতে যেদিন সে গৌরীর হৃদয়ের

১. পরিচয়টুকুও পাইল, সেদিন হইতেই শুধু কাজে নয় অকাজেও গৌরীকে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে বুদ্ধিমতী, শক্তিশালিনী কি কস্মিন্শি এইটুকুই মাত্র আর তাহার সংজ্ঞা রহিল না; সে মানুষের বিচিত্র পরিচয়ের একটি আধার, একথাও বার বার তাহার মনে পড়িয়া বাইতে লাগিল। চোখের সামনে দেখিয়াও যাহা সে এতদিন দেখে নাই, অল্পভবেই গৌরী এমন অনেক পরিচয় সে আবিষ্কার করিতে লাগিল।

সাথিয়া গায়ে পড়িয়া সে গৌরীর ফরমাস খাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার বাড়ীর চিঠি লইয়া যাওয়া, শব্দরকে খবরাখবব দেওয়া, আবার বাড়ী হইতে তাহার মনে ছোটখাট জিনিসপত্র আনা, এত কাজের মধ্যেও এসব সজ্জয় যাচিয়া করিতে লাগিল। কাছে আসার একটা নূতন বাতীক তাহাকে পাইয়া বসিল।

গৌরী অবাক হইত তাহার কাণে দেখিয়া। কি এমন সে করিয়াছে যাহার জন্ত এত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে? আবার ভাবিত—না, ইহা কৃতজ্ঞতা হইতে পারে না, একদিনের জন্ত এত দিন ধরিয়া কৃতজ্ঞতা পাগলেও দেখায় না, তা ছাড়া তাহাতে এমন প্রাণ. এমন স্বল্প দৃষ্টির পরিচয় থাকিতে পারে না। সজ্জয় তাহার দাদার বন্ধু, বৃদ্ধি তাই তাহারও বন্ধু হইয়া উঠিতেছে। বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী আরো কিছু কল্পনা করিবার সাধ মাঝে মাঝে আপনা হইতেই তাহার মনে উকি দিয়া উঠিত। কিন্তু তখন সে আপনাকে শাসন করিত—সকল লোভকে ত্যাগ করিবার স্পর্ধা দেখাইয়া শেষে এই কি তাহার পরিণাম? চঞ্চলার বন্ধু সাজিয়া এই কি তাহার প্রতিদান? আপনাকে জপাইত, আমি তুচ্ছতাব উপরে উঠিবার জন্ত, লোভকে জয় করিবার জন্ত, মানুষের মত মানুষ হইবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছি; ও পথ আমার নয়, নয়, নয়।

তবু মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। অতীতের যে জীবনকে সে না দেখিয়াই হারাইয়াছে, ভবিষ্যতের যে জীবনকে পাইবার ক্ষীণ আশাটুকুও আজ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে দুই-ই তাহাকে কঁাদাইত। অতীত ও ভবিষ্যতের অশ্রু তাহার কস্মিন্শি সংঘত জীবনের হিমের

আগল ভাঙিয়া চোখ ছাপাইয়া উঠিত। সমাজ তাহার জীবনের ভবিষ্যৎটার একটা বিরাট বন্ধ অঙ্ককারই রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, তবু পিছুমেহ সে অঙ্ককার হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক অল্প বয়সে সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। তাই তাহার এই জীবনই হয়ত আজ সকলে মানিয়া লইয়াছে। সে নিজে ত যাচিয়াই ইহা বরণ করিয়াছে। তবু মনে হয় জীবনের আনন্দ-খনিরূপে কিছু একটা সে পাইবেই। কিছু না পাইয়াই জগৎ হইতে বিদায় লইবে ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু কেনই বা হইবে না? অনেক মানুষই ত তেমন গিয়াছে; তাহাদের মত তাহারও সাস্থনা হইবে, “দুঃখ যে তোমার নয় রে চিরন্তন।” কিন্তু হায়, যৌবনধর্ম এ সাস্থনায় শাস্তি পায় না, ইহজীবনের এ নিঃস্বতাকে বিশ্বাস করে না। জীবন-জোড়া সুখ না হউক, তবু দু-দিনের জন্তও সর্বহারার আনন্দের উন্নত প্রাবনে একবার আপনাকে ভাসাইয়া দিবার সাধ মানুষের থাকে।

কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া এসব খেলালকে ভুলিতে হইবে গৌরী সংকল্প করিল। সে হৈমবতীকে গিয়া ধরিল, “মাসিমা, আমাকে খুব শক্তরকম একটা কাজ দিতে হ’বে। এমন স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে কাটিয়ে আমি বড় কুঁড়ে হ’য়ে যাচ্ছি।”

হৈমবতী বলিলেন, “তোমার কলেজের পড়া রয়েছে মা, এই ত আসছে বছরই বি-এ দেবে; তার উপর বাড়ীর কাজের পালা ত আছেই। এতেও যদি তুমি নিজেকে কুঁড়ে মনে কর তাহ’লে তোমাকে ঘানিতে ঘুতে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।”

গৌরী বলিল, “পুঞ্জের ছুটিত এল ব’লে, তখন কলেজও থাকবে না, এখানেও অনেকে বাড়ী চ’লে যাবে; সব কাজই হাফা হ’য়ে যাবে। তখন আমি ব’লে ব’লে কবুব কি? পরীক্ষার পড়া ত সেই শীতের পর থেকে স্বপ্নেই চলবে।”

হৈমবতী গৌরীর রকম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সে যে নিজের হাত হইতে নিজে পরিচয় পাইবার জন্তই নিজেকে পিষিয়া মাঝিতে চাহিতেছে তাহা বৃদ্ধিতে তাহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষের দেবী হইল না। না-জানি

কি দুঃখভালে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া মমতায় ও চিন্তায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল।

হৈমবতী মনের বেদনা মনে চাপিয়াই বলিলেন, “মেয়েদের কাজ ত মা, অনেকই আছে। বরং যত কাজ তার তুলনায় মাহুষ মোটেই মেলে না, এই দুঃখ। কিন্তু হাসপাতালে কি আতুর-আশ্রমে সেবার কাজের মত কাজ ত পড়াশুনার মাঝখানে তুমি পারবে না। না হ’লে সেদিন ভূষণ-বাবু আমাকে বল্লেন যে, তাঁদের আতুর আশ্রমে তাঁরা পুরুষ তিনজন আর তাঁদের স্ত্রীরা তিন জন ছাড়া দিনরাত্রি রোগীদের খবর নেবার কেউ লোক নেই। অথচ ভূষণ-বাবুর স্ত্রী তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে। এইসকল কাজের উপর ছোট ছেলের মা’র পক্ষে যে-কোনো রোগের সেবা করা কম শক্ত কথা নয়; তবু ব্রত নিয়েছেন ব’লে তিনি কোনোদিন কোনো কাজে আপত্তি করেন না। তাঁরা চান একটি অল্পবয়স্ক তোমারই মত মেয়ে। কিন্তু তোমাকে ত অল্প জায়গায় কাজের জন্ত এখন পাঠানো যায় না। তাতে অনেক হান্ধাম বাধবে, তাছাড়া তোমার পড়ার সময়ও পাবে না।”

গৌরী বলিল, “কেবল অবসর সময়-গুলোয় করা যায় আর ছুটিটা পুরো করা যায় এমন কোনো কাজ জোটে না?”

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, “কি জানি মা, আমাকে ত লোকে ইঞ্চুল, হাসপাতাল, পতিতোদ্ধার এই সবেরই জন্ত লোক দিতে বলে। আর কিছু কথা ত এখন শুনি। তবে সঞ্জয় আমাদের মন্ত ‘কর্মখালি’র পেজেন্ট আছে; তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত তোমার ফরমাস মত কাজ জুটিয়ে দিতে পাবে।”

গৌরী বলিল, “আচ্ছা তাই আজ খোঁজ করব।”
সন্ধ্যায় সঞ্জয় আসিতেই গৌরী তাহাকে গিয়া ধরিয়া বলিল, “আমার জন্তে কিছু কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।”

সঞ্জয় অস্বাভাবিক ভাবে বলিল, “বলুন না, কি কাজ চাই, আমার দপ্তরে অনেক কাজ আছে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এত শীঘ্র আবলম্বী হ’তে চাইছেন যে! পড়াশুনোর আর মন যায় না?”

গৌরী যেন ধরা পড়িয়া গিয়াই একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, “না, না, চাকরী চাইছি না, অন্য কাজ।”

সঞ্জয় বলিল, “ওঃ ধরাতী! তা দিতে পারি যত চান।” কিন্তু পরক্ষণেই একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, “আপনার ত কাজের কন্মতি নেই; তার উপর আবার কাজ চাপানো মানে আত্মহত্যার একটা চেষ্টা করা। কি হবে এমন ক’রে নিজেকে মেরে? আপনার এই ত বয়স, এখনও কাজ করবাব অনেক দিন প’ড়ে আছে। এখন যা কাজ করছেন সেগুলো শেষ হ’য়ে যাক, তারপর অন্য কাজ করবেন।”

সঞ্জয়ের এই দরদে গৌরীর দুইচোখ সজল হইয়া আসিল। সত্যিই ত সে আত্মহত্যা করিতেছে। শরীরটাকে হত্যা করিতেছে না বটে কিন্তু মনটাকে ত গলা টিপিয়া মারিতেই চাহিতেছে। কিন্তু না মারিয়াই বা উপায় কি? কি হইবে তাহার সে মন লইয়া যাহা কেবল পাগলের মত স্বপ্ন দেখে, আর অসম্ভব আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া তাহারই জন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরে? মনের ত তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; কাজের জন্ত একটা নিখুঁত কল যদি সে হইতে পারে তবেই জগতে যাহা সে হইতে চাহিতেছে,— অপরেও যাহা তাহাকে করিতে চায়, সেটা সম্ভব হইবে।

গৌরী চোখটা নামাইয়া বলিল, “না, সঞ্জয় বাবু, আমি শরীরের খুব যত্নই করি। আত্মহত্যা আমি করতে চাইছি না। কিন্তু কাজের মাহুষ হতে হ’লে মনটাকে খুব শক্ত বানিতে দিবারাত্রি যুতে রাখা দবকাব।”

একথাটা গৌরী বলিতে চাহে নাই। তবু ফস্ করিয়া এই কথাটাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সঞ্জয়ও এরকম উত্তর আশা করে নাই। সে ব্যথিত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার গৌরীর দিকে তাকাইয়া বলিল, “আচ্ছা, আমি আপনাকে ঠিক কাজ খুঁজে দেব, যদি আপনি কথা দেন যে শ্রান্ত হ’লেই বিশ্রাম নেবেন এবং মনটাকেও একেবারে জেলখানার কয়েদীর মত নির্ভর ভাবে বিচার করবেন না।”

গৌরী শেষ কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, শ্রান্ত হ’লে ত নিশ্চয়ই বিশ্রাম করব। আমাদের

আশ্রমের দুজন ডাক্তার অভিভাবক রয়েছেন; তাঁরা কি আর তাহ'লে আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন?"

সঞ্জয় বলিল, "আপনি ভূষণবাবুকে চেনেন? তাঁদের একটা আতুর-আশ্রম আছে।"

গৌরী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাসিমা আজই তাঁদের কথা বলছিলেন। আমি না চিনলেও তাঁরা যে খুব মহৎ লোক তা বুঝেছি।"

সঞ্জয় বলিল, "তাঁদের আশ্রমে যে-সব রুগীরা থাকে, তাদের চিঠিপত্র প'ড়ে শোনাবার আর লিখে দেবার কোনো লোক নেই। এর অভাবে ভূষণ-বাবুর স্ত্রী বড় মুস্থিলে পড়েছেন। রোজ সকালে সব চিঠি প'ড়ে দিয়ে আসবে এমন একজন লোক আমি ঠিক ক'রে দিয়েছি। কিন্তু পড়ার চেয়ে লেখার সময় লাগে বেশী, অথচ সেটা অবসর মত করা চলে। আপনি যদি সপ্তাহে দুদিন কি তিনদিন এই কাজটা ক'রে দেন ত তাঁদের খুব উপকার হয়। কিন্তু য' খানা চিঠি লেখার পর আপনার শ্রান্তিবোধ হবে ত' খানা লিখেই আপনি সেদিন থামতে পারবেন। এমন কি দরকার কিম্বা ইচ্ছা হ'লে দিনক্ষণ সব বদলে নিতে পারবেন। এতে কারুরই কিছু ক্ষতি হবে না।"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় করব। তার আগে একদিন আমি আশ্রমটা দেখতে চাই।"

সঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আপনাকে কালই নিয়ে যাব।"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "মাসীমা আপনার সঙ্গে আমার ঘেতে দেবেন ব'লি, ভাবছেন?"

সঞ্জয় এ উত্তরে শুধু শুধুই লাল হইয়া উঠিল। তারপর বলিল, "মাসিমাকে শুদ্ধই নিয়ে যাব। আপনাকে একলা যেতে তিনি দেবেন না তা জানি।"

চঞ্চলা একরাশ বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "এই বইগুলো একজন আশ্রমের নাইটসুলে দান করেছেন, কিন্তু ওদের পক্ষে এগুলো শক্ত হবে। আপনি যদি বইগুলো বিক্রী ক'রে দিয়ে এদের মত বই কিছু

সেই পয়সা দিয়ে জুটিয়ে দিতে পারেন তাহ'লে খুব ভাল হয়।"

গৌরী দেখিল চঞ্চলার মুখ আশ্চর্য্য গম্ভীর। সঞ্জয়ও খুব প্রফুল্ল নয়। সে বই কয়খানা লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি চেষ্টা ক'রে বিক্রী করিয়ে দেব।" তারপর পকেটের ভিতর হইতে একখানা খোলা চিঠি বাহির করিয়া চঞ্চলার হাতে দিয়া বলিল, "এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখবেন।"

চঞ্চলার মুখ অদ্ভুত রকম কঠিন হইয়া উঠিল। গৌরীর সামনেই তাহার হাতে চিঠি দেওয়াতে সে অস্বস্তি বিরক্ত ভাবে সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাইল। চিঠিখানাও ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল। কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি পড়'ব পরে। আশ্রমের কথা বুঝি কেউ লিখেছেন?"

সঞ্জয় পাছে কোনো উত্তর দেয় এই ভয়ে সে কথাটা বলিয়াই চলিয়া গেল। তাহার এ চলনাটুকু বুঝিতে গৌরীর একটুও অস্ববিধা হইল না। কিন্তু সে নিশ্চিত হইল তাহাদের দুইজনের দুই বিভিন্ন রকম ব্যবহার দেখিয়া। সঞ্জয়ই বা তাহার কাছে সব প্রকাশ করিতে উন্মুখ কেন আর চঞ্চলাই বা সব লুকাইতে চাহে কেন? এ যদি কেবল কুমারীর স্বাভাবিক লজ্জার জগুই হইত, তাহা হইলে এমন তীব্র বিরক্তি তাহার সহিত আশ্রিয়া জুটিত না। তাছাড়া সঞ্জয়কে এমন করিয়া এড়াইয়া চলাও অত সহজ হইত না। কি হইয়াছে ইহাদের মধ্যে ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। অথচ ইহাদের ভাবনাটা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছিল না।

চঞ্চলার আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্দ্বন্দ্বনে সঞ্জয় যেন একটু লজ্জিত হইয়া কৈফিয়তের স্বরে বলিল, "বড় রকম ছুঃখ পেলে মাস্তুরের সব সময় মাথার ঠিক থাকে না।"

গৌরী প্রশ্ন করিয়া এবিষয়ে নূতন কিছু জানিবার কৌতূহল আর দেখাইল না।

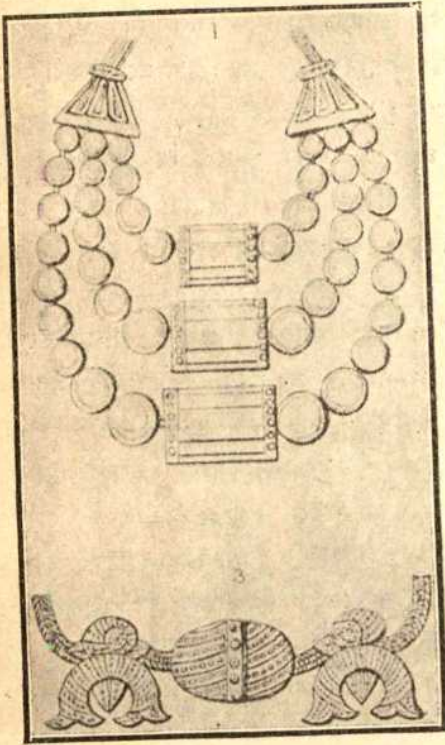
(ক্রমশঃ)



শ্রী কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারতের প্রাচীন সভ্যতা শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইল। এই সকল আক্রমণ বহুপূর্বকাল হইতেই এদেশের সীমান্ত প্রদেশ সকলে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা এতকাল



প্রাচীন বৌদ্ধযুগের হার

কেবলমাত্র লুণ্ঠন বা সাময়িক বিজয়ে পরিণত হইত। এদেশে শত্রু কর্তৃক স্থায়ীভাবে রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সফল হইল। পূর্বের অন্তরালে স্থিত উত্তর ভারতের কয়েকটি জনপদ ভিন্ন প্রায় অন্য সকল স্থানেই হিন্দুরাজত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইল।

সুতরাং উত্তর ভারতের সকল প্রকার শিল্পের অবনতিও সেই সময় হইতে আরম্ভ হইল। এই অবনতির এক কারণ এই যে, হিন্দু-শিল্পের ও ললিত কলার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট নিদর্শন ঐ সময় লুণ্ঠিত, নষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং পরবর্তী যুগের শিল্পীর সম্মুখে আদর্শরূপে কিছুই ছিল না। অবনতির অন্য কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুরাজত্ববর্গের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর উৎসাহদাতৃবর্গও লোপ পাইল। যাহারা পুরাতনের উচ্ছেদ করিয়া নূতন রাজত্ব স্থাপন করিল, তাহাদের লুণ্ঠন ও বিনাশের শাস্তিই প্রবল ছিল। শিল্পে উৎসাহদান করিবার, বা তাহাতে নূতন ধারা আনিবার মত সভ্যতা, কৃতি বা যোগ্যতা, কোনটাই তাহাদের ছিল না।

ইহার ফলে উত্তর ভারতের গহনায় ক্রমে পরিকল্পনা-বৈচিত্র্য, গঠন-লালিত্য, কারুকার্যের সৌন্দর্য ইত্যাদির দারুণ অভাব ঘটিতে লাগিল। ক্রমে হিন্দু গহনা-শিল্পে আদিমযুগের দোষসকল ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। শিল্পীগণও উৎসাহদাতার অভাবে কেবলমাত্র নিয়োগসাধকে (Order Supplier) পরিণত হইল। ফলে উপকরণের মূল্যই গহনার বিচারের একমাত্র নিষ্করণে গৃহীত হইল এবং গহনাধারণে বাহ্যাদোষ ও গহনার আয়তনে বিপুলতা ইত্যাদি দোষ পুনর্বার দেখা দিল।

যে ভারতীয় শিল্পের উদ্বোধন সভ্যজগতের আদিম শৈশবকালেই সাধিত হয়, থুঃ প্রথম শতাব্দীতেই যাহার উৎকর্ষ একরূপ উচ্চস্তরে উপনীত হয়, যে তাহার খ্যাতি সুদূর গ্রীস ও রোমেও প্রচারিত হয়, এবং থুঃ সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহার পূর্ণ বিকাশ, এইরূপ সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যপ্রভাযুক্ত ছিল যে কলা-কৌশলে, শিল্পচাতুর্য্যে বা কল্পনাবৈচিত্র্যে তাহার

প্রতিযোগিতা করা আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীর পক্ষেও নিতান্ত দুঃসাধ্য, অসম্ভব শত্রুর দস্থ্যবৃত্তির ফলে সেই শিল্পের এইরূপে অকালে ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটিল।

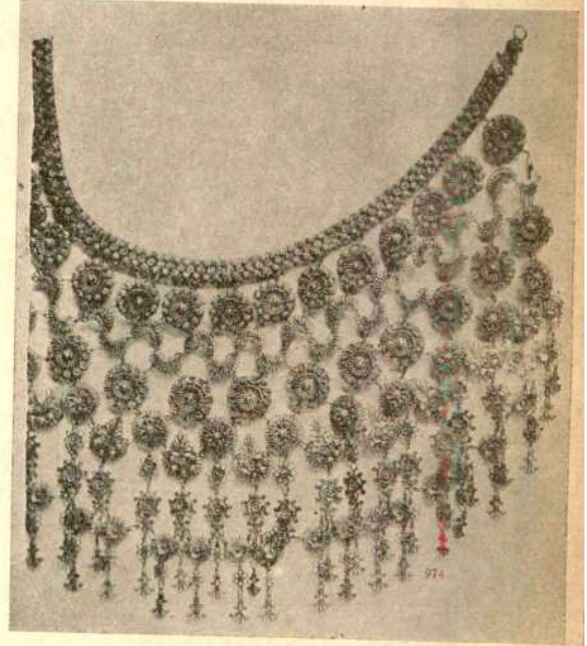
দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে বিদেশীর আধিপত্য বা প্রভাব অনেক পরে বিস্তারিত হয়, সুতরাং সে সকল দেশে ললিতকলা ও কলাশিল্প উত্তর ভারত অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। সেইজন্ত সেখানে খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্রে মূর্তিতে ও ধাতব শিল্পাদিতে প্রাচীন ভারতীয় কলাশিল্পের ক্রম লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল নিদর্শনে জীবন্তশিল্পের অগ্রমুখী গতির কোনও চিহ্ন নাই। কেবলমাত্র ইঙ্গিতমাত্রিক (Rule of thumb) অহুকরণের জড়ভাব, বা স্থলে স্থলে বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের আভাস পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় গহনার বাস্তব নিদর্শনের অতি অল্পই এখন পর্য্যন্ত বর্তমান; এবং যাহা আছে তাহাও দেশীয় রাজত্ববর্গের রত্নাগার সকলে লুক্কায়িত। সুতরাং এই যুগেরও গহনার পরিচয় সমসাময়িক চিত্র বা মূর্তি সকল হইতে লইতে হইবে।

দাক্ষিণাত্যের প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি সকলে যে সকল গহনার পরিচয় পাওয়া যায়, সে সকলের অধিকাংশই ত্রয়োদশ যুগের গহনার অহুকরণ মাত্র। এবং এইরূপ অহুকরণ-প্রবৃত্তির ফলে ধ্বংস অবপাত (decadence) অবশ্যস্তাবী, তাহারও পরিচয় এই সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে। এই সকল নিদর্শনে কয়েকটি মাত্র নূতন গহনার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা, মাহুয়ায় বৃহৎমন্দিরস্থ নটরাজ মূর্তির উরুদেশের উপরিভাগের (upper part of thigh) গহনা, উক্ত মন্দিরের তিরুমল্ল চৌলত্রিতে, নৃপতি তিরুমল্লের রাণীর সম্মুখে পরিহিত চন্দ্রহার, বেকটপতি রায়ের কাংসামূর্তির কর্ণভরণ ইত্যাদি, এবং রামেশ্বর মন্দিরের কয়েকটি জীমূর্তিতে নাসিকার গহনা। এইসকল গহনায়, স্বল্প রেখাপাত বা কারুকার্য-খচিত, সুগঠিত বহুসংখ্যক খণ্ডের, আয়তন অল্পপাতে সুন্দর বিস্তার, ইত্যাদি প্রাচীন গহনাশিল্পের বিশেষত্বের পরিচয় কিছুই নাই।

এ যুগের উত্তর ভারতের মূর্তি সকলের গহনায়

নূতনত্ব, বিশেষত্ব বা বিশুদ্ধ রূপরসজ্ঞান, ইহার কোনটিরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ইহা বলা উচিত, যে, এই অঞ্চলের দেশীয় নৃপতিবর্গের অধিকারে যে সকল মন্দির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি আছে, সে সকলে আমাদের অজ্ঞাত অনেক কিছু থাকিতে পারে, যাহা হইতে এ বিষয়ে আমাদের অনেক নূতন জ্ঞান লাভ সম্ভব।



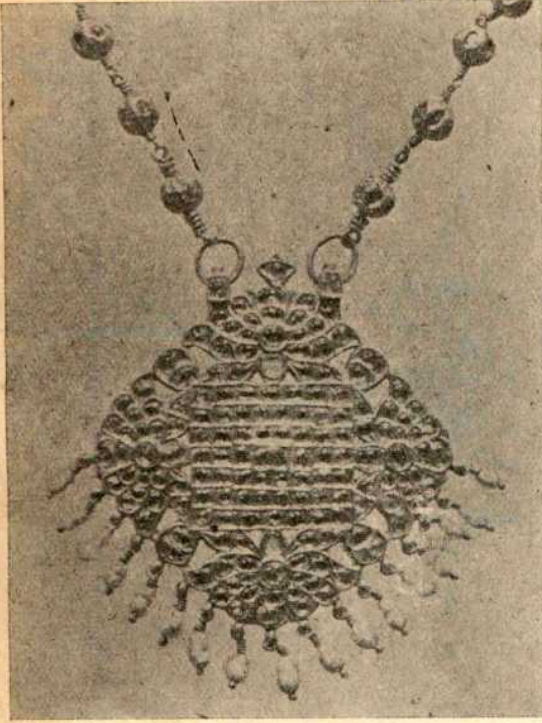
ধর্ম্মর হার। ত্রয়োদশ। বিশুদ্ধ
হিন্দু গহনার বিদেশী সংস্করণ

মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলায় অনেক প্রকার গহনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা অসম্ভব। কেননা এক্ষেত্রে অনেক কিছুই এখনো আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞাত।

প্রথমতঃ, চিত্রের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞাত শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত। সে সকল চিত্রের সময় ও কলারীতি (School) নিরূপণ সম্বন্ধে নানারূপ মত প্রচলিত, এবং সে সকল মতামতের কোনটি নির্ভুল তাহা বলা দুঃস্থ।

তবে মুঘল বাদশাহদিগের আমলের (আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজহান) কয়েকটি পুস্তক ও চিত্রসমষ্টি

(album) আছে, যেগুলির সময় ও শিল্পী নির্দেশ করা সম্ভব। সে সকলের মধ্যে সমন্বিত চিত্রসকলে সাময়িক গহনার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়।



দাক্ষিণাত্য (বা সিংহল?) স্বর্ণময়
রত্নাকমাল ও মণিমুক্তাখচিত পদ্মক।
খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে নির্মিত।

এই সকল পুস্তকের মধ্যে, সম্রাট আকবরের আদেশে অনূদিত পারসীভাষায় লিখিত মহাভারতের (রজম্নামাহ, Razmnamah) চিত্রই বোধ হয় এই সকল চিত্রের মধ্যে সর্ব প্রথম। ঐ পুস্তকে নানা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রাবলী আছে, তন্মধ্যে কয়েকজন হিন্দু ও অল্প সকলে নানাদেশীয় মুসলমান। ইহা ভিন্ন আকবরনামাহ, বাকিয়াৎ-ই-বাবরি ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক ও চিত্রসমষ্টিও এই মূল সম্রাটের আদেশে চিত্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

আকবরের পরে জাহাঙ্গীর ও তাহার পর শাহজহানও অনেক চিত্রকরকে রাজ-অঙ্গুগ্রহে উৎসাহিত করিয়া-

ছিলেন ও ইহাদের সময়ের অনেক চিত্রসমষ্টি এখনো এদেশে ও বিদেশে রহিয়াছে।

এই সকল চিত্রের মধ্যে যাহা কিছু হিন্দু শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত, তাহা হইতে সে সময়ের এদেশীয় গহনা-শিল্পের বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। দুঃখের বিষয় ঐ সকল চিত্রের মধ্যে যাহা কিছু জ্ঞাত তাহার অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এদেশে কি আছে বলা যায় না। কারণ এদেশের রাজস্ববর্গের অধিকারে যাহা কিছু আছে তাহা এদেশীয় জনসাধারণের চক্ষুর অগোচর। বিদেশীয়ের নিকট—বিশেষে ইয়োরোপীয়ের নিকট—তাহার প্রকাশ সহজেই হয়। সুতরাং ঐরূপ চিত্রের পরিচয় লাভের একমাত্র উপায় বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত ঐ সকল প্রামাণিক চিত্রের প্রতিক্রম দর্শন।

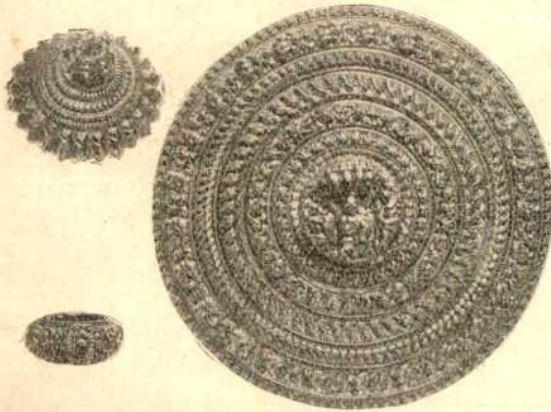
ঐ উপায়ে ভারতীয় গহনার কিছু পরিচয় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে, জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতীয় গহনায় বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার বিশেষ হয় নাই। যথা, রজম্নামাহতে দেখা যায় যে (Jeypore Memorials) বিস্তৃত হিন্দু গবযুক্ত গহনার মধ্যে গ্রথিত ও মুক্তা-শোভিত হার, কঙ্কণ ও বাজু ইত্যাদি তখনও প্রচলিত ছিল। রাজকুমার খুররমের (পরে শাহজহান) বিবাহের চিত্রে গায়িকাদিগের অঙ্গেও বিদেশী প্রভাবযুক্ত গহনা—যথা বিপর্যস্ত ত্রিকোণ (inverted triangle) আকারে রচিত-দুইটি মুক্তা উপরের দুই কোণে এবং নিম্ন কোণে মণিদোলক।—কর্ণের দোলক, যাহা প্রাচীন বাইজাঙ্গীয় গহনা—বা সম্পূর্ণ বিদেশীয় গহনা, যথা, নাসিকার অলঙ্কার বা পদাঙ্গুলীর অলঙ্কার বিশেষ, ইত্যাদির প্রচলন তখনও হয় নাই। জাহাঙ্গীরের সময় হইতেই বিদেশীয় (মুসলমানী) প্রভাব গহনা শিল্পে বিশেষ লক্ষিত হইতে থাকে।

নাসিকার গহনা যে বোধ হয় হিন্দু নহে এইরূপ মন্তব্য গতমাসের প্রবাসীতে “গহনা” প্রবন্ধে লিখিত হইবার পর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লেখককে বলেন যে, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় N. B. Divatia নামক একজন লেখক ঐ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সন্ধান পাইয়া লেখক ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উহা ১২২৪খৃঃ

বক্সয় এনিয়েটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (The Nose ring as an Hindu Ornament, by N. B. Divatia, B A, C S.)। এই প্রবন্ধ লেখক বলেন যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নথের কোনও বর্ণনা তিনি পড়েন নাই এবং তাঁহার বিশ্বাস যে, এই গহনা মুসলমান কর্তৃক এদেশে আনীত হইয়াছে। তাহার প্রমাণে তিনি দেখাইয়াছেন, যে, এই গহনার প্রচলিত নাম প্রায় সকলই মুসলমানী (আরবী, পারসী ইত্যাদি) শব্দ হইতে উৎপন্ন। দিভাটিয়া মহাশয় আরও বলেন, যে, হিব্রু ও

বর্তমান লেখকের সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য। পারসী, আরবী, ইত্যাদি ভাষায় কিছুমাত্রই অধিকার নাই। সুতরাং বিগত মাসের প্রবন্ধে “নাসিকার গহনা বোধহয় হিন্দু নহে” এইরূপ সাবধান মন্তব্য (guarded statement) করিতে হইয়াছিল। দিভাটিয়া মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে লেখকের ধারণা নিঃসন্দেহ হইয়াছে।

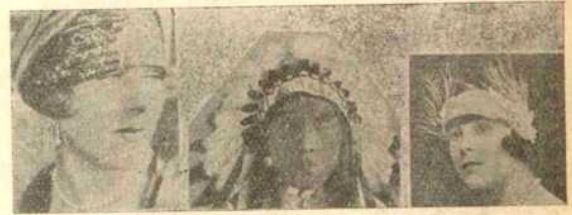
যে সকল প্রমাণ পাইয়া, নাসিকার গহনা হিন্দু নহে, লেখক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।



অঙ্গুরী ও শির-অলঙ্কার। বোধাই।

মিডিয়ানাইটিদিগের মধ্যে (মিডিয়ানাইট পুরুষদিগের পর্য্যন্ত) নাসিকার গহনার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এরূপ কথা ডি কুইন্সির “হিব্রু মহিলার প্রসাধন” (De Quincey, “Toilette of the Hebrew Lady”) নামক পুস্তকে আছে। তিনি আরও বলেন যে, যদিও অনেকে বলেন পারস্য দেশের ভাষায় বা সাহিত্যে নথ-জাতীয় গহনার উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, আসফ-উল-লুগত (Asaf-ul-lugat) এবং গয়াসউল লুগত (Gayas-ul-lugat) এই দুই পারসী অভিধানেই এরূপ গহনাবাচক শব্দ রহিয়াছে এবং তাহা আরবী বা তুর্কি ভাষাজাত বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব দিভাটিয়া মহাশয়ের মতে নথ বা ব্লাক মুসলমান কর্তৃক আনীত গহনা।*

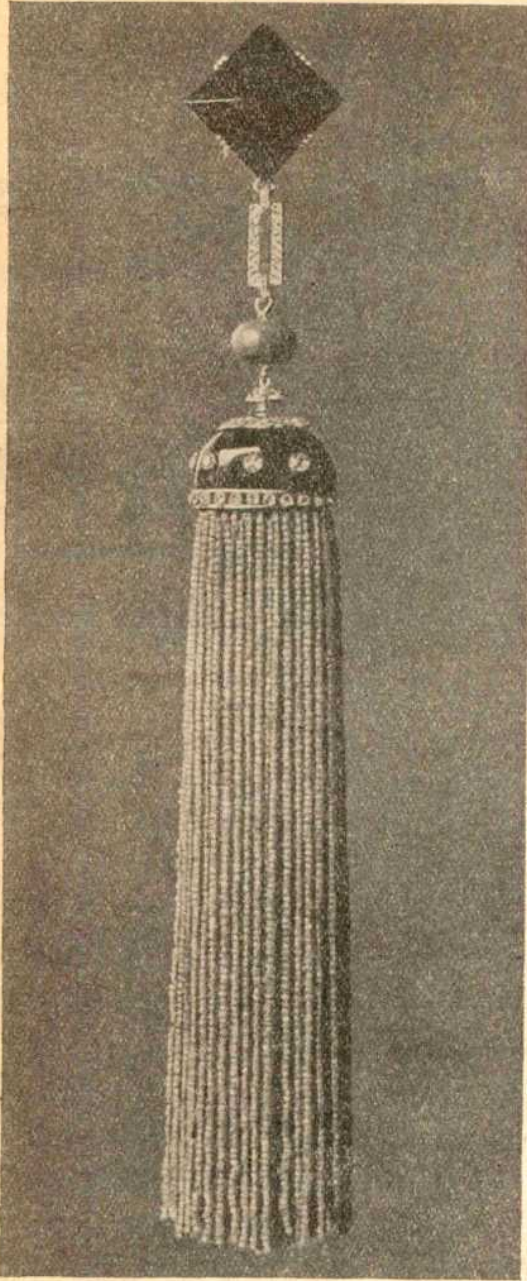
* শোনা যায় যখন শিল্পচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “গনেশজয়নীর” চিত্র প্রকাশিত হই, তখন স্বর্গীর বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐগণেশজয়নীর নাকে নথ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা আর্থ্য অলঙ্কার নহে।



আধুনিক শিরসজ্জা। সভ্য ও অসভ্য।
ভিন্নরূপে লোকাঃ।

অমরকোষে প্রত্যেক অঙ্গের গহনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। নাসিকার গহনার নাই।

অর্থশাস্ত্রে মণিমুক্তারচিত নানা অঙ্গের গ্রথিত গহনার বিবরণে, শিরঃদেশ, মণিবন্ধ, গলদেশ, কটি, গুল্ফ ইত্যাদি অঙ্গের উল্লেখ আছে; নাসিকার নাই। দিভাটিয়া মহাশয়ের মতে সংস্কৃত কাব্য বা অভিধান সকলেও নাই। অজ্ঞাটাগুহাচিহ্নাবলির মধ্যে নাসিকার গহনার নিদর্শন নাই (Griffiths' Ajanta, and Lady Herringham's Ajanta)। সাঁচি, ভারুট, অমরাবতী, এলুবা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, উদয়গিরি খণ্ডগিরি, মথুরা, কান্‌হেরি, দেওগড়, বেঙ্গনগর, বাদামি, এলিকাটা, মামলাপুরম, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক, এই কয়টি স্থানের ভাস্কর্য্য-শিল্পের মধ্যে নাসিকার গহনার নিদর্শন নাই। অন্ততপক্ষে Archaeological Survey of India কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলির মধ্যে, এবং কুমারস্বামী, William Cohn, Vincent Smith, Havell, Fergusson প্রমুখ সুদীর্ঘ লিখিত পুস্তকাবলির



বুকের গহনা। অত্যাধুনিক প্যারি ক্যাসন। প্রবাল, মুক্তা, হীরা ও অনিঙ্গ (স্বল্পমূল্য কৃষ্ণ উপরত্ন)

মধ্যে, সে সকল স্থানের ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপে যে সকল চিত্র আছে, সেগুলিতে নাসিকার গহনা নাই।

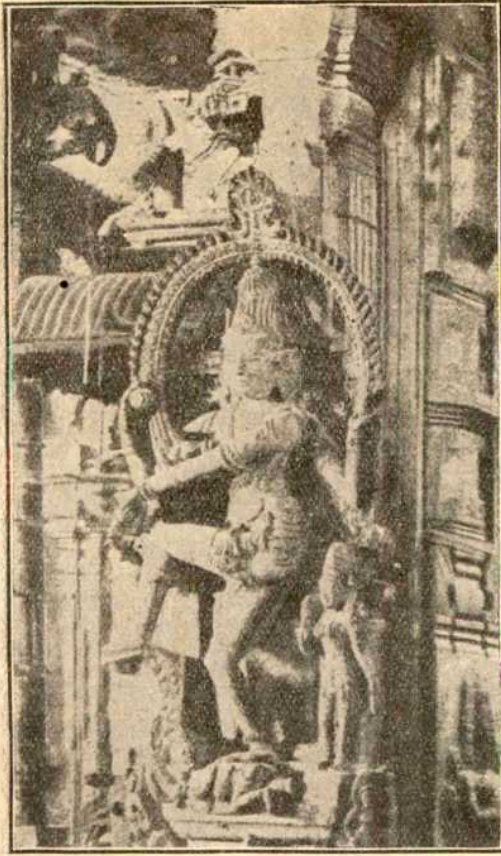
রজমুনমাহব চারখানি চিত্র লেখকের দৃষ্টিগোচর

হইয়াছে। সে কয়টি হিন্দু শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত এবং তাহাতে জীমূর্তিতে নাসিকার গহনা নাই। “রাজকুমার খুররমের বিবাহ” চিত্রের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেক প্রাচীন হিন্দু চিত্র আছে যাহাতে অঙ্কিত জীমগুলী মধ্যে কাহারও নাসিকার গহনা নাই, যদিও অত্যাধুনিক যথেষ্ট গহনা রহিয়াছে।

নাসিকার গহনা যে মুসলমান কর্তৃক আনীত তাহার প্রধান প্রমাণ দিভাটিয়া মহাশয়ের উল্লিখিত De Quincey লিখিত পুস্তকে (Toilette of the Hebrew Lady) সেমিটিক জাতির মধ্যে নাসিকার গহনার কথা (আরব দেশে মুসলমান ধর্মের জন্ম এবং আরবরা সেমিটিক জাতি)। Old Testamentএ নাসিকার গহনার উল্লেখ আছে বলিয়া লেখকের ধারণা আছে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার না দেখা পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। আরব ও মিশর দেশের নানাজাতির মধ্যে নানা প্রকার নাসিকার গহনার প্রচলন এখনও আছে, ইহা লেখক কর্তৃক স্বচক্ষে মিশর দেশে দৃষ্ট হইয়াছে। পারস্য দেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকর শাপুর (Shapur) কর্তৃক অঙ্কিত মুহাম্মদ তুঘলকের রাজসভার একটি চিত্রে প্রত্যেক নর্ত্তকীর নাসিকায় গহনা আছে, (অতএব নাসিকার গহনার প্রচলন ঐ সময়ে ঐ দেশে ছিল) যদিও তাহার অনেক পরবর্ত্তী কালে (আকবরের আমলে) এদেশে হিন্দু চিত্রকর অঙ্কিত চিত্রে নাসিকার গহনা নাই। জাহাঙ্গীরের ও তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের এদেশীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্রাবলীতে নাসিকার গহনা পাওয়া যায়। এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ের প্রায় সকল চিত্রে বিভিন্ন প্রকার অথ মুসলমান প্রভাবযুক্ত অলঙ্কারও দেখা যায়।

সুতরাং নাসিকার গহনা যে অহিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এদেশের গহনা-শিল্পে বৈদেশিক মুসলমানী প্রভাব বিস্তারের সময়, উক্ত নাসিকার গহনা সকলের প্রচলনের সময় দ্বারা নির্দেশ করাও বোধ হয় ভ্রাম্যক হইবে না।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদেশের গহনা সম্বন্ধে মাহুচিরমুঘল কাহিনীতে (Storia Do Mogor) কিছু কিছু



মাদুরা বৃহৎ মন্দির। নটরাজ মূর্তির উৎসর্গে নৃতন প্রকার গহনা।

পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের জ্যোতীষ্যের গহনার মধ্যে মাছুচি, কর্ণের গহনার বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই; এইমাত্র বলিয়াছেন যে, কর্ণের ছিদ্র অতি বৃহৎ (বোধ হয় বৃহৎ কুণ্ডল ধারণের জন্ত)। গলদেশে নানা প্রকার হার, পায়ে অধিশূন্য অলঙ্কার এই কয়টির কথা মাত্র তিনি বলিয়াছেন, নাসিকার গহনার উল্লেখ করেন নাই। অল্লবয়স্কাদিগের গহনার মধ্যে কটিদেশে হার, গুল্ফে ঘুঙ্গুর ও পদাদুলীতে আংটি ইহার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

দিল্লী রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের গহনার বর্ণনা মাছুচি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে দিয়াছেন। কিন্তু সে-বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন, কেন না বর্ণনার কিছু পরেই তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা

যায় যে, সেই মহিলাদিগকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তবে বোধ হয় তাঁহার বর্ণনা কতক অজ্ঞাত জ্যোতীষ্যদিগের গহনা দেখিয়া এবং রাজপ্রাসাদের বাদি-দিগের নিকট শুনিয়া লিখিত। বর্ণনা এইরূপ যথা—

“তাঁহারা দুই স্বস্ত্রে তিন ছড়া করিয়া মূতা ও গলাবন্ধের (scarf) আকারে গঠিত মণিহার পরেন। কণ্ঠ হইতে তলপেট (lower part of the stomach) পর্য্যন্ত অবলম্বিত, তিন হইতে পাঁচ ছড়া মূতার হার, তাঁহারা সচরাচর ব্যবহার করেন। সিঁথিতে এক পোকা মূতা



মাদুরা বৃহৎ মন্দির। নৃপতি তিরুমল্লের প্রীর সম্মুখে পরিহিত চল্লহার নাসিকায় গহনা আছে।

ও তাঁহার সহিত সংলগ্ন চল্ল, সূর্য্য বা তারার আকারে গঠিত গহনা পরিহিত হয়। এই গহনা অতিশয় মানানসই। তাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ছোট গোলাকৃতি গহনা (boucle—buckle)—যাহাতে দুইটি মূতার মধ্যে একটি

ছোট চুণীযুক্ত থাকে—ধারণ
বরেন। কর্ণে মহামূল্য মণি,
গলদেশে বৃহৎ মুক্তা বা মণির
মালা, এবং সর্কোপরি, বেস্ত্রে

মহার্য হীর, চুণী বা পান্নার থামীযুক্ত, অতি মূল্যবান গহনা
থাকে। বাজুতে দুই ইঞ্চি চোড়া বাজুবন্দ থাকে ;
বাজুবন্দ মণিখচিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে ছোট
ছোট মুক্তার খোপা সংযুক্ত থাকে। মণিবন্ধে মূল্যবান
বালা বা কঙ্কণ (bracelets) অথবা মুক্তার ছড়া পরিহিত
হয়। মুক্তার ছড়া নয় হইতে বারোবার ফের দেওয়া
থাকে। প্রত্যেক অঙ্গুলীতে মণিযুক্ত আংটি থাকে ;
কেবলমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটিতে মণির পরিবর্তে স্ত্রী একটি
মুকুর থাকে।

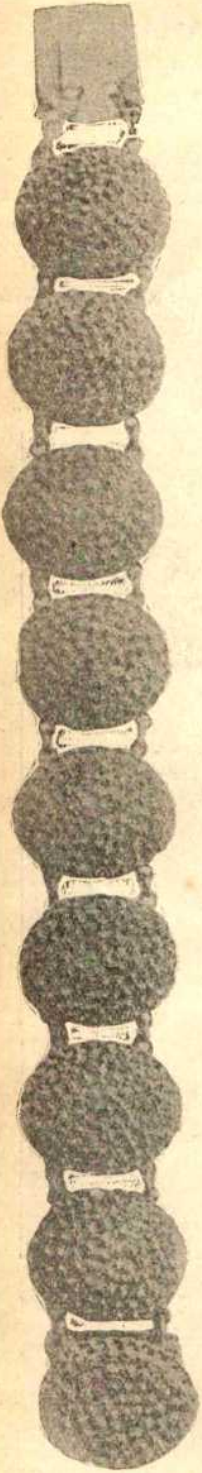
“তাহাদের কটিবন্ধ দুই অঙ্গুলী চওড়া, স্বর্ণময় ও বৃহৎ
মণিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের পায়জামার
(drawers) বন্ধনিস্থত্র সকলের মুখে পাঁচ অঙ্গুলি প্রমাণ
পনেরো ছড়া লম্বা মুক্তার গঠিত থোকা থাকে। গুল্ফে
মহার্য মল বা মুক্তার মালা থাকে।”

যাং হউক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে মুঘল ও
অন্য মুসলমানী গহনা ও গহনার পরিকল্পনার বিস্তার
সম্পূর্ণ হইল। এই সকল গহনার মধ্যে কতক খাটি
বিদেশী—যথা ব্লাক, বাইজাস্তায়ী ছল—এবং কতকের
জন্ম এদেশে কিন্তু পরিকল্পনা মুসলমানী।

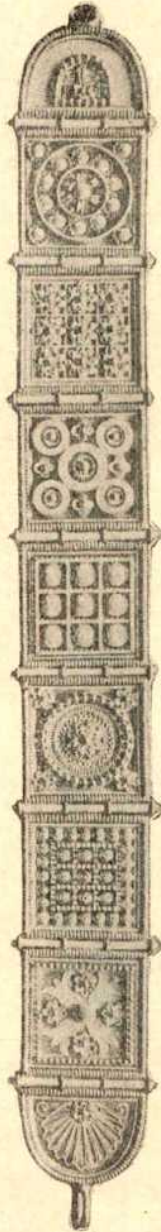
নূরজাহান সম্বন্ধে কিঞ্চিদন্তী আছে যে, তিনি শিল্পী
নিয়োগ করিয়া নূতন অনেক গহনার সৃষ্টি করিয়া
গিয়াছেন। হয়ত অন্য অনেক মুঘল অন্তঃপুরচারিণীও
এইপ্রকার গহনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

নূতন গহনার সৃষ্টি হউক বা না হউক, উত্তর ভারতে
মুঘল রাজধানী দিল্লী গহনা-শিল্পের পীঠস্থান হইয়া পড়িল ;
এবং ক্রমে, দিল্লী ও লাহোর হইতে শিল্পী লইয়া যাইয়া,
জয়পুর ও গহনা-শিল্পে—বিশেষে মণিকর্তন ও সংযোজন
এবং মীনা কার্যে—প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

দক্ষিণে মাদ্রাজ, সিংহল ও মহারাষ্ট্রের পুণা ইত্যাদি
কয়েকটা স্থলের গহনায় হিন্দুপ্রভাবের আধিক্য অনেক
দিন পর্য্যন্ত ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহার
কারণ এই সকল স্থলে হিন্দু রাজত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক দিন
ছিল। বোধ হয় এই সকল মধ্যযুগের হিন্দু রাজত্বের
মধ্যে বিজয়নগরই সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। হুংথের
বিষয় এই নগর ধ্বংসকাণ্ডে মুসলমান বিজেতা যেরূপ অসভ্য



পাছঁ চি (ব্রেসলেট) স্বর্ণময়।
দিল্লী।



ইতালীয় ব্রেসলেট
(Bracelet by
Castellani)

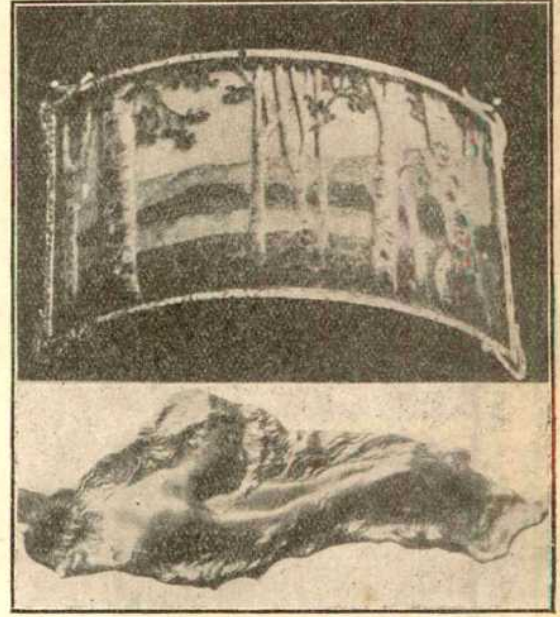
বকরোচিত পটুতা দেখাইয়াছিল, তাহা ভারতের চিতোরগড় ভিন্ন অত্র কোথাও তাহারা দেখাইয়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং যদিও ঐ জনপদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তথাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে ললিতকলা বা কলাশিল্পের নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই।

খৃঃ ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়, যাহার ফলে দেশে বিষম অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এদেশে যদিও বা আকবর জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বের মধ্যে ললিতকলা ও কলাশিল্পের পুনরুত্থান হইয়াছিল, এবং যদিও তাহা ধর্ম্মান্ধ আওরংজেবের বিদ্রোহ সঙ্ঘ করিয়া বাঁচিয়া থাকিত, এপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে তাহা অসম্ভব হইল। নূতনের সৃষ্টি এই প্রকার অত্যাচার ও অরাজকতার মধ্যে অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং পুরাতন যাহা কিছু ছিল, তাহার অধিকাংশ শতাব্দীব্যাপী লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্যের ফলে নষ্ট হইল। অল্প যাহা রক্ষা পাইল তাহা ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশে বিভক্ত হইয়া এদেশে ও বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে যে সকল ললিতকলা ও গহনা-শিল্পের সম্পদ মুঘল রাজধানী দিল্লী ও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রাদেশিক রাজধানী সকলে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা সুদূর পারস্য দেশ পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইল।

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে যে সকল স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হয় সে সকলে মুঘলদিগের সংগৃহীত ধনের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা রক্ষিত হয়। কিন্তু সে সকল রাজত্ব আবার বৈদেশিক বিজেতা কর্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। ভরতপুর, অধোধ্য, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, লাহোর, মহারাষ্ট্র-রাজধানীসকল, হায়দরাবাদ, মহীশূর, ইত্যাদি সকল স্থানই ধনলুপ্ত ইয়োরোপীয় যুদ্ধব্যবসায়ী বা বণিক-সম্প্রদায় ও তাহাদের নিযুক্ত সেনানী দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রাচীন গহনা-শিল্পের নিদর্শন যে এদেশে এতই বিরল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ধনরত্ন লুণ্ঠিত হওয়ায় এদেশের অতি নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজ্ঞতার অবহেলা ও অবজ্ঞা, ও তদপেক্ষা সাংঘাতিক বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার, এই সকল কারণে এদেশে শিল্পের যে ক্ষতি ও অবনতি হইয়াছে

তাহাও অতি প্রচণ্ড। এই হিসাবে ইংরাজ ও অগ্ন্যন্ত ইয়োরোপীয় জাতি আমাদের ধ্বংস ক্ষতি করিয়াছে মুসলমান বোধ হয় ততটা করে নাই। কারণ মুসলমান জাতি সকল যখন এদেশে প্রবেশ করে তখন শিল্প ও ললিতকলা ইত্যাদিতে এদেশে সমৃদ্ধিশালী, বিজ্ঞতার, যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন অত্র কোন বিষয়ে, তাহাকে শিক্ষা দান করি-

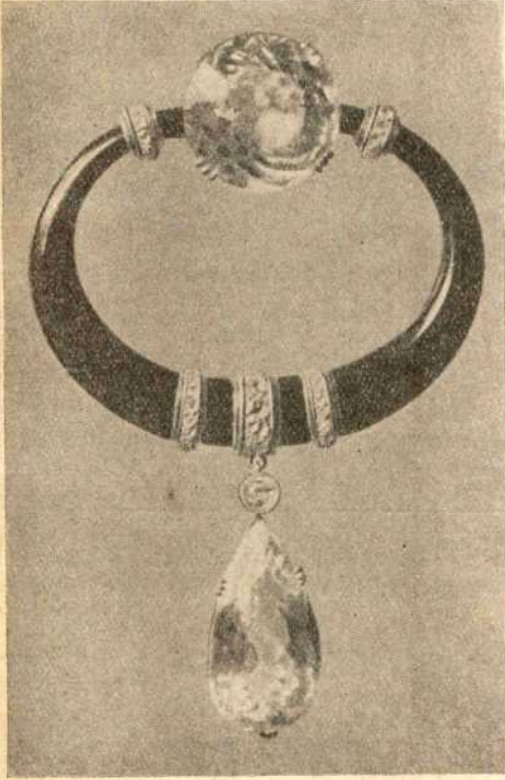


অত্যাধুনিক জর্ডান গহনা। উপরে মিনাচিত্রাঙ্কিত কঙ্কণ (Bracelet) নীচে ব্রীমুর্তি উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় ক্রস। (relief work in gold)

বার ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না, কিন্তু ইয়োরোপীয়েরা যখন বিজয় আরম্ভ করে তখন এদেশে বহুগুণ বহুশতাব্দী-ব্যাপী লুণ্ঠন, অত্যাচার ও বিপ্লবের ফলে অতি দীন দরিদ্র গতগোরব হতশ্রী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্বপভা ইয়োরোপীয়ের পক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

এই অবজ্ঞার ফলে এদেশের শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি অনাদৃত ও নষ্ট হইতে থাকে; এবং তাহার বিনাশে দুঃখ করিবার কেহই ছিল না। কারণ, যদিও তাহা আমাদের নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু বিদেশী বিজ্ঞতার মতামত প্রচারের ফলে আমাদেরই এই বিশ্বাস জন্মায় যে উহা সম্পদ নহে, আবর্জনা মাত্র। এইরূপ মত

প্রচারের মূলে বিদেশীর স্বার্থও ছিল—এবং এখনও আছে—ইহা কেবলমাত্র অবজ্ঞা-প্রসূত নহে। কেননা ইয়োৰোপীয়েরা মুঘলদিগের দ্বারা এদেশে বসবাস করিতে আসে নাই, সুতরাং এদেশের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বিস্তারের জন্য শিল্প ও কলাবিদ্যায় উৎসাহ প্রদানের কারণ রূপ যাহা কিছু স্বার্থ মুঘলদিগের ছিল, তাহা ইহাদের নাই। ইহাদের উদ্দেশ্য, স্বদেশজাত স্থলভ ও অপকৃষ্ট শিল্প ও পণ্য দ্রব্যাদির বিনিময়ে এদেশের স্বভাবজাত ধনসম্পদ আহরণ



“প্যারিক্যানন” অত্যাধুনিক। স্বল্পমূল্য ও বহুমূল্য উপকরণের সংমিশ্রণ (Fibule-onyx, aquamarine and brilliants)

করা। ফলে এদেশের শিল্পের অবনতি ইয়োৰোপীয়দিগের আমলে অতি দ্রুত হইয়াছে। গহনাশিল্পে যে এই অবনতি চরমে পৌঁছিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আদিত্যে অবিমিশ্র হিন্দু গহনাশিল্প কিছু ছিল কিনা এখনো বলা যায় না। আসীরাণীয় বা গ্রীক প্রভাব গহনা শিল্পে প্রবেশ করিয়াছিল কি না এবং করিলে কখন ও কতটা প্রবেশ করে, তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু ইহা সত্য যে,

অজুগা হইতে কোনার্ক ভূবনেশ্বরের সময় পর্য্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চদশ শতাব্দী বা ততোধিক কাল ধরিয়া ভারতীয় গহনাশিল্পের একটি ধারা চলিয়াছিল যাহার মধ্যে পরিকল্পনা, কারুকার্য্য, গঠন-বিশ্রাস, বা শিল্প-কৌশল, সমস্তই এদেশের শিল্পীগণের উদ্ভাবিত।

মুঘলদিগের সময় এই শিল্পের পুনরুত্থান হয়, যদিও তখন আর তাহাতে বিশুদ্ধ হিন্দুভাব ছিল না, এবং ইহা সম্ভব যে, আকবর হইতে শাহজহান পর্য্যন্ত মুঘলসম্রাটগণ ঘেরূপ রূপরসাহুরাগী ছিলেন, পরবর্ত্তী সম্রাটেরা সেরূপ হইলে এবং ঐ সম্রাটগণের দ্বারা সাম্রাজ্যরক্ষায় ও প্রজাপালনে সক্ষম হইলে, হয়ত ভারতীয় গহনা এবং অল্প কলাশিল্পে নব্য মুঘল ও প্রাচীন হিন্দু এই দুই প্রভাবের মিশ্রণে একটি নূতন ধারা আসিত, যাহার ফলে প্রাচীনই নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিজগুণে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় গহনাশিল্পের অবস্থা কি? কবির কথায় তাহার উত্তর—

“গতগৌরব, হৃতআসন, নতমস্তক লাজে”

কোন গহনাটি বিশুদ্ধ হিন্দু, কোনটি বিশুদ্ধ অহিন্দু, কোনটি বা উভয়ের মিশ্রণসম্মত, তাহার খবর যাহারা এদেশের ললিতকলা ও শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী, তাঁহারা পর্য্যন্ত রাখেন না।

কোন বাংলা মাসিক পত্রে জর্জেনক লেখক—ঘিনি ললিতকলা সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন—কথাপ্রসঙ্গে “শ্রীরাধিকার নাকের নোলক” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

শ্রীরাধিকা এখনো ঐতিহাসিকের অধিকারে আসেন নাই, তিনি এখনো কবি ও ভক্তের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বংশাহুকুম ইত্যাদি, নীরস ভূগোল বা জাতিভেদের নির্দেশের মধ্যে আসে নাই, কিন্তু ইহা বোধ হয় বলা যায়, যে যদি তিনি স্নেহ বা অনার্য্য-বংশোদ্ভবা না ছিলেন, তবে নোলকজাতীয় কোন গহনা তাঁহার রূপলাবণ্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।

এখনো আমাদের দেশে বিদেশীর অমুকরণই শ্রেষ্ঠতার পরিচয়, যদিও ক্রমে অতি দীর্ঘ সে মতের পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মত এ-

বিষয়ে কি তাহা বোধ হয় নিম্নলিখিত (গ্রাম্য ?)
“আগমনী” গানে প্রকাশ পায়।

“বাপের বাড়ী আস্বে উমা চড়ে এবার জুড়ী গাড়ি।”
“অর্ডার দেব হ্যামিল্টনে (!) গড়বে গয়না নিউ ক্যাশনে”
“নেকলেস দেবে পাল’ সেট করা, হাতে ডায়মন কাটা
চুড়ি।”

যদি কেহ ইহা অবিখ্যাস করেন ত তিনি যে কোন
ধনীগ্রহের ললনার অলঙ্কার দেখিয়া আসুন। তিনি
দেখিবেন যে গহনার মধ্যে—

শিরে :—টায়রা (ফিরিঙ্গি বিলাতী) খোঁপায় কাঁটা
বা চিরুণি (বিলাতি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত গঠনের
অনুসরণে প্রস্তুত)।

কর্ণে :—ঘিছদি মাকড়ি (জাতিনির্দেশ নিম্নপ্রয়োজন),
ইয়ারিং (এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান), ড্রপ (তথৈবচ), ছল
(মুসলমানী) এবং যদি কর্ণফুল থাকে তবে সেটা হিন্দু
হইলেও হইতে পারে।

নাসিকায় :—নোলক, লবঙ্গ, বেসর, “গৌড়া হিন্দু
বাড়ি” হইলে নথ, ইত্যাদি সকলই মুসলমানী।

গলায় :—নেকলেস (প্রাচীন, কুৎসিত ও পরিত্যক্ত
বিলাতি গঠন) মুক্তার কলার (বিলাতি)। মফ্ চেন
ইত্যাদি (বিলাতি)।

বাহুর উপরিভাগে—বাজুবন্দ (হিন্দু গহনা কিন্তু
মুসলমানী ধরণে প্রস্তুত), তাগা (ঐ), অনন্ত (হিন্দু কিন্তু
“ডায়মন কেটে জাত মারা”)।

মণিবন্ধে—ব্রেসলেট (৬০ বৎসর আগেকার বিলাতি),
ডায়মন কাটা চুড়ি (ঐ), বালা (হিন্দু কিন্তু বিলাতি
কারুকার্যের দরুণ জাতিচ্যুত)।

অঙ্গুলিতে—অঙ্গুরী (রিং বলা উচিত কেননা
বিলাতি হিসাবে প্রস্তুত)।

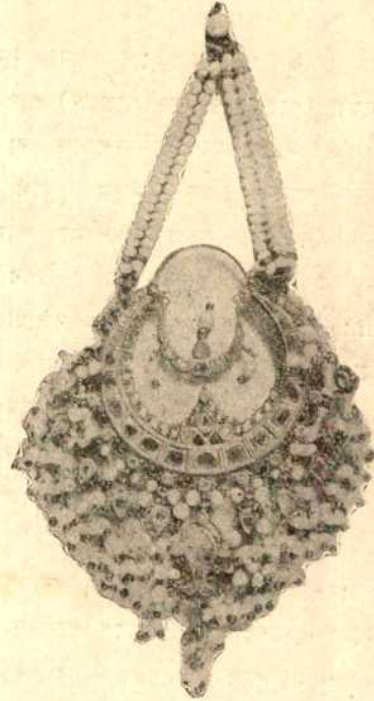
কটিদেশ—আধুনিক হইলে শূন্য। নহিলে অতি
আদিম কদম্ব্য মিশ্রজাতীয়, “টাকার পরিচয়” স্বরূপ স্থল
গোট বা চম্ভহার। অথচ প্রাচীনকালের ভারতীয়
কটি-অলঙ্কার অতি সুন্দর।

গুল্ফে—যদি হিন্দুয়ানি ও বয়স থাকে তবে এই খানেই

একমাত্র অতি প্রাচীন ও আদিম হিন্দু গহনা “মল” বিরাজ
করে।

আবার যদি জড়োয়া গহনা হয় তবে প্রত্যেকটি মণি
ইয়োরোপে, ও ইয়োরোপীয় প্রথা, কল্পিত এবং হয়
মুসলমানী নয় বিলাতী প্রথা সংযোজিত।

সুতরাং ইহা অনায়াসে বলা যায় যে পরিচ্ছদ হিসাবে
নব্য ভারতের পুরুষ যতটা বিদেশী ভাবাপন্ন, নব্য
ভারতমহিলাবৃন্দ গহনা হিসাবে তাহা অপেক্ষা অনেক
অধিক বিদেশী প্রভাবযুক্ত।



দিল্লীর জড়োয়া ছল।

স্বর্ণ, মুক্তা এবং কোণপূর্ণ্য মণি সংযোজন

এই বিষয়ে আরও অল্পত ব্যাপার এই, যে উক্ত বিদেশী
গহনা সকলের যে সকল দেশে জন্ম, সে সকল দেশে সে-
গুলির অধিকাংশই বহুকাল যাবৎ পরিত্যক্ত বা রূপান্তরিত
হইয়াছে। এদেশের শ্রেষ্ঠ “জুয়েলার” বলিয়া ধাহারা
পরিচিত তাঁহাদের সচিত্র গহনা-তালিকাগুলি তন্ন তন্ন
করিয়া দেখিলে একটিও আধুনিক পরিকল্পনায় রচিত
গহনার চিত্র দেখা যায় না।

ইহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে—এদেশে সকল বিষয়েই জনসাধারণের রূপরসজ্ঞান অতি নিম্নস্তরে নামিয়াছে সুতরাং শিল্প কার্যের যাচাই, উপকরণের মূল্য ঘরাই হইয়া থাকে। মোটামুটি একটা জাতি-বিচারও হয়, তাহা জিনিষটা দেশী (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) বা বিলাতী (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) এই সম্পর্কে।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে (শ্রাবণের প্রবাসীতে) এই-রূপ অবস্থার বিচারে বলা হইয়াছে যে, ইহার কারণ এ দেশের শিল্পকলায় সজীব, জাগ্রত ভাবের বা প্রাণের অভাব।

বস্তুতঃই চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে অলঙ্কার শিল্পের (ও অণু শিল্পেরও) প্রাণ-বিয়োগই ঘটিতেছে। এই সময়ের মধ্যে বিদেশজাত বা বিদেশী প্রভাবজনিত অনেক কিছু নূতন পদার্থ এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু সে সকল নিদর্শনের আসার ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। মুমূর্ষু রোগীর উপর উত্তেজক (stimulant) প্রয়োগের ফলে সাময়িক বলাধানের ছায়া সে সকল দ্রব্য এদেশীয় শিল্পীর ক্ষণস্থায়ী আর্থিক উন্নতি-মাত্র করিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী এই কারণে, যে, বিদেশী দ্রব্যের অঙ্ক অঙ্করূপ মাত্র এদেশে হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শিল্পীর পরিকল্পনার বা রচনা-কৌশলের মৌলিকত্ব অধিকারের কোনও চেষ্টা হয় নাই।

মুঘল বাদশাহদিগের সময়ে পারস্য, তাতার, আরব ইত্যাদি নানা দেশের গহনা এদেশে প্রচলিত হয়, কিন্তু সেদেশীয় গহনা-শিল্পের পরিকল্পনা বা রচনাবৈচিত্র্য এদেশের শিল্পী স্থায়ীভাবে গ্রহণ বা অধিকার করিতে পারে নাই। হুমায়ুন বাদশাহের মহারানী, ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান, ইহারা বিদেশ হইতে কারিগর আনাওয়া গহনা নির্মাণ করান। ভারতীয় কারিগর তাহা দেখিয়া “যদ্রুৎ তল্লিপ্তিতং” মতে তাহার অঙ্ক অঙ্করূপ করিয়াছে। সে গহনাব দোষ গুণ বিচার, তাহা কোন প্রথাভূসারে পরিকল্পিত ও রচিত, তাহার রচনায় বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহার উৎকৃষ্টতর নিদর্শন প্রস্তুত করিতে হইলে কিরূপে পরিকল্পনা করা উচিত, বিদেশীয় কারিগরের গহনা নির্মাণ প্রথার মধ্যে গ্রহণ বা পরিত্যাগ-যোগ্য কি আছে, এ সকল

তত্ত্বের অল্পসন্ধান বা ইহাতে অধিকার লাভের চেষ্টা কোনটাই সে করে নাই।

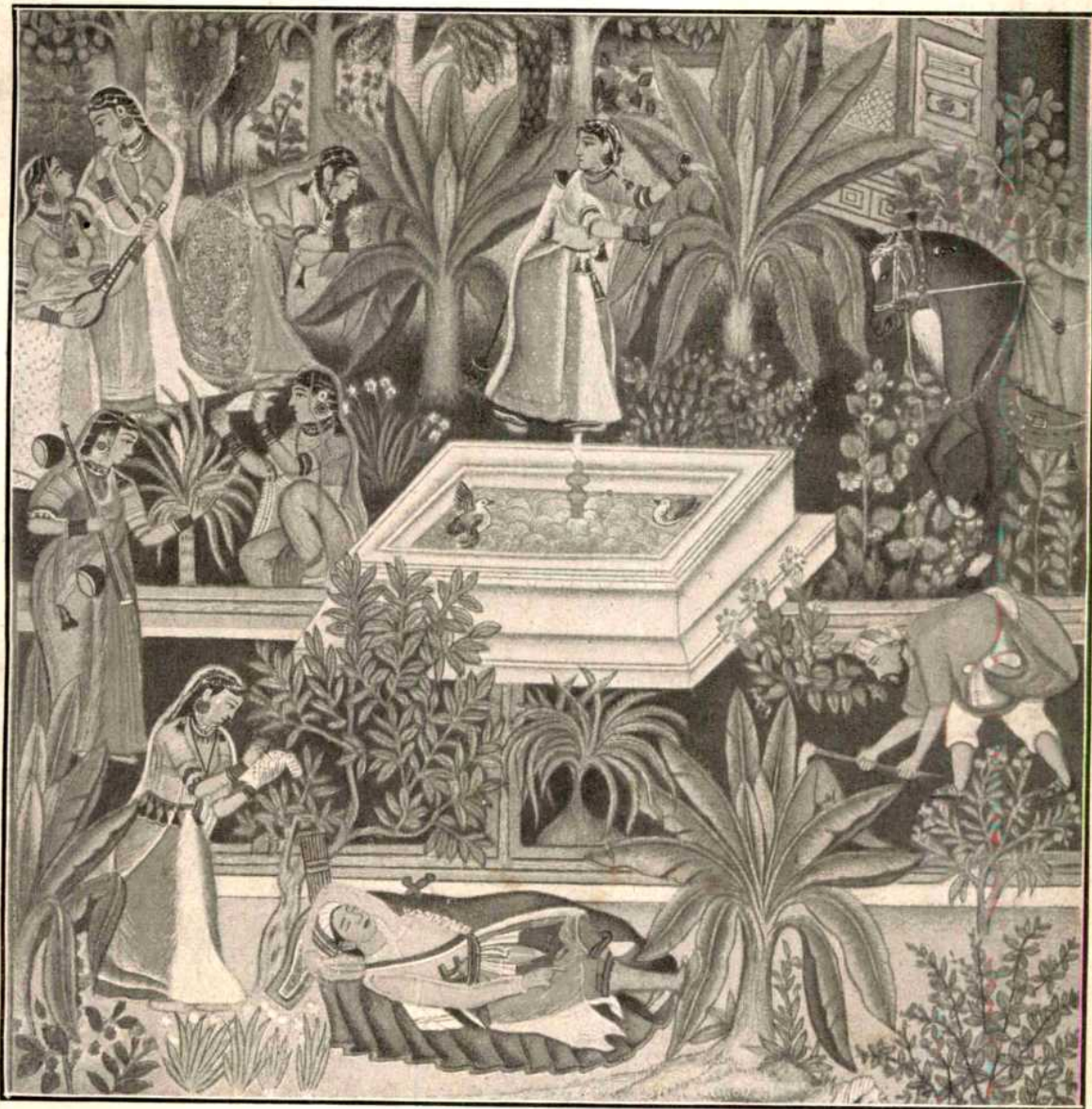
ফলে এ দেশের গহনাশিল্পী বিদেশী শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন মাত্র পাইয়াছে, বিদেশী শিল্পের প্রভাব বা জ্ঞান কিছুই পায় নাই। *

এখন এদেশে সকল শিল্পেই ইয়োরোপীয় আদর্শ, রীতি ও মতবাদের সজ্জ্ব চলিয়াছে, যাহার ফলে ক্ষৌণ্ণপ্রাণ হিন্দু শিল্পকলার সম্পূর্ণ নিকর্ণণ আসন্ন। বিদেশী শিল্প যে তাহার স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নহে, কেন না প্রথমতঃ তাহা শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তৎপরে দেশীয় শিল্পের ও শিল্পীর এতই অবনতি হইয়াছে যে, বিদেশীয় রীতি বা পদ্ধতি শিক্ষা দূরের কথা, বিদেশীয় নিদর্শনের যথাযথ অঙ্করূপও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

শিল্প ও শিল্পীর এরূপ অবস্থা হওয়ার প্রধান কারণ এই, যে, এদেশে রূপরসজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। শিল্প কলা কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কয়জনের মনে আনন্দ আনে? উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, মৌলিক পরিকল্পনা ও অঙ্ক অঙ্করূপ, এই সম্বন্ধে প্রভেদ বিচার, শিল্পীর পোষক স্থানে যাহারা আছেন তাহাদের মধ্যে, লক্ষে কয়জনের আছে?

স্থাপত্যকলার অলঙ্কার প্রসঙ্গে রবিন্সন বলিয়া গিয়াছেন :—“অলঙ্কারের রম্যতার দুইটি কারণ আছে, প্রথম তাহার রূপ ও গঠনসৌন্দর্য্যরূপী সূক্ষ্ম গুণ, দ্বিতীয় তাহার রচনা ও নির্মাণ ব্যাপারে মানবের যত্ন ও প্রয়াসের পরিচয়।.....ইহার নির্মাণ কালে কতবার কত চিন্তা, কত ইচ্ছা, কত ব্যর্থ চেষ্টা ও মর্মান্তিক হতাশ, ও সর্বশেষে আশা ফলপ্রসূ হওয়ায়, কত স্নেহ ও আনন্দ, গিয়াছে ও আসিয়াছে, সে সকলের বিবরণ অলঙ্কারের প্রতি অংশে দেখাই তাহার আনন্দদানের প্রকৃত কারণ। বিচক্ষণের চক্ষের সম্মুখে তাহার এই ইতিহাস সহজেই প্রকট হয়। কিন্তু যদিই বা তাহা অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলেও কল্পনাসাহায্যে উহা অল্পমান করা হয়। কেননা

* নূরজাহান গহনা-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও নূতন মতাদি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন শোনা যায়। বোধ হয় তিনি অল্প মাত্রায় সফলও হইয়াছিলেন। কেননা পোষক ও পুরস্কর্তার (Patron) উপর এই শিল্পের উন্নতি বা অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।



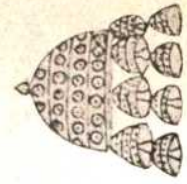
রজন্যামাহর একটি চিত্র । বিদ্যা ও চন্দ্রহাসের উপাখ্যান ।
তারা ও তুলসী কর্তৃক অঙ্কিত ।



মণিবয় কটিবন্ধ ও চন্দ্রহার। ভারতবর্ষ



জাহাঙ্গীরের শোভাযাত্রা। চিত্রকর মনোহর কর্তৃক অঙ্কিত।
১৬০৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। নাসিকার গহনার আবির্ভাব।
(মূল চিত্রের অংশমাত্র)

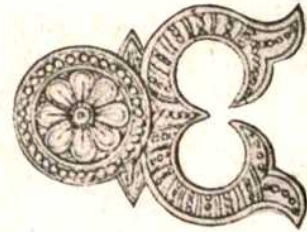


দোলক বা কুমক।



কুণ্ডল।

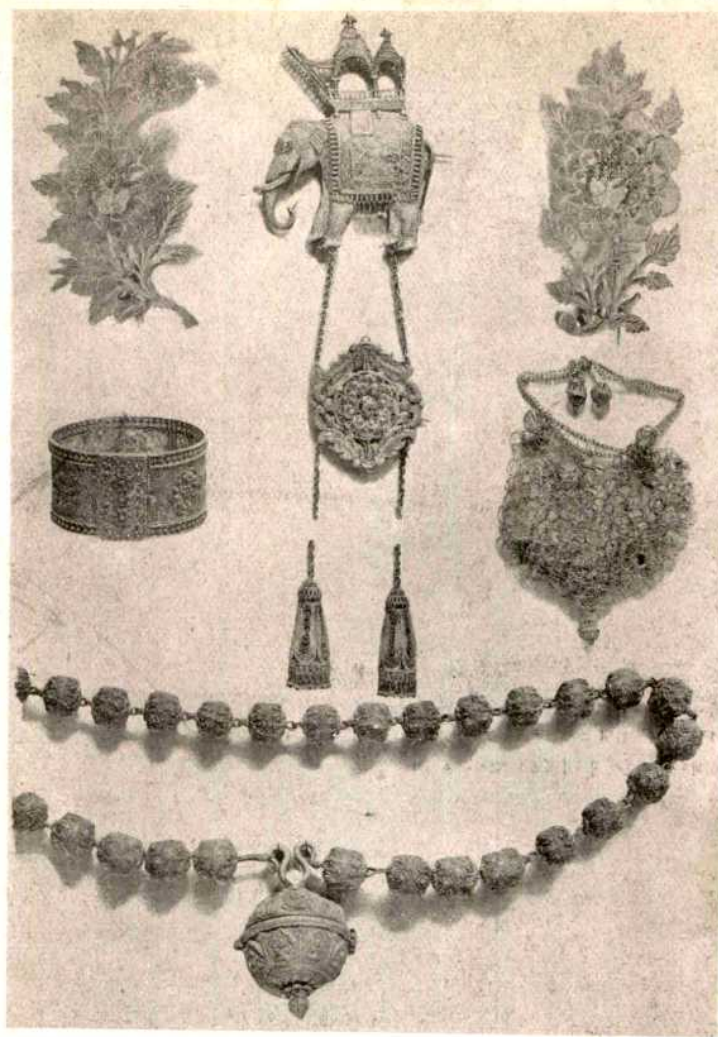
আটান বোজযুগের গহনা



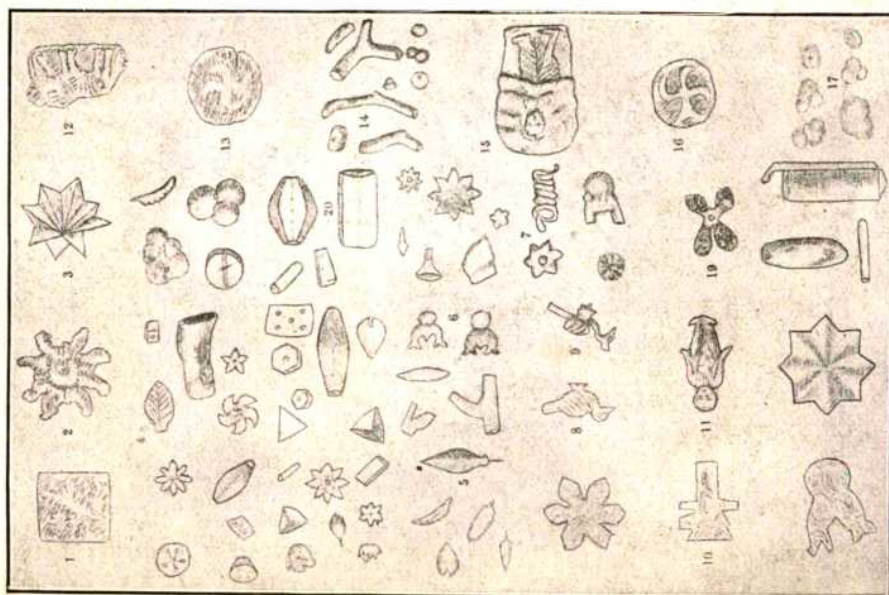
দোলক (locket)।



হিন্দু গহনা-পরিহিত আধুনিক বঙ্গমহিলা
(শিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেনের পরিকল্পনা)



উপরে তিনটি ক্রম (১ম শ্রেণীমুদ্রিত যুগ্ম ক্রম)—মাল্লাজ ও ত্রিবাঙ্কড়। মধ্যো কঙ্কণ ও টাকার খলি—মাল্লাজ। নিম্নে রত্নাক (খর্ব) মালা—মাল্লাজ



কাকুপে (Sakiya tope) আশু আচীন ভারতীয় গহনা (বাস্তব নির্দেশ)



রাজকুমার খুররমের বিবাহে গীতবাজ ইত্যাদি। ১৬১০ খৃঃ ভারতীয় গহনা।
নাসিকার গহনা নাই (মূল চিত্রের অংশমাত্র)।



সুলতান মুহাম্মদ তুগলকের সম্ভার নৃত্যগীতের চিত্র (খোরাসানবাসী শাপুর কর্তৃক অঙ্কিত)।
মুসলমানী গহনা। নাসিকার গহনা দ্রষ্টব্য (মূলচিত্রের অংশমাত্র)।

অগ্ন্যন্ত মহার্ঘ দ্রব্যের জ্বায় এই সামগ্রীটিরও মূল্য ঐ আয়াস প্রয়াস ও যত্নের দ্বারা নিরূপিত হয়। (Ruskin, The Lamp of Truth.)

অগ্ন্য এক স্থলে রক্ষিত বলিয়াছেন :—

“অত্যাৱশ্যক ভিন্ন এমন কোন দ্রব্যের নির্মাণে উৎসাহ বা সমাদর দিবে না যাহার পরিকল্পনায় বা নির্মাণে উদ্ভাবনী শক্তি বা কল্পনার কোনও স্থান নাই। অতীত-যুগের উৎকৃষ্ট কীর্ত্তির নিবর্ণন গঠন বা স্থতিরক্ষা ভিন্ন অগ্ন্য কোন কারণে অহুকরণের প্রস্তাব দিবে না।”

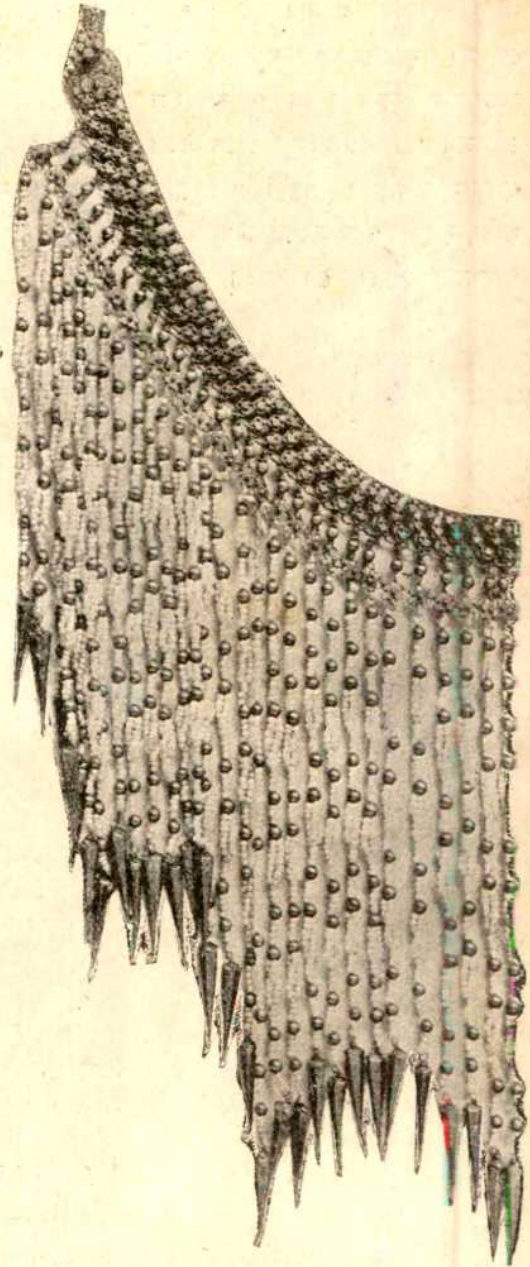
বিদেশে শিল্পী তাহার পরিকল্পনার জগ্ন্য যে-উপকরণ উপযোগী তাহাই ব্যবহার করে। উপকরণের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন তাহার নাই। কেননা তাহার নির্মিত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ রূপরসজ্ঞানের বিচারে হইয়া থাকে, স্বতরাং তাহার নিকট উপাদানের আপেক্ষিক মূল্যের কোনও সার্থকতা নাই।

আর এদেশে ? এদেশে সেইরূপ দ্রব্যের আদর বা মূল্য নিরূপণ হয় নিক্তি, বাজারদর ও কণ্ঠিপাথরের বিচারে। এখানে গিনি বা থাটি, চুণী বা পান্না, আটভরী বা দশভরী এই হিসাবে আদর কদর ও মূল্য স্থির হয়। শিল্পীর কল্পনা বা নৈপুণ্যের “রেট” বাধা আছে। “প্লেন” কাজে ৪, হইতে ৫ টাকা, “ডাইসের” কাজে কিছু বেশী, সে অতি সুন্দর, নিখুঁত, নূতন পরিকল্পনাই হউক বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের পাশ্চাত্য কদর্যা ফ্যাশনের অসংস্কৃত অনিপুণ জঘন্ট অহুকরণই হউক !

গহনা বিচারের কেবলমাত্র দুইটি নিক্ষ (test) থাকা উচিত। প্রথম, তাহা যিনি ধারণ করিবেন তাঁহার পক্ষে “মানানসই” কিনা, দ্বিতীয়, উহাতে শিল্পীর কল্পনা-বৈচিত্র্য বা কারুকৌশল কতটা আছে।

অর্থবল প্রদর্শনের জগ্ন্য যে গহনার সৃষ্টি তাহার মূল্যেই রুচির অভাব। তাহার নির্মাণ, ধারণ বা বিচার সবই মিথ্যা।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে (প্রাবণের ‘প্রবাসী’ দ্রষ্টব্য) এদেশে গহনার উপকরণের জাতি বিচারের বিষয় লিপিত হইয়াছে। ঐ লোকাচার অনুসারে এদেশে গহনা নির্মাণের উপকরণ সামান্য গভীর মধ্যে আবদ্ধ আছে,

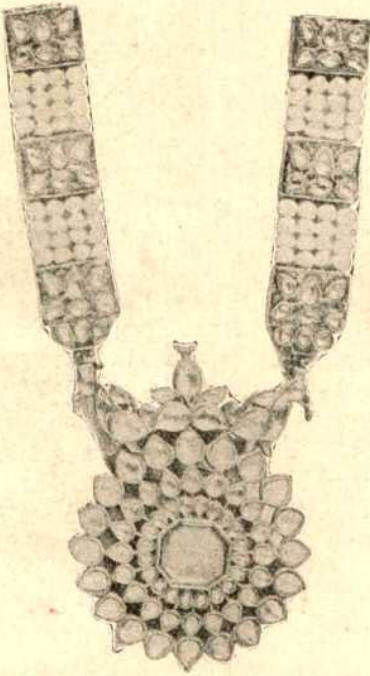


ব্রহ্মদেশের চন্দ্রহার। স্বর্ণ ও মুক্তা।
বিদেশে হিন্দু গহনার নিদর্শন।

ফলে শিল্পীর কল্পনা সীমাবদ্ধ হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা কিছু স্থায়ী ত্রী ও শোভা যুক্ত, যাহা কিছু অল্প আয়তনের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে সমর্থ, সে-

সকল পদার্থই গহনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য। মূল্য হেতুক অন্ধদেশাচার-নির্দিষ্ট এইরূপ জাতি-বিচারকে প্রকৃত শিল্পী ও রূপরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই হেয়জ্ঞান করা উচিত। বিদেশে ঐরূপ অন্ধবিচার নাই, সুতরাং তথাকার শিল্পীর পরিকল্পনায় হীরক ও মুক্তা শুক্তি, মুক্তা ও কচ্ছপের খোলা একত্রে স্থাপিত হইয়া পরস্পরের শোভা বর্দ্ধন করে।



কোণশূন্য মণি-সংযোজিত হার ও দোলক (ধুকধুকি),
দিল্লী

মণিমুক্তার এই জাতি-বিচারের ফলে লোকের রুচি এতই বিকৃত হইয়াছে, যে, মণিমুক্তা সংযোজন বা ব্যবহারের সহিত কলাকৌশল বা সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ যে-সকল জড়োয়া গহনা দেখা যায়, সে-সকলের মধ্যে শতকরা ৯৯টি দৃষ্টিকটু অশোভন, যথেষ্টভাবে সংযোজিত, এবং মণিসকলের আয়তন ভিন্ন অথ সকল গুণ নির্বিচারে সংস্থাপিত। “চোখ-ঝলসান” বা “তাক্লাগান” ভিন্ন অথ কোনও কারণে এইরূপ গহনার অস্তিত্বের সার্থকতা নাই। মণিসংযোজনে

আমাদের গহনাশিল্পের পূর্বকালের বিশেষত্ব সকল লোপ পাইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগহনাশিল্পে বহু কোণ, স্বল্প-কোণ, ও কোণবিহীন এই তিন প্রথায় কর্তিত মণিরই ব্যবহার ছিল। ফটিক-ভাবাপন্ন মণিমাত্রই যথাযথভাবে বহুকোণ সমন্বিত আকারে কর্তন করিলে তাহার জ্যোতিষ্করণ (glitter) ও প্রভা (radiance) বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এই জ্যোতি ও প্রভা উগ্র ও কঠোর; কোণশূন্য বা স্বল্পকোণ, ময়ূণ, পিণ্ড, বর্ন্তুল, ডিম্ব বা ফলক, ইত্যাদি আকারের মণির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি ও প্রভা তাহাতে নাই। কিন্তু এখন “লোক-দেখান”ই মণি ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং স্নিগ্ধ অপেক্ষা কঠোর উগ্রভাবেই সমাদর। গহনায় স্নিগ্ধতা বা কোমলতাবের যে কোনও সার্থকতা আছে, সে-বিচার কেহই করে না।

চিত্রাঙ্কনে যেরূপ মুহূর্ত্তে অত্যুজ্জ্বল সকল ছায়ার বর্ণ সমীচীন ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, অলঙ্কারেও সেইরূপ নানাবর্ণ ও ছায়াযুক্ত উপকরণ সকলের যথাযথ ব্যবহার কর্তব্য। এককালে এইরূপ নানাবর্ণ ও ছায়ার বিভিন্নভাবে কর্তিত মণির ব্যবহার দ্বারা অলঙ্কারের শোভাবর্দ্ধন কার্যের জ্ঞাত এদেশের গহনাশিল্পী ভুবন-প্রখ্যাত ছিল। এখন কেবল মাত্র উৎসাহদাতা ও পোষকের অভাবে এই শিল্প ও শিল্পী উভয়েই মরণোন্মুখ।

“ভারতীয় শিল্পীদের রচনা, কারুশৈলী ও কারুকার্য সম্বন্ধে এতই জ্ঞান আছে যে, অল্পপরিমাণ স্বর্ণ ও স্বল্পমূল্য মণিমুক্তার দ্বারা তাহারা অতি উচ্চশ্রেণীর অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে সমর্থ। পরিবর্তনায় রূপ, রুচি, শোভন ও অশোভনের সম্বন্ধ বিচার তাহাদের এতই সূক্ষ্ম, যে, প্রভূত পরিমাণ মণির ব্যবহার এবং অতি জটিল কারুকার্য থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারাদি নয়ন-সুখকর হয়। ইয়োরোপীয় গহনার তুলনায় তাহাদের গহনার এই বিশেষত্ব অতীব প্রশংসনীয়, কেননা ইয়োরোপীয় শিল্পীর দ্বারা “উচ্চশ্রেণীর গহনা” বলিতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ উপকরণে, অতি অল্প কারুকার্য-শোভিত জব্য।”

এখন এই দুই দেশের শিল্পীর, জ্ঞান ইত্যাদির হিসাবে, স্থান-বিপর্যয় হইয়াছে।

“ভারতবাসীদের স্বাভাবিক স্ফুর্তি পরিচয় তাহাদের অলঙ্কার ও মণিকাক্ষন-ভূষিত অস্ত্রে যেরূপ পাওয়া যায় সেরূপ আর কিছুতেই নহে। এসকল দ্রব্য যে, কেবলমাত্র দুপ্রাপ্য ও মহার্ঘ উপকরণে প্রস্তুত তাহা নহে, পরন্তু সে-সকল, কলাবিদ্যার সীমার মধ্যে যতটা যত্ন, আয়াস, স্ফুর্তি, লালিত্য ও প্রভা সম্ভব, তাহার সহিত নিশ্চিত।”

উপরোক্ত মন্তব্য, সার জর্জ বার্ডউড ১৮৮০ খৃঃ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (Birdwood, The Industrial Arts of India) অথচ তিনি এদেশের শিল্পকলার ভক্ত ত ছিলেনই না, বরঞ্চ তাঁহাকে বিশেষ নিন্দুক বলা চলে। তাঁহার, Journal of the Royal Society of Arts (Feb. 4, 1910) এ লিখিত এদেশীয় কলা, শিল্প, ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞাসূচক তীব্র নিন্দাবাদ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

এদেশের গহনা-শিল্পের অবনতির কারণও বার্ডউড দেখাইয়াছেন, যথা :—“দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারের কাজ ইয়োবোপীয় প্রভাবের দরুণ নিশ্চয় হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা ক্ষীণপ্রভ হইলেও (এখনও) যথেষ্ট সুন্দর।”

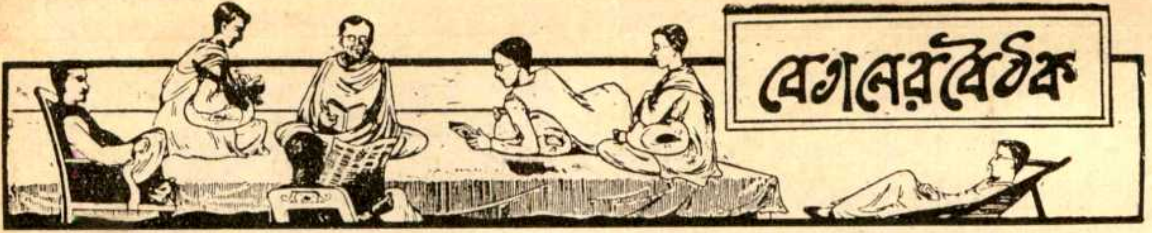
ইহা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বের কথা, ঐ সময়ের মধ্যে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, যাহারা স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছন্দমনে গহনা ক্রয় করেন—অর্থাৎ যাহারা কষ্টাদায় বা তদ্রূপ যন্ত্রণাদায়ক বাধ্যতামূলক অবস্থায় পড়িয়া ক্রয় করেন না, তাহারা যদি বহুমূল্য অথচ সুকৃতিসম্পন্ন বিদেশী গহনার কদর্যা অস্বীকার, ও জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতীয় গহনা-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এই দুয়ের পার্থক্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। বিদেশের যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা



আধুনিক বিলাতি গহনা ও তাহার ধারণ-পদ্ধতি

সুন্দর, তাহা স্বচ্ছন্দে তাহারা গ্রহণ করুন, কিন্তু প্রথমে এদেশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া বিচার করুন যে, কোন্টির ব্যবহার প্রকৃত স্ফুর্তি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচায়ক হইবে।



জিজ্ঞাসা

(১৬)

বিদেশে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি

ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার নিমিত্ত বৃত্তি দিয়া ইয়োরোপে (Europe) প্রেরণ করিবার কোন সমিতি আছে কি না এবং থাকিলে কোথায় কোথায় আছে ও তাহাদের ঠিকানা কি? ঐ সকল সমিতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার বাবতীয় ব্যয় বহন করেন কি না? সরকার হইতে ঐরূপ কোন বৃত্তি পাইতে হইলে কি গুণ থাকা আবশ্যক ও সরকারী বৃত্তির অঙ্ক কোথায় আবেদন করিতে হয়? শ্রী রেণু দাসগুপ্ত।

(১৭)

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল

এদেশে এমন কোন স্কুল বা কলেজ আছে কি না; যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। থাকিলে কোথায় ও তাহার ঠিকানা কি? শ্রী শশীকুমার মজুমদার

(১৮)

“জ্যোতির্গিরি কাঠ”

পার্বত্য প্রদেশ হইতে আনি এক-প্রকার “জ্যোতির্গিরি কাঠ” সংগ্রহ করিয়াছি। উহা অন্ধকারে ‘রেডিয়াম’এর মত আলোকিত হয়। ইহা আর কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়? উহার জ্যোতি ১৭২০ দিবস পরে (কোন পাত্রে রাখিলে) আশ্বে আশ্বে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ১০:১২ ঘটিকা কাল মাটিতে রাখিলে উহার জ্যোতি পুনঃ বাহির হয়। ইহা কি পদার্থ এবং আলো ইহার কোথা হইতে আসে? শ্রী হরকুমার পৈত

(১৯)

শব্দের ব্যুৎপত্তি

নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি কি বা কোন ভাষা হইতে শব্দগুলি আসিয়াছে?

পয়মস্ত, সাবেক, “বাহার” দেওয়া, “গড়” হইয়া প্রণাম, “গাদা” করিয়া রাখা, “টের” পাওয়া, আইবুড়া, “হৈসেল” ঘর, ফলাহার (ফলার), “কবুল” করা, আহাশুখ। শ্রী বিভূতি সিংহ

(২০)

সেলাই শিক্ষা

সেলাই এবং জামা-ইত্যাদি কাটা সম্বন্ধীয় বাঙলা ভাষায় কি কি পুস্তক আছে এবং কোন পুস্তক সর্বাঙ্গশঃ উৎকৃষ্ট ও তাহা কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীমতী রেণুকা মিত্র

(২১)

তৈলচিত্র সংস্কার

রংজলা তৈলচিত্র কি ভাবে সংস্কার করা যায়? কুমারী রাণু সেন

(২২)

পৌরাণিক উল্লেখ

- ১। রাধিকা রুক্মিণী রমা সত্যভামা দেবী।
স্বামিভাবে ভজে কৃষ্ণে তুয়া (ছর্গা) পদ সেবি।

২। আশী লক্ষ জন্ম আগে করিয়া গ্রহণ।

পশ্চাৎ মানব-দেহ।

৩। হিরণ্যকশিপু ও রাবণের স্ত্রায় কংসও অমরকল বর চাহিলে মহাদেব তাহার নিধনের হিঙ্গ রাখিয়া বর দিয়াছিলেন।

৪। বিবাহে বর ও বধুর হাতে সূত্র বন্ধন করা হয়।

৫। অন্ন-মেরু দান।

৬। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধদান।

৭। যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে।

বধিল দেবতাগণে বন্দী করি’ সত্যে ॥

*

*

*

অপর বলির পিতা বিরোচন দৈত্য।

অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য ॥

এই পৌরাণিক উল্লেখগুলির বিবরণ কোন কোন পুরাণের কোথায় কোথায় আছে কেহ সন্ধান করিয়া জানাইলে উপকৃত হইবো।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মীমাংসা

(১৩)

পশু পক্ষী সম্বন্ধীয় পুস্তক

বঙ্গভাষায় পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত পুস্তকখানি দেখা যায়—

১। পান্থীর কথা—ডাক্তার শ্রী সত্যচরণ লাহা,

এম্-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি,

এফ-জেড-এস্ প্রণীত।

উক্ত পুস্তক কলিকাতার “প্রকৃতি” কার্যালয় ২৪ নং হুজিয়া স্ট্রিটে এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকের শোকাংক পাওয়া যায়।

তরুণ শক্তি সাহিত্য মন্দির, কান্দীপুর।

(১৪)

আল্‌কাতার দাগ

কাপড়ের যতখানি স্থানে আল্‌কাতার দাগ লাগিয়াছে ততখানি স্থান সম্পূর্ণভাবে ভূবিয়া যায়, এরূপ পরিমাণ সরিষার তৈলে সেই স্থান, দাগ না উঠা পর্যন্ত ঘসিতে হইবে। তৎপর দাগ উঠিয়া গেলে তথায় তৈলের দাগ থাকিবে। ঐ দাগ উঠাইবার জন্য কিছু সোডা ও কাপড় কাচা সাবান সমান পরিমাণে এবং তাহা অপেক্ষা কিছু চূণ লইয়া একত্র মিশাইতে হইবে। তৎপর সেই কাপড়খানা তাহার মধ্যে ভিজাইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যন্ত সিদ্ধ করিয়া কাচিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

শ্রী শান্তিরামী দেবী

আলকাতার (Coal-tar) দাগযুক্ত জারগটায় Benzene দ্বারা ভাল করিয়া ধুইলেই ক্রমশঃ দাগ উঠিয়া যায়। তবে কাল একটা আভা থাকে, তাহা সাবান দ্বারা ধুইলেই সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়।

কুমারী কুন্তলা সেন

শ্রী রেণুকা মিত্র

শ্রী বীণাপাণি দত্ত

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী এন্ ও ক্রীম্যানের বয়স ৭৭ বৎসর। কিন্তু এখনও তাঁর অদম্য উৎসাহ। এই বয়সে তিনি গ্রেগোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন ও ইংরেজী সাহিত্য পড়া শুরু করিয়াছেন। নাতি-নাতনীর বয়সী অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখন ইঁহার সহপাঠী। জ্ঞান-পিপাসা বয়সের বাধন মানে না।



মাদমগজেল জুলিয়েট ভিলিয়ার

প্যারীর মহিলা-ব্যারিষ্টার মাদমগজেল জুলিয়েট ভিলিয়ারের নাম এখন পাশ্চাত্য জগতে আইনজ্ঞ-মহলে সুপরিচিত। সম্প্রতি ফরাসী আদালত খুলিবার সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ সন্দর্ভ পাঠ করেন। প্যারীর আইনজ্ঞসম্মেলনে তিনিই প্রথম নারী বক্তা।

বৃদ্ধিতে ও কার্যক্ষমতার ক্ষমতায় ভারতীয় মহিলারাও যে পুরুষের সমকক্ষ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভায় ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীরা প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

শুধু বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ও বাংলার মন্ত্রিস্বলের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। জীলোকদিগকে ট্যাক্স দিতে হয়, ব্যবস্থাপক সভা অহুমোদিত আইন মানিয়া চলিতে হয় কাজেই সে-সব প্রতিষ্ঠানে এক তরফা শুনানী হওয়া উচিত নয়। ঘরের বাহিরেও নারীদের কার্যক্ষেত্র আছে। সম্প্রতি কয়েক জন ভারতীয় নারী ফৌজদারী বিচার বিভাগে ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত



শ্রীমতী এন্ ও ক্রীম্যান

হইয়াছেন। নিয়ে আমরা কতকগুলি সংবাদ দিলাম :—

শ্রীমতী অলমেলুমাদাথা অমল মাদ্রাজে এবং বিচারপতি মাদগাওনকারের পত্নী শ্রীমতী ভদ্রবাই মাদগাওনকারও বনিতা আশ্রমের প্রধানা কর্মী শ্রীমতী শিবগাবরী গজ্জর বোম্বাইএর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

শ্রীমতী লক্ষ্মী একাম্ববন্ম মাদ্রাজের অন্তর্গত টিউটিকোরিন মুউনিসিপ্যালিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর কে, এন্ চন্দ্রশেখর আইয়ারের পত্নী

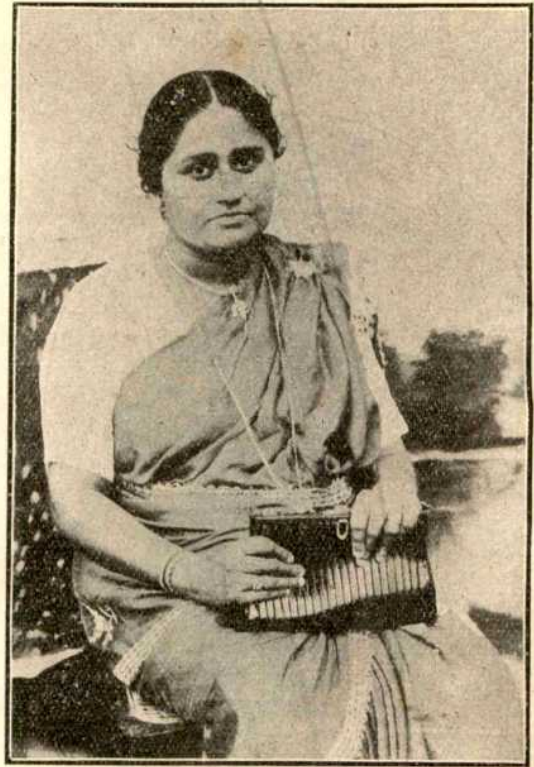
শ্রীমতী পার্শ্বতী অমল বান্দ্যলোর জেলা-বোর্ডের সদস্য হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন কৃতী ভারতীয় ছাত্রীর কথাও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার চিম্নলল শীতলবাদের কন্যা শ্রীমতী

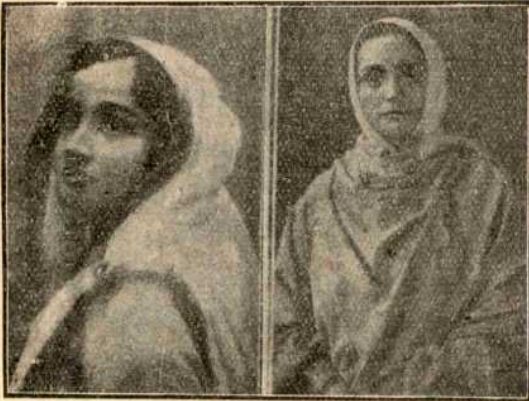


কুমারী শীলা রায়

শারদা দেওয়ান সম্মানে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি ভারতের লোকসংখ্যা সমস্তা শীর্ষক একটি সন্দর্ভ লিখিয়া প্রশংসা পাইয়াছেন। ইনি বিবাহিতা হইয়াও স্বামীর উৎসাহে এত দিন পড়া শুনা করিয়াছেন—সংসার-দুখ ইহার জ্ঞান লাভের পথে বিঘ্ন ঘটায় নাই। গুজরাতি হিন্দু ঘরের মেয়েদের ভিতর তিনিই সর্বপ্রথম এই ডিগ্রী পাইলেন।



শ্রীমতী লক্ষী একাশ্বরম্



শ্রীমতী মাদগাওনকার

শ্রীমতী গজ্জর

কুমারী সুলভা পানান্ডিকর এই বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ‘চ্যান্সেলার পদক’ এবং অস্বাভাবিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরীক্ষায় তিনি “ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব” শীর্ষক গবেষণা পূর্ব একটি সন্দর্ভ লিখিয়া পরীক্ষক মণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক আর ডি, রাণাডের পরে তের বৎসরের মধ্যে তিনিই দর্শনশাস্ত্রে এরূপ কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন। কুমারী পানান্ডিকর



শ্রীযতি পার্শ্বতী অমল

বর্তমান আমালনের দার্শনিক গবেষণাগারের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই বিদ্যামন্দিরের তিনি সর্বপ্রথম গবেষক ছাত্রী।

এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত শামলাল নেহেরু-হুহিতা কুমারী শ্রামকুমারী নেহেরু বি-এ ও এম্-এ প্রাথমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রাথমিক এল্-এল্, বি পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদেই আইন ব্যবসা করিবেন।

কুমারী নেহেরু কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষায় অঙ্ক শাস্ত্রে ও উর্দু ভাষায় প্রশংসার সহিত পাশ করেন ও শেষ পরীক্ষায় উর্দু ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা সহকারে উত্তীর্ণ হন। তারপরে তিনি চিকিৎসক হইবার মানসে এলাহাবাদের “মিযুর সেন্ট্রাল কলেজে” ভর্তি হন, কিন্তু ১৯১৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান



কুমারী শ্রামকুমারী নেহেরু

করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন ও রমণীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া—মাসিক ২০ টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে বি এ, পরীক্ষায় সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পদক এবং মাসিক ৩০ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সম্পাদক ও সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন; এবং প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান পাইয়াছেন। ‘ইন্টার-হোষ্টেল’ তর্ক-সভায় এবং “অল্-ইণ্ডিয়া কন্‌ভোকেশন্‌ তর্ক-সভায়” তিনি সর্বাপেক্ষা সুবক্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ভাল বক্তৃতার জন্য তিনটি পদকও পুরস্কার পাইয়াছেন।

এ-দেশী ছাত্রীরা সাধারণত বিজ্ঞান-চর্চার দিকে যায় না। কুমারী শীলা রায় সে অপবাদ ঘুচাইলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক এম্, এন্-সি পরীক্ষায়



শ্রীমতী অলমেলুমাত্মা অমল

তিনি রদায়ন-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী শীলা পরলোকগত ভাস্কর পরেশ-রঞ্জন রায়ের কন্যা।

আফগানিস্তানে সকল বিভাগেই দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সেখানকার নারী-সমাজেও অগ্রসরশীল যুগের এই পরিবর্তনের ঢেউ লাগিয়াছে। আফগান মহিলারা প্রায় ঘোমটার সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়াছেন। আলাগড় মেইল কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি একদল আফগান যুবক উচ্চশিক্ষার্থী ক্রান্তে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের যে আলোক-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রথমেই একটি ক্ষীণাঙ্গী কিশোরীর উপর নজর পড়ে। দেখিবা মাত্র মনে হয় যেন কিশোরী ইউরোপের কোন দেশের অধিবাসিনী। তাঁহার হাতে কায়দা-মাফিক হাত-ব্যাগ বুলিতেছে, পোষাক-পরিচ্ছদও ইংরেজ বালিকার মত।



শ্রীমতী সারদা বেগম

কিন্তু ফটোর নীচে চিত্র-পরিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, কিশোরী ছাত্রদলের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থী বিদেশ-যাত্রা করিয়াছেন। আফগানিস্তানের এই উন্নতির যুগে ভারতের ইসলাম গোরবী মুসলমানগণ নারী-সমাজকে বোঝা-পর্দার আড়াল করিতেই ব্যস্ত!

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৪ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছেন। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২ জন মুসলমান বালিকা—তাহাদের নাম কুমারী সরওয়ার আরা বেগম ও কুমারী আমিনা বাট। কুমারী সরওয়ারের বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী আমিনার বয়স মাত্র সাড়ে ১৩ বৎসর।

বাংলায় ঢাকার নবাব বাড়ীর কুমারী জুলেখা বাণু

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আকিয়ার আদালতের দোভাষী মহম্মদ মজিদের কন্যা কুমারী আসীমজিদ চট্টগ্রাম কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলেজে তিনি পুরুষ ছাত্রদের সহিত একত্রে পড়িতেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী বাড়ীতে পড়িয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং গণিতে খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বর্তমান বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের ছাত্রী কুমারী করুণাকণা গুপ্তা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মধ্য পরীক্ষাতেও (ইন্টারমিডিয়েট) কুমারী চারুপমা বসু প্রথম হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কৃতিত্বে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মোট ১৬৩ জন ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ছাত্রীদের পরীক্ষার এবার ফল ভালই হইয়াছে। কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয় বালিকা বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ১৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বৎসরের বি-এ



শ্রীমতী হুলতা পানান্ডিকার

পরীক্ষাতে ৩০ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৫ জন সম্মানের সহিত পাশ হইয়াছেন। বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী আভা সেন সংস্কৃত এবং ডায়োসিসেন কলেজ হইতে শ্রীমতী স্নেহময়ী সেনগুপ্তা ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের সম্মান-তালিকাতে দশজন ছাত্রীর নাম দেখিলাম; তন্মধ্যে লোরেটো হাউস হইতে কুমারী ক্লেটন ডোরোথি এবং বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী মালতী দত্ত যথাক্রমে চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

প্র



পিকি—

এই চিত্রটি একটি বিখ্যাত রঙান চিত্রের একরঙা প্রতিলিপি। ইহা এলিক ইংরেজ শিল্পী স্যার টমাস লরেঞ্জ কর্তৃক অঙ্কিত। এই ছবিটি বিগত ২৫শে নভেম্বর লন্ডনের একটি নিলামে প্রায় ১১ লক্ষ



স্যার টমাস লরেঞ্জ অঙ্কিত 'পিকি'

টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। কেতা একজন আমেরিকান কোটিপতি। এই চিত্র সম্বন্ধে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এটি তাঁহার আলেখ্য তিনি ভবিষ্যৎকালে বিখ্যাত কবি ব্রাউনিংজার এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের মাতুলানীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

শিশু-শিক্ষায় মেরিয়েটা জন্সন—

মিসেস্ মেরিয়েটা জন্সনের নাম আজ বহুস্থলে অপরিচিত হইলেও অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার নাম সর্বত্র পরিচিত হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশু-শিক্ষার যে সহজ পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন ও

তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে সেই পন্থা অমুযায়ী শিক্ষাদান করিয়া তিনি যে অফল পাইয়াছেন তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। তাঁহার অন্তরে অন্তরে দেশের কল্যাণ কামনা করেন বাহিরে তাঁহাদের সর্বপ্রথমে শিশুশিক্ষার দৌকর্য্য বিধান করা কর্তব্য। এবং এবিষয়ে মিসেস্ জন্সনের মতামত ও পদ্ধতি অমুযায়ী কাজ করিলে অফল লাভ করা কঠিন হইবে না। মিসেস্ জন্সন শুধু বস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, তাঁহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতির মূল তত্ত্ব হইতেছে—শিশুকে শিশু রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়া, গাথা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ। শিশুর সহজ সরল বুদ্ধিকে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টান্ত দ্বারা জাগ্রত করিয়া তোলাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য; তাহার স্মৃতিকে ভাবাক্রান্ত করিয়া তাহাকে হঠাৎ দিগ্গজ করিয়া তোলার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান।



মিসেস্ মেরিয়েটা জন্সন

তিনি উত্তর আমেরিকায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ছয় হইতে বিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশু ও যুবকদিগকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে দেখিলেই শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই বুঝা যায়। ইতিমধ্যেই শিক্ষাবিভাগের রথীরা আমেরিকার অসংখ্য বিদ্যালয়েও তাঁহার পদ্ধতি অমুযায়ী শিশুশিক্ষা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মিসেস্ মেরিয়েটা জন্সন একজন দূরদৃষ্টি ও মনোব-দম্পন মহিলা। প্রেম ও মাধুর্যের যেন তিনি অবতার। শিশুদের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্বের গুণে শুধু শিশু কেন বয়স্কেরাও মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার মুখশ্রী মানব-প্রেমের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াই আছে।



খেলাচ্ছিলে ভূগোলশিক্ষা

তাহার পরিচালিত বিন্যাসসমূহে শিক্ষা ও খেলা-ধুলা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে, শিশুরা খেলিতে খেলিতেই অনেক বিষয় শিক্ষা করে। পরিশ্রম করিয়া গলদ্ব্যর্থ হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা গিলিতে হয় না।

চারিটি বিখ্যাত চিত্র—

এই বৎসরের (ইংরেজি) প্রারম্ভে লণ্ডনের বালিংটন হাউসে ফ্রেমিশ

ও বেল্জিয়ান শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়। নানাদেশের শিল্প-সংগ্রহ-কারীরা বহু বিখ্যাত চিত্র এই প্রদর্শনীতে ধার দেন। এই প্রদর্শনীতে যে-সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বিশেষজ্ঞেরা তাহাদের মূল্য নির্ধারণ



হগবানের কোলে পুত্র বীণা মৃতদেহ—রবার্ট ক্যাম্পিন অঙ্কিত



‘ম্যাডোনা’—রোজার ভ্যান ডার ভেডেন অঙ্কিত



জ্যান ভ্যান আইক অঙ্কিত তাঁহার পত্নীর আলেকথ্য



রোজার ভ্যান ডার ওয়েডেন অঙ্কিত মহিলামূর্তি

করিয়াছেন প্রায় ১০ কোটি টাকা। সেই প্রদর্শনী হইতে চারিটি চিত্রের প্রতিচ্ছবি এখানে প্রকাশিত হইল।

প্রথম ছবিখানি রোজার ভ্যান ডার ওয়েডেনের গুরু রবার্ট ক্যাম্পিনের হস্তাক্রিত। বেলজিয়ানের লুভে' সহর এই ছবিটি ধার দিয়াছেন।

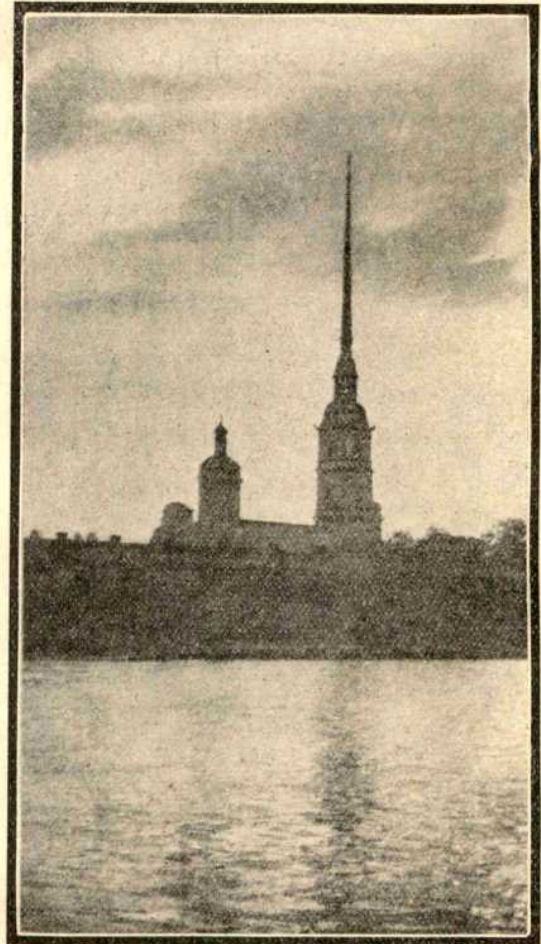
দ্বিতীয় ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রকর জ্যান ভ্যান আইকের অঙ্কিত ও তাঁহার পত্নীর আলেকথ্য। এই ছবিটির মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

তৃতীয় ছবিখানি রোজার ভ্যান ডার ওয়েডেনের। এই চিত্রের স্বত্বাধিকারী মিঃ মেলন যুক্ত আমেরিকার কেঃবাঃক্ষ।

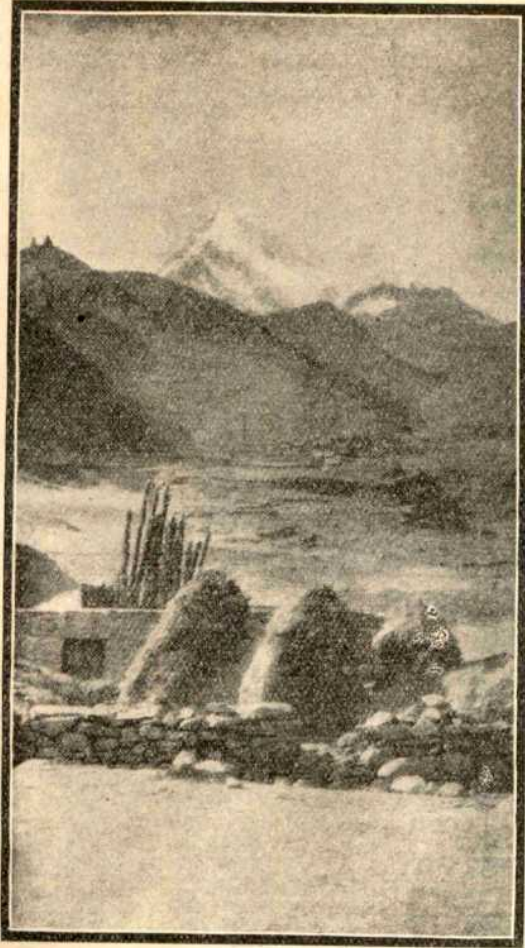
চতুর্থ ছবিখানিও রোজার ভ্যান ডাঃ ওয়েডেন অঙ্কিত ও আমেরিকার সম্পত্তি। ইহা বিখ্যাত ম্যাডোনা মূর্তি।

বর্তমান কৃষিয়া—

‘বোলশেভিজম’-বাদের কৃপায় বর্তমান কৃষিয়া পৃথিবীর সর্বত্র বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কৃষিয়া বলিতেই আমাদের মনে কতকগুলি



সেন্ট পল ও সেন্ট পিটার গীর্জা—এই দুই গীর্জার অভ্যন্তরে রোমানাৎ বংশীয়দের কবর অবস্থিত



বকেশাস পর্বতের পাদদেশে কৃষকপল্লী

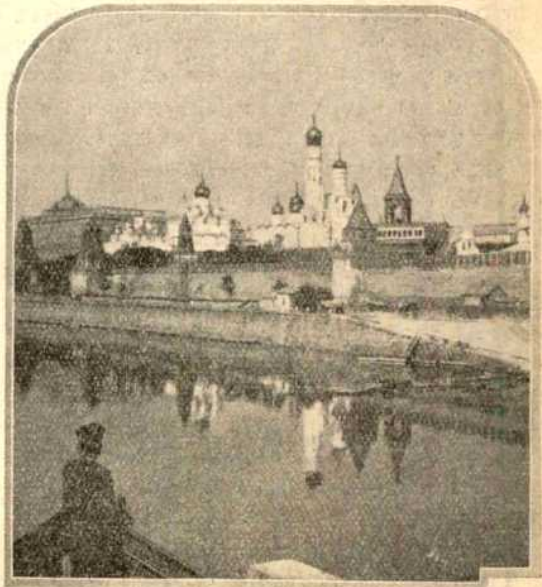
ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠে। রুশিয়াতে যখন সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রবল ছিল তখনকার সহিত বর্তমান রুশিয়ার বিস্তার প্রভেদ ঘটিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। এসম্বন্ধে একজন ইংরেজ মহিলা পর্যটক 'দি উণ্ডম্যান সিটিজেন' নামক কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি বিগত মহাযুদ্ধের সময় পেট্রোগ্রাদের হাসপাতালে কাজ করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে তিনি সেখানে (লেলিনগ্রাড ও মস্কো) গিয়া বোলশেভিক-তন্ত্রের প্রভাবে যে-পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছেন; সম্ভ্রুতি তিনি আবার সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বোলশেভিক আন্দোলনের প্রারম্ভে রুশিয়ার অবস্থা দেখিয়া আসিবার প্রায় চারি বৎসর পরে আমি পুনরায় সে-দেশে ভ্রমণ করতে যাই। রুশিয়ার বিষয়ে পরিবর্তন আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রুশিয়ার সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্তই গিয়াছিলাম। এই বিরাট জাতির দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না তাহা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।



মস্কোর বাজারদৃশ্য

মস্কোতে পদার্পণ করিয়া আমি পথঘাট প্রভৃতি সাধারণ দৃশ্যের উন্নতিই লক্ষ্য করিলাম। বাড়িগুলির সংস্কার করা হইয়াছে। জনসাধারণ বেশ ভাল অবস্থায় আছে বলিয়াই মনে হইল; দারিদ্র্যের চিহ্ন বিশেষ নাই, লোকের আহাৰ্য্যের অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না। আহাৰ্য্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে, জিনিষের মূল্যও হ্রাস পাইয়াছে। অধিকাংশ লোকই নিজেদের কাজ



মস্কো



মস্কোর বৃহত্তম গীর্জা

লইয়া যন্ত। বেশভূষা সযত্নে দারিদ্র্য লক্ষিত হইল। বস্ত্রাদি বাহির হইতে চালান আসে বলিয়া এবং বাহিরের চালানি ভ্রমের উপর শুক খুব বেশী বলিয়া বস্ত্র খুব মহার্ঘ্য; একটি ওভারকোট কিনিতেই প্রায় চারিশত টাকা খরচ পড়ে।

লেনিনগ্রাডে গিয়া সুবর্ষ এই উন্নতি লক্ষিত হইল না; সহরের সকল আড়ম্বর যেন নষ্ট হইয়াছে, তবে মজুরি চাষা ও ইহুদিরা পূর্ববৎ রাস্তায় ভিড় জমাইতেছে। নেভা নদীর তীরে মির্জা-চুড়ার স্বর্নদণ্ডগুলি স্থাণুলোকে তেমনি ঝলিতেছে। বাজারে অদ্ভুত মূর্তি ও সস্তা কাচের মালা বিক্রয়ের ধুম পূর্ববৎ লাগিয়া আছে, তবে বিক্রেতাদিগকে দেখিয়া মনে হয় তাহাদের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল। বৃদ্ধদের ও বেকারদের জীবন বড় দুর্ভব হইয়া উঠিয়াছে। লেনিনগ্রাড সহরটি দেখিয়া আমার চিত্ত পীড়িত হইল; সমৃদ্ধির উচ্চ শিখর হইতে ইহার অনেকখানি পতন হইয়াছে। মস্কোতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

রুশিয়াতে গৃহ-সমস্তা এখন সব-চাইতে বড় সমস্তা। বিশেষ করিয়া মস্কোতে লোকের বাসগৃহের বড় টানটানি পড়িয়াছে। দেশের নেতারা এই সমস্তা সমাধানের অল্প উত্তীর্ণ পড়িয়া লাগিয়াছেন, অনেক ভাণ্ডগড়া চলিতেছে; যুদ্ধের পর মস্কোর জনসংখ্যা শতকরা ৪০ জন বাড়িয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্ত ৯ বর্গফুট জায়গা নির্ধারিত হইতেছে এবং সরকার হইতে এইসকল গৃহের ভাড়া বাবদ প্রত্যেকের উপার্জনের শতকরা দুই অংশ কাটিয়া লওয়া হইতেছে। কিন্তু এত করিয়া গৃহ-সমস্তার সমাধান হইতেছে না, বহুস্থলে দেখিলাম এক-একটি বৃহৎ পরিবার একটি মাত্র কামরায় কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া আছে।

গৃহ-সমস্তা ঘটায় বিবাহ-সমস্তাও দেখা দিয়াছে। গৃহসমস্তার দরূণ বিবাহ-বিচ্ছেদে অসুবিধা ঘটতেছে, কারণ স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাসগৃহও ভাগ করিয়া লইতে হইতেছে।

কর্তমানে রুশিয়ার শিক্ষা বিস্তার বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। সকল

বিষয়ে শিখিবার প্রযুক্তি যুবকদের মধ্যে প্রবল। নেতারাও ও বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন। বস্তুতঃ রুশিয়া যে-ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে রুশিয়া পৃথিবীর এক প্রবলতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

“জগৎ-পারাবারের তীরে—”

নিউইয়র্কে শিশুসম্মেলন সমিতির অনুষ্ঠিত মেলায় প্রদর্শিত একদল শিশুর চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইল। মিসেস আইডা ডি একষ্টা রুট এই



নিউইয়র্ক শিশু-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একদল শিশু

চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে মাতা ও শিশুর মঙ্গলামঙ্গলের দিকে কিরূপ দৃষ্টি দেওয়া হয় এই চিত্র হইতেই অনুমিত হইবে।

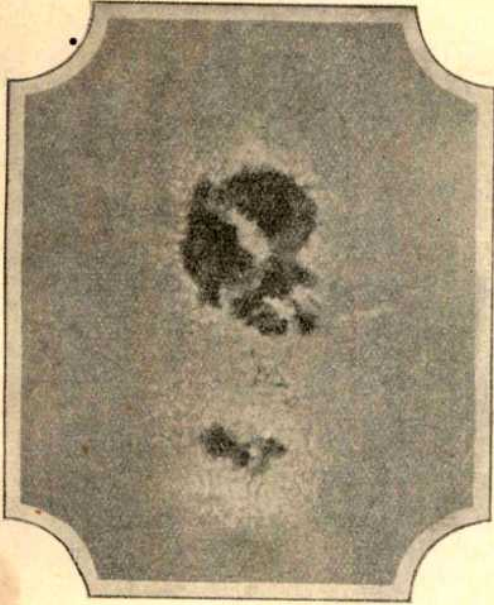
জ্যোতির্বিদ্যা কি মানুষের কাজে লাগে?

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, জ্যোতির্বিদ্যা কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, আসলে আকাশমাঝে



মার্কট উইলসন্ মানমন্দিরে ফার্ডিনান্ড এলারম্যান স্থায়ীকৃত সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন

জাল ফেলিয়া এই তারা-ধরার ব্যবসায়ের কোন মূল্য প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জগতে নাই। অন্ধকার আকাশের নিঃসীম শূন্যে চাহিয়া চাহিয়া (যন্ত্রযোগে) রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত করা কতকটা বাতুলতারই সামিল। ঈশপের গল্পেও জ্যোতির্বিদ্যাকে বাদ্য করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টে জ্যোতির্বিদের এই রাত্রি-জাগরণ যতই অকারণ মনে হউক, অধিধান করিয়া দেখিলে মানব-সমাজে এই বৈজ্ঞানিকদের দানের তুলনা হয় না। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান যে-সকল 'আবিষ্কার' করিয়াছে তাহার অনেকগুলিই এই বাতুলদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। বেতার-বার্তা ইহার মধ্যে একটি। বৃহস্পতি গ্রহের



সূর্য্যবক্ষে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান আবর্ত.—সূর্য্যক্ষত

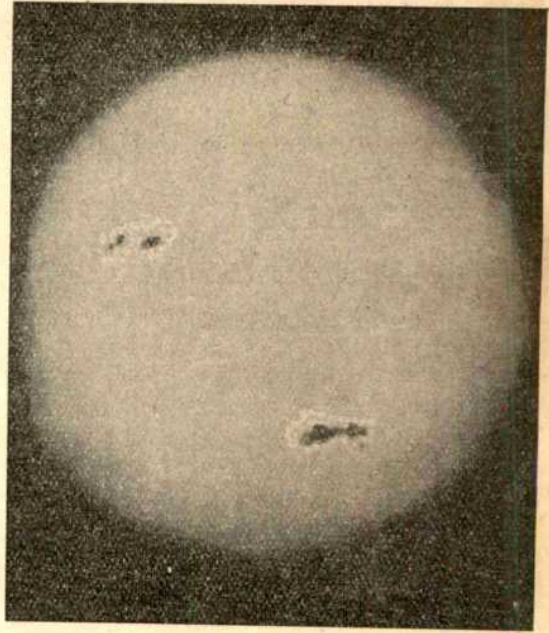
অষ্টচন্দ্রের গ্রহণ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া একজন জ্যোতির্বিদই বেতার-বার্তা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক আবিষ্কার করেন। আকাশে মেঘলোকে উড্ডয়মান বিমানপোত দেখিয়া আমরা বিজ্ঞানের মহিমাকীর্ণনে আত্মহারা হই বটে, কিন্তু তুলিয়া যাই যে, যে হিলিয়াম গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ইহার গতিবিধি তাহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ—সূর্য্যরশ্মির বর্ণ বিভাগ করিতে গিয়া।

কিন্তু এই যে-সকল আবিষ্কার সাধারণের এত কাজে লাগিয়াছে জ্যোতির্বিদের কাছে তাহাদের মূল্য খুব অধিক নহে। তাঁহাদের সাধনা দূরকে লইয়া, অতি নিকটের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহাদের নাই। দূরীক্ষণ যন্ত্রযোগে তাঁহারা এত দূরের নক্ষত্রমণ্ডলী বা নীহারিকা লইয়া কারবার করেন যে, সেইসকল স্থানে সেক্ষেপে :৮৬০০০ মাইল গতিবেগযুক্ত আলোকরশ্মি পৌছাইতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ সময় লাগে। তাঁহারা এমন সব আলোক-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করেন যাহা স্থিতির প্রারম্ভ হইতে আমাদের এই পৃথিবীর নিকে অগ্রসর হইতে হইতে সবেমাত্র এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে।

যে ভূমাকে লইয়া, বৃহৎকে লইয়া জ্যোতির্বিদের সাধনা, আমরা তাহার ক্রিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া পড়ি। অসীম আকাশে আমাদের

এই পৃথিবীর স্থান কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখিলে নিজেদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হয়। আমাদের সূর্য্যকে যদি একটি টেনিস-বল রূপে কল্পনা করা যায় তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী তাহার ২৩ ফুট দূরে ঠিক একটি বালুকাণার মত মনে হইবে এবং আমাদের নিকটতম তারকা ১১০০ মাইল দূরে অল্প একটি টেনিস-বলের মত বোধ হইবে।

সূর্য্যে হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার ব্যবহারোপযোগী হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কারের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। অনেক সময় কোন নতুন আবিষ্কারকে কাজে খাটাইতে আরো বেশী সময় লাগে এবং বহু ক্ষেত্রে আবিষ্কারগুলি ব্যবহারিক জগতে আমাদের প্রয়োজনেই লাগে না। ১৮৬৮ সালে অসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ লকেরার সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একটি নতুন গ্যাস আবিষ্কার করেন তাহাই হিলিয়াম। বিগত ইংরেপীয় মহাবৃহৎ সময়ে ক্যানসাস ও টেক্সাসের গৃহিণীদের কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী পরিমাণে এই গ্যাস প্রস্তুত হইতে থাকে। রেডিও বা



সূর্য্য ও সূর্য্যক্ষত

বেতারের আবিষ্কারও এইরূপ। রোয়েমার বৃহস্পতির চন্দ্রগুলির গ্রহণ লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখেন যে, অক্ষাংশ মতে ঠিক যে-সময়ে গ্রহণ লাগা দরকার তাহার ১৬ মিনিট পরে গ্রহণ লাগিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি আলোকরশ্মির গতিবেগ নির্ধারিত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার এই অনুসন্ধানের সাহায্য লইয়া ম্যাক্সওয়েল স্থির করেন যে, প্রচণ্ড-গতিবেগ-সম্পন্ন এই আলোক-তরঙ্গ চুম্বক ও বৈদ্যুতিক প্রভাববৃত্ত না হইয়া পারে না এবং আমরা চোখে দেখি না এরূপ অনেক আলোকতরঙ্গ আমাদের চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার শিষ্য হার্টজ এইরূপ অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গের আবিষ্কার করিয়া নিজের নামে নামকরণ করেন, মার্কিনি সেই তরঙ্গের দ্বারা সাক্ষাতিক সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন ও ডি ফরেস্টে নোজাহজি শব্দ প্রেরণের স্থবিধা করিয়া দেন।

এই পৃথিবীর ঝটিকা বাত্যা ইত্যাদির সহিত স্বর্ষের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অধুনা জ্যোতির্বিদগণ সচেষ্ট আছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইলে ভবিষ্যতে ঝটিকা বাত্যা ইত্যাদির কথা সঠিকভাবে বহু পূর্বে বলিয়া দেওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে, স্বর্ষাক্তের সহিত ইহাদের যোগ আছে। ইহারা স্বর্ষাক্তের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে ব্যস্ত আছেন। স্বর্ষাক্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের মত এই যে, এগুলি প্রবলবেগে সূর্যমান কাম্পপুঞ্জ ব্যতীত কিছুই নহে। এইসকল আবর্তের চতুর্দিকের

বাষ্প পরস্পর সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলন্ত বলিয়া মধ্যবর্তী হীনগম্ভকে কালো দেখায়।

এইরূপ নানাভাবের আবিষ্কারে জ্যোতির্বিদগণ নিয়ত ব্যস্ত আছেন; আমরা সকল সময়ে তাঁহাদের কার্যের কার্যকরী দিকটা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁহাদের আবিষ্কারগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং ইহাদের এই নিশাজাগরণ যে মানবেরই কল্যাণ-কামনায় তাহার সাক্ষ্য দেয়।

রণ-সঙ্গীত *

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জাগো ভাই জাগো, জাগো হে বন্ধু, হাজার হাজার,
বরিতে নবীন উজ্জ্বল যুগ হও আগুসার,
চল দলে দল, চল দৃঢ় পদে, নাহিক ভয়,
চল চল তরা স্রাবের যুদ্ধে লভিতে জয়;
হৃদয়-শোণিতে কিনিব সে জয় কাম্য অতি,
এ সাগর হতে অপর সাগর জানাবে নতি।
এ সারা ইতালী জুড়িয়া আমরা সকলে ভাই,
এক ভাষা আর এক স্বপ্ন আশা, দ্বিতীয় নাই।

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে স্বন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্মৃতি এই এ ফ্যাসিষ্ট-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

এই বলে বলী জাগ্রত আজি স্বদেশ মোর
লাঞ্ছনা ক্লেশ আর না সহিছে তুংখ ঘোর।
নবীন জীবনে জেগেছে আজিকে স্বপ্ন-দেশ,
গরীয়ান আজি মহীয়ান সে যে দৃষ্ট-বেশ!
জীবন-মশাল উজ্জ্বল করি' উঠে জালো,
ঘুচিবে আঁধার, অভিমান-পথ হইবে আলো।

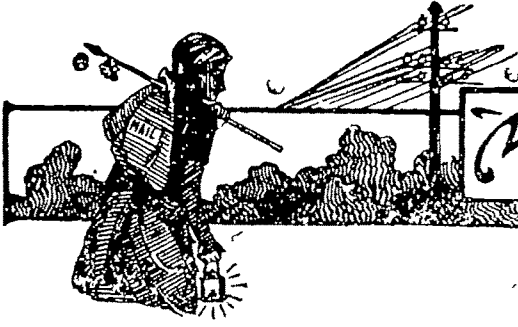
* ইতালীর ফ্যাসিষ্ট-দলের রণ-সঙ্গীত

চল দৃঢ় ধীর চল স্থির শাস্ত-গতি,
মুক্তি লভিবে তবে ত পূর্ণ শুদ্ধ-জ্যোতি।

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে স্বন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্মৃতি এই এ ফ্যাসিষ্ট-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

পরিখা-গহবরে রজনী জাগিয়া কাটিয়া পথ
গুলির দাহন দলিয়া চলিব, কে করে রদ?—
বহিয়া বহিয়া পতাকা আমরা চলিব জ্রুত,
সমর-ঘণী মথিয়া বহিব পতাকা পুত;
বিজয়-লক্ষ্মী লবেন পতাকা—দণ্ড তাঁর;
মাহুয আমরা মাহুযের মত ছনিবার।
মোদের ইতালী ইতালী বলিছে—‘কর রে রণ,’
ইতালীর নামে লড়িয়া জিনিব হৃদয়মন।

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে স্বন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্মৃতি এই এ ফ্যাসিষ্ট-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।



দেশবিশেষের কথা

বিদেশ

জেনীভা নৌবহর বৈঠক—

জেনীভার নৌবাহিনী-হ্রাস-বৈঠক ভাঙিয়া গেল। ইংবেজ মার্কিন ও জাপান এই তিন শক্তির প্রত্যেকের ক্রমবর্ধমান নৌবল হ্রাস ও নিষিদ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি মৌমাংসাব লক্ষ্য এই বৈঠকের অবতারণা। কাবণ, বিভিন্ন শক্তির মধ্যে প্রবল সন্দেহ যে, একের অস্ত্র অপেক্ষা নৌবল বেশী থাকিলে সে তাহার, সাম্রাজ্য-বিস্তার-লিপ্সা চবিত্তার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিবে।

বৈঠকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলিলেন, তাহার ইংরেজের সমান নৌবল প্রয়োজন, কাজেই, তাহার পক্ষে সময়-পোত-সংখ্যা কম সম্ভব নহে। ইহাতে ইংরেজ আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, ইংলণ্ডেব সাম্রাজ্য দীপপুঞ্জ লইয়াই গঠিত, কাজেই তাহার যে পরিমাণে বুদ্ধ-জাহাজ প্রয়োজন আমেরিকার তাহা নহে। সুতরাং আমেরিকার আদার অঙ্গদত। জাপানও প্রকৃত প্রস্তাবে নৌবল অথবা হ্রাস করিতে বাজী নহেন। কাজেই নৌবহর-নিরস্ত্রণ বৈঠকের অন্তিম পণ হইয়া গেল।

ব্যাপার যে এইরূপ দাঁড়াইবে ইহা অনেক আগেই ধারণা করা গিয়াছিল। নিউইয়র্কের 'নেশন' বৈঠক করিবার সময়ই বলিয়াছিল, "এই শক্তিরেব নিরস্ত্রীকরণ বা নৌবল হ্রাসেব বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই। ব্যয়সাঙ্কোচ বা শাস্তি নামে তাহারেব প্রিয়তম জীড়া-সামগ্রী নৌবাহিনীগুলি হ্রাস করিবার কথা তাহার কল্পনাও করিতে পাবেন না। নিজেদের বাহা কিছু আছে তাহা তাহার সকলেই বজ্রাব রাবিত্তে চান এবং সেই সঙ্গে আশা করেন যে, অস্ত্র যেন শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারেন।...এই শক্তির যেন পৃথিবীর লোকের ভাগ্য লইয়া দ্বাতক্ৰোড়া করিতেছে।" বৈঠক ভাঙিয়া গেল, কিন্তু বিলাতী কাগজগুলি এখনও আত্মকালন করিতেছে যে, সাফল্যের আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কুলিজ সমস্ত ধাপ্তাবাজি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "১৯২৯ সালে তিনি আব নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক আহ্বান করিবেন না।"

সুতরাং শাস্তি স্থাপনের ও বিশ্ব-মৈত্রী ঘটাইবার আর একটি অন্তিম পণ হইল। ওরাশিয়ার ১৯২২ সালেব নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক, জেনীভার নৌবল হ্রাস বৈঠক দুইটি ত একেবারে ভাঙিয়া গেল। এবার লীগ অব নেশন শাস্তি স্থাপনের আর কোন উপায় দেখিবেন?

সাকো ও ভ্যানজেকট—

শাস্তিবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী সাকো ও ভ্যানজেকটর যত্নাদেশের আদেশ লইয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে তুল্ম আন্দোলন হইতেছে।

নিউইয়র্ক, ফিজাডেলফিয়া ও বাল্টিমোরে এই ব্যাপার লইয়া দাড়াইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থলে এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত আন্দোলনের ঢেউ গিয়া পৌছিয়াছে। আমরা ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ রাষ্ট্রের অন্তর্গত নর্থিং ব্রেনটিং সহরের পাবলেনটার ও বেরাডেলী নামক দুইজন ইতালীয়ান জুতার ব্যবসায়ী ৪ হাজার পাউণ্ড লইয়া তাহাদের প্রভুর কারখানা অভিমুখে যাইতেছিল। পশ্চিমধ্যে দুইজন লোক তাহাদিগকে হত্যা করিয়া টাকাব বাক সহ চম্পট বেয়। ঐ এক্ষণে একপ লুট-তরাজ নূতন নহে। এই হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পর পুলিশ সাকো ও ভ্যানজেকটকে গ্রেপ্তার করে।

প্রাথমিক বিচার শেষ হইতে এক বৎসর সময় লাগে। অবশেষে তাহাদের প্রতি যত্নাদেশের হুকুম হয়। কিন্তু আদালত এক আদালত হইতে অস্ত্র আদালতে আপীল করে। ফলে ব্যাপারটির আর সাত বৎসর ধরিয়া আদালতে শেষ মৌমাংসা হইল না। কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ গল্প উঠিল, তাহাদিগকে শীঘ্রই যত্নদণ্ড দেওয়া হইবে। অভিযুক্ত আসামী দুইজন সমাজতন্ত্রবাদী ও শাস্তিবাদী দলেব বোক এবং বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহারা প্রকাশ্য ভাবে সেনাদলে যোগদান করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের অরাজক-পন্থী বলিয়াও প্রচাৰ কবিয়াছে। তাহাদের কানীস আদেশ হওবার সাম্রাজ্যবাদী এবং শাস্তিবাদী দল আশঙ্কা করিতেছেন যে আমেরিকান বুদ্ধিজীবীরা তাহাদের কার্যকলাপেব উপর অনন্ত—কাণ্ডেই আদালত অভিযুক্তদের প্রতি ক্ষাণ্ড ও পক্ষপাতশূন্য বিচার করেন নাই। হাংগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মিঃ ফ্রাঙ্কফার্টারও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামীর হবিচাব পায় নাই। তাহার যত্নে পূর্বোক্ত হত্যাকাণ্ড ম্যাসাচুসেট্‌সের মোবেলী দলের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ, তিনি ঐ দলের ম্যাড্রিস্‌ নামক এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাকো যে-জেনে অবকৃত আছে উক্ত ম্যাড্রিস্‌ও সেই জেনেব বন্দী। সাকোর গ্রী-পুত্রেব শোকাবগে দেখিয়া সে একান্ত অভিভূত হইয়া স্বীকার কবিয়াছে যে, সেই এই হত্যা করিয়াছে। এই স্বীকারোক্তির বলে ও অস্ত্রাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া অধ্যাপক ফ্রাঙ্কফার্টার বলিতেছেন যে, বিচারক বেদর আসামীদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন এবং তাহার বার পদ-পাতিত্ব-দোষে ছষ্ট। তাহার মতে জুরীরাও বিচারেব পূর্বে হইতে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করিত।

আমেরিকার বিচারাদালত সম্বন্ধে এরূপ উক্তি যদি সত্য হয় তবে তাহা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা আদর্শে

বিশ্বানী লোকদের নিকট ইহা অস্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু ১৩০০ সালের পূর্বাভাসের প্রবাসীর সম্পাদকীয় সম্বোধ্য যুক্তরাষ্ট্রের লিবারেটর নামক কণ্ঠ হইতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছিল যে, “আমেরিকানরা কলঙ্কিত হইয়াছে বলাদিগকে নিরপেক্ষভাবে মনে না।”

সাকো ভ্যানজেরিয়ার যুতাদত্তের হুজুম লইয়া সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ভিতর যে সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে তাহার শেষ কোথায় তাহা এখনও বলা যায় না। চারিদিকে দাঙ্গা, ধর্মঘটের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদী ও শান্তিবাদীরা এই অবিস্তারের বিরুদ্ধে লড়িতে কৃতসম্বল হইয়াছেন। দণ্ড কিছুদিনের জন্য স্থগিত বহিরাছে। এখনও আপীণের চেষ্টা হইতেছে।

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা

প্রবাসী-ভবন—

দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী স্বামী ভবানী দয়াল ১৯২৫ সালে মিঃ আব্দুর রহমানের দলের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সাহাবাদ জেলার বাহরা গ্রামে দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রত্যাগত আশ্রয়শ্রম ভারতীয়দের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। এই গৃহটির নাম হইয়াছে প্রবাসী-ভবন।

সম্প্রতি এডোমিরেটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন যে বিহারের কতিপয় জমিদারের আনুকূল্যে তিনি কেনিয়ার ৩০,০০০ একর জমী ক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার যে সকল ভারতবাসী আব ভাবতে ফিরিয়া বাইতে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম, এই জমীতে তাহাদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে।

ব্রেজিল—

দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল রাজসরকার তাহাদের দেশে ইউরোপ হইতে লোক আমদানী করিতে অক্ষম হইয়া এখন এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। বোম্বাইএ সম্প্রতি মিঃ সার্কা আনা নামক ব্রেজিল দেশীয় সাংবাদিক আসিয়াছেন। তিনি কর্ণট ভারতীয়দিগকে ব্রেজিলে বাইরা বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। সাংবাদিকের মারফতে তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রেজিলের স্বাস্থ্য ধূম ভাল ও সেশানকার উর্ধ্বা জমীতে কোকো, চিনি, তামাক প্রভৃতি চাষের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু সেদেশের আয়তন অনুসারে লোক-সংখ্যা অল্প। কাজেই সেখানে এখন বিদেশীদের যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। ব্রেজিল দেশে বোম্বাইএ রাজদূত সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, ব্রেজিল-সরকার দেশে উত্তরভারতের কর্ণট ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে প্রস্তুত। তিনি বলিয়াছেন ব্রেজিলে ভারতীয় বিবেষ একেবারেই নাই। সেখানকার রাজসরকার ভারতীয়দিগকে সমস্ত নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে প্রস্তুত। যাছাও সেদেশে নতুন বাইরে রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে কিছুদিন আহার ও বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে ব্রেজিলে ২০১২ জন ভারতবাসী আছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জুতার ব্যবসাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ফিজি—

লাউটোকা (ফিজি) হইতে শ্রীযুক্ত ভিঃ দেও আমাদিগকে একখানি পত্র দিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই :—

ফিজি-প্রবাসী ভারতীয়দের হ্রস্বস্থির কথা সকলেই অবগত আছেন। সেখানকার ভারতীয়দিগকে একতাবদ্ধ করিতে হইলে হুশিক্ষিত সমাজ-

সেবক ও রাষ্ট্রীয় কর্মীর আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন যে, কয়েকজন ফিজি-প্রবাসী ভারতীয় যুবককে বহিঃপুস্তকরূপে শিক্ষা দিয়া কর্মী করিয়া তোলা যায় তবে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। ইতরায় এবিষয়ে ভারতবর্ষের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্র—

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ আজ ১১ বৎসর যাবত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একরূপ নির্বাসিত হইয়া আছেন। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে তিনি তাহার নির্বাসিত-কাহিনীর কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী সকল ভারতবাসীর অন্তর্গতই সেইরূপ লাহনা লাভ ঘটতেছে। বিনা বিচাবে কারাবাস, গুপ্তচরের অত্যাচার প্রভৃতি হইতেই আশ্রয় করিয়া আরও অশেষ প্রকার লাহনা নির্বাসিত তাঁহাকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু তিনি ইহাতেও দমিবার পাত্র নহেন। কতিপয় আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে তিনি “ভারত-স্বাধীনতা-বাহুব-সমিতি” নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করিয়া ভারতীয়দের দুর্দশা-মোচন-চেষ্টা ব্রতী হন। অনেক প্রকার প্রতিবন্ধতা সত্ত্বেও তিনি এই কার্যে কিছু কিছু সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু তাহার পরেই ১৯২৩ সালের হুশিম কোর্টের রায়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

সম্প্রতি তাহার ঐকান্তিক চেষ্টার কোণখান্ড ব্যবস্থাপক সভায় “হিন্দু-পৌর-অধিকার-বিল” নামক আইনের বসুড়া পেশ করা হইতেছে। এই আইন পাণ হইলে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঘোষ মহাশয় এই প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রসমিতি ও ভারতবাসীরা এই ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ইংলণ্ড—

ডাঃ ফার্মাগোজ বিলাতের একটি নিউনিউপোর্টের সহকারী যন্ত্রা-চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ‘কালো আর্মী,’ কাজেই তাহাকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। অবশেষে ব্যাপারটি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। বিগত ৯ই জুলাই তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ যে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ ফার্মাগোজকে পদচ্যুত করিবার অনুরোধ মত নিয়াছেন। এই আদেশ পাইয়া দিটি কাউন্সিল তাহাকে পদত্যাগ পর দাখিল করিতে বলিয়াছেন।

নেটাল—

নেটালের সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে ৩১২ জন পুরুষ, ১২ জন স্ত্রীলোক ও ১৯০ জন শিশু (ভারতবাসী) সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সরকারী দপ্তরে এখনও ৪০০ বসত উঠাইবার দরখাস্ত পড়িয়া আছে।

ভারতবর্ষ

বস্ত্রা—

গুজরাট প্রদেশে ভীষণ বস্ত্রা হইয়া দেশবাসীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ভাবতের দৈত্যের দৈত্য নাই, তাহার উপর ভগবানের অভিধান যে অসম্ভব। গুজরাটবাসীর এই দুর্দিনে সমগ্র দেশবাসীর

সাধারণ প্রদান একান্ত কর্তব্য। উড়িয়া প্রদেশেও এখন বৃষ্টিপাতে উড়িয়াবাসিগণ বিষম ভোগ করিতেছেন।

ডিব্রুগড় ও ধুবড়ীতে বজ্রা হইয়া শস্ত নষ্ট ও কয়েকজনের প্রাণ-বিনাশ হইয়াছে।

—ত্রিশ্রোতা

গণিকাবৃত্তি বহিত করিবার আইন—

মাস্ত্রাজ্জ ভিক্সেলস সমিতি সালের গণিকা-বৃত্তি দমন লক্ষ্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। আইন-সভায় সভ্যগণের • অভিমতের লক্ষ্য উহা তাহানিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। এই বিষয় আলোচিত হইবার পরে বর্তমান বৎসরের শেষ ভাগে উহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে। বর্তমানে মাস্ত্রাজ্জে যে সিটি পুলিশ আইন প্রচলিত আছে, তাহা ৩০ বৎসর পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছে। এই আইনে পুলিশকে ঘোষণািত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। প্রস্তাবিত আইনানুসারে পুলিশ গণিকালয় খানাতল্লাস করিয়া অপরাধিগণকে ধৃত ও তাহাদের হস্ত হইতে নাবালিকা-গণের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন। গণিকালয়ের মালিকগণের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা রুজু করিতে পারিবেন। উপযুক্ত নোটিশ দ্বারা পুলিশ কমিশনার কোনও কোনও বাড়ী নীতিবিগর্হিত অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিতে নিষেধ কবিত্তে পারিবেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলিবে না। এই আদেশ অমাত্র করিলে অত্যধিক অর্থদণ্ড হইবে। ইন্সপেক্টরের নিয়তন পুলিশ কর্মচারী গণিকালয় হইতে বালিকাগণকে বেত্মগণেব হাত হইতে উদ্ধার সাধন কবিত্তে পারিবেন না। পুলিশ নাবালিকগণকে আদালতে উপস্থিত করিবেন এবং ২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহানিগেব ভরণপোষণ ও রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। রূপথে আনয়ন লক্ষ্য বাহা বা বালিকানিগেব সালের আনিবে, তাহারা বেত্মদণ্ড, ২ বৎসরের লক্ষ্য কারাদণ্ড এবং অনধিক ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। গণিকাগণের উপাধিক্ত অর্থে বাহা বা জীবনধারণ করিবে, তাহানিগের লক্ষ্য ও ঐকণ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আইন বর্তমানে সহবে প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে সফল লাভ হইলে সমগ্র প্রদেশে উহা প্রচলিত হইবে।

—ঢাকা-প্রকাশ

গণিকাবৃত্তি রহিত করিবার লক্ষ্য কলিকাতা ভিক্সেলস এসোসিয়েশন এবং কলিকাতার মেয়র চেষ্টিত হইয়াছেন। সহযোগী 'হিন্দুবজ্জিকা'র প্রকাশ—

সারা ভারতে নুনকল্পে তিবিধ লক্ষ গণিকা তাহাদের হীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। প্রতিনিয়ত ইহাদের সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে। কত অসহায় নিরুদ্বল বালিকা আড়কাটির কাছে পড়িয়া তাহাদের জীবনকে মরুভূমি করিয়া ফেলিতেছে। বাহাতে এই হীন ব্যবসা অচিরে বন্ধ করা হয়, দেশবাসীর সেই বিকে দৃষ্ট দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীহট্টেব বঙ্গভুক্তি—

আগামী ১৮ই আগষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে আলোচনার লক্ষ্য-শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীহট্টেব বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙলা

বজ্জ বিধবা-বিবাহ—

বজ্জীয় বিধবা বিবাহ সভার উদ্যোগে গত মাসে ১৫টি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ত্রিপুরা সামরিক পত্রিকাদিতে হইতেও কয়েকটি বিধবা-বিবাহের সংবাদ উদ্ধৃত করা হইল :—

অলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত সীতানাথ আশাপিকের শ্রীমতী হরিদাসী নারী এক বিধবার সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পৌবোহিত্য করিয়াছিলেন। —গুণীপ

গত ৮ই শ্রাবণ পাবনা শিমুলজীবনীর হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সাহার সহিত পাবনা বনগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মনমোহন সাহার বোড়ণ বয়ী বিধবা কস্তা শ্রীমতী কালীদাসীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। —হুয়াজ

বিগত শ্রাবণ মাসে রাঙ্গসাহী টাউনের নিকটবর্তী মতিহাব গ্রামে গোপ সমাজে চারটি বালবিধবার বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বরদস্তার পরিচয়—

শ্রীমতী সুবাসিনী দাসী, ১৩ বৎসর ৫ মাস বয়সে বিধবা। বর্তমান বয়স ১৪ বৎসর ৫ মাস। বর—শ্রী কৃষ্ণক ঘোষ, বয়স ৪০ বৎসর, দ্বিতীয় বিবাহ।

২। শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্তমান বয়স ১৮। বর—শ্রীকোকনচন্দ্র ঘোষ বয়স ৩১ বৎসর, ২য় বিবাহ।

৩। শ্রীমতী কুমুমবালা দাসী, ১২ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্তমান বয়স ২০ বৎসর। বর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বয়স ৪০ বৎসর, ১ম বিবাহ।

৪। শ্রীমতী রাইহুন্দারী দাসী, ১২ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্তমান বয়স ১৯। বর—শ্রীরামকান্ত ঘোষ, বয়স ২৫ বৎসর, ১ম বিবাহ।

৫। শ্রীমতী ধোণমায়ী দাসী, ১৩ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্তমান বয়স ১৭ বৎসর। বর—রতিকান্ত ঘোষ, বয়স ১৯ বৎসর, ১ম বিবাহ।

৬। শ্রীমতী মানরাহুন্দারী দাসী, ৮ বৎসর বিধবা। বর্তমান বয়স ২০ বৎসর। বর—শ্রীবেদরাম ঘোষ, বয়স ৩২ বৎসর, ২য় বিবাহ।

—হিন্দুবজ্জিকা

গত ১২ই আগষ্ট শুক্রবার, বাঁকুড়া বেলেতোড়া গ্রাম নিবাসিনী বালবিধবা শ্রীমতী আশালতা বোয়ের সহিত এই গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দস্তেব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী বয়স উনিশ ও পাত্রের বয়স উনত্রিশ বৎসর। পাত্রের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিহর নিবোগী। এই উৎসবেব কমুঠান হয় স্ববিধাতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বহু এম-বি মহাশয়ের গৃহে হিন্দু আচার মতে সম্পন্ন হয়।

এই প্রসঙ্গে সহযোগী বাঁকুড়া-দর্পণ লিখিতেছেন—

“আমাদের বাঁকুড়া জেলায় সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর গোয়াল মাছে—পন্ন-গোপ, মেড়েলি, করঞ্জ ও আহীরা। শেষ শ্রেণীর সংখ্যা অতি কম। এই গোয়ালদের মধ্যে কস্তা বিক্রয় প্রথা অনেক স্থানে আছে বহুই অনেক গোয়ালার বৎস লোপ হইতেছে। বাহাদের জন্যে জায়েগা বেনী নাই তাহাদের বিবাহ হইতেছে না। আমরা করঞ্জ গোয়ালাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিয়াছি বাহানিগকে কেহ কস্তা দিতেছে না। পূন-প্রথা রহিতের চেষ্টা হইতেছে, সভা-সমিতি হইতেছে, মন্তব্য গঠিত হইতেছে কিন্তু কোন কল হইতেছে না। চারি কৈবর্ত গোয়ালার প্রভুতি অনেক জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

ইহাব একটি কারণ অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ও কল্যাণ অক্ষত। ইহাযেব মধ্যে বিবাহ-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।”

যুবক সম্মিলনী—

গত মাসে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মৈমনসিংহ যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতি মৈমনসিংহ জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সম্পর্কিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত মাসে ঢাকা যুবক-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পটুয়াখালি সভ্যগ্রহ—

পটুয়াখালি সভ্যগ্রহ সমিতির সম্পাদক আমাদিগকে লিখিয়াছেন,

আগামী ২রা ভাদ্র জন্মষ্টমী তিথিতে এই আন্দোলনের এক বৎসর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষ্যে কর্মীরা সেই তাবিখে একটি উৎসব করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এই উৎসবে দেশবাসীর সহায়ত্ব ও আশীর্বাদ কামনা করেন।

পরলোকগত সাহিত্যিক পরমেশপ্রসন্ন রায়—

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরমেশপ্রসন্ন রায় বি-এ, বিজ্ঞানস্নাতক এলা আখাড়া বৃহস্পতিবার ঢাকায় তাঁহার নিজ বাস-ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্যিকরূপে তাঁহার নাম সুপরিচিত ছিল। তাঁহার রচিত “মেয়েলী ব্রত-কথা,” “বিয়ের বই,” “পঞ্চমুখ,” প্রভৃতি পুস্তক পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার দ্বারা সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

পুস্তক-পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আন্দোলনের নিয়ম। —প্রবাসী-সম্পাদক]

কাঠের কাজ—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ, হস্তশিল্প-শিক্ষক, শান্তিনিকেতন। ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ টাকা।

গ্রন্থকার মূখ্যবক্ষে লিখিয়াছেন, এই বই “দেশের ও বিশেষ করিয়া শিক্ষাবিভাগের কাজে লাগিলেই” তিনি “শ্রম মঙ্গল জ্ঞান করিবেন।”

দেশের কাজে লাগিবার আশা বৃদ্ধিতে পারি, দেশে কাঠকারুর অভাব আছে, কাঠকর্ম শিক্ষাইবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে কাঠকর্ম শিক্ষার কি বিশেষ প্রয়োজন ঘটতে পারে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বাজালা ও ইংরেজী ইস্কুল এবং কলেজ সহীরা শিক্ষাবিভাগ। কলেজের মধ্যে কেবল ইঞ্জিনিয়ারী কলেজে কাঠকর্ম শেখান হয়; কিন্তু সেটা কলেজ, হস্তশিল্প সেখানে বাস্তব স্থান নাই। ইস্কুলে বাস্তব বই চলে; কিন্তু সেখানে কলাশিক্ষার স্থান নাই। সেখানে ছেলেরা কান থাকিতেও বহির, চোখ থাকিতেও অন্ধ। সেখানে চক্ষু-কর্ণের বিবাস্তবজ্ঞানের কোনও প্রয়োজন মেলিতে পাওয়া যায় নাই, পুস্তকদ্বারা বিদ্যাই যথেষ্ট। অনেক ইস্কুলে প্রতিরূপ লিখনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আরই এই পর্যন্ত। কারণ এটা কালক্ষেপ মাত্র, পরীক্ষার পাসে চিত্তের মূল্য নাই। তবে, তবিত্তিহি, ইংরেজী ইস্কুলে কত কি কম শেখান হইবে, ইস্কুল ছাড়িলেই ছেলেরা কত কি কম করিয়া টাকা রোজগার করিতে থাকিবে। জানি না, এই অসম্ভব তাও ঘটবে কি না। কিন্তু ব্রিটিশ, এই প্রস্তাবের উৎপত্তি ইংরেজী উর্জমার। বাস্তবকাল হইতে সহজে বসিয়া মাথার কোটরগুলি তর্জমায় পূর্ণ করিলে তাহাতেই মন মাতিয়া থাকে, বাহিবেব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি থাকে না। বিভ্রান্ত আলয়ে কল্যকে প্রবেশ করিতে দিলে দুই নৌকায় পা পড়িবে। কাবণ বিদ্যার মনঃসিদ্ধি, কল্য হস্তসিদ্ধি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যভেদ করিতে গেলেই বিপত্তি ঘটে। বর্তমানে ইস্কুলের শিক্ষার বা বোঝাই হইয়াছে তাহাতেই ছেলেরা ভয়ে আড়ষ্ট, অভিভাবকেরা জাহি জাহি করিতেছেন। কারণ সেখানে প্রকৃতির সহিত পরিচয় হয় পুস্তকে, শিক্ষকের নিগিত রচিত ভূগোল নিম্নতমশ্রেণীর বালকে পড়ে,

ব্যাবহারিক জ্ঞানমিতিব সংজ্ঞায় তাহার কণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়, শিক্ষার নিত্য নূতন আবিষ্কৃত ক্রমের পরীক্ষা হয়; আর নিত্য নূতন বহির ও বাঁধা খাতার পরমা জোগাইতে পিতামাতা ব্যতিব্যস্ত হন। দেখিলে শুনিলে মনে হয় বাতিকপ্রাপ্ত লোকে শিক্ষাতরীর কর্ণধার হইয়াছেন। আশঙ্কিত হই, “কাঠের কাজ” বোকার উপর শাপের আঁটিই বা হয়।

আমি বহুকাল হইতে শায়-শিক্ষার (manual training) পক্ষপাতী, দুই একটা ইস্কুলে কাঠ দিয়া শায়-শিক্ষা দেখিয়াছি, শায়-শিক্ষকের গুণে এবং প্রধান শিক্ষকের অনুমোদনে অনেক ছেলের চোখ ফুটিয়াছে, হাত খেলিয়াছে। কিন্তু সে ইস্কুলের ছেলেরা প্রতিরূপ লিখন ও চম-চমক দর্শন, এই দুই ক্রিমার সাহায্য পাইয়াছে। এই দুইর যোগ না ঘটিলে চোখা বিকল হইত। বলা বাহুল্য শায়-শিক্ষা আর “কাঠের কাজ” (wood-working) এক বস্তু নয়। শায়-শিক্ষাকে বিদ্যা-শিক্ষার এবং বিদ্যা-শিক্ষাকে শায়-শিক্ষার অঙ্গ করা যেমন-তেমন কর্ম নয়। সে অনেক কথা, আর সেজন্য যে বই পড়ার ব্যবস্থা আছে, তাও নয়। বৎস হেলেদেব হাতে শায়-শিক্ষার বই দিলেই উদ্বেগ বার্ষ হইবে।

এখন দেখি, “কাঠের কাজ” পড়িয়া কেহ কাঠকর্ম শিখিতে পাবিবে কি না, অ-তক্ষা তক্ষা হইতে পাবিবে কি না। যাহারা ছুতাবের কর্ম জানে, করিতেছে; তাহারা এই বইতে শিখিবার মতন কিছু পাইবে না; যাহারা জানে না, কিন্তু শিখিতে চায়, তাহারাও এই বই পড়িয়া শিখিতে পাবিবে না। কেন পাবিবে না, তাহা পরে বলিতেছি। শিক্ষার্থীর আর-এক শ্রেণী কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহারা “স্তম্ভলোক”, সধ করিয়া শিখিতে চায়। এখানেও সেই উত্তর; বইখানি ইয়ুজিডেব জ্ঞানমিতি হইয়াছে, যে এগালিতে লেখক তাঁহাব জ্ঞান ‘প্রণালীবদ্ধ’ করিয়াছেন, সে এগালীর দোষই প্রথম শিক্ষার্থীর হাত পা শুটাইয়া পড়িবে।

পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, লেখক “স্তম্ভলোকের ভয়ে” বইখানির নাম “ছুতারের কাজ” রাখিতে পারেন

নাই। কিন্তু গ্রন্থকাব ভূগিগ্ৰাহেন, ভীক জ্ঞকর শিবা জ্ঞোটে না। যিদি নিজে ভঙ্গলোকের ভব করিতেছেন, কোন ভঙ্গলোক-শিবা সে ভরে ভীত না হইবেন? সে যাঁহা হইক, কথাতত্ত্বিক বটে, ঠিক নয়। ঠিক বটের উদাহরণ অনেক আছে। “বিদ্যা” ও “বিজ্ঞান” শব্দ দ্বাৰা ভঙ্গতা রক্ষার চেষ্টা দেখিয়াছি। “বয়ন বিদ্যা”, “দর্জী বিজ্ঞান” এই এই নামের বইর বিজ্ঞাপন পড়িয়াছি। একবার “ভারতবর্ষে” সূচীকম নয়, “সীমানাঙ্কন” নামে এক প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। এইমাত্র এখানে একটা বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, বাকুড়াষ “ব্যায়াম বিদ্যালয়” স্থাপিত হইয়াছে, ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামবিদ্যা শিখিতে পারিবে। কিন্তু ব্যায়াম বিদ্যা ও ব্যায়াম শিক্ষা এক পদার্থ নয়। বিদ্যা আমাদের শিরে এমন ভর কবিগছেন, আমরা সারা জগৎ বিদ্যাময় দেখিতেছি। কি জানি, মল্লভীড়া, কুস্তি আখড়া বলিলে ভঙ্গতা নষ্ট হয়, ব্যায়াম বিদ্যা বল, মাল হইতে হইবে না। Physical Training School বল, ভঙ্গতা রক্ষা চূড়ান্ত হইবে। দর্জী বলা হইবে না, টেলার; দস্তারী বলা হইবে না, বুক-বাইণ্ডার; ইত্যাদি। এই যে আশ্বপোনেব ইচ্ছা, সেটা কেবল দর্জী ও দস্তারী নয়; সাহেবী সাম্রাজ্য সেই ইচ্ছা।

সকল ইচ্ছাব নিদান এক নয়। বাবু বাড়ীর সেরেবা যখন কল ঘুরাইয়া কাপড় সেলাই করেন, তখন তাঁহার দর্জী হন না। আমার এক বিদ্যান বন্ধু কামারের কর্ম বেশ করিতে পারেন, তিনি কানার হন নাই। গন্ধাজী নাকি আপনাকে তাঁতী বলেন; কিন্তু কেহ কি তাঁহাকে তাঁতী বলে? তাঁত বোনা তাঁতীর পেশা হইলেও কেহ কি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত? কিন্তু যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে কেবল কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে, সে তাঁতী বই আর কি? বিলাতেও দোকানী গন্ধাজী, ছুতার কামার, প্রভৃতির পদ-গৌরব আছে কি? যেদিন কারু বিদ্যাবান হইবেন, সেদিন তাঁহার সম্মান আপনি বাড়িয়া উঠিবে। এইগুণে পটুয়ার কর্ম এখন সভ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে আর এক অন্তরায় আছে। সেটা এমন প্রচ্ছন্নভাবে আছে যে সহজে চোখে পড়ে না। মানুষের জাতিভেদ আছে, স্বতরাং কর্মেরও জাতিভেদ ঘটয়াছে। শূদ্র ছিল কাবু। শূদ্র হীনবর্ণ, লঘু; তাহার বৃত্তিও লঘু। বে অগ্রি, তাহার কর্ম নিম্ন। এদিকে কিন্তু কার না থাকিলে ব্রাহ্মণের দিন চলিত না। কাজেই সে অধম হইলেও তাহার নির্মিত ব্রহ্মা তাঁহার নিকট শুদ্ধ গণ্য হইল। চর্মকার অস্পৃশ্য, কিন্তু উপানহ দেখে ধারণী। “ছোট” লোকে করিত বলিয়াই কারু কর্ম—“ছোট” হইয়া গিয়াছিল। সে কর্ম আর “ভঙ্গলোকে” কবিলে “ছোট” হইত না। মৃগয়া রাজধর্ম; নিষাদে করিলেই প্রাণিহিংসা। তখনও কিন্তু সখের আৰ্য ছিলেন, রাজপুত্রও ছেলেবেলায় ধলা বালি লইয়া খেলা করে। প্রকৃতির প্ররোচনায় আশও খেলা করিতেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বের যখন প্রভু ও দাদে হিন্দুসমাজ বিভক্ত, যখন শূদ্র মাত্রেই দাস গণ্য হইত, তখন দেখি আর্বের, বিলাসী সভ্য আর্বের সখের কর্ম ছিল তক্ষকর্ম। তক্ষকর্ম ছোট হইলে কোন আর্ব দাসের সম্মুখে করিতে পারিতেন?

আমাদের স্বত্বধর বাস্তবিক ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ারেব মান আছে, স্বত্বধরেরও ছিল। তাঁহাব অদীনেও আদেশে তক্ষা কাজ কবিত। কারণ তক্ষকর্মেই মূলে বস্ত্রবিজ্ঞা (mechanics), সে বিজ্ঞা স্বত্বধরের। গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য ঘর আছে, স্বত্বধর সে সব গড়িয়া দিয়াছেন; তাঁহারই বিজ্ঞান ঘরের চাল নির্মিত হইয়াছে। বাড়ি ও ঘরানি, ছুতার ও কামার ঘরের কাঠকর্ম করিতেছে বটে; সেটা কিন্তু স্বত্বধরের নিকট শেখা।

বস্তুত: যে কর্মে জাতিই করুক, গণীর আদর চিরকাল আছে। তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দলে অগণ্য অগণী টুকিয়াছে। আও দুর্ভাগ্য, “ভঙ্গলোকে” মুড়ি-মুড়কির প্রভেদ জানেন না, বাইরের রঙ্গ চন্দ্র ভুলিয়া যান। কলিকাতার বাজারে এমন জুতা পাই নাই, বাব তলা চাচা ঘষা হয় নাই। সৌখিন ক্রেতা জানেন না, সে তলা কার্পেটের উপর টকিতে পারে; বালি কাকরে চলিতে হইলে চমের “নীল” আরও দুইমাস টকিত। তক্ষকর্ম ছুতাবে করে বটে কিন্তু দরজা জানাল মলবৃত্ত করিয়া পড়িতে পারে কপাট ঠিক মত বুনাইতে পারে, এমন ছুতার সহসা মেলে না। কপাট বুনানার দোষে গৃহস্থামিকে পাগল হইতে হয়; কিন্তু তিনিই আনাড়ীর দল বাড়াইয়াছেন, মুড়ি-মুড়কির সমান দর কবিয়াছেন।

আনাড়ীই বা পাই কই? বহু বহু গ্রাম আছে, যেখানে দুই তিন ফ্রেশের মধ্যে ছুতার নাই। পূর্বকালের কারুকুল বেগেও অনাহারে হ্রাস পাইয়াছে; এখন দিন কিবিগাছে বটে, দিন বেতন এক টাকা, কোথাও পাঁচদিক দিয়াও কিন্তু ছুতার পাওয়া যায় না। টেবিল চেয়ার করণনা চাই? দুই দশ দিন পরে পাইলেও চলে; কিন্তু সহ-নির্মানে বিলম্ব নয় না। গোলব গাড়ীর চাকার পুঠা কি আরা ভাঙিয়া গেলে কাজ অচল। অথচ গ্রামে বহু বহু লোক আছে, কাষ্টবনে ঘাহদের জাতি খোয়াইবার ভয় নাই। কিন্তু কে শেখায়? বই কই যে পড়িবা শিবিবা লইতে গাবে? স্বল্প-সমস্তা সমাধানের নানাগল থাকিবেও নাই।

এখানে একটা ঘটনা বলি। কয়েক বৎসর পূর্বে বাকুড়া বিষ্ণুপুত্র এক উৎসাহী ডেপুটি আসিয়াছিলেন। সেখানে একটা টেকনিকাল ইন্সকুল খুলিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এই নম শনিয়াই আমার মনে কেমন ষটকা লাগে। শুনিলাম বিশ পচিশ হাজার টাকা খরচে পাকা বাড়ী হইতেছে। এই সংবাদে ষটকা আরও বাড়িয়া গঠে। একদিন দৈবক্রমে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তখন ইন্সকুলে শিক্ষা কিছু কিছু আবস্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসিলাম, কে শিখিতেছে, কি শিখিতেছে। “ইন্সকুলের ছেলেরা শিখিতেছে, ফটো-স্ক্রোম করিতেছে।” এই উত্তর আমার ষটকার সময়েই মনে হইয়াছিল। গরে শুনিলাম তিনি বিষ্ণুপুত্রের হঠাৎ মারা গিয়াছেন। আর, মাস ছয়েক পূর্বে বিষ্ণুপুত্রের সংবাদে পড়িয়াছিলাম, ইন্সকুলটির ভগ্নাবস্থা। হস্ত তিনি কালিলে এত জরাজালেব মধ্যে ইন্সকুলটি এই দশা হইত না। ব্যয় ও আড়ম্বরের তুলনায় দেশে কখন ছুতার বৃদ্ধি হইয়াছে?

“কারের কাজ” বইখানি এইরূপ টেকনিকাল ইন্সকুলের চণ্ড লিখিত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “যাহাদের উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা, সেই আগত, আত্ম, অনাহত ও ববাহত শিক্ষার্থীদের হাতে বইখানি উৎসর্গ করিলাম।” জানিনা, কে সে শিক্ষার্থী, যে শুক নিরপেক্ষ হইয়া এই বই পড়িয়া কারের কাজ করিতে পারিবে। গ্রন্থকারের আরম্ভ-বাক্য এই,— “আমাদের দেশে কারের কাজ শিক্ষার বিশিষ্ট কোন নিয়ম বা কর্তৃপক্ষ নাই।” এটা ত ঠিক কথা নয়, দেখা-গড়ান নাই কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিলম্ব আছে। সেটা স্বাভাবিক ক্রম, এবং সে ক্রমই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধর শিবা হইয়া হাতে-হেতেরে শিক্ষার তুল্য আর কি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আছে? এই হেতু হস্তশিল্পের বই লেখা ভারি কঠিন।

গ্রন্থকার প্রথমই আবশ্যক যন্ত্রাব কর্ম দিয়াছেন। এই কর্মও পরে লিখিত সহ-বস, ক্রেম্প, চাবিকনে একত্র কাজ কবিবার বৈকি ইত্যাদি উপকরণ দেখিলেই বৃষ্টি টেকনিকাল ইন্সকুল তাঁহার লক্ষ্য। স্বদে নাই, এমন অনেক যন্ত্র তাহার আলুমারিতে দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকার যদি দাম ধরিয়া মোট ৭২৮ দিতেন, তাহা হইলে বৃষ্টিতেন, কলিকাতার দুই পাঁচজন ভাল কারিকর ছাড়া দেশের সাধারণ ছুতার তত টাকা

নাই। শরচ করা আবশ্যকও মনে করি না। দেশটা বিলাত নয় যে, তাহাকে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হইবে। একখান মোটা পাটা ভূঞে ফেলিলেই তাহাব বেকি হয়; লম্বা রোঁদা করিবার সময় একটা বেকি পাইলে ভাল, না পাইলে কাজ অচল হয় না। সে স্বচ্ছন্দে পা মুড়িয়া হাতে পারে কাজ করে, জুতা মোজা পরিয়া থাকে না। করাতেব হুতায় কালী শাখাইতে বাক্স, রীল প্রভৃতি অনাবশ্যক বাহ্যিক দেখিলে মনে হয়, ঝাঁকড়া চুলে টেরি কাট্রিয়া শাখা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া সৌধিন বালকে সৌধিন কর্ম করিবে। হাতে কালী লাগার ভয় থাকে, চা-খড়ি ত ছিল।

কাঠকর্ম সাধারণতঃ বিবিধ, গড়ন ও জোড়ন। গড়নের কাজ বলিলে চলিতভাষায় বাটালী দিবা সূঁচি গড়া বিখ্যাত। পূর্বকালের বৃষ্টিকর্ম। তাহা হইলেও কাঠ সাইত করা গড়নের মধ্যে আসে। গ্রন্থকার আশা করেন আমাদের কৃষকেরা লাঙ্গল মই বরের খুঁটি দবজা নিজে গড়িয়া লইতে শিখিবে। কিন্তু তাহার আলমারিতে বাইস দেখিতে পাইতেছি না। দেই বদের কালের বাসি, যাহা একাধারে বিলাতী দুইটা বস্ত্র উপযোগে করা বাটালী রোঁদা, সে বাইস নইলে গায়ের ছুতাবের হাত বন্ধ। তাহার আলমারিতে ভরই বা কই? তাহাকে বলিতে হইবে না, দেশী ভররের কাছে বিলাতী রাউট, গ্রামা ভাষায়, কলিকাতা পাইতে পারে না। বাইস, করাট, বাটালী, ভরর ধরিতে যে না শিখিয়াছে, সে কিছুই শেবে নাই। ছুতার অ-নাড়ী কি স-নাড়ী তাহা বুঝিবার তিন সোজা উপায় আছে। এক, তাহার হেতরের ধার দেখা। অ-নাড়ীর হেতরের ধার মোটা। দ্বিতীয় উপায়, তাহাকে একটা বাজ্ঞে কাঠে ইজুপ জাঁটিতে বলা। অ-নাড়ী সোজা বিদ্ধ করিতে পারে না; যদি বা পারে গায়ের জোরে ইজুপ বসায়। তৃতীয় পরীক্ষা, প্রাণীয়া পরীক্ষা, যেটা গড়িবে, দেটার রেখাচিহ্ন লেখা। দেখিতেছি, গ্রন্থকার হেতরে ধার দিতে বলিয়াছেন, ইজুপে গায়ের জোব লাগাইবাহেন, আর “অঙ্কন”টা বিবিধ মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাহার ছাত্র প্রথম পরীক্ষার পাস, অল্প দুই পরীক্ষার ফেল হইবে। প্রাণপণে ইজুপ কবিত্তে দেখিলে বুঝি, ইহার সম্মান জানে না। আর যে, ভূঞ বা কাগজে জিনিদগি লিখিয়া দেখাইতে না পারিবে, সে কাঠে আর কি দেখাইবে?

যন্ত্রের চলিত নাম, ও নানাবিধ জোড়নের নাম দেওয়ার একটু সূক্ষ্ম আছে। স্থানভেদে অল্প স্বল্প নামভেদ আছে। তথাপি ‘রেড’ নয়, রেডী বা উগা বা উগা। (বেতী নাম হিন্দী)। ‘অগর’ নয়, আগর; ‘অগরবিট’ নয়, আগরের ফল; ‘তেল পাণর’ নয়, তেলশিল; ‘২ ফিট লম্বা মাগিবার যন্ত্র’ নয়, দু-ফুটে, গজ, (বাঙ্গালার ফুটবিট নাই, সব ফুট); tennon saw টেন্ন সা। টানা করাতে বলিলে কগাতীর লম্বা করাতে বুঝায়। টেলা করাতে আব টানা করাতে, দুই রকম হাত করাতে আছে। সে টানা করাতে কোলের দিকে টানিতে হয়। এক্ষন্ত পৃথক করিতে হইলে কোলটানা করাতে বলিতে হয়। গ্রন্থকার screw driver কেন মার্শাল বলিয়াছেন, জানি না। বাঙ্গালার বলে তিকজু। বিস্তৃত ড্রিয়ার নাম পৌচ-ব্ব বেল জাপে। আমি শুনিয়াছি হাতুড়ীকে মাতল লস। হেতরের কর্ণে ১৪ ইঞ্চি রোঁদা আছে, ছোট রোঁদা কই; ‘পোক রোঁদা’ আছে, চেমা কই? পশুও দেখিতেছি না।

যাহাঁরা প্রথম লেখক হইবেন, ভাষার প্রতি তাহাদের একটু কর্তব্য আছে। গ্রন্থকার বাবতীয় জোড়নের ইংরেজী নাম চালাইয়াছেন। হেতরের ইংরেজী নামে ক্ষতি নাই, কিন্তু কর্মের ইংরেজী নাম দিলে বিষয়জ্ঞানে বিভ্রম হয়। বাঙ্গালী নাম ছিল না, কিংবা সার্থক নাম রচনা কঠিন, তাও নয়। তথাপি, করাতে ‘দানা’ নয়, দাঁত; ‘জু’ নয়, ইজুপ; পাণরে ধাব দেওয়া নয়, ধার করা বা শিলনা; ‘পলিশ করা’ নয়,

‘পালিশ লাগানা’ (পালিশ করা-মহুণ করা); ‘শাশাপাশি’ আঁধে নয়, এড়ো দিকে; ‘কুদ করা’ নয়, কৌদা; ইত্যাদি। ‘পুনর্পালিশ’ কথাটা বুঝিতে আমার সময় লাগিয়াছিল। কাঠে পালিশ লাগানা, কাঠ কৌদা, একাই এক এক কলা। এখানে তাহার স্থান নাই। তুলি দিয়া, কি বেকড়ার পুটলী দিয়া পালিশ মাখানা আর রং বা বার্নিশ লেপা একই। সেটা পালিশ নয়।

পুস্তকের শেষ অধ্যায়, “কাঠ পরিচয়।” কিন্তু পরিচয় করাইতে হইলে গুণ বর্ণনা চাই। সেদিকে লেখক না গিয়া কাঠের নাম মাত্র দিয়াছেন। কাঠের রংও বলেন নাই। সেজন্য কাঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “ইহার আঁশ খুব ঘন, কঠিন করিতে বেশ মোলায়েম।” শিশু-কাঠের “আঁশ খুব শক্ত ঘন এবং স্থাব্রভগ্নসম্পন্ন।” এই পরিচয় ঠিক নয় কাজেবও নয়। গাছের নাম করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিত। এখানেও একটু বাধা আছে। বাঙ্গালাদেশে শিশুকাঠ দেখিতে পাই না, যেটা দেখি সেটা সিতসার (সং সিতি এখানে কৃষ্ণবর্ণ)। গাছটার ঘেষে এই নাম চলিত আছে। দেখিতেছি, লেখকের কতকগুলি গাছ আসাম অঞ্চলের। যে গাছ যে দেশে জন্মে, তাহাব সেদেশী নাম অবশ্য দিতে হইবে; তাবপর তাহার সংস্কৃত নাম থাকিলে সে নাম। সে নাম পাইলে অল্প দেশেব লোক গাছটি চিনিতে পারিবে। সংস্কৃত নাম না থাকিলে সংস্কৃত নামেব কোন্ গাছের জাতি, তাহা বলিলে কিছু জানা যাইবে। তা বলিবা শিমুলের নাম ‘তুলা’ লেখা, কিংবা ব্রহ্মদেশীর ইংরেজী Ironwood এর বাঙ্গালী তজ্জমা ‘লৌহকাঠ’ একেবারে অচল। অরণ হইতেছে এই “লৌহকাঠ”কে নোয়াখালি ও চাটগাঁয়ে পিছাড় বলে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়,

হিজলীর মসনদ-ই-আলা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত। প্রকাশক কেম্যান্স কুটার, ভাদ্রনমাষি, জানু। পোষ্টঃ মেদিনীপুর। ২৭১+৩৪ পৃষ্ঠা। ২২ খানা চিত্র ও মানচিত্র।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ কূলের মাঝামাঝি হিজলী দ্বীপ এখন ম্যালেরিয়া-প্রসিদ্ধিত চাষের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রশতাব্দীতে বাঙ্গলার ইতিহাসে হিজলী বিখ্যাত ছিল। গঙ্গার এক শাখা যেখানে শেষ হইয়াছে, পূর্বে সাগরদ্বীপ এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার বিস্তৃত জমি, ঠিক এইরূপ স্থানে থাকার হিজলী বঙ্গোপসাগরের নাবিকদের পক্ষে অভ্যস্ত স্থিতির স্থান ছিল, এবং ইহার মুসলমান রাজা অনেক দিন স্বাধীনতা বক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমে হিজলীর শেষ বিদ্রোহ দমন হয়, এবং তাহার ২৭২৬ বৎসর পরে ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গের সুবাদার শাহেরুজা খাঁ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এই হিজলীতে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সাবাড় হইয়া যায়।

যে-সব বিদেশী জাহাজ বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিত তাহাদের পক্ষে হিজলীর সাহায্য না লইলে চলিত না, এক্ষন্ত পুরাতন পুর্নগীর্জ ও ইংরেজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হিজলী (Injelly)র অনেক কথা জানা যায়। বঙ্গোপসাগরের আর কোন বন্দর সম্বন্ধে এত বেশী সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহা ভিন্ন, হিজলীর সমাজে স্থানীয় রাজবংশের একখানি পুরাতন জাদী ইতিহাসেব হস্তলিপি রক্ষা পাইয়াছে, ইহার অনেক অংশই বিশ্বাসযোগ্য।

এইসব উপাদান একত্র করিয়া বহুবর্ষব্যাপী তদ্রাস্ত পণ্ডিতের কল মহেন্দ্রবাবু তাহার জগদুন্মির এই ইতিহাসখানি বচনা করিয়াছেন। ইহা শুধু হিজলী গ্রামের ইতিহাস নহে, ইহাতে বঙ্গোপসাগরের পার্শ্ববর্তী অপর দেশগুলির সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ আছে। গ্রন্থকার সমস্ত উপাদান বেশ

বিষয়ভাবে সমালোচনা করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়াছেন, কোন সংস্কারের প্রভাবে সত্যের হানি করিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য বাড়িয়াছে। হিজলীর ইতিহাস এই গ্রন্থে ধারণা দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা বেশী সংবাদ দেওয়া বা প্রেতত্তর প্রণালীতে রচনা করা সম্ভব মনে হয় না।

পাঠান যুগে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সম্রাট ব্যক্তি বা সামন্তরাজপুত্রকে “মদন-ই-আলা (= উচ্চ-আদমখারী) এই উপাধি দেওয়া হইত। বঙ্গ পাঠান যুগের অবসানের সময় এক মদন-ই-আলা পূর্ববঙ্গের (“জাতি-দেশের ”) ইমাম ছিলেন। আর এক বংশ হিজলীতে রাজত্ব করেন। এই শেষোক্ত বংশের সঙ্গে একদিকে উড়িষ্যা রাজ্যের অপর দিকে বঙ্গের মুঘল স্বাধিকারের সংঘর্ষ হয়। প্রকৃতি কর্তৃক স্বরক্ষিত কোণে আশ্রয় পাইয়া হিজলীর মদন-ই-আলা, দেশ বিস্তার, মসজিদ স্থাপন, কলা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক স্মরণীয় কাজ করেন। গ্রন্থের এই অংশ স্থপাঠ্য হইয়াছে।

গ্রন্থকার খ্যাতি কতাব এবং গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ব্যয়ে বণগ্রস্ত। আশা কবি বঙ্গের পাঠকগণ তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন, কাব্য এই গ্রন্থখানি আশাঘের এদেশের ইতিহাসের ভাঙা ভাঙা স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রী যত্নাথ সবকার

সপ্ত গোস্বামী—ঐদীপ্যচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। ১ম সংস্করণ, ১৯২৭, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃ: ৩৫৯, মূল্য ২/-

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ইতিহাস লিখিয়া বন্দী হইয়াছেন। তিনি বাঙালার বৈক্যব গোষ্ঠীপাদবিগের জীবনী ভক্ত-প্রসঙ্গ হিসাবে লিখিয়াছেন। ইহাতে বৈক্যব আচার্যদিগের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও তপস্কার উদ্ভল চিত্র একস্থানে পাওয়া যাইবার সুবিধা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বৈক্যবদিগের জ্ঞান বাঙালীর আধ্যাত্মিকতার অমুহুরাগী পাঠকদিগেরও আনন্দ বিধান করিবে। গ্রন্থে কয়েকখানা চিত্র আছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থকার ইতিহাসকে একেবারে জুলিতে পারেন নাই। তাই তিনি বৃন্দাবনে বাঙালীর একটি কীর্তি আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্যগণকে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন—উহা রাজা বসন্তরায়ের পিতা গুণানন্দের নির্মিত মন্দির।

পরিহাস—ঐরমসংগ্রহ লাহা। ১৩৩০। পৃ: ৯২, মূল্য ১/-

রসময়-বাবুর রঙ্গ, ব্যঙ্গ ও সরস কবিতায় নিজস্বতা আছে। তাঁহার এই গ্রন্থেও কতকগুলি উপভোগ্য বচন প্রকাশিত হইয়াছে। অতিকাব্য, হাতুড়ে, হিতে বিপরীত, জ্ঞানদর্শন, দোষ কার, প্রভৃতি কবিতা বেশ হইয়াছে। ঘোড়া কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কুলের ছেলেরা প্রথম প্রথম রচনা লিখিতে শিখিয়া ঘোড়া সম্বন্ধে যে অমূল্য ও অসাধারণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে এই রসিক গ্রন্থকার সেইরূপ রচনাকে পর্যায়ে প্রণীত করিয়াছেন।

শ্রী ব্রজেন বসু

রামায়ণে আর্ট—(জ্যোতিষ ব্যঙ্গনাট্য)—শ্রী শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক শ্রীসিংহপুর মুখোপাধ্যায়, ৬ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা। আট আনা।

একখনি ব্যঙ্গনাট্য। নাট্যকাণ্ডানি পঠান্তরিতিক মামুলি ছাঁদের নয়। ভাবে বিস্তারিত ও রচনা-কৌশলে—সর্বত্রই ইহার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব পরিস্ফুট। আমরা নাট্যকাণ্ডানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমরা আশা করি ইহা সাহিত্যরসিক ব্যক্তিকে আনন্দ দান করিবে।

বারাংফুল—শ্রীমতী রত্নমালা দেবী। প্রকাশক শ্রীবিজয়নাথ পাল মুখোপাধ্যায়, ছোট কেরা বাড়ী, মুন্সের। আট আনা।

কবিতার বই। কবিতাসুলিতে ছন্দের ও মিলের ত্রুটি আছে এবং ভাবে ও কল্পনায় নূতনত্বও নাই। তথাপি লেখিকার অমূল্যতা ও তাহার প্রকাশ এতই সরল ও স্বাভাবিক যে, তাহা চিত্ত স্পর্শ করে। পুস্তকের নামনির্বাচনে লেখিকার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কখনা এই নামে কবি করুণানিধানের একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে।

পারের গান—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল। প্রকাশক সাবস্বত লাইব্রেরী, ১৯৩২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

বহু কবি ও সাহিত্যিক অমর ছন্দে ও প্রবন্ধে মুক্ত শ্রমের স্মৃতি অঙ্কর করিয়া রাখিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে শ্রমাবিচ্ছেদকাতর কবি অতিশয় কল্পন ভঙ্গীতে ও মর্দঙ্গপাশী আবেগে শ্রমের মনোরম স্মৃতিচিহ্ন আঁকিয়াছেন। বিষয়টি এতই পরিষ্কার ও গভীর যে, ইহার আলোচনায় চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কবিতাসুলিতে স্থানে স্থানে ছন্দপতন সত্ত্বেও বইখানির আদর হইবে।

আমীনা (নাটক); রাধাকৃষ্ণ (নাটক); রমা (নাটক)—শ্রীকীরোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৫ নং উড স্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা, এক টাকা, এক টাকা।

তিনখানি নাটক। নাটকগুলির উদ্দেশ্য উচ্চ। রচনা ভাল হইয়াছে।

নারী-মঞ্জল—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ। ৫ কলেজ স্টোর, কলিকাতা, ও পটুয়াটুলী, ঢাকা। বারো আনা।

কবিতার বই। নয়টি কবিতায় নারীর গুণ কীর্তিত ও বর্ণিত হইয়াছে। পরিমলবাবু বহু পূর্বেই বাংলা দেশে কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দ সাবলীল এবং শব্দসম্পন্ন তাঁহার গণ্য। আলোচ্য নারী-মঞ্জলগুলিতে কবির নারীর প্রতি প্রজ্ঞাতত্ত্ব সন্দেহের আবেগে ও স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর ছাপা ও বঁধন মনোরম হওয়ায় বইখানি উপহারের সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছে।

বদরীনারায়ণের পথ—শ্রীবিভূষণ দত্ত। ভদ্রমন্দির, হরিদ্রাব হইতে প্রকাশিত। বারো আনা।

অমণ-কথা। ঘরে বসিয়া যাঁহার বদরীনাথের তথ্য জ্ঞানিত চান তাঁহার এই পুস্তকপাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

যুগ-সমস্যা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ধন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

বর্তমান রাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতা, যুবকগণের স্বাধীন মনোবৃত্তি অর্জনের উপায়, ইত্যাদি সমস্তর হৃদয় চিন্তাপ্রবৃত্ত সন্দেহের ইঙ্গিত এই পুস্তকে আছে। বইখানি দেশহিতৈষীর অবশ্য পাঠ্য।

প্রথম শিক্ষা ইংলণ্ডের ইতিহাস—ই. কানন সিংহ। আশুতোষ কলেজ, ভবানীপুর। ছয় আনা।

বইখানি ছেলেরের লজ্জা রচিত এবং ছেলেরের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

হিন্দু সংগঠন—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন। ১২ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

ইতিপূর্বে গ্রন্থকার কয়েকখানি স্ফুটিত গ্রন্থ লিখিয়া চিত্রাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্রাশীলতা, গবেষণা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে আজ অবধি হিন্দু জাতির পঠন ও সমাজব্যবস্থার অঙ্গের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রত্যেক হিন্দু যুবক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহাব হিন্দু-বোধ উদ্ধৃত করুন এবং হিন্দুর শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করুন।

গুরু গোবিন্দ—শ্রীগিরিজাকান্ত গোস্বামী। প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং। কমলা প্রেস, নাটোর। বারো আনা।

ঐতিহাসিক নাটক। রচনার দোষ থাকিলেও গুরু গোবিন্দের চিত্র মন্দ লাগিল না।

বলাকা ; শিশু ভোলানাথ ; মুকুট ; সঙ্কলন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী প্রাচ্যলয়, ২১৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য স্বাক্ষরে এক টাকা বারো আনা ; এক টাকা ; ছয় আনা ; এক টাকা চোদ্দ আনা।

রবীন্দ্রনাথের চারখানি গ্রন্থের নব সংস্করণ। ছাপা ও বঁধন রবীন্দ্রনাথের পুত্রকের যোগ্য হয় নাই। বিশ্বভারতী এবিষয়ে আর-একটু অস্বস্তি হইবেন কি ?

কল্লার—শ্রীমোতিরঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৬১ চার্টার্ড এণ্ড সন্স, ১৬১ ক্রামারগে দে স্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা।

কবিতার বই। এই গ্রন্থে যে-কবিতাগুলি সম্মিলিত হইয়াছে সেগুলি প্রবাসী, মানসী, নারায়ণ, ভারতী, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্মরণ্য সেগুলির গুণবিচার হইয়া গিয়াছে। কবিতাগুলি সরল, হৃদয় ও মর্মস্পর্শী। কবির ছন্দ যেমন স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন, তাহার ভাবও তেমনি কষ্টকল্পনাশূন্য নয়, অতি স্বাভাবিক। কাব্যমোদী মাত্রই বইটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

অভিশাপ—শ্রী বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী। দি বুক ষ্টল, পি-৮১, রমা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, বারো আনা।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লাঠি ডে অব পম্পিয়ারি অবলম্বনে ছেলেদের ক্ষয় রচিত গল্প-পুস্তক। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—“...ইংরিজি কিম্বা বাজার নামজাদা বইয়ের ‘শিশু সংস্করণ’ বাজারে নেই বললেই চলে। বিলাতে এরকম বইয়ের প্রচলন খুব বেশী। সেই অভাব পূরণের জন্মেই—... ‘অভিশাপ’ের জন্ম।” লেখক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাই বলিয়াছেন। আমরা জানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের বরদা একেদলী হইতে এই জাতীয় ‘শিশু সংস্করণ’ কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বাহা হউক, আলোচ্য পুস্তকখানি সহজ সরল বর্ণনাগুণে, সহজ সরল ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি-গুণে ছেলেদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যের অগ্ন্যুৎপাত, ও পম্পিয়ারি অধিবাসিগণের সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষার ব্যাকুলতা বাহিনী ছেলেদের কল্পনাতে উদ্ভূত করিবে।

বাসস্তিকা—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। জগন্নাথ হল সাহিত্য সমিতি, রমণী, ঢাকা। এক টাকা।

“বাসস্তিকা জগন্নাথ-নিকेतনের মুখপত্র।” এই সংখ্যা সেখানকার চতুর্থ বাৎসরিকী। পূর্বেকার সংখ্যাগুলির জ্ঞান এবারেও বাসস্তিকা তাহার গৌরব অক্ষুর রাখিয়াছে। বর্তমান কালের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকাব ও কবিগণের হৃদয়বিচীর্ণিত রচনা-সম্ভারে বাসস্তিকা হৃদয়স্থ, ও হৃদয়পাঠ্য হইয়াছে। এই সংখ্যাব বিশেষত্ব এই যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে দোলপুরীমা উপলক্ষ্যে রচিত বহু কবির হৃদয় হৃদয় ভবিষ্যৎ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পত্রিকাখানির ‘বাসস্তিকা’ নাম সার্থক হইয়াছে। এখানিকে পত্রিকা বলিলে ভুল বলা হইবে। ইহাকে প্রবন্ধ-কবিতাসংগ্রহ একটি মনোমোহন সাহিত্য-পুস্তক বলা যাইতে পারে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শিক্ষাবিজ্ঞান—আবদুর রহমান খাঁ, এম-এ, বি-টি। প্রকাশক গোপীমোহন দত্ত, ৪ ডেক্টর্ লাইব্রেরী, ঢাকা। দুই টাকা।

খাঁ সাহেবের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি আলোচ্য যে পুস্তকখানি আজ বাংলা সাহিত্যকে উপহাব দিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষায় অভিনব সামগ্রী। পুস্তকখানি শিক্ষা-বিজ্ঞান, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষা কি মিনিস এবং কি করিয়া তাহা প্রদত্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি তথ্য-ভাণ্ডার। পুস্তকখানির আলোচ্য বিষয়—শিক্ষা-বিজ্ঞান পাঠের আবশ্যিকতা, শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিধান, বিষয় নির্বাচন, শিশুর মানসিক বিকাশ, বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধান, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও কৌশল, পাঠদানের কার্যক্রম, শ্রেণী-শাসন, নানা বিষয় শিক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অতি-জ্ঞাতব্য, অতি-শিক্ষণীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিরল। পুস্তকখানি শিক্ষাবিষয়ক একটি বিশেষ অভাব দূর করিল। আমাদের দেশের শিক্ষকরা কোন রকমে পাশ-করা ব্যক্তি মাত্র। শিক্ষা কি মিনিস ও তাহা প্রদান করার জ্ঞান লাভের সুযোগ তাঁহাদের ঘটে না; অথবা শিক্ষাবিভাগের সে-বিষয়ে ব্যবস্থা নাই। সেইজন্যই আজকালকার ছাত্রগণ এত শিথিল-জ্ঞানসম্পন্ন। আমাদের দেশের ভারী শিক্ষকগণ শিক্ষকতা করিবার পূর্বে খাঁ সাহেবের এই পুস্তকখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া যদি কার্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষাদান সার্থক হইবে ও দেশে প্রকৃত শিক্ষিত যুবকের উদ্ভব হইবে। আমরা এই পুস্তকখানি শিক্ষিত ও শিক্ষাদানেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে অনুরোধ করি।

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—(২য় খণ্ড) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ধন পাবলিশিং হাউস, ১২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের গীতা (২য় খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। আড়াই টাকা।
উক্ত দুইখানি পুস্তকেরই প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে আমরা বাহা বলিয়াছিলাম, এই দুই দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য তাহাই। পুস্তক দুইখানিই অতীব প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয়। দুইখানি পুস্তকেই বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান আছে।

পাবনা জেলার ইতিহাস—ঐরাধারমণ সাহা, বি-এল
প্রণীত। সম্বন্ধী লাইব্রেরী, পাবনা হইতে প্রথম প্রকাশিত।
ছয় খণ্ডে প্রায় আটশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৮৮০।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের অধিকার বিস্তার সফলময়
বিধাতার অভিশ্রুতি কিনা বলিতে পারি না, তবে ইংরেজের অধীনতা
স্বীকার করাতে ভারতবর্ষে কতকগুলি বৃহৎ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে
যাহা চোখে দেখা যায়। পরিবর্তনের সকলগুলিই যে মন্দের দিকে
তাহা নহে, তবে মন্দের ভাগ বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল
অনিষ্টের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হইতেছে বৈদেশিক শিক্ষা-বীক্ষা-
আচার-আচরণ, আহাৰ-বিহার, বিলাস-ব্যয়ন, বেশ-ভূষা প্রভৃতির প্রতি
একটা প্রবল মোহ। আফিমের নেশার মত এই মোহ তিলে তিলে
আমাদের অধিকার করিতেছিল এবং এখনও হয়ত করিতেছে। কসে
আমরা ভারতবর্ষের জল-মাটি হাওয়ার মধ্যে মাতুল হইয়াও প্রকৃতিতে
ভারতবর্ষীয় হইয়া উঠিতেছি। ইংরেজ তাহাদের দুর্ব্বল শাসনভার
আমাদের ক্ষেত্র চাপাইয়াই ক্ষান্ত নহে, আমাদের মানসচিত্তও তাহাদের
কবলিত। আত্মল কাটরা ভারতীয় শিল্পের বিনাশ সাধন, বৎসরে
বৎসরে ভারতবর্ষের রক্ষণোৎসব এইগুলিই ভারতবর্ষে ইংরেজ ইতিহাসের
ষড় কথা নহে, সবচেয়ে কুফল দেখা দিয়াছে ভারতবর্ষের চিত্ত-
বিকৃতিতে। এই বৈদেশিক প্রভাব এমনই ভরদ্বার যে, গত দুইশত
বৎসরের মধ্যেই আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের সংস্কার ভুলিয়া আমরা
মলে প্রাণে বিদেশী হইতে বসিয়াছি। ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীরা আমাদের
নিকট বস্তুটা সত্য ভারতবর্ষ-ভস্তুটা সত্য নহে, এবং এখন হইতে সাবধান
না হইলে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ কেবলমাত্র
আকৃতিতেই ইংরেজ হইতে পৃথক থাকিবে, ভাবে-ভঙ্গিমায়া চিন্তায় মনে
কোন পার্থক্য ইংরেজের সহিত থাকিবে না, কেহ কেহ একপ আশঙ্কা
করেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে এই বৈদেশিক
প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার পরাজয়ই ঘোষণা করিতেছে, দুর্ব্বল, হীন
সভ্যতা যেন এরল সভ্যতার নিকট পরাজিত হইয়া তাকে আপনায়
আদান ছাড়িয়া দিয়াছে। এবং এইজন্যই আমাদের আপনাদের প্রতি
বিকার জন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য এই নৈরাশ্য সত্য নহে, আমরা
নিঃশেষই দেহে ও মনে হীন হইয়াছিলাম, ভারতীয় সভ্যতার তাহা
অপরাধ নহে। আমাদের পক্ষে সবার হইয়া পুনরায় দেশকে, দেশের
সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকে যেন দেশকে চিনিতে
পারে তাহার বাস্তব করিতে হইবে। ষষ্ঠ ও গ্রাম, জিলা প্রদেশ
ইত্যাদি মিলিয়া আমাদের অঞ্চল ভারতবর্ষ। প্রত্যেক গ্রাম জিলা
প্রদেশ খালিল নমনদী ইত্যাদির সহিত দেশের লোকের পবিচয় সাধন
করাইয়া, গ্রামভেদে দেশভেদে আচার বিচার কৃতি সংস্কার শিক্ষাদীক্ষা
শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতির বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ
ভারতবর্ষকে চিনিতে হইবে। বাড়ীর পাশে আত্মকুড় অপরিপক্ক রাধিয়া
নন্দনকাননের ঋণে বিভোর হইয়া থাকিলেও ম্যালেরিয়ার ভুলিতে হয়
এই সত্য আমাদের শিখিতে হইবে। স্কুল কলেজের ছাত্রদের, এমন কি,
শিক্ষিত ভক্তলোকদের সহিত দেশের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে আমাদের
শিক্ষার দৈর্ঘ্য একটু হইয়া পড়ে। তাহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
রাষ্ট্রীয় উদ্যানপতন, পারগারা জলপ্রপাত, অষ্ট্রেলিয়ার পশুপালন, ডেনমার্কের
সমবায়, ম্যানচেস্টারের কেন মিলের জন্মইতিহাস, হেনরী ফোর্ডের
কুলজীকৃষ্টি কথা ইটালিন চেনের ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে যত্নের পর যত্ন।
ধরিয়া বস্তু তা করিতে পারিবেন, কিন্তু মালমহ সুশীলবাহ বীরভূম
বীকুড়ার রেশমশিল্প, সিঙ্গাপুরের পাটের কলগুলি কিভাবে পরিচালিত

হয়, চলন বিলের অবস্থা কিরূপ, বাধরগঞ্জে কি পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়
এসম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলিতে পারিবেন না। ইহাদিগকে মারিপুর
ভিকারে কি ত্রিহতে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া
পান না। দেশের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই দেশবাসীর এইরূপ
জ্ঞান। দেশের প্রাণশক্তি যেখানে সেখানে কার সম্বন্ধে, মাটি জল হাওয়া
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নাই বলিয়াই বৈদেশিক প্রভাবে আমরা এত
সহজে অশ্রুত হইয়া পড়ি। দেশকে ভালমত চিনিতে পারিলে এই
বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হইবে না।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা কিছুকাল হইতে দেখিতেছি, বাঙলা
দেশে কয়েকজন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি দেশবাসীকে দেশে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ
কবিয়া তুলিবার জন্ত সর্বিশেষ চেষ্টা আছেন। কেহ বা প্রাচীন
ভারতবর্ষের, বৃহত্তর ভারতবর্ষের সহিত আমাদের যথার্থ পবিচয়
করাইতেছেন, কেহ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি
ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া পবেবর্ণার কলাকল আমাদের
গোচর করিতেছেন, আবার কেহবা কোন একটি জিলা গ্রাম বা বিভাগ
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেশের অংশবিশেষের সহিত আমাদের
সত্য পবিচয় করাইয়া দেশের অস্তিত্ব অংশ সম্বন্ধেও আমাদের অনুসন্ধিৎসা
জাগাইয়া তুলিয়া দেশ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন।
ঐযুক্ত রাধারমণ সাহা এই শেষোক্ত শ্রেণীর দেশহিতৈষীদের
দলে। তিনি আপনায় সকল চেষ্টা ও অধ্যবসায় পাবনা জেলা বা প্রাচীন
ও নতুন ইতিহাস সফলনে ব্যয়িত করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন
হইরাছেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, এই ভাবের জিলা বা বিভাগের ইতিহাস
কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, বাহিরের লোকের
কাছে এই সকলের মূল্য অধিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে এ ধারণা
সত্য নহে। এই ধরণের এক-একটি ইতিহাস জ্ঞানিতিব এক-একটি
প্রতিপাদ্যের মত, একটি সর্বিশেষ আয়ত্ত হইলে অস্তিত্ব আয়ত্ত করা
সহজ হয়। রাধারমণ-বাবুর পাবনা জিলায় ইতিহাস যে শুধু পাবনা-
বাসীরাই পক্ষে অবশ্য পাঠ্য তাহা নহে এইরূপ স্থলস্থিত ইতিহাসের সঙ্গে
পরিচয় থাকিলে বাঙলার অস্তিত্ব জিলা সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা
যায়।

অনেকে ইহাও মনে করিতে পারেন যে, জেলা-বিভাগের ইতিহাস
সংগ্রহ করা খুব গুরুতর কার্য নহে। অল্প পরিচয় অল্পকালেই ইহা
করা সম্ভব, কিন্তু রাধারমণবাবু যে ইতিহাসখানি লিখিয়াছেন তাহা
ক্ষুদ্র পাবনা জিলায় ইতিহাস হইলেও এতগুলি জ্ঞাতব্য কথা তিনি
ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, তাহা বস্তুতই একজনের এক
জীবনের সাধনার কাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে অসম্ভব হয় না।
রাধারমণ-বাবুর দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষের পরিচয় ও সাধনার ফলে বহু ত্যাগ-
স্বীকার করিয়া, বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া এই
পুস্তকের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এত করিয়াও তিনি যে
পুস্তকখানিকে সম্পূর্ণ মনে করেন, তাহা নহে। অনেক কথা হয়ত
এখনও তাহার বলা হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ একখানি সর্বব্যাপ্তময়
ইতিহাস সফলন করিয়া প্রথমিক পরিচয় ও সাধনাকে সার্থক
মনে করিতে পারেন।

রাধারমণবাবু পাবনা জিলা সম্বন্ধে কোন বিষয়কেই বাদ দিয়া
চলেন নাই। তাহার পুস্তকের হঠাৎ খণ্ডের নিয়মিত সামান্য পরিচয়
হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

প্রথম খণ্ডে—জেলার সাধারণ বিবরণ—অবস্থান ও প্রাচীনত্ব, পাবনা নামের উৎপত্তি; প্রাকৃতিক বিবরণ—চতুঃদীর্ঘা ও আরতন, স্থল জল ও বায়ু, নদীসমূহের বিবরণ, খাল, বিল ও চর; বাতাব্যতের উপায়—স্থলপথ, কোম্পানীর আমলের রাস্তা, ইম্পিরিয়াল ও লোক্যাল রোড, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড রোড, রেলপথ, হালট ও জাদ্দাল, জলপথ, ঈমারপথ, নৌকাপথ, সেতু ও খেওরা, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ইলিফেট ব্রিজ, ইমারদন ব্রিজ, খেখাঘাট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, থানা ও গ্রামাদি থানাসমূহ, প্রধান প্রধান বাজারাদি, আদালত ও অফিসাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডে—ইতিহাসিক বিবরণ; হিন্দু রাজত্বকাল—জৈন ও বৌদ্ধযুগ, পাল রাজত্বকাল, সেন রাজত্বকাল ও মুসলমান অধিকারকাল—পাঠান আমল, মোগল আমল; ইংরেজ শাসনকাল—ইংরেজ অধিকারের পূর্বাবস্থা, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা, বর্তমান ইংরেজ শাসনকাল।

তৃতীয় খণ্ডে—মসজিদ ও মন্দির; প্রাচীনদেব নিদর্শন—চিহ্নাদি, জলাশয় ও দৌর্বিহাতি, প্রাচীন জাদ্দাল ও রাজবস্ত্র। প্রাচীন সূত্র; ভাস্কর্য্যশাসন ও সনন্দ; জমিদার ও জমিদারগণ—জমির স্বত্ব, খাজনা, প্রজাবিহোহ, জেলাবাসী জমিদারগণ, ভিন্ন জেলাবাসী জমিদারগণ।

চতুর্থ খণ্ডে—কবি ও উৎপন্ন দ্রব্য; শিল্প ও বাণিজ্য; শিল্পজীবীগণ ও তাহাদের অবস্থা, শিল্পজাত দ্রব্য; বাণিজ্যাদি; শিক্ষা—সাধারণ বিবরণ, বিদ্যালয় ও শিক্ষিত সংখ্যা, সংবাদপত্র, লাইব্রেরী ও প্রেস, পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকগণ, বিশিষ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ; সম্ভ্য-সমিতি ও প্রবর্ণনী, পাবনাবাসী—বিদেশে।

পঞ্চম খণ্ডে—পাবনা সদর—পাবনা, সাঁড়া, আটঘরিয়া, চাটমহর, করিমপুর, সাঁথিয়া, বেড়া, স্বজানপুর, সিরাজগঞ্জ—সিরাজগঞ্জ, রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া, সাহাজাদপুর।

ষষ্ঠ খণ্ডে—আদম স্মারি—সাধারণ বিবরণ, লোকসংখ্যা, বিভিন্নজাতি ও সমাজ, বিভিন্ন ধর্ম্মদম্প্রদায়, লোকের আকৃতি, প্রকৃতি উপজীবিকা, জীবজন্তু; দেশের অবস্থা—সামাজিক নৈতিক আর্থিক, লোকের স্বথশাস্তি, প্রাকৃতিক বিপ্লবাদি, ক্রীড়া ও ব্রত পূজাদি; শাসন সংস্থাপাদি—সাধারণ শাসনবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, বিবিধবিভাগ, স্বায়ত্ব-শাসন, ডাকবিভাগ।

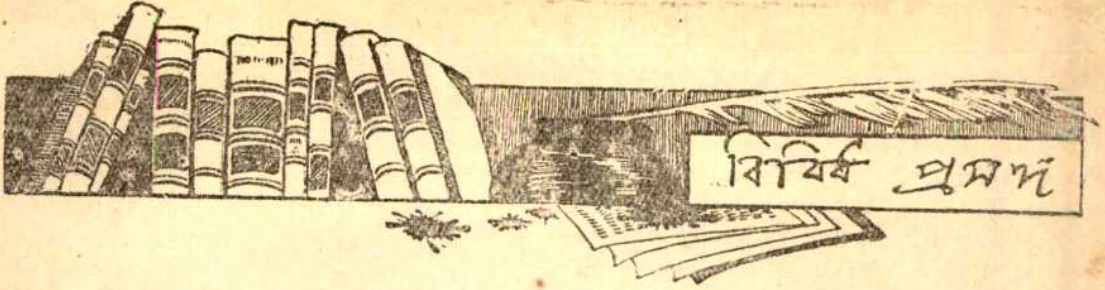
এই চরখণ্ডের বিষয় বিভাগ দেবিরাই বহিঃস্থানির মূল্য বুঝা কঠিন হইবে না। পুস্তকান্তর্গত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটিই উল্লেখ বা আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক দেশ-হট্টের বাস্তব এই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেখিলেই রাধারমণ-বাবু কার্যিক ও মানবিক পরিজ্ঞানের কিছু পথের পাইবেন। দেশের শিক্ষাবিগ্ণা, জমিদারগণা কিতাবে ধীরে ধীরে বিশেষীকরণকরকরিত হইতেছে, প্রাচীন কাকশিল্প ও কুটীবাগ্নি কিতাবে নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি অনেক বিষয়ই এই পাবনা জিলার ইতিহাস পাঠ করিলেই বুদ্ধিতে পারা যায়। এই ইতিহাসের মূলকথাগুলি বাঙলার অষ্টাশ্র জিলা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

মোটকথা, এরূপ একখানি বহির মূল্য টাকা আশ্র পাই দিয়া নির্ধারণ করা যায় না, প্রমুখ্যর যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এটি গ্রন্থন করিয়াছেন পাঠকের মনেও যদি সেই ভাবের উদ্ভেদ হয়, যদি সামান্য-মাত্রণ দেশজীতি জাগরিত হয়, তাহা হইলেই এই পুস্তকের স্বার্থ মূল্য দেওয়া হইবে। আমরা এই স্থলিত বৃহৎ ইতিহাসখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং বাঙলার অষ্টাশ্র জিলা সম্বন্ধে বাহাতে এই ধরনের ইতিহাস বাহির হয় তাহাব জন্ত প্রত্যেক জিলাবাসীকে সচেতন হইতে বলি।

বইখানির ছয়টি খণ্ডই পাবনা সহরে ছাপা হইয়াছে, এই হিসাবে বহিঃস্থানির ছাপাই বাধাইয়েরও প্রশংসা করিতে হয়। সিবাঙ্গগঞ্জে প্রস্তুত যে কাগজের নমুনা প্রমুখ্যর এই বইতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় সিরাজগঞ্জে কাগজের কল সহজেই চলিবে। আমরা এই প্রমুখ্যনি আন্তোপান্ত পাঠ করিয়া প্রমুখ্যরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভগবদ্গীতিমালা—বায় শ্রীবোপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, এম-এ. বি-এল, সংগৃহীত। প্রকাশক শ্রীললিতমোহন ঘোষ, ২৩১৩ গুপ্তশাসন চৌধুরী লেন, কলিকাতা। যেক্ষাপূর্বক যে যাহা দিখেন তাহাই মূল্য।

এই পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক ৬০০টি সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে ও প্রত্যেকটির স্বর নির্দেশিত হইয়াছে। গুপ্তনানক, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ, গোবিন্দ অধিকারী, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ-দিগের গান ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক ধর্ম্মপরাধণ ভক্তদর্শকে বিশেষ আনন্দ দিবে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।



যোগীন্দ্রনাথ বসু

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক বলিয়াই বাংলা দেশে সমধিক পরিচিত, যদিও তিনি আরও অনেক বহি লিখিয়াছেন। এই ভাবে পরিচিত হইবার কারণ এই, যে, তাঁহার লেখা এই জীবনচরিতটিই পাশ্চাত্য অনেক জীবনচরিতের সহিত তুলনীয় প্রথম উৎকৃষ্ট বাংলা জীবনচরিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আমার সহিত যোগীন্দ্রবাবুর পরিচয় হয় এই পুস্তক লিখিত হইবার পূর্বে। তিনি তখন বৈদ্যনাথ-দেওঘর বিভাগলের হেডমাষ্টার ছিলেন। হনোলুতে ফাদার (পাদরী) ডামিয়েন কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে গিয়া নিজের ঐরোগে আক্রান্ত হন, এবং তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হইয়া যোগীন্দ্রবাবু তাঁহার সমনামা বন্ধু (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র) যোগীন্দ্রনাথ বসুর সহিত মিলিত হইয়া “অমরকীর্তি” নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা ফাদার ডামিয়েনের জীবনচরিত। পরে আমি যখন দেওঘরে তাঁহার বাড়ীতে একবার অতিথি হই, তখন তাঁহার নিকট ডামিয়েনের সমাধিপাৰ্শ্বস্থ গাছের কয়েকটি পাতা তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম। তিনি তাহা হনোলু হইতে আনাইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথে তখন বিস্তর কুষ্ঠরোগী যাইত, এখনও গিয়া থাকে। উহা তীর্থস্থান এবং তথায় শিবের মন্দির আছে। মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হইবার আশা তাহাদের সেখানে যাইবার কারণ। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বৈদ্যনাথে তাহাদের কোন আশ্রয়-স্থান ছিল না, যত্র করিবার লোক ছিল না; পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দিরে তাহারা থাকিত, রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইত, অনেক সময় যথেষ্ট ভিক্ষা না পাওয়ার উপবাসী থাকিত,

এবং কখন কখন মৃত্যুর পূর্বেই শৃগালকুক্কুর কর্তৃক আক্রান্ত হইত। ইহাদের এইরূপ নানা দুর্দশা দেখিয়া যোগীন্দ্রবাবুর দয়ালু হৃদয় সাত্তিশয় ব্যথিত হয়। তিনি স্বয়ং কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করিতেন, কখন কখন তাহাদের ক্ষত দুইয়া ঔষধ লাগাইয়াও দিতেন, কিন্তু তাহাতে সকলের যথেষ্ট সাহায্য বা কষ্টের লাঘব হইত না। এই জন্ত তিনি, রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও বৈদ্যনাথের অন্ততম পাণ্ডা শিক্ষিত, সদাশয় ও সাধুচরিত্র গিরিজানন্দদত্ত ওঝা



যোগীন্দ্রনাথ বসু

মহাশয়ের সহযোগে, বৈদ্যনাথে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইহার জন্ত টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত খবরের কাগজে সর্বসাধারণের নিকট আবেদন প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হয়। সেই উপলক্ষে আমি যোগীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখি ও তখন হইতে তাঁহার সহিত পরিচিত হই। প্রধানতঃ স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের অর্থসাহায্যে কুষ্ঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়

এবং তাঁহার পত্নীর নামে উহার নাম রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম রাখা হয়।

যোগীন্দ্রবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লিখিতেছিলেন, তখন কিছুদিন বৈদ্যনাথে কলেজের ছুটির সময় তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। তখন উনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের কোঠায় চলিতেছে। সেই সময় তাঁহার অশীলতা, স্বশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিবার রীতি, এবং নানা শ্রেণীর লোকের উপকার করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তখন বৈদ্যনাথে কলিকাতার ও বঙ্গের অল্প অনেক জায়গার অনেক বাঙালী বাড়ী তৈয়ার করাইতেছিলেন। কেহ কেহ তাহার ভার দিয়াছিলেন বহু মহাশয়ের উপর। তিনি প্রত্যেকের হিসাব আলাদা আলাদা করিয়া রাখিতেন, এবং রোজকার হিসাব এমন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, যে, যে-কোন সময়ে কেহ হিসাব চাহিলে আদায়পত্রটির পর্য্যন্ত হিসাব দেখাইতে পারিতেন।

মধুসূদনের জীবনচরিতের অনেক উপাদান তখন তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম। কাহারও জীবনচরিতের জন্য যত উপাদান সংগৃহীত হয়, সমস্ত প্রকাশিত হয় না; কারণ পুস্তকের কলেবর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিতে হয়, এবং তন্মিন্ন এমন অনেক জিনিষ থাকিতে পারে যাহা মৃত ও জীবিত অনেকের গ্লানিকর। যাহারা উপকরণ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদনের বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক অত্যন্তম। ইহার বন্ধুপ্রীতিতে বিনিমিত হইয়াছিলাম। ইনি যখন মধুসূদনের সহিত হিন্দুস্কুলের নীচের ক্লাসে একত্র পড়িতেন, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তারিখ অল্পসারে পর পর তাড়া বাঁধা সমুদয় চিঠিপত্র তিনি যোগীন্দ্রবাবুকে দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে লেফাফার কোণে ছেড়া চাঁরকুটে ক্লাসে বসিয়া লেখা দুই বন্ধুর ইয়ারকিও ছিল। ইহা হইতে যেমন বসাক মহাশয়ের বন্ধুপ্রীতির ও কর্মশৃঙ্খলার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি ইহাও বুঝা যায়, যে, মধুসূদনের প্রকৃতিতে এমন কিছু ছিল যাহাতে নানা ভিন্নপ্রকৃতির লোকে তাঁহার গুণমুগ্ধ অকপট বন্ধু হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন।

যোগীন্দ্রবাবু গদ্যে রাণী অহল্যাবতীর জীবন-চরিত, তুকারামের জীবনচরিত এবং কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতার পুস্তকও তিনি কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। পৃথ্বরাজ, শিবাজী ও মানবগীতা তাঁহার রচিত বৃহৎ তিনখানি কাব্য। প্রথম দুইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। কবিতার পুস্তক রচনা করিয়া তিনি কবিত্বষণ উপাধি লাভ করেন। এই সকল কবিতার বহি ছাড়া “একাদশ অবতীর” নামক তাঁহার একটি ব্যঙ্গকাব্য আছে। তাহা যৌবনকালে রচিত।

তিনি রিপনকলেজে, দেওঘর স্কুলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের বাংলার ক্লাসে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

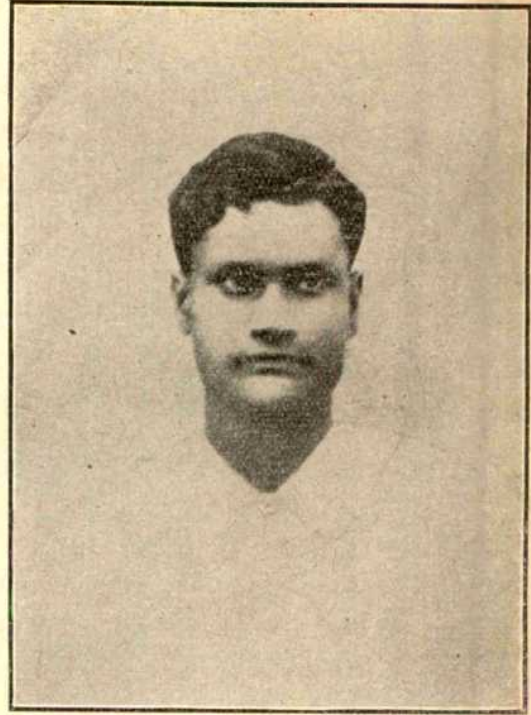
এই সকল কাজ ভিন্ন অল্প একদিকেও কুতূহী বলিয়া তিনি পরিচিত হন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পোষ্ট প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তিনি কর্তব্য-নিষ্ঠা ও স্নেহের সহিত এই কাজ সূচাঙ্গরূপে নির্বাহ করেন। পরে প্রফুল্লনাথের বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যও তিনি নিপুণতার সহিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দু সামাজিক রীতি অল্পসারে করিতেন। স্বদেশপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল।

জ্যোতিভূষণ সেন

জ্যোতিভূষণ সেনের নাম বাংলা দেশে অল্প লোকেই জানে। তিনি একজন প্রকৃত অকপট ও উৎসাহী দেশসেবক ছিলেন। তিনি এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গোথলে-প্রতিষ্ঠিত ভারতভূত্যা সমিতির (The Servant of India Society) শিক্ষাধীন সভ্য হন। এক বৎসর শিক্ষাধীন থাকিবার পর সমিতি তাঁহাকে পাকা সভ্য করিতে চান। কিন্তু তিনি আরো দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবেচনা করিবার অমুমতি চান। তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয়। চারি বৎসর পরে যখন আবার তাঁহাকে সভ্য করিবার কথা উঠে, তখন তিনি বলেন,

যে, সমিতির সভ্যদিগকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে ভয়োৎপাদক ; এবং সেই জন্ত তিনি সমিতির সভ্য না হইয়াও সেবক থাকিতে চান। সমিতি তাঁহার এই আকাজক্ষা শ্রদ্ধার সহিত পূর্ণ করেন, যদিও উহার সকল সভাই জানিতেন, যে, জ্যোতিভূষণ অপেক্ষা সমিতির সভ্য হইবার যোগ্যতর যুবক অল্পই আছেন। একবার একজন সভ্য এইরূপ অসুস্থমান প্রকাশ করেন, যে, সমিতির আর্থিক অবস্থা ভাল নহে বলিয়া জ্যোতিভূষণ উহার সভ্য হইতে চাহিতেছেন না। তাহাতে তিনি এই ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যথা পান, যে, এরূপ সন্দেহ দ্বারা তাঁহার উপর বড় অবিচার করা হইতেছে। বাস্তবিকও টাকাকড়ির সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বৈরাগ্য কাহারও ছিল না। তাঁহার বেশ লোভজনক চাকরী অনেক জুটিয়াছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তিনি ভারতভূত্যা সমিতির সভ্য না হইয়াও ততদিন উহার কাজ করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন, যতদিন সমিতি করিতে দিবেন, কিম্বা যে-পর্যন্ত-না তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তাঁহার মতের আর পরিবর্তন হইবে না স্বতরাং তিনি অসঙ্কোচে সমিতির সভ্য হইতে পারেন। তথাপি সমিতির সভ্যরা তাঁহাকে নিজেদের একজন এবং সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও নিকটতম মনে করিতেন। তাঁহাদের মুখপত্র সার্ভ্যাণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া কাগজে লেখা হইয়াছে, যে, তাঁহা অপেক্ষা প্রেমিক ও প্রীতির যোগ্য মানুষ কেহ জন্মে নাই (“A more loving and lovable soul never breathed”)। সমিতির লাইব্রেরী উহার একটি গৌরবের জিনিষ। আমাদের নিকট কেহ ভারতীয় বা অল্প রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ভাল ভাল পুস্তকের তালিকা চাহিলে আমরা ভারতভূত্যা সমিতির লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা দেখিতে বা উহার পুস্তকাধ্যক্ষকে চিঠি লিখিতে বলিয়া থাকি। গত চারি বৎসর জ্যোতি-বাবু এই লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এই ক্রমবর্ধমান উহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তৎসমুদয় একমাত্র জ্যোতি-বাবুর কাজ। সার্ভ্যাণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিকে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সমিতির দুই লক্ষাধিক টাকার

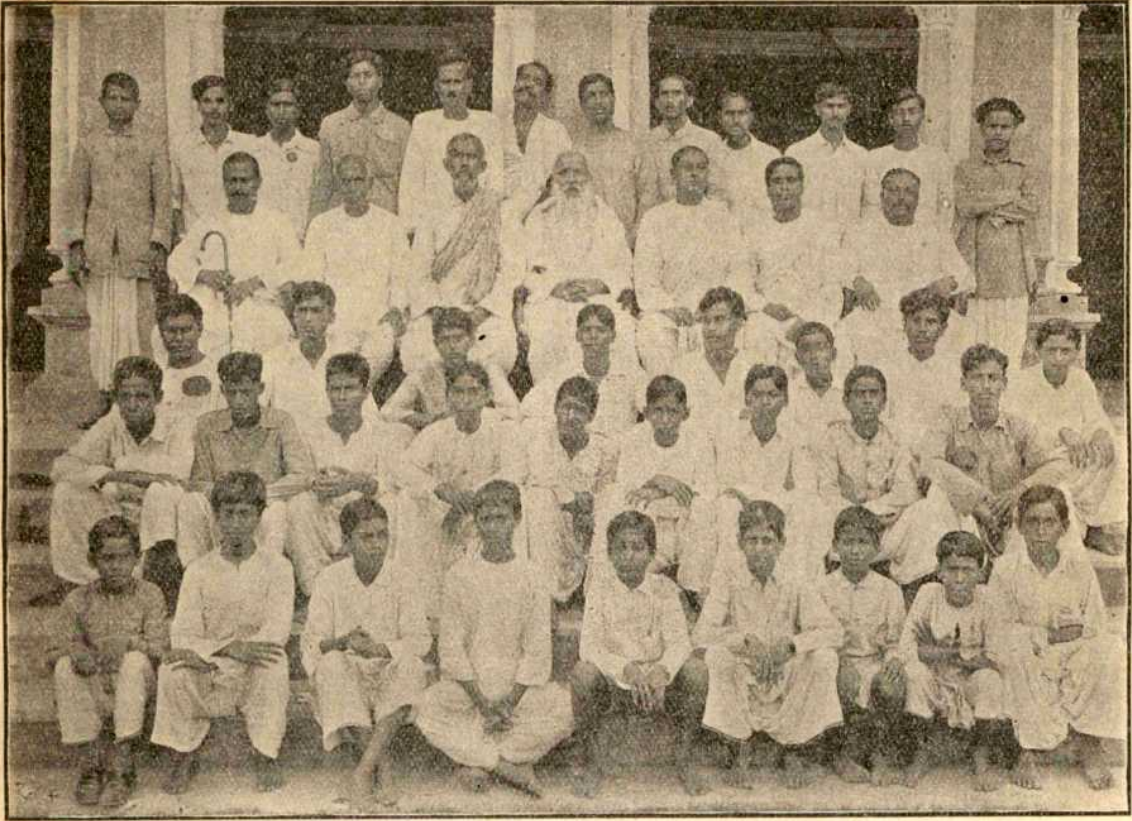


জ্যোতিভূষণ দেন

সম্পত্তি আধ্যাত্মিক ছাপাখানা পুড়িয়া যাওয়ার পর টাকা ভুলিবার জন্ত জ্যোতিভূষণ ও ভারতভূত্যা সমিতির অন্য কেহ কেহ ভারতভ্রমণে বাহির হন। তখন কলিকাতায় তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তাঁহার বিনয়নয় মুক্তি, সাদাসিধা পরিচ্ছদ, অমায়িক ব্যবহার কখনও ভুলিবার নহে। ঘোবনকালে তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ একটি খাঁটি সন্তান ও সেবকের ভক্তি ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইল।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ যুবকসম্মিলনীর সৌজন্যে আমার ময়মনসিংহ সহর অল্লস্বল্প দেখা ঘটয়াছে। তাহার জন্ত আমি কৃতজ্ঞ। এখানে খুব উৎসাহ দেখিলাম। ইহা সুশৃঙ্খলভাবে সংকার্য্যে নিয়োজিত হইলে ময়মনসিংহ সহরের ও জেলার এবং বাংলা দেশের খুব উপকার হইবে।



ময়মনসিংহ যুবক-সম্মিলনীর সভাপতি ও কণ্ঠবন্দ

[ত্রিযুক্ত প্রেমরঞ্জন দাশগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে]

এই জেলাটি শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় জেলা; লোকসংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০। তার নীচেই ঢাকা; লোকসংখ্যা ৩১,২৫,২৬৭। ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র প্রদেশের মধ্যে বৃহত্তম জেলা গোরখপুর; লোকসংখ্যা ৩২,৬৬,৮৩৩। ময়মনসিংহ লোকসংখ্যায় সকল জেলা অপেক্ষা বড় হইলেও হাজারকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা এই জেলায় কেবল মালদহ ভিন্ন বন্ধের অগ্র সব জেলার চেয়ে কম। হাবড়ায় এই সংখ্যা ১৬৮, চব্বিশপরগণায় ১৫০, ময়মনসিংহে ৬০, মালদহে ৫৫। এই সংখ্যাগুলি পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত সংখ্যা। ময়মনসিংহের এরূপ নিরক্ষরতার কারণ, ইহার শতকরা ৭৪.২১ জন অধিবাসী মুসলমান এবং তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা অত্যন্ত কম। ইহার হিন্দু পুরুষ ও জ্রীলোকদের মধ্যে হাজারে যথাক্রমে ২৩১ ও ৫৮ জন লিখনপঠনক্ষম, মুসলমান পুরুষ ও

জ্রীলোকদের মধ্যে যথাক্রমে ৫২ ও ৩ জন লিখনপঠনক্ষম। তুলনায় অগ্র বলা যাইতে পারে, যে, ঢাকায় হিন্দু পুরুষ ও জ্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ৩২৭ ও ৭১ জন এবং মুসলমান পুরুষ ও জ্রীলোকদের মধ্যে ৮৩ ও ৫ জন লিখনপঠনক্ষম। ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষাবিস্তারের খুব আবশ্যক আছে। এবিষয়ে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই বিশেষ মনোযোগ একান্ত আবশ্যক।

ময়মনসিংহ সহরের লোকসংখ্যা যেরূপ, সে হিসাবে বাংলা দেশের এরূপ বড় অগ্রাগ্র সহরের তুলনায় শিক্ষালয়ের সংখ্যা কম নয়, যদিও শিক্ষায় অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশসকলের তুলনায় অত্যন্ত কম। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ বেশ প্রস্তুত জায়গায় নির্মিত। ঘরবাড়ী ভাল, ছাত্রাবাস ভাল। ইহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলি কাজ চালাইবার উপযোগী এবং লাইব্রেরীও তদুপযোগী।

ছাত্রদের বসিবার পড়িবার জায়গা আরও বড় হওয়া দরকার। খেলিবার বিস্তীর্ণ মাঠ আছে। কলেজটিতে বি-এসসি পড়াইবার বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও অধ্যাপনার গৃহ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কিছু বাড়াইলেই ইহা করা যায়। তাহার জন্য এক লক্ষ টাকাও লাগিবে না। ময়মনসিংহ বড় বড় জমিদারের জন্ত প্রসিদ্ধ। এই টাকা তাঁহারা অনায়াসে দিতে পারেন। যাহারা পাটের কারবারে ধনী হইয়াছেন, তাঁহাদের হাতে নগদ টাকা আরও বেশী থাকিবার কথা। উকীলেরাও কেহ কেহ ধনী। নূতন বিজ্ঞানাধ্যাপক ও সহকারী বাহা নিযুক্ত করিতে হইবে, তাঁহাদের বেতন বৈজ্ঞানিক ছাত্রদের বেতন হইতে উঠিতে পারে। কলিকাতায় ছাত্রদের ভীড় বাড়ি অপেক্ষা মফঃস্বলে সকল রকম বিদ্যা শিখিবার ছাত্র বাড়ি ভাল। এই জন্য মফঃস্বলের সর্বত্র বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ময়মনসিংহে কোন একজন উৎসাহী লোক একাগ্রতার সহিত এই কাজটিতে হাত দিলে সফলকাম হইবেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকজ্ঞানসাধ্য পণ্যশিল্প শিখাইবার একটি প্রতিষ্ঠান হইলে আরও ভাল হয়। এখন যে শিল্পবিদ্যালয়টি আছে, তাহারই বিস্তৃতি ও উন্নতি দ্বারা ইহা হইতে পারে। আনন্দমোহন কলেজে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিখান হয়। সুতরাং তৎসম্পর্কে কৃষিবিদ্যা শিখাইবার জন্য খুলিলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উহা শিখান যায়।

ময়মনসিংহ সহরে বালকদের বিদ্যালয় যে কয়টি আছে, তাহার সবগুলির নিজের প্রশস্ত বাড়ী ও খেলিবার জায়গা নাই। প্রত্যেকটির প্রশস্ত খেলিবার জায়গা, ব্যায়ামাগার, এবং ব্যায়াম ও ক্রীড়ার শিক্ষক থাকা আবশ্যক।

বালিকাবিদ্যালয় তিনটি দেখিলাম। তাহার মধ্যে বিদ্যাময়ী বালিকাবিদ্যালয়ের বাড়ী ভাল, এবং খেলিবার জায়গাও কিছু আছে। অল্প দুটির খেলিবার জায়গা নাই। মেয়েদের ইস্কুলে খেলিবার জায়গার বিশেষ দরকার। তাহার বাড়ীতে সংকীর্ণ জায়গায় থাকে, ছেলেদের মত স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া অঙ্গচালনা করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল হয় না। এই কারণে

তাহাদের খেলিবার জায়গা ও ব্যায়ামাগার ছেলেদের চেয়েও প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। বড়োদা রাজ্যে ভারতবর্ষীয়া বালিকাদের উপযোগী অনেক নূতন খেলা ও ব্যায়াম প্রবর্তিত হইয়াছে। বাংলা দেশের সমুদয় বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বড়োদা হইতে এইসব খেলা ও ব্যায়ামের বৃত্তান্ত ও ছবি আনান উচিত।

বাংলাদেশের মত স্ত্রীশিক্ষায় অনগ্রসর প্রদেশে ময়মনসিংহের মত ছোট সহরে তিনটি বালিকাবিদ্যালয় থাকা প্রশংসনীয়। কলেজের শিক্ষা পাইবার জন্য অনেক বালিকাকে কলিকাতা আসিতে হয়। কিন্তু সকলের স্থান হয় না; ছাত্রীনিবাসে যাহাদের স্থান হয়, তাহারা কোন কোন ছাত্রীনিবাসে ভাল করিয়া থাইতেও পায় না। অধিকন্তু বেথুন কলেজের ইংরেজ মহিলা-প্রিন্সিপালের প্রকৃতি ঐ পদ অপেক্ষা নারীপুলিস বিভাগের অধিকতর উপযোগী। এই সকল কারণে মফঃস্বলেও যেখানে যেখানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে, সেখানে তাহা করা একান্ত কর্তব্য। ময়মনসিংহে ছাত্রীর সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে সেখানে আই-এ ক্লাস খুলিলে বড় ভাল হয়। ছাত্রীর অভাব মোটেই হইবে না। এবিষয়েও কাহারও একাগ্রতার সহিত মন দেওয়া দরকার। যেখানে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে, সেখানে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী লোক আছেন, সহজেই বুঝা যায়।

লালা স্তার গঙ্গারামের দানশীলতা

শ্রাবণের প্রবাসীতে লালা স্তার গঙ্গারামের বিষয় কিছু লিখিয়াছিলাম। তখন তাঁহার ছবি হস্তগত না হওয়ায় ছবি দিতে পারি নাই। এবার এই কর্মবীর ও দানবীরের ছবি দিলাম।

১৮৫১ সালে তাঁহার জন্ম ও ১৯২৭ সালে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ হইয়াছিল। তখনও তিনি কশ্মিষ্ঠ ছিলেন। রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভ্যরূপে বিলাতে গিয়া সেখানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পিতা কোর্ট ইন্সপেক্টর ছিলেন। সংলোক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল; লালা গঙ্গারাম যে লক্ষ লক্ষ টাকা



লালা শ্রীর গন্ধারাম

দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বেপার্জিত। তিনি মোট কত টাকা দান করিয়াছেন, ঠিক জানিবার উপায় নাই; কারণ গুপ্ত দান অনেক ছিল। ১৯২৩ সালে তিনি ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে শ্রীর গন্ধারাম

ট্রাস্ট বা হস্তসম্পত্তি রেজিষ্টরী করেন। এই ট্রাস্টকে তিনি ঘরবাড়ী ও অগ্র রকম সম্পত্তি দান করিয়া আসিতেছিলেন। এই সব সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি চলে। যে-সব অট্টালিকা তিনি ট্রাস্টকে

দান করিয়াছেন, তাহার আত্মমানিক মূল্য উনত্রিশ লক্ষ টাকা। তাহা হইতে বার্ষিক প্রায় সত্তয়া লক্ষ টাকা আয় হয়। ট্রস্টের অধীনে নিম্নলিখিত সাতটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র কার্যনির্বাহক সমিতি আছে।

১। বিধবাবিবাহসহায়ক সভা, লাহোর। ১৯১৪ সালে ইহার প্রতিষ্ঠার পর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইহার প্রভাবে ১১৮১৫টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ভারত-বর্ষে ইহার ৬৯১টি শাখা আছে। হরিদ্বার, লাহোর, মথুরা ও জয়পুরে বিধবা-আশ্রম আছে। এইসকল আশ্রমে এপর্যন্ত ১৪৫জন বিধবা স্থান পাইয়া বিবাহিত হইয়াছেন। ইহা লালা গঙ্গারামের প্রিয়তম প্রতিষ্ঠান ছিল। তিনি মনে করিতেন, বিধবাদের সাহায্য করাই তাঁহার ঐশ্বর্যের কারণ। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯২৭ সালের ব্যয়ের জন্ত ২৬০০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

২। বিনামূল্যে চিকিৎসার হাসপাতাল। ১৯২১ সালে ১,৩১,৫০০ টাকা ব্যয়ে ইহার জন্ত বাড়ী তৈরী হয়। ১৯২৬এবং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইহাতে ৫,৭৪,৮২৫ জন বাহিরের রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং ২,৭৭৪ জন হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীদের অধিকাংশ মুসলমান। বর্তমান বৎসরে ইহার বরাদ্দ ৩৩,৫০০০ টাকা।

৩। হিন্দু ছাত্রদের বৃত্তি শিক্ষা সমিতি। ইহা হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে ওকালতী ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য বৃত্তি-শিক্ষার জন্ত বৃত্তি দেওয়া হয়। উপার্জনক্ষম হইয়া বৃত্তির টাকা ফেরত দিবার ব্যবস্থাও আছে। এঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা, কৃষি, আরণ্যবিদ্যা, বাণিজ্য, খনিজ-উত্তোলন বিদ্যা প্রভৃতির জন্ত বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯২৬এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৪,৬১৬৮/৩ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত রোজগারী লোকেরা এপর্যন্ত ৩৩৮৪৩ ফেরত দিয়াছেন। এবং বৎসর এপর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত পাঁচজন ছাত্র সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং, ৩জন জলশেলচন, একজন রেলওয়ে ও একজন পূর্ব-বিভাগে কাজ পাইয়াছেন, এবং একজন এম্-বি পাস করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। ১৯২৭সালের বরাদ্দ ১১,২০০।

৪। ব্যবসাবাণিজ্যশিল্পাদি বিষয়ক অ. ফিস ও লাইব্রেরী। ইহার সাহায্যে অসুসজ্জিত লোকেরা নানাবিধ ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ ও ত্রান লাভ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন। ইহাতে এখন নানাবিধ পণ্যশিল্প, কারিগরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক ২৫০০ বহি আছে, এইসকল বিষয়ের ৭০খানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে রাখা হয়, ভারতবর্ষ, বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিল্পাদিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বগঠনপত্র রাখা হয়, এবং সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও চাকরীর সংবাদ পাওয়া যায়। এপর্যন্ত ৪৭ জন ছাত্রলোক এই আফিসের সহিত পরামর্শ করিয়া বা ইহার মুস্তকাদির সাহায্য লইয়া রোজগারী হইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যহ ৩০৪০ জন লোক এই আফিসে আসেন। ১৯২৭ সালের বরাদ্দ ৭,০০০ টাকা।

৫। অপহজ আশ্রম। ইহার জন্ত দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। যে-সব শিশু, বালকবালিকা, জীলোক ও পুরুষ বঙ্গবৈকল্য দুরারোগ্য পীড়া বা অতিবাহিক্যাদি কারণে নিজেদের ভরণপোষণে অসমর্থ এবং নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া পালন করিবার জন্ত এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪৪জন লোকের জহ ইহাতে স্থান আছে। ইহার সব বন্দোবস্ত আধুনিক উৎকৃষ্ট রকমের। ইহাতে এখন ২০জন পুরুষ, ৪জন জীলোক, এবং ১টি শিশু আছে। ইহাদের মধ্যে ৭জন অন্ধ, ১টি বালক থল, ১জন মুকবধির। রাস্তার ভিত্তারীদিগকে এখানে রাখা হয় না। প্রত্যেক আশ্রমীকে পরিচ্ছদ, বিছানা ও আসবাব দেওয়া হয়। সাধারণ খাদ্য ছাড়া প্রত্যহ দুগ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ফল দেওয়া হয়। এই বৎসরের বরাদ্দ ২,০০০ টাকা।

৬। শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যের দোকান। ইহা ১৯২৬ সালের মে মাসে খোলা হয়। লালা গঙ্গারাম জ্ঞানিতেন, যে, অনেক বিধবা ও গরীব মহিলা বাড়ীতে অনেক জিনিষ প্রস্তুত করেন, কিন্তু তৎসমুদয় লাভ রাখিয়া বিক্রীর বন্দোবস্ত না থাকায় তাঁহারা নিজে উপার্জনক্ষম হইতে পারেন না। এইজন্ত তিনি দশহাজার টাকা দান করিয়া এই দোকান

খুলেন। এখানে শ্রমশিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত সামগ্রী এবং বিধবা ও গরীব মহিলাদের তৈরী জিনিষ বিক্রী হয়, এবং তৎসমুদয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাঁচা মাল ও কল তাঁহারা এখানে কিনিতে পারেন। ইহার অধীনস্থ কারখানায় যন্ত্রাদি ও কাঁচা মালও রাখা হয়। তাহার সাহায্যে জীলোকেরা দিনমজুরী হিসাবে রোজগারও করিতে পারেন। আগে আগে এইরকম দোকান ফেল হওয়ায়, ক্রেতা আকর্ষণ করিবার জন্ত ইহাতে সাধারণ পণ্যস্রব্যও রাখা হয়। তাহাতে ইহাও প্রমাণ হইয়া যায়, যে, এই-সকল জিনিষের তুলনায় ভারতবর্ষীয় জীলোকেরা কিরূপ উৎকৃষ্ট জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন।

৭। গরীব, বিধবা, অল্প গরীব লোক এবং দুঃস্থ পরিবার, তাঁহারা অপহৃত আশ্রমে আসিতে পারেন না, মাসিক বৃত্তি পান। ১৯২৭ সালের বরাদ্দ ৫,০০০ টাকা।

এই সমুদয় ছাড়া লাল গঙ্গারাম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। যথা—

ক। লাহোরের হিন্দু বিধবাপ্রশ্রম। ১৯২১ সালে তিনি ১,৮৮,২০০ টাকা ব্যয়ে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া তাহাতে হিন্দু বিধবাপ্রশ্রম ও শিল্পবিদ্যালয় পরিচালনার্থ তাহা পঞ্জাব গবন্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। ৮৩জন বিধবা এখানে থাকিয়া শিক্ষা পান। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যয়নির্বাহার্থ ১২ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। এপর্যন্ত ৮৭জন বিধবা এখানকার শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই সরকারী বা বেসরকারী ইন্সুলে ৩০ হইতে ৮০ টাকা বেতনের কাজ পাইয়াছেন।

খ। হিন্দু ও শিখ নারী ও বালিকাদের জন্ত লেডী মেনার্ড শিল্পবিদ্যালয়। লাল গঙ্গারাম ৭৭,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া এই শিল্পবিদ্যালয় চালাইবার জন্ত গবন্মেণ্টের হাতে দেন। ইহাতে কার্যদক্ষ যথেষ্ট শিক্ষক ও যন্ত্রাদি আছে। এখানে সকল বয়সের নারী ও বালিকাদিগকে মোজা বুনা, দরজির কাজ, কাপড়ে ফুল তেলার কাজ, পেন্সী বোনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা স্বগৃহিণী হইতে ও উপার্জনক্ষম হইতে পারেন। কেহ কেহ চাকরী পাইয়াছেন। অন্তরা জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম

হইয়াছেন। ১২০জন এখানে শিক্ষা পান। কোন বেতন লওয়া হয় না।

গ। লাহোরের হেলী বাণিজ্য কলেজ। ইহার অট্টালিকা নির্মাণের ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১,৬০,০০০।

এই তিনটি অট্টালিকা যে উদ্দেশ্যে নির্মিত, তাহার জন্ত ব্যবহৃত না হইলে স্ত্রীর গঙ্গারাম ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীদের হাতে ফিরিয়া আসিবে, এবং তাঁহারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা করিবেন।

ঘ। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ও কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণা এবং দরিদ্রের সেবার্থ অনেক ব্যয় লাল গঙ্গারাম করিয়াছেন। কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণার জন্ত তিনি ২৫,০০০ টাকা দান করিয়া মেনার্ড-গঙ্গারাম গবেষণা বৃত্তি স্থাপন করেন। আকের স্বকৃ ছাড়াইয়া তাহা নরম করিয়া ও তাহাতে ঝোলাগুড় প্রবেশ করাইয়া তাহা গোবর উৎকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষা তিনি করাইয়াছিলেন। পরীক্ষা সফল হইয়াছিল।

এইসকল দান ব্যতীত তিনি গরীব ছাত্র ও গরীব ভ্রাতৃ পরিবারের লোকদিগকে গোপনে শত শত কঞ্চল, লেপ, লুই, বালাপোষ, গরম কোর্ডা, টাকা, কাপড় প্রভৃতি দিতেন। বর্তমান আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি তাঁহার উইল খোলা হইবার কথা। তাহাতে তিনি পঞ্জাবকে আরো কিছু দিয়া গিয়াছেন কিনা, জানা যায়বে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে, আবো ১০ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার ট্রাষ্টেব সম্পত্তি ৩০ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি টাকায় পরিণত করিবেন। এই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে কেহ দান করেন নাই, বলিতেছি না। কিন্তু নিজের জীবিতকালে, জুশ্বলার সহিত কার্য-নির্বাহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং স্থানিত ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া এরূপ নানাবিধ কাজ বন্ধের কোন দাতা আগে করিয়া গিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

বর্তমানে বাঙালী দরিদ্র হইলেও, স্ত্রীর গঙ্গারামের মত ধনী একজন বাঙালীও নাই বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা কেহ লালজির মত স্বদয়বান নহেন। বাংলার অবাঙালী বাসিন্দাদের মধ্যে স্ত্রীর গঙ্গারাম অপেক্ষা ধনী ত অনেক লোকই কলিকাতায় আছেন। তাঁহাদের

মধ্যে ২৪ জন দানশীলও বটে। কিন্তু কেহই স্ত্রার গঙ্গারামের সহিত তুলনীয় নহেন।

পঞ্জাবীর সহিত বাঙালী বিধবার বিবাহ

সাহায্যের মাতৃভাষা ও রীতিনীতি এক নহে, সাধারণতঃ একরূপ পুরুষ ও নারীর বিবাহ বাঙালীয় নহে। তাহা হইলেও, বাঙালী হিন্দু বিধবার বিবাহ সচরাচর হিন্দু বাঙালীর সহিত না হইলে, যে-কোন প্রদেশের হিন্দু সমাজের সহিত হওয়া মন্দ নহে। পঞ্জাবে ও সিন্ধু-দেশে বিবাহযোগ্য নারীর অভাব বেশী; এবং পঞ্জাবীরা জাতিবিচার না করিয়া বাঙালী হিন্দু বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এইজন্য এইরূপ কতকগুলি বিধবার পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। পরে আরও হইবে। ভাল কাজ হইলেই তাহার নকল মন্দ কাজ হয়। ভাল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে তাহার নকল মন্দ তথাকথিত প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। সংকাজের নাম করিয়া প্রবঞ্চক লোকেরা চান্দা আদায় করিয়া থাকে। পঞ্জাবে সংলোকদের দ্বারা স্থপরিচালিত বিধবাবিবাহসহায়ক সভা আছে। তাহার নকল বিধবা সব্ববাহ করিবার ব্যবসাও সেখানে আছে, এবং তাহার সহায় বাংলাদেশে (যেমন শুনিয়াছি নবদ্বীপে) আছে। ফলে কোন কোন বাঙালী হিন্দু বিধবা অসংলোকের হাতে পড়িয়া বিক্রীত ও চরম দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব, বাংলাদেশে ঐহারা বিধবার বিবাহ দানে উৎসাহী, তাহারা অসুস্থান-পূর্বক বিশেষ ধরন না জানিয়া যেন কোন বিধবার বিবাহ—বিশেষতঃ দুঃস্থ ভিন্নপ্রদেশবাসীর সহিত বিবাহ—যেন না দেন।

বাংলার জেলা ও পৃথিবীর স্বাধীন দেশ

পৃথিবীর এক অংশ এশিয়া মহাদেশ, তাহার এক অংশ ভারতবর্ষ, তাহার এক অংশ বাংলা, তাহার এক একটি অংশ জেলাগুলি; এই ভাবে বিবেচনা করিলে এক এক জেলার অধিবাসী আমাদের সহজেই মনে হয়, আমরা অতি

নগণ্য, টুকরার টুকরা, তস্ত টুকরা এক এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি, যে, অনেক স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা আমাদের জেলাগুলির সমান, জেলাগুলির চেয়েও কম, তাহা হইলে আমাদের এই আশা হইতে পারে, যে, তাহারা যখন শক্তিতে, শিক্ষায়, জ্ঞানে, কৃতিত্বে এত বড়, তখন আমাদের পক্ষেও মহত্ব ও কৃতিত্ব হ্রাস হইবে।

নীচে বাংলার জেলাগুলির লোকসংখ্যা (১৯২১ সালে) এবং তাহার নীচে কতকগুলি স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা দিতেছি।—

ময়মনসিংহ	৪৮,৩৭,৭৩০	বুলগা	১৪,৫৩,০৩৪
ঢাকা	৩১,২৫,৯৬৭	বর্ধমান	১৪,৩৮,৯২৬
ত্রিপুরা	২৭,৪৩,০৭৩	পাবনা	১৩,৮৯,৪৯৪
মেদিনীপুর	২৬,৬৬,৬৬০	মুর্শিদাবাদ	১২,৬২,৫১৪
২৪ পরগণা	২৬,২৮,২০৫	হুগলী	১০,৮০,১৪২
বাখরগঞ্জ	২৬,২৩,৭৫৬	বগুড়া	১০,৪৮,৬০৬
রংপুর	২৫,০৭,৮৫৪	বাঁকুড়া	১০,১৯,৯৪১
ফরিদপুর	২২,৪৯,৮৫৮	হাওড়া	৯,৯৭,৪০৩
ধশোর	১৭,২২,২১৯	মালদহ	৯,৮৫,৬৬৫
মিনাজপুৰ	১৭,০৫,৩৫০	জলপাইগুড়ি	৯,৩৬,২৬৯
চট্টগ্রাম	১৬,১১,৪২২	বীরভূম	৮,৪৭,৫৭০
রাজসাহী	১৪,৮২,৬৭৫	দার্জিলিং	২,৮২,৭৪৮
নদিয়া	১৪,৮৭,৫৭২	চট্টগ্রাম পার্কত্যা প্রদেশ	১,৭৩,২৪৩
নোয়াখালি	১৪,৭২,৭৮৬		

এখন পৃথিবীর কতকগুলি দেশের লোকসংখ্যা দিতেছি।

আকগনিহান	৪৬,০০,০০০	লাটভিয়া	২৮,০০,০০০
আলবেনিয়া	১০,০০,০০০	লাইবেরিয়া	২০,০০,০০০
আর্মেনিয়া	২০,০০,০০০	লুয়েম্বুর্গ	২,৬০,০০০
বোলভিয়া	২৮,০০,০০০	নাইজেরিয়া	১২,০০,০০০
বুলগেরিয়া	৪৮,৬১,৪৩৯	নিউক্যাম্ব্রিয়া	২,৫০,০০০
চিলি	৪২,০০,০০০	নিকারাগুয়া	৬,৪০,০০০
কোস্তা রিকা	৪,৬০,০০০	নরওয়ে	২০,৬০,০০০
কিউবা	২৬,০০,০০০	পানামা	৪,০০,০০০
ডেনমার্ক	৩০,০০,০০০	পারাগুয়ে	৮,০০,০০০
ডোমিনিকা	৭,০০,০০০	পেরু	৩৫,০০,০০০
ইকোয়েডর	২০,০০,০০০	সালভাদর	১০,০০,০০০
এক্সোনিয়া	১২,৫০,০০০	সুইডেন	৪৮,৮২,২৮৮
গোয়াটমালা	১৬,০০,০০০	সুইজারল্যান্ড	৪,০০,০০০
হাইটি	২৫,০০,০০০	উরুগুয়ে	১৪,০০,০০০
হুয়াস	৬,৫০,০০০	ভেনিজুয়েলা	২৪,২০,০০০
আমালগাও	৪৩,৯০,২১৯	ওয়েল্স	২২,০৬,৭১২

আমাদের বাংলা দেশের গবর্নমেন্ট বৎসরে ১১ কোটি টাকাও সরকারী সব রকম কাজের জন্য খরচ করিতে

পান না। বাংলা দেশ মরুভূমি নহে, কৃষিজাত ধন অনেক হয়, আরও হইতে পারে। শিল্পজাত পণ্যও এখানে কোটি কোটি টাকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু রাজস্বের অধিকাংশ টাকা ভারত গবর্নেন্ট শোষণ করেন। কৃষি-বাণিজ্যশিল্পের লাভেরও অধিকাংশ কোটি কোটি টাকা বিদেশীবা অস্থাসাৎ করবে—অধিকাংশ বাঙালীর ভাগে পড়ে ছিন্ন বস্ত্র, অর্দ্ধাশন ও অনশন। কিন্তু বাঙালী যদি উদ্যোগী হয়, আত্মশাসনের শক্তি ও অধিকার যদি বাঙালী অর্জন করিতে পারে, তাহা হইলে বাংলা দেশ কিরূপ শিক্ষিত, উন্নত, ধনশালী হইতে পারে, তাহা ময়মনসিংহ জেলা অপেক্ষা কম লোকের বাসভূমি দু'একটা দেশের দৃষ্টান্ত হইতে দেখাইতেছি।

বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ উভয় অধিবাসী একত্র গণনা করিয়া হাজারে ১০৪ জন লিখনপঠনক্ষম। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২০ জন নিরক্ষর। চিলি দক্ষিণ আমেরিকার একটি ছোট দেশ, বেশী কিছু সভ্যদেশ বলিয়া পরিচিত নহে। লোক-সংখ্যা মোটে ৪২ লাখ, ময়মনসিংহ জেলার চেয়েও কম। অথচ ইহার পুরুষনারীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন, হাজার-কবা ৬০০ জন লিখিতে পড়িতে পারে। এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। বঙ্গের একটি জেলার চেয়েও কম লোকদের জন্য দুটি সাধাবণ ও দুটি শিল্প বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া নানারকম বিদ্যালয় চারি হাজারের উপর আছে। লাইব্রেরী, মিউজিয়ম প্রভৃতি আছে। ১৯২৬ সালে বাংলার ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬ জন অধিবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যয় হইয়াছিল মোট ১,০২,৩২,২৭৩ টাকা। তাহার মধ্যে গবর্নেন্ট দিয়াছিলেন শতকরা ৪৮.৯৫ অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম। চিলির ৪২ লক্ষ লোকের জন্য ১৯২১ সালে সরকারী শিক্ষাব্যয় হইয়াছিল প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। ১৯২১ সালে চিলির মোট রাজস্ব হইয়াছিল ২,৪০,৯৬,২২৫ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ছত্রিশ কোটি টাকার উপর। ইহার মানে এই, যে, চিলির ৪২ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে ৩৬ কোটি টাকার উপর রাজস্ব ব্যয় হয়, আব বঙ্গের ৪৬৭ লক্ষ লোকের জন্য পৌনে এগার কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয় হয়। বাংলাদেশে চিলির চেয়ে কম ধন উৎপন্ন হয় না;

কিন্তু তাহা বাঙালীর ভোগে আসে না, বাঙালীর হিতের জন্য ব্যয় হয় না।

ডেন্মার্কের মোট রাজস্ব ১৯২১-২২ সালে হইয়াছিল প্রায় ৩৭ কোটি টাকা; মোট লোক-সংখ্যা ৩০ লক্ষ, অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলার চেয়ে কম, ঢাকা জেলার চেয়ে কম! বঙ্গের লোকসংখ্যা ডেন্মার্কের ১৫ গুণেরও বেশী, কিন্তু বাংলা গবর্নেন্ট রাজস্ব খরচ করিতে পান ডেন্মার্কের চতুর্থাংশের চেয়ে কিছু বেশী। ডেন্মার্কের শিক্ষাদির বন্দোবস্তের বিষয় পরে ছাপা হইবে। শিক্ষা বাধ্যতা মূলক ও প্রায় অবৈতনিক।

নরওয়ের লোকসংখ্যা ২৬লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বাখরগঞ্জ ও রংপুর, এই কয়টি জেলার প্রত্যেকটির চেয়ে কম। কিন্তু ১৯২১-২২ সালে রাজস্ব হইয়াছিল ৬০ কোটি টাকা—বঙ্গের প্রায় ছয়গুণ। অস্বাভাবিক ব্যবহার কথা পরে ছাপা হইবে।

সুইজারল্যান্ডের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ, ময়মনসিংহের চেয়ে কম। কিন্তু রাজস্ব হয় যোলকোটি টাকার উপর। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লাইব্রেরী আছে ছয় হাজার এবং তাহাতে বহি আছে ২৪ লক্ষ।

এই রকম আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গের এক একটি জেলার চেয়ে কম লোক এই যে-সব দেশে বাস করে, তাহারা পৃথিবীতে স্বনামধন্য, জগৎসভায় তাহাদের স্থান আছে; আমাদের স্থান নাই। আমাদের পবিচয় আমরা ব্রিটিশ প্রজা।

যে-সব দেশের কথা বলিলাম, তাহার কোনটিই বঙ্গের বা ভারতবর্ষের চেয়ে উর্বরা বা ধনিজসম্পত্তি আরণ্য-সম্পত্তি ও অস্বাভাবিক ঐশ্বৰ্য্যে ধনশালী নহে। তবে তাহারা উন্নত ও আমরা অবনত কেন? আমাদের জ্ঞান কম, মনুষ্যত্ব কম, একতা কম।

বঙ্গের প্রতি অবিচার

আমরা মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে অনেকদিন হইতে বহুবার বঙ্গের প্রতি অবিচারের বিষয় লিখিতেছি। জুলাই মাসে এ বিষয়ে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করিয়া প্রায় সমস্তটি ছাপাইয়া নানা খবরের কাগজে পাঠাইয়া-

ছিলাম। তা ছাড়া মডার্ন রিভিউতেও ছাপিয়াছিলাম। আমরা যতদূর অবগত আছি, বঙ্গের কয়েকটি ইংরেজী দৈনিকে বক্তৃতার মর্ম বাহির হইয়াছিল, তদপেক্ষা কম কাগজে সম্পাদকগণ ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছিলেন। একখানি ইংরেজী দৈনিক বক্তৃতাটি ছাপেন নাই। কোন মন্তব্যও করেন নাই, কিন্তু নিজেদের দলের একজন লোকের ঐ প্রকারের একটি প্রবন্ধ কয়েকদিন পবে ছাপিয়াছিলেন। বঙ্গের নেতারা কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

বঙ্গের বাহিরে বক্তৃতার যে অতিক্রম চূধক দৈনিক কাগজগুলিতে ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের প্রায় সব প্রধান প্রধান কথাই বাদ পড়িয়াছিল। বোম্বাইয়ের একটি কাগজে আসল কথাগুলি বাদ দিয়া বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। কেবলমাত্র মাদ্রাজের একটি দৈনিকে বক্তৃতার পূর্ণ তাৎপর্য বাহির হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বঙ্গের বাহিরের কোন কাগজে বক্তৃতার বিষয়টি সম্বন্ধে একপংক্তি সম্পাদকীয় মন্তব্যও আমাদের চোখে পড়ে নাই। এসব কথা ব্যক্তিগত অভিযোগ বা চুঃখ প্রকাশ কেহ যেন মনে না করেন। সকল দিক্ দিয়া বঙ্গের প্রতি অবিচার হইয়া আসিতেছে, বঙ্গকে পজু করিয়া রাখা হইতেছে—অথচ এবিষয়ে বঙ্গের নেতাদের সমুচিত দৃষ্টি নাই, এবং বঙ্গের বাহিরে কোন নেতা বা সম্পাদক এই অবিচারে বঙ্গের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও দেখাইলেন না, বা বঙ্গের রাবীর অংশমাজেবও সমর্থন করিলেন না, তাহাব কারণ কি এবং তাহা হইতে আমরা কি শিখিতে পারি, তাহা পাঠকদিগকে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে অনুরোধ করা আমাদের উদ্দেশ্য। বিষয়টি যে তুচ্ছ নহে, তাহার প্রমাণ, আমাদের উহা আলোচনা করিবার পর, মহাজন সভা, বেঙ্গল গ্রাশিয়াল চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, বঙ্গের গবর্নর ও এংলোইণ্ডিয়ান কাগজ ষ্টেটসম্যান্ একটি অবিচার সম্বন্ধে আলোচনা ও মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কাহারও সহানুভূতি ও সমর্থন না পাইলেও বাঙালীকেই নিজেদের প্রতি অবিচারেব প্রতিকারে সচেষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। বাঙালী নেতাদের ও অন্ত সকল বাঙালীর বুঝা উচিত, যে, বাঙালীদের প্রতি এখন সব দিক্ দিয়া যে অবিচার হইতেছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার তাহাদিগকে যে অত্যন্ত কম প্রতিনিধি দেওয়া হইতেছে, এখন বাঙালীরা তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার না করিলে, ভবিষ্যতে, স্বরাষ্ট্রাভ্যন্তর পরও, বর্তমান অবস্থার নজীবে অবিচার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এখনই খুব উত্তোগী হওয়া দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয়েব এম্-এ ও এম্-এসসি পরীক্ষার অধ্যাপকদিগকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষক বলা হয়। সাহিত্য ইতিহাসাদি বিভাগকে আর্টস বিভাগ এবং রসায়ন পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি বিভাগকে বিজ্ঞান বিভাগ বলা হয়। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ আর্টস শিক্ষা বিভাগের ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের এক একটি কৌন্সিল আছে। প্রতিবৎসর এই কৌন্সিল তাহার সভাপতি নির্বাচন করিয়া থাকেন। এবৎসর আর্টস কৌন্সিল অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্কে এবং বিজ্ঞান কৌন্সিল ডাক্তার স্ত্রার নীলরতন সরকারকে সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এবং স্ত্রার নীলরতন সরকার যোগ্য ব্যক্তি। তাঁহাদের নির্বাচন সম্বন্ধে খবরের কাগজে কোন বাদানুবাদ হই নাই।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহার বক্তৃতায় এইমত প্রকাশ করেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি নাই। তাঁহার নির্বাচনে দলাদলি হয় নাই, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু যেদিন শিক্ষকরা তাঁহাকে নির্বাচন করেন, সেই দিনই তাঁহারা, অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের নাম চারিটি উচ্চতর বিদ্যালয়শীলন বোর্ডের অন্ততম সভ্যরূপে প্রস্তাবিত হওয়ায়, একটিরও উপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে মনে করেন নাই। তিনি একটিতেও নির্বাচিত হন নাই, অন্ত কেহ কেহ নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত লোক একটিতেও নির্বাচিত না হওয়ায় কারণ দলাদলি বলিয়া আমাদের ধারণা। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি নাই, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনেব এই উক্তি ব্রাস্ত মনে করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন্সেব মধ্যে উচ্চতর বিদ্যালয়-শীলন বোর্ডগুলির নিম্নলিখিত কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে :—

The Board of Higher Studies in each subject shall, for purposes of Post-graduate teaching and Post-graduate examination, make proposals regarding

- (a) courses of study ;
- (b) text-books or recommended books ;
- (c) standards and conduct of examinations ;
- (d) teaching requirements from year to year and preparation of the time table ;
- (e) distribution of work among the members the staff in that department ;

(f) appointment of Examiners ; and
(g) such other matters as may, from time to time, be specified by the Council with the approval of the Senate.

অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার সিকি শতাব্দীর অধিককাল সাতিশয় যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত অধ্যাপকের ও পরীক্ষকের কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহুভাষাবিদ। তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধতম ছাত্র। উচ্চতর বিদ্যামুশীলনের বোর্ডের যে-সকল কর্তব্যউল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতে তিনি সমর্থ। তাঁহার অন্ত কি কি দোষ গুণ, যোগ্যতা অযোগ্যতা আছে, না আছে, তাহা এক্ষেত্রে বিচার্য্য নহে। এইসকল কারণে আমরা মনে করি, শিক্ষকদের তাঁহাকে নির্বাচন করা উচিত ছিল। তিনি নির্বাচিত না হইয়া চারিটি বোর্ডের মধ্যে কোন্টিতে অন্ত কে নির্বাচিত হইয়াছেন জানি না। জানিলে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের যোগ্যতার বিষয় আমরা অবগত থাকিলে সে-বিষয়ে কিছু লিখিতে পারিতাম। শুনিয়াছি, ইতিহাসের বোর্ডেও তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু ইতিহাসেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষকগণ তাঁহাকে না-লায়েক মনে করিয়াছেন—তাঁহা অপেক্ষা কাহাকে অধিকতর লায়েক মনে করিয়া নির্বাচন করিয়াছেন জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ক্যালেণ্ডারে ইতিহাসের শিক্ষক এবং ইতিহাসের বোর্ডের সভ্যদের তালিকায় তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহার সমান যোগ্যও কেহ আছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং অন্ততঃ পক্ষে ইতিহাসের বোর্ডে তাঁহার স্থান হওয়া উচিত ছিল। ইংরেজী সাহিত্য, আরবী-ফারসী, নৃতত্ত্ব, প্রভৃতি কোন কোন বোর্ডেও যে-সকল ব্যক্তির নাম দেখিতেছি, তাঁহারাও ঐ ঐ বিষয়ে প্রত্যেকেই যত্নবান অপেক্ষা পণ্ডিত নহেন।

আমরা আগেই বলিয়াছি, যে, বোর্ডের নির্দিষ্ট কাজের যোগ্যতা কাহার কিরূপ আছে, তাহাই বিচার্য্য, অন্ত কিছু বিচার্য্য নহে। কিন্তু কু-তार्কিকেরা অপ্ৰাসঙ্গিক কথা তুলিয়া অনেক সময় ভ্রম বা জ্ঞানকৃত দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও তাহা হইতেছে। যত্নবান বিরোধী-

দলের বলিয়া অল্পমিত একজন গুপ্তনামা লেখক একখানি ইংরেজী দৈনিক খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, যত্নবান ভাইস-চ্যান্সেলার হইবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে তোষামোদকারী, দাস প্রকৃতির লোক, ইত্যাদি বলিয়াছিলেন। সকলকে বলেন নাই, কতকগুলি লোককে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃতি ঐরূপ বটে, তাহা আমরা এখনও বলিতেছি। সত্য কথা বলা দোষ নহে। সত্যকথন উচ্চতর বিদ্যামুশীলন বোর্ডের সভ্য হইবার পক্ষে একটা অযোগ্যতা নহে। অবশ্য ঐহা হারা ঐরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহারা যত্নবান প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারেন না।

আর-একটা কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্ভবতঃ ঐ দলেরই কোন লোকের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, যে,

"it is in the constitution of the Boards that the voice of the teachers is predominant.....The Vice-Chancellor is appointed by the Governor-Chancellor But in the constitution of the Boards of studies, the teachers' vote is supreme."

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাধীন মত কবে হইতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা হয়। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে আগে হইত এক কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এখন না হয় দুই তিন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হইয়া থাকে। শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই বা প্রত্যেকেই কবে হইতে স্বাধীনচেতা স্বাধীনকর্মী হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ তদ্বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্ত পাঠাইতে পারিবেন। যত্নবানকেই লাইটসাহেব সর্বপ্রথমে ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন নাই, তাঁহার পূর্ববর্তী প্রত্যেক ভাইস-চ্যান্সেলার কোন না কোন লাইটের দ্বারা নিযুক্ত। সুতরাং যত্নবানকে বোর্ডে নির্বাচন করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষকদের স্বাধীনতা থর্ক হইত মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা শিক্ষকদিগকে ছুষিতে অনিচ্ছুক। বাঁহাদের কিছু-কাল অন্তর অন্তর পুনর্নিয়োগ অন্তর কৃপাসাপেক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বাধীনচেতা হইবেন, এমন আশা করা যায় না। অন্ত্যস্ত কারণের মধ্যে এই কারণে অনেকে চান যে, শিক্ষকদের পদের স্বাধীনতাবিধান হয়, যাহাতে তাঁহারা

নিরুদ্ধেগে স্বাধীনভাবে কাজ কবিতে পারেন। যত্নবান্বে এইরূপ স্থায়িত্ববিধানের পক্ষপাতী, তাহা তাঁহার কনভোকেশন বক্তৃতায় বলিয়াছেন।

পূৰ্বোক্ত কাগজে যত্নবান্বে পাণ্ডিত্যের ও অধ্যাপনানৈপুণ্যের প্রতি উচ্চতম শ্রদ্ধা ("highest respect") ঘোষিত হওয়ার পর বলা হইতেছে, যে, তিনি ভাল নেতা ও ভাল কার্যপরিচালক বা শাসনকর্তা ("a good leader and good administrator") নহেন। তাহা যদি সত্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য, বোর্ডের সভ্যদের কর্তব্যের মধ্যে কোথায় লেখা আছে, যে, প্রত্যেক সভ্যকে নেতা ও শাসনকর্তা হইতে হইবে? তাঁহাদের সব কর্তব্যের তালিকা উপরে ছাপিয়া দিয়াছি। তাহাতে ত নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের উল্লেখ দেখিতেছি না। যত্নবান্বে নির্বাচন না করিয়া অল্প ঝগড়াকে ঝগড়াকে শিক্ষকেরা নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেতা ও কার্যনির্বাহক বা শাসনকর্তা, তাহা ঐ কাগজে প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উহার লেখক তাহা করিতে পারেন নাই। আমরা নির্বাচিত চারিজনের নাম জানিলে তাহা করিতে চেষ্টা করিতাম। পরে জানিতে পারিলে চেষ্টা করিব। উক্ত কাগজের লেখক প্রথমে "ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই নাই।" প্রবাদবাক্যের দৃষ্টান্তরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন,

"It cannot be said that in the matter of the constitution of the Boards of Studies the teachers acted in the way they did in malice."

তাঁহার পর কিন্তু বলিতেছেন :-

"Before he became Vice-Chancellor he abused the teachers of the University in a bad way. After he became Vice-chancellor, he has followed a policy and has sought to shut out some of the teachers from the Senate or the Syndicate in a way that is hurtful to the feelings of the teachers. It is not unnatural for the teachers to give their reply."

শেষ বাক্যটিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে, যত্নবান্বে নির্বাচন করা হইবে কিনা বিবেচনা করিবার সময় তাঁহার বোগ্যতা অযোগ্যতা বিবেচিত হয় নাই; যেহেতু তিনি কতকগুলি লোককে নির্দাহ বলিয়াছিলেন এবং কাহাকেও কাহাকেও সেনেট বা সীণ্ডিকেটের সভ্য হইতে দেন নাই বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, অতএব তাঁহার কাজের পান্টা

জবাব স্বরূপ শিক্ষা করা তাঁহাকে নির্বাচন করেন নাই!

আমরা আগেই বলিয়াছি, তিনি সকল শিক্ষককে ভোষামোদকারী ইত্যাদি বলেন নাই, কতকগুলি লোককে বলিয়াছিলেন ইহা সত্য কথা। ইহাতে স্বাধীনচিত্ত শিক্ষকদের রাগের কোন কারণ নাই। সকল শিক্ষকের গেনেটের বা সীণ্ডিকেটের সভ্য হওয়াতেও তিনি বাধা দেন নাই। হয়ত কাহারও কাহারও এরূপ সভ্য হওয়ায় তাঁহার মত না থাকিতে পাবে, অপরের সম্বন্ধে মত থাকিতে পারে। শিক্ষকের পরিবর্তে অশিক্ষককে তিনি ঢুকান নাই। প্রত্যেক ভাইস-চ্যান্সেলরেরই এইরূপ কাহাণ্ড সম্বন্ধে অশুকল ধারণা, কাহারও সম্বন্ধে প্রতিশুকল ধারণা থাকিতে পারে। তাহাতে শিক্ষক মাত্রেরই রাগের কারণ নাই। যদি কোন ভাইস-চ্যান্সেলর অযোগ্য লোককে কোন পদ বা কাজের জন্ত নির্বাচন বা সুপারিস করেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহা অসন্তোষের কারণ হইতে পারে। কিন্তু যত্নবান্বে কোন অযোগ্য লোককে কোন কিছু জন্ত সুপারিস করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে, তাঁহার বিরোধী দলের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার দোষ বলিয়া যে-সব কথা উল্লেখ করিতেছেন, সেগুলি যদি প্রকৃতই তাঁহার দোষ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলেও তাঁহার বোর্ডের সভ্যদের যোগ্যতার বিচারস্থলে তৎসমুদয়েব উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইত। তাঁহাকে নির্বাচন না করিয়া দলাদলিপরায়ে লোকদের তৃপ্তি হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, তাঁহার যশ ও সম্মানের লাভ হয় নাই; ক্ষতি হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্রতিপত্তি কমিয়াছে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস কৌন্সিলের।

ফ্যাকাল্টি কমিশন

১৯১৯ সালে ভারতশাসনের ৬ নতুন আইন জারী হয়, তাহার কোন পরিবর্তন দরকার কিনা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ১৯২৯ সালে বা তাহার পূর্বে একটি কমিশন বসিবার ব্যবস্থা আছে। বিলাতের বর্তমান

টোরি গবন্মেণ্ট উহা এই কাবণে তাড়াতাড়ি বসাইতে চাহিতেছেন, যে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাদের মনোমত লোক বাছিয়া বাছিয়া উহার সভা নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে যদি তখন পাল্‌মেণ্টে শ্রমিকদল প্রবল হয়, তাহা হইলে শ্রমিক গবন্মেণ্ট এমন সব লোককে সভা নির্বাচন করিয়া বসিতে পারেন, যাহারা ভারতীয়দিগকে ভয়ানক বেশী রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়া ফেলিতে পারে—যদিও আমাদের সেরূপ কোন সম্ভাবনায় বিশ্বাস নাই।

খবরের কাগজে রাষ্ট্র হইয়াছে, যে, বর্তমান বিলাতী গবন্মেণ্ট কমিশনে একজনও ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করিবেন না, সব সভাই বিলাতী মনুষ্য হইবেন। অষ্ট-দিকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি বিলাত হইতে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত পটেল মহাশয় বলেন, যে, কমিশনে জনকতক ভারতীয় সভ্য থাকিবেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা বিলাতী মনুষ্যদের চেয়ে কম হইবে। আমাদের বোধ হয় পটেল মহাশয়ের কথাই ঠিক হইবে। কারণ, যদি একজন ভারতীয় লোককেও সভা না করা হয়, তাহা হইলে বিলাতী গবন্মেণ্ট জগতের কাছে একথা ঘোষণা করিতে পারিবেন না, যে, ভারতবর্ষের লোকদের মতও শুনা হইয়াছে। ইহা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কেন না, যদিও ইংরেজ জাতি নিজেদের মত ও স্বার্থ অমুসায়ে ভারতশাসন করে, তথাপি জগৎকে জানান দরকার মনে করে, যে, ইংরেজ রাজত্ব ভারতীয় লোকদের অমুমোদিত, কেবল ছুতারজন বিরুদ্ধমস্তিষ্ক, বা নগণ্য, বা বাজে লোক তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। জনকতক ভারতীয় লোককে কমিশনের সভ্য করিলে, ইংরেজের কোন স্বার্থহানিও হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ ভারতীয় কিরূপ লোককে সভা নিযুক্ত করা হইবে, তাহা বিলাতী গবন্মেণ্টই স্থির করিবেন; দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সভ্যেরা সকলে একমত হইলেও তাঁহারা সংখ্যায় নান হইবেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা সেই কারণেই অগ্রাহ্য হইতে পাবিবে; তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সভ্যেরা সংখ্যায় বেশী হইলেও বিলাতী গবন্মেণ্ট তাঁহাদের কথা অমুসায়ে কাজ করিতে বাধ্য নহেন—অন্যাসে অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

কমিশনের সব সভা বিলাতী, কিম্বা কমসংখ্যক কয়েকজন সভ্য ভারতীয় হওয়ার ফল কার্য্যতঃ একই হইবে। তবে বিলাতী মনুষ্যদের মধ্য হইতে সব সভ্য নির্বাচিত হইলে, একটি যে অসুবিধা হইবে, তাহা আগে বলিয়াছি; আর-একটির উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজরা বলে, কৃষিয়া সর্বদাই ভারতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রাদি করিতেছে। সে-বিষয়ে আমাদের সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু ইংরেজদের বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কমিশনের সব সভ্য ইংরেজদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিলে তাহা কৃষিয়াকে স্পষ্ট ভাষায় বেশী করিয়া ষড়যন্ত্রাদি করিতে বলার সমান হইবে। কাবণ, শুধু কৃষিয়া কেন, ইংরেজদের মিত্র দেশের লোকেরাও মুখে না বলিলেও মনে মনে বুঝিবে, যে, ভারতশাসন-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন বিষয়ে কমিশনের সভ্যরূপে ভারতীয়দের মত প্রকাশের সুযোগটুকুও না থাকিলে ভারতবর্ষে খুব বেশী অসন্তোষ ও ইংরেজশাসন হইতে কল্যাণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নৈরাশ্র জন্মিবে; সুতরাং ইংরেজবিরোধী বিদেশী শক্তিব তাহাতে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার খুব সুবিধা হইবে।

আমাদের নিজের মত এই, যে, জনকতক ভারতীয় কমিশনের সভ্য হইলেও আমাদের কোন লাভ নাই। তাঁহাদের কথা ইংরেজরা শুনিবে না। এই কারণে সব সভ্য বিলাতী হওয়াই ভাল। কুটনীতির খাতিরে ভারতের জনকতককে সভ্য করিয়া জগতের কাছে ইহা প্রচাৰ করিবার সুবিধা ইংরেজ গবন্মেণ্টের না হইয়াই ভাল, যে, আমাদের কথা দস্তুরমত শুনিবার পর একটা সিদ্ধান্ত ভারতের শাসনকর্তারা করিয়াছে। তার চেয়ে, ইংরেজরা যে সম্পূর্ণ নিজের মতলব অমুসায়ে কাজ করে, তাহাই বিনা আবরণে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া শ্রেয়ঃ।

যদি সকল বা অধিকাংশ সভ্য ভারতীয় হইবার ও তাঁহাদের দ্বিভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং তাঁহাদের রায় অমুসায়েই কাজ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমবা কমিশন হইতে অন্ততঃ কিছু সুফলের প্রত্যাশা করিতাম। কিন্তু যখন ওরূপ কোন সম্ভাবনা

নাই, তখন কমিশন হইতে কোন স্বফলের আশা আমরা করি না, কুফলেব আশঙ্কাই করি।

এখন যেকোন ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইতেছে, তাহা প্রবর্তিত করিবার সময়ে ও তাহার পূর্বে উক্ত হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে যতটুকু যতটুকু করিয়া যখন যখন রেস্পন্সিব গবন্মেণ্টের (দায়ী গবন্মেণ্টের—কাহার কাছে দায়ী তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই!) অভিযুক্ত অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে, তাহার পরিমাণ ও সময় নির্ধারণের অধিকার বিলাতী পার্লামেন্টেব অর্থাৎ ইংরেজ জাতিব থাকিবে। আমাদের ভাগ্যান্বিতা হইবার বিদেশীদের এই অধিকার এবং তাহাব প্রায়তা আমরা কোন কালেই স্বীকার করি নাই। কিন্তু স্বীকার না করিলেও তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া যখন স্বাধীনতার দিকে কার্যাত: অগ্রসর হইবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সুতরাং কমিশনের সব সভ্য ইংরেজ হইলেও আমরা নাচাব, অধিকাংশ হইলেও নাচার। আমাদের কেবল মত প্রকাশের কিছু স্বাধীনতা আছে। সেই ক্ষমতা আবার বলিতেছি, আমাদের দেশের কাজ কি প্রণালী অনুসারে কাহাদের দ্বারা নির্বাহিত হইবে; তাহা স্থির করিবার আভাবিক ও প্রায় অধিকার একমাত্র আমাদেরই আছে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ ও তাহাদের মিত্রজাতিরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল, যে, পৃথিবীর জাতি সমূহের নিম্ননিজ গত ও অভিপ্রায় অনুসারে স্বদেশীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করিবার অধিকার (self-determination) প্রতিষ্ঠিত করা এই মহাযুদ্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর, তাহাদের দ্বারা ঘোষিত ঐ উদ্দেশ্য ও অগ্রান্ত উদ্দেশ্যের কথা জেতারী আর বলেনা; তাহারা যুদ্ধেব ফলে যত জাতি, ভূখণ্ড ও অগ্রান্ত সম্পত্তিব মালিক হইয়াছে, তাহাই হস্তম করিতে ব্যস্ত। ইংরেজরা বিপদের সময় ভাবতীয়দিগকে কৌশলপূর্ণ স্বার্থ জ্যেষ্ঠপূর্ণ ভাষণও যে একটু আশা দিয়াছিল, সম্প্রদেব সময় তাহা চাপা দিতে বিলম্বমাত্রিও বিলম্ব হয় নাই, হইবে না। ভারতবর্ষে যদি বেশী চীৎকার হয়, তাহা হইলে অনির্দিষ্টসংখ্যক লোক বিনা-বিচারে বন্দীকৃত নিশ্চয়ই হইবে।

একটা কথা উঠিয়াছিল, যে, কমিশনেব সভ্যদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, সুতরাং ভারতীয় কাহাকেও এবং ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন ইংরেজকে উহার সভ্য করা উচিত নয়। ব্যবস্থা হইবে ভারতীয়দের ও তাহাদের দেশের মধ্যে, কিন্তু সেবিষয়ে তাহারা কিছু বলিতে করিতে পাইবে না, ইহা চূড়ান্ত নিরপেক্ষতাব আদর্শ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বিলাতী ইংরেজরা নিরপেক্ষ, ইহা ততোধিক মিথ্যা ও হাস্যকর কথা। সম্পূর্ণ শ্রায়বান ইংরেজ কেহ নাই, এরূপ কথা বলিতে পাবি না; কেননা তাহা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সাধারণত: ও জাতিহিসাবে ইহা সত্য, যে, ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রনৈতিক ও শিল্পবাণিজ্যিক অধীনতায় ফেলিয়া রাখা ইংরেজদের সামসারিক স্বার্থের অতিকূল; সুতরাং ইংরেজরা ভাবতবর্ষকে আত্মশাসনের অধিকার না দিবার কারণ আবিষ্কার বা ওজর সৃষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেই। তাহারা নিরপেক্ষ নহে, হইতে পারে না। এমন যদি কোন সভ্য জাতি থাকে, যাহাবা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অধীনতাজাত শিল্পবাণিজ্যিক অক্ষমতার দরুন ভারতবর্ষে নিজেদের মাল বণ্টনানী করিয়া প্রভূত লাভবান হয় না, এবং যাহাদিগকে ইংরেজ জাতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে লোভ বা ভয়ের বশবর্তী করিতে পাবিবে না, তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানবান শ্রায়পরায়ণ লোক আমরা নির্বাচিত করিলে নিরপেক্ষ লোক পাওয়া যাইতে পারে।

আর একটা কথা উঠিয়াছে, যে, যে সব প্রদেশে এক জন করিয়া ডেপুটী গবর্নর নিযুক্ত হইবেন। তিনি আইন ও শাস্তিশৃঙ্খলা (law and order) রক্ষার কর্তা হইবেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট তিনি জবাবদিহি হইবেন না, তাহার কোন কাজের আলোচনা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় হইতে পারিবে না, প্রাদেশিক গবর্নরের অধীন না হইয়া তিনি সাক্ষাৎভাবে ভারতগবন্মেণ্টের অধীন হইবেন। ইহার মোজা মনে এই, যে, প্রাদেশিক লোকেরা যত ইচ্ছা বলুন লিখুন, তাহাদের প্রতিনিধিরা কোমিলনামক বিতর্কসভায় যত ইচ্ছা বাগযুদ্ধ করুন, কিন্তু সবলকে শাসাইয়া আটকাইয়া ঠেঙাইয়া দুরন্ত করিবার একজন লোক থাকিবে যে, একেবারে

নিরঙ্কুশ। আমাদের বিবেচনায় এরূপ ব্যবস্থা প্রকৃত বা ইংরেজদের মনঃক্লান্ত কৃষিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। আমাদের পক্ষেও মঙ্গলজনক এই হিসাবে হইবে, যে, আমাদের পক্ষে চিরপর্যায়ীন রাধিব্যার নিমিত্ত ইংরেজরা যত রকম বুদ্ধি আঁটিতে পারে, তাহা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত ও কার্যে পরিণত হওয়া মন্দ নয়।

ষ্ট্যাটুটরী কমিশনটা শীঘ্র নিযুক্ত হইয়া শীঘ্র তাহার সাক্ষ্যগ্রহণাদি অভিনয় সমাপনান্তর রিপোর্ট প্রকাশ ও তদনুযায়ী বা তদ্বিরোধী কাঙ্গ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া গেলে ভাল হয়। তখন হিন্দুদলমানের ঝগড়া গালাগালি দাঙ্গা, বানার্ভ * ও ক্যাথেরিন্ মেয়ো প্রমুখ নিরপেক্ষ মহুযাদের দ্বারা ভারতবর্ষের মুখে মনোলেপন, এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অত্র সম্প্রদায়ের নারীহরণ ও নারীধর্ষণ, ইত্যাদি শোচনীয় ব্যাপার ক্রমে ক্রমে কমিতে পারে। তাহার পূর্বে কমিবে ত না-ই, বাড়িয়াই চলিতেছে।

ক্যাথেরিন্ মেয়োঁর “ভারত মাতা”

ক্যাথেরিন্ মেয়োঁ নামক এক মার্কিন জ্যলোক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে “ভৌতিকজনক দ্বীপপুঞ্জ” (“The Isles of Fear”) নাম দিয়া একখানা বহি লিখিয়াছিল। তাহাতে ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে এরূপ সব কথা লেখা আছে, যাহাতে মনে হইতে পারে, যে, তাহারা, এখন কেন, কোন কালেই জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত হইবে না। এখন আবার ঐ লেখিকা “ভারত-মাতা” (“Mother India”) নাম দিয়া আর একখানা বহি লিখিয়াছে। তাহাতেও ভারতীয়দের—বিশেষতঃ হিন্দুদের—যে চিত্র আঁকা হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকদের এই ধারণা অন্নিবে, যে, তাহারা আত্মশাসন ও আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ অযোগ্য, অতিশয় নোংরা, ও অসভ্য লোকদের চেয়েও অধম মাছুষ। স্বাধীনতাপ্রয়াসী জাতিদের কুৎসা করা লেখিকার পেশা মনে হইতেছে, যদিও তাহার আত্মপরিচয় এই, যে, তাহার আর্থিক অবস্থা স্বাধীন ও সচ্ছল এই আত্মপরিচয়টাই সন্দেহজনক।

আমরা এই বহি দেখি নাই। যে যে দেশী কাগজে

ইহার উল্লেখ দেখিলাম, তাহার সম্পাদকেরা ইহা সমালোচনার ক্ষমতা পান নাই। অথচ ইহার সমালোচনা ও খুব প্রশংসা বিলাতের ও ভারতের ইংরেজদের কোন কোন কাগজে দেখিলাম। লেখিকা ও তাহার প্রকাশক ধূর্ত লোক। যাহারা বহিধানার ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহাদের কাছে ইহা প্রেরিত হয় নাই। কিন্তু যাহাদের মধ্যে ইহার প্রচাৰ দ্বারা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা জন্মান দরকার, তাহাদের মধ্যে প্রচারের স্ববন্দোবস্ত হইয়াছে।

ইহার সমালোচনা হইতে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে এধারণা হয় না, যে, ইহার সব কথাই মিথ্যা। সত্য কথা আছে। কিন্তু যাহা কখন কখন ঘটে, কোথাও কোথাও ঘটে, তাহাকেই ভারতবর্ষের সব জায়গায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাল্যবিবাহের কুফলস্বরূপ বালিকাদের উপর অত্যাচারের ভীষণ ফোটোগ্রাফিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বাল্যবিবাহের সব কুফল আমরা অবগত আছি, তাহার বিরুদ্ধে বহুবছ সংস্কারক লিখিয়াছেন, বলিয়াছেন, আইন করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু ইংরেজ গবর্নেন্ট এইরূপ চেষ্টার সহায় না হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, হরবিলাস সর্দার বাল্যবিবাহ-নিষেধক আইনের প্রতিকূলাচরণ করিবেন, বলিয়া ভারতগবর্নেন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি শাসাইয়া রাধিয়াছেন, সম্মতি আইনে মেয়েদের বয়স বাড়াইবার চেষ্টায় গবর্নেন্ট বাধা দিয়াছেন, এ সব কথা ত ক্যাথেরিন্ মেয়োঁর বহিতে নাই। তাহাতে আছে, ইংরেজ-শাসনের স্বত্তি ও ধোঁসামোদ এবং ভারতীয়দের কুৎসা। বাল্যবিবাহের ভীষণতম, সর্বাপেক্ষা লজ্জাকর ও শোচনীয় কুফল কখন কখন ফলিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও, সর্বত্র বা অধিকাংশস্থলে এরূপ কুফল ফলিয়াছে, ইহা সত্য নহে।

শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে প্রসূতির অশিক্ষিতা ধাত্রীদের হাতে কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহার ফোটোগ্রাফিক বর্ণনা “ভারতমাতা” বহিতে আছে, উহার সমালোচনায় দেখিলাম। কিন্তু, কারণে অকারণে ইংরেজ গবর্নেন্ট যুদ্ধে কোটি-কোটি টাকা ঢালে, যেত সামগ্রিক

অসামরিক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য কোটি-কোটি টাকা খরচ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে চিকিৎসা ও ঔষধীবিদ্যা শিখাইবাব্ জন্য যথেষ্ট শিক্ষালয় স্থাপন করে না, বেসরকারী লোকেরা স্থাপন করিলে বা কবিতো তাহিলে তাহাতে নানা আপত্তি, বাধা-বিঘ্ন জন্মায়, একথা ক্যাথেরিন মেয়ো লেখে নাই। ইহাও লেখে নাই, যে, গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য নানা দেশে প্রসুতিদেব ছুরবস্থা ছিল। তাহার পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের, স্বাস্থ্যরক্ষা-বিজ্ঞানের, ও ঔষধীবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় প্রসুতিদের দুঃখকষ্ট কমিয়াছে। ইংরেজরা এদেশটা দখল করা, ঠাণ্ডা করা ও রাখা এবং ইহা হইতে অর্থ আহরণ করাতেই নিম্ন থাকায়, আধুনিক সমুদয় বিজ্ঞানের সুবিধা ভারতীয়দিগকে পিত্তিরক্ষা হিসাবে ধীরেস্থিরে সামান্য কিছু দিয়াছে, যথেষ্ট পরিমাণে দেয় নাই। এদেশে এখনও প্রসুতিদের দুঃখদুর্দশা বেশী পরিমাণে থাকিবাব যে ইহা একটা কারণ, তাহা লেখিকার বহিতে নাই। আমরা নিজে দেশের কর্ত্তা হইলে অন্ততঃ তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থানের সমান কিছু চেষ্টা করিয়া প্রসুতিদের দুর্দশা কিছু লাঘব করিতে পারিতাম।

যাহা হউক, আমরা যখন পরাধীন তখন সব দোষটা আমাদেরই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বাধীন হইলেও একেবারে নিষ্কল হইতাম না,—কোন দেশের লোকই নিষ্কল নহে। তফাৎ এই, যে, স্বাধীন দেশের লোকদের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে দুর্দশায় একলিয়া রাখিবার সহায়তা করিবার কোন প্রলোভন নাই, পরাধীনকে পরাধীন রাখিবার চেষ্টায় সহায় হইলে টাকা এবং খ্যাতি—অন্ততঃ পক্ষে খ্যাতি—পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে জলপ্লাবন

গুজরাতে, বড়োদায়, কাঠিয়াবাড়ী, ওড়িশায়, বঙ্গে, সিন্ধুদেশে,—ভারতের নানা অঞ্চলে জলপ্লাবন হইয়াছে। অনেকের ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছে, গোধান নষ্ট হইয়াছে; অনেক মানুষের প্রাণও গিয়াছে। বিপন্ন যে সকল লোক বাঁচিয়া আছে, তাহাদের দুঃখ দুব করি-

বার জন্য টাকা উঠিতেছে এবং কর্ম্মীরা কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া নানা ভাবে সাহায্য কনিবার চেষ্টা কবিতোছেন। সকল প্রদেশ হইতেই সকল প্রদেশের লোকদের জন্য সাহায্য প্রেরিত হওয়া দরকার। নগদ টাকা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বেশী আছে। একজন তথাকার লোকেরা খুব বেশী সাহায্য করিতেছেন। অন্ততঃ মাড়োয়ারীদের হাতে টাকা বেশী আছে। তাঁহারাও সাহায্য করিতেছেন। অন্ত সকলেরও যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

জলপ্লাবন আমেরিকার মত ধনী, স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানবিশিষ্ট দেশেও এখনও হইতেছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা এঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞান সাহায্যে নানা উপায়ে ভবিষ্যতে জলপ্লাবন নিবারণেব চেষ্টা করিতেছে। কোথাও কোথাও এই প্রয়াস সফল হইয়াছে। আমাদের দেশের গবর্নমেন্টেরও এইরূপ চেষ্টা করা উচিত। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ উত্তর বঙ্গে ১৮৭০ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত বারিপাত ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে মানচিত্রাদি সহ একটি বিস্তারিত রিপোর্ট বচনা করিয়াছেন। তাল গবর্নমেন্ট কর্ত্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তদনুসারে প্লাবন নিবারণের চেষ্টাও গবর্নমেন্টের করা কর্ত্তব্য হইবে। নতুন অধ্যাপক মহলানবীশের প্রদত্ত পরিশ্রম এবং তাঁহার রিপোর্ট ছাপাইবার জন্য গবর্নমেন্টের অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে। ভারতবর্ষেব সব অঞ্চলেব প্লাবন সম্বন্ধে এইরূপ রিপোর্ট লিখিত ও তদনুযায়ী কার্য আরম্ভ হওয়া উচিত।

বড়োদার মহারাজা গায়কবাড় নিজের রাজ্যের জন্য বিদেশলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রস্তুত অনেক কাজ করিয়াছেন। তিনি বড়োদা হইতে যোগ্য দেশী দুএকজন এঞ্জিনীয়ার আমেরিকায় পাঠাইয়া যদি তথাকার প্লাবন-নিবারক এঞ্জিনীয়ারিং নানা উপায় সম্বন্ধে তাঁহা দিগকে জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের ও ভারতবর্ষের অন্ত নানা স্থানের উপকার হইতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার

পঞ্জাবে রঞ্জীলা রস্থল নামক একখানা উর্দু বহি এক জন হিন্দু লিখিয়াছিল। তাহাতে মুসলমানদিগের ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের প্রতি বিজ্ঞপাদি ছিল। তাহার লেখক হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লাড়িয়া খালাস পায়। তাহার জন্ত মুসলমানেরা জজকে বরখাস্ত করিবার জন্ত বা তাঁহাকে ইন্তফা দেওয়াইবার জন্ত আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে। “রসিলা বর্তমান” নামক খবরের কাগজে ঐ পঞ্জাবেই “নরক-যাত্রা” নামক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে নরকে মহম্মদ ও তাঁহার পত্নীদের যজ্ঞা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। লেখকের শাস্তি হইয়াছে। এই ছুটা জিনিসের কোনটাই আমরা দেখি নাই। জজদের রায় এবং মুসলমানদের আন্দোলনের বৃত্তান্ত হইতে যতটুকু জানিয়াছি, তাহা হইতে ঐ ছুটাতে লিখিত বিষয়ের কিছু ধারণা জন্মিয়াছে।

লেখক দু-জনকে সমগ্র ভারতবর্ষের বা ভারতের কোন অংশের হিন্দুরা এরকম জিনিস লিখিতে বলে নাই। তাহারা হিন্দু-সমাজের বা তাহার কোন অংশের প্রতিনিধি নহে, তৎকর্তৃক অশুদ্ধ হইয়াও লেখে নাই। জজদের রায়ে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন প্রমাণ নাই, যে, তাহাদের কাজের জন্ত সমগ্র হিন্দু-সমাজ বা তাহার কোন অংশ দায়ী। হাইকোর্টের যে জজ দলীপ সিংহ “রঞ্জীলা রস্থলে”র লেখককে আপীলে খালাস দিয়াছেন, তিনি খুষ্টিয়ান। অথচ পঞ্জাবে ও অন্তর্য একরূপ আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, যেন হিন্দু সমাজ লেখা ছুটার জন্ত এবং ঐ লেখকের খালাস পাওয়ার জন্ত দায়ী। উত্তেজনা-প্রবণ মুসলমানদের মধ্যে এই আন্দোলনের ফসল উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের পক্ষে ভীষণ হইয়াছে। তথাকার হিন্দুরা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নিগৃহীত হইয়া ধন-প্রাণমানধর্ম সবই ঘাইবার ভয়ে ঘর-বাড়ী সম্পত্তি সব ছাড়িয়া দলে দলে পঞ্জাবে পলাইয়া আসিতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যে কিরূপ অসভ্য, উত্তেজনাপ্রবণ এবং কার্য্যকারণ, সশস্ত্রে বিচ্যববিশীন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। পঞ্জাবের মুসলমানদিগের

কোন কোন প্রকৃত পরিচালক এই সকল বর্বর লোক-দিগকে ক্ষেপাইয়া অতি দুর্কর্ম করিয়াছে। এই আন্দোলনের প্রকৃত কাবণ যে ধর্মসংঘর্ষ নহে, অর্থ-লোভপ্রসূত, তাহাও বুঝা যাইতেছে। তাহার অনেক প্রমাণের মধ্যে দুটির উল্লেখ করিতেছি। আন্দোলকদের এক দাবী এই, যে, জজ দলীপ সিংহকে ইন্তফা দিতে বাধ্য করা হউক, এবং একজন মুসলমানকে জজ নিযুক্ত করা হউক। দ্বিতীয় প্রমাণ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে। পরের ধন লুণ্ঠন করা কি ইসলামের উপদেশ? মুসলমানদের নেতাদিগের মধ্যে যাহারা মুশিক্ষিত ও স্তায়পরায়ণ, তাহারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন প্রশমিত করিলে স্ববুদ্ধির কাজ হইবে, প্রতিবেশীর উপযুক্ত কাজ হইবে। উত্তরপশ্চিমসীমান্তে মুসলমানেরা সংখ্যায় খুব বেশী, এবং গবর্নেন্টও হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে তৎপর নহে। সুতরাং হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা সহজ। কিন্তু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এরূপ অত্যাচার দ্বারা লাভ কি হইবে। সমগ্র মুসলমান সমাজকে এই অত্যাচারের জন্ত আমরা দায়ী মনে করি না বলিয়াই ধীর চিন্তার প্রয়োজনবোধ কথা লিখিতোছ। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ হইতে যদি সমুদয় হিন্দু বিতাড়িত হয়, তাহা হইলেও তথাকার মুসলমানেরা লাভবান হইবে না। অন্য জায়গার মুসলমানেরাও লাভবান হইবে না। ভারত-বর্ষে হিন্দুর সংখ্যা এত বেশী, যে, তাহাদিগকে নির্মূল করিয়া যাইবে না। যদি উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হিন্দুদের বর্তমান সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও এই লুণ্ঠিত ধন কয়দিন টিকিবে? ধনী হইতে হইলে তথাকার মুসলমানদিগকে উপার্জক ও সঞ্চয়ী হইতে হইবে; তাহারা হিন্দুদিগকে না তাড়াইয়াও তাহা হইতে পারে। কারণ, হিন্দুরা তথাকার শতকরা সাতজন মাত্র এবং ইংরেজদের মত দেশের প্রভুও নহে।

উত্তরপশ্চিমসীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার হওয়ায়, প্রতিহিংসাবশতঃ হিন্দুবহুল প্রদেশসকলে মুসলমানদের উপর এরূপ অত্যাচার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অন্তর্য সখ্যীদের উপর অত্যাচারের ভাবনা

বিব্রত হইয়া পাঠানরা অত্যাচারবিমুখ হইবে না। অগ্রজ মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের অতটা দরদ হইত না। তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে কতকটা গবনেণ্ট পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে পারেন তাহাদের পরিচালকেরা, এবং ভারতীয় মুসলমানদের নেতারা।

যে কারণেই হউক, হিন্দুবহুল প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের উপর* অত্যাচার হইবে না। হওয়া উচিত নহে। হইলে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, উত্তরপশ্চিমসীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার হওয়ায় ভাবতবর্ষের সর্বত্র হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অসন্তোষ খুব বাড়িতেছে। এরূপ অসন্তোষ-বৃদ্ধি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর নহে, পরস্তু অমঙ্গলজনক।

“জমীন্দার” নামক একখানা কাগজে মহাত্মা গান্ধীর নামে এক খোলা চিঠি বাহির হইয়াছে। উহা মাহুদ, আফ্রিদি, ওয়াক্রি প্রভৃতি পাঠান উপজাতির নেতাদের দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লেখার ধরণধারণ ও বাধুনি দেখিয়া কিন্তু উহা কোন ইংরেজী শিক্ষিত চতুর মুসলমানের লেখাই মনে হয়। উহাতে হিন্দুমহাদ্ভার সংগঠন ও শুদ্ধি-প্রচেষ্টা এবং আর্থ্যসমাজী-দের প্রচারাঙ্গীকার্য বন্ধ করিবার জন্ত গান্ধীজী কিছু করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া হইয়াছে। যেন তিনি বলিলেই ঐ সব প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যাইত এবং যেন আর সব ধর্মসম্প্রদায়েরই স্বার্থপ্রচার, স্বলবৃদ্ধি, স্বদলেব সংখ্যাভাগ নিবারণ, স্বলকে শক্তিমান করিবার অধিকার আছে, কেবল হিন্দুদেরই নাই! যাহা হউক, সে-বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্ত এই চিঠিটিব উল্লেখ করিতেছি না। উল্লেখের কারণ এই, যে, উহা হইতে অনুমান হয়, শুদ্ধি সংগঠন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারাও পাঠান উপজাতি (tribes) সকলকে ক্ষাপান হইয়া থাকিবে। কিন্তু যাহারা মনে করে, কোন জায়গায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া শুদ্ধি সংগঠন প্রভৃতি বন্ধ করা যাইবে, তাহাবা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাহাতে বরং হিন্দুরা শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করিবে। অত্যাচারীরা ও অত্যাচারের প্ররোচকেরা

ইতিহাস পড়ে না; নতুবা, মাহুদের মাথা কাটিয়া, মাহুদকে তেলে ভাজিয়া, মাহুদকে জীয়েন্তে পুড়াইয়াও ধর্মপ্রচেষ্টা বিনষ্ট করা যায় না, তাহার প্রমাণ তাহারা দেখিতে পাইত।

“জমীন্দারে” প্রকাশিত চিঠির একটু নিম্ন নীচে দিতেছি।

“The Jamrud incidents were just a few drops out of the ocean of our activities. Still, if your community is incapable of divining its own future, think what will happen to the seven percent of the Hindu population here that is absolutely at our mercy. If in the Punjab, Bengal and other parts of India, a common demonstration of Islamic brotherhood took place, what arrangements have you Mahatma Gandhi, or your community made to withstand it?”

লেখক বা লেখকেরা বোধ হয় মনে করে, সংখ্যায় নূন হিন্দুদিগকে অত্যাচারের ভয় দেখান ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার স্থাপিত প্রমাণ।

বঙ্গে নারীনির্যাতন

যে অমাহুদ আত্মীয়দের দ্বারা, বাহিরে পশুপ্রকৃতি অগ্র লোকদের দ্বারা অনেক বঙ্গনারীর নির্যাতন চলিতেছে। ইহা জঘন্য কাপুরুষতা; এবং পশুত্বেরও অধম, কারণ পশুরা এরূপ অত্যাচার করে না। এইসকল অত্যাচারের স্বযোগ যে-সকল সামাজিক প্রথা বা অগ্র রীতিনীতি হইতেই হউক না কেন, তাহার উল্লেখ দ্বারা নরাদমদের দুর্কার্যের আংশিক দোষক্ষালনও নিম্ননীয়। ভদ্রলোকের মত ঐ সব কুপ্রথা ও কুরীতির উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিবার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে।

প্রতি সপ্তাহের “সঞ্জীবনী”তে আমরা এইসকল অত্যাচারের তালিকা দেখিয়া থাকি। দেখিতেছি, আগেকার কয়েক বৎসরের চেয়ে ১৩৩০ সালে অত্যাচারের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। উহার তালিকা এখনও চলিতেছে। বৃদ্ধি কারণ কি?

প্রতি সপ্তাহেই তালিকায় দেখি, অত্যাচারিতাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান নারী দুই-ই আছেন। হিন্দু নারীর যে অধিক সংখ্যায় অত্যাচারিতা হন, ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়; মুসলমান নারীরা যে কমজন অত্যাচারিতা হন, তাহাও লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। মুসলমান অত্যাচারিতারা যে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু কোন সম্প্রদায়েরই একটি নারীও নিগৃহীতা না হইলে

দেশের লজ্জা দূর হইত। অত্যাচারীদের মধ্যে এতি সপ্তাহের তালিকাতেই হিন্দু অনেক দৃষ্ট হয়, যদিও অত্যাচারীর সংখ্যায় প্রতি সপ্তাহের তালিকাতেই মুসলমান তাহাদের চেয়ে বেশী। অধিকাংশ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করে মুসলমান, কোথাও কোথাও হিন্দুমুসলমান বদমায়ে-সেবা একজোট হইয়া অত্যাচার করে। হিন্দুপুরুষ দ্বারা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা বড় কম নয়। হিন্দুপুরুষ দ্বারা মুসলমাননারীর উপর অত্যাচার একেবারে হয় না, এমন নয়; তবে খুব কম স্থলে হয়। খৃষ্টান অত্যাচারীর নামও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কুমারী ইলিস্ নারী একটি ইংরেজ বালিকা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপহৃত হইয়া স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন পাঠানদিগের দেশে নীতা হয়। তাহার উদ্ধার সাধন করিবার জন্য সাম্রাজ্যময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া তবে ইংরেজ ক্ষান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই যে কত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে কত কুমারী, সধবা, বিধবা নারী অপহৃত হইয়াছে, কাহাকেও কাহাকেও খুঁজিয়াই পাওয়া যাইতেছে না, কাহারও কাহাবও প্রাণবধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের যথেষ্ট কাবণ জন্মিতেছে—এত বড় যে ভীষণ, লজ্জাকর ও শোচনীয় ব্যাপার, তাহাতে ভারতবর্ষের শাসনকর্তাদের কাহাবও টনক নড়িতেছে না। অপহৃত নারীদের উদ্ধারসাধনেব জন্য, ফেরার বদমায়েনদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়াইবার জন্য ম্যাজি-স্ট্রেটদের উপর, পুলিশের উপর কোন তথ্য তাগাদা পড়িতেছে না। বদমায়েনের অনায়াসে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অপহৃত নারীদিগকে লুকাইয়া লুকাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, এমন-কি কখন কখন মোকদ্দমা বিচার্য্যধীন থাকা কালেই উদ্ধৃত নারীকে পুনর্ব্বার অপহরণ করিতেছে। গবন্মেণ্টের কর্মচারীদের এই উদাসীন বা অক্ষমতার কারণ কি?

এখনও বোধ করি এক বৎসরও হয় নাই, পূর্ব আফ্রিকায় কোন ছুৰ্ত্ত নিগ্রো এক ইংরেজ মহিলার সন্ত্রাস হানি করে। অবিলম্বে সেখানে আইন হইয়া গেল, যে, ভবিষ্যতে কোন কৃষ্ণকায় কোন শ্বেতকায়ের ঐরূপ অপমান করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ভারতবর্ষে শত শত নারীর সতীত্বনাশ সর্কনাশ ও নানা লাঞ্ছনা, প্রাণবধ হইতেছে। কিন্তু আইনের কঠোরতা সাধন দূরে থাকুক, বর্তমান আইন অনুসারে তৎপরতার সহিত সমুচিত দণ্ডবিধানের চেষ্টাও হইতেছে না। গবন্মেণ্টের এপ্রকাব উদাসীন বা অক্ষমতার কারণ কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের শিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্ভোকেশ্যন্ উপলক্ষে ভাইসচ্যান্সেলর মিস্টার ল্যাংলী তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, মুসলমান ছাত্রদের বাসেব জন্য মুসলিম হল নির্মাণ শীঘ্র আবস্ত হইবে এবং তাহাতে ৭,৩০,২৮৫ টাকা ব্যয় হইবে। তাহাদের বাসগৃহ নির্মিত হইতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে, খুব জাঁকাল বৃকম বাড়ী হইবে। সাদাসিধা স্বাস্থ্যকর মজবুত বাড়ী তৈয়ার করিতে যত খরচ হয়, তাহা করিয়া বাকী টাকায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি স্থাপিত করিলে অর্থের সঞ্চয় হইত, এবং প্রাসাদ নির্মাণে সব টাকা খরচ করা অপেক্ষা তদ্বারা মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক পরিমাণে সাধিত হইত। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই যে গরীব, তাহা ল্যাংলী সাহেবের বক্তৃতাতেই আছে। তিনি বলেন, অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ ছাত্রাবাসের ৪০১ ছাত্রের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাহাদের মধ্যে ২৮১ জন হিন্দু, ১১৭ জন মুসলমান। অধ্যাপক সিংহ পরিবারের এক এক জনের বাঁচিয়া থাকিবার খরচ মাসিক নয় টাকা ধরেন। ইহা বেশী ধরা হয় নাই। বাঁচিয়া থাকিবার খরচ এত কম ধরিয়াও তিনি দেখেন, যে, মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন এরূপ সব পরিবাবেব ছেলে বাহাদের আয় বাঁচিয়া থাকিবার উক্ত আয় অপেক্ষাও কম, শতকরা ৬ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার মত, এবং শতকরা ৩১ জনের বাড়ীর আয় তার চেয়ে বেশী। তা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭২ জনের বাড়ীর আয় জমী-হইতে প্রাপ্ত। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার আয় অপেক্ষা কম, শতকরা ৭ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার মত, এবং শতকরা ৬০ জনের বাড়ীর আয় তার চেয়ে বেশী। অতএব দেখা যাইতেছে, মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ বড় গরীব। তাহাদের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ না করিয়া খুব স্বাস্থ্যকর সাদাসিধা মজবুত বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাকী টাকায় আয় হইতে তাহাদিগকে বৃত্তি দিলে ভাল হয়। এখনও নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় নাই। কর্তৃপক্ষ বলাভ ধনী মুসলমানদিগকে গরীব ছাত্রদের জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সরকার বাহাদুর স্বয়ং সেবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইলে অস্বীকারের ফল বেশী ফলিবে মনে হয়। মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র লোক খুব বেশী, কিন্তু টাকা যে কাহাবও নাই, তাহা নহে। বিদেশী

মুসলমানদের সাহায্যের জন্য যখন লক্ষ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইতে পারে, বিলাফৎ ফণ্ডের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে, তখন মুসলমান সমাজে নিশ্চয়ই টাকা আছে। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে, যে, যাহারা ধনী বা সঙ্গতিপন্ন তাহারা বিদ্যালয়রাগী নহেন। তাঁহাদের বিদ্যালয়রাগ জন্মিলে মঙ্গল হইবে।

অর্থাভাববশতঃ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থাভাব প্রকৃত বা একমাত্র কারণ না হইতেও পারে।

মুসলিম হস্ত নির্মাণে এত বেশী টাকা খরচ করিবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বাড়ীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সব বাড়ীর মত করা হইবে। সেগুলি টাকায় পূর্ববঙ্গের রাজবানী স্থাপন উপলক্ষে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন শিক্ষিত মুসলমান সমাজ হয় ত জাঁকাল বাড়ী অপেক্ষা সাদাশিখা বাড়ী ও অধিকতর শিক্ষাবিস্তার পছন্দ করিবেন। তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়?

চামার-ছাত্তের উপর ন্যায় ব্যবহার

লাহোরের আর্থসমাজীদের কলেজে একটি চামার ছাত্র ভর্তি হয় ও তাহাকে কলেজের ছাত্রাবাসে স্থান দেওয়া হয়। তাহাতে অস্বস্তিকারী ছাত্রেরা আপত্তি করে নাই। কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণেরা তাহাতে আপত্তি করে, এবং তাহার জন্য রাগিতে ও পবিত্রবোধ করিতে হইবে বলিয়া তাহারা ইন্তফা দেয়। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে অনেক বুঝান, কিন্তু তাহাদের মত পরিবর্তিত না হওয়ায় তাহাদের ইন্তফা গৃহীত হয়।

শান্তিনিকেতনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রে ছাত্রটি ছিল মুসলমান, এবং আপত্তি করিয়াছিল হাড়িজাতীয় ভৃত্যেরা। কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া ছিলেন।

বঙ্গের নদীতে ষ্টীমার যাত্রীর দুর্দশা

আমার বাড়ী পশ্চিম বঙ্গে, জীবনের অধিকাংশ সময় বাঁকুড়া, কলিকাতা ও এলাহাবাদে কাটিয়াছে। আমি গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, উট গাড়ী ও রেল গাড়ীতে ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলাম। সম্প্রতি দুই একবার অল্প সময়ের জন্য পূর্ববঙ্গের নদীতে ষ্টীমারে যাতায়াত করিয়াছি। ষ্টীমারগুলির প্রথম শ্রেণীর কক্ষগুলি চলনসই, কিন্তু প্রথম শ্রেণী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাখা নাই। তাহার আনাগার ও শৌচাগার অপকৃষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কামবা আছে দেখিলাম একটি পুরুষদের ও একটি মেয়েদের

জন্ম। সিন্ধুকবৎ, বায়ুচলাচল নাই, এবং প্রায় এজিনের উপর স্থাপিত বলিয়া খুব গরম। পাখা নাই। আনাগার শৌচাগার কোথায় আছে দেখি নাই। অনিয়মিত নৌচের তলায় আছে। এরূপ বন্দোবস্ত অত্যন্ত অববিধাজনক, বিশেষতঃ নারীদের জন্য। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বসিবার কোন বন্দোবস্তই নাই, এবং ছাফ এরূপ যে ঝড়বৃষ্টিতে মাথা বাঁচান দায়। আমবা রেলগাড়ীর কর্তাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য দোষ দি; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাহারা ষ্টীমারের কর্তৃপক্ষদের চেয়ে ভাল। ষ্টীমারের তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য শৌচাগার যাহা আছে শুনিয়াছি, তাহাব আলাদা আলাদা দরজা কপাট নাই। ইহা ব্যবহার করা পুরুষদের পক্ষেও লজ্জাকর, নারীদের পক্ষে অসম্ভব। বাঙালী এরূপ সহিষ্ণু অথবা জড়প্রায় জাতি, যে, এইরূপ বন্দোবস্ত ও ব্যবহার বহু বহু বৎসর ধরিয়া মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। পরাধীনতা মন্ত্রণের এমনি ক্ষতিই হবে!

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের মুক্তি

বিনা বিচারে রাজবন্দী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিনাসর্গে খালাস পাইয়াছেন। তিনি যে আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলেন, জনসেবার স্বযোগ পাইলেন, ইহা আনন্দের বিষয়। তাহার নিকট হইতে, রাজবন্দীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, সে-বিষয়ে সর্বসাধারণ অনেক খাতি খবর পাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখা যাইত, যে, রাজবন্দীরা কোন কোন সর্গে দস্তখত করিলে গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে খালাস দিতে রাজী আছেন। তাহাব নিকট হইতে জানা গিয়াছে, যে, সর্গগুলি এরূপ, যে, তাহাতে দস্তখত করিলে পরোক্ষভাবে নিজেকে অপরাধী বা অপবোধপ্রবণ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; এবং ইহা মোটেই সত্য নহে, যে, দস্তখত করিলেই মুক্তি পাওয়া যায়। দস্তখত কবান হইয়া গেলে গবন্মেণ্ট মুক্তি দিতে পারেন না দিতেও পারেন।

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, গবন্মেণ্টের সর্গগুলি একজন রাজবন্দীর নিকট উপস্থিত কবায় তিনি নিজের সরকার বাহাদুরকে নিম্নলিখিত সর্গগুলি পালন করিতে অনুরোধ করেন :—

১। গবন্মেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করিয়া অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করুন ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন;

২। এতদিন তাহাব স্বাধীনতা হরণ করার জন্য ক্ষতিপূরণ করুন;

৩। ভবিষ্যতে বিনাকারণে বিনাবিচারে তাঁহাব নিগ্রহ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করুন।

সবকাব বাহাদুর এই জ্ঞায্য অহুরোধের কি উত্তর দিয়াছেন, কাগজে তাহা লিখিত হয় নাই।

রাজবন্দীদের মধ্যে যাহারা বিখ্যাত লোক, তাঁহাদের মুক্তি আগে আগে হইতেছে, ইহা অসন্তোষের বিষয় নহে; কিন্তু তাঁহাদেরই সমান নির্দোষ ও তাঁহাদের চেয়ে অধিকতর ভগ্নবাহ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত রাজবন্দীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি না দেওয়ার কোন জ্ঞায্য কারণ দেখা যাইতেছে না।

অবলা-আশ্রম

খবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতায় অবলা-আশ্রম নামে একটি আশ্রম আছে, তাহা দ্বারা অনেক বিপন্ন, সঙ্গীহারা, প্রতারিতা ও নানাভাবে নিগৃহীতা নারীর উপকার হইয়াছে, এবং আশ্রম স্থানাভাবে অনেককে জায়গা দিতে পাবেন নাই। ইহাব সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৃত্তান্ত জানি না বলিয়া লিখিতে পারিলাম না। যাহারা জানেন, তাঁহারা সর্বপ্রকারে ইহার সাহায্য করিলে প্রীত হইব। ইহাব ঠিকানা ও কর্মীদের নাম সর্বসাধারণকে জানান উচিত। আমরা কখনও ইহার রিপোর্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। ইহা সত্য কথা, যে, আমাদের দেশের লোকেবা—বিশেষতঃ বাঙালীরা—জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সাহায্য করেন না। কিন্তু সাহায্য-সাহায্য বৃদ্ধের সকল প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট কর্মসিঁতা ও উদ্যোগ আছে, তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের অসুস্থতা অবশ্য অবলাআশ্রম ও তদ্বিধ অল্প অনেক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের কারণ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু সমস্ত দোষই যে বঙ্গীয় জ্ঞানসাধারণের, এমন বোধ হয় না।

উদ্যোগিতা কাহাকে বলে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাঞ্জাবের আলমদার কস্তামহাবিছালয়ের কর্মীরা একাধিকবার ভারতবর্ষে সকল প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে চণ্ডা আদায় করিয়া বেড়াইয়াছেন। অল্প নানা উপায়েও দান সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি ২২শে শ্রাবণ রাণীবন্দন (রক্ষাবন্দন) শুভ অকুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁহারা তাঁহাদের সকল পরিচিত লোকেব নিকট একটি রাখী, হিন্দী ও ইংবেলীতে একটি চিঠি এবং একটি করিয়া মনি-অর্ডারের ফারম পাঠাইয়া দিয়াছেন। হিন্দী চিঠিটির ফোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হমারে বন্ধু—

কস্তাও কী রক্ষা কবনা দেশ ঔর জাতি কা পরম ধর্ম হায়।
দেশদখাল কস্তাওকে হরক্ষিত হোনে সে হী হির ঔর উন্নতিশীল রহ-
সকতী হায়, অস্তথা নহী।

ইস সময় কস্তাশিকা নে সহায়তা দেনা হমারী পরম সহায়তা হায়।
ইসী দে দেশ ঔর জাতি কী নেবা কে লিনে হম তরবার হো সকেলী।
হমারী কস্তামহাবিছালয় হমারী পালন কর রাহা হায়। আপ ইস
কী সহায়তা কী জিরে, ঔর ইস দে হমারে সচে রক্ষক বনিয়ে।
আপ কী কস্তারে কস্তামহাবিছালয় জালদার কী ছাজিয়ে।

অনুমত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়ক সভা

এই সভা ১৯০২ সাল হইতে অল্পমত শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ইহার ৪০৫টি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ১২,৫৯৮ জন ছাত্র ও ৩,৬৭৬ জন ছাত্রী শিক্ষা পায়। বঙ্গের ও আসামের ২০টি জেলায় এই বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত। ইহার বার্ষিক ব্যয় ১৬০০০ টাকা। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সভাকে ৪,৫০০ টাকা খরচ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার হাতে এখন মোট ৩০০০ টাকা আছে। বাকী ১৫০০ টাকা শীঘ্র চাই। সভার কর্মাদিগকে আমবা বিশেষভাবে জানি। একটি পয়সাও তাঁহারা অপব্যয় করেন না। সভার রিপোর্ট ১৪নং বাজুড়বাগান রো, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়। যিনি যত বেশী টাকা পারেন তাঁহার নামে অবিলম্বে পাঠাইলে সভা ও সভাব মারফৎ দগিছ ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হইবেন। খুব কম সাহায্যও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

দুটি রেখাচিত্রের পরিচয়

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'ধবদ্বীপের পথে' প্রবন্ধে যে দুইখানি রেখা-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়ে কোনো কথা এই স্থলপথের বর্ণনায় নাই। আশ্বিনে সুনীতিবাবু যে জাহাজের বর্ণনা বাহির হইবে, তাহাতে ইহাদের বিষয় লিখিত আছে।

চিত্র-পরিচয়

আনারকলি

লাহোরে আনারকলি বেগমের সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে যে, আকবর বাদশাহ তাঁহাকে ভাল বাসিতেন; কিন্তু ভিনি স্বয়ং যুবরাজ সলিমের প্রতি অহুরাগিনী ছিলেন। আনারকলির প্রাপদও হইয়াছিল।

কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী

কালিম্পং-এর পথে পথে এই অল্প ভিখারীটিকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া যন্ত্রযোগে সে গান গায়, পথিকেবা যে যাহা দিয়া যায় তাহাই তাহার উপজীবিকা। চিত্রকর এই আশ্রুভোলা অল্প ভিখারীটির চিত্র তুলির সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।



প্রতীক্ষমান।

শিল্পী শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

অবাসী প্রেস, কলিকাতা]



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলীহনেন লভ্যঃ”

২৭শ ভাগ

১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩৪

৬ষ্ঠ সংখ্যা

মিলন

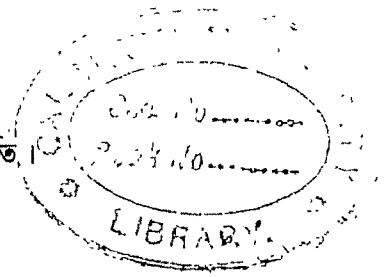
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল ব'য়ে,
তাহাতে মোর যা-হয় হোক ক্ষতি।
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হ'য়ে,
চরণে তব গোপনে তা'র গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি',
প্রদীপ ছিল মলিন-শিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালী,
দীপ্ত হ'য়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
বাহির হ'তে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি ॥

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি,
নীরব এই নীরস মরুতীরে।
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় অঁাকি'
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি' তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ্ শ্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হ'তে বহিয়া মোর নতি।
যে বীণা তব মন্দিরেতে বাজেনি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি ॥

আম্বোয়াজ্জ জাহাজ

১ আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল।



আলাপ-আলোচনা*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছপর-বেলা আমাদের থাওয়া শেষ হ'লে কবি বললেন,—
“শিল্পকলার উদ্দীপনা নিয়ে নন্দলালের সঙ্গে আমাব যে,
কথাটা হয়েছিল সেটা ভেবে দেখবার।

“বৈদিককালে বিশেষ মস্ত্র য়ে-সকল বিশেষ যজ্ঞবিধি
ছিল ইষ্টলাভের কল্পনা ছিল তার লক্ষ্য। ধর্মের আকারে
সে একরকম বৈষয়িকতা। বৈষয়িকতা মাছুষের সঙ্গে
মাছুষকে মেলাতে পারে না। কামনার বিষয়কে সকলের
সঙ্গে ভাগ ক'রে ভোগ করা চলে না। তাই সেইদিন পুণ্য-
ফলের সঙ্গে পণ্য-ফলের তফাৎ ছিল না, গো-কাঞ্চনের দরে
তার কেনা-বেচা চলত।

“বৌদ্ধধর্ম ধর্মের ক্ষেত্রে মাছুষকে মিলিয়েছিল, কেননা
ভোগ তার লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল মুক্তি। সেই মুক্তির
ডাকে মাছুষ জেগে উঠল।

“যখন ঘুমোই তখন আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। সেই
স্বাতন্ত্র্যের বেড়ার মধ্যে বেঁচে থাকি মাত্র, আপনাকে
জানিনে। সকলের মধ্যে নিজেকে জানাই হচ্ছে জানা।
তাই বৌদ্ধযুগে সর্বজনীন জাগরণের আলোতে মাছুষ
আপনাকে যখন প্রবল ক'বে জান্লে তখন আপনাকে প্রচুর
ক'রে জানাতে চাইলে। সেই জানাতে চাওয়ার একটা
অজস্র পবিচয় পাওয়া গেল তখনকার শিল্পকলায়।

“যুরোপে খৃষ্টধর্ম যখন সম্ভাব ছিল তখন সে ধর্মও কি
রকম অনিবার্য বেগে কলাসৃষ্টির উদ্রেক করেছে তার ব্যাখ্যা
করা বাহ্যল্য। আমাদের পৌরাণিক ধর্মে ভক্তির আস্থানে
সর্বসাধারণের মিলন, সেই মিলনে যে আশ্র-প্রকাশের উদ্যম
জেগেছিল তাও মূর্তিকলায়, চিত্রকলায়, গীতিকলায় উচ্ছ্বসিত
না হ'য়ে থাকতে পারেনি।”

দিলীপকুমার বললেন; “এই রকম হ'য়ে থাকে এটা তো
ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু কেন হয় সেটা তো জানা
চাই।”

* সমস্ত আলোচনাটি সম্পূর্ণ নিজের ভাষাতেই লিখতে হয়েছে।
ইপো। ১১ অগষ্ট ১৯২৭

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি বললেন, “বই পড়তে পড়তে পাঠক কোনো
একটি বিশেষ বাক্যে বিশেষ আগ্রহ বোধ করলে সেটার
নীচে লাইন টেনে দেয়। যদিও সে বাক্যের রচয়িতা সে
নয় তবু নিবিড় উপলব্ধির দ্বাবাই তার প্রতি সে নিজের
স্বস্ত অন্বেষণ করে। এমনি ভাবে বিশ্ব-সংসারে যে বিষয়টিতে
চিন্তের স্বস্ত বোধ করি তার গায়ে এমন চিহ্ন দিতে চাই যা
চিবকালের। সেই চিহ্নকে বলে আর্ট। সাধারণ বিশ্বলোকে
যে অসংখ্য জিনিষ আছে—আর আমার বিশেষ চৈতন্ত-
লোকে যা কিছু উদ্ভাসিত, ছইয়ের তফাৎ কেমন, যেমন
চাঁদের যে-পিঠ পৃথিবীর দিকে কেরানো, তার সঙ্গে বিমুখ
পিঠের যে-তফাৎ। এই আলো-করা পিঠটিকে নিবেই
পৃথিবীর গান, তার উৎসব। বিশ্বের যেখানে আমাদের
চিন্তের আলো বিশেষ ক'বে পড়ে, সেইখানেই বিধাতার
সৃষ্টিকে নানা রূপে রসে রঙে গানে বরণ ক'রে নিয়ে নিজের
সৃষ্টি ক'রে নিই। বর আসে বিয়ে করতে, নেহাৎ-সাধারণ
মাছুষ, কিন্তু সেদিন বাজনা বাজিয়ে আলো জালিয়ে বুঝিয়ে
দিই সকল মাছুষেরই অসামান্য মূল্য আছে, যথাস্থানে যাচাই
করলেই ধরা পড়ে। ক'নের বাড়ির নিকটে বরের দাম
রাজা মহারাজের চেয়ে বেশী,—মায়ের কোলের নিকটে
ছেলের দাম তেমনি। দামটা বাইরে নয় ভিতরে, আমাদের
চিন্তের স্বীকৃতিতে।

“নন্দলালের জিজ্ঞাস্তা ছিল এই যে, আধুনিক রূপকারের
কাছে, রসশৃষ্ঠার কাছে এখনকার যুগের ডাকটা কি?
বৌদ্ধযুগে, খৃষ্টযুগে যে-আস্থানে মাছুষের সৃষ্টিশক্তিকে
জাগিয়েচে তার ছাপ তখনকার কালের সকল কাজেই ;—
তখন কলাসৃষ্টির প্রেরণাতে যে ঐক্য তার রচনাতেও সেই
ঐক্য ছিল। আজ আমাদের কাজে ডাকের মধ্যেই বা
ঐক্য কি, আর কোথায় ঐক্য তার সাড়ায়?

“উত্তর দেবার আগে ভেবে দেখতে হবে এখনকার
কালে কোন কথাটা সব-চেয়ে বড়ো।

“পূর্বেই বলেছি বৈষয়িকতার মাছুষকে এক করে না।

শঙ্করাচার্য বলেচেন, অর্থমন্ডল ভাবয় নিত্যং। অর্থের মধ্যে মানবাত্মার বা বিশ্বজগতের অর্থ পাওয়া যায় না। আজকের দিনে বড়ো বড়ো মুনফার লোভে বড়োবড়ো ব্যবস্থাতন্ত্র পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে ব্রণের মতো ফুলে উঠেছে। কিন্তু এইসকল পুথুলকার ব্যবস্থা, এই সকল যন্ত্রবাহিনী ব্যবসা সর্বত্রই মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে আচ্ছন্ন ও তার সৃষ্টিশক্তিকে গীড়িত করেছে। অর্থ জিনিষটা বাইরের দিক থেকে সুরিধামাত্র, অন্তরেব দিক থেকে সার্থকতা নয়। ধনী দেবমন্দিরে যার মোটর গাড়ীতে, বাহু হুশোগের দিকে তার দাম, ভক্তিযোগের দিক থেকে কোনো দাম নেই। অতএব মোটরগাড়ীগত সম্পত্তি ভক্তি-অর্থ্যরচনার কোনো সৌন্দর্য্য দিতে পারে না।

“আসল কথাটা এই, বাইরের দিক থেকে মানুষের অধিকার ভেদ ঘুচে গেছে এইটেই এখনকার যুগের প্রধান সত্য। মানুষের মধ্যে শক্তির স্বাভাবিক পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য অনুসারে তার সিদ্ধির পরিমাণে পার্থক্য, কেউ উপরে ওঠে, কেউ নীচে নামে। কিন্তু সাধনার অধিকার সকলেরই কাছে সমান, সে-সাধনা অর্থেরই হোক, জ্ঞানেরই হোক, কষ্টেরই হোক। বুদ্ধবর্ষ মোক্ষের দিকে এই পথই খুলেছিল। আজ সেই পথ সকল প্রকার ব্যবহারের দিকে। একজন মানুষ বা পেয়েচে আরেকজন মানুষের তা আশা করবার কোনো বাবা নেই, সেই আশা করবার গোরবে মানুষের প্রধান মূল্য। সেইজন্তে আজ অবিচার ঘটলে মানুষ জোর করে বিচারের আবেদন করে। এইটে একালে ছিল ভিক্ষে, একালে হয়েছে দাবী। আইনে যদি পক্ষপাত থাকে তবে আজ জোর ক’রে বলতে পারি এটা অত্যাচার,—ব’লে সব সময়ে ফল হয় না, কিন্তু যত সামান্য লোকই হইনে কেন, আমার কাছেও আইনের জবাবদিহী আছে। আজকের দিনের সব-চেয়ে বড়ো জ্ঞানসম্পদ হচ্ছে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের সাধনার মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই।

• “বিজ্ঞানের সাধনা শুধু যে অব্যর্থ তা নয় বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা সর্বব্যাপী। বিজ্ঞান যে-তত্ত্ববুদ্ধির সৃষ্টি করে তার কাছে উঁচু নীচ নেই। নৃতত্ত্বের কাছে এমন মানুষ নেই যে অগ্রাহ্য। জ্ঞানের সাধনার মানুষের চিত্ত আজ সমস্ত

বিশ্বকে অধিকার করছে। জ্ঞানের এই কর্তৃত্বে প্রত্যেক মানুষেরই আজ দাবী আছে যদি তার শক্তি থাকে। শক্তির আন্তরিক পার্থক্য চিরদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, কিন্তু অধিকারের বাহু পার্থক্য আজ প্রায় নেই। যদি থাকে সেটা অপরাধ আকারে, অত্যাচার আকারে আছে, তার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষের কাছে নালিশ চলে।

“বিজ্ঞানের নিষ্ফল কৌতূহল অপক্ষপাতে বিশ্বের সকল পদার্থেরই অনুধাবন করছে, আমাদের দেশের পারমার্থিক সাধনারই মতো কুকুরে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ভেদ রাখতে না। বিজ্ঞানেব এই জ্ঞানার সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্বের ঐক্য উপলব্ধির মিল থাকতে পারে, কলা-বোধের মিল নেই। বিজ্ঞানের জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, আটের জ্ঞান ব্যক্তিগত। বিজ্ঞান বলে, আমি মনে জান্‌লুম; আর্ট বলে, আমার মনে লাগল। মনে লেগেচে এই কথাটা বলবার জন্তেই ছবি মূর্ত্তি গান কাব্য। আমার একটি গানের শেষ অংশে আছে :

দেখি গে তার মুখের হাসি,

ফুলের মালা পরিয়ে আসি,

ব’লে আসি বাঁশি আমার প্রাণে বেজেছে।

“আটিষ্ট্ এই কথাটাই বলে, আর ফুলের মালা পরায়, সর্ব মানুষের বরণডালা সাজাবার ভার তার পরে।

“কিন্তু ঐ মনে লাগবার শক্তিটার সন্ধান ও প্রসাব হ’তে পারে। মানুষের মনে লাগবার শক্তি আজ তার সীমানা চারদিকে বাড়িয়েচে তার পরিচয় পাওয়া যায়। একসময়ে দেবদেবী, দৈত্যদানব, রাজা ঋষি, বীরপুরুষ মানুষের মনে বেশী ক’রে লাগত, সামান্য মানুষের সাধারণ জীবনাত্রা চিত্তকে এড়িয়ে যেত। আজ সকল মানুষই আমাদের মনে লাগবার অধিকার নিজের জোরে দাবী করে। তারা গুলি ব’লে, জ্ঞানী ব’লে, ধনী ব’লে, মানী ব’লে বা সাধু ব’লে নয়, তারা মানুষ ব’লেই, মানুষের চিত্তগোচর হ’বার যোগ্য। চারদিকের অনেক কিছুই সহজেই যার চোখে পড়ে, মনে লাগে সেই এখনকার যুগের যোগ্য আটিষ্ট। চীনদেশে থাকতে সে-দেশের একজন বন্ধু আমার জুটেছিল, তিনি কবি। তার সঙ্গে বখন মোটরে বেড়াতে যেতুম তিনি হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়ে চৌচিৎ উঠতেন, দেখ দেখ, একটা গাধা—কিন্তু অমনি আর-একটা

কিছু। আর কিছু নয়, গাধার বিশেষ কোনো সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব আছে তা নয়, কিন্তু তার সত্তা তাঁর চিত্তকে স্পষ্টভাবে স্পর্শ করত ব'লেই তিনি অমন ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন। তিনি যদি আর্টিষ্ট হ'তেন তাঁর নিজের মনের ব্যগ্রতা দিয়েই গাধাটাকে আঁকতেন, গাধাটা ষোড়শী নারী ব'লে নম্র বা পরম্পরায়িক তপস্বী ব'লে নয়, কিন্তু সে তাঁর চোখে-পড়া, মনে-লাগা গাধা ব'লেই। নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ঐ গাধাটার ফোটোগ্রাফ নেব কিন্তু আর্টিষ্টের সাগ্রহদৃষ্টি ছবি আঁকে,—ফোটোগ্রাফে গাধাটাকেই দেখি, বৈজ্ঞানিকের চিত্ত দেখিনে—ছবিটিতে গাধাটাকে দেখি আর্টিষ্টের চিত্তের মধ্যে—অর্থাৎ শুধু তাব সংবাদ জানতে পাইনে, তার আদর বুঝতে পাই।

“বর্তমান যুগে আর্টিষ্টের এই আদরটি দূরে-নিকটে বড়োয়-ছোটোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে। যে আদর ধন-মান কুশলীল রূপ-গুণের দর বাচাই করে, এ তার চেয়ে অনেক বড়ো; এ সত্তার আদর। এই স্মিনিষটার দাম এত বেশী যে, এখনকার অনেক আর্টিষ্ট ইচ্ছা ক'বেই তাঁদের চিত্র ও মূর্তি থেকে শিবকে সন্মুখ করে বর্জন করেন, পাছে কেউ মনে করে তাঁরা লোভে না পড়লে সত্যকে দেখতে পান না, পাছে কেউ ভাবে

তাঁরা সত্তার বিশুদ্ধ সম্মান দেখাতে চান না, মানুষকে লোভ দেখাতে চান। এটাও হ'ল বাড়াবাড়ি। মনে আছে আমাব কোনো আত্মীয়ের সাংঘাতিক পীড়ায বাধ্য হ'য়ে একজন বিশেষজ্ঞ মিশনারী চিকিৎসককে ডাকতে গিয়েছিলাম—তিনি বললেন, তিনি ধনীর চিকিৎসা করেন না। অর্থাৎ পাছে কেউ বলে ধনীর মর্যাদা রাখবার লোভে বা ধনের লোভে তাঁর চিকিৎসা, এইজন্ত পরম বিপদেও ধনীর ঘরে তিনি যান না, ভুলে যান ধনীও মানুষ, দরিদ্রতম মানুষেরই মতো। ইস্কুলে-পড়া এক বালিকা আমার নাম্তা পরীক্ষার উপলক্ষে জিজ্ঞাসা কবেছিল তিন পাঁচে কত, আমি জবাব দিবেছিলাম পঁয়তাল্লিশ। এই উত্তরে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে তর্ক ক'রে বলে-ছিলাম, খুব সৰু সৰু পাঁচেও পনেরো আর তার চেয়ে তিন গুণ বহুরেব পাঁচেও পনেরো, এও কি সম্ভব? আমার কুতর্কের উত্তরে বালিকা বলেছিল পনেরোর প্রত্যেক এককতো একই, তা সে সৰুই হোক আর মোটাই হোক, আধুনিক আর্টিষ্টের কুতর্কেরও সেই উত্তর,—অর্থাৎ সত্তার আদর যদি আর্টের লক্ষ্য হয় তবে সন্মুখ সত্তাকেও সত্তা ব'লে মানতে হবে।”

আত্মা শক্তি

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সকল শক্তির আধার যিনি, ঐহাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া আমরা নমস্কার করি, তাঁহা হইতে শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কল্পনার কারণ কি? এই হই বিশ্বাসে কালের দীর্ঘ ব্যবধান, বেদান্তের স্তর পুরাণের স্তর অপেক্ষা অনেক গভীর। বিশ্বের সর্বত্র যেমন ক্রমবিকাশের নিয়ম ধর্ম্ম-জগতেও সেইরূপ, প্রথমে উন্মেষ, কালে পূর্ণ বিকাশ। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে বিক্ষেপের অবস্থা, বিস্ময়ের বিহীনতা, নিসর্গের ক্রিয়া-বৈচিত্র্যে বহু দেবতাব কল্পনা। অগ্নিতে এক দেবতা, বায়ুতে আর, বজ্রধারী পর্জন্তদেব তৃতীয়

দেবতা। ইহাদের তুষ্টির জন্য হোম যজ্ঞের সৃষ্টি। ক্রমে দৃষ্টি বিহর্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে আকৃষ্ট হইল। উপনিষদ-কার্যগণ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের একমাত্র কারণ নির্দেশ করিলেন। এক তিনি, অদ্বিতীয় তিনি, নিত্য তিনি, অক্ষর তিনি। প্রগাঢ় চিন্তা, গভীর ধ্যানের ফল স্বরূপ ব্রহ্মবাদের বহু শাখা-প্রশাখা হইল। আবার কালক্রমে বিশ্বাসের সম্প্রসারণ হইল। পৌরাণিক যুগে বেদান্ত কালের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, ভাষার সংক্ষিপ্ত সারবত্তা কতক পরিমাণে লুপ্ত হইল। কল্পনার প্রসার বাড়িল, অবতারবাদের সৃষ্টি

হইল, অলৌকিক ঘটনার প্রাচুর্য্যে ধর্ম-সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হুচনা দেখা দিল। এইরূপ তরলতা ও চঞ্চলতার অবস্থায় শক্তিবাদের ভিত্তি স্থাপনা। তন্ত্রের উচ্চ অঙ্গে শক্তির ব্যাখ্যা অতি পবিত্র, কিন্তু কোন জটিল শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সহজ কথায় শক্তির কল্পনা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তি যদি একটি পাটকেল তুলিয়া ছুড়িয়া ফেলে তাহা হইলে সেই লোষ্ট্রখণ্ড কিছু দূবে গিয়া পড়ে। নিষ্কপকারী ও পতিত পাটকেলের মধ্যে ব্যবধান হইল কেমন করিয়া? যদি সে-ব্যক্তি পাটকেল তুলিয়া লইয়া আর-এক স্থানে রাখিত তাহা হইলে গান্ধবে ও পাটকেলে সম্বন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু এই যে বল-প্রবোণ তাহার প্রেক্ষিয়া প্রয়োগকর্তা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেল। পাটকেলটি ফেলিলে আর ফিরান যায় না, যে ফেলে তাহারও সে সাধ্য নাই। এইজন্ত শাস্ত্রে কথিত আছে যে, উক্ত বাক্য আর মুক্ত বাণ নিবৃত্ত করা যায় না, অতএব এই দুই কাজ বিশেষ বিবেচনা কবিয়া করা উচিত। পাটকেলটি নিজের শক্তিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় নাই। যে ফেলিয়াছে তাহার নিষ্কপ-শক্তি তাহার শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পাটকেলকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তাহাকে বহন করিয়া দূবে লইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান বলে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকিলে সেই পাটকেলের কোন কালে পতন হইত না। নিতান্ত স্থূল কথায় শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এইরূপ করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে।

আব একদিক হইতে শক্তি বলিতে সৃষ্টির জী ভাব বুঝিতে হইবে। এই কারণে সৃষ্টির মূলে পুরুষ ও প্রকৃতির কল্পনা। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ ভাব ত্রিমূর্তির হস্তে শূন্য, ইহাদের তিন ভাষ্যা শক্তিস্বরূপ। যেমন গৃহ-সংসারে গৃহিণীর ক্ষমতা অধিক, গৃহিণী না থাকিলে সংসারের অসংখ্য খুঁটিনাটির সামঞ্জস্য হয় না সেইরূপ এই বৃহৎ বিশ্ব-সংসারে শক্তিরূপিণী দেবীদিগের কার্য্যকরী ক্ষমতা ও প্রাধান্য অধিক। উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেবী অথবা শক্তির স্বতন্ত্র স্থান। ব্রহ্মার পূজা নাই সূত্রাং ব্রহ্মাণীরও পূজা হয় না। গন্ধার পাবনী শক্তির উপাসনা। স্বর্গের অলকনন্দা, মহাদেবের জটাবিহারিণী, ভগীরথের

শঙ্খনাদের অমুবর্তিনী হইয়া ভগ্নাবশিষ্ট সগর-বংশকে উদ্ধার করেন। সেই কারণে ভাগীরথী কলুষনাশিনী, আবহমান পুরাকাল হইতে কোটি কোটি নরনারী গন্ধার খরস্রোত-সলিলে পাপ মনোমালিন্য ক্ষালন করিয়া আনিতেছে। লক্ষ্মীর পূজা পারলৌকিক মঙ্গলের জন্ত নয়, ইহ সংসারে বিস্তর রক্ষার উদ্দেশ্যে। গৃহস্থ এই চঞ্চলা দেবীকে নানা উপচারে পূজায় প্রসন্ন করিয়া গৃহের অবিষ্টাদ্রী দেবী করিয়া রাখিবার প্রয়াস করে। লক্ষ্মীর পূজা ঘরে ঘরে, কিন্তু কেহ তাঁহার নিকট পরলোকে কুশল প্রার্থনা করে না, কেহ তাঁহার নিকট মুক্তি-কামনা করে না, তাঁহার সেবায় ত্যাগ-স্বীকার করে না। তিনিও কাহারও ঘরে বাঁধা থাকেন না। যে ঐশ্বর্য্য-গর্ভিত মূঢ় মনে করে, সে হীরামণিক্যের লোহপেটিকায় লক্ষ্মীকে বন্দি করিয়াছে তাহাকে সর্ব্বস্বাস্ত্র পথের ভিখারী করিয়া হান্তচঞ্চলা দেবী লঘু পদক্ষেপে গৃহান্তরে প্রবেশ করেন।

শক্তিদিগের মধ্যে শিবানী প্রধান। ইনি সকল শক্তির মূলীভূতা, সকল শক্তি ইহাতে নিহিত আছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে সকল বিশ্বাসেই এইরূপ পরম্পরা দেখা যায়। বহু হইতে এক, এক হইতে বহু, আবার বহু একের আশ্রয় গ্রহণ করে। অস্তিত্বঃ এ দেশে এইরূপ ঘটিয়াছে। বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ধর্ম্ম-চিন্তার বিরাম ছিল না, সেইজন্ত ধর্ম্মের ধারা বহুমুখী। শিবের শক্তি বলিতে প্রধানতঃ স্তন্যদায়ী-শ্রেষ্ঠা পার্শ্বতীকেই বুঝায়। যুগল মূর্তিতে সর্ব্বত্র হর-গৌরীর উল্লেখ—অর্দ্ধেক গলায় হাড়মালা, অর্দ্ধেক গজ-মুক্তার মালা; অর্দ্ধাঙ্গে বিভূতি, অপরাধে মলয়জ পঙ্ক, অর্দ্ধ দিগম্বর, অর্দ্ধ পটবস্ত্র। যুগল নাম করিতে হরপার্কতী, গৌরীশঙ্কর, শিবদুর্গা বলি। প্রাচীন কাব্যে নগেন্দ্র-নন্দিনী উমার রূপ বর্ণনা অতুলনীয়—পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনত্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব—প্রচুর পুষ্পস্তবকে নত্রা পল্লব-বুক্কা গতিশালিনী লতার ছায় ছুঁয়া, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা এই ত্রিবিধ রূপে মহেশ্বরের শক্তি প্রকাশিত। শিব শব্দের অর্থ ই শুভ, এই কারণে তাঁহার মঙ্গলময় সৌম্য মূর্তি। তিনি আদিনট এইজন্ত তিনি নটনাথ। কিন্তু ভোলানাথ মহাদেবের আর-এক মূর্তি আছে, ত্রিশূলধারী, সর্বলোক-ভবঙ্কর, সংহার-মূর্তি, ভৈরব, রক্ত, মহাকাশ। এই রক্ত-

দেবের শক্তি রুদ্রাণী, কালের জায়া কালী। কাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া কালী শব্দ সাধিত হয়। কালী আদ্যা শক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংস হির জলের সহিত একের ও সেই জল বারু-সংযোগে চঞ্চল হইলে শক্তির সহিত উপমা করিতেন। কালীর কৃষ্ণবর্ণের উপমায় কহিতেন, সমুদ্রের জল দূর হইতে কৃষ্ণ অথবা নীলবর্ণ দেখায়, নিকটে গিয়া সেই জল হাতে করিলে কোন বর্ণই থাকে না।

এই দেবীকে ভক্তগণ, কবিগণ শ্রামা বলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে শ্রামা অর্থে সুন্দরী—তরী, শিখরিদশনা, পঙ্কবিষা-ধরোষ্ঠী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্রামা। আদ্যা শক্তিকে শ্রামা বলিতে কৃষ্ণা বুঝিতে হইবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কালীর বর্ণনা আছে। ঐ পুবাণের মতে কোপে দেবীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে—

কোপেন চান্ডা বদনং মনীর্ণমভূৎ

—কোপে ইহার বদন মনীর্বর্ণ হইল।

পুরাণকার কালীকে শক্তির অপর মূর্তি না বলিয়া তাঁহাকে অম্বিকার ললাটফলকোদ্ভবা কৃষ্ণবর্ণা দেবী কল্পনা করিয়াছেন। অম্বিকা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার ক্রুটী-কুটিল ললাট হইতে কালী করালবদনা নিজ্রাস্ত হইলেন। মতান্তরে, সতী দক্ষযজ্ঞে গমনকালে কালীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তখনও তিনি কুপিতা। অথচ কুমারসম্ভব কাব্যে দেখিতে পাই, কবি পার্শ্বতী ও কালীকে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবী নির্দেশ করিয়াছেন। শিব যখন বরের উপযুক্ত বেশে সজ্জিত হইয়া, তরবারি-মধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, গৌরীর পাণিগ্রহণার্থ শৈলরাজের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন সে-সময় সপ্তমাতৃকাগণ মহাদেবের অনুগমন করিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে নৃসিংমালিনী কালী গমন করিতে-ছিলেন—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালান্তরণা চকাশে।

সে-সময় সর্বাগণবেষ্টিত পার্শ্বতী বধুবশে পিত্রালয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই কালী যে মহাদেবের শক্তি অথবা রুদ্রাণী সে-কথার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কালিদাসের কল্পনায় কালী ও অনচা পার্শ্বতী দুই স্বতন্ত্র দেবী, অধিকন্তু এই কালী রুদ্রাণী হইলে এই সময়

বরের অনুগমন সম্ভব মনে হয় না, কারণ কোন পত্নীর পক্ষে সপত্নী হওয়া স্বথের সংবাদ নয় এবং স্বামীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। কালিদাসের কালে তন্ত্র শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল কি না এবং তাহার বিস্তৃত প্রসার হইয়াছিল কি না সে-কথা নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা যায় না, কিন্তু ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে তাত্ত্বিক মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশযানগামিনী ভীষণো-জ্জলবেশা কপালকুণ্ডলা যোগিনী, রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া শক্তিমাধ শিবের জয় উচ্চারণ করিতেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, কিন্তু ঐ শাস্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে নাই। নেপালে ও মিথিলায় অনেকগুলি পাওয়া যায়, বাকি কতকগুলি দেশান্তরে প্রচলিত। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাত্ত্বিক মতের বিস্তৃত প্রচলন হয় নাই। অষ্টবিধ আকারে কালীমূর্তির পূজাবিধি আছে, তাহার অধিক সংখ্যক পূজার প্রথাও ভয়ের সঞ্চার হয়। দুর্গম্ভারীদিগেরও উপাস্য ও ইষ্টদেবী কালী। সেকালে বাংলা দেশে ডাকাতের দল ডাকাতে-কালীর পূজা করিত। নরহত্যাকারী ঠগেরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে—কালীর উপাসক হইত। এই পূজাপদ্ধতি ত্রাসজনিত ও ইহার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা।

অপর পক্ষে কালী-উপাসকের মধ্যে অনেক পরম প্রেমিক ভক্ত ও মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইহারা অল্প দেবতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেন কালীর উপাসনা করেন এই প্রশ্নের উত্তরে কোন যুক্তি আছে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। কালী বলিতে পটের কালিকা মূর্তি অথবা কোন মন্দিরের কালীমূর্তি মনে পড়ে। এই মূর্তি মানস-চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত না করিলে আত্মা শক্তির গূঢ় অর্থ ধারণা করা অসম্ভব। পটকারের পটের ছবি কিংবা কুস্তকারের গঠিত অথবা ভাস্করের খোদিত মূর্তি দেখিয়া কোন দেবতার অবয়ব কল্পনা করিলে ভ্রান্তি হয়। এদেশে যাহারা দেবদেবীর মূর্তি চিত্র করে বা নিৰ্ম্মাণ করে তাহাদের কলাবিদ্যা ও ললিতকলার জ্ঞান যৎসামান্য, আদর্শ ধারণা এবং কল্পনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেবদেবী মূর্তি যে অনেক সময় দেখিতে বীভৎস হয় সে অপরাধ তাঁহাদের নয়, চিত্রকর বা সংগঠনকারীর কলা-কুশল্য

অভাব। কল্পিত দেবদেবীর সংখ্যা বিস্তর হইলেও তাঁহারা অমূর্ত, বাহ্যিক মূর্তি নাই তাঁহাকে মূর্তিমান্ অথবা মূর্তিমতী করিলেই দেবতা লঘু হইবেন। মূর্তিপূজার মূলে ধর্মভাবের দৈন্ত, সে-ভাব বলশালী ঐশ্বর্যশালী হইলেই মূর্তিপূজার আর স্থান থাকে না। দেবতার মাহাত্ম্য ধ্যান-ধারণার বস্তু, কোন ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত নয়। বেদের কালে দেবতার মূর্তি কল্পিত হইত, হস্ত দ্বারা প্রতিলিপিত হইত না। এই বিক্ষিপ্ত দেবকল্পনা উপনিষদে এক ব্রহ্মে কেন্দ্রীভূত হইল, কিন্তু এই দেবতাকে মানুষে কেনন করিয়া বুঝিবে? নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা—তাঁহাকে বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না*। তবে মানব তাঁহাকে কেনন করিয়া জানিবে? যে কয়েক ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ হইয়াছে ইহা ব্যতীত সাধারণ মানবের আর কি ক্ষমতা আছে? উপনিষদের যুক্তি, উপনিষদের গভীরতা সাধারণ লোকের উপলব্ধির অতীত, এবং সেই কারণে বিশ্বাসে ক্রমে শৈথিল্য দেখা দিল। এইসকল নীরস, সংক্ষিপ্ত কঠিন মস্ত্রে সাধারণ লোকের তৃপ্তি হইল না। তাহার পর বৃহদায়তন, রূপকে উপকথায় পরিপূর্ণ, অভূতপূর্ব, অলৌকিক ঘটনাবলী-সম্বলিত, অতিরঞ্জিত পুরাণ-সমূহ বিরচিত হইল। বেদবেদান্ত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ রহিল, পুরাণ উপপুরাণ লোকসাধারণে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

আদ্যা শাস্ত্রের অস্তিত্ব-রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইলে সর্ব প্রথমে মূর্তিকল্পনা চিন্তা হইতে অপসারিত করিতে হইবে। নিরাকারাকে সাকার করিতে পারা যায় না, অমূর্ত মূর্তির গভীর মধ্যে আবদ্ধ হয় না। পুরাণের মতে ক্রোধের আতিশয্যে দেবীর গৌর বর্ণ মসীবর্ণে পরিণত হয়। ক্রোধে বর্ণ সচরাচর আরক্ত হয়, কৃষ্ণ হয় না। আর-এক আপত্তি আরও সমীচীন। যদি স্বীকার করা যায় যে, কোন কারণে শিবানীর বর্ণ পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে আদ্যা শক্তি কে? দেবীর মুখের বর্ণ অন্তরূপ হইবার পূর্বে যে বর্ণ ছিল তাহাই ত তাঁহার আদি রূপ, বিবর্ণ আকৃতি কেনন করিয়া আদি হইতে পারে? প্রথমেই এই কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। আমরা বলি কৃষ্ণ একটি বর্ণ, কিন্তু

* কঠোপনিষৎ।

প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণতা সকল বর্ণের বিলুপ্তি। আলোকের প্রতিফলনে নানা বর্ণ দেখা যায়, আলোক না থাকিলে কোন বর্ণ থাকে না, সমস্তই মসীলিপ্ত হয়। সৃষ্টি-প্রকরণের পূর্বে যে অবিভাজ্য গাঢ় অন্ধকার ছিল তাহাই আদ্যাশক্তির কল্পিত বর্ণ। বেদ-বর্ণিত সেই অতি গভীর বর্ণনা স্বরণ করিতে হব। তখন অসং ছিল না, সং ছিল না, রক্তকপী বায়ু ছিল না, ব্যোম ছিল না, না ছিল মৃত্যু না ছিল অমৃত, না রাত্রি না দিন। কালপ্রবাহের কোন চিহ্ন ছিল না, ত্রিকাল নির্ণয়ের কোন উপায় ছিল না। তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়—অদৃশ্য অন্ধকারে অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল, নির্বাক, নিষ্পন্দ। সৃষ্টির প্রণব বাণী সেই সর্বব্যাপী স্তব্ধতায় উচ্চারিত হয় নাই। সৃষ্টির পূর্বে বোরা তমসাতিমিরমধ্যবর্তিনী যে শক্তি তাহাই আদ্যাশক্তি।

আবার এই শক্তি অন্তরবদলনী, মহিষমর্দিনী, শুভনিশুভ-বাতিনী। রূপকে রূপকে পৌরাণিক ধর্ম-সাহিত্য সমাচ্ছন্ন, কিন্তু এখন সেইসকল রূপকের গূঢ়ার্থ লোকে সহজে বুঝিতে পারে না, হয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, না হয় অশ্বাস-যোগ্য উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্ত শুভ ভেদ করিয়া নুসিংহ অবতারের আবির্ভাব গভীর ও সমর্থপূর্ণ রূপক। কিন্তু সে-কথা কয় জন বিচার করে? চণ্ডিকা মূর্তিতে কালীর দৈত্যবিনাশ, তাঁহার বিভূতিতে সৈন্তসৃষ্টি সবই রূপক এবং সেই সকল রূপকের অর্থ বুঝিতে পারিলে কালীভক্তের মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডিকার যুদ্ধের রঙ্গস্থল মানুষের হৃদয়ে, মানুষের প্রকৃতিতে যে-সকল রিপু আছে তাহারাই অন্তর। রক্তবীজ কে? যে রিপুকে দমন করিয়া আমরা মনে করি তাহার বিনাশ হইয়াছে অথচ পর মুহূর্তেই সেই রিপু আবার প্রবল হইয়া উঠে সেই রক্তবীজ। তান্ত্রিকের শবাসনা ভৈরবীর কল্পনা সংহারিণী দেবীর উৎকট উপাসনা।

রামপ্রসাদ সেনের জ্ঞান ভক্ত কবি অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংসের জ্ঞান লোকগুরু মহাপুরুষ কালীকে এ ভাবে দেখেন নাই। জগজ্জননীর যে শক্তি, দেবীতে তাঁহা সেই আদ্যা মাতৃশক্তি দেখিতেন। তাঁহাদের উপাসনা মাতৃবৎসল সন্তানের পূজা। ধর্ম বিপ্লয়মার্গ, ধ্যানমার্গ, জ্ঞানমার্গ বেদ-বেদান্তে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখন ভক্তি

ও প্রেমমার্গের পথ হইল। একদিকে কালীর মাতৃরূপ ধারণা, অপর দিকে রাবাকৃষ্ণের প্রেমের উন্মাদনা। বৈষ্ণব শাক্ত সম্প্রদায় স্বতন্ত্র, কিন্তু মূলে ত সেই এক, যিনি হর তিনিই হরি, যিনি শিবানী তিনিই নারায়ণী। শ্রীচৈতন্য কিরূপ ভক্তি-প্রেমের বহু আনিষাছিলেন মনে করিলে এখনও পুলকাক্ষিত হইতে হয়। কোথায় গেল নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যভিমান ও তর্ক-প্রবণতা! হরি নামের স্রোতে ভ্রায় ব্যাকরণ সব ভাসিয়া গেল। নবীন সন্ন্যাসী গৌরাস্বরের প্রেমোন্মত্ততায় নবদ্বীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যাব! হরিবাসরের সমস্ত রাত্রিব্যাপী সতীর্জন, পথেঘাটে হরিনাম-মাহাত্ম্যের ঘোষণা। ভক্তির গদ গদ ভাব, সাত্ত্বিক ভাবের স্বেদ, অশ্রু, পুলক, কম্প দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইল, গৌর নিতাইয়েব রূপায় কত জগাই মাঝাই তরিয়া গেল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে সাধনার ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। তপস্তার কঠোর আত্মসংযম ও আত্মপীড়ন বিস্ময় উদ্বেক করে, কিন্তু নিম্পৃহ তপস্তার দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সকাম তপস্তারই উল্লেখ আছে। কেহ ইন্দ্রের জন্ত, কেহ অমরত্বের জন্ত, কেহ ব্রাহ্মণত্বের জন্ত, কেহ বলবান শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্ত তপস্তা করিত। তপস্তা ও ধ্যানে প্রভেদ এই যে, তপস্বী প্রার্থনাকারী, কোন বরলাভের জন্ত তপস্তা করিতেন, ধ্যানী কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ধ্যান করিতেন। কঠোর তপস্চরণ করিয়া তাহাতে কোন ফল হয় না দেখিয়া বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হইলেন, ধ্যানে নির্ব্যাণের আলোক প্রাপ্ত হইলেন। বহুতর বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থ অবস্থার বার বার উল্লেখ আছে। নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষা প্রথমে গীতায় দেখিতে পাই, এই অপূর্ণ গ্রন্থে প্রথমে প্রচারিত হয় যে মানব সাধনা করিবে, কিন্তু সে সিদ্ধির অধিকারী নয়, ধর্মবৃক্ষ বোপণ করিয়া তাহাতে নিত্য জল সেচন করিবে, কিন্তু ফল ভগবানকে সমর্পণ করিবে। সাধনার এই উচ্চতম আদর্শ। ধর্মসাধনের বিবর্তনে প্রেমার্জ সাধনাই সর্বশেষের বিকাশ, জীব ও ব্রহ্মে দূরতা তিরোহিত হইয়া নৈকট্য স্থাপিত হয়। জ্ঞান দ্বারা সাধিত অদ্বৈতভাব স্বতন্ত্র, কারণ তাহাতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না। এ

বিশ্বাসে জ্ঞানের গৌরব আছে, ভক্তির প্রেম নাই। ধর্মের যুগযুগান্তরে এইরূপ বিশ্বাস ও সাধনার পর্য্যাব।

দেবতার রূপ রূপের কল্পনা পুরাণ হইতে আরম্ভ নয়। উপনিষদে রমণীকূলে ধন্য মৈত্রেয়ী তাঁহার অতুলনীয় প্রার্থনা মস্ত্রে ব্রহ্মকে কল্প নামে অভিহিত কবিয়াছেন। অসতোমা-সদগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়—অদ্য হইতে আমাকে সত্যে লইবা যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইবা যাও। প্রার্থনাসমাপ্তিতে মৈত্রেয়ী বলিতেছেন, রূপ যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—হে রূপ, তুমি আমার যে প্রসন্ন মুখ তদ্বারা আমাকে সত্যত রক্ষা কর। দেবতার বাম, অপ্রসন্ন, রূপ মূর্তি প্রথমেই মৈত্রেয়ীর স্মরণ হইতেছে, কিন্তু সেই দেবতা প্রসন্ন হইলে রক্ষা করেন। রূপ মূর্তিতে যিনি সংহারকর্তা, প্রসন্ন মূর্তিতে যিনি রক্ষাকর্তা, সেই দেবতার উভয় মূর্তি মৈত্রেয়ী যুগপৎ কল্পনা করিতেছেন।

অতএব এই পরম্পর বিরুদ্ধ দ্বৈত ভাব দেবতার সনাতন কল্পনা। শঙ্কর শিবসুন্দর রূপ, আবার তাঁহারই প্রলম্বকর, সর্বদহনকারী মহাকাল মূর্তি। যিনি কবালী, চামুণ্ডা, রণরঙ্গিনী তিনিই আবার অনাদ্যা, আদিভূতা, অভয়া, সর্বমঙ্গলা, ভুবনেশ্বরী। রূপ অথবা রূপাণীর উপাসনার কিংবা প্রচারে প্রতিষ্ঠা অথবা লোক-শিক্ষা হয় না। কোন কাপালিক অথবা উগ্র তান্ত্রিক, কোন শ্মশানবাসিনী তেজস্বিনী ভৈরবী লোক-সমাজে বহু সম্মান পান না। দেবতার শ্রদ্ধার মূলে ভীতি নয়, প্রীতি। তাঁহাকে সর্বদা ভয় করিব তাঁহাকে ভালবাসিব কেমন করিয়া? দেবতাকে ভয় করিলে কেমন করিয়া তাহাকে পাইব? এই কারণে শিবের উপাসনা বেকপ সাধারণে প্রচলিত রূপের উপাসনা সেরূপ নয়।

শক্তির উপাসনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও শক্তির কল্পনা প্রাচীন। কেন-উপনিষদে কথিত আছে দেবগণ দৈত্যদিগকে পরাভব করিয়া গর্ভপূর্ণ হইলে যক্ষকপী ব্রহ্ম অগ্নি ও বায়ুর দর্প হরণ করিলেন এবং ইন্দ্র তাঁহার সমীপবর্তী হইলে তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, যে-স্থলে যক্ষ দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থলে হৈমবতী উমা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ যক্ষ কে?” উমা উত্তর করিলেন, “ইনিই ব্রহ্মণ।” তখন দেবতার জ্ঞানিতে

পারিলেন। এই উমাই শক্তিকপিনী এবং উপনিষৎকার দেখাইতেছেন, ইহার অন্তর্দৃষ্টি দেবতাদিগের অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। উমা হিমবৎকন্যা ও পরমা সুনন্দী। অদিতিও সংহারকারিণী শক্তির কল্পনা, আবার এই অদিতিই দেব ও দৈত্যকুলের প্রমতি।

ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা উপনিষদ-সমূহে বেরূপ লক্ষিত হয় আর কোনও দেশের কোনও ধর্মগ্রন্থে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। • এই গভীর তত্ত্ব যেমন চিন্তাপূর্ণ ইহার উপলব্ধিও সেইরূপ কঠিন। উপনিষদের একমাত্র দেবতাকে ঋষিগণ নানা নামে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি পুণ্ড্র, তিনি প্রাজাপত্য, তিনি কল্যাণতমম, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি শাস্ত্র শিবমঐতং, তিনি সর্বাঙ্গে, তিনি অন্তর্ধামী। কিন্তু মনুষ্য-লোকে যে পিতৃমাতৃসম্বন্ধ আছে সেরূপ সম্বন্ধ ব্রহ্মে আরোপিত হয় নাই। ইহুদীদিগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে সর্বত্রই ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভব করা যায়, কিন্তু সর্বত্রই তাঁহাকে প্রভু অথবা প্রভু ঈশ্বর নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। বীণ্ডুথুই প্রথমে ঈশ্বরকে পিতৃনামে সম্বোধন করেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া অপরসাধারণকে সে-অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার প্রবর্তিত প্রার্থনা খৃষ্টধর্মাবলম্বী মাট্রেই আবৃত্তি করে। সেই প্রার্থনার প্রারম্ভেই আছে—

Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name—হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা, তোমার নাম পবিত্র হউক।

যিনি জগতের স্রষ্টা, জগৎপিতা, তিনি মানব-লোকেরও পিতা, অতএব পিতৃসম্বন্ধে তাঁহার প্রার্থনা করিলে চিন্তের প্রসাদ হয়। ব্রহ্মবাদীও পিতৃসম্বোধনে ব্রহ্মের উপাসনা করেন। কোন ধর্মের উপাদানে চিন্তার একটা প্রবাহ আছে, কোন ধর্মে তাহা নাই। ইসলাম ধর্মে কোরাণে বাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহাই ধর্মের আদি ও তাহাই শেষ, ইহাতে কোনরূপ সম্প্রসারণ বা বিবর্তন হইতে পারে না। ইহুদীয় ধর্মেও তাহাই। বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করিব না কারণ ঐ ধর্মেও অতীত ধর্মে মৌলিক প্রভেদ আছে। এই ভারতে শুধু ব্রহ্মবাদ বহুমুখী দেখা যায়। এমন কোন কাল হয় নাই যখন ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ততা বা উদাসীনতা দেখা দিয়াছে। যদি জ্ঞানের সোপান দেখা যায় তাহা হইলে বেদ

হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদের সোপানই সর্বোচ্চ। ঔপনিষদ-ব্রহ্মজ্ঞান আরম্ভ করা অত্যন্ত কঠিন, এন্থক্ষে আরম্ভ শব্দ ব্যবহার করাই অপরাধ, এবং সেই কারণে জ্ঞানমার্গের পথিক অল্প। যে-তীর্থে শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া উপনীত হওয়া যায়, সে-তীর্থের অনেক যাত্রী, কিন্তু যে-তীর্থের জন্ত বুদ্ধি, চিত্ত ও মেধার কঠিন শাসনের প্রয়োজন সে-পথে যাত্রী অধিক হয় না। এইজন্ত উপনিষদ-সমূহ বহু প্রাচীন হইলেও উহাদের কোন কালে বহুল প্রচার হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা নাই।

পিতৃভাবে দেবতার উপাসনা একটি সোপান। সে সোপান উচ্চ দিকে কি অধোমুখে সে-সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। তবে বাহাকে পুরুষ বলা হইত তাঁহাকে পিতা বলাতে মানুষ তাঁহাকে পূর্বের অপেক্ষা একটু নিকটে পাইল। পিতা দেবতুল্য, পিতৃ-ভক্তিতে মানুষ ধন্ত হয়, পিতা প্রধান গুরু, পিতার আদেশে সন্তান নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বপিতাকে পিতৃনামে সম্বোধন করিলে শাস্তি লাভ হয়, বিভূতপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে গভীর আনন্দ অনুভূতি হয়। ধর্মের উচ্চতম শিবরোও প্রেমের অভাব নাই, কেননা যথার্থ ঈশ্বরজ্ঞান প্রেমশূন্য হয় না, কিন্তু যেভাবে দেবতাকে স্মরণ করিবে সেই অনুসারে প্রেমের তারতম্য হইবে। ইহাতে কোন সম্প্রদায় অথবা কোন উপাসনাপদ্ধতির প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ নাই। এই ভাব নাই বলিয়াই এদেশে ধর্মের এত রূপ বিশ্বাস বিনা বিরোধে স্থান পাইয়াছে। অষ্টৈতবাদী, উপনিষদোক্ত ব্রহ্মোপাসক, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, মূর্তিপূজক সকলের এই মুক্ত ক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ঐচ্ছিক্য নাই। ধর্মের কোন নিষেধ নাই, বিশ্বাসে কোন বাধা নাই, এই মূল মহামন্ত্র আর্ধ্য ধর্মের পরাকাষ্ঠা।

আর-এক সোপান মাতৃভাবে দেবতার আরাধনা। পিতা পরমগুরু কিন্তু মাতার তুলনায় তিনি অনেক দূরে। পিতা গভীর, মাতা আনন্দময়ী; পিতা শাসন করেন, মাতা লালন করেন; পিতা কঠোর, মাতা কোমল; পিতা দূর্লভ-দর্শন, মাতা দৃষ্টির অতীত হন না; পিতা গুরু, মাতা দেবী। পৃথিবীতে প্রায় সকল ভাষাতে যৎসামান্য পরিবর্তন করিয়া মাতা শব্দই ব্যবহার হয়। মা—এই একাক্ষর

শব্দ—ভাষায় কি ইহার তুল্য আর একটি কথা আছে? এমন নরারম কে আছে যা বলিতে যাহার কণ্ঠ অন্তর্বাশ্প-জড়িত না হয়? যেমন মুকুবে প্রতিবিশ্ব পড়ে তেমনি এই একটি কথায়, এই মা নামে মানুষের ইহজীবনের লীলা প্রতিবিম্বিত হয়। যে অতীতের স্মৃতি মনের মধ্যে সর্বদা ছায়ায় মত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাকে জিজ্ঞাসা কব কাহার মুখখানি প্রথমে মনে পড়ে, কাহার কণ্ঠস্বর স্মৃতির বীণা-তন্ত্রীতে প্রথম শোনা যায়? জীবন-প্রভাতের প্রথম আলোকে মায়ের ককণাময়ী মূর্তি, বালাকালের সকল অবস্থায় মা, সংসারের প্রবেশ-দ্বারে সেই মমতাময়ী মা পথ দেখাইয়া দেন। রোগের যন্ত্রণার সময় শুষ্ক, তপ্ত, ক্লিষ্ট কণ্ঠে কাহার নাম মুখে আসে? প্রভাতকালে গাছের ডাল নাড়া দিলে যেমন শিশি-বিন্দু পড়ে মনের মধ্যে মায়ের স্মৃতি আন্দোলিত হইলে সেইরূপ চক্ষে অশ্রু ঝরে। বিনি জননীর জননী, আদি জননী সেই বিশ্বজননীকে মাতৃভক্তি, মাতৃপূজা অর্পণ করিলে কিরূপ আনন্দ হয়!

ইংরেজী ভাষার একটি বিশেষ প্রসাদশূণ্য এই যে, ঈশ্বরকে “তুই” বলিয়া সম্বোধন করিলে কোন দোষ হয় না। তাহাকে এইরূপ সম্বোধন করাই প্রথা। যীশু খৃষ্টের প্রচলিত প্রার্থনার আছে,—Hallowed be thy name. Thy kingdom come। বাংলায় যদি ইহার অনুবাদ করা যায়—তোমার নাম পূত হউক, তোমার রাজ্য স্থাপিত হউক, তাহা হইলে শুনিতে কেমন অসঙ্গত হয়। ইংরেজিতে তুই শব্দ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে উহার কেমন একটি স্বাতন্ত্র্য গান্ধীর্ষ্য লক্ষিত হয়। ইংরেজিতে ঈশ্বরকে you (তুমি) বলিলেই শুনিতে অসঙ্গত হয়। অপর পক্ষে বাংলায় ব্রহ্মকে তুই বলিলে অসম্মানসূচক হয়। তুই শব্দের তাচ্ছিল্য বা কটুতা বাদ দিলে ঐ শব্দ স্নেহ-ব্যঞ্জক, বড় ছোটকে তুই বলিয়া সম্বোধন করে। ছোট বড়কে তুই বলিতে পারে না। জীব কোন সাহসে ব্রহ্মকে তুই বলিবে?

যতক্ষণ ব্রহ্মকে পুরুষ অথবা পিতৃভাবে অনুধ্যান করা যায় ততক্ষণ ভাবার সংঘম লঙ্ঘন করা যায় না। কিন্তু একবার মাতৃভাবে তাহার ধারণা কবিত্তে পাবিলেই সব বান্ধন ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়। মাতৃবক্ষে সন্তান ঝাঁপাইয়া

পড়ে, দূর হইতে তাহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষান্ত হয় না। বাহার উপর আব্দাবের সীমা নাই তাহাকে কতক্ষণ সমিহা করিবে? প্রাণের সমস্ত আকুলতা-ব্যাকুলতা, হৃদয়-ভরা অভিমান তাহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়ে। শোকতাপ পাপের ভরা ভারি হইলে তাহার পাদপদ্মে নামাইয়া ভার-মুক্ত হই। রামপ্রসাদ যখন গাহিয়া উঠিলেন,

মা আমার ঘুরাবি কত
কলুর চোকচাকা বলদের মত?

তখন কানে প্রাণে বড় মধুর লাগিল। ভক্ত জগন্নাথকে তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ইহাতে অসমঞ্জস্য কিছুই ঠেকে না। এই যে কাতর প্রাণের অনুবোধ, নিয়ত নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণমান কর্মচক্র হইতে নিষ্কৃতির প্রার্থনা, সংশয় হইতে বিশ্বাসে নীযমান হইবার আবেদন, ইহাও সেই বহুগুণবাহিনী উপনিষদের প্রার্থনার প্রতিধ্বনি। ঘুরিয়া ফিরিয়া, রুদ্ধের পরিবর্তে ক্রোধীকে লক্ষ্য করিয়া, মৈত্রেয়ীর সেই চিরন্তন বান্ধি, রক্তাণি, বস্ত্রে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। ব্রহ্মবাদিনীর যে-কথা কালিভক্তেরও সেই কথা। আবৃতচক্ষু বলদের মত অন্ধকারে ঘুবিতেছি, তমসো মা জ্যোতির্গময়! তাহাকে এই নিবেদন তিনি ভীমা ভয়ঙ্করী নন, তিনি প্রসন্নময়ী, মঙ্গলময়ী। আগম নিগম ধ্যেয়াণ্ডত নহি পাণ্ডত মহিমা-সমূহ—আগম নিগম তাহার ধ্যান করে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ মহিমা পায় না।

দেবতাকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি কবা সাম্প্রদায়িকতা নয়। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন রোগের শেষ অবস্থায়, মৃত্যুর কিছু পূর্বে যন্ত্রণায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “মা, কোথায় তুমি?” জননী পাশে বসিয়াছিলেন, গাষ হাত বুলাইয়া কহিলেন, “এই যে, বাবা, আমি তোমার পাশে ব’সে আছি।” কেশবচন্দ্র মায়ের পায়ের ধূলি লইয়া মাখায় দিলেন, তাহার পর কহিলেন, “এ মা নয়!” অতঃপর মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন মায়ার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে, অন্তবাস্তা জীর্ণ, ক্লিষ্ট দেহ হইতে মুক্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। মহাপ্রাণ মহাপুরুষ ইহলোক হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লোকান্তরে অর্পণ করিতেছেন। ইহসংসারে বাহাবা আপনার বলিবার ছিল তাহার ইহসংসাবে রহিল। মহাপ্রস্থানের সময় কে কার

সঙ্গে যায়? মা ব্রহ্মময়ী, কোথায় তুমি? এই সংসার-ক্লান্ত সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও! যে-কর্মের জন্ত পাঠাইয়াছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে এখন তোমার চরণাবিন্দের চির-শাস্তিময় ছায়ায় সন্তানকে আশ্রয় দাও!

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে জননীরূপিনী আদ্যা শক্তির উপাসনার পূর্ণ বিকাশ ও পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই চিন্ময়ী দেবীকে যে-ভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন তাহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। যে-গ্রন্থে তাঁহার বাণী সম্বলিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি জানিতেন ও বলিতেন, যিনি পরব্রহ্ম অথও সচ্চিদানন্দ তিনিই মা। রামকৃষ্ণ পরমহংসের পুণ্ড্রিগত বিদ্যা ছিল না, সাধুভাবে তিনি কথাবার্তাও কহিতে জানিতেন না, কিন্তু এই যুগে এমন মনুষ্যস্পর্শী অমৃতময়ী বাণী আর কাহারও মুখ হইতে নিঃসারিত হয় নাই। পর্বতের অন্তর্দেশ হইতে যেমন মধুরসলিলা নিঝরিণী প্রবাহিত হয় রামকৃষ্ণের হৃদয়ের উৎস হইতে সেইরূপ জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম শিক্ষার অমৃতধারা প্রবাহিত হইত। এমন এক সময় ছিল যখন তাঁহার মুখে অল্প কথা ছিল না, শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল মা, মা, মা! সময়ে সময়ে তিনি মা বলিয়া এমন রোদন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া অবাক হইত। এই যে আবেগপূর্ণ আর্তি, কাতরতা, ইহাই প্রেমের পথ। আবার এই মহাপুরুষ নিজের সাধনায়, নিজের বিশ্বাসে এমন সর্ব্বদর্শনমন্ডর দেখাইয়া গিয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। সকল ধর্মে তাঁহার আস্থা, সকল ধর্মে তাঁহার প্রীতি। সকল সম্প্রদায়ের ভক্তকে তিনি শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সমাধি অনেক দিনের শোনা কথা, পূর্বে ধ্যানস্থ মুনিদিগের সমাধি হইত, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ লেখা আছে। প্রধান কালীভক্ত কাহারও কাহারও সমাধি হইত এমনও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীনন্দকুমারের গানে আছে—

কবে সমাধি হব শ্রামা-চরণে,
অহংত্ব দূরে রাবে সংসার-বাসনা সনে।

বাহার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার তাহার সমাধি অবস্থাও দেখিয়াছিলেন। সমাধি বুঝিবার

নয়, বুঝাইবারও নয়, কিন্তু রামকৃষ্ণ স্বয়ং শিষ্য ও শ্রোতা-দিগকে যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সমাধিতেও বিচিত্র সমন্বয়; কখন অরূপের আলোচনায়, কখন সচ্চিদানন্দময়ীর ভক্তি-উচ্ছ্বাসে, কখন রাধাশ্রামের প্রেমের মত্ততায়, সকল অবস্থাতেই সমাধি, কথা কহিতে কহিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, নিষ্পন্দ দেহ, স্থির মুখে ও অর্দ্ধনিম্নীলিত নয়নে অপূর্ণ আনন্দ-ভাতি!

এই সর্ব্বতোমুখী প্রীতি, ভগদত্তির তন্ময়তা ভক্তশ্রেষ্ঠের পক্ষেই সম্ভব। গীতায় উক্ত হইয়াছে,

জানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজ্ঞস্তো মামুপাসতে।
একেষ্টেন পুণ্ড্রেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।

অন্ত কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন। কেহ কেহ অভিন্ন ভাবে, কেহ কেহ স্বতন্ত্র ভাবে, কেহ কেহ সর্বাঙ্গিক ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে নানা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমার আরাধনা করিয়া থাকে।

অরূপ ব্রহ্মের রূপভেদও গীতায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,

পিতাঃ হমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুর্বেদ চ।

আমি এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ্য ও পবিত্র বস্তু, এবং আমিই ঔকার ও ঋক্, সাম, যজুর্বেদ স্বরূপ।

পৃথিবীর পাশ্চাত্য খণ্ডে যে-সকল দেশে ঐশ্বর্য্য ভোগ বিলাসের মদগর্বে পরব্রহ্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে সেখানেও চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে, নিসর্গ লীলার তিরস্করণীর অন্তরালে কোনও মহাশক্তি বিদ্যমান। সেই মহাশক্তি আত্মা শক্তি।

এই শক্তিরূপিনী, মাতৃরূপিনী দেবীতে ভক্তি অচলা হইলে, বিশ্বাস দৃঢ়রূপে মূলীভূত হইলে এই পৃথিবী পুণ্যভূমি হইয়া উঠে, সকল স্থানই তীর্থস্বরূপ মনে হয়, মৃত্যুভয় অপনীত হয়। তখন ভক্ত আনন্দের আবেগে গাহিয়া উঠেন,

শ্রামা মা বলে যথায় তথায়, প্রাণ যদি যায়
ভূদেব বারাগনী কি করে গয়ায়।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পায় সে চতুর্ভুজ,
শিবত্ব লইয়া দিব পিছু পিছু যায়!

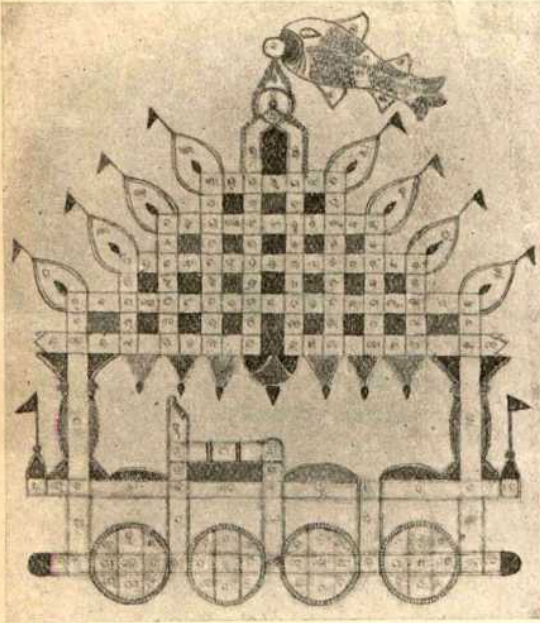
উড়িষ্যার আল্পনা

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

উড়িষ্যার শিল্পের দিকে শিল্পরসিকদের দৃষ্টি পড়েছে অনেকদিন থেকে। বাঙালী সমব্দারদের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম এসম্বন্ধে আলোচনার সুরু করেন।

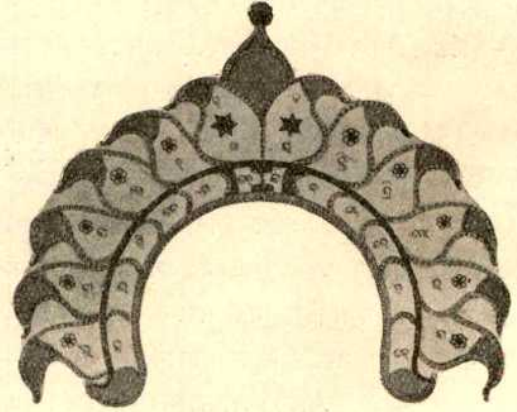
কিছু কাল আগে ডাক্তার এনান্ডেল (Dr. Anandale) চিহ্না হ্রদের নিকটে যে-আল্পনা সংগ্রহ করেন, সেগুলি তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির Memoirsএ প্রকাশ করেন।

উড়িষ্যার যে-সব শিল্পীদের পূর্বপুরুষরা পুরী, ভুবনেশ্বর

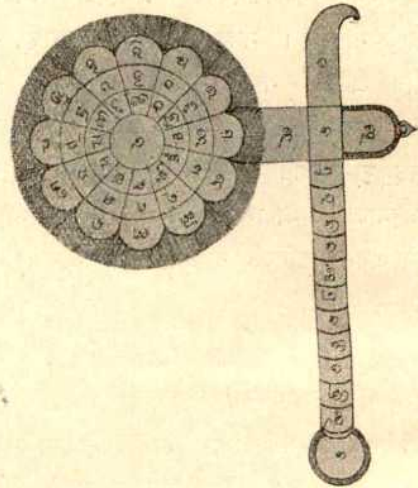


চিত্র নং ১

তার পরে যে-সব পণ্ডিত এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। এখনও যে একদল উৎসাহী কর্মী এবিষয়ে আলোচনা করছেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি শ্রীযুক্ত নির্মল-কুমার বসুর নতুন বই 'কণারকে'। যে-সব শিল্পীরা উড়িষ্যার শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেছিল, তাদেরই বংশধর এখনও পুরী, ভুবনেশ্বর ও যাজপুরে আছে। কলিকাতার প্রাচ্য-শিল্পকমার সমিতিতে তাদেরই দু'একজন শিল্পীকে এনে, সেই লুপ্ত শিল্পবিজ্ঞার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে যে আল্পনা দেওয়ার প্রথা রয়েছে, সেই আল্পনা সংগ্রহ করবার চেষ্টা তেমন



চিত্র নং ২

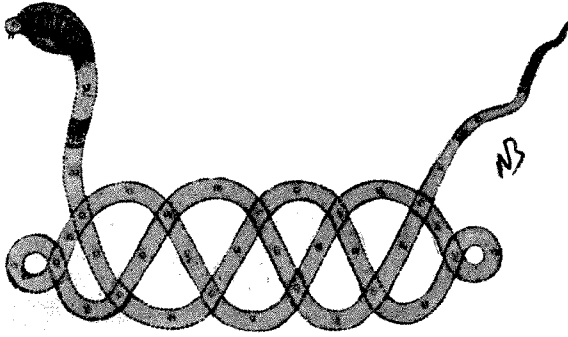


চিত্র নং ৩

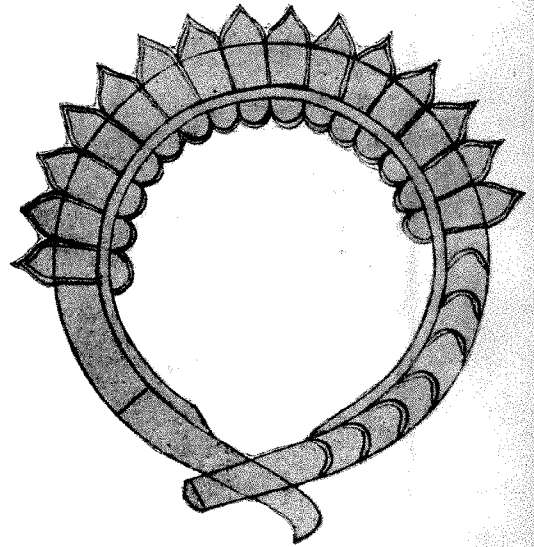
বা কণারকের মন্দির তৈরি করেছিল, আল্পনা তাদের হাতের কাজ নয়। আল্পনা হচ্ছে অন্তঃপুরের মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি। এখানে পুরুষ শিল্পীরা নিজেদের কোশল দেখাবার অবকাশ পায় না। মেয়েরাই নিজের হাতে পূজা-পার্বণে এই-সব আল্পনা এঁকে দেয়। কিছুদিন আগে আমি ময়ূরভঞ্জের আল্পনার নমুনা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছিলাম। আজ উড়িষ্যার জনসাধারণের মধ্যে যে-রকম আল্পনা দেবার প্রথা আছে তারই কিছু পরিচয় দেবো।

উড়িষ্যার আল্পনা “ঝুঁটা” নামে পরিচিত। এইসব ঝুঁটা দেয়ালের গায়ে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ-মাসে লক্ষ্মীপূজার

সময় দেখা যায়। কিন্তু পূজা-পার্বণ ছাড়াও অনেক সময় শুধু দেয়াল সাজাবার জন্তুও অনেক রকম আল্পনা দেয়ালে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে পূজার বা ধর্মকর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। যেমন অনেক সময় দেয়ালে শুধু এক রথের আল্পনা (চিত্র নং ১) দেওয়া হ’ল। এর সঙ্গে অবশ্য ধর্মের একটু সম্বন্ধ আছে। কারণ, উড়িষ্যায় রথের সঙ্গে সাধারণে খুব পরিচিত, বিশেষ জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে। জগন্নাথের প্রিয় ব’লে রথ দেয়ালে আঁকা খুব স্বাভাবিক। রথের চুড়ায় যে পতাকা দেওয়া হয়েছে সেটির মাছের আকার, বোধ হয় “মীনকেতন” বোঝাবার জন্তেই দেওয়া হয়েছে। অথ



চিত্র নং ৪



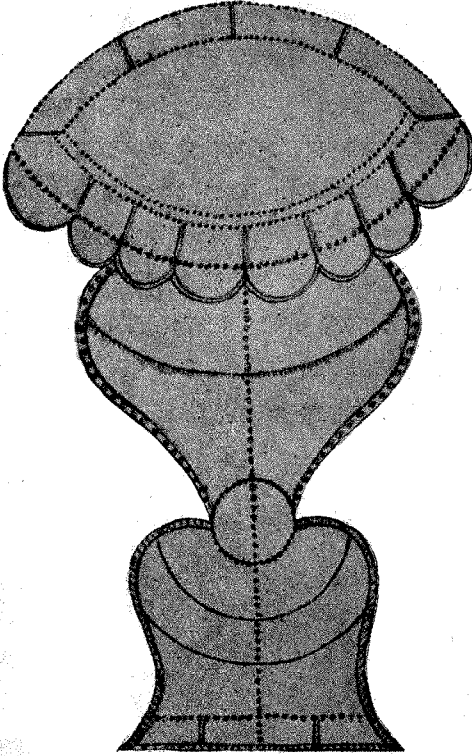
চিত্র নং ৬



চিত্র নং ৫

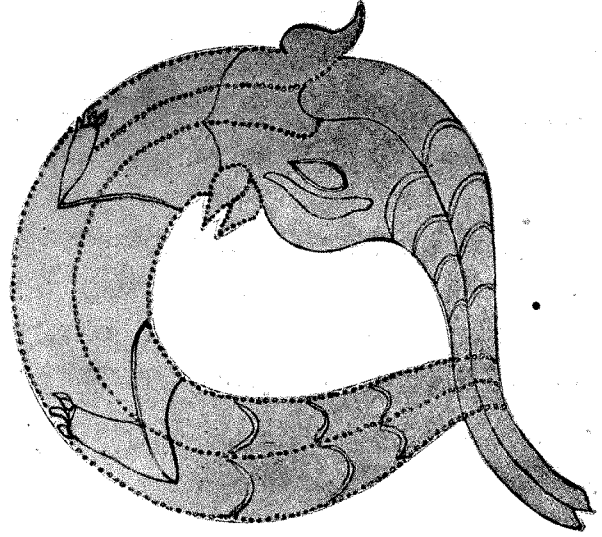
আল্পনাগুলির ধর্মকর্মের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ নেই, যেমন মুকুট (চিত্র নং ২) বা পাখা (চিত্র নং ৩) বা সাপ (চিত্র নং ৪) বা ময়ূর (চিত্র নং ৫)। অপর আল্পনাগুলি সম্বন্ধে (চিত্র নং ৬, ৭, ৮) ঐ কথাই প্রযোজ্য।

এই আল্পনার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি একান্তই মেয়েদের সম্পত্তি। যদিও তারা কোন আর্টস্কুলে শিক্ষা পান না, তবুও খুব সুন্দরভাবে তাঁরা এগুলি আঁকেন। এই যে জনসাধারণের শিল্প এটি অভিজাত সম্প্রদায়ের শিল্প থেকে বিভিন্ন। যে-সব শিল্পীরা রাজার বা ধনীর জন্তু শিল্পরচনা করেছে, তাদের সমুখ্যা ণ্ডিমের। তাদের শিল্পকলা সেই



চিত্র নং ৭

শিল্পীদের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই আল্পনা জনসাধারণের সম্পত্তি, এটি লৌকিক শিল্প। এ কোন দল বিশেষের মধ্যে নীমাবদ্ধ নয়, বা কোন রাজা বা কোন ধর্মীর আদেশে দৃষ্ট নয়। দেবপূজার সময় বা আনন্দ-উৎসবের সময়েই এই আল্পনার আবির্ভাব হয়।



চিত্র নং ৮

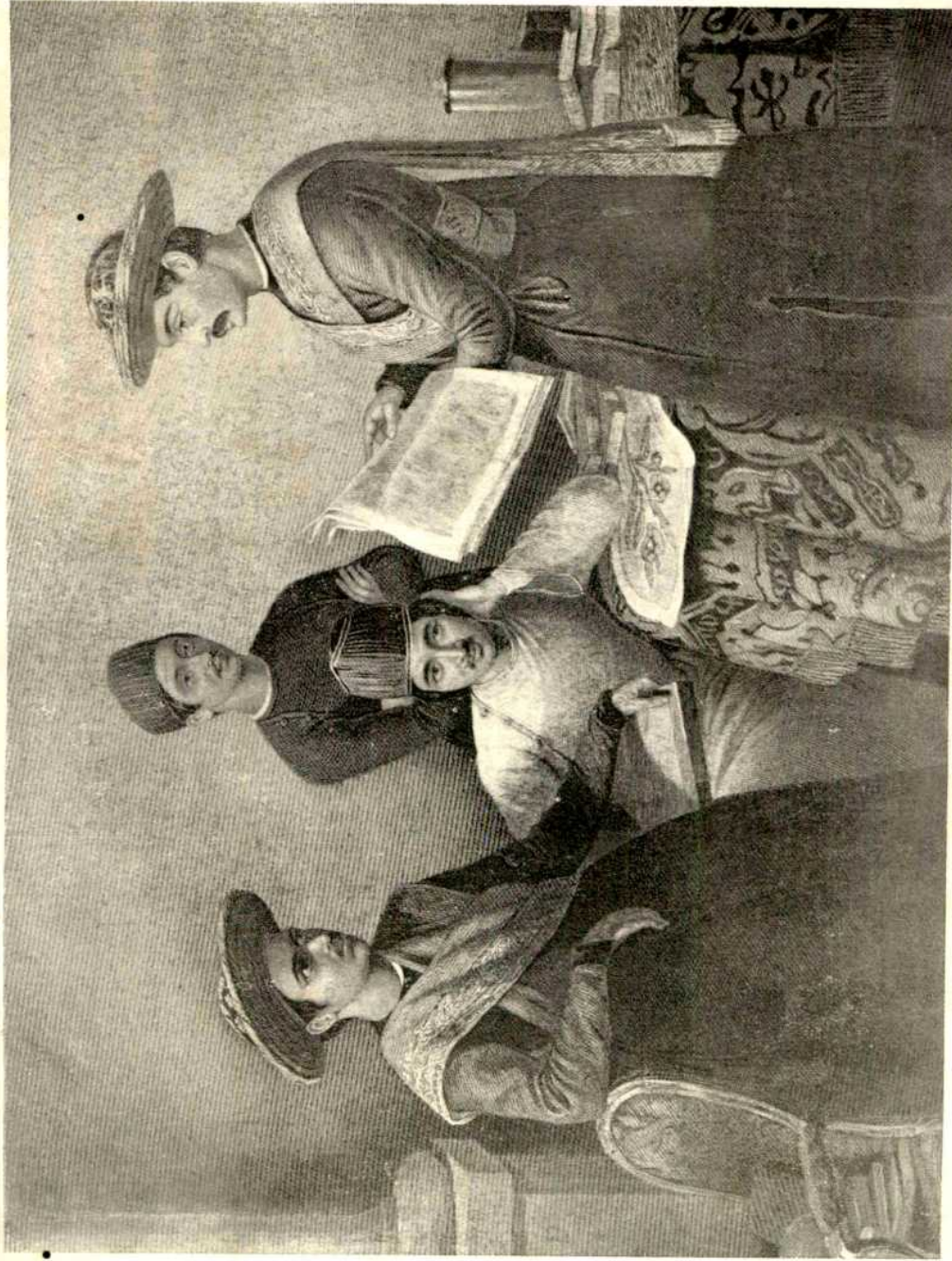
এই প্রবন্ধে যে আল্পনার নমুনাগুলি দেওয়া হইল, সেগুলি “প্রবন্ধ চিত্রকাব্য” নামে একখানি উড়িয়া বই হইতে দেওয়া হইয়াছে। যদিও এখানি একটি উড়িয়া কাব্য, তবু এতে অনেক ছবি দেওয়া আছে। সেইসব ছবি আল্পনার মত দেওয়ালে আঁকা হয়। আমার কাছে যে “প্রবন্ধ চিত্রকাব্য” আছে, সেটি হাতে লেখা ও ছবি-গুলিতে রং দেওয়া আছে। এখানি ময়ূরভঞ্জের আমার এক বন্ধু আমাকে ধার দিয়েছেন।

হিন্দু বিদ্যার্থী (Hindu Students)

এই ছবিখানি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিসাতের তৎ-সাময়িক প্রসিদ্ধ চিত্রকর আর, এ, স্কানলন (R. A. Scanlon, R. A.) কর্তৃক অঙ্কিত হয়। ছবিতে যে চারজন ছাত্রের প্রতিকৃতি আছে তাঁহারা সকলেই বাংলাদেশের কৃতী সন্তান। ইহঁরাই প্রথম বিদ্যার্জনের জন্ত এদেশ থেকে বিসাত যাত্রার সূচনা করেন।

গভর্নর জেনরল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনের নাম নানা কারণে এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার অনেক কার্টির মধ্যে, এই ছবিখানি সম্পর্কে দুইটির বিষয় বলা যায়।

প্রথম, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারিতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনা; দ্বিতীয়, ঐ বৎসরের ৭ই মার্চ



Longo Kumar Shukla Singh *Popul Chandra Lal* *Dwarika Nath Das Bose*
Rohinton Bose

স্বর্গ্যকুমার চক্রবর্তী

গোপালচন্দ্র শীল

দ্বারিকানাথ দাস বসু

ভোজানাথ বসু

তারিখে এতদেশবাসীদের ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধীয় গভর্ণমেন্ট অর্ডার। তাঁহার এই সংকারণের মূলে রাজা রামমোহন রাব, সাব চার্লস ট্রেভেলিয়ান, লর্ড ম্যাকলে ও রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডফ এই কয়জন ছিলেন। ইহাদের পরামর্শ ও চেষ্টা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে এইসকল কার্য করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার দ্বারা স্থাপিত হইবার পরে ঐকপ অন্তান্ত কলেজও স্থাপিত হয়। যে-সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশের শিক্ষা ও উন্নতির পথের কুসংস্কারমূলক বাধা-বিপত্তি উচ্ছেদ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্ততম এইসকল মেডিক্যাল কলেজ। ইহাদের জন্তই এদেশীয় ছাত্রেরা শব্দব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করে ও ইহাদেরই দরুন বিদ্যাশিক্ষার্থে সমুদ্রপথে বিদেশ-যাত্রারও সূচনা হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথম বার বিলাত-যাত্রার সময় ছইজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে নিজের খরচে বিলাতে লইয়া যাইয়া শিক্ষাদান করিতে চাহেন। কিন্তু সেইবার কেহই তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। তিনি দ্বিতীয় বার যাইবার সময়ও পুনর্বার ঐ প্রস্তাব করেন। ডাঃ মুয়াট (Dr. Mouat) মেডিক্যাল কলেজের সমবেত ছাত্রবৃন্দের সম্মুখে এই প্রস্তাবের কথা বলেন ও সঙ্গে-সঙ্গে এইরূপে বিদ্যালোভের সফল সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ফলে, তিনজন ছাত্র বিনাসর্তে বিদেশ যাত্রার জন্ত অগ্রসর হইলেন।

ইহার পর ঐ কলেজের প্রফেসর (Dr. Goodeve) গুডিভ কয়েকটি সর্তে ঐ ছাত্রদের অভিভাবকরূপে সঙ্গে যাইতে ও আরো একজন ছাত্রের খরচ জোগাইবার ভার গ্রহণ করিতে চাহেন। গভর্ণমেন্ট তাঁহার সর্তে রাজী হওয়ায় তিনি আরও ৭৫০০ টাকা সংগ্রহ করেন। এই টাকার অর্দ্ধেকের উপর মহামহিম বাংলার নবাব নাজিম মহোদয় দান করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ প্রফেসর গুডিভ ও ঐ চারি জন ছাত্র বেন্টিঙ্ক স্ট্রীমারে বিলাতযাত্রা করেন। এই চিত্রে উক্ত চারিজনদের প্রতিমূর্তি ও স্বাক্ষর

রহিয়াছে। তাঁহাদের নাম, ধাম, বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

(১) স্বর্ধ্যকুমার (গুডিভ) চক্রবর্তী। ইনি ঢাকার বিক্রমপুর পরগণায় কোমুখা গ্রামে ১৮২৫ (৭) খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়সে, পিতৃমাতৃহীন অবস্থায়, তিনি এক আত্মীয়ের আশ্রয়গ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করার পর ১৩ বৎসর বয়সে তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, কিন্তু আত্মীয়েরা আর সাহায্য করিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে শিক্ষায় সাহায্য দানের পরিবর্তে, এক ভদ্রলোকের পাচক রূপে নিযুক্ত হইতে হয়। সেখানে স্নবিদ্যা না হওয়ায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া গিঃ আলেকজান্ডার নামক এক সিবিలిয়ানের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে ১৮৪৩ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে লণ্ডন যুনিভার্সিটি কলেজে চার বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি, ও এম্-ডি, দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইংলণ্ডের কলেজ অব্ সার্জন্সএর সদস্য পদলাভ করেন (Member of the College of Surgeons of England)। ইতিমধ্যে তিনি ইয়োরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার বিলাতের শিক্ষকগণের চেষ্টায় ও প্রাশংসাবাদে গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে এদেশে ফিরিবার পর মেডিক্যাল কলেজে এসিষ্ট্যান্ট ফিজিসিয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ১৮৫৪ খৃঃ তিনি অস্থায়ী প্রফেসর (মেটরিয়াল মেডিকা ও ক্লিনিকাল মেডিসিন) পদলাভ, ও ১৮৫৫ খৃঃ বিলাতে যাইয়া এসিষ্ট্যান্ট সার্জন্সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার ফলে, ১৮৫৭ খৃঃ অস্থায়ী সাধারণ প্রফেসর পদে নিযুক্ত হইলেন। নব বৎসর অস্থায়ী প্রফেসর থাকার পর ১৮৬৬ খৃঃ তিনি স্থায়ীরূপে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ১৮৪৯ খৃঃ খৃষ্টবর্ষ গ্রহণ ও উক্ত বর্ষমতে এক মহিলার পাণি-গ্রহণ করেন। ডাঃ গুডিভ তাঁহাকে সম্প্রদান কবায় তিনি তাঁহার নাম গ্রহণ করেন।

১৮৭০ খৃঃ স্বাস্থ্যের জন্ত তাঁহাকে পুনর্বার বিলাত যাত্রা করিতে হয়। এবং সেইখানে লণ্ডনসহরে ১৮৭৬ খৃঃ ২৯শে

সেপ্টেম্বর চার পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

তিনি অধ্যাপনায় অতিশয় যত্নবান ছিলেন ও ছাত্র এবং সহকর্মী বিদেশী শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন। এনিউরিজম্ রোগে পটাসিয়াম্ আইওডাইড্ প্রয়োগ তাঁহারই আবিষ্কার।

(২) ভোলানাথ বসু। ইনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ব্রাহ্মণ ও গুড্ডিভের চেষ্ঠায় ১৮৪০ খৃঃ ইঁহার মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ ঘটে। ১৮৪৫ খৃঃ বিলাতে বাইয়া ১৮৪৮ খৃঃ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-ডি, উপাধি লাভ করেন (ইনিই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন)। দেশে ফিরিয়া তিনি ফরিদপুরে গভর্নমেন্টনিযুক্ত ডাক্তারের পদ লাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি সামরিক চিকিৎসা-বিভাগে কার্য করেন। চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও তজ্জন্ত পদক লাভ করেন। যুদ্ধ-শান্তির পর তিনি নিজ পদে ফিরিয়া বাইয়া তথায় ১৮৭৭ খৃঃ পর্যন্ত থাকেন। তাঁহার পর দুই বৎসরের ছুটিতে বিলাতে থাকিয়া, ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকট নারিকেল-ডাঙ্গায় তিনি জীবনের শেষাবশ্য যাপন করেন। ১৮৮৩ খৃঃ ১লা অক্টোবর তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তিনি অতিশয় সহৃদয় দক্ষ ও পরোপকারী চিকিৎসক ছিলেন। এদেশীয় ঔষধাবলী সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার নামে একটি পদক, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিকাল মেডিসিনের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রতিবৎসর দেওয়া হয়।

(৩) গোপালচন্দ্র শীল। ইনি ১৮৪৭ খৃঃ লন্ডনের এম্-বি, পরীক্ষা প্রথমবিভাগে পাশ করেন। তখন এম্-ডি, পরীক্ষায় ল্যাটিন্ লজিক ও ফ্রেঞ্চ এই তিন বিষয়ে পাশ করিতে হইত। ইনি হাঁসপাতালে শিক্ষালাভে ব্যস্ত থাকায় ঐসকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই; স্মরণ্য

তাঁহার এম্-ডি, পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই; কিন্তু ব্যবহারিক চিকিৎসাশাস্ত্রের (Practical medicine) দুরূহ পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। এদেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীচিকিৎসা বিভাগে রেসিডেন্ট সার্জন্স পদ দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন।

(৪) দ্বারকানাথ বসু। ইনি এদেশে থাকিতেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও জেনারেল এসেন্সীতে শিক্ষালাভ করেন। বিলাতে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তিনি ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি রয়েল কলেজ অব্ সার্জন্সের ডিপ্লোমা লাভ করেন। ফিরিবার পর (১৮৪৭ খৃঃ) তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজের জীচিকিৎসা বিভাগের রেসিডেন্ট সার্জন্সের পদে ও পরে ইংরাজী ক্লাশে এসিষ্ট্যান্ট ডিমনষ্ট্রেটর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উভয় পদেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। তাঁহার ডাক্তার হিসাবেও কলিকাতায় যথেষ্ট পসার ছিল।

দ্বারকানাথ অল্পদিন পরেই ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার সতীর্থরা প্রত্যেকেই নানারূপ প্রশংসাপত্র, পদক ও স্নানাম অর্জন করিয়া ফিরেন। তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগ (Council of Education) এবিষয়ে যন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গত প্রকাশ করেন "... The highest honor on Dr. Goodeve, as well as on the successful graduates themselves and the institution in which they received the ground work of their professional education."

অর্থাৎ "এই ব্যাপারে, ডাক্তার গুড্ডিভ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ ও যে প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়, সকলেরই যশ ও সম্মান লাভ হইয়াছে।"

পরভূতিকা

শ্রী সীতা দেবী

১১

শোভাবতীকে আনিবার জন্ত যে গাড়ী গিয়াছিল, সেটা ঘণ্টা দুই পরে ফিরিল। সন্ধ্যার ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে। ভানুমতী সিঁড়ির গোড়াষ দাঁড়াইয়া দিদিকে অভ্যর্থনা করিল, “মেজদি, উপরে উঠে এস, সোজা। ডাক্তারে ত আমার নীচে যাওয়া বারণই করবে দিবেছে, আমি পারতপক্ষে আব সিঁড়ি মাড়াই না।”

শোভাবতী অতিকষ্টে একটা একটা করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়ও ছিল একটি শিশুকথা, এবারেও তাই। তফাতের মধ্যে প্রথমবারের সঙ্গিনীটি ছিল তাহার কথ্য, এবারেবটি তাহার নাতনী, দুর্গার কথ্য ইলা। শোভাবতীর নিজের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে উজ্জ্বল গৌবর্ণ ক্রমে স্নান হইতে হইতে একরকম কালোই হইয়া গিয়াছে। চব্বিশ বৎসর বয়সের সে ‘সঞ্চারিণী’ পল্লবিনী সত্যের মত দেহবষ্টি আর নাই, এখন সে বিপুলায়তনা বাঙালী গৃহিণী। মাথার সামনের চুলে পাক ধরিয়াছে, টাকও একটুখানি দেখা দিয়াছে, সেটা চাকিব্বার জন্ত সীমস্তে খুব চওড়া কবির। সিন্দূর গোপা। পরণে তাহার সেমিজের উপর বিপুল লালপাড়ফুল গরদ; ব্লাউন্স পেটিকোট পবার উৎপাত সে অনেকদিন চুকাইয়া দিয়াছে। গিন্নি মল্লেশ্বরের আর সে সবে প্রয়োজন কি? সঙ্গে কয়েকটি খুব মোটা মোটা সোনার গহনা। সচবাচর এগুলি ব্যবহার না করিলেও, ভানুমতীর বাড়ী আসিতে হইলে শোভাবতী সর্বদাই বথাসাধ্য গহনা পরিয়া আসে। নাই বা সেখানে কেহ থাকিল, তবু একে জমিদারবাড়ী, তাতে কুটুম্বের বাড়ী।

ইলাকে লইয়া উপরে উঠিতে শোভাবতী হাঁপাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভানুমতী বলিল, “নামিবে দাও মেজদি,

ইলাকে। এদানীং যা মোটা হ’বে পড়েছ, আর ছেঁদে পিলে কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা তোমাব পোষায় না। তবে ও মাঝি, এদিকে আর, ইলাকে উপরে দিবে যা।”

মাঝবী ছুটিয়া আসিয়া ইলাকে বহন করিয়া আনি। শোভাবতী কোনোমতে উপরে উঠিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, “কেন রে চোখ দিচ্ছি? মোটা হব না ত কি? মোটা হবার ত বয়েসই হয়েছে, নাতী নাতনীর মুখ দেবেছি। তোর মত কি চারকাল প্যাকাটির মত শবীরই থাকবে? দেখিস্ এখন, বৌ এলে তোকে কি রকম হোমান দেথাবে তার পাশে।” শোভাবতীকে মোটা বলিলে সে বড়ই চাটবা যায়।

ভানুমতী হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা, আগে বউই আম্বক, তারপর আমায় যেমন দেখাবার দেখাবে। চল ঘরে বসবে চল, একেবারে হাঁকিয়ে পড়েছ। মাঝি, খুকীকে নিয়ে তুই নীচে যা, ভবানীকে বল ওকে গিষ্টি দিতে। উপরে পান আর খাবার জল পাঠিয়ে দে।”

কথা বলিতে বলিতে, দুইবোনে আসিয়া ভানুমতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দিনের বেলায় অসহ্য গরম কাটিয়া গিয়া, এখন সন্ধ্যার সময় বেশ একটুখানি ঝিরঝির করিয়া হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেজের উপর একখানা মাহুর পাতিয়া ভানুমতী বলিল, “বোস্ ভাই মেজদি। তারপর তোমার কর্তাটির খবর কি? আর যে একেবারেই এ-মুখো হন না?”

শোভাবতী বলিল, “আছেন একরকম। শীতটা গিবে বাতের বেদনাটা খানিকটা গিয়েছে। কোন্ মুখোই লা হন? সারাদিন ত আছেন নিজের কাগজপত্র, মল্লেশ্বরের আদালত নিয়ে। ছেলোটোর ক’টা ভাল ভাল সঙ্গী এসে ফিরে গেল, তা সেদিকেও খেয়াল নেই। নিজেই বেশ নিবেই আছে। আমি আছি ব’লে তাই, তা না হ’লে খাওয়া-নাওয়াও এতদিনে উঠে যেত বোধ হয়।”

ভানুমতী উৎসুক হইয়া বলিল, “অনেক সম্বন্ধ আসছে নাকি স্ত্রীলোকের ? ওমা, তা বাপ একবার খেয়ালও করে না ? বিয়ে দেবার মতলব নেই নাকি ছেলের ?”

শোভাবতী তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, “কে জানে ! বললে বলেন বোস, রোস, এরই মধ্যে তোমার ছেলের বিয়ের বয়স উৎরে গেল নাকি ? ক’হাজাব কামাচ্ছে তোমার ছেলে ? বিয়ে ক’বে বৌকে খাওয়াতে পাববে ত ?”

ভানুমতী বলিল, “আহা, ঘরে খাবার বড় ভাবনা, সেই হুঃখে আর ছেলের বিষেই হচ্ছেনা ! আজকালকার পুরুষ-মানুষগুলির ধরণই হচ্ছে এক অদ্ভুত ! যেমন ছেলে, তেমনি বড়ো ! খোকাটাকে দেখনা, একবার বিয়ের নাম কবলেই যেন মারমুখো হ’য়ে আসে। এবার তবু কত কষ্টে একটুখানি নিম্নরাজী মতন হয়েছে। সেইজন্তেই আজ তোমায় আসতে বললুম, এই বেলা যদি কিছু পাকাপাকি ক’রে নেওয়া যায়।”

শোভাবতী উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “খোকা রাজী হয়েছে তা হ’লে ? ওরা ত শুনলে বর্তে যাবে। আমার ত গানের মাংস খুলে খাচ্ছে, কবে মেয়ে দেখতে আসবে, কবে মেয়ে দেখতে আসবে ক’রে। এইবার তাহ’লে ব’লে দেব। কি বললে খোকা ?”

ভানুমতী বলিল, “পুরোপুরি রাজী আর কৈ ? তবে অনেক বলা-কওয়াতে মেয়ে দেখে আসতে রাজী হয়েছে। আমি বলেছি মেয়ে যদি তার পছন্দ না হয়, তবে আমি আর কথাটি কইব না। মেয়ে খুব সুন্দর ত ? আমি ত সেই আশায় আছি। তা না হ’লে যে মাথা-পাগুলা ছেলে আমার, কোন্ দিন এক মেম বউ এনেই হবত হাঙ্গির করবে। বড় ভয়ে ভয়ে আছি।”

মাববী পান ও জল আনিয়া রাখিল গোটা দুই পান একসঙ্গে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া, অম্পষ্ট স্বরে শোভাবতী বলিল, “তা মেয়ে কিছু নিম্নের নয়, আমার নিজের চোখে দেখা মেয়ে। তোদের ঘরের কিছু অসুগুণি হবে না। রং খুব ফরশা, তোর মত হবে। চুল খুলে দেখিনি, তবে খুব চুল আছে ব’লে শুনি। তা কবে স্নবিধে হবে ব’লে দিস, ওরা দিন দেখে সব ঠিক কববে।”

ভানুমতী বলিল, “শনি-রবিবারের মধ্যে যদি ভাল দিন থাকে, তাহ’লে তখনই যেন ঠিক কবে। অল্প দিন আবার খোকার কলেজ থাকে, সে যেতে চাইবে না। দু চারজন বন্ধু-বান্ধব তাব সঙ্গে যাবে বোধ হয়। তাছাড়া দেওয়ানজি-কে আসতে লিখতে হবে, সম্বন্ধ ঠিক ক’বে, তিনিও যাবেন। একজন বোঝা-শোনা মানুষও সঙ্গে থাকা ভাল।”

শোভাবতী বলিল, “তবে তাই ব’লে দেব। ওদের বড় মেয়েটার স্বস্তরবাড়ী আমার বাড়ীর খুব কাছেই, রোজই ছাতে উঠে কথাবার্তা বলে। তাকে বললেই সে তখুনি খবর পাঠিয়ে দেবে। তারপর, তুই আছিস্ কেমন ? একটু যেন ভালই দেখছি। এবার একাদশীর পব আর অশুখ করেনি ত ?”

ভানুমতী বলিল, “না এবার ত অনেকটা ভালই আছি। গরমটা কমলে আর একটু সাব্ব বোধ হয়। ডাক্তারে বলছে পুজোর ছুটিতে হাওয়া বদল কবতে যেতে, কোথায় যাব তাই ভাবছি। আমার ইচ্ছা পুরী যাই, তা খোকা যেতে চাষ না ; বলে, ‘ওখানে দেখবাব জিনিষের মধ্যে সমুদ্র আব উড়ে, দুটোই আমার দেখা আছে, আর দেখতে চাই না।’”

শোভাবতী বলিল, “আমবা এবার দেওঘর যাচ্ছি, চল্‌না আমাদের সঙ্গে ? খোকা না হয় তার যেখানে খুসি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেড়িয়ে আসবে। তুই গেলে ত আমিও বাঁচি, একজন কথা বলবার লোক পাওয়া যায়।”

ভানুমতী বলিল, “সে হ’লে ত আমিও বাঁচি। যাক্, সে এখনও মাস দুই তিন পরের কথা। এখন আগে খোকার বিয়ের একটা ব্যবস্থা যেমন ক’রে হোক করতে হচ্ছে। যা ত শরীর, কবে আছি, কবে নেই। এখন একটা নাতি দেখে যেতে পারলে আব হুঃখ থাকে না। নিজের সব গহনাগুলো দিবে সাজিয়ে, একটি টুকটুকে বৌ-এর মুখ দেখতেও বড় সাধ যায়।”

শোভাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “অত সাধ ক’রে তোর জন্তে সব গড়িয়েছিল রে ! ক’ দিনই বা পরতে পেলি ? এখন কোন্ ঘরের কোন্ বেটা এসে সব জুড়ে বসবে।”

ভানুমতী বলিল, “যাক্ গে ভাই, সে কথা আর তুলিস্

নে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল ঘটেছে, এখন বোএব অদৃষ্টে যেন শাঁখা, সিঁছর, গহনা, সব অক্ষয় হয়ে থাকে। তুমি আজই ওদের খবর দিও কিন্তু।”

শোভাবতী বলিল, “তা ঠিক দেব। তোর গাড়ীটা একটু ব’লে দে, আমায় দিয়ে আসুক গিয়ে। আজ আবার দুর্গার দেওর ছোটোকে খেতে বলেছি, একটু রান্নাবান্নাগুলো না দেখলে চলবে না।”

শোভাবতী চলিয়া যাইবার পর, সুরীরের অপেক্ষায় ভানুমতী খানিকক্ষণ বসিয়াই রহিল। কিন্তু মাসীয়ার সহিত দেখা হওয়ার ভয়েই হোক, কি সিনেমাতে গিয়াছিল বলিয়াই হোক, সুরার সেদিন অনেক দেৱী করিয়াই ফিরিল। তাহার পূর্বেই ভানুমতীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া; ভবানী জোর করিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিল। কারণ ডাক্তার তাহাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রাত ন’টার বেশী যেন ভানুমতীকে কিছুতেই জাগিতে না দেওয়া হয়। স্ততরাং সে রাজে আর মাতা-পুত্রে দাশ্য হইল না।

সকাল হইবামাত্র সুরীর মায়ের মুখে খবর পাইল যে, মাসীনের শনিবারেই তাহাকে ক’নে দেখিতে যাইতে হইবে। সে দিন ভাল লগ্ন আছে, দেওয়ানজিকেও আসিতে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখন সুরীর কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইতে চায়, যেন ঠিক করিয়া রাখে। “আচ্ছা, আচ্ছা,” বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কলেক্স যাইবার ছুতা করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিল।

কলেজে গিয়া চন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ বলিয়া আর একটা ছেলেকে সে এই বিজয়বাত্রার সঙ্গী নির্বাচন করিল। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে, বড়’বে স্নানীল ও সুরোধ বাগকের মত মায়ের নান্দীচিহ্ন কনে দেখতে চলেছিস্? তোর এত সব বক্তৃতা গেল কোথায়?”

সুরীর বলিল, “ক’নে দেখার বিরুদ্ধে ত আমি কোন বক্তৃতাই করিনি। বিয়ে করব এমন কোনো কথা আমি দিই নি।”

প্রবোধ বলিল, “বিবেই যদি করবে না ত মেয়ে দেখতে গিয়ে লাভ? এত সার্কাস বা বায়োঙ্কোপ নয়?”

সুরীর বলিল, “তারা এবং আমার মা যখন আমাদের সে মেয়ে না দেখিয়ে ছাড়বেন না, তখন আমি দেখাটা চুকিয়ে

দিয়ে নিশ্চিন্ত হ’তে চাই। তা না হ’লে ভদ্রলোকের মেরেকে অকারণ সংএব মত সামনে এনে দাড় করাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই।”

চন্দ্রনাথ বলিল, “মেয়ে যদি খুব সুন্দরী হয়, এবং তোর পছন্দও হয়, তাহ’লেও তুই বিবে করবি না?”

সুরীর বলিল, “আমার পছন্দ হবে না, পরীষ বাচ্ছা হ’লেও না। বারো-তেবো বছরের মেয়েকে বিবাহের purposeএ পছন্দ হওয়াটাকে আমি চরিত্রের একটা criminal weakness মনে করি। যাদের মা বাবার কোলে থাকবার কথা, তাদের ছেলের মা হ’তে বাধ্য করাটা আইনে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।”

প্রবোধের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বৌ এখন পর্যন্ত কিশোরীই। সে একটু দুঃখ হইবা বলিল, “তুমি বড় strong language ব্যবহার কর হে। অমন বলেও সবাই, বিয়েও শেষে ছোট মেয়েকে করে সবাই। যে দেশের বা। আমাদের পাঁচজনের ঘরে একেবারে পাকা-পোক্ত ঝামু মেয়ে নিরে এসে, নিজেদেরও অসুবিধা, তাদেরও অসুবিধা।” অশ্রু প্রসঙ্গ বলিয়া কথাটা তিন বন্ধুতে ঐ-খানেই চাপা দিল।

শনিবার দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। ক’নেব বাড়ীর লোক খুব খুশী হইয়াঃ দিনক্ষণ সব তাতেই রাজী হইয়াছে। বুদ্ধ দেওয়ানজীও সময় মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুরার ও তাহার দুই বন্ধু তাহার বসিবার ঘবে বসিয়া সমরোপযোগী গোলমাল করিতেছে। অন্তঃপুরে শোভাবতী, দুর্গা, বিজনবালা, তাহার ছোটজা প্রভৃতি মিসিয়া বিধিমতে ছেলেকে খাড়া করাইয়া পাঠাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। একমাত্র ছেলে, কোথাও যেন বিন্দুমাত্র ক্রিয়াকলাপের ক্রটি না হয়, এই ভানুমতীর ইচ্ছা। সে বিববা, তাহার শুভকর্ষের কোথাও ছায়াপাত করিতে নাই, সে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

নিতাস্তই ক’নে দেখিতে যাইবার ব্যাপার, তাহা হইবা কত আর ঘটা করা যায়? শীঘ্রই সুরীরের ডাক পড়িল। সে বন্ধুদের বসিতে বলিয়া ভিতরে আসিবামাত্র, তাহার ম, মাসী, দিদি, কাকী প্রাণ সম্বন্ধে কথা বলিয়া উঠিলেন। শোভাবতী বলিলেন, “এই এক আমাদের ভট্টাচ্য বামুন

ছেলে হয়েছেন! কেন বে, একখানা ভাল কাপড়-জামাও কি পরতে নেই? এ কি কাবো বাপেব শ্রাদ্ধে মস্ত পড়াতে যাচ্ছি?”

ভানুমতী বলিল, “কোথায় পাবে বল? মাত্র তিন আলমারী কাপড়, জামা, চাদর ওর? সে সব কার জন্তে জমা করছি?”

সুবীর কথা না বলিয়াই ফিরিয়া গেল, এবং মিনিটকয়েক পরে চান্দাই ধুতি, গবদের পাঞ্জাবী, বেনারসী চাদরে সজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ভানুমতীর ইচ্ছা ছিল, দায়ী বিষ্ট-ওঘাচ, হীরার আংটি, বোতাম প্রভৃতিগুলোও ছেলের গায়ে ওঠে; কিন্তু বেশী বকাবকি করিলে পাছে ছেলে একেবারেই বাকিয়া বসে, এই ভয়ে সে আর কিছু বলিল না। শীঘ্রই বিবিমতে যাত্রা করিয়া, মোটর-হর্ণের শব্দে পাড়া কাপাইয়া সুবীর ক’নে দেখিতে বাহির হইয়া গেল। বুদ্ধ দেওয়ানজী এবং তাঁহার সঙ্গী এক প্রোট ভদ্রলোক আর একখানা ধারকবা মোটরে করিয়া পিছনে চলিলেন।

মেদের বাপ রাধিকাপ্রসাদ মিত্র ওকালতী করিয়া নিতান্ত কম পয়সা রোজগার করেন নাই। আজকাল কৰ্ম হইতে একরকম অবসর গ্রহণ কবিষাছেন। ভবানীপুরেই কিছু দূরে তাঁহার বাড়ী। আত্মীয়স্বজন লইয়া পরিবারটি নিতান্ত ছোট নয়।

বৈঠকখানায় তখন বাড়ীর লোক, আত্মীয় কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী মিলিয়া রীতিমত ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। জমিদার-পুত্র ভাবী বরকে দেখিতে মেয়েদেবও উৎসাহের অন্তঃ নাই, কাজেই অন্তঃপুরও কোলাহল-মুখরিত। দুইটি ঘরে লোক জমা হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। ভাঁড়ার ঘরে যেখানে জলখাবার সাজানো হইতেছে, সেখানে বাড়ীর যত বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার সঙ্গে পাড়ার যত গৃহিণীর দল আসিয়া যোগ দিয়াছেন। অবোধে সমালোচনা চলিতেছে। আর একটি বড় ঘরে সেটি বাড়ীর এক বোঁএব শয়নকক্ষ, ক’নে সাজানোব জের এখনও চলিতেছে। বার পাঁচ ছয় সাজ বদল করিয়া ক’নে বেচারী এতক্ষণে বেন একটু নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ঘবভরা বালিকা, কিশোরী ও তরুণী। এখনও কেহ বা কনের চুপটা একটু টানিয়া সাম্নে নামাইয়া দিতেছে, কেহ বা গালে ও কপালে অল্প একটু পাউডার যোগ

করিয়া দিতেছে, এখানের ত্রোটটি টানিয়া ওখানে করিয়া দিতেছে।

এমন সময় বাহিরে মোটরের বাণী শোনা গেল। “ঐ রে, এসে পড়েছে,” বলিয়া বালকবালিকার দল বাড়ী কাঁপাইয়া সদরের দিকে দৌড় দিল। কিশোরী ও যুবতীর দল দরজা জানলার ফাঁকে ফাঁকে উকি মারিয়াই কোতুল চরিতার্থ কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিল।

সুবীরদের মোটর দুইখানা বাড়ীর সাম্নে আঁসিবামাত্র, বৈঠকখানা হইতে তাহাদের অভ্যর্থনা কবিবাব জন্ত প্রায় শ’ধানিক লোক বাহিব হইয়া আসিল। বিপুল সমারোহ করিয়া তাহাদের লইয়া গিয়া বনানো হইল। মেয়েব বাপ খুড়ো প্রভৃতির সঙ্গে দেওয়ানজী ও তাঁহার বুদ্ধ সঙ্গীটাই কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন, ছেলেরা একটু দূবেই বসিল। পাড়ার যুবকের দল তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার জন্ত আসিয়া জুটিল।

প্রথমে আসিল জলখাবারের ডাক। সকলকে পাশেব ঘরে উঠিয়া বসিতে হইল। চাওজনের জায়গা পাশাপাশি করা হইয়াছে, মার্কেল-মণ্ডিত মেয়ের উপর। আসনগুলি কাণো মথমলের, বাসনগুলি রূপার এবং খেতে পাথরের। এক একজনের জন্ত যাহা জলখাবার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গোটা চার মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পাবে। ধালা, বেকাবী, বাটি, গেলাস বহুদূব জুড়িয়া সাজানো হইয়াছে। সুবীর বসিয়াই চন্দ্রনাথের কানে কানে বলিল, “কি হে হামাগুড়ি দিতে হবে নাকি শেষে? এত দূর পর্যন্ত হাত ত পৌছবে না। ক’নেব বাড়ীর লোকেবা কি আমাদের মানুষের আদিপুৰুষ বলে ভ্রম করছেন?”

প্রবোধ বলিল, “গল্প শুনেছি, অনেক বনিযাদী বাড়ীতে এইরকম করে খাবার সাজালে, সঙ্গে একটা বাকানো কাঠেব লাঠি দিয়ে দেখ, যাতে দূরেব বাটিগুলো টেনে নিতে পারে।”

সুবীর বলিল, “ভাগ্যে আমাদের তা দেয়নি। আমি অন্ততঃ লাঠি দেখলে তাব অর্থ অল্প রকম কর্তাম।”

হাস্তালাপের ভিতর জলযোগ শেষ হইয়া গেল। যাহা খাইল, তাহার দশগুণ জিনিষ নষ্ট করিয়া, নিমজ্জিতের দল উঠিয়া গেল। বৈঠকখানায় গিয়া বসিবামাত্র মেয়ের এক খুড়া ইঁাকিয়া বলিলেন, “ওবে নলি, পান দিয়ে বা।”

কল্পা পান লইয়া প্রবেশ করিল। ইহাই রীতি, অতএব বাড়ীতে একশ' জন চাকর-বাকর থাকিলেও মেয়েকে পান লইয়াই আসিতে হইবে। অবশ্য তাহার হাতে মাত্র একটি মাঝারী গোছের কপার ডিবা; বেশীভাগ পান, মশলা দাসীতেই বহন করিয়া আনিয়া। মেয়ে পান আনিয়া বুদ্ধ দেওয়ানজীর সামনে রাখিল, কোনোমতে একটা প্রণামও তাঁহাকে করিয়া ফেলিল।

চাব পাঁচ জোড়া চোখ আসিয়া পড়িল মেয়েটির মুখের উপর। সূবীর দেখিল, সামনে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া, তাহার রং উজ্জল গৌরবর্ণ, মুখশ্রীও সুন্দর। তবে সে নিতান্তই বালিকা, বয়স কিছুতেই তেরোর বেশী হইবে না। তাহাব মনে হইল একটু কম করিয়া সাজাইলে ইহার স্বাভাবিক শ্রী অনেক খানিই ধরা পড়িত। মূল্যবান বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ী, জামা, ও ধারকরা মণিমুক্তাব ভারের তলাব মেয়ে যে কোণাথ তলাইয়া গিয়াছে তাহাকে প্রায় খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। তবু মেয়েটি যে সুন্দরী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মেয়ের সহিত কথা বলার ভার বুদ্ধ দেওয়ানই গ্রহণ করিলেন। ক'নের নাম নলিনী, সে ফোর্থ ক্লাশে পড়ে। রান্নাবান্না শিখিতেছে, আলুব দম ও মাংস রাঁবিতে জানে, শিঙাড়া পান্তর প্রভৃতিও অল্প জানে। শেলাই শেষে সে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর কাছে। তাহার হাতের কাজ কয়েকটা পরীক্ষার্থে উপস্থিতও করা হইল। মোটেই উপর সে বেশ প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সূবীর বা তাহার বন্ধুরা কল্পাকে কোন প্রশ্নই করিল না।

চন্দ্রনাথ বলিল, “কি হে কেমন দেখ্‌ছ? আমার ত সব দিক দিবে বেশ ভাগই মনে হচ্ছে।”

সূবীর বলিল, “ভালই ত।”

প্রবাব বলিল, “তবে চাঁদ, পথে এসো। এই না ছোট মেয়ে তোমাব ভাবি অপছন্দ? এবাব কেমন?”

সূবীর বলিল, “আমার মতের কোনো পরিবর্তন হইবে ব'লে ত বুঝি না। মেয়েটি দেখতে ভাল, লেখাপড়া, কাজ-কর্ম শিখেছে, কিছুই অস্বীকার করা যায় না। আমার যদি মেয়ে adopt কব্বার সখ থাকত, তাহলে একে ঠিক পছন্দ কব্বাম। বেশ কচি মুখ, গাল টিপলে দুখ বেবয়।”

তাহাব বন্ধুবা বলিল, “তোমাব মত ফাজিল ছুনিয়'র নেই হে! কি চাও তুমি?”

সূবীর বলিল, “জানিনা। হরত কখনও কাউকে দেখে মনে হবে ‘একে চাই’। তখন বুঝবে আমাব আদর্শটা কি।”

মতামত পবেজ্ঞানান হইবে বলিয়া ববপক্ষ প্রস্থান করিলেন। কল্পাপক্ষে তখন ববের চেহারা স্বভাব চরিত্র প্রভৃতি লইয়া মহা সমালোচনা লাগিয়া গেল। সূবীর যে নিশ্চয়ই বেশ কিছু অহঙ্কারী এ বিষয়ে প্রায় সকলেরই একমত দেখা গেল। হইলই বা জমিদারের ছেলে, তাই বলিয়া এত নাক সিঁটুকাইবার ঘটা কেন; তাহারা কি এতই ফেল্‌না? তাহাদের মেয়ে পাইলেও অনেক লোকে লুফিয়া নেষ।

১২

স্কুলের ঘণ্টা পড়িতে তখনও কিছু দেরি ছিল, কৃষ্ণা সেই অবসরে নিজের ঘরখানা গোছাইয়া-গাছাইয়া একটু ভদ্র করিয়া তুলিতেছে। সবে কাল সে আসিয়া পৌছিয়াছে, কাজেই জিনিষপত্র যেমন-তেমন ভাবে ঘরময় ছড়ানো। বাব্ব এখনও তালাবন্ধ, স্ট্রুকেস্টাও; তাই, কেবল বিছানাটা খোলা হইয়াছে।

কৃষ্ণাব ঘরখানা ছোটই, বাতাসও বিশেষ নাই, তবে আলো আছে এই বা বক্ষা। ঘরের দেওয়ালে কৃষ্ণার নিজের, তাহার সহপাঠিনী বন্ধুদের এবং তাহাব পালিকা মাতার অনেকগুলি ছবি, সুদৃশ্য কালো ফ্রেমে বাঁধানো। এক কোণে একটি কালো মেহগনির ড্রেসিং চেই, আর এক কোণে আয়না। ঘরের সব আসবাবই খুব চক্‌চকে কালো পালিশের।

স্ট্রুকেস্ট খুলিয়া তাহার ভিতরের কাপড়, ব্লাউস পেটিকোট প্রভৃতি কৃষ্ণা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। সেগুলি পরিপাটি করিয়া আল্‌নার গোছাইতেছে, এমন সময় দরজায় টোকা দিয়া মিহি গলায় কে জিজ্ঞাসা করিল, “কৃষ্ণাদি, আস্‌ব?”

কৃষ্ণা বলিল, “এসো।” মেয়েটি ঢুকিয়া একখানা চিঠি আঁগাইয়া ধরিয়া বলিল, “দেওয়ান এখনু দিবে গেল।”

উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়াই কৃষ্ণা বুকিস চিঠিখানা লাভগ্যার। মনে মনে হাসিয়া বলিল, “বাপ্বে, কি অদাবারণ বন্ধুপ্রীতি! সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চিঠি হাজির!”

ঠিক এই সময় চং চং কবিবা স্কুলের ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। হাতের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চিঠিখানা বন্ধ অবস্থাতেই একটা দেয়ালে ঢুকাইয়া দিরা, কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি জুতা মোজা পবিয়া নীচে নামিয়া গেল। লম্বা ছুটি-ভোগের পর, আবাব একটানা পাঁচ ঘন্টা চীৎকার কবিয়া পড়াইতে তাহার বেশ পবিশ্রম বোধ হইতে লাগিল। মেয়েগুলি দেড়মাস মা-বাপের আদর খাইয়া আরো যেন বেঘাড়া হইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশই ছুটির পড়া কিছুই করে নাই। অনেক বকুনি এবং শাস্তি বিতরণ করিয়া, একেবারে শ্রান্ত হইয়া চাবটার সময় কৃষ্ণা আবাব নিজের ঘবে ফিরিয়া আসিল।

চান খাইয়া আর কাজে হাত দিবেনা ঠিক করিয়া সে খাটের উপর একটু গড়াইয়া লইল। লাভগ্যার চিঠি তখনও পড়া হয় নাই। দেয়াল হইতে সেটা টানিয়া বাহির কবিয়া শুইয়া শুইয়াই পড়িতে লাগিল।

গিরিডি

বাণীকুঞ্জ

ভাই কৃষ্ণা,

তুই গিয়ে গিরিডিটা একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে। তুই নামে কালো, কিন্তু কাজে ছিলি আলো। যা হোক, আর দিন পাঁচ পবে আগিও যাব মনে ক'রে, বিবহটা কোনোমতে সস্থ ক'রে যাচ্ছি। বেড়ানোটা বন্ধই আছে, কার সঙ্গেই বা বেড়াব? রাতদিন সেলাই ক'বে ভাই-বোন্দের একবছরের মত কাপড় চোপড় ক'রে দিচ্ছি, যাতে পূজোর ছুটিতে এসে আবাব না সিঙ্গারের কল নিয়ে বসতে হয়।

গীলা, বেলা, নূতন ক্রক প'রে একদিন বেড়াতে এসেছিল, তখনকেই বেশ মানিয়েছে। থোকা নাকি তার খেলনা এরই মধ্যে ভেঙে ফেলেছে।

এখন আসল কথা পাড়া যাক। তুই আমাব কাজের সন্ধান পেলে চোখ কান খোলা রাখতে বলেছি, না? আমি কল্কাতায় না গিয়েই এক কাজের সন্ধান পেয়েছি। মাইনে

বেশ আছে, তোর আমেরিকা যাবার জাহাজ ভাড়াটাড়া গোছাবাব সুবিধাই হবে। তবে কাজটা তোর সুবিধাব যাগ্বে কিনা তা জানি না।

আমাদের বাড়ীর সামনের লাশবাড়ীটা এতকাল খালি থেকে, হটাৎ এক ভাড়াটে লাভ করেছে দেখেই গিয়েছিলি। কাল অকস্মাৎ তাদের বাড়ীর এক পাল মেয়ে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী এসে হাজির। তুই তখন সবে বিদায় হ'য়ে গিয়েছিলি। সন্ধ্যাটা একবকম ক'রে কেটে যাবে, আশা ক'রে, তাদের সাদরেই অভ্যর্থনা করেছিলাম। ছুটি বউ, একটি গিন্নি, এবং গোটাচার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। গিন্নির স্বামী মস্ত বড় মানুষ, লাখপতি একেবারে। বস্মাতে কাঠের ব্যবসা করেন। তিনি নানা স্থানে ঘোরেন, গিন্নি ছেলে পিলে বউ ইত্যাদি নিয়ে বেঙুনেই বাস করেন। তা না হ'লে ছেলে-পিলের পড়ানোর সুবিধা হয় না। বড় ছেলেছটি বিলাতে আছে, বউদের গিন্নি নিজের কাছেই রেখেছেন। এদের ইংবেজী পড়াতে এবং গান বাজনা শেখাতে চান। তাদের ভয়, পাছে বিলাত থেকে এসে অশিক্ষিত স্ত্রীদের ছেলেরা পছন্দ না করে। কিন্তু মেয়ের কাছে পড়াতে সম্পূর্ণ নারাজ। একটা বাঙালী টাচার চান, ব্রাহ্ম কি হিন্দু হ'লেই ভাল, ক্রীশ্চান হ'লেও খুব বেশী আপত্তি নেই। তবে গরু-টরু না খায়, এমন হলেই ভাল। তাকে থাকার ঘর, খাওয়া-দাওয়া বাদে দু'শো টাকা মাইনে দিতে রাজী আছে, যদি সেলাই, গান বাজনা, পড়ানো, সবেরই ভার নিতে পারে।

শুনবামাত্র আমার তোর কথা মনে হ'ল। একাধারে এত গুণ এক তোর আছে ব'লেই জানি। দেখ, কবি নাকি? খাওয়া-দাওয়ার কোনো খরচ নেই, বাবুগিবি ক'বে যদি একশ টাকাও ওড়াস, তাহ'লেও একশ টাকা মাসে save করতে পারবি। বছর খানেক কাজ ক'লেই তোব Passage money জমা হ'বে যাবে।

ভেবে চিন্তে কাজ কবিস্ কিন্তু বাপু। আমি শুধু সন্ধান ব'লে দিচ্ছি, এদের সঙ্গে আমাব চেনা-শোনাও নেই, কেমন মানুষ, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানি না। মগের মুগ্ধক, নিতান্ত কাছেও নয়। তোর বয়স অল্প, কপের বালাইও কম নেই, বিপদের আশঙ্কা আছে। তবে এদের বাড়ীটা একেবারে

প্রমীলার রাজ্য, নিতান্ত বাচ্চা ছাড়া, পুরুষ জাতীয় কোনো জীব নেই, সে দিক দিয়ে খানিকটা safe ; আব রেজুনে আমাদের চেনা-শোনা বাঙালী আবো ছ-চাব ঘর আছেন, তাঁবাও তোর খোঁজ খবর নিতে পারবেন। দেশে থাকলে বেশী মাইনে তুই পাবি না। বড় জোর একশ', তাও পাওয়া খুব শক্ত।

গিন্নীটিকে মানুষ ভাল মনে হ'ল, তাই তোর কথা বললাম। তিনি ত তোকে না দেখেই বাজী, এখন তুই রাজী হ'লেই হয়। এবা মাস খানিক পরে কলকাতা যাবে, সেখান থেকে বন্দা ফিরবে। তুই যদি কাজটা নিতে চাস, তা হ'লে আমি তোকে নিয়ে গিয়ে এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে দেব। তাদের কথা-বার্তার বুঝলাম বেশ smart, up-to-date মানুষই এবা চায়, তবে অতিশয় বেশী modernism বোঝে সব তাদের হজম হবে না। এক কথাব তাবা ঠিক তোর মত একটি মানুষ চায়। এখন তোর পছন্দ হ'লেই হয়।

চিঠির উত্তর এখানেও দিতে পারিস, কি আমি ফিরবার পর মুখেও বলতে পারিস।

কেমন আছিস? আমবা সব এক রকম। বৃষ্টির জালাব কিছু আর ভাল লাগে না।

ইতি

লাবণ্য

চিঠিখানা শেষ করিয়া ক্লষ্ণা ভাবিতে লাগিল কি তাহাৰ করা উচিত। টাকার শোভ বে না আছে তা নয়, আবার দেশ ছাড়িবা বাইকেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু চিরকালই এই পঞ্চাশ টাকার কাজে তাহাৰ চলিবে নাকি? আমেরিকা কি বিলাত যাইতে পারিলে যথেষ্ট সুবিধা হওয়াব সম্ভাবনা। কিন্তু টাকা বোগাড় করিতে হইবে তাহাৰ নিজেকেই। সুতরাং এই ধবণের চাকরী করা ছাড়া উপায় কি?

মানুষগুলি কেমন কে জানে? কোনো বিপদ আপদ ঘটবে না? বাডীতে পুৰুষমানুষ কেহ নাই, এ একটা সুবিধার কথা। কিন্তু তবু অনেকখানি বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিবা তাহাকে বাইতে হইবে। জগতে তাহাৰ আপনার বলিতে যখন কেহই নাই, তখন অত ভাবিলে আর

চলে কই? তাহাকে আগুলাইবার মানুষ যখন ভগবান রাখেনই নাই, তখন ক'নে বউ হইবা থাকাব শোভ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। মনে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া সংসারে অকুণ্ঠিতভাবে চলাকেবা করা ছাড়া উপায় কি? সে চাকরীটা শইবেই ঠিক করিয়া ফেলিল, যদি বাডীব লোকগুলিকে দেখিবা শুনিল। তাহাব পছন্দ হয়। ল'বণ্যকে চিঠি লিখিয়া আব কাজ নাই। তদিন পরে ত সে আসিবা পৌছিলে।

ঢং ঢং কবিবা চাবের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। খাট হাড়িয়া উঠিয়া, পাছখানা একজোড়া মখমলের চট্টার ভিতব ঢুকাইবা ক্লষ্ণা নীচে চলিবা গেল। আহাবাস্তে ফিরিবা আসিবা তাহাৰ আব ঘর গোছানোর কাজে ভিড়িতে গেটেই মন গেলনা। কেবলি মনে হইতে লাগিল, এবরে আর ক'দিন ছাছি? হুদিন বাদেই পোটলাপুটলি বাঁবিবা কোন্ পথে যাত্রা করিতে হইবে ঠিকানা নাই। নিতান্ত না করিলে নয়, এমন গোটা কয়েক কাজ সারিয়া সে বেড়াইতে চলিবা গেল।

মাঝের ক'টা দিন অনেকবকম ভাবনাই সে ভাবিবা শইল। কিন্তু যাওয়াটাই শেষ পর্য্যন্ত স্থির বহিল। শুধু কলকাতা আর গিরিডি, গিরিডি আব কলকাতা কবিবা কতদিন কাটান যায়? অচেনা অদেখা দেশেব টান যেন তাহাৰ শিবায় শিবায় এখন হইতেই বাজিতে আবন্ত করিল।

লাবণ্য ফিরিবা না আসা পর্য্যন্ত সে বড় অস্থিরভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। কোনো কাজেই সে মন দিতে পাবে না। কেবলি মনে হয়, হুদিনের জন্ত কেন আর এত হাঙ্গাম করা। অথচ চারিদিকের অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলা ভিতরে ভিতরে কেবলি তাহাকে পীড়া দিতে থাকে।

যাই হোক, কোনমতে মাঝের চারপাঁচটা দিন কাটিয়া গেল, লাবণ্যও কলিকাতাৰ আসিবা পৌছিল। স্কুলেব কাজ সারিয়া ফেলিয়া, চা পাইয়া সে লাবণ্যেব সঙ্গে দেখা করিতে বাইবে বলিবা বাহির হইবা পড়িল। ফিরিতে রাত হইলেও হইতে পারে, এজন্ত মেট্রনকে তাহাৰ ঘবে থাবাব রাখিবা দিতে, এবং দরোয়ানকে গেট খোলা রাখিতে উপদেশ দিবা গেল।

কৃষ্ণা লাভণ্যর স্কুলে পৌছিয়া দেখিল, মেয়েবা মাঠে বেড়াইতেছে, লাভণ্য তাহার চিরসঙ্গী সেলাই হাতে কবিতা বেঞ্চে বসিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছে। কৃষ্ণাকে দেখিয়া, সে সেলাই রাখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “কাজটা নিবিই মনে হচ্ছে। তা না হ’লে শুধু কি আর আমার টানে, এত সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি?”

কৃষ্ণা তাহার পিঠে এক কিল মারিয়া বলিল, “তুই ভারি মিথ্যাবাদী। কবে আমি তোর সঙ্গে দেখা করিতে আসতে এক বছর দেবি করেছি শুনি?”

লাভণ্য বলিল, “তা অবশ্য করিস্ন। তাই ব’লে যেদিন আসি, সেই দিনই কিছু তোর দেখা পাই না। আচ্ছা, ঝগড়া থাক্ এখন। এই খানেই বসা যাক, আমার এখন ঘবে ঢোকবার জো নেই। তারপর, তুই কি ঠিক কবলি বল?”

কৃষ্ণা বলিল, “আমি ত যাবই ভাবছি। দুশো টাকা, আর পঞ্চাশ টাকায় ঢের তফাৎ। তবে অবশ্য মানুষ-গুলিকে না দেখে কিছু বলতে পারি না। হাজার হোক, মেয়ে মানুষ ত? তাব উপব আবার বাঙালীর মেয়ে। প্রাণে ভয়-ডর আছে ত?”

লাভণ্য বলিল, “আমাব ত বিশ্বাস তোব ভালই লাগবে। আমি যেটুকু দেখলাম, তাতে আমাব কিছু মন্দ লাগেনি। গিল্লিটি একটু হাবা-গোবা ধরণের, তবে মনটা ভাল। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা ছাড়াবটা বলবেন, সেগুলো তোকে সয়ে যেতে হবে। বোঁ ছুটি বেশ, বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, গিশুক প্রকৃতির, তোর ভালই লাগবে। খোঁজখবর নিয়ে যতদূর জানলাম, ওরা মানুষ ভালই। রেঙ্গুনে আমার এক কাকা থাকেন, তাঁর কাছেও চিঠি লিখেছি খোঁজ নেবার জন্তে। ওরা আর দশ-পনেরো দিন পরেই কলকাতা আসবে, এখানে মাস খানেক থেকে, তারপর রওনা হবে।”

কৃষ্ণা বলিল, “তবে সে ক’দিন অপেক্ষা ক’রেই দেখি। এখনি কাজে নোটিস্ দেবনা। শেষে এক্স ওকুল হুকুল যাবে?”

লাভণ্য বলিল, “নোটিস্ দেবার ঢেব সময় পাবি; ওরা কলকাতায় একমাস থাকবে ত? সেই এক মাসের নোটিস্

দিলেই চম্বে। আমি বলি, তুই কাজ নে। তোর স্বভাবে পঞ্চাশটাকাব কাজকব: বেনীদিন সহিবে না। এর থেকে বেশ বড় সুবিধা তোর হ’তে পারে।”

কৃষ্ণা বলিল, “দেখাই বাক। আচ্ছা, ওদের সব কেমন দেখে এলি? লীলা, বেলা কেমন আছে? খোকাটা আরো ছুঁই হয়েছে নাকি?”

তুই সবীতে তখন ঘবোয়া গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়ের দল তাহাদের সামনে দিয়া ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতেছিল। কৃষ্ণাব রূপ সন্দেহে যে খুব গভীর আলোচনা চলিতেছে, তাহা ইহারা বসিয়া বসিয়া টের পাইতেছিল। লাভণ্য হাসিয়া বলিল, “দেখ, মেয়েমানুষেরই মুণ্ডু ঘুরে ঘায় তোর চেহারায় দেখে, ছেলের পালের মতো পড়লে, তাদের যে কি দশা হয়, তাই ভাবছি।”

কৃষ্ণা বলিল, “অকারণ ভাবনা পরচ ক’রে কি কব্বি, আমি ত আব কোনো ছেলের কলেজে কাজ নিচ্ছি না?”

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়ের দল আস্তে আস্তে বোর্ডিংএব দিকে চলিল। লাভণ্য বলিল, “খেয়ে যা না এখানেই? তোকে যে অপূর্ব থানা খেতে হয়! একটু মুখ বদল ক’রে যা।”

কৃষ্ণা বলিল, “তা লোভ হচ্ছে বটে। আমাদের মেট্রনটির বাংলা রান্না সন্দেহে যা জান, দেখলে তোর পেটে ব্যথা ধ’রে যাবে, হাসতে হাসতে। আমিও তার চেয়ে বেশী জানি। কাল স্কুল রাঁধতে বলেছিলাম, তাতে একরাশ লঙ্কাবাঁটা দিয়ে এমন এক সুখান্দ্য তিনি তৈরী করিবে দিলেন, যে, আমার ত চক্কস্থির!”

লাভণ্য বলিল, “আমাদের সে সুখটা আছে ভাই। মাইনে কম পেলেও, আরাম ক’রে খেতে পাই। মাসীমা এখন অবস্থাব প’ড়ে বোর্ডিংএ মেট্রন-গিরি কব্বে এসেছেন, কিন্তু আগে খুব গোঁড়া হিন্দু ঘরেব বোঁ ছিলেন। শক্ত শাওড়ীর হাতে প’ড়ে রান্না বান্না খুব ভালই শিখেছেন। সামান্য শাক পাতা দিয়ে যা রাঁধেন, তাই যেন অমৃত মনে হয়।”

তুই বন্ধু উঠিয়া লাভণ্যর ঘরে চলিল। অতিথি আসিয়াছে বলিয়া লাভণ্য আজ আব খাবার ঘরে থাইতে গেলনা, দুইটি মেয়েকে ডাকিয়া তাহার ঘরেই ছজনের খাবার দিয়া থাইতে

বলিল। অল্পক্ষণেই মবেই তাহার। সাজাইয়া গুছাইয়া
জ্বলন্ত ভাত দিয়া গেল। লাভণ্য বলিল, “তোব আসাব
খবর মাসীয়াব কাছে পৌছে গেছে, দেখেছিস্? অতদিন
বেখানে তিন চারটার বেশী তরকারী থাকে না, সে স্থলে
সাজ আটটা নটা তরকারী। এরই মধ্যে ভল্লমহিলা কখন
এত রাঁধলেন জানিনা।”

কৃষ্ণা বলিল, “এব চমৎকার বাঁবেন সত্যিই, আমার
ঘাস-পাতা খাওয়া মুখে খুবই ভাল লাগছে।”

যে মেয়ে দুটি ইহাদের পরিবেশন করিতেছিল, তাহাদের
ভিতর একটি হঠাৎ অদৃষ্ট হইয়া গেল এবং অল্পপবেই
সাঁটতে করিয়' আরো তরকারী আনিয়া উপস্থিত কবিল।
কৃষ্ণা ত ব্যাপাব দেখিয়া, প্রায় পাওয়া ছাড়িয়া পলাইবার
জোঁগাড় করিল। বলিল, “বাবা! ভাল বলেছি বলে কি
আমি একলাই বোড়িং শুদ্ধ মানুষের খাবার খেয়ে যাব?
তোদেব মাসীয়া কি ভেবেছেন আমি ভাট-বানুনের
মেয়ে?”

মেয়েরা এবং লাভণ্য মিলিয়া অনুরোধ-উপবোধ করিয়াও
তাহাকে আর বেশী কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

কৃষ্ণা যখন বোড়িংএ ফিরিল তখন রাত অনেক।
মেয়েবা সব শুইতে চলিয়া গিয়াছে, দুএকটি শিক্ষয়িত্রীর ঘবে
তখনও আলো জলিতেছে। নিজের ঘরে ঢুকিয়া জুতা-মোজা
ছাড়িয়া কৃষ্ণা ঘুমাইবার জোঁগাড় করিতে লাগিল।
জানলাগুলা ভাল করিয়া খুলিয়া দিল যাহাতে
একটু বাতাস ঘরে আসিতে পারে। তাহার পর
বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আবার নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায়
মন দিল। অর্থের প্রলোভনে সে ত চলিল, কোথাব
কোনু অচেনা অজানা মানুষের মধ্যে। ইহার পর
তাহাব ভাগ্যে কি বে আছে তা কে বলিতে পারে? কিন্তু
জন্মাবধি ত তাহার প্রতি বিধাতা বিরূপ। তাহার জন্ম
প্রথম হইতেই ঘর কোথাও ছিল না। এখন আর ঘরের
মায়া কবিলে তাহাব চলিবে কেন? হৃদনের অতিথিব
মতই সে সব জাবগায় বাইবে, আসিবে, মাযার বন্ধনে বাঁধিতে
কেহই তাহাকে চাহিবে না। যবণের দিন পর্যন্ত এমনই

একাকিনীই হযত সে থাকিবে। ভালবাসা পাইবার
আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা, নারীর হৃদয় জুড়িবা থাকে
সর্বদাই, সে আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি কি কখনও হইবে না?
সকলের বাহিরের ঘরের অতিথি সে হইবে, আদরও পাইবে。
কিন্তু কাহারও হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে তাহাব প্রবেশ-ধিকার
কি ঘটিবে না?

ভাবিতে-ভাবিতে কখন বে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা
নিজেই বুঝিল না। সকালে উঠিয়া মন হইতে সকল দ্বিধা
সংশয় সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কিছু অস্বাভাবিক
বাধা যদি না জোটে তাহা হইলে সে বর্ষায যাওয়াই স্থির
করিয়া ফেলিল। সংশয়ের দোলায় ভুলিয়া গাভ নাট
কিছুই। একবার সাহসে ভর কবিয়া সে দেখিতে চায়,
অদৃষ্টে তাহার ভাল কিছু আছে কি না। বাই হোক, এই
স্কুলের চাকরীতে সে ইস্তকাই দিবে।

সেই দিনই সে পদত্যাগপত্র লিখিয়া সেক্রেটারীর কাছে
পাঠাইয়া দিল। অত্যাশ্চর্য শিক্ষয়িত্রীরা মহা ঠাট্টার ধূন
লাগাইয়া দিল। লাল সাড়ী, জামা, কিনিয়া দিবার, গহনা
গড়াইয়া দিবার জন্ত সবাই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত,
এ কথা সে ক্রমাগতই শুনিতে লাগিল।

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, “লাল না হোক, অল্প রংএব শাড়ী
জামা কিছু হযত শীগগিরই দরকার হ'তে পারে। তখন
আপনাদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাব। গহনাটাব সম্প্রতি ত
কিছু দরকার দেখছি না, পরে যদি হয ত, আপনাদের
জানাব।”

একজন শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিস্ বাব কি
সাহেবের ঘর আলো কর্তে যাচ্ছেন? গহনা-পাটব দরকার
নেই?”

কৃষ্ণা বলিল, “সাহেবের এমন মতিচ্ছন্নে ধরেনি। আমি
অল্প একটা ঘরে বাচ্ছি বটে, এবং কতকটা আলো দান
করার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু সাহেবকে নয়, দুটি ছোট মেয়েকে।”

তাহার সখী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “না, আপনি নেহাৎ
বেরসিক। এতদিনেও সাহেব জোঁটাতে পারলেন না?”

(ক্রমশঃ)

রস ও রুচি

শ্রী ব্রজচূড়ামণি হাজারা

রুচি অল্পদূরে রসের আয়োজন হয়, না, রসের অল্পগামী রুচির আবির্ভাব হয়? হুই কথাই সত্য। রস ও রুচি দুইটিরই পৃথক্ শক্তি আছে। উভয়ই পরস্পরকে বলিতে পারে—

—“leave your power to draw
And I shall have no power to follow you.”

রসনার্থ রসের ব্যাপার স্বতন্ত্র—অনেকটা স্বভাব ও অভ্যাসের অধীন। স্বভাব ও অভ্যাস অল্পদূরে রসবিশেষে রুচি হয়। যে রস লইয়া মানুষের মন ও হৃদয় চালিত ও দগিত হয় তাহারও নিয়ম অনেকটা সেইরূপ—তবে রুচির লীলা বিশেষ বিভিন্ন।

নানা বিষয়ে জন্তুদের মধ্যেও রুচির লীলা দেখা যায়। সাধারণত জীবনের অহিতকর কোনও বিষয়ে তাহাদের রুচি দেখা যায় না। মানুষ জন্তুদিগকে তাহাদের স্বভাব-বিকল্প নানা সাজে সাজাইতে পারে, নানা কাজে লাগাইতে পারে, তাহাদিগকে নানা খাওয়াইতে পারে। কিন্তু যখন তাহারা স্বভাবত জগতে স্বাবীন ভাবে নথ্য দেহে বিচরণ করে তখন তাহারা স্ব-স্ব জীবনের ও স্বাস্থ্যের উপযোগী বিষয়ই উপভোগ করে। তাহাদের পরিচ্ছদের সৃষ্টি বা রুচির বিকার নাই। প্রকৃতি-পুরীতে পশুপক্ষিগণ সজ্জীতধ্বনি করে কিন্তু তাহাদের রাগ-রাগিণী বা তালমানের বিকৃতবিশ্বাস বা অপব্যবহার নাই। তাহারা অভাবে ক্লেশ পায়, কাঁদে; আর আনন্দে সুখ পায়, হাসে। তাহারা দাম্পত্য-প্রণয় বা অপত্যস্নেহে অনভিজ্ঞ নয়! সকল বিষয়েই তাহাদের নিরূপিত স্থান ও নিয়মিত কাল আছে।

তবে তাহারা লেখাপড়া বা শিল্প জানে না। তাহাদের বর্ণমালা, বা মাত্রামিলন নাই। ছন্দ বা কাব্যশাস্ত্র নাই। কোনও ভাবের বা ভঙ্গীর বিবরণ বা ছবি সময়াস্তরে অপরের নিকট ধরিতে পারে না।

মানুষের সেই শক্তি ও সুবিধা আছে। মানুষ নানা

ভাষায়, নানা ছন্দে, নানা রঙ্গে, নানা রসে মিলাইয়া জগতের নানা ব্যাপারের কথা লিখিতে পড়িতে ও আঁকিতে শিখিয়াছে। মানুষের প্রায় সকল ব্যাপারেই—আহারে পরিচ্ছদে, গতি-বিবিতে, কাজকর্মে, দীক্ষাশিক্ষায় রুচির লীলা লক্ষিত হয়। রস ও রুচির আলোচনায় উৎকৃষ্ট নিরুপেক্ষ তুলনা হয়, মঙ্গল-অমঙ্গলের বিবেচনা হয়, সাধু-অসাধু বিচার হয়। রুচিতেই ব্যক্তিমাত্রের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

কত ভাবুক মনের ভাব প্রকাশ করিতে কত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া কত মহাত্মা ভাবার অলৌকিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। মনের ভাবের আবেগে অথবা পরের শিক্ষা ও উপকারের জন্ত, মনে চিন্তার স্রোত পরিচালন ও হৃদয়ে ভাবের সঞ্চারণ ও ভাবার বিস্তার করিবার জন্ত কত পুরাণ স্মৃতি ও কাব্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ‘বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ’ রসের সমাবেশ পূর্বক হৃদয় আকর্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসার ও সমাজের চিত্র প্রদর্শন উদ্দেশ্যেও বহু নাটক ও চরিতা-বলীর রচনা হইয়াছে।

আজকাল অসংখ্য উপন্যাস ও অভাবনীয় গল্প ও কথার অজস্র বর্ষণ হইতেছে। লেখার লাগিতা ও লেখকের নিপুণতার নিত্যনব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুলভ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার অন্ত নাই। কবিতার ও ছড়ার ছড়াছড়ি। কিন্তু অধিক স্থলেই সহৃদয় বা স্নেহের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সেগুলি পাঠ করিলে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপভ্রংশ আধুনিক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর রীতি-নীতির কথা মনে পড়িয়া যায়। লেখা-পড়ার বহু বিস্তার হইয়াছে; নানা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু ভাবের সাধুতা, ভাবার সৌন্দর্য্য এবং কথার স্নেহচিহ্ন বড় বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

সুন্দর সামগ্রী যতই বুদ্ধি পায় ততই সুখের কথা। যখন পড়িবার লোক ছিল না তখনও বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এখনও তাহাব আবিষ্কার, মুদ্রাঙ্কন, প্রকাশ ও প্রচার চলিতেছে। যে-সকল গ্রন্থে শিথিবাব ভাবিবাব ও চরিত্র গঠন করিবাব অনেক বিষয় আছে তাহার প্রচারও পাঠক বিবগ। এখন রাজনীতির চর্চাতে যেমন শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকাব ব্যক্তি সতত নিরত, উদারনীতি লইয়া বনোজ্যেষ্ঠগণ ততোধিক বিবত। তাহার বশে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়া লেখক বহুপাঠক আকর্ষণের চিন্তাতেই আকুল। সূত্ররং দৃষ্টি সেই দিকে থাকাব অতদিক হইতে স্বতই ভ্রষ্ট হইয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষার কথা মনে নাই। অবসর-রঞ্জন ও সহজে সাধাবণের হৃদয়-বিনোদন ও দৃষ্টি আকর্ষণই প্রবান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

দোকানদারী বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধ-রুচি ছবির অল্পকরণে সাধাবণের উন্নতি শিক্ষা বা পাঠ্যব জ্ঞান প্রবর্তিত অনেক মাসিক পত্রিকা এবং অনেক গ্রন্থও সুরুচি-বিগর্হিত বিচিত্র চিত্রে পবিপূর্ণ। পত্রিকার বা গ্রন্থের মলাট উন্টাইলেই নূতন পত্রিকার মত বহু বিজ্ঞাপনপত্র পার হইতে পারিলে তবে আসল পত্রিকাব খোল দেখা যায়। এইসকল বিজ্ঞাপনে যে কুরুচিপূর্ণ ছবি বা কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার হয় তাহার কথা দূরে। আসল পত্রিকায় বা গ্রন্থের আচ্ছাদিত কলেবরে তাহারই প্রবন্ধাবলির মধ্যে কচিং প্রাসঙ্গিক অধিক স্থলে অপ্রাসঙ্গিক, ভাবে নানা রসের দৃষ্টি গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কবিতা কুরুচি-বচিত। সুরুচিব পবিচয় ছুপ্রাপ্য।

এইরূপ বিধানের উপযোগিতার বিচার কে করবে? বোধ হয় কোনও সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তি ইহার নিন্দা করায় একটি মাসিক পত্রিকা এই কচিরিচারের টিপ্পনি কবিত্তে গিয়া আদর্শ মাতৃমূর্তির চিত্র দিয়াছেন—কেবল মস্তকটি এবং মস্তকেই হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সংলগ্ন—অত্যাঙ্গ অঙ্গ লুপ্ত। কি সুরুচি ও পবিত্রতার পরিচয়!

অনেক দেশে দেবদেবীর পূজা উপসংক্ষে দেবালয়ের সন্নিকটে বা প্রাঙ্গণেই মেলা বসে। অনেকে দেব-দর্শন ও কলা-বিক্রয় উভয় উদ্দেশ্যেই যায়। অনেকে কেবল দেব-দর্শন উদ্দেশ্যেই যায়। অধিকাংশ লোকই কিন্তু নাগর-দোলায় চড়িতে, পাঁপর ভাজা খাইতে, মুখস প'বতে বা

জুয়া খেলিতে যায়। ইহাদেব মধ্যে কাহাবও দেব-দর্শনে মতি জন্মে কিনা বলা যায় না, তবে দেব-দর্শকের মধ্যে অনেকে পাঁপর ভাজা খায়। দোকানীর কি? সে ত সাধাবণের কচির অলুয়ায়ী সামগ্রীর আহরণ করিয়া ণাভের জন্তই আসে। লোকের রুচি বুঝিয়াই দোকানদার দোকান সাজায়।

লেখাপড়ার বিষয়েও নানা লোকের নানা রসে কচি। কিন্তু তাই বলিয়া মাসিক পত্রে সকল রসের সমাবেশ কেন? বাহাব যেটাতে রুচি সে সেইটা পাঠ করবে বলিয়া? না সকল পাঠকের সকল রসে রুচি জমাইবাব জন্ত? শিথিবাব পড়িবার অনেক বিষয় আছে। সেইসকল বিষয়ের বিস্তারই সকলের উপকারী। কোনও কোনও প্রবন্ধে ভাষা, প্রকৃতত্ত্ব, ইতিহাস, দেশবৃত্তান্ত বা বিজ্ঞানের আলোচনা থাকে। তাহা পাঠ করিয়া অনেকের উপকার ও শিক্ষালাভ হয় ও চিন্তাশক্তি জন্মে। কিন্তু তাহার সঙ্গে কুভাব-উদ্দীপক এক নর-নারীর ছবি ছাপার উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারা যায় না। অনেক পত্রিকায় তে কুরুচিপূর্ণ গল্প ও উপহাস প্রকাশিত হয় তাহাতে সাধাবণের অপকাব-সাধন অনিবার্য। ভাষার লাগিত্য, মৌন্দর্য্য বা ওজস্বিতা দেখাইতে অনেক বিষয় আছে। সংসাবে নানা চরিত্রের লোক আছে এবং লোকের হৃদয়ে নানা ভাবের স্ফুর্জি আছে। কুচরিত্রের চিত্রও তাহার অলঙ্কার ও অঙ্গ-ভঙ্গীর অঙ্কন করিয়া এবং কুভাবের উদ্দীপনা করিয় লেখক বা সম্পাদক সাধাবণের কি উপকাব করেন তিনিই জানেন। লেখক তাঁহার জীব কীর্ত্তি ত্রয় প্রকাশ ও উপভোগ এবং স্বীয় শিষ্য ও দলভুক্ত ব্যক্তিকে নেপথ্যে তাঁহার প্রিয় রসের আস্থাদন করাইতে পাবেন। কিন্তু সাধাবণের জন্ত প্রবর্তিত স্থানে তাঁহার নিমজ্ঞ বা আসন সমীচীন বোধ হয় না।

সকল দেশেই সকল শাস্ত্র অনুসাবে অমঙ্গল রিপূর দমনই মানুষের প্রধান কর্তব্য; যিনি তাহা করিতে পারেন তিনিই আদর্শ চরিত্র। সচরিত্রেই সুরুচির সঞ্চার হয়। কুরুচি অসচরিত্রের পবিচয় দেয়। অসচরিত্র বা কুরুচিগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্ত সুরুচিজনক রস তাহাব সমুখে ধবা উচিত। সে যদি তাহার প্রিয় রসের অনুদরণ কবিয়া লেখক বিশেষের দ্বারে যায় সে স্বয়ং যাইতে পারে।

অন্তের তাহাকে বরং ফিরাইবার প্রয়াস করা উচিত, তাহা হইলে তাহার সে রসে বিতৃষ্ণা কমিয়া গেলেও যাইতে পারে। কিন্তু সচ্চরিত্রের সম্মুখে কুরুচিপ্ৰসূত কুরুচিজনক রসের অবতারণা তাহার স্মৃতিতে কনুয মিশাইয়া চরিত্রের হানি করে না কি? ব্যবসায়ের অর্থের প্রয়াস করিয়া অপরের অমঙ্গল সাধন কি সাহিত্যিক সজ্জনের বিধি? ইহা লেখক ও সম্পাদক উভয়েরই চিন্তার বিষয়।

রঙ্গমঞ্চে স্মৃতি কুরুচি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সংসারী সন্ন্যাসীর সাজে পুরুষ-রমণীর নৃত্যগীত দেখিলে শুনিলে কি আত্মদর্শনের ক্ষমতা জন্মে? যাহার আত্মদর্শনের বথার্থ আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার আত্মদর্শন আপনা হইতেই ঘটে অস্বর্ধ্যানী বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর নথর মনুষ্যজীবনেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাকে আত্মদর্শনের ছলে রঙ্গভূমিতে বারবণিতার নৃত্যগীতময় অভিনয় দেখিতে যাইতে হয় তাহার আত্মজ্ঞান ও উন্নতির আশা বৃথা। কটুরসকে মধুমণ্ডিত করিলে তাহার অভ্যন্তর বা গুণ পরিবর্তিত হয় না। তাহার ক্রিয়া ও ফল নিষেধ বা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। রচয়িতার ও অভিনেতার অর্থাগম যেমন নিশ্চিত সাধারণের অমঙ্গলসাধনও তেমনই অনিবার্য।

মানুষ প্রকৃতি ও সংসারের মাঝে আছে। প্রকৃতি ও সংসার হইয়াই তাহার আলোচনা। প্রকৃতি ও সংসারে নিত্য নূতন জ্ঞানলাভই তাহার পরম লাভ। সেই লাভেই তাহার অদীম আনন্দ। যাবতীয় বস্তু বিষয় ব্যক্তি ও আত্মা হইতে পরমাত্মার জ্ঞানলাভে যে আনন্দ তাহাই জীবনের সার। এইসকলই লেখার ও পড়ার বিষয়। তাই লিখিয়া আনন্দ, তাই পড়িয়া আনন্দ। মানুষ, সময় ও সামর্থ্য ইহা অপেক্ষা সংকারণ্যে ব্যয় করিতে পারে না।

শরীর ও মন এবং যাবতীয় কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংশ্রবে থাকিয়া মানুষ বিবিধ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়। পবিত্র প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং অব্যবহৃত প্রবৃত্তিগুলির দমনই তাহার কর্তব্য। সংসার ও সমাজে থাকিয়া সংযম ও সন্ন্যাস শিক্ষাই তাহার ব্রত। স্বভাবজাত বাণা বিঘ্ন অতিক্রম করিতেই বহু শক্তির আবশ্যক। তাহার পর কলিত, সজ্জিত, রচিত শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিবার প্রয়োজন ঘটিলে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। তাহা কোথা হইতে আসিবে? যাহারা এইরূপ শত্রুর সৃজন ও সংরক্ষণ করিতেছেন তাহারা একবার আপনাদের অর্থাগম ও রচনা-নিপুণতার কথা ছাড়িয়া অপরের কথাটা ভাবিয়া দেখুন।

মীরাবাদী ও অত্যাচার হিন্দী কবি

শ্রী সূর্য্যপ্রদত্ত বাজপেয়ী চৌধুরী

হিন্দী সাহিত্যের মণিকোঠায় বহু যুগের অক্ষয়-অমূল্য সম্পদ জমা হ'বে আছে, চন্দ-বরদাই, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাদী, হ'তে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় “বঘেলখণ্ডের মরগিয়া কবি জ্ঞানদাসের” পর্য্যন্ত লেখা সঞ্চিত আছে এবং তা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

মীরাবাদী ও তুলসীদাস, তানসেন ও সুরদাসের মধ্যে

পত্র-ব্যবহার ছিল। এখানে তাঁদের কিছু পরিচয় দিচ্ছে- তাঁদের লিখিত ছটি চিঠির নিদর্শন দেওয়া যাবে। হিন্দী-প্রেমিক বাঙ্গালী পাঠক দেখতে পাবেন, কি মধুরভাবপূর্ণ এই পত্রাবলী। যখন মীরাবাদীকে রাণার পক্ষ থেকে নানা প্রকারের উৎপীড়ন ও নির্যাতন করা আরম্ভ হ'ল, তাঁর সাধন-পথের জয়-যাত্রায় নানা বিঘ্ন-বিপদ এসে পড়ল,

তখন তিনি হুঃখে হুঃশিষ্টায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি অবশেষে তুলসীদাসকে নিম্ন-লিখিত পত্র দেন—

“শ্রী তুলসী স্বধনিধান, হুঃহরণ শুঁসাই,
পঃহিণর প্রণাম কর, অঃ হরো শোক সমুদাই।
যঃ কে স্ব-জন হমারে যেতে, সৃঃণ উপাধি বাঢ়াই,
সাধুসঙ্গ অঃ সজ্জন করত মোহি দেত কলেশ মহাই।
বালপনে মে মীরা কীনা গিরধরলাল মিতাই,
মেতো অঃ ছুটত নহি কৈসে, লগি লগন বরিয়াই।
মেরে মাত পিতাকে সম হো, হরিভক্ত ন হুঃদাই,
হমকে কহা উচিত করিকে হয় মো লিখিয়ে সমুদাই।”

অর্থাৎ “হে হুঃহরণ স্বধনিধান গোস্বামী তুলসীদাস, আমি বারংবার তোমায় প্রণতি জানাচ্ছি। তুমি আমার সকল শোক হরণ করো। আমার স্ব-জন আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করছে আর তারা আমার সাধুসঙ্গ ও সজ্জন করতে অনেক ক্লেশ দেয়। শৈশব হ’তে মীরা গিরধরলালের সহিত মিত্রতা করেছে এবং তা ক্রমেই গভীৰতর হচ্ছে। অনেক চেষ্টা ক’রেও তা এখন ছাড়তে পারি না। তুমি আমার মাতা-পিতা সদৃশ এবং তুমি হরিভক্তদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তুমি আমায় বুঝিয়ে লিখে পাঠাও যে, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।”

গোস্বামী তুলসীদাস উত্তরে লিখে পাঠান—

“বাক প্রিয় না রাম বৈদেহী।
তলিয়ে তার কোটি বৈরী সম, যত্নপি পবন সনেহী।
তলে পিতা এহ্লাদ, বিবীষণ বন্ধু, ভরত মহতাই।
বলি গুরু তলে, কস্ত ব্রজবিনতা, ভরে সব মঙ্গলকারী।
না তো নেহ রাম মো মনিরত, হস্তং হুঃসেবা যাইলো ;
অঙ্গন বহী আঁধা ঘো ফুটে বহতকু কাহী বহীলো।
তুলসী ! মো সব ভাতি পরমহিত, পুত্র্য প্রাণতে প্যায়ে ,
ধা মো হোর সনেহ রামপর এহী মতো হমারো।”

অর্থ —“তোমার রাম নাম নেওয়ার পথে বে বাবা জন্মাব সে যদি তোমার পরম স্নেহের পাত্রও হয় তবুও তাকে তুমি কোটি বৈরী অর্থাৎ পরম শত্রু ব’লে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিবীষণ বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে, ব্রজবিনতা নিঃশেষ কাস্তকে, ভগবদ্-আরাধনায় বিঘ্ন হয় ব’লে চিরদিনের জন্তে ত্যাগ ক’রেছিলেন এবং তা তাঁদের পরম মঙ্গলকর হ’য়েছিল। চোখে জ্ঞানাজ্ঞান লাগলে চোখের দীপ্তি উজ্জ্বল হয় এবং রামপদে ভক্তি বাড়াবার জন্তে পরম স্নেহদ্রব্যও

যদি ত্যাগ করতে হয় তবে তাও ত্যাগ করবে—আর আমি কত তোমায় বোঝাব। যে-সব কাজ করলে তোমার রামের উপর অচলা ভক্তি হয় তা তুমি অবিলম্বে করবে—এই আমার মত।”

কবিতা দুটি এতই উচ্চভাব-গৌরবান্বিত যে, তার ঠিক বথায়থ অমূল্যবাদ করা অসম্ভব। উভয়ের অতুল কবিত্ব-প্রতিভা কবিতা দুটিতে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

এর পরই মীরাবাদী সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে চ’লে যান এবং জীব গোস্বামীর সহিত মিলিত হন।

জীব গোস্বামী মেয়েদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক’রতেন না। মীরাবাদী স্বধন তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তিনি স্পষ্টই ব’লে পাঠালেন যে, মেয়েদের সঙ্গে তিনি দেখা ক’বেন না।

মীরাবাদী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন যে,

“মায় নহী জানতী কি গিরধর লাল কে দিব্যর হই আউর ভি পুরুষ হয়।”

অর্থাৎ আমি জানিনা যে, গিরধর লাল ছাড়া আর কোনো পুরুষ এখানে আছে।

এ কথা শুনে জীব গোস্বামী নগ্নপদে গিয়ে সাঁদরে মীরাবাদীকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসেন।

সাধক-কবি রৈদাসকে মীরাবাদীর দীক্ষাগুরু ব’লে উল্লেখ করা হয়েছে।

রৈদাসের আসল নাম ছিল রবিদাস। লোকমুখে রূপান্তরিত হ’তে হ’তে বৈদাসে ক্রমে পরিণত হয়েছিল।

বৈদাস জাতিতে চামার ছিলেন ;• তার পিতার নাম রঘু, অর্থাৎ রঘুনাথ আর মাতার নাম ঘুরবিনয়া ছিল। বৈদাস মুচীর কাজ ক’রে ক্ষুণ্ণবৃত্তি ক’রতেন এবং সাধু-সজ্জনের সেবা ক’রে দিন কাটাতেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন এবং কথিত আছে যে, তাঁর ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

রৈদাস হিন্দী ভাষায় বিখ্যাত কবি ছিলেন। কবীর ও রৈদাস রামানন্দেব শিষ্য ছিলেন। কবীর ও রৈদাসের মধ্যে প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডা, বাদামূল্যবাদ হ’ত অথচ উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

শুক্রবাত প্রদেশে এখনও বৈদ্যসেব লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছেন। তাঁরা নিজেকে “রবিদাসী” বলে উল্লেখ করে থাকেন।

রৈদ্যসেব অমূল্যবাণী ও উপদেশাবলী হিন্দী ভাষার পরম গৌরবের সামগ্রী।

সুরদাসের ও তানসেনের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে উভয়েই প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হ’য়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তা ক্রমেই নিবিড়তর হয়েছিল। সুরদাসকে হিন্দী ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ব’লে উল্লেখ করা হয়।

“হর হরজ, তুলসী শরী, উড়গণ কেশোদাস,
অব কে কবি খদ্যোৎসম, বহী, তহী হোত প্রকাশ।”

অর্থ—“হিন্দী সাহিত্য-গগনে সুরদাস সূর্য্যের স্থান, তুলসীদাস চন্দ্রের স্থান ও কেশোদাস তারকার স্থান বিরাজ করছেন আর আজকালকার কবি খদ্যোৎসম অর্থাৎ জোনাকী-পোকার স্থান যেখানে সেখানে একটু আলোক বিকিরণ করে চিরতবে নয় প্রাপ্ত হয়।”

মহাপ্রভু বলভাচার্য্যের আদেশানুযায়ী সুরদাস শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন এবং তাই পরে “সুবসাগর” ব’লে সর্কজন-সমাদৃত হয়েছে।

সুরদাসের বচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “সুবসাগর” ছাড়া, শিবের বিবাহ, নল-দময়ন্তী ও হরিবংশের টীকা বইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিস্তারিত ভাবে সুরদাসের জীবন কথা ও কাব্য-মাধুর্য্য আলোচনা করতে গেলে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুণা হবে না। কেবলমাত্র তাঁর সহস্রকে যতটুকু এ প্রবন্ধে বলা আবশ্যক তার-ই উল্লেখ করতে চাই।

সুরদাসের অনূপম কবিত্বশক্তি, কবিতার লালিত্য ও মাধুর্য্য, লেখার ছটা ও সঙ্গীল গতি, তাঁর লেখা পড়তে গেলেই মনকে মুগ্ধ করে।

সুরদাস ও তুলসীদাস হিন্দী-ভাষা-ভাষীদের নিকটে যে সমাদর পেয়েছেন তা সকল কবিগণের চিবকালের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী হ’য়ে থাকবে।

সুরদাসের জন্ম দিল্লীর নিকটে সোঁহী নামক একটা গওগ্রামে হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল রামদাস। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন।

সুরদাসেরা ছিলেন সাত ভাই। ছয় ভাই ণড়াইয়ে গিয়ে মুসলমানের হস্তে নিহত হ’ল। সরদার কবি সুরদাসকে মহাকবি চন্দরদাইয়ের বংশজাত ব’লে উল্লেখ করেছেন।

‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে সুরদাসকে জন্মান্ত ব’লে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাপ্রভু বলভাচার্য্য ব্রজভাষার আটজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবির নাম দিয়ে “অষ্টছাপ” স্থাপিত করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে,—সুরদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস, কুন্ডনদাস, চতুর্ভূজ দাস, ছীত স্বামী, নন্দদাস আর গোবিন্দ স্বামী।

বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে সুরদাসের আসন ও মান সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

সুরদাস প্রসিদ্ধ ‘সুবসাগর’ গ্রন্থে সওয়া লক্ষ পদ রচনা করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচ হাজার পদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুরদাসের ভক্তগণের বিশ্বাস যে, সুরদাস উদ্ধবের অবতার ছিলেন এবং শুধু তাবি জন্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সখ্যভাব ছিল।

সুরদাস শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভাবেই আজীবন পূজা করে গেছেন।

সঙ্গীতের রাজা তানসেনের কথা বেশী করে না বললেও চলে।

তানসেনের গুণ ছিলেন বৈজু-বাওরা। বৈজু-বাওরার বিস্তৃত জীবন-কথা এখনও প্রকাশিত হয়নি।

তানসেন সুরদাসের পরম বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তানসেন ‘নওরতনের’ সামিল হ’য়ে প্রাব-ই দিল্লীতে থাকতেন বলে সুরদাসের সঙ্গে তাঁর বড় দেখা হ’ত না।

একবার বহুদিন পরে সুরদাসের একটি ভজ্ঞন তানসেন গেবে ভাবি খুসী হ’য়ে সুরদাসকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখে পাঠান—

“কি ধোঁ সুর কো শর লগেও কী ো। হর কি পীর,
কি ধোঁ সুর কি তন লগেও তনমন দহত শরীর।”

অর্থ—“বহুদিন পবে সুরদাসের বচিত গান গেয়ে বন্ধুকে মনে পড়েছে, তাই লিখেছেন—আজ আমার অঙ্গে কি সুরের ব (অর্থাৎ বীণের) তাঁব (শর) লাগল না সুরদাসের বেদনা আমায় অধীৰ করেছে। আজ কি সুরদাসের সহিত আমার মিলন হয়েছে যে, আমার শবীবে একটি অম্লভূতি জেগেছে।”

উত্তরে সুরদাস নিম্নলিখিত চিঠি লিখে পাঠান—

“বিধনা এহ জিয়া জান কর, শেষ ন বিহো। কান,
ধরা মের সব ভোলুতো, তান্‌সন-কি তান।”

অর্থ—“বিবাতা পূর্বে জেনেইত শেষকে (অর্থাৎ বাঁসুড়ী নাগ যার মন্তকে এই পৃথিবী অবস্থিত আছে) কান (কর্ণ) দেননি। শেষ নাগকে কান দিলে সে তানসেনের অপূর্ণ সঙ্গীত শুনে মাথা বোলাতো আর সমস্ত পৃথিবীটা পাছে চুরমার হয়ে যেতো।”

উভয় উভয়ের গুণে ও নিবিড় প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে বোধহয় এই পত্রগুলি লিখেছেন।

হিন্দীভাষাকে যে-সব মুসলমান কবি আপনার মাতৃভাষা ক'রে নিয়েছিলেন তাঁদের নাম এখানে দিচ্ছি। তাঁরা হচ্ছেন—আমির খুসরু, মালিক মুহম্মদ জারগী, বাদশাহ আকবর, কাদের বখ্‌স, আবদার বহীম খানখানা, উসমান, সৈয়দ ইব্রাহিম, মুমাবক, আহম্মদ, আবদার রহমান, জলীল, ইয়াকুব খাঁ, জুলফিকর, অনওয়ার খাঁ, আজম শাহজাদা, সৈয়দ গুলাব নবী, তালেব আলী, নবী ও আলম।

এঁরা খুব উচুঁদবের কবি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ছিলেন এবং এঁদের রচিত গ্রন্থাবলী হিন্দী ভাষায় গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে।

হিন্দীভাষাতে নানা প্রকারের প্রবাদ-বচন, আখ্যায়িকা, ভিখারী গান, বারমাস্তা ও জীআচারের বহুপ্রকারের গান পাওয়া যায়।

তুগলদাসের ভাই নন্দ দাসও একজন শ্রেষ্ঠ কবি

ছিলেন। তাঁর গানে বাৎসল্য-রসের প্রাচুর্য দেখা যায়। এখানে তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করছি।

“চিড়িয়া চুহ চাই।

চকহী কি শুন বাণী, কহত যশোদা রাণী

জাগো মেরে লালা।

রবি কি কিরণ জানি, কমলিনী বিকাশানি,

কুমুদিনী সন্তানি, দধি মধত্‌ বালা।

স্বপ্ন, স্ববাহ যত, বস্ত্র পরণত,

ধোরে ঠাড়ে টেরত লাল গোপালা।

নন্দদাস বলিহারী, উঠো বৈঠো গিরিধারী

এসে কোই দেখে চাহে নয়ন বিশালা।”

নন্দার্থ :—“পাখী ডাকছে। চক্রবাকীর স্বর শোনা যাচ্ছে। যশোদারাগী তাঁর ছেলেকে বলছেন—জাগো খোকন—এখন বিছানা ছেড়ে ওঠো। সূর্য্যকিরণ দেখে কমলিনী বিকশিত হ'ল আর কুমুদিনী সজ্জিত হ'ল। ঘরে ঘরে এখন ব্রজঙ্গনাগণ দধি মধন করছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন স্ববাহ যত সখা বস্ত্র প'বে দ্বাবে দাঁড়িয়ে গোপাল ব'লে ডাকছে। নন্দদাস প্রভাতী সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে বলছেন গিরিধর এখন তুমি উঠে বোসো—এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে নয়ন চরিতার্থ করো।”

এক ভাষার কবিতা বা সঙ্গীত অন্য ভাষায় দখায়ত্ব অনুবাদ করা যায় না। হিন্দী-প্রেমিক বাঙ্গালী পাঠক দেখতে পাবেন—কী মাধুর্য্যই না নন্দদাস এই কবিতার ইনের গানে ঢেলে দিয়েছেন। অপার, অফুরন্ত মাতৃস্নেহের প্রসঙ্গ যেন মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এই কবিতা লাইন পড়তে গেলে তাই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের “শিশু ভোগানার্থ” ও দাশরথি বায়ের “শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে” প্রভৃতি কয়েকটি গান বাদ দিলে বাঙ্গালী বাৎসল্য-ভাবের বা মাতৃস্নেহের বড় বেশী গান বা কবিতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হিন্দী সাহিত্যের রসগারের এক-একটি রত্ন এমনি চোখ ঝলসিয়ে দেয় আর মনে অপূর্ণ পুলকের সঞ্চার করে।

ময়ূর-সিংহাসন

অধ্যাপক শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু, এম-এ

কলাশিল্পপ্রিয় শাহজাহানের জগদ্বিখ্যাত “তথ্যে তাজউল” বা ময়ূর-সিংহাসন মোগল-কীর্তির একটি অন্ততম নিদর্শন। এই অসাধারণ সিংহাসনটি জনসাধারণের একটি বড়ই কোতূহলের বিষয়। পারসিক কবিগণের অতিশয়োক্তি-দোষ থাকিলেও, ময়ূর-সিংহাসনের বিষয় কবি যাহা গাহিয়াছেন, তাহা বোধ হয় নিতান্ত অতিরঞ্জিত নহে। এই রাজসিংহাসনটি যে চন্দ্র বা সূর্য্যকেও সৌন্দর্য্যে পবিত্রত করিয়াছিল তাহাই দেখাইবার জন্য কবি লিখিয়াছেন :—

সানন্দ পর কলুচ পুদ রা বপায়ন
দেহদ খুশিও ও মাহ রা ক নমায়শ্ ।

অর্থাৎ, আকাশ যদি ময়ূর-সিংহাসনের নীচে দাঁড়াই তাহা হইলে এই সিংহাসনটি চন্দ্র বা সূর্য্যকেও উজ্জল কাস্তি প্রদান করিতে পারে।

মোগল শিল্পকলার চরম আদর্শ না হইলেও ময়ূর-সিংহাসন যে বাদশাহের অতুল সম্পত্তির পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রকৃত ও মূল তথ্য জানিতে হইলে, প্রথমে রাজদ্ববারেব সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোবীর “পাদশাহনামা” (১) এবং মীর মহম্মদ মাসুম লিখিত “তারিখ-শাহ সুজাএ” (২) আত্মাদিগের পাঠ করা উচিত। এ বিষয় পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গাহনওয়াজ খাঁও তাঁহার “মাসিব উল্ ওমবা”য় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (৩)।

তাহা ছাড়া, ব্যার্গিষে (৪), তাভার্গিষে (৫) ও মাসুমি (৬) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পরিব্রাজকগণ ইহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া ও তাহা তাহাদিগেব ভ্রমণ-কাহিনী মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া আত্মাদিগের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

হামিদের মতামুসারে (৭) মনে হয় যে, আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাহানের শাসনকাল পর্য্যন্ত রাজকোষে যে সকল অপরিমেয় মাহাৎ মণিমুক্তাভি ও প্রচুর ধনরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ময়ূর-সিংহাসন নির্মিত হয়। “মাসিব উল্ ওমবা”র গ্রন্থকারও এই কথারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (৮)। তাহার মতে মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য সিংহাসনের ব্যবহারে বাদশাহী গরিমা বাড়াইবাব অভিপ্রায়ে সম্রাট এই সিংহাসন তৈয়ারী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

পাদশাহনামা পাঠে জানা যায় যে, শাহজাহান প্রাদেশিক ও রাজকীয় কোষাগার হইতে দুই কোটি টাকা মূল্যেব হীরা জহরৎ আনিতে আদেশ দেন। তাহা হইতে তিনি প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যেব সর্কোংকুঠ হীরকাদি সিংহাসনের জন্য বাছিয়া লন। মীর মহম্মদ মাসুম সিংহাসনের হীরকাদির মূল্য এক কোটি টাকারও অধিক নির্ণয় করিয়াছেন (৯)। “মাসিব উল্ ওমবা” গ্রন্থে সিংহাসনের জন্য নির্ধারিত জহরতের মূল্য ৮৬ লক্ষ টাকা উল্লিখিত আছে। তাহা ছাড়া, এক লক্ষ তোলা ওজনের

(১) Bibliotheca Indica Series. এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত।

(২) India Office Persian Mss. no 33. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত বহুলাধ সরকার, সি, আই, ই মহোদয়ের পাঠাগারে ইহার এক প্রতিলিপি আছে। প্রত্নতত্ত্বের সরকার মহাশয়ের নিকট এই পুঁথিখানি ব্যবহার করিবার অনুমতি পাই।

(৩) Bibliotheca Indica Series এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ৩ খণ্ড।

(৪) Bernier's Travels Ed. by A. Constable (1891). Second Edn. revised by V. Smith. Publishers Humphrey Milford.

(৫) Tavernier's Travels in India. Ed. by V. Ball. Pub. by Macmillan & Co. 1889 (two vols.)

(৬) Storia Do Mogor (Indian Text Series). Ed. by W. Irvine.

(৭) পাদশাহনামা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮-৮৩

(৮) মাসিবউল্ ওমবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫

(৯) “তারিখ শাহ সুজাএ” ৭৭এ পৃষ্ঠা।

এবং চতুর্দশ লক্ষ টাকার মূল্যের বিগ্ধ স্বর্ণ বাদশাহের কাছে আনা হয়। হামিদ এই স্বর্ণখণ্ডের পরিমাণ দৈর্ঘ্য ৩৬ গজ এবং প্রস্থে ২৮ গজ অনুমান করিয়াছেন।

ময়ূর-সিংহাসন কার্যের তত্ত্বাবধায়ক বেবদল খাঁর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শাহনওয়াজ খাঁ লিখিয়া গিয়াছেন। (১০) বেবদলের পূবা নাম ছিল, বে বদল খাঁ সায়িদা গিলানি। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা কবি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া রাজদরবারে প্রথম প্রবেশ লাভ করেন। পরে শাহজাহান তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেবদল খাঁ খেতাব দেন ও পরে স্বর্ণকার বিভাগের কর্তৃপদে অভিষিক্ত করেন।

সিংহাসনটির নিম্নলিখিত বিবরণ পারসিক সরকারী কাগজ-পত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। সিংহাসনে ব্যবহৃত বহুবিধ হীরকগুলির মধ্যে যে-কোনটি সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিতে পারিত। তাই কবি বলিতেছেন,

“যে অনওয়া জোয়াহির গুতা অলওয়া
চোরগে আলমে হয় দানয়ে খাঁ।”

সুৰূপা রমণীকুলের সৈধ্য উৎপন্নকারী, সিংহাসনে জড়িত চুণি বা মোহিতকগুলির মূল্য নির্ণয়ের বহির্ভূত ছিল। কবির ভাষায়,

“যে ইয়াকুতশ কে দখ করদে বহানিস্ত
লবে লালে বুজী রা দিল বতী নিস্ত।”

সিংহাসনটির ছাতের ভিতর দিকে কলাই করা এবং সোনা ও হীরা দিয়া মোড়া; বাহিরের দিকে চুণি ও নীলকান্তমণির জড়োয়া কাজ; পান্না-বিজড়িত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর ছাতটি স্থাপিত। ছাতের দুই পার্শ্বে হীরক-নির্মিত দুইটি ময়ূর; তাহাদের মাঝখানে মণি, হীরা, চুণি ও পান্না রচিত একটি বৃক্ষ। সিংহাসনে আরোহণের জন্য অত্যুজ্জল-হীরক-শোভিত তিনটি সোপান। হেলান দিয়া বসিবার জন্য একাদশটি বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত ফলক; তন্মধ্যে মাঝেরটির মূল্য প্রায় দশলক্ষ টাকা। পারস্তের নূপতি শাহ আব্বাস সফ্‌ভি, এক লক্ষ টাকার যে পয়রাগ

মণিটি উপঢৌকন স্বরূপ জাহাঙ্গীরকে প্রেরণ করেন, তাহা ঐ মাঝের ফলকটিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। ঐ মণিটির উপরে আমিব তৈমুর, মিরজা শাহরুখ, মিরজা উলুগবেগ প্রভৃতি পূর্ব পুরুষগণের নাম খোদিত ছিল। অবশেষে জাহাঙ্গীর ইহার উপর নিজের ও তাঁহার পিতা অকবরের নাম খোদাই করান।

মীর, মহম্মদ মাসুম বেশ একটি সম্পূর্ণ নূতন ও একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের খবর দিয়াছেন (১১) এবং অন্য কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইহার উল্লেখ করেন নাই। সিংহাসনটির প্রত্যেক অংশ খোলা যাইত এবং ঐ অংশগুলি রাজভাণ্ডারে রক্ষিত থাকিত। বিশেষ বিশেষ দিনে, বাদশাহের এই সিংহাসনে উপবেশন সময়ে, ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলিকে জোড়া দেওয়া হইত। মাসুম একটি বড়ই হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। বৃদ্ধ শাহজাহান যখন আগ্রাহর্গে বন্দী ছিলেন, তখন মহম্মদ মুসতান তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে ময়ূর-সিংহাসনটি আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার পিতা অওরঙ্গজেব কর্তৃক আদিষ্ট হন। কিন্তু সিংহাসন প্রদানে অনিচ্ছুক ও অসহায় শাহজাহান তাঁহার বড় সাধের সিংহাসনটি হস্তান্তরিত করিবার পূর্বে একবার ইহা স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মহম্মদকে বিভিন্ন খণ্ডগুলি নিজের সম্মুখে একবার আনিতে আদেশ দেন। মহম্মদ পিতামহের আদেশানুযায়ী কার্য করিলে, শাহজাহান সিংহাসনের দুইটি খণ্ডাংশ লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যায়। পৌত্রের কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও আপাততঃ সেগুলি প্রত্যর্পণ করেন নাই। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে বন্দী বাসশাহকে অংশ দুইটি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করা হইরাছিল।

নিজ রাজত্বের অষ্টম বর্ষের ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃঃ) ১৩ ও ১৪শের তৃতীয় দিবসে একটি আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত নওরোজের দিনে, এই অতুলনীয় সিংহাসনে শাহজাহান প্রথম আরোহণ করেন। সিংহাসনটির উপরে হাজী মহম্মদ

(১০) Carr Stephen তাঁহার Archaeology of Delhi (পৃ: ২০১) নামক পুস্তকখানিতে অষ্ট্রিয়ান বার্ভোকে ময়ূর-সিংহাসন নির্মাণ-কার্যের তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া খাঁকার করিয়াছেন।

(১১) “তাহিৎ-শাহ হুজাএ” পৃ: ৭৮৫; J. N. Sarkar, O. I. E.—Nadir Shah in India. P. 75. Patna University Readership Lectures, 1922.

জ্ঞান কুদুশি (১২) রচিত মিত্রাক্ষর ছন্দের একটি কবিতা আছে। তাহার শেষ দুই চরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ১০৪৩ হিজরীতে সিংহাসনটির নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে কবি বেবদল খাঁ ১৩৪টি মিত্রাক্ষর ছন্দের শ্লোক রচনা করেন। ইহার প্রত্যেক দ্বাদশ চরণের একটি শেষ পঙক্তি বাদশাহের জন্মতারিখ নির্ণয় করে। ৩২শ চরণটি বাদশাহের সিংহাসন আরোহণ বিষয়ে ও অবশিষ্ট চরণগুলিতে সম্রাটের আকবরবাদ (আগ্রা) হইতে কান্দাহারে গমন ও আগ্রায় পুনরাগমন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

পাশ্চাত্য পরিব্রাজকগণ স্বচক্ষে ময়ূর-সিংহাসন দেখিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাউক। ফ্রান্স হইতে আগত হীরা খোদাইকারক ও জহুরী তাত্ভার্গিএ ১৬৫১-১৬৬৯ খৃঃ ভারত ভ্রমণ করেন। ১৬৬৫ খৃঃ মোগল রাজধানীতে বাসকালীন তাহার ময়ূর-সিংহাসন দেখিবার সুযোগ ঘটে। তাত্ভার্গিয়ের মতে বাদশাহের সাতটি সিংহাসন ছিল (১৩)। তাহার মধ্যে একটি হীরায় মোড়া এবং অস্তগুলি চুণি ও মুক্তার দ্বারা তৈয়ারী। সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট এবং প্রস্থে ৪ ফুট; ২০ হইতে ২৫ ইঞ্চি উচ্চ চারিটি পায়ার উপর সংরক্ষিত; পায়ালগুলি চতুষ্টয় দণ্ডের সহিত সংযুক্ত। উল্লিখিত চারিটি দণ্ডের উপর দ্বাদশটি স্তম্ভ এবং স্তম্ভদ্বীপে তিনদিক আবৃত আচ্ছাদন—অর্থাৎ সিংহাসনটির সমুখ অনাবৃত। পায় ও দণ্ডগুলি স্বর্ণ, পদ্মরাগমণি মরকত বা পান্নার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক দণ্ডের মধ্যভাগ পান্না চতুষ্টয় পরিবৃত এক একটি “বদক্গান” মণির দ্বারা পরিশোভিত। অক্সন নদীর শাখা “শিগনান্” সচরাচর যে স্থানকে “বদক্শান্” বলা হয় সেই স্থানের বিখ্যাত মণিকে “বদক্শান্-মণি” বলে। সিংহাসনের নিম্নভাগ যথাক্রমে চতুষ্টয় পান্না বেষ্টিত মণি এবং মণি-বেষ্টিত পান্নার দ্বারা সংবদ্ধ।

(১২) হাজি মহম্মদের উপন্যাস ছিল “কুদুশি”। তিনি ছিলেন শাহজাহানের আমলের রাজকবি বা “মালিকুণ শোয়ারা”। ১০৫৫ হিঃ বা ১৬৪৫ খৃঃ তিনি মুহাম্মদে পতিত হইলেন। Archaeological Survey Report, 1911-1912. Bibliographical Dictionary—T. W. Beale. Lond. 1894.

(১৩) Tavernier's Travels in India, vol I, p. 384.

সিংহাসনটির উপর তিনটি গদি থাকিত। মবোরটি, যাহার উপর বাদশাহ হেলান দিয়া বসিতেন, সেইটি ছিল সর্বাঙ্গাঙ্গী বৃহৎ ও গোলাকৃতি। দুই পার্শ্বের দুইটি গদিও আকারে বেশ প্রশস্ত ছিল। ইহা ব্যতিরেকে বহুমুখ্য প্রস্তরাদির দ্বারা খচিত একটি তরবারী ও একটি করিয়া, গদা, ঢাল, ধনুক ও সর্বপরিশেষে একটি শরপূর্ণ তুণ সিংহাসনে বিলম্বিত থাকিত।

চাঁদোয়ার অভ্যন্তরীণ হীরা ও পান্নার দ্বারা এবং ইহার চারিদিক পান্নার ঝালর দ্বারা নির্মিত। চত্ৰাতিপটি চতুর্ভুজ গম্বুজের মত—ইহার উচ্চদেশে একটি ময়ূরপৃষ্ঠ উল্লেখন করিয়া আছে। ময়ূরটির পৃচ্ছদেশ নীলকান্ত, মণি এবং অপর পর নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা তৈয়ারী; ইহার দেহ স্বর্ণ এবং বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। ময়ূরটির দুই পার্শ্বে সমউচ্চ দুইটি ফুলের তোড়া; সেগুলি স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা খচিত। এই স্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, পারসিক ভাষায় লিপিত ইতিহাস-গুলি, যথা “পাদশাহনামা” বা “মাসিরউলগুমরা” ইত্যাদি সিংহাসনটির ছাদের উপরিভাগে দুইটি ময়ূরের উল্লেখ পাওয়া যায়, পরন্তু তাত্ভার্গিএর বিবরণীতে মাত্র একটি ময়ূরের কথাই লেখা আছে।

সিংহাসনের অগ্রভাগে একটি হীরা এবং তৎসংসঙ্গ চুণি বা পান্না দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিত। ইহার উভয় পার্শ্বে প্রায় চারি ফুট ব্যবধানে দুইটি রক্তবর্ণের রাজহত্ৰ; ইহার চতুর্দিকে মতির ঝালর। লোকমুখে তাত্ভার্গিএ অবগত হইলেন যে, এই সিংহাসনটি বহু মূল্য প্রায় একশত সাত কোটি টাকা (১৪)।

(১৪) “নামির নামা” বা নামিরের ইতিহাসে ময়ূর-সিংহাসনের মূল্য ২,০০০,০০০ পাউণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। ইংরাজ বণিক জোনাস হানাবরে (Jonas Hanaway) তাহার An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea, Two vols. Dublin 1754, London 1762 (vol II. Chap. X) বইখানিতে মোগল বাদশাহের ময়ূর-সিংহাসন, তাহার অপরাপর নরটি সিংহাসন এবং হীরা জহরতের অসংখ্য প্রস্তর এই সমস্ত বিনিবন্ধগুলির মূল্য ১১, ২৫০,০০০ পাউণ্ড বলিয়াছেন। Scott সাহেব কেবল ময়ূরসিংহাসনের মূল্য ১,০০০,০০০ পাউণ্ড বলেন। Persia and the Persian Question by Hon. G. N. Curzon. Longmans Green & Co. 1893. P. 318. fn.

ফরাসী চিকিৎসক ব্যার্নিএ ১৬৫৬-১৬৫৮ খৃঃ ভারত পরিভ্রমণ করেন। ইনি তাভ্যার্নিএর মত দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। ব্যার্নিএর নীতিদীর্ঘ বিবরণীতে নিম্নলিখিত ভারতময় পরিলাক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তাঁহার মতে সিংহাসনটির ছয়টি পায় ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ইহার মূল্য চারি কোটি টাকা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সর্বপরিশেষে তাঁহার বিবরণে আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্ত এই যে, সিংহাসনটি তৈয়ারী হয় তাঁহার এক স্বদেশবাসীর তত্ত্বাবধানে। ব্যার্নিএ এব্যক্তির নামোল্লেখ করেন নাই, মাত্র এই বলিয়াছেন যে, সে ইউরোপের বহু নৃপতিবৃন্দকে খুটা মণি-মাণিক্য-সাহায্যে প্রতারিত করিয়া পরিশেষে মোগল দরবারে আশ্রয় পাইয়া উন্নতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়। তবে সে নিশ্চয়ই অষ্টিন দ. বুডে।

মাহুচ্চি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নিজের বিবরণীতে সিংহাসনের বিষয় বিশেষ কিছু বিবৃত করেন নাই। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়াছেন যে, (১৫) সিংহাসনটির নির্মাণকর্ত্তা শাহজাহানের ইহার উপর উপবেশন করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহার পুত্র অওরঙ্গজেবই প্রথম এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এ কথা সত্য নহে। শাহজাহানের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসে স্পষ্টই লেখা আছে যে, তিনি নিজে ঐ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।

১৭৩৬ খৃঃ বিজয়ী বীর নাদির শাহ দিল্লীতে পঞ্চ দিবস-ব্যাপী লুণ্ঠনের পর মোগল বাদশাহের বড় সাধের ময়ূর-সিংহাসনটি বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জনসাধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস এই যে, পারস্ত দরবারে ইহা রক্ষিত হইয়া আত্ম পর্য্যস্ত মোগল সম্রাটদিগের সে অতীত গৌরব ও লুণ্ঠকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব বড় লাট হর্গীস সর্ড বর্জ্জন তাঁহার লিখিত এক পুস্তকে (১৬) পারস্তের রাজধানী তেহেরানে রক্ষিত ময়ূর-সিংহাসনটির একটি বিবরণী দিয়াছেন এবং ইহা যে বাদশাহ

শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসন নয় তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

কর্জন সাহেব তেহেরানে রক্ষিত ময়ূর-সিংহাসনটিকে স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সিংহাসনটি ছিল আংগা-গোড়া সোনা দিয়া মোড়া; তাহার উপর চুনি ও পান্না বসান ছিল। সমগ্র আসনটি সাতটি পায়ের উপর রক্ষিত; উপরে উঠিবার জন্য দুইটি সিঁড়ি ইহাতে গিরগটি জাতীয় এক প্রকার জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সিংহাসনটির চারি পার্শ্ব দ্বন্দ্ব স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা সজ্জিত—একটি আর একটির সহিত খোদিত লিপিকৃত তক্তার দ্বারা সংবদ্ধ। সিংহাসনটির পশ্চাদ্ভাগ খুব উন্নত; ইহার শিখরদেশে উজ্জল প্রতীকালী হীরক নিশ্চিত একটি ঘূর্ণায়মান তারকা। দুই পার্শ্বে হীরক নিশ্চিত দুইটি পক্ষীর প্রতিকৃতি।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা সহজেই অনুমান হয় যে, তেহেরানেব সিংহাসনটির সহিত মোগল বাদশাহ শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসনের সহিত সাদৃশ্য খুবই কম। পূর্বোক্ত সিংহাসনটি যে ময়ূর-সিংহাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ইহা দেখাইবার জন্য কর্জন সাহেব যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা কর্তব্য।

পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পরিত্যক্ত ব্যার্নিএর মতে মোগল বাদশাহের সর্বশুদ্ধ ৭টি সিংহাসন ছিল। ইংরাজ বণিক হ্যান্ডলে বলিয়াছেন যে, নাদির শাহ স্বদেশ-প্রত্যাগমন সময়ে, মোগলদিগের ৯টি সিংহাসন সঙ্গে লইয়া যান। কর্জন সাহেবের মতে, পারস্তের সিংহাসনটি যে ভারত হইতে আনীত সিংহাসন-গুলির মধ্যে অন্যতম, এইরূপ সিদ্ধান্তে বড় বেশী ভুল ন থাকিতে পারে; তবে ইহা যে ময়ূর-সিংহাসন নয় ইহা নিশ্চিত।

তাভ্যার্নিএর মতানুসারে শাহজাহান কৃত ময়ূর-সিংহাসনের চারিটি পায় ছিল। তেহেরানে রক্ষিত সিংহাসনটির ৭টি পায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পারস্তে প্রেরিত ইংরাজ প্রতিনিধি ম্যালকম (১৭)

(১৫) Storia Do Mgor, vol II., P. 345.

(১৬) Persia and the Persian Question, vol I., pp. 317-322.

(১৭) Malcolm's History of Persia vol, II., 37 n. Pub. by John Murray, Lond. MDCCCXXIX.

বলেণ যে, নাদিরশাহ ভারত হইতে নিজের দেশে কিরিয়া গিয়া যোগগদিগেব কতকটা অমুয়ায়ী একট সিংহাসন তৈয়ারী করান। কিন্তু ইহাও এই বাদশাহেব মৃত্যুর পর নষ্ট হয়।

ফ্রেড্রার সাহেবের মতে নাদিরের হত্যার পর ভারত হইতে আনীত সমুদয় লুণ্ঠন-সামগ্রী যত বাদশাহের সেনাগণ পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। ভারতের ময়ূর-সিংহাসনটিও সেই সময় বিভক্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্তে প্রেরিত ইংরাজ প্রতিনিধি জি, উজ্জ্লে তাঁহার লিখিত একটি পুস্তকে বলেণ যে, তিনি যে-সময় পারস্তে যান সেই সময় সেইখানকার ময়ূর-সিংহাসনটির মূল্য লোকপরম্পরায় ১০০,০০০ তুমান (পারস্তের মুদ্রা) বা এক লক্ষ পাউণ্ড অবগত হন (১৮)। এখন কথা হইতেছে এই যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সিংহাসনটির মূল্য খুব সম্ভবতঃ পারস্তে নির্মিত রাজ-সিংহাসনেরই মূল্য বলিয়া ধারণা হয়, কারণ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ভারত হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনীত ময়ূর-সিংহাসনের বে ইহা মূল্য তাহার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।

কর্জন সাহেব পারস্তের ভূতপূর্ব জনৈক রাজমন্ত্রী নিকট অবগত হইলেন যে, পারস্তের এই সিংহাসনটি ইসপাহানেই নির্মিত হয়। ইসপাহানের প্রধান পুরোহিত (সদর)

মহম্মদ হোসেন খাঁ, পারস্তের বাদশাহ ফৎ আলী খাঁর (১২) সহিত “তাউস খানুম” নামী জনৈক ইসপাহান মহিলার পরিগয় উপলক্ষে একটি সিংহাসন নির্মাণ করান এবং এই সিংহাসনটি তাউস খানুমের নাম হইতেই “তবুতে তাউস” বা ময়ূর-সিংহাসন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ভারতের ময়ূর-সিংহাসনটিকে পারস্তের বাদশাহ আগা মহম্মদশাহ, নাদির শাহের প্রপৌত্র শাহরুখের নিকট হইতে টুকরা অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন। পরে আগা মহম্মদ এই প্রাপ্ত টুকরাগুলিকে একত্র করিয়া এক নূতন ধরণে তেহেরানের ময়ূর-সিংহাসনটি তৈয়ারী করান।

বস্তুতঃ, ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসন জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার খণ্ডাংশ হইতে নূতন ধরণে নির্মিত তেহেরানে রক্ষিত রাজসিংহাসনটি সেই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। “মাসির উলু ওমরা”র গ্রন্থকার অতিশয় গর্বের সহিত লিখিয়াছিলেন—

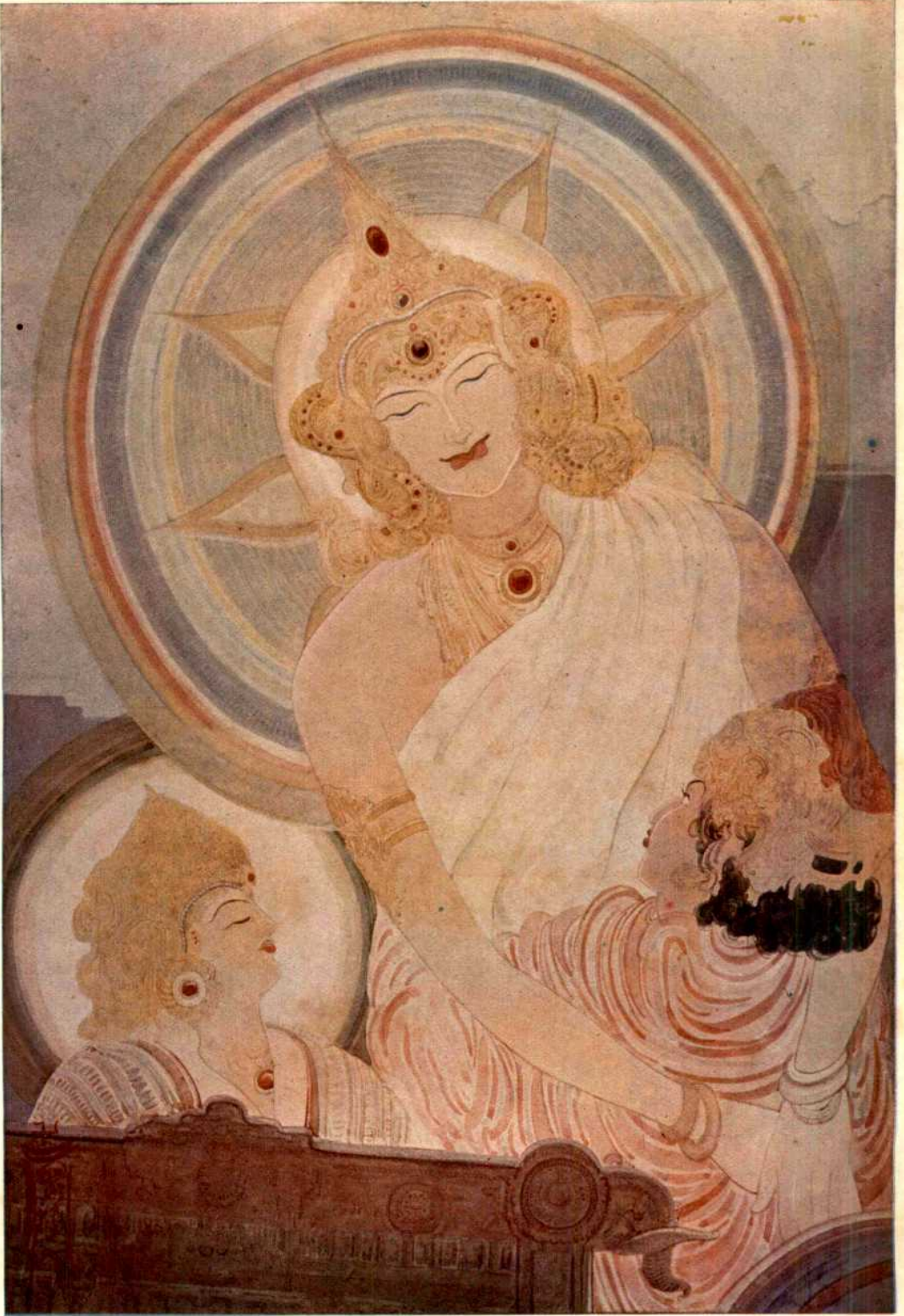
পানশ ব চস্ম ধর নিআমদ

হরচন্দ্র নজায়া কর্দ আহ ওমাল।

অর্থাৎ, ময়ূর-সিংহাসনের অল্পরূপ অলঙ্কৃত সিংহাসন অল্প কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। এখন কোথায় সে মোগল-গরিমা! কোথায় বা সে-সব ঐশ্বর্য! আর কোথায় বা সে অতুলনীয় ও অত্যাশ্চর্য্যপ্রভা-বিশিষ্ট সিংহাসন। কালের স্রোতে তৃণখণ্ডের স্তায় সবই ভাসিয়া গিয়াছে। আছে কেবল স্মৃতিটুকু।

(১৮) উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একলক্ষ তুমান, একলক্ষ পাউণ্ডের তুল্য। ল। কর্জনের জাফল ইন্ড টাই লক্ষ পাউণ্ডের তুল্য ২৫।

(১২) কাজর বশের ফৎ আলী খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করেন। Lt. Col. P.M. Sykes—History of Persia (vol. II., p. (393) Pub. Macmillan & Co. 1915.



বোধিসত্ত্ব

শিল্পী—শ্রী প্রমোদকমার চট্টোপাধ্যায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[বেহালা-নিবাসী ৬ বৈশাখ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্ততম শিষ্য ও আবি-ব্রাহ্মণমাজের প্রণবক ছিলেন। তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের নিষমিত পত্রালাপ চলিত। তাহার মধ্যে যতগুলি চিঠি আছে, তাহা ১৭৮৪ শক (খৃঃ ১৮৬২) হইতে ১৮০৬ শকেব (খৃঃ ১৮৮৪) মধ্যে লিখিত। এই পত্রগুলি ৬ বৈশাখ চট্টোপাধ্যায়ের অযোগ্য পুত্র অছাত্তাঙ্গন, ঐযুক্ত চিত্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নেই অংসের গ্রাম হইতে রক্ষা পাইয়া আনিয়াছে। সে-যুগের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিতে এবং সেই সময়কার কাগজপত্র যথাসম্ভব রক্ষা করিতে অঙ্কের চিত্তামণি-বাবু যে-পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার অমুগ্রঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই পত্রগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। অনেকগুলি পত্র এমনই জীর্ণ ও কটনষ্ট অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে যে, পাঠোদ্ধার করা কঠিন ও সময়বাপেক্ষ। উল্লিখিত ১৭২১ শক (১৮৬২ খৃঃ) হইতে লেখা চিঠিগুলি ছাড়া আরও হইল—তখন বিখ্যরেণ্য রবীন্দ্রনাথ আট বৎসরের বালকমাত্র। আশা করি এই পত্রগুলি সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবে।

—প্রবাসী সম্পাদক]

ও

গান্ধীপুত্র

২৮ পৌষ, ১৭২১ শক

প্রীতিভাজনেষু—

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্ত—

তোমার ২ অগ্রহায়ণের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা ৩০ কার্তিকের বেহালায় ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিলাম। ৩০ কার্তিকে যদিও আমার হর্ষল শবীর তোমাদের সন্নিবানে বাইতে পাবে নাই, তথাপি আমার মন তথায় বিচরণ কবিতোছিল। আমি তো অল্পে অল্পে এপর্যন্ত আশিষ্য পৌছিযাছি। ১১ মাঘের উৎসব তোমার হৃদয়ের উৎসাহের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমার প্রসন্ন মুক্তি ও উদার ভাব ও সবিনয় বাক্য সেদিন অনেক কার্য্য করিবে। তোমার মঙ্গল হউক, তোমার সাধু কামনা-সকল পূর্ণহউক। ইতি

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

জলদ্বার

২৫ কাশ্বিন, ১৭২১ শক

প্রীতিভাজনেষু—

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্ত—

তোমার স্মৃতির পত্র সকল নিষমিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি। হৃদয় মন প্রাণে তুমি ব্রাহ্মবর্ষ বিস্তারের জন্ত দিবানিশি যে পরিশ্রম করিতেছ ঈশ্বর তাহার ফল মুক্তহস্তে বিধান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার বাহার সঙ্গে একবার আলাপ হয় তাহাকেই তুমি তোমার হৃদয়ের গুণে বদ্ধ করিয়া রাখ। এই প্রকারে ক্রমাগত তোমার বন্ধুবর্গের বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মবর্ষ প্রচার-কার্য্যে তোমার বলবৃদ্ধি হইতেছে। আমি তোমাকে সর্বদা পত্র লিখিতে পারি বা না পারি তোমার পত্র যেন আমি নিয়তই পাই এই আমার প্রার্থনা। তুমি আমার হৃদয়ে সর্বদাই জাগ্রৎ হইয়া আছ এবং আমাব আন্তরিক বিগুহ ব্রাহ্মবর্ষ প্রচার-কার্য্যের প্রশস্ততা তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর তোমার শরীর মন আত্মাকে নিয়তই বলবীৰ্য্য প্রেরণ করুন। ইতি—

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

বর্ধশালা

১ বৈশাখ, ১৭২২ শক

নমঃ শম্ভবাব চ মনোভবাব চ।

নমঃ শঙ্করাব চ ময়ঙ্করাব চ॥

নমঃ শিবাব চ শিবতবাব চ॥

প্রীতিভাজনেষু—

অন্য নববর্ষের প্রথম দিনে তোমাকে সম্মানিত করিয়া নমস্কার করিতেছি। তোমার প্রতি আমার মনের প্রীতি ও

আদর গ্রহণ কর। এই ১৭৯২ শকেও এই দেহ-পঞ্জর মধ্যে
পাকিয়া এই ভুলোক হইতে তোমাকে যে এই পত্র লিখিতেছি
—এইই আশ্চর্য্য।

“বর্ষগেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে”

চৈত্র মধুমাসে তিনখানি তোমার মধুময় পত্র দ্বারা সর্বত্র
কুশল সংবাদ পাইয়া মনের উল্লাসে আছি। তোমার
পিতৃশ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে নির্বিলম্বে
নির্ঝাহ হইয়া গিয়াছে—শ্রীরাম-বাবু প্রকৃতি বন্ধুবর্গের স্বল্পে
তোমার আবাস-বাটির কষ্টকোদ্ধার হইয়াছে—ব্রাহ্মণ সংশ-
জাত শাস্ত্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক অনুরাগে বেহালা
ব্রাহ্ম সমাজ উত্তম চলিতেছে—ইহা তোমার হৃদয়ের
সন্তোষের ফল। ঈশ্বর তাহার ভক্তদিগের প্রতি এ প্রকার
প্রসাদ বিতরণ করেন যে, তাহার শত্রুরা ভয় পায় এবং
বন্ধুরা আকৃষ্ট হয়।

“তৎ প্রতিষ্ঠেতুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান ভবতি। তন্মহ-
ইতুপাসীত মহান্ ভবতি। তন্মহন-ইতুপাসীত মানবান্
ভবতি। তন্মহন-ইতুপাসীত নমাস্তে সৈ কামাঃ। তদ্বাস্তেতু-
পাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি।”

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পাকড়ানীর পরামর্শে বর্ধমানের ট্রাষ্টভীড়
প্রস্তুত করিবে এবং তাহার ব্যয় জ্যোতির নিকট হইতে
লইবে।

ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারি-সংক্রান্ত খৃষ্টিয়ানদিগের
কীর্তন শুনিয়া অতীব কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। এইক্ষণে
হরি-সভার উপায় কি?

হেমেন্দ্রের রচিত নূতন গান একটি অদ্য তোমাকে
উপহার দিতেছি।

অনিন্দ-ধারা প্রবাহে কিবা আজি,
হৃদ্যাকাশ-মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে ॥
দেখ রে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়;
এক দৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে
অবনত আছেন প্রেমভাবে তাকারে;
শুভ পূর্ণ আজি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

বর্ষশাল।

২৫ আষাঢ়, ১৭৯২ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

বর্ষশেষের দিনে তুমি আদি সমাজে যে উপদেশ
দিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল—তাহাতে
নিঃস্রোজ্ঞনীয় কথা একটিও নাই। তাহার জন্ত তোমাকে
ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রামবাজারের ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ত তুমি এত পরিশ্রম
করিয়াও তাহার নেতা হইতে পারিলে না—ইহা অতি
দুঃখের বিষয়।

অগ্রসর ব্রাহ্মেরা খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের অনুকরণ করিতে
ভালবাসেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টিকি কাটিতে চান
ও সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন; তুমি আলিপুরের
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপাসনার সময়ে খালি পায়ে
উপাসকদিগের সহিত একাসনে বসাইয়া সমাজের গৌরব
রক্ষা করিয়াছ—ইহা তোমারই কাজ। ঐ সাহেবকেও
ভক্তিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি আর একটি পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছ—ঈশ্বর
তোমাকে প্রজার দ্বারা, কীর্তির দ্বারা মহান্ করিতেছেন।
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছ এবং তাহার বয়স
কত হইল? তোমার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হইয়া যথাকালে
ঈশ্বর-প্রেম লাভ করিয়া ভাগ্যবান হউক, এই আমার
আশীর্বাদ।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

প্রীতিভাজনেষু

নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে তুমি যে প্রকার উৎসাহের
সহিত নিপুণরূপে সূত্রপাত করিতেছ ইহাতে আমি অতীব
সন্তুষ্ট হইতেছি। ঈশ্বর তোমাকে চিরজীবী করিয়া এই
হৃদ্যাগ বঙ্গদেশের শ্রী ও ধর্ম্মের উন্নতি করুন—এই আমার

প্রার্থনা। তুমি বাহ্যিক গ্যাণ বলিয়া জানিবে তাহাতে আপনাকে নিমুক্ত করিবে; ঈশ্বর তোমার শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবেন।

ইতি—

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

তারিখ পূর্ব

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৭২০ শক

প্রেমাপ্নয়েষু

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্ত—

তোমার পত্রসকল এই অরণ্য মধ্যে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে। আমার প্রতি তোমার যে-প্রকার অটল অমুরাগ ইহাতে আমার স্নেহ তোমার প্রতি সহজেই ধাবিত হইতেছে। তোমার হৃদয় মন প্রসন্ন থাকুক—তোমার সকল কামনা সফল হউক—তোমার জয় হউক।

গোকুলকৃষ্ণ-বাবু যেমন হৃদয় তাঁর তেমন কার্য্য। তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠাজনিত সত্যবহারে তিনি সকলেরই মনকেই আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার নম্রতা, তাঁহার বিনয়ে সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। তাঁহার মনের ভক্তির প্রভাবে সমাজ-স্থলে উপাসনা-সময়ে দীপমালা আরো উজ্জ্বল ও পরিশোভিত হইয়াছিল। এমত স্থলে তোমার হৃদয় সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইবে না তো আর কোথায় হইবে?

তুমি লিখিয়াছ ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়ম লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। তোমরা তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করিতেছ—উত্তম। কত লোকের স্বাক্ষর সেই নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা আমাকে জানাইবে। সারদা ও নবগোপালবাবু এতদিনে কি সিমলাতে সেই আবেদন-পত্র লইয়া যান নাই? * * * *

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

বাক্সটা শেষ

২২ আষাঢ়

১৭২০ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার—

বিশ্বাসের নিকট হইতে তোমার পীড়ার সম্বাদ পাইয়া

অবধি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলাম। পবে তোমার এই ২২ আঘাতের পত্র পাইয়া প্রাণ পাইলাম। তোমার শরীরের উপর তুমি কিছুই বদ্ধ কর না। কখনো ঝড়ের মধ্যে যাইয়া হাত ভাঙ্গো, কখনো বা বৃষ্টিতে ভেঙ্গে—হয়ত উপরি উপরি রাত জাগে—ইহাতে শরীর কি প্রকারে ভাল থাকিতে পারে? সাবধান হইয়া চপিবে, সম্প্রতি অধিক পরিশ্রম করিবে না।

তারপবে ব্রাহ্ম বিবাহের আইন হইবার বিষয় কি-স্তনিয়াছ আমাকে অবগত করিবে।

রাজনারায়ণ-বাবু মঘে মঘে আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত আমাকে লিখিয়াছেন—আমি তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছি—

“তুমি এখন এক একদিন সমাজের প্রকাশ্য উপাসনা কার্য্য নির্বাহ করিতে প্রস্তুত আছ—অতি আত্মাদের সহিত ইহাতে আমি অমুমোদন করিতেছি”—অতএব তুমি তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিবার জন্ত এক বুধবার প্রথমতঃ স্থির করিবে এবং সেদিন তাঁহাকে তুমি সমাদরপূর্ব্বক বেদীতে বসাইয়া দিবে * * * ইতি—

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ও

অনুত্তর

১৭ গোষ, ১৭২০ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার—

তোমার পত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক উৎসবের যে বর্ণনা করিয়া আমাকে সবিশেষ সকল সংবাদ অবগত করিয়াছ, তাহাতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সমান আমার নিকটে সে-সকল প্রতীতি হইল। ইহার জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই ক্ষণে ১১ মাসের উৎসব নির্দিষ্টে সূচাক-রূপে সম্পন্ন হইলে হয়।

রবীন্দ্র প্রভৃতি বাগকেরা বেহালাতে পাবায়ণে যে যোগ দিয়াছিল তাহা শুনিয়া আত্মোদিত হইলাম। তাহাদের

ব্রাহ্মধর্ম কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহা আমি কিছুই তোমাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া শুনি নাই। তোমার পাণ্ডেয় ব্যয়ের আদেশ এই পত্র তোমার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ প্রেরণ করিতে থাকুন। মনো পাঠাইতেছি গ্রহণ করিবে এবং তোমার শারীরিক ইতি—

কুশল সম্বাদ লিখিয়া আমাকে সম্বোধ রাখিবে। মঙ্গলদাতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

যবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ

শ্রী বিষ্ণুরাজ চট্টোপাধ্যায়, পি, এইচ-ডি (লণ্ডন) ও শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ

ভারতবর্ষের ইতিহাস ধীরে ধীরে তাহার এক অজ্ঞাত অখ্যাত অব্যায়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেছে। সুদীর্ঘ কৃষ্ণাবরণ টানিয়া যে আপনাকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেই বহুদিন-বিস্মৃত রাজলক্ষ্মী আজ তাহার গোপন-রহস্যের মধ্যে- ধীরে ধীরে সকলকে আমন্ত্রণ জানাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকেরা প্রথম হইতে এই কথাটাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন, যে, ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ অপূর্ণ অদ্ভুত কুর্শ্ববৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো সম্বন্ধই ছিল না, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া, সকল ছোঁয়া বাঁচাইয়া ভারতবর্ষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারত-ইতিহাসের এই সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা ও হ্রস্বপন্যে কলঙ্ক আজ ইতিহাসের সত্য দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছে। ইতিহাস এক কথা প্রমাণ করিয়াছে, ইতিহাসের প্রথম প্রভাত হইতেই ভারতবর্ষ দিকে দিকে তাহার সাংঘাত ও সভ্যতার বাণী প্রেরণ করিয়া তাহার ঐশ্বর্য ও সম্পদের বিস্তীর্ণ জীলাক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করিয়াছে; তাহার শিল্পী ও ধর্ম-প্রচারককে পাঠাইয়াছে উত্তর এশিয়ার মবভূমিতে, প্রাচীন সভ্যতার জীলাভূমি চীনে জাপানে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, আর চিররহস্যবৃত চম্পা কঙ্কোজ শ্রাম ব্রহ্মে। শুধু কি সে তাহার শিল্পী ও পণ্ডিত, প্রচারক ও পুরোহিতকে

পাঠাইয়াই ক্ষান্ত ছিল, নিজের অতি প্রিয় সন্তান কত রাজরাজেশ্বরকেও রাজবংশের সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে দেশে বিদেশে প্রতিদিন ভারতের নব নব উপনিবেশ স্থাপনায়। ভারত-ইতিহাসের এ তথ্য এক অপূর্ণ বিস্তৃত অধ্যায়। সে অতীত ইতিহাসের যতই অনুশীলন হইতেছে ততই নব নব তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে এবং সকলকে বিশ্বাসে পুলকে স্তম্ভ করিয়া দিতেছে। এই বৃহত্তর ভারতের অপূর্ণ আভাস আমরা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিতেছি।

ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বকোণে যবদ্বীপের ইতিহাস এই বৃহত্তর ভারতের সূমহান ইতিহাসেরই এক অধ্যায়। প্রাচীন কাল হইতেই যবদ্বীপে ভারতবর্ষের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার, শিল্প ও সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও রাজবংশ আপনার অপ্রতিভ প্রভাব বিস্তার করিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে যেন একটি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছিল। কত শতাব্দী পরে দেখি আজও সর্বত্র তাহার নিদর্শন ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বহির্ভাৱে ভারতীয় সভ্যতার এই অপূর্ণ নিদর্শনের প্রতি আমাদের দেশের বিবুদ্ধজনের সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙালী অল্পসঙ্কীর্ণ পণ্ডিতরা জাভায় বালীতে চম্পায় কঙ্কোজ গিয়া ফরাসী ও ডচ পণ্ডিতদের সহযোগে এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমাদের দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও এই

উদ্দেশ্যে জাভা যাত্রা করিয়াছেন। জাভার ইতিহাস ও জাভায় ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার উপনিবেশ স্থাপনার অপূর্ণ অঙ্কুর তথ্য তাঁহার কবিচিন্তকে মুগ্ধ ও বিম্বিত করিয়াছে।

খৃষ্ট-জন্মের পূর্বে বোব হয় জাভার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে—সুগ্রীব যেখানে তাঁহার বানর সৈন্যকে পাঠাইতেছেন চারিদিকে সীতার অবস্থানে—যবদ্বীপের উল্লেখ আছে, কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত সিঁলভ্যা লেভি বলেন, রামায়ণের ঐ অংশ-টুকু প্রক্ষিপ্ত এবং এই প্রক্ষেপ কিছুতেই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে নয়। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টোলেমি (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) ‘যবদিউ’ বলিয়া যবদ্বীপের উল্লেখ করিতেছেন। ‘যবদিউ’ যে যবদ্বীপ এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না যখন দেখি ‘যবদিউ’ অর্থে তিনি বলেন, যবদ্বীপে যব উৎপন্ন হয়। চীনা সাহিত্যে এ কথার উল্লেখ আছে যে, ১৩২ খৃষ্টাব্দে ইয়ে-তিয়োর (Yetio) এক রাজা, তিয়াও পিয়েন, (দেববর্ষ ৭) চীন দেশে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; চীন-সম্রাট তিয়াওপিয়েনকে একটি স্বর্ণ-মোহর দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই ইয়ে-তিয়ো নিশ্চয়ই যবদ্বীপ। এইজন্ত মনে হয় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত যবদ্বীপ নাম বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

যবদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন শিলালিপি বাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা যবদ্বীপে নয়—বোর্নিও দ্বীপে। তাহাতে কোনো তারিখ খোদিত নাই, কিন্তু অক্ষরের নমুনা দেখিয়া মনে হয় তাহার বয়স খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে কিছুতেই হইতে পারে না এবং সে অক্ষর অনেকটা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন পল্লব শিলালিপি ও চম্পাক্ষোজের সর্বপ্রাচীন শিলালিপি অক্ষরের অনুরূপ। বোর্নিও দ্বীপের এই শিলালিপিগুলি বেশ শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং তাহা হইতে কোনো এক রাজবংশের পরিচয় আমরা পাই—বাহার প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন অশ্ববর্ষ এবং তাঁহার পুত্র রাজাবিরাজ মূলবর্ষ। মূলবর্ষ বাহুবর্ষক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের যুগ-কাঠও শিলালেখগুলির সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।

তার পরেই আরও কতকগুলি শিলালিপিতে পশ্চিম যবদ্বীপের রাজা পূর্ণবর্ষের নাম পাওয়া যায়। অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করিতেন এবং এই অক্ষরগুলিও প্রাচীন পল্লব গ্রন্থাক্ষরের অনুরূপ। এই শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, পূর্ণবর্ষ বর্তমান ব্যাটাভিয়ার সন্নিকটে তরুম নগরের রাজা ছিলেন এবং তিনি চন্দ্রভাগা ও গোমতী নামে দুইটি খাল কাটাইয়াছিলেন। দুইটি শিলালিপিতেই পূর্ণবর্ষের পদচিহ্ন খোদিত আছে—সেই পদচিহ্নকে আবার বিষ্ণু-পদচিহ্নের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। দুইটি কথা এখানে লক্ষ্য করিবার বস্তু—চন্দ্রভাগা ও গোমতী এই দুইটিই উত্তর ভারতের দুইটি নদীর নাম। অনুমান হয়, এই রাজবংশ উত্তর ভারতের কোনো রাজবংশের শাখা। এই ঔপনিবেশিক রাজবংশের রাজারা কি করিয়া মাতৃভূমির সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতেন এই নামগুলি হইতে তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়। আর-একটি জিনিসও লক্ষ্য করিবার মত—শিলালিপিতে আপন পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার সঙ্গে বিষ্ণুপদের তুলনা করিবার মতন হুসাহসও এই ঔপনিবেশিকদের ছিল; ভারতবর্ষের কোনো রাজা অথবা সম্রাটের এতবড় স্পর্দ্ধার প্রমাণ আমরা কোথাও পাই না।

খুব সম্ভব এই পূর্ণবর্ষের সময় অথবা তার কিছু পূর্বে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ সিংহল হইতে পশ্চিম জাভায় আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান্ তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলিয়াছেন যে, সে-সময় যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল, বৌদ্ধধর্মের ততটা ছিল না। যবদ্বীপ হইতে দুইশত হিন্দু বণিকের সঙ্গে জলপথে জাহাজে চড়িয়া তিনি ক্যান্টনে গিয়াছিলেন ৪১৩ খৃষ্টাব্দে।

কাশ্মীরকুমার শিল্পী গুণবর্ষ ৪২৩ খৃষ্টাব্দে জাভা গিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভব তিনিই সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জাভা হইতে তিনি চীনে গিয়াছিলেন জাহাজে চড়িয়া—“নন্দী” নামধারী একজন হিন্দু ছিলেন তার মালিক।

তার পরে জাভার উল্লেখ যেখানে পাই সেও চীনা সাহিত্যে। প্রথম সুঙ বংশের ইতিহাসে দেখা যায়, ৪৩৫

খৃষ্টাব্দে ধ-ব-দ'র এক রাজা শ্রী-প-দ-দো-অ-ল-প-মো (শ্রীপদ ধরবর্ষণ ?) চীন-সম্রাটের সভায় এক রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের জাভার ইতিহাসেব খবরও আমরা পাই চীনা বিবরণে। জাভার উত্তর-পশ্চিমাংশে তখন লন-গ-সু নামে এক রাজ্য ছিল। লোকেরা বলে—“চার শত বৎসর আগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; এক সময় এমন হইল যে, এক রাজা তাঁর শাসনে সকলকে উত্থাপ্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার এক আত্মীয় ছিলেন খুব বুদ্ধিমান—প্রজারা তাঁহাবই অমুগত হইয়া পড়িলেন * * * রাজা তখন সেই আত্মীয়কে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন; সেই নির্বাসিত ব্যক্তি ভারতবর্ষে গিয়া এক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া বসিল। লন-গ-সু'র রাজা যখন মারা গেলেন তখন দেশবাসীরা সেই নির্বাসিত রাজাত্মীয়কে রাজা হইবার জন্ত ডাকিয়া আনিল।” এই রাজার পুত্র চীন-সম্রাটের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেই পত্রটি বৌদ্ধ-ধর্মের শাস্ত্র সিদ্ধ স্থরে সিদ্ধ।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভার প্রতিপত্তি কমিয়া মধ্য-জাভাই শ্রী ও সমৃদ্ধিতে উন্নত হইয়া উঠিতেছিল। চীনের তান্ত্র বংশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মধ্য-জাভায় কলিঙ্গরাজ্য বলিয়া এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জাভার এই বালী ও কলিঙ্গরাজ্য হইতে চীন-সম্রাটের সভায় ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারবার দূত প্রেরিত হইয়াছিল।

৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এই কলিঙ্গরাজ্যের প্রজাসাধারণ ‘সীমা’ নামে এক মহিষসী নারীকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাঁহার স্বশাসন এমনই ছিল যে, পথে কোনো জিনিস পড়িয়া থাকিলেও কেউ কুড়াইয়া তুলিয়া লইত না। একজন আরব সর্দার একবার একটি স্বর্ণখলিক। এই রাজ্যের সীমার মধ্যে পথের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। পথযাত্রীরা কেহই উহা কুড়াইয়া তুলিয়া লয় নাই এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত উহা এমন করিয়াই পড়িয়া ছিল। একদিন রাজকুমার উহার উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া রাণী ‘সীমা’ এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি কুমারের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। পরে একটা

মীমাংসা হয় এবং কুমারের পদতলের যে অংশ ঐ স্বর্ণখলি স্পর্শ করিয়াছিল তাহা কাটিয়া ফেলা হয়।

জাভার এই কলিঙ্গ রাজ্যের কথা এর পরে আমরা আর শুনিতে পাই না। জাভায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলালিপির তারিখ ৬৫৪ শকাব্দ (৭৩২ খৃষ্টাব্দ); সেই শিলালিপি হইতে আমরা সেই সময়কার কিছু কিছু খবর পাই এবং ইহার অক্ষর একেবারে এই সময়ের কথোজরাজ ভববর্ষণের শিলালেখ’র অক্ষরের অনুরূপ। ইহাতে কুঞ্জরকুঞ্জ নামক পবিত্র তীর্থে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা আছে এবং সন্নহ ও সঞ্জয় (পিতা ও পুত্র) নামে মধ্য-জাভায় দুই রাজার নাম আছে। ডিয়েন্ডে উপত্যকার শৈব-মন্দির-গুলি বোধ হয় এই সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। সঞ্জয় স্মাত্তা, বালি, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে আপন প্রভুত প্রভাব ও রাজত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জাভার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সাহিত্যে বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূর্ব জাভার ‘দিনয়’ নামক স্থানে ৬৮২ শকের (৭৬০ খৃষ্টাব্দে) আর-একটি শৈব শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে— তাহাতে অগস্ত্য ঋষির একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার খবর জানিতে পারি। ব্রাহ্মণভক্ত, অগস্ত্য-পূজক রাজা গজয়নের আদেশে এই মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল—“এই বৎসর বর্ষার বারিপাতের আকাঙ্ক্ষায় সুদৃশ্য মহর্ষিভবনে কুন্তলগ্নে দৃঢ়চিত্ত রাজা কর্তৃক এই অগস্ত্য কুন্তলোনির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।” একশত বৎসর পরের আর একটি শিলালিপিতেও আমরা অগস্ত্য ঋষির উল্লেখ দেখিতে পাই (৭৮৫ শক ৬৬৩ খৃষ্টাব্দ)। এই শিলালিপি কিছু সংস্কৃত ও কিছু কবি ভাষায় লিখিত। জাভায় অগস্ত্যের নাম হইতেছে ‘বেলাইঙ’; এই নামেও সেখানে তাঁহার পূজা হইত। ঋষি অগস্ত্য স্বয়ং “ভদ্রলোক” নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অগস্ত্য ঋষির এক বন্দনা-গীতিও তাহাতে স্থান পাইয়াছে।

মধ্য-জাভায় এই সময় খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাতন শৈববংশের পতনের পর স্মাত্তার এক মহাযান-পন্থী বিরাক্ রাজবংশের অভ্যুদয় হইতেছিল। চীনদেশের

সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে জানা যায় খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে সুমাত্রায় 'পালেম্বাঙ' নামে এক হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিত মসিয়ো সোদেশ (Coedes) প্রমাণ করিয়াছেন, এই 'পালেম্বাঙ' ও চীনা সাহিত্যের সন্-ফট-সি অর্থাৎ শ্রীবিজয় একই জিনিস। তাহারই গবেষণার ফলে আজ ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ পূর্বে বৃহত্তর ভারতের এক অপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও মধ্য-জাভা ও সুমাত্রা জুড়িয়া এই শ্রীবিজয় রাজ্যের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শৈলেন্দ্রবংশের কোনো রাজা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তদানীন্তন চোলসম্রাটের অনুমতি লইয়া বর্তমান মাদ্রাজের সন্নিকটে, নেগাপট্টমে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নালন্দায় আবিষ্কৃত দেবপালের এক তাম্রশাসনেও দেখিতে পাই, শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা পরম স্নগত বালপুত্রদেবের ইচ্ছায় নালন্দায় একটি বিহার নির্মিত হইয়াছিল এবং পালসম্রাট দেবপাল এই বিহারের পালনোদ্দেশ্যে পাচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মনে হয় ইংসিঙের পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই সুমাত্রা মহাযান বৌদ্ধধর্মের এক বিরাট কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

মধ্য-জাভাতেও এই শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ৭০০ শকের (৭৭৮ খৃষ্টাব্দের) একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, মধ্য-জাভার 'কালাসনে'র তারামন্দিরটি কোনো শৈলেন্দ্র সম্রাটের আদেশে তাহারই বিজয়-রাজ্যের মধ্যে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব শৈলেন্দ্রাবিস্কৃত এই মধ্য-জাভা কোনো রাষ্ট্রস্বজি দ্বারা শাসিত হইত। ঐতিহাসিকের কাছে এ তথ্য খুবই মূল্যবান যে, এই শিলালিপি উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা, দক্ষিণ ভারতের পল্লবাক্ষরে নয়। এই শৈলেন্দ্র-বংশের শ্রীবুদ্ধির যুগেই কঙ্কোজেও মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী অক্ষর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। উত্তর ভারতের এই ব্রাহ্মীলিপি অনেকটা বঙ্গাক্ষর লিপির অনুরূপ—দেবনাগরীর সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য খুব কম। তাছাড়া এই সময়কার জাভা, কঙ্কোজ, সুমাত্রার

মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে শৈব ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের অদ্বুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। ইহা হইতেই অনুমান হয়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর হইতেই এইদিকে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব কমিয়া আসিতেছিল এবং তাহার ধর্ম ও শিল্প ক্রমেই বঙ্গ ও মগধের পালরাজবংশের সাধনা ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতেছিল।

এই শৈলেন্দ্রাবিপত্যই মধ্য-জাভার স্বর্ণযুগ। এই যুগেই বরবুদরের বিরাট বৌদ্ধমন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডি মেণ্ডুটে (জাভার অধিবাসীরা মন্দিরকে চণ্ডী বলে) যে-অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা গঠন-ভঙ্গীতে ভাবরূপে স্নম্মা ও সৌন্দর্য্যে শুণ্ডযুগের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য-নির্শনের সম্মুখে সগর্বে দাঁড়াইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যামুরাগী কোনো শৈলেন্দ্ররাজ "কবি"-ভাষায় (জাভার প্রাচীন ভাষা) একটি সংস্কৃত পুঁথির তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জাভায় এই শৈলেন্দ্রাবিপত্য প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

শৈলেন্দ্র-প্রভুত্ব দ্বারা তাড়িত হইয়া যে-শৈবরাজারা পূর্বে জাভায় আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারাই এই সময় মধ্যজাভার শৈলেন্দ্র প্রতিনিধিদের হাত হইতে জাভার একাবিপত্য কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বরবুদরের সময় হইতেই 'মধ্য-জাভায়' যে স্থাপত্য-কীর্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল তাহা এই শৈবাবিপত্যে হিন্দু-ধর্মের পুনরাবির্ভাব-সময়েও বিপুল উৎসাহে অনুসৃত হইতে লাগিল। 'প্রস্থানামে'র মন্দিরশ্রেণী ও তাহার প্রাচীর-গাত্রে রামায়ণের যে বিচিত্র কাব্যগাথা চিরকালের অক্ষরে খোদিত হইয়া আছে তাহা এই যুগেই নির্মিত ও রূপায়িত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই, যে-কারণেই হউক, মধ্য-জাভার অপূর্ণ শ্রী ও সমৃদ্ধির যুগের অবসান হয়।

এই সময় হইতে পূর্বে জাভা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বসে এবং সেখানে ম্পুসিন্দক্ নামক জনৈক রাজার অধীনে এক প্রবল রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিন্দকের প্রপৌত্রী মহেন্দ্রদত্তার বিবাহ হইয়াছিল বালিদ্বীপের "রাষ্ট্রিক" (প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্ত) উদয়নের সঙ্গে। এই বালিদ্বীপ ইতিমধ্যেই পূর্বে জাভার

রাজাদের প্রভুত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছিল। উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তার পুত্র ছিলেন মহাপুরুষ ঐলঙ্গ। ১৫ বৎসর বয়সেই ঐলঙ্গ শত্রুহস্ত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্ত বন-গিরি-অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া সেইখানে অরণ্যবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যদি তিনি হৃতসিংহাসন আবার ফিবিয়া পান তাহা হইলে বনবাসী সাধুসন্তদের জন্ত একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া দিবেন। পরবর্তী কালে এ প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। ২৫৭ শক, ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সকল শত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া সিংহাসন অবিকার করেন এবং সমগ্র যবদ্বীপের রাজপদে বৃত্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালেই “কবি”-ভাষায় লিখিত ‘অর্জুন-বিবাহ,’ ‘বিরটি পর্ব’ প্রভৃতি কাব্য ও মহাভারতের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভব রামায়ণও এই সময় অনূদিত হইয়াছিল।

১০৪২ খৃষ্টাব্দে ঐলঙ্গ তাঁহার দুই পুত্রকে রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া আবার বনবাসী হন; ভরদ নামক এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী দুই পুত্রের রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া জ্ঞান জনশ্রুতি আছে। ইহার একটি রাজ্যের নাম জঙ্গল—আর-একটি কেদিরি অথবা ‘ডাহি’। ‘জঙ্গল’ রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নাই; কিন্তু জ্ঞান প্রাচীন “কবি”-সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ আনয়ন করিয়া-ছিলেন কেদিরি’র কবিরা। জ্ঞান জাতীয় ভাব ও কল্পনাকে সার্থক করিয়াছিল এই কেদিরি রাজ্য—আজও জ্ঞান অধিবাসীরা সে-কথা ভুলিতে পারে নাই। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে রাজসভায় রাজকবি ছিলেন ত্রিগুণ। ‘সুবনসম্বক’ ও ‘কুম্বজ্ঞন’ নামক দুইখানি কাব্য ইনি রচনা করিয়া-ছিলেন। ১১২০ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন কামেশ্বর—তাঁহার অদ্ভুত কীর্তিকাহিনী-বিজড়িত স্মৃতি আজিও জ্ঞান কথায় গাথায় বাঁচিয়া আছে। ‘জঙ্গল’র রাজকুমারী চন্দ্রকিরণকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন—দুইজনে এক-সঙ্গে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রাজকবি মণু ধর্মরাজ “স্মরদহন” (মদনভঙ্গ) নামক এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

১১৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে কেদিরি’র

রাজা ছিলেন জয়বয়। তাহারই রাজত্বকালে কবি পেছুলুহ “ভাবতযুদ্ধ ও হবিবংশ” নামক দুইখানি কাব্য প্রকাশ করেন। “ভাবতযুদ্ধে” জয়বয় খুব বীরবোদ্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং স্নমাত্রা-বিজয়ী বলিয়া তাঁহার উল্লেখ আছে। জয়বয় ছিলেন বৈষ্ণব; জ্ঞান লোকেরা আজিও বিশ্বাস করে জয়বয় পুনর্জন্ম লাভ করিয়া কেদিরি’র স্বর্ণরাজ্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কেদিরি’র রাজারা জ্ঞান বাহিরেও সন্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ১১২৯ খৃষ্টাব্দে কামেশ্বর চীন-সম্রাটের নিকট হইতে রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। আরবী পুঁথিপত্র হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান অধিবাসীরা এই সময় আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তার সাধন করিয়াছিল। এমন-কি কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জ্ঞান ও স্নমাত্রার হিন্দু অধিবাসীরাই মাদাগাস্কারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কেদিরি রাজ্য কেন্ অরোক নামক জর্নৈক দুর্দর্শ বীরের কর-কবলিত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান ইতিহাস “কবি”-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ জুড়িয়া বহু বিচিত্র তথ্য পরিপূর্ণ হইয়া আছে। “পর রতন” নামক গ্রন্থে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ হিন্দুরাজ বংশের শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান সমগ্র ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ আছে; নগর কুতাগম গ্রন্থেও জ্ঞান ইতিহাসের অনেক তথ্য আছে, কিন্তু তাহা ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ হযমবুরকের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত।

কেন্ অরোক ছিলেন সিদ্ধসারি ও মজাপহিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ। ত্রক্ষর পুত্র, বিষ্ণুর অবতার ও শিবের পরমাত্মীয় বলিয়া “পররতনে” তাঁহার উল্লেখ আছে। পৃথিবীতে এমন দুষ্কর্ম নাই যাহার অনুষ্ঠান তিনি করেন নাই, কিন্তু যেহেতু এতগুলি দেবতার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ, সেই হেতু কোনো পাপই তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনো ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি ‘সিদ্ধসারি’র সামন্ত রাজ-সভায় পারিষদরূপে প্রবেশ লাভ করেন; সিদ্ধসারি’র রাজা তখন কেদিরি’র সামন্ত রাজ। রাজসভার পারিষদরূপে ক্রমে তিনি রাজরাণীর অত্যন্ত প্রিয়-

পাত্র হইয়া উঠেন; বাজরাণী দেদিস্ ছিলেন অপক্লপ রূপসী, জাভায় তাঁহার মতন রূপসী আর কেউ ছিল না। অনেক চক্রান্ত, অনেক ষড়যন্ত্রের পর, কেন্ অরোকের ষুপ্ত-ছুবিকার আঘাতে কেদিরি-বাজ নিহত হন এবং ১২২০ খৃষ্টাব্দে কেন্ অরোক্ সিঙ্গসারি'ব সিংহাসন অধিকার করিয়াই বিধবা রাণী দেদিসের পাণিগ্রহণ করেন। রাজা হইয়াই কেন্ অরোক্ জঙ্গল ও কেদিরি রাজ্য অধিকার করেন, এবং সিঙ্গসারি রাজ্যকে সমৃদ্ধি বশিবে তুলিয়া দিয়া “রাজস সঙ অমুর্কভূমি” উপাধি গ্রহণ করেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। জাভায় প্রজ্ঞাপাবমিতার যে অপূর্ণ সুখ্যা ও সৌন্দর্য্যাবিভক্ত ভাস্কর্য্য-নিদর্শনটি রহিয়াছে তাহা এই কেন্ অরোকের রাজত্বকালেই নিদ্বিত। পণ্ডিতেরা বলেন, রূপসী রাণী দেদিসেরই ইহা রূপমূর্তি।

সিঙ্গসারির চতুর্থ রাজা ছিলেন কুতনগর (১২৬৮-১২৯২ খৃষ্টাব্দ)। কুতনগর জাভার ইতিহাসকে একটি নূতন রূপ প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতেই সিঙ্গসারি'ব রাজ-বংশের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। “শিব-বুদ্ধ” বলিয়া তিনি দেশের লোকের নিকট হইতে পূজা পাইতেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসংযমী ও দুর্বল-চিত্ত। তিনি বিজয়-অভিযান পাঠাইয়াছিলেন ‘মলয়’তে (সুমাত্রায়), বালিতে, বকুলপুরে (দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্নিও); অথচ তাঁদের নিজের ঘরে, নিজের রাজ্যে সমস্ত শক্তি দরাজ হস্তে অপব্যয়িত হইতেছিল, কোনো সম্ভব, কোনো শৃঙ্খলাই ছিল না। এদিকে আপন গর্বে দর্পিত রাজা চীন-সম্রাট কুবলাই খাঁ'র দূতকে অপমান করিয়া বিদায় দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া কেদিরি'র সামন্তরাজ জয়কতোঙ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কুতনগরের কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন রাদেন্ বিজয়। এই রাদেন্ বিজয় বিদ্রোহী জয়কতোঙকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীবীরের অগিত বিক্রমের সম্মুখে রাদেন্ বিজয়ের ক্ষুদ্র শক্তি শ্রোতের মুখে তুণেব মত ভাসিয়া গেল। জয়কতোঙ কুতনগরকে হত্যা করিয়া সিঙ্গসারি অধিকার কবিলেন, বাদেন্ বিজয় জাভার উত্তরে মাল্লবা দ্বীপে পলাইয়া গেলেন। ‘কয়েক দিন পবেই আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্বশত্রু জয়কতোঙ'র রাজ-সভায় অহতম

মন্ত্রীকপে প্রবেশ কবিলেন এবং রাজার অনুমতি লইয়া এক জনবিরল বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে, এক নূতন নগরী প্রতিষ্ঠা কবিলেন। এই নগরীই পরে মজ্যাপহিত নগরী নামে খ্যাত হয়। বিজয় প্রতি মুহূর্ত্তে হতরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্ববোণ খুঁজিতেছিলেন—১২৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই সুবোণ আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন পরে কুতনগর চীন-দূতকে যে অপমান কবিতা বিদায় দিয়াছিলেন তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য কুবলাই খাঁ তাঁহার সৈন্ত প্রেরণ করিলেন; রাদেন্ বিজয়ের পবামর্শানুসারে এই চীন-সৈন্ত-বাহিনী জয়কতোঙ'র কেদিরি রাজ্য আক্রমণ করিল—যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়কতোঙ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাদেন্ বিজয় এইবার এই চীনা সৈন্তদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিলেন—হঠাৎ আক্রমণে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া চীনা সৈন্ত স্বদেশে পলায়ন কবিল।

জাভায় ভারতীয় উপনিবেশ

সমস্ত শত্রু চারিদিক হইতে এইভাবে নিঃশেষ করিয়া লইয়া রাদেন্ বিজয় ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আপনাব প্রতিষ্ঠিত মজ্যাপহিত রাষ্ট্রে আপন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এবং ‘কুতরাজস জয়বর্দ্ধন’ উপাধি লইয়া পূর্ব জাভার কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। মজ্যাপহিতেব এই সর্বপ্রথম রাজার একটি সুন্দর শিল্প-মূর্ত্তি আছে—বিষ্ণুর প্রতিকপে তিনি রূপায়িত। মৃত রাজাদিগকে তাঁহাদের উপাশ্র দেবতাব রূপে রূপায়িত কবার প্রথা জাভাতে যেমন, কম্বোডিয়াতেম্নি ছিল।

কুতরাজস'র পুত্র পিতার সম্মান ও স্মৃতির মূল্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সে সম্মান ও স্মৃতিকে শুধু বক্ষা নয়, তাহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন মজ্যাপহিতেব তৃতীয় শাসনকর্ত্তা কুতরাজস'র কন্ঠা ত্রিভুবনোত্তম দেবী জয়বিষ্ণু-বর্দ্ধনী। এই মহীবদী নারী তাঁহার মাতা গায়ত্রীদেবী ও ভগিনী রাজদেবীর সঙ্গে একযোগে রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেন—তাঁহার স্বামী ছিলেন রাজ্যের মহাদণ্ড নাযক। কিন্তু বীৰত্ব ও পৌরবে সকলের অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিলেন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গজমদ। একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে সকল সভাসদবর্গের সমক্ষে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, বর্ত্তদিন

পশ্চিম জাভার সমগ্র ভূখণ্ড, বালি, বকুলপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্নিও) সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য এবং সিংহপুর (শিঙাপুর) মজ্যপহিত করতলগত না হয়, ততদিন রাজকোষের একটি স্বর্ণকণাও আমি স্পর্শ করিব না। সভার সকলে বিজয়ের কলহান্তে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। অপমানাহত গজমদ রাণী ত্রিভুবনোত্তম দেবীর নিকট অপমানের বিচার প্রার্থনা করিলেন—রাণীর বিচারে সকল বিজয়মন্ত সভাসদ বহিষ্কার-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। গজমদ নির্ভয়ে রাজ্যদেশ মন্তকে লইয়া বিজয়াভিযানে বাহির হইলেন।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে বালিদ্বীপ মজ্যপহিত-বশ্তা স্বীকার করিল; বালি'র বীর রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে জাভা, মাছরা ও সেলিবিস্ দ্বীপের সমগ্র ভূখণ্ড মজ্যপহিত-সাম্রাজ্যের করতলগত হইল। ত্রিভুবনোত্তম দেবীর রাজদণ্ড ত্যাগের পর হয়মবুরুক মজ্যপহিত সিংহাসনে আরোহণ করেন—ইহার রাজত্বকালেও গজমদই প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময়েই পূর্ব ভারত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপগুলিও একে একে মজ্যপহিত সাম্রাজ্যের বশ্তা স্বীকার করে।

সুমাত্রার রাজা আদিত্যবর্ষণের এই সময়কার একটি অদ্ভুত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিলালিপিটির ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, কিন্তু জাভা ও সুমাত্রায় কি করিয়া তাত্ত্বিক মহাবান ও বজ্রবান বৌদ্ধধর্ম অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছিল, এই লিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “১২৬৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কুমার আদিত্য-বর্ষণ শ্রাশান-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ অভিষেকোৎসবে দীক্ষা লাভ করিয়া ক্ষেত্রজ হইলেন এবং ‘বিশেষ ধরণী’ নাম গ্রহণ করিয়া পরম মুক্তি লাভ করিলেন। জনহীন রাজ্যের রাজসিংহাসনে (অসংখ্য নরমুণ্ডের উপর) বসিয়া, বিকট হাস্তে সকল দিক কল্পিত ক্রিয়া তিনি নররক্ত পান করিতেন এবং তাঁহার মহাপ্রসাদ (নরমেধ-যজ্ঞ) উল্কে ধুমায়িত হইয়া চতুর্দিক উৎকট হুগন্ধে ভরিয়া তুলিত; কিন্তু বাহার্য দীক্ষিত ও লক্ষ্যমন্ত তাহাদের কাছে এই হুগন্ধ অগণিত পুষ্পের নন্দন-সুস্বাদি বলিয়া মনে হইত।” ইহার ঠিক অর্থ বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তাত্ত্বিক ধর্মের আভাস ইহার মধ্যে অত্যন্ত সুপরিষ্কৃত। মৃত্যুর পর আদিত্যবর্ষণ,

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

জাভার তাত্ত্বিক ধর্মের প্রসারের প্রমাণ অল্পত্রুণ আছে। সিঙ্গসারির শেষ রাজা কৃতনগরের রাজসভায় বাস করিতেন কবি প্রপঞ্চ। “কবি”-ভাষায় লিখিত তাঁহার ‘নগরকুতাগম’ গ্রন্থেও রাজ্য কৃতনগরের তাত্ত্বিক ধর্মচরণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কৃতনগর শিব বুদ্ধেরই প্রতীক বলিয়া জাভায় পূজিত ও সম্মানিত হইতেন; তিনি শ্রাশানভূমিতে দীক্ষা লাভ করিয়া জিন ‘অক্ষোভা’র মানব-প্রতীক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কৃতনগর তাত্ত্বিক চক্রের পূজা করিতেন এবং আরো ভীষণ জটিল তাত্ত্বিক অলুষ্ঠানেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—নগরকুতাগম গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। ঠিক এই সময়েরই মজ্জান মহাবান ধর্মের আর-একটি গ্রন্থও (সঙ হ্যাং কমহবানিকন্) তাত্ত্বিকধর্মের চিহ্ন বেশ সুপরিষ্কৃত। এই গ্রন্থেরই এক স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের অংশসমুত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, জাভা ও সুমাত্রায় দিনের পর দিন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে—নানান কুৎসিত আচার ও বিকৃত বিহুট অলুষ্ঠানের মরু-বালিরাশির মধ্যে কি করিয়া বিলুপ্ত হইয়া বাইতেছিল এবং ভারতবর্ষের এই সন্ধর্মের বিলোপ কি করিয়া ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মের প্রসারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে হয়মবুরুকের বধঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাণী জয়বিষ্ণুবর্দ্ধনী রাজদণ্ড পরিত্যাগ করেন। এই হয়মবুরুকের রাজত্বকালেই মজ্যপহিত সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি লাভ ঘটিয়াছিল। নগরকুতাগম ও পরবর্ত্তান্ গ্রন্থে তাঁহার রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। জাভা হইতে আরম্ভ করিয়া নিউগিনি পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বোর্নিও, দক্ষিণ ও পশ্চিম সেলিবিস্, বুটন, বুরু, মেয়াম, বান্দা, বঙ্গ-গই, মলুকাদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্তই মজ্যপহিত রাজ্যের বশ্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মালয় দ্বীপপুঞ্জের কেদাহ, কেলাঙ, সিঙাপুর, পাহাঙ ও কেলানতন্ এবং সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যও হয়মবুরুকের করতলগত হইয়াছিল। গজমদের সগর্ভ প্রতিক্ষা হয়মবুরুকের রাজত্বে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। এই

সুবিভূত বিজিত রাজ্যেব তালিকা ছাড়া নগর কৃতাগম গ্রন্থে মজ্যপহিত-রাজ্যের গিত্তশক্তিপুঞ্জেরও উল্লেখ আছে—শ্রাম-দেশের অধোধ্য ও বাজপুৰী ; ব্রহ্মদেশের মকংমা (মার্ত্তমান), কষোজ, চম্পা ও বনন রাজ্য (উত্তর আনাম) ইহারা সকলেই মজ্যপহিত শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

বিজিত দ্বীপের রাজারা নিয়মিতভাবে মজ্যপহিত রাজ্য-সভায় কর প্রেরণ করিতেন। 'হয়মবুক'ও এইসকল রাজ্য অধিকার কবিবাই ক্ষান্ত ছিলেন না ; প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক স্থানে তিনি রাজ্যকার্য্য পরিদর্শনের জন্ত মন্ত্রী ও ভূজঙ্গদেব (গুণী ব্রাহ্মণ) প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতেন। শৈব ভূজঙ্গেরা রাজ্যকার্য্য পরিদর্শন ছাড়া সর্বত্র শৈবধর্ম্মের প্রচাবে সাহায্য করিত। কিন্তু পশ্চিমজাভায় বৌদ্ধ ভূজঙ্গেরা কোনো আমল পাইত না, সেখানে প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কেহ ছিল না। পূর্বজাভায় ও পূর্বদ্বীপপুঞ্জে, ইহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ভরদ ও কুটরন নামে দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু বালিদ্বীপে মজ্যপহিত রাজ্যের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাব প্রচলন করিয়াছিলেন।

ভূজঙ্গদের রাজ্যকার্য্য পরিদর্শনের ব্যবস্থায় মজ্যপহিত রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজ্যদেশ অমাত্র করিবার সাহস কাহারও হইত না—কবিলে "জলধি মন্ত্রী"-দের হাত হইতে কাহাবও নিস্তার ছিল না।

নগরকৃতাগম গ্রন্থের মত রাজ্যপরিচালনার ভার ছিল দোষলেশসংস্পর্শহীন পাঁচজন মন্ত্রীর উপর। রাজ-কুমারেরাও রাজ্যের কোনো কোনো অংশে রাজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেন—ইহাদেরও মজ্যপহিত রাজ্যসভায় আসিয়া কব ও প্রণতি নিবেদন করিতে হইত। হয়মবুকের রাজমহিষী ছিলেন ত্রীপুরমেশ্বরী সুষমা দেবী—নগরকৃতাগম গ্রন্থে তিনি রতির মানবী প্রতিকরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

মজ্যপহিত রাজ্যের রাজ্যবিস্তৃতি-গরিমাই শুধু গর্বেব বিষয় ছিল না। প্রপঞ্চ-লিখিত গ্রন্থে রাজ্য-ধানীব. অপূর্ব সমৃদ্ধির বিবরণও আছে—সুদৃশ-জগতীর জলাশয়ে কেশর-চম্পকবীথিকায়, বিস্তৃত পুষ্পোচ্ছাদনে, প্রাসাদে, হট্টমন্দিরে, রাজ্যবিতানে মজ্যপহিত

রাজধানী হসিত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্য-বিতানে বসিয়া রাজ্যপতি (প্রধান মন্ত্রী), আর্ধ্য, ও পঞ্চমন্ত্রীতে মিলিয়া রাজ্যের সম্মুখে রাজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজধানীর পূর্ব প্রান্তে শৈব ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন—তাহাদের নেতা ছিলেন ব্রহ্মরাজ। দক্ষিণ প্রান্তে বাস করিতেন বৌদ্ধেরা—এই বৌদ্ধ-সংঘের কর্তা ছিলেন রেক্সদদি। পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেন ক্ষত্রিয় ও মন্ত্রীরা। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ছিল—এই সময়কার ইতস্ততঃ-বিস্তৃপ্ত বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। জাভার সাহিত্য বহুশপরিমাণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত ; বৌদ্ধ কবির পৰ্য্যন্ত এই সময় রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতেন।

এই সময়কার জাভাব ভাস্কর্য্যে ভারতীয় প্রভাব কমিয়া গিয়া পলিনেশিয়ান প্রভাবই অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব জাভার চণ্ডী পানাতবমে রামায়ণের যে-সব প্রস্তর-চিত্র খোদিত আছে তাহাতে এই পলিনেশিয় প্রভাব অত্যন্ত নিপুণ ভাবে আপনাব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। মেঘের ভটাজালের অলঙ্কার রূপেব মধ্যে দৈত্য-দানব, নর-বানর অপূর্ব অদ্ভুত উপায়ে রূপাঙ্কিত হইয়া আছে। কিন্তু এই পলিনেশীয় প্রভাব মন্দিরের বাহিরের প্রাচীর-গাভের উপরই আবদ্ধ—মন্দিরের ভিতরের দেবদেবীর শিল্পরূপ একেবারে মধ্য জাভার ভারতীয় প্রভাবে সমৃদ্ধ। এইসব মূর্তির পাদপীঠে প্রায়ই উত্তর ভারতের ব্রাহ্মীলিপি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়—অক্ষরগুলি নাগরী হইতে রূপান্তরিত হইতে হইতে প্রায় বঙ্গাক্ষরের অল্পরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে হয়মবুক দেহত্যাগ করিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর হইতেই মজ্যপহিত রাজ্যবংশের ধ্বংস-লীলা সুরু হইল। স্বীয় পুত্র ও জামাতাব মধ্যে গৃহ-বিবাদেব সূত্রপাত হইয়া এই ধ্বংসলীলার প্রথম অঙ্কের অভিনয় আবিস্ত হইল। উত্তর বোর্নিও, সুমাত্রাব ইন্দ্র গিরি ও মালাকা স্ত্রযোগ বুদ্ধিমা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং তাহার পরেই দারুণ হর্ভিক্ষে সমগ্র মজ্যপহিত রাজ্য

বিলুপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। মজাপহিতের সর্বশেষ, রাজা নব্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। হয়গুবুকের পৌত্রী স্নহিত'র রাজত্বকালে কেদিরি রাজ্য মজাপহিত অধীনতা হইতে মুক্তিসাধ করিল। স্নহিত'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃতবিজয় চম্পারাজ্যের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই রাণী ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত পোষকতা করিতেন এবং ইহারই কন্যাগে ইসলাম ধর্ম জাভায় সর্বপ্রথম প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করে। ইনি ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

চম্পা-রাজকুমারীর ইসলাম ধর্মের এই পোষকতার সমুচিত প্রতিদান মুসলমানেরা দিতে পারে নাই—তাহাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মজাপহিতের শেষ সম্রাট অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মজাপহিত রাজ্যের ধ্বংসের পর সম্রাট মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া শুইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি স্বপ্নচক্ষে দেখিতেছি সমুদ্রের ওপার হইতে বিজাতীয়েরা আসিয়া এই রাজ্য অধিকার করিবা লইবে'—ওলন্দাজেরা আসিয়া তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল করিয়াছে।

কিন্তু শিলালিপি বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় মজাপহিত রাজ্যকে ধ্বংসের কুক্ষিগহ্বরে টানিয়া নামাইয়াছিলেন জনৈক হিন্দু রাজা রণ-বিজয়। রণ-বিজয় ছিলেন কেদিরি'র রাজা; এই কেদিরি রাজ্য রাণী স্নহিত'র রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ১৫২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মজাপহিত রাজধানী অটুট ছিল, কিন্তু প্রবান প্রবান রাজবংশ সকলই বালিদ্বীপে পলাইয়া গিয়াছিলেন। রণ-বিজয়ের বংশ বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই—ইসলামের মুক্তশ্রোত সকল রাজ্য, রাজবংশকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। প্রকরণ শতাব্দীর শেষপাদ হইতেই জাভা ও সুমাত্রায় ইসলাম-আধিপত্যের স্বত্রপাত হইল।

বালিদ্বীপের ইতিহাস ইতিমধ্যে অল্পদিকে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মজাপহিত রাজ্য ধ্বংসের কিছুকাল পূর্বেই কয়েকজন শৈব ব্রাহ্মণ বালিদ্বীপে পলাইয়া গিয়াছিলেন। বালির ব্রাহ্মণেরা বলেন তাঁহারা পদগু (পণ্ডিত) বাহ রত্ন (অচিরাগত) নামক জনৈক ব্রাহ্মণের বংশ-সম্প্রদায়।

এই ব্রাহ্মণের পুরুষারা ছিলেন। তাঁহারই পাঁচপুত্র হইতে বর্তমান বালির ব্রাহ্মণের পাঁচটি শাখা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বালিদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম এখনও বিদ্যমান, কিন্তু হিন্দুধর্মের মত এতটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। উৎসব উপলক্ষে চারিজন শৈব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে একজন পঞ্চম বৌদ্ধ ভিক্ষুকও আহ্বান করা হয়। ব্রাহ্মণদের বলা হয় ইদা, ক্ষত্রিয়দের বলা হয় দেব, বৈশ্যদের বলা হয় 'গুপ্তি' এবং শূদ্রদের বলা হয় 'বাপে মেমে' (বাবা মা)। বালির হিন্দুরা বহুদিন জাভাকে ভূখিতে পারে নাই, অসীম কৃতজ্ঞতায় তাহাকে স্মরণ রাখিয়াছিল, কিন্তু রাজ্য রাজ্য যুদ্ধের আর বিরাম ছিল না। দিনের পর দিন যুদ্ধ ও রক্তপাতে পূর্ণ জাভা ও পশ্চিম বালি জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইল; এবং তাহাতেও যখন জাভাদ্বীপে বালিরাজ্যের বিস্তৃতি সম্ভব হইল না তখন বালির রাজার পূর্বদিকে লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ বিজয়ের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। বালিদ্বীপে হিন্দু রাজারা আজও রাজ্য করিতেছেন—ভারতবর্ষের বাহিরে একমাত্র বালিদ্বীপেই আজও হিন্দুরাজত্ব বিদ্যমান আছে।

বেদের কোনো কোনো অংশ মাত্র বালিদ্বীপে প্রচারিত ও প্রচলিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের সমগ্রটুকুর সহিতই বালিদ্বীপের হিন্দুরা পরিচিত। সেখানে প্রচলিত 'তুতুব' নামক গ্রন্থভাগ-সমূহে ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, রাজনীতি বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে বিবিধ সংগ্রহ সন্নিবিষ্ট আছে। বালিদ্বীপে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচলনের প্রমাণ ইহা হইতে অধিক আর কিছু আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বালিতে "কবি"-ভাষার রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড ছাড়া) প্রচলিত আছে। রামায়ণের (উত্তরকাণ্ড) লইয়া পৃথক গ্রন্থ আছে। বালির লোকেরা মহাভারতের নামও জানে না, কিন্তু "কবি"-ভাষায় লিখিত মহাভারতের ছয়টি পর্কের প্রচলন আছে।

জাভা, সুমাত্রা ও বালিদ্বীপে ভারতীয় রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস পূর্ব ভারতমহাসমুদ্রে বৃহত্তর ভারতের এক অধ্যায় মাত্র। রাজার নাম, রাজ্যের নাম, রাজবংশের

নাম, রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা, মন্ত্রী-পরিষৎ প্রভৃতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ভারতবর্ষ এই দ্বীপগুলির প্রত্যেকটির সীমার মধ্যে আপনার স্বরূপ রূপকে এক এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্তি দান করিয়াছিল। কিন্তু, বৃহত্তর ভারতের ইতিহাসে রাজা ও রাজবংশের ইতিবৃত্ত নিত্যন্তই তুচ্ছ। কোনো রাজা বা রাজবংশ বৃহত্তর ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে সজীবিত করিয়া রাখে নাই—রাখিয়াছে • শিল্পী ও কবি, পুরোহিত ও প্রচারকেরা—স্বাধীন সত্য বৃহত্তর ভারত রচনা করিয়া তাহার মধ্যে

প্রচার করিয়াছে ভারতের ধর্ম ও সাধনা, শিক্ষাইয়াছে ভারতের ভাষা ও সাহিত্য, গড়িয়াছে মূর্তি ও মন্দির। সেই ধর্ম ও সাধনার ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, মূর্তি ও মন্দিরের ইতিহাসই বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। জাভা, সুমাত্রা ও বাসিন্দীপে বৃহত্তর ভারতের সেই সত্য ইতিহাস অপূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল—সে-সমৃদ্ধির কাহিনী ইতিহাসের আর-এক বিস্তৃত অধ্যায়। *

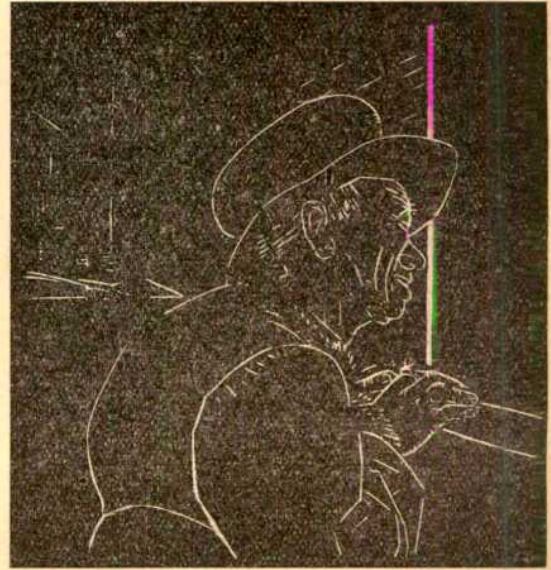
* বৃহত্তর ভারত-পরিষদে পঠিত।

আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র (Wood-cuts)

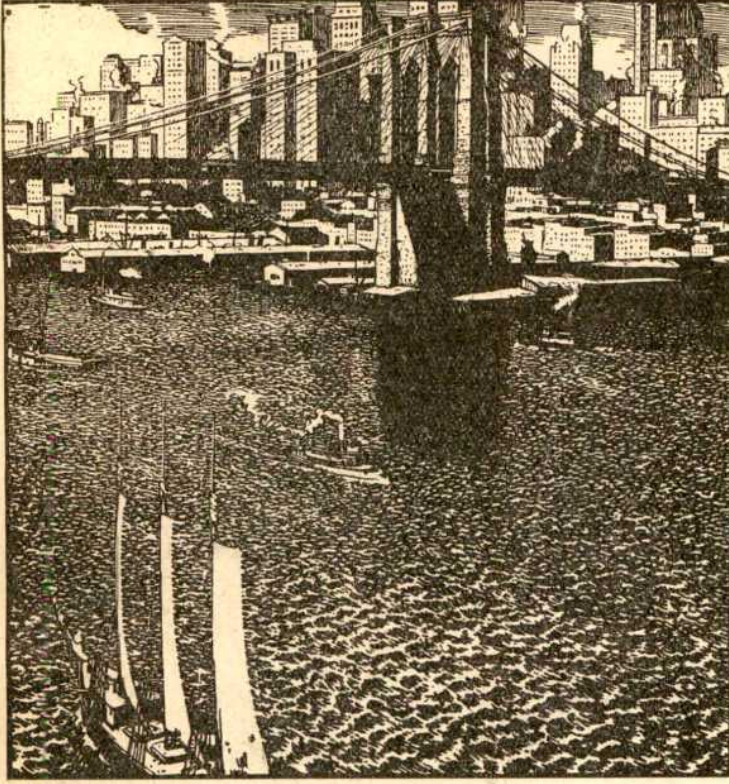
শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী সজনীকান্ত দাস

পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় শিল্পকলা তত্রত্য শিল্পীদের অদম্য উৎসাহ ও প্রবল প্রাণশক্তির প্রভাবে দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। শিল্পকলার অগাধ বিভাগের মত প্রাচীন কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতিরও যেন পুনর্জন্ম ঘটয়াছে। মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিত্রশিল্পের এই বিশেষ বিভাগটি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস বহুদিনের। প্রাচ্য চীন দেশেই কাঠ-খোদাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের একটি কাঠ-খোদাই-চিত্র স্মার আউরেল ষ্টাইন তুন-হুয়াঙ-এ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পবিদেরা অনুমান করেন সম্ভবতঃ এই চিত্রটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত। ইয়োরোপের কাঠ-খোদাইয়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে ইহা ইয়োরোপে প্রবর্তিত হয়। চীনা শিল্পীরা এ-বিষয়ে ইয়োরোপীয় শিল্পীদের গুরু কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ক্রমপরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই পৃথক্

ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের পূর্বসীমান্তে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শিল্পের অস্তিত্ব



১নং চিত্র। মাদিয়া লেন ফষ্টার কর্তৃক খোদিত।
আনাতোল ফ্রাঁসের কোনো পুস্তকের জঙ্ঘ প্রস্তুত



‘ব্রুকলিন ব্রিজ’
পি. ক্লিক কর্তৃক খোদিত

অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া জাপানের চমৎকার রঙীন-ছাপচিত্রে (Colour Print) পর্যাবসিত হইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপে, এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রণর হইয়া বোড়শ শতাব্দীতে ডুরোর ও হোল্‌বাইন এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর হস্তে চরম গৌরবলাভ করিয়া হঠাৎ যেন সমাপ্ত হইয়া সৃজন-শিল্প- (creative art) শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র কাঠ-খোদাই-শিল্পের ইয়োরোপীয় ধারা লইয়াই আলোচনা করিব। বস্তুতঃ এই শিল্পের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ভিন্ন ধারা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিচার করিলে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অনুমিত হয়। ইয়োরোপে রঙীন কাঠ-খোদাই-চিত্র (colour wood-cuts) অপ্রচলিত ত নহেই, এমন-কি বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তবুও ইয়োরোপীয় কাঠখোদাই-শিল্প বলিতে আমরা সাদা ও কালোর সমাবেশে অঙ্কিত ছবিই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া থাকি। ডুরোর ও হোল্‌বাইনের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই

শিল্প-বিভাগে কোনো নিপুণ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ে কাঠখোদাই-শিল্প কতকটা গতানুগতিক যন্ত্রশিল্পে পরিণত হয়। যে-কোনো ধরণের অঙ্কিত চিত্র আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুকরণে কাঠে যথাযথ খোদাই করিয়া আধুনিক বাস্তবিক শিল্পীদের মত রঙে রেখায় বাহৃতঃ আসনের একটা নকল খাড়া করিয়া তোলাই তখন শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ক্যামেরা ও নানাবর্ণের প্রসেস এন্থ্রেভিং (তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর উপর বিশেষ বিশেষ দ্রাবক প্রয়োগে আলোকচিত্রের অনুরূপী আলো ও ছায়ার নিবিড়তার তারতম্য অনুযায়ী যে-কলক উৎকর্ণ হয় তাহার সাহায্যে ছবি ছাপান) আবদ্ধ হওয়াতে গ্রন্থাদি এইভাবে চিত্র-সম্বলিত করা অল্প পরিশ্রমে ও অনেক কম খরচে হইতে

লাগিল ; সুতরাং এইরূপ গতানুগতিক ভাবেও কাঠখোদাই-পদ্ধতির অস্তিত্ব বজায় রহিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, একদিক্ দিয়া বাহ্যিকতার বিবেচিত হইল অর্থাৎ ব্যবসার দিক্ দিয়া এই কাঠখোদাই-শিল্পীদের যে অনিষ্ট হইল যেন তাহারই ক্ষতি-পূরণস্বরূপ এই পদ্ধতি সৃষ্টিশিল্পকলা শ্রেণীতে পুনর্বার স্থান পাইল। ব্যবসায়ের আবরণ খসিয়া যাওয়াতে ইহার স্বাধীন মূর্তি প্রকাশ পাইল। আজকাল আমরা অনেক পুস্তকই কাঠখোদাই-চিত্র-শোভিত দেখিয়া থাকি। ইহার কারণ এই নয় যে, এই পদ্ধতিতে অল্পমূল্যে আদল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি দেওয়া যায়। আদলে ইহাতে পুস্তকের শোভা যথার্থ বর্ধিত হয়। কেবলমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে কোনো পুস্তকে কাঠখোদাই-চিত্রের সমাবেশ হয় না। যেদিন এইভাবে লোকের মনে বন্ধমূল হইল সেদিনই যেন এই শিল্পের নবজাগরণ হইল। ফরাসীদেশে সর্বপ্রথমে এই

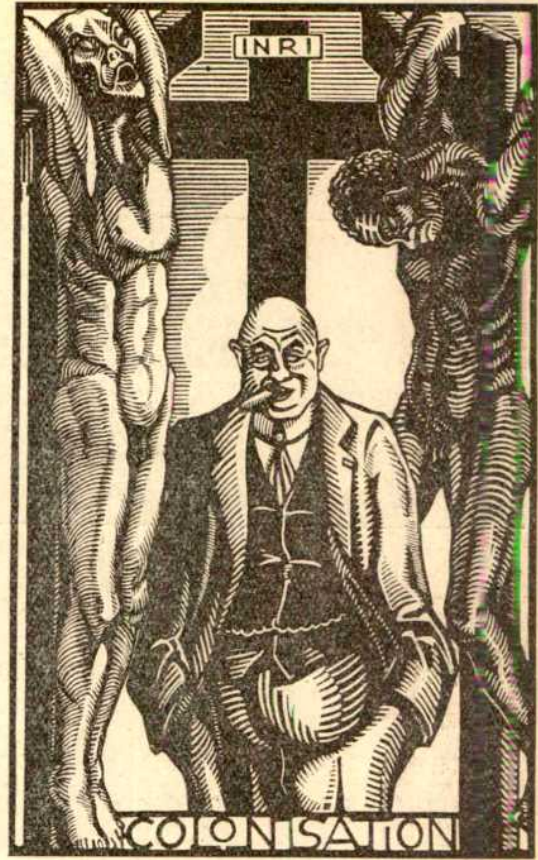
জাগরণের সূচনা হয়, সম্প্রতি পৃথিবীর সর্বদেশে ইহার অনুশীলন হইতেছে। এমন-কি শিল্পকলার অগ্রাগ্রহ বিভাগে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি, ব্র্যাঙ্কিন ও ডেরেনের (Brangwyn ও Derain) মত প্রথিতনামা শিল্পীরাও কাঠ-খোদাইকে স্বল্প কলাশিল্পের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া ইহাতে হাত দিয়াছেন।

(১)

খোদাই-শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ কথা ও কাঠ-খোদাই-শিল্পপদ্ধতি—

সচরাচর পুস্তক বা সংবাদপত্রাদিতে আমরা যে ছবি দেখিয়া থাকি তাহা কাগজের উপর পেন্সিল কলম বা তুলি-দ্বারা হস্তাক্ষিত ছবিরই আলোকচিত্র ও প্রেসে এন্‌গ্রেভিংয়ের সাহায্যে নিশ্চিত ফলকের ছাপ মাত্র। এই সকল ছবিতে আমরা শিল্পীর ছবির আদর্শে স্বল্প-সাহায্যে প্রস্তুত প্রতিকৃতিরই পরিচয় পাই—আসলে এইসকল ছবিতে শিল্পীর হাতের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। কাঠ-খোদাই ছবি ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহার সহিত শিল্পীর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কাঠখণ্ডের উপর হাতে খোদাই করিয়া শিল্পী যে ছাঁচ নিৰ্ম্মাণ করেন, কাঠ-খোদাই ছবি তাহারই ছাপ (Print)। অর্থাৎ কাঠখোদাই ছবি আসল ছাঁচের ছাপ মাত্র। কাঠ-খোদাই এন্‌গ্রেভিং বা তক্ষণ শিল্পের অন্তর্গত। এই দুই ধরনের ছাপে বিস্তর প্রভেদ।

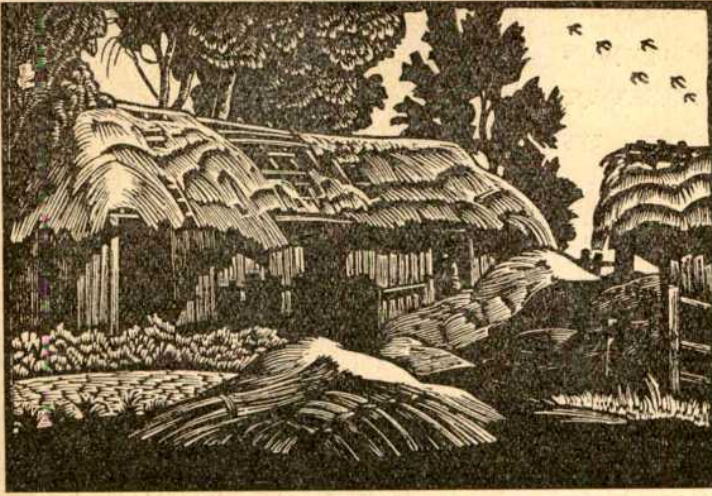
সকল ছাপা ছবিকেই আমরা দুইটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করিতে পারি; এক, যন্ত্রনির্ম্মিত ফলকের ছাপ (অর্থাৎ 'প্রেসে'), দুই, হাতে খোদাই-করা ফলকের ছাপ (অর্থাৎ এন্‌গ্রেভিং)। প্রথম শ্রেণীর ছাপ-চিত্র যে-ভাবে প্রস্তুত হয় তাহাতে এইগুলিকে কোনো ক্রমেই শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত বলা চলে না। 'প্রেসে' ছাপা ছবি প্রস্তুতের প্রকার-ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ কখনো অল্প মূল্যের স্থল হাফটোন হইতে পারে, কখনো বা মূল্যবান স্বল্প রঙীন কোলোটাইপ ছবিও হইতে পারে। স্থল, স্বল্প যে-ভাবেই এগুলি প্রস্তুত হোক—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এগুলি প্রাণহীন ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত ছবির যান্ত্রিক (instrumental) প্রতিকৃতি মাত্র। এইসকল প্রণালীর আসল উদ্দেশ্য কোনো হস্তাক্ষিত রঙীন কিংবা রেখা-চিত্রের, খোদিত চিত্রের,



‘নান্সাজা-বিস্তার’

জঁ। কেফালিনোস কর্তৃক খোদিত

আলোক-চিত্রের অথবা যে-কোনো ছাপা বা হস্তলিখিত পৃষ্ঠার রঙ, রেখা ও বরণধারণ সর্বতোভাবে আসলের অনুরূপ করিয়া তোলা। মূল্যবান 'প্রেসে' ছাপা ছবিতে, (যেমন মেদীচি ছাপের ছবি) এমন সুকৌশলে ছাপ লওয়া হইয়া থাকে যে, বাহারা এইসকল ছাপ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা অদ্বুত যন্ত্র-কৌশলের তারিফ না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু, এইসকল ছাপের প্রশংসার ইখানেই শেষ। ছাপা ছবিতে শিল্পনৈপুণ্য বা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা আসল ছবিখানির বস্তু। কিন্তু শিল্প-সমালোচনায় খোদাই-করা ছাঁচের ছাপা ছবি (এন্‌গ্রেভিং) সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হাতে খোদাই-করা কাঠ বা বাতু-ফলকের ছাপ মাত্র। এই খোদাই-কার্যে সাতটি বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হয়।



‘গোলা ঘর’
এথেলবার্ট হোয়াইট কর্তৃক খোদিত

এই সাত প্রণালীর কোনোটিতেই কোনো আদর্শকে অনুসরণ করিয়া তাহার বার্থ প্রতিনিপি গড়িয়া তোলা হয় না। খোদাইকার বা শিল্পীর মন—রেমব্রান্ট ও ডুরেরের মত শিল্পীর বিরাট চিন্তাশক্তি—এইসকল প্রণালীর অন্তরালে কাজ করিতে থাকে। তাঁহাদের অন্তর্লোকে প্রতিকল্পিত দৃশ্যই তাঁহারা স্বল্প শিল্পানুভূতির সাহায্যে উপকরণের উপর অঙ্কিত করিয়া দেন। শিল্পীর শিল্পচিন্তাকে রূপে ফুটাইয়া তুলিবার বে, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উপকরণের আছে, তাহা এবং শিল্পীর আপন স্বাভাব্য এই ছই মিলিয়া সকল খোদিত-চিত্রকে (এনগ্রেভিং) এমন একটি শিল্প-সুখমা প্রদান করে যাহা সাধারণ যন্ত্র-নির্মিত প্রসেস্ ছাপে পরিলক্ষিত হয় না।

জাইলোগ্রাফী বা কাঠ-খোদাইয়ের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের কাছে কাঠখোদাই-শিল্পের ‘আঙ্গিক’* বা টেকনিকের আলোচনা করিতে হইবে।

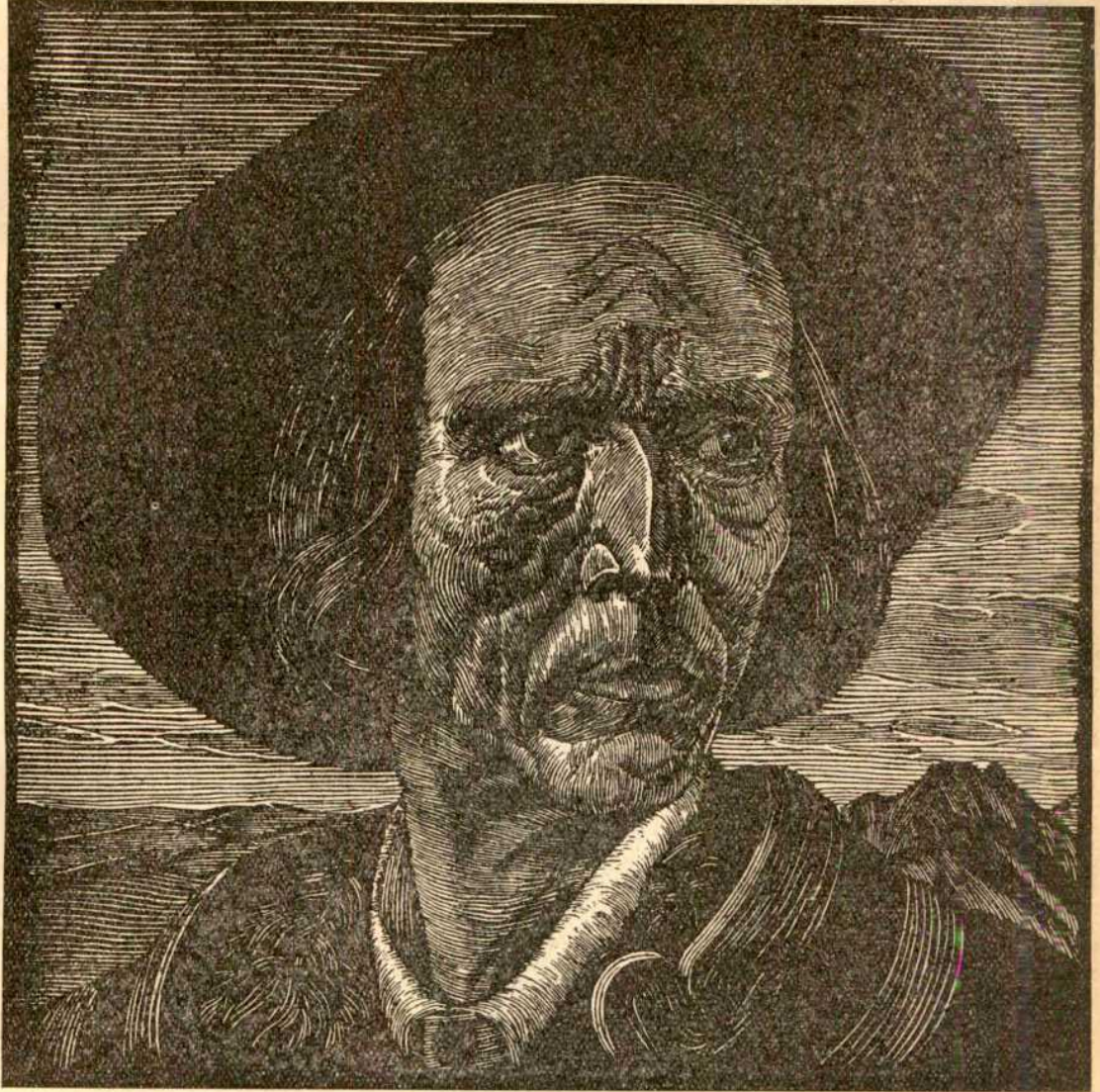
শিল্পী তাঁহার প্রয়োজন-মাত্তিক আয়তনের ও নরম বা শক্ত একখণ্ড কাঠকলক লইয়া তাহার উপরে ছুঁচ বা পেন্সিল দিয়া তাঁহার কল্পিত ছবির একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া লন। সেই খসড়াটির উপর ইহার পর ছুরী বা বুরিন (খোদাইয়ের যন্ত্রবিশেষ) চালাইয়া খোদাই করা হয়। যে যে

অংশ কাটিয়া ফেলা হয় ছাপ লওয়ার সময় সেগুলি সাদা দেখায়; অকঙ্কিত অংশ কালো চিহ্নিত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কাঠখোদাই পদ্ধতির গোড়ার কথা এই সাদা রেখা। এক নম্বর চিত্রে যে ছাপের প্রতিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র এই সাদা ও কালো রেখা-চিত্রিত। সাধারণ হস্তাঙ্কিত চিত্র ঠিক উহার উল্টা, তাহাতে সাদা পটভূমির উপর মানুষের বাহ্যবয়ব কালো রেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়। কিন্তু এই ধরনের চিত্রে, শিল্পীর যাহা আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে-চেষ্টা

তাহা কতকটা ব্যর্থ হয়, অধিকন্তু, ছবির বর্ণোজ্জ্বলতা বা চটক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। কাঠ-খোদাই শিল্পে শূন্য কালো পটভূমির উপর সাদা রেখার সাহায্যেই শিল্পী বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হয়; হস্তাঙ্কিত চিত্রে যেমন কালো রেখা বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, কাঠখোদাইয়ে তেমনি সাদা রেখা বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞাপক। সাদা-রেখার সাহায্যে চিত্রকে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবার সুবিধা এই যে, ইহার বহুল প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না, তাছাড়া, শিল্পীর অথ কিছু কৌশলের সাহায্যও লইতে হয় না; কালোর উপর সাদার সমাবেশে সহজেই সমগ্র জিনিষটি স্পষ্ট করিয়া তোলা সহজ হয়। কাঠ-খোদাই ছাপে আমরা যখনই এই শিল্পের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের—অর্থাৎ সাদা রেখার যথাযথ প্রয়োগের অভাব* দেখি তখনই বুঝিতে পারি শিল্পী অথ কোনো শিল্পকে আদর্শ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ধরনের ভ্রমাত্মক কাঠখোদাইয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—মিঃ রিকেটস্ খোদিত “হিমনেরেটো মেকিয়া পলিফিলি” (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) বিষয়ক ছাপগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইসকল ছাপ হস্তাঙ্কিত ‘পেন্সিল ড্রইং’য়ের হুবহু অনুকরণ মাত্র।

এই সাদা রেখার কাজে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাঠ-খোদাই শিল্পী ক্রমে ক্রমে কালোর উপর সাদা জমি (spaces), কালো রেখা, কালো জমি, কালো ও সাদার

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়োগ।



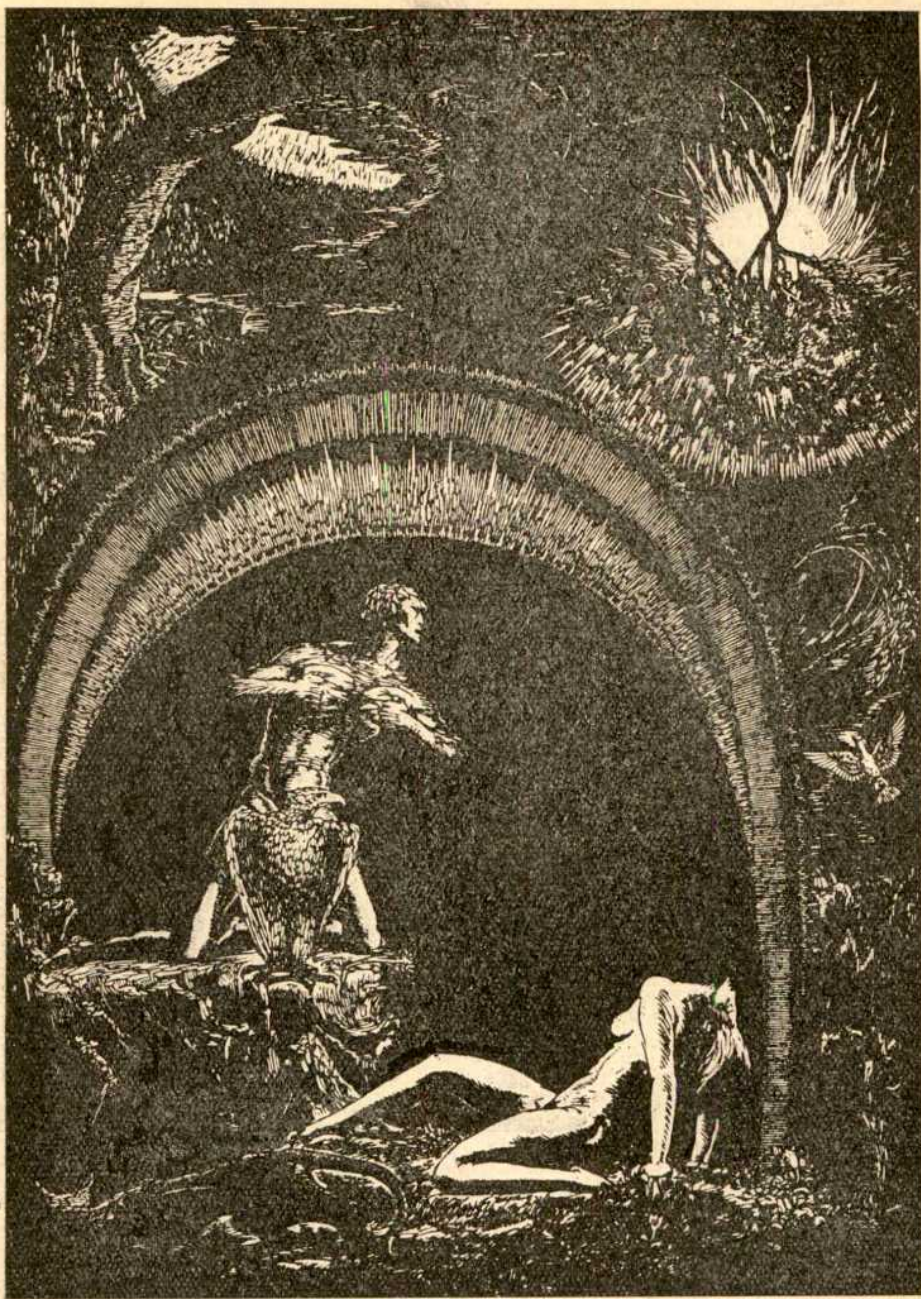
'পোলাণ্ডীয় কৃষিকারী'—ত্‌লাডিস্‌ল স্বক্‌জিলাস কর্তৃক খোদিত

সংমিশ্রণ, এবং বিন্দু ও রেখার সাহায্যে শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। কাহার পর কি প্রয়োগ করা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া বলা কঠিন। শিল্পীর কল্পনা ও কারু-ক্ষমতা দ্বারাই পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। হান্স্‌ন পাউল একজন নিপুণ উচ্চ শ্রেণীর কাঠ-খোদাই শিল্পী, —ইনি কালোর পাশে সাদা জমির বৈবম্য পরিষ্কৃত করিয়া তাঁহার থসড়া (Design) গড়িয়া তোলেন। কিন্তু বিখ্যাত ইংরেজ-শিল্পী গর্ডন ক্রেগ তাঁহার কাঠখোদাইয়ের আদর্শ বিবৃত

করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—“আমি সাদা জমি ও কালো-রেখা, ছটিকেই এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলি যে, সমগ্র ছবিখানি উগ্র ধূসর বর্ণে চিত্রিত মনে হয়।”

(২)

শিল্পীর কল্পনা-শক্তির উপর উপকরণ বস্তুর প্রভাব অত্যন্ত শিল্পীর সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁহার অনুমত বিশেষ শিল্পকলার যথাযথ ধারা বজায় রাখিয়া চলা

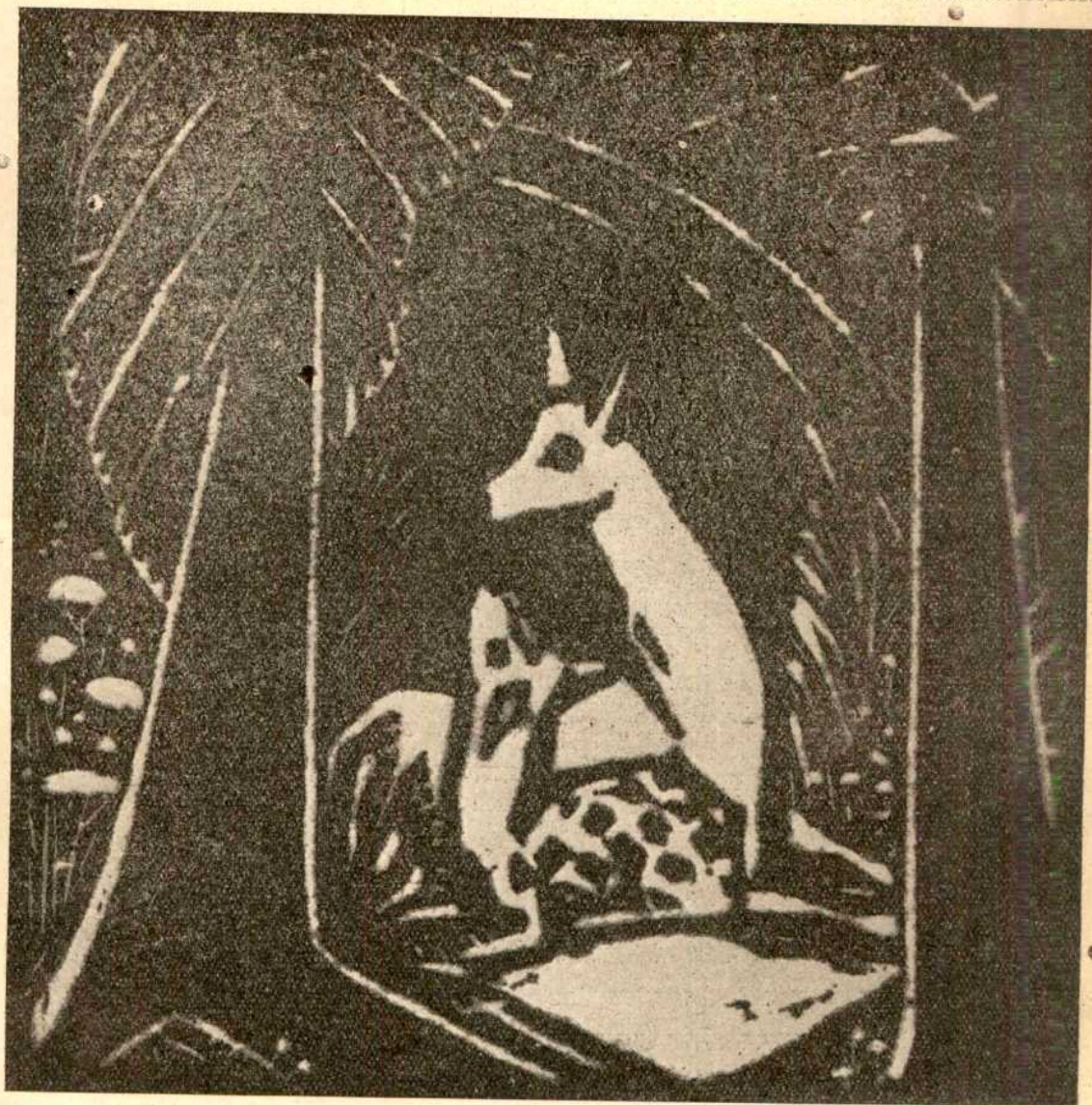


‘স্বর্গচ্যুতির পর’—ক্রমে গোল্ডস্মিট কর্তৃক খোদিত

এই প্রাথমিক সূত্রটি ঠিক মত আয়ত্ত হইলে শিল্প-দীক্ষা-
হীন লোকের অনেক অন্ধসংস্কার দূর হইত। তাঁহারা বুঝিতে
পারিতেন যে, কল্পনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিলেই শিল্প হয় না,
শিল্প-সংক্রান্ত কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া না চলিলে

শিল্পের অঙ্গহানি হয়। সাধারণ লোকের কাছে সেই
ছবিই সব-চেয়ে মূল্যবান বাহ্য দৃশ্যজগতের বস্তু বা
বিষয়কে চোখে প্রত্যক্ষ দেখাইতে সক্ষম।

প্রত্যক্ষ বিশ্বে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন দিকের



২নং চিত্র। 'হরিণ'—প্লাগেনহাউজেন কর্তৃক খোদিত

আয়তন প্রকার লইয়া প্রত্যেক বস্তু অবস্থিত; ছবির কাগজের সমতল ভূমির উপর যখন সেই বস্তুই চিত্রিত হয় তখন তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ব্যতীত তৃতীয় দিকটি (dimension) লুপ্ত হয়। এখানেই শিল্পীর প্রথম অঙ্কবিদ্যা, কিন্তু নিপুণ শিল্পী অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া পারিপ্রেক্ষিক (perspective) ও ছায়ালোক রচনা করিয়া দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম দ্বারা এই তৃতীয় দিকের অভাবের বোধ দূর করেন। সিনেমা বা চলচ্চিত্রে এই কৌশল চরম সম্পূর্ণতা লাভ

করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন এই চলচ্চিত্রের সহিত রঙীন কোটোগ্রাফী ও গ্রামোফোন যুক্ত হইবে তখন শিল্পকলায় বাহারা আদলের নিখুঁত নকল সন্ধান করেন তাহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, দৃশ্য জগতকে প্রত্যক্ষ-গোচর করাইবার জন্ত চিত্র-শিল্পের মত প্রাচীন ও অনস্পৃগ পন্থার অনুসরণ করার প্রয়োজন নাই। চিত্রশিল্পের সমর্থনকারীদের পূর্বের মত আবার বিশ্বাস করিতে হইবে যে, চিত্র-শিল্প দৃশ্য-জগতের কোনো বস্তু বা বিষয়ের যথার্থ

প্রতিকৃতি নহে। রঙীন চিত্র অথবা খোদাই, রেখাচিত্র ইত্যাদি যে-কোনো চিত্রশিল্পই হউক না কেন ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য রঙ রেখা ইত্যাদির সমাবেশে একটি সুসমঞ্জস রূপোন্মেষশালী সৃষ্টি চিত্র গড়িয়া তোলা ;—বাস্তব জগতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ না থাকিতে পারে, চিত্রাঙ্কিত বস্তুর বাস্তব জগতে অস্তিত্ব না থাকাও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ দর্পণে বা বাতায়নের ভিতর দিয়া আমরা বাস্তব জগতকে যেমন প্রত্যক্ষ করি ছবিতে সেরূপ করি না। সমতল জমির উপর রঙ ও রেখার আলঙ্কারিক সমাবেশে বা রূপোন্মেষিণী মূর্তির অঙ্কনে চিত্র প্রস্তুত হয়।

শিল্পীর কল্পনায় বাস্তবের যে ছাপ বা ইম্প্রেশন ছবি তাহারই প্রকাশ মাত্র ;—চিত্রাঙ্কণের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রশিল্প বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে ; সকল দিকেই সাধারণ কোনো একটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অঙ্কন-কালে যে আঙ্গিক বা টেকনিক অনুসরণ করা হয় ছবি তাহার অনুযায়ী হইবে। কোনো শিল্পী তৈলচিত্রের বিশেষত্বকে জলরঙা (water-colour) ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত নহেন, রেখাচিত্র ও বর্ণচিত্রের পার্থক্যও তিনি ভুলেন না। তেমনি খোদাই-শিল্পের সাতটি বিভাগের পার্থক্য ভুলিলেও চলিবে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কাঠখোদাই শিল্পীর উপকরণ অধিক নহে। রঙ বর্জন করিয়া কেবলমাত্র সাদা-কালোর সমাবেশে তাঁহাকে আলো ও বর্ণের খেলা দেখাইতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে এমন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় যাহাতে মূর্তির সতেজ প্রকাশে রঙের অভাব প্রকাশ না পায়। এই কারণেই কাঠ-খোদাই ছাপের আকর্ষণী শক্তি অধিক, কারণ আমরা জানি যে, কেবলমাত্র বাহ্য মূর্তির সৌন্দর্য উপলব্ধি বস্তু নিরপেক্ষ হইয়া করিতে হয় এবং ইহার জন্ত সাধনা আবশ্যক। রঙ সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং রংএর প্রভাবে ছবি অনেক সময় যেন দেহ ধরিয়া উঠে, কিন্তু শিল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি রঙের এই সহজ আকর্ষণে প্রলুব্ধ হন না, তাই কাঠখোদাই ছাপ যখন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে তখন তাহা বস্তু-নিরপেক্ষ বা abstract ভাবেই করিয়া থাকে ; সুতরাং এই আকর্ষণ

প্রবলতর হয়। কাঠখোদাই শিল্পীর অল্প বিশেষ অনুবিধা এই যে, কাঠের উপর ছুরীর সাহায্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়—কাগজের উপর পেন্সিল বা কাপড়ের উপর তুলির প্রয়োগের মত তাহা সহজ নহে। প্রথমতঃ কাঠ জিনিষটিই যথাসাধ্য বাধা দিয়া থাকে, তাছাড়া বস্তুর গুণিও এমন নহে যাহাতে কাঠখোদাই-শিল্পী এটিং-শিল্পীর মত সহজ স্বাধীনতা পাইতে পারে। বস্তুত, কাঠখোদাই-শিল্প শিল্পের ‘আঙ্গিক’ বা টেকনিকের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, শিল্পীকে আপন কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খোদাই কার্য চালাইতে হয়। শ্রেষ্ঠ কাঠখোদাই-শিল্পীরা কাঠের উপর পেন্সিল দিয়া খসড়া না আঁকিয়াই একেবারে ছুরী চালাইয়া থাকেন। মিঃ গডর্ন ক্রেগের কথায়—“অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কাঠফলকের আয়তন ইত্যাদিই আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বিশেষ বিশেষ ছবি খোদাই করিতে সাহায্য করে। কাঠফলককে সাদা কাগজ কল্পনা করিয়াই যদি আমাকে কাজ করিতে হয় তাহা হইলেই আমার মাথা ঘুরিয়া যায়। কাঠখোদাই কার্যে যে ভয়ঙ্কর মানসিক নিয়মানুবর্তিতা (discipline) প্রয়োজন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনশ্রুতি ছবিতে যে কাঠ-খোদাইছাপের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে বলি। রোড্রালোক ও ছায়ার যে অপূর্ণ সমাবেশে ছবিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কাঠফলকের প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পিত হইয়াছিল।

(৩)

কাঠখোদাইকার্যে শিল্পসৃষ্টি

খোদাই বা এন্‌গ্রেভিং মাত্রই হয় অনুকরণ, নয় স্বতন্ত্র সৃষ্টি। অনুকরণ খোদাই বলিতে কোনো একটি অঙ্কিত চিত্রকে আদর্শ করিয়া খোদাইয়ের বিশেষ পদ্ধতি (সাতটির মধ্যে একটি) অনুসরণ করিয়া খোদিত চিত্র বুঝায়। তেমনি কোনো কিছুকে আদর্শ না করিয়াই শিল্পী মন হইতে যাহা গড়িয়া তোলে তাহাকেই সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। এই অর্থে আধুনিক অধিকাংশ কাঠ-খোদাই ছাপই শিল্পীর সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্বে কাঠ-খোদাই শিল্প ‘শিল্প সৃষ্টি’ পর্যায্যভুক্ত

ছিল না। ইত্যাক্ষিত চিত্রের সত্তা অনুকরণ-স্বরূপ এণ্ডি বাজারে প্রচলিত ছিল। বাহাবা অর্থাভাবে দামী ছবি কিনিতে অক্ষম ছিল অথচ কুমারী মেয়ী প্রভৃতির ছবি ঘরে প্রাপিতে বাহাদের সখ হইত তাহাবাই তখন এইসকল কাঠ-খোদাই-শিল্পী (জার্মানীর) পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাহাদের সকল কাজই সাদা জমির উপর কাণো বেখাব সমাবেশে প্রস্তুত ; ইহাতে বুঝা যায় যে, পেন্সিল ড্রইংয়ের অনুকরণে এগুলি খোদিত হইত। বোড়শ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ডুবোব ও হোলবাইন এই দুই জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী কাঠ-খোদাই করিতে আবস্ত করেন। তবে ইহাবা সহস্রে খোদাই করিতেন, কিন্তু আদর্শ চিত্র আঁকিবা দিয়া অস্ত্রের দ্বারা খোদাই করিবা লইতেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তাহাদের ছাপের আঙ্গিক বা টেকনিক লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেগুলি হুবহু বেখা-খোদাই ছাপের অনুকরণ। তবে ইহারা উভয়েই যে, তাহাদের নামে প্রচলিত কাঠখোদাই ছাপগুলিতে শিল্পশৃষ্টির স্বাভাব্য বজ্রা বাপিষাছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের পব ইম্প্রেশনিষ্ট দলের কয়েকজন শিল্পী উনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে কাঠখোদাই-শিল্পের পুনরুদ্ধার করেন। জার্মানীতে মুনখ ও ফ্রান্সে গোগ্যা প্রথমে এই শিল্পের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পাবেন ইহা যে উচ্চশ্রেণীর স্থপতি-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহাবা তাহাই প্রচাৰ করিতে থাকেন। একপাশ কাঠফলকের উপর আপন স্মৃতি ও কল্পনা অনুযায়ী কোনো স্থপতির ফটাইবা তুলিবার অবিচাৰ যে শিল্পী আছে তাহাবা তাহা প্রমাণ করিষাছেন। সেইদিন হইতে কাঠখোদাই-শিল্প যে বহুশিল্প বা অল্প ধবণের চিত্রের হীন অনুকরণ নহে তাহা হিব হইবা গিয়াছে। যথার্থ শিল্পী ও সাংকেব হাতে এই কাঠখোদাই-শিল্প কি চমৎকার হইবা উঠিতে পাবে তাহা তাহাদের হাতের কাজ দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। এখনে আমবা কয়েকটিমাত্র নমুনা প্রতিকৃতি দিলাম। এই নূতন শিল্পের আসন ইষোবোপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে বাঙালী শিল্পীর দৃষ্টি যদি এই িকে আকর্ষিত হয় তাহা হইলে দেখকেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইব। বাঙালী শিল্পীবা এই শিল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিষাছেন, একথা অবগু আজকাল বল চলে না।

গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১

গিরিবালাকে জানিতাম। গ্রামের নদীটির বাকের মুখে বৃত্ত-ঝোপের ছায়ার অন্ধকার আশ্রয় করিষা ছুটির সময় বপন সন্ধ্যাকালে বোয়াল মাছের সন্ধানে ছিপ ফেলিয়া বসিতাম তখন সে বাটে প্রদীপ ভাসাইতে আসিত। এক-পানি গোল মুখ, টীকল নাক, তাহাতে একটি ছোট নোসক— নিতাই জেলের আট বছরের মেয়ের নাম গিরিবাল। ; প্রতি সন্ধ্যায় সে নদীর স্রোতে ভাগ্যেব প্রদীপ ভাসাইয়া মাটির ছোট কলসীতে জল ভরিষা যন্ত্রের 'বন্দে মাতা সুরবনী'

গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিয়া যায় ;—গিরিবালার নাম জীবনের এই বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাসটুকুই আমার ডান ছিল।

ইহাব পব যাহা শুনিষাছি তাহাই লিখিতেছি। দশ বৎসর যখন বয়স তখন গিরিবালার বিবাহ হইল এবং সেই বৎসরেই পিতা নিতাই ও স্বামী সদানন্দ পদ্মাব মাছ ধািতে গিয়া আব ফিরিল না। মাযের সঙ্গে গিরিবাল ও কাঁচি তাহাব পর নিতাই মাঝির জাল গুকাইবা চালাপািাতে টেকি পাতিয মাতা ও পুত্রী পাড়ার লোকের ধান ভািাতে আবস্ত করিষা দিল।

২

বৎসর চার পাঁচ পর একদিন রাঘবাবুদের আঙ্গিনায় আছড়াইয়া পড়িয়া গিরিবালার মাতা কাদিয়া জানাইল যে, আজ একমাস হইতে রাক্তিতে তাহার ঘুম নাই। সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ীর চারিপাশে লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ভয়ে তাহার গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। তিনপুঙ্খ আগে রাঘবাবু ছিলেন গ্রামের জমিদার; জমিদারী এখন বাস্তবিকতার সাড়ে সাত বিঘা জমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেউড়ী এখনও আছে, কিন্তু দারোগান নাই। তথাপি এখনও বদন রায় মহাশয়কে অনেক অভিযোগ শুনিতে হয়। কিছুদিন পূর্বেও বিচার করিয়া জরিমানা ও নজর খাবদ কিছু প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ফজল মিঞা বাঁশচিটা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হওয়াতে প্রাপ্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন বিচার না করিয়া রায়-বাবু শুধু পরামর্শ দিয়া থাকেন। দারোগাকে সকল কথা জানাইবার উপদেশ দিয়া তিনি বুড়ী মানদাকে বিদায় করিয়া দিলেন, দরকার হইলে তাহার পক্ষে হইয়া দারোগাকে হুই কথা বলিবেন, এ ভরসা দিতেও ক্রটি করিলেন না।

এইবার মানদা বিপদে পড়িয়া গেল। দারোগা হাকিম। তাহার সহিত কি করিয়া কথা বলা যায়? অনেক ভাবিয়া একদিন সে এক কাঠা সরু ধানের চিঁড়া লইয়া গ্রামের চৌকীদার নছর সেখের শরণ লইল। উপঢৌকন পাইয়া খুশী হইয়া নছর সেখ দিন কয়েক রোঁদ হইতে কিরিবার পথে নিজাই মাঝির বাড়ীর নিকটে হাঁক দিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও গিরিবালার মাতার অস্বস্তির কারণ ঘুটিল না। অবশেষে বিনা পারিশ্রমিকে নছর সেখের ধান ভানিয়া ও গাছের মর্ডমান কলা উপহার দিয়া বুড়ী একদিন তাহাকে দারোগার নিকট লইয়া যাইতে নছর সেখকে রাজী করিল।

স্বযোগেও ঘটয়া গেল। পাশের গ্রামেই দারোগা সাহেব তদন্তে আসিয়াছিলেন। নছর সেখকে অগ্রবর্তী করিয়া কালী গাইয়ের এক ঘটি ছুধ হাতে বুড়ী গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সম্মুখে আসামী ও করিয়াদী পক্ষের অনেকগুলি সাক্ষী যুক্তকরে দণ্ডায়মান; তাহাদের সম্মুখে

সম্মুখি হোট বংশমধ্যে দারোগা সাহেব বসিয়া। মঞ্চের সম্মুখ দিক্কার একটা খুঁটিতে বাঁধা একজোড়া মুরগী, পিছনের খুঁটিতে বিরাট ক্লককায় এক খাসী বাঁধা। গম্ভীর মুখে দারোগা সাহেব লিখিতেছিলেন। মুরগী ও খাসীর সহিত এক ঘটি ছুধের তুলনা করিয়া বুড়ী মনে মনে শঙ্কিত হইল; পরক্ষণেই নছর সেখের ইঙ্গিত মাত্রে দারোগা সাহেবের হুই পা আছড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাতের সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ী আপনাব বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা সাহেব অর্ধেক শুনিয়াই কহিলেন, “মেয়ের বয়স কত?”

“এই ঘোল বছর, ছক্কর! সোমস্ত—”

“এখন যাও। সরেজমিন তদন্ত করব। ইঁা, তারপর আসামীব হুই নছর সাক্ষী বাঁটু দপ্তরী।”

বাঁটু দপ্তরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নছর বুড়ীকে লইয়া গিয়া কানে কানে কহিল, “সাঁঝে বাড়ী থেকে জেলের বেটী, দারোগা সাহেব যাবেন।”

বুড়ী অকূলে কূল পাইয়া মা মনসার নামে পাঁচ পয়সার বাতাসা মানৎ করিয়া ঘরে ফিরিল। মায়ের মুখে সমস্ত শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গিরিবালার খানিক কাদিল। তাহার পর বেড়ায় টাঙ্গানো সত্যনারায়ণের ছবিখানির সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিল, “লজ্জা-নিবারণ হরি! লজ্জা নিবারণ কব, ঠাকুর!”

তখন সন্ধ্যা। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া গলগল্প বজ্রাঙ্কলে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গিরিবালার সম্ভবতঃ কোনো প্রার্থনা জানাইতেছিল, এমন সময় দারোগা সাহেব আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দারোগাকে দেখিয়া গিরিবালার মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল। মানদা রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ায় একখানি মাছর বিছাইয়া দিল। দারোগা সাহেব আসন লইয়া সমস্ত শুনিয়া গিরিবালাকে ডাকিলেন। পরণের ছোট কাপড়খানির চারিদিক সামলাইতে সামলাইতে সঙ্কচিতা গিরিবালার আসিয়া দাঁড়াইল। হুই চক্কর সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকেও দারোগা সাহেব ভালো করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া লইলেন। মেয়েটি দেখিতে নিতান্ত মন্দ

নহে। তখন তাহাব মনের গতিটা কোন্ দিকে বুঝিবাব জ্ঞাত হই একটি প্রশ্ন কবিত্তেই লক্ষ্য মরিয়া গিরি একেবারে ঘরের অন্ধকার বেড়াষ গিবা মুখ লুকাইল। মানদা ক্রমাগত ঘরের মধ্য হইতে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কোনোক্রমেই কন্যাকে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না।

অগত্যা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পব দারোগা সাহেব উঠিলেন এবং মণ্যে মণ্যে সন্ধান লইবেন—মুছ হাসিবা এই প্রতিশ্রুতিটা দিয়া গেলেন। দারোগা চলিয়া গেলে বাহির হইতে নছর চৌকীদার আসিনায় প্রবেশ করিবা কহিল, “বেঁচে গেলে জ্বলে-বোঁ, হাকিম তোমাব সহায় হ’য়েছেন।”

বুড়ী নিশ্চিন্ত হইয়া হই কব কপালে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, কিন্তু গিরি সেদিন আব শব্দা ছাড়িবা উঠিল না।

৩.

ইহার পর দিনকয়েক নানা স্থানে তদন্তে যাইবার পথে দারোগা সাহেব প্রতিশ্রুতি মত বুড়ী ও তাহার কন্যার সন্ধান লইতে আসিলেন। কিন্তু সন্ধানের মুখ্য বস্তুটি বোড়ার পাখের শব্দ পাইলেই ঘরের পিছনের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া যে কোথাব অন্তর্হিত হইয়া যাইত তাহা মানদাও আবিষ্কার করিবা উঠিতে পারিত না। কন্যার এই অকৃতজ্ঞতায় বুড়ী লজ্জিত হইত ও কন্যার পক্ষ হইতে হাকিমের কাছে ক্ষমা চাহিবা তাহাব জ্ঞাত প্রতিবারই ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিত। বলা বাহুল্য, এই একঘেয়ে নীরস ক্ষমাতিক্ষা দারোগা সাহেবের বেশী দিন ভালো লাগিল না এবং ষাণ্-চিটার হাটের পথে তাহার গতিবিধি ক্রমে ক্রমে বিবল হইয়া আসিল।

ইহাতে অবশ্য গিরিবালাব অবস্থার কোনো ইতব-বিবেচন হইল না; জীবন-ধাৰা যেমন বহিতেছিল তেমনই বহিবা যাইতে থাকিল। সমস্ত দিন নানা কাজের মধ্যে আপনাব অবস্থার কথাটি বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্তু স্বর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিত এবং পৃথিবীটাকে মনে হইত একটি জীবন্ত প্রেতপুরী। সহসা একদিন গিরিবালাব সমস্ত দুর্ভাবনার সমাপ্তি হইল।

সেদিন শ্রাবণের বর্ষ প্রভাত হইতে আরম্ভ হইরাছিল। বর্ষার রাত্রি। প্রথম প্রহরেই পল্লীর বুকে নিশীথের

নিমন্তকতা ঘনাইয়া আসিবাছিল। সেই নিমন্তকত ভেদ করিবা গিরিবালাব মাতার বুটী-প্রাচীর হইতে সহসা এক আর্ন্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল। শ্রাবণের বর্ষ-বব ছাপাইয়া সে আর্ন্তনাদ স্বধ-স্বপ্ত ভদ্র পল্লীকে পর্যাস্ত ধ্বনিত করিবা তুলিল এবং পল্লীর নিদ্রার জড়তা টুটিবার পূর্বেই ভরা নদীর তরঙ্গ-কল্লোলে ডুবিয়া গেল।

গ্রামে যে একেবারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল ন তাহা নহে। ও পারের ঝাউ-বনের অন্ধকারের অন্তরালে এখন গিরিবালাকে বহিয়া পান্সী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে তখন পথের মোড়ে নছর চৌকীদারের ভীম গর্জন শোনা গেল। এতিকে গণেশ মাঝিৰ মুখে সংবাদ পাইয়া হাক ঘোষাল আসিয়া রান্ন-বাবুকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, “যা ভেবেছিলাম, বায়-বাবু, তাই হ’ল, নিতাই মাঝির মেয়েকে নিয়ে গেল।” বায়-বাবু চক্ষু মুছিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে বাইরে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে রায়বাড়ীর বৈঠকখানায় গ্রামের ভদ্রসন্তানদের একটি ছোট সভা বসিয়া গেল। মাখন ভৌমিকের বয়স অল্প। পথের থিয়েটারে ক্রমাগত লক্ষণের ভূমিকা অভিনয় করিতে কবিত্তে বিপন্না জীলোকো প্রতি তাহার এক-বকম মমত্ব-বোব জন্মিয়াছিল, সভাস্থ একজন থানায় সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেই সে কহিল, “ব’নায় খবর দেওয়া কিছু নয়। আমি যাচ্ছি আপনাবা তালুনা।” হাক ঘোষণা ধমক দিয়া কহিলেন, “ওই কাজটি কোরো না, বাবাজী! থিয়েটার কব্বে গিয়ে চিন্তে চাঁড়া-গর পা’ ধ’বে ‘দাদা’ ‘দাদা’ ব’লে চৈচাও, সেটা বরং সওয়া বায়, কিন্তু ছোট লোকের হাতে মার পেবে আব আমাদের মুখ হাসিও না।” ছোট লোকের হাতে মার খাওয়ার আশঙ্কায় অকস্মাৎ মাখন ভৌমিকের উৎসাহ দপ করিবা নিভিয়া গেল এবং অতঃপব থানায় সংবাদ দেওয়াই যে, সর্বাঙ্গপেক্ষা সুবৃষ্টি সে-বিষয়ে ফাহারও মতদ্বৈধ রহিল না।

গিরিবালাব চরিত্র সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা সর্বাঙ্গকার আলোচনা হইবা এখন ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল তখন একদিন ইঠাং সংবাদ আসিল যে, গিরিবালাকে ববৎ-গির আমীর শেখের বাড়ীতে পাওয়া গিবাছে। গ্রাম জাবাব চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং যদিও হাট-বাব তথাপি ষাণ্-চিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট চামড়ার দালাল ফজল সিংহাব

বাড়ীর বাহিরের আসিনায় কোহুলী দর্শকের ভিড় জমিয়া গেল।

ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণ-দিবসের রক্তসন্ধ্যা সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গী চৌকীদার দুজনের কাঁধে হাত রাখিয়া টলিতে টলিতে গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যর্থ অশ্রুপাতের চিহ্ন তখনও তাহার কপোলে শুধার নাই, জাগরণরক্তিম নিশ্চল চক্ষুদ্বিটি তখনও সন্ধ্যার রক্তদীপ্তিতে জলিয়া জলিয়া উঠিতেছিল। চারিপাশের চিরপরিচিত মূর্তিগুলি গিরিবালা একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু সেকালের মত আজ আর মাথার বোমটা টানিয়া দিল না। ক্ষণিকের জন্ত গ্রামের লোকের মনে হইল এ যেন সে গিরিবালা নহে। এইসময় জনতার পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদের মত কন্টার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল, “তোরা এ দশা কে কসেছে, গিরি!” উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিমেষ-কালের জন্ত মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা অঙ্গুলি তুলিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল, কথা কহিল না।

ফজল মিঞার হুকুমে আসামী আমীর শেখ হাজির হইল। ফজল মিঞাকে পায়ের নাগরা খুলিতে দেখিয়াই আমীর শেখ দুই হাত জুড়িয়া কহিয়া উঠিল, “হজুর ও আমার ‘নেকাব’ বিবি।”

সহসা এই কথা শুনিয়া গিরিবালা শিহরিয়া উঠিল এবং সমস্ত দেহভাব ফজল মিঞার পদতলে নিষ্ক্ষেপ করিয়া অশ্রুটন্তরে কি কহিল তাহা বোঝা গেল না। তাহার মাথায় হাত দিয়া সংক্ষিপ্ত একটি আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিয়া ফজল মিঞা আমীর শেখকে থানায় লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। থানা বহুদূর, কাজেই সে-রাত্রি ফজল মিঞার জিম্মায় গিরিবালাকে রাখিয়া মেঘাবেরা হাট কবিত্তে চাওয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে ফজল মিঞার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান কাদের শুনিতে পাইল যে যেন তাহার মনিবের বাহিরের কোঠাঘরে গিনতির স্বরে কহিতেছে, “আপনার পাষে পড়ি ছজুব, আপনি আমার ধর্মবাপ”। তাহার পরই মেঘ-গর্জনের সাথে সাথে শ্রাবণ-রাত্রির ধারা নাগিয়া আসিল, আব-কিছু শোনা গেল না।

ইহাব পর থানা। অভিযোগ দণ্ডবিধি আইনের অনেক-গুলি ধারা বেসিয়া গিয়াছে; মাংলা সঙ্গীন। আসামীরা একরার লইতে হইবে। কাজেই গিরিবালাকেও একরাত্রি থানায় অপেক্ষা করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে বধন চৌকীদারের সাথে সে গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল তখন থানাব বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট দারোগা সাহেব এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আমীর শেখ এই উভয়েব মধ্যে গিরিবালা কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইল না।

ইহাব পর সাহেব ডাক্তার লেডী ডাক্তার পুলিশের বড় বড় উকীল মোক্তার কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বপ্নবিষ্টের মত গিরিবালা তাহাব উত্তর দিয়া গেল। কি বলিল, তাহাও মনে রহিল না। কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আসামী আমীর শেখ ও তাহার ছয়টি সহচরকে দেখাইয়া আপনাব জীবনের কগন্ধেব প্রত্যেকটি কাহিনী সে অতি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া গেল, বলিতে কোথাও বাবিল না। গ্রাম হইতে যে দুই একজন ভদ্র-সন্তান মানদাকে সঙ্গে লইয়া মাংলা উপলক্ষে সহস্র আসিয়াছিলেন তাহারা নিতাই মাঝির কন্টার এই নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বিচার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আদালতের বটতলার মানদাব গরুর গাড়ী গ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। গিরিবালা ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে চলন্ত গাড়ীর চাকা ধরিয়া কাদিয়া কহিয়া, “আমাকে যেলে যাস্নি, মা! নিরে চল!”

ইহার উত্তরে গাড়ীর মধ্যে একজন হাউহাউ করিয়া কাদিয়া উঠিল, তাহাকে ধমকু দিয়া হারু বোঝা গাড়ীর পর্দা তুলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, “তা বটেইতো! বুড়ী তোমাকে নিয়ে এখন পবকাল খোঁয়াকু!”

গরুর গাড়ীর চাকা হইতে গিরিবালা শিথিল মুষ্টি খুলিয়া পড়িল, গাড়ী চলিয়া গেল।

লোকের মুখে এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছিলাম, ইহাব পর বিচিত্র পুঁথির বিবিধ তথ্যের নীচে পুরাতন কাহিনীটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ সহসা গিবিবাণার কথা মনে হইবার হেতু আছে। টানিতেছে। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম, চিনিতে বিধম্ব কাণ বদনী হইয়া আসিয়া প্রাতে প্রাথমিক পরিদর্শনের হইল না। মাটিতে জালু পাতিয়া বসিয়া আশার মুখে কাঞ্জে বাহির হইয়াছিলাম, এমন সময় কে চীৎকার করিয়া দিকে চাহিয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, “জগা আমার উঠিল, “ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও ! আমার দেশের মানুষ দেশের মানুষ, এমন কেন হ'ল ?”

খাচ্ছে, ছেড়ে দাও !” মুখ ফিরাইয়া দেখি একটি রমণী আমার ডাক্তারী বিভাগে আসি এ প্রশ্নের উত্তর জুটিল না, পাগলা গারদের মোটা লোহাব শিক্ দুই হাতে ধরিয়া নীচবে ফিবিয়া গেলাম।

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। জাহাজে—মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর—১৪-২০শে জুলাই

অঁবোয়া (Amboise) ভাঙ্গ
১০ই জুলাই ১৯২৭

জাহাজখানা বেশ বড়ো, পনেরো হাজার টনেব জাহাজ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী সব মিলে প্রায় পাঁচ শ' বাতী এতে যেতে পারে ; এ ছাড়া দুটি পোলা ডেক আছে। সেই ডেক দুটি জাহাজ আর বোন্দুর আটকারার জন্তে ক্যান্সিসেব শাখিযানা দিবে ঢেকে দেওয়া হয়, তাতে আরও শতখানেক বাতী বায় ; এই খোলা ডেক হ'ল চতুর্থ শ্রেণী। কম বেশী শ' তিনচার, আনানী আর ফরাসী সেপাই এই জাহাজে যাচ্ছে, জাহাজটা একেবারে ভরতি। হবেক বকম জাহাজের হবেক বকম মানুষের সমাবেশ। ফরাসী তো আছেই ; তা ছাড়া ভারতবাসী—পণ্ডিতের তামিল, আর অল্প তামিল হিন্দু, তামিল খ্রীষ্টান, তামিল মুসলমান ; মোপলা মুসলমান ; মালাবাব থেকে, মালায়ালী ভাষী হুচার জন তেলুগু ; আমরা ক'জন বাঙালী হিন্দু ; আনানী—এদের আবার দুই ভাগ—এক, উত্তরে টনকিন-এর লোক, এরা সব দাঁত বাসো বঙে রঙিয়ে থাকে ; আর দুই, দক্ষিণে, কোচিন-টিনেব লোক, এরা দাঁত স্বাভাবিক সাদাই বাখে ; জন ষাট-সত্তর আবব, কেউ আল-জবাইব বা (Algeria) আলজিরিয়াব লোক, কেউ-বা (Aden) আদন অঞ্চলেব লোক। এরা জাহাজের কলবরে কাজ করে, ফরাসী ফিরিস্তী

তববেতর, ফরসা রং, কানো বং, বাদেব Creole ক্রেওল বলে, মাদাগাস্কার থেকে, মবীচ দ্বীপ থেকে, অল্প অল্প ফরাসী উপনিবেশ থেকে ; জনাকতক কাফবী, এরা নসুইসে আর পবিবেষক ; আর দু পাঁচ জন চীনেম্যান। খাটি ইট্রোপীয়-দেব মধ্যে বোধ হয় ফরাসী ছাড়া আর অল্প জাহাজ নেই।

মার্সেইল (Marseilles) থেকে এই জাহাজ ছেড়েছে জুন মাসের বাইশে তারিখে ; এবং গন্তব্য স্থান হ'ছে নুঁকিনের হাইফং বন্দর, সেখানে পৌছবে সেই জুলাইষো উনত্রিশে-ত্রিশে নাগাদ ; গন্ত লক্ষ্য পাড়ি। এতগুলি জাহাজের লোক, তাদের নিজ-নিজ ভাষা, নিজ-নিজ মনোভা, নিজ-নিজ চিন্তা ; কিন্তু বেশ মিলে মিশে সবাই চলেছে। ভদ্রভাবে থাক্বাব ইচ্ছে থাক্লে, অপরের সঙ্গে বনিয়ে চল্যাব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিজের জাহাজের prestige নামক গর্ব বা বন্দ্রাক্রতা যদি এসে খর্ব না ক'রে দেয়, তা হ'লে ভালব অভাবেও মানুষের মধ্যে পবস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য আটকায় না। এই জাহাজে তাই দেখছি। ভারতীয় বাতীদের রাব্বব জন্ত চাব জন রাধুনী আছে, তার দু'জন হচ্ছে মোপলা মুসলমান, একজন তামিল মুসলমান, একজন তেলুগু হিন্দু ; এরা সব মাহে, কারিকালেব লোক। (এইসব টুকটাকি ধর পেলাম তেলুগু হিন্দু বাবুচিটির কাছ থেকে, সে হিন্দী বলতে পারে, তার নাম লচমীনারায়ণ নারুড়)। এখানে হিন্দু-

মুসলমানের বিরোধ নেই, তামিল মুসলমানের সঙ্গে এক চোটার্‌ইয়ের উপর শুয়ে তামিল হিন্দু যাচ্ছে, স্থব ক'রে ক'রে তার প্রাচীন তামিল শৈব সাধকদের পদ আর তাঁদের জীবন-চরিত প'ড়ছে।

মুসলমান যাত্রীদের জন্তে একটি ভেড়া জবাই ক'রে তার হাল ছাড়াচ্ছে এক যোপলা বাবুচী, খোপা ডেকের এক কোণে, এক পাল ফরাসী আর আনামী সেপাই আশে-পাশে দাঁড়িয়ে লোলুপ-দৃষ্টিতে এই চম্‌মোংপাটন ব্যাপার দেখছে। আমাদের লচমীনারায়ণ মন্ত বড়ো মাদ্রাজী শিল-নোড়া দিয়ে লক্ষা হলুদ আদা জ্বিরে মরিচ বেঁটে তাল ক'রে ক'রে রাখছে, আমি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বেশ দোস্তি ক'রে হিন্দুস্থানীতে আলাপ জমাচ্ছি। ফরাসীদেরও সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা ক'চ্ছি। তামিল মুসলমান বাবুচী একজন একরাশ আলু নিয়ে ছুরী দিয়ে কুটছে, আর-একজন পাশে পেরোজ-রসুনের কাড়ি নিয়ে বাছছে। ইঞ্জিতের ভাষায় ছজন আনামী আর একজন ফরাসী সেপাই তার কাছ থেকে একটা ক'রে রঙন চেয়ে নিয়ে হাতে ক'বে খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা খেতে শুরু ক'রে দিলে। এইসমস্ত নানা জাতের লোক দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সত্তাব রেখে যে চ'লেছে এটা দেখে আমাদের দেশের স্বার্থীক লোকদের প্ররোচনায় মুসলমানে হিন্দুতে যে প্রায় নরখাদক জাতের মতই নরক সৃষ্টি ক'রছে সে-কথা স্মরণ ক'বে নিজেদের উপরে আর মনোভাব বিশেষের উপরে বিশেষ ক'রে বিজ্ঞার দিতে হয়।

এতগুলি মানুষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠাপন্ন ভাষাকে লোকে সহজেই মন্যস্থ ব'লে মেনে নিয়েছে। ফরাসীর জাহাজ,—ফরাসী ভাষা তো আছেই। ভাগ্যিস্ পারিসে আট ন' মাস ছাত্রাবস্থার কাটিয়ে আসবার সুযোগ হ'য়েছিল আমার, তাই ফরাসীতে কাজ-চালানো গোছ কথাবার্তা ক'বে বাঁচা যাচ্ছে। আনামী হাবিসদার শ্রেণীর ওদেদাররাও কিছু কিছু ফরাসী বলে; আর পণ্ডিচেরীর তামিল ছচার জনের সঙ্গে বেশীর ভাগ ফরাসীতেই কথা হ'য়েছে। ইংরেজী-জানিয়ে খুব কমই আছে—কিন্তু তবুও দেখছি ইংরেজীর মধ্যস্থতা ফরাসীকেও স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে—ফরাসী সেপাইদের মধ্যে ছচার

জন ইংরেজী শেখার বই নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রছে দেখলুম। জাহাজের খানসামা স্বিদমংগারেরা ছচার বচন ইংরেজী জানে, ভালো ইংরেজী জানা একটি ফরাসী সেনানীর সঙ্গে আলাপ হল। ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে মিল ঘটিয়ে দেবার জন্ত এখন ইংরেজীই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মধ্যস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একথা মুখে স্বীকার ক'রতে ফরাসীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলেও, কার্যতঃ ইংরেজী শেখবার চেষ্টার দ্বারা এই অবস্থাকে এ'রা স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। বহুপূর্বে একখানা ফরাসী বইয়ে একটি কথা বেশ গর্বের সঙ্গে উদ্ধৃত দেখেছিলুম—লেখক ফরাসী, তিনি ব'লেছেন, কে এক বিখ্যাত বৈদেশিক অ-ফরাসী ফ্রান্সদেশের প্রশংসা ক'রে ব'লেছেন *Tout homme a deux patries la sinne, et puis la france*—সব মানুষের দুটি ক'রে স্বদেশ আছে; তার নিজের মাতৃভূমি, আর তারপরে ফ্রান্স। একথা এখন কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু এমন দিন আসছে মনে হয়, আর আন্তর্জাতিক মেলামেশার সুবিধার পথে সে-দিনকে আমি সানন্দে অভিনন্দন ক'রবো, যখন পৃথিবীর তাবৎ সত্য লোকের সম্বন্ধে একথা বলা চ'লবে, যে সকলের দুটো ক'রে ভাষা; এক, তার নিজস্ব মাতৃভাষা আর দ্বিতীয়, ইংরেজী। অবশ্য এর মানে আমি এই বুঝিনা যে, এই দ্বিতীয় ভাষাটি আব সমস্ত প্রাচীন আর অর্ধপ্রাচীন সভ্যতার বাহন বড়ো বড়ো ভাষাগুলিকে মেবে ফেলবে, তাদের চর্চাকে বন্ধ ক'রে দেবে। হিন্দুস্থানীদের ব্যবহার ভারতবাসীদের মধ্যেই নিবদ্ধ—তামিল আর অল্প দক্ষিণী সবাই এ ভাষা জানে না, ছ'চারজন মাত্র “তোরা তোরা ইন্তুস্তানি শান্ত” এই ভাষা উত্তর ভারতের লোকদের মধ্যে চলে, দক্ষিণ ভারতে প্রায় চলে না, আর ভারতের বাইরে একেবারেই অচল।

জাহাজে ফিরে আসা যাক। প্রথমেই জাহাজে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তারা হ'চ্ছে যাদের কাছ থেকে সেবা পাওয়া যায়। জাহাজ ছাড়বার খানিক পরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার জন্ত ভিতরে ক্যাবিনে নামা গেল। বাস্ক-টাস্ক নাড়া-নাড়ি ক'বুছি, এমন সময়ে একটি রং ফর্সা ফরাসী ফিরিজি Creole (ক্রেওল) জাতীয় ছেলে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে এক গাল

হেনে স্বাগত ক'রে ফরাসীতে ব'ল্লে—“নমস্কার, আপনারা তো তিনজন এই দুই ক্যাবিনে থাকবেন ? আসি হ'চ্ছি আপনাদের ক্যাবিনেব চাকর আর খানদামা। যখন কিছু দরকার হবে ক্যাবিনেবের কোণেব বিজলীর ঘণ্টার বোতাম টিপবেন, আওয়াজ পেলেই আমি হাজির হবো।” আমি ব'ল্লাম, “বেশ, বেশ ; তোমার নাম কি ? আব তোমার বাড়ীই বা কোথায় ?” তাব বাড়ীব খোঁজ বোব হয় ইতিপূর্বে কেউ নেননি ; সে এই জিজ্ঞাসাতে তাব প্রতি দরদেব আভাস পেয়ে বেশ খুসিই হ'ল। ব'ল্লে, তাব নাম (Marcel) মার্শেল, বাড়ী মাদাগাস্কারে। আফ্রিকার প্রতীপ ঘব'লেই দৈত্যভূতোর আবির্ভাব হ'ত অস্তথা নয় ; আমাদের মাসেলেরও সেই অবস্থা ; ঘণ্টা টিপে না ডাকলে সে আসে না, এবং সময়ে সময়ে সে না এসে অস্ত কেউ আসে। কিন্তু তা ব'লে কাজ আটকাব না।

মাসেলের বদলে অস্ত যে Slave of the bell (ঘণ্টাব দাসটি, কবি ব'ল্ছেন “ঘণ্টাকর্ণ”—যে ঘণ্টাকে আকর্ণ করে) ক'বার দর্শন দিয়েছেন সেটি একটি দাস নয়, দাসী। প্রথম দিনেই মাসেলকে স্মরণ ক'বে ঘণ্টার বোতাম টেপা গেল—তার পরেই ক্যাবিনের দরজায় টোকামারা শব্দ শুনলাম। (Entrey) “জাঁত্রে” অর্থাৎ “ভিতরে এসো” ব'ল্লেই বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে একেবারে আমাদের একটি আফ্রিকানী পুতুলের মুখ ঢুকল। মুখখানির সঙ্গে আফ্রিকানী পুতুলের মুখের যে অবিকল নিকটতম সাদৃশ্য আছে সেটা ধ'রে ফেলেছিল স্মরেনবাবুর মতন স্পট পটুয়ার রসজ্ব চোখ। একটি জ্যোত খুব মোটামোটা ঠান্দিদিগোছ চেহাবার জীলোক, সাদা পোবাক পরা, চোখে উজ্জ্বল স্নেহ-মাধা দৃষ্টি, মুখখানা ভাষমানীষীতে ভরা, ফরাসীতে জিজ্ঞাসা ক'ব'লে আমাদের কি চাই—আব নিজের পরিচয় দিলে যে, সে জাহাজেব কী, ডাকলে পর মার্শেল অস্ত কাছে থাকলে সেই আসবে, তার নাম (Louise) লুইজ। এই কীটি একটি খাটি ফরাসী মানুষ—পারিসে এর জাতের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল,—পরের বাছাকে আব'তি কববার জন্তেই যেন

এদেব সৃষ্টি। আমাদের পাবিসের বাড়ীব কত্রীটি চেহারা ভাবেভঙ্গীতে বোব হয় এরই বোন্ ছিল—সে আমাদের কী ব'ল্লেই না ক'রত। এখানে জাহাজে অবশ্য তার বন্ধ-অব'তি কব'বার স্রোণ নেই, কিন্তু একে দেখলে বোব হয় যে, এ ছোট ছোট নাতিপুতিদের আদর-দিয়ে তাদের মাথা-বিগুড়ে দেওয়া একটি আসল দিদিমা। ইনি আবার হালফাশানে ইউরোপীয় মেয়েদের মতন ক'রে চুল ছেঁটেছেন, তাতে মুখখানা এর কৌতুকময় হাসির সঙ্গে মিলে অদ্বুত দেখায়। বড় মোটা ব'লে যখন হাসে তখন গুরখা বা চীনের মুখেব মত চোখ দুটির জায়গায় খালি ছুটি সবগ রেখা মাত্র দেখা যায়। জাহাজে প্রথম শ্রেণীর দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলে যচ্ছে। লুইজকে দেখি বেশীভাগ সময় তাদের নিয়েই ব্যস্ত—তাদের খাওয়ানোর ভার এর উপর। যখন দেখা যায় দ্রুস্ত ছেলেদের তাদের মারদের কাছ থেকে হাত ধ'রে এ পুরন-স্নেহেব সঙ্গে খাওয়ার ঘরে নিবে বাক্ছে, তখন লুইজ বে একজন পয়লা নম্বরের দিদিমা সে-বিবয়ে সন্দেহ থাকে ন। কবিকে দেখে এব তারি ভক্তি হ'বেছে—বলে, “কি চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন হিক্রা খি মুসা। কি মহত্ত্বান্বিত কপাল, চোখ, মুখ !” আফ্রিকানীর সঙ্গে দিনে ৪.৩ বার ক'রে দেখা হয়। প্রথম দেখা হ'লেই একগাল হেসে bon jour monsieur) “ব'রুর, মনিও” বলা তো আছেই। জবাবে আমিও বলি, “ব'রুর, লুইজ”—তার পর চোখ-চেখি হ'লেই বাড় নেড়ে হাসা আছে।

জাহাজের অস্ত খানদামারা সকলেই কবিব একটুখানি কাজ ক'ব'তে পেলে যেন কৃতার্থ হয় ব'লে মনে হয়। সবাই যে তাঁব ভক্ত পাঠক তা নয়, তবে কবিকে দেখাই এদের মনে যে একটু বিশেষ শ্রদ্ধা হ'য়েছে তা নিশ্চয়। কবির খাস খিদমৎগারটিকে দেখেছি, ঘণ্টা টিপ্তেই সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসেছে। এই খিদমৎ-গারটিব সঙ্গে আমি ছ'দণ্ড আলাপ ক'রে নিয়েছিলুম। এটি বেশ লম্বা চওড়া স্ত্রী যুবক একটি ; কবির ঘরব কাজের জন্তে বিশেষভাবে নিয়োজিত এই কথ' ব'ল্লে, আর জিজ্ঞাসা ক'ব'লে যে কবি জার্মান জানেন কি না ; ফরাসী তিনি কহিতে পারেন না সেটা শুনেছিল। ফরাসী ছাড়া জার্মান ভাষা এ নিজে ব'ল্লেতে পাবে, ব'রু দুই একথা

* গত সংখ্যাব প্রবাসীতে ‘যবদ্বীপের পথে’ প্রবন্ধে এই ছবিটি প্রসঙ্গে ছা'। হয়েছে।

ব'লতে বোঝা গেল এ জাত-ফবাসী নয়, আর জাব্মান ব'লতে পাবলে যেন খুসি হয় মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'রতেই আমার অনুমান যে ঠিক তা প্রমাণ হ'ল—এর বাড়ী Alsace অলসাস্ প্রদেশে, নববিজিত জাব্মানভাবী অংশে মুল্-হাউজন্ (Mulehousen) এ। আমার ভাঙা ভাঙা জার্মানকে মাঝে মাঝে ফরাসীর জোড়াতাড়া দিয়ে খানিক এব সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। তার জাব্মান জাতীয়ত্ব সঙ্কে বেশ সচেতন আর সান্ধিমান ব'লে মনে হ'ল, আন ফরাসীরা যে এই জাব্মান ভাবার—তার মাতৃভাষার—ইঙ্কলে পঠনপাঠন বন্ধ ক'বে দিয়েছে, সে-বিষয়ে এর যে প্রচ্ছন্ন একটু দবদও আছে, সে-কথা স্পষ্ট ক'রে না বললেও ধরা গেল। এই যুবক যে লেখাপড়া ভালো জানে তা নয়; তবে কবির নাম শুনেছে। জাব্মান ভাষার বইও ছচার খানা প'ড়েছে। জাব্মান যার মাতৃভাষা তাকে তা জোর ক'রে ভুলিয়ে ফবাসী বানাতে হবে, এই যে ফবাসী সরকারের কার্যনীতি অলসাসে অনুমত হ'চ্ছে, এব অন্তরালে জাব্মান-ভাবী লোকদের যে চাপা একটা আপত্তি এবং রাগ আছে, সেটা খুঁইয়ে খুঁইয়ে উঠে আবার যুদ্ধের দাবিগ্রন্থে হয় তো কোনও দিন দেখা দেবে। এইরকম বর্ষরতা—একটা জাতের ভাষা আর সভ্যতাকে আর-একটা ভাষার আর সভ্যতার চাপে নিশ্চেষ্ট ক'বে তাকে ধ্বংস ক'রে দেবার চেষ্টা—এটা অনেক বার অনেক জাতের মধ্যে ঘটেছে; ইংরেজ এ চেষ্টা করেছে আয়ারলণ্ডে, কষ করেছে পোলাণ্ডে, জাপান এখন নিষ্ঠুরভাবে ক'রছে কোরিয়াতে। ভাবতের বাইরে প্রায় সব জাত ক'রেছে—ক'ব্ছে।

জাহাজের অস্ত্র চাকর-বাকরদের মধ্যে আনামী রাঁধুনী আছে, তাদের উপরে ফরাসী হেড-রাঁধুনী (chef) শেফ। আনামী লোক খুব। এরা সব চুপসারে নিজ নিজ কাজ ক'রে বাচ্ছে, সকলের মুখগুলি কোনও রকম ভাব-দোতক নয়,—মোজ্জোল ধাঁজের মুখ, যার থেকে মনের ভিতরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না বলে। কিন্তু মোটের উপর এদের—যাকে বলে good humoured, অর্থাৎ গোলাগুলি দিল্লুগ প্রাণ, দেখে তাই ব'লেই মনে হয়।

আমাদের জাহাজ ছাড়লে বৃহস্পতিবার বিকালে। জাহাজেব কতকগুলি অফিসারের মধ্যে প্রিয়-দর্শন একটি ভদ্রলোক এসে আমায় বল্লেন, “মসিও তাগোর—এর যাতে কোনও কষ্ট না হয় আপনারা দেখবেন।” আমি ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর এই কুশল-দেখানার প্রত্যুত্তর করলুম। তারপর তিনি বল্লেন যে, এই জাহাজে তাঁর একটি বন্ধু যাচ্ছে, সে ফরাসী সেনাদলের অফিসার, নামটি Jean Jacques Neuville (ঝাঁ-ঝাক্ ন্যোভিল্)। ইনি একজন চিত্তাশীল লেখক, ইংবেজী জানেন, কবির সঙ্গে এঁর আলাপ হ'তে পারে কি? এই ব'লে এঁর সঙ্গে পবিচয় কবিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটি বেশ। অল্প-বয়সী যুবক, মবকোতে কিছুকাল ছিলেন, মরক্কোর জীবন আর ওখানকার মুসলমান জগতেব ভাব-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'রে একখানা উপন্যাস লিখেছেন। এঁর সঙ্গে ২৩ দিন ধ'রে বেশ খানিকক্ষণ ক'রে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—কতক ফরাসীতে, কতক ইংরেজীতে। ইনি বল্লেন যে, ফরাসীদের মধ্যে আর ফবাসী প'ড়ে বুঝতে পারেন এমন অল্প ইউরোপীয়দের মধ্যে কবির সঙ্কে তাঁর জীবনী তাঁব লেখা ইত্যাদি জানবার জন্ত খুব একটা কোতূহল আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন ভালো বই একখানাও এ পর্যন্ত লেখা হ'ল না—যাতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবি বড়ো হ'বে উঠেছেন তাব একটা স্পষ্ট ছবি থাকে, আর তাঁর সব বইয়ের গোড়া থেকে আবস্ত ক'রে তাঁর তাবৎ লেখার একটা ধারাবাহিক পরিচয় থাকে, আর আরও ভালো ক'রে খুঁটিয়ে আলোচনা ক'বতে সাহায্য ক'বার জন্ত যথোপযুক্ত প্রমাণ-পঞ্জী থাকে। তিনি ইংবেজ লেখক Thomson (টমসনের) ছোটো বই যেখানো ভারতবর্ষের এক খৃষ্টীয় মিশনরী সম্প্রদায়ের প্রকাশিত একটি গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে বেরিয়েছে, সেখানা প'ড়ে দেখেছেন, কিন্তু সে-বইখানি তাঁর আদৌ ভালো লাগে-নি—টমসন-এর সহানুভূতির অভাব আছে ব'লে তাঁব মনে হয়, আর ভাবে বোব হয় লেখক কবির ভাষাও ভালো বোঝেন না। আমি বল্লুম যে, তিনি অনুমান করেছেন ঠিক, আর টমসন হালে আব-একখানা বই বা'র করেছেন, সেটা আরও বড়ো, কিন্তু সেটাও ভালো হয়নি—বইখানাতে খবর বা আছে তা বেশীর ভাগ পরেব কাল থেকে নেওয়া—

আর লেখক কিছু ভালো করে না বুঝে কেবল নথ নেড়ে গিল্লিপনা ক'বেছেন যেন তিনি মস্ত একজন সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের এত কাছে আছেন যে, আমরা তাঁকে আত্মীয় পণ্ডিতের অল্পমোদিত পথ ধরে তাঁর জীবনী-কথা আর তাঁর কাব্যকথা বিশ্লেষ ক'রতে পারি না। তবে আমাদের লেখকদের মধ্যে দু-চার জনে তাঁর সম্বন্ধে ছোটো-খাটো প্রবন্ধ লিখে তাঁর কবি-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন করাতে চেষ্টা করেন—যদিও বড়োভাবে কেউ কিছু করেন নি। আর আমাদের মধ্যে দু-চার জন আমাদের বয়সের রসজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি আছেন, যারা নিজেরদের মাতৃভাষার সাহিত্য বেশ ভালো জানেন, তার ঐতিহাসিক চর্চাও ক'রেছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত আর এক বা একাধিক ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতিমত ভাষাজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন,—খামখেয়ালী ভাবে নয়, discipline হিসাবে অর্থাৎ উদ্দেশ্যবান শ্রমশীল শিশুকু হ'বে আলোচনা ক'রেছেন,—আমাদের আশা আছে যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকে শিক্ষিত অভিরূপোচিত রস-বিশ্লেষের দ্বারা, বিশ্বের রসিক লোকের সামনে অনেকটা এই প্রতিভারই উপযুক্ত প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দ্বারা উপস্থিত ক'বতে পারবেন। স্বদেশবাদী ও বিশ্ববাদী বাদের কাছ থেকে এই কাজ আশা ক'রতে পাবে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে সুহৃদ্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, আর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথাই মনে হ'চ্ছিল।

বিদ্যাপতি-সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যিকাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঙ্গু মহাশয় কর্তৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধটি গত জুলাই মাসের মডার্ন-রিভিউতে প্রকাশিত হ'য়েছে, যাতে অল্প বিষয়ের মধ্যে কবির “উর্ধ্বশী” কবিতার একটি চমৎকার ইংবেজী অনুবাদ আছে, আর বাঙলা তথা বিশ্বসাহিত্যের ঐ চরম রসসৃষ্টিটির একটি সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিচার আছে, সেটি মডার্ন-রিভিউ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে সঙ্গে রেখেছিলুম, দরকার হ'লে যোগ্য পাত্রের কাছে তার আলোচনা ক'রবো ব'লে। সেটি আমার হাতে কাছেই ছিল, আর ছিল সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগত রবিদত্তের কৃত ঐ “উর্ধ্বশী” কবিতারই আর একটা অনুবাদ—এই দুটা শ্রীযুক্ত জোভিল-কে প'ড়তে দিই। তিন দিন এই প্রবন্ধ

আর অনুবাদ তিনি রাখেন, চতুর্থ দিনে ব'ললেন যে তার চমৎকার লেগেছে,—এগুলি যদি আমি তাঁকে স্বহস্ত্যাগ ক'বে দিতে পারি তাহ'লে অতি আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ ক'রে নিজের কাছে রাখেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁকে এগুলি তখন দিয়ে দিলুম।

কবির সঙ্গে জোভিল-এর আলাপ করিয়ে দিলুম। দু-একদিন অনেকক্ষণ ধরে কবির সঙ্গে এর কথাবার্তা হয়—বিশেষ ক'রে ইউরোপের আজ-কালকার ষাড়াইয়ের পরের অবস্থা নিয়ে—কোন দিকে ইউরোপের মনের গতি এখন চ'লছে, শেষে কি, কি ক'রে তার সাধনা চ'লতে পার—এই সব বিষয় নিয়ে।

একটা বিষয়ে ইনি কবিকে একটা প্রশ্ন ক'রলেন—(yellow peril) পীতাক্ষ বা পীত-ভয় অর্থাৎ চীন জাত থেকে কোনও সত্যিকারের আশঙ্কা ইউরোপের আছে কি না। কবি ব'ললেন, peril ব'ললে যে কথা বোঝায়, যে, একটি শক্তিশালী জাত তার মানোয়ারী জাহাজ তাব সেপাই বন্দুক কামান, তার মিশনারী ঔপনিবেশিক বনে, যত রাজ্যেব লোক লঙ্ঘন নিয়ে আর একটি জাত, যে জাত মোটেই এদের চায় না, তার ঘাড়ের উপর একটি উৎপাতের মতো প'ড়ল, আর তার মধ্যে একটা কায়মী স্থান নিয়ে আরব্য রাজনীর সিন্ধবাদের উপাখ্যানেব (Old Man o' the Sea) সাগর পারের দ্বীপের বুড়ের মতন তার ঘাড়ের চেপে হ-হাতে তার গলা-টিপে রেখে গট হ'য়ে ব'সে রইল, এই যে (predatory instinct) শ্বেন বুদ্ধি এটা হ'চ্ছে ইউরোপীয় জাতেরই কীর্ষি। ইউরোপ এই ক'রে সারা ছন্টিটির উপরে চেপে ব'সে আছে, জগতে একটি মস্ত সত্যিকারের white peril র'য়েছে। এশিয়ার কোনও জাত এখনও এমন ক'রতে চেষ্টা করেনি—হালে যদি কেউ ক'রে থাকে তো কোরিয়াতে জাপান ক'রেছে, তাও ইউরোপের অনুকরণে। চীনেরা শাস্ত শিষ্ট জাত—এরাই এফমাত্র সভ্য জাত যাদের মধ্যে কাটাকাটি যাদের ব্যবসায় এমন সৈনিক-সেনানীর স্থান সমাজে উচ্চ স্থানে কামিন-কলেও ছিল না—সেপাইকে এরা ভারতে ঙ্গু আর গলাবাটার সামিল ক'রে দেখেছে। এই চীন চান্স যে, সে তার নিজের বিরাট দেশের মধ্যে তার প্রাচীন রীতিনীতি নিয়ে নিজের

ইচ্ছে মতো চলে, তার যা যা দরকার এই দেশের মধ্যেই সে পায়। বাইরের জিনিষের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নেই দেশের মধ্যে তার খালি জায়গাও কিছু কিছু আছে কিন্তু খামকা যদি ইউরোপের লোকেরা তাদের উপরে চরাও হ'য়ে তাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে তাদের উপরে অত্যাচার করে, যেমন আজকাল ইংরেজ আর জাপান আর অন্ত জা'তে মিলে ক'ব্ছে, তা হ'লে চীনের আপত্তি করাটাতে ছায়-বিচার নিয়ে দেখলে কাক রাগ করা চলে না। তবে রুশের মতন কোনও চঞ্চল হৃদাস্ত ইউরোপীয় জা'তের পরিচালনায় জাপানে-চীনে মিলে গিয়ে বস্তার মতন সত্যিকারের ইউরোপীয় ধরণের একটা পীত-ভয় সৃষ্টি করা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সে রকমটা যে হঠাৎ হবে কবি তা মনে করেন না (—এখানে কিন্তু অবাস্তব ভাবে ব'লে রাখি, কবি যেভাবে এই চীন-সমস্তাটিকে দেখেছেন, আমি নিজে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেভাবে দেখি না—এ সম্বন্ধে যে তথ্য আমার চোখে প'ড়েছে, তাকে আমি আমার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক ব'লেই মনে করি—যাক। সিঙ্গাপুরে নেমে মালায় দেশে এ সম্বন্ধে আরও কিছু চোখে দেখে আর কানে শুনে পরে কি মনে হয় লেখা যাবে—কবির নজ্জ এ বিষয়ে আজ কালের মধ্যে আলোচনাও কিছু ক'রেছি—তিনি কতকগুলি বিষয়ে আমার তথ্যগুলি যদি সত্য হয় তা হ'লে আমার আশঙ্কাগুলি অমূলক নয় একথা স্বীকার ক'রেছেন)।

এ'র লেখা একখানি ফরাসী উপজ্ঞাস ইনি কবিকে উপহার দিলেন। মোট কথা, এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে মিশে একটি বেশ সুশিক্ষিত হৃদয়বান বিচারশক্তিশালী ফরাসী যুবকের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ হ'ল। এ'র সঙ্গে এ'র রেজিমেণ্টের আর একটি অফিসার ছিলেন, ইনি ইংবেজি জানেন না। হিন্দুধর্মের মূল কথাটা কি, সংক্ষেপে জানতে চাইলেন। আমার অসম্পূর্ণ ফরাসীতে তখন তাঁকে নিঃশব্দ ব্রহ্ম, আত্মা, কর্মবাদ, সত্ত্ব ব্রহ্মা, ব্রহ্মা-বিকৃ-শিব, নিত্যধর্ম, লোকধর্ম, প্রতিমা পূজা, হিন্দু সমাজ, জাতিতত্ত্ব জ্ঞান, ভক্তি—প্রভৃতি হুল কথাগুলি ব্ধাসম্ভব শুছিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রলুম। ইনি কিছুই জানেন না, মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। আমি বললুম যে, হিন্দুধর্ম ব'ললে একটা

system of culture, একটা বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি বা সভ্যতাকে বোঝায় যেটা গত তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষে নানা জা'তের ভাব-সম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বিকশিত হ'য়ে আসছে; এতে কোনোও dogma বা creed, কোনও ধরাবাধা অবশ্য স্বীকৃতব্য মতের বালাই নেই। তবে এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ লোক যে কতকগুলি ভাবকে সবচেয়ে যুক্তি তর্কানুমোদিত ব'লে মেনে থাকে, সেগুলি ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে। সেগুলির সংক্ষেপে ব্ধাসাধ্য ব্যাখ্যা দিলুম। আর সব মতবাদের মূলে সব ধর্মসাধনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা হিসাবে যে নিত্যধর্ম—দম, ত্যাগ, মৈত্রী প্রভৃতি আছে—ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধি আর সদহুমানকে মুখস্থান দেওয়া হ'য়েছে, কোনও বাদ—জ্ঞান বা ভক্তি প্রভৃতি এগুলি যে গোণ, “নাসৌ মুনির্নয় মতং ন ভিন্নং”—“যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং তথা ভজাম্যহং”—এই কথাটা বুঝতে চেষ্টা করলুম। “হিন্দুধর্ম” যে এতটা উদার, এর মধ্যে যে খৃষ্টোপাসক ভক্তেরও স্থান আছে—এ কথা ভদ্রলোক বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

প্রথম শ্রেণীর জন্ত যাত্রীদের মধ্যে আনাম-যাত্রী কতক-গুলি কোম্পানী অফিসার আর ফরাসী সরকারের কর্মচারী, ডাক্তার ব্যবসায়ী। এ'দের চার পাঁচজনের সঙ্গে জীরা আছে। সকলেই ফরাসী, অন্ত ইউরোপীয় যাত্রী কেউ বোধ হয় নেই। এরা এমন কিছু বিশেষত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। তবে এদের মধ্যে অভিজাত্যের শিক্ষা আর ভব্যতার দিক থেকে—বেশ একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একটা যুগল স্বামী-স্ত্রী আছেন—চালচলন সবচেয়ে aristocratic বা অভিজাত ব'লে মনে হয়। ছদ্মনেই আবাওয়সী লোক। বিশেষ ক'রে জীটার মুখ দেখে একেবারে বাঙালীর মেয়ে ব'লে মনে হয়। জীটা আবার একখানা বাঙালী ধরণের সাদা সাড়ী সরা কালো কঙ্কাপাড়কে পিন্টিন দিয়ে ঘাঘরার মতন ক'রে প'রে সকালে ডেকে স্বামীর সঙ্গে ঘোরেন, পিছন থেকে বাঙালীর মেয়ে বলে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। এই মহিলাটা ডেকে চলাফেরার সময়ে কেমন যে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ চৈত্বে ডেকে-চেযারে ব'সে আমাদেব সঙ্গে কথা কইছেন কবির প্রতি নেত্রপাত ক'রে অবিন্দবাদিত ভাবে শাস্তভাবে

তার শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান—সেটা ভারী সুন্দর লাগে।
বাঙালী ভক্তগৃহস্থদের গিল্লীর মত স্নেহময় প্রশান্ত দৃষ্টি ব'লে
সুরেন-বাবু এর নামকরণ করেছেন “বেনে-বউ”। রাত্রে
খাওয়া-দাওয়ার পরে দেখছি, ডেকের উপর এক কক্ক-
ধ্বনি গ্রামোফোনে যত সব মার্কিন (Jazz) জায়গাটের
বিকট গান আর উৎকট বাদ্য একটা শব্দের তাণ্ডব সৃষ্টি
করে—বেন নোতুন খোয়া-বিছানো মেরামতী বড়ো রাস্তার
উপর দিয়ে রোসার ইঞ্জিন তার সব রকম আর্দ্রনাদ নিয়ে
চলতে আরম্ভ করলে, আর আমাদের প্রথম শ্রেণীর চার
পাঁচটি বিবাহিতা, কুমারী আর অবীরা প্রোঁচা, তরুণী আর
অজ্ঞেয়-বয়স্ক, পীনা, তরুণী আর স্থলোদ্ধমব্য-ক্ষীণ নিম্নাঙ্গী
ততগুলি অতি সাধারণ ফরাসীর মত মোটা-সোটা থপথপে
unromantic শ্রীহৃদ-বিহীন পুরুষের সঙ্গে (এদের কার-
কার বত্রিশ পাঁচ দাঁতের মধ্যে ঘোলা পাটাই সোনা
বাঁধানো—কবি ব'লছেন, বহুমূল্য এদের হাসি, সোনার
হাসি কি না!) ধপাধপ করে যত আজকালকার ইতর ভাব-
দ্যোতক মার্কিন নাচ নাচতে শুরু করে—তখন দেখি, এই
দম্পতী তাতে যোগ দেয় না। এই রকম আর একটি দম্পতী
আছে, স্বামী ইন্দোচীনের একটি বড়ো সেনানী হ'বেন,
জবরদস্ত গোঁপওয়ালা ভারিকে চেহারা, যেন নেপোলিয়নের
বিখ্যাত অশ্বারোহী দল (Chasseurs) শাস্ত্র-দলের একজন
সওয়ার—দুইটা একটা ক্ষীণাঙ্গী মধ্যবয়সের মহিলা, এঁরাও
একটু আলগোছা থাকেন। এই দম্পতীর একটি ভারী
সুন্দর শ্রীমান ছেলে আছে, তার সঙ্গে ভাব ক'রেছি—তার
নাম (Louis) লুই, বয়স ন'বছর, অঁাদো শীন-এ ছেলেবেলায়
কবে ছিল মনে নেই—খালি ফরাসী দেশের ইতিহাস আর
ফরাসীদেশের ভূগোল প'ড়েছে—তার একটা দাদামশায়
আছে, তার মায়ের বাপ, তিনি একে বড় ভালো বাসেন—
এতদিন ধরে জাহাজে ক'রে জলে জলে আসছে কিন্তু তবুও
তার খারাপ লাগে না, কারণ এই বেশ আর তার ছুটি ছোটো
ছোটো বন্ধু জুটেছে তাদের সঙ্গে সারাদিন যখন ইচ্ছে খেলতে
পারে—এইসব খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছি ;
আর ছেলের সঙ্গে ভাবের ফলে তার বাপের সঙ্গেও আলাপ
হ'য়েছে। বাপটা ব'লছেন—“বেশ, vous etes deja
des camarades—এরি মধ্যে বেশ দোস্ত হ'য়ে পড়েছে।”

এই থেকে সকালে এর সঙ্গে দেখা হ'লে পরস্পর অভিবাদন
করি, আর কবির সামনে যাবার সময়ে এর বিরাট সোজার
টোপা বা টোপর—সেটিকে টুপী ব'ললে তাতে ক্ষুদ্রতা
আরোপ করে তার অপমান করা হয়—সেটিকে
ডান হাতে তুলে কবিকে অভিবাদন ক'রে যান।
শাড়ীওয়ালা মহিলাটির স্বামী একদিন আমার সঙ্গে
আলাপ করলেন—ইনি জানতে চাইলেন কবির গৈতুক
বাসভূমি কোথায়—আর তাঁর মাতৃভাষা কি যখন
শুনলেন যে, কলিকাতায় এঁর বাড়ী তখন বললেন যে,
তাহ'লে তো ইনি “বাঁগালি” অর্থাৎ বাঙালী। আমি
বললুম, “আপনি ফরাসী, কিন্তু ভারতবর্ষে যে বাঙালী
আর অল্প অল্প ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতীয় লোক আছে
এখবর আপনি রাখেন তাহ'লে দেখছি।” ইনি উত্তরে
বললেন—“আমি পণ্ডিতেরীতে কিছুকাল ছিলুম (এঁর স্ত্রীর
শাড়ী-প্রীতির কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারা গেল)—সেখানে
যে বিখ্যাত বাঙালী political refugee (বাঙালার কি
ব'লবে)—“রাজনৈতিক কাশীবাসী”! গশ্ (অর্থাৎ
শ্রী অরবিন্দ ঘোষ) আছেন। শহরটা অতি বাজে—
একটুও (vie intellectuelle) বুদ্ধিবৃত্তির সাড় পাওয়া
যায় এমন জীবন নেই—একজন ইংরেজ ব'লেছে যে, এই
শহর হ'চ্ছে (a city of ghosts) প্রেতান্নার পুরী সেটা
ঠিক কথা—দেখতুম যে অরবিন্দের দলটিতেই কিছু সচিষ্ঠা
আছে।” শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে (Paul Richard) পোল
রিচার্ ব'লে একজন ফরাসী আর তাঁর স্ত্রী থাকতেন, এঁরা
তিনজনে মিলে (Arya) “আর্য্য” ব'লে একখানি দার্শনিক
মাসিকপত্র ইংরেজীতে বা'র ক'রতেন—এঁদের নাম
শুনেছেন, তবে আলাপ হয়নি এদের সঙ্গে।

প্রথম শ্রেণীর অল্প যাত্রীদের মধ্যে পুরুষদের দুই এক-
জনের সঙ্গে কচিং কখনও একটা-আধটা বাক্যালাপ হ'য়েছে
মাত্র—“বঁঝর” বা পরস্পরের জন্ত গুভদিন কমনা—বা
কপালে হাত ঠেকিয়ে আধা-ফোজী কায়দায় নমস্কার করা—
এইটুকু যা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা এদিকে আসেন না,—
তাদের জন্ত জাহাজের পিছন দিক্কার খোলা ডেকটার
ব্যবস্থা, যেখানে জাহাজের স্কানী বা হাল-ঘর চাকা ঘুরিয়ে
ঘুরিয়ে সামনের কম্পাসের নির্দিষ্ট দিশা দেখে জাহাজকে

তার গন্তব্যের অভিমুখী ক'রে রাখছে। তৃতীয় শ্রেণীও একেবারে আলাদা, এদের জন্ত বিশেষ কোনও খোলা ডেক নেই—এরা সামনের আর পিছনের সাধারণ খোলা ডেক-গুলিতে খাসাদী, আঙুনঘরের মিজী, ফরাদী, আরব, মোপসা, আনামী, বাবুরচী, যত হরেক রকমের লোকের

মাঝে আর খোলা ডেকের চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীদের পাতা শতরঞ্জী, কল্ল আঁচড়াইয়ের ফাঁকে একটু আঁধুঁ বা দাঁড়াবার জায়গা পায়, তাতে দাঁড়িয়ে আবশ্যক মনে করলে বাইরের খোলা হাওয়া একটু ক'রে সেবন ক'রে যায়।

কোইয়া-সানের যাত্রী

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী

যে-দিন কোইয়া-সানের তীর্থযাত্রী হ'য়ে নারা (Nara) থেকে বেরিয়েছিলাম সে-দিনকার কথা ভুলবার নয় আজ পাঁচ বছরের কথা। দিন পঞ্জিকা রাখিনি। কিন্তু মনের



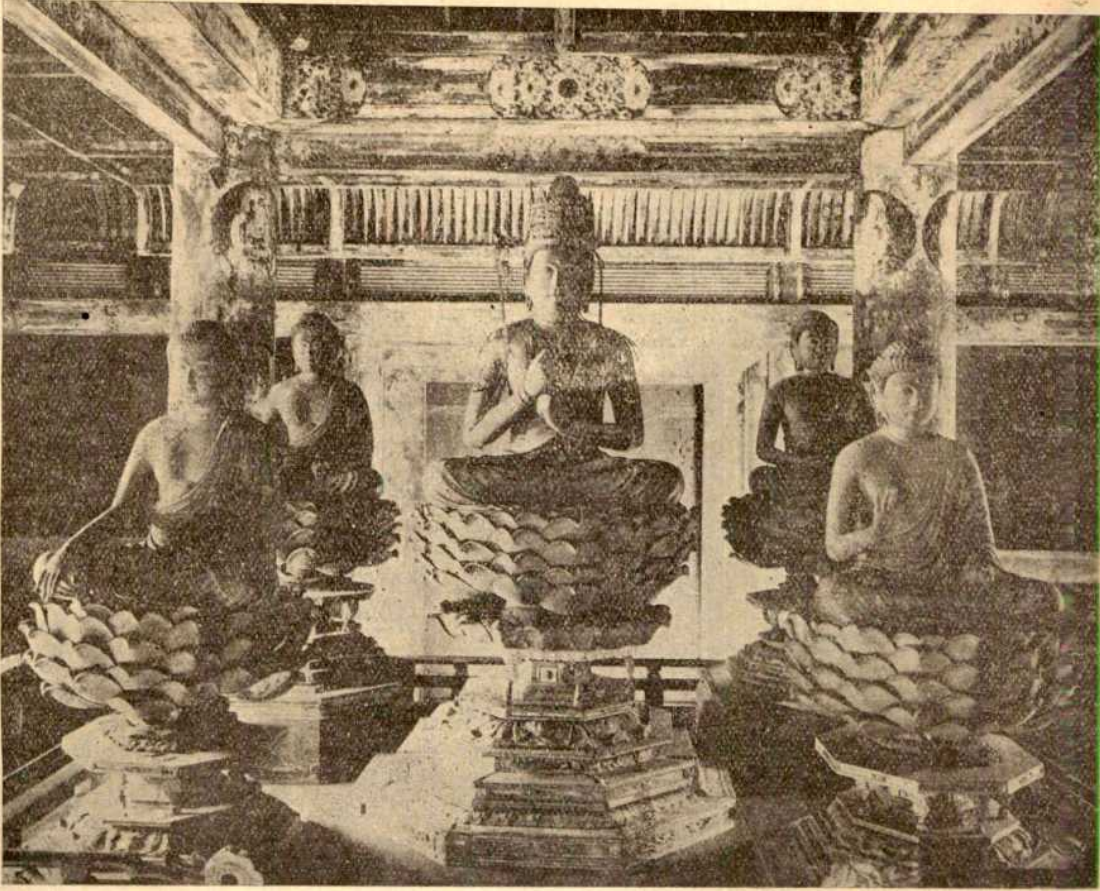
শো-তোকু তাইশি

পটে যে-ছবি আঁকা রয়েছে—ইতিহাসের স্মৃতি যে-ছবিকে সজীব ক'রে দিয়ে গেছে সে ছবি মুছবার নয়। সেদিন প্রাতে উঠে আমরা নারার তপোবনের পথ বেয়ে চলেছি—কোইয়া-সান রওনা হ'ব ব'লে। বসন্তের হাওয়া এসে তখন এই 'উদীয়মান-সূর্য'র বেশে মেগেছে। জাপান ফুলে ফলে সেজে উঠেছে। জাপানের ঘাটে বাটে, বনে ও কন্দরে সে শোভা পরিফুট হ'য়ে উঠেছে। সুন্দরীর কিমোনোতে (Kimono) বসন্তের সে রাগ ধরা পড়েছে। নারার তপোবনের তখন এক অপূর্ণ শোভা হয়েছে। তপোবন-তরু পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে। সাকুরা-হানায়* গাছ ভ'রে উঠেছে। উমো† তখন কুঁড়ি থেকে সব বেরোয় নি। শীতের বাতাসে আড়ষ্টতা তখনো তার কাটেনি।

এমন পথ বেয়ে আমরা চলেছি। ঝিলের পাশ থেকে হরিণশিশু এসে তার অভিবাদন জানিয়ে গেল। আশ্রমের মন্দির থেকে ভিক্ষু শাকা নিয়োরাইয়ের (Shaka-niyorai-শাক্য তথাগত) গুণগান করলেন—ও পশ্চিমমুখী হ'য়ে বুদ্ধের জন্মভূমির উদ্দেশ্যে তাঁর ভক্তির অঞ্জলি দান করলেন। মন্দির-চূড়ায় ব'লে পাখী তার সহানুভূতি জানিয়ে গেল। আমাদের মনটাও শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো। ভারতের হারাণো ও চিরপ্রিয় আদর্শ নিয়ে গড়া এই আশ্রমকে জাপান কেমন

* Sakura-no-hana ; Cherry flowers

† Ume-no-hana—plum flowers



কোইয়া-সানের মঠে—পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ

ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছে ভেবে হৃদয় আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

পুরাণো স্মৃতির এই পবিত্র স্পর্শে পুলকিত হ'য়ে আমরা কোইয়া-সান যাত্রা করলাম। জাপানের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু কো-বো দাইশির জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দেখে চক্ষু সার্থক করবো—ও আশ্রমের ভিক্ষুদের সংস্পর্শে এসে ধ্যাত্ব হ'ব এই বাসনা নিয়েই আমাদের এই তীর্থযাত্রার আয়োজন। জাপানের অভ্যুদয়ের প্রতীক যুবক কো-বো দাইশি চীনে রওনা হ'য়েছিলেন—সত্যকার ভারতের খোঁজে। জাপানী বৌদ্ধধর্মের অবনতি দেখে তাঁর মনে ক্ষোভ হয়েছিল—জাতির অধোগতি দেখে তাঁর হৃৎপিণ্ড উপস্থিত হয়েছিল। যে ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধবাণীর সত্য জগতে প্রচারিত হ'য়েছিল সে-দেশ পর্যন্ত তিনি যেতে পারেন নি। তবে

চীন দেশের মন্দিরে মন্দিরে সেই সত্যের সন্ধান পাবেন ভরসায় ও ভারতীয় ভিক্ষুদের সংস্পর্শে আসতে পারবেন এই আশায় তিনি বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। ভারতের সেই সত্য এনে স্বদেশকে জাগিয়ে তুলেছিলেন—এক অভিনব জাতীয়তার সৃষ্টি করেছিলেন—জাপান আজও রক্তজ্ঞাতভরে তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়। সেই ভারতসন্তান হ'লে যদি আমি কো-বো দাইশির সমাবস্থানে আমার নমস্কার না জানিয়ে যাই তবে তার চেয়ে আর ছুঁতে পারি না। তাই কোইয়া-সান তীর্থের যাত্রী হ'য়ে বেরিয়ে পড়লাম।

* * *

কোইয়া-সানের অপর নাম তাকানো ইয়ামা (Takano yama)। সান্ বা ইয়ামা হচ্ছে পর্বত। সান্ চীনা কথা—জাপানীতে চলতি হ'য়ে গেছে। ইয়ামা খাটা জাপানী



কনকুসিয়স

কথা। এই কোইয়া পর্বত প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু—ইয়ামাতো (Yamato province) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ইয়োশিনো-গাওয়া (Yoshino gawa) বা ইয়োশি নদীর ধারে অবস্থিত।

নারা থেকে আমরা ৯টার ট্রেনে রওনা হ'লাম। পথের দু'ধারে জাপানের মনোহর প্রকৃতি—পাতায়, ফুলে ভরে হাসছে। মাঝে মাঝে ছোট পাহাড় পল্লবিত দেবদারুতে শোভিত হ'য়ে অভিনব দৃশ্য উৎপাদন করেছে। নীচে ছোট ছোট নদী ছুটে চলেছে। এই প্রকৃতিই জাপানকে সুন্দর ক'রে তুলেছে; জাপানীকে আর্টিষ্ট করেছে। তাই জাপানী

চিত্রকরের তুলিকাপাতে এই প্রকৃতি সহজভাবে মূর্তি পেয়েছে—জাপানী কবির গানে ইয়ামা-কাওয়ার (পাহাড়ীয়া নদীর) প্রতিধ্বনি ধরা দিয়েছে।

কোইয়া-সানের পথে হোরি-উ-জীর বিখ্যাত মন্দির। নারার থেকে সাত মাইল দূর। এই হোরি-উ-জীই হচ্ছে জাপানের সব চেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির—৬০৭ খৃঃ অব্দে রাজকুমার শো-তোকু নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটা জাপানী বৌদ্ধদের সব চেয়ে বড় তীর্থস্থান। প্রায় ষেড় হাজার বছর ধরে এই মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক অংশ তার জীর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু জাপানী বৌদ্ধদের মনে সে-মন্দির বর্তমান যুগেও নিত্য নূতন ভাব জাগিয়ে তোলে। হোরি-উ-জীতে ভারতের অনেক খাঁটি জিনিষের সন্ধান মেলে। সেগুলি চীনেদের হাত দিয়ে পরিবর্তিত হ'য়ে আসে-নি। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর লেখা সংস্কৃত পুঁথি এখান থেকেই পাওয়া গেছে। ভারতে বা চীন দেশে কোথাও এত পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি মেলে নি। শুধু মধ্য-এসিয়ার মরভূমিতে সম্প্রতি এর থেকে পুরাণো সংস্কৃত পুঁথিও কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। হোরি-উ-জীতে খাটা ভারতীয় শিল্পের নিদর্শনও মেলে। সম্প্রতি আচার্য্য সিন্ধুভা-জেভি জানিয়েছেন যে, হোরি উ-জীর ভিক্ষুদের ভিতর কেহ কেহ ভারতীয় সঙ্গীতকলার ধোঁজ রাখেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ভিক্ষুরা জাপানে যে-সব সুর আমদানী করেন, ভিক্ষু-পরম্পরায় হোরি-উ-জীতে তার আলোচনা ও শিক্ষা ছিল এবং এখনও কিছু আছে। আচার্য্য জেভি হোরি-উ-জীর ভিক্ষুদের গীত সেই সুরের স্বরলিপি ক'রে নিয়েছেন এবং তা' শীঘ্রই প্রকাশ করবেন লিখেছেন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের দুই একটি রাগ কি ভাবে গীত হ'ত তার আভাস কিছু এর থেকে মিলবে আশা করা যায়।

* * * *

আমরা কোইয়া-সানের বাতী। হোরি-উ-জীতে বেশী থামবার সময় নেই। ফুলেভরা বনভূমি দিয়ে দেবদারুভরা উপত্যকা দিয়ে ও ছোট ছোট শ্রোতস্বতীদেব বৃক্কের উপর দিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা পরে কোইয়া-গুচি (Koya-guchi) ষ্টেশনে পৌঁছলাম। গুচি মানে হচ্ছে ঘার। কোইয়া-

গুটি হ'য়ে কোইরা পাহাড়ে চড়তে হয় ব'লে ষ্টেশনটির এই সুন্দর নামকরণ হয়েছে—'কোইরা'র দরজা। নারা থেকে কোইরা-গুটি প্রায় ৪০ মাইল পথ।

আমরা যখন কোইরা-গুটি পৌছলাম তখন আকাশে মেঘ জমেছে ও অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে। 'উদীয়মান-সূর্য্য'র দেশে সূর্য্যের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কোইরা-গুটি থেকে আমাদের হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হবে। কোইরা-গুটি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা ছোট একটি নদীর ধারে এসে পড়লাম। নদীটির নাম কানো-কাওয়া (Kano-Kawa)। এই নদীর ধার বেয়ে কিছুদূর উঠলেই একটি ছোট গ্রামে এসে পৌছা যায়। গ্রামের নাম শিডে (Shide)। স্থানটি খুবই সুন্দর। নদী-প্রপাতের দুই ধারে অবস্থিত। একটি সেতু দিয়ে পার হ'তে হয়। ছোট গ্রামটির চারিদিকে ঘন দেবদারু বন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে। আশে পাশে দুই একটি মাকুরা গাছও দেখা যাচ্ছে। কোইরার পাহাড়ে তীর্থযাত্রীরা এই পথ দিয়ে যায়। পাহাড়ে উঠতে হয় পায়ে হেঁটে। ভাল সময় প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। এমন সুন্দর রাতা আর দেখিনি। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার উপায় আমাদের ছিল না। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। অল্প বৃষ্টির সঙ্গে তখন তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। শীতের ঝাপ্টা-হাওয়ায় হাত পা আড়ষ্ট হ'য়ে আসছে। এপ্রিল মাসের প্রথম। জাপানে বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়েছে। কিয়োটো ও নারাতে মাকুরা ফুল দেখা দিয়েছে। জাপানী মেয়েরা রঙ-বেরঙের কিমোনো প'রে বেরোতে আরম্ভ করেছে। তাই আমরাও সাহস ক'রে সেদিন গরম পোষাক নারায় ফেলে এসেছি। সেজন্ত শীতের চোট্টা খুব বেশী সহ্যে হ'ল—উপায় নাই। শিদের পাহুনিবাসে বসে "ও-চা" * খেয়ে শরীরটা একটু গরম ক'রে নিলাম ও আমরা ক'জন বীরদর্পে বেলা ১১ টায় কোইরা-সানে চড়া আরম্ভ করলাম। আচার্য্য লেভি, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক সাকাকি, ও



জিমু-তেমো—জাপানের প্রথম সম্রাট

আমি। আচার্য্য পত্রীর জন্ত খোঁজ ক'রে একখানি ডুলি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং তিনি তা'তেই চললেন। কোইরা-সানের আশ্রমে বেলা ১২।১ টা নাগা'ত পৌছে খাওয়া-দাওয়া করব ঠিক ছিল। মাত্র ৪ মাইল চড়াই। কিন্তু তুষার ও বৃষ্টিপাতে এই পথ এমনি পিছল হ'য়ে উঠলো যে, এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে আমাদের চার ঘণ্টা লাগলো। তার ওপর সারাদিনের উপোস ও শীতের বঠ ত আছেই। কোইরা নগরের পাদদেশে যখন আমরা পৌছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমরা আশ্রমের অতিথি। পূর্বেই খবর দেওয়া ছিল। সুতরাং নগরস্বারেই

* জাপানে ও-চাই বেশী চলিত। গরমজলে চায়ের কাঁচা পাতা ভিজিয়ে এ চা তৈরী হয়। দুধ বা চিনি দেওয়া হয় না। "ও" কথাটি সম্মানসূচক। এ চায়ের চাব জাপানে হয়—তাই তাঁকে সম্মানসূচক নাম দেওয়া হয়েছে। দুধ চিনি দিয়ে যে চা তৈরী হয় তাকে "কো চা" বলা হয়? "কো" মানে "ছোট"।



কোইয়া-সানে কো-বো দাইশির প্রথম আগমন

কয়েকজন আশ্রমবাসী ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হ'ল। সিন্ধু ও ক্লাস্ত দেহে ধীরে ধীরে আমরা আশ্রমে প্রবেশ করলাম ও নির্দিষ্ট পান্ননিবাসে আশ্রয় নিলাম। তখন কোইয়ার মন্দিরে-মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। আশ্রম-বাসী ভিক্ষুদের সমবেত হ'বার সময় হয়েছে। শাক্যমুনি ও কোইয়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কো-বো-দাইশির পূত স্মৃতিতে আশ্রমবাসী ভিক্ষুদের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—মন আনন্দে উছল হ'য়ে উঠেছে। তা'দের আনন্দধ্বনির স্পর্শে আমাদেরও শান্তি যেন অনেকটা লগু হ'য়ে এল।

* * * *

কো-বো দাইশির কার্যকলাপ ভাল ক'রে বুঝতে গেলে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার গোড়ার খবর কিছু জানা দরকার, কারণ এই থেকেই জাপানে এক নতুন জাতীয় জীবনের গঠন আরম্ভ হয়—ও এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই গঠনের মূলে হচ্ছেন এক রাজকুমার নাম শো-তোকু (Sho-toku)। তিনি নিজে কোনোদিন রাজপদ না পেলেও প্রায় ত্রিশবৎসর ধ'রে (৫৯৩-৬২২খৃঃ অঃ) অপ্রাপ্তবয়স্ক সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হ'য়ে শাসনকার্য নিরীহ করেছিলেন।

শো-তোকু যখন জন্মগ্রহণ করেন (৫৭৩ খৃঃ অঃ) তখন জাপানে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয়দলের ভিতর গণ্ডগোল চলছে।

তাদের ভিতর যে দল মাথা উঁচু ক'রে উঠতে পারতো তার ক্ষমতাতেই রাজ্য পরিচালিত হ'ত। সম্রাটের ক্ষমতা একপ্রকার ছিল না। শো-তোকু যখন রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বৎসর। স্থিরবুদ্ধির ব'লে তিনি নানা দলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে শাসন-সংস্কারে মন দিলেন। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ল জাতীয় একতার অভাব। এই একতা স্থাপন করতে হ'লে জাতের মনকে আগে তৈরী করা ও একটা সাধারণ আদর্শ সামনে দিয়ে সেই মনকে পল্লবিত ক'রে তোলা দরকার। বৌদ্ধধর্মই এ কাজে সবচেয়ে বড় সহায় হ'বে শো-তোকু সেটা বুঝতে পারলেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলছিল। ৫২২ খৃঃ অঃ শিবা তাচিতো (Sibba Tachito) নামে একজন চীনা ভিক্ষু কেরিয়া হ'য়ে জাপানে আসেন। কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের অনেকদিন থেকেই আদান প্রদান চলছিল। সেই সূত্রেই শিবা-তাচিতো জাপানে পদার্পণ করেন। তাচিতো ইয়ামাতো বিভাগে (Yamato province) বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনা ক'রে শাক্যবুদ্ধের ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ইয়ামাতো জাপানীদের আদি বাসভূমিও তখন জনবহুল। তাচিতোর বহু চেষ্টায়ও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয়নি। জাপানীরা এই বিদেশী ধর্মগ্রহণে তখন বিশেষ ঔৎসুক্য

দেখায়নি। এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে (৫৪৫-৫৫২ খৃঃ অঃ) কোরিয়ার অন্তঃপাতী কুদারা (Kudara) জনপদের রাজা জাপান-সম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হন ও সেই সময়ে ছ'বার বুদ্ধমূর্তি, ও বৌদ্ধশাস্ত্রের গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাঠান। এই সূত্রে জাপানের সঙ্গে একটা নিকট-সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছাই তাঁর বেশী ছিল। জাপান প্রথমে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও কুদারার রাজা ভগ্নোৎসাহ হ'লেন না। ৫৭৭ খৃঃ অঃ তিনি

বৌদ্ধধর্মকে জাতীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করলেন। বহু সমারোহে সমুদ্রতীরে “শি-তেন্-নো জির” (Shi-tenno-ji চতুর্দিক্‌পালের মন্দির—‘জি’ মানে মন্দির) মন্দির নির্মাণ করা হ'ল। সেই সঙ্গে ভিক্ষুদের জ্ঞাত শিক্ষা-বিভাগ খোলা হ'ল। বুদ্ধ ও দরিদ্রের বাসস্থান, রোগীর আরোগ্য-শালা ও ভৈবজ্যাগারের ব্যবস্থাও হ'ল।

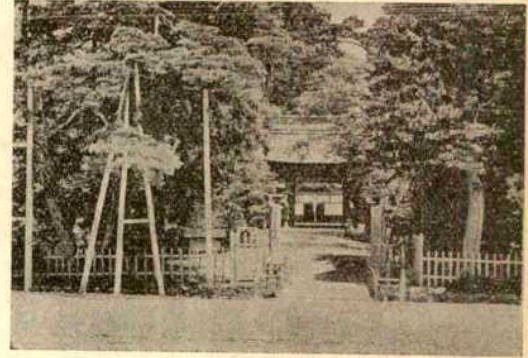


কোয়ামন্—অবলোকিতেশ্বর

পুনরায় জাপানে উপহার পাঠালেন—প্রায় ছ'শো বৌদ্ধগ্রন্থ, বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের জ্ঞাত ভাস্কর, ও মন্দির নির্মাণের জ্ঞাত স্থপতি। মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে ভারতীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছ'জনকে এই সঙ্গে জাপানে পাঠান হ'ল। নানি-ওয়া (Nani-wa-বর্তমান ও-সাকা O-saka) নগরে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং কোরিয়া থেকে প্রত্যাগত কয়েকজন জাপানী রাজকর্মচারী এতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন। এর পরই শো-তোকু তাইশির আবির্ভাব।

শো-তোকুর হাতে ক্ষমতা আসবার পরই তিনি

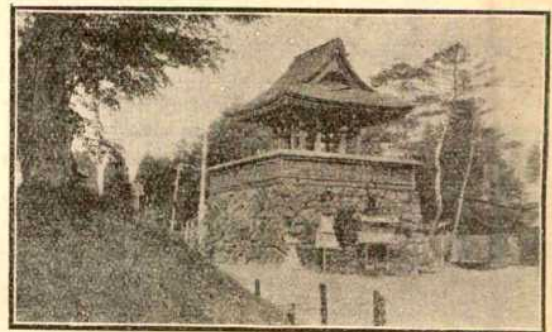
১০৭—১০



কোজো-বু-জি মন্দির—কোইয়ামন্

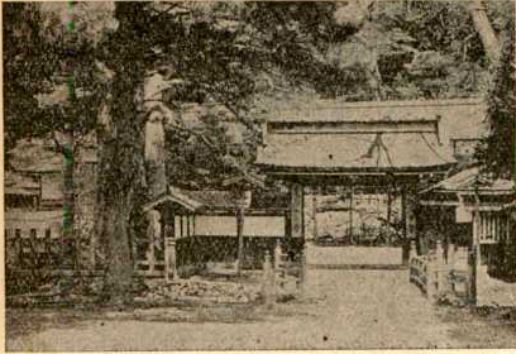
কোরিয়া ও চীন থেকে যে-সব অর্ণবপোত জাপানে আসতে সেগুলি প্রথমে এই স্থানে ভিড়তো। সেইজন্ত বিদেশীদের অবস্থানের জ্ঞাত পাহনিবাসেরও সৃষ্টি হ'ল। অতিথি-সংস্কারের কার্যে কোনো ক্রটি না হয় সে-বিষয়ে মন্দিরের পুরোহিতেরা দৃষ্টি রাখতেন। এই আতিথেয়তার দ্বারা জাপান আজও বজায় রেখেছে।

শো-তোকু দেশের শাসন-প্রণালীর সংস্কার করেন। এই নূতন শাসন-প্রণালীর প্রথমেই তিনি ধর্মের কথা তুলেছেন। প্রজার নৈতিক উন্নতিই প্রথম দরকার।



কোইয়ামানের পথে—মন্দির

ধর্মবিশ্বাসই সেই উন্নতির মূল। এর ভিতর দিয়েই রাজা-প্রজার একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে একথা তিনি ভাল ক'রে বুঝেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মত উদার ধর্ম নাই। সুতরাং জাপান যদি এই ধর্মের ত্রিরত্নকে বরণ ক'রে নেয় তাহলে রাজাপ্রজা সকলে এক হুত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে ও সেইটাকে অবলম্বন ক'রে একটা জাতি গ'ড়ে উঠতে পারে।



কোইয়ান-সান্ বিদ্যামন্দিরের প্রধান দ্বার

নূতন শাসন-প্রণালীর আরম্ভেই তিনিই এই মহান আদর্শকে বুঝিয়েছেন। * এই অভিনব শাসনসংস্কারে শো-তোকু কয়েকজন সহৃদয় সহায় পেয়েছিলেন এবং তাঁদের সাহায্যেই জাতির সংগঠন-কার্যে অনেকটা সফল হ'য়ে যেতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চীনের সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ক'রে জাপানের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে গিয়েছিলেন। অশোকের মত তাঁর হৃদয় প্রজার হুখে কান্দত। দেশের দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। তাই জাপানের জন্তে তিনি এতটা ক'রতে পেরেছিলেন। সেজন্ত দেশের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট

* জু শিচি কেম্পো (Jushichi Kempo) বা সপ্তদশ শাসন-প্রণালীর (৬০৪ খৃঃ অব্দ) প্রথম হুত্রেই তিনি বলছেন—

“জনসাধারণ একতার সমাদর করবে। শাসন-বিষয়ে অবধা বাধা প্রদান করবে না। ত্রিরত্নকে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘকে—ভক্তিভাবে পূজা করবে। ত্রিরত্নেই চার জগতে ধর্মের সবচেয়ে বড় আদর্শ। জনসাধারণ যদি এই ত্রিরত্নকে ভক্তি করে তাহলে তাদের মন সরল হ'বে, তারা সত্যের আশ্রয় নেবে শো-তোকু জনসাধারণকে তিনখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়বার আদেশ দিয়েছিলেন—১। সন্ধর্শপুণ্ডরীক হুত্র। ২। বিমলকীর্তি-নির্দেশ। ৩। শ্রীমালা দেবাসিংহনাদ হুত্র। তিনখানিই মহাযান গ্রন্থ।



অমিদা—অমিতাভ বুদ্ধ

ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। পরবর্তী যুগের জাপানী বৌদ্ধেরা অবলোকিতেশ্বরের অবতার ব'লে তাঁকে পূজা দিয়েছে।

কিন্তু শো-তোকুর কাজ সম্পূর্ণ হ'তে সময় লেগেছিল। তাঁর মহান উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি হয়েছিল প্রায় দু'শো বছর পরে। শো-তোকুর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল কিন্তু তা'তে নূতন দলাদলিরও সৃষ্টি ক'রেছিল। ধীরে ধীরে জাতির মন গ'ড়ে উঠছিল বটে, কিন্তু রাজকীয় দলের বিবাদ মিটে অনেক সময় লেগেছিল। ঐদের দলবিশেষের প্রভাবে বৌদ্ধসংঘেরও কিছু অবনতি হয়েছিল—রাজপুরোহিতের। ধর্মচর্চা ছেড়ে রাজনীতিতে

মনোনিবেশ করছিলেন ও নানা ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে সুরু ও কো-বো। এঁরা এসেই জাপানের উন্নতির ছ'টি নূতন করেছিলেন। ধর্মপ্রচার চললেও মহানুভব ভিক্ষুদের ধারার সৃষ্টি করেন ও সেই ধারা বেয়ে জাপান বত হ'য়ে সংখ্যা কমে আসছিল। ঠিক এই সময়ে (খৃষ্টীয় ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শো-তোকুর ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জাপানে দু'জন প্রান্তঃস্বরণীয় দেবীয়া ও কো-বোর কীর্তিকলাপ ও কো-বোর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এঁদের নাম দেঙ্গীয়ো (Dengyo) কোইয়ানান আশ্রমের কথা বারাস্তরে বলবার ইচ্ছা থাকে।

সনেট-গুচ্ছ

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতলু, ভুরু-ধলু বাঁকাসে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঞ্জে মজাইবে, মুকুতা-হাসিনী ?
আনো বীণা সপ্তস্বর—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্ত্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ-পদ্মাসনে—
যে-বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হতাশনে,
পশে পুনঃ রসাতলে—মানুষের মর্ম-নিবাসিনী !

করি' উচ্চ শঙ্করনি, এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে,
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতি-ভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরির নূপুর-নিকল ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা—কূলে যার দেবতার ভ্রমে ?

পৌর্ণমাসী

আজ দীর্ঘ পৌর্ণমাসী বাপিয়াছি বিজ্ঞান-বাসরে—
সুন্দরের কোজাগর, নিদ্রাহারা নিদ্রাধ-শরীরী !
পরিণাম-রমণীয় দিবসের দীপ্তি অনুসরি'
উঠেছিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গাচ নীলাধরে।

বিধু পিষাইল যবে জ্যোৎস্না-সীধু ধামিনী-অধরে—
খুলে' ছিঁড়ে' থসে' গেল তারকার সিঁথী সাতনরী !
তার পর সধরিল নীবি-বাস চমকি' শিহরি'—
হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর, প্রহরে প্রহরে !

শেষ হ'ল সুধাপান,—ম্লান হাসি আরও যে মধু !
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্বাশার আসন্ন আভাস,
একটি অক্ষর মুক্তা দোলে হের, নয়নে বধূর—
পূর্ণ-সুখ পূর্ণিমার মুখে সে কি মাদুরী উদাস !
অস্ত গেল নিশানাথ, বনে বনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে ছড়ায়ে প'ল বিধবার কোটার সিঁহর

ভোরের আলো

নিশা অবসান হ'ল। যত পাখী আছিল যেখানে
ডাকিতেছে একসাথে, আনন্দের কি কলকূজন !—
দিকে দিকে যৌন-ভক্ত অঙ্গারার নূপুর-নিকল
ক্ষটিক-আকাশে যেন সচকিত প্রতিধ্বনি হান !
বাতায়নে দাঁড়াইল শয্যা ত্যজি' উবার আছানে,
শিশুর ক্ষীরাশুগন্ধী অধরের হাসি অতুলন
হেরিলাম দিবামুখে—প্রভাতের প্রথম কিরণ,
নিরুল্লঙ্ঘ্য, বর্ণহীন—শুধু আলো, নিশা-অবসানে !

সে যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কোমল-আভাস !
 সৃষ্টির আল্লাদ যেন, জগতের নিগূঢ় চেতনা !
 পরিব্যাপ্ত বিভা শুধু ! জড়বক্ষে প্রাণের বিকাশ !
 মৃত্যুময়ী ধরণীর শিরে যেন আশীষ-সাম্বন !
 সেই নির্বিশেষ জ্যোতি ভরিয়াছে সকল আকাশ,
 ভরিয়াছে মোর নেত্র সেই প্রভা স্নিগ্ধ নিরঞ্জন !

বন-ভোজন

দিবা-বধু পরিষাছে বাকলের শাড়ী, কড়ি-হার,
 আর্দ্র চুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
 তপন-প্রোয়নী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
 সিঁহুর মুছিবা পবে কালাশুর ললাটে তাহার !
 আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
 যত বৃদ্ধ বনস্পতি ; তাই যত্নে অঞ্চল সঞ্চরি'
 কটিতটে, স্নবহৎ খালিকাষ পায়সামু ভরি,'
 ফিরিছে নিকটে দূরে, শুষ্ঠন খসিছে বার বার ।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন !
 নিদ্রাবাস্ত তরুরাজি, উপবাসে বিনীর্ণ মলিন—
 কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন !
 পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন !
 হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলান্বন—
 পিয়িছে শ্রামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন !

জ্যোৎস্না-নিশ্চিতি

রজনী গভীর হ'ল, ক্লমপক্ষ-দ্বিতীয়াব শশী
 উঠিয়াছে উর্দ্ধনভে—প্রোতোহীন নীলের পাথারে !
 মন্ত্র-স্কন্ধ চরাচর, তরুশ্রেণী কাতারে কাতারে
 দাড়াইয়া তজ্জাতুর—নিস্তরঙ্গ তিমির-সরসী !

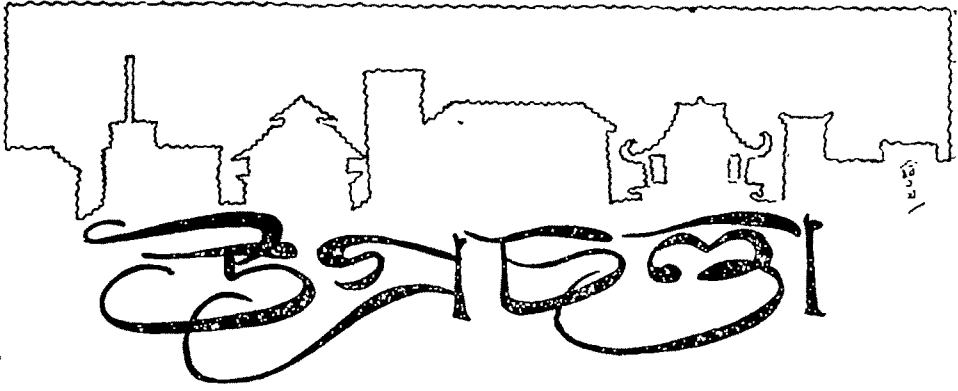
মনে হয়, ধরা যেন শুক্রাশ্বরা বিধবা-রূপদী—
 এলাইয়া কক্ষকেশ, অদৃষ্ট সে বেদনার ভারে
 পড়ে' আছে সংজ্ঞাহাবা, রজনীর নিশ্চিতি-আগারে—
 ধু ধু করে রূপ-মক দিশাহীন দিগন্ত পরশি' !

একি কাস্তি ভয়ঙ্করী ! এর চেয়ে ভালো অন্ধকার,
 প্রাণহীনা ধরিত্রীর স্করণ লজ্জা-নিবারণ,
 এষে মোন-অট্টহাস, মরণের জ্যোৎস্না-জাগরণ !
 যৌবন—দেহের ব্যাবি, রূপ যেন তাহারি বিকার !
 মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
 দিবসের লীলা-শেষে নিশাকালে একি হাহাকার !

শেষ-বাসর

আজ সখি, সাদ্র হ'ল আমাদের মিলন-বাসর ;
 বাদলের ক্রমা তিথি, আর্দ্রবায়ু উঠিতেছে স্বদি,'
 লুকাই মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
 তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেদন !
 চুরি করে' এসেছি, তেটিবারে নাহি অবসর—
 জানো সে ককণ কথা, অগ্নি মোর হৃৎকের প্রোয়নী !
 এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দশী,
 বিনা ফুলে বিনাইয়া দিহু তোর কুন্তল ধূসর !

যদি পুন দেখা হয় চন্দ্র-কাস্ত চৈত্র-রজনীতে,
 ফুলে-ফুলে ভরি' দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী ছকুল,
 গাব গান প্রাণ-ভরা, হলি' দৌহে স্বপ্ন-তরলীতে !
 আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—
 ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর সঙ্গীতে,
 ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল !



শ্রী সীতা দেবী

লম্বা গ্রীষ্মের ছুটি পাইয়া শিশু কন্যা ও পত্নী সহ হীরেন দেশে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। রেশ্মনে থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের স্বামীজীর একেবারে অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল। যেমন দেশ তাহার তেমন মানুষ! প্রভা ত মনে করিতেই পারে না যে, এই দীর্ঘ ব্রহ্মপ্রবাসের মধ্যে, সে ছইটা, বড় জোর তিনটার বেশী নূতন মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে। করিবার দরকারও সে বিশেষ অনুভব করিত না।

এবার বেশ কিছুকাল দেশে কাটাইয়া আসিবে আশা করিয়া, যথাসাধ্য জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া, বাদবাকি এক বন্ধুর বাড়ী রাখিয়া, বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া তাহারা যাত্রা করিল। কথা ছিল, ছুটি শেষ হইলে হীরেন ফিরিয়া আসিয়া মেসে থাকিবে, প্রভা পাঁচ ছয় মাস পরে একেবারে পূজার ছুটি পার করিয়া ফিরিবে।

গ্রীষ্মের ছুটি দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া আসিল, আর দিন দশ বাকি। আহা! রাস্তাে মাহুর পাতিয়া শুইয়া হীরেন খবরের কাগজ হাতে ঘুমের আয়োজন করিতেছিল। প্রভা খুকীকে কোলে করিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল, “বাবা, যা গরম। হুপুর-বেলা আমার মাথা যেন পাগল হ’য়ে ওঠে। একটু যে ঘুমিয়ে কাটাব, তারও যো নেই, যা লক্ষ্মীর অবতার মেয়ে।” হীরেন বলিল, “ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, তাহ’লে বেশ নিশ্চিন্ত হ’য়ে ঘুমতে পারবে। আমারও একটা দিনান্তে গল্প করবার লোক থাকবে।”

প্রভার মুখখানা একটুখানি স্নান হইয়া আসিল, বলিল,

“সত্যি, এইত সেদিন এলাম। এর মধ্যেই ফিরবার দিন এসে পড়ল। আবার সেই হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, শূঁটলি বাঁধ আর খোল। জাহাজের ছোট খুপুর্নী আর খুকীরা চীৎকার মনে করলেই আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।”

হীরেন বলিল, “তোমার প্রাণ এখনি হাঁপবার ত কোনো সম্ভব কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যাবে ত ছ’মাস পরে। আমি বরং কাল সকালে একবার ‘বার্ষ এন্‌গেজ’ করার চেষ্টায় বেরলে পারি। সূরের বিষয়, আবার মাসে বঙ্গোপসাগরে ঘোণ খাবার জন্তে কিছু যাত্রীর হুড়োহুড়ি প’ড়ে যাবে না।”

প্রভা মুখ আরো বেশী গম্ভীর করিয়া বলিল, “হ্যাঁ, ছ’মাস পরে যাব, না আরো কিছু! তোমায় রেজিষ্ট্রি ক’রে লিখে দিয়েছি আর কি।”

হীরেন একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “তার মানে?”

প্রভা বলিল, “মানেটা ত বেশী কিছু শক্ত নয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।”

অতিশয় ভীত সঙ্কত হইবার ভান করিয়া মাথায় হাত দিয়া হীরেন বলিল, “আঃ সর্বনাশ। তাই নাকি?”

প্রভা বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ তাই। আপনায় যে একেবারে মাথায় বাজ পড়ল দেখছি। ছুটির পর গিয়ে খুব ফুর্তিতে কাটাবার সব ব্যবস্থা ক’রে এসেছিলে বুঝি? আমি গেলে বাধা পড়বে?”

গৃহিণীর চোখে জলের আবির্ভাব হইতে আর দেরি নাই দেখিয়া হীরেন বুদ্ধিমানের মত স্তব্ধ ফিরাইয়া লইল।

বলিল, “আচ্ছা, গেলেই না হয় ধরলাম। বাড়ী ঘর ত সব ঘটা করে উঠিয়ে দিয়ে এলে। এখন কিরে গিয়ে উঠবে কোথায় শুনি? মেসে না জুর্গাবাড়ীতে?”

প্রভা সব কথারই উত্তর ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সে বলিল, “কেন, গিয়ে মধু-বাবুদের বাড়ী উঠবে, তার পর বাড়ী খুঁজে নেব।”

হীরেন বলিল, “বাড়ী পাওয়া অমনি সোজা কিনা? বাড়ীওয়ালারা সব তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। হঠাৎ এমন মত পরিবর্তন হ’ল কেন শুনি?”

উত্তরে শুনিল, যে, মত পরিবর্তন হইয়াছে গৃহীণীর খুসি। এবং কারণ যদি সে না বুঝিতে পারে তবে তাহার বুঝিয়া কাজ নাই।

বাহিরে মুখ হাঁড়ি করিয়া, এবং মনে অত্যন্ত খুসি হইয়া হীরেন ঘুমাইয়া পড়িল। বিকালে উঠিয়া, চা খাইয়া বলিল, “তাহ’লে একবার কেবিনের চেষ্টায় বেরনো যাক?”

প্রভা বলিল, “হ্যাঁ, আগের থেকে চেষ্টা করা ভাল, তা না হ’লে আবার এক কেবিনে জায়গা পাব না।”

হীরেন বলিল, “নাই বা পেলে? ছ’মাস দূরে থাকবার ব্যবস্থা ছিল, তার জায়গায় তিনটা দিন কি আর থাকতে পারবে না?”

প্রভা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “আহা, সেই ভয়ে ত আমি একেবারে ম’রে গেলাম। খুকীটা হাড় জালিয়ে ধায়, একলা সামলাতে পারি না, তাইনা। তা না হ’লে তিন দিন ছেড়ে, তেত্রিশ দিন তুমি থাকনা গিষে যেখানে খুসি।”

হীরেন বলিল, “জী জ্ঞাতি। এই পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে থাকবার আতঙ্কে হাঁপিয়ে উঠেছিলে, আর এখন উন্টো বস্তুতা কব্ছ। তোমাদের বিশ্বাস কব্বে যে শাজে মানা করেছে, তা ঠিকই করেছে।”

উত্তরে শুছাইয়া কিছু বলিবার না পাইয়া, প্রভা এমন মুখ করিয়া চলিয়া গেল যেন হীরেন এমন একটা বাজে কথা বলিয়াছে, যাহার উত্তর দিবারও প্রয়োজন নাই।

বর্ষাকালে বাড়ীর ভীড় থাকে না, কাজেই এক কেবিনে জায়গা পাওয়া সহজেই ঘটয়া গেল। দিন তিন চার

চেউয়ের দোল খাইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন ভাবে, চতুর্থ দিনে তাহারা রেশ্মনে আসিয়া পৌছিল।

মধু-বাবুকে আগেই পত্র লিখিয়া হীরেন তাহাদের শুভাগমনের জ্ঞাত প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিল। দেখা গেল, তিনি জাহাজ-বাটেই অপেক্ষা করিতেছেন।

পোর্টলা-পু’টলি লইয়া প্রভা আসিয়া মধু-বাবুর বাড়ী উঠিল বটে, কিন্তু দুদিন যাইতে-না-যাইতেই তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। মধু-বাবু মব্যবিত্ত গৃহস্থ, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া রেশ্মন সহরে বাস করেন, সম্বল মাত্র ছ-শ’ টাকার চাকরী। কাজেই প্রচুর বাড়ীভাড়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া যে কার্টের খাঁচাটিতে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আলো এবং বাতাসের কোনো স্থান নাই। ভাড়া দেয় না বলিয়াই যেন তাহাদের প্রবেশ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। একপাল লোকের মধ্যে শিশু কল্লা সহ প্রভার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। এমন ভাবে থাকা তাহার কোনো-কালে অভ্যাস নাই। ছেলেমেয়েগুলির চীৎকার আর হুড়াহুড়িতে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। নিজেই মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে তান ধরিয়া, তাহার হুর্গতির বেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিল।

এত লোকের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত সাক্ষাতের কোনো উপায় ছিল না। খাইবার সময় ভিতরে আসিয়া হীরেন স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওকি, তোমার অসুখ করেছে নাকি?”

প্রভা বলিল, “না, কিন্তু দোহাই তোমার যেমন হোক, বাড়ী একটা শীগগির ঠিক কর। এখানে আর দু’দিন থাকলে আমি নিশ্চয় ক্ষেপে যাব।”

হীরেন বলিল, “তখনই বলেছিলাম এমন অব্যবস্থার মধ্যে এসো না। তা, কারো কথা শুনবার মেয়ে ত তুমি নও। বাড়ী এখন হুট কব্বেই কোথায় পাই?”

কিন্তু প্রভার মুখ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইতেছিল। আহা! সন্তোষ জীকে না বলিয়াই সে বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

বিকালবেলা আসিয়া মধু-বাবুর বড় মেয়েকে দিয়া প্রভাকে

বাহিরের ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইল। সে আসিলে বলিল,
“দেখ, বাড়ী একটা পাওয়া গেছে—নং ষ্ট্রীটে। তোমার
হবত পছন্দ হবে না, কিন্তু সম্প্রতি ত আর কোনো বাড়ী
খালি দেখছি না।”

প্রভা উৎসাহিত হইয়া বলিল, “যে কোনোরকম বাড়ীই
আমার এখন পছন্দ হবে। তার চারটে দেয়াল আর
একটা ছাদ আছে ত?”

হীরেন বলিল, “প্রথমে উৎসাহ দেখাতে তুমি কখনও
ক’র না, কিন্তু উৎসাহটা পাঁচ মিনিটের বেশী
না, এই বা ছুঃখ। একটু দেখে শুনে তারপর চল,
গিবেই যে বলবে ফের বাড়ী বদল কর, তা হ’বে না।
হুদিন বাদে কলেজ খুলবে, অত টো টো ক’রে
ঘুরবার সময় পাব কখন?”

প্রভা একটু দমিয়া গিয়া বলিল, “কেন বাড়ীর খুঁটটা
কি?”

হীরেন বলিল, “বাড়ীর খুঁৎ বিশেষ কিছু না, ভাড়ার
পক্ষে ভালই। দুটো ঘর বড়, আলো বাতাস আছে,
নতুন বাড়ী, ছারপোকা-আরগুনার আড্ডা নয়। কিন্তু
পাড়াপ্রতিবেশী ভাল না। পিছন দিকটা যত মুসলমান
আর মাস্তাজীর বাস, পাশে থাকে ফিরিঙ্গী। সেইটাই
নাকি সব-চেয়ে ভয়ানক। যে ঘরে আমরা যাব ভাবছি,
তাতে আগে এক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, এই ফিরিঙ্গীর
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ’য়ে উঠে পালাচ্ছেন। কালই তিনি
যাবেন সকালে, স্ততরাং ইচ্ছা করলে তুমিও কাল যেতে
পার। তবে এইটা বুঝে বেও।”

প্রভা একটু ভীত ভাবে বলিল, “সাহেবটা কি খুব
মাতাল?”

হীরেন হাসিয়া বলিল, “সাহেবও নয়, মাতালও নয়।”

প্রভা অবাক হইয়া বলিল, “তবে কি?”

হীরেন বলিল, “কালো মেম সাহেব। অতি উগ্রচণ্ডা।
ভয়ে কেউ তার সামনে এগোয় না।”

প্রভা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “ওমা, মেমোমামুস, তাকে
এত ভয়? তুমি বাড়ী নাও গো, আমি বেশ থাকতে
পারব। ঝগড়া ক’রে না পারি, ভাব ক’রে নেবো।”

হীরেন হাসিয়া বলিল, “সেই ভাল। ঐ ক’রেই ত

তোমরা নামে অধীন হ’য়েও, কার্যতঃ প্রভু হ’য়ে আছ।
আচ্ছা, তাহ’লে গোছগাছ ক’রে নাও, আমি সেই ভদ্র-
লোককে কথা দিয়ে আসি।”

পরদিন সকালে আহালাদি করিয়া সকলের কাছে
বিদায় লইয়া হীরেনরা নতুন বাসাব উদ্দেশে বাহির হইয়া
পড়িল। গাড়ীতে উঠিয়াই প্রভা বলিল, “বাঁচলাম
বাবা।”

হীরেন বলিল, “আগে বাড়ীতে তিন রাত্রি কাটাও;
তার পর বোঝা যাবে, বাঁচলে কি মরলে।”

বাড়ীতে ঢুকিয়াই, স্তূপাকার জিনিষ পত্র আর আসবাব
গোছাইতে প্রভা এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল, যে, পাড়া
প্রতিবেশী দেখিবার তাহার একটুও সময় হইল না।
সারাদিন অবিশ্রান্ত খাটিয়া রাত্রে সে কোনো মতে দুইটা
ভাত মুখে শুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন ঘুম ভাঙিল তাহার অনেক বেলায়। বেলাটা
আরো যথেষ্ট বেশী হইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একটা
চৌচামেচির শব্দে তাহার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। গলাটা
পুরুষালি ধরণের মেঘের। প্রথম কথাই সে শুনিল,
“How dare you? It is my money, not yours!”

তারপরই ঝন্ঝন্ করিয়া একটা চীনা মাটির বাসন
ভাঙিয়া পড়িল।

প্রভা তাড়াতাড়ি খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। খোলা
জান্না দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিল,
তাহাদেরও জান্না খোলা, কিন্তু একটা আধ-ময়লা ছিটের
পরদা ঘরটার আবর্জনা রক্ষা করিতেছে। ঘরের ভিতর যে
একটা ছড়াছড়ি দাপাদাপি চলিতেছে, তাহা বেশ বোঝা
গেল। প্রভা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের জান্নাটা সশব্দে
বন্ধ করিয়া দিল।

জান্না বন্ধ করার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া হীরেন বলিল,
“কি অত ঘটা ক’রে জান্না বন্ধ করছ কেন? রুটি স্নান
হয়েছে নাকি?”

প্রভা বলিল, “বর্ষণ নয়, গর্জ্জন।” তাহার স্বামীর
তখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না,
সে নিদ্রাভ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, “পাশের বাড়ীর বুঝি? দিলে
ভোরবেলা ঘুমটা ভাঙিয়ে।”

“আহা, কিবা ভোর, আটটা বেজে গেছে কোন্‌কালে।”
বলিয়া প্রভা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চায়ের জোগাড় করিতে
গু ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিতে গেল।

চাকরটা তাহার অনেককালের, তাহাকে বেশী কিছু
দেখাইয়া দিতে হইত না। কাজেই ভাঁড়ার বাহির করিয়া
দিয়া, চা খাইয়া এবং বাজারের পরসাদি দিয়া প্রভা অনেকখানি
নিশ্চিন্ত মনে সামনের ছোট বারান্দাটিতে আসিয়া
দাঁড়াইল।

বাড়ীখানার সামনে, রাস্তার ওপাশে একটি খুষ্টিয়ান
মিশনারী স্কুল। গাছের সারে তার সামনের দিকটা
অনেকটাই ঢাকা, বাড়ীখানা বিশেষ চোখে পড়ে না।
মেয়েদের খেলিবার মাঠটা অনেকখানি দেখা যায়। তখনও
স্কুল বসিতে অনেক দেবী, মেয়েরা আসিয়া জুটে নাই,
কেবল বোর্ডিংএর দুই চারিটি ছোট ছোট মেয়ে দোলনায়
ভলিয়া ও একটা কাঠের তক্তায় চড়িয়া খেলা করিতেছিল।
প্রভাদের বাড়ীর নীচের তলাটা সবটাই দোকান, মুসলমান
দোকানদার লুঙ্গি ও টুপি পরিয়া, বাহিরে একটা ভাঙা টুল
লইয়া বসিয়া আছে।

তাহার একপাশে দোতলায় একটি মাদ্রাজী পরিবার ও
তিনতলায় একটি মেম সাহেব থাকে বোঝা গেল।
মাদ্রাজীর বারান্দায় একপাল বোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছেলেমেয়ে
অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় মহা কলরব কবিয়া খেলা করিতেছিল।
মেমটি একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই ভিতরে
চলিয়া গেল।

প্রভা যতক্ষণ ইহাদের দেখিতেছিল, ততক্ষণ অল্প পাশের
বারান্দা হইতে ছইজোড়া চোখ তাহাকেও যে খুব ভাল
করিয়া দেখিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ
এধারে মুখ ফিরাইতেই সে দেখিতে পাইল, একটি বছর
চল্লিশ বয়সের জীলোক, কোমরে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া,
তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে। পরণে তাহার
মেয়ের পোষাক, রঙটা বেশ কালো, মুখ দেখিয়া বুঝিবার
যো নাই তিনি কোন্‌ জাতীয়া। দো-আঁশ্‌লা হওয়াই
সম্ভব, ব্রহ্মদেশের রক্ত যে তাহার শরীরে খানিকটা আছে,
তাহাও বোঝা যায়। চোখ দুইটা ছোট, মুখ দেখিলেই
বোঝা যায় প্রচণ্ড রাগী। ইনিই যে সেই অনামমথ্যা মহিলা,

তাহা বুঝিতে প্রভার দেহি হইল না। ফিরঙ্গী মহিলার
পিছন হইতে আর-একটি অল্পবয়স্ক মেয়েও প্রভাকে উঁকি
মারিয়া দেখিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হয়, সে
বয়োজ্যেষ্ঠাটিরই ছোট বোন। প্রভা তাহাদের দিকে
ফিরিতেই তাহারা গুৎগুৎতীর ভাবে ঘরের ভিতর চলিয়া
গেল।

প্রভা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হীরেন খাট ছাড়িয়া উঠিয়া,
চা খাইবার জোগাড় করিতেছে। জীকে দেখিয়া বলিল,
“এতক্ষণ অত মন দিয়ে কাকে দেখছিলে?”

প্রভা বলিল, “বীর গুণের সৌরভে মুগ্ধ হ’বে এখানে
এসেছি, তাঁকেই।”

হীরেন জিজ্ঞাসা করিল, “কি রকম? প্রথম দর্শনে
প্রেমে পড়া চলে?”

প্রভা বলিল, “আমি ত পড়িনি, তবে তুমি চেষ্টা করে
দেখতে পার।”

হীরেনের সেদিকে বিশেষ উৎসাহ আছে বলিয়া মনে
হইল না। সে চা-পানাস্তে, কাপড় জামা বদলাইয়া বাহির
হইয়া গেল।

মেথেকে সকালের খাওয়া খাওয়াইয়া প্রভা একটু
রান্নাবান্নার তদারক করিতে চলিল। রান্নাঘরের পিছনে
একটি বারান্দা, একটি ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়া তাহাতে
ওঠা যায়। প্রভা বাহির হইয়া দেখিল, বাড়ীটার মত গুণ
এই যে, পিছনে রেক্সনের বিখ্যাত কাঁচড়া গলি নাই। বাংলা
দেশ হইতে আসিয়া প্রথমেই এই আঁস্তাকুড়ের অত্যাচারে
প্রভা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। রেক্সনের সর্বত্রই প্রায়
দুই সার বাড়ীর মাঝখানে এই জাতীয় একটি গলি থাকে।
দুই পাশের বাড়ীর সব ক’টি তলা হইতে তাহার মধ্যে
সর্বজাতীয় ময়লা এবং আবর্জনা বর্ষিত হয়। ম্যুনিচপ্যা-
লিটির মেথর সকালে একবার তাহা পরিষ্কার করিয়া যায়,
কিন্তু পাঁচ মিনিট বাইতে-না-বাইতেই তাহা আবার উল্লুর
ছাই, উচ্ছিষ্ট ডাল, ভাত, তরকারী, ঘর ঝাঁট দেওয়া ধূলা,
বালি, কাগজের টুকরা এবং দুই সার বাড়ীর শিশুদের
বিঠায় ভরিয়া ওঠে। নীচের তলায় অধিকাংশ স্বলেই
ব্রহ্মদেশীয়রাই বাস করে, কারণ তাহারা সিঁড়ি ওঠা-নামা
করিতে একান্তই নারাজ। তাহাদের কিন্তু এই আবর্জনা

স্তূপেব মধ্যে বাস করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। প্রভা প্রায়ই দেখিত ঐ সুগন্ধে আয়োদিত গদিব ময়লাব রাসেব মধ্যে কোনো মতে একটুখানি স্থান কবিয়া লইয়া কোনো একটি বস্ত্রিনী লোহার উলুনে রান্না কবিতে বসিয়া গিয়াছে। উপর হইতে এপনি বে তাহার ডেক্চিতে অতি অকণ্য বকম ময়লা আসিয়া পড়িতে পারে, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই। দেখিয়া প্রভাব গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিত, ভাবিত, “তোমরা কেবল পালিশ ক’রে খোঁপা বাঁধতে, আর রং বেবঙের রেশমী লুঙ্গি পবতেই শিখেছ, কিন্তু আসলে এতবড় পেঙ্গীর জাত জগতে নেই।”

এ বাড়ীটিতে ময়লা ফেলিবার গলি নাই, দেখিয়া সে খুসিই হইল। পিছনে একটা উঠানেব মত জায়গা, সেখানে তিন চার নাব তারের উপর নানা রংএব এবং নানা ফ্যাশনেব কাপড শুকাইতেছে। প্রভা বুঝিল পাশেই কোথাও ধোপাব আচ্ছা আছে। উঠানের পরেই কতকগুলি কাঠের ঘর, তাহাতে বাড়ীওয়ালার দাবোয়ান চাকর প্রভৃতি থাকে, ছচার ঘব গবীবভাড়াটিয়াও থাকে। প্রভাব আগমন জানিতে বে এ পাড়াব কাহাবও বাকি নাই, তাহা সে বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিল। কাঠের ঘবের মোতলা হইতে একটি পশ্চিমী মুসলমান স্ত্রীলোক তাহাকে এক দৃষ্টে দেখিতেছিল। তাহাব কোলে একটি ক্ষুদ্র শিশু। স্ত্রীলোকটিব বয়স হইয়াছে, সামনের চুল কিছু কিছু পাকা। প্রভাও তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া, সে ভাবজমাইবাব ইচ্ছায় এক গাল হাসিয়া বলিল, “সেলাম, আশ্চা।” কি ভাবে তাহার সহিত আলাপ করিবে ভাবিতেছে এমন সময় ঘোরতর কালো রংএব একটি মাল্লাজী বালিকা, এক রকম ছিটকাইবাই ঘব হইতে বাহির হইয়া পড়িল। উঠানের মধ্যে পড়িয়া, পা আছড়াইয়া সে বেরকম তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল, তাহাতে বোঝা গেল ঘরের ভিতব একটা বিষমবকম বিপ্লব বাধিয়া থাকিবে।

হঠাৎ পাশেব বারান্দায সেই কালো মেমদাহেব আসিয়া দাড়াইল। চীৎকার কবিয়া বলিল, “এ মাল্লাজী শূয়ারকা জাত, ক্যা দিনবাত চিল্লা-চিল্লি কবতা? চুপ্ সে রহো।”

তাহার কণ্ঠস্বব শুনিবাই বালিকার অমন প্রবল আর্দানাদ একেবারে থামিয়া গেল। তাহাব মাও তাড়াতাড়ি বাহিব

হইয়া আসিয়া মেয়েকে হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। প্রভাব মেয়েও মায়ের পাশে আসিয়া দাড়াইবাছিল, তজনেব দিকে আগেব মত গম্ভীর ভাবে



হঠাৎ বারান্দায সেই কালো মেমদাহেব আসিয়া দাড়াইল

তাকাইয়া মেমদাহেব ঘরে চলিয়া গেল। প্রভা দেখিল, মহিলাটি গিণ্যা খ্যাতি অর্জন করেন নাই। গল্লাগালিব ওস্তাদী অন্ততঃ তাহার যথেষ্টই আছে।

সেদিন আর উগ্রচণ্ডার বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বেলা বারোটা-একটায় দরজা জানলা বন্ধ করিয়া তিনি গাড়ী চড়িয়া কোথায় যেন বাহির হইয়া গেলেন। রাতে প্রভাব ঘুমাইবার পব ফিরিয়া থাকিনে, কাবং, তাহাব আগমন-সংবাদ তাহারা জাগিয়া থাকিতে আব পাইল না।

পবদিনও দিনের বেলাটা একবকম কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় পাশেব বাড়ীতে আবার আসর জমিয়া উঠিল। কলহের

শব্দে ছুটিয়া আসিয়া প্রভা পবদার এ পাশ হইতে উকি মারিয়া দেখিল, মেমের শয়নকক্ষে রীতিমত মল্লবুদ্ধি বাড়িয়া গিয়াছে। একটি ছোকরা সাহেবের গলাব গলাবন্ধ মুঠি করিছা ধরিয়া মেমসাহেব তাহাকে অনববত চড়



ছোকরা সাহেবের গলাবন্ধ ধরিয়া চড় লাগাইতেছেন

লাগাইতেছেন, সাহেব কি যেন একটা বলিয়া প্রাণপণে তাহার কবল হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে সেও মেমের পিঠে দুই একটা কিল লাগাইতেছে কিন্তু বঁবরসে মাতিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্যও কবিতেন না। অল্পবয়স্ক মেয়েটি চুপ করিয়া অস্থির বনের জানলাব ধাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বাঙালীর মেয়ে প্রভার এ রকম দৃশ্য দেখা অভ্যাস ছিল না। পুরুষ মানুষে মাঝে মাঝে মার খায়, এই তাহার জানে। হঠাৎ এ রকম ব্যাপার দেখিয়া সাহেবটার জন্ত তাহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। জান্‌লা বন্ধ করিয়া সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বাবান্দায় পূর্ব দিনের দুই সেই মাদ্রাজী বালিকাটি দিয়া জমাইয়া বসিয়া আছে। ইহা যেন তাহার

বাপ-দাদার ঘর। তাহার বেশটি একটু নতুন ধরণের। মাথার চুল খুব টানিয়া বাঁধা, কিন্তু তাহার খোঁপাব উপর মস্তবড় এক লাশ রিবনের ফুল সেফটিপিন দিয়া আট্‌কানো। কানে লাশ পাথরের ফুল, হাতে পাঁচ ছয় গাছা করিয়া কালো কাঁচের চুড়ী, পায়ে রূপার মল। পরণে একটি বেগুনী রংএর ফ্রক, উহা তাহার গোড়ালী পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। পায়ে মলের উপরেই একজোড়া জুতা। অত্যন্ত পাকা গিল্লির মত মুখ করিয়া সে বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া প্রভার অত্যন্ত হাসি পাইল। সে কিন্তু প্রভাকে দেখিয়া দিয়া সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “আম্ম, আঙা মাংতা? হামরা মাকো পাশ বহৎ আঙা হায; রোজ ফজরমে হামরা বাবা একঠো খাতা, মা একঠো খাতা, হামকো আবাঠো দেতা, মগর, হামরা চাচা লোগকো একদম নেহি দেতা।”

প্রভা তাহার কথাব কিছু উত্তর দিবার আগেই বালিকার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চেহারাটা নিতান্ত মন্দ না। পরণে বিশাল লাশপাড়বৃত্ত হন্দে রংযেব শাড়ী, কানে দুই সার সোনার মাঝুড়ী, নাকেও দুই ধাবে দুইটা নাক-ফুল। বালিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া উঠাইয়া বলিল, “ছোকরী বহৎ বদ্‌মাস হায আম্মা, সব আদমী কো সাংখ আকে বাত্ করোগা, কোই কো নেহি ডব্‌তা।”

প্রভা বলিল, “উয়ো ঘরকো মেমকো ত বহৎ ডব্‌তা?”

মাদ্রাজী রমণীটি বলিল, “উয়ো মেম? উয়ো আদমী নেহি, শযতান হায আম্মা! মরদ লোককোডি পকড়কে আচ্ছা সে মাংতা।”

মাদ্রাজীণীর কাছে প্রভা শুনিল যে সাহেব ছোকরা। ঐ মেমের স্বামী। বসিবা বসিয়া জীর পয়দায় থায় বলিয়া চাটুণী স্বরূপ মারধোরও তাহাকে মাঝে মাঝে হজম করিতে হয়। ছোট মেয়েটি মেমের বোন। তিনিও ভগিনীর রূপা হইতে বঞ্চিত হননা! চাকর-বাকর কেহ ভয়ে এ বাড়ীতে আসেনা বলিয়া, সব কাজকর্ম ইহা বা নিজেবাই করেন। মেমসাহেব পোষাক শেলাই কবেন, তাহাতেই ইহাদেব সংসার চলে। সাহেবটি ফুর্টি করিয়া বেড়ায়,

এবং মাঝে মাঝে জীর প্রহার খায় ও তাঁহাকেও প্রহার করিবার চেষ্টা করে।

উগ্রচণ্ডার মেজাজ সেদিন বড়ই সপ্তমে চড়িয়াছিল, রাত্রেও তাঁহার কাংসকণ্ঠের চোটে প্রভাব ঘুম ভাঙিয়া গেল। মহিলাটি থাকেন দোতলায়, তিনতলায় এক গুজ-বাটী পরিবার বাস কবে, তাহাদের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। রাত্রে তাহারা একটু বেশী উৎসাহে খেলা করিতে-ছিল। হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল, Damned Madras swine! একদম শোনে নেহি শেক্তা! ক্যা উপর হুম্ হুম্ কব্তা?" সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবের শয়নকক্ষের জানলাটা হড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল, এবং অকথ্য ইংরেজী এবং রেঙুনী হিন্দিতে অনবরত গালাগালির স্রোত বহিষা চলিল।

প্রভা বলিল, "মাগো মা, উপরের মানুষগুলো কি? এসে ওব দাত ক'টা কিলিবে ভেঙে দিতে পারে না? এত মা বাপ তোলা গাল হজম করছে কি ক'রে? আমি যে বাঙালীর মেয়ে, আমারই রক্ত গরম হ'য়ে উঠছে। তোমার রাগ হচ্ছে না?"

হীরেন বলিল, "ওরা যদি দিব্য গাল হজম কবতে পারে ত ককক না? আমি ওদের হ'য়ে বাগ কবতে যাই কেন? আমি কেবল ভাবছি, যে, এই কালিন্দী মেম সাহেবটি ভাবতীয়মাত্রকেই মাল্লাজী ঠিক কবল কি ক'রে?"

প্রভা বলিল, "ওপরের গুজরাটীগুলির জুতার তলারও মেম দাঁড়াতে পারে না। হিংসেয় বোধ হয় জলে মরে তাই অত গাল দেয়। তা না হ'লে ছেলেপিলের ছড়া-হড়িতে মেয়ে-মানুষের মাথা ঘুম চ'ড়ে যায়, এতো কখনও দেখিনি। আমার নন্দিনীটিরও সাপ্তাহিক চীৎকারের রাত ত ঘনিষে এল, সেদিন বোব হয় মেম আমার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ কববে।"

হীরেন বলিল, "খুব ত সাহস দেখিয়ে এসে, এখন কেমন ক'বে আত্মবক্ষা কর দেখা যাবে। আমি কিন্তু মোটেই এগোবোনা, তা ব'লে রাখছি।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, এগিয়োনা। তুমি কি ভাবছ আমার সাহায্য কব্বাব লোক নেই? আমার আয়াকে সেই বাত্রে রেখে নেব এখন। সে গালাগালিতে মেম

সাহেবকেও হার মানাতে পারে। আব হাতাহাতি হয় যদি, ত আমি নিজেই পাবব। পশ্চিমে মানুষ হযেছি নাপু, কোনো কালো পেট্রীকে ডরাই না।"

হীরেন হাসিয়া বলিল, "দেখাই যাবে।" কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে রণরঙ্গিনীর সঙ্গে প্রভার যুদ্ধে ডাক পড়িল না। ত.হাব মেয়ে রাত্রে ষথাবীতি চীৎকার করিয়া গেল, এবং সারা রাত মা বাবাকে নাচাইয়া ফিরিয়া ভোবের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু এত গোলযোগের মধ্যেও পাশের বাড়ীর মেম সাহেব দিব্য ঘুমাইয়া রহিলেন। বেলা ন'টার ঘুম হইতে উঠিয়া প্রভা বলিল, "থাক্, মেম সাহেব মাল্লাজী না হ'লে গাল দেন না বোঝা গেল। কিন্তু গুজরাটীকে তিনি যখন মাল্লাজী ভাবেন, তখন বাঙালীকেও মাল্লাজী ভাবতে তাঁর বেশী কষ্ট পেতে হ'ত না।"

হীরেন বলিল, "ছোট ছেলেব কান্না ভেবে হয়ত কিছু বলেনি।"

প্রভা বলিল, "থাক্ না। ওব মধ্যে অতটুকু মনুষ্য আছে কিনা? সেদিন উপর তলার ছেলেদের গোলমালে গাল দিল না?"

হীরেন বলিল, "গোলমালে তার মা-বাবাও বেশ খানিকটা যোগ দিয়েছিলেন। আব গাল ত ও ছেলেদের দেয়নি, দিচ্ছিল তার মা-বাবাকেই। অথবা এও হ'তে পার, তিনি গত রাত্রে খুব বেশী খোঁশ মেজাজে ছিলেন।"

হঠাৎ রাস্তায় বিকট কোলাহল শুনিয়া স্বামী জী দু-জনেই ছুটিয়া বারান্দায় বাহিব হইয়া আসিল। দেখা গেল মেম সাহেবের মেজাজ রাত্রে যেমনই থাকিয়া থাক, সকাল বেলায় মোটেই প্রসন্ন নাই। গাড়ী চড়িয়া তবে তিনি কোথা হইতে ফিরিয়াছেন এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া গাড়ীওয়ালাকে তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির নমুনা দিতেছেন। গাড়ীওয়ালাকে চার আনা মাত্র পয়সা দেওয়ায় সে তাহা লইতে অস্বীকার করিতেছে, মেম তাহাকে বুঝাইতেছেন যে কুন্দীব গাড়ীকে তিনি ইহাব বেশী দিতে পারেন না। "চলা বাও ম্যান, চলা বাও। কুলী গাড়ীকো কেতনা মিলেগা? ক্যা ইবে তুমাবা মোটর গাড়ী হায়?"

ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান বিকট মুখভঙ্গী কবিয়া বলিল, "আবে বহৎ বড়া মেম হায়! মোটর মে তুম্ কভি চড়া মেম্?"

মেম সাহেব ঘরে ঢুকিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা খালি condensed milk এর টিন ঠন্ কবিয়া গাড়ীওয়ালার কামানো মাথার উপর আসিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ সমস্তবে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। গাড়োয়ান স্রুবিধা নষ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ীর উপর চড়িয়া বসিল এবং মেম সাহেবের উদ্দেশে অতি অশ্রাব্য গালিবর্ষণ করিতে করিতে গাড়ী হাঁবাইয়া দিল। “হাম্ অভিন্যাতা ধানামে বিপোর্ট কব্নে কো।” রাস্তার লোকে হাসিয়া বিদায় হইল।

প্রভা বলিল, “লক্ষ্মীছাড়ীকে চুলের মুঠি ধ’রে কেউ আচ্ছা করে ছ-বা দেয ত আমি তাকে বক্শিস্ দিই। সবাই এটাকে এত ভয় করে ব’লে এর আশ্পর্শ আয়ো বেড়ে বাচ্ছে আচ্ছ গাড়োয়ানকে মাঝে, কাল ভদ্রলোককে ঠ্যাঙাবে।”

হীরেন বলিল, “পুরুষ মানুষেব জাত কি বকম chivalrous দেখলে? টিন্ ছুঁড়ে মাঝেও ফিরে মারে না।”

প্রভা বলিল, “মুখে আগুন chivalryর। ওটা কি মেয়ে মানুষ নাকি? আব জন্মে ভারুক ছিল নিশ্চয়।”

মেমসাহেবের মেজাজ বড় অল্লই ওঠে-নামে দেখা গেল। চা খাইয়া, সাম্নেব ঘরে আসিতেই প্রভা শুনিতে পাইল তিনি বেশ মোদারেম গলায় আয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেবী রাত্রে এত কানাকাটি করিবাছে কেন? প্রভা ভাবিল, “একটু মেয়ে মানুষের প্রাণ ধড়ে আছে দেখছি।” আষা ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল মেমসাহেবের বেশ ভাল ওষুৎ জানা আছে বাচ্চাদের পেট-ব্যথার। দরকাব হইলে তাঁহার কাছ হইতে আনা যাইবে।

দিনেব পর দিন কাটিয়া চলিল। উগ্রচণ্ডার কল্যাণে মাঝে মাঝে বিনা পয়দাষ তামাসা দেখা যাইত বলিয়া প্রভাব দিনগুলো নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে কাটিত না। বাবান্দাষ চেযাব লইয়া বসিয়া সে ইহার কাণ্ড-কারখানা দেখিত। সাহেবটির বিশেষ কাজ কর্ম না থাকায়, তিনিও বেলাব ভাগ সময় বাবান্দাষ দাঁড়াইয়া আসেব-পাশেব লোক দেখিতেন; তাঁহার উৎপাতে প্রভাকে মাঝে মাঝে ঘরে চলিয়া আসিতে হইত। তবে জী ঘরে থাকিলে সাহেব

ভরসা করিয়া আর প্রতিবেশিনী দর্শনে বাহির হইতেন না। সাম্নেব ঘরে একটা গ্রামোফোন শোভা পাইত, তাহাতে বিলাতী হাল্কা নাচেব স্রব বাজাইয়া, মনের দুখে একলাই ঘরময় নাচিয়া ফিরিতেন। মেম সাহেব ইচ্ছা করিলেই নাচেব দোসর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাব সেরূপ কোনো ইচ্ছা দেখা যাইত না। পিছনেব ঘরে সেলাইঘের কল টানিয়া লইয়া বসিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-সহকারে শেলাই করিয়া বাইতেন, এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া স্বামীব নাচেব তাল ভঙ্গ কবিয়া দিতেন।

কত রকম-বে-রকমের মানুষই যে ইহাব কাছে পোষাকের অর্ডাব দিতে আসিত, তাহাও প্রভার এক দেখিবার জিনিষ ছিল। দুইটি অতিকায় মেমকে প্রায়ই দেখা যাইত। তাঁহাদের দোতলাব সিঁড়ি উঠিতেই লাগিত পুরা দশ মিনিট। তারপর মিনিট পাঁচ চেয়ারে বসিয়া তাঁহারা হাঁপাইতেন, অতঃপর আসিত কাজের কথা। অগ্র-মানুষে যেমনই কাপড়ের ফরমাইশ্ দিক, ইহার সর্বদাই খুব ডগ্‌ডগে রঙের পাতলা কাপড়ের পোষাকের ফরমাইশ্ দিতেন। তাহার ঘাঘরা হইত অতি ছোট, এবং উপরেও যে খুব বেশী কিছু থাকিত তাহা নহে। উগ্রচণ্ডা খুব গম্ভীরভাবে ইহাদের কথা শুনিয়া বাইতেন, সম্ভবতঃ ইহাবাই তাঁহাব সবচেয়ে বড় মানুষ বরিদাব, কাজেই খাতির না কবিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া বাইবার পর প্রায়ই ইহাব হাঁড়িমুখে একটু হাসি দেখা যাইত।

সেদিন সন্ধ্যাটা বর্ষাকালের পক্ষ বেশ একটু পরিষ্কার ছিল। এমন সময়টা বিফল হইতে না দিয়া প্রভা আব হীরেন বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের মেয়ে অনেক আগেই তাহাব চট্টগ্রামবাসী বাহনটির কাছে চড়িয়া ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছিল। বাড়ী আগলাইতে বহিল ক্ষেবল আয়া।

বেড়াইয়া এবং বাযোঙ্কোপ দেখিয়া প্রভারা বখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত প্রায় ন’টা। গাড়ীথানা বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই হীরেন বলিয়া উঠিল, “ওরে বাপুবে, বাড়ীব সাম্নে লোক ত মন্দ জমা হয়নি, ব্যাপার-খানা কি?”

প্রভা আতঙ্কিত হইয়া বলিল, “ওমা, আমার বাড়ীতে কিছু হবনি ত ? মেয়েটাকে রেখে গিয়েছি।”

হীরেন বলিল, “এখানে লোক জমা কব্বার জন্মে আমার মেয়েব ডাক পড়বে না। আমাদের গুণবতী প্রতিবেশিনীই রয়েছেন।”

প্রভা বলিল, “কিন্তু আয়াকে বারান্দায় দেখছি না যে ? সে ত রাত্তায় একটা কিছু শব্দ শুনলেই তখন ছুটে এসে হাজির হয়।”

বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়াইতেই তাহাদের মিথ্যা আশঙ্কাটা দূর হইয়া গেল। প্রভাব ঘরের নীচেই যে দোকান, তাহারই সামনে দাঁড়াইয়া দুই হাত কোমবে দিয়া মেমসাহেব এক বিচিত্র নাচ নাচিতেছেন, এবং তাঁহার মুখ হইতে হিন্দী, ইংবেঙ্গী এবং বর্ম্মীয় অনর্গল গালাগালি বাহির হইতেছে। তাঁহার সাহেব স্বামীটি সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বীরাসনা জীর সাহায্যে অগ্রসর হইবেন, না, সোজাশুষ্টি উপবে চম্পট দিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। আশে-পাশেব বত দোকানদার, কুদী, মজুব, রিক্শওয়ালা, সব ভিড় কবিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

প্রভা এবং হীরেন গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। বারান্দায় আসিয়া তাহাবা নীচের বীরসনাথক অভিনয়টির কারণ অনুসন্ধান করিতে দাঁড়াইল।

শোনা গেল মেমসাহেবের একটি ভাগ্নে প্রায়ই এ বাড়ীতে আসে যায়। সে নীচেব দোকান হইতে চার আনাব সোডাওয়াটার কিনিয়া খাইয়াছে এবং পয়সা দেয় নাই। দোকানওয়ালা পয়সা চাওবাতে বলিয়াছে যে, তাহার মাসী দিবে। মাসীমার কাছে পয়সা চাওয়ার তিনি স্বভাবোচিত মধুর ভাবে জানাইয়াছেন যে, জিনিষ যখন তিনি লন নাই, তখন পয়সা দিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না। দোকানওয়ালা দুই চাবি দিন ভাবাচাচা খাইয়া চুপ করিয়াছিল। আজ বিকালের দিকে মস্তবড় এক ট্রাঙ্ক লইয়া উগ্রচণ্ডা সম্ভবতঃ কাপড় কিনিতে বাজার বাইতেছিলেন। দোকানদারের হঠাৎ মনে হইল মেম বুঝি প্রস্থান করিতেছেন, তাহার চাব আনা পয়সা

জলেই গেল। ঝোঁকেব মাথায় সে বলিয়া বলিল, “এই গাড়োয়ান, গাড়ী রোকো। মেমসাহেব, হামরা পয়সা দে কে- যাও।”

ইহাতেই কুকণ্ঠেব বাবিয়া গেল। মেম বাজার বাওয়া সেদিনকার মত স্থগিত রাখিলেন। ট্রাঙ্ক নামাইলেন এবং নিজেও নামিয়া আসিলেন। তাঁহার রকম দেখিয়া দোকানদার ফুটপাথ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চুক্তিয়া পড়িল, এবং সেইখানে থাকিয়াই আত্মরক্ষার বিফল প্রয়াস করিতে লাগিল। প্রভারা যখন আসিয়া পৌছিল, তখন প্রায় নাটকের পঞ্চমাঙ্ক। মেম হাঁকিতেছেন, “এ কুক্কা বাচ্চা, হাম্ দিবা তুমারা মাল ? নিকল্ কে আও, তুমকো জুতীসে মাবেগা। আচ্ছাওয়ালা ঘর হোনে দে হাম্ ভিতব্ যাতা, মগব্ কুলীকো ঘবমে হম্ নেহি যানে শেক্তা।”

দোকানদার ভিতর হইতে বলিল, “বেটা বোলতা মা পয়সা দেগা, মা বোলতা বেটা পয়সা দেগা, এ কায়সা ? ওর কোন্ শালা তুমলোগ্কে মাল বিক্রী কবেগা।”

সাহেবের আত্মাভিমান আঘাত লাগিল, তিনি গম্ভীর করিয়া বলিলেন, “দেখো, শালা শালা মৎ বোলো।”

দোকানদার তাহার ত্রায়দন্ত অমুরোধ রক্ষা করিল না। আরো দু-চারবাব তাহার মুখ হইতে উক্ত বাক্যটি শোনা গেল। সাহেব কোট খুলিয়া সিঁড়িতে রাখিলেন, গলাবন্ধটাও ত্যাগ করিলেন। শার্টের আন্তর ‘ওটাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আও ম্যান্, বাহব্ আও।”

দোকানদার ত তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলই না, তাহার পত্নীও স্বামীব এই আকস্মিক প্রীতির পরিচয়ে মোটেই খুসি হইলেন না। একগাই আত্মরক্ষাব সমর্থ নন এমন ইন্দ্রিতেই তিনি চটিয়া গেলেন। স্বামীকে এক ঠেলা দিয়া বলিলেন, “You need n't butt in. I have got my shoe for him. Get away !” সাহেব বেচারী সরিয়া গিয়া আবার কোট পরিতে এবং গলাবন্ধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

মেমসাহেবের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণেও হিন্দুস্থানী-নন্দন যখন বাহিরে আসিল না, তখন তিনি তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষকে অকথ্য গালি দিতে দিতে উপবে উঠিয়া গেলেন এবং বাবান্দায় দাঁড়াইয়া রাত্তার লোককেও অভিনন্দন কবিতেন।

আরম্ভ করিলেন। নীচেব ভীড়ের মধ্যে খুব অবাধে হাসি টিট্কারি চলিতেছে দেখিয়া সাহেব একবার জীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্ত হাত ধবিয়া একটান দিল, কিন্তু প্রবল এক গুঁতা ধাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

প্রভা বলিল, “আয়াটা গেল কোথায়? খুকী ত দিব্যি শুয়ে ঘুমচ্ছে।”

চাকরের কাছে পৌঁজ লইয়া জানা গেল, নীচের তলাব মাল্লাজী জীলোকটির হঠাৎ কি অসুখ হওয়ায় তাহার মেয়েটা আসিয়া আয়াকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। সে তখন হইতে আর উপরে আসে নাই। চাকরকে বলিয়া গিয়াছিল, খুকী কান্নাকাটি করিলে তাহাকে যেন ডাকিয়া আনে। খুকী নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া চাকরও আর তাহাকে ডাকিতে যায় নাই।

প্রভা বলিল, “যা গিয়ে ডেকে আন। দিব্যি বসে আড্ডা দিচ্ছে আর কি?”

চাকর নীচে চলিয়া গেল আয়াকে ডাকিতে। একটু পরে আয়া তাহার সহিত উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভা শুনিয়া মাল্লাজী জীলোকটির হঠাৎ প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ধবে তাহার জীলোক আর কেহই নাই। অগত্যা সে আয়ার শবণাপন্ন হইয়াছে। গৃহিণীকে বহুৎ সেলাম জানাইয়া সে অল্পরোধ করিতেছে যেন আয়াকে আঁজ রাতটা তাহার কাছে থাকিতে দেওয়া হয়। প্রভা আর বিরক্তি মাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি আয়াকে নীচে পাঠাইয়া দিল। বাত্রের দুই একবার সে নীচের তলার কাত্তরানির শব্দে জাগিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া দেখিল আয়া কখন আসিয়া প্লানাদি করিয়া কাছে জাগিয়া গিয়াছে। প্রভা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওর বাচ্চা হ’লে গেছে? কি বাচ্চা হ’ল? ছেলে না মেয়ে?”

আয়া বলিল, মেয়েই হইয়াছে। তাহাব গলার স্বরে ভয়ানক একটা নিরুৎসাহ প্রকাশ পাইল। প্রভা ভাবিল, ছেলে না হইয়া মেয়ে হইয়াছে, তাই বুঝি এত দুঃখ। সে বলিল, “ছেলেও যা মেয়েও তা। মেয়ে হ’লে কি আর হয়েছে?”

আয়া বলিল, স্নহ সবল মেয়ে হইলে ত কথাই ছিল

না। কিন্তু এ মেয়ে হইয়াছে কুৎসিৎ বিকলাঙ্গ, এ বাঁচিয়া থাকিলে মা বাপের অশেষ দুঃখের কারণ হইবে।

প্রভা দুঃখিত হইয়া বলিল, “ওমা, তাই নাকি? আমি আবার মেয়ে দেখতে যাব ভাবছিলাম।”

আয়া বলিল, “যেখানে মা, ওর মা লজ্জা পাবে, এমন মেয়ে হওয়া মায়েরই লজ্জা। কেউ দেখতে গেলে বড় কান্নাকাটি করবে। তার খুব অব এসেছে, এখন চুপ চাপ থাকাই ভাল।”

প্রভা জিজ্ঞাসা করিয়া, শিশুটি কি রকম বিকলাঙ্গ? আয়া বলিল, তাহাব ঠোঁট কাটা, এবং একটা পা বাঁকা। জন্ম গ্রহণ করিতে সে মাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছে। মেয়ের বাবা এমন সন্তান হওয়াতে রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, জীলোকটিকে দেখিবার কেহ নাই।

প্রভা বলিল, “কি সর্বনাশ! মানুষ এমন শযতানও হয়? এই নে দুটো টাকা, মেয়ে মানুষটাকে দুধটুধ কিনে দিয়ে আয়। তার কাছে এখন কে আছে?”

আয়া বলিল যে, উপর তলার মুসলমানী এখন আছে, সে এখনও খানিকক্ষণ থাকিতে পারিবে, দুপূবে আয়া যাইবে। ততক্ষণে আশা করা যায়, জীলোকটির গুণঘর স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। আয়া টাকা লইয়া ‘দুধ ইত্যাদি কিনিতে চলিয়া গেল।

প্রভা শবনকক্ষে ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় মেম-সাহেবের গলা শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কাহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মাল্লাজী আওরতেব কি বাচ্চা হইয়াছে। উপর তলার সেই মুসলমান মেয়েটি তাহার কথাব উত্তর দিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতবে চলিয়া গেল। মেমসাহেবের কোতুল তখনও চরিতার্থ হয় নাই বোঝা গেল, কারণ তিনি সব বিষয় বিশদভাবে জানিবার জন্তই বোধ হয় পিছনের লোহার সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রভা খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া বহিল। নীচের তলায় অকস্মাৎ ভয়ানক চোঁচামেচি হ্রস্ব হইয়া গেল। হিন্দি, ইংবেজী এবং তামিল ভাষার ঝড়ের মধ্যে সে বুঝিযাই উঠিতে পারিল না যে, ব্যাপার কি হইতেছে। কিন্তু মেম সাহেবের গলা চাপা পড়িবার নয়, তাহার মিহিহ্রবের

“[Adrasī swine! শূবারকা বাচ্চা।” সকল গোল-
মালের উপবেই শোনা যাইতে লাগিল। ফটাফটু কয়েকটা
চড়ের শব্দও শোনা গেল, প্রভা যদিও বুঝিল না কে
কাহাকে ঠ্যাঙাইতেছে। তবে মেম উপস্থিত থাকিতে
মারা এবং গাল দেওয়ার কাজে আর কেহই অগ্রসব হইবে
না, এটা সে ধরিয়াই লইল।

খানিকক্ষণ পরে উগ্রচণ্ডা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে
উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার কালো মুখ একেবারে লাল হইয়া
উঠিয়াছে। প্রভার আয়াও এক রকম তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই
ফিরিল। প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, “নীচের তলার অত গালা-
গালি মারামারি ক’বছিল কা’বা?”

আয়া বলিল, যে, মাদ্রাজী পুকুরটা খুব একচোট মদ
খাইবা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এমন বিকলাঙ্গ সন্তান
প্রসব কবার জন্ত জীকে গালি দিতেছিল এবং মারিতে
বাইতেছিল। তাহাব মেয়ে কাড়িয়া লইবা নদীতে ফেলিয়া
দিবে বলিবা ভয় দেখাইতেছিল। আয়া এবং ঐ ঘরের
মুদলমান জীশোক দুইজন তাহাকে গালি দিতেছিল,
মাদ্রাজীব বড় মেয়ে এবং জী কান্না জুড়িয়াছিল। এমন সময়
মেমসাহেব গিয়া রঙ্গমঞ্চে হাজির হন। ব্যাপার শুনিয়া
তিনি মাদ্রাজীটাকে খুব কুৎসিৎ ভাবে গালি দেন। সে
মাতাল হইয়া ভয়ডব ভুলিবা গিবাছিল, সেও তাহাকে
একটা অতি বিস্তীর্ণ গাল দেয়। ইহাতে তিনি তাহাকে
আচ্ছা করিয়া চড় মারিয়া এবং পায়ের জুতা খুলিয়া পৃষ্ঠে
তাহার বাড়ি এক ঘা দিয়া উপরে চলিবা আসিয়াছেন।

প্রভা বলিল, “বেশ হয়েছে! এমন মানুষের কাছে
মেমসাহেবের মত মানুষেরই যাওয়া ভাল। মেয়েমানুষটা
কেমন আছে?”

আয়া বলিল যে, প্রকৃতি সম্প্রতি ভালই আছে। কিন্তু
মেয়ের কোনো কাপড়-চোপড় নাই, জীশোকটিও গুধু
মাছের পাতিয়া পড়িয়া আছে। তাহাব স্বামীও মেয়ে
মার খাইবা পলায়ন করিবাছে, আবার কখন এ মুখে
হইবে তাহা বলি কঠিন। আশ্রাব কাছে যদি বেবী-বোঁড়া
জামাটামা থাকে তাহা হইলে তিনি যেন কয়েকটা ঐ
গবীবের বাচ্চাদের জন্ত দেন।

প্রভা জামা খুঁজিবার উদ্দেশ্যে ঘবে ঢুকিতে বাইতেছে,
এমন সময় দেখা গেল মেমসাহেব আবার পিছনের সিঁড়ি
দিয়া নীচে নাগিতেছেন। তাঁহার হাতে একটা মোটা
বিলাতী কলম এবং ভারি একটা স্মাটকেস। আয়া
কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি নীচে
নামিয়া গেল। প্রভার কাজ ছিল, সে ঘরের ভিতর
চলিবা গেল।

কয়েক মিনিট পরেই আয়া একেবারে উঠিতে পড়িতে
ঘবেব ভিতর আসিবা ঢুকিল। মেমসাহেব নাকি একেবারে
সবাইকে তাক লাগাইয়া দিবাছেন। মাদ্রাজী স্ট্রীপোক-
টাকে একখানা কলম দিয়াছেন, তাহার দাম কম হইলেও
কুড়ি পঁচিশ টাকা। আব ঐ বাচ্চাটাকে এক নক্সা ভর্তি
জামা, টুপি, মোজা, কত কি দিয়া আসিয়াছেন। দেঙলি
অতি স্নন্দর দেখিতে, কতক রেশমেব, কতক হস্তী এবং
গবম কাপড়ের, সব মেয়েব নিজের হাতের শেলাই,
তাহাতে তিনি কতবকম ফুল, লতা পাতা নক্সা
উঠাইয়াছেন। ঐ রকম শিশুর সঙ্গে এ সব পোষাক
একেবারেই মানাইবে না, এই যা দুঃখ!

প্রভা অবাক হইয়া বলিল, “ওমা, চার আন পয়দার
জন্তে যে মানুষের মাংসার টিন ছুঁড়ে মাবে, তার হঠাৎ এমন
মতি হ’ল যে? আমি ওটার সঙ্গে কথা বলি না তা না
হ’লে জিগ্গেব ক’বতাম।”

আয়া বলিল, কোনো ভাবনা নাই, সে মেমসাহেব বাহিরে
গেলেই তাহার ছোট বোনের কাছ হইতে সব খবর জোগাড়
করিয়া আনিবে।

সৌভাগ্যক্রমে সে সন্ধ্যোগ শীঘ্রই মিলিয়া গেল, খাওয়া-
দাওয়া সারিয়া অল্প দিনের আগেই মেমসাহেব বাবু লইয়া
বাজার করিতে চলিবা গেলেন। তাহার বোন বারান্দায়
দাঁড়াইবা বোনের যাত্রা দেখিতে লাগিল। আয়া তৎক্ষণাৎ
হাতের কাজ ফেলিবা তাহার সহিত গল্প জমাইতে বলিল।
প্রভাবও ব্যাপারটা জানিতে একটু কৌতূহল ছিল, সেও
আবার কাছে আসিবা দাঁড়াইল।

ঐ কাপড়গুলি কাহার জিজ্ঞাসা করাতে ছোট মেমসাহেব
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবা ইংবেজীতে বলিল, “আমার
বোনের মেয়ের।”

প্রভা চুপ করিয়া বলিল, “আহা, মেয়েটি নেই বুঝি?”

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না।” এ বিষয়ে তাহার কথা বলিতে হব ত কষ্ট হইতেছে মনে কবিয়া প্রভা ঘরে চলিয়া গেল।

আয়ার অতটা ভদ্রতা জ্ঞান ছিল না, সে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াই চলিল। উগ্রচণ্ডার অনেক কথাই সেদিন সে শুনিয়া আসিল। অল্প বয়সে ইহাব এক মাতাল মাদ্রাজী সাহেবের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাহার টাকা ছিল অনেক, কিন্তু মদ খাইয়া সে প্রায় সবই উড়াইয়া দিয়াছিল। মেমের ববস তখন অল্প, এতখানি মেজাজও হয় নাই, স্বামীকে সে ভয় করিয়াই চলিত, তাহার প্রহাবও মুখ বুজিয়া সহ্য করিত।

বিবাহের তিন চাব বৎসর পবে ইহার একটি সন্তান হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে জন্মিল বিকলাঙ্গ হইয়া। সাহেব ত রাগে প্রায় পগল হইয়া উঠিল, এবং বাগটা ঝাড়িল সবই জীব উপর। শিশুর উপর ঝাড়িতেও তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু জী মাঝে পড়িয়া সব রাগটা নিজের গায়ে টানিয়া লইত, কাজেই ছোট মেয়েটা বাঁচিয়া যাইত। এই কল্প বিকলাঙ্গ শিশুকে কেহই দেখিতে পারিত না, ভালবাসিত না, তাই সে যেন মায়ের বড় একান্ত আপনার ধন হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাঙ্গীর মত হিংস্র স্নেহে সে সন্তানকে আগুলাইয়া থাকিত, কাহাকেও মেয়েকে দেখিতে শুদ্ধ দিত না। স্বামী বাড়ী হইতে বাহির হইলেই সে মেমের জন্ত শেলাই করিতে বসিত। সেলাইঘে হাত ছিল তাহার অসাধারণ। পাড়ায় এত সুন্দর পোষাক আব কোনো শিশুর ছিল না। কিন্তু হায, এমন অসাধারণ কুৎসিৎ আব কোনো শিশু ছিল না। মেয়েকে সাজাইয়া-গুজাইয়া সে ঘরের ভিতবই লইয়া ফিরিত, কখনও কাহারও সামনে বাহির করিত না। কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যে এই সামান্য সুখটুকুও সহিল না। অতিবিক্ত মদ খাইয়া আসিয়া সাহেব একদিন কন্ডাকে খাট হইতে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। দুর্ভাগ্য

শিশু এ আঘাত সামলাইতে পারিল না, তাহার জীবন-দীপ সেইখানেই নিভিয়া গেল।

উগ্রচণ্ডার জ্ঞান হইল পবদিন থানার এক ঘরে। সে না কি স্বামীকে কাঠ কাটিবার দা দিয়া এমন এক ঘা লাগাইয়াছে যে, তাহার এখন জীবন সংশয়, সে হাসপাতালে আছে। বিচারে অবশ্য সে খালাস পাইল, কিন্তু স্বামীর ঘর আর তাহাকে কবিত হইল না। যে আইনের বন্ধনে সে বাঁধা ছিল, সে আইনই তাহাকে স্বামীব কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

খাওয়া পরাব ভাবনা তাহার হইল না, সেলাই করিয়া সে বেশ উপার্জন করিতে লাগিল। কিন্তু স্বভাব তাহার একেবারে বদলাইয়া গেল। মানুষ জাতটাকেই সে যেন কাটিয়া-কুটিয়া শেষ করিতে পারিলে বাচে। পুরুষ মানুষ দেখিলে তাহার হাড় আঁলা কবিত, সুস্থ সুন্দর শিশু দেখিলে সে ঘুণায় মুখ ফিরাইত। তাহার মুখও যেমন খুলিল, হাতও তেমনি চলিল।

অথচ এমন মানুষের মন, যে, মানুষকে এত ঘৃণা করা সত্ত্বেও সে নিঃসঙ্গ থাকিতে পারিল না। বসিয়া খাইবার লোভে এই সাহেব ছোকরা তাহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং অত্যাচার খাদ্যের সঙ্গে মারও দিয়া খাইয়া চলিয়াছে। ছোট বোনেরও থাকিবার জায়গা নাই, তাই সেও এখানে পড়িয়া মার হজম কবে।

এমন সময় বড় মেমসাহেব বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বোনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চীৎকার কবিয়া বলিলেন, “What are you staring at like an owl?” সে বেচারী তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর পলাইয়া গেল।

প্রভা ভাবিল, বাহিরটি ত কালো পাথরের পাহাড়, কিন্তু আজ ইহার অন্তরের স্নেহনির্ঝরিণীব সন্ধান পাওয়া গেল। কত কালের হারানো মেমের স্মৃতি আজও তাহাকে মাঝে মাঝে নারীর আসনেই টানিয়া আনে। ইহাব পর হইতে উগ্রচণ্ডাকে গাল দেওয়া সে ছাড়িয়াই দিল।

কবিতা পাঠ্য



শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি—মাতার কর্তব্য

শিশুর স্তন্যপোষণ করা, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ণয় করা, তাহার পীড়া হইলে অর্থব্যয় করা যেমন পিতার বৃহৎ কর্তব্য, তেমনি তাহার শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাহার স্বভাব-চরিত্র গঠিত করিয়া তোলা, তাহার স্বাস্থ্য উন্নত করা, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, মাতার বৃহৎ কর্তব্য। অনেক সময় বালিকা জননী, অর্থাৎ চৌদ্দ পনের বোল বৎসরের বালিকা, রাত্রি জাগিতে বিবস্ত্র হইয়া অব্রূণ শিশুকে অর্থাৎ মাত্র ২৩ মাসের শিশুকেও গালি দিয়া থাকে, আর অব্রূণ শিশু ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া কাদিতে থাকে। ইহাতে শিশুচিন্তে ভীততা হ্রাস, ফলে সে শিশু বড় হইয়াও ভীত হইবেই, অনেক সময় শিশুর প্রতি রাগ করিয়া বালিকা জননী তাহাকে ২৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কাদাইতে থাকেন, ইহাতে শিশুর ভীতি ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগে, কাদানে স্বভাব ধবিয়া যায়, ফলে সে বদ-সেজাজী হব।

শিশুর স্বভাব ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা—

১। শিশুকে সর্বদা ঈশ্বরভক্তি শিখাইতে হইবে, কারণ পুণ্যের প্রতি আকর্ষণই সংপথে রাখিবার প্রধান সহায়।

২। শিশুকে কখনো নিবাশার বাপী শুনাইবে না; কারণ তাহাতে শিশু-হৃদয় নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, উদ্যম নষ্ট হয়।

৩। কখনো ভয়ের কাহিনী শুনাইবে না, তাহাতে শিশুর মাহস জন্মিতে পারে না, কারণ হৃদয় তাহাতে দমিয়া যায়, দুর্বলতার হুষ্টি করে। সব সময় বকুনীতেও শিশু-হৃদয় দমিয়া যায়।

৪। তাহাকে ঠাকি দিয়া ঠাকি শিখাইবে না, তাহাতে সে ঠাকি শিখিয়া রাখিবে।

৫। তাহাকে বাজে কথা বা বাজে গল্প অর্থাৎ বাহাতে সার নাই, শুনাইবে না, তাহাতে বুদ্ধি হান্ধা হইয়া যায়।

৬। শিশুকে ভ্রমেও পয়সা চিনাইবে না। অল্পবয়সে টাকা পরসার আসক্তি কুপথে চানিয়া লইয়া যাইতে পাবে, কারণ অল্পবয়সে সংযম শিক্ষা হয় না, আরো এই যে, টাকা পরসার চেনাব সঙ্গে সঙ্গে জগতেব অনেক কিছুই শিখিতে বৃত্তিতে পাবে।

৭। শিশুর সম্মুখে যা তা বলিবে না। এটুকু জানিবে—শিশু অবিশ্বাস কবিত্তে জানে না, সে বাহা শুনিবে, তাহাই বিশ্বাস করিবে এবং সেই বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহার চিত্র গঠিত হইবে। সাংসারিক কথাবার্তা বালক-বালিকার সম্মুখে না বলাই শ্রেয়।

৮। শিশুকে এটা কবিও না, ওটা কবিও না, প্রতি পদে এমনি নিষেধের জোরে বাঁধিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বকে নষ্ট কবিবে না। এইভাবে যে শিশুকে দমাইয়া দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে দরকার হইলেও সে মন্ডা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। হৃদয়ে শক্তি না থাকিলে ভবিষ্যতে সে স্তায়-অস্তায় বৃত্তিও চলিতে পাবিবে না। মন্দের সহিত বৃত্তি চলিতে হৃদয়-বলের অভ্যুত্থান প্রয়োজন। শিশুকালে হৃদয়-বল নষ্ট হইলে সে-বল আঁব ভাগে না।

৯। শিশুর অক্ষমতা বাহাতে বাধা না পায় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১০। শিশু বাহাতে কুসঙ্গে না পড়ে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১১। মনকে যুগা করিতে ও ভালকে ভালবাসিতে শিশুকালে হইতেই শিক্ষা দিতে হইবে। মিথ্যা কথা বলা মন্দ; ইহা বলিলেই মিথ্যা কথা কি শিশু বুঝিবে না, শুধু বুঝিবে মিথ্যা বহা মন্দ। কিন্তু ইহাও বোধ হয় ভাল যে, মন্দ বলিয়া কিছু আছে ইহা একেবারে জানিতে না দেওয়া।

১২। শিশুকে কখনো পাগল বোকা বজ্জাত বলিয়া গালি দিবে না। তাহাতে উহার ধারণা হইবে যে, সে ঐ রকমই একটা কিছু।

১৩। মাতা শিশুর সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া সাহিত্যের গুণাবলী ও উপকারিতা করিয়া তাহাকে সাহিত্যমুরাঙ্গী কবিয়া তুলিবে।

শিশুকে গল্প বলিবে, পরে সেই গল্প তাহাকে অল্প সময় বসিতে বলিবে এবং লিখিয়া দিতে বলিবে। ইহাতে তাহার গল্প লিখিবার শক্তি জন্মিবে, বা রচনা-শক্তি জন্মিবে। শিশুকে শাসন কবিলে বাক্যের দ্বারা, মাঝিবা নয়। মার শাইলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। শৈশব হইতে ছাত্র অন্তায় বৃদ্ধাইয়া, হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, বাক্যের দ্বারা, গল্পের দ্বারা, কথায় কথায় এমন ভাবে শিক্ষা দিবে যে, তাহার কর্ণ দৃষ্টি হৃদয় আকর্ষণ করে। এইসব কথার মূলে ভবিষ্যতের উচ্চ আশা এমন ভাবে ফুটিয়া উঠা চাই যে, সেই আশার আকর্ষণে শিশু-হৃদয় আকৃষ্ট হইবে।

শিশুকে যখন মারিতে উদ্যত হওয়া যায়, তখনই সে যে'ভর পাখ, সে ভব সহজ নয়। তাহাব উপর যখন গ্রহাব পড়িতে থাকে, তখন তার অন্তঃকরণের অবস্থা জানিতে পারিলে হাতের লাঠি থামি পড়িবে। এই দাবণ ভয়ে শিশু হৃদয়-বল হারাইতে থাকে এবং হৃদয় পাইয়া তাহাব হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হয়, কিন্তু লাভ ততখানি হয় না।

শিশু বাহাব নিকট মার ধার, স্বভাবতঃ তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে, এবং অপবাদের গুরুত্ব না বুঝিয়া মার খাইলে বা অল্প অপরাধে অধিক শাস্তি পাইলে, তাহার চিন্তেব একপ অবস্থা হওয়াব আবেগ অধিক সম্ভাবনা। এজন্য শিশু পিতামাতার নিকট অধিক মার খাইলে পিতামাতাব প্রতিও ভক্তিহীন হইতে পারে; এমনও হইতে পারে যে, পরে বৃত্তিতে পারিলেও সে-ভক্তি আর ঘিরিয়া আসে না। অবশ্য গুরুতর অপরাধ কবিলে শিশুকে মারিতে হইবে, কিন্তু অধিক নয়। যে শিশুর অল্প শাসন হয় সে অল্পেই শুধু রাইতে পারে, কিন্তু বাহাকে অধিক শাসন করা হয় সে শাসনকে ভয় করে না। সেটা তার অভ্যাসেব ভিত্তি দাঁড়াইয়া যায়। আর ছুট শিশুকে মারিয়া শুধু বাইতে চাহিলে সে আরো মন্দ হয়, পিতামাতাকে ঠাকি দিয়া চলিতে শিখে। ভালবাসায তাহার চিত্তবৃত্তি কোমল করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা ভাল। পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন হইলে তাহার পতনের সম্ভাবনা, কারণ পিতামাতাব আকর্ষণ সম্ভানকে হৃদেব বাহির হইতে বাধা দেয়।

পুত্র ও কস্তাকে ভিন্ন চক্ষে দেখিবেন না। মনে রাখিবেন কস্তাই একদিন পুত্র্য ও নাবীর জননী হইবে।

পিতামাতা মনে করিবেন না যে, শিশু কেবল তাঁহাদের জন্ত জন্মিয়াছে। সে বিশ্বপতি—দেহের, সমাজের, জাতির। তাহার উপর পৃথিবীর অনেক বিষয়ই নির্ভর করে।

(মানসী ও মর্শ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৩৪) মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা

ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি

ধোবাসান—নিশাপুর

পারস্তের ইতিহাসে ধোবাসান ও তাহাব রাজধানী নিশাপুর পারস্তের নখাবুগে ও পরেও দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের জ্ঞান-সম্বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধোবাসান পারস্তের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

ধোবাসানের উত্তর দিকে রাজধানী নিশাপুর। নিশাপুর পারস্তের মধ্যে অতি প্রাচীন নগর। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিষমবিশাখ।

অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভালোকে ধোবাসান ও তাহাব রাজধানী নিশাপুর আলোকিত হইয়াছিল। পারস্তের প্রথম ও দ্বিতীয় কবি পদপদব বখাক্রমে কার্দোসী ও আনওয়ারী, ফের্দোসী-সাহিত্যগুরু কবি আনাদী, হুকাইকবি কবিরুদ্দিন আস্তর, কবি নিজামই আশিরী, কবি-সাহিত্যিক নিজামী আফজি, কবি রাফি ই নিশাপুরী, জ্যোতির্বিদ হকিম-ই-মওসিলি, কবি-জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম, দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক হাবান, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হাসান ইশাক, দার্শনিক আবু ইমাম গাজালি, চিকিৎসক মুহম্মদ দখিম, খাজাইমাম প্রভৃতি অসংখ্য সনাতী জন্মগ্রহণ করিয়া ধোবাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুরকে চিরসৌন্দর্য্যবান করিয়া “প্রতিভার স্তম্ভিকাণ্ড” বাক্যের সার্বকথা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

নানাবিধযিনী বিদ্যাভূমিলনের কেন্দ্রস্থান রূপে বেমন নিশাপুর এসিক ছিল, তেমনি শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে হুপ্রসিদ্ধ ছিল। তুলা, পশম অপব্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। পশম-নির্মিত নরনমনবিশোহন সূক্ষ্ম বস্ত্র জগতেব নানা দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতে সর্ব্ব হইয়াছিল।

রাষ্ট্রনৈতিক জগতেও নিশাপুর যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আরবীয় গণিতজ্যোতিষতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেলজুক বংশীয় রাজধানী নিশাপুরে আসিয়া উপনীত হওয়ায় নিশাপুর বিদ্যাপীঠরূপে পরিগণিত হয়।

(বীশরী, আষাঢ় ১৩৪৪)

শ্রীমুবেশচন্দ্র নন্দী

পুরুষসিংহ

রাজা মরিলেন। কিন্তু সবিবার পূর্বে রাজকুমারের হাতে সাতটি মহলের সাতটি চাবিকাঠি দিয়া গেলেন। আদেশ রহিল এই যে, ছয়টি মহল খুলিয়া বাহা কিছু দেখিবে, বাহা কিছু পাইবে, সকলই তোমার। কিন্তু সপ্তম মহলের প্রান্তদেশে যে ছোট কুঠরীটি আছে তাহা কদাপি খুলিও না।

রাজকুমার কাহাবও নিষেধ না শুনিয়া একদিন সপ্তম কুঠরী

কলুপে চাবি পবাইলেন। বহুদিনের পুরাতন দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল।

রাজকুমার তন্ময় হইলেন। এ কি স্বপ্নমাত্র? কখনো না। এই ত সেই। সেই কে? চিরদিন বাহাকে চাহিয়াছি। কেমন কবিয়া পাওয়া যায়? খুজিয়া বাহির কবিব। স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকুক, উহাকে চাই-ই চাই। বাজকুমার বাহির হইলেন। বাজকুমার কস্তার সন্ধানে বাহির হইলেন। বাজকুমার যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহাব সঙ্কিত গতির বেগে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ততই ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

তারপরে পাতাল ভেদ কবিয়া মায়াপুরী সন্ধান, কক্ষের পব কক্ষ অতিক্রম কবিয়া পালকের উপর সেই সুবৃক্ষ কস্তার দীর্ঘনাল। কিন্তু কস্তাকে একেবারে আয়ত্ত কবিত্তে হইলে রাক্ষসেব কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার কবিত্তে হয়।

বাংলার বৌদন আজ ঐ সপ্তম কুঠরীতে অনধিকাংশ প্রবেশ করিয়াছে। সে আজ সমস্ত কথাব মধ্যে শুধু এই কথটাই ভুলিয়াছে যে, জীবনের অপব সকল কামনাব জ্ঞান রমণীও সাংবান বস্তু। বরস হইলেই তাহাকে অনায়াসে ভিক্ষা পাইবাব জন্মগত অভ্যাস রহিয়াছে বলিয়াই তাহাকে নৃতন করিয়া চাহিবার যে বিপুল সাধনা তাহার সত্যমুর্ত্তি বাংলাব বৌদনেব চিত্ততলে ষথার্থ রূপ-পরিগ্রহ কবিত্তে পাবে নাই। তাই প্রচুর অশ্রুপাতকেই ব্যাধাব শ্রেষ্ঠ পবিচয় এবং পুরুষ ও নাবীর বৌদন আকাজ্ঞাকেই মনুষ্য-জন্মেব পরম গতি স্থির করিয়া অবিরত যে-চিত্তে অঙ্কিত করিয়া চলিয়াছে, তাহা অনভ্যন্তের তিলক-ধাবণের জ্ঞান তাহাব নিম্নেব রূপালকেও বিড়ম্বিত করিয়া তোলে, অপরের চক্ষের সম্মুখেও কোনও স্বপ্নেব সৃষ্টি করিতে পারে না। নির্বাণী, অস্থিতলক্ষা, সঙ্কল্পবিনোব জীবনে যদি কাম্যলাভ না ঘটে তাহার একমাত্র পরিণতি দাঁড়ায় “ভবিতব্য”-কে স্বীকার কবিয়া লওয়ার অথবা যন্ত্রা, আশ্রয়ত প্রভৃতির সাহায্যে মৃত্যুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবা। মাঝে মাঝে যদি ভাগ্য দেবান প্রদত্ত হয়, কিম্বা নাটিকা কোনরূপে নাটকের ভাগ্যে আপনি ফলিয়া উঠেন তবেই যা শেষবাক্য ঘটে। নতুবা বিধিপ্রহসিত বিরহের নিরাশ্রয় দেহকে ষথাসাধ্য অলঙ্কার দ্বারা মনোজ্ঞ করিয়া তুলিবাব জ্ঞান তাহার প্রতিটি অঙ্গ প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘ-নিশ্বাস, অশ্রুবারি, বৌদন-আকৃতি, দর্ম্মবাধা প্রভৃতি দ্বারা ধচিত্ত কবিত্তে হয়।

পুরুষ ও নাবীর মিলনাকাঙ্ক্ষা যে চিরন্তন, ইহা প্রবসত্য। এই মিলন-প্রবাসের বিচিত্র ব্যাধাব ইতিহাসই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু সে কোন ব্যাধা? কস্তার পটলিখা দেখিয়া মুগ্ধ রাজকুমার যদি সেই যবেরই আঙিনার বসিয়া বসিয়া স্বপ্নের পর স্বপ্নমালা পাবিয়া চলিতেন অথবা উল্লাসের জ্ঞান পটলিখা বুকে চাপিয়া ষথায় তথায় ভ্রমণ কবিত্তে কবিত্তে জীবনের অবশিষ্ট করটা দিন কাটাইয়া দিতেন, তবে যে-ব্যাধা প্রকাশ পাইত তাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব ধোবাক জোগাইতে পারিলেও বাজকুমারের ভাগ্যে কস্তালাভ ঘটাইতে পাবিত না। কস্তাব চিত্রদর্শন অবধি তাহাকে পাইবাব অদম্য বাসনাকে জ্বলে ধাবণ করিয়া বিশ্বভূবনে তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আশা ও নৈরাশ্রের যে অবিরত স্বপ্ন, দোনালি, কপালি, সবুজ, সুনীলে আশ্রয়, মনোহব, নির্ঝাঁকু মাধবাজ্যে কস্তাকে পাইয়াও না-পাওয়ার যে দুঃখ, এবং শেষবাক্যের প্রাণপাতটিকে বধ করা পর্য্যন্ত বহুতর সংগ্রামেব মধ্যে জ্ঞানন্দ-সংগৃহের তীব্রদোলার যে ব্যাধা, এক কথায় রাজকুমারের কস্তালাভ-সাধনাব অন্তবে যে বিপুল বেদনা নিহিত আছে তাহাই ব্যাধাব ষথার্থ পরিচয়।

সীতাহরণের পর রামচন্দ্র যদি তাঁহাদের দুইজনের দণ্ডকারণ্যে একত্রবাসে বর্মণীর কয়টি দিনের বিগত কথা স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া বনে বনে শুধু বিলাপ করিয়াই বেড়াইতেন ও নির্বাসন-অন্তে সীতার পরিহিত বসনের ছিন্ন অঞ্চল সংগ্রহ করিয়া স্ববাজ্যে বিবিধা আসিতেন তবে রামাষণ রচনা হইত না। দিনের পর দিন উদাত অশ্রু বাধা চক্ষু ব সমুখ হইতে অপসারিত করিতে কবিত্তে মটায়ুর রক্তাক্ত ছিন্নপত্র ও সীতার উন্মোচিত অলঙ্কার-চিহ্নিত পণে ব্যাকুল চিত্তে সীতামেষণের যে সুদীর্ঘ যাত্রা, তাহার প্রতি পদক্ষেপে বাঁ বাজিয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম বাধা বা বেমনা। উহা নির্বাসনের দ্বারা নিবৃত্তর আচ্ছন্ন নহে, লঙ্কাবিজয় ও সীতার উদ্ধাব উদ্ধাব মাধায় মুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

পুরুষ ও নারী ব পরস্পরসম্বন্ধে দেহ বড় কি মন বড় এইটাই একমাত্র সমস্যা নহে। বড় কথা এই যে, তোমাকে আমি চাই কি না। যদি চাই তবে তোমাকে পাইবার জন্য আমার মধ্যে বাসনা উদ্ভাস, সাধনা উদ্ভূত হইয়াছে কি না। যদি তোমাকে পাওয়ার পথে বাধা থাকে তবে ভাগ্য-দেবতার সঙ্গে একটা আপোষ-নীমাংসা না করিয়া সেই বিপর্যয়ের বিস্তৃত অরণ্য পায়ে পায়ে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইব—যাবৎ তোমাকে না আয়ত্ত করি। সে অবশ্য যদি অসীম হয় তবে এ জীবন একটি সুদীর্ঘ যাত্রাতেই পর্যাবসিত হইবে। রক্তাক্ত গতি ধামিবে না।

এই যাত্রারই একটা জড়, প্রাণহীন, প্রয়াসহীন, বিকৃত ছাঁচামাত্র বাংলার যৌবন-সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তাই আজ বাংলার তরুণ প্রেমিক কেবলমাত্র আপনার ভ্রমস্থানের ভেলা সাড়াইয়া তাহাতে দুই টুকু বা ছিন্ন প্রেম-পত্রের পাল উঠাইয়াছেন এবং সেই পালে ঘন ঘন দীর্ঘবাসের বাতাস দিয়া দুস্তব জীবন-সমুদ্রে পার হইবার বাসনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মী মথন ঘবে আসিবেন তখন তাঁহাকে কোথায় যে টাই দিব সে-চিত্তার একটি বড় অবকাশ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু লক্ষ্মী আসিবেন কেমন করিয়া? বাচিয়া লক্ষ্মী কাহারও ঘবে আসেন না। বাজকুমার ছদ্ম মন্থলেব সমস্ত ধনবর্ষা উত্তরাধিকারস্বত্রে পাইয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তম মন্থলেব অধিষ্ঠাত্রী যে মানসলক্ষ্মী তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারবোগনাই, দেশাচার বা লোকাচার তাঁহাকে কবতলপত আয়লকীরণ পাওয়াইয়া দিতে পারে না। সে লক্ষ্মীকে উদ্যোগেব দ্বারা উপাখ্যস্ত করিতে হয়, শৌর্যের দ্বারা জয় করিতে হয়। জয়তেব আসি হইতে আজ পর্যন্ত বরন বে-জ্ঞাতি জীবন্ত থাকিয়াছে, তাহার জীবনের বিশাল সমুদ্রমস্থনের মধ্যে এই লক্ষ্মীকেই লক্ষ্য করিয়া জয়-পরাজয়ের বিচিত্র কাহিনী তাহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

জীবনে ও সাহিত্যে এই লক্ষ্মীকে লাভ করিতে হইলে পুরুষসিংহেব একান্ত উদ্যোগ ও সাধনার দ্বারাই পাওয়া হইবে, কেবলমাত্র মেটো বংশধরানি দ্বারা নহে।

(শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৩৪) শ্রী বোণানন্দ দাস

১২৭৯ বঙ্গাব্দের কয়েকখানি গ্রন্থ

বাজালা ভাষা ও বাজালা সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাবলি। বিখ্যাত বাজালা গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থকলের বিকিৎ সমালোচন সমেত প্রথম ভাগ। শ্রী বাসগতি স্মারক প্রণীত। ছপনী।

প্রবচনিক। শ্রীমাইচাঁদ শীল প্রণীত। নাটক।

নটনন্দিনী। শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ। একখানি উপস্থাপন।

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, বাণীকি গ্রন্থ।

দেবদত্তম্। শ্রীপ্রমথনাথ গণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষা-হরিতক। কলিকাতা, বাণীকি গ্রন্থ।

প্রথম শিক্ষা বাজগণিত। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, সংকলিত।

ইউরোপে তিন বৎসর। ইংরাজি গ্রন্থ।

মুখ্যায় মাপেজিন। কলিকাতা বেবিন কোং। দশ বৎসর পবে ইহার সুবোধ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শতুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

বেঙ্গাল মাপেজিন। কলিকাতা বিবটোরিয়া প্রেস। উপবোজ পত্রখানি, এবং এখানি উভয়ই ইংরাজি। শ্রীযুক্ত বেবেরেও লালবেহারী দে কর্তৃক এখানি সম্পাদিত।

সঙ্গীতলহরী। কুমার মহেন্দ্রলাল ধাঁন প্রণীত। এখানি গীত-পুস্তক।

কাব্যমালা। কলিকাতা। বেঙ্গীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি।

স্বাধ্য-কৌমুদী। অর্থাৎ সর্বসাধারণের অবজ্ঞা জাতব্য স্বাধ্য-বিষয়ক নূতনবিধ গ্রন্থ। প্রথম ভাগ। ডাক্তার শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। ঢাকা গিরীশ গ্রন্থ।

ললিত কবিতাবলী। কাব্যমালাব রচয়িত্ত-প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং।

কাব্যমঞ্জরী। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং।

অর্থাৎ প্রবর। তত্ত্ববোধক মাসিক পত্র। পাত্তবিদ্যাঘাটস্থিত সাহিত্য গ্রন্থ। শ্রীকান্তচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অবলা-বিলাপ। শ্রীমতী অন্নদাহম্বরী দাসী প্রণীত। শ্রীযুক্ত হৃদয়শঙ্কর বাবু কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিত্যক্ত পত্নী। শ্রীঅধিকাচরণ গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত।

প্রবন্ধকুসুমাবলী। শ্রীদশানন্দ দত্ত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

ভক্তৃহবি কাব্য। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত।

জ্ঞানাসুর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। রাজসাহী, বোয়ালিয়া। বাজসাহী প্রেস।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর্বা।

সঙ্গীতরত্নাকর। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

হবিবংশ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইবা হোণালকুড়িয়া সাহিত্যসংগ্রহভবন হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

পদ্যময়। প্রথম ভাগ। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এনন্ গ্রন্থ।

পদ্যমালা। উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, ধোপায়ন গ্রন্থ।

কবিতাকুহুম। প্রথম ভাগ। শ্রীতিনকড়ি সুধোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা বি, সি, রায় এণ্ড কোম্পানি বহু।

সন্ধ্যাকুহুম। শ্রী শ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা প্রাচীন ভারত বহু।

প্রথম চরিতাষ্টক। শ্রীকালীদাস ঘটক কর্তৃক সঙ্কলিত। হুগলী বুদ্ধদেব বহু।

ঐতিহাসিক নবস্তাস। অজ্ঞাণ্ড। সাধবমোহিনী। শ্রীগঙ্গপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা স্ট্যান্ডার্ড বহু।

শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস। বর্গাব হাক্কাম হইতে লর্ড

নব্ব্বকের আগমন পর্য্যন্ত। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভারত বহু।

সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বহু কোং। এখানি কাব্য।

গান্ধারী বিলাপ কাব্য। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত।

প্রমীলাবিলাস। গুণগম্ভীর-নিবাসী শ্রীমহিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আল্ফ্রেড প্রেস। এখানিও কাব্য।

নন্দময়স্তী কাব্য। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। কলিকাতা, স্কুলবুক প্রেস।

(বঙ্গদর্শন, ১২৭২)

ময়মনসিংহ জেলার যুবকসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীহৃদেন্দ্রক্লেশন হোম-রায় অঙ্কলিখিত]

আমাব দুর্ভাগ্য, যে, আমি আমাব দেশকে ভাল ক'রে দেখি নাই, বাংলাদেশটিকে পর্য্যাপ্ত ভাল ক'রে চিন্তে পাবি নাই, নিজের জেলাতেও অনেক দিন যাই নাই। এইজন্যই গত বৎসরে যখন কর্তব্যের আহ্বানে সমুদ্র পার হ'য়ে বিদেশে যেতে হ'ল, তখন সেটা আমাব কাছে খুব সুখের বিষয় হয় নাই। দেশকে ভাল ক'রে না চিনেই আমি বিদেশে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমার উচিত ছিল, যৌবনে যখন আমার শক্তি বেশী ছিল, উৎসাহ ছিল, নানা বিষয় জ্ঞানবার কোঁতুল ছিল, সেই সময়ে নিজের দেশকে ভালরূপে চেনা ও জানার চেষ্টা করা। যা হোক, এবিষয়ে আমার অনেক দেরী হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু ভাল কাজ না করার চেয়ে দেরীতে আরম্ভ ক'রাও ভাল। সেইজন্য আজকাল আমাকে দয়া ক'রে কেহ কোন জায়গার ভাকলে আমি সেখানে যেতে চেষ্টা করি। কেন না, এতে আমাব নিজের খুব উপকার হয়, নতুন যৌবনের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁদের উৎসাহ হ'তে আমি উৎসাহ পাই, নতুন জ্ঞান লাভ করি, নিজের যবের কোণে টেমিলের পাশে ব'সে সেই উৎসাহ। সেই জ্ঞান পাওয়া যায় না। এই-জন্য আপনারা যে আমাকে আহ্বান ক'রে এনেছেন, আপনাদের প্রতি আমাব শ্রদ্ধা, ঐতিহ্য ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

আমাব এই একটা বিষয় আছে, যে, চেষ্টা করলেই আমরা নীচে হ'তে উপরে উঠতে পারব, আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই অনেক কাজ ক'রে যেতে পারব। ময়মনসিংহ জেলার অনেক যৌবনের কথা, মহিষাব কথা অন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় এখানে বলেছেন। সে-সব আমাব আর বলবার প্রয়োজন নাই, আমাব তেমন জানাও নাই। তবে মোটের উপর এইটুকু জানি, যে, বাংলা দেশের মধ্যে ময়মনসিংহ সবচেয়ে-বড় জেলা, এ জেলায়, এ সহবে অনেক বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করেছেন যৌবন খ্যাতি

বাংলাদেশ ও ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ময়মনসিংহের আর-একটা দিক দেখাব, তা নিম্নাঙ্কলে নয়। এখানে এসে যে প্রাণ দেখলাম, যে উৎসাহ দেখলাম, সেইজন্যই আমি আপনাদিগকে বলছি আপনাদের আদর্শকে বড় ক'রে দেখতে হবে। ভগবান যেখানে বেশী দিয়েছেন, সেখান থেকেই বেশী আশা করা যায়। একথা ভাবলে আপনাদের চলবে না, যে, এশিয়া পৃথিবীর একটা অংশ, ভাবতবর্ষ এশিয়ার একটা অংশ, বাংলা দেশ ভারতের একটা অংশ, সেই বাংলাদেশের একটা জেলা ময়মনসিংহ। এত ছোট ক'রে দেখলে চলবে না। বড় আদর্শ স্থাপন করতে হবে আপনাদের সামনে। এখানে যে উৎসাহ, যে প্রাণবন্তা দেখলাম, তাতে আপনাদের কাছে বেশী দাবী করি। সেইজন্যই কয়েকটা নীতি ক'রা আমি বলব।

ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৪৮ লক্ষের উপর, কিন্তু শিক্ষার বিস্তার এখানে কিরূপ? সুখের বিষয়, এই ছোট সহবটিতে অনেকগুলি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে—তিনটি বালিকাবিদ্যালয় আছে, কলিকাতা ছাড়া বাংলার আর কোন সহবে বোধ হয় এতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় নাই। সেদাস রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই, লেখাপড়া-জানা লোকের শতকরা সংখ্যা হিন্দাব ময়মনসিংহের স্থান বাংলাদেশের সব জেলার নীচে, এক শুধু মালদহের উপরে। এখানে শতকরা মোটে ৬ জন লোক লিখতে পড়তে জানে। বঙ্গ লিখনপঠনকর্ম লোকের সংখ্যা কলিকাতা ছাড়া হাওড়া জেলায় সবচেয়ে বেশী, তাও কিন্তু মাত্র শতকরা ১৬ জনের উপর। ময়মনসিংহ জেলায় লিখনপঠনকর্ম লোকের অল্পপাত এত কম হবার একটা কারণ এই, যে, এ জেলায় অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার খুব কম। কাজেই গড়পড়তা এ বকর অবস্থা দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হিন্দুদিগকেও করতে হ'বে। প্রাচীন যে প্রশ্ন

আমি “Am I my brother's keeper?” “আমি কি আমার ভাইয়ের বন্ধক, অভিভাবক”? তাব মূলগত মনোভাবের বশবর্তী হলে চলবে না। আমরা সকলেই অল্প সকলের হিতাহিতের জন্ত দায়ী। প্রতিবেশীর উন্নতি না হ'লে অল্প সবাইকেই তাব কলভোগ কর্তে হয়।

আমি এখন কয়েকটা দেশের কথা বলব, যাদের লোকসংখ্যা ময়মনসিংহের চেয়ে কম বা ভার কাছাকাছি বা কিছু বেশী। এগুলিসবই স্বাধীন দেশ। এদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোকা বাবে ময়মনসিংহ কি করতে পারে। ময়মনসিংহ জেলাব লোকসংখ্যা ১২২১ সালের গণনা অনুসারে ৪৮ লক্ষের উপর, এখন আরো বেশী হয়েছে। আফগানিস্তান, যাকে বৃটিশরাই পর্যন্ত ভয় করবেন, তাব লোকসংখ্যা কত? কেহ কেহ বলেন, মোটে ৫০ লক্ষ।* আলবানিয়া এখন সাধারণতঃ, ইহার লোকসংখ্যা ৮,৩০,৮৭৭, আর্মেনিয়া ৮,১০,০০০, অস্ট্রিয়া ৬৫ লক্ষ, দক্ষিণ আমেরিকার বোলিভিয়া ৩০ লক্ষ, ডেনমার্ক ৩৪ লক্ষ। এই ডেনমার্কই লোক শ্রীবাস্থ্যে এসে জাৰ্গা দখল করেছিল। এরা মানুষ, সেইজন্মেই যে দেশে ৩৪ লাখ লোক, সেই দেশের মানুষ এসে ৩২ কোটি লোকের দেশে নিজের স্থান ক'বে নিতে পেরেছিল। তাবপব দেখুন, ডোমিনিকার থাকে ২লক্ষ লোক, এছোনিয়া ১১ লক্ষ, ইকুয়েডরে ১৫ লক্ষ, কিন্সাশা ৩৫ লক্ষ। লীপু অব নেশনসে হন্দুবাসের পর্য্যন্ত প্রতিনিধি আছে, যদিও তার লোকসংখ্যা ৭,৭৩,৪০৮ এবং তাবা প্রধানতঃ লাল ইতিহাস বংশীয়। আইরিশরা, বাঁবা স্বাধীনতার সংগ্রামে সফলকাম হয়েছেন, সংখ্যার মোটে ২৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০২। ময়মনসিংহ জেলায় যে এত পাট উৎপন্ন হয়, এতে ধনী হ'য়ে যায় তো প্রধানতঃ স্কটলণ্ডের লোক। স্কটলণ্ডের লোকসংখ্যা ৪৯ লক্ষ। এদের সম্বন্ধে একটা তামাসা আছে, যে, কেউ যদি উত্তর সেক আবিষ্কার করতে যান, তিনি গিয়ে দেখতে পাবেন, সেখানে আগে থাকতেই একজন স্কট স্কটলণ্ডের পতাকা পেড়ে বসে আছে। অর্থাৎ সেখানেই কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে, সেখানেই স্কটলণ্ডের লোক আছে। খুব ছোট দেশও মনুষ্যত্বের জোরে ও অবস্থার গুণে স্বাধীন হয়, যেমন লুকসেমবুর্গ, লোকসংখ্যা মোটে ২ লক্ষ ৬০ হাজার। তাদেরও প্রতিনিধি আছে লীপু অব নেশনসে। নরওয়ের লোকসংখ্যা ২৬ লক্ষ, পেরুর ৩৫ লক্ষ। বহুবার আক্রান্ত হ'য়েও যে-দেশ আজ পর্য্যন্ত পরাধীন হয় নাই, সেই হুইজার-ল্যান্ডের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। মানুষ যখন নিজেকে বড় ক'রে ভাবে, তখন সে চেষ্টা করলে সত্যি বড় কিছু করতে পারে। আর যদি ভাবে, আমি নগণ্য, আমার যা বাস্তবতা তা পৃথিবীর ছোট একটি টুকরা টুকরা তত্ত্ব টুকরা, তবে তাব দ্বাৰা কিছুই হয় না। আমি অবশ্য আপনাদিগকে অহঙ্কারে ক্ষীত হ'তে বলছি না; কিন্তু বলছি, নিজের নিজের মনুষ্যত্বের উপব শ্রদ্ধা থাকা চাই।

এখন কয়েকটি দেশের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কিছু বলব। কোন অবিখ্যাত হুন্দা ইউরোপীয় দেশের কথা আগে না বলে অল্প একটি দেশের কথা বলি। চাষবাসের সঙ্গে যাদের কিছু সম্পর্ক আছে তাবা দক্ষিণ আমেরিকার চিলি কথা জানেন। চিলির সোডা-নাইট্রেট

সারের ব্যবসায়ীরা তাদের কলিকাতা আফিসে একটা ল্যাবরেটরী রেখেছে। সেখানে যে-কোন জারগার মাটি পাঠিয়ে দিলে তাব সেই মাটি বিশ্লেষণ ক'রে বলে দেয়, সেই মাটিতে কি রকম সাব দনকার ও আবশ্যকানুযায়ী সার বিক্রী করে। এই চিলিতে সন্তানকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩৯ লাখ। এখানে ১২২০ সাল হ'তে আইন করা হয়েছে যে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিতে তাদের পিতামাতা বা অল্প অভিভাবকে বাধ্য করা হবে। এদের মধ্যে কিছু অসভ্য আদিম অধিবাসী থাকে সন্তো শতকরা ৬০ জনের উপর লোক লিখনপঠনকর্ম। হুন্দা বঙ্গ শতকরা ১০ জন, ময়মনসিংহে শতকরা ৬৩ জন লিখনপঠনকর্ম। চিলিতে ছোট বিশ্ববিদ্যালয় আছে, নানারকম শিক্ষাশিক্ষাব জন্ত অল্প ছোট বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, ভূতত্ত্ব-বিদ্যালয়, সঙ্গীত-বিদ্যালয় ইত্যাদি অনেক আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৮০০। হাতীয়া লাইব্রেরীতে বই আছে ৩,২৭,৮৮১। বাংলাদেশে ১২২৬ সালে শিক্ষার জন্ত ব্যয় হ'য়েছিল ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। তার অর্ধেকেরও কম গবর্ণমেন্ট দিয়েছেন, বাকী ছাত্র-বেতন ও সাধারণের দান হ'তে প্রাপ্ত। চিলিতে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্তই উহার গবর্ণমেন্ট ১২২১ সালে ১৪০ কোটি টাকা দিয়েছিল, অস্বাস্থ্য শিক্ষার খরচে ৫১ সালে ১ কোটির উপর। এখন আবও বেশী। অষ্ট চিলির লোকসংখ্যা ৩৯ লক্ষ, বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪৬৭ লক্ষ। ময়মনসিংহে ১ বানা সাপ্তাহিক ও ১ বানা মাসিক কাগজ আছে। চিলিতে ১২২৫ সালে ৬২৭ বানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র ছিল, তার মধ্যে ২২ বানা দৈনিক, ও ১৭৬ বানা সাপ্তাহিক। বাংলা প্রদেশ ভারত গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে রাজস্বের ভাগ পান পোনে ১১ কোটি টাকা; চিলির রাজস্ব ১২২৫ সালে হ'য়েছিল ২৪০ কোটি পাউণ্ডের উপর, অর্থাৎ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। ৩৯ লক্ষ লোক তাদের সব রকম রাষ্ট্রীয় কাজ চালানর জন্ত এত টাকা খরচ করতে পারে। এতেই বুঝা যায়, কিসে তাদের এত উন্নতি হয়।

ডেনমার্কের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। ডেনমার্ক ভারতের ও বঙ্গের মত কৃষিপ্রধান। অনেকে বলেন, ভাতাবর্ষে কৃষি উন্নতি হ'তে পাবে না, কারণ জোতগুলো সব ছোট ছোট ক'রে ভাগ করা। ইহার মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু ডেনমার্ক তো আইন ক'রেই জমি ছোট ছোট টুকরা করা হয়েছে। এই কৃষিপ্রধান ৩৪ লক্ষ লোকের বাসভূমি ডেনমার্কের উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানেও ৭ বছর হ'তে ১৪ বছর পর্য্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা আমাদের প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের চেয়ে বেশী ও ভাল শিক্ষা বিনি পরসাষ পায়। একটা দেশের উন্নতির জন্ত বত বকমের বিদ্যালয় দরকার—শিশু-বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয়, ললিতকলা বিদ্যালয়, তার সবই এখানে আছে। ১২২১-২২ সালে এর আয় হ'য়েছিল ২৪০ কোটি পাউণ্ড; প্রায় ৩৭ কোটি টাকা। ডেনমার্কের প্রধান ব্যবসা পনিব, মাখন, দুধ, ডিম শস্ত ইত্যাদি চালান দেওয়া। খনিজ সম্পত্তি নাই। শুধু কৃষিতেই এদেশ ধনী। আমেরিকায় যেমন হবিষ্প্রত জমি এক সঙ্গে চা' করে, ডেনমার্ক তেমনভাবে চাষ হয় না; আমাদের দেশের মতই ছোট ছোট জমিতে কিন্তু আধুনিক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চা' করা হয়।

নবওয়েতে ২৬ লক্ষ লোক, সেখানেও অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অল্প সব রকমের বিদ্যালয় আছে। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই দেশের সব ছেলেমেয়ে বিনি পরসাষ যে শিক্ষা পায়,

* ইহা আনুমানিক। হুইটেকাস পত্রিকায এক জাৰ্গায় আছে ৫০ লাখ, এক জাৰ্গায় ৪৬ লাখ। চেসোসের একাইক্লোপীডিয়াতে আছে আনুমানিক ৬৪ লাখ। ভারতবর্ষের ১২২১ সালের সেনাসে আছে আনুমানিক ৬৩ লাখের উপর। স্টেটসম্যানস ইয়্যাব বুক অনুসারে আনুমানিক ৮০ লাখ।

তা এদেশেব প্রবেশিকার শিক্ষার চেয়ে ভাল ও বেশী। নবওয়েব জমি অমূল্যব; তবু ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা, খনিজ সম্পত্তি ও শিল্প উদ্যোগ দ্বারা এদেশ ধনী হইতেছে। নরওয়েরই অধ্যাপক স্টেন কোনো অনেক বৎসর আগে আমাদের দেশে গবর্নমেন্টেব প্রাচীনলিপি-পাঠক হ'য়ে এসেছিলেন এবং পরে বিশ্বভারতীর সংস্কৃতির অধ্যাপক হয়েছিলেন। আমাদের, দেশে নানা রকমের লিপি আগে প্রচলিত ছিল, সে-সব পড়'বাব হৃদয়ক লোক আমাদের দেশে যথেষ্ট ছিল না। এইজন্য ভারত গবর্নমেন্ট নরওয়ের যুনিভার্সিটি থেকে এ'কে এনেছিলেন। ইনি বিশ্বভারতীতেও কিছুদিন ছিলেন। এরা নিজের দেশের সাহিত্যাদির চর্চা ক'রেও অল্প দেশের ভাষা ও সাহিত্যচর্চা করেন, এমন শিক্ষাবিস্তার হইতেছে এদেশে। চেষ্টা থাকিলেই মানুষ বড় হয়। ১৯২১-২২ সালে এদের রাজস্ব হইছিল প্রায় ৬০ কোটি টাকার সমান। ২৬ লক্ষ লোকের জন্য এটা টাকা খরচ হ'তে পারে। নরওয়ের সম্পদের প্রধান কাবণ অরণ্যানী এবং মাছ ধরার ব্যবসা। ময়মনসিংহ জেলায়ও তো মাছের ব্যবসা হ'তে পারে। অরণ্য থেকেও আয় হ'তে পারে। কিন্তু সেগুলোব মালিক আমরা নই।

হুইজার্ল্যান্ডে ৪০ লাখ লোকের জন্য সাতটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া অল্প সব রকমের স্কুল কলেজ আছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও ছেলেমেয়ে উভয়েব জন্য বাধ্যতামূলক। এরা যে কতটা সত্য ঙ্গাতি, তা বোঝা যায় এতে, যে, এদেশে ৬০০০ লাইব্রেরী আছে, আর বই আছে প্রায় ৯৪ চুবানবই লাখ। এদেশেব রাজস্ব ১৯২২ সালে হ'য়েছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকার সমান।

এতক্ষণ যে-সব দেশের কথা বলা হ'ল, সেগুলো সবই ভারতবর্ষের মত মাটির দেশ, সোনাকপার নয়; এবং তাদের অধিবাসীরাও মানুষ, দেবতা বা অতিমানুষ নয়। শিক্ষিত, ধনী ও শক্তিশালী আমরাও হ'তে পারি, যদি চবিত্তবান, জ্ঞানী, পরিশ্রমী, ও স্বাধীন হ'বার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি।

আমার নীরস বক্তব্য এখানে শেষ হ'ল। এখন অল্প কয়েকটা কথা বলতে চাই। এটা তরুণ-সম্মিলনী। সেইজন্য তরুণ যারা বিশেষ ক'রে তাঁদেরই আমি কিছু বলব। কালিদাসের রঘুবংশের প্রথমদেই আছে, “বাগধারিবিসম্পৃক্তো বাগধর্যপ্রতিপত্তম্। রুগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥” সেই লোকটি পড়বার সময়ে আমরা শিখেছিলাম, “পিতরৌ” শব্দে মাতা ও পিতা দুজনকেই বোঝাচ্ছে, যদিও মাতা শব্দের উল্লেখ নাই। তেমনি আমি যখন তরুণদের কথা বলব, তখন বুঝতে হবে আমি শুধু পুরুষদের কথা বলছি না, মাতৃ-ভাতির কথাও বলছি। তাঁদেরও শক্তি আছে, তাঁদেরও কর্তব্য আছে। অবশ্য শিক্ষার অভাবে সবলের মধ্যে সে-শক্তিব উপযুক্ত সুরণ হব নাই। আমাদের দেশে নারীই তো শক্তিবিনী বলে বর্ণিত হয়েছেন। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও নারী। অতএব এখন নারীদের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার নাই। এটা মন্ত প্রহসন। আমার যা নিবেদন তা তরুণ তরুণী উভয়েবই প্রতি।

আমরা ত মৃত্যুর আস্থান শুনেছি, মৃত্যুর দূত যে কোনো সময় আসতে পারে, কিন্তু অনেক কাজ আমাদের ক'তে বাকী রয়ে গেছে। কিন্তু আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা চেষ্টা করলে সে-সব ক'তে পাব্বে। কেউ কেউ বলতে পারেন, আমি স্বদেশপ্রেম অল্প হ'য়ে একথা বলছি। কিন্তু আমি স্বদেশপ্রেম অল্প হলেও সব কথা বিচার ক'বে বলতে চেষ্টা করি।

আমি ভাবতেব অনেক ভায়গার গিয়েছি, বিদেশেরও কিছু কিছু দেখেছি। আমার মনে হয় না, বাংলার ছেলেমেয়েরা অন্তর্নিহিত শক্তিতে অল্প কোন দেশের ছেলেমেয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট। আমি অবশ্য বাঙালী যুবকদের তরুণীদের অহঙ্কারী করতে চাই না। আমি আমার কাগজে খুব কড় কথা লিখে অনেককে বেদনা দি বটে, কিন্তু আমার মনে-বাংলার শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেব প্রতি প্রীতি, বিশ্বাস ও প্রীতি আছে। আমি যদি কবি হ'তাম, তা'হ'লে তা ভাল ক'রে প্রকাশ ক'তে পাবতাম। কবি বখন নই, নীরস গদ্যেই জানাব। ষাঁদের বয়স বেশী হয়েছে অথচ প্রাণটা নবীন রয়েছে, যারা প্রাণে চিরবসন্তের আস্থান শুনেছেন, তরুণেব প্রতি আমার যে প্রাণনা, সেটা তাঁদের কাছেও পৌছাতে চাই। ময়মনসিংহ জেলার যারা তরুণ, নারী কি পুরুষ, তাঁদের কাছে আমি-এই দাবী করছি, আরতনে ও লোকসংখ্যার ময়মনসিংহ যে-সব ভূখণ্ডেব সমতুল্য, অল্প সব রকমেই এ জেলাকে সেইসব দেশের সমতুল্য করতে হবে। ২৬ লাখ, ৩০ লাখ, ৪০ লাখ লোক কি হ'তে পারে, করতে পারে, তা' আমি দেখিয়েছি। তা আমাদের দ্বারা কেন হবে না? বলতে পারেন, আমাদের হুযোগ নাই, অবস্থা প্রতিকূল। হুযোগ কখন কখন নিজ থেকে স্বারে ধাক্কা দেয় বটে, কখন কখন অবস্থা অনুকূল হ'য়ে পড়ে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই হুযোগ ক'রে নিতে হয়। এক ‘স্ববিরোধী’ ভিনিস ছাড়া মানুষের পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব নয়। আপনাতো দেখেছেন, আগে বা কখনা ছিল, তা' সবই এখন হয়েছে। পুষ্পকবণ তো আর এখন কল্লনা ভিনিস নয়। কথিত আছে, ইঞ্জিনিং মেয়েব আড়াল থেকে বুদ্ধ করেছিল। অনেক মানুষ আজকাল এরূপ বুদ্ধ বয়ে, বাঙালীর ছেলেও ফ্রান্সে এরোমেনের বুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। এখন রেডিওর সাহায্যে প্রতিনিয়তই আকাশবাণী শোনা যাচ্ছে। হুতরাং কিছুই অসম্ভব বলা যেতে পারে না।

সংস্কৃতে আছে ‘যুবৈব ধর্মশীলঃ স্তাৎ’। ইংরেজীতে তেমনি আছে, The glory of a young man is his strength। দুটি একই কথা। যুবকেরা ধর্মশীল হ'বে, এ কথা মনে এ নয় যে, যুবকেরা বনে গিয়ে সুর্য্যাসী হ'য়ে মৃত্যুব অপেক্ষা করবে, এর অর্থ আমরা এই বুঝব যে, যৌবনের ধর্ম যা তাই তাদের গ্রহণ করতে হবে। তরুণের ধর্ম বা লক্ষণ হচ্ছে শক্তি, সেই শক্তি আপনাদিগকে অর্জন করতে হবে। শিকড় মাটিতে হুপ্রোবিত হ'লে গাছ পত্রপুষ্পকলে হুশোভিত হয়। একটা বড় বাড়ী ক'তে হ'লে তার ভিত বেশ পাকা চওড়া ক'রে ক'তে হয়। তেমনি শক্তির গোড়ার ভিনিস সতেজ শক্তিমান দেহ। অবশ্য যে ব্যক্তি চিরকণ, সে যে কোন কাজ ক'তে পারে না, তা নয়। কিন্তু রথ ছর্কল ঙ্গাতি বড় কিছু কখনও করতে পারে না। শিক্ষানীতির একটা গোড়ার কথা আছে, হুহ বলিষ্ঠ সহন্যনামধারী প্রাণী তৈরী করা। যুব সৌজা সত্যি কথাও অনেকে বড় লোকের নাম না করলে মানতে চান না। তাই বলি, হাঁবাট ‘স্পেক্সার’ তার শিক্ষাবিবধক প্রবন্ধে একথা বলেছেন। আপনাবা তরুণেরা সবলের আগে শবীরটা তাক্সা করুন। আমি এখানকার সিটি ইন্সকু দেধ'তে গিয়েছিলাম, সেখানে ছেলেমেব মুখ দেখে অনেককেই বেশ হুহ মনে হ'ল, এতে আমি বড় হুহী হয়েছি। ভাল ক'বে যেতে দিতে পাবলে, একটু খেলার ভাষণ দিলে, আমাদের দেশের ছেলেরাও মানুষ হ'তে পাব্বে, তাদের শরীর ও মনের শিরদাঁড়া খাড়া থাকতে পাবে। দেহকে হুহ রাখার জন্য বা' বা' ক'বা দরকার তা'ব কথা তো আমাদের ছেলেমেয়েরা পাঠশালা থেকেই পড়'ছে, কেবল কাজে ক'রলেই হয়। সংযম, অবলাগিতা খুব দরকার। ধর্মাবা বে প্রহচর্যের কথা বলে গিয়েছেন।

তরুণদের সেই ত্রুটি-পালন করা উচিত। ত্রুটি মানে অবস্থা সন্ন্যাসী হওয়া বা কৃষ্ণসাধন করা নয়। মানুষকে ভগবান যে-সব শক্তি দিয়েছেন সেগুলি ঠিক ভাবে ব্যবহার করা উচিত। গীতাতো সন্ন্যাসী হ'তে বা কৃষ্ণসাধন ক'তে বলা হয় নাই। “যুক্তাহাববিহারশ্চ” হ'তে হবে, উপযুক্ত রূপে আহাব-বিহার করতে হবে, আর জীবনে আনন্দকে পেতে হবে। উপযুক্ত কোন কোন লোকের সন্ন্যাসী হওয়ার বিবোধী আমি নই। একটা জাতির কি করা উচিত, তাইই কথা হচ্ছে। ১০১১ বৎসর বয়সে বাংলা ইন্ডুল ৬৬তম বৃষোপাখ্যায়ের পুরাবৃত্তসারে আমরা পড়েছিলাম। স্পার্টার লোকদের দৃঢ় কববার জন্ত লাইকার্গাস খুব কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন, স্পার্টাবাসীরা দৃঢ় ও বীর হয়েছিল ও বটে। কিন্তু এদেশের লোকেরা সকল বকম বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে, কৃতিত্ব লাভ করেছিল। তাদের আদর্শ জগতে এখনো চলছে, অথচ বীরত্বও তারা স্পার্টার সমকক্ষই ছিল। আমাদের আদর্শ সর্বাঙ্গীন হওয়া চাই। আনন্দ আর বিলাস ও আমোদপ্রিয়তা এক জিনিস নয়। আনন্দ খুব উচু জিনিস। বিলাসী সেই আনন্দ পায় না, তা'বা যা পা'য় তা মেকী। উপনিষদে আছে, আনন্দ থেকেই সব উৎপত্তি, আবাব যেদিন সব লুপ্ত হবে সেদিন সবই আনন্দের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ ক'বে। আনন্দের ভিতর দিয়েই আত্মা পুষ্টিলাভ করে। ভাত্তাবেরা বলেন, আনন্দের সঙ্গে যা খাওয়া যায় তা যেমন সহজে পরিপাক হয়, জীব ক'বে গিলিয়ে দিলে তেমন হয় না। শিক্ষাতত্ত্ব-বিদেবাব বলেন, বাসকদিগকে শিক্ষা দিতে হবে আনন্দের ভিতর দিয়ে, নইলে সহজে নতুন জ্ঞান হৃদয়মনপ্রাণের জিনিস ক'রে ক্লেব যায় না। এতদ্বারা আমি বলেছি, সংসমের সঙ্গে আনন্দ চাই।

তরুণের অঙ্গ কয়েকটি লক্ষণ, সাহস, অতঃ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর। তা নইলে কিছু করা যায় না। আর দরকার প্রজ্ঞাবান হওয়া—প্রজ্ঞাবান লভতে জ্ঞান। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞপের ভাব, ব্যস্তের ভাব থাকলে শিক্ষা হয় না। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের কোথাও কোথাও এই বিজ্ঞপের ভাবটা, অকালবিজ্ঞতাটা কিছু বেশী।

তরুণের আর-এক লক্ষণ সবর্ণের চিন্তাকে মনে স্থান না দেওয়া। অজ্ঞানচিত্ত অসবর্ণে বিশ্বাস তরুণের লক্ষণ। সময়ের হিসাব ক'বে, বয়সের হিসাব ক'বে তা'বা কোন কাজে প্রযুক্ত হন না। আজ সকল দেশেই একটা ইয়ুথ মুভমেন্ট অর্থাৎ তরুণ-প্রচেষ্টা আবিস্কৃত হয়েছে। যাদের মনটা বুড়ো হ'লে গেছে, অনেকের ১০১৬ বছরও হ'বে যা'য়, তাদের কিছু বলবার নাই। অতীতের উপাসক যারা, তাদের কাজের পরিচয় তো আপনারা দেখছেনই, জরাজনিত্য ও প্রাচীনতার কীর্ত্তি পরিচয় তো আপনারা পেয়েছেনই। এমন তাজা লোকদের কাজ নতুন পথ খুঁজে বেব করা। জীবা হ'লে চলবে না। শিশু প্রথম পৃথিবীকে দেখে বিস্ময়ভরে একটা নতুন জিনিস হিসাবে। শিশু যখন হাঁটতে শিখে তখন সে বাববার প'ড়ে গিয়েও দমে না, কিছুতেই কোলে থাকতে চাব না, নিজে হাঁটতে চায়। শিশুর মতন বন ও চোখ দিয়ে প্রাচীন পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে হবে, নতুন ক'বে তাকে গড়তে হবে। পুরোনো-জিনিসকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে বলছি না, তাকে নতুন ক'রে গ্রহণ ক'তে হবে। পুরাতনের

অস্তিত্বকে অবশ্য শ্রদ্ধা ক'তে হবে, কিন্তু তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস ক'রে নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভের ক্ষমতা বাল্যদলে চলবে না।

তরুণের অঙ্গ এক লক্ষণ—আইডিয়ালিজম বা আদর্শে নিষ্ঠা। অর্থাৎ যা বাস্তব, চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, তাই সত্য নয়, যা হওয়া উচিত তাই সত্য। Fact is not truth, সত্য যা' তা' য়ানের জিনিস। ময়মনসিংহের সম্বন্ধে বা সত্য তাকে য়ানের ভিতর দিয়ে দেখতে হবে, দেখতে হ'বে ৪৮ লক্ষ লোক সাহসে নবীন জ্ঞানে প্রবীণ হয়েছে; স্বাধীন হ'য়ে বিশ্বপ্রেমিকের ধর্মে দীক্ষা লাভ করেছে। আজ যা তথ্য (fact), তা তো চ'লে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে। ময়মনসিংহের শতকরা ৯৯ জন লোক নিরক্ষর, এই তথ্য দিনের পর দিন মিথ্যা হচ্ছে। কিছুদিন প'বে এই তথ্য বদলে যেতে পারে, একেবারে মিথ্যা হ'বে যেতে পারে। আর বা সত্য তা ক্রমে প্রকাশ পাব। সত্যকে মনশ্চকুতে ধারণা ক'রে নিতে হবে! ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নানারকম তথ্য দেখিয়ে পাশ্চাত্যেরা যখন আমাদের অস্তিত্ব ক'তে চাব, বলে, বে, “তোমরা এত অশিক্ষিত, দুর্বল, সামাজিক কুপ্রথা'র জর্জরিত, তোমাদের মধ্য এত গৃহবিবাদ,” তখন আমাদের বলতে হবে, “তোমরা যা বলছ তা তথ্য হ'তে পারে বটে; কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাই সত্য নয়, অম'বা যা হ'তে চাই, যা হ'তে চেষ্টা করছি, তাই হচ্ছে সত্য।” তরুণেরা য়ানের ভিতর দিয়ে স্থি'ব ক'রন কি উাদের হওয়া উচিত এবং তা'বই উপাসনা ক'রন। কিন্তু শুধু আইডিয়ালিজম হ'লেই চলবে না। মাননী মুস্তিকে বাইরের রূপ দিতে চেষ্টা করতে হবে। যা হওয়া চাই করা চাই বলে মনের ভিতর স্থি'ব ক'বেন, বাইবে তাই হতে হবে ক'তে হবে।

তাবপর আশাশীলতা—সবকিছুই হতে পারে ও হবে। ভারত-বর্ষ যত মহৎ, যত ভাল, যত স্বাধীন হ'তে পারেন, ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন ক'বলে তা হ'তে পারেন, সে-বিষয়ে আমি আমাব অজ্ঞতা স্বীকার করছি, ঠিক কোনো প্রণালীই আমি ব'লে নিতে পারছি না। কিন্তু তা ব'লে কোন প্রণালীই নাই, এ কথা আমি মানি না। আমি যুড়ার ঘারে এসে পড়েছি, ত'বু আমি আশাহীন হইনি। তরুণেরাও আশা বাধুন, উপায় বেব ক'রন। বাধা বিঘ্ন তো আছেই, কিন্তু বাধা বিঘ্ন আছে অতিক্রম ক'ববার জন্ত। সংগ্রাম ক'বেই তো মানুষের শক্তি'ব বিকাশ হয়। এমাসন বলেছেন, He who wrestles with me strengthens me, “বে আমাব সঙ্গে কুস্তি লড়ে, সে আমাকে বলিষ্ঠ করে।” কোনমতেই দম্বেন না, অদম্যতা তরুণের লক্ষণ।

তরুণের পঞ্চম লক্ষণ, অমরত্বে বিশ্বাস। চিববসন্তের হাওয়া তরুণদের উপব বয়ে যাচ্ছে, অনির্বাণ অগ্নি বয়েছে তাদের মধ্যে। তরুণর যে আত্মাহুতি দিতে পারে, কেন পারে? কারণ তা'বা জ্ঞানে, যে, সেবা অম'ব, নিষ্ফল সেবা নিষ্ফল আত্মহুতি ব'লে কিছু নেই, সেবা যে দেবায়ি-দেবব চরণে প্রদত্ত অঞ্জলি, তিনি অবিনাশী, তিনি যাবনের দেবতা, তরুণদের রাজাধিবাজ। আমি যদি ঋষি হতাম, কবি হতাম, চির-তরুণতাব বন্দনা রচনা ক'বে আপনারদের শোনা'তাম। কিন্তু সে নাবর্ধ্য আমার না থাকলেও প্রজ্ঞা নিবেদন ক'ববার অধিকার আছে। তরুণকে ও চিরতরুণতাব উৎসকে আমি নমস্কার করছি।

সত্তর বৎসর কলিকাতা ছাত্রাবাসে (১৮৫৭-১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

কলিকাতার পথে

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, কহিয়াছি তখন পদ্মাব ওপারে রেল বসা দূরে থাকুক তাহার কল্পনাও হয় নাই। চায়ের কারবারের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যাত্রায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাহাজেই ইংরেজ কোম্পানীদের মাল আমদানী ও রপ্তানী হইত। জাহাজেই বেহার অঞ্চল ও সাঁওতাল পরগণা হইতে চা-বাগানের কুলীও চালান হইত। এই জাহাজেই আমি প্রথমে শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালন্দ আসি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বদলী হইত। কলিকাতার যাত্রীবা ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের জাহাজে চাপিতেন। এখন গোয়ালন্দ হইতে ৬৭ ঘণ্টায় নারায়ণগঞ্জে যাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক দিনেও যাওয়া যাইত না। এখন জাহাজ দিন রাত চলিতে পারে। সেকালে বিজলীর আলো আবিস্কৃত হয় নাই। সন্ধ্যার পরে জাহাজ চালান সম্ভব ছিল না। এইজন্য ঢাকা হইতে গোয়ালন্দের পথে যাত্রীদিগকে এক রাত্রি জাহাজেই কাটাইতে হইত। শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জ আসিতে পাঁচ দিনের কম নয়। কখনো কখনো ৭।৮ দিন লাগিত। মাল বোঝাই করার জন্ত সে-সকল জাহাজ বড় বড় বন্দরে কখনো কখনো দুই দিন, এবং সর্বদাই অন্ততঃ একদিন আটকিয়া থাকিত। কাজেই শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিতে ৭।৮ দিন লাগিত।

এই ৭।৮ দিন চিড়া চিবাইয়া কাটানো আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দুযানীর বন্ধন একেবারে টুটিয়া গিয়াছিল। শ্রীহট্টেই মুসলমানের রুটী বিস্কুট খাইতে আরম্ভ করি, পূর্বেই ইহা কহিয়াছি। মুসলমানের ভাত

খাইতেও নিজের ভিতরে কোন সন্দোহ ছিল না। তবে আমার প্রথম জাহাজ যাত্রার জ্বালের বাঁধন একেবারে নষ্ট করিতে হয় নাই। সে জাহাজে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কেরাণী ছিলেন—বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়। জাহাজের পেছনে যে জালিবোট বাঁধা থাকিত তাহাতেই তাঁর রান্না হইত। আমরা তাহার উপরে ভাগ বসাইতাম। এইরূপে কায়ক্লেশে ভাঙ্গা জ্বালের যতটুকু ছিল তাহা বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিতাম।

নারায়ণগঞ্জ—পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে

আমি প্রথমে যে-নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম সে-নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা গ্রাম ও বাজার। আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড় বন্দর ও সহর। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে তখনও রেল হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় রানীত্রাণাসের আফিস বসিয়াছে, আর ছাতকের ইংলিশ কোম্পানীরও একটা বড় আফিস ছিল। নারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এইসকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশ্রয় ও আহার পাইত। একজন যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত; বেশী প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপান্ন, গব্যঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টান্ন মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। নারায়ণগঞ্জে নামিয়া এইরূপ একটা আখড়াতেই আতিথ্য গ্রহণ করি।

ঢাকা—গোয়ালন্দের জাহাজ

ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে তখন দুইখানা জাহাজ চলাচল করিত। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় সপ্তাহে দুবার ঢাকা

হইতে গোয়ালন্দ যাওয়া যাইত। জাহাজ দুখানির নাম এখনও ভুলি নাই। একখানি ছিল “Prince of Wales,” আর একখানি ছিল “Princess Alice”। শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় যে-সকল মালের জাহাজ চলিত এ দুখানি জাহাজ তার চাইতে অনেক ভাল ছিল। এ দুখানি যাত্রী-জাহাজ ছিল। মাল-জাহাজ প্রায়ই দুই পাশে দুখানা অতিকায় আঁধা বোট বা গাথা বোট বাঁধিয়া টানিয়া নিত, ঢাকা-গোয়ালন্দের যাত্রী-জাহাজে সচরাচর কোন গাথাবোট বাঁধা থাকিত না। তবুও একদিনে ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে যাওয়া যাইত না। নারায়ণগঞ্জে যাইয়া গোয়ালন্দের জাহাজের জন্ত পথ চাহিয়া থাকিতে হইত। শ্রীহট্টের জাহাজে জাহাজের কেরাণী হরমোহন-বাবুর অমুগ্রহে কোনো রকমে জাত বাঁচাইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু গোয়ালন্দের জাহাজে হরমোহন-বাবুর মত কোনো কর্মচারী ছিলেন না। সুতরাং এখানে মুসলমান খালাসীদের আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। এই আমার প্রথম মুসলমানের অগ্রপ্রাশন। এসকল জাহাজে তখনও দেশীর লোকেরা ইংরেজী ধরণে খানা খাইতে আরম্ভ করেন নাই। উচ্চশ্রেণীতে দেশীয় যাত্রীও চলাচল করিতেন না। উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর এখনকার মতন কোন ব্যবস্থাও ছিল না। এখন আমাদের নদীর জাহাজে দেশীয় লোকেরাই কাপ্তানের বা সারেংয়ের কাজ করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসব পূর্বে তাঁদের প্রশিক্ষা লাভ হয় নাই। তখন তাঁরা খালাসীর কাজই কেবল করিতেন। জাহাজের কাপ্তান এবং এনজিনিয়ার দুইই বিদেশীয় ছিলেন। ইংরেজ যাত্রী আসিলে তাঁহারা কাপ্তানের ক্যাবিনেই আশ্রয় পাইতেন এবং কাপ্তানের টেবিলেই খানা খাইতেন। দেশীয় যাত্রীদের সে-লোভও জন্মে নাই আর ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া বসিবার-দাঁড়াইবার সাহস এবং অভ্যাসও হয় নাই। সুতরাং আমাদের মতন আচার-ব্রহ্ম হিন্দুদিগের পক্ষে মুসলমান খালাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করা ব্যতীত আহারাদির জন্ত অল্প কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না।

খালাসীদের আতিথ্য

তবে এই খালাসীর খানা খাইতে যাইয়া মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু গোলমালও বাধিত। আমাদের

মতন ছেলেদের উদর পূর্ণ করা তাঁদের পক্ষে সর্বদা সহজ ছিল না। বিশেষতঃ আট আনায এত পরিমাণ কারী-ভাত জোগাইতে গেলে অতিশি-সেবাই করিতে হইত, লভবান ব্যবসা করা সম্ভব ছিল না। এইজন্য প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে আমাদের খটাখটি বাবিয়া যাইত। আমরাও ছাড়িবার পাত্র ছিলাম না। কারীর বরাদ্দ যথেষ্ট বাড়াইয়া যখন অসম্ভব হইল তখন ভাতের দাবী চড়াই গেল। এ ভাত যে সকলই আমাদের পেটে যাইত তাহা নহে। প্রকাশ্যে খালাসীর হাতে থাইবার সাহস তখনও হয় নাই। সারেংয়ের ক্যাবিনেই, আর কখনো কখনো জাহাজের চাকার উপরে যে ছোট ঘর থাকিত তাহাতে, বসিয়া থাইতে হইত। আর ভাত দিয়া গেলেই সে ভাত আমাদের পেটে না যাইয়া অনেক সময় পট্টা-গর্ভে যাইয়া অদৃশ্য হইত। এইরূপে খালসী যখন দেখিল যে ব্যঞ্জনাদির সাহায্য ব্যতীতও আমরা এত পরিমাণ অন্ন ধ্বংস কবিতো লাগিলাম তখন আমাদের কারীর মাত্রা সম্ভব মত বাড়াইয়া একটা রফা করিল। এইরূপে অনেক সময় অনেক কোঁতকের সৃষ্টি হইত।

গোয়ালন্দের বেল—পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে

এইরূপে জাত ধোয়াইয়া কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে দুই দিন পরে গোয়ালন্দ পৌঁছিয়া বেল গাড়ীতে উঠিলাম। আমবা রেলের কর্তাদের নিকট হইতে যে সুখ-স্বচ্ছন্দতার দাবী করি তাহা পাই নাই। কিন্তু প্রথম যে রেলগাড়ীতে চড়ি, সে গাড়ীর তুলনায় স্বাস্থ্য-কালিকার গাড়ী কত যে শ্রেষ্ঠ তাহা মনে বরিলে অসম্ভাবের কারণ অনেকটা কমিয়া যায়। তখন নিম্নতম শ্রেণীর গাড়ীগুলিকে চতুর্থ শ্রেণী কহিত। মধ্যম শ্রেণীর বা Intermediate গাড়ী তখনও হয় নাই। তবে পূর্বে বাহা তৃতীয় শ্রেণী কহিত তাহাই কার্যতঃ এখন মধ্যম শ্রেণী হইয়াছে। নিম্নতম শ্রেণীর গাড়ীতে কাঠের জানালা ছিল, কাচের জানালা তখনও হয় নাই। এখনও তাহাতে গদী নাই, তখনও ছিল না। পাখানা গাড়ীর ভিতরে হয় নাই। ট্রেনে নামিয়া মাল-মুদ্রাদি ত্যাগ করিতে হইত। ইহাতে কখন কখন যাত্রীদের পথের মাঝখানে পড়িয়াও থাকিত হইত। এ অভিজ্ঞতাও যে আমাদেরও হয় নাই এমন নয়।

যাত্রীর ভিড় এখনকার চাইতে বোধ হয় বেশী হইত। এখন যতগুলি ট্রেন প্রতিদিন গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় আসে সেকালে তাহার ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় দিনে একখানা ও রাত্রিতে একখানা,—এই দুইখান ট্রেনই গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। সেকালের বেগের যাতায়াতের কথা মনে করিলে এবিষয়ে যাত্রীদের সুখ-সুবিধা কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া ভবিষ্যতের অনেক আশা হয়।

কলিকাতায় প্রথম প্রবেশ

কলিকাতার প্রথম দর্শনে মনে কি ভাব জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না। তবে বিলাতের পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথম লণ্ডনের আলো দেখিয়া ইংরেজ-বাংলার মনে যে-সকল ভাবের উদয় হয়, কেতাবে পড়িয়াছি,—কলিকাতার প্রথম দর্শনে আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব জন্মে নাই, একথা বলিতে পারি। শিয়ালদহ হইতে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিয়া সুনন্দরমোহনের সঙ্গে শ্রীহট্টের ছাত্রাবাসে বাইয়া উঠিলাম। সেকালে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীই সচরাচর পাওয়া যাইত। ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়া আর নড়ঝড় গাড়ী; ইহাই, এখন যেমন তখনও প্রায় সেরূপই, কলিকাতার সেকড়া গাড়ীর লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বোধ হয় রাজপথে বেশী বাহির হইত না। কুক কোম্পানীর আড়গড়া ছাড়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ী কোথাও পাওয়া যাইত না। আর বিবাহের মিছিল ব্যতীত কেহ কুকের বাড়ীর গাড়ী ভাড়াও করিত না।

ইংরেজীতে কলিকাতাকে City of Palaces কহে। কিন্তু প্রথম কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া ইহাব প্রাসাদাবলী দেখিয়া আমার মনে কোনো বিশেষ বিস্ময় বা উল্লাস জন্মে নাই। তখন কলিকাতার এখনকার চেহারাও ছিল না। অধিকাংশ রাজপথেই সারি সারি খোঁলার-ঘর ছিল। শিয়ালদহ হইতে বাহির হইয়া বজ্রাঙ্গারের রাস্তা দিয়া কলেজ স্ট্রীটে পড়িয়া মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নিম্ন খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের মেসে (mess) বাইয়া উঠিলাম।

এখন এ-রাস্তায় ছুধারেই পাকা বাড়ী হইয়াছে। সুসজ্জিত দোকান-পাটে রাজপথের নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। সেকালে

এরূপ ছিল না। নিম্ন খানসামার লেন বহুদিন কলিকাতার মানচিত্র হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার নাম লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; বস্তুরও শেষ চিহ্ন পর্যন্ত আঁক আর নাই। নিম্ন খানসামার লেন এখন মেডিকেল কলেজের ভিতবে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। মেডিকেল কলেজও তখন এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। পুৰাতন বড় বাড়ীটা মাত্র ছিল। উত্তরে ও দক্ষিণে খালি জায়গা পড়িয়া ছিল। উত্তরে সে-জায়গায় এখন শ্রামাচরণ লাহার চোখের হাসপাতাল হইয়াছে। দক্ষিণে আগেকার হাতার বাহিরে অনেকগুলি নূতন বাড়ী উঠিয়াছে। এইরূপে মেডিকেল কলেজ উত্তরে কলুটোলার রাস্তা হইতে দক্ষিণে বর্তমান ইডেন হাসপাতাল রোড পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ইডেন হাসপাতাল রোডের পূর্ব নাম ছিল চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন। এই চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন পশ্চিম মুখে যাইয়া চুনাগলিতে পড়িয়াছিল। চুনাগলি নামও বদলিয়া গিয়াছে। এখন ইহা ফিয়ার লেন হইয়াছে। সহরের রাস্তায় এই নাম-বিপর্যয়ে কলিকাতার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের কতটা যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতেছে এখনকার সহরের মিউনিসিপাল কর্তারা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। চাঁপাতলা নামের পিছনে একটা পুরাতন ইতিহাস ছিল। চুনাগলির নামের পিছনেও একটা ইতিহাস ছিল। চুনাগলি বলিতে আমরা সেকালের কলিকাতার ফিরিঙ্গিবাড়া বুঝিতাম। চুনাগলির সাহেব, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা বিশেষ পরিভাষা ছিল। ফিয়ার লেন সে-স্মৃতিকে জাগায় না। নিম্ন খানসামার লেন নামের পিছনেও সেরূপ একটা স্থানীয় সামাজিক ইতিহাস লুকাইয়া ছিল। খানসামা হইলেও নিম্ন একদিন কলিকাতার ঐ পল্লীতে একজন সমাজপতি ছিল। এইরূপ কত অলিগলির প্রাচীন নামের সঙ্গে কলিকাতার পুৰাতন সামাজিক ইতিহাস জড়াইয়া ছিল। নূতন বাবুদের আত্মীয়-স্বজনবর্গের নাম জাহির করিবার বলবতী পিপাসাতে সে-সকল ঐতিহাসিক চিহ্ন লোপ পাইতেছে। ধারা এমন সম্ভাষ আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা স্বজন-প্রীতির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁরা একথা ভাবেন না যে, তাঁদের পরে ধারা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্তা হইবেন তাঁরাও আবার নিজেদের

আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্ত আঞ্জিকার এই নামগুলি মুছিয়া ফেলিয়া পথঘাটের অন্ত নামকরণ করিতে পারেন এবং করিবেন। আমার মনে হয়, এর চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে সেদিন যেদিন কলিকাতার কোন পথের নামে কোন লোকের নাম বুলু থাকিবে না এবং মার্কিনের নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহরের মতন আমাদের সহরেও রাজপথের নাম ১ নং, ২ নং, ৩ নং, এইরূপ নম্বর ওয়ারী হইবে।

• সিলেট মেস্

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানাধীনে কোন ছাত্রাবাস বা মেস্ ছিল না। মফঃস্বল হইতে যে-সকল ছাত্র কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিতেন, তাঁহারা নিজেরাই বাড়ী ভাড়া করিয়া একসঙ্গে বাসা বান্ধিয়া কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলার ছাত্রেরা নিজদের এক-একটা ছাত্রাবাস গড়িয়া তুলিতেন। এইরূপে ত্রিপুরা হইতে যাহারা আসিতেন তাঁরা ত্রিপুরা-মেসে থাকিতেন। ঢাকার অনেক-গুলি যুবক কলিকাতায় পড়াশুনা করিতেন; এইজন্য ঢাকার ছটা মেস্ ছিল। ইহাব মধ্যে ৩৩নং মুসলমান পাড়া লেনের মেসই সর্বপ্রধান ছিল। এই মেসের সঙ্গে সে-কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রের স্মৃতি জড়িত ছিল। বোব হয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় এইখান হইতেই গণিতে অনর্স পৰীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। ৬৭জনীন্যাথ রায়, ৬৩শ্রীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত, প্রভৃতি সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতম রত্ন-সকল, অনেকেই ৩৩নং মুসলমান পাড়ার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। এইজন্য সে-যুগের কলিকাতার ছাত্রাবাস-সমূহের মধ্যে মুসলমান পাড়ার এই মেস্ একটা আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল। বরিশালেরও বোব হয় একটা স্বতন্ত্র মেস্ ছিল। তখনও যশোর ও খুলনা পৃথক্ হয় নাই। একই জিলা ছিল। যশোর-খুলনার একটা মেস্ ছিল। আমাদের শ্রীহট্টেরও একটা মেস্ ছিল। আমি এইখানেই আসিয়া প্রথম উঠিলাম। স্মরণীয়মোহন দাস মহাশয় আমার একবৎসর পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই কহিয়াছি। তিনি

সিলেট মেসেতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আসিয়া আমিও এই দলেই ভিড়িয়া গেলাম।

তখন ১৫ নং নিমু খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের আড্ডা ছিল। একতালা বাড়ী। অনেকগুলি ঘর। বাড়ীর দুটো খণ্ড ছিল। সিলেট-মেস্ হইলেও এখানে অন্ত জেলারও কেহ কেহ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুমারখালীর তিন-জন ছিলেন। ঢাকার একজন, এবং উত্তর বঙ্গের এক-জন। ঢাকার শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। ইনি ডাক্তারী পাশ করিয়া এম-বি উপাধি লইয়া সরকারী কর্ম গ্রহণ করেন। বহুবৎসর পরে (১৮৯৪) ইহার সঙ্গে মথুরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি মথুরায় সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সম্ভবতঃ সে-জেলার দিভিল সার্জনের পদই লাভ করিয়াছিলেন। কুমারখালীর নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ও ডাক্তারী পড়িতেন। ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া ইনি নিজের গ্রামে বাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বহুকাল পরে কুমারখালীতে ইহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। পরলোকগত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ও আমাদের সিলেট-মেসে ছিলেন এবং এখান হইতেই ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছুদিন মফঃস্বলে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শেষে কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তবে এই ছাত্রাবাসের অধিকাংশ সভ্যই শ্রীহট্ট হইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য ছাত্রেরাই এই মেসে থাকিতেন। শ্রীহট্ট সাহা-প্রধান স্থান। সাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণকায়স্থদির মতনই উচ্চ শিক্ষা বিস্তার হইতেছিল। প্রাচীন সমাজে ইহাদের জল চল ছিল না বলিয়া নিমু খানসামার লেনেব মেসে ইহাদের কেহ ছিলেন না, স্বতন্ত্র মেসে অথবা অন্যান্য জেলার মেসে ইহাদের কেহ কেহ থাকিতেন।

মেস্-জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা

জীবনের প্রথমে বিদেশে-বিভূমে আসিয়া নিঃসম্পর্কিত লোকের সঙ্গে এই আমার প্রথমে একত্র বসবাস করিতে হয়। আর প্রথম দিন এই ছাত্রাবাসে আহার করিতে বসিয়া আমার ভিতরে এমন একটা আঘাত লাগে যাহা আজও

ভুলিতে পারি নাই। আমাদের পরিবারে সকলে, আত্ম-পর-বিচার-বিরহিত হইয়া একই খাদ্য খাইতাম। এমন-কি ভৃত্যেরা ও আমার বাবা এবং আমরা যে-চাল খাইতাম সেই চালই খাইতেন। মনে পড়ে, একবার একটা জমিদারী কিনিয়া বাবার অল্প-বিস্তর অর্থকষ্ট উপস্থিত হব। সে-সময়ে আমাদের বাসার বরাদ্দ দুধ বন্ধ হইয়া যাব। বাবার শরীর তখন ভাল ছিল না। এই কারণে তাঁহাকে নিজের জন্ত কিছুটা দুধের ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। ইহার প্রতিবাদ করিয়া বাবা কহিয়াছিলেন, যে, তিনি জন্মে কখনও নিজের বাহা খাইতেন তাহা কমই হউক বেশীই হউক বাড়ীর অপর সকলকে—চাকরদের পর্য্যন্ত না দিয়া খান নাই। যতদিন পর্য্যন্ত বাসার চাকরবাকরদেরও দুধের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, ততদিন তিনি নিজের কখনও দুধ খাইতে পারেন না। এই ভাবেই আমি বড় হইয়া উঠিয়াছিলাম। কলিকাতায় ছাত্রাবাসে প্রথম দিন খাইতে বসিয়া দেখিলাম যে, সকলের জন্ত মামুলী রকমে ভাল ভাতা মাছের ঝোল ও অমলের ব্যবস্থা; কিন্তু কেহ কেহ ইহারই মধ্যে ডিম খাইতেছেন কেহ বা ঘি খাইতেছেন কেহ বা দই খাইতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার কি যে বিরক্তি হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত সে-কথা ভুলি নাই। বলা বাহুল্য, যে ক্রমে আমাকেও এই বিধানের বশবর্তী হইয়া নিজের পয়সাখ বিশেষ বিশেষ আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রথম দিনের কথা চিরদিনেব মতন প্রানের উপরে দাগিয়া রহিষাছে।

ছুঃমার্গ পরিহার

শ্রীহটে থাকিতেই হিন্দুমানির বন্ধন আলগা হইয়া যাইতেছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহা একেবারে খসিয়া পড়িল। শ্রীহটে লুকাইয়া হিন্দু অখাদ্য খাইতাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশভাবে খাদ্যাখাদ্যের বিচার পরিহার করিলাম। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসের কেহ কেহ হিন্দুমানী ছাড়িতে রাজি ছিলেন না। বোধ হয় তাঁদের অভিভাবকেরাও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে সর্বদা সাবধান ও শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। অল্পদিনেব ম্যেই আমাদের এই ছাত্রাবাসে দুইটা দল গড়িয়া উঠিল। একদল

কোন প্রকারের বন্ধন স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না; আর একদল সমাজের ভয়ে প্রকাশে কোন অনাচার করিতে সাহস পাইতেন না। শ্রীহটে মুসলমানের পাঁউরুটি বিস্কুট লুকাইয়া খাইতাম। এখানে ধারা হিন্দুমানির আবরণ রাখিবার জন্ত ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাও মিশ্রিগঞ্জের পাঁউরুটি ছাড়িয়া বামনের পাঁউরুটি খাইতে পারিতেন না। প্রতিদিন বিকাল বেলা, কটীওয়াদা ঘরে ঘরে ধার যেমন ব্যবস্থা সেইরূপ তাঁর টেবিলে বা বিছানায় রুটি রাখিয়া যাইতেন। একদিন বৈকালে শ্রীহট্ট হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিবাব জন্ত আমাদের মেসে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই আত্মীয়ের বিছানাতেও টাটকা গরম পাঁউরুটি পড়িয়াছিল, ইনি আর কোন উপায়ে এই রুটিখানি লুকাইতে না পারিয়া তাহার উপরে বসিয়া পড়িলেন! এইরূপ কোতুককর ঘটনা মাঝে মাঝে হইত।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর সত্যানুরাগ

সেকালে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে অসাধারণ সত্যানুরাগ ছিল। কলতঃ দেশের সাধারণ লোকের মনেও এই ধারণা ছিল যে, ইংবেজানবীশবাবুরা কখনও মিথ্যা কথা কহেন না। আমাদের ছাত্রাবাসে বাহারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় অনেকেই মিথ্যা কথা কহিতে চাহিতেন না। বাহারা হিন্দুর অখাদ্য খাইতেন না তাঁরাও মনে মনে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। মুসলমানেরা বাহা খান তাহা খাইলে যে ক্ষম নষ্ট হয়, এ বুদ্ধি তাঁহাদের বিন্দু পরিমাণেও ছিল না। সমাজের বিরুদ্ধে বাইবার সাহস তাঁহাদের ছিল না। তাঁরা নিজেরাই সরল ভাবে ইহা স্বীকার করিতেন। অল্পদিকে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য করিয়া আপনাব জাত বাঁচাইবার জন্ত ইহারা মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহিতেন না। এইজন্তই এক মুসলমানের পাঁউরুটি ছাড়া হিন্দুর অখাদ্য অথ কোন খাদ্য ইহারা খাইতেন না। আর পাঁউরুটি বিস্কুট খাইতেন এইজন্ত যে একথা লইয়া শ্রীহট্টের সমাজে কোন কথা উঠিবার আশঙ্কা ছিল না। একবার আমাদের মেসের পাচক ব্রাহ্মণ আসেন নাই, কে রাখিবে এই প্রশ্ন উঠিল। একরূপ বাধ্যকাল হইতেই

আমার রান্নার বেশ সখ ছিল। বাবাও রান্নাতে ভাল বাসিতেন। আমি বাগ্গাববিই মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার রান্নাবাড়া দেখিতাম। আজি পর্যন্তও আমার রান্নার সখ যায় নাই। আমাদের ঘেসে যখনই পাচক ব্রাহ্মণ অল্পপস্থিত থাকিতেন তখন অনেক সময়ই আমি সেকাজ করিতাম। আমাদের একজন ব্রাহ্মণ-বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর খাওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে। তিনি বলিলেন, ভাত ছাড়া আর যা-কিছু তুমি গিয়া রান্না, ভাতের ফেন গড়াইবার সময় আমাকে ডাকিও। আমি যাইয়া ভাত নামাইব। শুনিয়া, আমরা হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, এ কেমন? ভাল তরকারী সবই আমাদের হাতে থাইতে পারেন, ভাতের বেলাই অপরাধ? তিনি গম্ভীর ভাবে কহিলেন—ভাত থাইতেও আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বাড়ী যাইয়া মিছা কথা কহিতে পারিব না। অত্রাঙ্কের হাতে ভাত থাইয়াছি কি না, লোকে এই কথাটাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। ভাল, ভাজা থাইয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিবে না। স্নতরাং ভাত না খাইলে আমি তোমাদের সহিত ভাত খাই নাই, স্বচ্ছন্দচিত্তে এ কথা বলিতে পারিব।

জাত বাঁচাইবার রক্ষা

আমাদের মেসে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিবার জন্ত ক্রমে এক নূতন বিধান প্রবর্তিত হয়। বেশী কথাকথি করিলে মেস্ ভান্দিয়া যাইবে, ধারা হিন্দুয়ানী মানিতেন না তাঁদের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাঁরা সে-অবস্থায় মেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রক্ষা হইল। রক্ষাটা এই হইল যে, মেসের কোন সভ্য হিন্দুর কোন অখাদ্য মেসের ভিতরে আনিতে পারিবেন না। বাহিরে ধার যেমন ইচ্ছা সেইরূপই থাইতে পারেন।

এই রক্ষার ফলে স্তন্দরীমোহন এবং আমাকে একদিন বড় মুস্থিলে পড়িতে হইয়াছিল। বোধ হয় তখন পূজার ছুটি। একদিন ঝি বামন কেহই আসে নাই। বাজার হইতে লুচি ও স্নদেশ আনিয়া থাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। এখন কলিকাতার প্রায় সর্বত্র রান্না মাছ মাংস প্রভৃতির খাবার দোকান হইয়াছে। সেকালে কেবল মদের দোকানের

নিকটেই এইরূপ রান্না মাছ মাংস প্রভৃতি পাওয়া যাইত। বহুবাজারের নিকটে, মদন বড়ালের লেনে, আমাদের বাসা ছিল। আর বহুবাজারের রাস্তায় অনেকগুলি মদের দোকান ও তারই আশেপাশে রান্না মাছ মাংসের দোকানও ছিল। স্তন্দরীমোহন এবং আমি খান অল্পেবণে বহুবাজারের রাস্তায় যাইয়া এইরূপ একটা চাটের দোকান হইতে গরম লুচি ও মাংসের কারি কিনিয়া লইলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথাও বসিয়া খাবার জায়গা আছে কি না। সে-ব্যক্তি আমাদের একটা ফটক দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐ দিকে একটা খাবারের ঘর আছে। আমরা সেই ফটক দিয়া যাইয়া একটা একতলা ঘরে ঢুকিলাম। সেখানে একটা কেরোসিনের আলো ঝুলিতেছিল। মাঝখানে একখানা টেবিল পাতা, তার দুদিকে দুখানা লম্বা বেঞ্চি। আমরা ভাবিলাম যে বেশ জায়গা পাওয়া গেল, এখানে বসিয়া নির্ঝিল্লি রাত্রে খাওয়াটা সারিতে পারিব। এই ভাবিয়া আমরা যেই লুচির চুপড়ী ও মাংসের মালসা টেবিলের উপরে রাখিয়া থাইতে বসিব, এমন সময় একজন বয়স্ক ব্যক্তি একটা গ্লাস হাতে ও একটা বোতল বগলে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাকে দেখিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। আমরা তখন তাড়াতাড়ি আমাদের লুচি মাংস হাতে তুলিয়া লইলাম। আমরা চলিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছি দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেন—সজ্জা কি বাবা তোমরা যা কর্তে এসেছ, আমিও তাই কর্তেই এসেছি। তাহাকে দেখিয়াই আমাদের পিত্তি শুকাইয়া গিয়াছিল। আমরা সেখানে আর তিলাদ্ধি অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তারপর সমস্তা হইল, কোথায় বসিয়া থাইব। বাসায় লইয়া যাইবার হুকুম নাই, রাস্তায় দাঁড়াইয়া লুচি মাংস খাওয়া যায় না। আমাদের বাসার সামনেই এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানা ঘরের পাশে একটা রোয়াক ছিল, সেখানে যাইয়া কোনও মতে খাওয়া গেল; তারপর বাসায় যাইয়া ঘরের কুঁজার জলে সেই খাদ্য গলাধঃকরণ করিলাম। ঐ রোয়াকটা প্রতিদিন প্রত্যুষে মিউনিসিপালিটির কন্স-টারীদের যে কাজে লাগিত, সে কথা মনে না করাই ভাল।

(ভ্রমশঃ)

লেপ-চিত্রাঙ্কণ

শ্রী কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাদ আছে যে, “কালি, কসম ও মন” এই তিন একত্র হইলে পরে লেখা হয়। চতুর্থ একটি পদার্থ, তাহা ভূজপত্র বা কাগজ বা ঐরূপ অথ কিছুই হউক, আধাররূপে যে নিত্যন্ত প্রয়োজন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চিত্রাঙ্কণেও কল্লনা, লেখনী বা তুলি, তরল বর্ণ (তুলির সাহায্য বিনা শুষ্ক বর্ণদ্বারাও হয়) ও চিত্রাঙ্কণের আধার-স্বরূপ কিছু একটা থাকা চাই। আদিম প্রাগ্-ঐতিহাসিক



ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ।

যুগের মানব তাহার বাসস্থান বা পর্বত-গুহার গাত্রে প্রথমে স্থায়ী চিত্রাঙ্কণ করে। এখনও সেই গৃহ-চিত্রাঙ্কণ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ক্রমে চিত্রাঙ্কণ আরও সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠে। তখন যে কোন পদার্থের সমতল ও বর্ণসংযোগ-উপযোগী গাত্র আছে, সে-সকলই আধাররূপে গৃহীত হয়।

ললিতকলার প্রধান উদ্দেশ্য—বোধ হয় কল্লনা-চক্ষুর পরিতৃপ্তি। যদি কেবল মাত্র ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে চিত্রাঙ্কণে স্থায়িত্বের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, ব্যবসায়ের খাতিরেই হউক বা নিজ কার্যের নিদর্শন স্থায়ী করিবার জন্য শিল্পীর ইচ্ছার

দরুণই হউক, আধার-ভেদে চিত্রাঙ্কণ (বা অল্প কলা-পদ্ধতির) পদ্ধতি ও উপকরণ-ভেদ হয়। এবং এইরূপ ভেদের উদ্দেশ্য—বাহ্যতে বর্ণ বা আলোখ্যের বিকৃতি বা ক্ষয় সহজে না হয়।

মানুষের সংসার ও গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় সামগ্রী সকলের মধ্যে কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যাদি খুবই প্রচলিত। শয্যাসনরূপ গৃহসজ্জা, দিঘুক, পেটিকা ইত্যাদি মানবের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সামগ্রীতে কাঠের ব্যবহার অতিশয় সাধারণ। অতএব সে-সকল সর্বদাই দৃষ্টির মধ্যে পড়ে; এবং সেইজন্য, বাদগৃহের প্রাচীর যে-কারণে চিত্রিত করা হয়, সেই কারণে প্রত্যেকেরই, রূপরসের অনুভূতির মাত্রা অনুসারে, সে-সকলকে অল্লাধিক কারুকার্য বা আলোখ্য দ্বারা শোভিত করার ইচ্ছা হয়।

এই ইচ্ছার ফলে সাধারণ উপায়ে আলোখ্য আগলপনা হইতে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ উপকরণ সাহায্যে লেপ-চিত্রাঙ্কণ পর্যন্ত দারুশিল্পের একটি প্রধান বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আরম্ভ সাধারণ উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বর্ণে কাষ্ঠগাত্র রঞ্জন, ও চরম উৎকর্ষ জাপানী শিল্পীর লেপ-চিত্রাঙ্কণ।

এই লেপ-চিত্রাঙ্কণ কি?

বেনারসের কাঠের খেলনা, ব্রহ্মদেশের কাঠের কোটা ইত্যাদি অনেকেই দেখিয়াছেন। কাঠের উপর রঙ্গীন গালা বা অল্প পদার্থের লেপ দ্বারা ঐসকল সামগ্রী চিত্রাঙ্কণ বা আলোখ্য-ভূষিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার কারুকার্যের নাম লেপ-চিত্রাঙ্কণ (Lacquer work)।

বিভিন্ন দেশে নানা উপায়ে ও নানা প্রথা অনুসারে ঐ প্রকার কারুকার্য হয়। তন্মধ্যে চীন ও জাপানের লেপ-কারুকার্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর, জটিল ও বিখ্যাত।

যদিও কাঠের স্বাভাবিক শোভা অনেক স্থলে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহা বর্ণ হিসাবে অতি সঙ্গীর্ণ সীমার মধ্যে

বন্ধ এবং কাঠের স্বাভাবিক কয়েকটি দোষের কারণে তাহার উপর সাধারণ উপায়ে চিত্রাঙ্কণও সম্ভব নহে। কারণ অধিকাংশ কাঠেরই সকল অংশ সমান ভাবে বর্ণ গ্রহণ করে না এবং কাঠ স্বভাবতই ক্ষয়-প্রবণ।

ঐসকল দোষের প্রতীকারের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কাঠের উপর লেপ দ্বারা তাহাকে আবরণযুক্ত করা হয়। কাঠগাত্র আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তাহার ক্ষয়প্রাপ্তি হয় না এবং উপযুক্ত উপকরণের সাহায্যে যথাযথভাবে লেপ-প্রদান করিলে ঐ আবরণ রন্ধু শূন্য ও নির্মূল এবং নানা বর্ণে ও ছায়ায় চিত্র বা আলেক্য অঙ্কনের উপযুক্ত হয়।



জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। অদিক শিল্পী রিটুয়ো কৃত।

লেপ-কারুকার্যের উপকরণ নানা প্রকার। এদেশে প্রধানতঃ লাক্ষা হইতে প্রস্তুত নানা বর্ণের গালার ব্যবহার হইয়া থাকে। চীন ও জাপানে Rhus Vernicifera নামক বৃক্ষের ধূপজাতীয় নির্যাস (Gum and Resin) ব্যবহৃত হয়। ইয়োরোপীয় শিল্পীগণ সুরাসারে দ্রবীভূত গালা বা গালার সহিত অল্প পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চীন ও জাপানের লেপ-চিত্রাঙ্কণে যে সকল উপকরণ

ব্যবহৃত হয় তাহার প্রয়োগ অতি কঠিন, কিন্তু তাহার ফলে উৎপন্ন কারুকার্য সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে লেপ-চিত্রাঙ্কণের প্রধান উপায় নানাবর্ণের গালা।



ইয়োরোপীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। অদিক অভিনেতা জেভিড্ গ্যারিকের আলমারীর পাল্লা।

যে-কাঠের দ্রব্যটি চিত্রাঙ্কিত করিতে হইবে, প্রথমে তাহা রেঁদা ও শিরীষ কাগজ, বা খরাদ বস্ত্রের (Lathe) সাহায্যে মসৃণ করা হয়। তাহার পর উপযুক্ত বর্ণের গালা তাহার উপর দ্রুত ঘর্ষণ করা হয়। ঘর্ষণের উত্তাপে গালা

(অতি অল্প পরিমাণ) গলিয়া কাঠের উপর লেপভাবে সংলগ্ন হয়। এইরূপে গালা সংযোগের পর তাল বা খেজুর ডালের খণ্ডের দ্বারা গালার লেপ ঘষিয়া তাহাকে পুনর্বার পালিশ করা হয়। তাহার পর তৈলের প্রলেপ দিয়া ঘর্ষণের দ্বারা সমস্তটি মসৃণ করা হয়। ইহার পর এই উপায়ে ভিন্ন বর্ণের গালার দ্বারা প্রথম লেপের উপর অল্প একটি লেপ দেওয়া হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চার পাঁচটি বা ততোধিক লেপ দ্বারা কাঠের দ্রব্যটি আচ্ছাদিত করা হয়।



জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। ফুজিওয়ারা যুগ
(খ্রঃ ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী)

পরে এই লেপ আচ্ছাদনের উপর বুলি (graver, engraving tool) চালাইয়া আলেখ্য বা চিত্রাঙ্কণ করা হয়। বুলি দ্বারা উপরের আচ্ছাদন কাটিয়া যে যে বর্ণ প্রয়োজন সেই বর্ণের লেপ অনাবৃত করা হয়। মনে করুন, প্রথম লেপ সবুজ, দ্বিতীয় লোহিত, তৃতীয় হরিদ্রা, চতুর্থ নীল ও সর্বোপরি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ লেপ দেওয়া হইয়াছে।

আলেখ্যের যে-অংশ সবুজ সে-অংশে কৃষ্ণ, নীল, হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের লেপ কাটিলেই সবুজ বর্ণ দেখা দিবে, যে-অংশ লোহিত তাহার জন্ত কৃষ্ণ, নীল ও হরিদ্রা বর্ণের লেপ কাটিলেই হইবে। আলেখ্যের “জমী” কৃষ্ণ বর্ণই থাকিবে।

কখন কখন “জমী” লেপে রঙীন রাংতা (tinfoil) বা অঙ্গুর খণ্ড বার্ণিশের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। মসৃণ কারুকার্য শেষ হইলে পরে সর্বোপরি স্বচ্ছ বার্ণিশের মসৃণ প্রলেপ দিয়া লেপ-চিত্রাঙ্কণ শেষ করা হয়।

কোন কোনও প্রদেশে স্তরাস্তর বা অল্প তরল পদার্থে দ্রবীভূত বর্ণযুক্ত গালার দ্বারা এই লেপ দেওয়া হয়। এই



ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ।

প্রথামুসারে লেপ-চিত্রাঙ্কণ সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, কাশ্মীর (কাশ্মীরে কাগজের মণ্ড—papier maché—হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের উপরই উৎকৃষ্ট লেপ-চিত্রাঙ্কণ হয়), যুক্ত-প্রদেশে বেরেলী, বেনারস, মাদ্রাজে কাছুল, মাদ্রাজ, মহিশূর ও সাওয়াণ্টবাডি, এই সকলস্থানে হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশে এইরূপ লেপচিত্রাঙ্কিত কাঠদ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত। সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবহারের তৈজস-পত্রাদিতেও এই শিল্পের নিদর্শন সর্বদাই পাওয়া যায়। কাঠ, বাঁশ বা বেতের চাঁচরি দ্বারা বোনা (woven) দ্রব্যাদির উপর গালা এবং (তৈল ও বৃক্ষ-নির্যাস হইতে উৎপন্ন) বার্ণিস দ্বারা লেপ-কারুকার্য করা



চীনদেশে লেপ-চিত্রাঙ্কণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

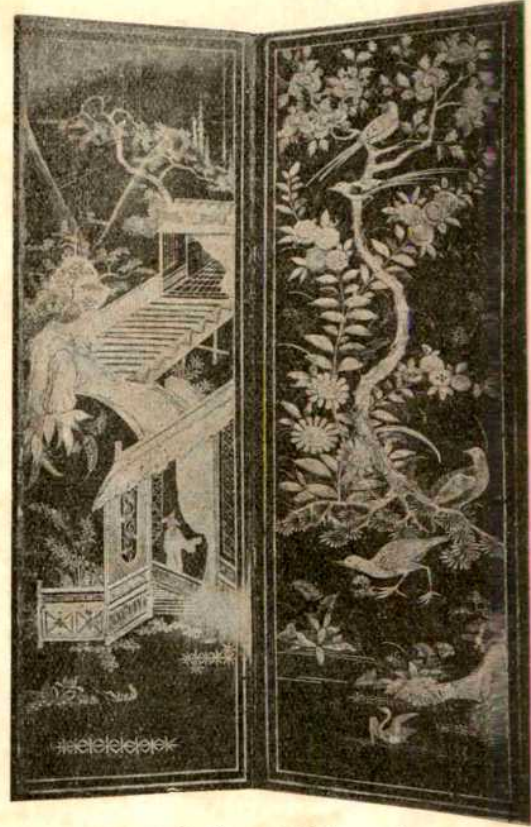
হয়। বহুল প্রচলনের ফলে সে দেশের এই কার্যের শিল্পী-দিগের উৎসাহ বা ক্রোতার অভাব নাই, সুতরাং সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশের লেপ-চিত্রাঙ্কণের নিদর্শন সকল ভারতবর্ষে প্রাপ্ত এই প্রকার দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সংস্কৃত (well-finished)। তবে এদেশের কারিগর উৎসাহ পাইলে কি প্রকার কার্য করিতে পারে তাহার পরিচয় দেশী রাজত্ববর্ণের প্রাসাদাদির আস্রাব-পত্রে পাওয়া যায়।

এদেশের দুই একটি স্থলে কয়েক ঘর মাত্র শিল্পী এখনও আছে, যাহাদের লেপ-কারুকার্য-প্রথা উপরোক্ত পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রাজপুতানার শাহপুরা নামক ক্ষুদ্র সহরে কয়েক ঘর শিল্পী আছে (অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল)। তাহারা প্রধানতঃ উট বা গাভার চর্মনির্মিত ঢালের বা অঙ্গ-শব্দের খাপের উপর লেপ কারুকার্য করে। তাহাদের ব্যবহৃত উপকরণের সহিত গালা ইত্যাদির বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। ইহারা বৃক্ষ-নির্ঘাস হইতে প্রাপ্ত ধূপ বা “গদ” জাতীয় নানা পদার্থের সহিত তৈল মিশ্রণে কয়েক প্রকার বার্নিস (varnish) প্রস্তুত করে। এই বার্নিস নানা প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহা দ্বারা নানা বর্ণের লেপ দান করা যায়। চর্মনির্মিত দ্রব্যটি পরিষ্কার ও উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া তাহার উপর ঐরূপ লেপ দান করা হয়। লেপ শুকাইয়া যাইবার পর তাহা অতিশয় যত্নের সহিত “পালিশ” করিয়া মসৃণ ও উজ্জল করা হয়। পরে তাহার উপর ভিন্ন বর্ণের বা একই বর্ণের আরো দুই চারিটি লেপ প্রদান করিয়া প্রত্যেক লেপ শুকাইবার পর মসৃণ করিয়া লইলে পর জমী প্রস্তুত হয়। তাহার পর অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও নানা বর্ণে রঞ্জিত বার্নিস এবং সোণার পাত ইত্যাদি উজ্জল পদার্থের সাহায্যে এই জমীর উপর রীতিমত চিত্র অঙ্কিত হয়। চিত্রাঙ্কণের পর উহার উপর ক্রমে ক্রমে নানাবর্ণের ও নানা ছায়ার পঁচিশ-ত্রিশটি লেপ সংযোগ করা হয়। কখন কখন কয়েকটি লেপ প্রদান, পরে চিত্রাঙ্কণ বা আলোখ্য, পুনর্বার লেপ প্রদান ও চিত্রাঙ্কণ, এইরূপে স্তরে স্তরে লেপ ও খণ্ডে খণ্ডে চিত্রাঙ্কণ দ্বারা কারুকার্য সম্পন্ন করা হয়।

মাদ্রাজ প্রদেশের গাজাম, কৃষ্ণা ও কাবুল অঞ্চলে

কয়েক ঘর কারিগর আছে, যাহাদের প্রথা অল্প অল্প এক রূপ। ইহারা প্রথমে হরিণের চর্মখণ্ড জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া পরে তাহা ফুটাইয়া ও ছাঁকিয়া শিরীষ (glue) প্রস্তুত করে। এই শিরীষের সহিত শ্বেত ডামার (Dammer এক জাতীয় ধূপ) ও ডাইয়া উত্তম রূপে মিশান হয় এবং পরে তাহাতে জল দিয়া উপযুক্ত রূপ “আঠা” প্রস্তুত হয়। এই



লেপ-চিত্রাঙ্কিত আবরণী (screen)।

আঠার সহিত অতিশয় মিহি মৃৎভাণ্ডচূর্ণ ও ঘৃতকুমারী জাতীয় উদ্ভিদের নির্ঘাস (aloes)—তিন ভাগ চূর্ণ ও এক-ভাগ নির্ঘাস—মিশাইয়া গাঢ় “কাই” (paste) প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের উপর লেপ-চিত্রাঙ্কণ হইবে সেটি প্রথমে উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া, তাহার উপর তৃণীর এই “কাই” দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করা হয়। চিত্রের রেখাদিকল ক্রমাগত কাই সংযোগে জমী হইতে উৎক্ষিপ্ত (standing out in relief) করা হয়। চিত্রাঙ্কণের পরে সমস্ত দ্রব্যটির উপর এক “পৌছ” শ্বেত “তেল রং” দেওয়া হয়। তৈল-বর্ণ

প্রয়োগের পর সমস্ত জমী রৌপ্যপাত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অঙ্কিত অংশ নানারূপ তৈলবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। জমী ও আলেখ্য মধ্যে গিণ্টী ও কাচখণ্ড প্রয়োগ দ্বারা বর্ণের উজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করা হয়।



ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিকু প্রদেশ।

চীন ও জাপানের লেপ কারুকার্যের অত্যন্তম উপাদান উরুশি (Rhus Vernicifera) নামক বৃক্ষের নির্যাস। এই নির্যাস তাহারাই বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা, সকল অংশ হইতেই পায়। তাহা কর্তনক্ষত (incision) হইতে নির্গত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন সময় ও আহরণ-প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নির্যাসের গুণের বৈধেই প্রভেদ হয়।

উরুশি নির্যাস সংগ্রহের পরে তাহা নানা প্রক্রিয়া—যথা হীরাকব, টুংতৈল, সিরকা (Vinegar) ইত্যাদি প্রয়োগ—দ্বারা শোধিত ও গুণযুক্ত করা হয়। ইহা দ্বারা

উরুশি নির্যাস বিভিন্ন পরিমাণে স্বচ্ছতা, তারপ্যা, ওজ্জ্বল্য ইত্যাদি গুণ প্রাপ্ত হয়।

জাপানী শিল্পী প্রথমে অতি বস্তুর সহিত কাঠ বাছাই করে। কঠিন, স্থল্মাশ, ব্রণহীন, নিম্নলিখিত কাঠের তত্ত্ব বা খণ্ড প্রথমে অতি বস্তুর সহিত কর্তিত ও সংযোজিত হয়। তাহার পর শোধিত উরুশি নির্যাসের সাহায্যে এই কাঠ-গাত্রের সহিত একখণ্ড মিহি ঠাসবুনন ফৌমবস্ত্র (linen) সংলগ্ন করা হয়। তাহার পর সমস্ত দ্রব্যটির উপর (অন্ততঃ তাহার যে অংশে চিত্রাঙ্কণ হইবে তাহাতে) উরুশি নির্যাসের সহিত অল্প উপাদানের মিশ্রণে প্রস্তুত “কাই”য়ের মোটা ছই তিন স্তর লেপ দান করা হয়। এই সকল লেপ শুকাইলে পরে তাহা “শান-পাথর” (whetstone) দ্বারা ঘষিয়া উত্তমরূপে মসৃণ করা হয়।

ইহার পর প্রকৃত লেপ-চিত্রাঙ্কণ আরম্ভ হয়। প্রথমে “চ্যাপ্টা” ক্ষুদ্রলোমযুক্ত (মানুষের চুল এস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) তুলির দ্বারা, স্থল্ম ও সমভাবে, শোধিত উরুশি নির্যাসের একটি লেপ বিস্তার করা হয়। তাহার পর আর্দ্র অবস্থায় দ্রব্যটি গরম ও জ্বালন্তে কুলুঙ্গী বা আলমারীতে শুকাইবার জন্য রাখা হয়।

শোধিত উরুশি নির্যাস হইতে প্রস্তুত বানিশের একটি বিশেষ গুণ আছে। উহা আর্দ্র উয় বাতাসেই উত্তমরূপে শুক্ক হয়। একবার শুকাইলে তখন জল, বাতাস, উত্তাপ (১৬০° সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত) কোন কিছুতেই নষ্ট হয় না।

শুকাইবার পর তাহাকে কাঠকয়লা গুঁড়া দ্বারা হাতে ঘষিয়া সমানভাবে মসৃণ করা হয়। একটি লেপ বিস্তার শুকান ও মসৃণ করিতে এক হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে। এইরূপে চিত্র বা আলেখ্যবিহীন সাধারণ লেপযুক্ত দ্রব্যে ত্রিশ হইতে সত্তর বা আশী স্তর লেপ দত্ত হয়।

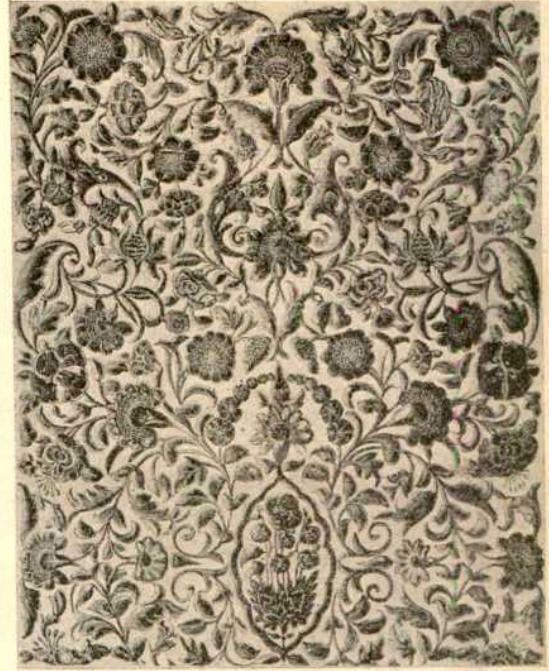
চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কন ইত্যাদির নানারূপ প্রথা জাপান ও চীনে প্রচলিত আছে। স্তরে স্তরে ভিন্ন বর্ণের লেপ দিয়া পরে উপরের স্তরে কর্তন দ্বারা নীচের বর্ণের প্রকাশ; কাঠগাত্র ক্ষোদিত করিয়া তাহাতে বর্ণযুক্ত লেপ প্রয়োগ; “জমীতে” সোনালী বা রূপালী পাত কিম্বা মুক্তাশুক্ল যোজন দ্বারা রচনা; উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বর্ণমিশ্রিত গাঢ় হইতে অতি তরল নানা প্রকার উরুশি বার্ণিশের সাহায্যে

উৎক্ষিপ্ত (in relief) বা সাধারণ চিত্রাঙ্কণ; চিত্র বা আলেখ্যের মধ্যে উজ্জলবর্ণ ধাতু, খনিজ, মৃত্তাশুল্ক ইত্যাদি স্বন পদার্থের (solid) খণ্ড সংযোজন;—এইরূপ বিভিন্ন প্রথায় ভূষিত লেপ কারুকার্যের নিদর্শন জাপানে পাওয়া যায়।

চীনদেশেও নান প্রকার লেপ কারুকার্যের প্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোরোমান্ডেল (Coromandel Lacquer) প্রথায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদিই প্রসিদ্ধ। এই প্রথামতে প্রথমে মসৃণ কাষ্ঠগাত্র খেতাভ মৃত্তিকাজাত বর্ণ ও বার্ণিসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত “কাই” দ্বারা (স্তরে স্তরে) আচ্ছাদিত হয়। তাহার উপর কয়েকস্তর কৃষ্ণ বর্ণ বার্ণিসের আচ্ছাদন দেওয়া হয়, বাহাতে লেপ আচ্ছাদনের উপরিভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

চিত্রাঙ্কণের সময় শিল্পী উপরের কৃষ্ণবর্ণ লেপ বুলি দ্বারা কাটিয়া নীচের স্বেতবর্ণ প্রকাশ করে। তাহার পর সেই অনাবৃত অংশ নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া অঙ্কনকার্য সমাপ্ত করে। এই প্রকার লেপ-চিত্রাঙ্কণ সৌন্দর্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু স্থায়িত্ব হিসাবে জাপানী শিল্পের কাছে ও আসে না।

পাশ্চাত্য দেশসকলে চীন ও জাপানের শিল্পের সমাদর বহুকাল হইতেই আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে ঐরূপ শিল্পের অনুকরণেরও সূত্রপাত হয়। কিন্তু চীন ও জাপানের শিল্পীর সহিষ্ণুতা, পুরুষানুক্রমগত অভিজ্ঞতা ও উৎকৃষ্ট নির্ঘাস ব্যবহারের গুণ সঙ্কেত তাহারা কোথায় পাইবে? সুতরাং সে দেশের লেপ-শিল্প অনুকরণ হিসাবেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, শিল্প হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। সেখানের শিল্পী সুরাসারে দ্রবীভূত নানাবর্ণের ও বর্ণহীন গালা, ও তাহার সঙ্গে কপূর, নানা প্রকারের ধূপ ইত্যাদির মিশ্রণ (Mixture) দ্বারা লেপ কার্য করে। প্রথমে কাষ্ঠের গাত্র শিরীষ কাগজ ইত্যাদি দ্বারা মসৃণ করা হয়। তাহার পরে এক “পৌছ” মিশ্রিত লাফাদ্রব প্রয়োগ করা হয়। ইহার উপর জিলাটিন, বিশেষভাবে প্রস্তুত “সফেরা” ও জঙ্গ এই তিনের মিশ্রণে প্রস্তুত আচ্ছাদন-উপাদান (undercoat) বেশ সমভাবে মোটা তুলির সাহায্যে লেপিত হয়। আচ্ছাদনের গাত্র অতিবস্ত্রের সহিত মসৃণ

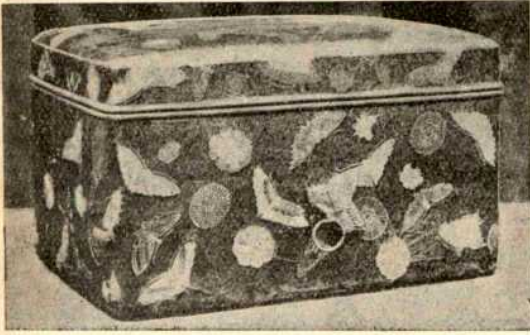


ভারতীয় লেপ চিত্রাঙ্কণ। মাদ্রাজের কানু ল অঞ্চল।

করিয়া তাহার উপর তুলি দ্বারা একস্তর লাফাদ্রব লেপন করা হয়। লেপস্তর শুকাইলে তাহা শিরীষ কাগজ ও পামিস্ পাথরের গুড়া (Pumice Powder) দ্বারা মসৃণ করিয়া তাহার উপর আবার আর এক স্তর লাফাদ্রব, এইরূপে পাঁচ ছয় স্তর লেপ দান করা হয়। উহার উপর তৈলবর্ণ (Painter's oil colour) ও তুলির দ্বারা সাধারণ তৈলচিত্রাঙ্কণের প্রথায় চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কিত এবং তাহা শুকাইলে তাহাকে অতি সন্তুর্পণের সহিত মসৃণ করিয়া সর্বোপরি এক স্তর তৈল বার্ণিসের আচ্ছাদন সংযোগ করিলেই পাশ্চাত্য প্রথা মতে লেপ-চিত্রাঙ্কণ সমাপ্ত হয়।

সাধারণ চিত্রাঙ্কণে কেবল মাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিস্তার (two dimensions) থাকে। নিপুণ শিল্পী, চিত্রে বর্ণের ছায়া ও বিভিন্ন অংশের আয়তনপ্রভেদ অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) দ্বারা তৃতীয় দিকে বিস্তারের (third dimension) একটি কৃত্রিম অনুভূতি দান করেন। ভাস্কর্য্যশিল্পে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও স্থূলতা বা বেধ এই তিন দিকেরই প্রকৃত বিস্তার থাকে।

কিন্তু তিনদিকে প্রকৃত রূপে বিস্তার রাখিবার কারণেই ভাস্কর্যশিল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্র ও তাহার উদ্দেশ্যকতক পরিমাণে চিত্রশিল্প হইতে বিভিন্ন। চিত্রশিল্পে, প্রতিকৃতি অঙ্কনে (Portraiture) অল্পসংখ্যক প্রতিকৃপের সন্নিবেশ ও বিস্তার হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রে (Landscape-painting এ) বহুসংখ্যক প্রতিকৃপের সংযোজন পর্য্যন্ত, সমস্তই সম্ভব; ভাস্কর্যশিল্পে তাহা নহে। চিত্রশিল্পে বর্ণ, আলোক ও ছায়ার প্রভেদে একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন সম্ভব; যথা রাত্রির অন্ধকার মধ্যে ক্ষুদ্র শিখায় আলোকিত এবং মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত একই



জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কন। (খৃঃ ১২শ শতাব্দী)।
স্বর্ণ-নির্মিত প্রজাপতি ও পুষ্প শোভিত কারুকার্য।

সুন্দরীর ছুইটি বিভিন্ন রূপের চিত্র। ভাস্কর্যশিল্পে সে প্রকার প্রভেদ প্রদর্শন করা যায় না। আবার ভাস্কর্যশিল্পে গুরুত্ব (mass), শক্তি (energy), অঙ্গদৌর্ভব ইত্যাদির প্রতিকৃপ যেরূপ বিকশিত হয়, চিত্রশিল্পে তাহা সম্ভব নহে।

উৎক্ষেপ (relief work) প্রথাছায়ায়ী শিল্প, (দোষ-গুণহিসাবে) চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্প, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে স্থিত। চিত্রশিল্পের ছায়া পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা আপেক্ষিক অবস্থানের আভাস দেওয়া, বা ভাস্কর্যশিল্পের প্রথায় তিন দিকের বিস্তার (কিয়ৎপরিমাণে) দিয়া প্রতিকৃপবিচ্ছাদে দৃঢ়তা ও রচনায় লালিত্য (Strength in composition

and grace in form) প্রদর্শন, এই দুইই উৎক্ষেপ প্রথায় সম্ভবপর হয়।

উৎক্ষেপন, তক্ষণ বা উৎকীরণ (engraving) এবং বর্ণযোগে চিত্রাঙ্কন এই তিন প্রথার সমাবেশে যে ললিতকলা-নিদর্শনের সৃষ্টি, তাহাতে একাধারে বর্ণছায়ার রম্যতা, গঠন ও রচনার লালিত্য ও প্রতিকৃপবিচ্ছাদের সমতা ও দৃঢ়তা সকলই পাওয়া যায়, এবং নিপুণ শিল্পী কতৃক যথাযথ ভাবে ও সামঞ্জস্যের সহিত পরিকল্পিত ও নিষ্পন্ন হইলে তাহা যে বিশেষভাবে নয়নসুখকর হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

যে সকল শিল্পপ্রথায় এইরূপ সমাবেশ দেখা যায়, তাহার মধ্যে মিনা ও লেপ-চিত্রাঙ্কন (বিশেষে জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কন) সর্বোত্তম। তরল ও স্নিগ্ধ বর্ণবৃত্ত আভ্যময় স্বচ্ছ মিনা বা লেপ-রাশি; তাহার আবরণের ভিতরে উজ্জল হইতে নিম্প্রভ নানাবর্ণে ও ছায়ায় অঙ্কিত চিত্র; চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গ যথাযথভাবে উৎক্ষিপ্ত ও উৎকীরণ; এবং সেই শিল্পদ্রব্যের সর্বোদ্বের, আলোকরশ্মির বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে প্রতিফলন কারণে, ঘনীভূত বর্ণ ও দীপ্তিপুঞ্জসদৃশ প্রকাশ;—কলাশিল্পে ইহা অপেক্ষা অধিক মৌলদ্ব্যর্থের বিকাশ কল্পনা করা কঠিন।

অবশ্য এইরূপ কলাশিল্পে ললিতকলার প্রধান প্রধান অঙ্গের ছায় অবিমিশ্র ও শুদ্ধ ভাব নাই; সূত্রাং ইহা লঘু কলা (Minor arts) নামে খ্যাত। কিন্তু চীনদেশীয় বা জাপানী (বিশেষে জাপানী) লেপচিত্রে শিল্পীর ঋজু দৃঢ় রেখাপাত, বর্ণসমাবেশে অসাধারণ বর্ণসামঞ্জস্য ও ছায়া-প্রভেদ-জ্ঞানের পরিচয়, বা তাহাদের উজ্জল ও নিম্প্রভ, শীতল ও উষ্ণ (warm & cold colours and tones) এবং পরস্পর-বিরোধী (contrasting) বর্ণসমূচ্চয়ের স্বভাবজাত বিশিষ্টতার সহিত সংস্থাপন, দেখিলে তাহাদিগকে ললিতকলার সভায় উচ্চাঙ্গনের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

ত্রিবর্ণ চিত্র-পরিচয় :—

প্রথম চিত্র—চীনদেশের লেপ-চিত্রাঙ্কন

দ্বিতীয় চিত্রের উপরের অংশ—শাহপুরের কারিগর খুদাবক্স নির্মিত লেপ-চিত্রাঙ্কিত একটি ঢালের ছবি

নীচের অংশ—বিকানীর লেপ-চিত্রাঙ্কিত টেবিল



পরও নিজে উৎসাহী হইয়া পড়াশুনা করিয়াছেন। এই কারণে ইহার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুনন্দা সেনের কন্যা কুমারী মনোবা সেন কেস্থি জের ট্রিনিটি সঙ্গীত-কলা বিদ্যালয়ের দিনিয়র বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। পিয়ানো বাদনের জ্ঞান তিনি এই বৃত্তি লাভ করিলেন।



শ্রীমতী ললিতা বালসুন্দরম্

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী বালসুব্রাহ্মণ্যম্ মাদ্রাজ প্রদেশের গাল্গাইডের সহকারী নেতৃত্ব পদ পাইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এইরূপ সম্মান পাইসেন।

ফোজদারী বিচার বিভাগে ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহে ভারতীয় নারীদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাইয়ের ভগ্নীসমাজের সভানেত্রী শ্রীমতী তারাবাই মানেকলাল প্রেমচাঁদ বোম্বাইয়ের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কোইম্বাটোরের বিখ্যাত সমাজ-সেবা কর্মী শ্রীযুক্ত ললিতা বালসুন্দরম্ তত্রত্য জেলা শিক্ষা-পরিষদের ও শ্রীমতী ক্যাথারিন সুদায়হ কৃষ্ণা জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।



শ্রীমতী অশোক দেবী

কলিকাতায় বিগত মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দুইজন বাঙালী মহিলা—শ্রীমতী মায়া দেবী ও শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী—সদস্য পদ প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই পুরুষ ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনে এ-পর্যন্ত একজনও মহিলা নির্বাচিত হইতে পারিলেন না, ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয়। বোম্বাইয়ের পুরুষ ভোটারগণ এ-বিষয়ে খুব উদার।

প্র

জীবনদোলা

শ্রী শাস্তা দেবী

(১০)

সকাল না হইতেই গৌরী উঠিয়া পড়িয়াছে। মেঘটা কাটে নাই, সূর্য্যও সহরের বাড়ীর আড়ালে অনেক নীচে পড়িয়া ; কাজেই তখনও চারিদিকেই অন্ধকার। সেই আধ-অন্ধকারেই গৌরী স্নানাদি শেষ করিতে চলিল ; আলো হইলেই কলেজের বই কয়খানা একবার দেখিয়া লইবে ; তারপর ভূষণ-বাবুদের আতুরআশ্রম ঘুরিয়া আসিয়াই তাহাকে আহারপর্ক সমাপন করিয়া কলেজ রওনা হইতে হইবে।

সবে যখন উঠানে আসিয়া রোদ পড়িয়াছে তখনই সঞ্জয় আসিয়া হাজির। পরের জন্ত বেগারখাটা তাহার চিরদিনেরই কাজ, তাহাতে তাহাকে কোনদিন পরাশ্রুণ দেখা যায় না ; কিন্তু কাজে এমন ঘড়ির কাঁটার মত তৎপরতা ইতিপূর্বে তাহার কেহ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন ভোর হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাজগুলা তাহার দরজায় পেশনের খাউ-ক্লাশ যাত্রীদের মত ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সূতরাং প্রত্যেকটির প্রতি নজর দিতে দিতে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সময় কখন যে পার হইয়া যায় তাহার ঠিক নাই। অনেক সময় ট্রেন ছাড়িবার পর টিকিট দেওয়ার মত অবস্থাও সে অনেকের ভাগ্যে ঘটাইতে বাধ্য হইয়াছে ; কারণ সূর্য্যদেব একটা দিনরাত্রিতে চক্ষিণ ঘণ্টার বেশী এক মিনিট সময় দেন না, কিন্তু আহার-নিদ্রাও কাজ কর্ম্মে ছত্রিশ ঘণ্টার উপবৃত্ত দৈনিক খোরাক সঞ্জয় অনেক সময়ই সংগ্রহ করিয়া বসে। সঞ্জয়কে যে দুই দশদিন দেখিয়াছে সেই বুঝিবে যে, আজ সমস্ত কাজকে নিষ্ঠুরভাবে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া সে পলাতক আসামীর মত লুকাইয়া এখানে আসিয়া জুটিগাছে।

ইতিহাসের মোটা বইখানা কোলে করিয়া তাহার ঘন-মন্নিবিল্লি অক্ষরগুলোর চঞ্চল মনটাকে নিবিল্লি করিবার চেষ্টায় গৌরী বোধহয় দুই মিনিটও বসে নাই, এমন সময় সঞ্জয়কে উঠানে ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া উপরের

বারান্দা হইতেই ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, “ওকি, আপনি যে এত সকাল বেলাতেই !”

সঞ্জয় বলিল, “সকাল বেলাতেই ত আস্তে বসেছিলেন, রাত্রে এলে চলবে কি ক’রে ?”

গৌরী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “আমি ত বলেছিলাম, কিন্তু চপলা বললে ‘সঞ্জয়বাবুকে সকালে আস্তে বললে রাত্রে আসেন, এইটাই হচ্ছে আমাদের দেশের কর্ম্মীদের নিয়ম’।”

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ, সেকথাটা ঠিক বটে। কর্ম্মীরা যে-কাজটা করতে সব-চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখান, কাগজে কাগজে জয়-হুন্দুভি বাজিয়ে নিজেদের কীর্ত্তি ঘোষণা করেন, সেই কাজটাই করবার বেলা তাঁদের টিকির ডগাও দেখা যায় না। এটা আমার জাতভাইদের একটা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু আমি নিজেও যে ঐ পথের পথিক অপরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে তা বিশ্বাস হয় না।”

গৌরী নীচে আসিয়া বলিল, “আজ যে আপনি ঠিক সময় আসবেন তা আমি কিন্তু ধ’রেই রেখেছিলাম। অবশ্য এত আগে আসবেন তা ভাবিনি। আপনি ঘরে বসুন, আমি বাই চট্ ক’রে মাসিমাকে খবর দিয়ে আসি গে ; নাহ’লে শুধু শুধু খানিকটা সময় নষ্ট হ’বে।”

সঞ্জয়ের মুখে আসিল, “না হয় খানিকটা সময় জীবনে নষ্টই হ’ল ; সব সময়টাকেই পাট-গুদামের বস্তার মত আগাগোড়া কাজে ঠেসে দিতে হবে বিধাতা কি আমাদের উপর এমন কোনো আইন জারি করে দিয়েছেন !”

কিন্তু তাহার কিছুই বলা হইল না। কাজের হত্ব ধরিয়াই গৌরীর সঙ্গে তাহার পরিচয়, কাজের সহায় বলিয়াই গৌরীর তাহার সহিত কথাবার্তা, কাজে আপনাকে পিষিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিতেই তাহার সহিত গৌরীর পরামর্শ ; তাহার দুইজন যে কাজের মানুষ বলিয়াই মানুষের কাছে পরিচিত, তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অপরেও ভাবে না, তাহাদের

নিজেদেরও যেন ভাবিতে লজ্জা হয় ; এমন অবস্থায় হঠাৎ অকাজের গুঞ্জে সময় নষ্ট করিতে গোবীকে সে ডাকিবে কি বলিয়া ? কিন্তু তবু আপনার কাছে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই অলস গুঞ্জেই সে আজ কাজের সময়ে আগাই কাজের অভিসাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু কাজটুকু মনে থাকিলে তাহার অপর দশটা হাতের কাজের কাজ ফেলিয়া এতদূরে সে সবাব আগে ছুটিয়া আসিত না।

হুই মিনিট না বাইতেই গৌরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “মাসিমা এখনও আধঘণ্টা খানেক দেরী আছে। আপনি একলাটি চুপ ক’রে ব’সে থাকবেন ? কাউকে ডেকে দিলে হয় না !”

ডাকিবার মানুষের মধ্যে মেয়েদের আশ্রমে চঞ্চলা ছাড়া আর বে দ্বিতীয় প্রাণী থাকিতে পারে না, তাহা গৌরীও জানিত, সঞ্জয়ও বুঝিল। কিন্তু চঞ্চলার নামটা করিতে গৌরীর কেনন যেন বাধিয়া গেল। সঞ্জয়ের সহিত তাহার যে কেবল কাজের সম্পর্ক এইটুকু সঞ্জয়কে সে বুঝাইতে চায়, অথচ বাহাব কাছে সে এত কাজের সেবা আদায় করিতেছে তাহাকে কাজের অভাবে অবসর সময়টুকু একলা ফেলিয়া চলিয়া বাইতেও ভদ্রতা বাধিতেছিল। মনের নিম্নত কোণে এই ক্ষুদ্র অবসর-কালটুকু সঞ্জয়ের সঙ্গে বাপনের যে একটা স্নেহ লুকাইয়াছিল ভদ্রতাজ্ঞান তাহাবই দহাষ হইয়া উঠিল দেখিয়া গৌরী আপনার মনকে শাসন করিবার একটা উপায় খুঁজিতেছিল। মনে হইল, চঞ্চলাকে ডাকিয়া দিলে তাহার ভদ্রতা রক্ষাও হইবে এবং সঞ্জয়ও হয়ত বেশী খুসী হইবে। কিন্তু তবু একেবারে তাহার নামটা সে কবিত্তে পারিল না, যদি সঞ্জয় মনে করে গৌরী ইহার দ্বারা কিছু ইঙ্গিত কবিত্তেছে, অথবা যদি সে ভাবে গৌরী চঞ্চলাকে হিংসা করে। সঞ্জয় বলিল, “কাকে আর ডাকবেন ? সকলেবই কাজ আছে। তা ছাড়া আশ্রমের মেয়েদের পুরুষ অভ্যাগতদের সামনে আসবারও নিয়ম নেই।”

গৌরী বলিল, “সকলের সামনে আসবার নিয়ম নেই বটে, কিন্তু আপনাদের সামনে হুই একজনের আসবার নিয়ম আছে বৈকি ! চঞ্চলা চপলারা ত সর্বদা আপনাদের সঙ্গেই কাজ করছে।”

সঞ্জয় এবার একটু ঠেস দিয়া বলিয়া ফেলিল “সেই-জন্তেই ত মনে হয় আপনারই মত তাদেরও অকাজ সময় নষ্ট কন্বার অবসর কম।”

গৌরী চুপ করিয়া গেল। কথাটা তাহার লাগিয়াছে বুঝি। একটু লজ্জিত হইয়াই সঞ্জয় বলিল, “হ্যাঁ, চঞ্চলাকে সেই চিঠিখানার কথা একবার জিজ্ঞাসা করলে হ’ত তাকে একবার ব’লে দেখতে পাবেন যদি সময় হয় কাজটা সেবে নিই।”

কি কাজ ও কি চিঠি সঞ্জয় যেন তাহা গৌরীকে নাইবাব জন্তই কথাগুলো ঐভাবে বলিল, কিন্তু তবু গৌরী কোনো কোতুহল না দেখাইয়া শুধু চঞ্চলাকে ডাকিয়া আনিবাব জন্ত উঠিয়া চলিয়া গেল।

কি-একটা আনন্দের সৌরভ সকালবেলা কাজের ছুতা কবিয়া সঞ্জয়কে বহুদূর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল ; কিন্তু কাছে আসিতেই সে স্বাসটুকু ফুবাইয়া গিয়া তাহা বেননাব ক্ষতগুলি নানা স্থতির কণ্টকক্লিষ্ট হইয়া উঠিল দেখিয়া মনটা তাহার অনেকখানি মুস্ড়াইয়া গেল।

চঞ্চলা চিঠিখানা হাতে করিয়া আসিয়া ঘবে ঢুকিল ; আজ আবার অনেকদিন পবে তাহারা ভীড়ো বাহিরে পবম্পবেব কাছে আসিয়াছে, বহুদিন তাহার স্তবোগ হয় নাই, একথা বুঝিয়াই গৌরী দূরে সরিয়া গেল। এই দুইটি মানুষকে গৌরী আগে আপনার কল্পনায় যে-স্বপ্নে বাঁধিয়াছিল, এখন তাহার ভিতর নানা খটকা আসিয়া স্তত ছিঁড়িয়া দিতে লাগিল। তাহার কল্পনা যদি সত্য হইত তাহা হইলে সঞ্জয়ের ব্যবহারে যে-আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ার কথা আজ ত সে তাহার বিপরীতটাই দেখিল। আব যদি ইহা মিথ্যা হয় তবে তাহার নিজ কর্ণকেই অবিশ্বাস করিতে হয়। তৃতীয় আব-একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চঞ্চলার জন্ম-পরিচয় পাইয়া সঞ্জয়ের মন ফিরিয়া গিয়াছে কিন্তু সঞ্জয়ের মত পুরুষের সন্ধে এ সিদ্ধান্তটা মনে আন অসম্ভব বলিয়াই গৌরীর বোধ হইল। তা ছাড়া সঞ্জয়ের ব্যবহারে কোনো লজ্জা কি কুষ্ঠার পবিচয়ও ত সে দেখে না। বাহাতে মনে হইতে পারে যে, সে চঞ্চলার সহিত বোঝা-পড়র একটু ভুল কি ভ্রান্তি পাকাইয়া বসিয়াছে। আপনার কল্পনাটাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে করিয়া তাহার জায়গাব একেবার নূতন

একটা কিছুকে খাড়া করিতে তাহার নিজের ইচ্ছা হইত বলিয়াই প্রণয়ের পথের বিচিত্র কুটিল গতির দোহাই দিয়া সে আপনার প্রথম কল্পনাটাকেই প্রাণপণে সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। মনকে বলিত, “চঞ্চলার সহিত সঞ্জয়ের সম্বন্ধটাই সত্য; আমার স্বার্থাশ্রমী মন তাহাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চায় বলিয়াই সত্যের দিকে অন্ধ হইয়া বসিয়াছে।”

গৌরী ঘরের বাহিবে বাইতেই চঞ্চলা বলিল, “চিঠিখানা ভাগ্যিস তুমি আমাকে পড়তে দিয়েছিলে, নাহ’লে একে পর তাতে আমার মত হয় অস্পৃশ্য পবকে যে কেউ কোলের মেয়ে হারানো মাণিক বলতে পারে তা বিশ্বাস কর্তেই পাবতাম না। পিতৃস্নেহ বাই হোক, মাতৃস্নেহ যে একেবারে মিথ্যা নব এটা আজ আমাকে স্বীকার করতে হবে। আমার মা যখন আমাকে ফেলে চ’লে গেল, তখন তার হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েই বিজ্ঞপ করেছিলাম, আজ পর্যন্ত ভাবিনি কতবড় প্রেম তাকে এ ত্যাগ-স্বীকার করিয়েছে। আজ আর-এক মায়ের মুখে শুনে প্রথম ভেবে দেখছি যে, সত্যিই ‘সন্তানের সঙ্গে বৃকের শিরাগুলো পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে তাকে হয়েছিল যাতে তারই মত স্বর্ণাঙ্গীবন না তাব জীবনমণিকে যাপন করতে হয়। মাতৃস্নেহ গৌরবের সঙ্গে কলঙ্কটাও যদি সে সগর্বে লোকের চক্ষের সম্মুখে তুলে ধরে দেখাবার স্পর্ধা ক’বে তাতে ত তার সন্তানকেই অপমান করা হ’ত। নির্দোষী সন্তানকে চিরকলঙ্কের টিকা সে পরাতে চায়নি, তাই অসীম সাহস নিয়েই জীবনের একমাত্র স্মৃতি ও অবলম্বনকেও সে ত্যাগ ক’রে দূরে চ’লে যেতে পেরেছিল।’ তোমার মার চোখ দিয়ে না হ’লে আমার মাকে এমন ক’বে আমি কোনোদিন দেখতে শিখতাম না। আমার মাকে যিনি চিনি দিয়ে দিলেন সেই নূতন-পাওয়া মাকে তোমার হাতে প্রণাম পাঠাচ্ছি।”

সঞ্জয় বলিল, “কিন্তু মা যে তাঁর হারানো মণিকে দেখবার জন্যে পাগল হ’বে উঠলেন তার কি করা যায়?”

চঞ্চলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না, না, সে হ’বে না। আমার অমন মাকে নিজের মা ব’লে পরিচয় দেবার যখন ভাগ্য আমার নেই, তখন দশজনের মাঝখানে তাঁকে দেখবার অধিকারও আমি চাই না। মাকে বোলা ভাগ্যে

ধাক্কা দেওয়ার মতো তাকে নিজেই কোনোদিন দেখে দণ্ড হ’য়ে আসবে।”

সঞ্জয় বলিল, “তোমার ভাব আমার মত অর্ধাঙ্গীনের হাতে দিবে মা নিশ্চিন্ত হ’তে পারছেন না। তিনি নিজে না তদারক ক’লে নাকি কোনো সুব্যবস্থাই হবে না।”

চঞ্চলা একটু আনন্দের হাসি হাসিল। তারপর বলিল, “কিন্তু মা কি জানেন না যে, তাঁর অপাব স্নেহও সমাজে আমার জ্ঞাত ফিরিয়ে দেবে না? আমার যেটুকু সুব্যবস্থা সে আমার নিজের শক্তি ও চরিত্রের জোরেই ক’রে নিতে হবে। এখানে কেউ আমার সহায় হ’তে পারে না। একজনের শুভ ইচ্ছা ত শতজনের গঠিত সমাজকে ঠেলে ফেলতে পারে না।”

সঞ্জয় বলিল, “ঠেলে ফেলে দেওয়ার ত কোনো দরকার নেই। মার শুভ ইচ্ছা অপবের মনে শুভ ইচ্ছা আর সহায়ত্বটিকে জাগিয়ে তুলতে পারে; তেমনি ক’রেই তোমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে মা সবচেয়ে বড় সহায় হ’তে পারেন।”

চঞ্চলা বলিল, “আমার পরিচয় অপরের কাছে প্রকাশ কর্তে যখন আমি পাব না এবং আমার অর্ধ পরিচয় অর্থাৎ হীন জন্মমাত্রের পরিচয় যখন আমি কাউকে দিতে চাই না, তখন আমার সমাজে প্রতিষ্ঠা না খোঁজাই উচিত। পৃথিবীতে আমার একলা থাকাই ভাল। পরকে ছলনা ক’রে অথবা পরের ককণা উদ্বেক ক’বে পতিতোদ্ধারের কার্যে তাদের আমি লাগাতে চাই না।”

সঞ্জয় শিরিয়া উঠিয়া বলিল, “ছিঃ চঞ্চলা, নিজের সম্বন্ধে এমন ক’রে কথা তুমি বোলো না। আমাদের চেয়ে একবিন্দুও নীচে যে তুমি নও, তা কি তোমাকে ব’লে দিতে হবে? সত্যি, চঞ্চলা, এমন ক’বে দিন চলবে না। তুমি আমাকে অমুমতি দাও আমি মার সাহায্যে তোমাকে আপনার বলবার অধিকারটুকু যেমন ক’রে পারি সংগ্রহ ক’রে নি। মা ত লিখেইছেন, ‘আমি হাতে পায়ে ধ’রেও তোমার বাবার কাছ থেকে আমার হারানো মেয়েটিকে ফিরে নিতে চাই।’”

চঞ্চলা বলিল, “সে হয় না।”

সঞ্জয় বলিল, “কেন হবে না চঞ্চলা? মা যদি তাঁর সন্তানকে ফিবে পাবার জন্তে সংগ্রাম করবে চান, তুমি কেন তাতে বাধা দেবে?”

চঞ্চলা বলিল, “মনে হবে আমিই যেন চক্রান্ত করে তোমাদের সঙ্গে টেনেছি।”

সঞ্জয় বলিল, “যা সত্য নয় তা মনে হবে বলে তুমি কোনো মানুষের আন্তরিক ইচ্ছায় বাধা দিতে পারো না। তা ছাড়া তুমি জান না যে, আমার মা কত সাবধানী। তিনি যখন একথা তুলবেন তখন তাঁর কথার ভাবে তুমিই একথা জান কি না বাবার সন্দেহ হবে।”

চঞ্চলা বলিল, “আমি যে সমস্তই জানি তা তিনি জানেন।”

সঞ্জয় বলিল, “কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে তা তিনি জানেন না। তুমি আর কোনো আপত্তি করো না, লক্ষ্মীটি; আমি কাউকে কোনো অনুরোধ করব না—কিন্তু মা নিজ ইচ্ছায় যা করতে চাইছেন তাতে আমি বাধা দিতে চাই না।”

চঞ্চলা বলিল, “আচ্ছা, তাই হবে। এখন আমি চললাম, নইলে নানা কথা উঠতে পারে।”

চঞ্চলা দ্রুত পদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সঞ্জয় আপনার কথা ও ঘরের কথা কোনো দিন ভাবে নাই, পরের কথা ভাবাই তাহার কাজ। আজ কিন্তু আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই নানা চিন্তা তাহাকে বিরিয়া ধরিল। কোথা হইতে এই চঞ্চলা আজ তাহার জীবনের সহিত এমন করিয়া জড়াইয়া পড়িল যে, তাহাকে ছাড়িয়া এক পাও কোনো দিকে সরিয়া যাইবার তাহার উপায় নাই? এই স্বেচ্ছাজ্ঞিত দায়িত্বের বোঝার জন্ত ইহা কি পর জগতে কাহারও নিকট সে দায়ী নহে বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে এতটুকু অবিচারের ভয়ে সে পদে-পদে আপনাকে অপরাধী করিতেছে। পাছে সে স্বার্থপরের মত আপনার সুখ খুঁজিতে গিয়া চঞ্চলাকে অবহেলা করে এই ভয়ে আপনার সকল কাজকেই সে ওজন করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। হুদিন আগে এমন দিন ছিল যখন বাস্তবিকই পরহিতচিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল, আত্মসুখ বলিতে ভিন্ন আর-এক পর্যায়ের জিনিষ তখন তাহার মনোরাজ্যে দেখা দিত না; সুতরাং আপনাকে

স্বার্থপর বলিয়া দোষ দিবার তাহার কোনো প্রকৃত কারণ ছিল না।

কিন্তু প্রথম যৌবনে সকল মানুষেরই মত যে একটা সুখ-কল্লনা তাহার মনটাকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার পর কর্মক্ষেত্রের একটানা ভিড়ের ভিতর মাঝে মাঝে কেবল ক্ষণিকের মত চোখের সমুখ দিয়া যাহা ঝলকিয়া গিয়াছে মাত্র আজ এতদিন পরে সেই সুখ-স্বপ্ন তাহাকে শরনে জাগরণে বিরিয়া ধরিতেছে। সকলের জন্ত নয়, কেবল নিজের জন্ত আর আর-একটি মাত্র মানুষের জন্ত জীবনটাকে একবার পরিপূর্ণরূপে পাইতে সাধ হইতেছে। এই কাজের ভিড়ের বাহিরে কোনো-একটা মানুষ তাহাকে কাজের জন্ত নয়, গুণের জন্ত নয়, কেবল তাহারই জন্ত, তাহার দোষ-গুণ, অপূর্ণতা, ক্র্যাপামি, পাগলামি সব-কিছুর জন্তই আপনার বলিয়া কাছে টানুক, কর্মীর যোদ্ধাবেশ ছাড়িয়া ভদ্রতার ছদ্মবেশ ছাড়িয়া আপনার ঘরোয়া সরল বেশে বাহার বুকের কাছে পড়িয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকা যায় এমন একটা একান্ত নিজের মানুষ নিরাশার তাহাকে লইয়া সকল ভুলুক এই কামনা মনে আজ জাগিয়াছে বলিয়া আপনার সকল চিন্তা সকল কাজেই স্বার্থের গন্ধ পাইয় সে চমকিয়া উঠিতেছে।

গৌরীকে সেই স্বপ্নরাজ্যের রাণীরূপে যেন সে দেখিয়াছে এ সন্দেহটা তাহার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। সুখ-চিন্তার হাত হইতে এই তরুণ যৌবনেই আপনাকে ছিনাইয়া লইবার জন্ত যে আপনার চারিদিকে কেবল প্রহরীর পর প্রহরী খাড়া করিতেছে, সেই পুষ্প-পেলবার কঠোর তপস্তা সঞ্জয়ের মনে এমন একটা আঘাত দিতেছিল যাহাকে করুণা বলিতে তাহার লজ্জা হয়, সহানুভূতি বলিলেও ঠিক বোঝানো যায় না, অথচ যাহা গৌরীর সম্বন্ধে তাহাকে সর্বদা জাগরুক করিয়া তুলিতেছিল। তাহাও স্বপ্ন-সাধের সহিত এই তপঃক্লিষ্টার প্রতি মমতাটা এমন এক হইয়া উঠিতেছিল যে, এখানে সাবটাকে কেবল মাত্র আপনার একটা স্বার্থের প্রকাশ বলিয়া সে ছাটিয়া ফেলিতেও পারিতেছিল না। আপনার স্বার্থ ভুলিব বলিলে বাহা ভোলা সহজ, গৌরীর আত্মনিপীড়িত স্নেহময় মুখখানি মনে করিলে তাহা ভোলা তত সহজ থাকে না। এই

সমস্তার মীমাংসা! সে কি করিবা করিবে? গৌরী তপস্তাব হাত হইতে গৌরীকে রক্ষা করিবার অধিকার তাহাকে অর্জন করিতে হইবে, আবার চঞ্চলার নির্বাসন হইতে তাহাকে মুক্তিও সম্ভবকেই আনিয়া দিতে হইবে। কিন্তু একলা সে এই দুই পথের মাঝখানে স্বার্থের গন্ধ যেদিকে সেই দিকেই যদি বেশী ঝুঁকিবা পড়ে?

গৌরী আসিয়া বলিল, “মাসিমার হয়েছে; এইবার তবে চলুন যাওবা যাক!”

সময়ের ইচ্ছা করিল বলে, “আমি কি কেবল তোমার আশ্রমের পথ দেখাতেই এসেছি? তপস্বিনী হ’রে বিশ্বের সেবার চিন্তায় কাছের মানুষগুলোকে ‘এমন ক’রে অবজ্ঞা কর কি ক’রে?’”

কিন্তু মুখে বলিল, “হ্যাঁ, চলুন, আপনার আবার কলেক্স আছে। ফিরতে দেবী হ’লে ষাওয়া-দাওয়ারও সময় পাবেন না।”

তিনজনে পথে বাহির হইয়া পড়িল। গৌরীর পথ হাঁটার কোনো দিন বিশেষ অভ্যাস ছিল না; কিন্তু ভবু সকল সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া সে হৈমবতী ও সঞ্জয়ের সঙ্গে অচ্ছন্দেই রাজপথ বাহিয়া চলিল।

(১১)

ছোট একটি তিনতলা বাড়ী। তিনতলায় তিনখানি মাত্র ঘর; তাহার একখানিতে তিনটি পুরুষ কর্ম্মী এবং অন্য দুইখানিতে সপরিবারে ভূষণ-বাবু থাকেন। তাহার দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র। গৃহিণী ও বড়মেয়েটি সংসারের সমস্ত কাজ করেন, তাহার উপর আছে রোগীর সেবা।

একতলায় ও দুতলায় পাঁচখানা করিয়া ঘর, সবই রোগীদের থাকিবার জন্য। একতলায় পুরুষেরা থাকে, দোতলায় থাকে মেয়েরা।

হৈমবতী, সঞ্জয় ও গৌরী বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিতেই ভূষণবাবু ষ্টোভের উপর হইতে ফুটন্ত জলের কেটলিটা ও টেবিল হইতে একটা তুলার প্যাকেট হাতে করিয়াই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার দুইটা হাতই জোড়া, স্তূতরাং সহাস্যমুখে কেবল একবার মাথাটা নোয়াইয়াই নমস্কারটা সারিয়া গেলেন।

তারপর হৈমবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের মত তিনজন মানুষকে সকালবেলাই আমাদের মাঝখানে পেলাম। আপনারা ত্যাগী, কর্ম্মী, আপনাদের আদর্শেই আমাদের মাথা ভুলে চলতে হবে।”

হৈমবতী বলিলেন, “আপনি সঙ্গীক সম্ভান-সম্ভতি নিয়েও যে ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তার তুলনায় আগার সন্ন্যাসী মানুষের এ সামান্য কাজ ত কিছুই নয়।”

ভূষণ-বাবু সগজ্জ সম্মে চকিত হইয়া বলিলেন, “আপনি অমন কথা বলবেন না। আসুন, সকলে ভিতরে আসুন।”

সকলে রোগীদের ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ছোট ছোট ঘর, একখানা ঘরে তিনখানার বেশী খাট ঘরে না। ভূষণ-বাবু বলিলেন, “রোগী কম থাকলে ঘরে ঘরে দুজন ক’রেই আমরা রাখি। নেহাৎ যখন বেশী হয় তখন ওবি মধ্যে তিনজনকে স্থান দিতে হয়। যদিও তাতে ওদেরই স্বাস্থ্যের ভয় আছে।”

হৈমবতী বলিলেন, “আপনারও ত লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়, একটা আপিসঘর রাখেন-নি?”

ভূষণ-বাবু হাসিয়া বলিলেন, “গৃহিণীর ভাঁড়ার-ঘরের কোণেই আমার আপিসের সমস্ত সাজ-সরঞ্জামকে স্থান দিতে হয়েছে; আর দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা ওই বারাণ্ডাতেই সেরে নিতে হয়।”

বারাণ্ডার কোণে একটা চৌকা টেবিল, একটা মোটা কাঠের চেয়ার ও দুইখানা ধূসর রঙের বার্ণিশকরা বেঞ্চি ঝড়জলের চিহ্ন বুকে করিয়া বিস্রাজ করিতেছিল।

দোতলায় মেয়েদের ঘরগুলি পৌর হইয়া সকলে তিনতলায় উঠিলেন। মেঝেতে বসিয়া ভূষণ-বাবুর ছোট মেয়েটি একটা লালপাড় দিয়া তাহার পুতুলের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল এবং কোমরে একটা কাপড়ের পুটলি লইয়া সেক দিতেছিল। বাবাকে দেখিয়া সে পরম গম্ভীর ভাবে বলিল, “বাবা আমার ছেলোটার বাত বড় বেড়েছে, কালী ডাক্তারকে একবার খবর দাও না!”

সঞ্জয় তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “এই যে আমি একজন ডাক্তার, কি হয়েছে দেখি তোমার ছেলের।”

খুকী বলিল, “সারারাত চাচাচ্ছে, দিনে রুগীর সেবা

ক'ব আবার রাস্তিরে ছেলে চোঁচালে কি বাঁচা যায়?”

ভূষণ-বাবু গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ওগো, তোমার জোতাপাখী মেয়েটি যে তোমার সব গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দিলে!”

গৃহিণী বলিলেন, “ওটা অমনি বাঁদর, আমি যা বলব যা ক'ব সব ওর করা চাই।”

হেমবতী বলিলেন, “এইসব কচি কচি ছেলে-পিলে নিয়ে আপনি রুগীর সেবা করেন কি ক'রে? ও কাজটার জন্ত কঁঠার কাছে ছুটি নিতে পারেন না!”

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, “তা আর কি ক'রে হয়! তাহলে একেবারে গোড়াতেই ছুটি নিতে হ'ত। এ বোঁগ ত আর ওর আঙ্গকের নয়। আমার বিয়ের আগের থেকেই এসব চলছে। ছেনেগুনেই ত ঘরে এসেছিলাম। কেবল বড় খুকী হ'বার সময় থেকে ওর কাছে কথা নিয়েছিলাম যে, বাড়ীতে সংক্রামক রুগী আনতে পাববেন না। দেখবেন এখন, আমার রুগীদের বেশীর ভাগের রোগই বার্ক্কোর রোগ। ওদের সেবা মানে বাতের মালিশ, ফোমেন্ট, দুধবার্ণি জোঁগানো আর বুড়োবয়সের প্রণাপ শোনা।”

গৌরী বলিল, “ঘরের কাজকর্ম কে করে?”

গৃহিণী বলিলেন, “একটা মেথর আর মেথরাণী আছে, তারাই মোটামুটি করে। উপরি তদারকটা আমাকেই করতে হয়। বড়খুকীটা ইঙ্কল যাবার আগে ভাত ডাল কোটানোটা একটু দেখে ততক্ষণে আমি ওদিক সেরে আসি। ছপুরে আবার ছেলেপিলেদের সেলাই ফোঁড়াই আছে, তার উপর ওদেরও চিঠিটা এটা সেটা নিয়ে লেগে থাকতে হয়। সেই হয়েছে বিপদ।”

সঞ্জয় বলিল, “আপনার সেই কাজের সহায় হ'বার জন্তেই ইনি এসেছেন। উনি এখানে থাকবেন না বটে, কারণ ওর আবার কলেজে পড়া, নাইট ইঙ্কল পড়ানো ইত্যাদি নানা কাজ আছে। তবু রুগীদের চিঠিপত্র লেখা পড়া, এদিক-ওদিক একটু দেখা-শুনা করা এগুলো উনি ক'রে যেতে পারবেন নিজের সুবিধা-মত।”

গৌরী বলিল, “আমি সেলাই-ফোঁড়াইও একটু-আগটু জানি, দরকার হ'লে তাও আমাকে দিয়ে মাঝে-মাঝে করিয়ে নেবেন।”

গৃহিণী বলিলেন, “এত কাজের উপর আপনি আপনার অত কাজ কখন ক'বেন ভাই? আমাদের মত শুধু ঐ নিয়ে থাকলেই ত আপনার চলবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বাঁধা হ'য়ে গেছে, এখন কেবল কলের মত একভাবে কাজ ক'রে যাওয়া, ভাবনা চিন্তা সমস্তা গীমাংনা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাতে হয় না, কাজেই কাজটা সহজ হ'য়ে গেছে। আপনারা ছেলে মানুষ, আপনাদের সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে, তার জন্তে সকল দিকে প্রস্তুত হ'তে নানা ব্যবস্থা করতেও ত আপনাদের সমর্থ চাই।”

গৌরী বলিল, “আমার ভবিষ্যৎও অন্ত ভাবে একেবারে কচি বয়সেই বাঁধা হ'য়ে গেছে, তার জন্তে বড় বয়সে ভাববার আর আমার কোনো দরকার নেই। বাকি দিনগুলো সমস্তই এখন কোনো ফাঁক না রেখে কাজের কলে নির্দিষ্টারে ফেলে দেওয়া যায়।”

ভূষণগৃহিণী বিস্মিত হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি গৌরীকে কুমারী মনে কল্পিয়াছিলেন; ভাল করিয়া তাকাইয়া সে যে বিধবা এ সম্ভেদটা তাহার মনে আসিল। মনটা ব্যথা পাইল, এভাবে কথাটা না তুলিলেই হইত। বলিলেন, “আপনার বয়স এত কচি, কত বড় বড় কাজ আপনার পথ চেয়ে প'ড়ে আছে। আপনারা মাথা খাটিয়ে কত নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি ক'রবেন। আমরা ছেলেপিলে নিয়ে বাঁধা কাজেই সুবিধে পাই। তা ব'লে কলের চাপে নিজেকে পিষে বাঁধা কাজ বার ক'বার সময় এখনও আপনার হয়নি।”

গৌরী বলিল, “কিন্তু কাজের মানুষ হওয়ারও ত একটা সাবনা আছে। নিজেকে আঙঠে-পুঠে যদি কাজ দিয়ে না বেঁধে ফেলতে পারি, যদি খেয়াল-খুসীর ফাঁকে মনটাকে অন্তপথে ভেসে যেতে দিই তাহ'লে সাবনায যে বাঁধা পড়বে, মনটা অগস হ'য়ে উঠবে, নিজেকে আপনাদের মত বড় ক'বে গ'ড়ে তুলব কি ক'রে?”

সঞ্জয় বলিল, “মহুযাধর্মকে বলি দিয়ে যে-সাবনা, তাকে কি সাবনা বলে? মানুষের দেহ-মনকে আনন্দ দেওয়া

অবকাশ দেওয়াকে যদি আলস্য বলত তাহলে পৃথিবীতে প্রতি পদে পদে এত আনন্দ এত অবকাশের উৎস বিধাতা খুলে রাখতেন না।”

হৈমবতী বলিলেন, “গৌরী আমার একেবারে তপস্বিনী গৌরী হ’য়ে উঠতে চায়। দেখছ না যা, এই যে এঁদের এমন সেবা আর কষ্টের সংসার এর ভিতরও থোকা-খুকীদের সঙ্গে খেলার খেলুড়ী হ’য়ে মাকে যোগ দিতে হচ্ছে, হাসি-গল্পে আনন্দে সময় কাটাতে হচ্ছে। সেটা কি সাধনা থেকে চ্যুতি? পৃথিবীর আনন্দ পৃথিবীর হাসি খেলা, বিশ্রাম সৌন্দর্য্য এই সব কিছুকেই যদি ছেঁটে ফেলে দাও তাহলে বুঝবে কি করে কোন মানুষটা দুঃখী আব কোন মানুষটা সুখী? বিবাতা আমাদের অন্তে চারিদিকে যে আনন্দের ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন তার স্বাদটুকু গ্রহণ করতেও যদি ভয় পাও, তাহলে হতভাগ্য বঞ্চিত মানুষগুলোর ব্যথা যে কি তা জানবে কি উপায়ে? বড় রকম ত্যাগ করতে হলে সকল আনন্দের বন্ধনকেই স্বীকার করতে হবে না হ’লে যে আনন্দ কখনও নিজের জীবনে ভোগ করনি, সেটা ত্যাগের কোনো অর্থ হয় না। সন্তানকে কোলে একদিন পেয়েছিলুম ব’লেই তাকে যেদিন হারাগাম, সেদিন মাতৃহীনের দুঃখ খানিকটা বুঝলাম। জীবনে পরের ছেলের অন্তে যেটুকু করতে পেরেছি, সেটুকু নিজের ছেলেকে ভালবাসতে তাকে নিয়ে খুলা-খেলা করতে শিখেছিলাম ব’লেই।”

ছোট খুকী আসিয়া বলিল, “মাগো, বাইরের মানুষদের চা খেতে বলবে না? খালি বকব বকব করছ কেন সবাই? দিদি কতো—ক্ষণ চায়ের জল ক’রে ব’সে আছে।”

খুকীর মা বলিলেন, “সত্যি ত, খুকী আমাকে আসল কাজের কথাটা মনে করিয়ে দিলে। আপনারা কৈকান্দ সকাশে বেরিয়েছেন, এখনও মুখে জল পড়েনি, সেটা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল।”

মাযের ডাকে দশ এগার বছরের মেয়ে বড় খুকী টেতে করিয়া চা পেয়ালা পিবিজ ইত্যাদি আনিয়া হাজির করিল। গৌরী চা খায় না, কিন্তু ইহাদের তাহা সে বলিতে পারিল না। কারণ সে বেশ বুঝিল যে, যদি সে থাইবে না বলে তবেই এই শত অসুবিধার ভিতরও ইহারা তাহার জন্ত অন্ত

আয়োজনে লাগিয়া যাইবেন। গৌরী হৈমবতীকে বিম্বিত করিয়া সকলের সঙ্গে চা রুটি ও মাখন খাইল।

সাবনা ও ত্যাগের প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়া গেল। গৌরী যে কঠিন একটা পণ করিয়াছে তাহা তাহার এই দুই চার কথাতেই সঞ্জয় বুঝিল। এই কঠিন পণের ভিতর হইতে এই তপস্তার দুর্ভেদ্য বস্ত্রের অন্তরাল হইতেই তাহার হৃদয়টিকে উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে তাই বেন সঞ্জয়ের রোখ চাপিয়া গেল। হৃদয়-আবেগের উৎসাহ ষাখুর হ্রস্ব বস্ত্রের মত ছুটিয়া বাহির হইতে না চায় সে কখনও এমন গুরুভার শিলার তলে হৃদয়ের মুখ চাপিয়া ধরিতে চায় না। প্রাণ যে তাহার নিপীড়িত দেহ-পিঞ্জরের বন্ধনের ভিতর হ্রস্ব হইয়া উঠিয়াছে, সে যে মুক্ত স্বাধীনরূপে পূর্ণ আলোকের মাঝখানে ঝাঁচিয়া উঠিতে চায় তাহা আর লুকাইয়া রাখা পাছে না যায় তাই বুঝি এত বাঁধাবাঁধি এত বাড়াবাড়ি! সেই ভালো, সঞ্জয় ভাবিল সহজে সন্তায় যে নারীর মনকে পাওয়া যায় তাহার মূল্য দেশের মানুষ কোনো দিন বুঝে নাই, সেই কি বুঝবে? এই তপস্বিনীর তপস্তার বিরুদ্ধে তপস্তা করিয়া সাধনাকে সাধনা দিয়া জয় করিয়া তাহাকে নারীর মনের ছয়ার খুলাইতে হইবে, তবেই সে নারীর মূল্য নারীর মর্যাদা বুঝবে।

কিবিবার সময় হইল। ভূষণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি যদি এখানে কাজের জন্ত আসেন, তাহলে এঁর এখানে আসা-যাওয়ার ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে।”

ভূষণবাবুর গৃহিণী শৈবলিনী বলিলেন, “আমাদের গাড়ী-পাক্কীও নেই, লোকজনও নেই। কেই বা নিয়ে আসবে যাবে? আমার যদি সময় থাকত ত আমি সঙ্গে ক’রে আনতাম।”

গৌরী হাসিয়া বলিল, “আপনি যদি আমার তদারক করতে বসেন তাহলে ত আমি আপনার মন্ত সহায় হ’লাম দেখছি।”

সঞ্জয় বলিল, “সন্তায় একটা পাল্কীর ব্যবস্থা করলে হয় না।”

গৌরী বলিল, “তাতেও ত আবার পরস্য খরচ আছে। কাজে যখন নেমেছি, তখন পায়ে হাঁটতে হবে এটা ধ’রে নিয়েই বেরোনো দরকার।”

হৈমবতী বলিলেন, “পায়ে হাঁটো আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গী হবে কে?”

গৌরী বলিল, “কেন, আমি একলাই বাব আসব। আমার সঙ্গে আর একটা মানুষকে জোড়া করলে তার কাজ ত পণ্ড হবে।”

হৈমবতী বলিলেন, “কিন্তু তোমার বাড়ীর লোকে তাতে রাজি হবেন না যে।”

গৌরী বলিল, “ভবিষ্যতে আরো অনেক বিষয়েই হয়ত বাড়ীর লোককে চটাব, এইটুকুতেই এখন ভয় পেলে চলবে কেন? যখন আশ্রমে এসেছিলাম, তখনও বাড়ীর সকলে না হোক অনেক রাগ করেছিলেন। এখন তাঁদের সঙ্গে গেছে। নূতন আর-একটা কাজ করলে হয়ত সকলেই রাগ কবেন, কিন্তু সে-রাগ পড়ে যাবে। বাবাই ত আমাকে নিজের উপর নির্ভর করবার মন্ত্র দিয়েছিলেন, আজ কাজের বেলা তার একটুকুমাত্র প্রকাশ দেখলে যদি তিনি রাগ কবেন তাহলে আমাকে সে-রাগ মাথায় পেতেও কাজে বেবোতে হবে; কারণ এ শিক্ষা ত প্রথম আমার তাঁর কাছেই।”

ভূষণবাবু বলিলেন, “আপনারা ভেবে দেখুন, যদি ঠুর একলা আসা-যাওয়াই মত হয় এবং তাই স্থির করাও হয়, তবু প্রথম কয়েকদিন সঙ্গে কারুর থাকা দরকার হবে, কারণ পথে-ঘাটে চলা ত ঠুর কোনো দিন অভ্যাস নেই।”

সঞ্জয় বলিল, “আমি শব্দকে বলে দেখব; সে যদি নিজে ছ চার দিন সাহায্য কব্বে রাজি থাকে এবং আমার সাহায্যে আপত্তি না করে তা হলে কয়েকটা দিন আমরাই চালিয়ে নিতে পারব। তারপর ত আব আমাদের দব্কাবই থাকবে না।”

হৈমবতী বলিলেন, “আচ্ছা, তাই বলে দেখ কি হয়।” যাইবার সময় হইল। গৌরী শৈবলিনীকে বলিল, “আপনার ঘর-সংসারটা একবার দেখে যাই।”

বড়-ঘরখানি শুইবার বসিবার পড়িবার খেলিবার সকল রকম সাজ-সরঞ্জামে ঠাসা। পাশে ছোট একটি ঘরে আধ-খানা ভাঁড়ার, তরিতরকারী চাল ডাল জল ছুন তেল সব তাহাবই ভিতর অত্যন্ত অল্প জায়গায় গায়ে গায়ে সাজানো।

অপর কোণে ছোট একটি চেয়ার ও টেবিল, দুইটা বেতের বাস্কে দুই বোঝা কাগজ, দুই তিনটা ফাইল, একটা ব্যাশ-বাস্কে, কাগজ কলম পেন্সিল খাতাপত্র প্রভৃতি আগিসের সরঞ্জাম। মাঝখানে স্বল্পপরিমিত একটুখানি জায়গায় তিন চারখানা পিড়ি, সেইটুকু সকলের আহারের স্থান। তাহার পাশে টালির চাল দেওয়া ছোট একটি রান্নাঘর, বড় খুঁকী তখনও উপক্রমণিকা হাতে করিয়া সেখানে তাহের হাঁড়িটা তদারক করিতেছে। সব দেখিয়া শুনিয়া গৌরী বলিল, “বেশ আপনার সংসারটি।”

শৈবলিনী বলিলেন, “আপনাকে ছোট বোনের মত মনে ক’রে একটি কথা বলছি, কিছু মনে কবেন না। এই ছোট দুখানি ঘরের ভিতর এই যে গরীবের সংসার দেখছেন, এর সঙ্গে অনেক দুঃখ-কষ্টের বোঝা আছে, চোখের জল ও এর জন্তে ফেলতে হয়েছে। ছোট ছোট ছেলে নিয়ে কাজের পথে কত যে ঘা খেতে হয়েছে কত কাজ আটকা পড়েছে তার ঠিক নেই, কিন্তু তবু কাজ বন্ধ হানি; কারণ আমার সকল কাজের সকল সাধনার এই হল প্রেরণা। যদি কাজের সকল সরঞ্জাম সংগ্রামের নকশা অল্প সকল বর্ষ খুলে ফেলবার একটা স্থান না থাকত, কাজের শেষে দুঃখের পারে কেবল নিজের বন্বার কোনো আনন্দ না থাকত তাহলে হাজার নিরাশ্রয় হলেও শুকনো কাজ এমন ক’বে আমায় বাঁধতে পারত না। শুধু তাই নয়, এমন ক’রে স্বামী পুত্র কন্যাকে যদি না ভালবাসতে শিখতাম তাহলে পরের দুঃখ যে কি হৃদয়ে দিয়ে তা কোনো দিন বুঝতাম না। তাই আমার মনে হয়, ঘর-সংসার আমাদের সাধনারও একটা অঙ্গ। একথা মেয়েরা ভুললে তাই চলে না। অবিশিষ্ট তাই বলে সকলকেই যে সেটা কব্বে হবে তা বলছি না। মানুষ কত কারণে কত পথ ত্যাগ কব্বে বাধ্য হয় তা জানি, কিন্তু যা কিছু আমরা করি তাই যে নিম্নের নয় এইটাই আমার বলবার উদ্দেশ্য।”

গৌরী চুপ করিয়া শুনি। তারপর বলিল, “আপনি ত আজ থেকে আমার দিদি হ’লেন। কাজের কথা সব ক’থা এর পর আপনার কাছে নূতন ক’রে অনেক শুনব, অনেক শিখব।”

(ক্রমশঃ)

ভবষুর্যের চিঠি

(রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতিভাণ্ডার)

শ্রী তারকনাথ দাস

২০শে জুন তারিখে বার্লিনে হইতে এই সংবাদ প্রচার হইল যে, আগামী ২রা অক্টোবর তারিখে, জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফিল্ড্ মাৰ্শাল্ ভন্ হিন্ডেনবুর্গের ৮০ বৎসরের জন্মদিন ; উক্ত দিনে সমস্ত জার্মান তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কিছু টাকা প্রেসিডেন্টকে ডানি দিবে এবং উক্ত টাকা দ্বারা হয়ত প্রেসিডেন্ট জার্মান জাতির আর্থিক উন্নতির জন্য একটা ফাউন্ডেশন্ গঠন করিবেন। প্রত্যেক জার্মান যাহাতে কিছু-না-কিছু টাকা দান করে তাহার জন্য দেশব্যাপী কমিটি গঠন হইবে। এই পবরটি পড়িয়া বিশ্ব-রাজনীতি-বিশারদ বিস্মার্কের জীবনীর একটা ঘটনা মনে হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী প্রুসিয়ার যুদ্ধের জয়ের পর জার্মানির লোকেরা বিস্মার্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কয়েক লক্ষ টাকা দেয়। আমার যতদূর জানা আছে, উক্ত টাকা বিস্মার্ক জার্মানজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওরিয়ন্টাল সেমিনার স্থাপন করিবার জন্য দান করেন। জার্মানদের মধ্যে দেশভক্তি “মুখের কথা” নয়, কাজের দ্বারা তাহারা দেশভক্তি দেখায়।

এইসঙ্গে একটা কথা বলিয়া লই। বর্তমান যুগে ভারতের জননেতাদের মধ্যে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অতুক্তি হয় না। তিনি ১০০ বৎসর পূর্বে ভারতের এবং হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য যে-সমস্ত কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং যদি কোন দিন ভারত পুনরায় উন্নত হইতে চায় তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত কর্মশুলিকে ভারতব্যাপী করিতে হইবে। বর্তমান ভারতে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে, প্রকৃত “শ্রদ্ধা” নাই বলিলে অতুক্তি হয় না। যে-হিন্দু সমাজে গুরুদক্ষিণার জন্য শিষ্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইত, সেই ভারতে কেবল “বাক্যে শ্রদ্ধা এবং

কার্যকালে ভণ্ডামির প্রাবাল্য” দেখা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য নানা প্রকারের সভা হয়, কিন্তু কার্য বড় বেশী হয় নাই।

আগামী ১৯২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসরের উৎসব হইবে। এ সময়ে ইংলণ্ড আমেরিকা ও বিভিন্ন দেশ হইতে প্রসিদ্ধ লোকেরা ভারতে আসিবেন। এই উৎসব উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য যদি রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহা হইলে খুব ভাল হয়। ভারতের বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা এবং ভারতের যে-সমস্ত উদারচেতা হিন্দুরা রাজা রামমোহন রায়কে হিন্দু সমাজের সংস্কার-ক্ষেত্রে সহকর্মী বলিয়া মনে করেন তাহারা, যে-সমস্ত ভারতবাসী রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব-ধর্মের-সার সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াসকে মানবজাতির মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন তাহারা, যে-সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা অপর ভারতবাসী রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের প্রথম রাজ-প্রতিনিধি, যিনি ভারতের কল্যাণের জন্য এবং দিল্লীর বাদশাহের স্বত্ব রক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বিদেশে নিজের জীবন দেন, তাহারা, সকলেই যদি গড়পড়তা এক টাকা করিয়া টাকা দেন তাহা হইলে অল্পে তিন লক্ষাধিক টাকা রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডারে উঠান সম্ভব। আশা করি, সময় নষ্ট না করিয়া রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করিতে ক্রটি হইবে না।

যদি রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহা হইলে উক্ত স্মৃতিভাণ্ডারের টাকার দ্বারা কি করা উচিত? প্রথমতঃ—স্মৃতিভাণ্ডারের মূলধনের একটি টাকাও কোন বিষয়ে যাহাতে খরচ না হয় সে-দিকে নজর

রাপিতে হইবে। স্বতিভাণ্ডারের মূলধন বাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহা করিতে হইবে। বাঙ্গলায় একটা চলিত কথা আছে যে, “জলপূর্ণ কলসী থেকে যদি প্রত্যেক দিন একটুখানি ক’রে জল ব্যবহার করা হয় এবং কলসী পূর্ণ করিবার জন্ত যত্ন করা না হয়, তা হ’লে সময়ে কলসী শুষ্ক হয়।” ভারতে জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত ও জাতীয় অভ্যুদয়ের জন্ত কয়েকটা স্বতিভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের অবস্থা আজ শোচনীয়। জাতীয় ভাণ্ডার, তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের টাকা সব প্রায় খরচ হইয়া গিয়াছে—কাজ কিছুই হয় নাই—এবং ভবিষ্যতে কাজের আশা নাই। কিন্তু যখন স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের জন্ত একটি ফণ্ড স্থাপন করেন তখন উহার প্রধান সর্ত্ত এই হয় যে, কেহ মূলধন খরচ করিতে পারিবে না। মূলধন খরচ করিতে পারিবে না—এই সর্ত্ত না রাখিলে হয় ত উক্ত টাকা বিজ্ঞান-বিভাগের বাড়ী বা যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্ত এতদিন শেষ হইয়া যাইত এবং বিজ্ঞান-চর্চার কাজ বন্ধ হইত। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত ক্রোড়াদিক টাকা উঠান হইয়াছে; উহার অধিকাংশ টাকা বাড়ী তৈয়ার করিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় দেনায় জড়িত এবং নানা প্রকারের শিক্ষা-প্রচারের কাজে হাত দিতে পারে না। কাজেই আমার মনে হয়, কেবল মূলধন রক্ষার জন্ত যত্ন করিলেই হইবে না। মূলধন বাড়াইবার জন্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায়-স্বতিভাণ্ডার যদি স্থাপিত হয় তাহার মূলধন বৃদ্ধির জন্ত কি করা প্রয়োজন? প্রথমতঃ স্বতিভাণ্ডারের মূলধন দ্বারা খুব ভাল ব্যবসায়ের শেষার বা গভর্ণমেন্ট কাগজ ক্রয় করা দরকার। অর্থাৎ মূলধন হইতে বাহাতে ভাল আয় হয়, অথচ মূলধন নষ্ট হইবার ভয় না থাকে তাহার জন্ত যত্ন করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ—মূলধনের আয়ের দশমাংশ প্রত্যেক বৎসর মূলধন বৃদ্ধির জন্ত মূলধনে জমা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক বৎসর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিনে ভারতে ও বিদেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা ফণ্ডে জমা দেওয়া চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসরের উৎসব উপলক্ষে তিন লক্ষ টাকা মাত্র রাজা রামমোহন রায়-

স্বতি-ভাণ্ডারের জন্ত উঠান যায় এবং মূলধন বৃদ্ধির জন্ত পূর্ণ প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত মূলধন পাঁচ লক্ষ হইতে দশ লক্ষ বা ততোধিক হইবে। মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে এবং নানা প্রকারের সংকার্য বাড়িবে।

এখন কথা উঠিবে, যে, যদি রাজা রামমোহন রায়-স্বতিভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহা হইলে উক্ত ভাণ্ডারের মূলধনের আয় কি ভাবে ব্যবহার করা উচিত। ভারতের কল্যাণের জন্ত শত পন্থায় কাজ করা যাইতে পারে। তবে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে তিনি যে-কার্য্যের জন্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন সেই কার্য্যগুলির জন্ত এই স্বতি-ভাণ্ডারের আয় ব্যয় করা উচিত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে তিনটি প্রধান কার্য্যপন্থা দেখা যায়। প্রথমতঃ, তিনি একজন ধর্ম্মবীর; তিনি বর্ত্তমান ইন্দুধর্ম্মের মধ্যে নতুন জীবন আনেন এবং তিনি সর্ব্বধর্ম্মের সার বুদ্ধিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমাজ-সংস্কারক, তাঁহাব যত্নে সতীদাহ বন্ধ হয়; তিনি বালাবিবাহের বিরুদ্ধে, জীশিকার জন্ত বালাবিধবা-বিহারের জন্ত শত বৎসর পূর্বে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—তিনি ভারতবাসীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্র অমুসরণ করিবার ব্যবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি পতিত দিল্লীর বাদসাহের উকিল হইয়া, ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রথমে ইংলণ্ডের রাজদরবারে ভারতের দাবী বুঝাইতে যত্ন করেন এবং ভারতের সেবার বিদেশে প্রাণ দেন। আজ ভারতের হিন্দু যুবক ও যুবতীরা “কালাপানীর পারে” গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবা নিজেদের এবং দেশের কল্যাণের জন্ত কাজ করিতেছেন এবং ইহা শক্ত কাজ বলিয়া বুঝিতেও পারেন না। কিন্তু শতাব্দিক বৎসব পূর্বে ব্রাহ্মণ রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করিয়া পথ দেখাইয়া গিয়াছেন তাই আজ এসব কাজ সুসাধ। রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বৃহৎ-ভারতপন্থা। মোটা কথা রাজা রামমোহন রায় স্বতি-ভাণ্ডারের আয় হইতে উক্ত তিন প্রকার কাজ করিতে হইবে।

ধর্মবীর রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্ত ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্বভারতীতে বা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে) Chair of Comparative Religion, সর্ব্ববর্ষ সাধনার ও অধ্যাপনার জন্ত একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় প্রফেসর অফ কম-প্যারেটিভ্ রিলিজন্স জন্ত বাৎসরিক বেতনের ভার বহন করিতে হইবে।

সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্ত জীশিক্ষা বিস্তার, হিন্দুসমাজে বাণ্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচার ও ছুৎকারবাদ দূর করিবার জন্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে। এই বিভাগের কার্যের জন্ত বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও কার্যের কুল-কিনারা দেখা যায় না। কাজেই শক্তিমত ও সাধ্যমত কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। মৃতন কাজে হাত না দিয়া প্রজ্ঞেয়া শ্রীমতী অবলা বসু, সরলা দেবী প্রভৃতি বঙ্গীয় নারীরা জীশিক্ষা-বিস্তারের জন্ত এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য যে-যত্ন করিতেছেন, তাহাদের কাজের-সাহায্যের জন্য রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের আয়ের কতকাংশ ব্যয় করা উচিত।

ভারত-প্রতিনিধি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকাজী রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্ত (Raja Rammohun Rai fellowships) রাজা রামমোহন রায় ফেলোশিপ স্থাপন করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের ব্যয়ের কতকাংশ হইতে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ একজন ভারতের উন্নতমনা দূরদর্শী বিদ্বান অধ্যাপককে বিশ্বভ্রমণের জন্ত পাঠাইতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় এবং এই তিন পন্থায় কার্য্যারম্ভ করা যায় তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের যুবক যুবতীর মধ্যে, শত শত কর্ম্মীর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আদর্শ জাগিবে। পতিত ভারতে, হিন্দু সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মানুগ সমাজ সংস্কার ও বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-প্রয়াস আবার জাগিয়া উঠিবে। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে দীক্ষিত “বৃহৎ-ভারতপন্থী” নূতন নূতন কর্ম্মী চাই। দূরদেশ হইতে ভবঘুর্য্য তারকনাথ, রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপনের জন্ত করবোড়ে ভারতের হিন্দু জৈন বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান শিখ ও ভাবতের বৃহৎ ভারতপন্থী নেতাদের নিকট ভিক্ষা করিতেছে। ইতি

আপনাদের
ভবঘুর্য্য তারকনাথ দাস

জননী

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ওদের যাকে শুদোই সেই বলে—“আমার বাড়ী? আমার বাড়ী, মা, মেহেরপুর।” কথার সুরটা টানে টানে কেমন যেন পেঁচিয়ে চলে। কারু গালভরা হাসি, কারু মুখ থেকে বিষ ঝরে; কেউ হাজারো গরীবানার মধ্যেই একটু সোখীন—পানে দোস্তায় ধোপকাপড়ে; কেউ মোটেই তা’ নয়।

মেহেরপুর কতবড় দেশ তা’ জানিনে; খুব বড়ই হবে; সেই দেশ থেকেই দেশবিদেশে বছর-বছর ঝিয়ের রপ্তানি আসে, শ’ ছ’শো। তাই ভাবি, আমাদের চন্দনপুরের চেয়ে সেটা খুবই বড় হ’বে।

আবার সবারই বাড়ী যে, মেহেরপুরেই তাও আমার মনে হয় না; উনিও বিশ্বাস করেন না; আশ্পাশের

দশবিধ কোশের লোকে ঐ কথাই বলে; ভাবে; কে চেনে সে পাড়াশা !.....তাই সবাই মেহেরপুরের নামই করে; বলতেই লোকে চিনবে।

নাম সবারই কিছু মানানসই হয় না।

যে খুব কালো, তার নাম সন্দেরী; যার মাথাঝোড়া টাক, তার নাম এলোকেশী, হাসতে যার ময়লা মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, তার নাম স্নহাস।.....এমনি কিস্ত সবার নাম!

কেউ কাজের লোক—শীতে বাদলে সমান।..... বন বন ক'রে ঘোরে আর কাজ করে; বলে,— “এই ত’ আমার ঘর, বোমা; যে অন্ন দেয় সেইত’ আপন।”...কেউ আবার গতির বাড়ানে’, নড়তেই চায় না— যেন রাজরাণী; কুটোটা কেটে ছ’খান করতেই বলে,— “গা আর বয়না, মা; মরণ হ’লেই বাঁচি; যমে—”

ব’লেই, “মাগো, খেয়ে ফেললে” চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠে, যেন ডাক্তারে ডাক্তারই বম এসেছে.....

চেয়ে দেখি, আরশোলা!

আবার ঝগড়াও করে—বলে,—“হুংখে প’ড়ে গতির দিয়ে দাসীগিরি করতে এসেছি, তাই ব’লে কি মুননাড়া সহব? উ’ হ’; তেমন বাপের বেটি আমি নই।” বলে আর মাথা নাড়ে।—

কথার দামটা ধরতে পারনে, বেটির বাপকে চিনিনে ব’লে।

এদের একটিকে নইলে আমার চলে না।

তিনটি ত’ আমরা মাহুব—উনি আমি আর বুড়ু। কিস্ত ওতেই উনকোটি ভবিষ্যত কাজ।.....ভোর থেকে কাজের শুরু, আর শেষ সেই রাত বারোটায়। কাজের কি ফল দেওয়া যায়!...খামখাই কাজ কত বাড়ি তা’ গেরস্ত মাহুবই জানে। গরু নেই, বাছুর নেই...তবু কাজ যেন দ্রোপদীর বজ্র...কেবলি কোথা থেকে খুলে’ খুলে’ সামুনে আসছে...তার শেষ নেই।—

মনা বলে,—“তিনটে দোকের আবার কাজ কি লা? তার আবার একটা কি।” শুনে’ গালে হাত দি’।.....

আমাব এদিকে হাত পা টাটিয়ে ওঠে; মনে হয় ভেঙ্গে বৃষ্টি প’ড়ি।—

নুতন ঝিকে ঝি ব’লেই ডাকি।

কে এখন বুড়ো মেয়েকে নিস্তার নিস্তার করে। কেমন বাধে।

নিস্তারের বাড়ী কিস্ত হঠাৎ মেহেরপুরে নয়।

তাকে নিয়ে এল মেহেরপুরেরই মুক্ত, ছগো চ’লে গেলে।..... জবাব আমি তাকে দেইনি।

“ভেয়ের অসুখ; দেশের লোক এসেছে, সেই বললে”— ব’লে ছগো কাঁধ দিয়ে বাগিশ জড়িয়ে, আর কাপড়ের এক বৌচ’কা নিয়ে ভাইয়ের জন্তে চোখের জল ফেলতে চ’লে গেল।—

ছগো লোক ছিল ভাল; মেয়ের যতন দেখতো আমরা; ধমকে’ কথাও কইত, যেন হাতে ক’রে মাহুব করেছে।.....বুড়ুকে নাওয়ানো-ধোয়ানো, কাপড়-পরানো থেকে যত সব সে-ই করত.....জামাজুতো-পরানো পর্যন্ত।—

অবদর দেখলে বলত,—“যত গেরো আমার, আর যত গরজ আমার। নিজের মেয়ে যদি পরের কাছে নাছুর হ’ত তবে আর ভাবনা ছিল না। কাজ, কাজ, কাজ—কাজ একটু রাখো গো রাখো, এটাকে আগে দেখো.....”

কিস্ত আমাকে উঠতেও হ’ত না, বকতে বকতে সে নিজেই দেখত।

গুর আসার আগে, ঘটিতে পা-ধোবার জল ভরে ঘটির মুখে গামছাখানা তাওয়া ক’রে রেখে দিত; বলত,— “বেটাছেলে কি সহজে তুষ্ট হয়, মা! শিব তুষ্ট হন ত’ ওরা হয় না।—”

আবার বলত,—“বেশ বশ করেছ বাবুকে; কেবল চেয়ে চেয়ে হাসে.....ভারি মিষ্টি।.....”

কিস্ত এই ছগো চ’লে গেলে মুক্ত এসে বললে,— “শুনেছ, বোমা, অবাক কথা। ছগোয়ার সব মিছে কথা; ভেয়ের অসুখ-সুখ সব মিছে কথা ছগোয়ার; ছল ক’রে

চ'লে গেল। বড় দারোগার বাসায় লেগেছে।.....ক'টা
যারি নেমক্‌হারামীর মুখে।—”

নিস্তার আরো ভালো।

ভাবনা'ই ছিল, না জানি এ আবার কেমন হবে।.....
একটা ক'রে যি পালায়, আর আমার বুক কাপে।.....
সবারই দেখেছি, গোড়ার দিকটায় দিনকতক বেশ বনিবনাও,
হাসি-খুসী ; তারপর যত দিন যায় তত তাদের নিজের
নিজের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু নিস্তার বেশ—ভারি কিছু ভদ্র চেহারা, যেন
জজ্জগিনি, মুখখানা গোল, চোখ দুটো ভাসা ভাসা,
আঁচিসাট মোটাসোটা, রং আধ ফর্সা ; হাত-পায়ের
গড়নে দিবি একটা স্ত্রী।—

নিস্তারের বাড়ী শ্রোটে। গৌটে কোথায় কে জানে ?
নিস্তার বললে,—“সে নৈহাটি থেকে সাত কোশ পূবে।”

...তারপর একটুখানি কি ভেবে বললে, “বড় হুঃখ, মা।”

কোথায় যে হুঃখ টের পাইনে। নৈহাটি থেকে শ্রোটে
সাতকোশ পূবে, সেটা এমনই কি হুঃখের কথা!—কিন্তু
বলতে বলতে তার চোখের কোণে জল জমে ; দেখে' মনে
হয়, হুঃখটা তার গায়ের ভিতরে কোথাও, নৈহাটি থেকে
সাতকোশ পূবে ব'লে নয়।.....

কি বলব তাই খানিক ভেবে বললাম, “হুঃখ কার নেই
বলো, মেবে! আমার কি কম হুঃখ—একটা দিন এমন
যায় না যেদিন মনটা স্বচ্ছন্দ ঠেকে, যা' চাই আজ সব আমার
আছে।”

নিস্তার কথা কইলে না, ঘাড় নামিয়ে রইল।

আমি বললাম,—“নেই-নেই হুঃখ আর ঘোচে না ;
কেবলি হাত'ড়ে' বেড়াই, কিসে হুঃগয়সা শ্রয় হবে।...
বুড়ু আঁতুল গায়ে থাকে, তার আর ছোটো পেনি হ'লে ভালো
লাগে ; ছোটো ইজার তার চাই ; উনি ছেঁড়া জামা প'রে
বেড়ান ; বুড়ুর হুঃখ দি বার্লি মিশিয়ে ; বুক কাট কাট করে
—এমন হতভাগীর পেটে এসেছিলি—”

হঠাৎ খেমে যেতে হয়, আমার চোখেও জল এল।

নিস্তারের হুঃখের কারণটা একদিন সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে
পড়ল।...বুড়ু ঘুমিয়েছে, উনি প্রাইভেট পড়া'তে বেরিয়ে
গেছেন ; আগি র'া'ছি—

ভাত চাপিয়ে হাওয়ায় এসে একটু বসেছি। নিস্তার
বললে,—“এই পোড়া পেট কেন বিবি দিয়েছিল
জানিনে, মা। পেটের দায়ে মানুষ কি না কব্বে বলো !
ল্যাঁলাটি, ফাঁকিবাজি, যামলা মালালত—সবই ত ঐ পেটের
জন্তেই সৃষ্টি হয়েছে ; গাড়ী বলো ঘোড়া বলো, হাওয়াগাড়ী
বলো, রেলগাড়ী বলো, নোক' বলো, জাহাজ বলো—মানুষের
পেটের খোরাকে বোঝাই হয়েইত সব ছোটোছুটি করছে ;
তাতেও কুলোয় না—আবার শুন্নি উড়ে জাহাজ
হয়েছে। নয়, বোমা ?”

আমি বললাম, “তা' ত' সত্যিই। পেট না থাকলে কে
কার বলো। পেট আছে ব'লেই ত' মানুষ মানুষের
বশ।”

নিস্তার বললে, “পেট মানে না ব'লেই ত ছুটে' বেরিয়েছি
ছেলে ছটোকে একলা ফেলে।”

—“তোমার ছেলে আছে নাকি ?”

—“তোমাদের পায়ের ধুলোর আশীর্বাদে আছে, মা,
ছটি।”

—“বড় হয়েছে তারা ?”

—“বড়ি আঠারো বছরের, ছোটটি গেল মাঝে চোন্দোর
পড়েছে।” ব'লে নিস্তার কোঁস' ক'রে একটা নিঃশ্বাস
ফেললে।

—“কি করছে ছোটো ছেলেমানুষ একা একা তাই আমি
ভাবি দিনরাত, মা। তাদের পিসি আছে, সে চোখে ভালো
দেখে না। অসুখ আছে বিস্ময় আছে ...। সেবার
ধীরুর হাম হ'ল বোশেখ' মাসে, হামের পর হ'ল আমাশা...
সেই থেকে তার কাহিল ভাবটা যায়নি আজও। কি যে
কব্বে তারা, আর কেমন আছে কে জানে।—” ব'লে
ছড়াবনার নিস্তার যেন মুঃড়ে' পড়ল।

শুনে আমারও মনে হ'ল মা-হারা হ'য়ে ছেলেরা
সহায়হীন হ'য়ে পড়েছে ঠিকই।...আমার বুড়ু যত বড়ই
হোক, আমি তার কাছে নেই, তার এমন দ্রববস্থা ত
ভাবতেই পারিনে। বিয়ের পর আলাদা কথা ; তখন ত

সে পরের হবে...তবু ত' মন জুড়বে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তাবা কি কিছু বোঝে? নিজের খোঁজ কি তারা নিজে রাখতে পারে, না জানে।

উনিই ত' একটি বুড়ো ছেলেমানুষ, নিজের কাপড় গামছা জামা জুতো, টাকা পয়সার হিসেব রাখা দূরে থাক, খেয়ে পেট ভুল কি না তাই কি ছাই ভালো করে বোঝেন? ...খেয়ে উঠছেন, এমন সময় আরো দুটি ভাত দিলে, না না করেন, কিন্তু ভাতক'টি উঠে যায়, হামেসা দেখেছি ...ঐ দু'টির ক্ষিদে ত' পেটেই থাকত। ছেলেরা ত আরো কাঁচা, আরো অবোধ।

এই কথাগুলোই আমি নিস্তারকে বললাম।

নিস্তার বললে, “তাই মা; বা' বলেছ তাই। বেটা-ছেলেরা কি মানুষের মত মানুষ, না, তাদের জ্ঞানগম্য আছে। খাওয়ালে ত' খেলে, না খাওয়ালে ত' চাওয়া নেই। বড়ছেলে সুরু বড় মা-জ্ঞাওটা; যেদিন চ'লে আসি সেদিন আমার আঁচল চোখে দিয়ে সে কি তার কান্না!” ব'লে নিস্তার গালের ওপর থেকে চোখের জলের ধারা আঁচল দিয়ে মুছে ফেললে। আবার বললে—“সে-ও যত কাদে আমিও তত কাদি। কিন্তু ধীর আমার সুবোধ; সে বললে—“দাদা, কাদিস্নি, মা আমার আসবে শুনে আমি একচোখে হাসি, একচোখে কাদি। ” ব'লে নিস্তার একটু থামলে ... কিন্তু তখনি আবার বলতে লাগল,—“খেয়ে তাদের পেট ভব্ছে না, এ আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এখন থেকে।” নিস্তার হুঁপিয়ে হঠাৎ কঁদে উঠল।

নিস্তার বলে,—“সুরুর রং ফসা, ধীর আমার কালোটি। তবে সুরু কেমন আপনভোলা, ধীর বেশ গোছালো। ধীরই তার দামাকে চালিয়ে নেবে।”...ব'লে নিস্তার হাসতে থাকে।

কাজে কর্মে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের তাবদার এ বড় তামাসার কথা।—

নিস্তার বলছিল, “হুটিতে ঝগড়াঝাটি হয়, আবার মিলও বেশ।”

আমি বললাম, “লেখাপড়া শেখালে ত'—”

নিস্তার বললে, “পাঠশালে দিয়েছিছু হুটিকেই। পন্ডিতের চাল ডাল মাইনে পাখনীর হুকুম-হাঙ্গামা যে নিত্য নিত্য কত তার ঠিক নেই।...কেবল দাও আর দাও...কথা পাই বলো মা, অত যে খালি জোগাব' আর জোগাব'। ছাড়িয়ে নিলাম; ভাবলাম, যদি উপোস ক'বে পড়ান খরচ জোগা'তে হয়, তবে পড়া শেষ না হ'তে যে ম'রেই যাবো।”

বুড়ুকে শিখিয়ে দিবেছি, নিস্তারকে পিসি ব'লে ডাকতে। শুনে নিস্তার ভারি খুসী। বললে, মেয়েছেলে হওয়ার ঐ ত' মজা, বোমা, কেউ না ডাকলে তার কাঁকা ফাঁকা শক্তি শক্তি লাগে। তোমার যদি ঐ সোনাটুকুন না হ'ত তবে কি শুধুই ওগো-ইঁগায় বুক ভরত ভেবেছ!...তা আর হ'তে হয় না।...এই ব'লেই বুড়ুর গালে আলগোছে একটা চুমু খেল।

নিস্তার বলে,—“তোমাদের চরণের আশীর্ব্বাদে আমার সুরু ধীর একদিন রোজগার করবেই।... তখন আমি রাজ-মাতা হ'ব বোমা—তুমি যেমন এখন রাজরানী।”... এই কথা ক'টি বলতেই তার চোখ ডাংগর হ'য়ে ঝকঝক করে; আবার পরক্ষণেই নিবে' যাব। নিস্তার বলত—“সে দেখতে পাবে না তার সুরু ধীর রোজগার করছে, টাকা আনছে... ..”

ছুখে নিস্তারের চোখে জল আসত।

আমি বলতাম, “তিনি স্বর্গ থেকে দেখবেন; দে'খে তোমার সুখে তাঁর আত্মা সুখী হবে।”

হঠাৎ মুক্ত এসে হাজির—

বললে, “লা লা ওলা—কি করছিস্ লা নিস্তার?” তারপর ঢিপ ক'রে আমার একটা নমস্কার ক'রে গা এলিয়ে দিয়ে ধপ ক'রে ব'সেই পা ছড়িয়ে দিলে।

মুক্তর অমনি, কলকলানি শব্দাব।

নিস্তার বললে—“বোমায়ের সঙ্গে সুখ-ছুখের কথা কইছি, বোন্। ছেলে ছোটো—”

মুক্ত চোঁচিয়ে উঠলে—“হু—টো...?”

চোখ বড় ক'রে ও-কাবের গোল স্তরটা অনেকক্ষণ টেনে চলল।

নিস্তার ধমকে' গেল, যেন মুক্ত নজর দিচ্ছে।

মুক্ত বললে—“ছেলের মুখে দি' হুড়ো জ্বলে’। আমার হাড় শু'ড়িয়ে তবে শত্রুরা মরেছে...”

কিন্তু মনে হ'ল মুক্ত বেন একটি নিঃশ্বাস চেপে' গেল।

ভারি গলায় নিস্তার বললে—“ছেলের মাকে অমন কথা বলিস্নি, মুক্ত।”

—“বলব না কেন তাই বল আমাকে। ছেলে—ছেলে—ছেলে—মায়ের গায়ে হাত তোলবার আগে তারা আঁতুড়ে মরে না কেন।”—ব'লে মুক্ত আঙ্গুল মট্কাতে লাগল।

নিস্তারের মুখের দিকে চেয়ে আমি তাড়াতাড়ি অস্ত্র কথা পাড়লাম।

উনি বলছিলেন, “বুড়ুর পিসির ছেলেদের কি খবর?”

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল; বললাম, “ভালো কথা, নিস্তার আগাম তিনটি টাকা চেয়েছে, ছেলেরা আস্তে চায়; বলে, দাও বোমা, বাবুকে ব'লে তিনটে টাকা আমার আগাম; একবার এসে তারা তোমাদের পায়ের ধুলো নিয়ে যাক।”

উনি হাসলেন, বললেন,—“পায়ের ধুলোর দাম আরো বাড়িও; ভদ্র-লোকের ভেতর চালাবার চেষ্টা করো।”

কিন্তু টাকাটাও দিতে বললেন।

নিস্তার টাকা নিয়ে, খুঁটে বাঁধলে; তারপর আর কিছু দেখিনে। বললে—“টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, বোমা, ধীরুর নামে পাঠিয়েছি। ছ'ভয়ে ঐ নিয়ে সখের ঝগড়া হবে.....”

নিস্তার স্তব্ধ হাসি হাসলে।

ছেলে ছ'টি টাকা তিনটে নিয়ে খেলা ক'রে ঝগড়া করছে, এ যেন তার মুখের ভাবে আমিও দেখতে পালম।

রোজই তাগিদ দিতাম—“কই নিস্তার তোমার স্ক্রু ধীর এল কই?”

ছেলেরা এসে পৌছুতে দেবী ক'ছে এ যেন তারই বড় অপরাধ। নিস্তার কাতর হ'য়ে বললে, “কেন যে দেবী করছে—তাই আমিও ভাবছি বোমা দিনরাত। আসবে নিশ্চয়। টাকার রসিদ যখন এসেছে।”—ব'লেই সে কাজে চ'লে গেল।

আবার তখনই ঘুরে' এসে বললে,—“আসবে তারা নিশ্চয়, বোমা। আমি দেখতে চেয়েছি,—থরচ পাঠিয়েছি, তারা না এসে পারে?”

ছেলেরা এলে যে আনন্দ হবে তারি চেউয়ে সে এখনই ভ'রে উঠেছে।

আমার মনের কথা বোধ হয় নিস্তার টের পেয়েছিল; বললে, “টাকা তারা বাজে থরচ করবে না, আমার ছেলেরা তেমন নয়।—”

স্ক্রু ধীর এল না।

কিন্তু মুক্ত একদিন যাকে নিয়ে এল, সে একেবারে নতুন মানুষ।

মুক্ত চোঁচাতে লাগল—“কই লা, নিস্তার, দেখ এসে কে এসেছে”...

আমি বেরিয়ে এলাম।

মুক্ত তাকে বললে,—“পেমাম কর আবাগী।”

প্রণাম ক'রে মেয়েটি বললে,—আমার বাড়ীও গৌটে, নিস্তারের দেশের মানুষ।—”

মুক্ত গলা ফাটাতে লাগল—“কৈলা নিস্তার...নিস্তার...নিস্তার...”

কিন্তু নিস্তারের আর দেখা নেই।

আদর-আপ্যায়িত পান-সুপুঁরি আর একথা-সেকথার পর শুদোলাম,—“তুমি এলে, নিস্তারের ছেলে হটকে কেন নিয়ে এলে না?”

মেয়েটি আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। আমি বলতে লাগলাম—“নিস্তার তাদের আসার থরচ পাঠিয়েছে তিন টাকা। আমি বললাম বাবুকে, নিস্তার তার ছেলেদের

না দেশে দেশে বড় কাতব হ'বে উঠেছে...আমুক তারা একবার, দেখা দিয়ে বাক্ মাঁকে।”

নতুন মেয়েটি একবার আমাব মুখের পানে, একবার মুক্তর মুখের পানে চাহিতে লাগিল; শেষে বল্লে,—“অবাক্ কর্লে, মা, নিস্তারের ত' ছেলেপিলে নেই।”

—“নেই? সুর ধীক”.....

কিন্তু ন্যাপারটা একেবারে হেঁয়ালি, মাখামুণ্ডু তার কিছুই বোঝা গেল না।

নিস্তার অল্প বয়সেই বিববা হব ছেলে হ'বার বয়স তখন তাব হয়নি।

আমার মুখে সব শুনে’ “নিস্তার, নিস্তার” ক'রে মুক্ত বাড়ী তোলপাড় ক'রে তুলল, এ-ঘর, ও-ঘর, সব জায়গা পাঁতি পাঁতি ক'বে খোজা হ'ল, নিস্তার কোথাও নেই।—

মুক্ত বল্লে,—“পাণিয়েছে মাগী ফাঁকি দিয়ে টাকা নিবে।—”

কিন্তু তা ত নয়, উণ্টে সেই টাকা পাবে।

উনিও শুনে অবাক্ হ'বে গেলেন।

বে শোনে সেই অবাক্ হ'য়ে যায়।

তিনদিন পরে ভিন্নপাড়া থেকে নিস্তারকে মুক্তই

গ্রেপ্তার ক'রে নিবে এল।

এসেই নিস্তার কাদতে লাগল, বল্লে,—“মিছে কথা কষেছি বোমা, আমায় মাঁপ কবো। আমার যে ছেলে নেই এ-কথা আমি ভাবতে পারিনি যে।.....

না হওয়াব জালা ঐখানেই। বল্লাম,—“তুমি আনাব কাছেই থাকো”—

নিস্তার বল্লে,—“না, তুমি ত' আমাব ছেলে: াল আর শুন্বে না।—”

বাঁকুড়ার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার অভয়-আশ্রম লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি বাঁকুড়া গিয়াছিলাম। অভয়-আশ্রম ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দর্শন করিবা তদুপলক্ষে কিছু কিছু বলিবাছিলাম। বক্তৃতাগুলির কিছু আভাস দিল। এ বৎসর বাংলা দেশে কলিকাতার বাহিরে যে-যে জায়গায় গিয়াছি, তথাকার লোকেরা আমাব প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য আমাকে বাহা বলিয়াছেন, তাহাদের ধারণা তদনুযায়ী হইলেও আমার নিকট তাহা খুব বেশীকম অতিশয়োক্তি মনে হইয়াছে। বাঁকুড়ায় অভয়-আশ্রম লাইব্রেরীতেও এইরূপ নানা কথা আমাব সম্বন্ধে উক্ত হওয়ায় আমি বাহা বলিবাছিলাম, তাহাব তাৎপর্য্য নীচে লিখিত হইতেছে। অল্প ছুটি প্রতিষ্ঠানেও ঐকম কথা বলা হইয়াছিল। তাহাব উত্তরে বাহা বলিবাছিলাম, তাহা লিখিবাব প্রয়োজন হইবে না।

“পরিবারে যে-সব শিশু স্নানগ্রহণ কবে, তাহাবা কপবান, গুণবান না হইলেও স্নেহেব পাত্র হইবা থাকে। তাহাবা ঘবেব ছেলে বলিবাই ভালবাসা পাইবা থাকে। তাহাদের ভালবাসাব দাবী তাহাদের কোন-প্রকার বোগাতার উপব নির্ভব কবে না। তাহাবা ঘবেব ছেলে বলিবাই সকলের স্নেহেব অধিকারী হব। আমি বাঁকুড়ায় স্নানগ্রহণ কবিবা এখানেই আলিত পালিত হই, বালা ও কৈশোবেব শিক্ষাও এইখানেই লাভ করি। আমার

জীবনেব নানা মধুব-স্মৃতি এই সহবেব নানা স্থানেব সহিত ব্ৰুডিত। আমাব কোন কৃতিত্ব, কোন যোগ্যতা আছে কিনা, তাহা বিচার না কবিবাই বাঁকুড়াব সকল লোকেব খ্রীতিব দাবী কবিতে পারি। সেই খ্রীতি পাইলে আনন্দিত হইব। সম্মানেব দাবী আমি কবিতে পারি না। আপনাবা আমার যোগ্যতা ও কৃতিত্বেব েবর্ননা কবিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য পরিমাণে সভ্য হইলেও হইতে পাবে, না হইতেও পাবে। তাহাব বিচার না কবিবা, আমি সেই বন্দ্য আনন্দিত হইবাছি এই কারণে, যে, উহা হইতে ইহা বুঝা যায়, যে, আপনাবা মনে কবেন, অমূল্য বাঁকুড়া জেলাতেও আপনাদের ঐকম প্রশংসা ও সম্মান পাইবার উপযুক্ত লোক স্নানগ্রহণ কবিতে পার। বাঁকুড়ার প্রতি এই যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, ইহা মূল্যবান। আপনাদের আদর্শ যে উচ্চ, তাহা ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। আদর্শ যেখানে বহিরাছে, সেখানে তাহাব সহিত একাত্ম চেষ্টাব বোগ হইবেই, আমবা বৃদ্ধেবা বাহা কবিতে পারি নাই, বাঁকুড়াব বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বালক ও যুবকগণ তাহা কবিতে সমর্থ হইবেন।”

অভয়-আশ্রম মেধব-পাড়ায় কতকগুলি ছেলেকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেখানে আমি গিয়াছিলাম। “বাংলার মাটি বাংলাব জল পুণ্য হউক” এই মন্ত্রেব ববীন্দ্রনাথের বে গান আছে, মেথব ছাত্রেরা সেই গান কবিল। তাহাদের পিতামাতা ও অল্প গুরুজন উপস্থিত

এইরূপ ছেলেমেয়েদের দ্বারা যদি অতি কঠিন কাজ অসম্ভব না হয়,

তবে ভগবানের রূপার সর্বান্বসম্পন্ন আমরা চেষ্টা করলে কি খুব কঠিন কাজও করতে পারি না?

আজ মেঘের-পাড়া গিবেছিলাম। মেঘের ছেলেরা দাঁড়িয়ে ববীন্দ্রের রাবী-উৎসবের সেই পরিচিত—বাঙলার মাটা ইত্যাদি, গানটা গাইলে। শুনে মনে হ'ল—সত্যি মাটা বাদেই মাটা পুণ্য হ'তে পারে তাদের আমবা দু'বে রেখেছি। বখন ছোট ছিলাম, মা, দিদি, দিদিমা এ বা সব ক'বেছেন বা মেঘববা করে, কিন্তু তারা ছোট হননি। বিদেশীরা আমাদের নোংরা বলে খোঁটা দেয়, আমরা বাগ করি। কিন্তু বস্তুতঃ ভ্রমণ করতে করতে দুর্গন্ধ পেলেই আমরা বস্তুতে পারি কোন গ্রামের নিকটে এসেছি। বাংলায় মাটা বাংলার জল পবিত্র রাব'বার দিকে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি নাই।

অনেক আগে থাকতেই জানতাম, বাঁকুড়ার কুঠরোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। শুনেছি, সেলাস বিপোর্টে যা লেখা আছে তার চেয়ে ৪৫ গুণ বেশী। কি ক'লে আব না বাড়ে তাব চেষ্টা করা উচিত।

সমস্ত চেষ্টা গ্রামের লোকদের-নিজদের করা উচিত। বাদেই কুঠ হ'য়েছে তাদের সমস্ত আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত। তাদের ব্যবহৃত সেলাস, খাবার পাত্র, কাপড়-চোপড় অস্ত্রকে ব্যবহার করতে দিতে নাই—এবিধে হিন্দু আচার ভাল ছিল, তা আজকাল আমরা মানি না। এটা পাত্র জল ইত্যাদি ধোয়া, ছোট ছেলেদের মুখে মুখের পান দেওয়া, এনব অনেকেই কবে—ক ব'লতে পারে কাব শরীরে কি বোগ আছে? কুঠ সম্বন্ধে খুবই সাবধান হওয়া উচিত।

বকরমার অনেক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পাশ্চাত্য লোকদের কাছে শিখ'বার আছে। পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি—পরিষ্কার তক্তকে রান্নাবর, আমাদের দেশে এ'দো ভিজে রান্নাবর—এবিধে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের পায়খানা—হানের ঘর—সবই পরিষ্কার। আমাদের দেশের নাবা বড় লোক, তাদের অনেকের এবিধে দৃষ্টি কম। আর অনেক ক্ষেত্রে তা অপ্ৰস্তুতায় বিশ্বাস থেকেই হ'বেছে। একটি বাড়ীর কথা বলি, সেখানে পূর্বে মধ্যভাবতের এক রাজা ছিলেন। হানের ঘর, শোচাঙ্গাব কী বিশ্রী অপরিষ্কার ক'রে রেখে গিবেছিলেন! তা রাজা হ'লে কী হয়। মেঘের গেলে অপবিত্র হবে! অনেক দিন মেঘের লাগিয়ে তবে তাকে ব্যবহার্য্য করতে হ'য়েছে।

আমি জেনোভার বখন ছিলাম, তখন সেখানে হানের ঘর রোজ হ'ত পাঁচসিকা, একটাকা দু' আনা। আমি বাঙালী, কাজেই দশটা আমার বোজাই দিতে হ'ত। পরিষ্কার ষট্‌ঘণ্টে ঘর। টব প্রভৃতি জতি পরিষ্কার। নিত্য নূতন খোওয়া তোয়ালে। একদিন দেখি, হানের ঘরে ষট্‌ঘণ্টা খুব ভাল বিছানা পাতা রবেছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, পূর্ক্স রাতে খুব লোক বেশী হওয়ায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঐ ঘরেও জাবগা দিতে হ'য়েছে—তা ব'লে ঘরটি মোটেই শোবার অমুপযুক্ত নয়। এসব দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই দরকার। একবার জনৈক বিখ্যাত ডাক্তার বলেছিলেন, “সভ্যতার একটি মাপকাঠি পায়খানা কোন্ দেশে কী বকম।”

ইউরোপের সর্বত্র পাকপ্রণালী ও খাইবার সময় বতটা এক, আমাদের দেশে একটা জেলা, মহব, গ্রামেও কখন কখন বতটা এক নয়। যে যে কারণে ইউরোপে কাজের সুবিধা হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এই দৃষ্টি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে পাকপ্রণালীর এত প্রভেদ আছে, যে, কাল খাইতে অনভ্যস্ত লোকের কোন কোন প্রদেশে ও জেলার ষাওয়ারই কঠিন হয়। খাইবার সময়ের পার্থক্যও খুব বেশী। অনেক বাড়ীতে এক-একজন এক-একসময়ে খান। ইহাতে কাজের অসুবিধা হয়, এবং খাওয়াইবার ভাব বাহাদের উপর, তাহাদেরও অসুবিধা হয়।

বাঁকুড়া কলেজ হস্টেল ছাত্রসম্মিলনী কর্তৃক প্রদত্ত
অভিনন্দনের উত্তর

অতীতের গৌরবকে ভিত্তি ক'রে কেবল ভবিষ্যৎ উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চেষ্টা করা হিতকর নয়। অতীত-পৌনঃস্মৃতিব একমাত্র সম্ভাব্য এই, যে, উহা আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায়, যে, আমাদের দেশে এই মাটি, জল, বাতাস, আকাশেই, ষাঁদের বস্ত্র আমাদের শিবার প্রবাহিত, তাঁদেরই দ্বারা মহৎ কাজ হ'য়েছিল, হতবাং আমাদের দ্বারাও হ'তে পারে। পূর্ক্সাপেক্ষা বড় উন্নত মহৎ অবস্থাতেও পৌঁছতে পারা যায়। সংস্কৃত শ্লোকে আছে—‘মামুষ সর্বত্র জয়ের ইচ্ছা করে, কেবল দুটি জায়গা ছাড়া—শিবা ও পুত্রের নিকট ছাড়া। মামুষ চাষ, সে যা কিছু বড় জিনিষ ক'ববে, তাঁর থেকে বড় কাজ ক'ববে তার শিবা, তার পুত্র। তারা তাকে পরাস্ত ক'ববে, বেশী জ্ঞান কীর্তিলভ ক'ববে, মহৎ হবে, এ আশা মামুষ করে। আমাদেরও পূর্ক্সপুর্ক্সদের মুখ উজ্জ্বল গৌরবময় ক'রতে হবে। অবনত মুখ ছেলে হ'বে থাকলে কি তা পাবা যায়? যায় না। আমরা তাঁদের থেকেও বড় কীর্তী স্থাপন ক'রব। তাঁদের উপদেশ পালন ক'বে আরও বড় কাজ ক'রে যাব—জগৎ জ্ঞানে পাবুবে—এরা তাঁদেরই সমস্ত ষাঁরা বড় কবি হ'য়েছিলেন, বড় দার্শনিক হ'য়েছিলেন, ষাঁরা ষবিধে পৌঁছেছিলেন। কেবল পূর্ক্স-গৌরব স্মরণ ক'রে চুপ ক'বে থাকলে বা তা নিয়ে অহঙ্কার ক'রলে বড় হওয়া যাবে না। খুব বড় জিনিষাবেব ছেলে সব হাবিয়ে ঝুঁড়ে-ঘরে বাস করার সময় যদি পূর্ক্সপুর্ক্সদের গৌরবমাত্র সার ক'রে দস্ত ক'রে বেড়ায়, তাতে কি কেউ মনে করে যে সে পূর্ক্স-পুর্ক্সদের গৌরব টিক রাখ'তে পেরেছে? স্মৃতি রক্ষা করতে হবে। তাকে উজ্জ্বল করতে হবে। উপায় জ্ঞান, কর্মপ্রবণা, সাধনা। জ্ঞান যে জিনিষ, প্রেরণা যে জিনিষ, সেটা ভগবানের প্রদত্ত আলো-বাতাসের মত—তাকে ভাগ করা বো নাই। এটা জ্ঞানের আলো কি জাদ্বীনিব আলো সে বিচাবেব উপায় নাই—সব জায়গান জ্ঞানই নিতে হবে। শুধু এহণে অপমান আছে, দানও করতে হবে। যে জ্ঞান পাশ্চাত্য থেকে পাব, সেটা উপায় স্বরূপ ক'বে তাকে আরও বেশী পুষ্ট ক'বব। তার উপায়ও চেষ্টা করতে হবে। একটা চরিত্রগত গুণ চাই—যাতে জ্ঞানলাভ হয়, তার সঙ্গে প্রজ্ঞাবান হ'তে হবে। প্রজ্ঞাবানরাই জ্ঞানলাভ করতে পারে। অস্ত্র দিকে অস্বিষ্টাস ও অমুকরণ তাপ করতে হবে, প্রবোজন হ'লে পুরাতনের দাবা ত্যাগ করতে হবে। যুবকদের সামনে দীর্ঘ জীবনপথ প'ড়ে রয়েছে। মহতী চেষ্টা তাঁরা কখন, তাঁদের সিদ্ধিলাভ হবে ও দেশ ধন্য হবে। বিধাতা তাঁর পতাকা বাদেব হাতে দেন, পতাকা-বহনেন শক্তিও তাঁদের দেন।

বাংলার অস্ত্র অনেক স্থান অপেক্ষা বাঁকুড়ার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল, তা যুবকদের চোরা দেখলেই বুঝা যায়। পূর্ক্স বাঁকুড়া আরও স্বাস্থ্যকর ছিল। তখন এখানে কলেজ ছিল না। কাজেই আমাদের ক'লকাতা গিয়ে প'ড়তে হ'ল আর সারী পেলাম ডিসপেন্সারি। এখানে ক'লকাতার ছেলেরদের থেকে ভাল স্বাস্থ্য ও তাহা ভাব দেখতে পাচ্ছি। এই যে সুযোগ, এটা একটা ধুণ। এ সুযোগ আমরা ছেলেবেলা পাই নাই। ষাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা বেন শিক্সা সাক্স হ'বার পর তা শুধ'বার চেষ্টা করেন। এক-একটা শিক্সা-প্রতিষ্ঠানে বত খরচ হয়, তা কেবল ছাত্রদের বেতন থেকে কুলায় না। কাজেই কিছু টাকা ঐ পরীক বন্ধ নিরক্ষর প্রজাদের নিকট প্রাপ্ত টেন্ড থেকে দেওয়া হ'ব। কতক এদেশের ও বিদেশের অস্ত্র লোকেরা দেন।

শিক্ষা পেবে সকলেরই স্বপ্ন শোধ করতে হবে। অনেক সময় আমরা ২১টা ছেলেকে ক'থ শিখিবে একটা সেবা ক'বে ভাবি বড় কাজ করলাম, বড় অর্থহীন করলাম। সত্যিই কি আর এ বেশী কিছু করা ?

বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃত্ত কর্তৃক

প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর

এ জেলায় শিক্ষার যে অভাব আছে তা আমি জানি এবং কাল কিছু বিছু ব'লেওছি। এমন স্বাধীন দেশ আছে, যেখানে লোক-সংখ্যা খুবই অল্প, অথচ সেখানে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, বহু স্কুল কলেজ আছে, বাণিজ্য, শিল্প, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি শেখাবার জন্যেও অনেক কিছুই আছে। আমাদের অপেক্ষা অনেক অল্পসংখ্যক লোকের দেশে যদি তা সম্ভব হ'বে থাকে, তবে আমাদের সকলের কোন-না-কোন বরম শিক্ষা পাবার আশা ক'বা আর বেশী কি ?

কোন প্রতিষ্ঠান কেবল ছাত্র-বেতনে চলে না, অনেক স্থানে অল্প সাহায্যও পাওয়া যায়। পাওয়া না গেলে নিরুপার হ'য়ে বেতন অনেক স্থানে বেশী করতে হয়। উপায় কি ? বাঁকুড়া মেডিক্যাল ইন্সট্রুটের অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা পাওয়া বড় কঠিন। কেননা, টাকা নিতে ভাল লাগে, দিতে ভাল লাগে না! আপনাবা বৈ-শিক্ষা লাভ ক'রছেন, এতে জগতের বহু কল্যাণ সাধন হ'তে পারবে। মানুষ নিজের রোগে, আত্মীয়স্বজনের বোগে যখন সাহায্য পায়, তা কোন দিনই ভুলতে পারে না।

বাঁকুড়ায় কুঠ-রোপ ভাবতবর্ষে সকল স্থান অপেক্ষা বেশী। এখানে বীরা শিক্ষা পাচ্ছেন তাঁরা কেউ কেউ অল্পত্র এবিষয়ে আবার শিক্ষা লাভ ক'বে এবিষয়ে বাঁকুড়ার উন্নতি সাধন করুন। গঙ্গাজলঘাটতে সুন্যাম, এই স্কুলের একটি ছাত্র সেই চেষ্টায় আছেন। শুনে অত্যন্ত খুসী হ'লাম। দেহমনের কল্যাণে মানুষের কল্যাণ। দৈনিক স্বাস্থ্যের উপর আত্মার হৃদয়তা নির্ভর ক'বে, আবার আত্মার হৃদয়তা উপরও শারীরিক হৃদয়তা নির্ভর ক'বে। তাহ'লেও মানুষের কল্যাণকে মোটামোটি মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য, এই দুভাগে বিভক্ত ক'বা যেতে পারে। তার একটা ভাগের ভার আপনাদের উপর। আমরা আশা ক'বি, আপনাবা এই ভার বহনের উপযুক্ত হবেন।

[বাঁকুড়া মেডিক্যাল ইন্সট্রুট হস্পব স্বাস্থ্যকর খোলা জায়গায়

অবস্থিত।] হাসপাতালে শক্ত শক্ত রোগের অস্ত্রচিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসা হইতেছে। বিস্তার বোগীৰ উপকার হইতেছে। সর্ব-সাধারণের ইহার অর্থসাহায্য করা উচিত।]

অভয়-আশ্রমের প্রাঙ্গণে লাঠিখেলায় পর বক্তৃতা

অনেকে মনে করিতে পারেন, যুদ্ধে বা কাজে লাগে না, এমন যে লাঠিখেলা, তার কি প্রয়োজন আছে ? কিন্তু এটা ভুল। লাঠিখেলায় শরীর হুহ ও দৃঢ় হ'ব, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক জড়তা দূরীকরণে সাহায্য হয়, হৃদয় লোকদের বিকল্পে আশ্রয় ও দুর্বলের রক্ষার ক্ষমতা জন্মে। এরূপ ক্ষমতা জন্মিলে সাহসও বাড়ে। কোন সম্মত দেশেই আজকাল তীরধর্মু লইয়া যুদ্ধ হয় না। কিন্তু এখনও জাপানে ইহা শিক্ষা হিসাবে বোদ্ধাদের শিক্ষার প্রথম ধাপ বলিয়া কার্যকর স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ডে অনেক তীরধর্মুর ক্লাব আছে, মেরোও সেখানে তীর ছুড়িতে শিখে। আমেরিকাতেও তাই। শারীরিক ও মানসিক উপকার হয় বলিয়াই জাপানে ও পাশ্চাত্য নানা দেশে তীরধর্মুর আদব বহিবাছে, যদিও যুদ্ধে ইহার প্রচলন আর নাই। তেমনি লাঠিখেলাও, যুদ্ধে প্রচলিত না থাকিলেও, অল্প নানাপ্রকারে হিতকর।

[ইহার পর বাহা বলিয়াছিলাম, তাহা অল্পত্র প্রকাশিত ময়মনসিংহেব বক্তৃতার যুবকদের অল্প অভিপ্রের্ত শেষ অংশের মত।]

গঙ্গাজলঘাটী অমরকানন আশ্রম

গঙ্গাজলঘাটী গ্রাম বাঁকুড়া ও রাণীগঞ্জেব মধ্যপথে অবস্থিত। এই গ্রামেব নিকটে “অমর-কানন আশ্রম” নামক একটি জাতীয় বিদ্যালয় আছে। তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থানটি রম্য। কোন গ্রামের খুব নিকটে বা দুবে বা মধ্যে নহে। নিকটে হরীতকী, মহা প্রভৃতির স্বাভাবিক উদ্যান আছে। আশ্রমেব নিজের ধানের ও আঁকের ক্ষমী ও চাষ আছে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া স্ত্রী বাটাও হাতের তাঁতে কাপড় বোনা শিখান হয়। গোশালাও আছে। বিদ্যালয়েব পঠনপাঠনের গৃহ, লাইব্রেরী ও ঔষধবিতরণ গৃহ ছাড়া স্বতন্ত্র একটি উপাসনাব গৃহ আছে। অল্প দুবে একটি পাহাড়ের উপর হুগলী জেলার এক ভদ্রলোক একটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে কখন কখন বাস করেন। তত্ত্বিন্ন ঐ পাহাড়ের উপর একজন বাঙালী ব্রহ্মচারী থাকেন। স্বাস্থ্যকর-প্রাকৃতিক-রোমন্থ্যপূর্ণ স্থানে অবস্থিত এই জাতীয় বিদ্যালয়টির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনীয়।

আলোচনা

“কলিকাতার ভাইস-চ্যান্সেলারের উপর আক্রমণ”

এই শীর্ষক টিপ্সনীটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু ক্রিষ্ণাস্ত আছে। টিপ্সনীটিতে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উপস্থিত করা হইয়াছে :—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল “চাই” আছেন। তাঁহার শ্রীযুক্ত যদুবাবু বিষ্ণু নান মিথ্যা কথা রচাইতেছেন।

অভিযোগটি অনির্দিষ্ট ও গুরুতর নয় কি ? কিন্তু ইহার প্রমাণ কোথায় ? প্রথমতঃ কি কি মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে, এবং সেগুলি যে মিথ্যা তাহাব প্রমাণ কি ? কেহ সেগুলি মিথ্যা এই কথা বলিলেই কি সেগুলি মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ?

(২) “আপেকার কর্তার আমলে পরীক্ষার খুব বেশী পাশ উহাব আদেশে হইত”। এই আপেকার কর্তার কে ? তাঁহার আদেশে যে বেশী পাশ হইত তাহার প্রমাণ ? ভূতপূর্ব কর্তার

আদেশে যদি বেশী পাশ সম্ভব হইত, তাহা হইলে নব কর্তার আদেশের অন্তরঙ্গ অবস্থা যে তাঁহার আদেশের ফল নহে, তাহার প্রমাণ কোথায়? যদুবাবুর পক্ষ হইতে অন্ত কাহারো ওকালতীই কি যদুবাবুর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ?

(৩) যদুবাবুর বিকল্প পক্ষীয় একদল “চাই” আছেন; বাঁহাদের আশ্রিতদের “উপরি পাওনা” ছিল, এখন গিয়াছে। অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতব। ইহার প্রমাণ কি? অথবা বিপক্ষে “চাইসিরি” কবাই দোষের, অন্ত প্রকারের “চাইসিরি”তে বোধ হয়, দোষ হয় না?

(৪) “মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই”। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কি সত্য? এক ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার ফলাফলের নিম্নলিখিত তালিকাই সত্য নিদ্বিধরণে সাহায্য করিবে:—

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের গড়
১৯২৩	X	৭৪.৮
১৯২৪	X	৭৭.৫
১৯২৫	১৯,০৮২	৭৩.৮
১৯২৬	১৬,৪০৬	৫৭.২
১৯২৭	১৫,৬৬৭	৫৩.৯

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও গড় পাশের সংখ্যায় হ্রাস হয় নাই কি? এবং এই হ্রাসের কারণ কি? বাঁহারা শ্রীযুক্ত যদুবাবুর “চাই”, তাঁহাদের উত্তর দেওয়া উচিত।

শ্রীমণীজ্ঞানার্থ রায়

সম্পাদকের মন্তব্য

কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রধানত: মর্ডার রিভিউ ও প্রবাসীকেই করিতে হইত। তখন প্রত্যেক ব্যাপারের বিস্তৃত বৃত্তান্ত ও প্রমাণাদি আমবাই দিতাস। এখন অনেক বাংলা ও দৈনিক কাগজ এই কাজ করিতেছেন। সুতরাং বিস্তৃতভাবে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করা আমরা আব আবশ্যক মনে করি না।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিকল্পে কি কি মিথ্যা কথা প্রচারিত হইতেছে, এবং সেগুলি যে মিথ্যা, তাহার প্রমাণ আনন্দবাজার পত্রিকা, বহুমতী, বেঙ্গলী প্রভৃতিতে বহুবার বিস্তৃত ভাবে লেখা হইয়াছে। তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

“আপেকার কর্তা” পরলোকগত স্ত্রীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহা বহুজনবিদিত কথা এবং শ্রীযুক্ত রসাপ্রসাদ চন্দ্র বখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তখন লিখিয়াছিলেন, যে, আশুতাবু নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সীণ্ডিকেট আদিতে এমন লোক চুকাইয়াছেন বাঁহারা তাঁহার মুঠাভিতর। এইজন্য তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার আদেশে কাজ হইত এবং হইতে পারিত। এবিষয়ে তাঁহার কোন লিখিত বা মুদ্রিত আদেশ নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ইহা অবগত আছেন। পরীক্ষায় বেশী ছাত্র যে কৃত্রিম কাণ্ডে পাস হইত, তাহার একটা ভাল প্রমাণ এই, যে, আশুতাবুর মৃত্যুর পর হইতে পাস কম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা প্রতিবাদকারীর তালিকাতেই দেখা যাইতেছে। ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ সালে যথাক্রমে শতকরা ৭৪.০৮, ৭৭.৫ এবং ৭৩.৮ জন পাস

হইয়াছিল। তাহার পর কমিয়া ১৯২৬ সালে একেবারে শতকরা ৫৭.২ জন পাস হইল। হঠাৎ স্কলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা অবনতি কিংবা হঠাৎ স্কলগুলিতে অন্তর্ভুক্তি বিন্দুতিপরাবণ ছাত্রবৃন্দের আবির্ভাব হইতে পারে না। প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকদের মধ্যেও বেশী পরিবর্তন হয় নাই। কম পাস হইবার কারণ এই, যে, বাঁহাব প্রভাবে বেশী পাস হইত, তাঁহার অবর্তমানে ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী স্বাভাবিক ফল কলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ১৯২৭ সালেও সেইরূপ ফল হইয়াছে।

ভূতপূর্বে কর্তার আদেশে বেশী পাস সম্ভব হইত এই কারণ, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক-আদির নিয়োগ তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে হইত। ১৯২৭ সালের পরীক্ষা-গুলির প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিয়োগ যদুবাবুর আমলে হয় নাই। নিজের ব্যক্তিগত হুকুমে বেশী বা কম পাস করাইবার মত প্রবৃত্তি যদুবাবু আছে কি না তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তাঁহার সেক্ষেপ প্রবৃত্তি যদি থাকিত, তাহা হইলেও কাজ তদনুসারে হইত না; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতাবুর মত তাঁহার প্রভাব নাই, হুকুমও বাটে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছল্য যে বেশ চলে, তাহার একটা মাত্র প্রমাণ দিলেই হইবে। অল্প বোডের ভাষা দুই-ধাক্কা, ইতিহাসের বোর্ড অব হাইবার ঠাড্ডিমে পর্য্যন্ত তিনি নির্বাক হইতেন নাই। তিনি যে পরীক্ষায় কম বা বেশী পাস করা সম্বন্ধে পরীক্ষক-দিগকে মৌখিক বা লিখিত চাইদের আশ্রিত লোকদের উপরি পাওনা কোন আদেশ দেন নাই, তাহা কোন কোন পরীক্ষক ধরনের কাগজে লিখিয়াছেন। চাইদের আশ্রিত লোকদের উপরি পাওনা ছিল, ইহা গুরুতর অভিযোগ বটে, কিন্তু সত্য। কোন কোন চাইয়ের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অভিযোগ বাহা আছে, তাহা আমরা লিখি নাই। শুব বেশী উপরি পাওনা বাহাব ছিল, তাহার বোজগাধের পথ, অন্তত: কতকটা, বন্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসিলে প্রমাণ উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইবে। প্রতিবাদকারীর প্রস্তাব উত্তরে প্রমাণের সম্মান দিলে অসং-লোককে প্রমাণ নষ্ট করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। আসাদেব সম্মত হয়, ইতিমধ্যেই কিছু কিছু প্রমাণ নষ্ট হইয়াছে।

“মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই”, এই কথা বখন আমরা লিখিয়াছিলাম, তখন ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ ও আই-এসসির ফল বাহির হইয়াছিল। পরীক্ষার্থীর সংখ্যার হ্রাসের বিষয় আমরা কিছু লিখি নাই; ইহা প্রতিবাদকারী নিজের উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিজের নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, ১৯২৫ সালের ১৯.৮২ জন. হইতে কমিয়া ১৯২৬ সালে ১৬.৪০ জন পরীক্ষার্থী কেন হইয়াছিল। তখন যদুবাবু ভাইস-চ্যান্সেলার হন নাই। প্রতিবাদকারী নিজের নিজেকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, ১৯০৮ ও ১৬.৪০ এ বৎ প্রভেদ তাহা যদি যদুবাবুর প্রভাব, ব্যতিরেকে কোন স্বাভাবিক কারণে ঘটয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ১৬.৪০ ও ১৬.৬৭ এন মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ যদুবাবুর প্রভাব ব্যতিরেকে পূর্ববৎ স্বাভাবিক কারণে ঘটতে পারে কি না।

কেল একটুও অধিক হয় নাই, একপ কথা আমরা লিখি নাই; মোটের উপর বেশী হয় নাই, লিখিয়াছিলাম। তাহা সত্য কথা। শতকরা ৭৪, ৭৭, ও ৭৩ এর অধিক সংখ্যক পাশের পরেই নতুনরা ৫৭ পাস হওয়ারও প্রতিবাদকারী বা চাইদের দলের অহ কোন লোক তাহাকে “বেশী ফেল” মনে করিয়া চাঁৎকার জুড়িয়া দেন নাই; কেননা, তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন জজ জীতেন্দ্র, যদুবাবু নথ।

কিন্তু এখন ৫৭'২ এ'ব পর ৫০.৯ কেও বড় বেশী ফেল বলিখা চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করা হইতেছে; যেহেতু এখন ভাইস্-চ্যান্সেলার বহুবাবু!

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে ধনীদেব কর্তব্য

আমাদের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, “অল্প অনেক লোকে ধৈর্য আয় ও আশ্রমের দ্বারা বিস্তার পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, জমিদারবাণীনা পরিশ্রমে সেইরূপ আয় ও আশ্রম পান। ইহা বহু তাঁহারা কৃষক ও শ্রমিকদের নিকট ধনী অতএব জমিদারীর প্রত্যেক প্রাণে পাঠশালা চালান প্রত্যেক জমিদারের কর্তব্য।” এসম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; তাহা নিম্নে লিখিতেছি। প্রথমতঃ, বাংলা দেশের প্রত্যেক জমিদারই যে (প্রায় নহে, সম্পূর্ণ) বিনা পরিশ্রমে আয় ও আশ্রম ভোগ কবিতেছেন একথা সত্য নহে। প্রজাদের নিকট হক পাওনা আদায়ের দ্বারাও অনেক জমিদারকে বিস্তার পরিশ্রম কবিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহারা সেই পরিশ্রমেব ভাৱ অস্ত্রের উপর স্তম্ভ করেন, তাঁহাদিগকে বহুদিন জায ও আশ্রম ভোগ করিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, পৈত্রিক জমিদারীর সালিক পুরাতন জমিদার সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিশ্রমেব অভাবের দোষ বিদ্যমান থাকিলেও যাহারা নিজে জমিদারী উপার্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ দোষ আবাদিত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, জমিদার বাতীত বাংলা দেশে অল্প শ্রেণীর লোকও আছেন যাহারা আয় ও আশ্রমের দ্বারা, প্রত্যেকে নাই হউক পরোক্ষে, কৃষক ও শ্রমিকদের নিবট ধনী, কোম্পানীর বাগজ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া যাহারা পাথের উপর পা তুলিয়া আশ্রমে দিন কাটাইতেছেন, তাঁহাদের আয় অংশতঃ হইলেও কৃষক ও শ্রমিকদের কষ্টাঙ্কিত অর্থ হইতে আসিতেছে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। চতুর্থতঃ, কবিিক পরিশ্রমের অভাব লক্ষ্য কবিয়া যদি সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য লেখা হইয়া থাকে, তবে কারিক পরিশ্রমে পরামুখ, অথচ আয় ও আশ্রম ভোগকারী ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তার ও সম্পাদকগণ গ্রামে গ্রামে না হউক, অন্ততঃ নিজ নিজ গ্রামেও ত পাঠশালা স্থাপন করিতে পারেন। আয় ও আশ্রমেব দ্বারা কারিক পরিশ্রম কবা একান্তই কর্তব্য, আশা কবি, সম্পাদক মহাশয় সেদিক মনে করেন না। পঞ্চমতঃ, কঠোর চেষ্টা সত্ত্বেও মহালের বাকী বকেয়ার অনাদায়ে বে-সমস্ত জমিদারকে ঋণ কবিয়া লাট রক্ষা করিতে হইতেছে, সেইসমস্ত জমিদারগণের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় কি একই উপদেশ দিবেন? এসম্বন্ধে বক্তব্য বহু আছে। সব জমিদারই কিছু পরিশ্রমে কাতর নহেন। অনেক জমিদারেরই প্রজাদের প্রতি কর্তব্য-জ্ঞান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব দিক বিবেচনা না কবিয়াই সম্পাদক মহাশয় জমিদার শ্রেণীর উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তমোহন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকের মন্তব্য

শিক্ষা-বিস্তারে জমিদারদের খুব হযোগ আছে। এইজন্য সে-বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিরাছিলাম। কাহাবও প্রতি কটাক্ষপাত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কি কি উপায়ে কোন কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমরা যদি একখানা বহি কিংবা অন্ততঃ একটা ধীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতাম, তাহা হইলে তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের উল্লেখ না থাকিলে তাহা বিশেষ দ্রষ্ট মনে করা বাইতে পারিত। কিন্তু “বিবিধ প্রসঙ্গে” কোন বিষয়েরই আলোচনা নিঃশেষে করা যায় না। সুতরাং যদি শিক্ষা-বিস্তারে জমিদার ছাড়া অল্প কোন কোন শ্রেণীর লোকের কর্তব্যেব উল্লেখ না করিয়া থাকি, তাহা গুরুতব অপবাদ নহে।

জমিদারদের মধ্যে পরিশ্রমী, শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী লোক আছেন, জানি। আমরা কখনো শ্রেণীগত ভাবে বলিয়াছি; তাঁহাদের মধ্যে কেহই পরিশ্রমী নহেন বা শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী নহেন, এরূপ অপ্রকৃত কথা বলি নাই। অধিকাংশ জমিদার শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী, ইহা কেহ আমাদেরকে বুঝাইবা দিলে কৃতজ্ঞ-চিত্তে আল্লাদের সহিত আমাদের মন্তব্য প্রত্যাহার করিব।

যাহারা আমাদের দ্বারা জমিদারদের বা তাঁহাদের কর্মচারীদের পরিশ্রম, সমান পরিমাণ টাকা রোজগারের দ্বারা অল্প অনেক শ্রেণীর লোকদের দৈহিক-মানসিক শ্রমের সমতুল্য নহে।

যাহারা ঋণ ববিয়া লাট রক্ষা করেন, জমিদারী মোটের উপর লাভজনক না হইলে তাঁহারা তাহা কবিতেন না,—করিতে পারিতেনও না। কারণ, যাহা লাভজনক নহে, তাহা বন্ধক বাধিয়া মহাজন ঋণ দেয় না।

যাহারা নিজে জমিদারী উপার্জন করেন, তাঁহারা ওকালতী ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় কবিয়া করেন। ওকালতী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা সাপেক্ষ। শিক্ষিত লোকেরা সবাই গবীষ শ্রমজীবী প্রভৃতির নিকট শিক্ষার দ্বারা অংশতঃ ধনী। শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা এই ধন শোধ করা তাঁহাদের কর্তব্য। এইরূপ কথা আমাদের “বিবিধ প্রসঙ্গে” আমরা লিখিয়াছি। সুতরাং নিজে জমিদারী-উপার্জক, বা উকীল, বা ব্যারিষ্টার, বা মোক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের কর্তব্য এরূপ কথা দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক উল্লেখ না করার কোন দোষ হয় নাই। যাহারা কোম্পানীর বাগজ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া তাহার হ্রদ হইতে আশ্রমে কালক্ষেপ করেন, তাঁহারা শিক্ষিত লোক হইলে, তাঁহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে ধরিতে হইবে। যদি তাঁহারা অশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের উল্লিখিত কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন বটে। ইহা দেখাইবা দেওয়ার আমরা প্রতিবাদকারীর নিকট কৃতজ্ঞ।

জমিদারদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত কি না জানি না, অনেক শিক্ষিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের দাবিধ বৈদ্য-শিক্ষিত বলিখা দাবিধ, জমিদার বলিয়া দাবিধ।

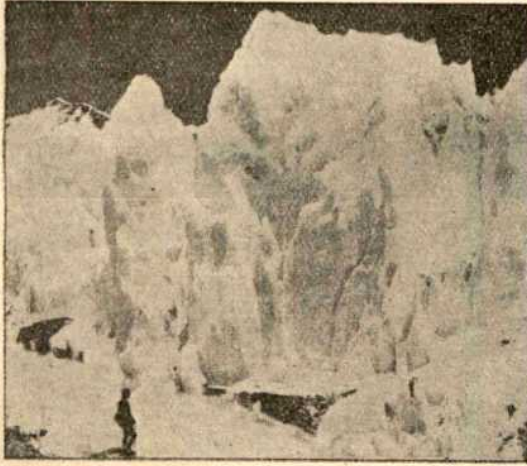
পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, জমিদারদের বাহা কর্তব্য বলিয়া আমরা বলিয়াছি তাহা বাণবিক তাঁহাদের কর্তব্য কিনা, তাহাই আসল প্রশ্ন। যে কারণে, আমরা তাহা তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়াছি, সে কারণটা যদি ঠিক না হয়, তাহা হইলেও কর্তব্যটি অকর্তব্য হইয়া বাইবে না। অল্প কাহাবও কর্তব্য নির্দেশ আমরা যদি না করিয়া থাকি, কেবল মাত্র সেই কাণেও জমিদারদের কর্তব্যটি অকর্তব্য হইবে না। অতএব শিক্ষা-বিস্তার তাঁহাদের কর্তব্য কি না, তাহা তাঁহারা, তাঁহাদের কর্মচারীরা ও তাঁহাদের পক্ষ-সমর্থকেরা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।



গৌরীশঙ্কর অভিযান—

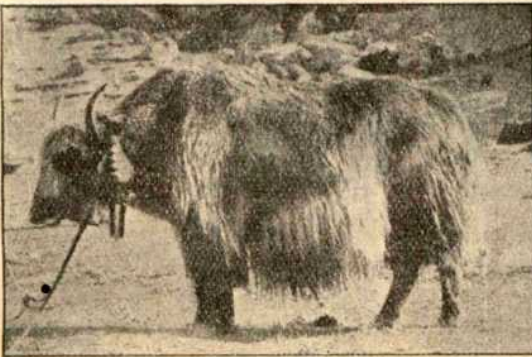
ক্ষুদ্রদেহ মানব বিপুল প্রতিভা ও অমিততেজস্বলে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহায়তায় জীবজগৎ ও জড়জগৎকে করায়ত্ত করিয়া কি অসাধ্য সাধন করিতেছে ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু তাহাদের তুহিন-শীতলতা লইয়া তাহার আক্রমণ রোধ

ধরণীর বক্ষপঙ্ক্তির ভেদ করিয়া খনিজ দ্রব্য আহরণ করিতেছে; এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গম, সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ যে তুষারাবৃত হিমালয় মানুষ তাহাকেও রেহাই দিল না। হিমালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক শিখরে সে বাসভূমি নির্মাণ করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছে। অজলিহ

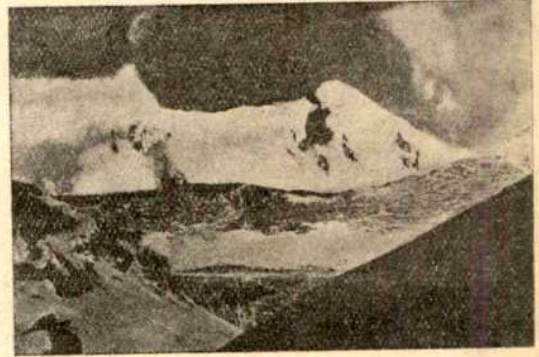


গৌরীশঙ্করের পথে

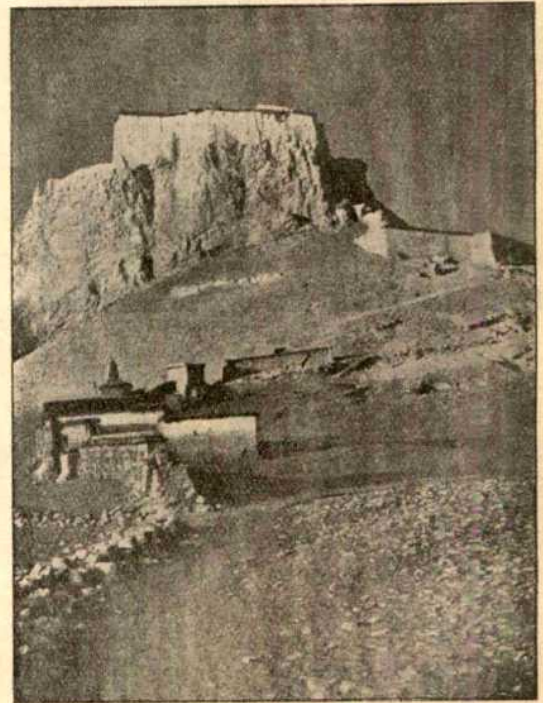
করিতে পারিল না; উত্তাল তরঙ্গ ও বিশালকায় সামুদ্রিক জন্তু-সঙ্কুল বারিষি এখন স্থলপথ অপেক্ষা কম নিরাপদ নহে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আফ্রিকার গহনতম অরণ্যও মানবের পদচিহ্ন বক্ষে ধরিতেছে। হৃদয় আকাশলোকে এখন সে নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করে। সমুদ্রের অতল গহন হইতে সে মুক্তা সংগ্রহ করিতেছে,



দুর্গম পথে যাত্রীদিগের সহযাত্রী—ইয়াক



গৌরীশঙ্করে সন্ধ্যা



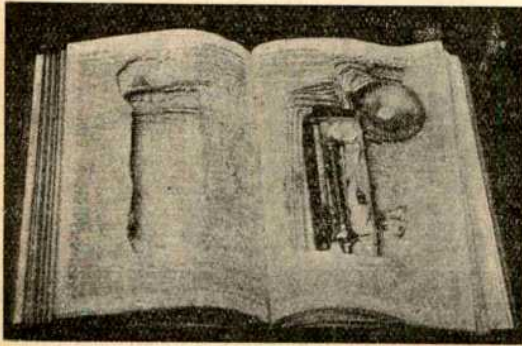
কাপ্পাজঙ্গের বৌদ্ধ মন্দির—উচ্চতা ১৫০০০ ফুট

গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্ট্—এতকাল মনুষ্য-পদচিহ্নে কলঙ্কিত হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি মানবদেহধারীর হাতে তাহার মাহাত্ম্যও নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ও প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। বাহারা তাহার সন্ধান নষ্ট করিয়াছিল তাহারা জরী হইয়াও জীবন লইয়া ফিরিতে পারে নাই। তাহাদের সহযাত্রী ক্যাপ্টেন জে, বি, এল, নোয়েল তাহাদের সেই বিজয়-অভিযান ও গৌরবময় মৃত্যুর ইতিহাস চলচ্চিত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র প্রদর্শন করিয়া ফিরিতেছেন।

তৃতীয় এভারেষ্ট্ অভিযানে ম্যালোরী, আর্ভিন, নটন, ক্রস, সোমারভেল, প্রভৃতি বীরগণ কিভাবে জীবন বিপন্ন করিয়া দুর্গম তুষার-সমচ্ছন্ন গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ম্যালোরী ও আর্ভিন কিভাবে এভারেষ্টের অত্যাশ্চর্য্যে আরোহণ করিবার পর চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যান, এইসকল বিবরণ ‘এভারেষ্টের মহাকাব্য’ নামক পুস্তিকায় বাহির হইয়াছে। আমরা আগামী সংখ্যায় এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ দিব, এখন কেবল মাত্র চারটি চিত্র দিতেছি।

মাদক দ্রব্যের আমদানি—

আইন-সম্মত উপায়েই অপব্যাপ্ত পরিমাণ মাদক দ্রব্য ভারতবর্ষের সর্বত্র বিক্রিত হইতেছে; ভারতবর্ষের একতৃতীয়াংশ লোক কোন-না-কোন বড় মাদক দ্রব্যের দাস। আইন-সম্মত সরকারাধুমেদিত উপায় ছাড়াও আরো কত ভাবে যে মাদক দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী

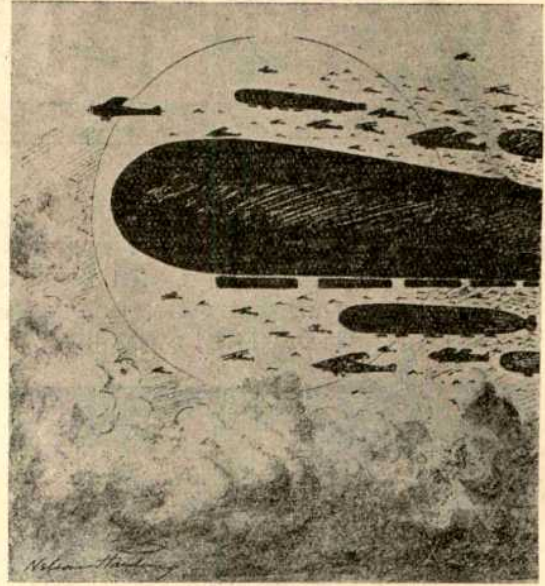


মাদক দ্রব্য প্রচারে ধর্মগ্রন্থের ব্যবহার

হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসকল লোকের বুদ্ধি দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই বুদ্ধি সংকারণে নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উন্নতি হইত। বিদেশ হইতে ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে কেমন করিয়া মাদক দ্রব্যের চালান আনিতেছে এখানে তাহার একটি নমুনা দেখান হইল।

ব্যোমযান-ভীতি—

এরোপ্লেন, জেপেলিন ইত্যাদির সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া আকাশপথ রোধ করিতেছে ইহা দেখিয়া একজন বাঙ্গ-চিত্রকর ঈগল পত্রিকায় এই বাঙ্গ-চিত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে গ্রহ উপ-

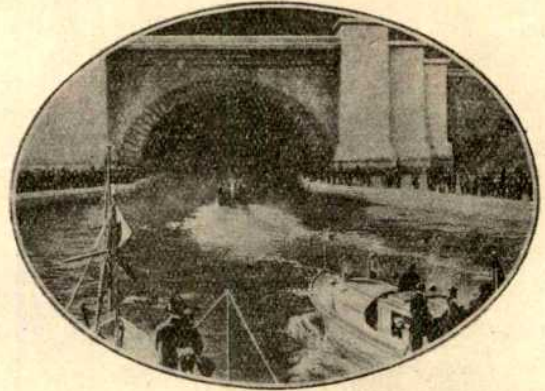


ভবিষ্যতের স্বর্বাগ্রহণ—কোন সালে; ১৯—?

গ্রহের ছায়া-আলোক-পাতে আর গ্রহণ হইবে না। পৃথিবীর এই স্ববৃহৎ যন্ত্রগুলিই স্বর্ষ্যকে অন্তরাল করিবে, চিত্রকর ইহারই আভাস দিতেছেন।

বৃহত্তম হুড্জ—

পূর্বে মার্শেই বন্দর হইতে বেরে নগরে জলপথে মাইলবার উপায় ছিল না। এই ১৫ মাইল পথের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাইলব্যাপী একটি খাড়া পাহাড় বর্তমান ছিল। প্রায় ১৫ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ফরাসী

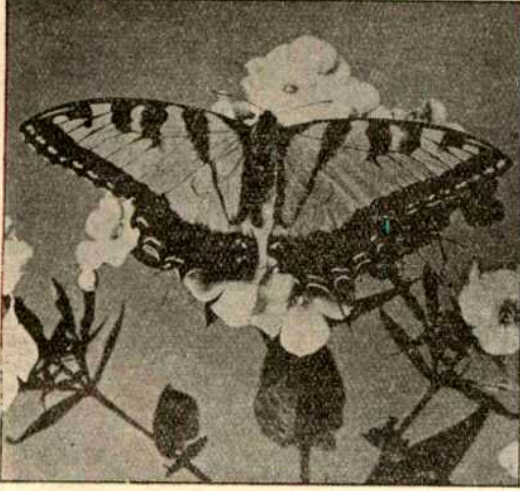


পাঁচ মাইলব্যাপী ‘হুড্জ’

ইঞ্জিনিয়ারগণ এই পর্বত ভেদ করিয়া একটি হুড্জ জলপথ (টানেল) নির্মাণ করিয়াছেন। এই হুড্জ ৭২ ফুট চওড়া। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ পড়িয়াছে। এই হুড্জ-পথে যে-নৌকাটি প্রথম প্রবিষ্ট হয় ইহা তাহারই ফোটো।

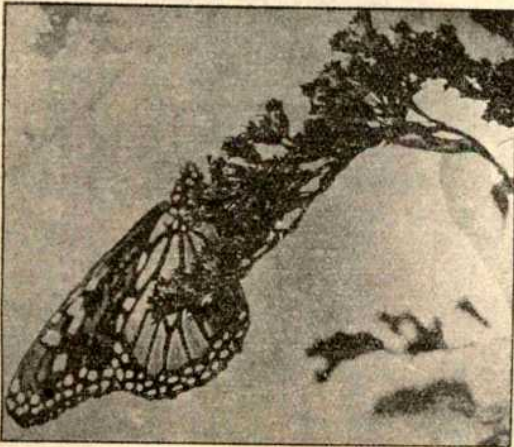
গন্ধবহ প্রজাপতি—

প্রজাপতিরা যে শুধু ফুলে ফুলে মধু পান করিয়াই ফেরে তাহা নহে, গন্ধ সংগ্রহ করিবার ও বিতরণ করিবার ক্ষমতা এক শ্রেণীর প্রজাপতির আছে। ইহারা দেখিতেই শুধু ফুলের মত সুন্দর হয় না, ফুলের মত সুগন্ধও ছড়াইয়া থাকে। মাজেরী মাকড়সি প্রজাপতি



গন্ধবহ প্রজাপতি

সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন, এই গন্ধবহ প্রজাপতি সকলগুলিই জাতিতে পুরুষ। বস্তুতঃ, পক্ষী-জগতে দেখা যায় পুংজাতিই মহিলাদের অপেক্ষা বেশত্বায় অধিকতর ডাকজমকশালী হইয়া থাকে। গন্ধ বিতরণের কাজও এই পুরুষ প্রজাপতিদের। সাধারণতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, জামাইকা, নিংহল ও আমামে এই শ্রেণীর প্রজাপতি দৃষ্ট হয়। জামাইকার প্রজাপতি সিরিঙ্গা ফুলের গন্ধ এত অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করে যে, ইহারা যে-স্থানে উড়িয়া বেড়ায় সেইস্থান অপূর্ব



গন্ধবহ 'রাজ'-প্রজাপতি

সৌরভে আমোদিত থাকে। আমরা এখানে গন্ধবহ প্রজাপতি দুইটি চিত্র দিলাম।

পৃথিবীর কনিষ্ঠতম সম্রাট—

রুম্যানিয়ার বর্তমান সম্রাট প্রথম মাইকেল পৃথিবীর কনিষ্ঠতম রাজা। ইহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ইনি ইংরেজী, ফরাসী ও

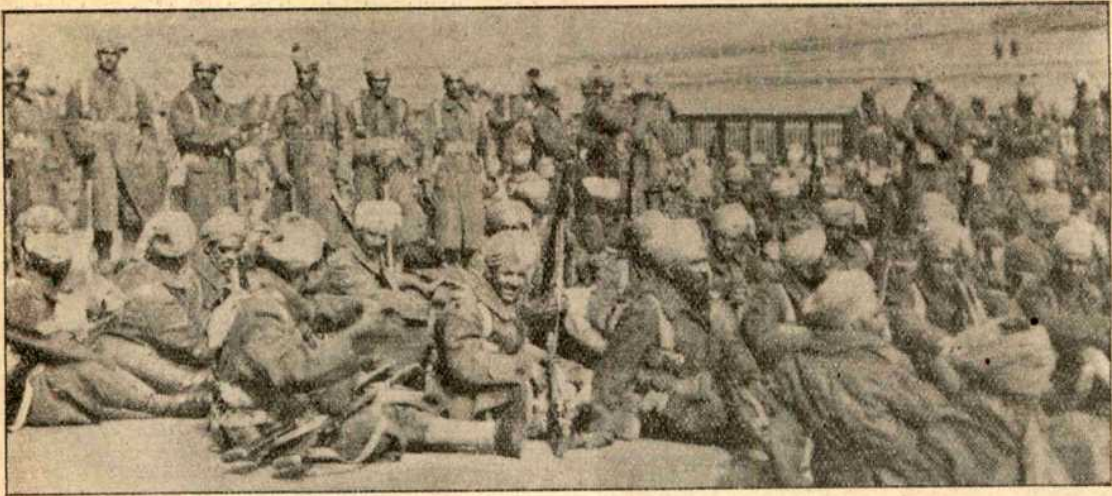


রুম্যানিয়ার সম্রাট প্রথম মাইকেল

রুম্যানিয়ান এই তিন ভাষায় কথা বলিতে পারেন। রাজা ভিয়েকের সময় ইনি ক্ষুধার্ত হইয়া মাকে বলিয়াছিলেন, "মা, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, বাড়ী চ'ল না।"

চীনে ভারতীয় সৈন্য—

চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইংরেজ-প্রদানিত ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ করা উচিত কি অসুচিত ইহা লইয়া বিচ্ছিন্নাল পূর্বে



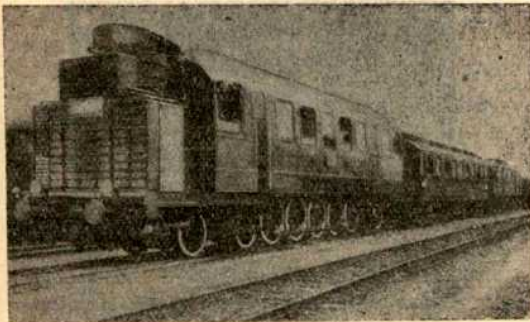
চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদল

আমাদের দেশের সংবাদপত্রাদিতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ভারতের জনমত চীনের বিরুদ্ধে নহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। আমরা এখানে চীনে ভারতীয় সৈন্যদলের একটি চিত্র দিলাম। ভারতে যে বাদ-বিতণ্ডাই হউক ইহার বেশ আনন্দেই আছে মনে হইতেছে।

দ্রষ্টব্য। গাড়ীতে ১০০০ মাইল পথের উপযুক্ত তৈল লইবার ব্যবস্থা আছে। গাড়ী চলিবার সময় ধোঁয়া উড়িয়া রেলযাত্রীদের চোখে গুঁড়া পড়িয়া কোন অসুবিধা ঘটায় না।

তৈলচালিত রেলগাড়ী—

জার্মানিতে সম্প্রতি একটি রেলগাড়ী নির্মিত হইয়াছে। ইহা কয়লার বদলে তৈল দ্বারা চালিত হয়। রাদিয়ান ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক লোমোনোভক ১২০০ হর্স পাওয়ারের একটি এঞ্জিন নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইঞ্জিনে একটি ডিজেল মোটরযুক্ত আছে—



তৈলচালিত রেলগাড়ী

এই মোটর তৈল সাহায্যে কাজ করে। অব্যবহার্য কয়লা হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করিয়া তাহারই সাহায্যে এই এঞ্জিনের তৈল প্রস্তুত হয়। এই ফোটোটি বার্লিনের নিকটে গৃহীত হইয়াছিল। ভিতরের মোটরটি ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বাহিরের প্রকাণ্ড রেডিয়েটরটি

শ্রবণ-শক্তিবর্দ্ধক যন্ত্র—

বক্তৃতা-সভা, থিয়েটার ইত্যাদির পিছনের দিকে বসিয়া অনেক সময় বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক একটি সহজবহুল অল্প

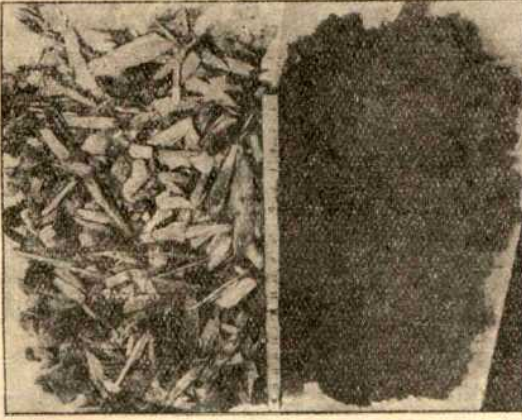


শ্রবণশক্তিবর্দ্ধক যন্ত্র

মূল্যের শ্রবণশক্তি-বর্দ্ধক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মহিলাটি এই যন্ত্র কানে লাগাইয়া আছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে যেমন দূরের জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় এই যন্ত্র-সাহায্যেও তেমনি দূরের কথা স্পষ্ট শোনা যাইবে।

পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবহার—

কাঠের কারখানায় কাঠের গুঁড়া ও টুকরা টুকরা কাঠ অনেক সময় অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। উইলিয়াম এইচ ম্যাসন এগুলিকে কাজে খাটাইবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কাঠের টুকরা ও গুঁড়াগুলিকে একত্র করিয়া বারুদের সাহায্যে একটি চাপে পরিণত করা হয়। তখন ইহা অনেকটা পশমের



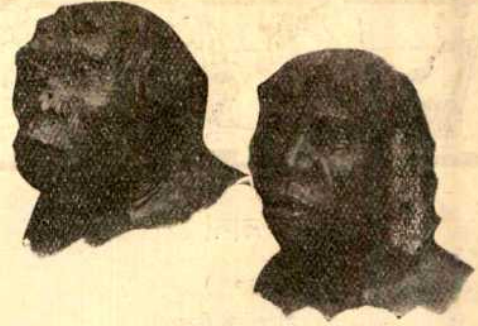
অব্যবহার্য্য কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবহার
বামদিকে। বারুদ-সংযোগের পূর্বাৱস্থা
ডানদিকে। পরের অবস্থা

মত দেখিতে হয়। এই জিনিষটিকে লইয়া যথাযথ চাপ-প্রয়োগে নানা কাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ছবিতে বামদিকে বারুদ-সংযোগের পূর্বের অবস্থা এবং ডানদিকে বারুদ-সংযোগের পরের অবস্থা দেখানো হইয়াছে।

বনমানুষ কি মানুষের পূর্বপুরুষ ?

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইনের মতবাদ অনুসারে আমরা এতকাল জানিয়া আসিতেছিলাম যে, বনমানুষই আমাদের পূর্বপুরুষ। পরে এই তত্ত্বই রূপান্তরিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়—মানুষ ও বনমানুষ উভয়েই বনমানুষেরই মত কোনও ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি জীব-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অগ্রগণ্যবাস্তুদের অত্যন্ত ম নিউইয়র্ক সহরের বাত্ময়রের অধ্যাপক হেনরী ফোরফিল্ড ওস্বর্গ প্রচার করিতেছেন যে, মানুষের পূর্বপুরুষ এই বনমানুষও নহে আবার বর্তমানে মানুষ নামে খ্যাত কোন মানুষও নহে। তাঁহার মতে মানুষের পূর্বপুরুষ ‘আদি মানব’ (dawn men) বন-মানুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আঞ্জিও অনাবিকৃত কোন প্রাগ-ঐতিহাসিক জীব হইতে কমবিস্তরন-ধর্ম্মানুযায়ী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মতবাদ লইয়া তাঁহার ভূতপূর্ব শিষ্য ডাঃ উইলিয়াম কে, গ্রেগরীর সহিত বিবাদ শুরু হইয়াছে। তিনি ডারুইনের পক্ষ সমর্থন করেন।



উপরে, জাভার আদিমানুষ (পিথেক্যানথোপাস ইরেস্টাস)
নীচে, ইংলণ্ডের ‘পিল্ট ডাউন’ মানুষ

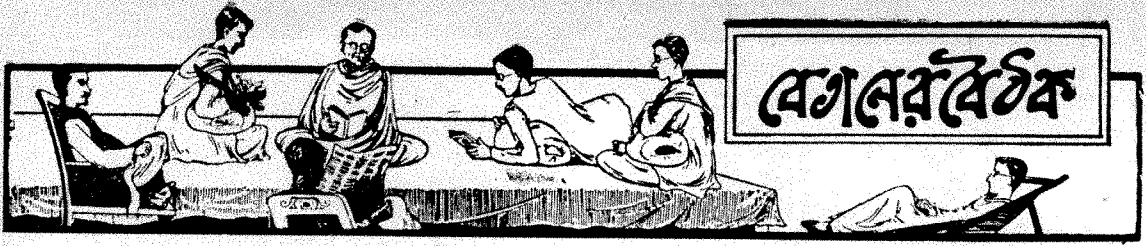
অধ্যাপক ওস্বর্গ বলিতেছেন যে, কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষের পূর্বপুরুষ এই আদি মানবের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ ছিল। তখন এই আদি মানবও ছিল আবার বন মানুষেরও অভাব ছিল না। তিনি বলেন যে, মধ্য এশিয়ায় বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে ইহাদেরও পূর্বপুরুষের সম্ভাবনা পাওয়া যাইবে।



উপরে, ইয়োরোপের নিয়াণ্ডারথাল মানুষ
(২৫০০০—৫০০০০ বৎসর পূর্বে)
নীচে, ক্রোমাগনন মানুষ (২০০০০ বৎসর পূর্বে)

তাঁহার মতে এই ‘আদি মানব’ মঙ্গোল, নিগ্রো ও অকেশিয়ান জাতিদের জন্মদাতা। ইহারা মাটির উপর বাস করিত, অতিশয় ধৃষ্ট ও যন্ত্র-নির্মাণে পারদর্শী ছিল। মধ্য এশিয়ার সমতল ভূমি ও অধিতাক ভূমি-সমূহে ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করিত। ইয়োরোপের ‘নিয়াণ্ডারথাল’ মানুষ, জাভার ‘পিথেক্যানথোপাস ইরেস্টাস’ ও ইংলণ্ডের ‘পিল্ট ডাউন’ মানুষ ইহাদেরই বংশধর।

অধ্যাপক ওস্বর্গের এই মতের একটি প্রমাণ স্বরূপ তিনি নেব্রাস্কা পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রায় তিনশত রকমের প্রস্তরীভূত অস্থিযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এইগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্ততঃ ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল।



জিজ্ঞাসা

(২৩)

সাক্ষেতিক চিহ্ন

বান্ধলায় + প্রাস, —মাইনাস, = ইকুয়াল টু প্রভৃতি চিহ্ন আছে। কিন্তু তাহা আমি পড়িতে জানিনা। অক্সিজেন + হাইড্রোজেন = জল। ইহা কিরূপে পড়িয়া শুনাইতে হয়? বিজ্ঞানের positive এবং negative এর বান্ধলা কি?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৪)

মহাভারতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মহাভারতের এক স্থানে পারসীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আভাষ আছে। ইহা কোন পর্বের কোন অধ্যায়ে আছে?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৫)

মূল মহাভারত

মূল মহাভারতের এমন কোন বান্ধলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বাহাতে Contents Index এবং প্রতি অধ্যায়ে Heading আছে?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৬)

পুরাণের ভৌগোলিক নাম

পার্সিটর প্রণীত ইংরেজী পুস্তকে যেসকল বান্ধলায় সেই রূপ কোন পুস্তক আছে কি না বাহাতে পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নামের বর্তমান সময়ের প্রচলিত নাম পাওয়া যায়?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৭)

য়ালুমিনিয়ামের পাত্র

কেহ কেহ বলেন য়ালুমিনিয়ামে লেড আছে। এজন্য ইক্মিক কুকারের রাঁধা খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা দুর্বিধ কি না এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল কি না?

শ্রী অঘোরচন্দ্র তালুকদার

(২৮)

“মেয়ে” শব্দ

“মেয়ে” শব্দ সাধারণতঃ কন্যাকে বুঝায়, কিন্তু বীরভূম জেলায় কোন কোন অংশে “মেয়ে” শব্দ স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কোন সংস্কৃত শব্দ হইতে এই “মেয়ে” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আর কোনো অঞ্চলে এই মেয়ে শব্দ স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয় কি না?

বান্ধলা সাহিত্য মধ্যে কোথাও এই অর্থে “মেয়ে” শব্দের প্রয়োগ আছে কিনা?

শ্রী গৌরহৃন্দর রায়

(২৯)

দেশ-মাতৃকার বোধ

কোন দেশের লোকের মনে সর্বপ্রথমে দেশের প্রতি মাতৃবোধ জন্মিয়াছিল? ভারতবর্ষের কোন প্রাচীনতম পুস্তকে এই ভাব-সূচক রচনা দেখিতে পাওয়া যায়?

শ্রী রামনারায়ণ মজুমদার

(৩০)

ক। লেবু রাখার উপায়

কমলা লেবু বৎসরের সকল সময় পাওয়া যায় না। তাহা সর্বদা রাখিবার উপায় কি? এমন কোন জিনিষ প্রয়োগ করা যায় কিনা বাহাতে লেবু সর্বদা মতেজ থাকে এবং আশ্বাদনের পরিবর্তন না হয়।

খ। দুধ রাখার উপায়

দুধ সময় মত গরম বা জ্বাল না দিলে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কোন জিনিষ প্রয়োগ করা যায় কিনা বাহাতে দুধ নষ্ট না হয় এবং ২১ দিন রাখা যায় এবং স্বাদেরও পরিবর্তন না হয়।

শ্রীমতী ইলাবতী সেন।

(৩১)

বিধবা-আশ্রম

ভদ্রঘরের অনাথা, অন্নব্রহ্মা বিধবা মহিলা বাহাতে স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা ও শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নিষ্ঠাচার প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকাার্জন করার জন্ত নানা রকম শিল্পকার্য ও লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারেন বাংলাদেশে তজ্জন্ত কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কিনা? থাকিলে তাহার ঠিকানা কি? প্রবেশার্থীদিগকে এখানে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয় কিনা? শিক্ষালাভেচ্ছুক এখানে কত দিন বাস করিতে পারেন তাহার কোন নিয়ম আছে কি? শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এই মহিলাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন কি?

শ্রী অন্নদাচরণ ভৌমিক

মীমাংসা

(১৫)

আলকাতরার দাগ

১। কাপড়ের যেখানে আলকাতরার দাগ পড়ে, সেস্থানটি কতকগুলি আমরুল শাকের পাতা দ্বারা (এই পাতার রসে ‘অক জালিক’ নাম কএক প্রকার এসিড পাওয়া যায়।) তাহা কোনও দাগ

উঠাইবার এক প্রধান উপাদান) খুব জোরে জোরে ঘষিবা দিন। তৎপর কেরোসিন বা ভাল সরিষার তৈল দ্বারা বাববার ঘষিতে থাকুন। অবশেষে সোড়া ও কাপড়-কাচা সাবান দ্বারা কাচিবা লইলে আলোকাতরার দাগ উঠিয়া যাইবে। পবীকৃত।

২। জামিরের রসের ভিতর দাপযুক্ত ছানটি কয়েক ঘণ্টা ভিজাইবা রাসিয়া পবে ভাল সাবান ও সমপরিমাণ চূণ গবমজলের সহিত মিশাইয়া লউন। এই মিশ্রিত জল দ্বারা কাপড় ধুইলে দাপের চিহ্নও থাকিবে না। পবীকৃত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৭)

ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল

অগ্রসিদ্ধ প্রকৃতির শ্রীযুত সন্তোষ নাথ শেঠ মহাশয় Maharajah Kasimbazar's Polytechnic Institute, 1-3 Nanda Lal Bose Lane, Calcutta তে হাতেকলমে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা-দিবার ভার লইয়াছেন। উপবোক্ত ঠিকানায চিঠি লিখিলে সমস্ত বিষয় জানা যায়।

শ্রীমতী বীণাপাদি দত্ত

(১২)

শব্দের ব্যুৎপত্তি

“সাবেক” শব্দটি বিদেশীয়। আবারী ভাষা হইতে আসিয়াছে। “বাহার” সম্বন্ধেও ঐ কথা।

“পরমস্ত”, “টের” ও “হৈসেল” শব্দ দেশজ বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালা ভাষার ও সম্বন্ধে কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় না। চলতিতেই প্রচলিত।

“আইবুড়ু”—সংস্কৃতের অপভ্রংশ অব্যুত হইতে আসিয়াছে। “গড়” শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিধা, ক্ষবিত অর্থেও দেখা যায়। প্রাণস অর্থ-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

“ঘব” শব্দ সংস্কৃত গৃহ শব্দের অপভ্রংশ।

“কলাহারের” প্রকৃতিগত অর্থ—কলভোজন (কল+আহার) [যদিও অধুনা ঐ অর্থে কলার অর্থাৎ দধ্যাদি সংযোগে চিপটিকাদি ভোজন বা লুচিসন্দেশ ভোজনই বুঝায়।]

“কবুল” ও “আহামুক” শব্দ আরবীয়। পেশোক্ত শব্দটি আহামুক নহে—(যদিও আমরা ঐ শব্দের সহিত পরিচিত) “আহামুক” প্রকৃতকপ।

শ্রী বৈষ্ণবনাথ মুখোপাধ্যায়

আহামুক, আহামুক এই শব্দ আরবী “আহামুক” শব্দজ “আহামুক” শব্দের অপভ্রংশ “আহামুক”। উহার অর্থ নির্কোষ অর্থাৎ বেওকুফ।

আইবুড়ো—প্রকৃতিবাদ অভিধানে, ইহা আরব শব্দজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ইহাকে সংস্কৃত অব্যুত (অর্থ অবিবাহিত) শব্দজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ সোজা কথার বলিতে গেলে অব্যুত শব্দের অপভ্রংশে “আইবুড়ো” আইবুড়ো বা “আইবড়ু পদ হইয়াছে (এখানে বলিয়া রাখি যে, সংস্কৃত “বুদ্ধ” হইতে প্রাকৃত “বুদ্ধ” বা “বুড়ো এবং হিন্দী “বুড়ো” হইতে প্রায়া “বুড়া”, “বুড়ো” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে)।

“বাহাব” দেওয়া—“বাহাব” শব্দটি ফারসী “বহার” শব্দজ অর্থাৎ “বহাব” শব্দের অপভ্রংশে “বাহাব”, উহার অর্থ সৌন্দর্য, চটক। “বাহার দেওয়া”=বাহাতে হুন্দর দেখায়, এমন সাজ করা।

পরমস্ত—পর+মস্ত। “পর” শব্দটি সংস্কৃত “পদ” হইতে হিন্দী “ও” হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় “পর” হইয়াছে। “পর” অর্থ সৌভাগ্য, হুন্দর, আর “মস্ত” বুদ্ধ। অতএব “পরমস্ত” শব্দের অর্থ ভাগ্যবান, হুন্দর-ক্রান্ত।

“টের” পাওয়া—সংস্কৃত “তির্যাক্” (অর্থ বক্র) শব্দের অপভ্রংশ (হিন্দী টেরা শব্দজ) “টের”। “টের পাওয়া” অর্থ জানিতে পারা।

“গাদা” কবিবা বাধা—হিন্দী “গাদনা” হইতে উদ্ভূত পুঙ্খবে “গাদি,” মধ্যম পুঙ্খবে “গাদ” ১ম পুঙ্খবে “গাদেন” এবং পরিশেষে প্রাদেশিক অসমাপিকা ক্রিয়ায় “গাদা” কবিবা বাধা (অর্থাৎ গাদিয়া বা শুপাকাব করিবা ঠাসিয়া রাখা) হইয়াছে।

“গড়” হইয়া প্রাণস—সংস্কৃত “গঠন,” হিন্দী “গঢ়না,” প্রাকৃত “গঢ়ো” শব্দ হইতে বাঙ্গালায় “গড়” হইয়াছে। গড় হইয়া প্রাণস করার অর্থ সাটোজে প্রাণস করা।

“কবুল” করা—“কবুল” আরবী “কবুল” শব্দোৎপন্ন। কবুল করা অর্থ—স্বীকার পাওয়া, সম্মত হওয়া।

“সাবেক”—আরবী “সারিক্” হইতে “সাবেক” হইয়াছে। সাবেক শব্দের অর্থ পূর্বের, পুরাতন।

“হৈসেল—হাঁড়িশাল” (রক্ষনস্থান, পাকশাল) হইতে “হৈসেল শব্দের উৎপত্তি। উহার অর্থ রক্ষনাগার।

কলাহার—কলের আহার হইতে (কলাদির ভক্ষণ, অন্ন ভিন্ন অস্ত্রান্ত আহারীয় সামগ্রী ভোজন) কলাহার এবং সংক্ষেপে “কলার” (“কলার”) প্রায়া শব্দ হইয়াছে।

N. B. বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত “বাঙ্গালা ভাষার অভিধান” এর সাহায্য গ্রহণ কবিবাছি।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

পরমস্ত শব্দ “পদমস্ত” হইতে। পদমস্ত=পদমস্ত=পরমস্ত।

“সাবেক” আরবী শব্দ=পূর্বের।

“বাহাব” ফারসী শব্দ=বসন্ত, তাবপর এখন বাংলায় হুন্দর অর্থ ব্যবহৃত হয়।

গড়—ডাঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে দেশী শব্দ। গত=মাগধী প্রাকৃতে গট=গড় (কৃষ্ণকীর্ণ) কোথাও যাইবার সময় যে প্রাণস বোধ হয় পূর্বে তাহাই বুঝাইত। এখন অর্থের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। গাদা=স গাধা শুপা=গাদ+আ=গাদা। টের=দেশী শব্দ।

আইবুড়ো—অব্যুত, অথবা হুনীতি-ব্যবহৃত মতে সংস্কৃত আয়ুর্ভ শব্দ হইতে।

হৈসেলের হাঁড়িশাল, হাণ্ডিশাল, হাঁড়শাল হৈসেল=হৈসেল কবুল আরবী শব্দ=স্বীকার

আহামুক—আরবী আহামুক শব্দ হইতে, অর্থ নির্কোষ।

হরেশচন্দ্র দাস।

(২০)

সেলাই শিক্ষা

শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “সহজ সেলাই শিক্ষা” সর্বপ্রকার পোষাকের ছাঁট কাট ও সেলাই শিখিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট পুস্তক। চারিখণ্ডে মূল্য মাত্র ৩।০০।

শ্রীমতীশচন্দ্র মিত্র।



বিদেশ

চীনের ভবিষ্যৎ—

চীনের জাতীয়-দলের সেনাধ্যক্ষ চ্যাং কাইসেকের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হঠাৎ অবসর-গ্রহণের সংবাদে সমগ্র জগৎ গুস্তিত। কেহ কেহ অমুমান কবিত্তেছেন যে, ভাবতবর্ষের মৌরজায়েরেব সত্ত নাকি চ্যাং কাইসেক অর্ধেব লোভে দেশ শত্রুহস্তে তুলিয়া স্বদেশে, পলায়ন করিয়াছেন। যে বিজয়ী সেনাপতি যুদ্ধের পর যুদ্ধে শত্রুদলকে বিধ্বস্ত কবিয়া ইবাংসি উপত্যকায় জাতীয়-দলের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন তাঁহার এই শোচনীয় অধঃপতনে, জাতীয়-দলের বিচক্ষণ পররাষ্ট্রসচিব ইউজেন. চেনেব হঠাৎ পদত্যাগে ও জাতীয়দলের রুশ বন্ধু বরোদিনের চীন পবিত্যাগে চীনেব জাতীয় দল নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। ইতি-মধ্যেই নাকি তাহাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদেব লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

ইংবেজও এই হ্রবোগে চীনেব সহিত গোলবোগ বাধাইবাব জন্ত চেষ্টিত। সম্প্রতি একখানি ইংবেজ উড়ো-জাহাজ চীনেব জমীৰ উপব দিবা বে-আইনি ভাবে উড়িয়া যাইবাব সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে। চীনরা জাহাজখানি সবাইয়া লইতে আইন সম্মত ভাবে বাধা দেব। ফলে ইংবেজ রুষ্ট হইয়া সংবাদইবেব রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইংরেজের এইরূপে নিবপেক্ষতা ভঙ্গ করাতে বাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

চ্যাং কাইসেকের সম্বেহ-জনক অবসর গ্রহণের পব হইতে হাংকোউয়ের জাতীয়-দলের উপর চীনেব ভবিষ্যত নির্ভব করিতেছে। চীনেব ভাগ্য এখন হাংকো সর্বকাবের দৃঢ়তা, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও সাহসেব উপর নির্ভব কবিত্তেছে। তাহাদের দেশনিষ্ঠা ও শ্রমিক শক্তির লোকবলই এই দারুণ বিপদের সময় চীনেব জাতীয়-দলের মন্ডল। জাতীয়দলেব বর্তমান নেতাবা যদি সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া বিদেশী-অর্থ বশীভূত গৃহশত্রুদের দমন করিতে না পাবেন ও একযোগে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান কবিত্তে পবাস্থ্য হন তবে নবীন চীনেব জাতীয় জাগরণ ম্লান হইবে সম্বেহ নাই।

আয়র্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় সমস্তা—

আয়র্ল্যাণ্ডেব রাষ্ট্রীয় সমস্তা লইয়া এক ভীষণ গোলবোগেব সূচনা হইয়াছে। ইংলণ্ডেব বাজার আমুগতা স্বীকার করিয়া শপথ বরিতে অসম্মত হইয়া ডি ভেলেবাব দল (Fianna Fail Party-আয়র্ল্যাণ্ডেব ভাগ্য নিয়ন্ত্রক দল) এতদিন নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও আইবিশ রাষ্ট্র-সভায় যোগদান কবেন নাই। আয়র্ল্যাণ্ডেব পররাষ্ট্র ও বিচার সচিব কেভিন ও হিঙ্গিন্সেব হত্যাব পর ফ্রি স্টেট সবকাব এইরূপ আইন প্রণয়ন করিবাব-সংকল্প কবিয়াছিলেন সে, ষাঁহাবা ইংলণ্ডেব রাজাব আমুগতা স্বীকার কবিয়া শপথ লইতে স্বীকৃত হইবে কেবলমাত্র তাহাবাই রাষ্ট্র সভার নির্বাচনে দাঁড়াইতে পাবিবেন। সবকাবের নূতন চাল বৃষ্টিতে পাবিয়া ডি ভেলেবাব সদলবলে আইন সভায়

প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি অবস্থ বলিয়াছেন তাহাদের এই শপথ আগ্রহ কবিয়া গ্রহণ আন্তরিক নহে।

ডি ভেলেবাব দল, জাতীয়দল ও শ্রমিকদল একযোগে আয়র্ল্যাণ্ডেব বর্তমান সরকার কসগ্রেড দলের পতনের জন্ত চেষ্টিত হইয়াছে। সম্প্রতি একটি ব্যাপারে গবর্নমেন্ট ও বিপক্ষদল সমান সমান ভোট পাওয়াব সম্ভাব্যতাব নিষ্পত্তি ভোটে গবর্নমেন্ট পক্ষ জয় লাভ কবে। গবর্নমেন্টের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকায় কৃষকদল শ্রমিকদলের সহিত যোগ দেব নাই।

সম্ভাব্যতাব নিষ্পত্তি ভোটের জোরে রাজ্য চলা অসম্ভব। তাই আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্য এখন অনিশ্চিত। নূতন নির্বাচনে যে-পক্ষ জয়লাভ কবিত্তে তাহাবাই রাষ্ট্র পরিচালন কবিত্তে।

জগলুল পাশার মহাপ্রাণ—

সকল দেশেই জাতীয় জাগরণের সময় সেই জাতি একটি বিশিষ্ট নেতাকে বেঙ্গ কবিয়া গড়িয়া উঠে। সেই নেতাব জীবন-কাহিনীই সেই দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রূপে পবিগণিত হয়। সেই কারণে চীনেব জ্ঞান ইয়াং সেন, কয়েব লেনিন, তুরস্কের কামাল, ইতালীর মুসোলিনী, আয়র্ল্যাণ্ডের ডি ভেলেরা, ভারতের মহাত্মা গান্ধী দেশে দেশে পুজিত। এই সকল একনিষ্ঠ দেশসেবকদের মধ্যে যেন জাতীয় স্বাধীনতাব আদর্শ মুর্ভ হয় এবং তাহাতে অমুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ জীবন উৎসর্গ কবে।

জগলুল জাতিতে কণ্ট, ধর্ম্মে ষ্ট্রিয়ান এবং ব্যবসায়ে আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান-প্রধান মিশরের জাতীয় দলের নেতা-পদে মিশববাসীবা ষ্ট্রিয়ান জগলুলকেই বরণ কবিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে জগলুল পাশার বয়স্ক্রম ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। কৈশোবেব প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি মিশরের স্বাধীনতার জন্ত আত্মনিবেশণ কবিয়াছিলেন। কখনও সংবাদ-পত্র-সেবী রূপে, কখনও শাসন বিভাগের কর্মচারী রূপে, কখনও আইন উপদেষ্টা রূপে, কখনও শিক্ষক রূপে তিনি দেশ-সেবা কবিয়া গিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ ভাগে ইংবেজের দৃষ্ট মিশরের উপর পরে। ইংরেজ বুলিল হুয়েজবাল ও কার্গাস-ক্ষেত্র-সমুদ্র হ্রদানে একাধিপত্য বিস্তার কবিত্তে হইলে মিশরকে কবতলগত করা দরকার। তখন মিশব নামমাত্র তুর্কীব অধীন ছিল। তুবক্ষক সরাইয়া দিয়া ইংরেজ মিশবেব উপব শ্বেতকাবদিগের জন্মগত অভিভাবকত্ব দাবী করিতে দেবী করিল না। কিন্তু মিশববাসী তাহাতে স্বীকৃত হইল না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশবীরা বিদ্রোহ ঘোষণা কবিল। জগলুল পাশা সেই বিদ্রোহে মিশববাসীদের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীবা ব্যর্থ হইল। মিশবে ইংরেজের প্রভুত্বের সূচনা হইল। ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাকামী মিশববাসীরা শক্তি সঞ্চয় কবিত্তে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রাবল্জে জগলুলের নেতৃত্বে তাহারা মিশবে ইংবেজের আধিপত্য বিস্তারের বিপক্ষতাবরণের জন্ত বিদ্রোহী হইল।

এবারেও তাহা বা পবাক্ষিত হইল এবং জগলুল ছব বৎসবের স্তম্ভ নির্ধারিত হইলেন। কিন্তু মিশরের অশান্তি দমন হইল না। জগলুলের অবর্তমানে তাহার সহচরগণ দেশবাসীকে তাহা বাদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপে মহাসমর বাধিল। যুদ্ধের অবসানে মিশর সন্ধি-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী উত্থাপন করিল, কারণ বাষ্ট্রপতি উইলসনের জাতীয় স্বরাষ্ট্রবাদের কথায় তখন পবাক্ষিত জাতিবা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আশা যে সন্ধি-সভায় নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত কবাইবে। কিন্তু ইংবেজ এই দাবী অগ্রাহ করিল। জাতীয় দলের নেতা জগলুল প্রত্যেক মিশরবাসীকে ‘হয় স্বাধীনতা বা শোরব-মুহুর্ত’ কথা স্বদেশের মুক্তি কামনাধ আত্মবিসম্বন্ধনের মহিমামব মুহুর্ত বরণ’ করিতে আহ্বান কবিলেন। জগলুলকে আবাব সম্ভাবিত করা হইল। মিশরের জাগ্রত জনমত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। জগলুলের অমৃতচবদলের ইঙ্গিতে মিশরের জাতীয়দল সরকারের সহিত অসহযোগ করিলেন। ফলে মিশরের অবস্থা সঙ্গীন হইল। ইংবেজ কমিশন বসাইয়া মিশরে দেশী বাজা স্বীকাব কবিয়া এই এবল আন্দোলন কিছুকালের জন্য থামাইলেন।

কিন্তু জগলুল ও তাহা দেশবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবাব চঞ্চ ব্যস্ত। তাহা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া আবাব আন্দোলন করিতে লাগিল। নির্বাচনে জগলুলের দল জয় লাভ করিয়া জগলুল প্রধান মন্ত্রী হইলেন। মন্ত্রী-সভা মিশরে ইংবেজের সামরিক বস্ত্র উচ্ছেদ করিবাব দাবী করিলেন। এই সময় হঠাৎ হুদানের ইংবেজ শাসন-কর্তা স্তার লি ট্যাক নিহত হইলেন। ইংবেজ মিশর-উপকূলে সাজোয়া জাহাজ পাঠাইয়া বিপুল ক্ষতিপূরণ ও জগলুলের পদত্যাগে দাবী করিল। জগলুল পদত্যাগ করিলেন কিন্তু পুনর্নির্বাচনে আবাব জয়ী হইলেন। ইংবেজ আবাব নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভাবে দাবী করিল যে জগলুলকে মন্ত্রী গঠন করিতে দেওয়া হইবে না। বলদৃষ্ট ইংবেজের দাবীতে জগলুল ভীত হইলেন না কিন্তু দেশে অশান্তি ঘটাইতে না বাজ বলিয়া তিনি মন্ত্রীসঙল গঠন করিলেন না—মধ্য-পন্থীরা মন্ত্রীগঠন করিল। জগলুল আইন সভায় সভাপতি হইলেন।

পার্ব্য জীবনে জগলুল খুব স্বাধী লোক ছিলেন। তাহা বপ্তরী সদাসর্বদা স্বামীব কার্যে সহায়তা কবিতেন। জগলুল-মহিবী মিশরের নাবী-ডাগরণের প্রধান নেত্রী। ইউরোপীয় সহায়ুচ্চের অবসানে জগলুল ও তাহা সহকর্মীগণের নির্ধারনের পর এই মহিবী নারী দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন এই বলিয়া, “ইংরেজদিগকে স্বীকার কর। তাহাদিগকে কোনও ববমে সাহায্য কবিও না। হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পরম অন্তরঙ্গ নির্ধারিত-দিগকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। তাহা বা যেন মুক্ত স্বচ্ছ উজ্জল স্বাধীনতা বা আলোকের সঙ্গে পিত্তই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।” বীর স্বামীব মহাপ্রয়াণের পর তিনি স্বামীব আবক্ত কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। সমগ্র মিশরবাসী জগলুল-মহিবীর সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

জগলুলের স্তম্ভ মিশরবাসীব দেশজোড়া শোকচ্ছাদ দেখিয়া কতকটা অনুমান কবা যাব তিনি মিশরবাসীব কিকণ প্রিয় ছিলেন। মিশরের জাতীয় জীবনের এক অতি সঙ্কটাপন্ন মুহুর্তে বাষ্ট্রবীর জগলুল পাশাব পবলোক-গমন সংবাদে স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক নরনারীই স্তম্ভিত হইবেন।

কানাডায় হীরক-জুবিলি-উৎসব—

সম্প্রতি ইংলণ্ডের যুবরাজের উপস্থিতিতে অত্যন্ত ধুমধামেব নহিত কানাডাব জাতীয়তার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষাট বৎসব হইল ঐ প্রদেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলি এক হইয়া একটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এই উৎসব। ১৮৬৭ সালে ইংরেজের ইঙ্গিতে এই একত্রীকরণের সময় যদিও কোন কোন প্রদেশ যথা নোভাস্কোশিয়া, নিউব্রান্সউইক প্রভৃতি রাষ্ট্র আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হব নাই। এখন যুক্তকানাডায় আর কোন অসন্তোষের বীজ নাই। কিন্তু এই ষাট বৎসবে সংযুক্ত কানাডা জাতীয় স্বাধীনতার দিক দিয়া ও দেশের ধন-সম্পদের দিক দিয়া অনেক উন্নতি লাভ কবিয়াছে। এখন কানাডা আব ভারতের মতন সব বিষয়ে ইংরেজদের অধীন নহে। কানাডার গভর্ণর বিলাত হইতে প্রেরিত হইলেও তিনি কানাডা রাষ্ট্র-পরিষদের অমতে কোন কার্য করিতে পারেন না। কানাডায় মন্ত্রী-সভা বিলাতের মন্ত্রীসভাব সহিত রাজকার্যেব আদান প্রদান কবে ও বিদেশে রাজদূত পাঠায়। ১৯২৬ সালেব ডোমিনিয়ন কনফারেন্সের আলোচনাব ফলে কানাডা, আবার্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা এইরূপ জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। ভাবতবর্ষ এই সভায় আহুত হইয়াছিল, কিন্তু সে যে তিমিরে বেই তিমিরেই বহিবা গেল।

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা—

কেনিয়া

কেনিয়া স্বাধীনতাসন বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে ভবিষ্যতে নাইরোবি ও মোম্বাসা মিউনিসিপ্যালিটিতে ভারতীয়গণ অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবে। কিন্তু ঐ দুই প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় বণিকদের স্তম্ভ প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কেনিয়াব ভারতীয় সম্প্রদায় এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে তাহা জানা যায় নাই।

নেটাল

নেটালের ‘ইণ্ডিয়ান ভিযু’ নামক সংবাদ-পত্র লিখিতেছেন যে, তথাকার শতকরা ৭৩ জন ভারতীয় বালক-বালিকা অশিক্ষিত। উক্ত পত্র লিখিতেছেন যে ভাবতবাসীরা প্রাচীনকালের গোববের বড়াই না করিয়া যেন ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধবগণকে হুশিক্ষিত কবিয়া তুলিতে প্রবাসী হন। নেটালের ভারতীয় শিশুদের হুশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভাবতবর্ষ হইতে কতকগুলি গ্রান্ডয়েট পাঠাইলে ভাল হব।

ডাব্বান

নাইরোবির ‘ডিমোক্র্যাট’ সংবাদপত্রে প্রকাশ যে প্রায় ৪০০ ভারতীয় শ্রমিক ডাব্বান হইতে বসত উঠাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব-আফ্রিকা

পূর্ব-আফ্রিকা ভারতীয় সম্রাট জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। সেধানকাব ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উচ্ছেদ কবিবাব স্তম্ভ বিপুল ষড়যন্ত্র হইতেছে। স্তার সিড নি হেন নামক একজন পার্লামেন্টের সদস্য সম্রাতি লণ্ডনেব একটি সভায় পূর্ব-আফ্রিকা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কতকগুলি অযথা ও মিথ্যা কুৎসা আবোপ কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ভারতের বাত্মনৈতিক আন্দোলনকারীদের হাতের জড়নক মাত্র। ব্যবসা সম্পর্কে ও ব্যক্তি-গত ব্যাপাবে তাহাদের নৈতিক চবিত্র অভ্যন্ত হীন এবং তাহাদের দেশোদ্দেশি পূর্ব-আফ্রিকা অধিবাসীরাও অধঃপতনে বাইতেছে।”

এদিকে তথাকার গবর্নর স্যার এডোয়ার্ড গ্রীপ্স্‌নে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও ভারতীয়দের স্বার্থহানী ঘটাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে পূর্ব-আফ্রিকার প্রদেশগুলিকে লইয়া একটি রাষ্ট্র-সমষ্টি করিতে হইবে। এই রাষ্ট্র-সমষ্টি যদি ক্রিষ্টিয়ান কমিটিব নির্দেশানুযায়ী হয় তাহা হইলে ভারতবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। মিঃ এওকস ও মিঃ ওয়া এডমন্ড ভারতের অনন্যত উদ্বোধিত কবিত্তে চেষ্টা করিতেছেন।

ট্রান্সভাল

পণ্ডিত বেনাকী দাস চতুর্দেবী 'গীভাব' পত্রে ট্রান্সভালে ভারতীয় শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত একখানি চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ ১৯১৩ সাল হইতে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের শিক্ষার অস্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই বৎসর জনসংখ্যার মাত্র একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, বর্তমানে ঐ প্রদেশে ৬টি বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সেখানকার জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প। ট্রান্সভালে ২৩৫২ জন বালক ও ৫,০৪৬ জন বালিকা আছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৬০০ জন বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। ঐ অঞ্চলে একটিও বালিকা-বিদ্যালয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়া

দেওয়ান বাহাদুর বজ্রচরিত্রার সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে কিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সেখানে ভারতীয়দের স্বার্থসংরক্ষণার্থ একজন এক্সেচুট প্রেরণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ফটল্যাণ্ড

এডিনবার্গের থানা ও উৎসবঘরনমূহে ভারতীয় ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ইংলণ্ডপ্রবাসী সমস্ত এশিয়াবাসীর স্বার্থরক্ষার্থ এডিনবার্গে এশিয়াসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সমাজের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ডি, এল, মমতালী সংবাদপত্রে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইতেছেন :—

“ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে। পবদেশী শাসকদের নিকট আমাদের পক্ষে অনেক অপমানই অপমানিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু আজ আমরা যে দেশে বাস করিতেছি ব্রিটিশ জাতি সে দেশকে স্বাধীন বলিয়া বড়াই করে। কিন্তু এই স্বাধীন দেশেও কি আমরা স্বাধীন? যে সমস্ত পাঠক এডিনবার্গে বর্ণবিষয়ে কথ্য অবগত আছেন আসি তাঁহা-দিগকেই ইহা বিচার করিয়া দেখিতে বলিতেছি। এই বিষয়ে এখন বিদ্যমান।

“এই বিরূপ মনোভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমরা এশিয়া-সমাজ নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পাঠক ও অমুদ্রাহকবর্গ হইতে আমাদের অর্থ সাহায্য চাহিতেছি। আমাদের সমস্ত এই বর্ণবিষয়ে দূর করিবার জন্য সর্বপ্রকার নীতিসঙ্গত চেষ্টা করিবে। অনেক সঙ্কীর্ণমনা লোক আমাদের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের বিরূপ করিবে। কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া আমাদের দৃষ্টান্ত স্বাধীনতার চর্চা করিতে হইবে।”

সম্প্রতি এডিনবার্গের টাউন কাউন্সিলের একটি অধিবেশনে লর্ড প্রোভস্ট প্রিন্সেস্‌ন বলেন যে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদিগকে এডিনবার্গের বর্ণবিষয়ে আন্দোলনের বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য অমুরোধ করিয়াছেন। সভার সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণবিষয়ে আন্দোলনকে অস্ত্রাঘাত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ

সীমান্তে হিন্দু-বহিকার—

পেশোয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে—সীমান্তের আফ্রিদি দুই দলে ও অন্তান্ত স্থান হইতে হিন্দু ও শিখগণ বিভাজিত হইয়া দলে দলে পেশোয়াবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পাঠানদের বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। লাতিকোটালের আফ্রিদিরা হিন্দুদের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা ধনী—সে টাকা তাহারা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। “রজিলা রহুলের” আন্দোলনের ফলে কিছুদিন বাবৎ পল্লাব হইতে মোল্লা মোলবীরা সিয়া সীমান্তের অল্পসংখ্যক হিন্দুদিগকে নির্ধ্যাতন করিবার জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিতেছিল, এতদিনে তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। দিল্লীতে এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়া এবং গৃহহীন হিন্দুদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লালার কিম্বারীনাথের সভাপতিত্বে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—জনশক্তি

বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত—

কানপুর মিউনিসিপালিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মিউনিসিপালিটি-পরিচালিত বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে বন্দেমাতবন্ জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবে। বালকগণের কোমল হৃদয়ে দেশপ্রেম উদ্ভূত করিবার এই চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সরকারী কর্মচারীর পোষাক—

সরকারী কর্মচারীগণের পোষাকের জন্য দেশী কাপড় ব্যবহার করা কর্তব্য এই মর্মে বিহার আইন সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকার পক্ষে প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, মিতব্যয়িতাব দিক দিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণীয় নহে।

—পল্লীবাসী

কুলীর জীবনের মূল্য—

আসামের একটি চা-বাগানের এক মিস্ত্রীসাহেবের অনুগ্রহে; পূর্বা নামক একজন কৃষ্ণকুলী ভবলীলা সম্বরণ করে। মিস্ত্রী সাহেব হেণ্ডারসন মাতাল অবস্থায় কুলীকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দেয়, ফলে কুলীটির মৃত্যু হয়। বিচারে ডেপুটি কমিশনার বলিয়াছেন যে, যদিও গোঁণভাবে হেণ্ডারসনই কুলীটির মৃত্যুর কারণ, তবুও ভাল প্রশমণের অভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল। এই মামলা উপলক্ষে সহযোগী আনন্দবাজার সমস্ত্য করিতেছেন—“ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের গণ্ডী পার হইয়া মোকদ্দমা সেসনে গেলেও শেতাঙ্গ জুরীদের বিচারে হেণ্ডারসন খুব সম্ভব মুক্তিলাভ করিত! অতএব আপশেষ করিবার কিছু নাই। কাল কাদমীর প্রাণের মূল্য বহুবাব ঐ আসামের আদালতেই বাচাই হইয়া, ঘা পয়সার সমান বলিয়া ঠিক হইয়াছে। গবীর কুলী পুসার হত্যাকাণ্ডের বিচারে নূতন কিছু হয় নাই।”

বাংলা

হগলী ঐতিহাসিক সম্মিলন—

গত মাসে হগলী ঐতিহাসিক সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাসম্বোধাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিতেন। সভাপতি মহাশয় হগলী জেলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেন। ভাস্কর কালিদাস নাগ ছাড়াই সাহায্যে “বৃহত্তর ভাবত” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

—আশ্বশক্তি

ঐতিহাসিকের মৃত্যু—

গত মাসে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক অধবচ্ছল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বহুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

—শক্তি

বাঁকুড়া অভয়-আশ্রম—

অভয় আশ্রম পুস্তকাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত মাসে বাঁকুড়া আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শোভাযাত্রার সহিত আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। কলেজ ছাত্রাবাসে এবং মেডিকেল ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দান করা হয়। তিনি পক্ষাঙ্গলগাটী অমবকানন আশ্রম পবিত্রকরণ করেন।

—যুগদীপ

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ—

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস. সি. মিত্র আমাদিগকে জানাইতেছেন :—

এই বিভাগ হইতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক একটি হাতে চালান ধানভাঙ্গা কল প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার কার্যকাৰিতা গ্রাম্য প্রচলিত ঢেঁকির কার্যের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ। এই কলে নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়া মোটামুটি এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে—

১। পনের মিনিটে ইহাতে প্রায় দেড় সেব ধান ভাঙ্গা এবং তাহা হইতে এক সেব আলান্ন চাউল পাওয়া যায়।

২। এক পোষা চাউল হইতে ১৩৩টি চাউল ভাঙ্গুটা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহাব মধ্যে ৭৮টি দানাব দুই মুখ মাত্র ঈষৎ ভাঙ্গা এবং বাকী ৫৫টি দানাব দুই আধবান হইয়া ভাঙ্গা। ইহাতে খুঁদেব পরিমাণ নাই বলিলেই চলে। অপরতঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ৩০ সেব ঢেঁকি ভাঙ্গা চাউলে এক সেব হইতে তিন সেব পর্য্যন্ত চাউল ভাঙ্গুটা অবস্থায় পাওয়া যায়।

৩। এই কলে কেবল মাত্র একটি লোকের দ্বারা এক ঘণ্টায় ছয় সেব পর্য্যন্ত চাউল পাওয়া যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় ঘরিলেও এই কল হইতে ঘণ্টায় গড়পড়তা চাব সেব হিসাবে চাউল পাওয়া যায়। কিন্তু ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গিতে হইলে অন্ততঃ তিনজন লোকের আবশ্যক এবং মাত্র ৩০ সেব চাউল তাহারা চাব ঘণ্টা যাবৎ একত্র পরিশ্রম করিলে প্রস্তুত কবিতে পারে।

বঙ্গীয় সরকারে শিল্প-বিভাগেব রসায়নবিৎ শ্রীযুক্ত ডাঃ রসিকলাল দত্তের তত্ত্বাবধানে একটি বাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। দেশীয় শিল্পীরা এই বিভাগেব নিকট যে কোনরূপ সাহায্য পাইতে পারে তাহাব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ, ৪০।এ, ব্রি স্থল স্ট্রীট, কলিকাতা)

“ইরোরোপীয় মহাবুদ্ধে বান্দালী”—

ঐচ্ছিকান্ত দত্ত, শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল, পোঃ বরাহনগর, জিঃ ২৪ পরগণা আনাদিগকে লিখিতেছেন :—

“বেঙ্গল আধুলেস কোর” “ডবল কোম্পানী”, “৪০ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী”, “ভাবতবঙ্গী সৈন্যদল”, ইউনিভারসিটি কোর”, ইত্যাদি যাবতীয় সমর-সংক্রান্ত বিভাগে যোগদানকারী বান্দালীদিগের কার্যকাৰিতার যাবতীয় বিবরণ যিনি যতটুকু জানেন আমাকে লিখিয়া জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বিধবা-বিবাহ—

গতমাসে কুমিল্লা-বিধবা-বিবাহ সভার উদ্যোগে ৩টি বিধবা-বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। বাংলার নানান্থান হইতে আসবা আরও অনেকগুলি বিধবা-বিবাহেব সংবাদ পাইয়াছি।

দান—

(১) ত্রিপুরা জিলাব অন্তর্গত বুড়িচঙ্গ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে স্থানীয় তালুকদার শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নংদ ৪০০০ হাজার টাকা দান কবিয়াছেন। স্কুলটি বৈষ্ণব ব্রহ্মদশাশ্রম হইয়াছিল তাহাতে তাহাব এই আশাতীত দানে স্কুলটি সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্কুল কমিটি কৃতজ্ঞতােব চিহ্ন স্বরূপ মণীন্দ্রবাবু পিতাব নামানুসারে বিদ্যালয়ের নাম “বুড়িচঙ্গ আনন্দ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়” বাধিতে স্থির করিয়াছেন।

(২) বাঁকুড়া জেলার অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বামসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমুদ্র হাজরা মহোদয়ের স্বেচছা পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টেব উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাশুঙ্কল হাজরা মহাশয় রামসাগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দুই হাজার টাকার কোম্পানীর বাগদান করিয়া স্কুলের কতৃপক্ষ শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পল্লীবাসী দরিদ্র ছাত্রদিগেব শিক্ষাবিধানাদেশে এই মহৎ দান।

হিন্দু রমণীর সাহস—

সৈয়দসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমাব অন্তর্গত ইসলামপুরেব নিকটবর্তী খড়মা গ্রামেব যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি তাহার বাড়ীর সংলগ্ন বাড়ীর বাবুবাম শীলের স্বীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা কবে, কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। গত ২০শে আশ্বিন বেলা ১০টাব সময় বাবুবামেব অসুপস্থিতিেব সুযোগে উক্ত বিশ্বাস তাহার বাড়ীতে ঢুকিয়া কাঠকর্ত্তন নিবতা উক্ত শীলের স্বীকে ধবিত্তে বায। স্বীলোকাট নতীত বক্ষাব জন্য উপায় না দেখিয়া হস্তস্থিত দা দ্বারা বিশ্বাসেব গলায়, হাতে ও অন্যান্য স্থানে কোপ বসাইয়া দেয়। বিশ্বাসের তখনই মৃত্যু হইয়াছে। বিষয়টি আদালতের বিচারায়ীন।

—শাস্তিবাহিনী

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণাব অবিনাশ তেলী নামক এক ব্যক্তিব বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতেরা বাড়ীতে প্রবেশ করিলে অবিনাশেব স্বী উপাযাত্তব না দেখিয়া একস্থানি ধঙ্গ লইয়া রণবঙ্গিনী বেশে ডাকাতদের সম্মুখে দাঁড়াইলে ডাকাতেরা প্রাণভয়ে পলায়ন কবে।

—জনগণিত

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের বার্ষিক উৎসব—

বিগত জম্মাষ্টমীতাবিধে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহেব বার্ষিক উৎসব মহাসমাবেহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে ৩ সন্ধ্যাকালে নিম্নহ-মুস্ত্র ও বাস্তভাওসহ জনতাপূর্ণ শোভাযাত্রা পরিচালনা এবং নিয়মিত রূপ সত্যাগ্রহীেব আত্মসমর্পণ দ্বারা সত্যাগ্রহেব বিশেষত্ব বঙ্গা কবা হইয়াছিল। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের পরিচালকগণ সমসাময়িক বৈষ্ণব উৎসাহ, অধ্যবসায, আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন কবিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সত্য বক্ষাব জন্য যে কঠোর ত্রতের অমুঠান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উদযাপন ও সুসমাঞ্জিত পক্ষে হিন্দু সাত্রেবই সাহায্য ও সহায়ত্বভূতি থাকা প্রয়োজন।

পটুয়াখালিতে ও ঢাকার জম্মাষ্টমীতে এবার কোন গোলমাল হয় নাই। কিন্তু কুমিল্লায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কুমিল্লায় শ্রীবিশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বীর যুবক উন্নত মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে পরিবাসস্থ মহিলাদিগকে বক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন। এই দাঙ্গাব ফলে কুমিল্লা অভয়-আশ্রমেব অনেক কম্বী প্রেস্তার হইয়াছে।



[পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনাব সমালোচনা না ছাপাই আশাদেব নিযম]

—সম্পাদক]

হালুম বুড়ো—শ্রীপারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রবাসী-কার্যালয়, ১১ নং আপাব সাব্বুল্লাব রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। ১৩৩৪।

রুব্বি পারীমোহন-বাবু ইতিপূর্বে “কাক্রিদের দেশ আফ্রিকায়” নামক পুস্তকে আফ্রিকার জঙ্গল-মরুভূমিতে জীব-জন্তুদের লড়াইয়ের কথা লিখিয়া শিশুদের আপনাব জন হইয়াছিলেন। ছেলেদের উপযোগী রচনাও তাহাব বখেষ্ট দক্ষতা আছে। এবারে তিনি প্রবাসী, মোচাক, সন্দেশ প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাহাব লিখিত শিশুদের উপযোগী কবিতাগুলি সংগ্রহ কবিবা তাহাব “হালুম বুড়ো” পুস্তক বাহির কবিলেন। এই বহুচিত্রিত মজাদাব বইএ শিবঠাকুরের বিধে ও তাঁর ভূতপেত্বে বববাজীদের কথা, ছেলে-বাজার দুর্ঘোষনের উরুস্ত্রের হাসির কবিতা, বাব-ভালুকের ছেলেচুটির কাহিনী, কাঠের পুতুলের রঙ্গড়ার গল্প ও ঘুসপাড়ানীর গান, বর্ষার ছড়া ইত্যাদি কবিতাগুলি ছেলেমেয়েবা খুব উপভোগ কবিবে ও হাসিয়া গড়াইবে। কবিতাগুলি নানা ছন্দে লেখা, সমস্ত ছন্দই ছেলেদের উপযোগী; তাহাবা নাচিবা নাচিবা হর কবিয়া পড়িবে ও নাতিয়া বাইবে। মলাটের চিত্রটি ও ভিতবের ছবিগুলি খুব মন্দ হইয়াছে। পুস্তার সময় ছেলেমেয়েবা এই মজাদাব কবিতাব বই পড়িবা আনন্দ পাইবে।

য

বীরহে বাঙালী ; ব্যায়ামে বাঙালী—দুইখানিরই প্রণেতা শ্রীঅনিলচন্দ্র বোব। প্রকাশক শ্রীহরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, ১৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রত্যেকখানিব মূল্য এক টাকা।

অপুষ্টি শরীবে অল্প মন্যে যদি অবস্থান ঘটে তাহা হইলেই মানসিক উৎকর্ষের সম্ভাবনা অত্যধিক। আমাদের বাংলা দেশে কবেকটি মনীষী ও মহাপুরুষের জন্ম ঘটিলেও আজ অবধি বাঙালী জাতিটা অসুচ জ্ঞানে বিদ্যাও বুদ্ধিতে সন্যাক্ষেপে সমুদ্র হইবা উঠিতে পাবে নাই। তাহাব মুখ্য কাবণ, বাঙালীর দেহ অপরিসুষ্টি নয়,—দুর্বল ও শিথিল। আমবা শরীরবলের বত বেশী উৎকর্ষ সাধন কবিত পাবিব, মানসিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমবা সেই পবিমানেই উন্নতি লাভ কবিত পাবিব। সেইজন্য জাতিক শরীরগঠন-চর্চাব কার্যে তাহাবা উৎসাহিত কবিত-ছেন তাহাবা জাতিব পোড়া পত্তন কাষেমি কবিতেন। আলোচ্য পুস্তক দুইখানি হাতে পাইয়াই আমবা আনন্দিত হইয়াছি, কেননা এই বই দুইটির উদ্দেশ্য শক্তিতে বাঙালীকে প্ররুদ্ধ করা। বই দুইটিতে পৌরাণিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি বাঙালীর শক্তিকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে। বহু বীর ও কৃষ্ণিগীব বাঙালীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও কর্মকথার বিবৃতি ছাড়াও বই দুইটিতে ব্যায়ামে, ক্রীড়া-কৌশলে, ধর্মুর্দিদায়, অসিধেলাষ ও লাঠিধেলাষ বাঙালীর পাবদর্শিতা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক অনেক বীবেব ছবি থাকাব বই দুইটি লোভনীয় হইয়াছে। আমবা বই দুইটিব বহুল প্রচার কামনা কবি।

বিধবা-বিবাহ—ঈশবচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রকাশক শ্রীবাজ-কুমাব ভট্টাচার্য। প্রান্তিহান—৬২ আর্মহাষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও সমস্ত পুস্তকালয়। মূল্য পাঁচ টাকা।

পুণ্যপ্রোক মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল-বিধবার দুর্দশা মোচনাব জন্য যে দুঃখ ও পবিত্র অক্লান্ত স্বীকার করেন, তাহাব জীবিতকালে তাহা সমাদৃত না হইলেও বর্তমানে বাংলা দেশে ও সারা ভারতবর্ষে তাহার সে সংস্কার-চেষ্টা সাফল্য-লাভের পথে অগ্রসর। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যেব কথা। যে-সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্রমীমাংসা প্রয়োগে তিনি বালবিধবার বিবাহ অনুমোদন কবেন তাহা আবার দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত কবা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন বোধ কবিবা প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থখানিব পুনঃ প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতিকে উপকৃত করিয়াছেন। জাতীয়বোধ-জাগ্রত বাঙালী এ পুস্তকের যথাযোগ্য সমাদর কবিবে, সন্দেহ নাই।

ভিখারিণী—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্র-চন্দ্র ভান্ডারী, ৩৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। এক টাকা। কবিতাব বই। কবিতাগুলি খুব মন্দ ও নয়, খুব ভালোও নয়। কবিতাগুলিতে সারলা আছে।

সমাজ—উপাধ্যায় ব্রজবান্ধব। বর্ধন পাবলিশিং হাউস, ১২৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

ব্রজবান্ধবের অপ্রকাশিত রচনাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। প্রবর্তক-কার্যালয় হইতে তাহার “আমার ভাবত উদ্ধাব” প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থেব প্রকাশকও বাঙালীর কৃতজ্ঞতাজনন। বইটি প্রচাবিত হইয়া বাঙালীকে স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করুক—ইহাই আসামিগের কামনা।

বন্ধিম-চিত্র—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। প্রকাশক শ্রীজগ-দীপচন্দ্র নৃপোপাধ্যায়, কমলালয়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। এক টাকা।

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় যখন “প্রাচীন চিত্র” নামক পুস্তকে সংস্কৃত কাব্যাবলীর মনোরম পরিচয় প্রদান করেন তখন আমবা তাহাকে তাহাব অধিকারক্ষেত্রেই বিচরণ কবিত দেখি, এবং সেখানে তাহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হই। এখন হঠাৎ তাহাব প্রণীত “বন্ধিম-চিত্র” হাতে পাইয়া উৎসুক হইয়া উঠিলাম তাহার আধুনিকত্বপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান। বইটি পড়িয়া দেখিলাম, তাহাব চিত্র একেবারে আধুনিক ভাবে প্রভাবিত। তাহাব বেদান্তশাস্ত্রী উপাধিতে ভদ্দ কাইবার হেতু নাই; তাহা নাথিকেলের ছোবড়ার মত, ভিতবে কোয়ল শাঁস ও শ্লিষ্ট জল বেশ আছে। শৈবলিনী, কুলনন্দিনী, বোহিণী, দলনী, গোবিন্দলাল প্রভৃতি কাহারও চরিত্রালোচনাব তিনি পিছপাও হন নাই। তাহাব ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর। চবিত্র-ব্যাখ্যা অতিশয় স্বাভাবিক,

চিত্তাকর্ষক, আদর্শরহীন ও সংকীর্ণ। সাহিত্য-সম্রাটের সৃষ্ট চবিত্তের আলোচনা কবিতা তিনি নিজের উপকৃত হইয়াছেন, বাংলা সাহিত্যকেও যথেষ্ট উপকৃত কবিয়াছেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার আছে। নায়ক-নাথিকার সহজ সম্বন্ধেব আলোচনা করিতে গিয়া তিনি কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ কবিয়াছেন ও সমাজশাসনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পাবেন নাই। তথাপি মোটের উপর, আমরা বহুদিন এমন সুন্দর মনোজ্ঞ বঙ্কিম-পরিচয় পাঠ করি নাই। বাংলা সাহিত্যে বইটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

প্রবাদ-পদ্য (প্রথম ও তৃতীয় ভাগ)—শ্রী চন্দ্রভূষণ শর্মা মণ্ডল। ২০২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত। মূল্য প্রত্যেকখানি চার আনা।

বাংলা দেশের প্রবাদ অর্থাৎ নীতিকথাব বহুগুলি অপরিণীত। সেগুলি এক জায়গায় কবিতা সেগুলি প্রয়োগ-পরিচয় প্রদান করা দুইই কাজ। অথচ সে-কাজেব অত্যন্ত প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার সেই অভাব বোধ কবিতা প্রমাণ অর্থাৎ গল্প প্রযোগে অনেকগুলি প্রবাদ-বাক্য একত্র কবিয়াছেন। প্রবাদ-পরিচয়ক গল্পগুলি সহজ, সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড পাই নাই। সেইট পাইলেও গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ মনে কবিবার কাবণ হইবে না। কেননা, বিষয়টি এতই ব্যাপক যে, তাহা বহু খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার যোগ্য। আমরা এই গ্রন্থের ক্রমশঃ প্রকাশ্য বস্তুগুলির ক্ষুদ্র উদ্যম হইয়া বহিস্যাম। পুস্তকটি প্রয়োজনীয় ও সুন্দর। তবে বইটির ছাপা ও বাঁধান আবে পবির্কাব এবং গল্পগুলি তাহা আরো সবল হওয়া দরকার।

ব্রতকথা—(প্রথম ভাগ) শ্রী বোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রকাশক শ্রী কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ৪, গোপাল বহু লেন, বামাপুকুর, কলিকাতা। ছয় আনা।

পুস্তকটিতে ১৫টি ব্রতের পরিচয় ও উৎপত্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে। একপ গ্রন্থের বস্তু প্রয়োজন আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

গুপ্ত

আমরা কি ও কে (ছোট গল্পের বই)—শ্রী কেদারনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ প্রকাশিত, ২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১২০ পৃঃ। মূল্য দুই টাকা।

ইহাতে 'আমরা কি ও কে,' 'আনন্দময়ী দর্শন,' 'দেবীমাহাত্ম্য,' প্রভৃতি নয়টি কথা আছে। লেখকের পরিচয় অনাবশ্যক। কয়েক বৎসর হইল আমরা এই প্রবীণ ব্যক্তিটিকে নবীন লেখকরূপে পাই-রাছি। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিবল; এখন 'তৎকণ' না হইলে লেখক হওয়াব গৌরব নাই। কেদারবাবু যে এতকাল চুপ কবিয়া থাকিয়া শেষে আব আত্মসংবরণ কবিত্তে পাবেন নাই, ইহা বাংলা সাহিত্যের মৌল্যগ্য বলিষা মনে কবি। তাঁহার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, তিনি তথ্য-কথিত তৎকণ না হইয়াও চিব তৎকণ। আধুনিক সাহিত্যের রঙ্গ ও কৃত্রিম ভাববিলাস এবং বিকৃত আর্টের কুৎসিত কসবতের মধ্যে বখন কেদারবাবু আপন-ভোলা বসিকতা ও তাহাব অন্তবালে জমাটি অশ্রুবাপের ইন্দ্রধনু-শোভা দেখিতে পাই, তাঁব খোলা-প্রাণের উচ্ছ্বাসি বখন ছাপার অক্ষর ছাপাইয়া উঠে, তখন সত্যই দুঃ হইতে হয়। গল্পগুলির মধ্যে সুন্দর আর্টের নিদর্শন হয় ত নাই, মনস্তত্ত্ব ও মৌলিক

চরিত্র-চিত্রণ অথবা নির্দিষ্ট-স্বয়ং শিল্পীব বাস্তব বস্তুগুলি নিখুঁত নমুনাও হয় তা নাই—কিন্তু এমন একটা কিছু আছে, বাহা পাঠকের মনঃস্পর্শ কবে, এবং পাতার পর পাতা উঠাইয়া শেষ ছত্রে পৌঁছিতে একজন আত্মীয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের পব হঠাৎ বিচ্ছেদের মত দুঃখ বোধ হয়। তাহাব বলিবার ভঙ্গিটি নিজস্ব। ভাষাব এমন একটি সহজ সঙ্গীত গতি আছে তাহা এমন বিশুদ্ধ ও অনাড়ম্বর, যে, তাহাতেই তাহাব ভাবাবেগ সংক্রামক হইয়া পাঠকের হৃদয় জয় কবে। বইখানির নাসকরণ সার্বক হইয়াছে। যে সমাজ-জীবন ও ভাববাবা হইতে আমরা কৃত্রিম উপায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, পিতৃপিতামহদের রক্তধাবায় যে প্রবৃত্তি ও সংস্কার মগ্ন হইলেও মুগ্ধ হইতে পাবে না, যে ভাব-সাধনা ও স্বপ্নবিলাস উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দুর্বলতা বান্ধালী প্রকৃতিব সঙ্ক্ৰান্ত, তাহাবই ইঙ্গিত লোকের উচ্ছ্বাসময়ী করুণাব হাস্য-পরিহাসের আবরণে সব গল্পগুলিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় ইংব্রাশিক্ষাব ভবা-জোয়ার একটি অতিশয় স্বজাতি-প্রেমিক বাস্তবপ্রিয় বান্ধালীকে ভবনক নাড়া দিয়াছিল—সমাজ, সাহিত্য ও প্রাত্যহিক জীবন-বাতায় এই নব ভাবের বস্তায় তিনিও ভাসিয়া-ছিলেন। কাবণ, তাহাব হৃদয়-ধর্ম্ম তাহাকে কোথাও বাধা পাইতে দেয় নাই, কিন্তু এই বিপবীত ভাব-সংঘর্ষের মধ্যেও তিনি নিজের সমাজ ও বাস্তব মায়া এক সুহৃৎের জন্ত কাটা হইতে পারেন নাই। আজ জীবন-সঙ্গায় সেই বস্তাব উপকূলে দাঁড়াইয়া, বাহা ছিল ও কপান্তবিত হইয়াছে, বাহাকে তিনি অতিদূবে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন—তাহাবই স্মৃতির আবেগে তাহাব হৃদয় মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাই 'আনন্দময়ী দর্শন,' 'পুর-সুন্দরী' ও 'খাকো' লিখিয়া তিনি নিজের পিপাসার্ত হৃদয়ের তর্পণ কবিয়াছেন। এই তিনটি গল্পে তাহাব ভাবদৃষ্টি ও ইষ্টকল্পনার পরিচয় আছে। আমাদের মতে 'পুর-সুন্দরী' গল্পটিই এই সংগ্রহের মধ্যে তাহাব সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।

ম

কীর্তিলতা—সহাকবি বিদ্যাপতি বিবচিত্ত, মহামহে পাধ্যায়

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই সম্পাদিত। হৃদয়কেশ সিবিজ, নং—২। ১৫৭নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনচন্দ্র পাল, বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৯.০।

বৈষ্ণব পদকর্তা হিনাবে বিদ্যাপতির নাম বাঙলায় রূপবিচিত্ত হইলেও তাহাব রচিত অসংখ্য গ্রন্থের উল্লেখ বাঙলায় এতবৎকাল দেখা যায় নাই। মহামাঙ্গ সাব সর্জক জীযাব্দন্ সাহেব বিদ্যাপতি বিচিত্ত 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলেন কিন্তু পুস্তকগুলি এতদিন পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাই নাই। অজ্ঞেয় শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রম কবিয়া অনেক গতিতেব সহায়তায় প্রাপ্ত পুথিব পাঠ উদ্ধাব কবিয়া এই কীর্তিলতা গ্রন্থ প্রকাশ কবিয়াছেন। গ্রন্থ তিনি সমগ্র ভারতের সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রথমে তিনি ১৮৯৮ সালে নেপাল রাষ্ট্রদূতবাবের উপবোল কবিয়া দুইখানিই দেখিয়াছিলেন ও তাহাব নকল লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু নকল ঠিকমত হয় নাই মনে করিয়া পুনরায় ১৯২২ সালে মহারাজা সার চন্দ্র সম্ভের জঙ্গ মহাশয়ের অনুগ্রহে পুথি পাইয়া কীর্তিলতা প্রকাশ কবিয়াছেন। অসম্পূর্ণ কীর্তিপতাকাব পাঠোদ্ধাব করিতে না পারার তাহা প্রকাশ কবেন নাই।

কীর্তিলতা একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে ভূক্ত-ভুজুর রক্তচলে তদানীন্তন ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। অনেকটা বাঙলা উপকথাব

বাল্মীকি-ব্যাঙ্গমৌর্য পল্লবের মত। রায় গঙ্গেশের পুত্র কীর্তিসিংহ ভূপালের ইতিহাস কাব্যের বিষয়। ইহাতে তখনকার দিনের দরবাবের কথা, লৌকিক আচার আচরণ, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ, তুর্কস্বেদেব কথা ইত্যাদি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। পুঁথির সকল স্থানের যথাযথ পাঠ উদ্ধার হয় নাই বলিয়া অর্থ সর্বত্র স্পষ্ট না হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রমে বাঙলায় কীর্তিলতা পুস্তকেব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙালী পাঠকের হৃদি কবিতা দিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে কীর্তিলতা পুস্তকেব চুখক বাঙলায় দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ইহাতে তাঁহার জীবনী কবিত্বশক্তি ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ ও প্রামাণিক আলোচনা আছে। ইতিপূর্বে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একপ তথ্যপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ আমরা পাঠ কবি নাই।

তাবপব বিদ্যাপতিব আমলে প্রচলিত মৈথিল ভাষায় কীর্তিলতা গ্রন্থ। বাঙলা অক্ষরে ছাপা হওয়াতে ইহা পড়িতেও আমাদের কষ্ট হয় না। অবশ্য স্থানে স্থানে অর্থ কবা অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় যথাসাধ্য টীকা কবিতা দিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এমন সুস্পাদিত গ্রন্থ আমরা এদেশে কম দেখিয়া থাকি। আমরা প্রকাশক ও সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানাইয়া পাবিতেছি না। ছাপাই হুন্দব।

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণদাস বিবচিত। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ২৪৩।১ আপাব সাকুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী সং ৭০। মূল্য সদস্ত পক্ষে ২, সাধারণপক্ষে ১।০।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া অনেক কাব্য প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি অসিদ্ধি-লাভও করিয়াছে। ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিণী, মালাধর বহু ও মাধব আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল, কাশীরামদাসীপ্রজ কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণবিলাস প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থটি ধুব প্রচারিত না হইলেও কৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে ইহা একটি উপাদেয় চমৎকার কাব্য। এই বহুমূল্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মাধব আচার্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হুকবি কৃষ্ণদাস বিবচিত। এই কাব্যগ্রন্থে বহু স্থলে অপূর্ণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁহাবা প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন এই কাব্যটি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। বইখানি সম্পাদনকার্যও হুন্দব হইয়াছে। টীকাব সাহায্যে পড়িতে কষ্ট হইবে না। ছাপাও হুন্দব হইয়াছে।

চৈতন্য-পরবর্তী সহজিয়া তত্ত্বাত্মশীলনের প্রবেশিকা (An Introduction to the Study of the Post Caitanya Sahajiya Cult)—শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ প্রণীত, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকর্ষ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্য।

বইখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইলেও বাঙলা সাহিত্য-সেবীর পক্ষে এখানি বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই। বাঙলার সহজিয়া-বাদ সম্বন্ধে আমরা সত্যমিথ্যা অনেক কথাই শুনিয়া থাকি। সহজিয়া তত্ত্ব আসলে কি বস্তু, ইহাব প্রসার কতদূর, এই সত্যবাদী লোকের সংখ্যা কত, আচার আচরণ কিরূপ, ইহাদের গ্রন্থ সংখ্যা কত, গ্রন্থ-গুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ইত্যাদি সম্বন্ধে কাহারো সঠিক ধারণা নাই। চলিত কথায় উপর নির্ভর করিয়া সহজিয়াদিগকে 'নেড়ানেড়ী

বলিয়া গালি দেওয়ার একটা হজুক আজকাল দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি কাহারো দেখি না। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রচলিত গ্রন্থ ইত্যাদিও এমন গোপনে প্রচলিত হয় যে ইহাদের সম্বন্ধে ঠিকমত তথ্যসন্ধান করা সহজ নহে। ইহাদের পুস্তকাদিও গুহ্য ভাষায় লিখিত বলিয়া সাধারণে বুঝিতে পারে না। মণীন্দ্রবাবু এই পুস্তকখানিতে ইহাদের সম্বন্ধে বতদূর সম্ভব সত্য সংবাদ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মতবাদকে পবিত্রকৃত কবিতা ইনি সাধাবর্ষের উপকার করিয়াছেন। পবিত্রকৃত প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকাটিও বহুমূল্য। সহজতত্ত্ববাদীরা যাই হউক বাঙলা সাহিত্যকে যে ইহাবা বহুদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা অস্বীকার কবিরার উপায় নাই। স্তবত্যাং ইহাদের সম্বন্ধে সত্য আলোচনা করার প্রয়োজন হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবু, দেহতত্ত্ব, স্ত্রী-মাধন, পবকীয়া তত্ত্ব, সহজ-তত্ত্ব, তত্ত্ববাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অমৃতরসাবলী নামক গ্রন্থেব বিস্তৃত আলোচনা কবিতা 'বস কদম্ব' বইখানি আলোচনা ও বর্ণনা পাঠ কবিতা আমরা উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্থ।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ বিবচিত। শ্রীতাবকেশব ভট্টাচার্য এম-এ ও শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। ২৪৩।১ আপাব সাকুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।০, সদস্ত-পক্ষে ২।০।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাহিত্যের রত্নাগার হইতে যে কয়েকটি বহুমূল্য পুঁথির গুণ্ডন কর্তৃক বৎসরের মধ্যে আবিস্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও কবিবল্লভের এই "রসকদম্ব" গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধহয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরেই ইহার স্থান। ইহা সহজ-তত্ত্ব-বিষয়ক বহি হইলেও কাব্য হিসাবে ধুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। সকলকেই এই পুস্তকটি পাঠ কবিতা দেখিতে অনুমোদন করি। এই বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যিক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু An Introduction to the study of the Post Caitanya Sahajiya Cult পুস্তকেব পরিপাঠে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাঙলাব সাহিত্য সম্বন্ধে বাঁহাব এতদূর প্রজ্ঞা ও সহাতত্ত্ব হইতে তিনি বেন এই বইখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

সচিত্র কাশীধাম—পূণ্যার্থী বারাগসীর সচিত্র ইতিবৃত্ত। মনোমোহন চক্রবর্তী প্রণীত (২য় সংস্করণ) ২৫৭ এ বউবাজার স্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীমঙ্গল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।৫০।

এই চমৎকার বইখানিকে কাশীর একটা সুবৃহৎ ইতিহাস বলিলেও হয়। কাশী দর্শনাস্থিলাবিসিগেব সঙ্গী হইবার উপযুক্ত। পূণ্যধাম কাশীর মন্দির, ঘাট, মন্দির এক কথায় সমস্ত ভট্টব্য স্থানের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র এই পুস্তকে আছে। সামাজিক ও ধর্মসংস্কারের ইতিহাসও হুজিখিত।

গো-জাতি—শ্রীঅনিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৫২ আপাব চিংপুং রোড, কলিকাতা। আট আনা।

গোজাতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ হুন্দব পুস্তক। ইহাতে গো-পালন, গোময়, গো-মূত্র, গো-অঙ্গি ইত্যাদির কার্যকাবিতা, গোবাধি ও তাঁহাব চিকিৎসা, দুগ্ধবৃদ্ধির উপায়, দুগ্ধ অবিকৃত বাধার

উপাধ, পোগণকে শূদ্ধহীন করার উপাধ, বসদ করার প্রণালী, ইত্যাদি পো-সম্বন্ধে বহু বহু শিক্ষাপ্রদ আধুনিক-জ্ঞান-সম্ভার আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। বইটি সংক্ষিপ্ত হওযাও অধিকতর মূল্যবান হইয়াছে। বইটি বাংলার নবে নবে প্রচলিত হইলে দেশের যথার্থ উপকাব হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও ক্রীচৈতন্যদেব—প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম-এ প্রণীত। একাশক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, প্রবাসী-প্রেস, ২১ আপার সার্কুলাব রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩২২। দুই টাকা।

পুস্তকটিতে বৈষ্ণব ধর্মের জন্ম ও বিকাশ, চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম, চৈতন্যদেবের বিশেষত্ব, চৈতন্যদেবের জীবন-কথা ও ধর্মমত ইত্যাদি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বাংলার এই মহাপুরুষের জীবন ও ধর্মভাবের দ্বাৰা বাংলা দেশ উজ্জীবিত এবং বাংলাব সাহিত্য পল্লবিত হইয়া উঠে। এ হেন ধর্মোপদেশের জীবন আলোচনা অর্থে বাংলা দেশের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ লিপিবদ্ধ করা। আলোচ্য গ্রন্থের প্রাণ লেখক মহাশয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসীম শ্রদ্ধা ও প্রাঞ্জল লিপিকুশলতায় চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্মকথার হৃদয় পরিচয় প্রদান কবিয়াছেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থানাভাবে আমরা বইটির বিশদ পরিচয় দিতে পারিলাম না। আমরা বইটি পড়িবা আনন্দিত ও উপকৃত হইযাছি। ষাঁহার চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্মের নিবপেক্ষ সবল আলোচনা দেখিতে চান তাঁহার এই পুস্তকটি পাঠ করুন।

গুপ্ত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—অধ্যাপক কগীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ প্রণীত। ববনা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। ১৩৩৬।

ছাত্রবন্ধু ত্যাগী অধ্যাপক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন-কথা। বৈজ্ঞানিক হিসাবে, সমাজ-সংস্কারক হিসাবে, জাতীয় শিক্ষার প্রধান প্রবর্তক ও খাদির প্রচারক রূপে এবং অক্সফোর্ড দেশ-সেবকরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভাবতের জননাধিপতির নিকট সুপরিচিত। তাঁহার জীবন কথা আলোচনা করিয়া কগীন্দ্রবাবু সাধারণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন আচার্য্য রাব "সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্ডিরে যোগ দিয়েছেন।" আচার্য্য বায় প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরী ছাড়িয়া দেন নাই—কার্য্যকাল শেষ হইলে অবসর গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কগীন্দ্রবাবু বর্ণনা ভঙ্গীতে বইখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা আশা কবি পুস্তকখানি পাঠব-সমাজে সন্মাদব লাভ করিবে।

মাধবীর বিজোহ (উপন্যাস)—শ্রীবামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। স্বাস্থ্যচন্দ্র সাহিত্য মন্দির, মহেশপুর বশোহব। মূল্য ১।০। ১৩৩৪

সচিত্র উপন্যাস। পোলামীর মোহে এক যুবকগণের চৈতন্য সম্পাদন কবিবার উদ্দেশ্যেই নাকি গ্রন্থখানি লেখা। আমাদের মনে হয় লেখকের বর্ণনামুগ্ধতায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

প্রবাল (উপন্যাস)—শ্রী সরদারীবালা বসু। সুরদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩৩৪। মূল্য ২।০।

উপন্যাসখানি ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে ধাবাবাহিক ভাবে বাহিব হইয়াছিল।

পদ্মলোচন (সচিত্র উপন্যাস)—এস জি মজুমদার। ডি, এন্ড লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। ১৩৩৪।

কিছুদিন পূর্বে লেখকের ত্রিলোচনের পরিচয় এসঙ্গে আমরা মজুমদার সাহেবের বর্ণনা-কৌশলের প্রসংশা করিয়াছিলাম। বর্তমান বইখানিতেও তাঁহার সেই পৌবব অক্ষুর রহিয়াছে। উপন্যাসখানি গট হৃদয় হইয়াছে, ভাষাও বেশ স্ববলরে। ছাপা, বাঁধাই ও মলাট-চিত্র সমস্তই বেশ হইয়াছে। লেখক আমাদের প্রথমে ত্রি-লোচন পবে পদ্মলোচন উপহাব মিলেন। ইহাব পবে কি রক্ত-লোচন দেখাইবেন? গ্রন্থখানির সহিত লেখকের কটো-চিত্র আছে।

প্রা

পুষ্পরথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাগ্‌চী, এম-এ। বামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। আনা।

কৃষ্ণীশবাবু বইখানি একট! মত্ত অভাব পূরণ করিল। উডো জাহাজের আজ ধুব বড় দিন। তার নিত্য নূতন উন্নতি বিধান হইতেছে। কোন জাতিব সব-চেয়ে বড় শক্তি এখন উডো-জাহাজে নিবন। সেই তাব প্রকান্ত। এই উডো জাহাজের উদ্ভাবনের গল্প আজ কৃষ্ণীশবাবু আমাদের হুকুমাব বালকদের কাছে উপস্থিত কবিয়াছেন। উডো-জাহাজের সম্বন্ধে যদি তারা কিছু জানিতে উৎসুক হয় তবে এই বইটি পড়িলে চলিবে। বইখানা তাহাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে না—কারণ কৃষ্ণীশ-বাবুর ভাষা অতি প্রাঞ্জল। সাধারণের মত কবিতা লেখা। লেখক তাঁহার নিবেদনে বলিয়াছেন যে, বইখানি Claxton's Mastery of the Air নামক হৃদয় পুস্তক অবলম্বনে রচিত। তা' ভাড়া অস্ত্রাস্ত্র তথাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। বইখানি পড়িলে অমুহূদেব কেনকপ লক্ষণ দেখা যায় না।

হুগু উডো-জাহাজের উদ্ভাবনের গল্পেই বইখানি ভরা নয়। উডো-জাহাজ কত বকমেব তাদের বর্ণনা তাদের নানা প্রভারের কলকজীর প্রভেদ নানাকপ নক্সা দিয়া, তার ভবিষ্যৎ দ্বিতীশ বাবু বইখানিতে বলিয়াছেন। উডো-জাহাজ সম্বন্ধে সব ধরবই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

উডোর পরিভাষা সম্বন্ধে বে-পবিচ্ছেদ লেখা হইয়াছে তাহাও বেশ হইয়াছে। লেখক ইংরেজী কথাগুলির অমুহূদ কবিবার চেষ্টা না কবিতা ভালই করিয়াছেন।

প

জপঞ্জী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এল, কলকাতা অনুষ্ট। মূল্য ১। এক টাকা। গ্রন্থকাবের নিকট, মোজাঃফরপুর, অথবা গুপ্তদাস লাইব্রেরী কলিকাতায় প্রাপ্য।। পৃঃ ১-৪১ + ১-২৪।

'জপঞ্জী' শিব সম্প্রদায়েব আবাধ্য গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবে' প্রথম মহলা, আদি গুণ শ্রীনানকেব গীত-সংগ্রহ। নানকশাহীদেব পঞ্চম গুণ শ্রীঅর্জুনদেব তাঁহার নিজের বচিত ও তাঁহার অগ্রণামী গুণ-চতুষ্টয়েব রচিত গীত সমুহ প্রথম সংগ্রহেব ব্যবস্থা কবেন। শ্রীনানকেব রচনা এই 'জপঞ্জী' মহলা ১, এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমে পঞ্চম গুণ অর্জুনদেবের বচনা 'হৃদমঙ্গী' মহলা ৫ নামে প্রচলিত হব। দশম গুণ গোবিন্দের পর আব শিব সম্প্রদায়ে নূতন গুণ নির্বাচিত হন নাই, তখন অর্জুনদেবের কাল হইতে অস্ত্রাস্ত্র গুণদেবের যে বচনা ত্রমায়রে সন্নিবিষ্ট হইতেছিল, তাহা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া পুণ্যগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' আকাব গ্রহণ করে। শিখদের এই গুণ-বাক্যাবলীই বর্তমানে সমস্ত

শিখের গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছে, এই পবিত্র মন্ত্রগুলির পাঠ ও গীত পূজা ও আরাধনা শিখমাত্রেয়ই কর্তব্য। সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ভাবত-বর্ধ বধন আপনাত আভিন্ন, পরিপূর্ণ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় উদ্ভূত হইয়াছিল, নানকদেব ইতিহাসের সেই মহাক্ষণে তাহাব এই সাধনার অঙ্গতম নেতাকপে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। তাই, তাঁহাব সেইদিনকাব মঙ্গ ৪৫৮ বৎসব পরেও এমন অন্নান ও অপকূপ রস-সুস্বাদ হইয়া রহিয়াছে যে, শুধু শিখ নয়, হিন্দু মুসলমান ষ্ঠান যে কোনো ধর্মাবলম্বী, যে কোনো দেশবাসী, তাহাব মধ্যে আপনাব স্বাধীন জীবনের প্রতিকূপ ও আপনাব ভক্ত-জীবনের প্রেরণা পাইতে পারেন। ‘জপজী’ ওকমুখী ভাষায় লিখিত ও সাধারণত ওকমুখী বর্ণমালায় মুদ্রিত হয়। খ্রীষুজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল গীতগুলি মুদ্রিত করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সংযোজিত কবিয়াছেন। ইহাতে বহু বাঙ্গালীব পক্ষে মূল পাঠও হুসাধ্য হইবে, এবং ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সহাবে অর্থ গ্রহণ সহজ হইবে। অনুবাদ যেমন সবল, তেমনি মন্ত্র-শর্শা, মূল মন্ত্রীদের ভাব ও বেশ তাহাব ভিতর দিয়া পাঠককে স্পর্শ করে। ইহা ছাড়া ঐছের ভূমিকা হিসাবে অনুবাদক শিখগুরু নানক, তাঁহাব জীবন, ও তৎসম্পর্কে প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি, এবং তাঁহার ধর্মগত, আত্মা, কর্মকল জন্ম-মরণ, সদগুরু-তত্ত্ব প্রভৃতি উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সম্পর্কে একটি বিশদ নাতিদীর্ঘ বচনা সন্নিবদ্ধ কবিয়া পাঠক-মাত্রকেই বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার একটি অমূল্য রত্নরূপে ভক্ত, সাধক, ও রসিকজন সকলেবই অশেষ আদবেব হইবে।

সুখমণী—অনুবাদক খ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এল। মূল্য ১ এক টাকা। পৃ. ৮+২১৪। প্রাপ্তিস্থান, গ্রন্থকাব, মোহাঃকবপু, অধবা, গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতা।

‘গ্রন্থনাহেব’ অন্তর্গত মহলা, পঞ্চমগুরু অর্জুনদেবের বচিত এই গীতচয় ‘সুখমণী’ নামে পরিচিত। এই নামেব বিভিন্ন তাৎপর্য আছে, কিন্তু তথাপি ইহার অর্থ সাধারণত স্পষ্ট নয়। ‘সুখমণী’ মোট ২৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ—প্রত্যেকটি শ্লোক ‘অষ্টপদীতে’ অর্থাৎ আটটি খণ্ডাংশে বিভক্ত। এবং এইরূপ প্রত্যেক পদে আবার দশটি পংক্তি। বর্তমান অনুবাদেব এই দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম সংস্করণ বোধ হয় বাঙ্গালা ১৩১৬ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলেমনে তব, গ্রন্থখানা বাঙ্গালী সমাজে আদৃত হইয়াছে। ইহাতে আমবা অত্যন্ত আনন্দ-লাভ কবিলাম। যদিও অনুবাদক মহাশয়ের অন্বিত ‘জপজী’ গ্রন্থখণ্ডের মত ইহাতে, ব্যাখ্যা সংযোজিত হয় নাই, তথাপি ইহার অনুবাদাংশ মূলেব অক্ষরপে পংক্তি হিসাবে বিভক্ত হওয়ায় পাঠকেব আবো সুবিধা হয়। গ্রন্থশেষে (‘জপজী’র সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য) যদি ওকমুখী বর্ণমালার এক প্রতিলিপি ও কোনো পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি অনুবাদক সন্নিবেশ কবেন, তাহা হইলে কোনো কোনো কৌতুহলী পাঠকের কৌতুহল বোধহয় নিবৃত্ত হইবে।—‘সুখমণী’ বাঙ্গালাব রস-পিপাসাহৃদেব চিত্তে হৃৎ-সঞ্চার কবিবে, এবং বাঙ্গালার ভক্তি-সাধকদেব প্রাণ স্পর্শমণির স্তায় স্পর্শে, ভক্তি-উজ্জ্বল কবিবে।

গ

বিশ্ব-বৈতালিক (কবিতা)—খ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাট্টা। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচসিকা। পৃ.—১৭৪। ১৩৩৪।

চক্চকে মলাট, তক্তক্তকে ছাপা এবং আকারেব ক্ষীণত্ব যদি কাব্য-কলার পবিসাণ হয়, তাহা হইলে এই বইখানি চমৎকার

হইয়াছে। কিন্তু গুণেব দিক হইতে বলিতে গেলে বলিতে হয়—হৃদয় শিশু! রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অমুকবণে ইহাব প্রত্যেক পৃষ্ঠা ভাবাক্রান্ত। যেন কোবা কাপড়ের উপব ধার-করা ধোপ-দোস্ত জামা পরিয়া কোন দেমাকী পাড়াপেরে সহবে চলিয়াছে,—সন্ধ্যা নাই, যে, জামাটি দেহেব মাপে বড় এবং বৈমানান। কবিতাব ভাব ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের ধার-করা, কিন্তু প্রকাশের অক্ষমতা এবং ছন্দজ্ঞানেব অভাবে তাহা ভ্যাংচানিতে পরিবর্তিত। বথা—

“অস্তরের হর অনাহত
বাইবেব তানে ক্রমাগত
মিলে, মিলে প্রবাহিত হেব হৃবধুগী,
জান কর জ্ঞানী গুণী,
মহানন্দে প্রাণ হউক পাগল!”

চমৎকার। অথচ সুদীর্ঘ চাবপৃষ্ঠা ব্যাপী একটি দার্শনিক ভূমিকায় কবিবেব নিলজ্ঞ আমিত্ব প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাব একটি আঙ্গোকেট্রে ঐছের প্রবেশ-দ্বার অলঙ্কৃত। দ্বন্দ্ববাদ।

ব

আলুপোড়া—(ছেলেদেব গল্প)—খ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা, ৩২ পৃষ্ঠা।

বাহাবা শৈশব ও কৈশোব অতিক্রম কবিয়াছে তাহাদেব দত্ত গল্প উপস্থাপন কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিবা বশ অর্জন কবা কঠিন নহে, অন্ততঃ লেখকেব সমসামোভাববিশিষ্ট একদল লোক যে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওই শ্রেণীব পাঠকদের সকলেবই বুদ্ধিবৃত্তি সচাগ; নানা জিনিষ দেখিবা শুনিবা ও পাঠ করিয়া, সংসারের বহু বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিয়া তাহারা প্রত্যেকেব মতকে ও মতবাদকে প্রজ্ঞা কবিতো ও তাহার যথায়ম মূল্য দিতে শিখিয়াছে। কিন্তু শিশু ও কিশোবদিগকে সন্তুষ্ট ও তাহাদের মনকে অধিকার কবিতো গেলে মত বা তথ্য লইয়া ঠাকি দেওয়া চলে না! সৃষ্টিব প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত সকল শিশু ও কিশোবের এক মন, এক ভাব। গল্প উপকথা বা কবিতা তাহাদের মনকে নাড়া দিতে না পাবিলে তাহারা সেগুলি ঠেলিবা রাখে, সেগুলিকে এতটুকু প্রজ্ঞা কবিবাব মত উদাবতা তাহাদের নাই।

হরেশবাবু এই বইখানি শিশুমনকে জয় কবিবাব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর শিশুরা আলুপোড়া লইয়া দল বাঁধিয়া হলা করিতেছে, টানাটানি হেঁচড়াহেঁচডি শুরু কবিয়াছে। একজন মহাউৎসাহে গল্পগুলি পড়িতেছে, বাকী সকলে চুপ কবিয়া শুনিতেছে, হাসিতেছে এবং নারে মারে কোলাহল কবিয়া উঠিতেছে। শিশুদেব মন এত সহজে অধিকার করিতে পারিয়াছেন দেখিবা এই বইখানিকে অল্প কোনো অগ্র-পরীক্ষায় না ফেলিবা আমরা ইহাকে নিঃসন্দেহে সার্টফিকেট দিতেছি, সকল শ্রেণীর শিশু ও কিশোব-সম্রদায় ইহাকে আদব কবিবে।

আমাদেব মনেব এক অংশ এখনো শৈশব ও কৈশোব অতিক্রম কবে নাই। আলুপোড়া পড়িবা আসিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ কবিয়াছি, বিশেষ করিয়া আলুপোড়া, কেল্লাব জুতো ও বুদ্ধির ঢেঁকি পড়িবা মনে হইল আলুপোড়া গল্পটি ত আমাদেবই কথা, চোঁআব সঙ্গে আমাদেব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, পাঁচু ত আমাদেবই বাড়ীব চাকর!

বইটি সম্বন্ধে আব একটি কথা বলিবার আছে। যে তিনটি গল্প বিদেশী গল্পের ছায়া লইয়া লিখিত সেগুলি যেন একটু আড়ষ্ট, দেশী গল্পগুলি চমৎকার উৎসাহিত। এই ছ আনার মূল্যে বহিমানিব জন্ত আমবা শিশুদের তরফ হইতে গ্রন্থকার ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ছেলেবয়সে (উপন্যাস),— শ্রী শিববাস চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক ডি. এম লাইব্রেরী ৩১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

১৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী এ উপন্যাসখানি গ্রন্থকারের মনোবিকারের একটি ইতিহাস। কদম্বতার আবেশে গ্রন্থকারের স্বদেশ-প্রেম হাবুডুবু খাইয়াছে। ক্ষমতাব অপব্যবহার দেখিয়া আমাদেরও মন ব্রিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তপথের যাত্রী—উপন্যাস, শ্রী ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। প্রকাশক ববল লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা মূল্য ১০।

গ্রন্থকার প্রাচীনপন্থী লেখক। মনস্তত্ত্ব ও আধুনিকতম টেকনিকের বাসাই না থাকিতে আমরা এই উপন্যাসখানি পড়িয়া খুসী হইয়াছি। সহজ কথা সহজ করিয়া বলিবার ক্ষমতা লেখকের আছে অথচ তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও সহজে বহন করিয়া লইয়া যান। সবিল ও শোভনার চবিত্র বেশ ফুটিয়াছে।

আলোর কমল (উপন্যাস),— শ্রী ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। ১৫নং নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট কলিকাতা, মেটকাফ প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০।

ব্যোমকেশবাবুর এই উপন্যাসখানিও সুসিদ্ধ। মাঝে মাঝে চরিত্রচিত্রণ একটু অস্বাভাবিক হইলেও শেষ পর্যন্ত পড়িতে কষ্ট হয় না। মাঝবের চরিত্র ভালই লাগিল।

ব্রাহ্মস্পর্শ (উপন্যাস),— শ্রী হরেন্দ্রলাল সেন লিখিত। প্রকাশক শ্রী যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ম্যানিগাঁও, সাহুদ এণ্ড কোং সদরঘাট চট্টগ্রাম। মূল্য দেড় টাকা।

ব্রাহ্মস্পর্শে বাত্রা করিয়া গ্রন্থের নাটক মনোবাহু কিকপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পত্নী উষাব সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ও পবে সমুদ্রতীরে শোভাব সহিত প্রণয় ঘটনা তাঁহাকে যে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে

মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল—এই উপন্যাসে তাহা চমৎকার ফুটিয়াছে। উপন্যাসটির পবিত্রতা হৃদয়ব। গ্রন্থকারের লিখনশক্তিও ভাল।

প্রাথমিক প্রতিবিধান (১য় সংস্করণ)— শ্রী হরীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ২। ১৯২৭

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রথম প্রতিকার-কল্পে কি উপায় করা কর্তব্য (First Aid) সেই সম্বন্ধে উপদেশ। অল্পদিনের মধ্যেই বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। তাহাতেই বোঝা যায় পাঠক সন্মানে ইহার আদর হইয়াছে। আমরা প্রথম সংস্করণই বইখানির বণাযোগ্য প্রশংসা করিয়াছি। আমরা ইহার সমাদর ও বহুল প্রচার কামনা করি।

তিন্দুবাষ্ট্রের গডন— শ্রী বিনয়কুমার সবকার প্রণীত। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৪।

অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, “হিন্দু নব-নারী ৭০০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তের ‘বান্ধ’ চালাইতেছে—আব বোন সন্তের শ’ নংসর ধবিয়া বান্ধতন্ত্রের ‘রাড’ চালাইতেছে। ষষ্ঠপূর্ণ চতুর্থ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু জাতির ‘পাবলিক ল’ বা বাষ্ট্র-শাসন এই গ্রন্থে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।” গ্রন্থকার অনেক প্রশংসা প্রদান দিয়া হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় শক্তিবোধের ইতিহাস দেখাইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু সমাজপতির বাষ্ট্র গঠনের দিক দিয়া বধেই অগ্রসর হইয়া ছিলেন। সেই রাষ্ট্রধর্মবাদের চিন্তা বা ধারা লেখক পত্রিকাসমাজের নিকট উপস্থিত করিয়া দেশের প্রভুত উপকার করিয়াছেন

আবর্ত— অধ্যাপক শ্রী হরিপদ পাণ্ডে। সংস্কৃত শ্রেণ উপনিষদ-টাবি, কলিকাতা। ১৩৩০

উপন্যাস। হরিপদ-বাবু বোধ হয় এইখানি উপন্যাস বচনার প্রথম প্রয়াস। তাই অনেক স্থলে technique এর দোষ দেখিলাম। তাঁহার লিখিবার শক্তি আছে। আশা করি ভবিষ্যতে এ সমস্ত ত্রুটি সংশোধিত হইবে।

সুভাষচন্দ্র— শ্রী হেমন্তকুমার সবকার সম্বলিত ডি, এম; লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ১০। ১৩৩৪

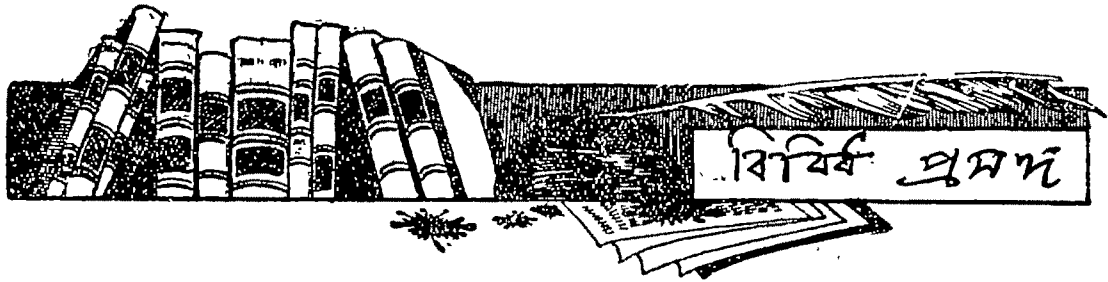
সম্মলনকারী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বালাবজু, তিনি চিঠি পত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বইখানিতে আবও অধিক সংবাদ আশা পাইব। কনিষ্ঠা ছিলাম। পুত্রকের ছাপা ও বাঁধাই অন্দর হইয়াছে।

প্র

ভ্রমসংশোধন

আবণ

পৃঃ	কলাম	পঙতি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮৭	১	নিম্ন হইতে ৩য় পঙতি	সর্বদোষে	সর্বদোষে
৪৯১	২	ঐ	“বলিয়া” শব্দটি নিম্ন হইতে ৫ম পঙতিতে “হবিধা হয়” শব্দের পবে বসিবে।	
৪৯৪	২	নিম্ন হইতে ১৬শ পঙতি	বোট বিদ্যাস সে	বোট সে
৪৯৬			কবি টলস্টয়েব একখানি চিঠি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তকর নাম “শ্রী কালিদাস নাগ” ভ্রমক্রমে ছাপা হয় নাই।	
৪৯৬	১	নিম্ন হইতে ১৬শ পঙতি	পাবে গায়ে বসিয়া আধুনিক	পায়ে গায়ে আধুনিক
৫০১	১	উপব হইতে ৫ম পঙতি	এককালের	এতকালের
৫০২	১	ঐ	তাকাইয়া মেঘটি বলিল	তাকাইয়া বলিল



সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে লর্ড আরুইনের বক্তৃতা

গত ২৯শে আগষ্ট, ১২ই ভাদ্র, বড়লাট লর্ড আরুইন সিমলায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের সম্মুখে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি প্রকাশ করেন, যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার বক্তৃতাটি ভাল। তাহাতে ধর্মোপদেশ আছে। তাঁহার অনেক কথায় আমরা সাব দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকার লাভে ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা পড়িবে, সে-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, যে, ভারতবর্ষ আত্মশাসক না হইলে বিবাদ-ভঞ্জন হইবে না। এবিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে ও থাকিবে। তাঁহারা বলেন, আগে তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মিটাও, তবে স্বরাজ পাইবে; আমরা বলি, ঝগড়ার প্রবান কারণ সকল দূর করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারে আমাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকা দরকার, কেননা ঝগড়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে। এই কারণ তৃতীয় পক্ষ প্রভু থাকিতে দূর করা ভ্রাসাধ্য, হব ত অসাধ্য।

লর্ড আরুইন যদি ধর্মোপদেশী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশিত সাধু ইচ্ছার পূরা প্রশংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি রাজপ্রতিনিধি ও দেশের শাসন-কর্তা। সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতায় অকপটতা প্রকাশ পাইতেছে, ইত্যাদি মন্তব্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই। তিনি রাজপ্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা করা ছাড়া অল্প দায়িত্ব ও কর্তব্যও আছে। তিনি যে শান্তি স্থাপন-প্রয়াসী, কাজে তাহার কি পরিচয় দিয়াছেন? কার্যতঃ কিছু করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই বড়লাটের আছে। যদি না থাকে,

তাহা হইলে তাঁহার পদত্যাগ করা উচিত। কারণ, তাহা অপেক্ষা ভাল বক্তা ও উপদেষ্টা পাদরীদের মধ্যে অনেক আছেন যাহারা তাঁহা অপেক্ষা খুব কম বেতনে উপদেশ দিতে রাজী হইবেন।

গৃহ রাষ্ট্রনীতি বা শাসননীতি সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার বড়লাটের সহিত সাংক্ষাৎ করিতে বান;—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বান, কিংবা আহত হইয়া বান। যে আঠার মাসের সাম্প্রদায়িক বিরোধে হতাহতের সংখ্যা বড়লাট দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি একবারও একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার সহিত সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন কি? করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত নহি। গত বৎসরের কলিকাতার ধুনাধুনিব সময় লাট মিটন দার্সিলিঙে বসিয়াছিলেন; পুলিশ এ বৎসর শান্তিরক্ষার যেকপ বন্দোবস্ত করিয়াছিল, গত বৎসর তাহা করে নাই; রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জনের সময়, ইংলিশম্যান ষ্টেটসম্যান পর্যন্ত বলিয়াছিল, যে, মুসলমানেরা আগে হইতে পরামর্শ আঁটিয়া সরকারী হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্মীয়স্থানে বাধা দিয়াছিল; পাবনায় অরাজকতা ঘটিয়াছিল; ইত্যাকার নানা শোচনীয় ব্যাপারের কোন কৈফিয়ৎ গোপনেও বড়লাট লইয়াছিলেন কি? লইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। লইয়া থাকিলে ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিলে, এখনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা কেন চলিতেছে? অন্তান্ত প্রদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণের জন্তই বা তিনি কি করিয়াছেন? সত্য, এই কাজ প্রথমতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের, কিন্তু তাঁহারা যখন অকৃতকার্য হইয়াছেন দেখা যাইতেছে, তখন বড় কর্তা কিছু করেন নাই কেন?

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে দেখা যাইতেছে, শান্তিভঙ্গের

আশঙ্কার অছিলায় হিন্দুদের ধর্মসম্পৃক্ত কাজে বাধা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহা এ আশঙ্কায় নহে, যে, হিন্দুরা শাস্তিভঙ্গ করিবে ;—এই আশঙ্কায়, যে, হিন্দুরা শোভাবাত্রা করিলে মুসলমানেরা শাস্তিভঙ্গ করিবে। অতএব, যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী আইন মানে, তাহাদের অধিকার লোপ করাই সরকারী কর্মচারীরা অধিকতর সুবিধাজনক ও আরামদায়ক এবং স্বায়স্ফুত মনে করে। বড় কর্তা এ বিষয়েও ত কিছু বলেন না, দেখিতে পাই।

বস্তুতঃ, তিনি যে একটা গোল টেবিলের বৈঠকের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে কেবল হিন্দুমুসলমান নেতাদের ডাকিবার কথাই ভাবিয়াছেন বলিয়াছেন ; কিন্তু অপর এক পক্ষ যে-সব সরকারী কর্মচারীদের অকর্মণ্যতায় অবহেলাষ বা অন্ত্র দোষে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণিত হয় না, তাহাদিগকে ডাকিবার কথা তাহার চিন্তাপথে আবির্ভূত হয় নাই।

হিন্দুরা মনে করে, মুসলমানদেরও কেহ কেহ মনে করে, ব্যবস্থাপক সভা-আদিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্রয় দেওয়ায়, সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বন্দোবস্ত সর্বত্র যোগ্যতা অনুসারে না হইয়া অনেক স্থলে সম্প্রদায় অনুসারে ভাগাভাগি হওয়ায়, শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বত্রই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগাভাগির দাবী উত্থাপিত হইয়াছে ; বিরোধের তাহা একটা মূলীভূত কারণ। অতএব হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তি অনুসারে নির্বাচন, চাকরীতে নিয়োগ, ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। অত্য়দিকে শিক্ষিত মুসলমানদের অবিকাংশ সাম্প্রদায়িক হিসাবে নির্বাচন ব্যবস্থাপক সভা হইতে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত সর্বত্র প্রচলনের পক্ষপাতী। সরকারী চাকরীর সব বিভাগেও তাহারা সম্প্রদায় হিসাবে ভাগাভাগির পক্ষপাতী। ইহা বিরোধের মূলীভূত একটা প্রবান কারণ। এইসব কারণ যখন ভারতের একটা ছটা প্রদেশে নয়, প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান, তখন ইহার প্রতিকার প্রাদেশিক কোন শাসনকর্তার সাধ্যায়ত্ত নহে ; ইহা বড় কর্তারই এলাকা।

* পরিশেষে আমরা বলিতে চাই, বিরোধের জন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিবুদ্ধিতা দোষ ও দায়িত্ব আছে, কিন্তু দোষ, দায়িত্ব কেবল তাহাদেরই নহে। সরকারী

নীতি, সরকারী ব্যবস্থা, সরকারী কাজ, সরকারী অবহেলা, সরকারী পক্ষপাতিত্ব, প্রভৃতির দোষেও বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে। বিরোধ বাড়িতেছে, বিরোধ লোপ পাইতেছে না। সুতরাং হিন্দুমুসলমানকে গম্ভীর ভাবে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেই সন্তোষ ও শাস্তি স্থাপিত হইবে না, সর্বোচ্চ শাসনকর্তার সকল কর্তব্য পালিত হইবে না।

ক্যাথারিন মেয়োর একজন পূর্ববর্গ

কুমারী ক্যাথারিন মেয়োনাম্নী এক মার্কিন জীলোক ভারতবর্ষের কেবল মাত্র মন্দ দিক্টা দেখাইয়া “মাদার ইণ্ডিয়া” নামক একখানা বহি লিখিয়াছে। যদি তাহাতে লিখিত সব কথা সত্য হইত, তাহা হইলেও কোন দেশের কেবল দোষগুলা দেখাইয়া বহি লিখিলে সেটা কুকাঙ্ক বলিয়া বহিখানা নিন্দনীয় হইত। কিন্তু বহিখানাতে অনেক মিথ্যা কথা আছে, তাহা উহার নানা কাগজের সমালোচনায় উদ্ধৃত অনেক কথা হইতে বুঝা যায়। পুস্তকবিক্রেতার নিকট হইতে বহিখানা পাইলে আরও কত মিথ্যা কথা আছে, জানিতে পারিব।

এই বহিতে আবে ছবোআ নামক গত শতাব্দীর এক ভারতপ্রবাসী পাদরীর বহি হইতে কিছু কিছু উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। পাদরীরা নিজের ধর্মের ও নিজ নিজ সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এবং ধর্মপ্রচারার্থ স্বদেশ হইতে অর্থসংগ্রহের জন্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সমাজের অনেক নিন্দা প্রচার করিয়াছেন। আবে ছবোআও তাহার একখানা বিখ্যাত পুস্তকে তাহা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুসমাজের সত্য দোষ যে তাহাতে কিছু নাই, এমন নয়। ভারতীয়দের নাড়ীনক্স বরের কথা জানিবার জন্ত তিনি ইউরোপীয় সমাজ ও ইউরোপীয় পোষাক ছাড়িয়া দেশী লোকদের সঙ্গে দেশী পোষাক পরিয়া মিশিতেন। ভারতীয়রা বেশী বোকা কিম্বা বেশী কূটবুদ্ধিবহিত সরল প্রকৃতির বলিয়া, ঐ জন্ত ছবোআ ভারতীয়দের প্রিয় হইয়া উঠেন, এবং তাহার প্রতিশোধরূপ তাহাদের সব দোষ একখানা বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যদি শুধু পাদরী হইতেন, তাহাতেই রক্ষা ছিল না।

কিন্তু, একে মা মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ—তাঁহাকে দেশের তৎকালীন রাজা ঈষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানী টাকাও খাওয়া-ইয়াছিলেন। তিনি ফরাসী বলিয়া তাঁহার বহিখানা ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। এই ফরাসী বহির হস্ত-লিপি তৎকালীন বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেস্টিক্স আট হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া লন। ইহা পরে কোম্পানীব ব্যয়ে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয় এবং অনুবাদ মুদ্রিত হয়। দুবোআ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান, তখন ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্নেন্ট তাঁহাকে পেন্সন দিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ইংরেজদের অর্থকরী চর মনে করিলে অত্যাশ্চর্য্য হইবে না। আমরা যাহা লিখিলাম; তাহার প্রমাণ এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণের অষ্টম খণ্ড ৬২৪ পৃষ্ঠা হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“But his great work was his record of *Hindu Manners, Customs and Ceremonies*. Immediately on his arrival in India he saw that the work of a Christian missionary should be based on a thorough acquaintance with the innermost life and character of the native population. Accordingly he abjured European society, adopted the native style of clothing, and made himself in habit and costume as much like a Hindu as he could. He gained an extraordinary welcome amongst people of all castes and conditions, and is still spoken of in many parts of South India with affection and esteem as “the prince’s son, the noblest of Europeans.” Although Dubois modestly disclaimed the rank of an author, his collections were not so much drawn from the Hindu sacred books as from his own careful and vivid observations, and it is this, united to a remarkable prescience, that makes his work so valuable. It is divided into three parts: (1) a general view of society in India, and especially of the caste system. (2) the four states of Brahmanical life; (3) religion—feasts, temples, objects of worship. Not only does the abbe give a shrewd, clear-sighted, candid account of the manners and customs of the Hindus, but he provides a very sound estimate of the British position in India, and makes some eminently just observations on the difficulties of administering the Empire according to Western notions of civilization and progress with the limited resources that are available. Dubois’s French Ms. was purchased for eight thousand ruples by Lord William Bentinck for the East India Company in 1807; in 1816 an English translation was published, and of this edition about 1864 a curtailed reprint was issued. The abbe, however, largely recast his work, and of this revised text (now in the India Office) an edition with notes was published in 1897 by H. K. Beauchamp. Dubois left India in January 1823, with a special pension conferred on him by the East India Company, and on reaching Paris was appointed director of the Missions Etrangères, of which he afterwards became superior (1836-1839).”

“পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রগতি সম্বন্ধীয় ধারণা অনুসারে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহ করা কঠিন”, ইত্যাকার মন্তব্যপ্রকাশও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে দুবোআর ৮০০০ টাকা ও পেন্সনরূপ বকশিশ পাইবার একটা কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। গোপনে আরও টাকা তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে আগে আগে পাইয়াছিলেন কিনা, জানি না। কিন্তু একজন ফরাসী দেশেব পাদরীকে ইংরেজ গবর্নেন্টের পেন্সন প্রদান হইতেই বুঝা যায়, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত বোগ ছিল।

আর এক ভারতহিতৈষিণী পাশ্চাত্য স্ত্রীলোক কয়েকমাস হইল কুমারী নেভিল্ রজ্জ্ নারী একটি স্ত্রীলোক ভারতবর্ষে কোন কোন কুৎসিৎ ব্যারামের চিকিৎসা ও হ্রাসেব উপায় নির্দেশের জন্য সামাজিক স্বাস্থ্য (Social hygiene)-বিদ্যান ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য, ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনার্থ শাশা চামড়ার কোন লোক আমাদের দেশে আসিলেই, আগরা বুদ্ধিমান বলিয়া তাহাকে খুব আদর-বত্তর করিয়া থাকি। এই স্ত্রীলোক-টিকেও করা হইয়াছিল। কাগজে দেখিলাম, ভারতবর্ষে অল্পদিন থাকিয়াই এই ভারতহিতৈষিণী ঠিক করিয়া কেদিয়াছেন যে, চরিত্রহীনতাজনিত ব্যাবির প্রাচুর্য্য ভারতবর্ষে ইংলণ্ডেরও চার গুণ বেশী। কি উপায়ে ব্রিটিশ কোটি লোকদের গোপনীয় স্বর্ণিত ব্যাবির এতটা ঠিক ঠিক থবর তিনি পাইলেন, জানি না। কিন্তু ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কেহ এবিষয়ে কিছু লিখিলে ভাল হয়। আমরাও পরে লিখিতে পারি। আমাদের সম্বন্ধে হইতেছে, এই স্ত্রীলোকটির যতদূর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিকক্ষে ব্যবহৃত হইবে। বলা হইবে, যে-দেশে দুর্নীতি এত বেশী, তাহা স্বরাজের উপযুক্ত নহে। ভারতবর্ষেব সর্ববিধ প্রকৃত সামাজিক, নৈতিক, দৈহিক ব্যাধি দূরীভূত হউক, ইহা আমরা সর্বাস্তঃকরণে চাই। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয়দের রাজনৈতিক অধিকার বাড়ান না কমান হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত কমিশন বসিবার সময় আসিতেছে, সেই সময়েই

ভারতবর্ষের সকল রকম দোষ আবিষ্কার ও সংশোধন করিবার আগ্রহ পাশ্চাত্য ভারতবহিতৈষীদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠা আকস্মিক মনে হইতেছে না।

ক্যাথারিন মেয়োর বহির উদ্দেশ্য

ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে বাধা দেওয়া যে ক্যাথারিন মেয়োর বহির উদ্দেশ্য, সে-বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

“মাদার ইণ্ডিয়া” বহি লিখিবার পূর্বে এই জীলোক ফিলিপিনোদের সমস্ত দোষত্রুটির বর্ণনাপূর্ণ “দি আইল্‌স অব্ ফীয়ার,” নামক এক বহি লেখে। আত্মশাসন-ক্ষমতার প্রমাণ প্রদর্শন করিলেই ফিলিপিনোদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, আমেরিকার জোস্‌ আইনে এই অঙ্গীকার আছে। কিন্তু আমেরিকার সাম্রাজ্যোপাসকেরা সেই অঙ্গীকার পালন কবিতো চায় না। সেইজন্য তাহারা জেনারাল উড্‌ নামক এক ব্যক্তিকে ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা করিবার পাঠায়। সে-ব্যক্তি ফিলিপিনোদের যোগ্যতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে, এবং নানা-প্রকারে তাহাদের স্বাধীনতা লাভ আন্দোলনে বাধা দেয়। ক্যাথারিন মেয়োর ফিলিপিনোদিগকে আমেরিকান ও অন্যান্য জাতিদের চক্ষে হেয় প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বোক্ত বহিখানা লেখে। সমালোচনার জন্য উহা আমাদের ও অন্যান্য ভারতীয় দেশী সম্পাদকদের নিকট আসিয়াছিল। উহার ভূমিকা ভারতে ডায়াকি বা বৈরাগ্য প্রবর্তনের অন্ততম মূল উদ্যোক্তা লায়নেল কার্টিসের লেখা। ভারতীয় দেশী সম্পাদকেরা ফিলিপিনো নহে বলিয়া এবং ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা-লাভ-অঙ্গীকার ভারতীয়েরা নিজেদের স্বাধীনতা লাভের একটা নজীরের মত মনে করে বলিয়া, ফিলিপিনোদের অব্যোক্তাপ্রদর্শক এই বহি আমাদের ও অন্ত কোন কোন সম্পাদকের নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, “মাদার ইণ্ডিয়া” বহি ভারতীয় দেশী কোন সম্পাদকের নিকট সমালোচনার জন্য আসে নাই; আমরা উহা ধাক্কার কিম্বা কলিকাতার অন্ত কোন দোকানেও পাই নাই। অথচ ম্যাংগো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকরা

ও খৃষ্টিয়ান মিশনারীরা উহা পাইয়াছেন। বহিখানা আমেরিকান, ইংলণ্ডে, ইউরোপের জার্মানী, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ইংলণ্ড আমেরিকার নানা কাগজে উহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। ইংলণ্ডে প্যারলিমেন্টের সভ্যদিগকে ঐ বহি বিনামূল্যে এক এক খানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইসকল ভণ্ড্য হইতে অনুমান করা যায়সঙ্গত, যে, লেখিকার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে “সভ্য” জগতের লোকদের মনে অবজ্ঞার উদ্রেক করা; তাহা হইলে ঐ “সভ্য” জগৎ ইংরেজদের ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত রাখার বিরোধী হইবে না। ইংরেজ সম্পাদক-দেব সঙ্গে সঙ্গে দেশী সম্পাদকদের নিকটও যদি বহিখানা সমালোচনার্থ আনিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, যে, লেখিকা আমাদের উপকারার্থ আমাদের দোষ আমাদের কাছে জানাইতে চাহিতেছে, এবং যেটা দোষ নয় তাহা দেখাইয়া দিবার এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ আমাদের দিতেছে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অন্তরূপ। উদ্দেশ্য এই, যে, জগতের লোক আমাদের কাছে আগেই জঘন্য বর্ষের মনে করুক, আমরা যেন সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার ভ্রম দেখাইবার সুযোগ না পাই।

লেখিকার স্বাধীন জীবিকা (independent means) আছে, উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরেজের টাকা খাইয়া লিখিবার দরকার তাহার নাই। “তাকুর-ঘরে কে?” “আমি কলা খাই নাই।” সাম্রাজ্যোপাসক আমেরিকান ও ইংরেজদের টাকা খাওয়ার অপনাদ দিবার আগেই সাফাই। লেখিকার টাকা আছে স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ, যে, কেবল নিঃস্ব শোকেরাই টাকার লোভে অপকর্ম করে, কোন ধনীর লোভ নাই ও কোন ধনী টাকার জন্য অপকর্ম করে না?

ক্যাথারিন মেয়োর এদেশে আসিবার আগে বিলাতি ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়াছিল এ দেশের ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট পরিচয়পত্র লইবার জন্য। আচ্ছা, তাহা না হয় সরকারী চোখে ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য দরকার। কিন্তু বেসরকারী মত জানিবার জন্য ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মিক, শৈক্ষিক প্রভৃতি প্রচেষ্টার নেতাদের সঙ্গে ত লেখিকা দেখা করে নাই। ভারতে ভাল কি কিছুই নাই?

একজন খুব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নিকট গুলিয়াছি তিনি যখন দিল্লী গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বড় বড় ইংরেজ আমলাদের সঙ্গে ক্যাথারিন মেয়োর খুব দহরম মঠরম। লেখিকা কলিকাতায় কর্নীলিয়া সোরাবজী নামী ভারতবিষেয়ী অল্প এক লেখিকার অতিথি ছিল। ক্যাথারিন মেয়োকে কালীঘাটের মন্দিরের ও শ্মশানের সব-কিছু দেখাইবার ভার পড়িয়াছিল বাবু হরিদাস হালদারের উপর। খবরের কাগজে প্রকাশিত সরদার শাদুল সিংহের চিঠি হইতে জানা যায়, পাঞ্জাবে ক্যাথারিন মেয়ো টিকটিক পুলিশের সাহায্য পাইয়াছিল। বুঝা যাইতেছে, সরকারী বন্দোবস্ত এরূপ হইয়াছিল, যাহাতে ভারতবর্ষের মন্দ সব কিছু বিকৃতভাবে ক্যাথারিন মেয়ো দেখিতে পায়। ভারত-বর্ষে অগণিত স্তম্ভের দেবমন্দির আছে, যাহার স্থাপত্য উৎকৃষ্ট এবং যেখানে পশুবলি হয় না। তাহা না দেখিয়া ক্যাথারিন মেয়ো দেখিল কেবল কালীঘাটের মন্দিরে পাঠা বলি, ও তাহার ফোটোগ্রাফ তুলিয়া বহিতে ছাপিল।

ক্যাথারিন মেয়োর প্রথম মিথ্যা কথা

ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার কাগজের সমালোচনায় দেখিলাম, “মাদার ইণ্ডিয়া” বহির দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাক্যেতেই বলা হইতেছে, যে, কলিকাতায় অনেক বহির দোকানে রানীকৃত রুশীয় রাজনৈতিক পুস্তিকা বিক্রীর জন্ত রাখা হয়, তাহার উপর মাছির আড্ডা, এবং রক্তহীন অপ্রশস্তবক্ষ ধুতিপরা ছাত্রেরা নিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করে। আমরা জানি, ইহা নির্জলা মিথ্যা কথা। কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে একজনও রুশীয় ভাষা জানে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রুশীয় ভাষায় লেখা চটি-বহি রাশি রাশি বিক্রীর জন্ত আনিবে, এমন আহাম্রিক দোকানদার এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। রুশীয় ছাড়া আমাদের ছাত্রদের জানা অল্প কোন ভাষায় লেখা রুশীয় রাজনৈতিক পুস্তিকাও কলিকাতার কোন দোকানে থাকে না; কেননা, গবর্ণমেন্টের আইন অনুসারেই এরকম বহি আমদানী করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মনে করুন, যদি কোন দোকানদার কোনপ্রকারে গোপনে সেরূপ বহি আমদানী

করে (যাহা করিবার কোন কাবণ নাই), তাহা হইলেও এমন বেকুব কে আছে, যে, সেগুলি প্রকাশ্যভাবে বিক্রীর জন্ত টেবিলে সাজাইয়া রাখিবে? রুশীয় পুস্তিকাগুলার উপর এত মাছির বা বসিবে কেন? সেগুলি কি রক্তমাখা?

ক্যাথারিন মেয়োর মতে ভারতীয়েরা আফ্রিকার বর্ষরদের চেয়েও নিকৃষ্ট, ঠিক মানুষ নয়, মহুষ্যের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর এক রকম জীব; ইংরেজরাজত্ব আছে বলিয়া এই প্রাণীগুলি টিকিয়া আছে, নতুবা ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমার ওপার হইতে মহুষ্যান্যামবীরী জীবেরা আসিয়া ভারতীয়দের উচ্ছেদ সাধন করিত। ইংরেজরাজত্বের এমন মিথ্যা ও হান্সকর সমর্থন পূর্বে কখন শুনি নাই। ভারতীয়-দের ইতিহাস ইংরেজরাজত্বের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়। ইংরেজরা এদেশে আসিবার পূর্বে তাহা হইলে ভারতীয়েরা টিকিয়াছিল কেমন করিয়া?

ক্যাথারিন মেয়োর বহির এবং গিল্চার নামক লোকটার ভারতীয় বিবাদের কুৎসার একটা কুফল এই হইয়াছে, যে, ভাবতীয়েরা উত্তেজিত হইয়া আমেরিকার ও ব্রিটানের সামাজিক সর্বপ্রকার দুর্নীতির প্রতিই বেশী করিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে। অধিকন্তু আমাদের সত্য সত্য যে-সব দোষ আছে, তাহা নাই, বা তাহা দোষ নয়, বা তাহা যতটা অনিষ্টকর বা নিন্দনীয় বলা হয় ততটা অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে, এই-প্রকার কথা বলিবার আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। তাহা হিতকর নহে। পাশ্চাত্য সমাজ নির্দোষ নহে। কোন কোন দিকে আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপ-আমেরিকার সামাজিক ব্যাধি গুরুতর। কিন্তু তাহার আলোচনার চেয়ে পাশ্চাত্যেরা তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনীতির কিণ্ডে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের উপর প্রভু করিতে পারিতেছে, তাহার আলোচনা কল্যাণকর। কেবল পাশব বলে, অজ্ঞানের বলে, পাশ্চাত্য প্রাচ্যের উপর কতৃ করিতেছে না। কোন জাতির পাশব বশ ও তাহারা বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হইলে অধিক দিন টিকিতে পারে না; যেমন প্রাচীন রোমকদের বল টিকে নাই। পাশ্চাত্যেরা বিজ্ঞানের বলে, বৈজ্ঞানিক অজ্ঞানের বলে, বুদ্ধির বলে, এবং একতার বলে বলীয়ান। বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক অজ্ঞ-

শত্রু প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতিরেকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না, উহা মার্জিত হয় না। শিক্ষা দান ও লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানবান হইতে হইলে, কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রয়োজন। একতার জন্তও কতকগুলি গুণের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জাতিসকলের, সকল রকম কৃতিত্বের মূলীভূত গুণসমূহের প্রতি মনোনিবেশ এবং আমাদের অন্তর্নিহিত সেইসব গুণের সম্যক বিকাশ সাধন আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাহার পরিবর্তে আমাদের পক্ষে উদ্বেজিত করিয়া যে পাশ্চাত্যের দোষ আবিষ্কার ও বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত করা হইতেছে, ইহাতে আমাদের অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের সত্য দোষসকল সংশোধনের পরিবর্তে তৎসমুদয়ের সমর্থন বা লঘুকরণে যে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মান হইতেছে, তাহাও অনিষ্টকর।

আশা করি, ভারতীয়েরা অপরের নিন্দা-কুৎসায় বিচলিত না হইয়া নিজ নিজ সদগুণ-সমূহের বিকাশসাধন ও দোষ-সমূহের উন্মূলনরূপ কর্তব্য পাগনে সর্বদা অবহিত থাকিবেন।

স্বাধীনতালোপ ও জাতীয় দোষ

যে যে কারণে এক-একটা জাতির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়, সামাজিক নানা দোষ তাহার অন্তর্গত বটে। কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নহে। ইতিহাসে ইহাও দেখা গিয়াছে, যে, সামাজিক কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট জাতির দ্বারা সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট জাতি পরাজিত হইয়া স্বাধীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সামাজিক কতকগুলি দোষ থাকিলেই কোন জাতির আত্মশাসন-অধিকার লুপ্ত হওয়া উচিত, ইহা সত্য নহে।

গত মহাযুদ্ধের ফলে কতকগুলি দেশকে স্বাধীন হইতে দেওয়া হইয়াছে, বা স্বাধীন করা হইয়াছে; পরাজয় সত্ত্বেও কোন কোন জাতিকে স্বাধীন থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। বাহারা স্বাধীন থাকিতে পাইল বা পরাধীন অবস্থা হইতে স্বাধীন অবস্থায় উপনীত হইল, কমিশন বসাইয়া তাহাদের

সামাজিক স্থনীতি স্থনীতি সম্বন্ধে আগে অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর তাহাদিগকে স্বাধীন থাকিতে বা হইতে দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ জয়ী জাতিরা এরূপ কোন একটা সিদ্ধান্ত করে নাই, যে, বাহারা চরিত্রবান, বাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা নিখুঁত, বাহাদের দেশে কোন কুৎসিৎ রোগ নাই, বাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাহারাই স্বাধীন হইতে বা থাকিতে পারিবে; এবং এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা কমিশন বসাইয়া জাতিসমূহের চারিত্রিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থার অনুসন্ধানের ফল অনুসারে কাহারও স্বাধীনতা এবং কাহারও বা স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং ক্যাথারিন মেয়ো আমাদের বিরুদ্ধে বাহা কিছু লিখিয়াছে, সমুদয় সত্য হইলেও আমাদের স্বাধীন হইবার অধিকার লুপ্ত হইতে পারে না। আমাদের বাহা কিছু দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতীত কালের ও বর্তমান সময়ের বড় বড় স্বাধীন জাতিদের সম্বন্ধেও তাহা বলা বাইতে পারে। তা ছাড়া, ঐ সকল স্বাধীন জাতিদের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে, বাহা আমাদের নাই।

জানি, তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। সেইজন্য, আমাদের চরিত্রে, জ্ঞানে, একতায়, দৃঢ়তায়, স্বার্থত্যাগে ও শক্তিতে ইংরেজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃসাধ্য বটে। কিন্তু দুঃসাধ্যের সাবনায় সিদ্ধিলাভ মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি ও পুরস্কার। এই সাবনা আমাদের হউক।

মহাভারতে আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নল রাজা শুটি ছিলেন, ততক্ষণ শনি বা কলি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। অন্তর্জিতার ছিদ্র অবলম্বন করিয়া তবে শনি তাহার দেহে প্রবেশ করে। আমরা যে-পরিমাণে নির্দোষ হইব, যে পরিমাণে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ভাল হইবে, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের শত্রুদের নিন্দা ও অনিষ্ট-চেষ্টা অগ্রাহ্য করিতে পারিব। শত্রুদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়; তাহাদিগকে তর্কে পরাজিত করা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও আবশ্যক নিজেদের সত্য দোষ সংশোধন।

গঙ্গাজলঘাটীর কম্বীর প্রতি আবিচার

বাঁকুড়ার “যুগদীপ” কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে।

বাঁকুড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ত্যাগী কম্বী অহিংস অসহযোগী শ্রীব্রজ গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অজুহাতে যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন, তাহাৰ প্রতিবাদ জন্ত কাপিন্টা গ্রামে শ্রীব্রজ কৃষ্ণলাল সিংহের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভাৰ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

“সবকার-পক্ষ, পুতচরিত্র গোবিন্দ-বাবু নামে গঙ্গাজলঘাটীর বিদ্যালয়-গৃহে প্রবেশ নিষেধ করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার অজুহাতে যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ কবিত্তেছে। উক্ত বিদ্যালয়-গৃহটি বর্তমানে জাতীয় বিদ্যালয় কমিটির অধীনে আছে। গোবিন্দ-বাবু জাতীয় বিদ্যালয় কমিটির সম্পাদক; উক্ত বিদ্যালয় গৃহে তাহার কর্তনও অনধিকারপ্রবেশ হয় না। কল্লুপক্ষ অজ্ঞাত-বশতঃ তাহার নামে যে প্রবেশনিষেধাজ্ঞা নোটিশ দিয়াছেন, এই সভা তাহাৰ নিষ্পত্তি করিতেছে।”

আমরা গোবিন্দ-বাবুকে জানি। যে সময়-কালন আশ্রমে তাহার দেশহিতৈষণা ও স্বাধীনত্যাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। গোবিন্দ-বাবু শ্রদ্ধেয় লোক। তাহার উপর ১৪৪ ধারা প্রয়োগ শোচনীয় ভ্রম। তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিতে চাই না। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বতঃপ্রসূত হইয়া নোটিশ প্রত্যাহার করিলে ভাল হয়। অতঃপূর্ব কি আমাদেরকে শুনিতে হইবে, যে, অমুকের উপর, নিজের বাসগৃহে প্রবেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, ১৪৪ ধারা প্রযুক্ত হইয়াছে? হাকিমি অত্যাচারণ হস্তকর হইলে তাহাতে গবর্নমেন্টের সুখ্যাতি হয় না।

বেঙ্গল শ্রাশস্তাল ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল কম্বী কটন মিল

বেঙ্গল শ্রাশস্তাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বাঙালী জাতির ছন্দায় হইয়াছে—বদিও উহা ফেল হইয়াছে কয়েকজন প্রতারকের দোষে। যাহাদের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হইবে, তাহাদের শাস্তি হইবে। সে-বিষয়ে এখন কিছু বলিবার নাই।

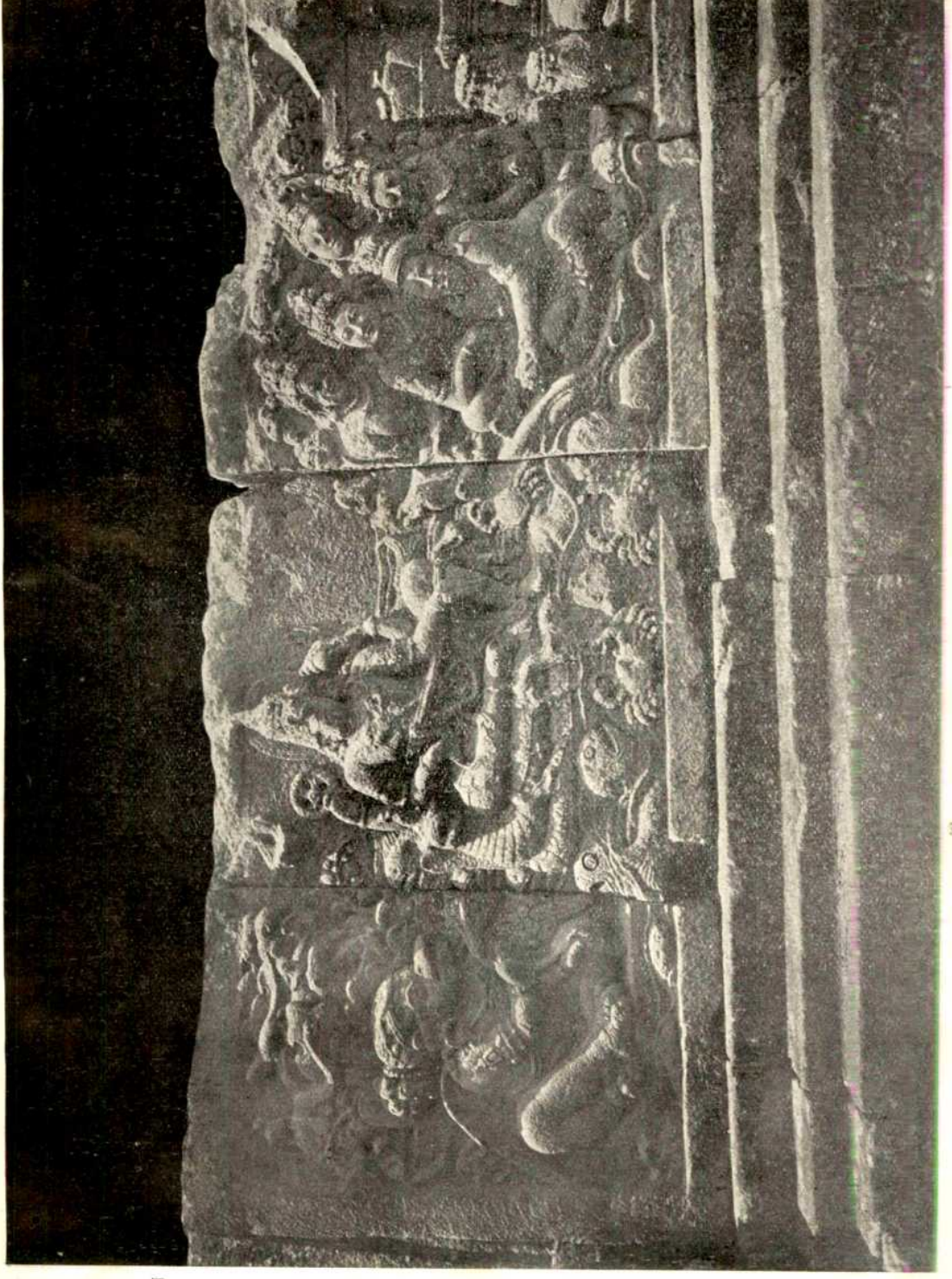
অবাঙালীরা যাহাই মনে করুন, একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাহা হইতে আমরা নিজে যেন স্বজাতির সকল লোকের উপর বিশ্বাস না হারাই। ইংরেজদের এবং অন্য

সব ধনী জাতিদের অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে; ভ্রমবশতঃ চোরদের দোষেও অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া তাহারা স্বজাতীয় সব লোকের উপর বিশ্বাস হারায় নাই। তাহারা যেমন কর্মে অসমর্থ বা অনভিজ্ঞ কিংবা প্রবঞ্চকদিগের সম্বন্ধে খুব বেশী সাবধান হইয়াছে, আমাদেরকেও তাহাই হইতে হইবে। কিন্তু সব রকম কাজ দক্ষতা, সাবধানতা ও সাধুতার সহিত করিয়া বাইতে হইবে; হাত পা শুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেবল বিদেশী জাতিদের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা একথা বলিতেছি না। কলিকাতায় ও বাংলাদেশের মফঃস্বলের নানা স্থানে বাঙালীদের অনেক ব্যাঙ্কের কাজ চলিতেছে। সবগুলি যে খুব ছোট, তাহাও নহে। সেগুলির কাজ নৈপুণ্যের সহিত চলাতে বুঝা যাইতেছে, যে, সব বাঙালী এবিষয়ে অকেজো, অনভিজ্ঞ বা প্রবঞ্চক নহে। ইহাতে আমাদের উৎসাহবুদ্ধি হওয়া উচিত।

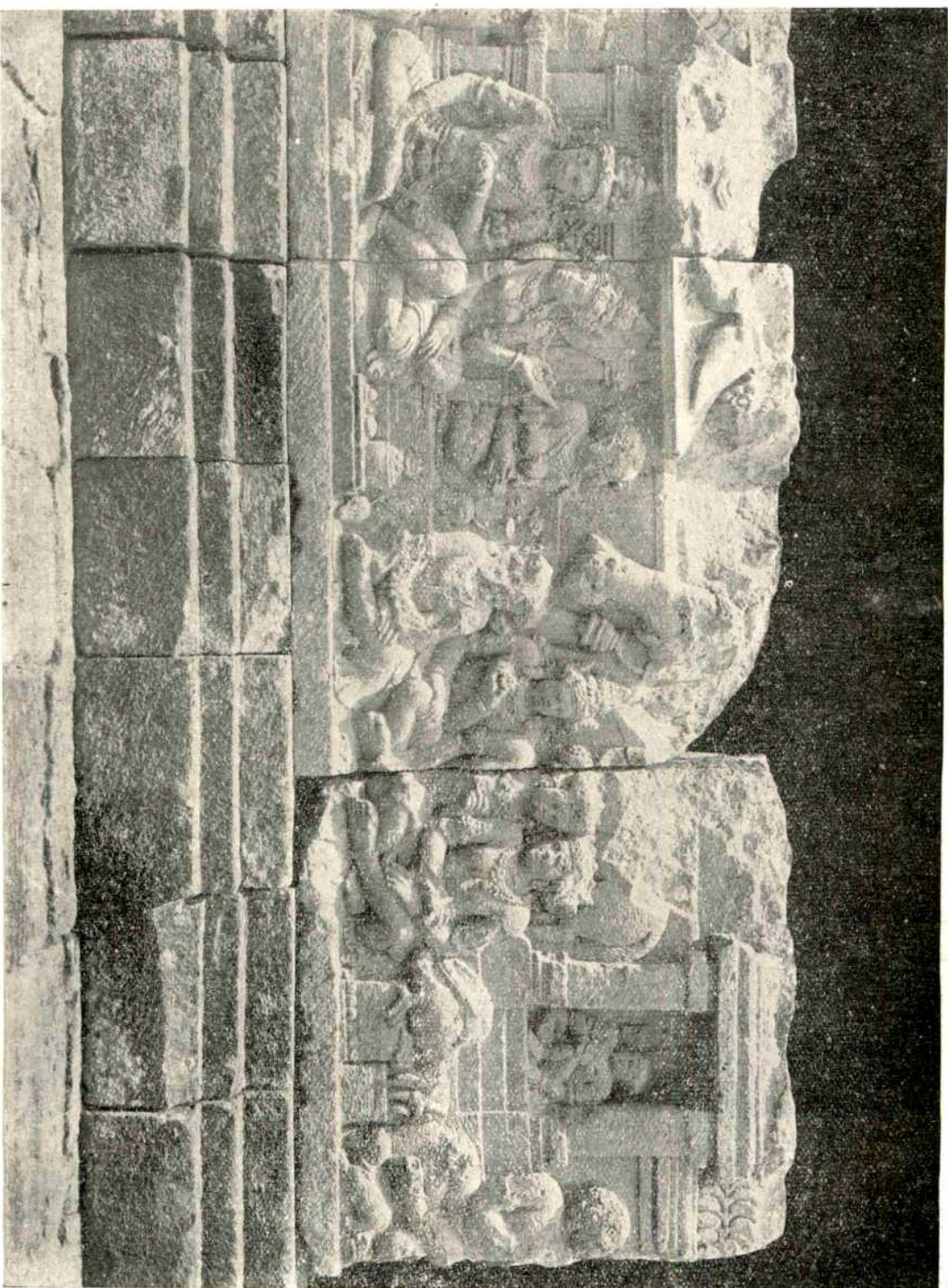
বেঙ্গল কম্বী কটন মিল ফেল হইতে হইতে যে রহিয়া গেল, ইহা সুখের বিষয়। নতুন বিস্তার ধনীদিগের টাকা যাইত এবং বাঙালীর কলঙ্ক আরও বাড়িত। বেঙ্গল শ্রাশস্তাল ব্যাঙ্ক করূপ লাভ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা জানি না। কিন্তু বেঙ্গল কম্বী কটন মিল যে খুব লাভের জিনিষ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার জিনিষের কাটুতি বরাবরই খুব ছিল। অনেক সময় চাহিদার অল্পকপ মাল-কল জোগাইতে পারিত না। ফলে অধীনকারদিগকে মুনফা দিয়াও বেঙ্গল শ্রাশস্তাল ব্যাঙ্কে ২৯ লক্ষ টাকা জমা ছিল, এবং বিক্রোতার নিকটও ৭৮ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। তা ছাড়া, অনেক লাখ টাকা চুরিরও অভিযোগ আছে। সততার ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইলে কলের শ্রীবুদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মন্ত্রী অপসারণ, দ্বৈরাজ্যবিনাশ নহে

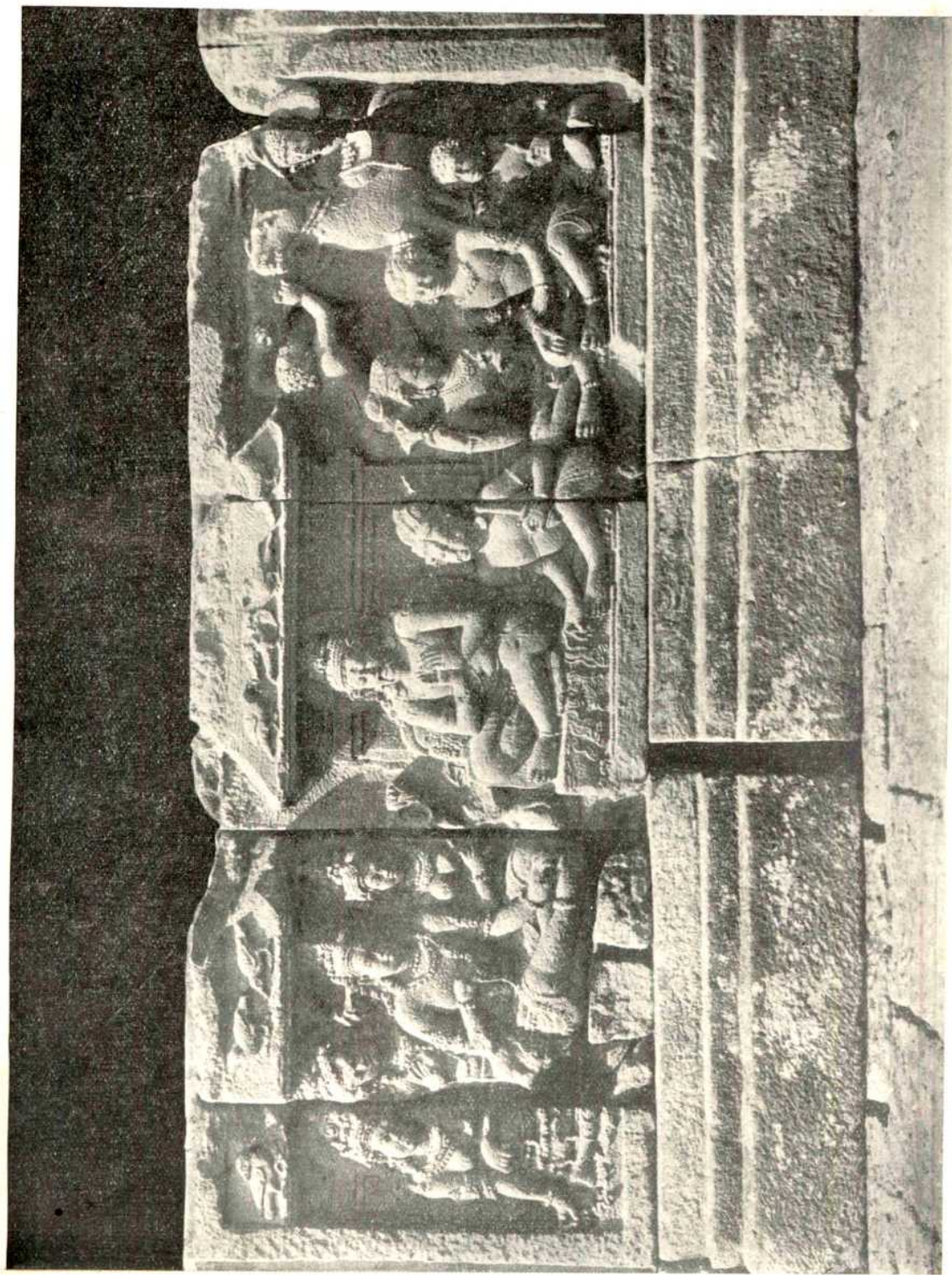
যাহাদের ভোটে চক্রবর্তী-গঙ্গনবীর মন্ত্রিত্ব গেল, তাহারা সকলে দ্বৈরাজ্য-বিনাশের জন্য ভোট দেয় নাই। কেহ কেহ সেইজন্য দিয়াছে বটে; কিন্তু অন্য কেহ কেহ, যেমন রহিমী দল, গঙ্গনবীর প্রতি ব্যক্তিগত অনাস্থা বা আক্রোশ বশতঃ



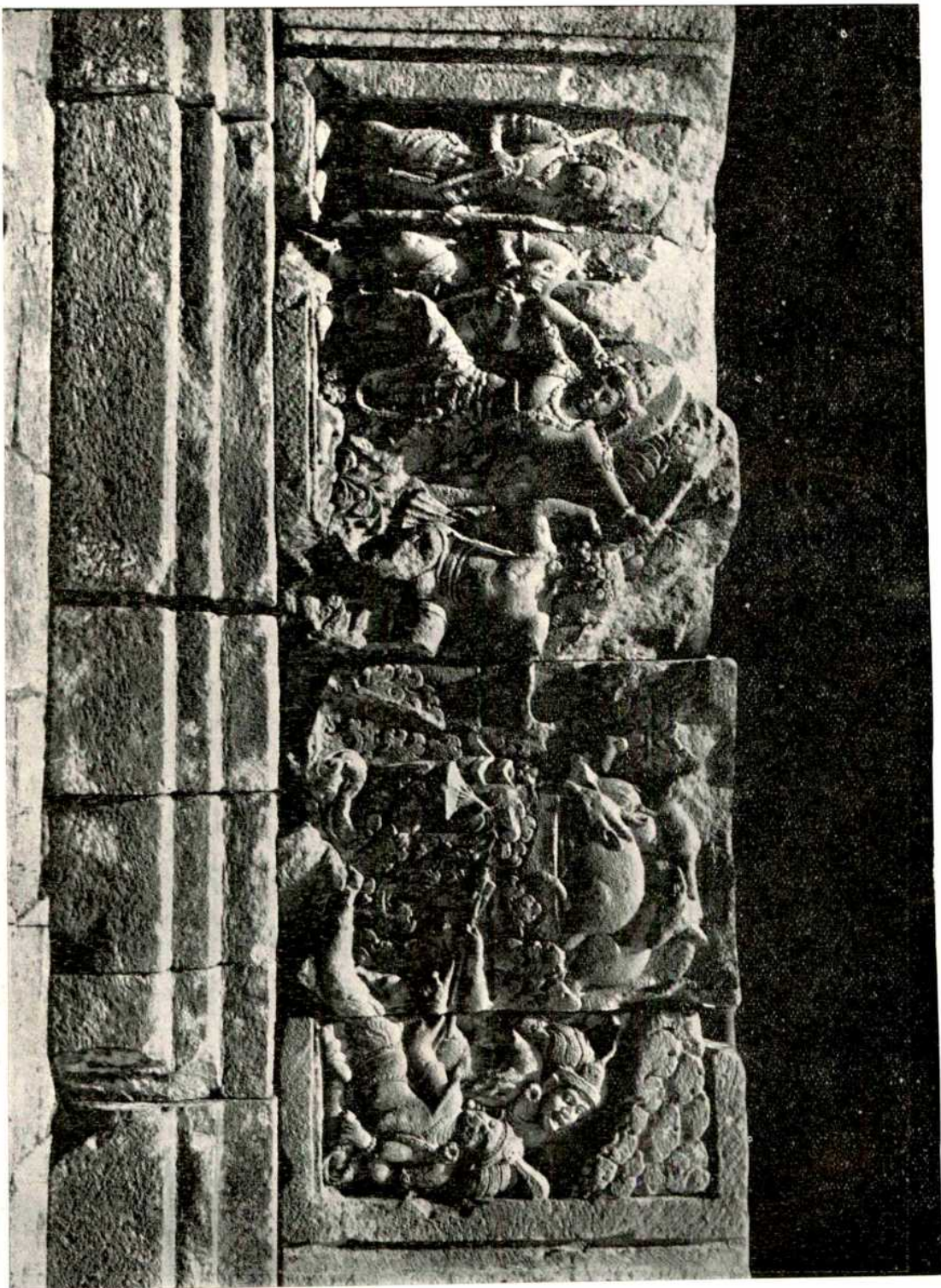
১। অনন্তশয়নে বিষ্ণু। বামে গরুড়, দক্ষিণে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন।



୧ । ନାହିସି ନର ରାଜା ନୀଳରଥ, ରାଜକନ୍ୟା ଓ ସାମାନ୍ୟମାନ ଭଗବତ୍ କବିରାଜ

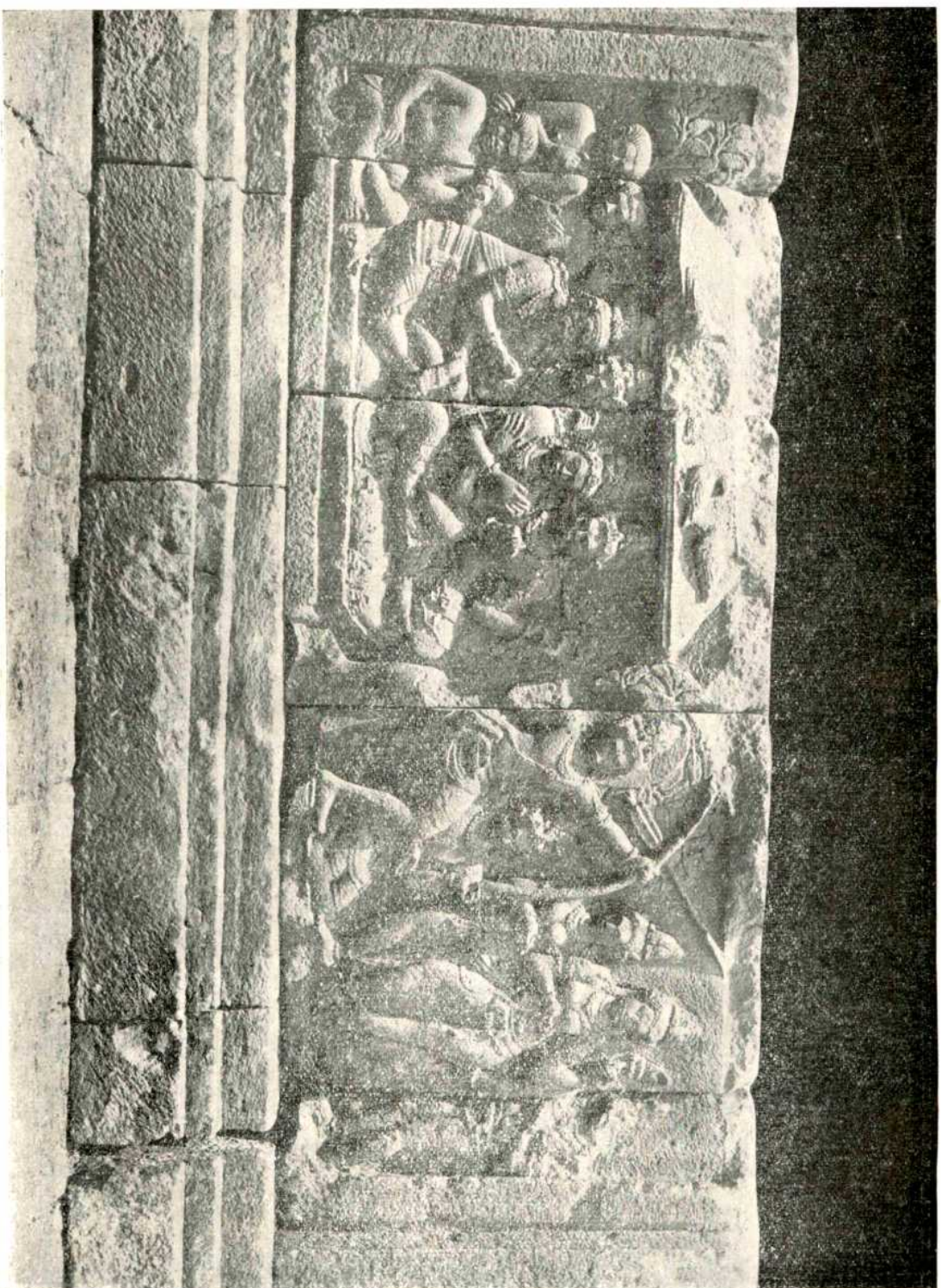


৩। মহাবিষ্ণুবিষ্ণুর আগমন—দশরথ কতক মদ্যুনা

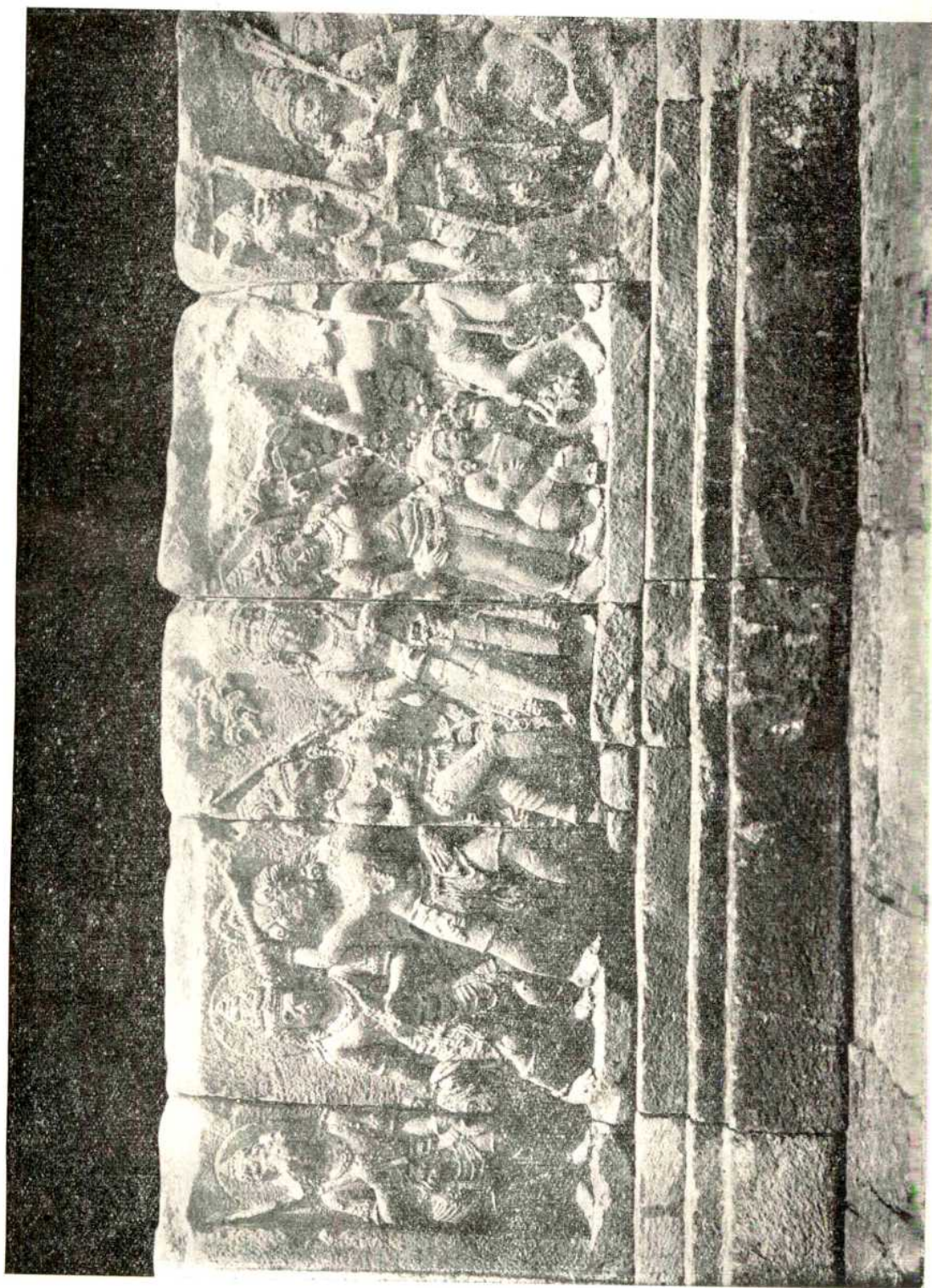




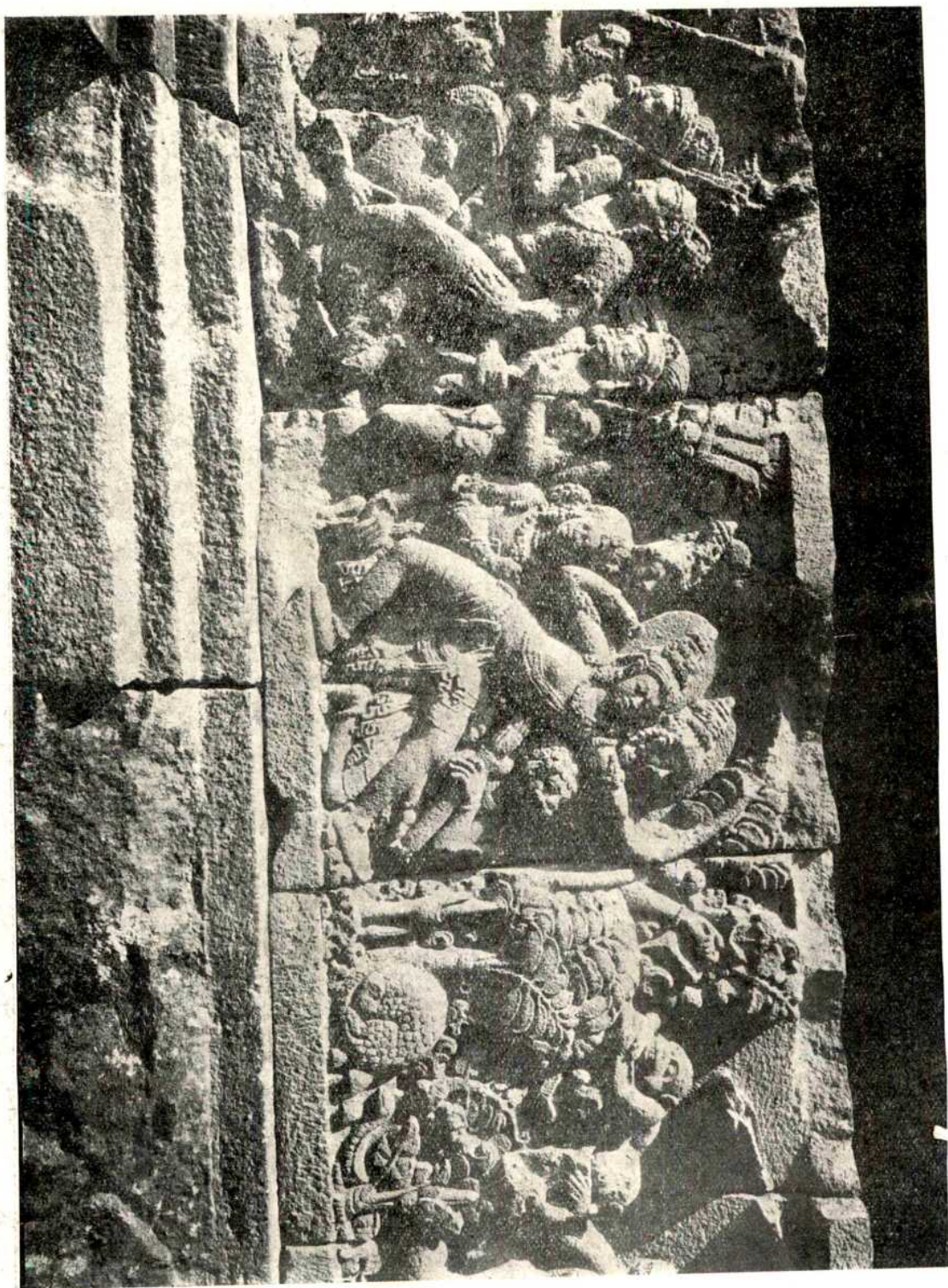
৫। বিশ্বাসিতের যজ্ঞশালা। রাম মারীচাদি রাক্ষসদের সতীত যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞ প্রসঙ্গ করিতেছেন।

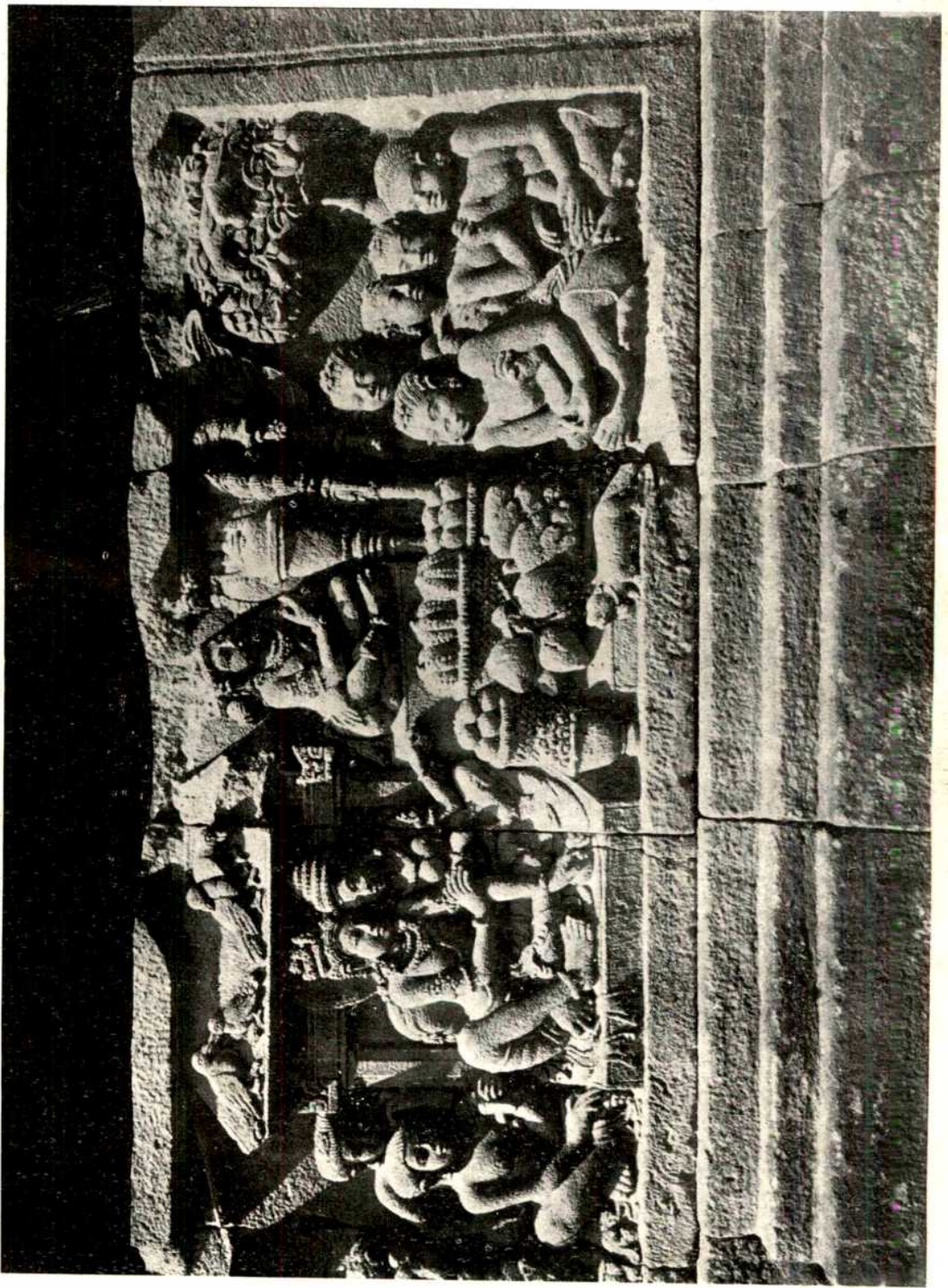


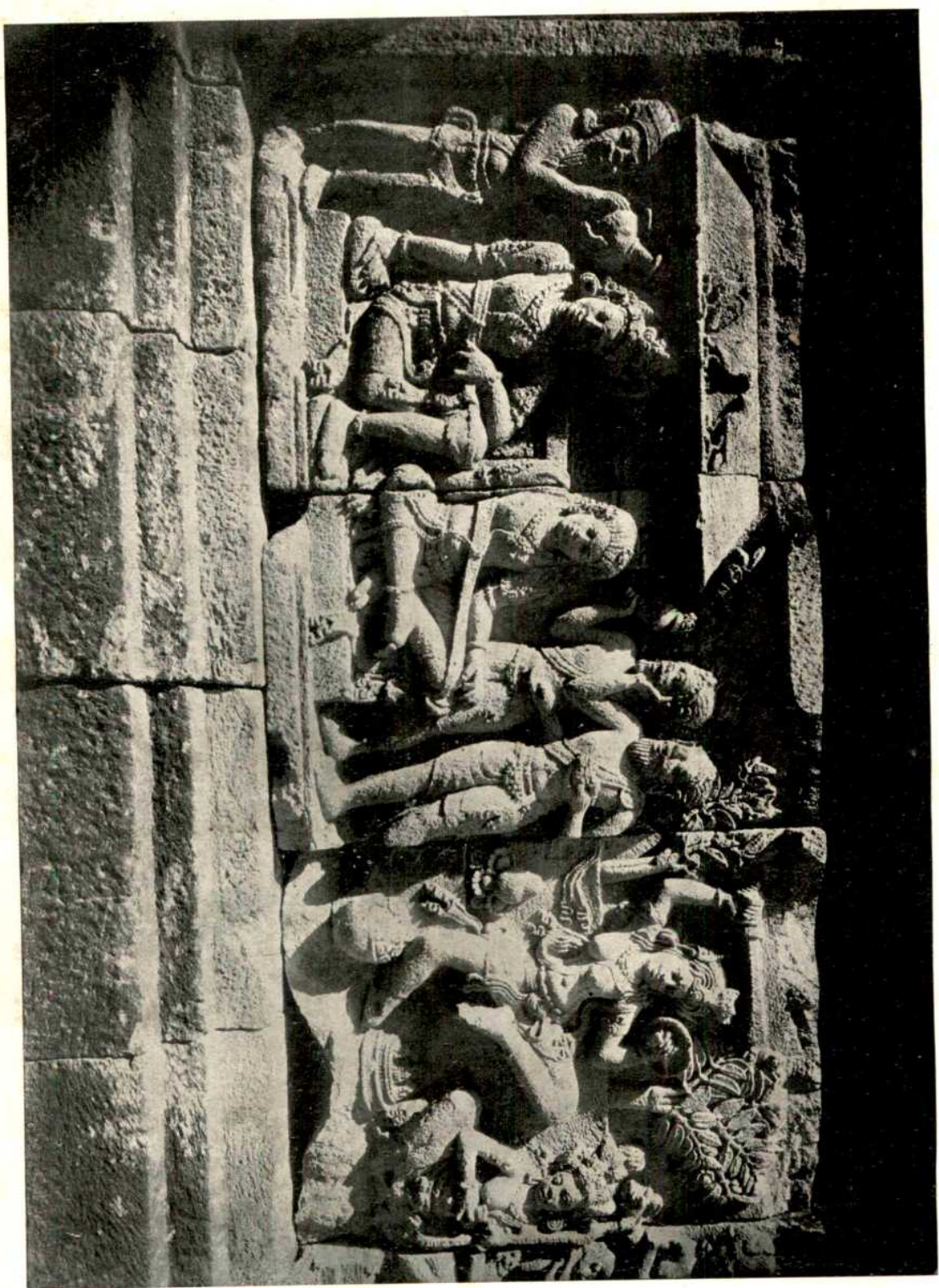
৬। রাজর্ষি জনকের সভায় বিশ্বামিত্র রাম ও শত্রুঘ্ন। মীতাপেরীর নামক রামের হরণস্থল



৭। দীতাপরিণয়ের পর রাম ও লক্ষ্মণের অযোধ্যা যাত্রা। পথে পরশুরামের আক্রোশ







ভোট দিয়াছে। তাহাদের মনোমত অল্প মন্ত্রীদেব, দ্বারা দ্বৈরাজ্য শাসনপ্রণালী চলায় তাহাদের আপত্তি নাই, বরং মত আছে। হুতবাং দ্বৈরাজ্য ধ্বংস করিলাম বলিয়া উল্লাসের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

কেহ যদি দ্বৈরাজ্যকে স্বায়ত্তশাসন বলিয়া দেশের লোককে বুঝাইতে চায়, কিম্বা বুঝাইতে চায়, যে, দ্বৈরাজ্য-হুত্রে স্বরাজ পাওয়া যাইবে, বা উহা স্বরাজের পথে আধ-রাস্তার পান্থশালা, এবং যদি তাহার সে-চেষ্ঠা সফল হয়, তাহা হইলে দ্বৈরাজ্য জিনিষটা একজনের স্বৈর-রাজ্য অপেক্ষাও খারাপ। কেননা, একজনের স্বৈচ্ছাচার জিনিষটাকে লোকে চেনে, ঘৃণা করে, ভয় করে ও তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকে। কিন্তু বাহা গণতন্ত্র নহে, তাহাকে গণতন্ত্র বলিয়া চালাইবার চেষ্ঠা সফল হইলে মানুষ, অদাববান হইয়া পড়ে, এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আগন্তু করিতে পারে।

কিন্তু ভারতে প্রচলিত দ্বৈরাজ্য যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা উপায় নহে, ইহা মনে রাখিতে পারিলে (তাহা সহজও বটে) দ্বৈরাজ্য নিরবচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্র বা স্বৈর-রাজ্য অপেক্ষা কিছু ভাল। ইহার দ্বারা কিছু দেশহিত হইতে পারে, কিছু অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

সেইজন্য আমবা মনে করি, কেহ যদি দ্বৈরাজ্য সত্য-সত্যই বিনষ্ট করিতে পারেন, এবং অবিকল্প প্রকৃত স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারেন, অন্ততঃপক্ষে স্বরাজ্যের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি প্রশংসার্পী। কিন্তু বাংলাদেশে শুধু যেমন মন্ত্রীর অপসারণ হইতেছে, দ্বৈরাজ্যের পরিবর্তে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও স্বৈরতা বাড়িতেছে, তাহা ভাল নয়। কর্মঠ, কর্তব্যপরায়ণ, তেজস্বী মন্ত্রীদের দ্বৈরাজ্য তার চেয়ে ভাল। চক্রবর্তী ও গজেন্দ্রী সেরূপ মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মে নাই।

বাংলা দেশে এখনও যে হিন্দুমুসলমানে বিরোধ চলিতেছে, তাহার জন্য গজেন্দ্রী অনেকটা দায়ী। তিনি মন্ত্রী হইবার আগে মসজিদের সামনে হিন্দুদের গীতবাদ্য সহকারে গমন বন্ধ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন করিয়া-ছিলেন—যদিও কোরানে কোথাও মসজিদের সম্মুখে এরূপ গীতবাদ্য নিষিদ্ধ হয় নাই এবং যদিও হিন্দুদের এই

অবিকার খ্রীষ্টকোমিলের রায়ে পর্য্যন্ত বীকৃত হইয়াছে। মুসলমান বলিয়াই কাহারও মন্ত্রী হওয়াব আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতার জন্য নানাজাতি কোন হিন্দু, মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে মন্ত্রী করা উচিত নহে। চক্রবর্তীর বেঙ্গলশাসনশাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের সহিত বনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এবং তাহার জামাতার নামে নানা অভিযোগ তিনি মন্ত্রী থাকিতে থাকিতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য নিজের বিরুদ্ধে ভোটের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি পদত্যাগ করিলে ভাল করিতেন। তাহার বিরুদ্ধে এই দুই কারবার সম্পর্কে কোন অপরাধের কথা অবশ্য উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু তিনি যদি কারবারে মনোযোগী, সাবধান ও সূক্ষ্ম হইতেন, তাহা হইলে এগুলির এরূপ দুর্দশা হইত না। তিনি যে ঐ দুটির জন্য নিজে ৪৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত জামীন হইয়াছিলেন, ইহা তাহার প্রশংসার কথা।

প্রাচ্যের বিরুদ্ধে নিন্দা-অভিধান

হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ, পৃথিবীর এই তিনটি প্রধান ও প্রাচীন ধর্মের উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষে। ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্মের উৎপত্তি হয় এশিয়া-মাইনরে। মুসলমানদের ধর্মের উৎপত্তি হয় আরবদেশে। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া চীনের নিজের প্রধানতঃ নীতিমূলক ধর্মের প্রবর্তক কংফুচ বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। চীন, হিন্দু, ইহুদী ও আরব এই চার প্রাচীন সভ্য জাতি এখনও জীবিত আছে। চীনদের বিরুদ্ধে তৎকালের বুদ্ধ এবং তত্পরি লেখনীর যুদ্ধ চলিতেছে। অস্ত্রেরা সকলে সর্বত্র স্বাধীন না হইলেও নানাদিকে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত ও অল্পভূত হইতেছে। এইজন্য ঠিক একই সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে নবীবুদ্ধের অবতারণা দেখিয়া এই যুগপৎ আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে কৌতূহল হয়। একই সময়ে সকলের প্রতি আক্রমণ কি সম্পূর্ণ আকস্মিক?

হিন্দুকে আক্রমণ করিয়াছেন বার্ণার্ড শ, ক্যাথারিন মেয়ো, পিলচার, প্রভৃতি। সম্ভ্রুতি “থামিলা” (Thamilla

নামক একখানা ফরাসী বহির ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। উহার প্রকাশকেরা বলেন,

"Above all else, Thamilla is a revelation of the blighting effect of Moslem law on Moslem womanhood. The French original was written in order to compel attention to the rights of women, and it was reproduced in English, as the translators (both American women) state, because we heard in it the poignant and inarticulate cry of the women in all the East, without hope in the world."

তাৎপর্য। "মুসলমান আইন মুসলমান নারীদের উপর কিরূপ সর্বনাশক প্রভাব বিস্তার করে, থামিলা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মূল কবাসী বহিট নারীর অধিকার বিষয়ে মনোবোগ দিতে বাধ্য করিবার জন্য লিখিত হয়। এবং অনুবাদকেবা (উক্তয়েই-আমেরিকান স্ত্রীলোক) বলেন, যে, উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে এইজন্য, যে, উহাতে আমরা স্ত্রীলোকে সর্বপ্রকার আশা-বিহীন সমুদ্র প্রাচ্যের স্ত্রীলোকদের তীব্রজ্বালানয়ী অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম।"

প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্য লোকদের প্রভুত্ব করিবার নবতম ওজুহাত, প্রাচ্য নারীদিগকে তাহাদের পিতাব্রাতা-স্বামীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা।

কাণ্ডারিন মেন্সো বার্গার্ড শ প্রভৃতিব আক্রমণ হিন্দুদের উপর, কারণ ইংরেজদের অধীন জাতিদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, শিক্ষায় অগ্রসর, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশী তৎপর। ফরাসী গ্রন্থকার আক্রমণ করিয়াছেন মুসলমানদিগকে (এবং আবুযজ্জিকভাবে সমুদয় প্রাচ্যকে) বোধ হয় এইজন্য, যে, সীরিয়ায় মুসলমানেরা ফ্রান্সের অভিভাবকত্ব অগ্রাহ্য কবিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল এবং স্পেনের সাহায্য করিতে গিয়া ফরাসীদিগকে মুসলমান রিক্দের সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখিত ফরাসী বহিটির ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইবার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, পরাধীন মুসলমানদের অবিকাংশ ইংরেজের প্রজা, স্ত্রতরাং তাহাদিগকে কেন ইংরেজের অধীন করিয়া রাখা দরকার, তাহার একটা কারণ দেখান চাই।

বাকী থাকে ইহুদীরা। পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ানবা বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের নিন্দাবাদ ও শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। এমন কোন নির্ভুর অত্যাচার নাই, বাহা তাহাদের উপর না হইয়াছে। সুসভ্য আমেরিকার কু ক্লুজ ক্ল্যান নামক সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ইহুদীদিগকে তাড়ান বা বধ করা। ইহুদীদের বিরুদ্ধেও

সম্প্রতি রডেরিক ষ্টোগথেইম্ নামক এক জার্মান "ইহুদীদের সিদ্ধিলাভেব হেঁয়ালি" ("Riddle of the Jews' Success") নামক এক বহি লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, যে, কসেরা-বীজাগুর মত ইহুদীরা ইউরোপীয় সভ্যতার জীবনোৎসকে বিধাক্ত করিয়াছে। তাহার মতে গত মহাবুদ্ধটা সম্পূর্ণরূপে ইহুদীরা ঘটাইয়াছিল; তাহারা জার্মানীর ভূতপূর্ব সম্রাটকে তাহার রাজত্বের শেষ পনব বৎসর ধরিয়া বিরিয়াছিল ও তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল। ইহুদীদিগকে এই পুস্তকে নীতিহীন ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, যে, প্রধানতঃ তাহারাই পাপব্যবসার জন্য বালিকা ও নারী সংগ্রহ করে। ইহুদীদের মধ্যে খুব দুই লোক আছে, অল্প জ্ঞাতির মধ্যেও আছে। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, ইহুদীরা সংখ্যায় কম হইলেও অনেক শতাব্দী হইতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অনেকে ইহুদী।

ছোট ছোট স্বাধীন দেশ ও বঙ্গের

ছোট ছোট জেলা

অন্যত্র প্রকাশিত ময়মনসিংহের বন্ধুতায় দেখাইয়াছি, যে, পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা ময়মনসিংহের চেয়ে কম, এবং সেইসকল দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি ময়মনসিংহ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। ধনশালিতাতেও তাহারা ময়মনসিংহের অনেক উপরে। অল্প কোন কোন বড় জেলার লোকেরাও দেখিতে পাইবেন, যে, ঐ বন্ধুতায় উল্লিখিত কোন কোন স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা তাহাদের জেলার চেয়ে কম বা তাহার সমান। বঙ্গের ছোট জেলাগুলির লোকদেরও জ্ঞানা উচিত, যে, কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে, বাহার লোকসংখ্যা তাহাদের জেলাগুলির চেয়ে কম। নিম্নলিখিত জেলাগুলির লোকসংখ্যা অল্প সবগুলির চেয়ে কম।

জেলা	লোকসংখ্যা
হুগলী	১০,৮০,১৪২
বগুড়া	১০,৪৮,৬০৬

জেলা	লোকসংখ্যা
বাকুড়া	১০,১২,২৪১
হাবড়া	২,২৭,৪০৩
মালদহ	২,৮৫,৬৬৫
জলপাইগুড়ী	২,৩৬,২৬২
বীরভূম	৮,৪৭,৫৭০
দার্জিলিং	২,৮২,৭৪৮
চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল	১,৭৩,২৪৩

লোকসংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত যে যে দেশে প্রধানতঃ খেত অবিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনাবিকার আছে, তাহারা কার্যতঃ স্বাধীন। তাহাদের নাম না করিয়া ছোট ছোট সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ সকলের নাম করিব।

আলবানিয়া। লোকসংখ্যা ৮,৩১,৪৭৭। তন্মধ্যে শতকরা ৭১ জন মুসলমান। এই দেশে ৫৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চতর বিদ্যালয় ১৪টি আছে। শিক্ষকদের জন্ত ট্রেনিং কলেজ একটি আছে। একটি আমেরিকান শিল্পশিক্ষালয় এবং মেবেদের জন্ত কলেজ আছে। ১৯২৬-২৭ সালেব রাজস্ব ২,৩০,০২,২৬০ সোনার ফ্রাঙ্ক।

কোণ্টা রিকা। লোকসংখ্যা ৫,০৭,১২৩। ৪৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি বালকদের উচ্চতর বিদ্যালয়, ১টি বালিকাদের কলেজ, ১টি নর্ম্যাল স্কুল, ছটি সাধারণ কলেজ, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ১৯২৬ সালে রাজস্ব হইয়াছিল ১৩,৯৩,০২০ পাউণ্ড।

ডোমিনিকা। লোকসংখ্যা ৮,২৭,৪০৫। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এখানে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়; নর্ম্যালস্কুল, ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সরকারী বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৯৭২। ১৯২৬সালে রাজস্ব ১,১২,৬৮,০০০ ডলার।

হণ্ডুরাস। লোকসংখ্যা ৭,৭৩,৪০৮। অধিবাসীরা প্রধানতঃ আদিম লাল আমেরিকান। ৭ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ১৯২৪-২৫ সালে ৯৮৭টি বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ৪৩,২২৬, ছাত্রীসংখ্যা ৩৫,৫৬১। একটি জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাছাড়া, যুদ্ধবিদ্যা, আকাশবান-চালন, আইন, শিক্ষাবিদ্যা, বাণিজ্য, কৃষি, প্রভৃতি শিখাইবার বিদ্যালয় আছে।

লুক্সেমবুর্গ। লোকসংখ্যা ২,৬০,৭৬৭। ৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সব বালকবালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৯৯৫ জন শিক্ষক আছেন। তার মধ্যে ৪৮২ জন শিক্ষয়িত্রী। তা ছাড়া উচ্চতর বিদ্যালয় আছে ৩৮টি, ছটি শিল্প বাণিজ্য-কলেজ, ২টি মেয়েদের কলেজ, একটি শিল্পবিদ্যালয়, একটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার কলেজ, একটি থনি-বিদ্যালয়, একটি কৃষি বিদ্যালয়, এবং একটি সংগীত পরিষৎ আছে। ১৯২৬ সালের রাজস্ব ১৬,৮৪,৭৭,৩৪৭ ফ্রাঙ্ক।

নিকারাগুয়া। লোকসংখ্যা ৬,৩৮,১১২। অনেকে আদিম লাল আমেরিকান। শতকরা ৫০ জন লিখন-পঠনক্ষম, বঙ্গে শতকরা ১০ জন লিখনপঠনক্ষম। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সব রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৮৯।

পানামা। লোকসংখ্যা ৪,৪২,৪৮৬। ৭ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত সব বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ৫০২টি স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বালক-বালিকাবা একত্র শিক্ষা পায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মেবেদের জন্ত নর্ম্যাল-স্কুল এবং ছেলেদের জন্ত নানাবিধ শিল্প কারিগরী ও ব্যবসা শিখাইবার স্কুল আছে। অনেক যুবা ছাত্র-ছাত্রী ইউরোপ ও ইউনাইটেড্‌ হেটসে পানামা গবন্মেণ্টের ব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছে। ১৯২৩-২৪ সালে রাজস্ব ২১, ২৪, ৮৩৬ পাউণ্ড।

পারাগুয়ে। লোকসংখ্যা ৮,৫৩,৩২১। শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২০৪; ছাত্রসংখ্যা ৪০,১৫২, ছাত্রী ৩০,৬৬১। তা ছাড়া বেসরকারী ৩১টি স্কুল আছে। তিনটি গ্রাম্যজাল কলেজ আছে। ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬টি নর্ম্যাল স্কুল আছে। এতদ্বিধা শিক্ষাবিভাগের অধীন জাতীয় লাইব্রেরী, জাতীয় প্রাণিবিদ্যা মিউজিয়াম, এবং বোটানিক্যাল-জুলজিক্যাল উদ্যান আছে।

মোনাকো। লোকসংখ্যা ২২,১৫৩ (বাহিশ হাজার একশত তিগ্নান)।

উপরে যে-সব ছোট ছোট স্বাধীন দেশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিলাম, তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত যে প্রকার, বঙ্গের ছোট বা বড় জেলাগুলিতে তাহা নাই। তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্তের সহিত আমাদের জেলাগুলির শিক্ষার বন্দোবস্তের কত প্রভেদ, আমরা কত নীচে, তাহা প্রত্যেক জেলার লোকেরা চেষ্টা করিলেই নির্ধারণ করিতে পারিবেন। আমাদের অল্পমত অবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণও অনুমান করিতে পারিবেন। আমরা তুলনার জন্য পৃথিবীর সুসভ্য, সমুন্নত, শক্তিশালী, ধনী দেশসমূহের উল্লেখ করি নাই। ছোট ও অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা দেশ কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের সহিত তুলনাতেও আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমাদের অনেক নেতা দেশের জন্য প্রাণ দিবার নিমিত্ত যুবক-দিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন। আমরা বৃদ্ধ; প্রাণ দিবার প্রবৃত্তি (এবং অনেকে বলিবেন সাহস) আমাদের নাই। সুতরাং তাহার জন্য আহ্বানও কাহাকেও করি না। কিন্তু ছটি অবস্থায় আমরাও সে আহ্বানের অর্থ বুঝিতে পারি। প্রথম, নারীর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার জন্য বঙ্গে, এবং অন্য কোন কোন প্রদেশেও, প্রাণপণ করিয়াও নারীর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজন অনেক স্থলে ও অনেক সময় হইতেছে। রক্ষার চেষ্টায় প্রাণ যে যাইবেই, এমন নয়। চেষ্টা বাহারা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা খুব কম। তাহাদের মধ্যে একমাত্র কুমিল্লার পুণ্যবান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হত হইয়াছেন। সর্বত্রই নারীরক্ষার চেষ্টা হওয়া চাই। এপর্যন্ত আত্মরক্ষার চেষ্টায় যত জন বঙ্গনারীর প্রাণ গিয়াছে, নারীরক্ষাচেষ্টায় ততজন বঙ্গীয় পুরুষের প্রাণ যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌ স্বাধীনতার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং অন্য কোন কোন দেশ বেরূপ স্বাধীনতা-যুদ্ধ করিয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ যুদ্ধেব যদি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে দেশের জন্য প্রাণ দিবার আহ্বানের একটা সোজা মানে বুঝা যাইত। কিন্তু সেরূপ সম্ভাবনা আমাদের জীবিতকালে দেখি নাই।

এইজন্য আমরা পরিশ্রমে সমর্থ সকল পুরুষ ও নারীকে দেশের উন্নতির জন্য জীবনের প্রত্যেক দিন, সপ্তাহ, মাস ও

বৎসর উৎসর্গ করিতে দেখিলে আনন্দিত হইব। দেশের জন্য খাটিতে খাটিতে বাহার মৃত্যু হইবে, তিনি যন্ত। জানি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথায় মন যেমন মাতিয়া উঠে, এমন আর কিছুতে নহে। আমরাও স্বাধীনতা চাই। ইতিহাসে পড়িয়াছি, কোন দেশ কি উপায়ে স্বাধীন হইয়াছে। তাহার কোনটারই আমাদের দেশের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই। এইজন্য যে যে দিকে অগ্রগতি ও উন্নতির পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাই, তাহার কথাই বলি। হয় ত সেই সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে স্বাধীনতার পথও দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলোয়ার পশ্চাতে বাবমান হওয়ার আমরা পক্ষপাতী নহি। অবশ্য, আমরা বাহাকে আলোয় মনে করি, অন্য অনেকে তাহা মনে না করিতে পারেন। তাহারা যে আলো দেখিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাহাদের আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দল পাকান

অনেক জনের পরামর্শ ও মত অনুসারে যে-সব প্রতিষ্ঠানের কাজ হয়, তাহাতে প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেক ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহাকেই কার্যনির্বাহের আদর্শ প্রণালী মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানে লোভ, ভয়, চঞ্চলজ্ঞা, বজ্রব, আত্মীয়তা, অনির্দিষ্ট নানাপ্রকার লাভের আশা, টাকার বা অন্যকিছুর বৃষ্ ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ স্বাধীন মত প্রকাশ হয় না। তা ছাড়া নানা উপায়ে দল পাকানও হইয়া থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপায়ে আশুবাবু নিজের লোক এত ঢুকাইয়াছিলেন, যে, তাহার জীবিতকালে তাহার ও তাহার দলের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন তাহার দলের প্রভাব কিছু কমিয়াছে বলিয়া দল পাকাইবার চেষ্টা পূর্বাপেক্ষা বেগী করিতে হয়। কাজে কাজেই গবর্নমেন্টের যদি কোন একটা কাজ হাঙ্গল করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সরকারী প্রধান শিক্ষাকর্মচারীদিগকেও দল পাকাইতে হয়। তখন আশুবাবুর উত্তরাধিকারীরা চীৎকার জুড়িয়া দেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে

সরকারের গোলাম করিবার চেষ্টা হইতেছে। আশুবাবুর উত্তরাধিকারীদের দলপাকান যদি মন্দ না হয়, তাহা হইলে শিক্ষা-সেক্রেটারীর বা ডিরেক্টরের দল-পাকানটা কেন মন্দ হইবে? অবশ্য ছুটাই মন্দ। কিন্তু চালুনি ও ছুঁচের ঝগড়াটা সুশোভন নহে। ওয়ার্ডসোমার্থ সাহেব যখন শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজের কর্তৃপক্ষের দলপাকানর নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন যদি মুখ্যো-বীড়ুজ্যেদের দল-পাকানও নিন্দা করিতেন, তবে বৃহত্তম তিনি আশুবান, নিরপেক্ষ লোক। মুখ্যো-বীড়ুজ্যে দলের গোলামীও গোলামী, লিওসে-ওটেনের গোলামীও গোলামী। মুখ্যো-বীড়ুজ্যে দলের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতারক্ষার ধূয়া এবং ঐদলের প্রাধান্ত-রক্ষা সমার্থক। তাঁহারা নিঃস্বার্থ কর্ম্মীও নহেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেতন, কাগজ-পরীক্ষার ফী ইত্যাদি বাবতে বেশ ছপষসা রোজগার করেন। আয়োৎসর্গ জিনিষটা ভাল। কিন্তু এক মুরগী যেমন তিন চার পাঁচ জায়গায় জ্বাই করা যায় না, তেমনই একই মানুষ হাইকোর্টে, ল-কলেজে, পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে, সেনেটে সীণ্ডিকেটে, ফ্যাকাল্টিতে বোর্ডে, একটা দেহকে মনকে উৎসর্গ করিতে পারে না।

একটা যুক্তি শুনিয়াছি, যে, বেসরকারী কতকগুলি লোকের প্রভাব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা সোজা, কিন্তু সবকারী প্রভু একবার স্থাপিত হইলে সহজে নিষ্কৃতি নাই। কথাটা আপাততঃ শুনিতে বেশ লাগে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া লওয়া দরকার। কুড়ি বৎসরের অধিক পূর্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে কমন্টিটিউশন হইয়াছে, তাহাতে সরকারের মনোনীত সভ্যদের সংখ্যাই বেশী। লর্ড কার্জনের আইন বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের করতলস্থ করিবার জন্তই প্রণীত হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘকাল ধরিয়া আশুবাবু প্রভুত্ব করিয়াছেন, এবং এখন তাঁহার উত্তরাধিকারীরা করিতেছেন। সুতরাং সরকারী প্রভুত্ব বিনষ্ট করা যায় না, ইহা ঠিক নয়। সত্য বটে, সবকারী চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ত সকল সময়ে আশুবাবুর মত ক্ষমতাশালী ও ফন্দীবাজ লোক পাওয়া যাইবে না। সেইজন্তই ত আমরা বহুবৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা

ন্যূনকল্পে শতকরা আশী জন করা হউক। তাহা হইলে সরকারী মৎলব সিদ্ধি হুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আবার আশুবাবুবুও প্রভুত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। থাকায় তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনার্থ প্রস্তুত সকল বিলেরই ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারই দলের লোকেরা নূতন বিল পেশ করিবেন বলিতেছেন!

যহুবাবুর উপর মুখ্যো-বীড়ুজ্যে দলের বড় আক্রোশ; কেননা, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রভুত্ব স্বার্থে আঘাত লাগিবে। তাহারা যহুবাবুর ভাল কাজের সপক্ষে ভোট দেন না, অস্ত্রে তাঁহার পক্ষে ভোট দিলে চীৎকার জুড়েন, যে, সরকার পক্ষ তাঁহার দিকে ভোট দিতেছে, তিনি সরকারের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন! যে স্বরাজ্য দলের লোকদের সঙ্গে মুখ্যো-বীড়ুজ্যে দলের এখন দহরম মহরম, সেই স্বরাজ্য দলও ত কোন কোন আইন প্রণয়নের সময় ব্যবহাপক সভার সরকারী ও মনোনীত সভ্যদের সহিত এক দিকে ভোট দিয়াছেন। এইরূপ সহযোগিতার দ্বারা কি তাঁহারা তাহা হইলে গবন্মেণ্টের নিকট আত্মবিক্রয় কবিয়াছেন বলিতে হইবে? যহুবাবুর কিম্বা অন্ত কাহারও কোন ভুল হইতে পারে না বলিতেছি না। কিন্তু কোন একটা বা একাধিক কাজে গবন্মেণ্ট পক্ষের সহযোগিতা করিলে বা পাইলেই তাহা হইতে অবীনতা বা আত্মবিক্রয় প্রমাণিত হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুপদাধিকারী

এক-একটা কাজে যদি অনন্তকর্ম্মী লোক লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফাঁজ ভাল হয়। অনন্তকর্ম্মী লোক না পাওয়া গেলে অবশ্য অন্ত কাজে নিযুক্ত লোকও অগত্য লইতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ও অন্তান্ত আইন কলেজে বাহারা অধ্যাপকের কা করেন, তাঁহারা ওড়ালতী ব্যারিষ্টারী করেন, তাহা দো বিষয় নহে; বরং ওড়ালতী ব্যারিষ্টারীতে বাহা

কার্যালব্ধ অভিজ্ঞতা আছে, এরূপ অধ্যাপক কতকগুলি না হইলে ছাত্রদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। সেইরূপ বাঁহারা মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল সমূহে এবং আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপকতা করেন, তাঁহারা যে চিকিৎসাও করেন, তাহাতেও ছাত্রেরা অভিজ্ঞ লোকদের উপদেশ পাইবার সুযোগ পায়। কিন্তু বাঁহারা ওকালতী ব্যারিষ্টারী করেন, তাঁহারা আইন কলেজের অধ্যাপকতা ছাড়া যদি আবাব ইংরেজী সাহিত্য প্রকৃতিরও অধ্যাপক হন, তাহা হইলে নানা দিক-দিয়া তাহা আপত্তির কারণ হয়।

ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য আইন জ্ঞান ও আইনের চর্চা রাখা আবশ্যিক। এই জ্ঞান ও চর্চা আইন কলেজে অধ্যাপনার সময় কাজে লাগে। কিন্তু আইনের ব্যবসা করিতে করিতে, আইন কলেজের অধ্যাপকতা করিতে করিতে, বাঁহারা কেবলমাত্র সাহিত্যাদির অধ্যাপকতা করেন; সাহিত্যাদি বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হওয়া দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, আইনব্যবসারী লোককে সাহিত্যাদির অধ্যাপক করিলে, অধ্যাপকতাকেই বাঁহারা জীবনের কার্য করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত, এরূপ লোকদের উপর অবিচার করা হয়।

বাঁহারা উকিল ব্যারিষ্টার নহেন, কেবলমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহিত্যাদি শ্রেণীতে অধ্যাপকতা করিতে প্রস্তুত এবং করিবার যোগ্য, একপ লোক কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেক আছেন, এবং বাহিরেও আছেন। সেরূপ লোক থাকিতে, কোনও উকীল বা ব্যারিষ্টারকে আইন-কলেজের অধ্যাপকের পদের উপর আরও অন্য অধ্যাপকতা দেওয়া উচিত নহে, দিবার আবশ্যকও নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বৎসর হইতে এক একজন মাস্তুরের বহুপদ-অধিকার কুপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহা বন্ধ করা উচিত। এই কুপ্রথা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে আইন কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি দেখিতে পাইতেছি :—

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল ; রমাপ্রসাদ খোপাধ্যায়, এম এ, বি এল ; রাণাবিনোদ পাল, এম-এ, বি-এল ; মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল ;

অজয় দত্ত, এম-এ, বি-সি-এল ; এম-এ খুদা বখ্শ, এম-এ, বি-সি-এল ; শ্রীমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল (ছুটিতে)।

ইহাদের মধ্যে মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবার ইংরেজীর অধ্যাপক, শ্রীমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ছুটিতে) আবার ভারতীয় দেশভাষার অধ্যাপক, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ইতিহাস এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই দুটি বিভাগেব অধ্যাপক, অজয় দত্ত ও খুদা বখ্শ আবার ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং রাণাবিনোদ পাল আবার বাণিজ্যের অধ্যাপক। আমরা ইহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই জানিতে চাই, যে, বাঁহারা কেবল অধ্যাপকতা করেন বা করিতে প্রস্তুত, এমন আটজন যোগ্যলোক কি বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে ইহঁদের যে-বেতন পান সেই বেতনে সপ্তাহে ইহঁদের সমান সময় ইহঁদের অধ্যাপনার কাজগুলি করিবার জন্য পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই আগেও পাওয়া যাইত, এখনও পাওয়া যায়।

বাংলা দেশে নারীনিগ্রহ

বাংলা দেশে হুবুঁস্ত লোকদের দ্বারা নারীদের উপর যত অত্যাচার হয়, তাহার সবগুলি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না, সবগুলি জন্ত আদালতে মোকদ্দমাও হয় না। লোকলজ্জার ভয়ে, সামাজিক পাতিত্যের ভয়ে, হুবুঁস্তদের প্রতিহিংসার ভয়ে এবং সাক্ষীদের ভীকৃতায় অনেক ঘটনা চাপা পড়িয়া যায়। বাকী যাহা প্রকাশিত হয়, সঞ্জীবনী কাগজে তাহার তালিকা অনেক সপ্তাহ ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। ১৩২৯ সাল হইতে ১৩৩৩ পর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে, সহযোগী তাহার তালিকা দিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি-তালিকায় তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কতকগুলি সংখ্যা সংকলন করিয়া দিতেছি। প্রথমে দিতেছি কোন্ জেলায় কোন্ সালে কতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সংখ্যা।

জেলা	১৩২২	১৩৩০	১৩৩১	১৩৩২	১৩৩৩	মোট
বালিকাতা	১	৫	১২	৩১	৩৯	৮৮
২৪ পরগণা	০	০	১২	২০	৩২	৭১
নদিয়া	০	০	৫	১১	২৪	৪০
দুর্গাবাদ	০	০	৩	৩	২	৮
শশোয়	০	১	২	৮	৬	২৪
খুলনা	০	১	২	৩	১০	১৬
হাবড়া	০	১	৫	৫	৪	১৫
হুগলী	০	০	২	৩	৬	১১
বর্ধমান	০	০	৫	৩	৪	১২
মেদিনীপুর	০	০	৪	২	৪	১০
বীরভূম	০	০	৪	০	১	৫
বাকুড়া	০	০	১	১	২	৪
রাঙ্গামাটী	০	০	২	৪	১২	২৫
পাবনা	০	০	৬	৩	৭	১৬
বগুড়া	০	০	৬	৩	১১	২০
রংপুর	০	২	২০	১৭	১৬	৬২
দিনাজপুর	০	০	২	৬	৫	১৩
জলপাইগুড়ি	০	০	৩	০	০	৩
মালভূমি	০	০	১	২	১	৪
ময়মনসিংহ	০	১	২৫	২৪	২৮	৭৮
ঢাকা	০	২	১৬	২	১৫	৪২
করিমপুর	০	০	৪	৬	১৬	২৬
বাংলাবাজার	০	০	২	৫	১৬	২৩
জিপুরা	০	০	৪	৭	১	১২
নোয়াখালী	১	০	২	১	৩	৬
চট্টগ্রাম	০	০	৬	৫	৫	১৬
কক্সবন্দী	০	১	৮	৮	১৪	৩১

দুর্ভাগ্যের দলবদ্ধ ভাবে করিতেছে, তাহার প্রমাণ নিম্নে একটি তালিকায় পাওয়া যাইবে।

এই পাঁচ বৎসরে নিগৃহীতা কুমারীর সংখ্যা ৬৬, ৫৪ জনের বয়স ৫ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত, ১২ জনের বয়স অজ্ঞাত। নিগৃহীতা সধবার সংখ্যা ৩০৮ জন; তন্মধ্যে ২১৪ জনের বয়স অজ্ঞাত, বাকী ৯৪ জনের বয়স ১১ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত। নিগৃহীতা বিধবাদের সংখ্যা ৯৬ জন; ৬৩ জনের বয়স অজ্ঞাত, ৩৩ জনের বয়স ১৩ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত।

নিগৃহীতাদের ধর্ম

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টিয়ান	অজ্ঞাত	মোট
কুমারী	৪০	২১	২	৩	৬৬
সধবা	২১৩	৮২	০	৮	৩০৮
বিধবা	৮৭	৫	০	৪	৯৬
অজ্ঞাত	১৩৭	৩৮	১	৩০	২০৬

হিন্দু নারীদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার হইয়াছে দেখা যাইতেছে। তালিকাতে সধবাদের উপরই অত্যাচার বেশী দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যত ঘটিয়াছে, তাহাতে হয়ত বিধবাদের উপর অত্যাচার আরও বেশী হইয়া থাকিবে; তাহাদের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা করিবার লোক সধবাদের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা করিবার লোক অপেক্ষা হয়ত অনেক কম।

নারীর উপর অত্যাচার যে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বসাধারণের এ বিষয়ে অবিকতর সজাগ ভাব ও কর্তব্যপরায়ণতা বশতঃ হয়ত আগেকার চেয়ে এখন বেশী ঘটনা আদালতের গোচর করা হয়। কিন্তু শুধু এই কারণ দ্বারা সমুদয় বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহাও বলিলে চলিবে না, যে, বৃদ্ধির লোকেরা উত্তরোত্তর অধিকতর ভীক্স হইয়া চলায় নারীদের উপর অত্যাচার করিতে দুর্ভাগ্যের সাহস বাড়িয়া চলিয়াছে; কেননা, দেশের লোকের ভীক্সতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রমাণ নাই। অত্যাচার দমনের জন্য যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা এবং বেশী চেষ্টা করা উচিত, সে-বিষয়ে গবন্মেণ্টের উদ্যোগীতা দুর্ভাগ্যগকে বহুসংখ্যক কুমারী সধবা ও বিধবার উপর অত্যাচার করিতে উৎসাহিত করিতেছে মনে করিবার কারণ আছে। এইরূপ পৈশাচিক কাজ যে

দলবদ্ধ নিগ্রহের তালিকা। অত্যাচারী হিন্দুর দল ৮০টা; ২ হইতে ৪ জনের দল ৫৪টা, ৫ হইতে অধিক লোকের দল ২৬টা। অত্যাচারী মুসলমানের দল ২২৭টা; ৮৮টা ২ হইতে ৪ জনের দল, ১৩৯টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল। অত্যাচারী খৃষ্টিয়ানের দল ১টা, সংখ্যা ২ হইতে ৪জন। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত অত্যাচারীর দল ৩৯টা; ১৭টা ২ হইতে ৪ জনের দল, ২২টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল। খৃষ্টিয়ান ও হিন্দু ৫ হইতে অধিক লোকের দল ১টা। খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ৫ হইতে অধিক লোকের দল ১টা। অজ্ঞাতধর্মাবলম্বী অত্যাচারীর দল ৮৪টা; ১২টা দুই হইতে ৪ জনের দল, ৭২টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল। মোট দল ৪৩৩টা; ১৭২টা ২ হইতে ৪ জনের, এবং ২৬১টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল।

প্রত্যেক দল একটি করিয়া জীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে। বাংলা দেশের এই পাপ যে কিরূপ পৈশাচিক, তাহা এই দশবন্ধ নারকীয় অত্যাচার তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে।

বাংলা দেশের নেতারা, বাংলা দেশের গবর্নেন্ট ইহা দমন করিতে চেষ্টা করিবেন না? বাংলা দেশের নারী-দিগকে রক্ষা করিবার কি কেহই নাই?

হিন্দু দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	১৫২টা
"	মুসলমান	"	"	৯টা
"	খৃষ্টিয়ান	"	"	১টা
"	অজ্ঞাতধর্মী	"	"	১৫টা
মোট				১৭৭
মুসলমান দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	২২২টা
"	মুসলমান	"	"	১১০টা
"	পাদি	"	"	১টা
"	খৃষ্টিয়ান	"	"	১টা
"	অজ্ঞাতধর্মী	"	"	১৭টা
মোট				৩৫১
হিন্দু মুসলমান দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	৩৬টা
"	মুসলমান	"	"	২
মোট				৩৮
অজ্ঞাতধর্মী দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	৬৭টা
"	মুসলমান	"	"	২৩
"	অজ্ঞাতধর্মী	"	"	২২
"	খৃষ্টিয়ান	"	"	১
মোট				১১৩
খৃষ্টিয়ান দ্বারা	মুসলমান	নারীর	নিগ্রহ	১
অজ্ঞাত	খৃষ্টিয়ান	"	"	১
খৃষ্টান	"	"	"	১
"	অজ্ঞাতধর্মী	"	"	১
"	হিন্দু	"	"	১
সর্বমোট				৬৯৪

সকলের চেয়ে অধিক সংখ্যক অত্যাচার হইয়াছে কলিকাতা সহরে। তাহার কাবণ নানাবিধ হইতে পারে। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের বাহিরে হাজার হাজার পুরুষ বাস করে; শুণ্ডা আছে অগণিত; পাপব্যবসার প্রাচুর্য্য খুব বেশী। সুতরাং এখানে নারীর উপর অত্যাচার বেশী হইবারই কথা। অন্যদিকে কিন্তু বঙ্গের সব জায়গার চেয়ে কয়েক বর্গমাইল জায়গায় সাধারণ পুলিশ ও টিকটিক পুলিশ এখানে বেশী। লাটসাহেব বৎসরের অন্ততঃ কিছু সময় এখানে থাকেন। তাহার নাকের উপর এত নারীর সর্বনাশ হইতেছে, অথচ বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

আমরা অবগত হইয়া প্রীত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিষয়ের এম-এ ক্লাসে অনেকগুলি ছাত্রী পড়িতেছেন। ঠিক সংখ্যা জানিতে পারি নাই। শুনিলাম ইংরেজী সাহিত্যই পড়িতেছেন নয় জন। অন্যান্য বিষয়ও কয়েক জন পড়িতেছেন। ইহাদের মধ্যে হিন্দুবাড়ীর মেয়ে কয়েক জন আছেন।

ছাত্রীদের জন্ত স্বতন্ত্র বিশ্রামকক্ষ এবং তৎসংলগ্ন হাতমুখ ধুইবার ঘর প্রকৃতি আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, জানি না। এ বিষয়টির প্রতি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস কৌন্সিলের সভাপতি অব্যাপক রাবার্কফনের দৃষ্টি পড়িয়াছে কিনা, জানি না।

ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্ত একটি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলে হবত ছাত্রীর সংখ্যা আরো বাড়িতে পারে। ছাত্রীরা হাঁটিয়া ক্লাসে যাতায়াত করেন, তাহা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু দূর হইতে তাহা করা তাহাদের পক্ষে সুস্বাভাব্য নয়। ইংবেজ ও ইউরেনীয়েরা পদা মানে না। কিন্তু তাহাদের সমাজের ছাত্রীদের জন্তও তাহাদের বিদ্যালয়গুলির গাড়ী আছে। এইজন্ত গাড়ীর কথাটি তুলিলাম। জানি, ইহা ব্যয়সাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বহুৎ বাজে খরচ করেন। যে-বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয় না, এবং যাহার পরীক্ষা লওয়া বা উপাধি দেওয়া হয় না, যাহার

কোন ক্লাস নাই, তাহার স্ত্রী বহুবৎসর ধরিয়া হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়া আসিতেছে। এইসকল ছাত্রীদের নিমিত্ত আবশ্যক কিছু খরচ করিতে বলিতেছি।

বঙ্গের নদীতে ষ্টীমার কোম্পানী

বাংলাদেশের নদীগুলিতে ইংরেজদের যে-সব ষ্টীমার আছে, তাহাতে যাত্রীদের যত রকম অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হয়, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, যে, দেশের লোকেরা এইসব অস্বাস্থ্য ব্যবহার মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। সহ্য করিতে হইতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু দেশের লোকেরা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে, ইহা ঠিক নয়। একটি ইংরেজী পুস্তিকায় দেখিতেছি, ছয় বৎসর পূর্বে মোলভী এ এইচ এম্. ওয়াজির আলি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ষ্টীমার কোম্পানীগুলিকে ভাড়া কমানিতে এবং সমুদয় ষ্টেশনে প্রতীক্ষাশালা নির্মাণ করিতে বাধ্য করিবার কথা তুলিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, যে, বড় বড় ষ্টেশন-সমূহেও কোন প্রতীক্ষাশালা নাই। তিনি ইহাও দেখাইয়াছিলেন, যে, অনেক স্থলে ভাড়া খুব বেশী লওয়া হইতেছে। মধ্য মধ্য অস্তায় রূপে ভাড়া বাড়ানও হইয়া থাকে। যথা, ভাড়ার নিম্নলিখিত পরিবর্তন-গুলি দেখুন।

বরিশাল হইতে ভাড়া

	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৮	১৯২১
চট্টগ্রাম	১৮/০	১৮/০	২০/০	২৮/০
মাদারিপুর	৮/০	৮/০	২/০	২৬/০

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, যে, কোম্পানীর কোন আয়সঙ্গত নিয়ম অনুসারে ভাড়া নির্ধারণ কবে না। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে তর্কবিতর্কের সময় তৎকালীন সরকারী বাণিজ্য সদস্য মিস্টার কাব নিম্নলিখিত অধূত উত্তর দেন :—

হোয়াইটেওয়ে জেডল কোম্পানীকে তাহাদের জেতাদের স্ত্রী প্রতীক্ষাশালা নির্মাণ করিতে এবং কোন একটা নির্দিষ্ট মূল্যে তাহাদের ভিনিয় বিক্রী কবিত্তে বাধ্য করিতে যেমন আমাদেব ক্ষমতা নাই, ষ্টীমার কোম্পানীসমূহকে প্রতীক্ষাশালা নির্মাণ ববিত্তে বা ভাড়া কমানিতে বাধ্য কবিত্তেও তেমন ক্ষমতা নাই।

এখন পর্যন্ত ষ্টীমার কোম্পানী সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, হইতে পারে তাহাতে গবর্নেন্ট উক্তপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন নাই; গ্রহণ না-করায় ইংরেজ ব্যবসাদারদের সুবিধাই হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত। সমুদয় রেলকোম্পানী ষ্টেশনে ষ্টেশনে প্রতীক্ষাশালা নির্মাণ করে, এবং রেলওয়ে বোর্ডের অজ্ঞাতসারে ভাড়াও বাড়াইতে পারে না। ট্রাম কোম্পানী পর্যন্ত প্রতীক্ষাশালা নির্মাণ করিয়াছে। ষ্টীমার কোম্পানীর যে যে খানে প্রতীক্ষাকক্ষ নির্মাণ করিয়াছে, তাহাও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির বেশী বেশী অর্থসাহায্যে করিয়াছে।

ষ্টীমার কোম্পানীগুলার প্রবন্ধনার একটা দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত পুস্তিকায় দৃষ্ট হয়। গাবর্ণি-ভরগী থান সাত লক্ষের উপর সরকারী টাকা ব্যয়ে খনিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকগুলি ষ্টেশনের মধ্যে জলপথের দৈর্ঘ্য কম হইয়া যায়। কিন্তু কোম্পানী পথের দৈর্ঘ্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া কমায় নাই; এমন-কি তাহাদের টিকিটগুলিতে পথের দৈর্ঘ্য আগে যাহা ছিল, তাহা কমানিয়া ছাপে নাই, পূর্বের দৈর্ঘ্যই রাখিয়া দেয়! কোম্পানীর জুয়াচুরি প্রমাণ করিবার জন্য একটা মোকদ্দমা করা হয়, তাহাতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়।

কোম্পানীর জাহাজগুলা জীর্ণ ও পুরাতন, গত ঊনবিংশ শতাব্দী যখন আশী ও নব্বইয়ের কোটায় সেই সময়ে নির্মিত। এরূপ জাহাজে যাতায়াত শুধু অসুবিধা-জনক নহে, ঝড়ের সময় বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হবে? ইংরেজ গবর্নেন্ট পারত পক্ষে ইংরেজ ব্যবসাদারদের প্রভূত লাভ যাহাতে যথেষ্ট লাভের সীমায় আসে, এমন কিছু করিতে অস্বীকৃত। বাংলা গবর্নেন্টের দ্বারা ইহার কোন প্রতিকার হইবার আশা নাই। ত্রিযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিরোগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন, যাহার প্রবান দুটি ধারার তাৎপর্য এই, যে, সকৌন্সিল গবর্নর জেজারেল ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিয়া নদীর জাহাজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন যাত্রীভাড়া ও মালভাড়া

নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন, এবং প্রাদেশিক গবর্নেন্ট যাত্রীদের স্বার্থস্বাক্ষীয় বিষয়ে জাহাজের মালিককে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা পরামর্শ-কমিটি নিয়োগ এবং তাহাদের গঠনবিধি ও কার্যাবলী স্বাক্ষীয় নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন। নিয়োগী মহাশয়ের এই বিলটি পাস হইলে দেশের খুব উপকার হইবে। সর্বত্র সভা-সমিতি হইতে ইহার সমর্থন হওয়া উচিত।

কুমিল্লার দাঙ্গা

বড়লাট হিন্দুমুসলমানকে অতি উচ্চ উপদেশ শুনাইয়াছেন ; দেশের নানাস্থানের হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা তাহার প্রকৃত প্রতিধ্বনি রূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। এত জায়গায় সংঘর্ষ খুন জখম হইতেছে, যে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করাও মাসিক পত্রের পক্ষে কঠিন। আমরা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কুমিল্লার দাঙ্গার উল্লেখ এই কারণে করিতেছি, যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এখানে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া না হইত। কুমিল্লার অভয়-আশ্রমে জাতিধর্মনির্বিশেষে শিক্ষা ও চিকিৎসার দ্বারা সকলের সেবা করা হয়। মেথরে ও ব্রাহ্মণে, হিন্দু ও মুসলমানের কোন প্রভেদ করা হয় না। বার্ষিক রিপোর্ট-গুলিতে দেখিতে পাই, কোন কোন বৎসর কোন কোন দিকে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরা বেশী পরিমাণে সেবা পাইয়াছেন, যদিও প্রতিষ্ঠানটি হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত এবং হিন্দুদের অর্থে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত স্বতরাং মনের স্বস্তি অবস্থায় এখানে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ না থাকাই উচিত। বস্তুতঃ পূর্বে ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য ও দুর্ভিক্ষ জলপ্রাবন প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের যে-সেবা হিন্দুরা করিয়াছে, তাহার ফলভাগী হইয়াছে প্রবাসীরা মুসলমানেরা। কিন্তু তদ্বারা বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমিত হয় নাই। তথাপি মহাভারতে ও বুদ্ধদেবের বাণীতে অপ্রেমকে প্রীতি দ্বারা জয় করিবার যে-উপদেশ আছে, তাহাই অনুসরণীয়। বিভাগাগর মহাশয় বলিতেন বটে, “অমুক ব্যক্তি আমাকে কেন গালাগালি দেয় ? আমি ত কখনও তাহার উপকার করি নাই।” কিন্তু তাহা বলিলেও উপকার করিতে কখনও নিবৃত্ত হয় নাই।

হিন্দু নারীর দায়াধিকার

ঢাকা বৃদ্ধ সম্মেলনের এক অধিবেশনে কুমারী শকুন্তলা চৌধুরী এই প্রস্তাব করেন, যে, দায়ভাগ অমুখ্যায়ী উত্তরাধিকার ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্তন হওয়া উচিত যাহাতে হিন্দু নারীরা পিতৃসম্পত্তির জ্ঞাত্য অংশ পাইতে পারে। এই প্রস্তাব জ্ঞায়সম্মত। শ্রীমতী শকুন্তলা ইহাও ঠিক বলিয়াছিলেন, যে, হিন্দু নারীদের পিতৃসম্পত্তির জ্ঞাত্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়া বরপণ প্রথার অন্ততম পরোক্ষ কারণ।

ইংরেজ গবর্নেন্ট যাহাকে হিন্দু আইন বলিয়া চালাইতেছেন, তাহাই একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ হিন্দু আইন নহে। প্রাচীন অনেক সংহিতাদিতে হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার স্বাক্ষীয় ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্টতর ছিল, তাহা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার নিম্নলিখিত দুটি পুস্তিকায় মূল সংস্কৃত শ্লোক-সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন :—

(1) Brief Remarks regarding Modern Encroachment on the Ancient Rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance.

(2) Essay on the Rights of Hindus over Ancestral Property according to the Law of Bengal: Appendix, Hindoo Law of Inheritance.

যাহারা এবিষয়ে আলোচনা করিতে চান, তাহারা রামমোহনের ঐ দুটি পুস্তিকা পাঠ করিবেন।

বৃহত্তর ভারতে রামায়ণ

ভারতের আদি কবি বান্দীকির অমর কাব্য রামায়ণ ভারতবাসীদের চিরন্তন আনন্দের উৎস হইয়া আছে। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়ত খবর রাখি না, যে, একদিন বিরাট এশিয়া মহাদেশের বিচিত্র জনসংঘের মর্মস্থল অধিকার করিয়াছিল আমাদের এই রামায়ণ। দশরথ জাতক ও অত্যাচার কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে স্থলপথে মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করিয়া চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেই সময়েই স্থলপথে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ এই মহাকাব্যখানি হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া সবদেহে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্তই সুদূর কাছোজ রাষ্ট্রে শিল্পিগণ বাপুয়োন (Bapuon)

ও আঙ্কোর ভাট্ (Angkor vat) মন্দির-গাত্রে রামায়ণের প্রস্তর-চিত্র অঙ্কিত করিয়া তক্ষণ-শিল্পের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। কঙ্কোজ হইতে শ্রামায়ে (amakien) নামে রামায়ণ আঙ্গ ও লক্ষ লক্ষ শ্রাম-বীর চিত্তবিনোদন করিতেছে। মলয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রায় ইহার অল্প সংস্করণ প্রচলিত; তাহার নাম “হিকাইয়াং শেরা রাম” (Hikayat Seri Rama)। জাভা ও মাদুরা দ্বীপে ইহার নাম “রাম কেলিঙ্” (Rama-keling)। প্রাচীন জাভা ও বঙ্গী দ্বীপে উক্ত প্রাকৃত সংস্করণগুলি ছাড়া বাঙ্গালিকির মুগ কাব্যের আংশিক অনুবাদ “শেরং রাম” (Seret Rama) নামে বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি সুদূর সেলিবিস্ দ্বীপে (Celebes) কাপডেব ছাপে রামায়ণ চিত্র দেখা যায়। ক.ন.।

প্রাশ্বানান্ মন্দিরে রামায়ণের প্রস্তর-চিত্র

যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা “কবি”তে আদি কবি এই অমর রচনা প্রায় ১২০০ বিভিন্ন সংস্করণে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, রামায়ণ জনসাধারণের হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেবল কাব্যখানি পাঠ, অনুবাদ, অভিনয় করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, প্রাচীন মন্দির গাত্রে এই মহাকাব্যের ভাস্কর্য্যানুবাদ বাহা শিল্পীরা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে ম্যাজাভার “প্রাশ্বানান্” মন্দিরে রামায়ণের ধারাবাহিক যে প্রস্তর-চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা-তক্ষণ-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। রামায়ণের আদিভূমি ভারতেও এমন সুন্দর সুসঙ্গত রামায়ণ-চিত্রের পরিকল্পনা কোথাও দেখা যায় না। এই প্রাশ্বানান্ মন্দির ভূমিকম্পে অনেকটা ভাঙ্গিয়া যাব এবং রামায়ণের প্রস্তর-চিত্রাবলী (bas relief) নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আরুপূর্ব্বিক চিত্র আমরা পাই না। তবু কয়খানি প্রস্তর ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহা আমাদের শিল্পের ইতিহাসের অতুলনীয় সম্পদ। আশা করি এই চিত্রগুলি সাধারণের চিত্ত বিনোদন করিবে। সবগুলি

আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব। এবার দর্শনানি প্রকাশিত হইল। ক.ন.।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে গান্ধীজির মত

মাদ্রাজের পাচেইয়াপ্পা কলেজের ছাত্রদের অভিনবনের উত্তরে গান্ধীজি অস্বাভাবিক কথার মধ্যে বিধবাবিবাহের সমর্থন করিয়া কিছু বলেন। তিনি বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে বালিকা বিধবাদের বিবাহ-অবস্থায় রাখা ও থাকার সমর্থক কিছু নাই। “আমি ঈশ্বরকে গোপনে অনেকবার বলিয়াছি, ‘তুমি যদি চাও যে আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এই শোচনীয় ব্যাপার কেন আমাকে দেখিতে বাধ্য কর।’” তিনি সমবেত ছাত্রদিগকে প্রচলিত রীতি ভাঙিতে ও এই অশুভ প্রথা উন্মূলিত করিতে বলেন; বলেন, তাহার যেন কেবল বিধবা বাগিকাদিগকে বিবাহ করিতে প্রতিক্ষা করে।

মিস্টার জেম্‌সের জাভা যাত্রা

ইয়ং মেঙ্গ্ ক্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশনের মিস্টার জেম্‌স্ শীঘ্রই জাভা যাইতেছেন বলিয়া খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। জাভা ডচদের শাসনাধীন, এবং এই শাসন কয়েক শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হয়। তাহার বহু শতাব্দী পূর্বে হইতেই ডচরা খৃষ্টিয়ান ছিল। কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, ডচ্ গবর্নমেন্ট নাকি জাভায় ইয়ং মেঙ্গ্ ক্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশনের কাজের প্রবর্তনের জন্য মিস্টার জেম্‌সকে ডাকিয়াছেন। হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জাভা যাত্রার পরই ডচ্ গবর্নমেন্টের হঠাৎ এত খৃষ্টিয় ধর্ম্মে মতি কেন হইল, এবং তাহার জন্য জেম্‌সকে ডাক পড়িল, বুঝা যাইতেছে না। খৃষ্টিয় ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারে অনুরাগ ত তাহাদের অনেক আগেই হইবার কথা। গত বৎসর যখন লীগ্ অব নেশন্স স্যাসেমন্ট্রীর অবিবেশন উপলক্ষ্যে জেনীভায় ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক-গিয়াছিল এবং আমরাও গিয়াছিলাম, তখন এই মিস্টার জেম্‌সও গিয়া-ছিলেন। তাহাতে বোঝ হয়, তিনি ভারতীয়দের সহ কোন কারণে খুব ভালবাসেন।

এই প্রসঙ্গে ইয়ং মেঙ্গ্ ক্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশনের

সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। কিছু দিন পূর্বে ইউরোপীয় সভার উক্ত সমিতির রাজনৈতিক মতামত কার্য্যার্থ্য সম্বন্ধে অভিযোগ হওয়ায়, একটি তদন্ত কমিটি বসে। কমিটি উক্ত খৃষ্টীয়ান সমিতিতে ভারতাস্থকূল রাজনৈতিক মতপোষণ ও কার্য্যকরণ রূপ গুরুতর অপরাধে নিরপরাধ বলিয়াছেন। ইহা খৃষ্টীয় সমিতি প্রশংসা বা নিন্দা মনে করিবেন, জানি না। আমরা কিছ মনে করি, যে সমিতি এরূপ সার্টিফিকেট আবশ্যক মনে কবে, তাহা আবাস-সরকারী সমিতি। অস্বাস্থ্য ধর্ম প্রচারের জায খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারেও কোন আপত্তি করিবার কাহারও কোন অবিকার নাই। কিন্তু খেলাধুলা আয়োজন-প্রমোদের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভারতীয় যুবকের উপর যদি খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা ও তাহাদের উপর নজর রাখা আবশ্যক হব, তাহা হইলে তাহা ভারত গবন্মেণ্টের ও তাহার সমর্থক ভাবতধনশোধক ইউরোপীয় বণিকদের মতামতের তোষাক্কা না রাখিয়া করা উচিত। ধর্মসমিতির সহিত বিদেশী রাজশক্তির ও বণিকশক্তির বিন্দুমাত্র পবোক্ষ যোগও সন্দেহ উৎপাদন করে।

ভারতবর্ষ ও লীগ অব নেশন্স

লীগ অব নেশন্সের এই বৎসরের স্যাসেমব্লীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে ব্রিটিশভারত-গবন্মেণ্টের (ভারতবর্ষের নহে) অন্ততম প্রতিনিধি স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার যে বক্তৃতা করিয়াছেন, রয়টার তাহাব নিম্নলিখিত তাৎপর্য্য পাঠাইয়াছে :—

In the League Assembly, Sir C. P. Ramaswami Ayyar opening the debate on the work of the past year, congratulated the League on its having realised the importance of India and the eastern problems ; but it was not easy for his countrymen, remote and absorbed in their own problems, to realise concretely how the ideals of the League were being converted into practice. He would welcome any increase in the relations between the practical work of the League and the actual interests of India. He believed that it was through the technical organisations of the League that

the ideals of the League could be more adequately realised in non-European countries.

He dwelt on the importance of health organisations, particularly the bureau at Singapore, in assisting in the control of epidemics and welcome the projected tour in India of medical officer associated with the League, from which he anticipated valuable results.

He emphasised the special interest of India in the Economic Conference and said that the present fiscal policy of India showed that it was in harmony in principle with the conclusions of the Conference. He hoped that the attitude of the League towards the work of the Conference would demonstrate its interest in the problems and conditions of the countries far removed from Europe, but forming important factors in the sum total of world economy. He concluded by saying that India was most anxious to participate in the labours of the League.

এইরকমেব ভূষা খোসামোদপূর্ণ বক্তৃতা পড়িলে গা জ্বাল করে। লীগ ভারতের গুরুত্ব বুঝিয়াছেন বলা হইয়াছে তাহার পরিচয় ও প্রমাণ কোথায় ? ভাবতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ দূর করিতে, ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচারে প্রতিকার করিতে, লীগের এক কাণাকড়ির ক্ষমতাও নাই ভারতবর্ষের লোকেরা লীগকে নিজের কোন কথা জানাইতে পারেন না ; বিদেশী ভারত-গবন্মেণ্ট নিজের স্বার্থে যাহা জানাইতে চায় তাহাই লীগ জানিতে পাবে। লীগে স্বাস্থ্য বিভাগ, শ্রম বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তাহাদের আলোচনাদির ফলে ভাষ্য প্রস্তাব যাহা হয়, তাহা ভারতবর্ষের লোকেরা স্বয়ং নিজে দেশে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না ; বিদেশী ইংরেজ গবন্মেণ্ট যদি মনে করে, যে, তাহা ইংরেজের স্বার্থে ক্ষতি করিবে না, তবে তদনুসারে ভারতবর্ষে কাজ হইতে পাবে। যাহাতে ইংরেজদের সুবিধা, ভারতীয়দের অসুবিধা ভারতবর্ষে তাহাব প্রয়োগ ও প্রবর্তন অবিলম্বেই হইতে থাকে।

লীগের সহিত সংযুক্ত চিকিৎসা-কর্মচারীদের ভারত বর্ষে আগমন আমাদের লীগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঊদাসীন ও অকর্ম্মণ্যতার অভিযোগের ফল বলিয়া মনে করি। তাহাবা আসুন, দেখুন ; কিন্তু দেখিবেন ইংরেজ আমলা

চোখ দিয়া। ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও যি যে ছরবস্থা, ইংরেজ আমলাতন্ত্র তাহা নিজের কাদোবক্রটিজাত বলিয়া জানিতে দিবে না, তাহা এই দোষ বলিয়া বুঝাইয়া দিবে। বুঝাইয়া দিবে, যাদের ধর্ম এমন কুসংস্কারপূর্ণ, লোকাচার দেশাচার ন, যে, আমরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতাই ভালবাসি, পরিচ্ছন্ন থাকা ও চিকিৎসিত হওয়া অপেক্ষা ভাল মনে করি। এইজন্ত, যদি এখন হইতে সরকারী ডাক্তারেরা সংযত ভাবে এরূপ চেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে

লীগকে কে কত টাকা দেয়

পঞ্চবর্ষের গুরুত্ব লীগ একদিক দিয়া খুবই বুঝেন, ভারতবর্ষ তাহাকে টাকা দেয় বেশ। আমরা আগে আর লিখিয়াছি, ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানী জাপান এই পাঁচটা দেশের নীচেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে বেশী দেয়। “বেঙ্গলী” বে লিখিয়াছেন, কেবল ব্রিটেন, ও জাপান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী টাকা দেয় এবং ভারতের চেয়ে কম দেয়, তাহা ভুল। ব্রিটেন ৭২, জার্মানী ৭২, জাপান ৬০, ইটালী ৬০, বর্তমান ৫৬ ইউনিট দেয়।

স্মারক অভিযানে বাঙালী

আমেরিকার শিকাগো সহরের প্রাণবিদ্যাবিষয়ক মিউজিয়ামে একটি বিভাগের কন্সল্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মিউজিয়ামের স্মারকবৃত্ত অভিযানের অন্ততম কন্সল্ট্যান্ট হইয়া স্মারক সমুদ্রে ও দেশে গিয়াছেন। যে স্মারক তিনি গিয়াছেন, তাহার নায়ক কম্যাণ্ডার জি ম্যাকমিলান। তিনি একজন সুপরিচিত স্মারক অভিযানে অঞ্চল আবিষ্কারক।

শরৎকুমার রায় শিকাগো মিউজিয়ামে কাজ করিতে আগবানীতে নিউইয়র্ক পোষ্ট মিউজিয়ামের একজন ছিলেন। তিনি বি-এ এবং পদার্থবিদ্যা এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে গবেষক ছাত্র।

শরৎকুমার রায় বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন পদার্থবিদ্যা বাঙালীর ছেলে যে স্মারক প্রদেশের আবিষ্কার তথ্য, নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ



শ্রী শরৎকুমার রায়

করিতে পারে, এবং তাহার জ্ঞান বিদেশীর দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারে, ইহা স্মারকের বিষয়। ইহাতে বাঙালী যুবকদের উৎসাহ বাড়িবে।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে ভারতবর্ষের দরিদ্র, আর্ন্ত, বিপন্ন জনগণ একজন প্রধান বন্ধু হারাইল। মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে, অগ্নিকাণ্ডে গ্রাম, নগর, জেলা, প্রদেশ বিপন্ন হইবামাত্র রামকৃষ্ণ মিশন সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্বামী সারদানন্দ এই মিশনের অন্ততম সংগঠক এবং স্থাপনের সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের অন্ততম সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তাহার জীবনের প্রথম অংশ কঠোর তপশ্চর্য্যের অতিবাহিত হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুসারে তিনি কলিকাতায় প্রবৃত্ত হন, এবং গীতার



স্বামী সারদানন্দ

কর্মোপদেশ কি প্রকারে জীবনে মূর্তিমান হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করেন। “প্রবুদ্ধ ভারত” ঠিকই বলিয়াছেন, যে, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে যে আগুন ছিল, তাহাই তাঁহাকে অবিচলিত চিত্তে সংসারের কাজ করিতে সমর্থ করিত। তিনি জনহিতকর কার্যের জন্ত যত রকমের যত সাহায্য পাইতেন, তাহার পুঙ্খনাপুঙ্খ হিসাব রাখিতেন এবং রিপোর্টে সমস্ত হিসাব দিতেন। তাঁহাকে যে লোকে সাহায্য পাঠাইত, তাহার একটা প্রধান কারণ ছিল, তাঁহার মহৎ চরিত্রে বিশ্বাস; কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত হিসাব রাখা ও প্রকাশ করাও অত্যন্ত কারণ বলিয়া আমাদের ধারণা। যাহারা জনহিতকর অরাজনৈতিক, রাজনৈতিক কোন কাজের জন্ত দর্শনসাধারণের টাকা রাখেন, খরচ করেন, তাহারা সকলে স্বামীজির এই গুণটি লাভ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

পূজার ছুটি

দেশের যত শক্ত কাজের বোঝা চাপাইবার প্রস্তাব হয় তরুণদের উপর। তাহাতে তাঁহারা মনে করিতে পারেন,

যে, উপদেশটার দিব্য আরামে যত দায় বুঝি আমাদের ঘাড়ে তেছেন। আরাম জিনিষটা স প্রিয়; বুদ্ধদের ত বটেই—আলস্য করিবার ইচ্ছার অ স্বাভাবিক কারণও আছে। আমরা আরামপ্রিয়তা বশতঃ কোন উপদেশ দিতে যাই পূজার ছুটি যে-সব বুদ্ধ, যে কিশোর পাইবেন, তাঁহাদের দেশের সেবা করিবার সুযোগ পি যাহারা সরকারী চাকরী তাঁহাদেরও মিলিবে। তাঁহাদের অনেকে বাস্তবিক এমন ভাবে কাজ করিতেছেন, যাহা বিখ্যাত নেতা উপনেতা করি না। আর কোন প্রকারে দে করিতে যদি কেহ না পারেন, হইলে অন্ততঃ সকল ধর্মের ও জাতের লোকদের সঙ্গে বিদ্বেষের অহঙ্কারহিত ভাবে মেলাই করিলেও পরম মঙ্গল হইবে। ই জন্ত আলাদা করিয়া অবসর যদি

পান, ভালই। না-পাইলেও, সাংসারিক নানা করিবার সময় যত রকম লোকের সঙ্গে মিশিতে কথা কহিতে হয় তাহাদের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিলেও ত বহু সুফল ফলিবে।

সাদ জঘলুল পাশা

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতা জন্ত যাহারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম গিয়াছেন, মিশরের স্বদেশ-প্রেমিক সাদ জঘলুল পাশা তাঁহাদের অগ্রগীদের মধ্যে অত্যন্ত। তিনি জন্ত অনেক ত্রুণ সহ্য করিয়াছিলেন। জুইবার নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার উৎসাহ ক হ্রদয়ে স্বাধীনতাপ্রিয়তার আগুন নিবিয়া মিশরের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মুসলমান; শতকরা ৯০ জন মুসলমান, ৮.০৩ জন খৃষ্টিয়ান, বাকী ইহুদী ও কিন্ত তথায় কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই। পাশা মুসলমান অমুসলমান সকল মিশরবাসীর খাটিতেন, প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্বমুসলমানবাদ



মাদ জঘল পাশা

নাই। তাহার মৃত্যুতে মিশর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহার প্রভাব ও প্রেরণা মিশরবাসীদের প্রাণে চির-থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে।

বন্দী জনসংঘের মহা সম্মেলন”

সংঘের অধিবেশন গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের জ্যেষ্ঠ মাসে হইয়াছিল। খৃষ্টীয় মিশন তাহার আকিমা জানি না। “অধিকার” নামক কাগজে

মালী, স্বত্বধর, বৈশ্য সাহা, নমঃশূত্র কপালি, কল্লমল, রায়, দ্বি দাস, পৌণ্ড ক্রিয়, তৈলকার, ব্যাংকক্রিয়, সভা-লুপ্তমাহিবা প্রভৃতি জলনাচরণীয় এবং ঐসমস্ত শ্রেণীদের সংখ্যায় ৫ সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন।

উৎসাহ প্রশংসনীয়। ইহাকে সুপথে চালিত করিবার জন্য নেতাগণ সকল সময়ে অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। “অগ্রসর সম্প্রদায়সমূহ”কে “কটকটকোশনী” বলার সমর্থন আমরা করিতে পারি না। একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের সব লোক স্বার্থপর নহে, ইহাতে পারে না; এবং তাহার দল বাধিয়া দিয়া “অগ্রসর ও অধিকারচ্যুত” “শ্রেণীদিগকে” ও অপমান করে না।

এই সম্মেলনের অধিকাংশ প্রস্তাবের আমরা সমর্থন করি। বাহা সমর্থন করি না, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি। মুসলমান বা অল্প কাহারও জন্ত সরকারী কাজের ও ব্যবস্থাপক সভা মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া রাখার আমরা বিরোধী। একমাত্র যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ ও নির্বাচন শ্রেয়ঃ। ইংসেও বহু বহু শতাব্দীর পর বর্তমান শতাব্দীতে নিয়ন্ত্রণীয় শ্রমিকেরা পার্লামেন্টে কতক পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে; কিন্তু তাহাদের নেতারা কখনও চায় নাই যে, তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি মেম্বর-পদ রাখা হউক। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্ত বেশী-সংখ্যক বৃত্তি রাখার আমরা সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু কি ব্যবস্থাপক সভাদির প্রতিনিধিত্ব, কি শিক্ষালয়ে প্রবেশের সুবিধা-অসুবিধা, কোন বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষ্যেই আমরা “তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়-সমূহের” প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ বা তাহাদের প্রতি মন্দ অভিসন্ধি আরোপের সমর্থন করি না। হিন্দু সমাজের অনেক জাতি উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত বটেন; তাহা গজ্জা ও ছুংথের বিষয়। কিন্তু অল্প জাতির অনেক লোক তাহাদের সেবা করিতেছেন, তত্পলক্ষ্যে বিনা বিচারে বন্দী হইয়া রোপ-ভোগ অনেকে করিতেছেন, করিয়াছেন, মৃত্যুও কাহারও কাহারও হইয়াছে। কটু কথা প্রকৃত শত্রুকে বলা যদি অনিবার্য হয়, তাহা হইলেও শত্রু যাহারা নহে, তাহা-দিগকেও বাদ দেওয়া উচিত। সম্মেলনের একটি প্রস্তাব এইরূপ :—

১৪। (ক) যেহেতু সংঘের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়-সমূহ মুসলমানগণের প্রতিবেশী সেজন্ত এই সংঘ প্রস্তাব করিতেছে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই, বা থাকা উচিত নহে—এবং সংঘের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়-সমূহ ও মুসলমানগণ যেন পরস্পর পরস্পরকে প্রীতির চক্ষে দেখেন।

(খ) সংঘের অন্তর্ভুক্ত কোন লোকের সহিত মুসলমানদের কাহারও কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যেন তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্ত উভয় পক্ষের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে মালিশী কমিটি গঠন করা হউক।

মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত সংঘের কোন বিবাদ নাই, তাহা ভাল কথা। আশা করি, এই কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন লোক সংঘের অন্তর্গত কোন জাতির কোন মাহুঘের মাথা ফাটায় নাই ও ভবিষ্যতে ফাটাইবে না, এবং সংঘের অন্তর্গত কোন জাতির কোন নারী হরণ ও তাহার উপর অত্যাচার করে নাই, ও ভবিষ্যতে করিবে না। আমরা কিন্তু খবরের কাগজে এরূপ অত্যাচার-বৃত্তান্ত প্রায়ই পড়িয়া থাকি। তাহা সত্ত্বেও আমরা

মুসলমানদের সহিত সত্তাব রক্ষারই পক্ষপাতী। কিন্তু প্রস্তাবে তাহাদের সহিত বিবাদ না থাকার যে-কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে—“যেহেতু সংঘের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়সমূহ মুসলমানগণের প্রতিবেশী”—সেই কারণ হিন্দুসমাজের “অগ্রসর” জাতিদের প্রতিও বর্তে। কিন্তু তৎসঙ্গেও প্রস্তাবটিতে উল্লিখ রহিয়াছে, যে, “অগ্রসর” হিন্দুজাতিদের সঙ্গে সংঘের বিবাদ আছে। সমগ্র এক-একটা জাতির সম্বন্ধে এই বিদ্বেষ-ভাব ভাল নয়। “অগ্রসর” হিন্দু-জাতিদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি লোক অনগ্রসর লোকদের জন্ত সময় শক্তি অর্থ স্বাস্থ্য ব্যয় করিয়াছে, করিতেছে, বাহা মুসলমানেরা করে নাই। অগ্রসরদের সঙ্গে যেমন অনগ্রসরদের থানাপিনা, ঔদ্যাহিক আদান-প্রদান নাই, তেমনি মুসলমানদের সহিতও নাই। সংঘ মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহাদের প্রকৃত বন্ধুত্ব লাভ করিতে পারিলে বাস্তবিক তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে; কিন্তু “অগ্রসর” হিন্দুদের প্রতিও সত্তাব পোষণ করিতে পারিলে তাহারা লাভবান হইতে পারিবেন।

“এই সভা দক্ষিণভারতের অত্রাঞ্চ আন্দোলনের সহিত যোগদান স্থাপনের চেষ্টা করিবে।”

এরূপ প্রস্তাবের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। দক্ষিণ ভারতে “অস্পৃশ্য” ও “অনাচরণীয়”দের প্রতি অগ্র হিন্দুরা যেরূপ ব্যবহার করে, বাংলাদেশের অগ্রসরদের অনগ্রসরদের প্রতি তত লজ্জাকর ও নিষ্ঠুর ব্যবহার কখনও করে নাই। বাহা করে, তাহাও অবশ্য গহিত ও নিন্দনীয়। কিন্তু অগ্র প্রদেশের বগড়া ও কুপ্রচেষ্টা বাংলাদেশে আমদানী করার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাতে সফল হইবে না, কুফল হইবে।

সংঘ ইংরেজ গবন্মেণ্টের রূপাপ্রার্থী হইয়াছেন, যেন উহা তাহাদের জন্ত প্রায় দুই শত বৎসর ব্যাপী শাসন-সময়ে তাহাদের কতই না উন্নতি ও সাহায্য করিয়াছে। এখন যদি কিছু করে বা করিবার অঙ্গীকার করে, তাহা ভেদনীতি দ্বারা ভারতীয়দের একতানষ্ট করিয়া তাহা-দিগকে দুর্বল ও চিরপদানত রাখিবার জন্তই করিবে। তাহা অন্ততঃ শিক্ষিত “অগ্রসরদেরা” কেন বুঝিতে পারেন না, জানি না। মুসলমান নেতাদের মত তাহারাও কি ব্যক্তিগত চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত আছেন?

“অগ্রসর”-দিগকে যে এত মন্দ বলা হইতেছে, জিজ্ঞাসা করি, “অগ্রসর” অল্পসংখ্যক লোক অনগ্রসরদের জন্ত অল্প বাহা করিয়াছে, অনগ্রসরদের শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরা সেরূপ কি কি ও কত কাজ করিতেছেন? যদি বাস্তবিক সেরূপ কিছু করিতেছেন, অগ্রসরদের সমান বা

তাহাদের চেয়ে বেশী করিতেছেন, তাহা খুবই বিষয় ও প্রশংসনীয়।

মৎস্যজীবী সম্মিলন

ফরিদপুর জেলার পুথুরিয়ায় মৎস্যজীবী সা সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত কুমুদশঙ্কর রায় যে সংক্ষিপ্ত আ-পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক কাজের কথা তদনুসারে কাজ করিলে বীবরেরা উপকৃত হইবেন। তাহা শিক্ষাদাপেক্ষ; আবার শিক্ষা পাইলেই ও কৌলিক বৃত্তি ছাড়িয়া দেন। কিন্তু দোষটা তাহাদের নহে। সামাজিক প্রথা এরূপ, যে, কেহ দোকানে মুহুরীগিরি করিলে তাহা দোষাবহ হইবে ও “বাবু” পদবাচ্য হইবে, কিন্তু মাছের ব্যবসা করি-না হইয়া “অবাবু” হইয়া যাইবে।

গোড়াতেই কুমুদশঙ্কর-বাবু তাহাকে নির্বাচন করার বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন।

পূর্বে আপনারা শুনিয়াছেন যে, ভূমিদার সম্প্রদায়ের আপনাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী এবং ভূমিদারগণ আ-স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন এইটাই স্বাভাবিক। তবুও আপনারা আমাকে ভূমিদার-সম্প্রদায়-ভুক্ত জানিয়াও সা-করিয়াছেন তখন ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। আ-হয় এই নির্বাচন দ্বারা ভূমিদার সম্প্রদায়ের সহিত এক-আপনারা কাজ করিতে পারেন এবং ভূমিদারেরও আ-স্বার্থের বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে এইটাই প্রকাশ করি-আমি নিজে ভূমিদার একথা জানিয়াও যে এ পদ গ্রহণে করিয়াছি তাহার কারণ, আমার নিজেরও এরূপ বিশ্বাস ও স্বেচ্ছায় আমাদের পক্ষের কথাও দুই-একটা আপনাদের পারিব। একথা বলা বোধ হয় বেশীর ভাগ যে, এইরূপ আদান-প্রদানে বিরোধ যদি থাকে তাহা কমিয়া আসে এবং সন্দেহ ও স্বার্থের অনাবশ্যক বিরোধ দূর হয়।

তাহার পর তিনি দেখান, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উন্নতি অগ্র সব সম্প্রদায়ের উন্নতির সহিত জড়িত

বর্তমান যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ আর্থিক ই-করিতেছেন এবং এই আর্থিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার উপরই মঙ্গলমঙ্গল বহুপরিমাণে নির্ভর করে। প্রত্যেক সম্প্র-স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আর্থিক উন্নতি বিধান করিতে ভূ-ভূমিদারগণও যে তাহাদের স্বার্থ দেখিবেন ইহা স্বাভা-কথা এই যে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের মিলনে গোটা-এবং কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষতি হইলে সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থের মিলনে পরিবারের স্বার্থ এবং পরিবা-অন্তঃনের স্বার্থ হস্তক্ষেপ করিলে পরিবারের ক্ষতি, সম্প্রদায় অগ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থে হাত দিলে সমাজের ক্ষতি ও প্রজার স্বার্থ পরস্পরের উপর নির্ভর করে। প্রজার স্বার্থ ভূমিদারের স্বার্থ একথা যদি সত্য হয় তবে একথাও সত্য

কম ছাত্র ভর্তি করিবার নিষমণ মানিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাতে ছাত্রবেতন হইতে প্রাপ্ত আয় অতঃপর কম হইবে বলিয়া অল্পাধিকপক্ষে বাহা লেখা আছে ছাত্রদের নিকট হইতে তদপেক্ষা বেশী চাওয়া হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট হইতে বাহা চাওয়া হইয়াছে বলিয়া কংগ্রেস বাহির হইয়াছে, তাহা মাসিক নহে, বার্ষিক। ইহা সত্য কথা, যে, আমাদেব দেশেব অধিকাংশ ছাত্র ধনীৰ সন্তান নহেন। কিন্তু বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলও ধনী নহে, এবং ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোম্পানী বিশেষের দানের জন্ত পরিচালিত কাববারও নহে। ইহার দ্বারা নিজেবা উপকৃত হইবার এবং দেশকে উপকৃত কবিবার জন্ত ইহা চাহাইবার নিগিত্য ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও তাঁহাদের অভিভাবকগণ মাসিক এক আন টাকা অতিবিক্ত সাহায্য ইচ্ছা কবিলে কবিতো পারেন না, এমন নয়। পান তাংক প্রভৃতিতেও ইহা অপেক্ষা বেশী খরচ অনেকেব হয়। বস্তুতঃ, আমরা অনেকে ভাবিয়া দেখি না, যে, এই বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল করিতে হইলে আবও কত টাকার প্রয়োজন হইবে। গবন্মেণ্ট ইহার জন্ত একশত শতাংশিষ্ট হাঁসপাতাল চান। তাহা এখনও হয় নাই। তাহার জন্ত অনেক টাকা চাই। ইহাতে পদার্থবিজ্ঞান ও বসায়নবিদ্যা শিক্ষাইবার এখনও নিজের বন্দোবস্ত হয় নাই; ছাত্রেরা তাহা ওয়েসলিয়ান কলেজের সৌজন্যে সেখানে শিখেন। বিদ্যালয়েব তাহা কবিতো হইলে ন্যূনকল্পে পাঁচ হাজার টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও সরঞ্জাম চাই। ইহার কোন বেতনভোগী অন্তঃকৰ্ম্মী অধ্যক্ষ নাই। ওয়েসলিয়ান কলেজের অব্যক্ত ব্রাউন সাহেব দবা করিয়া অবৈতনিক অব্যক্তেব কাজ কবেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেশী বেশী টাকা আদায় করিতেই হইবে, এমন জেদ কাহারও নাই। কিন্তু খরচ চলা ত চাই। এইজন্ত আমরা আশ কবি, ছাত্রবর্গ ও অভিভাবকগণ ব্রাউন সাহেব ও কমিটিব সহিত সহযোগিতা কবিয়া এই হিতকর প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা কবিবেন। আমবা কয়েক দিন পূর্বে যখন বাঁকুড়া গিবা স্কুলটি দেখিতে যাই, তখন ছাত্রেরা আমাদিগকে তাঁহাদের অসন্তোষের বিষয় কিছু বলেন নাই। বলিলে তাঁহাদের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিতাম। বাঁকুড়া স্মিথসন টাকা তুলিবার চেষ্টা আগে করিয়াছেন, অতঃপরও করিবেন। টাকা থাকিলে ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার আনন্দ লাভ করিতে

স্মিথসনীর আপত্তি হইত না। কিন্তু টাকা পাওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য যে-সব ছাত্র মাসে এক আনটাকা বেশী দি পাবিবেন না, কমিটি তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা কবিতো পাবেন। তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহারা ছাড়িবা যাইবেন। তাহা দুঃখের বিষয় হইবে, উপায় নাই।

জলপ্লাবন

ভারতবর্ষ বড় দেশ, এবং ইহাতে একটা-না-এ দুর্ঘটনা ঘটিবা বহুসংখ্যক লোক প্রতিবৎসর বিপন্ন এ বৎসর ওড়িশা, গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, সিদ্ধ, বড়ো এবং বঙ্গের কোন কোন স্থান জলপ্লাবনে বিপন্ন হইয়াছে। সর্বসমেত বহুসংখ্যক ধরবাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, অনেক লোক নিরাশ্রয়, বঙ্গহীন, অন্নহীন হইয়াছে, শতক্ষেত্রে বিপন্ন হইয়াছে, গবাদি পশু মারা গিয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ধনীলোক বিস্তর থাকায় গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, সিদ্ধ সাহাব্যদানের সুবন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই হইয়াছে। ওড়ি বড় গরীব দেশ। ওড়িশাসংলগ্ন বাংলাব অংশও গরী এইসব অঞ্চলের জন্ত বাংলাদেশ হইতে সাহায্য প্রেরিত হওয়া আবশ্যিক।

টাকা অনাথ-আশ্রম

টাকা অনাথ-আশ্রমের বিস্তারিত বিবরণ চিত্রসহ পূর্বে প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে প্রায় ১ বৎসবে শতাবিক বালকবালিকা এখানে আশ্রয়লাভ কবি। সংসারের পথে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। আশ্রমে পানি ছেলেদের অনেকে এবং বিবাহিত মেয়েদের সকলে সাংগারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পত্রাদিযোগে এখন আশ্রমেব সহিত সম্বন্ধবৎ ব্যবহার করিতেছে। বর্তমান এমাস হইতে ১৪ বৎসব বয়সেব ১১টি বালক এবং দুই বৎসব হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ২২টি বালিকা এখানে আশ্রমে শারদীষ উৎসবে অন্তসব বালকবালিকা আনন্দ সম্ভোগ কবিবে। তখন ইহাদের কথা শ্রবণ কবিয়া সকলে যথাসা ইহাদেরও আনন্দের ব্যবস্থা করিবেন, এই অমুরোধ। সর্বকর্ম সাহায্য রাখ সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ, টাকা অনাথ-আশ্রম, টাকা, এই ঠিকানায পাঠাইতে হইবে।

জাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করিবেন, তাঁহাব জন্ত আপেক্ষা উচ্চতর আশা আর কি করা যাইতে পারে ?

আমরা বাণ্যকালে ত্রিপুরা রাষ্ট্রকে “স্বাধীন ত্রিপুরা” প্রভৃতি নামে পৃষ্ঠপোষকতা করিতাম। তাহা কখন কি প্রকারে উচ্চ পদবী হইতে অবনত হইল জানি না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে স্থপ হব না।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের কীর্তি

কৌন্সিল অব্ টেটকে রাষ্ট্রীয় পরিষদ বলা যাইতে পারে। ইহাব সদস্যেরা হয় ত আপনাদিগকে বিলাতী কৌন্সিল অব্ লর্ডসের সভ্যদের মত মনে করেন। এই প্রভৃতি ভাষাতে জুলুম কমিয়া গিয়া আইনের রাজত্ব বাড়ি ও স্বাধীন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। এমন কোন আইন পরিষদ পছন্দ করেন না। তাহার প্রমাণ আগে পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আবও একটা পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৮ সালের সমিতি আইনের দ্বিতীয়ভাগ (part II) অনুসারে গবন্মেণ্ট কোন সভা, সমিতি, প্রভৃতিতে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে ও উঠাইয়া দিতে পারেন। ডাক্তার হরি সিং গোড়ার একটি বিল দ্বারা হাইকোর্টকে গবন্মেণ্টের এই পদ্ধতি পরিচালনের সংশোধন করিবার এবং তজ্জন পরিচালন দ্বারা অত্যাচারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের ক্ষমতা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার বিলের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা তিনি ভারতীয় সমুদয় প্রজাকে বিলাতী হেবিয়াস কর্পাস আইনের সুবিধা চাহিয়াছিলেন। এই আইনের বলে বন্দীকে যথেষ্ট উপস্থিত করা যাইবে এবং কারাবরোধের কারণের নিমিত্ত বিচারক বা আদালত কাব্যাক্ষের রোয়ানো প্রাপ্ত করিতে পারেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক ডাক্তার গোড়ের বিল পাস হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদের ভারতীয় লর্ডেরা উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। হাদের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। ডাক্তার গোড়ের প্রস্তাবে পবিত্র হইয়া গেলে, গবন্মেণ্টের কোন কারণ না দেখাইয়া যাহাকে তাহাকে ক্ষমতা প্রদত্ত হইত; বন্দী হাইকোর্টে প্রতিকার প্রাপ্ত হইত; কোন কারণ না দেখাইয়া যে-কোন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে গবন্মেণ্টকে উঠাইয়া দিতে হইত। তাহা হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লোপ পাইত এবং স্বাধীন অবিভাজিত বিপ্লবীদের হাতে ধনে প্রাণে

যাবা যাইত! এই মহাবিপদ হইতে কৌন্সিল অব্ টেট গবন্মেণ্টকে ও ভারতীয়দিগকে রক্ষা করিয়াছেন! একপ মহৎ কার্যের জন্ত কৌন্সিলের সভ্যেরা কি বক্শিশ পাইবেন জানিবার জন্ত উদ্গ্রীব থাকিতে হইবে।

আমরা প্রস্তাব করি, কৌন্সিলকে উপযুক্তরূপে সম্মান দিবার জন্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার এইরূপ প্রস্তাব কেহ উপস্থিত করুন, যে, যেহেতু কৌন্সিল অব্ টেট বেআইনী আইন ও বেআইনী স্বেচ্ছাচারের সমর্থক, অতএব ভারত গবন্মেণ্ট ১৯০৮ সালের ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল্যামেন্ডেমেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে উক্ত কৌন্সিলকে বেআইনী সমিতি বলিয়া ঘোষণা করুন, এবং তদ্বারা উহাব বিলোপ সাধন করুন।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল

সম্প্রতি কলিকাতাব ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক কাগজে এই সংবাদ বাহিব হইয়াছে, যে, বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট হইতে অতিরিক্ত ১২ ও ১৮ টাকা বেতন চাওয়ায় তাহাবা ধর্মঘট করিয়াছে। এই ইস্যুতে সহিত প্রবাসী-সম্পাদকের সহায়ত প্রাপ্ত এবং ইহা একটি বেসরকারী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রবাসীতে ইহাব বিষয় অনেক বার লেখা হইয়াছে। তথাপি পাঠকবর্গকে ইহার এক্ষত অবস্থা আবার জানাইতেছি।

এই বিদ্যালয়ের বাঁকুড়া সম্মিলনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লোকপুস্তক পাকা বাড়ী ও অন্যান্য ইমারত, পুস্তকালয় ও বিস্তৃত হাতা বিদ্যালয়কে দান করায় ইহা স্থাপন করা সম্ভবপর হয়। বাঁকুড়ার মহিলা চাঁদা তুলিয়া স্বর্গাবা শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্তের নামে একটি পাকা প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করাইয়া তাহা প্রস্তুতিদের ব্যবহারার্থ দিয়াছেন। অল্প ছ একজনের খোক দানে অজ্ঞচিকিৎসা শিক্ষাইবাব কক্ষ প্রভৃতিও নির্মিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ইহাব ইন্সপেক্টরগণিতে শক্ত শক্ত বোগেরও চিকিৎসা হইতেছে বলিয়া এবং মিল্টন কোম্পানী একটি ম্যামুলাস দিয়াছেন বলিয়া ইহার দ্বারা বাঁকুড়া জেলার খুব উপকার হইতেছে। কিন্তু ইহা কোন সরকারী সাহায্য পায় না, স্থায়ী অল্প কোন বিশেষ আয়ও নাই। এই কারণে ইহাকে ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিতে হয়। বহুক্ষেত্রে এত দিন পরে ইহা টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টীর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার অবিকার আপাততঃ দুই বৎসরের জন্ত পাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে নির্দিষ্টসংখ্যক

দ্রুত হ্রাসদানেরও ক্ষতি। হতরাং প্রজাতি স্বাধীন বজায় রাখা এবং যে উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হ্রাসদানের কেবল কর্তব্য নয় স্বার্থ। কোন হ্রাসদান একথা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রকারে স্বার্থ হানি বা উন্নতিতে বাধা দেন তিনি সমাজের এবং নিজের শত্রু। তাহা বলাবের চেষ্টা অবশ্য সকলেরই করিতে হইবে।

আমরা কেহই যে সম্পূর্ণ উন্নতি করিতে পারিতেছি না, তাহার একটি প্রধান কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে রায় মহাশয় মনঃ—

একথা সত্য যে, আপনাবা রে-বাবণেই হউক নিজেদের স্বাধীন পূর্ণ বৃদ্ধি বাধিতে পারিতেছেন না এবং আপনাদের বাবণে বাবণে নানান্যানে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ইহা বহিঃক্ষেত্রে আপনাদের এবং আমাদের অত্যাচার সহ্য করিবার চেষ্টা। আমাদের বলিষ্ঠ এইজন্য যে, সমস্ত সমাজই অত্যাচারের দৈত্যের ভাবে পীড়িত এবং আমরা সকলেই বিনা অপত্তিতে এই ও অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং অত্যাচারের প্রণালীর (stem) অঙ্গ হইয়া রহিয়াছি। প্রতি সম্প্রদায় আলাদা ভাবে পরিচালিত নিজ সম্প্রদায়কে এই দেশব্যাপী দুর্দশার হাত হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। সকল সম্প্রদায় সমবেত ভাবে এ অত্যাচারের আঘাত করিতে পারিলে তবেই এ অত্যাচার বন্ধ হইবে। কেবল সাধারণ সহিত সম্প্রদায়ের কলহ হ্রাস করিলে দুর্দশা হ্রাস হইবে। যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন শক্তির উপর অত্যাচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও উপদ্রব। সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের কলহে বাহিরের শত্রুকে বল হইতে দেওয়াই নার্যকরতা কোথায় জানি না—এবং এইজন্যই স্বাধীনতার পক্ষপাতী। স্বরাজ হইলেই যে কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় শাসনালী লোকের হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা থাকিবে এবং তাহা অত্যাচারের প্রণালী অঙ্গরূপে বাধিবেন একথা আসি বিশ্বাস করি না। যোগে একদল বিদেশী শাসকের পবিত্রের মুষ্টিমেয় ধনিক দেশ শাসন করিবে, সে স্বরাজ আমিও চাই না। কিন্তু স্বরাজ আনিতে হলে পবিত্রের মধ্যে যে নির্ভরশীলতা আনিতে হইবে, তাহাই একপক্ষের বিশেষ সাধন করিবে। অবশ্য একথা সত্য যে, চিরদিনই মেঘ লোক থাকিবে তাহা অসম্ভব উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে পবিত্র নির্ভরশীল সমাজে এই অত্যাচার অত্যাচারের পথ ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিবে।

কৃতকর্মের পর্যাপ্ত আর্থিক উন্নতি ভিন্ন মানুষের মত হইয়া বাঁচিয়া থাকা যায় না। এইজন্য আর্থিক প্রয়োজন। দীর্ঘ সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির জন্য বাহ্য প্রয়োজন, কুমুদশঙ্কর-বাবু তাহার উল্লেখ

এই দেশে মাছ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্ধিত হইয়া সর্বত্রই—আমাদের দেশে একদিন জালে মাছ বেশী পড়িলে বিক্রয় করা ছাড়া উপায় নাই। তাবপব বাজারে মাছের দাম কম, তাব অর্ধেকও বাহ্য মাছ সে পাওয়া না। আপনাদেরই নিকট হইতে অল্পমূল্যে গ্রহণ করিয়া অল্প লোক বেশী লাভ করবে। এই মাছ বিক্রয় ব্যবসা আপনাদের নিজেদের হইবে। কলিকাতার যে-সমস্ত মাছ চালান হয় তাহাও সে ব্যবসাই অপরের হাতে। মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্যান্য তাহাতে লাভ করে। সে ব্যবসায় আপনাদের হাতে নিতে

হইবে। এইজন্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া বিহিত ব্যয় করা। মাছের অভাব এখন পূর্য্যপেক্ষা অনেক বেশী অনুভূত হইতেছে, এইজন্য মাছের চাষ দরকার—জন্য উন্নতি দরকার।

তাহার পর তিনি একে একে ধৃত মাছ তাজা রাখিবার জন্য সস্তা মুন, বরফ ও রেফ্রিজারি ঠাণ্ডা গাড়ীর (refrigeration waggon এর) আবশ্যিকতা বর্ণন করেন। তাহার পর বলেন, কড়লিভার তেলের মত মাছের তেল, মাছের আঠা (fish glue), ও মাছের সার (fish manure) প্রস্তুত করিতে পারিলে বিস্তর লাভ হইতে পারে। মোটর বোটে দ্রুত যাত্রাযাতের দ্বারা ও অগ্রাহ্য উপায়ে মাছের ব্যবসায় প্রসার ও উন্নতি করা যাইতে পারে। এইসব উপায় অবলম্বন ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য রায় মহাশয় সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে দীর্ঘরমের কর্মক্ষেত্র বাড়িবে, কাহাকেও বেকার থাকিতে হইবে না, সকলের অনসমস্তার সমাধান সহজ হইয়া আসিবে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে মাছ বনা ও বিক্রী একটা লাভজনক ব্যবসা বলিয়া পরিচিত। তাহাদের আয়োজনও কি বিবাত! মৎস্য ধরবার জন্য উন্নত প্রণালীর সাঙ্গ-সবজ্জাম, দ্রুত গমনাপমনের জন্য নিজেদের ষ্ট্রিমার মোটর বোট বহিঃক্ষেত্রে, ওদাম বহিঃক্ষেত্রে তাহা সমবায় সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গঠন করিয়া বহিতে পারিয়াছেন।

কুমুদশঙ্কর-বাবু ঝড়বৃষ্টি গণনার মিট্রিয়ারজিক্যাল অফিস হইতে অন্ততঃ প্রধান প্রধান মাছের ঘাটে পূর্বাঙ্কে ঝড়ের সম্ভাবনার খবর প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

মাছের ব্যবসার উন্নতির জন্য সকল রকম উপায় নির্দেশ ও অবলম্বনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মৎস্যব্যবসার সমিতি (Central Fishery Board) আবশ্যিক, বলেন।

তাহার পর বলেন, মৎস্য ব্যবসায় ও নৌকা চালনা যেমন অল্প দেশে কেহ হীন কাজ মনে কবে না, এদেশেও তেমনি উহা হীন কাজ বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের বাঙালী দীর্ঘবয়স নৌকা চালনা ছাড়া দিতেছেন মিথ্যা “ভদ্র” হইবার আকাঙ্ক্ষায়, আর অজ্ঞেবা সেই কাজটি দখল করিতেছে। সর্বশেষে রায় মহাশয় বলেন :—

এসময় কাজের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। সমস্ত পরিশ্রমমূলক কাজই প্রশংসনীয়, কিন্তু শিক্ষা দ্বারা সমস্ত কাজেরই মনোভাড়া। আপনাদের জাতীয় ব্যবসা উন্নতির জন্যও শিক্ষা দরকার। পূর্বেই বলিয়াছি শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিতে হইবে। আপনাদের যে তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীর বেহা বেহা আজ্ঞা করেন, তাহাও শিক্ষা দ্বারা দূর করিতে পারেন। নিজেদের মস্তামঙ্গল বৃদ্ধিতে অপরের উপদেশ শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেরাই নিজেদের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। সমবায় সমিতির সাধ্যো শিক্ষা প্রচারও সহজসাধ্য।

কিন্তু এসময়ই নির্ভর কবে আপনাদের নিজেব উপর। অস্ত্রব সাহায্যের উপব ভরসা কবিবেন না। এবং বস্তৃতঃও অস্ত্রব সাহায্য ছাড়া কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ কবা যায় না। একটা কথা আছে—‘বাবা নিজের সাহায্য নিজে করে ভগবান তাদের সাহায্য করেন’। আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সজ্জব অংশ ভাবিয়া প্রত্যেককে সম্মিতিব নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। বৎসবে একদিন মাত্র সভা উপস্থিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়া তারপব একবৎসব ‘বার বার তাব তাব’ হইলে চলিবে না। আপনাবা সাহসী, ভীষণ নদীতে প্রচণ্ড স্রোতে কত বিপদের মধ্যে আপনাদের কর্মক্ষেত্র, আপনাবা কোশলী ও বুদ্ধিমান, বিপদপূর্ণ কর্মস্থলে তাহাব শত পরিচর দিষাছেন; আপনাবা চেষ্টা করিলে যে আশ্রয়প্রার্থী বরিয়া সকলের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে পারিবেন, আর্থিক উন্নতি করিয়া, নৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দৃঢ় ও উন্নত করিয়া মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা আশা করি, কুমুদশঙ্কর-বাবু নিজের জমিদারীতে বাহা করা যায়, ধীরসম্প্রদায়কে সেই সেই উপায় অবলম্বন করাইবার চেষ্টা ক্রমাগত করিতে থাকিবেন। ইহত তিনি তাহা করিয়াছেন।

কয়েদীদের কথা

বঙ্গের ১৯২৬ সালের জেল রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, ঐ বৎসর মোট ২১৮৩৪ জন জী ও পুরুষ কয়েদী জেলে প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে শতকরা ৫৬.০৬ মুসলমান, ৪০.৬৮ হিন্দু, ০.৭৬ খৃষ্টিয়ান, ১.৩০ বৌদ্ধ ও জৈন, ১.২০ অন্তান্ত। বঙ্গের অবিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৩.৫৫ মুসলমান, ৪৩.৭২ হিন্দু, ০.৩১ খৃষ্টিয়ান। অতএব ১৯০৬ সালে মুসলমানেরা ও খৃষ্টিয়ানরা হিন্দুদের চেয়ে কিছু বেশী অপরাধ-প্রবণতা দেখাইয়াছিল। ১৯২৫ সালেও আপেক্ষিক অপরাধ-প্রবণতা এইরূপ ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সমাজ কারণ-চিন্তা করিবেন। হিন্দু কয়েদীর সংখ্যা ও অমুপাত আরও কম হইত, যদি পটুখাখালীতে সত্যগ্রহ না চলিত।

জীলোক কয়েদী ৪২০ জনের মধ্যে ২৩৪ জন হিন্দু, ১১৭ মুসলমান, ১১ খৃষ্টিয়ান, বাকী ৫৮ অন্তান্তধর্মাবলম্বী। হিন্দু জীলোকদিগের মধ্যে অতিরিক্ত অপরাধ-প্রবণতার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করা হিন্দু দলপতিদের কর্তব্য।

পুরুষ কয়েদী ২১৪১৪ জনের মধ্যে ১২১২৬ মুসলমান, ও ৮৬৪৬ জন হিন্দু। মুসলমান পুরুষ কয়েদীরা শতকরা ৫৬.৬ এর বেশী। মুসলমান পুরুষদের অপরাধপ্রবণতা হিন্দু পুরুষদের চেয়ে বেশী। এবিষয়ে বাহা কর্তব্য, মুসলমান নেতারা তাহা করিবেন।

ধর্মের অবমাননার শাস্তি

কোন ধর্মের, ধর্মপ্রবর্তকের, অবতারদিগের, দেব-গণের, সাধুসন্তগণের অবমাননা হয়, তাহা আমরা চাই। কিন্তু ক্রিপা সমালোচনা, ক্রিপা পরিহাস উপহাস। ব্যঙ্গ শ্লেষ নিশ্চিত অবমাননা বিবেচিত হইতে পারে, কঠিন। আইন করিয়া দিলে ধর্মবিষয়ক মত প্রব-স্বাধীন আলোচনায় বাবা পড়িবার সম্ভাবনা। আইন হইলেই যে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তাহা সুপ্রযুক্ত এবং ভ্রায়সঙ্গত বিচার হইবে, ভেদনীতি-পরায়ণ বি-রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে তাহার প্রত্যাশা করা না। এপর্যন্ত আইন বাহা আছে, তাহা হিন্দুদের বি-প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সমশ্রেণীস্থ রচনার জন্ত খৃষ্টিয়া মুসলমানদের বিকক্ষে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহার অনেক দৃষ্ট-আছে। এইরূপ নানা কারণে, ধর্মের অবমাননা স-নূতন আইন করিয়া বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাতে নূতন ক্ষমতা দেওয়ার আমরা বিরোধী। বিশেষ করিয়া কোন ক্ষমতা ত নূতন করিয়া দেওয়া উচিতই বাহার দ্বারা সরকারী কর্মচারীরা পক্ষপাতিত্ব দে-সাংস্কারিক বিষে ও বিরোধ বাড়াইতে পারে। বেক্রপ গতক দেখা যাইতেছে, এই উদ্দেশ্যে প্রণীত যে-সিলেক্ট কমিটির হাতে গিয়াছে, তাহা পাস হইয়া যা-তাহা যদি হয়, তাহা হইলে পাস হইবার পূর্বে অপমানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু ক-ক্ষমতা কেবল গবর্ণমেন্টের হাতে না রাখিয়া ধা-ধর্মের অপমান হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে, তাহাদি-নাশি করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে-জৈন বৌদ্ধ ইহুদী পার্শি খৃষ্টিয়ান মুসলমান শিব ব্রাহ্ম সমাজ সমাজী প্রভৃতি যে-কোন ব্যক্তির ধর্মে আঘাত লাগে-তিনিই মোকদ্দমা করিতে পারিবেন; কাহাকেও ক্ষে-সোপর্দ করা-না-করা সরকারী কর্মচারীদের মর্জির-নির্ভর করিবে না, কেবলমাত্র দণ্ড দেওয়া না-বিচারকের ভ্রায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে। এরূপ ব্যব-অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু গবর্ণ-হাতে সব ক্ষমতাটা দিয়া রাখা ভাল নয়। ই-বিষয়, যে, কতকগুলো ধর্মীয় পবধর্মধর্মী-দোষে গবর্ণ-এরূপ আইন করিবার সুযোগ

ত্রিপুরার মহারাজার গদী-প্রাপ্তি

ত্রিপুরার নূতন মহারাজাকে বঙ্গের গবর্ণর বসাইবা দিয়া আসিয়াছেন। তদুপলক্ষে আম-হইয়াছে। নূতন মহারাজা সকল রকমে প্রজার